যে কোন সময়ে
যে কোন স্থানে
যে কোন উপলক্ষে
খাটাউ
ভয়েল
মাকানজী স্পিনিং এণ্ড উইভীং কোং লিঃ, মিলস্ ঃ বাইকুল্লা, বোম্বাই।
অফিস ঃ লক্ষ্মী বিল্ডিং, ব্যালার্ড এষ্টেট, বোম্বাই।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
আনন্দমেলা		২২৫—২৪৮
শব্দভেজ্জা—মৌমাছি	... ...	২২৫
কর্তার ইচ্ছায় কর্ম (পৌরাণিক গল্প)	শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত	২২৬
বাংলার বীর প্রতাপাদিত্য (ইতিহাসের কথা)	শ্রীযামিনীকান্ত সোম	২২৭
কানাই বলাই দুটি ভাই (গল্প)	শ্রীনরেন্দ্র দেব ...	২২৮
রেলগাড়ি (আবৃত্তি-অভিনয়)	শ্রীরাধারানী দেবী ...	২২৯
বর্ষা-রাতের ছড়া (নৃত্য-নাটিকা)	শ্রীঅখিল নিয়োগী ...	২৩০
দিনের শেষে (মজার গল্প)	শ্রীলীলা মজুমদার ...	২৩১
তিনজনা (কবিতা)	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়	২৩২

ন্যাশনাল কারবন কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিঃ, বোম্বাই • কলিকাতা • মাদ্রাজ • নয়াদিল্লী

পূজার অভিনন্দন!

INSIST ON A
Lip-tight
FEEDER & NIPPLE

পূজা অভিনন্দন

মহীশূর
ল্যাম্প

বাজারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
ভারত সরকারের দর চুক্তি অনুযায়ী
সকল প্রকার ল্যাম্প নির্মিত হয়

দি মহীশূর ল্যাম্প
ওয়ার্কস লিঃ

মল্লেশ্বরম্ পোঃ, বাঙ্গালোর—৩
টেলিগ্রাম—'MYSORE LAMP'
টেলিফোন: ২০২৬

বঙ্গ, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার
সোল-সেলিং এজেন্ট:
মেসার্স অমৃতলাল ওঝা
এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
সিকিউরিটি হাউস,
৩৭-বি, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা—১

বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ...
নবোদয় ফিল্মস্-এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য

বিভ্রান্ত

কাহিনী—অজিত দে
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—চিত্ত মুখোপাধ্যায়
সুর—বেচু দত্ত
আবহ-সংগীত—
সুজিত নাথ ও কাজী অনিরুদ্ধ
শব্দযোজনা—জগবন্ধু বসু

রূপায়ণে—অসিতবরণ • সাবিত্রী • পাহাড়ী
কমল মিত্র • আশীষকুমার • কানু বন্দ্যোঃ
পদ্মা দেবী • তপতী ঘোষ • বোম্বাই, নটী
ও আরো অনেকে

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে দ্রুত
নির্মীয়মাণ

(সি ৫৯২৪)

GG BRAND
JAMS and CHOCOLATES
G.G. INDUSTRIES · AGRA

Calcutta Agent:
Advani Private Limited,
3D, Garstin Place, Calcutta-1.

জয়শ্রী শারদীয়া সংখ্যা

২০শে বাহির হইয়াছে। মূল্য—১৷৷৹
প্রবন্ধ—নির্মলকুমার বসু, অতীন্দ্রনাথ বসু, রথীন্দ্রনাথ রায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যব্রত বসু প্রভৃতি
গল্প—আশাপূর্ণা দেবী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সমরেশ বসু, সুশীল রায় ও আরো অনেকে
কবিতা—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, কিরণশঙ্কর সেন, সৌমিত্রশঙ্কর সেনগুপ্ত ও আরো অনেকে।
এ ব্যতীত বিশিষ্ট সাহিত্যিকের রসরচনা ভ্রমণ-কাহিনী, পুস্তক-পরিচয় ইত্যাদিতে এ সংখ্যা সমৃদ্ধ।
এজেন্টগণ যোগাযোগ করুন।
মূল্য অগ্রিম দেয়। কার্য্যাধ্যক্ষ—জয়শ্রী,
৪৭এ রাসবিহারী এভিনু, কলিঃ—২৬

০ উৎসবে আনন্দে অপরিহার্য ০
একটি ফিলিপ্স্ রেডিও

নভোসনিক ও সুপার-এম রেডিও জগতে
ফিলিপ্সের অনবদ্য অবদান
নতুন বিশেষ মডেলগুলি বাজিয়ে শুনুন

BCA 655 AC/DC or AC	৭২৫,
„ 456 AC/DC or AC	৫৫০,
„ 435 AC/DC	৪২৫,
„ 366 U AC/DC	৩১৫,
„ 236 U AC/DC	১৮৫,
„ 355 B ড্রাই ব্যাটারী	৩১৫,
„ 236 B „ „	১৮৫,

এ ছাড়াও ফিলিপ্সের অন্যান্য হল্যান্ড মডেল রেডিও, রেডিওগ্রাম, অটো রেডিও, রেকর্ড চেঞ্জার, টেপ রেকর্ডার প্রভৃতির জন্য আমাদের কাছেই আসুন।
॥ ফিলিপ্সের অনুমোদিত বিক্রেতা ॥

রেডিও ম্যানুফ্যাকচারার্স অফ ইণ্ডিয়া
৭০, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩
হিন্দ সিনেমার পাশে ০ ফোন: ২৪-১৩৯২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
সাহিত্যিকের সম্মান (সত্যি ঘটনা)	শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র	২৩৩
পূজোর চিঠি (কবিতা)	শ্রীনবগোপাল সিংহ	২৩৩
ঠেকে শেখা (গল্প)	শ্রীইন্দিরা দেবী	২৩৪
একানড়ের দাদা (ছড়া)	শ্রীবীণা দে	২৩৫
মধুমতীর হাটে (কবিতা)	বন্দে আলী মিঞা	২৩৬
ফসল (ছবি-ছড়া)	শ্রীসমর দে	২৩৬
শ্রীশ্রীভন্ডোলা বাবাজী (হাসির গল্প)	[illegible]	২৩৭
ধনী, মানী, উচ্চ, তুচ্ছ (রূপক)	শ্রীমনোজিৎ বসু	২৩৯
হ্যাংলা (গল্প)	শ্রীশৈলেন ঘোষ	২৪০
বাড়ির খবর সবই ভালো (হাসির কবিতা)	শ্রীআশা দেবী	২৪২

ঐতিহ্যেরই পথে----

সুতার সূক্ষ্মতা এবং
বয়নকৌশলে প্রাচীন ভারতের বস্ত্রশিল্প
আমাদের উন্নত শিল্পবোধ ও রুচিজ্ঞানের যে পরিচয় দিয়েছিল
কোন দেশই তার সমকক্ষ হতে পারে নি।
আজও আমরা সেই গৌরবময় ঐতিহ্য, সেই
বর্ণোজ্জ্বল অতীতের মান রক্ষা করে চলেছি।

কেশোরাম কটন মিলস্ লিঃ

ম্যানেজিং এজেন্টস্ : বিড়লা ব্রাদার্স প্রাইভেট লিঃ
৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১

বাংলার প্রাচীনতম সংগীত প্রতিষ্ঠান

বাসন্তী বিদ্যা বীথি

ত্রিংশতিতম জয়ন্তী উৎসবে সমাবর্তণী বক্তা ভারতবিখ্যাত সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত বিনায়করাও পটবর্ধনের অভিমত—"......

আজ আমি কোলকাতার বাসন্তী বিদ্যা বীথি পরিদর্শন করেছি। এঁদের শিক্ষা-পদ্ধতি ও অন্যান্য কার্যক্রমের সঙ্গে পরিচিত হয়ে অশেষ আনন্দ পেয়েছি। স্বকীয় প্রচেষ্টায় বিগত ত্রিশ বছরে তাঁরা সংগীত শিক্ষার মানকে যে স্তরে উপনীত করেছেন, তাতে আমার বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে এই সংগীত বিদ্যালয় একটি সংগীত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণতি লাভ করবে।"

স্বাক্ষর—ভি এন পটবর্ধন।
কলিকাতা, ৯ই সেপ্টেম্বর '৫৭
(হিন্দী অনুলিপি হইতে অনূদিত)

—কেন্দ্রসমূহ—

১২২-১, রাসবিহারী এভেন্যু, বালীগঞ্জ।
চৌরঙ্গী কলোনী দপ্তর।
২৭এ, হরমোহন ঘোষ লেন, বেলেঘাটা।
২৯৬বি, আপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার।
২৭, দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, ভবানীপুর।
বার্ণপুর—আসানসোল — কুলটি—চিত্তরঞ্জন
কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ ১বি, অক্রূর দত্ত লেন (দ্বিতল), কলিকাতা—১২।

প্রস্তুতকারক ঃ জাইস আইকন, এ জি, ষ্টাটগার্ট, পশ্চিম জার্মানি

সিগনারা নেটার (৬×৬ সি এম) :		সুপার আইকন্টা III	
লেন্সার এফ: ৪·৫, ভেলিও	১৩৫, টাকা	লেন্সার এফ: ৩·৫ প্রণ্টর-এস ভি এস	৪৬৪, টাকা
লেন্সার এফ: ৪·৫, প্রণ্টো	১৫৬, টাকা	সুপার আইকন্টা IV	
লেন্সার এফ: ৪·৫, প্রণ্টর এস ভি এস	২০০, টাকা	টেসার এফ: ৩·৫ সিঙ্ক্রো-কম্পুর	৮৫০, টাকা

স্থানীয় কর বাদে

আরও বহুরকম মডেলেরও মূল্যহ্রাস। আপনার জাইস ডীলারের সহিত শীঘ্র যোগাযোগ করুন।

ভারতের সোল এজেন্টস

অ্যাডেয়ার দত্ত অ্যাণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ

কলিকাতা - বোম্বাই - মাদ্রাজ - নয়াদিল্লী - সেকেন্দ্রাবাদ

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
জন্মদিন (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মাল্য বসু	২৪২
পুজোর উপহার (কবিতা)	শ্রীশান্তশীল দাস	২৪২
পায়রা-টায়রা (ছবি-ছড়া)	শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ	২৪২
কার্ডবোর্ডের কাজ (হাতের কাজ)	শ্রীসুধাংশু কর	২৪৩
রাজকন্যা কংকাবতী (কবিতা)	আশরাফ সিদ্দিকী	২৪৪
সোনামণি (গল্প)	শ্রীনন্দদুলাল সরকার	২৪৪
দূর হ কাক, দূর হ (তিব্বতী উপকথা)	শ্রীমণীন্দ্র দত্ত	২৪৬
থটরিডিং-এর ম্যাজিক (জাদুর খেলা)	শ্রী এ সি সরকার	২৪৭
নতুন ছড়া (ছড়া)	শ্রীবিমল ঘোষ	২৪৭
ছাতাছাট (ফটো ও ছড়া)	শ্রীরেবন্ত ঘোষ	২৪৮
[illegible] (প্রবন্ধ)	শ্রীমনোজ বসু	২৪৯
বিচিত্র সংলাপ (নাট্য-চিত্র)	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	২৫৬

অনতিবিলম্বে মুক্তি প্রতীক্ষায়!

ভারতীয় নারীত্বের মহিমা মাতৃত্বে........সেই মাতৃত্বেরই এক মহাকাব্য.........

একমাত্র পরিবেশক:

হিন্দুস্থান সুপার ফিল্মস্ (প্রাঃ) লিমিটেড

ফোন: ২৩—১৬৮৩

সূচীপত্র

বিষয় লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
বাঙালীর চিন্তাধারায় তন্ত্রের প্রভাব (প্রবন্ধ)—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন	২৫৯
আফিস-ঘর (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ...	২৬৪
পুরমুখ (স্মৃতিকথা)—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন	২৭১
দণ্ডকারণ্য (গল্প)—সম্বুদ্ধ	২৭৫
খাপছাড়া বাঙালী (প্রবন্ধ)—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ...	২৮৬
ইতিহাসের উপাদান (প্রবন্ধ)—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ...	২৯৫
দিনাজপুরে সাঁওতাল (প্রবন্ধ)—শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় ...	৩০৩
বাংলা নাটক ও নাট্যশালা (প্রবন্ধ)—শ্রীপ্রভাংশু গুপ্ত ...	৩০৫
যুদ্ধোত্তর নাট্য-আন্দোলন (প্রবন্ধ)—শ্রীতরুণ রায় ...	৩১১
চণ্ডীর মাতৃভাবনা (প্রবন্ধ)—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন ...	৩১৩
ঘটকর্পর ও কালিদাস (প্রবন্ধ)—ডঃ শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	৩১৯

চরিত্রহীন
ভূমিকায়: উত্তমকুমার
গঠনপথে
উপেন গঙ্গোপাধ্যায় এর
যৌতুক
প্রধান চরিত্রে: উত্তমকুমার

উন্নত কৃষিযন্ত্র উদ্ভাবন এবং নির্মাণে আত্মনিয়োজিত এক-মাত্র ভারতীয় প্রতিষ্ঠান

●

কার্লওম্‌স্‌ এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ

●

আমাদের আধুনিক কৃষি-যন্ত্রপাতির মধ্যে আছে * হুইল হো (নিড়েন যন্ত্র) * সিড ড্রিল (বীজ বোনার যন্ত্র) * জাপানী প্যাডি উইডার (ধানের নিড়েন যন্ত্র) * প্যাডি থ্রেসার (ধান মাড়াই যন্ত্র) ইত্যাদি রকমের যন্ত্রপাতি।

* আমাদের যন্ত্রপাতির বৈশিষ্ট্য *
* সহজ ও সবরকমের জটিলতাহীন
* পরিচালনে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয় না
* অংশাদি সহজে বদলান যায়
* কামারশালায় মেরামতে চলে
* টেকসই অথচ দামে খুব সস্তা

●

হেড অফিস:
২৮, ওয়াটারলু স্ট্রীট, কলিকাতা-
ফোন: ২৩—৬১২৭

ভারতনাট্যমের প্রতীক বৈজয়ন্তীমালা বলেন—

কামিনীয়া প্রসাধন দ্রব্যাদি
সবচেয়ে বেশী পছন্দ করি

ব্যবহারে উজ্জ্বল কেশদাম, নিখুঁত বর্ণসুষমা ও সাটিন-কোমল ত্বক
সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়

তিনি বলেনঃ—"আমি জানি কামিনীয়া প্রসাধন দ্রব্যাদির সমতুল আর কিছু নাই। আমি আমার পছন্দে সুখী। এইটিই ঠিক।"

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল কোং
বোম্বাই—২

কামিনীয়া
কেশ তৈল
কামিনীয়া স্নো
দিলবাহার টয়লেট সোপ
অটো দিলবাহার

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের জন্য একমাত্র পরিবেশকঃ

মেসার্স আর, শঙ্করলাল এণ্ড কোং

৮৭, খেংরাপটি স্ট্রীট, কলিকাতা—৭

[রাজপুত চিত্র অষ্টাদশ শতাব্দী]

কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি॥—শ্রীশ্রীচণ্ডী

ব্লক ও মুদ্রণ - ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

শ্রীঅজিত ঘোষের সৌজন্যে

বৎসর পরে আমরা পুনরায় মাতৃপূজার অংগনে সমবেত হইয়াছি। সংসারে মাতৃভক্ত সকলেই, কিন্তু বোধ হয় বাঙগালীর মাতৃভক্তি কিছু বেশী। বাঙগালী যেমন "মা" বলিয়া ডাকিতে পারে, দেবতাকে জননীরূপে ডাকিয়া আপন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারে, এমন আর কেহ পারে কিনা সন্দেহ! সেইজন্য বাংলাদেশে মাতৃমন্ত্রের এমন জাগরণ, মাতৃপূজার এমন প্রাধান্য, মাতৃ-নাম-গানের এত রচনা ও এত প্রচার। দেবতাকে "মা" বলিয়া ডাকিয়া বাঙগালী যে আনন্দ লাভ করে, এমন আনন্দ অন্য কোন সমাজে জাগরিত হয় কিনা জানি না।

জগজ্জননী মাতৃরূপে আসিয়াছেন; পূজার অংগন তাঁহার দিব্য প্রচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। যে মা গৃহে জননী, সেই মা-ই পূজাবেদীর উপরে জগজ্জননীরূপে প্রতিষ্ঠিতা। ইহা বাঙগালীর অপূর্ব উপলব্ধি ও অপূর্ব সাধনা। বাংলার সাধকেরা এই সাধনায় সিদ্ধিলাভের যে চূড়ান্ত পর্বতে আরোহণ করিয়াছেন, তেমন আর কেহ পারে নাই। রামপ্রসাদ হইতে রামকৃষ্ণ পর্যন্ত একই ইতিহাস এবং ইহা নিতান্ত ইদানীন্তনকালের ইতিহাস। বাংলার সাধনা এই এক ধারায় চলিয়া আসিয়াছে।

জননী আনন্দময়ী, জননী স্নেহময়ী; কিন্তু জননী শক্তিস্বরূপিণী,—যে শক্তিতে সৃষ্টি ও প্রলয়, উত্থান ও পতন অনন্তকাল ধরিয়া ঘটিতেছে। পাশ্চাত্ত্য জগৎ শক্তির সাধনা করে, তাহা জড়শক্তি; তাহা শেষ পরিণতিতে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতেছে। আমাদের দেশে শক্তির সাধনা হইয়াছে; তাহা চৈতন্যময়ী শক্তি, কল্যাণময়ী শক্তি। তাহা মৃত্যুকে প্রতিহত করে, জীবনকে রক্ষা করে এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে। "ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী" বলিয়া সাধক যখন মায়ের স্তব করেন তখন দশপ্রহরণ প্রয়োগে ধ্বংসের কথা ধারণা করেন না, জগৎ সংরক্ষণের চিন্তাই করিয়া থাকেন। সাধক অবনতমস্তকে প্রার্থনা করেন—"তুমি প্রণতগণের প্রতি প্রসন্ন হও, বিশ্বের আর্তি হরণ কর, ত্রৈলোক্যবাসিগণের নিকটে বরদমূর্তিতে প্রকটিত হও।"

"প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥"
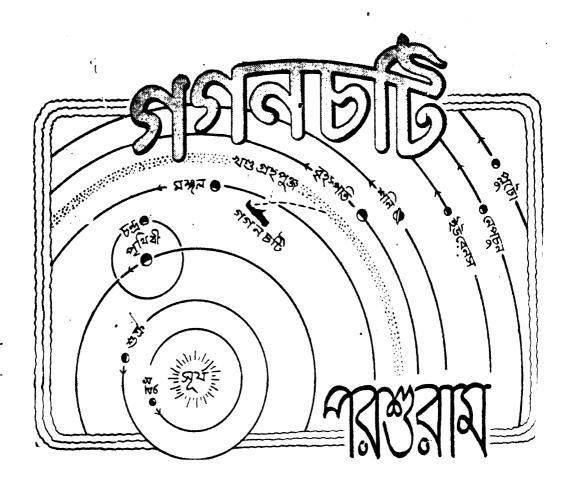
হাতিবাগানের দরজী আবুবকর মিঞা আর তার বউ রমজানী বিবি সন্ধ্যার সময় পশ্চিম আকাশে ঈদের চাঁদ দেখছিল। হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিস রমজানীর নজরে পড়ল। সে তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল, ও মিঞা, আসমানের মাঝখানে ছোট্ট কাটারির মতন জ্বলজ্বল করছে ওটা কি গো? আবুবকর অনেকক্ষণ ঠাহর করে বলল, কাটারি নয় রে, ওটা পয়জার, দেখছিস না তালতলার চটির মতন গড়ন। বোধ হয় মল্লিকবাবুরা ফানুস উড়িয়েছে।

আবুবকরের অনুমান ঠিক নয়, কারণ, পরদিন এবং তার পর রোজই সন্ধ্যার পর আকাশে দেখা গেল। এই অদ্ভুত বস্তু ফানুসের মতন এদিক ওদিক ভেসে বেড়ায় না, আকাশে স্থির হয়েও থাকে না, চাঁদ আর গ্রহ-নক্ষত্রর মতন এর উদয়-অস্ত হয়। উদীয়মান জ্যোতিঃসম্রাট তারক সান্যালকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ওটা রাহু বলেই মনে হচ্ছে, মহাবিপদের পূর্বলক্ষণ। এই কথা শুনে প্রবীণ জ্যোতিঃসম্রাট শশধর আচার্য বললেন, তারকটা গোমূর্খ, রাহু হলে মুণ্ডুর মতন গড়ন হত না? ওটা কেতু, ল্যাজের মতন দেখাচ্ছে। অতি ভীষণ দুর্নিমিত্ত সূচনা করছে। তোমাদের উচিত গ্রহশান্তির জন্য যাগ করা আর অষ্টপ্রহরব্যাপী হরিসংকীর্তন।

একটা আতঙ্ক সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। খবরের ক
নানারকম মন্তব্য প্রকাশিত হতে লাগল। একজন লিখ
বোধ হয় উড়ন চাকতি, ধাক্কা লেগে তুবড়ে গিয়ে চটিজ
মতন দেখাচ্ছে। আর একজন লিখলেন, নিশ্চয় ল্যাজ
ধূমকেতু, সূর্যের আর একটু কাছে এলেই নূতন ল্যাজ গ
তার ঝাপটায় পৃথিবী চুরমার হতে পারে।

প্রবীণ হেডপণ্ডিত কুঞ্জবিহারী তলাপাত্র কাগজে লিখ
এই আকাশচারী ভয়ংকর পাদুকা কোন্ মহাপুরুষের? দে
মনে হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। মধ্যশিক্ষাপর্ষদের খাম
দেখিয়া সেই স্বর্গস্থ তেজস্বী মহাত্মার ধৈর্যচ্যুতি হই
তাই তাঁহার এক পাটি বিনামা গগনতলে নিক্ষেপ করিয়া
এই উড়ুক্কু গগন-চটি শীঘ্রই শিক্ষাপর্ষদের মস্তকে নিপ
হইবে।

সরকার-বিরোধী দলের অন্যতম মুখপাত্র বিরূপাক্ষ
লিখলেন, না, বিদ্যাসাগরের চটি নয়, তার শুঁড় এত বড়
না। এই আসমানী পয়জার হচ্ছে স্বর্গস্থ মনীষী
মহেন্দ্রলাল সরকারের। যত সব মেডিক্যাল কলেজ
হাসপাতালের কেলেঙ্কারি দেখে তিনি খেপে উঠেছেন,
কাছে অন্য হাতিয়ার না পেয়ে এক পাটি চটি ছেড়ে
কর্তারা হুঁশিয়ার।

ভক্তকবি হেমন্ত চট্টরাজ লিখলেন, এই গগন-চটি মা

নয়, এ হচ্ছে মূর্তিমান ঐশ রোষ। চুরি ঘুষ ভেজাল মিথ্যাচার ব্যভিচার ভণ্ডামি ইত্যাদি পাপের বৃদ্ধি রাজ্য-সরকারের অকর্মণ্যতা, ধনীদের বিলাসবাহুল্য, ছেলেমেয়েদের সিনেমোন্মাদ, এই সব দেখে নটরাজ চঞ্চল হয়েছেন, প্রলয়-নাচন নাচবার জন্য ডান পা বাড়িয়েছেন, তা থেকেই এই রুদ্র চটি গগনতলে খসে পড়েছে। প্রলয়ংকর রুদ্রতাণ্ডব শুরু হতে আর দেরি নেই, জগতের ধ্বংস একেবারে আসন্ন। দেশের ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ আবালবৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ যদি শীঘ্র ধর্মপথে ফিরে না আসে তবে এই রুদ্ররোষ সকলকেই ব্যাপাদিত করবে।

কিন্তু আনাড়ী লোকদের এই সব জল্পনা শিক্ষিত জনের মনে লাগল না। বিশেষজ্ঞরা কি বলেন? বিশ্বম্ভর কটন মিল, বিশ্বম্ভর ব্যাংক, বিশ্বম্ভরী পত্রিকা ইত্যাদির মালিক শ্রীবিশ্বম্ভর চক্রবর্তী একজন সর্ববিদ্যাবিশারদ লোক, কোনও প্রশ্নের উত্তরে তিনি 'জানি না' বলেন না। কিন্তু গগন-চটির কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি শুধু গম্ভীরভাবে উপরনীচে ডাইনেবাঁয়ে ঘাড় নাড়লেন। কয়েকজন অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা বললেন, এখন কিছু বলা যায় না, তবে নক্ষত্র নয় তা নিশ্চিত, কারণ এর গতিপথ বিষুববৃত্তের ঠিক সমান্তরাল নয়। এই আগন্তুক জ্যোতিষ্কটি গ্রহের মতন বিপথগামী। পুচ্ছহীন ধূমকেতু হতে পারে। তা ভয়ের কারণ আছে বইকি। খালি চোখে যতই ছোট দেখাক বস্তুটি নিশ্চয় প্রকাণ্ড। দেখা যাক আমাদের কোদাইক্যানাল মানমন্দির আর গ্রীনিচ প্যালোমার ইত্যাদি থেকে কি রিপোর্ট আসে।

রিপোর্ট শীঘ্রই এল, দেশ-বিদেশের সমস্ত বিখ্যাত মানমন্দির থেকে একই সংবাদ প্রচারিত হল। দুর্বোধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বাদ দিয়ে যা দাঁড়ায় তা এই।—সূর্যের নিকটতম গ্রহ হচ্ছে বুধ (মার্কারি), তার পরে আছে শুক্র (ভিনস), তার পরে আমাদের পৃথিবী, তার পর মঙ্গল (মার্স), তার পর বহু দূরে বৃহস্পতি (জুপিটার)। মঙ্গল আর বৃহস্পতির কক্ষের মাঝামাঝি পথে প্রকাণ্ড এক ঝাঁক অ্যাস্টারয়েড বা ছোট ছোট খণ্ডগ্রহ সূর্যকে পরিক্রমণ করে। তারই একটা হঠাৎ কক্ষভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবীর নিকটে এসে পড়েছে। এই খণ্ডগ্রহটি গোলাকার নয়। ভারতীয় জ্যোতিষীরা এর নাম দিয়েছেন গগন-চটি অর্থাৎ হেভেনলি স্লিপার। আপাতত আমরাও সেই নাম মেনে নিলাম। এই গগন-চটির কিঞ্চিৎ স্বকীয় দীপ্তি আছে, তার উপর সূর্যকিরণ পড়ায় আরও দীপ্তিমান হয়েছে। পৃথিবী থেকে এর বর্তমান দূরত্ব পৌনে দু কোটি মাইল, প্রায় দু বৎসরে সূর্যকে পরিক্রমণ করছে। এর আয়তন আর ওজন চন্দ্রের প্রায় পাঁচ গুণ। এত বড় অ্যাস্টারয়েডের অস্তিত্ব জানা ছিল না। অনুমান হয়, গোটা কতক খণ্ডগ্রহের সংঘর্ষ আর মিলনের ফলে উৎপন্ন হয়ে এই গগন-চটি ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। এর উত্তাপ আর স্বকীয় দীপ্তিও সংঘর্ষজনিত। এই বৃহৎ অ্যাস্টারয়েড নিকটে আসায় মঙ্গল গ্রহ আর চন্দ্রের কক্ষ একটু বেঁকে গেছে, [illegible]দের জোয়ার ভাটার সময়ও কিছু বদলেছে। পৃথিবী [illegible] এর দূরত্ব এখন পর্যন্ত যা আছে তাতে বিশেষ ভয়ের [illegible] নেই, তবে সন্দেহ হচ্ছে গগন-চটি ক্রমেই কাছে আসছে। যদি বেশী কাছে আসে, তবে আমাদের এই পৃথিবীর পরিণাম [illegible]ক হবে তা ভাবতেও হৃৎকম্প হয়।

এই বিবৃতির ফলে অনেকে ভয়ে আঁতকে উঠল কয়েকজন [illegible]লকায় ধনী হার্টফেল করে মারা গেল। অনেকে পেটের অসুখ, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি আর হাঁপানিতে ভুগতে [illegible]গল। হিন্দুধর্মের সনাতনপন্থী স্বামী মহারাজগণ মুসল-[illegible]ন মোল্লা-মওলানাগণ এবং খৃষ্টীয় পাদরীগণ নিজের নিজের শাস্ত্র অনুসারে হিতোপদেশ দিতে লাগলেন। সাহিত্যিকরা উপন্যাস কবিতা রম্যরচনা প্রভৃতি বর্জন করে পরলোকের কথা লিখতে লাগলেন। কিন্তু বেশির ভাগ লোকের দুশ্চিন্তা দেখা গেল না, বরং গগন চটির হুজুগে পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা জমে উঠল। শেয়ারবাজারে বিশেষ কোনও মন্দা দেখা গেল না, সিনেমার ভিড়ও কমল না।

কিছুদিন পরেই দফায় দফায় যে জ্যোতিষিক সংবাদ আসতে লাগল তাতে লোকের পিলে চমকে উঠল, রক্ত জল হয়ে গেল। গগন-চটি নামক এই দুষ্টগ্রহ ক্রমশ পৃথিবীর নিকটবর্তী হচ্ছে এবং মহাকর্ষের নিয়ম অনুসারে পরস্পর টানাটানি চলছে। চন্দ্রসমেত পৃথিবী আর গগন-চটি যেন মিলে মিশে তাল-গোল পাকাবার চেষ্টায় আছে। হিসাব করে দেখা গেছে, পাঁচ মাসের মধ্যেই চন্দ্র আর গগন-চটির সংঘর্ষ হবে, তার পর দুটোই হুড়মুড় করে পৃথিবীর উপর পড়বে। তার ফল যা দাঁড়াবে, তার তুলনায় লক্ষ হাইড্রোজেন বোমা তুচ্ছ। সংঘাতের কিছু পূর্বেই বায়ুমণ্ডল লুপ্ত হবে, সমুদ্র উৎক্ষিপ্ত হবে, সমস্ত প্রাণী রুদ্ধশ্বাস হয়ে মরবে। চরম ধ্বংসের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের কিছু করণীয় নেই।

বিভিন্ন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মুখপাত্রগণ একটি যুক্ত বিবৃতি প্রচার করলেন —আমাদের করণীয় অবশ্যই আছে। সেকালে বৃদ্ধরা একটি ছড়া বলতেন —If cold air reach you through a hole, Go make your will and mend your soul। কিন্তু এই আগন্তুক গগন-চটি ছিদ্রাগত শীতল বায়ু নয়, মানবজাতির পাপের জন্য ঈশ্বরপ্রেরিত মৃত্যুদণ্ড, আমাদের সকলকেই ধ্বংস করবে। উইল করা বৃথা, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে আমাদের আত্মার ত্রুটি অবশ্যই শোধন করতে হবে। অতএব সরল অন্তঃকরণে সমস্ত পাপ স্বীকার কর, নিরন্তর প্রার্থনা কর, ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা কর, সকল শত্রুকে ক্ষমা কর, যে কদিন বেঁচে আছ যথাসাধ্য অপরের দুঃখ দূর কর।

ইহুদী মুসলমান আর বৌদ্ধ ধর্মনেতারাও অনুরূপ উপদেশ দিতে লাগলেন। আদি-শংকরাচার্যের একমাত্র ভাগিনেয়ের বংশধর ১০০৮শ্রী ব্যোমশংকর মহারাজ একটি হিন্দী পুস্তিকা ছাপিয়ে পঞ্চাশ লক্ষ কপি বিলি করলেন। তার সার মর্ম এই।—অয় মেরে বচ্চে, হে আমার বৎসগণ, মৃত্যু-ভয় ত্যাগ কর। আমার বয়স নব্বই পেরিয়েছে, আর তোমরা প্রায় সকলেই আমার চাইতে ছোট, কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই, কারণ ভবযন্ত্রণার ভোগ বালক-বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই সমান। আমাদের আত্মা শীঘ্রই দেহপিঞ্জর থেকে মুক্তি পেয়ে পরমাত্মায় লীন হবে, এ তো পরম আনন্দের কথা, এতে ভয়ের কি আছে? কিন্তু অশুচি অবস্থায় দেহত্যাগ করা চলবে না, তাতে নরকগতি হবে। তোমরা হয়তো জান, কোনও বড় অপারেশনের আগে রোগীকে উপবাসী রাখা হয় এবং জোলাপ আর এনিমা দিয়ে তার কোষ্ঠ সাফ করা হয়। যখন রোগীর পাকস্থলী শূন্য, মলভাণ্ড শূন্য, মূত্রাশয়ও শূন্য, সর্ব শরীর পরিষ্কৃত, তখনই ডাক্তার অস্ত্রপ্রয়োগ করেন। শুচিতার জন্য এত সতর্কতার কারণ—পাছে সেপটিক হয়। এখন ভেবে দেখ, অ্যাপেনডিক্স বা হার্নিয়া বা প্রস্টেট ছেদনের তুলনায় প্রাণ-বিসর্জন কত গুরুতর ব্যাপার। মৃত্যুকালে যদি মনে কিছুমাত্র কালুষ্য বা কলুষ বা কিল্বিষ থাকে, তবে আত্মার সেপটিক অনিবার্য। পাপক্ষালন না করেই যদি তোমরা প্রাণত্যাগ কর, তবে নিঃসন্দেহ সোজা নরকে যাবে। অতএব আর বিলম্ব না করে সরল মনে লজ্জা ভয় ত্যাগ করে সমস্ত পাপ স্বীকার কর, তাতেই তোমরা শুচি হবে। চুপি চুপি বললে চলবে না, জনতার

সমক্ষে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে, কিংবা ছাপিয়ে প্রচার করতে হবে, যেমন আমি করছি। এই পুস্তিকার শেষে তফসিল ক আর খ-এ মৎকৃত যাবতীয় দুষ্কর্মের তালিকা পাবে—কতগুলো ছারপোকা মেরেছি, কতবার লুকিয়ে মুরগি খেয়েছি, কতবার মিথ্যা বলেছি, কতজন ভক্তিমতী শিষ্যার প্রতি কুদৃষ্টিপাত করেছি—সবই খোলসা করে বলা হয়েছে। তোমরাও আর কালবিলম্ব না করে এখনই পাপপ্রক্ষালনে রত হও।

বিলাতে অক্সফোর্ড গ্রুপের উদ্যোগে দলে দলে নরনারী দুষ্কৃতি স্বীকার করতে লাগল, অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য দেশেও অনুরূপ শুদ্ধির আয়োজন হল। ভারতবাসীর লজ্জা একটু বেশী, সেজন্য ব্যোমশংকরজীর উপদেশে প্রথম প্রথম বিশেষ ফল হল না। কিন্তু সম্প্রতি প্যালোমার মানমন্দির থেকে যে রিপোর্ট এসেছে তার পরে কেউ আর চুপ করে থাকতে পারে না। গগন-চটি আরও কাছে এসে পড়েছে, তার ফলে পৃথিবীর অভিকর্ষ বা গ্রাভিটি কমে গেছে, আমরা সকলেই একটু হালকা হয়ে পড়েছি। আর দেরি নেই, শেষের সেই ভয়ংকর দিনের জন্য প্রস্তুত হও।

মনুমেণ্টের নীচে আর শহরের সমস্ত পার্কে দলে দলে মেয়েপুরুষ চিৎকার করে পাপ স্বীকার করতে লাগল। বড়বাজার থেকে একটি বিরাট প্রসেশন ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে বেরুল এবং নেতাজী সুভাষ রোড হয়ে শহর প্রদক্ষিণ করতে লাগল। বিস্তর মান্যগণ্য লোক তাতে যোগ দিয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে করুণ কণ্ঠে নিজের নিজের দুষ্কর্ম ঘোষণা করতে লাগলেন, কিন্তু ব্যাণ্ডের আওয়াজে তাঁদের কথা ঠিক বোঝা গেল না।

বিলাতী রেডিওতে নিরন্তর বাজতে লাগল—Nearer my God to Thee। দিল্লির রেডিওতে 'রঘুপতি রাঘব' এবং লখনউ আর পাটনায় 'রাম নাম সচ হৈ' অহোরাত্র নিনাদিত হল। কলকাতায় ধ্বনিত হল—'সমুখে শান্তিপারাবার।' মস্কো রেডিও নীরব রইল, কারণ ভগবানের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সদ্ভাব নেই। অবশেষে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের সনির্বন্ধ অনুরোধে আমাদের রাষ্ট্রপতি কমিউনিস্ট প্রজাবৃন্দের আত্মার সদ্গতির নিমিত্ত গয়াধামে অগ্রিম পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করলেন।

বৃহৎ চতুঃশক্তি অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের শাসকবর্গ গত পঞ্চাশ বৎসরে যত কুকর্ম করেছেন তার ফিরিস্তি দিয়ে White Book প্রকাশ করলেন এবং একযোগে ঘোষণা করলেন—সব মানুষ ভাই ভাই, কিছুমাত্র বিবাদ নাই। পাকিস্তানের কর্তারা বললেন, ইয়ে বাত তো ঠিক হৈ, হিন্দী পাকী ভাই ভাই, লেকিন আগে কাশ্মীর চাই।

জগদ্ব্যাপী এই প্রচণ্ড বিক্ষোভের মধ্যে শুধু একজনের কোনও রকম চিত্তচাঞ্চল্য দেখা গেল না। ইনি হচ্ছেন হাঠখোলার ভুবনেশ্বরী দেবী। বয়স আশি পার হলেও ইনি বেশ সবলা, সম্প্রতি দ্বিতীয় বার কেদার-বদরী ঘুরে এসেছেন। প্রচুর সম্পত্তি, স্বামী পুত্র কন্যার ঝঞ্ঝাট নেই, শুধু একপাল আশ্রিত কুপোষ্য আছে, তাদের ইনি কড়া শাসনে রাখেন। ভুবনেশ্বরী খুব ভক্তিমতী মহিলা, গীতগোবিন্দ গীতা আর গীতাঞ্জলি কণ্ঠস্থ করেছেন। কিন্তু পাড়ার লোকে তাঁকে ঘোর নাস্তিক মনে করে, কারণ তিনি কোনও রকম হুজুগে মাতেন না। তাঁর ভয়ার্ত পোষ্যবর্গ যখন ব্যাকুল হয়ে অনুরোধ করল, কর্তা-মা, গগন-চটি উদয় হয়েছেন, প্রলয়ের আর দেরি নেই। জগন্নাথ ঘাটে সভা হচ্ছে, সবাই পাপ কবুল করছে, আপনিও করে ফেলুন। মন খোলসা হলে শান্তিতে মরতে পারবেন।

ভুবনেশ্বরী ধমক দিয়ে বললেন, পাপ যা করেছি তা করেছি, ঢাক পিটিয়ে সবাইকে তা বলতে যাব কেন রে হতভাগারা? গগন-চটি না ঢেঁকি, আকাশে লাখ লাখ তারা আছে, আর একটা না হয় এল, তাতে হয়েছে কি? তোরা বললেই প্রলয় হবে? মরতে এখন ঢের দেরি রে, এখনই হা-হুতোশ করছিস কেন? ভগবান আছেন কি করতে? 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে'—রবি ঠাকুরের এই গান শুনিস নি? মানুষকেই যদি ঝাড়ে বংশে লোপাট করে ফেলেন তবে ভগবানের আর বেঁচে সুখ কি? লীলাখেলা করবেন কাকে নিয়ে? যা যা, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমো গে।

কিসে কি হয় কিছুই বলা যায় না। হয়তো ভুবনেশ্বরীর কথায় ত্রিভুবনেশ্বরের একটু চক্ষুলজ্জা হল। হয়তো কার্য-কারণ-পরম্পরায় প্রাকৃতিক নিয়মেই যা ঘটবার তা ঘটল। হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে তিন ইঞ্চি হরফে ছাপা হল—ভয় নেই, [illegible] দূর হচ্ছে। বড় বড় জ্যোতিষীরা একযোগে [illegible], বৃহস্পতি, শনি ইউরেনস আর নেপচুন এই চারটে প্রকাণ্ড গ্রহের সঙ্গে এক রেখায় আসার ফলে গগন-চটির পিছনে টান পড়েছে, সে দ্রুতবেগে পুরাতন কক্ষে নিজের সঙ্গীদের মধ্যে [illegible] আমাদের পৃথিবী বেঁচে গেল।

বিপদ কেটে যাওয়ায় জনসাধারণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, কিন্তু যাঁরা অসাধারণ তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। দেশের হোমরাচোমরা মান্যগণ্যদের প্রতিনিধিস্থানীয় একটি দল দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে নিবেদন করলেন, হুজুর, আমরা যে বিস্তর কসুর কবুল করে ফেলেছি এখন সামলাব কি করে? প্রধানমন্ত্রী সুপ্রীম কোর্টের চীফ জস্টিসের মত চাইলেন। তিনি রায় দিলেন, পুলিসের পীড়নের ফলে কেউ যদি অপরাধ স্বীকার করে তবে তা আদালতে গ্রাহ্য হয় না। গগন-চটির আতঙ্কে লোকে যা বলে ফেলেছে তারও আইন-সম্মত কোনও মূল্য নেই, বিশেষত যখন স্ট্যাম্প কাগজে কেউ অ্যাফিডাভিট করে নি।

বৃহৎ চতুঃশক্তি এবং ইউ-এন-ও গোষ্ঠীভুক্ত ছোট বড় সকল রাষ্ট্র একটি প্রোটোকলে স্বাক্ষর করে ঘোষণা করলেন, গগন-চটির আবির্ভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে আমরা যেসব প্রলাপোক্তি করেছিলাম তা এতদ্দ্বারা প্রত্যাহৃত হল। এখন আবার পূর্বাবস্থা চলবে।

গগন-চটি সুদূর গগনে বিলীন হয়েছে, কিন্তু যাবার আগে সকলকেই বিলক্ষণ ঘা কতক দিয়ে গেছে। আমাদের মান ইজ্জত ধুলিসাৎ হয়েছে, মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে আর দাঁড়াবার জো নেই।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে আমার বন্ধু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। জীবিত থাকিতে তিনি প্রত্নবিদ্‌গণের মধ্যে অগ্রণী বলিয়া অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, সাহিত্যিক মহলে এবং কলিকাতা সমাজের বহু স্তরে প্রচুর সম্মান ও সমাদর লাভ করিয়াছিলেন।

মহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কার করিয়া তিনি ভারতীয় প্রত্নবিদ্যায় একটা বিপুল আলোড়ন আনিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এই কীর্তির জন্য বাঙালীর গৌরব করিবার অধিকার আছে। যাঁহারা নানাবিধ সাধনার দ্বারা বাঙালীর গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাকে স্মরণ করা বাঙালীর কর্তব্য।

কিন্তু ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই এই কৃতী পুরুষের স্মৃতি বাঙালীর চিত্তে এত মলিন হইয়া উঠিয়াছে যে, অধিকাংশ বাঙালী হয়ত তাঁহার নামই জানে না। ইহা পরিতাপের বিষয়, কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। যাঁহারা স্মরণের যোগ্য তাঁহাদের তাড়াতাড়ি বিস্মৃত হইবার পটুত্ব আমাদের অসাধারণ।

আমার এই পরলোকগত বন্ধুর বিদ্যার পরিমাণ ও কীর্তির প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করিবার শক্তি আমার নাই—কেন না, প্রত্নতত্ত্বে আমি বিশেষজ্ঞ নই। কিন্তু তিনি আমার পরম বন্ধু ছিলেন। অনেকদিন তাঁহার সঙ্গে থাকিয়াছি, হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি। তাহাতে আমি তাঁহাকে যতখানি জানিয়াছি, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

ইংরেজী ১৮৮৭ কি ৮৮ সন।

আমার বাবা বগুড়া হইতে বদলী হইয়া বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া আসিলেন। তাঁহার বিশেষ পরিচিত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট উমেশচন্দ্র সেনের বাড়িতে তাঁহার সঙ্গে আমি যাইতাম। সেখানে উমেশবাবুর ছেলে আমার সমবয়সী হারানের সঙ্গে ভাব হইয়াছিল।

প্রায় পাশের বাড়িতেই থাকিতেন উকিল মতিবাবু, রাখালদাসের পিতা।

একটি বিশেষ দর্শনীয় বালক—আমাদের চেয়ে কয়েক বছরের ছোট—মতিবাবুর বাড়ি হইতে বাহির হইত পথে খেলিত। হারানের সঙ্গে তাহার ভাব ছিল, তাই আমারও সামান্য একটু পরিচয় হইয়া গেল।

বালকটি দর্শনীয় ছিল প্রধানত তাহার দেহের প্রসারের জন্য। আমি ও হারান দুইজনেই ছিলাম রোগা টিনটিনে, তাই এই বিশেষ স্থূলকায় বালকটি বিশেষভাবে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল।

ইহাই ছিল রাখালের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। এই পরিচয় বিশেষ নিবিড় হয় নাই, কেননা, রাখাল ছিল আমাদের চেয়ে বেশ ছোট। ঐ বয়সে বয়সের সামান্য ন্যূনতাও অন্তরঙ্গতার অন্তরায় হয়। তাহা ছাড়া, ইহার পরই আমি কলেজিয়েট

স্কুলে ভর্তি হইয়া পড়িতে আরম্ভ করি। তাহার পর সাড়ে তিন বৎসর আমি বহরমপুরে ছিলাম; যখন চলিয়া আসিলাম, তখনও রাখাল স্কুলে ভর্তি হয় নাই। বয়সে ছোট, পড়ে কম, স্কুলে পড়েই না যে ছেলে, তাহার সঙ্গে প্রয়োজনমত মুরুব্বিয়ানা করা যায়—বন্ধুত্ব হয় না।

অন্তরঙ্গ না হইবার আরও কারণ ছিল। আমি ঠিক রাখালদের পাড়ায় থাকিতাম না, একটু দূরে থাকিতাম। পাড়াতেই আমার সঙ্গে মেলামেশা ও খেলাধুলা করিবার অনেক ছেলে ছিল, তাই পাড়া ডিঙাইয়া তাহার সঙ্গে বেশী ভাব করিবার অধিক সম্ভাবনা ছিল না।

আর, আমি এবং রাখাল দুজনেই তখন ঘরের গণ্ডীর বাহিরে বড় যাইতাম না। রাখালেরা বড়লোক, তাহার বাপ প্রতিষ্ঠাবান্ উকিল এবং মাও বড় মানুষের মেয়ে, এ-কথা জানা ছিল। তা ছাড়া, রাখাল ছিল বাপ-মার একমাত্র ছেলে। মায়ের একটু বেশী বয়সে তাহার জন্ম হয়; তাহার জন্য দৈব প্রচেষ্টা ছাড়াও সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজের ঔষধের প্রয়োজন হইয়াছিল, এই প্রসিদ্ধি ছিল। কাজেই সে ছিল পিতামাতার নয়নের মণি। এমন ছেলেকে বাড়ির ভিতর বা আশেপাশে পাহারা দিয়া না রাখিয়া যার-তার সঙ্গে মিশিবার সুযোগ দিতে বাপ-মা স্বভাবতই কার্পণ্য করিতেন।

আমিও অনেকটা সেইরকম ছিলাম। বাবা ধনী না হইলেও সে-কালের ডেপুটি ছিলেন। সে-কালে ডেপুটিদের মান-মর্যাদা এত অধিক ছিল যে, সাধারণের সঙ্গে মেলামেশা তাঁহাদের পক্ষে সহজ হইত না। তদুপরি তাহার অল্পকাল পূর্বেই আমার বড় দুই ভাই পর পর মারা যাওয়ায় আমিও তখন বাপ-মার একমাত্র পুত্র। এইসব কারণে আমিও প্রায় রাখালেরই মত যত্ন ও আদরের বেষ্টনীর ভিতর বন্দী ছিলাম। তাই আমাদের দেখা-শোনা হইত কালেভদ্রে।

আমি যখন তখনকার ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি, তখন বাবা বদলী হইয়া আমাকে লইয়া বারাসতে গেলেন। আমাদের সংযোগের যে সূত্রটি ছিল, তাহা সুদৃঢ় হইবার আগেই ছিঁড়িয়া গেল।

বহরমপুর ছাড়িবার পর প্রায় ছয় বৎসর পর্যন্ত রাখালের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল না। যখন আমি প্রথম শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমার এক পিসতুত ভাই, তিনি বহরমপুর থাকিতেন, মুঙ্গেরে আমাদের বাড়িতে আসেন। আমি পড়ার বই খুব অল্প পড়িতাম, কিন্তু সর্বদাই বাহিরের ইংরেজী ও বাংলা বহু বই পড়িতাম। এই স্বভাব সে-কালের প্রবীণেরা বিশেষ সুনজরে দেখিতেন না। আমার সেই বড় দাদা বলিতেন, "ঠিক রাখালের মত। সেও পড়ার বই পড়তেই চায় না, সব সময় বাইরের বই পড়ে।" এতদিন পরে রাখালের সম্বন্ধে আমি এই সংবাদ পাইলাম।

১৮৯৭ সনে এন্ট্রান্স পরীক্ষার পর ছুটি পাইয়া আমি বহরমপুরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে তখন আমি ছিলাম রাখালদের পাড়ায়। একদিন রাখাল আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে, বন্ধু ত্রিভঙ্গমোহন সেন তাহাকে আমার কাছে আনিয়া বলিলেন, "তোমার সঙ্গে একটি বপু দেখা করতে এসেছে।" যতক্ষণ সে ছিল ততক্ষণ ত্রিভঙ্গ তাহার দেহের স্থূলতা লইয়া

কৃতিত্ব রাখালদাসের। তাঁহার প্রতিভা ও কর্মকুশলতাই সবটার মূলে ভিত্তি।

মহেঞ্জোদাড়োর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আমার সাধ্যশক্তির অতীত। তাহার প্রয়োজনও নাই। তাহার বিশ্লেষণ স্যার জন মার্শাল রচিত বিরাট গ্রন্থ The Indus Valley Civilization গ্রন্থে আছে। তাহার পরেও অনেক ছোট বড় বই রচনা হইয়াছে। ইহা আবিষ্কারের ফলে প্রত্ন-ভারতের দৃশ্যপটের একটা পর্দা উঠিয়া গিয়াছে; ভারতের অতীত ইতিহাসের কালের সীমা বহু সহস্র বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ও তাহার তথ্যের জ্ঞান বহুপরিমাণে সমৃদ্ধ হইয়াছে। ফলত সেই ইতিহাসের আদি পরিচ্ছেদ নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে। এই বিরাট কর্ম যে একজন বাঙালীর আবিষ্কার তাহাতে বাঙালীর বিশেষ গর্বের অধিকার আছে। ইহার জন্য সমগ্র বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে বাঙালী জাতির রাখালদাসের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতার ঋণ জন্মিয়াছে।

তাঁহার কৃতকর্মের গৌরব ও মর্যাদা সম্বন্ধে রাখালদাস মোটেই অচেতন ছিলেন না। প্রসঙ্গান্তরে কথা কহিতে কহিতে তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এত বড় আবিষ্কার জগতে রোজ রোজ হয় না, it comes once in an age. কিন্তু সেই একদিন ছাড়া তাঁহাকে কোনওদিন তাঁহার এই বৃহৎ কীর্তির কথা বলিতে শুনি নাই, ইহা লইয়া দম্ভ করিতে কখনও শুনি নাই।

দর্পের তাঁহার অভাব ছিল না। অসামান্য শক্তি ছিল তাঁহার। সে-শক্তি সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং তাহা নিয়তই প্রকাশ হইত তাঁর কর্মে, কথায়। কিন্তু তাহা লইয়া আত্মশ্লাঘা বা দম্ভ করিতে কখনও শুনি নাই।

তাঁহার বিদ্যা ও জ্ঞান কেবল ইতিহাসের সংকীর্ণ গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ ছিল না। সকল বিষয়ে তাঁহার বিপুল অনুসন্ধিৎসা ছিল। আর তাঁহার চরিত্রে ছিল না তুষ্টি। কোনও কিছু করিয়াই তিনি মনে করিতেন না যথেষ্ট করিয়াছি। নিউটনের মত তিনি মনে করিতেন, সম্মুখে বিস্তৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহাসমুদ্রের কথা—তাহার ভিতর কয়েকটি উপল কুড়াইয়া পরিতৃপ্ত হইতেন না। সর্বদাই নূতন চেষ্টার জন্য আগ্রহশীল হইতেন।

তাঁহার জীবনের পরবর্তী কাহিনী বড় মর্মন্তুদ। এত বড় কৃতী বিদ্বান ও আজন্ম সৌভাগ্যের দুলাল শেষ জীবনে অদৃষ্টের কাছে বড় লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। তাঁহার চাকুরি ঘুচাইয়া আর্থিক ও মানসিক দুর্গতি যতটা তিনি ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার চেয়ে বেশী পীড়িত হইয়াছিলেন ভবিষ্যতের কল্পনায়। শরীর তাঁহার একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল।' যৌবনকালেই তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন, এখন তাহা ও তাহার আনুষঙ্গিক উপদ্রব তাঁহাকে জীর্ণ করিয়া দিল। অকালে তিনি হঠাৎ মারা গেলেন।

দীর্ঘকাল দারুণ রোগ বহন করিয়াও তিনি ছিলেন সদাপ্রফুল্ল ও অসাধারণ পরিশ্রমী। বন্ধুপ্রীতি তাঁহার যেমন গভীর, তেমনি বিস্তীর্ণ ছিল। সর্বশ্রেণীর লোকের ভিতর তাঁহার বন্ধু ছিল। তিনি ছিলেন, যাহাকে বলে মজলিসী লোক। তাঁহার মাধ্যমে আমার অনেক বন্ধু লাভ হইয়াছিল। তাঁহার বাড়িতে যখনই যাইতাম, তখনই প্রায় দেখিতাম, অনেকগুলি লোক লইয়া মজলিস করিয়া সদালাপে ব্যস্ত।

মাইকেল মধুসূদনের সম্বন্ধে শুনা যায়, তিনি তিন-চারটি পণ্ডিত দ্বারা বেষ্টিত হইয়া একসঙ্গে তিন চারিখানি গ্রন্থ রচনা করিতেন। এক একজন এক একখানি গ্রন্থ লিখিয়া যাইতেন। এক সময়ে রাখালও তেমনি একাধিক লিপিকার বেষ্টিত হইয়া তাহাদিগকে দিয়া এক সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন বই লেখাইতেন দেখিয়াছি।

তাঁহার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল বলিষ্ঠতা ও প্রদীপ্ত আত্মপ্রত্যয়। আমার তাহা কখনও ছিল না। তাই একবার রাখাল আমাকে তিরস্কার করিয়া লিখিয়াছিলেন, "Remember, the world does not love a weak man." তাঁহার চরিত্রে ও কর্মে, আর যে দোষই থাক, দুর্বলতা কখনও ছিল না।

ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁহার কৃতিত্ব ছিল সর্বজনস্বীকৃত। তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি যে সর্বদাই নির্ভুল হইত, এ-কথা কেহ বলিবে না, কিন্তু তাহার মধ্যে একটি জিনিস কখনও ছিল না—গোঁজামিল দিবার চেষ্টা তিনি কখনও করিতেন না, বা রাগ দ্বেষ দ্বারা তাঁহার ঐতিহাসিক দৃষ্টি তিনি কখনও সজ্ঞানে বিচলিত হইতে দিতেন না।

আজকাল আমাদের দেশে ইতিহাসকে বিকৃত করিবার একটা বিকট চেষ্টা দেখা দিয়াছে। ইতিহাসবিশারদ একাধিক ব্যক্তি ইতিহাসকে পলিটিক্সের সেবাদাসী করিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে ইতিহাসের নামে সত্য বিকৃত করিতেছেন দেখিতে পাই। তাই আজ মনে পড়ে এই নিদারুণ সত্য ও যুক্তিনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞের কথা। ভাবি, রাখালদাস যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে তিনি কী তীব্র ভর্ৎসনায় ইহাদিগকে কুণ্ঠিত করিতেন।

আমাদের মিলজাত দ্রব্য
উৎসবের আনন্দ পরিপূর্ণ ক'রে তুলবে

কাকাতুয়া মার্কা ময়দা
হ্যারিকেন মার্কা ময়দা
গোলাপ মার্কা আটা
হ্যারিকেন মার্কা আটা
ঘোড়া মার্কা আটা

প্রস্তুতকারকঃ
দি হুগলী ফ্লাওয়ার মিলস কোং লিঃ
দি ইউনাইটেড ফ্লাওয়ার মিলস কোং লিঃ
ম্যানেজিং এজেন্টসঃ
শ ওয়ালেস এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা, হাওড়া ও সহরতলীর অধিকাংশ বিশিষ্ট মুদীদোকানে নির্ধারিত মূল্যে পাওয়া যায়। গ্রাহকগণকে অধিক মূল্যে আটা ও ময়দা ক্রয় না করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

নিবেদকঃ
চৌধুরী এণ্ড কোং
৪।৫ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১

আমরা তান্ত্রিক ও পৌরাণিক এই দুই পদ্ধতিতে দেবতার পূজা করিয়া থাকি। পৌরাণিক পূজাই বেশি প্রচলিত। আমরা সাধারণত গণেশ শিব বিষ্ণু লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি দেবতার যে পূজা করিয়া থাকি তাহা পৌরাণিক পূজা। আমাদের দুর্গোৎসবও পৌরাণিক নিয়ম অনুসারেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বৃহন্নন্দিকেশ্বর নামক অপ্রচলিত পুরাণ, দেবীপুরাণ, কালিকা পুরাণ বা মৎস্যপুরাণে যে বিধান দেওয়া হইয়াছে বলিয়া কথিত হয় তদনুসারে আমরা এই উৎসবের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। তবে ইহার মধ্যে কিছু কিছু তান্ত্রিক উপাদানও আছে। তাই তান্ত্রিক দীক্ষা যিনি গ্রহণ করেন নাই এমন লোকের পক্ষে দুর্গার পূজা বা পূজার কার্যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করার প্রথা নাই। দুর্গাপূজার ভোগ রন্ধনের জন্য তাই দীক্ষিতা নারীর প্রয়োজন হয়। বর্তমানে অবশ্য অনেকের কাছে এ নিয়ম অজ্ঞাত। অনেকের আবার এরূপ ভুল ধারণাও আছে যে দুর্গাপূজা নিছক তান্ত্রিক অনুষ্ঠান। শিক্ষিত মহলেও অনেকের এমন ধারণা আছে যে, শুধু দুর্গা নয় যে কোন দেবীর পূজা পার্বণই তান্ত্রিক অনুষ্ঠান—তন্ত্রে কেবল শক্তি পূজার ব্যবস্থাই আছে।

বস্তুত তন্ত্রে বিভিন্ন দেবতার পূজার ব্যবস্থা আছে—সমাজে বিভিন্ন দেবতার তান্ত্রিক ও পৌরাণিক দুই রকম পূজারই প্রচলন আছে। আপাতদৃষ্টিতে দুই পূজার মধ্যে পার্থক্য সামান্য—খুঁটিনাটি মন্ত্রাদির মধ্যে ভেদ যাহা আছে তাহা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত নহে। তাহা ছাড়া, তান্ত্রিক ও পৌরাণিক পদ্ধতি পরস্পরকে এমনভাবে প্রভাবিত করিয়াছে যে, বিশুদ্ধ তান্ত্রিক বা বিশুদ্ধ পৌরাণিক অনুষ্ঠান খুঁজিয়া বাহির করা অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। বেদ ও পুরাণের বিভিন্ন বিষয়ের একটা তান্ত্রিক রূপ দেওয়ার চেষ্টাও দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চ মকার শোধনাদি বিশুদ্ধ তান্ত্রিক অনুষ্ঠানেও বৈদিক মন্ত্রের প্রয়োগ বিশেষ কৌতুকজনক। পৌরাণিক অনুষ্ঠানে অবিকৃতভাবে বৈদিক মন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে তাহার আংশিক পরিবর্তন বা সম্পূর্ণ রূপান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক স্বস্তিবাচন ও গায়ত্রীর অনুকরণে তান্ত্রিক স্বস্তিবাচন ও গায়ত্রী রচিত হইয়াছে। তান্ত্রিক আচমন, ঘটস্থাপন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্রের আদৌ ব্যবহার হয় না—তাহার স্থলে তান্ত্রিক মন্ত্র ব্যবহৃত হয়। উপনয়ন বিবাহাদি দশবিধ সংস্কারের ও শ্রাদ্ধের তান্ত্রিক রূপ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন দেবতার স্তোত্রকবচ প্রভৃতি যেমন পুরাণে পাওয়া যায় তেমনই তন্ত্রে তাহাদের রূপ দেখা যায়। পৌরাণিক গীতার মত তান্ত্রিক গীতারও অস্তিত্ব আছে। মুণ্ডমালাতন্ত্র হইতে দুর্গাগীতা প্রাণতোষণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

দুর্গাদেবীর তান্ত্রিক পূজা কেবল বাংলা দেশে নয় বাংলার বাহিরেও প্রচলিত আছে। দুর্গার তান্ত্রিক পূজার গ্রন্থ বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। দুর্গাকে যাঁহারা ইষ্টদেবতা হিসাবে পূজা করেন—দুর্গামন্ত্রে যাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন—দুর্গার নিত্য উপাসনা যাঁহাদের মুখ্য কর্তব্য এমন লোক বিরল নহে। দুর্গার রূপান্তর জগদ্ধাত্রীর নিত্য উপাসকও আছেন। কার্তিক মাসের শুক্লা নবমীতে জগদ্ধাত্রীর বিশেষ পূজা বাংলাদেশে সুপরিচিত। এই উপলক্ষ্যে কোন কোন স্থানে প্রচুর জাঁকজমকের ব্যবস্থা দেখা যায়। জগদ্ধাত্রী পূজা তান্ত্রিক নিয়ম অনুসারেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইঁহার পূজার বিস্তৃত বিবরণ মায়াতন্ত্র নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে দুর্গার উপাসনায় বামাচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে দুর্গার উপাসনায় কালীর উপাসনার মতই ব্যবহার করিতে হইবে—কারণ দুর্গা ও কালী অভিন্ন। কালীর সহিত অভেদ জ্ঞানে দুর্গার আরাধনা করিলে অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়।

কালীবদাচরেদ্ বিদ্যাং কালীবৎ পূজয়েৎ
সদা।
কালীবৎ সাধয়েদ্দেবীং কালীবচ্চিন্তয়েৎ
সদা॥
যা কালী সা মহাদুর্গা যা দুর্গা
সৈব তারিণী।
অভেদেন যজেদ্দেবীং সিদ্ধয়োষ্টৌ
চর্বন্তি হি॥

—মায়াতন্ত্র—১২শ পটল
(এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি)

শিককাবাব সহযোগে নানারূপ মাংসের দ্বারা দেবীর পূজার বিধান এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে কাক শুক পেচক মেষ ছাগ নর গজ উষ্ট্র গর্দভ ও গৃধ্রের নাম করা হইয়াছে (৪র্থ পটল দ্রষ্টব্য)। বামাচার সম্পর্কে যবনদের কথা বলা হইয়াছে এবং যবন মন্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। যবনেরা কলিকালে শক্তিশালী তাহারা মৎস্য মাংসভোজী, সর্বদা মদ্যসেবী এবং অনাচাররত। তাহাতেই তাহারা সিদ্ধিলাভ করে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের লোকেরা আচারপরায়ণ হইয়াও দীর্ঘকালে সিদ্ধিলাভ করেন এবং অনাচারী হইলে বিনষ্ট হন ইহাতে সন্দেহ নাই।

কলিকালে তু দেবেশি যবনা বলবত্তরাঃ।
মৎস্যমাংসরতাঃ সর্বে সর্বদা মদ্যসেবিনঃ।
অনাচাররতাস্তেন সিধ্যন্তি যবনাঃ কলৌ॥
সাচারা ব্রাহ্মণাদ্যাস্তু সিধ্যন্তি বহুকালতঃ।
অনাচারাঃ প্রণশ্যন্তি সত্যম্ অত্র ন সংশয়ঃ॥
(মায়াতন্ত্র—৭ম পটল)

মায়াতন্ত্র গ্রন্থখানি এক সময়ে বাংলাদেশে বেশ প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। বঙ্গাক্ষরে লিখিত ইহার তিনখানি পুঁথির কথা জানা যায়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় ইহার যে পুঁথির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে সাত পটল পর্যন্ত আছে। ইহার সহিত দ্বাদশ পটলে সমাপ্ত এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথির মিল আছে মনে হয়। তবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে পুঁথির বিবরণ দিয়াছেন তাহার সহিত ইহাদের বিশেষ কোন মিল দেখা যায় না। তন্ত্রসার, আগমতত্ত্ববিলাস, শাক্তরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে মায়াতন্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্ত্রসারে জগদ্ধাত্রী পূজা প্রকরণে মায়াতন্ত্র হইতে অনেক অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তবে সেখানে মায়াতন্ত্রের নাম নাই। জগদ্ধাত্রীর ধ্যান, জগদ্ধাত্রী পূজায় ব্যবহার্য মাংসাদির কথা মায়াতন্ত্রের সোসাইটির পুঁথির দ্বিতীয় ও চতুর্থ পটলে যেমন আছে তন্ত্রসারেও প্রায় তেমনই পাওয়া যায়। অথচ এই প্রসঙ্গে তন্ত্রসারে উদ্ধৃত শ্লোকগুলির আকর হিসাবে মায়াতন্ত্রের বা অন্য কোন গ্রন্থের উল্লেখমাত্র করা হয় নাই।

রুদ্রযামল ও মুণ্ডমালাতন্ত্র হইতে দুর্গানামমাহাত্ম্য সম্পর্কে কিছু কিছু

শ্লোক প্রাণতোষণী তন্ত্র ও শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত হইয়াছে। রুদ্রযামলের অন্তর্গত বলিয়া কথিত দেবীচরিত্র নামক গ্রন্থাংশে চতুর্থ অধ্যায় হইতে দুর্গার প্রাদুর্ভাবের কাহিনী ও আশ্বিন নবরাত্রের বিধানাদি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টমীর দিন অর্ধরাত্রে হোমকার্য নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং পূজার পরে মহিষাদি বলিদানের কথা বলা হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাংলার বিশিষ্ট তান্ত্রিকদের গৃহে অষ্টমীর মধ্যরাত্রে অর্ধরাত্রবিহিত পূজার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীচরিত্রের একাদশ অধ্যায়ের শেষে নববস্ত্র পরিধান ও আত্মীয়স্বজনকে দানের কথা আছে।

রুদ্রযামল তন্ত্রের দুর্গাপটল বা দুর্গা পূজা পদ্ধতির পুঁথি উত্তর প্রদেশে পাওয়া গিয়াছে। রুদ্রযামলতন্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত নবদুর্গাপূজা রহস্যের একখানি পুঁথি এসিয়াটিক সোসাইটিতে আছে। ইহাতে শৈলপুত্রী, চণ্ডঘটা, কুষ্মাণ্ডী প্রভৃতি নবদুর্গার পূজাপদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে।

দুর্গার কোন কোন স্তব ও কবচ বিভিন্ন তন্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত। তন্ত্রসারে উদ্ধৃত দুর্গাশতনাম স্তোত্র ও দুর্গা কবচ এবং অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য প্রকাশিত দুর্গাদাদিসহস্রনাম স্তোত্র যথাক্রমে বিশ্বসার তন্ত্র, কুব্জিকাতন্ত্র ও কুলার্ণব তন্ত্র হইতে গৃহীত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। দুর্গার তন্ত্রোক্ত এইরূপ আরও স্তবকবচের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শারদীয়া দুর্গাপূজার বিস্তৃত বিবরণ মৎস্যসূক্ত নামক গ্রন্থ হইতে প্রাণতোষণী নিবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই বিবরণের মধ্যে দেবীর বিভিন্ন রূপের ইঙ্গিত করা হইয়াছে—দেশের এক এক অংশে এক এক রূপের পূজার কথা বলা হইয়াছে। ওড্রদেশে, কলিঙ্গে, মধ্যদেশে অষ্টভুজা দেবীর পূজা করণীয়; অযোধ্যা, সুরাষ্ট্র, শ্রীহট্ট, কোশল প্রভৃতি স্থানে দেবী অষ্টাদশভুজা; মহেন্দ্র, হিমালয়, কুরু, মথুরা, কেদারে দ্বাদশভুজা; মকরন্দ, বিরাট, কৌমার, গৌড়, পারিপাত্রে দেবী দশভুজা; মরহট্ট, নেপাল, কচ্ছ, কঙ্কণে চতুর্ভুজা; সাগর-সমীপে দ্বিভুজা দেবী পূজনীয়। মৎস্যসূক্তে দেবীর দুইটি ধ্যান উল্লিখিত হইয়াছে। একটি পৌরাণিক পূজায় প্রসিদ্ধ জটাজুট সমাযুক্তাম্' ইত্যাদি।

ইহা মৎস্যসূক্তেও পূজার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাহা ছাড়া, ষষ্ঠীর দিন সায়ংকালে বিল্বমূলে দেবীর পূজার সময় যে ধ্যানের নির্দেশ করা হইয়াছে তদনুসারে দেবী মহারজতবর্ণা, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা নানারত্নাবৃতা কঙ্কণ কটক শোভিতা দশবাহু শোভমানা ত্রিশূল করবাল চক্র বাণ শক্তি খেটক পূর্ণচাপ পাশ অঙ্কুশ পরশু প্রভৃতি অস্ত্রধারিণী—দেবীর বামপদ মহিষের উপর স্থাপিত—ছিন্নমুণ্ড মহিষ অধোদেশে বিরাজমান। সেখানে খড়্গবর্মধর উদ্ধত মহান্ অসুর। দেবী বিল্ববৃক্ষস্থিত। আমরা দুর্গাদেবীর প্রতিমায় কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী সরস্বতী বা জয়া বিজয়ার মূর্তি যোগ করিয়া থাকি অথচ যে ধ্যানে দেবীর পূজা করা হয় তাহাতে এই সব মূর্তির কোন উল্লেখ নাই। কালী বিলাস-তন্ত্রে ইহাদের শুধু উল্লেখই আছে এমন নহে—মূল মূর্তির কোন্ দিকে কোন্ দেবতা স্থাপন করিতে হইবে তাহাও বলা আছে।

জয়া বামে স্থিতা বিদ্যা বিজয়া চাপি দক্ষিণে।
বামে চ কার্তিকং দেবং দক্ষিণে গণপন্তথা॥

জয়া বামদিকে এবং বিজয়া দক্ষিণ দিকে অবস্থিত—কার্তিক বামে এবং গণেশ দক্ষিণে। সাধারণত এই জয়া বিজয়ার মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার পরিবর্তে লক্ষ্মী সরস্বতীর মূর্তি নির্মিত হইয়া থাকে। লক্ষ্মী দুর্গার দক্ষিণে এবং সরস্বতী বামভাগে অবস্থিত।

যা নিত্যা প্রকৃতির্নিত্যা দুর্গায়া
দক্ষিণে স্থিতা।
সারদা ভারতী নিত্যা বামভাগে সদাস্থিতা॥

এই সব দেবতার ধ্যান বা বর্ণনাও কালী-বিলাসতন্ত্রে দেওয়া হইয়াছে। তবে

ধ্যানানুসারে মূর্তি আজকাল কচিৎ গঠন করা হয়। জয়া তপ্তকাঞ্চনবর্ণা দ্বিভুজা চঞ্চলনয়না কটাক্ষশরযুক্তা দিগম্বরপরিচ্ছেদা দিব্যাভরণসংযুক্তা সিদ্ধিপ্রদায়িনী। বিজয়া দলিতাঞ্জন তুল্যবর্ণা দ্বিভুজা খঞ্জননয়না কটাক্ষবাণোদ্দীপ্তা অঞ্জনযুক্তলোচনা দিব্যাস্ত্রধারিণী নানারত্নবিভূষিতা। কার্তিক সুতপ্ত-কনকবর্ণ খড়্গপট্টীধর উষ্ণীষযুক্ত মস্তক ময়ূরবাহন বীর ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক। গণেশ লম্বোদর মহাকায় গজানন ত্রিলোচন পার্বতীনন্দন সর্বদেবময়। লক্ষ্মী জয়ার মত তপ্তকাঞ্চনবর্ণা দ্বিভুজা চঞ্চল-নয়না, বিজয়ার ন্যায় কটাক্ষবাণোদ্দীপ্তা অঞ্জন-যুক্ত লোচনা, শুক্লাম্বরধারিণী সিন্দূর-তিলকোজ্জ্বলা শুক্লপদ্মাসনস্থিতা নারায়ণ-প্রিয়া। সরস্বতী শঙ্খেন্দুকুন্দসঙ্কাশা দ্বিভুজা পদ্মলোচনা কটাক্ষবাণোদ্দীপ্তা দিব্যাম্বরধারিণী দিব্যাভরণবেশা বাগরূপা।

দেবতাদের স্থান সন্নিবেশ সম্পর্কে কালীবিলাসতন্ত্রের এই নির্দেশ সর্বত্র প্রতিপালিত হয় না। বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গে দেবীর দক্ষিণে গণেশ বামে কার্তিক—পূর্ববঙ্গে ইহার বিপরীত। দুর্গাপূজার সময় নানাস্থানে যে নানা মূর্তির পূজা হয় তাহাদের মধ্যে আরও নানারূপ বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বৈচিত্র্যের তেমন কোনও আলোচনা কোথাও হয় নাই।

মূলতন্ত্র ছাড়া বিভিন্ন নিবন্ধ গ্রন্থেও দুর্গাপূজার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র দেশের তান্ত্রিক সমাজে সম্মানিত স্বয়ং শংকরাচার্য কর্তৃক লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধ প্রপঞ্চসার ও লক্ষ্মণ দেশিক রচিত শারদা-তিলক নামক গ্রন্থে স্বতন্ত্র দুর্গাপ্রকরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে বিস্তৃতভাবে দুর্গার তান্ত্রিক পূজার রহস্য বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে দুর্গার বিভিন্ন রূপের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যথা, দুর্গা, মহিষমর্দিনী, জয়দুর্গা, শূলিনী দুর্গা ও বনদুর্গা। প্রপঞ্চসারের মতে দুর্গার বর্ণ দূর্বার মত এবং ইনি চতুর্ভুজা। জয়দুর্গা ও বনদুর্গা ভীষণাকারা। ইঁহাদের বিশেষ পূজা গ্রামাঞ্চলে কখনও কখনও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইঁহাদের কোন মূর্তি প্রস্তুত করা হয় না। নির্দিষ্ট গাছের তলায় জয়দুর্গার পূজা হয়। জয়দুর্গা পূজার পূর্ণ নাম পত্রাবলী জয়দুর্গা পূজা। পূজার পূর্বে দেবীর আবাহন প্রসঙ্গে পত্রাবলীর সং বা চুঙিরা উলঙ্গ নৃত্য করিয়া থাকে—দেবী পূজাস্থানে আসিয়া পূজা গ্রহণ না করিলে নানারূপে লাঞ্ছনার ভয় দেখান হয়। জয়দুর্গার বর্ণ কৃষ্ণ মেঘের মত—হস্তে শংখ চক্র খড়্গ ও ত্রিশূল। দেবী সিংহারূঢ়া এবং চতুর্ভুজা। দেবীকে মাছ পোড়া ও সিদ্ধ চাউলের ভাতের ভোগ দেওয়া হয়। দেবীর প্রসাদ কেহ গ্রহণ করে না। জয়দুর্গার পূজার অঙ্গ হিসাবে অন্যান্য নানা দেবতার পূজা করা হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরী, মগধেশ্বরী, দানবমাতা বনদুর্গার নাম উল্লেখযোগ্য। দানবদিগের নামগুলি কৌতুকপ্রদ। যথা, ছোটেশ্বর, কৃষ্ণকুমার, অগ্নিমুখ, একজঙ্ঘ, ঊর্ধ্বপাদ, হরিপাগল, মোচরাসিংহ, গাভুরডসন ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে বার ভাই আছেন। বনদুর্গার পূজার সময়ও তাঁহাদের পূজা করা হয়। বিবাহাদি শুভ কার্য উপলক্ষ্যে যে নিস্তারিণী পূজা বা আকুলাইর পূজা করিবার প্রথা আছে তাহা এই বনদুর্গা ও দানবদের পূজা। দানবমাতা বনদুর্গা মদমত্তা, তাঁহার মহালোচন আঘূর্ণিত, তাঁহার মুখমণ্ডল ভীষণাকার, মস্তকে জটাভার, গলদেশে নরকপালের মালা, সর্প-রাজরচিত হারের জন্য তিনি উজ্জ্বলাকৃতি, তাঁহার নিতম্ব সর্পরাজিপরিবেষ্টিত, তিনি ধনুর্বাণধারিণী ও লোকভয়ংকরী। বন-দুর্গার নানারূপের পরিচয় নানা গ্রন্থে পাওয়া যায়। দুর্গার অন্যরূপের মধ্যে বাংলার বণিক্‌সমাজে প্রসিদ্ধ গন্ধেশ্বরীর নাম করা যাইতে পারে। বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির দিন ইঁহার বিশেষ পূজা করা হয়। তবে প্রচলিত দুর্গামূর্তির মত ইঁহার মূর্তি নয়। মূলত দেবীর এই বিভিন্ন রূপ দেবীর সর্বাত্মকতার সূচনা করে—সমস্ত দেবতার অভেদের আভাস দেয়। মায়ামন্ত্রে দুর্গা ও কালীর অভেদের কথা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। প্রাণতোষণী গ্রন্থে উদ্ধৃত পিচ্ছিলতন্ত্রে অন্যান্য শক্তি-দেবতাকেও দুর্গা বলা হইয়াছে—তারিণী সুন্দরী কালী দুর্গা ভৈরবী ভুবনেশ্বরী মহালক্ষ্মী ইঁহাদের সকলেরই নাম দুর্গা অর্থাৎ ইঁহারা সকলেই এক। এই ঐক্য প্রতিপাদন হিন্দু দেববাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বেদের বহু দেবতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—একং সদ্ বিপ্রবহুধা বদন্তি—একই পরমেশ্বরকে বহু নামে অভিহিত করা হয় ইন্দ্র বায়ু, মাতরিশ্বা প্রভৃতি।

আশ্চর্যের বিষয়, জয়দুর্গা বনদুর্গার পূজা অল্প-বিস্তর প্রচলিত থাকিলেও ইঁহাদের বিশেষ কোন প্রমাণ অর্বাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে দুর্গাপূজার কথা বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সুপ্রসিদ্ধ তন্ত্রসারে

আর, এম, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
হেড অফিস : ৪৯, সীতানাথ বোস লেন, সালকিয়া, হাওড়া।
ফোন : হাওড়া-৩৬৪৫ টেলিঃ AREMCEE
PRASA/RMC 9

দুর্গাপূজার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থে দেবীর যে ধ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে তদনুসারে দেবী চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী শঙ্খ চক্র ধনুর্বাণধারিণী মরকতবর্ণা। ইহাতে আভিচারিক কার্যে বিভিন্ন দ্রব্যের সাহায্যে দুর্গাদেবীর হোমের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তিল দ্বারা হোম করিলে নর ও নরপতিদিগকে বশীভূত করা যায়—শ্বেত সর্ষপ দ্বারা হোম করিলে সাধক তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হয়—পদ্মদ্বারা হোম করিলে শত্রু জয় করিতে পারিবে—দূর্বা দ্বারা হোম করিলে শান্তি পলাশের দ্বারা পুষ্টি, ধান্যের দ্বারা ধান্যশ্রী লাভ করিবে—কাক-পক্ষের দ্বারা হোম করিলে মানুষের মধ্যে দ্বেষভাব সঞ্চারিত করিতে পারিবে আর মরিচের দ্বারা হোম করিলে শত্রুর সর্বথা মৃত্যুপ্রাপ্তি ঘটে। সাধারণত ঘৃত মধু শর্করা মিশ্রিত তিল বা দুগ্ধ মিশ্রিত অন্নের দ্বারা দেবীর হোম করিবার কথা।

দুর্গাচরণার্চামৃতরহস্য নামক অপরিচিত গ্রন্থে চার অধ্যায়ে দুর্গাকে উপলক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন দেবীর পূজার বিধান বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে দুর্গার সা-

ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থ ও পুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায় নাই। ইহার একখানি পুঁথি এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায় আছে। যদুনাথ চক্রবর্তীর মন্ত্ররত্নাকর, রঘুনাথ তর্কবাগীশের আগমতত্ত্ববিলাস প্রভৃতি গ্রন্থেও দুর্গার তান্ত্রিক পূজার বিবরণ পাওয়া যায়। ইঁহারা প্রমাণ স্বরূপ শারদাতিলকের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং দুর্গার বিভিন্ন রূপের বিবরণ দিয়াছেন।

তান্ত্রিক দুর্গাপূজার বিভিন্ন অঙ্গের বিবরণপূর্ণ গ্রন্থের কিছু কিছু পুঁথিও নানাস্থানে পাওয়া গিয়াছে। দুর্গাপুরশ্চরণ-পদ্ধতি, দুর্গাপূজন ও দুর্গাপূজা বিধানের পুঁথি ইউরোপের কোন কোন পুঁথিশালায় আছে। দেবীরহস্যের অন্তর্গত দুর্গা-পঞ্চাঙ্গের পুঁথি হাথুয়ার রাজবাড়ি, কাশী ও কাশ্মীরে আছে। হাথুয়ার রাজবাড়ির পুঁথিতে দুর্গাপূজাবিধি, দুর্গাপূজাপদ্ধতি দুর্গাসহস্রনাম, দুর্গাকবচ ও দুর্গাস্তোত্র এই পাঁচটি বিষয় আছে।

দুর্গার তান্ত্রিক পূজার কথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাপ্ত বিভিন্ন তান্ত্রিক গ্রন্থে পাওয়া যায় সত্য, তথাপি মনে হয় পৌরাণিক পূজার মত তান্ত্রিক পূজা খুব বেশি প্রচলিত হয় নাই। তাই দেখি পৌরাণিক পূজা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পুস্তকে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে—কিন্তু তান্ত্রিক পূজা সম্বন্ধে এ জাতীয় আলোচনা তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। চারখানি পুরাণ অনুসারে দুর্গাপূজার চার রকম পূজা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তাহা ছাড়া পৌরাণিক দুর্গাপূজা সম্পর্কে বহু মনীষি কর্তৃক বহু স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচিত হইয়াছে—তান্ত্রিক পূজা সম্পর্কে এইরূপ গ্রন্থের সংখ্যা নগণ্য। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গ্রন্থ-গুলির নাম করা যাইতে পারেঃ—রঘু-নন্দনের দুর্গাপূজাতত্ত্ব, বিদ্যাপতির দুর্গা-ভক্তিতরঙ্গিণী, রামকৃষ্ণকৃত দুর্গার্চন-কৌমুদী, শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণির দুর্গোৎসববিবেক, শূলপাণির দুর্গোৎসব-বিবেক, উড়িষ্যারাজ রামচন্দ্র গজপতির দুর্গোৎসব-চন্দ্রিকা, মধুসূদন বাচস্পতির দুর্গার্চাকালনিষ্কর্ষ, পরমানন্দ শর্মার দুর্গার্চাকৌমুদী, কালীচরণের দুর্গার্চা-মুকুর, রঘূত্তমতীর্থের দুর্গাভক্তিলহরী, গোপাল ন্যায়পঞ্চাননের দুর্গোৎসব নির্ণয়, শম্ভুনাথের দুর্গোৎসবকৌমুদী, রামচন্দ্র-ক্ষিতিপতির দুর্গোৎসবচন্দ্রিকা এবং মহেশ ঠক্কুরের দুর্গাপ্রদীপ প্রভৃতি। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে অল্প কয়েকখানিই এ পর্যন্ত মুদ্রিত ও পণ্ডিত সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। বাকীগুলি পণ্ডিতসম্প্রদায়ের নিকটও তেমন পরিচিত নহে। ফলে দুর্গাপূজা সম্বন্ধে অনেক তথ্য আমাদিগের নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। তান্ত্রিক ও পৌরাণিক এই দ্বিবিধ পূজার কথা অনেকের নিকট নূতন বলিয়া মনে হইতে পারে। অবশ্য পূজার খুঁটিনাটি পার্থক্য সম্বন্ধে সকলের ঔৎসুক্যও না থাকিতে পারে। তবে দেবতার বিভিন্ন রূপের কথা জানিবার আগ্রহ স্বাভাবিক। দুর্গাপূজার সময় নানা ধরণের নানা মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সকলগুলির না হইলেও কোন কোনটির পরিচয় দুর্গাপূজা বিষয়ক প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে মিলিতে পারে। তাহাতে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের যোগসূত্র ধরা পড়িবে—দুর্গাপূজা সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যাইবে। বাংলার জাতীয় উৎসব দুর্গোৎসব। বাংলার মত অন্যত্র দুর্গাপূজার প্রচলন না থাকিলেও বাংলার শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় সমগ্র ভারতে নানারূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অন্য স্থানের কথা দূরে থাকুক বাংলার এই উৎসবের বিস্তৃত পরিচয়ও আমাদের জানা নাই। এই পরিচয় পাইতে হইলে দুর্গা-পূজা সম্পর্কে প্রাচীন সাহিত্যের যেখানে যে কথা আছে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হওয়া দরকার। সেই হিসাবেই বর্তমান প্রবন্ধে তান্ত্রিক দুর্গাপূজার কিছু বিবরণ সংকলিত হইল—দুর্গাপূজা বিষয়ক সাহিত্যের কিছু আভাস দেওয়া গেল।

আমরা আগ্রার তাজমহল দেখব বলেই বেরিয়েছিলাম। কিন্তু আগ্রার বাঙালী বন্ধুবান্ধবেরা বললেন, "এতদূর যখন এসেছেন তখন হরিদ্বারটাও দেখে যান।" আমাদের তত ইচ্ছে ছিল না। কারণ, প্রথমত, টাকা কমে গিয়েছিল; দ্বিতীয়ত, অত বড় পরিবার এবং লটবহর নিয়ে ঘোরা-ফেরা করবার আর উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। আমাদের দলে যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা সবই ছিল, আর ছিল প্রত্যেকের বিবিধ রকম বায়নাক্কা। কেউ ঝাল পছন্দ করে, কেউ করে না; কারও বাথরুম না হলে স্নানের সুবিধা হয় না; বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা স্লেচ্ছাচার পছন্দ করেন না; ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেলে মেজাজ বিগড়ে যায় তাঁদের; দু-তিনটে ছেলে অসুখে পড়ে গেল। আর টাকা ত জলের মত খরচ হচ্ছিল। তাই ভাবছিলাম, এখন ঘরের ছেলে ভালয় ভালয় ঘরে ফিরতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু আগ্রার বন্ধুরা একেবারে না-ছোড়। টাকা কমে গিয়েছে শুনে তাঁরা কিছু টাকা ধার দিতেও উদ্যত হলেন। তাঁদের বললাম, "হরিদ্বারে কাউকে ত চিনি না। এখানে আপনারা ছিলেন—কোন অসুবিধা হয়নি।" একজন বন্ধু বললেন, "হরিদ্বারেও হবে না। সেখানে বিশ্বাস মশাই আছেন—"

"বিশ্বাস মশাই কে?"

"গেলেই বুঝতে পারবেন।"

যদিও প্রত্যেকটি লোক অসুবিধা ভোগ করছিল, তবু হরিদ্বারের নামে উৎসাহিত হয়ে উঠল সবাই। বিশেষ করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। শেষটা বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার করে যাওয়াই স্থির করলাম। হুজুকে বাঙালী আর কাকে বলে!

॥ ২ ॥

হরিদ্বারে পৌঁছলাম ভোরে। তখনও অন্ধকার ভাল করে কাটেনি। জানলা দিয়ে খুব আশাভরে মুখ বাড়ালাম, ভাবলাম কোনও অপরূপ দৃশ্য বুঝি চোখে পড়বে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ড টেনে নিতে হল। বৃষ্টি পড়ছে, কনকনে শীত। প্যাসেঞ্জার-কুলি ভিজে ভিজেই ছুটোছুটি করছে প্যাচ-পেচে প্ল্যাটফর্মে। দমে গেলাম বেশ। মাল-পত্র আর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আমাকেও নামতে হবে এর মধ্যে। বিদেশে কুলিরাই বন্ধু। তাদেরই সাহায্যে নেমে পড়লাম অবশেষে। নেমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগলাম। কোথায় যেতে হবে, কোথায় আশ্রয় মিলবে, কিছু জানা ছিল না। অবিলম্বে কয়েকটা পাণ্ডা এসে ঘিরে ধরল এবং কোথায় বাড়ি, পিতার নাম কী, পিতামহের নাম কী, কোনও পাণ্ডা ঠিক করা আছে কি না, প্রভৃতি প্রশ্ন করে অস্থির করে তুলল সকলকে। কী করব দিশাহারা হয়ে ভাবছিলাম, এমন সময়ে বিশ্বাস মশাইয়ের কথা মনে পড়ল। একটা কুলিকেই জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, বিশ্বাস মশাই কোথা থাকেন জান?"

"ওই ত বিশ্বাসবাবু। এ বিশ্বাসবাবু, এ বিশ্বাসবাবু, ইধর আইয়ে—"

কুলির ডাকে যিনি এসে দাঁড়ালেন, তাঁর চেহারা দেখে ত চক্ষুঃস্থির হয়ে গেল। এরই ভরসায় আমরা এসেছি! এ যে ভিখারী একটা! পরনে আধময়লা জামা-কাপড়, পায়ে শতচ্ছিন্ন ময়লা কেড্‌স। মাথার চুলগুলো লম্বা লম্বা এবং অবিন্যস্ত, গোঁফ-দাড়িও আছে, তাও কেমন যেন খাপছাড়া গোছের, বেশ ঘনসন্নিবদ্ধ নয়, এখানে চারটি ওখানে চারটি ছড়ান-ছড়ান। রংটি কুচকুচে কালো। হাত দুটি জোড় করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। চোখ দুটি ছোট ছোট কিন্তু অপরূপ যে বিনয় ভদ্রতা এবং স্নিগ্ধতা ঝরে পড়ছিল সে-চোখের দৃষ্টি থেকে তা আজকাল দুর্লভ। অথচ ভদ্রলোকের বেশ-

বাস এমন কুৎসিত কেন। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

"আমাকে ডাকছিলেন?"

নমস্কার করে বললাম, "আগ্রার মতিবাবু আপনার খোঁজ করতে বলে দিয়েছিলেন। আমরা এখানে নতুন এলাম ত, কিছুই জানি না, কাউকে চিনিও না—"

"তা বেশ চলুন, আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব—"

তারপর কুলির দিকে ফিরে বললেন, "কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার ওখানে নিয়ে চল—"

বিশ্বাস মশাইয়ের পিছু পিছু আমরা সার বেঁধে চলতে লাগলাম।

বিশ্বাস মশাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলেন। না নিলে ওর জন্যে আর একটা কুলি করতে হত। কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার আস্তানায় যখন পৌঁছলাম, তখন কুলিরা পয়সা চাইতে লাগল। সাধারণত কুলিরা যা করে বিদেশী দেখে, খুব বেশী চাইতে লাগল। আমার কাছে দশ টাকার নোট ছিল, খুচরো পয়সা ছিল না, তাই বেশ একটু বিরক্ত বোধ করতে লাগলাম।

বিশ্বাস মশাই বললেন, "নোটটা আমাকে দিন—"

অচেনা লোককে নোটটা দিতে একটু দ্বিধা হচ্ছিল প্রথমে, কিন্তু গত্যন্তর ছিল না বলে দিলাম। বিশ্বাস মশাই কুলিদের দিয়ে জিনিসগুলি যথাস্থানে রাখিয়ে বিছানা-পত্র পাতিয়ে আমাদের খালি কুঁজো দুটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কুলিরাও তাঁর পিছু পিছু গেল। তারপর যা ঘটল তাতে অবাক হয়ে গেলাম। কুলিদের গোলমালে ব্যাপারটা এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি। গঙ্গার কলকলধ্বনি শোনা গেল। নদী যে কলকল-ধ্বনি করে এ-কথা কেতাবেই পড়েছিলাম, কানে শুনিনি কখনও। কুম্ভকর্ণের বাড়িটা ঠিক গঙ্গার উপরই, তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, যেন একটি তন্বী কিশোরী খিলখিল করে হাসতে হাসতে ছুটে চলেছে। গঙ্গার এমন রূপ আর কখনও দেখিনি। খুব কম চওড়া, নীলাভ জল, অত্যন্ত স্বচ্ছ, নীচের বালি পর্যন্ত দেখা যায়। আর বড় বড় মাছ নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। হঠাৎ হরিদ্বারের মহিমা যেন চোখে পড়ল, গম্ভীর বিরাট কিছু নয়, সজীব, সতেজ, চিরনবীন।

"খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কোথা করবেন আপনারা—"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি বিশ্বাস মশাই ফিরে এসেছেন। নোটটি ভাঙিয়েছেন তিনি, কুলিঃ পিছু দু-আনার বেশী দেননি, কিছু টাকার খুচরো করে এনেছেন, এমন কি চার-আনার আধুলো পর্যন্ত সংগ্রহ করেছেন। বললেন, "অনেক ভিকিরিকে দিতে হবে কি না।" পাই পয়সা হিসেব দিলেন, তারপর বললেন, "খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কী করবেন বলুন—"

"কী ব্যবস্থা আছে এখানে?"

"দোকান থেকে কিনে খেতে পারেন। লুচি তরকারি পাওয়া যেতে পারে, ভাতও পাবেন একটা হোটেলে। কিন্তু ও-সব কি আপনারা খেতে পারবেন? দামও নেবে, তৃপ্তিও পাবেন না।"

আমার স্ত্রী বললেন, "এখানে রান্না করার ব্যবস্থা হয় না? আমাদের স্টোভ আছে—"

"হ্যাঁ মা, খুব হয়। আমি একটা তোলা উনুনেরও ব্যবস্থা করে দিতে পারি—"

"তাই হক তাহলে। খিচুড়ি আর কিছু ভাজাভুজি করা যাক, বৃষ্টিও নেবেছে, জমবে ভাল।"

সকলে এই ব্যবস্থাতেই রাজি হয়ে গেল।

আমার শালী প্রশ্ন করলেন, "মুগ ডাল পাওয়া যাবে?"

"যেতে পারে। তবে এখানে অড়র ডালই বেশী চলে। আমি চেষ্টা করে দেখব।"

মুগের ডাল এখানে পাওয়া যায় না বলে, বিশ্বাস মশাই কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। এটা যেন তাঁরই অপরাধ।

"মুগ না পাওয়া গেলে মশুরি আনবেন। খাঁড়ি মশুরি হলেই ভাল হয়—"

"চেষ্টা করব। খুবই চেষ্টা করব।"

"তরকারি কি পাওয়া যায় এখানে?"

"আলু, নেনুয়া, ঝিঙে। পেঁয়াজও পাওয়া যাবে।"

"পটল?"

আবার কুণ্ঠিত হলেন বিশ্বাস মশাই।

"না, পটল এখানে পাওয়া যাবে না।"

"বেগুন?"

আরও কুণ্ঠিত হলেন।

"না, বেগুনও নয়।"

হাত কচলাতে লাগলেন ভদ্রলোক।

"লঙ্কা পাওয়া যাবে নিশ্চয়?" আমার স্ত্রী প্রশ্ন করলেন।

"তা যাবে, তা যাবে।"

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ।

ফোঁস করে উঠলেন আমার বোনটি।

"লঙ্কা পেয়ে আর কাজ নেই। বৌদি খিচুড়িটি ঝালে পুড়িয়ে দেবে তাহলে।"

"তোকে আমি সাবু করে দেব, তাই খাস।"

কিন্তু-কিন্তু মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্বাস মশাই।

আমি তাঁকে গোটা পাঁচেক টাকা দিয়ে বললাম, "যা পান কিনে আনুন। আমি ততক্ষণ স্টোভ জেলে চায়ের জলটা চড়িয়ে দিই।"

দুটো ঘর নিয়েছিলাম আমরা। একটা ঘরে বাবা মা ছিলেন।

মা বেরিয়ে এসে বললেন, "আমার বাবা একটু গঙ্গাজল চাই!"

চার সঙ্গী

আলোকচিত্রী শ্রীশম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বাস মশাই কখন যে কুঁজো দুটি ভরে এনেছিলেন টের পাইনি। বললেন, "দু কুঁজো জল আমি এনে রেখে দিয়েছি ও-ঘরে।"

"ও কুঁজো বাবা শতেক জাতে ছুঁয়েছে। একটু শুদ্ধভাবে যদি—"

"আচ্ছা আনব মা। নতুন কলসী কিনে ভরে আনি তাহলে—"

বিশ্বাস মশাই চলে গেলেন।

আমি স্টোভ জেবলে চায়ের জলটা চড়িয়ে দিলাম।

গিন্নী ছোট ছেলের কপালে হাত দিয়ে বললেন, "এর ত বেশ জ্বর হয়েছে দেখছি—"

মন্তব্য করলাম, "আগ্রাতেই ত ওর জ্বর হয়েছিল। লাফিয়ে ত চলে এলে।"

"আমি লাফিয়ে এলাম, না তুমি লাফিয়ে এলে? পরের ঘাড়ে দোষ চাপান তোমার কেমন একটা স্বভাব—"

দাম্পত্য কলহের উপক্রম হল।

ছোট ছেলেই থামিয়ে দিলে সেটা।

"না বাবা, আমার কিছু হয়নি। র‍্যাপার মুড়ে শুয়েছিলাম কিনা তাই কপালটা গরম হয়েছে—"

"খুব হয়েছে, শুয়ে থাক এখন।"

মায়ের ধমক খেয়ে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে সে আবার শুয়ে পড়ল।

একটু পরেই বিশ্বাস মশাই বাজার থেকে ফিরলেন জিনিসপত্র নিয়ে। দেখলাম আপাদমস্তক ভিজে গিয়েছেন ভদ্রলোক। আমার শালীর দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, "থাড়ি মুশুরিই পেয়েছি মা। বেশ ভাল ডাল।"

তাঁর পিছনে দেখলাম পাণ্ডাদের একটা ছোঁড়া নতুন কলসীতে করে গঙ্গাজলও নিয়ে এসেছে মায়ের জন্যে। বিশ্বাস মশাই আমার কাছে এসে কানে কানে বললেন, "আমিই নিয়ে আসতুম গঙ্গাজলটা, কিন্তু আমি ত ব্রাহ্মণ নই। কর্তা মা যদি আপত্তি করেন, তাই ওকেই বললাম নিয়ে আসতে। গোটা চারেক পয়সা দিলেই চলবে।"

বিশ্বাস মশাই বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর সপ-সপে ভিজে কাপড়ের কোঁচাটা নিঙড়ে জল বার করতে লাগলেন। কামিজের সামনের দিকটাও নিঙড়ে ফেললেন।

চা হয়ে গিয়েছিল।

বললাম, "চা খান বিশ্বাস মশাই।"

"দেবেন? বেশ দিন—"

একটা গ্লাসে চা দিলাম। তিনি একধারে সসঙ্কোচে বসে চা খেলেন।

গিন্নী বাজারের জিনিসপত্র দেখে বললেন, "গুঁড়ো হলুদ আর লঙ্কা এনেছেন, কিন্তু ও ত ধুলোয় ভরতি, ওতে খিচুড়ির রং ত ভাল হবে না—"

বিশ্বাস মশাই একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন।

"হ্যাঁ, সেকথা আমারও মনে হয়েছিল। আচ্ছা, দেখছি—"

পাণ্ডার সেই ছেলেটি তখনও দাঁড়িয়েছিল, বিশ্বাস মশাই তার কানে কানে কী বললেন, তারপর তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই দেখলাম তিনি ছোট একটি শিল-নোড়া, কিছু গোটা হলুদ আর শুকনো লঙ্কা নিয়ে এসেছেন।

আমার শালী বললেন, "ওরে বাবা, ওসব এখন বাটবে কে?"

"আমি বেটে দিচ্ছি, কতক্ষণ আর লাগবে—"

বিশ্বাস মশাই এক কোণে বসে বাটনা বাটতে লেগে গেলেন।

বাটনা বেটে তোলা উনুনটা নিয়ে এলেন তিনি। বাজার যাওয়ার সময়েই সেটাতে আঁচ দিয়ে গিয়েছিলেন। গিন্নী খুশী হলেন খুব। বেশ গনগনে আঁচ উঠেছে।

শালী বললেন "আমি আলু-ছেঁচকি করব। ঊষা, তুই ভাই আলুগুলো কুটে ফেল—। ও হরি, বঁটিই যে নেই—"

"এনে দিচ্ছি—"

বিশ্বাস মশাই পাণ্ডাদের কাছ থেকে বঁটি জোগাড় করে আনলেন।

আলু কোটা হলে আবিষ্কৃত হল ছেঁচকি হওয়ার পথে আর একটি অন্তরায় বিদ্যমান। পাঁচ-ফোড়ন নেই। বিশ্বাস মশাই আবার ছুটলেন।

তারপর স্নান করবার পালা। গঙ্গার স্রোত এত বেশী যে, সেখানে নেবে দাঁড়ান পর্যন্ত যায় না। একটা শিকল আছে, সেইটে ধরে কোনরকমে একটা কি দুটো ডুব দেওয়া যায়। বিশ্বাস মশাই সবাইকে একে একে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে আনলেন। তারপর দল-বেঁধে সবাইকে নিয়ে মন্দির, হর কি পৈরি, প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়ে আনলেন।

এসব সেরে বেশ ক্ষিধে পেয়ে গেল সকলের। তখনও কিন্তু রান্না চড়েনি। ঠিক হল কিছু গরম লুচি-তরকারি খেয়ে নেওয়া যাক জলখাবার হিসেবে। বিশ্বাস মশাই আবার গেলেন সে-সব ভাজিয়ে আনতে। তাঁকে পই পই করে বলে দেওয়া হল, তিনি যেন নিজের সামনে ভাজিয়ে আনেন সব।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আনব বই কি। নিজের সামনেই ভাজিয়ে আনব।"

বৃষ্টির বেগটা কমেছিল কিন্তু টিপ টিপ করে পড়ছিল তবু। বিশ্বাস মশাই বেশ ভিজেই ফিরলেন।

বললাম, "বিশ্বাস মশাই আপনি কাপড়টা জামাটা ছেড়ে ফেলুন না।"

বিশ্বাস মশাই নির্বিকার। খাবারের ঝুড়িটা খুলতে লাগলেন। বললেন, "খাঁটি ঘিয়ে ভাজিয়ে এনেছি। আচারও বেশী করে এনেছি একটু—"

"এনেছেন বেশ করেছেন। কাপড়-জামাটা ছাড়ুন—"

বিশ্বাস মশাই হেসে বললেন, "একেবারে রাত্রে শোবার সময় ছাড়ব। শুকনো জামা-কাপড় পরলে আবার এখুনি ত ভিজে যাবে।"

বুঝলাম, এ-বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। কারণ পরমুহূর্তেই বাবা বললেন, তাঁর নস্যি ফুরিয়ে গিয়েছে, এখানে পাওয়া সম্ভব কি?

তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন বিশ্বাস মশাই।

"হ্যাঁ, সম্ভব বই কি। র-মাদ্রাজী, পরিমল দুরকমই পাওয়া যাবে। কোন্‌টা আনব বলুন—"

বাবা র-মাদ্রাজী আনতে বললেন। র-মাদ্রাজী নস্যি এনে বিশ্বাস মশাই পা-টি মুড়ে যেই বসেছেন অমনি আমার গিন্নী বললেন, "ছায়া, চিরুনিটা যে তোর হাতে দিলুম আগ্রা হোটেলে—"

ছায়া আমার শালী। সে ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, "আমার হাতে কখন দিলে আবার। দিয়ে থাকলে ওই অ্যাটাচিতেই রেখেছি—"

"কই এতে ত নেই!"

বাক্স, সুটকেশ, তোরঙ্গ সব খোঁজা হল। চিরুনি নেই।

সুতরাং বিশ্বাস মশাই আবার ছুটলেন চিরুনি কিনতে, স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে ছুটলেন। আমি তাঁকে কয়েকটা কুইনিন ট্যাবলেটও আনতে দিলাম আমার ছোট ছেলেটার জন্যে। জ্বর যদি বেড়ে যায়, বিপদে পড়ে যাব এই বিদেশে। সমস্ত এনে দিলেন বিশ্বাস মশাই।

খিচুড়ি আর আলুর ছেঁচকি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাস মশাইকেও আমাদের সঙ্গে খেতে বলেছিলাম। খাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বিশ্বাস মশাই বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন। ভাল ঘি আছে আমার একটু, নিয়ে আসি—।" দৌড়ে চলে গেলেন এবং ভাল গাওয়া ঘি নিয়ে এলেন একটা শিশি করে। বললেন, কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন—তিনি দিয়ে গিয়েছেন এটা তাঁকে। বেশ তৃপ্তি সহকারে খাওয়া গেল।

খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম আমরা সবাই। বিশ্বাস মশাই বসে রইলেন একধারে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে।

"আপনিও যান না, একটু বিশ্রাম করে নিন।"

বিশ্বাস মশাই সসঙ্কোচে বললেন, "আপনাদের যদি কোনও দরকার হয়—"

"না, আর কিছু দরকার হবে না। আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন গিয়ে। বিকেলে এসে আমাদের সঙ্গে চা খাবেন।"

চলে গেলেন বিশ্বাস মশাই।

বিকেলে এলেন একটি লোক সঙ্গে করে। বললেন, "আপনারা কি দুধ খাবেন,

আমার পরিচয় দেবার মত নয়

ঢাকা, ঘাটে একটি বউ কলসী ভাসিয়ে চান কচ্ছে, টকটকে লাল গামছা তার হাতে। হৃষিকেশ হরিদ্বারের গঙ্গার চেয়েও ও-ছবি আমার বেশী ভাল লাগে—"

"আপনি ত কবি লোক দেখছি—"

কুণ্ঠিত হাসি হেসে বিশ্বাস মশাই বললেন, "আমি সামান্য লোক। তবে আমার দাদা একজন নামজাদা লোক ছিলেন, তাঁর কথা বলতেও লজ্জা করে আমার। আমি তাঁর ভাই হওয়ার উপযুক্ত নই।"

"কে আপনার দাদা বলুন ত—"

"কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস। আমি দাদার নামের মর্যাদা রাখতে পারিনি।"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

"আপনি কী করেন এখানে—"

"এই যাত্রীদের, বিশেষ করে বাঙালী যাত্রীদের, সেবা করি। এ ছাড়া আর কী করবার যোগ্যতা আছে বলুন—"

"বাসা বলে ত আমার কিছু নেই। ট্রেন-গুলো অ্যাটেণ্ড করি, যদি কোন যাত্রী আসে। প্ল্যাটফর্মেই থাকি অধিকাংশ সময়। আর তা না হলে ওই কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার বাড়ির বারান্দায়। যাত্রীদের সেবা করাই কাজ ত—"

পাশের ঘরে আমার ছোটছেলেটার গলার আওয়াজ পেয়ে উঠে পড়লেন বিশ্বাস মশাই।

"খোকন উঠেছে, ওর জন্যে দুধ জোগাড় করেছি একটু, গরম করে খাইয়ে আসি—"

তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলেন।

লছমনঝোলা যাবেন। যদি যান, তাহলে বাসে করেই যাওয়া ভাল। ইনি আমার চেনা বাসওলা। একটা ছোট বাস যদি রিজার্ভ করে নেন, ইনি সস্তায় করে দেবেন—"

বললাম, "যেতে ত খুবই লোভ হয়। কিন্তু আমাদের ব্যাপার ত দেখছেন, এখানে আপনি ছিলেন তাই সামলে দিলেন, কিন্তু সেখানে—"

"যদি বলেন সেখানেও আমি যাব।"

খবরটি পাওয়ামাত্র চনমন করে উঠল সবাই।

বাবা বললেন, "এতদূর এসে যদি না দেখে ফিরে যাই তাহলে আমাদের আর দেখা হবে না। তোমরা হয়ত আবার আসতে পার, কিন্তু আমরা আর পারব না।"

এ-যুক্তি অকাট্য। একটা কুইনিনের বড়ি খেয়ে ছেলেটার জ্বরও কমে গিয়েছিল। সুতরাং যাওয়াই স্থির হল।

হৃষিকেশ-লছমনঝোলার বর্ণনা করে সময় নষ্ট করব না, কারণ তা বর্ণনা করা যাবে না। হৃষিকেশ-লছমনঝোলায় বিশ্বাস মশাই যা করেছিলেন তা-ও প্রায় অবর্ণনীয়। আমি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিলাম বলে আমার পা পর্যন্ত টিপে দিয়েছিলেন তিনি। হৃষিকেশের সরাইখানায় বিশ্বাস মশাইকে একটু নির্জনে পেয়েছিলাম রাত্রিবেলা।

জিজ্ঞাসা করলাম "আপনার দেশ কোথা বিশ্বাস মশাই। বাংলা দেশে নিশ্চয়?"

"হ্যাঁ, বাংলা দেশে বই কি। তবে সে-দেশ ছেলেবেলায় ছেড়ে এসেছি।"

"কোথা বাড়ি ছিল আপনার?"

"তা আর না-ই শুনলেন। আমি সামান্য লোক—"

কাঁচুমাচু হয়ে থেমে গেলেন বিশ্বাস মশাই।

"না, না, বলুন শুনি।"

"আমার পরিচয় দেবার মত নয়। আমি বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারিনি, লেখা-পড়া পর্যন্ত শিখিনি, ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলাম।"

সসংকোচে থেমে গেলেন।

"বাংলা দেশের কথা মনে আছে আপনার?"

"খুব বেশী নেই। তবে একটি ছবি মনে আছে। ছোট একটি পুকুর, পুকুরের পাড়ে তালগাছ, নারকেল গাছ সুপুরি গাছ। পুকুরের জল কুচকুচে কালো, সবুজ পানায়

ফেরবার সময় হরিদ্বারে বিশ্বাস মশাই এলেন আমাদের ট্রেনে তুলে দেবার জন্য। অনেক রাত হয়েছিল। নিজ হাতে তিনি আমাদের বিছানাপত্র পেতে দিলেন, জিনিস-গুলি গুছিয়ে দিলেন। কুঁজোতে জল ভরে দিলেন, রাত্রের খাবার আলাদা করে বেঁধে দিলেন, তারপর প্ল্যাটফর্মে নেমে ম্লান-মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন অন্যদিকে চেয়ে। মনে হল, তিনি যেন অতি প্রিয় পরিজনদের বিদায় দিতে এসেছেন।

ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল, গার্ড সাহেব বাঁশি বাজালেন।

হঠাৎ আমার কী মনে হল, হঠাৎ মুখ বাড়িয়ে ডাকলাম—

"বিশ্বাস মশাই, শুনুন—"

বিশ্বাস মশাই এগিয়ে এলেন।

"এইটে রেখে দিন, সামান্য কিছু—"

একখানা দশ টাকার নোট বার করে তাঁর হাতে দিলাম।

"আঁ, একী, আপনি আমাকে টাকা দিলেন, টাকা দিলেন!"

ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে।

দেখলাম, বিশ্বাস মশাই নোটটি হাতে করে অসহায়ভাবে চেয়ে রয়েছেন আমাদের গাড়ির দিকে। তাঁর মুখ বিবর্ণ, হাতটা কাঁপছে।

উলটো সমঝালি রাম

॥ ক্ষিতিমোহন সেন ॥
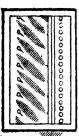
ছেলেবেলায় দেখতাম কাশীতে, শারদীয় উৎসবের একটি বিশেষ রূপ। উত্তরপ্রদেশে অবাঙালীদের মধ্যে এই উৎসব সাধারণত আরম্ভ হত নবরাত্র নিয়ে। নবরাত্রের ভোর-বেলা কাশীর একটি বিশেষত্ব ছিল।

আমরা বালকের দল ভোর না হতেই গঙ্গাস্নান করে চেলবস্ত্র পরিধান করে সেদিন দলে দলে দুর্গাবাড়ি যেতাম। কাশীর বাঙালীটোলা থেকে দুর্গাবাড়ি অনেকটা দূর। তবু সেই বয়সে এমন উৎসাহ ছিল যে, দুর্গাবাড়ি পৌঁছে দেবীদর্শন করেও অনেক সময়ে দেখা যেত, তখনও সূর্যোদয় হয়নি।

দুর্গাপুজো জগজ্জননী মহাশক্তির পুজো। এখনকার কাশী একটি শৈব পীঠস্থান, কিন্তু এই শৈব পীঠস্থানের অনেক দেবদেবীমূর্তি দেখলে মনে হয়, আমাদের সঙ্গে চীন জাপান ও মিশরের কী গভীর সম্বন্ধ বহুকাল ধরে চলে আসছে এই শক্তি-সাধনার পথে।

বাঙালীটোলার চৌষট্টি যোগিনীর তীর্থ-স্থানগুলির মধ্যে শক্তির বাহন সিংহমূর্তি যিনি দেখেছেন, তিনিই স্বীকার করবেন যে, তিব্বত, চীন, জাপানের এই সব বাহনের রূপ, তার ধ্যানমন্ত্রের সঙ্গে আমাদের পূর্ব-সাধকদের সাধনার সঙ্গে অনেক দিক দিয়ে মিল আছে।

মুসলমানদের মধ্যেও শক্তিপূজক দু-এক-জন সাধকের দেখা মেলে। রাজপুতানার রসুলশাহ একজন সেইরূপ মস্ত সাধক। এই রসুলশাহের একজন ভক্তলোক একবার পুজোর সময়ে এলেন কাশীতে। রইলেন দুর্গাবাড়ি ছাড়িয়ে; সংকটমোচন তীর্থের পাশে। মুন্সী কেদারনাথের বাগানে। দুর্গা-বাড়ির কাজ সেরে আমরা যেতাম তাঁর কাছে।

* * *

প্রায় চার শ বছর আগেকার কথা।

ভক্ত দাদুর কাছে একদিন এক মুসলমান মহিষীর লোক এসে হাজির। তাঁর স্বামী গুজরাতের সুলতান, অতি দুর্দান্ত তাঁর প্রতাপ।

এক সময়ে এই মহিষীর মুহা বশবর্তী ছিলেন সেই সুলতান। কিন্তু হায়, এখন আর তিনি মহিষীর আয়ত্তের মধ্যে নেই। তাই ভক্ত দাদুর কাছে মহিষী কাতর প্রার্থনা জানিয়ে লিখেছেন যে, তাঁকে এমন বশী-করণ কবচ দেওয়া হক যাতে ঐ সুলতান মহিষীর আয়ত্তের মধ্যে ধরা পড়েন।

এরূপ কাজের কথা শুনে সন্ত দাদুজী অতিশয় বিচলিত হয়ে উঠলেন। দাদুজী জানালেন, এইসব জাদুটোনা ত তাঁর পথ নয়। বরং বলতে পারেন, এইসব ছোট দিকে মন না দিয়ে তিনি যেন সুলতানের প্রেমযুক্ত সেবায় লেগে থাকেন। একদিন না একদিন সুলতান নিজের ভুল বুঝতে পারবেন। "আপনি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন।" কথাটি তিনি লিখে পাঠালেন একটি ছন্দো-বদ্ধ কবিতায়।

কবিতাটি এই :

> টামন টুমন হে সখা
> কর মতি কভী কোয়।
> প্রেমভর সেবা কর
> আপহি পতিবশ হোয়॥

এই ঘটনার পর বছর দেড়েক চলে গেল। দাদুর আশ্রমের লোকজনেরও মনের উপর একটি বিস্মৃতির পর্দা এসে পড়ল।

একদিন প্রভাতকালে অনেক উট, গরু প্রভৃতি নানা ভারবাহী জীব দাদুজীর আশ্রমে এসে উপস্থিত। বিস্মিত আশ্রম-বাসীরা বার বার প্রশ্ন করে জানলেন, ঐ সমস্ত ভারবাহী জীব দাদুজীর জন্য অনেক সওগাত বহন করে এনেছে।

মস্ত সাধক দাদুজী হলেন বৈরাগী-মানুষ। এই সব সওগাত নিয়ে তিনি করবেন কী? তবু যখন বার-বার প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন, তখন শুনতে পেলেন, গুজরাতের সুলতান-মহিষীকে কিছুদিন আগে দাদু যে এক বশীকরণ কবচ দিয়ে-ছিলেন, সেই কবচের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায়, সুলতান-মহিষী দাদুজীকে সামান্য কিছু সওগাত পাঠিয়েছেন। এখন সন্তজী দয়া করে যদি এই সামান্য বাসনাপূর্তির উপহারগুলি গ্রহণ করেন, তবেই সেই রাজ-মহিষীর বাসনা পূর্ণ হয়।

দাদুজী যখন শুনলেন যে, তাঁর দেওয়া কবচের বশীকরণ-মন্ত্র সিদ্ধ হয়েছে, তখন দাদু আরও মুশকিলে পড়ে গেলেন।

দাদুজী বললেন, "জাদুটোনা বশীকরণ প্রভৃতি পথ ত আমাদের নয়। আর তা ছাড়া এইরকম কবচ তাবিজ দেওয়াও আমার মনঃপূত নয়। তবে রাজমহিষী কী করে বুঝলেন যে, আমার দেওয়া বশীকরণ-মন্ত্রে তাঁর বাসনা সিদ্ধ হয়েছে?"

রাজপুরুষেরা বললেন, "আমরা কি বৃথাই এইসব ভার বহন করে নিয়ে এলাম। আমাদের রাজমহিষী কি শুধু স্বপ্নাবিষ্টের মত সন্তজীর জন্য এইসব উপঢৌকন পাঠিয়ে দিলেন। এমনকি তিনি সন্তজীর স্মরণার্থ এই মন্ত্রগর্ভ তাবিজটিও এই সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কারণ, অনেকে বলেছিলেন যে, দাদুজী কিছুতেই এইসব সওগাত স্বীকার করবেন না। এইসব মন্ত্র-তাবিজের কারবার তাঁর নেই। এইসব যুক্তিতর্ক শুনে কেউ তখন সেই সওগাত নিয়ে সন্তজীর আশ্রমে যেতে সাহস পাচ্ছিলেন না। তখন রাজ-মহিষী তাঁর হাত থেকে তাবিজটি খুলে আমাদের সঙ্গে দিলেন। এই তাবিজের মধ্যে তাঁর লেখা মন্ত্রটি এখনও আছে। একবার আপনারা খুলে দেখুন না কেন।"

তাবিজটি খোলা হল। দেখা গেল যে, তার মধ্যে সেই বশীকরণ-মন্ত্র স্বীকার না করবার বাণী, অর্থাৎ

> টামন টুমন হে সখী
> কর মতি কভী কোয়।
> প্রেমভর সেবা কর,
> আপহি পতিবশ হোয়॥

অর্থাৎ যেই মন্ত্র দিয়ে তিনি এই তাবিজ দেওয়ার বিরুদ্ধমত জানালেন, সেই মন্ত্রকেই তাবিজের মধ্যে ভরে মহিষী কবচরূপে ধারণ করলেন। এই এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। অর্থাৎ সাধনার যে-মন্ত্র দিয়ে দাদুজী বশী-করণের আসল পথ জানালেন, সেই মন্ত্রকেই মহিষী বশীকরণের মন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলেন, এবং তাতে ফলও সিদ্ধ হল।

• • •

বাংলাদেশেও তিন-চারশত বছর আগে

এই রকমেরই আর একটি ঘটনা ঘটেছিল। মনাই ফকিরের গুরুর গুরু (দাদাগুরু) ঘড়া ফকির সাহেবও কাউকেও মন্ত্রটোনা বা তাবিজ দিতেন না। এই কথাটি তাঁর এক ভক্তকে লিখে জানালে, সেই লেখাটিই তিনি ধারণ করেন। এবং ফলসিদ্ধিও নাকি ঘটল। তারপর এই কথা বলে যখন ফকির সাহেবের দোকামে (আশ্রমে) সেই মানত পূর্ণ হওয়ার উপচয়ন এল, তখন নাকি সেই দাদা-গুরু মাধাই সাহেব বলেছিলেন—

"নূতন এক চীনশহরে
বন্ধ্যা নারীর পুত্র মরে।"

এই যে বাণীটি তিনি পাঠান তা বাউলদের মধ্যে এখনও প্রসিদ্ধ।

সেই সঙ্গে মনাই ফকির আরও বলে পাঠানঃ

"শাল গাছে বাউলের বাসা
মউল শিয়ালে খায়
কইমু কারে বুঝব কে বা
কে বা তা পতিয়ায় (প্রত্যয় করে)।"

এইরকম অদ্ভুত সিদ্ধি নিয়ে অনেক মজার মজার গল্প বাউলদের মধ্যেও প্রচারিত আছে। মুসলিম সাধনার মধ্যে এইসব কথা অনেক শোনা যেত মুন্সী কেদারনাথের বাগানে যিনি আসতেন সেই সাধুটির মুখে। এখনও শারদীয় পূজা উপস্থিত হলে সেই সব কথা মনে হয়।

মুসলমান সূফী ও বাংলার বাউল, এই উভয় দলের মধ্যেই ঐ ভাবের নানা কথা,ও কাহিনী দেখতে পাই।

সূফীদের মধ্যে প্রচলিত এক মজার গল্প-সংগ্রহের নাম "হিকায়ত-ই-লতীফ," অর্থাৎ মজার গল্পসংগ্রহ। এইরকম মজার গল্পের রসসৃষ্টি করতে হলে একদিকে একটু সরল বুদ্ধির লোকচরিত্রের দরকার। পার্শী সূফীসাহিত্যে এই জন্য খররিজম প্রদেশ-বাসীর চরিত্র রয়েছে।

খররিজমে অনেক পাণ্ডিতের জন্ম। তাই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মূর্খতার রসটি জমিয়ে তুলতে হলে ঐ প্রদেশের গল্পের সাহায্য নিতে হয়।

এই মূর্খতা ও পাণ্ডিত্যের যোগে কী সুন্দর রূপ-রস জমে ওঠে, তা পড়লেই বোঝা যায়।

উদাহরণস্বরূপ সেইরূপ একটি গল্প নিয়ে দেখা যাকঃ

এক বৃদ্ধ মৌলবী মহাপণ্ডিত আর তাঁর এক প্রিয় শিষ্য, উভয়ে বহু শাস্ত্র আলোচনা করে দেখলেন যে, পুঁথিগত বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করলেই মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধি মহত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠ হয়।

গুরু মৌলবী বললেন, "তবে চল, তীর্থ-দর্শন উপলক্ষ করে দেশবিদেশে ঘুরে আসা যাক।"

উভয়ে বের হলেন। কয়েকটা দিন নির্বিঘ্নে কাটল। তারপর একদিন এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর পার হতে গিয়ে হঠাৎ চেলাটি এক তৃণাচ্ছাদিত কূপের মধ্যে পড়ে গেলেন। ভাগ্যে কুয়োটা তত গভীর ছিল না। উপর থেকে বৃদ্ধ গুরু বললেন, "হে আমার প্রিয় শিষ্য, ভয় নেই, আমি উপরে আছি। এখান থেকে দূরে একটি গ্রামও দেখা যাচ্ছে। সেখানে গিয়ে আমি লোকজন নিয়ে আসি। প্রহরখানেকের মধ্যে তোমাকে উদ্ধার করা যাবে। ভয় নেই। তুমি শুধু ততক্ষণ স্থির হয়ে থাক। তোমার আবার ছুটে-বেড়ান রোগ আছে। সেইটের বশবর্তী হয়ে আর কোন দিকে যেন চলে না যাও।"

এইরকম আর একটি গল্প বলা যাক। এক মৌলবী একদিন সকালবেলা শহরের উপকণ্ঠে বেড়াচ্ছেন। এমন সময়ে কয়েকটি দুষ্টু ছেলে পিছন থেকে হঠাৎ দৌড়ে এসে তাঁর পাগড়িটা তুলে নিয়ে দৌড়ে পালাল। মৌলবী সাহেব বুড়ো মানুষ। তিনি এই ছোকরাদের সঙ্গে পারবেন কেন! তাই দেখা গেল, একটি ছোকরা পাগড়ি হাতে দৌড়ে পালাচ্ছে। আর তার পিছনে পিছনে মৌলবী সাহেব প্রাণপণ করে দৌড়চ্ছেন। আর বলছেন, "হে মহাশয়, আপনি ত আমার ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন না। কাজেই আপনার কাজ শেষ হয়ে গেলে পাগড়িটা ফেরত দেবেন কী করে।"

খালি-মাথায় পথেতে যাওয়া অত্যন্ত অভদ্র আচরণ। তবু ঐ বৃদ্ধ বহু চেষ্টা করে খানিকটা গিয়েই এক মকবরাতে (কবরস্থান) বসে হাঁপাতে লাগলেন। মৌলবী খুব বিখ্যাত পণ্ডিত লোক। তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে জনৈক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি এখানে কেন? আপনার মাথার পাগড়ি কোথায়? আপনি কার প্রতীক্ষায় মকবরাতে এই রকম বসে আছেন?"

মৌলবী বললেন, "এক ভদ্রলোক হঠাৎ আমার পাগড়ি নিয়ে দৌড়ে চলে গেলেন। তিনি আমার ঠিকানা জেনে গেলেন না, কি তাঁর ঠিকানাও বলে গেলেন না। এমন অবস্থায় কী করা যায়? বেঠিকানা মানুষের ঠিকানা মেলে কোথায়? তখন মনে হল, এটা ত মকবরা, কাজেই একদিন না এক-দিন তাঁকে এখানে আসতেই হবে। তাই এখানেই প্রতীক্ষা করছি।"

কিন্তু হায়! সেই বৃদ্ধ মৌলবী সাহেবটি এই তরুণের প্রতীক্ষা কতদিন আর করতে পারবেন?

• • •

এখনও শারদীয় উৎসব এলে সেই সমস্ত গল্পের স্মৃতি মনের মধ্যে জেগে ওঠে।

কিন্তু এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে যে, আমাদের এই সব চঞ্চলতার মূল্য কী। কারণ, কাল সীমাবদ্ধ। এবং এইসব সাহিত্যের বিরাট সমুদ্র আমাদের চারদিকে এখনও স্তব্ধ হয়ে রয়েছে।

(সি ৫৯৯১)

দাশের রসগোল্লা
বিদেশেও প্রিয়জনের তৃপ্তিকর

দাশের্স কনফেকসনারী

তত্ত্বাবধানে
কে,সি,দাশেস্ গ্রাণ্ডসন্
হাইকোর্ট, কালিঘাট
কলিকাতা

এই পথে আসতে যেতে অনেকবার দুজনের মুখোমুখি দেখা হয়েছে। ট্রামে বাসেও কতবার। আর, এই যক্ষা হাসপাতালের ফটকেও। শুধু মুখচেনা পরিচয়; একটা বছরের মধ্যে অনেকবার মুখোমুখি দেখা হলে যতটুকু পরিচয় হয়, ততটুকু। দুজনের মধ্যে কোনদিন কোন আলাপ, কিংবা সামান্য দু-একটা কথারও বিনিময় ঘটেনি।

কিন্তু অনুমানে দুজনেই দুজনের ভাগ্যের একটা বেদনার পরিচয় বুঝে নিতে পেরেছে। ধারণা করতে পারে প্রভাত, এই হাসপাতালের কোন কেবিনের বিছানায় এমন কেউ একজন আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন, যিনি এই মহিলার কোন আপন-জন হবেন। সুমিত্রাও অনুমান করতে পারে, ভদ্রলোক এখানে নিশ্চয় এমন কোন রোগীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসেন, যিনি ভদ্রলোকের কোন আপন-জন; কিংবা প্রায় আপনজনের মত কেউ একজন হবেন।

পরিচয় হলো সেদিন, যেদিন দেখতে পেল সুমিত্রা, সেই চেনামুখ অথচ অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে সুমিত্রারই পরিচিত পুরনো বান্ধবী অঞ্জলি হাসপাতালের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

অঞ্জলিই পরিচয় করিয়ে দিল। ভদ্রলোক হলেন অঞ্জলির দাদা প্রভাতকুমার বরাট। জীবন বীমা কোম্পানির অর্গানাইজার। এতদিন আসাম সার্কেলের চার্জে ছিলেন, কিন্তু বউদির অসুখ হবার পর বাধ্য হয়ে আর চেষ্টা করে কলকাতার অফিসে ফিরে এসেছেন।

—নিরুপমাকে মনে আছে তো সুমিত্রা?

—হ্যাঁ।

—সেই নিরুপমার দিদি শোভাদির সঙ্গে দাদার বিয়ে হয়েছে।

কুণ্ঠিতভাবে এবং একটু ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে সুমিত্রা—কি অসুখ শোভাদির?

কোন কথা না বলে, শুধু চোখের ইসারায় বিরাট হাসপাতাল বাড়িটাকে দেখিয়ে দিয়ে গম্ভীর হয়ে যায় অঞ্জলি।

অঞ্জলির দাদা প্রভাত বরাটের দু'চোখের দৃষ্টিও যেন হঠাৎ উদাস হয়ে যায়। পাতা ঝরে গিয়েছে, রিক্ত হয়ে গিয়েছে ফটকের কাছের যে কৃষ্ণচূড়াটা, সেটারই দিকে তাকিয়ে আনমনার মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে প্রভাত বরাট।

—দাদা?

অঞ্জলির ডাক শুনে মুখ ফেরায় প্রভাত।

সুমিত্রার পরিচয় শোনাতে থাকে অঞ্জলি—এ হলো আমার বন্ধু সুমিত্রা। এক কলেজের একই ক্লাসের বন্ধু। আমার যে-দিন বিয়ে

হয়েছে, সেদিন সুমিত্রারও বিয়ে হয়েছে। তাই কেউ কারও বিয়ে দেখতে পাইনি।

আরও অনেক কথা বলে অঞ্জলি, তাই জানতে পারে প্রভাত, অঞ্জলির বান্ধবী এই মহিলা হলেন সুমিত্রা ঘোষ। সুমিত্রার স্বামী লোকেন ঘোষ ইকনমিক্সের ভাল স্কলার, কলেজের লেকচারার। আর সুমিত্রা ঘোষ নিজেও মেয়ে-স্কুলের টিচার। বেশ আছে ওরা দুজন; স্বামী-স্ত্রীতে একসঙ্গে মিলে লেখাপড়ার চর্চা করে বেশ সুখেই আছে।

—কিন্তু...। কি-যেন সন্দেহ করে সুমিত্রার মুখের দিকে একটা প্রশ্ন করতে গিয়েই হঠাৎ থেমে যায় অঞ্জলি।

—কি বলছিলে? প্রশ্ন করে সুমিত্রা।

—তুমি এখানে কেন? ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করে অঞ্জলি।

—উনি যে এখন এখানেই আছেন।

মাথা হেঁট করে সুমিত্রা। বেদনাতুর মুখের একটা দুঃসহ বিষাদের ছায়া যেন লুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করছে সুমিত্রা। গম্ভীর হয়ে যায় অঞ্জলি। আর, প্রভাতের উদাস চোখের দৃষ্টিও করুণ হয়ে যায়।

সেদিনের পর অনেকদিন পার হয়ে গিয়েছে। প্রভাত বরাট আর সুমিত্রা ঘোষের মুখোমুখি দেখাও হয়েছে অনেকবার। ট্রামে বাসে পথে, আর হাসপাতালের এই ফটকের কাছেও কতবার দেখা হয়েছে। কিন্তু আর তো সেই অপরিচয়ের বাধা নেই। এখন দেখা হলে দুজনের মধ্যে দুচারটে প্রশ্নের বিনিময় হয়েই থাকে। কুশল প্রশ্ন নয়; দুটি উদ্বিগ্ন অদৃষ্টের করুণ প্রশ্ন।

জিজ্ঞেস করে প্রভাত—এখন কেমন আছেন মিস্টার ঘোষ?

সুমিত্রা—আছেন একরকম।

প্রভাত—কিছুটা উন্নতি নিশ্চয় হয়েছে?

সুমিত্রা—উন্নতির কোন লক্ষণ তো দেখছি না। ...শোভাদি কেমন আছেন?

প্রভাত—ভাল হয়ে যেতে পারে বলে আশা করতে পারা যাচ্ছে, এই মাত্র।

(২)

আজকাল আসবার সময় যদি ট্রামে বাসে বা পথে কোথাও দেখা হয়ে যায়, তবে বাকি পথটুকু দুজনে একসঙ্গেই গল্প করতে করতে পার করে দিয়ে হাসপাতালের ফটকের কাছে এসে একবার থামে। —আচ্ছা আসি। সুমিত্রা চলে যায়, পূবের ওয়ার্ডের দিকে।

—আসুন। প্রভাত চলে যায় পশ্চিমের ওয়ার্ডের দিকে।

চলে যাবার সময় যদি ট্রামে বাসে বা পথে কোথাও দেখা হয়ে যায়, হাসপাতালের ফটকে কিংবা ঢাকুরিয়া বাজারের বাসস্টপের কাছে, অথবা যাদবপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, তবে বাড়ি ফেরবার বাকি পথের অনেকখানি দুজনে একসঙ্গে গল্প করতে করতেই পার হয়ে যায়।

শ্যামবাজারের পাঁচ-রাস্তার সিঁথির বাস ধরবার জন্য উত্তর দিকে এগিয়ে যায় সুমিত্রা আর, দমদমের বাস ধরবার জন্য পূর্বদিকে এগিয়ে যায় প্রভাত।

—সিঁথিতে কোথায় থাকেন আপনি? জিজ্ঞাসা করে প্রভাত।

সুমিত্রা—জয় দত্ত ফার্স্ট লেন।

প্রভাত—আপনাদের নিজেদের বাড়ি?

সুমিত্রা যেন একটা দীর্ঘশ্বাস চাপতে চেষ্টা করে বলে।—হ্যাঁ... আর বলবেন না! এই বাড়িটাই তো...।

প্রভাত—কি বলছিলেন?

সুমিত্রা—কত আশা করে, কত চেষ্টা করে, এই বাড়িটাকে উনি কিনলেন। কিন্তু একটা মাসও এই নতুন কেনা বাড়িতে থাকবার সৌভাগ্য ও'র হলো না। বাড়িটাকে কেনবার পনর দিন পরেই ও'র এই কালব্যাধিটা ধরা পড়লো; সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে চলে গেলেন।

আর কোন প্রশ্ন করার সাহস পায় না প্রভাত। সুমিত্রা ঘোষের ভাগ্যের পরিহাস আরও কত নির্মমতা করে রেখেছে কে জানে! প্রশ্ন করলেই যদি শুধু এরকম এক-একটা দুঃসহ দুঃখের আর যন্ত্রণার কথা শুনতে হয়, তবে প্রশ্ন না করাই ভাল। প্রভাত বলে—আচ্ছা, আমি এবার আসি।

সুমিত্রা—আপনি দমদমে বোধ হয় অনেকদিন আছেন।

প্রভাত—হ্যাঁ।

সুমিত্রা—দমদমের কোথায়?

প্রভাত—বললে চিনবেন না। একটা নতুন রাস্তা, রাম রায় স্ট্রীটে আমার বাড়ি।

সুমিত্রা—আপনার নিজের বাড়ি নিশ্চয়।

প্রভাত—হ্যাঁ; তবে কি জানেন...।

কথা থামিয়ে হেসে ফেলে প্রভাত; একটা করুণ আক্ষেপের হাসি।

—কি বলছিলেন? প্রশ্ন করে সুমিত্রা।

প্রভাত বলে—একটা আধখানা বাড়ি।

সুমিত্রা—তার মানে?

প্রভাত—বাড়িটা মাত্র অর্ধেক তৈরী হয়ে উঠলো, বাস্...শোভাকে এই ভয়ানক রোগে ধরলো। শোভাকে হাসপাতালে ঠাঁই নিতে হলো। কাজেই...আর কি দরকার বলুন... শোভা যদি ভাল না হয়ে উঠতে পারে, তবে এই আধখানা বাড়ি অমনি আধখানা হয়ে পড়ে থাকবে। বাকিটুকু আর তুলবোই না।

সুমিত্রা—ভাল হয়ে যাবেন; নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবেন শোভাদি। আপনি এত হতাশ হয়ে পড়বেন না।

প্রভাত—সত্যি কথা কি জানেন? আমি সত্যিই হতাশ হইনি; যদিও ডাক্তারদের কথা থেকে বুঝতে পারি যে, ও'রা হতাশ হয়ে গিয়েছেন।

সন্ধ্যার আলোকের মেলা, আর, যান ও জনতার অফুরান আনাগোনার এই বিপুল হর্ষময় উৎসবের মধ্যে যেন একেবারে একলাটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন প্রভাত বরাট নামে এই ভদ্রলোক। ফুটপাথের এক পাশে দাঁড়িয়ে সুমিত্রার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই একেবারে আনমনা হয়ে গিয়েছেন। তবু অদ্ভুত একটা আশার জোর যেন চিকচিক করে জ্বলছে প্রভাত বরাটের দুই চোখে। একটা বিষণ্ণ স্নিগ্ধতা।

সুমিত্রা বলে—আপনি তো তবু একরকম ভাল আছেন। আশা নেই জেনেও আশা করতে পারছেন। আপনার মনের জোর আছে। কিন্তু আমি...আমি যে দিনগুলি সহ্য করতেই পারছি না।

কেঁদে ফেলে সুমিত্রা। চোখের উপর রুমাল চেপে চোখের জল চেপে রাখতে চেষ্টা করে।

বিচলিত হয় প্রভাত—এ কি করছেন, ছিঃ।

চোখ মুছে নিয়ে সুমিত্রা বলে—ডাক্তাররা বলছেন বটে যে, যদিও অবস্থা সিরিয়াস, তবু একেবারে হতাশ হবারও কারণ নেই; কিন্তু আমি যে কিছুতেই আশা করতে পারছি না প্রভাতবাবু।

সান্ত্বনা দিতে গিয়ে প্রায় একটা ধমক দিয়ে ওঠে প্রভাত বরাটের গলার স্বর।—এত দুর্বল মন হলে চলে না, খুব ভুল করছেন আপনি। আবোল তাবোল ভেবে মিছিমিছি নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন। ডাক্তারেরা যখন বলেছে যে আশা আছে, তখন নিশ্চয় আশা আছে। হতাশ হবার কোন অধিকারই আপনার নেই।

পথের পাশের একটা দোকানের আলো-ঝলমল রঙীন চেহারার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সুমিত্রা। প্রভাতের সান্ত্বনাময় ধমক খেয়ে যেন শান্ত হতে চেষ্টা করছে সুমিত্রা। সব বিষাদ জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে যেন স্নিগ্ধ হয়ে উঠতে চাইছে সুমিত্রার চোখ। কিন্তু ইচ্ছে করলেও পারছে না বোধ হয়। প্রভাত বরাট দেখতে পায়, মহিলার চোখে যেন একটা স্নিগ্ধ বিষণ্ণতা ছলছল করছে।

প্রভাতের গলার স্বর এইবার নরম হয়ে যেন গলে যায়।—মিস্টার ঘোষ নিশ্চয় ভাল হয়ে উঠবেন। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

—চলি এবার। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়েই সিঁথির বাস ধরবার জন্য এগিয়ে যায় সুমিত্রা। প্রভাতও রাস্তার ওপারের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায়; একটা খালি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। দমদম যেতে আপত্তি করবে না তো ট্যাক্সিটা?

(৩)

হাসপাতালের একটি কেবিন। বিছানার উপর বসে আছে প্রভাতের স্ত্রী শোভা। জীর্ণ-শীর্ণ ও ধুকপুকে একটি শরীরে আলোয়ান জড়িয়ে শুধু সাদাটে মুখখানি

যেন কোন মতে বাতাসের বুকে ভাসিয়ে রেখেছে শোভা। মাথার রুক্ষ চুল ফেঁপে রয়েছে। আর সিঁথির উপর ছড়িয়ে রয়েছে এক গাদা গুঁড়ো সিঁদুর।

শোভার বিছানার কাছে একটা টুলের উপর একটি আয়না আর সিঁদুরের কৌটা। শোভার এই রক্তহীন সাদা মুখে অদ্ভুত একটা হাসি যেন ঐ সিঁদুরের আভার মতই জ্বলজ্বল করে।

ঘরের ভিতর পায়চারি করে ঘুরেফিরে শোভার সঙ্গে গল্প করছিল প্রভাত। কেবিনের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় সুমিত্রা। হাসিমুখ তুলে সুমিত্রাকে আহ্বান জানায় শোভা। —আসুন। ওঁর কাছেই শুনলাম, আপনি আজ আমাকে দেখতে আসবেন।

কেবিনের ভিতরে ঢুকে, আর একটা চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে সুমিত্রা বলে—আজ কেমন আছেন?

—আজ আরও ভাল আছি। হেসে ফেলে শোভা। হাসির শব্দটা অদ্ভুত। সেতারের তারের উপর হঠাৎ একটা অসাবধান হাতের আঘাত পড়লে যেমন ঝনন্ করে একটা আর্ত হাসির ঝংকার চমকে ওঠে, শোভার হাসিটাও সেইরকম, একটা চমকে ওঠা ঝংকার।

—আমার কথাটা বোধ হয় বুঝতে পারেননি, তাই আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন। শোভা আবার নিজেই হেসে উঠে প্রশ্ন করে।

সুমিত্রা—বুঝবো না কেন? আপনি ভাল থাকুন। ভাল হয়ে উঠুন, এই প্রার্থনা করি।

—ছি ছি ছি। দয়া করে ওকথা বলবেন না। দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছি। এগিয়ে যেতে দিন। ভুল প্রার্থনা করে আমার সাধের মরণটাকে বাধা দেবেন না।...কিন্তু বাধা দিলেই বা কি হবে? ওষুধে না, কারও প্রার্থনাতেও না; আমার এই নিংসিঁদুর মিথ্যে হবার নয়।

কপালে হাত ছুঁইয়ে সিঁদুর-ছড়ানো সিঁথিটাকে দেখিয়ে দিয়ে হাসতে থাকে শোভা।—বিয়ের পর এক মাস যেতেই রাঙাপিসিমার পরামর্শে নিংসিঁদুর ব্রত করেছিলাম। ভাগ্যিস করেছিলাম। আমি যে সধবা মরবো মিসেস ঘোষ। কেউ আমার এই ভাগ্য খারাপ করে দিতে পারবে না; কারও সাধ্য নেই।

আয়নাটা হাতে তুলে নিয়ে মুখের কাছে ধরে, আর এক হাতের আঙুল চালিয়ে রুক্ষ চুলের ফাঁস ভাঙতে ভাঙতে শোভা বলে—উনি বলেন, আমি নাকি স্বার্থপরের মত কথা বলি। কিন্তু কি করবো বলুন? এই একটি স্বার্থ আমি ছাড়তে পারি না। আমি আগে যাবই।

হঠাৎ ব্যথিতভাবে চমকে ওঠে শোভা। শোভার মুখের সব হাসি যেন অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। —কি হলো? আপনি কাঁদছেন কেন?

চোখের উপর রুমালটাকে জোরে একবার ঘষে নিয়ে সুমিত্রা বলে—কিন্তু আমি যে কোনদিন নিংসিঁদুর করিনি। আমার কি

চিত্রলেখা, শান্তিনিকেতন — শিল্পী শ্রীনন্দলাল

আপনার মত আগে চলে যাবার সৌভাগ্য হবে?

—হতে পারে বৈকি। বিড়বিড় করে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে শোভা।

—হতে পারে কেন? নিশ্চয় হবে। আপনার মাথার সিঁদুরও নিৎসিঁদুর। সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে জোরগলায় চেঁচিয়ে ওঠে প্রভাত।

—ডাক্তারেরা কি বলেন? প্রভাতের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে শোভা।

প্রভাত বলে—ডাক্তারেরা বলেছেন, হতাশ হবার কোন কারণ নেই। তবু উনি, মিছি-মিছি...তুমি ওঁকে একটু বুঝিয়ে দাও শোভা।

শোভা—সত্যিই তো। আপনি উতলা হচ্ছেন কেন? নিশ্চয় সেরে উঠবেন মিস্টার ঘোষ। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনার সিঁদুরও নিৎসিঁদুর হোক।

—আজ আসি। বিদায় নেয় সুমিত্রা।

—আসবেন মাঝে মাঝে, যত দিন না...। আবার চমক দিয়ে বেজে ওঠে শোভার সেই রক্তহীন সাদাটে মুখের অদ্ভুত হাসির ঝংকার।

(৪)

সুমিত্রা বলে—হ্যাঁ বেশ তো। চলুন না। আপনার কথা তো আমার কাছে সবই উনি শুনেছেন। আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেলে উনি খুবই খুশি হবেন।

প্রভাতের ইচ্ছে ছিল, সুমিত্রারও আগ্রহ আছে; প্রভাত আর সুমিত্রা হাসপাতালের পূর্বদিকের ওয়ার্ডের একটি কেবিনের ভিতরে ঢুকতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে সুমিত্রার স্বামী লোকেন।

—আপনি বসুন। আপত্তি করে বাধা দিয়ে লোকেনের কাছে এগিয়ে আসে প্রভাত। নিজেই একটা চেয়ার কাছে টেনে নিয়ে চেয়ারের উপর বসে।

লোকেন—আপনার কথা সবই শুনেছি সুমিত্রার কাছে।

প্রভাত—এখন কেমন আছেন?

লোকেন হাসে—ভাল আছি বলতে পারি না। কিন্তু আশা আছে, ভাল হয়ে উঠবো।

প্রভাত—নিশ্চয় ভাল হবেন। মিসেস ঘোষের কাছ থেকে যেটুকু শুনেছি; তাতে তো মনে হয়, ডাক্তারেরাও হোপফুল।

লোকেন হাসে—ডাক্তাররা কেন হোপ করছেন জানি না; কিন্তু আমি ফুলের মত হোপ করছি ঠিকই।

প্রভাত—আপনিই যদি এরকম অন্যায় কথা বলেন তবে মিসেস ঘোষকে আর দোষ দেব কি?

লোকেন—আঁ? সুমিত্রা বুঝি আপনাদেরও কাছে কান্নাকাটি করে আপনাদের বিরক্ত করেছে?

প্রভাত—না না, বিরক্ত ধরবেন কেন? এসব কথা কি মানুষকে বিরক্ত করবার জন্য, না কেউ বিরক্ত হয়? তবে হ্যাঁ, মিসেস ঘোষ একটু বেশি নার্ভাস।

লোকেন—সেই জন্যেই তো দুঃখ হয় মিস্টার বরাট। ও যে শেষ পর্যন্ত কি করে ফেলবে...শোকটোক সহ্য করতে পারবে কি? না সেন্টিমেণ্টের মাথায় একটা আত্মঘাতী কাণ্ড করে......।

—থাক এসব কথা! প্লীজ! চমকে উঠে আড়চোখে ঘরের এদিকে একবার এবং ওদিকে একবার তাকায় প্রভাত। তার পরেই যেন একটা উদ্বেগ থেকে মুক্ত হয়ে হাঁপ ছাড়ে। না, কাছে দাঁড়িয়ে নেই সুমিত্রা। লোকেন ঘোষের কথাগুলি সুমিত্রার কানে যায় নি। কেবিনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দূরের আকাশের দিকে, কিংবা ফটকের কাছের কৃষ্ণচূড়াটার দিকে তাকিয়ে আছে সুমিত্রা। সেই নেড়া ও রিক্ত কৃষ্ণচূড়ার মাথায় কাঁচা সবুজের প্রলেপ পড়েছে।

প্রভাতও গলার স্বর নামিয়ে লোকেন ঘোষের কাছে ফিসফিস ক'রে যেন আবেদন করে।—আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

লোকেন—বলুন।

প্রভাত—মিসেস ঘোষের কাছে আপনি এধরনের হতাশার কথা বলবেন না।

লোকেন—বুঝেছি, ওর কান্নাকাটি দেখে আপনিও খুব ব্যথিত হয়েছেন।

প্রভাত—ঠিকই বুঝেছেন মিস্টার ঘোষ; মিসেস ঘোষ বড় অবুঝের মত কান্নাকাটি করেন। আপনার উচিত ওঁকে বুঝিয়ে দেওয়া, হতাশ হবার একটুও কারণ নেই।

লোকেন—আমি অনেক চেষ্টা করেছি মিস্টার বরাট। কিন্তু অসুবিধের ব্যাপার এই যে, আমার মনেই বিশ্বাসের জোর নেই।

প্রভাত—চেষ্টা করে বিশ্বাসের জোর রাখুন। আপনি তো মিছিমিছি, ভুল করে, ডাক্তারদের কথা অবিশ্বাস করে নিজের একটা দুর্ভাগ্য কল্পনা করছেন।

লোকেন বলে— ঠিকই বলেছেন। না... দেখি সুমিত্রাকে নার্ভাস করে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না।

প্রভাত—আজ তাহলে উঠি।

লোকেন—আসুন...হ্যাঁ...মিসেস বরাট এখন অনেকটা ভাল আছেন আশা করি।

প্রভাত—তাঁর ধারণা, তিনি ভাল আছেন। যদিও ডাক্তাররা জানেন যে, তিনি অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছেন সেই অচেনা জগতের দিকে, ফ্রম হুজ ফেটাল বর্ন নো ট্রাভলার হ্যাজ এভার রিটার্ণড্!

বলতে বলতে ছটফট করে ছোট ছেলের মত কঁকিয়ে কেঁদে উঠেই ঢোক গিলে কান্নার শব্দটা চেপে দেয় প্রভাত।

লোকেনের শুকনো গলার শুকনো স্বরও হঠাৎ বেদনাহত হয়ে কেঁপে ওঠে—না না না, আপনি এরকম উতলা হবেন না মিস্টার বরাট। আমার অনুরোধ, প্লীজ...।

প্রভাত বলে—আপনার কাছে মনের যত যন্ত্রণার গুমোট মন খুলে একটু হালকা করে নিলাম মিস্টার ঘোষ। আপনার কাছে ধরা পড়ে যেতে লজ্জা নেই; কিন্তু মিসেস ঘোষের সামনে তো পারি না।

প্রভাতের চেয়ারের ঠিক পিছন থেকে বলে ওঠে সুমিত্রা।—আমি একাই নার্ভাস নই প্রভাতবাবু।

যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে প্রভাত। সুমিত্রার কাছে ধরা পড়ে যাবার যে ভয় থেকে এত চেষ্টা করে নিজেকে এতদিন বাঁচিয়ে এসেছে প্রভাত, সেই ভয়। বিব্রতভাবে এবং একটু লজ্জিত হয়েও বোধ হয়, পকেট হাতড়ে সিগারেট বের করতে চেষ্টা করে প্রভাত।

সুমিত্রা বলে—আমি না হয় সেণ্টিমেণ্টাল মেয়েমানুষ; আপনি পুরুষমানুষ হয়ে এ কি করলেন?

লোকেন বলে—ঠিকই বলেছে সুমিত্রা। আপনার এতটা বেশি সেণ্টিমেণ্টাল হওয়া উচিত নয় মিস্টার বরাট।

লোকেনের কাছেই অভিযোগ করে সুমিত্রা—শোভাদি একটা নিৎসিঁদুরের গল্প হেসে হেসে বলেছেন, আর উনিও সেই গল্প বিশ্বাস করে বসে আছেন।

লোকেন—থাক সুমিত্রা। এসব আলোচনাই কোন কাজের আলোচনা নয়।

সুমিত্রা জেদ করে।—না; প্রভাতবাবু কথা দিন, উনি আর কখনও নিজেকে এরকম অসহায় বলে ভাববেন না, নিজেকে একলা মনে করতে পারবেন না।

হেসে ওঠে প্রভাত—চেষ্টা করবো নিশ্চয়।

লোকেন বলে—কোন চিন্তা করবেন না। নিশ্চয় ভাল হয়ে উঠবেন মিসেস বরাট। আই প্রে, তিনি ভাল হয়ে উঠুন।

(৫)

লেকে যাবার রাস্তা, গোল পার্ক ঘিরে বড় বড় আলো জ্বলছে যেখানে, সেখানে একটা গাছের গায়ে হাত দিয়ে চুপ করে একলাটি কেন দাঁড়িয়ে আছেন প্রভাতবাবু? বাসের জানালা দিয়ে দেখতে পেয়েই বাস থেকে নেমে পড়ে সুমিত্রা।

—আপনি কি বাড়ি ফিরছেন?

—হ্যাঁ?

—তবে এখানে এভাবে চুপটি করে কেন...।

—এখনই ফিরতে ইচ্ছে করছে না, তাই দাঁড়িয়ে আছি।

—আজ হাসপাতালে যাননি?

—গিয়েছিলাম।

—কখন?

—বিকালে।

—কেমন আছেন শোভাদি?

—জিজ্ঞেসা করেছিলাম, কিন্তু কোন উত্তর দিলে না আপনার শোভাদি।

থরথর করে কেঁপে ওঠে সুমিত্রার চোখ—কি বলছেন একটু স্পষ্ট করে বলুন প্রভাতবাবু।

প্রভাত—শোভার আজ আর কথা বলবার শক্তি নেই। ডাক্তারেরা বলেছেন, বড় জোর আর পাঁচ-সাত দিন।

—না না, হতে পারে না। এরকম ভয়ানক কথা বিশ্বেস করবেন না প্রভাতবাবু। বলতে বলতে সুমিত্রার হাত দুটো বার বার উতলা হয়ে ওঠে। যেন কারও চোখ মুছে দিতে গিয়ে ভুল করে নিজেরই চোখ মুছতে থাকে সুমিত্রা।

অনেকক্ষণ নীরব হয়ে থাকার পর হাসতে চেষ্টা করে প্রভাত। —মনে হচ্ছে, বোধ হয় আপনারই অপেক্ষায় এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

—ভাগ্যিস দাঁড়িয়েছিলেন, তাই আজ আপনাকে...।

প্রভাত—কি?

সুমিত্রা—আপনাকে অন্তত দুটো সান্ত্বনার কথা বলবার সুযোগ পেলাম।

প্রভাত—মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

সুমিত্রার চোখ দুটো যেন হঠাৎ বেদনায় আহত হয়।—মিথ্যে? একথা কেন বলছেন প্রভাতবাবু?

প্রভাত—শোভা তো সত্যিই বাঁচবে না।

সুমিত্রা—আপনি বারবার ওকথা বললে আমি কি আর বলবো বলুন?

প্রভাত—না, সে তো ঠিক কথা।...কিন্তু আপনি আর রাত করবেন না।

সুমিত্রা অনুনয়ের সুরে বলে—আপনিই বা রাত করবেন কেন প্রভাতবাবু? বাড়ি ফিরে যান।

প্রভাত—বিশ্বাস করুন, বাড়ি ফিরে যাব ঠিকই। কিন্তু এখনই যেতে ইচ্ছে করছে না।

সুমিত্রা—একথা বললে আমাকেও বিপদে ফেলা হয়।

প্রভাত—কেন?

সুমিত্রা—আপনাকে আজ এভাবে একা একা ছেড়ে দিয়ে আমারও চলে যেতে যে ইচ্ছে করছে না।

প্রভাত বলে—চলুন তাহলে।...একটা ট্যাক্সি ডাকি, কেমন?

সুমিত্রা—ডাকুন।...ভালই হবে। কেউ একজন সঙ্গে না থাকলে আমারও ট্যাক্সিতে যেতে অস্বস্তি হয়, ভয় ভয়ও করে।

চলন্ত ট্যাক্সির ভিতরে অনেকক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে থেকে হঠাৎ ছটফট করে ওঠে, জোরে একটা দীর্ঘশ্বাসও ছাড়ে প্রভাত।—ভাগ্যের ঠাট্টাটা বুঝুন একবার।

সুমিত্রা—কি বললেন?

প্রভাত—আমার লাইফ-পলিসিটা শোভার নামে অ্যাসাইন করে দিয়েছিলাম। খুব বিশ্বাস ছিল, আমিই বেচারাকে একা রেখে আগে চলে যাব। কিন্তু কি যে হলো, সব ওলট-পালট হয়ে গেল। শোভা আমার লাইফ-পলিসিটাকে যেন ঠাট্টা ক'রে ছিঁড়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

সুমিত্রা—আমি ঠিক এর উলটো কাণ্ডটি করেছি। আমিই রাগ করে আর জোর করে ও'র লাইফ-পলিসিটাকে সারেণ্ডার করিয়ে সেই টাকায় বাড়ি কেনবার দেনা শোধ করিয়েছি। এখন দেখুন; সেই বাড়ি পড়ে রইল কোথায়, আর উনি এখন কোথায়?

প্রভাত—আপনি আবার ভুল ভাবনা করছেন। মিস্টার ঘোষ আবার বাড়িতে ফিরে আসবেন। আপনার দুঃখ করবার কোনই কারণ নেই।

সুমিত্রা—জানি প্রভাতবাবু; আপনি আমাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দেবার মানুষ নন। কিন্তু......।

প্রভাত—কি বলুন?

সুমিত্রা—সৌভাগ্যে আর বিশ্বাস করবার মত মনের জোর পাই না।

প্রভাতই যেন মনের সব জোর দিয়ে সুমিত্রার ভয় ভেঙ্গে দিতে চায়। —বিশ্বাস করুন, আপনাকে কখনো একা-একা অসহায় হয়ে পড়ে থাকতে হবে না।

সুমিত্রা—এই যে, শ্যামবাজার এসে পড়েছে। আমি এখানে নেমে যাই।

প্রভাত—আসুন।

(৬)

বিকাল হয়েছে। হাসপাতালের ফটকের কাছের কৃষ্ণচূড়ার মাথা লাল হয়ে উঠেছে। ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকতে গিয়েই দেখতে পায় সুমিত্রা, হাসপাতালের অফিস-ঘরের দিক থেকে প্রভাতবাবু আস্তে আস্তে হেঁটে ফটকের দিকেই আসছেন।

থমকে দাঁড়ায় সুমিত্রা। প্রভাত কাছে এসে দাঁড়াতেই প্রশ্ন করে সুমিত্রা—কখন্ এসেছিলেন?

প্রভাত—এই মিনিট দশেক আগে।

সুমিত্রা—এরই মধ্যে চলে যাচ্ছেন?

প্রভাত—হ্যাঁ, সামান্য একটু কাজ ছিল। হাসপাতালের কিছু পাওনা হয়েছিল। টাকাটা দিয়ে এলাম।

সুমিত্রা—কিন্তু......।

প্রভাতের মুখে একটা রুক্ষ, শুষ্ক ও তীক্ষ্ম হাসির জ্বালা যেন ঝিকঝিক করে। —বুঝতে পারলেন কিছু?

চেঁচিয়ে ওঠে সুমিত্রা—শোভাদি কেমন আছেন?

প্রভাত—নেই। কালই শেষ রাতে চলে গিয়েছে। তাই আজ পর্যন্ত বাকি বেড-ভাড়া যা জমা হয়েছিল, সব হিসেব করে মিটিয়ে দিয়ে এলাম।

চোখের উপর রুমাল চেপে ফোঁপাতে থাকে সুমিত্রা।—আপনাকে কি বলে সান্ত্বনা দেব, বুঝতে পারছি না প্রভাতবাবু। শোভাদি এ কি ভয়ানক কাণ্ড করলেন?

প্রভাত হাসে—আপনার শোভাদি তাঁর নিঃসিঁদুরের জেদ রাখলেন। আমাকে একলা রেখে পালিয়ে গিয়ে সুখী হলেন। ......আচ্ছা চলি।

চমকে ওঠে সুমিত্রা। বিদায় চাইছেন প্রভাতবাবু। সত্যিই তো, এই হাস-পাতালের কোন ওয়ার্ডের কোন কেবিনে এই রঙীন কৃষ্ণচূড়ার ছায়ার কাছে প্রভাত-বাবুর জীবনের আর কোন কাজ নেই। এতদিনে শূন্য হয়ে, মুক্ত হয়ে, একেবারে একলা হয়ে চলে যাচ্ছেন ভদ্রলোক। প্রভাত-বাবু আর এখানে আসবেন না; একটা দুঃখের তীর্থে আসা-যাওয়ার পথে সুমিত্রার এতদিনের সঙ্গী মানুষটা এবার সঙ্গছাড়া হয়ে গেল।

সুমিত্রা—সত্যিই তাহলে যাচ্ছেন; বিদায় নিচ্ছেন প্রভাতবাবু?

প্রভাত—হ্যাঁ।

সুমিত্রা—এখন কোথায় যাবেন?

প্রভাত—এখন তো আর দমদমের ঐ আধখানা বাড়িতে পড়ে থাকবার কোন অর্থ হয় না।

সুমিত্রা—তার মানে?

প্রভাত—আবার আসাম সার্কেলে চলে যাব।

সুমিত্রা—কলকাতাতে কি আর আসবেন না?

প্রভাত—আসবো বৈকি। এবং আসলেই আপনার খোঁজও নেব নিশ্চয়। হ্যাঁ, আপনার সিঁথির ঠিকানা?

সুমিত্রা—এগার নম্বর জয় দত্ত ফাস্ট লেন?

বিদায় নেবার জন্যেই বোধহয় একটা শেষ কথা বলতে চায় প্রভাত; কিন্তু কি-যেন ভেবে নিয়ে হঠাৎ বলে ওঠে। —হ্যাঁ, ডাক্তারদের কাছ থেকে একটা সুখবর শুনে এলাম।

সুমিত্রা—কিসের সুখবর?

প্রভাত—ভিয়েনার একজন বিখ্যাত স্পেশ্যালিস্ট সার্জন নাকি আর এক মাসের মধ্যেই আসবেন। মিস্টার ঘোষের কেস তাঁর কাছে রেফার করা হবে; এবং তাঁরই পরামর্শ মত অপারেশন করা হবে। ডাক্তারদের ধারণা, এই অপারেশন সফল হবে, যদিও এধরনের জটিল কেসের প্রায় ক্ষেত্রে অপারেশন বিফল হয়ে যায়।

সুমিত্রার মুখে একটা করুণ হাসির ছায়া কাঁপতে থাকে।—বুঝতে পারছি না প্রভাতবাবু, আপনার কথায় হতাশ হব, না আশা করবো?

প্রভাত—নিশ্চয় আশা করবেন।

নীরব হয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে

থাকে সুমিত্রা। প্রভাতের কথার মধ্যে হেঁয়ালি নেই। তবু যেন মনের ভিতরে এলোমেলো হয়ে একটা হেঁয়ালির বেদনা ছুটোছুটি করছে। কাকে আশা বলে আর কাকে হতাশা বলে, বুঝতে গিয়ে সুমিত্রার মাথাটাই ক্লান্ত হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। না, এই ভদ্রলোকের কাছে আজ আর কিছু বলবার নেই।

প্রভাত বলে—আসি তাহলে?

সুমিত্রা—আসুন।

(৭)

আজ সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত সেই যে বিছানার উপর পড়ে আর বালিশ আঁকড়ে অসাড় হয়ে শুয়েছিল সুমিত্রা; সন্ধ্যা হলেও সেইভাবে শুয়ে পড়ে থাকে। সিঁথির জয়দত্ত ফার্স্ট লেনের এগার নম্বরের বাড়িটার এই ঘরের অন্ধকার, সুমিত্রার অদৃষ্টের সবচেয়ে নির্মম আতঙ্কটারই মত নিরেট হয়ে উঠতে থাকে। আলো জ্বালাতেও ভুলে গিয়েছে সুমিত্রা।

কাল বিকালে হাসপাতালের কেবিনে লোকেনের করুণ চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে, হাসিমুখের অজস্র ভাষায় সাহস দিয়ে লোকেনের মাথার উপর অনেকক্ষণ মাথা রেখে, সেই যে চলে এসেছে সুমিত্রা; তার পর থেকে সুমিত্রার সেঁতসেঁতে চোখ আর শুকনো হয়নি। আজই সকালে লোকেনের ফুসফুসে অপারেশন হয়েছে। কি হয়েছে কে জানে? পাশের বাড়ির টেলিফোনের নম্বরটা হাসপাতালের অফিসে লিখিয়ে রেখে এসেছিল সুমিত্রা। কথা আছে, যথাসময়ে টেলিফোনে হাসপাতাল থেকে খবর জানিয়ে দেবে। কিন্তু কই? সন্ধ্যা হয়ে গেল। এখনও খবর আসে না কেন?

কিন্তু খবরটা অনুমান করতে কি কোন অসুবিধা আছে? প্রায় ক্ষেত্রে যে অপারেশন সফল হয় না, সে অপারেশন কি সুমিত্রার উপর বিশেষ দরদ করে সফল হয়ে যাবে? এত বড় সৌভাগ্য যে কল্পনা করতেই পারে না সুমিত্রা। কল্পনা করবার, বিশ্বাস করবার শক্তিই নেই। বরং, বিশ্বাস করতে হয়, এখনও লজ্জা করে সুমিত্রাকে ভয়ানক খবরটা দিতে পারছে না হাসপাতালের অফিস।

হঠাৎ সুমিত্রার কান দুটো চমকে ওঠে। শুনতে পায় সুমিত্রা, পাশের বাড়ির কাকিমা চেঁচিয়ে......না কাঁদিতে কাঁদিতে নয়, হাসতে হাসতে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠছেন, এই ঘরের দিকে আসছেন।—সুমিত্রা সুমিত্রা! কোথায় তুমি?

ধড়ফড় করে বিছানা থেকে নেমে আলো জ্বালে সুমিত্রা। ঘরে ঢুকেই কাকিমা হেসে ওঠেন—এইমাত্র হাসপাতাল থেকে খবর এল। খুব ভাল অপারেশন হয়েছে। ডাক্তাররা বলেছেন, আর চিন্তা করবারই কিছু নেই। একেবারে নিরাপদ।

সুমিত্রার চোখ-মুখ ছাপিয়ে যেন হাসির এক ঝলক আলো উথলে ওঠে। অদৃষ্টের করুণ কান্নাটা যেন একটা হাঁপ ছেড়ে একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছে। পাশের বাড়ির কাকিমাকে প্রণাম করেই নিজের মনের আবেগে ঘরের ভিতরে ঘুরে বেড়াতে থাকে সুমিত্রা।

কাকিমা বললেন—আমি চলি। আমি এখনি তোমার খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চলে যান কাকিমা। হঠাৎ নিথর হয়ে, দু'চোখ অপলক করে, যেন একটা আর্তনাদহীন বেদনায় বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুমিত্রা। আর কোন উদ্বেগ নেই; কিন্তু কি অদ্ভুত এই নিরুদ্বিগ্ন শূন্যতা। আর হতাশ হবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই; কিন্তু কি অদ্ভুত এই হতাশোষাকে আশা।

জীবনের এত বড় সৌভাগ্য আশা করতে পারেনি সুমিত্রা। এবং যেন এই সৌভাগ্যকে সহ্য করবার মত শক্তি খুঁজছে, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না সুমিত্রা। আলো নিভিয়ে দিয়ে আবার বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে সুমিত্রা। কান্না চাপতে গিয়ে ফুঁসফুঁস করে; আর, বার বার বালিশে চোখ ঘসে ছটফট করতে থাকে।

(৮)

আর দেখতে হয়নি সুমিত্রার, হাসপাতালের ফটকের কাছের কৃষ্ণচূড়া আবার কবে রিক্ত হয়ে কেমনতর উদাস হয়ে গেল। এদিকের পথে আসা-যাওয়ার পালা শেষ হয়ে গিয়েছে কবেই।

সিঁথির জয়দত্ত ফার্স্ট লেনের এগার নম্বর বাড়ির উপরতলার একটি ঘরের ভিতর হেসে হেসে গল্প করে সুমিত্রা—এখন মনে পড়লেও লজ্জা লাগে।

লোকেন—কি?

সুমিত্রা—এই বাড়িটাকে অপয়া বাড়ি মনে করে কত ভয়ই না পেয়েছিলাম; কত আক্ষেপও করেছি।

লোকেন হাসে—আপাতত ভয় নেই।

সুমিত্রা ভ্রূকুটি করে হাসে—আবার অপয়া কথা? প্রভাতবাবুর ওয়ার্নিং ভুলে গিয়েছ?

লোকেন—প্রভাতবাবু কে?...ও হ্যাঁ, সেই চমৎকার কোমল স্বভাবের জেন্টেলম্যান।

সুমিত্রা—হ্যাঁ। ভদ্রলোক প্রায় প্রত্যেক মাসেই একটা করে চিঠি লিখে আশ্চর্য করে দিচ্ছেন।

লোকেনও আশ্চর্য হয়—সে কি! চিঠিতে কি লেখেন ভদ্রলোক?

সুমিত্রা—আমাকে সান্ত্বনা জানাচ্ছেন। চিন্তা করতে নিষেধ করছেন। অনুরোধ করছেন, যেন আশা রাখি।

হো হো করে হেসে ওঠে লোকেন।—একার কমেডি অব এরর!

সুমিত্রা—কমেডি কেন বলছো? ভদ্রলোক যে সত্যিই দুশ্চিন্তা করে কষ্ট পাচ্ছেন। বোধ হয় ধারণা করেছেন যে, তোমার অসুখ সারেনি, ভয়ানক কিছু হয়ে গিয়েছে।

লোকেন—ট্র্যাজেডি অব এরর!

সুমিত্রা—ভদ্রলোক তাঁর ঠিকানা লেখেন না; জীবন বীমার কাজে আসামের এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাই বোধ হয় ঠিকানা দেন না। তা না হলে, সুখবরটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতাম যে, তুমি ভাল হয়ে গিয়েছ, আর চিন্তা করবার কিছু নেই।

উঠে দাঁড়ায় সুমিত্রা। দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আরও ব্যস্ত হয়ে ওঠে।—আমি চললাম। স্কুলে আজ টিচারদের একটা মিটিং আছে।...তুমি বেশি ওঠানামা করবে না; এক কাপের বেশি চা খাবে না। সুপ তৈরী করে রেখেছি; মীট সেফের ভিতরে আছে।

নীচে নেমে, বাইরের ঘরের দরজা খুলে এগিয়ে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় সুমিত্রা।

প্রভাতবাবু, আসছেন!

—আসুন; কবে ফিরেছেন? হাসিমুখে জিজ্ঞেসা করে সুমিত্রা।

—আজই। হেসে হেসে উত্তর দেয় প্রভাত।

সুমিত্রা—আপনার খবর ভাল?

প্রভাত—হ্যাঁ, আপনার খবর বলুন।

সুমিত্রা—সুখবর। উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এই মাসের শেষেই কাজে জয়েন করবেন।

প্রভাতের চোখের কৌতূহল হঠাৎ বিস্ময়ের একটা চমক লেগে কেঁপে ওঠে। যেন সুমিত্রার সিঁথির সিঁদুরের ছটা হঠাৎ প্রভাতের চোখের উপর লুটিয়ে পড়েছে।

অদ্ভুত এক খুশির উচ্ছ্বাস তুলে হাসতে থাকে প্রভাত।—তাই বলুন! আমি বলেছিলাম কি না, আপনার সিঁদুরও নিত্য-সিঁদুর। এখন বিশ্বাস করছেন তো?

সুমিত্রা—করছি বৈকি!

প্রভাত—তাহ'লে এখন স্বীকার করুন, আমি আপনাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিইনি।

সুমিত্রা—স্বীকার করি।

প্রভাত হাসে—স্বীকার করুন, আপনি আমাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

মাথা হেঁট করে সুমিত্রা—না।

কৃতার্থভাবে, যেন একটা সফল স্বপ্নের আনন্দে চোখের চাহনি নিবিড় করে নিয়ে হাসতে থাকে প্রভাত—যাক, শুনে খুবই সুখী হলাম। আপনাকে ভুল বুঝিনি তাহলে, আচ্ছা...আমি এবার চলি, মিসেস ঘোষ।

মহাভারত-কাহিনী

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দু জাতির দুইখানি অতি মহার্ঘ এবং জগতে অতুলনীয় সম্পদ। ইহাদের মধ্যে রামায়ণ কাব্য এবং মহাভারত ইতিহাস বলিয়া প্রাচীনকাল হইতে বর্ণিত হইয়া আসিতেছে। আধুনিক কালে সকল বিদেশীয় এবং অনেক দেশীয় আলোচক দুইখানিকেই এপিক বলিয়া যে-যুগে এই দুইখানি মহাগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, বৈদিক-যুগের অব্যবহিত পরবর্তী সেই যুগকে এপিক এজ—মহাকাব্যের যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের পরিভাষায় যে-সকল গ্রন্থ মহাকাব্য বলিয়া গণ্য, সেগুলি অবশ্য ঐ যুগের বহু পরবর্তী কালের বস্তু। সে কালকে এপিক এজ বলা হয় না।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে ইলিয়াদ (Iliad) ও ওদিসী (Odyssey) এই দুইখানি প্রাচীনতম গ্রীক গ্রন্থ মহাকাব্য বলিয়াই গণ্য হইয়াছে এবং ঐ সকল দেশের শিক্ষিত সমাজ উহার প্রশংসায় শুধু মুখর নহেন, অতি-বাদীও বটেন। উভয় কাব্য একই ব্যক্তির (হোমার Homer-এর) রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও দুইখানি শুধু ভিন্ন লোকের রচনা নয়, প্রত্যেকখানিতে একাধিক লোকের রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ইহাই আধুনিক মত। কিন্তু ইহাও স্বীকার্য যে, বহু কবির রচনার সমাবেশেও গ্রীক জাতির মজ্জাগত সমন্বত শিল্প সংস্কারবশত উহাদের কাব্যধর্মের, বিশেষত একলক্ষ্যতার ও জমাটভাবের কিঞ্চিন্মাত্র হানিও হয় নাই। কাব্য দ্বারা লোকশিক্ষার উপযোগী আদর্শ স্থাপন এবং সমাজের কল্যাণকর নীতিবাদ প্রচার উহাদের লক্ষ্য নয়। এ-বিষয়ে রামায়ণ ও মহাভারত ইলিয়াদ ও ওদিসী হইতে অতিশয় ভিন্ন। মূলে ইহারাও হয়ত যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও সুসম্বদ্ধ কাব্য-কাহিনীরূপেই রচিত হইয়া থাকিবে (যদিও আমাদের জাতীয় রুচি ও অভ্যাস বিবেচনা করিলে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ যে নাই তাহা জোর করিয়া বলা চলে না); পরে উত্তরোত্তর বহু হস্তে বহু বিষয়ের সমাবেশে দুইখানিই বিপুলাবয়ব ধর্মগ্রন্থে পরিণত হইয়াছে এবং ঐভাবে উহাদের মর্যাদাও অসীম।

রামায়ণের মূলে রচয়িতা মুনিবর বাল্মীকি বেদোত্তর সংস্কৃত ভাষার আদি কবি এবং স্বীয় রচনা-গৌরবে অতি সার্থকভাবেই কবিগুরু বলিয়া সম্মানিত। কবি বলিয়াই এবং কাব্য লিখিতেছেন বলিয়াই তিনি বর্ণনীয় কাহিনীতে যথেষ্ট মৌলিকতা ও কল্পনাচাতুর্য সংযোজনের স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য অবলম্বনে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। বৌদ্ধ (পালি) দশরথ জাতকের বিষয় বিবেচনা করিলে এরূপ অনুমান অসংগত নয় যে, এককালে সমাজের সাধারণ জনগণের মধ্যে রামসীতা কাহিনী নানা আকারে প্রচলিত ছিল। বাল্মীকি তাহারই একটা অবলম্বন করিয়া এবং তাহাকে একটা বিশিষ্ট রূপ দিয়া বহু আদর্শ চরিত্র ও আদর্শ-শিক্ষা-সম্বলিত একখানি অপূর্ব ও অদ্বিতীয় কাব্য রচনা করিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার কবিগুরু নামের সার্থকতা।

মহাভারত গ্রন্থখানি বরাবর ইতিহাস বলিয়াই প্রসিদ্ধ। "ইতিহাস" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে—ইতিহ (এইরূপই)+আস (হইয়াছিল) অর্থাৎ প্রাচীন সত্য ঘটনার বিবরণ। "ইতিহ" হইতেই "ঐতিহ্য"—শব্দ ব্যুৎপন্ন; উহার অর্থ= প্রাচীন প্রবাদ, কিংবদন্তী ইত্যাদি—ইংরেজীতে যাহাকে বলে লেজেণ্ড (legend)। লেজেণ্ড সর্বত্রই মূলে অল্পাধিক সত্য হইলেও কালের স্রোতে আবর্তিত হইতে হইতে নানা কল্পিত বস্তুযোগে ক্রমশ স্ফীত, স্ফীততর হইতে থাকে। শক্তিশালী লেখকেরা ঐরূপ এক একটা প্রবাদ গ্রন্থস্থ করিবার কালে যথারুচি পরিবর্তন পরিবর্জন ও অনুরঞ্জন দ্বারা তাহাকে নবরূপ দান করেন। রচনার গুণে তাহাই সাধারণ্যে প্রচলিত হইয়া যায় এবং মূল সত্যের সন্ধান দুর্ঘট হয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালেও রাজসভার চারণ, কবি, এমন কি ঐতিহাসিক (historiographer) দিগকে সত্যকে যথেষ্ট বিকৃত করিতে এদেশেই দেখা গিয়াছে। ইহা ছাড়া এদেশে ইহাও বহুবার দেখা গিয়াছে, এক-খানি প্রাচীনতর গ্রন্থ নিজগুণে বহু জনাদৃত হইলে, অনেক মনীষী ও শক্তিশালী লেখকও ঐ বিষয়ে স্বতন্ত্র একখানি নূতন গ্রন্থ না লিখিয়া ঐ গ্রন্থেই নিজের রচনা নিঃসঙ্কোচে যোজনা করিয়া দিয়াছেন। অনেক সময় নিজের যশ অপেক্ষা সমাজের কল্যাণ ইঁহাদের কাম্য ছিল। অনেক ক্ষেত্রে উক্ত কারণেই সাম্প্রদায়িক মতবাদ বা ধর্ম প্রচারের সুযোগও ঐভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

পূর্বোক্ত সকলপ্রকার প্রক্ষেপই মহাভারতে অত্যন্ত অধিক। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস উহার রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বর্ণিত ঘটনাবলীর রঙ্গমঞ্চে কিন্তু তিনি বহুবার অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি আবার ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর (উভয়েই ক্ষেত্রজ পুত্র) জন্মদাতা বলিয়া ঐ পুস্তকেই উল্লিখিত। সুতরাং তিনি কৌরব পাণ্ডব উভয়পক্ষের পিতামহ। কিন্তু সেভাবে তিনি কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। একজন সর্বজনমান্য মহর্ষিরূপে উপদেষ্টার ভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ দেখা দিয়াছেন। বস্তুত মহাভারত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমকালে বা প্রায় সমকালে রচিত মনে করিবার কোনও যুক্তিসংগত কারণ নাই। উহা বহু পরে রচিত হওয়াই সম্ভব যখন উহার অনেক ঘটনাই সত্যরূপ বর্জন করিয়া অলীক অবান্তর রূপ গ্রহণ করিয়াছে। মূল মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসের রচনা বলিয়া নিজ রচনার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তিনি যিনিই হউন, অমরলোক হইতে একবার নামিয়া আসিয়া কৌতূহলবশে প্রচলিত (সংস্কৃত) মহাভারতখানির ভিতরে চক্ষু বুলাইলে নিশ্চয়ই স্তম্ভিত হইবেন। প্রত্যেক পর্বেই তিনি নিজের অলিখিত, অজ্ঞাত এবং বোধ করি স্বপ্নেও অচিন্তিত বহু বস্তু দেখিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। তিনি বুঝিবেন বহুলোকের বিদ্যাভিমান জ্ঞানধর্ম ও নীতি প্রচারের আগ্রহ, চমৎকার জননের লোভ, এমনকি অনুচিত করকণ্ডূয়নও তাঁহার অতি যত্নে লিখিত গ্রন্থখানিকে শুধু কিম্ভূতকিমাকার করে নাই, তাহাকে ক্ষত-বিক্ষতও করিয়াছে।

মহাভারতে অবান্তর প্রসঙ্গ কিছু কিছু নিশ্চয় গোড়া হইতেই ছিল; কেননা আমাদের দেশে খুব প্রাচীনকাল হইতেই গল্প লেখক-গণের গল্প শেষ করার ব্যগ্রতা অপেক্ষা তাহা পল্লবিত করার আগ্রহ অধিক দেখা গিয়াছে। তাহার মধ্যে অন্য লোক হাত দিলে ত কথাই নাই। এইরূপেই মহাভারত বহু অবান্তর প্রসঙ্গে স্ফীত হইয়াছে। অতি সামান্য এক একটা সূত্র ধরিয়া ঐ সকল প্রসঙ্গের অবতারণা হইয়াছে। অনেক সময়ে অবান্তর প্রসঙ্গ ঢুকাইবার জন্য সূত্রও কল্পিত হইয়াছে। বনপর্বে দেখা যায় বনবাসী পাণ্ডবগণের নিকট এক একদিন এক এক মুনি আসিয়া তাঁহাদের সান্ত্বনা

বিধান বা চিত্তবিনোদনের জন্য এক একটি উপাখ্যান বলিতেছেন, তাহাও সংক্ষেপে নয়, প্রচুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণসহ বিস্তৃত আকারে। এইরূপে এক' একজন হইতে নল-দময়ন্তীর কাহিনী, সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী, অগস্ত্য-লোপামুদ্রার কাহিনী এবং অগস্ত্যের অন্যান্য কীর্তি (যথা বাতাপি ভক্ষণ, সমুদ্রশোষণ, বিন্ধ্য পর্বতের খর্বতা বিধান), ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন কাহিনী, ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী, পরশুরাম কর্তৃক মাতৃহত্যা ও ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংসের বিবরণ, শিবি-শ্যেন উপাখ্যান, দধীচির অস্থি-দান কাহিনী, মান্ধাতার উপাখ্যান, সোমক রাজার উপাখ্যান (কত উল্লেখ করিব?) নানা মুখে বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণ-কাহিনীও বাদ যায় নাই। ইহার পরে ভীমকে হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া পুনরায় রামচরিত্র বর্ণন, হনুমানের ত্রেতাযুগের রূপ প্রদর্শন এবং তদ্দ্বারা সত্য ত্রেতা দ্বাপর, এমনকি কলিযুগের অবস্থাও বর্ণন করান হইয়াছে। কালিদাসের জগদ্বিখ্যাত নাটক শকুন্তলার মূল কাহিনীও মহাভারত (আদিপর্ব) হইতে গৃহীত। যযাতি-দেবযানি-শর্মিষ্ঠা-পুরুর কাহিনীও আদিপর্বে আছে। বস্তুত সকল পর্বেই নানা কাহিনী স্থান পাইয়াছে।

বনপর্বে নারদ মুনি আসিয়া যুধিষ্ঠিরের এক প্রশ্ন উপলক্ষ্য করিয়া প্রায় তিন শত তীর্থের বিবরণ দিলেন, তীর্থযাত্রার বিধি ও মাহাত্ম্যও বর্ণন করিলেন। ইহাতেও ঐ বিষয় শেষ হইল না। আবার যুধিষ্ঠিরের আর একটি প্রশ্ন উপলক্ষ্য করিয়া পুরোহিত ধৌম্য আরও কয়েকটি তীর্থের বিবরণ ও মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। উহাদের কয়েকটি উত্তরকালে জনপ্রিয় হইয়া থাকিবে। নানা তীর্থমাহাত্ম্য আরও বহু স্থানে আছে। মহাভারতে কোনও প্রসঙ্গই অল্পে বা একবারে শেষ হয় নাই। নানা হাত বলিয়াই ঐরূপ হইয়াছে। সভাপর্বে নারদ যমলোকস্থিত পাণ্ডুর অনুরোধে যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করিবার জন্য উপদেশ দিতে আসিয়া প্রশ্নচ্ছলে সর্ববিধ রাজধর্মের বিস্তৃত উল্লেখ করিলেন। আবার ঐ রাজধর্ম এবং তৎসঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্ম, নানা নীতি ও সদাচার—যুধিষ্ঠিরকে শিক্ষা দিবার জন্য শরশয্যায় মরণ-প্রতীক্ষায় শায়িত বৃদ্ধ ভীষ্মকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। গীতায় একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ে এবং আংশিকভাবে আরও দুইটি অধ্যায়ে সাংখ্যদর্শন নিঃশেষে ব্যাখ্যাত হইলেও মরণোন্মুখ ভীষ্মকে দিয়া সে-বিষয়েও বক্তৃতা দেওয়ান হইয়াছে। মহাভারতে কল্পনার প্রাচুর্যই কত! ক্ষুদ্র একটি দৃষ্টান্ত দিব। সভাপর্বে পূর্বকথিত কারণে যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াও ময়দানব নির্মিত সভা দর্শন করিয়া নারদ-মুনি (অবশ্য যুধিষ্ঠিরের অনুরোধেই) তাহার নিকট ইন্দ্রসভা, যমসভা, বরুণসভা, কুবেরসভা এবং ব্রহ্মসভার পৃথক পৃথক পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিলেন।

গীতা মূল মহাভারতের অংশ কিনা এ-বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেকেই সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। বিচারপতি তেলাং ঐ সংশয় যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই। গীতা এক হাতের রচনা কিনা এ-প্রশ্নও উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই উঠাইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে Dahlman, Oldenburg, Deussen, Senart প্রভৃতি এক কর্তৃত্বে বিশ্বাসী; Weber, Garbe, Hopkins, Holtzman, Schrader, Jacobi, Winternitz প্রভৃতি ভিন্ন-মতাবলম্বী। ইঁহাদের মতের মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে। Holtzman-এর মতে গীতায় গোড়ায় ছিল বিশ্বদেবতাবাদ (pantheism), পরে উহা বিষ্ণুভক্তির সমর্থক (Vishnuvite) হইয়াছে। Garbe-এর মত ইহার ঠিক বিপরীত। Hopkins-এর মতে গীতা গোড়াতে একখানি অসাম্প্রদায়িক গ্রন্থ, সম্ভবত একখানি অর্বাচীন উপনিষদই ছিল; পরে উহাতে পরমদেবতারূপে বিষ্ণুকে, আরও পরে কৃষ্ণকে ঢুকান হইয়াছে। এ-বিষয়ে অপেক্ষাকৃত আধুনিক জার্মান পণ্ডিত Dr. Rudolf Otto-র মত আরও বিচিত্র। ইনি গীতায় উপর্যুপরি আটটি স্তর আবিষ্কার করিয়াছেন। যেটি তাঁহার মতে মূল স্তর সেটিকে তিনি নিষ্কাষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহাতে কৃষ্ণ বলিতেছেন অর্জুন, তুমি দুশ্চিন্তা পরিহার কর, এই-রূপ মনে করিয়া যুদ্ধ কর যে, তুমি লোক-বাসনা হইতে কোনও কার্য (human work on thy own behalf) করিতেছ না; আমার যন্ত্ররূপে আমার কার্য (এই স্থলে "স্বধর্মপালন করিতেছ, তাহাই ঈশ্বর প্রীত্যর্থে তাঁহার যন্ত্ররূপে করিয়া যাও" বলিলে বোধ করি Otto-র ধারণার সহিত অধিক সঙ্গত হইত।) করিতেছ। এই শিক্ষা তাঁহার মতে মহা-কাব্যোচিতও বটে, আর ইহা নানা তত্ত্বা-লোচনা দ্বারা ভারাক্রান্তও নহে। ইহার পরে Otto এক স্তরে দেখিয়াছেন "প্রপত্তি ভক্তি" (১১শ অধ্যায়, ৫২—১২শ), এক স্তরে "সসাংখ্য ভক্তি" (১৪শ ১৫শ), এক স্তরে অসাম্প্রদায়িক ধর্ম ও প্রজ্ঞার উপদেশ (১৬শ—১৮শ ৪৯), এইখানে প্রায় প্রাচীন ইরানীয় কায়দায় সুমতি কুমতির দ্বন্দ্ব (dualistic opposition) স্থান পাইয়াছে। আর এক স্তরে (১৩শ) গোটা সাংখ্য-দর্শনখানিই স্বাধীনভাবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ-বিষয়ে এই পর্যন্তই যথেষ্ট। আমাদের দেশে ভাষ্যকারগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও গীতার শিক্ষায় অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে, ইহা কাহারও মত নহে। যে যে স্থলে নানারূপ শঙ্কিত হইতে পারে বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছেন, সেগুলিকে বিরোধাভাস বলিয়া ধরিয়া লইয়া স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক মতের অনুকূলে তাহাদের সমন্বয় সাধন করিবার চেষ্টাই করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ মূল মহাভারতে অবশ্যই ছিলেন; তবে "স্বয়ং ভগবান" রূপে নয়, অবতার-রূপেও নয়, শৌর্যবীর্যে অতুলনীয় এবং জ্ঞান ও ধর্মে মহনীয় একজন মহামানব-রূপে। রাজসূয় যজ্ঞে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সমবেত রাজগণের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তিকে অর্ঘ্য দান করিতে বলিলে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন, এখানে কে যোগ্যতম ব্যক্তি? তদুত্তরে ভীষ্ম বলেন, এখানে "তেজো-বলপরাক্রমৈঃ"—তেজস্বিতায়, বলশালিতায় এবং শৌর্যে কৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহার অধিক কিছুই বলেন নাই। ভীষ্মের ঐ কথায় কৃষ্ণকে অর্ঘ্য দান করা হইলে শিশুপাল ঈর্ষান্বিত হইয়া ভীষ্মকে গালাগালি করিতে থাকেন। তখন ভীষ্ম বলেন, "এই সভায় আমি এমন একটি রাজাকেও দেখিতেছি না, যিনি যুদ্ধে কৃষ্ণের পরাক্রমে বিজিত হন নাই। কৃষ্ণের যশ, বীর্য ও জয় করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই আমরা উঁহার পূজা করিয়াছি। পূজ্যতা বিষয়ে কৃষ্ণে দুইটি কারণই রহিয়াছে; এক বেদবেদাঙ্গ বিজ্ঞান, অপর অমিত বল।" এই ব্যাপারে এই পর্যন্ত উক্তি স্বাভাবিক এবং যথেষ্ট এবং ভীষ্মের পূর্ব উক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যযুক্ত। ইহার পরে যাহা আছে তাহা উত্তরকালে ভীষ্মের মুখে দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। তাহা এইরূপঃ—কৃষ্ণের জন্যই এই চরাচর বিশ্ব, কৃষ্ণই সকল ভুবনের উৎপত্তি ও লয়স্থান। বুদ্ধিতত্ত্ব, মন, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ সবই কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত, ইত্যাদি ইত্যাদি। মহা-মানবত্ব হইতে দেবত্বে উন্নয়ন সহজ, সুতরাং বাহিরে সমাজমধ্যে কৃষ্ণ ভগবদবতার ও ক্রমে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া পূজিত হইতে থাকিলে মহাভারতে স্থানে অস্থানে সকারণে অকারণে বহু হাতে বহুভাবে তাঁহার তাদৃশ মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে। যাদব ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবনের পল্লীদেবতা গোচারণকারী, গোপবালকগণের বন্ধু ক্ষীর-সরপ্রিয়, যশোদাদুলাল ও গোপ-যুবতীগণের প্রেমের পাত্র শ্রীকৃষ্ণের (সম্ভবত নামসাদৃশ্যে) একাত্মতা স্থাপিত হইলে তাঁহার বৃন্দাবনলীলাও কিছু কিছু মহাভারতে ঢুকিয়াছে। তথাপি কৃষ্ণ "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি" (বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া এক পাও যান না) এবং বৃন্দাবনের কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, আসল কৃষ্ণ, দ্বারকার কৃষ্ণ তাঁহার বিলাস

মাত্র, এরূপ মত কোনও প্রক্ষেপকারী ঢুকাইয়া দিবার সাহস পান নাই।

ধর্মের দিক দিয়া বৈষ্ণব মতই মহাভারতে প্রধান হইলেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ইষ্ট-দেবতার মাহাত্ম্যও কৌশলক্রমে ইহাতে যোজিত হইয়াছে। যেমন বনপর্বের গোড়ার দিকে ধৌম্য কর্তৃক সূর্যের মাহাত্ম্য ও সূর্যের অষ্টোত্তর শতনাম কথন, যুধিষ্ঠির কর্তৃক সূর্যের আরাধনা, সূর্য কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে বরদান এবং তৎসঙ্গে এরূপ একটি স্থালী (হাঁড়ি) দান করেন, যাহাতে সকল প্রকার খাদ্যসামগ্রী, যে পর্যন্ত দ্রৌপদী নিজে ভোজন না করিবেন, সে পর্যন্ত অফুরন্ত থাকিবে। কিরাত-রূপ-ধারী শিবের সহিত অর্জুনকে যুদ্ধ করাইয়া পরে তদ্দ্বারা শিবের পূজা, শিবের স্তব, অর্জুনের প্রতি শিবের প্রসন্নতা ও তাঁহাকে শিবের পাশুপত অস্ত্র দানও ঐ পর্বেই আছে। বিরাট পর্বের আরম্ভে যুধিষ্ঠির কর্তৃক শ্রীদুর্গার স্তব আছে। আর গণপতি না হইলে ত মহাভারত লিখিতই হইতে পারিত না। মহাবীরের (হনুমানজীর) কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

এখন মূল কাহিনীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই মহাভারতের কেন্দ্রীয় ঘটনা। একই পরিবারের অদূর-বিচ্ছিন্ন দুই শাখার মধ্যে রাজ্যের ভাগ লইয়া এই যুদ্ধ। তদানীন্তন ভারতের সমস্ত হিন্দুরাজা এক বা অন্যতর পক্ষে উহাতে যোগ দেয় এবং সকল রাজাই স্ব স্ব সৈন্য-দলসহ নিহত হন। কেবল অর্জুনের সঙ্গেই দশ দিন যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিলেও প্রতিদিনই যে-কোনও একটা ফাঁকে একা ভীষ্মই দশ হাজার করিয়া সৈন্য ধ্বংস করেন। তিনি মানুষ হইলেও গঙ্গাদেবীর গর্ভজ বলিয়াই এত পরাক্রম। দুই পক্ষের যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়া রহিলেন মাত্র একপক্ষের পাঁচ ভাই, তাঁহারা মানুষীর গর্ভে দেববীর্যে উৎপন্ন। অন্য পক্ষের একশত ভ্রাতা একই জননীর গর্ভে স্বীয় পিতার ঔরসেই অলৌকিকভাবে জাত হইলেও দৈব তেজের অভাবেও বটে, দুষ্কৃতির ফলেও বটে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের বন্ধু কর্ণ দেববীর্যে উৎপন্ন (তাহাও আবার তিন পাণ্ডবের জননী কুন্তীর কানীন পুত্ররূপে) হইলেও রক্ষা পান নাই। ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যু ছিলেন। এ সকলই অবাস্তব ব্যাপার। দুর্যোধনাদির পুত্রেরা এবং পাণ্ডবদিগের পুত্রেরাও সকলেই নিহত হইল। বাকি রহিল মধ্যম পাণ্ডবের এবং কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রার এক পৌত্র। সে তখন মাতৃগর্ভে ছিল, তাই রক্ষা। ইহাতেও কৃষ্ণমাহাত্ম্য প্রচারের জন্য অলৌকিকতার স্পর্শ দেওয়া হইয়াছে।

আরও একটু অবাস্তবতার কথা বলা যাক। দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের যুগপৎ পরিণীতা স্ত্রী। প্রাচীন ভারতীয় আর্য সমাজে কানীন ও ক্ষেত্রজ পুত্রের বহু উল্লেখ আছে। এককালে স্ত্রীরা যৌন ব্যাপারে এক-নিষ্ঠতা রক্ষা করিতে পারিতেন না, প্রবাদ-রূপে ইহার উল্লেখও মহাভারতেই আছে। কিন্তু কুত্রাপি এক স্ত্রীর যুগপৎ বহু পতিত্বের উল্লেখ নাই। দ্রৌপদীর বহুপতিত্ব বালসাহিত্যোচিত এক গল্প ফাঁদিয়া সমর্থন করা হইয়াছে। কিন্তু বহুপতিত্ব যে সমাজে প্রচলিত ছিল না, তাহা বুঝা যায় কর্ণের একটা কথা হইতে। যে-সভায় যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় সর্বস্ব, এমন কি ভ্রাতৃগণ ও স্ত্রীকেও হারেন, সেই সভায় দুঃশাসন এক-বস্ত্রা দ্রৌপদীকে বলপূর্বক টানিয়া আনিলে, তাহারই ভ্রাতা বিকর্ণ ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। তদুত্তরে কর্ণ বলেন, বেদে স্ত্রীলোকের একপতিত্বই বিহিত হইয়াছে। দ্রৌপদীর পতি পাঁচজন, সুতরাং সে বন্ধকী (বেশ্যা) বলিয়াই গণ্য। বস্তুত দ্রৌপদী-ধর্ষণ ব্যাপারও সম্পূর্ণ অবাস্তব। বলা হইয়াছে যুধিষ্ঠির পণে হারিয়া ভ্রাতৃগণ সহ দুর্যোধনের দাস এবং দ্রৌপদী তাঁহার দাসী হইয়াছেন, কিন্তু কোন সভ্য সমাজে অকারণে বা সকারণেই একটা দাসীকে বা বেশ্যাকেই প্রকাশ্য সভায় চুলে ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বিবস্ত্রা করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়? মহাভারতের যুগে হিন্দু জাতি কি এত অসভ্য ছিল? এই ঘটনা নিশ্চয়ই মূল মহাভারতের ছিল না। কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য প্রচার জন্য উহা পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। বলা হইয়াছে—

"দ্রৌপদী লজ্জা নিবারণের জন্য সর্ব-দুঃখহর্তা নরমূর্তিধারী কৃষ্ণ নামক বিষ্ণুকে মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ধর্ম আসিয়া বস্ত্ররূপ ধারণ করিয়া নানাবিধ বস্ত্রসমূহ দ্বারা দ্রৌপদীকে আবৃত করিলেন। * * * ধর্ম আসিয়া লজ্জা রক্ষা করিতে থাকায় নানাবিধ রাগবিরাগযুক্ত শত শত বস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল।"

(মহাভারত, সভা পর্ব, হরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগিশের সংস্করণের বঙ্গানুবাদ অংশ হইতে উদ্ধৃত।)

ভীষ্ম মহাভারতে ন্যায়ধর্মপরায়ণতার জন্য সর্বমান্য এবং সর্বাধিক মান্য। কিন্তু এই ঘটনা উক্ত গ্রন্থে যুক্ত করিয়া তাঁহাকেও খর্ব করা হইয়াছে। ভীষ্ম কেন প্রতিবাদ করিতেছেন না, তেজস্বিনী দ্রৌপদীর এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি যাহা বলেন তাহার মর্ম হইতেছে, ব্যাপারটি এমন জটিল যে, ইহা ন্যায্য কি অন্যায্য হইতেছে "ন্যায়ের সূক্ষ্মতা নিবন্ধন" তিনি উহা ঠিক বুঝিতেছেন না, অতএব চুপ করিয়াই আছেন।

ভীষ্মের এইরূপ নৈতিক ক্লীবতার জন্য মূল মহাভারতকারকে দায়ী করা সঙ্গত হইবে না। আর এই ঘটনা উপলক্ষে দুর্যোধন ও দুঃশাসনকৃত অপমানের প্রতি-শোধার্থ ভীম সর্বসমক্ষে যে প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা পালন করিতে তাঁহাকে ধর্মযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করিতে এবং রাক্ষসলীলার অভিনয় করিয়া দুঃশাসনের রক্তপান করিতে হইয়াছে। দুর্যোধন বীর হইলেও অজেয় ছিলেন না, অর্জুনের সহিত রণে ভঙ্গ দিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন; আর স্বহস্তে বধ করাই দুঃশাসনের যথেষ্ট শাস্তি নয় কি? কেবল কৃষ্ণমাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই এতগুলি অসম্ভাব্য মলিন ব্যাপার কল্পনা করা হইয়াছে।

সর্বশেষে অবাস্তব ব্যাপার হইতেছে দ্রৌপদীসহ পঞ্চ পাণ্ডবের পদব্রজে সশরীরে স্বর্গ-গমনের প্রয়াস এবং তাহাতে একজনের (যুধিষ্ঠিরের) সাফল্য। এটা ধর্মের শেষ পুরস্কার। একবার অর্জুনও কিন্তু অস্ত্র-শিক্ষার্থ তপস্যা করিয়া স্বীয় জন্মদাতা দেবরাজের কৃপায় সশরীরে স্বর্গে গিয়া দেবসভায় আসন পাইয়াছিলেন। উর্বশীর কামবাসনা প্রত্যাখ্যান করিয়া দেবরাজ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কৃপায় দেবাস্ত্রও লাভ করিয়াছিলেন। এগুলিও অবাস্তব ব্যাপার। শেষ মুহূর্তে তিনি স্বীয় জনকের কৃপা আর পাইলেন না।

উপরে যতটুকু বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই সংস্কারমুক্ত পাঠকমাত্রেই বুঝিবেন সমস্ত মহাভারত-কাহিনীটিই অলীক ইংরাজীতে যাহাকে বলে myth, তাহাই। তথাপি ইহা সম্ভব যে, বহু লোকক্ষয়কর একটা মহাযুদ্ধ—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটাই মূলে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। এ-বিষয়ে অনেক আলোচনা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ করিয়াছেন। আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্যভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন বঙ্গের অন্যতর গৌরব সুপণ্ডিত, সুলেখক, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত। পাঠক তৎপ্রণীত Ancient India (Epochs of Indian History series) নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে তাঁহার মত পাইবেন। তাঁহার আলোচনা সংক্ষিপ্ত। এখানে তাহার মর্ম দেওয়া যাইতেছে—

আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া প্রথমে পঞ্চনদ (তাঁহারা বলিতেন সপ্ত সিন্ধু) সেবিত ভূখণ্ডে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাঁহাদের এক একটি দল পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া এক একটি অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিতে থাকে। এইরূপে প্রথম কুরুদেশে, পরে পাঞ্চালে, পরে ক্রমে ক্রমে কোশল, বিদেহ, কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে এক একটি স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয়। এই সকল রাজ্যের মধ্যে যেমন জ্ঞান বিজ্ঞান

ধর্মাদি অর্থাৎ Culture বিষয়ে বন্ধুত্বমূলক প্রতিযোগিতা ছিল, তেমনই সময় সময় নানা কারণে যুদ্ধবিগ্রহও কম হইত না। কেননা কালধর্মে সতত অস্ত্রনির্মাণ ও অস্ত্রচালনা অভ্যাসের ফলে তাহাদের হস্ত ছিল "রণকণ্ডু"গ্রস্ত। হিন্দুরা পঞ্চনদ প্রদেশে থাকার কালেই সুদাস নামক এক রাজার বিরুদ্ধে দশ রাজা যুদ্ধাভিযান করেন, ইহার উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। ঐ রণকণ্ডুর জন্যই দুই রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে উভয় পক্ষের মিত্ররাজারা ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়াই যে-কোনও পক্ষাবলম্বনপূর্বক তাহাতে যোগ দান করিতেন। এইরূপেই একবার এক পক্ষে কুরুগণ এবং অন্যপক্ষে পাঞ্চালগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তদানীন্তন ভারতের সমস্ত হিন্দুরাজ্য উহাতে লিপ্ত হয়। খুব সম্ভবত পাণ্ডবেরা কুরু ও পাঞ্চাল হইতে স্বতন্ত্র একটা হিন্দুজাতি ছিল। তাহারা শৌর্য-বীর্যে সমুন্নত ছিল বলিয়া পাঞ্চালগণ তাহাদিগকে মিত্ররূপে বরণ করে। পাঞ্চালীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডবের বিবাহ ঐ ব্যাপারেরই রূপক বর্ণনা। পূর্বেই বলা হইয়াছে এবং রমেশচন্দ্র দত্ত ইহা দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন যে, এক স্ত্রীর বহুপতি (polyandry) হিন্দু সমাজে কোনও কালেই প্রচলিত ছিল না। শৌর্যবীর্যে সমুন্নত বলিয়াই পাণ্ডবগণ পাঞ্চালপক্ষে নেতৃত্ব করেন, এবং জয়যুক্ত হন।

এরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, উত্তরকালে পাণ্ডবজাতীয় রাজারা প্রবল হইয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করিলে প্রচলিত নানা প্রবাদ, লোকগাথা, লোকস্মৃতি ইত্যাদি অবলম্বনে মহাভারত রচিত হয় এবং তাহাতে তাহাদের পূর্বপুরুষেরা দেববীর্যে উৎপন্ন মহা মহাবীররূপে নন্দিত ও কুরুক্ষেত্র জয়ী বলিয়া সংবর্ধিত হন, "and although belonging to a distinct race they were represented as cousins of the Kuru princes so that later generation might not look upon them as userpers—R. C. Dutt. যদিও ভিন্নজাতির (অর্থাৎ হিন্দু জাতিরই স্বতন্ত্র একটা শাখার) লোক তথাপি তাহাদিগকে কৌরবগণের জ্ঞাতি ভাই বলিয়া এই জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে যেন ভবিষ্যৎকালের লোকেরা তাহাদিগকে পররাজ্যগ্রাসকারী মনে না করে।

পাণ্ডবেরা যে মূলে কুরুবংশীয় ছিলেন না, আমার মনে হয়, এইরূপ একটা মত মহাভারত রচনার কালে প্রচলিত ছিল এবং তাহার একটু ক্ষীণ আভাস মহাভারতেই আছে। বর্ণনীয় মহাভারত-কাহিনীর সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার জন্য ঐ প্রবাদকে নিম্নলিখিত রূপ দেওয়া হইয়াছে—

জ্যেষ্ঠভ্রাতা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া কনিষ্ঠ পাণ্ডু দুই স্ত্রী কুন্তী ও মাদ্রী এবং কয়েকটি অনুচর সহ বনে চলিয়া যান। তিনি মৃগয়াব্যসনী ছিলেন, মৃগয়ার আনন্দে দিন যাপন করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। একদিন বনে মৃগীর সহিত বিহাররত এক মৃগকে তিনি বাণে বিদ্ধ করেন। ঐ মৃগটি ছিল প্রকৃতপক্ষে এক ঋষিকুমার। বাণে বিদ্ধ হইয়া সে স্বরূপ ধারণপূর্বক অনুচিত সময়ে তাহাকে আক্রমণ করা হইয়াছে বলিয়া পাণ্ডুকে শাপ দিয়া প্রাণত্যাগ করে। ইহাতে পাণ্ডুর নির্বেদ উপস্থিত হয় এবং তিনি পরিজনদিগকে বিদায় দিয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন করেন। কুন্তী ও মাদ্রী তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে অস্বীকৃত হইয়া তাপসীবেশে তাঁহার সঙ্গে থাকেন। তৎপর তাঁহারা শতশৃঙ্গ নামক পর্বতে গমন করেন। ঐখানে পাণ্ডুরই নিয়োগক্রমে কুন্তী তিন এবং মাদ্রী দুই পুত্রের জননী হন। কয়েক বৎসর পরে যুধিষ্ঠিরের বয়স যখন ১৬ বৎসর (ভীমের ১৫ ও অর্জুনের ১৪), পাণ্ডু কামবশে মুনিশাপ বিস্মৃত হওয়ার ফলে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন, মাদ্রী সহমৃতা হন। কুন্তী তখন নিরুপায়। কী করিবেন? পর্বতবাসী ঋষিরা হস্তিনায় ফিরিয়া যাইবার পরামর্শ দিলেন, এবং তাঁহাদের কয়েকজন রক্ষকরূপে তাঁহাদের সঙ্গে হস্তিনাপুর পর্যন্ত আসিলেন। বুঝা যায় বনে ও পর্বতে বাসকালে হস্তিনাপুরের সহিত পাণ্ডুর যোগাযোগ ছিল না। স্বভাবতই সকলের সন্দেহ হয় আগন্তুকগণ পাণ্ডুরই স্ত্রী-পুত্র কিনা। অবশেষে সঙ্গে আগত ঋষিদিগের সাক্ষ্যে সে-সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং পুত্রগণ সহ কুন্তী রাজপরিবারে গৃহীত হন। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, পুত্রেরা সকলেই কৈশোরপ্রাপ্ত (একজন কৈশোর-উত্তীর্ণপ্রায়) হইলেও পাণ্ডু তাহাদিগের রাজোচিত শিক্ষাদীক্ষার জন্য স্বরাজ্যে প্রেরণ আবশ্যক মনে করেন নাই।

মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ কৌরব এই বংশবোধক নামেই প্রায় সর্বত্র উল্লিখিত হইয়াছেন, পিতৃনামানুসারে ধার্তরাষ্ট্র শব্দ তাঁহাদিগের সম্পর্কে অল্পই প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্যদিকে পাণ্ডবেরা কদাচিৎ কৌরব বলিয়া সম্বোধিত হইলেও পিতৃনামেই অধিক অভিহিত। মহাভারতকার প্রবাদ হইতে কৌরব পাণ্ডব দুই নাম বোধ করি বংশভেদবোধকরূপেই পাইয়াছিলেন। কুরুবংশ ভরতবংশও বটে। তিনি পাণ্ডবদিগকে মধ্যে মধ্যে কৌরব ও ভারত এই দুই শব্দে অভিহিত করিয়া তাহারা যে দুর্যোধনাদির জ্ঞাতিভাই, এই মতকে দৃঢ়তা দানের চেষ্টা করিয়াছেন। ঐরূপে তাঁহার গ্রন্থের মহাভারত-নামও সার্থক হইয়াছে।

মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
(একটি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক)
এই নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্তোষজনক কাজে আপনি খুসী হবেন
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ কারবারের সুবিধা আছে
চেয়ারম্যান: রায় বাহাদুর এস, সি, চৌধুরী
ডিরেক্টর: শ্রী ডি, এন, ভট্টাচার্য্য
জেনারেল ম্যানেজার: শ্রী আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি
১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই হইতে
সেভিংস ব্যাঙ্ক
একাউন্টের
সুদের নূতন বর্ধিত হার শতকরা বৎসরে ১½% হইতে
৩% পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তন করা হয়েছে।
বিস্তৃত বিবরণ ব্যাঙ্কের যে কোন শাখা বা আফিসে পাওয়া যাইবে।
হেড আফিস: ৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

প্রেমেন্দ্র মিত্র
মৌসুমী

বেঁ ...া লেগেছে এই শীতের ভোরে রাস্তাটুকু আসতে। ...ই পুরনো একঘেয়ে কলকাতার রাস্তাগুলো ...রের আলোয়—বিশেষ করে শীতের ভোরের কু... আলোয়—যেন আর কোন অনাবিষ্কৃত অচেনা শহরে চলে যায়।

রূপকথার মায়াপুরী নয়, কিন্তু আরেক রহস্যঘেরা শহর, সেখানে যে-কোন মুহূর্তে জীবনে যেন অনেক কিছু হতে পারে, অদ্ভুত সম্ভাবনা আশ্চর্য সাক্ষাৎ যেন আধ-পরিস্ফুট শহরের গলিতে রাস্তায় বাড়িতে শুধু সাহস করে কল্পনা করার অপেক্ষায় আছে।

গ্রে স্ট্রীট, চিতপুর, হ্যারিসন রোড, নতুন পোল আর ওপারের স্টেশন, সেই মুখস্থ সব নাম আর দেখে দেখে চোখের অরুচি চেহারা ছেড়ে ফেলে, মনের মধ্যে সুরের কাঁপন তোলা ঝাপসা সব আশার ইঙ্গিত নিয়ে আরেক কোথাকার ছবি হয়ে ওঠে যেন।

এত ভোরে অনেক দিন বুঝি শহরের রাস্তায় বার হয়নি। না, তাও ঠিক নয়। হয়ত বেরিয়েছে, কিন্তু এই চোখই ছিল না দেখবার, ছিল না মনের এই নিশ্চিন্ত অবসর।

দৌড়োতে দৌড়োতে কি সুর ভাঙা যায়। সমস্ত দেহমন দিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে যুঝতে যুঝতে স্বপ্ন দেখার ফুরসত কোথায়।

সেই ফুরসত আজ কি হয়েছে?

হয়েছে বই কি একটু।

ভোরবেলার এই সদ্য-ঘুম-ভাঙা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এমন করে নিশ্চিন্ত নির্লিপ্তভাবে সব কিছু তারিয়ে তারিয়ে দেখতে নইলে কি পারত—!

এই স্টেশনে হামেশাই ত আসতে হয়। ওয়াগন বুকিং, মাল খালাসের ঝামেলা, ও. আর. নিয়ে গণ্ডগোল সব কিছু ত সে নিজেই করে এসেছে। হন্তদন্ত হয়ে আসা, শুধু কাজ সেরে চলে যাওয়ার ঊর্ধ্বশ্বাস তাড়া। চোখে কানে কিছু দেখবার, আনমনে একটু পায়চারি করবার সময় পেয়েছে কই! আফসোসও হয়নি তার জন্যে।

তার মনের ভিতরকার দৌড় বাইরে হয়ত ধরা পড়েনি। ছিমছাম সুশ্রী চেহারা, প্রসাধনে পোশাকে সংযত রুচি, জাত-ছাড়া কাজের ভার নিয়েও চোখে যেন অসহায় নির্ভরতার একটু আভাস, আর সাবধানে ঈষৎ রাঙান ঠোঁটে মাঝে মাঝে সেই একটু জড়তা-ভাঙা কৌতূহল-জাগা দুর্বোধ হাসির ইশারা।

দৃষ্টি আর হাসিটুকু একেবারে মাজা, ওজন করা। পুরুষের দুনিয়াকে ওইটুকু ঘুষ না দিতে জানলে আজকের এই তাপসী রায় হয়ে ওঠা যায় না।

আজকের তাপসী রায় কিছুক্ষণের জন্যে নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে ভোরবেলাকার এই স্টেশনের স্বাদ নিতে পারে।

বিনা কাজে আজও অবশ্য সে আসেনি, কিন্তু কাজটা গৌণ। গৌণ কেন, শুধু একটা ছল বলে স্বীকার করতে তার মনে অন্তত দ্বিধা নেই।

প্ল্যাটফর্মটাকে এই ভোরেও ঠিক নির্জন বলা যায় না। প্ল্যাটফর্মের সিমেন্টের উপরেই গড়াগড়া বহু মানুষ শুয়ে আছে। কিন্তু ভোরের অস্ফুট নীলাভ আলো, ব্যস্ততার অভাব আর অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা মিলে একটা নির্জনতার অনুভূতি এনে দেয়।

বইএর কাঠের স্টলটা বন্ধ, তালা দেওয়া। যে-কটা বেঞ্চি প্ল্যাটফর্মে আছে, তার সবগুলোতেই কেউ না কেউ হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। স্টলটায় হেলান দিয়েই তাপসী দাঁড়িয়ে থাকে তাই।

অনেক আগেই স্টেশনে এসে পড়েছে। ইচ্ছে করেই এসেছে অবশ্য। স্টেশনের প্রথম ট্রেন ছাড়তে এখনও ঘণ্টা-খানেকের বেশী দেরি। প্রথম ট্রেনে এমনিতেই যাত্রী কম। তারও দু-চারজন ছাড়া এসে পৌঁছয়নি এখনও।

একটু একটু করে স্টেশন জাগছে অবশ্য। কুলিদের দু-চারজন উঠে পাগড়ি বাঁধতে শুরু করেছে। প্ল্যাটফর্মের কলে জল নিচ্ছে দুটি ছোট মেয়ে একটা পুরনো তোবড়ান বালতিতে। দুই বোনই হবে। যেমন দুর্বল রোগা চেহারা, তেমনি ময়লা ছেঁড়া পোশাক। এই শীতেও শতচ্ছিন্ন ফ্রকের উপর একটা করে সুতির ছেঁড়া কাপড় চাদরের মত জড়ান। দুই বোনই কৌতূহলী হয়ে তার দিকে তাকাচ্ছে। স্টেশনে বাধ্য হয়ে যারা আশ্রয় নিয়েছে, সেই উদ্বাস্তুদেরই মেয়ে সন্দেহ নেই। জল ভরা হয়ে গেল। দুজনে মিলে বালতিটা বয়ে নিয়ে যেতে যেতে তাকে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছে। বড় বোন একাই বইছে ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে, ছোট বোনের শুধু ধরে থাকার খেলা।

হঠাৎ স্মৃতির অতল থেকে একটা বুদ্বুদ যেন উঠে এসে মনটাকে বিস্বাদ করে দেয়।

না, রাস্তায় বাইরের কলে কোন দিন জল আনতে যেতে হয়নি। তখনকার দিনে তাদের বাড়িতে সেটা অভাবনীয়। কিন্তু ভোর হবার আগে খিড়কির দরজা খুলে পাশের বাড়ির টিউবওয়েলে সারা দিনের খাবার জলটা সংগ্রহ করতে যেতে হয়েছে দিনের পর দিন। জল বয়ে আনার কষ্ট ছিল, কিন্তু তার চেয়ে বেশী ছিল ভয়, পাছে কেউ দেখে ফেলে। বিশেষ করে পাশের বাড়ির ঝি মঙ্গলা, যার মিষ্টি মাখান কথার বিষ সবচেয়ে অসহ্য।

জোর করে তাপসী মনের ওই দিকের জানলায় যেন পর্দা টেনে দেয়। ও-সব কথা ভাববার আজ সময় নয়।

প্ল্যাটফর্মের ব্যস্ততা বাড়ছে। যাত্রীরা কিছু কিছু আসতে শুরু করেছে। যারা শুয়ে ছিল, তাদের সবাই উঠে পড়েছে। প্ল্যাটফর্মের ধারে বসে সশব্দে কুলিদেরই একজন মুখ ধুচ্ছে। সেই নীলাভ অস্পষ্টতা আর নেই। প্ল্যাটফর্মের উ... ওভারব্রীজের উপরকার আকাশ এখনও গাঢ় ভোরের কুয়াশায় ঘোলাটে, কিন্তু তার গায়ে যেন ঈষৎ রঙের ছোপ লেগেছে পুবের অদৃশ্য সূর্যোদয়ের আভায়।

দেখতে দেখতে প্ল্যাটফর্মের চেহারা বদলে যাচ্ছে। যাত্রী যতটা কম হবে ভেবেছিল তা নয়। এখনও আধ ঘণ্টা বাকী।

যারা এসেছে, বেশির ভাগই তৃতীয় শ্রেণীর মনে হয়। তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে।

এতক্ষণে কল্যাণের আসা উচিত ছিল। কথা ছিল সেই রকমই। তাপসী তাই বলে দিয়েছিল যতদূর স্পষ্ট করে সম্ভব। খানিকটা আদেশের ভঙ্গিতেই বলতে হয়েছে, কিন্তু ইচ্ছাটা অস্পষ্ট রাখেনি।

"অ্যালার্ম-ঘড়ি আছে ত! সেটায় দম দিতে ভুলে যাবেন না যেন।"

"ট্রেন ছাড়বে ত পাঁচটায়।" কল্যাণ বলেছে তার সেই ঈষৎ অলস, ঈষৎ কৌতুকের আভাস মেশান কণ্ঠে।

"পাঁচটা নয়, চারটে পঞ্চান্ন। আর একদিন না হয় ব্রাহ্ম-মুহূর্ত কাকে বলে দেখলেন! এক ঘণ্টা আগেই আসুন না কাল। একবার না হয় নিয়মভঙ্গ হক।"

কল্যাণ হেসেছে, "বেশ তা-ই যাব। কিন্তু—"

কল্যাণ কী বলতে গিয়ে থেমেছে। চোখের কোণে সেই ঈষৎ কৌতুকের আভাস।

তাপসী টেবিল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ড্রয়ারের চাবিটা হ্যান্ড-ব্যাগের ভিতর রাখতে রাখতে বলেছে, "কিন্তু—কী?"

"অত আগে গিয়ে করব কী তাই ভাবছি! স্টেশনের গেটই ত খুলবে না?"

"খুলবে! খুলবে! না খোলে, আমি আপনার জন্যে গেট খুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। আপনি আসুন ত দেখি। তবে খাতাপত্রগুলো নিতে যেন ভুলবেন না।" এইটুকু কাজের সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়ে আলাপটাকে একটু ছদ্মবেশ দেবার চেষ্টা। কল্যাণ কি তা বোঝে না? ঠিক বোঝা যায় না এখনও।

সম্পর্কটা মনিব-কর্মচারীরই বটে। কিন্তু তাপসী নিজের গাম্ভীর্য ও দূরত্ব বজায় রাখলেও মনিবের মত ব্যবহার কারও সঙ্গেই করে না। যারা স্বভাবে কি স্বেচ্ছায় মাথা নুইয়ে থাকে তাদের গায়ে পড়ে শোধরাবার চেষ্টাও করে না অবশ্য।

কল্যাণ মাথা নোয়াবার মানুষ নয়, বরং তার সমস্ত ঈষৎ অলস ভঙ্গিতে, কথাবার্তার ধরনে একটা স্বাভাবিক আভি-জাত্যই আছে। কিন্তু কাজের সম্পর্কটা যেন ভুলতে চায় না।

আজ তা ভোলাবার জন্যেই এই আয়োজন। মন ধরার ফাঁদ বলে স্বীকার করতেও তার লজ্জা সে পার হয়ে এসেছে। নিজের মনকে স্পষ্ট করে দেখার সাহস সে রাখে।

ভদ্রেশ্বরে আজই যাবার এমন কিছু তাড়া না হলে ছিল এত ভোরের গাড়িতে ত নয়ই। সেখানে কাজের কিছু গণ্ডগোল হয়েছে সত্যি। রবিমামাকেও একবার দেখে আসা দরকার। কিন্তু সেজন্যে তার একা যাওয়াই যথেষ্ট। বরাবর সে তাই গিয়েছে। কালই হঠাৎ ঠিক করেছে হিসেবপত্র দেখবার জন্যে কল্যাণ সঙ্গে না গেলে নয়।

কেউ কিছু ভেবেছে কি? কল্যাণ মজুমদার আবার হিসেব দেখবার মানুষ হল কবে? কী আর এমন হিসেব! হরিপদ ঘোষই ত যেতে পারত!

পারত নিশ্চয়। কিন্তু অফিসের জরুরী কাজের জন্যেই হরিপদবাবুকে নিয়ে যাওয়া যায় না। বেশী কিছু গণ্ড-গোল নয় বলেই কল্যাণ গেলেই চলবে।

এ-সব কৈফিয়ত কাউকে অবশ্য দিতে হয়নি। নিজের মনকে চোখ ঠারবার জন্যেও নয়। শুধু ডাঃ ভৌমিক যদি কিছু বলেন, তারই জন্যে তৈরী জবাব।

ভৌমিক অবশ্য কিছুই বলবেন না, তাপসী জানে। আজ-কাল কিছু বলেন না। শুধু সেই সবল কঠিন সুগঠিত মুখের পক্ষেও বেমানান বড় বড় চোখে একটা বিদ্রূপমিশ্রিত কৌতুক সারাক্ষণ সব সাধারণ কথাতেও ঝিলিক দিতে থাকে অস্বস্তিকরভাবে।

ভদ্রেশ্বর থেকে ফেরবার পরদিনই হয়ত আসবেন। রেশমী সাদা চুলের তলায় সেই পৌরুষদৃপ্ত অক্ষয় যৌবনের চেহারা, সাদা চুলই যেন চেহারার দুর্লভ বিশেষত্ব। সেই নিখুঁত পোশাক, ত্রুটিহীন ব্যবহার।

তাঁর জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট বড় চেয়ারটায় বসবেন সটান সোজা হয়ে মিলিটারি অফিসারের মত। মাথার টুপিটা কোলের উপর। তার কানাটায় আস্তে আস্তে হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞাসা করবেন, "ভদ্রেশ্বরের ব্যবস্থা করে এলে তাহলে! বেশী কিছু হাঙ্গামা পোহাতে হয়নি নিশ্চয়!"

মুখে সাধারণ প্রশ্ন, আয়ত বেমানান একটু ঠেলে ওঠা চোখ দুটিতে সেই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের হাসি। তবু তাতে রূঢ়তা নেই।

এই চোখের দৃষ্টি কিন্তু বোঝা কঠিন। এমনিতে সব দিক দিয়ে সৌম্য চেহারায় অত্যন্ত বেখাপ্পা একটা দুঃশীলতার ইঙ্গিত সে-চোখের দৃষ্টিতে যেন মেশান।

প্রথম আলাপের সময় বাইরে শক্ত হয়ে থাকলেও তাপসীর বুকের ভিতরটা কেমন কেঁপে উঠেছিল দুর্বোধ অস্পষ্ট ভয়ে। তারপর অবশ্য সাত বছর কেটে গেল।

কিন্তু গাড়ি ছাড়তে যে আর দেরি নেই। কল্যাণের হল কী!

আসতেই পারল না নাকি!

অস্থিরভাবে প্ল্যাটফর্মের গেটের দিকে তাপসী তাকায়। প্ল্যাটফর্মে এখন দস্তুরমত ভিড়। দলে দলে লোক আসছে।

কিন্তু কল্যাণের দেখা নেই। ইচ্ছে করেই সে এল না নাকি! আজ যদি সে কথা না রাখে? ক্ষোভ রাগ হতাশা মিশে একটা অদ্ভুত অনুভূতি বুকের ভিতরটায় হঠাৎ যেন জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

না, এ-অপরাধের ক্ষমা নেই।

কিন্তু দুর্ঘটনা কিছু ঘটতেও ত পারে। এ-চিন্তাটা আমল পায় না বেশীক্ষণ। এটা শুধু কল্যাণের দোষ স্খালন করে নিজের মনকে স্তোক দেবার চেষ্টা। কিন্তু তবু বুকের জ্বালাটা কিছু যেন কমে।

আর অপেক্ষা করা চলে না। হয় ভদ্রেশ্বর যাওয়াই বন্ধ করতে হয়, নয় যেতে হয় একাই।

গার্ড হুইস্‌ল দিচ্ছে। সামনেই তার কামরা।

না, যাওয়া বন্ধ করা চলে না। তাপসী ফার্স্ট ক্লাসের দরজাটা খুলে উঠে পড়ে। ভিতরে ঢুকে প্ল্যাটফর্মের দিকের

জানলায় মুখ বাড়িয়ে শেষ আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকে—যদি কল্যাণ এখনও ছুটতে ছুটতে আসছে দেখা যায়।

না, তার কোন সম্ভাবনা নেই। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকেই তাপসী তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে চমকে ওঠে।

চলতি গাড়িতে একজন উঠেছে। অল্পবয়সী সুবেশ ভদ্র চেহারা। কিন্তু জাতটা তাপসীর চেনা। এখন মনে পড়ে, অনেকক্ষণ ধরেই প্ল্যাটফর্মে তার কাছাকাছি ঘোরাফেরা করতে করতে তার দিকে নজর দিচ্ছিল। দুবার চোখাচোখি হয়ে যেতে সঙ্কোচভরে সরে গিয়েছে। এখন আর নিজেকে বোধ হয় সংবরণ করতে পারেনি। সুশ্রী সুবেশ তরুণী একজন একা একা যাচ্ছে—তার সান্নিধ্যের প্রলোভন জয় করা এ-জাতের পক্ষে শক্ত।

মেয়েদের গাড়িতে উঠলেই হত। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কল্যাণ আসবে আশা করেই এই কামরার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

ভদ্রলোক যেন খালি গাড়িতেই উঠেছেন, এইভাবে তার দিকে একবার চোখ পর্যন্ত না দিয়ে অন্য দিকের বেঞ্চিটায় গিয়ে পা তুলে বসেন। হাতে একটা ছোট অ্যাটাচি শুধু। সেটা খুলে তা থেকে একটা সাময়িকপত্র বার করে যেন তন্ময় হয়ে পড়তে শুরু করেন তার পর।

তাপসীর মুখে একটু হাসি দেখা দেয়। না, ভয়টয় তার নেই। এ অতি সামান্য ব্যাপার। তবে একটু বিরক্তি লাগে। কল্যাণ যখন এল না, তখন একা একা যেতে পারলেই ভাল হত। সত্যিকার নিঃসঙ্গতা। তার সমস্ত মন নির্জনতার জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। দিনরাত ছুটে চলাই তার জীবন। মাঝে মাঝে নিজের সঙ্গে একা হওয়ার জন্যে তাই অসীম ব্যাকুলতা অনুভব করে। নিজের দিকে একবার চেয়ে দেখবার, নিজের সঙ্গে কথা বলবার নির্জনতা।

যাকগে, কিছু আসে যায় না। থাকলেই বা ভদ্রলোক ও-ধারের বেঞ্চিতে বসে। সে নিজের মধ্যে অনায়াসে ডুবে গিয়ে সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।

বাইরের দিকে মুখ করে সেই চেষ্টাই করে তাপসী। সমস্ত শরীর-মনকে কিছুক্ষণের জন্যে একটা নিশ্চিন্ত ছুটি দেওয়া কিন্তু হয়ে ওঠে না। ট্রেন এখনও লিলুয়া পার হয়নি। রেলের লাইন, শেড, সার সার ইঞ্জিন, গাড়ি, নোংরা জলা, নোংরা শহরতলি শীতের ভোরের কুয়াশা ঢাকা দিয়েও যেন কুশ্রী দেখায় অত্যন্ত। তা ছাড়া হাওয়াটা বড় বেশী ঠাণ্ডা কনকনে। ইঞ্জিনের দিকে মুখ করেই এতক্ষণ বসে ছিল। এবার একটানা জানলার আড়ালে মুখ রেখে উল্টো দিকে মুখ করে বসবার ব্যবস্থা করে।

জানলা সব কটাই খোলা। একটা অন্তত বন্ধ করা দরকার। কাঁচের সার্সিটা তাই তোলবার চেষ্টা করে। কিন্তু সার্সিটা আটকে গেছে কীভাবে। খানিকটা তোলার পর কিছুতেই শেষ পর্যন্ত ওঠান যায় না। ঝিলমিলি-দেওয়া কাঠের সার্সিটাই তার বদলে তোলবার চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু গাড়ির যা হাল, সেটাও আধখানা উঠে আটকে যায়।

"একটু সরুন, আমি তুলে দিচ্ছি।"

তাপসী পাশ ফিরে তাকায়। ভদ্রলোক কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। সরে বসতে গিয়ে আবার তার হাসি পায়। ভদ্রলোক যে-রকম সুযোগ চাইছিলেন, তাই সে জুগিয়ে দিয়েছে নিজে থেকে। এর পর আর আলাপ না করে থাকা যাবে না বোধ হয়।

ভদ্রলোককে কাঁচের সার্সিটা নিয়ে বেশ হিমসিম খেতে হচ্ছে কিন্তু। অনায়াস তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে পৌরুষ-গর্ব বুঝি আর বজায় রাখা যায় না। কী একটা দোষের দরুন সার্সিটা খাপের মধ্যে এতখানি বসে গিয়েছে যে, তোলবার খাঁজটা ভাল করে জোর দেবার মত আঙুলের নাগালের মধ্যেই নেই। নেহাত শীতের হাওয়া, নইলে ভদ্রলোক গলদ্ঘর্মই হয়ে উঠতেন।

তাপসীর হাসিও পায়, করুণাও হয় ভদ্রলোকের দুরবস্থায়। অপরিচিত মহিলার সাহায্যে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে এখন পিছিয়ে যাওয়াও যায় না। কিন্তু সার্সিটা যেন ইচ্ছে করেই বাদ সাধছে। প্রাণপণ চেষ্টায় ভদ্রলোকের মুখের চেহারা বিকৃত হয়, কপালের শিরা ফুলে ওঠে। এরই মধ্যে একবার তাপসীর দিকে চোখ পড়ায় তিনি অপ্রস্তুতভাবে একটু হাসেন। বলেন, "ভাল করে ধরাই যাচ্ছে না।"

"থাক তাহলে যেমন আছে!" তাপসী তাঁকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করে।

কিন্তু এত বড় পরাজয় স্বীকার করলে তাঁর পৌরুষের অভিমান যে একেবারে ধুলোয় লুটোয়। চোখ মুখ সিঁটিয়ে ভদ্রলোক আবার সার্সির সঙ্গে যোঝা শুরু করেন।

তাপসীকেই এবার সাহায্যের জন্যে এগুতে হয়। একে ধরবার খাঁজটা অনেক নিচুতে, তার উপর পুরুষের মোটা আঙুল বলেই ভাল করে নাগাল পায় না।

"আপনি একটু সরুন। আমি একটু তুলে দিলে তখন টেনে উঠিয়ে দেবেন।"

"দেখুন তাহলে একবার।" ভদ্রলোকের মুখ এখন করুণ। তবে বেশী দূরে সরে তিনি দাঁড়ান না।

তাপসী সরু লম্বা আঙুলে সার্সিটা খানিকটা ওঠায়। ভদ্রলোক ব্যাকুলভাবে সেটা ধরে ফেলে কোন রকমে শেষ পর্যন্ত উঠিয়ে মানরক্ষা করেন।

"ধন্যবাদ!" বলতে গিয়ে তাপসী চুপ করে যায়। ভয় হয় কথাটা বিদ্রূপের মত না শোনায়। তা ছাড়া আলাপের ভূমিকা তার দিক থেকে না-ই বা হল।

ভদ্রলোক একটু হাঁফাতে হাঁফাতেই ও-পাশের বেঞ্চিতে গিয়ে বসেন। সার্সি তোলবার কেলেঙ্কারিটা ভুলতে পারেন না বলেই বোধহয় লজ্জায় আলাপ করবার চেষ্টা আর করেন না। তাপসী একটু স্বস্তি পায়।

পরের স্টেশনে ভদ্রলোক নেমেই যান। যাবার আগে একটু ভদ্রতার হাসি হাসেন। তাপসীও হেসে সৌজন্যরক্ষা করে। ভদ্রলোকের জন্যে এখন তার করুণাই বেশী। বেচারা! সান্নিধ্যের সুযোগ হয়েও এমন ভেস্তে গেল!

নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে একলা ঘোরাফেরা যখন থেকে করছে, তখন থেকে এ-জাতের লোকের দেখা হামেশাই পেয়ে আসছে।

সবাই হয়ত মন্দ লোকও নয়। এই ভদ্রলোকের কথাই ধরা যাক। শয়তান বদমাস কিছু নয়, সভ্যভব্য সাধারণ মানুষ। মেয়েদের সম্বন্ধে একটু দুর্বলতা, একটু কৌতূহল, একটু রোমান্সের দিবাস্বপ্ন ছাড়া মনে হয়ত কিছুই নেই। দিবাস্বপ্নটাও ঠিক স্পষ্ট নয়। তাকে একলা গাড়িতে উঠতে দেখে শেষ মুহূর্তে সাহস করে উঠে পড়েছেন। ভেবেছিলেন—কী ঠিক ভেবেছিলেন হয়ত নিজেও জানেন না। মন্দ কি, দেখাই যাক না। হয়ত আলাপ হতে পারে। আলাপ হলে যে কতদূর গড়াবে, বা গড়ান উচিত, সে সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। মেয়েদের সম্বন্ধেও একটা অদ্ভুত ঘোলাটে ধারণা। বিশেষ যে-সব মেয়ে সঙ্গী ছাড়াই ঘোরে, পোশাক-আশাকে কিছু পারিপাট্য যাদের আছে, তাদের সম্বন্ধে। একটু সুযোগ সুবিধা হলেই তাদের চোখে যেন নিমন্ত্রণ ফুটে উঠতে পারে এমনি একটা আশা।

সমস্ত ব্যাপারটা হয়ত এই যুগের পৌরুষের একটা করুণ প্রহসন। আদিম মানুষ কাকে বলে তাপসীও ঠিক বোঝে না, কিন্তু তা বলতে মনের যে সহজ স্বাভাবিক সুস্থ প্রকৃতি ভাবতে ইচ্ছে করে, তা অনিবার্যভাবে কৃত্রিম আড়ষ্ট আধুনিক জীবনে শোনা ও পড়া কথায় ভাবনা ও ধারণার অস্পষ্ট ঘোলাটে জটিলতায় এমন চাপা পড়ে আছে যে, নিজের চাওয়ার চেহারাটাই অধিকাংশ পুরুষের কাছে ঝাপসা অর্থহীন। নোংরা পঙ্কিল মন যাদের, চোখের দৃষ্টি শরীরের ভঙ্গিতে ফুটে বেরোয়, তাদের কথা ধরছে না, যে-ভদ্রলোক এই মাত্র অপ্রস্তুত-ভাবে নেমে গেলেন, ধরছে তাঁদের, অন্যদের কথা। দুর্জনও নয়, আবার শালীনতার নির্দেশেও বাঁধা থাকতে পারেন না।

ঠিক কী আশা করে ভদ্রলোক খালি কামরাতে উঠেছিলেন, ভাবতে তাপসীর মজা লাগে। একা পেয়ে অন্যায় সুযোগ নেবার জন্যে নিশ্চয় নয়। সে-সাহস বা পাশবিক অসুস্থতা

নেই। একটু আলাপ হবে। নাম জানবেন, ঠিকানা জানবেন এই আলাপের জের টেনে একদিন গিয়ে হাজির হবেন, নিজের বৈশিষ্ট্যে হয়ত হৃদয় জয় করে ফেলবেন। তারপর?

আলাপ হলে হয়ত দেখা যেত, হৃদয় জয় করার ঝামেল পোহাবার ক্ষমতাই নেই। কী করেন ভদ্রলোক? দেখে মনে হয় ঠিক বাঁধা মাইনের চাকরির উপর নির্ভর নয়। হয় পৈতৃক সংস্থান কিছু আছে, নয় কিছু নির্বিঘ্ন গোছের কারবার। অশিক্ষিত মূর্খ নয়, কিন্তু পড়াশোনাও ভাসাভাসা। তাপসী যদি আলাপ হবার পর দুষ্টুমি করে বলত, "আসুন না একদিন আমাদের ওখানে!" তাহলে গর্বে আনন্দে ফুলে উঠলেও সাহস করে যেতে বোধ হয় আর পারতেন না।

এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এতকিছু ভাবছে দেখে তাপসীর হঠাৎ অবাক লাগে। পরমুহূর্তেই নিজেকে সংশোধন করে। না, তুচ্ছ মোটেই নয়। আর কিছু না হক, নিজেকে যথার্থ চেহারায় দেখবার শক্তি বোধহয় সে এই ক বছরের নিত্য-সংগ্রামের জীবনে অর্জন করেছে। নীরব বা সরব পুরুষের কোন রকম স্তুতিই তার খারাপ লাগে না, এমন কি তা শালীনতার সীমা একটু আধটু ছাড়ালেও।

তা ছাড়া—তা ছাড়া সত্যি কথাটা তার কাছে আর অগোচর থাকে না।

সে কল্যাণের কথাই ভাবছে, নিজের একরকম অজ্ঞাতেই হয়ত তুলনা করছে দুটো ছবির।

কল্যাণের সঙ্গে প্রথম এমনি ট্রেনের কামরাতেই দেখা হয়েছিল। এমন নির্জন কামরায় অবশ্য নয়। ঠাকুমা, মা, বড়দা, ছোট বোন নমিতা অমিতা, সকলেই ছিল সে-কামরায়। সেটা প্রথমও নয়, তৃতীয় শ্রেণীর কামরা।

নিজের পায়ে দাঁড়াবার পর সেই তার প্রথম ছুটি উপভোগ। বাড়ির সবাইকে নিয়ে, বিশেষ ঠাকুমাকে খুশী করতে, কাশীতে এক মাসের জন্যে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। সেখান থেকে যাচ্ছিল বিন্ধ্যাচলে একদিনের জন্যে।

মোগলসরাইএ গাড়ি বদল করতে হল। অসম্ভব ভিড় গাড়িতে। বড়দার যত কিছু আস্ফালন বাড়িতে। পথে-ঘাটে মেয়েদের চেয়ে অসহায়। ভিড় দেখে ভড়কে গিয়েছেন, কিন্তু সেটা লুকোচ্ছেন তিরিক্ষি মেজাজে যত কিছু নিয়ে খিটখিট করে।

"তোমাদের সঙ্গে আসাই ঝকমারি হয়েছে আমার। এতটুকু যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে! নিজেরাই এক একটি পুঁটলি, তার ওপর আবার রাজ্যের জিনিস সঙ্গে না নিলে নয়—ও খাবার ঝুড়ি, জলের কুঁজো, হেন-তেন কেন? মরুভূমিতে যাচ্ছি নাকি! নিজেরাই উঠব কী করে তার ঠিক নেই, ওসব যদি পড়ে থাকে আমি জানি না।"

ঠাকুমা হেসে বলেছেন, "তুই নিজে গাড়িতে ওঠ ত। ওসব কিছু তোকে জানতে হবে না।"

ঠাকুমার তখনই কোমর বেঁকে গিয়েছে। লাঠি ধরে কুঁজো হয়ে হাঁটেন। কিন্তু বুড়ি যেন ইস্পাত দিয়ে তৈরী। যেমন শরীরে, তেমনি মনে।

তাপসীর নিজেরও একটু ভাবনা ছিল। গাড়িতে সব কিছু সামলে ওঠা যাবে কি না। মেয়েদের গাড়িতেই অবশ্য উঠবে ঠিক ছিল। কিন্তু গাড়িটা এসে থামল বেয়াড়া জায়গায়। প্ল্যাটফর্মের সেই মানুষের স্রোত ঠেলে মেয়েদের কামরার দিকে তখন যাওয়াও শক্ত। সামনে যে-কামরাটা পড়েছে, বড়দা, হন্তদন্ত হয়ে তাতেই নিয়ে তুললেন সবাইকে, মানে নিজেই আগে উঠে পড়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচামেচি করতে লাগলেন সকলকে তাড়া দিয়ে।

"ওই চেঙাড়িটা যে পড়ে রইল! আরে কুঁজোটা যে ভাঙবে"—ইত্যাদি

কোনরকমে গাড়িতে সবাই উঠল। বসবার জায়গাও হল কজনের কোনরকমে। গাড়িতে তিল ধারণের জায়গা সত্যি নেই। গরিব ওদেশী চাষাভুষোর সংখ্যাই বেশী। মেয়েছেলে দেখে তারা তবু যা হোক করে কটা জায়গা করে দিলে। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে তারা অনেকে গাড়ির মেঝেতেই বসেছে। বড়দাকে আরও অনেকের সঙ্গে দাঁড়াতে হয়েছে দরজায়।

গাড়ি ছাড়বার সময় সেই দরজাতেই গণ্ডগোল বাধল।

বড়দা মারমুখো হয়ে কাকে ধমকাচ্ছেন শোনা গেল: "না, না, এ-কামরা নয় মশাই, এ-কামরা নয়। দেখতে পাচ্ছেন না, গুড়ের নাগরি হয়ে যাচ্ছি। অন্য কামরা দেখুন।"

"অন্য কামরা দেখেই ত আসছি।"

তাপসী জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে পেল, দুটি বাঙালী ছেলেই দরজা দিয়ে ঢোকবার চেষ্টা করছে। আর বড়দা দরজা আগলে বাধা দিচ্ছেন।

"অন্য কামরা দেখেই আসছেন!" বড়দা মুখ ভেঙালেন, "সব কামরার চেয়ে এইটেই আরামের মনে হল!" বড়দার খোঁচাটা খুব অস্পষ্ট নয়।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ছেলে দুটি ঠেলেই ভিতরে উঠে পড়ল। বড়দা বিরক্ত মুখে একটু সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। এখন বাধা দিতে গেলে চলন্ত ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দিতে হয়।

ভিতরে ঢুকে একটি ছেলে বড়দার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে, "ভিড় বাড়াতে এত আপত্তি কেন মশাই! ভিড়ের লোভেই ত থার্ড ক্লাসে ওঠা!"

বড়দা উত্তর না দিয়ে মুখের চেহারাতেই তাঁর যথোচিত জবাব দিলেন। তাদের দিকে পিছন ফিরেই দাঁড়ালেন তারপর।

এইভাবেই পরের স্টেশন পর্যন্ত চলল। প্ল্যাটফর্ম সেখানেও যাত্রীতে গিজগিজ করছে। মির্জাপুরে কী একটা মেলা আছে এই সময়। তাই এই ভিড়।

বোঝাই সত্ত্বেও গাড়িতে আরও কয়েকজন ঠেলে উঠল। বড়দা রাগ করেই নির্বিকার, বাধা দেবে কে? কিন্তু ছেলে দুটির একজনের পা তার মধ্যে কে দিলে মাড়িয়ে। "আরে আরে সামালকে ভেইয়া, থোড়া সামালকে। মেরা টেংরি ত পেড় সে বনা হুয়া নেহি।"

অপূর্ব হিন্দী শুনে পা যে মাড়িয়ে ফেলেছিল সে কী বুঝল বলা যায় না, তবে অপরাধটা স্বীকার করে বললে, "মাফি মাঙে বাবুসাব।"

তাপসীর ইচ্ছে হচ্ছিল বলে, "পা মাড়ালে আপত্তি কেন? ভিড়ের লোভেই ত থার্ড ক্লাসে ওঠা।"

বড়দারই এই সুযোগটা নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি শুধু রাগেই ফুলছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মুখের মত জবাব দেবার খেয়ালই নেই তাঁর।

বড়দার এখনও রাগ করে থাকায় কিন্তু তাপসীর হাসি পাচ্ছিল। রাগারাগি গোড়ায় একটু হলেই বা, পুষে রাখবার মত কিছু তা নয়। আর ছেলে দুটিকে কিছু অভদ্র উদ্ধতও ত মনে হয় না।

স্বাভাবিক কৌতূহলে তারা অবশ্য বার কয়েক এদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যে। অমিতার ফ্রক, আর নমিতা শাড়ি ধরলেও নেহাত বাচ্চা। দৃষ্টিটা তাই তাপসীর উপরেই থেমেছে অনেকবার। কিন্তু সে-দৃষ্টিতে কোন অসম্মান নেই। সত্যি কথা বলতে গেলে তাপসীর ভালই লাগছিল।

আড়াউরা রোড না কী স্টেশনটার নাম ঠিক মনে নেই। ট্রেন সেখানে থামবার আগে আর-এক গোলমাল বাধল।

জায়গার অভাবে তাদের দু বেঞ্চিতে ভাগ হয়ে বসতে হয়েছে। একদিকে ঠাকুমাকে নিয়ে তাপসী, আর-এক বেঞ্চিতে মা, নমিতা ও অমিতা।

ট্রেন চলতে চলতে হঠাৎ নমিতা অমিতাকে সভয়ে সিঁটিয়ে পা গুটিয়ে নিতে হয়েছে। মেঝের উপর যারা জায়গা করে নিয়েছে, তাদের একজন বমি করে একেবারে ভাসিয়ে দিয়েছে সব। দুর্গন্ধে প্রাণ যায়।

চেঁচামেচি বকাবকির মাঝখানে ট্রেন আড়াউরা রোড স্টেশনে থেমেছে। মাথায় লম্বা চুলওয়ালা যে ছেলেটির উপর বড়দা বিশেষভাবে চটে আছেন, সে-ই তাঁকে উদ্দেশ করে বলেছে, "একটা কিছু ব্যবস্থা ত না করলে নয়। প্ল্যাটফর্মে নেমে একটা মেথর টেথর ডাকান না।"

"কেন?" বড়দা সরোষে এবার তার দিকে ফিরে জবাব দেবার সুযোগ নিয়েছেন, "কামরাটা কি আমার একার নাকি, না নাক শুধু আমারই আছে?"

ছেলেটি মাথার লম্বা চুলগুলো একবার হাত বুলিয়ে পিছনে সরিয়ে ঈষৎ অলস ও বিদ্রূপ মেশান কণ্ঠে হেসে বলেছে, "নাক আমাদের সবারই আছে, কিন্তু ওখানে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা আপনার পরিবারের লোক বলেই মনে হচ্ছে। আর যারা আছে, তারা ত কিছু করবে না, পারবেও না। সুতরাং গরজটা আপনারই হওয়া উচিত নয় কি!"

"তা ত উচিতই। আমি মেথর ডাকতে নামি, আর ট্রেনটা ছেড়ে দিক, কেমন?"

ছেলেটি এ-কথার কোন উত্তরও দেয়নি। এক দৃষ্টে খানিক ভুরু কুঁচকে বড়দার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে নেমে গিয়েছে। সঙ্গের ছেলেটি বাধা দিতে গিয়েছিল, "আরে এখন যাচ্ছ কোথায়! ট্রেন এখনি ছেড়ে দেবে যে!"

ছেলেটি সে-কথায় একবার ফিরেও তাকায়নি।

জানালায় মুখ বাড়িয়ে তাপসী কিছুক্ষণ ছেলেটির উপর ভিড়ের মধ্যেও লক্ষ্য রাখবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বেশীক্ষণ পারেনি। মেথরের খোঁজে সে দৃষ্টিসীমার বাইরেই চলে গিয়েছে।

মেথর এসে পৌঁছয়নি, কিন্তু ট্রেন সত্যিই দিয়েছে ছেড়ে। ছেলেটির কোন চিহ্ন নেই।

শুধু তার বন্ধু নয়, তাপসীও ব্যাকুলভাবে চলমান প্ল্যাটফর্মের উপর চোখ বুলিয়েছে। ছেলেটির দেখা নেই। মেথরের সন্ধান সে কোথাও পেয়েছে কি না, কে জানে, কিন্তু সময়মত ফিরে আসতে আর পারেনি।

"নবকুমারকে কাঠ খুঁজতে পাঠালেন ত শেষ পর্যন্ত।" রীতিমত ঝাঁঝের সঙ্গে কথাটা বলে বন্ধু ছেলেটি বিষদৃষ্টিতে বড়দার দিকে তাকিয়েছে। ট্রেন তখন প্ল্যাটফর্মের বাইরে।

বড়দা লজ্জিত হননি একটুও। বেশ উত্তপ্ত স্বরেই জবাব দিয়েছেন, "নবকুমার হবার যার অত শখ, তাকে ঠেকাবে কে!

মাফি মাঙে বাবুসাব

আমি ত তাকে সাধিনি মশাই ট্রেন থেকে নামতে।"

আর কিছু কথা হয়নি তারপর।

তাপসীর মনটা হঠাৎ অত্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছিল মনে আছে। তা কি শুধু ট্রেনে এসে উঠতে না পারায় ছেলেটির অসুবিধার কথা ভেবে?

তখন অন্তত স্পষ্ট করে কথাটা বুঝতে চায়নি। নিজের কাছে স্বীকার করতে চায়নি যে, সারা জীবন যাকে দেখেনি, ট্রেনের এই কয়েক মিনিটের নিতান্ত মামুলী দেখার পর যে হয়ত চিরকালের জন্যে বিশাল পৃথিবীর জনসমুদ্রে কোথায় হারিয়ে যাবে, এই কটি মুহূর্তেই মনের উপর একটা মধুর পাকা ছাপ সে রেখে যেতে পারে।

বন্ধু ছেলেটি চুনারেই নেমে গিয়েছিল। বোঝা গিয়েছিল, চুনারই দুই বন্ধুর গন্তব্য। তাপসী নিজে সেখানে নেমে কামরা পরিষ্কার করবার ব্যবস্থাও করেছিল। হঠাৎ একবার দারুণ

ইচ্ছে হয়েছিল বন্ধুকে ডেকে একটু পরিচয় নেয়। পারেনি। ইচ্ছেটুকুর জন্যেই মনে মনে লজ্জা পেয়েছিল।

আজকের তাপসী রায় হলে কি পারত না? পারত বোধহয়।

কিন্তু আজকের তাপসী কি সত্যিই এত কিছু বদলে গিয়েছে?

বদলেছে শুধু বাইরে। ভীরু সঙ্কোচ আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠেছে, নিজেকে খোলা চোখে দেখবার সাহস পেয়েছে, কিন্তু সত্তার কোন মূলে পরিবর্তন কি হয়েছে?

নিজেকে নিজে বিচার করে অন্তত বোঝা যায় না।

সেদিন সেই চুনার স্টেশনে দুর্বোধ অসহায় একটা হতাশায় জীবনটা হঠাৎ বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল। নিজেকে শাসন করবার চেষ্টা করেছিল কটি মুহূর্তের অস্ফুট মূঢ় দিবাস্বপ্নকে এমন দুর্বলভাবে প্রশ্রয় দেবার জন্যে। কিন্তু থেকে থেকে একটা কুয়াশার মত বেদনা যেন সমস্ত মনে ছড়িয়ে গিয়েছে কোথা থেকে। সে-বেদনার ঠিক স্পষ্ট রূপ নেই, বিশেষ কেউ যেন তার পাত্র নয়। সে-বেদনা সব কিছুর নিরর্থকতার ধোঁয়াটে একটা নৈর্ব্যক্তিক আকস্মিক উপলব্ধি—কেমন একরকম হারিয়ে যাওয়া।

এই অনুভূতিটা কতদিন ছিল ঠিক মনে পড়ে না। সময় অনেক বড় ক্ষতের উপরেও প্রলেপ লাগায়। এ-স্মৃতিও তাই মুছে গিয়েছিল নিশ্চয়।

মুছে গিয়েছিল, কিন্তু নির্মূল হয়নি।

নির্মূল যে হয়নি, তা টের পেয়েছিল সেইদিনই। ডাঃ ভৌমিক একটা ছোট চিঠিতে 'সাংসারিক'এর জন্যে একজনকে অনুমোদন করে যেদিন পাঠিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, সংসারে কল্পনাতীত ব্যাপারও ঘটে। কল্পনাই আমাদের মাপা, তাই বোধহয় আমরা অবাক হই।

ডাঃ ভৌমিকের চিঠি নিয়ে যে অফিস-ঘরে ঢুকেছিল, তাকে দেখবামাত্র বিস্মৃতির অন্ধকার যেন বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এক নজরেই চিনতে পেরেছিল তাপসী। কিন্তু প্রকাশ করেনি কিছুই।

অবস্থাটা বড় বিসদৃশ।

যে এসেছে সে প্রার্থী, আর অনুগ্রহ করবার অধিকার তার। কল্যাণের কিন্তু অনুগ্রহপ্রার্থীর মত চেহারা সেদিনও ছিল না। সে একবার তাপসীর দিকে অলসভাবে চেয়ে তাপসী কিছু বলবার আগেই বেশ সহজভাবে অসঙ্কোচে একটা চেয়ার টেনে বসেছে।

তাপসী ভিতরে ভিতরে কোথায় এই সঙ্কোচহীনতায় খুশী না হয়ে পারেনি, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা দুর্বুদ্ধিও অদম্য হয়ে উঠেছে তার মনে।

"আপনিই কল্যাণ মজুমদার?" ডাঃ ভৌমিকের চিঠিটায় অবহেলাভরে একবার দৃষ্টি দিয়ে তাপসী অনাবশ্যক প্রশ্নটা ইচ্ছে করেই করেছে।

তার দিকে সহজভাবে তাকিয়ে থেকে কল্যাণই একটু মাথা নেড়েছে মাত্র।

"কাজটা কী ধরনের, ডাঃ ভৌমিকের কাছে জেনেছেন কিছু?" নেহাত যান্ত্রিক গলায়, সাধারণ প্রশ্ন।

কল্যাণ একটু হেসেছে, "বেশী কিছু নয়! সাংসারিক লিমিটেড থেকে আপনারা একটা পত্রিকা বার করছেন, তার সম্পাদনায় সাহায্য করা। তাই না?"

"তাই। তবে কাজটা কী ধরনের, কী আপনাকে করতে হবে, তা ত আপনার জানা দরকার।" তাপসী স্বরে একটু কাঠিন্য আনবার চেষ্টা করেছে।

"বেশ, জানিয়ে দিন।" কল্যাণ যেন গুরুত্বই দিতে চায় না ব্যাপারটায়।

কয়েকটা পাতলা চুল কপালের এদিকে উড়ে এসে পড়েছে। এখন কল্যাণ অলস হাতটা বুলিয়ে সেগুলো পিছনে সরিয়ে দেবে, একটা অদ্ভুত আগ্রহের সঙ্গে তার জন্যে অকারণে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে তাপসী। বাইরে সাধারণ সাদা গলায় আলাপ চালিয়েছে।

"তার আগে আপনার বিষয়ে কয়েকটা কথা জানলে ভাল হয়।"

"বলুন।"

"আপনি এ-ধরনের কাজ কখনও করেছেন?"

"এ-ধরনের মানে কাগজ সম্পাদনা?"

তাপসী মাথা নেড়ে সায় দিয়েছে। মনের ভিতর মৃদু একটা কম্পন অনুভব করেছে সেই সঙ্গে, কল্যাণের চুলগুলো সরাবার জন্যে সেই প্রতীক্ষিত অলস হাত তোলার ভঙ্গিতে।

"যা করেছি, তাকে ঠিক সম্পাদনা বলব কিনা বুঝতে পারছি না।" কল্যাণের মুখে কৌতুক মেশান সেই হাসি, যা তাপসীকে এখনও কেমন বিহ্বল করে দেয়।

"বুঝিয়ে বলুন।" নিজেকে লুকোতে স্বরটা যেন একটু রূঢ়ই হয়ে গিয়েছে।

কল্যাণ কিন্তু খেয়ালই করেনি বোধহয়। তেমনি হেসে বলেছে, "কজন আমারই মত আনাড়িতে মিলে একটা কবিতার কাগজ বার করেছিলাম একবার। দু সংখ্যার পরই তার পরমায়ু ফুরিয়েছে।"

তাপসী হাসিটা চেপেছে। গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করেছে, "আপনি কবিতা লেখেন?" গাম্ভীর্য সত্ত্বেও বিস্ময়টা একেবারে চাপা পড়েনি।

"লিখি কখনো কখনো!" বলেই কল্যাণ একটু হেসে তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে, "কিছু হয় না।"

"আর—?"

"আর কিছু লিখি না!"

"না, তা জিজ্ঞাসা করিনি, জানতে চাইছি আর কী করেন।"

"কিছু না।" নির্বিকারভাবে উত্তর দিয়েছে কল্যাণ।

"কিছু যদি মনে না করেন," যেন শুষ্ক সৌজন্যের সঙ্গে তাপসী জিজ্ঞাসা করেছে, "আপনার অন্য কোয়ালিফিকেশন, মানে..."

"মানে পড়াশুনার কথা জানতে চাইছেন ত! তাও কিছু নয়। বি-এ-তে কমার্স ছিল। পরীক্ষা দিইনি। দিলে ফেলই করতাম।"

সরলতাটা কি ভান! তা মনে হয়নি তাপসীর। এবার মুখের

কৃত্রিম কাঠিন্য একটু ভেঙে দিয়ে ঈষৎ স্মিত মুখেই বলেছে, "কবি হয়ে কমার্স পড়া? সেটা কী রকম?"

"কেন? কমার্স পড়লে কবি হওয়া যায় না?"

"তা জানি না, কিন্তু কবিদের পক্ষে ঠিক যোগ্য বিষয় কি?"

"নয়ই বা কেন? তবে আপনি যাদের কথা ভাবছেন, তারা ত 'সাংসারিক'এর মত কাগজের কাজ করতেও আসে না। তাদের হয় অনেক টাকা থাকে, নয় টাকাটা তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, মানে—"

কল্যাণ কৌতুকভরা মুখে একটু হেসেছে।

"মানে—?" জিজ্ঞাসা করতে হয়েছে তাপসীকে।

"মানে, যখন যা দরকার, ধার চাইলেই তারা পায়। ধার নেবার একটা সহজাত ক্ষমতা তাদের আছে। তাদের সামনে পড়লে কারুর না বলবার উপায় নেই।"

আলাপটা ঠিক চাকরির ইণ্টারভিউএর মাত্রা রেখে চলছে না বুঝেও তাপসী না বলে পারে না, "কবি হওয়ার এও একটা দরকারী গুণ নাকি?"

"হতেও পারে। কিন্তু আমি এখনও হাতমক্স করছি, কবি হতে পারিনি। তাই 'সাংসারিক'এর কাজের উমেদার হতে হয়েছে।"

কল্যাণ কথাটা যথাস্থানে ফিরিয়ে এনে ভালই করেছে। তাপসী এবার গম্ভীর হয়েই বলেছে, "সাংসারিক লিমিটেড নামটা আপনার অজানা আশা করি নয়।"

"না, তাহলে আর দরখাস্ত করলাম কী করে?"

"সে-কথা বলছি না, বলছি আমাদের ব্যবসা কিসের, তা জানেন কি না!"

"তা একটু আধটু জানি। আপনাদের বিজ্ঞাপন কাগজে

কবি হওয়ার এও একটা দরকারী গুণ নাকি?

চোখে পড়ে। জ্যাম, জেলি, গোটা, কাসুন্দি ইত্যাদির কোনটা হয়ত মুখেও পড়েছে।"

না, আর আলাপটাকে বেলাইনে যেতে দেওয়া হবে না। তাপসী মুখটা গম্ভীর রেখেই বলেছে, "আসলে এ-কাগজ হচ্ছে মেয়েদের ঘর-সংসার, গৃহস্থালির। আর বুঝতেই পারছেন, আমাদের সাংসারিক লিমিটেডের তৈরী জিনিসের কাটতি বাড়ানর জন্যে। তাই ভাবছি আপনার ভাল লাগবে কি না?"

কথাটা বলে ফেলে তাপসী হঠাৎ ভয় পেয়েছে। কল্যাণ যদি অনিচ্ছাই জানায় শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু কল্যাণ তা জানায়নি। হেসে বলেছে, "ভাল লাগবে জেনে ত আসিনি, এসেছি কাজ চাই বলে। আর রসের কবিতা লিখতে পারি না বলেই হয়ত রসনার কবিতা এ-হাতে খুলতেও পারে।"

ঠিক কাজের উমেদারের উপযুক্ত কথা নয়, কিন্তু কাজ কল্যাণ সেই দিন থেকেই পেয়েছে। ঘরে ঢোকবামাত্রই পেয়েছে বলা যায়।

শুধু 'সাংসারিক'এর সম্পাদনায় সাহায্য সে অবশ্য এখন করে না, কমার্সের ছাত্র হবার জোরে হিসাবপত্রও দেখে একটু-আধটু। অকর্মণ্য কাউকে অন্যায় প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে এমন কথা অন্তত কারও বলার সুযোগ নেই।

যিনি বলতে পারতেন, তাঁর মৌন মুখে শুধু একটু চোখের হাসিই কখনো-সখনো দেখা যায়। তা ছাড়া তাঁর বলার মুখ তিনি নিজেই বন্ধ করেছিলেন সেই গোড়াতেই।

কল্যাণকে কাজে নেওয়ার কদিন পরে নিজের নির্লিপ্ততা প্রমাণ করবার জন্যেই তাপসী বোধহয় ডাঃ ভৌমিককে একটু খোঁচা দিয়েছিল। "মেয়েদের হেঁসেল ভাঁড়ারের কাগজের জন্যে শেষে এক কবি ধরে পাঠালেন। তাও আবার ব্যর্থ কবি!"

ডাঃ ভৌমিক তাপসীর দিকে একটু বিস্মিতভাবে তাকিয়ে বলেছিলেন, "তাঁকেই ত কাজে নিয়েছ, না?"

"আপনি বাছাই করে পাঠিয়েছেন, না নিয়ে পারি? কিন্তু ভয় হয়, দ্বিতীয় রামপ্রসাদ না হয়ে দাঁড়ায়। 'সাংসারিক'এর পাতায় হঠাৎ একদিন আধুনিক কবিতা কিলবিল করছে না দেখতে হয়।"

"না, সে-ভয় নেই।" ডাঃ ভৌমিক হেসেছিলেন, "কবিদের কথা জানি না, কিন্তু ব্যর্থ কবিরা শেষে দারুণ হুঁশিয়ার সেয়ানা হয়। দুনিয়ায় নিজের চেষ্টায় পয়সা প্রতিপত্তির চুড়োয় যারা ওঠে, তাদের বুক চিরে দেখ, ব্যর্থ কবির শুকনো কলজে বেশির ভাগই পাবে।"

মুখে হাসি লেগে আছে, কিন্তু ডাঃ ভৌমিকের স্বাভাবিক গলা যেন নয়। তাপসী একটু অবাকই হয়েছিল।

অবাক কল্যাণের একটি ব্যাপারেও হয়েছিল। প্রথম দিন অফিসে এসে কল্যাণ কি তাকে চিনতেই পারেনি!

গোড়ার দিকের যা সম্বন্ধ ও পরিচয়, তাতে সে-কথা জিজ্ঞাসা করা চলে না।

জিজ্ঞাসা করেছিল অনেক পরে। ঘটনাটা বলায় কল্যাণের মনে পড়েছিল, কিন্তু প্রথম দিন সে সত্যিই চিনতে পারেনি, স্বীকার করেছে।

এই চিনতে না পারার কথা ভেবে অনেক দিন তাপসীর মন খারাপ গিয়েছে। তারপর মেনে নিয়েছে। হতাশার সঙ্গে নয়, কঠিন সঙ্কল্প নিয়ে। আগুন তার মনেই আগে জ্বলেছে এ-কথা ঠিক, কিন্তু কল্যাণের মনে তার ছোঁয়া সে লাগাবেই। সেখানেও আগুন আছে লুকিয়ে, সে জানে। শুধু ঠিক জায়গাটিতে স্পর্শের অপেক্ষা। পারবে, তাপসী তা পারবে। জীবনে হার ত সে কোথাও মানেনি। কত দুরারোহ সিঁড়ি বেয়ে কোন্ অতল থেকে অস্খলিত পদে উঠে এসেছে এত উর্ধ্বে। তার মনে তাই অটল আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা।

শ্রীরামপুরে একটি পরিবার গাড়িতে উঠলেন। বর্ষীয়সী একটি মহিলা, তাঁর অল্পবয়সী ছেলে বউ ও একটি কোলের বাচ্চা।

বর্ষীয়সী মহিলার ভারিক্কী জাঁদরেল চেহারা। বিধবা, গরদের থান পরা। ধবধবে গায়ের রঙ। কাঁচাপাকায় মেশান মাথায় চুলের রাশি। গলায় একটা সরু সোনার হার।

কাছাকাছি কোথাও যাচ্ছেন। ছোট বাচ্চার ফিডিং বটল ইত্যাদি খাওয়া-দাওয়ার সরঞ্জাম একটি বেতের ঝুড়িতে উঠেছে, আর একটি পানের বাটা বাক্স।

বোঝা গেল এটি নিত্যসঙ্গী। গাড়িতে উঠেই সেটি খুলে পান সাজতে সাজতে ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ ধরে তাপসীকে বেশ সোজাসুজিই লক্ষ্য করছেন। তাপসীকেই একটু অস্বস্তি বোধ করে মুখটা জানলার দিকে ফেরাতে হল। অস্বস্তির কারণ ভদ্রমহিলা কী লক্ষ্য করছেন, তা সে জানে। শুধু সাজ, পোশাক, চেহারা নয়, লক্ষ্য করছেন তার সিঁথি। আর সেই সঙ্গে তার বয়সটা অনুমান করবার চেষ্টা চলেছে, তাপসী জানে।

বৌ ত বটেই, ভদ্রমহিলার ছেলেও খুব শান্ত বাধ্য বলে বোঝা গেল। তাঁর রাশভারী শাসনেই কেমন সিঁটিয়ে বোধহয়। অবস্থাপন্ন ত নিশ্চয়ই, পোশাক-পরিচ্ছদও খুব সেকেলে নয়। কিন্তু বৌটি প্রায় কপাল-ঢাকা ঘোমটা দিয়ে অতি মৃদু গলায় ছাড়া কথা বলে না। তাও শাশুড়ীর প্রশ্নের উত্তরে একটা দুটো। ছেলেটির বয়স খুবই অল্প। বেশ সুবেশ সুশ্রী চেহারা, কিন্তু কেমন যেন বড়বেশী ভালমানুষ গোবেচারি গোছের। নির্জীব মনে হয় তাই বোধহয়।

বেশ সুখী পরিবার কিন্তু। মার হাতেই সংসারের রাশ নিশ্চয়ই। সমর্থ হাতে তিনি সব চালান। ছেলে-বৌয়ের কোন দায় নিতে হয় না। নিশ্চিত নির্বিঘ্ন অনুরাগ-মধুর জীবন। ভদ্রমহিলাকে মাঝে রেখে কয়েকবার গোপনে কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি বিনিময় ও ছোঁড়া-ছোঁড়া দু-একটা কথাতেই তা বোঝা যায়।

ছেলেমানুষ বৌটিকে লক্ষ্য করতে করতে তাপসীর কি ঈর্ষা হয় একটু? তারও এইরকম জীবনই ত হতে পারত। অন্তত যে-ধরনের সংসারে, যে-পরিবেশে তার জন্ম, সেখানে মেয়েদের পক্ষে এর চেয়ে কাম্য আর কিছু ছিল না।

কিন্তু ঈর্ষা দূরে থাক, হঠাৎ তাপসী যেন একটা পরিত্রাণের পরিতৃপ্তিই অনুভব করে। না, কোন আফসোস আর তার নেই। এই নির্বিঘ্ন নিশ্চিন্ত জীবনের মন্থর মসৃণ সুখ সে চায় না। জীবনকে অনেক তিক্তমধুর ফেনিলোচ্ছল রূপে সে জেনেছে কঠোর সংগ্রামের মধ্যে, যাত্রা শুরু করেই তীরের নিরাপদ

GOVERNMENT Cooch Behar

আশ্রয় যে সে পায়নি, তার জন্যে ভাগ্যের কাছে বরং সে কৃতজ্ঞ।

ঝড়-তুফান ত বটেই, ছোটখাট আঘাতগুলিও অবশ্য সইতেই হয়।

বর্ষীয়সী মহিলা অনেকক্ষণ ধরেই আলাপ করবার জন্যে উসখুস করছিলেন। এবারে সুযোগ করে নেন। কয়েকটা পান সাজা হবার পর একসঙ্গে কয়েকটা মুখে দিয়ে কৌটো থেকে জরদার দানা খুঁটতে খুঁটতে তাপসীর দিকে চেয়ে নিজে থেকেই শুরু করেন, "পান খাওয়ার অভ্যাস নেই বোধহয়?"

তাপসীর অপরাধ, সে ঠিক এই সময়টাতেই তাঁর পান খাওয়ার ধরনটা লক্ষ্য না করে পারেনি।

একটু হেসে তাকে বলতেই হয়, "না।"

জরদার দানাগুলি মুখে দিয়ে ভদ্রমহিলা ঠোঁটের একটা অদ্ভুত কায়দা করে বলেন, "তা মুখের চেহারা দেখেই বুঝেছি। আজকাল কী যে ধরনধারণ হয়েছে মেয়েদের! ঠোঁটে রঙ মাখবে, তবু পান খেতেই আপত্তি। আরে পানে ঠোঁট যেমন রাঙা হয়, তেমন কি হবে ওই মেলেচ্ছ লাল খড়িতে!"

তাপসী কিছু না বলে মুখে শুধু একটু সৌজন্যের হাসি মাখিয়ে রাখে। ভদ্রমহিলা যে 'আপনি' বলতে নারাজ, অথচ 'তুমি' বলতেও তাঁর বাধছে, কথার ধরনে তা স্পষ্ট। অচেনা বলেই একটু সমীহ করে 'ঢং'এর বদলে আজকালকার মেয়েদের ধরন-ধারণ বলে নিজেকে সামলেছেন। কিন্তু তাপসীর ঠোঁটের হাল্কা রঙটুকুকে যে রেয়াত করেননি তা বোঝা কঠিন নয়।

আলাপটা জেরার কাছ ঘেঁষে আসতে বেশী দেরি হয় না।

"কতদূর যাওয়া হচ্ছে?"

"ভদ্রেশ্বর।"

"সেইখানেই বাড়ি বুঝি?"

"না।" 'কাজে যাচ্ছি' বলতে গিয়ে তাপসী সামলে নিয়ে বলে, "এমনি একটু যাচ্ছি।"

'কাজে যাচ্ছি' বললে পাছে দীর্ঘ কৈফিয়তের ধাক্কায় পড়ে, তাই তাপসীর এই বাক্-সংবরণ। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু লাভ হয় না।

ভদ্রমহিলা একটু ইতস্তত করে বলেই ফেলেন, "সঙ্গে যে কাউকে দেখছি না। অন্য কামরায় আছে বুঝি!"

"না। একলাই যাচ্ছি।" তাপসী রূঢ় হবে, না হাসবে, ঠিক মনঃস্থির করতে পারে না।

"ও!" বলে ভদ্রমহিলা গলার স্বরেই তাঁর মনের ভাবটা বেশ কিছুটা বুঝিয়ে দেন।

কিছুক্ষণ আর কোন কথা হয় না। বৌটির দিকে তাপসীর ইতিমধ্যে চোখ পড়েছে। ঘোমটার তলায় এক দৃষ্টে এই সব কথাবার্তার মধ্যে বৌটি তাকে লক্ষ্য যে করেছে, তা তাপসী দেখেছে। কিন্তু সে-দৃষ্টির মধ্যে বিস্ময় কি বিরূপতা কিছুই নেই। নেহাত সাধারণ একটু কৌতূহল মাত্র। মেয়েটি নিজের জীবনের মাধুর্যটুকুর মধ্যেই এমনভাবে মগ্ন যে, বাইরের কিছু তেমন ভাবে সেখানে সাড়াও তোলে না। শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত! তাপসীর ওই কথাটাই মনে আসে। না, অবজ্ঞা মোটেই নেই তার ও-ধরনের জীবনে, কিন্তু কেমন যেন একটা সংশয় আসে।

কী যে ধরনধারণ হয়েছে মেয়েদের

যেখানে জয়ের উল্লাস নেই, নেই অনিশ্চয়তার ভয়, সে-সুখের গভীরতা কতদূর?

ভদ্রমহিলার কথায় চমক ভাঙে। তিনি বেশীক্ষণ আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারেন না। আবার জেরা শুরু করার একটা ভূমিকা করে নেন।

"ভদ্রেশ্বর পৌঁছতে ত আর দেরি নেই।"

তাপসী হাতঘড়িটায় একবার চোখ বুলিয়ে বলে, "না, আর মিনিট পনর লাগবে মনে হচ্ছে।"

"স্টেশনে কেউ নিতে আসবে না?"

কী যে তাপসীর হঠাৎ হয়ে যায় কে জানে।

"হ্যাঁ, উনি, মানে মিঃ মজুমদারই আসবেন বোধহয়!" মুখ দিয়ে কথাটা বেরুবার পর যেন নিজের দুষ্টবুদ্ধিটার হঠাৎ খামখেয়ালি সে টের পায়।

ভদ্রমহিলার দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। তাপসীকে একটু কষ্ট করেই মুখের ভাব স্বাভাবিক করে রাখতে হয়।

কিন্তু অদম্য কৌতূহল আর চেপে রাখা শক্ত ভদ্র-মহিলার পক্ষে।

"কিছু মনে কর না মা, সিঁথিটা সাদা দেখে ঠিক বুঝতে পারিনি এতক্ষণ।" কথার সুরটা একটু বাঁকা। সম্বোধনটাও আর অনির্দিষ্ট রাখা যায়নি বিস্ময়ের আতিশয্যে।

তাপসী একটু হাসে। একবার যখন কল্পনাকে ছেড়েই দিয়েছে, তখন আর রাশ টানা কেন। বলে, "সিঁদুর আমরা ত দিই না। দিতে নেই।"

ভদ্রমহিলার মুখখানা দেখবার মত। গালের পান বেকায়দায় প্রায় বিষম লাগিয়ে দেয়।

"কেন?" কাশি থামিয়ে তিনি বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করেন।

"আমরা,—আমরা ক্রীশ্চান!"

"ও!" এবার সুরটা একেবারে আলাদা। ভদ্রমহিলার কৌতূহল ভালভাবেই মেটা উচিত এতক্ষণে। তবু নিজের মনগড়া ধারণাগুলো হঠাৎ এমন পাল্টে যাওয়ায় ঠিক এখনও ধাতস্থ হতে পারছেন না।

ট্রেন ভদ্রেশ্বরে এসে পড়েছে ইতিমধ্যে। একটু সৌজন্যের নমস্কার জানিয়ে তাপসী নেমে যায়।

স্টেশনে রবিমামাই এসেছেন।

ভদ্রমহিলার অবস্থাটা তাপসী বেশ বুঝতে পারে। কৌতুকের সঙ্গে করুণাও তার হয় একটু। তাপসী নেমে যেতেই তিনি এ-ধারের বেঞ্চিতে এসে নিশ্চয়ই জানালা দিয়ে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। রবিমামার মধ্যে তাপসীর 'উনি' অর্থাৎ 'মিঃ মজুমদার'কে খোঁজবার চেষ্টা তিনি নিশ্চয় করছেন না। কিন্তু প্রায় জটাজুটমণ্ডিত একমুখ-শুভ্র-শ্মশ্রুশোভিত, গেরুয়া-পরা রবিমামাকে প্রণাম করতে দেখে তার ধর্মমতের উদারতা সম্বন্ধে কী ধারণা করছেন সেইটাই জানতে ইচ্ছে করে।

'সাংসারিক'এর শাখা ছোট শহরের বাইরে।

বেশ বিস্তীর্ণ জায়গা নিয়ে পুকুর, বাগান, টালিতে-ছাওয়া বাড়ি, মন্দির সমেত সাজান-গোছান আশ্রমের মত।

ব্যবসার চেহারাটা নেই। এবং তার জন্যে দায়ী রবিমামা। তিনিই মনের মত করে সমস্ত জায়গাটা সাজিয়েছেন।

ছোট একটা জায়গা নিয়ে শাখা-কেন্দ্রের সাধারণ একটা আস্তানা হলেই চলত। সেই রকম কথাই ছিল।

কিন্তু রবিমামা জেদ ধরেছেন একটু বেশী করে জায়গা শহরের বাইরে নেবার জন্যে। তিনি 'সাংসারিক'এর শাখার তদারক করবেন, সেই সঙ্গে তাঁর শেষ বয়সের সাধও মেটাবেন, আশ্রমের মত একটি নিভৃত শান্ত বিশ্রামের জায়গা গড়ে তুলে।

এ-রকম একটা পরিকল্পনা ব্যবসাদারী হিসাবের বাইরে। তাপসীর হিসেবী মন সায় দেয়নি। কিন্তু তবু সে সংকল্প ঠিক করে ফেলেছে। প্রস্তুত হয়েছে দরকার হলে ডাঃ ভৌমিকের সঙ্গে এ-ব্যাপার নিয়ে যুঝতে।

প্রস্তুত হয়েছে শুধু রবিমামার জন্যে, যে-রবিমামা তাঁর চিরকেলে ধরনে বহুকাল নিরুদ্দেশ থাকার পর হঠাৎ নতুন চেহারা নিয়ে কিছুদিন আগে আবির্ভূত হয়েছেন তার জগতে। মাঝে মাঝে যে-রবিমামার আকস্মিক অন্তর্ধান, দীর্ঘ অজ্ঞাতবাস ও অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব জ্ঞান হওয়া থেকে তাদের পরিবারের জীবনের একটি বিশেষ নাটকীয় উপাদান হয়ে আছে, দেখে আসছে।

এবার রবিমামার আবির্ভাব তার পক্ষেও কল্পনাতীত চেহারায়।

অফিস সেরে বাড়িতে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে যেতে যেতে অবাক হয়ে দেখেছে, বাইরের ঘরে কে একজন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী গোছের মানুষ বেশ আরাম করে আরাম-কেদারায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে।

বাইরের ঘরটা সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় সম্পূর্ণভাবে দেখা যায় না। আরাম-কেদারায় শায়িত লোকটির মুখটা তাই দেখতে পায়নি। দেখলেও চিনতে পারত কিনা সন্দেহ।

বেশ একটু বিরক্ত হয়েই সে উপরে গিয়েছে। নিশ্চয়ই কোন রকমের কোন প্রার্থী। হয় কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠান, নয় কোন ধর্মসম্প্রদায়ের জন্যে চাঁদা চাইতে এসেছেন।

তাপসীর একেবারে স্পষ্ট নিষেধ আছে এ-ধরনের লোককে প্রশ্রয় দেবার। নেহাত চেনা-জানা লোকের দরকারী কাজে আগে থাকতে জানিয়ে ছাড়া বাড়িতে আসা সে পছন্দ করে না।

বাড়িতে বড়দা নেই সে জানে। উপরে উঠে চাকরকে তাই ধমক দিয়েছে প্রথমেই, "কাকে বাইরের ঘর খুলে বসিয়েছিস? কী বলা আছে আমার?"

চাকর কিছু বলবার আগেই অমিতা নমিতা হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এসেছে।

"ওর কোন দোষ নেই দিদি!"

"ওর দোষ নেই! তাহলে তোমরা দুই উমনো ঝুমনো মিলে এই কাণ্ড করেছ! কেন? পরীক্ষা পাসের কোন মাদুলি, কি তাড়াতাড়ি বিয়ে হবার কোন মন্তর-টন্তর দেবার লোভ দেখিয়েছে বুঝি!"

"ধ্যেৎ!" বলে অভিযোগটা খণ্ডন করে দুই বোন উত্তেজিত-ভাবে এ ওকে থামিয়ে তারপর যা বলেছে তার মর্ম এই যে, বাইরের ঘরের দরজা খুলে বসতে না দিলে পাড়ার লোকজন কি পুলিশ ডাকতে হত, লোকটা নাকি এমন নাছোড়বান্দা। চাকরের কথা সে নাকি গ্রাহ্যই করেনি। তাপসী বাড়ি নেই এবং তার সঙ্গে এখানে দেখা হয় না শুনে সে নাকি সোজা উপরেই উঠে আসতে চেয়েছে। সেই জন্যেই বাধ্য হয়ে দরজা খুলে দিতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

হাতের অ্যাটাচিটা রেখে জামা কাপড় না ছেড়েই তাপসী নীচে নেমে গিয়েছে। সন্ন্যাসী বা যে-ই হন, বেশ একটু কড়া করে শুনিয়ে দিতে হবে।

বাইরের ঘরে অত্যন্ত কঠিন মুখ নিয়ে ঢোকার পরও লোকটির বিশেষ কোন বিচলিত হবার লক্ষণ দেখা যায়নি।

শুধু হাত-পা-ছড়ান অবস্থা থেকে, আরাম-কেদারার হাতল থেকে পা দুটো নামিয়ে একটু সোজা হয়ে বসে বেশ স্বাভাবিক সঙ্কোচহীন দৃষ্টিতেই তাপসীর দিকে তাকিয়েছে।

তাপসীর রাগ হয়েছে অত্যন্ত বেশী, কিন্তু সেটা দমন করে মুখের চেহারায় আর গলায় সমান কাঠিন্য বজায় রেখে জিজ্ঞাসা করেছে, "কী আপনি চান? বাড়িতে কারুর সঙ্গে আমি দেখা করি না তা আপনাকে বলা হয়নি?"

"তা হয়েছে।" লোকটি সমান নির্বিকার!

"তবু জোর করে আপনি হাংগামা বাধাবার চেষ্টা করেছেন কেন? গেরুয়া পরে লম্বা চুল-দাড়ি-গোঁফ রাখলেই কি দুনিয়ায় সাতখুন মাপ হয়ে যায় মনে করেন!"

"না।" বলে মাথা নেড়ে লোকটি তাপসীকে যেন আরও ভাল করে লক্ষ্য করেছে খানিক! তার পর আবার বলেছে, "তুমিই তাহলে আমাদের তাপসী রায়! মানে উপুসী!" সঙ্গে

সঙ্গে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে মুখে ও ঈষৎ রক্তাভ চোখে অদ্ভুত একটি কৌতুকের হাসি ফুটে উঠেছে।

এক মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে থেকে তাপসী প্রায় চিৎকার করে দাঁড়িয়ে উঠেছে আনন্দে, "রবিমামা!" ওই একটা কথা আর কৌতুকের এই হাসিটিই তাকে চিনিয়ে দিয়েছে।

তারপর ছুটে গিয়ে রবিমামাকে জড়িয়ে ধরেছে বিস্ময়ে আনন্দে অধীর হয়ে, তার গাম্ভীর্য মর্যাদা বয়স সব ভুলে সেই ছেলেবেলায় যেন পৌঁছে গিয়েছে।

রবিমামাও তখন দাঁড়িয়ে উঠে তাকে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরেছেন। দুজনের কারুর চোখই বুঝি শুষ্ক নেই।

রবিমামা সেই থেকে আছেন।

তাঁকে যে চিনতে পারেনি প্রথমে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

প্রায় দশ বছর বাদে তিনি দেখা দিলেন বলেই নয়, তাঁর এ-চেহারা কল্পনাই করা যায় না।

জ্ঞান হওয়া থেকে রবিমামাকে দেখে আসছে। চিরকালই তাঁর খেয়ালের হদিস পাওয়া ভার; কখনও দু মাস, কখনও দু বছর তিনি কোথায় যে ডুব মেরেছেন, কেউ জানতে পারেনি। কিন্তু এত দীর্ঘকাল যেমন তিনি আগে কখনও অন্তর্ধান হননি, তেমনি এমন অবিশ্বাস্য পরিবর্তনও দেখা যায়নি তাঁর।

নমিতা অমিতা কী করে তাঁকে চিনবে! রবিমামাকে শেষ যখন তারা দেখেছে, নেহাত তখন তারা ছোট। তা ছাড়া সে

ছুটে গিয়ে রবিমামাকে জড়িয়ে ধরেছে

আরেকটা মানুষ, আর এক চেহারা। তাপসীরই যেন বিশ্বাস হতে চায় না সহজে।

তার ছেলেবেলার জগতে রূপকথার রাজ্যের পরী আর দেবদূত মিলে একটি আশ্চর্য মানুষকে সে জানত। তার কাছে সব কিছু চাওয়া যায়, সব কিছু না চাইতে পাওয়া যায়।

তখন তাদের পরিবারের চরম দুঃখের দিন চলেছে। জ্ঞান হবার পর অত অল্প বয়সে তা বোঝবার কথা নয়। বোঝবার ক্ষমতা থাকলেও তার অন্তত বোঝবার দরকার হত না।

সন্ধ্যার একটু পরে লাইনের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালটাকে সবুজ আলো ফুটিয়ে নামতে দেখলেই যেন সব স্বপ্ন-মেটান আলাদীনের প্রদীপ তার হাতে এসেছে মনে হত।

ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের সবুজ আলো সব দিন হয়ত আশা মেটাত না। মাটি, কাঁপিয়ে, সারবাঁধা ঝকঝকে আলোর চমক লাগিয়ে ট্রেনটা তীক্ষ্ণ একটা ডাক দিয়ে স্টেশনের দিকে চলে যেত।

ব্যস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে মার কাছে একটু মৃদু বকুনি খাওয়াই সার হত শুধু।

দরজায় সাইকেল-রিকশ দাঁড়িয়ে নেই। বাড়ির মধ্যে হাসির হুল্লোড় উঠছে না। ট্রেনে কেউ আসেনি।

হয়ত শুকনো মুখে ঘরে ঢুকতেই মার সামনে পড়া। "কোথায় ছিলি এতক্ষণ পর্যন্ত! অর্ধেক রাতে পাড়া বেড়িয়ে আসা হল!" মার বকুনিতে কোন দিনই ধার নেই। চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। ঠাকুমা শুধু হেসে ফোড়ন কেটে বলেছেন, "পাড়া বেড়াতে গেছল না ছাই। ও সেই লাইনের ধারে গেছল বুঝতে পারছ না! কার আসবার কথা ছিল ও মুখপুড়ী মেয়ে সব জানে।" তাপসী আর সেখানে দাঁড়ায়নি। ঠাকুমা কী করে সব জানতে পারেন, অবাক হয়ে শুধু তাই ভেবেছে।

কিন্তু এ-আশাভঙ্গ সুদসুদ্ধ উসুল হয়ে যেত সেদিন, যেদিন পাকা রাস্তায় ঘুরে আসার তর সয় না বলে, অন্ধকারেও সোজা মাঠের ভিতর দিয়ে কোথাও কাঁটাতারের তলা দিয়ে গলে, কোথাও খানা খন্দ পার হয়ে রেলের লাইন থেকে অতখানি পথ ছুটতে ছুটতে এসে দেখা যেত, হয় সাইকেল-রিকশ তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে বা সবে সওয়ারি নামিয়ে ঘণ্টি দিতে দিতে মোড়ের বাঁক ঘুরে চলে যাচ্ছে।

পড়ি কি মরি করে বাইরের খোলা বারান্দার সিঁড়িগুলো ডিঙিয়ে ভিতরে ছুটে ঢুকতেই দুটো প্রসারিত ব্যগ্র বাহু তাকে জড়িয়ে বুকে তুলে নিত। সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসের চিৎকার, "আমি ফার্স্ট আমি ফার্স্ট!"

দামী সেণ্ট, চুরুটের আর হেয়ার লোশনের সেই একটা অদ্ভুত মেশান গন্ধ আজও যেন সে ভোলেনি। সেটা উপভোগ করতে করতে একটু ঠোঁট উলটে সে অভিমানের ভান করে বলত, "আমি ত হেঁটে হেঁটে এসেছি।"

"তাই ত বটে! তাই একটু জোরে জোরে হাঁফাচ্ছ শুধু!"

সবাই হেসে উঠত। এটা তাদের দুজনের মধ্যে একটা পুরনো বাজি জেতার খেলা। তাপসী লাইনের ধার থেকে ট্রেন পাস [illegible] দেখে আগে বাড়ি এসে পৌঁছবে, এই নিয়ে তাদের বাজি। তাপসী কোন দিনই সে-বাজি জিততে পারেনি।

"নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও ওটাকে।" বাবা এবার বলতেন, "ওই নোংরা হাত-পায়ে দিলে তোমার দামী সুটের দফা-রফা করে!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ নামিয়ে দিন আহ্লাদী মেয়েকে!" বড়দা তার চেয়ে প্রায় ছ বছরের বড়, তবু তাপসীর বেশী আদর বলে তার উপর হিংসা ছিল বেশ।

রবিমামা বুক থেকে নামাতেন না। হেসে বলতেন, "দাঁড়াও, আমার 'উপসী' মেয়ে একটু দম পাক।"

'উপসী'টাও একটা পুরনো ঠাট্টা।

কবে আরও ছেলেবেলায় রবিমামা নাকি তার জন্যে অত্যন্ত দামী জমকালো একটা ফ্রক কিনে এনেছিলেন। বাবা তাতে মৃদু আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, "ওই একরত্তি মেয়ের জন্যে অত দামের জামাগুলো কেনার কী দরকার ছিল! পোশাকী জামা একটা হলেই ত যথেষ্ট। বাকীগুলো দুদিনে নষ্ট করবে বই ত নয়।"

"না হে, না!" রবিমামা নাকি বলেছিলেন, "তোমার এ-মেয়ের কি যা তা জিনিস হলে চলে! ওর সব একেবারে সেরা হওয়া চাই। ও এককালে কী রূপসী হয় দেখ।"

তাপসীর 'রূপসী' কথাটা বোধহয় মজার লেগেছিল। কিছু না বুঝে সে বলেছিল নাকি, "আমি ত উপসী!"

সেই ঠাট্টা বড় হয়েও অনেকদিন তাকে শুনতে হয়েছে। শুধু রবিমামার মুখ থেকেই অবশ্য।

সে-রবিমামার এমন রূপান্তর হওয়া সম্ভব, কেউ তখন ভাবতেও পারত!

রবিমামা তখন পুরোদস্তুর শৌখিন সাহেব। যেমন চেহারা, তেমনি পোশাকে কোথাও একটু খুঁত ধরবার জো নেই।

খুব ছোটবেলায় না বুঝলেও একটু বড় হয়ে সে জেনেছে, শহরের একেবারে সেরা দর্জির কাটা অত্যন্ত দামী পোশাক ছাড়া রবিমামার গায়ে কিছু ওঠে না। মাঝারী কোন কিছুতেই তিনি সন্তুষ্ট নন। প্রাচুর্যের সঙ্গে রুচি মিশে তাঁর সব কিছুতে একটা বিরল আভিজাত্যের ছাপ।

সেই রবিমামা তাঁর দামী সুটকেশ নিয়ে তবু সুদূরে সাঁওতাল পরগনার এক নগণ্য শহরে তাদের দরিদ্র সংসারে যখন তখন, কখনও খবর দিয়ে এবং বেশির ভাগই বিনা খবরে এসে হাজির হতেন।

বাবার তখন কাজকর্ম গিয়েছে। কলকাতার নানা সরিকের বাড়ির অংশ বিক্রি করে সামান্য যা পেয়েছেন তাই নিয়ে কম খরচে চালাবার আশায় সাঁওতাল পরগনার ছোট একটা শহরে অতি অল্প ভাড়ায় একটা বাড়ি নিয়ে আছেন।

রোজগারের অজুহাতে বাজারে একটা দোকানও দিয়েছেন মনিহারীর। কিন্তু সেটা অর্ধেক দিন বন্ধই থাকে। দোকান চালাবার মত বুদ্ধি কি ধৈর্য বাবার নেই। তাঁর স্বভাবে মজ্জাগত আলস্যের সঙ্গে আকাশ-কুসুম রচনা করার ক্ষমতার অদ্ভুত সংমিশ্রণ। তা ছাড়া সারাক্ষণ মার জন্যে দুর্ভাবনায় তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত থাকলে অন্য কিছু করবেন কখন!

মা রুগ্ণ। চিরকালই রুগ্ণ, দুর্বল। ছেলেবেলায় প্রথম

স্মাতিই মার নিত্য অসুস্থতার, আর বাবার তাই নিয়ে ব্যতিবস্ত হয়ে থাকার। বড় হয়ে সে জেনেছে, বাবাকে স্ত্রৈণ বলে লোকের নিন্দা করার কথা। বাবার অবশ্য তাতে দ্রূক্ষেপও ছিল না।

বলতে গেলে মার জন্যেই বাবার চাকরি গিয়েছিল বলে সে শুনেছে। নমু মানে নমিতা হবার পর মা বুঝি অনেকদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। বাবারও কাজকর্ম অফিস সব মাথায় উঠেছে তখন। মার্চেন্ট অফিসের কাজ। কামাইএর পর কামাই তারা সহ্য করবে কেন? একদিন ছাঁড়িয়ে দিয়েছে।

হয়ত ঠাকুমা কিছু বলেছিলেন, হয়ত বলেননি। ঠাকুমা অদ্ভুত মানুষ। কঠিন, আত্মনির্ভর, দুর্বোধ। ওই ইস্পাত থেকে বাবার মত কাদামাটি কী করে তৈরী হল বোঝা যায় না। বাবা বলিষ্ঠ বিশাল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। কিন্তু শুধু শরীরে। মন একেবারে নরম কাদার। দিবা-স্বপ্ন নিয়ে জীবন।

ঠাকুমার ধারা পরিবারে কেউ বুঝি পায়নি। খানিকটা কি পেয়েছে সে নিজে?

মা ত বেশির ভাগই কাটিয়েছেন বিছানায়। সেই ছেলে-বেলাতেই নমুকে মানুষ করেছে ঠাকুমা আর সে। তাকে ওই বয়সেই কী না করতে হয়েছে নমুর জন্যে। নমু তাই তার সব চেয়ে আদরের। তার গলার হাড় বলে সবাই ঠাট্টা করে এখনও।

চাকরি খুইয়ে, বাড়ির অংশ বেচে বাবা যে সাঁওতাল পরগনার ছোট শহরে গিয়ে উঠেছিলেন, সে শুধু সস্তার লোভেই পুরোপুরি নয় নিশ্চয়, মার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এইটিই ছিল বোধহয় প্রচ্ছন্ন আশা। কিন্তু স্বাস্থ্যকর সুলভ জায়গা হলেই ত হয় না, কিছু সাচ্ছল্যও ত চাই সংসারে। তারই একান্ত অভাব।

সে নিজে অবশ্য টের পায়নি বিশেষ কিছু। তবে তাদের নিত্য অভাবের সংসারে মাঝে মাঝে উৎসবের হাওয়া যে রবি-মামার জন্যেই বইত, এটুকু তার মনে আছে।

রবিমামা এলে ক দিনের জন্যে সব কিছু যেন বদলে যেত। খাওয়া দাওয়া বেড়ান হাসি গল্প হুল্লোড়। সারাক্ষণ সেই বালিকাজের-অভাবে-ইঁট-বার-করা বাড়ি সরগরম হয়ে থাকত। সকলের জন্যেই কিছু-না-কিছু জিনিস রবিমামা আনতেন, সব চেয়ে ভাল জিনিস তার জন্যে। তারই আদর সব চেয়ে বেশী।

ওই ফিটফাট সাহেব মানুষ এত দূরে এই দারিদ্র্যের সংসারে ছুটে এসে কী সুখ যে পেতেন কে জানে।

নগণ্য শহরেরও একেবারে দরিদ্র পাড়ার এক প্রান্তে, তৈরি-করতে-গিয়ে-ফেলে-রাখা অসম্পূর্ণ একটা বাড়ি। একদিকে বালিকাজ হয়েছে, তিনদিকে হয়নি। উঠোন ঘেরা দেয়াল খানিকটা তোলা হয়েছে, খানিকটা মেহেদির বেড়া আর শালের খুঁটি দিয়েই কাজ চালান। যিনি তৈরি করছিলেন, তাঁর পয়সায় কুলোয়নি, ভাড়াও তাই সস্তা।

ছোট বড় মিলে তিনটি মাত্র ঘর।

বাবা মা কোলের নমুকে নিয়ে বড় ঘরটায় থাকেন, মাঝারিটা তার আর ঠাকুমার জন্যে। নমুকে অবশ্য বেশির ভাগ দিনই সেখানে রাখতে হয়। ছোটটা বড়দার জন্যে একা। বড়দা তখন [illegible] করে [illegible] পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছে।

এ-বাড়িতে রবিমামার দামী স্যুট টাঙিয়ে রাখবার জায়গাই পাওয়া দায়। তিনি এলে বড়দা আসেন ঠাকুমার ঘরে। বড়দার ছোট ঘরটাতেই রবিমামার জায়গা হয়।

কিন্তু কোন অসুবিধেই রবিমামার যেন গায়ে লাগে না। কোথায় যায় তাঁর শৌখিনতা আর সাহেবিয়ানা।

স্যুট ছেড়ে কাপড়ের অভাবে মার একটা ছেঁড়া শাড়িই ফেরতা দিয়ে পরে, বাবার একটা ঢলঢলে শার্ট গায়ে দিয়ে, বড়দার চপ্পল পায়ে গলিয়ে সটান বাজারে চলে যেতেও তাঁর লজ্জা করে না।

সঙ্গে অবশ্য তাপসী সব সময়ে। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরা পর্যন্ত, যখনই যতবার রবিমামা এসেছেন।

মা কখনও হয়ত অনুযোগ করেছেন, "ওই বুড়ো মেয়েকে আবার সঙ্গে নেওয়া কেন, ছেলেবেলা যা গেছে গেছে। কিন্তু এখন ট্যাঙ্গস ট্যাঙ্গস করে ওর যেখানে সেখানে যাওয়া ভাল দেখায়?"

"খুব ভাল দেখায়! তোমার 'উপুসী' মেয়ের দিকে লোকে কী রকম ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, যদি দেখতে ত বুঝতে।"

তাপসীই লজ্জা পেয়েছে। লজ্জা পাবার মত বয়স তার হয়েছে তখন।

মা বেশ রাগই করেছেন। "আপনার কাণ্ডজ্ঞান যদি কোন কালে হয়! দুম করে যেখানে যা খুশি বললেই হল! মেয়েটা কি এখনও কচি খুকী আছে?"

"নেই বলেই ত তৈরী করে দিচ্ছি। দুনিয়ায় তোমাদের মত আহাম্মকের মার যাতে না খায়।" বলে রবিমামা হেসেছেন।

পিছু লাগা, খুনসুটি করা রবিমামার চিরকালের স্বভাব। কেউ রেহাই পায় না। ঠাকুমারও নিষ্কৃতি নেই।

ঠাকুমা তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক পুজোয় বসেছেন হয়ত।

রবিমামা সেখানে গিয়ে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে হাতজোড় করে বসে রইলেন।

ঠাকুমা পুজোর সময় কথা বলেন না। রবিমামারও অসীম ধৈর্য।

ঠাকুমার পুজো শেষ হতেই গম্ভীরভাবে বললেন, "ঠাকুরকে আমার কথাটা বলতে ভোলেননি ত মাসিমা!"

ঠাকুমা মুখ টিপে একটু হেসে বললেন, "তোমার আবার কী কথা?"

"বাঃ, মনের মত একটা বৌ আমার জন্যে চাইতে বলেছিলাম না! এমন লক্ষ্মীছাড়ার মত ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াব নাকি চিরকাল?"

"তা ছাড়া আর করবে কী। ঠাকুরের বয়ে গেছে তোমার মত ওড়নচড়ে বাউণ্ডুলের জন্যে বৌ জোগাড় করে দিতে!"

"আর ওড়নচড়ে বাউণ্ডুলে নই মাসিমা। ঠাকুরের যদি বিশ্বাস না হয় ত ব্যাঙ্কের পাশবইটা দেখিয়ে দিচ্ছি খুলে। দস্তুর মত শাঁসালো এখন।"

"তোমার ও-শাঁসের ওপর ভরসা কী! আজ আছে, কাল ফোঁপরা।"

"বেশ! ঠাকুর যদি অত বেয়াড়া হয়, তাহলে দেক-ক'দিন

লক্ষ্মীঠাকরুনকে পাশ থেকে চুরি করে একেবারে বিলেতে পাঠিয়ে। ঠাকুর মরবেন তখন বুক চাপড়ে।"

মা বুঝি কাছেই ছিলেন। বেশ একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "ঠাকুর-দেবতা নিয়ে এসব কী ঠাট্টা! সব কিছুর সীমা আছে!"

ঠাকুমাই বরং হেসে বললেন "ঠাকুরের কিন্তু সীমা নেই বৌমা। তিনি কি এমন ছেলেমানুষ যে, ওই ঠাট্টায় রাগ করবেন!"

শুধু মা-ঠাকুমার পিছনে নয়, বাবার পিছনে পর্যন্ত রবিমামা লাগতে কসুর করেননি।

বাবার মনিহারী দোকান উঠি-উঠি করছে তখন। মা আবার অসুখে পড়েছেন। বাবার দোকানে যাবার গা-ই নেই। সারাদিন প্রায় মার কাছটিতেই থাকেন, আর নিজের মনকে প্রবোধ দেবার জন্যে যত সব আজগুবি ব্যবসার কল্পনা করেন। সেগুলো মার কাছে বসে আবার শোনানও চাই।

মা হয়ত বলেছেন সকালবেলা, "আজ দোকানে যাচ্ছ ত?"

"দোকানে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ ত যেতেই হবে।" বলে বাবা তখনকার মত কথাটাকে চাপা দিয়েছেন।

দুপুর খাওয়া-দাওয়ার পর আবার গিয়ে বসেছেন মার কাছে। তাপসী তখন মার পায়ে সেঁক দিচ্ছে মালসার আগুনে। মার অদ্ভুত রোগ। বেশ থাকেন, হঠাৎ কিছুদিন বুকের ধড়ফড়ানি অত্যন্ত বাড়ে, মাথা তুলে বসতে পারেন না, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। চিকিৎসা অনেক রকম হয়েছে আগে। ইদানীং মা আর ডাক্তার দেখাতে রাজী হন না। তবে অন্য সেবা-শুশ্রূষা চলে বাবার জেদের জন্যে।

মার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বাবা জিজ্ঞাসা করেছেন, "কালকের চেয়ে আজ ভাল মনে হচ্ছে, না?"

"হ্যাঁ, অনেক ভাল।" বলে বাবাকে আশ্বাস দিয়ে মা খানিক বাদে ক্ষুণ্ণ স্বরে বলেছেন, "আজও দোকানে তাহলে গেলে না?"

"না। ইচ্ছে করছে না যেতে! আর গিয়ে হবেই বা কী!" বাবা নিজের কৈফিয়ত বানাতে বানাতে নিজেই উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন, "দোকান এবার তুলেই দেব ঠিক করেছি। এই অখদ্দে শহরে কি ওই সব মনিহারী দোকান চলে। এখানে টিনের আয়না আর কাঠের কাঁকইএর বাইরে খদ্দেরের হাত এগয় না। কেরোসিনের কুপি থাকতে লণ্ঠন কেনবার লোক নেই। এখানে মনিহারী দোকান করাই ঝকমারি হয়েছে।"

ধৈর্য ধরে সকলের না শুনেও উপায় নেই। রবিমামা আগের দিন সন্ধের গাড়িতে এসেছেন। তিনিও এসে তক্তপোষটার একপাশে বসে বাবার দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে নিজে একটা ধরিয়েছেন। রবিমামাকে শ্রোতা পেয়ে বাবার কল্পনা আরও খুলে গিয়েছে।

"বুঝেছ রবি! আমি কাঠের ব্যবসাই করব ঠিক করলাম। যেখানে যেমন দরকার। বাজারের শিউপ্রসাদকে দেখেছ ত, হাটের দিন চট পেতে ভেলি গুড় বেচত। এই ক বছরে কাঠের ব্যবসায় একেবারে লাল হয়ে গেছে। ভেলোয়াড়ার জঙ্গলের কাঠ, দেখে-শুনে নিলেমের সময়ে ঠিকমত কিনতে পারলেই হল। একেবারে ফেলো কড়ি তিনগুণ লাভ!"

মা মৃদুস্বরে বলেছেন, "কিন্তু কাঠের ব্যবসা ত আর বাড়িতে বসে হবে না। জঙ্গলে ত যেতে হবে!"

"তা ত হবেই!" এত সহজ কথাটা মা না বোঝায় বাবা যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, "জঙ্গলে না গেলে গাছ ত আমার বাড়ির উঠোনে হবে না।"

"তুমি যাবে জঙ্গলে! আমি না মরলে তুমি বাড়ি থেকে এক-পা নড়বে না আমি জানি। এর চেয়ে তাই আমার মরাই ভাল।"

বাবা কাতর হয়ে উঠেছেন, "কী যে যা তা বল তার ঠিক নেই। এরকম কথা যদি বল, তাহলে আমি আর এ-ঘরেই আসব না।"

বাবা ঘর থেকে কিন্তু নড়েননি।

রবিমামা গম্ভীরভাবে বলেছেন, "ঘরে বসেই কাঠের কারবার কিন্তু করা যায় হরিহর।"

"কী রকম?" বাবা কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন।

"কটা সিকোইয়ার চারা শুধু লাগিয়ে দাও বাড়ির ধারে-কাছে! সিকোইয়া কী রকম গাছ জান ত? গাছের গুঁড়িটাই কুড়ি হাত আর লম্বা দু শ হাতের ওপর। দেখাশোনার দরকার নেই, আপনি বাড়বে। আর একটা গাছেই অর্ধেক রাজত্ব।"

বাবা নিজেই খুঁত ধরেছেন, "হুঁ, তোমার যেমন কথা! চারা লাগালে গাছ বাড়বে কতদিনে সে-হিসেব রাখ।"

"তা রাখি বই কি! নিদেন পক্ষে হাজার বছর! হাজার বছর ধরে ত নিশ্চিন্দি!"

বাবাই সবার আগে হেসেছেন। রবিমামার উপর রাগ করা শক্ত। তা ছাড়া তাঁর উপর বাবার সত্যিকারের একটা টান ছিল।

"কর, ঠাট্টা কর!" বাবা হেসেই চলেছেন, "চললেই চাল্লশ বুদ্ধি, না চললেই হতবুদ্ধি! বরাতজোর করে খাচ্ছ। আমাদের ব্যবসা-বুদ্ধিকে ত হেসে উড়িয়ে দেবেই। আমার মত ঝক্কি ঘাড়ে করে মাথা তুলে দাঁড়াতে হত ত বুঝতে। তোমার কী বল না। একেবারে ঝাড়া হাত-পা। যখন যেখানে খুশি ঝাঁপিয়ে পড়তে তাই আটকায় না। পিছুটান ত নেই কোথাও।"

হয়ত তাপসীর মনের ভুল, কিন্তু রবিমামার সদাপ্রসন্ন মুখের হাসিটা কেমন যেন একটু ম্লান হয়ে গিয়েছে মনে হয়েছে।

না, রবিমামার পিছুটান কোথাও যে নেই, একটু বড় হয়েই তা জেনেছে। জেনেছে, রবিমামা তাদের আপনার কেউ নয়, এমন কি, জাতের ও দেশেরও তফাত।

তারা মেদিনীপুর অঞ্চলের লোক, আর রবিমামার আদি বাড়ি ছিল ত্রিপুরায় না কোথায়, তিনি নিজেই ভাল করে জানেন না।

মার বাবা কাজ করতেন এলাহাবাদে। সেইখানে ছোটবেলা মাকে চিনতেন। সেই চেনার গুণেই বুঝি তাদের বাড়ির সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। সে-সূত্র কিন্তু কোথায় কবে সহজ গভীর ঘনিষ্ঠতার মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছে, কেউ টেরও পায়নি। তাপসীও তাই ছেলেবেলা কিছু জানত না।

বড় হয়ে জেনেছে। কিন্তু সে-জানাটা যেন অবান্তর একটা

তথ্য মাত্র। রবিমামার চেয়ে আপনার তাদের কেউ নেই—এই বদ্ধমূল বিশ্বাস তাতে একটু দোলেও না পর্যন্ত।

রবিমামা সম্বন্ধে সব কিছু অবশ্য জানতে পারেনি। জানা সম্ভব নয়। তাঁর দু-একটা দিক রহস্যে ঢাকা। সে-রহস্য উন্মোচনের কৌতূহলও তখন ছিল না।

রবিমামার কোন কুলে কেউ নেই, এইটুকু জানা।

কী করেন তিনি, কোথায় থাকেন, মাঝে মাঝে যখন নিরুদ্দেশ হন?

সঠিক কিছু শোনেনি। কী একটা বড় ওষুধের না কিসের কোম্পানির হয়ে নাকি তাঁকে দেশ-দেশান্তরে ঘুরতে হয়, এই শুনেছিল প্রথম। নিজেই শেষে একটা কোম্পানি গড়ে তুলে সেটা দাঁড় করাবার চেষ্টায় ঘুরছেন, এই রকম খবর শুনেছিল পরে।

ফ্রক ছেড়ে তখন শাড়ি ধরেছে। তাই যতটুকু শুনেছে, তার চেয়ে বুঝেছে অনেক বেশী। বুঝেছে যে, তাদের সংসারের চাকা অচল হতে গিয়েও কেন আবার গড়িয়ে চলে। বুঝেছে, অনিয়মিত হলেও কোথা থেকে তাদের কয় ভাইবোনের পড়া-শুনোর খরচ আসে। খুব বেশীদিন রবিমামা না এলে কেন বাড়িতে পাওনাদারদের আনাগোনা বাড়তে থাকে।

নিজের অনিচ্ছায় দৈবাৎ কানেও গিয়েছে কিছু।

বাবা নিয়ম ভঙ্গ করে সত্যিই বড়দাকে নিয়ে সেদিন দোকানে গিয়েছেন। নমিতা অমিতা তাদের ছোটদের স্কুলে। ঠাকুমা নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছেন। তাদের মেয়েস্কুলের আগেকার একজন হেডমিস্ট্রেস মারা যাওয়ায় টিফিনের পরই তাদের ছুটি হয়ে গিয়েছে অপ্রত্যাশিতভাবে।

বাড়িতে এসে খোলা বাইরের বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

মার গলা শোনা যাচ্ছে। এমন কিছু তীক্ষ্ণ নয়। কিন্তু চিরকালের মৃদুভাষী মার পক্ষে এমন কণ্ঠস্বর বেশ একটু অস্বাভাবিক।

"কী ক্ষতি করছেন বুঝতে পারছেন না!"

"সত্যি পারছি না।" রবিমামার সহজ হাল্কা পরিহাসের স্বর, "আর নিজের জীবনটা যার আগাগোড়া লোকসান, অন্যের ক্ষতি করতে তার একটু লোভ ত থাকতেই পারে।"

"সব কিছুই হেসে ওড়াবার জিনিস নয়।" মার স্বর তাঁর পক্ষে যতদূর সম্ভব কঠিন।

রবিমামার স্বর কিন্তু হঠাৎ ভারী শুনিয়েছে।

"হেসে উড়িয়ে দিই, তাতেও আপত্তি? হেসে ওড়াতে না পারলে এতদিন যে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতাম।"

তাপসীর আর থাকা উচিত নয়, সে বুঝেছে। কিন্তু তবু পা দুটো যেন নড়তে চায়নি।

বেশ একটু স্তব্ধতার পর মার গলা শোনা গিয়েছে।

"এখনও এ-সব কথার কোন মানে হয়! চিরকাল একটা রোগের বস্তা বইবার দায় থেকে যে নিষ্কৃতি পেয়েছেন, তাতে বরং আপনার খুশী হওয়া উচিত।"

"হয়ত উচিত। কিন্তু যা উচিত, তা ত কোনদিনই করতে পারলাম না। তখনও যা উচিত ছিল করিনি, এখনও পারছি কই।"

"কী লাভ আর এ-সব কথা শুনিয়ে! ভুলে যান কেন যে, যাকে এ-সব শোনাচ্ছেন, চুলে তার পাক ধরেছে, চল্লিশ বছরের টানা-হেঁচড়ার জীবনে মনে আর তার সাড় নেই।"

"দুর্ভাগ্য ত সেইখানেই রমা। তুমি সব কিছু পিছনে ফেলে অনায়াসে চল্লিশ বছরের অসাড়তায় পৌঁছে গেছ। আর আমি

ঠাকুরকে আমার কথাটা বলতে ভোলেননি ত মাসিমা

সেই পঁচিশ বছরের জ্বলন্ত বেড়াজাল থেকে এখনও মুক্তি পেলাম না। কিন্তু সে-কথা শুনিয়ে সত্যি কোন লাভ নেই। মাঝে মাঝে তোমাদের একটু বিরক্ত করতে আসা ছাড়া কী ক্ষতি তোমাদের করছি, বুঝিয়ে দাও একটু।"

"না থাক। কথার সুর আজ যেদিকে গেছে, যা বলব, তাতে শুধু আঘাতই খুঁজে বার করবেন।"

"আঘাত পাব বলে এত তোমার ভয়।" রবিমামা হেসেছেন বুঝি একটু। "ওইটুকু জানার আনন্দেই আজ সব সহ্য করতে পারব। তুমি বল।"

"বেশ, শুনুন তাহলে। আপনার সাহায্য না পেলে এ-সংসার চলত না এটা ঠিক। এ-বাড়ির কেউ আপনাকে পর ভাবে না। আমরা যে এখনও পথে গিয়ে দাঁড়াইনি, আমাদের ছেলে-মেয়েরা যে লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পেয়ে মানুষ হচ্ছে, তার জন্যে সবাই আমরা কৃতজ্ঞ। তবু আমার মনে হয়, আপনি অকাতরে যত দিয়েছেন, তত আমাদের ক্ষতিই হয়েছে। আর কারুর না হক, হয়েছে আমার স্বামীর। উনি দুর্বল মানুষ, স্বপ্ন নিয়েই দিন কাটান, কিন্তু আপনার ওপর এমন নির্ভর করবার অভ্যাস না হলে হয়ত উনি এত অকর্মণ্য হয়ে যেতেন না, হয়ত পৃথিবীর সঙ্গে যোঝবার সাহস পেতেন।"

"শুধু তোমার স্বামীর কথাই ভাবছ রমা।" কী করুণ শুনিয়েছে রবিমামার গলা, "আমার কথা একটুও ভাবলে না? কিছুই যে জীবনে পায়নি, সে শুধু তোমার ছেলেমেয়েদের আপনার করে নিয়ে একটু সান্ত্বনা, একটু তৃপ্তি পেতে চায়—এই সুখটুকু থেকেও তাকে বঞ্চিত করতে চাও?"

তাপসী আর সেখানে দাঁড়ায়নি। বুঝতে দেয়নি যে, সে বাড়ি ফিরেছিল অসময়ে। সন্তর্পণে সেখান থেকে সরে গিয়ে কাছাকাছি এক সহপাঠিনী বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। বাড়ি ফিরেছে অনেক পরে, স্কুলের ছুটি হবার সময়ে।

রবিমামা তারপরও এসেছেন। এসেছেন বেশ সহজভাবেই। মার সঙ্গে কী তাঁর শেষ কথা হয়েছিল, তাপসী জানে না। তবে কথা যা-ই হয়ে থাক, কারও ব্যবহারে তার কোন আভাসও পাওয়া যায়নি।

শাড়ি ধরার পর বেশীদিন রবিমামার সঙ্গে যেখানে-সেখানে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ কিন্তু হয়নি। রবিমামার আসা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

প্রথমে ভাবনা করার কোন কারণই হয়নি। রবিমামার পক্ষে এ ত আর নতুন কিছু নয়। মাঝে মাঝে এমন ডুব মারাই তাঁর নিয়ম। কিন্তু এবারের সময়ের ব্যবধানটা ক্রমশ যেন বড় দীর্ঘ মনে হয়েছে। ছ মাস, এক বছর, দু বছর কেটে গিয়েছে।

বাবার দোকান উঠে গিয়েছে। বড়দা কলকাতায় কী একটা সামান্য চাকরি পেয়ে চলে গিয়েছে। তাপসী ভালভাবেই পাশ করে স্কুল ছেড়ে বেরিয়েছে। রবিমামার তবু কোন সাড়াশব্দ নেই।

সংসারের অবস্থা চরম দুর্দশায় পৌঁছেছে। তাপসীর সামনে অসীম শূন্যতা। প্রধানত মা এবং তাঁরই ছোঁয়াচ লেগে বাবা তার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু সব দিন দুবেলা যে-বাড়ির হাঁড়ি চড়ে না, সে-বাড়ির মেয়েকে শুধু চেহারার খাতিরে বিয়ে করবার গরজ সুপাত্রদের অন্তত খুবই কম।

আর চেহারাও ত গল্পকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্রমে। দুর্ভাগ্যের বিষ-নিশ্বাসে রূপই সবার আগে শুকোয়। অভাবে দুশ্চিন্তায় অর্ধেক দিন উপবাসে সমস্ত লালিত্য শ্রী ধীরে ধীরে ঝরে গিয়েছে। শীর্ণ অস্পষ্ট চেহারায় অসীম ক্লান্তির কালিমা।

ক্লান্তি তাপসীর মনেও। অনেক আশা স্বপ্ন তার ছিল, পেয়েছিল অনেক আশ্বাস। স্কুল ছেড়ে কলেজ। জীবনের উজ্জ্বল বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। কিন্তু ধীরে ধীরে তার কল্পনার পাখা সে গুটিয়ে নিয়েছে। কিছু আর সে চায় না। যোগ্য হক, অযোগ্য হক, যে কেউ তাকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে তার বাবা-মাকে শুধু দায়মুক্ত করুক।

শুধু এক একদিন দারুণ ইচ্ছা করে সন্ধ্যার পর সেই লাইনের ধারে গিয়ে দাঁড়াতে। ডিসট্যান্ট সিগন্যালের সেই সবুজ আলো একবার দেখতে পেলেই যেন এ-সব দুঃস্বপ্ন কেটে যাবে। দারিদ্র্যের সঙ্গে মার শাসন বুঝি আরও কঠোর হয়েছে। বাড়ি থেকে দিনের বেলা বার হওয়াই মানা। তার নিজেরই সাহস হয় না সন্ধ্যার পর একলা যেতে। তবু অনেক চেষ্টা করে লুকিয়ে একদিন গিয়েছিল।

জায়গাটাই গিয়েছে বদলে। নতুন দুটো বাড়ি তৈরী হচ্ছে কাছাকাছি। সে-নির্জনতা আর নেই।

ডিসট্যান্ট সিগন্যালটাও সবুজ আলো দেখিয়ে নামেনি। সে-গাড়ির সময়ই বদলে গিয়েছে, পরে সে জেনেছে।

আর সকলে কী ভেবেছে সে জানে না, কিন্তু নিজে সে এবার বুঝেছে যে, রবিমামা আর আসবেন না।

রবিমামার শেষ আসার কথা তার মনে পড়ে। পরে যা ঘটবে, তার আভাস তখনই তার বুঝি পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে বোঝেনি। এমন কি, রবিমামার স্বাভাবিক হৈ-হুল্লোড় করার ধ্বনি সেবারে যে একটু আতিশয্যের দিকে গিয়েছে, তা থেকেও অনুমান করতে পারেনি কিছু।

বরং রবিমামার একান্ত বিশ্বাসের পাত্রী হওয়ার গৌরবে ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে মনে মনে।

রবিমামা সেবারে রাশি রাশি উপহার এনেছেন সকলের জন্যে। তিনি যেন কল্পতরু হয়েছেন কদিন ধরে। বাবার জন্যে দামী জুতো-ধুতি-জামার উপর এসেছে সোনার বোতাম, ঠাকুমার জন্যে গরদের থান, সোনার জলে নামলেখা বাঁধান শ্রীমদ্ভাগবত। মা কিছু পাওয়া পছন্দ করেন না, তবু তাঁর জন্যে একটি সোনার সরু হার, বড়দার জন্যে ক্যামেরা, টর্চ, নমিতা অমিতার জন্যে জামা, কাপড়, খেলনা, বই ছাড়া স্কুলে নিয়ে যাবার ঝোলান চামড়ার দুটি স্যাচেল, আর তার জন্যে দুহাত ভর্তি সোনার চুড়ির সেট।

খুশী যেমন, তেমনি অবাকও হয়েছে সবাই।

"ব্যাপার কী রবি, হঠাৎ লটারি জিতেছ, না সোনার খনির সন্ধান পেয়েছ?" বলেছেন বাবা।

"ডাকাতি করেছি হে, দিনে ডাকাতি!" হেসেছেন রবিমামা।

ছিলেন মাত্র তিন দিন, কিন্তু বাড়িতে দুদণ্ড সুস্থির হয়ে বসেননি। এখানে ওখানে দূর-দূরান্তরে সকলকে টেনে নিয়ে

বেড়িয়েছেন। একদিন পিকনিক জামবনির বাঁধের ধারে, একদিন ট্রেনে সকলকে, মায় মাকে সুদ্ধ চড়িয়ে বিশ মাইল দূরের কালেশ্বরের মন্দিরে, আর শেষ দিন একটা গোটা বাস ভাড়া করে, একরাশ খাবার সঙ্গে নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খেয়াল মাফিক যেখানে সেখানে টহল।

সেই রাত্রেই রবিমামা ফিরে যাবেন।

"আর একটা দিন থেকে যাও হে রবি। এসে অবধি ত শুধু ঘোড়দৌড়ই করলে আর করালে। একদিন অন্তত বিশ্রাম করে যাও।" বাবা বলেছেন।

"বিশ্রামের ভাবনা কী! সময় হলেই করব।" বলে রবিমামা কথাটাকে আর আমল দেননি।

অনেক রাত্রে গাড়ি। তবু রবিমামা এবারে জেদ ধরেছেন, সকলকে স্টেশনে যেতে হবে বলে।

গোটা পাঁচেক রিকশা আগে থাকতে ঠিক হয়েছে তাই।

মা শেষ পর্যন্ত অসুখের জন্যে যাননি। ঠাকুমা পর্যন্ত তাদের সঙ্গী হয়েছেন।

স্টেশনে এমন কিছু কিন্তু ঘটেনি মনে করে রাখবার মত। না, তাও বুঝি ঘটেছিল।

রবিমামা ফার্স্ট ক্লাসেই যাতায়াত করেন বরাবর। যাবার সময় তাঁর বার্থ আগে থাকতে রিজার্ভ করা থাকে।

এবারে তা ছিল না। রবিমামা অত রাত্রে অন্য ক্লাসে জায়গা না পেয়ে থার্ড ক্লাসেই উঠেছেন।

সবাইকে নিয়ে স্টেশনে পেঁছিতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। পেঁছিতে না পেঁছিতেই গাড়ি এসে পড়েছে। কথাবার্তা বিশেষ কিছুই হয়নি কারও সঙ্গে। শুধু ট্রেন ছাড়বার আগে গাড়িতে উঠতে গিয়েও রবিমামা হঠাৎ নেমে এসে ঠাকুমার পায়ের ধুলো নিয়েছেন।

বাবা হেসে বলেছেন, "এ-সব ভক্তি-টক্তির বালাই ত তোমার ছিল না কখনও! হঠাৎ মতিগতি বদলাচ্ছে তাহলে।"

"না হে, না, মাসিমা ত আর জটাই বুড়ি নয়, কোনদিন হঠাৎ সরে পড়বে, টের পাব না। তাই পায়ের ধুলোটা নিয়ে ওপারের একটু মূলধন করে রাখলাম।"

হুইসল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে তারপর। ছোট স্টেশন। প্ল্যাটফর্মে তেমন আলোর জোর নেই। দেখতে দেখতে গাড়িটা অন্ধকারে শুধু একটা ক্রমশ-ক্ষীণ-হয়ে-যাওয়া আরক্ত চোখ যেন হতাশভাবে মেলে ধরে মিলিয়ে গিয়েছে ধীরে ধীরে।

কামরাটা যতক্ষণ দেখা গিয়েছে, তাপসীর মনে হয়েছে, সকলের মাঝে রবিমামা যেন শুধু তার দিকেই চেয়ে থেকেছেন।

অত রাত্রে ছোট শহরের নির্জন রাস্তা দিয়ে রিকশায় ফিরতে ফিরতে মনটা রবিমামার এই যে শেষ আসা তা না জানলেও বেশ খারাপ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা গর্বও জেগেছে।

রবিমামা সবচেয়ে তাকেই বিশ্বাস করে তার কাছে নিজের একটি মূল্যবান জিনিস গোপনে রেখে গিয়েছেন। এই কদিনের হৈ-হুল্লোড়ের ভিতরও এক সময়ে তাকে একলা ডেকে রবিমামা মোটা মজবুত চামড়ার মত কাগজের মাঝারী একটি খাম তার হাতে দিয়ে রেখে দিতে বলেছিলেন সাবধানে।

বাবার কাছে রাখবার কথা বলতে গিয়ে মনে পড়েছে সেটা অন্তত সাবধানতা হবে না। তা বুঝে তাপসী একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করেছিল, "মার কাছেও দেব না?"

একটু হেসে রবিমামা বলেছিলেন, "না, কারুর কাছে না। তোমার কাছেই থাকবে। কাউকে জানাবারই বা দরকার কী!"

কী আছে এ-খামে, তা জানবার কৌতূহলটা একটু ঘুরিয়ে প্রকাশ না করে পারেনি।

"তোমার দরকারী কিছু আছে বুঝি?"

আবার রবিমামা হেসেছিলেন, "দরকারী? হ্যাঁ, আমার না হক, কারুর কাছে দরকারী হতে পারে একদিন।"

রবিমামা তাপসীর গাল দুটো একটু টিপে আদর করে অন্য ঘরে চলে গিয়েছিলেন।

সে দরকারী খাম ফেরত নিতেও রবিমামা আর আসেননি। তাপসী সযত্নে সেটি লুকিয়েই রেখেছে। অত্যন্ত কৌতূহল মাঝে মাঝে হলেও কিছুতেই খুলে দেখতে তার হাত ওঠেনি।

কী হয়েছে রবিমামার, কিছুই জানবার বুঝি উপায় নেই। কখন কোথায় থাকেন, ঠিক নেই বলেই বোধহয় রবিমামা কোনদিন কোন ঠিকানা দেননি। তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্রের কোন যোগাযোগ এ-বাড়ির কখনও হয় না। তিনি মাঝে মাঝে আসবার আগে একটা চিঠি কখনও দেন মাত্র। যে-কয়দিনের জন্যে তিনি আসেন, সেই কয়দিনের শুধু সম্বন্ধ তাঁর সঙ্গে। তারপর তাঁর নিশ্চিহ্ন অন্তর্ধান।

তাঁর সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে কোন আলোচনাও হয় না আর। পরস্পরের মধ্যে তাদের যেন একটা গোপন বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে এ-বিষয়ে।

ইতিমধ্যে আরও অনেক কিছু ঘটে তাদের পরিবারে।

সাঁওতাল পরগনার নগণ্য শহরের বাসা ছেড়ে কলকাতায় বেলেঘাটার অত্যন্ত দরিদ্র বস্তি অঞ্চলে একটা ছোট টিনের বাড়িতে তাদের গিয়ে উঠতে হয়।

বড়দা সেখানে এক তেলের কলে কাজ করেন।

সেইখানেই বাবার একবেলা খাতা লেখার একটা কাজ জোটে।

বেলেঘাটার বাড়ির কথা ভাবতে গেলে সারাদিন একপাশের টিনের তোরঙের কারখানার হাতুড়ি পেটার আওয়াজ, আর দিন রাত্রি অনতিপ্রশস্ত দুটো ঘর আর একফালি বারান্দার মধ্যে বন্দী হয়ে সামনের নোংরা কাঁচা নর্দমার গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়া মনে পড়ে।

সেই নগণ্য শহরে ভাঙা বাড়িতেই তারা থাকত। কিন্তু সেখানে তবু মাঠ ছিল, আকাশ ছিল, ছিল একটু বাইরে যাওয়ার স্বাধীনতা।

এখানে তাদের টিনের চালের সঙ্কীর্ণ বাড়িটুকুর চারিদিকেই আকাশ-আড়াল-করা বাধা। পশ্চিমমুখো দুখানি এক সারির ঘর। তাতে ছোট ছোট দুটি মাত্র খুপরি জানালা। সে-জানালা দিয়ে সরু গলির অপর দিকের নোংরা খাটালটাই দেখা যায়। খাটালের চাল ডিঙিয়ে দৃষ্টি পেঁছবার মত ফাঁক নেই। পূব দিকে আকাশ, জীর্ণপ্রায় হলেও বিরাট এক পুরনো কালের বাড়িতে আড়াল। বেশ উঁচু মাথা ছাড়ানু করোগেট

টিনের দেওয়াল খানিকটা কেটে কব্জা দিয়ে একটা দরজা তৈরী করা আছে। কিন্তু সে-দরজা সারাক্ষণ বন্ধই থাকে। এককালে বড় জমিদার-বাড়ির এটি আস্তাবল গোছের কিছু ছিল। জমিদার বাড়ির দুর্দিনে ঘোড়ার জায়গায় মোটর আর আসেনি। তাই টিন দিয়ে আড়াল করে সেটুকু থেকে যা ভাড়া পাওয়া যায়, তাই আদায় করবার চেষ্টা হয়েছে।

দুটি ঘরের লাগাও বারান্দা আর উঠোনটি নেহাত সরু। তার দু প্রান্তের দেওয়ালটা ইটের। কিন্তু সে-প্রাচীরের উপর দিয়েও দক্ষিণের তোরঙ্গের কারখানার ঢালু টিনের ছাদের ভিতরটাই শুধু দেখা যায়।

এক ফালি আকাশ শুধু চোখে পড়ে উত্তরের ইটের দেওয়ালের উপর দিয়ে। সে-আকাশ দূরের কোন কোন কারখানার সারাক্ষণ ধোঁয়া-ছাড়া চিমনিতে কলঙ্কিত হলেও সকাল থেকে সন্ধ্যা তার রঙ ত বদলায়। রাত্রে ইচ্ছে করলে কোন কোন দিন সপ্তর্ষির চারটি ঋষিকে অন্তত পূব থেকে পশ্চিমে ঘুরে যেতে দেখা যায়! সেখান দিয়েই ঝোড়ো হাওয়া আসে কখনও কখনও শহরের ধুলো উড়িয়ে, আর আকাশে যেদিন মেঘ করে, সেদিন সেখান থেকেই তা দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখে অন্যমনা হয়ে যাওয়া যায়।

সংসারের উদয়াস্ত খাটুনির মধ্যে একটু সময় পেলে তাপসী সেইখানেই দাঁড়ায়। ওইটুকুই তার মুক্তি। সারাক্ষণ ওই ছোট্ট বাড়ির সীমানাটুকুর মধ্যে জীবন আবদ্ধ। কোথাও বেরুবার উপায় নেই। যাবেই বা কোথায়?

ভব্যতার স্মৃতি ও সংস্কার আছে, সম্বল নেই।

দারিদ্র্য যত বেড়েছে, তত বেড়েছে গোপন অনুচ্চারিত ভয় এই পরিবারটির মনে। পাকা ছাদের জায়গায় যেমন টিনের চালের তলায় আসতে হয়েছে, তেমনি নিজেদের শ্রেণী সমাজ থেকে দৈন্যের ঢালু পাড় দিয়ে গড়িয়ে আরও নীচে ওই কাঁচা নর্দামার জগতেই না তলিয়ে যেতে হয়।

ভব্যতার স্মৃতি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরার চেষ্টায় নিজেদের উপর শাসন আরও কঠোর হয়েছে।

এই পাড়ায় এসে থাকতে হয়েছে, উপায় নেই। কিন্তু মেয়েরা অন্তত কোথাও বেরিয়ে নিজেদের মান-মর্যাদা না খোয়ায়।

তাদের বাড়িওয়ালা, প্রতিবেশী পড়তি জমিদার, তার বাড়িতে যাওয়া যায় অবশ্য। কিন্তু তাও খুব হিসেব করে, বুঝে-সুঝে। পড়তি বলেই তাদের সম্পদ ও আভিজাত্যের দম্ভ অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে উগ্র। শুষ্ক সৌজন্য দেখাতে এক-আধবার কিছুক্ষণের জন্যে গিয়ে বসে ঘষা আলাপ করা যায় মাত্র। খাবার জল নিতে কিন্তু ভোর না হতে লুকিয়ে তাদের টিউবওয়েলে যেতে হয়।

এ-জীবন থেকে বেরুবার রাস্তা মাত্র দুটি। হয় মৃত্যু, নয় বিয়ে।

তার বিয়ের চেষ্টার বিরাম নেই।

পাত্রের যোগ্যতা সম্বন্ধে আশা-আকাঙ্ক্ষা ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। কিন্তু তবু কোথাও কোন কিনারা হয় না।

যৌতুক দিয়ে প্রলুব্ধ করবার অবস্থা নেই, দেখাবার সৌন্দর্যও শুকিয়ে গিয়েছে।

দেখতে যারা আসে, তারা প্রায় অধিকাংশই পরে খবর দেবার আশ্বাস দিয়ে যায়। সে-আশ্বাস বেশির ভাগই মিথ্যে। যাও বা খবর দু-একজন দেয়, তাদের খাঁই মেটাবার সাধ্য এ পরিবারের আর নেই।

কাগজের বিজ্ঞাপনের জবাবে ফটো পাঠিয়ে যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়, তাদের কেউ কেউ, বিশেষত মেয়েরা এসে ত প্রায় স্পষ্টই সন্দেহ প্রকাশ করে ফটোর যাথার্থ্য সম্বন্ধে। সন্দেহ করা খুব অন্যায় নয়। ফটো যা দু-একটা আছে সে ত আগেকার। ক্যামেরা উপহার পাবার পর দুর্দিন ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত বড়দা আনাড়ি হাতে যে-সব তুলেছিল। সেই কাঁচা হাতে তোলা ছবির সঙ্গেও এখনকার চেহারার মিল খুঁজে বার করাই কঠিন।

মেয়েরা দেখতে এলে, কাঁচা নর্দমার গলিতে ঢোকবার সময় প্রথম যে নাক সেঁটকান, তা আর বিদায় নেওয়ার আগে পর্যন্ত স্বাভাবিক হয় না। ওরই মধ্যে যাঁরা একটু ঠোঁটকাটা, তাঁরা বেশ একটু খোঁচা দিয়েই বলেন, "অসুখ-বিসুখ থেকে উঠেছে বুঝি!"

মা প্রতিবাদ করে বলেন, "না, অসুখ-বিসুখ ত করেনি। মা হয়ে বলতে নেই, কিন্তু ওর অসুখ-বিসুখ বড় একটা করে না। মাথা ধরে একদিন শোয় না পর্যন্ত!"

মার শীর্ণ রুগ্‌ণ চেহারার দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসের হাসিটা কোনরকমে গোপন না করেই আগন্তুকেরা বলেন, "তাই নাকি! বড্ড পাকান শির-ওঠা চেহারা কি না, তাই ভাবছিলাম বুঝি অসুখ-বিসুখ। আপনাদের ফটোর সঙ্গে কিন্তু মেলে না! রঙও ত শুনেছিলাম ফর্সা!"

ঠাকুমা সাধারণত এ-সব ব্যাপারে নীরব সাক্ষী হয়েই বসে থাকেন। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে হঠাৎ কখনও কথা যেন ছিটকে বার হয়।

"শোনা কথায় দরকার কী ভাই। যা চেহারা, তা ত চোখেই দেখতে পাচ্ছ। আর নিটোল গড়ন দুধে-আলতা রঙ নিয়ে আমাদের মত ঘরে হবে কী? যেখানে যাবে সেখানেও সোনার পিঁড়িতে বসিয়ে সরবাটা আর কেউ মাখাবে না! ফুলশয্যের রাত না পোয়াতে ত চুলো ধরাবার কয়লা ভাঙতে যেতে হবে। কলতলার বাসন, হেঁসেলের ভাতের হাঁড়ি আর শিল-নোড়া সামলাবার জন্য বাইরের চেকনাইএর চেয়ে শক্ত হাড়ই দরকার!"

যাঁরা দেখতে এসেছেন, এর পর তাঁদের যাবার একটু তাড়া পড়ে যায়।

তাঁরা চলে যাবার পর মা ক্লান্ত-কাতরভাবে বলেন, "ওরা আর খবর কিছু দেবে না। আপনার কথা শুনে যা মুখ করে গেল!"

ঠাকুমা খানিক গম্ভীরভাবে চুপ করে থাকেন। তার পর একটু তিক্ত হাসি হেসে বলেন, "আমারই অন্যায় হয়েছে বৌমা! বুড়ো হয়ে মুখের আর রাশ নেই। আর আমি এ-সবের মধ্যে থাকব না, কথা দিচ্ছি!"

কথা কিন্তু ঠাকুমা রাখতে পারেন না।

তিনিই হঠাৎ বজ্রকঠোর হয়ে সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়ান বলে তাপসীর জীবনের ধারা সম্পূর্ণ নতুন পথে বয়।

বহু নিষ্ফল খোঁজাখুঁজির পর একটি পাত্র তখন পাওয়া গিয়েছে। বিশেষ কিছু না নিয়েই বরাসনে বসতে সে রাজী। পাত্রের দর যে কী, তা কারও অজানা নয়। কিন্তু আগেকার আশা-আকাঙ্ক্ষা শুধু মাটিতে নেমে আসেনি, বিচার করবার দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে এসেছে ক্লান্তিতে, হতাশায়।

তা ছাড়া নিজেদের মনকে প্রবোধ দেবার মতও কিছু আছে। বয়স একটু বেশী হলেও এমন কিছু বুড়ো বা দোজবরে নয়। শ্রীর বালাই না থাক, দৈত্যের মত চেহারা, আর স্বাস্থ্য।

কাছেই এক কয়লার ডিপোয় কাজ করে।

কয়লার বাকী দাম আদায় করতে এসে প্রথমদিন কুৎসিত-ভাবে ইতর ভাষায় গালমন্দই দিয়ে গিয়েছিল, সেই সঙ্গে অভদ্র লোলুপ দৃষ্টি মেলে রেখে বাড়ির মেয়েদের মধ্যে তাপসীকে বোধ হয় দেখেও ফেলেছিল দৈবাৎ।

এ-দিক ও-দিকে খোঁজ নিয়ে নিজেই প্রস্তাব পাঠিয়েছে। কিছু চায় না। একটা সাইকেল আর কিছু নগদ হলেই সে তাপসীকে উদ্ধার করতে রাজী।

কথাবার্তা একটু এগুবার পর পাত্র নিজেই ইয়ার-বন্ধু নিয়ে পাকা দেখতে এসেছে একদিন।

বাড়িতে দুটি মাত্র ঘর। বারান্দায় একটা কাপড় ঝুলিয়ে পর্দা ফেলে দুদিকের ব্যবধান রচনা করে এক ঘরে পাত্রপক্ষকে বসান হয়েছে। অন্য ঘরে তাপসীকে অনুষ্ঠানের উপযোগী সাজান হয়েছে যথাসাধ্য।

পাঁজি দেখে সময় ঠিক করা আছে আগেই। বাবা ও-ঘর থেকে তাপসীকে নিয়ে যেতে এসেছেন।

দু ঘরের মধ্যে মাটি-লেপা পাতলা চেঁচাড়ির টাটির ব্যবধান মাত্র। ওদিকের সব কথাবার্তাই গোড়া থেকে কানে আসছে।

তারই মধ্যে পাত্রের গলা এখন শোনা গিয়েছে। তাপসীর বড়দাকে উদ্দেশ করে বলছে, "বাজে ঝামেলা চটপট চুকিয়ে ফেল মাইরি! শালা, এতক্ষণ বিড়ি ধরাতে না পেরে পেট ফুলে ঢাক! তোমার বাবারও আচ্ছা আক্কেল! বসে বসে খালি বাজে ভ্যানর-ভ্যানর। জামাইএর যে এদিকে ধোঁয়ার জন্যে প্রাণ আইঢাই সে-খেয়াল নেই।"

কথাগুলো না শোনার ভাবই করেছে সবাই। এমন কিছু গায়ে মাখবার কথাও নয় বোধহয়।

বাবা তাড়া দিয়েছেন, "নাও নাও, তাড়াতাড়ি কর।"

"কেন, এত তাড়াতাড়ি কিসের?" ঠাকুমারই শান্ত অথচ কঠিন স্বর, "খাবার-দাবারগুলো দিয়ে এস না আগে!"

"খাবার-দাবার!" বাবা অবাক হয়েছেন আর সকলের মতই। "আগে মেয়েকে নিয়ে যেতে হবে না?"

"না, মেয়েকে নিয়ে যাবার দরকার নেই।" ঠাকুমা সত্যিই যেন ইস্পাতে তৈরী।

"কী বলছেন মা," মার কণ্ঠস্বর কান্নার মত, "ওদিকে যে সব শোনা যাচ্ছে!"

"তাই জন্যেই ত বলছি! পাকা দেখা আর হবে না। যাঁরা

ঝামেলা চটপট চুকিয়ে ফেল

কষ্ট করে বাড়িতে এসেছেন, তাঁদের খাইয়ে দাইয়ে যেটুকু খাতির করতে পার কর।"

ও-ঘরে কথাগুলো বেশ স্পষ্টই শোনা গিয়েছে নিশ্চয়।

যে কেলেঙ্কারিটা তারপর হয়েছে, ইয়ারবন্ধুসমেত পাত্র স্বয়ং এ-অপমানের শোধ যে-ভাষায় ও ব্যবহারে নিয়ে গিয়েছে, তা মনে করলেও আজ লজ্জা হয়।

তারা চলে যাবার পরও এ-ব্যাপারের জের মেটেনি।

মা একেবারে ভেঙে পড়েছেন, বাবা বিমূঢ় নির্বাক। বড়দাই শুধু তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন ঠাকুমার বিরুদ্ধে।

"এই যদি তোমাদের মতলব ছিল, তাহলে পাকা দেখার নামে ওদের ডাকা কেন? এর পর তোমাদের কোন ব্যাপারে যদি থাকি!" বলে বড়দা কথাটা অসমাপ্ত রেখেই রাগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন।

মা এইবার কাতরভাবে বলেছেন, "বিয়ে ওর আর হবে না, আমি বুঝতে পারছি।"

"নাই বা হল বিয়ে!" ঠাকুমার অবিচলিত কঠিন স্বর শোনা গিয়েছে, "এমন বিয়ে হওয়ার চেয়ে জন্ম জন্ম আইবুড়ো থাকা ভাল।"

"কিন্তু মা......" বাবা কী বলতে গিয়েছেন।

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়েই ঠাকুমা বলেছেন, "কিন্তু কী? লোকে নিন্দে করবে? জাতে ঠেলবে? আমাদের মত

ধারা হাতাতে তাদের সমাজ-জাত কিছু আছে? কিছু নেই। জাত কুল বাঁচাতে বিয়ের নামে ওই জ্যান্ত কবরে যাওয়ার চেয়ে রাস্তায় ভিক্ষে কি ঝি-বৃত্তি করাও ভাল। আর তা-ই বা করবে কেন? বিয়ের বাজারে কানাকড়ির দাম নেই বলেই কি আর সব জায়গায় তাই! আজ থেকে মেয়ে বলে নিজেকে যেন ও না ভাবে। আর তেমন তেজ যদি থাকে ত মেয়ে হয়ে জন্মানটা অভিশাপ হয়ে থাকবে কেন?"

ঠাকুমাকে চিরকাল তেজী শক্ত বলে সে জানে। কিন্তু তাঁর এ-চেহারা কোনদিন দেখেনি, এত কথাও কোনদিন শোনেনি তাঁর মুখে।

জীবনের ধারা তার সেইদিন থেকেই বদলেছে।

রবিমামার গচ্ছিত রাখা থামটা সেই সময়েই একদিন খুলেছিল সব দ্বিধা-সঙ্কোচ জয় করে।

স্টেশন থেকে 'সাংসারিক'এর আস্তানায় যেতে যেতে বিশেষ কোন কথা হয়নি।

জায়গাটা বেশ দূর। রবিমামা নিয়মিত একটা ছ্যাকরা-গাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

অনেকবার তাপসীর মনে হয়েছে, গাড়িতে যাবার পথে পৌঁছবার আগেই কথাটা বলে ফেলা ভাল। কিন্তু কিছুতেই মনের জোর পায়নি।

এটা কি ভয়!

না, ভয় সে কোনকালেই রবিমামাকে করে না। আজ ত নয়ই, সে-যুগেও করত না।

কিন্তু সঙ্কোচটা তাহলে কেন?

কেমন একটা মমতা-মেশান করুণায় বোধহয়।

রবিমামা আর যাই হন, একদিন যে করুণার পাত্র হতে পারেন, এটা সত্যিই কল্পনাতীত ছিল সেদিন।

শুধু বাইরের পোশাকে নয়, ভিতরের প্রকৃতিতেও রবিমামা অনেকখানি বদলে গিয়েছেন।

তাঁর দুর্বল অসহায়তার জন্যেই করুণা হয়, ঠিক, কিন্তু বাইরের আচরণে সে-দুর্বলতার কোন পরিচয় তা বলে নেই। বরং ঠিক উল্টো। ভিতরের দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বলতা তিনি বাইরের জোরাল আস্ফালনের ভান দিয়ে যেন ঢাকতে চান। এমন জেদ ও অধৈর্য, সব কিছু এমন জোর দিয়ে বলার স্বভাববিরুদ্ধ চেষ্টা তাঁর কোনকালে ছিল না। সব চেয়ে অবাক হতে হয় তাঁর এই পুজোআর্চা ঠাকুর-মন্দির নিয়ে এমন মেতে ওঠায়।

অন্য কাজের মধ্যে যে-ব্যাপারটার মীমাংসা করবার জন্যে রবিমামার কাছে আসা, তা তাঁর এই বিষয়ের একটি অবুঝ জেদ নিয়েই।

কিন্তু বলি-বলি করেও সারা সকাল কথাটা বলা হয় না।

রবিমামার সঙ্গে সব কিছু একবার ঘুরে দেখে বেড়ায়।

ছবির মত জায়গাটিকে সাজিয়ে তোলার ব্যাপারে রবিমামার চেষ্টার যে কোন ত্রুটি নেই, তার প্রমাণ সব কিছুতে।

চারিদিক ঝক-ঝক তক-তক করচে। পুকুর, ফুলের বাগান, তরকারির খেত, কারখানা-ঘর—কোথাও কোন খুঁত ধরবার নেই।

আচার, মোরব্বা, রান্নার মশলা ইত্যাদি যেখানে তৈরি করে বোতলে ভর্তি করা হয়, তার পাশে আর একটা শেড উঠেছে—তোয়ালে, গামছা, জানলার পর্দা ইত্যাদি বোনবার ছোট ছোট তাঁত বসাবার জন্যে।

যতটা আশা করেছিল, কাজ তার চেয়ে বরং বেশীই এগিয়েছে। রবিমামা এ-দিক দিয়ে কোন সমালোচনার সুযোগ কাউকে দেন না।

এবার মন্দিরের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। মন্দিরটি নিতান্ত ছোট, বাংলার নিজস্ব রীতিতে আটচালার ধরনে তৈরী। মন্দিরের চারিধারের চাতাল বাঁধান হচ্ছে। থাম বসিয়ে ছাদ দিয়েও খানিকটা জায়গা ঢাকা হবে।

কথাটা এইবার বোধহয় পাড়া যায়। কিন্তু বাধা পড়ে অপ্রত্যাশিতভাবে।

একটা সাইকেল রিক্‌শ লতানে গাছের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকছে।

তাপসীর বুকের স্পন্দন বেড়ে যায়। রিকশতে কল্যানই যে বসে আছে, তাতে ভুল নেই। নিজেকে বেশ কষ্ট করে সংযত করে রেখে তাপসী সাধারণভাবে আলোচনা চালাবার চেষ্টা করে রবিমামার সঙ্গে।

রিকশটা তাদের কাছেই এসে থামে। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে অ্যাটাচি বগলে করে কল্যাণ তাদের দিকে এগিয়ে আসবার পর তাপসীর যেন তাকে লক্ষ্য করবার সময় হয়।

"কী, এতক্ষণে এলেন!" নেহাত নিরুত্তাপ প্রশ্ন।

কল্যাণকে বেশ লজ্জিত মনে হয়। "পাঁচ মিনিটের জন্যে ট্রেনটা ধরতে পারলাম না। কারেণ্ট বন্ধ হয়ে মাঝ-রাস্তায় ট্রামটা আটকে গেল। এই ছাড়বে এই ছাড়বে ভাবতে ভাবতে বেশ একটু দেরি করে ফেললাম। এখন না দেখা যায় একটা বাস, না পাই একটা ট্যাক্সি। ট্যাক্সি একটা যদিবা পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাতেও সময়মত পৌঁছতে পারলাম না। পরের ট্রেনটায় আসতে হল।"

এ-সব কৈফিয়তে যেন কোন আগ্রহ নেই তাপসীর। নিতান্ত সহজ পরিহাসের আলাপের সুরে বলে, "ট্যাক্সি ত বাড়ি থেকে করতেও কেউ আপনাকে মানা করেনি! যাক, শেষ পর্যন্ত যে এসে পৌঁছতে পেরেছেন, এই ভাল।"

"বাঃ, আসব না কীরকম! কথা যখন দিয়েছি!"

তাপসী অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে নেয়, পাছে ধরা পড়ে যায় বলে। অপ্রত্যাশিত আনন্দটা এক মুহূর্তে যেন তীব্র রাগ হয়ে ওঠে। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, "কথা রাখার জন্যে যেমন করে হক এই অসময়ে শুধু আসাটাই কি যথেষ্ট!"

রবিমামাই তাকে সামলে নেবার সুযোগ দেন। মন্দিরের গায়ে কয়েকটা নতুন কারুকাজ করাচ্ছেন। সেইগুলো দেখাতে নিয়ে যান তাপসীকে।

কল্যাণকে রবিমামা ডাকেন না। সে দ্বিধাগ্রস্তভাবে কিছু-ক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অফিস-ঘরের দিকে এগয়। কল্যাণকে রবিমামা পছন্দ করেন না, তাপসী তা জানে। আজ এই মুহূর্তটিতে অন্তত রবিমামার উপর সেজন্যে কোন ক্ষোভ সে অনুভব করে না।

কিন্তু এই সাময়িক তিক্ততার শোধ সুদসুদ্ধ তার মনকে দিতে হয় অনুশোচনায়।

দুপুরে খাতাপত্র হিসেব দেখা হয়।

কল্যাণ এ-কাজে পাকা না হলেও আনাড়ি নয়। তা ছাড়া গাফিলি তার নেই। সব কিছু অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে সে দেখে মিলিয়ে নেয়।

কারখানা-ঘরের এক পাশে ছোট অফিস-ঘর। উত্তরদিকের ঘর বলে দুপুরবেলাতেও বেশ একটু ঠাণ্ডা। সামনে পুকুর, বাগানের উপর দিয়ে শীতের একটা কনকনে হাওয়া আজ আবার সারাক্ষণই বইছে।

ছোট টেবিলটার ধারে বাইরের দিকে মুখ করে বসে তাপসী কিছুতেই যেন হিসাবপত্রের উপর মনটা নিবদ্ধ রাখতে পারে না।

গায়ের শালটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়েও যেন ঠিক স্বচ্ছন্দ মনে হচ্ছে না। বাঁধান পুকুরঘাটের উপর যে রোদটা এসে পড়েছে, সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

এই শীতের জন্যেই কি তার অন্যমনস্কতা!

কিন্তু কল্যাণেরও ত এই শীতে একটু কাতর হওয়া উচিত। গরম জামাও সে গায়ে দিয়ে আসেনি। সুতির একটা পাঞ্জাবির উপরে গরম একটা আলোয়ান পাট করে শুধু কাঁধের উপর ফেলা।

রবিমামা না হয় সন্ন্যাসী হয়ে উঠেছেন সত্যিকারের। শীত গ্রীষ্ম তাঁর কাছে সমান। সারা বছর এক গেরুয়া পোশাকের কোন পরিবর্তন নেই। কল্যাণের শরীরের সাড় কি শুধু কাজের তন্ময়তাতেই ভোঁতা হয়ে গিয়েছে? সে কি শুধু একটা হিসেবের জড় কল মাত্র।

নিজের মনের অদ্ভুত অনুভূতিটার মানে করতে গেলে তাপসী থই পাবে না। বাইরে শরীরের শীত, আর ভিতরে একটা হতাশ জ্বালা! জ্বালা কল্যাণের এই কাজের তন্ময়তায়। কল্যাণ যেন ইচ্ছে করেই নিছক কর্তব্যবোধের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে তাকে যন্ত্রণা দেবার জন্যে।

তার তখনকার তাচ্ছিল্যের জন্যে কল্যাণের কি এই প্রতিশোধ!

কিন্তু তা হলেও তাপসী যে পরম তৃপ্তি পেত। প্রতিশোধের পিছনে একটু জ্বালা আছে এ-সান্ত্বনা অন্তত তার থাকত।

সে-সান্ত্বনাই যে তার নেই। এই শীতের হাওয়া সম্বন্ধে যেমন, তার সম্বন্ধেও কল্যাণ তেমনি সম্পূর্ণ সচেতনই নয় যেন।

অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল খানিক। রবিমামা ও কল্যাণের একটু মৃদু বাদ-প্রতিবাদে চমক ভাঙে।

"যেমন আছে তা-ই লিখে নাও।" রবিমামার সেই অকারণে অতিরিক্ত জোর দিয়ে চরম আদেশ দেওয়ার মত সুর।

"কিন্তু কী বাবদে খরচ তার ত একটা নাম দিতে হবে।" কল্যাণের মৃদু অথচ দৃঢ় আপত্তি।

"নাম কী দেবে জান না! অ্যাকাউনটেনসির বিদ্যে কতদূর!"

"বিদ্যে বেশী নয়।" কল্যাণ একটু হাসে, "কিন্তু খরচ দেখাতে হলে কী বাবদে তা হচ্ছে তা জানান দরকার বলেই শিখেছি।"

"তা যদি শিখে থাক, তাহলে এটা কোন্ খাতে যাবে তাও জানা উচিত ছিল। লেখ 'এনটারটেনমেণ্ট'—উৎসবের জন্যে খরচ!"

কল্যাণ তবু কলম থামিয়ে বসে থাকে।

"কই, লিখলে না!" রবিমামার অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট।

"তা কেমন করে লিখি। সাতদিনের উৎসবে পাঁচ শ টাকা খরচ হয়েছে লিখলে অডিট পাস করবে কেন? এ-খরচের কোন্ স্যাংশন নেই, আপনি ত জানেন।"

"স্যাংশন না থাকে ত করিয়ে নেবে।" রবিমামার সংক্ষিপ্ত সোজা আদেশ।

আলোচনা চালাবার চেষ্টা করে রবিমামার সঙ্গে

কথাটা তোলবার এই উপযুক্ত সুযোগ। কিন্তু কল্যাণকে অন্যায় ভৎর্সনা থেকে বাঁচাবার জন্যেও রবিমামাকে এই অবস্থায় আঘাত দিতে মন ওঠে না। তাঁর এই দাম্ভিক জবরদস্তির পিছনে নিজের অধিকারের সীমানা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার করুণ দ্বিধাটুকু তাপসী বেশ ভাল করেই বুঝতে পারে। সারাজীবন মুক্ত হস্তে তিনি সকলকে দিয়েই এসেছেন, তাঁর সহজ কর্তৃত্বকে স্বীকার করবার জন্যে কখনও কোনও শক্তির আস্ফালন তাঁর দরকার হয়নি। আজ যেভাবে যতটুকুই হক, উপুড় করার বদলে, হাত যে তাঁকে পাততে হচ্ছে, এই গ্লানি ভুলতেই তিনি বুঝি অস্বাভাবিকভাবে উগ্র। যে ধ্যানধারণা ধর্মের চর্চা নিয়ে তিনি আছেন, তার মধ্যেও মনের এই গ্লানি মুছিয়ে দেবার মত সুধা এখনও বুঝি তিনি পাননি।

প্রসংগটা আর তিক্ত না হতে দেবার জন্যেই তাপসী হঠাৎ বলে, "আচ্ছা, দরজাটা ভেজিয়ে দিলে হয় না! আমার কিন্তু বেশ কাঁপুনি ধরছে এই হাওয়ায়।"

"আরে তাই ত!" কল্যাণের আগেই রবিমামা তাড়াতাড়ি উঠে দরজাটা ভেজিয়ে দেন। "এতক্ষণ বলিসনি কেন?" রবিমামা বেশ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, "ঠাণ্ডা লেগে আবার অসুখ না করে।" তাঁর চোখে সেই আগেকার মতই অকৃত্রিম স্নেহ উথলে ওঠে।

"না, অসুখ করবার মত নয়। কিন্তু কল্যাণবাবু কী করে সহ্য করছিলেন, তাই ভাবছি। তোমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।"

কল্যাণ একটু হাসে। "আমার ত খারাপ লাগছিল না—।"

"খারাপ লাগছিল না! বলেন কী! আপনার ত বিলেতের লোক হওয়া উচিত ছিল।"

সহজ কথাবার্তার ভিতর দিয়ে সকালের অস্বস্তিকর স্মৃতিটা মুছিয়ে দেওয়া হয়ত যেত। কিন্তু রবিমামা তার সুযোগ দেন না।

"তাহলে ও-খরচটা সম্বন্ধে কী করা হবে ঠিক করে নাও।" তাপসীকে উদ্দেশ করেই কথাটা বলা।

"হ্যাঁ, তা-ই করব। তবে এখন আর থাক রবিমামা! রোদ্দুর পোয়াবার জন্যে প্রাণটা ছটফট করছে।"

রবিমামা হেসে সায় দেন।

কল্যাণই একটু আপত্তি জানিয়ে বলে, "আর সামান্য মাত্র লেখা বাকী ছিল।"

"তা থাক না। বিকেলে ওটুকু সেরে না হয় সন্ধ্যের গাড়িতেই ফেরা যাবে।" তাপসী তার মিনতিটাকে যেন আদেশের সুর দিতে চায়।

"আচ্ছা।" বলে কল্যাণ খাতাপত্র গুছিয়ে তোলার আগেই তাপসী দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যায়। রবিমামা তার সঙ্গ যে এখন পেলে খুশী হতেন, সে জানে। কিন্তু এখন রবিমামার কাছে থাকলে কল্যাণকে একলা পাবার ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকুও ব্যর্থ হয়ে যাবে।

বেরিয়ে গিয়ে সামনের বাঁধান ঘাটে সে দাঁড়ায় না। পুকুরের পারের ফুল দিয়ে কেয়ারি করা রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে যেন ও-পাশের ফুলগাছের বাগানেই বেড়াবার জন্য।

রবিমামা তার প্রায় পিছন পিছন বেরিয়ে এলেও এক মুহূর্ত একটু থেমে অন্য দিকে চলে যান। গেটের কাছে দু-গরুর গাড়ি পেয়ারা আর পাকা বিলিতী বেগুন এসেছে। কারখানা-ঘরে গাঁয়ের মেয়েদের মশলা কোটার শব্দ শোনা যাচ্ছে। রবিমামার সে-সব তদারক না করলে নয়।

একেবারে পুকুরের অপর পারে সবজি-বাগানের কাছে গিয়ে কটা কপির চারা লক্ষ্য করবার অছিলায় নিচু হয়ে বসে তাপসী একবার অফিস-ঘরের দিকটায় চেয়ে নেয়।

কল্যাণ খাতাপত্র রেখে অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে একটু দাঁড়িয়েছে। হয়ত কারখানা-ঘরের দিকেই কর্তব্যবোধে এবার চলে যাবে, কিংবা তার কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে ওই-দিকের ঘাটেই রোদ পোহাবে।

কিন্তু সমস্ত অনুমান ব্যর্থ করে কল্যাণ খানিক বাদে তার দিকেই আসছে দেখা যায়।

কল্যাণ কাছে পৌঁছবার আগেই তাপসী দাঁড়িয়ে ওঠে। তারপর একটু হেসে বলে, "কপিগুলো খুব বড় বড় হবে মনে হচ্ছে। সাধারণ জাতের নয় বোধ হয়।"

কথাটার কোন দাম নেই, এটা শুধু কাজের সম্পর্কটা ভুলিয়ে খানিকক্ষণ এক সঙ্গে থাকাটা সহজ করার ভূমিকা।

কল্যাণ তা বোঝে কি না বলা যায় না। কিন্তু নিচু হয়ে বসে কপির চারাগুলো একটু লক্ষ করে বলে, "আমি আবার এ-সবের কিছু বুঝি না, তবে ছেলেবেলায় পাঁজিতে যেন রাক্ষুসে কপির না ওইরকম কী নামের বিজ্ঞাপন দেখেছি মনে হচ্ছে।"

"আপনি ছেলেবেলায় পাঁজি দেখতেন?"

"নিশ্চয়ই! কে না দেখে। পাঁজি মানে পাঁজির বিজ্ঞাপন। সে একটা আশ্চর্য কল্পনাতীত জাদুকরের রাজ্য। কী না সেখানে পাওয়া যায়।" বলতে বলতে কল্যাণ উৎসাহিত হয়ে ওঠে, "আশ্চর্য সব বইএর নাম, ভয় রোমাঞ্চ রহস্য, প্রায় বিনা-মূল্যে আশাতীত সব উপহার,—ঘড়ি ক্যামেরা বন্দুক, অবিশ্বাস্য সব বিদ্যা, ভূত ভবিষ্যৎ জানবার ক্ষমতা, যে-কোন মানুষকে দিয়ে যা ইচ্ছে করান......"

এই ত কল্যাণ বেরিয়ে এসেছে তার আবরণের বাইরে বাঁধ নিজের অজান্তে। এই সুরটুকু শুধু বজায় রাখবার জন্যে যা উৎসাহ দেওয়া দরকার।

"সে-সব বিদ্যা কিছু শিখেছিলেন না কি!"

"চেষ্টা অন্তত করতে ছাড়িনি।—খামের মধ্যে চারি আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন,—বিজ্ঞাপনের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি।" কল্যাণ হেসে ওঠে ছেলেমানুষির স্মৃতিতে। হাসির নির্মল সারল্যটুকুও কি তাপসীর মনগড়া!

"তারপর?" সবজি-বাগানের ধার দিয়ে দূরের মাঠটার দিকে যেতে যেতে তাপসী সুরটা জাগিয়ে রাখে।

"তারপর আর কী! দু-পয়সার বুকপোস্টে চটি একটি বই। তাতে নানান দুর্লভ অলৌকিক বিদ্যা ও তা আয়ত্ত করার উপায়ের আরও বিশদ বিবরণ। তবে সে-সব টিকিট শুধু চার আনার ডাক-টিকিটেই বাক্স খোলা যায় না। [illegible]

রচ একটু বেশী, আমার মত ছেলেদের ক্ষমতার বাইরে। কোন এক অভাবিত সুদিনের আশায় সে চটি বইটি তাই সযত্নে তুলে রেখে দিয়েছি সামান্য একটু দীর্ঘশ্বাস চেপে। কিন্তু ভূত-ভবিষ্যৎ জানবার কি পৃথিবীর যাকে খুশি বশে আনবার বিদ্যা যে একটু বেশী খরচ করতে পারলেই লাভ করা যায়, স-কথা অবিশ্বাস করিনি।"

বাগানের প্রান্তে সারি সারি অনেকগুলো নারকেল গাছ। শীতের হাওয়ায় তাদের ছিন্ন ছিন্ন হালকা ছায়া মাঠের উপর দুলছে। সেই ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে তাপসী একটু হেসে বলে, "বশ করবার ক্ষমতা পেলে কী করবেন কিছু ঠিক করে রেখেছিলেন?"

কথাটা বলেই তাপসীর আফসোস হয়।

কল্যাণ হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে ওঠে। মুখে সেই ঈষৎ কৌতুকের সংযত হাসি।

বলে, "না, তা ঠিক করিনি।"

কল্যাণ আবার নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে, বুঝতে দেরি হয় না। সুরটা কেটে গিয়েছে। তাপসী একটু চেষ্টা করে তবু।

"সত্যিকারের পৃথিবীতে ছেলেবেলাকার সব রঙ যে নোংরা ময়লা হয়ে যায়, এইটেই বোধহয় সবচেয়ে বড় দুঃখ।"

এবারেও কথা ঠিক এভাবে বলতে চায়নি। এরকম কথাও তার স্বভাববিরুদ্ধ বুঝে তাপসী লজ্জা পায়।

কল্যাণ উত্তরে শুধু বলে, "তাই কি!" তারপর কাজের প্রসঙ্গই তোলে।

"আপনাকে যে বিশেষ কথাটা বলতে এসেছিলাম, তা-ই বলা হয়নি। মামাবাবু রাগ করছেন, কিন্তু উৎসবের ওই পাঁচ-শ টাকা খরচটার একটা মীমাংসা না করলে বিকেলে আবার হিসেব দেখার কোন মানে হবে না। ও-খরচ যে ডাঃ ভৌমিক বোর্ডে স্যাংশন করতে দেবেন না, তা ত বুঝতেই পারছেন।"

তাপসী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হয় তার। হিসাবপত্রের এ-সব কথা যেন বিষ। তা সত্ত্বেও নিজেকে সংবরণ করে সে একটু কর্তৃত্বের মেজাজেই বলে, "তবু ও-কথাটা আজ আর তুলবেন না। ও-খরচটা খাতায় ওঠাবারও দরকার নেই। আমিই ওটা দিয়ে দেব আলাদা।"

কল্যাণ একটু বিস্মিতভাবে তাপসীর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর "আচ্ছা" বলে ফিরে চলে যায় কারখানা-ঘরের দিকে।

শীতের রোদ-মাখান ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঈষৎ কাঁপন-লাগা নারকেলপাতার হালকা ছায়া-দোলান এই মধুর বেলাটা তাপসীর কাছে এক মুহূর্তে একেবারে বিস্বাদ হয়ে যায়।

দিনের পর দিন ত চলেই যাচ্ছে। কতবার আর এমন সাজান সুযোগ তার জীবনে আসবে।

কল্যাণ নিজের মধ্যে এমনি গুটিয়েই থাকবে তার কাছে। যে-জাদুতে তার মনের গহন লোক ছুঁয়ে স্পন্দিত করা যায়, তা তার জানা নেই।

কিংবা কল্যাণই বুঝি অন্য ধাতুতে তৈরী। যে-ধাতু তার হৃদয়ের উত্তাপে গলবার নয়।

কিন্তু সন্ধ্যার পর ফিরতি ট্রেনে যাবার সময় কী করে একটা

আপনাকে নামতে হবে না

অঘটনই বুঝি ঘটে; তাপসীর সমস্ত হতাশাই যেন অমূলক প্রমাণ হয়ে যায়।

বিকেলের হিসেব দেখার পর্ব প্রায় নির্বিঘ্নেই পার হতে পেরেছে।

রবিমামা তাকে রাতটা থেকে যাবার অনুরোধ করেছে একবার। তাপসী মনের হতাশায় প্রায় রাজীই হয়ে গিয়েছিল। কী ভুলই তাহলে করত।

শেষ পর্যন্ত অফিসের কাজের দরুন রবিমামার অনুরোধ তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে।

কেন বলা যায় না, রবিমামা আর বিশেষ পীড়াপীড়ি করেননি।

যথাসময়ে সকালের সেই ছ্যাকরাগাড়িতে কল্যাণের সঙ্গে সে উঠে বসেছে। রবিমামা বাগানের এক রাশ তরি-তরকারী সঙ্গে দিয়েছেন জোর করে।

এ-সব নিয়ে যাওয়ার হাঙ্গামার কথা বলে কোন লাভ হয়নি।

"কেন, কল্যাণ আছে ত সঙ্গে।" রবিমামা তার আপত্তি খণ্ডন করে দিয়েছেন।

স্টেশনে পৌঁছে তাপসী টিকিট কেনবার টাকা দিয়েছে কল্যাণের হাতে। কল্যাণ টিকিট কিনে এনে খুচরো ফেরত দেবার সময় তাপসী অবাক হয়েছে একটু।

"ফিরতি ট্রেনের টিকিটের দাম কম নাকি!" হেসে জিজ্ঞাসা করেছে।

"কেন? কম হল কোথায়?"

"ফেরত যা দিলেন তা ত পাবার কথা নয়। হয় টিকিটবাবুই ভুল করেছেন, নয় আপনি!"

"না, ভুল কেউ করেনি।" বলে কল্যাণ টিকিট দুটো বার করবার পর রহস্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। টিকিট দুটির একটি প্রথম ও আরেকটি দ্বিতীয় শ্রেণীর।

"তার মানে?" তাপসী একটু ক্ষুণ্ণই হয়েছে। "আপনাকে কি দু'রকম টিকিট নিতে বলেছিলাম!"

"তা বলেননি। কিন্তু খরচটা যখন অফিসের, তখন আমার ত দ্বিতীয় শ্রেণীর বেশী পাওনা নয়।"

"পাওনা-দেনা সম্বন্ধে আপনি এত হিসেব করে চলেন! তাপসীর গলাটা একটু তিক্তই বলা যায়।

কল্যাণ কিন্তু হেসেছে সহজ ভাবে।

"চলার চেষ্টা ত করা উচিত। অনেক অস্বস্তি থেকে বাঁচা যায়।"

ইতিমধ্যে ট্রেন এসে পড়েছে। আর কোন কথার সুযোগ হয়নি তখন।

তাপসীর কামরা খুঁজে নিয়ে সেখানে তাকে উঠিয়ে আনাজের ঝুড়িগুলো তোলাতে তোলাতে গার্ডের হুইসল পড়েছে।

কল্যাণ নামতেই যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ তাপসী তার হাতটা ধরে ফেলেছে নিজের অজ্ঞাতেই বোধ হয়।

"কোথায় যাচ্ছেন এখন! ট্রেন ত ছেড়ে দিচ্ছে!"

"এখনও একটু দেরি আছে।"

তাপসী সচেতন হয়ে হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলেছে, "তা থাক, আপনাকে নামতে হবে না। আমি কি এই কামরায় একলা যাব নাকি?"

প্রথম শ্রেণীর কামরাটা সত্যিই একেবারে খালি।

কল্যাণ আর আপত্তি করে মিছামিছি কথা বাড়ায়নি। গাড়িও তখন ছেড়ে দিয়েছে।

বেশ খানিকক্ষণ আড়ষ্ট স্তব্ধতায় তারপর কেটেছে। অন্তত তাপসীর কাছে তা-ই।

দুদিকের দুই বেঞ্চিতে দুজনে বসে। জানলার সার্সিগুলো আগের কোন যাত্রীর কল্যাণে বন্ধ বলে ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে বাইরের আওয়াজও একটু বুঝি কম আসছে।

"কাজটা কিন্তু বে-আইনী করছি।" গাড়ির আওয়াজের দরুন একটু চেঁচিয়েই কথাটা বলে।

"বে-আইনী!" প্রথমে তাপসী বুঝতে পারে না। তারপর বুঝে হেসে বলে, "তাতে হয়েছে কী? মাঝে মাঝে একটু আইন ভাঙা ভাল। নইলে আইনের বাঁধনে অসাড় হয়ে যাবেন যে!"

"কিন্তু শাস্তিটাও মনে রাখবেন! এখন টিকিট-চেকার উঠে যদি আমায় ধরে, আর আপনি বলেন যে, আমায় চেনেন না, তাহলে আমার অবস্থাটা কী হবে ভাবুন! কাছে এখন উপরিও নেই যে গুনেগার দেব।"

কল্যাণের এই সহজ স্বাভাবিক চেহারাটা কোথায় যে লুকিয়ে থাকে! তাপসীর ভয় হয় পাছে আবার এই সুরটা কেটে যায়।

"আমার' ত অবস্থাটা দেখবার লোভ হচ্ছে!" হেসে বলে তাপসী।

"তার মানে আপনি আমায় চেনেন নাও বলতে পারেন। তা হলে অবশ্য আমাকেও আত্মরক্ষার অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। টিকিট দুটোই আমার কাছে এখনও। তার গায়ে কারুর নাম লেখাও নেই।"

"কিন্তু টিকিট-চেকারের পক্ষপাতিত্বটা কোন দিকে হবে, তা ভেবে দেখছেন না?"

"তা বটে!" কল্যাণ একটু হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "একে আপনি মহিলা, তার ওপর আমার চেহারা-পোশাক দেখেই শ্রেণী-বিভাগটা সে করে ফেলবে অনায়াসে।"

দুজনেই সহজভাবে হাসে। এ [illegible] তাপসীর আশাতীত। এই আলোকিত ট্রেনের কামরাটা শুধু বাইরের শীতের হাওয়ার বিরুদ্ধে নয়, বাইরের সব কিছু থেকে সার্সি তুলে যেন তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সেই অফিসের সম্পর্কের দূরত্ব, সেই নিজেদের উন্মোচন করার সংকোচ, কিছুই এখানে নেই। বিশেষ করে কল্যাণ এতখানি স্বাভাবিকভাবে কোন দিনই তার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেনি।

ভাগ্যও যেন তাদের সাহায্য করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

তরকারির ঝুড়িগুলো ঠিকভাবে বোধ হয় রাখা হয়নি। একটা আর-একটার উপর ট্রেনের ঝাঁকানিতে হঠাৎ কাত হয়ে পড়ে তরি-তরকারি কিছু কামরার মেঝের উপর গড়িয়ে যায়।

কল্যাণ আর তাপসী দুজনে দুদিক থেকে একসঙ্গেই উঠে পড়ে।

কল্যাণ আপত্তি জানিয়ে বলে, "আপনি আবার উঠছেন কেন? আমি তুলছি।"

"বাঃ এ কি পুরুষমানুষের কাজ নাকি?"

দুজনেই তখন মেঝের উপর বসে পড়ে পলাতক তরকারিগুলো উদ্ধারের চেষ্টায় লেগেছে।

কল্যাণ হেসে বলে, "পুরুষের কাজ কি না জানিনা; কিন্তু কাজের ভাগাভাগি কি আর আপনারা রাখতে দিলেন?"

ট্রেনের দোলায় এধার থেকে ওধারে গড়ানো আলুগুলো কুড়োনোই সব চেয়ে শক্ত।

তাপসী বিরক্তির ভান করে বলে, "রবিমামার জন্যেই এই সব হাঙ্গামা। তরি-তরকারি যেন কলকাতায় পাওয়া যায় না!"

"তরি-তরকারি পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে এই [illegible] কি!"

তাপসী সত্যিই একটু অবাক হয়ে

অশোকারিষ্ট
নারীর নষ্টশ্রী পুনরুদ্ধার করিয়া স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ করে।
শান্তিরস সালসা
বিশুদ্ধ রক্তপ্রবাহে দেহ ও মন প্রফুল্ল রাখে।
৪০।১৩, আপার চিৎপুর রোড
ব্রাঞ্চ—৬৩।২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কল্যাণের দিকে তাকায়। তারপর অসংকোচে বলেই ফেলে কথাটা। "আচ্ছা রবিমামাকে আপনার একটু খারাপ লাগে, না?"

"খারাপ?" কল্যাণ একটু অবাকই হয়। "খারাপ লাগবে কেন?"

"না; উনি ত আপনার সঙ্গে ঠিক ভাল ব্যবহার করেন না। একটু রূঢ়ই হন বলা যায়।"

"সে ত আমার ওপর নয়। বিদ্বেষটা ও'র অডিট ডিপার্টমেণ্টের ওপর। আমাকে উনি তার প্রতিনিধি হিসেবেই দেখেন।"

শুধু তাই কি? তাপসী ঠিক বুঝতে পারে না, কিন্তু কল্যাণের মনের এই বিক্ষোভহীন দিকটা তার বড় ভাল লাগে। ভাল লাগে আরও অনেক কিছুই। এই নির্জন গাড়ির কামরায় অত্যন্ত বিসদৃশভাবে মেঝের উপর উবু হয়ে বসে, কখনো বা হাঁটু গেড়ে বেঞ্চির তলায় হাত বাড়িয়ে গাড়ির ঝাঁকুনিতে অনবরত গড়িয়ে-পা..ন তরি-তরকারি একসঙ্গে সংগ্রহ করে তোলার মধ্যে এত মধুর উত্তেজনা যে আছে, কে জানত! ইচ্ছে করলে চেষ্টা করে একটু অসাবধান হয়ে অনায়াসে পরস্পরের দেহের স্পর্শও একটু পাওয়া যায়। কিন্তু লোভ তার অত সুলভ ও সামান্য নয়।

শুধু আনাজগুলো কুড়িয়ে তোলবার পর ঝুড়ি দুটো বেশ সাবধানে এক কোণে বসান হলে, তাপসী এবার নিজের সীট ছেড়ে কল্যাণের দিকেই গিয়ে বসে।

গাড়ির গতি মন্থর হয়ে আসছে। স্টেশন এসে পড়েছে। এ-স্টেশনেও কেউ উঠবে না এ-আশা করতে তাপসীর সাহস হয় না। ভাগ্যের এত করুণা কি সম্ভব!

কিন্তু দৈব আজ সত্যিই তাদের সহায়। স্টেশনে গাড়ি থামবার পর খানিকক্ষণ বেশ নির্বিঘ্নেই কাটে। কাঁচের সার্সির ভিতর দিয়ে তাপসী প্ল্যাটফর্মের উপর শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে রাখে, এ-কামরার দিকে কেউ আসছে কি না দেখতে।

"সার্সিটা নামিয়ে দেব?" জিজ্ঞাসা করে কল্যাণ।

"না, না, কিছু দরকার নেই।" তাপসী ব্যস্ত হয়ে আপত্তি জানায়।

"কিন্তু অত আগ্রহভরে দেখছেন কী?"

নিজের মুখের চেহারায় হয়ত ধরা পড়েছে ভেবে তাপসী একটু লজ্জিত হয়ে ওঠে প্রথমে। বলে, "দেখব আর কী! এমনি চেয়ে আছি!"

তারপর সামলে নিয়ে হেসে বলে, "দেখছিলাম আপনার টিকিটচেকার আসছে কি না।"

"আর তাতে ভয় পাই না। রেহাই পাবার রাস্তা বার করে ফেলেছি!"

"কিরকম "

"ওই তরকারির ঝুড়ি একটা দিয়ে দেব। জরিমানা বা ঘুস যা খুশি ভাবা যায়। সুতরাং আমার বা টিকিট-চেকার কারুর বিবেকেই বাধবে না।"

"কিন্তু স্বত্বাধিকারের আইনে বাধবে না একটু! রবিমামা ওগুলো আমাকেই দিয়েছেন বোধ হয়।"

"তা দিয়েছেন, কিন্তু এত কষ্ট করে যে কুড়িয়ে তুললাম তাতেও অর্ধেক দাবি আমার জন্মায়নি?"

"আইনে তা বলে না!"

"অমন আইন তাহলে শোধরান দরকার।"

শুধু কথা বলার আনন্দেই হাল্কা এই অর্থহীন কথা কাটাকাটি হয়ত আরও কিছুক্ষণ চলত কিন্তু হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে দুজনেই চমকে ওঠে।

ভারিক্কী চেহারার একজন—পোশাকে রেলের কর্মচারী বলেই মনে হয়—দরজা খুলে ভিতরে উঁকি মেরে দেখছেন গাড়ির পা-দান থেকে।

তাপসীর সব আশা ধূলিসাৎ হয় বুঝি।

দরজা খুলে ভিতরে উঁকি মেরে—

কিন্তু বয়স্ক ভদ্রলোক কী ভেবে আ ভিতরে পা না বাড়িয়ে নেমে যান। হয় মনে তাঁর একটু রঙ এখনও আছে। যৌবনে এই নিভৃত অবসরটুকু থেকে বঞ্চিত করে চান না।

গাড়ি ছেড়ে দেয়।

কথার সুরটা কেটে গিয়েছে, তবু মনে সুরটা যেখানে আছে, সেখানে জোড়া লাগা দেরি হয় না। টিকিট-চেকারের প্রসঙ্গটা খেই জোগায়।

"ভদ্রলোক টিকিট চেক করতেই বোধ উঠছিলেন।" হেসে বলে তাপসী।

"তাহলে নেমে গেলেন কেন?"

তাপসীর বলতে ইচ্ছে করে, আমার আ প্রার্থনায়। তার বদলে পাল্টা প্রশ্ন ক "আপনার কী মনে হয়?"

"বোধ হয় পাছে গোলমালে পড়তে এই ভয়ে। এই শীতের রাতে কে টিকি দাম, জরিমানা, এই সব হিসেব নিয়ে মাথা

করে। ধরা আর ধরা পড়ায় সমান হাঙ্গামা ত!"

দুজনেই হেসে ওঠে। কল্যাণ কপালের সেই উড়ো চুলগুলো ক বার হাত বুলিয়ে পিছনে সরিয়ে দিয়েছে, তাপসী বোধ হয় গুনেই ফেলেছে।

কী অসংগত নির্লজ্জ অদম্য একটা ইচ্ছার ঢেউ ওঠে ওই চুলগুলো একটু স্পর্শ করতে। সেই সংগেই মন একটা তীব্র ধিক্কার অবশ্য দেয় এই অন্যায় কামনার অসংযমে। কিন্তু তবু নিজেকে খুব অপরাধী যেন ভাবতে পারে না কিছুতেই। এই কামনাকে প্রশ্রয় দেবার সাহস তার নেই, তবু হৃদয়ের স্পন্দনে যে রক্তস্রোত আলোড়িত, এ-কামনা তার মতই পবিত্র সে অনুভব করে।

হঠাৎ অবান্তরভাবে তাপসী একটা প্রশ্ন করে বলে, "সাংসারিকএর কাজ আপনি বোধ হয় পারলে ছেড়ে দেন। না?"

কল্যাণ একটু অবাক হয় বটে; কিন্তু হাসি-মুখেই বলে, "ছাড়তে আর পারছি কই!"

"তার মানে ভাল কাজ কিছু যোগাড় হলেই ছেড়ে দেবেন, এই ত।"

"না, তাও কেমন করে বলি!" কল্যাণকে যেন ভেবে ভেবে কথা বলতে হয়, "আসল কথা এ-বিষয়ে কিছু ভাবিইনি বিশেষ। তা ছাড়া এখানে মন্দই বা আছি কী?"

"কিন্তু ধরুন আপনাকে যদি ভদ্রেশ্বরে বদলি করা যায়। রবিমামার সংগে আপনার ত সত্যিকার কোন বিরোধ নেই। অডিটএর সংগে সম্পর্ক না থাকলে কোন খিটিমিটিও বাধবে না।"

"তা হয়ত বাধবে না! কিন্তু ভদ্রেশ্বরে বদলি হতে যাব কেন?" কল্যাণের গলায় কৌতুক।

"আপনার লেখার সুবিধের জন্যে। কলকাতার চেয়ে কবিতা লেখার পক্ষে জায়গাটা ত অনেক ভাল।"

"কে বললে!" কল্যাণ হাসে, "লেখার জন্যে কি নির্দিষ্ট বিশেষ কোন জায়গা দরকার! শুধু মাঠ ঘাট নির্জনতা থাকলেই কবিতা হয়? আমি ত কলকাতা ছেড়ে কোথাও থাকতেই চাই না।"

একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গিয়ে যেন আপনার মনেই কল্যাণ বলে যায়, "নিছক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখবার চোখই বোধহয় আমার নেই। কলকাতা হয়ত খুব নোংরা, খুব বিশ্রী, বাড়িতে বাড়িতে মানুষে মানুষে এমন ঘেঁষাঘেঁষি যে, চোখ কি হাত-পা মেলবার জায়গা নেই। তবু আসলে আমি ভিড়ের মানুষ বলে ওইখানেই আমার মনের সাড়া পাই। এলোমেলো আঁকা-বাঁকা ছাদের রেখায় কাটাকুটি না হলে আকাশ আমার কাছে অপরূপ হয় না; রাস্তার ধারে মানুষের রাস্তার জঞ্জালের সংগে যা সাধ মেলায় সেই গাছই শুধু আমার কাছে অপরূপ; শহরের আলো জ্বলে না উঠলে রাত্রের তারাদের রহস্য আমার মনকে ছোঁয় না!"

কল্যাণ থেমে পড়ে একটু হাসে। না, উচ্ছ্বাসভরে এত কথা হঠাৎ বলে ফেলেছে বলে অস্বস্তির হাসি এটা নয়, মনের সহজ প্রসন্নতারই প্রকাশ।

হাতে হাতে তারা পরস্পরকে ছোঁয়নি কিন্তু মন যেন নিশ্চিন্ত স্নিগ্ধ সান্নিধ্যের মধ্যে মুক্ত করে দিয়েছে।

একটা গভীর ঘনিষ্ঠতার স্বাদ মনের মধ্যে না অনুভব করলে কল্যাণ কি এ-সব কথা এমন করে তাকে শোনাত!

কৃত্রিম যে ব্যবধানটা তাদের দূর করে রাখে, সেটা কি তাহলে এতদিনে সরল? তাই অন্তত মনে হয়।

কল্যাণই আবার কথা শুরু করে, "সাংসারিকএর কাজ নিয়ে আপনি অনেকবার আমায় প্রশ্ন করেছেন। হয়ত কাজটার আমি ঠিক উপযুক্ত নই, কিন্তু কাজ হিসেবে এটার ওপর আমার বিরাগ থাকতে পারে ভাবেন কেন? কাজ ত একটা কিছু করতে হবে। শুধু জীবিকার জন্যেও নয়। কবিতাই যদি লিখতে চাই, তাহলেও পৃথিবীর মানুষের কাজে হাত না মেলালে ত কবিতা লেখা যায় না। আর ভাল লাগার কাজই শুধু করতে চাইলে চলবে কেন? শুধু ভাল লাগার মশলায় জীবনটা ত গাঁথা যায় না। তাতে দানাই বাঁধে না।"

খানিকক্ষণ কারও মুখেই আর কোন কথা নেই।

গাড়ির দ্রুত চলার শব্দটা যেন নিস্তব্ধতারই একটা ইন্দ্রিয়গোচর রূপ।

একটা ছোট স্টেশন পার হয়ে যায় সে-শব্দের ছন্দে খানিক একটা রঙ বৈচিত্র্য এনে দিয়ে।

"একটা কথা বলব কি না ভাবছি!"

তাপসী চমকে ওঠে। একটু কষ্ট করেই বাইরে স্থির থেকে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে উৎসাহ দিতে হয়, "বলুন না!"

"আপনার সম্বন্ধে একটু অন্যায় কৌতূহল আছে আমার মনে। ভাল লাগার কথা বলছিলেন, যা আপনি করেছেন ও করছেন তাতে আপনি সম্পূর্ণ খুশী কি নন?"

"আপনার কী মনে হয়?" ঈষৎ হতাশাতেই তাপসীর গলার স্বরটা বোধহয় একটু স্তিমিত।

"এটা ত এড়িয়ে যাওয়া হল। এ প্রশ্ন করবার অধিকার নেই যদি মনে করেন, জবাব দেবেন না।"

তাপসী এবার হাসে। "অধিকার স্বীকার করলেই কি জবাব দেওয়া যায়! জবাব আমি নিজে পেলেই আপনাকে দিতাম। তবে আপনার মত [illegible] আমিও মনে মনে ও-কথাটা মানি যে, জীবনটা শুধু ভাল লাগার মশলায় গাঁথা যায় না।"

ট্রেনের শেষ দিকটার গভীর সুরটা স্টেশনে নেমেই হাল্কা হয়ে গেল।

কুলির মাথায় তরকারির চুবড়ি চাপিয়ে স্টেশনের বাইরে পর্যন্ত পেঁছে দিয়ে কল্যাণ বললে, "আপনাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি, দাঁড়ান।"

"আর আপনি?"

"আমি ত বাসেই চলে যেতে পারব।"

"তা কখনও হয়! কীরকম শিভ্যালরি আপনার, এই রাত্রে আমায় বাড়ি না পৌঁছে দিয়ে পালাতে চাচ্ছেন? আমি একলা যেতে পারব না।"

কল্যাণ হাসল, "এটা কি সাংসারিক লিমিটেডের প্রধান পরিচালিকার মত কথা হল?"

"প্রধান পরিচালিকা হলে ত তিনি হুকুম করতেও পারতেন।"

"পৌরুষে নিয়ে খোঁচা দেওয়ার চেয়ে হুকুম করা ভাল।"

কল্যাণ তারপর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। এই প্রথম তাপসীদের বাড়িতে তার আসা। তাপসী রাত্রে খেয়ে যেতে অনুরোধ করেছে, মাও তার সংগে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু কল্যাণ রাজী হয়নি।

"আমার দিদিটিকে আপনারা জানেন না। তাকে আগে থাকতে না জানিয়ে কোথাও খেয়ে এলে আর ক্ষমা করতে পারবেন না। আর একদিন বরং আসব।" বলে বিনয় দেখিয়েই কল্যাণ অব্যাহতি চেয়েছে।

"কিন্তু অন্য কোন দিন পর্যন্ত এত কাণ্ড যা বয়ে আনলেন সেই ভদ্রেশ্বরের তরকারির স্বাদ কি থাকবে!"

"বাজারের তরকারি কিনে ভদ্রেশ্বরের বলে চালালে অন্তত বুঝতে পারব না! রবিমামার আদরের স্বাদটা ত আমার জন্যে নয়।"

এমনি হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে কল্যাণ বিদায় নিয়েছে।

মা বলেছেন, "তোদের ওখানে চাকরি করে? দিব্যি ছেলেটি!"

নমিতা ফিকফিক করে একটু হেসেছে। হাসি চাপবার চেষ্টা করছে সে অনেক আগে থেকেই।

অমিতা বলেছে, "ছোড়দিটা যেন কী! তখন থেকে কী যে খুক-খুক করে হাসছে!"

তাপসীরও কৌতূহল হয়েছে এবার। মৃদু ভর্ৎসনার সুরে সে বলেছে, "সত্যি, তখন থেকে হাসছিস কেন রে নমু?"

এবার নমিতার হাসি আর বাধা মানেনি। হাসতে হাসতেই বলেছে, "তোমার কল্যাণ-

[illegible]

GOVERN... Cooch B...

"হ্যাঁ জানি। তাতে হাসবার কী হয়েছে!" নমিতা বলেই বোধহয় তাপসীর গলাটা রুক্ষ না হয়ে স্নিগ্ধই থাকে।

"ও'র লেখাগুলো মনে পড়ে হাসি পাচ্ছে! পড়েছ?"

"না, পড়িনি। তুই পড়েছিস না কি!"

"বাঃ, পড়িনি আবার। সত্যি দিদি, পড়লে না হেসে থাকতে পারবে না। দেখবে? নিয়ে আসব?" নমিতা উঠে দরজা পর্যন্তই ছুটে গিয়েছে।

"দাঁড়া, দাঁড়া!" তাপসী তাকে থামিয়েছে, "এখন আনতে হবে না। কিন্তু তুই কল্যাণবাবুর লেখা পেলি কোথায়।"

"আমাদের কলেজ ম্যাগাজিনে। উনি যে এককালে আমাদের কলেজেই পড়েছেন। পুরনো ছাত্র হিসেবে তাই লেখা দেন মাঝে মাঝে। আর আমাদের যা মজা হয়।"

"ও'র কবিতা নিয়ে সবাই ঠাট্টা করে বুঝি?" তাপসীর গলার স্বর বেশ ক্ষুণ্ণ।

"না দিদি, না।" অমিতা এতক্ষণে প্রতিবাদ করবার সুযোগ পেয়েছে। "ছোড়দি কবিতার কিছু বোঝে না, তাই। কল্যাণবাবুর সত্যি নাম আছে।"

"হ্যাঁ, তুই ত সব বুঝিস।" নমিতা ছোট-বোনকে ধমকে চুপ করিয়ে দিয়ে বলেছে, "ইচ্ছে হচ্ছিল ও'র কবিতার কটা লাইনের মানে জিজ্ঞাসা করি।"

"আচ্ছা, এর পর যে-দিন আসবেন, করিস জিজ্ঞাসা।" বলে তাপসী প্রসংগটা তখনকার মত থামিয়েছে।

খাওয়া দাওয়ার পর আবার কিন্তু কল্যাণের কথাই উঠল।

ঘুমোতে যাবার আগে তাপসীর ঘরে বসে খানিকক্ষণ গল্পগাছা করা অনেক দিন থেকে সকলের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে।

সংসারের অবস্থা ফিরবার পরই অবশ্য এই নতুন ধারা চলছে।

প্রথম প্রথম খারাপ লাগত একটু। বড়দা অনেক আগেই প্রায় আলাদা হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আর দুটো আসন যে শূন্য তা যেন কিছুতেই ভোলা যেত না।

এখন আর সে-কথা অবশ্য মনেই থাকে না।

মা চশমা চোখে দিয়ে এক কোণে বই পড়ছেন। পড়া নামেই, বইটা কোলের উপর রেখে গল্প করেন। নমিতা রেডিওতে যতরাজ্যের বাজে গান ধরবার চেষ্টা করে। অমিতার সংগে তাই নিয়ে তার রোজ ঝগড়া। অমিতা একটু গম্ভীর প্রকৃতির, সিনেমার গল্প বা গানের মত হাল্কা ছ্যাবলা জিনিস তার ভাল লাগে না। কিন্তু নমিতার চেহারা চরিত্র সবই আলাদা।

প্রাণের স্রোতে উচ্ছল জলের ধারার মত। গভীর হয়ত তেমন নয়, কিন্তু চঞ্চল বেগে ঝলমল করছে সারাক্ষণ। চেহারাও তার

কান যে ঝালাপালা হয়ে গেল!

চরিত্রের সংগে মানানো। ওই বয়সে তাপসী নির্মম দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত না হলে প্রায় যেমনটি দেখাতে পারত। তাপসীর মধ্যে যে দৃঢ়তার আভাস দিল, তা অবশ্য নমিতার নেই। নেই সেই শান্ত স্থৈর্যটুকু। নেই বলেই যেন সে আরও সহজে নির্বিচারে মানুষের মন গলায়, টানে। তাপসীর কাছে যে অতিরিক্ত অন্যায় আশকারা সে পায়, সেটা যেন তার ভাগ্যেরই পাওনা।

নমিতা, দিল্লি থেকে লখনউ, লখনউ থেকে সিলোন ধরতে রেডিওর চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চলেছে অনবরত।

তাপসী বিছানার উপরই আধ-শোয়া অবস্থায় কোলে একটা প্যাড নিয়ে চিঠি লিখবার চেষ্টা করছিল একটা। চিঠিটা গুছিয়ে লেখা শক্ত। লিখবার চেষ্টা করছে সেই এসে অবধি।

এক সময়ে একটু মৃদু ভর্ৎসনার সুরে

বললে, "একটু থামবি নয়! কান যে ঝালা-পালা হয়ে গেল! চিঠিটা লিখতে পারছি না মন দিয়ে।"

"বাবা-রে বাবা! তোমাদের জ্বালায় একটা ভাল গান শোনবার উপায় নেই।" নমিতা রেডিওটা বন্ধ অবশ্য করে দিলে তক্ষুনি। কিন্তু "কাল থেকে রেডিওটা আমার পড়ার ঘরে নিয়ে রাখব।" বলে ঝাঁঝটাও প্রকাশ করতে ছাড়লে না।

তাপসী হেসে চিঠি লিখবার প্যাডটা কোল থেকে নামিয়ে ফাউনটেন পেনটা বন্ধ করতে করতে বললে, "দরকার নেই আমার চিঠি লিখে! তুমি শখের গানই শোন।"

মা একটু অনুযোগ করলেন, "ওই করেই ত নমুর মাথাটা তুই খাচ্ছিস তাপসী। ওই ছাইপাঁশ গান রোজ দিন-রাত শুনছে। দুদণ্ড বন্ধ করলে কী হয়। ওর আদেখলে-পনার জন্যে আর কেউ কাজকর্ম করবে না।"

তাপসীই তার পক্ষ নিয়ে বললে, "বন্ধ করে ত দিয়েছে বাপু, কেন আর মিছিমিছি কথা শোনাচ্ছ। চিঠি লেখা আর আমার কিন্তু এখন হবে না নমু। তুই ইচ্ছে করলে গান শুনতে পারিস।"

"কেন তুমি কিছু বলতে যাও মা।" অমিতা ফোড়ন কাটল, "দিদির কাছে ছোড়দির কোন দোষ কখনও হতে পারে! সে যদি আমি হতাম, এতক্ষণ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হত।"

"হ্যাঁরে হিংসুটি! আমার হিংসের ত মরে যাচ্ছিস্।" বলে অমিতার খোঁপাটা একটু টেনে দিয়ে উঠে পড়ে নমিতা দিদির কাছে বিছানায় গিয়ে বসে পড়ল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা দিদি, ওই তোমাদের কল্যাণবাবুকে দিয়ে অফিসের কাজকর্ম হয়?"

"তার মানে!" তাপসীও অবাক! "কাজ-কর্ম না হলে অফিসে আছেন কেন? আর হঠাৎ এ-কথা মনে হলই বা কিসে?"

"এমনি! ও-রকম লোক কি অফিসের কাজ করতে পারে?"

"কেন, কবিতা লেখেন বলে?"

"হ্যাঁ, আবার ওই-রকম কবিতা?" কবিতার কথাটা মনে হতেই নমিতা আর একবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

"কবিতা যা-ই লিখুন," তাপসী একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করলে, "কাজ যা করবার ঠিকই করেন!"

"ঠিক ত? না তুমি আর এক রামপ্রসাদ বানিয়ে নাম কিনবে ভাবছ!"

"সে আবার কী?"

"এই উনি আফিসের খাতায় হিসেবের বদলে হয়ত ভুলে কবিতা লিখে ফেলছেন, আর তুমি কবে উনি আরেক ধুরন্ধর হবেন, সেই আশায় সে-সব জমিয়ে রাখছ?"

তাপসী হেসে ফেলল, "কবিতা উনি এখনও ভুলে কখনও লিখে ফেলেননি, লিখলে হয়ত জমিয়েই রাখতাম। কিন্তু তুই হঠাৎ কল্যাণবাবুর পেছনে লাগলি কেন!"

"তা লাগবে না!" অমিতাই চিমটি কাটলে, "ছোড়দির কাছে সিনেমার হিরো ছাড়া আর কেউ মানুষ বলে গণ্য নাকি!"

"হ্যাঁরে বইএর পোকা!" নমিতা পাল্টা খোঁচা দিতে ছাড়লে না, "তুই ত আবার মানুষও চিনিস না, খালি মলাট!"

সেদিন হাসা-হাসির ভিতর দিয়েই প্রসঙ্গটা শেষ হল।

পরের দিন অফিসে তাপসী একটু হেসে কথাটা আবার তুললে।

অফিসের তখন ছুটি হয়েছে। ইচ্ছে করেই তাপসী কল্যাণকে ছুটি হবার একটু আগে ডেকে পাঠিয়েছিল একটা কাজের ছুতোয়।

পাঁচটা বাজতেই খাতাটা বন্ধ করে বললে, "নাঃ, আজ থাক!"

"থাকবে কেন?" কল্যাণ আপত্তি জানাল, "কাজটা সেরেই ফেলুন।"

"নাঃ," তাপসী খাতাটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চেয়ারে ভাল করে হেলান দিয়ে বসল, "উপরি খাটলে আমায় ত আর কেউ উপরি মাইনে দেবে না।"

"উপরি পেতে হলে নীচে থাকতে হয়!" কল্যাণ ভদ্রেশ্বর থেকে ফেরার পর অনেক সহজ হয়েছে।

"তাই বুঝছি ক্রমশ।" বলে তাপসী একটু হাসল, তারপর একটু চুপ করে থেকে যেন সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, "অফিস থেকে এখন যাবেন কোথায়? বাড়ি!"

"বাড়ি!"—কল্যাণ একটু ভাবল, "না, বাড়িতে যাব না। এদিক ওদিক ঘুরে এক বন্ধুর কাছে যেতে পারি।"

"বন্ধু! কে বন্ধু? না, না, আমার প্রশ্নটা ভুল বুঝবেন না। বন্ধু মানে আপনার সেই চুনার যাবার সঙ্গী কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

"হ্যাঁ, সে-ই! হরিশ তার নাম।"

"হরিশবাবুও কি আপনার এক গোত্রের' মানে, লেখেন?"

"না!" কল্যাণ হাসল, "লিখতে যাবে কোন্ দুঃখে! সে লেখাপড়ার কোন ধারই ধারে না, তার ছোটখাট একটা কাঠের আসবাবপত্র তৈরির কারখানা আছে।"

"বাঃ, ভারী আশ্চর্য ত!"

"আশ্চর্যটা কী! কাঠের জিনিসের কারবার?" কল্যাণের মুখে কৌতুকের হাসি।

"বাজে কথা বলবেন না!" তাপসী বিরক্তির ভান করল, "আশ্চর্য বলছি আপনার বন্ধু পছন্দ।"

বলে যায় তুচ্ছ সব কথা, যান্ত্রিকভাবে

সোভিয়েট মোটর সাইকেল

V/O AVTOEXPORT
MOSCOW

ইউ. জেড—৪৯—৩·৫ অশ্বশক্তি
কে ৫৫—১·২৫ অশ্বশক্তি
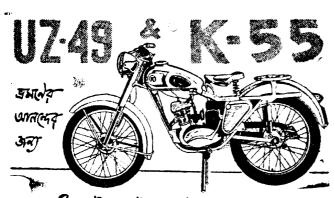
কম খরচের দিকে নজর রেখে এই সাইকেলগুলি প্রস্তুত—ওজনে হাল্কা মজবুত এবং এমন বহু বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যার দরুণ বিবেচক ক্রেতাগণ বিশেষভাবে এদের পছন্দ করে থাকেন।

সোল এজেন্টস্ :-
সাইকেল হাউস
১৭৪এ, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : ২৩-১২০৫

GOVE... Coo...

শুধু কথার পিঠে বলে যাওয়া মাত্র। কিন্তু মুখে যখন কথাগুলো, মন তখন তার অন্য এক বিস্ময়-বেদনায় মগ্ন। কিছুই জানি না, কিছু নয়! একটা কান্নার মত সুর কোথায় হৃদয়ের নেপথ্যে যেন বাজে। যার চেয়ে আপন বলে কাউকে মন মানতে চায় না, কতটুকু তার জানি! তার বর্তমান, তার অতীত, কিছু নয়। অথচ তার সবকিছু জানবার জন্যে হৃদয় ব্যাকুল, তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের স্পর্শ নিজের জীবনে অনুভব করতে উৎসুক।

কল্যাণ ইতিমধ্যে তার কথার জবাব দিয়েছে, সে শুনতে ভোলেনি।

"বন্ধু কি পছন্দ করবার জিনিস। যার সঙ্গে হবার, আপনা থেকে হয়। তা ছাড়া......"

"তা ছাড়া কী! আপনার সবই উল্টো. এই ত! হ্যাঁ শুনুন. বাড়িতে বোনেদের কাছে ত আর আমি মান থাকছে না, আপনার কবিতা না পড়লে!"

কল্যাণ হাসল, "মান বাঁচাতে মিছিমিছি বিপদ ডেকে আনবেন কেন! আপনার বোনেরা পড়েছেন নাকি আমার লেখা?"

"হ্যাঁ, পড়েছে। তাদের একজন আপনার ভক্ত, আর একজন শত্রু। আপনার কবিতার কথা মনে করতেই তার হাসি আসে।"

"খুব আশার কথা! আমার লেখা যদি বা কেউ দৈবাৎ কখনও পড়ে ফেলে, তার একটি-মাত্র ভাবাবেগই সাধারণত হয়। সেটি রাগ! সুতরাং হাস্যকর কারুর মনে হলে ত আমার সময় ফিরছে বলতে হবে।"

"সে যাই বলুন, আপনার লেখা আমায় না পড়ালে নয়। বোনেদের কাছে মুর্খ হয়ে আমি থাকতে পারব না। কোথায় কিনতে পাওয়া যায় বলুন. না হয় কিনেই নেব।"

"কিন্তু কিনবেন কী! আমার বইটই কিছু নেই।"

"বই নেই!"

"না। ছড়ান লেখা বইএর মধ্যে জড় করবার সাহস এখনও পাইনি।"

"বেশ, আপনার ছড়ান লেখাই দেখব। বাড়িতে নিশ্চয় আছে। চলুন, আপনার দিদির সঙ্গেও আলাপ হয়ে যাবে।"

"দিদি!"

কথাটা তখন থামাতে হল। বাইরে একটু কাশির আওয়াজ।

ডাঃ ভৌমিকই ঢুকলেন।

"না, সাংসারিক লিমিটেডএর পরমায়ু ফুরিয়েছে দেখছি।"

তাপসী ও কল্যাণ দুজনেই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করল। নিজের নির্দিষ্ট আসনটিতে বসে তিনি এদেরও বসবার ইঙ্গিত করলেন।

তাপসী হেসে বলল, "হঠাৎ এমন অলক্ষুণে কথা বলছেন কেন?"

একটি মুখ — শিল্পী শ্রীগোপাল ঘোষ

"বলছি, তোমাদের বাড়াবাড়ি দেখে!"

তাপসীর মুখটা আরক্ত হয়ে উঠল আপনা থেকে। এরকম আঘাত ডাঃ ভৌমিকের কাছে সত্যি অপ্রত্যাশিত।

ডাঃ ভৌমিক কিন্তু তখনও হাসছেন। মন্তব্যটা ব্যাখ্যা করে বললেন, "কাজে ফাঁকি দেওয়ার মত বেশী কাজ করাও মারাত্মক। ঘড়িতে পাঁচটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে! কল্যাণবাবুর ওপর একটু বেশী অত্যাচার হচ্ছে না!"

মন্তব্যটার আসল অর্থ হয়ত এ ছাড়া কিছু নয়। অন্তত তাই মনে করাই ভাল।

নিজেকে সামলে তাপসী হেসে বললে, "অত্যাচার কল্যাণবাবুর ওপর একটু করছি, কিন্তু অফিসের কাজের দিক দিয়ে নয়।"

একটু থেমে যেন নিজেকে শক্ত করে নিয়ে সে বললে, "কল্যাণবাবুর বাড়িতে আজ যাব ঠিক করেছি। সেই জন্যেই ও'কে বসিয়ে রেখেছি।"

"কোথায় থাকেন কল্যাণবাবু?" ডাঃ ভৌমিকের গলার স্বর সহজ সাধারণ। "আমি ত যাবার পথে তোমাদের পৌঁছে দিয়ে যেতে পারি।"

"না, না আপনাকে কষ্ট দেব না।" তাপসীর ভঙ্গিটা সৌজন্যের হলেও কণ্ঠে দৃঢ়তা।

"বেশ! সে তোমাদের যেমন অভিরুচি।" ডাঃ ভৌমিক হাসলেন। "আচ্ছা আমি চলি।" হাতের অ্যাটাচি থেকে একটা ফাইল বার করে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে ভৌমিক আবার বললেন, "এটা দিয়ে যেতে এসেছিলাম সময়মত দেখে রেখ। পরের জেনারেল

মিটিং-এ যা অদল-বদলের কথা তোলা দরকার সবই পাবে। আর একটা কথা, সে-চিঠিটা পাঠিয়েছ বোধ হয়।"

তাপসীর মুখে এবার অস্বস্তির ছায়া দেখা গেল।

"না, পাঠাইনি এখনও। লিখে রেখেছি।"

ডাঃ ভৌমিক একটু চুপ করে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "তোমার পক্ষে এ যে কতখানি কঠিন তা জানি। কিন্তু তোমায় দিয়ে এ-কাজ না করলে আঘাতটা আরও কঠোর, আরও রূঢ় হবে, এই আমার বিশ্বাস।" ভৌমিকের গলার স্বরে গভীর সহানুভূতির কোমলতা।

কথাটা বলে ডাঃ ভৌমিক আর দাঁড়ালেন না। অ্যাটাচিটা তুলে নিয়ে শুধু হাত তুলেই বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন।

খানিকক্ষণ কারও মুখেই কোন কথা নেই।

ঘরের আবহাওয়াটা কেমন বদলে গিয়েছে।

কিন্তু এই অস্বস্তিকর অবস্থাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। তাপসী জোর করে নিজেকে নাড়া দিয়ে সহজ হবার চেষ্টা করলে।

টেবিলের ড্রয়ারগুলোয় চাবি দিয়ে হাতের ব্যাগে সেটা তুলে উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বললে, "চলুন। আজ আপনার নিষ্কৃতি নেই।"

কল্যাণ অদ্ভুতভাবে একটু হাসল, "সত্যি যেতে চান!"

"সত্যি নয় ত কি ঠাট্টা করছি এতক্ষণ!" তাপসী বেল টিপল।

বেয়ারা এসে দাঁড়াবার পর বলল, "একটা ট্যাক্সি ডাকো।"

বেয়ারা চলে যেতে কল্যাণের মুখের হাসিটা লক্ষ্য করে বলল, "হাসছেন কেন?"

"হাসছি আপনার ট্যাক্সি ডাকায়। আমার বাসা এখান থেকে খুব দূর নয়। আর সে-গলিতে ট্যাক্সিও ঢোকে না।"

"বেশ, ট্যাক্সি ফিরিয়ে দিয়ে হেঁটেই যাব তাহলে। আসুন!"

তাপসী দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

"একটু দাঁড়ান।" কল্যাণের হাসিটা এবার একটু যেন কুণ্ঠিত। "বাড়িতে আমার দিদিও নেই।"

"দিদি নেই! কোথায় গেছেন তিনি?"

"কোনদিন ছিলেনই না, তা যাবেন কোথায়?" কুণ্ঠার চেয়ে কৌতুকটাই এবার বড় হয়ে উঠেছে কল্যাণের হাসিতে।

"তার মানে?" তাপসী ভ্রূকুটিভরে কল্যাণের দিকে তাকাল। রাগ করবে না হাসবে, সে নিজেও ঠিক করতে পারছে না।

"তার মানে, সেদিন দিদি একটি তৈরি করতে হয়েছিল আপনাদের সম্মান রক্ষার বেশ অনুরোধ এড়াবার জন্যে। সে-দিদির আবার যে প্রমাণ দরকার হবে, তা ভাবিনি।"

কী বলবে তাপসী? এক মুহূর্তের মধ্যে তার মনে অনেকগুলো অনুভূতি যেন এলোমেলোভাবে জট পাকিয়ে ভেসে যায়।

বানানো দিদির আবার প্রমাণ দরকার হবে, ভাবেনি কল্যাণ! তার কাছে সেদিনের সব কিছু একটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র যার আগুপিছু কোন ধারাবাহিকতা নেই। সেদিনের ঘটনার মধ্যেই সব কিছু সমাপ্ত। পিছনে তার জন্যে কোন প্রত্যাশা ছিল না, সামনে নেই কোন সুরের রেশ! না, না, তাপসী তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। অমন করে কল্যাণ নিজেকে তাহলে মেলে ধরত না তার কাছে। কল্যাণের চরিত্রের ধরনই এমনি অমিল উপাদানে মেশান। আর তা যদি বলতে হয়, তাহলে কার তা নয়। শুধু অক্ষম বানানো গল্পেই মানুষের শুধু একটা দিক আগাগোড়া একরঙাভাবে স্পষ্ট হয়ে থাকে।

তার ধারণার সমর্থন পেতে বুঝি খুব দেরি হল না।

"তা ভাবেননি!" কপট সুরটাই তাপসী গলায় রাখল "তার মানে ভেবেছিলেন, আপনাকে আর কোনদিন আমাদের বাড়ির সঙ্গে সংস্রব রাখতে হবে না। তার মানে আপনি অম্লান বদনে মিথ্যা বলতে পারেন!"

কল্যাণ ইচ্ছে করে শেষ কথাটারই জবাব দিলে, "তা মিথ্যা মাঝে মাঝে বলি বই কি। আজকাল পৃথিবীতে ও-অভ্যাসটা রাখা ভাল। আপনি কখনও মিথ্যা বলেন না বুঝি?"

এবার তাপসী হেসে ফেলল, "আমার সাজা দিয়ে আপনার কি সুবিধে হবে? আপনার দোষটা কাটবে তাতে?"

বেয়ারা এসে খবর দিলে, ট্যাক্সি এসেছে।

"ভালই হয়েছে!" তাপসী বললে, "মিথ্যার প্রায়শ্চিত্ত আপনাকে করতে হবে। দিদি যখন আপনার বানানো, তখন আমাদের বাড়িতেই চলুন আজ।"

"কিন্তু নিজের কীর্তির ব্যাখ্যা করতে হবে না ত? ওর চেয়ে শাস্তি আর কিছু কিছু নেই।"

"সেই শাস্তিই আপনার প্রাপ্য। চলুন।"

একরকম জোর করেই কল্যাণকে ধরে নিয়ে যাওয়া। তাপসীর মনে মনে কোথায় একটা সংকোচের গ্লানি তাই ছিল। কিন্তু সে-গ্লানি কিছুক্ষণের মধ্যেই বাষ্পের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এত সহজে এমন উৎসাহভরে কল্যাণ তাদের সঙ্গে মিশতে পারবে, তাপসী সত্যিই ভাবেনি।

বড়দা ও বৌদিকে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বাড়িতে দেখে প্রথমেই একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল। বড়দা সপরিবারে বাড়ির পাশের অংশেই থাকেন। একই ছাদের তলায়, কিন্তু ঢোকবার দরজার মত সবই প্রায় আলাদা। অসদ্ভাব নেই কিন্তু দূরত্বটা আছে। আসা যাওয়া চলে, কিন্তু ঠিক আত্মীয়তার স্তরে আপনার জনের মত নয়। ছেলেমেয়েরা দুরন্ত, বৌদি এই অজুহাতই দেন। বলেন, বাড়িতেও বন্ধ করে রেখে আসা যায় না, অথচ যেখানে যাবে জ্বালাতন করে মারবে। তাই নাকি যখন-তখন আসা যায় না। যুক্তিটা যে শুধু পরের বাড়ির বেলাতেই খাটে তা বোধ হয় বৌদির অজানা নয়। বৌদি পিছনে যা বলেন, তাও অবশ্য তাদের জানা। তাঁদের ছেলেমেয়েদের যখন গরিব-দুঃখীর মত মানুষ হতে হবে, যত আপনার জনই হক, বড়মানুষের সংস্রব তখন বেশী না রাখাই ভাল।

ও-সব পুরনো কথা। মনে যা-ই থাক, বাইরে কোনরকম গোলমাল নেই বললেই হয়।

ছেলেমেয়েরা অবশ্য দুরন্ত সত্যিই। দুরন্ত শুধু নয়, শিক্ষার শাসনের অভাবে একটু অসভ্যই বলা যায়।

আজকের মিলেই বাড়িতে তাদের দেখে তাপসীর তাই একটু আশঙ্কা হয়েছিল। কল্যাণ শেষে অতিষ্ঠই না হয়ে ওঠে। কিন্তু ব্যাপার যা হল তা ঠিক উল্টো।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই কল্যাণ যেন অনায়াসে সহজ হয়ে যেতে পারল। তাদের দুরন্তপনাই এ-পরিবারের সঙ্গে তার সংযোগের আড়ষ্টতাটা দিলে কাটিয়ে।

বড়দার সাথী তুলনা একটি ছেলে। কেউ কারও চেয়ে কম যায় না। চেনা-অচেনা, আপন-পর নেই, কথাবার্তাও যাচ্ছেতাই। ছোট ছেলেটি ত যাকে বলে একেবারে বিচ্ছু।

কল্যাণকে নিয়ে তাপসী যখন ঢুকল তখন সে একটা সোয়েটার আরম্ভ করে নিয়ে পরমানন্দে তার উপরই রং-টং ফেলে কী বদখেয়ালের সদ্ব্যবহার করছে। যে-ভাবে মুখ বাঁকিয়ে সে কল্যাণের দিকে তাকাল তাতে বোঝা গেল, এই নতুন উপদ্রবের আবির্ভাবে সে মোটেই প্রসন্ন নয়। তবে বড় দিদি তখন তাপসীকে জোরে ধরে তার ব্যাগটা কাড়াকাড়ি করার চেষ্টা করছে।

কল্যাণ এক মুহূর্তেই পরিবেশটা [illegible] বুঝে নিল, তারপর প্রথম সম্ভাষণ ও পরিচয়ের পর্ব তাড়াতাড়ি শেষ করেই গিয়ে বসল ছেলেটির কাছে সোয়েটার এক পাশে রেখে জিজ্ঞাসা করল "কী নাম তোমার খোকাবাবু?"

খোকাবাবু বিরক্তির সঙ্গে তাকিয়ে জবাব দিলেন না। কিন্তু দিদিরা তখন তাপসীর ব্যাগ-কাড়াকাড়ির চেয়ে ভাল শিকারের সন্ধান পেয়ে মামার উপর এসে পড়েছে। বড়টি নিজে থেকেই পরিচয় দিল, "ও

GOVER
Cooch B

অবজ্ঞাভরে...জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কে?"

নাম সতু, আমার নাম রানী আর এইটের নাম পেত্নী।"

"হ্যাঁ পেত্নী! তুই পেত্নী!" দুই বোনে সেইখানেই চুলোচুলি লেগে গেল তৎক্ষণাৎ। সতু তারই মধ্যে নির্বিকারভাবে আঙুলের নখ চুষতে চুষতে, অবজ্ঞাভরে কল্যাণের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কে?"

"আমি? দাঁড়াও, কাল ত ছিলাম কেরানী।" বলে পকেট থেকে নোটবইটা বার করে যেন অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কল্যাণ বললে, "আজ পুলিশ না ডাকাত কী হব এখনও ঠিক হয়নি।"

"ধোৎ!" বলে এ্যাটো হাতেই এক ঝটকায় নোটবইটা কেড়ে নিয়ে সতু বললে, চালাকি হচ্ছে, না? দেখি কী লেখা আছে!"

এরকম একটা মুখরোচক ব্যাপারে দুই বোনের চুলোচুলি তখন থেমে গিয়েছে। সতুর নোটবইটার উপর দখলও ক্ষণস্থায়ী। সেটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে রানী বললে, কী লেখা আছে না ছাই! গল্প ঝাড়ছে বুঝতে পারছিস না! তুই যেমন বোকা!"

বোকা হক না হক, সতু তার দখল ছাড়াতে ক্ষিপ্ত, ছোট বোনও সেই সঙ্গে নোটবইটির উপর দাবি পেশ করতে ব্যগ্র। বিশেষ কায়দায় নোটবইটি পুনরুদ্ধার করে তৃতীয় মহাযুদ্ধ নিবারণ করে কল্যাণ গম্ভীরভাবে বললে, "আচ্ছা কে তোমাদের মধ্যে বোকা দেখি! বুদ্ধির বাসাগুলো দেখতে হবে।"

"কোথায়—?" বড় মেয়েটি বেশ সন্দিগ্ধ।

"কোথায় আবার, মাথার ভেতরে।"

"ফের গুল দিচ্ছে রে!" ছোট বোন মন্তব্য করলে। কিন্তু বড় তাকে ধমক দিয়ে উঠল, "থাম না! শুনিই না কী বলে। মাথার ভিতরে দেখবে কী করে?"

"বাঃ কানের ফুটোগুলো আছে কী করতে?" কল্যাণ ছোট বোনটিকে কাছে টেনে নিলে। সে বাধা দেবার চেষ্টা করে প্রতিবাদ জানালে প্রবলভাবে, "হ্যাঁ, কানের ফুটো দিয়ে আবার বুদ্ধি দেখা যায়!"

"বুদ্ধি না থাকলে যায় না। বুদ্ধি না থাকলে দেখিও না।"

এরপর আর কারও দিক দিয়ে আপত্তি এল না। পাছে বুদ্ধি নেই বলে প্রমাণ হয়ে যায় এই ভয়েই বোধ হয়।

এমনি করেই আরম্ভ। তারপর তাদের গল্প বলে, নতুন খেলা শিখিয়ে, ম্যাজিক দেখিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই কল্যাণ এমন বশ করে ফেলবে কে ভাবতে পেরেছিল। নেহাত বৌদির বকাবকি রাগারাগিতে যখন নিতান্ত অনিচ্ছায় তারা গেল, তখন বাড়ির আবহাওয়াই বদলে গিয়েছে।

অনেকদিন এ-বাড়িতে এমন স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের স্রোত বুঝি বয়নি।

মা-ই কল্যাণকে রাত্রে খেয়ে যেতে অনুরোধ করলেন, "আজ আর তোমার কোন কথা শুনছি না! তোমার দিদি যদি রাগ করেন, তাহলে আমার নামেই দোষ দিও না হয়।"

কল্যাণ একটু হেসে তাপসীর দিকে চাইল, তারপর বললে, "না, আজ আর দিদির রাগ করবার উপায় নেই।"

মা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "ও, দিদিকে তাহলে বলে এসেছ? খুব ভাল।"

আর মিথ্যেটাকে চালিয়ে রাখা যায় না বুঝি।

নমিতার দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, সে হেসে বলে উঠল, "না মা না, দিদির সঙ্গে চোখো-চোখিতে বুঝতে পারছ না? আর একটা কী ব্যাপার আছে!"

"যা আছে থাক, আজ যে খেয়ে যেতে আপত্তি করেনি, তাই আমার যথেষ্ট।"

"না মাসিমা, তা ঠিক যথেষ্ট নয়।" কল্যাণ 'মাসিমা' সম্বোধনটা এই প্রথম ব্যবহার করলে, "আপনার কাছে একটু মাপ চাওয়ার দরকার আছে।"

"কেন বাবা! মাপ চাইবার মত কিছু ত করনি।"

"করেছি মাসিমা। আপনার কাছে কাল মিথ্যে কথা বলেছিলাম," একটু থেমে কল্যাণ একটু কুণ্ঠিতভাবে হেসে বললে, "বাড়িতে দিদি বলে আমার কেউ নেই। বাড়ি নয়, আমি মেসেই থাকি।"

এমন সুযোগ মা কি আর ছাড়েন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এবার প্রশ্ন শুরু হল। কোথায় কে আছে না আছে সব কিছু সম্বন্ধে।

মার এই সেকেলে কৌতূহল একটু খারাপ লাগলেও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়েও পারা যায় না। কল্যাণকে এভাবে প্রশ্ন করে তার পরিচয় নেওয়া ত তাপসীর পক্ষে সম্ভব হত না এখন।

বেশী কিছু কল্যাণের অবশ্য বলবার নেই। এইটুকু শুধু জানা গেল যে, দিদিটি তার নিছক কল্পনা নয়। দিদি তার সত্যিই একজন ছিলেন। মা-বাবা-মরা ছেলে, দিদির কাছেই মানুষ হয়েছে। বড় হয়ে এসেছিল কলকাতায় পড়তে দিদি-ভগ্নীপতিরই সাহায্যে। পড়াশুনা শেষ হবার আগেই দেশের সেই নিদারুণ দুর্দিন এল। উন্মত্ত হিংসার তাণ্ডবে সব কিছু গেল লণ্ডভণ্ড হয়ে। দিদিরা যেখানে থাকতেন সে-অঞ্চলে তখন আগুন জ্বলে উঠেছে। সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করে দিদিদের নিরাপদ জায়গায় আনবার জন্যে সে সেখানে যখন গিয়ে পৌঁছল, তখন খবর পেলে, তাঁরা আরও অনেক বিপন্ন গ্রামবাসীর সঙ্গে একটি নৌকোয় করে রওনা হয়ে গিয়েছেন কয়েকদিন আগে। সে-নৌকোর আর কোন সন্ধান তার পর মেলেনি। গুজব অনেক রকম শুনেছে। কোনটা তার সত্য, জানবার কোন উপায়ই আর নেই।

কথা শেষ করে কল্যাণ কয়েক সেকেণ্ড যেন অন্যমনস্ক হয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। ঘরের কারও মুখেই কথা নেই।

কল্যাণই প্রথম একটু ম্লান হেসে বললে, "এ ত আর শুধু আমার একার ইতিহাস নয়। কত লক্ষ মানুষ আমার চেয়ে অনেক বেশী ঘা খেয়েছে। দেশের বুকের সেই ঘা আজও দগদগ করছে সমানভাবে।"

এরপরও কিছুক্ষণ সমস্ত ঘর স্তব্ধ।

কথাটা বুঝি না তুললেই হত।

কল্যাণ নিজেই আবহাওয়াটা হাল্কা করে আনলে। তাপসীর দিকে ফিরে বললে, "আসল কথাটাই কিন্তু এখনও জানা হয়নি। এ-বাড়িতে আমার শত্রু-মিত্র দুই-ই আছে বলেছিলেন না! শত্রু-মিত্র কই, চিনিয়ে দিলেন না ত!"

অন্য সবাই একটু অবাক।

মুখ টিপে হেসে অমিতা-নমিতার দিকে চেয়ে তাপসী রহস্যজনকভাবে বললে "সেটা চিনিয়ে দেওয়া কি উচিত হবে? মিত্রের আপত্তি না থাকতে পারে, কিন্তু শত্রু একটু অসুবিধায় পড়বে বোধ হয়।"

নমিতা প্রথমটা একটু বিমূঢ় হয়েই দুজনের দিকে চেয়েছিল। তারপর ব্যাপারটা বুঝে লজ্জায় রাগে মুখ রা করে একেবারে যেন কাঁদো-কাঁদো হয়ে উ দাঁড়াল।

"এ তোমার খুব অন্যায় দিদি! না, আ এখানে, থাকব না।"

সে উঠে প্রায় চলেই যায় আর কি।

"আরে শোন শোন!" তাপসী হাস হাসতে তাকে ডাকল, "আমি কিছু বলতে তুই ত নিজে থেকেই ধরা দিলি।

"না, তোমার সব বলে দেওয়া অত্য অন্যায়!" নমিতা অভিমানভরে ফি দাঁড়াল।

"যদি বলেই থাকি ত দোষটা কী তাে তুই ত নিজেই কবিতার মানে জিজ্ঞাসা কর বলেছিলি।"

"বলেছিলামই ত!" নমিতা এখন মরিয় আরক্ত মুখে ফিরে এসে নিজের জায়গ বেশ তেজের সঙ্গে বসে বললে, "এখনও বলছি, আপনার কবিতার কোন মানে ! না।"

"এই কথা!" কল্যাণ যেন নির্বিক "এ-কথার জন্যে আপনি শত্রু হতে যাে কেন? এ-রকম প্রশংসা পেলে ত বে যাই।"

আমি অসলার—উজ্জ্বল আলোর প্রতীক--

নমিতা সন্দিগ্ধভাবে ভুরু কোঁচকালে, "তার মানে? এটা প্রশংসা হল নাকি?"

"ভাবছেন, ঠাট্টা করছি!"—কল্যাণের কথার ধরন অত্যন্ত যেন ধীরস্থির, "মোটেই না। মানে কিছু হলেই আমাদের লেখা একেবারে মাটি, তা জানেন? তাহলেই একেবারে সেকেলে হিসেবে বাতিল হয়ে গেলাম। পাছে মানে হয়ে যায় বলে কী ভয়ে ভয়ে যে থাকতে হয় তা ত জানেন না।"

নমিতা এবার ক্ষিপ্ত, "আমাদের রানী-মিনি-সতু পেয়েছেন!"

কিন্তু তার মন্তব্যটা সকলের হাসিতে চাপাই পড়ে গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর কল্যাণ বিদায় নিয়ে চলে যাবার সময় তাপসী একলাই তাকে নীচে এগিয়ে দিতে নেমে গেল।

"আপনি আবার কেন আসছেন?" একবার মৃদু প্রতিবাদ জানালে কল্যাণ।

"বাড়ির আমিই 'এখন' কর্তা তখন অতিথিকে আমি ছাড়া কে এগিয়ে দেবে!"

নীচে নেমে এসে বড় অপরূপ লাগল রাস্তাটা।

শীতের রাত একটু গভীরই হয়েছে। রাস্তাটা প্রায় নির্জন। দোকান-পাট এমনিতেই এ-রাস্তায় কম। তাও যা আছে, অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দূরে মোড়ের মাথায় ডিসপেন্সারিটার লাল নীল বোতল সাজান শো-কেস-এর আলোগুলো যেন এই নীলাভ অন্ধকারে ছন্দ-পতনের মত। বিকেল থেকে একটা কনকনে হাওয়া শীতটাকে শুধু ধারালো করে তোলেনি, আকাশটাকেও যেন ধোঁয়াটে কুয়াশার আবরণ সরিয়ে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। সামনের বড় বড় বাড়িগুলোর মাথার উপর দিয়ে যেটুকু দেখা যায় তাতে মনে হচ্ছে, ঝকঝকে তারাগুলো যেন রূপালী নূপুরের মত এখুনি বেজে উঠবে।

একটুখানি পাশাপাশি দুজনে দাঁড়াল। কিন্তু তাপসীর মনে হল, এই মুহূর্ত কটির ইঙ্গিতে যেন সমস্ত ভবিষ্যতে প্রসারিত হয়ে গিয়েছে।

"যাবেন কী করে? একটা রিকশও ত দেখছি না।"

"রিকশয় আমি চড়ি না।"

"তাহলে—?"

"তাহলে আবার কী? হেঁটে যাব।"

"হেঁটে এই এতখানি পথ! না না, একটু এগিয়ে গেলেই ট্যাক্সি পাবেন নিশ্চয়।"

"পেলেও গাঁটের পয়সা খরচ করে এত বড় এক সুখ বিলিয়ে দেব ভাবছেন! কলকাতার শীতের রাত্রের নির্জন রাস্তায় হাঁটবার সৌভাগ্য ত রোজ রোজ হয় না।"

এবার তাপসী হাসল। বললে, "এটা একটু বাড়াবাড়ি হল না? আর যদি রাত্রে হাঁটবার শখ ত রোজ রাত্রে হাঁটলেই পারেন! আপনাকে কেউ ত বেঁধে রাখে না।"

"তা রাখে না। কিন্তু রোজ হাঁটলে ত সেটা অভ্যাস হয়ে যাবে! অভ্যাসে কোন কিছুর দাম আর থাকে! আমি সেই ভয়ে ভোরে পর্যন্ত রোজ উঠি না, পাছে সূর্য ওঠার বিস্ময় ফুরিয়ে যায়।"

"আপনার মনের পালিশ তাহলে খুব পাতলা বলুন, একটুতেই রঙ চটে যায়!"

"তা হতে পারে। সুতরাং পালিশ বাঁচিয়ে চলাই ভাল।"

"না, বাজে কথা বলে আর আপনার দেরি করিয়ে দেব না।" তাপসী হাসলে।

"দেরি ত আপনাদেরও করিয়ে দিলাম। এত দেরি নিশ্চয়ই আপনাদের সাধারণত হয় না!"

কত কথাই বলা যায়, কিন্তু এখনও তার সময় বুঝি আসেনি। তাপসী তাই নিজেকে সম্বরণ করে শুধু বললে, "সব দিন ত আর একরকম নয়।"

"আচ্ছা চলি!"

কল্যাণ নমস্কার করে যাবার উদ্যোগ করতেই তাপসীর মুখ থেকে কথাটা বুঝি আপনা থেকে বেরিয়ে গেল।

"আশা করি খুব খারাপ লাগেনি আজ?"

কল্যাণ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, "না। খারাপ লাগবে কেন? তাহলে ত আমিও সে-কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি। সারাক্ষণ কী বকবকই করেছি!"

"যা-ই করে থাকেন, বাড়ির সবাইকে ত বশ করে ফেলেছেন দেখলাম।"

"তাই নাকি?"

"বুঝতে পারেননি! আশা করি আজ যা-যা বলেছেন তার সবটাই অন্তত বানান নয়।"

"না, তা নয়, তবে..." বলে একটু থেমে কল্যাণ যেন আরও গভীর অন্য সুরে বললে, "তবে একটা গল্প যেন আজ থেকে বানান যেতে পারে মনে হচ্ছে।"

আর এক মুহূর্তে না দাঁড়িয়ে কল্যাণ সোজা সামনে বেরিয়ে চলে গেল।

তাপসী দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে বেশ কিছুক্ষণ। স্তব্ধ—কী এক দুর্বোধ্য আনন্দের শিহরনে অবশ হয়ে।

একটা চড়া হেডলাইট-জ্বালা মোটর রাস্তার স্তব্ধতা চুরমার করে চলে যাবার পর সে বাড়ির দিকে ফিরল।

তখনও তার মন কিন্তু আগের সুরেই বাঁধা।

আজকের উজ্জ্বল তারা-ছিটান আকাশের তলায় এই তন্দ্রাতুর শহরে জীবন-বিধাতা কোন এক নতুন গল্প বানাবার বুঝি খেই ধরেছেন।

রাতে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ তার চোখে ঘুম এল না।

এ-অনিদ্রা কিন্তু একটা মধুর বিলাস।

খানিক বাদে টের পেল, পাশের খাটে মাও জেগে আছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "এখনও ঘুমোসনি?"

"না।"

মা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ কোন ভূমিকা ছাড়াই বললেন, "বেশ ছেলেটি!"

তাপসী নিরুত্তর।

মা-ই নিজের মনে বলে চললেন, "কিন্তু কেউ কোথাও নেই, রোজগারও ত শুধু তোদের ওখানে চাকরিটুকু...!"

"তাতে আমাদের কী?" তাপসী হাসল নিঃশব্দে।

"না, কিছু নয়। তবু নমুর জন্যেই ভাবনা একটু হয় বই কি! ওকে যা আহ্লাদী শৌখিন করে তুলেছিস তুই..."

তাপসী জোরেই হেসে উঠল এবার। "তুমি থাম ত মা। রাত দুপুরে আর ভাববার কিছু পেলে না!"

মা নীরব হলেন।

* * *

তাপসী চিঠিটা অনেক কষ্টে, অনেক কাটাকুটি করে লিখে ফেলেছে। কিন্তু লিখেও পাঠান আর হয়নি।

দ্বিধা আর করবে না বলে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে চিঠিটা খামে ভরে নিজেই সেটা আটা দিয়ে এঁটে অফিসের 'আউট-ট্রে'তে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু বেয়ারা এসে সেগুলো ডাকে দেবার জন্যে নিয়ে যাবার সময় আর স্থির হয়ে থাকতে পারেনি। ডেকে তাকে দাঁড় করিয়েছে। তারপর ওই চিঠিটাই বেছে তুলে রেখে দিয়েছে ড্রয়ারে।

ডাঃ ভৌমিক নিশ্চয়ই চিঠির কথাটা আবার তুলবেন। এবার আর কী অজুহাত দেবে চিঠি না পাঠাবার, এখনও ভেবে ঠিক

বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম এনেছে ট্রে-তে করে, সঙ্গে কিছু স্যান্ডউইচ। কথাটা ওইখানেই তাই চাপা পড়েছে।

"চা-টা আপনিই তৈরি করবেন নাকি?" ভৌমিক আদেশটাতে অনুরোধের সুর দিয়েছেন।

তাপসী চা তৈরি করতে উঠে দাঁড়িয়েছে।

"উঠে দাঁড়ালেন কেন?" ভৌমিক সত্যিই যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন একটু।

"বসে ঠিক সুবিধে হয় না। টেবিলটা উঁচু।"

"আপনার পক্ষেও? সাধারণ বাঙালী মেয়ের চেয়ে আপনি ত বেশ লম্বা।"

আলাপটা একটু যেন ব্যক্তিগতই হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নিজের উপর ডাঃ ভৌমিকের দৃষ্টিটা এই যেন প্রথম অনুভব করে বেশ একটু অস্বস্তির সঙ্গেই তাপসী কথাটাকে ওইখানেই শেষ করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, "আপনার চিনি ক চামচ দেব?"

"চামচ দুই দিন।" ভৌমিকের মুখে ঈষৎ হাসির আভাস, "বেশী দিলেও অবশ্য আপত্তি নেই।"

"সে কী? কতটা লাগে তার কিছু ঠিক নেই!" তাপসী ডাঃ ভৌমিকের মুখ থেকে এরকম কথা শোনবার সত্যিই যেন আশা করেনি। কিন্তু মন্তব্যটা করে ফেলেই অনুতপ্ত হয়েছে। এ অনধিকার চর্চার দরকার ছিল না।

"না থাকাটা আশ্চর্য মনে হচ্ছে?" ডাঃ ভৌমিক আবার একটু হেসেছেন, তারপর আধা-কৌতুক আধা-গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলেছেন, "সব কিছুতেই কি হিসেব ঠিক রাখা যায়! বেঠিক হওয়ার সাধ ওই ছোট-খাট ব্যাপারেই হয়ত মেটাই।"

অবান্তর, প্রায় অপ্রাসঙ্গিক কথা। এ-ধরনের কথা তাকে শোনাবার মত সম্পর্কও গড়ে ওঠেনি তাদের মধ্যে। ক্ষমতাবান বড়-লোকের একরকম খেয়াল বলেই তাপসীর কথাটা নেওয়া উচিত। একরকম স্বগত উক্তি। কাজের ক্লান্তি কাটাবার অবসরে নেহাত অনুগ্রহ করে অধীন কাউকে কাছে পেলে শোনানো।

চা তৈরি শেষ হলে পেয়ালা সামনে নিয়ে বসবার পর ডাঃ ভৌমিক ব্যক্তিগত প্রসঙ্গই আবার কিন্তু তুলেছেন। তুলেছেন একেবারে সোজাসুজি।

"আপনার বাবা যে নেই, দরখাস্তেই জেনেছি। বাড়িতে আর কে কে আছেন?"

"মা, দুই ছোট বোন, আর বড়দা।" উত্তর দেওয়ার ধরনে তাপসী তার মনের ভাব বিশেষ গোপন রাখেনি। এসব প্রশ্নের কোন প্রয়োজন আছে বলে সে যে মনে করে না, তা খানিকটা স্পষ্টভাবেই বুঝতে দিয়েছে। সংসারের ভার তার যেমনই হক, সেই কাঁদুনি গেয়ে চাকরির অনুগ্রহ সে চায় না।

ভৌমিক কিন্তু তার সংক্ষিপ্ত উত্তরে স্বরের কাঠিন্যটুকু গ্রাহ্য করেননি। জিজ্ঞাসা করেছেন, "বড়দা কিছু করেন?"

"করেন।"

"বোনেরা পড়ছে বোধহয়!"

"হ্যাঁ।" গরম হলেও কয়েক চুমুকে জোর করে চা-টা শেষ করে তাপসী জিজ্ঞাসা করেছে, "আমায় আর কিছু কি বলবেন?"

"বলতাম!" ডাঃ ভৌমিকের মুখে অদ্ভুত একটু হাসি, "কিন্তু আপনি ত ওঠবার জন্যে ব্যস্ত মনে হচ্ছে।"

কোহিনুর সিল্কেই তাঁর রূপ খোলে

"হ্যাঁ, শর্টহ্যান্ড স্কুলে দেরি হয়ে যাবে যেতে।"

ডাঃ ভৌমিক দেয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলেছেন, "দেরি ত যা হবার হয়েই গেছে। আর আমি না হয় যাবার পথে পৌঁছে দিয়ে যাব।"

"না না, আপনি পৌঁছে দেবেন কী!" তাপসী লজ্জিত হয়েছে এবার। "আজ না হয় যাব না।"

"সেই ভাল!" সকৌতুক দৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ডাঃ ভৌমিক বলেছেন, "তাহলে আর এক পেয়ালা চা ঢালুন, স্যান্ডউইচ ত ছোঁননি একটাও।"

তাপসী আর আপত্তি না করে ভৌমিকের কথা রেখেছে। অনুগ্রহ সে চায় না সত্যিই, কিন্তু এ-চাকরি না গেলে সে খুশীই হৈবে, এ-কথা অস্বীকার করতে পারে না। ডাঃ ভৌমিকের ব্যবহারে সেই আশ্বাসই যদি থাকে, তাহলে অকারণে সে তাঁকে বিরূপ করে তুলবেই বা কেন?

খানিকক্ষণ কোন কথা আর হয়নি।

তারপর ডাঃ ভৌমিক হঠাৎ বলেছেন, "শর্টহ্যান্ড শেখাটা আপনাকে আপাতত ছাড়তে হবে।"

তাপসীর বিস্মিত সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে আবার বলেছেন, "অবশ্য এখানে কাজ করবার যদি আপনার ইচ্ছা থাকে।"

"ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা। ইচ্ছে আমার নেই এমন কথা ত বলিনি। কিন্তু কাজ আমায় দিয়ে যখন হচ্ছে না..."

ভৌমিক বাধা দিয়েছেন, "হচ্ছে না ঠিকই। কিন্তু হতে পারে কি না তাই আর একটু দেখতে চাই। আপনার কাজ তাই একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি।"

হেঁয়ালি দিয়ে এ কী রকম পরিহাস! তাপসীর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে সন্দেহে।

ডাঃ ভৌমিক সেটুকু যেন উপভোগ করেই রহস্যটা পরিষ্কার না করে বলেছেন, "আজ আপনি আসতে পারেন। কাল অফিসে এসেই সব জানতে পারবেন। একটু বেলা করেই না হয় আসবেন।"

বেশ বিমূঢ়ভাবেই তাপসী সেদিন বাড়ি ফিরে গিয়েছে।

নতুন ব্যবস্থা পরের দিনই জানা গি[illegible]।

এক দিক দিয়ে এ-ব্যবস্থা তার আ[illegible]।

[illegible] অফিসের ব্যাপারে তাকে সাহ[illegible] জন্যে একজনকে নেওয়া হচ্ছে [illegible] তাই টিফিনের পর এসে শ[illegible] [illegible]রক করলেই চলবে। কি[illegible]। এ-ঘরে [illegible] [illegible] করে দিয়ে তাকে পারেন। [illegible] নিজস্ব অনেকগুলো কাজে [illegible] হয়েছে। অফিসের ছুটির [illegible] [illegible] থাকতে হবে। [illegible]

ডাঃ ভৌমিকের [illegible] [illegible]

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই সম্বন্ধ নয়। অফিসে আসার পর কিছু কিছু শুনেছে, এখন আরও ভাল করেই জানতে পারে যে, ছোট বড় আরও নানা ব্যাপারে তিনি জড়িত। ভৌমিকের ব্যক্তিগত জীবনের কথাও কিছু কিছু তার কানে এসেছে। জীবনে যারা যে-কোন দিকে সাফল্যের চূড়ায় ওঠে, তাদের নামের সঙ্গে সত্যমিথ্যা জড়ান কল্পনা মিশে থাকা স্বাভাবিক। নিন্দুকেরা তাঁর ক্ষমতা স্বীকার করেও বলে যে, তিনি নাকি নিজের স্বার্থসুখ ছাড়া জীবনে আর কিছু জানেন না। নিজের উন্নতির জন্যে সব কিছু তিনি বিসর্জন দিয়েছেন। স্নেহ মায়া ভালবাসা বলে কিছু তাঁর অভিধানে নেই, বিয়েও পর্যন্ত করেননি তাই। পৃথিবীতে তিনি নিঃসঙ্গ।

ভক্তেরা অনেক রকম কথাই বলে। এক-কালে গুপ্ত বিপ্লবী দলের সঙ্গে নাকি তাঁর যোগ ছিল। পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে বিদেশে পালিয়ে গিয়ে সেখানেই নানা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। ফিরে এসেছেন গত যুদ্ধের সময় ছদ্মনামে। সেই নামই লোকে তাঁর জানে।

সত্য মিথ্যা যাই হক, মানুষটার মধ্যে যে কোথাও একটা রহস্য আছে তা তাপসী কিছুদিন কাছাকাছি এসেই অনুভব করে।

কাছাকাছি আসবার সুবিধে হয় চাকরির নতুন ব্যবস্থা হবার কিছুদিন পরেই। তার জীবনের আর-এক পট-পরিবর্তনও সেই সঙ্গে।

কয়েকদিন কাজ করবার পরেই ডাঃ ভৌমিককে অফিসে আর দেখা যায় না। শোনা যায় তিনি অসুস্থ।

ডাঃ ভৌমিক ছাড়া সব কিছুই অচল। উপরওয়ালা কর্মচারীদের তাই তাঁর বাড়িতে গিয়েই হুকুম-পরামর্শ নিয়ে আসতে হয়। একদিন তাপসীরও ডাক পড়ে।

ডাঃ ভৌমিকের গাড়িতেই আর দুজন কর্মচারীর সঙ্গে সে তাঁর বাড়িতে গিয়েছে সেদিন।

মানুষটা যে নিঃসঙ্গ, তা তাঁর বাড়িটা দেখলেও বোঝা যায়। শহর ছাড়িয়ে বহুদূরে একেবারে একানে একটি উঁচু দেওয়াল-ঘেরা বাড়ি। রাস্তার ধারে হলেও কাছে পিঠে একটা মাটির কুঁড়েও কোথাও নেই।

বাইরের ভারী লোহার গেটটুকু বন্ধ করে দিলে বাড়িটা যেন দুর্গের মত দুর্ভেদ্য। ভিতরে বাগান, সব্জি-খেত, ছোট একটি পুকুর, সব আছে।

নিঃসঙ্গ হলেও শৌখিন মানুষ সন্দেহ নেই। আতিশয্য কোথাও না থাকলেও বাড়িটির গড়নে, মালমশলায়, আসবাবপত্রে সাজ-সরঞ্জামে একটি পরিচ্ছন্ন অথচ মৌলিক রুচির পরিচয়।

নীচের বারান্দা দিয়ে উঠলেই প্রথমে একটি বড় ঘর। সেটি অফিসের কাজেই সাধারণত ব্যবহৃত হয় মনে হয়েছে। আসবাবপত্র সেই ধরনের।

দেখা গিয়েছে, অসুস্থ হলেও ভৌমিক শয্যাশায়ী নন। তারা কিছুক্ষণ বসবার পরই তিনি ওপর থেকে নেমে এসেছেন। চেহারা একটু শুকনো, চুলগুলো রুক্ষ, নইলে অসুস্থতার বিশেষ ছাপ চেহারায় নেই। পরনে ধবধবে পাজামা ও পাঞ্জাবি। এ-বেশে তাঁকে যেন আরও বেশী মানায় মনে হয়েছে।

খানিকক্ষণ তাদের সঙ্গে বসে, যাকে যা নির্দেশ দেবার দিয়ে, তিনি বিদায় দিয়েছেন। অন্য কর্মচারীদের সঙ্গে গাড়িতে ফিরবার সময় তাপসীর মনে হয়েছে, শুধু মাইনেটা উসুল করা ছাড়া তাকে ডাকবার এমন কোন জরুরী প্রয়োজন ছিল না।

কিন্তু তাপসীর অনুমান ভুল।

কাজ তাকে তারপর যথেষ্ট করতে হয়েছে।

ডাঃ ভৌমিক অনেক দিন ধরেই অফিসে যেতে পারেননি। তাপসীকেই তাঁর বাড়িতে গিয়ে কাজ সেরে বা নিয়ে আসতে হয়েছে প্রতিদিন।

অসুস্থ বলেই এক নাগাড়ে বেশী কাজ দিতে তিনি বোধহয় পারেননি। কাজ

থামিয়ে সাধারণ গল্পগুজব করেছেন কখনও-কখনও।

সে-সব গল্প থেকে মানুষটার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু দু-একটা জানলা হঠাৎ খুলে গিয়ে অনেক কিছুর রহস্যময় ইঙ্গিত যেন মেলে।

কোনদিন হেসে বলেছেন, "এমন তাজা চেহারায় অসুখটা আবার কী, নিশ্চয় আপনারা ভাবেন, না?"

তাপসী কিছু জবাব দেবার আগেই হেসে বলেছেন, "অসুখটা কিন্তু বানানো নয়, বিশ্বাস করুন।"

তাপসী কুণ্ঠিতভাবে বলেছে, "ও-কথা আমায় বলেছেন কেন? আমি কি বলেছি অসুখ আপনার বানানো? কেউ কি সাধ করে অসুখ বানায়।"

"বানায় না!" ভৌমিক বিস্ময়ের স্বরে বলেছেন, "বেশির ভাগ সুখ-অসুখ সবই ত আমাদের বানানো। তবে ওই ক্ষমতাটা আমার কম। ভালমন্দ কোন দিকেই কল্পনা আমার খোলে না।"

"অসুখটা সত্যি আপনার কী? যদি অবশ্য প্রশ্নটা অন্যায় না মনে করেন!" সাহস করে জিজ্ঞাসা করেছে তাপসী।

"তা মনে করব কেন? অসুখের কথা বলা ত একটা বিলাস বলেই জানি। কিন্তু আপনাকে বলব কি, আমি নিজেই ভাল করে বুঝি না। ডাক্তারদের গালভরা সব নাম আছে, সেগুলো শুনলেও অসুখ বেড়ে যায়। তবে আমি যতদূর বুঝেছি, এ-সব রোগ হওয়াও একটা বাহাদুরি এবং এ-সব রোগ বাধান যারতার কর্ম নয়। প্রচুর বিশ্রাম ও ডাক্তারদের মোটা 'ভিজিট' দেবার যাদের ক্ষমতা নেই, তারা এ-রোগে ভোগে না।"

অসুখের কথাটা ভৌমিক যে এমনি করে এড়িয়ে গেলেন, তা তাপসী বুঝেছে। সে আর কোন প্রশ্ন তাই করেনি।

কিন্তু এক এক সময় ভৌমিক যেন ইচ্ছে করেই নিজেকে খুলে ধরেছেন। হয়ত এই শৈথিল্য এটা অসুস্থতারই একটা প্রকাশ।

"আপনি ত নানা দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন শুনেছি।" সম্বন্ধটা আর একটু সহজ হবার পর তাপসী একদিন বুঝি বলেছিল।

"লোকে তাই বলে, না?" ডাঃ ভৌমিক হেসে বলেছেন, "তারা ত আমায় ডাক্তারও বলে।"

তাপসীর বিস্ময় লক্ষ্য করে ভৌমিক বুঝিয়ে দিয়েছেন, "সত্যি কোন রকম ডাক্তারই আমি নই। না চিকিৎসার, না অন্য বিদ্যায়। তবু কোথাও প্রতিবাদ আমি করি না। মিথ্যেটা যদি চলে, চলুক না। জীবনে অনেক কিছুই ফাঁকির দৌলতেই পাওয়া যায়, ইচ্ছে করে দিই বা না দিই। এই যেমন আমার চেহারা।"

"বুঝতে পারলাম না।" তাপসী সত্যিই বিমূঢ়।

"ভালমন্দ যা-ই বলুন, চেহারাটা পাঁচ-জনের থেকে আলাদা, তা ত স্বীকার করবেন!" একটু হেসে ভৌমিক ব্যাখ্যা করেছেন এবার। নিজের রাশ সম্পূর্ণ যেন ছেড়ে দিয়ে বলেছেন, "বুদ্ধি, সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, যতই যা থাক, এই চেহারাতেই অর্ধেকের বেশী কাজ হয়েছে। লোকেরা এ-ধরনের চেহারাকে আপনা থেকে সমীহ ও বিশ্বাস করে, দারোয়ানেরা সেলাম করে খুশী হয়ে। নিজের চেহারার এ-মূল্য যেদিন থেকে বুঝেছি, সেদিন থেকে জীবনের ধারা বদলে গেছে।"

একটু থেমে হঠাৎ তার চোখের দিকে চেয়ে বলেন, "এ-রহস্য আপনারও জানা দরকার।"

নেহাত কি অহেতুক কথার পিঠে কথা!

বোধহয় নয় বলেই মনে হয়েছে সেদিন রাত্রে।

অনেকগুলো চিঠিপত্র বিবরণী টাইপ করতে সেদিন বেশ দেরি হয়ে গিয়েছে।

গাড়িটা চলে যাওয়ার শব্দ পেয়েছে ওপরের ঘরে বসে কাজ করতে করতেই। তাতে ভাবনার কিছু নেই। তার কাজ বেশী থাকলে অন্য কর্মচারীদের গাড়ি এরকম আগে কোন কোন দিন পৌঁছে দিয়ে আসে, তারপর তাকেও কাজ শেষ হলে একেবারে বাড়ি পর্যন্তই পৌঁছে দেয়।

গাড়িটা ফেরার শব্দ কিন্তু আর পায়নি সেদিন।

কাজ শেষ করে একটু উদ্বিগ্ন ভাবেই পাশের ঘরে ডাঃ ভৌমিকের কাছে খোঁজ করতে গিয়েছে।

ডাঃ ভৌমিকের ঘরটা যেমন প্রশস্ত, তেমনি চারিদিকে বড় বড় জানালায় খোলা-মেলা।

এই ঘরেই তাঁর শোয়া থাকা। শুধু বই ছাড়া ঘরটিতে অন্য জিনিসপত্রের বাহুল্য নেই। একটি নিচু খাট, একটি আরাম-কেদারা ও ডিভান, দেয়ালে দু-তিনটি বাছাই-করা ছবি এবং গুটিকয়েক দামী কাজ করা টিপয় গোছের কাঠের নিচু টেবিল ও চৌকি জাতীয় জিনিস।

...রাগে ভৌমিক এখন অনেকটা সুস্থ। দু...

...গতীতে ভৌমি মধ্যেই অফিসে আবার যাবেন ও ...

...য্য করল ...রর কা...

...তার অধীনে ...ছেন, "বড় কেদারায় অর্ধশায়িত অবস্থায় ...

...ধু কাজগুলো ...করেন।" ...পাতত একটা বই পড়ছিলেন।

...তু এদিকের দ... "বোনেরা প... আসার পর বইটা বন্ধ করে ...

... ডাঃ ভৌমিকে... "হাঁ।" গরম ... বসে বলেছেন, "কী? ...

...র ভার দেও... র চা-টা শেষ ...

...পর সেজন্য তা... ছে, "আমায় ... গাড়িটা এখনও ফিরল না?"

..."বলতাম!" ডাঃ ... লেছে তাপসী।

...ধু এই এক... টু হাসি, "কিন্... নি। বসুন না।"

...ত মনে হচ্ছে।

তাপসী অস্বস্তির সংগে বসবার পর আবার বলেছেন, "ভাবনা কী অত! জলে ত পড়েননি।"

এই মামুলী সান্ত্বনায় তাপসী বিশেষ আশ্বস্ত হয়নি। উদ্বিগ্ন স্বরে বলেছে, "এত দেরি ত কোনদিন হয় না?"

"নেহাত আপনি ছেলেমানুষ দেখছি। কোনদিন হয়নি বলেই কখনও হবে না, এমন কিছু কথা আছে? বরাবর সব কিছু একরকম হলে ত আজ আপনি এখানেই থাকতেন না!"

ভাল লাগেনি এই পরিহাসের হাল্কা সুর এ-সময়ে।

একটা মোটরের শব্দ দূরের রাস্তায় শুনে তাপসী ব্যাকুলভাবে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বারান্দা থেকে বাইরের গেট ও বেঁকে-যাওয়া রাস্তার খানিকটা দেখা যায়।

এই অন্ধকার রাত্রে মোটরের হেডলাইট-টাকেই শুধু দূরের রাস্তায় বাড়ি ছাড়িয়ে চলে যেতে দেখা গিয়েছে। ভৌমিকের গাড়ি সেটা নয়।

ফিরে ঘরে ঢুকতে ডাঃ ভৌমিকের ঘণ্টার আওয়াজ পেয়েছে। ছোট্ট একটি রূপোর ঘণ্টা। বাড়িতে থাকলে ভৌমিক এই ঘণ্টাটি নেড়ে চাকর-বাকরকে ডাকেন। ঘণ্টার মৃদু রেশমী সুরে কী যেন জাদু আছে। কাজ করতে করতে অনেকবার তাপসী কেমন আনন্দের অস্ফুট শিহরন অনুভব করেছে এই ধ্বনিতে।

আজ কিন্তু সে-আওয়াজটাও সাড়া আনে না।

ভৌমিক বলেন, "অপেক্ষা যখন করতেই হবে, তখন একটু চা হক।"

খানসামা এলে সেই হুকুমই দেন।

"গাড়ি ত কোথাও খারাপ হয়েও যেতে পারে!" তাপসীর আশংকাটা তার স্বর একটু কাঁপিয়ে দেয়।

"তা ত পারেই!" ভৌমিক ব্যাপারটায় কোন গুরুত্বই যেন না দিয়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন, "আসুন এদিকে!"

তাপসী একটু অবাক হয়েই তাঁর সংগে এগিয়ে যায়।

ভৌমিক ঘরের অন্য দিকের একটি দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে দেন। এ-দরজাটা বরাবর বন্ধ থাকতেই তাপসী দেখেছে।

একটি নাতিপ্রশস্ত সুসজ্জিত ঘর। ভৌমিক দরজার বাইরে থেকেই দেখিয়ে বলেন, "গাড়ি যদি নাও ফেরে, আপনার অস্থির হবার কিছু নেই। এ-ঘরে রাতটা আপনি কাটিয়ে দিতে পারেন। কোন অসুবিধে হবে না।"

মুখ না তুলেই তাপসীর মনে হয়, ডাঃ ভৌমিকের অর্থপূর্ণ [illegible] দৃষ্টি [illegible] যেন মর্ম ভেদ করতে চাইছে।

কিন্তু সমস্ত উদ্বেগ অস্থিরতা এক মুহূর্তে তার কেটে যায়। ঘরের ভিতরটা একবার ঘুরে এসে শান্তভাবে বলে, "বেশ, গাড়ি না ফিরলে এখানেই থাকব।" তারপর একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করে, "গাড়িটা আজ ফিরবে না বলেই মনে হচ্ছে, না?" কণ্ঠে তার কোন অস্থিরতা আর নেই।

"এতক্ষণ দেরি করতে দেখে সেই ভয়ই ত হচ্ছে। কিছু বেশীরকম গোলমাল হয়েছে নিশ্চয়।"

"এত দূরে থাকলেও দুটো গাড়ি আপনি রাখেন না!" তাপসীর প্রায় পরিহাসের সুর।

"না রেখে ভালই করি মনে হচ্ছে। রাখলে এরকম অতিথি ত পেতাম না।" ভৌমিক এসে নিজের জায়গায় বসেন।

তাপসী আর বসে না। বলে, "থাকতেই যখন হবে, তখন হাতমুখগুলো একটু ধুয়ে নিই।"

"হ্যাঁ যান। ঘরের সংগেই সব ব্যবস্থা আছে।"

তাপসী ঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। তারপর আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করে না। বাথরুমের পিছনে আর-একটা দরজা আগেই দেখে গিয়েছে। সেটা সন্তর্পণে খোলার পর মেথরের সিঁড়িটা দেখা যায়। এ-দরজা ও সিঁড়ি না থাকলেও অন্য দুঃসাহসিক চেষ্টা করতে অবশ্য সে দ্বিধা করত না। সিঁড়িটা থাকাতে সুবিধেই হয়।

সাবধানে জুতো জোড়া খুলে নীচে গিয়ে সে প্রথমে গেটটার দিকেই নিঃশব্দে এগিয়ে যায়।

বাড়ির সামনের দিকে একটি মাত্র উজ্জ্বল আলো জ্বালা। সে-আলো গেটের দিকটায় তেমন পৌঁছয়নি।

কিন্তু গেট পর্যন্ত যাওয়া হয় না। মনে হয়, দরোয়ান বা কেউ যেন সেখানে পায়চারি করছে অন্ধকারে।

টি, সি, আডেডি এণ্ড সন্স

৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ফিরে সে বাগানের ভিতর দিয়ে পুকুরের ধার দিয়ে অন্য দিকের দেওয়ালের কাছে পেঁাছয়। এ-দিকটা একেবারে অন্ধকার, কিন্তু তার চোখ ইতিমধ্যেই খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

এ-দিক দিয়ে দেওয়াল টপকান তার পক্ষে অসম্ভব। শুধু অস্পষ্ট একটা স্মৃতির উপর ভরসা করেই এ-দিকে এসেছে। লক্ষ্য করবার দরকার না থাকলেও এ-দিকে মালীদের বাইরে যাওয়ার ছোট একটা দরজা যেন দেখেছে কবে।

ভাগ্য বুঝি তার সহায়। দরজাটা খুঁজে পায়। না, তালা দেওয়াও নয়। শুধু একটা খিল আঁটা। সেটা খুলে বাইরে একেবারে খোলা ধানখেতের ভিতর গিয়ে পড়ে।

তখন বর্ষার প্রায় শেষ। ভিজে কাদা-মাটি ও ধানের চারাগুলো পায়ে গায়ে লাগে, অন্ধকারে কী রকম একটা বিশ্রী অনুভূতি জাগায়। কিন্তু সে-সব তার গ্রাহ্য করবার সময় নেই।

দিকটা একবার দাঁড়িয়ে ঠিক করে নিয়ে সোজা বড় রাস্তাটার দিকে সে এগোয়। ছোটবার চেষ্টা করে না। তাতে কোন লাভ নেই।

বড় রাস্তায় পেঁাছে রাস্তা ধরেই সে হাঁটতে শুরু করে। প্রতিদিন যাবার আসবার পথে এ-বাড়ি থেকে মাইল তিনেকের মধ্যে একটা রেলওয়ে ক্রসিং পেয়েছে। একটা গুমটি-ঘরও দেখেছে সেখানে। স্ত্রীপুত্র নিয়ে একজন জমাদার সেখানে থাকে লক্ষ্যও করেছে। সেই লেভেল ক্রসিংই তার লক্ষ্য।

রাস্তাটা একরকম নির্জন হলেও মাঝে মাঝে দু-একটা মোটর এ-দিক ও-দিক থেকে আসে যায়।

গাড়ির আলো দূর থেকে দেখলেই তাপসী রাস্তার ধারে কোন গাছের বা ঝোপের পিছনে আশ্রয় নেয়। একলা একটি যুবতী মেয়েকে এ-ভাবে এ-রাস্তায় হাঁটতে দেখলে যে-কেউ কৌতূহলী হতে পারে। বালির খোলা থেকে চুলোয় পড়তে সে রাজী নয়।

গুমটি-ঘর পর্যন্ত পেঁাছোন কিন্তু তার হয় না।

অনেক দূর থেকেই উজ্জ্বল দুটো হেড-লাইটের আভাস পেয়ে রাস্তার ধারে গিয়ে একটা বড় গাছের পিছনে আশ্রয় নিয়েছে।

গাড়িটা কিন্তু সবেগে অন্য সব মোটরের মত পার হয়ে যায় না। ধীরে ধীরে আসতে আসতে তার কাছে এসেই থেমে যায়।

জোরালো একটি টর্চ হাতে ভৌমিকই গাড়ি থেকে নেমে তার কাছে এগিয়ে আসেন।

না, তাপসী পালাবার চেষ্টা করে না, চিৎকার করবারও নয়। স্থির হয়ে পাথরের মতই দাঁড়িয়ে থাকে।

টর্চটা তার উপর একবার বুলিয়ে নিয়েই ভৌমিক নিভিয়ে দিয়েছেন। কাছে এসে দু-এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলেন "এস।"

সম্বোধনটাও নতুন, গলার স্বরটাও একেবারে যেন আলাদা।

ভৌমিক তার হাতও ধরেন না, দ্বিতীয়-বার অনুরোধও করেন না। পিছন ফিরে আবার গাড়িটার দিকে যেতে যেতে শুধু বলেন, "এতটা করবার কিছু দরকার ছিল না। ছিঃ।"

তাপসী কিছুই বলেনি। ভৌমিক গাড়ির দরজাটা খুলে ধরবার পর নীরবে গিয়ে বসেছে। তার পাশে এসে বসে গাড়ির দরজা বন্ধ করে ভৌমিক কলকাতার দিকেই গাড়ি চালাতে বলেছেন ড্রাইভারকে।

সুদীর্ঘ রাস্তায় অনেকক্ষণ ধরে কোন কথাই হয়নি। তাপসীর মনে হয়েছে, একটা নেশার মত অবসাদের কুয়াশা তার সমস্ত মন যেন ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে।

অনেকক্ষণ বাদে ভৌমিক হঠাৎ এক সময়ে বলেছেন, "গাড়িটা কিছুক্ষণ বাদেই ফিরেছিল। একটু অপেক্ষা করলেই পেতে।"

আবার দুজনেই চুপ।

তাপসী যা ভেবেছে, সবই কি তাহলে ভুল! সবই কি তার অসুস্থ অস্বাভাবিক কল্পনা! একটা কান্না যেন বুকের ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে চেয়েছে অকারণে। কিছুই সে বুঝতে পারে না। পারবে না হয়ত কখনও।

নিজের মনের একটা দিক শুধু চকিতে যেন দেখতে পেয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে।

তাকে খুঁজে বার করার পর ভৌমিক গাড়িটা তাঁর বাড়ির দিকে ফেরাতে বললে বাধা যে সে দিত না, এটুকু সে জানে।

বাড়ি পর্যন্ত পেঁাছে দিয়ে নামবার সময় ভৌমিক বলেছেন, "অফিসে কাল আর এস না। অফিসের ছুটির পর আমিই গাড়ি পাঠিয়ে আনিয়ে নেব।"

গাড়ি যথাসময়ে এসেছে। তাপসী গিয়েছে বিনা দ্বিধায়।

সেই কমিটি-রুম। জানলা দিয়ে গির্জের চুড়োটা বর্ষাশেষের খেয়ালী বৃষ্টিতে কখনও ঝাপসা কখনও পরিষ্কার দেখা গিয়েছে।

সেই দিনই ভৌমিক তাকে চাকরি ছেড়ে দেবার কথা বলেছেন, বলেছেন সাংসারিক লিমিটেডএর পরিকল্পনার কথা। সব ভার তাপসীর উপরেই তিনি দেবেন জানিয়েছেন।

"আমার ওপর! আমি পারব?" তাপসী বিস্মিত অভিভূতভাবে জানিয়েছে।

"পারবে। আমি মানুষ চেনারই ডাক্তার।"

ভৌমিক আরও বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ছোট লিমিটেড কোম্পানি হবে। তাপসীর একটা অংশ থাকবে। তার টাকা তিনিই এখন দেবেন।

তাপসী হঠাৎ দৃঢ়ভাবে আপত্তি জানিয়েছে। না, এ-অনুগ্রহ সে নেবে না। কত টাকার অংশ নিলে তার চলবে?

বিস্মিত হলেও ভৌমিক হেসে বলেছেন, "কত আর, হাজার, দু হাজার! আছে তোমার?"

"আছে। আমি নিজেই দু হাজার দেব।"

রবিমামার টাকার ওইটুকুই তখন অবশিষ্ট ছিল।

রবিমামার টাকাতেই কোম্পানিতে তার প্রতিষ্ঠা।

সেই সামান্য সূত্রপাত থেকেই সাংসারিক ক্রমশ দিনে দিনে শশিকলার মত বেড়ে উঠেছে। বেড়ে উঠেছে ভৌমিকের সাহায্যে পরামর্শে, নিশ্চয়, কিন্তু তাপসীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দামও তার মধ্যে কম নয়। সাংসারিক লিমিটেড তাঁর ধ্যান-জ্ঞান সেই থেকে।

কিন্তু সমস্ত কিছুর যিনি মূল, সেই রবিমামাকে নিষ্ঠুরভাবে এবার চরম আঘাত দিতে হবে। না দিয়ে উপায় নেই।

জীবনের সায়াহ্নে ধর্মকর্ম নিয়ে তাঁর এই মেতে ওঠা হয়ত আত্মপ্রতারণা। কিম্বা হয়ত সারাজীবনের অস্থির তরঙ্গ-দোলার সীমান্তে এসে যথার্থই কোন আশ্চর্য ধ্রুব উপলব্ধির স্বাদ তিনি পেয়েছেন। সে যাই হক, একটা পরিতৃপ্ত শান্তি যে তিনি পেয়েছেন, এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

সেই শান্তি থেকেই তাঁকে বঞ্চিত করতে হবে।

কেন করতে হবে, ডাঃ ভৌমিক শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই তা তাপসীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন বুঝি বাধ্য হয়ে।

ভদ্রেশ্বরে রবিমামাকে আর থাকতে দিলে সাংসারিক-এর বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা, রবিমামারও বিপদ কম নয়।

আভাসে-ইঙ্গিতে হয়ত তাপসী কিছু শুনেছিল। ঘৃণাভরে মন থেকে সেসব কথা সরিয়ে দিয়েছে। এখন জেনেছে সেসব রটনা একেবারে অমূলক নয়। রবিমামার শেষ নিরুদ্দেশ হওয়ার সঙ্গে এমন কিছু জড়িত, এত বছর বাদেও যার কালিমা সাংসারিক-এর গায়ে এসে লাগতে পারে। রবিমামাও নিরাপদ নন।

রবিমামা তাই অন্য কোথাও চলে গিয়ে তাঁর আশ্রম-মন্দির যা চান প্রতিষ্ঠা করুন, এই অনুরোধই তাঁকে করতে হবে। যথাসাধ্য এ-সবের খরচ দেবার জন্যে তারা প্রস্তুত, এ-কথাও জানাতে হবে সাবধানে তাঁর আত্মাভিমানে আঘাত না দিয়ে।

জানান অনেকদিন আগেই উচিত ছিল, কিন্তু নিজের মনের গোপন সংকোচ ক্রমাগতই পিছিয়ে দিয়ে এসেছে। চিঠিতে লেখা কঠিন বলে ভেবেছিল নিজেই গিয়ে রবিমামাকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করবে। কিন্তু তাও পারেনি।

কিন্তু ডাঃ ভৌমিকের কাছে আর গড়িমসির কোন অজুহাত চলে না।

তাই সেই মর্মান্তিক চিঠিই সে লিখছে।

এ-চিঠি না লিখলে ডাঃ ভৌমিককেই ব[illegible] হয়, না হবার হয় হক, [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

থাকা চলে না। যা সম্বল করে সে দাঁড়িয়েছে, তার গায়েও ত সেই একই কলঙ্কের দাগ।

কিন্তু এ-কথা বলতে পারল কই।

শুধু শেষ পর্যন্ত চিঠিটাই আবার ছিঁড়ে ফেলে দিলে।

তার বদলে শুধু দু ছত্রে রবিমামাকে একবার তাদের বাড়িতে এসে দেখা করতে লিখলে।

রবিমামা এলেন না।

তার বদলে একটা বন্ধ বড় খাম এল তার মার নামে।

মার নামে চিঠি আসা অভাবিত। খেয়াল না করে অমিতা তাই ভুলে খুলে ফেলেছে। একটা পুরনো ফ্যাকাশে হলদে-হয়ে-আসা ফটো। তার সঙ্গে একটুকরো কাগজে কয়েকটি লাইন লেখা।

কিছু বুঝতে না পেরে অমিতা তাপসীর হাতে এনে সেগুলো দিলে। "এ আবার কী দিদি?" জিজ্ঞাসা করলে সবিস্ময়ে।

তাপসী পড়ল। "কিসে কী হয় কেউ জানে কি! নদীর শোক শেষে সাগরেও পৌঁছে দেয়। এই স্মৃতির সম্বল তাই আজ অনায়াসে ফিরিয়ে দিলাম।"

এও হয়ত একরকম ভাববিলাসের খ্যাপামি। হয়ত তা নয়।

পুরনো বিবর্ণ ফটোটা থেকে বিশেষ কিছু বোঝা শক্ত। রবিমামার হাতের লেখা নমিতা অমিতা আর বড় হয়ে কবে দেখেছে যে চিনবে!

"কী সব আবোল-তাবোল যে লিখেছে!" ফটো ও চিঠিটা তাপসী নিজের ড্রয়ারে রেখে দিয়ে বললে, "দেখবখন পরে!"

কিছু বুঝুক না বুঝুক, কেউ আর এ নিয়ে প্রশ্ন করেনি।

মাকেও তাপসী সে-চিঠি দেয়নি।

সেই চিঠি আসার পরেই জানা গিয়েছে, রবিমামা ভদ্রেশ্বর ছেড়ে চলে গিয়েছেন। কোথায় গিয়েছেন, কেউ জানে না।

এই দ্বিতীয়বার তাঁর নিরুদ্দেশ হওয়া। এবারের যাওয়া যে তাঁর শেষ, আর যে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না, তাপসী তা জানে।

রবিমামা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকগুলো ঘটনা বড় তাড়াতাড়ি পর পর ঘটে যায়।

রবিমামার দীর্ঘশ্বাসেই যেন তাদের সাংসারিক লিমিটেডের উপর অপ্রত্যাশিত-

● সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ●

শিশু ও রোগীর

উপযোগী

এশিয়াটিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ
কর্পোরেশন

১৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা—৭

শারদীয় অভিনন্দন গ্রহণ করুন

হেমন্তকুমার দেয়াশী এণ্ড ব্রাদার্স

(প্রাইভেট) লিমিটেড

রেজিস্টার্ড টাটা ও ইস্কো ডিলার্স

প্রসিদ্ধ লৌহ ও ইস্পাত ব্যবসায়ী

২১নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা—৭

গ্রাম: "STEELBAR" ফোন: ৩৩-১৬৩৬

ভাবে দুর্যোগের ঝড়ঝাপটা আসে। দু-চারটে বড় বড় স্থায়ী কনট্রাক্ট বাতিল হয়ে যায়। অহেতুকভাবে প্রচুর দাদন নিয়ে একটি পার্টি হঠাৎ লাটে উঠে তাদের দেয়-মাল আর দিয়ে উঠতে পারে না। তাদের নিজস্ব শিশি-বোতলের কারখানাও যন্ত্রপাতি বিগড়ে কিছুদিনের জন্যে অচল হয়।

তাপসীকে আহার-নিদ্রা ভুলে এই সব গণ্ডগোলের কিনারা করবার জন্যে দিবারাত্র খাটতে হয় ডাঃ ভৌমিকের সঙ্গে।

এরই ভিতর কল্যাণ একদিন এসে জানায়—সাংসারিক-এর চাকরি সে ছেড়ে দিচ্ছে।

প্রথমে বেশ একটু অবাক হলেও আহত হবার বদলে তাপসী খুশীই হয়েছে শেষ পর্যন্ত। কল্যাণ তার কাছে চাকরি না করলে তাদের সম্বন্ধের একটা অদৃশ্য অথচ অনস্বীকার্য কাঁটা সত্যি দূর হয়ে যায়।

কাজের চাপে আজকাল কল্যাণের সঙ্গে মনের মত করে মেলামেশার সময়ই পাচ্ছে না।

কল্যাণ তাদের বাড়িতে এখন প্রায় নিয়মিতই আসে। সে-ই সব সময়ে উপস্থিত থাকতে পারে না।

এক-একদিন মনে হয়, কল্যাণের চোখের দৃষ্টিতে, কথার সুরে যেন একটু ক্ষোভের, অনুযোগের ইঙ্গিত।

হয়ত বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছে। কল্যাণ সম্ভবত অফিসের পরই চলে এসেছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে হতাশও হয়েছে বুঝি একটু। তাকে দেখেই যেন ওঠবার উপক্রম করে বলে, "সে কী, এত তাড়াতাড়ি ফিরলেন কী করে? সবে ত রাত দশটা!" সবাই হাসে।

এই বিদ্রূপের পিছনে কী থাকতে পারে, তা অনুমান করে তাপসীর ভালই লাগে।

একটা সোফায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে সে হেসে বলে, "ঠিকই ত। সবে ত রাত দশটা। এখুনি আপনি উঠি-উঠি করছেন কেন?"

"আমার আবার বিশ্রী স্বভাব, জীবনটা কী হেলায় যে নষ্ট করছি, খানিকক্ষণ না ভাবলে ঘুম আসে না। বাড়ি ফিরে সেই দুর্ভাবনার সময়টা ত পাওয়া চাই।"

তাপসীও সকলের সঙ্গে হেসে ওঠে।

"কার গাড়িতে এলে দিদি? ট্যাক্সি ত মনে হল না!" জিজ্ঞাসা করে নমিতা।

"না। ডাঃ ভৌমিকের গাড়িতেই এলাম।" তাপসী জানায়। নমিতার এই সব ছোটখাট ব্যাপারে কৌতূহল বরাবরই।

কল্যাণকে কতক্ষণ তারপর আর ধরে রাখা যায়। দেখাশোনা কিছুদিন তাই বিরল হয়ে এসেছে এক অফিসের কাজে ছাড়া।

কিন্তু অফিসে প্রয়োজন থাকলেও কল্যাণকে ডাকতে আজকাল তার কেমন সঙ্কোচ হয়।

সুতরাং কল্যাণ যে এ-কাজ ছেড়ে দিচ্ছে, তাতে ভালই হবে মনে হয়। সাময়িক এই বিপদগুলো কেটে গেলে তাদের পরস্পরের কাছে আসার আর কোন বাধাই থাকবে না।

. কল্যাণ নিজে থেকে কিছু যখন বলে না, তখন কোথায় কী কাজ নিয়ে কল্যাণ এ-অফিস ছাড়ছে, তাপসীও জিজ্ঞাসা করতে চায় না।

এ-সব প্রশ্ন এখন অবান্তর।

কিছুদিন এখন হয়ত দেখা হবে না। কিন্তু কল্যাণ যেখানেই কাজ নিক, তাদের বাড়িতে আসা ত আর বন্ধ করবে না! সে নিজে এখন থাকতে না পারলেও কল্যাণের কোন অসুবিধা নিশ্চয় হবে না। বাড়ির সকলের সঙ্গেই সে একান্ত সহজ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু তাপসী নিশ্চিন্ত হবার সুযোগ আর পায় কই!

এর পরের কল্পনাতীত আঘাত তাকে একেবারে বিমূঢ় করে দেয়।

নমিতা একদিন কলেজ থেকে আর ফেরে না। তাদের কলেজের একজন বেয়ারা খামে বন্ধ একটি চিঠি দিয়ে যায় তাপসীর নামে। তার মধ্যে একটুকরো কাগজে শুধু লেখা "আমার জন্যে ভেব না। যথাসময়ে সব জানাব।"

না, এ-ব্যাপার নিয়ে থানা-পুলিশের কেলেঙ্কারি করা যায় না। একমাত্র ভরসা-স্থল ডাঃ ভৌমিকের কাছেই তাপসী দিশাহারা হয়ে পরামর্শের জন্যে যায়।

ডাঃ ভৌমিক সব কথাই মন দিয়ে শোনেন। জিজ্ঞাসাও করেন দু-একটা প্রশ্ন। কিন্তু তাঁর যেন বিশেষ কোন ব্যস্ততা নেই। কেমন যেন উদাসীন-ই মনে হয়।

"কী করব তাহলে বলুন!" ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করে তাপসী।

ডাঃ ভৌমিক শুধু নীরবে তার দিকে খানিক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন, "যদি বলি কিছু-ই কর না। নমিতা ত আর নাবালিকা নয়!..."

"কী বলছেন আপনি!" তাপসী উত্তেজিত হয়ে ওঠে। "ব্যবসাই ধ্যান-জ্ঞান করে শুধু হিসেবের কল-ই হয়ে গেছেন। মানুষের হৃদয় বলে আর কিছু আপনার নেই। মেয়েটার কী হল না হল খোঁজও নেব না!"

ডাঃ ভৌমিকের মুখে সেই কৌতুকের আভাস দেখা যায়। শুধু হাসিটা একটু ম্লান। বলেন, "বেশ। পুলিশকে না জানিয়ে খোঁজ নেবার কী চেষ্টা করা যায়, দেখছি। যা করবার ভেবেচিন্তেই করতে হবে। মিছিমিছি অস্থির হয়ে ত কোন লাভ নেই।"

কিন্তু ডাঃ ভৌমিকের পক্ষে এ-উপদেশ দেওয়া সহজ হলেও তাপসী অস্থির না হয়ে পারে কই।

[illegible]

দূর-দৃষ্টি — শিল্পী শ্রীগোপাল ঘোষ

মূল্যবান কিছু আশা করা বৃথা জেনেও তার মেস খোঁজ করে সেখানেও একবার যায়।

কল্যাণ মেসে ছিল না। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে তাপসীকে তার জন্যে অপেক্ষা করতে দেখে একেবারে অবাক হয়ে যায়।

"সে কী, আপনি এখানে!" তাপসীর এ-মেসে আসা তার পক্ষে সত্যিই অবিশ্বাস্য।

"কী করব বলুন। বিপদের দিনেই বন্ধুদের দেখা পাওয়া যায় না। নিরুপায় হয়ে তাই নিজেকেই আসতে হয়েছে।"

তাপসী তারপর এক নিশ্বাসে সমস্ত ব্যাপারটা জানায়।

না, কল্যাণ ডাঃ ভৌমিকের মত উদাসীন নয়। বরং তার সমস্ত মুখে একটা গভীর বেদনার ছায়া।

সব কথা শুনে সেও খানিক চুপ করে থাকে, তারপর প্রায় কান্নার মত গাঢ় সহানুভূতির স্বরে বলে, "আপনি বাড়ি যান। এত আর ভাববেন না। নমিতার খবর আর কেউ দিক বা না দিক আমিই আপনাকে দেব।"

সত্যিই যেন একটা আশ্বাসের সাহস নিয়ে তাপসী বাড়ি ফিরে যায়।

নমিতার খবর কিন্তু কাউকে দিতে হয় না।

পরের দিন দুপুর বেলা অফিসেই অমিতা উত্তেজিতভাবে এসে হাজির হয়। তার কাছে জানা যায় যে, নমিতা খানিক আগে বাড়িতে ফিরেছে। কিন্তু বেশীক্ষণ সে নাকি থাকতে রাজি নয়। নিজের কয়েকটা জিনিসপত্র নিয়েই চলে যাবে।

তাপসী এক মুহূর্ত আর অপেক্ষা করে না। ট্যাক্সি ডাকিয়ে তখুনি অমিতাকে নিয়ে বাড়ির দিকে ছোটে। তার নিজের মনে আনন্দ-বেদনা-আশংকা মিলে যেন সব একাকার হয়ে গিয়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে শান্তভাবেই, বরং একটু অপ্রসন্নমুখে নিয়েই, বাড়িতে ঢুকবে ঠিক করে রাখলেও তাপসী নিজেকে সামলাতে পারে না। প্রায় একরকম ছুটেই বাইরের ঘরে

ঢুকে নমিতাকে দেখতে পেয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে।

"কোথায় ছিলি নমু! কেন চলে গিয়েছিলি এমন করে?" তাপসীর চোখের জল বাধা মানে না।

দিদির আলিঙ্গন ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে ছাড়িয়ে নমিতা একটু সরে দাঁড়ায়।

অশ্রুজলে ঝাপসা চোখেও তাপসী এবার দেখতে পায়, নমিতার কঠিন মুখে এতটুকু প্রসন্নতা নেই। দূরে মা যেন স্থাণুর মত বসে আছেন। তাঁর থমথমে মুখটাও এবার চোখে পড়ে।

প্রাণপণে নিজের কণ্ঠকে শাসনে রেখে সে স্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করে, "তুই নাকি এখুনি চলে যাবি বলেছিস?"

"হ্যাঁ।" নমিতা মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়েই জবাব দেয়।

"কেন?" তাপসীর গলার স্বর ক্রমশ রুক্ষ হয়ে ওঠে, "কোথায় তুমি গিয়েছিলে কাউকে কিছু না জানিয়ে? কোথায় এখন যেতে চাও?"

"সব কথা এখন তোমার না শোনাই ভাল।" নমিতার স্বরও কঠিন।

"না শোনাই ভাল!" তাপসী জ্বলে ওঠে। "এতদূর তোমার স্পর্ধা বেড়েছে! এই কেলেঙ্কারির পর একটু লজ্জা পর্যন্ত নেই!"

"লজ্জার কাজ আমি কিছু করিনি।"

"করনি! তোমার বয়সের মেয়ের বাড়ি ছেড়ে দু রাত্রি বাইরে থাকা লজ্জার কিছু নয়?"

"না, নয়। বেশ শোন তাহলে!" নমিতা কাছের সোফাটায় ঋজুভাবে বসে। "আমি বিয়ে করতে গেছলাম। এখন আমার স্বামীর কাছেই ফিরে যাচ্ছি।"

"তুমি বিয়ে করেছ!" তাপসীর বিস্ময়টা এক মুহূর্তে তীব্র বিদ্রূপে গিয়ে পৌঁছয়। "কে তোমার সেই স্বামীটি, বাড়ি থেকে পালিয়ে যাকে গোপনে বিয়ে করতে যেতে হয়! যার পরিচয় পর্যন্ত আপনার জনকে দেওয়া যায় না!"

নমিতা তেমনি কঠিন স্বরেই বলে, "পরিচয় অনায়াসেই দেওয়া যায়। কিন্তু তবু বলছি, জানতে এখন চেও না।"

"না, জানাতে তোমায় হবে-ই।" তাপসী উগ্রস্বরে দাবি করে, "এটুকু জানবার অধিকার অন্তত আমাদের আছে।"

নমিতা এবার সোজা তাপসীর দিকে তাকায়। তারপর শান্ত দৃঢ়স্বরে বলে, "আচ্ছা, তোমাদের অধিকারই মানলাম। বিয়ে হয়েছে কল্যাণের সঙ্গে।"

সমস্ত ঘরটায় মনে হয় যেন এতটুকু হাওয়া নেই। কিন্তু সে শুধু এক মুহূর্তের জন্যে। তারপরই তাপসী নিজের সমস্ত সংযম যেন হারিয়ে উচ্চৈঃস্বরে অপ্রকৃতিস্থের মত অবিশ্বাসের হাসি হেসে ওঠে।

"কল্যাণকে! কল্যাণ তোমায় বিয়ে করেছে!"

তাপসীর হাসির মধ্যেই নমিতা তার হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে একটা কাগজ বার করে তার দিকে এগিয়ে দেয়। "অত যখন অবিশ্বাস, কাগজটা তাহলে পড়েই দেখো!"

কাগজটা হাতে নিয়েও কিছুক্ষণ যেন তাপসী কিছু বুঝতে পারে না। লেখাগুলো কীটের সারির মত কাগজটার উপর কিলবিল করে বেড়াচ্ছে মনে হয়।

তারপর একটা যেন আর্তনাদ করে সে নমিতার উপর উন্মত্ত আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে! দু হাতে আঘাতের পর আঘাত করতে করতে বলতে থাকে, "আমি যে তোকে মায়ের চেয়ে বেশী করে মানুষ করেছি নমু। তুই যে আমার বুকের হাড় ছিলি!"

মা ও অমিতা সন্ত্রস্ত ব্যাকুলভাবে এসে নমিতাকে তার কাছ থেকে সরিয়ে দেন।

ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে তাপসী সোফাটার উপর বসে পড়ে নিজের দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে প্রাণপণে কান্না রোধ করবার চেষ্টায়।

নমিতা কিন্তু তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তীক্ষ্ণ বিষাক্ত তীরের মত তার কথাগুলো এসে বিঁধতে থাকে।

"হ্যাঁ, মানুষ করেছ! আদরও করেছ, আর তাই কিনে রাখতে চেয়েছ আমায়। আমার শরীর মন প্রাণ সব! কিনে রাখাই তোমার স্বভাব। সকলকে তুমি দয়া করতে অনুগ্রহ করতে চাও। কল্যাণকেও তুমি কিনে রাখতে চেয়েছ চাকরি দিয়ে, অনুগ্রহ করে। কিন্তু ভালবাসা কিনতে পাওয়া যায় না। তোমার ওই ডাঃ ভৌমিকের উচ্ছিষ্ট অনুগ্রহ তাই লাথি মেরে সরিয়ে সে চলে গেছে। এই আমিও যেমন যাচ্ছি।"

নমিতা তার হ্যাণ্ডব্যাগ আর আগে-থাকতে-গোছান স্যুটকেশটা নিয়ে সবেগে বেরিয়ে চলে যায়।

তাপসী মুখ তুলে তাকায় না পর্যন্ত।

* * *

কতদিন তারপর কেটে যায়। তাপসী হিসাব রাখে বই কি! জীবনে উন্নতি করতে গেলে সব হিসাব রাখতে হয়। হিসাবে তার গাফিলতি নেই বলেই সাংসারিক লিমিটেড সমস্ত দুর্যোগ কাটিয়ে আবার এগিয়ে চলেছে।

অনেকদিন আগে সেই নমিতার চলে যাওয়ার কিছুদিন পরেই একটি চিঠি এসেছিল। নমিতার নয়, কল্যাণের। কী লিখেছিল সে। সব ঠিক মনে নেই বুঝি। শুধু এই রকম কথা যেন ছিল, "ব্যর্থ কবিদের ক্ষমা কর। গভীর ধ্যানের নিষ্ঠা নেই বলেই রঙিন শব্দের ঝঙ্কারে তারা ইচ্ছে করে নিজেদের ভোলায়। ধ্রুবতারার তপস্যা ত সকলের জন্যে নয়।"

ব্যর্থ কবির মতই কি সব অর্থহীন ভাবালুতা!

ডাঃ ভৌমিক কবে যেন একদিন ছুটি নিয়ে মোটরে তাঁর সঙ্গে কিছুদিন ঘুরে আসবার কথা বলেছিলেন।

তাপসী একদিন ভাববার সময় নিয়ে সে-অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিল। হেসে বলেছিল, "দুই শূন্য যোগ দিলে কি এক হয়! সেই শূন্যই থাকে!"

এও সেই ব্যর্থ কবিরই বোধ হয় প্রতিধ্বনি।

সেদিন হঠাৎ ড্রয়ার খুলতে মার সেই পুরনো বিবর্ণ ছবিটা চোখে পড়ল।

সংকল্প করলে, তার ছেলেবেলার ছবি সে কোথাও রাখবে না।

শারদীয়া পূজায়
হিমালয় খাঁটি ঘৃতের
আহার্য পরিবেশন করে
উৎসবের আনন্দ বৃদ্ধি করুন
হিমালয়ের গব্য ঘৃত সর্বোত্তম
প্রতি সের ৪৷৵০
বায়ুরুদ্ধ টিনে
প্রতি সের ৫৷৹
হিমালয় ঘি কর্পোরেশন
৯১ বড়তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : ৩৩—৬৪৬৪
আসামের সর্বত্র ষ্টকিষ্ট আছে

সর্বাণীর বাপের বাড়ি ছাপরা জেলায়, কিন্তু বিয়ে হল যশোহর জেলার এক গ্রামে। কেন, তার উত্তর নিষ্প্রয়োজন। কারণ "জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে" এই ডাকের বচন ত সকলেরই জানা আছে।

সর্বাণী সুন্দরী। সুন্দরী বললে ঠিক বলা হয় না, পরমা সুন্দরী। বয়স কত? তা ঠিক বলা যায় না, এ বিষয়ে এক একজনের এক-এক মত। শিবসুন্দরী দেব্যা, অর্থাৎ সর্বাণীর ঠাকুরমার মতে সর্বাণী এখনও বার পার হয়নি। সর্বাণীর মা বলেন, "সবু এই মাঘে তের উৎরে চৌদ্দয় পা দিয়েছে।" আর প্রতিবেশিনী 'রঘুপতিয়া কী মাই' নামক মহিলাটির [illegible] সর্বাণীর [illegible] [illegible] বৎসরের কম নয়। কেননা তার রঘুপতির চাইতে সর্বাণী প্রায় দু বছরের বড়, এ তিনি হিসাব করে দেখেছেন।

যা হক, মেয়েটিকে দেখলে কোনমতেই চৌদ্দ বৎসরের বেশী মনে হয় না। এমন কাঁচ কাঁচ মুখ আর এমন সরল চাহনি,— দেখলে মনে হয়, সে যেন এখনও শৈশবই অতিক্রম করেনি।

সর্বাণীর বাবা বাঙালী হলেও তাঁর এখন আর ষোল আনা বাঙালীত্ব নেই। তাঁরা তিন পুরুষ বিহারপ্রবাসী। কেদারবাবুর ভাষায়, তাঁরা এখন 'দেমোশিয়াল' অর্থাৎ ডোমিসাইলড্ হয়ে গিয়েছেন। ছাপরা জেলায় প্রকাণ্ড বাড়ি, জমিদারি আর চালানী ব্যবসা,—তার উপর আবার সর্বাণীর বাবা একজন বড় উকিল। মামলা মকদ্দমায় পাটনা থেকেও মাঝে মাঝে তাঁর ডাক আসে। বড় দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন মজঃফরপুরে আর দ্বারভাঙ্গায়। কিন্তু সব ছোটটির বেলায় মনের মত পাত্রের অভাবে তাঁকে বাংলা দেশেই যেতে হয়েছিল, এবং থাকতেও হয়েছিল সপরিবারে প্রায় তিন মাস।

অবশ্য তিন মাসের মধ্যেই মনের মত পাত্র পাওয়া এবং সেই সঙ্গে বিয়ের যোগাযোগ ঘটান সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কিন্তু হরিচরণবাবুর শুভাদৃষ্ট ও অর্থবল দুই-ই বেশ প্রবল ছিল। নয়ত এক পরিবারে শিবতোষের মত জামাই, প্রাণতোষবাবুর মত বেহাই এবং অন্নপূর্ণার মত বেয়ান সংযোগ সংসারে সত্যই দুর্লভ। অবস্থা কুলশীল সমস্তেরই সেই সঙ্গে শুভসংযোগ হয়েছিল। কেবল একটিমাত্র খুঁত, তা হল মেয়ের শ্বশুরবাড়ি শহরে নয়, অজ পাড়াগাঁয়ে।

সর্বাণীর মা ও অন্যান্য পরিবারবর্গও বিবাহ উপলক্ষে বাংলা দেশে এসেছিলেন। কলকাতায় বাড়িভাড়া নেওয়া হয়েছিল। পাত্রপক্ষও কলকাতার বাসাতেই বিবাহ উৎসব সমাধা করলেন। অবশ্য আর একটি উৎসব অর্থাৎ দেশে ফিরে গিয়ে যা হবে তা তখনকার মত স্থগিত রইল। সুতরাং বিহার-প্রবাসিনীদের এক সঙ্গে রথ দেখা ও কলা বেচা দু কাজ[?]ই হয়ে গেল। কালীঘাটে কালীদর্শন, এবং পরেশনাথের মন্দির, জাদুঘর, পশুশালা এমনকি থিয়েটার দেখাও বাকি রইল না তাঁদের। এভাবে কয়েকদিন তাঁদের পরমানন্দে কেটে গেল। সর্বাণীর মা এ সময় বৈবাহিক গৃহের সকলের সঙ্গে প্রীতির মধুর সম্বন্ধে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন যে, বাংলা দেশ থেকে যাবার সময় এইসব প্রিয়জনকে ছেড়ে যেতে হবে একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ ছলছল করে উঠল। সর্বাণীর মা মেয়ের হাত দুটি বেয়ানের হাতের উপর রেখে বলেছিলেন, "দিদি, তোমার জিনিস তুমি নাও, এতদিন আমার ছিল এখন তোমার হল।"

বিয়ের কয়েকদিন পরে যে যার ঘরে ফিরলেন, অর্থাৎ শিবতোষের মা ফিরলেন তাঁর পাড়াগাঁর বাড়িতে, আর সর্বাণীর বাবা ফিরলেন সপরিবারে ছাপরায়। কিন্তু ফিরবার সময় সর্বাণীকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন না, শিবতোষের মায়ের হাতেই অর্পণ করে গেলেন।

এখন সর্বাণী শ্বশুর বাড়িতে আছে। সেখানে আছে তার দু ননদ, তারা প্রায় তার সমবয়সী। আরও আছেন তার খুড়-শাশুড়ী, দু খুড়তুত দেওর, পিসশাশুড়ী ও তাঁর একটি বিধবা মেয়ে, দুজন দিদিশাশুড়ী এবং সম্পর্কিত আরও অনেকে। চাকর দাসী নিয়ে প্রায় শতাবধি লোক পরিবারে। তাছাড়া, ভাশুর আছেন, বড় জা আছেন শ্বশুর ও শাশুড়ী আছেন।

এত লোকের মধ্যে থাকতে পেয়ে সর্বাণী বাপের বাড়ির বিরহ-দুঃখ স্মরণ করবার সময় পাবে কখন? দিনরাত তাকে সকলেই ডাকাডাকি করছে। বৌমা বৌমা ঃ সবু-সর্বাণী! বৌদিদি, মামীমা প্রভৃতি আখ্যায় নানা কণ্ঠে আহ্বান। শ্বশুর বাড়িতে বধূদের লাঞ্ছনা গঞ্জনার কাহিনী শুনে শুনে বৌ ছাপরায় থাকতে ভেবে রেখেছিল "শ্বশুরা" অর্থাৎ শ্বশুর-বাড়ি জেলখানার মত এক ভীষণ স্থান। একজনের শাশুড়ী নাকি খুন্তি তাতিয়ে বৌয়ের পিঠে ছ্যাঁকা দিয়েছিল, নাক কেটে দেওয়ার কথাও সে শুনেছে। কিন্তু তার শাশুড়ী দিনের মধ্যে কতবার তাকে বিনা কারণে "বৌমা! বৌমা" করে ডাকছেন, আর কাছে এলে আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, দু হাতে মুখখানি ধরে অপলকচোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকছেন। যেন দেখে দেখে তাঁর সাধ আর মিটছে না। আবার শ্বশুর ডাকেন, সে-ডাকে যেন বাড়ি গমগম করে, "কই রে! আমার সর্বেশ্বরী সর্বাণী মা কই রে, আমার মালক্ষ্মী কই রে!" ভাশুর অবশ্য সামনে আসেন না কিন্তু আড়ালে আবডালে থেকে সব সময়ই খোঁজ নেন। কলকাতায় তাঁকে সব সময়ই যাওয়া আসা করতে হয়, আসার সময় সর্বাণীর জন্য কিছু না কিছু আনা তাঁর চাই-ই।

শিবতোষ শনিবার বাড়ি আসে, আবার সোমবার ভোরেই রওনা হয়ে যায়। সেদিন এসে একটা ফোটো হাতে নিয়ে সর্বাণীকে দেখিয়েছিল "দেখত কেমন দেখতে!"

সর্বাণী দেখেছিল, একটি ষোল সতের

বছরের মেয়ের ছবি। "কেমন দেখতে? তা, ভালই ত মনে হচ্ছে।"

শিবতোষ বলেছিল, "জান, এ আমার সংগে এক কলেজে পড়ে। এবার ওরও ফোর্থ ইয়ার।"

সর্বাণী অবাক হয়ে গিয়েছিল। ওমা, এই মেয়ে এত বিদ্বান!

পরের বারে শিবতোষ এসে সর্বাণীকে বলল, "সব্, আচ্ছা, ধর ও যদি তোমার সতীন হয়, অর্থাৎ আমি যদি ওকে বিয়ে করি তাহলে কি তোমার রাগ হবে?"

সর্বাণী "ধেৎ" বলে হেসে ফেলল। বললে "কেন, ও কি তোমাকে সেই কথা বলেছে নাকি?"

শিবতোষ গম্ভীরভাবে বললে "তুমি হাসছ? এ হাসির কথা নয়, এ হল জীবন মরণের কথা।"

সর্বাণী যেন অবাক হয়ে গেল, বলল "তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না।"

শিবতোষ কোন উত্তর না দিয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে এমন ভাবে বসে রইল যেন তার মনে একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে। তার পর মুখ তুলে বলল "উঃ!"

সর্বাণী একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বলল, "ওরকম করছ কেন? মাকে ডাকব?"

"না, না, পাগল নাকি, মাকে ডেকে কী হবে?"

কী হয়েছে শিবতোষের? সর্বাণী একেবারে শিশুর মত সরল। সে বুঝতেই পারে না, শিবতোষ কেন এমন করছে, কী হয়েছে তার।

সেবার এই পর্যন্ত। ক্রমশ শিবতোষ তার মনের কথা সর্বাণীকে জানাল। খুবই মোলায়েম ভাবে বলল "সবু, তুমি ত জান তোমাকে আমি কোন কথা গোপন করতে পারি না। কাকেই বা আমি আমার মনের যন্ত্রণা জানাব। তুমি ছাড়া কে আছে?"

সর্বাণী অস্থির হয়ে উঠল। তাই ত, মনের যন্ত্রণাই বটে। শিবতোষ এত আমুদে ছেলে, তার মুখ সদা হাস্যময়। সেই মুখ এত মলিন হয়ে গেল কেন? নিশ্চয়ই ভিতরে কোন গুরুতর ঘটনা ঘটেছে। বেচারী শিবতোষ। তার এত কষ্ট, আর সর্বাণী মনের আনন্দে আছে। ছি ছি এ কি স্ত্রীর কর্তব্য? বলাবাহুল্য বিয়ের সময় সর্বাণী যে-বইগুলি উপহার পেয়েছিল, সেগুলির বেশির ভাগই স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশে পরিপূর্ণ।

শিবতোষ একবার সর্বাণীর মুখের দিকে চাইল। কি সরল সেই মুখ! আকুল ভাবে স্বামীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। শিবতোষের বুকের ভিতর কেমন যেন করে উঠল। অভিনয় করা আর বুঝি তার চলে না। কিন্তু এত সহজেই যদি সে ধরা দেয় তবে আর মজা কী হবে?

তাই শিবতোষ সর্বাণীকে তার একটি গোপন কথা জানাল। সে কথাটি এই যে, শিবতোষ কলকাতায় সম্প্রতি একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছে, মেয়েটিও এমনভাবে তার প্রেমে পড়েছে যে, শিবতোষ যদি তাকে বিয়ে না করে তা হলে সে আত্মহত্যা করবে। আত্মহত্যা করা ছাড়া তার অন্য উপায়ও নাই, কেননা সে কুমারী মেয়ে। শিবতোষ যদি তাকে বিয়ে না করে, তার বাবা নিশ্চয়ই অন্য কোন পাত্রের সংগে তার বিয়ে দিয়ে দেবেন। শিবতোষকে সে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছে, সে কি আর অন্যকে পতিরূপে গ্রহণ করতে পারে!

সর্বাণী সম্প্রতি সাবিত্রীর উপাখ্যান পড়েছে। সে বুঝতে পারল, বাস্তবিকই শিবতোষের সংগে বিয়ে না হলে মেয়েটির অবস্থা সংকটজনক হবে।

আর শিবতোষ? সেই বা কী করবে? সে সর্বাণীকে অবশ্যই ভালবাসে। না হলে তার প্রাণের গোপন কথা সর্বাণীকেই বা জানাবে কেন? কিন্তু ব্যাপারটা যখন এমন গুরুতর একটা মেয়ের প্রাণ নিয়ে টানাটানি তখন—

সর্বাণীর মন এক জটিল আবর্তের মধ্যে যেন ঘুরপাক খেতে লাগল। একবার সে মনে করল, মায়ের অর্থাৎ শাশুড়ীর কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জানায়। কিন্তু উপায় নাই। শিবতোষ কলকাতায় যাওয়ার আগে সর্বাণীকে মাথার দিব্য দিয়ে কথাটা কারও কাছে বলতে বারণ করে গিয়েছে। বলেছে, "সবু, তুমি ছাড়া আর আমার বিশ্বাসের পাত্র কে আছে? তাই মনের যন্ত্রণায় তোমার কাছেই সব বলেছি। কিন্তু তুমি যদি একথা ঘুণাক্ষরে আর কাউকে বল, তবে আমার আর বিজলির দুজনেরই সর্বনাশ হবে। বাবা হয়ত রেগে গিয়ে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন আর নয় ত কলকাতায় গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে বিজলির বাবাকেই সব জানিয়ে দেবেন। ভাব দেখি, তা হলে কী বিপদ হবে। আর মা, মাকে ত জান, তিনি যে কি কাণ্ড করবেন তা আমি ভাবতেও পারি না। পাড়া-পড়শী সবাই আমাকে ছি! ছি! করবে। এমন হলে দেশ ছেড়ে পালান ছাড়া আমার আর কী উপায় থাকবে বল দেখি।"

আমি চলে যাব, একেবারেই চলে যাব।" বলে সর্বাণী দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু সে কি বেরিয়ে যেতে পেরেছে? না ত। সে ত যেখানে ছিল সেখানেই আছে।

শিবতোষকে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কি আমাকে এখনও দেখতে পাচ্ছ?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শিবতোষ বললে, "পাচ্ছি।"

"না, আর পাবে না, আর 'আমায় দেখতে পাবে না। আমি একেবারে চলে যাব, সবাই যেমন মরে গেলে একেবারেই চলে যায়।'

"এবার? এবার ত আমি চলে গিয়েছি, এবার ত আমি মিলিয়ে গিয়েছি হাওয়ার সংগে। নয়?

"আর ত আমায় দেখতে পাচ্ছ না? অমন করে চাইছ কেন, তবে কি এখনও আমাকে দেখতে পাচ্ছ?"

"পাচ্ছি" শিবতোষের মৃদু স্বর সর্বাণীর কানে এল।

"কি হল এ আমার কি হল? মরে গিয়েও আমি তবুও মরে গেলাম, না? উঃ কি যন্ত্রণা! কেমন করে আমি একেবারে চলে যাব, হাওয়ার সংগে মিলিয়ে যাব? কি করব, বল, আমি কী করব? সহ্য হয় না, আর এমনভাবে থাকা আমার সহ্য হয় না।"

"ভগবানের আশ্রয় নাও সবু, তাঁকে ডাক। তিনিই উপায় করবেন।"

"ভগবান! ভগবান!" পাগলের মত সর্বাণী ডাকতে লাগল। "হে মা কালী, হে মা দুর্গা, বাঁচাও, বাঁচাও, অগতির গতি হে দীনবন্ধু! আঃ কি শান্তি, কি আরাম!" এবার, এবার সর্বাণী তবে মুক্তি পেয়েছে? এবার ভগবান তাকে মুক্তি দিয়েছেন?

• • •

মাথার কাছেই বসে ছিল শিবতোষ। সর্বাণীর ঠোঁট নড়ছে দেখে বললে, "সবুরানী, সবু, জল খাবে? কী চাই?"

সর্বাণী চোখ মেলল। অবাক হয়ে চারদিক চেয়ে দেখছে। একি, সে এখন কোথায়? তার শোওয়ার ঘরেই ত সে শুয়ে রয়েছে। ওই ত টেবিল, ওই ত আয়না, ওই ত আলমারি, ওই ত বাটী হাতে করে মা ঘরে ঢুকলেন, মুখে তাঁর উদ্বেগের ছায়া। শিবতোষকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শিবু, বৌমা এখন কেমন আছে? জ্বরটা কি, ছেড়েছে?" সর্বাণী স্পষ্ট শুনতে পেল। না, মরেনি সে, বেঁচেই আছে। জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখছিল। আঃ কি আরাম! কি আরাম! মরেনি, মরেনি বেঁচেই আছে সে।

মা চলে গেলেন। তখন শিবতোষ সর্বাণীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললে, "রানী আমার, আমি কি তোমাকে ছেড়ে আর কাউকে ভালবাসতে পারি? ও-সব মিথ্যে করে বলেছিলাম। বিজলি বলে কোন মেয়েই নেই। আর তুমি এমন বোকা যে, তাই বিশ্বাস করলে আর এমন অসুখ বাধিয়ে বসলে। পাগল আর কাকে বলে।"

সর্বাণীর দুর্বল মনে সব কিছু যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তবে এটুকু সে বুঝতে পেরেছে যে, সে মরেনি, তার অসুখ হয়েছিল। আর বুঝতে পেরেছে, বিজলি বলে কোন মেয়েই নেই, ওটা শিবতোষের আহ্লাদ, তাকে ঠকানর জন্য কেবল একটা চালাকি।

সর্বাণী দুর্বল হাতে শিবতোষের সবল হাত আঁকড়ে ধরল তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। এটা জ্বর ছাড়ার পর আরামের ঘুম। এবার আর কোন স্বপ্নই তার শান্তির ব্যাঘাত করল না।
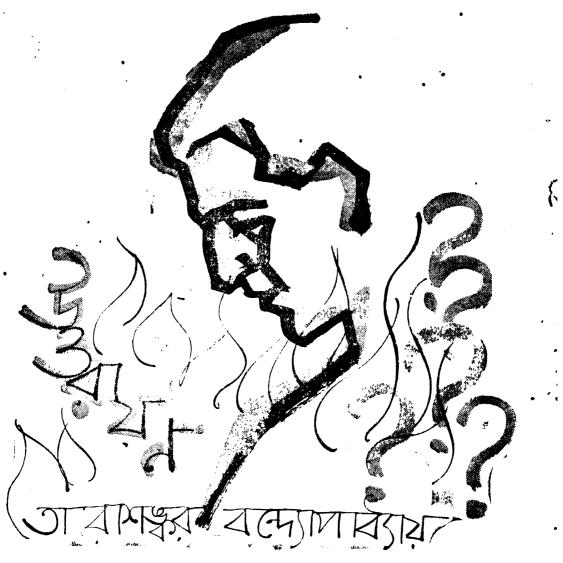
আরতির অবস্থাটা বোঝাতে হলে উপমা দিয়ে বোঝাতে হয়।

অন্ধকার দুর্যোগের রাত্রে ভেঙে-পড়া ঘরের এক ণে আশ্রয় নিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে করতে অকস্মাৎ আলো দেখা দিল; সেই আলোতে জীবনের আশ্বাস ফিরে [illegible] সর্বপ্রথম নজরে পড়ল, এক কোণে মেঝের সঙ্গে গেঁথে রয়েছে একটা আংটি: মলিন, ডেবে যাওয়া একটা আংটি। হয়ত পিতলের, নয়ত তামার। কিন্তু তা যাচাই করবার বা [illegible]কে নেড়ে চেড়ে দেখবার সময় ত তখন নয়। নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে মেঝেয় গেঁথে যাওয়া আংটিটা বিচিত্রভাবে মনের মধ্যে যেন মাজা-ঘষা হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে; তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যায় অনেক কাল আগে হারিয়ে যাওয়া বহুমূল্য হীরের আংটিটির কথা। সেই গড়ন। ঠিক সেই আকার! ঠিক সেই আংটি। সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত হয়ে ওঠে প্রাণ-মন; হৃৎপিণ্ড ধ্বক ধ্বক করে মাথা কুটতে থাকে চরমতম উত্তেজনায়, পায়ের আঙুল থেকে হাতের আঙুল পর্যন্ত সর্বাঙ্গ যেন কাঁপতে থাকে; মাথার ভিতরটায় স্মৃতি-বাহী সমস্ত স্নায়ু-শিরাগুলি যেন ঝনঝন করে ওঠে; ছুটে গিয়ে সেটিকে ফিরে পাবার, অন্তত যাচাই করে দেখবার, আকুল আগ্রহে অধীর হয়ে ওঠে জীবন।

ঠিক তা-ই হল আরতির। অধীর হয়ে উঠল আরতি।

১৯৪৬ সনের ১৯শে আগস্ট।

বড়বাজার অঞ্চলে, কপালিটোলা লেনের কাছাকাছি একটি

গলিতে একখানা পুরনো আমলের বড় বাড়ি। ১৬।১৭।১৮। তিনদিন তিনতলার ছাদে এক কোণে পড়ে থাকা গত তিরিশ চল্লিশ বছরের কি তারও বেশী কালের অব্যবহার্য কয়েকটা জলের ট্যাঙ্কের একটার মধ্যে ঢুকে আত্মরক্ষা করে পড়ে ছিল। ১৬ই তারিখের রাত্রি তখন ৮টা। দিনের বেলা থেকেই বাড়ি থেকে বের হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সে-কথা মনে হলেই তার বাল্যকালে মামার বাড়িতে কালীপুজোর রাত্রির কথা মনে পড়ে যায়। সেখানে এক শ সওয়া শ পাঁঠা বলি হত। সন্ধ্যা থেকে একটা খোঁয়াড়ে পাঁঠাগুলোকে এনে পুরে দিত এবং বলির পূর্বকাল পর্যন্ত সতর্ক প্রহরা থাকত চারিপাশে। লাঠি বা খোঁচা যা-কিছু দিয়ে হক যে-পশুটা মুখ বের করবার চেষ্টা করত, তার মুখেই আঘাত করে ভিতরে ঠেলে দিত। তারপর একে একে হত বলিদান। একসঙ্গে দু তিনটেকে বলি দেওয়াও আরতি দেখেছে। ১৬ই বিকেল থেকে তাদের অবস্থা হয়েছিল ঠিক তাই। তারা মানুষ, তাই তারাও ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল—নইলে ঠিক বলির পশুগুলোর মত ভীতার্ত হয়ে তারা একসঙ্গে এক জায়গায় ঘেঁষাঘেঁষি করে জমাট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। সন্ধ্যের পর থেকেই তাণ্ডব শুরু হয়েছিল। রাত্রির অগ্রগতির সঙ্গে নরকের যবনিকা উঠে প্রকট হল পৈশাচিক উৎসব। এতটা আশঙ্কা কেউ করেনি। বিংশ শতাব্দীতে এ ছিল কল্পনার অতীত। বিকট চিৎকার উঠল। লাল মশালের আলো জ্বলল। দল বেঁধে ঘর ভাঙল। দানবের মত চেহারা নিয়ে দলবন্ধভাবে ঘরে ঢুকল। হত্যা, লুঠ, নারীদেহের উপর পশুর মত বীভৎস অত্যাচার। তারপর আগুন লাগিয়ে চলে গেল। দূর থেকে তা চোখে দেখা যায় না, প্রত্যক্ষদর্শী দেখেও বর্ণনা করতে পারে না। যে-টুকুও পারে, কানে শুনে মানুষ তা সহ্য করতে পারে না। অথচ যারা অত্যাচার করলে, তারা তা পারলে। যাদের উপর অত্যাচার হল, তাদের মধ্যে কয়েকজন সহ্য করেও বেঁচে রইল। একটা দৃশ্য আরতির মনে আছে। একতলায় দরজা ভেঙে তখন সদ্য ঢুকেছে বর্বরের দল। দোতলা বাড়িটা এক-কুঠুরি দু-কুঠুরিতে ভাগ করা বহু ভাড়াটে অধ্যুষিত একখানা বাড়ি। দুটি তলায় অন্তত কুড়িটি ভাগে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ জনের বাস। তার মধ্যে শিশু এবং নারীতে পঁচিশ জন। পুরুষের সংখ্যা কুড়ি-বাইশ। পুরুষহীন পরিবার বড় একটা ছিল না, আরতি ছাড়া। আরতি দুখানা ঘর আর একটা স্বতন্ত্র বারান্দা নিয়ে বাস করত—বাবার সংসারসম্বলহীনা এক বুড়ি পিসীকে নিয়ে। বাড়িখানা আরতিরই বাড়ি। আরতির বাবা কিনেছিলেন প্রায় ৩০ ৩৫ বৎসর আগে, লাভের লোভে। সেন্ট্রাল অ্যাভেনু রাস্তার স্কীম তখন সদ্য কাজে পরিণত হবে। একজন বাড়ির দালাল তখন তাঁকে বুঝিয়েছিল যে, পুরনো বাড়িটা সস্তায় কিনে খুব ভাল রঙচঙ করলে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কাছে অনেক বেশী দাম পাওয়া যাবে। যারা দাম কষবে, তাদের কিছু টাকা দক্ষিণা দিলেই হবে। সবই হয়েছিল, কিন্তু বাড়িটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে পড়েনি। নীচের তলার দরজা যখন ভাঙল—তখন একবার একটা কলরব উঠল। কলরব নয়, একটা আর্ত ক্রন্দন-রোল। ও—। সে 'ও—' রোল ওই বর্বরের হা-হা শব্দের চেয়েও মর্মান্তিক, এবং তার মধ্যে সে যে কী বিভীষিকা, সে যে না শুনেছে, তাকে বলে বোঝান যায় না। পুরনো কালের চকমিলান ভিতরে-উঠান-ওয়ালা বাড়ি; নীচের উঠানে মশালের আলো হাতে তারা ঢুকে হা হা চিৎকারের সঙ্গে ধ্বনি দিয়ে উঠল। ঈশ্বরের নামকে কলঙ্কিত করে ঈশ্বরের নাম নিয়ে ধ্বনি! বুড়ি ঠাকুমা সর্বাগ্রে একটা অমানুষিক 'ও—' চিৎকার করে ছুটে বেরিয়ে গেল বারান্দায়। ঠাকুমা—বলে তাঁকে ডেকে ফেরাতে গিয়ে আরতি এসে পড়ল সিঁড়ির মুখে। নজরে পড়ল, আক্রমণকারীরা তখনও বাড়িতে ঢুকছে এবং প্রথম দল এগিয়ে আসছে সিঁড়ির মুখে। তারা উঠবে উপরে। মুহূর্তে আরতি ছাদের সিঁড়ি ধরল। ছাদের দরজাটায় খিল ছিল না, শুধু ছিল উপরে নীচে ছিটকিনি। তাও উপরেরটা অচল, নীচেরটাই ছিল সচল। ছাদে এসে সর্বপ্রথম চেয়েছিল সে ছাদ থেকে দরজা বন্ধ করে শিকল আটকাতে। কিন্তু শিকল ছিল না। তবু সে কড়া-দুটো ধরে দরজাটা টেনে দিয়ে চারিদিকে খুঁজেছিল একটু আশ্রয়। একবার ছুটে গিয়েছিল আলসের ধারে। গিয়ে শিউরে উঠেছিল। নীচের রাস্তা পর্যন্ত উচ্চতার পরিমাপ দেখে নয়। রাস্তায় দানবিক উল্লাস দেখে, মশালের আলো দেখে, চারি-পাশের বাড়িতে-বাড়িতে চিৎকার শুনে। একটু দূরে একটা বাড়ির ছাদে দেখেছিল, একটি মেয়ে ভয়ে পাগলের মত চিৎকার করে ছুটে বেড়াচ্ছে, তাকে ধরবার জন্য হা-হা শব্দে অট্টহাস্য করে ছুটছে একটা পশু। তার পাশেই একটা পুরুষকে এক-খানা ছোরা দিয়ে আঘাত করলে আর দুজন। আরতি এবার বুদ্ধি-বিবেচনা না-করেই ছুটে গেল ছাদের দরজার দিকে। নীচে নেমে যাবে সে। কোথায় যাবে তা জানে না—তবে নীচে যাবে। মনে ভাসছিল নিজের ঘরখানি। কিন্তু ছাদের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নীচের সচল ছিটকিনিটা আটকাবার আংটাটা ভেঙে যাওয়ার পর সিঁড়ির উপরেই একটা গর্ত খুঁড়ে নিয়েছিল বাড়ির লোকেরাই; দরজা ঠেলে দিলেই ছিটকিনিটা আপনি পড়ে যেত গর্তটার মধ্যে। চিৎকার আপনি বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল তার গলা থেকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজের মুখ নিজে চেপে ধরেছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই আত্মরক্ষার সচেতন বুদ্ধি ফিরে এসেছিল তার। ওই স্তূপীকৃত বাতিল জলের ট্যাঙ্কগুলোর কাছে ছুটে এসে, গুঁড়ি মেরে কোন রকমে আলসের ধার ঘেঁষে একেবারে কোণটায় এসে বসেছিল; কিন্তু তাতেও তার স্বস্তি হয়নি। সব চেয়ে নীচের ট্যাঙ্কটার ভাঙা মুখটার মধ্য দিয়ে গলে সে ভিতরে ঢুকে বসেছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই, কি তার মিনিটখানেক পরেই, ছাদের দরজায় ধাক্কা পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বর্বরদের [illegible] কণ্ঠের কথা শুনতে পেয়েছিল, "বন্ধ হ্যায়। তব ত আদমি হ্যায় ছাদকা অন্দর। তোড়ো।"

দুমদাম শব্দ উঠল। আরতি দাঁত টিপে চোখ বন্ধ করে প[illegible] রইল। তারপরই শুনতে পেলে, "আরে-আরে- ইধরসে ব[illegible] হ্যায়, উস্কা ছিটকিনি উধার [illegible]।"

পরমুহূর্তেই দরজাটা খুলে গেল। ক[illegible]া, বলতে [illegible]

GOVERN... Cooch B...

হে ভগবান—রক্ষা কর, রক্ষা কর। নইলে মৃত্যু দাও!

পারে না আরতি; তবে মনে হল, অসংখ্য উন্মত্ত দর্পিত পদ-ক্ষেপে ছাদখানা বুঝি ভেঙে পড়বে। পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে বেড়ালে তারা।

"ইধর দেখো। ইয়ে পানিকে টাঁকিকে ইধর।"

জীর্ণ ট্যাঙ্কগুলোর উপর প্রথম পড়ল কয়েকটা লাঠির আঘাত। উপরের দুটো ট্যাঙ্ক হুড়মুড় করে পড়ল স্থানচ্যুত হয়ে। একটা পড়ল ছাদের ভিতরের দিকে; অন্যটা পড়ল আরতির আশ্রয়স্থল ট্যাঙ্কটা এবং আলসের মধ্যবর্তী ফাঁকটার উপর। অন্ধকার হয়ে গেল পৃথিবী। আরতির জীবনের বোধ করি সর্বোত্তম সৌভাগ্য সেই অন্ধকার। ভগবান দেবতা মানলে সে মনে করত এবং বলে বেঁচে যেত, ভগবান যেন অন্ধকার হয়ে আমাকে বুকে দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন।

কারণ ওতেই বেঁচে গেল সে। ওধারের ট্যাঙ্কটা থেকে পচা জল এবং আরও কিছু এমন ছাদময় গড়িয়ে পড়ল, যার জন্য ওই পশুর দল তোবা-তোবা বলে পিছিয়ে গেল। এই ট্যাঙ্কটার মধ্যেও আরতি এমনি দুর্গন্ধময় পচা জলের স্পর্শ অনুভব করছিল, আর তার সঙ্গে নানান ধরনের কীটের স্পর্শ। উচ্চিংড়ে, আরশুলা, আরও অনেক কিছু। এরই পর হঠাৎ তীব্র জ্বালাকর দংশন অনুভব করেছিল সে। তারপর আর মনে নেই। যন্ত্রণায় চেতনা বিলুপ্ত হয়েছিল তার। চেতনা যখন ফিরেছিল, তখন দিনের আলো চারিদিকে। যে-কয়টা ছিদ্র ছিল, তার ভিতর দিয়ে কয়েকটা রশ্মিরেখা এসে ভিতরে পড়ে ভিতরের অন্ধকারকে স্বচ্ছ করে তুলেছিল। অসহ্য তৃষ্ণা। কিন্তু চারিদিকে ওই পৈশাচিক উল্লাস কলরোলের বিরাম ছিল না। ছাদের উপর থেকেই টের পেয়েছিল দোতলায় গোলমাল উঠছে; নানান ধরনের শব্দ উঠছে; ভারী জিনিস—কারা যেন টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। দোতলায় কী হচ্ছে, তা সে দেখতে পেয়েছিল —ট্যাঙ্কের ছিদ্র এবং আলসের ফাঁক দিয়ে সামনের একটা বাড়ির তে-তলার ঘরে। দিনের আলোতেও খুন হচ্ছে, নারী-ধর্ষণ হচ্ছে, লুঠ হচ্ছে। একজন বুড়ি রক্তের প্লাবনের মধ্যে ভাসছে, একটি অর্ধোলঙ্গ যুবতী মেয়ে অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে, গোঙাচ্ছে; কতকগুলো লোক ঘরের জিনিসপত্র টেনে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। বাক্স ব্যাগ, দেওয়াল-ঘড়ি, রেডিয়ো, কাপড়চোপড়, যে যা পাচ্ছে টেনে নিয়ে চলেছে। কয়েকজন খাট খুলছে। ড্রেসিং টেবিলের আয়না খুলছে। ড্রয়ারগুলো টেনে উপুড় করে ফেলে দেখছে। তৃষ্ণা তার আতঙ্কে শুকিয়ে গেল। মনে হল—চেতনা তার বিলুপ্ত হয়ে আসছে, কিন্তু প্রাণপণে নিজেকে সচেতন রাখলে সে। অচেতন অবস্থায় সামনের বাড়ির ওই অচেতন মেয়েটার মত এমনি গোঙানি যদি তার গলা থেকে বেরিয়ে আসে! তৃষ্ণা নিবারণ করেছিল বর্ষার আকাশ। ঘন মেঘ করে এসে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল; ট্যাঙ্কের উপরের দিকের টিনটার একটা ছিদ্র বেয়ে গড়গড় করে জল পড়তে শুরু হল, সেই জল ব্যাকুল অঞ্জলিতে ধরে খেয়ে বেঁচেছিল। সুস্থ হয়েছিল। বেলা তখন কত, তা তার জানবার কথা নয়। হঠাৎ এই কলরোল আবার বাড়ল। এবার ধ্বনির উত্তরে ধ্বনি উঠতে লাগল। নজরেও পড়ল, উত্তর দিকে বড় বড় বাড়িগুলির ছাদে লোকের চলাফেরা। তারা এরা নয় তারা আক্রান্ত, তাদের সম্প্রদায়ের লোক। হাতে বড় বড় থান ইট, আরও কত কিছু, বন্দুকও দেখতে পেলে তাদের হাতে। বন্দুকের শব্দ গত রাত্রি থেকেই হচ্ছে। বড় বড় বিস্ফোরণের শব্দ উঠতে লাগল। জ্বলন্ত কাপড়ের পুঁটলি পড়তে লাগল একবার এদের ধ্বনি এগিয়ে যায়, একবার ওদের ধ্বনি এগিয়ে

আসে। সন্ধ্যা থেকে বাড়তে লাগল তাণ্ডব। সে-তাণ্ডব শেষ-রাত্রের দিকে স্তব্ধ হল। তখন একবার বের হয়েছিল সে। আর থাকতে পারেনি। বেরিয়ে একবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেহখানাকে যতটুকু পারে সুস্থ করে নিয়েছিল। উর্ধ্বলোকে আকাশের নক্ষত্রমালার দিকে তাকিয়ে যে-ভগবানকে সে বিশ্বাস করে না, সেই ভগবানকে ডেকে বলেছিল, "হে ভগবান—রক্ষা কর, রক্ষা কর। নইলে মৃত্যু দাও!" চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল।

ময়লা জলের ট্যাঙ্ক থেকে আকণ্ঠ জল খেয়েছিল।

ভগবানের পাঠান কি না সে জানে না, তবে কাকের থা চিলের মুখ থেকে খসে পড়া আধখানা পোড়া রুটিও হঠাৎ সে পেয়ে গিয়েছিল। ভোরবেলার আগেই এসে আবার সে সেই ট্যাঙ্কটার ভিতর ঢুকেছিল। ১৮ তারিখে এ-বাড়িতে আর কোন সাড়া পায়নি। শুধু বার তিনেক কোন একজনের শিস শুনেছিল; শিসের সংকেত নয়, শিস দিয়ে গান। বাড়িটা যেন ইডেন গার্ডেনের একটি নির্জন প্রান্ত, সেই নির্জন প্রান্তে কোন দেওয়ানা বা বিলাসী ঘুরছে আর শিস দিয়ে গান করছে। কোলাহল ছিল রাস্তায়। প্রচণ্ড কলরব আর কোলাহল, ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি, বোমার শব্দ। সন্ধ্যা পর্যন্ত আক্রমণকারীর দলের ধ্বনি পিছনে হঠল। সন্ধ্যার পর নূতন কিছু আরম্ভ হল। অনবরত প্রায় বন্দুকের শব্দ—আর প্রচণ্ড বেগে লরি-ছোটার শব্দ।

ফট-ফট-ফট-ফট-দুম-দুম। সে আর কান পাতা যায় না। ধ্বনি কোলাহল প্রায় স্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে এক-আধবার শোনা যায় শুধু। কখনও শোনা গেল এক একজন মানুষের মর্মান্তিক আর্ত চিৎকার।

১৯শে সকাল বেলা। আবার বাড়ির নীচে মানুষের পদশব্দ শোনা গেল। অনেক মানুষ। যেন প্রতিটি ঘর খুঁজছে। কথা কানে এল, "কেউ বেঁচে আছে? সাড়া দাও—আমরা উদ্ধার করতে এসেছি।"

সামনের তেতলা বাড়িটার ঘরে কয়েকজন এসে ঢুকল।

"কেউ আছ?"

আর তার সন্দেহ রইল না। চিৎকার করতে চেষ্টা করলে সে, "ওগো—ওগো—আমি আছি! বাঁচাও!" কিন্তু কণ্ঠস্বর তার ফুটল না। সে বের হয়ে আসবার জন্য চেষ্টা করলে। কিন্তু তার হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে, দেহে যেন একবিন্দু শক্তি আর অবশেষ নেই। সামনের ট্যাঙ্কটা তার ঠেলায় পড়ে গিয়ে একেবারে মোক্ষম হয়ে মুখ আটকে বসে গেল। এবার একটা চিৎকার করে সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

জ্ঞান যখন হল, তখন তাকে ধরাধরি করে নানান হচ্ছে। তাকে এনে তুললে একটা লরিতে। লরিতে গাদাগাদি লোক, পুরুষ নারী শিশু যুবা বৃদ্ধ। প্রেতার্তের আতঙ্ক মুখে-চোখে। তাদের বাড়িটার এক বুড়ো রয়েছে, আর পুরুষ কেউ নেই; তিনটি মধ্যবয়সী মেয়ে রয়েছে, মুখে কালশিটের দাগ, বুকে দাগ; মুখাবয়বে আতঙ্ক-লজ্জা-ঘৃণার স্মৃতি মাখান এক উদাস ক্লান্তি। সূর্যে সর্বগ্রাসী গ্রহণ যে-সময়টিতে পূর্ণ হয়, সেই সময়টিতে পৃথিবীর সর্বাঙ্গে যে-ছায়া ফুটে ওঠে, এ যেন ঠিক সেই ছায়া; সর্বনাশের ছাপ!

চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু ধরে মেডিক্যাল কলেজের সীমানা পার হয়ে গাড়িটা যখন মির্জাপুর স্ট্রীট ধরে ঘুরছে, ঠিক সেই মুহূর্তে তার নজরে পড়ল।

এই কয়েক দিনরাত্রির দুরন্ত দুর্যোগকে এক মৃত্যু-বিভীষিকাময় প্রলয়-রাত্রির সঙ্গে তুলনা করে বলতে গেলে বলতে হয়, দুর্যোগ অবসানে সূর্যোদয়ের মত ওই মুহূর্তটিতে নজরে পড়ল, মাটিতে-ধুলোয়-আবর্জনার কালিমায় বিবর্ণ-হয়ে-যাওয়া একটি আংটি।

একটি মানুষ। রোদে পোড়া রঙ, তামাটেও নয়, কালোই হয়ে গিয়েছে। মাথায় রুক্ষ খসের বড় বড় চুলের কয়েক গোছা লালচে হয়ে গিয়েছে। ঘন চুলের নীচে কপালখানি বড় ছোট, ওই ছোট কপালের ত্রিবলী রেখার দাগগুলি ময়লা জমে পেন্সিলের দাগের মত হয়ে রয়েছে। বাকী মুখটা দাড়ি গোঁফে ঢেকে গিয়েছে। চোখে শান্ত উদাস দৃষ্টি।

বারেকের জন্য আরতির দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টি মিলল। তারপর ক্লান্তিভরে আরতিও দৃষ্টি নামিয়ে নিলে; সেও অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালে। আরতির কোন কিছু মনে করার অবস্থা তখন ছিল না। শুধু মনে হল, লোকটা বড় রোদে পুড়ে গিয়েছে। পরমুহূর্তেই একটি রশ্মিরেখা আপনি জ্বলে উঠে তার মনের অতীত কালের অন্ধকারাচ্ছন্ন স্মৃতির ঘরে বারেকের জন্য ঝলকে উঠে আবার নিভে গেল।

লরিটা মোড় ফিরল আমহার্স্ট স্ট্রীটে।

নিদারুণ ক্লান্তির উপর আগস্টের প্রখর রৌদ্রে আরতি কেমন হয়ে যাচ্ছিল। দ্রুত ধাবমান কোন খোলা যানের উপর বসে যেতে-যেতে পাশের বাড়িগুলোকে পিছনে ছুটছে বলে মনে হয় স্বাভাবিকভাবেই, কিন্তু আরতি দেখছে আরও কিছু। সে দেখছে, বড় বড় বাড়িগুলো কাত হয়ে পড়তে পড়তে পিছনের দিকে যেন ডিগবাজি খেয়ে চলে যাচ্ছে।

এরপর একটা বিস্ফোরণের শব্দ তার কানে এসেছিল।

একটা বোমা পড়েছিল আমহার্স্ট স্ট্রীট আর মেছুয়াবাজার স্ট্রীট জংশনে। শব্দ শুনে সে চকিত হয়েছিল, কিন্তু চেতনায় ফিরতে পারেনি। বারেকের জন্য মাথা তুলে আবার ঢলে পড়েছিল। চেতনা হল বাগবাজার স্ট্রীটে বোসেদের বাড়িতে আশ্রয় পাবার পর। সেও কিছুক্ষণের জন্য; তাকে দেখে—তার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা করে তাকে উদ্ধার-কর্তারা একটি ঘরে অল্প কয়েকজন মহিলার সঙ্গেই রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা গেলেন ভিতর পর্যন্ত, তাদের দিকে একবার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সে। সেই তাকাবার সময় আর একবার চোখ পড়ল ওই মলিন লোকটির উপর। আবার একবার পড়ল। যখন ডাক্তার এসে তাকে দেখলেন, তখন।

তারপর সারারাত ধরে সে ঘুমিয়েছিল।

॥ দুই ॥

পরের দিন সকালে।

ঘুম ভাঙবার ঠিক সংক্ষিপ্ততম মুহূর্তটিতেই **আশ্চর্য** কোন কারণে আরতির প্রথম মনে পড়ে গেল ওই মানুষটিকে। তারপর মানুষটির সূত্র ধরে লরি, লরির সহযাত্রী-যাত্রিণী, তারপরই যেন একটা বড় ঝাঁপ দিয়ে অনেক ঘটনা পার হয়ে মনে পড়ে গেল দুর্যোগের কটি দিনরাত্রি অথবা দুর্যোগের সেই দিনরাত্রির অতীত একটা বিভীষিকাময় কালকে। বউবাজারের গলির সেই বাড়ি।

দুর্যোগের অবসান হয়েছে। সে একটা স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। আঃ!

আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সেই মানুষটিকে।

কোথায় কী আছে মানুষটির ম... ! যেন মনের ঘরের কোন্ কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। হঠাৎ যেন টান পড়ে যাচ্ছে! লোকটার পোশাকে পরিচ্ছদে মোটর-ড্রাইভারি বা মোটর মেরামতের কারখানার কিছু সংস্রব আছে। পরনে ছিল—খাকী প্যাণ্ট, খাকী হাফ-হাতা শার্ট; হাতে ছিল একটা মোটরের স্টার্টিং হ্যাণ্ডেল।

চিন্তায় বাধা পড়ল। ভলেণ্টিয়াররা মাটির ভাঁড় আর একটা বড় কেটলি নিয়ে চা দিতে এসেছে। উঠানে বারান্দায় কলরব উঠেছে। দুর্যোগ পার হয়ে একরাত্রি এই নিরাপদ আশ্রয়ে বাস করে জীবন এরই মধ্যে অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে। পাথর চাপা-পড়া ঘাস যেমন পাথর সরে গেলে আলো-বাতাসে মুহূর্তে মুহূর্তে সজীব হয়ে ওঠে ঠিক তেমনিভাবে মুহূর্তে মুহূর্তে বেঁচে উঠছে মানুষ।

ভাঁড়ে চা আরতি বহুকাল আগে খেয়েছে। ওই মামার বাড়ি যাওয়ার সময় রেলপথে স্টেশনে খেয়েছে। বর্ধমান থেকে হাওড়া পর্যন্ত স্টেশনে স্টেশনে ভাঁড়ের চায়ের কারবারটা জোর চলে। কিন্তু সেও অনেকদিনের কথা। আরতির মাতামহীর মৃত্যুর পর থেকেই সে যাওয়া-আসাও বন্ধ হয়েছে! মামারা কেউ কলকাতায়, কেউ দিল্লীতে—কেউ বম্বেতে বাস করছেন। মামার বাড়ি শেষ সে যখন যায় তখন তার বয়স চৌদ্দ পনের বছর। সে আজ বার বছর আগের কথা। ভাঁড়ে চা বোধ হয় তারপর আর খায়নি। তবুও আজ বেশ লাগল। জানালার মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছে, একটা উনোনে হাঁড়িতে জল গরম হচ্ছে এবং সেই জল আর একটা বড় হাঁড়িতে ঢেলে প্যাকেট-প্যাকেট গুঁড়ো চা ঢেলে দিয়ে পাইকারি হারে চা হচ্ছে। গুঁড়ো চায়ের একটা গন্ধ আছে। হাঁড়িতে গরম জলের মধ্যেও অন্তত হাঁড়ির গন্ধ থাকবার কথা। কিন্তু সে-সব কিছুই যেন টের পেলে না। বরং তৃপ্তি করে ভাঁড়ের চাটুকু শেষ করে বললে, "আর একটু দেবেন ত।"

"নমস্কার! আপনাদের নাম-ঠিকানা, গার্জেনের নাম, কাকে কাকে পাচ্ছেন না, আর কলকাতায় কোন নিকট-আত্মীয়স্বজন আছেন কি না—যেখানে গেলে আশ্রয় পেতে পারেন, এইগুলি বলতে হবে।"

তিনজন ভদ্রলোক ঘরে এসে ঢুকলেন। আরতি একজনকে চেনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, নামকরা গান্ধীভক্ত। আর দুজনের একজন কোন সম্পন্ন ঘরের সন্তান। আর-একজন বোধ করি পাড়ার সেই সব ছেলেদের একজন, যারা সাধারণ সময়ে রোয়াকে বসে আড্ডা দেয়, চায়ের দোকানে তকরার করে, এবং যে-কোন হৈ চৈ হলেই সেখানে ছুটে যায়। কালকের সেই লোকটিরই দোসর কেউ হবে।

কালকের সেই লোকটিকে আবার মনে পড়ে গেল। কলকাতার হাজার হাজার মোটর-ড্রাইভার, মোটর-মিস্ত্রিদের কেউ!

তাদের এককালে মোটর ছিল; তার ড্রাইভার বরাবর একজন—বুড়ো বচ্চন সিং। বৃদ্ধ শিখ। এ-লোকটি হিন্দুস্থানী, নয়ত বাঙালী। এরকম কাউকে ত—তার মনের প্রশ্নকে খণ্ডিত করে প্রফেসর ঘোষ সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "আপনি—তুমি—তুমি আরতি না? ইউনিভার্সিটিতে ইকনমিক্স-এর ক্লাসে—?"

আরতির মুখে এবার একটু স্মিত এবং সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। সে হাত জোড় করে নমস্কার করতে গিয়ে হঠাৎ উঠে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সামনেই দাঁড়াল।

সবিস্ময়ে প্রফেসর ঘোষ বললেন, "তুমি? মানে তোমরাও আটকে পড়েছিলে না কি? তোমাদের ত নিজেদের বাড়ি! অন্তত তা-ই শুনতাম ইউনিভার্সিটিতে।"

"হ্যাঁ, আমাদেরই বাড়ি। বউবাজারে কপালিটোলা লেনের কাছে।"

"সর্বনাশ! সে ত একেবারে ভয়ানক জায়গা। লুঠতরাজ হয়েছে নাকি?"

আরতি মৃদুস্বরে বললে, "এক রাত্রি এক-দিন ধরে লুঠ হয়েছে। যা নিয়ে যেতে পারেনি তা নীচের উঠোনে জড় করে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। চার-পাঁচজন খুন হয়ে পড়ে আছে দেখে এসেছি। আমার এক বুড়ি ঠাকুমা—বাবার পিসিমা—"

আরতির কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল, চোখ ফেটে দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে এল। আর সে আত্মসংবরণ করতে পারল না।

অধ্যাপক ঘোষ তার মাথায় হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিলেন, "কেঁদ না। বেঁচে যখন গেছ; কিন্তু—কিন্তু—তোমায়—। তোমায় মারধর করেছে কি?"

আরতির কপালে কয়েকটা ছড়ে যাওয়ার দাগ দেখে তিনি শিউরে উঠলেন। তাঁর শেষের কথা কটা বলবার সময় কণ্ঠস্বরে নিদারুণ আতঙ্ক ফুটে উঠল।

সুকৌশলে প্রফেসর ঘোষ যে-প্রশ্ন তাকে করেছিলেন, সে আরতি বুঝেছিল। সে ঘাড় নেড়ে জানালে, "না।"

"যাক, তবু ভাল।" প্রফেসর ঘোষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, কিন্তু আবার বললেন, "লজ্জার এ সময় নয়। মানে অত্যাচার হয়ে থাকলে তার দুটো প্রতিকার প্রয়োজন, তার যেটা প্রাথমিক, সেটা চিকিৎসা। নয় কি?"

আরতি আবার ঘাড় নেড়েই বললে, "না। আমাকে ওরা খুঁজেই পায়নি। আমি প্রথমেই ছাদে উঠেছিলাম। ছাদের কোণে কতকগুলো পুরনো জলের ট্যাঙ্ক ডাঁই করা ছিল। আমি তারই সকলের তলাটার মধ্যে ঢুকে ছিলাম। ওরা উপরের কতকগুলো খুঁজে কিছু না পেয়ে সেটা আর নাড়েনি। আমি তিনদিন সেই তারই মধ্যে ছিলাম।"

প্রফেসর ঘোষ আবার একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটু হেসে বললেন, "আমারই ভুল। তোমাকে পেলে—তোমাকে ওরা ছেড়ে যেত না।"

এবার আরতি শিউরে উঠল। ওদের বাড়ির ভাড়াটেদের তিনটি তরুণী বউ, পাঁচটি যুবতী মেয়ে, তারা ত কেউ আসেনি! মনে পড়ে গেল সামনের তেতলা বাড়িটার সেই যুবতী বধূটির সেই গোঙানি!

"কিন্তু তুমি এখন যাবে কোথায়? ও-বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা এখন ভুলে যাও। এখানকার অবস্থা ত দেখছ। তুমি কি এখানে থাকতে পারবে?"

সঙ্গের ভদ্রলোকটি এবার কথা বললেন, "বিপদের কথা নিশ্চয় স্বতন্ত্র। থাকতেই হয়। কিন্তু কলকাতায় কোন নিরাপদ এলাকায় কোন আত্মীয়স্বজন নেই আপনার?"

প্রফেসর ঘোষ বললেন, "আত্মীয় না থাক, তোমার বন্ধুবান্ধবও ত অনেক আছে! কারও বাড়ি গিয়ে থাক এখন। এখানে অনেক অসুবিধা! আমি ত জানি, এ ঠিক সহ্য করতে পারবে না তুমি।"

তারপরই সঙ্গী ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে বললেন, "ওঁর জন্যে ভাবতে হবে না! আরতির অনেক বন্ধুবান্ধব।......তুমি ঠিক কর কোথায় যাবে। আজই পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব।"

আরতির কানের পাশ দুটো গরম হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। গায়ের রঙ ফরসা হলে বোধ হয় টুকটুকে রাঙা হয়ে উঠত। আরতির সৌভাগ্য যে, তার রঙ ময়লা। ইউনিভার্সিটিতে সে-সময় [illegible] ছেলেরা তার আড়ালে তাকে লেডী কালিন্দী বলে ডাকত।

প্রফেসর ঘোষ তখন [illegible] একটি প্রৌঢ়াকে প্রশ্ন করছেন। [illegible] মা

আপনাদের কথা! কোথায় বাড়ি বা বাসা ছিল?"

* * *

"ওর জন্যে ভাবতে হবে না। আরতির বন্ধুবান্ধব অনেক।"

কথা কটা আরতির কানের কাছে যেন বেজে চলেছে। তারই জন্য কানের পাশ দুটো গরম হয়ে উঠেছে তার। প্রফেসর ঘোষ যেন খোঁচা দিয়ে কথাটা বললেন।

মতবাদে মানুষ যে-বাদীই হক না, মানুষের নিজস্ব স্বভাবকে অতিক্রম করা যায় না। গান্ধীবাদী অধ্যাপক ঘোষ নইলে এমন করে কথাটা বলতেন না। গান্ধীবাদের জন্যই আধুনিকতাকে প্রফেসর ঘোষ পছন্দ করেন না। আধুনিক কালে যা সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে জন্মায়, তা-ই সতেজ প্রকাশে ঝলমল করে ওঠে, তাই উল্লসিত-বর্ধনে বাড়ে, তা-ই দ্রুততম গতিতে ছোটে। যা পুরনো, তা-ই মন্থর, তা-ই স্থবির, তা-ই বিষন্ন, তা-ই মলিন। নূতনকে আধুনিককে চিরকাল এইভাবে পছন্দ করে না।

আরতির বাবা ছিলেন পুরোপুরি মডার্ন। সেকালে এম-এ পাশ করেও চাকরি খোঁজেননি। ব্যবসায়ে নেমেছিলেন। ব্যবসায়ে অনেক উপার্জন করেছেন, অনেক লোকসান দিয়েছেন, অনেক খরচ করেছেন। এক ছেলে, রথীন। এক মেয়ে, আরতি। রথীনকে ছেলেবেলা থেকেই পড়তে দিয়েছিলেন সেণ্ট জেভিয়ার্সে। আরতিকে প্রথমে দিয়েছিলেন —লরেটোতে, তারপর ডায়োসেশনে। আরতির জন্ম কপালিটোলার বাড়িতেই। তখন বাড়িটার কোন ভাড়াটে ছিল না। গোটা বাড়িটাই সায়েবী ঢঙে আধুনিকতম স্বাচ্ছন্দ্য এবং সজ্জায় সাজান ছিল। জন্মে থেকে আরতি খাবার ঘরে দেখেছে টেবিল-চেয়ার। মধ্যে মধ্যে ছেলেবেলায় মামার বাড়ি গিয়ে পুরনো কালের ধারাধরনের মধ্যে অসুবিধায় পড়ত। দাদা রথীন কোনকালেই মামার বাড়ি যেত না। তার মামারাও আধুনিক-পন্থী, কিন্তু পৈতৃক দেবত্র সম্পত্তির টানে তাঁরা আজও গ্রামের সঙ্গে বাঁধা আছেন: পুজোপার্বণ আচারবিচার বজায় রাখতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তার বাবার ওই বন্ধন ছিল না। তিনি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, পড়াশুনায় ভাল ছিলেন বলে ওই সম্পত্তিবান ব্যবসায়ীর ঘরে বিয়ে করেছিলেন। সেই সূত্রে ব্যবসায়ে নেমেই পৈতৃক জমিজিরাত যা ছিল সব বিক্রি করে দিয়ে মুক্তি নিয়েছিলেন। এবং আধুনিকতাপন্থী শ্বশুরবাড়িকে ছাড়িয়ে সত্যকারের আধুনিক হয়েছিলেন। বিদেশের বহু ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। আরতির জন্মের আগে [illegible] আরতি শুনেছে, প্রথম মহাযুদ্ধের পরে [illegible]নিকার ইংরেজ আমলের কোল [illegible], এঁরা তার বাবাকে খুব ভালবাসতেন। তাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন পর্যন্ত খেতে আসতেন মেম-সায়েবদের নিয়ে। হোটেল থেকে লোক এসে সার্ভ করত। তার সঙ্গে থাকত তার মায়ের হাতের কিছু দিশী রান্না। অনেকে এর জন্যে অনেক নিন্দে করেছে, কিন্তু তার বাবা কোন দিন গ্রাহ্য করেননি। তিনি মুখের উপর বলতেন, "Please, Please, ও-সব কথা বলবেন না আমাকে। আমি মূর্খ নই। আমার ফ্রাস্ট্রেশনের হেতু নেই, আমি গড্ডালিকাপ্রবাহের মানুষ নই, বুড়ো-গরু-টানা একখানি গো-যান নই, আমি সস্তা জনপ্রিয়তার ভিক্ষুক নই, আমি ইতিহাস জানি, আমি সে-ইতিহাসের স্বরূপ নিজের চোখেই দেখেছি, এই কালেই দেখেছি। বাঙালী জাত মেছোর জাত আর চাষার জাত। মাছ-ভাত খাদ্য; একফালি লেংটি বস্ত্র; আর পরকীয়া সাধন তার আধ্যাত্মিকতা, ওই রসের গান তার সাহিত্য। খোল বাজিয়ে ধেই ধেই করে নাচ তার নাট্যকলা। ওই কালিঘাটের পট তার শিল্পকলা। মাটির ভাঁড় আর খুরি তার তৈজস। খড়ের চালের মাটির কুঁড়ে, পূর্ববঙ্গে ছিটে বেড়ার, এই তার স্থাপত্য। ভাগ্যে ইংরেজ এসেছিল। তাদের সংস্পর্শে এসে ইংরিজী শিখে জাতটা বাঁচল। ওই ব্রাহ্মরা ভাগ্যে ইংরিজি শিখেছিল, আর হিন্দু সমাজ থেকে কেটে বেরিয়েছিল, তাই রবি ঠাকুরকে পেয়েছে। নইলে ইংরিজী শিখেও ধর্মের টানে বঙ্কিমেই খতম হত পালা।"

তারপরই বলতেন "আবার এসেছে এই এক গান্ধী। গুজরাটী বুদ্ধ। দেশটাকে একেবারে কপনি পরিয়ে ছাড়বে। বঙ্কিম করেছিল—মা মা। এ করছে—রাম রাম! শেষ পর্যন্ত দেশের এনার্জিকে রাম নাম সত্ হায় হাঁক দিয়ে নিমতলায় পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।"

এই ধরনের উক্তির পরে সমালোচকেরা স্তম্ভিত হয়ে যেত। কোন পুজোতে তিনি চাঁদা দিতেন না। তাঁর দম্ভ এবং আদর্শ বজায় রাখবার সঙ্গতি তাঁর ছিল। সে দু দিক দিয়েই। অর্থের দিক দিয়ে ত বটেই, মনের দিক থেকেও। ভেঙে গিয়েছিলেন শেষ দিকটায়। উনিশ শ চল্লিশের শেষ দিকে। আরতির মা তখন মারা গেছেন। রথীন বিলেতে। যুদ্ধ লাগল। তার বহুদিন আগে থেকে তার বাবা জাপানীদের সহযোগিতায় এখানে কাঁচ লোহা তৈরির একটা বড় প্রচেষ্টায় নেমেছিলেন। জাপানীরা যুদ্ধে নামবার সঙ্গে সঙ্গে সে-প্রচেষ্টায় একেবারে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গেল। বলতে গেলে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। তখন তার বাড়ি আরও তিনখানা বাড়ি করেছেন। একটা ব্যাঙ্ক করেছেন। ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কটা ফেল পড়ল। জাপানীযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে। রেঙ্গুন পড়েছিল ১৯৪২-এর মার্চ মাসে। তার আগেই যুদ্ধের চেয়েও দ্রুত গতিতে ঘটনাগুলো ঘটে গেল। ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার দায়ে তার বাবা অ্যারেস্টেড হলেন। নতুন তিনখানা বাড়ি বিক্রি করে বাবা মুক্ত হলেন প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে। আরতি এই সময়টাতেই ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হয়েছে। এই সময়কার কথা তুলেই প্রফেসর ঘোষ তাকে খোঁচা দিয়ে কথাটা বললেন।

কালো মেয়ে আরতি ইউনিভারসিটিতে ঢুকত তার রূপসজ্জার অপরূপত্বে এবং অভিনবত্বে সকল মেয়েকে ম্লান করে দিয়ে, এবং তার ব্যক্তিত্বে ও গাম্ভীর্যে ছাত্রছাত্রী সকলকেই বেশ একটু ত্রস্ত করে তুলে। তার সাজ-সজ্জায় উপকরণের প্রাচুর্য ছিল না, বরং কমই ছিল। কিন্তু আশ্চর্য রকমের আকর্ষণীয় ছিল তার সেই স্বল্প পরিচ্ছন্ন উপকরণের সজ্জা। গলায় একছড়া মুক্তোর ছোট হার, কানে দুটি দুল ছাড়া আর কোন গহনা সে পরত না। কিন্তু শ্যাম্পু করা চুলে, মিহি সাদা রেশমী শাড়ি ব্লাউসে, পাউডারের অতি সূক্ষ্ম প্রলেপ মাখা মুখে ও চোখে ঈষৎ নীলাভ রিমলেস চশমায় মেয়েটিকে অত্যন্ত বিলাসিনী মনে হত। কাপড়ের জমিটাই শুধু সাদা নয়, কাপড়টার সবটাই সাদা, কোন পাড় পর্যন্ত থাকত না। চলত ফিরত একটু অলস ভঙ্গিমায়। কারও সঙ্গেই প্রায় কথা বলত না। ছেলেদের সঙ্গে ত নয়ই। অথচ সকলেই যেন অনুভব করলে যে, এর মধ্যে ওর একটা খেলা রয়েছে। কিন্তু কেউ জানত না তার আসল কারণটা কী। বাবার অবস্থার বিপর্যয়ের পর আরতি সাজতে ভালবাসত না। গহনা তখন ব্যাঙ্কে বাঁধা রয়েছে। বাড়ি বিক্রির টাকায় দেনা শোধ হয়েছে, কিন্তু বাবাকে বলতে পারেনি, বাবা, গহনাগুলি ছাড়িয়ে আন। চুল শ্যাম্পু করায় সে আজীবন অভ্যস্ত; কাপড়-চোপড় তার সবই ওই ধরনের। সুতরাং তাকে নিয়ে যে ফিস্‌ফিসানি উঠেছিল তাতে তার রাগের চেয়ে দুঃখই হত বেশী। ছেলেদের মহলে অনেকের ধারণা ছিল, সে ক্রীশ্চান। তাদের কেউ কেউ তাদের কপালিটোলার বাড়ি পর্যন্ত তার পশ্চাদনুসরণ করে—ফিরিঙ্গী পাড়ায় বাড়ি দেখে ওই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল। তাতে তার হাসিই পেয়েছিল। হায় রে হিন্দু ধর্ম! শেষ পর্যন্ত তেলমাখা চকচকে চুলে, পাড়ওয়ালা শাড়িতে আর মুখ-নামিয়ে চলায় তোমার স্থিতি নির্ধারিত হল! তার ঘেন্না হত! নাম তার তারা অনেক দিয়েছিল। মিস চার্লিয়াস। একদিন একটা কাগজ তার গায়ে এসে পড়েছিল!

তাতে লেখা ছিল, তোমার নাম কি শ্যামল'? মধ্যে মধ্যে এক কলি গান পিছন থেকে ভেসে আসত, কৃষ্ণকলি তারেই আমি বলি। এগুলো সে গ্রাহ্য করত না। হঠাৎ একদিন শুনলে সে, কেউ বলে উঠল, লেডী কালিন্দী! সে ফিরে তাকিয়ে কাছাকাছি কাউকে দেখতে পায়নি। একস্তর সিঁড়ির নীচে একদল ছেলে কলরব করছিল। রাগ তার সেই দিন হয়েছিল। একদল ছেলেমেয়ে তার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করেছিল। অন্যভাবে। ভদ্রভাবে। তারা রাজনীতি করত। তারা চেয়েছিল তাকে দলে টানতে। কিন্তু সেও সে পারেনি।

হঠাৎ একদিন তার সমস্ত সহ্যশক্তির আবরণটা ভিতরের বিস্ফোরণে ফেটে খানখান হয়ে গেল: উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। সেদিন আধা-স্ট্রাইক, গোছের কী একটা হয়েছিল; ছেলেমেয়েরা প্রায় অধিকাংশই অনুপস্থিত সেদিন, আরতি লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে নীচে নামছিল। লিফ্‌টটা ছিল বিকল। সিঁড়ির একটা মোড়ের চাতালে দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। আরতি দেখলে, তাকে দেখে তাদের মধ্যে একটা দৃষ্টি-বিনিময় হয়ে গেল। দুজনের মুখেই একটু চকিত হাসি খেলে গেল। কুঞ্চিত হয়ে উঠল আরতির ভ্রূ; সে নীচের দিকে তাকিয়ে অবনত দৃষ্টিতে পথ চলতে পারে না, সামনের দিকেই দৃষ্টি রেখে দৃঢ়-পদক্ষেপে নামতে লাগল। মোড়ের চাতালে পা দেবামাত্র একটি ছেলে হাতের খাতা-বই কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে বললে, "নমস্কার! কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

অগত্যা প্রতিনমস্কার করে আরতি বলেছিল, "বলুন।"

হেসে ছেলেটি বলেছিল, "মানে আপনার নামটা জিজ্ঞাসা করছিলাম। আপনিই ত রতি দেবী? রতি সেন?"

মুহূর্তে বিস্ফোরণের মত ক্রোধে সে যেন ফেটে পড়েছিল। কিন্তু চিৎকার করেনি। ছেলেটির হাতের বই এবং খাতাগুলি ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে নামতে শুরু করেছিল। ছেলেটি হতবুদ্ধি হয়ে বোবার মত মিনিট-খানেক দাঁড়িয়ে থেকে তার পিছনে ছুটে এসে বলেছিল, "এ কী, আমার বই-খাতা নিলেন কেন? এ কী? দিন।"

"সেক্রেটারির ঘরে আসুন। সেখানে তাঁর হাত থেকে নেবেন। এর থেকে আপনার নাম, রোল নম্বর, ক্লাস—এ-পরিচয় আমি শুনব। এবং আমার নাম পরিচয়ও আপনাকে বলব।"

তার চলার গতি দ্রুততর হয়ে উঠেছিল আপনা-আপনি।

"শুনছেন? শুনুন! শুনুন!"

উত্তর দেয়নি আরতি।

"মাপ করুন আমাকে। শুনছেন!"

এরও উত্তর না-দিয়ে আরতি সিঁড়ি নেমেই চলেছিল। পিছনের দিকেও ফিরে তাকায়নি।

"আর কখনও—"

"কী হয়েছে? কী ব্যাপার?"

ঠিক পরের চাতালটায় সিঁড়ির মোড়ে
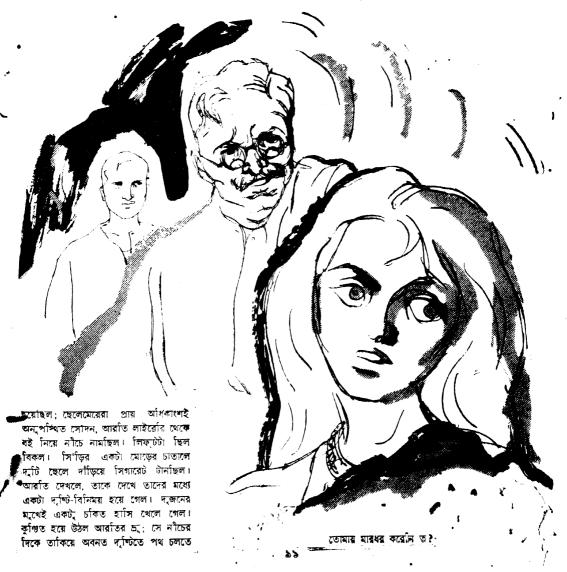
তোমায় মারধর করেনি ত?

প্রফেসর ঘোষ প্রশ্ন করেছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই তিনিও বিপরীতমুখ-মোড় ফিরে আরতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন থমকে। নীচে থেকে উঠবার সময় এদের কথাগুলি তাঁর কানে গিয়েছিল। হয় ত বা খানিকটা তিনি দেখেওছিলেন।

আরতি হাঁপাচ্ছিল। উত্তেজনায়। কানের পাশ দুটো আজকের মতই ঝাঁ ঝাঁ করছিল। যথাসাধ্য আত্মসংবরণ করে সে বলেছিল, 'আমি সেক্রেটারির কাছে ও'র নামে কমপ্লেন করতে যাচ্ছি।"

ইচ্ছে হয়েছিল এগিয়ে চলে যাবার। এই গান্ধীবাদী, মিষ্টমুখ, আপোষপন্থী লোকটিকে তার খুব ভাল লাগত না কোন কালেই। কিন্তু প্রফেসর ঘোষই বলেছিলেন, "কী হয়েছে, আমাকে বলতে পার না? সেক্রেটারি নেই; এই এখুনি ওদিক দিয়ে ভাইস্ চ্যান্সেলারের সঙ্গে চলে গেলেন।"

"আমি সার শুধু নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম। এবং তার জন্যও আমি বারবার মাপ চাইছি।"

"চুপ কর তুমি। আগে ওঁর কাছে শুনব আমি। অবশ্য উনি যদি বলেন।"

আরতি একবার ঠোঁট কামড়ে ধরে আত্মসংবরণ করেছিল; বলতে চেয়েছিল, 'না। যা বলবার সেক্রেটারির কাছেই বলব।' কিন্তু সে-কথাটাকে ঠোঁটের মুখে আটকে নিয়ে বলেছিল, "আমার নাম আরতি। উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন নিরীহভাবে—আপনার নাম জিজ্ঞাসা করছিলাম। আপনিই ত রতি দেবী? তাই আমি ওঁর খাতাবই কেড়ে নিয়ে সেক্রেটারির কাছে যাচ্ছি।"

প্রফেসর ঘোষেরও মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। রূঢ় কিন্তু নিম্নকণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, "ছাত্রদের কলঙ্ক তুমি! এত বড় লজ্জার কথা আর হয় না।"

ছেলেটি আর দাঁড়াতে পারেনি শক্ত হয়ে, ভেঙে পড়েছিল মুহূর্তে। টপটপ করে তার চোখ থেকে জল ঝরতে শুরু করেছিল। কথা বলতে চেষ্টা করেও পারেনি। কথা বলতে গিয়ে ঠোঁট কাঁপছিল অবলার মত।

আরতি এবার তার খাতাবই তার হাতে দিয়ে বলেছিল, "নিন। কিন্তু আর কখনও এমন করে কোন সহপাঠিনীকে রসিকতা করতে গিয়ে অপমান করবেন না।"

ছেলেটি খাতাবই পেয়ে মাথা হেঁট করে চলে গেল। আরতিও ফিরল। কিন্তু প্রফেসর ঘোষ তাকে ডেকে বলেছিলেন, "তুমি দাঁড়াও। চল আমি তোমাকে বাসে বা ট্রামে কিসে যাবে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

এবং [illegible]ই নামতে শুরু করেছিলেন। [illegible] নামতেই বলেছিলেন, "[illegible]টা কথা বলব। Don't take it [illegible] না আমাকে।"

[illegible] একটু হেসেছিলেন। ঘোষ করি রূঢ় কথা মোলায়েম করবার জন্য। কুইনিনের উপর কোটিংয়ের মিষ্টির মত মিষ্টি হাসি।

আরতি বলেছিল, "বলুন।"

"তুমি এত অমিশুকে কেন? তোমার সঙ্গে যারা পড়ে, তাদের সঙ্গে মেলামেশা কর না কেন? এবং—বেশভূষায় আর একটু সহজ, মানে—আমাদের দেশের মত হতে পার না? আর একটু সোবার? এ নিয়ে অনেক কথা কানে আসে। সেই জন্যই আমি বলছি।"

আরতি বলেছিল, "আমার উপর রাগ করবেন না সার, আমি এখানে পড়তে এসেছি, বন্ধুদের আসর জমাতে আসিনি। আমার বন্ধু-বান্ধবী অনেক আছে। এবং বন্ধু হতে গেলে যে সহৃদয়তার প্রয়োজন, তা এখানে কারুর আছে বলে মনে করিনে। সেই জন্যই বলি, আর নূতন বন্ধু-বান্ধবীর আমার প্রয়োজন নেই। আর আমার এই বেশভূষাতেই আমি ছেলেবেলা থেকে অভ্যস্ত। একে আমি আনসোবার বলে মনেও করিনে!"

বলেই বেশ একটু দ্রুতগতিতে প্রফেসর ঘোষকে পিছনে ফেলে চলে যেতে চেষ্টা করেছিল। প্রফেসর ঘোষ বোধ করি এর পর আর তার সঙ্গে যেতে চাননি; ইচ্ছে করেই পিছিয়ে পড়েছিলেন।

এর পর এক সপ্তাহের মধ্যে—।

* * *

"কিছু ঠিক করেছ? কোথায় তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে বল ত?"

অধ্যাপক ঘোষ অপর সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ সেরে ঘর থেকে বের হবার মুখে আবার আরতির সামনে দাঁড়ালেন এবং ওই প্রশ্ন করলেন।

আরতির ভুরু কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল একমুহূর্তে। উত্তর দেবার মত চিন্তা করবার অবকাশ সে পায়নি। যথাসর্বস্বের মধ্যে ওই বাড়িটা আর ব্যাংকে কিছু টাকা ছাড়া বাকি সবই তার গিয়েছে। কাপড়জামা পরনে যা আছে, তা ছাড়া আর নেই। আত্মীয় তার আছে। আপনার মামাতো ভাইয়েরা। বন্ধুবান্ধবও আছে। কিন্তু কোথায় গেলে এই একান্ত রিক্ত অবস্থায় সত্যকারের স্নেহ এবং সমাদর পাবে, সাক্ষ্য হিসেব না করলে তা নির্ণয় করা যায় না। মামাতো ভাইরা আপনজন হলেও তাদের সঙ্গে সব প্রীতি-আত্মীয়তা যেন নষ্ট হয় গেছে।

কাল যুদ্ধ! পৃথিবীজোড়া বাইরের ধ্বংসলীলাই তার একমাত্র অভিশাপ নয়; নাগাসাকি-হিরোশিমায় আটম বোমা বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া বায়ুস্তরেরই শুধু বিষ ছড়িয়ে ক্ষান্ত হয়নি। মানুষের মনোলোকে যে বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে, তার জ্বালায় জীবনলোকে সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধের মধ্যে তার মামাতো-ভাইয়েরা কোন সক্রিয় রাজনীতি করেনি, করার মত যোগ্যতাও তাদের ছিল না, নেই। কিন্তু তারা দেশপ্রেমের ও স্বাধীনতাকামনার মনোবিলাসে যুদ্ধের গোড়া থেকেই জার্মানির সমর্থক ছিল তারপর জাপান যোগ দিলে তারা আরও উৎসাহিত হয়েছিল। তারও পরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই যুদ্ধ-রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হতেই এই সব শৌখিন মনে-মনে বিপ্লবীরা—ঘরের মধ্যে এবং ইচ্ছা দিয়ে এই পক্ষকে সমর্থনে সবাক আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে তার দাদা রথীন মারা গেল লণ্ডনে জার্মান বোমায়। সেই আঘাতে সেরিব্রেল থ্রম্বসিস হয়ে আরতির বাবার ডান দিকটায় হল প্যারালিসিস। এখানেই শেষ নয়। তার পরই বিয়াল্লিশ সনের ডিসেম্বরের চব্বিশে ডালহৌসি স্কোয়ারে জাপানী এয়ার রেডের রাতে আতঙ্কে তিনি মারা গেলেন। এর ফলে আরতি হয়ে উঠল জাপান জার্মানি এবং তাদের সঙ্গে আছেন বলে নেতাজী সুভাষচন্দ্রেরও ঘোরতর বিরোধী। প্রায় গোটা দেশেরই তখন থেকে আজও পর্যন্ত এমনি অবস্থা। নানান রাজনৈতিক দলের প্রভাবে একটি বাড়ির মধ্যেই হয়ত চারটি ছেলে চার রকম মতবাদে পরস্পরের বিরোধী। মর্মান্তিক আঘাতে আরতির বিদ্বেষের তীব্রতার আর সীমা ছিল না। সেই তীব্রতায় সে মামাতো ভাইদের সঙ্গে মামার বাড়ির সংস্পর্শও প্রায় ত্যাগ করেছে। একজন ভাইয়ের সঙ্গে তার বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ। এই মহাদুর্যোগের মধ্যেও সেখানে যাবার কথা ভাবতে পারছে না আরতি। বন্ধুবান্ধবের কথা মনে করতে গিয়ে সর্বাগ্রে মনে পড়ছে তাদেরই কথা, যারা তার ভাবেই ভাবিত। কিন্তু তাদের অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত। তার মতামত যাই হক না, নিজের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতাকে খর্ব করে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সে আজও জড়িত হয়নি।

* * *

"ঠিক করে উঠতে পারনি? আচ্ছা—ও-বেলা পর্যন্ত ভেবে ঠিক কর। তোমার কাপড়চোপড় ত কিছু নেই? চাই ত!"

"না। ঠিক করেছি। আমার এক মামা থাকেন এখানেই, বালীগঞ্জে, মনোহরপুকুর রোডে। আমি সেখানেই যাব।"

"তা হলে ত নিশ্চিন্ত। ঠিকানাটা বল ত? টেলিফোন থাকলে এখনি খবর দিয়ে দিচ্ছি। তাঁরা এসে পড়বেন।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে আরতি বললে, "না। এতখানি হয়ত তাঁরা পারবেন না। আমাকে অনুগ্রহ করে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন না?"

প্রফেসর ঘোষ সঙ্গের ভদ্রলোকটির দিকে তাকালেন, "কেশব ভাই—"

GOVER
Cooch Beha

সৌম্যদর্শন কেশববাবু বললেন, "ব্যবস্থা করছি। গাড়ি চাই। ও-বেলা, মানে তিনটে পর্যন্ত বোধ হয় পারব। গাড়ি পেলেও মুশকিল হচ্ছে ড্রাইভারের। নার্ভাস ভিতু লোক দিয়ে ত হবে না। মাধব বা রতন, ওদের কেউ হলে ভাল হয়। রতন হলে আবার সঙ্গে লোক চাই। হাজার হলেও মিস্ত্রী ক্লাসের লোক। ভাল জানি না। নতুন। তবু তিনটে পর্যন্ত হবে বলেই মনে করি।"

"আমার জন্যে একজোড়া কাপড় আর জামাটামা চাই। এইটে—।"

গলা থেকে লকেট সমেত একছড়া সরু হার খুলে দিয়ে বললে, "এইটে বি[illegible] করে বোধ হয় হয়ে যাবে।"

"আমাদের ফান্ড রয়েছে।"

বাধা দিয়ে হেসেই আরতি বললে, "আমার ভাগ্যক্রমে কিছু রয়েছে। আপনাদের অনেক জনের জন্যে অনেক করতে হবে। আমারও একখানা কাপড় আর একটা জামায় চলবে না। আরও খরচ আছে। বিক্রি ত আমাকে করতেই হবে।"

প্রফেসর ঘোষ হাত পেতে বললেন, "দাও।"

ঠিক সেই মুহূর্তেই একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াল প্রকাণ্ড বাড়িটার সিঁড়ির সামনে। নামলে একটি খাকী পোশাক পরা সবলকায় ভদ্রলোক।

"দাদা!"

"মাধব!" সাড়া [illegible] প্রফেসর ঘোষের সঙ্গী।

মাধব এসে দাঁড়ালেন। আরতি চিনতে পারলে, এই ভদ্রলোকই কাল্কের উদ্ধারকারী দলের কর্তা ছিলেন। ইনিই গাড়ি চালাচ্ছিলেন।

"কাল রাত্রে সাদা রঙের ক্যাডিল্যাকখানার কথা গুজব নয়, সত্যি। নিকিরীপাড়ার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন রাত্রি প্রায় দশটা। রতন দেখেছে নিজের চোখে।"

বলেই তিনি ডাকলেন, "রতন!"

"না। চল, আমরাই যাই।"

প্রফেসর ঘোষ বললেন, "সাদা ক্যাডিল্যাক?"

"চিফ মিনিস্টারের একখানা সাদা ক্যাডিল্যাক আছে। লোকে বলছে এখানা—"

কথা বলতে বলতেই বেরিয়ে গেলেন তাঁরা।

আরতি জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিল বাইরের দিকে। নিকিরীপাড়া কথাটা তার মাথায় সাড়া জাগিয়েছে। নিরীহ নিকিরীদের এ-পাড়ায় নাকি নিষ্ঠুর প্রতিশোধের আক্রোশে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। দা, লাঠি, ঢেলা, যে যা পেয়েছে—তাই দিয়ে আক্রমণ করেছে। গোটা নিকিরী বস্তিটাতে আগুন লাগিয়ে পাহারা দিয়ে

একতারা — শিল্পী শ্রীমাখন দত্তগুপ্ত

পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টারও বেশী জ্বলেছে বস্তিটা।

এখনও একটা মসজিদের ভিতর কয়েকটা মৃতদেহ পড়ে আছে: রাস্তার উপরেও এখানে-ওখানে কয়েকটা শব নাকি এখনও পড়ে আছে।

"আমি নিজের চোখে দেখেছি স্যার। আর গাড়িটা আমি চিনি।"

আশ্চর্য কণ্ঠস্বর। ভরাট এবং সবল। যেন কাঁসরের মত। চমকে উঠল আরতি।

কালকের সেই লোকটি!

আশ্চর্য। অদৃশ্য অশরীরীর মত কার অস্তিত্ব তার মনোমণ্ডলে অনুভব করছে। কিন্তু তাকে না পারছে দেখতে, না পারছে স্পর্শ করতে, শুধু একটা অধীরতায় অস্থির হয়ে উঠছে—। কে?

॥ তিন ॥

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একটা দেশলাইয়ের কাঠি মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠে চকিতের জন্য একখানা মুখের খানিকটা দেখিয়ে যেন নিভে গেল। ধূলিমলিন আংটিটার পলকাটা পাথরটার একটা পলের উপরের মালিন্য মুছে গিয়ে একটি বিন্দুর মত দীপ্তি বারেকের জন্য চোখে পড়ল যেন।

চমকে উঠল আরতি। সমস্ত স্মৃতিলোকটায় আলোড়ন উঠল। সে? কিন্তু তাও কি হয়?

মামার বাড়ির দরজায় নেমে ঘটনাটি ঘটল। মামাতো ভাইয়ের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জ্বালাকর অভ্যর্থনায় তখন সে প্রায় বিমূঢ়

বাগবাজারে বসুদের বাড়ি থেকে গাড়িতে উঠে অবধি মামাতো ভাইদের এই অভ্যর্থনার আশঙ্কাতেই নিজের মধ্যেই সে দুশ্চিন্তায় ডুবে ছিল। পৌঁছে দেবার জন্য বসুদের বাড়ি থেকে যিনি গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন, তিনি মাধববাবু; [illegible]কারী দলের নেতা। বিশিষ্ট ঘরের ছে[illegible] সকাল-বেলা প্রফেসর ঘোষের সঙ্গে [illegible] বলে যিনি এসেছিলেন, নিঃসংশয়ে [illegible]। মুখের সাদৃশ্যই সে-কথা বলে দেয়।

ও-বেলায় কেশববাবুকে দাদা বলেই ডেকেছিলেন। সঙ্গে আর একজন, ওঁদেরই কেউ হবেন।

বসুদের বাড়ি থেকে গাড়িখানা গঙ্গার ঘাটের দিকে পথ ধরেছিল। পথে পোড়া নিকিরীপাড়ার বিরাট চিতাটা তখনও ধোঁয়াচ্ছে। রাস্তার পাশ থেকে গলিত শবের গন্ধ আসছে। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের রাস্তাঘাট তৈরি করা খোলা বিস্তীর্ণ জায়গাটার ধারেই নিকিরীপাড়া। নতুন রাস্তার উপর কয়েকখানা নৌকো পড়ে রয়েছে। নৌকোর উপর বসে রয়েছে কতকগুলো শকুন, ঘুরছে কয়েকটা কুকুর, গোটা রাস্তাটা বস্তিটার ছাইয়ের গুঁড়োতে কালো হয়ে গিয়েছে। তারই মধ্যে পড়ে রয়েছে পচে ফুলে ওঠা কয়েকটা শব। মসজিদ একটা কালো হয়ে গেছে পুড়ে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছিল আরতি!

"আপনি আশেপাশে তাকাবেন না। বরং নাকে কাপড় দিয়ে চোখ বুজে থাকুন। এখানে অনেক লাশ পড়ে আছে।"

বলেছিলেন মাধববাবু। তারপরই আবার বলেছিলেন "আরও পাবেন শোভাবাজারে। হাবু গুণ্ডার আড্ডার ওখানে।"

মাধববাবুর সঙ্গী মৃদুস্বরে বলেছিল, "নেই লাসটা সরিয়েছে? কবন্ধটা?"

"দা দিয়ে দু ফাঁক করাটা? সরিয়ে থাকবে। তবে সকালেও ছিল।" রতন বলছিল।

"ওখানেও ত সাদা ক্যাডিলাক এসেছিল?"

"কী করবে এসে! হিন্দুর ঘরে আগুন জ্বালালে, সে-আগুন মুসলমানের ঘরেও লাগে। মুসলমানের ঘরে লাগালে হিন্দুর ঘরের কাছে এসে সে-আগুন নিভে যায় না।"

"এ-পথে নিয়ে এলেন কেন?" অধীর আর্তস্বরে কথা কটা বেরিয়ে এসেছিল আরতির কণ্ঠ থেকে!

"কী করব বলুন। সব পথের ধারেই এ কিছু না কিছু ঘটেছে। অবশ্য এ-দিকটায় কিছু বেশী। কিন্তু আসতে হল বাধ্য হয়ে। যে গাড়ি ড্রাইভ করে যাবে, তাকে শোভাবাজারে নিতে হবে।"

"আপনি যাবেন না?"

"আমার যাওয়ার উপায় নেই। শোভাবাজারে কিছু মুসলমান আছে—তাদের রেস্কু করতে আসবে পুলিশ। আমি সেখানে থাকব। আপনার ভয় নেই, যে ড্রাইভার যাবে, সে আমার থেকে খারাপ চালায় না। সাহস হয়ত আমার থেকেও বেশী। আর সঙ্গে এই শম্ভু রইল। কোন ভয় নেই আপনার।"

হঠাৎ আরতি বলে উঠেছিল, "আমার মামাদের কেউ [illegible] বাড়িতে না থাকেন?"

[illegible] বলেছিলেন, "এই গাড়ি [illegible] আসবেন। [illegible] কেউ কাছাকাছি [illegible] থাকলে—সেখানেও এরা পৌঁছে দেবে। আপনাকে নিশ্চয়ই সেখানে নামিয়ে দিয়ে আসবে না।"

আরতির মনে তখন মামাতো ভাইরা কী অভ্যর্থনায় তাকে অভ্যর্থিত করবে—সেই কল্পনা উঁকি মারতে শুরু করেছে। মতভেদের ক্ষেত্রে যেখানে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হয়, সেখানে বিপন্ন হয়ে গেলেও আক্রমণের সুযোগ সামলাতে পারে না, এমনি মানুষই সংসারে বেশী। তা ছাড়া তার মামাতো-ভাইয়েরা পাকা ব্যবসায়ী হলেও অর্ধশিক্ষিত, শুধু অর্থের জোরেই তাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ এবং তীব্র। তার উপর আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি দেশের আবেগময় সহানুভূতি এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা আজ তাদের ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সের মত আত্মসাৎ করা মূলধন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ এই যুদ্ধের কয়েক বৎসরে তারা গোপনে কত টাকা ব্যয় করেছে আজাদ হিন্দ ফৌজের আগমন-পথ প্রশস্ত করবার জন্য, কতবার কোন মোটর-যাত্রায়, কত ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মীদের কোথায় কোন অরণ্যে তুলে কোথায় পার করে দিয়েছেন, কোন নগরের কোন গুপ্তাবাস থেকে সতর্ক পুলিশদৃষ্টি থেকে সরিয়ে এনেছেন, কোথায় কোন বোমার বা পিস্তলগুলির থলি পৌঁছে দিয়েছেন, কোন যাত্রায় ষাট মাইল থেকে আশি একশ-তে স্পীড তুলে কোন অনুসরণরত পুলিশ-মোটরকে ফাঁকি দিয়েছেন, কটা পিস্তল রিভলবার এমনকি রাইফেলের গুলি সাঁই সাঁই করে কানের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে, তার রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্ণনা করে তারা আজ মহাদর্পিত ব্যক্তি। নিষ্ঠুরভাবে রূঢ়ভাষী!

গাড়িটা থেমে গেল। শোভাবাজারের একটা গলির মোড়।

আরতি চিন্তার ক্লান্তিতে সিটের মাথায় মাথা রেখে ভাবছিল। চোখ বুজে ভাবছিল। সে মাথা তুললে না—চোখও খুললে না। বুঝতে পারলে, মাধববাবু নেমে গেলেন। তাঁর জায়গায় নতুন লোক উঠল।

মাধববাবুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে, "চোখে কী হল? গগল্স কেন?"

"লাল হয়েছে একটা চোখ, জল পড়ছে। ও-বেলা পোড়া বস্তিটায় ঘুরে দেখছিলাম, বোধ হয় ছাইটাই পড়েছে।"

"রাত্রে একটু কম্প্রেস করো। চলে যাও। তোমাকে বলার কিছু নেই। খুব হুঁশিয়ার!"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"স্ট্রাণ্ড হয়ে ময়দানে পড়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশ দিয়ে হরিশ মুখার্জি রোড ধরবে।"

গাড়িটা গর্জন করে উঠল। নড়ে উঠল। কণ্ঠস্বরে মনে হল, এ কালকের সেই বিচিত্র ভারী কণ্ঠস্বর। বারেকের জন্য একবার চোখ মেলে দেখে আবার চোখ বুজলে।

হ্যাঁ—এ সেই! কে? কিন্তু সে-চিন্তা-প্রশ্ন তার মুহূর্তে মুছে গিয়ে বড় মামাতো ভাইয়ের মুখ মনে পড়ে গেল। এবং কী কথা বলে তাকে সম্ভাষণ করবে, তাও যেন কানের পাশে বেজে উঠেছিল।

* * *

"কী গো? কমরেড আরতি সেন? কী ব্যাপার? ইনকিলাব জিন্দাবাদের ফার্স্ট শকেই ভেঙে পড়লে? তুমি ত পাকিস্তানের সাপোর্টার গো! কমরেডদের ত ঝাণ্ডা দেখালেই পারতে! সুড়সুড় করে ফিরে যেত।"

"কোন ঝাণ্ডাই আমার ঝাণ্ডা নয়। কোন দলের সঙ্গেই আমার কোন সম্পর্ক নেই। যাদের বোমায় আমার ভাই মরেছে, যাদের বা[illegible] শকে আমার বাবা মরেছেন, তাদের বিরুদ্ধে আমি চিরদিন থাকব। আমি পাকিস্তানের সাপোর্টার কোনদিন নই। তোমাদের মত একাধারে বিলাসী পলিটিসিয়ান এবং ধর্মধ্বজীও নই। যারা আমার চোখের সামনে ঘরদোর লুঠ করলে, অত্যাচার করলে জানোয়ারের মত, তারা আমার শত্রু। আবার দেখে এলাম, নিরীহ মুসলমান বস্তি পুড়ছে, তাদের শবদেহ পচছে। এসব যারা করেছে তারাও আমার বন্ধু নয়। তাদেরও আমি কেউ নই। তবে যারা অত্যাচারীর সঙ্গে সামনাসামনি লড়েছে, তাদের শ্রদ্ধা করি।" মুহূর্তের জন্য কথায় ছেদ টেনে আবার সে বললে, "জান, কপাল আমি মানি না। তবে কপাল ছাড়া কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বলছি, কপালের ফেরেই আজ তোমরা মামাতো ভাই বলে কয়েকদিনের জন্য তোমাদের কাছে আশ্রয় নিতে এসেছি।"

"আশ্রয় অবশ্যই পাবে। তেমন হৃদয়হীন আমরা নই। ওগুলো অনেক দুঃখেই বলেছি। কথাগুলো মনে পড়ে যায় যে! জঘন্য স্পাই-বৃত্তি করতেও বাধেনি তখন। আমাদের পিছনে পুলিশ লেগেছিল। সে-সব খবর তুমি ছাড়া কে দিয়েছিল?"

অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড চিৎকারে থমকে গিয়েছিল সকলে। আরতির মামাতো ভাই চুপ করে গেল; পরমুহূর্তেই রূঢ়কণ্ঠে বলে উঠল, "ইউ ব্রুট! কেন তুমি কুকুরটাকে ধমক দিলে এমন করে?"

আরতির গাড়িতে বসে কল্পনাটা আশ্চর্যভাবে সত্য হয়ে উঠেছিল এই পর্যন্ত। মনোহরপুকুরে গাড়ি থেকে নামতেই দেখা হয়েছিল তার বড় মামাতো ভাইয়ের বদলে ছোট মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে। মেলেনি এইটুকুই। বড় মামাতো ভাই বোধ করি তখনও ঘুম থেকে ওঠেননি। তাঁর শুতে হয় রাত দুটো আড়াইটে। আরতি শুনেছে, কালীঘাটের এলাকায় একখানা নতুন বাড়ি করেছেন তিনি। সেখানে থাকেন তাঁর এক সখী। সেই সখীর কুঞ্জের পালা শেষ করে বাড়ি

ফেরেন রাত্রি দুটো-আড়াইটেতে। আরতি শুনেছে, ডালহৌসি স্কোয়ারে বমিংএর রাত্রেও সেখানে ছিলেন তিনি। সুতরাং কালীঘাটের নিরাপদ এলাকায় তিনি নিশ্চয়ই যাওয়া বন্ধ করেননি। ছোট মামাতো-ভাইয়ের কাছে এতখানি কটুবাক্য প্রত্যাশা করেনি। যা সে বড়ভাই বলবে বলে কল্পনা করেছিল, তাই বললে ছোট ভাই। আরতি মনে মনে যে উত্তর ঠিক করে রেখেছিল, তাই দিলে। ঠিক এই সময়ে ওই ড্রাইভারটি তার ভরাট গলায় কল্পনাতীত একটা প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠল—"আও!"

একটা কুকুরকে। এই বাড়িরই পোষা একটা ছুকছুকে স্প্যানিয়েল জাতীয় কুকুর কখন বেরিয়ে এসেছিল ফটক খোলা পেয়ে। তখনও কথা হচ্ছিল ফটকের মুখে দাঁড়িয়ে। কুকুরটা মনিবকে পার হয়ে কাটা লেজটা বুড়ো আঙুলের মত নেড়ে একে ওকে শুঁকে এবং চেটে বেড়াচ্ছিল। মালিক এবং আরতিকে অতিক্রম করে এসে ড্রাইভারকে দেখে ঘেউঘেউ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাকে এমনি জোরে ধমক দিয়েছে ড্রাইভারটি। এবং এই অসহনীয় ঔদ্ধত্যের জন্য আরতির মামাতো ভাই রূঢ়কণ্ঠে বলে উঠল, "ইউ ব্রুট! কেন তুমি কুকুরটাকে ধমক দিলে এমন করে? হোয়াই?"

"আই হেট ডগ্‌স। আই হেট ডগ্‌স। বিশেষ করে যেগুলো অকারণে মানুষ দেখে চিৎকার করে।" বলতে গিয়ে আশ্চর্য ঘৃণার ভঙ্গিতে লোকটির ঠোঁট দুটো উল্টে গেল। সত্যসত্যই যেন মর্মান্তিক ঘৃণা উপচে পড়ল এবং তার স্পর্শ লাগল সকলকে।

"হোয়াট?" রাগে খেপে উঠল আরতির মামাতো ভাই। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতখানা উদ্যত হয়ে উঠল ড্রাইভারের মাথার চুল ধরবার জন্য।

ড্রাইভার তার হাত উঠিয়ে বাড়ান হাতখানা ধরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বললে, "কিছু মনে করবেন না, আমার চুল ধরলে আপনার হাত ধরতে হবে আমাকে। আমার হাত অত্যন্ত শক্ত। পনের ষোল বছর বয়সে শেয়ালে কামড়েছিল আমাকে, আমি শেয়ালটার চোয়াল চেপে ধরেছিলাম। চোয়ালটা ভেঙে গিয়েছিল। নখ দিয়ে আঁচড়েছিল অনেক, দেখুন দাগগুলো এখনও আছে। রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না।"

বলেই সে গাড়িতে চেপে বললে, "শম্ভুবাবু আসুন, আমাকে আর হাঙ্গামায় ফেলবেন না। ওদিকে বেলা যাচ্ছে। সন্ধ্যের পর কারফ্যু।"

শম্ভু আরতিকে বললে, "তা হলে আমরা যাই মিস সেন!"

আরতি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; সে যেন জমে পাথর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অন্তরের স্মৃতিলোকে আলোড়ন উঠেছে; যেন ঝড় বইছে।

আরতির মামাতো ভাই তখন চিৎকার করছে।—"স্টপ স্টপ, আই সে, স্টপ!"

গাড়িখানা স্টার্ট নিয়ে নড়ে উঠেছিল, থেমে গেল।

শম্ভু বললে, "না-না, চল! রতন! চল!"

নামতে যাচ্ছিল রতন ড্রাইভার, কিন্তু শম্ভুর কথায় নামতে ক্ষান্ত হয়ে শুধু একবার আরতির মামাতো ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আবার স্টার্ট দিয়ে গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। গাড়িটা বেরিয়ে গেল অস্বাভাবিক প্রচণ্ড গতিতে।

আবারও চিৎকার করে উঠল আরতির মামাতো ভাই, "স্টপ, ইউ সোয়াইন! ই-উ রাসক্যাল!"

"কী হয়েছে? কী?"

বারান্দায় বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ। "লাটু, এত চিৎকার করছ কেন? এ কী, আরতি? তুই বেঁচে আছিস? ভাল আছিস? আয়, আয়, ভিতরে আয়। বউমা—বউমা—!"

আরতি তবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এও কি সত্যি হতে পারে? তাই কি হয়? কিন্তু—কিন্তু—।

* * *

দুজন মানুষের 'আই হেট' বলার সঙ্গে এমনি ঠোঁট ওল্টানর ভঙ্গি হয়ত একরকম হতে পারে! হয়। একরকম ছাঁচের মানুষ হয়। নৃতত্ত্বে এর নজির আছে। একরকম মুখ হলে হাসি একরকম হয়, কথা বলার ভঙ্গি একরকম হয়! হয়! হাতের জোরও অনেকের আছে। শুধু হাতে বাঘ মেরেছে এমন মানুষের কথাও শোনা যায়। পাগলা শেয়ালের চোয়াল ভাঙা আশ্চর্য নয়। কিন্তু দুজনের হাতে কি ঠিক একরকম ক্ষতচিহ্ন হয়? ঠিক একরকম!

কিন্তু তা-ই বা কী করে হয়? সচ্ছল অবস্থার সরকারী চাকুরের ছেলে—নিখুঁত ফ্যাশনদোরস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসের ছাত্র; চোখেমুখে অফুরন্ত দীপ্তি, বিলাসী উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ, ভবিষ্যতে যে বিলেত যাবে; বড় ডিগ্রী নিয়ে এসে এখানে সরকারী বড় চাকরি নেবে; মোটর চড়ে ঘুরবে; সুসজ্জিত আপিসে বসবে; প্ল্যান তৈরী করবে, নোট লিখবে; সমস্ত মানুষকে অবজ্ঞা করে কথা বলবে; রাত্রে নাইট ক্লাবে যাবে—হৈ-চৈ করবে—বলে নিজেকে তৈরী করছিল, সে কিসের পরিণতিতে ওই ড্রাইভার হতে পারে? কিন্তু—কিন্তু—! সেই কণ্ঠস্বর সেই হাতের ক্ষতচিহ্ন; সেই—'আই হেট' বলার ভঙ্গি; সেই ক্রোধ! দাড়িগোঁফে মুখখানা ঢেকে গিয়েছে। মাথায় বড় বড় চুল। অযত্নে; মোবিলে পেট্রোলে তামাটে হয়ে উঠেছে। তার ছিল সযত্ন ফ্যাশনে ছাঁটা, শ্যাম্পু করা রেশমের মত চুল! অঙ্গ ছিল গৌরবর্ণ। সে-রঙ কি এমনি পুড়ে যায়, না যেতে পারে?

প্রবীর! প্রবীর চ্যাটার্জি!

ওই রতন ড্রাইভারের মধ্যে প্রবীর চ্যাটার্জি! হীরে বসান গিনি-সোনার আংটি এমন মলিন হয়?

॥ চার ॥

"আই হেট ইউ, আই হেট ইউ অল!"

বলবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবীরের ঠোঁট দুটো ঠিক এমনিভাবে উল্টে গিয়েছিল। যেন ঠোঁটের কিনারা থেকে গড়িয়ে অন্তরের সমস্ত ঘৃণাটা ঢেলে দিয়েছিল।

ঠিক ওই ছাত্র দুটিকে নিয়ে ঘটনার পর। তার আরতি নামের সুবিধে নিয়ে 'রতি' বলে গূঢ় অর্থব্যঞ্জক রসিকতা করার ঘটনাটা। যে-ঘটনাটা মিটিয়ে দিয়েছিলেন প্রফেসর ঘোষ। তারই দিন দশেক পর। ইউনিভারসিটিকে ঢুকতেই কয়েকটি ছেলের একটি দল যেন হঠাৎ বাতাসের দমকায় ছাই-ওড়া অঙ্গারস্তূপের মত দীপ্যমান হয়ে উঠেছিল, চোখে মুখে একটা ইশারা খেলে গিয়েছিল তাদের। সে তা গ্রাহ্য করেনি, ঢুকে গিয়েছিল বাড়িটার মধ্যে। আজ যেন সব কেমন ফাঁকা ফাঁকা; ছাত্রছাত্রীদের দল যেন অধিকাংশই আসেনি। পরক্ষণেই মনে পড়েছিল, সিঙ্গাপুর পড়ে গিয়েছে, জাপানীরা এগুচ্ছে রেঙ্গুনের দিকে, যুদ্ধের অবস্থা দিন-দিন বৈশাখের আগুন-লাগা উলুবনের মত হয়ে উঠেছে; ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে আগুন জ্বলবে-জ্বলবে হয়ে উঠেছে। এখন ছাত্র-মহলে মিটিংয়ের পর মিটিং চলছে। নানা মতের প্রবল প্রচার চলছে। বিচিত্র! এরই মধ্যে চলছে পূর্বরাগের পালা, বিয়েও কয়েকটা হয়ে গেল। বাইরের ওরা এ-সব কোন দলের নয় বলেই এই ভাবে বাইরে বাইরে ছিটকে ছিটকে বেড়ায়; ওদের সম্বল ওই হাসি-রসিকতা। রাখালরাজাদের বাঁশি ছাড়া গতি নেই। হায় কপাল! বাঁশি শুনে ব্রজের গোপিনীরা ভুলেছিল বলে কি বিংশ-শতাব্দীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাসের তরুণীর দল ভুলবে? বাঁশি, তাও সেই আদ্যিকালের বাঁশের বাঁশি! 'কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশি, ছাড়া এ-দেশের কবির কল্পনাতেই কিছু এল না। তা এই সব গোপবালকের দল! রাজনীতি যারা করে তাদের দলে সে কোনদিনই যাবে না, কিন্তু তাদের সে প্রশংসা করে। একটা আদর্শ আছে তাদের, মনের মিল ঘটে হাত মিলিয়ে কাজ করার মধ্যে।

"শুনুন!" একটি মেয়েলি কণ্ঠস্বর। তারই সহপাঠিনী। চেনে সে। বাধ হয় অনীতা।

"আমায় বলছেন?"

"হ্যাঁ।"

বলুন। কিন্তু আজ ব্যাপার কী বলুন তো?"

"ফাঁকা দেখে বলছেন?"

"হ্যাঁ। মিটিং বোধ হয়?"

"হ্যাঁ। বড় মিটিং আজকে। ইউনিভারসিটির বাইরে কোথাও হচ্ছে। ক্লাসটাস বোধ হয় হবে না। আমি আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।"

"আমার জন্যে?"

"হ্যাঁ। চলুন, বাড়ি ফিরবার পথে বলতে বলতে যাই।"

"না। আমি ভাই একটু লাইব্রেরিতে যাব।"

"না। আপনি থাকবেন না। চলুন। আপনাকে অপমান করবার জন্যে বোধ হয় একটা ষড়যন্ত্র হয়েছে। সেদিন আপনি একজন ছেলের খাতা কেড়ে নিয়ে—"

"হ্যাঁ। আবার আজও নেব। এবং গালে চড় মারব।" নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিল,—"আপসোস হচ্ছে, শু পরে এসেছি, স্যান্ডেল পরে আসিনি। শু আবার নতুন—চট করে খোলা যায় না।"

"আপনি জানেন না। সে নাকি মারাত্মক বেপরোয়া ছেলে। রাস্টিকেট হওয়াকেও ভয় করে না। শুনেছি বি-এসসি যখন পড়ত তখন গার্লস স্টুডেন্টদের জ্বালিয়ে খেত। একেবারে এসে পাগলী বলে অ্যাড্রেস করে কথা বলে। একবার এক্সপেল্ড হয়েছিল—। আজ অন্য ছেলেমেয়েরা মিটিংয়ে ব্যস্ত আছে জেনে—ওরা দল বেঁধেছে।"

সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছিল তার। বলেছিল, "কোথায় আছে বলুন না। আমি নিজেই গিয়ে দেখা করে বলি, "হ্যালো পাগলা,—"

"ইয়েস, ইয়েস, হিয়ার আই অ্যাম, পাগলী, হিয়ার আই অ্যাম।"

চমকে উঠল দুজনেই। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে একটি সুট-পরা ছেলে। ব্যাকব্রাশ করা চুল, বড় বড় চোখ, বয়স বেশ একটু বেশী। দেখেই চেনা যায়, যে-ছেলেরা পাঠ্য-জীবনের ভেলা ধরে যৌবন-সমুদ্রের স্নানের ঘাটে দোল খায় সুইমিং কস্ট্যুম পরে, এ তাদেরই একজন।

প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি উঠে এক-মুখ ব্যঙ্গ হাসি নিয়ে, সে এসে সামনে দাঁড়াল, "আমি এসেছি পাগলী।"

"কী চান আপনি?"

"আই অ্যাডোর য়ু।" তোমার এই বেশ-ভূষা, তোমার এই শ্যাম্পু-করা চুলের মধুর গন্ধ, পাউডারের হাল্কা সুরভি, আই অ্যাডোর পাগলী, আই অ্যাডোর।"

"আমি চিৎকার করব!"

"আই ডোন্ট কেয়ার পাগলী। ওই উপরে দেখ আমার দল আছে; নীচে দেখে এসেছি গেটের [illegible]—তোমার চিৎকারে কেউ আস[illegible] তোমাকে প্রেম নিবেদন করে চলে[illegible]

"কাওয়ার্ড!"

"তা যদি বল তবে অবশ্যই থাকব। যিনিই আসুন, তাঁর সামনেই বলব, আই অ্যাডোর হার। রাস্টিকেট হওয়াকে আমি ভয় করি না। আমি এখানকার রেগুলার ছাত্রও নই।"

ঠিক এই সময় উপরতলার সিঁড়িতে জুতোর শব্দ উঠেছিল।

সকলেই তাকিয়েছিল উপরের দিকে। উপরতলার ছেলেরা সাড়া দিয়ে ইঙ্গিতে কিছু জানিয়েছিল। সে-ইঙ্গিতে এই অভদ্র দুঃসাহসী ছেলেটি একটু ভ্রূ কুঁচকেছিল শুধু। নেমে এসেছিল ইউ টি সি'র পোশাক-পরা একটি ছেলে। কটা চোখ, রঙটা খুব ফরসা, সবল দীর্ঘকায়, তরুণ। আরতি চেনে না। ইউনিভারসিটিতে দেখেনি। তবুও সে বলতে যাচ্ছিল, "শুনুন।" কিন্তু তার আগেই এই দুঃসাহসী ছেলেটি হেসে তাকে সম্ভাষণ করলে, "হ্যালো প্রবীর!"

সে পাশ কাটিয়ে চলেই যাচ্ছিল—থমকে দাঁড়িয়ে বললে, "সুব্রত!"

"ইয়েস ওল্ড ফ্রেন্ড, ভাল আছ?"

"তুমি এখানে? আবার পড়ছ নাকি? ভর্তি হয়েছ? ওঃ, দেখালে বটে!"

"পড়ছি না ঠিক। কলেজের আশেপাশে ঘুরছি। কিন্তু তুমি কোথায়? এ-রাজ্যে—শিবপুরে থেকে—?"

"স্যারএর তলব ছিল, ইউ টি সি'র কাজে। আচ্ছা, গুড লাক।" বলে হেসে সে এতক্ষণে আরতিদের দিকে তাকালে। পরক্ষণেই সবিস্ময়ে বললে, "এ কি? আপনি রথীনবাবুর বোন না? রথীন সেন? শিবপুরে বি ই কলেজ থেকে পাশ করে বিলেত গেছেন? আমরা রথীনবাবুর জুনিয়র। সে-সময় আপনি মধ্যে মধ্যে যেতেন হোস্টেলে!"

"প্রবীর, তুমি যাও। ও'র সঙ্গে আমার কথা আছে।"

প্রবীর দুজনের মুখের দিকেই তাকিয়ে দেখে বলেছিল, "আই স্মেল সামথিং সুব্রত।"

মুহূর্তে আরতি বলেছিল, "ইনি আমাকে অপমান করছেন। আপনি—আপনি—।" আর কথা বলতে পারেনি—চোখ ফেটে জল আপনি বেরিয়ে এসেছিল।

"লীভ হার, প্রবীর। ও'র সঙ্গে ব্যাপারটা বলতে গেলে এখানকার ছেলেদের ব্যাপার।"

"এখানকার ছেলেদের ব্যাপার হলে—তারা কই? তুমি কেন? ছি ছি সুব্রত, এখনও তোমার এই নোংরামিগুলো গেল না!"

"শাট আপ।" চিৎকার করে উঠেছিল এই সুব্রত।

"চিৎকার কর না। আই ডোন্ট লাইক ইট। আমার চিৎকার তোমার থেকে অনেক জোরে বের হয়, তুমি জান। পথ ছাড়। চলুন আপনারা আমার সঙ্গে।"

"না। আবার বলছি প্রবীর, চলে যাও তুমি। আমরা পুরনো বন্ধু—"

"আই হেট ইউ!"

ঘৃণায় ঠোঁট দুটো ঠিক এমনিভাবে উল্টে গিয়েছিল।

"হোয়াট।" সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘুঁষি সে মেরেছিল। অতর্কিতে মারবার জন্যই মেরেছিল। কিন্তু প্রবীর যেন প্রস্তুত ছিল। খপ করে হাতখানা ধরেই একটু মোচড় দিয়ে কায়দা করে ফেলেছিল তাকে। হেসে বলেছিল, "আমি তোমার পুরনো ট্রিক জানি সুব্রত। আমি তৈরী ছিলাম।"

"ছাড়। হাত ছাড়!"

"জোর কর না। আমার হাতের জোর বেশ একটু বেশী। ছেলেবেলা পনের ষোল বছর [illegible] একটা পাগলা শেয়ালে কামড়েছি[illegible] আমাকে। পায়ে কামড়াচ্ছিল, আমি হাত দিয়ে তার চোয়ালটা ধরে ভেঙে দিয়েছিলাম। নখ দিয়ে হাতটা আঁচড়ে দিয়েছিল, দাগ দেখতে পাচ্ছ তার। দেখেছ?"

"প্রবীর!" এবার সুব্রতের চিৎকারের মধ্যে যন্ত্রণার আভাস ছিল।

"আরও একটু যন্ত্রণা দেব সুব্রত। যাতে তোমার সামলাতে কিছুক্ষণ লাগে।" হাতটার আরও খানিকটা মোচড় দিতেই একটা আর্তনাদ করে সুব্রত বসে পড়েছিল। এবার তার হাত ছেড়ে দিয়ে সে আরতি এবং তার সঙ্গিনীকে বলেছিল, "আসুন, আর দাঁড়াবেন না। শুনেছেন?"

আরতি এবং তার সঙ্গিনী নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। এবার প্রবীরের কথা শুনে দ্রুত পদে নামতে আরম্ভ করেছিল, সে প্রায় যেন ছুটে পালাচ্ছিল তারা।

"ছুটবেন না। ছুটতে হবে না।"

"ওপর থেকে ওর সঙ্গীরা নামছে।"

"নামুক। যারা নোংরামি করে, তারা নিরেনব্বইজন কাওয়ার্ড। একজন সুব্রত থাকে। ওদের সাহস থাকলে ওরা বাইরে থেকে সুব্রতকে ডাকত না। আপনার সঙ্গে কী হয়েছে জানি না। যাই হয়ে থাক, নিজেরাই বোঝাপড়া করত। এবং যেদিন এখানকার সব ছেলেই প্রায় দেশের সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে অনুপস্থিত, সেই দিনটিতে করত না!"

বলতে বলতেই তারা বেরিয়ে এসে কলেজ স্ট্রীটের গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল। গেটের দলটি তখন ভিতরের দিকে চলে যাচ্ছে। শুধু একটি ছেলে এগিয়ে এসে বলেছিল, "এর বোঝাপড়া বাকী রইল, প্রবীরবাবু। কিন্তু হবে একদিন!"

ক্ষতচিহ্নে চিহ্নিত হাতখানা প্রসারিত করে প্রবীর বলেছিল, "ফলো ইওর ফ্রেন্ডস। ওই যাচ্ছে। এগিয়ে আসবেন না।"

"আচ্ছা—"

মাথা [illegible] প্রবীর বলেছিল, "আই কেউ
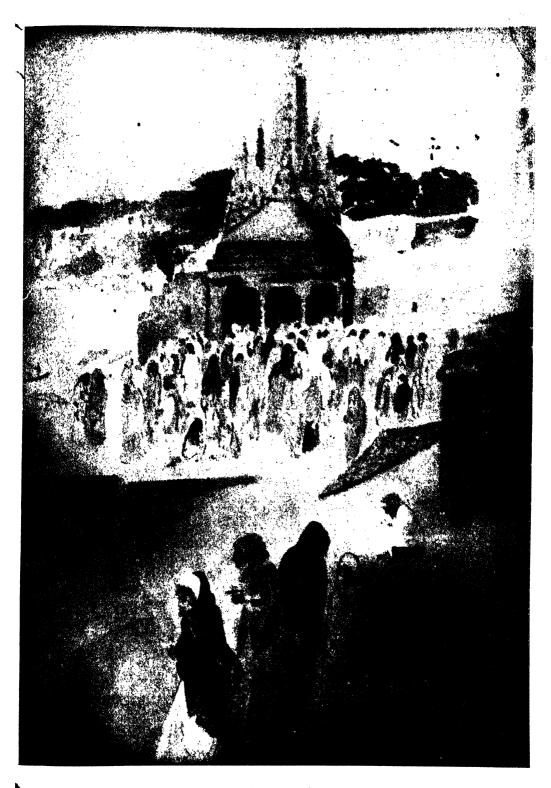
শীক্ টু ইউ।" ঘৃণায় প্রবীরের ঠোঁট টো উল্টে গেল।

* * *

সেই প্রবীর, আর এই মোটর-ড্রাইভার থবা মিস্ত্রী রতন। কী করে মেলে? ন্তু আশ্চর্য মিল। আশ্চর্য। সেই কণ্ঠ-র। সেই 'আই হেট' ব তে গিয়ে ঠোঁট টি ঠিক সেই তেমনি ক উল্টে যাওয়া। াতে সেই ক্ষতচিহ্ন। আ ল! সেই তচিহ্নটা সে নিজে ভাল দেখেছিল ! খুব ভাল করে। টেনিভাব-নটি থেকে বেরিয়ে প্রবীর ছেড়ে য়নি। ট্রামেই হক, আর ন সংগে গয়ে পৌঁছে দিতে চেয়েছি ছিল. এমন কি ট্যাক্সিতেও আপনার একা াওয়া উচিত নয়। সুব্রত আসলে । ব সমাজেরই কতকগুলো কলঙ্কের ত ীব থাকে। ও ছাত্রসমাজের কলঙ্ক। ওকে ানেন না। ট্যাক্সিতেও ও আপনার পিছন নতে পারে।"

আরতির সঙ্গিনীকেও সঙ্গে যেতে অনু-রোধ করেছিল। আরতির বাড়ি কপালি-টোলা শুনে বলেছিল. "তবে ত এই কাছেই। লুন, হাঁটতে হাঁটতেই চলি।"

আরতির সঙ্গিনী ছিল শ্যামবাজার-বাসিনী। মির্জাপুর স্ট্রীট এবং চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুর মোড়ে সে বিদায় নিয়ে বাসে চড়েছিল। বলেছিল, "এক বাস লোক রয়েছে—আর ওদের কাউকেও দেখছি না। আমি সেফ্লি চলে যাব। আপনি আরতিকে পৌঁছে দিন।"

পথে মাত্র দুটি কথা হয়েছিল। প্রবীর বলেছিল, "আপনাদের ত গাড়ি আছে!"

"না। বিক্রি করে দিয়েছেন বাবা।"

"ও। গভর্নমেণ্ট যুদ্ধের জন্য গাড়ি নিয়ে নিচ্ছে এখন। হ্যাঁ। তার চেয়ে বিক্রি ভাল।"

"না। আমাদের ব্যবসায় অনেক লোকসান হয়েছে। আমাদের প্রায় সব গেছে।"

এরপর আর কথা হয়নি।

বাড়িতে চা খেতে অনুরোধ করেছিল একটু। সেই চা খাবার সময় কৌতূহল-ভরে তার আস্তিন-গুটোন হাতখানার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "ছেলে-বয়সে খ্যাপা-শেয়ালের চোয়াল চেপে ধরতে ভয় করেনি আপনার?"

"বরাবরই ভয় আমার একটু কম। আমরা তখন জলপাইগুড়িতে থাকি। সেই সময় আমাদের একজন গুর্খা ড্রাইভার ছিল। সেই আমার সাহসের গুরু। যাকে বলে—ডেয়ার-ডেভিল! ছোট হাত-দেড়েক লাঠি নিয়ে বড় বড় সাপ মারত। কুকরি দিয়ে নেকড়ে ভালুক মেরেছিল। আর গল্প বলত। 'ভয় করে না?' জিজ্ঞাসা করলে শুধু হাসত। সে যেন পরম কৌতুক। হাসির আতিশয্যে বেচারার চোখ দুটো প্রায় বন্ধ হয়ে যেত। হেসে-টেসে নিয়ে বলত একটি কথা। 'ডর? না! ডর কাহে ওগা? ও জানবর, হম আদমী! মর্দানা! উসকে তাগদ হ্যায়, দাঁত হ্যায়, নখ হ্যায়, পঞ্জা হ্যায়। হমর ভি সব আছে! কুকরি আছে। লাঠি আছে!' গল্প বলত, ছেলে-বেলায় একবার বনের মধ্যে একটা বড় গর্ত দেখে কৌতূহলবশে হামাগুড়ি দিয়ে তার মধ্যে ঢুকেছিল। খানিকটা ঢুকেই দেখে একজোড়া চোখ জ্বল-জ্বল করছে। অবস্থা বুঝুন! সামনাসামনি! তার বেরুবার পথ—সামনের দিকে। এনার সামনে তিনি। এঁর পিছন ফেরবারও উপায় নেই, কারণ গর্তের মুখটা তত পরিসর নয়। তখন কী করে? সেই চোখ-বুজে-যাওয়া হাসি হেসে বলত, 'কী করেগা? উসকো সামনে খুব খ্যা-খ্যা-খ্যা—চিল্লায় দিয়া: বহত জোর সে! বাস উ বুড়বক বন গেয়া। উসকে বাদ থোড়া থোড়া পিছে হটনে লাগা। এক একবার

বরাবরই ভয় আমার একটু কম

থম্ কর—ফিন—খ্যা-খ্যা আওয়াজ দিয়া। ফিন হট লিয়া। ব্যস একদম বাহারমে আ কর গাড়াকে মুসে—একতরফ যাকে—দৌড় দিয়া। আগুড় গাড়া, সে এক ছোটসা ভাল্লু। নিকালকে একদম ঘোড়াকে মাফিক দৌড়কে বনমে ঘুস গিয়া! যো ডর দেখায়েগা, উসকে অপ ডর দেখাইয়ে না। বগ্ যায়ে গা।' তা ছাড়া বাবার আমার শিকারে শখ ছিল। কাজেই—।"

হেসেছিল একটু প্রবীর।

ততক্ষণ আরতি তার সবল হাতখানার দিকেই তাকিয়ে ছিল। এবার হাতখানা ধরে কাছে নিয়ে দেখে বলেছিল, "ওঃ—আপনাকেও জখম করেছিল খুব!"

"হ্যাঁ। আমাকে একবার কামড়ে পালিয়ে গেলে পারতাম না কিছু করতে। কিন্তু বারবার কামড়াতে লাগল। আমারও খুন চেপে গেল। ডান হাঁটুটায় কামড়াচ্ছিল—সেই হাঁটু দিয়েই সেটাকে মাটিতে ফেলে চেপে ধরে দুই হাতে মুখের দুটো ভাগ চেপে ধরে জরাসন্ধ বধের মত টেনে ছিঁড়ে দিয়েছিলাম। যন্ত্রণায় সামনের পা দুটো দিয়ে সেও হাতের উপর থাবা চালাতে চেষ্টা করলে। একটা পা আমার বাঁ পায়ে চাপা পড়েছিল, একটা পায়ের থাবা অন্তিম যন্ত্রণাতে সে আমার উপর চালিয়েছিল।"

প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তার মুখ।

ঠিক এই সময়টিতেই তার বাবা বাড়ি ফিরেছিলেন। ক্লান্ত, শ্রান্ত, ভেঙে পড়া মানুষ। কয়েকটা মাসের মধ্যে মানুষটি কী যে হয়ে গিয়েছিলেন! আগেকার কালের সেই দৃঢ়তা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। যে-মানুষের দৃপ্ত কথায়-বার্তায় মত-বিরোধীরা স্তব্ধ হয়ে যেত, সেই মানুষের বুলি হয়েছিল, 'জানি না—ঠিক বুঝতে পারছি না।' যাঁর প্রাণখোলা হাসিতে আশ-পাশের বাড়ির লোকেরা চমকে উঠত, যাঁর ভয়ে তাদের পোষা চন্দনটা একটা কর্কশ ক্যা—চ শব্দ করে উঠত, সেই মানুষের হাসি ক্লান্ত মুখের বিবর্ণ ঠোঁট দুটির একটি বিষন্নতা-মাখান রেখার টানে পরিণত হয়েছিল। আরতিকে কলেজের সময়ে বাড়িতে একটি অপরিচিত যুবকের সঙ্গে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। কলেজের বয়-ফ্রেন্ড সম্পর্কে তাঁর অত্যন্ত বিরূপতা ছিল। বলতেন, 'জাতিধর্ম আমি মানি না, মানব না। কিন্তু বংশ মানি। ফ্যামিলির পরিচয়টা আমার কাছে সব চেয়ে বড়। আই ডোণ্ট লাইক—আমার এটা আদৌ পছন্দ নয় যে, আমার মেয়ে কলেজে গিয়ে অজ্ঞাত-কুলশীল সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, এবং পরিশেষে এসে বলবে, 'বাবা—আমি একে ভালবেসেছি, ওকেই বিয়ে করতে চাই।'"

তিনি যখন কথা বলতেন, তখন যে-ই থাক ঘরে, স্তব্ধ হয়ে যেত তাঁর আন্তরিকতার দৃঢ়তায়, তার সঙ্গে ব্যক্তিত্বেও বটে। তিনি খানিকটা পায়চারি করে আবার বলতেন, 'আমার মেয়ে যদি তা করে, তবে কামনা করব, তার আগে যেন আমার মৃত্যু ঘটে।"

তার বাবার সেদিনের সেই মুখচ্ছবি আজও তাঁর চোখের উপর ভাসছে। তাঁর মুখের চেহারা মুহূর্তে যেন শবের মুখের মত পাণ্ডুর হয়ে উঠেছিল। নিঃশব্দে তিনি বেরিয়েই যাচ্ছিলেন, কিন্তু আরতিই ডেকেছিল, "বাবা!"

তিনি উত্তর দেননি, শুধু দাঁড়িয়েছিলেন।

"ইনি আজ আমাকে বড় অপমান থেকে বাঁচিয়েছেন বাবা।"

"অপমান থেকে?" এবার অমৃত সেন ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন, "কী হয়েছিল?"

"একটা বখে যাওয়া ছেলের দল—সবের মধ্যেই ভালমন্দ আছে ত, ছাত্রদের মধ্যেও আছে—তারাই কজনে—তাদের সঙ্গে আগে বোধ হয় মিস সেনের কিছুটা ঝগড়া বা মতান্তর হয়েছিল। সেই আক্রোশে তারা বাইরে থেকে একটা অত্যন্ত বখে যাওয়া ছেলেকে ডেকে এনেছিল।"

"আপনি? আপনি কে? আপনার ত মিলিটারি পোশাক দেখছি।"

"ইউ. টি. সির পোশাক এটা। আমি শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র। ইউনিভার্সিটিতে এসেছিলাম আমাদের কোরের কর্তার ডাকে।"

এবার আরতি বলেছিল, "উনি দাদাকে চেনেন বাবা। আমাকে দেখেই বললেন, আপনি ত রথীনবাবু—মানে রথীন সেনের বোন। আপনাকে অনেকবার দেখেছি আমাদের হোস্টেলে—দাদার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন।"

এবার প্রসন্ন হয়েছিলেন তার বাবা। একখানা চেয়ারে বসে বলেছিলেন, "আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ, ইয়াং ম্যান। আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

"প্রবীর চ্যাটার্জী।"

"বাড়ি?"

"বাড়ি ছিল এককালে বর্ধমান জেলায়। কিন্তু সে-সব আর নেই। ঠাকুরদা চাকরি করতেন, তারপর বাবা চাকরি করেছেন। তাঁরই সঙ্গে প্রথম জীবনটা জেলায় জেলায় ঘুরেছি, তারপর দিল্লীতে—"

"দিল্লীতে? কী চাকরি?"

"সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টে ডেপুটি সেক্রেটারি ছিলেন। বছরখানেক হল মারা গিয়েছেন।

"মা আছেন নিশ্চয়ই?"

"না। মা মারা গিয়েছেন অনেকদিন হল। দাদা আছেন। তিনিও দিল্লীতে সেক্রেটারিয়েটে কাজ করেন।"

"আই সী—" একটু চুপ করে থেকে হেসে বলেছিলেন, "আমার থিয়োরি সত্য হয়েছে। আমার একটা থিয়োরি আছে। মা-বাপ উচ্চশিক্ষিত—উচ্চশিক্ষা বলতে আমি ইংরিজী শিক্ষা এবং সহবত বুঝি—না হলে ছেলে কখনও ভাল হয় না। একসেপশন অবশ্য আছে। কিন্তু—।"

তারপর অ[illegible]ক কথা হয়েছিল।

তার ম[illegible] জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ইঞ্জিনীয়া[illegible]শ করে কী করবে? মানে স্বাধীনভা[illegible] সা—না—চাকরি?"

হেসে[illegible]লেছিল, "আমার ভারী ইচ্ছে মিলি[illegible]য়ারিংয়ের ট্রেনিং নিয়ে মিলি[illegible]পার্টমেণ্টে ঢুকি। দেয়ার ইজ লাই[illegible]

[illegible]সি, দেয়ার ইজ লাইফ—"

[illegible]বন যুদ্ধের মধ্যে ঢোকারও সুবিধে আছে।"

"নিশ্চয়। ভেরি গুড আইডিয়া। ভেরি গুড। —আমি খুব খুশী হলাম যে, দীজ পোলিটিক্যাল ইজ্‌ম্‌স তোমাকে ইনফ্লুয়েন্স করেনি।"

"আই হেট পলিটিক্‌স।"

আবার তার ঠোঁট উল্টে গিয়েছিল।

"মিলিটারি লাইফ তোমার স্যুট করবে। পছন্দ কর তুমি?"

"ভী—ষ—ণ! সেণ্টিমেণ্ট-ফেণ্টিমেণ্ট আমি বরদাস্ত করতে পারিনে। আমার কাছে মিলিটারি লাইফ আইডিয়াল লাইফ। সারাটা দিন কাজ করলাম, সন্ধ্যায় একটু ক্লাবে গেলাম, তারপর সারারাত্রি সাউণ্ড স্লীপ। যুদ্ধের সময় জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে [illegible] করব, বুলেট ছুটবে, শেল ফাটবে, এয়ার-রেড হবে, এর চেয়ে থ্রিল আর কিছু আছে? বুলডোজার চালিয়ে এক-একদিনে রাস্তা তৈরী করব, এক সপ্তাহে নদীর উপর ব্রিজ তৈরি করব, পাহাড় কাটব। আই লাইক ইট ভেরি মাচ।"

"ভেরি গুড। ভেরি গুড। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, কল্যাণ হক তোমার। এবং আমি বলতে পারি, তোমার উন্নতি হবেই!"

এর পরই প্রবীর উঠেছিল। "আই অ্যাম লেট। আমি আজ যাই।"

"আবার এস সময় পেলে। রথীনকে জানতে তুমি—"

"দাদা বলতাম তাঁকে। আমাদের সিনিয়র ত!"

"তা হলে তুমিও আমার ছেলের মত! তার উপর তুমি আরতিকে আজ—"

"ও সামান্য ব্যাপার। ইউনিভার্সিটির অন্য ছেলেরা থাকলে এটা কখনও ঘটতে পেত না। তারা পলিটিক্‌স নিয়ে [illegible] মিটিং করছে, তাদের সেই অ্যাবসেন্সের সুযোগে—"

"ওঃ, দীজ পলিটিক্‌স!" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন তার বাবা। তার-

" বলেছিলেন, "তবুও আমার কৃতজ্ঞতার রণ আছে। জলে ছেলে পড়ে গেলে -কোন বয়স্ক লোক তুলতে পারে। সেটা ক কথা। কিন্তু যে তোলে, মা-বাবার তজ্ঞতা তারই কাছে।"

হেসেছিলেন অমৃতবাবু। "যাও আরতি, বীরকে এগিয়ে দিয়ে এস।"

দরজার গোড়ায় অ[illegible] অনুরোধ নিয়েছিল, "আবার আস[illegible] কিন্তু।"

"আসব সময় পেলে। [illegible]

"কিন্তু কিছু নেই এর [illegible]

"আসবার কথায় কিন্তু [illegible] আপনার থায়। আপনি এর পর [illegible] টিতে কটু সাবধান হবেন।"

"আপনি ইউনিভার্সিটিতে প[illegible] লে ত।" হেসে বলেছিল আরতি।

সে-ও হেসেছিল। তারপর নমস্কার [illegible] ল গিয়েছিল। যুদ্ধের পোশাক-পরা বীর দীর্ঘ পদক্ষেপে গলির মুখে অদৃশ্য য় গিয়েছিল।

ঘরের মধ্যে আসতেই তার বাবা বলেলেন, "আইডিয়াল ছেলে; এমনি ছেলেই জ চাই।"

একমুহূর্ত পরে মধ্যে মধ্যে থেমে থেমে লেছিলেন, "কাল থেকে তুমি আর উনিভার্সিটিতে যাবে না। আমার ইচ্ছে—মি বি-টি ক্লাসে ভর্তি হও। তারপর াইভেটে এম-এ দিয়ো। আমি আজ র্বস্বান্ত। এই বাড়িখানা ছাড়া যা ছিল, ব শেষ আজ। তোমাকে চাকরি করেই তে হবে। কারণ রথীনের খরচের জন্য -বাড়িও হয়ত—। এমনি ছেলে পেলে—। ন্তু তোমার বিয়েই আমি দিতে পারব না। ী দেব তোমার বিয়েতে? না। শুধু হাতে সে পারব না! কিন্তু আশ্চর্য ছেলে—লিয়াণ্ট বয়! রথীনের চেয়েও ব্রিলিয়াণ্ট!"

* * *

সেই প্রবীর চ্যাটার্জি? তাই কি হয়?

মামার বাড়িতে একখানা ঘরে উপুড় হয়ে ছানায় শুয়ে স্তম্ভিত বিস্ময়ে ভাবছিল রতি। যে মুহূর্তে ওই রতন ড্রাইভার রতিকে স্তম্ভিত করে দিয়ে প্রচুর গ্যাস ড়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রচণ্ড বেগে গাড়িনাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল, যখন তার াট মামাত ভাই লাটু চিৎকার করছিল, খনই তার মামা বেরিয়ে এসেছিলেন পরের বারান্দায়। এবং প্রশ্ন করেছিলেন, ী হয়েছে? কী? লাটু, এত চিৎকার রছ কেন?" তার পরেই আরতিকে দেখে উঠেছিলেন, "আরতি? তুই বেঁচে িস? ভাল আছিস? বউমা! বউমা!" ড় বউ, অর্থাৎ বড় মামাত ভাইয়ের স্ত্রী রিয়ে এসেছিল। "বাবা!"

"আরতি!"

সুধা বউদি ছুটে নেমে এসেছিল। এই বউদিদিটির সঙ্গে আরতির আর একটি সম্পর্ক ছিল। সে তার পিতৃবন্ধুর কন্যা। তার বড় মামাত ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন তার বাবা। তা ছাড়াও মেয়েটি তেজস্বিনী। স্বামীর সমস্ত অনাচারকে উপেক্ষা করে, সকল দুঃখ বুকে চেপে এই বাড়ির মর্যাদা সে ধরে রেখেছে। বৃদ্ধ শ্বশুরের সে মায়ের অধিক। এ-সংসারের সকল কর্তব্য, সকল ন্যায়, এই একটিমাত্র মেয়েকে আশ্রয় করেই আজও বেঁচে আছে।

আরতিকে সে-ই সাগ্রহে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। "আয়! আয়!"

তার স্তম্ভিত মুখের দিকে তাকিয়ে বারবার প্রশ্ন করেছিল, "আরতি? কী হয়েছে রে? তোর মুখের চেহারা এমন কেন? আজ ক'দিন কী ভাবনাই ভেবেছি। যত বাবা ভেবেছেন, তত আমি! কেঁদেছি। ওই কপালিটোলায় বাড়ি—। বলে বলে কাল থানা থেকে খোঁজ করিয়েছিলাম। শুনলাম, বাড়িটা লুঠ হয়েছে নিঃসন্দেহে। এখন আর বাড়িতে কেউ নেই। আমি ভেবেছিলাম, তুই বেঁচে নেই। এদিকে গুজবের ত শেষ নেই। কেউ বলে, গাড়ি গাড়ি লাস গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। কেউ বলে, গাড়ি গাড়ি মেয়েছেলে কোথায় নিয়ে চলে গেছে।

আরতি এতক্ষণে বলেছিল, "এতটা নয়, কিন্তু অনেকটা বটে। সে আর জিজ্ঞাসা কর না বউদি। সে যে তিন রাত্রি দুদিন কীভাবে গেছে! মরে যাওয়াও কিছু আশ্চর্য ছিল না। বাঁচাটাই আশ্চর্য! সে এখন বলতে পারব না, শুধিয়ো না। যারা দিয়ে গেলেন, তাঁরাই কাল উদ্ধার করেছিলেন। আমি একটু শোব বউদি!"

ঘরটা খুলে দিয়ে তাকে শুইয়ে বউদি বলেছিলেন, "ঘুমো। কিছু খাবিনে?"

"না।"

"বেশ; ঘুম ভাঙলে ডাকিস। কিন্তু—"

"বল।"

"সন্ধ্যে ত হয়ে এল। গা-টা ত ধোয়া হয়নি। ধুয়ে নে। শরীরটা অনেক সুস্থ হবে। চান করবি? যা চেহারা হয়ে আছে।"

"হ্যাঁ বউদি, সেটা ভাল বলেছ।"

"আমার বাথরুমে আয়। বালতিতে গঙ্গাজল আছে। দু ঘটি মাথায় ঢালিস।"

অর্থটা আরতি বুঝেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল সারাটা মন। বলেছিল, "না বউদি। তার দরকার হবে না। আমি বুঝেছি, যা বলছ।"

বউদি বলেছিল, "বাঁচলাম ভাই। তবে সাবান মেখে ভাল করে চান কর। কাপড়চোপড় কী নিবি নে। বাথরুমের পাশের ঘরটাতেই আলমারিতে আছে।"

বাথরুমে ঢুকে মনে পড়েছিল প্রবীরেরই একটা কথা।

"কলকাতার এত নর্দমার জল গঙ্গায় পড়েও গঙ্গার জল অপবিত্র হয় না যখন শুনি, এবং সেই গঙ্গায় চান করে পবিত্র হওয়ার ধুম দেখি, তখনই বুঝতে পারি, গঙ্গায় এত ইলিশের ঝাঁক কী করে আসে। এরা মরে সব গঙ্গায় ইলিশ হয়।"

তারপরই বলেছিল, "এই কারণেই রামভক্ত গান্ধী এদের নেতা; আই-সি-এস সুভাষচন্দ্র নিত্যি কালী পুজো করেন।"

[illegible]কেই সে ভাবতে শুরু করেছিল। স্নান সেরে ঘরে শুয়েও তাই ভাবছে। একজনকে ভাবতে গেলেই অপরজনকে মনে পড়ছে।

কিন্তু এ কি সত্যি হতে পারে?

॥ পাঁচ ॥

বার দিন পর। ১লা সেপ্টেম্বর সে-দিন। রতনের সঙ্গে আরতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা হল। এই বার দিন আরতি মনের সঙ্গে লড়াই করেছে; কিন্তু কিছুতেই নিজেকে সংবরণ করতে পারেনি।

তার আগে প্রথম ঘটনার পরের দিনই কারফ্যুর জন্য বিকেলেই তার দুই মামাত ভাই-ই সান্ধ্য পরিক্রমায় বেরিয়ে গেলে সেও বেরিয়ে গিয়েছিল সুধাবউদির বাপের বাড়ি। ওঁদের বাড়ির পাশের বাড়িতে টেলিফোন আছে। তাঁদের সঙ্গে আলাপও আছে। সুধা বউদির বাপ তার পিতৃবন্ধু। তিনি নেই, কিন্তু তাঁর ছেলেরা আছেন। তাঁরাও আরতিকে স্নেহ করেন। তাঁরা বয়সে তার থেকে অনেক বড়; তাঁদের ছেলেরা সব কলেজের ছাত্র এবং যুদ্ধের সময় তারাও ঘোরতরভাবে আরতির মত জার্মানি ও জাপানের বিরোধী ছিল। একজন ত পুরোপুরি ওই জাপান-জার্মানবিরোধী অরাজনৈতিক সংঘের পিছনে প্রচ্ছন্নভাবে যে রাজনৈতিক দল আছে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। এই কারণে এ-বাড়ির সঙ্গে ও-বাড়ির সম্পর্ক প্রায় বিরোধের সম্পর্ক। সেই জন্যই মামাত ভাইরা বাড়িতে থাকতে সে আসতে পারেনি। সকাল থেকে এ-পর্যন্ত ঘরের মধ্যেই বসে ছিল। শুধু এই বিচিত্র বিস্ময়কর প্রশ্নটাই তাকে স্তম্ভিত করে রেখেছিল। এই কি সত্যি হতে পারে? কয়েকবার ব্যাঘাত করেছিল তার মামাত ভাইয়েরা। তাদের রাজনীতির এখন মোড় ফিরেছে। এই দাঙ্গার পর থেকে তারা হিন্দুসমাজের হয়ে লড়াই করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। পাড়ার উৎসাহী যুবকেরা দলে দলে এসেছে, সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রবল কলরবে আলোচনা হয়েছে। মধ্যে মধ্যে বোমা পিস্তল বন্দুক ইত্যাদির শব্দ কানে এসেছে। এই প্রসঙ্গেই তার মামাত ভাইয়েরা তার কাছে এসেছে তার অভিজ্ঞতার কথা শুনতে। তারা কাগজে ছাপবে; সাইক্লোস্টাইল করে

ভাবলাম দেখা করে যাই

নানান জায়গায় পাঠাবে। সুধা বউদি তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। একখানা কাগজ হাতে করে এনেছিল বড় মামাত ভাই, তাকে সই করাবার জন্য। সেখানা নিয়ে পড়ে কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে দিয়ে বলেছে, "ছি! ছি! ছি! কে লিখেছে এটা? তুমি? তোমারই ত হাতের লেখা!"

"হ্যাঁ, কেন? আমি। কাল রাত্রে তোমার কাছে শুনে—"

"আমি কী বলেছি তোমাকে? আরতির এই দুর্দশা হয়েছে—বলেছি? না—উল্টো বলেছি!"

"সেটা অনুমান করেছি। ও-কথা আরতি বলতে পারে না নিজের মুখে!"

"রাত্রে নিত্যি যে-লোক দুটোর সময় বাড়ি আসে, তার অনুমান এমনিই বটে। তোমরা যদি লুটতরাজের সুযোগ পেতে, সে-সাহস যদি তোমাদের থাকত, তবে তোমরা যে কী করতে—সে বোধ হয় ভগবানও অনুমান করতে পারেন না। যাও। তোমরা ওকে বিরক্ত কর না। ঘরে বসে বসে বাঘ-গণ্ডার মারছ, মার গিয়ে। এর পর আমি বাবাকে বলে দেব।"

মামাত ভাই এর পর চলে গিয়েছিল। অবশ্য স্ত্রীর সঙ্গে বেশ খানিকটা কথা কাটা-কাটি করে। কিন্তু সুধা বউদির সঙ্গে সে পারে না। অন্তত বাপ অর্থাৎ আরতির মামা যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন পারবে না।

আরতি ঘরে বসে ছিল, নিজের সামনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, হাজার প্রশ্ন উত্থাপিত করে।

আজ তিন বছরের উপর প্রবীর তার জীবন থেকে সরে গিয়েছে। যেমন অকস্মাৎ এসেছিল, তেমনি অকস্মাৎ। তার আগে একটা বছর প্রবীর পায়ে পায়ে তার অত্যন্ত নিকটে এসে পড়েছিল। নিকটতম নৈকট্যে। বোধ করি—বোধ করি কেন, নিশ্চিতভাবে—সে অনুভব করত, তার অন্তরতম প্রকোষ্ঠটির দুয়ারে প্রবীর হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। সেও খুলতে যাচ্ছিল। সেই মুহূর্তে হঠাৎ প্রবীর চলে গেল।

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসার প্রতি পদ-ক্ষেপটি তার মনে আছে। অন্তরের নীরব কামনা যদি অপরের অনুভব করে জানা সম্ভবপর হয়, তবে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু সে কোনদিন ডাকেনি। না, একদিন সে ডেকে-ছিল। মাত্র একদিন। অন্য সকল দিন সে নিজে এসেছিল। প্রথম দেখা হওয়ার পরের দিনই সে এসেছিল নিজে থেকে। ইউ-টি-সি-র পোশাকে নয়—চমৎকার হাল্কা গ্রে রঙের স্যুট পরে এসেছিল। তাতে তার চেহারাটাই অন্যরকম দেখাচ্ছিল। প্রথমটায় সে চিনতেই পারেনি। ছিপছিপে লম্বা, টকটকে রঙ, অবিন্যস্ত ভঙ্গিতে সুচারু বিন্যাসে বিন্যস্ত শ্যাম্পু করা চুল; টাইটা ছিল নীল। তার পাশেই ছিল গাঢ় রাঙারঙের একটি আধ-ফোটা গোলাপ। কলিং বেলের আওয়াজ শুনে, উপরের বারান্দায় বেরিয়ে উঁকি মেরে দেখে প্রশ্ন করে বসেছিল, "কাকে চাই?" ইংরিজীতে প্রশ্ন করেছিল। দেশী ক্রীশ্চান ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পাড়াটার পটভূমিতে প্রথমেই তাকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মনে হয়েছিল।

তার কটা চো[illegible]টি হেসে উঠেছিল। কিন্তু কোন র[illegible] না করে সম্ভ্রমভরেই বলেছিল, "[illegible]পনাকেই।" বলেছিল বাংলাতে।

এক মু[illegible]র পরই চিনতে পেরে-ছিল সে[illegible]য় ও-মা!" তারপরই ছুটে নেমে [illegible]দোর খুলে দিয়ে বার বার মাফ [illegible]সে। "আসুন আসুন" বলে আহ্[illegible]নিয়েছিল।

[illegible]কে এসেছিলাম একটু। ভাবলাম দেখা করে যাই। বাবা কখন ফিরবেন?"

"দেরি হবে। বিজনেস সবই গেছে। এখন ব্যস্ত হয়েছেন দাদার জন্যে। বলছেন, এ আমার বড় দুঃসময়, এ-সময় আর তার ইংল্যাণ্ডে থেকে কাজ নেই। তাকে আমি ফিরে পেতে চাই। সে ফিরে আসুক। টাকা জোগাড় করতে গেছেন—পাঠাবেন।"

"বড় ভেঙে পড়েছেন উনি। পড়বারই কথা।" একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে কথা কটি বলেছিল সে; সে-দীর্ঘনিশ্বাস অকৃত্রিম। সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছিল। বেদনার ক্ষেত্রে অকৃত্রিম সহানু-ভূতির একটা পরখ আছে; তার স্পর্শ পাওয়া মাত্র চোখ ফেটে জল আসে। তারও চোখ মুহূর্তে সজল হয়ে উঠেছিল।

এর পরের অংশটিও স্মরণীয় হয়ে আছে। সেদিন তাদের জীবনে সে এক পারাপারহীন অন্ধকার নেমেছে। সব আলো নিভে গেছে। শ্বাসবায়ুও যেন কে হরণ করে নিচ্ছে। সাত আট দিন পর। তারিখটা ২৬শে ফেব্রুয়ারি। বিয়াল্লিশ সাল। টেলিগ্রাম এসেছে, তার দাদা রথীন লণ্ডনের এয়ার-রেডে মারা গিয়েছে।

খবরটা পড়েই টেলিগ্রামখানা তার বাবার হাত থেকে খসে পড়ে গিয়েছিল। তিনি স্থির শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একটা অস্ফুট দুর্বোধ শব্দে আর্তনাদ করে ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন।

বাড়ির টেলিফোন তখন গিয়েছে। যুদ্ধের জন্য নিয়ে নিয়েছে গভর্নমেন্ট। জাপানীরা মালয় উপত্যকার মধ্য দিয়ে দ্রুততম গতিতে উত্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। খবর বেরিয়েছে, ইংরেজের যুদ্ধবিভাগ বলেছে, "আমাদের সৈন্যেরা এত ক্লান্ত যে খেতে বসে তারা ঘুমে ঢলে পড়ছে।" রেঙ্গুন এবং বার্মার অন্যান্য স্থান থেকে এ-দেশের প্রবাসীরা পিঁপড়ের মত সারি বেঁধে দুর্গম পার্বত্য পথে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর

হচ্ছে। কলকাতায় একটা আতঙ্ক এসেছে। আকস্মিক শীতপ্রবাহের মত যেন রাত্রির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে মুহূর্তে ঘন থেকে ঘনতর হয়ে উঠছে।

সেই অবস্থায় অজ্ঞান বাবাকে নিয়ে সে বাড়িতে একা। পুরনো বেয়ারাটাকে পাঠিয়েছিল ডাক্তারের কা[illegible]। সব চেয়ে কাছে যে ডাক্তারকে পাওয়া যা[illegible]র কাছে। ডাক্তার বলে গেলেন, "সেরিরেল[illegible]স। আকস্মিক আঘাতে বোধ হয় মাথা[illegible] শিরা ছিঁড়ে গেছে। মনে হচ্ছে, বাঁ[illegible]ও পঙ্গু হয়ে যাবার ভয় রয়েছে[illegible]র দেখান উচিত। এবং সেবার [illegible] ব্যবস্থা করুন। আপনার আত্মীয়[illegible] থাকলে খবর দিন।"

নার্সের ব্যবস্থা এই ডাক্তারই ক[illegible]দিয়েছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই নার্স এ[illegible]ছিল। তারপরই সে ছুটে গিয়েছিল হেয়ার স্ট্রীট থানায়—মামার বাড়িতে টেলিফোনে খবর দেওয়ার জন্য। কিন্তু এক্সচেঞ্জ থেকে খবর পেয়েছিল, তাদের টেলিফোনও নিয়ে নেওয়া হয়েছে! শুধু তাদের নিজের ডাক্তার পার্ক-সার্কাসের বি. সেনকে খবর দিয়ে ফিরে এসেছিল।

ডাঃ বি সেন এককালে ডাঃ রায়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন। তার বাবারই বয়সী, তাঁর বন্ধুও বটেন। আজ তিনি বড় ডাক্তার। তবু তাদের বাড়িতে সেই আগের মতই গৃহ-চিকিৎসকই আছেন। তাঁকে খবর দিয়ে তাঁকেই সে বলে দিল, মামাদের খবর দিতে।

বাড়ি ফিরে এসেই দেখেছিল, প্রবীর দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন পরনে ছিল ধুতি, টেনিস শার্ট।

"প্রবীরবাবু!" বলতে বলতেই সে কেঁদে ফেলেছিল।

প্রবীর বলেছিল, "আমি অনুমান করেছিলাম। আমাদের প্রফেসর বোসের ছেলে শৌরীন ওই বাড়িতে থাকত। তিনিও টেলিগ্রাম পেয়েছেন। রথীনবাবুর সঙ্গেই তিনি পড়তেন।"

সে উত্তর কী দেবে? শুধুই কেঁদেছিল।

প্রবীরই বলেছিল, "কান্না ত আছেই মিস্ সেন। সমস্ত জীবনই রইল। যে-বিপদ ঘটে গেছে, সে-বিপদ অতীত: তার জন্যে চোখের জল এখন সম্বরণ করতে হবে, কারণ তার আঘাতে আর একটা বিপদ ঘটতে চলেছে। এই আশঙ্কা করেই আমি ছুটে এলাম। আপনারা দুজনেই ভেঙে পড়বেন। কিন্তু এসে দেখছি বিপদ অনেক বেশী! চলুন, ভিতরে চলুন।"

রাত্রি আটটার সময় এসেছিলেন ডাঃ সেন। তারও এক ঘণ্টা পরে এসেছিল ছোট মামাত ভাই—ওই লাটু। বড় মামাত ভাই সম্পর্কে সন্ধ্যাই বেরিয়ে গিয়েছে [illegible]। ফিরবে বারটার আগে নয়। এবং ফেরার পর বেশ কয়েক ঘণ্টা না ঘুমিয়ে আর তার বের হওয়ার অবস্থা থাকে না।

প্রবীর নীরবে বসে ছিল রোগীর ঘরের বাইরে।

ডাঃ সেন তার সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন আরতিকে। "ও ইয়াং ম্যানটি কে আরতি?"

আরতি উত্তর দিয়েছিল, "দাদার বন্ধু। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র। আমাদের পরিবারের বন্ধু হয়ে গেছেন সম্প্রতি। দাদার খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন। তারপর এই বিপদে আমাকে একলা দেখে আর যেতে পারেননি।"

ডাঃ সেন খুশী হয়ে প্রবীরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তার বাবার মত ঈশ্বরে বিশ্বাস ডাঃ সেনেরও ছিল না, তবু সেদিন বোধ করি কী বলে প্রবীরকে শুভেচ্ছা জানাবেন খুঁজে না পেয়েই তার বাবার মতই বলেছিলেন, "গড উইল ব্লেস ইউ, মাই ইয়াং ফ্রেন্ড, আমি ভাবছিলাম এঁদের জন্যে। বিশেষ করে আরতির জন্যে। আমারই থাকা উচিত ছিল। কিন্তু......; তা তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করলে। যখন দরকার হবে, তুমি থানায় গিয়ে আমাকে ফোন কর। আমি যাবার পথে থানা থেকেই ডি-সিকে ফোন করে অনুরোধ করে যাচ্ছি, যেন গেলেই ফোন করতে পাও। ও-সিকে বলে দেবেন তিনি।

লাটু—তার ছোট মামাত ভাইও এসে প্রবীরকে দেখে ঠিক এই প্রশ্নই করেছিল, "ইনি কে আরতি?"

আরতি ঐ একই উত্তর দিয়েছিল।

লাটু বলেছিল, "কই, পরিবার-বন্ধুকে রথীনদা থাকতে ত কোনকালে দেখিনি? নামও শুনিনি! কবে থেকে জুটল?"

কথাগুলি প্রবীরের সামনে হয়নি, পাশের ঘরে হচ্ছিল; কিন্তু এমন জোরে বলছিল লাটু যাতে পাশের ঘরে, পাশের ঘরে কেন বাড়ির সকল ঘর থেকেই সকলে শুনতে পায়।

আরতি রুদ্ধ চাপা গলায় বলেছিল, "চুপ কর—উনি শুনতে পাবেন!"

"পেলেন ত পেলেন। আমি কাউকে খাতির করে কথা বলছি না।"

"খাতির কর বা না-কর, অনধিকার চর্চা করবার তোমার অধিকার নেই।"

"আই সী: তা হলে অনেকদূর এগিয়েছে!" বলেই 'শুনেছেন মশাই!' বলে বেরিয়ে গিয়েছিল লাটু প্রবীরের কাছে। আরতি পিছনে পিছনে এসে লাটুকে কোন কথা বলবার আগেই লাটু প্রবীরকে বলেছিল, "আপনাকে বলছি!"

প্রবীর মুখ তুলে তার দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল, "বলুন।"

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে-সাহায্য করেছেন তার জন্যে। এখন আপনি আসুন, রাত্রি হয়ে যাচ্ছে। ব্ল্যাক-আউটের রাত্রি।"

"ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু মিস সেন কোথায়? তিনি না-বললে ত আমি যাব না।"

"আমি তার মামাত ভাই।"

"শুনেছি। নমস্কার। কিন্তু মিস সেন না-বললে আমি যেতে পারব না।"

"আপনি যাবেন। আমি বলছি!"

"মাপ করবেন—মিস্ সেন না বললে আমি যেতে পারব না। কারণ আমি শুনেছি, আপনি ড্রাইভারকে আধঘণ্টা পরই হর্ন দিয়ে আপনাকে ডাকতে বলে বাড়িতে ঢুকেছেন। ড্রাইভার এর মধ্যে দুবার হর্ন দিয়েছে। আপনি থাকবেন না। সুতরাং আমি ত এই বিপদে একলা রেখে যেতে পারব না। ওই! আপনার ড্রাইভার আবার হর্ন দিচ্ছে। যান, আপনার দেরি হচ্ছে।"

"না না। আপনি যাবেন মশায়! আপনি গেলেন দেখে তবে আমি যাব। সম্পর্কহীন যুবকের সঙ্গে একবাড়িতে—"

আরতিও আর থাকতে পারে নি; সে ক্ষোভে রাগে অধীর হয়ে বেরিয়ে এসে বলেছিল, "লাটুদা, তুমি বাড়ি যাও। তোমাকে আসতে আমি বলিনি, তুমিও থাকতে আসনি। আমি মামাকে চেয়েছিলাম, তিনি আসতে পারেননি। তুমি এসেছ, খোঁজ নিয়েছ, তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ তোমাকে আমি দিচ্ছি। হাতজোড় করে বলছি, বাড়িতে এসে বাড়ির অপরাধ করে দিয়ো না আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে!"

লাটু এর পর বেরিয়ে চলে গিয়েছিল।

আরতি মার্জনা চেয়েছিল, "কিছু মনে করবেন না আপনি। আমি মার্জনা চাচ্ছি।"

হেসে প্রবীর বলেছিল, "ছি-ছি-ছি! কী বলছেন এ-সব? আমাকে যদি সত্যিই বন্ধু ভাবেন, তবে মার্জনা কেন চাইবেন? না-না-না। যান আপনি, দেখুন, বাবাকে দেখুন।" আবেগহীন অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে একটু মৃদু হেসে কথা ক'টি বলেছিল।

সমস্ত রাত্রি প্রবীর ওই চেয়ারে একভাবে বসে ছিল। শুতে অনুরোধ করলে শোয়নি। বলেছিল, "ঘুমুই ত রোজই। আর এই উৎকণ্ঠার মধ্যে ঘুম আসবেও না আপনি যান।"

শেষরাত্রে একবারমাত্র সে বেরিয়ে দেখেছিল, চেয়ারের পিছনে মাথা রেখে চো[খ] বুজেছে প্রবীর। নইলে যতবার উঠেছে ততবার সে তার সাড়া পেয়েছে।

সকাল বেলায় সে বিদায় নিয়েছিল। তখ[ন] তার বাবার অবস্থা ভালর দিকে।

প্রথম পদক্ষেপ ইউনিভারসিটির ঘটন[ার] দিন। দ্বিতীয় পদক্ষেপ তার পরদিন। তৃত[ীয়] পদক্ষেপ বাবার অসুখের দিন। সেই দি[ন] সে তাদের পরমাত্মীয় হয়ে গিয়েছিল। তা[র]পর ধীরে ধীরে সহজ যাওয়া-আসার ম[ধ্যে]

হঠাৎ একদা মনে হয়েছিল, তার অন্তরতম প্রকোষ্ঠটির দরজায় কে যেন হাত দিয়েছে। হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে, আঘাত দিয়ে ডাকবে কি না। সেও অপেক্ষা করে রইল, ডাকুক! একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষের অর্গলে হাত দিয়ে ভিতরে সে এবং বাহিরে প্রবীর পরস্পরের শ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যভাবে কোন একটা কিছুর ছায়া যেন পড়েছিল তাদের উপরে। এই পরস্পরের মেলা-মেশার অনেক অবকাশের মধ্যেও কোন দিন বা কোন বিশেষ সময় একটি আবেগের প্রকাশে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেনি। একটি কারণ সে জানে। সেটি তার ভাগ্য-বিপর্যয়ের বেদনার প্রভাব। রোগশয্যায় শুয়ে তার পুত্রশোকাতুর সর্বস্বান্ত বাবা যেন সংসারের সব কিছুকে বিষণ্ণ করে রেখেছিলেন। অন্যদিকে প্রবীরের অসাধারণ ভদ্রতা-বোধ। আরও কিছু ছিল। প্রবীর তখন পরীক্ষা দিয়েছে। ফল সম্পর্কে তার সন্দেহ ছিল না। সে তখন যুদ্ধ-বিভাগে চাকরি পাবার চেষ্টা করছে। এবং সেই আকাশ-মাটি-সমুদ্র ব্যাপ্ত করা প্রত্যক্ষ যুদ্ধকে সামনে রেখে কোন আবেগকে সে প্রশ্রয় দিত না। তবুও তারই মধ্যে কয়েকটি দুর্লভ দিনের স্মৃতি তার মনে আছে। শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষের ঘন মেঘাচ্ছন্ন একাদশী দ্বাদশী ত্রয়োদশীর রাত্রির চাঁদ ওঠার ক্ষণের মত কয়েকটি দিনের স্মৃতি।

তার বাবার সঙ্গে কথা বলতে-বলতেও প্রবীর কখনও কখনও নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। কখনও কখনও কর্মরতা আরতির দিকে এই দৃষ্টিতে তাকিয়ে নীরবেই বসে থাকত। অবাক হয়ে দেখত। আরতির চোখে চোখ পড়লেও লজ্জিত হত না। কখনও কখনও সপ্রতিভভাবেই একটু হাসত। পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে যেমন প্রসন্ন হাসি হাসে মানুষ, সেই প্রসন্ন হাসি। যে উদয়ে আলোকাভাস আছে, রক্তরাগ নেই, তেমনি উদয়-মুহূর্তের মত সেই হাসি।

একদিন সে নিজে বোধ হয় অন্তরে অন্তরে আরক্তিম হয়ে উঠেছিল। তেমনি হাসি হেসে বলেছিল, "এমন করে কী দেখেন বলুন তো?"

এখনও পর্যন্ত তাদের আপনি তুমি হয়নি।

প্রবীর বলেছিল, "আপনাকেই দেখি।"

"আমাকে? আমার মধ্যে কী আছে দেখবার?"

"আপনার মধ্যে একটা কিছু আছে, যা দেখতে ভাল লাগে। আপনার রূপ।"

"আমার রূপ? আমি ত কালো! আর গড়ন-পিটনের মধ্যে এমন কোন কিছু নেই, রূপের যা সংজ্ঞা আছে তার সঙ্গে যা মেলে।"

একটু হেসে সে বলেছিল, "আমার একটি জানা ঘটনার কথা বলি শুনুন। একটু হয়ত সংসারে সমাজে যাকে দুর্নীতিমূলক বলে, তাই। আমাদেরই এক আত্মীয় বর্ধমান জেলার অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। খুব উচ্চশিক্ষিত না হলেও, বংশগৌরবের প্রভাবে বংশের দীক্ষায় ভালই ছিলেন হঠাৎ তিনি। উন্মত্ত হলেন একটি নিম্নজাতীয়া কালো মেয়েকে নিয়ে। ঘর ছাড়তে উদ্যত হলেন। ছাড়লেন। তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কিসের জন্য এমন পাগল হয়েছেন তিনি? কী দেখেছেন তিনি ওর মধ্যে। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আমার চোখ দুটো যদি তোমাদের দিতে পারতাম তবে বুঝতে পারতে, দেখতে পেতে, কী দেখেছি, কী পেয়েছি। এক এক জনের এক এক রঙ ভাল লাগে। কিন্তু বলুন ত, রূপের বিচারে মৌলিক রঙগুলোর কোন রঙটা কোন রঙের চেয়ে নিষ্প্রভ, মলিন? রূপের মধ্যে এক অপরূপ বাস করেন। যে যার মধ্যে তাকে আবিষ্কার করে, তার রূপই তার ভাল লাগে। আপনার মধ্যে একটি সুষমা আছে। সে রঙ গড়ন দুয়ের অতিরিক্ত কিছু।"

আরতির বুকের ভিতরে স্পন্দন বোধ করি আবেগের স্পর্শে নৃত্যচ্ছন্দোময় হয়ে উঠেছিল। সে হেসে বলেছিল, "আপনার চোখ দুটো ধার পেলে বড় ভাল হত। একবার আয়নায় নিজেকে দেখে, মনের সুন্দরী না হওয়ার ক্ষোভটা মুছে ফেলতে পারতাম।"

"দেবার হলে নিশ্চয় দিতাম। এবং আমার চোখ পেলে আপনি আরও অনেক সুন্দরকে দেখতে পেতেন। আমার ছেলেবেলা থেকে রূপের একটা নেশা আছে। আকাশের চাঁদের [illegible]ক হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম। ফুলে[illegible]গান ছিল আমার সব চেয়ে প্রিয় জা[illegible]পবান আর রূপবতী যিনিই হন, [illegible] বাড়িতে এলে তাঁর সঙ্গ ছাড়তে [illegible]না। দেখুন না, ফুল না-পারে [illegible] না!" একটু থেমে হেসে ব[illegible] আমার চোখ পেলে কিন্তু আপনি [illegible] ইউনিভারসিটিতে যে-ছেলে[illegible] বই কেড়ে নিয়ে ঝগড়ার সূত্রপা[illegible]করেছিলেন, তার প্রতি সহানুভূতি অনুভব করতেন। মানে সে আপনার নামের যে-অক্ষরটা কেটে ছোট করে নিয়েছিল, সে-অক্ষর বাদ দিতে আপনারই ইচ্ছে হত।"

ঠিক সেই সময়েই বাবা ডেকেছিলেন, নইলে সে জিজ্ঞাসা করত, "তার অর্থ কি এই হয় না যে, আপনারও ওই নামে আমাকে ডাকতে ইচ্ছে করে?"

বাবা সেদিন একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার পাশে থেকে সে তাঁর সেবা করেছিল। কয়েকবার দুপাশে দুজনে বসে পরস্পরের দিকে একই উদ্বেগ-নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। সন্ধ্যার পর নার্সের ব্যবস্থা করে সে গিয়েছিল। সেই দিনই স্পষ্টভাবে সে অনুভব করেছিল, প্রবীর তার পরমাত্মীয়।

বিদায় দেবার সময় কথা খুঁজে না-পেয়ে এ-দেশের একটা অত্যন্ত সেকেলে কথাই বলেছিল, "আরজন্মে আপনি নিশ্চয় আমাদের কেউ ছিলেন!"

প্রবীর বলেছিল, "আরজন্ম যদি মানেন, তবে বলতে হয়, আপনি এবং আপনার বাবা, দু-জনে হয়ত বাবা মেয়ে ছিলেন না। আমি হয়ত একজনের পরমাত্মীয় ছিলাম। এ-জন্মে আপনাদের দুজনেই আমার পরমাত্মীয়। আসল কথা মমতা মিস সেন। ওই পরমবস্তুটি কী করে যে জন্মায়, এবং কোথায় জন্মায়, এ বলা বড় শক্ত। ওই ওরই জোরে মানুষের ঘর সংসার, মা-বাপ-ভাই-বোন স্ত্রী-পুত্র, সব দাঁড়িয়ে আছে। ওতেই মানুষ কুৎসিতকে সুন্দর দেখে, গুণহীনকে গুণবান দেখে। 'তনয় যদ্যপি হয় অসিতবরণ, প্রসূতির কাছে সেই কষিত কাঞ্চন।' আপনাদের সঙ্গে সেই পরম বস্তুতে বাঁধা পড়ে গেছি।"

বলে একটু হেসেছিল। আরতি চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কথাগুলি বড় ভাল।

বাংলার ভবিষ্যৎ
জাতির স্বাস্থ্যের
দৃঢ় ভিত্তি
বিশ্বনাথ ঘৃত
আমদানীকারক
পঞ্চানন আশ
এণ্ড কোং
২বি, রামকুমার রক্ষিত লেন,
বড়বাজার — চিনিপট্টী
কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩—৫৪১৪

প্রবীরের কণ্ঠস্বরে অন্তরের অকপট প্রকাশ। অভিভূত হয়ে যাবারই কথা; তাই গিয়েছিলও, কিন্তু তবু যেন কিছুর জন্য মনের গভীরে একটি বেদনা অনুভব করেছিল। যেন একটু অভিমান।

"আচ্ছা আমি [illegible] আজ। কাল সকালেই খোঁজ নেব।"

চলে গিয়েছিল সে [illegible]র সে যতক্ষণ জেগে ছিল, উদাস হ[illegible]ল। জীবনের যত নৈরাশ্যজনক ভাবন[illegible] সঙ্গে তাকে চেপে ধরেছিল।

রুগ্ণ পঙ্গু বাবার [illegible] হবে? সংসারে কেউ সত্যকারের [illegible] নেই, অথচ সম্মুখে গোটা জীবনটা [illegible]য়েছে। সম্বল ফুরিয়ে যাচ্ছে দিন দিন। [illegible]নের ফিরে আসবার জন্য বাবা যে টাকাটা বহু কষ্টে, বহু লজ্জা স্বীকার করে, আরতির মায়ের এবং কিছু আরতির গহনা বিক্রি করে সংগ্রহ করেছিলেন, রথীনের মৃত্যুতে সেটা পাঠাতে হয়নি। তাই আজও চলছে। তারপর?

ব্ল্যাক আউটের রাত্রি। আশপাশের ফিরিঙ্গি-পাড়ায় সদ্য-আগত ইংরেজ টমিদের ঘোরা-ফেরায় রাস্তাগুলি কিছু মুখর হয়ে থাকত। রাত্রে দরজা ভাল করে বন্ধ করে রাখতে হয়। দু-একটা মাতাল সেপাইয়ের স্খলিত কণ্ঠের গান কি দু-একটা উচ্চ শব্দ, কি হাসি মাঝে মাঝে বেজে উঠছিল। সেদিন খেতেও ভাল লাগেনি। রাত্রে ঘুমও ভাল হয়নি। সকালে বাবা ভাল ছিলেন। প্রবীর এসেছিল আটটা না বাজতেই। বাবা ভাল আছেন দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বলেছিল, "যাক্, দুশ্চিন্তা নিয়ে যেতে হবে না। আজই আমি দিল্লী যাচ্ছি। সাহস করে থাকবেন কিন্তু। আপনি বিংশ শতাব্দীর মেয়ে!"

সেইদিনের কাগজেই খবর ছিল, গান্ধীজী, পণ্ডিত নেহরু প্রভৃতি নেতাদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে।

প্রবীর কাগজখানার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "সাবধানেও থাকবেন। ঝড় উঠল।"

ফিরেছিল প্রায় মাস দুয়েক পর। দিল্লী থেকে আরও কয়েক জায়গায় যেতে হয়েছিল তাকে। এর মধ্যে চিঠিও লিখেছিল এক-খানা। চিঠিতে লিখেছিল, "জীবনে যে-চাকরির যে-কর্মের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম, তারই জন্য ঘুরতে হচ্ছে। কয়েক জায়গায় কয়েক রকম দেখা-শুনা, পরীক্ষা, [illegible]টারভ্যু।"

দু মাস পর ফিরে বলেছিল, "কী যে [illegible]শ্চিন্তা হত আপনাদের জন্যে, কী বলব! [illegible] ভরসা ছিল আপনার উপর। আপনি শক্তিমতী মেয়ে!"

হেসে সে বলেছিল, "চাকরির কী হল?"

"হবে। এখন লক্ষ লক্ষ বলির প্রয়োজন, এখন বাছাবাছির কড়াকড়ি নেই। যে-কোন দিন ডাক আসবে। যে-কোন মুহূর্তে।"

তারপর কথা হয়েছিল আগস্ট আন্দোলনের। বোম্বাইয়ে যখন গুলি চলে, তখন সে বোম্বাইয়ে ছিল। চোখে দেখেছে। গোটা বিহারের অবস্থা দেখে এসেছে। পাটনায় বেয়নেটের ডগা উঁচিয়ে বিশিষ্ট লোকদের দিয়ে রাস্তা কাটানর, ভাঙা কালভার্ট মেরামত করানর গল্প শুনে এসেছে।

কিছু ফটো তার কাছে ছিল। সেগুলিও দেখিয়েছিল। কলকাতার গল্প, মেদিনীপুরের কাহিনী বলেছিল আরতি। মেদিনীপুর তখনও ইংরেজের হাতের অর্ধেক বাইরে। কোথাও বারোয়ারি পুজোর বাজনা বাজছিল। সেদিন ষষ্ঠীর সন্ধ্যা। আকাশে মেঘ ঘুরছিল, রাত্রির অরণ্যের উল্লাসমত্ত দলবদ্ধ হাতির মত। আসামের জঙ্গলে একবার বাবার সঙ্গে বাবার এক ফরেস্টার বন্ধুর ব্যবস্থায় রাত্রে বন দেখেছিল। সেখানেই দেখেছিল দলবদ্ধ হাতিদের মাতামাতি। ঠিক তেমনি। সীসের মত একটি একটানা মেঘের আস্তরণের উপর ছোট বড় খণ্ড খণ্ড মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার সঙ্গে দমকা বাতাস।

প্রবীরই এক সময় এ-সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে বলেছিল, "এ কি, সাইক্লোন নাকি?" এবং তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল। বলেছিল, "কাল আসব।"

"এই দুর্যোগের মধ্যে যাবেন কী করে?"

"চলে যাব। কাছেই ত। আর ত শিবপুরে থাকছি না। এখন রয়েছি একটা হোটেলে। এই ত চৌরিঙ্গীর মোড়ে!"

সপ্তমীর দিন বিকেল বেলা পর্যন্ত সাইক্লোন তার চেহারা নিয়ে দেখা দিল। হাতির দল যেন রাতারাতি পাগল্য হয়ে গেল। উন্মত্ত দাপাদাপিতে পৃথিবীকে যেন নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

বাবা ভয়ার্ত স্বরে জড়িত জিহ্বায় বার বার তাকে ডাকছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন, "এ-কী? ওই?"

"ঝড়—বৃষ্টি!"

"এত? তার এত শব্দ?"

"বোধ হয় সাইক্লোন!"

"সাইক্লোন!" একটুখানি স্থির দৃষ্টিতে ছাদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "পুরনো বাড়ি; পড়ে যাবে না ত?"

রোগের জন্য দিন দিন বাবা যেন অবোধ হয়ে যাচ্ছিলেন! কথা বলতে বলতে সেই সাহসী বুদ্ধিদীপ্ত অমৃত সেনের মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল। ছেলেকে বুঝিয়ে বলার মতই সে বলেছিল, "না। ছাদ ত নতুন। ছাদ ত ভেঙে করান হয়েছে!"

"করান হয়েছে?"

"হ্যাঁ। ওই ত ঢালাই ছাদ। দেখছেন না? কড়ি-বর্গা নেই।"

"হ্যাঁ। কিন্তু—। ওঃ! কী ভীষণ ঝড়!"

একটু পরে বলেছিলেন, "সে? সে আসেনি?" প্রবীরের নাম মনে পড়েনি ওঁর। মধ্যে মধ্যে তার নামও ভুলে যেতেন।

আরতি মনে করে দিয়েছিল, "প্রবীরবাবু? আসবেন কী করে? রাস্তায় যে জল জমে গেছে। আর যে দমকা ঝড় আর বৃষ্টি!"

অর্থহীন করে ঘাড় নেড়েছিলেন, "হ্যাঁ। হ্যাঁ।"

প্রবীর কিন্তু তার মধ্যেই এসেছিল। এসেছিল কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে নিয়ে। কিছু ডিম, একখানা বড় রুটি, এক টিন মাখন, আর তার সঙ্গে কিছু সোনামুগের ডাল নিয়ে। হেসে বলেছিল, "যা গতিক—তাতে বাজার করাতে পেরেছেন কিনা জানি না। কালও পারবেন কিনা বুঝতে পারছি না। তাই নিয়ে এলাম। এত বড় হগ-মার্কেট প্রায় জনশূন্য। এ ছাড়া কিছু পাইনি। সোনামুগের ডালটা হঠাৎ পেলাম। সাইক্লোনই হক আর হারিকেনই হক, খিচুড়ি খাবার বড় ভাল রাত মানে আবহাওয়া এনেছে। ইলিশ পেলে সোনায় সোহাগা হত। তবুও ডিম খারাপ লাগবে না। যদি তাড়াতাড়ি বানান সম্ভবপর হয়, আমিও খেয়ে যেতে পারি!

"কিন্তু জলে ভিজে যে সপসপ করছেন।"

"রাস্তায় প্রায় সাঁতার দিতে হয়েছে। নতুন ওয়াটারপ্রুফ, ক্যাপ, ছাতা, গামবুট,—রণসাজের মানে বর্মের আর খুঁত রাখিনি, কিন্তু মিথ্যেই এরা ওয়াটার-বুলেটপ্রুফ বলে বিজ্ঞাপন দেয়, আসলে ছররা আটকায়, বুলেট আটকায় না। সত্যিই আপাদমস্তক ভিজে গেছি। গামছার মত কেউ যদি নিংড়ে দিতে পারে ত অন্তত এক চৌবাচ্চা জল হবে।"

"ছেড়ে ফেলুন ওগুলো। বাবার কাপড় চোপড় দিচ্ছি আমি।"

"আগে এগুলো ধরুন। এর এক কণা কি দানা নষ্ট হলে আমার দুঃখের সীমা থাকবে না।"

হেসে ফেলেছিল আরতি। "এত খিচুড়ি খাবার লোভ? আপনাকে ত এমন ভোজন-রসিক বলে কোনদিন বুঝতে পারিনি!"

"ঠিক দিনটি না এলে বিশেষ রূপ প্রকাশ পায় কী করে বলুন? আমাদের জাতের এই বিক্রম, এই বুলেটের সামনে বুক পেতে দাঁড়ান, এ রূপ কি এই বিয়াল্লিশের আগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর না এলে প্রকাশ পেত কোনদিন? এই সময়ের আগে সুভাষবাবুর মত বড় অ্যাডমায়ারার হক—কেউ কি কল্পনা করতে পেরেছিল যে, হিটলারের পাশে মিলিটারী জেনারেলের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে তিনি আর্মির স্যালুট নিতে পারেন। তিনি নিজে ভেবেছিলেন?" কথাটা হেসেই সে শুরু করেছিল, কিন্তু বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। সুন্দর রঙে যেন রক্তের

উচ্ছ্বাস জেগে উঠেছিল।

আরতিও গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে অন্য কারণে।

হিটলারের, জার্মানির নাম সে সহ্য করতে পারেনা। তার দাদাকে তারা—!

বলেওছিল, "ওদের নাম আমার কাছে করবেন না। আমি সহ্য করতে পারি না। আমি রাজনীতি থেকে অনেক দূরে থাকি কিন্তু সুভাষবাবুকে আমি অত্যন্ত ভক্তি করতাম। তিনি শেষে—। একটা দৈত্যের সংগে—।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে তৎক্ষণাৎ পাশের ঘরে চলে এসেছিল। বলেছিল, "কাপড় দিই; দাঁড়ান। ওয়াটারপ্রুফ-ট্রুফ-গুলো খুলুন।"

রাতে খিচুড়ি খেয়ে সে-রাতে প্রবীর আর হোটেলে ফেরেনি। রাত্রিটা তার বাবার পাশে বসে ছিল। রাতে তখন সাইক্লোন বোধ করি প্রচণ্ডতম গতিবেগে প্রকট হয়েছে। নিরাপদ ঘরে বসেও মনে হচ্ছে, এই দুর্যোগ-রাত্রির বুঝি অবসান হবে না। প্রতি মুহূর্তে একটা ভীষণতম বিপদ যেন আসন্ন মনে হচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে মনে হচ্ছিল, গোটা বাড়িটাই বুঝি ভূমিসাৎ হয়ে যাবে।

এমনি একটা মুহূর্তে এসেছিল তাদের খাবার সময়। ও ঘর থেকে বাবা আতংকে চিৎকার করে উঠেছিলেন। বোধ করি কারও বাড়ির টিনের একটা চাল উড়ে এসে তাদের ছাদের উপর বিপুল শব্দে আছাড় খেয়ে পড়েছিল।

খাওয়া ছেড়ে তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়েছিল প্রবীর। প্রবীরের সাহসেই সে সাহস পেয়েছিল, নইলে সেও ওই শব্দে হয় চিৎকার করে উঠত, নয়ত আড়ষ্ট পংগু হয়ে যেত। বাবার কী হত সে বলতে পারে না। সে যখন উঠে বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন বাবার পুরনো খানসামা রামধারী হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রবীর তাঁর কপালে হাত দিয়ে মুখের উপর ঝুঁকে বলছে, "ভয় নেই। কিছু হয়নি। আমাদের বাড়ি ঠিক আছে। ভয় পাবেন না। বোধ হয় কোন টিনের চাল উড়ে আমাদের ছাদে পড়েছে।"

বাবা কথঞ্চিৎ সুস্থ হলে বলেছিল, "আমি ইঞ্জিনীয়ার, আমি আপনাকে বলছি, এ-বাড়ি এমন সাইক্লোন পর পর ছ সাতদিন হলেও দাঁড়িয়ে থাকবে।"

বাবা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন। প্রবীর বলেছিল, "কোন ভয় করবেন না। আমি রইলাম আপনার পাশে। আর কয়েক ঘণ্টা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাস্ করে যাবে।"

এরপর সে কাপড় দিয়ে দরজা-জানালার ফাঁকগুলি সযত্নে বন্ধ করে বলেছিল, "যতটা পারি, সাউণ্ড-প্রুফ করলাম। এই ভয় করেই আমি এসেছি। আলিপুরের আবহাওয়া-আপিসের এক বন্ধুর কাছে খবর পেলাম, এত বড় সাইক্লোন এক শ বছরের মধ্যে হয়নি। সংগে সংগে আপনাদের কথা মনে হল। ওঁর এই ছেলেমানুষের মত ভয় পাওয়ার কথা জানি। তাই এলাম। একলা আপনি সামলাতে পারবেন না। যান, আপনি গিয়ে বিশ্রাম করুন। শেষরাত্রির দিকে ঝড় একটু কমবে বলে মনে করছি; তখন আপনাকে জাগিয়ে দেব।"

"না। আমিও থাকব।"

"না। থাকবেন না। না-হলে এই ঝড় মাথায় করে ভিজতে ভিজতে আমার আসার কোন অর্থ হয় না মিস সেন!"

এই সুরের এই কথাকে অমান্য করতে পারেনি আরতি। কিন্তু ঘুমুতেও পারেনি। বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব, ছাদের উপর আছড়ে-পড়ে-যাওয়া টিনের চালের উপর বৃষ্টিপাতের বিচিত্র শব্দ, ও-ঘরে বাবার জন্য চিন্তা, তার সংগে তার বাবার পাশে প্রবীর জেগে বসে আছে, এই অস্বস্তিতে ঘুম তার আসেনি। প্রবীরের কত দান তাকে নিতে হবে? কেন নেবে? এই প্রশ্নে সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এ-ক্ষোভ তার এই প্রথম। এতদিন এ-ক্ষোভ জাগেনি কেন, হঠাৎ এই কথাটা মনে হয়ে সে নিজেই বিস্মিত হয়ে গেল।

রাত্রি একটা বা সাড়ে বারটার পর সে আর থাকতে পারেনি। বাবার ঘরে এসে ঢুকেছিল। একটু আশ্চর্য হয়েছিল। এ-ঘরে ঝড়ের শব্দ কম। ঘরটার উপরে ছাদে একখানা ঘর আছে, সেই কারণে টিনের উপর বৃষ্টি পড়ার শব্দটাও কম। বরং যেন একটি সুরময় শব্দের মত হচ্ছে। ইঞ্জিনীয়ার মানুষ; যতটা পেরেছে, শব্দের প্রবেশ বন্ধ করেছে। বাবা গাঢ় ঘুমে ঘুমুচ্ছেন। নাক ডাকছে। প্রবীরও চেয়ারের মাথায় হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে। চেয়ারখানা আরামপ্রদ। ইজি-চেয়ারেরই অভিনব সংস্করণ। ঘুমুতে অসুবিধা হয় না। কোণে ঠেস দিয়ে রামধারী ঘুমুচ্ছে। আরতি কাউকে না জাগিয়ে এ-পাশের চেয়ারখানায় বসে গেল। নীল আলোয় ভরা ঘরখানা যেন স্বপ্নাবেশে ভরে গিয়েছিল। তার মধ্যে স্বাস্থ্যে দীপ্তিতে পরিপূর্ণ ঘুমন্ত প্রবীরকে অপরূপ বলে মনে হচ্ছিল।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চোখে জল এসেছিল তার। কেন, সে তা জানে। কিন্তু সে থাক। তারপর কখন সে নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল ঘড়ি বাজার শব্দে। ঢং ঢং ঢং শব্দে চোখ মেলেছিল সে। চোখ মেলেই আবার সে চোখ বন্ধ করেছিল অবশের মত। প্রবীর চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। ঘুমের ভান করে সে পড়ে ছিল। কিছুক্ষণ পর আবার চোখ মেলেছিল। প্রবীর কি এখনও দেখছে? হ্যাঁ দেখছিল। কিন্তু এরপর আর চোখ বোজা যায়নি। চোখে চোখ রেখেই জিজ্ঞাসা করছিল, "কটা বাজল?"

"চারটে দশ মিনিট।"

প্রবীর অন্তত [illegible]শ মিনিট তার মুখের দিকে তাকিয়ে [illegible]।

সকালেও ঝ[illegible] প্রবল, তবে কমে এসেছে। প্রবী[illegible]বিদায় নিয়ে বলেছিল, "ও বেলা পা[illegible]ব। ঝড় ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই কম[illegible]না—।

আরতি [illegible] "ধন্য মানুষ কিন্তু। চিরকাল [illegible]ঋণী থাকলাম।"

"কী [illegible] একে আপনি ঋণ বলেন? আপন[illegible]-আত্মীয়ের মত মনে করি—ভাল[illegible]।"

"[illegible] হলে আজও 'আপনি' সম্বোধনটা কায়েমী হয়ে থাকত না।"

"সেটা উভয়ত।"

"না। আজ আমি একবারও 'আপনি' বলিনি।"

"ওঃ! আশ্চর্যভাবে ঠকিয়েছ কিন্তু। আমি লক্ষ্যই করিনি। আমারও অনেকবার কিন্তু মনে হয়েছে।"

"হয়নি। কখনও না। বিশ্বাস করব না আমি।"

"অন্তত কাল বলব বলে এসেছিলাম, এটা বিশ্বাস কর।"

"বললে না কেন?"

"জানি না। বোধ হয় ঝড়ের বেগ, তোমার বাবার আতংক, এই সবে একটা গোলমাল করে দিলে।"

"অথচ তোমারই এটা বলা উচিত ছিল। তুমি দাতা—আমরা গ্রহীতা।"

হেসে প্রবীর বলেছিল, "দাতার চেয়ে গ্রহীতা সব ক্ষেত্রে ছোট নয় আরতি। যে গ্রহীতা অসংকোচে মর্যাদার সংগে মাথা তুলে নিতে পারে, সে ত দাতার চেয়েও বড়।"

"তাই কেউ পারে নাকি?"

"পারে বই কি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দান যে-ভিক্ষুক অসংকোচে গ্রহণ করে, সে হল পরম গ্রহীতা। বুদ্ধ, খৃষ্ট!"

"বাবাঃ, কী থেকে কী। যাও, খুব হয়েছে।"

"আরও নিতে পারে।"

"আর আমি শুনতে চাই না।"

সেটা তত্ত্বকথা নয়। তারপর স্থির-দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল সে। বলেছিল, "ভালবাসা যেখানে অকৃত্রিম, অকপট, সেখানে যে ভালবাসে সে দিতেও পারে, আর নিতেও পারে। হিসেব করে না। নারী পারে পুরুষের কাছে নিতে, পুরুষও পারে নারীর কাছে নিতে। দু-প্রাপ্যের পরিমাণও নেই—যত দেবে নেবে।"

তার ইচ্ছে হয়েছিল, সংগে সংগে হাত

পেতে দাঁড়াতে এবং বলতে, "দাও না। এইবার দাও!" কিন্তু তা পারেনি। আটকে গিয়েছিল কথাটা।

প্রবীর বলেছিল, "চুপ করে রইলে যে!"

এবার সে বলেছিল, "ভাবছি, পাতব হাত?"

"সে ভাল কথা। [illegible] ততদিন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসি। অ[illegible] কাল থেকে বলব বলব করে বলতে পা[illegible] কালই আমার পরওয়ানা এসে গেছে। [illegible] রেই পাড়ি। উপস্থিত পুনা।"

পাথর হয়ে গিয়েছে।

"আমি তোমাদের [illegible] ভেবে সামান্য কিছু করলাম। [illegible] ভাল লাগল বলে করলাম। ও [illegible] কর না। ঋণ ভেব না। কেমন?"

হাসতে হাসতে সে চলে গিয়েছিল। অপেক্ষা করেনি। যেন ও-বেলা ফিরে আসবে।

এরপর আর একদিন দেখা হয়েছিল। ১৯৪৩ সনের মার্চ মাস। বিয়াল্লিশের চব্বিশে ডিসেম্বর বাবা এয়ার-রেডের সেই আতংকময় দুঃসময়ে মারা গেলেন।

বাবা সেদিন একবার বলেছিলেন, "সে কই?" অর্থাৎ প্রবীর।

ওঃ, সে কী রাত্রি! ওঃ, সে কী আতংকিত মানুষের ঘরে ঘরে আর্তনাদ! চন্দ্রালোকিত রাত্রি এত ভয়ংকর হতে পারে, এ তার ধারণা ছিল না।

আর এই দেখলে ১৬ই আগস্টের রাত্রি!

সে-রাত্রে বার বার মনে হয়েছিল প্রবীরকে। ওদিকে বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ হয়ে চলেছিল। একটা প্রচন্ড শব্দের বিস্ফোরণের সংগে সংগে বাবা 'আঃ—' চিৎকার করে উঠে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

ওঃ! বাকী রাত্রিটা শবদেহ আগলে বসে ছিল সে। মনে মনে তাকেই ডেকেছিল। অল ক্লিয়ারের পরও পরের দিনের আতংকে অধীর হয়ে উঠেছিল।

মামারা ছিলেন না। রেংগুন পড়ার কিছু-দিন পর থেকেই তাঁরা দেওঘরে চলে গিয়ে-ছিলেন। ব্যবসার জন্যও বটে, এবং কলকাতার নৈশ আনন্দের জন্যও বটে, মামাত ভাইরা সপ্তাহে কয়েকটা দিন থাকতেন। কলকাতায় তখন পূর্বরণাংগনের সৈনিকদের কল্যাণে নৈশ আনন্দের রংগমঞ্চে নতুন যবনিকা উঠেছে। নোট উড়ছে বাতাসে। মাসাজ [illegible]ম, হোটেল এবং আরও কত বিচিত্র অবস্থায় গৃহস্থকন্যারাও সান্ধ্যচারিণী হয়ে উঠেছে। তাদের ব্লাউসের ভিতর থেকে এক[illegible] শ টাকার নোট বের হতে শুরু হয়েছে। কালোবাজারের অদৃশ্য লেন-দেনের কল্যাণে নুদী লক্ষপতি হচ্ছে। লক্ষপতি কোটিপতি হচ্ছে। অন্যদিকে ফুটপাথে কংকালের সারি। গৃহস্থপাড়ায় রাত্রে কান্না ভেসে বেড়ায়, একটু ফ্যান! এক মুঠো এ'টোকাঁটা।

স্বর তাদের বোধ করি অনাহারে অনু-নাসিক হয়ে গিয়েছে।

মামাত ভাইরা আছে। কিন্তু—। তাদের অবসর কোথায়। আর তারা...? তাদের সংগে সম্পর্ক ত তার বিদ্বেষে জর্জর! তার উপর মনে মনে তারা আজাদ হিন্দের সমর্থক হয়ে উঠে তার শত্রু!

রাত্রি যথানিয়মে পোহিয়েছিল। এবং সকালের আলোয় নতুন জোর নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সুধা বউদির বাপের বাড়ি—তার পিতৃবন্ধুর বাড়ি। মামাত ভাইদের ওখানে যায়নি। যাবে না বলেই প্রতিজ্ঞা করেছিল। মনে হয়েছিল, আপনারা ত দূরে আছে, এরাই তার প্রত্যক্ষ শত্রু! সুধা বউদির ভাইপো অরুণ, সে এসে সেদিন পাশে দাঁড়িয়ে সব করে দিয়েছিল। অদ্ভুত ছেলে। তার থেকে বয়সে ছোট, কিন্তু সে অদ্ভুত। প্রবীরের অভাব সে-ই পূর্ণ করেছিল। তাকে নতুন দিকে নতুন কাজে লাগিয়েছিল। নানান সমিতির কাজ! তার বাড়িটাকেই আপিস করে তুলেছিল।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন এল প্রবীর। একেবারে মিলিটারী পোশাকে। ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জি! মুখেচোখে ভাবেভংগিতে একটা সুস্পষ্ট পরিবর্তন। উচ্চকণ্ঠে ডেকে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকেছিল, "আরতি! আরতি!"

এসে ঘরের মধ্যে মজলিস দেখে মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে নিয়েছিল।

"প্রবীর!"

"হ্যাঁ। কিন্তু—"

"এ'রা সব আমাদের সমিতির কর্মী! দেশের এই দুঃসময়ে আমাদের অনেক কাজ। সেই কাজের জন্য সমিতি করেছি।"

"ও। কিন্তু—। বাবা—তোমার—"

"বাবা নেই। ২৪শের এয়ার রেডের আতংকে তিনি হার্টফেল করে মারা গেলেন।"

"বাবা নেই!"

"তিনি মুক্তি পেয়েছেন হয়ত। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করে এই কাজ নিয়েছি।"

প্রবীর চুপ করে বসে ছিল। বন্ধু-বান্ধবীরা চলে গিয়েছিল এর পর। সে আর প্রবীর দুজনে বসে ছিল। সে উৎফুল্ল হতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রবীর হয়নি। চা খেয়েছিল নিঃশব্দে। কথা বললেও ভাল করে উত্তর দেয়নি। কিছুক্ষণ পর বলেছিল, "বিদায়! যদি ফিরি ত আবার দেখা হবে। কালই চলেছি। নিরুদ্দেশ যাত্রা। মানে ঠিক কোথায় যাচ্ছি জানি না। ভোর রাত্রে মিলিটারী স্পেশাল ছাড়বে। এসেছি আজই সকালে। দেখা করে গেলাম।"

সে তার হাত চেপে ধরেছিল।

প্রবীর বলেছিল, "ছাড়!"

* * *

সেই শেষ দেখা। শুধু একখানা মাত্র চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল, "আরতি, সেদিন তোমার কাছে শুধু বিদায় নিতেই যাইনি, জীবনে তোমাকে, বাঁধতেও গিয়েছিলাম। [illegible] • বলব, রতি, বিদায়ের দিনে বাসর সাজিয়ে আমাদের জীবনের দেওয়া-নেওয়াটা সেরে নিয়ে যাই। যেটা সারা হলে হারিয়েও আমরা কেউ কারুর কাছ থেকে হারাব না। কিন্তু তা পারলাম না। তোমার বন্ধু-বান্ধবীদের দেখে উৎসাহটা এমনই ধাক্কা খেল যে, যেন একটা ভেলা চোরা পাথরে ধাক্কা খেয়ে ফে'সে গেল। নীরবে বসে থেকে ফিরে এলাম।"

এর পর খানিকটা যুদ্ধের সেন্সর বিভাগ থেকে কাটা!

আর কোন খবর সে কোনদিন পায়নি। কত নিদ্রাহীন রাত্রে তাকে ভেবেছে। কত নিদ্রার মধ্যে স্বপ্ন দেখেছে। কত কে'দেছে। শেষ পর্যন্ত প্রবীরের দাদাকে চিঠি লিখেছিল। তিনি লিখেছিলেন, তার কোন খবর তাঁরা পাননি। উদ্দেশ নেই। হারিয়ে গিয়েছিল প্রবীর। অনেক কে'দে সে তর্পণ করেছে।

হঠাৎ এ কী প্রেতমূর্তিতে সে উদয় হল?

॥ ছয় ॥

সুধা বউদির বাপের বাড়ি গিয়ে তাঁদের পাশের বাড়ি থেকে ফোন করেছিল বাগবাজারে কেশববাবুদের ওখানে। ডেকেছিল মাধব-বাবুকে। বলেছিল, "আমার নাম আরতি সেন। আমায় আপনারা রেস্কু করেছিলেন কপালি-টোলার বাড়ি থেকে...নং কপালিটোলা। প্রফেসর ঘোষ আমাকে চেনেন। কাল আমি বালিগঞ্জে মামার বাড়ি এসেছি।"

উত্তর পেয়েছিল, "নিশ্চয় বুঝেছি। বলুন কী বলছেন?"

"আপনি কি মাধববাবু?"

"না। আমি তাঁর দাদা। কেশব।"

"আমি—একটা খবর জানতে চাই। রতন বলে যে ড্রাইভার—"

"আমি শুনেছি। একটা আনপ্লেজাণ্ট কিছু হয়ে গেছে আপনার আত্মীয়ের সংগে। আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।"

"আমি রতনের খবর জানতে চাই। ও কে? ও কি ড্রাইভার? ওর ঠিকানা—"

প্রশ্ন করতে গিয়ে বিব্রত হল। কী বলবে? প্রবীরকে যে না-জানে, তার কাছে এ-প্রশ্নের অর্থ কী?

উত্তর পেয়েছিল, "ওর জন্যে আমরা মাফ চাচ্ছি। ছেড়ে দিন কথাটা। ও বড় মুডি লোক, কখনও কখনও রেগে ওঠে। আমার

ভাই মাধবের জানা লোক, খুব ভাল মোটর-মিস্ত্রী। জানেন ত এই সব ক্লাসের মিস্ত্রীদের 'মেজাজ।

কী বলবে এর পর? চুপ করে ছিল আরতি।

ওদিক থেকে একটু হাসির আওয়াজের সঙ্গে কথা এসেছিল, "আচ্ছা—তাহলে ছেড়ে দি!"

"ওর ঠিকানাটা দিতে পারেন? আমি আসবার সময় জায়গাটা দেখেছি, কিন্তু নম্বরটা...আমার অন্য প্রয়োজন আছে। খুব জরুরী। আপনি যে-জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছেন তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। আপনি ভাববেন না। নম্বরটা বলুন আমাকে।"

"নম্বর ত জানি না। তবে ওই বস্তির ওখানে গিয়ে রতন মিস্ত্রীর বাড়ি বললে দেখিয়ে দেবে। ওকে সকলেই চেনে। কিন্তু সন্ধ্যের আগে ত বাড়িতে পাবেন না ওকে। তবে বাড়িতে ওর মা আছেন, বউ আছে, তাদের বললে ওরা পাঠিয়ে দেবে। আমরা বলে দেব? এখানে ত এখন আমাদের সঙ্গে এই বিপদে কাজ করছে।"

চমকে উঠেছিল আরতি। মা-বউ? তবে?

এই মুহূর্তে—ওদিক থেকে আবার কথা এসেছিল, "এই যে রতন এসেছে। কথা বলুন।" এবং তার পরেই অপেক্ষাকৃত মৃদু এবং অস্পষ্টভাবে শুনতে পেয়েছিল, "তোমাকে ডাকছেন রতন টেলিফোনে।"

"আমাকে?"

"হ্যাঁ। সেই ভদ্রমহিলা। কপালিটোলার বাড়ির—"

"বলে দিন—ওঁদের যা খুশি করুন। আমি তার কী বলব?"

"না-না। উনি বলছেন সে জন্যে নয়। অত্যন্ত জরুরী বলছেন। শোন না কী বলছেন! খুব ব্যগ্র দেখলাম। ধর।"

"হ্যালো!" সেই ভরাট কণ্ঠস্বর। অনুচ্চ হলেও উত্তেজনায় কাঁপছে!

আরতি একেবারেই বলেছিল, "প্রবীর!"

এক মুহূর্তের বিলম্ব। উত্তরের প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে একমুহূর্ত দেরি। তারপরই উত্তর এল, "আমার পুরো নাম রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য।"

"না। প্রবীর। রতন ভট্টাচার্য কে তা জানি না, কিন্তু শেয়ালে কামড়ানর সেই দাগ—"

"মাফ্ করবেন। আমার অনেক কাজ, আমার সময় নেই।"

টেলিফোনটা খট করে উঠে বন্ধ হয়ে গেল। রিসিভার নামিয়ে দিয়েছে সে।

মা-বউ? মা ত তার কলেজ-জীবনের আগে মারা গেছেন। মিলিটারী ইঞ্জিনীয়ার প্রবীর নাম ভাঁড়িয়ে, মোটর-মিস্ত্রী হয়ে, কেমন বউকে নিয়ে বস্তিতে বাস করছে! সব ঝাপসা হয়ে গেল! যেন একখানা সদ্য আঁকা ছবির উপর হাত দিয়ে নেড়ে ঘেঁটে সব লেপে অস্পষ্ট দুর্বোধ্য করে দিল।

মূঢ় বিস্ময়ে, উত্তরহীন শত প্রশ্নে জর্জর হয়ে সে সেদিন সারারাত জেগে বসে রইল।

প্রবীরকে সে ভুলতেই বসেছিল। বাবার মৃত্যুর পর নতুন একটা পথ পেয়েছিল সুধা বউদির ভাইপো অরুণের কল্যাণে। আশ্চর্য আন্তরিকতাময় ভাল ছেলে। তার মত নূতন, দৃষ্টি নূতন, জীবনের পথচলার ভঙ্গি নূতন। ধারণা নূতন, ধরন নূতন। ওই জার্মানি এবং জাপানের বিরুদ্ধে তার বিদ্বেষ অসাধারণ। প্রথম মিল সেইখানে। ওই মিলের সূত্রে এক নূতন পথে সে এসে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ধারণা পাল্টেছে, দৃষ্টি বদলেছে, জীবনের অর্থ বদলেছে। তার বিষণ্ণ জীবনে নূতন উল্লাস এসেছে। তারই মধ্যে যে হারিয়ে গিয়েছে, তার স্মৃতি ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকা জীবনের স্বভাব নয়; পুরাতনকে হারিয়ে নতুন জীবনকে খুঁজে নেওয়াই তার প্রকৃতি-ধর্ম। তার মধ্যেই আছে সান্ত্বনা, তার মধ্যেই তার শান্তি। সে-নতুন জীবনের দেখা যে সে পায়নি, তা নয়। পেয়েছে। কিন্তু পথ চলার নিরন্তর ধাবমানতার মধ্যে কারও সঙ্গে হাত-ধরাধরি করবার অবকাশ হয়নি। বন্ধু তার অনেক। যে-কথা বলে প্রফেসর ঘোষ তাকে খোঁচা দিয়েছিলেন। বহুজনের সঙ্গেই তার প্রীতি, কিন্তু আবেগের উত্তাপে তাকে ঘন করে প্রেমে পরিণত করে নিতে প্রবৃত্তি হয়নি। সে-প্রবৃত্তি আর নেই। প্রেমে বিশ্বাসই নেই। কিন্তু প্রবীর সম্পর্কে একটা প্রচণ্ড কৌতূহল তাকে অস্থির করে তুলেছিল। শুধু কৌতূহলই নয়। একটা আক্রোশও যেন অনুভব করছে। তার এই লুকোচুরির মধ্যে যেন একটা গোপন পাপকে সে অনুভব করছে!

শোভাবাজারের বস্তিতে এসে সে দাঁড়াল। দাঙ্গার হানাহানি এখনও চলছে। কিন্তু এখনও আপন আপন এলাকার নিরাপদ গণ্ডিতে থেকে, দুই সীমানার সীমান্তে গুপ্তহত্যার পালার আর শেষ নেই। ওদিকে পূর্ববঙ্গ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বহুজন পালিয়ে আসছেন। তবুও তারই মধ্যে ট্যাক্সি করে সে এসে উপস্থিত হল। ক'দিন আগে প্রবল বর্ষণ হয়ে গিয়েছে। যেন কলকাতার বুকের কালো কলঙ্কের দাগ ধুয়ে দেবার জন্য প্রাণপণে জল ঢেলেছে আকাশ। কিন্তু তাতেও সে দাগ মোছেনি। শোভাবাজারের পোড়া বস্তিটা শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতের উপর যেন কালো মড়মড়ির মত বেধে রয়েছে। প্রবীরের হাতের শেয়ালের নখের ক্ষতের দাগের মত।

কেশববাবু ঠিক বলেছিলেন, বাড়ি খুঁজে নিতে বেগ পেতে হল না। নাম করতেই দেখিয়ে দিলে। "ওইটে। ওই দরজাটা। না, ওটার পাশেরটা।"

প্রকাণ্ড একটা [illegible] জায়গার উপর এক-টানা টিনের দেও[illegible]। টিনের চাল, লম্বা গুদামের মত এ[illegible]ত। টিনের দেওয়ালে সারি সারি জা[illegible]ধ্যে মধ্যে দরজা। দশ-বারটা দরজা [illegible] পর পর। আরতি বললে, "এ[illegible]।"

লোক[illegible] আপনি ডাকুন। রতন ত নেই। [illegible] গিয়েছে। ওর মা আছে। কানা, [illegible]াত। ডাকিনীর মত গালাগাল করে। [illegible] নেড়ে ডাকুন। ওই উঠোনে আর কেউ [illegible]কে না। ওই মায়ের ঝগড়ার জন্যেই সবটাই ভাড়া নিতে হয়েছে রতনকে। ওর বউ খুব ভাল। ডাকুন।"

কড়া নাড়লে আরতি। একটা তীক্ষ্ণ অসহিষ্ণু নারীকণ্ঠের আওয়াজ উঠল, "কে-রে? কোন চ্যাংড়া? কী চাই? মস্করা? না?" একবার কড়া নাড়ায় এতগুলি তীক্ষ্ণ বাক্য শুনে আরতি একটু দমে গেল। তবুও বললে, "আমি রতনবাবুকে চাই!"

"মেয়েছেলে? কোন মেয়েছেলের রতনের আমার দরকার নেই।"

"আছে। কাজ আছে আমার। জরুরী কাজ। খুব জরুরী।"

একটি মেয়ের মুখ উঁকি মারলে এবার। চকিতের জন্য। কিন্তু সেই চকিত দেখার মধ্যে তাকে যতটুকু দেখা গেল, তাতেই চমকে উঠল আরতি।

এ কী রঙ! এ কী চোখ! আশ্চর্য দৃষ্টি! শান্ত প্রসন্ন নীলাভ দুটি গোধূলি-তারার মত! রঙ টকটকে ফরসা বলে ঠিক মনে হল না, কিন্তু অপরূপ মাধুরী! এই বউ?

তখন ভিতর থেকে বউটি বলছিল, "কোন ভাল ঘরের বাবু মেয়ে মা!"

"ভাল ঘরের বাবু মেয়ে?"

"বোধ হয় গাড়িটাড়ি খারাপ হয়েছে বড় রাস্তায়, কেউ বলেছে তোমার ছেলের কথা।"

"বলে দাও, সে বাড়িতে নাই। ওই সেই শ্যামবাজারের দাঙ্গার আপিস দেখতে বল!"

আরতি বললে, "আমি অপেক্ষা করব। দেখা আমাকে করতেই হবে।"

এবার বউটি সামনে এসে দাঁড়াল। মুগ্ধ হয়ে গেল আরতি। এত রূপ! এত মাধুরী! এত প্রসন্নতা? প্রসন্নমুখে স্মিত হেসে সে বলল, "আসুন!"

নিতান্তই বস্তি। ছোট একটুকরো উঠোনের দুপাশে ঘর—অন্য দুপাশে এক টুকরো করে টিনের চালা এবং এক টুকরো ঘর। রান্নার ব্যবস্থা সেখানে।

"কোথায় বসবেন এখানে? আমাদের এই ঘরে—?"

"ঘরেই বসব!" বউটির মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে সে তখনও চেয়ে ছিল। মেয়েটি বয়সে তার [illegible]ক ছোট। কুড়িও এখনও হয়নি।

ওপাশে ঘরের দরজ[illegible]ছিল এক বৃদ্ধা। সাদা ঘোলাটে চোখে [illegible] দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। উৎ[illegible] শুনছিল। "কী বলছে বউ ফিস[illegible] ফিসফিস করে কী কথা?"

বউটি একটু অপর[illegible] হেসে বললে, "কথা একটু জোরে [illegible] চোখে ত দেখতে পান না। কথা না [illegible] পেলে রেগে ওঠেন। মাথাও খারাপ। [illegible] যখন যুদ্ধে গিয়েছিলেন, তখন আট মাস দশ মাস কোন খবর ছিল না। তখন লোকে বলত, উনি মারা গিয়েছেন।"

একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেয়েটি বললে, "তখনই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। ওই এক ছেলে ত!"

"বলি ওলো হারামজাদী! কথা কানে যায় না? কিসের ফিসফিসিনি? অ্যাঁ?" এবার বুড়ী চিৎকার করে উঠল।

হেসে বউটি বললে, "না মা, ফিসফিসিনি নয়, বলছি, বড় ঘরের মেয়ে আপনি, কোথায় বসবেন এখানে?"

শান্ত হয়ে বৃদ্ধা বললে, "ঘরে বসাও।" তারপরই বললে, "হুঁ, বড়ঘরের মেয়ে, সুবাস উঠছে গন্ধ মেখেছে বুঝি? গাড়ি বুঝি আর কেউ মারতে পারলে না? সে রতন এসে হাত দিলেই ফের ভরভরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ছুটতে লাগবে!"

বস্তির মতই ছোট টিনের ঘর। কিন্তু আশ্চর্য পরিচ্ছন্নতা। একখানি একজনের মত তক্তাপোষে একটি পরিচ্ছন্ন বিছানা। একটি সস্তা টিপয়ের উপর ধবধবে সাদা একখানি চাদরের টুকরো। তার উপর একটি ছোট ফুলদানিতে রাঙা টিকটিকে এক গুচ্ছ ক্যানা। মলাট ছেঁড়া একখানা ইংরিজী বই। মাথার দিকে দেওয়ালে দুখানা ছবি। গান্ধী এবং সুভাষচন্দ্র। ওদিকের দেওয়ালে কয়েকখানি দেবদেবীর ছবি।

খট্‌কা লাগল। প্রবীর গান্ধী বা সুভাষচন্দ্র কারও ভক্ত কোনদিন ছিল না। আর একখানা ফটো। যুদ্ধের পোশাকে একটি তরুণ সৈনিকের ফটো। মুখে দাড়িগোঁফ, বুকে হাত জড়াজড়ি করে বেশ বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। ফটোর তলায় একটি ফুল। কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল। কে? প্রবীর নয়। সাদৃশ্য আছে, কটা চোখ দাড়ি-গোঁফ সব আছে, কিন্তু তবু সে নয়। কই, ডান হাতের অর্ধেকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, দাগ কই?

আরতি হেসে বললে, "এ ত তোমার স্বামীর ছবি!"

"হ্যাঁ, যুদ্ধে যাবার আগে শখ করে তুলিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।"

"ফুল দিয়েছ তুমি?"

"হ্যাঁ।"

"জীবন্ত লোকটা থাকতে ছবি পুজো করেছ?"

মুহূর্তের জন্য মেয়েটি কেমন হয়ে গেল। তারপর বললে, "তাও করি, ছবিতেও ফুল দিই। তাতে দোষ কী হল?"

"দোষ না। তবে এ-যুগে এমন ভক্তি ত দেখিনে!"

মেয়েটি ফস করে বলে উঠল, "এ-যুগে এমন ভালবাসাও হয়ত নেই, তাই দেখেননি। দেখেননি, দেখে যান।"

মেয়েটি ও কথা বললে না, যেন দপ করে জ্বলে উঠল। আরতি অবাক হয়ে গেল একটু। একটু কৌতুক-হাস্যও উঁকি দিল তার ঠোঁটের ডগায়। কিন্তু কৌতুকবশে কিছু বলবার আগেই মেয়েটি আবার শান্ত হেসে বললে, "হাসছেন। তা একালের মেয়ে ত আমি নই। আমার কথা—"

বাধা দিয়ে আরতি সেই কৌতুকের রেশেই বললে, "কোন্ কালের তুমি? আদ্যিকালের?"

"বলতে পারেন। এ-কালে জন্মেও আদ্যিকালেরই বটে। আপনি একালের লেখাপড়া শেখা কলকাতার বাবুঘরের মেয়ে। আমার বাবা পাড়াগাঁয়ের ভটচাজ পণ্ডিত। স্বামীও ভটচাজ বাড়ির ছেলে। বয়সে বুদ্ধিবুড়ি না-হলেও আদ্যিকালের ছাড়া আর কী? আমাদের এসব আপনি বুঝবেন না।"

"বুঝব না? না-না। বুঝি বই কি, স্বামী দেবতা—"

বাধা দিয়ে মেয়েটি বললে, "মানে জানা আর মনে মানেটা বুঝতে পারা এক কথা নয়। মানুষ দেবতা হয়, তবে সে অনেক কালে একজন। আমরা ছেলেবেলায় বেরতো করেছিলাম, রামের মত, শিবের মত স্বামী পাব। আরও করেছি, নারায়ণকে স্বামী পাব। তার মানে,—বাবা বলেছিলেন আমি তা বুঝেছিলাম—তার মানে হল, পৃথিবীর সব কালের শ্রেষ্ঠ পাত্র। পুরুষোত্তমকে স্বামী পাব। পুরুষোত্তম বহুকালে একজন আসেন। তাঁকে যে পায়, সে হয় সীতা, নয় সতী, নয় রুক্মিণী। নয় গোপা, নয় বিষ্ণুপ্রিয়া। বাকী মেয়ের মনের আকাঙ্ক্ষা মনেই থাকে। তাই ত সব মেয়েই ষোল আনা সুখী হয় না। সে আপনাদের কালে। আপনাদের মধ্যে আমাদের চেয়ে আরও বেশী। সে-সম্বন্ধের [illegible] [illegible] আমরা মানি, আপনারা মানেন না। আপনারা যার সঙ্গে বনল না তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করে আর একজনের হাত ধরেন। আমরা যাকে পাই, সেই পুরুষের মধ্য দিয়ে ভজি সেই পুরুষোত্তমকে। ঘর আমরাও অবশ্য ছাড়ি। সে হল মীরার ঘর ছাড়া। কিন্তু সে ত সহজ নয়। আর খোঁপাতে ফুল পরি, পুরুষের বুকে পরিয়ে দিই, শুধু ছবির পায়ে দিলেই দোষ?"

এবার অভিভূত হয়ে গেল আরতি। উটচাজ-কন্যাটি দেখে ত যত নিরীহ মনে হয়েছিল তা নয়। এ যে ছোট্ট আকারের একেবারে মহাসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা। খোঁচাটা হয়ত বেশীই একটু লেগেছে। কিন্তু কথা কয় ত বেশ গুছিয়ে। মুর্খ যাকে বলে তা নয় এ-মেয়ে, এবং চেহারায় যত নরম এবং মিষ্টি হক, আসলে এ শক্ত মেয়ে, এবং মিষ্টতার মধ্যে ঝাঁঝ আছে। কথাগুলি ত সোজাও নয়!

মেয়েটিই আবার বললে, "বলেছিলাম ত, এসব সেকেলে কথা আপনার ভালও লাগবে না, হয়ত মানে খুঁজেও পাবেন না। আপনাদের কথা শুনেও তা-ই হয় আমাদের। এমনিই হাসি পায় কখনও, কখনও বা ভয় হয়!"

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল আরতি। মেয়েটিও চুপ করলে বোধ করি উত্তরের প্রত্যাশায়। বাইরে বৃদ্ধা বিড়বিড় করে বকেই চলেছে। কী বকছে, সেদিকে কান দেবার মত অবস্থা নয় আরতির। এ-আলোচনায় কৌতুক অনুভব করবার মত মনও নেই আর। মনের মধ্যে সব মানুষেরই একটা ঝাঁপিচাপা সাপ আছে, সেটাকে ফোঁস করতে দেওয়ায় লজ্জা আছে। বিশেষ করে প্রতিপক্ষ যদি ইতর জীব হয়। কিন্তু মেয়েটা যেন খোঁচা দেবার কাঠিটা উদ্যত করেই আছে। আরতি নিজেকে সংযত করে, কথার মোড়টা ফিরিয়ে দেবার জন্যই বললে, "তোমার নামটি কী বলত? বেশ কথা বল তুমি।"

"নাম?" মেয়েটি যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল।

"নাম বলতেও লজ্জা?"

"একটু।" বলতে গিয়েও হেসে ফেললে। "মানে নামের আমার বদল হয়েছে। বাবা আমার নাম রেখেছিলেন সতী। বিয়ের সময় আমার পিসশাশুড়ীর সতী নাম বলে পাল্টে রাখা হল সীতা। তারপর উনি যুদ্ধে গিয়ে নিখোঁজ হলে শাশুড়ী বললেন, 'ওই সীতা নামের দোষ।' তাই উনি ফিরে এলে বললেন, 'ওই নাম আমি আগে পাল্টাব।' তা উনি হেসে বললেন, 'তা হলে এমন রূপ যখন তোমার বউয়ের তখন সতীর সীতে হয়ে কাজ নেই, সতী হক রতি। আমার এই নিখোঁজেই ত মদনভস্মের ফাঁড়া পার হয়েছে।' আমার নাম রতি।"

আরতি যেন পঙ্গু হয়ে গিয়েছে।

এর কয়েক মুহূর্তে পরেই ভরাট ক[illegible]

স্বরের ডাক বাইরের দরজায় বেজে উঠল, "মা।"

"বাবা!"

বৃদ্ধার এ-কণ্ঠস্বর কল্পনা করা যায় না। কঠিন বরফের স্তর গলে যেন জলধারা হয়ে ঝরঝর শব্দে সংগীতময় হয়ে ঝরে পড়ছে। কলধ্বনি তুলে পৃথিবীর বুকের তৃষ্ণা হরণ করে ছুটে চলেছে।

"তোর জন্যে একটি বাবুঘরের মেয়ে সেই থেকে বসে আছে। বেচারীর গাড়ি কেউ ঠিক করে দিতে পারেনি। আহা। যা বাবা দিয়ে আয়। খেতে না-হয় একটু দেরিই হবে!"

আরতি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। মুহূর্তে প্রায় মুখোমুখি দাঁড়াল দুজনে।

* * *

বিহ্বল, মুহূর্তের জন্যও বিহ্বল হল কিনা কে জানে, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য তার দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে, নমস্কার করে বললে, "নমস্কার। চলুন আপনার গাড়ির কী হয়েছে দেখি!"

আরতি কিন্তু স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েই ছিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণাতি-তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে, জ্যামিতিক দুটি ক্ষেত্রকে যেমন করে সূক্ষ্ম হিসেবে মিলিয়ে দেখে, তেমনি করেই মিলিয়ে দেখছিল। 'রতি' নামের পর আর সন্দেহের কথা ওঠেই না। তবুও দেখছিল। দেখছিল তার স্থির-দৃষ্টির প্রতিক্রিয়ায় কেমন করে তার চোখ নেমে যায়! তা গেল। প্রবীরের কথায় সে বুঝলে, প্রতারণা গভীর; প্রবীর এদের সামনে কথাবার্তা বলতে চায় না। মন তার বিদ্রোহী হয়ে উঠল। না, সে যাবে না। এদের সামনেই প্রতারকের প্রতারণার খোলসটা ছিঁড়ে টেনে ফেলে দিয়ে তার স্বরূপটা প্রকাশ করে দেবে। কিন্তু পরমুহূর্তে বউটির দিকে তাকিয়ে সে আত্মসম্বরণ করলে; বললে, "এস!"

বেরিয়ে এল তারা বাড়ি থেকে। বৃদ্ধা বোধ করি পদশব্দ শুনে বললে, "চললি বাবা রতন? যা বাবা, কী করবি, বিপদে পড়েছে। বউ, খিল দে।"

দরজাটা ক্যাঁচ করে উঠল। একবার ফিরে তাকাল আরতি। বউটি সাপের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মেয়েরা বুঝতে পারে। কিছু অনুভব করেছে সে।

"চলুন, গঙ্গার ধারে চলুন। সেখানে নিরিবিলি হবে।"

গঙ্গার ধারে একটি নিরিবিলি জায়গায় এসে বললে, "এখানেই বসুন।"

"'বসুন' বলে অতি দুর্বল প্রতারণার-শানের দাড়িগোঁফ আর পরে রয়েছ কেন? সোজা সহজভাবে কথা বল। বস!"

একটু দূরে বসে সে বললে, "না; আমি আপনাকে আপনিই বলব। আমি সত্যি-সত্যিই আজ মোটর-মিস্ত্রী, সে প্রবীর আর আমি নই।"

"কিন্তু কেন? কেন তুমি আমার সঙ্গে এ-প্রতারণা করেছ?"

"আপনার সঙ্গে? কী বলছেন মিস্ সেন?"

"তুমি আমাকে চিঠি লেখনি? 'রতি' বলে সম্বোধন করতে আসনি শেষ দেখার দিনে?"

"এসেছিলাম, কিন্তু আত্মসম্বরণ করে ফিরেই গিয়েছিলাম। এবং যে-যে কারণে পরস্পরের উপর দাবি জন্মায়, বলুন আপনি, আমাদের আলাপের মধ্যে তেমন কোন কারণ ঘটেছে?"

"ঘটনা শুধু বাইরেই ঘটে না, মনের মধ্যেও ঘটে।"

"সে-ঘটনাও দু রকমের মিস সেন। এক ধরনের দুর্লভ ঘটনা ঘটে, যার পর আর মন পাল্টায় না। নইলে ঘটনা ত নিত্যই অজস্র ঘটছে। আজ বন্ধুত্ব, কাল বিচ্ছেদ, আবার আপোস; নয় কি? আপনার মনের ইতিহাস আমি ঠিক জানি না, তবে সে ত দাঁড়িয়ে নেই। ওই যে মাকে দেখলেন, উনি রতনের জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, সে আজও সারেনি। আমাকে রতন ভেবে ফিরে পেয়ে তবে কিছু শান্ত হয়েছেন!"

হাসলে সে একটু।

আরতি বললে, "নাঃ। সেজন্যে মনে কোন ক্ষোভ নেই। লোভ জিনিসটা সাময়িক; সেটা প্রেম নয়, মানে তোমার ওই দুর্লভ ঘটনা নয়, তবে হতে পারত। তুমি দীর্ঘদিন এসেছ—গিয়েছ—"

"তা গিয়েছি। কিন্তু আপনি জানেন, কোনদিন—মাত্র শেষের একদিন ছাড়া, যেদিন আপনি দেনাপাওনার কথা তুলেছিলেন, যেদিন আমরা তুমি তুমি হয়েছিলাম—সেই-দিন ছাড়া—কোনদিন আপনাদের কাজে সাহায্য করা ভিন্ন অন্য কোনদিকে এক পা এগোইনি। তা ছাড়া, আপনি কেন আমার জন্য অধীর হচ্ছেন? আমাকে ভুলে গিয়ে-ছিলেন, ভুলেই যান। আমি সত্যিই মৃত।"

"তুমি প্রেত!"

"বলুন, রাগ করব না।"

"তুমি কেন ওদের প্রতারণা করলে? ওই অপরূপ রূপসী বউটিকে পাবে বলে?"

"হ্যাঁ। তাই।"

"কিন্তু ওর স্বামী যেদিন ফিরবে, সেদিন?"

"সে বেঁচে নেই। আমার সামনেই সে মারা গেছে। আমার কোলের উপর।"

"তুমি স্কাউণ্ড্রেল। তুমি অতি হীন।"

"আপনি বুঝতে পারছেন না..."

"আমি আজই গিয়ে প্রকাশ করে দেব।"

"আপনি মিথ্যে উৎপীড়িত করবেন না নিজেকে মিস সেন। ও জানে!"

"জানে?" বিস্ময়ের আর অবধি রইল না আরতির। জানে! জেনে শুনে, পুরুষ আর পুরুষোত্তম নিয়ে ওই তত্ত্বকথাগুলি শুনিয়েছে সে! আশ্চর্য ত! না, আশ্চর্যই বা কিসের? যে-দেশে হরিনাম জপ করতে করতে অপরকে ঠকিয়ে স্বার্থসিদ্ধির উপায় চিন্তা করে, এক নিশ্বাসে মিথ্যা বলে, যে-দেশে ভগবানের মন্দিরের গায়ে অজস্র ব্যভিচারের চিত্রে[illegible] অলংকরণ, যে-দেশে পরকীয়াসাধন ধ[illegible] অঙ্গ, সে-দেশের মেয়ে ওই ভট্টাচার্য-কন[illegible] পক্ষে এই বা অসম্ভব কিসের? কি[illegible]...

"কিন্তু [illegible]মি কেমন করে এই অনাচারে [illegible]? তোমার জীবনের সে-শিক্ষ[illegible] কথা আর শেষ করতে পারলে [illegible]রতি। নির্বাক প্রশ্নের প্রখর[illegible]ক দৃষ্টিকে প্রদীপ্ত করে তার [illegible] দিকে চেয়ে রইল।

ত[illegible] কিন্তু বিরত হল না প্রবীর; মৃদু কণ্ঠে আস্তে আস্তে জবাব দিলে সে। বললে, "নিজে এই করার আগে আমার কোন বন্ধু এই কাজ করলে আমিও এই প্রশ্ন করতাম। কিন্তু নিজে যখন করলাম, তখন বুঝলাম। বুঝেই করেছি। যুদ্ধে গিয়ে রত্নেশ্বরকে দেখি। মেকানিক মিস্ত্রী, আমাদের ইঞ্জিনীয়ারিং ইউনিটেই কাজ করত। আমার চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল, তবে সে দাড়ি-গোঁফ রেখেছিল, ঠিক ধরা যেত না কতটা মিল। মিলত গলার স্বরে। আর চোখে। রঙ তার আমার থেকে ময়লাই ছিল। তবু মিল ছিল। থাক সে-সব ছোট ছোট খুঁটিনাটির কথা। সে মারা গেল আমার কোলের উপর। মরবার সময় বললে তার মায়ের কথা, স্ত্রীর কথা। সে কী আকুতি! আমরা তখন জাপানীদের কাছে হেরে বনে বনে পালাচ্ছি। সেই অবস্থায় কোন রকম এসে পৌঁছুলাম বাংলা দেশে। কলকাতার কাছেই এদের বাস ছিল। নাম বলব না। যে-সব গ্রাম এখন শহর হয়ে উঠেছে, যেখানের ব্রাহ্মণদের এককালে বাংলাজোড়া গৌরব ছিল; এখন গৌরবহীন, ভিক্ষুকের মত অবস্থা; যাদের বংশধরেরা সেই অগৌরবের জ্বালায় ইংরিজী শিখতে-গিয়ে কেউ অর্ধশিক্ষিত, কেউ শিক্ষিত হয়ে আমার আপনার মত নাস্তিক। সেখানে গিয়ে এদের পেলাম না। শুনলাম শাশুড়ী বউটিকে নিয়ে কলকাতায় এসেছে, খেটে খায়; রাঁধুনী বা ঝিয়ের কাজ করে। ঠিকানা জোগাড় করে এলাম। বউ, মা, দুজনেই আমাকে ভুল করলে রত্নেশ্বর বলে। তখন আমার দাড়িগোঁফ হয়েছে; আমার অজ্ঞাতসারে আমি রত্নেশ্বর সেজেছি। সে[illegible] ঘটনা—।"

চুপ করলে সে। হাসলে। কৌতুকের হা[illegible] নয়, সে-হাসি সুখস্মৃতি স্মরণের হা[illegible], অথচ বিষণ্ণ।

আরতির ভাল লাগছিল না বিন্যাস করে কথা বলার এই ঢংটিকে। প্রবীর পাঁকে

গড়া মূর্তির উপর রঙ দিয়ে মনোরম করতে চাইছে। প্রবীর চুপ করতেই সে বলে উঠল, "তুমি বউটির রূপ দেখে আপনাকে হারালে। সুযোগ নিলে!"

"হ্যাঁ। কথা সংক্ষেপ করলে তাই দাঁড়ায়।"

"তারপর মেয়েটির যখন সর্বনাশ হয়ে গেল, আর অস্বীকারের [illegible] রইল না, তখন তুমি হয়ত তাকে বললে [illegible] সে তুমি নও। ছি! ছি! তোমাকে ছি [illegible]!"

"মানুষের একটা [illegible] আছে; সে-অবস্থায় সে যখন পে[illegible] তখন কোন ছি-ছিকারই তাকে স্প[illegible] না মিস সেন।"

"তখন তার অধঃপতনে [illegible] সীমায় পেঁছিয় সে। চামড়া হয় গ[illegible] মত। পঙ্কপল্বলেই তখন তার বিলাস [illegible]"

"এরও প্রতিবাদ করব না আমি। কিন্তু শুধু একটি কথা বলব যে, মেয়েটি প্রথমে ভুল করলেও প্রথম রাত্রেই ভুল বুঝতে পেরেছিল। তাকে আমি ছুঁইনি, আমিও তাকে সব কথা খুলে বলেছিলাম। তখনও আমার চলে আসবার শক্তি ছিল, ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পথ ছিল না। ওই আধপাগলা বুড়ী সারাটা রাত্রি বউ-বেটার ঘরের দরজা আগলে শুয়ে ছিল। আরও কিছু ছিল, কিন্তু সে থাক।"

"সে ওই বউটির অপরূপ রূপ।"

"না, তা ছাড়াও ছিল। সে থাক। কিন্তু বার বার রূপ-রূপ বলে যে-ভাবে কথা বলছেন, তাতে রূপকে যেন তুচ্ছ এবং ব্যঙ্গ করছেন আপনি। বলতে পারেন, যেখানে একজনের রূপকে একজনের চোখে ভাল লাগলে সে তার জন্যে পাগল হয়, সব বিসর্জন দেয়, সেখানে যে-রূপ বহুজনের চোখে অপরূপ মনে হয়, সেই রূপে মুগ্ধ হয়ে যদি তার পুজো করেই থাকি, তবে কী দোষ করেছি আমি?" একটু স্তব্ধ থেকে আবার বললে, "লোকে বলে, যেখানে বহুর মনোহরণ করা রূপ, সেখানে ভগবানের আভাস।"

হেসে উঠল আরতি; বললে, "ভগবান! শেষ পর্যন্ত ভগবান প্রবীর? হায়! হায়! হায়!"

"ওঃ, আপনি ভগবান মানেন না?"

"না, মানি। কিন্তু তুমি মানলেও ও-নাম করবার অধিকারী তুমি নও।"

"মানতে পারলাম না। কারণ ভগবানই পাপপুণ্যের বিচারবোধ। তা থাক। কিন্তু [illegible]ন ত আমার অন্যায়টা কী? পাপ কোথায়?"

"এই প্রশ্ন তোমার জিভে আটকাচ্ছে না?"

"না। ধরুন, মেয়েটি বিধবা হলেন। আমি যদি বিবাহ করতাম [illegible] আপত্তি থাকতে পারত? অন্যায় হত আমার?"

ভ্রূ কুঁচকে আরতি বললে, "তা তুমি করনি।"

"না। কিন্তু তাকে নিয়ে আমি স্বামী-স্ত্রীর মতই বাস করি। আমাদের ঘরদোর দেখে এসেছেন। আমরা কীভাবে বাস করি, অন্তত সেখানে কোন ব্যভিচারের কোন নিদর্শন দেখেছেন কিনা বলুন!" একটু হেসে বলল, "এ-যুগকে আমি জানি মিস সেন; এ-যুগের যেটা চরম মডার্নইজ্‌ম তাও জানি। ক্লাব হোটেল দেখেছি। এ-যুগের অতি সৎ মডার্ন দম্পতিও দেখেছি। তাদেরও ডাইভোর্স দেখেছি। আমরা তাদের চেয়েও সৎ শান্ত এবং সুখী। আমি তাকে দেবীর মত দেখি, সে আমাকে দেবতার মত দেখে। এবার বলুন, কোন অপরাধ আমাদের?"

চুপ করে রইল আরতি। এই কথা যে বলতে পারে, তার সঙ্গে তর্ক করে সে কী করবে? মাথার ভিতরটা কেমন করছে তার। ক্ষোভ পাক খাচ্ছে, শিখা নিভে যাওয়া ধোঁয়ানো অগ্নিকুণ্ডের মত। সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্ণতার মত একটা অবসাদ। তারই মধ্যে একটা কথা মনে হল। ধীরে ধীরে মুখ তুলে সে বললে, "কিন্তু এইভাবে মিস্ত্রীর কাজ করে জীবনকে নীচের স্তরে নামিয়ে দিয়েছ কেন? তুমি যা বললে, যদি সত্যি হয়, তবে তুমি তোমার উপযুক্ত চাকরি করে ওকে উপরে তুলতে পারতে! মানুষ অন্ধকারে মুখ লুকোয় কখন—"

"সে তুমি বুঝতে পারবে না গো ঠাকরুন!"

চমকে উঠল আরতি! প্রবীরও মুখ নামিয়ে বসে ছিল। সে মুখ তুলে একটু হেসে বললে, "তুমি কেন এলে রতি?"

রতি কখন এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। কাঁধে গামছা কাপড়, হাতে একটি ঘটি। গঙ্গা-স্নানের অছিলা করে ওদের অনুসরণ করেছে।

রতি বললে "থাকতে আর পারলাম না। আমি ত চিনেছি এ কে! শোন, যা বললে তুমি, তার উত্তর শুনে বুঝা যায় না। তুমি ত বাবুঘরের মেয়ে গো। তোমাকে ভালবেসে কেউ ত ফকির হবে না। কোন কালেও তুমি বুঝবে না। তুমি নিজে যদি কোন ভিখিরীকে ভালবেসে তার পাশে দাঁড়িয়ে ভিখিরিনী হতে পার তখন বুঝবে। মেয়েটির চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে যেন জ্বলছে। গঙ্গার কূলে দাঁড়িয়ে এই জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে এই অপরূপ রূপসী মেয়েটি যেন বহ্নিশিখার মত জ্বলছে। আরতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে চাইল, কিন্তু পারলে না। এই মুখরা মেয়ের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ে পারবে না। সম্ভাগহ হলে হত। এর মুখে ত কিছু আটকাবে না! মেয়েটির মুখ আটকায়নি, সে আবার বললে, "ওকে তুমি এমন করে বল না। ও আমার পুরুষোত্তমের দান, নারায়ণের আশীর্বাদ। যাও, তুমি বাড়ি যাও। আমার ঘরে আগুন জ্বালাতে এস না।"

"জ্বালাবার কিছু নেই।" এবার নিজেকে সম্বরণ করে উঠে দাঁড়িয়ে ঘৃণাভরে বললে আরতি, "কী হবে জেলে? যা পুড়ে গেছে, তা কি আর পোড়ে? ও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রবীর, তুমি অঙ্গার। না, তুমি [illegible] তুমি প্রেত!"

সে আর দাঁড়াল না, পা বাড়ালে। ওদের দিকে ফিরে তাকালে না। শুধু শুনতে পেলে মেয়েটির কথা, "দাঁড়াও, চান করে নি। তুমিও চান কর না। ওই অকথা-কুকথাগুলো শুনলে!" অতি তিক্ত হাসি আরতির মুখে ফুটে উঠল।

গঙ্গার জলের পুণ্যে অশরীরী প্রেত মুক্তি পায় কি না, আরতি জানে না, কিন্তু জীবন্ত দেহধারী প্রেতের মুক্তি হয় না। তবে ডুবে মরলে স্বতন্ত্র কথা। প্রবীর ডুবুক বা না ডুবুক, তার স্মৃতি ডুবে যাক আজ, ভেসে যাক, সমুদ্রের গর্ভে হারিয়ে যাক।

॥ সাত ॥

না, জীবন্ত প্রেতের মুক্তি হয় না। সে ডুবে মরতে ত পারে না।

ঠিক এক বৎসর কয়েকদিন পর আবার তার সঙ্গে আরতির মুখোমুখি দেখা হল। গঙ্গার ধারেই, শ্মশান-ঘাটে। সে শ্মশানে এসেছিল বাংলার সাম্প্রদায়িক হিংসাযজ্ঞে অহিংসার আত্মদানের একটি আহুতির বহ্নিশিখার প্রজ্বলন দেখতে, প্রণাম করতে। অহিংসাব্রতী শচীন মিত্র, সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনাকে শান্ত করবার জন্য বেরিয়ে-ছিলেন জ্যাকেরিয়া স্ট্রীট অঞ্চলে। মুসল-মানরা শঙ্কিত এবং উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। আগুনও জ্বলেছিল। সেই আগুনে শান্তি-বারি সিঞ্চন করতে গিয়েছিলেন তিনি কয়েক জন সঙ্গী নিয়ে। সেখানে তিনি ছুরি খেয়ে আহত হন। মারা গিয়েছেন হাসপাতালে। শবদেহ বাগবাজারে তাঁর কাঁটাপুকুরের বাড়িতে এনে সেখান থেকে শ্মশান-ঘাটে এসেছে। ওদিকে পার্ক স্ট্রীটে মারা গিয়েছেন স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩রা সেপ্টেম্বর ওই 'শান্ত হও' বলতে গিয়ে ছুরি খেয়েছেন। উনিশ শ সাতচল্লিশ।

এক বৎসরের মধ্যে সারা দেশে অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছে। কত মানুষের জীবনে সংঘাতের পর সংঘাত, কত বিপর্যয় হয়েছে; আবার কত জনের জীবনে ঘাতে প্রতিঘাতে কত পরিবর্তন এসেছে। উল্টে-পাল্টে সব যেন আরেক রকম হয়ে গেল। কলকাতার দাঙ্গায় আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটল হিন্দুদের জীবনে। শোধের নামে যে রক্তপাত

তারা করল তাতে ইতিহাসের হিসেবে গোলমাল হয়ে যায়। ইংরেজের পরোক্ষ সাহায্য এবং মুসলিম লীগের হাতে রাষ্ট্র-শক্তি থাকলেও হিন্দুর প্রতিঘাতে কলকাতার মুসলমান বিমূঢ় হয়ে গেল। হারল। তার শোধে নোয়াখালিতে লাগল দাঙ্গা। সে-বিবরণে শিউরে ওঠে সভ্যতা, শৃঙ্খলা। আবার তার প্রতিঘাতে কলকাতায় আগুন জ্বলল। পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে গৃহস্থেরা পালিয়ে এল। সারা ভারতবর্ষে এখানে-ওখানে দপদপ করে আগুন জ্বলছে। আজ এখানে, কাল ওখানে, পরশু সেখানে। 'বিপ্লব! বিপ্লব!' বলে যারা চিৎকার করেছে, বিপ্লবের স্বরূপ দেখে তারা স্তম্ভিত হয়ে গেল, শিউরে উঠল! এর মধ্যে আরতিরও অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল। অনেক পরিবর্তন!

গঙ্গার ঘাটে প্রবীরের প্রেত-সান্নিধ্য থেকে চলে আসার পর প্রায় দুটো দিন সে যেন বাক্যহারা, দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর সমস্ত যেন কুৎসিত, বীভৎস মনে হয়েছিল। সুধা বউদি বার বার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কী হল-রে আরতি? নতুন কী হল? এমন হয়ে গেলি কেন?"

উত্তর না দিলে নয়, তাই বলেছিল, "পরে বলব বউদি। দোহাই, আজ আমায় জিজ্ঞাসা কর না।"

অরুণের এদের বাড়িতে আসা-যাওয়া ছিল না; সুধা বউদিই বলে দিয়েছিলেন, "কাজ নেই। অন্তত অরুণের এসে গিয়ে কাজ নেই। এলেই লাটু ঠাকুরপোর সঙ্গে লাগবে।" অরুণ লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছিল আরতিকে, তারা শান্তি-মিছিল বের করবে, কিন্তু তাও সে যায়নি। যাবার ইচ্ছে হয়নি। অবশ্য ১৬।১৭।১৮ই আগস্টের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পর শান্তি-মিছিলের আয়োজন উদাম তার ভাল লাগার কথা নয়। তবুও বুদ্ধি দিয়ে এর একটা রাজনৈতিক ব্যাখ্যা করে যে-লোকগুলো রাজনৈতিক নেতাদের প্ররোচনায় এমন করেছে, তাদের মার্জনা করে বের হতে সে পারত; কিন্তু মনের মধ্যে কোথায় যেন কী ঘটে গিয়ে জীবনটাকে স্প্রিং-কাটা ঘড়ির মত স্তব্ধ করে দিয়েছিল। সে বলে দিয়েছিল, সে যেতে পারবে না।

অনুভব করেছিল, প্রবীরকে সে ভালবাসত। সে-ভালবাসা নিদারুণ ঘৃণায় পরিণত হয়েছে; বিষের জর্জরতায় সে হতচেতন হয়ে গিয়েছে!

দু দিন, দু দিন কেন প্রায় এক সপ্তাহ লেগেছিল সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠতে। দু দিন বিছানাতেই অসুস্থের মত শুয়ে-ছিল। তার পর পাঁচটা দিন বিষণ্ণতা কাটাতে গিয়েছিল। সাতদিন পর প্রবীরের স্মৃতির উপর কঠিন আক্রোশে যবনিকা টেনে দিয়ে স্থির করেছিল, প্রবীরকে জীবনে আর উঁকি মারতেও দেবে না, সে বিয়ে করবে! বন্ধুর, অন্তত বাইরে-দেখতে-বন্ধুর অভাব ছিল না। তাদের যাকে হক! আটদিনের দিন সে সেজে-গুজে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে-ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ভাল লাগেনি। ফিরে এসেছিল। আবার কয়েক দিন ভেবে সে স্থির করেছিল, সে অরুণের কাছে গিয়ে তার সঙ্গ ধরে আবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তা-ই সে করেছিল। অরুণকে নিয়ে তাদের পুরনো সমিতির কাজ নতুন করে শুরু করেছিল। তার আগে অনেক কষ্টে এক-খানি ঘর সংগ্রহ করে বাসা পেতেছিল। ব্যাঙ্কের কাজ আবার চালু হয়েছে তখন এবং ব্যাঙ্কে যা ছিল, তাতে তার খুব অসুবিধে হয়নি।

কাজ করার তখন অসুবিধে অনেক। অরুণের এবং তার কয়েকজন সঙ্গীর জন্য। তাদের রাজনৈতিক মতামতের প্রতি সারা দেশটা তখন প্রচণ্ডভাবে বিমুখ। বিশেষ করে নেতাজী-বিরোধিতার জন্য নেতাজীর সমর্থক দল তাদের উপর খড়্গ-হস্ত। উত্তর দেবার পর্যন্ত অধিকার দেয় না। উপরন্তু পাকিস্থান সমর্থন করার অভিযোগ এনে তাদের বিব্রত করে তোলে। এরা আরতির মামাতো ভাইদের মত মেকী রাজনৈতিক কর্মী নয়। এরা সদ্য-কারামুক্ত বিপ্লবী কর্মীর দল।

কথাটা আরতির মনেও আলোড়ন তোলেনি এমন নয়। তুলেছে! তবে তার বিরোধিতা রাজনৈতিক মতবাদ থেকে নয়, তার নিজের জীবনের আঘাত থেকে। ক্রমশ সে বুঝতেও পেরেছে, ওদের সত্য আর তার সত্য এক নয়। অন্ধকার রাত্রে একই পথ ধরে একজন চলেছে মর্মান্তিক বেদনার উদ্‌ভ্রান্তিতে, আর আর-একজন চলেছে তার কোন গোপন উদ্দেশ্য সাধন করতে। এক সঙ্গে চলেছে বলে দুজনে এক পথের পথিক নয়। অন্তত এক দলের নয়। একদিন সুধা বউদি তাকে এই কথাটা বোঝাতেও চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, "তোর আঘাত আমি জানি আরতি। তুই যদি ঘরে বসে নেতাজী সুভাষকে অভিসম্পাত দিতিস, তাতেও কিছু বলতাম না। কিন্তু তুই এই ভাবে ওই অরুণদের সঙ্গে এই আলোচনা করিসনে।"

সে ফোঁস করে জবাব দিয়েছিল, "কেন?"

বউদি বলেছিলেন, "দেখ, যুদ্ধটা যদি দেশেই হত, ধর দেশের লোক সিপাহী-বিদ্রোহের মত স্বাধীনতার জন্যে লেগে যেত, আর তারই মধ্যে তোর যা ঘটেছে তাই ঘটত, ত কী করতিস?"

সে ঠিক উত্তর খুঁজে পায়নি; তবে একটা উত্তর না-দিয়ে ছাড়েনি, "তার সঙ্গে এর তুলনা হয় বউদি?"

আজ কিন্তু সেই কথাগুলো মনের মধ্যে ওঠে। দাঙ্গার আগে থেকেই ওঠে। ভাবে, তাই ত! তবুও সে-কথাটা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে পারা যায় না। এই সব কারণে ইদানীং সে অরুণদের কাছ থেকে একটু দূরে দূরেই থা[illegible] এবং অরুণদের কর্ম-মুখরতাও কিছু[illegible]স্তিমিত হয়েছিল। আবার সে তাদের কা[illegible]গিয়ে গেল। কাজেই সে নিজেকে [illegible]বে।

হঠাৎ [illegible]খালির খবর! কলকাতার আগুন [illegible]ত জ্বলেছে। সংবাদ-পত্র [illegible]দের আঘাতে দেশে যেন অন্ধ[illegible]ল!

[illegible]লে, "অরুণ, আমি ছুটি নি[illegible]

[illegible]কী? কী হল?"

কিছু করেই কিছু যেখানে হবে না, সেখানে কী হয়নি বল? কী লাভ মিথ্যা উৎসাহে জীবনের অপব্যয় করে? আমার আশা-ভরসা-উৎসাহ আর কিছু নেই। আমি ছুটি নিলাম।"

"না-না, এ-সব—"

"না নয়; আমি চললাম।"

চলে এসেছিল সে সমিতির কেন্দ্র থেকে। কী হবে? এই দেশে কিছু হবে না। হতে পারে না। সে-দেশে প্রবীরের মত মানুষের ওই পরিণতি হয়।

প্রবীরের প্রসঙ্গে সে মুহূর্তে সচেতন হয়ে ছেদ টেনে দিয়েছিল। প্রবীর কে? তার কথা কেন? তারপর সে বিছানায় শুয়ে সারাটা দিন কেঁদেছিল। অন্ধকার, সব অন্ধকার!

হঠাৎ পেয়েছিল আলো।

গান্ধীজী যাচ্ছেন নোয়াখালি। পদব্রজে তিনি পরিভ্রমণ করবেন অত্যাচারিত অঞ্চল। সেদিন সত্যসত্যই মনে হয়েছিল, নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে আলোকদীপ্তির মত চলেছেন কৌপীনবন্ত কৃশতনু মহাত্মাজী। আলোর ছটা পেলে পতঙ্গ যেমন অন্ধকার বিবর থেকে পাখা মেলে উড়ে গিয়ে সেখানে পড়ে, ঠিক তেমনি ভাবেই গিয়ে পড়েছিল। সে যাবে। মহাত্মাজীর সঙ্গে সে যাবে। গিয়েছিল এই শচীন মিত্রের কাছে। এই সহাস্যমুখ মিষ্টভাষী কর্মীটির কাছে যেতে তার সংকোচ হয়নি। শচীন মিত্র তাকে চিনতেন। চিনতেন অভিনয়-পারঙ্গমতার জন্য। অরুণদের সঙ্গে সে তাদের সাংস্কৃতিক দলের মধ্যে অভিনয়ে কয়েক-বারই অংশ গ্রহণ করেছিল। তাতে তার নামও হয়েছিল। শচীন মিত্র আগস্ট আন্দোলনের সময় আটক থেকে বাইরে এসে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন করেছিলেন। অভিনয় করেছিলেন অভ্যুদয় নৃত্যনাট্যের। শচীন মিত্র ছিলেন বড় উদার, যারা তাঁর মত অর্থাৎ আরতির মত রাজনৈতিক দলের

অন্তর্ভুক্ত না হয়েও তাদের দলে গিয়ে পড়েছিল. তাদেরও আহ্বান করেছিলেন। বিশেষ করে আরতির অভিনয়-পারঙ্গমতার কথা শুনে তাকে তার কাছে এসে ডেকেছিলেন। সে-দিন সে যায়নি। হয়ত প্রত্যাখানের সুরটা একটু রূঢ়ও হয়েছিল, কিন্তু শচীন মিত্র প্রসন্ন [illegible] সমুখেই ফিরে গিয়েছিলেন। এতদিন [illegible] মহাত্মাজীর সঙ্গে যাবার সুবিধার জ[illegible] গিয়েছিল শচীন মিত্রেরই কাছে।

"আপনার কাছে আমি [illegible] আমাকে মহাত্মাজীর সঙ্গে নোয়াখ[illegible] সুবিধে করে দিন। আমি যেতে [illegible]ব।"

শচীনবাবু মুখের দিকে [illegible]লেন বেশ একটু বিস্ময়ভরেই বোধ [illegible]

আরতি বলেছিল, "আমি আর। [illegible], আমার—"

"জানি। আমি ত আপনার কাছে গিয়েছিলাম একদিন!"

"হ্যাঁ। আমার সব গোলমাল হয়ে গেছে। আমি অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছি। আমার শান্তি নেই, সান্ত্বনা নেই—।" আর কথা জোগায়নি. স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুধু দুটি ফোঁটা জল তার বড় বড় চোখের পাতার প্রান্তে মুহূর্তের জন্য টলমল করে ঝরে পড়েছিল।

দরদী মানুষটি সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, "আচ্ছা দেখি আমি কী করতে পারি! হয়ত পারব। আমি খবর দিয়ে আসব।" তার পরই বলেছিলেন, "ওহো, আমাকে আপনি মার্জনা করবেন। আপনাদের বাড়ি ত—"

আত্মসম্বরণ করে ম্লান হেসে সে বলেছিল, "হ্যাঁ। সে-বাড়িতে নেই আমি এখন।"

"অনেক দুঃখ পেয়েছেন, না?"

"সে-দুঃখ পার হয়েছিলাম। কিন্তু তারপর—।" একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, "তারপর যে-দুঃখ, দুঃখ ঠিক নয়, কিন্তু অন্ধকারে যেন ডুবে গেছি।"

এমন উদার হৃদয়ের সস্নেহ সহানুভূতিতে সে অকপট হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পেরেছিল অন্ধকারের স্বরূপটা। কোথায় যেন জীবনের জোর হারিয়ে গিয়েছে. এমন একটা আশ্রয় চায় যাকে ধরে সে এ-অন্ধকার পার হয়ে যেতে পারে। অন্ধকার দেশজোড়া নিশ্চয়ই। কিন্তু তার মধ্যেই তার জীবন দুর্বল, দৃষ্টি দুর্বল হয়ে সে অন্ধকার নীবন্ধ্র, পারাপারহীন মনে হচ্ছে।

শচীন মিত্র মহাত্মাজীর সঙ্গে তার [illegible]খালিতে যাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। [illegible]বেঁচে গিয়েছিল সে। পেয়েছিল নূতন জী[illegible]ন। এ এক অনাস্বাদিতপূর্ব অমৃত। চি[illegible] নেই, ক্রোধ নেই, ভয় নেই, আছে শুধু তীর্থ[illegible]যাত্রীর মত বৈরাগ্যানিধুর পথ চলা। পথ চলতে চলতে সব ভুলে গেল সে।

নোয়াখালির পর বিহার! তারপর পাঞ্জাব, দিল্লী।

এর মধ্যে অরুণ এসেছিল একদিন! বলেছিল, "শেষ পরিণতি এই হল আপনার?"

একটু তিক্ততা ছিল বৈ-কি তার মধ্যে। কিন্তু তাতে তার প্রসন্নতা এতটুকু ক্ষুন্ন হয়নি। হেসে বলেছিল, "বেঁচে গিয়েছি অরুণ।"

কিছুক্ষণ তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে অরুণ বলেছিল, "কয়েকটা প্রশ্ন করব?"

আরতি বলেছিল, "তার আগে একটা প্রশ্ন করব আমি।"

"বলুন?"

"এই রক্তপাত, এই হানাহানি, এ তুমি সমর্থন কর? সহ্য করতে পার?"

"এ-প্রশ্নের কোন মানে হয়?"

"হয়। এতদিন বিপ্লব বিপ্লব করে চীৎকার করেছি। আজ এই হানাহানি রক্তপাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাবছি, তার রূপটাও ত এই! এই কেন, এর চেয়েও হয়ত বেশী ভয়ংকর! তফাত সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে না হয়ে বিদেশী এদেশীর মধ্যে হত। হয়ত বা শ্রেণীতে শ্রেণীতে হত। তাতেও ত এমনি করেই মানুষ মানুষকে হত্যা করত! এই রক্তপাত, এই দুঃখ, এই পাপ! আমার লাগানো আগুনে অগ্নি-কাণ্ডের উত্তাপ কি আমাকে লাগে না?"

অরুণ আর প্রশ্ন করেনি, চলে গিয়েছিল।

মনে মনে আরও বলেছিল সে। বলেছিল নিজেকেই। জীবনে যে শুচিতা পেয়েছি, যে পবিত্র ন্যায়ের বেদীতে দাঁড়িয়েছি, সেখানে না দাঁড়ালে বিশ্বাস করতে পারতাম না, এমন হয় বা হতে পারে। আমি আজ এই ভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রবীরকে ক্ষমা করতে পেরেছি। করুণা করতে পেরেছি। হায় হতভাগা! ওরে হতভাগী! দু-জনের জন্যই দু ফোঁটা চোখের জল ফেলেছিল সে। মানুষ বড় অসহায়। বড় অসহায়!

তারপর এল স্বাধীনতা। ১৫ই আগস্ট।

১৫ই আগস্ট সে ফিরে এল তার বাড়িতে।

গান্ধীজী বেলেঘাটায় এলেন। শান্তির দূত! প্রেম-ক্ষমা-অক্ষোভ-অক্রোধ-অভয়ের জীবন্ত বিগ্রহ।

বেলেঘাটা যাবার পথে সেদিন সে প্রবীরকে বোধ হয় দেখেছিল। পথে একটা গাড়ি মেরামত করছিল। মলিন তেলকালি-মাখা পোশাক, তেমনি মূর্তি। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মনে মনে বলেছিল, তুমি অন্তত দুর্বলতাকে জয় করে, মেয়েটিকে জীবনে সর্বজনের সমক্ষে স্বীকার করে, তোমার শিক্ষায় দীক্ষায় আবার নিজেকে প্রকাশ কর। আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি।

তারপর আবার লাগল দাঙ্গা। গতকাল শচীনবাবু ছুরি খেয়েছিলেন। মারা গেলেন হাসপাতালে। সারা রাত্রি কেঁদেছে আরতি, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলেছে, ভগবান! ফিরিয়ে দাও। ফিরিয়ে দাও। বাংলার মহৎপ্রাণ পুরুষটিকে অকালে ঝরিয়ে দিয়ো না! কিন্তু—!

বাগবাজার থেকে শবযাত্রা শ্মশানে এল। পথে দাঁড়িয়ে ছিলেন আচার্য কৃপালনী! সে দেখেছে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলেন। একটি লোকোত্তর বিষণ্ণ মহিমার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল সে। হঠাৎ সে আচ্ছন্নতা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

শ্মশানে দাঁড়িয়ে প্রবীর। ওদিকে সেই বধূটি। কার শব নামানো। মুখখানা বেরিয়ে আছে। শবটি সেই বৃদ্ধার। বধূটির দৃষ্টি বিচিত্র। সে-দৃষ্টি ভাদ্রের ভরা গঙ্গার স্রোতের উপর দিয়ে প্রসারিত হয়ে কোথায়, কোথায় যেন চলে গিয়েছে। বোধ হয় নদীর মোহনায়, সাগর-সঙ্গম পর্যন্ত!

প্রবীর দাঁড়িয়ে আছে। স্থির হয়ে। চোখ বুজে। তবু মুখ দেখে বোঝা যায়, সে ভাবছে। অন্তহীন ভাবনা।

আজ আর তার ক্রোধ হল না। ঘৃণা? না, ঘৃণা তার মোছেনি। তবে সে-ঘৃণা বিদ্বেষে ক্ষোভে প্রখর নয়। সে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

এদিকে চিতার আয়োজন হচ্ছে। শ্মশান-ঘাটে জীবনের ঢেউ এসে লেগেছে। লোকারণ্য। ফুলে ফুলে ছেয়ে গিয়েছে। কুসুমাস্তীর্ণ করে দিচ্ছে ইহলোক থেকে লোকান্তরে যাবার পথ। ওই পথে যাবে মহাযাত্রী!

আবার সে তাকাল ফিরে। না তাকিয়ে পারলে না। প্রবীরের নকল মা যাচ্ছে, দু-পাশে দু জন মাত্র। প্রবীর যেদিন যাবে, সেদিন একজন থাকবে, ওই বধূটি। কিন্তু এত চিন্তাকুল কেন প্রবীর? টাকাকড়ির অভাব? বোধ হয়! এখনও চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে সে। বউটি মুখাগ্নি করছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে এগিয়ে এল। থাকতে পারলে না। যে- অধঃপতনেই পতিত হয়ে থাক, একদিন উপকার সে অনেক করেছে। বলেছিল, আপনার ভেবে করেছি, আপনার ভেবে নিতে পারলে মনে ও-কথা উঠবে না মিস সেন! কিন্তু আপনার ত হয়নি! আজ যদি কিছু উপকারেও লাগতে পারে, কিছু যদি শোধ হয়, হক। তার ব্যাগে কুড়িটে টাকা আছে।

এগিয়ে গিয়ে সে কাছে দাঁড়াল। প্রবীর তাতেও চোখ খুললে না। সে ডাকলে,

"শোন—," সংশোধন করে ডাকলে, "শুনুন?"

প্রবীর চোখ মেলে চেয়ে একটু যেন চকিত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, "আপনি? শচীনবাবুর শেষ যাত্রায় এসেছেন! ওঃ, মহাপ্রাণ চলে গেলেন!"

সে-কথার উত্তর দিলে না আরতি। বললে, "উনি, মানে বউটির শাশুড়ী মারা গেলেন?"

"হ্যাঁ।"

এ-অবস্থায় কথা বলা বড় কঠিন। একটু চুপ করে থেকে মনে গুছিয়ে নিয়ে আরতি বললে "একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না।"

"না। বলুন। যা বলবেন, আমি মাথা পেতে নেব।"

"না। সে-সব কোন কথা আমি তুলব না। তোমার স্মৃতি, তার জন্যে ক্ষোভ দুঃখ আমি মুছে ফেলেছি। তা ছাড়া আজ আমি মহৎ আশ্রয় পেয়েছি—"

"আমি জানি, মহাত্মার সঙ্গে আপনি নোয়াখালি গিয়েছিলেন। সেদিন বেলেঘাটা যাচ্ছিলেন, তাও দেখেছি।"

"আমিও যেন আপনাকে দেখেছিলাম। ও-কথা নয়। আপনাকে অনেকক্ষণ থেকে দেখছি, আপনি চোখ বুজে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে আছেন। এসে অবধিই দেখলাম।"

"হ্যাঁ। আজ কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি। সামনে—। সে-সব শুনে আপনি কী করবেন মিস সেন?" একটু হাসল সে।

আবারও মনে মনে একটু গুছিয়ে নিয়ে আরতি বললে, "শ্মশানে দাঁড়িয়ে চিন্তা—। মানে উনি আপনার মা হলে কিছু বলতাম না।" আরও একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, "কোন দরকার যদি থাকে, টাকা-কড়ি—"

"না। ধন্যবাদ আপনাকে দেব না।" সেসব কিছু দরকার নেই। এ অন্য কথা।"

হেসে চুপ করলে সে।

আরতি চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল। বধূটি —রতি—ডাকলে, "শোন!"

প্রবীর ফিরল। রতি বললে, "তুমিও আগুন দাও না এইবার। অবান্ধবাবান্ধবা বা যে চান্য জন্মনি বান্ধবাঃ—আমি মন্তর বলে দিচ্ছি, বল—।" সে আরতিকে দেখেও দেখলে না। আশ্চর্য মেয়ে! ও-মেয়েরা বোধ হয় এমনিই হয়। ওদিকে তখন জয়ধ্বনি উঠেছে। কে যেন গান ধরেছে, জয় রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত পাবন সীতারাম!

প্রবীরের যাত্রার সময় যেন ওই দ্বিতীয় চরণটি কেউ গেয়ে দেয়।

॥ আট ॥

আরতি দেবী......

একখানা চিঠি। প্রথমে মিস সেন লিখে কেটে লিখেছে আরতি দেবী!

দু-দিন পর সে চিঠিখানা পেলে। মোটা খামের চিঠি। বাড়িতে এসে দিয়ে গিয়েছে। বাড়িতে এখন সে প্রায় একা। বাপের বুড়ী পিসি দাঙ্গার মধ্যেই শেষ হয়েছে। আরতি ফিরে আসবার পরও ভাড়াটেদের কেউ বড় একটা আসেনি। দু-তিনজন এসেছিল, যদি কোন সম্পত্তি পড়ে থেকে থাকে, তারই সন্ধানে। ফিরে এসেছে এক ঘর। এক ঘর নয়, একজনেই বলতে গেলে। সে এক পূর্ববঙ্গের ছেলে। দাঙ্গার মধ্যেই সে কী করে বেরিয়ে পড়ে চলে গিয়েছিল, এবং সারা দাঙ্গাটায় সে এক ভৈরবের খেলা খেলেছে। নিষ্ঠুর আক্রোশ তার। সে আরতির আসবার আগে থেকেই এসেছে। শ্যাডো মিনিস্ট্রি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। চিঠিখানা তারই হাতে দিয়ে গিয়েছিল। সে বলল, "আপনি বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ, বোধ হয় পাঁচ মিনিট পর। মোটর-মিস্ত্রী একজন।" চিঠির এদিকে প্রবীরের নামও লেখা আছে। প্রবীর চ্যাটার্জী। বিস্মিত হল আরতি, আবার ভুরুও কোঁচকাল তার। কী? কেন? ফেলে দেবে? না! খুললে সে চিঠিখানা। উপরে লেখা, "চিঠিখানা পড়বেন। আমার জন্যে দুঃখ অনুভব করেছেন সেই সৌভাগ্যের দাবিতে অনুরোধ করছি।" নীচে কালির দাগ চিহ্নিত করে সর্বাগ্রে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। প্রথমে মিস সেন লিখে কেটে আরতি দেবী বলে সম্বোধন করেছে। আরতি দেবী!

"আজ আবার আমি প্রবীর।

"জীবনের বিচিত্র দুশ্ছেদ্য বন্ধন কাল ছিঁড়েছে। এ-বন্ধন ছেঁড়ার আগে আমার উপায় ছিল না। সংসারে এমন অবস্থাও হয় আরতি দেবী, যখন মিথ্যাই হয় সত্যের চেয়েও বড়। আমার তা-ই হয়েছিল। নইলে, আপনি ত আমাকে জানতেন, বিধবা বিবাহে আমার কোন সংস্কারের বাধা কোন কালে ছিল না। এমন কি, বিবাহ না করেও ওকে নিয়ে যদি আমি আমার শিক্ষা দীক্ষা মত চাকরি করতাম, তাতেই বা আমার কে কী করত? প্রবৃত্তিই যদি হয় এবং লজ্জা বা সামাজিক সংস্কার না থাকে, তবে কিসের বাধা? বর্তমানে সমাজে রাষ্ট্রে উচ্চপদস্থ যারা এবং অতি মডার্ণ যারা, তাদের ত এ চাঁদের কলঙ্কের মত। জানি না স্বাধীন ভারতবর্ষে কী হবে। আমার চাকরি ছিল ইংরেজ রাজত্বে, যুদ্ধবিভাগের। আপনি মডার্ন লাইফের অনেক জানেন, অনেক দেখেছেন, কিন্তু যুদ্ধবিভাগের এলাকায় ইংরেজ আমলে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের প্রমোদ আপনি দেখেননি। প্রমোদ কেন, তাদের সংসার-জীবনও জানেন না। থাক সে-কথা। আমি আমার বিচিত্র অবস্থার কথা বলছিলাম। যে-অবস্থায় মিথ্যাই বড় হয়ে উঠল, সত্য মাথা তুলে প্রতিবাদ করতে গিয়েও পারলে না। হার মানলে। সত্য আমার ইচ্ছে করে হার মেনেছিল বলেই আমি কোনদিন কারুর কাছে লজ্জিত হইনি। আপনার কাছেও হইনি। সে নিশ্চয়ই আপনার মনে রয়েছে। আমার নিজের কাছেও হইনি। [illegible]ই পেরেছিলাম আপনার সে-দিনের কথা[illegible] সহ্য করতে, আপনার কাছে মুখ তুল[illegible]বং এই মিস্ত্রী-জীবনের মধ্যেও সু[illegible]। ওই বস্তিতে বাস করেও দুঃ[illegible] মিস্ত্রী সেজে ওই খাটুনি খে[illegible]বিধে বোধ করিনি। না, তুমি[illegible] ইখানেই। যা জানাতে চাই [illegible]

"[illegible]ছুটা বলেছি। আবরণটা। তার [illegible] থেকেই শুরু করি। যেদিন আ[illegible]র সঙ্গে আমার 'তুমি' বলার দোর খুলেছিল, সেই দিন থেকে শুরু করি। সাইক্লোনের দিন।

"আমি যখন পুনো আমেদাবাদ এবং উত্তর ভারত ঘুরে এলাম, তখন আমার মনে একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। জীবনে বাইরের জগতের আঘাতে যা ঘটে, আজ নিজের মনের অবস্থানুযায়ী প্রতিক্রিয়ায় সেই পরিবর্তন মানুষ ঘটিয়ে নেয়। ইংরেজের রাজকর্মচারীর ছেলে, রাজকর্মচারীর ভাই, নিজে যুদ্ধ বিভাগে চাকরি নিতে গেছি আমি, আমার মনে উত্তর ভারতের অগস্ট আন্দোলন একটা আশ্চর্য ভাবান্তর ঘটিয়ে দিয়েছিল। এরা যা করেছিল, এবং তার প্রতিকারে ইংরেজ তার লালমুখো গোরাদের ছেড়ে দিয়ে যা করিয়েছিল, তাতে মনে মনে আমার যা হওয়া উচিত তা-ই হয়েছিল। তাই সেদিন লঘুভাবে কী একটা কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেছিলাম, এ-দেশের লোক এমনভাবে লড়াই দিতে পারে এ কি কেউ জানত? সুভাষচন্দ্র বিদেশে গিয়ে সামরিক অধিনায়কের পোশাক পরে আর্মির স্যালুট নিতে পারেন, এ কি তিনিই জানতেন? আপনি তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে কটু কথা বলে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। মনে পড়বে বোধ হয়। আমার মনটা খুঁত-খুঁত করেছিল। তখন আমিও আমার মনকে বুঝিনি। তার পরদিনই চলে গিয়েছিলাম চাকরির তলব পেয়ে। ট্রেনিং-এর জন্য ঘুরতে হল কয়েকটা সামরিক কেন্দ্র। ইংরেজ অফিসারের গাল শুনলাম। মনটা আরও বিষিয়ে গেল। মনে মনে শপথ নিলাম। মনে পড়ে গেল রথীনদার কথা। আপনার দাদা। আপনারা জানতেন না, রথীনদা ছিলেন গোপনে গোপনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অনুগামী। রীতিমত তাঁর দলের সভ্য ছিলেন। আমাদের কলেজে তিনিই ছিলেন ওই দলের প্রতি[illegible]। তিনি যেদিন লণ্ডনে এয়ার রেডে

মারা গিয়েছিলেন, সেদিন বোধ হয় বাড়িটা হিট হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সৈনিকের মত বিপুল উত্তেজনায় উৎসাহে দাঁড়িয়ে ছিলেন খাড়া হয়ে। কোন শেল্টারে মাথা গ‍ুঁজে দিয়ে বসে বা শুয়ে থাকেননি। তিনি বলতেন এ ছাড়া আমাদের পথ নেই। অন্তত [illegible] হয়ে বেঁচে থাকবার পথ নেই। মৃ[illegible] হলে আজ হক কাল হক, এই পথে দ[illegible] হবে।

"আমি সেটা অন[illegible]াম। সেই অনুভূতি নিয়েই [illegible]য়ার পথে কলকাতায় নেমে দে[illegible] গেলাম আপনার সঙ্গে। কিন্তু [illegible]খলাম, আপনিও আপনার বেদনার [illegible] একটা পথে নেমে গিয়েছেন। একদ[illegible]নী এবং কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে [illegible]নি সমিতি খুলে কাজে মেতেছেন। মত ভাল বা মন্দ, সে-কথা নয়। মত—সব মতই ভাল। ভাল ভিন্ন মত হয় না [illegible]রতি দেবী। ভালতে যাওয়ার পথ ভাল-মন্দ হয় এবং সেই পাছা নিয়ে সংসারে তর্ক বাধে, শেষ পর্যন্ত বিরোধ হয়। সেই তর্ক সেই বিরোধ অনুভব করেছিলাম সেদিন, সেই মুহূর্তে। তাই সেদিন যা বলতে গিয়েছিলাম, তা বলতে পারিনি; চলে এসেছিলাম। যা বলতে গিয়েছিলাম, সে-কথার আর আজ পুনরুক্তি করব না, করার অধিকার নেই; তবে আপনার তা মনে আছে, আমি চিঠিতে লিখেছিলাম। সে-দিন গঙ্গার ধারে চিঠির কথা আপনি তুলেছিলেন।

"ফ্রন্টে চলে গেলাম স্পেশাল ট্রেনে। ইস্টার্ন ফ্রন্টে, আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তে। সেখানেই পেলাম এই রতনকে। আমাদের ইঞ্জিনীয়ারস ইউনিটে। সে পদবীতে জমাদার, কাজে মিস্ত্রী। আমি তার গ্রুপের ক্যাপ্টেন। দাড়িগোঁফ চুলওয়ালা ও ভটচাজ বংশের ছেলে। ধর্ম বংশ অনেক দোহাই পেড়ে সে দাড়িগোঁফ বজায় রেখেছিল। লোকটি অদ্ভুত নিপুণ মেকানিক। বিশেষ করে মোটর-যন্ত্র-বিদ্যায়। মোটর বিকল হলে একটু নেড়ে চেড়েই ধরে দিত কোথায় কী হয়েছে। ঠিক যেন পুরনো কালে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নাড়ী দেখে রোগ নির্ণয়ের মত। আর তেমনি ছিল জেদী। আর ছিল আমার মত ক্যাটস-আই। রঙয়েও সাদৃশ্য ছিল, তবে তার ছিল তামাটে; আর গলাও ছিল আমার মত ভারী। আমাদের ইউনিটের কর্তা একজন ইংরেজ, সে মধ্যে মধ্যে বলত, ও 'তোমার কেউ হয়?'

"বলেছিলাম, 'না।'

"সে বলেছিল, 'আশ্চর্য তো!'

"একদিন তাঁবুতে মদ খেতে খেতে বলেছিল, 'চ্যাটার্জি, তোমার বাবা ত হাই অফিসিয়েল ছিলেন? সত্যি না?'

"বলেছিলাম 'হ্যাঁ।'

"'তোমাদের বাড়িতে নিশ্চয় আয়া ছিল!'

"'হ্যাঁ। তবে আয়া নয়, ঝি বলি আমরা মেড-সারভেণ্টকে।'

"'ওই জমাদার ভটাচারিয়ার মা নিশ্চয় তোমাদের বাড়িতে মেড-সারভেণ্ট ছিল। বোধ হয় তোমার মনে নেই। নিশ্চয় তোমার জন্মের আগে। কারণ ও তোমার থেকে বয়েসে বড় হবে।'

"আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। কী উত্তর দেব ভেবে পাইনি। কোমরের রিভলভারটা যেন নিজেই নড়ে উঠেছিল। কিন্তু মিলিটারি ডিসিপ্লিন, হাত দিতে পারিনি। শুধু উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। মুখ বোধ হয় লাল হয়েছিল। লক্ষ্য করে বলেছিল, 'আই নো চ্যাটার্জি, তোমাদের এ-দেশের সব জানি আমি। আমার গ্র্যান্ডপা এখানে প্ল্যাণ্টার ছিল, তার তিনটে আয়া ছিল—অ্যান্ড—। আই নো!'

"আমি প্রতিবাদ জানিয়ে চলে এসেছিলাম। খোনা আওয়াজে একদল ইংরেজ কথা কয় শুনেছেন? লোকটা সেই খোনা আওয়াজে তবুও বলেছিল, আই নো আই নো ইয়োর ইণ্ডিয়া!

"তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

"আসামের অরণ্যভূমে তখন সন্ধ্যা নামছে। সূর্য অস্ত গিয়েছে। অরণ্যের আশ্রয়ে অন্ধকার বিচিত্র গাম্ভীর্যে থমথম করে। সেদিনের থমথমানি আমার মনে পড়ছে। মনে পড়ছে অজস্র ঝিঁঝি পোকার ডাকের মধ্যে কোন একটা রাত্রিচর পাখি সন্ধ্যায় প্রথম পাখসাট মেরে পাখা মেলেছিল এবং অত্যন্ত কর্কশস্বরে ডেকে উঠেছিল। আমি ভাবতে ভাবতে আসছিলাম, যে কোন উপায়ে হক এ-রেজিমেণ্ট থেকে ট্রান্সফার আমাকে নিতেই হবে।

"নিজের তাঁবুর দিকে আসছিলাম। নিজের বুটের শব্দে বুঝতে পারছিলাম, আমি আজ হত্যা করতে পারি। পথের পাশে সাধারণ কর্মীদের ছাউনি। তারই একটা থেকে রতনের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। সে সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করছে। ভারী গলার আওয়াজ সন্ধ্যার অন্ধকারে কাঁসরের শব্দের মত মনে হচ্ছিল। চণ্ডী আবৃত্তি করছিল। খানিকটা আগে কয়েকটা ভারী যন্ত্র স্তব্ধ হয়ে পড়ে ছিল। দিনের বেলা ওগুলো দৈত্যের মত কাজ করত। মাটি পাথর কেটে চষে এগিয়ে চলত একশটা কি হাজারটা বুনো শুয়োর বা মোষের মত। পথ তৈরি হচ্ছিল। আমরা পথ কেটে চলি আগে আগে। যান্ত্রিক বাহিনী যাবার জন্য পথ। ছাউনি থেকে দু-মাইল আগে কাজ হচ্ছিল। জনমানবহীন পাহাড় এবং বন চারিদিকে। শোনা যাচ্ছিল, শত্রুবাহিনী খুব দূরে নয়। দশ বিশ মাইলের মধ্যেই। মনে হয়েছিল, আজই রাত্রে যদি তারা হানা দেয় ত বড় ভাল হয়। অন্তত বন্দী হয়ে মুক্তি পাই। তখন নেতাজী এসেছেন, পূর্ব দিগন্তের রণাঙ্গনে নতুন সাড়া জেগেছে। বনভূমে উদয়-মুহূর্তের সূর্যরশ্মির একটা দুটো বাঁকা রেখার মত সে-সংবাদ আমাদের কানে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু খুব অল্প লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আমাদের ও-নাম মুখে আনার উপায় ছিল না। তবে ওরা নিজেরা মধ্যে মধ্যে নেতাজীকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করত। তা থেকেই বুঝতাম, সংবাদ সত্য। সেদিন মনে হয়েছিল, বন্দী হলে নেতাজীর সামনে দাঁড়িয়ে শপথ নেব। বলব, আমার রক্ত আমি দেব, প্রাণ দেব, আমার স্বাধীনতা দাও তুমি, আমার মনুষ্যত্বের মর্যাদা আমাকে দাও।

"এরই মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিলাম রতনলালের ঘরে। রতনলালের সদ্য স্তব পাঠ শেষ হয়েছে তখন। আমাকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে সৈনিকের [illegible]বাদন জানিয়ে বলেছিল, ইয়েস স্যার!

"সেই দিন আলাপ করেছিলাম ভাল করে। কলকাতার কাছাকাছি একটি পণ্ডিত-প্রধান গ্রামের পণ্ডিত-বংশের ছেলে। একদিন মর্যাদা ছিল। আজ মর্যাদা গিয়েছে। তাই নতুন পথ ধরেছে। অন্ন চাই, মর্যাদা চাই, ঘর চাই। ইংরিজী পড়তে শুরু করেছিল, ম্যাট্রিক পাশ করতে পারেনি। শেষে মেকানিক হয়েছে; বেশী উপার্জনের জন্য যুদ্ধে এসেছে। ঘরে মা আছে, স্ত্রী আছে। মায়ের একমাত্র সন্তান। মা কিছুতেই আসতে দেবে না, সে জোর করে এসেছে। বলেছিল, 'বলুন না, অবস্থা ফিরাবার এমন সুযোগ ছাড়তে আছে?' কথায়-কথায় বলেছিল, 'জীবনে ধিক্কার হত। আমার স্ত্রী পরমা সুন্দরী। রাজরানী হবার উপযুক্ত। আমার হাতে পড়ে সে হয়েছে ঘুঁটে কুড়ুনী। সত্যিই ঘুঁটে দিতে হয়। ফিরে গিয়ে বাড়ির অবস্থা ফেরাব। একটা মোটর মেরামতের কারখানা করব। খুব চলবে। মাকে বললাম, তুমি খুশী হয়ে ছেড়ে দাও আর আশীর্বাদ কর, আমি অক্ষত দেহে ফিরে আসব। মা আমার সাক্ষাৎ সতী। তিনি আশীর্বাদ করেছেন, আমি যদি সতী হই তবে তোর কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। আমি ব্রত করলাম। যতদিন না ফিরবি, এই ডান হাতে জপ ছাড়া কিছু করব না। বিছানায় শোব না। তেল মাখব না। হবিষ্যি করব। আর তিন হাজার দুর্গা-মন্ত্র জপ করব। তা-ই করছেন তিনি।' সব শেষে বলেছিল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে অনেক দিন থেকে ইচ্ছে স্যার। আপনার সঙ্গে আমার চেহারার মিল আছে। বামুনের ঘর ত, হয়ত খুঁজলে দু-তিন-পুরুষের মধ্যে রক্তের মিল পাওয়া যাবে।'

"পত্র দীর্ঘ হচ্ছে আরতি দেবী। সংক্ষেপ করতে হবে। রাত্রে বসে পত্র লিখছি। কাগজও বেশী নেই। আপনারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। সকালে হলেই আমাকে বের হতে হবে রতনের জীবনের পালা শেষ করতে। তাই একেবারে প্রত্যক্ষ ঘটনায় আসি। আমি রতন হলাম কী করে? কেন? ১৯৪৪ সন, মার্চ মাস। ওদিকে জাপানীদের পিছনে রেখে "আই-এন-এ' আজাদ হিন্দ এগিয়ে আসছে। ইংরেজ হটছে। বাতাসে সুরের রেশ যেন শুনতাম, কদম কদম বাড়ায়ে যা খুশিকে গীত গায়ে যা। খুব কড়াকড়িতে গোপন রেখে-ছিল ইংরেজ আই-এন-এর খবর। তবু কানাকানিতে খবর পেতাম। মুখ খোলার উপায় ছিল না। মিলিটারি বিভাগের সব চেয়ে বড় শিক্ষা, চোখে দেখো কানে শুনো, মুখ খুলো না! মৎ খুলো।

"আমরা পিছিয়ে চলছি। হটছি। পালাচ্ছি। সম্মান বজায় রাখতে ইংরেজ অফিসারেরা বলছে, স্কিলফুল রিট্রিট!

"মাথার উপর গুরুগুরু শব্দ উঠল। শত্রুবিমান। খান তিনেক। দেখতে দেখতে ছোঁ দিয়ে নেমে এল। তারপর সে এক ভয়াবহ পরিণাম। কলকাতার এয়ার রেডের অভিজ্ঞতা থেকে এ কল্পনা করা যায় না। পায়রার ঝাঁকের উপর বাজপাখির ছোঁ মারা দেখেছেন? মুহূর্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়! ঠিক তা-ই হল। কোন দিকে কে কোথায় গেল, পড়ল, লুকোল, কেউ বলতে পারে না। প্লেন কখানা চলে যেতে না যেতে আশে-পাশে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। বেলা তখন গড়িয়ে এসেছে। আমি বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ রতন ডাকলে, 'স্যার!' একখানা জীপ পেয়েছে রতন। 'উঠে পড়ুন!'

"পিছনে দেখি অজ্ঞান হয়ে আছে আমাদের ইউনিটের কম্যাণ্ডিং অফিসার।

"রতনের হাতে জীপ। সে ছুটল এঁকে-বেঁকে; বনের ভিতর দিয়ে, খাল ডিঙিয়ে, চড়াই ভেঙে চলল। পিছনে রাইফেল-মেশিনগানের অবিশ্রান্ত শব্দ উঠছে। বন-ভূমে তার প্রতিধ্বনি বাজছে পাহাড়ে পাহাড়ে! চিৎকার উঠছে—আঃ! আমি যদি সেদিন অপেক্ষা করতাম! কিন্তু ওই সময়টায় মানুষের মাথা ঠিক থাকে না।

"হঠাৎ এক জায়গায় গাড়িটা দাঁড়াল। রতন বললে, 'জলদি নামুন!' সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে নেমে রতন টেনে ইংরেজ অফিসারটাকে নামালে। তার তখন জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু সম্বিত ফেরেনি। আমিও লাফ দিয়ে নামলাম।

"ব্রেক ফেঁসে গেছে। ভাগ্যক্রমে একটা পাথরে আটকে গেছে সামনের চাকা! আর সামনে জল। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে পারেনি রতন। হেডলাইট জ্বালতে সাহস করেনি। আলোর সন্ধান খুঁজতে হয় না। আলো নিজেই সন্ধান দেয়। শত্রুর দৃষ্টি গাছের মাথায় জেগে থাকে!

"রতন বলেছিল 'হাঁটুন! এগিয়ে চলুন!'

"অন্ধকার নামছিল অরণ্যে। আমরা তিনটি মানুষ। শত্রুর হাত থেকে পালাচ্ছি। আমার মধ্যে মধ্যে মনে হচ্ছিল, পালাব না, অপেক্ষা করব, ধরা পড়ব। আই-এন-এতে যোগ দেব। কিন্তু ইচ্ছাটাকে কার্যকরী করবার মত অবকাশ পাচ্ছিলাম না, পা দুটো ওদের সঙ্গেই চলেছিল।

"ইংরেজটি জীপ থেকে ছটকে পড়ে আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল; রতন জীপ চালিয়ে আসবার পথে দেখে তুলে নিয়েছিল; লোকটা চোট খেয়েছিল পিঠে। হাঁটতে পারছিল না। রতন এক জায়গায় বলেছিল, 'তা হলে এখানটাতেই রাত্রের মত বিশ্রাম করুন।' সামনে একটা ঝরনা! বন খানিকটা ফাঁকা সেখানটায়। ইংরেজটির সঙ্গে ছিল মদের ফ্লাস্ক, জলের বোতল, লোকটার সঙ্গে খাবারও ছিল পিঠের ব্যাগে। আমাদের রিট্রিটের পথেই আক্রমণ হয়েছিল; পালাবার জন্য আয়োজনের ত্রুটি রাখেনি, কিন্তু জীপ উল্টে সে-সব গিয়েও সঙ্গের সরঞ্জাম কম ছিল না। লোকটা একাই খেতে শুরু করেছিল বসে বসে। আমিও বের করে খেতে গিয়ে সংকোচ বোধ করেছিলাম। বলে-ছিলাম, 'রতন।'

"রতন হেসে বলেছিল, 'আমার একটু পূজো আছে।' তার ব্যাগ থেকে কী সব বের করতে আরম্ভ করেছিল। চলে গিয়েছিল ঝরনার ধারে। সামনেই। কয়েক গজ মাত্র। সিগারেট লাইটার জেলে ঘোরাতেই বুঝলাম, আরতি করছে।

"ইংরেজটা চিৎকার করেছিল, 'বাতি নেভাও।'

"'নেভাচ্ছি। এখানে কেউ দেখতে পাবে না।'

"'নো-নো।' লোকটা উঠে এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল, 'ইউ—ট্রেটার!' চমকে উঠে আমিও ছুটে গেলাম। দেখলাম কালীমূর্তির আরতি করছে রতন, পাশে ব্যাগ থেকে বের-করা আরও ছবি রাখা রয়েছে। সে-ছবি গান্ধীজীর!

"লোকটা ছুটে গিয়েছিল। রতনের গলা ধরে ফেলে অসুরের মত বুকে বসে ঘুঁষির পর ঘুঁষি মারতে আরম্ভ করেছিল এবং শেষে রিভলভার বের করে ধরেছিল, 'উইল শুট ইউ—ইউ ডগ!'

"আমার হাতে তখন রিভলভার উঠেছে। গুলি আমি করেছিলাম স্থির লক্ষ্যে। একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। একটু। দুটো গুলি, এক মুহূর্তের আগে পিছে বেরিয়ে গেল। আমারটা আগে, ওর হাতেরটা পরে। ওর ট্রিগারের হাতটা যে টান শুরু করেছিল, সেটা আহত হলেও প্রায় আপনা-আপনি কাজ করেছিল। শুধু নড়ে গিয়েছিল। বুকে না লেগে লেগেছিল হাতের উপরে কাঁধে।

"মিলিটারী আইনে অপরাধী হয়ে গেলাম। রতন মরে[illegible]। কিন্তু মরলেই ভাল হত। ওকে নিয়ে[illegible] অবস্থাতেই হাঁটতে শুরু করেছিলা[illegible] ওঃ সে কী অবস্থা। ভীষণ অরণ্যে[illegible] একজন আহতকে নিয়ে একা আ[illegible] দিনের দিন রতনের হাত ফু[illegible] সঙ্গে ভীষণ জ্বর। এই দু[illegible] বলেছিল তার বউয়ের কথা, মা[illegible] মা আর বউ। বউ আর মা। [illegible]টা বের করে শতসহস্র বার দেখি[illegible] তিন দিনের দিন আর চলবার [illegible]মতা ছিল না তার, আমারও বইবার ক্ষমতা ছিল না। সেদিন চলায় ক্ষান্ত দিয়ে তাকে একটা গাছতলায় শুইয়ে আমি ছুটে-ছিলাম জলের জন্যে। সামনেই জল। জলের কাছে গিয়ে থাকতে পারিনি, শরীরের জ্বালায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ রতনের চিৎকারে ছুটে চমকে উঠলাম। কী হল? ছুটে গেলাম। গিয়ে শিউরে উঠলাম। রতনকে লক্ষ লক্ষ পিঁপড়েতে ছেঁকে ধরেছে। চিৎকার করছে। এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে এলাম। রতনের চোখ দুটো ভর্তি হয়ে গেছে পিঁপড়েতে। খেয়ে নিচ্ছে কুরে কুরে। রতন চিৎকার করছে, মা—মা! মা!

"আমি আর থাকতে পারলাম না। আমার রিভলভারটা তুলে নিয়ে গুলি করে তাকে মুক্তি দিলাম। তারপর ছুটে পালালাম। কিছুদূর এসে ফিরলাম। ফিরে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এলাম আমার ব্যাগটা। সঙ্গে সঙ্গে ওরটাও নিলাম।

"কলকাতায় এলাম ভিক্ষুকের বেশে। ভিক্ষাবৃত্তি করেই। পায়ে হেঁটে, বিনা টিকিটে রেলে চড়ে। তখন দাড়িগোঁফ গজিয়েছে। মনে অসহ্য যন্ত্রণা। যন্ত্রণা রতনের জন্য। বড় ভালমানুষ! আর কানে বাজছিল তার কথা, মা আর বউ। বউ আর মা। গুলি খেয়ে আহত হয়ে একদিন আমাকে বলেছিল, 'যদি মরে যাই তবে যেন খবরটা তাদের দেবেন।' তারপরেই বলেছিল, 'আমি মরব না। আমার মা কালীমায়ের কাছে হাত বাঁধা দিয়ে হবিষ্যি করে মাটিতে শুয়ে ব্রত করে আছে। বলেছে, আমি যদি সতী হই, তবে তোর কেশাগ্র স্পর্শ কেউ করতে পারবে না। তা—।' হেসে বলেছিল, 'সন্দেহ একটা গুলি কাঁধে লাগা, একি একটা বেশী কিছু? মায়ের ব্রতের পুণ্য যদি মিথ্যে হবে, তবে বুকের লাগানো নলের গুলিটা কাঁধে এসে লাগবে কেন?'

কলকাতায় ফিরতে লেগেছিল কয়েক

মাস। সন্তর্পণে ফিরছিলাম। স্বপ্নের মধ্যে ফিরছিলাম। ইংরেজটাকে মেরে কোর্ট মার্শালের ভয় ছিল, কিন্তু বেদনা ছিল না। রতনকে মেরেছি স্বীকার করে ফাঁসি যেতে দুঃখ ছিল না, কিন্তু অন্তর্জ্বালার শেষ ছিল না। গোহাটীর [illegible] কামাখ্যা পাহাড়ে সন্ন্যাসী সেজে ছিল[illegible] কিছুদিন। শেষে কলকাতায় এলাম। [illegible] কাছে যাইনি। ইচ্ছে হয়নি। আপন[illegible] সঙ্গে দেখে গিয়েছিলাম, আপনার [illegible]ত যা জেনে গিয়েছিলাম, তাতে [illegible] বলেছিল, না, কাজ নেই! আপ[illegible]গবে না, আমারও না। আর এ[illegible] বছর আপনার মন আমার জন্য [illegible] বসে আছে? আপনার পাশের সমা[illegible] দেখে গিয়েছিলাম। কী করব স্থির করি[illegible] তবে রতনের মা-বউয়ের খোঁজ করে তাদের কোন রকমে খবরটা দিয়ে যা হয় করব ভেবেই গিয়েছিলাম ওদের সন্ধানে। আপনাকে বলেছি, ওরা তখন গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এসেছে। শুনেছিলাম, বাগবাজার অঞ্চলে আছে। পাচিকাবৃত্তি করে। দু-একজন বলেছিল, রূপসী বউটাকে ভাঙিয়ে খায়!

"কলকাতায় ফিরে খুঁজে ফিরছিলাম। তখনও আশ্রয় নিইনি কোথাও। ঠিক করতেও পারিনি কিছু। তখনও ইংরেজ রাজত্ব। ইংরেজ অফিসার হত্যার অপরাধ মাথার উপর। ওই লোকটাকে মেরে বন্দুকের গুলিতে বা ফাঁসির দড়িতে মরবার ইচ্ছে আমার ছিল না। এর অনুকূলে যে-ন্যায়শাস্ত্র যে-কথাই বলুক, তার বিরুদ্ধে ছিল আমার সর্ব অন্তরের বিদ্রোহ।

"তৃতীয় দিন সন্ধ্যায়। বাগবাজারের ঘাটে শনি-সত্যনারায়ণের পুজো হচ্ছিল। নিতান্তই ব্যর্থ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ একটি বধূ এসে সামনে দাঁড়াল। বড় বড় চোখ, সে যেন জ্বলজ্বল করছে। মুখ, দেহ, এমন কি সারা অবয়বের মধ্যে আছে ওই আশ্চর্য দুটি চোখ, আর ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত ক্লান্তি এবং মালিন্যের ছাপ-পড়া দেহবর্ণ। অন্যথায় শুধু কঙ্কাল! যেন যক্ষ্মার রোগী। আর বুঝতে পারা যাচ্ছিল, ঘোমটায় ঢাকা আছে একরাশি চুল। মুখের দিকে তাকাল, অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে। তারপর চলে গিয়ে ফিরে এল এক বৃদ্ধার হাত ধরে। আমায় বললে, 'নাও—তোমার মা নাও! আমার ছুটি!' এবার চকিতে চিনলাম, রতনের বউয়ের ফটো আমার কাছে দেখেছি, চিনলাম, এই ত রতনের বউ!

"রতনের মা চিৎকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার মুখে হাত বুলিয়ে কেঁদে উঠল, 'হে শনি-সত্যনারায়ণ, একবার আমার চোখ দুটি ফিরে দাও। একবার! হে শনি-সত্যনারায়ণ!'

"বউটি তিরস্কার করে বললে, 'একবার মা বলে ডাক। চোখে চিনতে পারছেন না, ডাক শুনে চিনুন!'

"সমস্ত পুজোর্থীরা সবিস্ময়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ডাক শুনবে বলে। রতনের মা তখন বলছেন, 'আমি বলেছিলাম, আমি যদি সতী হই—তবে—'

"আমি আর থাকতে পারলাম না, 'মা-মা। ও সব কথা এখানে থাক! মা!'

"বুকে জড়িয়ে ধরে রতনের মা বললে, 'চোখে না দেখলেও সেই তোর ডাক শুনে জুড়িয়ে গেল। জুড়িয়ে গেল।'

"মিথ্যের প্রথম বাঁধন পড়ে গেল আরতি দেবী!

"সঙ্গে সঙ্গে বউটি যা করলে তা কেউ কল্পনা করতে পারে না। ছুটে গিয়ে গঙ্গায় নেমে স্নান করে এলো চুলে দেবতাকে প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমাকে কেউ একখানা ক্ষুর দাও গো, নয়ত ছুরি। আমার বুক চিরে রক্ত মানত আছে, পাঁচ টাকার মিষ্টান্ন মানত আছে, আজ আমার টাকা নেই, মিষ্টান্ন ত পারব না, কিন্তু বুকের রক্ত না দিলে যে আমার প্রত্যবায় হবে। একখানা ক্ষুর দাও গো!'

"এ-দেশ বিচিত্র। এল ক্ষুর। অভাব হল না। আশ্চর্য, হাঁটু গেড়ে বসে মেয়েটি ক্ষুর দিয়ে বুকটা চিরে দিলে খানিকটা। রক্ত গড়িয়ে বেরিয়ে এল। ছোট একটা বাটি কেউ যেন নিয়ে এসে ধরল। কে যেন পাঁচ টাকার থেকে বেশী টাকার মিষ্টি এনে নামিয়ে দিলে। শাঁখ বাজল। উলু পড়ল। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

"বাসায় এলাম।

"একখানা অতি জীর্ণ খোলার চাল, ছিটে বেড়ার দেওয়ালের ঘর, বাসা। সামনে তেমনি ছোট বারান্দা। আশেপাশে—এক-একখানা ঘরে—এক-একটি পরিবার। তার উপর বৃদ্ধার তপস্যায় যুদ্ধ থেকে বেঁচে হারান ছেলে ফিরে এসেছে, এই পুণ্য-কাহিনী শুনে লোকের ভিড়। সেদিন তাদের ব্যঙ্গ করতে পারিনি। মনেমনেও পারিনি। লোকগুলির প্রায় সকলেই কেঁদেছিল।

"বুড়ী আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বসেছিল। গুণগান করেছিল বংশপুণ্যের, গুণগান করেছিল দেবতার, অহঙ্কার করেছিল নিজের তপস্যার, নিজের সতীত্বের।

"'কার সাধ্য? যমের সাধ্য দূরের কথা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের ক্ষমতা ছিল না, সতীর বাছার প্রাণ নেয়। মহাশক্তি সতীর চরণ ধরে, আমি সতী বসে আছি যে!' প্রায় পাগলের মত হাসতে শুরু করেছিল।—হা-হা-হা-হা।

"আমি ডুবে যাচ্ছিলাম অথৈ জলে। এই সময় বাসিন্দাদের একজন আগন্তুকদের বলেছিল, 'এইবার একবার যাও বাপু! এতদিন পর হারানিধি এল; ওদের কথা কইতে দাও! যাও যাও সব।'

"কে যেন বলেছিল, 'ওলো, বউয়ের চুল-টুল বেঁধে দে। ভাল করে সাজিয়ে দে বাপু।'

"'সাজাতে হয় না। যে রূপ!'

"'রূপের কী রেখেছে? না-খেয়ে-খেয়ে-শুকিয়ে-শুকিয়ে নিজের রূপকে দেহকে পুড়িয়ে দিয়েছে ইচ্ছে করে।'

"'দিয়েই বেঁচেছে মা। নইলে কি আর পাপের ছোঁ থেকে রেহাই পেত?'

"কে যে কোন ঘর থেকে বলছিল, জানি না। তবে কানে এসে ঢুকছিল।

"বুড়ী বলেছিল, 'হ্যাঁ বউ, আজ তুই রাত্রে ভাত খা।'

"'খাবে বই কি। সোয়ামীর পাতে খাবে! মাছ আছে ত? না-থাকে ত যাও না কেউ, নিয়ে এস! আজকের খরচ সবারই!'

"খেয়ে দেয়ে শুতে হয়েছিল। মনোরম করে পাতা শয্যা। আমার মনে হয়েছিল মৃত্যুশয্যা। হ্যাঁ, ওই শব্দটি ছাড়া আর কোন কথা হতে পারে বলুন?

"মিলিটারি অফিসার আমি, দিল্লীর কনট সার্কাস থেকে লালকেল্লা পর্যন্ত এলাকার প্রমোদ-জীবনের রোমাঞ্চক কাহিনী শুনেছি আমি; ইতিহাসের ওই সব গল্প এক সময় সংগ্রহ করে পড়েছি। আগ্রা কেল্লায় বাদশাদের জীবন্ত নারীকে ঘুঁটি সাজিয়ে সতরঞ্চ খেলার ছক দেখে আপসোস করেছি কেন বাদশা হয়ে জন্মাইনি। এখানকার হোটেল-জীবনও দেখেছি। নিজেকে অপাপ-বিদ্ধ বলব না। এখন থেকে শেষবার অর্থাৎ যেদিন আপনাকে কথা বলতে এসে ফিরে চলে গিয়েছিলাম, তারপর ফ্রন্টের পথে শিলংয়ে কয়েকদিন থাকার সময় একটা অ্যাংলো-বার্মিজ বা অ্যাংলো-খাসিয়া মেয়ে, ওয়াকী, নাম লনা, সে আমার উপর ঝুঁকেছিল। জীবনটা তখন মদের নেশার প্রভাবে চলেছে। ফ্রন্টে যাচ্ছি! জীবনের উপমা ফানুষের সঙ্গে, কখন ফেটে যাবে। সুতরাং তাকে রঙিন করে নাও। অফিসার্স মেস থেকে পালিয়ে তার সঙ্গে পাইন বনের তলায় চন্দ্রালোকিত রাত্রের প্রথম প্রহর যাপন করেছি। অসৎ আমি নই, কিন্তু কড়া নীতিবাদীর সৎও আমি ছিলাম না। সেদিন মন এইভাবেই তৈরি ছিল যে, মিসেস চ্যাটার্জি যিনি হবেন, তাঁকে অন্য অফিসারের সঙ্গে নাচতে হবে, শেরি খেতে হবে। যাক। তবু সেদিন 'ওই বস্তির ঘরে পাতা ওই শয্যা দেখে মৃত্যুশয্যার বিভীষিকা মনে জেগে উঠেছিল। মনে মনে ভগবানকে ডেকেছিলাম, 'রক্ষা কর, তুমি আমাকে রক্ষা কর।'

এল, বি, ফিল্মস্ ইন্টারন্যাশন্যাল

৯২৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড · কলিকাতা - ২৬
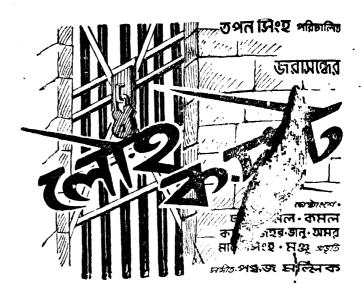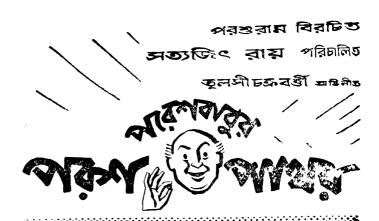
"ওই বধূটি নিজে হাতে পাতলে বিছানা। এরই মধ্যে সে আবার সাবান মেখে গা ধুয়েছে। মুখে স্নো মেখেছে, চুলেও সাবান দিয়েছে। কেন জানেন? এতটুকু দুর্গন্ধ পাছে আমাকে পীড়িত করে, তাই। অথচ আমি তখন নোং[illegible] কাপড়ে-চোপড়ে শুধু ভিক্ষুক! স্বল্প [illegible] সে-বাড়িতে: কেরোসিনের ডিবে আ[illegible]কেন। সেই আলোতে মনে হয়েছিল [illegible]লিনা মেয়েটা যেন মেঘ কাটিয়ে [illegible] ভোরের ভেনাসের মত প্রদীপ্ত [illegible]। আমি কেন জানি না, কাঁপছি[illegible]ছিলাম, কোথাও গিয়ে একটু [illegible]সব। কিন্তু তাও পারিনি। মন [illegible] পরি-বেশের প্রভাব যে মানুষের চরি[illegible] পাল্টে দেয়, এ-কথা এমনভাবে [illegible] অনুভব করিনি। যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের চেহারা দেখেছি। ভাল-মন্দ দুটোই দেখেছি। কিন্তু এ-ক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা। সে এমন শান্ত, এমন শুচি! ডাঃ জেকিল আর হাইড-এর হাইডও বোধ করি এ-পরিবেশে বিব্রত হত! বাঁশের পাতার মত ভিতরে-ভিতরে কাঁপছিলাম। নিজের দুর্বলতার জন্য নয়; এ-মেয়ের এমন রূপ সত্ত্বেও একে নিয়ে ব্যভিচারের কামনা আমার জাগেনি; সব মানুষের মধ্যেই পশু আছে, আমার পশুটা যেন ঘুমপাড়ানী কাঠির স্পর্শে হত-চেতন হয়ে গভীর শান্ত নিদ্রায় পড়ে ছিল আমার মমতা এবং সত্যের পদপ্রান্তে। তবু আমি কাঁপছিলাম কেন জানেন? কাঁপ-ছিলাম, একে আমি বলব কী করে, 'আমি সে নই; তোমার ভুল হয়েছে, তোমার দৃষ্টি ভুল, তোমার আনন্দ ভুল, তোমার বুক চিরে রক্ত দেওয়া ভুল, এই সজ্জা ভুল, এই শয্যা রচনা ভুল, সব ভুল, সব ভুল!' কী করে বলব? কী করে বলব, 'রতনের মায়ের অহংকৃত বাক্যগুলি মিথ্যা, তার এতদিনের এই তপস্যা মিথ্যা, তোমারও তাই। বিশ্বাস, তপস্যা, ধ্যান-ধারণা, সব মিথ্যা!'

"ভগবানকে আজ আমি বিশ্বাস করি। আপনিও করেন। বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভগবান-বিশ্বাসী, যিনি ভগবানকে না দেখেন, প্রত্যক্ষভাবে জানেন, তাঁর সাহচর্যে আপনি ধন্য, তাঁর স্পর্শ আপনি লাভ করেন। রামধুন গানও করেন। আরতি দেবী, তাই অসংকোচে বলছি যে, ভগবানই সেদিন রক্ষা করেছিলেন; আমার কথাটা তিনিই তাকে বলে দিয়েছিলেন।

[illegible]রাত্রে আমি মড়ার মতই চোখ বুজে পড়ে ছিলাম। অন্য পথ ত ছিল না। লিখতে ভুলেছি, তার আগে ভিক্ষুকের বেশ ছাড়িয়ে আমাকে নতুন ধোলাই-পেটা কাপড়-জামায় রাজবেশ পরিয়েছে। যাক। আমি খেয়ে ওই ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ কর-লাম। আরতি দেবী, এই ভিক্ষা-দশাতেও আমার কাছে কয়েকটা ওষুধ থাকত। তার একটা হল যন্ত্রণা উপশমের অ্যাসপিরিন জাতীয় ট্যাবলেট; আর থাকত জোরালো ঘুমের ওষুধ। খেয়ে ফুটপাথে বা যেখানে যেদিন হক শুয়ে পড়তাম। সেদিন ঘুমের দুটো ট্যাবলেট খেয়েও ঘুম আসেনি। স্নায়ু শিরা বোধ করি এমন প্রবল উত্তেজনায় চঞ্চল অধীর হয়ে উঠেছিল যে, ওই দ্বিগুণ মাত্রায় ঘুমের ওষুধেও ঘুম আনতে পারেনি। ছিল একটা আচ্ছন্নতা মাত্র। তার মধ্যেই স্পষ্ট বুঝলাম—আলোর ছটা। চকিতের জন্য চোখ মেলে দেখলাম, সে সেই মনোহর সজ্জায় সেজে মাটির প্রদীপে ভর্তি তেল দিয়ে প্রদীপ হাতে ঘর ঢুকছে। কাঠের পিলসুজটা টেনে কাছে এনে, প্রদীপটা বসিয়ে সলতেটা আরও উস্কে দিল। তার পর কাছে বসল। আমার মুখের দিকেই চেয়ে আছে সে, আমি চোখ বন্ধ করলাম সভয়ে। তাতেও বুঝতে পারলাম, কারণ তার ওই প্রদীপের শিখার দীপ্তি আমি চোখের পাতার নীচ থেকেই অনুভব করছিলাম; এবং তার উষ্ণ নিশ্বাস পড়ছিল আমার মুখের উপর। একসময় চোখের পাতার উপর আলোর দীপ্তি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল মনে হল; বুঝলাম আরও উস্কে দিয়েছে প্রদীপের শিখা। তার পর অনুভব করলাম আরও দীপ্তির সঙ্গে উত্তাপ। সে-দীপ্তি এত যে, বন্ধ চোখের অন্ধকার যবনিকা গাঢ় লাল রঙে রাঙা হয়ে উঠল। সব আচ্ছন্নতা তখন কেটে গিয়েছে আমার।

"বাইরে থেকে বিড়বিড় কথা ভেসে আসছে। বাইরে বোধ হয় রতনের মা দাওয়ার উপর বসে বকছে। 'ওই সীতা নাম! ও আমি কালই পাল্টাব। পাল্টাব। পাল্টাব। পাল্টাব। জনমদুখিনী সীতা। আমি তখন বারণ করেছিলাম। রতন শুনলে না। উঁহু! সীতাহরণের পালাটা নয় এই রতনের যুদ্ধে হারানোতে শেষ হল! অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেল। এই বেরতো, বুক চিরে রক্ত দেওয়া, এর চেয়ে একালে অগ্নিপরীক্ষা কী হবে? কিন্তু তারপরেতে আবার বনবাস সীতার। উঁহু, উঁহু, ও-নাম আমি কাল পাল্টাব। পাল্টে তবে জলগ্রহণ করব!'

"তারপর একটু চুপ করলে। আবার শুরু করলে, 'বউ! অ বউ! শুনছিস! কথা কইছিস না দুজনায়? রতন ঘুমুচ্ছে না কি? ঠেলে তোল না আবাগী! লজ্জা লাগছে? মরণ তোর লজ্জার। অ-বউ!'

"পাশের ঘরের কেউ যেন বললে, 'ঠাকরুন, তোমার কি আক্কেল-বুদ্ধি কিছু নেই গা?'

"'কেনে গা? অন্যায় কী বলছি?'

"'বলছ না? বলি, মা ঘরের দোর গোড়ায় জেগে বসে থাকলে বউবেটায় কথা কয় কী করে গা?'

"'তাতে কী হয়েছে। আমি চোখের মাথা খেয়ে চোখে দেখতে পাই না—'

"'এইবার কড়া কথা বলব।'

"'তা বল না। আজ আমার আনন্দ। আজ ঝাড়ু মারলেও সইব-লা তুলসী। বল।'

"'বলি কানের মাথা ত খাওনি? শুনতে ত পাও! না কী?'

"বুড়ী বললে, 'ওই দেখ! এটা ত মনে হয়নি তুলসী—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি এই শুলাম। আমার চোখের পাতায় লক্ষ্মণের চোদ্দ বছরের ঘুমের মত এই দু বছর দশ মাসের ঘুম জেগে আছে। শুয়ে জেগে থাকতাম, আর মনে মনে বলতাম ভগবানকে, কখনও বউকে, শেষে আমার সতী-অহংকার এমনি করে খান খান হয়ে গেল? ভগবান ত কথা কয় না তুলসী। বউ বলত, কখনও না। দেখবেন আপনি!'

"হাসলে বুড়ী। তারপর বললে, 'তুলসী, এই আমি শুলাম লা। দেখ না এখুনি ঘুমিয়ে যাব!'

"আরও কতক্ষণ পর। আর আমি থাকতে পারিনি। হাত জোড় করে উঠে বসেছিলাম। মেয়েটি নড়েনি, নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে যেমন ঘুমন্ত আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, তেমনিই তাকিয়ে রইল। আমি কিছু বলবার আগেই সে মৃদু কঠিন কণ্ঠে বললে, 'তুমি কে? তুমি ত সে নও!'

"কথার সূত্র পেয়ে আমি বেঁচে গিয়ে-ছিলাম—হাতজোড় করেই বলেছিলাম, 'আমি ক্ষমা চাচ্ছি। অপরাধের আমার শেষ নেই। কিন্তু আমি বলবার সময় পাইনি! কখন বলব?'

"'আমরাই দিইনি।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল সে। তারপর বলেছিল, 'অনেক-ক্ষণ একদৃষ্টে না-দেখে আমিও বুঝতে পারিনি। এমন মিল!'

"'হ্যাঁ। রতনও বলত, হয়ত দু তিন চার পুরুষ খুঁজলে এক রক্ত মিলবে। বামুনের ঘর ত! তা ছাড়া দাড়িগোঁফ হয়ে অমিল যেটুকু ছিল, ঢাকা পড়ে গেছে।'

"'আপনি তাকে জানতেন? আপনি তা হলে চাটুজ্যে সায়েব? সেও লিখেছিল একবার একখানা চিঠিতে।'

"'হ্যাঁ। আমিই সেই। তার খবর এনেছি আমি।'

"'বুঝেছি সে-খবর! সব ভুয়ো হয়ে গেল।' দরদর ধারায় জল নেমে এল এবার তার দু চোখ বেয়ে।

"আমি বলেছিলাম, 'এইবার বাড়ির সবাই ঘুমিয়েছে মনে হচ্ছে। আমি চলে যাই।'

"'না। কাল যাবেন। আমি গঙ্গার জলে ডুবে মরব। গঙ্গার জলই ভাল। অপমৃত্যুর পাপ ওই জলের পুণ্যে খণ্ডাবে। আপনার সঙ্গে তার আগে খুব ঝগড়া করব। তা হলে কোন কথা উঠবে না। আমার ডুবে মরাতেও না, আপনার চলে যাওয়াতেও না।'

"মুহূর্ত পরে উপরের দিকে মুখ তুলে অসহায়ের মত যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেছিল, 'কিন্তু ওই হতভাগী বুড়ী? হে ভগবান!'

"রাত্রি-অবসান আসছিল। জীবনের অন্ধকার ঠেলে বেরিয়ে আসতে হয়, দিনের আলো যথানিয়মে রাত্রির অন্ধকার মুছে দিয়ে আপনি এগিয়ে আসে। পৃথিবীর ঘোরার নিয়মে ওর একচুল এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। সকালবেলা পর্যন্ত কেঁদে, চোখ মুছে, বেরিয়ে গেল, যাবার সময় বলে গেল, 'যা বলেছি। আমার মরার আগে আপনি যাবেন না।'

"আজ কানে বাজছে, বুড়ী জেগে বলছে, 'সুপ্রভাত সুসংবাদ। আমার সতীগৌরব রেখেছিস মা, তার জন্যে আর এক বছর বেরতো বাড়ালাম। তোর গৌরব বাড়ুক মা। তোর পুজোর প্রচার হক। আমার কাল নাই, ক্ষমতা গিয়েছে, নইলে ধ্বপেচী মাথায় করে গাঁয়ে নগরে বলে বেড়াতাম, দেখ গো দেখ, মায়ের মহিমা দেখ!'

"একজন কেউ বউটিকে বলেছিল, 'ও বাবাঃ, মুখ চোখ ফুলে যে বউ! সারারাত বুকে মুখ রেখে কেঁদেছ মনে হচ্ছে?'

"বউটি উত্তর দিয়েছিল, 'সুখের দিনে দুখের কথা যে বড় মিষ্টি ভাই।'

"আমি মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলাম। রতনকে পিঁপড়েতে খেয়ে ফেলত, ফেলত, আমি তাকে মেরে নিমিত্তের ভাগী হয়েছি। আবার এই বউটির মৃত্যুর সকল দায় পড়বে আমার উপর।

"বসেইছিলাম। চা খেয়েছিলাম। বউটি [illegible] দিয়েই বলেছিল, 'স্নান করে পুজো করতে হবে। না জানেন, বই দেখে পড়তে পারবেন ত! গীতা আছে, চণ্ডী আছে নইলে বুড়ী কুরুক্ষেত্র ত করবেই, হয়ত সন্দেহ করবে। পুজোর আগে জল খেতে পাবেন না। চাইবেন না যেন!'

"মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে শুধু একটু হেসেছিলাম। দিনের আলোতে দেখলাম তাকে। হ্যাঁ, রতন বউ বউ করত, একে রাজ-রানীর সুখে সুখী করবার জন্যে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল, সে মিথ্যে নয়, সে তার মোহ [illegible]য়!

"কিছুক্ষণ পর ওই মা এসে বসেছিল [illegible]ছে।

"গায়ে হাত বুলিয়ে, বুকে জড়িয়ে ধরে [illegible] আবোল-তাবোল কত কথা। 'সেই কথাটা [illegible]ন আছে? সে ঘটনাটা? সেইটা?' কখনও [illegible]সি, কখনও বেদনার্ত দীর্ঘনিশ্বাস, সে [illegible] জীবনানন্দের আশ্চর্য প্রকাশ!

"হঠাৎ মুখে হাত বুলিয়ে বলেছিল, [illegible] তুলসী বলে, ওই বউয়ের দাড়িওলা মানায় না ঠাকরুন। আর এমন ছেলে, কটা চোখ, কটা রঙ, কোট পেণ্টুল পরলে সায়েব সায়েব লাগবে। দাড়িফাড়ি কামাতে বল। তা আমি বলি, ওরে, এ আমার শ্বশুরকুলের সাতপুরুষের দাড়ি! ওই দাড়ি রেখেছে বলেই চণ্ডী গীতা পড়ে পুজো করে, নইলে সব ভেসে যেত। এ তান্ত্রিক-বংশের দাড়ি।'

"বউটি এসে বলেছিল, 'মা, তোমার ছেলেকে নিয়ে গঙ্গাস্নান করে আসি। আর পথে কালীতলা-মদনমোহনতলায় পেনাম করে আসব।'

"'হ্যাঁ-হ্যাঁ। তাই যাও। তোমরা দুজনেই যাও। আমাকে নিয়ে হাঙ্গামা হবে। যা বাবা। যা।'

"আমার বুক কেঁপে উঠল থরথর করে। হে ভগবান—তবে কি—?

"মেয়েটি বললে, 'এস।' আমাকে অসহায়ের মত যেতেই হল। পথে বেরিয়ে মেয়েটি বললে, 'ভয় নেই, এখনি আমি ডুবে মরতে যাচ্ছি না। আপনার কাছে সব বিবরণ শুনব। ঘরে ত হবে না। বুড়ী কান পেতে আছে। ঘরে ঘরে কান খাড়া হয়ে রয়েছে। চলুন, গঙ্গার ধারে বসে শুনব।'

"যেখানটায় সেদিন আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল, ঠিক সেইখানটিতেই বসে বলে-ছিলাম রতনের কথা। মেয়েটি নড়েনি চড়েনি, গঙ্গার স্রোতের দিকে মুখ করে চোখ রেখে শুনে গিয়েছিল। রতনের প্রশংসা শুনে একবার, আর-একবার তার মৃত্যুর কথা শুনে, দুবার নীরবে কেঁদেছিল।

"আমিই বলেছিলাম, 'আমি আর উপায়ান্তর না দেখে, ওই পিঁপড়েরা তাকে লক্ষ দংশনে ছিঁড়ে খাবে, নৃশংস যন্ত্রণা সে ভোগ করবে, এ দেখে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। গুলি করেছিলাম। আমাকে ধরিয়ে দিতে চান দিন, ফাঁসি যেতে আমার কোন দুঃখ হবে না। বিশ্বাস করুন, কোন—।'

"কথা কেড়ে নিয়ে বউটি বলেছিল, 'না। তা হলে আপনি আমাদের খবর দিতে আসতেন না। খুঁজতেন না। কাল আমাকে অবসর দিতেন না আপনাকে ভাল করে দেখতে, ভুল ভাঙতে।'

"তারপর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

"বহুক্ষণ পর অসহনীয় হয়ে উঠেছিল আমারই; বলেছিলাম, 'উঠুন।'

"'দাঁড়ান, ভাবছি!'

"'কী?'

"'কী করব আমি! আমি ত এখনিই ঝাঁপ দিয়ে মরতে পারি। কিন্তু তারপর? ওই বুড়ী? ভার ত আমার! কী বলে আপনাকে বলে যাব, আপনি ওর ভার নেবেন?'

"আমি বলেছিলাম, 'তার থেকে আমি পালিয়ে যাই।'

"'উঁহু'। ও-বুড়ী উন্মাদ হয়ে যাবে।' তার-পর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, 'সত্যি কথা বলতে—আমিও আর বাঁচতে পারব না। আমার সব মনের জোর যেন ভেঙে দুমড়ে মুড়ে-পড়া চালাঘরের মত মাটিতে শুয়ে গেছে। আপনি যতক্ষণ [illegible]ছেন ততক্ষণ যেন ধরবার একটা খুঁটি [illegible]ছি।'

"'তবে?'

"'আপ[illegible]ও দু-একদিন থাকুন। আমি ভা[illegible]

"'কি[illegible]বেন না। বোধ হয় ভুলে যাচ্ছেন[illegible] সিঁদুর পরতে হবে, মাছ খেতে[illegible] সেজে থাকতে হবে। আ[illegible] ব্রাহ্মণ-ঘরের মেয়ে, বউ। তা[illegible]

"[illegible] সে বলেছিল, 'সে কি আমার মনে নেই? আছে।'

"'কী করবেন?'

"'সধবার বেশে আচারে পাপ আমার হবে না। বিধবা আমি স্বামী মরলেও হব না। সে গোপন কথা। আমার কুষ্ঠীতে ছিল বৈধব্য-যোগ, আর—দেখছেন ত আমার রূপ! বাবা বলতেন, এত রূপ যার, তার ভাগ্য এই! ওকে যার তার হাতে দিতে পারব না। দিলেও ত সে বাঁচবে না। তাই বিয়ের আগে শালগ্রাম শিলার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তোকে পুরুষোত্তমের হাতে দিলাম মা। এইবার যার হাতে দিয়ে লৌকিক বিয়ে দেব, সে হবে ওঁরই প্রতিনিধি। বাঁচে ত এতেই বাঁচবে। না বাঁচে ত কী করব! কিন্তু ওই কুষ্ঠীর লিখন ওই মঙ্গল বেটার অণ্টমে অ[illegible]র রোধ আমি করে দিলাম। বিধবা তুই কোন দিন হবিনে! ওর জন্যে আমি ভাবিনে। এ-কথা আমার স্বামীও জানতেন না। আপনাকে বললাম। আচ্ছা—'

"হঠাৎ সে বলে উঠেছিল, 'আচ্ছা—।' কী যেন হঠাৎ মনে হয়েছিল, বলতে গিয়ে-ছিল, কিন্তু থেমে গেল!

"'বলুন?'

"'আপনি ঠিক এমনি করে আমাদের সঙ্গে থাকুন না!'

"স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি।

"'রতন সেজে?'

"'হ্যাঁ! অন্তত ওই বুড়ী যতদিন আছে। যেমনভাবে কাল রাত্রি থেকে আমরা রয়েছি, তেমনি ভাবেই থাকব। আপনাকে মনে হচ্ছে বড্ড চেনা, বড্ড আপনার।'

"মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিল, 'মনে হচ্ছে, সে ছিল আমার পুরুষোত্তমের অক্ষম প্রতিনিধি, আপনি, আমার—তাঁর প্রতিবিম্ব!'

"আমি অবাক হয়ে চেয়েছিলাম তার দিকে।

"সে বলেছিল, 'শুনেছি মধ্যে মধ্যে কায়া ধরে ছদ্মবেশে ভগবান ভক্তের সেবা করেন, হাসেন, কথা বলেন, কৌতুক করেন। ধরা দেন

।। আপনি ভগবানের ছায়া হয়ে আমাদের
া দিন না। আপনি আমাদের হন,
ামাদের বাঁচান, আমরা আপনার হব, শুধু
ামাদের কায়ার কোন সম্পর্ক থাকবে না,
ম্পর্ক থাকবে আর সবের! নতুন কালে
নেছি, ছেলে মেয়েতে এমন বন্ধুত্ব ত হয়!
খানে অবিশ্যি দুজনে ... বন্ধু।
ামি ভটচাজ-বাড়ির ... বউ। বন্ধু
ামাদের হয় না, হতে ... আপনি হবেন
ামার পুরুষোত্তমের প্র... এর পর
মি' বলে শুরু করতে ... এসেছ,
গবান সাজ, পুত্রহীনার ... স্বামী-
ীনার স্বামী হও, মানুষ ...
র না?' আমি হাঁ করে ...
র মুখের দিকে। কথা শুনে ...
ারিয়ে ফেলেছিলাম, তাকে দেখে ...
রা হচ্ছিলাম। তার মুখের সে ...
ীপ্তি—! তার চোখে দীপ্তি, মুখে দীপ্তি
সিতে দীপ্তি, সে আশ্চর্য!

"মেয়েটি হেসে বলেছিল, 'বল?' তার
বু দৃষ্টি দেখে বলেছিল, 'কী দেখছ এমন
রে? আমার রূপ? দু চোখ ভরে দেখ,
...! এ-রূপ তোমার জন্যে। তোমার
শ্রয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব, নির্ভয় হব,
ামি আরও রূপসী হব। সাজব। তোমার
র আমার মধ্যে পিলসুজে রেখে জেলে
ব ঘিয়ের প্রদীপ।'

"সেই দিন গঙ্গার জলে স্নান করবার
ম প্রবীরের নাম-পরিচয়, প্রবীরের শিক্ষা-
ক্ষা সব ডুবিয়ে দিয়ে সত্যিই রতন হয়ে
রে এসেছিলাম। বুড়ী খুব তিরস্কার
রেছিল, বউটি মুখরার মত জবাব দিয়ে
েছিল, 'তোমার ছেলেকে আমি খুঁটে
ধেছি, বেশ করেছি। চোখ গিয়েছে, দিলে
মি রাখতে পারবে। ভাবনা, ভেবেই ত
ল, আমি থাকতে ভাবনা কিসের শুনি।
তো বামুনীকে জান না?'

"বুড়ী চিৎকার করে উঠেছিল, 'না-না।
-নাম তুই মুখে আর নিবি না হতভাগী।
ই নামের জন্যে আবার হারাতে হবে।
ীতার বনবাস। ও-নাম আর নয়। ওরে
চন, এখুনি নাম পাল্টা। এখুনি।'

"আমার কী জানি কেন আরতি দেবী
তি' নামটা মনে পড়ে গেল। বিদ্যুৎ চমকের
ত। তার কাহিনী মনে পড়ল। আমি আজ
ম হয়ে অতনু হয়ে গেছি। ও হক
তি'। তাই বললাম, একটু ঘুরিয়ে বললাম,
, মরে বেঁচেছি। মদন তাই বেঁচেছিল।
র এই রূপ, থাক না মা ওর নাম রতি!'
বুড়ী বলেছিল, 'খুব ভাল! খুব
ল। রতি! রতি!'

"রতি হেসে বলেছিল, 'আজ ফুল কিনে
ন ... মালা গেঁথে তোমাকে সাজাব,
মি সাজব।'

"সত্যিই সেজেছিল। মাঝখানে জ্বলন্ত
প্রদীপের আড় রেখে সে কী হাসি। সে কী
মাধুরী তার মুখে!

"রাত্রির পর রাত্রি।

"আমি ধরলাম রতনের কাজ। ইঞ্জিনিয়ার
ছিলাম, যন্ত্র যথেষ্ট বুঝতাম। যুদ্ধের সময়
রতনের কাছে কাজ শিখেছিলাম। কাজ
আবিষ্কার করলাম। কারও কারখানায়
মিস্ত্রীর কাজ করব, সেটা ভাল লাগেনি।
সকালে বের হতাম রাস্তায়। কাঁধে যন্ত্রের
ঝুলি। হাঁটতাম সেণ্ট্রাল অ্যাভেন্যু ধরে,
পথে কারুর মোটর অচল দেখলেই গিয়ে
দাঁড়াতাম।

"'দেব মেরামত করে?' কাজ অনুযায়ী
দাম বলতাম। মানুষ অনুযায়ী দাম বলতাম।
মানুষ অনুযায়ীও বলতাম।

"মেরামত করে দিয়ে গাড়ি ঠিক চলছে বা
চলবে দেখিয়ে দেবার জন্য তাদের সঙ্গেই
চলতাম। পথে অচল গাড়ি দেখলে সেখানা
থেকে নেমে এখানার পাশে এসে দাঁড়াতাম।

"'দেখব গাড়িটা? চলছে না? দেব
মেরামত করে?'

"চার টাকা থেকে দশ টাকা পর্যন্ত! দিনে
অন্তত চার-পাঁচখানা গাড়ি—পঁচিশ টাকা
রোজকার হত। বাগবাজারের ওই বস্তি থেকে
শোভাবাজারে এলাম। একখানা গোটা বাসা।
আপনি দেখে এসেছেন!

"রতি কাজ ছাড়ল, রান্নার কাজ। দিনে
দিনে সত্যই রূপসী হল। আমি এই শেষ
কালে অস্বীকার করব না আপনার কাছে,
আমি শুধু করুণা করে এক সন্তানহারা
হতভাগিনী অন্ধ বৃদ্ধাকে পুত্রশোকের
নিদারুণ আঘাত থেকে রক্ষা করবার জন্যই
মিথ্যা তার পুত্র-পরিচয়ের দুর্ভাগ্য মাথায়
করে আত্মোৎসর্গ করিনি; আমি রতনকে

যে-যন্ত্রণা থেকে রক্ষার জন্য গুলী করে থাকি, তারই শোধ দিতে ওখানে এমন করে থাকিনি। রতির ওই রূপ, ওই রূপে আমি জ্যোতির্লেখার কাছে অদৃশ্য কোন বন্ধনে বাঁধা পড়েছের মত থেকেছি, ঘুরেছি! রতি রতি নয়, ও জ্যোতি! ওর দাহিকা শক্তি নেই। থাকলে পুড়ে যেতাম। দিনের পর দিন, পুষ্টিতে তুষ্টিতে, স্বাস্থ্যে, প্রসাধনে ও আরও রূপসী হয়েছে। রাত্রির পর রাত্রি আমরা পাশাপাশি মুখোমুখি বসে থেকেছি, ওকে দেখেছি। ও হেসেছে, ওর হাতখানি আমার হাতে থেকেছে। তারপর হঠাৎ উঠে বলেছে, 'শুয়ে পড়—আমি যাই।' ও শুতে পাশে একখানা ছোট ঘরে, পুজোর ঘরে। এ-ঘরে দেখেছিলেন, একখানি তক্তাপোষে একজনের বিছানাই ছিল। আমার কোন অনুশোচনা নেই। ওরও ছিল না। একদিন বলেছিলাম, যে নেয় সে সব সময় দাতার চেয়ে ছোট নয়। ও সেই গ্রহীতা। অসংকোচে নিয়েছে। অর্থ নয়, আমার আত্মদান। মানে আমার নিজেকে দেওয়া।

"একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমার এই মিস্ত্রী সেজে থাকতে কষ্ট হয়?'

"বলেছিলাম, 'না।'

"খুব খুশী হয়েছিল। বলেছিল, 'চিনতে আমার ভুল হয়নি। তুমি আমার পুরুষোত্তমের ছায়া।'

"সেই দিনই কথাটা মনের মধ্যে আলোচনা করতে করতে ওকে বলেছিলাম, 'এক কাজ করব রতি?'

"'কী?'

"'যুদ্ধ মিটে আসছে। আমার বিরুদ্ধে সেই অফিসারকে মারার কোন প্রমাণও নেই। আমি এইবার কোথাও চাকরি নেব? মাকে একটা কিছু বললেই হবে!'

"সে বলেছিল, 'না। তা হলে...বুঝিয়ে ঠিক তোমাকে বলতে পারব না আমি, তাহলে তুমি আর আমার পুরুষোত্তমের ছায়া থাকবে না। আমি তখন লোভের পাপে সত্যি সত্যিই তোমার রক্ষিতা হয়ে যাব। না।'

"তারপর বলেছিল, 'তোমাকে আমি ভালবাসি। সত্যিই বাসি। ওই ভগবানের ছায়া বলে মনে করে নিয়ে বাসি। কিন্তু তোমার ওপর আমার লোভ নেই।'

"এই শেষ আরতি দেবী। এতটুকু কিছু গোপন করিনি! এত কথা আপনাকে লিখতাম না। সেদিন শ্মশানে দেখা হলেও লিখতাম না। কিন্তু দেখলাম, সে-আপনিও আর নেই। খবর পেয়েছিলাম, আপনি মহাত্মাজীর সঙ্গে নোয়াখালি গেছেন, তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন। সেদিন ভাল দেখলাম, তাঁর সাহচর্যের ছায়া পড়েছে আপনার উপর। মুখেচোখে বেদনা দেখেছিলাম, ক্রোধ দেখিনি। তাই লিখলাম। আপনি এখন বুঝতে পারবেন। আর একটু ও-পৃষ্ঠায় দেখুন।"

* * *

উদাস দৃষ্টিতে জানালার মধ্য দিয়ে ভাদ্রের সেই দিনটির রৌদ্রালোকিত আকাশের দিকে আরতি চেয়ে বসে রইল। ক্রোধ নয়, ঘৃণা নয়, বেদনা, শুধু বেদনা। অন্তর ভরে গিয়েছে। শরতের আমেজ লাগা ওই গাঢ় নীল আকাশের চারিদিকে ছড়ান অজস্র কুষ্ণ-শুভ্র মেঘপুঞ্জের মত পুঞ্জে পুঞ্জে বেদনায় যেন ভরে গিয়েছে অন্তর! চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল টপ টপ করে! মনে মনে বলতে গেল, প্রবীর তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু আগে পৃষ্ঠাটা ওল্টাল।

"পরশু বন্ধা মারা গেলেন। আপনি দেখেছেন, মুখাগ্নি করেছিল সে-ই। শেষকালে, আত্মীয়-বান্ধব অন্য জন্মের বান্ধব বলে আমাকে দিয়েও দেওয়ালে আগুন। আমি তখন ভাবছিলাম, এরপর? রতিকে সে-প্রশ্ন করবার সময় হয়নি, পাইনি। কিন্তু ওর মুখচোখ দেখে বুঝেছিলাম, এ-ভাবনা সেও ভাবছে। ভাবছে, এরপর? আপনি লক্ষ্য করেননি, সে কী দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল গঙ্গার দিকে। সে যেন গঙ্গাসাগর পর্যন্ত প্রসারিত উদাস দৃষ্টি! কী খুঁজেছিল বুঝতে পারিনি। বাড়িতে ফিরে সন্ধ্যার সময় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'রতি।'

"'বল?'

"'কী ভাবছিলে এমন করে?'

"'কাল বলব।'

"'আমি বলব?'

"আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল। রতির এই প্রথম কান্না। প্রথম দিন রতনের মৃত্যু-সংবাদে কয়েক ফোঁটা চোখের জল সে ফেলেছিল, কিন্তু সে কান্না নয়। এ কান্না, সে কী কান্না। কাঁদতে কাঁদতেই উঠে চলে গিয়েছিল। তারই মধ্যেই কোন রকমে বলেছিল, 'কাল। কাল!'

"পুজোর ঘরে গিয়ে শুয়েছিল।

"আমিও শুয়েছিলাম। ঘুম আসেনি। শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে উঠে দেখলাম রতি নেই। পেলাম একখানা চিঠি। লিখেছে, 'সারারাত কাঁদলাম। মা মরল। বন্ধন কাটল। আর ত কোন ধর্মের কোন ন্যায়ে আমি তোমাকে বেঁধে রাখতে পারব না। না, পারব না। তোমাকে এইভাবে বেঁধে রাখব কী বলে? আমার অধিকার নেই। বর্ষা গেল, এইবার যে মেঘ কাটিয়ে সূর্যচন্দ্রের মত উঠবার সময় হয়েছে। আমার ত সঙ্গে যাবার শক্তি নেই, উপায় নেই। তাই সুতোকাটা ঘুড়ির মত ভাসলাম। তুমি আমার পুরুষোত্তমের ছায়া। বহুভাগ্যে ও-ছায়া মেলে, মিলেছিল আমার; এবার কাল হয়েছে, আমাকে ও-ছায়া ছেড়ে সরতে হবে। [illegible] বুঝতে পার না, আমি পারি, তুমি আ[illegible] কাছে ত তোমার ইচ্ছায় নেই; তিনি [illegible] য় আছেন, তুমি তাঁর ইচ্ছায় তাঁর [illegible] ত আমার উপর নিজেকে মেলে রে[illegible] আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন [illegible] র কষ্ট হচ্ছে। তাই চললাম। [illegible] দেখেছিলে, কোন দিকে তাকি[illegible] গঙ্গাসাগরের দিকে। ভরা[illegible] ন, কুটো পড়লেও সেখানে টান[illegible] খানে কামনা নিয়ে যাচ্ছি ত! ক[illegible] না, সে বলব না। আমায় খুঁজো না!.....শেষে একটা কথা বলি। তুমি আমার পুরুষোত্তমের ছায়া। তোমার কোন গ্লানি নেই, অন্যায় নেই, আমি জানি। তবুও লোকে যখন তোমার কথা শুনবে—তখন আমার স্বামীকে রক্ষা করবার জন্য অত্যাচারী সায়েবকে যে তুমি মেরেছ তা নিয়ে কথা তুলবে। বিচার করতে চাইবে। তুমি পিঁপড়ের কামড়ে নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই দিতে তাকে যে গুলী করেছিলে সেটা ন্যায় কি অন্যায়। পরীক্ষা সংসারে ভগবানকেও দিতে হয়। তুমিও দিও। তুমি সব আগে গিয়ে বিচার চাও। বল, আমার বিচার কর! আজ দেশ স্বাধীন। এ-দেশের যে-দণ্ড আসুক, তুমি পিছুবে কেন? মুক্তি তুমি পাবে। না পাও, তাতেই বা কী? ন্যায়ের অবতার ওই ত বসে আছেন বেলেঘাটায়। তাঁর কাছে গিয়ে বল, বিচার কর! ইতি রতি।'

"আবার পুনশ্চ লিখেছে, 'তুমি যেন রতি নামে আর কাউকে ডেকো না।'

"আমি মহাত্মাজীর কাছেই যাচ্ছি আরতি দেবী, আত্মসমর্পণ করতে। ইতি।

প্রবীর।"

* * *

বিশ্ব পৃথিবী ঝাপসা হয়ে যেন কুয়াশায় ঢেকে গেল!

তোমার যাত্রা শুভ হক প্রবীর। নেবে বই কি; যা করেছ, তার বিচারে যা প্রাপ্য তা নেবে বই কি! কঠিনতমই যদি হয়, আমি কাঁদব!

আরতি প্রতীক্ষা করে রইল। হয় মুক্তিতে মালা দিয়ে স্বাগত জানাবে। নয় শবাধারের জন্য মালা নিয়ে যাবে, দিল্লীর লালকেল্লা পর্যন্ত।

আকাশ রৌদ্রালোকে ঝলমল করছে। শিবাস্তে পন্থানঃ।

কবিতা

মানুষ যা চেয়েছিল

জীবনানন্দ দাশ

গোধূলির রং লেগে অশ্বত্থ বটের পাতা হতেছে নরম ;
খয়েরী শালিখগুলো খেলছে বাতাবী গাছে—
তাদের পেটের সাদা রোম
সবুজ পাতার নীচে ঢাকা পড়ে একবার পলকেই বার হয়ে আসে,
হলুদ পাতার কোলে কেঁপে কেঁপে মুছে যায় সন্ধ্যার বাতাসে।
ও কার গোরুর গাড়ি রয়ে গেছে ঘাসে ঐ
পাখা মেলে ফড়িঙের মত।
হরিণী রয়েছে বসে নিজের শিশুর পাশে বড় চোখ মেলে ;
আঁকা-বাঁকা শিং ছুঁয়ে তাদের মেরুন গোধূলির
মেঘগুলো লেগে আছে ; সবুজ ঘাসের পরে
ছবির মতন যেন স্থির ;
দিঘির জলের মত ঠাণ্ডা কালো নিশ্চিন্ত চোখ ;
সৃষ্টির বঞ্চনা ক্ষমা করবার মতন অশোক
অনুভূতি জেগে ওঠে মনে।...
আঁধার নেপথ্য সব চারিদিকে—
কূল থেকে অকূলের দিক নিরূপণে
শক্তি নেই আজ আর পৃথিবীর—
তবু এই স্নিগ্ধ রাত্রি নক্ষত্রে ঘাসে ;
কোথাও প্রান্তরে ঘরে অথবা বন্দরে নীলাকাশে :
মানুষ যা চেয়েছিল সেই মহাজিজ্ঞাসার শান্তি দিতে আসে।

প্রবাসী চলে এসো ঘরে

বিষ্ণু দে

আপন লাগে কি এবারে গ্রামের গলি ?
হাওয়া অনুকূল, প্রবাসীও ফেরে ঘরে
নিজবাসে ফেরে, শান্তিতে ঘুমে হৃদয়,
অনঙ্গ ঘুমে সকল অঙ্গ ভরে।
পরোক্ষে দেখি মাধুরী, চন্দ্রাবলী !

তবুও মাথুর দেশে কালে সন্তত,
জন্মপ্রবাসী কেন আমাদের হৃদয় ?
আমি অন্তিমে, অঙ্গনে অন্তত
তোমার প্রসাদ বিলাও, চন্দ্রাবলী।

দুহু কোরে একি দোঁহে কাঁদা বিচ্ছেদে,
বিপুল পৃথিবী এবং একটি হৃদয় !
সাধে ও সাধ্যে একে-দশে ভেদাভেদে
সারাটা দেশে কি মাথুর, চন্দ্রাবলী ?

দুজনেই আছি একটি আশায় বাঁধা,
এক সাধনায় মিলেছি অনেক হৃদয়,
সকলেই জানি প্রবাসে মেলে না রাধা।
ঘুচুক বিরহ অনেক সাধাসাধা.
তুমি আমি দোঁহে দেখব, চন্দ্রাবলী।

স্মরণীয়

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

॥ এক ॥

বেল চাঁপা রজনীগন্ধায়
সড়কের হাওয়ায় বাগান;
হঠাৎ স্নায়ুরা করে স্নান
তোমার সন্ধ্যায়।
তুমি কি কোথাও আলো জ্বালো?
কোনো ট্রামে নামবে কি এসে?
পথ যেন এখানে ফুরালো
তোমায় আবার ভালোবেসে।

॥ দুই ॥

ফুলের দোকানে কিনি ফুল,
ভুলে যাই ঘরে যেতে হবে;
কবেকার চুলের সৌরভে
করি আজও ভুল।

॥ তিন ॥

ভুল কি না বলতে কে পারে—
আমি যদি রাখি ফুল আমার প্রাচীন শবাধারে।

জ্বরে

অরুণ মিত্র

দিনের জানলাটা কোন্ সময়
মস্ত এক কালো আকাশ হয়ে গেছে
আমি শুয়ে শুয়ে ওড়ার আওয়াজ শুনছিলাম
আমার নাড়ীতে গুনছিলাম দূরে আলোর ধাক্কা
হঠাৎ সব চুপচাপ রঙমোছা
কখন নিঃসাড়ে বৃষ্টির ছাউনি পড়েছে চারধারে।

আমার জ্বরের বিছানা থেকে ডাকি
ধুকপুকে পাখিটাকে
বিকেল তাকে সোনার জালে ধরে
অন্ধকারের মুঠোয় রেখে গেছে
সে বুঝি এখন পলকা ঘুমে আঁকড়ে রয়েছে
আমি ভাবি অতটুকু বুক
এবার কি বিদ্যুতে দাগা হবে,
উঁচু পিদ্দিমটা যেখানে মেঘের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়েছে
সেইদিকে তাকিয়ে কাঁপি।

তাকে ডাকি
এই ত তার সূর্যকে আমার এখানে বিছিয়ে রেখেছি
আমার হাতের আঁজলে তার শস্যের কণা জমা করেছি
তার ছায়াবটের ঝুরি
আমার মাটিতে নামিয়েছি।

বাঁচবার সাড়া যদি আসে সেজন্যে আমার অস্ফুট
হৃৎপিণ্ডের উপর করতল রেখে আমি উন্মুখ হয়ে থাকি।

অকাল অতসী

মণীশ ঘটক

অতসীর কাঁচ সবুজ পাতার ফাঁকে
ফুটিয়াছে দুটি হলুদবরণ ফুল,
অকালের ফুল, দেখিয়া [illegible] জাগে,
স্নিগ্ধ দরশ, হৃদয় হর[illegible]

শেষ আষাঢ়ের [illegible] মেঘ নভোতলে
এখানে [illegible] কৌতুকী ছায়
হাসিয়া [illegible] হরায় কুতূহলে,
পুনঃ [illegible], একী লুকোচুরী

ফড়িঙেরা করে [illegible]মেলো ছুটোছুটি,
নবজাত ছাগশিশু উল্লাসে নাচে,
সবুজ পাতায় অতসীর ফুল দুটি
সহসা হেরিনু ডানা মেলে উড়িয়াছে।

সচকিত চিতে হেরি বিস্ময়ে অতি,
হলুদবরন ওরা দুটি প্রজাপতি!

বিশল্যকরণী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

যে-বিষে সর্বাঙ্গ জ্বলে, সঞ্চারিত শিরায় শিরায়
নয়নে, নখাগ্রকোণে, বিন্দু বিন্দু রক্তকণিকায়;
যে-বিষে আসে না মৃত্যু, আসে শুধু মৃত্যুর যন্ত্রণা,
জীবনের যত বিড়ম্বনা
ক্ষীণস্রোতে ফেনায়িত তরলাগ্নি স্নায়ুতে স্নায়ুতে
বিতৃষ্ণা ও বিষাক্ত বায়ুতে
শ্বাসরুদ্ধ পরমায়ু অনিঃশেষ কালের প্রহরী
সে-বিষ রেখেছি কণ্ঠে ধরি।

অতৃপ্ত তৃষ্ণার জ্বালা দহে সর্বক্ষণ
অভিশপ্ত দেহাধারে আমার এ অক্ষয় জীবন।
সূচিতীক্ষ্ণ বহ্নিমুখ নীলাভায় থরথর কাঁপে
জ্বলে পুড়ে ছাই হয় তাহারি উত্তাপে,
হৃদয়ে সঞ্চিত যত কামনার ধন
স্বপ্ন-সাধ-অতিক্রান্ত আমার এ জীবন-যৌবন।

এ-বিষে বিষম ব্যথা সে-ব্যথার বিশল্যকরণী
নিমেষে নিমেষে মৃত্যু, সে-মৃত্যুর যন্ত্রণাহরণ
ছিল মোর কুঞ্জবনে
ছায়াঘন নিরালায় একান্ত নির্জনে
রেখেছিনু সযতনে সবার আড়ালে
কুসুম চয়নে এসে কে যে কবে চরণ বাড়ালে
সেই দিকে অগোচরে, কে জানে সে-কথা—
দেখিলাম ছিন্নমূলে পল্লবিনী-লতা
ভূমিতলে পড়ে আছে বিশুষ্ক মলিন;
হেথায় সর্বাঙ্গে মোর বিষক্রিয়া বিরামবিহীন।

ঘরের আকাশ

হরপ্রসাদ মিত্র

...াছেতে, ফুলেতে, শস্যে,
জলে-স্থলে
...জার তুলোটে
এখনো সময়-ক... ...খে যায়
ভূমার কবিতা—
'সুন্দর' মা... ...ত।
'শান্তি' মা... সুন্দর।
মরণ-নি... ...যে যায় সে
মৃত্যুঞ্জয় প্রেম!

...াত ফুরোবার আগে ভোরে ... ...াতে ছায়াতে
দেয়ালে পুরনো ছবি;
কত দূরে নদীর বালিতে
চাকার গভীর দাগ রেখে রেখে
বনের কিনারা—
উজিয়ে গিয়েছে চলে
ভিন্ গাঁর গোযান-যাত্রীরা!

...ন্নার আঘ্রাণে, স্নানে, শব্দে, গানে কত যে ক্রেংকারে
জীবনের রাজহংস ডানা ঝাড়ে
প্রাত্যাহিক রোদে।
তারপর, বাসে ভিড়—
ঘাম-ঝরা প্রচণ্ড সকাল।
ঋতুর খেয়ালী-সংঘ গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ মিলিয়ে
এবং প্রত্যহ ফেরা সেই মত—
ভাঁটিতে উজানে
সময়ে বালির রঙ,
শ্রান্তি শান্তি
ঘরের আকাশে।

বাইশে শ্রাবণ : ১৩৬৪

দিনেশ দাস

কান্নার করুণ মেঘ আকাশে ঘন্নায়।
সূর্যের সিঁদুর-টিপ, তারার মটরমালা
লুকোল কোথায়?
মেঘের সমুদ্র ফেনোচ্ছ্বাস
আলো নেই, শূন্য দীপদান—
কোন্ আলো দেবে বলো আমাদের পথের সন্ধান?

একটি একটি করে অনেক বছর হল শেষ
শুধু জমে ঘৃণা, ভয়। সহস্র বিদ্বেষ
আমাদের পাকে পাকে বেড়ে ধরে,
জীবনের পুজোর প্রসাদে নিত্য ধুলো পড়ে।

আকাশ-পৃথিবী জুড়ে কী এক অদ্ভুত
বিয়োগান্ত নাটকের কালো যবনিকা:
ধোঁয়া-বৃষ্টি হয় চারিধারে।
তবু এই ধোঁয়া-ভরা মেঘের ওপারে
জাগে এক স্থির বিদ্যুৎ—
বজ্রগর্ভ আলোকের শিখা।

সে-আলোয় তোমারি ত নাম—
তোমারি নামেতে দেখি আলো হয়।
অন্ধকার ঝরে পড়ে কালো-কালো টসটসে
আঙুরের মত,
ঝরে পড়ে যত মিথ্যা ভয়!
আলো হয়, দিন হয়।
তোমার বৈশাখী আলো
শুভ্র স্ফটিকের মত জ্বলে—
জলে, স্থলে,
সমুদ্রে, আকাশে, শালবনে :
বাইশে শ্রাবণে॥

কাশফুলের কন্যা

গোপাল ভৌমিক

ভাবি সে আসবে ফিরে :
জীবনের উঠানটি ঘিরে
ফুটে উঠবে সন্ধ্যামালতীরা;
এ-দেহের শিরা উপশিরা
ভুলে যাবে সব ক্লান্তি, ভয়
দিনশেষে। আসবে প্রলয়
পরিচিত পৃথিবীতে, যার মুখরতা
লজ্জা পাবে দেখে তার মূক নিঃসঙ্গতা।

কিন্তু সে সতীর ব্যথা
এসেও আসে না; সময় অযথা
যায় কেটে
স্থূলে গান শুনে আর ভুল পথ হেঁটে।
জীবনের মহাফেজ
ঘুমোয় সারাটি দিন; যখন সতেজ
হয়ে আর কিছু চায়
দেখে সে হারিয়ে গেছে বনের ...

কখন একাকী :
সমবেত কণ্ঠে গান গেয়ে দেয় ফাঁকি
কায়া তার মনের উঠানে—
বীণা যদি না-ই বাজে, কোথা তার মানে!

লাজুক কিশোরী মেয়ে চায় তার গানে
মোহাঞ্জন এঁকে দিতে প্রতি প্রাণে প্রাণে।
নদী-তীরে কাশফুলে
দেখেছি সে দুলে দুলে
কতদিন দিয়েছে আভাস
আর এক পৃথিবীর; আজ সে-আকাশ
বিমলিন।
সীমিত পৃথিবী চোখে দিয়ে দূরবিন
মেলে দেখি গ্রহতারা।
সে-বালিকা গৃহহারা
কেঁদে ফেরে দূর দূরান্তরে
মূঢ় আমি চুম্বকের ঝড়ে।

...OVER... Cooch ...

মরু-স্বপ্ন

শ্রীকৃষ্ণধন দে

মেঘ আজ হায়, আমারে ভুলিয়া যায়,
ফুল আজ মোর বুকে না ফুটিতে চায়,
উপোসী মনের মেদুর স্বপনখানি
দূরের আকাশে ফোটে মৃগতৃষিকায়!
সাগর শুকাল জানি না কবে এ-বুকে,
চাঁদ সরে গেল মমতাহারানো মুখে,
শুধু যে তপন অসহ অনল জ্বালি
দিনের বাঁধনে আমারে বেঁধেছে হায়,
বন্ধু, নিরালা নীলিমা-স্বপন লয়ে
ফিরে যেতে চাই অতীতের স্নেহছায়।

সৃজনব্যাকুলা পৃথিবীর কলগীতি,
বধিরা রাত্রি, অধীরা দিবার স্মৃতি,
জলকর্দমে প্রাণের লাজাঙ্কুর
ধরণীর বুকে কবে মুখ তুলে চায়!
সেদিন আমার ঢেউ-ভরা যৌবন
উচ্ছল-কল-সঙ্গীত-সুমোহন,
অগ্নিগিরির লাভা-আভা-চন্দন
এঁকেছে এ-বুকে রাঙা ছবি তুলিকায়।

বন্ধু, আমার আকাশে ছিল যে তারা
জানি না কোথায় হল [illegible] পথহারা,
হয়ত তাদের ঝরে-যাও[illegible] আলোকণা
ঝিকমিক করে আজো [illegible] বালুকায়!
দিনের প্রদাহে যে-প[illegible] লায় ত্রাসে,
রাতের আঁধারে সে[illegible] ফিরে আসে,
উড়ে যেতে যেতে [illegible] ঝাপটায়।
আঁধি-ভরা কো[illegible] দিনে
কালো ঝড় [illegible] পথ চিনে,
নামে ক্যারা[illegible] মলিন সাঁঝে
বিস্মৃতিব[illegible] রের বালুকায়।

লুপ্ত এখানে জনপদমুখরতা,
বিস্মৃত কত নৃপতির [illegible]তিকথা,
কত পিরামিড কালের প্রবাহবুকে
মাথা তুলে যেন ঝঞ্ঝারে ধমকায়!
বন্ধু, আমার হারানো স্বপনটিরে
ঊষর বক্ষে কে দেবে আবার ফিরে?
সেদিনের সেই দুস্তর পারাবার
এক ফোঁটা জল চায় আজ পিপাসায়!

বিচিত্র মায়ায়

মণীন্দ্র রায়

যতদিন যৌবনের প্রভুত্ব, পৃথিবী
ষোড়শী মেয়ের কৌতূহলে
আড়ে আড়ে চায়।
তারো পরে তাকে নিয়ে কাটে যে জীবন,
সে শুধু সম্ভব মমতায়।

কেননা সবারই আছে শুশ্রূষার হাত।
পাখি ফিরে আসে ডালে, মোহানার নদী
বেড়ে ওঠে গোমুখীর গুহাহিত ঘরে।
কেবল মানুষ কোন ঈশ্বরের করুণা যেহেতু
পায় না, রাজত্ব নিজে গড়ে।

তাকে বলো প্রেম। কিন্তু [illegible]র
ন্যায়দণ্ডে ও হৃদয় যত [illegible]বালক
তবু কি দেখনি সেই কঠিন খেলায়
তুমি এক সিংহের ক্রীড়[illegible]!

এবং সবার চেয়ে দুরূহ যা, বলি ঃ
অরণ্য নির্ম[illegible] হলে [illegible]টি মরে, আর
মরু পা [illegible]
বনস্পতি [illegible] চাই [illegible] শিকড়ে
[illegible] সংসার,
[illegible] চাই বিচিত্র মায়ায়॥

হারানো দিগন্ত

শ্রীযতীন্দ্র সেন

যে-দিগন্ত হারিয়েছি ঝোড়ো রাতে পাখির মতন,
সেথা কভু ফিরে যাব, মনে নাই এমন দুরাশা,
দিনান্তে কুলায়ে ফেরা বলাকার ডানায় ডানায়
হাতছানি দিয়ে ডাকে পুরাতন তীরের পিপাসা।

যে-কূল এসেছি ছেড়ে নিরুদ্দেশ দূর যাত্রাপথে,
উন্মত্ত ঝড়ের বেগে ভাঙা হাল, ছিঁড়েছে নোঙর,
সে-কূল মিলায়ে গেছে, ভেসে গেছে নিশ্চিহ্ন অকূ[illegible]
ঘাটে ঘাটে ঘুরে ঘুরে খুঁজে ফিরি বেনামী বন্দর।

এখনো তেমনি সেথা ভাদ্র-নদী ছলছল জল
কানায় কানায় ভরা, কূলে কূলে করে কানাকানি,
তীরে তীরে নাসিহাঁস, উড়ে যায় গাঙ-শালিকেরা,
অজানা নৌকার মাঝি দূর বাঁকে চলে গুন টানি।

গিরিমাটি-ধোয়া জল নেমে আসে গেরুয়া রঙের,
বাবুভরে বনঝাউ রহি রহি ফেলে দীর্ঘশ্বাস;
চিকন পাতায় তার [illegible]
পথভোলা মেঘ হেন খুঁজে ফিরি হারানো আকাশ॥

যখন ফুল ফোটাই

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

মরসুমে য[illegible] ফুল ফোটাই
তখন সেই [illegible]র বাঁকেই চলে যাই,
নির্জন পা[illegible] এক নির্বাক প্রকৃতি
শেষ রাতে [illegible] লণ্ঠন নিয়ে
এপার থে[illegible] যেতে,
দিদিমার ম[illegible]
তারায় তা[illegible] থেকে
যেখানে মা [illegible] থাকতেন।
সমস্তটাই ঝাপসা[illegible]
জ্যোৎস্না কিংবা কু[illegible] অদৃশ্য।
দিদিমার লণ্ঠন নিভলে
কেবল সেই [illegible] সকালে
আমার মায়ের বর্ষার চোখে
খুশির বিভাসটুকুই মনে পড়ে।
মা আমার নদীর বাঁকের মাটি
আমি যেখানে উন্মোচিত।

জন্মলগ্নে মা কি জানতেন
এত কষ্টের শেষে
অশ্বত্থ নয়, চন্দন নয়, তিনি জন্মালেন
এক বকুল ফুলের গাছ।
এরই জন্যে তাঁর অবিরল অশ্রু আষাঢ়ে
শিশিরের অবিকল কান্না অঘ্রাণে
মাঘের হিমবাহ পিঠের উপর
এত হৃদয়দাহ বৈশাখে।

সময়ের নদীর বাঁকে
যখন ফুল ফোটাই,
অনন্ত জন্মের সেই আবছা, তারাভরা
আকাশের দিদিমা বুঝি
গাছের পাতায় হাত বুলোন।
ঝিকে তারা-রঙের ফুল মাথায়,
তখন আমার বসন্ত
মায়ের খুশির বিভাস ছড়ায়।

চিঠি

মৃণালকান্তি

নিঃসঙ্গ আঁধারে আজ দেখ দীপ জেবলে,
এতদিন তুমি কার পুজো করে এলে।
তিরিশটি বসন্তের ফুল আর গান,
কী দহনে গেল ঝরে, কাকে দিলে দান?
কাক ডাকা ধুধু নীল দুপুরের সুর,
কোন দিন ও-মনকে ডাকেনি কি দূর!
কত দূরে নিয়ে যাবে এই কানাগলি।
ঘরেতে জমেছে রাশি সংসারের ধূলি।
মৃত্যুর নির্জন ছায়া যখন এক কী,
এই সুখ প্রত্যাহের কত বড় ফাঁকি।
চিনে নাও, চেতনার ধ্যানী দীপ জবালো,
যে-প্রাণে জাগাবে প্রাণ, দেবে ধ্রুব আলো।

অভ্যাস

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভোরের অভ্যস্ত সুরে প্রথম কাকলি
মানে নেই মানে আছে, মহড়া দৈনিক ঃ
প্রত্যহ-পাঠের পরে [illegible]পদাবলী
পণ্ডরাতি বুঝে নেয় ভাবের সৈনিক।

ঘুম ভেঙে উঠে দেখি পড়ে আছে নীচে
আঁধারের আলো-মাখা ম্লানমুখী যুঁই ঃ
সকালের রীতি, হায়, তুমি-আমি মিছে
মিছে মোহঘন রাত ধরি-ধরি ছুঁই!

দিন-কানা চোখে বুঝি রাত-জাগা জাদু
প্রতি দিনই উড়ে যায় হালকা পাখায় ঃ
আকাশ মাটির মিল যত হক স্বাদু
মন বাঁধা তবু, শুধু রাতের চাকায়।

গত রাতে কাল ছিল, তা-ই হল আজ
নিশিভোগ-উপচারে রৌদ্রভরা কাজ।

শুধুই

গোবিন্দ চক্রবর্তী

শুধুই সুনীল বিস্ময়,
শুধুই অপার বিস্তার—
অন্য কোন কিছু নয় আর
নিরন্তর নিথর সময়।
আর ভারাক্রান্ত দীর্ঘশ্বাস
কাঁপা-কাঁপা মানুষের ক্লান্ত ইতিহাস।
অন্ধতা ও হিংসা, ক্ষুধা, ভয়—
সভ্যতার জটিল অন্বয়,
চেনা ভিত নড়া-চড়া ঃ
সাম্রাজ্যের ওঠা-পড়া—
চুরমার পুরনো বিশ্বাস।
রঙচটা মরা ছবি,
বাঁধা ছকে ফেলা—
ধরা বাঁধা চেনা খেলা
আর বাজি মাত;
শুধু পোহাল না এই হৃদয়ের রাত—
জুড়াল না জবালা আর জবালা।
সুপরিচিত নাটকের প্রাণহীন পালা
কত আর করি অভিনয়!
আন, আন এইবার কিছু বিবর্তন—
উদাসীন হে পৃথিবী, হে শিল্পী জীবন!
দাও এক অন্য প্রত্যয়
নিবিড় নীলের রঙ
গাঢ় ও গহন,
শত নয়-ছয়-এ তবু
সে কেবল অবগাঢ়, গাঢ়তর হয়।
শুধুই অপার বিস্তার,
শুধুই সুনীল বিস্ময়।

চলো যাই

অরুণকুমার সরকার

কাঠের গুঁড়োয়। গন্ধ বাতাসে, শহরে
অসংখ্য করাত রাত্রিদিন
অরণ্যের আত্মাকেও কাটে।
চলো যাই
গঙ্গাতীরে আজো কিছু প্রাণ, কিছু প্রাচীনতা আছে
এবং অসুখী গ্রামে উজ্জ্বল সকালে
হলুদ ঢেঁড়স ফুল লাল তার হৃৎপিণ্ড নিয়ে
সূর্যমুখী।

চোখ আছে, দৃশ্যবস্তু আছে
কিন্তু যেন আলোর অভাবে
সবকিছু তালগোল-পাকানো হাতড়ানো।
আমরা সব চ্যাপ্টা তোবড়ানো
কিংবা গুঁড়োগুঁড়ো
উড়োজাহাজের ট্রামের বাসের খাদ্য।
খাইদাই ভালই, শুধু ফিটফাট বিছানায়
খাঁজে খাঁজে মেদ কিংবা...
ভাঁজে ভাঁজে দারিদ্র্য অথচ
ভদ্রতায় আত্মতৃপ্ত, কিছু লোনা উত্তেজনা কিনে আপাতত
খাইদাই ভালই, শুই ফিটফাট বিছনায়
প্রাতঃকালে মুখ ধুই ধবল গামলায়
এবং যদিও চামড়া ঢেকে রাখি শৌখিন পোশাকে
মাছ ঢাকা অসম্ভব শাকে।
কাঠের গুঁড়োর গন্ধ, কাঠের গুঁড়োর গন্ধ,
কাঠের গুঁড়োর গন্ধ বাতাসে, শহরে।

কিন্তু গ্রাম নয়
গ্রাম অসম্ভব, শব, স্মৃতির গোগ্রাস।
আকাশে ও ঘাসে স্নিগ্ধ হৃদয়ের মুগ্ধ গঙ্গাতীরে
উদ্যান-নগরী চাই। চলো যাই সেখানে, যেখানে
প্রত্যেকের শখের বাগানে গানে প্রেমে বেদনায়
হলুদ ঢেঁড়স ফুল লাল তার হৃৎপিণ্ড নিয়ে
সূর্যমুখী।

বৃষ্টির পর

চিত্ত ঘোষ

বৃষ্টির পর ভেজা গাছে বসে ঘুঘু ডাকে,
বৃষ্টির জল গাছের পাতায় ঝুলে থাকে।
দিনের স্বপ্ন দুপুরের কোলে শোয়,
ঝুঁকেপড়া গাছ পুকুরের জল ছোঁয়।
দূরের জানালা কী মন্ত্রে খোলে, কে এসে দাঁড়ায় পাশে,
কত চেনা মুখ কথা কয়ে ওঠে, উচ্ছলতায় হাসে।
ভুলে যাওয়া কত ঠিকানার ডাকঘর,
পাঠায় খামের স্মরণীয় চিঠি এই বৃষ্টির পর।
পাত্র-ছলছল ভেঙে-পড়া, কেন
চোখে জল কেন তবে?
মেঘের আকাশে আরো মেঘ জমে,
আবার বৃষ্টি হবে।

অনুচ্চারিত

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

এ এক রহস্য যেন। অন্ধকারে কে[illegible] জানল না
জোগায় অভয় প্রাণে আকাশের [illegible] শুভ্র তারা
তমোঘ্ন বর্তিকা জেবলে। কী [illegible] যে তৃষিত সাহারা
খর্জুর-বীথিতে ভরে অগ্নিঝরা [illegible]। কী চেতনা

পর্বতের পাদদেশে তৃণগুচ্ছে [illegible]ন্ধানে
অবিরল আন্দোলিত। কে[illegible]র্জন নদীতে
জাগায় জলের স্ফীতি। [illegible]ন্ধ শাখাটিতে
সঞ্চারিত মাঠের সবুজ [illegible]ত্র কিসের আহবানে

থরে থরে গুচ্ছে ফুল[illegible]ন আজো বিতৃষ্ণার দেশে
ম্লানমুখ কৃষ্ণচূড়া হে[illegible]। ওঠে দুর্জয় ভঙ্গীতে
উদ্দীপ্ত দুবাহু মেলে। আর তীব্র দুঃখনিশাশেষে
ঘরে ফেরে প্রবুদ্ধ প্রেমিক। বার-বার গ্রীষ্মে শীতে

যদিও বিক্ষত তবু আশ্চর্য অদৃশ্য আয়োজনে
তোমার গোপন হাত কাজ করে সাক্ষাৎ নির্মাণে॥

আজন্ম

অরবিন্দ গুহ

শিকড়ে আমার বাসা, আমি মৃত্তিকার অন্তরালে
অদৃশ্য, অথচ দ্যাখো আমার ইচ্ছায় মূর্ত তুমি;
আমারই শ্রমের মূল্যে তুমি এই প্রাণরঙ্গভূমি
উদ্ভাসিত করে আছ। উদয়াস্ত হিরণ্যে, প্রবালে
তুমি সমুজ্জ্বল—আমি তোমার সুখের স্বপ্নে সুখী;
শিকড়ে আমার বাসা, তুমি আকাশের মুখোমুখি।

স্বপ্ন, তুমি কি আমাকে কখনো স্মরণপ্রান্তে আনো
নিদ্রায় অথবা জাগরণে? আমি তোমার বৈভবে
গর্বিত যেহেতু জানি পরিণামে তোমার কী হবে;
আমার কর্তব্য তাই নিরন্তর তোমাকে জানানো
বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে কিংবা ফুল থেকে ফলে;
রূপান্তরে অবিশ্বাসী তুমি তারুণ্যের কোলাহলে।

শিকড়ে আমার বাসা। এই কালধর্মের কাহিনী;
আমাকে কুটিল ভাবো, মূলে তার অভিন্ন প্রেরণা;
বর্তমানে যা পেয়েছ—সুন্দরীর স্মিত অভ্যর্থনা—
অতীতে তা আমিও পেয়েছিলাম। একই উৎসে ঋণী
তুমি আর আমি, অন্ত আর আদি—আদিঅন্তহীন;
কেউ স্বেচ্ছাধীন নই, উভয়ে সমান পরাধীন।

শিকড়ে আমার বাসা। পাতালের অন্ধকার জল
আমার তৃষ্ণার তৃপ্তি। তুমি আকাশের অধিবাসী।
আমার অতীত তুমি—তাই আমি মনে-মনে হাসি;
জানো না তো কে তোমার একমাত্র সহায়, সম্বল
আমি জানি—তুমি সুখী; তুমি তো জানো না—আমি
শিকড়ে আমার বাসা, তুমি আকাশের মুখোমুখি॥

আষাঢ়ের দিবাস্বপ্ন

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্রাম-মধ্যাহ্ন-প্রান্তে [illegible]ক ছুটে এসে
দম নেয় হরিণ-সময়

সূর্যদাহে দিন জ্বলে [illegible]
আকাশ-পিপাসু প্রাণ [illegible]পাঁজরে মাথা কোটে!
বর্ষণ এখনো দূর, জল[illegible]দারুচয়:
একটি মেঘের পারাবত
সুদূর ঈশান-কোণে মেঘদূত [illegible]
একটি মেঘের পারাবত
পাখা ঝাপটায় মনোমত্ত।
একটি মেঘের পারাবত
দৃষ্টির সীমা ছেড়ে হয়ে গেল দূর—
দু পাখায় বাঁধা সপ্ত সুরের ঘুঙুর!
একটি মেঘের পারাবত
ঠোঁটে যার অলকার নায়িকার বিরহের চিঠি!
কে প্রাণ নাচায়, কেন গান গেয়ে উঠি?
স্মৃতিপুষ্পলাবী এ-প্রহর
আলো-হাওয়া-মেঘ-ছায়া-ভারে মন্থর।

হাওয়া বয় ঝিরঝির জাফ্রির কোলে
ঝরোকায় মাথা খুঁড়ে হাহাকার তোলে—
ধোয়ীর পবনদূত দাঁড়িয়েছে কাছে
প্রাণে তার বহু কিছু বলবার আছে—
কী খবর কোথাকার কোন সে প্রিয়ার
কাজলিত কিশোরিকা দিঠির দীয়ার!
ভাষাহীন নতমুখে দুটি চোখে শিখাহীন মেঘেলার আলো—
ওড়নার মেঘ-রং বাতাসের হাত দিয়ে সেই কি পাঠাল?

আশৈশব চেনা ঘড়ি—তারি দুটি ছোট কালো হাত
ভাবতে অবাক লাগে,
কী করে যে ধরে রাখে অগণিত মুহূর্ত-প্রপাত!
দুয়ার রয়েছে খোলা; কড়া কি নাড়ল কেউ? কেউ নয়, নয়।
ও শুধু হাঁটছে হাওয়া
চলে যেতে ফেলে-যাওয়া
টুকরো টুকরো স্মৃতি হারাবার ভয়।
চুপ, চুপ, মন!
দূরে দূরে শোনো কার মৃদু উচ্চারণ!
বাতাসের কথা ফোটে—
সময়-হরিণ ছোটে
মুড়িয়ে গহন মহাচেতনার বন—
কল্পিত তুরীয়েরও সীমা পার হয়।
আঁধির আঁধিতে ওড়া ধূলি আর ধূম।
ভেসে গেছে সুবিস্তীর্ণ হাওয়ায় হাওয়ায়।
এই যে ঝিমিয়ে-আসা দুপুরে নিঝুম
মেঘের মন্থর ক্ষণ ছায়ায় পোহায়!
রোদের প্রহর আজ কী অবাক মেঘদূতময়!

নির্জন ঘরে

রাম বসু

আমার নির্জন ঘর
সেখানে অন্ধকারের কারুকার্য
আমার বিগত প্রেম-স্মৃতিক-টকীর্তি কেয়া
সেখানে আমি আদরের আঙুল রেখেছি
পাখির পিঠে চড়ে আকাশ উড়ে আসছে জানলায়
তার দিকে মেলে ধরেছি আমার দৃষ্টি
আমার দৃষ্টির দিগন্ত মিশেছে বুকের গভীরে
পাতা খসার শব্দে স্তব্ধতায় অস্ফুট বৃত্ত আমার চার পা
আমার এই নির্জনতার ঘরে, এই অন্ধকার ঘরে।

খোলা জানলার পাশে কারা এসে দাঁড়াল
কাদের কর্কশ উজ্জ্বল মুখরেখা চকিতে সরে গেল
তাদের শিকারী পদশব্দ আমার স্নায়ুতে
তাদের গায়ের বুনো গন্ধে মেতে উঠল অন্ধকার।

কারা আমার ভুলে-যাওয়া নাম ধরে ডাকছে
আমার ভুলে-যাওয়া জন্মান্তরের আদরের নাম
যে-নাম এখনো আমার রক্তের ডুকানে গমকে
যার মন্ত্রস্বরে বশীভূত আমি।

তোমরা কী করে পেয়েছ এই নাম
তোমরা কারা, কী চাও আমার কাছে
কেন এমন করে ভেঙে পড় কান্নার ঝাপটায়?

আমার কথাগুলো মৃত অসাড় পাখি
শুকনো নিথর নদীর মত জিভ
চোখের চরে ক্ষতির জ্বালা
কেবল অস্তিত্বের তলায় নাগ-বাসুকি মাথা দোলাচ্ছে।

ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে
আকাশ মৃত পৃথিবী কোলে করে বসে আছে যেন।

আলোক-লগ্ন

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

এমন মুহূর্ত আসে অন্ধকার ভাঙার সময়;
কী মন্ত্র বিছায় তারা নদী-মাঠ-মেঘ-মাটিময়
অজানা গাছের গানে, ঘুমে-ভরা ধুলো-সোনা পথে,
পৃথিবীর বস্তুলোকে, প্রসারিত প্রাণীর জগতে!
সব যেন ভাল লাগে এ-মুহূর্তে, কী গভীর ক্ষমা
দিগন্তে ছড়িয়ে দিল আলোকের দূর পরিক্রমা।

প্রেমের বেদনা এ যে, তাই দেখি সময়-আকাশ
চেতনার স্তবগানে এনে দেয় অমৃত-আভাস,
প্রণাম-নিবিড় ক্ষণে ভরে যায় সকালের রোদ
ভুলে যাই এ-প্রাণের যেখানে যা বেদনা-বিরোধ।
কেবল স্মরণশেষে আরও এক জীবন-পিপাসা
অন্বেষণ নিয়ে ফিরে জড় করে স্নেহ ভালবাসা

তবু এই সত্য জানি এ-মুহূর্ত অনেক আসে না
দুর্লভ এমন লগ্নে, শুধে যাই জীবনের দেনা।

GOVE... Cooch

স্বর্ণমুষ্টি

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ডান হাতে এক মুঠি ছাই
তুলে নিয়ে বাঁ-হাতে রাখলাম, তারপর
ডান হাতে রাখলাম। আমি ডান হাতে
অনেক অনেকবার এঁকেছি স্বাক্ষর।
চোরের মতন কিংবা চৌর্যবাঁকা সাপের মতন
হঠাৎ পিছন ফিরে তাকালাম, শঙ্কাশ্বজু প্রাণে
দারুণ সাহস এল, অর্ধেক মানুষ অর্ধদেব
শিব ছাড়া এই রাত একটার শ্মশানে
কে থাকে? চোরের মত চৌর্যবাঁকা সাপের মতন
আমিও শ্মশানলুব্ধ, মৃতদের সত্যের সন্ধানে।
শিরীষ-ডালটা কাঁপল, একটা ডোমকাক
উড়ে গেল, ভয়ের খোরাক
ছড়ান রয়েছে, আমি মৃতদের জীবনের টানে
শ্মশানে এসেছি: কিন্তু ডান হাতে এক মুঠো ছাই
তুলে নিয়ে মনে হল আয়ুর বাগানে
পারুল-মালতী-যূথী-রঙ্গনের উতল আঘ্রাণে
ভরে আছি, ভেঙে গেছে অবিশ্বাসী যমের বড়াই।
আমার ডান হাত এক দীর্ঘ দীর্ঘ মালঞ্চের মত
সুবিস্তৃত হল, আমি দেখতে পেলাম নতোন্নত
পিয়াল-মহুয়া, আমি শুনতে পেলাম :
"পৃথিবীতে অমিতার নাম
এখন কি মনে আছে মানুষের? একজন অন্তত
আমায় কীভাবে দ্যাখে, মাঝে-মাঝে কৌতূহলে বুক
ভরে ওঠে; কিন্তু থাক, উত্তর দিয়ো না। কৌতূহল
প্রেমের চেয়েও সত্য, ভয় হয় এখনো অমল
সম্পূর্ণ অমল হয়নি। কৌতূহল আমায় ভরুক।"

আরেক আকণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনলাম কেঁপে-কেঁপে :
"কে তুমি? তোমাকে আমি ঊর্মিমালা ভেবে
কাছে এসে দেখি তুমি ঊর্মিমালা নও, এমন-কি
ঊর্মিমালার ভাই সুপ্রভাস নও, আমি একা
মানুষের জীবনের ময়ূরপঙ্খী
বেয়ে এসে দেখি, কই, এখানেও তার নেই দেখা,
অথচ এখানে আছে ঊর্মিমালা ভেবে
বিরাট জীবন আমি কাটিয়েছি ভীষণ সংক্ষেপে!"

মেঘের দিন : বীতবর্ষণ

অসিতকুমার

এ-আকাশ ক্লান্তিঘন। এই রোদে রোগিণীর হাসি।
বাতাসে বিষণ্ণ ছোঁয়া ছুঁয়ে যায় প্রশ্নহীন মনে।
এ-দিন আমারই মত, প্রতিহত আপন যৌবনে,
বুঝি তাই একে এত কাছে পাই। এত ভালবাসি!
মানুষের আসা-যাওয়া সুর-স্বর মত অনুভব
জানি না কিসের মন। [illegible]পীড়িত পৃথিবীর গায়
দুই হাতে চোখ ঢেকে সে একা, আপন বেদনায়।
আমার [illegible] নিয়ে আমি যাই [illegible] কাছে আসি
সে আমায় দিতে পারে। আমি তাকে দিতে পারি সব।

ঘর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পাহাড় সমুদ্র আর অরণ্যের স্তব [illegible]লিখে লিখে
ক্লান্ত এক কবি আজ ঘুমিয়েছে এ[illegible] ছোট ঘরে,
যখন সে জেগে ছিল, ছোট ছোট ঘ[illegible]ভর্তি এই পৃথিবীকে
উদার প্রশস্ত চোখে চেয়েছিল ব[illegible]ন্তরে।

কৈশোরে অম্লান এক শ্বেতপ[illegible] তার বুকে
প্রসন্ন রৌদ্রের আলো, টলে[illegible]চ্ছ সরোবর
এবং উদাস, নীল, আকা[illegible]র্ণ সুখে
মুগ্ধতার নানাবর্ণ চিত্রি[illegible] ভরেছে অন্তর!

জীবন বিশাল করো, হে আকাশ, পথে পথে ঘুরে
এখন সে বলে উঠল, সত্যকার জীবনের মুখোমুখি এসে
লক্ষ-বাহু তুলে ধরো, হে অরণ্য, অসহিষ্ণু যৌবনের সুরে
কোথায় এসেছি আমি—অসহ্য এ স্পন্দহীন দেশে।

দিবাস্বপ্নে সব ছিল, সমুদ্র আকাশ মাঠ বন।
তবু তার দিন ভরল সঙ্কীর্ণের নানান আঘাতে।
কাচের জানলার পাশে পাখির মতন তার মন
শ্বেতপদ্ম খুঁজতে এল কোনো এক যুবতীর হাতে।

এখন নিতান্ত ক্লান্ত যুবকটি ঘুমিয়েছে একা।
স্বপ্ন নেই আকাশের, তৃপ্তি নেই পাহাড়ে সাগরে।
পরাজিত মহত্ত্বের সঙ্গে হবে অন্য চোখে দেখা;
দ্বিতীয় পৃথিবী এক প্রতীক্ষায় বসে আছে তারই ছোট ঘরে

যুবরাজ

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

সারাদিন ধরে রাখি চোখেচোখে। তাকে
হারাতে পারি না এই ব্যস্ত সব মুহূর্তের ভিড়ে।
অস্ফুট ছায়ার মত তার মায়ামুখ মিশে থাকে
ভাবনার অনেক গভীরে।

হাজার প্রাণের স্রোত বাজারে-রাস্তায়। কারা যায়?
কারা আসে প্রতিদিন? আনমনে একা পথ হাঁটি।
গানের কলির মত সুর হয়ে বাজে চেতনায়
শুধু তার গোপন কথাটি।

সারাদিন ধরে যাকে চোখেচোখে রাখি, হৃদয়ের
অনেক গভীরে তার কথাগুলি গানের মতন
সুর গাঁথতে পারে। তবু দিনান্তের কূলে একবার
থমকে দাঁড়াই এসে! বুকে যার ছবি, সে কখন
দু চোখে [illegible] এক আশ্চর্য স্বপ্নের সিংহদ্বার :
অনন্য সে যুবরাজ প্রাণের নিহিত সাম্রাজ্যের॥

মায়া-কুরঙ্গী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

জংলীবাবা যে সত্যকার একজন সাধুলোক, ঠক-দাগাবাজ নন, তাহার দুইটি প্রমাণ পাইয়াছিলাম। প্রথমত, অনুরাগী ভক্তেরা তাঁহার কাছে আসিতেছে দেখিলেই তিনি তারস্বরে এমন অশ্লীল গালিগালাজ শুরু করিতেন যে, রীতিমত গণ্ডারের চামড়া না হইলে কেহ তাঁহার কাছে ঘেঁষিতে সাহস করিত না। দ্বিতীয়ত, তিনি এক মুষ্টি যবের ছাতু ছাড়া আর কিছু ভিক্ষা লইতেন না। প্রভাতে সর্বাগ্রে যে ভিক্ষা দিত, তাহার ভিক্ষা লইতেন, আর কাহারও ভিক্ষা লইতেন না।

মহারাষ্ট্র দেশে বহু সাধু-সন্ত জন্মিয়াছেন; জ্ঞানেশ্বর একনাথ রামদাস তুকারাম সাঁইবাবা। বর্তমানেও বহু সাধু-সন্ত আছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা সহজে দেখা দেন না। মানুষের বর্তমান জীবন-ধারা যে-পথে চলিয়াছে সাধু-সজ্জনেরা সে-পথ সযত্নে পরিহার করিয়া চলেন। আর আমরা, যাহারা প্রতীচ্য-সভ্যতার কৃপায় সিনেমা পাইয়াছি, টেলিভিশন পাইয়াছি, হাইড্রোজেন বোমা পাইয়াছি, নেংটি-পরা সাধুতে আমাদের কী প্রয়োজন?

আমি নিতান্তই সংসারী মানুষ; জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ। তবু সাধুসন্ন্যাসীর খবর পাইলে মনটা চঞ্চল হয়। একদিন শুনিলাম শহরের উপকণ্ঠে এক সাধু আসিয়াছেন, নাম জংলীবাবা; প্রকৃতি নামের অনুরূপ অর্থাৎ একেবারে বন্য। জংলীবাবাকে দর্শন করিবার জন্য মন উশখুশ করিতে লাগিল। জানি, সাধু-সন্ন্যাসীকে দর্শন করিলেই ইষ্টলাভ হয় না; কিন্তু আজকালকার ছেলেমেয়েরাও ত জানে সিনেমার দেবদেবীদের দর্শন করিলে চতুর্বর্গ লাভ হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের ঠেকাইয়া রাখা যায় কি? ওটা একটা বায়ু-ঘটিত রোগ।

একদিন অপরাহ্নে সাধু-দর্শনে বাহির হইলাম। পুনা হইতে যে পথটি শোলাপুরের দিকে গিয়াছে, সেই পথের ধারে নির্জন প্রান্তে সাধুর আস্তানা। মাইল দেড়েক গিয়া দেখিলাম, রাস্তার ধারে কয়েকটি দামী এবং চকচকে মোটর দাঁড়াইয়া আছে। মোটরের আরোহীরা—সকলেই মেদপুষ্ট মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি—রাস্তার এক ধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছেন। বুঝিলাম তাঁহারা যেদিকে তাকাইয়া আছেন, সেইদিকেই সাধুর আড্ডা। তাঁহারা এ-পর্যন্ত আসিয়া বাকী পথটুকু অতিক্রম করিতে সাহস করিতেছেন না। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম, সাধুর ঢিল ছোঁড়া অভ্যাস আছে।

যাহা হউক, এতদূরে যখন আসিয়াছি, তখন ভয় করিয়া লাভ নাই। রাস্তা হইতে পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে একটি খর্জুরকুঞ্জ। মোটরওয়ালাদের পিছনে ফেলিয়া সেই দিকে চলিলাম। চারিদিকে বড় বড় পাথরের চাঁই ছড়ান। খর্জুরকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মাঝখানে কয়েকটি পাথরের চাঙড় মিলিত হইয়া কুলুঙ্গির মত একটি কোটর রচনা করিয়াছে; সেই কোটরের মধ্যে ঘিয়ে-ভাজা ডালকুত্তার মত রক্তচক্ষু লোলিহজিহ্ব জংলীবাবা বসিয়া আছেন।

বাবাকে দেখিলে ভক্তির চেয়ে ভয়ই বেশী হয়। আমি নত হইয়া প্রণাম করিলাম। বাবা রাষ্ট্রভাষায় আমাকে বড়কুটুম্ব সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কী চাস্? কবে নোবেল প্রাইজ পাবি তাই জানতে এসেছিস?"

অবাক হইয়া বাবার পানে চাহিলাম। সাধু-সন্ন্যাসীরা ত সংসারের কোনও খবরই রাখেন না, বাবা নোবেল প্রাইজের কথাও জানেন! আমি কোটরের বাহিরে উপবেশন করিয়া জোড়হস্তে বলিলাম, "না বাবা, আমি ও-সব কিছু জানতে চাই না। আমি শুধু শ্রীচরণ দর্শন করতে এসেছি।"

বাবা বলিলেন, "কবে তোর বৌ মরবে, কবে নতুন বিয়ে করবি তাও জানতে চাস্ না?"

"না বাবা।"

বাবা ঘোর বিস্ময়ে আমাকে কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর ঘাড় তুলিয়া দূরস্থিত ভক্তদের উদ্দেশে অকথ্য মুখ-খিস্তি করিলেন। অবশেষে আমাকে বলিলেন "শ্রীচরণদর্শন ত হয়েছে, এবার যা, দূর হ।"

কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলাম, "বাবা, আপনি সিদ্ধপুরুষ, অন্তর্যামী, আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন। আমিও নেহাত বোকা

নই, বুঝতে পেরেছি। আপনার অগ্নিশর্মা-রূপ একটা ছদ্মবেশ, আমার মতন হতভাগা সংসারীদের দূরে রাখতে চান।"

বাবা মিটিমিটি চাহিয়া বলিলেন, "তুই দেখছি একটা বিচ্ছু। কী চাস বল।" বাবার কণ্ঠস্বর যেন একটু নরম হইয়াছে।

বলিলাম, "বাবা সারাজীবন ধরে একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি। কোথাও উত্তর পাইনি। আপনি কৃপা করে অধমের অজ্ঞান-মসী দূর করুন।"

"ভণিতা ছাড়, কী প্রশ্ন বল।"

"বাবা, পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে, সকলের ভিত্তি হচ্ছে জন্মান্তরবাদ; অর্থাৎ আত্মা অমর, দেহের বিনাশ হলেও আত্মা বেঁচে থাকে। এই জন্মান্তরবাদ বা আত্মার অমরত্ব যদি সত্যি না হয়, তাহলে কোনও ধর্মেরই কিছু থাকে না। এখন কথা হচ্ছে, আত্মা যে বেঁচে থাকে তার কোনও প্রমাণ আছে কি?"

"কী প্রমাণ চাস?"

"শাস্ত্রে দু রকম প্রমাণের উল্লেখ আছে, প্রত্যক্ষ আর অনুমান। এর যেটা হক একটা পেলেই সব সন্দেহ দূর হবে।"

বাবা বলিলেন, "হিন্দু ন্যায়শাস্ত্রে আর-একটা প্রমাণ আছে তাকে বলে আপ্তবাক্য।"

সক্ষোভে বলিলাম, "আজকাল আপ্তবাক্যে কেউ বিশ্বাস করে না বাবা, হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে, বুদ্ধদেব যীশুখৃষ্ট সবাই গাঁজা খেতেন। তবে কি বাবা সত্যিকার প্রমাণ কিছু নেই?"

জংলীবাবা কিছুক্ষণ তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, "প্রমাণ আছে। কিন্তু তোরা অন্ধ, দেখাব কী করে?"

বলিলাম, "আপনি মহাপুরুষ, জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দিয়ে আপনি যদি অন্ধের চক্ষুরুন্মীলন না করেন, তবে কে করবে?"

বাবা আবার তেরিয়া হইয়া উঠিলেন, পাঁচ মিনিট ধরিয়া আমার চৌদ্দ পুরুষান্ত করিয়া শেষে বলিলেন, "নিজের পূর্বজন্ম স্বচক্ষে দেখলে তোর বিশ্বাস হবে?"

জোড়হস্তে বলিলাম "হবে বাবা।"

"তবে যা, রাত্রিবেলা ঘরে দোর দিয়ে বসবি, একটা মোমবাতি জেলে একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে থাকবি। যতক্ষণ মোমবাতি পুড়ে শেষ না হয়ে যায় ততক্ষণ চেয়ে থাকবি। এমনি রোজ করবি। যদি বাপের পুণ্যি থাকে একদিন দেখতে পাবি।—যা, এখন বেরো।"

আমি উঠিবার উপক্রম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মোমবাতির দিকে চেয়ে থাকবার সময় কী ভাবব বাবা?"

"কিচ্ছু ভাববি না, মন শূন্যে করে ফেলবি। যা ভাগ।"

* * *

সেই দিনই সন্ধ্যার পর এক বাণ্ডিল মোমবাতি কিনিয়া আনিলাম এবং আমার লেখা-পড়ার ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়া গেলাম। বাড়ির সবাই জানে এ-সময়ে আমি একান্তমনে লেখাপড়া করি, তাই কেহ বিরক্ত করে না।

জ্বলন্ত মোমবাতির পানে চাহিয়া বসিয়া থাকা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়, কিন্তু মনকে নির্বিষয় করাই প্রাণান্তকর। পতঞ্জলি বলিয়াছেন, ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ। গীতা বলেন, মনকে আত্মসংস্থ করিয়া ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ। কথাগুলো জানা আছে। সুতরাং চেষ্টার ত্রুটি করিলাম না। কিন্তু মন প্রমাথি এবং বলবদ্দৃঢ়। একদিক পরিষ্কার করি ত অন্য দিক হইতে পঙ্গপালের মত চিন্তা ঢুকিয়া পড়ে। ঝাঁটা হস্তে মনের এদিক হইতে ওদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু কোনই ফল হইতেছে না। এ যেন মশক-পরিবৃত স্থানে কেবল চড়-চাপড় চালাইয়া মশা তাড়াইবার চেষ্টা।

প্রথম দিন বৃথা গেল, দ্বিতীয় তৃতীয় দিনও তাই। মোমবাতি পুড়িয়া শেষ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু আমার পূর্বজন্মের আমি দেখা দিতেছে না। ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিলাম।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার মন বোধ-হয় শূন্যতার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, আমি জানিতে পারি নাই। পঞ্চম দিনে ফল পাইলাম। মোমবাতি জ্বালিয়া সবেমাত্র বসিয়াছি, মনটা নিস্তরঙ্গ হইয়া আসিতেছে, দেখিলাম মোমবাতির শিখা ঘিরিয়া অভঙ্গ রামধনুর মত একটি সপ্তবর্ণের মণ্ডল রচিত হইয়াছে ক্রমে মণ্ডলের ভিতর দিয়া ঘরের যে অংশ দেখা যাইতেছিল, তাহা অদৃশ্য হইয়া গেল, শুধু মণ্ডলের মধ্যবর্তী মোমবাতির পীতাভ স্নিগ্ধ শিখাটি রহিল .....তারপর শিখাটিও অদৃশ্য হইয়া গেল। মণ্ডলের মধ্যে রহিল কেবল অচ্ছাভ শূন্যতা।

এইবার ধীরে ধীরে মণ্ডলমধ্যবর্তী শূন্যতা চিহ্নিত হইতে লাগিল। একটা মুখ ছায়াছবির পটের উপর আলোকচিত্রের মত ফুটিয়া উঠিল। জীবন্ত মুখ: চোখের দৃষ্টিতে প্রাণপূর্ণ সজীবতা। পুরুষের মুখ; মস্তক এবং মুখ মুণ্ডিত, একটু শীর্ণ অস্থিসার গঠন, কণ্ঠের অস্থি উচ্চ। মুখ-খানা যেন চিন্তায় মগ্ন হইয়া আছে। চক্ষু উন্মীলিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু বাহিরের কিছু দেখিতেছে না নিজের মনের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া আছে।

এই মুখখানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমার বুকের মধ্যে একটা অব্যক্ত উদ্বেগ বন্ধ কক্ষে ধূমকুণ্ডলীর মত তাল পাকাইতে লাগিল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। মনে হইল ওই মুখখানা আমারই মুখ, ওই মুখের অন্তরালে যে চিন্তার ক্রিয়া চলিতেছে, তাহা আমারই চিন্তা; জানি না কতকাল পূর্বে কোথায় বসিয়া আমি এই চিন্তা করিয়াছিলাম। ক্রমে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল; আমার বর্তমান সত্তা ধীরে ধীরে ওই অতীত সত্তার সহিত মিশিয়া অভিন্ন হইয়া গেল।—

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। বর্তমানে আমি আয়নায় নিজের যে মুখ দেখিতে পাই, তাহার সহিত ওই মুখের বিশেষ সাদৃশ্য নাই; কিন্তু একেবারে বিসদৃশও নয়। ভ্রূর হাড় উঁচু, কান বড়, চিবুক ছোট; এই রকম সাধারণ মিল আছে। একই বংশের দুইজন মানুষের মধ্যে এইরূপ সাদৃশ্য থাকা সম্ভব।

* * *

আমি কে, কোথায় আছি, কী করিতেছি তা জানি। কিন্তু কত দিন আগেকার কথা তাহা জানি না। অব্দ সম্বতের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। এইটুকু বলিতে পারি, অজন্তায় মাত্র পাঁচটি গুহা তখন খোদিত হইয়াছিল।

অজন্তার একটি গুহার মধ্যে আমি বসিয়া আছি। গভীর রাত্রি। আমার দুই জানুর পাশে দুইটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই আলোতে গুহা-প্রাচীরের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। আমি একাকী বসিয়া চিত্র আঁকিতেছি।

গুহায় আর কেহ নাই, আমি একা। দিনের বেলা অনেক ভিক্ষু শ্রমণ এখানে কাজ করে। কেহ পর্বতগাত্র কাটিয়া গুহা রচনা করে, কেহ মূর্তি গড়ে, কেহ গুহাপ্রাচীরে চিত্র আঁকে। সন্ধ্যার সময় তাহারা পর্বতপার্শ্ব হইতে উপত্যকায় নামিয়া যায়। দুই সমান্তরাল পাহাড়ের মাঝখান দিয়া উপলবন্ধুর অগভীর জলপ্রবাহ গিয়াছে, সেই নির্ঝরিণীর কূলে আমাদের মৃৎকুটীর। সেখানে রাত্রি কাটাইয়া প্রভাতে আমরা আবার উপরে উঠিয়া আসি, সারাদিন কাজ করি। ইহাই আমাদের জীবন। সংসারের একান্তে গিরি-সঙ্কটের নির্জনতার গোপন স্বর্লোক রচনা করিতেছি, ভগবান বুদ্ধের অলৌকিক মহিমার শিল্প-কায়া গঠন করিতেছি। আমরা যখন থাকিব না, আমাদের অনামা কীর্তি তখনও অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে।

আমার নাম পুণ্ডলীক। কলিঙ্গ দেশে এক ক্ষুদ্র জনপদের অধিবাসী ছিলাম। কিন্তু স্বদেশে আমার সহজ শিল্প-কৃতিত্বের আদর হইল না। কুড়ি বৎসর বয়সে আমি সংসার ছাড়িয়া বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করিলাম। বুদ্ধের সঙ্ঘ-বিহারে শিল্পের আদর আছে। শীঘ্রই আমার শিল্পক্রিয়া গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। শিল্পাচার্য গোতমশ্রী আমাকে শিষ্য করিয়া লইলেন।

তারপর চৌদ্দ বৎসর কাটিয়াছে। গুরুর সঙ্গে বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি, বহু সংঘারাম স্তূপ চৈত্য অলঙ্কৃত করিয়াছি। নিভৃত গিরিসঙ্কুল প্রদেশে

পর্বতগাত্রে গুহা খোদিত করিয়া শিল্প-মন্দির রচনার রীতি দাক্ষিণাত্যের রাজারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। দুই তিন শত বৎসর ধরিয়া এই রীতি প্রচলিত আছে। রাজারা অর্থদান করেন, শিল্পীরা পাষাণপটে তথাগতের অলৌকিক জীবনকথার রূপদান করেন। গত তিন বৎসর আমরা অজন্তায় কাজ করিতেছি। আচার্য গোতমশ্রীর সঙ্গে আমরা দশজন প্রতিমা-শিল্পী ও দশজন চিত্রশিল্পী আছি। আমি চিত্রশিল্পী। আরও অনেক শ্রমণ আছে, তাহারা শ্রমসাধ্য কাজ করে।

আজ গভীর রাত্রে অন্ধকার গুহামধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া আমি চিত্র আঁকিতেছি। চিত্র প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে, কেবল স্থানে স্থানে একটু রঙের স্পর্শ, একটু বাঙ্ময়ার সংস্কার করিতে হইবে। কাল মহারাজ বাণদেব চিত্র পরিদর্শন করিতে আসিবেন। তৎপূর্বেই চিত্র প্রস্তুত থাকা চাই।

প্রদীপ তুলিয়া ধরিয়া চিত্রটিকে পরীক্ষা করিলাম। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে চারি হস্ত পরিমাণ চিত্র। আশেপাশে উপরে জালক হইতে অন্য চিত্র আঁকিয়াছি, সকলের মধ্যস্থলে এই চিত্রটি। চিত্রের বিষয়বস্তু—সিদ্ধার্থ ও গোপার বিবাহ। চারিদিকে বহু পরিজন, কেন্দ্রস্থলে গোপার পাণিগ্রহণ করিয়া বর-বেশী সিদ্ধার্থ।

চিত্রটি শিল্পশাস্ত্রানুযায়ী হইয়াছে, আচার্য গোতমশ্রী দেখিয়া তুষ্ট হইয়াছেন। সামান্য অঙ্কনের ত্রুটি যেটুকু আছে তাহা আজ রাত্রেই সংশোধন করিব। কিন্তু—এই চিত্রের মূলে যে বিপুল প্রতারণা আছে তাহা কেবল আমি জানি; আর কেহ তাহা দেখিতে পায় নাই। গোপার যে-মূর্তি আঁকিয়াছি তাহা দেবীমূর্তি নয়, আমার কামনার রসে নিষিক্ত লালসাময়ী স্ত্রীমূর্তি।

আমি ভিক্ষু, আমার জীবন নারীহীন। কিন্তু নারীর জন্য কোনও দিন তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করি নাই। আমার শিল্পই আমার জীবন। বহু নারীচিত্র আঁকিয়াছি—দেবী মানবী অপ্সরী কিন্নরী গন্ধর্ববধূ; নির্লিপ্ত নিরাসক্ত চিত্তেই আঁকিয়াছি। এইভাবে চৌদ্দ বৎসর কাটিয়াছে। তারপর সহসা আজ হইতে তিন মাস পূর্বে আমার অন্তর্লোকে বিপ্লব ঘটিয়া গেল।—

তিন মাস পূর্বে প্রতিষ্ঠান নগর হইতে পরমসৌগত শ্রীমন্মহারাজ বাণদেব আসিয়াছিলেন; সঙ্গে ছিলেন রানী কুরঙ্গিকা। নবীন রাজা, নবীনা রানী। একটি গুহায় উচ্চ পাষাণ-চৈত্য আছে, রাজরানী সেই চৈত্যমূলে স্বর্ণমুষ্টি রাখিয়া পূজা দিলেন। তারপর রাজা আচার্য গোতমশ্রীকে বলিলেন, 'আমার ইচ্ছা একটি গুহা-প্রাচীরে সিদ্ধার্থ ও গোপার পরিণয়-দৃশ্য অঙ্কিত করা হয়।"

তাঁহার পাশে, একটু পিছনে, রানী কুরঙ্গিকা

গোতমশ্রী দেখিলেন, রাজা ও রানীর নূতন বিবাহ হইয়াছে, নব-অনুরাগের মাদক রসে উভয়ের মন মজ্জিত হইয়া আছে; তাই সিদ্ধার্থ ও গোপার বিবাহ-চিত্র অঙ্কিত করাইতে তাঁহাদের এত আগ্রহ। গোতমশ্রী আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি তাঁহার প্রধান শিষ্য, রাজাদিষ্ট চিত্র আমিই আঁকিব।

সেই রানী কুরঙ্গিকাকে প্রথম দেখিলাম।

রাজা বাণদেবও অতিশয় সুপুরুষ; যৌবন-ভাস্বর দেহ, বুদ্ধি-দীপ্ত প্রসন্ন মুখমণ্ডল। কিন্তু আমি যেন তাঁহাকে দেখিতেই পাইলাম না। তাঁহার পাশে, একটু পিছনে, রানী কুরঙ্গিকা নতমুখে লীলা-কমলের দল নখে বিদ্ধ করিতেছিলেন; আমি কেবল তাঁহাকেই দেখিলাম।

রানী কুরঙ্গিকার রূপের বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শিল্পীর বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়া আমি তাঁহার রূপ দেখি নাই, দেখিয়াছিলাম অন্ধ আবেগের আশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়া। মুহূর্তমধ্যে আমার দেহ-মন উন্মথিত করিয়া এক মদান্ধ রসোচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছিল।

আমার চৌত্রিশ বছর বয়স হইয়াছে। আমি জানি, আমার অন্তরে যে রসোচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছে তাহা অমৃতের উৎস নয়, তীব্র গরলের ধারা। আমার মনের গরলের সহিত রানী কুরঙ্গিকার কোনও সংস্রব নাই, ইহা একান্তভাবে আমার মনের গরল। কোথায় এতদিন লুক্কায়িত ছিল, দেহের কোন গূঢ়-গহন গুহায় আত্মগোপন করিয়া ছিল; আজ সহসা অগ্ন্যুৎপাতের মত বাহির হইয়া আসিয়াছে।

বাহির হইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু তবু বাহিরে উহার প্রকাশ কেহ লক্ষ্য করে নাই। গোতমশ্রী কিছু জানিতে পারেন নাই, রাজাও না। আশ্চর্য মানুষের মুখ! আমরা শিল্পী, মানুষের মুখ আঁকিয়া মানুষের মনের কথা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু বাস্তব জীবনে মুখ দেখিয়া মনের কথা কতটুকু জানা যায়? মানুষের মনে অনেক পাপ। তাই ছদ্ম-সাধুতা তাহার সহজাত সংস্কার।

গোতমশ্রী রাজার প্রস্তাব আমাকে শুনাইলেন। আমি চিত্র আঁকিতে সম্মত হইলাম। প্রাচীরের কোন্ স্থানে চিত্র অঙ্কিত হইবে তাহা স্থির হইল। নূতন গুহার প্রাচীরে অধিকাংশ স্থান এখনও শূন্য; মনোমত স্থান নির্বাচনের অসুবিধা নাই। পুরাতন গুহাগুলির সকল স্থান ভরিয়া গিয়াছে। অজন্তার নিকট দিয়া প্রতিষ্ঠান নগর হইতে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত দীর্ঘ

বাণিজ্যপথ আছে, সেই পথে বহু সার্থবাহ মহার্ঘ পণ্য লইয়া যাতায়াত করে। তাহারা দৈবতুষ্টির জন্য চৈত্যে পূজা দিয়া যায়, গুহাপ্রাচীরে আপন মনোমত চিত্র আঁকাইয়া লয়। এইভাবে গুহাগুলি একে একে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

রাজা বাণদেব অঞ্জলি ভরিয়া নানা বর্ণের রত্ন আমার সম্মুখে ধরিলেন, বলিলেন, "ভিক্ষু, এই রত্নগুলি আপনি নিন। এদের চূর্ণ করে যে বর্ণ হবে সেই বর্ণ দিয়ে চিত্র আঁকবেন। যেন যুগযুগান্তরেও চিত্রের বর্ণ মলিন না হয়।"

রাজা বাণদেব কবি এবং প্রেমিক। আমার চক্ষু তাঁহার মুখ হইতে দেবী কুরঙ্গিকার দিকে ফিরিল। তিনি আমার পানে কুরঙ্গ-নয়ন তুলিয়া মৃদু হাসিলেন। যেন স্বামীর নির্বন্ধের সহিত নিজের আগ্রহ যোগ করিয়া দিলেন।

আমার অন্তরের মধ্যে একটা আর্ত আকূতি শীৎকার করিয়া উঠিল—দেবি, আমার মনকে ক্ষমা কর, আমার মনের পঙ্ক যেন তোমাকে স্পর্শ করতে না পারে।

রত্নগুলি নিজ অঙ্গুলিতে লইয়া মহারাজ বাণদেবকে বলিলাম, "তাই হবে আর্য।"

বিদায় গ্রহণের পূর্বে বাণদেব আমাকে আড়ালে লইয়া গিয়া বলিলেন, "ভিক্ষু, শিল্পীকে উপদেশ দেবার স্পর্ধা আমার নেই। কিন্তু দেবদেবীর আলেখ্য রচনার সময় মানুষী মূর্তিরই আশ্রয় নিতে হয়।"

ইঙ্গিতের তাৎপর্য—আমি যেন রাজা বাণদেব ও রানী কুরঙ্গিকার আদর্শে সিদ্ধার্থ এবং গোপার চিত্র অঙ্কন করি। বলিলাম, "অবশ্য। আমার স্মরণ থাকবে।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদিনে চিত্র প্রস্তুত হবে?"

বলিলাম, "তিন মাস লাগবে।"

তিনি বলিলেন, "ভাল। তিন মাস পরে এই কৃষ্ণা নবমী তিথিতে আমরা আবার আসব, আপনার শিল্প-কলা দেখে যাব।"

তারপর রত্নগুলির বর্ণানুসারে পৃথক্‌ভাবে চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত অন্য রসায়ন মিশাইয়া রঙ প্রস্তুত করিয়াছি, গুহা-প্রাচীরের গাত্র মসৃণ করিয়া তাহার উপর চিত্র আঁকিয়াছি। সিদ্ধার্থের চিত্রে কালায়ত লোকসিদ্ধ আকৃতির সহিত বাণদেবের আকৃতি মিশাইয়াছি। আর গোপাকে আঁকিয়াছি রানী কুরঙ্গিকার প্রতিচ্ছবি করিয়া। নীলকান্ত মণির চূর্ণ দিয়া তাঁহার কেশ আঁকিয়াছি, ভ্রূ আঁকিয়াছি, নেত্রতারা আঁকিয়াছি। পদ্মরাগের গুঁড়া দিয়া আঁকিয়াছি তাঁহার অধর। পীত পুষ্পরাগ-চূর্ণের সহিত শঙ্খচূর্ণ মিশাইয়া রচিয়াছি তাঁহার দেহবর্ণ। আর—তাঁহার সমস্ত দেহে লেপিয়া দিয়াছি আমার মনের গলিত-তপ্ত লালসা।

কেন এমন হইল? যাহাকে চিনিতাম না, জানিতাম না, যাহার মনের পরিচয় পাই নাই, তাহার দেহটা এমন করিয়া কেন আমার মন জুড়িয়া বসিল! আমি নারী-লোলুপ লম্পট নই, শুদ্ধাচারী ভিক্ষু। যৌবনের সীমান্তে আসিয়া আমার এ কী হইল! গোপার চিত্র আঁকিতে আঁকিতে আমি যে দুরন্ত হৃদয়াবেগ অনুভব করিয়াছি তাহা পূর্বে কখনও অনুভব করি নাই। কখনও অলৌকিক উল্লাসে মন ভরিয়া উঠিয়াছে কখনও মনের অশুচিতায় নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মিয়াছে। এত আনন্দ এবং এত কলুষ যে আমার মধ্যে ছিল, তাহা আমি নিজেই জানিতাম না।

চিত্র শেষ হইয়াছে, আমার সঙ্গে চিত্রের সম্বন্ধও ফুরাইয়া আসিতেছে। কাল রাজা বাণদেবের নিকট এই চিত্র সমর্পণ করিয়া আমি নিষ্কৃতি পাইব। আমার গুরু এবং সতীর্থগণ চিত্র দেখিয়া অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন, আমি লজ্জায় অন্তরের মধ্যে আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছি। কেবল একটি সান্ত্বনা আমার আছে—আমার মনের কথা কেহ জানিতে পারে নাই। গোপার মুখে যে দেবীভাব না ফুটিয়া মানুষী ভাব ফুটিয়াছে তাহা রসজ্ঞের চক্ষে বিবাহকালীন বিভ্রমের স্বাভাবিক ব্যঞ্জনা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শিল্পীর মনের লালসা-কলুষ যে চিত্রিতার অঙ্গে লিপ্ত হইয়াছে তাহা কেহ ধরিতে পারে নাই।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে। গুহার মুখের কাছে অস্পষ্ট চন্দ্রালোকের আভা ফুটিয়াছে। আমি প্রদীপ ধরিয়া গোপার আলেখ্য তিল তিল করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম। অধরে আরও একটু লালিমা যোগ করিয়া দিলাম, কটিতে ত্রিবলীর রেখা নীল বর্ণ দিয়া একটু স্পষ্ট করিলাম। তারপর দীপ নিভাইয়া গুহার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

বাহিরে গুহা হইতে গুহান্তরে যাইবার সংকীর্ণ পথ, তাহার অন্য ধারে গভীর উপত্যকার খাদ। উপত্যকার পরপারে রোমশ পাহাড়ের মাথায় ভাঙা চাঁদ মুখ তুলিয়াছে। চারিদিক স্বপ্নাচ্ছন্ন।

বহিঃপ্রকৃতির বিপুল স্তব্ধতার পানে চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল, আজিকার রাত্রি আমার জীবনের শেষ রাত্রি; আমার বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে।—

দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্বে রাজা বাণদেব আসিলেন। রানী কুরঙ্গিকা সঙ্গে আসেন নাই, রাজা একাকী আসিয়াছেন।

চিত্রের সম্মুখে সারি সারি দীপ জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কারণ দিবাভাগেও গুহার অভ্যন্তর ছায়াচ্ছন্ন। রাজা বাণদেব দীর্ঘকাল দাঁড়াইয়া চিত্রটি দেখিলেন। তাঁহার মুখে নানা ভাবের ব্যঞ্জনা পর্যায়ক্রমে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল; কখনও সম্বৃত গাম্ভীর্য, কখনও ভঙ্গুর হাস্য। রসিক ব্যক্তি পরম রসবস্তু পাইলে এমনই আত্মসমাহিত হইয়া যায়।

অবশেষে তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আমার পানে চক্ষু ফিরাইলেন। তাঁহার

FOR PARTICULARS WRITE TO- ADCCO LIMITED
29/3A, CHETLA CENTRAL ROAD • CALCUTTA-27

রাঙা মাটির পথ — আলোকচিত্রী শ্রীতুলসীদাস সিংহ

চোখের দৃষ্টি দেখিয়া আমার অঙ্গ সহসা হিম হইয়া গেল। তিনি বুঝিয়াছেন; আর কেহ যাহা অনুমান করিতে পারে নাই, তিনি তাহা বুঝিয়াছেন। তিনি শুধু চিত্রই দেখেন নাই, চিত্রকরের অন্তরও দেখিয়াছেন। প্রেমের চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া যায় না, তাই এই তরুণ যুবকের চক্ষে আমি ধরা পড়িয়া গিয়াছি।

বাণদেব মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "ভিক্ষু, ধন্য আপনার প্রতিভা।—একবার এদিকে আসুন, আপনাকে আড়ালে দুটি কথা বলতে চাই।"

গোতমশ্রী ও অন্য শিল্পীরা গুহামধ্যে রহিলেন, রাজা গুহার বাহিরে গেলেন। আমি তাঁহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। সম্মুখেই অতলস্পর্শ খাদ; তাহার তলদেশে উপলচপলা নির্ঝরিণী রবিকরে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

রাজা কণ্ঠস্বর নিম্ন করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষু, আপনার কলানৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু—"

কম্পিতস্বরে বলিলাম, "কিন্তু কী আর্য?"

রাজা বলিলেন, "বুদ্ধের সংঘ আপনার প্রকৃত স্থান নয়। আপনার অন্তরের তৃষ্ণা এখনও দূর হয়নি। আপনি আসুন আমার সঙ্গে, সংসারে ফিরে চলুন—"

রাজা বাণদেব যদি তরবারি দিয়া আমার শিরশ্ছেদ করিতেন তাহা হইলে পলকমধ্যে আমার লজ্জার অবসান ঘটিত। কিন্তু তাঁহার শান্ত সংযত বাক্যে সমস্ত পৃথিবী আমার চক্ষে লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। কণ্ঠ দিয়া শব্দ বাহির হইল না।

বাণদেব বলিয়া চলিলেন, "ভোগেরও সার্থকতা আছে। সংযত ভোগে ধাতু শুদ্ধ হয়, শিল্পীর পক্ষে ভোগের প্রয়োজন আছে। যে-শিল্পীর ধাতু প্রসন্ন হয়নি সে রসলোকে উত্তীর্ণ হতে পারে না। আপনি চলুন আমার সঙ্গে, আমার সভায় প্রধান শিল্পীর আসন অলংকৃত করবেন—"

আর সহ্য হইল না। আমার মস্তিষ্কের মধ্যে যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়া গেল। চিৎকার করিয়া বলিলাম, "মহারাজ, আমি ধর্মভ্রষ্ট ভিক্ষু, ধর্মভ্রষ্ট শিল্পী—পৃথিবীতে আমার স্থান নেই।"

উন্মত্তের মত আমি খাদে লাফাইয়া পড়িলাম।

* * *

আত্মস্থ হইয়া দেখিলাম, মোমবাতিটা দপ্‌দপ্ করিয়া নিভিয়া যাইতেছে।

পরদিন প্রাতঃকালেই জংলীবাবার আস্তানায় গেলাম। দেখি কোটর শূন্য, বাবা অন্তর্হিত হইয়াছেন।—

আমার জীবনে এই যে একটা আষাঢ়ে ব্যাপার ঘটিয়া গেল, এই লইয়া মাঝে মাঝে চিন্তা করি। যখনই চিন্তা করি, মনের মধ্যে দুইটি প্রতিপক্ষ মাথা তোলে। এক পক্ষ নির্বিচারে বিশ্বাস করে, সে-রাত্রে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা আমার পূর্বজন্মেরই একটি দৃশ্য। যদি কোনও দিন অজন্তা দেখিতে যাই, নিশ্চয় নিজের হাতে আঁকা ছবি দেখিতে পাইব। অন্য পক্ষ বলে, জংলীবাবা সম্মোহন বিদ্যা দেখাইয়াছেন।

মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, আবার মোমবাতি জ্বালাইয়া বসি। কিন্তু ভয় হয়। যে তীব্র মনঃপীড়া একবার পাইয়াছি তাহা আর দ্বিতীয়বার অনুভব করিতে চাই না।

তবে একটা লাভ হইয়াছে। আমি যে ছবি আঁকিতে পারি তাহা এতদিন জানিতাম না, চেষ্টাও করি নাই। এখন চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, ছবি আঁকা আমার পক্ষে সহজ। সুদূর অতীত কালের একটি কুরঙ্গনয়না যুবতীর মুখ ইচ্ছা করিলেই আঁকিতে পারি।

কেয়া

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বয়সে বড় হলেও সিগারেটটা আর সামনাসামনি ধরায় না। "একটু আসছি" বলে বেরিয়ে যায় বাইরের গোল বারান্দায়। থেকে থেকে দক্ষিণের হাওয়ায় গন্ধটা ঠিকই পায় জয়ন্ত।

সে-গন্ধটা আরও খারাপ লাগে যখন তারপরে একেবারে মুখের সামনে এসে বসে রামপদ। সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ তত বিশ্রী লাগে না, কিন্তু ঠোঁটের পোড়া তামাকের গন্ধে কেমন গা বমি-বমি করতে থাকে।

খটাত করে মস্ত একটা পানের ডিবে খুলে তা থেকে রামপদ একসঙ্গে একেবারে গোটা দুই পান মুখে পুরে দেয়। এমন হাঁ করে যে, জয়ন্ত ভাবে ওর আলজিভটা পর্যন্ত বুঝি দেখা যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর অস্বস্তি লাগে। খামোখা চিড়িয়াখানার হিপোটাকে তার মনে পড়ে।

তার অর্থ এই নয় যে, আকারে-প্রকারে রামপদ হিপোর মত অতিকায়। বরং জয়ন্তর মতই তার লম্বা রোগাটে চেহারা। আসলে অতিকায় হচ্ছে তার বাপ তারাপদ মল্লিকের ব্যবসা। হাওড়ার গোটা তিনেক মেশিন টুল্স কোম্পানির তিনি মালিক। অতএব সঙ্গত কারণেই ক্লাস সেভেনে বার তিনেক ফেল করে পাড়ার স্কুল-কলেজযাত্রিণী মেয়েদের ছবি তোলবার জন্যে ক্যামেরা কিনেছিল রামপদ। কিছুদিন চলেছিল ভালই। তারপর হঠাৎ একদিন একটি রুক্ষ মেজাজের মেয়ে তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিলে। তা থেকে নারীজাতি সম্পর্কে একটা নিদারুণ বৈরাগ্যে তার মন ভরে গেল। যোগাভ্যাস করার জন্যে হাতিবাগানের এক তান্ত্রিকের আড্ডায় সে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করল। বাপ তারাপদ মল্লিক আফিঙের নেশায় আধবোজা চোখে কিছুদিন সেটা লক্ষ্য করলেন। সাধনার পথে রামপদ যখন অনেকখানি এগিয়েছে, তখন প্রায় বিনা নোটিসেই একটা বিকট চেহারার ময়ূরপঙ্খী মোটরে চাপিয়ে বিয়ে দিতে নিয়ে গেলেন ছেলেকে।

সে আজ দশ বছরের কথা। এর মধ্যে একেবারে নিরীহ ভালমানুষ হয়ে গিয়েছে রামপদ। দু-তিনটি ছেলেমেয়ে হ[illegible] নিজের স্ত্রী সম্পর্কে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত হয়েছে এবং বাপের ব্যবসা দেখাশোনা আরম্ভ করেছে। সেই সঙ্গে তার আরও মনে হয়েছে, ছেলেবেলার একটা মারাত্মক ভুল অন্তত তার সংশোধন করা দরকার। নেহাতপক্ষে স্কুল-ফাইন্যালটা পাশ না করলে ভদ্রসমাজে বাস করা যায় না।

অতএব জয়ন্তকে আসতে হয়েছে।

বি-কম্ পাশ করে বেকার। এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে লাইন দিয়েছে, দুটো কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়েছে, কিন্তু এখনও কিছু সুবিধে হয়নি। ছ মাস ধরে একটা স্কুল মাস্টারি হব-হব করছে, কিন্তু ম্যানেজিং কমিটি নাকি এখনও মতিস্থির করতে পারেনি। অথচ এভাবে আর কতদিন চলে?

মা-বাবা পড়ে আছেন পাকিস্তানে, তাঁদের আনা দরকার। বেলেঘাটায় গ্রাম-সুবাদে যে কাকা আছেন, তাঁর বাসায় আর এমন করে মুখ থুবড়ে থাকা চলে না। আত্মসম্মানটা এখনও সম্পূর্ণ মুছে যায়নি বলে মধ্যে মধ্যে অসহ্য হয়ে ওঠে। টিউশান থেকে কিছু কিছু

কাকিমার হাতে তুলে দেয়, কিন্তু তাঁর মুখের মেঘ কাটে না।

কাকা অবশ্য কিছু বলেন না। নিরীহ গোবেচারা মানুষ—সংসারকে যথাসাধ্য পাশ কাটিয়েই চলতে চান। তা ছাড়া সময় কোথায় তাঁর? ল্যোডিং-ক্লিয়ারিং-এর সামান্য চাকরি—সারাটা দিনই কাটে কয়লায় আর ধুলোয় ভরা চিৎপুরের রেলওয়ে ইয়ার্ডে। সন্ধ্যায় কাশতে কাশতে বাসায় ফিরে আসেন।

কাকিমা বলেন, "একলা মানুষ—খাটতে খাটতে সারা হয়ে গেল! অথচ সবাই নিজের নিজের ভাবে—ওর দিকে কেউ ফিরেও চায় না।"

বাপের জন্যে রুটি করতে করতে বিব্রত হয়ে ওঠে আঠার বছরের মেয়ে কেয়া। বলে, "আঃ, কী করছ মা! শুনলে জয়ন্তদার কষ্ট হবে যে!"

কিন্তু জয়ন্তর এখন আর কষ্ট হয় না। বরং কাছেই সে লজ্জায় সংকুচিত হয়ে থাকে। টিউশানের সামান্য টাকার উপর নির্ভর করেই যে-কোন একটা ছোটখাটো মেসে গিয়ে উঠবে, সে-কথাও ভেবেছে কয়েকবার। কিন্তু এখানেও নিজেকে জড়িয়েছে জয়ন্ত। কেয়া। কেয়া। কী করে যে হঠাৎ একদিন ধরা পড়ল মনের কাছে!

সকালে চা দিতে এসে কেয়া একবার তাকাল এদিক ওদিক। না, মা কোথাও কাছাকাছি নেই।

'জান জয়ন্তদা, একটা সুখবর আছে।"

'কিসের সুখবর?" জয়ন্ত চোখ তুলল।

খুশির ভঙ্গিতে কেয়া বললে, "কাল বিকেলে আমাকে দেখতে আসবে।"

জয়ন্ত চমকে উঠল। একটু হলেই চায়ের কাপটা ছলকে পড়ত: "কে দেখতে আসবে?"

শব্দ করে হেসে উঠল কেয়া। বললে, "আকাশ থেকে পড়লে? আমাকে যারা ঘরের বউ করে নিতে চায়—তারাই আসবে। বন্ধুদের সঙ্গে বর নিজেও আসতে পারে সঙ্গে। অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি থাকবে না আশা করা যায়।"

জয়ন্ত হঠাৎ অনুভব করল, জিনিসটাকে খুব সহজভাবে সে নিতে পারছে না।

"তোমাকে পছন্দ হবে না, দেখে নিয়ো।"

"আমি কালো বলে?"

"ঠিক তাই।"

"কিন্তু আমার চোখমুখ ভাল, গড়ন ভাল, চেহারায় লক্ষ্মীশ্রী আছে।" কেয়া আবার হেসে উঠল।

"নিজেকেই সার্টিফিকেট দিচ্ছ নাকি?"

"বাঁচাই হতে চলেছি। জড়পদার্থ ত নই। আর যদি মুখে আটকায়, নিজের গুণ নিজেই কীর্তন করব।"

কী ভেবে জয়ন্ত কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কেয়া হাসছে—কিন্তু সে-হাসি তার চোখে নেই। একরাশ গভীর কালো জলের মত ছলছল করছে তারা দুটো।

"তবু তোমার আশা নেই।" খুব আস্তে আস্তে বললে জয়ন্ত।

চোখ থেকে জল ঝরল না বটে, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল কেয়া। বর্ষা নামল না—তার ছায়া নামল।

কেয়া বললে, "নিজে ত কখনো তাকিয়েও দেখলে না। আর কারও পছন্দ হয়—তাও বুঝি চাও না?"

আর তৎক্ষণাৎ নিজেকে চিনল জয়ন্ত। একটা দমকা হাওয়ায় পর্দাটা সরে গেল সামনে থেকে। এইজন্যেই। এইজন্যেই ত এতদিন এ-বাড়ি ছেড়ে সে কিছুতেই চলে যেতে পারেনি। কেয়া একদিনে ঝড়ের মত এসে দেখা দেয়নি তার কাছে। তিলে তিলে নিজেকে সঞ্চার করেছে জয়ন্তর মনে—নিঃশব্দে কখন সবখানি জায়গা জুড়ে বসেছে। কেয়াকে হারাবার একটুখানি সম্ভাবনাতেই সম্পূর্ণ জেগে উঠল জয়ন্ত। যন্ত্রণায় টনটন করে উঠল বুক।

তাকিয়ে দেখল, ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে কেয়া।

পরের দিনের ফাঁড়াটা অবশ্য কেটে গেল। কেয়ার কালো রঙ জয়ন্তকে রক্ষা করেছে এ-যাত্রা। তা ছাড়া কাকার বাসার চেহারা দেখেই পাত্রপক্ষের নাক যে সিঁটকে উঠেছিল শেষপর্যন্ত সে-নাক আর সোজা হয়নি। কেয়া বাতিল।

কিন্তু বার বার ত এমনভাবে চলবে না। কালো মেয়ের ভিতরেই হঠাৎ কেউ কৃষ্ণকলিকে আবিষ্কার করতে পারে একদিন—হঠাৎ জেদ চেপে গিয়ে কেউ বলে বসতে পারে, 'বাঙালী ত আর সায়েব নয়! কালো মেয়ে বলে কি তার বিয়ে হবে না? তা ছাড়া ছেলে বেচে আমি টাকা নিতে চাইনে মশাই, আপনি শাখা-সিঁদুর দিয়েই সম্প্রদানের ব্যবস্থা করুন।'

আতঙ্কে পর পর কয়েক রাত জয়ন্তর ঘুম এল না।

কেয়া ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "তোমার যদি একটা চাকরি-বাকরি থাকত, তা হলেই—"

তা হলেই। কিন্তু ওই সামান্য বাধাটুকুই সমুদ্রদুস্তর। প্রায় ছ মাস চেষ্টা করেও কোন কিনারা এখন পর্যন্ত চোখে পড়ল না। শুধু রামপদর মুখের দিকে তাকিয়েই কখনও কখনও বুকের ভিতরে দুর দুর করতে থাকে দুরাশা। তিন-তিনটে মেসিন-টুলস কারখানার মালিক। কোনমতে যদি একবার স্কুল ফাইন্যাল তরিয়ে দিতে পারে, তবে কৃতজ্ঞতার খাতিরেও হয়ত তার একটা গতি করে দিতে পারে রামপদ। ইচ্ছে করলেই।

কিন্তু পরীক্ষা পাশ করার যতটা শখ আছে—ততটা উদ্যম রামপদর নেই। দু লাইন ইংরেজী লিখতেই তাকে দুবার গোল বারান্দা ... আয়কে হয়—যে ইংরেজীতেও চারটে ভুল, দুটো বানান, দুটো কনস্ট্রাকশন। ঘাড় চুলকে রামপদ বলে, "হে—হে, কি জানেন, বুড়ো বয়সে আর—"

"কিন্তু পরীক্ষাটা ত আপনাকেই দিতে হবে।"

"সে ত বটেই।" রামপদ সায় দেয়, "চেষ্টা ত সাধ্যমতই করছি।"

সে-চেষ্টার খুব বেশী লক্ষণ অবশ্য দেখা যায় না। এই ত প্রায় এক ঘণ্টা হল জয়ন্ত এসেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত রামপদর দেখা নেই। চা আর খাবার যথানিয়মেই এসেছে—সেগুলো শেষ করে চুপচাপ বসে আছে জয়ন্ত। সামনে উঠোনে একটা বিরাট কাকাতুয়া দাঁড়ের উপর বসে সমানে চিৎকার করছে। অমন একটা কর্কশকণ্ঠ বীভৎস পাখি পুষে কী লাভ হয়, জয়ন্ত দার্শনিকের মত সেই কথাটাই ভাবতে লাগল। উঠোনের আর এক দিকে দুটো প্রকাণ্ড গরু একমনে জাবনা খাচ্ছে—অনেকটা করে দুধ দেয় নিশ্চয়।

কানের কাছে হঠাৎ একটা দানবিক আর্তনাদ। জয়ন্ত প্রায় আঁতকে উঠল।

জাবনা-খাওয়া গরু দুটোর মতই পরিতৃপ্ত ভঙ্গিতে পান চিবোতে চিবোতে ঘরে ঢুকেছে রামপদ। তার কোলে বছরখানেকের প্রায়-গোলাকার একটি শিশু। আকাশজোড়া হাঁ মেলে সে চিৎকার জুড়েছে।

রামপদ অপ্রতিভ হয়ে বললে, "কী করা যায় স্যার, আমাকে কিছুতেই ছাড়ছে না। তাই সঙ্গে করেই নিয়ে এলুম। নে বাপু—ঘাম এখন, মাথা ধরে গেল।"

বলেই রামপদ তাকে টেবিলের উপর বসিয়ে দিলে। আর বসানোর সঙ্গে সঙ্গেই রামপদর বংশধর দ্বিগুণ জোরে প্রতিবাদ করে উঠল। জয়ন্ত হাঁ-হাঁ করে পাঠ-সংকলনটা সরিয়ে নিলে ছেলেটার আক্রোশধরা মুঠো থেকে।

"আপনি বরং ওকে শান্ত করেই আসুন।"

"হ্যা স্যার, তাই যাচ্ছি—" রামপদ আবার ছেলেটাকে তুলে নিলে টেবিল থেকে, "পড়াশুনো করব কি স্যার, এই হারাম—" বলেই জিভ কেটে সামলে নিলে, "এই এদের জ্বালায় কি মাথা ঠাণ্ডা রাখবার জো আছে। পাগল করে দিলে। এই চুপ চুপ। দেখছিস কেমন সুন্দর কাকাতুয়া? উঃ—গলার আওয়াজ ত নয়, যেন কামান দাগছে! লালু—লালু—লক্ষ্মী ছেলে—দ্যাখো কেমন এরোপ্লেন যাচ্ছে—দ্যাখো—ওই যে—"

কল্পিত একটা এরোপ্লেন দেখাতে দেখাতে রামপদ সপুত্র অন্তর্হিত হল। দূর থেকে ছেলেটার সিংহনাদ ভেসে আসতে লাগল একটানা।

জয়ন্ত আবার বসে রইল চুপ করে। কেয়ার কথা মনে পড়ছিল।

"বাবা আর খরচ চালাতে পারল না। নইলে আমি এবারে বি-এ পড়তুম। তুমি যদি

আমাকে একটু সময় করে পড়াতে জয়ন্তদা, তাহলে ঠিক এক বছর খেটে আমি স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে যেতুম।"

কিন্তু সময় কই জয়ন্তর? দু বেলা টিউশান না করলে কাকিমার মুখের মেঘ কাটে না। পাকিস্তানে বাবা-মা পড়ে আছেন —তাঁদের কলকাতায় আনা দরকার। কেয়াকে পড়ানোর মত বাড়তি সময় সে পাবে কোথায়?

কাকাতুয়াটা আবার উৎকট চিৎকার ছাড়ছে আর দাঁড়টায় নানা বিচিত্র ভঙ্গিতে দুলছে সার্কাসের ক্লাউনের মত। কার গলার জোর বেশী? ছেলেটার—না ওই পাখিটার?

"লেখাপড়ায় আমি খারাপ ছিলুম না জয়ন্তদা। ঠিক ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করতে পারতুম।" কেয়া বলেছিল।

জয়ন্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলল। হতে পারে। রামপদ একটু ইচ্ছে করলেই হয়। কিন্তু তার আগে পরীক্ষায় তাকে তরিয়ে দেওয়া দরকার। সে-কাজটা আপাতত এভারেস্ট ডিঙনোর চাইতে সহজ বলে মনে হচ্ছে না। জয়ন্ত তাকিয়ে দেখল গোরু-দুটো নিশ্চিন্তে জাবর কাটছে। রামপদও। কেবল পৃথিবীর যা কিছু দুশ্চিন্তার ভার তারই মাথার উপরে চেপে বসে আছে যেন।

জয়ন্ত আবার নিঃশ্বাস ফেলল। রামপদর ইংরেজী কম্পোজিশনের খাতাটা খোলা আছে চোখের সামনেই। বেশ বড় বড় অক্ষরে পড়া যাচ্ছে—"হি ইজ থটিং"।

থটিং। মোটা টাকার মায়া এর পরে আর জয়ন্তকে এখানে বাঁধতে পারত না—চাকরির আশা ছেড়েই সে উর্ধ্বশ্বাসে রাস্তায় ছুটে বেরুত—যেচে সে পাগল হতে চায় না। কিন্তু যেদিন থেকে কেয়াকে দেখতে আসা শুরু হয়েছে, সেদিন থেকেই জয়ন্ত মরিয়া হয়ে কোমর বেঁধেছে। কোনো বিভীষিকাকেই আর তার ভয় নেই।

রামপদ ফিরে এল। মুখে সেই পোড়া সিগারেটের গন্ধ। গা গুলিয়ে উঠল জয়ন্তর।

"বিয়ে থা করেননি—খাসা আছেন স্যার। সংসার করা কী যে ঝামেলা!" রামপদকে আধ্যাত্মিক মনে হল: "আমারও স্যার এ-সব জালে জড়ানোর ইচ্ছে ছিল না। কেবল বাবার জন্যেই—"

উদাস দৃষ্টিতে রামপদ গোরুদুটোর দিকে তাকিয়ে রইল।

অধৈর্য হয়ে জয়ন্ত বললে, "ইতিহাসের যে-দুটো কোশ্চেন লিখতে বলেছিলুম——লিখেছেন?"

রামপদ বিমর্ষ হয়ে বললে, "সময় আর পেলুম কই! কাল আবার সকলকে নিয়ে থিয়েটারে—" বলতে বলতেই আবার জিভ কাটল: "মানে এমন কাজ পড়ে গেল যে কী বলব।"

ঠিক কথা। বলবার কিছুই নেই।

দাঁতে দাঁত চেপে জয়ন্ত বললে, "আপনার পরীক্ষার কিন্তু এক মাস বাকী।"

"সে-সব ভুলিনি স্যার—ওদিকে ঠিক আছে। কালীঘাটে পুজো দিচ্ছি প্রত্যেক শনিবার।" রামপদ একটা হাই তুলল: "কিন্তু শরীরটা আবার সব সময়ে ভালও যায় না। এই দেখুন না, কাল রাতে ঘুমটা সুবিধে হয়নি গা-টা ম্যাজ্‌ম্যাজ্ করছে।"

জয়ন্ত উঠে দাঁড়াল। রামপদর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই।

"তা হলে আজ থাক।"

রামপদ ক্ষুণ্ণভাবে মাথা নাড়ল: "হ্যাঁ স্যার, আজ থাক। শরীরটা বেচাল হলে পড়ায়ও মন বসবে না। কাল সময়মতই আসছেন ত?"

দরজার গোড়ায় মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল জয়ন্ত। বললে, "আসব।"

পথে বেরিয়ে অসহ্য তিক্ততায় জয়ন্তর মনে হল, কালও তাকে এ-বাড়িতে আসতে হবে। লাল পেন্সিল দিয়ে সংশোধন করতে হবে অবিশ্বাস্য ইংরেজী, রামপদর ঘোলা-ঘোলা অর্থহীন চোখের দিকে না তাকিয়েও সমানে অঙ্ক কষতে হবে একটার পর একটা, পোড়া সিগারেটের কটু গন্ধে বমি আসতে চাইলেও সে-কথা কোনমতেই বলা যাবে না। আর দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হবে বুকের নাড়ী ছিঁড়ে যাওয়া প্রত্যাশায়। অথচ রামপদ কোনদিন পাশ করতে পারবে না!

কেয়াকে পড়ান যেত। কিন্তু মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে প্রাইভেট টিউটার রাখবার শক্তি নেই কেয়ার। অন্তত এইখানেই জয়ন্ত যা কিছু দুর্লভ।

বিকেল থেকে বৃষ্টি নেমেছে একটানা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখনও থামবার লক্ষণ নেই। আজ রবিবার, জয়ন্তরও তাড়া নেই কিছু। একটা কাঠের টুল নিয়ে জানলার পাশে চুপ করে বসে ছিল।

গ্যাস জ্বলেছে রাস্তায়। সামনের খাটালটা বৃষ্টির ঝাপ্টায়, আবছা আলোতে অদ্ভুত দেখাচ্ছে—বড় বড় মোষগুলোকে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মত মনে হচ্ছে এখন। পথের উপর দিয়ে খালের মত হয়ে ঘোলা জলের স্রোত বইছে—তা থেকে চারদিকে ছড়াচ্ছে খাটালের দুর্গন্ধ। মশা তাড়াবার জন্যে মোষের ল্যাজ উঠছে-পড়ছে, আলো-অন্ধকারে এক-একটা সাপের ফণা দুলে উঠছে যেন।

রামপদর সেই নধর-নিটোল গোরুদুটোকে মনে পড়ল। রামপদকেও। বাইরের এই কদর্য দৃষ্টির দিকে চোখ মেলে কী অসম্ভব দুরাশার স্বপ্ন দেখছে জয়ন্ত! এই জীর্ণ একতলা বাড়িতে, ক্লিয়ারিং এজেন্টের এই দীন কর্মচারীর দীনতম সংসারে, সম্মুখের খাটালটার ওই উগ্র দুর্গন্ধের মধ্যেও স্বপ্ন দেখছে জয়ন্ত। দেশে—আখ্‌টির ... খালের ধারে, ঘন জঙ্গলের মধ্যে এখন এমনিভাবে বৃষ্টি পড়ছে, কালো-কাজল ছায়ার আড়ালে কেয়াফুল ফুটেছে, বুকের ভিতরে কেয়া কাঁটার বিষাক্ত যন্ত্রণা সহ্য করেও কাল কেউটে জড়িয়ে আছে গাছের সঙ্গে, কেয়া গন্ধের নেশায় তার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে।

টপ্ করে এক ফোঁটা জল পড়ল জয়ন্তর কপালে।

স্বপ্নভঙ্গ। একটু বেশী বৃষ্টি হলেই এ পুরনো বাড়ির ছাত দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ে। জয়ন্ত শিথিল ক্লান্তিতে উঠে দাঁড়াল। টুলটাকে একটুখানি সরিয়ে নিলে এ পাশে।

একরাশ তীব্র উচ্ছ্বসিত আলো এসে আঘাত করল চোখে। কেয়া চা নিয়ে এসে ঘরে। লাইটটা জেলে দিয়েছে।

"অন্ধকারে চুপ করে বসে আছ জয়ন্তদা?"

চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে জয়ন্ত হাসল। বললে, "দেশের কথা ভাবছিলুম।"

কেয়া এসে জানলার রেলিং ধরে দাঁড়াল। পথের উপর ঘোলা জলের স্রোতটা লক্ষ্য করল খানিকক্ষণ, তারপর দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিলে আকাশের দিকে। সেখানে ঘন কালো মেঘের উপর রেলওয়ে সাইডিঙের ধোঁয়া কতগুলো ভৌতিক ছায়ামূর্তির মত ... যেন খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কেয়া ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল।

"সত্যি। দেশে আর ফেরা যাবে না—না?"

জয়ন্ত জবাব দিল না। জবাব তার জানা নেই।

চায়ে একটা চুমুক দিয়ে আর একটু পরে জয়ন্ত বললে, "ভাবছিলুম, দেশে এখন কেয়াফুল ফুটেছে।" বলে জয়ন্ত আবার হাসল। তার মনে হল, কথাটা খুব সুন্দর করে বলা হয়েছে, কেয়ার ভাল লাগবে।

দুটো নিবিড় বিষণ্ণ চোখ জয়ন্তর দিকে ঘুরে এল।

"কেয়াফুল এবার ঝরে যাবে জয়ন্তদা, এত বৃষ্টি তার সইবে না।"

জয়ন্তর মনের লঘুতা মিলিয়ে গেল।

"কী হয়েছে কেয়া?"

"একটা কোন গোলমাল হবে জয়ন্তদা। বাবা বাড়িতে বিপদ ডেকে আনছে।"

চকিত হয়ে জয়ন্ত বললে, "তার মানে?"

"কালকে রাত্রে কাগজ পোড়ার গন্ধে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল।" কেয়ার ... ভারী হয়ে এল: "ভাবলুম, রান্নাঘরে কোথাও আগুন-টাগুন ধরেছে? এসে দেখি বাবা চোরের মত বসে বসে কী সব কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলছে। বললুম, 'এত রাতে তুমি এ কী করছ? কী পোড়াচ্ছ ওসমস্ত

াবা ধমক দিয়ে বললে, 'অত খবরে তোর ী হবে? তুই যা—ঘুমো গে।'"

জয়ন্ত চা-টা শেষ করল। আশ্চর্য, তবু ার মনে হচ্ছিল, গলার ভিতরটা শুকিয়ে ঠ হয়ে রয়েছে।

কেয়া বললে, "বাবার চোখদুটো জ্বলছিল য়ন্তদা। আর কাগজের আগুনে কী যে য়ঙ্কর দেখাচ্ছিল মুখখানা! বাবার অমন শ্রী চেহারা এর আগে আমি কখনও াখিনি।"

"তুমি যা ভাবছ হয়ত তেমন কিছু য়।" জয়ন্ত নিরুদ্যমভাবে কেয়াকে উৎসাহ তে চাইল।

"আমার আঠার বছর বয়েস হয়েছে য়ন্তদা, ছেলেমানুষ নই।" কেয়া অন্ধ ালো আকাশে ছায়ামূর্তির শোভাযাত্রার দকে তাকাল: "এখন আমার মনে হচ্ছে, কছুদিন থেকেই বাবার হালচাল একটু ন্যরকম। থেকে থেকে কেমন করে চেয়ে াকে, অনেক রাতে বাড়ি ফিরে খুব াবধানে কড়া নাড়ে, মা-র সঙ্গে ফিস-ফিস রে কথা বলে। বাবা নিশ্চয় কোন অন্যায় রছে জয়ন্তদা।"

এইমাত্র চা খেয়েও গলা মুখ সমস্ত ুকিয়ে আছে। জয়ন্ত ঠোঁট চেটে বললে, "কিন্তু কাকাবাবু ত যেমনি নিরীহ, তেমনি ভীরু। কোন অন্যায় কি তিনি করতে পারেন? তাঁর কি সে-সাহস আছে কেয়া?"

ছাত চুঁইয়ে কয়েক ফোঁটা জল পড়েছে কেয়ার মাথায়—চিকমিক করছে কেয়াফুলের একরাশ রেণুর মত। সেই রেণুগুলো এবার কেয়ার চোখে এসেও জমেছে মনে হল।

"বাবা কী করবে। মা-ই টাকা টাকা করে বাবাকে প্রায় পাগল করে তুলেছে।" কেয়া চোখ মুছে বললে, "জান জয়ন্তদা, মা-র জন্যেই বাবা জীবনে শান্তি পেল না কোনদিন।"

এবারেও জয়ন্তর কিছু বলবার ছিল না। কেবল কোথা থেকে একটা শীতল আতঙ্ক তার বুকের মধ্যে ঘনিয়ে উঠতে লাগল।

"মা বরাবরই লোভী আর স্বার্থপর। অভাবে আরও নীচে নেমেছে। কিন্তু কেবল নিজেই নামেনি, সেই সঙ্গে বাবাকেও টেনে নামাচ্ছে। আমার কী মনে হয় জান? আমারও বোধহয় খুব দেরি নেই। কাগজে দেখেছি, মেয়েরাও আজকাল অভাবের তাড়ায় ট্রামে-বাসে পকেট কাটতে আরম্ভ করেছে। হয়ত আমিও একদিন—"

পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল জয়ন্তর—একটা বিষক্রিয়া যেন বিদ্যুতের মত ছুটে গেল রক্তে। পরক্ষণেই কেয়ার শীর্ণ অথচ আশ্চর্য সুকুমার একখানা হাত চলে এল জয়ন্তর হাতে। এর জন্যে কেউই তৈরী ছিল না। কেয়া নয়—জয়ন্তও না।

কোন ভরসা নেই, কোন জোর নেই, তবু

কেয়াফুল এবার ঝরে যাবে জয়ন্তদা

গভীর প্রত্যয়ে জয়ন্ত বললে, "কিছু ভেব না কেয়া, কিছু ভেব না। আমি আছি।"

আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কেয়া। কাকিমা ডাকছিলেন রান্নাঘর থেকে।

জয়ন্ত চেয়ে রইল বাইরের দিকে। দুর্গন্ধ ঘোলাজলের স্রোত বয়ে চলেছে। কোন একটা জীবনের সংকেত। খাটালের আলো-অন্ধকারে মোষগুলোকে দেখাচ্ছে কয়েকটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মত। আর-একটা দুর্বোধ্য প্রতীক। কোন অর্থ কোথাও আছে, অথচ স্পষ্ট করে ধরা যায় না।

আসল কথাটা রামপদ ভাঙল পরীক্ষার দু দিন আগে। বার তিনেক গোল বারান্দায় ঘুরে আসবার পর। পোড়া সিগারেটের গন্ধে জয়ন্তর স্নায়ুগুলো যখন প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে এসেছে—সেই সময়।

প্রথমে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। এমন কি, সামনে রামপদ দাঁড়িয়ে আছে কিনা তাও ঠিক বুঝতে পারল না। তার মনে হল, উঠোন থেকে একটা গোরু জাবর কাটতে কাটতে এই দোতলার বারান্দায় উঠে এল কী করে?

রামপদ পান চিবুচ্ছিল। আর ভরসা পেয়ে বলে যাচ্ছিল: "আইডেন্টিটির ব্যাপারটাও ম্যানেজ—"

এইবারে নড়ে উঠল জয়ন্ত।

"আপনি পাগল হয়েছেন—না আমি?"

"অ্যাঁ?" একটা আচমকা ধাক্কা লেগে থমকে গেল রামপদ, চোয়াল ঝুলে পড়ল তার।

"পরীক্ষার ভাবনায় কি মাথা খারাপ হয়েছে আপনার?" আবার তীক্ষ্ণ গলায় জয়ন্ত প্রশ্ন করল।

রামপদ বুঝতে পারল, পাথরে এসে ঠেকেছে। এখান থেকে আর এক পা-ও এগোতে পারবে না।

সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য কৌশলে রামপদ বদলে ফেলল মুখের চেহারা। তারাপদ মল্লিকের ছেলে। রক্তে নির্ভুল উত্তরাধিকার। এখনও ইংরেজীতে সে 'থটিং' লেখে, কিন্তু তিন চারটে মেশিন টুল্‌স কারখানার সে মালিক।

অকৃত্রিম কৌতুকে রামপদ হেসে ফেলল।

"আপনি কি সত্যি ভাবছিলেন স্যার? আমি কিন্তু ঠাট্টা করছিলুম।"

ঠাট্টা? জয়ন্ত স্থির দৃষ্টিতে রামপদর মুখের দিকে চাইল। রামপদ এখনও হাসছে। অস্বাভাবিক চেষ্টায় মুখের পেশীগুলোকে টেনে টেনে হাসিটা ধরে রাখবার চেষ্টা করছে। জয়ন্ত তিন মাস পরে এই প্রথম দেখল, রামপদর গোঁফজোড়া অদ্ভুতভাবে পাকান। ঠিক কাঁকড়াবিছের ল্যাজের মত দেখতে।

জয়ন্ত বললে, "পরশু আপনার পরীক্ষা আরম্ভ। এ-সময় এ-ধরনের হিউমার বন্ধ রাখলেই ভাল হয়।"

"সে ত বটেই স্যার, সে ত বটেই।" রামপদ আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল: "এখন খুব সিরিয়াস্‌লি পড়া দরকার।" তারপরে বইটা খুলে সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে, "এই কবিতাটা স্যার এখনও বুঝতে পারছি না। যদি একটুখানি—"

জয়ন্ত বাসায় ফিরল অনেক দেরিতে। ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গিয়েছিল গড়ের মাঠে। ময়দানের ভিতরে অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে, প্রথম বৃষ্টিতে

রোমাঞ্চিত একরাশ ঘন ঘাসের উপর বসে ছিল অনেকক্ষণ। আকাশে ছায়া-রৌদ্র দুলছিল, সামনের গাছগুলোতে কাকেরা বর্ষার নীড় বাঁধছিল, গঙ্গার হাওয়া আর জাহাজের গম্ভীর ডাক আসছিল। চৌরঙ্গির ট্র্যাফিক থেকে অনেক দূরে বসে জয়ন্ত স্বপ্ন দেখছিল, লাখুটিয়ার খালের উপর শোলা আর বেতের বন নুয়ে পড়েছে, বুনো গাছের কচি পাতা খেয়ে চলেছে প্রজাপতির শুঁয়া আর ভিজে মাটির নীল-কাজল ছায়ার ভিতরে কেয়ার গুচ্ছ গন্ধের আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

রামপদর মুখটা মনের উপর ভেসে উঠল তারপর। কাঁকড়াবিছের ল্যাজের মত তার গোঁফজোড়া, দু পাশে অদ্ভুত ভঙ্গিতে পাকান। জয়ন্ত চকিতে নিজের ভিতরে খানিকটা বিষাক্ত যন্ত্রণা অনুভব করল। ছটফট করে উঠে দাঁড়িয়ে দেখল, হাতের ঘড়িতে সাড়ে এগারটা বেজেছে।

ফিরল, যখন বারটা পেরিয়ে গিয়েছে।

বাসার সামনে একটা ছোট জটলা। ভিতর থেকে কাকিমার আর্তনাদ ভেসে আসছে। হৃৎপিণ্ডে ঘা পড়ল জয়ন্তর।

দেওয়ালে মাথা ঠুকতে চেষ্টা করছেন কাকিমা—দু তিনজন প্রতিবেশিনী তাঁকে ঠেকিয়ে রাখছে জোর করে। বারান্দার কাঠের খুঁটিতে হেলান দিয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে কেয়া।

জয়ন্তকে দেখে কাকিমার স্বর আকাশে গিয়ে উঠল।

"দাঁড়িয়ে কী দেখছিস রে জয়ন্ত। ওরে —আমার সর্বনাশ হয়েছে রে—ওরে ওঁকে ছাড়িয়ে আন্‌রে—নইলে আমি দেওয়ালে মাথা ঠুকে মরব রে—"

মাথা যে অনেকক্ষণ ধরেই ঠুকছেন তাতে সন্দেহ নেই। কপালের অনেকখানি ফুলে আছে বলের মত গোল হয়ে। তাতে চুনের আর রক্তের দাগ। রক্ষাচণ্ডীর মত চুলগুলো খুলে পড়েছে—ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে কাকিমাকে।

কেয়া তীক্ষ্ন হাসি হাসল। কেয়াকাঁটার যন্ত্রণা জ্বলছিল তার হাসিতে।

"বাবাকে পুলিশে নিয়ে গেছে জয়ন্তদা। বাবা চুরি করেছিল।"

রামপদর কথা শুনে যেমন হয়েছিল, এখনও ঠিক সেইরকম মনে হল। সামনে কেয়া কোথাও নেই। একটা সাপের ফণা দুলছে। লাখুটিয়ার খালের ধারে কেয়াবনের ভিতরে যে কালকেউটেরা জড়িয়ে পড়ে থাকে।

কেয়া আবার বললে, "উকিলের কাছে গিয়েছিলুম। নগদ শ পাঁচেক টাকা ছাড়া কেউ জামিন হতে চায় না। ক্লিয়ারিং এজেন্টের একজন সামান্য কেরানীকে কেউ বিশ্বাস করে না জয়ন্তদা।"

কাকিমা সমানে কেঁদে চলেছেন। বিচিত্র সুরে, ইনিয়ে বিনিয়ে। জয়ন্তর ঠোঁট দুটো নিঃশব্দে নড়ে উঠল কয়েকবার।

"বাবাকে বাঁচাতে গেলে এখন আমাকেও কোথাও চুরি করতে বেরুতে হয় জয়ন্তদা। অথবা আরও কোন অধঃপাতের পথ খুঁজতে হয়।"

জয়ন্তর মুখের সামনে কাল-কেউটে দুলতে লাগল, চাপা হাসির আওয়াজটা শোনাল সাপের শিসের মত: "তোমার অভিশাপেই আমার বিয়ে হল না। এখন কোন্ দাম দিয়ে বাবাকে আমি জেল থেকে ফিরিয়ে আনব?"

আর দাঁড়ান চলে না। এরপরে কেয়াকে আঘাত করে বসতে পারে জয়ন্ত।

"আমি আসছি—" বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল এই নরক থেকে। মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে তার আগুন জ্বলছিল।

বেপরোয়া হয়ে রামপদ তখন একটা সংস্কৃত ট্র্যানস্লেশন করবার চেষ্টা করছিল। চমকে উঠে দাঁড়াল। হাতের সিগারেটটা টুপ করে খসে পড়ল কার্পেটের উপর।

সেই অবস্থাতেও জয়ন্ত দেখল, অপরিচ্ছন্ন বড় বড় অক্ষরে রামপদ লিখেছে: ঈশ্বরস্য লীলা ক্ষুদ্রঃ নরং কি উপায়ে জানিষ্যতি—

ভটস্থ হয়ে রামপদ বললে "এই অসময়ে কী মনে করে স্যার? বসুন—বসুন—"

জয়ন্ত বসল না। রামপদর খাতার দিকে চোখ রেখেই প্রায় বোবা গলায় বললে, "তখন ও-কথাটা কি সত্যিই ঠাট্টা করে বলেছিলেন আপনি?"

তারাপদ মল্লিকের ছেলে রামপদ মল্লিক হাসল। মুখের পেশীর সঙ্গে সঙ্গে গোঁফের প্রান্ত দুটোও দুলে গেল তার। রামপদ বললে, "বসুন স্যার, স্থির হয়ে বসুন। ওরে, স্যারের জন্যে বরফ দিয়ে এক গ্লাশ ঘোলের সরবত নিয়ে আয়—"

তারপরে দুটো টেলিফোন। একটা উকিলকে—একটা ক্লিয়ারিং এজেন্টের অফিসে। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি রামপদ মল্লিক বলছি। আমি ইণ্টারেস্টেড। টাকা দিয়ে মিটিয়ে ফেলুন। ধন্যবাদ। তারও পরে একটা মোটা অঙ্কের টাকার চেক। রামপদর হাতের লেখা যতই খারাপ হক, চেকের সই তার দেখবার মত।

পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার আধ ঘণ্টা পরেই ইনভিজিলেটর একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালেন। প্রথম থেকেই আশপাশে ঘুর-ঘুর করছিলেন ভদ্রলোক।

"একটু উঠতে হচ্ছে আপনাকে।"

স্প্রীং-টেপা পুতুলের মত উঠে পড়ল রামপদ মল্লিক। তৎক্ষণাৎ। যেন এরই জন্যে সে অপেক্ষা করছিল।

ইনভিজিলেটরের স্বরে সকৌতুক সহানুভূতি: "কেন আর মিথ্যে কষ্ট পাচ্ছেন?"

না, আর কষ্ট পাওয়ার দরকার নেই।

কাগজে কলম থেমে গিয়েছে ছেলেদের। পরীক্ষার 'হল' নিশিরাত্রের কবরখানার মত নিস্তব্ধ। কারও একটা নিঃশ্বাস পর্যন্ত পড়ছে না।

"এবার তা হলে আপনাকে অফিসে আসতে হচ্ছে।" অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বললেন ইন্‌ভিজিলেটর। শক্ত হাতের চাপ পড়ল জয়ন্তর কাঁধে।

হল থেকে বেরিয়ে চলল জয়ন্ত। আর পঞ্চাশ জোড়া চোখ বোবা আতঙ্কে অনুসরণ করতে লাগল তাকে। তারা যেন কোন হত্যাকারীকে দেখছে।

জয়ন্ত জানে। অফিস থেকে তাকে পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করা হবে। সেখান থেকে থানার হাজতে। কাঁধের উপর কয়েকটা কঠিন আঙুলের নিষ্ঠুর চাপ অনুভব করতে করতে জয়ন্ত ভাবল: "তার জামিনের ব্যবস্থা করবে কে? রামপদ, না কেয়া?"

ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি নেমে এসেছে। এমনি বর্ষাতেই, লাখুটিয়ার খালের ধারে, নীল-কাজল ছায়ার আড়ালে কেয়াফুল ফোটে।

আসামের আদিবাসী

শ্রীনিখিল মৈত্র

সারা আসামের সমতলভূমিতে আর পাহাড়-পর্বতে আদিম সমাজের মানুষ ছড়িয়ে রয়েছে। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার পাঁচ-ভাগের এক-ভাগ আদিবাসী। গারো, খাসী-জয়ন্তিয়া লুসাই, মিকির-উত্তর কাছাড় এবং নাগাপাহাড়, এই পাঁচটি আদিবাসী-অধ্যুষিত এলাকা আসামের স্বায়ত্তশাসিত জেলার মর্যাদা পেয়েছে। তা ছাড়া অন্যান্য সব জেলাতেই আসামের বর্ণবৈচিত্র্যময় আদিবাসী-গোষ্ঠীর বসতি রয়েছে। গোয়ালপাড়া থেকে জোড়হাট, গৌহাটি (কামরূপ) থেকে লখিমপুর, ব্রহ্মপুত্রের সমভূমিতে, দূরে বনে-জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের গায়ে কাছাড়ী, খাসী, মিকির, মিরি, মিশমী প্রভৃতি কতরকমের আদিম মানুষের বসবাস।

তারা কীভাবে, কখন, কোথা থেকে এসেছে এ সম্বন্ধে অনুমান আর গভীর গবেষণার অন্ত নেই। কাছাড়ী-গারো-হাজং প্রভৃতি আদিবাসীদের পূর্বজেরা চীনের ইয়াং-সি-কিয়াং ও হোয়াং হো নদীর দোয়াব থেকে আসামের পূর্ব ও পশ্চিম দ্বার দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে। '৩১ সনের আদমসুমারির রিপোর্টে কাছাড়ী আদি-বাসীদের আদিভূমি সম্বন্ধে এক কিংবদন্তীর উল্লেখ করা হয়েছে। বহু যুগ আগে কাছাড়ীরা বসবাস করত উজ্জ্বল এক শৈলশিখরে। তার নাম ছিল ইলাস কামরুলি। সেই শৈলাবাসের বাড়িঘর সব পাথর দিয়ে তৈরী। গ্রামের পাশে উপত্যকার পথে প্রবহমান খরস্রোতা, চঞ্চলা নদী। সেই সুদূরে দুরধিগম্য গ্রামও কিন্তু একদিন বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত হল। ভীত, ত্রস্ত গ্রামবাসীরা নিজেদের মাতৃভূমি ত্যাগ করে, ভেলায় চড়ে নদীর অপর পারে এসে আশ্রয় নিল।

গারো আদিবাসীদের আদি বাসস্থান ছিল তিব্বতের তরুরা প্রদেশে, এ-তথ্যও আমরা প্রাচীন গারো লোককথায় জানতে পারি। সেখান থেকে জাম্পা-জালিনপা ও সুকপাবাঙ্গপার নেতৃত্বে একদল সাহসী অভিযানকারী বেরিয়ে পড়ে নতুন দেশের সন্ধানে। যাত্রাপথে তারা আসে ধুবড়িতে। কিন্তু ধুবড়ির নরেশ ধোবানী বহিরাগত মানুষকে সেখানে বসবাসের অনুমতি দিলেন না। ক্লান্ত যাত্রীর যাত্রা আবার শুরু হল। মানস নদীর ধারে স্থানীয় নৃপতি আবার তাদের পথরোধ করলেন। কিছুদিন এই রাজার কারাগৃহেও অভিযাত্রীদের থাকতে হয়। তারপর আরও বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করে গারোরা এসে বসতি গড়ে তোলে আরবেলা পাহাড় ও স্রোতস্বিনী সোমেশ্বরীর আশেপাশ। গারো কথা-কাহিনীতে ইয়াক সুপরিচিত জন্তু। অথচ, ইয়াক তারা কখনও দেখেনি।

গারো আর বোড়ো (বা কাছাড়ী) কিংবদন্তীর এই সাদৃশ্য এবং অন্য আরও কারণ দেখে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন যে, এই উপজাতি সম্ভবত উত্তর-পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম আসামের তিস্তা, ধরলা, ও সঙ্কোশ প্রভৃতি নদীর উপত্যকা দিয়ে ভারতবর্ষের পূর্ব সীমানায় প্রবেশ করে। শক্তিশালী

টাকার মূল্যে কেউ দেয় না। ধাতুর মুদ্রা সামান্য পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আসল সম্পদের পরিচয় কিন্তু তিব্বতী মন্দিরের পুরাতন ঘণ্টা, বিশেষ রকমের পুঁথি ও বন্যমহিষ। ঘণ্টার মূল্য নির্ধারিত হয় প্রাচীনত্বের মাপকাঠিতে। আমাদের গৃহস্বামীর ঘরে এক অতি পুরাতন ঘণ্টা দেখলাম যার বিনিময়ে একটা গোটা গ্রাম কেনা যায়।

বাইসন-(বন্য মহিষ)এর কাহিনী আরও বিচিত্র। জঙ্গলে বন্য পশুর পাল রয়েছে। নিজ পরিবারের বিশেষ চিহ্নে সেই বন্য-মহিষকে চিহ্নিত করতে পারলে পশুর মালিকানা সেই পরিবারের হবে। তা সমাজ মেনে নেবে এবং তা বেচাকেনাও করা যেতে পারে। বিবাহের সময় দফলা যুবককে যৌতুক দিতে হয় কন্যাপক্ষকে। বীর যোদ্ধা সঙ্গী সাথী নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বন্য মহিষ শিকার করতে। পাঁচটা পশুর বিনিময়ে আভিজাত্যগর্বী গ্রামবৃদ্ধের কন্যার পাণি-পীড়ন দফলা যুবকের পক্ষে সম্ভব। বন্য-মহিষ বিক্রয়ের পর নতুন মালিক তখনই তাকে ধরবে না। উৎসব-অনুষ্ঠানে বিরাট ভোজে এই পশু বলি দেওয়া হয়।

দফলা গ্রামে অল্প কদিনের বসবাসে কোনও বৈরিভাব লক্ষ্য করিনি। তবুও, অন্য আদিবাসী মানুষের মধ্যে যেভাবে মিশে যেতে পেরেছি, এখানে তা সম্ভব হয়নি। অবশ্য তার বড় কারণ যে, প্রথম থেকেই বেশ কিছু বাধানিষেধের মধ্যে আমাদের থাকতে হয়েছিল। দুর্যোগের দিনে গিয়েছি, তাই উৎসব-আনন্দের পরিচয় পাইনি। এরই মধ্যে একদিন মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখতে পেয়েছিলাম। শব সমাধি দেবার বিধি দফলাদের মধ্যে প্রচলিত। গ্রামবাসীদের সঙ্গে সমাধিস্থানে গিয়ে দেখলাম যে, মৃতদেহের সঙ্গে সেই বৃদ্ধের তরোয়াল, দা, তীর, ধনুক প্রভৃতিও রেখে দেওয়া হল। শবদেহ মাটি দিয়ে ঢেকে দেবার পর সেখানে বাঁশ বসান হল। শুনলাম যে, সদ্যোমৃতের পিপাসা তৃপ্তির জন্য কদিন ধরে ঘরে চোলাই মদ ফাঁপা বাঁশের মধ্য দিয়ে ঢেলে দেওয়া হবে। দফলা পুরোহিত নিয়েবু শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলেন। ভূত-প্রেত এবং সমস্ত অনিষ্টকারী শক্তিকে বিতাড়নের দায়িত্ব তাঁর। সাধারণ ঝগড়ার সালিশের জন্যে এখনও অনেক গ্রামবাসী এই পুরোহিতের শরণাপন্ন হয়। মন্ত্র উচ্চারণের পর নিয়েবু বাদী-বিবাদী দুই পক্ষকেই শার্দুল-দংষ্ট্রা স্পর্শ করিয়ে শপথ দেওয়ান। মিথ্যাবাদী অতি শীঘ্রই ব্যাঘ্রের উদরস্থ হবে, এই ভবিষ্যদ্বাণী করে ওঝা বিচারক তাঁর রায় দেন। শোদুং দিংদুং শপথ নিলে, বাদী বিবাদী দুই পক্ষকেই ফুটন্ত জলে হাত ডোবাতে হয়। ধারণা যে, মিথ্যা-ভাষীর হাতে ফোস্কা পড়বে, সত্যাশ্রয়ীর কোনও শারীরিক ক্লেশ হবে না। এই সব আচার অনুষ্ঠানে বরাহ ও মুর্গি বলি দেওয়া বিধেয়।

দফলাদের বিশ্বাস, অনিষ্টকারী শক্তি হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ ভক্ষণ করে রোগভোগের সৃষ্টি করে। এইরকম বহু কথা এই আদিম সমাজ সম্বন্ধে শুনেছিলাম। আসার দিন গ্রামবৃদ্ধ পাহাড়ের ওপারে যে-সব খণ্ডজাতি আছে, তাদের কথা বলছিলেন। সেখানে নাকি এখনও নরমুণ্ড সংগ্রহ করা হয়। সেই সব ভয়ংকর লোকেরা শত্রুর মাথা কেটে ফেলে এবং বিজয়-চিহ্ন হিসেবে ডান হাতের তালু নিজেদের গ্রামে নিয়ে আসে। এই সব জঙ্গলে কত রকমের বিচিত্র জীবজন্তু আছে, তাও গ্রামবৃদ্ধ বলছিলেন। সে-বিবরণ কতটা বাস্তব আর কতটা কল্পনার সৃষ্টি তা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। বিদায়
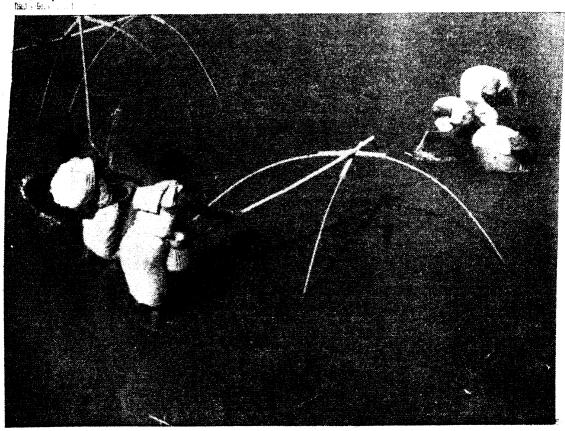
কাছাড়ী মেয়েরা মাছ ধরছে

নেবার পূর্বক্ষণে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "ঐ অস্পষ্ট কালো পাহাড়ের দেশে এ-অঞ্চলের কেউ কখনও গিয়েছে?" মঙ্গোলীয় আকৃতির বৃদ্ধ নির্বিকারভাবে ধীরে ধীরে বললেন, "না, ওদেশে আমরা যাই না। এই যে পূর্বদিকে সারি সারি মেঘের পাশে খাড়া পাহাড়ের প্রাচীর দেখছ, ঐ পর্যন্ত আমাদের যাবার অধিকার আছে। তার পর নিষিদ্ধ অঞ্চল। সেখানে কত উপদ্রবী শক্তি রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের পুরোহিতও কোনও কিছু করতে অক্ষম।"

আসামের আদিম সমাজে সর্ববৃহৎ গোষ্ঠী কাছাড়ী বা বোরো এবং তাদের জীবনযাত্রার ধরনধারণ দফলা-আবরদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাড়ে চার লাখ কাছাড়ী গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দরাং, উত্তর কাছাড়, মিকির পার্বত্য জেলা ও নওগাঁ জেলায় ছড়িয়ে রয়েছে। গত মহাযুদ্ধের শেষাশেষি কাছাড়ী গ্রামকে ভালভাবে দেখার আমার প্রথম সুযোগ ঘটে। বদরপুর থেকে লামডিং পর্যন্ত ১১৩ মাইল মীটার গেজের রেলপথ পাহাড়ের গা ঘেঁষে, সুড়ঙ্গপথে পর্বতের বাধা ভেদ করে, ছোটবড় জলধারা অতিক্রম করে চলে গিয়েছে। লড়াইএর সময় ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকার সংযোগকারী এই রেলপথের গুরুত্ব ছিল সমধিক। যাতায়াতব্যবস্থা দ্রুততর করার জন্যে দুই স্টেশনের মধ্যে অনেক সাময়িক 'ক্রসিং স্টেশন' তৈরি হয়েছিল। এইরকম ছোট এক নামগোত্রহীন স্টেশনে চলেছিলাম এক রেলকর্মচারী বন্ধুর আমন্ত্রণে। শুনেছিলাম যে, পাহাড়ের উপরে তাঁর বাসগৃহ থেকে নীচে ঝরনার ধারে হাতির পালকে জলকেলি করতে দেখা যায়। সেই সংবাদ পেয়ে বদরপুর থেকে লামডিংগামী গাড়িতে চড়ে বসলাম। বদরপুর স্টেশন ছাড়িয়ে বরাক নদীর উপর বিস্তৃত সেতু পার হয়ে রেল-লাইন পাহাড়ের উপর উঠতে আরম্ভ করল। হাফলং পর্যন্ত ঝাটিঙ্গা নদীর উপত্যকা দিয়ে লাইন চলেছে। মাঝপথে আমরা বরাইল পাহাড় পার হয়ে চললাম। সমস্ত দিন ধরে ছোট ছোট পাহাড়ী স্টেশনে লোক নামাওঠা করতে দেখলাম। আর প্রায় সব স্টেশনেই আদিবাসীরা কমলা, কলা, আনারস নিয়ে বেচাকেনা করতে এসেছে। সেবার অবশ্য বহু চেষ্টা করে, সারারাত জেগে বসে থেকেও হাতির দেখা পাইনি। তার বদলে পরিচয় হল ছোট এক দিমাসা গ্রামের সঙ্গে। দক্ষিণ কাছাড়ীদের দিমাসা বা বৃহৎ-নদীপুত্র বলে উল্লেখ করা হয়, যদিও তাদের বর্তমান বাসভূমির কাছে কোনও বড় নদী নেই। বর্তমানে পশ্চিম অঞ্চলের কাছাড়ীদের বোরো বলে উল্লেখ করা হয়। মেচ নাম সম্ভবত প্রতিবেশীদের দেওয়া এবং এখন কাছাড়ীরা এই নামকে অবজ্ঞাজনক বলে মনে করে। রাভা
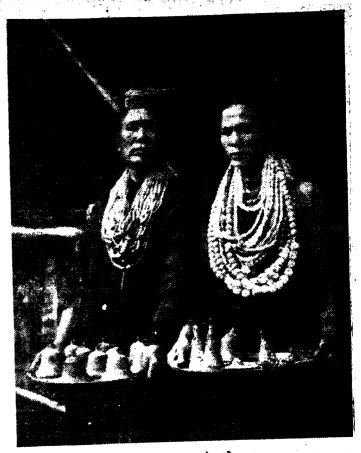
দফলা গ্রামবৃদ্ধ ও তাঁর স্ত্রী

(তোথলা), ধীমল, কোচ, সোলনিমিয়া, মহলিয়া, ফুলগোরিয়া প্রভৃতি শাখায় ব্রহ্মপুত্রের উত্তর অঞ্চলের কাছাড়ীরা বিভক্ত। দক্ষিণ ও পূর্ব অংশের কাছাড়ী দিমাসা, হোজাই, লালুং প্রভৃতি গোষ্ঠীর নামে পরিচিত। গারো, হাজং ও টিপরা আদিবাসীরাও দক্ষিণীদের নিকট-আত্মীয়।

কাছাড়ী ভাষায় জলকে বলে দি। আসামের বহু নদীর নামকরণ কাছাড়ীরা করেছে; তা নাম দেখলেই বোঝা যায়। যেমন দিহ, দিবাহ, দিরু, দিকু, দিগারু প্রভৃতি। মাইবঙ্গ মন্দির কাছাড়ী রাজাদের কীর্তি। হিন্দু সমাজের সংস্পর্শে এসে এই বিরাট আদিম সমাজের জীবনে কী বিরাট পরিবর্তন হচ্ছে তা সমাজবিজ্ঞানীদের লক্ষ্য করার বিষয়। এ-বিষয়ে সম্প্রতি বিশেষ কোনও কাজই হয়নি। অনেকদিন আগে মিশনারি প্রচারক রেভারেন্ড ইণ্ডলি কাছাড়ী সমাজে হিন্দুভাবধারার সংক্রমণে কী ভীষণ বিপর্যয় আসতে পারে, তার সম্বন্ধে মন্তব্য করে গিয়েছিলেন। তার ভিতরে যুক্তির যতখানি অভাব, ধর্মান্ধতাও ঠিক ততখানি উগ্র। এ-কথাও বিশেষ করে ভেবে দেখার যে, আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন কাছাড়ীদের মধ্যে বহুদিন চেষ্টা করেও খুব অল্প কয়েকজনকেই ধর্মান্তরিত করতে পেরেছেন। অথচ, আসামের অন্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশনারিরা বিশেষ সাফল্য লাভ করেছেন।

আসাম আদিম সমাজের সব থেকে শান্তিপ্রিয় অংশ মিকির উপজাতি। আসামের অন্য কোনও খণ্ডজাতির সঙ্গে মিকিররা নিজেদের আত্মীয়তা স্বীকার করে না। সুপ্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ ডাল্টনের মতে উত্তর কাছাড় পর্বতশ্রেণীতে মিকিরদের আদি বাসভূমি ছিল এবং কাছাড়ীদের সঙ্গে বিবাদের ফলে সে-স্থান ত্যাগ করে অনেকে খাসী-জয়ন্তিয়া পর্বত অঞ্চলে চলে আসে। মিকির কিংবদন্তীতে কুপলি নদীর ধারে খাসী-জয়ন্তীয়া পাহাড়ের পূর্ব প্রান্ত থেকে তাদের চলে আসার কাহিনী জানতে পারা যায়। সেখানে খাসী সামন্ত রাজাদের

অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মিকিররা আহোম নৃপতির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। আহোম রাজার অনুগ্রহে মিকিররা নতুন বসতি স্থাপনা করে। উত্তরে কলিয়াবর থেকে কাজিরঙ্গা পর্যন্ত বর্তমান মিকির দেশের সীমারেখা ব্রহ্মপুত্রের গা ঘেঁষে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে।

মিকির উপজাতির মধ্যে ইঙ্গতি, তেরাঙ্গ, ইঙ্গলিঙ্গ ও তেনতা শাখাই বড়। তাছাড়া ফাঙ্গচো, তকবি, বঙ্গরুঙ্গ, রঙ্গচাইচু, কিলিং প্রভৃতি আরও কয়েকটি ছোট গোষ্ঠীও আছে। মিকিররা নিজেদের পরিচয় দেয় আরলেঙ্গ অর্থাৎ মানুষ বলে। গারোরাও তেমনি নিজেদের অভিহিত করে আচিক (পাহাড়ী), মান্ডে (মানুষ) বলে। মিকির নামের সঠিক উৎপত্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে, অনেকেই অনুমান করেন, এ-নাম অসমীয়া প্রতিবেশীদের দেওয়া। মিকির পাহাড়ে গত তিরিশ বছরের মধ্যে বহু রেঙ্গমা নাগা ধানশিরির পর্বতটে থেকে চলে এসে বসবাস করছে। যমুনা ও দিয়াঙ্গ নদীর উপত্যকায় মিকিরদের সঙ্গে পাশাপাশি রয়েছে কাছাড়ীরা। আগেকার অসদ্ভাব এখন সম্পূর্ণ দূর হয়ে গিয়েছে। এই দুই উপজাতির সম্পর্ক এখন সম্পূর্ণ সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের। নওগাঁ ও কামরূপ জেলার সীমারেখায় খাসী পাহাড়ে লালুঙ্গ মিকিরদের প্রতিবেশী। জয়ন্তিয়া পাহাড়ে সিনটেঙ্গ ও কুবন আদিবাসী মিকিরদের সঙ্গী।

আদিবাসী গ্রামে উৎসবের দিনে অপরূপ দৃশ্য দেখেছি। আনন্দের হাসি সেখানে সংক্রামক। আহারে, পানে, নৃত্যে, গীতে সমস্ত পরিবেশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আদিম জীবনের এই বলিষ্ঠ প্রকাশ আমাকেও চঞ্চল করে তুলেছিল। সেই সব অবিস্মরণীয় দিনের স্মৃতি এখনও মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। খরস্রোত ব্রহ্মপুত্রের বিভক্ত জল-ধারার মধ্যে দ্বীপভূমিতে মিকির আদিবাসীর ছোট ছোট গ্রাম। শীতের অপরাহ্নে এমনি এক ছোট গ্রামে 'অম্নাগ পুচক' উৎসব দেখেছিলাম। সন্ধ্যার অস্তগামী সূর্যের আলোয় বালুস্তূপের পাশে ব্রহ্মপুত্রের প্রশস্ত জলধারা সজীব হয়ে উঠেছে। আরও বহুদূরে হিমালয় পর্বতমালার নামগোত্র-হীন শিলারাশি অস্পষ্ট আলোকে অদ্ভুত আকার ধারণ করেছে। সেদিন চাষের কাজে কেউ বেরয়নি। রাখাল গরুর পাল নিয়ে অনেক আগে গ্রামে ফিরে এসেছে। সন্ধ্যা সমাগমে উন্মুক্ত আকাশের তলে গ্রামের আঙিনায় নাচের আসর বসেছে। সবাই সযত্নে পরিপাটি বেশবিন্যাস করে এসেছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আরও বেশী করে সেজেছে। আজ নৃত্যগীত উৎসব তাদেরই। যুবক-যুবতীরা সম্পূর্ণ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বৃদ্ধজনের আনন্দ-উল্লাসে হাস্য পরিবেশনের ভার নিয়েছে যুবক-যুবতী, বালক-বালিকার দল। উৎসবের কল-রোল ব্রহ্মপুত্রের জলধারাকেও বুঝি আরও চঞ্চল, আরও উদ্দাম করে তুলেছিল। ভগবান নিরঞ্জন নিরাকারএর উদ্দেশে মিরীদের ডাবু উৎসব সম্পন্ন হয়। নবান্নের দিনে বাঙলার কৃষক যেমন দেবতাকে নতুন ধানের অর্ঘ্য নিবেদন করে, এ-উৎসবের মূল উদ্দেশ্যও প্রায় সেইরকম। গ্রামের বেদীমূলে বলিদানের পর পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করেঃ

পিতা চন্দ্র, মাতা সূর্য, তোমরা দেখ ও শোন! বৃক্ষ, লতা, নদী, বেতস ও ভূমি! তোমাদের সকলের সামনে আজ আমরা নিরঞ্জন নিরাকারকে এইসব উৎসর্গ করছি। যাতে গ্রামের সমস্ত অকল্যাণকর শক্তি দূরে হয়।

আসামের বিভিন্ন আদিবাসীদের উপ-জীবিকা কৃষি। বহুদিন ধরে গারো, মিজো, কাছাড়ী, মিকির, নাগা প্রভৃতি আদিবাসীরা ঝুম প্রথায় চাষ আবাদ করে আসছে। পাহাড়ের গায়ে বনজঙ্গল কেটে তাতে আগুন জ্বালিয়ে চাষযোগ্য ভূমি তৈরি হয়। সেই-খানে ধান বা অন্য শস্যবীজ ছিটিয়ে দিয়ে চাষ হয়। দু-তিন বছর ফসল বেশ ভালই হয়। তারপর জমির উৎপাদনশক্তি দ্রুত হ্রাস পায় এবং সব থেকে বিপজ্জনক কথা, প্রকৃতিদেবীর বহু আয়াসে হাজার হাজার বছর ধরে সঞ্চিত মৃত্তিকার স্তর পাহাড়ের গা থেকে বর্ষণবেগে ধুয়ে মুছে যায়। ধীরে ধীরে চিরশ্যামল বৃক্ষ-লতাগুল্মে আচ্ছাদিত পাহাড় হয়ে পড়ে ঊষর, একমাত্র ঘাস ছাড়া অন্য কিছু সেখানে জন্মায় না। এর আগে-কার দিনে আদিম সমাজের জনসংখ্যা যখন কম ছিল, নিজেদের ঝুম জমির পরিমাণও ছিল অনেক বেশী। তখন কয়েক বছর ঝুম করার পর আদিবাসী কৃষক সে-জমি ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় চাষ শুরু করত। বেশ কয়েক বছর পরে জমি তার উর্বরা শক্তি অনেকখানি ফিরে পেলে আবার সেখানে চাষআবাদ শুরু হত। এখন অবশ্য জমির আয়তন সংকুচিত হয়েছে, লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। তাই ঝুমের জমিতে বারবার অল্প সময়ের ব্যবধানে চাষ করা হচ্ছে। ফসলের ফলন কমে আসছে এবং ভূমিও তার শ্রী-সম্পদ হারিয়ে ফেলছে। এর জ পাহাড়ের গায়ে আল বেঁধে সাধারণ চা বাসের প্রণালী আদিম সমাজে শেখাব প্রয়োজন আছে। অঙ্গামী নাগারা এ-বিষ অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। আদিবা এলাকায় তামাক, তুলো, লঙ্কা, সুপা প্রভৃতি পণ্যশস্যের চাষবাসেরও প্রয়োজ আছে।

আসামের আদিম সমাজের মধ্যে গারো দেরই প্রকৃতিদেবী দিয়েছেন বহুরকমে খনিজ ও বনজ সম্পদ। বিস্তৃত অঞ্চল জু প্রচুর কয়লা এবং চুন-পাথর পাওয়া যায় সিমেণ্ট তৈরির কারখানাও এখানে গ তোলা সম্ভব। ঝুম প্রথায় চাষআবাদ ক গারো পাহাড়ের অমূল্য বনসম্পদ অযথ অপচয় করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও গারো পাহাড়ে বিরাট শালবন আছে। উনত্রি হাজার একর জমিতে তুলোর চাষ হয়। তুলো চাষের উপযোগী বিস্তৃত কৃষ্ণমৃত্তিকা-অঞ্চ অনাবাদী অবস্থায় পড়ে আছে। গারো এলাকার উন্নয়ন-পরিকল্পনা সম্বন্ধে স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি সকলেই জোর করে বলেছেন যে, রেলপথ দিয়ে গারো পাহাড়কে বাইরের জগতের সঙ্গে সংযুক্ত না করতে পারলে ধরিত্রীর বুক থেকে কোনও খনিজ সম্পদকেই কাজে লাগান যাবে না। পাকা সড়ক, রেলপথ, কোথাও বা স্টিমার চলাচলের দাবি আসামের আদিবাসী অঞ্চলে শুনেছি।

আসামের আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন বিভিন্ন খ্রীষ্টান মিশনারি সম্প্রদায়। তাঁরাই বিভিন্ন আদিবাসীর লিপিবিহীন কথ্য ভাষার লিখিত রূপ রোমান হরফে দিয়েছিলেন। আজ ভারতীয় ভাবধারা ও হিন্দী প্রচারের ব্যগ্রতায় যেন এ-কথা আমরা ভুলে না যাই যে, খণ্ডজাতীয় শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা তার মাতৃভাষাতেই দেওয়া প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম রাজভাষা বা হিন্দী কখনই হতে পারে না। আসামের আদিবাসী এলাকায় ঘোরাফেরা করতে গিয়ে বার বার এ-কথাই মনে হয়েছে যে, আদিম সমাজের স্বাভাবিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না। বহিরাগত শিক্ষক, সমাজ-সংস্কারক এবং শাসক—সবাই অনগ্রসর মানুষকে শেখাতে ব্যগ্র। কিন্তু তাদের জীবন থেকে নিজেদেরও যে কিছু শেখা এবং বোঝার প্রয়োজন আছে এ-রকম বোধ বড় বেশী দেখিনি।

(আলোকচিত্র—শ্রীসুনীল জানা)

ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে শহরের। মৌলালি থেকে পার্ক-সার্কাস পর্যন্ত চওড়া রাস্তা টানা হয়েছে। অ্যাসফাল্ট ঢেলে ভারি স্টীম-রোলার চালিয়ে রাস্তাটা চকচকে-ঝকঝকেও যেমন হয়েছে, তেমনি হয়েছে মসৃণও। এমন পালিশ-করা রাস্তায় পা দিতে যেন বাধো বাধো ঠেকে। ময়লা জুতোটা হাতে নিয়ে সন্তর্পণে এর উপর দিয়ে একটু হেঁটে নেওয়া যেতে পারে বড়জোর।

যে মৌলালি থেকে পার্ক-সার্কাস পর্যন্ত যেতে হলে আগে যেতে হত লোয়ার সার্কুলার ধরে বরাবর অনেকটা এগিয়ে পার্ক স্ট্রীটে বাঁক নিয়ে, কিংবা ইন্টালির সরু আঁকাবাঁকা পথ ধরে বাঁকে বাঁকে পাক খেয়ে অনেক মেহনতের পর, সেখানে আজ এই নতুন রাস্তা ধরে অনেক কম তকলিফে পৌঁছে যাওয়া যায়।

তৈরি হয়ে যাবার পর এখন মনে হচ্ছে—বাঃ, দিব্যি, খাসা। কিন্তু তৈরি করতে অনেক তেল-খড় পুড়েছে, অনেক নাকালের ও অনেক খেসারতের মুখোমুখি দাঁড়াতেও হয়েছে। কিন্তু সেসব কথা দিয়ে আমাদের কাজ কী।

চওড়া রাস্তাটা লোপাট করে দিয়েছে অনেক বস্তি এবং অনেক বসতিও। সেই সব পুরনো আর জীর্ণ কংকাল উচ্ছেদ করে দিয়ে মসৃণ আর পরিচ্ছন্ন মূর্তিতে রোদের নীচে শুয়ে শুয়ে চকমক-ঝকমক করছে এই নতুন সড়ক।

এরই মধ্যে এই নতুন রাস্তার দুধারে বাড়ি উঠেছে নতুন নতুন। ডিজাইনও নানা রকম। কোনোটা বাক্স প্যাটার্নের, কোনোটা মানোয়ারি ডিজাইনের—সেই জাহাজের মোটা মোটা চোঙ পাঁচতলার ছাদ থেকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দক্ষিণের দিকে মুখ করে, সেই হাঁ-মুখ দিয়ে অগাধ বাতাস অফুরন্ত উল্লাসে এই বাড়ির ঘরে-ঘরে হাওয়ার দাক্ষিণ্য বিতরণ করে।

রাস্তার একপাশে দাঁড়ালে দেখা যায়, তার দুপাশে সার সার বাড়ির মিছিল। অনেক সময় মনে হয়, যেন ছবি—পটে আঁকা।

কিন্তু সেই পটের দুই-একটা জায়গা একটু যেন পোকায় খাওয়া। দুই-একটা পুরনো আর জীর্ণ বাড়ি ওরই মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে দীন হয়ে—যেন একচুলের জন্যে বেঁচে গেছে এই রাস্তার কবল থেকে।

গাড়ি চলে। কত গাড়ি তা গোনা যায় না। সব গাড়ির নামও জানিনে—হাজার রকমের মডেল। তাদের বডির পালিশ যেন রাস্তার পালিশের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে চোখ ধাঁধিয়ে ছুটোছুটি করে ওদিক থেকে এদিক, এদিক থেকে ওদিক।

সেই জলুস আর জেল্লার মধ্যে তিন দাঁড়ি আঁকা হ্যাকনি ক্যারেজও চলে মাঝে-সাজে—হাড়জিরজিরে ঘোড়া চাবুক খায় আর ধোঁকে, রাস্তার পালিশের উপর আল-লাগানো খুরের ছাপ আঁকতে আঁকতে একটু-একটু করে এগতে থাকে।

বড় মজা লাগে দেখতে। নতুন উদ্যম নিয়ে নতুন জীবন গড়ে উঠেছে যে-তল্লাটে, সেখানে ঐ বুড়ো ঘোড়ার জীবনধারণের এই কায়ক্লেশ যেন কোনো করুণাই উদ্রেক করে না। বরঞ্চ মজাই লাগে।

সাত বছর বাদে বাপের বাড়িতে আসছে করুণা। বিয়ের ছয় মাস পরেই চলে গিয়েছিল আসামের শিবসাগরে—চা-বাগানের আপিসে ওর স্বামী চাকরি করে। অত দূর দেশ থেকে বাপের বাড়িতে আর আসা হয়ে ওঠেনি তার। দূর দেশ বইকি। কলকাতা থেকে সোজাসুজি শিবসাগর পর্যন্ত লাইন টানলে হয়তো বেশি দূর বলে মনে হবে না, কিন্তু ট্রেন—কত-যে বাঁকা পথ তার কি ঠিক আছে? তারপর মনিহারিঘাট, সকরি-গলিঘাট, ট্রেন থেকে নামো স্টীমারে ওঠো, স্টীমার থেকে নামো ট্রেনে ওঠো। ঝকমারির একশেষ। তবু রক্ষে, ঝাড়া-ঝাপটা মানুষ করুণা। এর উপর যদি আবার বাচ্চা-কাচ্চা থাকত, তাহলে জীবনে হয়তো আর বাপের বাড়ি-মুখো হতে চাইতই না। অত ঝামেলা

সহ্য করতে রাজি হয় ক'জন? ভগবান তার কপালে সুখ লিখেছেন এর জন্যে তাকে হিংসে করলে চলবে কেন। যদি কোনো আক্রোশ তার উপর থাকত ভগবানের তাহলে অপুদির মত এক ডজন—

বিকেল প্রায় তিনটে। শিয়ালদহ স্টেশনে এসে ট্রেন থামল। প্লাটফরমে পা দিয়েই মাথার কাপড় নামিয়ে দিল করুণা। দেশের মাটিতে পা দিয়েই সে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল—এতদিন ছিল বধূ, এবার যেন হয়ে গেল কন্যা।

কুলী মাল নামাচ্ছে অবনী তদারক করছে। মালগুলো প্লাটফরমে জড়ো করা হল।

করুণা জিজ্ঞাসা করল, সব ঠিক আছে তো? টিফিনক্যারীটা কোথায়? আর তোমার ফেলাস্ক?

অবনী বলল, ঠিক আছে। এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট—

চারদিকে এত লোকজন, সে-কথা ভুলেই গেল করুণা। খিলখিল করে হেসে উঠল, বলল, তুমিও যে দেখছি অপুদি হলে গো। রোজ সন্ধ্যায় অপুদি ঠিক এইভাবেই তার বাচ্চাদের গুনে গুনে ঘরে ঢোকায়। দেখনি?

অবনী একটু বিরক্তই বুঝি হল। বিরক্ত হড়-একটা সে হয় না। মাল গুনতে গুনতেই বলল, ভগবান তাকে দিয়েছে, তোমাকে দেয়নি। তাই বুঝি ইয়ে?

করুণা একটু এগিয়ে গিয়ে অবনীর প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, কে দেয়নি বললে?

—ভগবান।

করুণা অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু থেমে বলল, তুমিই আমার সেই ভগবান।

—তার মানে? অকারণেই বুঝি চটে উঠল অবনী, বলল, তার মানে?

করুণা তার ট্রাঙ্কের উপর একটা পা তুলে দাঁড়িয়ে বলল, মানে-ফানে জানি নে। মেয়েদের কাছে স্বামীই ভগবান, এইটুকু মাত্র জানি।

অবনী গুম হয়ে গেল। কিন্তু গুম হয়ে থাকার কোনো উপায় নেই এখানে। কুলীরা তাড়া দিচ্ছে।

অবনী বলল, গাড়ি বোলাও।

কুলীরা এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। গাড়ি কি ডেকে এ প্ল্যাটফরমে ঢোকানো যাবে? মালপত্র নিয়ে গিয়ে শ্বারস্থ হতে হবে যে গাড়িরই।

তবে তাই। দুটো কুলী চলল আগে আগে, ওরা দুজন খুচরো দু-একটা মাল হাতে নিয়ে পিছন-পিছন।

করুণার এতদিনের চেনা জায়গাগুলো একটু যেন বদলে-বদলে গিয়েছে। বৌবাজারের মোড়টা ঠিক আছে বটে, কিন্তু ঐ হাসপাতালটা—ক্যাম্পবেলটা—নতুন চেহারা নিয়েছে একেবারে। নামটাও পালটে গেছে নাকি। বড় বড় অক্ষরে কি যেন লেখা?

—দেখ, দেখ। করুণা বলল, কি নাম লেখা ওটা? পড়-না।

অবনী বলল, জানি নে।

—ইশ। রাগ হয়েছে আবার। এদিক নেই, ওদিক আছে। অত রাগতে নেই গো, অত রাগাতে নেই। মেয়েরা কত সয় তা জান না? তোমাদের আবার একটুতেই ফোস্কা পড়ে গায়ে।

অবনী বলল, বক্তৃতা রেখে রাস্তা বাংলে দাও তোমার গাড়োয়ানকে।

হেসে উঠল করুণা, বলল, বেশ। গাড়োয়ানটাও বুঝি আমার?

—তা বই কি। তোমার দেশের মাটি এটা। এখানকার সবই—

—এই গাড়োয়ান, বাঁয়ে চলো, বাঁয়ে।

বাঁয়ে বাঁক নিতেই সব গোলমাল হয়ে গেল করুণার। তার চেনা জায়গা, তার দেশ। এ-তল্লাটে কত দৌড়োদৌড়ি করে ঘুরে বেরিয়েছে সে, বেগুনি-ফুলুড়ির দোকানে-দোকানে কত দৌরাত্ম্য করেছে সে এক-কালে, এর গলিঘুঁজি সবই ছিল তার নখ-দর্পণে, তার কাছে আজ সব গোলমাল হয়ে গেল। নাথের বস্তির সেই এলোকেশী, যাকে তারা এলো-মাসী বলে ডাকত, কত রঙ্গ করত কত রসিকতা করত সেই এলো-মাসীটা। পাড়া ছিল তাদের একটা পরি-বারেরই মত—কিন্তু একি, সামনেটা একে-বারে বদলে গেছে যে। বাবার চিঠিতে এই বদলের খবর সে একটু-একটু পেয়েছে বটে, কিন্তু সে বদল যে এই ধরনের বদল তা ধারণাই করতে পারেনি করুণা। গাড়ির জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে নতুন সড়কটা দেখিয়ে দিয়ে গাড়োয়ানকে সে বলল, সোজা চল।

চারদিকে শুধু জলুস, আর শুধু জেল্লা। তার মধ্যে তিন দাঁড়ি আঁকা এই হ্যাকনি ক্যারেজ চলেছে ধিকধিক করে। চামড়া দিয়ে ঢাকা ঘোড়ার পাঁজরার হাড়ের উপর চাবুক কষছে গাড়োয়ান।

চোখে ধাঁধা ছিটিয়ে হুশ-হুশ শব্দে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে নতুন নতুন মডেলের হাওয়াগাড়ি।

জানলা দিয়ে মুখ বার করে একটা নিশানা খুঁজতে লাগল করুণা। হাঁ, পেয়েছে বটে, একটা নিশানা। চটা উঠে গেছে গায়ের, তবুও চেনা যায়—জীবনকৃষ্ণ সাহার পাঁচতলা বাড়িটা।

গাড়ি আর একটু এগোতেই চওড়া রাস্তার উপরেই তাদের বাড়িটা চোখে পড়ে গেল করুণার। আনন্দে আকুল হয়ে উঠল বুঝি সে। অবনীর বাঁ উরুর উপর তার ডান হাতের ভর দিয়ে সে উঁচু হয়ে উঠে বলল, ঐ যে, ঐ যে, ঐ যে।

চারদিকে তাকাল সে। কত উঁচু উঁচু বাড়ি উঠেছে। কত নতুন নতুন প্যাটার্ন। সব পুরনো স্মৃতি উহ্য হয়ে গেছে। বুঝি একটু দমেই গেল করুণা।

বলল, এখানে বাস করা দায়।

—কেন? বেকুবের মত প্রশ্ন করল অবনী।

করুণা তার কাঁধের উপর থেকে কাপড়টা টেনে তার চওড়া পাড়টা খোঁপার উপর ফেলে বলল, সে তুমি বুঝবে না। মানুষের কোথায় দুঃখ কোথায় কষ্ট তা বোঝার মত মন কি তোমার আছে?

নিজের কি আছে আর নিজের কি নেই—সেসব নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার গরজ নেই অবনীভূষণের। তাছাড়া, এখন ওসব ছোট কথা নিয়ে হৈ হৈ করারই কি সময়? সাত বছর বাদে সে আসছে শ্বশুরবাড়ি—সেখানকার খাতির-যত্নের জন্যেই সে লালায়িত, শ্বশুর নন্দিনীর দু-চারটে চড়া কথা বা কড়া মন্তব্য এখন হজম করতে সে রাজি।

পাঁচ কোঠার একতলা একটা ছোট বাড়ি। করুণার ঠাকুরদা যখন স্টিমার কোম্পানির বুকিং ক্লার্ক—চাঁদপাল-ঘাটে যখন তাঁর প্রায় একাধিপত্য, সেই সময় তিনি তৈরি করেন এই বাড়িটা। সে প্রায় পঞ্চাশ বছরের কথাই হয়ে গেল। বাড়িটা এখন তাই বুড়ো হয়ে গেছে—একেবারে সেকেলে। কিন্তু এতটা সেকেলে এটাকে আগে দেখাত না, সাত বছর আগে যখন এখানে নবত বেজেছিল, তখনো এটা এ-পাড়ার মধ্যে একটা ইজ্জতওলা বাড়িই ছিল। কিন্তু আজ?

করুণা বাড়ির উঠানের গারদের খোলা বারান্দায় পায়চারি করে আর চারদিকে তাকায়। চারদিক থেকে বাড়ির অন্দরের দিকে উঁকি দিয়ে আছে নতুন বাড়ির মিছিল।

করগেট-টিন দিয়ে ঘেরা কলতলা, মাথাটা
খালা। এতে আগে অসুবিধে হয়নি
তটুকু, কিন্তু এখন চোরের মতন এদিক-
দিক চেয়ে তবে জল ঢালতে হয় গায়ে।

বারান্দায় জলচৌকিতে বসে শ্বশুর-
শায়ের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলে
অবনীভূষণ, শিবসাগরে জিনিসপত্রের দাম
কমন, কপিটা আলুটা পাওয়া যায় কি না,
ত্যাদি ঘরোয়া আলোচনা। আলোচনা করে
আর এদিকে ওদিকে তাকায় অবনীভূষণ।
পুবদিকের জানালা দিয়ে চেয়ে চেয়ে তাদের
দেখছে একটা মেয়ে। অবনীকে এ-বাড়িতে
তুন দেখেই বুঝি তাদের কৌতূহল
জেগেছে।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তরুবালা,
ললেন, অবনী, একটু ঘরে যাও।

অবনী চট করে উঠে দাঁড়াল, তার
নে হল ওবাড়ি থেকে ওই বেহায়া মেয়েটার
উঁকি দেওয়া দেখেই বুঝি তার শাশুড়ি
তাকে এভাবে সাবধান করে দিয়ে গেলেন।
উঠে দাঁড়িয়ে অবনী তার শাশুড়ির মুখের
দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, করুণা নাইতে
গেছে, বেরতে পারছে না।

অবনী ঘরের মধ্যে চলে যেতেই করুণা
করগেটের দরজা ঘড়-ঘড় শব্দে খুলে
তর-তর করে চলে গেল ওদিকের ঘরটায়।
যেতে যেতেই সে তার চোখ চালিয়ে নিয়েছে
চারধারে, লক্ষ্য করেছে সে সব, ঘরে ঢুকে
সে নিজের মনেই বলতে লাগল, পাজি,
বদমায়েশ।

মাঝের দরজাটা একটু ফাঁক করে অবনী
ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, গাল দিচ্ছ
কাকে?

তেতে উঠল করুণা, বলল, তোমাকে।
তোমাকে।

বলেই সে ঘুরে দাঁড়িয়ে গামছা দিয়ে
ফটাশ ফটাশ শব্দে ঝাড়তে লাগল তার চুল।
চুল না, যেন উচ্ছল ঝরনা। মসৃণ পিঠটা
বেয়ে নেমে এসেছে যেন প্রশস্ত একটা কালো
বন্যার স্রোত।

সর্বাঙ্গে নিটোল স্বাস্থ্য করুণার। রং
তার কালো। কালো বলেই হয়তো এত
ভালো ঠেকে। শ্বেতপাথরের মূর্তি
মনোহর, না কষ্টিপাথরের? কালো
যে সব সময় মন্দ না, তার প্রমাণ বুঝি
করুণার শরীরটা।

অবনী দরজাটা টেনে দিয়ে সরে গেল,
কিন্তু মরমে যেন মরেও গেল সে। তার
কেমন যেন ভয় হল, ওবাড়ি থেকে ঐ
মেয়েটার উঁকি দেওয়া বুঝি দেখে ফেলেছে
করুণাও।

করুণাকে গম্ভীর-গম্ভীর দেখে অবনী
তার কাছে বিশেষ ঘেঁষছে না, কিন্তু একটু
সুযোগ পেলেই তার চোখ চলে যাচ্ছে উপর
দিকের ওই জানলায়। কিন্তু সব সময়ই তার
জন্যে ওখানে কেউ প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়ে
থাকবে, এমন কোনো কথা নেই।

দিন কাটে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে
করুণা। তার সারাটা শরীর সব সময়
কেমন-যেন শিরশির করতে থাকে, একটু
স্বস্তি নিয়ে একটু শান্তি নিয়ে চলা-ফেরা
করা দায় হয়ে উঠেছে এই অন্দরেও। তার
মনে হয় তার সারা গায়ের উপর দূরে থেকে
চোখ বুলিয়ে চলেছে যেন কারা।

নতুন পাড়া হয়েছে এটা। রুচিও এদের
নতুন। চাল-চলনও আলাদা। এর সঙ্গে
নিজেদের খাপ খাওয়ানো বড় মুসকিল।
এদের ছেলের নামও যেন কেমন-কেমন—
জকি কেসি জলি। আর মেয়েরা! হায়-রে
কপাল, অত বড় ধিঙ্গি ধিঙ্গি দেখতে, তবু
শাড়ি পরতে শেখেনি। বিউটি ফ্যান্সি
সোয়ান—এসব নাম কোনো মেয়ের হতে
পারে, এর আগে ধারণাই করতে পারেনি
করুণা। চারদিক থেকে ওই সব নামের ডাক
শুনতে পায় সে, আর তার সর্বাঙ্গ যেন
রী-রী করে ওঠে।

এ এক আজব দেশে এল নাকি করুণা?
এ-দেশ এত শিগগির এমন-ধারা উজবুগ
হয়ে গেছে জানলে, সাত বছর বাপ-মায়ের
সঙ্গে দেখা না হওয়া সত্ত্বেও, কার সাধ্য
তাকে নিয়ে আসতে পারত এখানে?

স্নান-ঘর থেকে এক দৌড়ে বেরিয়ে
বারান্দা পার হয়ে ঘরে চলে যায় করুণা।
ঘর থেকে কাপড় বদলে চুল আচড়াতে-
আচড়াতে বেরিয়ে এসে আড়চোখে একবার
এদিকে ওদিকে তাকায়, গলা চড়িয়ে বলে,
মা, বাবাকে বল, বেচে দিক এ-বাড়ি। এতটুকু
আব্রু নেই, এতটুকু পর্দা নেই যার অন্দরে,
তাদের ঘরে মেয়ে-বউ থাকবে কী করে?

মার কানে হয়তো কথাগুলো যায়ই না।
তিনি খুন্তি দিয়ে তখন কড়াইয়ের তরকারি
উল্টে-পাল্টে দিচ্ছেন।

করুণা ঘরে এসে ঢুকতেই অবনী বলল,
তুমি চটেছ। কিন্তু মাইরি বলছি, আমার
কোনো দোষ নেই।

—কিসের দোষ গো? ঘুরে দাঁড়াল
করুণা।

অবনী কি যেন বলতে গেল, বাধা দিয়ে
করুণা বলল, নির্লজ্জ! আমার কি ভিমরতি
ধরেছে? তোমাকে আমি চিনি না? তোমাকে
করব সন্দেহ? সাত বচ্ছর ঘর করছি নে
তোমাকে নিয়ে?

এ-কথা শুনে খুশি হতে হবে, না,
মর্মাহত হতে হবে—ঠিক যেন বুঝতে পারল
না অবনীভূষণ। স্ত্রীর মুখের দিকে এক-
দৃষ্টে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। কপালে গোল
সিঁদুরের ফোঁটা যেন আগুনের মতন গনগন
করছে, সিঁথেয় সিঁদুরের রেখাটিও যেন
অবিকল একটা শিখা। ঐ আগুনে পুড়ে
মরতেও ইচ্ছে হল না অবনীর, ঐ শিখায়
নিজের শরীরটা একবার ঝলসে নিতেও সাধ
হল না তার। অকারণেই তার বুকের
ভিতরটা দুরু-দুরু করে কেঁপে উঠল মাত্র
একবার। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল অবনীভূষণ।

অন্দরে আর সদরে যখন কোনোই ভেদ
নেই, নিজেকে তাহলে এই ক্ষুদে বাড়ির
নুনে-খাওয়া প্রাচীরের ভিতরে আটকে রেখে
লাভ কি। করুণা বাইরের রাস্তার দিকে
এসে আজকাল দাঁড়িয়ে থাকে যখন-তখন।
সে দেখে ঐ মসৃণ রাস্তা, একটা প্রকাণ্ড
কেউটের মত লম্বা শরীরটা, সূর্যের নীচে
টান করে ফেলে রেখে যেন আরামে রোদ
পোয়াচ্ছে। নতুন সড়কের এই সাপের শরীরটা
সে দেখে আর ভাবে, এর ফণা আছে কি না।
এ-ও একটা নির্বিষ ফণাহীন সাপ কি না।
বাঁয়ে তাকায়, ডানে তাকায় করুণা।

উঁচু উঁচু বাড়ির জানলায় দরোজায় পর্দা
ওড়ে—কেউ সাদা, কেউ গোলাপি, কেউ-বা
গাঢ় নীল। ওইসব পর্দার আড়ালে কত
নাটকই-না অভিনয় হচ্ছে বলে মনে হয় তার।
যে-পাড়ার ছেলে আর মেয়েদের চালচলন
এমন ধারা তাদের অসাধ্য আর আছে কি।
ঐ যে ধাড়ি ধাড়ি মেয়েরা সালোয়ার পরে
ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর হাসতে হাসতে গড়িয়ে
পড়ছে, ওদের কি লজ্জাসরম একটুও নেই?

রোঁয়াওলা বাঘা কুকুরের গলায় শিকল
বেঁধে ট্রাউজার-পরা ঐ ছোঁড়াটা রোজ সকালে-
বিকালে এ-কিনার থেকে ও-কিনার পর্যন্ত
ঘুরে বেড়ায় কিসের জন্যে কে বলবে বল।
কুকুরটা অকারণেই রাস্তার আর ফুটপাথের
আর দেয়ালের গা শুঁকে শুঁকে বেড়ায়।
দুটো জীবই যেন এক জাতের। গা জ্বলে
যায় করুণার।

এ কোন্ দেশে এসে পড়ল করুণা?
এ যে এক আজব দেশ, এ যে অদ্ভুত রাজ্য
একটা।

জাহাজ প্যাটার্নের বাড়ির ছাদে কি যেন
খেলা করে ওরা, এক গুচ্ছ পাখির পালক

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল
রেডিও শিক্ষার বই
বাংলা এবং হিন্দী
থিওরেটিক্যাল ও প্রাকটিক্যাল
বেতার তথ্য ১ম খণ্ড ২য় খণ্ড ৬৷৷০ প্রতিটি
শীল রেডিও ১৪, দুর্গা পিথুরী লেন, বহুবাজার কলিকাতা-১২

একবার এদিক, একবার ওদিক লাফ দিয়ে লাফ দিয়ে চলে যায়।

আবার বাজে পিয়ানো। টুং-টাং-টুং-টাং আওয়াজের সঙ্গে নীল আলো জ্বলা ঘর থেকে খিল-খিল হাসির শব্দ এসে ছড়িয়ে পড়ে রাস্তার এ পাশের এই জীর্ণ বাড়িটার গায়ে।

গা শিরশির করে ওঠে। ঘরের মধ্যে চলে আসে করুণা। দেখে, লন্ঠনটা কমিয়ে দিয়ে বালিশের উপর কনুইয়ের ভর রেখে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে অবনী।

অবনী আর কোনো কথা না পেয়ে সোজা হয়ে উঠে বসেই বলল, রাত কত হল? খেয়ে-দেয়ে নেওয়া যাক। চুপচাপ বসে আছি, তবু এত ক্ষিদে পায় কেন বলো তো।

—কে জানে। ঠোঁট উল্টে গা মোড়ামুড়ি দিয়ে করুণা বলল, অকর্মণ্য লোকদের ক্ষিদে আবার একটু বেশিই হয়ে থাকে। শুনি তো এমনি।

অবনীর মর্যাদায় এবার বুঝি ঘা লেগেছে, বলল, কে বলে? শ্বশুরমশায় না শাশুড়ি-ঠাকরুন?

—না গো মশাই না। বলে তোমার সবচেয়ে আপনার জনই, বলে তোমার শ্বশুরনন্দিনী।

অবনী এ কথার আর কোনো উত্তর দিল না।

আছে তারা এই পাড়ায় তবু তারা যেন এ-তল্লাটের কেউ না। পিয়ানোতে পিংপঙে ব্যাডমিণ্টনে রেডিয়োতে রাস্তায় দুই ধার সারাদিন উচ্ছল, সেই উচ্ছলতার কিনারে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে করুণার পিত্রালয়। যেন চঞ্চল ঝরনার জলে হাত দিতে সাহস না পেয়ে তফাতের পাথরের গুঁড়ির উপর বসে ঐ জলতরঙ্গের বাজনা শুনে মোহিত হওয়া।

কিন্তু এ যে আশ্চর্য ব্যাপার, এক টুকরো চঞ্চল ঝরনার মতই তাদের বাড়িতে এসে হাজির হল, কে এ?

—আমার নমে বিউটি। তোমাদের নেবারু। ঐ বাড়িতে থাকি। মা বলে, খাসা বৌটি, আলাপ কর্ আলাপ কর্। আসিই নে, আসিই নে। আজ এসে পড়লাম। কি নাম তোমার ভাই?

—করুণা।

—গ্র্যান্ড নাম, সুইট নাম।

করুণার দুই হাত নিজের দুই হাত দিয়ে ধরে মেয়েটা দোলনার মত দোলাতে লাগল।

সংকোচে জড়োসড়ো হয়ে যেতে লাগল করুণা। সে দেখতে লাগল মেয়েটাকে। বিউটি মানে কি তা জানে না করুণা, সে কেবল মেয়েটার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। দূর থেকে একে দেখছে অনেক দিন থেকে, এর চলা-বলা দেখে এর সম্বন্ধে যা ধারণা করার তা করে রেখেছে, কাছ থেকে দেখে মনে হল, ঠোঁটে গালে আর নখে রং না মাখলেই বুঝি আরো ভালো লাগত ওকে দেখতে।

বিউটি বলল, ঐ জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখি অসভ্যের মত, আজ এসে পড়লাম।

—খুব ভালো করেছ।

এতক্ষণে কথা বলতে পেরে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল করুণা।

বিউটি বলল, যেয়ো আমাদের বাড়ি। মা তোমার রূপের যা ভক্ত ভাই, কী বলব। বলেন, তোমার রং কালো না হলে নাকি ভালোই হত না।

করুণা বলল, কে কে আছেন তোমাদের বাড়িতে?

—আমাদের বাড়িতে? আমাদের বাড়িতে আছেন মা বাবা আর আমার দুই বোন।

করুণা একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল, আর ঐ বাড়িটা কাদের?

—কোন্‌টা? ওইটে? মিস্টার কাঞ্জিলালের। ও-বাড়িতে অনেক লোক, অনেক মেয়ে আর অনেক ছেলে।

—তোমরা যাও না ও-বাড়ি?

হেসে উঠল বিউটি, বলল, যাই মানে? দিনের প্রায় ওআন-থার্ড সময় কেটে যায় ঐ বাড়িতে।

কথাটা শুনে করুণা একটু চুপ করে রইল। তার পর কি-যেন বলতে গিয়েই থেমে গেল।

বিউটির সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল করুণার। এই আলাপের পর থেকে বিউটি-দের বাড়িতে সে যেতে আরম্ভ করল। অনেক জড়তা কেটে গেল বটে, কিন্তু ওদের বাড়ির ওই উঁচু ঘর থেকে নিজেদের বাড়ির দিকে চেয়ে নিজেদের আরো দীন এবং আরো দরিদ্র বলে মনে হতে লাগল তার। দীন-দরিদ্র মনে হতে লাগল বটে, কিন্তু মনটা যেন সাফ হয়ে গেল অনেক। বিউটিদের মুখের রঙের আড়ালে তাদের নিজেদের রং বুঝি চাপাই পড়ে গিয়েছিল। অহংকার-টহংকার বলে কোনো বালাই তাদের নেই। এতে তাদের সঙ্গে মেশা সহজ হল বটে, কিন্তু বিউটির সম্বন্ধে তার একটু উদ্বেগ যেন হল।

ঘনিষ্ঠতা অনেকখানি গাঢ় হয়ে আসার পর করুণা একদিন বলল, ও বাড়ি বেশি যেয়ো না ভাই।

—কোন্ বাড়ি?

—ওই কাঞ্জিলালদের বাড়িতে।

—কেন। কেন। কেন বৌদি?

করুণা বলল, ও-বাড়িতে অত ছেলে।

হেসে উঠল বিউটি খিলখিল করে, বলল, ভয় কি। ওরা কি বাঘ না ভাল্লুক? খেয়ে ফেলবে নাকি আমাদের?

করুণা বলল, তা না। ধর, যদি হঠাৎ হাত চেপে ধরে কোনো দিন?
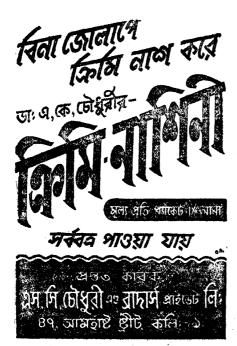
আবার হেসে উঠল বিউটি, বলল, আমিও তবে তার হাত চেপে ধরব, বলব, গুড নাইট, গুড বাই।

মেয়েটার সাহস দেখে করুণার বড় আশ্চর্য ঠেকতে লাগল। এত বড় মেয়ে হয়েছে, আর দেখতেও এমন টুকটুকে ফুটফুটে, বলা যায় না, কখন কিভাবে কি অঘটন ঘটে যায়, তবু মেয়েটা বলে, আমিও তার হাত চেপে ধরব? এরকম কথা শুনে বুক যে কেঁপে ওঠে তার।

বিউটি বলে, যে যত ভয় করে বৌদি, লোকে তাকে তত ভয় দেখায়।

বিউটির সংগে কথা বলছে, বিউটির কথা সে শুনছেও, তবু তার নিজের মনের কথাটা ভাঙছে না। কথাটা যে কী তা কিছুতে খুলে বলতে পারছে না।

নতুন রাস্তায় দিন চলে নতুন উদ্দামে। মসৃণ পিচের রাস্তায় নিঃশব্দ দ্রুততায় ছুটে চলে হাওয়াগাড়ি। টুংটাং আওয়াজ বেজে ওঠে কখনো, এ আওয়াজ পিয়ানোর না রিকশার?

দুপুরে বেলা চানের ঘর থেকে তরতর করে পা ফেলে সে চলে আসে ঘরে, আসার সময় কাঞ্জিলালদের বাড়ির দিকে তাকায়। এটা যেন অভ্যাস হয়ে গেছে, যদি কোনো দিন ওখানে ঐ জানলায় দৈবাৎ কাউকে দেখতে না পায়, তাহলে সেদিনটা কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে করুণার।

অবনী জিজ্ঞাসা করে, মুখ ভারি কেন?

করুণা বলে, সব সময়ই কি তোমার মত হালকা হয়ে বসে থাকতে হবে? একটু ভারিক্কি হতে শেখো।

অবনীর যেন বিশ্বাস হয় না—এই কি সেই শিবসাগরের করুণা? সেখানে তো সে কথায়-কথায় এমন তেতে ওঠেনি, এমন ঠেস দিয়ে কথা বলেনি। বাপের বাড়ির জমিতে পা দিয়ে তাহলে কি তার দেমাক বেড়েছে, কিংবা—

—কিংবা কিংবা কিংবা? বলো, বলো, কি বলতে চাও খুলেই বলো-না।

কিন্তু কিছু বলে না অবনী। তার আপশোশ হয়। সারা রাস্তা ট্রেনের আর স্টিমারের ধকল সহ্য করে না নিয়ে এলেই হত। তাহলে তাকে কথায় কথায় এমন হেনস্তা হতে হত না। এটা যদি অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে যায় করুণার, তাহলে শিবসাগরে ফিরে গিয়েও যে এমনিধারা মেজাজই দেখাতে থাকবে।

আজ দুপুরে করুণা একটা সাংঘাতিক কান্ড করে বসেছে। তার সারা শরীর কাঁপছে। চানের ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে ইশারায় কথা বলে ফেলেছে ঐ বাড়িটার ঐ মানুষটির সংগে। ইশারায় সাড়া দিয়েছে সেও—ঐ মানুষটাও। পর্দার আড়ালে নিজেকে বরাবরই একটু ঢেকে রাখে সে, আজও সে তেমনিভাবে আড়ালে থেকেই বলেছে—আচ্ছা।

খাওয়া-দাওয়া সেরেই করুণা ছুটল বিউটিদের বাড়ি। ভীষণ চঞ্চল ঠেকছে নিজেকে। বিউটি নেই, কলেজে গেছে।

বিকেলে আবার সে গেল বিউটিদের বাড়ি। রোজকার মত নানা ধরনের কথা বলতে লাগল সে বিউটির সংগে। ঐ গম্বুজওলা বাড়িটা কাদের, ঐ বাক্স-প্যাটার্নেরটা কাদের, আর ঐটে, ঐ যে দেখা যাচ্ছে দূরে—

উপর থেকে নীচে রাস্তার দিকে তাকাল। দেখল, সেই ছেলেটা—ট্রাউজার পরে কুকুরের গলার শিকল ধরে চলেছে।

—বিউটি বলল, ও হচ্ছে মিস্টার কাঞ্জি-লালের মেজছেলে বিপুল। নাইস বয়, এবার ডি-ফিল হয়েছে। রাতদিন বই নিয়ে পড়ে থাকে।

অনুনয় করার মত করে বলতে লাগল, চল চল চল

করুণার শরীরটা কেঁপে উঠল। পর্দার আড়াল দিয়ে একেই সে দেখছে কিনা কে বলবে। এ-ই হওয়া সম্ভব। নইলে কুকুর নিয়ে করুণাদের বাড়ির সামনে এমন ঘোরাঘুরি করে কেন। মানুষটাকে ভালো করে দেখার জন্যে করুণা রেলিঙের উপর একটু ঝুঁকল।

বিউটি তার হাত ধরে টেনে বলল, এই, পড়ে যাবে।

সোজা হয়ে দাঁড়াল করুণা।

ধীরে ধীরে নেমে আসছে অন্ধকার। দু-একটা তারা ফুটল আকাশে, সেই সঙ্গে নতুন রাস্তার দু ধারে নতুন বাল্বের আলোও উঠল জ্বলে। তারা দুজন সেই আলোর মালা দেখে যেন মুগ্ধ হয়ে গেল।

অন্ধকার যতই ঘন হয়ে উঠতে লাগল করুণার মনের চাঞ্চল্য ততই যেন অধীর হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু কেন, সে-কথা কী করে সে প্রকাশ করে। আজ কতদিন ধরে দুপুরের সেই স্নানাভিসার তার চলেছে, আজ সে এক পরম দুর্বল মুহূর্তে তার চরম দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছে।

আজ রাত্রিটা তার বড় সংকোচের বড় সংকটের আর বড়ই অসহ আনন্দের। যদি উভয়ে উভয়ের সংকেত বুঝে থাকে, তাহলে এই রাত্রিটা—

বিউটি বলল, কি ভাবছ যেন বৌদি?

—না। কিছু না।

করুণা ঠিক হয়ে দাঁড়াল। তার মনে হচ্ছে তার শরীর যেন আগুন হয়ে উঠেছে, তার সর্বাংগ যেন অধীর প্রতীক্ষায় আকুল হয়ে উঠেছে। কথা বলতে গিয়ে বার বার তার গলা ধরে আসছে।

বিউটি বলল, তোমার শরীর বোধ হয় খারাপ বৌদি। ঠান্ডা লেগেছে নাকি। গলা যেন ভার-ভার।

করুণা বলল, তোমাকে বোধ হয় আটকে রেখেছি।

—কেন। কী কাজটা এখন আমার?

—কাঞ্জিলালবাবুদের বাড়িতে যাবে হয়তো।

হেসে উঠল বিউটি, বলল, ওটা তো আমার ডিউটি না। যেতেই হবে তার মানে কী আছে। রোজ যাই বলে রোজই কি যেতে হবে?

হাসল করুণাও। কি যেন জিজ্ঞাসা করতে সে চায়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারে না।

এবার করুণা জিজ্ঞাসা করল, আমাদের উঠোনের দিকের দোতলা ঘরে বুঝি থাকেন উনি?

—উনি কে?

—ওই যে, একটু আগে কুকুর নিয়ে গেলেন। কাঞ্জিলালবাবুর ছেলে।

—ধেৎ। বিউটি বলল, ও-ঘরটা ওদের কিচেন।

—কি বললে?

—কিচেন, রান্নাঘর। ওখান থেকে উঁকি-ঝুঁকি দেয় বুঝি কেউ?

যেন ধরা পড়ে গেছে এইভাবে তাকাল করুণা, বিউটি বলল, ওটা ওদের বাবুর্চি। ভারি পাজি, ভারি বদমাশ। দুবার ওকে তাড়িয়ে দেয়, আবার এসেছে কেঁদে-কেটে হাতে-পায়ে ধরে।

করুণার পা কাঁপতে লাগল, শক্ত হয়ে দাঁড়াল সে। কথা বলতে পারল না।

বিউটি বলল, চাকর-বাকরদের স্বভাবই অমনি। তাদের জন্যে অযথা বেইজ্জৎ হতে হয় মনিবদের।

একটু থেমে বিউটি বলল, তোমাদের বাড়ির চাকরটার স্বভাবও কিন্তু ভালো না বৌদি। ও-ও ভীষণ উঁকিঝুঁকি মারে।

—কি বললে? যেন চমকে উঠল করুণা, বলল, তাই নাকি? টের পাইনি তো এতদিন।

এই নতুন রাস্তাটার ফণা খুঁজেছিল একদিন করুণা, আজ সেই রাস্তাটা তার বিষাক্ত ফণা উঁচিয়ে যেন মোক্ষম ছোবল দিল তাকে।

করুণা বলল, পালাই। রাত হল।

বিউটি কি উত্তর দেয় তার জন্যে অপেক্ষা না করেই সে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে নেমে হল-ঘর পার হয়ে প্যাসেজ ডিঙিয়ে রাস্তা মাড়িয়ে এসে পড়ল তাদের বাড়িতে।

লণ্ঠনের পলতে কমিয়ে বালিশে কনুইয়ের ভর দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল অবনী।

বিদ্যুতের বেগে করুণা ঘরে ঢুকেই শব্দ করে বসে পড়ল চৌকিতে।

ব্যস্ত হয়ে উঠে বসল অবনী, বলল, কি হল।

অবনীর দুই হাত চেপে ধরে করুণা অনুনয় করার মত করে বলতে লাগল, চল চল চল।

—কোথায়। কোথায়।

—ফিরে চল। এক্ষুনি এক্ষুনি। এখানে আর থাকা না। এ পাড়া বড় বিশ্রী, বড় বিশ্রী।

অবনী ভারিক্কে গলায় বলল, কেন, বলিনি আগে। একটা অতি যাচ্ছেতাই পল্লী হয়েছে এটা, কেবল জলুস আর জেল্লা বাইরেই, ভিতরে নোংরার আণ্ডিল।

—অতশত জানিনে। আজ রাত্রেই যেতে হবে যেমন করে হোক। আমি থাকব না এখানে, থাকতে পারব না।

—রাত্রে ট্রেন কই? কি হয়েছে বলো। অবনী তার পিঠের উপর একটা হাত রাখল।

করুণা অধীর গলায় বলল, আলোটা নিবিয়ে দাও। আড়াল করে বসো আমাকে।

নিশ্চয় ভয়ংকর কিছু-একটা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছে তার স্ত্রী, অবনীভূষণ এর কি প্রতিকার করবে কিছু বুঝতে না পেরে উঠে গিয়ে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ক্লান্ত গলায় বলল, নিশ্চয় ভয় পেয়েছে কিছু দেখে। ভয় কি, আমি আছি।

অন্ধকারের মধ্যে করুণা অবনীর দুই হাত চেপে ধরে কাঁপা গলায় বলল কই কই, কই তুমি?

একটা হাত কব্জির উপর থেকে কাটা। তবু বাকী হাতখানাতেই ভেল্কি খেলে। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। না পারে এমন কাজ নেই। অবশ্য না করে উপায়ই বা কী? বাড়িতে ত মেয়েছেলে বলতে কেউ নেই! বাইরের লোকজন রাখবে এমন পয়সা কোথায়? আগে তবু যা হক একটা চাকরি করত, এখন ত আবার পেনশন হয়ে গিয়েছে।

যেমন দান তেমন দক্ষিণা। যেমন চাকরি তেমনি পেনশন। রান্না থেকে গুল্-পাকান পর্যন্ত সব কিছু পারে বলেই কারও কাছে হাত পাততে হয় না সাধন দত্তকে। কি অর্থে, কি সামর্থ্যে! অনেকদিন আগে একবার সাধন দত্তর পিসি ওর কাছে এসে থাকবার জন্যে ঝুলোঝুলি করেছিল; বলেছিল, "বেটাছেলে, দুটো রাঁধা-ভাত পাবি না? তার ওপর এই ভগবান মেরেছে—"

সাধন দত্ত মনে মনে বলেছিল, ভগবান মেরেছে বলে সবাই মিলে মারবে? রক্ষে কর বাবা, রাঁধা-ভাতের চরণে দণ্ডবৎ। সুখের চাইতে স্বস্তি ভাল। মুখে বলেছিলেন, "বল কি পিসিমা, তুমি বুড়ো হয়েছ, তোমারই কোথায় এখন সেবা খাবার বয়েস, তা নয় আমি বুড়ো-মন্দ তোমার সেবা খাব? আমার যাই হক একখানা হাত রয়েছে, পা রয়েছে দু দুটো, একটা পেট খুব চালিয়ে নিতে পারব। তুমি কালী-গঙ্গা সেরে দেশে ফিরে যাও।"

বলা বাহুল্য, এত বড় অপমানের পর আর থাকতে পারেননি পিসিমা। সেই অবধি সাধন দত্ত একখানা হাতেই ভেল্কি খেলিয়ে আসছে।

এখন ত শুধু ঘরের কাজ, অফিসে থাকতে সহকর্মীরা অবাক হয়ে প্রশংসা করত, "মাইরি দত্ত, তুমি এক হাতেই কেল্লা মারতে পার। আমরা এই সন্ধ্যে অবধি খেটেও টেবিলে পাহাড় জমিয়ে বসে আছি, আর তোমার বেলা চারটে না বাজতেই টেবিল ফর্সা? অতগুলো ফাইল মেটাতে পারলে এরই মধ্যে?"

তা পারত সাধন দত্ত।

তবে বেশী কথা বলত না, শুধু হাসত। বড়জোর বলত, "ডান হাতটা আছে, তাই রক্ষে।"

বেশী কথা কখনও বলে না সাধন দত্ত। যখন শুধু 'সাধন' ছিল, যখন রক্তে ছিল চাঞ্চল্য, চোখের দৃষ্টিতে ছিল চুলবুলুনি, তখনও মুখে কথা কমই ছিল।

এখনও তাই আড্ডা দেবার বন্ধু জোটাতে পারে না, কাজ-কমা ফাঁকা ফাঁকা দিনগুলো নিয়ে একা একা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। হয়ত বা কখনও বালিগঞ্জের রেলে চেপে ঢাকুরে, যাদবপুর, কখনো শেয়ালদার স্টেশন থেকে সোদপুর-খড়দা-শ্যামনগর। সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া সেরে বেরোয়, সারাদিন কাটিয়ে রাতের দিকের ট্রেনে ফেরে। সব সময়ে টিকিট কেনেই, এমন অপবাদ দেওয়া যায় না সাধন দত্তকে। তবে তার জন্যে অপমানিত হয়নি আজ পর্যন্ত। যতই হক, বেটাছেলের বুদ্ধি আর কৌশল।

কৌশল খেলাতে গিয়ে হেমাঙ্গিনী হাতে-নাতে ধরা পড়ল। অবিশ্যি সেও যে আজ সদ্য নতুন তা নয়, বিনা টিকিটে যাতায়াত করছে সেই আকালের বছর থেকে। তা তখন একটা দলও ছিল। পুঁটি, কালোর মা, নলিনী, হরিদাসী, আর এই হিমি। চাল-চালানোর ব্যবসা করে ফেঁপে উঠেছিল তখন। এখন আর ব্যবসায় সে বোলবোলাও নেই। তা ছাড়া এখন হিমিকে রোগে

ধরেছে। জ্বরে জ্বরে দেহ জরজর, তাই কলকাতায় আসছিল হিমি হাসপাতালে দেখাতে। তাদের জগদ্দলেও হাসপাতাল আছে, কিন্তু সেখানকার আইন বড় কড়া। কারখানার কুলি-কামিন ছাড়া কেউ ওষুধ পাবে না।

পরনে ফর্সা ধবধবে নরুনপাড় ধুতি, সরুগলা সেমিজ, গায়ে সাদা উড়ুনি জড়ান। ভদ্র বিধবার মত শান্তভাবেই বসেছিল হেমাঙ্গিনী, তবু আশ্চর্য, পাশের আরোহী অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, "এই সব হচ্ছে বে-টিকিট প্যাসেঞ্জার। অথচ বসেছে দেখ গ্যাঁট হয়ে।" পার্শ্ববর্তীর পার্শ্ববর্তী আরও অস্ফুটে কী প্রশ্ন করলেন, পূর্ববর্তী বক্তা অতঃপর শ্রুতিগোচর স্বরে বললেন, "ওই পেশা। ও কি নেহাত আজ এ-লাইনে যাওয়া-আসা করছে? অনেককাল করছে। কখনও ত দেখলাম না—"

সাধন দত্ত হাঁ করে তাকিয়ে ছিল এদিকে। ওর নিজেরও যে টিকিট নেই, সে-খেয়াল ছিল না; অবাক হয়ে ভাবছিল, মানুষটা ত আগাগোড়া চাদরমুড়ি, মাথাতেও আড়ঘোমটা, এতকাল তাকিয়ে থেকে থেকেও ত আবিষ্কার করতে পারেনি সাধন দত্ত ওর পুরোপুরি মুখটা কেমন। অথচ লোক দুটো কী করে ধরে ফেলছে, ওর আঁচলে টিকিট আছে কি না!

মূর্তিটির ধরনধারণ দেখে মনে হয় না এদের আলোচনা তার কানে গিয়েছে। রক্ষণশীল ভদ্রঘরের বিধবা মহিলার মতই চুপ করে বসে থাকে জানলার দিকে তাকিয়ে। কিন্তু পার্শ্ববর্তীর পার্শ্ববর্তী সহসা নড়েচড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সরে এসে বলে, "আপনার টিকিট আছে?"

পার্শ্ববর্তী ওর শার্টের কোণ ধরে উদার স্বরে বলে ওঠে, "যেতে দাও না দাদা। তোমারই বা কী, আমারই বা কী? কোম্পানী কা মাল, দরিয়া মে ডাল।"

ভদ্রলোক জামার কোণ ছাড়িয়ে নিয়ে বলে উঠলেন, "উঁহু, এটা ঠিক নয়, এ হচ্ছে কাপুরুষতা। দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া। আমরা প্রত্যেকেই এ-বিষয়ে উদাসীন বলেই না দেশে এত দুর্নীতি! শুনেছেন, টিকিট আছে আপনার?"

অর্ধাবগুণ্ঠিতার অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মুক্ত হল। মনে হল কী বলবে, কিন্তু বলল না, ঘোমটাটা আবার টেনে দিয়ে আরও ঘুরে বসল।

দুর্নীতি-দমনকারী কিন্তু নাছোড়বান্দা। তিনি এবারে প্রায় ধমকের সুরেই বলে ওঠেন, "কথা বলতে জান না? বোবা?" বলা বাহুল্য, হেমাঙ্গিনীকে বার বার আপনি বলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কারণ ইত্যবসরে তার চালচলনের ইতিহাস তিনি শুনে নিয়েছেন।

ধমকের সুর শুনেই হেমাঙ্গিনী ঝটকা মেরে ঘুরে বসল। তীব্রসুরে বলে উঠল, "তুমি জিজ্ঞেসাবাদ করবার কে বাছা? চেকারবাবু তুমি?"

"আমি কে?" বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হয়, "জানতে পারবে আমি কে, চল না কলকাতায়।"

সাধন দত্ত যাকে বলে বিস্ফারিত লোচনে এই অভিনয় দেখছিল। তার দেহের প্রতিটি লোমকূপ যেন দৃষ্টিপ্রদীপ হয়ে জ্বলে উঠেছে। এ কী। এ কী! গাড়ির আর পাঁচজনে অবশ্য এই ফাঁকা আওয়াজের নেহাত ফাঁকামিটা সহজেই ধরতে পারল, কিন্তু হেমাঙ্গিনী কেমন ঘাবড়ে গেল। হয়ত শারীরিক অশক্ততার জন্যেই, হয়ত বা একেবারে এমন একা আসার অভ্যাস নেই বলেই। ও অসহায়ের মত একবার গাড়ির আরোহীদের মুখের দিকে চেয়ে দেখল, তারপর সহসা সাধন দত্তর দিকে তাকিয়েই বলে উঠল, "দেখছ ঠাকুরপো, লোকটা আমাকে না-হক কী রকম অপমান করছে!"

ঠাকুরপো!

এই আকস্মিক সম্বোধনের কৌতুক-রহস্যে গাড়ির এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি একটা হাসির ঢেউ বয়ে গেল। যাঁরা রীতিমত ভদ্র, তাঁরাও কাশতে শুরু করলেন। সাধন দত্ত কিন্তু নির্বিকার। ও উঠে এল গম্ভীরভাবে। গম্ভীরভাবেই বলল, "দেখছি বৈকি সেজবৌদি। শুধু চুপ করে আছি ভদ্রলোকের ধৃষ্টতার বহরটা শেষ অবধি দেখবার জন্যে।" নীতিবাগীশটির দিকে তাচ্ছিল্যের একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সাধন দত্ত।

এবারে ভদ্রলোক একটু আমসি মেরে গেলেন। তবু মচকালেন না। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে তিক্ত ব্যঙ্গের স্বরে বলে উঠলেন, "বেশ ত ঠাকুরপো, আপনিই না হয় বলুন না সেজবৌদিকে, দয়া করে টিকিটটা দেখাতে।"

এবারে আর চাপা-হাসির ঢেউ নয়, রীতিমত হাস্যরোল। অবাধ উন্মুক্ত, অনেক রকমের হাসি। ভদ্র, সভ্য, পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে ভিতরের ইতর উঁকি না মেরে পারে না এই অপরূপ কৌতুকে।

সাধন দত্ত বেশী কথা বলে না। তবু এখন বলল। দাঁড়িয়ে উঠে ভদ্রলোকের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, "যে-প্রশ্ন উনি করেছিলেন, সেইটাই আমিও করছি। টিকিট চাইবার অধিকার আপনার আছে? আপনি রেলকোম্পানির প্রতিনিধি?"

"যেতে দিন দাদা, যেতে দিন—" বলে অপর এক ভদ্রলোক সাধন দত্তর জামার হাতাটা ধরে টেনে বসাতে গিয়ে চমকে ওঠেন।

"কী দাদা! হাত কই?"

লম্বা-হাতা মোটা লংক্লথের পাঞ্জাবিটা এতক্ষণ যে-সত্যকে আড়াল করে রেখেছিল, হিতকামীর হিত-চেষ্টার ফলে সে-সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ল।

হাত নেই।

অস্ফুট একটা আর্তনাদের মত সমস্ত আরোহীর মুখ থেকে উচ্চারিত হল কথাটা।

সাধন দত্ত সোজা দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে বলে, "নেই দাদা! ভগবান মেরেছে। আপনাদের দু দুখানা আস্ত হাতের সঙ্গে নখ, দাঁত, শিঙ—এতগুলো সম্পত্তি দিয়েছে ভগবান, আর আমার মাত্র দুখানা হাতের থেকেও আবার একখানা কেটে নিয়েছে। এস, সেজবৌদি, নামো। দরকার হয় রেল-অফিসে গিয়েই টিকিট জমা দেব।"

স্টেশন ছুঁই-ছুঁই। মন্দীভূতগতি ট্রেন থেকে নেমে পড়ে সাধন দত্ত। আশ্চর্য, হেমাঙ্গিনীও বিনা প্রতিবাদে নিঃশব্দে নেমে পড়ে পিছন পিছন।

অতঃপর গাড়িতে কী ঘটল সে-কথা থাক, এদের কথাই হক।

প্রথম কথা হেমাঙ্গিনীই কইল। বেদনা আর বিস্ময়মেশা স্বরে বলল, "হাত কাটা গেল কিসে?"

"ডাক্তারের ছুরিতে।" বলল সাধন দত্ত।

"আহা তা যেন বুঝলাম, কিন্তু হয়েছিল কী?"

সাধন দত্ত এক সেকেন্ড থেমে মিটি-মিটি হেসে বলল, "সে একটা ইতিহাস! পরে হবে সে-সব কথা। কিন্তু কথা হচ্ছে এ-লাইনে নাকি তুমি প্রায়ই আস?"

প্রায় আসার মধ্যে চাল চালানের ইতিহাস আছে, তাই হেমাঙ্গিনী অপরূপ ভঙ্গিতে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, "প্রায় আবার কোথা? কালেভদ্রে।"

সাধন দত্ত আবার হাঁ করে তাকায়।

এখনও এইভাবে হাসে হেমাঙ্গিনী? হাসতে পারে? মেয়েমানুষের কি বয়েস বাড়ে না? কত বয়েস হল হেমাঙ্গিনীর? চল্লিশ? বেয়াল্লিশ? পাগল! বেয়াল্লিশ পার হয়ে এসেছে কোন না দশ বছর আগে। মনে মনে নিজের বয়েসের হিসেবটা একবার করে নিয়ে নিশ্চিত হল সাধন দত্ত। অথচ এখনও বাইশ বছরের মত মুখ টিপে হাসতে পারে হেমাঙ্গিনী। যে-হাসির আগুনে সাধন দত্ত—! চমকে উঠল সাধন হেমাঙ্গিনীর কথার ধাক্কায়। "তুমি যে দেখছি একেবারে বুড়ো হয়ে গেছ! বৌ যত্ন করে না বুঝি?"

"কই আর?"

সাধন দত্তও হাসতে চেষ্টা করল মুখ টিপে। তাতে শুধু মুখের পেশীগুলো একটু কুঁচকে উঠল। আর মুখের চেহারাটা একটু বিকৃত দেখাল।

"আচ্ছা, আমি গিয়ে দুকথা শুনিয়ে

দিচ্ছি। পুরুষের শরীর কখনও অযত্নে টেঁকে? ছেলেপুলে কী?"

"কিছু না।"

"অ্যাঁ! ছেলেপুলে হয়নি?"

"না।"

"আ কপাল!"

"কপাল ত ভালই।" সাধন বলল।

"দূর, পাঁচটা কাচ্চাবাচ্চা না হলে কখনও মন টেঁকে? এই আমারই দেখ না, শুধু একটি ওই বস্তুর অভাবে জীবনটাই"—থেমে গেল হেমাঙ্গিনী। তাড়াতাড়ি কথা ফিরিয়ে বলল, "বেলঘোরেতেই থাক বুঝি এখন?"

"রামো! কলকাতায় ছাড়া মানুষে বাঁচে?"

হেমাঙ্গিনী অবাক হয়ে বলে, "তাহলে এখানে নামলে যে?"

"কারে পড়ে। তুমি যে কাণ্ডটি বাধিয়েছিলে!"

হেমাঙ্গিনী লজ্জা পেল, কিন্তু চুপ করে থাকল না। তাড়াতাড়ি বলল, "তাড়াতাড়িতে টিকিট কেনা হয়নি।"

"একাই যাওয়া আসা কর?"

আর একবার তেমনি বাইশ বছরে হাসি হাসল হেমাঙ্গিনী। হেসে বলল, "দোকলা আর পাচ্ছি কোথায়?"

"আশ্চর্য!" সাধন দত্ত নিশ্বাস ফেলে বলে, "তুমি বারোমাস এই পথে যাওয়া-আসা কর, আমিও নিত্যি আসি; অথচ একদিনও কি দেখা হতে নেই?"

হেমাঙ্গিনীও নিশ্বাস ফেলল একটা।

এতক্ষণে যেন ওর চৈতন্য হল কার সঙ্গে কথা বলছে। উদাস স্বরে বলল, "দেখা হলেই বা কী লাভ হত।"

"নাঃ লাভ আর কী?"

কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ।

আবার হেমাঙ্গিনীই আগে কথা কওয়ার ভার নেয়। "এখানে যদি থাক না, ত যাচ্ছ কোথায়?"

সাধন দত্ত চমকে উঠে বলে, "কই? যাচ্ছি না ত কোথাও।"

"যাচ্ছ না কোথাও?" হেমাঙ্গিনী অবাকের অবাক, তস্য অবাক! যাচ্ছ না ত হাঁটছ যে?"

"কী জানি! এমনি!" বলেই হেসে উঠে বলে- বসে সাধন দত্ত, "অনেকদিন পরে তোমায় দেখে বুঝলে সেজবৌ—মানে খেয়াল নেই কেন হাঁটছি। তা তুমি যাচ্ছিলে কোথায়?"

"কলকাতায়, আবার কোথায়?"

"তা হলে—আমিও ত—মানে, আমিই বা এখানে তোমাকে নিয়ে কোথায়—বেশ তা হলে আবার স্টেশনেই ফেরা যাক কী বল? গাড়ি অনেক আছে, পেয়ে যাব যা হক একটা।"

এবারে পুরো পয়সা দিয়ে দুখানা টিকিট কিনল সাধন, জুত করে গাড়িতে উঠে বসল দুজনে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে তখন।

"এতদিন পরে তুমি আমায় চিনলে কী করে বল ত সেজবৌ? আশ্চর্য ত!"

ধড়িবাজ হেমাঙ্গিনী গম্ভীর উদাস স্বর আমদানি করল কণ্ঠে। বলল, "প্রাণের চেনা থাকলে পরজন্মেও চেনা যায়, তা এত কেবল কটা বছর মাত্র। বিপদে মধুসূদনকে খুঁজতে গিয়ে তোমার খোঁজ পেলাম।"

ত্রিশ বছর ধরে একখানা হাতে ভাত রেঁধে খাচ্ছে সাধন দত্ত, উনুনে আগুন দিচ্ছে, বাটনা বাটছে, গুলে পাকাচ্ছে, তবু সেই হাতের ভিতর কী অদ্ভুত চাঞ্চল্য জাগে হেমাঙ্গিনীর ওই কোলের উপর পড়ে থাকা হাতখানা চেপে ধরবার জন্যে। কষ্টে সে-ইচ্ছে সংবরণ করে সাধন বলল, "স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি যে, তোমার সঙ্গে আবার কোনদিন দেখা হবে।"

"দুঃস্বপ্নে বল।" বলে মুচকি হেসে হেমাঙ্গিনী সেমিজের ভিতর থেকে পান-দোক্তার কৌটো বার করল। একটু বাড়িয়ে ধরে বলল, "চলে?"

সাধন দত্ত মাথাটা নাড়ল। "না! জানই ত দোক্তার গন্ধেই আমার মাথা ঘোরে।"

"ও বাবা, এখনও সেই খোকাটি আছ? বৌ বুঝি মানুষে করে তুলতে পারেনি?"

সাধন দত্ত এবার মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে ওঠে, "মাথা নেই তার মাথাব্যথা। বিয়েই করিনি তার বৌ।"

"বিয়ে করনি?" হেমাঙ্গিনী প্রথমটা চমকে উঠল, তারপর সেই অবাক-অবাক চোখের কোণে জ্বলে উঠল লোভের আগুন। বিয়ে-থা করেনি। তা হলে হয়ত তেমন গুছিয়ে দুটো দুঃখের কথা বলতে পারলে কিছু আদায় করা যাবে। হুঁ, বিয়েই করেনি, তাই এখনও তেমনি ন্যাকাবোকা রয়ে গিয়েছে।

পান-দোক্তার কৌটোকে আবার যথাস্থানে রেখে হেমাঙ্গিনী নড়েচড়ে বসে বলল, "বিয়ে করনি কেন গো ঠাকুরপো? মেয়েমানুষের ওপর ঘেন্নায়?"

বাইশ বছর থেকে বাহান্ন বছরের দরজায় এসেছে হেমাঙ্গিনী, আর এই দীর্ঘ পথটা অতিক্রম করতে কত না ঘাটের জলই খেতে হয়েছে তাকে। কত ঘাট ঘুরল, কত সিঁড়ি নামল, কত চাল চালতে চালতে শেষ অবধি চাল চালুনের ব্যবসা ধরল, আবার সে-ব্যবসা ছেড়ে এখন জ্বরে জরজর, তবু কি তার মধ্যে থেকে আজও মল্লিকদের বাড়ির সেজবৌ কথা কয়ে ওঠে? যার কথায় ছিল ছুরির ধার?

সাধন দত্ত কথা কইতে জানে না।

আগেও ভোঁতা ছিল, আজও তাই। শুধু নিজে ভোঁতা বলেই হয়ত তীক্ষ্ণধার ছুরির প্রতি ওর বরাবর লোভ।

"ঘেন্না আবার কী? কার ওপর ঘেন্না? ও-না-না। সে আর তোমার দোষ কী! হিঁদুর ঘরের বিধবা, ও ছাড়া আর—না না ওসব কিছু না। বিয়ে করবার সময় পেলাম কবে? তা ছাড়া—হাতকাটা পাত্তরের হাতে মেয়ে দিতই বা কে?"

হাতকাটা!

হেমাঙ্গিনী চোখ গোল করে বলে উঠল, "হাত গেছে কতদিন?"

"সেই তত্তদিন।" আবার মিটিমিটি হাসে সাধন।

হেমাঙ্গিনী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

কী যেন ভাবতে চাইছে। কিসের যেন হিসেব করছে। সাল, তারিখ, মাস বছরের হিসেবই হয়ত।

হিসেবের ফাঁকে ফাঁকে ও কি কোন ছবি দেখতে পাচ্ছে? মল্লিকদের সেই বিরাট বাড়িখানার ছবি?

সামনে পিছনে দরদালান দেওয়া, চকমিলান সেই বাড়িখানার চৌকো চকের খাঁজে খাঁজে আরও কত শাখা-প্রশাখা। ক্ষুদে ক্ষুদে কুঠরি, কত ছোট ছোট দরজা, কত টুকরো টুকরো ঘেরা বারান্দা।

লুকিয়ে প্রেম করবার পক্ষে আদর্শ গড়নের বাড়ি।

কে জানে সে-বাড়ির আদিপুরুষের আমল থেকে আনাচেকানাচে কত আদি-রসাত্মক লীলা ঘটে এসেছে। পূর্বকালে মল্লিকদের ইজারা নেওয়া ঘাটে না কি আর্মানীদের জাহাজ ভিড়ত। সে-সব কথা হেমাঙ্গিনীর জানার নয়। হেমাঙ্গিনী শুধু এ-যুগের কথাই জানে। যখন মল্লিকবংশের পুরুষরা লক্ষ্মীকে সিন্দুকে পুরে নিশ্চিন্ত গৃহলক্ষ্মীদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে শিখেছে। হেমাঙ্গিনী জানে শুধু বাড়ির সেজবৌকে।

সেজবৌ!

ফর্সা ধবধবে মিহি আদ্দির সেমিজ, কালো নরুনপাড় সিমলের ধুতি। হাতে দুগাছা করে প্লেন চুড়ি, গলায় সরু গোট হার। এই সাজ!

পাখির মত হাল্কা শরীর, ছুরির মত ধারালো কথা। বিয়ের বছর না ঘুরতেই বিধবা।

শ্বশুর থাকতে স্বামী গিয়েছে, তাই বিষয়ের ভাগিদার নয়। শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী।

যারা পাঁচ শরিকের এক শরিক, সেই বড় মেজ, ন, ছোট বৌরা সকলেই দিব্যি ভারভারিক্কী। সেজবৌয়ের গতিবিধিতে উড়ন্ত মৌমাছির চাপল্য।

নন্দাইরা এলে ননদের ঘরে ঢুকে তার খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়িয়ে দিয়ে আসে সেজবৌ, ছড়া কাটে, নন্দাইয়ের গায়ে

"এত ভয় কিসের?"

পানের খিলি ছুঁড়ে মারে। দূরসম্পর্কের দেওররা এলে তাদের সুবিধে-স্বাচ্ছন্দ্যের ভার স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়ে রাঁধুনীর সংগে ঝগড়া করে, বড়গিন্নীর কৃপণতার প্রতি কটাক্ষ করে। আর বয়সে একটু বড়সড় ভাগ্নে আর ভাসুরপোগুলোকে শুধু তাস-খেলার প্রলোভনে ভুলিয়ে একেবারে অনুগত করে রাখে।

প্রখরা প্রগল্‌ভা তরুণী বিধবার মত বিপজ্জনক বস্তু সংসারে অল্পই আছে। তাই বড়-মেজ গিন্নীরা যেন হিস্‌হিসিয়ে বেড়ায়। কিন্তু এ'টে উঠতে পারে না। ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে পড়ে সেজবৌ। বেরিয়ে পড়ে আড্ডা দিয়ে বেড়ায় ঘরে ঘরে।

হয়ত রাতদুপুরেই গিয়ে আসন্ন-পরীক্ষার্থী পিসতুত দেওরের ঘরে হানা দেয়, বেপরোয়া তার পড়ার বইগুলো উল্টে-পাল্টে দিয়ে বলে, "চব্বিশ ঘণ্টা বই মুখে, এ ভাল ছেলের জ্বালায় কী হবে গো! দুটো কথা কইতে এলাম, বুঝলে?"

ছেলেটা ভয়ে কাঠ হয়ে যেত। আড়ষ্ট হয়ে তাকিয়ে থাকত খোলা দরজার দিকে, আর সেজবৌ দিব্যি খাটের ধারে বসে পা দোলাতে দোলাতে বলত, "অত ভয় কিসের? তোমায় ত আর খারাপ করে দিচ্ছি না? চব্বিশ ঘণ্টা বুড়ীগুলোর সংগে থেকে থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, দুটো আড্ডা না দিয়ে বাঁচা যায়? ভয় নেই, ভয় নেই। গিন্নীরা এখন কর্তার ঘরে।"

নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর ছেলেগুলো ব্যাঙের পায়ে দড়ি বেঁধে তার গায়ে ছুঁচ ফুটিয়ে ফুটিয়ে যে আমোদ পায়, সেই আমোদের আস্বাদ বুঝি পেতে চাইত হেমাঙ্গিনী।

কিন্তু বারুদের বাক্সে আগুনের ছিটে মারলে কি সে-বারুদ শুধুই ফুলকি কেটে থেমে থাকে? এক সময় সবটা জ্বলে উঠে আধারটা ফাটিয়ে বেরিয়ে আসে না সে-আগুন? মুখচোরা মাথানিচু পরানুগৃহীত জীবটাও হঠাৎ একদিন ফেটে পড়ল! ফণা তুলে উঠল! বই খাতা উল্টে দেওয়ার সংগে সংগে ফস্ করে পলতে ঘুরিয়ে নিভিয়ে দিল টেব্‌ল-ল্যাম্পটা। খপ্ করে চেপে ধরল টেবিলের উপর রাখা ফর্সা পাতলা হাত-খানা। চাপা নিষ্ঠুর গলায় বলে উঠল, "কে কাকে খারাপ করতে পারে জান কিছু?"

অপ্রত্যাশিত এই আক্রমণে আচমকা কি একটা চিৎকার করে উঠেছিল মল্লিকদের বিধবা সেজবৌ? হয়ত করেছিল। নইলে সংগে সংগে ভিড় জমে উঠেছিল কী করে বিরাট বাড়ির নীচেরতলার এক টুকরো অবহেলিত খুপরিতে লুকিয়ে থাকা ছোট্ট সেই কুঠুরিটার সামনে?

পাখির পালকের মত হাল্‌কা দেহখানা ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে পিছলে বেরিয়ে পড়তে পেরেছিল সেজবৌ, কিন্তু ছেলেটা পালাতে পারেনি।

"পালালে চলবে না! মরি ত এক সংগেই মরব—" বলে গোঁয়ার্তুমি করে কপাটে খিল লাগাতে গিয়ে, নিজের হাতটাকেই শুধু পিষে মেরেছিল দুটো কপাটের মাঝখানে। পিষে ত যাবেই, বেরিয়ে পড়েই বাইরে থেকে কপাট টেনে শিকল তুলে দিয়েছিল কিনা বুদ্ধিমতী সেজবৌ।

না দিলে, সেই ভিড়ের সামনে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কে'দে কে'দে বলত কী করে, "ওর মনে যে এত কাপট্য, জানব কী করে? তখন আমায় বললে, 'শুতে যাবার আগে দুটো লবঙ্গ দিয়ে যেও ত সেজবৌ, লবঙ্গ খেলে চোখের ঘুম ছাড়ে।' আমি সরল মনে তাই দিতে গেছি। কী করে জানব যে, লক্ষ্মীছাড়া আমাকে একলা পেয়ে—" কে'দে ভেঙে পড়ে বাকী কথাটা শেষ করতে পারেনি সেজবৌ।

কিন্তু এত চেষ্টাতেও সেদিন সেজবৌয়ের সরলতাকে বিশ্বাস করেনি কেউ। বিশ্বাস করেনি যে, আগুনে জ্বেলে পুড়ে মরবার দুঃসাহস তার ছিল না, শুধু এক-আধটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে জ্বেলে গভীর অন্ধকারের দুঃসহতাটাকে সহনীয় করবার বোকামি ছিল।

না, অত অদ্ভুত কথা বিশ্বাস করে না কেউ। সংসার-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা সেই রাত্রেই গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছিল হতভাগা ছেলেটাকে, আর রাত পোহাতেই ভোরের গাড়িতে সেজবৌকে চালান করে এসেছিল নবদ্বীপে।

সেই নবদ্বীপের ঘাট থেকে, কত ঘাটেই ঘোরাঘুরি।

সামনের পথের হিসেব আছে, পিছনের ইতিহাস অজানা! কে জানে কী হয়েছিল সেই পায়ে-দড়ি-বাঁধা ব্যাঙটার!

এবারে প্রথম বক্তা সাধন দত্তই।

"কী, চুপ মেরে গেলে যে?"

হেমাঙ্গিনী একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "না, চুপ নয়, নিজের পাপের হিসেব কষছি।"

সাধন দত্ত জোর দিয়ে হেসে ওঠে, "হুঁঃ! খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই, পাপের হিসেব কষছে! আরে বাপু, দোষ আমারও ছিল। সংগে সংগে চিকিচ্ছে-পত্তর করলাম না, কিছু না; পড়ে পড়ে পচল, পচে পচে গ্যাংগ্রীন হল, বাদ দিতে হল শেষটা। দোষ কার?"

"তোমার জীবনটা আমিই নষ্ট করলাম!" কথা কইল চালচোর হিমি নয়, কইল মল্লিক বাড়ির সেজবৌ! যে-মেয়ে প্রগল্‌ভা বাচাল হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হলেও একটা মানুষ ছিল। কিন্তু এই দীর্ঘকাল পুঁটি, হরিদাসী, কালোর মা-দের সংগে কথা কয়ে কয়েও তার সেই মানুষ-জীবনের ভাষা আজও মনে আছে হেমাঙ্গিনীর?

সাধন দত্ত চকিত হয়ে উঠল। "কী মুশকিল! জীবনটা কি মাছ-দুধ? যে এক কথাতেই নষ্ট হয়ে যাবে? দিব্যিই ত কাটিয়ে এলাম! রাঁধি বাড়ি খাই দাই, তোফা থাকি! যাচ্ছই ত, দেখতে পাবে আমার সংসার!"

"যাচ্ছি মানে?" হেমাঙ্গিনী বলে ওঠে, "আমি কোথায় যাব?"

"কেন, আমার বাড়িতে।"

"পাগল নাকি!"

"পাগল মানে? সেখানে কে তোমাকে মারতে আসবে?"

"মারতে আসার কথা নয়।, যাব কোন মুখে? আমি যাচ্ছি মারোয়াড়ী হাসপাতালে ভর্তি হবার চেষ্টায়।"

"হাসপাতালে?" সাধন দত্ত চমকে উঠল, "কেন, হাসপাতালে কেন?"

"কেন আর! রোগে ধরেছে! মরলে আপদ চোকে, কিন্তু মরছি কই? নিত্যি জবর, নিত্যি জবর।"

সাধন দত্ত ঈষৎ গাঢ় স্বরে বলে, "ওঃ তাই! তাই চেহারা এমন খারাপ হয়ে গেছে? আমি ভাবছিলাম দুঃখে ধান্ধায়!"

"সেটাও মিথ্যে নয়! জীবনের ওপর দিয়ে কত ঝড়ই বয়ে গেল! তোমাকেও মারলাম, নিজেকেও বাঁচাতে পারলাম না। এখন সত্যি মরতে পারলেই জুড়িয়ে যাই।"

"মরতে তোমায় দিচ্ছে কে?" সাধন দত্ত উৎফুল্ল স্বরে বলে, "হাসপাতালেই বা যেতে দিচ্ছে কে? দেখ না, এই একখানা হাতের সেবাতেই তোমায় ভাল করে তুলতে পারি কিনা।"

আর কথা বাড়ায় না সাধন দত্ত, তোড়-জোড় করে নেমে পড়ে।

স্টেশন থেকে বাড়ি যেতে বাসে উঠল না, একখানা ট্যাক্সিই করে বসল!

হেমাঙ্গিনী কেমন চুপচাপ! যে-হেমাঙ্গিনী খানিক আগেও ভেবেছে জুত করে দুটো দুঃখের কাহিনী শোনাতে পারলে হাবাগোবা লোকটার কাছ থেকে কিছু হাতাতে পারা যাবে, সে-হেমাঙ্গিনী যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে।

চাবি খুলে ঘরের আলো জবালল সাধন দত্ত। "এই দেখ! বৌ নেই বলে ঘরের কিছু অগোছালো দেখছ নাকি সেজবৌ? নাও এখন মুখ হাত ধুয়ে নাও। শরীর ত ভাল নয়, রাত্তিরে খাও কী?"

"ছাই খাই!" হঠাৎ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল হেমাঙ্গিনী, "অনেক কুটুম্বিতা হয়েছে; থাক, এবার যেতে দাও দিকি।"

সাধন দত্ত থতমত খেয়ে বলে, "কোথায় যাবে এখন এই রাত্তিরে?"

"চুলোয়!" ঝাঁঝিয়ে ওঠে হেমাঙ্গিনী, "তোমার পিত্যেশে বেরিয়েছিলাম নাকি?"

প্রৌঢ় সাধন দত্তর পেশীবহুল মুখে ফুটে ওঠে এক বিচিত্র হাসি। "তুমি আমার পিত্যেশে বেরোওনি জানি, কিন্তু আমি ত তোমার পিত্যেশেই বেরিয়েছিলাম সেজবৌ!"

"তার মানে?" হেমাঙ্গিনীর ভুরু কুঁচকে ওঠে, "তুমি জানতে আমি আসব?"

মাথা নাড়ল সাধন দত্ত, "জানতাম না, ভাবতাম! ভাবতাম, যদি দৈবাৎ কোনদিন দেখা পেয়ে যাই—"

হেমাঙ্গিনী গম্ভীর মুখে বলে, "দেখা পাওয়ার জন্যে এত আকিঞ্চন কেন? প্রতি-শোধ নেবার বাসনায়?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—" খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে সাধন দত্তর ভোঁতা চোখ দুটো, "সেইজন্যেই ত। আজ হাতে পেয়ে গেছি, আর ছাড়ি?"

"হাতে পেয়ে?" জোচ্চোর ফাঁকিবাজ অর্থলোলুপ হিমির মুখেও এবার আরও বিচিত্র অপরূপ এক হাসি ফুটে ওঠে, "হুঃ! তবু যদি পুরো দুখানা হাত থাকত!"

হা হা করে হেসে উঠল সাধন দত্ত। স্বভাবছাড়া অভ্যাসছাড়া জোর হাসি। "নেই —সে ত আমার পক্ষে ভাল গো! এখন আর চেঁচিয়ে লোক জড় করে নালিশ করতে পারবে না—'একলা পেয়ে লক্ষ্মীছাড়াটা আমায় জড়িয়ে ধরে—'"

আলোকদূত জোনাকি

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

দিবাবসানে রাত্রির অন্ধকার ধরণীর বুকে নেমে এসে ক্ষুদ্র জোনাকি যখন ক্ষণে ক্ষণে আলোক বিকিরণ করে বাতাসে উড়ে বেড়ায়, তখন সেই অপরূপ দৃশ্য দেখে কে না মুগ্ধ হয়। রূপপিয়াসী সাহিত্যকারেরা যে প্রকৃতির এই আলোকদূতের প্রতি আকৃষ্ট হবেন, তা সহজেই অনুমেয়। পৃথিবীর প্রায় সর্বদেশের কবি-সাহিত্যিকেরা তাই নানা উপমাচ্ছলে ও নানা প্রসঙ্গে জোনাকিকে তাঁদের রচনায় স্থান দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

আকাশের তারায় তারায়
বিধাতার যে-হাসিটি জ্বলে
ক্ষণজীবী জোনাকি এনেছে
সেই হাসি এ-ধরণীতলে।

জোনাকির অনুপম আলোকদ্যুতি দেখে বিজ্ঞানীরাও বিমুগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, জোনাকির এই অভিনব আলোকের উৎস কোথায় এবং এই আলোক বিকিরণের হেতু কী? এই রহস্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে বিজ্ঞানীরা যে তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন তা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি বিস্ময়কর।

প্রকৃতির সৃষ্টিকৌশল এমনই অপূর্ব যে, কীটাণুকীট থেকে আরম্ভ করে প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি প্রাণীর যেমনভাবে যা যা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা দৈহিক উপাদান প্রয়োজন, তেমনভাবেই তার দেহ গঠিত হয়েছে। ক্ষুদ্র প্রাণিসমূহের মধ্যে বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ যে-সকল ক্রিয়াকলাপ আমরা দেখি, তার প্রত্যেকটির পশ্চাতে হেতু আছে।

বোতলের ভিতর থেকে জোনাকির আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে

অন্ধকার নিশীথে জোনাকি যে ক্ষণে ক্ষণে আলো বিকিরণ করে, তার পশ্চাতেও একটি হেতু আছে এবং সে-হেতু হচ্ছে প্রিয়া-মিলনের প্রয়াস। পুং-জোনাকি এই আলোক-সংকেতের দ্বারা স্ত্রী-জোনাকির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। এই প্রেমালোকে আকৃষ্ট হয়ে স্ত্রী-জোনাকিও তার প্রণয়াস্পদকে প্রতি-আলোকসংকেত জানায়।

বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, পৃথিবীতে পনের শতেরও অধিক জোনাকির প্রজাতি আছে এবং প্রত্যেক প্রজাতির আলোকসংকেত ভিন্ন। ফোটিনাস পিরালিস নামক এক প্রজাতির পুং-জোনাকিরা প্রায় ছয় সেকেণ্ড অন্তর একবার পীতাভ আলো বিকিরণ করে। পুং-জোনাকি আলোকসংকেত করার দুই সেকেণ্ড পরে স্ত্রী-জোনাকি আলোকসংকেত দ্বারা তার আহ্বানের সাড়া দেয়। ফোটিউরিস পেনসিলভেনিকা নামক অপর এক প্রজাতির পুরুষেরা অল্প সময়ের মধ্যে পর পর দুই থেকে পাঁচ বার পীতাভ সবুজ বর্ণের তীক্ষ্ণ আলো বিকিরণ করে এবং স্ত্রীরা একবার মাত্র অপেক্ষাকৃত মৃদু আলো বিকিরণ করে তার সাড়া দেয়। পক্ষান্তরে ফোটিনাস সিন্টিল্যান্স নামক প্রজাতির পুরুষেরা পাঁচ থেকে দশ মিনিট অন্তর নারাঙ্গী রঙের ক্ষণস্থায়ী আলো বিকিরণ করে। প্রকৃতির এমনই শিক্ষা যে, এই ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গেরা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ আলোকসংকেত সহজেই চিনে নিতে পারে। অনেক সময় পেনসিলভেনিকা স্ত্রী-জোনাকি তার আলোক-সংকেত দ্বারা অপর প্রজাতির পুরুষকে প্রলুব্ধ করে উদরসাৎ করে; কিন্তু নিজ প্রজাতির প্রণয়াকাঙ্ক্ষী পুরুষ হলে তাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে।

কোন কোন প্রজাতির আলোক-বিকিরণ ক্ষমতা অতি ক্ষীণ বা আদৌ নেই বললেই চলে। ইংলণ্ড, উত্তর ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুদূর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে এইরকম আলোকবিহীন কয়েক প্রজাতির জোনাকি দেখা যায়।

আকৃতির দিক থেকে অন্যান্য সাধারণ পতঙ্গের সঙ্গে জোনাকির বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। তবে অন্যান্য পতঙ্গের তুলনায় তার চোখ দুটি বেশ বড়। সকল প্রজাতির পুং-জোনাকির ডানা আছে। অধিকাংশ স্ত্রী-জোনাকির ডানা নেই; কয়েক প্রজাতির ডানা আছে বটে, তবে তারা কদাচিৎ উড়ে বেড়ায়। স্ত্রী-জোনাকিরা মাটিতে তৃণের মধ্যে বসবাস করে। কিন্তু বহু
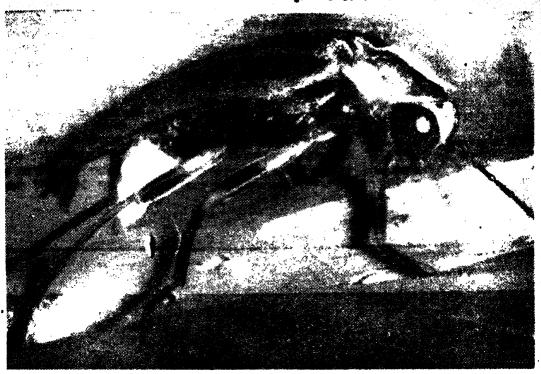
একটি জোনাকির শরীরকে আলোকচিত্রে বহুগুণ বড় করে দেখান হয়েছে

জোনাকি শূক ও অণ্ড অবস্থাতেও আলোক-দীপ্ত থাকে। পূর্ণত্ব প্রাপ্তির পর প্রথম কয়েকদিন অধিকাংশ জোনাকি কোনরূপ খাদ্য গ্রহণ করে না। জোনাকির সাধারণ খাদ্য হচ্ছে নানাপ্রকার ক্ষুদ্র কীট।

যে বৈশিষ্ট্য জোনাকীকে পতঙ্গসমাজের মধ্যে আভিজাত্য দান করেছে, সেটি হচ্ছে তার আলোক বিকিরণের অভিনব ক্ষমতা। এই আলোক বিকিরণের জন্যে তার দেহে বিশেষ অঙ্গ এবং উপাদান আছে। দেহের পশ্চাদ্‌ভাগে অর্থাৎ লেজের দিকে এই অঙ্গ অবস্থিত।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে পুরুষ ও স্ত্রী জোনাকি মিলন-আকাঙ্ক্ষায় আলো বিকিরণ করে। গোধূলিলগ্নে. জোনাকির এই মিলনাভিসার শুরু হয়। বাতাসে উড়তে উড়তে পুং-জোনাকি ক্ষণে ক্ষণে আলো বিকিরণ করে প্রিয়াকে আহ্বান জানায় এবং ভূমিস্থ স্ত্রী-জোনাকি তার দেহ-নিঃসৃত আলোক-সংকেতের দ্বারা প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর আহ্বানে সাড়া দেয়। প্রিয়ার কাছ থেকে প্রেমালোকের সংকেত পেয়ে পুং-জোনাকি তখন তৃণের বুকে নেমে এসে তার সঙ্গে মিলিত হয়।

এই প্রসঙ্গে সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হ' এই যে, গোধূলি ছাড়া অন্য কোন সময়ে জোনাকি আলো বিকিরণ করে না। ক্ষুদ্র কীট জোনাকির এই অদ্ভুত সময়-জ্ঞান হয় কী করে? জীব-বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, আঁধারের তারতম্য উপলব্ধির এক অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা আছে জোনাকির। গোধূলির আধো-আলো আধো-আঁধার পরিবেশকে তারা মিলনাভিসারের উপযুক্ত কাল বলে বেছে নেয়। আবছা আলোতেই তারা সচরাচর দেহের আলো বিকিরণ করে, দিবাভাগের তীব্র আলোতে আদৌ করে না এবং দীর্ঘস্থায়ী নিবিড় আঁধারে কদাচিৎ করে থাকে।

যথোপযুক্ত আলোর পরিবেশ সৃষ্টি হলে ঠিক ২৪ ঘণ্টা অন্তর জোনাকি তার দেহস্থ আলো বিকিরণ করে। পরীক্ষাগারের বদ্ধ ঘরে রেখেও দেখা গিয়েছে, জোনাকি ঠিক সন্ধ্যা-সমাগমে আলো বিকিরণ করতে আরম্ভ করে। বদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও জোনাকি কীভাবে সন্ধ্যার সমাগম উপলব্ধি করতে পারে? সূর্যের অস্তগমন বা মহাজাগতিক রশ্মির হ্রাসবৃদ্ধি অথবা দিবাবসান সংক্রান্ত অপর কোন প্রভাবের সঙ্গে জোনাকির এই যথার্থ সময়-উপলব্ধির কোন সম্পর্ক আছে কি? বিজ্ঞানীরা বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, জোনাকির যথার্থ সময়-বোধের সঙ্গে এ-সবের কোন সম্পর্ক নেই। বস্তুত যথাসময় নির্ধারণের কোন ক্ষমতাই নেই জোনাকির। প্রকৃতপক্ষে যা তারা উপলব্ধি করে, সেটা হচ্ছে ২৪ ঘণ্টা পর্যাবৃত্তের এমন একটা সহজাত বোধ যা তাদের বলে দেয় যে, একটি পূর্ণ দিবস অতিবাহিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, জোনাকির দেহ-নিঃসৃত এই যে আলো, তার উৎস কোথায় এবং কী উপায়ে তা উৎপন্ন হয়? বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করে বলেছেন, জোনাকির দেহে লুসিফেরিন নামক একপ্রকার পদার্থ আছে যার দ্বারা এই আলোর সৃষ্টি হয়। লুসিফেরিন যখন দেহাভ্যন্তরের অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়, তখনই এই আলো নিঃসৃত হয়। লুসিফেরিনের সঙ্গে অক্সিজেনের মিলন. ঘটায় লুসিফেরেজ নামক অপর একটি পদার্থ, যা রসায়ন-বিজ্ঞানের ভাষায় অনুঘটক নামে অভিহিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জোনাকির দেহনিঃসৃত আলো হচ্ছে রাসায়নিক দহন-ক্রিয়ার প্রতিফল। সাধারণ আলো বিকিরণের সঙ্গে তাপও উৎপন্ন হয়। কিন্তু জোনাকির দেহনিঃসৃত আলোর সঙ্গে তাপ একেবারেই প্রায় উৎপন্ন হয় না। এ-কারণে জোনাকির আলোকে শীতল আলো বলাই যুক্তিযুক্ত।

লুসিফেরিন ও লুসিফেরেজ উভয় পদার্থই জোনাকির দেহে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক কোষের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। এই সূক্ষ্ম কোষগুলিই হচ্ছে জোনাকির আলো বিকিরণের বিশেষ অঙ্গ। অক্সিজেন ছাড়া কোন দহন-ক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে না, জোনাকির কোষাভ্যন্তরের দহন-ক্রিয়ার জন্যেও তাই অক্সিজেন প্রয়োজন। জোনাকির দেহ-কোষে এই অক্সিজেন

সরবরাহ করে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নালিকা। কোষ মধ্যে অক্সিজেন, জলীয় অংশ, লুসিফেরিন এবং লুসিফেরেজের সম্মিলনের ফলেই আলো উৎপন্ন হয়। অন্যান্য প্রাণীদের মত জোনাকির দেহে যে রাসায়নিক শক্তি বিদ্যমান আছে তা-ই প্রত্যেক আলোক-উদ্ভাসনের পর লুসিফেরিনকে উজ্জীবিত করে।

বিজ্ঞানীরা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন, জোনাকির মৃত্যু হবার পর ও তার লেজের অংশ থেকে আলো উদ্ভাসিত হয়। এমন কি, লেজের অংশ চূর্ণীকৃত অবস্থায় দুই তিন বৎসরকাল নিম্ন উষ্ণতায় (শূন্য সেণ্টিগ্রেড তাপাঙ্কের ১৭ ডিগ্রি নিম্নে) রেখে দেবার পরও অন্ধকার ঘরে সেই চূর্ণে সামান্য পরিমাণ জল সংযোগ করলে তা থেকে আলো বিকীর্ণ হতে দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, দুই তিন বৎসর পরও এই চূর্ণে যে যৎসামান্য রাসায়নিক শক্তি সঞ্চিত থাকে, তারই বলে এরূপ আলো বিকীর্ণ হয়।

জোনাকি কী কৌশলে ক্ষণেকের জন্যে আলো জেলে আবার ক্ষণেকের মধ্যে তা নিভিয়ে ফেলে—সে-রহস্য আজও বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটন করতে পারেননি। কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন, যে নালিকাগুলি আলোক-কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে সেগুলিতে ভাল্‌ভ আছে এবং সেই ভাল্‌ভগুলির দ্বারাই আলোর উদ্ভাসন ও নির্বাপণ নিমেষমধ্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু এই তত্ত্বের সমর্থনে পর্যাপ্ত প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

সৌন্দর্যপ্রিয় জাপানবাসীদের কাছে আলোকদূত জোনাকির বিশেষ সমাদর আছে। ছাত্রছাত্রীদের কষ্টসাধ্য অধ্যয়ননিষ্ঠা বুঝাতে জাপানী সমাজে কিসেৎসু বলে একটি কথা আছে, যার অর্থ হচ্ছে, ছাত্ররা এত দরিদ্র অথচ এমন দৃঢ়সংকল্প যে, জোনাকির ক্ষীণ আলোকেও তারা পাঠাভ্যাস করে। জাপানে কোন কোন নৈশভোজ অনুষ্ঠানে রেস্তোরাঁর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের শোভা বর্ধনের জন্যে পেশাদার সংগ্রাহকদের কাছ থেকে জোনাকি কিনে ছেড়ে দেওয়া হয়। জাপানের হোনসু দ্বীপে উজি নামক স্থানে প্রতি বছর জুন মাসে জোনাকিকে নিয়ে একটি উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়।

মৎস্য মারিব, খাইব সুখে — আলোকচিত্রী শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ

Cooch Behar

আরোগ্য

সমরেশ বসু

নটীর হাটের এই স্টেশনের সামনেটিতে দাঁড়িয়ে থাকি রোজ। সকালে-দুপুরে-বিকেলে-সন্ধ্যায়-রাত্রে-মধ্যরাত্রে। কখনো সজ্ঞানে আসি, কখনো নিশির টানে। না এসে পারিনে।

নটীর হাট যেন এক অদৃশ্য পাঁচিলে ঘেরা, ছন্নছাড়া কোন্ এক আদ্যিকালের নগরী। সবই তার পুরনো, প্রায় প্রাচীনের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, তাবত বাসাড়ে-বাসিন্দে-অধিবাসী, মন্দির-বিগ্রহ-ধর্মশালা, সবই। নতুন উঠেছে যেগুলি, সেগুলি যেন পুরনো ছেঁড়া ধুলোমাখা কাগজের স্তূপে কয়েকখণ্ড নতুন কাগজ। চোখে পড়েও পড়ে না। বাসু পুকুরের গলিটি এখনো আছে ঠিক তেমনি। আছে তার শেওলা-ধরা, বেঁটেখাটো, নিচু, একতলা দোতলা বাড়িগুলি, এবড়ো খেবড়ো রাস্তাটি, খোপে খোপে বংশপরম্পরায় সেই শালিকেরা, আর সেই একই গোত্রের মেয়েরা, যাদের চেহারা ও নাম বদলায় প্রায়ই, দলে দলে যায় আর আসে। কিন্তু সন্ধ্যাকালে সবাই রং মাখে, সাজে, এসে দাঁড়ায় রাস্তার দরজায়। নটীর হাটের একেলে পৌরকর্তারা রাস্তাটির নাম করে দিয়েছেন 'সাহিত্য-সম্রাট-ভ্রাতা রোড'। কেমন একটু কানে লাগে খট করে। কে সেই সাহিত্য-সম্রাট, কে তাঁর ভ্রাতা কে জানে। ভ্রাতার নাম না থাকাটাও বড় বিচিত্র, কিন্তু এইটি বিশেষত্ব নটীর হাটের। কেননা, ও নামে ত কিছুই যায় আসে না, রাস্তাটা যে নটীর হাটের মজ্জায় মজ্জায় বাসু পুকুরেরই গলি। আর ঠিক এমনি গলি এত আছে নটীর হাটের এই সোয়া বর্গমাইলের চৌহদ্দিতে ...যাক, প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি।

বছর ষাটেক আগেও পশ্চিমে গঙ্গাই ছিল নটীর হাটের সদর দেউড়ি। এখন এই স্টেশন। জংশন স্টেশন। পুরনো সদর এখন খিড়কি-দোর। যত রাজ্যের যাওয়া আসা এখানে। শুধু শহর নয়, মনে হয়, স্টেশনের এখানটা যেন সেই অলক্ষিত পাঁচিল-ঘেরা নটীর হাটের সুউচ্চ সর্বোচ্চ চিলেকোঠাখানি। এখান থেকেই দেখা যায় নটীর হাটের সব অন্দর ও অন্ধকারের ঘটনা, শোনা যায় স্পষ্ট অস্ফুট সব কলকাকলি।

এই চিলেকোঠাখানি আমার খেলাঘর। এর অগুনতি ঘুলঘুলিতে আমি সকৌতুক অস্থির চোখ নিয়ে ছুটে বেড়াই। তার মধ্যে একটি ভুল সম্প্রতি ধরা পড়েছে। আমি অনুভব করেছি,

এ শুধু আমার খেলাঘর নয়, আমার যত শিক্ষার গোড়া বাঁধার এটি একটি স্কুলও বটে।

জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ-শ্রাদ্ধ, পাপ-পুণ্য, কলঙ্ক-অকলঙ্ক, নটীর হাটের যত প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য ঘটনার ঢেউ শেষ পর্যন্ত আছড়ে এসে পড়ে এখানেই। স্টেশনের সামনে এই একশ দেড়-শ গজের নানান ভিড়ের মধ্যেই। নটীর হাটের এই প্রবেশমুখে, যত চেনা-অচেনার যাওয়া আসার পথের ধারে।

ওই যে লাঠি হাতে, চটি পায়ে, চাদর গায়ে বুড়ো মানুষটি চলেছেন তাঁর শিখায় বাঁধা কাঠগোলাপ উড়িয়ে, উনিই হলেন নটীর হাটের চক্রবর্তীদের বারো শরিকের এখনকার দিনের সবচেয়ে প্রবীণ। আমার সঙ্গে দেখা হলেই বলেন, "নটীর হাটের কথা বলছ ত? না, আমরা এখানকার সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দে নই। রাম কুণ্ডুকে চেন ত, এখানে যার সতেরখানা বাড়ি আছে? তাকে সব দিয়ে গেছে উলূপী বারুণী।...গদাই সাধুখাঁকে চেন? যার সাতটা ইঁট-কাঠের গোলা, পেট্রল-পাম্প, সিনেমা আছে? সে পেয়েছে তার ঠাকুর্দার কাছ থেকে সৌরভীবালার সম্পত্তি। অধর পালকেও চেন, লোহা আর সোনা দুই-ই তার অনেক। সে ভোগ করছে সুখদার দান। এই পাল কুণ্ডু সাধুখাঁদের দেশ নটীর হাট। অবিশ্যি সবাই পরের সম্পত্তিতে বড়লোক নয়, নিজেরও আছে অনেকের। ব্যবসাটা ওদেরই একচেটে।"

"কিন্তু ওই উলূপী বারুণী, সৌরভীবালা, সুখদারা কারা?"

"ওরা সেকেলে নটী, অর্থাৎ বেবুশ্যে। নটীর হাটের আদিবাসিনী। তবে শোনো, তখন সেই......"

থাক, প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি আবার। যদি ও'কে জিজ্ঞেস করা যায়, কিন্তু এত ব্রাহ্মণ-বসতি হল কী করে, ফোকলা দাঁতে হেসে বলেন, ধর্মের কলে।

উনি বেশী বলেননি। ধর্মের কলটা বাতাসে কিংবা আর কিছুতে নড়ছিল, সেটা ধরা পড়েছে আমার চিলেকোঠার ঘুলঘুলিতে। তাহলে চক্রবর্তীদের ইতিহাস...

সেসব থাক্। ওই ঘোড়ারগাড়ির ভুনু গাড়োয়ান যেদিন ওর আগুনের মত ষোড়শী বউ ঝুনিয়াকে নিয়ে এল প্রথম...থাক্ সেসব।

ওই যে যাচ্ছেন ফণীন্দ্র ঘটক, তাঁর পরমাসুন্দরী সাত মেয়ের কথা...না, সেটি এখন নয়।

গজেন্দ্রগমনে যাচ্ছে পথের মাঝখান দিয়ে ধবধবে ফর্সা, মেদবহুলা বাড়িউলী সুখবালা, গোটা মালপোতা পাড়াটা ওর নিজেরই। ওর গায়ের ভাজে ভাজে আছে নটীর হাটের আদি ইতিকথা। তের বছরের মেয়ে যেদিন প্রথম এল...থাক, সেই অপ্রাসঙ্গিক কথাই এসে যাচ্ছে। তা হলে মালপোতা পাড়ার অজ্ঞাতকুলশীল শিরীষ কেমন করে কার্তিক হালদারের মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল, সে-কথাও বলতে হয়।

আর ওই যে যাচ্ছে সুধারানী বন্দ্যোপাধ্যায়, নটীরহাটের হাল-কলেজের ছাত্রী, ওর কিংবা অধ্যাপক ত্রৈলোক্যনাথ গুপ্ত কিংবা কৃষ্ণপ্রিয়া স্কুলের মাস্টার রেণুপদ নাথের জীবন-বৃত্তান্ত সামান্য জিনিস নয়। কোন্‌টা সামান্য! নটীর হাটের এম এল এ অথবা শ্রমিক-নেতা, সাহেব—সাহেবকুঠি, ক্লাব, সাহেবদের পরকীয়া-প্রবৃত্তি—কিছুই যাবে না ফেলা।

সবচেয়ে মজার হল অধ্যাপক যুধিষ্ঠির চাটুজ্যের কথা। নটীর হাটে ও'রও অনেক অবদান। তার মধ্যে একটি, উপন্যাস লেখা। তার আগে এই যুধিষ্ঠির চাটুজ্যে বিয়ের পরে যখন ভোটে দাঁড়াতে গেলেন...থাক, আমি ত আজকে এসব বলতে বসিনি। তবু যে বলতে হল, তার কারণ, যা বলব, তা নটীর হাটের বৃন্তছেঁড়া একটি কুসুমের মত। তাই এত কথা।

আমার ঘুলঘুলি দিয়ে দেখতে পাচ্ছি অবনীকে। তার বিষয়ই হচ্ছে নটীর হাটের সবচেয়ে হালের ঘটনা।

স্টেশন থেকে নেমে, কোনরকমে একটি টুথপেস্ট কিনে অবনী হন্ হন্ করে চলেছে বাড়ির দিকে। ওর চীনাবাড়ির চিকন মসৃণ মোটা সোলের জুতোর শব্দ শুনলেই বোঝা যায়। খুশিতে ডগোমগো কুরঙ্গটা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে।

নটীর হাটের মধ্যে কয়েকটি বাছা সুন্দর-দেখতে ছেলের মধ্যে ও একটি। চোখা নাক, টানা চোখ, রক্তাভ ঠোঁট আর ধবধবে ফর্সা রং, কিন্তু একেবারেই উন্নাসিকের মত দেখায় না। মাথার চুল কোঁকড়ান নয়, বড় বড় কয়েকটি ঢেউয়ে যেন একটি বিহ্বল অবসাদ চুলের বিন্যাসে। সেটিও বিচিত্র একটি সৌন্দর্য। এমনিতেই অবনী সুন্দর, তার উপরে নিপুণ হাতে টাই বেঁধে, কোট চাপিয়ে যখন বেরোয় ওর সেই সাবলীল ভঙ্গিতে, তখন পুরুষের ভিড়ে পুরুষ দেখেও তাকিয়ে থাকতে হয় একটুক্ষণ। ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে সে বি-এ পাশ করেছে। তারপর তেইশ বছর বয়সেই একটা ভাল চাকরি পেয়ে গেছে বিলিতী মার্চেণ্ট অফিসে।

আমি দেখছি, অবনী যাচ্ছে। দক্ষিণ দিকে খানিকটা গিয়ে বেঁকে গেল পুবে। তারপরে আবার দক্ষিণে, পুবে আবার, দাঁড়াল গিয়ে সেই বাড়িটার সামনে। সেই মান্ধাতার আমলের বাড়ি, প্রায় বিঘে দুয়েক জমি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শতাব্দীর উপরে। এ-বাড়ির খ্যাতি শুধু নটীর হাটে নয়, সারা বঙ্গে। নাম বললে সবাই চিনি চিনি করে উঠবে, তাই পরিচয়টা চাপা থাক। অবনী এই বাড়ির বিখ্যাত বংশের ছেলে।

আমি ওকে আজ দেখছি, আরম্ভ করছি তিন বছর আগে থেকে। তখন তার চাকরি-জীবন শুরু হয়ে গেছে। তিন বছর আগে, সেদিনও সন্ধ্যাবেলা ঠিক এমনিভাবে এ-বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল অবনী। কিন্তু থমকে দাঁড়াল সেকেলে বাড়িটার গজাল-মারা সদর-দেউড়ির সামনে। ইলেক্‌ট্রিক নেওয়া হয়েছে, তবু বাড়িটার গা থেকে পিদিম হ্যারিকেনের রেশ ঘুচতে চায় না। দেউড়ির আলোয় মনে হয়, গত শতাব্দীর সেই ভুতুড়ে আলোটাই যেন জ্বলছে। সামনে পোড়ো উঠোন আর ভাঙা ঠাকুরদালান, ওখানটা অন্ধকার। পাঁচ শরিকের যাওয়া-আসার পথ, তাই কেউ তার ভাগের সামান্য মিটার ওখানে খরচ করতে রাজী নয়। ইঁদুর ছুঁচো ব্যাং ছাড়া সাপও থাকতে পারে, আছেও। তবু।

উঠোনের বাঁ দিকে যে ঘরগুলিতে আলো দেখা যায়, ওগুলি অবনীদের। বাবা মা ভাই বোন, সব মিলিয়ে সংসার ওদের এখনও পুরনো বংশ হিসেবে খুবই জমাট।

অবনী থমকে দাঁড়াল। ওদিকটায় ও যেতে চায় না। কার্তিক মাসের হেমন্ত-জ্যোৎস্নায় এখনও কোথায় শরতের সোনার আভাস রয়ে গেছে একটু। তার উপরে হৈমন্তিক কুয়াশা-কুহকের একটু রেশ নির্বাক কৌতুকে রয়েছে চেয়ে। যেন পোড়ো উঠোন আর ঠাকুরদালানে ঘাপটি মেরে বসে আছে কারা আলো-আঁধারিতে।

অবনী যেতে চায়, ওদের ঘরগুলি পেরিয়ে, ন-জ্যাঠামশায়ের পরিত্যক্ত মহলটায়। কিন্তু ঘরের লোকে দেখে ফেলে, সেই ভয়। উঠোনে ঢুকে, বাঁদিকের উপরে ওঠার সিঁড়ি। কিন্তু ভাঙা। উপরে এখন আর মানুষ ওঠে না। যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে হুড়মুড় করে। এই

দি রিলিফ

২২৬, আপার সার্কুলার রোড

এক্সরে, কফ প্রভৃতি অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা হয়

দরিদ্র রোগীদের জন্য—মাত্র ৮্ টাকা

সময়ঃ—সকাল ৯টা থেকে ১২-৩০ ও বৈকাল ৪টা থেকে ৭টা

ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উঠে, একটি চোরা সিঁড়ি আছে পিছনের মহলে যাবার। কিন্তু......

এগিয়ে গেল অবনী পা টিপে টিপে। পায়ের চাপে সিঁড়িগুলিই দুরু দুরু করে, কিংবা ধুক ধুক করে নিজের বুক, ঠিক ধরতে পারে না অবনী। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে, সবে মাত্র চোরা সিঁড়ির শেষ ধাপটায় এসেছে। এমন সময় অস্ফুট আর্তনাদ শুনে থমকে গেল। দেখল, সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ভয়ে জড়োসড়ো ললনা। চিনতে ভুল হয়নি, তাই।

অবনী তাড়াতাড়ি বলল, "আমি ললনা, আমি অবনী।"

ললনা কাঁপছিল। আর একটি শীৎকার দিয়ে ও অবনীর বুকের কাছে ঘেঁষে এসে ফাস-ফিসফিস গলায় বলল, "মা গো! কী ভয় পেয়েছিলুম। এখানে কী করে এলে?"

"ওপারের সিঁড়ি দিয়ে।"

"কী সর্বনাশ।"

ললনার কথার উপরেই অবনী ঠোঁট চেপে দিল।

ললনা বলল, "এত ভয় কিসের যে, এমন খারাপ পথ দিয়ে এলে?"

অবনী বলল, "মার চোখে যে সন্দেহটা দেখা দিয়েছে, সেটা চাপা দেবার জন্যে। সামনে দিয়ে এসে তোমাদের দোর ঠেলতে হবে না। ভাববে, তবু ছেলেটা একদিন ললনাদের ওদিকে যাওয়া কামাই দিয়েছে।"

... ছিল না ললনার বাবা-মাকে। ওরা এ-বাড়ির লোক নয়, দুর্গতির দায়ে কলকাতা থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে আজ ছ মাস। অবনীর ন জ্যাঠামশায়রা প্রায় দু-পুরুষ ধরে আছেন কলকাতায়। নটীর হাট থেকে মুছে গেছেন তাঁরা। কিন্তু শরিকানার ভাগটুকু খালি রাখতে হয়েছে। এখন এসে আশ্রয় নিয়েছেন ন-জ্যাঠামশায়ের ভায়রাভাই, অর্থাৎ ললনার বাবা। ভদ্রলোক নিজের জীবনটা মামলার বাজি খেলে হেরে গেছেন নিজের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কাছে। সব হারিয়ে এসেছেন, আর কারও নয়, ভায়রাভাইয়ের পোড়োভিটায়। ইতি-মধ্যেই নটীর হাটের মার্কেটে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছেন নিজেকে। মনে হয়, ঠিক নটীর হাটের আদিবাসিন্দা যেন। প্রায় প্রতি-দিনই নানান পার্টির সঙ্গে যান মহকুমা আদালতে, সাক্ষী হিসেবে। হক কথা না বলুন, যুধিষ্ঠিরের বিকিকিনির হাটে বিকোচ্ছেন মন্দ নয়।

সে-কথা যাক। ভদ্রলোকের কিছু না থাক, রূপ ছিল ঘরে একরাশ। নিজের মধ্যবয়সী স্ত্রী থেকে তিন মেয়ে, সব কটি শুধু রূপ নয়, অপরূপ। একটা ভয়ংকর সর্বনাশের মত, যেন বৈশাখের তপ্ত-বাতাসে শিয়রে রাখা অগ্নিশিখা। অবনীর মায়ের

কণ্টক-জঞ্জাল আলোকচিত্রী শ্রীঅনিল বসু

মনের কথায়—পোড়োবাড়িটায় যেন কতগুলি নাগিনী ঘুরছে কিলবিল করে!

আমি আমার চিলেকোঠার ঘুলঘুলি থেকে দেখতে পাই, নটীর হাটের যত বাদলা-পোকাগুলি পড়ন্তবেলায় যায় অবনীদের নির্জন পাড়াটায়। দেখে ভাবি, বাদলাপোকা শুধু আগুনে পোড়ে না, সুযোগ পেলে তাদের সাপেও সাপটে দেয় টপাটপ।

ওই একরাশ রূপের একটি, বড় মেয়ে ললনা। অবনীর পাশে, একটি সুদৃশ্য সোনার হারের সুন্দর লকেটের মত। সুগৌরী, একহারা, কিন্তু একটি আশ্চর্য ধার ওর দেহলাবণ্যে। খর চোখে দীপ্ত দুটি তারা। যেদিকে চায়, সেখানেই দাগ দিয়ে দেয় একটু। কিন্তু রক্তাভ ঠোঁট দুটি কেমন যেন বিলিতী পুতুলের মত নিষ্প্রভ আবেশে ফুলো ফুলো। তার উপরে, এই অভাবের মধ্যেও ললনা সজ্জা-পটীয়সী।

প্রথম যেদিন চোখে চোখ পড়ল, দাগ পড়ে গেল অবনীর বুকে। তারপর শিকড় গাড়তে গাড়তে, জড়িয়ে ধরল আষ্টেপৃষ্ঠে।

ললনার বাবা মা এসব দেখেও দেখেননি। কিন্তু দেখতে ভোলেননি অবনীর বাবা মা, ভাই বোন, আরও পাঁচ শরিকের খুড়ো-জ্যাঠা-দাদারা। প্রথমে কানাকানি, তারপরে ফিসফাস, তারও পরে গুঞ্জন। কিন্তু এই দু বিঘে পুরনো বাড়িটার ভিতরেই যত। পারিবারিক ব্যাপারটা কেউ বাইরে টেনে নিয়ে গেল না।

অবনী একটু সাবধান হওয়ার চেষ্টা করল। তাই অন্ধকারে, ভাঙা পরিত্যক্ত চোরা সিঁড়ি দিয়ে, গোখরোর খোলস মাড়িয়ে এই দুঃসাহসিক অভিসার।

সেটাও ধরা পড়ে গেল। আন্দোলন উঠল সারা বাড়িতে।

কিন্তু এই দুজনের আন্দোলন তার চেয়ে

অনেক বেশী। গোটা বাড়িটা এ'টে উঠতে পারল না। ওরা দুজনে হল আরও বেপরোয়া। মাঝখান থেকে ছলনাটুকু গেল। অবনী সোজাসুজি নিজেদের উঠোন পেরিয়েই যাতায়াত করতে লাগল ললনাদের মহলে।

অবনীর মা রান্নাঘরে ভাত দিতে এসে, অভিমানক্ষুব্ধ গলায় বললেন, "এসব কী হচ্ছে। তুই না বড় ছেলে এ-ঘরের। তবে যা খুশি তাই কর, আমি যাই কিছুদিন দাদার বাড়ি।"

অবনী বলল, "তার চেয়ে তোমরা থাক, আমিই চলে যাব।"

মনে মনে ভয়ে বিস্ময়ে শিউরে চুপ করে রইলেন অবনীর মা। ঘর ছাড়তেও ছেলে রাজী আছে তবে!

বাবা ত মুখে একেবারে কুলুপকাঠিই এ'টেছেন। এখন চেয়েও দেখেন না। অবনীর রোজগার ছাড়া সংসার চলবে না, ও'র মুখে-চাবির ওইটিই কারণ। যদিও জানেন, ছেলে তাঁর বিদ্যায় বুদ্ধিতে রূপে, ব্যবহারে ও কথায়, গোটা নটীর হাটে প্রায় বেজোড়।

সব জানে, কিন্তু প্রাণ মানে না অবনীর। ললনার চোখের তারা ওকে টেনে নিয়ে যায়। সাড়া পড়ে গিয়েছে রক্তে, তাকে কী দিয়ে আটকে রাখবে অবনী।

রক্তে দোলা লেগেছে ললনারও। একটু দেরি হলে ঝড় ওঠে তার দু চোখে। অবনী কাছে এলেই, দু চোখে আলো জেলে যেন আরতি করে। ঠোঁট দুটি আর একটু ফুলিয়ে বলে, "এত দেরি করলে যে?"

"দেরি কোথায়? পাঁচ মিনিট ত।"

"ওইটুকুই অনেকখানি।"

অবনী অবাক বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে ললনার রূপ দেখে ডুবে যায়। তার চেয়ে বেশী ললনা। অবনীকে বলে, "তুমি যখন আমার রূপের প্রশংসা কর, মনে হয় ঠাট্টা করছ।"

"কেন?"

"নিজের রূপটা বুঝি তাকিয়ে দেখ না?"

দেখে, কিন্তু সেটা স্বীকার করার মত অবিনীত নয় অবনী। বলে, "পুরুষের আবার রূপ!"

ললনা কথাও জানে। বলে, "হ্যাঁ, সেটা বলার জিনিস নয়, মনে মনেই জানি। তা ছাড়া, তোমার কত গুণ! তোমার পায়ের যুগ্যিও নই আমি।"

অবনী বলে, "তা ঠিকই। কেননা, তুমি যে বুকের যুগ্যি।"

"আহা, ইয়ার্কি!"

কখনও বলে, "আচ্ছা, তোমার হাতের লেখাটা তুমি কী দিয়ে লেখ?"

অবনী হেসে বলে, "কেন, হাত দিয়েই।"

"তোমার হাতে তবে ছাপাখানার মেশিন বসান আছে। আশ্চর্য। কী সুন্দর তোমার হাতের লেখা।"

কথাটা ঠিক। অফিসে বড় সাহেব থেকে আর্দালীটি পর্যন্ত তার হাতের লেখায় মুগ্ধ। তার ইংরেজী ড্রাফ্ট না হলে ছোট সাহেবের মন ওঠে না। নটীর হাটের ও অফিসের বন্ধুদের অনেকে ইংরেজী চিঠি লিখে দেওয়ার দায়টা সে সানন্দে নিয়েছে।

অবনী ললনাকে টেনে নিয়ে যায় বাড়ির পিছনের উঠোনের নির্জনে। বলে, "আমার লেখার চেয়ে, তোমার কথা যে আরও সুন্দর।"

কিন্তু দেখা যায়, জিতটা শেষপর্যন্ত ললনার। কেননা অবনীর চেহারা, পোশাক, গুণ, সবই অতুলনীয়। ললনার বেলায় ললনা নিজেই মুখথাবাড়ি দেয় অবনীকে।

যদিও ক্ষীণ রেখায় কাজল টানতে গিয়ে চোখের ধারটা বাড়িয়েই ফেলে বেশী। কাঁধকাটা লাল জামাটার উপরে শাড়িটা এলিয়ে দিতে গিয়েও কষে জড়িয়ে ফেলে কোমরে।

এমনি করে কেটে গেল আরও ছটি মাস। কখনও ভাঙা সিঁড়ি ভেঙে নড়বড়ে দোতলার ঘরে, কখনও পিছনের উঠোনের হাসনুহানার তলায়, ঘোর সন্ধ্যায়, খিড়কি দোর খুলে, লতাজঙ্গলে আবৃত পরিত্যক্ত বাগানে।

বাড়িতে সকলের অস্বস্তি। নটীর হাটের মানুষেরা নিশ্চিন্ত। সদরে কোন সাড়াই নেই।

আমি ভাবি, তারপর? ঘুলঘুলি দিয়ে মাঝে মাঝে একটি লোককে আসতে দেখেছি ললনাদের বাড়িতে। বয়স হবে প্রায় পঁয়তাল্লিশ। ললনারা ডাকে বসন্তকাকা বলে। বাড়ি কলকাতায়, অবস্থাপন্নও বটে।

বসন্তকাকা একদৃষ্টে চেয়ে দেখেন ললনাকে। ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলেন, "নটীর হাটে আছ তাহলে ভালই।"

"যেমন দেখছেন।"

"দেখতে খুব ভাল নয় অবিশ্যি, মনে হয় অন্তরে অন্তরে ভালই।"

ললনা কোন জবাব দেয় না। মাথা নিচু করে, আঙুলে ফাঁস জড়ায় আঁচল দিয়ে। বসন্তকাকা শান্ত মানুষ, চোখ-খাবলার মত তাকিয়ে থাকেন ললনার দিকে। বলেন, "মাসখানেকের মধ্যেই বাড়িটা বোধহয় কেনা হয়ে যাবে। আলিপুরের সেই বাড়িটা।"

অবনী জিজ্ঞেস করে ললনাকে, "উনি কে?"

"বসন্তকাকা।"

"আপন কাকা?"

"না, বাবার বন্ধু।"

এ-কথা সে-কথার পর আজকাল অবনী বলে প্রায়ই, "বাড়ির লোকেরা না বিয়ে দিলে, আমরা রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করতে পারি।"

অবনীর এ-কথার উপরে ললনা শুধু এ[illegible] বিলিতী পুতুলের মত রক্তাভ ঠোঁট দু[illegible] দেয় চেপে। অবনীর অসাড় অনুভূতি[illegible] চাপা পড়ে যায় সিদ্ধান্তটা।

তারপর আমি দেখলাম আমার এই চি[illegible] কোঠার ঘুলঘুলি দিয়ে, আসল সিদ্ধান্ত[illegible] বয়ে নিয়ে এলেন বসন্তকাকা। অবনী ত[illegible] অফিসে গেছে। বসন্তকাকা একেবারে ল[illegible] নিয়েই এসেছেন কলকাতা থেকে। ললনা[illegible] মালপত্র উঠল তার মধ্যে। মালপত্র সামান্য[illegible] ললনার মা-বাবা-বোনেরাও উঠল বস[illegible] কাকার সঙ্গে।

ললনা উঠবার আগে অসঙ্কোচে [illegible] অবনীদের উঠোনে, একেবারে অবনীর ঘ[illegible] একটি খাম রাখল টেবিলে, তারপর অব[illegible] মাকে প্রণাম করে, বসন্তকাকার হাত [illegible] লরিতে গিয়ে উঠল।

নটীর হাটের একটি বিশেষত্ব, মা[illegible] যেমন আসে, তেমন ফিরে যেতে পারে [illegible] নটীর হাটের স্মৃতি নিয়ে গেল ললনা।

সন্ধ্যাবেলা যখন নটীর হাটের সদরে অ[illegible] শুনতে পেলাম অবনীর পদশব্দ, সাহস [illegible] উঁকি দিতে পারলাম না ঘুলঘুলি দি[illegible]

বাড়ি এসে ন-জ্যাঠামশায়ের উঠো[illegible] দরজাটা সপাটে খোলা দেখে অবাক [illegible] অবনী। অন্ধকার দেখে আরও অবাক।

ঘরে এসে খাম দেখে খুলে ফেলল। [illegible] ছিল, "বসন্তকাকা আমার নামে এ[illegible] বাড়ি কিনেছেন আলিপুরে। আমরা এ[illegible] থেকে সেখানেই থাকব। আমাদের পৈ[illegible] সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার জন্যে বাবাকে সা[illegible] করবেন বসন্তকাকা।......নটীর হাটের সা[illegible] বাসে এইটুকু বুঝে গেলাম, সংসারে এখনও কত ভালমানুষ আছে, কত সুখ ও সৌন্দর্য আছে। —ললনা।"

অবনী চিঠি রেখে, হাত মুখ ধুয়ে বলল, "মা, খেতে দাও।"

যেন কিছুই হয়নি, এমনি একটি ভাব করে বলল অবনী। কেবল ওর সুন্দর প্রসন্ন মুখের ভ্রূ ঠোঁট আর নাকের পাশে কয়েকটি সুগভীর রেখা দেখা দিল। আমার ঘুল-ঘুলিতে ধরা পড়ল, অবনীর চোখে মুখে ওগুলি বিদ্রূপের চিহ্ন। নিঃশব্দে, সব-কিছুকেই সে বিদ্রূপ করছে।

তারপর মাসখানেক বাদে, অফিসে ছোট-সাহেব প্রথম ওকে ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে। একটি কাগজ দেখিয়ে বললেন, "এটা কার হাতের লেখা অবনী?"

"আমার!"

ছোটসাহেবের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেলেও বোধহয় এত বিস্মিত হতেন না। লাফিয়ে উঠে বললেন "ইমপসিবল! এত কুৎসিত হাতের লেখা তোমার?"

সত্যি, হাতের লেখাটা অতি কদর্য, বকের

ঠ্যাং-এর মত। অবনী নির্বিকারভাবে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই।"

ডেস্ক খুলে ছোটসাহেব আর-একটি কাগজ বার করলেন। তাতে ছিল মুক্তো-ঝরা হস্তাক্ষর। বললেন, "এটা কার হাতের লেখা তবে?"

ও বলল, "আমারই। কিন্তু এখন আর আমি ওর চেয়ে ভাল লিখতে পারিনে।"

ছোটসাহেব হাসবেন না কাঁদবেন, বুঝতে পারলেন না। কয়েক মিনিট প্রায় রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়তীব্র চোখে তাকিয়ে বললেন, "কাগজ নাও আমি ডিক্টেক্ট করছি, তুমি লিখে যাও।"

অনায়াসে লিখে গেল, অবিকল সেই কদর্য হাতের লেখাগুলির মতই। ছোট-সাহেব আরও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আচ্ছা, তুমি যাও।"

চলে এল। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গোটা অফিস হাঁ করে তাকিয়ে রইল অবনীর দিকে।

নটীর হাটের মানুষের চোখে তখনও কিছুই ধরা পড়েনি।

কিন্তু একদিন ধরা পড়ল, চোখে-না-পড়ার ভিতর দিয়ে। অবনীর যাওয়া-আসার পথে, দোকানী আর পড়শী, সবাই ওকে একবার তাকিয়ে দেখত।

একদিন কেউ ফিরেও দেখল না, কারণ তারা চিনতেও পারেনি যে, অবনী যাচ্ছে। কেননা, নটীর হাটের কড়ি মিস্ত্রীর মত, ছোট ছোট চুলের মাঝখানে সিঁথিকাটা অবনীকে চেনাই দুষ্কর।

ওর ডেইলি-প্যাসেঞ্জার বন্ধুরা, নটীর হাটের মানুষেরা সবাই অবাক হল, হাসল, দুঃখিত হল। কেউ বলল, "এ আবার কেমন ফ্যাশান হে।" কেউ বলল, "অমন সুন্দর চুলগুলি। এ কি বিচ্ছিরি, ছি ছি ...."

অবনী হাসে। আমি দেখি, হাসির মধ্যে ওর সেই বিদ্রূপই আরও তীব্র হয়ে উঠছে। কিন্তু তার মুখটা যাচ্ছে বদলে, আর হাসিটা অবিকল নটীর হাটের তেজারতী কারবারী কের কুণ্ডুর মত ছুঁচলো আর কুৎসিত হয়ে উঠল।

এর সঙ্গে সঙ্গেই এল একটু শীর্ণতা, গামড়া মুখ আর অংক কষিয়ে বুড়ো মাষ্টারের মত নীরবতা। চোখে ছানি পড়েনি নিশ্চয়ই। কিন্তু চোখের মণি দুটিও কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠল। ধবধবে রংটা গেল কালো হয়ে। শেষে প্যান্টশার্টগুলির রং-এর ছিটই শুধু গেল না, শরীরের তুলনায় বড় লটলে হল।

ঠিক সেই দুটি হাতের লেখার মত। প্রায় চাঁদের সঙ্গে জোনাকির মত তফাত। মাসের মধ্যে ওকে দেখাতে লাগল যেন সারহীন বয়স্ক উকিলের মত।

বিশেষ কোন উপলক্ষ্যে

মনের মতো 'নিখুঁত' উপহার

কাউকে উপহার দেবার জন্য যদি এমন জিনিস চান যা সমাদর পাবে ও সুদীর্ঘকাল টিকবে তাহলে একটি ওয়েস্ট এণ্ড ঘড়ি কেনাই আপনার পক্ষে ঠিক হবে। সুইজারল্যাণ্ড-এর শিল্পকুশল সেরা কারিগরদের পাকা হাতে তৈরী প্রতিটি ওয়েস্ট এণ্ড ঘড়িই সৌষ্ঠবে, সময়রক্ষায় ও নির্ভরযোগ্যতায় অতুলনীয়। উপহার দিতে হয় তো এমন জিনিস দিন যা সারা জীবন সুন্দরভাবে চলবে—সুতরাং একটি ওয়েস্ট এণ্ড ঘড়ি দেওয়াই ঠিক।

দি মিনিয়েচার কে-২

রোল্ড গোল্ড — ১৭০, ১৮ ক্যাঃ গোল্ড — ২৫০,

WEST END WATCH CO.

BOMBAY · CALCUTTA

WEW 57-11

। দাঁড়িয়ে হেসে মরে

আমি ভাবি, এ ভয়ংকর প্রতিশোধটা নিচ্ছে কোন্ প্রকৃতি, কিসের জন্যে।

নটীর হাটের ফিস্‌ফাস্ গুঞ্জরিত হয়ে উঠল। মন্দিরে, বৈঠকখানায়, ক্লাবঘরে আর রকের সান্ধ্য আসরগুলির সব মাথা টনটন করে উঠল ব্যথায়। বাঁড়ুজ্যেদের সেজ শরিকের ঘরের ভিতরে ঘটছেটা কী? হিং-টিং-ছট-এর মত মানে উদ্ধারে ঘোল খেতে লাগল সবাই।

ছোট ছোট ছেলেপিলেরা অবনীর পিছনে লাগল একটু-একটু করে। পথে পড়ে ফণীন্দ্র ঘটকের বাড়ি। তার রূপসী সাত মেয়ে রাস্তার ধারে জানালায় দাঁড়িয়ে হেসে মরে।

এসব শুধু উপরে-উপরে। ভিতরে ভিতরেও অবনীর নতুন পরিবর্তন দেখা গেল। অফিসের লেখায় ভুল বেরিয়ে পড়ে রোজই। সেখানে ওকে করুণা করল সাহেব।

বাড়িতে ত কান্নাকাটির দাখিল। বাবা মরতে লাগলেন গুমরে গুমরে। মা চেয়ে থাকেন জলভরা চোখে। ভাইবোনেরা ভীত, বিস্মিত।

ছ মাস বাদে মাইনে পেয়ে অবনী বাড়িতে টাকা কমিয়ে দিল অর্ধেক।

মা বললেন, "এ কী, এত কম?"

ও বলল মোটা বড়গড়ে গলায়, "এর চেয়ে বেশী দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার একটা ভবিষ্যৎ দেখতে হবে ত।"

মায়ের প্রাণটা ধক্ করে উঠল। ও মা! বলে কী। বললেন, "কী বলছিস তুই অবন?"

অবনী হাসল, "ঠিকই বলছি। আর তা ছাড়া খাওয়ার অত বাছাবাছি কিসের? শুধু ডাল-ভাত করতে পার না?"

মায়ের মনে হল, তিনি জ্ঞান হারাবেন, পড়ে যাবেন ধুলোয়। এটা কে? বাড়ির কারুর খাওয়াপরার দুঃখ যে সহ্য করতে পারে না, সেই ছেলে এই?

তারপর দেখা গেল, অবনীকে ভাত দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারেন না। মুখে নয়, অন্তরে বললেন, শুধু ভাতগুলি অমন রাক্ষসের মত খায় কী করে ছেলেটা। মনে মনে বলতে হল মাকে, কী বিশ্রী খাওয়া!

এখন সরষের তেল মাখে মাথায় থাবলা থাবলা, ঘসর ঘসর দাঁত মাজে ছাই দিয়ে।

একদিন ঠাকুরদালানের উঠোনে এক তাল গোবর দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল অবনী। গোবর এরকম বহুদিন চোখে পড়েছে, কিন্তু ফিরেও দেখেনি। হঠাৎ ছোট বোনকে ডাকল কেমন একটা গোঁয়ারের মত করে। বলল, "খেতে পারিস, আর গোবরটুকু কুড়িয়ে দেয়ালে চাপটি মেরে রাখতে পারিসনে। রোজ রোজ অত ঘুঁটের পয়সা আসে কোত্থেকে।"

বিষয়টা সামান্য, কিন্তু কত যে অসামান্য [illegible]টি ভেবে, আড়ালে বসে আঁচলে মুখ চেপে কেঁদে উঠলেন ওর মা।

অনেকদিন পর সাহস সঞ্চয় করে একদিন মা বলে ফেললেন, "অবন, ললনাকে তুই বিয়ে করে আন।"

মায়ের দিকে তাকিয়ে ওর এখনকার স্বভাব-কুৎসিত হাসি উঠল ফুটে। বলল, "দোকানের পুতুল নাকি সে?"

আরও কয়েক মাস বাদে দেখা গেল, অবনীর ডান কাঁধটা যাচ্ছে উঁচিয়ে। একটু একটু করে বেশ খানিকটা উঁচু হয়ে শরীরটা গেল বেঁকে। তারপরে বাঁ পা খোঁড়াতে লাগল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোমর বেঁকে হাঁটু ভেঙে কেমন একটা বিশ্রী হ্যাঁচকা দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল ও।

আমি আমার ঘুলঘুলি থেকে দেখলাম, অবনীর চলার ভঙ্গিতেও একটা ভয়ংকর বিদ্রূপ ফেটে পড়ছে। ঠিক একটা ক্ষুব্ধ ক্ষিপ্ত মানুষ একজনকে ভেংচালে যেমন হয়, সেইরকম।

রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে রোজ দেখল ওকে নটীর হাটের মানুষেরা। আর সে সবাইকে যেন ভেংচাতে লাগল এই কদর্য ভঙ্গিতে। চলার তালে তালে ওর বুকের থেকে একটি শব্দ এসে বাজল আমার কানে, "এই এই ত দ্যাখ চেয়ে, এই আমি।"

ঘরে বাইরে সবাইকে জানিয়ে দিল, "আপনি আপনি ওর হাত পা এমনি বেঁকে যাচ্ছে নার্ভগুলি যাচ্ছে মরে হাত আর পা যাচ্ছে শুকিয়ে।"

ঘরে বলল, বাইরের ডাক্তার দেখছে। বাইরে বলল, দেখছে ঘরের ডাক্তার।

আর মধ্যরাত্রে আয়নার সামনে ঠিক সেই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তেমনি কুৎসিত হেসে বলল, "চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত অনেক ভান করেছি। আসল রূপটা ফুটেছে আমার এতদিনে।"

আমি আমার চিলেকোঠাখানিতে বসে

ভাবছিলাম, মানুষের মনের চিলেকোঠায় কতগুলি ঘুলঘুলি আছে।

কিন্তু সামনের রাস্তায় অনেক লোক ওর পিছনে লাগল। অকারণ ডেকে ডেকে নানান কথা জিজ্ঞাসাবাদ করে। কেউ ঠাট্টা করে, করুণা করে কেউ। ছোঁয়াচে রোগের ভয়ও আছে অনেকের।

ওদের বাড়ি থেকে পশ্চিমে, হোমিও-প্যাথি ডাক্তার গোকুল মিত্তিরের বাড়ির কাছে এসে, দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরে যেতে লাগল রোজ। আগে যেত গোকুল ডাক্তারের বাড়ির উত্তর দিক দিয়ে।

এতদিন আমার ঘুলঘুলি থেকে যেটা দেখেও দেখিনি, তা হল দুটি চোখ। লক্ষ্য করে দেখলাম, অবনীর যাওয়া-আসার সময়টিতেই ঠিক নির্বাক নিশ্চল প[illegible]র মত সেই চোখ দুটি গোকুল [illegible]ক্তারের জানালায় তাকিয়ে থাকে অপলক। সেই চোখে যত মুগ্ধতা, তত বিস্ময়, তত করুণা।

চোখ দুটি গোকুল ডাক্তারের মেয়ে পারুলের। মনে পড়ল, পারুলের চোখদুটি এমনি পটে আঁকা ছবিটির মত তিন বছর ধরে তাকিয়ে আছে। কারও চোখে পড়ে না।

পারুলের রূপ বলতে কিছু নেই। কালো রং, সাদাসিধে মুখ। আটপৌরে শাড়িতে কুড়ি বছরের একটি নির্জন নদীর জোয়ার আপন উল্লাসে টলোমলো। অতি সাধারণ চোখ দুটিতে অতল গভীরতা। চুলগুলি বাঁধে রোজ আঁট খোঁপা করে। পারুলকে চোখে পড়তে চায় না।

আমার মত অবনীটাও কানা ছিল এত-দিন। এতদিন ও উত্তরে বেঁকেছে। এখন দক্ষিণে বেঁকতে গিয়ে সহসা একদিন চোখ পড়ে গেল পারুলের চোখে।

পারুলের মুগ্ধ বিস্মিত করুণ চোখ দুটিতে কী ছিল, কে জানে। অবনীর উঁচিয়ে ওঠা কাঁধটা হঠাৎ একটু নেমে গেল যেন।

তেমনি লেংচে লেংচে খানিকটা এগিয়ে আবার ওর কাঁধটা উঁচু হল।

পরদিন মনে ছিল না। কিন্তু চোখা-চোখি হতেই, অবনীর কাঁধ আর বাঁ পাটা সহসা যেন নাড়া খেয়ে সোজা হয়ে উঠল।

আমিও নাড়া খেয়ে গেলাম আমার এই অদৃশ্য চিলেকোঠার মধ্যে। এ যেন কেমন শক-ট্রিটমেণ্ট শুরু হয়ে গেল অবনীর।

কিন্তু পরমুহূর্তেই ও আবার লেংচে বেঁকে চলল উত্তরে।

অথচ পরদিনই আবার তেমনি নাড়া খেয়ে সোজা হয়ে ওঠার লক্ষণ দেখা গেল অবনীর। মুখে বিদ্যুৎ-চকিতে দেখা দিয়ে গেল সেই কোমল মিষ্টি ভাবখানি। কিন্তু সবটুকুই বিদ্যুৎ-চমকের মতই। রোজই প্রায় চলল এরকম।

আর আমি দেখলাম পারুলের মুগ্ধ চোখদুটিতে এক বিচিত্র আবেগের সঞ্চার। জানালায় আসার সময়টা গেল ওর আরও বেড়ে। যেন এই নটীর হাটের মত নটীর হাটের আকাশের মত চিরদিন সে জানালায় বসে থাকতে চায়, থাকবে।

আমি দেখলাম পরম কৌতূহলে, অবনীর কাঁধটা কেমন সমান হয়ে আসছে, পাটা খুব ধীরে ধীরে, একটু একটু করে সোজা হয়ে উঠছে। তারপরে কেশে-বেশেও যেন একটি অস্পষ্ট পরিবর্তন দেখা দিল। হাসিটা ফিরে পেতে লাগল আগের মাধুর্য।

তারপর একদিন ফেরার পথে, সন্ধ্যাবেলা অবনী দাঁড়িয়ে পড়ল পারুলের জানালাটার কাছে। একবার পারুলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটু সলজ্জভাবেই মাথা নত করল সে। ওর সেই পুরনো কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞেস করল, "গোকুলকাকা ভাল আছেন?"

পারুলের মনে হল, ওর নির্জন নদীটা হঠাৎ-বানে এক্ষুনি প্লাবিত হয়ে যাবে। কোনোরকমে বলল, "হ্যাঁ।"

চলে গেল অবনী।

পরদিন আবার দাঁড়াল। বলল, "গঙ্গার ধারে শিবের ঘাটে আসবে?"

পারুলের বুকের মধ্যে কাঁপছিল থরথর করে। বলল, "যাব। আপনি যান।"

প্রায় আগেরই মত হেঁটে অবনী নির্জন শিবের ঘাটে এল। সন্ধ্যা তখনও উৎরোয়নি। নটীর হাটের পশ্চিমাকাশে লাল রং লেগে আছে তখনও।

অবনী ভাবতে চেষ্টা করল এটা কোন ঋতু, কী মাস। বাতাসে ঈষৎ শীতের আভাস আছে। পারুল এল। দাঁড়াল একটু দূরে। নির্জন নদীটি সঙ্গমের বাঁকে এসে থমকে গেছে যেন।

অবনী বলল "এস।"

পারুল কাছে এল। এসে, তাকিয়ে আবার চোখ নামাল। দুজনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ।

অবনী বলল, "এমন করে রোজ কী দেখ পারুল।"

বলতে গিয়েও পারুল প্রথমে জবাব দিতে পারল না। কয়েকবার জিজ্ঞাসার পর বলল, "বুঝতে পারেন না?"

পারুলের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল অবনী। তারপরে বলল "পারি, কিন্তু কেন?"

পারুল তাকাল ওর সেই মুগ্ধ চোখ তুলে।

আবার দুজনেই চুপচাপ।

খানিকক্ষণ পর পারুল বলল, "আপনার অসুখ একেবারে সেরে গেছে?"

সেইটাই ভয় করছিল আজ অবনীর। সত্যি, সেরেছে ত? ওর রোগ, পঙ্গুতা, ভীরুতা, নীচতা। গলার কাছে বড় শক্ত লাগছিল কিছু। পারুলের হাত ধরে, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে বলল, "হ্যাঁ, তাই ত, সেরেই উঠেছি।"

চোখ ফিরিয়ে নিলাম ঘুলঘুলি থেকে। অবাক হয়ে ভাবলাম, ঘরের কোণে পড়ে থাকা ওষুধ-লতার এমনি গুণ নাকি! শুধু দুটি চোখের তারায় অসুখও সেরে যায় এই মানুষের সংসারে।

নটীর হাটের মাথাব্যথা আবার একবার নতুন করে উঠল কয়েকদিন। কেউ বলল, "ভূতে ধরেছিল।" কেউ বলল, "না, এরকম একটা রোগ সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। সেবারে আমার দিদির..."

"মুণ্ডু! খোঁজ নিয়ে দেখ, নির্ঘাত কোন তালে ছিল। ফেরেব্বাজ নয়ন সাধুখাঁ জালিয়াতির দায়ে একবার বোবা আর কালা হয়ে গেছল, মনে আছে?"

বাস্ পুরুতের গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে বললে গদাই, "ওসব শালা কিছু নয়, সেরেফ ভি ডি বাবা। গদাশালার চোখ ফাঁকি দিতে পারবে না, ওসব শালা অনেক, শালা..."

তা বটে। গদা একসময়ে হামা দিয়েও চলেছে। এর উপরে আর কথা নেই।
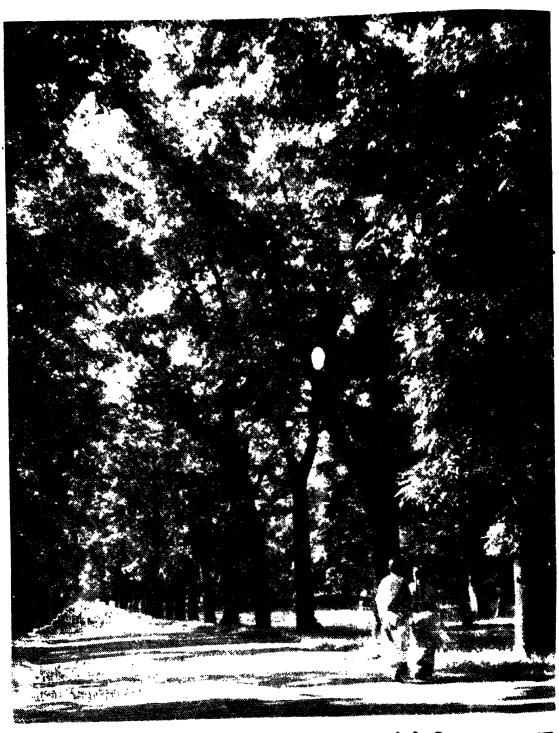
আলোকচিত্রী শ্রীনেপাল মুখোপাধ্যায়

বনবীথি

সংস্কারক

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

লেকের ধারে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম আমরা। আ[illegible] আর আমার সদ্যোলব্ধ বন্ধু সুধা-বি[illegible]। আমার এই বর্ষীয়ান বন্ধুটি চক্রাকারে ভ্রমণ ভালবাসেন না। লেকের চারপাশে যেখানে নানা বয়সী বায়ুসেবীরা পাক খায়, তাদের অনুগমন করা তাঁর রুচি-বিরুদ্ধ। ফাঁকা জায়গায় সোজাসুজি হাঁটতে তাঁর ভাল লাগে। তিনি বলেন, "আপনারা গল্প-লেখক, তাই গোলাকার পথই আপনাদের পছন্দ। কিন্তু আমার পথ সোজা। সামনে যতদূর চোখ যায়, ততদূর আমার হাঁটতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এই কলকাতা শহরে সেই ইচ্ছা পূরণের কি জো আছে? এখানে পদে পদে বাধা। চোখের বাধা, পায়ের বাধা, মনের বাধা। শুধু শহরই বা বলি কেন, সারা দেশটাই ত এমনি।"

খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে একটু জন-বিরল জায়গা বেছে নিয়ে আমরা দুজনে ঘাসের উপর মুখোমুখি বসলাম। চারদিকের বাড়িগুলিতে তখন আলো জ্বলে উঠেছে। দূর থেকে এই ধরনের আধো আলো আধো ছায়ায় ভরা ঘরগুলি দেখতে আমার বড় অদ্ভুত লাগে। সন্ধ্যার আলোয় মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা যেন এক রহস্যের ছোঁয়া পায়। মনে মনে ভাবি, এই জীবন-রহস্যের কতটুকুই বা এ-জন্মে জেনে আর জানিয়ে যেতে পারব।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম বোধহয়। হঠাৎ আমার বন্ধুর কথায় চমক ভাঙল, "ও দিকে কী দেখছেন, ওপরের দিকে তাকান। আকাশ দেখুন, নক্ষত্রলোক দেখুন। আমি এখানে আসি তাই দেখবার জন্যে। দিনের বেলায় নানা কাজের চাপে সংসার চিন্তার জ্বালায় এত বড় আকাশকে দেখেও দেখিনে মশাই। দেখব কি, রাস্তার ভিড়ে নিজের কাছা-কোঁচা সামলাতেই অস্থির। তা ছাড়া গাড়ি চাপা পড়বার ভয় নেই? বয়স অবশ্য ষাটের কাছাকাছি হল। কিন্তু তাই বলে আমি অমন অপঘাত-মৃত্যু চাইনে। বরং আরও বছর বাটেক বাঁচতে পারলে আমি খুশী হই। এখনও অনেক কাজ বাকী।"

আমি হেসে বললাম, "বলেন কী। আপনার কথাবার্তার ধরনে এ-পৃথিবী ত বাসযোগ্য বলে মনে হয় না।"

সুধাবিন্দুবাবু আমার সূক্ষ্ম খোঁচায় উত্তেজিতভাবে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর একটু চড়া গলায় বললেন, "বাসযোগ্য ত নয়ই। অনাচার, ব্যভিচার, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থ-পরতায় দেশ ভরে গেছে। কিন্তু সমস্ত আগাছার জঙ্গল উপড়ে ফেলে বাস্তু বানাতে হবে, ঘর তুলতে হবে। আর সেইজন্যেই বাঁচা দরকার। আমারও, আপনারও। এ ছাড়া বেঁচে থাকবার আর কোন সার্থকতা নেই। আবার যদি ইচ্ছা কর, আবার আসি ফিরে। কিন্তু হাজার ইচ্ছা করলেও, আমাদের স্ত্রী-পুত্র হাজার কাকুতি-মিনতি করলেও মরবার পর আর ফিরে আসা হবে না। যা করবার এই জীবনেই করে যেতে হবে। প্রতিটি মুহূর্তকে মনে করতে হবে লক্ষ বর্ষের সমান। আমার কথাগুলি ভেবে দেখেছেন?"

আমি বললাম, "হুঁ।"

তিনি আমার সংক্ষিপ্ত জবাবে কেন যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন, বললেন, "ছাই দেখেছেন। দেশের কথা, সমাজের কথা কিছু ভেবে দেখেন না আপনারা। আপনারা এই লেখকরা যদি নিজেদের দায়িত্ব পালন করতেন তাহলে সমাজের চেহারা অন্য রকম হত। আকাশের কথা বলছিলাম। মাথার উপর যে আকাশ আছে, আর পায়ের তলায় এই বিপুলা পৃথিবী, এ-কথা সাধারণ মানুষের মনে থাকে না। মনে করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের। আপনারা যাঁরা শিল্পী, তাঁরাই ত মানুষকে উদারতার দিকে টানবেন, ছোট মানুষকে বড় করবেন, বৃহত্তর মহত্তর জীবনের সন্ধান দেবেন। কিন্তু সব ভুলে গিয়ে আপনারা তুলে নিয়েছেন শুধু সেক্স। আপনাদের কথা-সাহিত্যে ও ছাড়া আর কোন কথা নেই। স্বকীয়া, পরকীয়া, আজকাল আবার আরও বিকৃতি এসেছে। আরে মশাই, নারী-পুরুষের এই আকর্ষণ-বিকর্ষণ ত হাজার হাজার বছর ধরে একই ধারায় চলেছে। মানুষের সভ্যতায় ও সম্পর্কের এমন কী মৌলিক অদল-বদল হয়েছে যা নিয়ে আপনি নতুন কিছু লিখতে সাহস পান?"

আমি নিরুত্তরে আমার উদ্দীপ্ত বিক্ষুব্ধ বন্ধুকে দেখতে লাগলাম। ছিপছিপে, দীর্ঘ চেহারা। বয়সের ভার দেহের উপর জমেনি। বরং নাক ঠোঁট চিবুকের গড়ন এখনও বেশ ধারালো। আর কথা ত নয়, বাঁকা তলোয়ার। খাপে ঢাকা নয়, খাপ খোলা। সুধাবিন্দুবাবু আধুনিক সমাজ-সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতির কঠিন সমালোচক। বৃত্তিতে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হলেও নিজের বিদ্যাকে শুধু ছাত্রদের বুদ্ধিগ্রাহ্য করেই খুশী থাকেননি, নিজের বিষয় ছাড়াও সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাসে পড়াশুনোর অভ্যাস এবং আগ্রহ বজায় রেখেছেন।

তাঁর কথার জবাবে আমি বললাম, "দেখুন, প্রেম নিয়ে নতুন কিছু লেখা যাবে না জেনেও অনেকে তা লিখবে, আরও অনেকে তা পড়বে। আসলে কোন বিষয়েরই নতুনত্ব সেই বিষয়ের মধ্যে নেই, আছে সেই বিষয় পরিবেশন আর ভোগের মধ্যে। আর একটা কথা। ব্যাপারটা যার যার প্রবৃত্তি আর প্রবণতার উপর নির্ভর করে। যে-লেখক ও ছাড়া লিখতে পারেন না তাঁকে ওই লেখাই লিখতে দিন। আর যাঁরা ও বিষয় নিয়ে লিখতে-পড়তে লজ্জা পান, তাঁরা না-ই বা লিখলেন, না-ই বা পড়লেন। তাঁদের জন্যে আরও হাজার পদার্থ আছে।"

সুধাবিন্দুবাবু এবার আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে তাঁর চোখে আর ঠোঁটে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "এবার আপনাকে চটাতে পেরেছি। কিন্তু আপনার কথাটা মানতে পারছিনে। শুধু নিজের প্রবৃত্তি আর প্রবণতার দোহাই দিয়ে আপনি আপনার দায়িত্ব

এড়াতে পারেন না। নিজের ভাল লাগাটাই যে পৃথিবীর পক্ষে সবচেয়ে ভাল এমন নির্ভাবনা শুধু শিশুদের থাকে। তারা নিজেদের খেলা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। আপনি কি বলতে চান, শিল্পীরা কোনদিন শৈশবের স্তর পার হন না?"

আমি বললাম, "আপনি শিশুই বলুন আর ভ্রূণই বলুন, রূপ-সৃষ্টির সঙ্গে খেলার খানিকটা মিল আছে। সে-খেলা হেলাফেলার জিনিস নয়। সে-খেলা জীবনকে রস দেয়, আনন্দ দেয়।"

সুধাবিন্দুবাবু হেসে উঠলেন, "আর আপনাকে পায় কে। রূপ আর রসের দোহাই যদি একবার দিতে পারলেন তাহলে সাত খুন মাপ! একটু আগে আপনি ভোগের কথা বলছিলেন। এখন আবার বলছেন খেলা। লীলা কি খেলা যে-নামই দিন, আপনাদের লক্ষ্য ওই ভোগ। সাহিত্য শিল্প আপনাদের শুধু সম্ভোগের উপচার জোগায়, তার চেয়ে বেশী কিছু দেয় না। কিন্তু আমি সাহিত্যকে সে-চোখে দেখিনে। আমি ভাবি সাহিত্য হবে মন্ত্রের মত। ওঝার মন্ত্র নয়, কানে ফুঁ দেওয়া গুরুর মন্ত্র নয়, জীবনের বেদমন্ত্র। আমি ধর্মের জায়গায় নীতির জায়গায় শিল্পকে বসাতে চাই। কিন্তু আপনি নিজেই বলছেন আপনাদের সারা জীবনের কাজ খেলা ছাড়া কিছু নয়।"

আমি চুপ করে রইলাম। কারণ তর্ক করে লাভ নেই। সুধাবিন্দুবাবু নিজের কথার জের টেনে বললেন, "এই গরমের দেশটা এমনিতেই বড় বেশী মাত্রায় এরোটিক। ছেলেই বলুন, মেয়েই বলুন, তারা হাফপ্যাণ্ট আর ফ্রক ছাড়তে না ছাড়তে সেক্স-কনশাস হয়ে ওঠে। মনসাকে ধোঁয়ার গন্ধ দিয়ে লাভ কী। যে-আগুন এমনিতেই জ্বলছে, তাকে ফের হাওয়া দিচ্ছেন কেন? সব যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আমার চোখের ওপর একটা জীবন সেই ছাই-ই হয়ে গেল। আমি কিছুতেই তাকে রক্ষা করতে পারলাম না।"

দীর্ঘশ্বাস চেপে সুধাবিন্দুবাবু চুপ করে রইলেন। আমি খুব সন্তর্পণে প্রশ্নটি এগিয়ে দিলাম, "কার কথা বলছেন?"

সুধাবিন্দুবাবু বলতে লাগলেন :

"আমার ভাগ্নে সরোজের কথা। ওই বাপ-মা-মরা ছেলেকে সাত বছর বয়স থেকে আমি মানুষ করেছি। ওর ভরণপোষণের ভার যখন নিলাম, আমার নিজের ঘাড় তখনও শক্ত হয়নি। বিধবা মা, ছোট ভাই, স্ত্রী আর দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি নিজেই তখন সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি। মফস্বল কলেজের মাষ্টারি। রোজগার সামান্য। কিন্তু মধ্যবিত্তের সংসারে ব্যয় আয়ের পিছনে-পিছনে হাঁটে না, আগে আগে ছোটে। সরোজের জ্যেঠা আর কাকাও ছিলেন। অবশ্য আলাদা অন্নে। আমার বোনের ইচ্ছে ছিল না ছেলে তাঁদের কাছে থাকে। কারণ তাঁদের সংসারে পড়াশুনোর আদর নেই। টাকার জোরে মেয়েদের ভাল ঘরে বিয়ে দেওয়া, আর অন্নপ্রাশনের পর থেকেই ছেলেদের ব্যবসা-বাণিজ্যে পাকা করে তোলা তাঁদের বংশের মূলমন্ত্র। কিন্তু আমার বোন লেখাপড়া ভালবাসত। মরবার আগে ছেলেকে সে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, 'দাদা, ও যেন মানুষ হয়, ও যেন তোমার মত হয়।'

"বয়স ষাট হতে চলল, মানুষ হতে পেরেছি এ-অহংকার অবশ্য আর করিনে। কিন্তু মানুষের মত মানুষ যে কাকে বলে, সে-আদর্শ আমার মনে ছেলেবেলা থেকেই আছে। আর এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত তার বড় একটা নড়চড় হয়নি। ভাবলাম, নিজের অপূর্ণতা ছেলেমেয়েদের ভিতর দিয়ে মেটাব। জন্ম-জন্মান্তর মানিনে। কিন্তু পুরুষানুক্রম মানি।

"পূর্ণতার সাধনা একপুরুষের নয়। সরোজ আমার ছেলের চেয়ে দু বছরের ছোট আর মেয়ের প্রায় সমবয়সী, মানে মাস-কয়েকের বড়। স্ত্রীকে বললাম, 'আর না। এই তিনটিকে যদি মানুষ করে তুলতে পার, মনে করবে তেত্রিশ জন্মের তপস্যা সার্থক হয়েছে।'

"নিজের ছেলেমেয়েদের চেয়ে সরোজকে আলাদা করে দেখবার কোন কথাই ওঠে না। আমার আপন বোনের ছেলে। আমার স্ত্রী ওকে নিজের ছেলের মতই কাছে টেনে নিল। সরোজ আমার ছেলেমেয়ের সঙ্গে থাকে, একই ঘরে শোয়; শুধু একই দামের নয়, একই রঙের জামাজুতো পরে। আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমার স্ত্রীকে ও মা বলে ডাকে। হাজার শিখিয়ে দিলেও মামীমা বলে না। আমাকে মামা বলে ডাকতে হয় বলে ও প্রায়ই সম্বোধনটা এড়িয়ে যায়। কিন্তু ওর মিষ্টি-মিষ্টি হাসি, চোখের সলজ্জ চাউনি দেখে আমার বুঝতে কিছু বাকি থাকে না। ডেকে ডেকে ওর সাড়া মেলে না, আবার না ডাকতে কখন যে এসে গা ঘেঁষে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে আমি টেরও পাইনে। আমার স্ত্রী বলে, 'দেখতে সুন্দর বলে তুমি সরোজকেই বেশী ভালবাস।'

"শুনে আমি হাসি। মাঝে মাঝে স্ত্রীকে ডেকে উপদেশ দিই, 'খবরদার, হিংসা-দ্বেষের ভাবটা যেন ওদের মনে কক্ষনো এন না। আমাদের কাছে সবাই সমান।'

"সরোজ আমার গায়ের রং আর গড়নের অনেকটা পেয়েছে। নরাণাং মাতুলক্রমঃ। আমি ভেবেছিলাম শুধু আকৃতি নয়, প্রকৃতিও সরোজের আমার মতই হবে।

"ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়াটা যাতে ওরা শেখে সে-দিকে আমি লক্ষ্য রেখেছি। তার উদ্দেশ্য যে গাড়িঘোড়া চড়া নয়, জীবনেরই এক স্তর থেকে আর এক স্তরে আরোহণ করা, সে-কথা ওদের মনে বদ্ধমূল করবার চেষ্টা করেছি। শুনেছি আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি জাত-কবি আছেন, কেউ বা জাত-প্রেমিক। কিন্তু যৌবনকাল থেকেই আমি জাত-মাস্টার। আমি যে শুধু পড়িয়ে খাই তা নয়, আমি পড়াতে ভালবাসি। ছেলেরা যাতে মনের খাদ্য পায়, আমি সাধ্যমত তার জন্যে চেষ্টা করি। কিন্তু করলে কী হবে, সুখাদ্যে ইদানীং ছেলেমেয়েদের রুচি কম। আর এই রুচিবিকার ঘটাবার মূলে আমি আপনাদের দায়ী করি। আমরা বলি, [illegible]থ; আপনারা বলেন, এই ভুবনলীলা দেখে [illegible]। তারা তা-ই করে। কোন জিনিস গভীরভাবে ভাবতে চায় না, চিন্তা [illegible] চায় না। কেবল আর্ট, আর্ট আর আর্ট। হালকা সিনেমা, হালকা সাহিত্য আর পলকা পলিটিক্স। এর নাম আর্ট নয়, এর নাম ফ্লার্টিং। গভীর একনিষ্ঠ প্রেমের সঙ্গে তার তফাত আকাশ পাতাল। আর্ট আর পলিটিক্সের দোহাই দিয়ে এরা [illegible] জীবনগঠনকে বাদ দেয়, চরিত্রগঠনকে এরা উপেক্ষা করে। এর জন্যে আপনারা কম দায়ী ভাববেন না। কারণ আপনারাই ত এখন আদর্শ, যাদের নিজেদের জীবনে কোন আদর্শ নেই। তবু এখন আপনাদেরই যুগ, আপনাদেরই রাজত্ব। সিনেমাশিল্পী আর কথাশিল্পীদের নিয়ে ছেলেমেয়েরা যে মাতামাতি করে, সমাজের শিক্ষকরা তার সিকির সিকিও পান না। ভাববেন না আপনাদের আমি হিংসে করছি। সভাসমিতিতে আপনারা মানপত্র পান, ফুলের মালা পান, খুবই ভাল কথা। কিন্তু ভেবে দেখবেন, মালার বদলে কী দিচ্ছেন। যদি ফাঁকি দিয়ে থাকেন, সে-মালা শুকোতে বেশী দেরি লাগবে না। আমি বলি, আপনাদের হাতে আছে অমোঘ অস্ত্র। আমি দেখতে চাই, সে-অস্ত্র আপনারা ঠিকমত ব্যবহার করছেন। আপনারা যদি সত্যিই তরোয়াল দিয়ে দাড়ি চাঁছতে শুরু করেন, তাহলে দেখে দুঃখ হয়, রাগ হয়। নিরুপায় হয়ে নিজের হাতের আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে করে।

"ছেলেমেয়েদের আমি একটু কঠিন আদর্শেই মানুষ করেছি। অল্প বয়সে সস্তা সিনেমা-সাহিত্যের দিকে তাদের ঘেঁষতে দিইনি। সকালসন্ধ্যা নিজে কাছে বসে পড়িয়েছি। পাঠ্য বই ছাড়া যে-সব বই তারা পড়ে সেগুলি যাতে একেবারে অপাঠ্য না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেছি। ভক্তিবাদ থেকে যুক্তিবাদে তাদের মনকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছি, যেমন আমি কলেজেও করি। আমি জানি আমার হাতে কলম নেই, পায়ের

নীচে জনসভার প্লাটফর্ম নেই, আমি কোন ধর্মসংঘ কি রাজনৈতিক সংঘের সভ্য নই, আমি একজন সাধারণ মাস্টার, আমার কর্মক্ষেত্র ছাত্রদের মধ্যে। আর একটি পরিবারের পালক হিসেবে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের মধ্যে। 'দারাপুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার' এমন ঔদাস্যের ভান আমি করিনে। যতদিন বে'চে আছি, ওরা আমার সব। আমার ছেলেমেয়েরা জানে, আমি আমার স্ত্রীকে গভীরভাবে ভালবাসি। পরিবারের কর্ত্রী হিসেবে তাঁকে যথেষ্ট মূল্য আর মর্যাদা দিই। নইলে তারা কেন দেবে? আমার আত্মীয়-স্বজন আর পাড়াপড়শীরা জানে, আমি আমার ছেলেমেয়েদের প্রাণের চেয়ে ভালবাসি। তাদের জন্যে আপ্রাণ পরিশ্রম করি। কিন্তু সেই পরিশ্রমের ফল শুধু অশনবসনে ব্যয় করিনে। আমি তাদের শেখাই, তোমাদের বেশীদূর যেতে হবে না, তোমরা তোমাদের পরিবারকে ভালবাস, প্রতিবেশীদের ভালবাস। কিন্তু সে-ভালবাসা যেন খাঁটি হয়, তা যেন শুধু কথার কথা না হয়, তা যেন সত্যিই কল্যাণকর হয়। আমাদের দাবি মানতে হবে, আজকের দিনে জোট বে'ধে মাঝে মাঝে এ-রব না তুলে উপায় নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের কাছে নিজের যে দাবি, তা কি শিকেয় তোলা থাকবে? আমি আমার ছাত্রদের বলি, ভাল কর, ভালবাস, ভাল হও। আর এগুলিকে শুধু কয়েকটা ভাল কথা বলে মুখস্ত করে রেখ না। মুখের কথাকে মনের কথা, মনের কথাকে কাজের কথা করে তোল।

"যাকগে। যা বলছিলাম। মা মারা গেলেন, ভাই বিয়ে থা করে পাহবলপুরে জি এস ফ্যাক্টরিতে চাকরি পেয়ে চলে গেল। পৈতৃক বাড়িতে রইলাম শুধু আমি। কলেজে ছেলেদের পড়াই, বাড়িতে যতটুকু সময় পাই ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসি। আমার স্ত্রী মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলেন, 'তোমার কি ক্লান্তি নেই। রাতদিন বকবক করছ ত করছই।'

"আমি হেসে বলি, বুঝেছি পারছি তোমার ক্লান্তি এসেছে। এক কাজ কর। তুমিও আমার ছাত্রছাত্রীর দলে ভর্তি হয়ে পড়। দু-একটা পরীক্ষা-টরিক্ষার জন্যে তৈরী হও, দেখবে সময়টা মন্দ কাটবে না।'

"সে বলে, 'রক্ষে কর। যে-পরীক্ষা দিচ্ছি, তা-ই ঢের। আমার আর নতুন পরীক্ষায় কাজ নেই।'

"তখন আমার অবস্থা সচ্ছল ছিল না। টানাটানির মধ্যেই দিন কাটত। ওরই মধ্যে দু-চার টাকা লুকিয়ে ছাপিয়ে দুঃস্থ বন্ধু কি আত্মীয়স্বজনকে পাঠাতাম। বই কেনার বাতিকও ছিল। তার ফলে অভাব-অনটনের ঝামেলাটা আমার স্ত্রীর উপর দিয়েই বেশী যেত। সবই যে সে হাসিমুখে সহ্য করত এ-কথা বললে আপনি মুখে হয়ত কিছুই বলবেন না কিন্তু মনে মনে নিশ্চয়ই মন্তব্য করবেন, ভদ্রলোক কী স্ত্রৈণ।

"মতবিরোধ মন-কষাকষি আমাদেরও আর পাঁচজনের মত হয়েছে। কিন্তু গুরুতর রকমের প্রলয়কাণ্ড কিছু ঘটেনি, যা নিয়ে আপনি মুখরোচক গল্প লিখতে পারেন।

"কিন্তু সমস্যা হল সরোজকে নিয়ে। আমি আমার ছেলেমেয়েদের মত করে একই ধাঁচে একই ধরনে ওকে মানুষ করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু করলে কী হবে, গোড়া থেকেই ও যেন একটু অন্য ধারা নিল। আমি ভাবলাম এ কি হেরিডিটি? বংশের ধারা? কিন্তু আমি হেরিডিটির হাতে ষোল আনা আত্মসমর্পণ করতে রাজী নই। আমি ওকে নিজের হাতে নিলাম। পড়াবার ধরন বারবার পালটালাম। খেলার ভিতর দিয়ে শেখাতে চেষ্টা করলাম। তবু ছেলেটা ঠিক আমার পছন্দমত এগোতে পারল না। ক্লাসের পরীক্ষায় অবশ্য পাশ করে করে যেতে লাগল। কিন্তু সেইটাই ত সব নয়।

আমার কর্মক্ষেত্র ছাত্রদের মধ্যে

"সরোজের মামী বললেন, 'তুমি ও নিয়ে বেশী ব্যস্ত হয়ো না। সকলের মাথা কি সমান? হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান হয়?'

"আমি চটে উঠে বললাম, 'দেখ, ওই ধরনের বেয়াড়া তুলনা তুমি আমার সামনে দিতে এস না। হাতের পাঁচটা আঙুল সমান নয়, তা নিয়ে আমরা কেউ মাথা ঘামাইনে, হায়-আফসোসও করিনে, কিন্তু বাড়ির পাঁচটি ছেলেমেয়ের প্রত্যেকটিকে বিদ্বান বুদ্ধিমান দেখতে চাই।'

"আমি সরোজের দিকে আরও মনোযোগ দিলাম। ইংরেজী আর অংককে যতদূর সহজ সরল আর সরস করা যায়, আমি তার চেষ্টার ত্রুটি করলাম না। কিন্তু আমি মন দিলে কী হবে, সরোজের যেন তেমন মন নেই। ওর যে মাথা কম তা নয়, কিন্তু মনটাই যেন কেমন অন্যমনস্ক। থেকে-থেকে ও হাঁ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি ধমক

দিয়ে বলি, 'কী রে? তুই কি কবি হবি, না দার্শনিক হবি?'

"সরোজ চমকে ওঠে। আমার কথাটা ঠিক যেন বুঝতে পারে না। বোকার মত ভয়ে ভয়ে একটু বা লজ্জিত হয়ে জবাব দেয়, 'না মামা।'

"আমি বলি, 'কবি হলেও আজকাল লেখা-পড়া শিখতে হয়। স্বভাবকবির যুগ চলে গেছে।'

"প্রথমে ভাবলাম, ম্যাট্রিকুলেশনটা পাশ করলে ওকে কোন একটা লাইন-টাইন ধরিয়ে দেব। পড়াশুনোয় যদি ভাল না হয়, ওকে জোর করে জেনারেল লাইনে আটকে রেখে লাভ কী। কিন্তু সরোজ কিছুতেই অন্য কিছু পড়তে চাইল না। ওর মামীরও তাতে অনিচ্ছা। এদিকে রেজাল্ট সেকেন্ড ডিভিশনের উপরে ওঠেনি। আমার ছেলে স্কলারশিপ পেয়েছে, মেয়ে তা না পেলেও তার প্লেস নিতান্ত খারাপ হয়নি। কিন্তু ভাগ্নেটি এমন সাধারণ স্তরে নেমে গেল দেখে আমার নিজেরই লজ্জার সীমা রইল না। ছি ছি ছি, ওর জ্যেঠা-কাকারা কী মনে করবেন। হয়ত ভাববেন, আমি নিজের ছেলেমেয়ের বেশী যত্ন করেছি, ওর দিকে ততটা লক্ষ্য রাখিনি। কিন্তু তা ত নয়। আমি ত সাধ্যমত সবাইকেই সমান সুযোগ-সুবিধে দিয়েছি। জ্ঞানবুদ্ধিমত কোনরকম ইতরবিশেষ করিনি।

"আমি একদিন ওকে ডেকে বললাম, 'কি রে, এখানে কি তোর মন টিঁকছে না? তুই কি তোর কাকার কাছে দোলতপুরে যাবি? তিনিও তোকে নিতে চাইছেন।'

"এ-কথা শুনে সরোজ আমাকে কিছু বলল না, কিন্তু ওর মামীর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল, 'মামা আমাকে পাঠিয়ে দিতে চাইছেন।'

"শুনে আমার স্ত্রী বাঘিনীর মত তেড়ে এলেন, 'ছি ছি ছি, তোমার কি কোন আক্কেল-বুদ্ধি নেই? ছেলে সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করছে বলে কি পচে গেছে? তুমি ওকে এখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়ার কে?'

"আমি ত মহা অপ্রস্তুত। বললাম, 'আমি ত ঠিক তা বলিনি।'

"সরোজের মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে ওর মামী ওকে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে গেলেন। দুর্বল রচনার ওপর আপনাদের কতখানি মমতা থাকে জানিনে, কিন্তু দুর্বল সন্তানের ওপর মেয়েদের স্নেহের সীমা নেই। আরও একটা কারণে সরোজ ওর মামীর মন কেড়ে নিয়েছিল। সংসারের টুকটাক কাজে ও তার মামীর সাহায্য করত। আমার ছেলেমেয়েকেও আমি বাবুগিরি, বিলাসিতা শেখাইনি। বলেছি, 'তোমরা এম এ-ই পাশ কর, আর এম এসসি-ই পাশ কর, ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে কেউ থাকতে পারবে না। মেয়েদের রান্নাবান্না শিখতে হবে, ছেলেদের হাটবাজার কি টুকটাক সংসারের কাজ করা দরকার। আমার বাড়িতে তখন চাকর-বাকর ছিল না। আমার স্ত্রীকেই সব করতে হত। আমি চাইতাম আমার ছেলেমেয়েরা যেন মার কষ্ট বোঝে, তাকে সবাই মিলে সাহায্য করে। কিন্তু আশ্চর্য, সরোজকে কিছু মুখ ফুটে বলতে হত না। ও নিজে থেকেই ওর মামীমার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে যেত। কখন দু বালতি জল দরকার, কখন কয়লা ফুরিয়ে গেছে, আর আমার স্ত্রী উঠে চেঁচামেচি শুরু করেছে, সরোজ পড়া ছেড়ে সব চেয়ে আগে উঠে যেত। সব ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে আসত।

"সরোজের মামী হেসে বলত, 'ও যেমন আমার দুঃখ বোঝে, এ-সংসারের কেউ তেমন বোঝে না।'

"ছেলেটির এই দায়িত্ববোধে, এই হৃদয়-বত্তায় আমি খুশী হতাম। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও ভাবতাম, ও যদি পড়াশুনোয় আরও ভাল হত, তাহলে সোনায় সোহাগা হত। কিন্তু তেমন যেন বড় একটা পাওয়া যায় না। সংসারে সোনা আর সোহাগা প্রায়ই আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। হৃদয়ের সঙ্গে, বুদ্ধির কোন অহিনকুল সম্বন্ধ আছে বলে আমি ত মনে করিনে। কিন্তু কদাচিৎ এদের মিলতে মিশতে দেখি।

"যা হক, তারপর একটা বড় রকমের ঘটনা ঘটল। আমাদের পারিবারিক ঘটনা নয়, দেশ জোড়া; মানে দেশ ফাঁড়ার ঘটনা। প্রথমে দাঙ্গাহাঙ্গামা রক্তারক্তি কান্ড। তারপর সালিশি, আলাদা হও, আলাদা খাও। তবু ঠিক পার্টিশনের সঙ্গে সঙ্গেই আমি খুলনা ছেড়ে আসিনি। নিজের বাড়িঘর জায়গা-জমি আঁকড়ে থাকবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার স্ত্রী শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। ঘরে বয়স্থা মেয়ে। আত্মীয়-বন্ধু সব একে একে চলে এসেছে। এসে আমার এক-গুঁয়েমির নিন্দা করতে শুরু করেছে। আমার স্ত্রী বার বার বলতে লাগলেন, 'আমি এমনভাবে কিছুতেই থাকব না। তুমি যদি না যাও, ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি একাই চলে যাব।'

"আমি বললাম, 'একা আর কোথায় যাবে। দয়া করে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল। বোঝা বিড়েটা অন্তত বইতে পারব।'

"কলকাতা শহরে চাকরি একটা অতি কষ্টে জুটল। কলেজের গুরুগিরিই। ভাগ্যক্রমে পেশাটা বদলাতে হল না। কিন্তু কাজ জুটল ত মাথা গুঁজবার আস্তানা জোটে না। ছেলেপুলে নিয়ে দাঁড়াই কোথায়। আত্মীয়বন্ধুর ঘরের ভাগীদার হয়ে কদিন আর থাকা যায়। শহরে ভদ্রলোকের বাস-যোগ্য বাড়ির অভাব। নিলামের ডাকের মত সেলামি আর আগাম টাকার ডাক। স্ত্রীর তাগিদে ছুটির দিনে সকালে চা-টা খেয়ে বেড়িয়ে পড়ি। টালা থেকে টালিগঞ্জ ছুটোছুটি। তারপর বাড়িতে এসে দাম্পত্য কলহ। 'তোমার দ্বারা হবে না।' স্ত্রী যত পতিব্রতাই হক, এ-কথা জীবনে সে বহুবার উচ্চারণ

করে। আর স্বামী যত স্ত্রীগতপ্রাণই হক, ও-কথা সে বিনাবাক্যে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করতে পারে না।

"শেষ পর্যন্ত আমার দ্বারাই হল। এক সহকর্মী বন্ধু ব্যবস্থা করে দিলেন। উত্তর কলকাতায় একখানা পুরনো বাড়ির পুরো একটি দোতলা। ঝোঁকের মাথায় ভাড়া নিয়ে ফেললাম। তিনখানা ঘর।

"মাসিক পঁচাত্তর টাকা ভাড়া। রোজগারের প্রায় অর্ধেক নিয়ে টানাটানি। তা হক, তবু এমন একটু জায়গা চাই যেখানে আলো-বাতাস আসে। অন্তত এমন একখানা ঘর চাই, যেখানে ছেলেমেয়েরা দুদণ্ড বসে পড়া-শুনো করতে পারে।

"পুরনো সেকেলে ধরনের বাড়ি। তবু আমার স্ত্রী ঘরগুলি দেখে পছন্দ করলেন। দুনিয়ার হালচালটা এতদিনে তাঁর [illegible]ধিগম্য হয়েছে। রান্নাঘরের অবস্থা ভাল, [illegible]নানের ঘরের ব্যবস্থা নেহাত খারাপ নয়। সামনে এক চিলতে ঝুল-বারান্দা আছে। আর মাথার উপরে বড় এক ফালি ছাদ। দেখে ছেলে-মেয়েরা ত মহা খুশী। কলকাতায় এসে এত দিন পর্যন্ত ওদের ছাদ জোটেনি। বাড়ি-ওয়ালা শম্ভু বসাক আর এক অংশে থাকেন। মাঝখানে দেওয়াল তোলা। তাঁকে জলকল আর ছাদের আলো-হাওয়ার ভাগ দিতে হবে না।

"কিন্তু দু দিন যেতে না যেতেই আমাদের হরিষে বিষাদের অবস্থা হল। বাড়িটা যা হক এরই মধ্যে কোন রকমে থাকবার যোগ্য হলেও পাড়াটা ভাল নয়। দিনের বেলায় তবু এক-রকম থাকে। কিন্তু সন্ধ্যা উতরে গেলেই ভূতপ্রেতের নৃত্য শুরু হয়। যত রাত বাড়ে, মাতাল গুণ্ডার হৈ-হুল্লোড়, কান্না চেঁচা-মেচিও পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। মনে মনে ভাবলাম, 'এ ত আচ্ছা কাণ্ড হল। ফ্রম ফ্রায়িং প্যান টু ফায়ার। এর চেয়ে বেলেঘাটার সেই বস্তিবাড়ি ভাল ছিল যে।'

"বাড়িওয়ালাকে ডেকে বললাম, 'বড় বিশ্রী জায়গা ত শম্ভুবাবু। এ-সব আপনারা সহ্য করেন কী করে?'

"ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের নীচে। বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। গায়ে তেরছি-কলার পাঞ্জাবি। চোখ দুটো ছোট ছোট। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, বেশ চালাক-চতুর। সংসারে নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। শম্ভুবাবু আমার কথা শুনে হেসে বললেন, 'সহ্য করব কি মশাই। ওরাই ত দয়া করে আমাদের সহ্য করছে। এ-পাড়ায় ওদের মৌরসী স্বত্ব। তবু ত আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে।'

"আমি বললাম 'না না। এর একটা ব্যবস্থা করুন।'

"তিনি বললেন, 'কী আর ব্যবস্থা করবেন বলুন, সবই কি আমার আপনার হাতে? তা ছাড়া ঠিক আপনার পাশের বাড়ি ত নয় যে, গায়ে গা ছোঁয়া লাগবে। গলির ওপারে কয়েকটা বাড়ি অমন অনেক দিন ধরেই আছে। কলকাতা শহর হল শ্রীজগন্নাথক্ষেত্র। এখানে অত ছোঁয়াছুঁয়ি বাছ-বিচার করলে চলে না মশাই।'

"বললাম, 'দেখুন নিজের জন্যে ত ভাবনা নেই। ভাবনা ছেলেপুলের জন্যে। সুস্থ পরিবেশে ভাল আবহাওয়ায় তাদের যদি না রাখতে পারি—'

"শম্ভুবাবু হেসে উঠলেন, 'আপনি ত মশাই আচ্ছা মানুষ। আমরা ত স্ত্রীপুত্র নিয়ে পুরুষানুক্রমে এখানে বাস করছি। কই, আমাদের ত ক্ষতি হয়নি। আর আপনি যে এত খুঁতখুঁত করছেন, যাবেন কোথায় শুনি? ঠগ বাছতে যে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের কল্যাণে সব জায়গায় এরা ছড়িয়ে পড়েছে। এখান থেকে তাড়া খেয়ে ওরা ভদ্রপাড়ায় ভদ্রলোকের বাড়িঘরে—।'

"আমি তাঁকে বাধা দিয়ে বললাম, 'থাক থাক। কী হয়েছে তা ত চোখের ওপরই দেখতে পাচ্ছি। এর কী প্রতিকার আছে সে-কথা বলুন। আমাদের কী করা উচিত সে-কথা বলুন।'

"ভদ্রলোক কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে থেকে চলে গেলেন। বোধহয় আমি একটু বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম।

"ছেলেমেয়েদের আমি ছাদে ওঠা বারণ করে দিলাম। বিশেষ করে বিকেলে আর সন্ধ্যা বেলায়। কারণ ছাদ থেকে সবই দেখা যায়। কেউ বা খোঁপায় ফুলের মালা জড়িয়ে জানলায় এসে দাঁড়ায়, কেউ বা বিশ্রীভাবে হেসে আর অঙ্গভঙ্গি করে আর-এক জানালার সঙ্গিনীর সঙ্গে আলাপ করতে থাকে। ঘরের মধ্যে কেউ কেউ হারমোনিয়ম বাজিয়ে অশ্লীল সুরে গান ধরে। আরও যা যা হয়, সেগুলি আর আপনার শুনে কাজ নেই মশাই। আমি ওদের বারণ করে দিলাম, 'খবরদার, কেউ ছাদে উঠবিনে। ভাল পাড়ায় ভাল বাড়িতে যখন যাব, তখন উঠবি। কিন্তু এ-ছাদ তোদের ছাড়তে হবে।'

"ছেলেমেয়েরা আমার বাধ্য। তারা কথা শুনল। শুধু আমার শাসন না, রুচির শাসনও আছে। সেই শাসনই সব চেয়ে বড় শাসন। আমি বলি একমাত্র সুশাসন। প্রবৃত্তিকে

রুচি দিয়ে নিত্য মার্জনা করতে হয়। এ-যুগের সব চেয়ে বড় রূপস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। তিনি রুচিরও স্রষ্টা। রবীন্দ্রসাহিত্য আর সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে যাতে ওদের সেই রুচিধর্মে দীক্ষা হয়, আমি রোজ তার চেষ্টা করি।

"ছাদে কেউ ওঠে না। শুধু সরোজ আর তার মামীমা ছাড়া। ভিজে কাপড় মেলতে হয়, শুকনো কাপড় তুলতে হয়। গোটা কয়েক ফুলের টব আছে। সরোজ সেগুলিতে জল দেয়। তবু আমি মাঝে মাঝে আপত্তি করি, 'ও কেন ছাদে যায়?'

"সরোজের মামী হেসে বলেন, 'ও কি একা যায় নাকি? আমি সঙ্গে থাকি। একেবারে কেউ সাহায্য না করলে আমি কি পারি?'

"আমি গম্ভীর হয়ে বলি, 'তা ঠিক। তোমারও অত ঘনঘন ছাদে গিয়ে দরকার নেই। আমি বারান্দায় কাপড় মেলবার ব্যবস্থা করছি।'

"সরোজের মামী হেসে বলেন, 'সে-ব্যবস্থা তোমার আগেই আমি করে নিয়েছি। কিন্তু এতগুলি মানুষের কাপড়চোপড় কি এক বারান্দায় কুলোয়? ভয় নেই, আমার জন্যে তোমাকে অত ভাবতে হবে না। আমার আর বয়ে যাওয়ার বয়স নেই।'

"আমি বলি, 'দেখ, বেশী বয়সে বয়ে যাওয়ার ওই এক সুবিধে। বয়সের দোহাই দিতে দিতে যাওয়া যায়।'

"আমার স্ত্রী হেসে বলেন, 'তাহলে তোমাকেও ত আমার আঁচলে গিঁট দিয়ে রাখতে হবে।'

"প্রথমে বাড়িওয়ালাকে বললাম; কিন্তু তিনি আমার কথা কানে তুললেন না। শেষে আমিই নিজের খরচে ছাদের চারদিকে উঁচু দরমার বেড়া এ'টে দিলাম। ছাদে যখন ওদের উঠতেই হবে, যতটা পারা যায় আব্রুর ব্যবস্থা করা যাক। আপনি হাসছেন। যে-কোন রিফর্মকে আপনারা শিল্পীরা উপহাস করেন, তা আমি জানি। বড় বড় রাজনৈতিক বিপ্লবীরা আমাদের অবজ্ঞা করেন, তাও আমার অজানা নেই। কিন্তু রিফর্মের নামে সব চেয়ে নাক সিঁটকান বোধ হয় আপনারা—আপনারা যাঁরা ফর্মের পূজারী। যাঁরা কলম ধরেই জাতসাহিত্য সৃষ্টি করতে বসেন। কিন্তু মশাই, রিফর্ম ছাড়া কোন্ সমাজটা চলে শুনি? কোন্ পরিবারটা বেঁচে থাকে? কোন্ মানুষটা শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলতে পারে? একটু তলিয়ে ভেবে দেখুন, জেনে হক, না জেনে হক, আপনি সংস্কার করে যাচ্ছেন। আপনি আপনার স্ত্রীকে শোধরাচ্ছেন, ছেলে-মেয়েকে শাসন করছেন পাড়াপড়শির চাল-চলনের সমালোচনা করছেন, সমাজ আর রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেখানে আপনার সায় নেই সেখানে হয় হায়-হায় করছেন, না হয় শ-কার ব-কারে গাল দিচ্ছেন। আমরা প্রত্যেকেই এমনি। শুনেছি প্রত্যেকের মধ্যে একজন করে শিল্পী বাস করেন। তেমনি একজন করে সংস্কারক সংগঠকও আছেন। আপনার সেই দ্বিতীয় সত্তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখবেন না। ওঅন. ফীড্স দি আদার।—একজন আর একজনের পরিপূরক, পরিপোষক।

"আপনি ভাবছেন ছাদের ওপর দরমার বেড়া এ'টে এত বড় বড় কথা বলছি কেন। শুধু বেড়া বাঁধা নয়, জীবনে আরও একটু নড়াচড়ার চেষ্টাও করেছি। যখন গ্রামে কি মফঃস্বল শহরে ছিলাম, সেখানে আরও পাঁচজনকে নিয়ে স্কুল করেছি, নাইট স্কুল করেছি, ভাল একটা লাইব্রেরি গড়ে তুলবার চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু আপনাদের এই বড় শহরে এসে সব খুইয়েছি। এখানে শুধু অন্ন আর অন্ন। এই বাজারে তিনটি ছেলে-মেয়ের থাকা-খাওয়া, ভদ্ররকমের পোশাক-আশাক আর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে করতে যাকে গলদঘর্ম হতে হয়, তার কি আর অন্য দিকে চোখকান দেওয়ার জো থাকে মশাই? আর চোখকান বন্ধ রেখে, হাত দুটি গুটিয়ে রেখেও আপনি যদি ভাবেন যে, আপনার হৃদয়-দরজা অষ্টপ্রহর খোলা থাকবে, তাহলে—তাহলে আপনি মহা ভুল করবেন। তিন শিফ্টে পড়াই, তাতেও পোষায় না, রাত জেগে নোট-বই লিখি, মডেল প্রশ্নোত্তর তৈরি করি, স্বনামে বেনামে কত যে বই লিখেছি, আপনারা তার খোঁজ রাখেন না। তা ছাড়া বয়সের ভার আছে, সংসারের দায় আছে। এসব আপনাকে কেবল অন্দরের দিকে ঠেলে দেবে। অন্দরের দিকে, অন্তরের দিকে নয়। কান পেতে রই আপন হৃদয় গহন দ্বারে—সে-সৌভাগ্য এ-যুগের মানুষের হবার জো নেই। আজও ভাড়াটে বাড়ির সদর দরজায় উৎকর্ণ হয়ে থাকতে হয়। কে এল, কে গেল, সেই দুর্ভাবনায় মরি।

"দরমার বেড়া এ'টেই অবশ্য আমি নিশ্চিন্ত রইলাম না। ইংরেজী বাংলার কাগজের সম্পাদকদের কাছে কিছু কিছু চিঠিপত্রও পাঠালাম। কোনটা ছাপা হল, কোনটা হল না। আমি জানি, এই রকমই হয়। যা হক, তবু চেষ্টা ত করে দেখলাম।

"সরোজ আই এ-টা নমোনমো করে পাশ করল। কিন্তু বি এ-তে গিয়ে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। অহংকার করিনে, কিন্তু নিজের ছেলেমেয়ের জন্যে এ-দুঃখ পেতে হয়নি মশাই। নবেন্দু তখন জিওলজি নিয়ে এম এসসি পড়ছে, নীতিকে এম বি-তে ভর্তি করে দিয়েছি। ওর নিজের শখ ডাক্তারি পড়বে পড়ুক। কিন্তু সরোজটা কী করে বসল। প্রথমে আমার ভারী রাগ হল। ইচ্ছে হল ওর গালে ঠাস ঠাস করে গোটা কত চড় বসিয়ে দিই। কিন্তু মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি সে-মুখে দাড়িগোঁফ গজিয়ে গেছে। ছেলেটা চওড়ায় বেশী বাড়েনি, কিন্তু লম্বায় আমার মাথার সমান। ও যে এত বড় হয়েছে, আমি ভাল করে লক্ষ্যই করিনি। কিন্তু ওই দেখতেই বড়, বয়স বেশী না, সবে কুড়ি ছাড়িয়েছে। আমি ওকে ধমক দিয়ে বললাম, 'কোন রকমে পাশটাও করতে পারলিনে?'

"সরোজ মুখ নিচু করে রইল।

"আমি বললাম, 'অংকটা কিছুতেই শিখলিনে, তাই তোকে সায়েন্স পড়ান গেল না। টেকনিক্যাল লাইনগুলি চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। ভাবলাম বি এ, এম এ-টা ভাল ভাবে পাশ করে যাবি। পাশ করাটা নেহাতই পড়ার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সেটুকুও তোর দ্বারা হল না। হ্যাঁরে, জীবনে করবি কী, খাবি কী করে। সে-কথাটা একবার ভেবে দেখেছিস?'

"হঠাৎ সামনে আমার স্ত্রীকে দেখে আমার রাগ তাঁরও বেড়ে গেল। আমি তাকেও দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ধমকে উঠলাম, 'ফের যদি তুমি সংসারের কোন কাজ ওকে দিয়ে করাবে—।'

"আমার স্ত্রী প্রতিবাদ করে বললেন, 'সংসারের কোন্ কাজটা ও বেশী করে শুনি? আমার ছেলেমেয়েরা যা করে, ও তার চেয়ে বেশী কিছু করে না। যে-ছেলে পড়াশুনো করে, তার ওটুকু কাজে কিছু এসে যায় না। কত ছেলে খুদকুঁড়ো খেয়েপরে দিনরাত ছেলে পড়িয়ে পড়ার খরচ চালায়। সে-তুলনায় তোমার ভাগ্নে ত স্বর্গে আছে।'

"অকাট্য যুক্তি। আমি তাড়াতাড়ি কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে বললাম, 'হুঁ।'

"আমার স্ত্রী বলে চললেন, 'কাজকর্মের দোহাই দিলে কী হবে তোমার ভাগ্নের কত গুণ গজিয়েছে তা ত আর জান না।'

"আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী গুণ গজিয়েছে?'

"আমার স্ত্রী বললেন, 'ও কি পড়াশুনো করেছে যে পাশ করবে? দু বছর ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে কেবল নভেল পড়েছে, আর ওই শম্ভুবাবুর বাড়িতে গিয়ে আড্ডা দিয়েছে। তোমরা যদি গালগল্প আর নভেল-নাটকের পরীক্ষা নিতে তাহলে তোমার ভাগ্নে সেরা নম্বর পেত।'

"আমার মেয়ে নীতি বলল, 'মিছিমিছি সরোজদার নামে দোষ দিচ্ছ মা। নভেল-নাটক ত আমরাও পড়ি। পরীক্ষার ব্যাপার অনেক সময় কত রকমের কী হয়ে যায়—।'

"আমি মেয়েকে ধমক দিয়ে বললাম, 'থাক থাক, তোকে আর ওকালতি করতে হবে না।'

"কিন্তু দু দিন বাদে আর্থিক লোকসানের জ্বালাটা একটু কমলে আমি নিজেই ওকালতি শুরু করলাম। ওকে কাছে ডেকে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললাম, 'একটা বছর গেছে, তাতে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়নি। ভাল করে পড়াশুনো কর, সামনের বার ডিস্টিংশন পাওয়া চাই। দেখ,

ফেল করাটা একটা অ্যাকসিডেণ্ট ছাড়া কিছু না। দুর্ঘটনা। কিন্তু খুব বড় রকমের দুর্ঘটনা বলে ভাববার কোন হেতু নেই। পাস ফেল বড় কথা নয়, জ্ঞান লাভটা বড় কথা। জ্ঞানের পথ ছাড়া মনুষ্য হওয়ার ত আর কোন পথ নেই।'

"সরোজ মাথা নিচু করে আমার উপদেশ শুনেতে লাগল। আমি উৎসাহ পেয়ে বলে চললাম, 'আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ত্রুটি আছে। পড়ানর ত্রুটি, পরীক্ষা নেবার ধরনে ত্রুটি, পদে পদে ভুল, পদে পদে গলদ। তবু তোমার পদস্খলন কেউ ক্ষমা করবে না। এই ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে তোমাকে উচ্চশিক্ষিত হতে হবে। তবে তুমি এর সমালোচনা করতে পারবে। নইলে তোমার কথা কেউ কানেই তুলবে না। বলবে নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। কিন্তু উঠোন যে সত্যিই বাঁকা-।'

"হঠাৎ মনে হল, সরোজ যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। কান খাড়া করে আর একটা কী ব্যাপার যেন শোনবার চেষ্টা করছে। আমি বললাম 'কী রে!' ও বলল, 'কিছু না।' কিন্তু একটু বাদে একটা বিশ্রী রকমের চিৎকার আর গোঙানির শব্দ আমারও কানে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে উত্তরের জানলাটার দিকে দু পা এগিয়ে গেল সরোজ। ওর চোখে মুখে একটা তীব্র উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করলাম।

"আমি বললাম, 'কী হয়েছে?'

"ও আগের মতই জবাব দিল, 'কিছু না।'

"কিন্তু ব্যাপারটা আমি ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি। বিরক্ত হয়ে বললাম, 'ফের বুঝি সেই উৎপাত আরম্ভ হয়েছে? কিন্তু ওদিকে কান দিয়ে লাভ কী!' তারপর আমি আমার মেয়ে নীতিকে ধমক দিলাম, 'তোরা ওই উত্তর দিকের জানলাটা কেন খোলা রাখিস বল ত? আমি হাজার বার বলেছি ওটা বন্ধ করে রাখবি। জানিসই ত যখন-তখন ওদিকে ওই সব হাঙ্গামা শুরু হয়। সন্ধ্যার পর ও-জানলাটা কক্ষনো খোলা রাখবিনে।'

"উৎপাতের কথাটা আপনাকে বলা হয়নি, এবার বলি। বলব কি, বলবার মত কথা নয় মশাই। এ-বাড়িতে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা আমরা টের পেয়েছিলাম। প্রায় প্রথম থেকেই বছর ষোল সতেরর একটি মেয়ে গলির ওপারে লাল রঙের বাড়িটার জানলায় এসে দাঁড়াত। মেয়েটি শুনেছি দেখতে সুন্দরী। শুনেছিই বললাম। কারণ আমি কোন দিন তার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখিনি। কিন্তু আপনাদের সৌন্দর্যের আদর্শের সঙ্গে আমার মেলে না। ফুটফুটে রঙ, বাঁশির মত নাক, পটলচেরা চোখ, আরও যেন কী কী সব লেখেন আপনারা—ফর্দ-মেলান মেয়েদের এই রূপ কোন দিন আমাকে আকৃষ্ট করেনি। এখনকার কথা বলছিনে, যখন বয়স ছিল, মুগ্ধ হওয়ার মত চোখ আর মন ছিল, তখনকার কথাই বলছি। তখনও যে-মুখে বিদ্যা-বুদ্ধির ছাপ দেখতাম সেই মুখই আমার ভাল লাগত। মেয়েদের মুখেও আমি পুরুষের ব্যক্তিত্ব আর শিক্ষা-সংস্কৃতি আশা করতাম। তা থাকলেই যে মেয়েদের নমনীয়তা কমনীয়তা চলে যায়, তাদের মুখে দাড়ি-গোঁফ গজাতে থাকে, সে-কুসংস্কার আমার ছিল না। থাক ওসব। আমার রুচির কথা বলে আর কী হবে। আপনাদের পাঁচজনের আদর্শে মেয়েটি সুন্দরীই ছিল। আমার স্ত্রী আর মেয়েও তার রূপ নিয়ে আলোচনা করত। অবশ্য আমার আড়ালে। আমি সামনে পড়লে তারা চুপ করে যেত। ও-সব আলোচনা আমার কানে গেলে আমি বলতাম, রূপ যাদের জীবিকা, তাদের রূপ থাকবে এ আর বেশী কথা কী। তার গুণের কথা যদি থাকে তা-ই বল। সংসারে রূপের যে রূপ, তা দেখতে দেখতে মিলায়। দেখতে দেখতে তার ওপর অভ্যাসের পর্দা পড়ে। তাই মানুষ নতুন নতুন মুখে রূপ খুঁজে বেড়ায়। মেয়েরাও খোঁজে, পুরুষরাও খোঁজে। রূপ আর নতুনত্বের সংজ্ঞা তখন তাদের কাছে অভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু যে দেখতে জানে, তার কাছে তা হয় না। সে রূপের গুণ দেখে না, গুণের রূপ দেখে। বিদ্যার রূপ, বুদ্ধির রূপ, মায়া-মমতা-স্নেহ-ভালবাসা-শ্রদ্ধার রূপ, যে-রূপ জরায় জীর্ণ হয় না, ব্যবহারে ক্ষয় হয় না, যা চিরদিন অম্লান থাকে। আপনি হাসছেন। মানে বিশ্বাস করছেন না। কিন্তু গুণের এই রূপে আপনি আমি সবাই দেখে থাকি। কেউ সে সম্বন্ধে সচেতন, কেউ তা নয়, এই যা তফাত। এই গুণগত রূপ আমরা দেখি বুড়ো বাপ-মার আদরে, কচি ছেলেমেয়েদের আহ্লাদে, প্রৌঢ়া স্ত্রীর সেবাযত্নে। কিন্তু যে-রূপের জন্যে আপনারা পাগল, যে-রূপের স্তুতিতে আপনারা পঞ্চমুখ আর সহস্রলোচন, সে এক ধরনের আবিষ্টতা ছাড়া কিছু নয়। সে আপনার নেশার রূপ, আসক্তির রূপ। সে

শারদীয়ার শুভ প্রভাতে দেশবাসীকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা

সেই স্বদেশী যুগের ভারত বিখ্যাত

স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

২১৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট : কলিকাতা

মহাত্মা গান্ধী বলেন—আমি "স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরীর" নানা প্রকার শিল্পকার্য দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বড়ই সুখের বিষয় যে, দেশীয় শিল্পের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ভগবানের নিকট ইহাদের ক্রমোন্নতি কামনা করি।

কারও মুখের রূপ নয়, আপনার চোখেরই আরোপ করা রূপ।

"কিন্তু আমার মেয়ে বলল, 'বাবা, ও-মেয়েটার গুণও আছে। ও স্কুলে পড়ে, তা ছাড়া গানের গলাটাও বেশ মিষ্টি। এতদিন নাকি হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করেছে।

"আমি বললাম, 'এ-খবর তোরা কী করে জানলি? তোরা কি ওর সঙ্গে কথা বলিস নাকি?'

"নীতি বলল, 'ছি ছি ছি, কথা বলব কেন। শম্ভুদা বলেছেন আমাদের। তিনি ওদের অনেক খবর জানেন। ঝরনার মা আর দিদিমার সঙ্গেও নাকি তাঁর আলাপ আছে।'

"এ-কথা শুনে আমি মোটেই খুশী হলাম না। ওদের খবর তিনি রাখুন, ভাল কথা, কিন্তু সে-খবর আমাদের বাড়িতে দেওয়ার কী দরকার। আমি আমার স্ত্রীকে গোপনে ডেকে নিষেধ করে দিলাম, 'ওই শম্ভুবাবু লোকটির সঙ্গে বেশী মেলামেশা করে কাজ নেই। ওঁর আলাপ-আলোচনাটা তেমন রুচিসংগত বলে আমার মনে হয় না।'

"আমার স্ত্রী বললেন, 'আমি যখন ওদের মাথার ওপর আছি, আমার ওপর নির্ভর কর। ও-সব ব্যাপার নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে।'

"কিন্তু স্ত্রীর হৃদয়ের ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস থাকলেও তাঁর মাথার ওপর সব সময় নির্ভর করতে পারিনে। দোষটা আমাদেরই। আমরা মেয়েদের মাথার আগুলফলম্বিত কেশদামের দিকেই এতকাল দৃষ্টি রেখেছি। ভিতরের বিদ্যাবুদ্ধির চাষে সাহায্য করতে শুরু করেছি মাত্র অল্প দিন হল।

"মেয়েটি প্রথম প্রথম তার মা-দিদিমার কাছে খুব বেশী আসত না। ছুটিছাটায় মাঝে মাঝে এসে থাকত। ছুটোছুটি দাপাদাপি হাসাহাসিতে বাড়িটা অস্থির হয়ে উঠত। ও-বাড়িতে যে নতুন কেউ এসেছে, তা বেশ বোঝা যেত। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই এক উপসর্গ শুরু হল। গলির মোড়ে মাঝে মাঝে নতুন নতুন মডেলের গাড়ি এসে দাঁড়ায়। আর বাড়ির ভিতরে কিসের একটা টানাটানি-ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। চিৎকার, কান্নাকাটি, শাসন, গালাগালিও চলতে থাকে। ও-পাড়ায় এ-ধরনের হৈ-হুল্লোড় ত আছেই। আমি প্রথমে ভাবতাম সেই রকমই কিছু একটা হবে। তারপর সন্দেহ হতে লাগল, ব্যাপারটা অন্য-রকম। গোড়ার দিকে এ-ধরনের কান্নাকাটির শব্দ শুনলেই ছেলেমেয়েদের কেউ কেউ ছাদে চলে যেত, কি জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কী হচ্ছে না হচ্ছে দেখতে চাইত। কিন্তু আমি ব্যাপারটার কিছু কিছু আন্দাজ করে ফেলেছি। তাই যথাসাধ্য ছেলেমেয়েদের সাবধান করে দিলাম। ছাদ ঢাকবার ব্যবস্থা করলাম। তারপর ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করতে লাগলাম অন্য কোথাও উঠে যাবার। কিন্তু যাওয়া কি মুখের কথা মশাই। ভাড়াবাড়ির যা অবস্থা, তাতে লোকান্তর গমন বরং সহজ, কিন্তু গৃহান্তর গমন একেবারে অসাধ্য।

"ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি যে হাত পা গুটিয়ে বসে রইলাম তা মনে করবেন না। শম্ভুবাবুর বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হলাম একদিন। সাবেক কায়দায় তাকিয়া-টাকিয়া দিয়ে ফরাস সাজান। এক পাশে খান কয়েক চেয়ার-টেয়ারও আছে। দেয়ালে টাঙান কয়েকখানা বড় বড় অয়েলপেণ্টিং। বীরপুরুষের মত সব চেহারা। বুঝতে পারলাম শম্ভুবাবুরই পূর্বপুরুষ। কারও হাতে বীণা, কারও হাতে বন্দুক। শম্ভুবাবুরও গানবাজনার শখ আছে। হারমোনিয়ম আর বাঁয়া-তবলা দেখে তা টের পেলাম। জনকয়েক বন্ধুর সঙ্গে তিনি বসে কী সব গল্পগুজব করছিলেন, আমাকে দেখে আপ্যায়ন করে বললেন, 'আরে আসুন মাস্টারমশাই, আসুন।'

"মাস্টারমশাই কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শম্ভুবাবুর বন্ধুর দল একটি দুটি করে ঘর ছেড়ে পালাল। পার্সেণ্টেজটা নিয়ে ক্লাসের ব্যাকবেঞ্চারের দল যেমন আস্তে আস্তে সরে পড়ে, এ-ও প্রায় তেমনি। আমি তাতে টললাম না। এ-কথা সে-কথার পর আমি শম্ভুবাবুকে বললাম, 'মশাই, ব্যাপারটা কী। ও-বাড়িতে রাতদুপুরে অত চিৎকার কান্নাকাটি কিসের বলুন ত। ঘরে যে আর টিকতে পারিনে।'

"তিনি হেসে বললেন, 'কেন মাস্টারমশাই, চোখ ঢেকেছেন, এবার কান দুটো ঢাকবার ব্যবস্থা করুন। তুলো গুঁজে নিন।'

"ভিতরে ভিতরে রাগ হলেও তাঁর বিদ্রূপ আমি গায়ে না মেখে বললাম, 'তা বটে। কিন্তু পাড়ার মধ্যে এমন সব বীভৎস কাণ্ড, আপনারা কেউ কিছু করতে পারেন না?'

"শম্ভুবাবু বললেন, 'করার এক্তিয়ার আমাদের নেই। ওটা ওদের মা-মেয়ের ব্যাপার। ওটা ওদের ব্যবসা, রুজিরোজগার। তার ওপর হাত দিতে যাবে কে?'

"আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপারটা কী।'

"শম্ভুবাবু তখন বেশ খুশী হয়ে ও-বাড়ির তিনপুরুষের ইতিহাস বলতে লাগলেন। ঝরনার দিদিমা কেমন ছিল, মা কেমন ছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। ঝরনার মার বয়সের কালে কী রকম সব শাঁসালো বাবুর দল ও-বাড়িতে আসত সেই সব কাহিনী। কিন্তু আজকাল দিনকাল পালটে গেছে। ওদের মেয়েদেরও একটু লেখাপড়া না শেখালে, চালাক-চতুর না করে তুললে চলে না। তাই মেয়েকে ওরা গোড়ার দিকে স্কুলে দিয়েছিল, খরচ করে ভাল হস্টেলেও রেখেছিল। এখন সেই খরচাটা তুলে নিতে চায়। আর বেশী ইনভেস্ট করবার ওদের সাধ্য নেই, বোধ হয় ধৈর্য নেই। কিন্তু মা-দিদিমার পথ ধরা মেয়েটার মোটেই ইচ্ছা নয়। সে বাইরে আরও পাঁচটি ভদ্রঘরের মেয়ের সঙ্গে মিশেছে, তাদের বাড়িতে গিয়ে ভিন্ন রকমের চালচলন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখেছে। সে চায় না ওই পেশা নিতে। ঝরনা বলে, 'আমি আরও পড়ব।' কখনও বলে, 'থিয়েটার-সিনেমায় নামব।' মার মন বোধ হয় মাঝে-মাঝে গলে। কিন্তু দিদিমা পাথর। সে সাবধান করে দেয়, 'তাহলে মেয়ে একেবারে হাতের বার হয়ে যাবে।' এদিকে ঝরনার মা ঝরনার দিদিমাকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারে না। কারণ মার যেমন অল্পবয়সী মেয়ে আছে, দিদিমার তেমনি বাড়ি-টাকাকড়ি-গয়নাগাটি রয়েছে। ঝরনাকে রাজী করানোর জন্যে দিদিমা নরমে গরমে নানারকম সাধ্যসাধনা করে। নাতনী যখন একেবারেই অবাধ্য হয়, তখন দিদিমার নিষ্ঠুরতার সীমা থাকে না। সে-নিষ্ঠুরতার বর্ণনা শম্ভুবাবু এমনভাবে করতে লাগলেন যে, শুনে সত্যিই আমার কানে আঙুল দিতে ইচ্ছা করল। বীভৎস উৎকট অবিশ্বাস্য সব কথা। মানুষ যে মানুষের উপর, বিশেষ করে নিজের সন্তানের উপর অমন অকথ্য অত্যাচার করতে পারে, তা আমি ধারণায় আনতে পারিনে। শম্ভুবাবু আমার কথা শুনে বললেন, 'মাস্টারমশাই, মানুষ কি আর সব সময় মানুষ থাকে। ওদের ত আমরা অমানুষ করেই রেখেছি।'

"আমি বললাম, 'তবু এ-সব একেবারেই গাঁজাখুরী গল্প বলে মনে হয়।'

"শম্ভুবাবু হেসে বললেন, 'ওখানে গাঁজা কেন, মদ, ভাঙ, চণ্ডু, চরস—সবই চলে।

ওখানকার গল্পটা গাঁজাখুরি নয়, জীবনটা গাঁজাখুরী।'

"আমি বললাম, 'কিন্তু মেয়েটা ওখানে থেকে এ-সব সহ্য করে কেন? ও ত বড়সড় হয়েছে। লেখাপড়াও নাকি কিছু শিখেছে। ও ওখান থেকে চলে গেলেই পারে।'

"শম্ভুবাবু বললেন, 'সেই ত মজা মাস্টার-মশাই। দুনিয়াটা দশঘরের নামতার মত অমন সোজা জিনিস নয়। মেয়েটাও কি কম সেয়ানা? সে কি নিজের ভবিষ্যৎ বুঝতে পারে না। পালিয়ে যাবে কোথায়? বেড়া-জালে দু দিন বাদেই ধরা পড়বে। তা ছাড়া টাকা-গয়না, বাড়ি-গাড়ির লোভ কি ওরও নেই? ও কি বুঝতে পারে না, দিদিমার কাছ থেকে চলে গেলে ও কানাকড়িও পাবে না? টাকাকড়িটা ওরা খুব ভালই চেনে। পুরুষেরা চায় কামিনী, কামিনীরা চায় কাঞ্চন। এই হল দুনিয়ার নিয়ম।'

"শম্ভুবাবুর সঙ্গে আমি আর বৃথা তর্ক করলুম না। কেউ কেউ আছে, যে-কোন অনিয়মকে তারা নিয়ম বলে সয়ে নিতে পারে। উঠে যাওয়ার আগে আমি ওঁকে শুধু একটা অনুরোধ করলাম, 'এসব আলোচনা যেন আমার ছেলেদের সামনে—।'

"শম্ভুবাবু জিভ কেটে বললেন, 'আরে ছি ছি।'

"তারপর থেকে উৎপাতটা কখনও বাড়ে, কখনও একটু কম থাকে। মাঝে মাঝে ওরা বোধহয় মেয়েটাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেয়। বাইরে কোথাও রেখে সাধ্য-সাধনা চলে। জানিনে মশাই কী কান্ড হয় না হয়।

"পতিতা-সমস্যা নিয়ে আমি কোনদিন মাথা ঘামাইনি। প্রথম বয়সে শরৎবাবুর বইতে ওদের কথা কিছু কিছু পড়েছি, তারপর বড় হয়ে সব ভুলেও গেছি। কোন বইয়ের গল্প আমার মনে থাকে না। শম্ভুবাবুর সঙ্গে সেই আলাপের পর দু-একদিন ও-সব নিয়ে একটু চিন্তা করতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু অবসর পেলাম না। ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা এসে পড়ল। বিশ্রী একটা সেন্টার। আমি পাশ করাতে চাইলে কী হবে, ওরা জোট বেঁধেছে ফেল করার জন্যে। আমি আমার নিজের কলেজের ছাত্রদের কথা ভাবতে লাগলাম। কে জানে তারা কেমন লিখেছে। একজামিনারের হাতে তাদেরই বা কী হাল হচ্ছে। আমি ভেবে দেখেছি, পরীক্ষা-সাগরে পতিত এইসব ছেলেদের সমস্যাই আমার সমস্যা। দু-চারটি ছেলেকে যদি ভাল করে লেখাপড়া শেখাতে পারি, অন্তত তাদের মনে শেখার আগ্রহটা জন্মিয়ে দিতে পারি তাহলেই ঢের। 'মাটির প্রদীপ ছিল সে কহিল,—স্বামী, আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।' প্রথম বয়সে অসাধ্য সাধনের দিকে অনধিকার চর্চার দিকেই ঝোঁক ছিল বেশী। মালকোচা দিয়ে কাপড় পরে, বাঁশের লাঠি বাগিয়ে ধরে ভাবতাম, দুনিয়ার সব অনিয়ম ভেঙে চুরমার করব, দুনিয়ার সব সমস্যার সমাধানের ভার আমার হাতে। বয়স বাড়বার পরে দিনে দিনে বুঝতে পারছি, মোল্লার দৌড় মসজিদ তক। কিন্তু মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছতে গেলেও প্রাণপণ করতে হয়। হাঁটুর জোর ক্রমেই কমে আসছে; মসজিদ পর্যন্তও পৌঁছন হবে না, সে-কথা বুঝতে আর বাকি নেই। কিন্তু তাই বলে দৌড়নটা এখনও বন্ধ করিনি। ছুটোছুটি না হক, হাঁটাহাঁটিটা এখনও চলে।

"আমি সরোজকে বুঝিয়ে বললাম, কোন বাজে ব্যাপারে ও যেন কান না দেয়। যে-দুঃখের প্রতিকার করবার সাধ্য আমাদের নেই, তার কথা ভেবে যেন নিজের কাজ নষ্ট না করে। পরের জন্যে কিছু করতে হলে আগে চাই আত্মজ্ঞান, আত্মগঠন। সরোজ আমার কথা মন দিয়ে শুনল। তারপর সত্যিই বেশ খেটে পড়াশুনো আরম্ভ করল। বাড়ির চিলেকোঠা খুব নির্জন। ও নিজেই বই খাতা বিছানা পাটি নিয়ে সেখানে উঠে গেল।

"আমি বললাম, 'ও-ঘরে কি তোর সুবিধে হবে?'

"সে বলল 'হ্যাঁ মামা।'

"ওখান থেকে সেই মেয়েটার চেঁচানি যে আরও বেশী কানে আসবে সে-কথা বলতে আমার যেন কেমন লজ্জা করল। আমি ভাবলাম, গোলমালটা ত আর সব দিন হয় না। সরোজ যখন একটু নিরালায় থাকতে, নির্জনে পড়াশুনো করতেই ভালবাসে তা-ই করুক। বয়স হয়েছে, নিজের দায়িত্ব নিজেই বুঝে নিক। সব সময় চোখে চোখে রাখব তেমন সময় আমার নেই, তা ছাড়া তা বোধ হয়

নিষ্ঠুরতার সীমা থাকে না

উচিতও নয়। নিজের চোখদুটো সরিয়ে নিয়ে আমাদের কলেজের জন দুই প্রফেসরকে বলে দিলাম ওর ওপর একটু নজর রাখতে। চক্ষুষ্মান বলে তাদেরও খ্যাতি আছে।

"ইতিমধ্যে একদিন কলেজ স্ট্রীটে সরোজের জ্যেঠামশাই পূর্ণ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা। তাঁরা আমার আগেই দেশ ছেড়েছিলেন। কাঁকুলিয়া রোডে বাড়ি করেছেন। বেশ হিসেবী আর করিৎকর্মা লোক। তিনি সরোজের ফেল করার খবরটা নিশ্চয়ই আগে জেনেছিলেন, তবু যেন জানেন না এমনি ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'সরোজ কি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে?'

"আমি দুঃখ করে বললাম, 'কই আর হল। পাশই করতে পারল না।'

"তারপর তিনি আমার ছেলেমেয়ের খবর জিজ্ঞেস করলেন। সব শুনে বললেন, 'ওদের ক্যারিয়ার ত ভালই হয়েছে।'

"তাঁর চাপা ব্যঙ্গটা তীরের মত আমার বুকে গিয়ে বিঁধল। মানে, আমি আমার ছেলেমেয়েদের যতটা যত্ন নিই, ভাগ্নের বেলায় ততটা নিইনে। অথচ ব্যাপারটা কিন্তু উল্টো। সরোজ আমার সংসারে আদরযত্ন বেশী ছাড়া কম পায় না। একবার ভাবলাম, পূর্ণবাবুর সঙ্গে খুব একচোট ঝগড়া করি। 'খুব ত মশাই এখন সরোজ সরোজ করছেন। কিন্তু ভাই মারা যাওয়ার পর একবার খোঁজও নেননি। ভাইয়ের সঙ্গে কীরকম ভাব ছিল তাও আমার জানতে বাকি নেই।'

"কিন্তু রাস্তার ওপর ঝগড়াটা আর করলাম না। তার ফলে মনটা আরও অশান্তিতে ভরে উঠল।

"পূর্ণবাবু বিদায় নেওয়ার সময় বললেন, 'ইচ্ছে করলে সরোজ আমাদের ওখানেও থাকতে পারে। তেতলা বাড়িতে জায়গার ত আর অভাব নেই।'

"আমি বললাম, 'ওর বাপ-মা তেতলা বাড়ি পছন্দ করত না। সরোজ তার মামার কাছে শাক-ভাত খেয়ে থাকুক, তার মা মরার সময় সেই ইচ্ছেই জানিয়ে গেছে।'

"সারাটা পথ মন বড় অস্থির আর অশান্ত হয়ে রইল। সরোজের বদলে নিজের ছেলে-মেয়েদের কারও পরীক্ষার ফল খারাপ হলে যেন এতটা কষ্ট পেতাম না। মনে মনে ভাবলাম, যেমন করেই পারি, ভাগ্নেকে মানুষ করে তুলব। ওর জ্যেঠা-খুড়োকে দেখাব আমি গরিব হতে পারি কিন্তু অভি-ভাবক হিসেবে অপদার্থ নই।

"দিনান্তে একবার করে ফের সরোজের খোঁজখবর নিতে শুরু করলাম। স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদেরও বলে দিলাম ওকে একটু বেশী তোয়াজ করতে।

"আমার স্ত্রী হেসে বললেন, 'সরোজকে তুমি কাছায় বেঁধে কলেজে নিয়ে যাও। বাব্বা, ভাগ্নে ত আর কারও হয় না, পৃথিবীতে তোমারই একটিমাত্র হয়েছে।'

"আমি যখন সরোজকে একটু বেশী আদর করতে যাই, আমার স্ত্রী ওইরকমই ঠাট্টা করেন। আবার আমার স্ত্রী যখন সরোজের ওপর বেশী পক্ষপাত দেখান, আমিও তাঁকে পরিহাস করতে ছাড়িনে।

"যা হক, সরোজকে পড়াশুনোর সব রকম সুযোগ সুবিধে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে রইলাম, রোজ একবার করে ওর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কী করে না করে দেখি, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজখবর নিই। আর কী করতে পারি বলুন! রোজগারের ব্যবস্থা ত করতেই হবে।

"ইতিমধ্যে ও-বাড়ির সেই উৎপাতটা আরও বাড়ল। হৈ চৈ মারামারি কান্নাকাটি। অশান্তির একশেষ। আগে আগে আমার কৌতূহল ছিল। এখন আর নেই। তা ছাড়া হাঙ্গামাটা ওদিককার কেবল একটা বাড়ির নয়, প্রত্যেক বাড়ির এটা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সকলে আমরা সবাই যখন একসঙ্গে বসে চা খাই, কি রাত্রে একসঙ্গে খেতে খেতে গল্প করি, আমাদের মধ্যে সবরকম আলোচনাই হয়। সাহিত্য সঙ্গীত রাজনীতি সম্বন্ধে আমরা খোলাখুলি আলোচনা করি, শুধু পাশের বাড়িগুলির কথা আমাদের মধ্যে একবারও ওঠে না। অনর্থক পরচর্চায় আমার ছেলেমেয়ের কোন আসক্তি নেই। আর ওরা ত একেবারেই পর, সমাজের পরগাছা।

"শুধু সরোজ আমাদের আলোচনায় তেমন যোগ দেয় না। খায় আর মাঝে মাঝে অন্য-মনস্ক হয়ে কী যেন ভাবে। নীতি বলে, 'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি সরোজদা?' সরোজ মাথা নেড়ে বলে, 'উঁহু।'

"নীতি বলে, 'মনে মনে ইকনমিক্স মুখস্ত করছ বুঝি?'

"নীতির ঠান্ডা তামাশায় সরোজ আগে যেমন চটত, বাদ-প্রতিবাদ করত, এখন আর তেমন করে না। ও ভারী শান্ত আর গম্ভীর হয়ে গেছে। আমি ভাবি, পড়াশুনোর কথাই ভাবছে হয়ত। পাশ না করা পর্যন্ত বেচারার মনে শান্তি নেই। মেয়েকে ধমক দিয়ে বলি, 'তোরা যদি সবাই একসঙ্গে ওর পিছনে লাগিস—।'

"নীতি বলে, 'সবাই পিছনে লেগেও আমরা কিছু করতে পারব না বাবা। তোমার জন্যে কার সাধ্য সরোজদার গায়ে একটু আঁচড় কাটবে।'

"মাঝে মাঝে দেখি সরোজ চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে ছাদের ওপর পায়চারি করছে। অনেক রাত অবধি ওর ঘরে আলো জ্বলে। আমি বলি, 'তুই কি সারারাতই জেগে থাকিস নাকি? অত বেশী খেটে দরকার নেই। শরীর ভেঙে পড়বে।' নীতি বলে, 'সরোজদা এবার একটা দারুণ কান্ড করবে। পরীক্ষায় রেকর্ড মার্ক না তুলে ছাড়বে না।'

"তারপর শেষপর্যন্ত সেই দারুণ কান্ডই হল। পরীক্ষার খাতায় অবশ্যই নয়। একদিন ভোরে উঠে সরোজকে আর দেখতে পেলাম না। খানিকবাদে শম্ভুবাবু এসে খবর দিলেন, ও-বাড়ির ঝরনাও উধাও। তার মা দিদিমা চাকর দরোয়ান কেউ তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। তবু এই দুই অন্তর্ধানের মধ্যে যে কোন যোগাযোগ আছে, তা আমাদের বুঝতে, বিশ্বাস করতে, সময় নিল। আমরা সবাই হতভম্ব হয়ে রইলাম। ব্যাপারটা চোখের সামনে দেখেও তাকে যেন চট করে স্বীকার করে নিতে পারলাম না। কিন্তু আমার স্বীকার অস্বীকারে কী এসে যায়। এই নিয়ে সারা পাড়া তোলপাড় হল। চায়ের দোকানে লণ্ড্রিতে ডিসপেনসারিতে নানারকমের কানা-ঘুষো চলতে লাগল। তারপর শুধু কানা-কানির মধ্যেই ব্যাপারটা থেমে রইল না। ঝরনাদের বাড়ির দালাল আর দরোয়ান এসে আমাকে শাসিয়ে গেল, তাদের নাবালিকা মেয়েকে যদি আমরা ভালয় ভালয় বের করে না দিই, তাহলে আমাদের নামে ওরা পুলিশ-কেস করবে। শুধু তা-ই নয়, ঝরনার মা আর দিদিমা এতদিন আড়ালে ছিল। এবার তারাও বারান্দায় দাঁড়িয়ে যা নয় তাই বলে গালাগাল শুরু করল। দুজনকে দেখতে প্রায় একই রকম। বিরাট বিপুল দুই মাংসের স্তূপ। শাসানি-ফোঁসানির সঙ্গে অশ্রাব্য অশ্লীল ভাষায় তারা আমার চোদ্দ-পুরুষ উদ্ধার করতে লাগল। আমার ছেলে মুখ লাল করে এসে বলল, 'থানায় গিয়ে ডায়েরি করে আসি বাবা। ওদের কী অধিকার আছে আমাদের এ-সব কথা বলবার।'

"আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'কাজ নেই বাবা। তার চেয়ে চল আমরাই এখান থেকে উঠে যাই।'

"আমার স্ত্রীও আমার মতে সায় দিল, 'সেই ভাল।'

"তারপর দিন তিনেকের মধ্যেই বাড়ি বদলে আমি এই লেক প্লেসে চলে এলাম। এখানে দ্বিগুণ ভাড়া। তা-ই সই। তিন বছরের মধ্যে যেখান থেকে নড়তে পারছিলাম না, শত অসুবিধে সত্ত্বেও কেবল হিসেব-নিকেশ করছিলাম, তাড়কা রাক্ষসীদের তাড়নায় দুদিনেই সেখানে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। বলতে গেলে শাপে বর হল মশাই। আসবার সময় শম্ভুবাবু হাত জোড় করে বললেন, 'আমাদের কী অপরাধ, আমাদের কেন ছেড়ে যাচ্ছেন। দুদিন সবুর করুন, ওদের আমরাই শায়েস্তা করছি। আপনাদের মত এমন ভাল আর ভদ্র ভাড়াটে আমি এর আগে পাইনি।'

"কিন্তু আমি কিছুতেই মত বদলালাম না।

"এই হাঙ্গামা হুজ্জতে সরোজের জন্যে শোক করবার কথা আমরা প্রায় ভুলে গেলাম। আমার স্ত্রী পর্যন্ত ক'দিনের মধ্যে তার জন্যে হায়-আফসোস করবার অবসর পেলেন না।

'এখানে এসে কাজ আরও বাড়ল। ঘর-দোর সাজান গুছানর হাঙ্গামা কি কম।

"আমাদের বেডরুমটাই সব চেয়ে বড়। কারণ সে ঘরে ত শুধু আমরা দুজন থাকি না, সংসারের আরও পাঁচটা জিনিস থাকে। কোথায় খাট থাকবে, কোথায় টেবিল আলমারি, আমার স্ত্রীর পছন্দ আর হয় না। হয়ত এই নিয়েই একচোট ঝগড়া হয়ে গেল। পুরো একটা ছুটির দিন এইসব গোছগাছ-টানাটানিতেই কাটল। অনার্স ক্লাসের লেকচারটা নিয়ে মোটে বসতেই পারলাম না। রাত্রে এত ক্লান্তি লাগতে লাগল যে, শুতে না শুতেই ঘুম।

"সেই ঘুম ভাঙল কিসের একটা ফোঁস-ফোঁসানির শব্দে। অনেকদিনের অভ্যাস, শব্দ শুনেই বুঝতে পারলাম, সাপ টাপ কিছু নয়, আমারই অর্ধাঙ্গিনী। আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুয়ে কাঁদছেন। আমি আস্তে আস্তে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। আরও আস্তে আস্তে বললাম, 'রানু, কী হয়েছে। অমন করছ কেন?'

"আগে আগে বাপ মার আড়ালে স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকতাম। গুরুজনেরা চলে যাওয়ার পর লঘুজনরাই তাদের জায়গা নিয়েছে। ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেলে একটু সামলে চলতে হয়। নইলে নিজেরই যেন কেমন বাধো বাধো লাগে।

"আমার স্ত্রী অস্ফুট স্বরে বললেন 'দেখ, আমি যে তাকে আমার নবু নীতিরই মতই ভাল বেসেছিলাম।'

"কী সর্বনাশ। আমি ভেবেছি সেই খাট-আলমারির ঝগড়ার জের। এ ত তা নয়। আমি তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে চুপ করে রইলাম। আর আমার সেই স্পর্শে তিনি বুঝতে পারলেন, আমার মুখে সান্ত্বনার কথা না থাকলেও আমার বুকে তাঁরই মত শোকের সাগর উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

"আমার স্ত্রী বলতে লাগলেন, 'এখন বুঝতে পারছি, ও কেন দিনরাত অত ছাদে থাকতে চাইত। মরা ফুলগাছে জল দেওয়ার গরজ কেন অত বেশী ছিল ওর। কিন্তু এমন যে হবে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। ও যে আমার চোখে এমন করে ধুলো দিয়ে—।'

"আমি বললাম, 'রানু, ও তোমার চোখে ধুলো দেয়নি, নিজের ভবিষ্যৎকেই নষ্ট করেছে। তুমি ওর জন্যে মোটেই দুঃখ কর না।'

"আমার স্ত্রী বার বার বলতে লাগলেন, চুপ চাপ না থেকে সরোজের খোঁজ-খবর ভাল করে আমার করা উচিত। ছেলেমানুষ, একটা ভুল করে ফেলেছে বলে কি তাকে অমন গোল্লায় যেতে দিতে হবে। পুলিশের সাহায্য নিতে হলেও তা-ই নেওয়া দরকার। আমার হাতে টাকা যদি না থাকে, আমার স্ত্রীর গায়ে গয়না ত আছে।

"খোঁজখবর গোপনে গোপনে সাধ্যমত নিলামও। কিন্তু কেন লাভ হল না। উড়ন্ত পাখির কি কোন পাত্তা পাওয়া যায়। যতদিন পাখা গজায়নি, ততদিন বুকে করে রেখেছি। কে জানে কোথায় সরে পড়েছে, কি নামটাম ভাঁড়িয়ে আত্মগোপন করে রয়েছে। আমার আরও কিছু অর্থব্যয় হল। তারপর আমি রাগ করে সবাইকে বলে দিলাম, 'খবরদার, ওর নাম যেন আমার বাড়িতে কেউ মুখে না আনে।'

"আমার সামনে কেউ মুখে আনল না, কিন্তু আড়ালে আবডালে খুব জল্পনা কল্পনা চলল। এখন শুনলাম, বইয়ের ভিতর দিয়ে ওদের নাকি মনের কথার আদানপ্রদান চলত। শম্ভুবাবুর বই ঝরনাদের বাড়িতে যেত। সেই বই ফের আসত সরোজের হাতে। মেয়েটা নাকি বলত, আমাকে উদ্ধার কর। হস্টেলের বাইরে নাকি ওদের দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। কবে শম্ভুবাবুর বাড়িতে নীতি সেই মেয়েটাকে দেখেছে। আমি বকাবকি করব বলে সে আমার কানে দেয়নি। এখন অনেক কথাই বেরোতে লাগল। চোর পালালে বুদ্ধি না বাড়ুক, তার চাতুরিটা ধরবার জন্যে সবাই উৎসুক হয়। আমার বাড়ির সবাই সন্দেহ করতে লাগল, এ-ব্যাপারে শম্ভুবাবুরও অনেকখানি হাত আছে অন্তত তিনি যতখানি ধোয়া-তুলসী সেজেছেন এ-ব্যাপারে তত ভালোমানুষ তিনি নন। এ-সব আলোচনা আমার আড়ালে প্রায়ই চলত। কিন্তু যখনই কোন কথা আমার কানে যেত, আমি ওদের মনে করিয়ে দিতাম, 'ও-সব থাক। পৃথিবীতে আলোচনা করবার আরও বহু বিষয় আছে।'

"তারপর মনে করিয়ে দেওয়ার আর দরকার হল না। ওরা নিজেরাই সব ভুলে গেল। সময় সব জ্বালা সব ক্ষত ভুলিয়ে দেয় সব অকেজো কৌতূহল ঝেড়ে ফেলে। 'আমার ছেলে পাশ করে সারভে অব ইণ্ডিয়ায় ভাল চাকরি পেল, মেয়েও পাশ করে ঢুকল সেবাসদনে। আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ও বলল, তাহলে এম-ব্রি পড়বার মানে রইল কী। কী আর করব, আমি ত জোর করে কিছু করতে পারিনে, এখন যার কথা শুনবে, তাকে খুঁজে বার করতে হবে।

"সরোজের কথা আমাদের অনেকদিনের মধ্যে মনে পড়ল না। তারপর মনে করবার ফের একটা উপলক্ষ্য ঘটল। বছর দুই বাদে সরোজের একখানা চিঠি এল ওর মামীমার নামে। বোধহয় গোপনে আমার কলেজ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে থাকবে। অনেক ভনিতা করে লিখেছে, একটি ছেলে হওয়ার পর তার স্ত্রী মরণাপন্ন হয়ে পড়েছে। তারা এখন নিঃস্ব। দয়া করে তার মামীমা যদি গোটা পাঁচশেক টাকা তাকে ধার দেন, তাহলে তার বড় উপকার হয়।

"নীতি উল্লাসে উছলে উঠল, 'মাগো! সরোজদার ছেলে হয়েছে। আমাদের সরোজদা।'

"আমি বললাম, 'তোমাদের সরোজদা নয়। আর বাচ্চা ত শিয়াল-কুকুরেরও হয়ে থাকে।'

"নীতি বলল, 'বাবা, অমন বিশ্রীভাবে কথা বলছ কেন?'

"বললাম, 'তবে কীভাবে বলব?'

"আমি জানি এ-সব ব্যাপারে আমার চেয়ে আমার ছেলেমেয়েদের সহিষ্ণুতা বেশী। কিন্তু ওরা জানে না, সরোজ আমার কাছে কী ছিল, তাকে আমি কীভাবে মানুষ করতে চেয়েছিলাম। আমার বোন আর ভগ্নীপতির কথা মনে পড়ল। তাদের বিশ্বাসের মর্যাদা আমি রাখতে পারিনি। সরোজের জ্যেঠা আর কাকার সামনে আমার আর মাথা তুলে দাঁড়াবার জো নেই। আমার দুঃখ ওরা কী করে বুঝবে।

"টাকাটা ওর মামী অবশ্য পাঠিয়ে দিলেন। আমার সম্মতি তিনি চাইলেন না, আমারও দেওয়ার দরকার হল না। আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা অমন এক-আধটু লুকোচুরি আমার সঙ্গে করে। ওটুকু সইতে হয়। তবে সান্ত্বনা এই যে, সে-চুরি পুকুরচুরি নয়। আমরা ত সত্যিই আর আমাদের পরিবারে এক-একটি অটোক্র্যাট হতে পারিনে। যে যা-ই বলুক, হতে চাইওনে। আজকাল আমার ছেলে আর মেয়ের সঙ্গে আমার ঘোরতর তর্ক হয়। প্রায়ই মতের মিল হয় না। বিশেষ করে সাহিত্য টাহিত্য নিয়ে বিষম ঝগড়া বেধে যায়। যে-সব লেখককে ওরা মাথায় তোলে, আমি তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র রস খুঁজে পাইনে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আমি জানি, এ-সব নিতান্তই মতভেদ। ওরা মুখে যা-ই বলুক, ওদের স্বভাব-

ভারতে সর্বাপেক্ষা ফাইন
সিল্ক, কটন ও উলের
গেঞ্জী প্রস্তুতকারক

দেশবন্ধু হোসিয়ারী
ফ্যাক্টরী
১০০এ, গড়পার রোড, কলিকাতা—৯
ফোন : ৩৫—৪৫৮৩ * গ্রাম : নিটকুল

চরিত্রে কি আচার ব্যবহারে এমন কিছু নেই যা মর্মভেদী। ওদের সঙ্গে আমার শুধু রক্তের সম্পর্ক নয়, এক গভীর রুচির ঐক্যও গড়ে উঠেছে। যতদিন বাঁচবে আপনার বাপ-মার আশীর্বাদে আশা করি তা স্থায়ী হয়ে থাকবে।

"শুধু সরোজ—। তার কথা মনে হলে এখনও—। থাক সে-কথা।

"ওর মামীমার আশীর্বাদের জোর আছে দেখা গেল। মাসখানেক বাদে ফের চিঠি এল। ওর স্ত্রী সুস্থ হয়েছে। সরোজ একদিন প্রণাম করতে আসতে চায়।

"আমি বললাম, 'খবরদার ওর নামও কর না।'

"ছেলে বলল, 'বাবা, তোমার এই শুচিবায়ু কেন।'

"আমি বললাম, 'শুচিবায়ু ত নয়, শুচিতা। যে-কোন সংস্কারকেই কুসংস্কার বলে ভেব না।'

"কিন্তু আমার নিষেধ সত্ত্বেও সরোজ সত্যিই একদিন দেখা করতে এল। জানিনে ওরাই গোপনে গোপনে আসতে বলেছিল কি না। ছুটির দিন। বিকেল বেলা। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সদর দরজা পর্যন্ত এসে ইতস্তত করছি বেরুব কি বেরব না। হঠাৎ দেখলাম দূরে থেকে একজন অচেনা লোক আমাদের বাড়ির দিকে আসছে। আর একটু কাছে এসে দেখলাম, অচেনা কেউ নয়, সরোজ। কিন্তু চেনা সত্যিই শক্ত। এই ক' বছরেই চেহারা অনেক পাল্টে গেছে। শুধু রোগাটে নয়, বুড়োটেও হয়েছে বেশ। বছর দশেক বয়স বেড়ে গেছে যেন। ও বোধ হয় ভাবেনি, প্রথমেই আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। সামনে পড়ে ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল একটু। তারপর আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে এল।

"আমি এক লাফে অনেকখানি পিছিয়ে গিয়ে বললাম, 'খবরদার, ছুঁয়ো না আমাকে।'

"ও অস্ফুট স্বরে বলল, 'মামা'

"আমি বললাম, 'এখানে তোমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই।'

"ও বলল, 'আমি একবার মার সঙ্গে—।'

"আমি বললাম, 'তোমার মা বহুকাল আগে মরে বেঁচে গেছে। এখানে কেউ নেই তোমার। এক্ষুনি চলে যাও।'

"সরোজ আর কোন কথা বলল না। ততক্ষণে বৃষ্টিটা আরও জোরে এসেছে। ও ভিজতে ভিজতেই চলল। আমি ফিরে এলাম ঘরে।

"আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা বসে বসে আড্ডা করছিল। আমাকে ফিরে আসতে দেখে আমার স্ত্রী খুশী হয়ে বলল, 'বাঁচা গেল। ভাবছিলাম তুমি বোধহয় বৃষ্টির মধ্যেই বেরোলে।'

"আমি বললাম, 'কেন, আমার কি আক্কেল-বুদ্ধি বলে কিছু নেই?'

"আমার স্ত্রী হেসে বলল, 'তা একটু কমই আছে।'

"আমার ছেলেমেয়ে তাকে ঘিরে বসে ছিল। আমি ওদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকালাম। ওরা কি সব জানে? ওরা কি সব টের পেয়েছে? কিন্তু আমার বাড়ি, আমার ঘর। সরোজকে এখানে ঢুকতে না দেওয়ার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে। তবু সত্য কথাটা ওদের কাছে বলতে পারলাম না। ব্যাপারটা চেপে গেলাম।

"নবু বলল, 'বাবা তুমি অমন করে তাকাচ্ছ কেন?'

"নীতি বলল, 'বাবা নিশ্চয়ই হিপনটিজম প্র্যাকটিস করছে। আমরা ত সহজে বাধ্য

হবার কেউ নই।' এরপর ওরা তিনজনেই খুব হেসে উঠল। নীতিই হাসতে লাগল বেশী। আজকাল প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রকেই শুধু মিত্রের আসন ছেড়ে দিতে হয় না, মেয়েও বান্ধবীর জায়গা দখল করে। আপনি কিছুতেই তাদের আটকে রাখতে পারেন না। দিনকালই এই রকম।

"ওদের হাসতে দেখে আমি খুব চটে উঠলাম। বাচালতা প্রগল্‌ভতা চট করে সইতে পারিনে। তবে আজকাল মাঝে মাঝে একা-একা অন্য রকমও ভাবি। ভাবি বয়সকে অল্পবয়সীরা যেমন শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে, সমবেদনা দেখায়, তেমনি সেই সঙ্গে একটু হেসে না নিয়েও পারে না। বার্ধক্য হয় যৌবনের কার্টুন। ইডিওসিনক্রেসিতে নিজের আত্মীয়স্বজনকে হাসতে দিতে হয়। হাসতে না পারলে তারা ভালবাসতে পারে না। হাসিটা উপহাস না হলেই হল।

"খানিক বাদে ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমিও হাসলাম। তবু আসল কথাটা তখনও বলতে পারলাম না। তারপর ওরা ফের আর একদফা চা আর পাঁপর ভাজা করল। বৃষ্টি তবুও ধরে না। কাজকর্ম নেই। ভাই-বোনে মিলে বসল রেকর্ড বাজাতে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ড। একের পর এক গান শুনতে লাগলাম। 'জীবন যখন শুকায়ে যায়', 'আলোকের এই ঝরনাধারায়', 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন।' এই পুরনো গানখানার নতুন রেকর্ড এসেছে। শুনতে শুনতে হঠাৎ উঠে গিয়ে আমি আমার কাজে বসলাম। কিন্তু মন বসল না। গানের কলিগুলি বেজে চলল,

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন,
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে।
সবার পিছে সবার নীচে সব-হারাদের মাঝে।

"মনে মনে ভাবলাম, এ-দৈন্য কি শুধু অর্থের? না, না। এ-দৈন্য সংশিক্ষার, এ-দৈন্য শুভবুদ্ধির, এ-দৈন্য মহৎ হৃদয়ের।

যখন তোমায় প্রণাম করি আমি
প্রণাম আমার কোনখানে যায় থামি
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে।'

"কাজ হল না। সারা সন্ধ্যা, সারাটা রাত কী একটা ছটফটানি আর অস্বস্তির মধ্যে কাটল। পরদিনও তাই। আমার স্ত্রীর চোখকে ফাঁকি দিতে পারলাম না। তিনি বললেন, 'কী হয়েছে?' আমি বললাম, 'কিছু না।' কলেজের এক সহকর্মী বললেন, 'সুধা-বিন্দুবাবু, আপনাকে আজ যেন বড় অন্য-মনস্ক দেখছি।' আমি শুনিনি-শুনিনি করে জবাবটা এড়িয়ে গেলাম। তাঁর কাছে কথাটা ভাঙলাম না। সে-দিনও গেল।

"পরদিন স্ত্রীর জমাখরচের খাতার ভিতর থেকে চুরি করে নিলাম সরোজের ঠিকানা লেখা পোস্টকার্ডটা। কলেজে গেলাম। ক্লাসগুলি শেষ হল। তবু প্রোফেসরস্ রুমে খানিকক্ষণ বসে রইলাম। তারপর হঠাৎ উঠে পড়লাম। মন স্থির করে কিছু করবার জো নেই। যা করবার অস্থিরভাবেই করতে হবে।

ঠিকানাটা খিদিরপুরের। কিন্তু জায়গাটা যে অত ঘিঞ্জি তা ভাবিনি। সন্ধ্যা উতরে গেছে। বড় রাস্তায় আলো জ্বলছে। কিন্তু সে-আলো বস্তির মধ্যে ঢোকেনি। অতি কষ্টে জিজ্ঞেস করে করে সরোজের বাসাটা বের করলাম। কড়া নাড়তে হল না। দোর খোলাই ছিল। আমার পায়ের সাড়া পেয়ে উনিশ-কুড়ি বছরের একটি মেয়ে বেরিয়ে

এল। রোগাটে শীর্ণ চেহারা। পরনে সাধারণ একখানা মিলের শাড়ি। সিঁথিতে সিঁদুর। মাথায় আঁচল ছিল না। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি তুলে দিল।

"ঝুল-বারান্দায়-দাঁড়ান সেদিনের ঝরনাকে আমি ভাল করে দেখিনি। দেখলেও এই মেয়েটির সঙ্গে ঠিক মিলিয়ে নিতে পারতাম কি না সন্দেহ। এক মুহূর্ত দুজনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সরোজ আছে?'

"মেয়েটি লজ্জিত হয়ে অল্প একটু হাসল, বলল 'না। তিনি ত এই খানিক আগে বেরিয়ে গেলেন।'

"বললাম, 'কোথায়?'

"টিউশনিতে।'

"মনে মনে হাসলাম। নিজে কত বড় বিদ্যার জাহাজ! ও আবার মাস্টারিতে নেমেছে। তারপর একটু ইতস্তত করে বললাম, 'আমি সরোজের মামা।'

"মেয়েটি বোধ হয় আগেই আমাকে চিনতে পেরেছিল, কিন্তু সে-কথা বলবার সাহস পাচ্ছিল না। আমি নিজেই পরিচয় দেওয়ায় ও এবার নিচু হয়ে আমাকে প্রণাম করল। কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করলাম, কিন্তু ঠিক আগের মত লাফিয়ে সরে যেতে পারলাম না। জোড়পায়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। অভ্যাসবশে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদও করলাম।

"ঝরনা এবার মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'ভিতরে আসবেন না?'

"না আর কী করে বলি। গেলাম ভিতরে। ঘরে ইলেকট্রিক লাইট নেই। হ্যারিকেনের আলোই জ্বলছে। দেয়াল ঘেঁষে একখানা তক্তপোষ। তার ওপর শিশু ঘুমোচ্ছে। এক টুকরো কাপড়ে ক্ষীণ দেহটুকু ঢাকা। দড়ির আলনায় শাড়ি আর ধুতি ঝোলান। কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীর আসন। দেখে দেখে গা যেন শির-শির করে উঠল। অনেক সাধ্য-সাধনার পর উর্বশী আজ জায়া আর জননী হয়েছে। এ কি ওর এক জন্মের সাধ? এ সাধ কি ওর মা আর দিদিমার মনেও ছিল না? তক্তপোষের ধার ঘেঁষে বসলাম। খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর হঠাৎ বললাম, 'তোমরা কি প্রথম থেকেই এ-বাড়িতে আছ?'

"ঝরনা মুখ নিচু করে বলল, 'না। প্রথমে একটা ভাল বাড়িতেই উঠেছিলাম।'

"সেখানে চলত কী করে?'

"ঝরনা আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। তারপর লজ্জিতভাবে একটু হেসে বলল, 'দিদিমার কিছু গয়না চুরি করে এনেছিলাম।'

"এ-কথা শুনে আমি কিন্তু হাসতে পারলাম না। তারপর বসে বসে আরও খানিকক্ষণ শুনলাম ওদের কাহিনী। গোড়ার দিকে খুব সাধু সংকল্পই ছিল। কালীঘাটে বিয়ের পাট সেরে একজন ভর্তি হয়েছিল স্কুলে আর একজন রাত্রের কলেজে। কিন্তু অধ্যবসায়টা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ছেলে হওয়ার আগে থেকেই অসুখবিসুখে ধরেছে। তারও আগে ফুরিয়েছে গয়নার টাকা। কিছু নাকি চোরের ওপর বাটপারিতেও গেছে। সরোজের স্থায়ী কোন কাজকর্ম এখনও জোটেনি। এটা-সেটা করে চলে।

"ভাবলাম ঝরনার মা-দিদিমার খবরটা এবার জিজ্ঞেস করি। তারা কি কোন সাহায্য করেনি, নাকি ওরাই নিতে চায়নি? আমার মত তাদেরও কেউ কি এমনি লুকিয়ে দেখা করতে এসেছিল? ভাবলাম জিজ্ঞেস করি। কিন্তু কেমন যেন সংকোচ হল।

"খানিক বাদে বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ঝরনা আরও একবার প্রণাম করে বলল 'আবার আসবেন।'

"আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিছুতেই বলতে পারলাম না, 'তোমরাও যেয়ো।' কথাটা কেন যেন গলায় আটকে গেল। আমি জানি, আমি না পারলেও আমার ছেলে-মেয়েরা পারবে। তারা বলবে।

"বাড়িতে এসে রাত্রে খাওয়ার সময় সবিস্তারে বললাম সরোজদের কাহিনী আর আমার অভিযানের কথা। নবু খেতে খেতে আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকাল, 'সত্যি বলছ বাবা? তুমি এতখানি আধুনিক হয়েছ?'

"আমি হাতের গ্রাস মুখে না তুলে ওদের দিকে চেয়ে চড়া গলায় বললাম, 'না, আধুনিক হইনি। এই যদি তোমাদের আধুনিকতা হয়, আমি এর মধ্যে নেই।'

"নীতি বলল, 'কেন?'

"আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'এ ত সেই বাল্যপ্রেম, বাল্যবিবাহ, অশিক্ষা আর অকাল-সন্তান। এই দায়িত্বহীনতার মধ্যে প্রগতি কোথায়?'

"ওরা আর তর্ক করল না। পাছে আমি আরও রেগে যাই, রেগে গিয়ে বিষম খেয়ে বসি। একদিন সেই রকমই এক কাণ্ড ঘটেছিল।

"কিন্তু সত্যিই আমি রাগ করিনি। সেই আগের মত জ্বালা আর নেই। ঘা অনেক শুকিয়ে গেছে। তবু এখনও সরোজদের কথা মনে হলে আমি ভারী একটা অস্বস্তি বোধ করি। রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে মাঝে মাঝে আমি ওদের কথা ভাবি। সরোজ তার ছেলে বউকে কী করে বাঁচাবে? ওই বিদ্যেবুদ্ধি আর ওই রোজগারে কী করে ছেলেকে মানুষ করবে, লেখাপড়া শেখাবে? আমি যেটুকু করেছি, ও ত সেটুকুও করতে পারবে না।

"আমার নবু মাঝে মাঝে অনুপ্রাস দিয়ে কথা বলতে ভালবাসে। সে বলে, 'বাবা, শুধু কম্প্যাশন থাকলে হয় না, সেই সঙ্গে প্যাশনও থাকা চাই।'

"কিন্তু বলতে পারেন, মানুষ আর কত-কাল এই যুক্তি-বুদ্ধিহীন বিচার-বিবেচনাহীন প্যাশনের দাসত্ব করবে?' "

সুধাবিন্দুবাবু তাঁর বক্তব্য শেষ করে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ দুটি আরও কিছুক্ষণ ধরে প্রশ্নবোধক হয়ে রইল। একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি ফের জিজ্ঞাসা করলেন, "কী, কথা বলছেন না যে?"

হেসে বললাম, "আমার কথা আপনার কাহিনীর মধ্যেই আছে।"

GOVERNMENT LIBRARY Cooch Behar
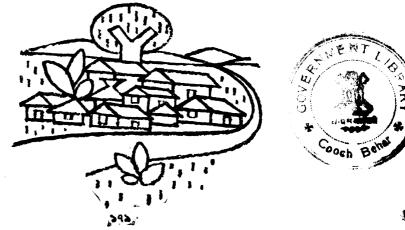
হিন্দী সাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল মালিক মহম্মদ জয়শী যখন "পদ্মাবৎ" কাব্য রচনা করেন, তখন তিনি বুঝতে পারেননি যে, সাড়ে চার শ বছর পরে হিন্দী ভাষাই হবে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা। সে-যুগে হিন্দীর না ছিল কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য, না ছিল কোন জাতীয় মর্যাদা। হিন্দী সাহিত্যের যে কয়টি গ্রন্থ কালের বিচারে আজও টিকে আছে, তার মধ্যে কবি জয়শীর "পদ্মাবৎ" কাব্যের নাম করা যেতে পারে। জয়শী আরও কতকগুলি কাব্যগ্রন্থ হিন্দী ভাষায় রচনা করেছেন। তিনি হিন্দী সাহিত্যকে নানা দিক দিয়ে শক্তিশালী করে তুলেছেন। হিন্দী সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে কবি জয়শীর নাম অমর অক্ষরে লেখা থাকবে। হিন্দী সাহিত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকবে তাঁর কীর্তিকথা। বর্তমান প্রবন্ধে মালিক মহম্মদ জয়শীর জীবনকথা ও সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

"জায়েশ" অযোধ্যা প্রদেশের একটি ছোট শহর। এখানকার জলবায়ু খুব স্বাস্থ্যকর। এককালে রাজপুতদের "ভোরা" গোত্রের বসতিস্থান ছিল এই জায়েশ নগর। প্রায় সাড়ে ন শ বছর পূর্বে সুলতান গিয়াসুদ্দীনের সময় সৈয়দ নাজেমুদ্দিন জায়েশ অঞ্চল অধিকার করেন। তিনি এখানে নূতনভাবে বসবাস আরম্ভ করলেন। এ-অঞ্চলের নাম জায়েশ কেন হল সে-সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এখানে প্রচুর সৈন্যের সমাবেশ হত। সৈন্যেরা পরস্পরকে জয়োঽস্তু বা জয় হক বলে অভ্যর্থনা করত। অনেকের মতে "জায়েশ" শব্দটা জয়োঽস্তুর অপভ্রংশ। আবার কেউ কেউ বলেন যে, "জায়ে আয়েশ" বা আরামের স্থান থেকেই জায়েশ শব্দের উৎপত্তি। বস্তুত এই স্থানটি এক যুগে আনন্দধামই ছিল। কথিত আছে যে, সৈয়দ নাজেমুদ্দিন এখানকার জলবায়ুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বলেছিলেন, "জায়েই আস্ত" অর্থাৎ এই সেই স্থান, যে-স্থান তিনি অনুসন্ধান করছিলেন।

এই জায়েশ শহরে হিন্দুস্থানের বুলবুল মালিক মহম্মদ জায়েশ ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই জায়েশ থেকেই তিনি খ্যাতিলাভ করেন। সেইজন্য তাঁকে বলা হয় "জয়শী"। কবির পিতার নাম মালেক সেখ শরীজ। মোগল সম্রাট বাবর তখন দিল্লীর রাজতক্তে অধিষ্ঠিত। জায়েশ শহরের যে-গৃহে কবি মালিক মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন, তার ভগ্নাংশ এখনও বিদ্যমান আছে। কবি শৈশবেই পিতৃহীন হন। সাত বছর বয়সের সময় তিনি কঠিন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। জীবনের কোন আশা ছিল না। বহু চিকিৎসার পর তিনি সে-যাত্রা রক্ষা পেলেন বটে, কিন্তু বিনিময়ে তাঁকে দিতে হয়েছিল অনেক কিছু। রোগ-মুক্তির পর তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেল। একটা কানেও কম শুনতে পেতেন। তাঁর মুখমণ্ডল এমন কুৎসিত হয়ে গেল যে, অপরিচিত লোক তাঁকে দেখলে ভয় পেত। আর হাত-পা এমনভাবে অবশ হয়ে গেল যে, তাঁকে চিরদিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হত। তিনি "পদ্মাবৎ" কাব্যে তাঁর দেহের এই অবস্থার কথা করুণ ভাষায় উল্লেখ করেছেন। কথিত আছে পাঠান-সম্রাট শেরশাহের দরবারে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁর কুৎসিত চেহারা দেখে ব্যঙ্গের হাসি হেসেছিলেন। তাঁকে কবি মৃদু-ভাষায় বলেছিলেন, "মাটি দেখে হাসছেন কেন।"

জয়শী কোনরকমে বসন্ত রোগ থেকে মুক্তি পেলেন বটে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তাঁর জননী স্বর্গধামে চলে গেলেন। এখন তিনি পৃথিবীতে একাকী; তাঁকে দেখা-শুনা করবার কেউ থাকল না। এ-অবস্থায় অনেকেই ফকির ও সাধুসঙ্গ লাভ করে জীবনের গতির পরিবর্তন করে। তিনিও সাধুসন্তদের সঙ্গে মিশে গেলেন। তাঁদের সংসর্গে তাঁর কুৎসিত চেহারার জন্য কেউ তাঁকে বক্র ইঙ্গিত করত না। সেজন্য তাঁকে কোনপ্রকার মনঃকষ্ট পেতে হত না।

তিনি এখন থেকে সাধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁদের সংস্রবে এসে তাঁর কবিত্বশক্তির উন্মেষ হতে লাগল। প্রথম প্রথম তিনি ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে কবিতা রচনা করতেন। আর তা যত্রতত্র পড়ে শুনাতেন। তাঁর সামান্য কিছু পৈতৃক ভূসম্পত্তি ছিল। সাধুসঙ্গে থাকলেও তিনি নিজেই তার দেখাশুনা করতেন। এতেই তাঁর গ্রাসাচ্ছাদন হয়ে যেত। কোথাও হাত পাততে হত না। "মালিক" ছিল তাঁর বংশের উপাধি। দরবেশ ও ফকিরবেশে থাকতেন বলে তাঁকে বলা হত "মোহাম্মাকে হিন্দ" "শেখে হিন্দ"। কোন কোন জীবনীতে তিনি এই নামে উল্লিখিত হয়েছেন।

মালিক মহম্মদ জয়শী দরবেশের বেশে থাকতেন বটে, কিন্তু তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি। তিনি বিবাহ করেছিলেন এবং কালক্রমে সাত পুত্রের পিতা হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবিত অবস্থাতে এই সাতটি পুত্রই একই দিনে একই সঙ্গে মারা যায়। তাঁদের মৃত্যু সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি এইরূপঃ—জয়শীর পীর বা ধর্মগুরুর নাম শাহ মোবারক বুদ্‌লা। তিনি চামড়ার কাপড় ব্যবহার করতেন। কিন্তু শিষ্য মালিক মহম্মদ গুরুর এ-পোশাক মোটেই পছন্দ করতেন না। তাঁর পীর যাতে চামড়ার বস্ত্র ব্যবহার না করেন, সেজন্য তাঁকে বহুবার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। অবশেষে কবি "পুস্তিনামা" বা চামড়া কাব্য নাম দিয়ে একটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করেন। তাঁর পীর কবিতাটি শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হন। তখন তিনি ক্রোধভরে বলে উঠলেন, "ওরে আঁটকুড়ো (নিঃসন্তান) তুই কি জানিস না যে, তোর পীর চামড়ার কাপড় পরে!" জয়শীর সন্তান ছিল সত্য। কিন্তু গুরুর বাক্য অব্যর্থ। ঠিক সেই সময় খবর এল, তাঁর পুত্রগণ একসঙ্গে আহারে বসেছিল, কিন্তু ঘরের ছাদ ভেঙে পড়ায় তারা একসঙ্গে ছাদ চাপা পড়ে মারা গিয়েছে। অভিশাপ এমনভাবে ফলবে, তা পীর সাহেবও বুঝতে পারেননি। তিনি খুবই দুঃখিত হলেন। তখন তিনি এই বলে আশীর্বাদ করলেন যে, সাতটি ছেলের প্রাণের বিনিময়ে তিনি দ্বিগুণ ফললাভ করবেন। এবং তাঁর চৌদ্দটি গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করবে। বাস্তবিক তিনি চৌদ্দটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সবগুলিই প্রসিদ্ধিলাভ করেছে।

কবি জয়শী তাঁর দীর্ঘ জীবনে বহু দুঃখকষ্ট ও বিরহ-বেদনা সহ্য করেছেন। এসব দুঃখকষ্ট সইতে হয়েছিল বলে তাঁর কবিতা এত মর্মগ্রাহী। ব্যথা-বেদনাই তাঁর কবিতার প্রাণ। ইসলামের পরিবেশে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি সর্বদা সাধুসন্ত ও ফকির দরবেশের সঙ্গে কাটাতেন। তাঁদের সংসর্গ তাঁর অন্তরকে

উদার করেছিল। তাই তিনি একান্ত বিশ্ব-প্রেমিক হতে পেরেছেন। তিনি সকল শ্রেণীর লোককে ভালবাসতেন। অকৃত্রিম মানবতাবোধের ফলে তিনি এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথ সংকীর্ণ নয়। নানা পন্থায় তাঁকে পাওয়া যায়। তিনি এক স্থানে লিখেছেন, "আকাশে যতগুলি নক্ষত্র আছে, ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করবার ততগুলি পথ আছে।"

তিনি কোন প্রচলিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেননি। তবে তাঁর কাব্য ও জীবনেতিহাস থেকে জানা যায় যে, তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল গভীর। তাঁর কাব্যে জ্যোতিষ, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরাণিক দেবদেবী, ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে বহু নির্ভুল তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর কাব্যের স্থানে স্থানে রাশিচক্রের এমন সব ইঙ্গিত আছে যে, মনে হয় তিনি তৎকালজ্ঞাত জ্যোতিষশাস্ত্র জানতেন। তিনি আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষা জানতেন। কোন কোন স্থানে সংস্কৃত শ্লোকের অবিকল পদ্যানুবাদ আছে।

কিন্তু কেবল পুঁথিগত বিদ্যাতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। সেই সঙ্গে তিনি অর্জন করেছেন বাস্তব জীবনের বহু অভিজ্ঞতা। তিনি ছিলেন চিন্তাশীল লেখক। বিশাল ছিল তাঁর সাধারণ জ্ঞানের পরিধি। মানবসমাজের সুখ-দুঃখ, প্রেম, বিরহ ও আরও নানা সমস্যার কথা তিনি জানতেন। তিনি ফকিরের মত জীবন ধারণ করতেন। প্রেম ও ভালবাসায় তাঁর হৃদয় ছিল পূর্ণ। বস্তুত ভালবাসা ব্যতীত কেউ তাঁর হৃদয় জয় করতে পারেনি। জাগতিক কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতেই তিনি ভালবাসতেন। কিন্তু তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকে জীবজগতের নানা সমস্যার দিকে টেনে আনবার জন্য চেষ্টা করতেন। সেইজন্য তিনি সর্বশ্রেণীর ও সর্বধর্মের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। তাঁর এই উদার হৃদয়ের জন্য তাঁর কবিপ্রতিভার খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। সরল সহজ গ্রাম্যমানুষ তাঁর কবিতা এইজন্য পাঠ করত যে, তিনি তাদের মনের কথা নিখুঁতভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি যেন তাদেরই আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। আবার অন্যদিকে তাঁর বহু কবিতায় মরমী ভাব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল। "আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়"—এই মহাজন-বাক্য তিনি মেনে চলতেন। তাঁর খ্যাতি যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন তাঁকে দেখবার জন্য দূরদূরান্ত থেকে বহু লোক আসত তাঁর গৃহে। কিন্তু তারা স্তম্ভিত হয়ে দেখত যে, এত বড় সাধক কবি নিজের হাতে কৃষি-কাজ করছেন, অথবা দীনবেশে কোন সাধুর

পূজার দিনগুলি মধুময় হউক

দেশের ও জাতির সেবায় নিয়োজিত

সিদ্ধেশ্বরী কটন মিলস্ প্রাইভেট লিঃ

মিলস্ঃ অনন্তপুর হাওড়া
অফিসঃ ৫৮, ক্লাইভ স্ট্রীট কলিকাতা—৭
ফোন ঃ ৩৩—৩৭৫৯

নিত্য প্রয়োজনীয় ধুতি ও শাড়ী

পশ্চিম বাংলায় সূতার কলের বড়ই প্রয়োজন

সেই প্রয়োজন মেটাতে এগিয়ে এসেছে

সর্বাধুনিক যন্ত্রসমন্বিত সূতাকল

অনন্তপুর টেক্সটাইলস্ লিমিটেড

মিলস্ঃ অনন্তপুর হাওড়া
অফিসঃ ৫৮, ক্লাইভ স্ট্রীট কলিকাতা—৭
ফোন ঃ ৩৩—৩৭৫৯

সংগে বসে তত্ত্বকথা আলোচনা করছেন। তখন এই মহান ব্যক্তির নিকট তারা শ্রদ্ধায় মাথা নত করত।

কবি জয়শী দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটির মধ্যে কিছুটা অতিরঞ্জন থাকতে পারে। কিন্তু এর থেকে তাঁর মহৎ জীবনের কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। ইমঠির রাজার বেতনভোগী একটি ব্যাধ ছিল। সে সর্বদাই রাজার সংগে থাকত। কবি জয়শী এই ব্যাধকে খুব সম্মান দেখাতেন এবং তাকে সমীহ করে চলতেন। দরকার পড়লে তার জন্য রাজার নিকট সুপারিশও করতে কুণ্ঠিত হতেন না। একটি সামান্য ব্যাধকে কেন তিনি এত সম্মান দেখান, অমাত্যগণ এর কারণ জানতে চাইলেন। তখন তিনি বললেন, "যে আমার ভাবী হত্যাকারী, তাকে কেন সম্মান দেখাব না?" তখন তাঁর কথায় তাৎপর্য কেউ বুঝতে পারেনি। তাঁর কথা শুনে রাজা সেই ব্যাধকে তৎক্ষণাৎ বধ করতে চাইলেন। কিন্তু কবি বাধা দিলেন। অতঃপর সাবধানতার জন্য রাজার আদেশে ব্যাধের নিকট থেকে সমস্ত অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হল। কিন্তু বিধির বিধান অলংঘনীয়। এক অন্ধকার রাত্রে সেই ব্যাধটি ঘরে ফিরছিল। পথের মধ্যে ছিল এক ভীষণ জংগল। জংগলে বাঘের উপদ্রব ছিল। একটি বন্দুক যোগাড় করে সে জংগলের ধার দিয়ে বাড়ির পথে যাত্রা করল। সেই সময় একটু দূরে সে বাঘের ডাকের মত একটা শব্দ শুনতে পেল। অমনি শব্দ লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়ে দিল। বন্দুকের শব্দে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল। কিন্তু এ কী? কাকে সে হত্যা করল? এ যে মানুষ! বস্তুত যাঁকে লক্ষ্য করে ব্যাধটি গুলী ছুঁড়েছিল, তিনি মানুষ। মহামানুষ। স্বয়ং জয়শী। ব্যাপার এই যে, কবি প্রত্যহ অর্ধরাত্রে জংগলের নিস্তব্ধতার মধ্যে ঈশ্বরের ধ্যানে তন্ময় হয়ে চিৎকার করতেন (জিক্‌র)। লোকের কানে সেই চিৎকার-ধ্বনি বাঘের ডাকের মত শোনাত। ব্যাধটিও সেই ভুল করেছিল। সেই রাত্রে রাজা স্বপ্ন দেখলেন যে, তাঁর সেই ব্যাধটি কবি জয়শীকে হত্যা করে ফেলেছে। অনুসন্ধান করে জানা গেল, তাঁর স্বপ্ন সত্য। তিনি শোকে দুঃখে একেবারে ভেঙে পড়লেন। তাঁর প্রাসাদের উত্তরদিকে একটি নির্জন স্থানে কবির দেহ সমাহিত করা হল। তাঁর কবরের তত্ত্বাবধানের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হল। সমাধির পাশে প্রত্যহ কোর-আন পাঠের জন্য একজন "কারী" (যে কোর্-আন পাঠ করে) নিযুক্ত হল। বহুদিন পর্যন্ত রাজার ব্যয়ে এই নিয়ম চালু ছিল। জয়শী বেঁচে ছিলেন প্রায় ১০৪ বৎসর। তিনি মোট চৌদ্দটি গ্রন্থ রচনা করেনঃ—(১) আখ্‌রাওয়াত, (২) পদ্মাবৎ, (৩) সাখ্‌রাওয়াত, (৪) চাম্পাওয়াত, (৫) এত্‌রাওয়াত, (৬) মিস্‌কাওয়াত, (৭) চত্‌রাওয়াত, (৮) খর্‌রাওয়াত, (৯) সুরাইনামা, (১০) মাখ্‌রানামা, (১১) পুস্তিনামা, (১২) মহ্‌রানামা, (১৩) ভুলিনামা, (১৪) আখ্‌রী কালাম্।

এদের মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। "আখ্‌রাওয়াত", "পদ্মাবৎ" এবং "আখরী কালাম", এই তিনটি গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়। কবির গ্রন্থের ভাষা হিন্দী। দেবনাগরী ও উর্দু এই দুই লিপিতেই এই তিনটি গ্রন্থ প্রচলিত। "পদ্মাবৎ" রচনার এক শ বছর পরে আরাকান রাজার আদেশে তার বঙ্গানুবাদ হয়েছে। "পদ্মাবৎ" ধীরে ধীরে উত্তর ভারতের সর্বত্র সমাদর লাভ করেছে এবং নানা ভাষায় তার অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলার প্রাচীন কবি আলাওল হিন্দী কাব্যের ভাবানুবাদ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর এই অনুবাদ "পদ্মাবতী" নামে সুপরিচিত।

কবি জয়শীর "আখ্‌রাওয়াত" গ্রন্থটি আখ্‌লাক বা আচরণ ও কর্তব্য সম্বন্ধে বহু সদুপদেশে পূর্ণ। তাঁর "আখেরী কালাম" "পদ্মাবৎ"-এর বহু পূর্বে লেখা হয়েছিল। অবশ্য "পদ্মাবৎ"-এর সঙ্গে তাঁর আর কোন গ্রন্থের তুলনাই হয় না। হিন্দী প্রেম-মার্গের মর্মবাণী হচ্ছে তার গভীর আধ্যাত্মিকতা। কবি জয়শীর বহু প্রেমের কবিতা আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। "পদ্মাবৎ" কাব্যগ্রন্থ একটি প্রেমের কাহিনী। কিন্তু এ-প্রেম কেবল দৈহিক প্রেম নয়—এর অন্তরালে আছে ইন্দ্রিয়াতীত ঐশ্বরিক প্রেমের স্পষ্ট ইংগিত।

জয়শী রাজপুত ও মুসলমানদের ইতিহাস থেকে বহু উপকরণ সংগ্রহ করে এই গ্রন্থ লিখেছেন। হিন্দু ও ইসলামিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে একত্র করে এমনি কাব্য সৃষ্টি করেছেন, যা সকল সম্প্রদায়কে আনন্দ দিয়েছে। এক সময়ে "পদ্মাবৎ" হিন্দু ও মুসলমানদের ঘরে ঘরে পরম আগ্রহভরে পঠিত হত।

এবার "পদ্মাবৎ-"এর মূল কাহিনীটি বলা যাক। এক সময়ে সিংহলের রাজা ছিলেন গন্ধর্বসেন। তাঁর কন্যা পদ্মাবতীর সৌন্দর্য ও গুণগরিমার খ্যাতি নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু গন্ধর্বসেন কোথাও পদ্মাবতীর জন্য সৎপাত্র পেলেন না। পদ্মাবতীর নিকট একটি শুকপাখী ছিল। সে অহংকার করে বলেছিল যে, সে রাজকুমারীর জন্য একটি সৎপাত্র জোগাড় করবে। কিন্তু রাজা গন্ধর্বসেন শুকপাখির অহমিকতায় ক্রোধভরে তাকে হত্যা করবার আদেশ দিলেন। পদ্মাবতী কৌশলে তার জীবন রক্ষা করলেন। পাখিটি গোপনে সিংহল ছেড়ে চলে গেল। বহু ভাগ্যবিপর্যয়ের পর সে চিতোরে এসে উপস্থিত হল। তখন চিতোরে রাজত্ব করতেন রাজা রতনসেন। তাঁর মহিষী নাগমতীও সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। রানী তাঁর সৌন্দর্যের জন্য গর্ব অনুভব করতেন। কিন্তু শুক-পাখিটি তাঁর সে-গর্ব ভেঙে দিল। সে নাগমতীর মুখের উপর বলল, "তোমার আর কী রূপ! সিংহলের রাজকুমারী পদ্মাবতীর রূপের তুলনায় তুমি কুৎসিত।" শুকপাখির কথা শুনে রানী অত্যন্ত বিচলিত হন। এদিকে শুকপাখি অবসরমত রাজা রতনসেনের নিকট পদ্মাবতীর রূপের ও গুণের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করল। এবং এ-কথাও বলল যে, "আপনিই তার সর্বাংশে উপযুক্ত।" সে-যুগের রাজারা সৌন্দর্যের উপাসক ছিলেন। পাখির মুখে পদ্মাবতীর রূপের ও গুণের কথা শুনে রাজা তাঁকে পাবার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন এবং বহু লোকলস্কর নিয়ে সিংহলে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন সেই শুকপাখিকে। লোকজনকে একটু দূরে রেখে নিজে যোগীর বেশে মহাদেবের মন্দিরে অবস্থান করতে লাগলেন। আর শুকপাখিটি সটান পদ্মাবতীর কাছে চলে গেল। তাঁর কাছে রাজা রতনসেনের গুণগরিমার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করল। তার কথা শুনে পদ্মাবতীও রতনসেনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ কাউকে দেখেননি। পূজার দিনে রতনসেন পদ্মাবতীকে দেখলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। আবার ওদিকে রতনসেনকে দেখে পদ্মাবতীর প্রাণে আগুন জ্বলে উঠল। মহাদেব ও পার্বতী তাঁদের নিরাশ করলেন না। নানা কৌশল অবলম্বন করে তাঁদের ভালবাসার পরীক্ষা করলেন। তারপর মহা ধুমধামের সঙ্গে তাঁদের বিয়ে হয়ে গেল।

ওদিকে চিতোরের রাজপ্রাসাদে রানী নাগমতী রাজার বিরহে প্রায় পাগলিনী হয়ে উঠলেন। তিনি যাকে দেখেন, তার কাছেই নিজের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করেন, আর রাজার সন্ধান এনে দিতে বলেন। অবশেষে রানীর দুঃখ দেখে ছোট্ট একটি পাখির মনে জেগে উঠল করুণা। সে রানীর দূত হয়ে সিংহলে চলে গেল। পাখির মুখে চিতোরের দুর্দশার কথা শুনে রাজা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। সত্যি ত তিনি রাজধর্মে অবহেলা করেছেন। নাঃ, আর সিংহলে থাকলে চলবে না। এবার স্বদেশে ফিরে যেতে হবে। অবশেষে এক শুভদিন দেখে রাজা রতনসেন পদ্মাবতী আর তার সঙ্গিনীদের নিয়ে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন। কিন্তু পথে উঠল প্রবল ঝড়। এই ঝড়ে রাজা আর পদ্মাবতী বিচ্ছিন্ন হয়ে

কন্‌কনে শীতেও
শ্যামপুকুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরীর
FLEECY BACK
বা তুলাদার গেঞ্জী
সব রকমে উপযোগী
বিভিন্ন ডিজাইনে ও ১৮" হইতে ৪০" সাইজে পাওয়া যায়। বিশেষভাবে আঁশ উঠান কাপড়ে তৈরী। সহজে কাচা যায় ও পোকায় কাটে না। ত্রিশ বৎসরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
শ্যামপুকুর হোসিয়ারী
ফ্যাক্টরী প্রাইভেট লিঃ
৩নং ব্রজনাথ মিত্র লেন, শ্যামপুকুর
কলিকাতা-৯

গেলেন। বহু দুঃখ-কষ্ট ও অনুসন্ধানের পর আবার মিলিত হলেন তাঁরা। এইভাবে নানা দুর্যোগের ভিতর দিয়ে এক বছর পর রাজা চিতোরে প্রত্যাবর্তন করলেন। চিতোরের প্রজারা বিপুল সমারোহে রাজা ও নূতন রানীকে বরণ করে নিল।

কিন্তু রাজা রতনসেনের কপালে নিরবচ্ছিন্ন সুখ লেখা ছিল না। একটি সামান্য বিষয় নিয়ে দরবারের জ্যোতিষী রাঘবচেতনের সঙ্গে রাজার হল মনোমালিন্য। রাঘবচেতন প্রতিশোধ নেবার জন্যও বটে, এবং প্রতিদানে পুরস্কার লাভের আশায়ও বটে, পাঠান-সম্রাট আলাউদ্দীনের দরবারে উপস্থিত হলেন। রাঘবচেতন আলাউদ্দীনের কাছে পদ্মাবতীর রূপ-গুণের প্রশংসা করলেন। সম্রাট তাঁর কথায় বিশ্বাস করে পদ্মাবতীকে লাভ করবার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। রাঘবচেতনের সুকৌশল ব্যবস্থায় আলাউদ্দীন আয়নার মধ্যে পদ্মাবতী বা পদ্মিনীকে দেখে ফেললেন। চিতোরে তাঁর দূত গেল। বহু প্রলোভন দেখান হল। কিন্তু কিছুতেই পদ্মাবতীকে পাওয়া গেল না। সমস্ত চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, তখন আলাউদ্দীন বাহুবলের সাহায্যে পদ্মাবতীকে করায়ত্ত করতে চাইলেন। একটা খণ্ডযুদ্ধও হয়ে গেল। এই যুদ্ধে রাজপুতেরা দেখালেন তাঁদের সহজাত বিক্রম ও তেজস্বিতা, কিন্তু যুদ্ধে রতনসেন বন্দী হলেন। পদ্মাবতী কৌশলে রতনসেনকে উদ্ধার করলেন। কবি রঙ্গলাল এই ঘটনার উপরে 'পদ্মিনী' কাব্য লেখেন।

সে যাই হক, তারপর রতনসেন চিতোরে প্রবেশ করবার জন্য অগ্রসর হলেন। কিন্তু তিনি স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে শত্রুপক্ষ চিতোর দখল করে বসে আছে। তিনিও সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তাঁর বীর বাহিনীর সঙ্গে আক্রমণকারী সৈন্যদের তুমুল যুদ্ধ হল। কিন্তু যুদ্ধে তিনি নিহত হলেন। তাঁর জন্য সজ্জিত চিতায় পদ্মাবতী ও নাগমতী স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন করলেন। তারপর যখন আলাউদ্দীন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন, তখন দেখা গেল সব শূন্য। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড ব্যতীত আর কিছুই তাঁর দৃষ্টিগোচর হল না।

আলাউদ্দীন যে কৌশলে পদ্মাবতীকে দেখেছিলেন, এ-কথা বহু ইতিহাসে লেখা আছে। বস্তুতঃ কবি জয়শী ইতিহাস ও কল্পনাকে এমনভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন, আর এমন অনুপম ভাষায় বর্ণনা করেছেন যে, কল্পনা ও বাস্তবের পার্থক্য মোটেই ধরা যায় না। কবির কল্পনা ইতিহাসের মতই সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে। পদ্মাবতী কাব্যের গল্পাংশই শেষ কথা নয়। মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণ, অপরূপ বর্ণনাভঙ্গী, সে-যুগের সমাজের চিত্র, হিন্দু-মুসলিম সমাজের আচার ব্যবহার, সে-যুগের যুদ্ধ-পদ্ধতি—এসব ত আছেই, তা ছাড়া আছে ভাষার মাধুর্য ও চমৎকারিত্ব। পদ্মাবতী হিন্দী-সাহিত্যে কবি জয়শীর একটি অমূল্য উপহার। কবি জয়শী যখন গল্পে উল্লিখিত নায়ক বা নায়িকার মনের অবস্থার বর্ণনা করেছেন, তখন তার বাস্তবতাবোধ দেখে মুগ্ধ হতে হয়। মানব-চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিখুঁতভাবে উদ্ভাসিত করা হয়েছে। রাজার অমাত্যদের ষড়যন্ত্র, মেয়েদের বেশভূষা, কেশ প্রসাধন, চরিত্র অংকন ইত্যাদি খুব সুন্দর হয়েছে। কবি সেই সঙ্গে চরিত্রের সততা ও ভদ্রতা, বীরত্ব ও স্বদেশ-প্রেমের অনুপম চিত্র এঁকেছেন। তিনি গল্পচ্ছলে পদ্মাবতীর কাহিনী লিখেছেন বটে, কিন্তু সমগ্র কাব্যটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে বিদ্যমান আছে একটি রূপক কাহিনী। কাব্যটি পাঠ করলে পাঠকের অন্তর শুদ্ধ ও পবিত্র হয়ে ওঠে। ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রেমের অপূর্ব সমন্বয় হয়েছে জয়শীর এই কাব্যে। সাড়ে চার শ বছর গত হয়েছে, তবু কবি জয়শীর কাব্য তাঁর বৈশিষ্ট্য হারায়নি। আজ উত্তরপ্রদেশের নানা স্থানে তাঁর কাব্য আদরের সঙ্গে পঠিত হয়। তাঁর বহু কবিতা প্রবাদ-বচনের মত ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আজ হিন্দী ভাষার পালাজাগরণের দিনে কবি জয়শীকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।
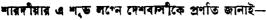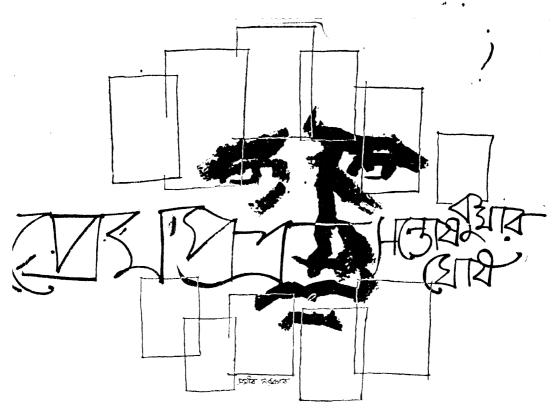
কনক, আমি সুধাময়। তোমাকে যে ভালবেসেছিল। এবং যার ভালবাসার ভয়ে তুমি এখন [illegible] পালিয়ে রয়েছ।

এ-লেখাটা শেষ পর্যন্ত তোমাকে হয়ত পাঠাব না, পাঠাতে সাহস হলেও রুচি হবে না, তবু লিখছি। এই ভরসায় যে, কিছু হালকা হওয়া যাবে। নিজের নামটা আগে-ভাগে লিখে রাখলুম, ফলে শেষের পৃষ্ঠাটা তোমাকে প্রথমেই দেখে নিতে হবে না।

মধ্যবয়সী একটা মানুষের ভালবাসাকে ভালুকের মত ভয় পাও, কনক, তুমি কী! একটু যদি ধৈর্য থাকত তোমার, তবে জানতে, সে-ভালবাসার নখ-দাঁত কোনটাই নেই। সুতরাং পালাবার প্রয়োজন ছিল না।

এখন তুমি ত অনেক দূরে কনক, সত্যি করে বল ত, তোমাদের জানালা থেকে আমাকে যখন দেখতে, তখন তোমার মনে ঠিক কী ভাব জাগত। মাথার দখল নিয়ে লড়াই করে কাঁচা আর পাকা দু তরফের চুলই যার সাফ হয়ে এসেছে, সেই লোকটি টেবিলে বসে ঝিমোত, গালে তার তিন দিনের বাসী দাড়ি, ঢিলে লুঙিগতে কষে-বাঁধা কোমর। লোকটি কলম খুলে কাগজ সামনে নিয়ে বসে থাকত। মাঝে মাঝে লিখত। কী, জান? মানে-নেই এমন টুকিটাকি। ছাতের কার্নিশে বসে একটা কাক কাকিনীটার ঘাড়ের রোঁয়া ঠুকরে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, আর একটা অবাক কাঠবিড়ালী একটু দূর থেকে তাই তারিফ করছে, লোকটি তার খাতায় এই জরুরী খবরটি টুকে রাখল। কিংবা কোনদিন দুপুরের দাউদাউ রাগের পরে ক্ষ্যাপাগল আকাশটা হঠাৎ সোরগোল করে হয়ত কান্না জুড়ে দিয়েছে, লোকটি তখন লেখা ফেলে পিছনের পানাপুকুরে বৃষ্টির খই ফুটেছে কিনা দেখতে দৌড়ল। এ-সব কোন কাজে লাগে না, না-কাহিনী, না-ডায়েরি, তবে খাপছাড়া লোকটার কথাই আলাদা!

লুকিও না, কনক, আমি জানি, তুমি লুকিয়ে দেখতে। কিন্তু তোমার কী মনে হত। কৌতুক? সম্ভব। ভয়? বোধহয় না; তখনও আমাকে ভয় করবার কোন কারণ ঘটেনি। কিন্তু সে যখন কিছুই লিখতে না পেরে কাগজ কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিত, অস্থির হয়ে এ-দিক ও-দিক চাইত, তখন? করুণা কি হত, কনক? কমবয়সী মেয়েরা কি প্রৌঢ় পাগলামিকে করুণাও করে?

দেখ, কনক, সময়কে যদি বলা যায় বহতা পানি, এক-একটা বয়স তবে তার পাড়ের এক-একটা বাঁধান ঘাট; উজান থেকে মানুষ কতটা এল সে-হিসাব যার সিঁড়িতে খোদাই করা আছে। ভাঁটির ঘাটে দাঁড়িয়ে পিছনে চাইলে উজানের ঘাট বড় জোর ঝাপসাভাবে চোখে পড়বে; কিন্তু মানুষ সেখানে কখনও ফেরে না, ফিরতে পারে না।

কেউ যা পারেনি, ভেবেছিলুম আমি তা পারব। উজানে ফিরব। জানতুম না, প্রকৃতির নিয়মের উপর জোরজুলুম চলে না।

তোমার মনে আছে, কনক, আমার বসবার ঘরের জানালাটার পাশে একদিন বিকালে আমরা দুজন দাঁড়িয়ে ছিলুম? পর্দা সরিয়ে তুমি কী যেন দেখছিলে। হয়ত রাস্তার ভিড়। কিংবা কিছুই দেখছিলে না, শুধু চেয়ে ছিলে। আমি পিছনে এসে দাঁড়ালুম। তোমার কাঁধে সন্তর্পণে একটি হাতও রেখেছিলুম মনে পড়ছে। স্পর্শকাতর লতার মত তুমি কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেলে; সরে যেতে চাইলে।

আমার ইচ্ছাটা যদি নিজেই নিজের বিধি হত, তবে সেই মেঘে-ঢাকা কালামুখী বিকেলে ব্যাপারটা কতদূর গড়াত, বলতে পারিনে। একটু দূরে গিয়ে তুমি জোরে

জোরে শ্বাস নিচ্ছ, আমার দিকে অপলক চেয়ে একটু একটু করে পিছনে হঠছ।

হঠাৎ আমি অস্ফুট গলায় নিজেকে বলে উঠতে শুনলুম, "বন্ধ কর, বন্ধ কর জানালাটা।" বলতে বলতে আমি পাল্লা দুটো নিজেই টেনে ধরলুম। ঠাস-ঠাস চড় পড়ার মত দুটো শব্দ হল। আমি দম নেবার জন্যে একবার চোখ বুজেছি, তুমি সেই অবসরে ছুটে পালিয়ে গিয়েছ।

কনক, তুমি আজও জান না, সেদিন আমার কী হয়েছিল। কেন হঠাৎ জানালাটা টেনে বন্ধ করে দিলুম।

আমার স্ত্রী যূথিকা কিন্তু জানত, কেন। বসবার আর শোবার ঘরের মাঝখানে একটাই ত পর্দা, ফ্যানের হাওয়া সেটাকে থেকে-থেকে মুঠোর মত পাকিয়ে আবার খুলে দেয়। বিছানায় বালিশের উপর বালিশ সাজিয়ে যূথিকা এ-দিকেই চেয়ে ছিল, সব দেখছিল।

একটু পরে যখন ও-ঘরে গেলুম, সে বালিশের স্তূপে পিঠ ঠেকিয়ে সোজা হয়ে বসল। একটা চোখ ছোট করে তাকিয়ে বলল, "কে এসেছিল।"

তোমার নাম বললুম।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় চোখটাকে বন্ধ করে যূথিকা ভাবনার ভান করল। তারপর দুটো চোখই খুলে বলল, "বুঝেছি। সিনেমায় নামবে বলে ঘোরাঘুরি করছে, পাড়ার সেই খারাপ মেয়েটা, কেমন? তা হঠাৎ অমন দুদ্দাড় ছুটে পালাল কেন?"

সব জানে, তবু আমার মুখে শুনতে চায়। বন্ধ জন্তুকে খোঁচা দেবার বর্বর সুখ।

তিক্ত গলায় বললুম, "জানি না। তুমিই বল না।"

"জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছিলে বলে।"

চমকে উঠলুম। অত্যন্ত কর্কশ গলায় জিজ্ঞাসা করলুম, "জানালা কেন বন্ধ করলুম, তা-ও জান বোধ হয়?"

অদ্ভুত চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে যূথিকা ধীরে ধীরে বলল, "তা-ও জানি। জানালার ঠিক বাইরে কচি সজনে গাছটার পাশে ন্যাড়া-মরা নিম গাছটাকে দেখে হঠাৎ ভয় পেয়েছিলে।"

অনেক দিন কল্পনা করতে চেষ্টা করেছি, কোন মানুষ যদি হাসতে হাসতে হঠাৎ মরে যায়, তবে তার মুখে কেমন হাসি ফুটে থাকে। চোখের কোল হয়ত একটু কুঁচকে যায়, সামান্য ফাঁক হয় ঠোঁট দুটি। আর তার কোন নড়চড় কিছুতে হয় না। যূথিকার মুখে সেই স্থির, বোবা হাসি দেখতে পেলুম। কনক, চিত্রটি সম্পূর্ণ করতে আমি সেদিন যূথিকার চোখের মণি উপড়ে নিতে পারতুম।

আজ বুঝতে পারছি, যূথিকা ঠিকই বলেছিল। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সেই খণ্ড-মুহূর্তে সহসা মনে হয়েছিল, মরজন্ম ঘুচে গিয়ে লোকান্তরে আমরা উদ্ভিদ্-দেহ পেয়েছি; সবুজ-সজীব সজনের ডালের পাশে ন্যাড়ামরা নিম হয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি।

জানালাটা সেদিন থেকে বন্ধই থাকত। তবু কনক, তোমার কাছে আজ অকপটে স্বীকার করছি, মাঝে মাঝে এক একদিন আমি লুকিয়ে জানালাটা খুলতুম। কেন, আমিও জানিনে। মরা নিমের ডালে একটি দুটি কচি পাতা ফুটেছে দেখতে পাব, হয়ত গোপন মনে এই অসম্ভব আশা লালন করেছি। চুয়ান্ন বছরের প্রবীণ শরীর একটি বাতুল ইচ্ছার নাড়িকে আশ্রয় করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেয়েছে।

এইখানে যূথিকার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খোলাখুলি আলোচনা করলে ভাল হয়। উপরে তার যে-ছবিটি এঁকেছি তা থেকে যদি ধারণা কর কনক যে, আমরা বিবাহিত জীবনে সুখী হইনি, তবে ভুল করবে। যদি মনে কর, যূথিকা স্বভাবক্রূর সামান্য রমণী, তবে তার প্রতি অবিচার করা হবে।

আসলে যেদিন যূথিকা হাসপাতাল থেকে দুরারোগ্য অসুখ নিয়ে ফিরে এল, সেদিন থেকেই এই জটিলতার শুরু। সূতিকায় ত কত শিশুই মরে, কিন্তু তাদের মায়ের দেহ-মনে এমন ছাপ আর কেউ রেখে যায় না। যূথিকা জেনে এসেছিল সে আর কোন দিন মা হবে না। তার চোখের চাউনিই বদলে গিয়েছিল।

প্রথমে দিন কতক বিছানাতেই আয়না-চিরুনি, পাউডার আর স্নো নিয়ে পা ছড়িয়ে বসত। মুখ দেখত আর মুখ দেখত। রঙ বুলিয়ে ঠোঁট দুটি করত টুকটুকে। আঙুল দিয়ে সিঁথি চিরে চিরে পরখ করত ক'টা চুল পাকল। গুনত, ভুল করত, ফের গুনত।

হঠাৎ-বা কোনদিন জিজ্ঞাসা করত, 'এটা কী সাল বল ত?' শুনে নিয়ে হিসাব করতে বসত।...'এক, দুই, তিন...আমার তবে এখন চলছে চুয়াল্লিশ। না-না, হল না, তেতাল্লিশ। কী জানি, ঠিক গুনতে পারছি না। তুমি একবার বলে দেবে?'

ভয় হত, বয়স গুনে গুনে আর পাকা চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাগল না হয়ে যায়।

এ-ভাবটা মাস তিনেকের বেশী স্থায়ী হয়নি। একদিন দেখি, শিয়র থেকে সরে গেছে আয়না, বালিশ-বিছানার আনাচে-কানাচ থেকে পাউডার কুঙ্কুম ইত্যাদি বিলাসের সব উপচার অন্তর্হিত।

কাছে যেতেই বলল, "উঁহু, এস না, এস না, আগে গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে এস।"

বিস্মিত এবং কতকটা বিরক্তও, জিজ্ঞাসা করেছি, "গঙ্গাজল কোথায় পাব।"

"আছে। চাকরকে দিয়ে আজ আনিয়েছি। তুমি আমাকে গীতা এনে দেবে?"

তিন দিনে যূথিকার এক অধ্যায় গীতা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তা নিয়ে আমার কোন অভিযোগ ছিল না, কিন্তু সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরলে আমাকে তার ব্যাখ্যা করে শোনাতে বসত কিনা, কনক, মুশকিল ছিল সেখানে। বিষয়ে আমার উৎসাহের অভাব তা ছিলই, কিন্তু প্রকৃত সমস্যা অন্য। যূথিকা যতদূর সম্ভব আমার ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা করছিল। দৈবাৎ গায়ে গা ঠেকত যদি, সে-পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে গঙ্গাজলের ব্যবস্থা ত ছিলই।

মজা যে একেবারেই পাইনি, তা বলব না কনক। পেয়েছি। প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ও দিয়েছি। কিন্তু ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে তখন কল্পনাও করতে পারিনি।

যূথিকা একদিন বলল, "আমি দীক্ষা নেব।"

বললুম, "বেশ ত, নাও না। গুরু-টুরু কি পেয়ে গেছ।"

"গুরু আমার ঠিকই আছে। শোন, তিনি বলেছেন তোমাকেও দীক্ষা নিতে হবে।"

"আমাকে? আমাকে আবার কেন। তোমার পুণ্যের একটু ভাগ আমাকে দিও, তবেই বৈতরণী তরে দেখবে স্বর্গে ঠিক তোমার পাশে গিয়ে হাজির হয়েছি।"

বলতে বলতে, কী সর্বনেশে বুদ্ধি হল, ঝুঁকে পড়ে যূথিকাকে বুকের উপরে টেনে নিতে গেলুম। তীব্র একটা গুলীর মত ছিটকে গেল যূথিকা, আলুথালু বেশে ভাঙা চেরা একটা বাঁশির মত গলায় চেঁচিয়ে বলল, "ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না তুমি আমাকে।" মাথায় ঠক করে কী লাগল, তুলে দেখি সেই বাঁধান শ্রীমদ্‌ভগবদ্-গীতা। যূথিকা হাঁপাতে হাঁপাতে আবার বলল, "পশু।"

সেই মুহূর্তে আমারও কী জানি কী হল, এই স্ত্রীলোকটির দিকে চেয়ে সমস্ত শরীর রী-রী করে উঠল। সব দিক থেকে নিঃস্ব এই মেয়েমানুষটার কাছে কোনদিন কিছু চাইতে পারব না, চাইলেও দেবার মত কানাকড়ির সম্বলও ওর নেই। শনের-নুড়ি চুল আর রগ-ওঠা রোগা-রোগা হাত দুটির দিকে চেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললুম, "বুড়ি!"

পলকে যূথিকাকে ফ্যাকাশে হয়ে যেতে দেখলুম। "কী, কী বললে?"

কথাটাকে জিভ দিয়ে যেন টাকার মত বাজিয়ে বাজিয়ে বললুম, "বুড়ি। বুড়ি। বুড়ি।"

ভেবেছিলুম, নুয়ে-নেতিয়ে পড়বে। কিন্তু না, ধীরে ধীরে যূথিকা নিজেকে যেন ফিরে পেল। এক-পা এক-পা এগিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল আমার সমুখে। বলল, "বুড়ি? আমি বুড়ি? আর তুমি?"

কী ছিল সেই অপলক চোখে, আমার ভিতরটা অকস্মাৎ কেঁপে উঠল। অত্যন্ত ক্ষীণ, শুকনো গলায় বললুম, "আমি কী।"

আশ্চর্য স্থির এবং প্রশান্ত ভঙ্গিতে যূথিকা বলল, "তুমিও কিছু বালকের খোকাটি নও। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তোমার ছায়াই তোমাকে সে-কথা বলে দিত। আমাকে বলে দিতে হত না।"

কনক, আয়নার দরকার হয়নি, যূথিকার চোখে আমি নিজের ছায়া দেখেছি। সে-চেহারা এক ভয়াল তান্ত্রিকের। শবাসনে বসেছে—শব তার নিজেরই শরীর। ইচ্ছা-বাসনা, সুখ-স্বপ্ন সব মটমট করে ভেঙে সামনে জ্বালান ধুনিতে আহুতি দেবে।

তুলনাটা কিছু বীভৎস হয়ে গেল, হয়ত দুর্বোধও। সোজা করে বলি। সেই সময়ে আত্মহত্যার মত কাঁচা-নাটকীয় একটা কাণ্ড করবার প্রবল লোভ মাঝে মাঝে আমাকে বিচলিত করেছে। পাহাড়ে উঠে চারদিকে চেয়ে লোকে যে শূন্যতা অনুভব করে, এ তা-ই। উঠবার পথ খাড়া ছিল, দুর্গম ছিল, কাঁটায় কাঁকরে কষ্টে, রক্তে-যন্ত্রণায় মাখামাখি অভিজ্ঞতা। কিন্তু এখন চূড়ায় উঠেছি, যা কিছু দেখার দেখে নিয়েছি, আর উঠব না, কষ্ট পাব না, কিছু নেব না, দেবও না, শুধু নেমে যাব। আরোহণের পর এই অবরোহণ।

সেই নামেমাত্র বেঁচে থাকাটাকে আমি ভয় করতে শুরু করেছি। স্বাদহীন, স্বেদহীন সেই আলুনী আয়ু নিয়ে আমি কী করব।

কনক, ঠিক এই সময়ে তোমরা এই পাড়ায় উঠে এলে। এক দিন লেখার টেবিলে বসে ফরমাশী ফিলমের স্ক্রিপ্ট লিখছি, রাস্তার ও-পাশের বাড়ির ছাদে তোমাকে দেখতে পেলুম।

দেখ, প্রথম দেখাটাকে আমরা একালে আর তেমন মূল্য দিই না, হঠাৎ-কোন-কিছুকেই না। সব সম্পর্কই পরম্পরা বেয়ে বেয়ে লতার মত জড়িয়ে ওঠে। তবু সেদিন অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে দেখেছিলুম।

ছাদের কার্নিশে কোন কিছু না ধরে পা ঝুলিয়ে বসে আছ—তোমার সেই দুঃসাহসী কিন্তু অনায়াস ভঙ্গির ছবি আমার মনে একেবারে ছাপা হয়ে গেছে। ভাল লাগল, ভয় পেলাম। তোমার বসবার ভঙ্গিকে ভাল লাগল। বেপরোয়া, সব কিছু তুচ্ছ করবার ভাবকে ভয় পেলাম। ওভাবে ছাদে পা ঝুলিয়ে আমিও একদিন বসেছি, এখন শরীর ওজনে ভারী, মনও ভীতু, এখন আর পারি না, কিন্তু তুমি পার, আর সেই পারার অহংকার লুকোবার এতটুকু প্রয়াস তোমার মধ্যে দেখলুম না। সেই ঔদ্ধত্য আমাকে মুগ্ধ করল।

তবু সেই মোহ হয়ত শুদ্ধ, নির্গন্ধ সাদা ফুলের মত অনুভূতি মাত্র হয়ে মনে বেঁচে থাকত, কিন্তু যূথিকা প্রথম থেকেই সন্দেহের নখে আঁচড়ে আঁচড়ে তাকে রক্তাক্ত ঘায়ের মত করে তুলল যে। নইলে,

তোমার সঙ্গে আমার বয়সের যা ব্যবধান, তাতে আমি দিব্য তোমার পিতৃব্য বনে যেতে পারতুম।

প্রথম বোধ হয় পাড়ারই কী একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তোমাকে গান গাইতে শুনি। সেখানে কার মধ্যস্থতায় আমাদের আলাপ হল জানি না, কিন্তু তার দিন কয়েক পরে তুমি নিজেই একদিন আমার বসবার ঘরে চলে এলে। কার কাছে শুনেছ, আমি সিনেমার জন্যে গল্প, চিত্রনাট্য, সংলাপ ইত্যাদি রচনা করে থাকি। স্টুডিও-মহলে আমার যাওয়া-আসা আছে। সামান্য পরিচয়ের ভরসায় জানতে এসেছ, আমি কিছু সুবিধা করে দিতে পারি কি না।

পারি না, কিন্তু তোমাকে সেদিন কথাটা খোলাখুলি বলতে অহঙ্কারে বেধেছিল। আশাও দিইনি। একেবারে নিরাশও করিনি। সত্যি কথা বলতে কী, আমি অবাক হয়ে তোমাকে শুধু দেখেছি। সেই সবে পরিচয়, তবু তোমার এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। এই একবার বসলে, এই উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালে। মাথায় সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে কথা বলতে গিয়ে খোঁপা একবার আলগা হয়ে পড়ল, পিছনে দু-হাত নিয়ে কনুই তুলে ফের সেটাকে বিন্যস্ত করলে। সামান্য একটা কথাতেই কৌতুক পেয়ে হঠাৎ হালকা গলায় হেসে উঠেছ। সেটাও ঈষৎ বিস্ময়কর, কিন্তু তখন অসংগত বা বেমানান মনে হয়নি।

গাম্ভীর্যের মুখোশ এঁটে বসে ছিলুম বটে, কিন্তু কনক, সেই মুখোশের ছিদ্র দিয়ে আমি তোমাকে অপলক দেখছিলুম। ঠিক তোমাকে কি? না, তোমার চাপল্যকে। যে-চাপল্য আমি ইহ-জন্মের মত খুইয়েছি, আর পাব না, তাকেই তুমি তোমার শাড়ি-ব্লাউজের মত, তোমার চোখের ক্ষীণ সুর্মা-রেখার মত, অসামান্য রুচির সঙ্গে পরে আছ।

যূথিকা সেদিনই টের-পেয়েছিল; হেসে বলেছিল, "ও-মেয়েটা তোমার কাছে কেন এসেছিল, সিনেমায় নামতে চায় বুঝি?"

সংক্ষেপে বলেছি, "হ্যাঁ।"

যূথিকা তবু থামেনি, গলায় নকল গাম্ভীর্যের ঢঙ এনে বলেছিল, "সাধু সাবধান।"

"মানে?"

"নিজেই বুঝে দেখ।"

তীব্র কণ্ঠে বলেছি, "আমার বোঝা আছে। তুমি দয়া করে তোমার ছোট মন আর খুঁতখুঁতে নাক নিয়ে এ-সব ব্যাপারেএস না।"

"না। আমার আর কী। আমার বিছানার চার পাশে ত তুমি ওষুধের শিশির পাহাড় জমিয়ে রেখেছ, তার লেবেল পড়ে-পড়েই আমার দিন কাটবে। কিন্তু আমি হাসছি তোমার কথা ভেবে। ও-মেয়ের চোখের দিকে চেয়েছ, দেখেছ, মণি দুটো না-সাদা, না-বাদামী, কী অদ্ভুত রঙের? এ-সব মেয়ে সর্বনেশে হয়, জেনে রেখ।"

কনক, সেদিন লতিকার কথায় চটেছি। কিন্তু পাড়ায় তোমার সত্যিই ত সুনাম ছিল না। ওই ক-দিনেই তোমার নামে অনেক খবর কানে এসেছে, কিছু চোখেও পড়েছে। তোমার হাবভাব ভাল না, তুমি পুরুষের সঙ্গে বড় বেশী মেশ, এমন কি, সদর রাস্তার প্রকাশ্যেই লোকের সঙ্গে সহাস্য নির্লজ্জ গল্প জুড়ে দাও। এর সঙ্গে দুপুরে হয়ত বের হও রিকশায়, ওর সঙ্গে সন্ধ্যায় ট্যাকসিতে। অনেক দিন গভীর রাত অবধিও ফেরনি, হলপ করে এমন কথা বলবারও লোক ছিল!

আর বিছানায় শুয়ে শুয়ে যূথিকা কোথা থেকে কীভাবে জানি না, সব খবরই জোগাড় করত।

প্রথম দিকে তিন-চারদিন পর-পর আসতে, পরে প্রায় রোজই আমাদের বাসায় আসা শুরু করলে। জানতে, কোন্ সময়ে আমাকে বাসায় পাওয়া যায়। যূথিকার সঙ্গেও আলাপ করে নিলে। রোজ তার ঘরেও একবার যেতে, তার কোমরের ব্যথা আর ঘাড়-ফোলাটা কেমন আছে খোঁজ নিতে। যূথিকা সামনাসামনি তোমাকে কিছু বলত না, কিন্তু মনে মনে জ্বলত, জ্বলত, জ্বলত। আড়ালে যে-সব খারাপ গালাগাল মুখে আনত, শুনলে, কনক, তুমি কানে আঙুল দেবে।

ইনিয়ে-বিনিয়ে, কথায় বিষ-ফোঁড়ন দিয়ে বলত, "মেয়েটাকে সিনেমার কাজ এখনও জুটিয়ে দিতে পারলে না বুঝি? তা বাপু আমি বলি কী, ওসব সিনেমা-টিনেমা বাড়ির বাইরে হলেই ত ভাল। বাড়িতে কি ওসব কেউ করে?" বলতে বলতে হাসত যূথিকা, "দেখ, একটা মজার কথা মনে পড়ল। আমার এক দাদামশাইয়েরও এ-সব রোগ ছিল। থিয়েটারের কার কাছে তিনি রোজ যেতেন। কিন্তু মনে রেখ, যেতেন, তাকে বাড়িতে এনে তোলেননি। সেকালের লোকেরাও তোমাদের মত খারাপ ছিল, কিন্তু ভদ্র ছিল। বাড়ি আর বাগান-বাড়ির তফাত বুঝত। তোমরা দুটোকে এক করে দিতে চাও।"

জবাব দিতে হলে অত্যন্ত কুৎসিত ঝগড়ার ডুবজল পাঁকে নামতে হয়। অতএব কনক, আমি অধিকাংশ দিনই চুপ করে সরে এসেছি।

এসেও ত পরিত্রাণ পেলাম না।

যূথিকা সেই জানালা বন্ধ করে দেবার ঘটনার চারদিন পরে বিশ্রী রকমের ঠাট্টা করল। এই চারদিন তুমি আসনি। অথচ তুমি এখানেই ছিলে। একদিন বিকালে ত মুখোমুখি পড়ে গেলুম। পাড়ার যুব-সঙ্ঘের পাণ্ডা গোছের একটি ছেলের সঙ্গে তুমি রিকশায় উঠছ। আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। মাথার চুল ফাঁপান ধূসর, শাড়ির আঁচল অন্যমনস্ক, পাশের ছেলেটির সঙ্গে আরও জোরে জোরে হেসে হেসে কথা বলছ।

কনক, সেদিন আমারও মনে হয়েছিল, তুমি সত্যিই বড় খারাপ মেয়ে।

বাড়ি ফিরে কোন কাজে মন দিতে পারিনি। চড়া আলোটা নিভিয়ে নিষ্প্রভ নীল ডুমটা জেলে শুয়ে পড়েছি। ও-পাশের খাট থেকে যূথিকা বলেছে, "কী হল।"

শুকনো এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছি। "মাথা ধরেছে।"

"তবে বালিশ-টালিশ সরিয়ে বিছানাটা একটু ঠিকঠাক করে নাও?"

আধো-অন্ধকারে দেখিনি, ও মুখ টিপে টিপে হাসছিল।

বালিশ সরাতে গিয়ে বিষাক্ত বিছের কামড় খেলাম। যন্ত্রণায় গলা অবধি নীল হয়ে এল। কোনমতে বললুম, "এ-সব কী। কে এনেছে, কে রেখেছে এ-সব এখানে?"

অত্যন্ত ভাল মানুষের ভঙ্গিতে যূথিকা বলেছিল, "কোন্ সব?"

"এই যে কলপ, আর সাপসার শিশি?"

নিষ্ঠুর নির্বিকার গলায় যূথিকাকে উত্তর দিতে শুনেছি, "আমি। আমিই বাজার থেকে আনিয়েছি।"

"কেন?" মাথার যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে প্রচণ্ড গর্জনে যেন ফেটে পড়লুম। বললুম, "কেন, কেন, কেন।"

ঠোঁটের উপর তর্জনী রেখে যূথিকা ফিসফিস করে বলল, "শ্-শ্-শ্। আস্তে। তোমার সুবিধার জন্যেই।...আজকাল ও আর আসে না, দেখি ত সেজন্যে ঘরময় পায়চারি কর, মাথার চুল ছেঁড়। আসল কথা কী জান? তোমার বয়সকে তুমি ভুলেছ, কিন্তু বয়স তোমাকে ভোলেনি।"

চমকে চাইলুম। একটু দূরেই থরে থরে শিশি-বোতল সাজিয়ে ছোট খাটটার সঙ্গে যূথিকার বি-শ্রী একদা-নারী শরীর শুয়ে আছে। অস্পষ্ট আলোয় সেদিকে চেয়ে মনে হল, যেন যূথিকা নয়, যেন আমার

ভয়ের বয়সটা ছদ্মবেশ নিয়ে আমাকে উপহাস করছে।

কলপ আর সালসায় শিশিটা ছুঁড়ে শব্দ করে চুরমার করবার লোভ অতি কষ্টে সংবরণ করেছি। কারণ আমি ভীরু, প্রৌঢ়, সামাজিক মানুষ। এক সঙ্গে তিন ধাপ করে সিঁড়ি টপকানর মত সব রকম আতিশয্যই এ-বয়সে বারণ।

কনক, তুমি আমার চোখে কামনার হিস-হিস চেরা-জিভকে নড়ে উঠতে দেখেছ, কিন্তু তার আড়ালে পরম-কাপুরুষ সামাজিক মানুষটিকে দেখতে পাওনি। পেলে অন্তত পালাতে না।

সত্যি কথা, সেদিন অনেক রাত অবধি সদর রাস্তায় তোমার জন্যে পায়চারি করেছি। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে একটা গাড়ি পলকে অদৃশ্য হল, তুমি ওদিকে খানিক চেয়ে থেকে বাসায় ঢুকতে যাবে, আমি তোমার পথ আড়াল করে দাঁড়ালুম। বললুম, "একবার আমার সঙ্গে একটু আসবে কনক? কয়েকটা কথা ছিল।"

চমকে ভয়ে-ভয়ে বললে, "কোথায়?"

"পার্কে, কিংবা...ধর, কোন চায়ের দোকানে?" এলোমেলো জবাব, হয়ত সেই জন্যেই তোমার সন্দেহ হল। একটু পিছিয়ে গিয়ে বললে, "না-না। আজ থাক। অনেক রাত হয়ে গেছে।" উপর দিকে আকাশে চেয়ে যেন তারাদের সাক্ষী মানলে।

হঠাৎ তোমার কব্জিটা চেপে বললুম, "এসই না। বেশিক্ষণের জন্যে ত না। আমার কথাগুলো যে খুব জরুরী।"

অনায়াসে হাতটা ছাড়িয়ে নিলে, দ্রুত পাশ কাটিয়ে চৌকাঠে পা রেখে ফিরে বললে, "আজ নয়। কাল সকালে আসবেন। আর, আর, দেখুন—" তোমার গলা এখানে একটু কেঁপেছে, "দেখুন, আমাকে যত খারাপ ভাবছেন, আমি ঠিক ততটাই খারাপ নই।" বেত-খাওয়া জন্তুর মত মাথা হেঁট করে ফিরে এসেছি।

কনক, আজ তোমার কথাটা তোমাকেই ফিরিয়ে দিই। যতটা ভেবেছিলে, আমিও ঠিক ততটাই খারাপ নই।

মিছিমিছি সেদিন ভয় পেলে কেন। পেলে যদি, এত কেন, যে-ভয় হিতাহিত জ্ঞানহীন করে? অনাথা পাড়ার রকের মরুব্বী অপদার্থ ছোকরাটার সঙ্গে সাত-দিনের মধ্যে পালানর মত ভুল তুমি করতে না। এ-কথা আমি পরে বারবার ভেবে সুখ এবং দুঃখ পেয়েছি যে, ভালবেসে নয়, আমার হাত এড়াতেই তুমি চূড়ান্ত দামে একটা লোকশান কিনেছ।

পাড়ায় অবশ্য তোমার পলায়ন নিয়ে অনেক মুখরোচক গুজব তৈরি এবং ফিরি হয়েছিল। তার মধ্যে একটা ছিল, তোমার মাতৃত্ব আসন্ন।

তোমার কারণ তুমি জান, আমার তরফ থেকে একটা কথা তোমাকে খোলাখুলি জানাতে চাই। সেদিন সন্ধ্যাবেলা যত চাঞ্চল্যই দেখিয়ে থাকি না কেন, আমরা শিক্ষিত ভদ্রলোক, সব রকমের বাড়াবাড়িকেই ভয় করে থাকি। বেশী দূর এগোতাম না। এক, ইচ্ছা ছিল না। দুই, সাধ্যও না।

আজ কবুল-জবাব দেবার নেশায় পেয়েছে, নইলে সাধ্যের কথাটা লিখতে কলম সরত না।

যূথিকাকে একদিন বুড়ি বলে গাল দিয়েছিলুম, মনে আছে? যে-দিন সে আমাকে আয়নায় মুখ দেখতে বলেছিল?

ও বিছানা নেবার প্রায় এক বছর পরের কথা। একদিন আমার চোখকান-ঢাকা নীতিবোধের টুপিটা বিকালের হাওয়ায় উড়ে গেল। সন্ধ্যার ঘোর লাগতে বেরিয়ে পড়েছিলুম সেই সুখের সন্ধানে, যা পণ্য। সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু সংগ্রহ করতে পারিনি। শুধু গান শুনে আর, আর পান করে ফিরে আসতে হয়েছে। বোবা, বিবাদ ইচ্ছাটা শরীর-চেতনায় কিছুতে ধরা দেয়নি। যূথিকার সালসার শিশির ঠাট্টাটা সাধে কি সহ্য করতে পারিনি।

শ্রাবণের মেঘ যেমন আকাশ ছেয়ে এবং প্রবল জ্বর শরীরের রক্তকণা ছেয়ে আসে, মৃত্যুর সাধও তেমনই আমাকে সেদিন পেয়ে বসেছিল। কোন কাজে মন ছিল না। ভাবিনি সেই নিরাশা এবং নিষ্ক্রিয়তার সাঁড়াশির চাপ কোনদিন আবার শিথিল হবে।

হয়েছিল। সামান্য ক-দিনের জন্য, কিন্তু হয়েছিল।

পরিবর্তনটা যূথিকার চালাক চোখে ধরা পড়েছিল। বিছানায় শুয়ে শুয়েই এক ধরনের আমোদ-পাওয়া হাসি হাসত। মুখে কিছু বলত না, কিন্তু চোখের পাতা কখনও ঠোঁটের কাজ করে। সেই হাসির মানে আমি পড়তে পারতুম। যূথিকা যেন বলত, ব্যাপার কী। আগে ঠেলে-ঠুলে নড়ান যেত না, এখন যে বড় চটপটে ভাব। সময় মত নাওয়া-খাওয়া। লেখার প্যাডে ধুলো জমছিল, হঠাৎ তিন-তিনটে স্ক্রিপটের খসড়া তৈরি হয়ে গেল।

চোখের পাতা দপদপ কাঁপত, যূথিকা যেন বলত, জানি জানি, এত উৎসাহের ইড়া, পিঙ্গলায় কে বসে আছে জানি।

প্রায় বছর ঘুরতে চলল, কনক, এখনও তোমার খোঁজ পাইনি। তোমার বাড়ির লোকেরা সন্তাপে, লজ্জায় এ-পাড়া ছেড়ে গেছেন। শুনেছি তাঁরা তোমাকে হিসাব থেকে খারিজ করে দিয়েছেন। পুলিশ-কেস করবার মত [illegible]ও তাঁরা তোমাকে দিতে রাজী নন।

একটি পাথরের নুড়ি কয়েকটি জল-বলয় তুলে ডুবে গিয়েছে, পুকুর শান্ত, স্থির।

কিন্তু একটি হৃদয় এখনও শান্ত হয়নি। উপসংহারে তার একটা অত্যন্ত ছেলে-মানুষী সাধের কথা শোন। সব গিয়েছে,

আমার কথাগুলো যে খুব জরুরী

তবু এখনও মাঝে মাঝে এই সাধের সহকারে একটি প্রিয় কল্পনার লতাকে জড়িয়ে দিই। কী কল্পনা, জান?

একবার, জীবনে আর মাত্র একটিবারই, তোমার সঙ্গে দেখা হবে। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে তোমার বাসার দরজায় গিয়ে দাঁড়াব, টোকা দেব। না, দেখা হতে তোমার মুখ কঠিন হবে না। ম্লান হেসে বলবে, "ও, আপনি?"

ম্লান হাসি, কনক, কেননা চারদিকে চোখ বুলিয়ে ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছি যে, তুমিও সুখে নেই। অনেক উচ্চাশা ছিল যার মনে, অনেক প্রাণের ফেনা যার চোখের কোণ দিয়ে উছলে পড়ত, এই হতশ্রী পরিবেশের হট্টগোলে তাকে চেনা শক্ত হবে।

"খুব রোগা হয়ে গিয়েছ।"

অপ্রতিভ হয়ে বলবে, "হাঁ, বড় একটা অসুখ থেকে উঠলাম। টাইফয়েড হয়েছিল। দেখছেন না, চুলের হাল? সব উঠে গেছে।"

জানি, অত্যন্ত অনুচিত কল্পনা, একান্তই হীন। তবু এই বিষাক্ত লালা দিয়ে মন-মাকড়শা তার জাল বুনে চলে; ছিঁড়ে বেরিয়ে আসি, সে-সাধ্য নেই।

একটি কর্কশ কান্নার শব্দকে অনুসরণ করে লিকলিকে রোগা এক শিশুকে দেখতে পাব।

জিজ্ঞাসা করব, "এরও অসুখ?"

মাথা নিচু করে বলবে, "হ্যাঁ। জন্ম থেকেই রিকেট।"

"—চিকিৎসা?"

এবার জবাব দেবে না, এবং দেবে না বলেই অকস্মাৎ টের পাব, যার সঙ্গে ঘর ছেড়ে এসেছিলে, সে সরে পড়েছে। তুমি একা।

কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে যাব, কিন্তু ফিরেও আসব খানিক পরে। ঘোরাঘুরি করে ফল আর টনিক ওষুধ কিনে এনেছি।

সেগুলো হাতে তুলে নিতে তোমার চোখ ছলছল হবে।

পরদিন আবার ফিরব। তারও পরদিন আবার।

বাস্তবে হয়ত সম্ভব হত না, কিন্তু সবটাই যখন কল্পনা, তখন একদিন তোমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কিছু টাকা দিতে বাধা নেই। তোমার কুণ্ঠা দেখে বলব, "না-না, দান নয়, ধার। একটা কাজ পেয়ে শোধ দিও।"

কাজ? বিষণ্ণ উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে বলবে, "কাজ কোথায় পাব।"

অভয় দিয়ে বলব, "নিশ্চয়ই পাবে। তোমাকে এতদিন বলিনি, একটা ফিল্ম কোম্পানির সঙ্গে ছোট একটা পার্ট তোমাকে দেবে বলে কথা প্রায় পাকা করে এনেছি।"

বিশ্বাস করতে সাহস পাবে না, অথচ চোখ দেখে বুঝতে পারছি ত, বিশ্বাস করতে পারলে তুমি বেঁচে যাও। হয়ত সেই টানা-পোড়েনে তোমার চোখে জল এসে যাবে। হঠাৎ আমার হাত দুটি চেপে ধরার মত ছেলেমানুষি করে ধরা গলায় ধীরে ধীরে বলবে, "আপনাকে আমি কিছুই দিইনি, তবু..."

কনক, তখন? যে-কথাটি বলবার জন্যে কল্পনার এই আয়োজন, তার এক বর্ণও কি সেই গদ্‌গদ মুহূর্তে মুখে ফুটবে? হয়ত বলতেই পারব না, কী পেয়েছি, কতখানি। বেঁচে থাকার অভিরুচি তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছ। জেনেছি, এখনও তবে আমি ভালবাসতে পারি। আমার যৌবন যায়নি।

মুখ ফুটে বলতে যদি পারি, অবাক হয়ে তাকাবে।—"যায়নি?"

"না।"

দেহগত তুচ্ছ একটা পটুতা নয়, ভালবাসা পাওয়াও না, শুধুমাত্র ভালবাসতে পারাই যে যৌবন, এ-বয়সে এ-কথা বোঝা তোমার পক্ষে শক্ত হবে। তবু লিখে রাখলুম, এই ভরসায় যে, কোনদিন হয়ত বুঝবে। কেননা, কনক, তোমারও ত এই বয়সের অবসান আছে।
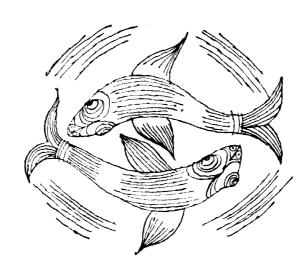
অনেকটা হাঁটতে হয়। কোথায় কাচ-কারখানার কাছাকাছি তেঁতুল ঝোপের কাছে স্কুল, আর কোথায় ময়লাফেলা মাঠের সীমানা ছুঁয়ে ডোমপাড়ার পুকুর। একটা শহরের একেবারে পুবে, অন্যটা পশ্চিমে। রাস্তাটা তাও বা যদি সিধে হত। দেড় মাইলটাক পথ কমত খানিকটা। সিধের বদলে বেঁকেছে, পাক খেয়েছে, ঘুরে ফিরে লতিয়ে লতিয়ে চলেছে। আর যত রাজ্যের ভিড়, হৈ-হট্ট-গোলের মধ্যে দিয়ে; মল্লিকবাবুদের মোটর কারখানা, পোস্ট অফিস, পুলিশ থানা, বাবুপাড়া, বাজারটাজার আশেপাশে রেখে।

নূপুরের তাতে সুখ: ডুমুরের কষ্ট। নূপুর বলে, "একটা পথ হাঁটি, খেয়ালই থাকে না।" ডুমুর বলে, "তোর মত আমার লম্বা লম্বা ঠ্যাং নয়ত; আমার পা ধরে যায়।" পাল্টা জবাবে নূপুর মাথা দুলিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে উপহাস করে, "পা ধরে যায়—! কী আমার মহারানীর পা রে, এইটুকু রাস্তা যেতে খসে পড়ে। দেখিস, ফোস্কা না পড়ে যেন, কাঁটা না ফোটে! মাসিকে বল না, তোর জন্যে ক্ষিতীশবাবু-দের বাড়ির মেয়েদের মতন ঘোড়ার গাড়ি করে দেবে।"

ঠাট্টাটা শুধু যদি ডুমুরকে নিয়ে হত, হয়ত মুখ বুঝে সহ্য করে যেত। মাসির নামে গায়ে লাগল ডুমুরের। তেলচিটে, রঙফিকে লাল ফিতেটা চুলের গোছা থেকে খুলতে খুলতে [illegible] ঘামে ভেজা মুখে দিদির দিকে চেয়ে রুক্ষ চোখে বলল ডুমুর, "মাসির ঘরের ত ঘোড়ার আস্তাবল ছিল না, থাকলে একটা গাড়িরও যোগান থাকত, দেখতিস। তখন তোকে আর বাণী-মানির শাড়ির আঁচলের কাদা ধুয়ে দিয়ে, গোবরলাগা জুতো মুছে ঘোড়ার গাড়িতে উঠতে হত না। তাও ত ওদের পায়ের তলায় ঘাড় পিঠ গুঁজে ঝিয়ের মতন বসতে পাস।"

কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যিই সেদিন বাণী-মানির শাড়ির পায়ের কাছের পাড় আর জুতো ধুয়ে দিয়েছিল নূপুর। স্কুলে টিফিনের ছুটিতে শিপ্রার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওরা। গল্পে এতই তন্ময় যে, জামগাছের তলায় পা হড়কে পড়ল বাণী। গোবরে পা ডুবল। মানির শাড়িতেও ছিটকে গেল। নূপুর তা ধুয়ে দিয়েছে এবং অনেকটা এই উপকারের দাবিতে তাদের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে, পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে ওদের বাড়ির ফটক পর্যন্ত এসেছে। কিন্তু এ ছাড়া আরও ত দু-চার বার বাণী-মানির গাড়িতে চড়েছে নূপুর। কই, তখন ও পায়ের গোবর ধুয়ে দেয়নি, যদিও বসার বেলায় পায়ের তলাতেই বসেছে। আহা, তাতে কী, বসার জায়গা থাকলে কি আর ও না বসত। গদির এক-পাশে বাণী, আর একপাশে মানি। তাদের বই-খাতাপত্র, টিফিন-কৌটো, দুধের বোতল। অবশ্য এও ঠিক, গোবর মুছে না দিক, অন্য কিছু ওদের হয়ে না করে দিয়েছে, না দেয়, এমন দিন স্কুলে খুব কমই যায়। তাকে তাই বাণী-মানিরা ভালবাসে। গাড়িতে চড়তে চাইলে চাপায় কখনো-কখনো। আর গাড়িতে চড়লে অবশ্য খুবই মজায় কাটে। অত যে নাকউঁচু, ফিটফাট, অল্প কথার বাণীদি-মানিদি—(হ্যাঁ, সাক্ষাতে ওদের তা-ই বলতে হয়; স্কুলের ছোটবড় সব মেয়েকেই দিদি বলতে হয় নূপুর-ডুমুরকে, বয়সে ওরা পনের ষোল হওয়া সত্ত্বেও)—সেই বাণীদি-মানিদি পর্যন্ত ঘোড়ার গাড়ির দরজা অর্ধেকের উপর ভেজিয়ে দিয়ে কী কাণ্ডই না করে। হাসে, গায়ে গায়ে পড়ে, গুনগুন গান গায়, খাতার মধ্যে থেকে চিঠি বের করে নিজেদের মধ্যে ইশারা করে করে পড়ে। এ ওকে চিমটি কাটে, ও তার গায়ে কাগজের বল পাকিয়ে মারে। তার উপর মজার মজার কথা। 'এই নূপুর, তোর ইয়ে হয়?' কী হয়, নূপুর অবাক আর জিজ্ঞাসু চোখে বাণীদির মুখের দিকে চেয়ে থাকে; কথাটা বুঝতে পারে না, ধরতেও পারে না। ওর বোবা ফ্যালফেলে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওরা দুই জ্যাঠতুত-খুড়তুত বোন খিলখিল করে হেসে ওঠে। মানি বলে, "তোর ঘুম হয় ত রাত্রে?" এবার নূপুর আরও অবাক। এই দুই দিদিই পাগল। রাত্রে আবার ঘুম হয় না কার? জবাবটা তবু একটু লজ্জিত এবং আড়ষ্টের মতন দেয় নূপুর, "খুব হয়; গাঢ়।" জবাব শুনে ওরা দু বোন আবার হেসে ওঠে বাণী বলে, হাসি থামলে, "যাঃ মিথ্যুক—। তোর আবার খুব আর, গাঢ় কি হবে রে—শ্যা ঘেঁটোর কাঠির মতন রোগা তুই।" আবার হাসি।

ও-সব কথা থাক, ডুমুরের কথাটা খুব গায়ে লেগেছে নূপুরের। সায়ার দড়ি আলগা করে, শাড়ির সামনের কোঁচটা খুলতে খুলতে নূপুর তার রোগা লম্বা ঘাড় আরও একটু সোজা করে বোনের দিকে লঙ্কাজ্বালা চোখে চেয়ে থাকল একটু। "কী বললি তুই? কী করি আমি? বাণী-মানির আঁচলের গোবর ধুয়ে জুতো পরিষ্কার করে গাড়ি চড়ি?"

"হ্যাঁ, শুধু চড়িস না, ঝিয়ের মতন ওদের পায়ের তলায় কুঁজো হয়ে বসে থাকিস।"

নূপুর অল্পক্ষণের জন্যে চুপ। সারা গা যেন জ্বলে যাচ্ছে। বোনের উপহাস আর

বিন্দুপড়া গোল কালো বিশ্রী মুখটা দেখতে দেখতে খেপে উঠল নূপুর। ভীষণভাবে চেঁচিয়ে উঠল, চিকন গলায়, "বেশ করি বসি ঝিয়ের মতন। ঝিয়ের মেয়ে ঝিয়ের মতন বসব না ত কি ওদের কোলে চড়ে বসব।"

"দিদি!" ডুমুরও চেঁচিয়ে উঠল। ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ল নূপুরের কাছে, যেন আর একটা কিছু বললেই এখুনি নূপুরের গা মুখ খিমচে কামড়ে, মাথার চুল ছিঁড়ে একটা সর্বনেশে কাণ্ড করবে।

নূপুর ভয় পেয়ে একটু পিছিয়ে গেলেও একেবারে হার মেনে নিয়ে মুখ বন্ধ করে মাথায় চলে যাবে, তেমন মেয়ে নয়। কথা সে বলতই কিছু, আঁচড়া-আঁচড়িও হত খানিক, কিন্তু ততক্ষণে স্নেহশশী এসে গিয়েছে।

স্নেহশশীর গোলগাল চেহারা, হয়ত একটু মাথায় খাটো। রঙ মাছের আঁশের মতন ঘোলাটে ফরসা। মাথার চুল অল্প, মুঠোর মতন একটা আলগা খোঁপা—থাকলেও চলে, না থাকলেও ক্ষতি ছিল না। উস্কোখুস্কো চুল, মাথা কপাল কানের পাশে ওলটপালট হয়ে আছে। নিকেলের এক মস্ত-হাঁ চশমা। পুরু ঠোঁটে পানের ছোপ। ঘামে মুখ-গাল-গলা ভিজে দরদর করছে; পরনের থানটা গোড়ালিরও এক বিঘত উঁচুতে। গায়ের সেমিজটাও ঘামে ভিজেছে। ডান হাতে পুরনো তালিমারা ছাতা; কালো রঙ উঠে উঠে এখন প্রায় খয়েরী। কাঁধের পাশে পাড়-সেলাই থলি ঝুলছে এক। পায়ে মোটরের টায়ারের চটি, ঘরের বাইরে খুলে এসেছে।

ছাতা রেখে, কাঁধের থলি খুলতে খুলতে হাঁপধরা স্নেহশশী থানের আঁচল দিয়ে মুখ মুছল। "কী হল, আবার দুটোতে খেয়োখেয়ি করছিস? ফিরেছিস কখন—? আগুন দিয়েছিস উনুনে?"

শেষ প্রশ্নটা নূপুরকে। এবেলা নূপুরের উনুন ধরাবার কথা; ওবেলা ডুমুরের।

নূপুর চলে যেত অন্য সময় হলে; এখন কিন্তু গেল না। তার ভয়, ওর অসাক্ষাতে ডুমুর যদি কথাটা বলে দেয়; গাড়ি চড়ার কথা নয়, ঝিয়ের মেয়ের কথাটা।

ডুমুর বুদ্ধিমতী। কী বলতে হয় না-হয়, সে জানে। ঝগড়াঝাঁটির কথা না তুলে অন্য কথা তুলল ডুমুর। "আর পারি না; গরমের ছুটিটা কবে থেকে হবে বল ত মাসি?"

"এই ত আর ক'দিন পরেই।" স্নেহশশী ভাঙা হাতপাখাটা টেনে নিয়ে মেঝের উপর ধপ করে বসে পড়ল। "তোদের এত পারি না পারি না কেন রে? মর্নিং স্কুল—সকাল-বেলা ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাস, ফেরত বেলাতেই যা রোদ। তা আমার সঙ্গে এলেই পারিস, ছাতার তলায় আনব। তাও ত আসিস না।"

না, তা ওরা আসে না। নূপুর ত নয়ই, ডুমুরও নয়। মাসির সঙ্গে আবার [illegible] ছুটির পরও খানিকক্ষণ স্কুলে আটকে থাকা। তার পর পাড়ায় পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে আরও এক ঘণ্টা দেরি করে তবে বাড়ি আসা। হ্যাঁ, তাদের মাসি, স্নেহশশী স্কুলের ঝি—গরুর পালের মত মেয়ে জুটিয়ে স্কুলে নিয়ে যাওয়া, আবার বাড়ি বাড়ি ফেরত দিয়ে যাওয়া তার কাজ।

মঙ্গলময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে স্নেহশশী বছরের পর বছর ধরে এই কাজ করছে।

"এবার নাকি এক মাসেরও বেশী ছুটি মাসি?" ডুমুর স্নেহশশীর হাত থেকে পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগল।

"এক মাস ছ'দিন।" স্নেহশশী এমন-ভাবে বলল যেন এ সব গূঢ়তত্ত্বের কথা একমাত্র বড়দিদিমণি আর সে জানে, অন্য কেউ নয়।

নূপুর এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গিয়েছিল উনুন ধরাতে।

"এই নূপুর—" স্নেহশশী বলল, "তুই আজ ইংরিজী পড়া পারিসনি; ভূগোলে ম্যাপিমার অঙ্কও করতে পারিসনি। কমলাদিরা আমায় বলেছে। কেন পারিসনি?"

নূপুর জানে, কমলাদি কি উমাদিরা কেউ সেধে মাসিকে এ-সব কথা বলতে যায় না। মাসিই শুধোয়। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে। মাসির এটা অভ্যেস। বোনঝিদের পড়াশোনার উপর চোখ রাখে।

"পেরেছিলাম; একটু ভুল হয়েছিল।" নূপুর বলল। বলে আর দাঁড়াল না; তাড়াতাড়ি উনুনে ধরাতে গেল।

এবার ডুমুরের পালা। গা থেকে সেমিজ খুলে কোমরে নামিয়ে দিয়ে স্নেহশশী বলল, "আর তুই কী করেছিস রে ডুমুর, টিফিন-ঘরের গ্লাসে করে জল খেয়েছিস?"

"খেয়েছি।"

"কেন, তোদের না বারণ করে দিয়েছি। হাত করে খেতে পারিস না? আমি ত খাই।"

"আমার ডান হাতটা দেখ না—" ডুমুর হাত বাড়িয়ে দিল। তরকারি নামাতে গিয়ে হাত পুড়েছিল কাল। ফোস্কাটা আধ-ভাঙার মতন রঙ ধরে গেছে। "এই হাতে ধরে কি জল খাওয়া যায়?"

"তবে, গেলাস ধরে রেখে দিলি না কেন?" স্নেহশশীর গলায় ধরে চাপা এক বিরক্তি।

ডুমুর চুপ। স্নেহশশীও। অনেকক্ষণ পরে স্নেহশশী বলল, "নিচিন্দিপুরের মানুষের জিনিস আমাদের ছুঁতে নেই।"

ছোঁয়াতে নেই ডুমুর তা জানে। [illegible] বুঝি কেউ [illegible]। [illegible] ডুমুর, একা ভাববার ছোট্ট কাল। ওর জল খাওয়ার সময় টিফিনঘর ত খোলা ছিল, কে দেখে ফেলল। [illegible] রেখে দেবার পর অবশ্য হাসি পেয়েছিল। তবে কি সে আড়াল থেকে সব দেখেছিল?

ডুমুরের কথার কোন জবাব দিল না স্নেহশশী। গায়ের ঘাম অনেকটা মরেছে। অনেকটা হালকা হয়েছে আবার [illegible]-ভাবটাও খানিক কেটেছে মনে হল। মাথা চুলকে, হাই তুলে স্নেহশশী এবার উঠি উঠি করছে। বাইরে ইতিমধ্যে কাঠকুটো দিয়ে উনুন ধরিয়ে দিয়েছে নূপুর, খোলা দরজা দিয়ে গলগলে ধোঁয়ার খানিকটা ঘরে ঢুকেছিল।

ডুমুর আজ বেশ একটু চটেছে, হয়ত তার গায়েও লেগেছে কিছু। মাসি জবাব দিচ্ছে না দেখে, অধৈর্য হয়ে বলল, "কে তোমায় লাগিয়েছে বললে না?"

"যেই বলুক, তোর তাতে কী! যা অন্যায় তা তুই করবি কেন?" স্নেহশশী একটু সামান্য ধমকের গলায় বলল।

এর পর সরাসরি না হলেও মাসিকে শুনিয়ে শুনিয়ে গজগজ করতে লাগল ডুমুর, "ডোমপাড়ার কাছে থাকি বলে আমরা কি ডোম মুচি মেথর নাকি যে হ[illegible]

উৎসবে ও উপহারে

আপনার প্রিয়জনের জন্য রুচিসম্মত রকমারী সিল্ক, বেনারসী, ক্রেপ, বিষ্ণুপুরী, ঢাকাই, জর্জেট, বাঙ্গালোর, শিফন, মহীশূর, টাঙ্গাইল ও ভারতীয় তাঁত বস্ত্রের বিপুল আয়োজন

যাবতীয়

শীতবস্ত্র ও পোষাক

শাল, আলোয়ান, র‍্যাগ, কম্বল, সোয়েটার, অলেস্টার, কোট ইত্যাদি

যাবতীয় মিলের ধুতি, শাড়ী, সার্টিং, কোটিং, আদি সুলভ মূল্যে পাইবেন

রামকানাই যামিনীরঞ্জন

পাল প্রাইভেট লিঃ

বড়বাজার ঃ কলিকাতা ফোন ঃ ৩৩-২৩০৩

আমাদের নবতম প্রচেষ্টায় সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধের অনুমোদিত খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র

রামকানাই মেডিকেল ষ্টোর্স

১২৪।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, শ্যামবাজার, পাঁচ মাথার মোড়ে কলিকাতা—৪

ফোন—৫৫-১৩৬৬
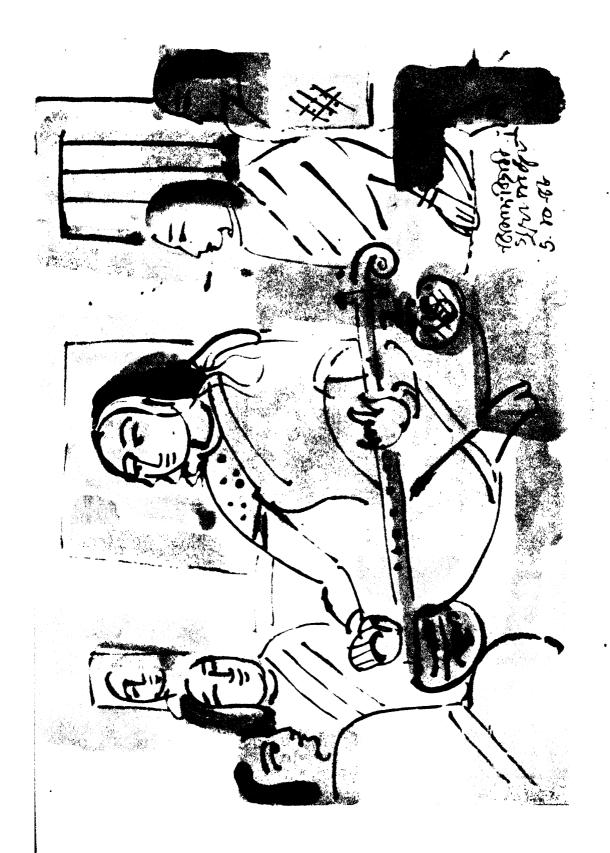
বা খুশি বলবে। নাই দিয়ে দিয়ে মাথায় উঠেছে সব। রঙ্গি রঙ্গি মেয়ে, তাদের আবার ফুটুনি দেখ। গ্লাসে জল খেলে জাত যাচ্ছে সব।" ডুমুর দড়ির ওপর টাঙান গামছাটা টান মেরে টেনে নিল, মাসির পাড়ের থলিটা পেরেক থেকে খুলে তাল পাকিয়ে বাইরে ছুড়ে দিল। "সিক্স ক্লাসের এক ফোঁটা মেয়ে সুরমা, তাকেও দিদি বলিনি বলে চুগলি খেয়েছে কাল ফরসা দিদিমণির কাছে। অমন মেয়ের গলা টিপে দিতে হয়, বদমাস শয়তান কোথাকার!"

"আমি যদি ছোট বড় সবাইকে দিদি-মণি বলতে পারি, তোরাই বা না পারবি কেন? বললে কি মুখ ক্ষয়ে যায় তোদের?" স্নেহশশী এবার সত্যিই রেগেছে।

"মুখ ক্ষইবে কেন, মাথা হেঁট করে থাকতে হয়।" ডুমুরের স্পষ্ট জবাব। "অতয় আমার কাজ নেই। আমি পারব না। আমি আর স্কুলে যাব না কাল থেকে। তোমায় বলে রাখলাম তা।" ডুমুরের গলা ভারী হয়ে এসেছিল। হয়ত চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল। পাড়-সেলাই এক-রঙা ময়লা শাড়িটা হাতে করে স্নান করতে চলে গেল ডুমুর, পুকুরে।

স্নেহশশী এই গোঁ-ধরা, বেয়াড়া মেয়েটার ভবিষ্যতের আশঙ্কায় একটু মন দিয়ে উঠে পড়ল। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। উনুন ধরল এতক্ষণে। রান্না হতে, স্নান করতে খেতে দুপুর। তারপর আর কতটুকু জিরোন। বিকেল হতে না হতেই বেরুতে হবে। তিন বাড়ির কাজ। এক বাড়িতে সেলাই শেখান, এক বাড়িতে একটি অন্ধ বাচ্চাকে কিছুক্ষণ সামলান, তারপর বড়দিদিমণির বাড়ি গিয়ে তার রান্নাটুকু করে দিয়ে আসা। বড়দিদি-মণি অবশ্য একা লোক; ঝঞ্ঝাট নেই তেমন।

এত যে গা-গতর দেওয়া, এ-সব কার জন্যে? স্নেহশশী মনে মনে নুপুর-ডুমুরকে বলল, তোদের জন্যেই ত! তোরা যদি না পড়বি, না ভাল ভদ্র হবি, ত আমার এই বয়সে এত কষ্টর দরকারটা কী?

নুপুর-ডুমুরের দায়-দায়িত্ব ভাবনা না থাকলে স্নেহশশীর বাস্তবিক কোন ঝক্কি ছিল না। একলা মানুষ। ডোমপাড়ার কাছে খাপরার-চাল-দেওয়া মাটির বাড়িটা তার। একখানা বড় ঘর, আর একটা ছোট। একটু বারান্দা, এক ফালি রান্নাঘর, বাড়ির বাইরে ক'হাত জমি, বাগান মতন। তাতে পুঁই-লাউ-কুমড়োর মাচা, দু-চারটে বেগুন আর লঙ্কা গাছ, তুলসী চারা, দোপাটি ফুলের ঝোপ, বেলফুলও আছে দু-একটা। যতটুকু জায়গা তার চেয়ে বেশী গাছ। বাগান ত নয়, ঝোপের মতন দেখায়। তা দেখাক। কী আসে যায় তাতে! মানুষটা বেঁচে থাকতে থাকতে মাথা গোঁজার জন্যে এটুকু করেছিল তাই না রক্ষে। নয়ত বাজারের এঁদো অন্ধ-কার নোংরা ঘিনঘিন পায়রাখোপ ঘরে থাকতে হত স্নেহশশীকে। তাও ভাড়া গুনে।

মানুষটা বুদ্ধিমান ছিল। ভবিষ্যৎ বুঝতে পারত। হাতে কিছু টাকা এল যখন, হঠাৎ উড়িয়ে ফুরিয়ে দিল না, ডোমপাড়ার কাছে এই সস্তা জমিটুকু ধরে-কয়ে আরও একটু সস্তা করে কিনে নিল। সোয়া কাঠা জমি—বোধ হয় টাকা চল্লিশ পড়েছিল। তারপর একটু একটু করে এই বাড়ি। মজুর দু-চারজন যা না খেটেছে, তার চেয়ে বেশী খেটেছে মানুষটা নিজে। কাদার গাঁথনি করার সময় স্নেহশশীকে পর্যন্ত বাদ দেয়নি। খাপরাগুলো নিজেই বসিয়েছে একরকম। খুব কাজের লোক ছিল মানুষটা। আর বুদ্ধিমান। মল্লিকবাবুদের মোটর-কারখানায় কাজ করত। তখন ও-কারখানা কত ছোট ছিল, শহরের এই দিকটাও এত ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেড়ে ওঠেনি।

স্নেহশশী তখন বউ মানুষ। অবশ্য এমন নয় যে, গলা পর্যন্ত ঘোমটা টেনে বাড়ির মধ্যে সারাদিন সে বউ সেজে বসে থাকত। স্নেহশশী তা পারত না। আলাপী স্বভাব, কথা বলতে না পারলে পেট ফুলে মরত। একটু ঘোরাফেরার অভ্যাস ছিল। মানুষটা যতক্ষণ বাড়ি থাকত, ততক্ষণ স্নেহশশী কোথাও বেরুত না। কিন্তু মোটর-কারখানার কাজ, সময়ের ঠিক ছিল না; কাজ পড়লে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। তখন স্নেহ-শশীর বড় কষ্ট হত। এ-বাড়ি সে-বাড়ি ঘুরে বেড়াত। বউ-ঝিদের সঙ্গে গল্প করত, একে তাকে সেলাই শেখাত। সেলাইয়ের হাতটা বরাবরই ভাল ছিল তার। এক ভাঙা ঝরঝরে সেলাই-কল কিনে সেটা সুন্দর করে মেরামত করে দিয়েছিল সেই মানুষটা। স্নেহশশী তাতে রাজ্যের বউ-ঝি-বাচ্চাকাচ্চার জামা ফ্রক ইজের সেলাই করে দিয়েছে। কলটা এখন আর নেই, গত বছর পুজোর আগে আগে খুব বর্ষায় বাড়িটার মাথার উপরকার পুরনো খাপরাগুলো একেবারে ফাঁক-ফুটো হয়ে গেল। জল আর আটকায় না। তখন কলটা বিক্রি করে দিয়ে সেই টাকায় নতুন খাপরা কিনে মাথা বাঁচাতে হল। স্নেহশশীর খুব কষ্ট হয়েছিল কল বিক্রি করতে। কিন্তু না করেও উপায় ছিল না। ধার কর্জ করতে ভরসা হয়নি; আগে থাকতেই একটা ধার মাথার উপর চেপে বসেছিল—নুপুরের অসুখের সময় থেকে—তার দেনা পুরো শোধ হয়নি তখনও—আবার ধার করে সে-বোঝা বাড়ান!

স্নেহশশী একলা মানুষ হলে এত তার ঝক্কি ঝামেলা ছিল না। সে-মানুষটা মাথা গোঁজার জায়গা করে দিয়ে গিয়েছিল—একটা পেট চালাবার জন্যে মঙ্গলময়ী স্কুলের ঝিয়ের চাকরিটাই যথেষ্ট ছিল। উনচল্লিশ টাকা সাত আনা মাইনে; তার কুলিয়ে ত যেতই, উপরন্তু দু-পাঁচটা টাকা হাতে হরদম থাকত।

এখন আর কুলোয় না। তিনটে পেট; দু-বেলা ভরান চাই। তার উপর টুকটাক আছেই। খেতে যেমন পয়সা লাগে, পরতেও তেমন দরকার। এ-মেয়ের শাড়ি আসে ত ও-মেয়ের জামা। নুপুরের জন্যে একটু দুধ বরাদ্দ আছে। বড় কাহিল মেয়েটা। এক পো দুধ নেওয়া হয়—চা-টা খেয়ে যেটুকু থাকে নুপুর খায়। ওর একটু খাওয়া-দরকার। এবার নাইন ক্লাসে পড়ছে। মাথার খাটুনি আছে। এখন থেকে শরীরে কিছু না জমলে স্কুলের শেষ পরীক্ষাটার পড়ার খাটুনি খাটতে পারবে কেন? ডুমুরটা অত পলকা নয়, তার দুধ লাগে না। কিন্তু ওই মেয়েটার অন্য রকম গোঁ। চেয়েচিন্তে পুরনো বই এনে দিলে সে পড়বে না; মেয়ে-দের পরীক্ষার পুরনো খাতা থেকে কাগজ এনে দিলে সে তাতে লিখবে না। তার জন্যে কিনে-আনা বই চাই, খাতা চাই। আর নিত্যই ও-মেয়ে শাসাচ্ছে, স্কুলে আর যাব না। অনেকটা পথ—আমার পা ব্যথা করে।

স্নেহশশী জানে, পা ব্যথা নয়—অন্য ব্যথা। মনে যা বড় লাগে, বুকেও। ডুমুর সবার সঙ্গে মানে এক হতে চায়—ইরা মীরা হাসি কল্পনার সমান সমান। কারুর কাছে হেঁট হতে সে রাজী নয়।

ঠিক ওর মেসোর স্বভাব। সে-মানুষটাও এমনি ছিল। স্নেহশশীকে কোন অবস্থা থেকে কীভাবে এনেছিল সে-কথা ভাবলে আজও বুক শুকিয়ে আসে। ভদ্র, কিন্তু বড় গরিব ঘরের মেয়ে ছিল স্নেহশশী। উড়ো এক মাঝবয়সী বর জুটেছিল কপালে। হাট

শ্রীশ্রীমা

সারদামণি দেবী

শ্রীমানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত — ৬, টাকা

শ্রীশ্রীমায়ের এরূপ বৃহৎ, নির্ভুল ও সর্বাঙ্গসুন্দর জীবন-চরিত ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। দেশ, অমৃতবাজার, আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী, উদ্বোধন প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চ-প্রশংসিত।

পরিবেশক—(১) রায় চৌধুরী এন্ড কোং, ১১৯, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫, (২) দাশগুপ্ত এন্ড কোং লিমিটেড, ৫৪।৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, (৩) সিগনেট বুক শপ, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, (৪) ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

(সি ৫৬৭০)

করে কোথা থেকে এল—আগ বাড়িয়ে আধ-পাগলা দাদাটাকে ধরল। আমার এ আছে, সে আছে। বাড়িঘর-জোতজমি। দাদা বোন পার করল। বিয়ের পর বাড়ি যাচ্ছি বলে স্নেহশশীকে নিয়ে গিয়ে উঠল কোথাকার এক ধরমশালায়। অষ্টমঙ্গলায় বাপের বাড়িতে ধুলো-পা করবার নাম করে এনে রেখে দিয়ে পালাল। তার আগেই গায়ের সামান্য যা গয়না-গাঁটি তাও ফন্দি করে বাগিয়ে নিয়েছে।

স্নেহশশী ঘেন্নায় লজ্জায় ব্যথায় প্রথম প্রথম কিছু ভাঙেনি। ভেবেছিল, বিয়ে যখন করেছে সাত পাক দিয়ে নারায়ণ সাক্ষী করে—তখন আজ হক, কাল হক, ফিরবে।

কিন্তু সেই জালিয়াত জোচ্চোরটা ফিরল না। চাপা কথাও আর চাপা থাকল না, স্নেহশশীর মুখ থেকে ধীরে ধীরে বাড়ির আর পাঁচজন জানতে পারল। তারপর—বছরের পর বছর সেই কষ্টের সংসারে মরমে মরে, মান খুইয়ে, বিছের কামড়ের মতন জ্বালা সয়ে সয়ে কাটছিল। এমন সময় ওই মানুষটার সঙ্গে কেমন করে যেন ভাব হল। জাতে ছোট, মনে বড়। প্রায় পঁচিশ বছর বয়সে, সব যখন মরে গিয়েছে, আশা সুখ স্বপ্ন কিছু আর নেই, তখন যে কী হল স্নেহশশীর, কিছুতেই মন বাঁধ মানল না। ভালবাসল লোকটাকে। তারপর এক মাঝরাতে বাড়ি ছেড়ে উধাও।
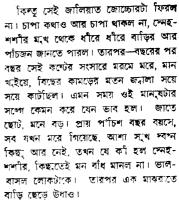
ওদের বিয়ে হয়নি; না সাতপাক, না নারায়ণ, না ঠাকুর-দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে সামান্য একটা প্রতিজ্ঞা পর্যন্ত। তবু ওই মানুষটার নামে সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে স্নেহশশীর মন ভরে গেল। বিয়ে না করেও ওরা স্বামী-স্ত্রী। এক সংসার, এক সুখ, একই দুঃখ, একই বিছানা—সে সুখেই হক কি শোকেই হক।

এ-শহর ও-শহর ঘুরে ঘুরে শেষে এই শহরে। এখানে বছর ছয় বেঁচে ছিল মানুষটা। তারপর চলে গেল চিরকালের মতন। যাবার আগে যেন বুঝতে পেরেছিল। ডোমপাড়ার বাড়িটা তাই তৈরি করে দিয়ে গেল মাথা গোঁজার জন্যে।

বাস্তবিকই লোকটা মান বুঝত। ভালবাসা বুঝত। কর্তব্য বুঝত। মল্লিকবাবুদের কারখানায় গোলমাল হল, কথা কাটাকাটি। চাকরি ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন বাজারে আলুর দোকান দিল; পোষাল না বলে কাপড় ফিরি; তাতেও যখন সুবিধে হল না—বাজারে মাংসর দোকান দিল।

স্নেহশশীর সেটা ভাল লাগেনি। শেষ পর্যন্ত কসাইগিরি! ছি ছি, ওটা ভদ্রলোকের কাজ নয়।

"আমি ভদ্রলোক নই," মানুষটা ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল। "ভদ্রলোকদের পায়ের জল চাটতে আমি যাব না। আমি ছোটলোক। লেখাপড়া জানি না; ব্যাঙের পাতা পর্যন্ত বিদ্যে। হাত নেড়ে খাই। মাংসর দোকানে পয়সা আছে। আমি করব।"

নুপুর আর ডুমুর তখন সবে ঘাড়ে এসে পড়েছে। স্নেহশশীর দিদির মেয়ে। বাপ গিয়েছে অনেক দিন। মাটা যাব-যাব করছিল। ছোট বোনকে অনেক দিন যাবৎ চিঠিপত্তরের মধ্যে দিয়ে ধরেছিল। শেষে একরকম পায়ে ধরল মর-মর সময়ে। ওই মানুষটাই রেলভাড়া খরচ করে বর্ধমানে গিয়ে মেয়ে দুটোকে নিয়ে এল।

মানুষটা মরার আগেও বলেছে, "সব বিক্রি করবে—ঘটিবাটি মায় বাড়ি পর্যন্ত; কিন্তু খবরদার, মান নয়; আর—।" আর যা তার কথা ওঠে না।

স্নেহশশী মান বিক্রি করেন। করে না। যা বিক্রি করে তা শ্রম। হয়ত সব শ্রমের মধ্যে শ্রদ্ধা নেই। স্নেহশশী স্কুলের ঝি। তাকে কেউ শ্রদ্ধা করে না তাই। তাতে কী. ভালবাসে ত; তাতেই স্নেহশশী খুশী। নূপুর-ডুমুর তাদের মাসির এই খুশিটুকু বুঝুক, স্নেহশশী আর কিছু চায় না।

গরমের ছুটি হল।

খুব গরম পড়েছে এবার। কোন সকালে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ তেতে ওঠে. বেলা বাড়ার তর সয় না—কটকটে রোদ আর রোদের ঝাঁঝে চোখ জ্বলে যায়; সামনের ডোমপাড়ার ফাঁকা মাঠটা উনুনের আঁচের আভার মতন গনগন করতে থাকে। খানিক বেলা হল ত কার সাধ্যি ঘরের বাইরে আসে, যেমন গরম বাতাস তেমনি চড়া কাঠফাটা রোদ। গাছলতাপাতা যেন পুড়ে পুড়ে শুকিয়ে হলুদ হলুদ রঙ ধরেছে, মাঠের ঘাসও। কার পোষা এক তিতির আসত আগে, স্নেহশশীদের বাড়ির কাছে আতা গাছে এসে বসত। এত রোদে সেও আর আসে না। কানা কাকটা শুধু কুমড়ো-মাচার উপর বসে মাঝে মাঝে ডাকে।

স্নেহশশীর হয়েছে মুশকিল। সারাটা দিন ঘরে বসে বসেই কাটাতে হয়। বিকেলেও এক বাড়ির কাজ কমে গিয়েছে। বড়দিদিমণি ছুটিতে বাড়ি গিয়েছেন। অন্য দুই বাড়ির একটাতে, যেটাতে সেলাই শেখাত স্নেহশশী, তাদের ওখানে রোজ যাওয়ার কথা নয়—তবু যেত ও; এখন আর তাও যাওয়া যায় না—সেই মাধুরী বৌমণির বাচ্চা হবে, রোজই শরীর খারাপ যাচ্ছে। বিছানা আর ছাড়ে না। ও-কাজটা হয়ত গেল।

নূপুরেরও ভাল লাগে না। স্কুল বন্ধ ত সব বন্ধ। দুটো মনের মতন কথা বলবে এমন সঙ্গী নেই। লতিকার চশমা আসার কথা ছিল কলকাতা থেকে, এসেছে কিনা কে জানে! কেমন দেখাচ্ছে ওকে চশমা পরে—? দীপালির বিয়ের কথা উঠেছিল, এই জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ়েই হয়ে যেতে পারে। দীপালি পাটিগণিত বইয়ের মধ্যে করে তার হবু বরের ছোট্ট এক ছবি এনেছিল। ওরা ক্লাসের সব মেয়ে দেখেছে। নূপুরকে বাদ দিয়েছিল প্রথমে। তারপর দীপালির পায়ে ধরে সেধে শেষে ছবিটা দেখেছে নূপুর। বেশ চেহারা, দীপালির বরের। চুল ওলটান, লম্বা নাক, হাসি-হাসি মুখ। বান্ধব আলয়ের সেই ছেলেটার মতন। ও-ছেলেটাও বেশ ভাল। নাম মাধব। দোকানের কাচের আলমারির পাশে টুলের উপর বসে থাকে। নস্যি নেয়, গল্পের বই পড়ে, আর মাঝে মাঝে হেলান দিয়ে পা তুলে বাঁশের আড়বাঁশি বাজায়। ওর দোকানে স্কুলের মেয়েরা খাতাপত্র, পেন্সিল, লজেন্স, চানাচুর, ফিতে-টিতেও কিনতে যায়। নূপুরও অন্য মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে কতদিন গেছে। নিজে একলা খুব কমই। মাধবদা এমন দুষ্টু, নূপুরকে দোকানে দেখে একদিন কোথা থেকে পায়ে বাঁধা ঘুঙুর বের করে দিয়েছিল একজোড়া। ঠুনঠুন ঝুনঝুন করে কী সুন্দর শব্দ হয়েছিল, যখন হাতে করে নাড়ল ও। "নেবে নাকি, নাও না—খুব সস্তা দাম।" ছেলেটা মুখ টিপে টিপে হেসে বলেছিল, "আরও সস্তায় দিয়ে দেব।" আহা, নূপুর কি নাচতে জানে নাকি যে পায়ে ঘুঙুর বাঁধবে। লজ্জায় আর চোখ তুলতে পারেনি নূপুর। তারপর মাথা নেড়ে বলেছিল, "পয়সা নেই।"......আর একবার মাধবদা ওকে গল্পের বই পড়তে দিতে চেয়েছিল। নূপুর তাও নিতে পারেনি। সর্বনাশ। ডুমুরটা আছে না। তার চোখ বাঁচাবে কী করে নূপুর।......

মাধবদাকে আর দেখতে পাচ্ছে না নূপুর; পাবেও না স্কুল খোলা পর্যন্ত। এ-ছাড়া আরও কত কী! পাল কোম্পানির দোকানে নতুন রকমের শাড়ি এলে দোকানের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখে। মেয়েরা যেতে যেতে দেখে। চায়ের দোকানের কাছে শহরে যে সিনেমা এসেছে তার রঙচঙে ছবি। কী সুন্দর! কোন্ মান্ধাতার আমলে নূপুররা একবার মাসির সঙ্গে "সাবিত্রী" দেখতে গিয়েছিল, তার পর ব্যাস্ আর কোন সিনেমাই দেখেনি। বাণী-মানিরা সব বই দেখে—যত বই আসে। তারা সবাইকে চেনে। যারা সিনেমা করে। চায়ের দোকানের কাছে টাঙানো রঙচঙে

ছবিগুলো দেখে দেখে নূপুরও অনেকের মুখ চিনে গিয়েছে। বন্ধ যায় না, এই এক মাসেরও বেশী না দেখে দেখে আবার মুখগুলো সব ভুলে না যায়।

বিশ্রী লাগে নূপুরের। খালি সংসারের কাজ কর আর বই মুখে করে বস। ডোমপুকুরের জল শুকিয়ে কাদা হয়ে গিয়েছে, ও-জলে আর স্নান পর্যন্ত করা যায় না। খানিক দূরের শিব-মন্দিরের কুয়ো থেকে আগে শুধু খাবার জন্যে এক ঘড়া জল আসত, এখন ঘড়া ঘড়া জল বয়ে আনতে হয়। ডুমুরটা এত পাজী যে, কখনও ঘড়া কাঁকালে করবে না; জল আনতে বললে বালতি হাতে ঝুলিয়ে যাবে। নূপুরের ত ওই সরু লাউয়ের মত একটু কোমর। ঘড়ায় জল বইতে ওর যে কী কষ্ট হয়। কে তা দেখছে।

আরামে আর স্বস্তিতে আছে ডুমুর। স্কুল বন্ধ ত নয়, যেন জায়গা বদল; এক শহর থেকে আর-এক শহরে চলে আসা। কারও সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কেউ চোখ চিরে দেখছে না, ঠোঁট বেঁকাচ্ছে না, চুগলি কাটছে না। স্কুলের সেই বদমাস পাজী হতচ্ছাড়া মেয়েগুলোকে যে দেখতে হচ্ছে না, তাদের কিচির মিচির শুনতে হচ্ছে না, এতে ডুমুর বেঁচেছে: বাঁচা শুধু নয়, খুব স্বস্তি আর সুখে আছে। মন একেবারে ঝরঝরে। এ-বেলা ও-বেলা বই নিয়ে খানিক বসছে, বাকীটা সময় টুকটাক কাজ আর কথা নিয়ে দিব্যি আছে। আজ ঝুল-পড়া রান্নাঘর পরিষ্কার করছে, কাল সোডার জল দিয়ে কৌটোবাটা মায় এঁটো ন্যাতা মরচে-ধরা কড়াই ধুচ্ছে। বড় ঘরটার সব কিছু তিল তিল করে পরিষ্কার করল। তারপর পড়ল বাগান নিয়ে। পাঁচ হাতের সেই ঝোপের পিছনে গোটা একটা দিন কাটাল। মেসোমশাইয়ের আমল থেকে কঞ্চির এক খাঁচা ছিল; সেই ভাঙা খাঁচা মেরামত করে বারান্দায় ঝুলিয়ে রাখল। একটা টিয়াপাখি হলেই হয়। স্নেহশশী বলল, "পাখি আর পাবি কোথায়, ওই কানা কাকটাকে পুষতে শুরু কর।" বয়ে গিয়েছে ডুমুরের কানা কাক পুষতে। কোন ফাঁকে ডোমপাড়ায় গিয়ে হরিকে বলে এসেছে একটা পাখির কথা। টিয়া হক, ময়না হক, যা হক একটা ভাল পাখি।

নূপুর ঠাট্টা করে বলল, "ধরে দিতে বলেছিস, না তৈরি করে দিতে বলেছিস?"

"কেন?" ডুমুর ভুরু কুঁচকে দিদির দিকে তাকাল।

"না, তাই বলছিলাম। ও ত ছুতোর; কাঠের একটা পাখি তৈরি করে দিলে কালই পেয়ে যাবি।" নূপুর ঠোঁট টিপে হাসে।

কথাটা মিথ্যে নয়। হরি সুবল ছুতোরের ছেলে। একেবারে জোয়ান বয়স। বাপের কারবারে কাজ করে। আর কাজের মধ্যে মাঠকুড়িয়ার বাগানে গিয়ে পুকুরে মাছ ধরে।

দু বোনের খিটিমিটি এ-রকম লেগেই থাকে। তবে, স্কুল বন্ধর জন্যে ডুমুরের মনটা এতই ভাল যে, নূপুরের সঙ্গে খুব বেশী কথা-কাটাকাটিও আর করে না। বরং মাঝে মাঝে নরম হয়ে যায় খুব। ভাবসাব করে, হাসি তামাশাও।

হরি সত্যিই সেদিন এক টিয়াপাখির ছানা এনে হাজির করল। তাকে খাঁচায় পুরে ডুমুর বলল, "দেখলি ত, কাঠের নয়, জ্যান্ত পাখিই এসেছে।"

"দেখেছি; আমার চোখ আছে।" নূপুর একটু মুচকি হাসল।

হাসিটা ডুমুরের কেমন যেন লাগল। তখন নয়, যখন দু বোনে জল আনতে যাচ্ছে শিব-মন্দিরের কুয়ো থেকে, বিকেলের গোড়ায়, ডুমুর কথাটা তুলল। কাঁঠালগাছের ছায়া পেরিয়ে এসে করবী-ঝোপ আর বুনো তুলসীর ডালপালা ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে যেতে যেতে ডুমুর বলল, "এই, তুই তখন অমন করে হাসলি কেন রে?"

"কখন?"

"সেই তখন—!"

নূপুর বুঝতে পেরেছিল কোন সময়ের কথা বলছে ডুমুর। তবু ন্যাকাবোকা সেজে আবার বললে, "তখন—তখন কি, কখন তা বল; আর না হয় চুপ করে থাক।"

ডুমুর দিদির দিকে একবার তাকাল। করবীর একটা লম্বা ডাল ওর বুকের কাছে এসে পড়েছিল। সরিয়ে দিতে দিতে ডুমুর বলল, "সেই যে তখন, হরিদা যখন পাখি দিয়ে গেল।"

নূপুর এবার ছোট বোনের মুখ দেখল ঘাড় ঘুরিয়ে।

"এমনি হাসলাম।"

"মিথ্যে কথা বলছিস?"

"ওমা, হাসির আবার সত্যি মিথ্যে কি! হাসি পেল, হাসলুম।"

ডুমুরের সন্দেহ তবু যায় না।

নূপুর এবার বলল, "হরিটা কেমন উজবুক রে—! আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম ওর ওপর।"

"কেন, কী করল ও?"

"কেন কি, বাইরে থেকে কোন রকমে কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে ফিরছি, গায়ে জামাটামা কিচ্ছু নেই; ও হাঁদাটা হাঁ করে তাকিয়ে আছে। অসভ্য। সহবত জানে না।"

নূপুর বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, "ডোমপাড়ায় থেকে থেকে একেবারে ছোটলোক হয়ে গেছে।"

ডুমুর পলকেই রেগে আগুন। কালো মুখ আরও কালো করে ঝাঁঝিয়ে উঠল, "যা যা—ওই ত তোর বকের মত লম্বা কুঁজো

দ্রষ্টব্য:—আমাদের গেঞ্জী খুব নকল হচ্ছে। কেনার সময় "কালিঘাট হোসিয়ারী" কলিকাতা লেবেলটি ভালভাবে দেখে নেবেন। পাশের ছবিতে লেবেলের নক্সা দেখুন।

TRADE MARK

শারদীয়া পুজায়
প্রিয়জনকে উপহার দেবার মত জিনিষ
বিখ্যাত "সামারকুল" (জালি)
কিম্বা
প্যাগোডা, হলিউড এবং
নং ৪৯ (ফাইন) গেঞ্জী
ফোন: ৪৬—৪৬৪৯

TRADE MARK

KALIGHAT HOSIERY FACTORY
231, RASHBEHARI AVENUE
CALCUTTA 19

চেহারা। তোকে আবার তাকিয়ে দেখবে কি রে!" হাতের বালতিটা পারলে বুঝি দিদির পিঠেই এক ঘা বসিয়ে দিত ডুমুর, এমন তার রাগে-আগুন চেহারা।

"হয়েছে কি ডোমপাড়ায় থাকে ত! কত লোকই ত থাকে; আমরাও। সবাই কি আমরা ডোম মেথর নাকি?"

"উ, খুব যে টান!" নূপুর ভেঙিয়ে বলল। তারপর হন হন করে হাঁটতে লাগল।

ডোমপাড়ায় যে ডোমরা থাকে না, তারা আরও একটু দূরে থাকে, নূপুর তা জানে। কিন্তু ছুতোর, কামার, মিস্ত্রি, মজুর—এরা ত থাকে। ডুমুরের নজরটা ওই দিকে।

আর তার—? নূপুর মনে মনে হঠাৎ নিজেকে প্রশ্ন করল।

টিয়াপাখির ছানাটার যত্ন আত্তি দেখলে নূপুরের গা জ্বলে যেত। স্নেহশশীর হাসি পেত। ছাতু গুলে গুড় দিয়ে পাখিটাকে যতই খেতে দিক ডুমুর, ওই পালক-ওঠা ছানাটা যে বাঁচবে না নূপুর তা জানত। তবু, ডুমুর যখন সেই পাখিটা নিয়ে আদিখ্যেতা করত, আর দিদির দিকে বেঁকা চোখে চেয়ে চেয়ে গালের উপর কেমন করে এক চাপা হাসি ফোলাত—যার অর্থ হচ্ছে দেখ, তোর হিংসুটে চোখ নিয়ে চেয়ে দেখ্—তখন সেই হাসি দেখে নূপুর যেন কিসের চাপা রাগে অস্থির হয়ে যেত।

কী দেখত রে নূপুর? ওই মরা হাজা পাখির ছানা, না তার বেশী আরও কিছু?

স্নেহশশীর কাছে এক সকালে আট আনা পয়সা চেয়ে বসল নূপুর।

"কী করবি পয়সা?" স্নেহশশী আমতলা থেকে কুড়ন ক'টা আম কেটে তেল দিয়ে মশলা দিয়ে মাখছিল আচার করার জন্যে।

"আধ দিস্তে কাগজ আর একটা পেন্সিল কিনব।"

"তাতে আট আনা লাগবে না। আনা পাঁচেক লাগবে।" স্নেহশশীর জবাবে কোনরকম তিরস্কার ছিল না।

নূপুরের মুখ ভার হল। চোখ ছলছল করে উঠল। মাথার একটা ফিতে কিংবা ক'টা কাঁটাও ত সে কিনতে পারে। সে কি চোর না ছ্যাঁচড় যে তিন আনা পয়সা ভোগা দিয়ে নিয়ে নেবে।

আট আনাই পেল নূপুর। তারপর বাড়িতে সাবানে রঙ করা ফিকে লাল শাড়ি পরে, পায়ে চটি গলিয়ে অমন কাঠ-ফাটা রোদের এক শেষ দুপুরে বেরিয়ে গেল।

ফিরল বিকেলেই। আট আনা অনুপাতে সবই এনেছে। কাগজ, পেন্সিল, ফিতে। এবং ডুমুর দেখল, তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খুব লজেন্স চুষল নূপুর। এক সময় নিজে থেকেই শুধিয়েছিল, "বেশ টক; খাবি একটা?"

"না।" ডুমুর মাথা ঝাঁকাল, "তুই খা।" তারপর সারা ঠোঁটে আর নাকের ডগায় ভীষণ এক বিস্বাদ ঘেন্না জাগিয়ে বলল, "ভিক্ষের জিনিস আমি খাই না।"

"কী বললি?" নূপুর ছোট বোনের সামনে যেন ছুটে এসে দাঁড়াল।

"যা বলেছি ঠিক বলেছি।" ডুমুর অবিচল। "তোর চেয়ে আমি অঙ্ক ভাল জানি—; আমায় মাসি পারসনি যে যা খুশি বুঝিয়ে দিবি।"

নূপুরের আর সহ্য হল না। ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিল ডুমুরের গালে। "ছোট-লোক, অসভ্য কোথাকার। বড্ড তোর মুখ হয়েছে, না? কাকে কী বলতে হয় জানিস না।"

চড় খেয়ে ডুমুরের মাথার মধ্যে শিরায় যেন আগুন জ্বলে গেল। নূপুরের বিনুনিটা খপ করে ধরে ফেলল। তারপর গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে হ্যাঁচকা এক টান। ছোট বোনের গায়েই হুমড়ি খেয়ে পড়ল নূপুর। এরপর—যা স্বাভাবিক—দু বোনে খানিক আঁচড়া-আঁচড়ি খামচা-খামচি। স্নেহশশী বাড়ি থাকলে এতটা হত না।

ঝগড়ার শেষে রেষারেষির আবহাওয়ায় নূপুর বলল, "তোর মতন আমার নিচু নজর নয়। বেশ, আমি না হয় ভিক্ষে করি; তুই বা কোন কমতি যাস। চেয়েচিন্তে ওই ত এনেছিস, মরাহাজা একটা পাখির ছানা।"

ডুমুরের চোখের কোনায় নূপুরের নখ লেগে ছড়ে গিয়েছিল। জ্বালা করছিল বেশ। আঙুল দিয়ে জায়গাটা রগড়াতে রগড়াতে ডুমুর জবাব দিল, "তোর মতন হাত পেতে চাইলে অনেক জিনিস আনতে পারি।"

"হ্যাঁ, সব পারিস তুই, জানা আছে।" নূপুর ফেঁসে-যাওয়া আঁচলের কাছটা কাঁধের ওপর তুলে বারান্দায় চলে গেল।

ডুমুরের টিয়াপাখিটা ধুঁকছিল। খাঁচার একপাশে বুকের মধ্যে ঠোঁট গুঁজে নেতিয়ে ছিল। স্নেহশশীর চোখে পড়তে বলল, "ওটার পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে। ছেড়ে দে ওটাকে ডুমুর।"

ছেড়ে দিল ডুমুর। আতাগাছের পাতা-ভরা এক ডাল বেছে রেখে দিয়ে এল। বিকেলেই মরল পাখিটা। মরে মাটিতে লুটিয়ে থাকল।

দিন দুই ধরে দেখল নূপুর ফাঁকা খাঁচাটা। শেষে ঠাট্টা করে বলল ডুমুরকে, "খাঁচাটা আর মাথার ওপর ঝুলিয়ে রেখেছিস কেন বাহার করে!"

ডুমুর কোন জবাব দিল না।

গরমের ছুটি ফুরিয়ে স্কুল খুলল আবার। দুপুরে স্কুল। নুপুর ডুমুর বাড়ি থেকে একসঙ্গে বেরয়, অথচ বেশ আগু-পিছু হয়ে স্কুলে পেঁছয়। ফেরার বেলাতেও তাই। স্নেহশশীর সঙ্গে ওদের আসা-যাওয়ার সম্পর্ক থাকে না।

ডুমুরের প্রায়ই শরীর খারাপ হচ্ছে আজকাল। আজ পেটে ব্যথা, কাল মাথা ধরা, কান কট কট, পায়ের গাঁট ফোলা। স্নেহশশী বলে, "এত কামাই করলে কি পড়াশোনা হয়।"

"হয় না ত হয় না; আমি তার কী করব?" ডুমুরের অখুশী গলা, "মরতে মরতেও কি পড়তে হবে নাকি?"

"বিনি মাইনেয় পড়া। অত কামাই করলে কি চলে? পরীক্ষায় পাশ করতে পারবি না। নাম কেটে দেবে খাতা থেকে।" স্নেহশশী ক্ষোভের সঙ্গে বলে।

"দিক।" ডুমুর নির্বিকার।

স্নেহশশীর খুবই কষ্ট হয় এ-সব কথা শুনলে। "কত মেয়ে আছে, সুযোগের অভাবে লেখাপড়া শিখতে পায় না, স্কুল-টুলের মুখ দেখার ভাগ্য হয় না জীবনে। তোদের এত সুবিধে—তবু তোরা হেলায় হারাচ্ছিস। আমি যদি স্কুলে না চাকরি

করতাম, পড়াতে পয়সা লাগত না? তখন মাইনে গুনে দু-বোনকে কি পারতাম স্কুলে পড়াতে। তা ছাড়া কত বেশী বয়সে সব স্কুলে ভর্তি হলি দু বোনে। এখনও যদি এমন হেলা ফেলা করিস!"

ডুমুর চুপ করে মাসির কথা শোনে। পরের দিন কী খেয়াল হয়, বইপত্র বগলে করে স্কুলে যায়। দু চার দিন নিয়মিত আসা যাওয়া; তারপর আবার আচমকা একদিন বেঁকে বসে। যাবে না স্কুলে।

নুপুরের কামাই নেই, অনিচ্ছা নেই, অনাগ্রহের ভাব নেই। বরং ডুমুর যে-দিন যায় না, সেদিন নুপুর আরও একটু তাড়াতাড়ি বেরয় বাড়ি থেকে, আরও একটু দেরি করে ফেরে। ছুটিটুটির দিন নুপুর বড় বেশী আনমনা। ডুমুর তা লক্ষ্য করে।

বর্ষার জলে ভিজে স্নেহশশীর ঠান্ডা লাগল। প্রথমে জ্বর। যাচ্ছে যাবে করে তিন-দিন কাটল। তারপর পাকা হয়ে বসল। জ্বরের সঙ্গে আর পাঁচটা উপসর্গ।

মাসি অসুখে পড়ার পর থেকে ডুমুর স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলে। নুপুরও কামাই করতে চেয়েছিল প্রথম প্রথম। কিন্তু তার নাইন ক্লাসের পড়া আর সামনেই পুজোর ছুটির পরীক্ষা বলে স্নেহশশী তাকে কামাই করতে দেয়নি। নুপুর তাতে খুশী হয়েছিল। বিকেলের দিকে রোজই ফেরার সময়টা বাড়তে লাগল। ফেরার পথে স্নেহশশীর ওষুধ আনতে রামেশ্বর ডাক্তারের দোকানে তার যাবার কথা নয়। তবু দেরি হয় কেন? দেরি ত হবেই। ছুটির পর মীরার বাড়ি গিয়ে ইংরিজীর মানেটা আনতে হয়েছে, সুব্রতার খাতা থেকে অংক-গুলো টুকে না নিলে সাতাশ প্রশ্নমালার অংকগুলো আর একটাও মাথায় ঢুকত না।

স্নেহশশী এতে খুশী। খুবই খুশী। পড়াশোনায় খুবই চাড় হয়েছে মেয়েটার। ঠাকুরের কৃপায় আর একটা বছর এইভাবে লেগে থাকে মেয়েটা। ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা পাশ করতে পারলে নুপুরের ভবিষ্যৎ যে কেমন হবে তার স্পষ্ট একটা ছবি এঁকে রেখেছে স্নেহশশী। ডুমুর-নুপুরকেও বলেছে। "আমাদের স্কুলেই তোর চাকরি করে দেব। বড়দিদিমণি আমায় কথা দিয়েছে। আর এ-স্কুলে যদি নাও হয়, রেলের পাড়ায় মেয়েদের মাইনর স্কুল হচ্ছে—সেখানে তোর বাঁধা কাজ নুপুর। অনাদিদাদা আমায় ঠেলতে পারবে না।"

মাসির আড়ালে ডুমুর বাঁকা হাসি হেসে বলে নুপুরকে, "তবে আর কি, তোর ত পাখা গজাল বলে।"

"তোর ত গজিয়ে গেছে এরই মধ্যে।" নুপুরের পালটা জবাব।

"দেখেছিস নাকি?" ডুমুর আরও নিষ্ঠুর হয়ে হাসে যেন।

"চোখ থাকলেই দেখা যায়। ভাগ্যিস মাসির অসুখটা করেছিল!" নুপুর ঠোঁট কামড়ে হাসে, "সাপে বর হয়েছে তোর।"

"তোরই বা কম কী! ফাউনটেন পেন পাচ্ছিস, সেন্টের শিশি, একরাশ চিরকুট—এত কথাও লেখে তোকে।" ডুমুর ছুরির ফলার মত শান দেওয়া চোখে তাকায়।

নুপুর আর তত চমকে ওঠে না। ভয়ও পায় না। ঘেন্নাই হয় ডুমুরের উপর। অত সাবধানে লুকিয়ে রাখা জিনিসগুলো হাটকে হাতড়ে ঠিক খুঁজে খুঁজে বের করে দেখেছে হারামজাদী। বোনের চোখে চোখে চেয়ে নুপুর এবার বলে, "জিনিসগুলো তোর হরিদাকে চিনিয়ে দিচ্ছিস ত, ফাউনটেন পেন কাকে বলে, সেন্ট কেমন দেখতে—। হ্যাঁ, ভাল করে চিনিয়ে দে; না চিনলে জানলে বেচারা আনবে কী করে?"

স্নেহশশী সেরে উঠেছে। বড় কাহিল শরীর। জ্বরজ্বালা না থাক, দুর্বলতা বড় বেশী। একটু আধটু হাঁটাহাঁটি না করতে পারে এমন নয়—কিন্তু ইচ্ছেই করে না। সারা দিন শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। হাত পা নাড়তেও আর ভাল লাগে না।

ক'দিন খুব বৃষ্টি হয়ে গেল। মঙ্গলময়ী স্কুলের ও-পাশটা জল-থৈথৈ। ঝিলের জল বেড়ে অতটা ছড়িয়ে যাবে কে ভেবেছিল। আসলে ঝিলের জল নয়, মরা খাল দিয়ে নদীর জল ঢুকে ঝিল ভাসিয়ে দিয়েছে।

জল না কমে যাওয়া পর্যন্ত স্কুল বন্ধ। দু দিন হয়ে গেল, এখনও জল সরছে না। নুপুরের অসহ্য হয়ে উঠেছে।

আজ আবার সকাল থেকে আকাশ কালির মত কালো হয়ে গিয়েছে। আবার বুঝি শুরু হল। শুরু হলে, আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হয় না, সে-বৃষ্টি সহজে থামবে। হয়ত আবার তিন চারদিন একটানা চলল।

নুপুরের সারা মন তেঁতো, বিশ্রী, রুক্ষ, হয়ে উঠল।

ডুমুর খুব খুশী। আ, এই বৃষ্টি চলুক না একটানা। যতদিন খুশি।

বৃষ্টি এল। একটু বেলায়। যেমন তোড়, তেমনি ফোঁটা। আধঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব ভিজে শপশপ করতে লাগল। গাছ-পাতা চুইয়ে চুইয়ে জল পড়ছে। মাঠের খানা-

ডোবা ভরে গিয়েছে, ঘাসের ডগা তলিয়ে জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে।
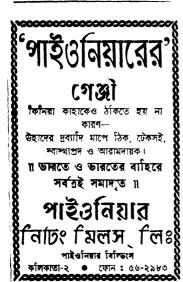
বৃষ্টিটা প্রথম চোটে বেশী সময় নিল না। থেমে গেল। আকাশে শুধু আরও ঘটা বাড়তে লাগল।

খাওয়া দাওয়া সেরে স্নেহশশী বর্ষার এমন ঠাণ্ডায় ঘুমিয়ে পড়ল। নূপুর ডুমুর কাজ-কর্ম সেরে ঘরের একপাশে মাদুর বিছিয়ে পড়ে থাকল। চোখ বুজে।

প্রথমে ডুমুর উঠল। তখন দুপুর হবে। অনুমানে বোঝা যায়। বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ইস, আকাশ কী কালো। যেন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। তেমনই অন্ধকার। ব্যাঙ ডাকছে। দূরের ছোট লাইনের গাড়ি যাচ্ছে—তার শব্দ। ও, তবে তিনটে বাজে প্রায়। বাড়ির বাইরে এল ডুমুর। কানা কাকটা খাপরার ফাঁকে গিয়ে বসেছে। আতাগাছটা ভিজে যেন শীতে কাঁপছে।

জলজমা মাঠে পা দিয়ে ডুমুর এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর পায়ের কাপড় একটু তুলে সামনের কাঁঠাল আর আমঝোপের দিকে এগিয়ে চলল। তার চন্দনা আসব আসব করেও আসছে না।

নূপুর ছটফট করছিল। কান্না পাচ্ছিল তার। আজ নিয়ে তিনদিন। এক শুধু রবিবারে দেখা হত না বলে কী কষ্ট পেত ওরা। আজকাল রবিবারের দুপুরেও দেখা সাক্ষাতের একটা ব্যবস্থা করা গিয়েছে। শিবমন্দিরের পথে। সেখানে বড় বেশী লতা-পাতা ঝোপঝাড়—তার আড়ালে।

নূপুর বারান্দায় এসে ডুমুরকে দেখতে পেল না। কোথায় গেল? হয়ত পুকুরের দিকে। শিবমন্দিরের দিকে যাবে কি যাবে না—একটু ভাবল নূপুর। যার জন্যে যাওয়া সে যদি না আসে?

আসবে। না এসে পারে না। আজ নিয়ে তিন দিন। তিন দিন দেখা নেই, পাগল হয়ে গিয়েছে না!

নূপুর পা বাড়াবার আগে টিকটিকির ডাক শুনল।

আকাশে আরও ঘন করে মেঘ জমে উঠেছে। ঠাণ্ডা বাতাস। গাছের পাতার আড়াল থেকে ক্লান্ত পাখিরাও মাঝে মাঝে ডেকে ওঠে। টুপটাপ জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছে হাওয়ায় গাছের পাতা থেকে। কেমন সব ফাঁকা। যেন এ-জল এ-মাটি এমন বাতাস —এখানে নেই।

নূপুরের মোহ হঠাৎ যেন সাপের ছোবল দেখে চমকে উঠল। জলের ওপর খসে পড়া আঁচলটা তুলে নিয়ে ককিয়ে উঠল নূপুর। ছুটে পালিয়ে যেতে চাইল।

মাধব ছাড়বে না। ফিস ফিস করে কী যেন বলছে। হাত বড় শক্ত আর গরম মাধবদার।

নূপুর একরকম সবটা জোর দিয়ে ধাক্কা দিল মাধবকে। তারপর বুনো লতাপাতার ঝোপের উপর লাফিয়ে পড়ল।

নূপুর প্রথমটা ছুটেছে। তারপর দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল। ও কাঁদছিল। কান্নাটা তার কানে যাচ্ছে না। আর কানে যাচ্ছে না বুকের তলায় রাখা ঘুঙুরটার হাসির শব্দ। অথচ তার শব্দটা হাঁটার তালে তালে বাজছিল।

বাড়ির চৌকাঠে পা দিয়ে নূপুর পাথর। সামনে দাঁড়িয়ে স্নেহশশী। ডুমুরও মুখ নিচু করে মাসির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ওর কাপড় জামা কাদায় জলে একশা। হাতে ছোট্টমতন এক খাঁচা।

স্নেহশশী চৌকাঠ ধরে খানিকটা সময় বোনঝিদের দিকে কেমন অদ্ভুত, শূন্য, অর্থ-হীন আর গভীর বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল, কথা বলল না। নিশ্বাস ফেলল। শব্দটা নূপুর-ডুমুরের কানে গেল।

আরও একটু চুপচাপ থেকে স্নেহশশী বলল, "বাড়িটা ভেবে-চিন্তে ঠিক জায়গায় করেছিল সে-মানুষটা। সংসার সে চিনত, বুঝলি?"

স্নেহশশী আর কোন কথা না বলে ফিরে গেল। বাড়ির মধ্যে।

অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নূপুর পা বাড়াতে যাচ্ছিল, জামার তলা থেকে বুকের কাছে ঘুঙুরটা বেজে উঠল। চমকে উঠল নূপুর। ডুমুরের দিকে তাকাল একবার। তারপর ঘুঙুর জোড়া বের করে মাঠের জলেকাদায় ছুঁড়ে দিল।

দু-বোনই চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল ক পলক। আকাশে মেঘ ডাকছিল। ডুমুর উঁচু হয়ে চাইল। ঘনঘটা মেঘ। হরির দেওয়া চন্দনাটাও ডুমুরে ছেড়ে দিয়েছে। আর দিদির মতনই কাঁদতে কাঁদতে ছুটতে ছুটতে এসেছে। হাতের খাঁচাটা যেন থেকেও ছিল না। এবার বুঝতে পারছে ডুমুর। খাঁচাটা ছাইগাদার দিকে ছুঁড়ে দিল।

নূপুর ডুমুর পাশাপাশি চৌকাঠ ডিঙোবার জন্যে পা বাড়াল।

বিশ্রাম — আলোকচিত্রী শ্রীবিনয়ভূষণ দাস

কবিতার ভাববস্তু কোন কবিরই "উদ্ভাবিত" নয়, দূরবর্তী দেশ বা কালের সাহিত্য হইতে "আবিষ্কৃত" হইতে পারে। কোন কোন ভাববস্তু কোন কোন পাঠকের কাছে নূতন মনে হইতে পারে। কিন্তু অন্য বহু পাঠকের কাছে নূতন নয়। যাহার অল্প-সংখ্যক কবিতা পড়া আছে, তাহার কাছে কোন কোন কবিতার ভাব নূতন ঠেকিতে পারে। যাহার দেশ-বিদেশের বহু কবিতা পড়া আছে, তাহার কাছে নূতন ভাববস্তু খুবই দুর্লভ। এক যুগের কবিতায় কোন ভাববস্তুর সন্ধান না মিলিতে পারে, অন্য যুগের কবিতায় হয়ত তাহা আছে। এক দেশের কবিতায় না পাওয়া গেলে অন্য দেশের কবিতায় পাওয়া যাইতে পারে।

সভ্যতার ক্রমবিবর্তন, জাতীয় জীবনে পরিবর্তন ও যুগচক্রের আবর্তনে, নব নব ঘটনাপরম্পরার সন্নিপাতে ও অভিঘাতে, নব নব সমস্যার সমুদ্ভবে নব নব বিষয়বস্তু ও ভাব-সংকরের আবির্ভাব হইতে পারে। কিন্তু এই সকল বিষয়বস্তু ও ভাবসংকর চিরন্তন সামগ্রী নয়। আজ যাহা নূতন, কাল তাহা পুরাতন; আজ যাহা লোক-চিত্তকে বিচলিত করে, কাল হয়ত তাহা নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ—এককালে এ-দেশে যে-সকল সামাজিক আচার ও আনুষ্ঠানিক সংস্কার কবিতার বিষয়-বস্তু ছিল, আজ সেগুলির আর আবেদন নাই। দেশের পরাধীনতার গ্লানি এক সময় কাব্যের একটা বিষয়বস্তু বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর আর তাহার মূল্য থাকে না।

তাহা ছাড়া যুগধর্মের আবর্তনে বিবর্তনে যে-সকল বিষয়বস্তু, সমস্যা ও ভাবসংকরের উদ্ভব হয়, সেগুলি কোন কবির নিজস্ব সম্পদ হইয়া উঠে না, একই কালে তাহা প্রত্যেকেরই অধিগম্য ও উপজীব্য হইয়া উঠে। কে ঐরূপ বিষয়বস্তু বা ভাব-সংকর লইয়া প্রথম কবিতা রচনা করিলেন, তাহা কাহারও মনে থাকে না, তাহা সাহিত্যের ইতিহাসের উপজীব্য হইয়া রহিয়া যায়।

যে-কোন বিষয়বস্তু বা ভাববস্তু, নূতনই হউক আর পুরাতনই হউক, যে-কবিতায় সর্বাঙ্গসুন্দর বাণীরূপ লাভ করিবে এবং রচনায় কলাকৌশলে সর্বজনীন আবেদন লাভ করিবে, তাহাই উৎকৃষ্ট কবিতা। অতএব কবিতার বিচারে ভাববস্তু বা বিষয়বস্তুর উপর জোর না দিয়া প্রকাশভঙ্গীর উপরই জোর দিতে হইবে। প্রকাশভঙ্গী বা টেকনিকই নূতন হইতে পারে এবং কবির স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিতে পারে। পুরাতন বা প্রচলিত বিষয়বস্তু বা ভাববস্তুতে সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি সম্পূর্ণ প্রকাশভঙ্গীর কলাপ্রকর্ষের উপর নির্ভর করে। ঐরূপ বিষয়বস্তু বা ভাববস্তুকে প্রচুর শক্তিপ্রয়োগে আলোড়িত করিলেই তাহা সম্ভব হয় না।

ভাববস্তু বা বিষয়বস্তু কবিতার পক্ষে সবচেয়ে বড় সম্পদ নয় বলিয়াই একই ভাববস্তু ও বিষয়বস্তু লইয়া যুগে যুগে বহু কবি কবিতা রচনা করিতে ইতস্তত করেন নাই—দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী অভিনব বাণীরূপ দানের উপরই নির্ভর করিয়াছেন।

আমি ভাববস্তু বা বিষয়বস্তুকে একেবারে উপেক্ষা করিতে বলিতেছি না, তবে প্রকাশভঙ্গীকে উপেক্ষা করিয়া কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব ও বিষয়বস্তুর আলোচনাকে কবিতার যথার্থ বিচার মনে করি না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কবিতা সম্বন্ধে আমাদের দেশের গ্রন্থ ও পত্রিকায় যত আলোচনা পড়ি, তাহাতে কেবল অন্তর্নিহিত ভাব বা বিষয়বস্তুর আলোচনাই দেখিতে পাই। কলেজের অধ্যাপনাতেও এই ধারাই চলে। কলেজের অধ্যাপনা পরীক্ষাভিমুখিনী, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের দ্বারা তাহা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রশ্নপত্রে যদি কেবল কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব ও বিষয়বস্তুর আলোচনাই চাওয়া হয় তাহা হইলে অধ্যাপনায় যথার্থ কবিতা বিচারের প্রত্যাশা করা যায় না। ফলে, আমাদের দেশে যাহারা কলেজে পাঠ সমাপন করিয়া পরীক্ষা পাশ করিয়া বাহির হয়, তাহারা কবিতার প্রকাশভঙ্গীর উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করিতে পারে না। কবিতার রস প্রধানত নির্ভর করে প্রকাশভঙ্গীর উৎকর্ষের অর্থাৎ তাহার চাতুর্য মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের উপর।

সে-দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কাব্য বিচার করিতে গেলে কবিতা ও গদ্যসাহিত্য বিচারের মধ্যে পার্থক্যও স্বীকৃত হয় না।

প্রকাশভঙ্গীকে ইংরেজীতে বলে টেকনিক। এই টেকনিক সম্বন্ধে এখানে দুই চার কথা বলিতে চাই।

কবিতা নানা শ্রেণীর আছে; তাহাদের মধ্যে লিরিক এক শ্রেণীর কবিতা। সাহিত্য বলিলে এখন প্রায় সকলে কেবল গল্প উপন্যাস, খুব জোর তথাকথিত রম্যরচনা—এককথায় কথাসাহিত্যকেই বুঝে। ইহা যেমন ভুল, কবিতা বলিলে কেবলমাত্র লিরিক কবিতা মনে করা তেমনি ভুল। যে-কবি লিরিক লিখিল না, যে শিশুদের জন্য কবিতা লিখিল, যে গাথা-কবিতা লিখিল—সে কবিই নয়, ইহা ভুল ধারণা। এক মানদণ্ডেও সকল শ্রেণীর কবিতার বিচার চলে না। কবিতা-বিচারের আগে কোন শ্রেণীর কবিতা, তাহা বুঝিয়া লইয়া কবিতাবিশেষের কাছে তদনুরূপ উৎকর্ষ প্রত্যাশা করিতে হইবে।

কবিতাকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বুঝা যাক। এক শ্রেণীর কবিতায় organic development-এর ধারা অনুসৃত হয়। ইহা ভাস্কর্য-শিল্পের অনুগামী। কবি এই ধারায় ভাবকোরককে ধীরে ধীরে সৌগন্ধ্যে, মাধুর্যে ও সৌন্দর্যে ফুটাইয়া তুলেন—ধাপে ধাপে উন্মেষ সাধনের ফলে এমন অবস্থায় ভাবধারা আসিয়া পৌঁছায় যে, তাহার পর একটি চরণও যোগবিয়োগের উপায় থাকে না। বক্তব্যের আর কোন আকাঙ্ক্ষাও থাকে না। কবিতার প্রাণধর্ম নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া জীবদেহের মত সমগ্র রচনাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া জীবন্ত করিয়া রাখে। জীবদেহের বিবিধ প্রত্যঙ্গের মত কবিতার প্রত্যেক অংশ কাব্যদেহের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বন্ধ থাকে। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতাই এই শ্রেণীর। দুই চারিটির নাম করার প্রয়োজন। যেমন—'হৃদয়যমুনা', 'পুরস্কার', 'বিদায় অভিশাপ', 'যথাস্থান', 'অতীত', 'মদনভস্মের পূর্বে' ও 'মদনভস্মের পরে', 'পুরাতন ভৃত্য', 'ব্রাহ্মণ', 'গানভঙ্গ' ইত্যাদি।

আর এক শ্রেণীর কবিতা অনেকটা mechanical structure—ইহা স্থাপত্য শিল্পের অনুবর্তী। এই শ্রেণীর কবিতাকে ইচ্ছামত বাড়ান কমান যাইতে পারে। একটি ভাবসূত্রে চিত্রপরম্পরা বা আনুষঙ্গিক

অনুভাব-পরম্পরা এই শ্রেণীর কবিতায় গ্রথিত থাকে। Organic development-এর কবিতার মানদণ্ড এই শ্রেণীর কবিতার বিচারে প্রয়োগ করা উচিত নয়। সত্যেন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুলের বহু কবিতা এই শ্রেণীর। কালিদাসের মেঘদূতই এই শ্রেণীর কাব্য। রবীন্দ্রনাথের 'নগর-সঙ্গীত', 'সেকাল', 'বর্ষামঙ্গল' ইত্যাদি অনেকটা এই শ্রেণীর। এবং কোন কোন চিত্রাত্মক কবিতা অনেকটা এই শ্রেণীর। "নৈবেদ্য" ও "স্বদেশ"-এর সনেট-পরম্পরা সংস্কৃত কাব্যের শ্লোক-মালার মত সূত্রে মণিগণা ইব—কণ্ঠে ধারণের যোগ্য।

পরম্পরা (Sequence) অনুসারে কবিতার গঠন পরীক্ষা করা যাইতে পারে। প্রধানত এই পরম্পরা ত্রিবিধ—Emotional বা আবেগাত্মক, Rhetorical বা আলংকারিক, Logical বা যুক্তি-শৃঙ্খলা-মূলক। অবিমিশ্রভাবে কেবল যুক্তি-শৃঙ্খলা-মূলক, কেবল আবেগাত্মক, কেবল আলংকারিক অনুক্রমের কবিতা রচিত হইতে পারে, আবার একই কবিতায় বিবিধ অনুক্রমের অনুস্যূতিও হইতে পারে। যুক্তিমূলক অনুক্রমে সাধারণত একটি তত্ত্বের উন্মেষ সাধন বা তথ্য প্রতিপাদন করা হয়। এই প্রতিপাদ্য সত্যটি দিয়া কবিতার সূত্রপাতও হইতে পারে, অথবা তাহার দ্বারাই কবিতা উপসংহৃতও হইতে পারে। "শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান!" এই প্রশ্ন দিয়া আরব্ধ রবীন্দ্রনাথের 'বৈষ্ণব কবিতা' নামক কবিতায় প্রতিপাদন করা হইয়াছে—না, শুধু বৈকুণ্ঠের জন্য নয়, মর্ত্যলোকের জন্যও এই গান। "চৈতালী"র 'মানসী' কবিতায় শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী—এই সত্যেরই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। "চৈতালী"র 'বঙ্গমাতা', 'স্নেহগ্রাস', 'কাব্য' ইত্যাদি সনেটের উপসংহৃতিই প্রতিপাদ্য সত্য। 'মুক্তি' নামক (বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়)—সনেটটিতে প্রতিপাদ্য 'প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।' 'ন্যায়দণ্ড' সনেটের প্রতিপাদ্য—

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

রবীন্দ্রশিষ্যগণ ও রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিগণ আবেগাত্মক অনুক্রমের কবিতা খুব বেশী লিখিয়াছেন। এই শ্রেণীর কবিতায় থাকে মনের আবেগের অকুণ্ঠিত প্রকাশ। ভাওয়ালের গোবিন্দ দাস এই শ্রেণীর কবিতা খুব বেশী লিখিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র-লালের বাৎসল্যরসের কবিতা, দেবেন্দ্রনাথের উল্লাস-রসের কবিতা, অক্ষয়কুমারের "এষা"র কবিতা রজনীকান্তের আগমনী বিজয়ার কবিতা, মোহিতলালের কোন কোন কবিতা ('কালাপাহাড়', 'নূরজাহান', 'নাদীর শা' ইত্যাদি), করুণানিধান, কিরণধন, কুমুদ-রঞ্জন, যতীন্দ্রমোহনের বহু কবিতা এবং কাজী নজরুলের বেশির ভাগ কবিতা এই অনুক্রমে রচিত।

রবীন্দ্রনাথের 'বধূ', 'মানসী', 'কাঙালিনী' 'যেতে নাহি দিব', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অকাল-মৃত্যুতে রচিত কবিতা, 'অপমানিত' (কোন কোন গ্রন্থে 'দুর্ভাগা দেশ' নামে অভিহিত) 'ভারততীর্থ', 'বিদায়' ইত্যাদি কবিতা আবেগাত্মক অনুক্রমে রচিত।

আলংকারিক অনুক্রমের কবিতায় অলংকারের চাতুর্যই গতি নিয়ন্ত্রিত করে। "বনবাণী"র 'বসন্ত'-এর মত রূপকাত্মক কবিতাগুলি সবই এই অনুক্রমের দৃষ্টান্ত। সিম্বলিক্যাল কবিতাগুলিকেও আলংকারিক অনুক্রমের কবিতা বলিতে পারা যায়। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের আলংকারিক অনুক্রমের কবিতা অনেক। সকল কবির কবিতাতেই অল্পবিস্তর অলংকরণ আছে, কিন্তু অলংকরণকে আদ্যন্ত প্রাধান্য দিলেই অনুক্রম আলংকারিক হইয়া উঠে। পদ-বিন্যাসের চাতুর্য ও বক্রোক্তিও অলংকরণ। এই চাতুর্য বহিরঙ্গীয় হইতে পারে, আবার অন্তরঙ্গীয়ও হইতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের আলংকারিক চাতুর্য বহিরঙ্গীয় আর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের চাতুর্য প্রধানত অন্তরঙ্গীয়। এই দুই কবিই এই চাতুর্যকে প্রাধান্য দিয়াছেন। বিশেষ করিয়া যতীন্দ্রনাথ যে-বাক্যে বক্রোক্তির সমাবেশে আলঙ্কারিক চাতুর্য দেখাইবার সুবিধা হইবে না মনে করিয়াছেন, সে-বাক্য একেবারে বর্জনই করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার কবিতার অনুক্রম অধিকাংশ স্থলে আলংকারিক। অবশ্য বক্রোক্তিও অলংকার, একথা মনে রাখিতে হইবে।

সংস্কৃত কবিদের কতকগুলি শ্লোক লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায়—সংস্কৃত কবিরা যুক্তিমূলক অনুক্রমের অনুসরণ করেন নাই। আবেগাত্মক অনুক্রমও অধিকাংশ স্থলে অনুসরণ করেন নাই, কালিদাসের 'রতি-বিলাপ', 'অজবিলাপ'-এর অনুক্রমও পুরা আবেগাত্মক নয়। "রঘুবংশ"-এ গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম বর্ণনা, "কুমারসম্ভব"-এ উমার রূপ বর্ণনা ইত্যাদি রীতিমত অলঙ্কারেরই মালিকা। সংস্কৃত টীকাকারদের মতে "কুমার-সম্ভব"-এর অকাল-বসন্ত বর্ণনা স্বভাবোক্তি অলংকারের মালিকা। আমরা অবশ্য ইহাকে অলংকারই বলি না। অন্যান্য সংস্কৃত কবিরাও প্রধানত অনুসরণ করিতেন আলংকারিক অনুক্রম। অনেকে এক একটি অলঙ্কার প্রয়োগের জন্যই এক একটি শ্লোক রচনা করিতেন। যাহা অলঙ্কৃত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেন না, তাহা ভাব-পরম্পরার সূত্র রক্ষার পক্ষে যত প্রয়োজনীয় কথাই হউক, তাহাতে যত অর্থগৌরবই থাকুক, তাহাকে শ্লোকত্ব দান করিতেন না।

—হোমিওপ্যাথি পড়ুন ও শিক্ষা করুন—

আপনার হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, অনেক ভাবিলেন কি করিয়া শেখা যায়। বাজারে বহু রকমের পুস্তক আছে, ইহার কোনটি ভাল ঠিক করিতে পারিলেন না, নাম জানা না থাকায় দোকানে গিয়া একটি বই কিনিয়া আনিলেন, কিছুদিন পরে দেখিলেন যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা পান নাই, কিন্তু—ডাঃ এন, সি, ঘোষ M. D (U. S. A) প্রণীত—

১। কম্পারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা—১৯শ সংস্করণ
২। হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিসনার্স গাইড—১১শ সংস্করণ
৩। কলেরা ও বসন্ত ট্রিটমেণ্ট—৬ষ্ঠ সংস্করণ

নাম জানা থাকিলে কখনই এরূপ হইত না।

আপনার জানা যে কোন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের নিকট ইহার সত্যাসত্য যাচাই করুন, পুস্তকবিক্রেতাদের প্রলোভনে ভুলিবেন না। বাংলায় সহজ ও সুন্দর ভাষায় লিখিত এই পুস্তকগুলি আজও ভারতবর্ষে অতুলনীয়। মেয়েরাও ইহার সাহায্যে চিকিৎসা করিতে পারেন।

কলিকাতার সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে ও হোমিও ঔষধালয়ে পাইবেন।

ডাঃ এন সি ঘোষ প্রতিষ্ঠিত

ঘোষ হোমিও ফার্মেসী

৪৪ বি, মনসাতলা লেন, কলিকাতা-২৩ ফোন—৪৫-২০৮০
বিঃ দ্রঃ—মফঃস্বলের অর্ডার যত্নসহকারে সরবরাহ করা হয়।
— মূল্য তালিকার জন্য লিখুন —

● তনুশ্রীর সজীবতার জন্য 'দেবযানী'।
● গন্ধে আছে প্রাণস্পর্শী আবেগতা।
● ব্যবহারে আনে চন্দ্রিমার মত স্নিগ্ধতা।

ডি· জে· প্রোডাক্টস্
মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস্
৯, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোনঃ ২২-৫৯৯১।

শ্লোকগুলির মধ্যে আবেগের কিংবা ভাব-প্রসঙ্গের ক্ষীণ সূত্র মাত্র থাকিত। কবির প্রখর দৃষ্টি থাকিত আলঙ্কারিক চাতুর্যের দিকে।

তথ্যগর্ভ কবিতার অনুক্রম সাধারণত যুক্তিশৃঙ্খলামূলকই হয়। ইহার অনুক্রম যদি আলঙ্কারিক হয়, তাহা হইলে সেই তথ্যগুলিই শুধু কবিতায় স্থান পায়, যেগুলি অলঙ্কারের বন্ধনে বাঁধা পড়ে; আবেগাত্মক অনুক্রমে তথ্যের স্থান সংকীর্ণ, তাহাতে কল্পনার লীলাই এবং হৃদয়াবেগের উৎসারই প্রবল। তথ্যভার কল্পনার পক্ষদ্বয়ের শক্তি হরণ করে, হৃদয়াবেগের উৎসারকে ব্যাহত করে।

তবু কবিতায় তথ্যতত্ত্বের স্থান আছে। কবিতায় তথ্যতত্ত্বের অবস্থানকেই অর্থ-গৌরব বলে। এই অর্থগৌরব কবিতার একটি সম্পদ। এই অর্থগৌরবের জন্য এক সময় ভারবি কালিদাস হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু অসামান্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

তরবারির পক্ষে ধার-ভার-সার তিনেরই প্রয়োজন। তরবারির ধারই সবচেয়ে বড় গুণ সন্দেহ নাই, কিন্তু তরবারিকে ধারালো হইতে হইলে সারালো হইতে হয়, "পিতলক কাটারি"র মত হইলে চলে না। হৃদয় স্পর্শ করিবার শক্তিই কবিতার পক্ষে ধার। তরবারি নিতান্ত পাতলা হইলেও ধারের কাজ ঠিকমত হয় না, কিছু ভারও চাই।

কবিতার পক্ষেও সেই কথা খাটে। তত্ত্ব-তথ্য কবিতায় ভার ও সার যোগায়। তথ্য-গর্ভ কবিতা যদি হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে, তবে বুদ্ধির সাহায্য লইয়া হৃদয় স্পর্শ করিতেছে বলিয়া অথবা যুক্তিশৃঙ্খলার অনুক্রম অনুসরণ করিতেছে বলিয়া অবজ্ঞেয় হইতে পারে না। অনেক রসজ্ঞ পাঠক এই শ্রেণীর কবিতার পক্ষপাতী।

তিনটি অনুক্রম স্বতন্ত্রভাবে যাহাতে বর্তমান, সেরূপ কবিতার সংখ্যা বেশী নয়। অধিকাংশ উৎকৃষ্ট কবিতায় একাধিক অনুক্রম অনুস্যূত আছে। রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ', 'এবার ফিরাও মোরে', 'ঐকতান', 'শাজাহান' ইত্যাদি কবিতায় যুক্তিমূলক অনুক্রমের সহিত আবেগাত্মক ক্রমের অনুসীবন ঘটিয়াছে। 'সমুদ্রের প্রতি', 'বৃক্ষ বন্দনা' ইত্যাদি কবিতায় আলঙ্কারিক অনুক্রমের সঙ্গে আবেগাত্মক অনুক্রম অনুস্যূত হইয়াছে।

"বনবাণী"র 'বসন্ত'-এর মত অবিমিশ্র আলঙ্কারিক অনুক্রমের কবিতা রবীন্দ্রনাথের খুব অল্পই আছে।

যে-অনুক্রমেই কবিতা রচিত হউক, ক্রম-ভঙ্গ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যেখানে একাধিক অনুক্রমের অনুসীবন ঘটিয়াছে, সেখানে সেগুলির ধারা কলাসম্মতভাবে ওতপ্রোত হওয়া চাই।

অনেকে মনে করেন, যুক্তিশৃঙ্খলামূলক অনুক্রম গদ্যেরই নিজস্ব; কবিতায় এই অনুক্রম বর্জনীয়। কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, বহু উৎকৃষ্ট কবিতা প্রধানত যুক্তিশৃঙ্খলা-মূলক অনুক্রমেই রচিত। কাহিনীমূলক গাথা-কবিতা, বর্ণনাত্মক কবিতা, চিন্তাত্মক কবিতা, প্রশস্তিমূলক কবিতা—এই অনুক্রমেই রচিত। পাঠকদের কেহ বা যুক্তিমূলক ক্রমের, কেহ বা আলঙ্কারিক ক্রমের, কেহ বা কেবল হৃদয়াবেগের অনুক্রমের পক্ষপাতী। যে-পাঠক কোন একটি অনুক্রমের সে-পাঠক মনে করিতে পারেন, অন্য অনুক্রমের রচিত কবিতা নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

আদর্শ সংস্কৃতিসম্পন্ন রসজ্ঞ পাঠক সকল অনুক্রমের কবিতারই রস উপভোগ করিতে পারেন। কেবল অনুক্রমের কথা নয়, বিবিধ শ্রেণীর কবিতাই রসজ্ঞদের উপভোগ্য। একশ্রেণীর কবিতার প্রতি পক্ষপাতী হইয়া অন্যান্য শ্রেণীর কবিতায় যে রস পায় না, সে দুর্ভাগ্য। যে-ফুলে যতটুকু মধু আছে, মধুকর তাহাই গ্রহণ করে, পল্লী প্রান্তরের দ্রোণপুষ্পের মধুটুকুও সে আহরণ করিতে ভুলে না। সকল ফুলের মধু আহরণের ফলেই মধুচক্র রচিত হইয়া উঠে। কাব্যবিচার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নয়—অপকৃষ্ট বর্জনের পরীক্ষা।

কেহ কেহ গাঢ়বন্ধ রচনার পক্ষপাতী। কবিতা গাঢ়বন্ধও হইতে পারে, শ্লথবন্ধও হইতে পারে; রসঘনও হইতে পারে, ফেনিলোচ্ছলও হইতে পারে। ইক্ষু চর্ব্য পদার্থ, ইক্ষুরস পেয়। ইক্ষু হইতে রস গ্রহণ করিতে হইলে চর্বণ করিতে হয় দন্তের সাহায্যে। অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্যের সম্বন্ধে চর্ব্যমানতার কথা আছে—গাঢ়বন্ধ কবিতার পক্ষে তাহাই প্রযোজ্য। বলা বাহুল্য দন্তের সাহায্য এখানে বুদ্ধিরই সাহায্য।

গাঢ়বন্ধ রচনায় কবির বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ সচেতন ও সক্রিয় থাকে। গাঢ়বন্ধ রচনাই সাধারণত ব্যঞ্জনাগর্ভ হয়। এই শ্রেণীর রচনায় দুইটি বাক্যের মধ্যে পরম্পরার ব্যবধান থাকে।

এই শ্রেণীর রচনায় পাঠকের প্রতি অনেকটুকু শ্রদ্ধাও সূচিত হয়। কবি প্রত্যাশা করেন, রসজ্ঞ পাঠক তাঁহার অকথিত বাণীগুলি বুঝিয়া লইবেন। এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে রসঘন চরণগুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থাকে না এবং পুনরাবৃত্তি বর্জন করা হয়। এ যেন সূত্রাকারে কবির বক্তব্যের বিবৃতি। কবিতার মধ্যেই টীকা ভাষ্য থাকিলে বিদগ্ধ পাঠক মনে করেন কবি তাঁহার রসজ্ঞতার যথাযোগ্য মর্যাদা স্বীকার করিলেন না।

গাঢ়বন্ধ রচনায় আভাণক সূক্তি সুভাষিত ইত্যাদি অনেক থাকে। সেগুলি পাঠকের স্মৃতির শুক্তিপটে মুক্তার মত সঞ্চিত থাকিয়া যায়।

সংস্কৃত কাব্যের শ্লোকগুলি সবই গাঢ়-বন্ধ রচনা। শ্লোকগুলির বাংলায় অনুবাদ করিলে ইহার গাঢ়বন্ধতা নষ্ট হইয়া যায়। যাহারা অনুবাদ পড়িয়া সংস্কৃত কাব্য বুঝিতে চায়, তাহারা ক্ষীরের তৃষ্ণা ঘোলে বা নীরে মিটাইতে চায়।

বৈষ্ণব কবিদের কোন কোন পদ গাঢ়-বন্ধ রচনা। গোবিন্দদাস, যদুনন্দন দাস ইত্যাদি পদকর্তারা শ্রীরূপগোস্বামী ও অন্যান্য কবিদের সংস্কৃত শ্লোককে পদের আকার দান করিয়াছিলেন, সেগুলিতে গাঢ়তা অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। বৈষ্ণব পদাবলীর গাঢ়বন্ধতার একটি কারণ, প্রত্যেক পদের আয়তনের একটি সীমা-বন্ধনী পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট ছিল। প্রত্যেক পদ এক একটি গীতি বলিয়া উদ্বেলিত হইয়া তাহার প্রবাহ সীমাবন্ধনকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।

জয়দেবের সময়ে পদরচনার একটা নির্দিষ্ট সীমা-বন্ধনীর প্রবর্তন হয় নাই। কিন্তু জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত বলিয়া সংস্কৃতের নিজস্ব গঠনপদ্ধতি ও কবির স্বকীয় স্বাভাবিক সংযম তাঁহার রচনাকে গাঢ়বন্ধ করিয়াছে। কবির স্বভাবসিদ্ধ সংযম না থাকিলে সংস্কৃত কবিতাও অমিত-ভাষণে শ্লথবন্ধ হইতে পারে। জয়দেবই সমসাময়িক কবি উমাপতি ধরের রচনার দোষ ধরিয়া বলিয়াছেন—বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতি-ধরঃ।

বাংলা সাহিত্যে শ্রীমধুসূদন যে সনেটের প্রবর্তন করিয়াছেন—তাহা গাঢ়বন্ধ রচনার পক্ষে অনুকূল. সনেটের বন্ধনের মধ্যে কবি-কল্পনা গাঢ়তার সৃষ্টি করিতে বাধ্য হয়।

বাংলা সাহিত্যে কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল ও মোহিতলাল মজুমদারের রচনা গাঢ়বন্ধ। সংস্কৃত শ্লোকের মত রচনায় গাঢ়তা থাকার জন্য বোধ হয় এই রীতিকে Classical রীতি বলা হয়।

আবেগাত্মক কবিতার পক্ষে গাঢ়বন্ধতা অনুকূল নয়। আবেগাত্মক রচনায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকে না· টীকা ভাষ্যের প্রয়োজন হয় না বটে, কিন্তু হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাস থাকে। সতর্ক বুদ্ধির প্রয়োগে এই উচ্ছ্বাসকে মুহুর্মুহু ব্যাহত করিলে আবেগের পরি-পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় না।

আবেগের উত্তাপে হৃদয় বিগলিত হয় এবং নয়নও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিগলিত হয় —অতএব তারল্য আবেগাত্মক রচনার স্বধর্ম।

গাঢ়বন্ধ রচনা বোধশক্তির সহায়তায় পাঠকের অন্তর স্পর্শ করে। সেজন্য গাঢ়-বন্ধ রচনা বিদগ্ধজনেরই উপভোগ্য। আবেগাত্মক শ্লথবন্ধ রচনা সরাসরি পাঠকের হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া পাঠক-হৃদয়কে বিগলিত করে। অতএব এই শ্রেণীর রচনা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই উপভোগ্য।

আমাদের সাহিত্যে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গোবিন্দ দাস, দেবেন্দ্রনাথ ইত্যাদি কবিরা সকলেই শ্লথবন্ধ রচনাধারার কবি।

রবীন্দ্রনাথ এই দুই ধারার মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সনেটের কঠোর বন্ধন পছন্দ করিতেন না! তাঁহার কল্পনা-বিহঙ্গের পক্ষে সনেট রীতিমত পিঞ্জর। তিনি যে সনেটাকারে চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহার বন্ধন অনেকটা শিথিল। তবু এই চৌদ্দ শিকের খোলা পিঞ্জরের মধ্যে তাঁহার কল্পনা মাঝে মাঝে প্রবেশ করিয়া রচনায় গাঢ়তার সৃষ্টি করিয়াছে।

কবির Symbolical কবিতাগুলির প্রায় সবই গাঢ়বন্ধ। বৈষ্ণব পদাবলীর মত অনেক গানও গাঢ়বন্ধ রচনা। 'কণিকা'র এপিগ্রামাটিক কবিতাগুলি সংস্কৃত শ্লোকের মতই গাঢ়বন্ধ। তবে আবেগাত্মক কবিতাই তাঁহার বেশী—সেগুলি উচ্ছ্বাস-ময়। হৃদয়াবেগের ধর্মই সেগুলি পালন করিয়াছে। যেখানে তাঁহার হৃদয়াবেগ জীবনকে অবলম্বন না করিয়া প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াছে, সেখানে আবেগ সংযত। সেখানে ভাষা গাঢ়বন্ধ না হইলেও শিথিল-বন্ধ নয়।

আবেগাত্মক কবিতার পক্ষে শ্লথবন্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। যে-কোন কবিতায় প্রত্যেক শব্দের যদি সার্থকতা থাকে, প্রত্যেক চরণ যদি রসের পরিপোষক বা ভাবের উন্মেষক হয় এবং নব নব অলংকরণ যদি শ্রী সৌষ্ঠব সঞ্চার করে, বাক্যগুলি যদি বাচ্যাতিশায়ী অর্থ দ্যোতনা করে তাহা হইলে শিথিলবন্ধ হইলেও কবিতার উৎকর্ষ অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু যদি কবিতায় এক কথা বা একই অনুভূতির পুনরাবৃত্তি থাকে, অযথা অলস সমারোহ থাকে; মিল, অনুপ্রাস, স্তবকগঠন ও ছন্দোবৈচিত্র্যের অনুরোধে যদি অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় শব্দের সমাবেশ ঘটে, শব্দের ঘনঘটা বা আড়ম্বরের সাহায্যে ভুলাইবার প্রয়াস থাকে, শব্দসমুচ্চয় যদি অর্থ প্রকাশে সহায়তা না করিয়া অর্থকে
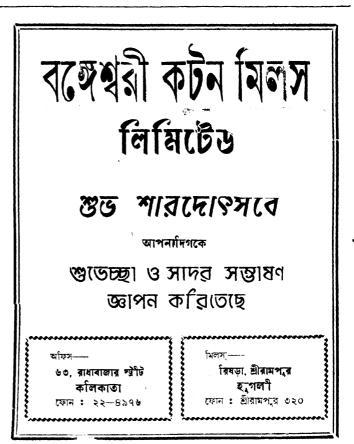
আবৃত করে, যদি অসম্বন্ধ ও অবান্তর পদ-বিন্যাস পাঠকের অবধানকে পীড়িত করে, তাহা হইলে শ্লথবন্ধতা কবিতাকে সাধারণ ছন্দোহীন গদ্যে পরিণত করে। পক্ষান্তরে অতিরিক্ত গাঢ়তা যদি কবিতাকে প্রহেলিকায় পরিণত করে—দুইটি চরণ বা দুইটি শব্দের ব্যবধান ব্যঞ্জনাগর্ভ না হইয়া কেবল অর্থকৃচ্ছ্র সাধন করে, তাহা হইলে তথাকথিত গাঢ়-বন্ধতা আর গুণের পর্যায়ে পড়ে না।

কেবল হৃদয়াবেগ নয়, অনেক ভাববস্তু বা বিষয়বস্তুর পক্ষে গাঢ়বন্ধতা উপযোগী নয়।

ছন্দ ও মিত্রাক্ষর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এ-প্রবন্ধে নাই। সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিব। ছন্দও মিত্রাক্ষর কবিতার পক্ষে অপরিহার্য নয়। রবীন্দ্রনাথ ছন্দোবৈচিত্র্য ও মিত্রাক্ষরী চাতুরীকে চূড়ান্ত সীমায় তুলিয়াছিলেন। চূড়ান্ত সীমায় আরোহণ করিলেই অবতরণ করিতে হয়। আগেই "চিত্রাঙ্গদা"য় তিনি মিল বর্জন করিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি ছন্দ বর্জন করিয়াও কতকগুলি কবিতা লিখিলেন। সে-গুলির ভাষা হইল গদ্য ও পদ্যের মাঝামাঝি। অবশ্য তাহারও একটা ছন্দ আছে। তবে সে-ছন্দ কবির লেখনীর প্রভু হইয়া আর থাকিল না, তাহা তাঁহার লেখনীর ভৃত্য হইল। কবি বোধহয় অনুভব করিলেন, রসোত্তীর্ণ করিতে হইলে সকল প্রকার ভাবকে প্রচলিত ছন্দের বন্ধনে প্রকাশ করা চলে না। বোধ হয় ভাবিলেন, ছন্দের শাসন তাঁহার ভাবধারার স্বাভাবিক স্বাধীন প্রবাহ ব্যাহত করিতেছে, ছন্দের প্রয়োজনে অনেক অবাঞ্ছিত শব্দ আসিয়া তাঁহার রচনাকে শ্লথশিথিল ও তাঁহাকে অমিতভাষী করিয়া তুলিতেছে। হয়ত ভাবিলেন, ছন্দ ও মিত্রাক্ষর দুইয়ে মিলিয়া তাঁহার কবিতাকে কৃত্রিমতায় দূষিত করিতেছে। দেখা গেল, প্রচলিত ছন্দ ও মিত্রাক্ষর বর্জনের ফলে তাঁহার কবিতার ঐশ্বর্য বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই।

ছন্দ বাহন মাত্র। বাহনের গৌরবে কোন দেবতার মহিমা বাড়ে না। ষন্ডবাহন হইলেও শিবের উপাসকের অভাব নাই। আবার ময়ূরবাহন হইলেও কার্তিক ঘরে ঘরে পূজিত হন না। মিত্রাক্ষরী ছন্দের গতি মন্থর, অমিত্রাক্ষর রচনারীতির গতি দ্রুত। বিমানের যুগে মন্থরতা অসহ্য। এইসবের জন্যই রবীন্দ্রনাথপ্রবর্তিত নবরীতিই স্পৃহণীয় ও গ্রহণীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় না, ছন্দে রচিত কবিতার কোন মূল্য নাই, ছন্দের প্রচলনকে বন্ধ করিতে হইবে। অথবা "পুনশ্চ"-এর আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলিকে বাতিল করিতে হইবে। রসোত্তীর্ণ হইবার জন্য কবিতাকে প্রচলিত কোন ছন্দের সাহায্য লইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আজ দেখা যাইতেছে, ছন্দে রচিত না হইলেও কবিতা রসোত্তীর্ণ হইতে পারে। কবিতার জন্য ছন্দ একটা চাই-ই—ইহা একটি সংস্কার মাত্র। সর্বসংস্কারমুক্ত মনেই কবিতার বিচার করিতে হইবে।

আর-একটি প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

সভ্যতার উন্মেষের একটা লক্ষণ পারিপাট্য, সৌষম্য, সৌরুচ্য, পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা-শ্রীর প্রতি অনুরাগ। সভ্য পাঠকেরা কবিতাতেও এইগুলি দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন, এই গুণ-গুলির অভাব থাকিলে কবিতা পাঠকালে মনে মুহুর্মুহু অস্বস্তির সঞ্চার হয়, এই অস্বস্তিতে অপ্রসন্নচিত্তে কবিতার রস উপভোগ করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই গুণগুলির পর্যাপ্ত পরিমাণে সমাবেশ দেখিয়া এ-দেশের সুসভ্য পাঠকগণ পরিতৃপ্ত হইলেন। রঙ্গলাল-হেম-নবীনকে তাঁহারা আর দেশের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মানিতে পারিলেন না। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী কবিদের অন্য ঐশ্বর্য যাহাই থাকুক, এই গুণগুলির অভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ঐশ্বর্যের অভাব নাই, এই গুণগুলি তাহাতে মাধুর্য ও লাবণ্যের সঞ্চার করিয়াছে। পরবর্তী কবিরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত এই গুণগুলির অনুশীলন করিলেন। ছন্দের অনবদ্যতা, মিলের চাতুর্য ও নির্দোষতা, অনুপ্রাসের ভূরি ভূরি প্রয়োগ, পদবিন্যাসের লালিত্য, স্তবকবিন্যাসের বৈচিত্র্য, শ্রুতিকটু ও গদ্যাত্মক শব্দ পরিহার, ছন্দোহিল্লোল সৃষ্টি ইত্যাদি সমস্তই ঐ গুণগুলির অঙ্গীভূত।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় রসৈশ্বর্য ছিল অফুরন্ত, এই গুণগুলি তাহাতে সোনায় সোহাগা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের অনুকারী কবিদের এই গুণগুলিই প্রধান সম্বল।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই বিপরীত ধারায় প্রবর্তন হইল। গোবিন্দদাস, অক্ষয়-কুমার, দ্বিজেন্দ্রলাল ("মন্দ্র" ও "আলেখ্য"-এ) —এই তিনজন কবি অতিরিক্ত পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা সাধনকে কৃত্রিমতা-দোষ বলিয়া মনে করিলেন। গোবিন্দদাস সুরুচি-নিষ্ঠতাকে একটা গুণ বলিয়া স্বীকার করিলেন না। দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতায় গদ্যাত্মক ভাষা চালাইতে লাগিলেন এবং অক্ষয়কুমার অতিরিক্ত পারিপাট্যকে অস্বাভাবিক মনে করিলেন। 'নিটোল শিশিরকণা, মেদিনী বন্ধুর'—এই একট চরণে তাঁহার মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, অতিরিক্ত মাজিয়া-ঘষিয়া পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা সাধন করিলে কোন বস্তুরই ভিটামিন থাকে না; কবিতাকে ছান্দসিক চাতুর্যের দ্বারা ও সুললিত পদ-বিন্যাসের দ্বারা সুপরিচ্ছন্ন করিতে গেলে তাহার প্রাণশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহাদের ধারণা—কবিতাকে বাঁচিতে হইলে নিজের শক্তিতেই বাঁচিতে হইবে; ছন্দ, অনুপ্রাস, সঙ্গীতের মাধুর্য, গতানুগতিক অলঙ্কার ইত্যাদির ভূষণ পরিয়া লোকচক্ষু ভুলাইলে চলিবে না। নিজের নিরাভরণ লাবণ্যে উপ-ভোক্তাকে মুগ্ধ করিতে হইবে। কবিতার পক্ষে দেহসৌন্দর্য বড় নয়। তাহার ভাবৈশ্বর্যই শ্রেষ্ঠ সম্বল। ভূষণ কবির হৃদয়ের সঙ্গে পাঠকের হৃদয়ের ব্যবধান রচনা করে।

ইহার উত্তর : নিরাভরণাও সুন্দরী ও হৃদয়বতী হইতে পারে, সাভরণাও কুৎসিতা ও হৃদয়হীনা হইতে পারে। পক্ষান্তরে নিরাভরণা কুৎসিতা ও দুঃশীলা হইতে পারে—সাভরণাও সুন্দরী ও সুশীলা হইতে পারে।

অতএব পাঠক যেন জনশ্রুতিতে বিশ্বাস না করিয়া উভয় মতবাদের কবিদের দপ্তরে সৎ কবিতার সন্ধান করেন। সন্ধান ব্যর্থ হইবে না।

উদাসীন পাঠকের চিত্ত আকর্ষণের জন্যই যদি কবিতার পক্ষে ভূষণাদির প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কবিতার পক্ষে তাহা শ্লাঘার কথা নয়, তাহার মর্যাদাহানিরই কথা। ভূষণ তখন নিশ্চয়ই দূষণ।

যতদিন পাঠক নিজে অন্তরের অনুরাগে কবিতার সন্ধান করিবেন না, ততদিন কবিতাকেই পাঠক সন্ধান করিতে হইবে।

কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য—কবিতায় পারি-পাট্য, পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলাশ্রী, সৌষম্য কি শুধু পাঠকচিত্ত ভুলাইবার জন্য? কবিতার রসনিষ্পত্তিতে কি তাহারা কোন সহায়তাই করে না, পাঠকের চিত্তকে কি রসাভিমুখী বা রসবোধের পক্ষে অনুকূল করিয়া তুলে না?

উচ্চ-প্রশংসিত সুখপাঠ্য
শ্রীগুণদাচরণ সেন লিখিত
শ্রীমদ্ভাগবত
(সংক্ষিপ্ত আখ্যানভাগ)
ভূমিকাসহ প্রায় ৩৫০ পৃঃ। ৫, টাকা।
বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য (আখ্যানভাগ)
ভূমিকাসহ প্রায় ১০০ পৃঃ। ১॥৹ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান: গ্রন্থকার, ৩৯, টাউনসেন্ড রোড। প্রবর্তক, ৬১, বহুবাজার। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট।

আজ থেকে প্রায় সাতাশি বছর আগে কেশবচন্দ্র সেন বিলেতের মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখে।

১৮৬৯ সনের শেষভাগে কেশবচন্দ্র তাঁর বিলাত-ভ্রমণের অভিপ্রায়ের কথা প্রথম প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি কলকাতা টাউন হলে একটি জনসভায় তিনি বলেছিলেন যে, কোন শ্রেণী-বিশেষের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ইংলণ্ডে যাচ্ছেন না। তাঁর ভ্রমণের উদ্দেশ্য হল শিক্ষালাভ ও সত্যান্বেষ, যাতে তিনি স্বদেশে ফিরে এসে তাঁর নবলব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়ে দেশবাসীর সেবা করতে পারেন। ম্যাক্সমুলারের কথায়, "Keshub Chunder Sen came to England to see and to learn." অবশ্য ম্যাক্সমুলার আরও বলেছিলেন,
"But though Keshub Chunder came to learn he had also to teach and preach".

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি কেশবচন্দ্র পি অ্যান্ড ও কোম্পানির "মুলতান" জাহাজে কলকাতা বন্দর থেকে যাত্রা করলেন। আরও কয়েকজন বাঙালী বিলেতে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে একই জাহাজে রওনা হলেন। কেশবচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ও সহকর্মী প্রসন্নকুমার সেন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কেশবচন্দ্রের সহযাত্রী হবার জন্য প্রসন্নকুমার ইস্ট ইন্ডিয়া রেল কোম্পানির চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন।

কেশবের অগণিত বন্ধুবান্ধব তাঁকে বিদায় জানাতে সমবেত হয়েছিলেন গার্ডেন রীচ জাহাজঘাটে। ইঞ্জিনঘরের কাছে কেশবচন্দ্রের ছোট কেবিনটির সামনে ভিড় করেছিলেন তাঁর শুভার্থীরা। ফল, ফুল, মিষ্টি ও নানা উপহারে ভরে উঠেছিল তাঁর কামরা। অবশেষে যখন জাহাজ ছাড়বার সময় হল, তখন বন্ধুরা আবেগে এত বিচলিত হয়ে পড়লেন যে, কেউ চোখের জল চাপতে পারলেন না। কেশবচন্দ্র নিজেও না।

অবশ্য জাহাজে অন্যান্য যাঁরা বাঙালী যাত্রী ছিলেন, তাঁদের সঙ্গলাভ করে কেশবচন্দ্রের বিচ্ছেদ-বেদনার কিছুটা লাঘব হল। ১৫ই ফেব্রুয়ারি তাঁর রোজনামচার পাতায় তিনি লিখেছিলেন,
"....Our party being large and agreeable—we are six and all Brahmos—we do not feel much inconvenience and the pains of separation from home are in a great measure alleviated."

৭ই মার্চ তারিখে স্ত্রী জগন্মোহিনী দেবীকে এডেন বন্দর থেকে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে বলেছিলেন, "আমাদের যেরূপ বড় দল তাহাতে দেশ ছাড়িবার কথা অনেকটা বিস্মৃত হইয়াছি। যখন সকলে মিলিয়া গল্প করি, তখন যেন দেশে আছি বোধ হয়।"

কেশবচন্দ্র ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত নিয়মিত দিনপঞ্জী রেখেছিলেন। এই দিনপঞ্জী ও জগন্মোহিনী দেবীকে লেখা তাঁর চিঠিগুলি থেকে তাঁদের ভ্রমণকালীন অভিজ্ঞতার কথা কিছু কিছু জানা যায়।

যেমন, ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁর রোজনামচায় তিনি লিখছেন, "জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে একজন আছেন বেশ সুপুরুষ,

কিন্তু তাঁর একটি গুরুতর দোষ যে, নর-মাংসের ওপর তাঁর আছে একটু বিশেষ লোভ। কেউ তাঁর সামনে গেলে তিনি শুভেচ্ছা জানান তাঁর বিরাট দন্তপাটি ব্যাদান করে।" কেশবচন্দ্র আরও মন্তব্য করছেন,
"....were he to dine with us in the saloon how cheerfully would he dine on us."
বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন যে, এই সম্মানিত যাত্রীটি ছিলেন একটি "রাজকীয় বাঙ্গালী বাঘ"।

জাহাজে দৈনিক পাঁচবার আহার পরিবেশন করা হত। কেশবচন্দ্রের কখনও এতবার করে খাওয়ার অভ্যাস ছিল না। তিনি ত ঘণ্টায় ঘণ্টায় আহারের ডাকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন। তাই ১৮ই ফেব্রুয়ারির দিনপঞ্জীতে তিনি লিখলেন:
"What would my countrymen say when they learn that we take five meals everyday? Would they not think that our only business here is to serve the stomach and study gastronomy."

জাহাজে যদিও সাধারণত ইউরোপীয় খাদ্য পরিবেশিত হত, তবুও এই ভারতীয় দলটির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এঁদের খাদ্যতালিকা ছিল নিম্নরূপ:

(১) ভোরে চা; (২) সকাল সাড়ে আটটার সময় ভাত, আলুভাজা, তরকারি; (৩) বেলা বারটার সময় রুটি, কলা; (৪) বিকেল ৪টার সময় প্রকৃত ভোজন—ভাত, ব্যঞ্জন, বাদাম, লেবু, তরমুজ; (৫) সন্ধ্যা ৭টার সময় চা-দুধের সঙ্গে রুটি।

আরও দেখতে পাচ্ছি যে, জাহাজে তাঁরা পান ও মশলা খেতেন। মাদ্রাজে এক বন্ধু অনেকগুলি পান তাঁদের দিয়েছিলেন। তাছাড়, মার্সেলস বন্দরের কাছাকাছি এসে তাঁরা একদিন "সাহেব ব্রাহ্মণে"র সঙ্গে পরামর্শ করে ডাল রান্না করে খেলেন। ১৯শে মার্চ কেশবচন্দ্র স্ত্রীকে লিখলেন, "জাহাজের খাওয়া ক্রমে কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। প্রতিদিন আলু পোড়া, ঝালের তরকারি আর ভাল লাগে না।...মা সঙ্গে যে মুগের ডাল দিয়াছিলেন, সেই ডাল আজ রান্না হইল। আহার করিয়া যে কত তৃপ্তি পাইলাম, তাহা বলিতে পারি না।"

২২শে ফেব্রুয়ারি তাঁরা গল বন্দরে পৌঁছেছিলেন। সেখানে ডাঙায় নেমে বেড়াতে বেড়াতে তাঁরা এক জায়গায় একটি বিষ্ণুমূর্তি দেখতে পেলেন। কেশবচন্দ্র লিখেছেন,
"I am struck with astonishment to see an image of Vishnu there."

জাহাজে বেশ কয়েকজন অস্ট্রেলিয়ান যাত্রী ছিলেন। তাঁরা সব সময়ই হৈ-হুল্লোড় করতেন এবং মদ্যপান, জুয়াখেলা অথবা নাচগানে ব্যস্ত থাকতেন। কেশবচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীরা এঁদের উচ্ছৃঙ্খল, সময়ে সময়ে উন্মত্ত আচরণে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ

করতেন। তিনি দিনপঞ্জীতে এ'দের সম্বন্ধে লিখলেন, "স্ফূর্তি করাই মনে হয় এদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। পানাহার ও প্রমত্ত আমোদে গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া তো এদের আর কোন কাজ আছে বলে মনে হয় না। এদের সঙ্গে সবচেয়ে ভাল তুলনা চলে বাগবাজারের ইয়ার-লোকেদের।"

৪ঠা মার্চ "মুলতান" জাহাজ এডেন বন্দরে এল। কেশবচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুরা একটি ঘোড়ার গাড়ি করে শহর দেখতে বেরুলেন। সবিস্ময়ে তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে, কোচোয়ানটি একজন বাঙালী। তাছাড়া, এডেন বাজারে জিলিপি, গজা, সুপারী ইত্যাদি বিক্রী হয় দেখেও তাঁরা বেশ বিস্মিত হলেন।

"....is it not strange we purchase jilapee and gaja (Bengali sweetmeat) and betel nuts?" —তিনি লিখলেন।

১৯শে মার্চ তাঁরা ফ্রান্সের মার্সেলস্ বন্দরে উপনীত হলেন। সেখানকার একটি প্রসিদ্ধ হোটেলে তাঁরা উঠলেন। এরকম জাকজমকপূর্ণ হোটেল তাঁরা এর আগে কখনও দেখেননি। এখানে ভারী মজার একটা ব্যাপার ঘটল। কেশবচন্দ্র দীর্ঘ পথ ভ্রমণের পর এত ক্লান্তি বোধ করছিলেন যে, হোটেলে এসে কিছুক্ষণ পরেই তিনি উৎকৃষ্ট মেহগনি কাঠের তৈরী একটি খাটে নরম স্প্রিংএর গদিযুক্ত বিছানার উপর দেহ এলিয়ে দিলেন। কিন্তু অত্যধিক নরম বিছানাটি এতটা ডেবে গেল যে, তাঁর ভয় হল, তিনি বোধ হয় গদিশুদ্ধ মাটিতে পড়ে যাবেন। তিনি তাড়াতাড়ি পাশের ঘর থেকে প্রসন্নকুমারকে ডেকে বললেন, "আমাকে বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছ কি? শীগ্‌গির আমাকে টেনে তোল, নইলে মেঝেতে পড়লুম বলে।"

পরদিন ভোরে উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখতে পেলেন যে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে শহরের প্রতিটি অধিবাসী রাজপথ দিয়ে যেন প্রায় ছুটছে—"everybody had taken to his heels."। ইউরোপের লোকেদের এই তাড়াহুড়োর ভাবটাকে কিন্তু কেশবচন্দ্রের কোনদিনও ভাল লাগেনি। বিশেষ করে, রাজপথ দিয়ে মেয়েদের দৌড়ে চলাটাকে তাঁর অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হত।

অবশেষে দেশ ছাড়বার সুদীর্ঘ পাঁচ সপ্তাহ পরে কেশবচন্দ্র ২১শে মার্চ, ১৮৭০ লণ্ডনের চ্যারিং ক্রশ্ (Charring Cross) স্টেশনে এসে নামলেন। লণ্ডনে পৌঁছেই স্টেশনে কয়েকজন বাঙালীকে দেখে তিনি খুব খুশী হয়ে উঠলেন, "I am glad to see two Bengalees standing on the platform. B—and R—." B হচ্ছেন শ্রীবিহারীলাল গুপ্ত (কেশবচন্দ্রের ভাগ্নে—আই সি এস পরীক্ষা পাশ করে কালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন), এবং R হচ্ছেন স্বনামধন্য শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত। তাঁদের আরও দুই বন্ধু—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীআনন্দমোহন বসু কেশবচন্দ্রকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজ ভদ্রলোকেরাও এসেছিলেন। ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ফরেন, ইউনিটারিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-এর তরফ থেকে রেভারেণ্ড রবার্ট স্পিয়ার্স কেশবচন্দ্রের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করবার ভার গ্রহণ করতে উৎসুক হলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র সবিনয়ে সে-আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে প্রথম দিন-কয়েকের জন্য রমেশচন্দ্র দত্তের আলবার্ট স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে উঠলেন। সেখানে পৌঁছেই দেশের চিঠি পেয়ে খুব খুশী হলেন।

"How great is my joy to find on my friend's table a batch of letters from home"— —তিনি লিখলেন সেদিনের দিনপঞ্জীতে।

২৩শে মার্চ কেশবচন্দ্র নরফোক স্ট্রীটে মিসেস্ স্যাম্পসন-এর হোটেলের একটি কামরায় উঠে গেলেন। কেশবচন্দ্রেরই কথায়, "ইহা এখানকার সাহেবরা আমার সম্মানার্থে আমাকে দিয়াছেন। ইহার ভাড়া এক মাসের জন্য ১২০, টাকা তাঁহারা দিবেন।"

এইদিন লণ্ডনে প্রচুর তুষারপাত হয়। কেশবচন্দ্র এর আগে কখনও তুষারপাত দেখেননি। তাই তিনি দিনপঞ্জীতে লিখলেন, "This day for the first time in my life, I see snow falling in beautiful flakes. It is a shower of snow.... I am so highly delighted with this wonderful natural phenomenon that I cannot resist the temptation of going about in the verandah, and receiving a good sprinkling of flakes on my overcoat."

২৫শে মার্চ লণ্ডন থেকে কেশবচন্দ্র জগন্মোহিনী দেবীকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তিনি এই মহানগরীতে তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতার কিছু কিছু আভাস দিলেন। তিনি লিখলেন, "এখানে আসিয়া অবধি নূতন নূতন ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত ও আনন্দিত হইতেছি। লণ্ডন শহর খুবই প্রকাণ্ড। দিবারাত্রি গোলমাল। গাড়ি-ঘোড়াতে রাস্তা সকল পরিপূর্ণ। দোকানের সংখ্যা নাই। এক এক স্থানে পাঁচ মিনিট

TO MRS. PROFESSOR FAWCETT.

(From Punch's own Correspondence.)

DEAR MRS. PROFESSOR,

You have lately been delivering lectures on the Electoral Disabilities of Women. I quite sympathise with your wifely desire to keep abreast of your excellent and irrepressible husband. As it seems to be his special function to start untimely hares in the House of Commons, you cannot be more congenially occupied than in agitating crude changes out-of-doors. I can only hope that if your agitation for the electoral rights of your sex ever carries it as far as the polling-booth, it will be content to stop there, and not press forward to the House. I own I do not like to contemplate the possibility of two FAWCETTS in the field—or rather on the Commons—at once, and one of them in petticoats, uniting the normal feminine unwillingness to take an answer, to the special irrepressibility and deafness to all reasons but his own of the eminent man whose wife, by natural selection, you have become.

I find now that you have dropped the limitation with which your sister agitators started, and that you go in for repealing the electoral disabilities of *all* women—married as well as single. You are logical in this, as well as wise in your generation. I am not aware whether you admit that man and wife is one flesh. I know you refuse to admit that man and wife is one purse. I cannot wonder that you should refuse to admit, by implication, that man and wife is one mind, and that a vote given to the wife will be only another given to the husband.

One object of the various movements you are so active in promoting—Women's Suffrage Movement, Women's Separate Property Movement, Women's Examination Movement, Women's University Movement, Women's Admission to the Professions Movement, &c.,—is the cultivation of a bold spirit of self-dependence and self-assertion in your sex, which, if you could develop it to the full, would, I doubt not, soon dispose of all objections to a married woman's franchise founded on the assumption that the wife would be likely to be guided by her husband in giving her vote.

Besides, if married women are not to have votes, you lose what seems likely to be one of the chief motives to electoral activity among your sex. As a rule, women—married women, in particular, with home cares and labours heavy upon them—care little, as yet, about politics. You admit this, but explain it by their exclusion, thus far, from political functions. But one thing they *do* care about—bless em!—and that is the comfort of their homes, and the satisfaction of "paying their way." Women, as far as I have seen, hate and fear debt, far more than men, and when trusted with any voice or control in money matters, are keener bargainers, and better husbands of their husbands' earnings than we are. One value, at least, the franchise will have in their eyes—it will be worth money. As they don't care for politics, and *do* care for money—for family needs, above all—they will be likely enough not only to see that their husbands vote for the side that pays best—as the election reports show they do now, very generally, in the class usually influenced by bribes—but will bring another vote to the agent's book, for another lump of "sugar." But the unanimity of the vote will be the wife's work, not the husband's; and what oftenest determines it will be the colour of the candidate's money. I feel pretty sure that whatever the female franchise may cost the country, it will cost candidates a pretty penny.

Has it never occurred to you that in parcelling out life into two great fields, the one inside, the other outside the house-doors, and in creating two beings so distinct in body, mind, and affections as men and women, the Framer of the Universe *must* have meant the two for different functions? Can you deny, or shut your eyes to the fact that a similar distinction runs through the whole animal kingdom? Surely, so long as the masculine creature keeps aloof from the domain of the feminine, and leaves to her the nursing and rearing and training of the family, and the ordering and gracing of the home, there lies a tremendously strong presumption against the wisdom of the feminine entry on the masculine domain of business and politics?

I have not the pleasure of your acquaintance; but I have never pictured you to myself as one of those formidable, bass-voiced, big-armed men-women, whose assault on the position of our sex is inspired by an unfitness to rule in their own. On the contrary, I should expect to find you as charming, graceful, and feminine as your pretty name—MILLICENT. May I presume on that impression to ask you, *entre nous*, and in strictest confidence, how you manage matters with the Professor when you want to carry a point? Do you argue with him? I should hope not, judging from my experience of him in the House. I see how GLADSTONE fares at his hands. I imagine *you* must have a very different way of going to work with him. If you have that wifely power which is your right at home, may I ask how this is acquired and retained? Is it by any arts within masculine reach, or by a magic all feminine, and all your own—such as all men succumb to from the hand of some Circe or other?

Don't trouble yourself to give an answer. I read it in your face—on your lips, that smile without speaking. And *there* is the female franchise, *Frau Professorin*. Give women votes! Bless you, dear bewitching creatures,—so strong while you are willing to be weak, so irresistible while you choose to use your own weapons,—if you care for votes, you have them already. Have you not the men's? In a word here is my dilemma, dear Mrs. Professor. Either women don't care for votes—in which case they will make a bad use of them; or they *do* care for them, in which case they have ours.

Look how you rule in that Parliament for the business of which you do care, and whose budget you control and appropriate. What man dares call his *home* his own? What man, that deserves to be called a man, with a good wife, wishes to be other than her humble servant, bread-winner, hewer of wood and drawer of water, within the walls of that sacred sphere, of which the household hearth is the central sun? Depend upon it, if Nature had meant you for the franchise, you would have had it long ago. But then, if you had been in our place, we should have been in yours. Do you think it would be a better world for the change? Leaving you to ponder the question, I remain, my dear Mrs. Professor,

Your faithful friend and servant,

[illegible]

BABOO KESHUB CHUNDER SEN.

[This great Indian reformer is invited to a Tea Meeting by the British and Foreign Unitarian Society at the Hanover Square Rooms.]

WHO on earth, of living men,
Is BABOO KESHUB CHUNDER SEN?

I doubt if even one in ten
KNOWS BABOO KESHUB CHUNDER SEN.

Have *you* heard—if so, where and when—
Of BABOO KESHUB CHUNDER SEN?

The name surpasses human ken—
BABOO KESHUB CHUNDER SEN!

To write it almost spoils my pen:
Look—BABOO—KESHUB—CHUNDER—SEN!

From fair Cashmere's white-peopled glen
Comes BABOO KESHUB CHUNDER SEN?

Or like "my ugly brother BEN,"
Swarth BABOO KESHUB CHUNDER SEN?

Big as ox, or small as wren,
Is BABOO KESHUB CHUNDER SEN?

Let's beard this "lion" in his den—
This BABOO KESHUB CHUNDER SEN.

So come to tea and muffins, then,
With BABOO KESHUB CHUNDER SEN.

RATHER TOO MUCH OF A GOOD THING.

THE following is an extract from an account of the Boat Race:—

"We understand it is the intention of the authorities to take an early opportunity of coming to a clear understanding with the Thames Conservancy on the subject of the steamers, and for keeping the river clear on practice days on future occasions, failing which it is their intention to remove the race elsewhere, and this, we need scarcely say, would be a great loss to the Metropolis and its inhabitants."

Is not this a little unreasonable? The Thames does not flow merely to serve as a course for the Oxford and Cambridge Boat Race—it has other uses. It is conserved for business as well as pleasure. The traffic on the river is not insignificant; and if it is to be interfered with on practice days, as well as on the day of the race, the "authorities" (we presume the two University Boat Clubs are meant,) will of course be ready to make compensation to those who otherwise will suffer, that they may sport. The threat to remove the race elsewhere must be borne with submission; perhaps, however, the loss would not be confined to the Metropolis and its inhabitants; perhaps the crews themselves and their University friends might not feel quite the same stimulating interest in the struggle, if fought out in the oriental privacy of King's Lynn, even with all the assistance the Eastern Counties Railway could give it.

When we hear that the Derby is to be run on Salisbury Plain, we shall believe in the possibility of the University Boat Race being rowed and won on some other water than the Thames.

A Barrel of Barrels.

THE papers have a story about a man who received a barrel, found to be full of revolvers and cartridges. He stated that he had supposed it to contain Herrings. Suggests our ever ready friend SHAKSPEARE, "Shotten Herrings?"

পাঞ্চ পত্রিকার যে-পৃষ্ঠায় কেশবচন্দ্র সম্পর্কে ছড়া প্রকাশিত হয়েছিল, তার প্রতিলিপি

"উৎসবমুখর এই দিনগুলি আমাদের মনে নতুন ক'রে এই প্রেরণা জাগাক, যাতে আমরা আরও কর্মশক্তির উৎসাহ পাই, যাতে আমরা গ'ড়ে তুলতে পারি সুসমৃদ্ধ ও গৌরবোজ্জ্বল সোণার বাংলা"

বাঙ্গালী শিল্পে ও বাণিজ্যে আর পিছিয়ে নেই—

তারই প্রতীক—

মান্না মণ্ডল

এণ্ড

মল্লিক কোং

প্রসিদ্ধ চাউল ব্যবসায়ী

হাওড়া অফিসঃ রামকৃষ্ণপুর, চড়াঘাট ফোন—হাওড়া ৩২০

কলিকাতা অফিসঃ ৫৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ফোন—৩৩-৩৭৫৯

সহযোগী প্রতিষ্ঠানঃ

সিদ্ধেশ্বরী কটন মিলস্, প্রাঃ লিঃ
অনন্তপুর টেক্সটাইলস্, লিঃ
সিদ্ধেশ্বরী রাইস মিলস্, প্রাঃ লিঃ
আটেশ্বরী রাইস মিলস্, প্রাঃ লিঃ
বিশালাক্ষ্মী রাইস মিলস্, প্রাঃ লিঃ
গঙ্গা রাইস মিলস্,
শৈলেন্দ্র রাইস মিলস্,
অন্নপূর্ণা রাইস মিলস্,
সিংহবাহিনী রাইস মিলস্,
জগদ্ধাত্রী রাইস মিলস্,
লক্ষ্মীনারায়ণ রাইস মিলস্,

অন্তর অন্তর গাড়ি চলিতেছে, মনে কর, তাহা হইলে সমস্ত দিনের মধ্যে কতবার ঐ গাড়ি চলে। অনেকগুলি রেলগাড়ি মাটির নীচে চলে, উপর হইতে কিছুই দেখা যায় না। গতকল্য সন্ধ্যার সময় মিস্ কবের বাড়ি হইতে আসিবার সময় ঐ গাড়িতে চড়িয়াছিলাম। উহা অতি আশ্চর্য ব্যাপার। এখানে দোকানগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। এক এক দোকানে কেবল ফল আর তরকারী বিক্রয় হইতেছে, কমলালেবু, কপি, আঙ্গুর কেমন সাজান রহিয়াছে। চারিদিকে কেবলই সাহেব। সাহেব রাস্তা ঝাঁট দিতেছে, সাহেব জুতা বুরুস্ করিতেছে, সাহেব দুধওয়ালা প্রাতঃকালে milk—উঃ (দুগ্ধ চাই) বলিয়া আমাদের বাসার নিকটে দুগ্ধ বিক্রয় করে; গতকল্য সাহেব নাপিতের কাছে দাড়ি কামাইলাম, সাহেব কোচম্যান আমাদের গাড়ী হাঁকায়, সাহেব দরজি আমাদের কাপড় সেলাই করে। আমাদের বাসায় প্রায় সকল কার্য একজন বিবি চাকরানী সম্পন্ন করে। এখানকার চাকরানীরা দেশের সুকো ঝির ন্যায় নহে; ইহারা এত পরিশ্রম করে, দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়।"

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের নিজস্ব একটা রুচি ছিল। ইউরোপীয় খাদ্য তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কাজেই লণ্ডনেও তিনি দেশী রান্না করাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। একজন মেম-পাচিকাকে তাঁরা দেশী রান্নাবান্না শিখিয়ে নিয়েছিলেন। এ-বিষয়ে কেশবচন্দ্র সহধর্মিণীকে লিখে-ছিলেন, "বিবি ব্রাহ্মণী আমাদের ভাত রাঁধে। মনে করিয়াছিলাম, এখানে আহারের অত্যন্ত কষ্ট হইবে, কিন্তু তাহা হয় নাই। প্রতিদিন দুইবেলা ডাল ভাজা ও অপরাপর সামগ্রী আহার করিতেছি। এখানে ডাল খাইয়া বড় তৃপ্তি লাভ করিতেছি। আমরা 'ভেতো বাঙ্গালী', ডাল ভাত প্রতিদিন হাপুশ হুপুশ খাইতেছি। দুগ্ধ আমার অতি প্রিয়, তাহা তুমি জান, তাহা এখানে অধিক পাওয়া যায়।"

লণ্ডনে আসবার পর প্রথম তিন চার সপ্তাহ ধরে কেশবচন্দ্র বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

প্রথমেই দেখা করলেন তাঁর শুভার্থী ও অনুরাগী মিস্ কোলেটের সঙ্গে। মিস্ কোলেট পরে কেশবচন্দ্রের বিলাত ভ্রমণ সম্পর্কে একটি বই লেখেন।

২৮শে মার্চ হল্যাণ্ডের রানীর সঙ্গে কেশবচন্দ্রের দেখা হল। ডাচ সম্রাজ্ঞী তখন রাজকীয় অতিথিরূপে ইংলণ্ড ভ্রমণে এসেছিলেন।

১লা এপ্রিল ওয়েস্টমিনস্টার-এর ডীন কেশবচন্দ্রকে মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। এখানেই অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে তাঁর প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হয়। এ-বাড়িতে আহারের সময় পায়েস জাতীয় কোন মিষ্টান্ন খেয়ে কেশবচন্দ্র বেশ অবাক হয়ে গেলেন। তিনি সেদিন রাত্রে লিখলেনঃ
"Is it not strange that I am supplied with something very like 'paish' to begin with?"

৮ই এপ্রিল তিনি পার্লামেণ্টের একটি অধিবেশন দেখতে গেলেন। বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে তাঁকে বসতে দেওয়া হয়। সেদিন আইরিশ ল্যাণ্ড বিল আলোচিত হচ্ছিল। ইংল্যাণ্ডের খ্যাত-নামা বাগ্মী ও প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনও সেদিন বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কেশবচন্দ্র কিন্তু পার্লামেণ্টের পরিবেশ দেখে বিশেষ প্রীত হলেন না। তিনি দেখলেন যে, মাননীয় সদস্যদের অনেকেরই শৃঙ্খলা-বোধ পর্যাপ্ত নয়। কেউ কেউ টুপি মাথায় দিয়েই বসে আছেন। অনেকেই যখন খুশি বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন, আবার ফিরে আসছেন হয়ত একটি বিতর্কের মধ্যেই বেশ কিছুটা হট্টগোলের সৃষ্টি করে। ফিসফিস করে বা বেশ উচ্চগ্রামে কথা বলছিলেন ত অনেকেই, যদিও তখন পুরোদমে সরকারী কাজ চলছিল। কেশবচন্দ্রের ধারণা হল এই যে, "Only a few make speeches and appear to take interest; the others do very little beyond giving their votes when required."

বিলেতের পার্লামেণ্ট-ভবনের ভিতরে আরেকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তা হচ্ছে নারী-দর্শনার্থীদের জন্য পর্দাপ্রথার ব্যবস্থা। তাঁদের বসতে দেওয়া হয়েছিল পুরুষদের গ্যালারি থেকে অনেকটা দূরে কাঠের তৈরী পার্টিশনের আড়ালে। এই পার্টিশনের গায়ে ছিল ছোট ছোট ফুটো। কেশবচন্দ্র এ-ব্যবস্থাকে বর্ণনা করলেন "পার্লিয়ামেণ্টারী জেনানা" বলে। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, তখনকার দিনে বিলেতের পার্লামেণ্টে মহিলা-সদস্য থাকা ত দূরের কথা, মেয়েদের ভোট দেবারই অধিকার ছিল না।

১২ই এপ্রিল লণ্ডনের হ্যানোভার স্কোয়ার হলে ইংলণ্ডের ইউনিটারিয়ান সঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিরাট একটি অভ্যর্থনা-সভায় কেশবচন্দ্র বক্তৃতা দিলেন। বিভিন্ন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা, লর্ড লরেন্সের নেতৃত্বে পার্লামেণ্টের সদস্যদের একটি দল ও আরও বহু বিশিষ্ট নাগরিক বিশেষ আমন্ত্রণে এ-সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে কেশবচন্দ্রের ভাষণের কেউ কেউ সমালোচনা করলেও সাধারণভাবে এটি সমাদৃত হয়েছিল।

কেশবচন্দ্র প্রথমে বললেন যে, তিনি ইংলণ্ডে খৃষ্টধর্ম কীভাবে আচরিত হয় তা দেখতে এসেছেন। খৃষ্টীয় তত্ত্ব সম্পর্কে নতুন কিছু শিখতে নয়।

তারপর তিনি ভারতে যে সমস্ত পাদরী পাঠান হ'ত তাদের সমালোচনা করে বললেন, "আপনারা আমাদের দেশে এমন অনেক ধর্ম-

Keshub Chunder Sen left Calcutta on Tuesday 15th February, arrived in London on Monday 21st March and visited Rajah Ram Mohun Roy's tomb at Arnos Vale Cemetery on Sunday 12th June 1870.

May the Lord bless his soul!

Rakhalchandra Roy came at the same time and visited the tomb of the late Raja Ram mohun Roy. 12 June 70

May God have mercy on his soul.

We were accompanied by Miss Carpenter.

Prosonno Coomar Sen, a cousin to Keshub Chunder Sen, & who is a companion to him throughout his tour to Europe, came here to visit the Tomb of Rajah Rammohun Roy on the 15th of June 1870

May the Lord bless his soul!

আর্নস ভেল সমাধিক্ষেত্রের ভিজিটর্স বুকএ কেশবচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীদের মন্তব্য

যাজককে পাঠিয়েছেন যে, তাঁদের মনে ধর্মের গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাস পুরোমাত্রায় থাকলেও তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে নিষ্ঠাবান্ নন একেবারেই। এঁরা নামেই খ্রীষ্টান এবং আমাদের জনসাধারণের অশেষ ক্ষতি করছেন।"

তারপর তিনি অতি স্পষ্ট কথায় ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কয়েকটি কুফল বর্ণনা করে বললেন, "শাসনযন্ত্রে বহু গুরুতর গলদ আছে যা সংশোধন করা প্রয়োজন। জনসাধারণের বহু ন্যায্য অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করতে হবে। তাদের অনেক অবিচার ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়—সে-অন্যায়ের অবসান ঘটাতে হবে।"...ইত্যাদি

হ্যানোভার স্কোয়ার হল-এ এই বক্তৃতার পরে কেশবচন্দ্রের নাম ইংলণ্ডের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ব্রিটিশ-রাজ সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ভাষণ বিলেতের রক্ষণশীল সমাজের অনেকেই পছন্দ করেননি। বিখ্যাত "পাঞ্চ" পত্রিকা কেশবচন্দ্র সম্পর্কে তাঁদের স্বভাব-সিদ্ধ একটি ব্যঙ্গরসাত্মক ছড়া রচনা করে ১৬ই এপ্রিলের সংখ্যায় ছাপলেন।

ছড়াটি হল এইরকম:—

"Who on earth, of living men,
Is Baboo Keshub Chunder Sen?
I doubt if even one in ten
Knows Baboo Keshub Chunder Sen.
Have you heard—if so, where and when—
Of Baboo Keshub Chunder Sen!
The name surpasses human ken—
Baboo Keshub Chunder Sen!
To write it almost spoils my pen:
Look — Baboo—Keshub—Chunder Sen!
From fair Cashmere's white-people glen
Comes Baboo Keshub Chunder Sen?
Or like "my ugly brother Ben",
Swarth Baboo Keshub Chunder Sen?
Big as ox, or small as wren,
Is Baboo Keshub Chunder Sen?
Let's beard this "lion" in his den—
This Baboo Keshub Chunder Sen.
So come to tea and muffins, then,
With Baboo Keshub Chunder Sen".

নানা প্রতিষ্ঠান থেকে বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁর আমন্ত্রণে আসতে লাগল। সারাদিন তিনি মোটে বিশ্রাম পেতেন না বললেই চলে।

একদিন সকালে আগে থেকে কোন সময় ঠিক না করেই স্বনামধন্য দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল কেশবচন্দ্রের বাসস্থানে এসে উপস্থিত হলেন। কেশবচন্দ্র তখন দেশে চিঠি লিখছিলেন। ভারতগামী জাহাজ ধরাবার তাড়া। কাজেই কেশবচন্দ্র যতক্ষণ না তাঁর চিঠি লেখা শেষ হয়, ততক্ষণ তাঁর সম্মানিত অতিথিকে অপেক্ষা করবার জন্য অনুরোধ জানালেন তাঁর সহকর্মীদের মারফত। তাঁরা ত অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে

উঠলেন যে, হয়ত মিল্ সাহেব ব্যাপারটা ভুল বুঝবেন ও অপমানিত বোধ করবেন। কিন্তু তিনি কেশবচন্দ্র ব্যস্ত আছেন শুনে একটি খবরের কাগজ পড়তে শুরু করলেন এবং যতক্ষণ কেশবচন্দ্র চিঠি লেখা শেষ করে সেখানে উপস্থিত না হলেন, ততক্ষণ প্রসন্নচিত্তে বসে রইলেন। নানা বিষয়ে আলোচনার পর মিঃ মিল্ যখন বিদায় নিতে উদ্যত হলেন, তখন কেশবচন্দ্র তাঁকে সদর দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে আসতে চাইলেন, কিন্তু বিনয় ও সৌজন্যের আধার স্টুয়ার্ট মিল্ তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করলেন।

কেশবচন্দ্র নিয়মিতভাবে দেশে চিঠিপত্র লিখতেন। ভারতগামী প্রতি ডাকেই তিনি পত্নী জগন্মোহিনী দেবীকে একটি করে বিস্তারিত চিঠি লিখতেন। কিন্তু জগন্মোহিনী দেবী সব সময় অত নিয়মিত-ভাবে চিঠি লিখে উঠতে পারতেন না। প্রথমত কেশবচন্দ্রের মত চিঠি লেখার অত অভ্যাসও তাঁর ছিল না, দ্বিতীয়ত তিনি ঘর সংসারের কাজে ও শিশুসন্তানদের নিয়ে সব সময় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন। কেশব-চন্দ্র কিন্তু নিয়মিত বাড়ির চিঠি না পেলে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। মনে কষ্টও পেতেন। ৬ই মে, ১৮৭০ তারিখে লণ্ডন থেকে জগন্মোহিনী দেবীকে লেখা কেশবচন্দ্রের একটি চিঠির অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি। এর প্রতিটি ছত্রে ফুটে উঠেছে স্ত্রীর চিঠি নিয়মিত না পাবার দরুন তাঁর উদ্বেগ ও আকুলতা। তিনি লিখেছিলেন,

"প্রিয় জগন্মোহিনী,

আমি কি অপরাধ করিয়াছি বল। আমার জন্য কি একটু দয়া হয় না? কয়েক সপ্তাহ চলিয়া গেল, একখানিও পত্র তোমার নিকট হইতে পাইলাম না। প্রতিবার কত আশা করিয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকি, কিন্তু অবশেষে অবসন্ন হইয়া পড়ি। যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তুমি কি ক্ষমা করিবে না? এ সময়ে, এ অবস্থায় কি নির্যাতন করা কর্তব্য? আমি বিদেশে আছি বলিয়া কি এত নিষ্ঠুর হইতে হয়? তোমার মুখ কতদিন দেখি নাই, আরো কতদিন দেখিব না। এ অবস্থায় তোমার কোমল হস্তের লেখা একমাত্র অবলম্বন, তাহা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না। ভাই, আমার অনুরোধ রক্ষা কর। তুমি কেমন আছ, ছেলেরা কেমন আছে। অনুগ্রহ করিয়া ত্বরায় আমাকে অবগত কর। যদি অধিক লিখিতে না চাও, কেবল এইটুকু লিখিয়া দিও 'আমরা ভাল আছি'। ইহাতে অধিক কষ্ট হইবে না।
..........................ইতি

তোমারি কেশব"

২০শে মে-র চিঠিতে কেশব লিখলেন, "তুমি তো কিছুই লিখিলে না, আমাকে কি ভুলিয়া রহিলে? যাহা হউক, আমার কর্তব্য সাধন করিতেই হইবে। আমি না লিখিয়া থাকিতে পারি না। এ বিষয়ে তুমি আমাকে দোষী করিতে পারিবে না। আমার নিকট হইতে যথাসময়ে পত্র পাও নাই, এ কথা কি তুমি বলিতে পার? কখনই না।"

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন একদিন কেশবচন্দ্রকে প্রাতরাশে নিমন্ত্রণ করলেন। কেশবচন্দ্র তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখলেন, "Our host is a very genial and kind-hearted men, though his appearance shows he has the tremendous weight of the whole Government on his shoulders."

বিরোধী দলের নেতা ডিসরেলীর সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়। ডিসরেলীকে তিনি "the astute and shrewd-looking leader of the opposition" বলে বর্ণনা করেছেন।

এ-সময় একদিন একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটল। কেশবচন্দ্র মিসেস বিভান্ নামে সম্পূর্ণ অপরিচিতা এক মহিলার থেকে একটি চিঠি পেলেন। তিনি লিখলেন যে, তিনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে উৎসুক। সুতরাং তিনি যদি একদিন তাঁর সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনে যোগদান করেন, তবে তিনি কৃতার্থ বোধ করবেন। তাঁর বাসস্থান ছিল লণ্ডনের বাইরে। গভীর আগ্রহের সঙ্গে কেশবচন্দ্র একদিন মিসেস্ বিভানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। কিন্তু কেশব বিশেষ মর্মাহত হলেন যখন সেই ভদ্রমহিলা ভাল-ভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করা দূরে থাক, দেখা হওয়ামাত্র খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানাতে শুরু করলেন। কেশবচন্দ্র সেদিন রাত্রে লিখলেন, "It shows her warm and firm faith indeed, but to me it is anything but agreeable after the trouble and expenses incurred in coming all the distance." অবশ্য মহিলা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলেন।

নৃত্যে নিপুণ হতে হলে

এমন ওস্তাদের শিক্ষা নিতে হবে
যিনি নৃত্যশাস্ত্রে সুদক্ষ।
তেমনি স্বাস্থ্যসমস্যায়
নির্ভরযোগ্য উপদেশ পাবেন
একমাত্র সুচিকিৎসকের কাছে।
নিস্তেজ অবসাদক্লিষ্ট শরীর
বর্তমান যুগের একটি সমস্যা।
দৈনিক জীবনসংগ্রামে
অনিবার্য যে শক্তির অপচয়,
তার তুলনায় শক্তিসঞ্চয় নগণ্য।
পরিপূরক হিসেবে
উত্তম আহার্যও যথেষ্ট নয়।
এমন অবস্থায় চিকিৎসক একটি
সারবান তেজোবর্ধক টনিক
গ্রহণের উপদেশ দিয়ে থাকেন।
ভিনকোলার কথা
তাঁকে জিগগেস করে দেখবেন।
সাধারণ ও ভিটামিন সমৃদ্ধ
এই দুই প্রকার
ভিনকোলা পাওয়া যায়।

ভিনকোলা

সারবান তেজোবর্ধক টনিক

স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস লিঃ কলকাতা ১৪

PSSV 4

কেশবচন্দ্র বহু সভায় বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "Hindu Theism", "Christ and Christianity", "Liquor Traffic in India", "Women in India", "England's duty to India." ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর ভাষণ।

"Christ & Christianity" বক্তৃতাটিতে তিনি খ্রীষ্টধর্মে অসংখ্য সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও তাঁদের দলাদলির কথা উল্লেখ করে, তাঁদের বিভেদ ভুলে খ্রীষ্টের নামে একতাবদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়ে বললেন,

"....Come unto me, brothers and sisters of England.....break up the barriers that divide church from church, and sect from sect."

লন্ডনের বিখ্যাত সাপ্তাহিক "Spectator" এই বক্তৃতার ওপর মন্তব্য করলেন, "A unique sort of lecture on Christ and Christianity was delivered last Saturday at St. James Hall by Keshub Chunder Sen."

সেন্ট জেমস্ হল-এ "Liquor Traffic in India" বিষয়ে কেশবের বক্তৃতা এত সমাদৃত হল যে, বক্তৃতা শেষ হবার পর বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের টুপি নেড়ে অভিবাদন জানাতে লাগলেন। এত লোক তাঁর সঙ্গে করমর্দন করবার জন্য এগিয়ে এলেন যে, কেশবচন্দ্রের মনে হ'ল তাঁর হাত যেন ভেঙে যাবে।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কেশবের জীবন-চরিতে লিখেছেন,

"Hundreds of men and women pressed forward to shake hands with him which they did so heartily that the mild reformer feared his arm would be torn from their sockets."

এমন কি, জনতা তাঁর গাড়ির পিছনে ধাওয়া করলেন এবং দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলতে লাগলেন, "God bless ye."

কেশবচন্দ্র এই বক্তৃতায় মদ্যপানের কুফলের কথা বর্ণনা করে ভারতে মদের ব্যবসা অবিলম্বে বন্ধ করে দেবার আবেদন জানালেন। তিনি বললেন,

"Allow me to tell you that liquor traffic has produced demoralising effects among the people of India. ....They hate intemperance and drunkenness (cheers) and drinking has never found any favour amongst them as a custom."

এই বক্তৃতার পর তিনি যে জন-সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কেশব নিজেই দিয়েছেন জগন্মোহিনী দেবীকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে। তিনি লিখছেন, "বক্তৃতার পর আমাকে দেখিবার জন্য এবং আমার হস্ত স্পর্শ করিবার জন্য সকলে ঠেলিয়া আসিতে লাগিল। অত্যন্ত ভীড় হইল এবং আমার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। আমি যে কি বড়লোক হইয়াছি, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। রাজার ন্যায় আমাকে সমাদর করিতেছে। তুমি সঙ্গে থাকিলে তোমাকে রাণীর ন্যায় অভ্যর্থনা করিত সন্দেহ নাই। তোমার কেশবের এত মান! অবশ্য তোমার মনে মনে আহ্লাদ হইতেছে; এ সকল শুনিয়া তোমার বুক কি দশ হাত হয় নাই? অধিক বাড়াবাড়ি ভাল নয়, কেননা, বাটী গিয়া আবার সেই কলুটোলার কেশব হইতে হইবে।"

৬ই মে কেশবচন্দ্র বিশাল এক জনমণ্ডলীর সামনে তাঁর বিখ্যাত ভাষণ "England's Duties to India" প্রদান করলেন। ভারত ও ব্রিটেনের সর্বত্র এই বক্তৃতা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল।

তিনি ভারতীয় ছাত্রদের জন্য সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা, ব্যাপক জনশিক্ষার প্রচলন, মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার, ভারতীয়দের প্রতি আরও সদয় আচরণ ইত্যাদি নানা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বহু ব্রিটিশ কর্মচারী ভারতীয়দের প্রতি কী ভীষণ দুর্ব্যবহার করে থাকেন, তার একটি বর্ণনা দিয়ে কেশবচন্দ্র বললেন, "Let me also tell you that when

50 Grosvenor Park
Camberwell
10 August 1870

Sir,

In reply to the Duke of Argyll's kind letter of yesterday's date I beg to inform you that it will give me the greatest pleasure to avail myself of the honor of obeying the Royal command on Saturday next. In compliance with His Grace's instructions I shall take the 8.10 A.M. train from Waterloo Bridge.

I am
Sir
Yours faithfully
Keshub Chunder Sen

W. H. Benthall Esq.

মিঃ বেন্থলকে লিখিত চিঠির প্রতিলিপি

your people go to India, they should always take with them a large quantity of that commodity known as Christian patience. Some of them not only ill-treat my countrymen in the most wanton manner, but are sometimes driven by anger to deeds of violence and murder. I know there are cases on record—in which immoral, unconscientious, and heartless Christians, so-called, inflicted violent kicks and blows on poor helpless natives till they died."

কেশবের এই বক্তৃতা ভারতে ব্রিটিশ ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি করল। প্রতিবাদস্বরূপ, "ইণ্ডিয়ান মিরর" পত্রিকার প্রত্যেকটি ইংরেজ গ্রাহক এ-কাগজ নেওয়া বন্ধ করলেন। বোম্বাই-প্রবাসী একজন ব্রিটিশ ভদ্রলোক ত এতটা খেপে গেলেন যে, তিনি ঘোষণা করলেন, তিনি যখন চাবুক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন, তখন যদি কেউ তাঁর সামনে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাটি পড়বার সাহস সঞ্চয় করতে পারেন, তবে তাঁকে তিনি পাঁচশ টাকা পুরস্কার দেবেন। কলকাতার একদল সংকীর্ণমনা খৃষ্টান পাদরী একটি পুস্তিকা ছেপে প্রচার করতে লাগলেন যে, কেশবচন্দ্র সেন একজন পয়লা নম্বরের ভণ্ড, কারণ তাঁরা দেখেছেন যে, তখনও তাঁর বাড়িতে মূর্তি পূজো করা হয়। এ-কথা সত্যি যে, কেশবের আত্মীয়দের মধ্যে যাঁরা ব্রাহ্ম হননি, তাঁরা তখনও বাড়িতে বিগ্রহের উপাসনা করতেন। কিন্তু কেশব মনে করতেন যে, তাঁদের ধর্মাচরণে বাধা দেবার কোন অধিকারই তাঁর নেই। শত্রুরা এ নিয়ে বিকৃত প্রচার করত।

যাই হক, লণ্ডনে মাস দুয়েক বাস করবার পর কেশবচন্দ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন প্রদেশ সফরে বেরুলেন।

মিঃ স্পিয়ার্স কেশবের দৈনন্দিন কর্মসূচীর একটি খসড়া তৈরী করে ইউনিটারিয়ান সঙ্ঘের বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিলেন। এতে তিনি জানালেন, "মিঃ সেন রাত দশটায় কাজ শেষ করে শয্যাগ্রহণ করেন। তিনি সকাল ৮টার সময় এক কাপ চা পান করেন—সঙ্গে রুটি খান না। সকাল ১০-৩০ পর্যন্ত প্রার্থনা, চিঠিপত্র লেখা ও স্নান। সাড়ে দশটার সময় প্রাতরাশ ও বেলা একটা পর্যন্ত পাঠ। বেলা একটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, আলোচনা, সভাসমিতিতে যোগদান। বিকেল পাঁচটায় সান্ধ্য ভোজন, সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আবার সাক্ষাৎকার।"

কেশবের খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে মিঃ স্পিয়ার্স লিখলেন, "মিঃ সেন ও তাঁর ভাইপো নিরামিষ খান। কোনরকম মাংস, ডিম বা মদ তাঁরা স্পর্শ করেন না। তাঁরা জল, লেমোনেড ও গরম দুধ পান করেন। প্রাতরাশ খান—সেদ্ধ ভাত, মাখন দিয়ে ভাজা আলু, মটরশুঁটির সুপ। সান্ধ্যভোজন—প্রাতরাশেরই মত। শুধু সঙ্গে কিছু ফল, পুডিং বা মিষ্টি দিতে হবে। কেক ডিম ছাড়া প্রস্তুত করতে হবে। মিঃ সেন ও তাঁর ভাইপো একত্র বসে আহার করতেই বেশী পছন্দ করেন।"

কেশবচন্দ্র প্রথমে ব্রিস্টলে গেলেন। সেখানে তিনি মেরি কার্পেণ্টারের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। এর দু বছর আগে শ্রীমতী কার্পেণ্টার যখন কলকাতায় আসেন, তখন কেশবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। রাজা রামমোহন রায়ও ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর ব্রিস্টল ভ্রমণের সময় মেরি কার্পেণ্টারের অতিথি হন, এবং তাঁর অন্তিমশয্যায় মিস্ কার্পেণ্টারই তাঁর শুশ্রূষা করেন। মেরি কার্পেণ্টার রচিত রামমোহনের জীবনচরিতটিও সুপরিচিত।

মিস্ কার্পেণ্টারের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের কিন্তু ঠিক বনিবনা হল না। তিনি কেশবকে নানা বিষয়ে পদে পদে এতরকম অযাচিত উপদেশ বা আদেশ দিতে শুরু করলেন যে, তিনি মাঝে মাঝে তাঁর নিদারুণ বিরক্তির ভাব চেপে রাখতে পারতেন না। যতটা সম্ভব ভদ্রতা বজায় রেখে মৃদু প্রতিবাদও জানাতেন। উদাহরণস্বরূপ মিস কার্পেণ্টার কেশবচন্দ্রের পোশাক থেকে শুরু করে তাঁর আহার-তালিকা ও পদ্ধতি, নানারকম তথাকথিত বিলেতী শিষ্টাচার, আদব-কায়দা, এমন কি তাঁর চুল আঁচড়ানর বা গোঁফের ধরন ইত্যাদি বিষয়ে "লেক্‌চার" দিতেন। উত্যক্ত হয়ে কেশবচন্দ্র ত জগন্মোহিনীকে লিখেই ফেললেন: "তাঁহার (মিস্ কার্পেণ্টার) অনেক সদ্গুণ আছে, কিন্তু তাঁহার বকা স্বভাব অতি ভয়ানক। তিনি এত বকিতে পারেন যে, লোকে বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। বড় বড় করিয়া ক্রমাগত দিন রাত্রি আমাদের সহিত নানা বিষয়ে কথা কহিতেছেন।" প্রতাপ মজুমদার বলছেন, "In the end, something like a coolness sprang up between them."

কেশবচন্দ্র ব্রিস্টলের আর্নস ভেল সমাধিক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি দেখতে গেলেন। সমাধির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আবেগভরে তিনি প্রার্থনা করলেন, "I especially offer prayer for the soul of that illustrious man who came from my country and whose remains lie here.

তারপর সমাধিক্ষেত্রের ভিজিটর্‌স বুকে তিনি লিখলেন,

"Keshub Chunder Sen left Calcutta on Tuesday 15th February, arrived in London on Monday 21st March, and visited Rajah Rom Mohun Roy's tomb at Arno's Vale Cemetery on Sunday 12th June, 1870.

May the Lord bless his soul."

আমি যখন সম্প্রতি ইংলণ্ড ভ্রমণে গিয়েছিলাম তখন ব্রিস্টল আর্নস ভেল সমাধিক্ষেত্রে রাজা রামমোহনের সমাধি দেখতে যাই। সে-সময় ভিজিটরস বুকের যে-পাতায় সাতাশি বছর আগে কেশবচন্দ্র নিজ হাতে উপরের কথাগুলি লিখেছিলেন, সেই পাতাটির একটি আলোকচিত্র গ্রহণ করি। সেই আলোক-প্রতিলিপিটি এই প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রিত হল।

প্রসন্নকুমার সেন ও রাখালচন্দ্র রায় নামে আরেকজন বাঙালীও এই পাতায় সই করেছিলেন।

ব্রিস্টলে দলে-দলে লোক কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। একদিন এলেন এফ ডব্লু নিউম্যান নামে অদ্ভুত-প্রকৃতির এক ভদ্রলোক। তিনি ছিলেন তিনটি জিনিসের বিরোধী—টিকা, মাংস ও খৃষ্টধর্ম।

কেশবচন্দ্র একদিন স্ট্রাটফোর্ড-অন-আভন-এ শেক্‌সপীয়রের জন্মস্থান দেখতে গেলেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি শেক্‌সপীয়রের একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি নাকি প্রায়ই বলতেন,

"Possessed of the Bible and Shakespeare a man is above the world."

সেখানে তিনি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে সব ঘুরে দেখলেন। একটি টেবিলে শেক্‌সপীয়র তাঁর নাম খোদাই করেছিলেন, সেটিও দেখলেন। এই টেবিলে বসেই নাকি শেক্‌সপীয়র "Hamlet" নাটিকা রচনা করেছিলেন।

ব্রিস্টল থেকে কেশবচন্দ্র উত্তর-ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড সফরে বেরুলেন। লিস্টার, ম্যাঞ্চেস্টার, নটিংহাম, লিভারপুল, এডিনবরা, গ্লাসগো ইত্যাদি নানা জায়গায় তিনি ভ্রমণ করলেন।

তিনি যখন নটিংহামে উপস্থিত হলেন, তখন চল্লিশজন পাদরীর স্বাক্ষরিত একটি চিঠি এসে হাজির হল তাঁর নামে। এতে পাদরী সাহেবরা বলছেন, "খৃষ্টান না হলে তোমার পরিত্রাণ নেই। তুমি খৃষ্টান হবে কিনা তা আমরা অবিলম্বে জানতে চাই।"

কেশবচন্দ্র অবিলম্বেই উত্তর পাঠালেন: "আমি আপনাদের কথামত খৃষ্টান হব না, কিন্তু যীশুর বিনয়, ভক্তি, আত্মত্যাগ এবং প্রেম আমার প্রার্থনীয়।"

উত্তর-ইংলণ্ড সফরকালে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অনিয়মের ফলে কেশবচন্দ্র দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন তিনি ম্যাঞ্চেস্টারে মিঃ ও মিসেস ব্রুকস-এর বাড়িতে অতিথি। তিনি জ্বর ও ডাইরিয়া রোগে ভুগছিলেন।

কেশবের জীবনীকার চিরঞ্জীব শর্মা এই

প্রসঙ্গে বলছেন, "একে এই পরিশ্রম, তাহাতে আহার উদ্ভিদ্ মাত্র ভরসা; দুধ জলের মত, তরকারী কেবল সিদ্ধ করা, তাহাতে স্বাদ নাই; সুতরাং অনেক সময় খাইয়া পেট ভরিত না। গভীর রাত্রিকালে জঠরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিত। সঙ্গে স্বদেশের কিছু কিছু দ্রব্য ছিল, তদ্দ্বারা অরুচি নিবারিত হইত। রজনীতে ক্ষুধা-নিবারণের জন্য তাঁহার সঙ্গী প্রসন্নবাবু বিস্কুট কাছে রাখিতেন। লোকে বলিত, সেন মহাশয় অনেক বিষয় শিখিয়াছেন, কিন্তু একটি বিষয় শিখেন নাই। ইনি 'না' বলিতে জানেন না। বস্তুতঃ তিনি কাহারও অনুরোধ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না।"

চিরঞ্জীব শর্মা আরও বলছেন, "বুকের পত্নী এই বিদেশী সাধুর পীড়া দর্শন করিয়া কাঁদিতেন। তিনি জননীর ন্যায় স্নেহের সহিত তাঁহার সেবা করিতেন।"

কলকাতায় কেশবের আত্মীয়-বন্ধুরা তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন যে, তাঁরা তৎক্ষণাৎ তার করলেন। কেশবচন্দ্র টেলিগ্রাম করে জবাব দিলেন: "No feer, perfectly cured. Resumed work." চিরঞ্জীব শর্মা লিখেছেন: "ইহা কি জীবনপ্রদ কুশল সংবাদ?"

কেশব নাকি তাঁর অসুস্থতার সময় ভয়ানকভাবে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। সব সময়ই তাঁর মনে হচ্ছিল, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামমোহন রায়ের মৃত্যুর কথা। তাঁরা কেউই যে শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরে যেতে পারেননি, বিদেশেই তাঁদের অন্তিমশয্যা রচিত হয়েছিল, এ-সব কথা অহরহ তাঁর মনকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছিল।

উত্তর-ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড সফর শেষ করে কেশবচন্দ্র লণ্ডনে ফিরে এলেন। এই সফর-কালীন যেখানেই তিনি গিয়েছেন, সেখানেই লাভ করেছেন অভূতপূর্ব জনসম্বর্ধনা, আদর ও আপ্যায়ন। লিভারপুল থেকে ৭ই জুলাই তারিখে লেখা একটি চিঠিতে জগন্মোহিনী দেবীকে কেশবচন্দ্র লিখেছিলেন, "সকলে এত সমাদর করিতেছে যে, এখন 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' বলিতে হইতেছে। সকলে মিলিয়া আমাকে বড় লোক করিয়া তুলিয়াছে। তুমি মনে করিতেছ, আমার লেজ মোটা হইয়াছে। তাহা কিন্তু হয় নাই। আমি সেই ক্ষুদ্র কেশব, এখানে কেবল ভাত, আলু, ডাল, দুগ্ধ খাইতেছি!! সেই ভেতো বাঙালী!!"

লণ্ডনে ফিরে এসে তিনি রানী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রানীকে তিনি প্রথমে দেখেন মে মাসে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে একটি অনুষ্ঠানে। কেশব দিন-পঞ্জীতে লিখেছিলেন:

"Her Majesty is a plain-looking woman in plain dress, simple, yet dignified."

রানী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার ঘটল লণ্ডনের বাইরে অবস্থিত অসবোর্ন রাজপ্রাসাদে।

কেশবচন্দ্র ডিউক অব আর্গিল-এর থেকে একটি চিঠি পেলেন যে, রানী ভিক্টোরিয়া ১৩ই আগস্ট, শনিবার অসবোর্নে তাঁকে দর্শন দেবেন। কেশব ডিউক অব আর্গিল-এর প্রাইভেট সেক্রেটারি মিঃ বেন্থলকে একটি চিঠি লিখে উপরোক্ত পত্রটির প্রাপ্তিস্বীকার করলেন এবং জানালেন যে, নির্ধারিত দিনে তিনি অসবোর্ন রাজপ্রাসাদে উপস্থিত থাকবেন। কেশব বেন্থল সাহেবকে এই চিঠি লেখেন ১০ই আগস্ট, ১৮৭০। আমার লণ্ডন-প্রবাসের সময় বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে গিয়ে বর্তমান রানী এলিজাবেথের প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করি এবং তাঁর সৌজন্যে উপরোক্ত চিঠিটি এবং কেশবচন্দ্র সংক্রান্ত আরও কয়েকটি নথিপত্র দেখতে সক্ষম হই। উপরে উল্লিখিত চিঠিটির একটি আলোক-প্রতিলিপি এই প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রিত হল।

এই চিঠিতে কেশবচন্দ্র লিখেছেন,

56. Grosvenor Park,
Camberwell,
10 August, 1870.

Sir,

In reply to the Duke of Argyll's kind letter of yesterday's date I beg to inform you that it will give me the greatest pleasure to avail myself of the honour of obeying the Royal command on Saturday next. In compliance with His Grace's instructions I shall take the 8.10 A. M. train from Waterloo Bridge.

I am
Sir
Yours faithfully,
Keshub Chunder Sen.

N. H. Benthal, Esq.

রানী ভিক্টোরিয়া কেশবচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশী হলেন। ভারতের নানা সমস্যা নিয়ে খোলাখুলিভাবে তাঁরা আলোচনা করলেন। বিশেষ করে ভারতীয় নারীদের সমস্যা নিয়ে।

অবশেষে এল বিদায় নেবার পালা। ১৭ই সেপ্টেম্বর সাউদ্যাম্‌টন্ বন্দর থেকে কেশব-চন্দ্র পি অ্যাণ্ড ও কোম্পানির "অস্ট্রেলিয়া" জাহাজ ধরলেন।

লণ্ডন ত্যাগ করবার আগে ১২ই সেপ্টেম্বর হ্যানোভার স্কোয়ার হল-এ একটি বিদায়-সম্বর্ধনায় কেশবচন্দ্র এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিলেন। বিদায়-বাণীতে তিনি বললেন,

"From England I go away, but my heart will always be with you, and England will always be in my heart. Farewell, dear England, with all thy faults, I love thee still."

স্পিয়ার্স সাহেব ইংলণ্ডে কেশবের কর্ম-তৎপরতার যে বিবরণী প্রকাশ করলেন, তা থেকে জানা যায় যে, তিনি চোদ্দটি প্রধান শহরে ঘুরেছেন। আরও চল্লিশটি শহর থেকে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, কিন্তু সময়াভাবে যেতে পারেননি। সত্তরটির উপর জনসভায় তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ছাত্র-সমাবেশ ও লণ্ডনের পূর্বপ্রান্তে দরিদ্র পল্লীতে তিনি বক্তৃতা দেন।

কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ড-ভ্রমণ নানাদিক দিয়ে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়। ম্যাক্সমুলার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন,

"His stay in England was a constant triumph. His name has become almost a household word in England, and I have been struck, when lecturing in different places, to find that the mere mention of Keshub Chunder's name elicited applause for which I was hardly prepared."

২০শে অক্টোবর দুপুরবেলা কেশব বোম্বাই মেলে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলেন। হাওড়া সেদিন লোকে লোকারণ্য। তিল ধারণের জায়গা নেই। তাদের সমবেত জয়-ধ্বনিতে সমস্ত প্ল্যাটফর্ম যেন কেঁপে উঠল। কেশব ও তাঁর ভক্তদের চোখে দেখা দিল আনন্দাশ্রু। চিরঞ্জীব শর্মা বর্ণনা দিচ্ছেন, "তখন কেশবের মুখারবিন্দ বিকশিত, নয়নযুগল প্রেমে বিস্ফারিত হইল। আট মাস পরে সুস্থ সবল শরীরে, প্রসন্ন হৃদয়ে মাতৃভূমিতে পদার্পণ করিয়া তিনি হাসিলেন এবং সকলকে হাসাইলেন।"

প্রিন্সিপ্যাল ইন্দুভূষণ মজুমদার মহাশয়ের

মনোবিজ্ঞান	- ৮৲
নীতিবিজ্ঞান	- ৪৲
দর্শন প্রসঙ্গ	- ৬৲

চিন্তাশীল ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের পড়বার মত বই।

আশুতোষ বুক স্টল
১০বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড,
কলিকাতা—২৬
V P-তে যত্নের সহিত বই পাঠানো হয়।

জানালার বাইরে

আলোকচিত্রী শ্রীভরত নাগ

হিসেবী

রমাপদ চৌধুরী
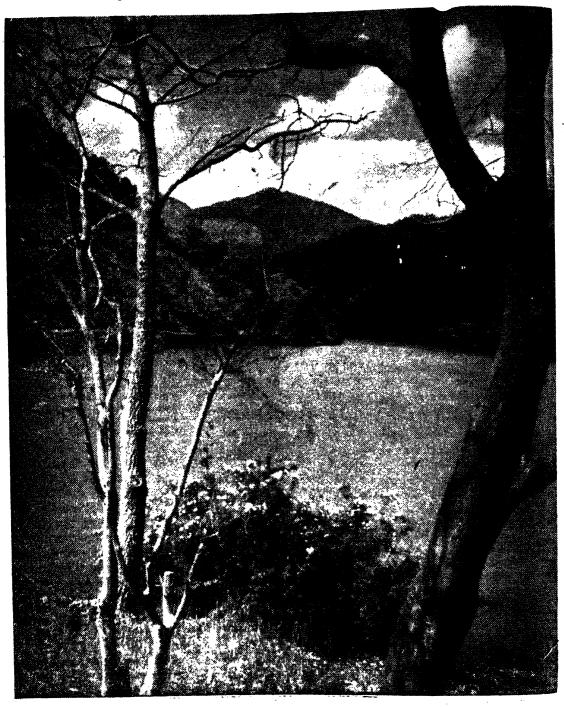
মহীতোষবাবুকে এ-ভাবে দেখব কোনদিন কল্পনাও করিনি। পার্কটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে অন্যমনস্কভাবেই তাকিয়েছিলাম প্রথমটা। ফুটপাতের উপর খড়ি দিয়ে চৌকো চৌকো কী সব ঘর কেটে একরাশ পুঁথিপত্র নিয়ে বসে ছিল লোকটা। গায়ে একটা ময়লা নামাবলী।

প্রথমটা চিনতে পারিনি। পার হয়ে খানিকটা যখন চলে এসেছি, তখন হঠাৎ মনে হল, মহীতোষবাবু না? ফিরে তাকালাম, চোখাচোখি হল আবার। এবং সঙ্গে সঙ্গে মহীতোষবাবু অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

বোধহয় লজ্জায়।

লজ্জা আমারও। ফুটপাথের গণৎকার হয়ে বসে আছেন মহীতোষবাবু, স্টিফেন্স কোম্পানির চার শ টাকা মাইনের বড়বাবু মহীতোষ সান্যাল।

আমি তখন অনেক ছোট। সেই তখন থেকেই শুনে আসছি, মহীতোষবাবুর মত কৃপণ আর একটি নেই। বুড়োরা অবশ্য বলতেন, কৃপণ নয়, হিসেবী।

কৃপণ কিনা জানি না, তবে খুব হিসেবী লোক ছিলেন মহীতোষবাবু। তিরিশ টাকা মাইনেতে ঢুকেই এক হাজার টাকা ইন্সিওর করে ফেলেছিলেন।

সে যুদ্ধের অনেক আগেকার কথা। তিরিশ টাকা মাইনেতে তখন পাঁচটা লোকের সংসার চলত। আর পাঁচটা লোকই তখন এসে গিয়েছে তাঁর সংসারে।

বাপ ছিলেন ঐ স্টিফেন্স কোম্পানিরই বড়বাবু। মাইনে মোটামুটি ভালই পেতেন। ছেলে কলেজে পড়ছে, বংশ ভাল, মেয়ের বাপরা ছোটাছুটি শুরু করে দিল।

ফলে, কলেজে পড়তে পড়তেই বিয়ে করে ফেললেন মহীতোষবাবু। করে ফেললেন বলব না, হয়ে গেল।

তারপর বছর না ঘুরতে একটি মেয়ে। মেয়ে হলেও মুখ তাঁর ভার করার কারণ ছিল না তেমন। বিয়ের ভাবনা, সে পনর বছর বাদে ভাবা যাবে। হ্যাঁ, পনরতেই অরক্ষণীয়া হত তখন। আর ভাত-কাপড়ের ভাবনা ত মহীতোষবাবুর নয়, মহীতোষবাবুর বাবার।

মহীতোষবাবুর বাবা যা মাইনে পেতেন, তাতে ছেলে-ছেলেরবৌ কেন, নাতনী নাতজামাইকেও বসে খাওয়াতে পারতেন। টাকায় তখন পনর সের চাল। এক জোড়া কাপড় দু টাকা দশ আনা।

মহীতোষবাবুও প্রথম দিকটায় তাই অতশত চিন্তা করেননি। যখন চিন্তা করতে শুরু করলেন, তখন আর নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। তিন তিনটি ছেলেমেয়ে তখন।

মহীতোষবাবুর বাবা অবসর নিলেন কাজ থেকে, আর এতদিনের বিশ্বস্ত চাকরির পুরস্কার চেয়ে নিলেন, ছেলের চাকরি।

তিরিশ টাকা মাইনের কেরানীর চাকরি। তা হক, তিনিও ঐ মাইনেতে ঢুকে বড়বাবু হয়েছেন।

প্রথম প্রথম বেশ চলে যাচ্ছিল। মাসের শেষে অভাবটা বাপের কাছে হাত পেতে মিটিয়ে নিতেন মহীতোষবাবু। ক্রমশ দু-পাঁচ টাকা করে বছরে বছরে মাইনেও বাড়ছিল। তারপর একে একে বাবা মা দুজনেই গত হলেন। জমান কিছু টাকা হাতে পেলেন মহীতোষবাবু। কিন্তু যত আশা করেছিলেন তত নয়।

মহীতোষবাবুর স্ত্রী গঞ্জনা দিলেন, "এখন বললে কী হবে, যা খরচে লোক ছিলেন।"

অথচ খরচ যে সত্যি কী করে গেছেন তিনি, বোঝা গেল না। মহীতোষবাবুর তিন বোনের বিয়ে আর অসুখে বিসুখে ডাক্তার ওষুধ। এত মাইনে পেতেন, সব কি এইভাবে গিয়েছে?

মহীতোষবাবু এমনিতেই হিসেবী মানুষ আরও হিসেবী হয়ে উঠলেন। মেয়ে দুটোর বিয়ে দিতে হবে ত। ছেলেকে পড়াতে হবে ইস্কুলে কলেজে।

এক হাজার টাকা ইন্সিওর করেছিলেন মাইনে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও কি

করলেন। ব্যাংকেও যখন যেমন পারতেন, বাঁচাতেন।

স্ত্রী কৃপণ বলত, মেয়েরা বায়না ধরত নতুন শাড়ির। তবু হিসেব এতটুকু নড়চড় হতে দিতেন না তিনি।

বাপের জমান টাকাগুলো উড়ে গেল বড় মেয়ের বিয়ে দিতে। মহীতোষবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "দেখলে ত। আরেকটা মেয়েকে পার করতে হবে। তাছাড়া, সমস্ত ভবিষ্যৎটাই..."

স্ত্রী বলত, "অত ভবিষ্যৎ ভাবলে চলে না। এখন খেয়ে পরে বাঁচলে তবে ত ভবিষ্যৎ।"

"আহা, না খেয়ে থাকার কথা ত বলছি না। তবে দু হাতে না ওড়ালেই হল।"

স্ত্রী ঝাঁঝালো গলায় বলত, "মাইনে ত এতদিনে পাচ্ছ পঞ্চান্ন। একটা হাত ভরে না, তার আবার দু হাতে ওড়াব!"

ধক্ করে একটু লাগত বুকে। তবু হাসি দিয়ে লজ্জা ঢেকে মহীতোষবাবু বলতেন, "তবু ত পঞ্চান্ন টাকা মাস গেলে পাচ্ছি। কিন্তু পঞ্চান্ন বছর বয়সে চাকরিটা ছেড়ে এসে যদি পনর বছর বাঁচতে হয়..."

স্ত্রী হাসত। "তখন তোমার অণিমারও বিয়ে হয়ে যাবে, আর মণ্টুও চাকরি করবে।"

"চাকরি?" অবিশ্বাসের হাসি হাসতেন মহীতোষবাবু। বলতেন, "বাবা ছিল বড়বাবু, সাহেব ভালবাসত, তা বলে আমার ছেলেরও চাকরি হবে নাকি অত সহজে!"

স্ত্রী বুঝতেন, তর্ক করে লাভ নেই। রেগে গিয়ে বলতেন, "নাও, বাজারের হিসেবটা নাও..."

খাতা কলম নিয়ে বসতেন মহীতোষবাবু। "বল।"

"মাছ সাড়ে তিন আনা।"

"মাছ সাড়ে তিন আনা। তারপর?"

"আলু সাত পয়সা।"

"আলু সাত পয়সা। হুঁ।"

"কয়লা দশ আনা।"

খাতা থেকে চোখ তুলতেন মহীতোষবাবু। চোখ থেকে চশমা খুলতেন। তারপর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলতেন, "ক মণ কয়লা লাগছে মাসে?"

ঐ এক কথা। ক মণ কয়লা লাগছে, ক সের তেল লাগছে, ভাত কেন ফেলা যায়। তার ওপর জিনিসের দাম ত আছেই।

আগে থলি হাতে নিয়ে নিজেই বাজার যেতেন, মণ্টুটা বড় হয়ে কিছুতেই বাজারটা হাতছাড়া করতে চায় না।

বেশ খানিকটা ঝগড়াঝাটির পর আবার খাতা কলম নিয়ে হিসেব লেখা শেষ করে দুটো টান মেরে মোট কষতেন। তিন তিনবার যোগ করে লিখতেন এক টাকা সাড়ে চোদ্দ আনা।

"বাকী ছ পয়সা?" মহীতোষবাবু প্রশ্ন করতেন।

"আবার ছ পয়সা কোথায় পাব, সবই ত খরচ হয়েছে। ভাল করে যোগ করে দেখ।"

"যোগ আমি ভাল করেই দিয়েছি।"

আবার খানিকটা কথা কাটাকাটি হত। তারপর উপায় না দেখে মোট অঙ্কের নীচে মহীতোষবাবু লিখতেন, গরমিল—ছ পয়সা।

মনটা বিষিয়ে যেত, গরমিলের জন্যে নয়। দুটো টাকা খরচের জন্যে। আগেকার পাতাগুলো উল্টে দেখতেন, কোনদিন দশ আনা, কোনদিন সাত আনা। কিন্তু মাঝে মাঝে এই যে চাল, কয়লা, তেল ইত্যাদির মোটা খরচগুলো—দেখলেই ভয় পেতেন মহীতোষবাবু।

সত্যি, এভাবে খরচ করলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

ভবিষ্যৎ কেন, বর্তমানও। তবু মাঝে মাঝে, বছরে একদিন ফূর্তি হত। মাইনে বাড়ার খবর শুনলেই। মাইনে বাড়ত। দু-পাঁচ থেকে দশ পনর পর্যন্ত।

মাইনে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য টাকা জমিয়েছেন আরও বেশী।

কিন্তু কী করে যেন খরচও বেড়ে গিয়েছে। ছেলেমেয়েদের হালচাল বদলে গিয়েছে বলেই হয়ত।

মোটা শাড়ি আর পরতে চায় না অণিমা। অথচ বড় মেয়ে প্রতিমা পুজোয় প্রথম মিহি শাড়ি পেয়েছিল। ছেলেও তেমনি। কলেজে ঢুকেই ফুল শার্ট পরতে শুরু করল। সিকি গজ কাপড় বেশী খরচ।

স্ত্রী চটে যেতেন। "তুমি এখন আর তিরিশ টাকার কেরানী নও।"

না, ধাপে ধাপে চাকরিতে উন্নতি হয়েছে মহীতোষবাবুর। কেরানী থেকে ছোটবাবু। মাইনে দুশ পঁচিশ।

ইন্সিওর আর জমান টাকায় সাত হাজার হয়েছে। কিন্তু ছোট মেয়ে গলায় গলায়। সম্বন্ধ ঠিক হলেই তিনটি হাজার টাকা বের করতে হবে। মোটামুটি একটা সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে, বাঁকিপুরের ছেলেটি এবার আই এ দেবে।

স্ত্রী বলে, "অণির বিয়ে দিয়েই মণ্টুর বিয়ে দেব।"

চোখ কপালে তোলেন মহীতোষবাবু। "মণ্টুর? বি এ পরীক্ষা দিচ্ছে, চাকরি-বাকরি করুক, তারপর।"

"তুমি চাকরি করে বিয়ে করেছিলে?"

"করিনি বলেই ত সারাজীবন ঠ্যালা সামলাচ্ছি। না, না, উপায়ক্ষম না হলে ছেলের বিয়ে দেব না।"

ছেলের বিয়ের কথা পরে ভাবলেও চলবে। মেয়ের বিয়েটা আসল। ছেলের বাপ এসে মেয়ে দেখে, আর মহীতোষবাবু গিয়ে পণাপণ জিজ্ঞেস করেন। এদিক হয়ত ওদিক হয় না।

এইভাবে বছরের পর বছর যায়। এদিকে

দুশ পঁচিশ থেকে তিন-চার লাফে একেবারে চারশ। ব্যাপার হল যুদ্ধ লেগে গেছে তাই সাহেবরা অনেকে চলে গেছে। কেউ যুদ্ধে, কেউ ভাল চাকরি পেয়ে। আর ধাপে ধাপে উঠে এসে বড়বাবু হয়ে গিয়েছেন মহীতোষবাবু। সুতরাং আই এ পাশ ছেলের সঙ্গে ছোট মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন না। রীতিমত গ্র্যাজুয়েট পাত্র চাই। মানে তিন হাজারে আর হবে না, পাঁচ হাজার।

পণের কথা শুনে চটে যান মহীতোষবাবুর স্ত্রী। যত ধান চালের দাম বাড়ছে, চাষীদের হাতে টাকা আসছে, খুশি মত সব পণ দিচ্ছে। বি এ পাশ ছেলে কি না পাঁচ হাজার?

মহীতোষবাবু হাসেন, "উঁহু, ব্ল্যাক ব্ল্যাক! কালোবাজার বলে না? সেই কালো-বাজার করে টাকা হয়েছে লোকের। বিয়ের পণেও তাই ব্ল্যাকমার্কেট হয়েছে।"

তবু উপায় নেই; শেষ পর্যন্ত ঐ পাঁচ হাজারেই বিয়েটা দিয়ে দিতে হল মহীতোষবাবুকে।

তা বলে হিসেব এতটুকু আলগা হতে দেননি। বাড়ি পাল্টাননি। কী হবে বেশী ভাড়া দিয়ে। ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে ত। কিন্তু হিসেবের খাতাটাই তাঁর হাতে, জিনিসের দাম ত তাঁর হাতে নয়। মাইনে যত না বেড়েছে তার চেয়ে জিনিসের দাম।

সন্ধ্যেবেলায় চোখে চশমা এঁটে খাতা কলম নিয়ে বসেন মহীতোষবাবু। যথারীতি বলেন, "বাজারের হিসেবটা দাও।"

"মাছ দেড় টাকা।"

"দেড় টাকা? কাল ত এক টাকা দু আনা ছিল।"

"চেঁচিয়ো না, জামাই রয়েছে ও-ঘরে।... রসগোল্লা এনেছিল আট আনার।"

"নাঃ, বড্ড বেহিসেবী হয়ে যাচ্ছ। রসগোল্লা কি পেট ভরে খাবার জন্যে? দুটো দিলেই পার।"

স্ত্রী কথাগুলো গায়ে মাখে না। বলে, "আলু তের আনা।"

উপায় না দেখে লিখে চলেন মহীতোষ-বাবু।

"কয়লা এক টাকা দু আনা।"

একে একে সব লিখে দুটো লাইন টেনে যোগ করেন মহীতোষবাবু। তারপর খানিকটা কথা কাটাকাটির পর গরমিল লেখেন, এক টাকা দু পয়সা।

শুধু এক টাকা দু পয়সা নয়, সবই যেন কেমন গরমিল হয়ে যাচ্ছে। মাইনে বেড়েছে ধাপে ধাপে, মাছের সেরও আট আনা থেকে ধাপে ধাপে তিন টাকায় এসে পৌঁছেছে। ঠিক যতখানি বাঁচাতে চান তিনি, জমছে না তা। আর যা জমছে তা...

মনে মনে একটা হিসেব করে নেন মহীতোষবাবু। ইন্সিওর চার হাজার, ব্যাঙ্কে সাত হাজার, প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটি নিয়ে এগার হাজার। মোট বাইশ হাজার থেকে পাঁচ হাজার গিয়েছে ছোট মেয়ের বিয়েতে। সেবার অসুখে চার মাস ভুগেছেন, তা কোন না এক হাজার দেড় হাজার। দু মাস ত আধা মাইনে ছিল। তারপর জামাইকে তত্ত্ব, পুজোর বাজার, ইত্যাদির বাড়তি খরচও আছে।

ছেলেটার চাকরি-বাকরি একটা হলে হয়, জিনিসপত্তরের দাম যা চড়চড় করে বাড়ছে। চাল, কাপড়, ওষুধ, এমন কি বাড়িভাড়াও।

এরই ফাঁকে একটা দুর্ভিক্ষ চলে গেল। সে কি সাংঘাতিক দৃশ্য। ভাবলেও শিউরে ওঠেন মহীতোষবাবু।

'ফ্যান দাও মা,' 'ফ্যান দাও মা'—নাকী কান্নায় রাত একটা পর্যন্ত ঘুমোতে পেতেন না, বিরক্ত হতেন লোকগুলোর উপর। সকালে অফিস যাবার সময় ফুটপাতে সারি সারি মড়া পড়ে থাকতে দেখেও এতটুকু দুঃখ হত না। শুধু ভবিষ্যতের ভয়ে আঁতকে উঠতেন।

ভাবতেন, হাজার পনর টাকা ত হাতে পাব চাকরি ছাড়ার সময়। তাতে আর কটা দিন চলবে।

যাক্, চালের দামটা বেড়ে আর দুর্ভিক্ষ হয়ে একটা কাজ হল। র‍্যাশনিং হল। র‍্যাশনিংয়ে একশ পঁচিশ টাকার চাকরি হল মন্টুর।

স্ত্রী ধরে বসলেন, "এবার বিয়ে দাও ছেলের।"

তা দিতেই হয়। বিয়ের বয়স পার হতে চলল ছেলে। সুতরাং...

মেয়েটেয়ে দেখে বিয়ে দিয়ে দিলেন শেষ পর্যন্ত।

বাপের অবস্থা দেখে বুদ্ধিসুদ্ধি হয়েছে ছেলেটার। তিন-চার বছরের মধ্যে ছেলে-পিলে হল না।

ছেলে হল চার বছর বাদে। আর সেই-বারেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে আসতে হল মহীতোষবাবুকে। সব মিলিয়ে দেখলেন, হাজার কুড়ি-বাইশ।

কিন্তু রোজগার শুধু মন্টুর—মন্টু নয়, এখন প্রিয়নাথ বলেন—একশো পঁচিশ। ঐ মাগগী ভাতাটাতা নিয়ে। কিন্তু খরচ কমিয়ে কমিয়েও আড়াইশ'র নীচে নামে না।

নাতিটা নাদুসনুদুস হয়েছে বটে, কিন্তু দুধ কি কম খায়? আর মেয়েরা মাঝে মাঝে আসে যায়, তাদের খরচ আছে।

যাক, ভগবান করুন, বেশীদিন না বাঁচতে হয়। কিন্তু সেই যে ছোটবেলায় ঠাকুমা বলেছিল, মাথায় যত চুল তত বছর পরমায়ু হোক, তাই যেন হতে চলেছে।

পাঁচটা বছর যেতে না যেতে বাইশ হাজারের অঙ্ক পনর হাজারে নেমে এল। নামছে না শুধু জিনিসের দাম। সব কিছুরই দাম বাড়ছে চড় চড় করে, দাম কমছে শুধু মানুষের।

"কইগো!" ডাকলেন মহীতোষবাবু।

"ডাকছ?" স্ত্রী এসে দাঁড়াল।

"হিসেবটা দাও। মাছ কত?"

"মাছ? মাছ কি রোজ আসে নাকি এখন?

"ও! কয়লা এসেছে আজ?"

"হ্যাঁ, আধ মণ।"

"আধ মণ। এত কমে হচ্ছে এখন কী করে? আগে যে বলতে......"

"আরও কমে হবে। তখন আর রান্নাই হবে না।"

হ্যাঁ সবই কিছু কিছু খরচ কমান হচ্ছে। কমান হচ্ছে না, কমে যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জমান টাকাও কমে যাচ্ছে মাসে মাসে।

"প্রিয়নাথ?" এবার ছেলেকেই ডাকলেন মহীতোষবাবু।

রাস্তায় গিয়ে বসলেও পার খড়ি পেতে

"ডাকছেন?" প্রিয়নাথ এসে দাঁড়ায়।

মহীতোষবাবু উসখুস করে বলেন, "মাইনে টাইনে না বাড়লে ত......"

"মাইনে বাড়বে?" হাসে প্রিয়নাথ। "শুনছি র‍্যাশনিং উঠে যাবে।"

উঠে যায়ও। তবে অন্য একটা চাকরি পায় প্রিয়নাথ। তারপর সেটাও যায়, আরেকটা।

মহীতোষবাবু বুঝতে পারেন, হিসেবটা কোথায় যেন গরমিল হয়ে যাচ্ছে। হুঁ, পনর হাজারটা নেমে এসেছে দশ হাজারে। তার-পর দশ হাজার থেকে পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার থেকে ফুরুৎ।

নামতে নামতে হঠাৎ একদিন মহীতোষ-বাবু আবিষ্কার কর[illegible], [illegible] হয়েছেন। জমান টাকা একটাও নেই। ছেলের মাইনে দেড়শ হয়েছে, কিন্তু নাতিটার ইস্কুলের মাইনে যা, প্রিয়নাথের বেলায় কলেজে অত দিতে হয়নি। অসুখ হলেই আজকাল ছ' টাকার ওষুধ লাগে।

মাঝরাত পর্যন্ত জেগে বসে থাকেন। বলেন, "কী হবে বল ত!"

স্ত্রী রেগে যায়। "কেন, তুমি ত হিসেবী মানুষ, ভবিষ্যৎ ভাবতে দিনরাত।"

"হুঁ, তা ত ভেবেছি। কিন্তু আমার হিসেবটা যে মিলল না গো। টাকায় যখন পনর সের চাল, তখন না খেয়ে টাকা জমিয়েছি। সুদে বেড়ে যা হাতে পেলাম, তাতে দু সের চাল হয় না।"

স্ত্রী রেগে যায়। "তখন পই পই করে বলিনি, এখন খেয়ে বাঁচি, শেষ জীবনে নয় ভিক্ষে করব।"

মহীতোষবাবু হেসে বলেন, "ভিক্ষে ত করতেই হবে।"

"তা হবে, কিন্তু তখন খেলে ভাবতুম, একদিন পেট ভরে খেয়েছি। পেট ভরে খেতেও পেলাম না, ভিক্ষেও করতে হল।"

মহীতোষবাবু চুপ করে বসে থাকেন। কী যেন ভাবেন।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, "কেন এমন হল বল ত?"

স্ত্রী কর্কশ গলায় বলে, "কেন আবার, কপাল।"

"কপাল? তাই হবে হয়ত।"

পরের দিনই খুঁজে খুঁজে পুরনো তোরং থেকে কোষ্ঠীটা বের করলেন মহীতোষবাবু। যখন ধাপে ধাপে উন্নতি হয়েছিল, তখন একবার কোষ্ঠী নিয়ে বসেছিলেন। ধাপে ধাপে একেবারে নীচের তলায় নেমে এসে আবার কোষ্ঠীটা খুলে বসলেন।

দিনরাত কেবল কোষ্ঠীটা মেলে ধরে দেখেন মহীতোষবাবু। আঁকজোক কষেন, পাঁজি দেখেন। আর মাঝে মাঝে বলেন, "শনির বক্রীটা কেটে গেলে হয়ত..."

কিংবা, বৃহস্পতি চতুর্থে এসে পড়লেই...

কখনো, মঙ্গল ব্যয়স্থ রয়েছে......

শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যায় মহীতোষবাবুর স্ত্রীর। বলেন, "কী কচ্ছ দিনরাত। নিজের কুষ্ঠীটা নিয়ে বসে না থেকে, রাস্তায় গিয়ে বসলেও তো পার খড়ি পেতে, দুটো পয়সা আসে।"

বোকার মত হাসেন মহীতোষবাবু। "বলছ?"

"হ্যাঁ বলছি, কেন শুনতে পাচ্ছ না, কানের মাথা খেয়েছ?"

হাসেন মহীতোষবাবু অপ্রতিভের মত। বলেন, "তা মন্দ নয়, দুটো পয়সা......"

* * *

"তা রাহু আপনার অষ্টম থেকে সরে গেলেই......"

পার্কটার পাশ দিয়ে ফিরে আসতে আসতে কথাটা শুনেই তন্ময়তা ভেঙে গেল।

কী ছাইভস্ম ভাবছিলাম এতক্ষণ।

কিন্তু......কই না, এ ত অন্য একজন গণৎকার।

ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। না, যেখানটায় মহীতোষবাবু একটু আগে বসে-ছিলেন, সেখানে নেই। শুধু ফুটপাতের উপর খড়ির দাগগুলো পড়ে আছে। পুঁথি-পত্রও নেই, মহীতোষবাবুও নেই।

হিসেবে বোধহয় আবার গরমিল হয়ে গিয়েছে মহীতোষবাবুর। হিসেবের খাতাটাই আছে মহীতোষবাবুদের হাতে, হিসেব লেখবার মালিক হলে কী হবে, হিসেব ঠিক করবার মালিক ত নন।

অজিত দত্ত

দেশনেত্রী-রূপে সরোজিনী নাইডুর কৃতিত্ব যত মহৎ এবং স্মরণীয় হক না কেন, তার দ্বারা তাঁর কবি-কৃতিত্ব মুহূর্তকালের জন্যও আচ্ছন্ন হওয়া উচিত নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর বিরাট রাজনৈতিক খ্যাতি আজ তাঁর কবি-খ্যাতিকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। আজ আমরা ভুলতে বসেছি যে, দেশ-হিতৈষণা যতই মহৎ কাজ হক, তার চেয়ে সার্থক কাব্যসৃষ্টির স্মৃতি আরও দীর্ঘতর কাল ধরে মানুষের মনে জাগরূক থাকে। উত্তরকাল সরোজিনী নাইডুকে কবি-রূপে মনে না রেখে পারবে না, এ-বিশ্বাস ত্যাগ করা যায় না। কোন একদিন, দেশের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের তীব্র আলোকে যদি অতীতের সম্মুখ-কর্মীদের যশ ঈষৎ ম্লানও হয়ে আসে, তখনও ইংরেজীভাষী কাব্য-পাঠক-সম্প্রদায়ে কবি সরোজিনী নাইডুর স্মৃতি বিলীন হবে না, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

সরোজিনী নাইডুর কবিকৃতিত্ব সাধারণ ভারতবাসী আজও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। তার কারণ, তাঁর কাব্য-প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ হতে না হতেই তিনি তাঁর অসমাপ্ত কাব্য-সাধনা ত্যাগ করে দেশোদ্ধারের কর্মময় ব্রতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আর, যেহেতু কাব্য- প্রতিভার যথার্থ মর্যাদা দিতে একটা জাতির দীর্ঘকাল চলে যায়, কিন্তু দেশনেতৃত্ব সহজেই জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি আকর্ষণ করে, সেহেতু আমরা আজ সরোজিনী নাইডুকে একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্‌ এবং দেশনেত্রী-রূপেই স্মরণ করি, তিনি যে ভারতের একজন উৎকৃষ্ট কবি, এ-কথা আমরা সহজে মনে করি না।

সরোজিনী নাইডুর কবিখ্যাতি এ-দেশে অপেক্ষাকৃত প্রচ্ছন্ন থাকার আরও একটি কারণ এই যে, মনে-প্রাণে, চিন্তায়-ঐতিহ্যে, স্বপ্নে ও সাধনায় তিনি পরিপূর্ণ ভারতীয় আদর্শে গঠিত হলেও, তাঁর কাব্যরচনার বাহন ছিল ইংরেজী। সরোজিনীর কাব্য-গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছিল বিদেশে—ভারতে তাঁর কবি-খ্যাতি বিলম্বিত হবার এও আর-একটি কারণ। অথচ সরোজিনী নাইডুর কবিতার ভাব-কল্পনা ও আদর্শ, সবই ভারতীয়—বিশেষত বাঙালীর অন্তরের সঙ্গে এমনই এক সুরে গাঁথা। যে-বাঙালী কোনদিন সরোজিনীর কবিতা পড়েনি, সেও

হঠাৎ পড়লে সরোজিনীর কবিপ্রাণের সঙ্গে একটি গভীর একাত্মতা বোধ না করে পারবে না।

সরোজিনীর কবিতার এই একান্ত ভারতীয় সুর, তাঁর কবিদৃষ্টি ও কল্পনার এই অকৃত্রিম ভারতীয়ত্বই পাশ্চাত্ত্য সমালোচকদের সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ ও চমকিত করেছিল। তাঁর কবিতার মধ্যে পাশ্চাত্ত্য পাঠকেরা ভারতীয় নারীর মন, আর তার সঙ্গে ভারতের আত্মার এমন এক অকল্পিত অদৃষ্টপূর্ব অপরূপ আলেখ্য উদ্ভাসিত দেখেছিলেন, যা অন্য কোন উপায়েই তাঁদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব ছিল না। কেবল ভারতীয় নারীহৃদয় এবং তার প্রেম ও বেদনাই নয়, রহস্যময় ভারতের মানুষ, তার পল্লী, তার চিন্তা, তার ধর্মচেতনা ও তার সামাজিকতা সবই ইংরেজ উপলব্ধি করতে পেরেছিল সরোজিনীর কাব্যে। ভারতের আত্মার অন্তরঙ্গ ছবি ইংরেজের কাছে সম্পূর্ণ অভিনব ও মোহময় রূপে প্রতিভাত হল সরোজিনী নাইডুর কবিতায়, যা অন্য কোনও উপায়েই ইংরেজ-মনে সহজে বোধগম্য হত না।

এইজন্যই তাঁর প্রথম কাব্য-গ্রন্থ The Golden Threshold-এর ভূমিকায় আর্থার সাইমন্ড্‌স্‌ লিখেছিলেন,—“They (Sarojini's songs) hint, in a sort of delicately evasive way, at a rare temperament, the temperament of a woman of the East, finding expression through a Western language and under partly Western influences. They do not express the whole of that temperament, but they express, I think, its essence; and there is an Eastern magic in them.” এ-কথা বলা হয়েছিল সরোজিনীর প্রথম কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায়। পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে সরোজিনীর রচনা আরও পরিণত হয়েছিল এবং ভারতের চিত্তকে আরও ব্যাপক ও

স্পষ্টরূপে উদ্ঘাটিত করেছিল। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ The Bird of Time-এর ভূমিকায় এড্‌মণ্ড্‌ গস বলেছেন,—

"She springs from the very soil of India; her spirit, although it employs the English language as its vehicle, has no other tie with the West. It addresses itself to the exposition of emotions which are tropical and primitive, and in this respect, as I believe, if the poems of Sarojini Naidu be carefully and delicately studied, they will be found as luminous in lighting up the dark places of the East as any contribution of savant or historian. They have the astonishing advantange of approaching the task of interpretation from inside the magic circle although armed with a technical skill that has been cultivated with devotion outside of it."

ভারতীয় পাঠকের কাছে সরোজিনীর কবিতা একটি স্বপ্নময় ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে, যা অন্তরকে অভিভূত ও মুগ্ধ করে, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য পাঠকের কাছে তা কাব্যরসের আস্বাদ আনবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় মনের রহস্যও উদ্ঘাটন করে দেয়।

সরোজিনীর কাব্যের বাহন ছিল ইংরেজী ভাষা। কিন্তু এ-ভাষা তাঁর কাছে বিন্দুমাত্র বিজাতীয় ছিল না। যে "technical skill"এর কথা গস্‌ বলেছেন, শৈশব থেকেই তা ছিল সরোজিনীর সহজায়ত্ত। অন্য অনেক ভারতীয় কবি, যাঁরা ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখে কবিযশঃপ্রার্থী হয়েছিলেন, তাঁদের তুলনায় সরোজিনীর এই সুবিধা ছিল যে, তাঁকে তাঁর চিন্তা ও কল্পনাকে ভারতীয় মাতৃভাষা থেকে ইংরেজীতে রূপান্তরিত করতে হয়নি। অবশ্য এ-বিষয়ে তরু দত্ত, অরু দত্ত ও রবি দত্ত কিছুটা ব্যতিক্রম, ইংরেজী-ভাষাকে তাঁরাও মাতৃভাষার মতই আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু তরু দত্ত ও অরু দত্ত তাঁদের স্বল্পায়ু জীবনে বেশীদিন কাব্যচর্চা করবার সুযোগ পাননি বলেই হক বা যে-কারণেই হক, সরোজিনীর কবিকৃতিত্ব যে তাঁদের সাফল্যকেও অতিক্রম করেছিল এ-কথা পাশ্চাত্ত্য সমালোচকমাত্রই স্বীকার করেছেন। ইংরেজী ভাষার উপর সরোজিনীর এই আশ্চর্য দখলের মূলে অনুসন্ধান করতে গেলে, তাঁর জীবনীর আংশিক উল্লেখ প্রয়োজন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে হায়দরাবাদে সরোজিনীর জন্ম হয়। তাঁর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আদি-নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার ব্রাহ্মণপুর গ্রামে। সরোজিনীর পিতা ছিলেন রাসায়নিক, অধ্যাপক। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি এস্‌সি উপাধি লাভ করে তিনি হায়দরাবাদ রাজ্যে রসায়ন অধ্যাপনার কর্মগ্রহণ করেন এবং হায়দরাবাদেই স্থায়ীভাবে বাস করেন। রসায়নশাস্ত্রে অঘোরনাথের ছিল একাগ্র অনুরাগ এবং মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক। ইনি মনে-প্রাণে পাশ্চাত্ত্য আদর্শ ও ভাবধারাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি, ইংরেজী ভাষাকেও তিনি তাঁর ও তাঁর পরিবারের একমাত্র ভাষারূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী বরদাসুন্দরী দেবী বাঙালীর মেয়ে। সর্বদা স্বামীর সঙ্গে ইংরেজীতে বাক্যালাপ করা হয়ত তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না কিন্তু তিনি সাধারণ বাঙালী হিন্দু ঘরের সাধ্বী স্ত্রী যেরূপ হয়ে থাকে তেমনভাবেই স্বামীর সহায় ছিলেন। অঘোরনাথ যখন পাশ্চাত্ত্য আদর্শ ও চালচলন পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করতে কৃতসংকল্প হন, তখন তিনি তাঁকে কোনরূপ বাধা দেননি। বরদাসুন্দরীও কবিতা লিখতেন—অবশ্য বাংলায়—এবং কবিখ্যাতিও তিনি বেশ কিছু অর্জন করেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, সরোজিনী ও তাঁর ভাই হরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁদের কবিত্বশক্তি পেয়েছিলেন মার কাছ থেকে। কিন্তু সরোজিনী নাইডু মনে করতেন যে, এ-শক্তি তাঁরা লাভ করেছেন, পিতামাতা উভয়ের থেকেই। এ-বিষয়ে সরোজিনী স্বয়ং যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে শুধু তাঁর পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসাই প্রকাশ পায় না, পিতা ও মাতা উভয়ের প্রভাবে তাঁর মধ্যে তীক্ষ্ণ মনীষা, কোমল ভাবপ্রবণতা ও গভীর সৌন্দর্যচেতনার যে সমন্বয় ঘটেছিল, তারও ব্যাখ্যা মেলে। সরোজিনী তাঁর বৈজ্ঞানিক পিতার রসায়নানুরাগ ও নিজের কবিতার কথা বলতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন:

"But this alchemy is, you know, only the material counterpart of poets craving for Beauty, the eternal Beauty. 'The makers of gold' and 'the makers of verse', they are the twin creators that sway the world's secret desire for mystery; and what in my father is the genius of curiosity—the very essence of all scientific genius—in me is the desire for Beauty."

অঘোরনাথ বাড়িতে একমাত্র স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়া অপর কারও সঙ্গে বাংলায় বড় একটা বাক্যালাপ করতেন না। মনে প্রাণে, চালে চলনে, আদর্শে অনুরাগে ইনি ইংরেজ ছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। পরিবারের সকলে—ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত সর্বদা ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করলেই তিনি খুশী হতেন। অল্পবয়স থেকেই শিশুদের সর্বদা ইংরেজী বলতে শিক্ষা দেওয়া হত। সরোজিনী লিখেছেন যে, তাঁর বাবার কাছ থেকে তিনি জীবনে একবারই মাত্র শাস্তি পেয়েছেন। যখন তাঁর ন'বছর মাত্র বয়স তখন ইংরেজী বলতে শিখতে না চাওয়ার শাস্তি হিসেবে তিনি সারাদিন সরোজিনীকে একা এক ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলেন। এই শাস্তির পর থেকে সরোজিনী আর কোনদিন ইংরেজী ভাষা শিক্ষায় কোন আপত্তি করেননি।

এইভাবে সরোজিনীর যে ভাষা-শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল, তা তাঁর আরও দৃঢ়রূপে আয়ত্ত হয়েছিল কৈশোর ও যৌবনে। মাত্র বার বৎসর বয়সে সরোজিনী মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে তাঁর বাবা তাঁকে মস্ত বড় গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিকরূপে গড়ে তোলবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। পড়ার চাপটা বোধহয় একটু বেশীই পড়েছিল। একদিন একটি বীজগণিতের অঙ্ক নিয়ে বসে সরোজিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছিলেন। সরোজিনী লিখছেন,

"It would not come right; but instead a whole poem came to me suddenly. I wrote it down."

এই থেকেই সরোজিনীর কবিজীবনের সূত্রপাত।

এই সময়ে সরোজিনী গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তার তাঁর পড়াশুনো সব বন্ধ করে দেন, আর খেয়ালী সরোজিনী ডাক্তারকে জব্দ করবার জন্য প্রাণভরে কবিতা

বিখ্যাত "শঙ্খ ও পদ্ম" মার্কা গেঞ্জী ব্যবহার করুন।

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী

কলিকাতা—৭

রিটেল ডিপো:

হোসিয়ারী হাউস

৫৫।১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪—২৯৯৫

ধবল

এক্‌জিমা, বাতরক্ত, ছুলি, মেচেতা ব্রণাদির দাগ ও বিবিধ চর্মরোগ মুক্তির বিশ্বস্ত চিকিৎসা-কেন্দ্র। হতাশ রোগী পরীক্ষা করুন। (সময় ৪—৮)। ২০ বৎসরের অভিজ্ঞ চর্মরোগ চিকিৎসক- পণ্ডিত এস, শর্মা, ২৬।৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯।

গল্প উপন্যাস প্রভৃতি লিখতে আর নানারকম বাইরের বই পড়তে শুরু করেন। এ-সময়ে তিনি ছ'দিনে ১৩০০ পংক্তির একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন। ১৩ বছর বয়সেই তিনি দু' হাজার পংক্তির একটি নাটক লিখেছিলেন এবং ১৪ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে একটি পুরো উপন্যাস ও বহু গদ্যরচনা লিখে ফেলেছিলেন।

কবিতা-গল্প লেখার শিক্ষানবিশি এই-ভাবে শুরু হল। কিন্তু তখনও ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে প্রকৃত শিক্ষা ও চর্চা বাকী ছিল। সে-শিক্ষা শুরু হল সরোজিনীর ষোল বছর বয়সে। ১৮৯৫ সনে অঘোরনাথ তাঁকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত পাঠিয়ে দেন। তিন বৎসর তিনি সেখানে ছিলেন। সরোজিনী প্রথমে লণ্ডনের কিংস কলেজ ও পরে কেম্ব্রিজের গার্টন কলেজে শিক্ষালাভ করেন। এ-সময়ে তিনি বহু ইংরেজ সাহিত্যিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন—গস্, সাইমণ্ড্স্ প্রভৃতি তাঁদের অন্যতম। এ'দের স্নেহময় নির্দেশ সরোজিনীর কবিতার উৎকর্ষসাধনে বিশেষ সহায় হয়েছিল, এ-কথা সরোজিনী নিজেই স্বীকার করেছেন।

এ-সময়ে সরোজিনী যে-সব কবিতা লেখেন, সেগুলি তিনি গস্ ও আর্থার সাইমণ্ড্স্কে দেখালেও, শিক্ষানবিশের প্রচেষ্টা হিসেবেই দেখিয়েছিলেন, এ-সব কবিতা যে প্রকৃতই পুস্তকাকারে ছাপার যোগ্য, অথবা কাব্য হিসেবে এগুলি বিশেষ-ভাবে আদৃত হতে পারে, এ-কথা তিনি নিজে কখনও মনে করেননি। সরোজিনীর মধ্যে তাঁর নিজের কবিতা সম্বন্ধে কোন অহমিকা ত ছিলই না, বরং এমন একটি সুন্দর বিনীত ভাব ছিল যা খাঁটি কবিরই লক্ষণ। প্রত্যেক প্রকৃত কবিরই মনে নিজের রচনা সম্বন্ধে একটি অতৃপ্তি থেকে যায়। মনে হয় যে-কথাটি যেমন করে বলতে চাই, বুঝি তেমন করে সে-কথাটি বলা হল না। সরোজিনীর মনেও এই অক্ষমতার, অপূর্ণতার একটি ক্ষোভ ছিল এবং তাঁর চিঠিপত্রে এই ক্ষোভ অতি মর্মস্পর্শীরূপে ব্যক্ত হয়েছে। আর্থার সাইমণ্ড্স্ যখন সরোজিনীর কবিতার উচ্চপ্রশংসা করে সরোজিনীকে এগুলি গ্রন্থাকারে ছাপাবার অনুরোধ জানান, তখন সরোজিনী একটি চিঠিতে তাঁকে লিখেছিলেন—"আপনার চিঠি পেয়ে মনে গর্ব, আর তার সঙ্গে বিষাদ অনুভব করলাম। সত্যই কি এ সম্ভব যে, আমি এমন কবিতা লিখেছি যা সৌন্দর্যে ভরপুর! আর এ-ও কি সম্ভব যে, সত্যই আপনি এগুলিকে জগতের সামনে প্রকাশ করার যোগ্য বলে মনে করেন? আপনি জানেন, আমার আর্টএর আদর্শ কত উঁচু; যে চরম চিরস্থায়ী সৌন্দর্যসৃষ্টি আমার আকাঙ্ক্ষা, আমার সামান্য কবিতাগুলি সে-সৌন্দর্যে অনেক হীন বলেই আমার মনে হয়।" আর একখানি চিঠিতে সরোজিনী লেখেন, "আমি সত্যই কবি নই। কবির দৃষ্টি ও কবি হবার আকাঙ্ক্ষা আমার আছে বটে, কিন্তু সেই কণ্ঠ আমার নেই। আমি যদি সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ, মহত্ত্বের ব্যঞ্জনাময় শুধু একটি কবিতা লিখতে পারতাম, তাহলেই আমি চিরকালের মত গর্বিত হতাম।" সেই একটি কবিতা লিখবার আকাঙ্ক্ষা সকল কবিমনের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা—কবির কাছে যে-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা চিরদিনই দুরায়ত্ত থেকে যায়। সরোজিনী বলেছেন, "আমি শুধু পাখিদের মত গান করি, সে-গানগুলি ক্ষণিকের।" এ-কথার উপর মন্তব্য করে আর্থার সাইমণ্ডস্ লিখেছেন যে, পাখির গানের মত স্বতঃ-উৎসারিত বলেই তাদের মূল্য এত বেশী। বাস্তবিকই সরোজিনীর কবিতার মধ্যে কোন কষ্ট-কল্পনা নেই, নেই দুরূহ চিন্তার জটিলতা। প্রেরণাই তাঁর কাব্যের প্রাণ, এবং সে-প্রেরণা মনীষার দীপ্ত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত।

ভেবে দেখতে গেলে সার্থক কবিতার মাপকাঠি কী? সে কি কোন দুরূহ চিন্তার সমাবেশ? সে কি সমস্যাসংকুল জীবনের ব্যর্থতার বিশ্লেষণ অথবা যুক্তি দ্বারা জীবনের অর্থোদ্ধারের চেষ্টা? নাকি স্বতঃ-উৎসারিত হৃদয়াবেগের প্রকাশকেই আমরা কবিতা বলব? এ-বিষয়ে অধ্যাপক ডালওয়ে টার্নবুল বলেছেন,

"In spite of all that critics and psychologists have written, we do not really know very much about the mystery of poetic creation, but this much will be generally admitted that the true lyric poet to a certain extent sings as the birds sing. The songs in the plays of Shakespeare have this fresh, natural, birdlike quality, and even if the poet elaborates his first careless rapture, the true lyric always has something of this quality of song. It was this quality of which Keats was thinking when he said that poetry should come like the leaves on the trees, or not come at all." সরোজিনীর কবিকণ্ঠ পাখির গানের মত মধুর ও স্বতঃ-উৎসারিত বলেই বোধহয় পাশ্চাত্য সমালোচকেরা সরোজিনীকে "Nightingale of India" আখ্যা দিয়েছিলেন।

সরোজিনীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ The Golden Threshold প্রকাশিত হয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। এর ভূমিকা লেখেন প্রসিদ্ধ ইংরেজ সমালোচক আর্থার সাইমণ্ডস্। দ্বিতীয় গ্রন্থ The Bird of Time এডমণ্ড গস্-এর ভূমিকাসম্বলিত হয়ে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করে। তৃতীয় গ্রন্থ The Broken Wing প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সনে। ভারতে ও বিদেশে সরোজিনী নাইডুর নির্বাচিত কবিতার কয়েকটি সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে।

উপল-বন্ধুর

আলোকচিত্রী শ্রীঅজয় মিত্র
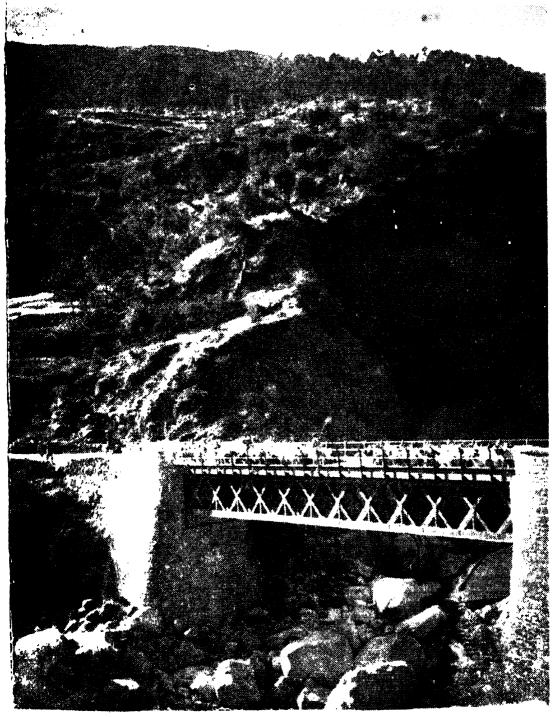
বিষয় অনুযায়ী সরোজিনী তাঁর প্রত্যেক গ্রন্থের কবিতাগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে সন্নিবেশিত করেছেন, তবু মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে তাঁর কবিতাগুলিকে প্রধানত দু ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগ হৃদয়াবেগ ও প্রেমের কবিতা আর এক ভাগকে সাধারণভাবে আখ্যা দেওয়া যায়—ভারতের প্রকৃতি ও জনমনের আলেখ্য।

আমরা, যারা ভারতীয় পাঠক, আমাদের কাছেও সরোজিনীর প্রেমের কবিতার একটি বিশেষ স্বাদ আছে। এই কবিতাগুলির মধ্যে এমন একটি কোমল মাধুর্য, একটি tenderness-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যা বাঙালী নারীর স্নিগ্ধ প্রেমাবেশকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই কবিতাগুলির পরিবেশ ভারতীয়, এর পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিও আমাদেরই অন্তরঙ্গ, তবু তাদের প্রকাশ-ভঙ্গিতে, শব্দবিন্যাসে, ছন্দ-ঝঙ্কারে ইংরেজী কবিতার শ্রেষ্ঠাংশের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। যে-নারীর মন বাঙালী বা ভারতীয় ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট হয়েছে, আবার ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠাংশকেও হৃদয়ংগম করেছে, তার পক্ষেই কাব্যে এ-জাতীয় সমন্বয় ঘটান সম্ভব। সরোজিনীর কবিতার ভাষার মাধুর্য ও কোমল বিষাদ অনুবাদে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তবু কৌতূহলী পাঠকের জন্য তাঁর দু-একটি কবিতার অনুবাদ দিতে চেষ্টা করছি।

খেয়াল (Caprice)

দু' আঙুলে তুমি তুলে নিয়েছিলে
বনের কুসুমটিরে,
অলস-বিলাসে রেখেছিলে তারে
উদাস ঠোঁটের পর,
কী খেয়ালে তার পাপড়িগুলিরে
ফেলেছিলে ছিঁড়ে ছিঁড়ে,
সে মোর হৃদয়, সে যে মম অন্তর!

দু' আঙুলে তুমি তুলে নিয়েছিলে
মদের পাত্রখানি,
হেলায়-ফেলায় কী খেয়ালে তারে
ছোঁয়ালে ওষ্ঠাধর,
নিঃশেষে পান করে সে-পাত্র
ফেলে দিলে কোথা জানি,
সে মোর আত্মা, সে যে মম অন্তর!
(The Broken Wing)

পুরস্কার (Guerdon)

প্রান্তরে ও বনে প্রভু, এনো ফাগুন মাস,
বাজপাখি আর বকের ডানায় উড়ন্ত উল্লাস,
চিতায় দিয়ো গতির লীলা, ঘুঘুকে রঙ, আর
আমায় প্রভু দিয়ো প্রেমের আনন্দ-সম্ভার।

ডুবুরিকে দিয়ো প্রভু ঊর্মি-সেঁচা মণি,
বরের চোখের কল্পনাতে বধূর আননখানি,
স্বপ্নাতুরের চক্ষে এঁকো যৌবনেরে, আর
আমায় দিয়ো সত্য পাওয়ার হর্ষ-উপহার।

ধার্মিকেরে দিয়ো প্রভু বিশ্বাসের গীতা,
রাজা এবং সৈনিকেরে কর্মে যশস্বিতা,
পরাস্তকে শান্তি দিয়ো, শক্তিমানে আশা,
কণ্ঠে আমার হর্ষে ভরা দিয়ো গানের ভাষা।
(The Bird of Time)

পথিক-গায়েন (The Wandering Singers)

বাতাসের স্বর যেখানে মোদের
পথিক পায়েরে ডাকে
প্রতিধ্বনিতে মুখর বনে বা
শহরের রাস্তায়,
হাতে বাঁশি আর কণ্ঠেতে গান
নিয়ে অনুসরি তাকে,
সকল মানুষ বন্ধু মোদের,
ঘর সারা দুনিয়ায়।

যত নগরীর গৌরব গেছে
মুছে তাহাদের গান,
যত রমণীর হাস্য-লাস্য
মরে গেছে তার স্মৃতি,
কত যুদ্ধের খড়্গ, রাজার
মুকুটের অভিমান,
সুখে-দুখে মেশা সে-সব সহজ
কথাই মোদের গীতি।

কী আশার কথা কোন স্বপ্ন বা
আমরা বুনেবো তবু,
বাতাস যেখানে ডাকে আমাদের
সেখানেই যেতে হবে,
কোনো প্রেম কোনো আনন্দ পিছু
টানে না মোদের কভু,
মোদের ভাগ্য ধ্বনিত কেবল
বাতাসের হাহারবে।
(The Golden Threshold)

সরোজিনীর কবিতার সম্যক্ পরিচয়ের জন্য আরও কয়েকটি কবিতার উদ্ধৃতি ও অনুবাদ প্রয়োজন ছিল। ভবিষ্যতে এই সার্থক অথচ বাঙালীর কাছে অজ্ঞাত কবির আরও কিছুসংখ্যক কবিতার পরিচয় দেওয়ার ইচ্ছা থাকল।

সরোজিনী ভাবপ্রবণ কবি ও কুশলী শিল্পী হয়েও জাগতিক ও নৈতিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। স্বদেশের জনগণ এবং তাদের আদর্শ, ধর্ম, রীতি-নীতি, দুঃখ-বেদনা সম্বন্ধে তাঁর মনে এমন একটি গভীর ও বিস্তীর্ণ সহানুভূতি ছিল যে, তিনি সহজেই তাঁর কবিতার মধ্যে সে-সব জিনিস অপরূপ মর্মস্পর্শিতায় ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। ভারতের সমাজ ও পল্লীজীবনের ছোট ছোট ছবি, ভারতের আচার-ব্যবহারের ছোট ছোট চিত্র, ভারতের জনগণের কথা, ভারতের বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সবই তাঁর কবিতার অদ্ভুত স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে বলেই ইংরেজ সরোজিনীর কবিতার মধ্য দিয়ে ভারত ও তার হৃদয়কে যতখানি দেখতে ও বুঝতে পেরেছিল, এমন করে আর কোন উপায়েই বুঝতে পারা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

একদিকে যেমন তাঁর হৃদয়াবেগ ও সহজ সৌন্দর্যচেতনার সংগে ভারতীয় পরিবেশের সমন্বয় ঘটিয়ে সরোজিনী লিখেছিলেন, Caprice, Ecstacy, Guerdon, Song of Springtime, The flowering year প্রভৃতি কবিতাগুলি, অপরদিকে তেমনি ভারতের বিশিষ্ট ঐতিহ্য, ধর্ম, রীতি-নীতি ও বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর Hymn to Indra, Song of Radha, Vasant Panchami, Damayanti and Nala, Suttee, The Call to Evening Prayer, The Imam Bara প্রভৃতি কবিতায়। আবার আর এক শ্রেণীর কবিতায় এদেশের প্রকৃতি ও তার সাধারণ জনগণের বিচিত্র কর্ম ও রীতি-নীতি অপরূপ সৌন্দর্যে ফুটে উঠেছিল। এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে একদিকে June Sunset, Nightfall in the City of Hyderabad প্রভৃতি এবং অপরদিকে Indian Dances, Indian Weavers এবং Bangle Sellers প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত এবং প্রধানত কবি হয়েও সরোজিনী নাইডু স্বদেশোদ্ধার ব্রতে যে গভীর প্রেরণা সঞ্চার করতে পেরেছিলেন, তার কারণ dreamer হিসেবে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। কেবল প্রেম ও সৌন্দর্যের স্বপ্নই নয়, উন্নত ভারতের স্বপ্নও তাঁর অন্তরকে আলোড়িত করেছিল। তাঁর বিস্তীর্ণ সহানুভূতিপ্রবণ মন ও গভীর মানবতাবোধ শুধু তাঁর কাব্য-প্রেরণা জুগিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, দেশের দুর্গত জনগণের সেবারও প্রেরণা দিয়েছিল। তাই যখন সরোজিনীকে দেশনেত্রী-রূপে স্মরণ করি, তখন সংগে সংগে এ-কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি।

শুভেচ্ছা

আমার ছোট্ট ও তরুণ বন্ধুরা,

এবার শরতে, আকাশের মুখে ফোটেনিকো যেন হাসি!
কান্নার জলে ভাসাতে ধরণী মেঘেরা জুটেছে আসি!
কেন এ কান্না জানো জানো ভাই? মাঠে যে হাসেনি ধান।
সোনার ফসল ফলাবে মেঘেরা তাই এই অভিমান!
অনেকেরই ঘরে অভাবের মেঘ মেলেছে দুঃখ ছায়া!
তাই যেন দেখি তাদেরই দুঃখে কাঁদে দেবী মহামায়া!
নিজে কেঁদে তিনি ফোটাবেন জানি সকলের মুখে হাসি
এই ভরসায় এসো সবে ভাই বাজাই শঙ্খ বাঁশি।
বাইরে থাকুক দুঃখ-অভাব, অন্তরে থাক আশা
প্রত্যেকে মোরা অন্যেরে দিই এসো আজ ভালবাসা।
ছোট এ কামনা সব বুক জুড়ে জাগুক আজিকে ভাই
এবার পুজোয় প্রীতি দিয়ে সবে, এইটুকু আমি চাই।

—তোমাদের

মহালয়া—১৩৬৪ মৌমাছি

লিখেছেন

শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীযামিনীকান্ত সোম, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীরাধারানী দেবী, শ্রীঅখিল নিয়োগী, শ্রীলীলা মজুমদার, শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীআশা দেবী, শ্রীবীণা দে, শ্রীবিমল ঘোষ, শ্রীইন্দিরা দেবী, বন্দে আলী মিয়া, শ্রীমণীন্দ্র দত্ত, শ্রীমনোজিৎ বসু, বুদ্ধ-ভূতুম, শ্রীসমর দে, শ্রীনির্মাল্য বসু, শ্রীশান্তশীল দাস; শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ, শ্রীনবগোপাল সিংহ; শ্রীসুধাংশু কর, শ্রীশৈলেন ঘোষ, আশরাফ সিদ্দিকী, শ্রীনন্দদুলাল সরকার; জাদুকর এ সি সরকার, শ্রীরেবন্ত ঘোষ ও মৌমাছি।

ছবি এঁকেছেন

শ্রীসমর দে, শ্রীঅহিভূষণ মালিক, শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ, শ্রীঅরুণ দাস, শ্রীবিমল দাস, শ্রীচন্দ্রনাথ দে, শ্রীমঞ্জরী উকিল ও শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর দত্ত।

ফটো তুলেছেন

শ্রীরেবন্ত ঘোষ

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত ॥

শেঠ চমনলালের চিরটা দিন কেটেছে টাকা-পয়সা টুং-টাং করে। শেষ বয়সে শখ হলো একটা ফুল-বাগান করবার। করলও সে-বাগান সে বাড়ির দরজায়। বাগানের সেরা বাগানই হলো বটে। ক্রোশকে ক্রোশ জুড়ে প্রকাণ্ড বাগান। দুনিয়ার হেন ফুলগাছ নেই যা নেই সেই ফুল-বাগানে।

শেঠজীর ফুল-বাগিচার নাম সবাইকার মুখে মুখে। একটা দেখার মত জিনিস বলে রাজ্যের লোক সে-বাগান দেখে যায়। দেখে সকলেই খুশী হয়ে বলে, "পুণ্যবান লোক আপনি, শেঠজী। নইলে কে করতে পারে এমন নন্দন-কানন দোরের গোড়ায়।" শুনে চমনলালের মুখে হাসি ফুটে উঠে। হাসতে হাসতেই সে জবাব দেয়, "হেঃ হেঃ! স্বর্গের পারিজাত-ফুলের একটা বীজ পাই তো, দেখিয়ে দিতে পারি, এই হাতের গুণে সত্যিই নন্দন-কাননের উপর টেক্কা দেওয়া যায় কি না।"

বাড়িতে চাকরবাকরের অভাব নেই, কিন্তু ফুল-বাগানের মালী নেই একজনও। চমনলাল নিজেই ফুলগাছের চারা এনে বাগানে পোঁতে, নিজের হাতেই আগাছা সাফ করে, গাছের গোড়ায় সার দেয়, জল ঢালে।

একদিন চমনলাল বাগানের কাজ করছে, হঠাৎ একটা গরু খিড়কি-দরজা দিয়ে সেখানে ঢুকে পড়ল। আর দেখতে না দেখতে কতগুলো ফুলগাছ উপড়ে নিয়ে খেতে লাগল। দেখে চমনলাল রাগে আগুন হয়ে উঠল। বাগানের একপাশে একটা লোহার ডাণ্ডা ছিল। সেটা তুলে দুহাতে সে দমাদম গরুটাকে পিটতে লাগল। দু-চারটে ঘা তার কপালের মাঝখানে গিয়ে পড়ল। ফিনকি দিয়ে সেখান থেকে রক্ত ছুটল। গরুটা কাঁপতে কাঁপতে দড়াম করে মাটিতে শুয়ে পড়ে চোখ বুজল।

আশপাশের লোকজনেরা কাণ্ডটা দেখতে পেয়েছিল। 'আহা-আহা' করে ছুটে এসে তারা বলল, "শেঠজী, আপনার ফুল-বাগানে হলো গোহত্যা! এ যে মহাপাপের ব্যাপার!"

চমনলালের রাগ তখনো পড়েনি। সে মুখ খিঁচিয়ে জবাব দিল, "যাও যাও! মহাপাপের ব্যাপার হলো কিসে? যার যেমন কর্ম তার তেমনি ফল। গরুটা এসে চুরি করে খেয়ে ফেলল আমার এত সাধের ফুল-গাছগুলো, তাতে তার পাপ হয়নি? সেই পাপের সাজাই পেয়েছে সে। তার জন্য আমাকে যা করতে হয়েছে, তাতে আমার হাতই-বা কি ছিল? কে না জানে শাস্তরের কথা—মানুষের প্রত্যেক অঙ্গের কর্তা এক একজন দেবতা। হাত-দুখানার কর্তাও সেই রকম স্বর্গের রাজা ইন্দ্র। হাত তো যন্তর-মাত্র। যন্তরের মালিক হাত-দুখানা যেভাবে চালান, সেই ভাবেই কাজ করতে হয় মানুষকে। কর্তার ইচ্ছায়ই সে-কর্ম করা। তাতে দায় কি হাতের?"

আকাশপথে চমনলালের একথা ইন্দ্রদেব শুনতে পেলেন। তিনি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরে তক্ষুনি চমনলালের ফুল-বাগানের কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

চমনলাল বাগানেই ছিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাকে বললেন, "এ বাগানটি কার, মশাই?

আগুনের শিখা থেকে বেরিয়ে এলো দুই বিকট মূর্তি

মরি মরি, এমন সুন্দর ফুল-বাগিচা তো পৃথিবীতে আর দেখিনি।'

চমনলাল এগিয়ে এসে জানালো, বাগানের মালিক সে।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন, "মহাভাগ্যবান লোক আপনি। আর বিশ্বকর্মার মতই ওস্তাদ আপনার এ বাগানের মালী, যার হাতের গুণে বাগানখানির এমন বাহার হয়েছে।"

চমনলাল বলল, "মালীফালী আমার কেউ নেই, মশাই। আমিই বাগানের মালিক, আমিই এর মালী। আর হাতের গুণের কথা বলেন তো, সে হাত-দুখানা এই।" চমনলাল তার হাত-দুটি ব্রাহ্মণের চোখের সামনে ধরে বলল, "প্রত্যক্ষ প্রমাণ চান তার? আসুন তবে বাগানের ভেতরে। নিজের চোখেই দেখে যান আমার হাত-দুখানির গুণ।" চমনলাল ব্রাহ্মণকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে ফুল-গাছগুলো দেখাতে লাগল, আর বড়াই করতে লাগল, "এ আর বেশী দেখছেন কি? স্বর্গের নন্দন-কাননের গাছগুলোর বীজ পাই তো, এই হাতেই ভেলকী খেলিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি, কোন বাগানের জলুশ হয় বেশি।"

ঘুরতে ঘুরতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে নিয়ে চমনলাল মরা গরুটার কাছে এলো। ব্রাহ্মণ থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এ কি? এখানে একটা মরা গরু কেন?"

চমনলাল আমতা আমতা করে উত্তর করল, "জানোয়ারটা নিজের পাপের শাস্তি পেয়েছে। বাগানে ঢুকে চুরি করে কতগুলো ফুলগাছ খাচ্ছিল, স্বর্গের রাজা ইন্দ্রদেবের হুকুমে তাই তার পাপের ফল ভুগতে হয়েছে।"

"স্বর্গের রাজা ইন্দ্রদেবের হুকুমে পাপের ফল ভুগতে হয়েছে! বলেন কি আপনি? ইন্দ্রদেব এলেন কখন এখানে?"

চমনলাল বলল, "এ সব কাজে তিনি কি নিজে কখনো আসেন? তিনি হুকুম চালান, কাজ করে যন্তর—তিনি যার দেবতা, মানুষের সেই হাত-দুখানা। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম,—জানেন তো শাস্তরের কথা,—না করেই-বা উপায় কি?"

ব্রাহ্মণ বললেন, "ওঃ, বুঝেছি। এ গো-হত্যার হুকুম দিয়েছিলেন ইন্দ্র, আর যন্তরের মত হুকুম তামিল করেছে আপনার হাত।"

চমনলাল ঢোক গিলতে গিলতে বলল, "সে তো কর্তার ইচ্ছায়ই কর্ম করা। আমার নিজের ইচ্ছায় কি এ-হাত দিয়ে কিছু করার জো ছিল।"

"কিন্তু বাগানখানার বাহাদুরী নেবার বেলায় তো আপনার হাত-দুখানার কর্তা আপনিই, ইন্দ্রদেবের নামটি পর্যন্ত শোনা যায়নি। ভণ্ড, নিজের হাতে পাপ করে তার দায় চাপাতে চাও হাতের কর্তা বলে ইন্দ্রদেবের ঘাড়ে, আর গুণের বেলায় বলে বেড়াও তোমার নিজের হাতে ভেলকী খেলে! গোহত্যার মহাপাপ ঢাকতে চাও শাস্ত্রের নামে ছল-চাতুরীর ভণ্ডামী দিয়ে!"

ইন্দ্রদেব নিজেকে আর গোপন রাখতে পারলেন না, নিজের মূর্তিতেই প্রকাশ পেলেন। তাঁর হাতের বজ্রের মুখে ধক্ ধক্ করে আগুন জ্বলতে লাগল। সেই আগুনের শিখা হতে বের হয়ে এলো দুই বিকট মূর্তি—দুইটিই মহাপাপের, একটি গোবধের, আর একটি ভণ্ডামীর। দুজনেরই গা দিয়ে আগুনের হলকা ছুটছে।

সেই আগুনের ঝাঁঝে চমনলালের সর্বাঙ্গ পুড়ে যেতে লাগল। "পুড়ে মলুম—পুড়ে মলুম" বলে সে চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল।

দেবরাজ ইন্দ্র আকাশপথে এসেছিলেন, আকাশপথেই অন্তর্ধান করলেন।

বাংলার বীর প্রতাপাদিত্য

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

প্রতাপাদিত্য ছিলেন যশোরের রাজা। এ-কথা সকলেই জানো। তবু কিছু বলি। এ বহুকাল আগেকার কথা। এ যশোর কোথায় ছিল? খুলনা, সাতক্ষীরা, ২৪ পরগণা, পূর্ববঙ্গের কতক অংশ নিয়ে ছিল এক মস্ত বড় রাজ্য।

প্রতাপাদিত্য কি রকমের রাজা ছিলেন, সে-কথা বলছি। প্রথমেই বলি যে, তখনকার কালে বাঙালী রাজারা, যেমন—ঈশা খাঁ, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন। তাঁরা মোগলের কোনরকম বশ্যতা স্বীকার করতেন না। স্বাধীনতা মানে—কারো অধীনতা স্বীকার করবো না, কাউকে কর বা রাজস্ব দেব না, নিজে সর্বেসর্বা হবো, নিজের রাজ্য নিজেই চালাবো—কারো কর্তৃত্ব মানবো না। এই কারণে, মোগল বাদশাহের সঙ্গে এঁদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ক্রমাগত লেগেই থাকতো।

প্রতাপ জন্মেছিলেন ১৫৬১ খৃীষ্টাব্দে। তখন মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল। প্রতাপ দিল্লীতে গিয়ে দু বৎসর ছিলেন, তাঁর কৈশোরের পর। দিল্লীতে থেকে তিনি অনেক-কিছু ভালো করে দেখতে লাগলেন। যেমন—বাদশাহী রাজনীতি, দুর্গগঠন, সৈন্যগঠন, বাদশাহী দুর্বলতা, বাদশাহী সভার দোষগুণ। এইসব দেখে-শুনে অনেক কিছু শিখতে লাগলেন। তারপর আকবর বাদশাহকে খুশি করে এক সনদ নিয়ে, বাংলায় ফিরে এসে, মহা ধুমধামে রাজত্ব করতে লাগলেন। তাঁর রাজধানী ছিল ধুমঘাটে। বহু দুর্গ তিনি তৈরি করেন। দুর্গগুলির মধ্যে চৌদ্দটি ছিল প্রধান দুর্গ। যেমন—যশোর দুর্গ, ধুমঘাট দুর্গ, মণি-দুর্গ, চাকশ্রী দুর্গ, শালিখা দুর্গ ইত্যাদি। রাজ্যের নানা জায়গায় গড়ে তুললেন এইসব দুর্গ। জানা যায়, কলকাতার আশপাশেই তাঁর সাতটি দুর্গ ছিল। যেমন—বেহালা, টালা, চিৎপুর, সালখিয়া প্রভৃতি জায়গায়।

শুধু কি দুর্গ। রণতরীও তৈরী হতে লাগলো অনেক অনেক। সৈন্যবাহী, ভার-বাহী, রসদবাহী, সংবাদবাহী বহু-বহু দ্রুতগামী রণতরী তাঁর ছিল। যুদ্ধের উপকরণ সব রণতরীতে বোঝাই থাকতো। এ সমস্তই পরিচালনের ভার ছিল বীর বাঙালীদের উপর। দেশের তখনকার উন্নত অবস্থা ভেবে দেখবার মতো। প্রতাপের উৎকৃষ্ট রণতরীর সংখ্যা ছিল দশ হাজারের বেশী। অন্য রকম পোতের সংখ্যা দু হাজারের বেশী।

প্রতাপাদিত্যের সৈন্য-সামন্ত ছিল আট রকমের। যেমন—ঢালী, তীরন্দাজ, গোল-ন্দাজ, অশ্বারোহী, নৌসৈন্য, গুপ্ত-সৈন্য, রক্ষীসৈন্য আর হস্তীসৈন্য। বাঙালী রায়বেঁশে আর ঢালী সৈন্যরা ছিল ভারি দুর্ধর্ষ। প্রত্যেক শ্রেণীর এক একজন অধ্যক্ষ ছিলেন। সকল অধ্যক্ষের উপর সর্বপ্রধান সেনাপতি ছিলেন প্রতাপের বন্ধু, মহাবীর সূর্যকান্ত গুহ। প্রতাপের আর এক বন্ধু ছিলেন শঙ্কর চক্রবর্তী। তাঁর এক দুর্দান্ত, রণদক্ষ খোজা ছিল, নাম তার কমল। এই খোজা ছিল তাঁর প্রধান সহায়।

সৈন্য সংগ্রহ হত কোথা থেকে? নানা জাতি থেকে সৈন্য আসতো। যেমন—বাগদী, জোলা, কৈবর্ত, নবশাখ, পৌণ্ড্র, গোয়ালা, পাঠান, মোগল, রাজমহলী, বর্ধমানী, পর্তুগীজ, কাফি, ওরাং, সাঁওতাল, কোড়া-কুর্মি, গারো, খাসিয়া, মিশ্র, আরাকানী—এইসব জাতির লোকেরা সৈন্যদলে ভর্তি হোত।

অত্যন্ত দুর্দান্ত চরিত্রের রাজা ছিলেন প্রতাপাদিত্য। রাজ্য সুদৃঢ় করে তিনি রাজ্য শাসন করতে লাগলেন, প্রজা পালন করতে লাগলেন। কিন্তু এমন শক্তিশালী রাজার পতন হলো কেন? কয়েকটি কারণ ঘটে গেল, যে-জন্য তিনি লোকেদের অপ্রিয় হলেন।

রাজা প্রতাপাদিত্যের দোষ থাকলেও গুণও ছিল অনেক। তাঁর যশোর রাজ্য বাংলাদেশে তখন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কুলীন এবং পণ্ডিতদের আনিয়ে যশোরে স্থিত করেছিলেন তাঁর বাপ-খুড়ো। প্রজারা সুখে এবং নির্ভয়ে থাকতো। তিনি যশোরেশ্বরী বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবী মূর্তিকে তিনি ভক্তিভরে পূজা করতেন।

তিনি স্বাধীন হয়েছেন, স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছেন। এতে দিল্লীতে আকবর বাদশার টনক নড়লো। সেনাপতি মানসিংহ এলেন সসৈন্যে প্রতাপকে দমন করতে। মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলো। মানসিংহ ছিলেন আকবরের কূটনীতিবিদ্ যোদ্ধা। প্রতাপের শৌর্য, বীর্য, পরাক্রম দেখে তিনি ভিন্ন পথ ধরলেন। যে-সকল রাজা বা জমিদার প্রতাপাদিত্যের দরবারে অত্যন্ত অনুগত হয়ে থাকতেন, মানসিংহ তাদের হাত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অল্পে অল্পে তারা মানসিংহের দিকে হল্লো, গোপনে-গোপনে। সেনাপতিদের উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন মানসিংহ। কৃতকার্যও হলেন।

মানসিংহের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ বাধলো। সে যুদ্ধে প্রতাপের বিশ্বস্ত খোজা কমল সাতদিন উপবাসী থেকে, অবিশ্রান্ত লড়াই করে প্রাণ দিল। মহাবীর সূর্যকান্ত যুদ্ধ করতে করতে জীবন হারালেন। প্রতাপ অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করলেন, আর সে-যুদ্ধ হলো অত্যন্ত শৌর্য আর বিক্রমের যুদ্ধ। তাঁর প্রাণপ্রিয় বন্ধু শঙ্কর চক্রবর্তী নিহত হলেন। সেনাপতি মদন মল্ল প্রাণ দিলেন, ফিরিঙ্গি সেনাপতি রডাও নিহত হলেন। বর্ষা এসে পড়লো। মহাবিপদ। প্রতাপ সন্ধি করতে চাইলেন। সন্ধি হলো। প্রতাপ নামেমাত্র মোগলের অধীনতা স্বীকার করলেন।

এর পরের কথা। ইসলাম খাঁ বাংলার নবাব হয়ে এলেন। দিল্লীতে তখন সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল। এই নূতন নবাব ইসলাম খাঁর সঙ্গে তেজস্বী প্রতাপাদিত্যের বনিবনাও হলো না। সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ হওয়াতে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। এবার নৌযুদ্ধ। এই নৌযুদ্ধও হলো অতি ভয়ানক। এই যুদ্ধে প্রতাপ মোগল সেনা-পতিদের কাছে একেবারে পরাস্ত হয়ে বন্দী হলেন। সর্বনাশ হলো। প্রতাপকে বন্দী করে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে এক খাঁচার মধ্যে এই বাংলার বাঘকে বন্দী করলেন ইসলাম খাঁ। বন্ধ করে আগরায় পাঠানো হলো। কিন্তু পথে, কাশীধামে, এই বাংলার বাঘ ১৬১১ খৃীষ্টাব্দে লোকান্তরিত হলেন ৫০ বৎসর বয়সে।

এক কথা বলবার আছে। প্রতাপের কৃপা-পাত্র এবং অনুগ্রহভাজনেরা যদি তাঁকে ত্যাগ না করতো আর বিশ্বাসঘাতকতা না করতো, তাহলে বাংলার ইতিহাস হয়তো বা দাঁড়াতো অন্য রকমের। বাঙালীর এই দোষেই সব গেছে।

মানসিংহ তাদের হাত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন

কানাই বলাই দুটি ভাই

॥ নরেন্দ্র দেব ॥

সে কালে গোকুলে ছিলেন এক রাজা। তাঁর সম্পত্তির মধ্যে ছিল শুধু একপাল নধর গরু। এই গরুগুলির দয়ায় তিনি আরামে বসে থাকতেন রাজসিংহাসনে, আর সারাদিন ভাল ভাল জিনিস খেতেন, সবই তাঁর গরুর দুধে তৈরি। দই, ক্ষীর, ছানা মাখন, ঘৃত, সর, সন্দেশ, রসগোল্লা, রাবড়ি, আরও কত কি!

রাজার কাছে ছিল দুটি রাখাল ছেলে। তারা দুই ভাই। নাম কানাই বলাই! অল্প বয়স তাদের। কিন্তু রাজার গরুর কাজ তারা খুব ভালভাবেই করত। রোজ তারা গরুর-পাল নিয়ে মাঠে মাঠে চরাতে যেত। গরুগুলি টাটকা তাজা ঘাস খেয়ে খেয়ে ক্রমেই বেশ গোলগাল হয়ে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজাও ছানা মাখন খেয়ে খেয়ে হাতির মত ঢাউস মোটা হয়ে পড়লেন। রাজার ত কাজ ছিল

আরামে বসে থাকতেন রাজসিংহাসনে

না কিছু। শুধু সারাদিন খেতেন আর সিংহাসনে বসে ঘুমের ঘোরে ঢুলতেন। মাঝে মাঝে কানাই বলাই, দুটো রাখাল ছেলেকে, ধরে এনে আচ্ছা করে পিটতেন। বলতেন, "না-ঠেঙালে ওরা ঠিক থাকবে না।"

রাজার দেখাদেখি রাখাল ছেলে দুটির ওপর রাজবাড়ির সবাই অল্পবিস্তর অত্যাচার করত। কিন্তু, কানাই বলাই বড় ভাল ছেলে। তবুও রাজার গরুরপাল নিয়ে তারা রোজই নিয়মমতো চরাতে যেত। ভাল ভাল ঘাস খুঁজে খুঁজে এ-মাঠ ও-মাঠ সে-মাঠ ঘুরে ঘুরে বেড়াত। বন থেকে পাছে বাঘ এসে গরুরপালে হানা দেয়, তাই কানাই বলাই সারারাত পালা করে গোয়াল পাহারা দিত।

দিন যায়। রাখাল ছেলে দুটি ক্রমে বড় হয়ে উঠল। কিন্তু, গরু চরানোর কাজ তারা ছাড়ল না। গরুগুলি বড্ড ভালবাসত তাদের দুটি ভাইকে। কানাই বলাইও প্রত্যেক গরুটিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। তাদের গায়ের রং দেখে দেখে নাম রেখেছিল 'শ্যামলী', 'ধবলী', 'কাজলী', 'পাটলী' এই-রকম কত কি? নাম ধরে ডাকলেই সেই গরুটি ওদের কাছে আসত। ওরা তাদের নদীতে নামিয়ে গা-ধুইয়ে স্নান করিয়ে দিত। গোপাষ্টমীর মেলার দিন তাদের শিং-এ তেল হলুদ মাখিয়ে ঘুঙুর বেঁধে দিত।

গরমের সময় তারা গরু নিয়ে চলে যেত একেবারে নদীর তীরে ছায়াঘন বনের ধারে গাছের তলায়। শীতকালে নিয়ে যেত কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়া থেকে বাঁচাবার জন্যে উঁচু পাহাড়ের আড়ালে। ঠাণ্ডা হাওয়া সেখানে ঢুকতে পারত না। বর্ষার দিনে ঝম্‌ ঝম্‌ করে মুষলধারায় বৃষ্টি নামলে কোথায় গরুরপাল নিয়ে গিয়ে তারা নিরাপদে আশ্রয় পেতে পারে, এ-সব খবর তারা ভাল করেই জানত।

কিন্তু, গরুরপালের মালিক সেই মোটা রাজা ছিলেন যেমনি কৃপণ, তেমনি নিষ্ঠুর। দারুণ রোদের দিনেও রাখাল ছেলে দুটিকে তিনি একটা তালপাতার ছাতাও কিনে দিতেন না। তিনি বলতেন, "ছাতা দিলে ওরা ছাতার আড়ালে আরামে ঘুমিয়ে পড়বে আর বাঘে এসে তাঁর গরু টেনে নিয়ে যাবে।" ছেলে দুটিকে তিনি তৃষ্ণার সময় যাতে একটু জল পান করতে পারে সেজন্য একটা মাটির কলসি পর্যন্ত কিনে দেননি। রাজার পাতের উচ্ছিষ্ট খাবার যা পড়ে থাকত, কানাই বলাই তাই খেয়েই মানুষ হয়েছে। রাজা যখন শীতের সময় রাত্রে তাঁর নরম-গরম গদি-ওয়ালা বিছানায় শুয়ে ঘুমুতেন, রাখাল ছেলে দুটি তখন বাইরের দাওয়ায় ছেঁড়া চাটাই পেতে শুয়ে শীতে ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপত। রাজা একখানা সুতী-চাদরও দিতেন না কখনো।

একদিন রাজা কানাই বলাইকে ডেকে হুকুম করলেন, "তোরা আমার সমস্ত গরু এনে এখনি হাজির কর আমার সামনে। আমি তাদের দেখতে চাই।"

গরুগুলিকে ওরা সেদিন নদীর ওপারে চরাতে নিয়ে গিয়েছিল। রাজার হুকুম শুনে তখনই গরুরপালকে তাড়া দিয়ে তারা এপারে ফিরিয়ে নিয়ে এল। কারণ, মোটা রাজা নদী পার হয়ে ওপারে যেতে পারবেন না। কাজেই গরুদেরই নদী পার করে এপারে আনতে হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একটি কচি বাছুরকে কোলে নিয়ে যখন কানাই নদী পার হচ্ছিল বাছুরটা হঠাৎ ভয় পেয়ে ছটফট করে উঠতেই হাত ফসকে নদীর জলে পড়ে গেল। নদীতে তখন প্রবল স্রোত। 'দেখ্‌ দেখ্‌—ধর্‌ ধর্‌' করতে করতে স্রোতের টানে তর তর করে বাচ্চাটা কোথায় ভেসে চলে গেল। বলাই তখনি জলে ঝাঁপিয়ে পিছু পিছু সাঁতরে ছুটেছিল বটে বাছুরটাকে বাঁচাতে। কিন্তু, পারলে না বেচারা বেশী দূর যেতে। স্রোতের টানে ঢেউয়ের মুখে হাবুডুবু খেয়ে, অনেক নাকানি চোবানীর পর অতিকষ্টে প্রাণ নিয়ে তীরে এসে উঠল।

রাজা ত শুনে একেবারে রেগে অগ্নি-শর্মা! গর্জন করে রাখাল ছেলেটাকে তেড়ে

হাত ফসকে নদীর জলে পড়ে গেল

মারতে উঠলেন। কিন্তু, বেজায় মোটা শরীর বলে তাল ঠিক রাখতে না পেরে, উল্টে পড়ে গেলেন। কানাই করলে কি, এই সুযোগে রাজাকে চেপে ধরে বলাইকে পালিয়ে যেতে বললে। বলাই কিন্তু কানাইকে ছেড়ে যেতে চাইলে না।

রাজা তখন একেবারে ক্ষেপে উঠে চিৎকার করে বললেন, "বেরিয়ে যা তোরা এখান থেকে, এখনি বেরিয়ে যা বলছি!"

"যে আজ্ঞে, মহারাজ।" বলে কানাই বলাই দুই ভাই রাজাকে প্রণাম জানিয়ে চলে গেল, সে কোন্‌ নিরুদ্দেশে, কে জানে? যাবার সময় রাজাকে বলে গেল, "মহারাজ! গরুগুলোর দুধ, ঘি, মাখন, ক্ষীর, সর, ছানা রোজ খান আপনি, কিন্তু, জীবনে কখনো ওদের সেবাযত্ন করেননি। দুটো খড়-বিচালি

খোল ভুষি কখনও খেতে দেননি। আপনি নিজে আরামে থাকেন। ভাল ভাল খেয়ে মোটা হচ্ছেন। কিন্তু, আমাদের দু ভাইকে পেটভরে খেতে না দিয়ে অস্থিচর্মসার করে দিয়েছেন। আমরা আপনার কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবো ভাবছিলাম অনেক দিন থেকেই, কিন্তু মায়ায় জড়িয়ে পড়েছিলাম বলে যেতে পারিনি। আপনি আজ আমাদের তাড়িয়ে দিয়ে ভালই করলেন, অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা চললাম। তবে একটা কথা বলে যাই যে, আমরা চলে যাবার পর আপনার গরুগুলি যদি অযত্নে মারা যায়, যদি বাঘে খায়, যদি আপনার গোয়াল ছেড়ে পালায় সেজন্যে আমাদের দায়ী করবেন না কিন্তু!"

রাজা একথা শুনে বড় ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন, তাইতো। গরুগুলি আমার সম্পত্তি হলেও ওরা তো আমাকে চেনে না। রাখাল ছেলে দুটোই ওদের সংগী সাথী। ওরা চলে গেলে গরুগুলোও যদি ওদের পিছু পিছু চলে যায়! তিনি তখন কানাই বলাইকে ডেকে বললেন, "তোমরা থাকো! চলে যেও না।"

ওরা বললে, "কোথা থাকবো মহারাজ? আমাদের কি মাথাগাঁজে থাকবার মতো একখানা ঘর কখনও করে দিয়েছেন?"

রাজা বললেন, "ভাল ঘরবাড়ি করে দেব। তোমরা এখানে থাক।" কানাই বলাই বললে, "এতোদিন যদি আমাদের খোলা আকাশের নীচে কেটে গিয়ে থাকে, আজও কাটবে, মহারাজ! আপনার এই দায়েপড়া দয়া আমরা চাই না, চললুম!"

বাঁশি বাজাতে বাজাতে কানাই বলাই দুই ভাই পথে নেমে পড়ল।

রাজার সমস্ত গরুপালও চললো তাদের পিছু পিছু। রাখাল ছেলেরা শহর ছাড়িয়ে, গ্রাম ছাড়িয়ে, চাষের ক্ষেত পিছনে ফেলে রেখে বনজংগল পার হয়ে চলে গেল অনেক দূরে। এসে পড়লো দেশের সীমানার কোলে, একেবারে সমুদ্রের ধারে। সেখানকার লোকেরা তাদের দু ভাইকে আর গরুগুলিকে খুব আদরযত্ন করে রাখল। তাদের থাকার সুব্যবস্থা করে দিল। এই দুটি বন্ধু-হারাকে পেয়ে তারা যেন বেঁচে গেল! কারণ তাদের দেশে একটিও গরু ছিল না: সবই গাধা!

দিন যায়। কানাই বলাই এখানে বেশ আরামেই ছিল! এমন সময়, একদিন খবর এল যে, মোটা রাজা গরুর খোঁজে জংগলের ধারে যাওয়ায় তাঁকে গরু মনে করে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে। রাখাল ছেলে দুটির এ খবর শুনে মনে বড় দুঃখ হল। তারা রাজার গরুগুলি নিয়ে গোকুলে ফিরে এল। তখন, গরুর দেবতা গোপালঠাকুর খুশি হয়ে কানাই বলাই দুই ভাইকে গোকুলের রাজা করে দিলেন।

রেলগাড়ি

রাধারাণী দেবী

ঝিক্ঝিক ঝম্ঝম্ দিন নাই রাত নাই।
ঝিক্ঝিক্ ঝম্ঝম্ কলকাতা বোম্বাই॥
মধুপুর—মধুপুর—যেতে হবে বহুদূর—
মধুপুর—মধুপুর—মালগাড়ি জুড়ে নাও!
ঝক্ঝক্—ঝম্ঝম্ ছুটে চল একদম
ঝক্ঝক্—ঝম্ঝম্—নীলবাতি দেখলাও।
পাটনা—পাটনা—রোকো ট্রেন—আর না—
পু-উ-রী—মিঠাই চাই—গ্রম্ দুধ—গ্রম্ চা।
ঘট-ঘং—ঘট্ঠাস—ক্লিং ক্লিঙ—খট্টাস—ঠি-সসসস
শীষষষষ—শীষষষষ—শীষষষষ—শীষষষষষ
চা—গ্রম—গরম চা—চা গ্রম—গ্রম চা—
চু-উ-ড়ী—খেলানা চাই-ই—জিলেবী—সামোসা—
লাইন ক্লিয়ার হো—ক্যু-উ-উ-ঝিক্—ঝিক গ্রাম—
'রাম-রাম ভাইয়া!—চিট্ঠি ভেজো!—রাম-রাম!'
ঝিক্ ঝিক্ ঝম্ঝম্ রাত নাই দিন নাই।
ঝিক্ঝিক্ ঝম্ঝম্ কলকাতা বোম্বাই॥

[ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত। দশ থেকে পনেরো জন পর্যন্ত এই আবৃত্তি অভিনয় করতে পারে। ট্রেনের গতিভংগী, গতির দ্রুততা, ক্রম-মন্থরতা, চাকার সিলিণ্ডারের আন্দোলন ভংগী প্রত্যেকটি ছেলে এক ছন্দে হাতের উঠা-নামা অভ্যাস করে নিখুঁত করবে। ছয় জন ছেলে একরকমের শার্ট প্যাণ্ট জুতো মোজা পরে ট্রেন সেজে আসবে। মাথায় এক-রকমের রুমাল বা টুপি ব্যবহার চলতে পারে। প্রত্যেকের পোশাক একরকম হওয়া চাই। প্রত্যেক ছেলে তার পূর্ববর্তী ছেলেটির পিঠঘেঁষে পিছনে দাঁড়িয়ে পূর্ববর্তী ছেলের কাঁধে বাঁ হাত রাখবে। সর্বপ্রথমে যে-ছেলেটি দাঁড়াবে তার বাঁ হাতখানি মুষ্টিবদ্ধ করে উঁচু করে ধরে ইঞ্জিনের চিমনীর ইঙ্গিত বহন করবে। প্রত্যেকটি ছেলে নিখুঁত ভাবে এক লাইনে এক ছন্দে তাদের ডানহাতে সিলিণ্ডারের ওঠানামা আন্দোলনের নকল করবে। তালে তালে পা ফেলে ট্রেন হয়ে দর্শকদের সামনে আবির্ভূত হবে।]

ট্রেনরূপী ছেলেরা—ঝিক্ঝিক্ ঝম্ঝম্
দিন নাই রাত নাই—
ঝিকঝিক ঝমঝম দিন নাই রাত নাই—
ঝিকঝিক—ঝমঝম—কলকাতা বোম্বাই—
ঝিকঝিক—ঝমঝম—কলকাতা বোম্বাই—

[আবৃত্তি করতে করতে ট্রেন একবার চক্রাকারে স্টেজে ঘুরে এলে বিপরীত দিক থেকে ট্রেনের ছেলেদের মতই একরকম শার্ট প্যাণ্ট পরা একটি ছেলে মার্চের ভংগীতে পা ফেলে আবৃত্তি করতে করতে প্রবেশ করবে।]

নবাগত ছেলেটি—মধুপুর—মধুপুর—যেতে হবে
বহু দূর—
মধুপুর—মধুপুর—মালগাড়ি জুড়ে নাও।

[চলন্ত ট্রেনের সবশেষের ছেলেটির পিছনে পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে বাঁ হাত চাপিয়ে ডান হাতে সিলিণ্ডার ওঠা-নামা করতে করতে বলবে—]

ঝক্ঝক্—ঝমঝম ছুটে চল একদম—
ঝকঝক—ঝমঝম—নীল বাতি দেখলাও—

[ট্রেনের গতি দ্রুততর হবে। দ্রুতস্বরে রেলের চাকার টানা সুরে সকলে গলা মিলিয়ে আবৃত্তি করতে থাকবে—]

ঝিকঝিক ঝমঝম দিন নাই রাত নাই—
ঝিকঝিক ঝমঝম—কলকাতা বোম্বাই।

[মার্চের ভংগীতে পা ফেলে যদু ও মধু প্রবেশ করবে। এদের দুজনের পরনে ধুতি আর কোট। যদুর মাথায় নীল কাপড়ের পাগড়ী। যদু ডান হাত উঁচু করে মাথার দিকে তুলে গম্ভীর উচ্চৈস্বরে বলবে—]

পাটনা—পাটনা—রোকো ট্রেন—আর না—

[মধু ফেরীওয়ালাদের মত বাঁহাত খালি কাঁধের উপর থালা ধরার ভংগী করে ডান হাতে চায়ের কেটলী দোলাবার ইঙ্গিত নিয়ে সুর করে হাঁকবে]

পু-উ-রী—মিঠাই—চাই—গ্রম্ দুধ—গ্রম চা—

ট্রেন হয়ে দর্শকদের সামনে আবির্ভূত হবে

[ট্রেন মৃদু হতে মৃদুতর-গতি হতে হতে ঝাঁকুনি খেয়ে থামার সঙ্গে সঙ্গে বলবে—]

ঘট্-ঘং ঘট্ঠাস্—ক্লিং ক্লিঙ—খট্টাস—ঠিস্সসস

[ট্রেন সম্পূর্ণ স্থির নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করবে]

শীষষষষ—শীষষষষ—শীষষষষ—শীষষষষষ

মধু—(গম্ভীর কণ্ঠে)—**চা গরম—গ্রম চা—চা গরম গ্রম চা চাই—**

[ফেরিওয়ালার ভঙ্গীতে বিনয়ের প্রবেশ]

বিনয়—(সুরে তীক্ষ্ণ গলায়)—**চু-উ-ড়ী—খোলানা চাই—**

মধু—(মোটা ভারী গলায়)—**সা-মোসা—বালু-সাই**

যদু—(এগিয়ে এসে উঁচু গলায় হাঁকবে)—

লাইন ক্লিয়ার হো—

[সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণে তীক্ষ্ণ হুইসলের আওয়াজ উঠবে]

ক্যু-উ-উ—ঝিকঝিক—ধ্রাম ধ্রাম—

[যদু মধু ও বিনয় ধীরে ধীরে মৃদুগতিশীল ট্রেনের পাশে পাশে বিদায়সূচক ভঙ্গীতে হাত নাড়তে নাড়তে ট্রেনের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকবে—]

—রাম-রাম ভাইয়া!—চিট্ঠি ভেজনা!—

রাম-রাম!!

[ট্রেন দ্রুতবেগে চলতে চলতে ও আবৃত্তি করতে করতে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে।]

ঝিকঝিক ঝমঝম দিন নাই রাত নাই!!

ঝিকঝিক ঝমঝম—কলকাতা-বোম্বাই!!

[ট্রেন যতক্ষণ দেখা যাবে ততক্ষণ এবং তার পরেও কিছুক্ষণ যদু মধু বিনয় সেই দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে উদাসমুখে হাত নাড়তে নাড়তে বিদায়-ইসারা করতে থাকবে। তারপরে বেরিয়ে যাবে।]

বর্ষা-ব্যাঙের ছড়া

শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপন বুড়ো)

[দারুণ রোদের তেজে চাষা আর চাষানীর দল ক্ষেতে কাজ করছে আর গান গাইছে। ওরা মেঘকে ডাকছে।]

[চাষা ও চাষানীদের নৃত্য-গীত]

রোদের তেজে প্রাণ বাঁচে না—
আমরা চাষীর দল—
ওরে দ্যাওয়া, আয় আকাশে
নামা জলের ঢল।
ক্ষেতে চালাই লাঙল রে ভাই
বীজ যে তাতে বুনি—
সোনা-ধানের লাইগ্যা মোরা
দাওয়াতে দিন গুনি।
আয় রে দ্যাওয়া, ঢাল রে পানি
বাড়া মো'গোর বল
চাষার দলে জাগবে পুলক
বাড়বে কোলাহল॥

[চাষা-চাষানীর দল চলে গেলে দুটি ফটিকজল পাখি নেচে গেয়ে মঞ্চে প্রবেশ করল। এই নৃত্য-নাট্যে সবাইকে মুখোশ ধারণ করতে হবে।]

[ফটিকজলের নৃত্য-গীত]

ফটিক জল! ফটিক জল!
আমরা পাখি আজ বিকল!
কণ্ঠ মোদের শুষ্ক ভাই
এক ফোটা জল ও-মেঘ চাই—!
আমরা যে রে চাতক দল
মেঘের জলই যে সম্বল!
পিপাসারই নাই রে তল......
ফটিক জল! ফটিক জল!!

[ফটিক জল পাখিরা নাচতে নাচতে চলে গেলে পেখম মেলে দুটি ময়ূর এসে ঢুকলো]

[ময়ূরের নৃত্য-গীত]

মোরা যে ময়ূর নাচি, মেঘের ডাকে
রামধনু রঙ আঁকা মোদের পাখে!
কালো কেশ, কালো চোখ
মেঘে মেঘে এক হোক
বিজলী চমক দেয়, জলদ হাঁকে—
মোরা যে ময়ূর নাচি মেঘের ডাকে!

[আকাশে মেঘ জমে উঠেছে, বিজলী হানছে, মেঘের ডাক শোনা যাচ্ছে। ময়ূরেরা নাচতে নাচতে চলে গেলে, এক দল দাদুরী ব্যাঙের ছাতা মাথায় দিয়ে ঢুকলো]

[দাদুরীদের নৃত্য-গীত]

আমি দাদুরী!
বর্ষার ঘোলা জলে কেবলি ঘুরি
লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি ডোবারে ঘিরে!
ব্যাঙের ছাতাটি সবে দেখেছ কিরে?

আনমনে গান গাই
জলে বড়ো সুখ পাই
কচু বনে বসে সুখে লাগাই তুড়ি
বর্ষার জলে যে গো আমি দাদুরী।

[দাদুরীর গানের সঙ্গে ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল। এইবার খানিকটা নীলাকাশ আর খানিকটা মেঘলা গগন দেখা গেল। তখনো বিদ্যুৎ চমকের বিরাম নেই। এই সময় একদল বলাকা নাচতে নাচতে এসে মঞ্চে প্রবেশ করল। তাদের সব সাদা পোশাক]

[বলাকাদের নৃত্য-গীত]

অসীম গগনে উড়ি মোরা বলাকা—
উধাও মোদের মন, খোলা যে পাখা!
আসে জল, আসে ঝড়
বাজ হাঁকে কড় কড়
মোদের পায়ের তলে নেই যে শাখা
মোরা বলাকা!
উড়ে-চলা কালো মেঘে সাদা বলাকা—
মনে হয় যুঁই ফুলে মালাটি আঁকা!
পথিকেরা পায় ভয়
মোরা জানি নিশ্চয়
ঝঞ্ঝারে সাথী করে বাঁচিয়া থাকা!
জলে-ঝড়ে উড়ে চলি মোরা বলাকা!!

[বলাকার দল নাচতে নাচতে চলে গেলে কদম ফুল এসে মঞ্চে প্রবেশ করল। এর পোশাক ঠিক কদম ফুলের মতো হবে।]

[কদমের নৃত্য-গীত]

মেঘ থম্ থম্ আকাশ তলে আমি কদম ফুল
কেশর দিয়ে চমর দোলাই,—নেই যে আমার তুল!
গৃহহারা পথিক জনে—
পথ যে দেখাই সঙ্গোপনে—
আমি যে গো বর্ষারানীর কানের সোনার দুল!

[এই সময় কেয়া ফুল নাচতে নাচতে এসে মঞ্চে প্রবেশ করল। কেয়া ফুলের সাদা পোশাক। একটি সাপ তার গায়ে জড়ানো]

[কেয়া ফুলের নৃত্য-গীত]

ঝরঝরানি বাদল রাতে যখন ডাকে দেয়া
আপন মনে উঠছি ফুটে আমি যে ফুল কেয়া।
সাপের সাথে মিতালী ভাই

গরল খেয়ে সুধা ঝরাই—
বর্ষারানীর গোপন কথা করছি দেয়া-নেয়া॥

[কদম ও কেয়া এক সঙ্গে]

আমরা যে গো কদম কেয়া বর্ষারানীর সই
আকাশ-ধরায় মিলন আজি—জল থৈ-থৈ থৈ!

[নাচতে নাচতে কদম-কেয়ার প্রস্থান]

[এইবার মন্থর গমনে এসে প্রবেশ করল জল-ভরা মেঘ। জল-ভরা মেঘকে ক্লান্ত বলে মনে হল। তার চোখ দুটি যেন ভেজা!]

[জল-ভরা মেঘের নৃত্য-গীত]

জল-ভরা মেঘ আমি নিশীথ রাতে—
কি দুখে এ রাতে মোর পরাণ কাঁদে!
এ ধরার পিপাসা যে মিটাই আমি—
শুধু একা কেঁদে ফিরি দিবস-যামি!
জল হারা মেঘে কেউ হৃদে না বাঁধে!
তাইত কাঁদিয়া ফিরি নিশীথ রাতে॥
জল-ভরা মেঘ আমি ধরাতে ফলাই—
রাশি রাশি সোনা-ধান, আর গান গাই।
জল নিয়ে আসি আমি সবার ডাকে—
জল হারা হলে কেউ চায় না তাকে!
নিঃশেষে দিয়ে যাই সবার মাথে
শূন্য হৃদয়ে কাঁদি নিশার সাথে॥

[গান গাইতে গাইতে জল-ভরা মেঘ বেদনায় ভেঙে পড়ল। তখনো আকাশে বিদ্যুৎ-চমক। ঐক্যতান যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ল]

(য—ব—নি—কা)

পোশাক হবে ঠিক কদম ফুলের মত

দিনের শেষে

লীলা মজুমদার
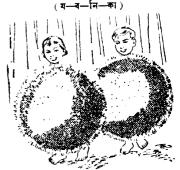
লক্ষ্ণৌ থেকে ওস্তাদ এসেছে। দাদু আর দিদিমা শ্যামলবাবুদের বাড়িতে গান শুনতে গেছেন, ফিরতে রাত হবে।

ঝগড়ু বললে, "তা তোমরা যদি সব কিছুই বিশ্বাস না করে আনন্দ পাও, তা হলে আমার আর কিছু বলবার নেই। তবে সর্বদা মনে রেখো, বোগিদাদা, যা বিশ্বাস করবার মতো নয়, তা যে সত্যি করে হয় না, এ রকম কোনো কথা নেই।"

ঝগড়ু রাগ করে উঠে দাঁড়াল। ওর পেছনে কুচি কুচি ঘাস লেগেছিল, তার কতকগুলো ঝরে ঝরে পড়তে লাগল। তাই দেখে বোগি নরম গলায় বললে, "তাই বলে ঘুটঘুটে অন্ধকারেও মানুষ চোখে দেখতে পায়, সে কথা কী করে বিশ্বাস করি? অসম্ভব জিনিস যে হয় না, ঝগড়ু।"

ঝগড়ু আরো রেগে গেল। "অসম্ভব বলেই সে-জিনিস হবে না? এ কি একটা কাজের কথা হল, বোগিদাদা?"

বাগান যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা মর্চে-ধরা কাঁটাতারের বেড়া। তারপরেই রেলের লাইনের বাঁধ আকাশ পর্যন্ত জুড়ে রয়েছে। দুপুরে দুখু ঘাস কেটেছে, যেখানে-সেখানে কুচি কুচি ঘাস পড়ে আছে; পাখিরা সব বাসায় ফিরে আসছে; শ্যামলবাবুদের গোয়ালে এখন গোরু দোয়া হচ্ছে। বাঁধের ওপারে কিছু দেখা যায় না; বাঁধের উপরে একটা নাড়া-মনসার ঝোপ কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে; পিছন দিয়ে সূর্য ডুবে যাচ্ছে।

কারো মুখে কথা নেই। কানে এল একটা শব্দ, টংলিং টংলিং টংলিং। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চেন-শেকল ঝোলাতে ঝোলাতে একটা মালগাড়ি বাঁধের উপর দিয়ে চলে যেতে থাকে।

যেই সূর্যের সামনে আসে, অমনি সেই গাড়িটা কুচকুচে কালো হয়ে ফুটে ওঠে। শেষ গাড়িটার দুদিককারই বড় টানা দরজা খোলা। সেই খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে ওপারের সূর্যটাকে এই মস্ত হয়ে দেখা গেল। আর দেখা গেল, সূর্যের সামনে গাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, কালো পাতলা ছিপছিপে একটা মানুষ। তার মাথার উপর খাড়া দুটো শিং।

বোগি, রুমু, ঝগড়ু, কেউ আর কথা বলে না। ঠিক সেই সময় বাঁধের পিছনে সূর্যও টুপ করে ডুবে গেল। আর অমনি চারদিক ধোঁয়া ধোঁয়া আবছায়া হয়ে উঠল। শীত-শীত মনে হতে লাগল। বকের মতো একটা সাদা পাখি কোঁ-ও-ও-ও কোঁ-ও-ও-ও বলে ডাকতে ডাকতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। ঝগড়ু উঠে পড়ে গা ঝাড়া দিয়ে নিল, "আর নয়, এখন ভিতরে চল।"

রুমু বললে, "ঝগড়ু, লুচি ভাজতে বল না, আমার খিদে পেয়েছে।"

ঝগড়ু রান্নাঘরের দিকে চলে যেতেই বোগি বললে, "সু—সু—সু, দেখ।"

বাঁধের ধার বেয়ে হাঁচড় পাঁচড় করে নেমে, এক লাফে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে, শিংওয়ালা লোকটা একেবারে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। ওর পিঠে একটা লম্বা ঝোলা।

"এই, শোন! আমাকে লুকিয়ে রাখবে?" বোগি রুমু ওর মুখের দিকে তাকায়, এ ওর মুখের দিকে তাকায়।

লোকটা বললে, "আমার পা ব্যথা করছে, তেষ্টা পাচ্ছে, ঘুম পাচ্ছে। রাখবে লুকিয়ে? তা হলে তোমাদের জাদু-পড়া, গুণ-করা, ভেল্কি-বাজি সব শিখিয়ে দেব। দেখবে?" বলেই লোকটা দিদিমার মা'র হাতে লাগানো সাদা গোলাপ ফুলের ঝোপের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। সেখান থেকে ডেকে বলল, "এই দেখ।" বলে টুপ্ করে একবার বসেই আবার উঠে দাঁড়াল। বোগি রুমু অবাক হয়ে দেখলে—কোথায় কালো পোশাক, কোথায় শিং। সাদা চুল, সাদা দাড়ি, সাদা পোশাক, মাথায় মুকুট। লোকটা একটু হেসে আবার টুপ করে একবার বসেই উঠে পড়ল। আবার কালো পোশাক, মাথায় শিং, যে কে সেই।

বোগি রুমু উঠে একবার গোলাপ গাছের পিছনটা ভালো করে দেখে এল। কোথাও কিছু নেই।

"কী দেখছ, দিদি? ভেল্কি লাগিয়ে দিতে পারি, কিন্তু ঠকাই না।"

বোগি বললে, "এসো, তোমাকে লুকিয়ে রেখে দেব, শোবার জন্য দড়ির খাট দেব, জল খেতে দেব, কিন্তু আমাদের অন্ধকারে দেখতে শিখিয়ে দিতে হবে, মাটিতে কান পেতে এক মাইল দূরে বনের মধ্যে হরিণ-চলা শুনতে শিখিয়ে দিতে হবে।"

একটা মালগাড়ি বাঁধের উপর দিয়ে যাচ্ছে।

রুমু বললে, "আর সেই?"

লোকটা অবাক হয়ে বললে, "কি সেই, দিদি?"

"সেই যে, বাঁশি বাজালে জন্তুজানোয়ার বশ হয়?"

"হ্যাঁ, তা-ও শিখিয়ে দেব, চোখের সামনে আমের আঁঠি থেকে আম গাছ করে তাতে ফল ধরাতে শেখাব, দড়ি বেয়ে শূন্যে মিলিয়ে যেতে শেখাব—"

বোগি বললে, "ধ্যেৎ!"

লোকটা বললে, "ধ্যেৎ? এই নাও ধর।" বলেই পাশের পেয়ারা গাছ থেকে একটা প্রকাণ্ড নীল রং-এর কাকাতুয়া ধরে দিল।

বোগি ঢোক গিলে বললে, "চলো।"

লোকটা তক্ষুনি নীল পাখিটাকে অন্ধকারে উড়িয়ে দিল। বলল, "হরিণ চলার শব্দ আর এমন কি। আমাদের মণিপুরে তুঁত-ফলের গাছে রেশমি-গুটির শুঁয়োপোকারা থাকে। রাত্রে যদি গাছতলায় দাঁড়াও, ওদের পাতা চিবুনোর শব্দ শুনতে পাবে।"

দূরে রান্নাঘরের আলো দেখা যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে লোকটা বললে, "আমার মা দুধ দিয়ে কমলালেবু দিয়ে মেখে শীতের রাত্রে বাইরে রেখে দিত, আর পাহাড় দেশের বেঁটে মানুষেরা এসে সে-সব খেয়ে যেত। তাই আমাদের কোনো অভাব থাকত না।"

রুমু বললে, "তুমি তাদের দেখেছ?"

বোগি বললে, "রুমু, বোকার মত কথা বল না।"

দুখু ভূতের ভয় পায়, মালীর ঘরে থাকে না। ঘরের পাশে জলের কল আছে। তাই শিংওয়ালাকে ওরা সেখানে থাকতে দিল। "যাও, ঢুকে পড়। ঝগড়ু দেখলে আবার মুশকিল হবে।"

লোকটা একটু ইতস্তত করে বললে, "একটা মোমবাতি হলে হত না? যদি ইঁদুর—মাকড়সা টাকড়সা থাকে?"

বোগি বললে, "তবে না বললে, অন্ধকারে দেখতে জানো?"

সে বললে, "আহা, আমি দেখতে পারি কখন বললাম? বলেছি, তোমাদের শিখিয়ে দেব। আমার অন্ধকারে ভয় করে।"

রুমু বললে, "দাদা, দাও না তোমার নতুন টর্চটা ওকে।"

রান্নাঘরের বারান্দা থেকে ঝগড়ু ডাকল, "বোগিদাদা—আ—আ, রুমুদিদি—ই—ই।" আর অমনি ওরাও লোকটার হাতে টর্চ গুঁজে দিয়ে ধুপধাপ দৌড় লাগল।

সব শেষের পেটফোলা গরম লুচিটা লাল কাশীর চিনি দিয়ে খেতে হয়। রান্নাঘরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ওরা মুখ

ধোয়। যেখানে মুখ ধোয়া জল পড়ে, সেখানে একটা মস্ত লঙ্কা গাছ হয়েছে। দুখু বলেছে, ওকে কেউ লাগায়নি, আপনা থেকেই হয়েছে। তাতে ছোট্ট ছোট্ট তারার মতো সাদা ফুল ফুটেছে আর রাশি রাশি লাল টুকটুকে লংকা ঝুলে রয়েছে। মাথার উপর আকাশটার ঘন বেগুনী রং, কিন্তু দূরের আকাশ আলো হয়ে রয়েছে; কালো বাঁধের উপর দিয়ে কালো শুঁয়ো-পোকার মতো একটা মালগাড়ি যাচ্ছে, টং লিং, টং লিং, টং লিং করে চেন-শেকল ঝোলাতে ঝোলাতে।

শুনে শুনে ঘুম পায়। রুমু বায়না ধরে, আজ কিছুতেই একলা শোবে না। ঝগড়ু বিড়বিড় করে কি সব বলতে বলতে বোগির খাটে ওর বালিশটা দিয়ে দেয়। বোগির কানে কানে রুমু বলে, "দাদা।"

"কি, রুমু?"

"ওর যদি ভয় করে?"

বোগি কোনো উত্তর দেয় না। তারপর বিরক্ত হয়ে বলে, "ও কি রুমু, আবার কান্নার কী হল?"

"ও-ঘরে মাকড়সা আছে দাদা, আমি দেখেছি।"

বোগি বললে, "ওকে টর্চ দিয়েছি তো, রুমু।"

"ঝগড়ুর ঘরে অনেক জায়গা।"

ঝগড়ু বললে, "কি কানাকানি হচ্ছে। ও সব ভালো নয় বলে দিচ্ছি। কি, লুকোচ্ছে কি? আজ গল্প শুনবে না?"

বোগি বললে, "তুমি যাও না, তোমার কত কাজ বাকি আছে। যাও না রান্নাঘরে।"

কিন্তু ঝগড়ু কিছুতেই যাবে না। চৌ-কাঠের উপর বসে পড়ল। "অসম্ভব জিনিস হয় না বলে?"

বোগি পাশ ফিরে শুলে। "হয়, ঝগড়ু হয়, আমি ভুল বলেছিলাম।"

ঝগড়ু রাগ করে আলো নিভিয়ে সত্যি করেই চলে যাচ্ছে দেখে রুমু হাত বাড়িয়ে ওর ফতুয়ার পকেটে গুঁজে দিল।

"কি কর দিদি, তামাকের গন্ধ হবে হাতে। কি, চাও কি?"

"অসম্ভবের গল্প বল ঝগড়ু।"

ঝগড়ু খাটের পায়ের দিকের রেলিং ধরে দাঁড়াল। "তোমরা হয়তো বলবে পরশ-পাথরও অসম্ভব?"

বোগি গায়ের ঢাকা খুলে ফেলে উঠে বসল। "পরশ-পাথর অসম্ভব জিনিস নয়? পরশ-পাথর থাকলে এত গরিব লোক হবে কেন?"

রুমু বললে, "তুমিই তো বলেছ, এত গরিব যে, বীচিসুদ্ধু কুল ছেঁচে খায়।"

ঝগড়ু বললে, "বেশ, তা হলে পৌষ মাসের সন্ধ্যাবেলায় কম্বল গায়ে দিয়ে বুড়ো লোকটা আমার ঠাকুরদার কাছে আসেনি।" ঝগড়ু আবার উঠে দাঁড়াল।

"না, ঝগড়ু না, দাদা কিছু জানে না, তুমি বল।"

ঝগড়ু শুরু করলে,—"চারদিক চাঁদের আলোয় ঝিমঝিম করছে, এমন সময় সে লোকটা এল। বলল, 'খিদে পেয়েছে, খেতে দাও।' ঠাকুরদা বললেন, 'কোত্থেকে দেব, এ বছর অজন্মা, আমাদেরই খাবার কুলোয় না, মুর্গী সব মরে গেছে, শালকাঠ ভালো দরে বিকোয়নি, দেব কোত্থেকে বল?' লোকটা বললে, 'তোমাদের এ বেলাকার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে?' 'না।' 'বেশ, তবে তোমার ভাগটাই না হয় দাও আমাকে।' বাড়িতে যা ছিল চেঁচেপুঁছে ঠাকুরদা সব তার সামনে ধরে দিলেন। বলেছিল তো, দুমকার ব্যাপারই আলাদা। লোকটা দাওয়ায়

কালো পোশাক—মাথায় শিং

বসে বাড়ি-সুদ্ধু সাবাকার ভুট্টা দিয়ে ভাত দিয়ে সেদ্ধ সবটুকু খেল, তার-পর আমাদের পাহাড়তলির কুয়োর মিষ্টি জলও এক ঘটি খেল। তারপর আঁচিয়ে উঠে টাঁক থেকে একটা হরতুকি আর একটা ছোট্ট কালো পাথর বের করে হর-তুকিটা মুখে ফেলে বলল, 'বড় অভাব তোমাদের, তাই না?' বলে পাথরটা দিয়ে পাথরের বড় থালাটাকে ছুঁয়ে দিল, অমনি থালাসুদ্ধু সোনা হয়ে গেল।

"সকলে তো থ'! বুড়ো লোকটিও কালো পাথরটাকে টাঁকে গুঁজে জঙ্গলের দিকের পথ ধরল। তখন সকলের চোখ চকচক করে উঠলো, সোনা থাকলে দুর্ভিক্ষেরও কোনো ভয় থাকবে না। চারদিক থেকে একটা 'ধর, ধর', 'গেল, গেল' রব উঠল। বুড়ো লোকটি একবার ওদের মুখের দিকে তাকাল তারপর একটা লাফ দিয়ে হরিণ হয়ে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল।"

বোগি রুমু কিছু বলল না।

ঝগড়ু বললে, "বল, এ-ও অসম্ভব।"

বোগি বালিশে মুখ গুঁজে বললে, "অসম্ভব হবে কেন?"

ঝগড়ু তো অবাক! এমনি সময় দাদু আর দিদিমা শ্যামলবাবুদের বাড়ি থেকে ফিরে এলেন। "সে এক কাণ্ড শুনে এলাম রে। রামহাটি স্টেশনে কে একটা জাদুকর নানারকম খেলা দেখাচ্ছিল, দেখতে দেখতে দারুণ ভিড় জমে গেল, তারপর কি নতুন খেলা দেখাবে বলে সে এর ঘড়ি, ওর আংটি, তার টর্চ সব নিয়ে দে লম্বা! ঐ ভিড় স্টেশনের মধ্যে একে-বারে নিখোঁজ হয়ে গেল, সবাই মিলে আতিপাতি খুঁজেও তার টিকিটি পেল না। কিন্তু তোদের ঘুমুবার সময় হয়ে গেছে, তোরা এখন ঘুমো।"

অনেকক্ষণ পরে রুমু বললে, "দাদা।"

"কী?"

"টর্চ তো ছিল না ওর কাছে।"

বোগি চুপ করে রইল। রুমু আবার ডাকল, "দাদা"।

"কী, বল্?"

"ওর কপাল কেটে গিয়েছিল।"

বোগি বললে, "আঃ, রুমু, ফের কাঁদছ কেন?"

"রক্ত বেরোচ্ছিল যে দাদা, টর্চের আলোতে দেখলাম।"

বোগি রুমুর পিঠে মুখ গুঁজে চুপ করে শুয়ে রইল।

ঘড়ির শব্দ দূরে সরে যেতে লাগল। আরো দূরে বাঁধের উপর মালগাড়ি যাচ্ছিল টংলিং টংলিং টংলিং।

পরদিন সকালে মালীর ঘরে গিয়ে বোগি রুমু দেখলো, দড়ির খাটে টর্চটা রয়েছে, আর একটা ছোট বাঁশি। লোকটা নেই।

তিনজনা

শ্রীলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

নাকছাবি গয়না
পরেছিল ময়না
গরবিণী সেই থেকে
হেসে কথা কয় না।
মল পরে মিণ্টি
তার ছোট বোনটি
বদরাগী দুজনার
বল দেখি কোন্‌টি?
ঝালাপালা কান্না
কাঁদে রাতে আন্না
সারা পাড়া জেগে উঠে
বলে ওরে 'আর না'।

সাহিত্যিকের সম্মান

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

সত্য কথা যা তা চিরদিনই বোধ হয় সত্য—কী বলো? এই যে, বহুদিন আগে চাণক্য বলে গেছেন—"বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে"—কথাটা সেদিনও সত্য ছিল আজও আছে। তারপর প্রায় দু হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে—যাতে চাণক্যের ঐ কথাটাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

শোনা যায়, এই নিয়ে একবার মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে মহারাজচক্রবর্তী বিক্রমাদিত্যের তর্ক হয়েছিল। দুজনেই এক-বস্ত্রে পরিচয় গোপন করে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কালিদাস নিজের প্রতিভাবলে অন্য এক রাজ্যে গিয়ে অনায়াসেই সেখানকার সভাকবি হলেন আর বিক্রমাদিত্য একদিন চোর অপবাদে বন্দী হয়ে সেই সভাতে এসে দাঁড়ালেন। সেদিন বিক্রমাদিত্য-পরিচয়ও তাঁকে কোন সুবিধা দিতে পারেনি। কারণ সে-পরিচয়ের কোন প্রমাণ ছিল না তাঁর। কালিদাসই সেদিন তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন।

মাত্র একশ বছরের কথা বলছি। ঠিক অতদিনও বোধ হয় হয়নি। আলেকজান্দার দুমা ফরাসী ভাষায় সাহিত্য রচনা করে সারা পৃথিবীতে স্মরণীয় এবং বরণীয় হয়ে উঠেছেন। 'মন্তেক্রীস্তো' আর 'দার্তাগনানের' স্রষ্টাকে দেখবার জন্য সারা পৃথিবী উন্মুখ হয়ে উঠেছিল সেদিন। তাঁর একটি বই বের হওয়ামাত্র পৃথিবীর বহু ভাষায় তার অনুবাদ হয়—তাই তিনি সকলের কাছেই পরিচিত।

দুমা ঘুরতেও পারতেন খুব। আর ঘুরলে লাভ বই লোকসান ছিল না। কোথাও থেকে ঘুরে এলেই ত বড় বড় ভ্রমণ-কাহিনী লেখা হবে—আর তা থেকে রাশি রাশি টাকা পাওয়া যাবে।

একবার হয়েছে কি, দুমা ককেশাসে বেড়াতে গেছেন। কসাকসদের দেশ, দেশের মানুষগুলো দুর্দান্ত, বেপরোয়া। হিংস্র এবং নিষ্ঠুর বলেও দুর্নাম ছিল সে-কালে। আসল কথা—প্রাণের মূল্য ছিল তাদের কম, দিতেও পারত যেমন, নিতেও পারত তেমনি অনায়াসে।

এ হেন কসাকসদের মধ্যেও দুমার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল, দুমাকে একবার চোখে দেখবার জন্য বহু দূর দূর থেকে লোক ছুটে আসতে লাগল। ভ্যাসিলি বলে এক তরুণ যুবক ত পাগল একেবারে। সে এসে বললে, "আমাকে দয়া করে আপনার চাকর রাখুন। মাইনে-পত্র কিছু দিতে হবে না, শুধু খেতে দেবেন!"

দুমা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাতে তোমার লাভ?"

"আপনার কাছে কাছে থাকতে পারব, আপনার সেবা করতে পারব, তাতেই আমার জীবন সার্থক হয়ে যাবে।"

দুমাও তেমনি। আর একটুও চিন্তা না করে বললেন, "বেশ, কিন্তু এখন ত আমার সঙ্গে ঘোরায় অসুবিধা, তুমি পারীতে আমার বাড়ি গিয়ে অপেক্ষা করো গে!"

যাও ত যাও। যাওয়া কি অত সোজা। সাত সমুদ্দুর ডিঙিয়ে যাওয়া। কোথায় ককেশাস আর কোথায় ফ্রান্স দেশ!

ভ্যাসিলি মাথাটাথা চুলকে বললে, "আজ্ঞে, পাসপোর্ট নেবার একটা হাঙ্গামা আছে, তা ছাড়া গাড়ি-ভাড়া লাগবে, আমার কাছে

কাগজখানা ভ্যাসিলির হাতে দিয়ে বললেন...

ত কিছুই নেই। তার চেয়ে বরং আমাকে আপনার সঙ্গেই নিন!"

"আরে! এর জন্য ভাবছ কেন? সে-সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখি একখানা কাগজ!"

একটা সাদা কাগজ টেনে নিয়ে খস্‌খস্‌ করে লিখে দিলেন তাতে, "আমার ভৃত্য ভ্যাসিলি যাচ্ছে, দয়া করে যেন তাকে পারী পর্যন্ত যেতে দেওয়া হয়।—ইতি, আলেকজান্দার দুমা।"

কাগজখানা ভ্যাসিলির হাতে দিয়ে বললেন, "যে কেউ ধরবে—এই কাগজ দেখিও। কোন ভয় নেই। টিকিটও লাগবে না। স্বচ্ছন্দে চলে যাও।"

ভ্যাসিলিরও দুমার ওপর এমন অচলা ভক্তি যে, সত্যি সত্যিই সে সেই কাগজটুকু সম্বল করে পারীর দিকে পাড়ি দিল।

দুমা কিন্তু ভ্যাসিলিকে যতই ভরসা দিন, নিজের ঠিক অতটা ছিল না; হয়ত তিনি ছোকরাকে এড়াতেই চেয়েছিলেন, তাই ঐ কাগজখানা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। মাস কতক পরে বাড়ি ফিরে তাই ভ্যাসিলিকে দেখে তিনি একেবারে অবাক হয়ে গেলেন।

"আরে, তুমি এখানে? কী করে এলে শেষ পর্যন্ত?"

ভ্যাসিলি উজ্জ্বলমুখে জবাব দিলে, "আজ্ঞে, কেন? আপনার সেই হাতের লেখাটুকু!...আপনি যা বলেছিলেন তাই। আপনার কথা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। আমার কোন অসুবিধাই হয়নি। সীমান্তে সীমান্তে যেমন ছাড়পত্র দেখতে চেয়েছে—আপনার কাগজটা দেখিয়েছি। দুমার নাম শোনা মাত্র সবাই ছেড়ে দিয়েছে। জাহাজে, ট্রেনে টিকিট চেয়েছে, আপনার নাম করতেই ব্যস্—সব হাঙ্গামা মিটে গেছে। বলেছে, দাও হে যেতে দাও, দুমার লোক, আটকালে তিনি কি ভাববেন! তাঁর হয়ত অসুবিধা হবে!"

এসব কাহিনী আজকের এই 'হামবড়া' মনোভাবের দিনে—অবিশ্বাস্য গল্প-কথার মতই শোনায়, না?

আকাশের —নীল কাগজে লিখলো চিঠি
সোনার জলে, সোনার বাণী
যে সোনা, রাতের তারার চোখের তারায়
বুলায় আলোর পরশখানি।
লিখেছে মিষ্টিহাতে, মিষ্টি কথা
মিষ্টি খোকা খুকুর নামে,
ভরেছে —জুঁই চামেলির গন্ধ-সুধায়
উজর কাশে, সবুজ ধানে।
জ্বেলেছে —সবুজ ঘন পাতার থালায়—
জবার দীপে আলোর শিখা
পায়ে কি পড়বে মায়ের, কিংবা হবে
সেই প্রদীপে আরাত্রিকা?
পরেছে অপরাজিতা নীল শাড়ি গো
জয়ন্তী সে, রং মিলিয়ে
ফুটেছে —কমল কলি দীঘির জলে
ঊষার আলোয় ঝিলমিলিয়ে।
ঝরেছে —শিউলি বকুল শ্যামল ঘাসে
শিশিরভেজা রাতের কোলে—
ভেঙেছে, ঘুম ভেঙেছে, চোখ খুলেছে
বনের কেয়া, শ্যামার বোলে।
এসেছে মা এসেছে, আলোর স্রোতে
ভাসিয়ে নিয়ে সোনার তরী
ছুটেছে —ঐ ছুটেছে মায়ের ছেলে
শূন্য ঝুলি আনবে ভরি।
প্রভাতে —খোকার হাতে আসলো চিঠি
আনলো কে যে কেউ না জানে,
পাঠালো পুজোর দিনে কে এই লিপি
নীল কাগজে, সবুজ খামে?

ঠেকে শেখা

ইন্দিরা দেবী

মা কষে বকুনি দিয়েছেন শীলাকে। দিনরাত খেলা আর খেলা—আর সন্ধ্যা হলেই বই কোলে নিয়ে ঢুলুনি—আর কিছু কাজ নেই। সারা গরমের ছুটিটা এই করে কেটেছে। আর স্কুল খুললে তো কথাই নেই। বলবার বা ছল করবার ঐ একটি উপলক্ষ্য। সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতেই স্কুলের গাড়ির হর্ন শোনা যায় আর তার আগেই তাকে তৈরী হয়ে থাকতে হয়, কাজেই সকাল'বেলা আর সময় কই? এই মেয়েকে দিয়ে কী কাজ হবে? আর বললেও একটু সাহায্য করার মত মেয়ে নয়।

আজকের রাগটা সেই কারণেই। সারা ছুটিটা হাত পা ছড়িয়ে, গল্পের বই পড়ে আর ভাই-বোনদের সঙ্গে মারামারি করে কাটলো। মা তাই আজ খুব রেগে গেছেন—আর এমন বকুনি দিয়েছেন যে, শীলা ঝাড়া এক ঘণ্টা খাটের তলায় বসে কেঁদেছে। কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলে উঠেছে। তখনও মার গলা শোনা যাচ্ছে, "হতচ্ছাড়া মেয়ে—একটুও কাজকর্মে মন নেই, কেবল খেলা আর আলসেমী করা। আজ সব কাজ করাবো—দেখি কেমন না করতে হয়। ওরকম বয়সে আমরা সারা সংসারের ভার নিয়েছি।"

মাকে আজ রাঙামাসীমার বাড়ি যেতেই হবে। রাঙামাসীমার বড় মেয়ের আশীর্বাদ আজ, তাই। বাড়িতে আজ ভাইবোনদের দেখাশোনা, খাওয়াদাওয়া, ঘরগুছানো সব নাকি শীলাকে করতে হবে। একথা শীলা অনেকবার শুনলো মার বকুনির মধ্যে।

সত্যি কথাই, কাজের নামে শীলার গায়ে জ্বর আসে। বই পড়া বা পুতুলের বাক্স নিয়ে বসে তাদের পোশাক বদলানো, সাজানো-গোছানো অথবা সন্ধ্যাবেলায় ছাদে পাশের বাড়ির রত্নার পুতুলের সঙ্গে নিজের পুতুল-ছেলের বিয়ে দেওয়া অনেক ভাল। আজ কিন্তু আর ছাড়া পাবার উপায় নেই। মায়ের আজ প্রচণ্ড রাগ, আর সেই রাগের মুখে যা বেরিয়েছে তা প্রতিপালন হবেই। মোট কথা আজ অনেক কাজ তার ভাগ্যে ঝুলছে।

মা কাপড়জামা পরে তৈরি হয়ে এলেন। সিঁদুরকৌটা খুলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথায় সিঁদুর দিতে দিতে বললেন, "ভালো করে শুনে রাখো, খাটের নীচেই বসে থাকো আর যাই করো। খাবার দাবার সব টেবিলে ঢাকা রইল, ওগুলো ভাইবোনদের দিও, আর ঘর তিনটে পরিষ্কার করে রেখো। আজ ঝি আসবে না। বিছানা, কাপড়, জামা সব [illegible] আর কিছু না করলেও চলবে। আমি সন্ধ্যার ভিতরেই আসতে চেষ্টা করবো।"

মা তো চলে গেলেন। সঙ্গে গেল কেবল একমাত্র টুটু—শীলার সব চেয়ে ছোট্ট ভাই।

খাটের তলা থেকেই শীলা তা দেখলো। মায়ের উপর রাগ যে একটু হলো না তা নয়। টুটুকে নিয়ে রাঙামাসীমার বাড়ি যাওয়া হলো, এদিকে ঝুনু, বুবু, নণ্টুকে নিয়ে আমি বাড়ি থাকবো, ঘর পরিষ্কার করবো। বয়ে গেছে, থাক দরকার নেই, মনে মনে গজগজ করতে করতে শীলা খাটের তলায় আধময়লা কাপড়ের পোঁটলায় রাখা মাথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে পাশ ফিরলো। ভাবলো, এখন তো থাকি শুয়ে, তারপর যা হয় হবে।

থাক, দরকার নেই, কাজ করে ফেলাই ভালো—না হলে ফিরে এসে মার আবার বকুনি খেতে হবে, তার চেয়ে করেই ফেলি—একথা ভাবলো শীলা খুব বিরক্ত হয়ে। অনেকক্ষণ কেঁদেছে সে, চোখগুলো আর মাথাটা কেমন ভারী মনে হচ্ছে। চোখ বুজে থাকলে যেন অনেক আরাম হয়। এখন নাকি কাজকর্ম করতে ইচ্ছা করে? কোথায় ঝাঁটা থাকে, কোথায় ঝাড়ন—কোনোদিন জানি না। এখন সে-সব খুঁজে দেখে বার করতে হবে। ঝুনু বুবুকে ডেকে বলবো নাকি? থাক, দরকার নেই। ইস, মাথাটা বড্ড ভারী লাগছে, চোখ দুটোও খুলতে ইচ্ছা করছে না যেন। ঝাঁটা! ঝাঁটা! কোথায় যে সব থাকে?

"এই তো আমি?"

"কে? কে তুমি?" ভয় জড়ানো গলায় শীলা বলে উঠলো।

"কে, দেখতে পাচ্ছ না? আমি, আমার নাম ঝাঁটা, চেনো না আমায়?"

"হ্যাঁ, চিনি বোধ হয়।" আমতা আমতা করে বলে উঠলো শীলা।

"বোধহয় মানে?" ধমকে উঠলো যে কথা বলছিল।

শীলা তাকিয়ে দেখলো, তাদের ঘর ঝাঁট দেবার ফুল্-ঝাঁটাটা সামনে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে—আর দড়ি বাঁধবার জায়গাটায় একটা মুখ। হাঁ, মুখ এত বড় যে, এদিক থেকে ওদিক হয়ে গেছে আর লাল পানের রসে টকটক করছে। চোখ উঁচিয়ে যেরকম করে কথা বলছে দেখলেই তো ভয়ে আত্মারাম খাঁচা ছেড়ে যায়।

তবু মনে সাহস এনে শীলা বললে, "মানে—মানে—আমি তো তোমায় খুঁজছিলাম।"

"খুঁজছিলে? মিথ্যে কথা। মা এইসব ছোটখাট কাজগুলো তোমায় সেরে রাখতে বলেছেন বলে মনে মনে রাগ করনি তুমি? এই বয়স থেকে তোমার কাজে এত ভয়?"

"ভয় ঠিক নয়, ভাল লাগে না আর—"

"কি আর? কাজ করতে লজ্জা?"

"লজ্জা নয়, তবে আমার বন্ধুরা তো কেউ কাজ করে না।"

মুখখানা আবার ধমকে উঠলো, "তোমার বন্ধুরা কাজ করাকে লজ্জা মনে করে আর তুমিও তাই ভাবো।"

কথাটা ঠিক, তাই শীলা চট করে জবাব দিতে পারলো না।

রাগে যেন ফেটে পড়ছে ঝাঁটার মুখখানা। "যে মেয়ে বা যে কোনও লোক ঘর-সংসারের কাজ করতে লজ্জা পায়—তার মত আহাম্মক আর দ্বিতীয় নেই। কাজ কাজ—তা যেরকম হোক। এইসব শিক্ষা কোথা থেকে হয়েছে তোমার?"

হতভম্ব হয়ে গেছে শীলা, মুখ দিয়ে কথা সরছে না তার। ঝাঁটা গর্জে উঠলো, "কাজকে ভয় করে তার কি শাস্তি এখনি দেখবে।"

"ওমা ওকি!" শীলা বলে উঠলো। দেখলে ঝাঁটাটা সজোরে সমস্ত ঘর ঘুরতে ঘুরতে চলেছে। পরিষ্কার হওয়া দূরে থাকুক—যেখানে যা জিনিস ছিল পড়ে ভেঙে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। এ-ঘর ও-ঘর করে শেষে ভাঁড়ার আর রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো আর ধুপধাপ দুমদাম শব্দে চারদিক মুখর হয়ে উঠলো।

"যাঃ কি হবে? টিপট, চায়ের পেয়ালা স... গেল। শব্দ হচ্ছে কি ভীষণ জোরে। আ... মায়ের কাছে বকুনি নয় মার খেতে হ... রক্ষে নেই দেখতে পাচ্ছি..." ভাবলে শীলা।

কিন্তু চুপ করে বসে থাকলে তো স... যাবে—দেখি যদি কিছু করা যায়?

মনে সাহস এনে উঠে পড়লো সে, তার... খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকতেই দেখলো, মা... পছন্দ করা অতি প্রিয় কাঁচের বাসন থে... ঝন ঝন করে দু'চারটে পড়ছে—আর দু'খ... চারখানা হয়ে যাচ্ছে। ঝাঁটাটা সবগুলো ঠেলা মারছে আর এ ওর গায়ে লেগে... আর্তনাদ করে পড়েই টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

এবার শীলার চোখে জল এসে...

খাটের নীচেই থাকো আর যাই কর..

ওগুলো মা যে কাউকে হাত দিতে দেন না। কতদিন শীলা বলেছে, ঐ ডিসে করে সে খাবে, কিন্তু মা তা কিছুতেই দেন না। আর সেই ডিস-কাপগুলোর এই দশা হচ্ছে।

শীলা চিৎকার করে বলে উঠলো,"কী করছো, কী করছো, সব যে গেল, ওগুলো মায়ের শখের জিনিস।"

"হোক শখের। যে-বাড়িতে তোমার মত মেয়ে থাকে, কাজে ভয় পায়, কাজ করতে হলে সম্মানহানি হবে ভাবে—সে-বাড়িতে এই রকমই হওয়া দরকার।"

ঝাঁটা এগিয়ে যেতে আরম্ভ করলো।

শীলা অনুনয় করে বলল, "আর তুমি এগিও না, মা এসে তাহলে ভয়ানক দুঃখ পাবে আর আমাকে—"

"তোমাকে বকুনি খেতে হবে—তাইতো? কিন্তু যে মেয়ে—"

বাধা দিল শীলা, "আমি তো বলেছি, এবার থেকে সব কাজ আমি নিজে হাতে করবো, আর কোনো কাজ করতে লজ্জা পাবো না।"

"সত্যি বলছ মন থেকে? না ভয়ে?"

"না মন থেকে বলছি—ভয়-টয় নয়।"

"মন থেকে বলছ যখন তখন আমিও বিশ্বাস করছি—আচ্ছা দেখি। তাহলে নাও সব গোছগাছ করে রাখো মা আসবার আগে।"

চোখ খুলে শীলা দেখলো বুবু ঝুনু মহা গোলমাল লাগিয়েছে। "মা তোমাকে বলে গিয়েছিল আমাদের খাবার দিতে, সব গোছ-গাছ করতে, সন্ধ্যা হয়ে গেল—খিদেয় মরে যাচ্ছি, শুয়ে আছো, খেতে দাও।"

ওমা তাই তো! সন্ধ্যা হয়ে এলো যে! মনে মনে ভাবলো শীলা আর চারদিকে তাকিয়ে দেখলো, কই বিশেষ কিছু এদিক ওদিক হয়েছে বলে মনে হলো না।

খাবার ঘরেও সব ঠিক আছে। ভাই-বোনেদের খাবার দিতে দিতে শীলা ভাবলো, তাহলে এতক্ষণ কী হলো?

বুবু ঝুনুকে তখন বলছে, "দেখ ঝুনু, কাজ করতে হবে বলে দিদির খুব ভাবনা!"

শীলা ধমকে বললে, "যাও বড়দের নিয়ে কথা বলতে হবে না।"

তারপর সারা সন্ধ্যা ধরে শীলা ঘরদোর পরিষ্কার করে গুছিয়ে-গাছিয়ে সব ফিটফাট করে রাখলে।

মা বাড়ি ফিরে খুব খুশি—শীলাকে খুব আদর করলেন।

এখন মাকে প্রায়ই বলতে শোনা যায়, "কি গোছানো আর ফিটফাট মেয়ে হয়েছে শীলা, অনর্থক বকতুম। এমন গোছগাছ করে কাজ করছে যে, আমি হেরে যাচ্ছি।"

শীলা কিন্তু চোখ বুজলেই সেই দৃশ্যটা ভাবে—নাঃ আর নয় এতদিন সে ভুল করেছিল।

একানড়ের দাদা

॥ শ্রীবীণা দে ॥
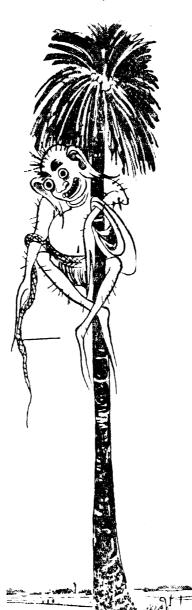
ওরে ভাই একানড়ে
কেন তুই গাছে চড়ে?
আয় নেমে আয় আমার কাছে,
আর কতদিন থাকবি গাছে?
কান দুটো তোর নোটা নোটা
হল গাল খেতে খেতে,
চোখ দুটো তোর আগুনের ভাটা
হয়েছে রোদে তেতে।

কোমরে তোর বিচিলি দড়ি
আহা ভাই পেট গেছে কেটে
ফিরিস লোকের বাড়ি বাড়ি
পা দুটো তাই গেছে ফেটে।
কাঁদুনে ছেলে ধরে'
ঝুলির ভিতর নিয়ে ভরে'
তালগাছে চড়ে' চড়ে'
বুকটা তোর গেছে ছড়ে!
তোকে সবাই ভয়ই করে
বুকে যে তোর রক্ত ঝরে
কেউ তো দেখে নাকো,
বুক মুখ মুছায় নাকো।
আহা ভাই তুই বড্ড একা
কেন ভাই দিসনে দেখা?
আমি ভাই কাঁদি নাকো,
তাই কি আমায় বাঁধিস নাকো?
আমি ভাই বাঁধব তোরে
আমার কাছে রাখব ধরে।
আয় তুই আমার কাছে
যাসনে আর ফিরে গাছে।
ঘরে তোকে লুকিয়ে রেখে
নাপিতভায়া আনব ডেকে
নখগুলো তোর দেব কেটে
ঝাঁকড়া চুল ফেলব ছেঁটে
দুধের সর মাখিয়ে গায়ে
তেল বুলিয়ে দেব পায়ে;
ঘায়ে দৈ-হলুদ দেব
চোখে কাজল পরিয়ে দেব
গাটি তোর নরম করে'
জড়িয়ে রাখব ধরে'।
আমি তোর দাদা হব
তোকে ভালবাসব ভাই,
একানড়ের দাদা আমি
তুই আমার ছোট্ট ভাই।

ফুল ফুল ফুল,
তোর কাছে যে হার মেনে যায়—
হাজার সোনার দুল!

ভুল ভুল ভুল,
তোকে ফেলে ঝোলাই কানে—
হীরের নকল ফুল!

হায় হায় হায়,
সৌরভে তোর পাগল হলে—
আর কিছু কে চায়?

ফুল ফুল ফুল!
এমন মধুর মিষ্টি-হাসির
আর কে সমতুল?

মধুমতীর হাটে

বন্দে আলী মিয়া

ছোটো একখানি ডিঙি বাঁধা আছে ঘাটে
সেই নায়ে চড়ি দীলুরে লইয়া খোকন যাইবে হাটে।
গ্রাম পার হয়ে রথতলা ছেড়ে হোথায় মহেশপুর
তার পরে আছে মধুমতী হাট—খুব সে গো বহু দূর।
দীলু ও খোকন ছোটো দুটি ভাই প্রহরেক হতে বেলা
সেই হাটপানে নৌকা লইয়া পথে দেবে তারা মেলা।
ভেসে যাবে ডিঙি—দীলু খুশী হয়ে বৈঠা চালাবে হাতে
মাথার ওপরে সাদা সাদা মেঘ ভেসে যাবে তার সাথে।
ধান ক্ষেত আর পাট ক্ষেত ফাঁকে ছোটো ছোটো কুঁড়ে ঘর
আঙিনায় তার ছড়ানো রয়েছে সোনালী আউস খড়।
কৃষাণ ছেলেরা কাস্তে লইয়া এসেছে ধানের ক্ষেতে
সন্ধ্যায় তারা মাছের লাগিয়া রেখেছে খাদুন পেতে।
খাদুনের মাঝে কৈ টাকি মাছ আটকে পড়েছে যত
সারা রাত হতে বিহান অবধি লাফাইছে অবিরত।
কৃষাণ ছেলেরা মাছ ধরে নেবে—ঘাস কেটে নিয়ে যাবে
খাল হতে 'ঢ্যাপ্' তুলিয়া তুলিয়া বেদম তাহারা খাবে।

ভেসে যাবে ডিঙি—আরো কিছু দূরে রূপালী কাশের বন
বাতাসের সাথে লুটোপুটি করে খেলা করে সারাক্ষণ।
ডিঙি ভিড়াইয়া দুই ভাই তারা কাশফুল তুলে লবে
শাপলা ফুলেরা উতল বাতাসে দোলে দুলে সারা হবে।
দীলু ও খোকন মুঠি ভরি তার তুলিবে শাপলা ফুল
হেথায় হোথায় ফুটেছে কুমুদ—তুলে নেবে বিলকুল্।
শাপলা কুমুদে সাত নরী হার গাঁথিয়া পরিবে গলে
তার পরে তারা বাঁধন খুলিয়া ডিঙি ভাসাইবে জলে।
শরৎ দিনের সাদা সাদা মেঘ আকাশেতে ভেসে যায়
ছায়া এসে পড়ে গাঙের বুকের কাকচক্ষু আয়নায়।
মাথার ওপরে সারি বেঁধে বক উড়ে যায় পাখা মেলি
পানিকৌড়ীরা সারা দিন ধরি করিতেছে জলকেলি।
স্রোতে ভেসে ভেসে চলে যাবে ডিঙি নদীর ভাটির টানে
অবাক হইয়া চেয়ে রবে দীলু দূরের গাঁয়ের পানে।
নাহিতে আসিয়া বৌ-ঝির দল কথা কয় তারা কত
ছোটো ছেলেমেয়ে সাঁতরায় আর খেলা করে অবিরত।
ঘাট ছাড়াইয়া ভেসে যাবে ডিঙি দূর হতে বহু দূর
বাগদী পাড়ার শ্মশান ছাড়ালে ডাহিনে মহেশপুর।
মহেশপুরের বাঁক পার হলে বামে মধুমতী হাট
সেইখানে তারা ভিড়াইবে নাও যেথায় নদীর ঘাট।
ঘাটেতে নামিয়া দীলু ও খোকন যাইবে হাটের মাঝে
কত লোকজন এসেছে সেথায় বেচা ও কেনার কাজে।
ঝাঁকার ওপরে কুমড়ো মরিচ কলা আর পুঁই শাক
মাটির কলসী সরা আর হাঁড়ি সেজায় তাদের জাঁক।
কাগজের পাখি নানান্ রকম—কঞ্চির ছোটো বাঁশি
মাটির পুতুল, সোলার ময়না—রাঙা ফুল রাশি রাশি।
চালুনী ও কুলা, বেতের চুপড়ি, বাঁশের সাজির মেলা
খুশি মতো তারা কিনিবে এ সব—কাটিয়া যাইবে বেলা।
গাঙের কিনারে মধুমতী হাট—অচেনা লোকের ভিড়
বেলা চলে যাবে সন্ধ্যা ঘনাবে—কালো হবে নদী তীর।
দশমীর চাঁদ জাগিয়া উঠিবে দূর আকাশের গায়

রূপালী আলোক ঝরিয়া পড়িবে ফুল-ফোটা জোস্‌নায়।
দীলু ও খোকন উজান বাহিয়া ফিরিয়া আসিবে বাড়ি
হাটে গিয়ে আজ দুটি ভাই তারা খুশী হবে খুব ভারী॥

শ্রীশ্রীভন্তোদা বাবাজী

'বুদ্ধুভূতুম'

মাস আস্টেক অদর্শনের পর, ভন্তোদার যখন পাড়ায় আবার দর্শন পাওয়া গেলো, ওঃ সে কী নামডাক যে তার ছড়িয়ে পড়লো, তা আর কি বলবো!

সবাই একমুখে বলতে লাগলো, "এমন নইলে ছেলে! ধন্যি ভন্তোর মা-জননী; একেবারে রত্নগর্ভা! এক ব্যাটা সাত ব্যাটার কাজ করলে। কুল পবিত্র করলে। জননীকে কৃতার্থ তো করলেই তার ওপর দেশ মানে, গলি, ওস্তাদের গলিকেও ধন্য করলে।"

এ কি যে সে কথা, বাবা! সেই যে একবার একুশ বছর বয়সে পিট সাহেব কি যেন হয়ে বিখ্যাত হয়েছিল, আর তার চেয়েও কম বয়সে এই ভন্তোও এবারে বিখ্যাত হয়ে পড়লো। হবে না? সেই ঘোর দণ্ডকারণ্যে গিয়ে, শ্রীশ্রীঘেরেণ্ডুক স্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়ে, সিদ্ধ-সাধু হওয়া কি চাট্টিখানি কথা? ভন্তো আর সে ভন্তো নেই, একেবারে শ্রীভন্তোদাস বাবাজী হয়ে ফিরে এসেছে। নাম শুনলেই তার দশা হয়। মাথা দিয়ে জ্যোতি বেরোয়। আর তখন যাকে যা বলে, তাই নাকি ফলে যায়।

ব্যাপার শুনে ভন্তোর ভূতপূর্ব চেলার দল তো থ মেরে গেলো। তারা ভাবতেই পারলে না যে, ভন্তোদার আবার এমন মতিগতি হতে পারে। সেই ভন্তোদা, যে নাকি কালীপুজোর দিন কুকুরের ন্যাজে ফুলঝুরি বেঁধে ন্যাজ-বাজি তৈরি করতো, দু পয়সার চিনেবাদাম কিনতে গেলে, দু আনার চোখেই উড়িয়ে দিতো, গল্প দিতে দিতে যার নাকি গল্প-সম্রাট নামই হয়ে গিয়েছিল, সেই নাকি আজ সাধু! সিদ্ধ-বাবাজী হয়ে গেছে!

ভেবলু তো বলেই বসলো, "ধ্যাৎ! এসব ভন্তোদার এক ভড়কি-বাজি, বুঝলি? সন্ধ্যেরাতে যে বটগাছের তলা দিয়ে হাঁটতে ভয় পায়, সে গেছে দণ্ডকারণ্যে সাধু হতে। আসলে ভন্তোদা যে বাড়ি থেকে না বলে 'পায়ে আকার' দিয়েছিল, সেইটে সামলাবার জন্যে ভন্তোদা এখন সাধুজী সেজে বাড়ি ফিরেছে। নইলে এক ফাস্‌কেতরে অমনি রাতারাতি সাধুবাবা হলেই হলো আর কি!"

"যা বলেছিস।" ঘোণ্টে সায় দিলে, "সব গাঁজা।—বাবা ভন্তু ফিরে এসো—বলে কেউ তো আর কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে না, তাই সুড়সুড় করে সাধু সেজে আপনা-আপনি বাড়ি ফিরতে হলো।"

ভন্তোদার ওপরে কেলোর কেমন একটা ভক্তি-ভক্তি ভাব ছিল; তাই সে বলে উঠলো, "না-রে সত্যিই! আমি একদিন গিছলাম ঠাকমার সঙ্গে ভন্তোদার বাড়িতে নেণ্টুর হেঁচকির জন্যে জলপড়া আনতে। ঠাকমার তো জলপড়ায় বেশ বিশ্বাস হয়েছে। আমারও ভাই কেমন লাগলো! ভন্তোদা আর সে ভন্তোদা নেই। চেহারাটা ভন্তোদার কেমন পান্‌তো পান্‌তো হয়ে গেছে।"

ঘোণ্টে বলে, "হবে না? খালি যে আম, সন্দেশ আর মালপো সাঁটুচ্ছে। আমাকে দেখে সেদিন আধখানা জিলিপি কামড়ে বললে, "খোকা, পেসাদ নিয়ে যাও।"

ঘোণ্টের কথা শুনে ভেবলু লাফিয়ে উঠলো, "এ্যাঁ তোকে এঁটো জিলিপি খাইয়ে খোকা বলেছে। আর আমাকে কি বলেছে জানিস? শুনলে তুই টগবগ্‌ করে লাফাবি!"

কেলো আর ঘোণ্টে একসঙ্গে জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে।

ভেবলু বলতে থাকে, "আরে আমি কি যাই ভন্তোদার ভড়কি দেখতে? নেহাত পাঁচীদিকে নিয়ে যেতে হলো ভাই। গিয়ে দেখি: ভন্তোদা এক গেরুয়া আলখেল্লা পরে, কপালে চন্দন চটকে, গলায় ইয়া এক লম্বা মালা ঝুলিয়ে, মৃগচর্মে একেবারে গ্যাঁট হয়ে বসেছে। আচ্ছা আচ্ছা বুড়োরা সব তার সামনে হাতজোড় করে ভক্ত হনুমানের মত বসে আছে। সে কী ভন্তোদাস বাবাজীর খাতির রে! কেউ বাক্স ভরা সন্দেশ দিচ্ছে, কেউ বা প্যাঁড়া। কেউ বা আবার ঠোঙা ভর্তি ল্যাংড়া আম দিয়ে পেন্নামও করছে। আমাকে চিনেও চিনতে পারলে না। উল্টে পাঁচীদিকে বললে, 'শিশুটি কে?' বল ঘোণ্টে, আমি হলাম শিশু আর উনি হলেন দাদু!"

"তবে আর বলছি কি!" ঘোণ্টে একটু রাগের সুরেই বলতে থাকে, "আমরা না হয় খাতির করে দাদাই বলতুম, নইলে পাড়ার সবায়ের কাছে ছিলি তো ভন্তে-ছোঁড়া। আজ না হয় ভোল বদলে ভন্তোদাস বাবাজী সেজে তোমার বাবা একটু ছাগলে দাড়ি হয়েছে, তাই বলে আমাদের চিনতেই পারবে না।"

"মওকা মিললে চিনিয়ে দেবো দেখিস।" ভেবলু বেশ একটা জোর দিয়ে বলতে থাকে, "বাবাজী সেজে ফোকোটিয় আম-সন্দেশ খাওয়া বের করে দেবো যখন বুঝবে, হ্যাঁ!"

ভেবলুর মনের বাসনাটা যে ভগবান এতো শিগ্‌গির পূর্ণ হবার সুযোগ করে দেবেন, তা ভেবলু বা ঘোণ্টে কেউ-ই কল্পনা করতেও পারেনি। কেলোর ঠাকুমার সাধু সেবার ইচ্ছেটাই তাদের বাসনা পূর্ণ হবার সুযোগ করে দিলে। ভন্তোদাস বাবাজী কেলোদের বাড়িতে তেঁ-রাত্রিরের জন্য পায়ের ধুলো দিতে এলেন।

নবীন সন্ন্যাসী দেখবার জন্যে সকাল থেকে সেদিন কেলোদের বাড়িতে যেন মচ্ছব পড়ে গেল। কেলো, ভেবলু বা ঘোণ্টের মতন ছেলেদের সেখানে পাত্তা পাওয়াই দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো। ভন্তোদাস বাবাজীর ঘরের কাছে-কিনারে তাদের ঘুরু-ঘুরু করতে দেখলেই বাড়ির লোকেরা পাহারা-ওয়ালাদের মতন হাঁকতে লাগলো, "সরে যা। সরে যা তোরা এখান থেকে। এখানে ধেই ধেই করা কেন? সাধু-সন্নেসীর ব্যাপার, শেষকালে হাফ-প্যাণ্টে সব ছুঁয়ে-নেপে একটা অনাছিষ্টি বাধাবি!"

এ সময়ে বন্ধুদের বাড়িতে ডেকে আনার জন্যে কেলো তার গেঁজোপিসীর কাছে একচোট রামতাড়া খেলে। বাড়ির চাকর কেষ্টার ওপরেও কড়া হুকুম হয়ে গেলো যে, আল্টু-ফাল্টুরা যেন সাধুবাবার ঘরে না ঢোকে।

ভন্তোদার ওপর ভক্ত কেলোর ভক্তিটা একটা ব্যাপারে বেশ ঢিলঢিলে হয়ে ছিল। তার ওপর বাড়িতে বন্ধুদের এই খাতির দেখে সে আর থাকতে পারলে না। ব্যাপারটা ফাঁস করে দিলে। হাত-পা নেড়ে সে নিজে থেকেই শুরু করলে, "জানিস, ভন্তোদার সব বুজরুকী! সিগ্রেট খায়! দুপুরবেলা কাল আমি নিজের চক্ষে দেখেছি!"

ঘোণ্টে চোখ দুটো বড় বড় করে তোলে। বলে, "এ্যাঁ বলিস কি, গাঁজা নয়তো! একহাত পাকায়, না দুহাত?"

কেলো লজ্জা পায়। মিনমিন করে বলে, "কখনো ডান হাত, কখনো বাঁ হাত।"

খোকা, পেসাদ নিয়ে যাও

ভেবলু তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। বলে, "ঠিক হয়েছে। এ সবে হবে না রে, ভক্ত সাজতে হবে রে, ভক্ত। যেমন ব্যাপার তেমন সাজ তো চাই, নইলে এখানবার গেটপাস পাবিনে।"

তারপর তিন বন্ধু গুজগুজ ফুস্‌ফুস্‌ করে কি পরামর্শ আঁটে। কেলোকে ভরসা দিয়ে ভেবলু বলে, "তোর বাড়ি বলে কিছু ভড়কাসনি। আমি আর ঘোণ্টে সন্ধেবেলা ঠিক ঠিক আসবো। তাই খালি একটু চোখ রাখবি।"

সন্ধ্যে হয় হয়। এমন সময় ভেবলু আর ঘোণ্টে এসে হাজির হলো কেলোদের বাড়ি। ভেবলুর ভোল দেখে কেলো তো অবাক। প্রায় চেনাই যায় না তাকে আর। সামনের লম্বা লম্বা চুলগুলো তার চোখ মুখ একরকম ঢেকে ফেলেছে। পরনে একখানা লাল চেলি। তারই সংগে মিলিয়ে গায়ে একটা উড়ুনী। কপালে ইয়া এক তেল চকচকে সিঁদুরের ফোঁটা। ঘণ্টের সাজও প্রায় ঐ রকমই; তবে দেখা গেলো, সে পাঁজাকোলা করে লতাপাতায় ঢাকা মস্ত একটা আমের ঝুড়ি বয়ে আনছে।

কেলো ওদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। ঘোণ্টের কথায় ওর চমক ভাঙলো। ঘোণ্টে ধমকে উঠলো, "হাঁ করে দেখছিস কি? এ-সব সাধুসেবার জন্যে এনেছি। লাইন-ক্লিয়ার কিনা দেখে আয়।"

ঘোণ্টে কয়লা-ঘরের পাশে ঝুড়িটা নামিয়ে রেখে একটু দম নিতে লাগলো। কেলোও সুড়ুৎ করে সংবাদ নিতে ওপরে উঠে গেলো।

ওপর থেকে সিগন্যাল পাওয়া মাত্তর ঘোণ্টে ঝুড়িটা ভেবলুর বুকে তুলে দিলে। ভেবলু দু-হাতে সেটাকে আঁকড়ে ধরে হন্‌হনিয়ে ভন্তোদাস বাবাজীর ঘরের দিকে পা বাড়ালো। কেলো আর ঘোণ্টে নীচেই সাধু-দর্শনের ফল দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

ভেবলুর পোশাক আর ঝুড়িটা একটা মস্ত গেট্‌পাস হয়ে গেলো এবার। যারা ওকে দেখলো, ভাবলো যে, সে বুঝি সাধু-বাবার জন্যে কিছু ভেট দিতে এসেছে। তাই কেউ কোন কিছু জিগ্‌গেসও করলে না তাকে।

ভন্তোদাস বাবাজীর ভক্তের ভিড় তখন বেশ একটু পাতলা ছিল। বাবাজী চোখ দুটো না-খোলা না-বোজা অবস্থায় ভক্ত-মুখে হরিনাম শুনছিলেন। ভেবলু সিধে ঘরে সেঁধিয়ে গেলো এবং মুহূর্তের মধ্যে ঝুড়িটা বাবাজীর একেবারে সামনে নামিয়ে রেখেই, উবুড় হয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো, "বাঁচাও ঠাকুর, বাঁচাও!"

হুড়মুড় করে একজনকে ঘরে ঢুকে অমনিভাবে ভন্তোদাস বাবাজীর পায়ে পড়ে কাঁদতে দেখে ভক্তরা কেমন ভ্যাবাচাকা মেরে গেলো। সাধুজী কি বলেন তাই শোনার জন্য সবাই কান খাড়া করে রইলো।

ভন্তোদাও দেখলে, পাপী উদ্ধার করার মস্ত মওকা মিলেছে। আমের ঝুড়িটার ওপর একবার সলোভ দৃষ্টি দিয়ে, ভেবলুর মাথায় হাত রেখে ভন্তোদা গেয়ে উঠলো, "সবই তাঁর ইচ্ছে।"

ভেবলু প্রসারিত দুই বাহু দিয়ে ভন্তোদার শ্রীপাদপদ্ম শক্ত করে জড়িয়ে ধরে এবং মুখটা দু হাতের মধ্যে আরও বেশী গুঁজে দিয়ে তেমনিভাবে ককিয়ে উঠলো, "না প্রভু, সবই তোমার ইচ্ছে।"

বাবাজীর বোধ হয় কৃপা হলো। অতি নরম গলায় প্রশ্ন হলো, "কি হয়েছে বাবা?"

ভেবলু কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিলে, "তিনটি অবোধ শিশু মাতৃহারা হয়েছে বাবা!" ঘরসুদ্ধু লোক "আ-হা-হা" করে উঠলো।

ভন্তোদাস বাবাজী একবার "মা-মা" করে চোখ বুজলো।

ভেবলু ফুঁপিয়ে উঠলো, "মায়ের আত্মা

ভন্তোদার কোলে-কাঁকালে উঠে পড়ল

ভূত হয়েছে ঠাকুর। রোজ রাতে কেঁউ কেঁউ করে সন্তানদের খুঁজে বেড়ায়। তাদের বাঁচাও সাধুবাবা, বাঁচাও!"

ভন্তোদাস সিদ্ধবাবাজী চোখ বুজে কি ভাবলো, তারপর চোখ বোজা অবস্থাতেই জিগ্‌গেস করলে, "সেই অসহায় শিশু-গুলি কোথায়?"

উত্তরে, ভেবলু কনুই দিয়ে আমের ঝুড়িতে একটা গোত্তা দিলে। 'কেঁউ-কেঁউ-এ্যাঁউ' করে ঝুড়ির ভিতর একটা চাপা আওয়াজ উঠলো।

ভন্তোদার কেমন-কেমন লাগলো। চোখ বড় বড় করে ভন্তোদা প্রশ্ন করলে, "তুমি কে?"

ভেবলু হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো, "আপনার চিরকালের সেবক।" কাঁদতে কাঁদতেই ঝুড়িতে জোরসে আর একটা গুঁতো দিলে। এবার ঝুড়ি থেকে কেঁউ-কেঁউ আওয়াজটা বেশ জোরেই শোনা গেলো।

কেলোর ঠাকুমা, "এ্যাঁ এর মধ্যে করে কচি বাচ্চা নিয়ে এসেছে গা!" বলেই তড়-বড়িয়ে ঝুড়ির মুখের পাত্তা সরাতে গিয়ে, ঝুড়িটা বাবাজীর আসনের ওপরেই উল্টে ফেললেন। সংগে সংগে তিনটে খেঁকী কুত্তার বাচ্চা, তারস্বরে কেঁউ-কেঁউ করতে করতে গিয়ে, ভন্তোদার কোলে-কাঁকালে উঠে পড়লো। ভেবলু সাট্‌পাট্‌ হয়েই পিছু হটতে লাগলো। আর প্রায় সেই সংগেই এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেলো।

বাবাজী ভন্তোদা, সকলের আগে অপবিত্র, অস্পৃশ্য, নিঘিন্নে খেঁকী কুকুরের ছোঁয়াচ এড়াবার জন্য কেতরে পড়লো। তারপর সেই অবস্থাতেই সবেগে একখানা লাথি ছুঁড়লো। কিন্তু লাথিটা কুকুর ছানাদের মাথা ফস্কে লাগলো গিয়ে সেই ওল্টানো ঝুড়িটার পেটে। ঝুড়িটা ফুট-বলের মত কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকলো। সেখান থেকে মুখ উল্টে, গোটা দুই পাঁঠার টেংরী, আর গোটা চারেক গাঁজার কল্কে বর্ষণ করতে করতে ঝুড়িটা পড়লো গিয়ে অদ্ভুত বেয়াড়া রকমভাবে ভালোমানুষ, সেজো পিসেমশায়ের মাথায়।

ঝুড়ির টোপরের মধ্যে মুণ্ডুটা ঢুকে যাওয়ায়, সেজো পিসেমশাই ভয়ে আধমরা হয়ে উঠলেন। "গেলুম রে! মারলে রে!" বলে মেঝের ওপর শুয়ে পড়ে গোঁ-গোঁ শব্দে তিনি হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করে দিলেন। ঘরসুদ্ধু লোক পিসেমশায়ের ধড় একদিকে আর ঝুড়ি একদিকে ধরে টানাটানি শুরু করে দিলে।

সেজো পিসেমশায়ের কাটা-ছাগলের মত হাত-পা ছোঁড়া দেখে, ভন্তোদাস বাবাজী ভীষণ ভড়কে গেলো। আর কাল-বিলম্ব না করে প্রায় মুক্তকচ্ছ হয়ে, হোঁচট খেতে খেতে সিঁড়ির দিকে দৌড় দিলে।

"ভন্তোদা, তোমার গাঁজার কল্কে—গাঁজার কল্কে।" বলতে বলতে ভেবলু তার পিছু ধাওয়া করলে।

ঠাকুমা চেঁচাতে লাগলেন, "হতচ্ছাড়া, খুনে গাঁজাখোর! আবার সাধু সেজেছে—বের করে দে—বের করে দে!"

ধন্য, মান্য, উচ্চ, তুচ্ছ

মনোজিৎ বসু

বিড়ালের বাড়িতে সেদিন এক সভা বসেছে।

সভা যেমন গোপন, তেমনি জরুরী। উপস্থিত পশু-পাখি, সংখ্যায় জন কুড়ি।

জঙ্গল-মহালের রাজা সিংহকেশরী। তার ভয়ে সবাই থরহরি কম্পমান। সাধারণ পশুপাখি সবাই তাকে অসাধারণ বলে মনে করে। দেখা হলেই পায়ে পড়ে। কবে তার কোন্ পূর্বপুরুষ বুনো-সমাজে এক নিয়ম চালিয়ে গেছেন, আজও সেই নিয়মের নড়্-চড়্ নেই। রাজা বদলায়, কিন্তু নিয়ম বদলায় না। আদ্যিকালের কোন্ সিংহ-অবতার পশুপাখিদের চার ভাগে ভাগ করে দিয়ে গেছেন, এখনও তাই আছে। ধন্য বর্ণ, মান্য বর্ণ, উচ্চ বর্ণ, তুচ্ছ বর্ণ। এই বর্ণ-সমস্যা নিয়েই বিড়ালের বাড়িতে সভা।

শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্বাদে হনুমান ধন্য। সরস্বতীর বরে রাজহাঁস ধন্য। তাই তারা ধন্য বর্ণের। বুনো-মন্দিরে তারাই পূজারী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের আশীর্বাদে—প্রজাপতি, গরুড়, ষাঁড় তারাও ধন্য বর্ণের। সিংহ স্বয়ং রাজা, তার ওপরে মা-দুর্গার সেবক—কাজেই, মহামান্য তিনি। বাহুবলে আর গায়ের জোরে বাঘ, হাতি, গণ্ডার, ভালুক, ঘোড়া, মহিষ—তারাও মান্য বর্ণের। বাবা, যমের বাহন মহিষ, তাকে না মেনে উপায় আছে? গোরু, ভেড়া, হরিণ, ময়ূর, পেঁচা, ইঁদুর—নানা কারণে বুনো-সমাজে তাদের কত আদর। পশুপাখিদের বর্ণ-বিচারে তারাই উচ্চবর্ণের। আর, তুচ্ছ হয়ে রইলো যত বিড়াল, গাধা, কাক, কুকুর, শকুন। ছোট বড় আরও কত পশুপাখি।

বক্তৃতা দিতে উঠে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে বললে, "মা-ষষ্ঠীর বাহন হয়েও বেরাল তুচ্ছ! বাঘের মাসি হয়েও বেরালী তুচ্ছ! অপরাধ,—বেরাল-বেরালী বুনো-সমাজের জেলে-জেলেনী। মাছ ধরে খায়। গায়ে যত-রাজ্যের আঁশটে গন্ধ! বেরাল-বেরালীর ভাগ্যই তাই মন্দ।"

গাধা বললে, "আমার ব্যাপারই দেখ না। আমি হলেম মা-শীতলার বাহন, তবু আমার তুচ্ছ-দশা ঘুচলো না। বুনো-সমাজ শীতলাকে দেবতা বলে গেরাহ্যি করে না। আর, করে না বলেই না যত মহামারী। বুনো-সমাজ বলে—আমি সবার মোট বয়ে বেড়াই, কাজেই আমি ছোটজাতের। আমার বাড়িতে একদিন এক ঘোড়া জল খেয়েছিল বলে তার নাকি জাত গেছে!"

কর্কশ-স্বরে কাক বলে উঠলো, "কেন, কিসের জন্য পশু-সমাজে আমাদের এই অনাদর? মিহি গলায় মেয়েলী সুরে কোকিল গান গায়। তাতেই সে উচ্চবর্ণে ঠাঁই পেলে। আর আমি যে কাগেশ্রী-রাগে সকাল-সন্ধ্যা উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত শোনাচ্ছি, তার কোনো দাম-ই নেই। হায়রে, আমার কপালেই যত হেনেস্তা। গানের কথা না-হয় বাদ-ই দিলাম। এদিকে, আমি যে রোজ রাজ্যের যত এঁটোকাটা পরিষ্কার করে চলেছি, সেদিকে কারও হুঁশ-ই নেই!"

ফ্যাঁচ্ করে দুবার হেঁচে নিয়ে শকুন বললে, "হুঁশ থাকলে কি আর পশু, পশু থাকত? একেবারে মানুষ হয়ে নরধামে বিচরণ করত। কি আর বলব দুঃখের কথা। প্রাণে আমার বড় ব্যথা। বুনো-সমাজের ভাগাড় আগলে পড়ে থাকি, যত রাজ্যের মড়া গিলে তাদের সৎকার করি, তবু আমি অচ্ছুৎ। আমার ছায়া মাড়ালে নাকি হনু-বাবাজীর তিনবার গঙ্গা নাইতে হয়!"

সভাপতি বিড়াল-মোড়ল এতক্ষণে আসন ছেড়ে উঠলো। গোঁফে একটা চাড়া দিয়ে বললে, "ভগবানের রাজত্বে সবাই সমান। এই কথাটাই আজ আমাদের সবাইকে বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে। আমরা আছি বলেই না বুনো-সমাজ টিঁকে আছে। শকুন যদি ভাগাড় আগলানো বন্ধ করে, বুনো-মড়ার সদ্গতি করবে কে? কাক-কুকুর যদি আস্তাকুঁড় পরিষ্কার না করে, এঁটোকাটা সাবাড় না করে দেয়—তিন বর্ণের পশুপাখি তাহলে টিঁকতে পারবে? গাধারা যদি মোট বওয়া বন্ধ করে, তাহলে ধন্য, মান্য, উচ্চেরা কোথায় যাবে শুনি? আমি যদি মাছ ধরা বন্ধ করি, বুনো-গিন্নীদের তাতে আনন্দ হবে? বিধবা না-হয়েই মাছ-খাওয়া বন্ধ, সইতে পারবে তারা? মা-ষষ্ঠীকে বলে গোপন-মন্ত্র নিয়ে আমি যদি রাজ্যে মহামারী ছড়াই, তাহলে কি ধন্য, মান্য, উচ্চেরা খুশী হবে?"

সকলেই বুঝলো বিড়ালের মতলবটা কি। তাই, উপস্থিত তুচ্ছ বর্ণের পশুপাখিদের মুখের কোণে একটা হাসি খেলে গেল।

বিড়াল বললে, "আমাদের অচ্ছুৎ করে রাখলে চলবে না। দেবতার মন্দিরে পূজা দেবার অধিকার আমাদেরও আছে। সে-অধিকার থেকে সিংহ-কেশরী আমাদের বঞ্চিত করতে পারেন না। যে-পুকুরের জল সবাই ব্যবহার করে, আমাদেরও সেই পুকুর ব্যবহার করতে দিতে হবে। যে-পথে সবাই চলে, আমরাও সেই পথ ধরে চলব। যে-পাঠশালায় সবাই পড়ে, আমাদের ছেলেমেয়েরাও সেই পাঠশালায় পড়বে।"

কাক বললে, "কিন্তু, আমাদের কথায় কান দিচ্ছে কে?"

বিড়াল হেসে জবাব দিলে, "সব্বাইকেই শুনতে হবে। আমাদের দাবি জানাতে আজ থেকে আমরা, অর্থাৎ তুচ্ছ বর্ণের পশু-পাখিরা সত্যাগ্রহ করব। যার যে-কাজ কেউ তা করব না। প্রয়োজন হলে অনশন করব, প্রাণ দেব।"

যে-কথা সেই কাজ।

শুরু হয়ে গেল তুচ্ছ পশুপাখিদের নীরব সত্যাগ্রহ। যে-যার ঘরে বসে রইলো, কাজে বের হলো না কেউ। এমনি করে একদিন। দু দিন। তিন দিন। এক সপ্তাহ।

সারা জঙ্গল-মহালের অবস্থা তখন শোচনীয়।

রাজবাড়ির আস্তাকুঁড়, পথঘাট এঁটো-কাটা আর ময়লা-আবর্জনায় ভর্তি হয়ে উঠলো। ভাগাড়ে জমে উঠলো যত রাজ্যের মড়া। পচা দুর্গন্ধে বনের বাতাস হলো দূষিত। এদিকে অসুখ, ওদিকে অসুখ। ধন্য বর্ণের পশুপাখিদের মাথা ধরলো, মান্য বর্ণের পশুপাখিরা রেগে টং। উচ্চ বর্ণের পশুপাখিরা ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে শয্যা নিল।

অশান্ত মন নিয়ে রাজা সিংহ-কেশরী ঘরে পাইচারি করতে লাগলেন। মন্ত্রীদের জরুরী তলব পড়লো। কি করা যায়, তাই নিয়ে সবাই ভেবে সারা।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন রাজা সিংহ-কেশরী। মা-দুর্গা এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর মাথার কাছে। বলছেন, "তোমরা হেরে গেছ। জোর করে কাউকে নীচে ঠাঁই দিলে, সে একদিন এমনি করেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সকলেই যখন পশুপাখি, তখন কেন এক দলকে ছোট করে রাখছ? ছোট কাজ করে বলেই তো ওরা ছোট নয়। ওরাই তো জঙ্গল-মহালকে সুন্দর করে রাখে, ওদের জন্যই তোমাদের যত সুখ ও শান্তি। নতুন যুগের রাজা তুমি, নতুন নিয়মে রাজ্য-শাসন কর, ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই তুলে দাও, জাতের বিচার ভুলে যাও।"

পরদিন সকালেই সিংহ-কেশরী ঘোষণা করলেন, "এখন থেকে বুনো-সমাজে বর্ণভেদ থাকবে না। সবাই হবে এক বর্ণের। সে-বর্ণের নাম ঐক্যবর্ণ। এখন থেকে বিড়াল, কুকুর, কাক, গাধা, শকুনকে কেউ অবহেলা

হ্যাংলা

শৈলেন ঘোষ

কাবলু মামার বাড়ি থেকে ফিরছিল। কাবলু, কাবলুর সঙ্গে মা আর ছোটমামা।

মামার বাড়ির ইস্টিশানের নামটা বেশ—গণেশপুর। বাড়ির থেকে গরুর গাড়ি চেপে সাত মাইল রাস্তা এলে তবে ইস্টিশান।

কাবলুরা টিনের ছাউনি দেওয়া ইস্টিশানের ওয়েটিংরুমে বসে আছে। বাব্বা যা বিষ্টি নেমেছে। একেবারে আকাশ যেন ভেঙে পড়ছে। এদিকে ট্রেন আসতেও দুঘণ্টা দেরী।

কাবলুর খুব ভালো লাগছে। ফাঁকা মাঠের ওপর ইস্টিশানটা। যেদিকে চাও শুধু মাঠ আর মাঠ। সবুজ মাঠ ধানগাছে ভরে আছে। ওয়েটিংরুমের জানলা দিয়ে চোখ মেলে কাবলু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

উঃ! কি জোর বিষ্টি পড়ছে। যতদূর চোখ যায়, খালি জল—ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্। মাঠের মাঝে লম্বা লম্বা গাছগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে কেমন! গাছের ডালে পাতার আড়ালে কাকগুলো ঘাপটি মেরে বসে আছে। বসে বসে ভিজছে। মাঠের ধানগাছগুলো জলের তোড়ে মাটিতে নুইয়ে পড়েছে। ইস্টিশানের পেছনদিকে পুকুরের জলে, বিষ্টি-ফোঁটা মিষ্টি মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে লুটিয়ে পড়ছে। পুকুরের পাড়ে পাড়ে গলা ফাটিয়ে ব্যাং ডাকছে। ঐ দূরে দুটো তিনটে ছেলে না মেয়ে টোকা মাথায় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কাবলু যদি এই সময়ে ঐখানে যেতে পারত। বিষ্টির জলে ভিজে ভিজে চান করতে ভারী মজাই।

নাঃ, কাবলুর যেন ক্ষিধে ক্ষিধে পাচ্ছে! আচ্ছা, বিষ্টি পড়লেই ক্ষিধে পায় কেন? কিন্তু এখন খাবার-দাবারই বা মিলিবে কোথা? এই বিষ্টিতে কি আর দোকানে যাওয়া যায়! হঠাৎ মনে পড়ে গেল, কেন: মা তো আসবার সময় বিল্টুর দোকান থেকে জিলিপি কিনে এনেছে। সত্যি! বিল্টুর দোকানের মচমচে জিলিপি খেতে ভারী মজা!

ইস্টিশানের ওয়েটিং-রুমের নড়বড়ে বেঞ্চিতে বসে, টিনের চালে বিষ্টি-জলের ঝমঝমানি শব্দ শুনতে শুনতে কাবলু জিলিপি খাচ্ছিল। ওমা! হঠাৎ কোত্থেকে একটা বেরালছানা হাজির—একেবারে কাবলুর পায়ের কাছে। শুধু কি পায়ের কাছে? তার হাতের জিলিপিটার দিকে ঠায় চেয়ে! বেরালটার কি বিচ্ছিরি শুঁটকে শুঁটকে চেহারা। শুকনো-শুকনো চোখ দুটোয় কেমন যেন হ্যাংলাপনা হ্যাংলাপনা চাউনি।

"উঃ! জিলিপি খেতে এসেছে! দেবে আর কি!" বলে কাবলু জিলিপিসুদ্ধ ডান হাতটা পেছনদিকে সরিয়ে, বাঁ হাতটা বেরালটার দিকে ছুড়ে ছুড়ে বললে, "ভাগ্, হ্যাট।"

বেরালটার গ্রাহ্যিই নেই। ওমা! তড়াং করে একটা লাফ দিয়ে একেবারে বেঞ্চির ওপরে। অমনি সঙ্গে সঙ্গে কাবলু বেরালটার পেটে মারলে এক ঘুষি। "ম্যাঁও" করে মুখে একটা আওয়াজ করে, সেটা ধপাস করে নীচে এক ডিগবাজি। আর নড়লো না। যেখানে পড়লো—সেখান থেকেই ড্যাব ড্যাব করে জিলিপিটার দিকে চেয়ে রইল। কাবলুর এমন রাগ ধরছে। ক্ষিধের সময় নিশ্চিন্তে খাবার যো নেই। কোত্থেকে এক আপদ জুটলো। বেরাল আবার জিলিপি খায় নাকি? কে জানে বাবা। "থাক্ বসে।" বলে কাবলু উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসলো। ঘুরে বসে আবার জিলিপিতে কামড় দিয়েছে। কি কাণ্ড—বেরালটাও সুড় সুড় করে ওর মুখের সামনে এসে দাঁড়াল। ল্যাজটা ওপর দিকে তুলে—এধার ওধার নাড়িয়ে নাড়িয়ে ঢেউ খেলাতে লাগল। কাবলুও আবার এদিকে ঘুরে বসলো। বেরালটাও ঘুরলো। আবার ওদিকে। বেরালটাও ওদিকে গেল। বাঁপাশ, ডানপাশ, পেছন, সামনে। জিলিপি হাতে নিয়ে কাবলুর সঙ্গে বেরালটার চোর-পুলিশ খেলা শুরু হয়ে গেল। এমন বে-আক্কেলে বেরাল আগে কে দেখেছে বাবা! কাবলু রেগেমেগে কাঁই। একটা তুচ্ছ বেরাল তাকে এমনি করে নাস্তানাবুদ করবে? এই না ভেবে, বেরালটাকে দেখিয়ে একসঙ্গে সবটা জিলিপি গালে পুরে কচমচ কচমচ করে খেয়ে ফেললে। খেয়ে দেয়ে জিলিপি-মোড়া শালপাতাটা শুঁকে ওর মুখের দিকে ছুড়ে দিলে। বললে "এই নে, খা। এমন হ্যাংলা বেরাল দেখিনি কখনও।"

শালপাতাটা পড়তেই বেরালটা তিড়িং করে এক লাফ। সটান শালপাতাটার সামনে! কিন্তু জিলিপি তাতে থাকলে তো। একটুখানি রস লেগে আছে। পাতাটা পায়ে করে নেড়ে-চেড়ে, কিচ্ছু না পেয়ে, মুখটা কেমন গোমরা করে বেরালটা গুটি গুটি চলে গেল—কিন্তু কোথায় যে গেল, কাবলু আর দেখতে পেলে না।

বিষ্টি কমে এসেছে। কিন্তু একেবারে থামেনি। ট্রেন আসবারও ঘণ্টা পড়ে গেল—ঢং ঢং ঢং। বলব কি—সঙ্গে সঙ্গে কতো লোক পিলপিল করে বাক্স-প্যাটরা, পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে প্ল্যাটফর্মে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এত লোক ছিল কোথারে বাবা!

আকাশে বিষ্টি পড়ছে—ঝির ঝির ঝির, ট্রেন ছুটছে ঝিক ঝিক ঝিক, পায়ে তার মল বাজছে ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্।

ঘুম-ঘুম-ঘুম। কাবলুর চোখে যেন ঘুম আসছে। ট্রেনের দোলনায় দোল খেতে খেতে মায়ের কোলে মাথা রেখে কাবলু ঘুমিয়ে পড়ল।

কাবলু বোধ হয় অনেকক্ষণ ধরে ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ কে যেন কানের কাছে গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠে ধমক দিলে, "এই ছেলেটা, ভেল্‌ভেলেটা।" আচমকা চমকে উঠে কাবলু ধড়ফড়িয়ে উঠে বসেছে। আরে, এ যে সেই বেরালটা! সামনের পা দুটো কোমরে রেখে, চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! ট্রেনের মধ্যে উঠল কী করে? কথা বলছেই বা কেমন করে? আরও ভালো করে দেখবার জন্যে ঘুম জড়ানো চোখ দুটো কাবলু যেই দুহাত দিয়ে মুছতে গেছে, বেরালটা অমনি ধাঁ করে পাঁজা কোলা করে তুলে—টুপ করে ট্রেনের জানলা গলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। একেবারে বাইরে মাঠের মধ্যে। কাবলু থতমত খেয়ে খুব জোরে "মা" বলে ডেকে উঠল। বয়ে গেছে। ট্রেনটা চোখের ওপর দিয়ে হুস্ হুস্ করে চলে গেল। কাবলু 'ভ্যাঁ' করে কান্না জুড়ে দিলে। বেরালটা অমনি কাবলুর বাঁ কানটা ধরে হিড় হিড় করে টানতে লাগল। কাবলু কিছুতেই যাবে না। বেরালটাও ছাড়বে না। কাবলুতে আর বেরালটাতে টানামানি খেলা শুরু হয়ে গেল।

(ধন্য, মান্য, উচ্চ, তুচ্ছ—শেষাংশ)

করতে পারবে না। সিংহবাহিনীর মন্দিরে এখন থেকে তাদেরও প্রবেশের অধিকার রইলো। কেউ যদি বর্ণশ্রেষ্ঠদের অছিলায় তাদের কোনো কাজে বাধা দেয়, তাহলে কঠিন শাস্তি পাবে।"

রাজার ঘোষণা শুনে বিড়াল হেসে গোঁফ মোচড়ালো, কুকুর দুই পা তুলে খুব একচোট নেচে নিলে, কাগেশ্রী-রাগে কাক ধরলো গান, গাধা ডিগবাজি খেল, আর আনন্দের চোটে নকুল তো কেঁদেই ফেললো। সিংহ-কেশরীর জয়ধ্বনিতে তারা মুখর হয়ে উঠলো।

ধন্য, মান্য ও উচ্চ বর্ণের পশুপাখিরা কিন্তু একদম চুপ!

কান টানাটানি, খামচা-খামচি, ধামসা-ধামসি। এও ছাড়বে না, সেও ছাড়বে না। শেষকালে পা পিছলে কাদাতে গড়াগড়ি। কোস্তাকুস্তি। এদিকে গড়গড় ওদিকে গড়গড়। গড় গড় গড়—সড়াৎ! দুজনেই পিছলে ধপাস করে একটা গর্তের মধ্যে। আয়ি ব্যাস! কি নিচু গর্ত! পড়ছে তো পড়ছেই। বেরালটার ল্যাজ আঁকড়িয়ে কাবলু পড়ছে, কাবলুর কান পাকড়িয়ে বেরালটা পড়ছে। পড়ছে—পড়ছে—পড়ছে। এক মিনিট, দু মিনিট, তিন-চার-ছয়-আট-দশ মিনিট। থামবার আর নাম নেই।

ধাঁই করে হুমড়ি খেয়ে কাবলু যখন থামলো—তখন বেরালটা ছিটকে কোথায় যে গেল, কাবলু আর দেখতে পেলে না। মাথাটা তার বনবন ঘুরছে। চোখ মুখ কাদায় একাক্কার। কোনরকমে চোখের কাদা সরিয়ে ভালো করে চাইতেই ব্যস! চক্ষু চড়কগাছ। একটা মস্ত বড় ঘর। কত উঁচুরে বাবা। সেই ঘরটাতে অমন একশো, দুশো, তিনশো চারশোটা বেরাল তার দিকে চেয়ে। কাবলু যেই তাদের দিকে চেয়েছে—তারা এমন ম্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা, মিউ-হু-হু-হু করে বিটকেল চেঁচিয়ে হেসে উঠল যে, কাবলুর ভয়ে প্রাণ যায়-যায়।

বলা নেই, কওয়া নেই, একটা বুড়ি-বুড়ি থুথুথুড়ি চেহারার বেরাল, সটান সামনে এসে কাবলুর মুখের কাছে তুড় তুড়তুড় করে তুড়তুড়ি কেটে ভেংচিয়ে দিলে। অমনি সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসি ম্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা, মিউ-হু-হু-হু।

তারপর সেই বুড়ি-বুড়ি থুথুথুড়ি বেরলাটা কেমন বেরাল-বেরাল গলায় চেঁচিয়ে উঠলো। ম্যা-এ্যা-এ্যা-এ্যাও—হাসি থাম্যাও।

অমনি চারশো-পাঁচশো বেরাল-গলার চারশো-পাঁচশো বেরাল-হাসি চুপ। বুড়ি-বুড়ি বেরালটা কাবলুর আরও কাছে এগিয়ে এসে, থয়েরি-থয়েরি চোখ দুটো পাকিয়ে এক দিষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এক মিনিট না দু মিনিট তাকিয়ে থেকেই হঠাৎ হেঁকে উঠল, "ম্যাও—পানি লে আঁও।" দেখতে দেখতে একশোটা বেরাল দুশো বালতি জল এনে কাবলুর মাথায় হুড়হুড়-হুড়হুড় করে ঢালতে শুরু করে দিলে। কাবলুর দম আটকে যাবার গোত্তর। জল মুখে ঢুকছে, চোখে ঢুকছে, কানে ঢুকছে, তারপর যেই নাকে ঢুকছে—অমনি ফ্যাচ্চচ্। কাবলু একটা বোম্বাই-হাঁচি হেঁচে ফেলেছে। ব্যস! অমনি জল ঢালা বন্ধ।

"হুম।" একটা বিচ্ছিরি শব্দ করলে বুড়ি-বুড়ি বেরালটা। তারপর গড়গড় করে বলে গেল, "এই মানুষের বাচ্চাটি রস চুষে চুষে জিলিপি খাচ্ছিলো। আমাদের এই বেরাল-ছাটি'র খুব খিদে পেয়েছিল। ও একটু জিলিপি চেয়েছিল বলে—ওকে হ্যাংলা বলেছে। আর শুকনো শালপাতাটা নাকে শুঁকে ওর দিকে ছুড়ে দিয়েছে। এমন কি ওর তলপেটে একটা ঘুষি মেরেছে। আর ল্যাজ টেনে অপমান করেছে। এখন কি কর্তব্য?"

একটা বেরাল অমনি বলে উঠল, "আজ্ঞে নিল ডাউন।"

আর একটা সঙ্গে সঙ্গে বললে, "এক পায়ে অন দি বেঞ্চ।"

আর একটা বললে, "ঘাড়ের ওপর থান ইঁট।"

"উঃ হুঁঃ," বুড়ি-বুড়ি বেরালটা ঘাড় নেড়ে বললে, "ও তো সহজ শাস্তি। আমার মনে হয় ধামা-চাপা।"

অতগুলো বেরাল অবাক-অবাক চোখে মুখ চাওয়া-চায়ি করতে লাগল। ধামা-চাপা! সে আবার কি!

বুড়ি-বুড়ি বেরালটা, ঘরের এ-ই উঁচু কড়িকাঠের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, "ঐ যে দেখছ শিকে—তার ওপর হাঁড়ি ঝোলানো—ঐখানে ওকে তুলে ধামা-চাপা দিয়ে রাখা হবে। এক মাস, দুমাস, তিন মাস। তারপর শুকিয়ে-মুকিয়ে চিমসে-পচে যখন ওর গা দিয়ে গন্ধ বেরুবে—তখন ভাগাড়ে ফেলে দেওয়া হবে। শকুনিরা যখন ঠুকরে ঠুকরে খাবে, তখন বাছাধন বুঝবে—না দিয়ে খেলে তার ফল কি।" একটু থামলো বুড়ি-বুড়ি বেরালটা। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "এ্যাই, শিকেয় তুলে দ্যাও।"

সঙ্গে সঙ্গে ইয়া তাগড়া, গোঁফওলা চারটে হুলো বেরাল কোত্থেকে হাজির। পাকড়াও করল কাবলুকে। আর কাবলু অমনি চেঁচিয়ে-মেচিয়ে হাত-পা ছোড়া-ছুড়ি শুরু করে দিলে। কিন্তু অমন চারটে ধুমসো বেরালের সঙ্গে কাবলু পারবে কেন? বেরাল চারটের একটা কাবলুর ডান হাত ধরল, একটা বাঁ হাত ধরলে, একটা ডান পা, একটা বাঁ পা। ধরে হুস্ হাস্ হুস্ হাস্ করে চ্যাং দোলানি দোলাতে লাগল। কাবলু প্যান-প্যানানি কান্না শুরু করল। দোলাতে দোলাতে, দোলাতে দোলাতে, এক-দুই-তিন বলে সাঁই করে ওপর দিকে ছুঁড়ে দিলে। কাবলু "মা" বলে চিল-চেঁচিয়ে উঠল। তার ঠ্যাং-এ ঘাড়ে এক হয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে গিয়ে মারলে এক ধাক্কা—শিকের তোলা হাঁড়িটাতে।

ঝট করে ঘুম ভেঙে গেল কাবলুর। একি সে স্বপ্ন দেখছিল। তড়বড় করে উঠে বসল। সে তো ট্রেনের মধ্যে। তখনও ট্রেন ছুটছে ঝিক ঝিক ঝিক। মা বললেন, "ফিরে কি হলো? অমন চিৎকার করে উঠলি কেন?"

কাবলু কেমন ভয় জড়ানো সুরে বললে, "নাঃ কিছু নয়।" তারপর ট্রেনের জানলা দিয়ে চাইল বাইরের দিকে। কই বেরালও নেই, গর্তও নেই। বিষ্টি থেমে গেছে। চারদিক জলে থই থই করছে। আকাশ বেশ ঝরঝরে। খালি এক টুকরা কালো মেঘ অনেকখানি জায়গা নিয়ে আকাশের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। চট্ করে সেদিকে নজর পড়তেই—ভয়ে কাবলুর গলা যেন কাঠ হয়ে

গেল। মেঘটার ঠিক যেন সেই বেরালটার মত চেহারা! সেই বুড়ি-বুড়ি থুথুথুড়ি বেরালটার মত। ওর দিকেই যেন তেড়ে আসছে।

ঝট্ করে মাকে জড়িয়ে ধরে কাবলু বললে, "আচ্ছা মা, রেলগাড়িটা আগে ছুটছে না আকাশের ঐ মেঘটা?"

মা বললেন, "রেলগাড়িটা।"

কাবলু চট করে ট্রেনের জানলাটা নামিয়ে দিলে। মা বললেন, "কি হলো রে, জানলা বন্ধ করছিস কেন?"

বাড়ির খবর সবই ভালো

॥ আশা দেবী ॥

কানাই নাকি? ফিরছ দেশে পাক্কা দুটি বছর পরে,
ব্যস্ত কেন? একটু হেথায় তামাক খেয়েই যাও না ঘরে!
বাড়ির খবর? ভাবনা কিহে—মন্দ কি আর সে সব এমন!
বলছি সবই, দম ধরে নিই! ছটফটানি তোমার যেমন!
কী বলছিলাম? বাড়ির খবর? হ্যাঁ-হ্যাঁ—ভালোই আছেন সবাই—
গত বছর নদীর জলে ডুবল তোমার দাদা নবাই।
তার শোকেতে পাগল হয়ে তোমার বাবা গেলেন রাঁচী—
তোমার মা তাই মরার আগে বলেছিলেন—"মলেই বাঁচি!"
তোমার কাকা চুরির দায়ে ঢুকল জেলে আগের মাঘে,
সেই মাঘেতেই তোমাদের ওই দুধেল গরু মারল বাঘে!
তার পরে এক নূতন চাকর বাড়ির যত বাসন নিয়ে
কেউ জানে না নিঝুম রাতে কোথায় গেছে লম্বা দিয়ে।
গাঁয়ের লোকে ফিস্টি করে শেষ করেছে ছাগলগুলো।
মোটরগাড়ির তলায় পড়ে চেপটে গেছে কুকুর ভুলো।
ভিটে মাটি? ভালোই আছে—উঠেছিল নীলেম ডাকে—
আমি সে সব নিলুম কিনে—অমনি কেন পড়েই থাকে।
সেই বাড়িতে বসত করে আমার জামাই সত্যচরণ—
অমন কেন করছ বাপু মুখটা করে ছাইয়ের বরণ?
বাড়ির খবর? খারাপ কি আর? আরে কোথায় চললে ধেয়ে?
সাজা তামাক জুড়িয়ে যাবে—যাও না দাদা দুটান খেয়ে॥

পুজোর উপহার

শান্তশীল দাস

পুজো-পুজো হাওয়া যখন বইছে সারা দেশে,
এমন দিনে বললে অণু বাবার কাছে এসে ঃ
দামী দামী পোশাক আমার অনেকগুলো আছে,
এবার বাবা একটা জিনিস চাইবো তোমার কাছে।
দিতেই হবে কিনে আমায়, 'না' বলবে না, বলো?
চোখ দু'টি তার হঠাৎ হয়ে উঠলো ছলোছলো।
হাত দু'টি তার ধরে বাবা বললে ঃ পাগোল ছেলে,
খুশি হবে মনটি তোমার বলই না কী পেলে?
বাক্সভরা টফি এবং ছবির বই একখানা
আনতে হবে, এই তো? এতো আছেই আছে জানা।
মুখটি নিচু করে অণু বললেঃ ওসব নয়;
কান্তিচরণ, জানো বাবা, বন্ধু আমার হয়;
আমাদেরই ইস্কুলেতে আমার সাথেই পড়ে,
বড্ড গরিব—মা ছাড়া আর সবাই গেছে মরে।
গেঞ্জী-গায়ে পড়তে আসে, নেইকো জামা তার;
এবার তাকে নতুন জামা পুজোয় উপহার
দেব, আমার ইচ্ছে ভারী, দাও না বাবা কিনে,
কতই খুশি হবে বল পেয়ে পুজোর দিনে।
বুকের কাছে টেনে নিয়ে মুখটি তুলে তার
বললে বাবা; নিশ্চয়ই তো, দেবেই উপহার।
কিন্তু শুধুই জামা দেবে? ধুতিও চাই কেনা,
পুজোর দিনে তা না হলে মোটেই মানাবে না।
কিনতে যাব যেদিন আমি আসবো দুটোই নিয়ে।
আনন্দেতে মুখটি অণুর উঠলো ঝলমলিয়ে।

জন্মদিন

নির্মলেন্দু বসু

মা বললেন, "আজকে খুকু লক্ষ্মী হয়ে থেকো—
দুষ্টুমি-টুষ্টুমি যেন একটু করিস্ নেকো।
ঠাকুরদাদার সঙ্গে যেন আজ দিসনি আড়ি ঃ
একটুকুতেই অমনি যেন মুখ না দেখি ভারী।
গুরুজনদের সব্বাইকে প্রণাম কোরো যেন।"
অবাক খুকু ডাগর চোখে বললে শুধু, "কেন?"
(হঠাৎ এমন লক্ষ্মী হয়ে থাকার কারণটুকু
অনেক ভেবেও পায় না খুঁজে পাঁচ বছরের খুকু।)
"'ক্যানো-ক্যানো' বড্ড করিস কিছু না বলতেই—
কেন আবার—এমনি কী আর লক্ষ্মী হতে নেই?
কেন একটা আছে বলেই বলছি আমি তোরে",
মা হেসে কন, "আজকে যে তোর জন্মতিথি ওরে!
ছানার পায়েস মাংস-লুচী আরো কী সব কতো
হবে দেখিস আর বছরের জন্মদিনের মতো,
সবাই এসে দেখিস কত আদর ক'রে তোকে—
কত পুতুল খেলনা দেবে দেখিস কত লোকে।"
"তাই নাকি মা", খুকু বলে, "কী মজা তাহলে"
বলেই খুকু উঠে পড়লো টুপ করে মার কোলে।
তারপর কী ভেবে যেন বলল খুকু মাকে,
"শুধু আমার জন্মদিনই কেবল এসে থাকে
প্রতি বছর ঘুরে ঘুরে—তেমনি মা তোমারও—
বলো না ক্যান জন্মতিথি আসে না একবারও?"
মা হেসে কন, "পাগলী খুকু—লুকিয়ে সে যে আসে-
সে আসে তোর ছোট্ট প্রাণের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে।
যেদিন আমি মা হয়েছি—পেলাম তোকে কোলে,
যেদিন খুকু আমায় প্রথম ডাকলি 'মা-মা' বলে—
নতুন করে মা-মণি তোর জন্মালো সেইদিনই
তোর কাছে তাই রয়ে গেলুম চিরদিনের ঋণী ঃ
এইদিনটি তাই তো তোকে সাজাই এত করে—
জন্মদিনের অর্ঘ্যটি দিই তোরই ডালায় ভরে॥"

কার্ডবোর্ডের কাজ

॥ সুধাংশু রুদ্র ॥

কার্ডবোর্ড বা পিজবোর্ড দিয়ে ঘরবাড়ি, নৌকো, জাহাজ, রেলগাড়ি, অনেক-কিছু তৈরি করা যায়। কিন্তু মানুষ বা জন্তুজানোয়ারের গোলগাল চেহারা তৈরি করতে গেলেই গালে হাত। অবশ্য খুব বেশী ঘাবড়াবার দরকার নেই। যেটা করতে হবে কার্ডবোর্ডের কাজের উপযোগী আকার-গুলোর একটা চৌকো চৌকো ছাঁদ কল্পনা করে নিলেই হবে।

যেমন ধর, এই ছবির ঘোড়াটা। পাতলা কার্ডবোর্ড কেটে সহজেই বেশ মজবুত একটা ঘোড়া করা যেতে পারে। কার্ডশিট অথবা শক্ত কার্টিজ কাগজ কেটেও খুব সহজে এটা করা যায়।

নকশা—১ (মাথা) ও নকশা—২ (দেহ) দুটি কাগজে ট্রেস করে নাও। নকশায় যেখানে ভাঁজ দেখান হয়েছে ঐখানে ভাঁজ করে দু' পর্দা কাগজ একসংগে লাইন বরাবর কেটে ফেল, যাতে নকশাটা পুরো হয়। অর্থাৎ মাথা বা দেহের একটা করে দিক এখানে দেখান হয়েছে, কিন্তু তোমার কাটা কাগজটায় থাকবে দুটো দিক যেমন ৩নং
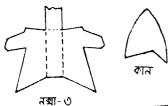
নকশায় দেখান হয়েছে। তারপর তোমার তৈরী নকশা দুটোর মাপে কার্ডবোর্ড কেটে ফেল।

নকশায় যেখানে যেখানে কাটা কাটা রেখা বা ফুটকি দেখান হয়েছে, সেখানে ভাঁজ করতে হবে। কার্ডশিট বা কার্টিজ কাগজে সহজেই ভাঁজ হয় কিন্তু কার্ডবোর্ডের বেলায় ব্লেড দিয়ে আলতো করে দাগ দিয়ে নিলে তবেই সমান ভাঁজ পড়বে। এবারে মাথায় যে ৪½" ইঞ্চি বাড়ান অংশ দেখান হয়েছে সেটি ঠিকমত বাঁকিয়ে ভিতর দিক থেকে আঠা আর সাধারণ কাগজ দিয়ে জুড়ে দিতে হবে। মাথা তৈরী হল। এবার ধড়ের সংগে লাগিয়ে দাও। তারপর পেটের নীচে ফাঁকা অংশটায় ¼" ইঞ্চি চওড়া ও ১½" ইঞ্চি লম্বা একটা টুকরো জুড়ে দাও। সামনের ও পিছনের পায়ের ফাঁকা অংশগুলির জন্য ৪টে টুকরো লাগবে ¼" ইঞ্চি চওড়া। এগুলি লাগান হলে তারপর কান। নকশার মত ২টো কান তৈরি করে ঠিক জায়গায় লাগাও। লেজের জন্য ১½" ইঞ্চি চওড়া একটা কাগজ সরু সরু ঝালরের মত কেটে পাকিয়ে নিলেই হবে।

কেশর ১" ইঞ্চি চওড়া কাগজ মাঝখান
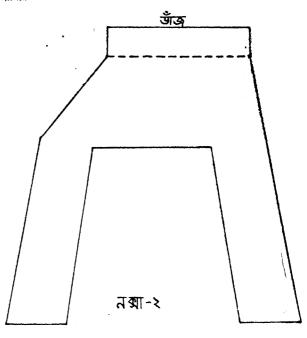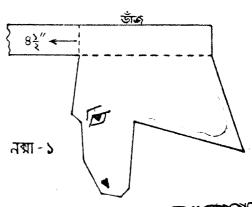
(শেষাংশ—পরের পাতায়)

রাজকন্যা কংকাবতী

॥ আশরাফ সিদ্দিকী ॥

তেপান্তরের নাম শোননি? তের নদীর দেশ?
ঢেউ-এর দোলায় সপ্ত সাগর রচছে যাহার বেশ!
শিয়রে যার সোনার পাহাড়! সোনার আলোর
হাট
আর ওধারে আকাশছোঁয়া ভানুমতির মাঠ।
সোনার গাছে রূপোর পাতা, ফুটছে মোতির ফুল
বেঙ্গমা আর বেঙ্গমী যে খুশিতে মশগুল!
সেই সে দেশের সোনার মেয়ে নাইক' যাহার তুল
রাজকন্যা কংকাবতী—রূপেও চাঁপা ফুল!
হাসতে তাহার মাণিক ঝরে—কাঁদতে ঝরে সোনা
সাঁঝ আকাশের আবির দিয়ে ঠোঁট দুটি তার
বোনা।
চাঁদের মতন মুখখানি তার জোছনা ঝলোমল
মেয়ে তো নয়—যেন দিঘির ফোটা নীলোৎপল!

কি বলছিলাম? হাঁ—শোন ভাই, সেই যে
কংকাবতী
অলকমণি রাজার মেয়ে মা যে হিরণমতী।
অলকমণির রাজ্য জুড়ে সদাই খুশির ঢল
হাতি-ঘোড়া হীরা-মণির ছিলই না যে তল।
লোকলস্কর সৈন্য সিপাই স্বজন প্রজা লয়ে—
রাজা-রানীর দিনগুলি সব সুখেই চলে বয়ে।...
যেমন হাসে নীল সায়রে লক্ষ শতদল
যেমন ঝরে চাঁদের হাসি জোছনা ঝলোমল
যেমন গাহে পাখিরা গান তেমনি কলোরোলে...
রাজকন্যার দিনগুলি সব সুখেই বয়ে চলে।
সাত সোমুদ্দুর তের নদী অনেক সে যে দূরে—
সেই সেখানে যক্ষ রাজার মায়ার পাহাড়পুরে!
রক্ষ পুরীর যক্ষ রাজা পাষাণ-সম প্রাণ
মুলোর মত দাঁতগুলি তার কুলোর মত কান!
ছেলের তাহার দেবেই বিয়ে পণ ছিল তার মনে
স্বপনপুরীর রাজকন্যা কংকাবতীর সনে।

আকাশ ভরে কাঁসে সেদিন মেঘের দাপদাপি
কেমন সেদিন আঁধার ভুবন উঠছে কাঁপি কাঁপি।
কেমন সেদিন পাগলা হাওয়ার ভয়াল গরজন...
সিপাই ঘুমায় শান্ত্রী ঘুমায় সবাই অচেতন...।
সাত মহলার সোনার খাটে ফুলের বিছানায়
রাজকন্যা কংকাবতী সুখেই ঘুম যায়...।

সুযোগ বুঝে রাজকন্যার পালংখানি মাথে
মিলিয়ে গেল যক্ষ রাজা সেই সে ঝড়ের রাতে।

রাজা কাঁদেন রানী কাঁদেন কাঁদে স্বপনপুর
রাজ্যব্যাপী চক্ষে সবার সপ্ত সমুদ্দুর...।
গায় না পাখি, ধায় না মরাল কমল সরোবরে
বনে বনে সবুজ পাতা যায় সে শোকে ঝরে।
রাজা গেলো রাজ্য গেলো উঠলো হাহাকার
অলকমণির সোনারপুরী হলো যে ছারখার!

সাত সমুদ্দুর তের নদী অনেক সে যে দূরে—
বন্দিনী সে মায়া গুহায় রাক্ষসীদের পুরে—
সাতশো হাজার রাক্ষসীদের কঠিন পাহারায়
আজো সেথা কংকাবতীর দিন যে কাটে হায়!
নেইকো সেথা চাঁদের হাসি, নেইকো রবির আলো
গায় না পাখি, ফোটে না ফুল; সদাই আঁধার
কালো।
দেশ বিদেশের সৈন্য সিপাই রাজারকুমার কত
রাজকন্যার মুক্তি লাগি আসলো শত শত।
গোলক ধাঁধায় পথ হারায়ে ক্লেশটা কাতর প্রাণ
যক্ষ রাজার মন্ত্র বলে হলোই যে পাষাণ!
আজো তারা বন্দী সেথায় পাষাণ কলেবর
রক্ষপুরীর যক্ষ রাজা এমনি ভয়ংকর।

কত যে যুগ মিলিয়ে গেলো কালের পারাবারে—
কত যে দিন বয়ে গেলো বলতে কে আর পারে!
কংকাবতীর চোখের বারি অশ্রু নদী হয়ে—
আজো নাকি সেই পাহাড় চলছে বয়ে বয়ে!!

(কার্ডবোর্ডের কাজ—শেষাংশ)

কেশর

থেকে ভাঁজ করে একসঙ্গে দুইধার ঝালরের মত কেটে দরকার মত লাগিয়ে নেবে। লেজ ও কেশরটা ক্রেপ কাগজেও করতে পার। তারপর খুশিমত রং চং করে চোখ এঁকে নাও, ব্যস্। একটা কথা, ঐ যে, ½" ইঞ্চি চওড়া টুকরো সব জুড়তে বলা হল, ওগুলো যদি নকশার সঙ্গে ব্রাশিং করে এঁকে নিতে পার তবে শুধু ভাঁজের ওপরেই পাগুলো তৈরি হতে পারে আলাদা করে না জুড়ে। সেটা এখানে বোঝাতে গেলে বেশী জটিল হয়ে যাবে কাজেই যারা সেটি নিজেরা চেষ্টা করে পারবে, তারাই চেষ্টা কোরো।

সোনামণি

নন্দদুলাল সরকার

রাজ্যের নাম রতনগড়।

সেই রতনগড়ের রাজবাড়িতে আনন্দ আজ আর ধরে না। রাজ্যের সব্বারই মুখে আজ হাসি। থেকে থেকে রাজা হাসছেন। মুচকিমুচকি হেসে রানী ঘুরছেন, ফিরছেন। বুড়োমন্ত্রী সাদা দাড়ির ফাঁকে ফাঁকে যখন তখন হেসে উঠছেন। সেনাপতি, সেপাই, লোকলস্কর, পাত্রমিত্র, ছোটবড় সকলে আজ খুব খুশি। খাওয়াদাওয়া, হাসি গানে, আমোদ আহ্লাদে রাজপুরীতে আনন্দের হাট বসেছে—গম্‌গম্ করছে রাজবাড়ি। আজ যে রাজকুমার সোনামণির হাতেখড়ি—তাই!

সাতটি বোনের একটি ভাই এই সোনামণি। রাজা-রানী কত দেবতাকে মানত করে কত ঠাকুরের পায়ে ধর্না দিয়ে হাজার রকম বার-ব্রত আর উপোষ করে তবে তো পেয়েছেন সোনামণিকে। পর পর সাত সাতটি মেয়ের পর রানীর কোলে এসেছে ফুটফুটে চাঁদ-পানা ছেলে—এই সোনামণি। ছেলে পেয়ে রাজা-রানী খুশি। ভাই পেয়ে রাজকুমারীরা খুশি। রাজকুমার দেখে রাজ্যের প্রজারা খুশি। রাজজ্যোতিষীও মহাখুশি। তিনি বলেছেন, "এযে সোনার টুকরো ছেলে। শুধু রতনগড় কেন, এ যে সারা জগৎ আলো করবে।"

কথা শুনে সবাই আহ্লাদে আটখানা। কেবল দুরদুর করে রাজারানীর মন। দুটো নয়, পাঁচটা নয়, শিবরাত্রির সলতের মতো ঐ তো একটি মাত্র ছেলে!

তারপর—এক বছর, দু বছর, তিন বছর, চার বছর, পাঁচ বছরও পার হলো। বেশ বড় হয়ে উঠলো সোনামণি! রাজা-রানী মহাখুশি—সোনামণি বড় হয়েছে! এবার সে লিখবে, পড়বে—তবে তো? আজ তার 'হাতেখড়ি'। তাই এই আয়োজন-উৎসব!

নহবৎখানায় নহবৎ বাজছে—বাগানে নাচ-গান হচ্ছে—পাকশালায় হাঁড়িহাঁড়ি রান্নাবান্না হচ্ছে। রাজ-দেউড়ি আজ হাট-করে খুলে দেওয়া হয়েছে সবারই জন্যে। কাতারে কাতারে পিলপিল করে প্রজারা আসছে! ঘুরছে ফিরছে—আনন্দ করছে। রাজবাড়িতে পেটপুরে খেয়ে তবে সবাই বাড়ি ফিরবে। পাঁচশো রাঁধুনী রান্না করতে হিমসিম খাচ্ছে! পাত্র-মিত্র মন্ত্রী নিয়ে রাজা ঘুরে ঘুরে তার তদ্‌বির তদারক করছেন। অন্দরমহলে রানী নিজে দেখছেন সোনামণির খাওয়ার ব্যবস্থা।

রাজকুমারীরা সাত বোনও তাদের সোনা-ভাইকে নিয়ে ব্যস্ত। গান করলো, গল্প করলো, শেষে লুকোচুরি খেলতে শুরু করলো! সোনামণির কিন্তু এসবে তেমন

মনে নেই! সে বারবার জানলার কাছে যায় আর ফিরে আসে। ফিরে ফিরে তাই সে 'চোর' হয়। তবুও খেলা চলেছে—চলেছে—চলেছে। বড়রাজকুমারী চোর হয়েছে। ছ-বোন লুকিয়েছিলো, বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু সোনামণি? সোনামণি কই? কে জানে—কোথায় সে লুকিয়েছে? কিছুতেই তাকে খুঁজে বের করতে পারছে না বড়-রাজকুমারী। বড়-রাজকুমারী ঘরের এ-কোণ খুঁজলো, ও-কোণ খুঁজলো, এ-ধার দেখলো, ও-ধার দেখলো—কোথাও পেলো না সোনামণিকে! আবার দেখলো—তাও না! শেষে ডাকলো, "ভাইমণি, কু দাও!"

কেউ কু দিলে না।

আবার ডাকলো, "কু দাও ভাইমণি!"

তাও না! কোনও উত্তর মিললো না!

এবার সাতবোনে মিলে তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলো তাকে! কিন্তু নাঃ! কোথাও খুঁজে পেল না তাকে। তাইতো?

বড়-রাজকুমারী ডাকে, "সোনা!"

ছোট-রাজকুমারী আরও জোরে ডাকে "মণি!"

সাতবোনে সবাই মিলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ডাকে, "সোনামণি ইই-ইই!"

নাঃ! কোন সাড়াও নেই, শব্দও নেই! বোনেদের বুক দুরদুর করে উঠলো! ভয়ে ভয়ে মায়ের কাছে গিয়ে বললে, "মা, সোনামণিকে খুঁজে পাচ্ছি না!"

মা আঁতকে উঠলেন। বললেন, "সে কি?"

"হ্যাঁ মা। কত ডাকলুম, কত খুঁজলুম কিন্তু সোনামণিকে পেলুম না!"

আলুথালু হয়ে রানী ছুটে এলেন। হন্তদন্ত হয়ে রাজা দৌড়ে এলেন। পাত্র-মিত্র, সেপাই, মন্ত্রী—সবাই কাজ ফেলে ছুটে এলো অন্দরমহলে।

খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ! রংমহল, অন্দরমহল, হাওয়া মহল, নাচ মহল—রাজবাড়ির সকল মহলেই খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেল। কোন মহলই বাদ গেল না। তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো সকল ঘর। কিন্তু সোনামণিকে খুঁজে পাওয়া গেল না কোথাও!

কেউ বললে, "পুকুরে পড়ে যায়নি তো?"

ঠিক! অমনি এক সঙ্গে একশোটা জাল ফেলা হলো রাজবাড়ির পুকুরে। একশোটা ডুবুরি নেমে পড়লো সায়রের জলে। দিঘির কালোজল তোলপাড় করে ঘোলাটে হয়ে গেল। তবু সোনামণির হদিস মিললো না!

একজন বললে, "বাগানে হারিয়েও তো যেতে পারে?"

সত্যিই তো! তক্ষুনি হাজার বরকন্দাজ ছুটলো রাজ-বাগানে। ফলফুলের বাগান তারা তচনচ করে ফেললো! সোনামণিকে সেখানেও খুঁজে পাওয়া গেল না! রাজা-রানী দুঃখে ভেঙে পড়লেন, হতাশ হয়ে পড়লো সবাই! তারপর?

তারপর নহবৎ গেলো থেমে, নাচগান গেলো ভেঙে, গোলমাল হৈ-চৈ—সব চুপ! থমথম করতে লাগলো পুরী। আনন্দের আসরে কান্নার সুর বেজে উঠলো।

সিংহাসনে বসে রাজা মাথায় হাত দিয়ে অঝোরে কাঁদেন—রানী পালঙ্কে পড়ে উবুড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদেন—দুহাতে মুখ ঢেকে সাত রাজকুমারী ডুকরে ডুকরে কাঁদে। চাপা-কান্নার জল পাত্রমিত্র সকলেরই চোখে ছলছল ছলছল করতে থাকে।

এমন সময় রাজবাড়ির পুব দেউড়ির দারোয়ান দুখন সিং দৌড়তে দৌড়তে রাজার কাছে এসে হাজির। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, "হুজুর, রাজকুমারকে পাওয়া গেছে!"

রানীমা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন

রাজা সোজা হয়ে বসলেন। বললেন "পাওয়া গেছে? কোথায়? কোথায় সে?"

"ঐ যে, ঐ যে হুজুর!"

সোনামণি দৌড়ে এসে রানীমাকে আঁকড়ে ধরলো। রানীমা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, "সোনা! মণি! কোথায় ছিলে এতক্ষণ তুমি?"

সোনামণি বললে, "সুখন আর ইসার সঙ্গে খেলা করছিলুম—মামণি।"

রাজা জিজ্ঞেস করেন, "সুখন! সে আবার কে?"

দুখন উত্তর দিলে, "আমার ছেলে মহারাজ!"

"আর ইসা?"

"আমার ছেলে, হুজুর", সহিস রহিম মিঞা বললে।

"আশ্চর্য! তুমি ওদের সঙ্গে কী করছিলে, সোনা?"

"খেলা করছিলুম—বাপি!"

"কোথায়?"

"ঐ দিকে—দুখনের বাড়ি ছাড়িয়ে পুব দিকের মাঠ—সেই মাঠে।"

"কিন্তু তুমি ওদের জানলে কী করে মণি?" রানী জিজ্ঞেস করেন।

"হাওয়া-মহল থেকে তো আমি রোজ ওদের দেখি—কেমন ওরা ছুটোছুটি করে, খেলা করে।"

রাজা বললেন, "তুমি আর ওখানে খেলতে যাবে না।"

"কেন বাপি?"

"গায়ে ধুলোকাদা লাগবে, শরীর খারাপ হবে।"

"বারে! কই সুখনদের তো কিছু হয় না—আমারই বা হবে কেন? ধুলোবালিতে ছুটোছুটি করতে, খেলতে আমার খুউব ভালো লাগে, বড্ড মজা লাগে। জানো, মামণি, সুখন আমাকে একটা পেয়ারা দিয়েছিল। উঃ! কি সুন্দর খেতে! আমাকে আর একটা পেয়ারা দেবে মামণি?"

"ছিঃ ছিঃ মণি! তুমি না রাজার ছেলে! তুমি আর ও-সব কখখনো খাবে না—ওদের সঙ্গে কখখনো খেলবে না!"

"বারে! আমার বুঝি খেতে ইচ্ছে করে না? দৌড়তে, খেলা করতে ইচ্ছে করে না? ভাব করতে মন চায় না?"

"না না! যা তা তোমার খাওয়া চলে না—যার তার সঙ্গে মেলামেশাও চলে না।"

"কেন?"

"তুমি রাজার ছেলে, আর ওরা হলো গরিবের ছেলে। ওদের সঙ্গে তোমার খেলতে নেই। বুঝেছ?"

সোনামণি কিছুতেই কথা শোনে না। বলে, "না না না—আমি কিছুতেই হতে চাই না রাজার ছেলে। আমি গরিবের ছেলে হবো—আমি ওদের সঙ্গে খেলা করবো মামণি!"—সোনামণি ভীষণ ঝোঁক ধরে, কান্না জুড়ে দেয়। রাজা ভোলান, রানী ভোলান—মন্ত্রী, পাত্রমিত্র কেউ তার কান্না থামাতে পারেন না! দুখন আর রহিম কোণে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে, রাজার সব রাগ বুঝি এক্ষুনি তাদের উপর পড়ে!

রাজজ্যোতিষী ছিলেন চুপচাপ। তিনি বললেন, "মহারাজ! আপনার সোনামণি নতুন মন নিয়ে জন্মেছে। ও নতুন রাজ্য গড়ে তুলবে মহারাজ! ওকে আপনি কিছুতেই ঠেকাতে পারবেন না! গরিব প্রজাদের ছেলে-মেয়েরাও তো তাদের মা-বাপের চোখের মণি। আপনার স্নেহ—এক সোনামণির সঙ্গে রাজ্যের আর সব মণিদের মধ্যে ভাগ করে দিন মহারাজ! রাজ্যে মণিমেলা গড়ে তুলুন—দেখবেন আপনার এক মণি লক্ষ মণি হয়ে জ্বলজ্বল করবে।"

রাজপণ্ডিত বললেন, "ঠিক! কালের নিয়ম মেনে চলাই উচিত।"

রাজা আর রানী মহাচিন্তায় পড়লেন। তারপর?

তারপর সোনামণিরই জয় হলো। জরীর আসন, সোনার থালা তোলা রইলো! সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পাত পেড়ে সোনামণি খেতে বসলো!

সবার আগে সৃষ্টি হলো স্বর্গ। তারপর সৃষ্টি হলো মর্ত্য। তারপর ছয় ঋতু—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। এক এক ঋতুর সংগে সংগে এলো রকম রকম ফুল, রকম রকম শস্য, আর রকম রকম ফল। ফলে, ফলে, শস্যে পৃথিবী ভরে উঠলো। মহাসুখে মানুষের দিন কাটতে লাগলো।

কিন্তু মানুষ চাইলো আরো সুখ। তারা ঘি, দুধ, মধু ও যবের গুঁড়ো মিশিয়ে তৈরি করলো পিঠে। আর সেই পিঠে ভেট দিয়ে কাককে পাঠালো স্বর্গে ভগবানের কাছে পাঁচটি বর প্রার্থনা করেঃ—

(১) সব ঋতু হোক বসন্তের মতো, যাতে গাছে গাছে ফলে প্রচুর ফল-ফুল, মানুষ যাতে ঋতু-পরিবর্তনের ফলে রোগগ্রস্ত না হয়।

(২) ক্ষেতে ক্ষেতে একবার যে-ফসল বোনা হবে তাতেই ফসল ফলুক প্রতি বছর, যাতে মানুষের ফসল বোনার পরিশ্রম লাঘব হয়।

(৩) মানুষের জীবনে যেন আর কখনো না আসে বন্যা ও ঝাত্যার অভিশাপ।

(৪) মানুষের সমাজে ধনী-দরিদ্রের ভেদ যেন না থাকে, দরিদ্র যেন উৎপীড়িত না হয় ধনীর হাতে।

(৫) সব মানুষ সমান হোক, যাতে সরকারী কর্মচারীর হাতে সাধারণ মানুষ না নিগৃহীত হয়।

ভেট নিয়ে উড়ে চললো কাক। স্বর্গে পৌঁছে উপহার নিবেদন করলো ভগবানকে। জানালো মানুষের প্রার্থনা। ভগবান প্রীত হলেন। বর দিলেন। কিন্তু কাককে সাবধান করে দিলেন, "এই পাঁচটি বর নিয়ে সোজা চলে যাবে মানুষের দেশে। প্রতিটি বর ঘোষণার সংগে সংগেই তা পূরণ হবে। তাই বলছি, খবরদার পথে কোথাও থামবে না, কাউকে বলবে না বর পূরণের কথা।"

ভগবানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পৃথিবীর পথে ফিরে চললো কাক। কিন্তু পথে না থেমে সে পারলো না। খুশিমনে একখানি ঝকমকে পাথরের উপর বসে সে পাখা ঝাড়তে লাগলো।

পাথর শুধালো, "কি গো কাকভাই, এতো খুশি কেন আজ? ভগবান বুদ্ধের প্রসাদ পেয়েছ নাকি?"

কাক কোন জবাব দিলো না। শুধু মাথা নাড়লো একবার। ভগবানের সতর্কবাণী তার মনে আছে—পথে কাউকে বলবে না বর পূরণের কথা।

পাথর অভিমান করে বললো, "কি ভাই, তুমি কি আজ আমার সংগে কথাই বলবে না? আমি না হয় গরিব মানুষ, চাল নেই, চুলো নেই, মাথা গুঁজবার আশ্রয় নেই, তাই বলে অহংকারে তুমি কথাও বলবে না?"

কাক আর কথা না বলে পারলো না। বললো, "সত্যি ভাই পাথর, রোদ-বৃষ্টি সব তোমাকে খালি গায়ে সইতে হয়। শীতের দিনে না জানি তোমার কত কষ্ট হয়। তাই আমি বলি কি, আমার কাছে তো ভগবানের বর আছে, তার একটি তুমি নাও। আজ থেকে তোমার পক্ষে আর ঋতুর পরিবর্তন হবে না। কী মজা হবে তাহলে! তোমার আর সর্দিও লাগবে না, কাশিও হবে না।"

ভগবানের কথা অন্যথা হবার নয়। কাকের কথা শেষ হতে না হতেই তা ফলে গেলো।

ভেট নিয়ে উড়ে চললো কাক

লাল আর বাদামী শেওলায় ঢেকে গেলো পাথরের গা। আর তাদের সর্দি লাগে না, কাশি হয় না।

খুশি মনে আকাশে পাখা মেললো কাক। খানিক পরে আবার বসলো একটা গাছের ডালে। মনের আনন্দে পাখা ঝাড়তে লাগলো।

গাছ শুধালো, "কি গো কাকভাই, এতো খুশি কেন আজ? মহান লামার প্রসাদ পেয়েছ নাকি?"

কাক কোন জবাব দিলো না। নীরবে মাথা নাড়লো একবার।

গাছ বললো, "ভাই কাক, ভেবেছিলাম তুমি সত্যি আমার বন্ধু। আমি সামান্য জীব, কদিনই বা বাঁচি পৃথিবীতে। তাই কি তুমি আমাকে ঘৃণা করো?"

কাক সগর্বে বললো, "না, না, বন্ধুদের আমি ভালবাসি। তোমার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য সত্যি আমার দুঃখ হয়। বরং এসো এক কাজ করি। আমার সংগে ভগবানের বর আছে। তার একটি তোমাকে দান করি। আজ থেকে তুমি বছরের পর বছর বেঁচে থাকবে, তোমার ফল থেকেই তোমার বংশবৃদ্ধি হবে, প্রতি বছর তোমাকে নতুন করে রোপণ করতে হবে না।"

সংগে সংগে ফল ফললো। এতদিনে পর্যন্ত গাছেরা ছিলো ফসলের মতো—প্রতি বছর তাদের রোপণ করতে হতো, প্রতি বছর তারা মরে যেতো। এখন থেকে তারা বেঁচে রইলো বছরের পর বছর, তাদের ফল থেকে হলো নতুন গাছের জন্ম, আর সেই গাছে গা[illegible] ভরে গেলো প্রতিটি পর্বত-প্রান্তর শ্যা[illegible] অরণ্যের সমারোহে।

খুশিতে আটখানা হয়ে কাক উড়ে চলল[illegible] মানুষের দেশে।

সবাই সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলো কাকে[illegible] জন্য। না জানি কী সংবাদ সে আনে! কিন্[illegible] হায়! সব আশা তাদের বিফল হলো। কা[illegible] আসল কথা গোপন করে মিথ্যে করে বললে[illegible] ভগবান তাদের কোন প্রার্থনাই পূর[illegible] করেননি।

হাহাকার করে উঠলো মানুষের দল আর্তনাদ করে বললো, "আমাদের কো[illegible] প্রার্থনাই পূরণ করলেন না ভগবান! এ[illegible] কষ্টের জীবনই আমাদের বইতে হবে! এতে[illegible] নির্মম ভগবান!"

মানুষের সে আর্তনাদ পৌঁছলো ভগবানের কানে। প্রথমটা তাঁর দুঃখ হলো। কিন্তু পরক্ষণেই হলো রাগ। ভ্রূ কুঞ্চিত করে তিনি ভাবলেন, এতো অকৃতজ্ঞ পৃথিবীর মানুষ! কাককে দিয়ে তাদের এতো সুবিধে করে দিলাম, তারা যা চাইলো সব দিলাম, তবু তারা হাহাকার করছে! দিবানিশি আমাকে দোষ দিচ্ছে। না, এই অকৃতজ্ঞদের শাস্তি দিতে হবে।

ভগবান সংগে সংগে স্মরণ করলেন শস্যাধিপতি বরুণদেবকে। তাঁকে বললেন, "এই মুহূর্তে তুমি মর্ত্যে যাও, সেখানকার সব শস্য হরণ করে নিয়ে এসো।"

তখনকার দিনে কি ধান, কি যব, কি ভুট্টা সব ফসলই ফলতো গাছের শিকড় থেকে একেবারে শিষ পর্যন্ত—সাজানো থাকতো থরে থরে। বরুণদেব ভগবানের আদেশে মর্ত্যে এসে নিজের হাতে সব গাছ থেকে শস্য তুলে নিতে লাগলেন। কিন্তু একেবারে সব শস্য তুলতে পারলেন না, একেবারে শিষের কাছে কিছু কিছু ফসল থেকে গেলো। যেই তিনি সেগুলি তুলবার জন্য দ্বিতীয়বার হাত বাড়ালেন, অমনি যতো রাজ্যের পাখিরা এসে তাঁর পায়ে উপুড় হয়ে পড়লো, "প্রভু,

বসলো একটা গাছের ডালে

রক্ষা করুন। এই যৎসামান্য শস্যও যদি আপনি নিয়ে যান তাহলে পক্ষীকুল বিনা দোষে না খেয়ে মারা যাবে।"

দয়া হলো বরুণদেবতার। গাছের মাথায় যৎসামান্য শস্য পাখিদের জন্য রেখে তিনি স্বর্গে ফিরে গেলেন। যাবার আগে তিনি পাখিদের কাছ থেকে কাকের কীর্তির কথা সবই জেনে গিয়েছিলেন, এবার তিনি সব বলে দিলেন ভগবানকে।

ভগবান তখনি ডেকে পাঠালেন কাককে। তাকে অভিশাপ দিলেন, "তুমি মহাপাপ করেছ। আমার প্রিয় মানুষদের মহা অনিষ্ট করেছ। আমি তোমাকে শাস্তি দিলাম। আজ থেকে পত্রহীন গাছের ডালে বসে তোমাকে সঙ্গীহীন হয়ে আর্তকণ্ঠে কা-কা করতে হবে। তীব্র শীত ঋতুতে তুমি বাসা বাঁধতে পারবে না। ঠাণ্ডায় তোমার শরীর অবশ হয়ে যাবে। প্রতিদিন ভোরে তুমি গাছের ডাল থেকে ন বার মাটিতে আছাড় খাবে। আর—আজ থেকে মানুষ তোমাকে দেখলেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে!"

তাই হলো। আজও কাকেরা শীতকালে বাসা বুনতে পারে না। আজও তারা পত্রহীন গাছের ডালে বসে কা-কা করে। আজও মানুষ কাকের ডাক শুনলেই বলে দূর—হ—দূর—হ।

কিন্তু মানুষের দুঃখের তাতে শেষ হলো না। ভগবান তো দুবার কাউকে বর দেন না। তাই আজো মানুষকে কঠিন পরিশ্রম করে বেঁচে থাকতে হয়। আজো প্রতি বছর শস্য বুনতে হয়। আজো গাছের শিষে যে সামান্য ফসল ফলে তাই দিয়ে তাদের ক্ষুধা মেটাতে হয়।

(একটি তিব্বতী উপকথা অবলম্বনে)

থটরিডিং-এর ম্যাজিক

জাদুকর এ.সি.সরকার

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার কোনটি জানো? বিবলিয়থিক ন্যাশনাল লাইব্রেরি। ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারিস শহরে অবস্থিত এটি। সম্প্রতি প্যারিসে থাকাকালে মাঝে মাঝেই বিবলিয়থিক ন্যাশনাল-এ যেতাম আমি পড়াশোনা করার জন্য। এইখানেই একদিন দেখা হল প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে। সিতে ইউনেভারাসিতিয়ার-এ আমার বিশেষ জাদু-প্রদর্শনী দেখেছিলেন এঁরা। তাই তাঁরা সবাই আমাকে ধরে বসলেন ম্যাজিক দেখাতে হবে। কোন সাজসরঞ্জাম নেই, তবুও ম্যাজিক দেখাতে হবে। কী আর করি, ছাত্রবন্ধুদের কাছ থেকে ছখানা বই নিয়ে তাই দিয়েই আরম্ভ করলাম ম্যাজিকের খেলা। টেবিলের উপরে বই ছ খানা সাজিয়ে রেখে আমি, ঘরের বাইরে চলে গেলাম। বাইরে যাবার আগে তাদের বললাম, "বন্ধুগণ, আমি বাইরে চলে গেলে আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতন যে কোনও একটি বই স্পর্শ করবেন এবং আমাকে ডাকবেন; আর আমি ঘরে ফিরে এলে আপনারা সকলে আপনাদের নির্বাচিত বইটির কথাই শুধু চিন্তা করতে থাকবেন।" আমি ঘরের বাইরে চলে যাবার এক মিনিট পরেই আমার ডাক পড়লো। ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে আমি সবাইকে একমনে নির্বাচিত বইটির কথা চিন্তা করতে বললাম। সবার মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমি টেবিল থেকে আনলাম সেই বইটি যা নাকি আমার ছাত্রবন্ধুরা নির্বাচন করেছিলেন সর্বসম্মতিক্রমে। কেমন করে এই অদ্ভুত খেলাটা সে-দিন আমি দেখিয়েছিলাম, সেই কথাই বলছি এখন।

সাজিয়ে রাখবার সময়ে টেবিলের উপরে বইগুলোকে আমি সাজিয়েছিলাম একটা অদ্ভুত নিয়মে। প্রথম সারিতে দুটো বই, দ্বিতীয় সারিতে তিনটে বই আর তৃতীয় সারিতে একটা বই—এইভাবেই আমি সাজিয়ে নিয়েছিলাম। এখন, টেবিলের উপরে যদি একটা মানুষের মাথার কল্পিত ছবি আঁকা যায়, তা হলে প্রথম সারির বই দুটোকে দুটো চোখ, দ্বিতীয় সারির তিনটি বইয়ের মাঝখানেরটাকে নাক আর দুপাশের দুটোকে দুটো কান বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে আর তৃতীয় সারির একমাত্র বইটিকে মুখ বলে
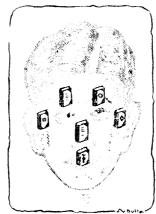
ধরে নিতে পারা যায়। ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে এব্যাপারটা। যে-দিনকার কথা বলছি, সে-দিন আমার ফরাসী বন্ধু মঁসিয়ে অনেঁও আমার সঙ্গে বিবলিয়থিক ন্যাশনালে গিয়েছিলেন। দরকার হলে মাঝে মাঝে মঁসিয়ে অনেঁ স্টেজে আমার সহকারী হিসাবেও কাজ করতেন। কাজেই আমার ইঙ্গিত খুব ভালই বুঝতে পারতেন তিনি। আমি বাইরে চলে গেলেও মঁসিয়ে অনেঁ ছাত্রবন্ধুদের সঙ্গে থেকে লক্ষ্য করেছিলেন কোন বইটি নির্বাচিত হল। আমি ঘরে ঢুকে তার দিকে তাকাতেই তিনি রুমাল বের করে তার নাক মুছে নিলেন আর আমিও বুঝে নিলাম যে, নাক মার্কা বই অর্থাৎ দ্বিতীয় সারির মাঝখানের বইটি নির্বাচিত হয়েছে। তারপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে থটরিড করার ভান করে নির্দিষ্ট বইটা তুলে নিলাম টেবিল থেকে। এই খেলাটা তোমরা যখন দেখাবে তখন দর্শকদের মধ্যেই সকলের অজান্তে তোমাদের সহকারী আত্মগোপন করে থাকবে। যথাকালে চোখ রগড়ে, কান চুলকিয়ে বা ঠোঁট কামড়ে অতি সহজেই সে ইঙ্গিতে তোমাদের জানাতে পারবে নির্বাচিত বইয়ের কথা। তবে হাঁ, খুব ভালভাবে কয়েকবার তালিম দিয়ে নেবে খেলা দেখানোর আগে, নইলে অপ্রস্তুত হতে হবে কিন্তু!

✱ নতুন ছড়া ✱

শ্রীবিমল ঘোষ

চোখে কাজল [illegible]
পুজো-পাড়ার কুঁজো সং
পায়ে গোড়ালি উঁচু জুতো
লাল-পাগড়ি রুলের গুঁতো।

✱

প্যাঁক-প্যাঁক হাঁসা-হাঁসী
পিঁক পিঁক ফুটো বাঁশি
ঠ্যান্ ঠ্যান্ ভাঙা কাঁশি
খ্যাঁকখেঁকিয়ে হাসছে মাসি।

✱

ওলাই চণ্ডী মাগো মা
কি খাবে মা আমার ছা
নেইকো ডানা নেইকো পা
বাদুড় ছানার আদুড় গা
শোন্ বলি কি খাবে তা
খাবি খেতে বলগে যা।
একশো খাবি গুণে খাবে
সশরীরে সগ্গে যাবে।

✱

মনজু রনজু কুমকুম
এক্কা দোক্কা ঝুমঝুম
খড়ির দাগ খোলাম কুচি
ছেঁড়া জুতো কানা মুচি।

ছাতোছুট :

ফটো ও ছড়া—শ্রীরেবন্ত ঘোষ

(১নং ছবি)

ঘুমিয়ে যখন সারা বাড়ি
টুনি পালায় তাড়াতাড়ি
চাঁদি ফাটা রোদের মধ্যে
নিয়ে বাবার ছাতি—
এখন যদি না হয় যাওয়া
বুনির বাড়ি আচার খাওয়া
হয়তো হবে মাটি।

(২নং ছবি)

এই মরেছে! একি! ওরে
পায়ের তলার মাটি সরে
যাচ্ছে নীচে! ঘুরছে মাথা!
কেমন তরো বাবার ছাতা!
ছাতাই শুধু নয়কো এটা
নয়তো প্যারাচুট!
মাঝামাঝি হবে কিছু
বোধ হয় ছাতাছুট।

(৩নং ছবি)

ছাদে এক আটকে ছাতা
ঘটালো বিপদ যা তা!
পড়লো টুনি কাদের ছাতে
দেখলো বুনি বয়াম হাতে
টুনিটা হাত পা ছুঁড়ে
দেছে খুব কান্না জুড়ে।

(৪নং ছবি)

বুনিটা ছুটে এসে
টুনিকে তুললে হেসে
ঝেড়ে তার ধুলো-গা
বললে 'নে আচার খা'
বয়ামের কুলের আচার
নিমেষেই হলো পাচার!

ঝর্নি ছেড়ে বেরুলাম। দুটো ড় গাড়ি। দেশের ভিতরটা রে বেড়াব। শহর ছাড়িয়েই বন। খাড়া খাড়া গাছ, ঘন সবুজ, চলেছে ত চলেইছে। বনজঙ্গল হামেশাই দেখে থাকেন। যা দেখেন না সেটা হল, এ-বনের তলদেশ সাফসাফাই, একটি আগাছা নেই। আজকে রবিবার, ছুটির দিন। মানুষ দলে দলে জুটে রাস্তার ধারে সাইকেল-মোটর ফেলে বনে ঢুকে পড়ছে চড়ুইভাতি ও রকমারি আমোদস্ফূর্তির আয়োজনে। খানাখন্দ পেলেই জলে ঝাঁপাচ্ছে ছেলেমেয়েরা। মনে হবে, বনের গাছও বুঝি মাপজোপ করে পোঁতা। এবং তলায় ঝাঁটপাট দেবার জন্য মাইনে-করা ঝাড়ুদার আছে।

গাড়িতে বিষম জোর দিয়েছে। ড্রাইভারের পাশের সিটে আমি। এতে দেখবার সুবিধা হয়। চেহারায় এলাকপোশাকে ও ভদ্রতায় ড্রাইভার আমার-আপনার চেয়ে কম যায় না। আপনার কথা সঠিক জানিনে, আমার চেয়ে ত বিস্তর উপরে। জর্মানির অটো বানের কথা শোনেন, এ রাস্তা হল তাই। মোটর ছুটানর রাস্তা। হিটলারের আমলে লড়াইয়ের জন্য আরও ভাল করে বানান। বিশাল পথ—ঠিক মাঝখান দিয়ে ঘাসে-আঁটা হাত পাঁচেক চওড়া সরু ফালি রাস্তাটা চিরে দিয়ে চলেছে। ডাইনে ধরে চলবার নিয়ম এসব দেশে। ঘাসের ফালির ডাইনে দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে, বাঁয়ের পথে ফিরে আসছে। যাওয়া ও আসার ঐ যে পথ, দাগ কেটে তা-ও আবার দু-ভাগ করা। কোন গাড়ি পিছন থেকে এসে আগে যাবে ত সে-গাড়ি ধরবে দাগের বামদিকের পথ। এগিয়ে উঠে আবার তখন সামনাসামনি চলবে। আড়াআড়ি কোন রাস্তা ছেদ করে যায়নি। আমরা ছুটেছি দক্ষিণমুখো—মাথার উপর দিয়ে অগণ্য পোল বানিয়েছে পূব-পশ্চিমের রাস্তাগুলোর জন্য। সাঁক-সাঁক করে সেইসব রাস্তার গাড়ি মাথার উপর দিয়ে ছুটে বেরুচ্ছে। উই টানা-রাস্তা চলে গেছে, বাঁকচুর নেই, নির্ভাবনায় জোর দিয়ে যান। স্পীডোমিটারে উঠছে সত্তর, আশি, একশ, একশ-বিশ—(মাইল নয়, কিলোমিটার), দুর্ঘটনার শঙ্কা নেই। চাকায় মাটি ছোঁয় কি না ছোঁয়, যেন উড়ে চলেছি।

শ-তিনেক মাইল ভেঙে ড্রেসডেন পৌঁছলাম। ড্রেসডেন শহর জানেন ত? অন্তত এর চিত্রশালার নাম শুনেছেন। নিদেন পক্ষে চিত্রশালার একখানা ছবি—রাফায়েলের আঁকা ম্যাডোনা? ভুবনে সকলের সেরা পাঁচ-সাতখানা ছবির একটি। শুধু ঐ ছবি চোখে দেখবার জন্য মানুষ দেশ-দেশান্তর থেকে ড্রেসডেনে ছুটত। অমনি আর একখানা হল প্যারির লুভ্র মিউজিয়ামের মোনালিসা। কপাল ভাল—ঐ দুটো ছবি এবং বাঘা বাঘা শিল্পীর আরও বিস্তর দেখা হল এবারের যাত্রায়।

ড্রেসডেনের বয়স গেল-বছর সাড়ে সাত-শ পুরল। ১২০৬ অব্দের এক বিবরণীতে শহরের নাম পাওয়া যাচ্ছে। এই নিয়ে উৎসব হল বিস্তর তোড়জোড় করে। শিল্প ও সংস্কৃতির অপরূপ নিকেতন—বোমায় সমস্ত ভেঙেচুরে পুড়িয়ে তালগোল পাকিয়ে রেখে গেছে। এর মধ্যে কে হাসতে পারে? যোগাড়-যন্ত্র প্রচুর, উৎসব তবু তেমন জমল না।

এল্‌ব নদীর পুলের উপর এসে গাড়ি থামাতে বলি। ওপারে দেখছি চেয়ে চেয়ে। বুকের মধ্যে গুরগুর করে। লড়াই কী বস্তু, কেভাবে পড়েছি; ছবি দেখে মনে একটা ভয়ানক চেহারাও ভাবতে চেয়েছি। কিছু না, কিছু না। এই জায়গায় এসে চক্ষের পলকে উপলব্ধি হল। মহাশ্মশানে ঢুকছি। তবু ত প্রায় তের বছর হতে চলল। রূপকথায় শুনেছি রাক্ষসে-খাওয়া পুরী। সে-পুরী কত বড় আর কেমন সুন্দর ছিল, এই জায়গায় এসে চোখে দেখুন। চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে গিয়েছে।

নদীর দু-পার জুড়ে শহর—জলধারা সুপ্রাচীন গির্জা ও প্রাসাদ, ওক আর চেস্টনাটের পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায়। থরে থরে পাহাড় উঠেছে একদিকে। দূর থেকে অবশ্য দেখবেন, ভিতরে ঢুকে দেখুন শহর সেখানেও। উঁচু পাহাড়ের চূড়া অবধি শহর চলে গিয়েছে। সর্বোচ্চ এক চূড়ায় কফিখানা। টেবিলে এক পাত্র কফি বা উগ্রতর কোন পানীয় নিয়ে চতুর্দিক অবলোকন করুন। আশেপাশে শহরে তাকিয়ে মনে হবে, বড় যত্নে অনেকদিন ধরে ভারী দরের শিল্পীরা চিত্র রচনা করেছিল, দানব এসে পায়ে সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গিয়েছে।

শিল্পী তাতে সন্দেহ কি? হাতে রঙের তুলি না-ই থাকুক, দেদার রঙ ছিল তাদের

বইয়ের দোকান, ড্রেসডেন

মনের মধ্যে। নয় ত এ-সব বস্তু সম্ভবে না। আজকের জর্মানি কিংবা হিটলারের দিনে অথবা প্রথম মহাযুদ্ধের আমলে যাঁ দেখছেন, চিরদিন অমনধারা ছিল না। ছোট বড় মাঝারি অনেক রাজা, অনেক রাজ্য—রাজায় রাজায় লড়ালড়ি। যত্রতত্র অগণ্য ক্যাসল বা দুর্গ সেকালের সেই বনেদিয়ানার সাক্ষ্য দিচ্ছে। স্যাক্সোনিয়ান রাজাদের রাজধানী এই ড্রেসডেন। পুরনো এক প্রাসাদের দেয়ালে রাজাদের ছবি দেখলাম। বংশানুক্রমে। পাথরের কুচি দেয়ালে বসিয়ে বসিয়ে ছবি করেছে। ছবির নীচে নাম লিখেছে অমনি পাথরের কুচিতে। ভুল হবার জো নেই। ঘোড়ার উপরে রাজারা—ঘোড়ায় চড়ে যেন মিছিল করে চলেছেন একের পিছনে অন্য। ভাগ্য বশে বোমায় নষ্ট হয়নি এই জায়গাটুকু। একটু-আধটু যা হয়েছিল, মেরামত হয়ে গিয়েছে।

ওরই মধ্যে একজন হলেন অগস্টাস। বিশেষণ জুড়ে ফলাও করে নাম বলে—অগস্টাস দ্য স্ট্রং, বলবান অগস্টাস। সতের শতকের মানুষ। মরদ সত্যিই—আশপাশের রাজারা তটস্থ হয়ে থাকতেন তাঁর আমলে। পোল্যান্ড জয় করেছিলেন—পোল্যান্ড এবং স্যাক্সনি উভয় রাজ্যের রাজা। বিক্রম শুধুমাত্র বাইরে নয়, অন্দরেও। তিন শ সাতাশ জন আইনসম্মত সন্তান তাঁর—এতগুলো তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বাড়তি আরও সব ছিল। রাণীরা ত ছিলেনই, তা ছাড়া রাজ্যের নানা অঞ্চলে বিস্তর অনুগৃহীতা। ঘোড়ার গাড়ি চেপে অগস্টাস দর্শন দিতে বেরুতেন। আমাদের সেকেলে কুলীনদের মত, কুলীন কুলসর্বস্ব নাটকে যেমন পাই। পোড়া একালে সমস্ত বানচাল হয়ে গেল—ওদেশে এদেশে কোথাও সংসারের রসকষ রইল না।

অগস্টাসের পাটরাণী কাউন্টেস কোসেল (Cosel)। ডাকসাইটে রূপসী, বিষম চতুরা। অমাত্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতেন, শেষে ধরা পড়ে গেলেন। রাজা তাঁকে বন্দী করে রাখলেন পাহাড়ের চূড়ার উপর এক ক্যাসলএ। ক্যাসল স্টোলপিন—ড্রেসডেন থেকে বেশী দূরে নয়। সতের বছর রইলেন তিনি আটক হয়ে। তারপরে ছেড়ে দিল। কিন্তু রাণী নিজের ইচ্ছায় রয়ে গেলেন ঐ ক্যাসলএ। আরও কুড়ি বছর বেঁচে ছিলেন তারপরে। আমরণ রইলেন। ভালবেসেছিলেন জায়গাটাকে।

একটু গল্প করে নিই মাঝখানে, দোষ নেবেন না। আমাদের দোভাষিণী লিজেল গল্পবাজ মেয়ে। বার্লিনে স্বামীর হেফাজতে বাচ্চা রেখে আমাদের সঙ্গে ঘুরছে। ফাঁক পেলেই গল্প জুড়ে দেয়। ভারতের মেয়েদের কথা উঠল। বলে, "তোমাদের দেশে ত নতুন আইন হল। নারীর অবাধ মুক্তি। বাপের সম্পত্তির মালিক হচ্ছে। ডাইভোর্স করে বেরিয়েও যেতে পারবে দরকার মত।"

"হলে হবে কী! অগস্টাসের ঐ পাটরাণীর মত। ক্যাসলএর ফটক খুলে দিল, তবু গেলেন না। আমরণ রইলেন স্বেচ্ছাবন্দিনী হয়ে। আমাদের মেয়েদেরও ঐ গতিক। আইন পাশ হয়েছে—সংসারে তবু আগে যা ছিলেন, এখনও ঠিক তাই। তোমাদেরই বা কী! মুখে লম্বা লম্বা বচন—ক'জনে বেরিয়ে এসেছে শুনি সংসার থেকে?"

লিজেল দেমাক করে, "সে বলতে হবে না। কাজ নিয়ে চলে এসেছি এই ত। সংসারে যখন দু-জনই, কাজের ভাগাভাগি দু-জনের মধ্যে। ঘরকন্না করা বাচ্চা দেখা স্বামীরও দায় বটে! এখন একবার মনেও পড়ে না তাদের কথা।"

"বটেই ত! কিন্তু ফোন করছিলে আজকে একটু আগে—"

"আমি?" ধরা পড়ে প্রগল্‌ভা একটু যেন রাঙা হয়ে উঠল, "কাকে কখন ফোন করতে দেখলে আবার?"

"বার্লিনে। শুধু আজ কেন, রোজই। জর্মন বুঝিনে, কিন্তু এটা বুঝি স্বামীকে

নারী-গির্জার ধ্বংসাবশেষ। এটিকে এই অবস্থাতেই রাখা হবে
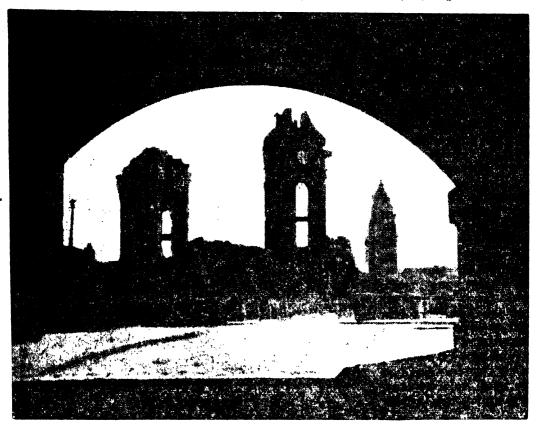
ফোন করে বাচ্চার রোজ খবরাখবর নাও। সব নতুন মা-ই করে অমনি—ধর পড়ে গেলে লজ্জা পায়। এদেশে, আমার দেশে, সব জায়গায়।"

যাকগে। অগস্টাসের কথা হচ্ছিল। দুর্ধর্ষ রাজা। কৃষক প্রজারা রুখে দাঁড়াল একবার, মেরেধরে ঠাণ্ডা করে দিলেন। একটা গুণে কিন্তু দোষ ঢেকে গিয়েছে। শিল্পরসিক। পুরনো রাজধানী মনের মত করে সাজালেন, শহরের নামডাক ভুবনময় ছড়াল। ড্রেসডেনের চিত্রশালা ষোল-আনা তাঁরই সংগ্রহ। ইউরোপের সকল জায়গায় তাঁর লোক টহল দিত—যেখানে যে ভাল ছবি পাও, জোগাড় করে নিয়ে এস। দামের জন্য কথা নেই। এমনি করে বিরাট সংগ্রহ-শালা গড়ে উঠল। শুধু গুণতিতে নয়, গুণে। বাইরে থেকে ম্যাডোনা এবং আর দু-চারখানা ছবির নাম শুনেছেন—চোখে দেখে আসল, ম্যাডোনার দুনিয়াজোড়া নাম নামজাদা শিল্পীদের কত কত বাহারের ছবি চাপা দিয়ে রেখেছে। প্রতিটি সংগ্রহ অগস্টাস বড় ভালবাসতেন, রাজবাড়িতে সমস্ত সাজান ছিল। মরবার পরে আলাদা এই আর্ট-গ্যালারি হল।

লড়াইয়ের সময় ছবি সরিয়ে ফেলেছিল। ভাগ্যিস পেরেছিল সরাতে, নয়ত পুড়ে জ্বলে ছাই হয়ে যেত, আজ তার কোন চিহ্ন পেতাম না। অনেক দূরে খনি অঞ্চলে পর্বতগুহা। গুহার অন্ধকারে রেখেছিল লুকিয়ে। গ্যালারির বাড়িতেও বোমা পড়ল, ভেঙেচুরে নৈরেকার হল। এখনও দেখুন, ভেঙে পড়ে আছে একটা দিক। ক্রেন বসিয়ে বিস্তর লোকজন লাগিয়ে সেটা নতুন করে বানাচ্ছে। বানাতে হবে আগে যেমনটা ছিল অবিকল তেমনি করে। এ-পাশটা মেরামত হয়ে গিয়েছে—সাবেকী কারুকর্ম, এক চুল তফাত ধরতে পারবেন না। মেরামত করে আবার ছবি দিয়ে সাজিয়েছে। ছবি মস্কোয় চলে গিয়েছিল। মাত্র গত বছর ফেরত এসেছে।

লড়াইয়ে হেরে নাৎসিরা তীরবেগে পালাচ্ছে—পালাবার মুখে যা সুমুখে পায়, নষ্ট করে দিয়ে যাচ্ছে। গুহার গহবরে ছবির নাগাল পায়নি, তার আগেই রুশ সৈন্য ঢুকে দখল করে বসল। নয় ত এসবের কী গতি হত, কে জানে। খবর পেল রুশীয়েরা গোপন গুহার। গিয়ে দেখা গেল, স্যাঁৎসেতে জায়গায় বিস্তর ছবি খারাপ হয়ে গিয়েছে। মস্কোয় নিয়ে গিয়ে বড় বড় শিল্পী লাগাল ছবির মেরামতের কাজে। খান কয়েক একেবারে গিয়েছে, সংস্কার সম্ভব হল না। মস্কোয় ছিল এত দিন। গত বছর চুক্তিপত্রে সই হল রুশ-কর্তাদের সঙ্গে। তারপরে প্লেন বোঝাই করে তারা পাঠিয়ে দিল। গুহার

রাফায়েলের ম্যাডোনা

মধ্যে যেভাবে রেখেছিল, তার ছবি রয়েছে। শিল্পীরা ছবির সংস্কার করছে, তার ছবি। চুক্তিপত্র এবং প্লেন বোঝাই করে ছবি ফেরত পাঠান—সমস্ত ফোটোগ্রাফ নীচের তলায় সর্বশেষ ঘরে পাশাপাশি সাজিয়ে রেখেছে।

একতলা-দোতলায় অনেকগুলো ঘর—তবু কুলাচ্ছে না, শেষটা গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি করে টাঙিয়েছে। বাড়ি মেরামত শেষ হলে ভাল করে সাজাবে। ঢুকবার জন্য দেড় মার্ক দক্ষিণা, ক্যাটালগ নেবেন ত আরও তিন মার্ক। কত মানুষ খাটছে, ছবি ও ঘরবাড়ি পরিমার্জনার কত রকম ব্যবস্থা! গদি-আঁটা আসন এখানে-সেখানে। ম্যাডোনার ঘরে ঢুকে মজা লাগে। একগাদা মেয়েপুরুষ কী রসে মজে আছে—কেউ কারও দিকে দেখে না তাকিয়ে, এতটুকু ফিসফিসানি কোন মুখে নেই। একদিককার দেয়াল জুড়ে বিশাল ম্যাডোনা—অন্যান্য দেয়ালেও ভাল ভাল বড় বড় ছবি; কিন্তু ম্যাডোনা তাদের নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। মানুষ দাঁড়িয়ে দেখছে ম্যাডোনা, আসনে বসে দেখছে। এগিয়ে পিছিয়ে ডাইনে ঘুরে কত রকম করে। খুট করে কেউ বা একটা আলো নিভিয়ে আঁধার মত করে একটুকু দেখে নিল। দেখে দেখে আশ মেটে না।

দুদিন গেলাম আর্ট-গ্যালারি, কিছুই দেখা হল না। চোখ আর ছবির কতটুকু দেখবে, ছবি দেখে মন। দু-দশ দিনে দেখে ফেলার বস্তু নয়। খাতা এগিয়ে দিল চলে আসবার সময়। লিখলামঃ তীর্থযাত্রীর মতন এসেছিলাম, মুগ্ধ মন নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু বাইরে শহরের কী চেহারা—ফুলের বাগান আগুনে পোড়াল কোন পাষণ্ডেরা! কথাগুলো বাংলায় লিখলাম, ইংরেজীও করে দিলাম পাশে। নামের বেলাতেও তাই। দুনিয়ার বিস্তর জায়গায় ঘোরাঘুরি হল, বাংলার

অনাহুলা সর্বত্র। দায়েবেদায়ে ইংরেজীর শরণ না নিয়ে উপায় নেই।

আর্ট-গ্যালারির অন্য দিকে ঘেরা উঠান। বিস্তর ভাস্কর্য। ফোয়ারায় জল ঝরছে। উত্তম বসবার জায়গা উভয় দিকে। জর্মন কথায় জায়গাটাকে বলে জুইঙ্গার—ঘেরা উঠান। স্যাক্সনি-রাজও বড় বড় উৎসব করতেন, শত শত নারী নাচ-গান করত উঠান জুড়ে। রাজবাড়ির মেয়ে-বউরা বসত খানিকটা উঁচুতে আড়ালমত জায়গায়। সামনাসামনি প্রকাণ্ড ফটক—মুকুটফটক নাম—ফটকের মাথায় ঈগলের মূর্তিওয়ালা মুকুট। পোল্যাণ্ডের রাজমুকুট। স্যাক্সনির মানুষ অগস্টাস পোলাণ্ডেরও রাজা হয়েছিলেন—কাজেকর্মে দেখাতেন উভয় রাজ্যের উপরে তাঁর সমান টান ইতরবিশেষ নেই। পোল্যাণ্ড হল প্রোটেস্টাণ্ট আর স্যাক্সনি ক্যাথলিক—উভয় ধর্মই মানতেন তিনি। বাড়ির মেয়েরা যেতেন ক্যাথলিক গির্জায়। প্রাসাদের পাশে গির্জা—মাঝখানে রাস্তা। পুরনারীরা গির্জায় যাবেন, সেজন্য রাজবাড়ির দোতলা দিয়ে গির্জা অবধি সোজাসুজি পুল। এ-জায়গায় বোমা পড়েনি। পুলের নীচে রাস্তা। উপরটা বেড়া দিয়ে ঢেকেঢুকে দিয়েছে—রাজবাড়ির মেয়েরা কি আপনার-আমার চোখের উপর দিয়ে বেরুবেন? মরবার সময় অগস্টাস বলে গেলেন, দেহ কেটে হৃৎপিণ্ড বের করে সেইটে কবর দেবে ড্রেসডেনের ক্যাথলিক গির্জায়। বাকী অংশ পোল্যাণ্ডে। তাই হয়েছে।

জুইঙ্গারেও বোমা পড়েছিল। একটা দিক একেবারে চুরমার। পাথরের আশ্চর্য শিল্পমূর্তিগুলো ভেঙেচুরে গাদা হয়ে আছে এখনও। বাড়ির যতটা মেরামত হয়েছে, দেখতে পাচ্ছি, আগের সঙ্গে বেমালুম মিলিয়ে করেছে। কালের প্রকোপে পুরনো অংশ কালো হয়ে আছে, নতুন যা গড়েছে সেটা কিঞ্চিৎ হরিদ্রাভ। এই যা একটু তফাত। ভাঙা মূর্তির সঙ্গে মিলিয়ে শিল্পী বাটালির ঘায়ে ঘায়ে নতুন মূর্তি গড়ে তুলছে, যেমন ছিল ঠিক তেমনিভাবে বসিয়ে দেবে। উপর তলায় একটুকু মিউজিয়াম। ওটা বাদ পড়ে গিয়েছিল। ড্রেসডেন ছেড়ে যাচ্ছি, লিজেল সেই সময় মোটর বেঁধে টিকিট কিনে দেখিয়ে আনল। রাজরাজড়ার কাণ্ড আলাদা। ঘড়ি ঘরে ঘড়িই বা কত রকম! বালু-ঘড়ি—ঝুরঝুর করে বালি ঝরে সময় বলে দেয়। সূর্য-ঘড়ি—১৬৫২ অব্দে নিখুঁত মাপ জোপে বানান, রোদে রেখে এখনও সঠিক সময় পাওয়া যায়। ষোল শতকের পিতলে তৈরী এক মানুষ সমান ঘড়ি। বানর বসে আছে এক ঘড়িতে, সেকেণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে চোখ পিটপিট করছে, ঘণ্টা পুরে গেলে টং টং করে ঘড়ি বাজায়। ১৫৮০ অব্দে এক ঘড়ি—মানুষ-কুকুর-খরগোস-ছাগল মেরি গো-রাউণ্ড চেপে ঘুরছে। ১৬৬০ অব্দে ঘড়ি—ঘণ্টা বাজবার মুখে সুবেশা পুতুল মেয়েগুলো দিব্যি একপাক নেচে নেয়। ঘণ্টা পুরলে এক ঘড়িতে অনেকক্ষণ ধরে মিঠি বাজনা বাজে। এক ঘড়ির সঙ্গে সৈন্যদল—সেকেণ্ডের টকটক আওয়াজের সাথে তালে তালে পা ফেলে মার্চ করে; মিনিট পুরলে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে উল্টো দিক মার্চ করে আবার। তারপরে ঐ দিকে, পুনশ্চ এদিকে। জাহাজ চলছে দুলে দুলে একটা ঘড়িতে। জ্যোতির্বিদ্যার ঘড়ি—গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ঘড়িতে পাওয়া যায়। নানারকমের কম্পাস। এক ঘরে সারি সারি গ্লোব। ১৬৪৮ অব্দের অতিকায় গ্লোব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছি। কলকাতা নেই থাকা সম্ভবও নয়। বারাণসী বড় বড় করে দিয়েছে। আগ্রা শহর ভুল করে দিয়েছে গঙ্গার উপর। ১৬৫২ অব্দের ছাপা বই

ম্যাক্স জিমারিং ওখানকার লেখক সমিতির জেনারেল সেক্রেটারি। পয়লা দিন সন্ধ্যার পর তাঁর কাছে চলেছি। পাহাড়ের অলি-গলি ঘুরে উঠতে উঠতে একটা বাঁকে হঠাৎ বাড়ি পেয়ে যাই। দিব্যি আছেন। বয়সে ভারিক্কী, কিন্তু কর্তা-গিন্নী উভয়েই স্ফূর্তিবাজ। কনকনে হিমের মধ্যে ছুটে এসে উপরে নিয়ে তুললেন। লাইব্রেরিতে বসেছি, টেবিল-ভরা ভূরি আয়োজন।

মেডের হাত ধরে বাচ্চা এসে ঢুকল তাকে নিয়ে লোফালুফি। কালো মানুষ দেখে ডরাবে কি—আমাদেরই একজন হয়ে মধ্যখানে জাঁকিয়ে বসেছে। মেড ডাকাডাকি করে—মা-বাপ বলছেন, লক্ষ্মী ছেলে শুয়ে পড়গে এবার। সে নড়বে না। দেশে থাকতে বর্ণবিদ্বেষ বলে একটা কথা শুনেছিলাম-বিস্তর দেশে ঘোরাঘুরি হল, ঐ বস্

এল্‌বে নদীতে স্টীমার চলেছে
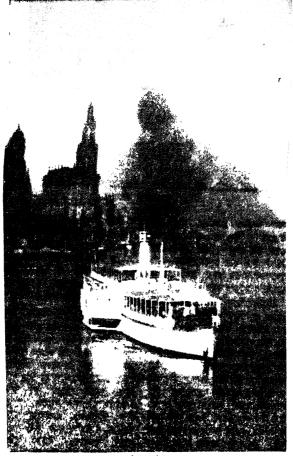
দেখিনি। কোন জায়গা কোন সম্প্রদায় কোন বয়সের মধ্যে নয়। বরঞ্চ উল্টো। কালো বলেই খাতির যেন বেশী। ভাব করবার জন্য লোক উসখুস করে। কালোর সেরা কালো আফ্রিকার ভায়াদের যা খাতির—হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরতাম, অঙ্গের উপর আর কয়েকটা পোঁচ দিতে তোমার এমন কী বেশী মেহনত হত ঈশ্বর!

গিন্নী ইতিমধ্যে গোটা তিনেক দপদপে আলো নিয়ে এসেছেন টানতে টানতে। সিনেমার স্টুডিওয় যেমন সব দেখেন। আলো জ্বেলেই হল না—ওদিকে সরে বসুন, এদিকে মুখ ফেরান, উঁহু আর একটু...। মোভি-ক্যামেরা উদ্যত, ছবি তুলে নেবেন সকলের। ঐ বাচ্চা সুদ্ধ। বলছেন, হাসুন দেখি। আহা, মুখ বুজে কেন? খান। কথাবার্তা বলুন।

অতএব হাসা-ভোজন এবং কথাবার্তা একমুখে সমস্ত করতে হচ্ছে। জিমারিংকে জিজ্ঞাসা করি, লড়াইয়ের সময়টা আপনি কোথায়? বোমায় ছারখার হয়ে গেল, আপনি ছিলেন তখন শহরে?

বোমা ফেলল, লড়াই তখন শেষ হয়েছে একরকম। সবাই জানে, হিটলার হেরে গেছে। রুশ-সৈন্য ঢুকে পড়েছে জর্মনির পূব অঞ্চলে। নাৎসিরা পালাচ্ছে। বোমা আগে পড়েনি; সেই প্রথম। আর সেই শেষ। মিলিটারী-ঘাটি নয়, শিল্প-সংগীত-সংস্কৃতির জায়গা—অকারণ বোমা ফেলতে যাবে কেন? শুধুমাত্র সেই একদিন—

মোভির খরখর আওয়াজ বন্ধ। জোরালো আলোগুলো নিভেছে, দেয়ালের ম্লান আলোটা শুধু। বাচ্চাকে নিয়ে মেড চলে গেল। গম্ভীর কণ্ঠস্বর—এক-একটা বুলেটের মত শব্দ বেরিয়ে আসছে জিমারিঙের কণ্ঠ থেকে। শ্রোতা আমরা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছি।

অনেক দিন নয়, শুধু সেই একদিন। পঁয়তাল্লিশ সনের তেরই ফেব্রুয়ারি। সন্ধ্যা থেকে রাত একটা-দেড়টা। তার মধ্যে সমস্ত শেষ।

গিন্নী ভিতরে চলে গেলেন ক্যামেরা রাখতে। আর আসেন না। থেমে থেমে জিমারিং কথা বলছেন।

তেরই ফেব্রুয়ারি। কোনদিন ভুলবার নয়। সন্ধ্যার পর ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান—আকাশ ছেয়ে গেল। পূব অঞ্চলের উদ্বাস্তুরা এসে পড়েছে। গোয়েবলসের প্রচার শুনে শুনে রুশদের ভেবেছে বাঘ-সিংহেরই রকম-ফের। ঘরবাড়ি ফেলে পাগল হয়ে পালিয়েছে। দশ হাজার এসে পড়েছে এই শহরে। বোমার বৃষ্টি করছে অবিরত চলেছে। বাদবিচার নেই। সেদিন সন্ধ্যার আগে কেউ ভাবেনি, এত বড় সর্বনাশ হবে রাত্রিটুকুর মধ্যে। বনেদি

ধ্বস্ত মূর্তির অনুকরণে নতুন মূর্তি তৈরি করা হচ্ছে

পাড়াগুলোর চিহ্নমাত্র রইল না। দাউদাউ করে জ্বলছে। বার বছর পরে আজও দেখ ধ্বংসের পাহাড়। অর্ধ রাত্রের মধ্যে সরকারী হিসাব মতে লোক মরেছিল পঁয়ত্রিশ হাজার। বে-সরকারী মতে তার ডবল। দশ হাজার উদ্বাস্তুর মধ্যে দশটি প্রাণীও বাঁচেনি......

জিমারিঙের বাড়ি থেকে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম। আর সকলে রইলেন, ওঁদের এখন চলবে। সকাল সকাল মানে বারটা। ওয়াল্ড-পার্ক হোটেলে আছি—অনেকটা দূরে। গিয়ে লিখব। না লিখে রাখলে কথাগুলো হয়ত মনে থাকবে, কিন্তু জিমারিঙের জ্বলজ্বলে ঐ চোখের ভাষা পাব কোথায়? ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি নেমেছে। পথ জনহীন—শহর জায়গা কে বলবে? গাড়ির ড্রাইভার, আর পিছনের বিশাল সিটের প্রান্তদেশে আমি। দু-জন এই আমরা। জায়গা জানিনে, মানুষ-জন চেনা নেই—কী অকুণ্ঠ নির্ভরতায় চলেছি তবু! লড়াইয়ের সময় এই জর্মনদের আতঙ্কে ব্যাকুল ছিলাম। এই ত কটা বছর আগের কথা। আজকে কাছাকাছি সেই তারা কত ভাল, কেমন কোমল স্বভাবের!

চূর্ণবিচূর্ণ অট্টালিকা—দুটো-দশটা কিংবা একশ-দুশ নয়, লাইনবন্দী চলেছে। দেড়খানা দেয়ালের উপর লোহার কড়ি ঝুলছে কোথাও; কোনখানে শুধু মাত্র ইটের পাহাড়। জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। ডাইনে বাঁয়ে দেখতে দেখতে যাচ্ছি। গাড়ি ছুটেছে—ঝুপঝুপ বৃষ্টিতে আওয়াজটা আর্তনাদের মত। রাস্তার আলো এই একটা, উই একটা—প্রেতপুরীর চৌকিদারগুলো জলে ভিজে ভিজে পাহারা দিচ্ছে। গা ছমছম করে—এই ত, বার বছর

পিলনিজের সামনে ভারতীয় লেখকবৃন্দ

মাত্র। তাদেরই আত্মীয়বন্ধু কতজন বেঁচে রয়েছেন, এই শহরেই আছেন ম্যাক্স জিমারিঙের মত। এক রাত্রে সত্তর হাজারের প্রাণ গেল—লড়াইয়ের সৈন্য নয়, নিরীহ গৃহস্থ মানুষ। গুণী-জ্ঞানী শিল্পী কতজন—তাঁদের মধ্যে বঙ্গবাসী একটি। আমি তাঁকে জানতাম ছাত্রজীবনে। অম্বিকা মজুমদার। বড় গায়ক—"মুঠো মুঠো রাঙা জবা কে দিল পায়" উদাত্ত গলার গান এখনও যেন শুনতে পাই। দক্ষিণ-কলকাতায় থাকতেন। আপনারাও চিনতেন অনেকে, এখন হয়ত মনে পড়ছে না। সঙ্গীতে ডক্টরেট পান। ড্রেসডেনে ছিলেন, লড়াইয়ের দরুন আটকা পড়ে ছিলেন। গায়কের কণ্ঠ চিরকালের জন্য নীরব হল সত্তর হাজারের সঙ্গে।

গাড়ির বাঁক দিল। এ-জায়গায় আরও এসেছি। ডাইনে নারী-গির্জার (Women's Church) অবশেষ—এই গির্জা মেরিমাতার নামে উৎসৃষ্ট। কত নামডাক ছিল, চোখ তুলে তাকাতে এখন ভয় করে। পুরনো কীর্তিগুলো ঠিক আগের মতন করে আবার গড়বে, কেবল এই গির্জা নয়। এতে হাত ছোঁয়াবে না কখনও। যেমন আছে তেমনি দশায় রেখে দেবে। অভিমান? এত নামের পুণ্যস্থান—লড়াইয়ে তার কী দুর্গতি, দেখ সকলে। লড়াই জিনিসটা কী সাংঘাতিক, তার আন্দাজ নাও। চিরকালের মানুষ দেখবে।

নারী-গির্জার প্রায় উল্টো দিকে প্রাচীন এক প্রাসাদ। অর্ধেক ভেঙে আছে—বড় বড় থামগুলোয় কাঠ বেঁধে ঘিরে রেখেছে, মানুষজন বিপজ্জনক জায়গায় ঢুকে না পড়ে। গাড়ি সেইখানটা এসেছে—হঠাৎ দেখি, প্রাচীন অলিন্দে ভাঙা খিলানের নীচে একজোড়া তরুণ-তরুণী। ছড়ছড় করে অঝোর ধারায় জল ঝরছে, দুর্যোগে আশ্রয় নিয়েছে। নিশিরাত্রি, ভয়াল মৃত্যুপুরী, আকাশের বিদ্যুৎ-চমক আর অবিরল বৃষ্টি—তারা সম্বিৎ হারিয়ে আছে, দুটি মাথা এক জায়গায়। আমার গাড়ি সগর্জনে পাশ দিয়ে বেরুল, মুখ তুলে তাকাল না এক নজর।

পিলনিজ বাদ দিয়ে ড্রেসডেন দেখা কখনো মঞ্জুর হবে না আপনাদের কাছে। শহরের কাছাকাছি বাগানবাড়ি—স্যাক্সনির রাজাদের কীর্তি। ড্রেসডেন গ্যালারির ছবি দেখলেন, পিলনিজে গিয়ে বাদ-বাকী দেখুন। বোমার ভয়ে ছবি সরিয়ে ফেলেছিল, এখনও সব আনা হয়নি।

সকালবেলা অতএব স্টিমার ধরতে এলব-এর ঘাটে এসেছি। বিষম কুয়াশা, কনকনে জোলো হাওয়া বইছে। টিকিট কেটে কখন আসে কখন আসে করছি। আসছে হামবার্গের দিক থেকে, যাবে চেক সীমান্ত অবধি। একটা ঘাট বাদ দিয়ে পরের ঘাটে আমরা নেমে যাব।

হেনকালে জিমারিং এসে পড়লেন। তিনি সঙ্গে যাচ্ছেন—স্থানীয় ব্যক্তি, ভাল করে দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন। অনেকগুলো পুলে গাঙের এপার-ওপার জুড়ে দিয়েছে। আঙুল তুলে জিমারিং বলেন, সমস্ত পুল নিশ্চিহ্ন করেছিল, ভেঙেচুরে ঐ একটা মাত্র ছিল। বোধকরি তাদেরই পারাপারের প্রয়োজনে। শহরের মানুষের অনেক দিন ঐ এক পুল ছাড়া গতি ছিল না। কিংবা নৌকোয়। আর যত পুল দেখ, সমস্ত নতুন করে বানান।

নদী বাঁক নিয়েছে এইখানে, অনেকটা ফাঁকা জায়গা। জিমারিং দেখাচ্ছেন, চর এটা। তেরই ফেব্রুয়ারির রাত দুপুরে দাউদাউ করে শহর জ্বলছে। সে তাপে কেউ টিঁকতে পারে না। বোমার মারে যারা মরেনি, তারা সব ছুটে এল ফাঁকায়। ওখানে ঐ চরের উপর আশ্রয় নিল। শুনবে তারপর? শকুনের মত প্লেনগুলো ভুঁইয়ের দিকে ছোঁ মারে, মানুষ দেখে দেখে মেশিন-গান করে উপরে উঠে যায়। এলব-এর চরে মড়ার গাদা, রক্ত গড়িয়ে গাঙের জল রাঙা হয়ে গেল। ঐ জায়গায়—যেখানটায় ডেইজি ফুল ফুটে তারার মতন আলো করে আছে।

ছোট বয়সে কপোতাক্ষীতে স্টিমারে যেতে যেমন দেখেছি, তেমনি। চেনা গাছপালা নেই, ঘরবাড়ির চেহারাও আলাদা—তবু সেই ঘন সবুজ চতুর্দিকে, সবুজ পাতালতায় রঙ-বেরঙের ফুল। ঝিলিমিলি নদীস্রোত, কপোতের চোখের মত স্বচ্ছ জল। অনেক সমুদ্র পার হয়ে এসে আমার ছোট্ট বেলার নদী ফিরে পেলাম।

পিলনিজের ঘাট বলে দিতে হয় না। রাজবাড়ি দেখেই [illegible]। অবাক কাণ্ড—চীনা ধরনের বাড়ি, পিকিনে অবিকল যে-বস্তু দেখে এসেছি। রাজরাজড়ার খেয়াল, পয়সার কিছু কমতি নেই—হুকুম হল স্যাক্সনি-ভূমিতে চীনা-বাড়ি বানাতে হবে চীন থেকে স্থপতি এল। একেবারে গাঙের উপরে—জলের ধাক্কা লাগে বাইরের উঠানের প্রান্তসীমায়। বোমা পড়েনি, নিখুঁত রয়ে গিয়েছে। রাজা এসে থাকতেন অবরে-সবরে ইংলণ্ডের রাণী যেমন উইণ্ডসরে গিয়ে থাকেন। জায়গা পেয়েছে খাসা। নদীপারে ছোট ছোট পাহাড় আর বন। এদের ব[illegible] দেখে বিশ্বাস নেই—বাঘ-হরিণ নয়, খু[illegible] সম্ভব নরবসতি ঐ বনেও। এ-পারে[illegible] বিস্তীর্ণ বাগান। বড় বড় ওক গাছ-বিশাল প্রাচীন বনস্পতিরা। কাঠের টবে[illegible] মধ্যে চীনা গাছ-পালা—বয়সে দু-তিন শ[illegible] নীচে কেউ নন। চেস্টনাটগাছ অজস্র-সাদা সাদা ফুলে পাতা দেখবার জো নেই আঁকা-বাঁকা ঝিল—হাঁস ভাসছে ঝাঁক বেঁধে ডাঙায় উঠে গাছের তলে পাখনার জ[illegible] ঝাড়ছে। ঝরনার জল আসছে কলকল করে দূরের বনান্তরাল থেকে, নালা বেয়ে ছায়া ছায়ায় বড় গাঙে গিয়ে পড়ছে। বেগুনে লাইলাক ফুল। লিলি ফুল। ক্যামেলিয়া ফুল—লোহার ফ্রেমের উপর ছাউনি ক[illegible] ঢেকেঢুকে রাখে, শীতের অন্তে ছাউনি খুলে দেয়। ফুলগাছ ও লতাপাতায় রীতিম[illegible] দেয়াল বানিয়েছে। দেয়াল-ঘেরা কুঞ্জবন চল[illegible] ত চললই। রাজার ঘরের বউমেয়েরা ম[illegible] সুখে ঘুরে বেড়াত। নতুন কালের ছেলে মেয়েরা এখনও এসে আড়ালে আবডা[illegible] মধুগুঞ্জন করে। রাজহংসের মত ধবধ[illegible] সাদা বার্জ—এলবএর উপর জলবিহা[illegible] বেরুতেন রাজা। আধানারী-আধামৎ[illegible] শিঙা বাজাচ্ছে বার্জের গলুইয়ে। পি[illegible] দিকে রাজার কামরা, কামরার উপর মুকু[illegible] চিহ্ন। বার্জ এখন ডাঙার উপ[illegible] পাকাপাকি রকম তুলে রেখেছে। কত লে[illegible]

খাটছে বাগানবাড়ির কাজে! কাচের গরম ঘরে রকমারী গাছপালা বানাচ্ছে। দূরের লোক কাছের লোক দলে দলে বাগানে এসে ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়ায়। বর্ণনা দিয়ে কী বোঝাব, চোখে না দেখলে হবে না। পথ কুল্যে ছ-হাজার মাইলও নয়, আসুন না দেখে।

ঘুরে ঘুরে শেষটা আর বেরুবার পথ পাইনে। ফেরা হবে মোটরে নদীপথে নয়। ডাঙার দিকে যে দরজা সেইটে খুঁজছি। একটা পথ ধরে অনেক দূরে গিয়ে—দেয়াল। অন্য পথেও তাই। বাচ্চা ছেলে কয়েকটা এক-পায়ে নেচে নেচে খেলছে। বোবা লোক ত আমরা—কথায় বোঝাতে পারিনে, হাতমুখের ভঙ্গি করি। চালাক ছেলেগুলো—এতেই বুঝে ফেলল। সঙ্গে করে নিয়ে দরজা দেখিয়ে দিল।

তেমাথা পথে এসে দাঁড়ালাম। জর্মানির গ্রাম। এই জায়গাতেই আমাদের মোটর দুখানা আসবে, এসে এখনও পৌঁছয়নি। গাছতলায় ছোট্ট এক ঘরে দোকান। এইচ. ও. (পুরো কথা—Handels Organisation) সাইন বোর্ডে রয়েছে; অস্যার্থ সরকারী দোকান। কাজ নেই ত দোকানে ঢুকে দরদাম দেখা যাক। মার্কের ভারে পকেট ঝুলে পড়েছে—হালকা করা যাক খানিকটা।

সাবান কিনছি, ছবি কিনছি, কিছু খাম—বাঃ রে, চকোলেট রয়েছে, তবে আর কেনবার ভাবনাটা কী? চকোলেটেরও জায়গা ড্রেসডেন। দোকানের মেয়ে দুটোকে দু-টুকরো দিয়ে দুই-দুনো-চার পাটি দাঁতে হাসি বার করা গেল। পথের উপর বিদেশী দেখে পাড়ার পলিতকেশ কয়েকজন আগুয়ান হয়েছেন, তাঁদের দিলাম। মাছের ভ্যান এসে রাস্তার পাশে দাঁড়াল—মানুষজন হুড়মুড়িয়ে এসে গাড়ির ঘুলঘুলির সামনে লাইন দিল। যার যে-পরিমাণ দরকার, ওজন-কলে মেপে রঙিন কাগজে প্যাক করে দিয়ে পয়সা নিচ্ছে। খানিকটা চেয়ে চেয়ে দেখে কিউয়ের কাছে এগিয়ে চকোলেট ছাড়লাম কয়েকটা। এতক্ষণের শৃঙ্খলায় ফাটল ধরে গেল—চকোলেট চুষছে, মাছওয়ালা প্রশ্ন করে জবাব পায় না। বিরক্ত পিছনের মানুষ কিউ ভেঙে আগে গিয়ে উঠছে। গ্রাম হলেও ইলেকট্রিসিটি সর্বত্র—মই নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে মিস্ত্রি ছুটছে, কোনখানে লাইন বিগড়েছে নিশ্চয়। চকোলেট এক টুকরা দিলাম এগিয়ে। মই ফেলে মিস্ত্রি মশায় কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালেন—আলাপনের বাঞ্ছা, কিন্তু নিরুপায় উভয় পক্ষই। কোন বাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল কয়েকটি বাচ্চা—ট্রাইসাইকেলে চেপেছে একটি, অন্যগুলো সাইকেল ঠেলছে আর হুল্লোড় করছে। চকোলেটের প্রয়োগ হল। তখন বিষম বিপদ—সাইকেল চড়াবে। না চড়িয়ে শুনবেই না। আরে বাপু, বসি কোনখানে? আর এই দেহভারে ঐ কখানা দুমড়ে তালগোল পাকিয়ে যাবে, সেটা ভাব একবার। চকোলেটের দেখছি অমোঘ শক্তি। আমার ত মনে হয়, ডালেস আর ক্রুশ্চেভকে দু-প্যাকেট ড্রেসডেন-চকোলেট যদি পাঠান হয়, চকোলেট মুখে পুরেই তাঁরা একমত হবেন। অবশেষে গাড়ি দেখা দিল আমাদের। ড্রাইভারদেরও দিলাম। একশ-বিশ ত সাধারণ স্পীড এঁদের—হাসির বহরে মনে হচ্ছে এবারে মোটর প্লেনের মত ওড়াবেন, চাকা ভুঁয়ে ঠেকবে না।

ঠিক তাই। আধঘণ্টার মধ্যে শহরে এসে পড়লাম। ভিন্ন এক পাড়া। বড় বড় ফ্ল্যাট বাড়ি উঠে গেছে। ঐতিহাসিক বাড়িগুলো ধীরে সুস্থে হতে পরাবে—নিরাশ্রয়দের এই সব জায়গা সকলের আগে। হাই ইস্কুল, টেকনিক্যাল ও মেডিক্যাল ইস্কুল। থিয়েটার-সিনেমা। বোমার আগুনের ভস্ম উড়িয়ে দিয়ে চারিদিকে সবুজ জীবনের পত্তন।

বেলা হয়েছে। হকগে। জিম্মারিং টিকিট কেটে আনলেন। পাহাড়ে ওঠার রেলগাড়ি অবিরত ওঠানামা করছে, একটিবার না উঠে হোটেলে ফেরা যায় কেমন করে? ড্রেসডেনের সবচেয়ে উঁচু রেস্তোরাঁয় বসে অন্তত এক পাত্র কফি খেতে হবে।

রেলগাড়ি শুঁয়োপোকার মত পিলপিল করে চূড়ায় উঠল। হংকঙে ট্রামে চড়ে এমনি উপরে উঠেছিলাম। গোটা অঞ্চল নজরে আসে। নদীখাল, জলা জায়গা, সবুজ সমভূমি, অরণ্যময় পাহাড়—এই একটা, উই আর একটা। রেস্তোরাঁয় বড় ভিড়, এত জনের জায়গা হল না, সময়ও নেই জায়গার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবার। ঐ উপরেও এক্‌জিবিশন, সেখানে খানিকটা ঘোরাঘুরি হল। এক দঙ্গল ইস্কুলের ছেলেমেয়ে বেড়াতে এসেছে, ভাব জমাবার চেষ্টা হল তাদের সঙ্গে। আবার নেমে এলাম।

ঠিক দুপুর। ছুটুন, আর নয়। নারী-গির্জার পাশে সেই পথ। কল আর মানুষে মিলে রাবিশ সরাচ্ছে। বিস্তর লোক ভিড় করেছে একটা জায়গায়। কী দেখছে। গাড়িও থামাল একটুক্ষু। মানুষের কঙ্কাল। চাপা পড়ে ছিল ভাঙা বাড়ির তলে—মানুষ, তার ঘরগৃহস্থালী সাধবাসনা। বেরিয়ে এসেছে। নতুন আর কি, এমন এখানে আখছার বেরোয়। পোড়া দুয়ার-জানলা, টুকরো ইট, তোবড়ান লোহা আর ঐ এক যুগ আগেকার পুরনো কঙ্কাল খানাখন্দে ফেলে দিয়ে জীবন্তদের ঘরবাড়ি হচ্ছে সুখশান্তিতে বসতির জন্য। সামনা-সামনি কাঠের ঘরের ঐ ওদিকটায় তাদেরই দুটি মণ্ডপ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল—দুর্যোগ নিশীথে কাল তাদের দেখেছিলাম।

হোটেলের লাউঞ্জে একটি মেয়ে বসে আছে। অনেকক্ষণ ধরে আছে। আমাদের জন্য। খবরের কাগজের সংবাদদাতা—আমাদের মতামত চায়। বিদেশে এসে দর বেড়েছে, মতামতের দাম হয়েছে। ড্রেসডেনের কী ভাল লাগল বলুন? সে-জবাব ত এক কথায়—ছবির গ্যালারি। তাবৎ দুনিয়া যার নাম জানে। আর কী ভাল লাগল? সর্বনাশে মুশড়ে পড়নি তোমরা, নতুন করে বানাচ্ছ আবার সব।

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে মৃদুকণ্ঠে বলে, তবু কিন্তু অনেক সমস্যা, অনেক বিপদ। তৃতীয়-লড়াইয়ের ছায়া দেখছি এরই মধ্যে।

ত্রিশঙ্কু ॥ কুয়াশায় আবৃতদেহ কে চলেছ তুমি?

নরকযাত্রী ॥ পরিচয় শুনে কী লাভ, আমি নিতান্ত হতভাগ্য।

ত্রিশঙ্কু ॥ হতভাগ্য! শুনে সমবেদনা অনুভব করছি।

নরকযাত্রী ॥ তুমি সহৃদয় বটে।

ত্রিশঙ্কু ॥ সহৃদয়! সহৃদয়তাই বটে। তোমার ভাগ্যহীনতার প্রসঙ্গে নিজের কথা মনে পড়ে গেল!

নরকযাত্রী ॥ তুমিও কি হতভাগ্য!

ত্রিশঙ্কু ॥ চরাচরে এমন হতভাগ্য আর কে আছে?

নরকযাত্রী ॥ আশ্চর্য! আমার ধারণা ছিল, আমার চেয়ে বড় হতভাগা আর কেউ কোথাও নেই।

ত্রিশঙ্কু ॥ ভাগ্যহীনতার ঐটি যে লক্ষণ। সর্বদাই নিজেকে হতভাগ্যের সেরা মনে হয়!

নরকযাত্রী ॥ তা বটে। ভাগ্যবান লোকে যেমন নিজের সৌভাগ্যকে স্বীকার করতেই চায় না।

ত্রিশঙ্কু ॥ হাঁ, এ ঠিক তার বিপরীত। কিন্তু এখনও তোমার পরিচয় পেলাম না।

নরকযাত্রী ॥ ভাগ্যহীনতার আবার পরিচয় কী? আর কেনই বা পরিচয়দান?

ত্রিশঙ্কু ॥ [illegible] [illegible] পারি [illegible] নিজের বাদে কার অবদান?

নরকযাত্রী ॥ তবে শোন, আমি নরকযাত্রী!

ত্রিশঙ্কু ॥ আহা, শুনে লোভ হচ্ছে।

নরকযাত্রী ॥ মর্মান্তিক এই পরিহাস।

ত্রিশঙ্কু ॥ পরিহাস নয় বন্ধু, পরিহাস নয়, সত্যই শুনে ঈর্ষা অনুভব করছি।

নরকযাত্রী ॥ বিচিত্র তোমার মতিগতি। এই অস্বাভাবিক ঈর্ষার কারণ?

ত্রিশঙ্কু ॥ তোমার বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পারছি। কিন্তু মনে রেখ, নরকের চেয়েও হীনতর স্থান সম্ভব।

নরকযাত্রী ॥ তেমন কোন স্থান থাকলেও আমার অগোচর। জানি মর্তলোক, জানি সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত রসাতল, জানি সপ্ত লোক—নরকের চেয়ে হীনতর স্থান জানিনে।

ত্রিশঙ্কু ॥ যদি থাকে তবে সেখানকার অধিবাসীকে কী বলবে?

নরকযাত্রী ॥ অসম্ভব আলোচনায় কী লাভ? তার চেয়ে তোমার পরিচয় শুনি।

ত্রিশঙ্কু ॥ আমার জগতের পরিচয়েই আজ আমার পরিচয়।

নরকযাত্রী ॥ তবু যেমন করে হক পরিচয়টাই শুনি।

ত্রিশঙ্কু ॥ সে-জগতের দেবার মত কোন পরিচয় নেই, কী বলে তোমাকে বোঝাব?

নরকযাত্রী ॥ কেন?

ত্রিশঙ্কু ॥ নইলে আর হতভাগ্যতম বল কেন।

নরকযাত্রী ॥ তবু যেমন করে হে বুঝিয়ে দাও, আভাসে ইশারায় অনেক রহস্য বোঝান চলে।

ত্রিশঙ্কু ॥ তা চলে অবশ্য। তবে শো যেসব বস্তুকে মনুষের কল্পনা চ কাম্য মনে করে স্বর্গ তাই দিয়ে গড় নরক ঠিক তার উল্টো, বর্জনী আবর্জনালোক নরক। আর মর্ত্য ভা মন্দর মিশালে তৈরি। কেউ ব ভালটা বেশী, কেউ বলে মন্দটা।

নরকযাত্রী ॥ উত্তম বলেছ। কিন্তু এ ছা আর কী থাকতে পারে জানিনে।

ত্রিশঙ্কু ॥ সেটাই যে বোঝান কঠিন, ত চেষ্টা করা যাক। এ তিনের বাই আছে এক জগৎ যা অবাস্তবতা কুয়াশা দিয়ে তৈরি।

নরকযাত্রী ॥ অবাস্তবতার কুয়াশা! তোমা কথাটাই যে কুয়াশার মত। কুয়াশ দিয়ে কি কুয়াশা বোঝান যায়?

ত্রিশঙ্কু ॥ তবেই বুঝে নাও সে-জগৎ কেমন অবাস্তব, যার পরিচয় দেবা যোগ্য শব্দ নেই মানুষের ভাষায়।

নরকযাত্রী ॥ ইশারা ইঙ্গিত আছে।

ত্রিশঙ্কু ॥ কুয়াশা শব্দটি সেই ইশার ইঙ্গিতের অন্তর্গত।

নরকযাত্রী ॥ আর একটু স্পষ্ট কর।

ত্রিশঙ্কু ॥ কুয়াশা স্পষ্ট হলে কি আ

কুয়াশা থাকে? অবাস্তব লোককে স্পষ্ট করতে গেলে তার মধ্যে বস্তু এসে পড়ে, তখনই তার স্বধর্ম যায় নষ্ট হয়ে।

নরকযাত্রী ॥ কোথায় এই অবাস্তবলোক?

ত্রিশঙ্কু ॥ বাইরে এবং ভিতরে দুই স্থানেই।

নরকযাত্রী ॥ আবার কুয়াশা।

ত্রিশঙ্কু ॥ বাইরে অন্তরীক্ষে, ভিতরে মনের মধ্যে।

নরকযাত্রী ॥ অন্তরীক্ষের কথা বলতে পারিনে, যাকে পাপ বলি তাকেই কি মনোলোকের অবাস্তবতা বলছ?

ত্রিশঙ্কু ॥ পাপ ত অবাস্তব নয়, পাপ বস্তুস্পর্শ-জড়িত।

নরকযাত্রী ॥ পুণ্য?

ত্রিশঙ্কু ॥ পুণ্যও বস্তুস্পর্শ-জড়িত।

নরকযাত্রী ॥ পাপও নয় পুণ্যও নয়, তবে আর কী হতে পারে?

ত্রিশঙ্কু ॥ পাপ পুণ্য কোনটারই চর্চা করেনি যে, কেবলই নিজের ছায়া নিয়ে ছিল মত্ত হয়ে, তাকে কী বলবে?

নরকযাত্রী ॥ আত্মপ্রেমে মুগ্ধ।

ত্রিশঙ্কু ॥ অবাস্তবতার প্রেমে মুগ্ধ।

নরকযাত্রী ॥ তবে আত্মতন্ত্রতাই কি অবাস্তবতা?

ত্রিশঙ্কু ॥ অনন্যতন্ত্র আত্মতন্ত্রতাই অবাস্তবতা।

নরকযাত্রী ॥ অনন্যতন্ত্রতা আর আত্মতন্ত্রতা কি স্বতোবিরোধী নয়?

ত্রিশঙ্কু ॥ স্বতোবিরোধী বলে জগতে কিছু নেই, ওটা দেখার ভুল। দুই চোখের তারায় ছায়া পড়ে দুটো, কিন্তু বস্তু প্রতিভাত হয় একটি—এই ত স্বাভাবিক। অনন্যতন্ত্রতা আর আত্মতন্ত্রতা সেই দুটো ছায়ার মত।

নরকযাত্রী ॥ কিন্তু প্রতিভাত বস্তু এক বই নয়।

ত্রিশঙ্কু ॥ নিশ্চয়।

নরকযাত্রী ॥ কী তার নাম?

ত্রিশঙ্কু ॥ বিশ্বতন্ত্রতা।

নরকযাত্রী ॥ এবারে কুয়াশা ক্রমে গাঢ়তর হচ্ছে।

ত্রিশঙ্কু ॥ তবে বস্তুলোকের দিকে এগোচ্ছি। ঘনতর কুয়াশাকেই বলি মেঘ।

নরকযাত্রী ॥ মেঘের চেয়ে বাষ্পের উপরে ভরসা বেশী—বেশ জলের মত পরিষ্কার করে দাও দেখি।

ত্রিশঙ্কু ॥ স্বর্গের, নরকের সীমানার বাইরে অন্তরীক্ষের প্রান্তরের প্রান্তে যে অবাস্তবলোক আছে, অনন্যতন্ত্র বিশ্ববিমুখ আত্মতন্ত্রতার মন্থনজাত কুয়াশা দিয়ে যে-লোক তৈরী, যেখানে আলো নেই অন্ধকার নেই, উর্ধ্ব নেই, অধঃ নেই, কাল নেই, দেশ নেই; যেখানে জ্ঞান নেই, ভক্তি নেই, কর্ম নেই; যেখানে কেবল অহং আছে বলে অহংটাও নেই—সেই দেশের একক অধীশ্বর আমি ত্রিশঙ্কু!

নরকযাত্রী ॥ তুমি ত্রিশঙ্কু! অযোধ্যার অধিপতি, পুরাণে শোনা আছে তোমার নাম। কী পাপে তোমার এই গতি হল মহারাজ।

ত্রিশঙ্কু ॥ অবাস্তবতার অভিশাপে।

নরকযাত্রী ॥ কে দিল এমন নিষ্ঠুর অভিশাপ?

ত্রিশঙ্কু ॥ সব অভিসম্পাত যে দিয়ে থাকে।

নরকযাত্রী ॥ অদৃষ্ট?

ত্রিশঙ্কু ॥ অভিশাপ মাত্রেই আত্মশাপ, অভিশপ্ত ব্যক্তিমাত্রেই আত্মশপ্ত।

নরকযাত্রী ॥ নিজেই নিজেকে শাপ দিয়েছ?

ত্রিশঙ্কু ॥ নিজে শাপের কারণ ঘটিয়েছি, বাইরে থেকে এসেছে উপলক্ষ্য। ও একই কথা হল।

নরকযাত্রী ॥ কৌতূহল ক্রমে বাড়ছে, দাও তোমার আত্মাভিশাপের বিবরণ।

ত্রিশঙ্কু ॥ ছিলাম অযোধ্যার অধিপতি,

দুটী অনবদ্য অবদান

প্রস্তুতকারক—দেজ মেডিকেল ষ্টোর্স্ প্রাইভেট লিমিটেড

দানে ধ্যানে ক্রিয়া-কর্মে অশেষ ছিল আমার খ্যাতি। অবশেষে জীবনের অপরাহ্নে সশরীরে স্বর্গলাভের ইচ্ছা হল। দেবগণ স্বভাবতই প্রত্যাখ্যান করলেন আমার প্রার্থনা। তখন পড়লাম গিয়ে বিশ্বামিত্র ঋষির চরণে; বললাম, তপোধন, আপনি তপোবলে আমাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করুন। ঋষির দয়ার শরীর, তিনি আমার আকুলতা দেখে মন্ত্রবলে প্রেরণ করলেন স্বর্গাভিমুখে। তখন বুঝতে পারিনি কী শোচনীয় পরিণাম অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। স্বর্গে উপস্থিত হওয়া-মাত্র ইন্দ্র করলেন প্রত্যাখ্যান। তখন, হায়, তখনি প্রথম বুঝলাম যে, সর্বনাশ সাধন করেছি নিজের। বিশ্বামিত্রের মন্ত্র আর ইন্দ্রের প্রত্যাখ্যান—দুয়ে মিলে অধঃ ঊর্ধ্ব করল রুদ্ধ। আমার মর্ত্যও গেল সরে, স্বর্গও হল না আয়ত্ত। এখন আমি, তখন থেকে আমি, কতকাল হল বলতে পারিনে, অবাস্তবতার অন্তরীক্ষে বিশ্বের বিদ্রুপের মত দোদুল্যমান।

নরকযাত্রী ॥ শুনলাম তোমার ইতিহাস।

ত্রিশঙ্কু ॥ একে ইতিহাস বলছ? দেশ-কালের লীলায় ইতিহাসের সৃষ্টি। এখানে দেশ নেই, কালও নেই।

নরকযাত্রী ॥ সমস্তই সত্য, কিন্তু তুমি কোন পাপ করনি।

ত্রিশঙ্কু ॥ পাপ! এর চেয়ে পাপ ভাল, এই অবাস্তবতার চেয়ে পাপবোধ সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।

নরকযাত্রী ॥ এত খেদ কেন। তোমার অন্তরীক্ষ আর যাই হক, নরক ত নয়।

ত্রিশঙ্কু ॥ এর চেয়ে নরক অনেক বরণীয়।

নরকযাত্রী ॥ কেন, কেন?

ত্রিশঙ্কু ॥ নরক বস্তু দিয়ে গড়া, সেখানকার দুঃসহ রৌরব অগ্নি সেও ত বাস্তব বই নই। আর সেখানে কাল আছে, তাই কালের অবসান আছে, একদিন হবে তোমার মুক্তি। এখানে কাল নাই, তাই মুক্তির আশা নাই; দেশ নাই, তাই স্থানান্তর প্রাপ্তির আশা নাই। কেবলি অবাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করে মরছি। এ যে কী দুঃখ কেমন করে বোঝাব। অনন্ত কুয়াশার বদলে আমার আত্মা প্রার্থনা করছে একবিন্দু শিশির।

নরকযাত্রী ॥ এখনও বুঝতে পারলাম না কী পাপে তোমার এই গতি!

ত্রিশঙ্কু ॥ সশরীরে স্বর্গগমন! আমি এমন কিছু প্রার্থনা করেছিলাম য একান্ত অবাস্তব। বস্তুপ্রকৃতিরে লংঘন করতে চেয়েছিলাম, বস্তুজগতের অভিসম্পাতে নিক্ষিপ্ত আমি অবাস্তবতার কুজ্ঝটিকা সমুদ্রে। যাই হক এ চরম দুঃখ তোমাকে বোঝাতে পার না।

নরকযাত্রী ॥ রাজন্, তুমি কি নারকী সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করতে সম্মত আছ?

ত্রিশঙ্কু ॥ এখনই, এখনই। কিন্তু তুমি কি এত শোনবার পরেও আমার স্থলাভিষিক্ত হতে সম্মত।

নরকযাত্রী ॥ নিশ্চয়—রৌরব অনলের ভয়ে আমি ভীত।

ত্রিশঙ্কু ॥ হায়, তুমি সম্মত থাকলে আমার সাধ্য নেই যে স্থান পরিবর্তন করি।

নরকযাত্রী ॥ বাধা কী?

ত্রিশঙ্কু ॥ বাধা আমি স্বয়ং—নইলে আ অবাস্তবতার শৃংখল দুর্মোচ্য কেন

নরকযাত্রী ॥ এস না চেষ্টা করা যাক।

ত্রিশঙ্কু ॥ অসাধ্য, অসম্ভব।

নরকযাত্রী ॥ তবে?

ত্রিশঙ্কু ॥ তবে আর কি, যাও। স্বর্গে তুলনায় নরক যত ভয়ংকর, নরকে তুলনায় এ অবাস্তবলোক তার চেয়ে ভয়ংকর। তুমি হতভাগ্য, আমি হ ভাগ্যতম।

নরকযাত্রী ॥ তবে চলি, মহারাজ।

ত্রিশঙ্কু ॥ যাও, কিন্তু মনে রেখ, ম রেখ, অবাস্তবতার অন্তরীক্ষচা ত্রিশঙ্কুকে, আর সকলকে বল, বুঝি বল স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের নাগালে বাইরে অবাস্তবতার দুস্তর স্বী নির্বাসিত এই ত্রিশঙ্কুর দুঃখ— দুঃখ ভাষার অতীত, বর্ণনা ক বোঝাই এমন সাধ্য নেই, যে বো সে বোঝে! চরাচরে আর কাউ কখনও যেন না বুঝতে হয়— মহত্তম দুঃখ। বিদায় বন্ধু, বিদা আশা করি বিদায়ের আগে বুঝে গে কেন সদ্য নরকযাত্রীকেও আমার এ ঈর্ষা।

ঊনবিংশ শতকে বাঙালী প্রতিভার যে বহুমুখী ও বিস্ময়কর বিকাশ ঘটিয়াছিল, তাহার মূলে কী কী কারণ বিদ্যমান ছিল, সে সম্পর্কে সম্যক আলোচনা আজও হয় নাই। অনেকেই বলিয়াছেন, বিগত শতকে বাংলার জাগরণের মূলে আছে পশ্চিমের উদার সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ঃ—তাই এই যুগের বাঙালীর সর্ববিধ কর্ম-প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে যুক্তি-বাদ, স্বাধীনতা-স্পৃহা, স্বাজাত্য-বোধ ও মানবতা বা মানবমুখিতা। কিন্তু এরূপ উক্তি যে একদেশদর্শী ও বিভ্রান্তিকর, তাহা আমাদের বুঝিবার সময় আসিয়াছে। উনিশ শতকের বাঙালীর পরম্পরাগত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তাহার চিন্তাধারাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তাহার পরিচয় লাভ করিতে হইলে বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা করার প্রয়োজন। আমরা সে-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না; আমরা শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, পুরুষানুক্রমে আমরা যে-চিন্তাধারার উত্তরাধিকারী হইয়াছি, যুগ যুগ ধরিয়া যে-ঐতিহ্যকে আমরা বহন করিয়া আসিয়াছি, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলেও তাহা বিলুপ্ত হয় নাই, হইতে পারে না। বাঙালীর জীবন উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি মূলত বৈদিক অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেও ধর্মসাধনায় ও অধিকাংশ আচার-অনুষ্ঠানে বাঙালী তান্ত্রিক,—তাই বাঙালীর চিন্তাধারায় এবং বাঙালীর সাহিত্য-কর্মে আমরা তন্ত্রশাস্ত্রের যে প্রভাব দেখিতে পাই, তাহা কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়।

বাংলায় নবযুগের প্রবর্তক বিচিত্রকর্মা রাজা রামমোহনের মধ্যে যেমন উপনিষদ ও বেদান্তের প্রভাব ছিল, তেমনই মহানির্বাণ প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব ছিল। মহানির্বাণ তন্ত্রের মধ্যেই তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সাহচর্য রামমোহনের জীবনে নিষ্ফল হয় নাই। জন-শ্রুতি এইরূপ যে রাজা স্বয়ং তীর্থস্বামীর নিকট তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং লক্ষবার পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন। "কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার" নামক ক্ষুদ্রাকৃতি নিবন্ধে রামমোহন তান্ত্রিক আচার সমর্থন করিয়াছেন। বেদান্তগ্রন্থে দেখা যায়, রামমোহন মোটামুটি আচার্য শঙ্করের মতবাদকে মানিয়া লইয়াছেন, যদিও শঙ্করের মায়াবাদ তিনি সমর্থন করেন নাই। এই অদ্বৈত উপলব্ধিই তন্ত্রশাস্ত্রের শেষ কথা, তবে বিশিষ্ট উপাসনা-পদ্ধতি (যেমন যন্ত্র-প্রতীক উপাসনা) ও ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়াই তান্ত্রিক সাধক ব্রহ্মের সহিত আপনার ঐক্য অনুভব করেন। ভূতশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি প্রভৃতি সাধকের উপলব্ধির সহায়মাত্র। "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ,"—স্বয়ং দেবতা হইয়া দেবতার যজন করিবে, ইহাই তন্ত্র-শাস্ত্রের নির্দেশ। আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় তন্ত্রশাস্ত্রও অধিকারবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তন্ত্রশাস্ত্র তাই মানুষকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্য অনুসারে বিভক্ত করিয়া তাহার জন্য দেবাচার, বীরাচার ও পশ্বাচারের বিধান দিয়াছেন। আবার উপাসক-গণের হিতের জন্য তন্ত্র ধ্যান, জপ, এমন কি, বাহ্যপূজারও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।

"উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাধমাধমা॥"

(আমি ও ব্রহ্ম অভিন্ন, এই ভাবটি উত্তম, ধ্যানভাব মধ্যম, স্তুতি ও জপ অধম ভাব, আর বাহ্যপূজা অধমের চেয়েও অধম।)

রাজা রামমোহন গভীরভাবে নানা শাস্ত্রের পর্যালোচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ এ-কথা বলিয়াছেন যে, মূর্তিপূজা বা প্রতীকোপাসনা সর্বত্রই নিম্নাধিকারীর জন্য বিহিত হইয়াছে।

রাজা রামমোহন ব্রহ্মোপাসনার জন্য মহা-নির্বাণ তন্ত্র হইতে স্তবপঞ্চক গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। পরবর্তীকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের উপাসনা-পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষার জন্য উহার মধ্যে কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা রামমোহন ইহার একটি বর্ণও পরিবর্তিত করেন নাই। স্তবপঞ্চকটি এইরূপ—

"নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্তৃপাতৃপ্রহর্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বিকল্পম্॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকানাম্॥
পরেশ প্রভো! সর্বরূপাবিনাশিন্ননির্দেশ্য
সর্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর! ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীশ! পায়াদপায়াৎ॥
ত্বদেকং স্মরামস্ত্বদেকং ভজামস্ত্বদেকং
জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥"

(সর্বলোকের আশ্রয় তুমি, সৎস্বরূপ তুমি, তোমায় নমস্কার, চৈতন্যস্বরূপ তুমি, বিশ্ব-রূপ তুমি, তোমায় নমস্কার। অদ্বয়তত্ত্ব ও মুক্তিপ্রদ তুমি, সর্বব্যাপী নির্গুণ ব্রহ্ম তুমি, তোমায় নমস্কার।

(একমাত্র শরণ্য তুমি, বরেণ্য তুমি, জগৎ-কারণ বিশ্বরূপ তুমি জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্তা তুমি, পরাৎপর নিশ্চল নির্বিকল্প তুমি।

(ভয়সমূহেরও ভয়, ভীষণেরও ভীষণ তুমি, প্রাণিসমূহের গতি এবং পাবনগণেরও পাবন তুমি, অত্যুচ্চ পদের নিয়ন্তা তুমি, শ্রেষ্ঠগণের শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকদিগের রক্ষক তুমি।

(হে পরমেশ, হে প্রভো, হে সর্বময়, হে অনির্দেশ্য, হে ইন্দ্রিয়সমূহের অগম্য, হে সত্যস্বরূপ, হে অচিন্ত্য, হে অক্ষর পুরুষ, হে সর্বব্যাপিন্, হে অব্যক্ত, হে জগতের প্রকাশক, হে অধীশ্বর, আমাকে বিনাশ হইতে রক্ষা কর।

(আমি তোমায় স্মরণ করি, তোমারই ভজনা করি, হে জগতের সাক্ষিস্বরূপ, আমি তোমায় নমস্কার করি। সৎস্বরূপ তুমি, সকলের আশ্রয় তুমি, নিরালম্ব তুমি, ভব-

সাগরের তরণি তুমি, তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম।)

রাজা রামমোহনের দেহে ও মনে দুর্জয় শক্তি ছিল। তিনি দেহচর্চার এবং মাংসাদির আহারের দ্বারা দৈহিক পুষ্টিসাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, —যাহার দেহ বলিষ্ঠ ও দৃঢ়িষ্ঠ, তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব। পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দও অনুরূপ মত পোষণ করিতেন। ভারতের অধোগতি ও পরাধীনতার যে-সমস্ত কারণ রামমোহন নির্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য। (১) ভারতবাসীদের মধ্যে সংহতির অভাব, (২) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের বিবাদ, (৩) অহিংসা ও নিরামিষাহারের প্রতি অতিমাত্রায় পক্ষপাতিত্ব।

বাস্তবিক, রামমোহন চাহিয়াছিলেন, আমাদের জীবনে দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সর্ববিধ শক্তির বিকাশ হউক। বলিষ্ঠ, দৃঢ়িষ্ঠ, মেধাবী রামমোহনের দৃষ্টি চিরদিন মানুষের ব্যবহারিক জীবনের দিকে সজাগ ছিল। তিনি সন্ন্যাসের পক্ষপাতী ছিলেন না, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের জীবনই তিনি মানুষের পক্ষে কাম্য বলিয়া মনে করিতেন; আর তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যেই তিনি তাঁহার আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

বাংলার অন্যতম মনস্বী সন্তান ভূদেব মুখোপাধ্যায় তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। শাস্ত্রে তাঁহার শ্রদ্ধাও ছিল গভীর, তিনি শুধু যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার দত্তের ন্যায় ধীশক্তির আলোকে শাস্ত্র বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। 'বিবিধ প্রবন্ধ'এ তিনি তন্ত্র সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন, উহাকে বিশদ করিবার অবকাশ পান নাই। কিন্তু সে-আলোচনা স্বল্পাক্ষরে গ্রথিত হইলেও সারগর্ভ। হেমচন্দ্র যখন 'দশমহা-বিদ্যা' নামক খণ্ডকাব্য রচনা করেন, তখন ভূদেববাবু তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করেন। দশমহাবিদ্যা সমাপ্ত করিয়া হেমচন্দ্র ভূদেব-বাবুকে একখানি পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি বলেন, 'যথার্থ তান্ত্রিক একমাত্র আপনাকেই দেখিয়াছি।' তিনি ভূদেববাবুর নিকট এই প্রার্থনা করেন যে, ভূদেববাবু যেন উমার এমন একটি ধ্যান রচনা করেন যাহাতে তাঁহার মাতৃভাবের অভিব্যক্তি থাকিবে এবং তাঁহার ক্রোড়ে একটি শিশু বিরাজ করিবে

প্রত্যুত্তরে ভূদেব হেমচন্দ্রের কাছে তান্ত্রি মূর্তিকল্পনার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করি একখানি পত্র লেখেন। ভূদেব বলেন, এ মূর্তিকল্পনায় স্তরভেদ আছে। সে অধিকারীর প্রয়োজনে অন্নপূর্ণার যে-মূ অংকিত হইয়াছে, তাহা এইরূপ—

"রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়া-

মন্নপ্রদান নিরতাং স্তনভারনম্রাং।

নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য

হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্‌।

(যিনি রক্তবর্ণা, বিচিত্রবসনা, যিনি অ প্রদাননিরতা, স্তনভারনম্রা, যাঁহার ললা শশিকলা, তাণ্ডব নৃত্যে প্রবৃত্ত শিবের দর্শ যিনি প্রসন্না, যিনি ভবদুঃখহন্ত্রী, সে ভগবতীর ভজনা করি।)

ভূদেববাবু লিখিতেছেন, "এ-মূর্তি চিন্তন কর। এ-মূর্তি অন্তুতরূপে অতীন্দ্রিয়। তোমার মনে হইবে যে, তুমি ঈশ্বরীকে (চিৎস্বরূপিণী) দেখিতেছ, কিন্তু বাস্তবিক তুমি কেবল তাঁহার পরিচ্ছ তাঁহার অলংকার, তাঁহার ভাবভঙ্গীম দেখিতেছ এবং তাঁহার জগৎপ্রেমও দেখি

মধু বাতা ঋতায়তে

মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ

মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ

মধুময় হউক আমাদের জীবন,

আনন্দময় হউক

শারদীয় দিনগুলি

পূর্ব রেলওয়ে

BRIPAIC

পাও, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ দেখিতে পাও না। তুমি গতিশীল ও ক্রিয়াশীল যাহা যথার্থত দেখিতে পাও, তাহা সেই জড় অংশ।" (দশমহাবিদ্যা, বসুমতী সাহিত্যমন্দির, পৃঃ ৪—৫)। ভূদেববাবু বলিতেছেন, ভুবনেশ্বরী মূর্তিতে কিন্তু আমরা ঈশ্বরীর স্বরূপ দেখিতে পাই, কেননা, ইহাতে জড় ও চিৎকে পৃথক করিয়া দেখান হয় নাই। ভারতীয় ঋষি জানেন—ব্যষ্টিগতভাবে জগতের প্রত্যেকটি পদার্থ বিশ্বাত্মায় বিধৃত। এই অন্বয় জ্ঞানই হিন্দুসাধনার বিশেষত্ব।

ভুবনেশ্বরীর ধ্যান এইরূপ—

"উদ্যদ্দিনদ্যুতিমিন্দুকিরীটাং
তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়যুক্তাম্।
স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশপাশাভীতিকরাং
প্রভজে ভুবনেশীম্॥"

(যিনি প্রকাশমান সূর্যের ন্যায় জ্যোতির্ময়ী, যিনি ইন্দুকিরীটিনী, তুঙ্গকুচা, নয়নত্রয়যুক্তা, কুশপাশহস্তা বরাভয়দায়িনী, স্মেরমুখী, সেই ভুবনেশ্বরীকে ভজনা করি।)

এখানে ভক্ত দেখিতে পান,—জগন্মাতা তাঁহার হস্তে ভীতিকর অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া আছেন এবং বর ও অভয় দান করিতেছেন। তিনি প্রসন্নবদনা ভুবনেশ্বরী।

ইহার পর ভূদেববাবু গণেশ-জননীর ধ্যানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার গণেশ-জননীর মূর্তির, যিনি বরাননা, বিম্বোষ্ঠী, চারুদশনা, হাস্যময়ী, অভয়প্রদা, নানালংকার-সংযুক্তা, স্নিগ্ধাঙ্গী, নীলোৎপলিকা, পীনোন্নত-পয়োধরা, যাঁহার ক্রোড়ে শিশু গণেশ বিরাজিত, যিনি গৌরবর্ণা, ক্ষীণমধ্যা, রত্ন-পীঠের উপরি অবস্থিতা ও সর্বকামফলপ্রদা সেই দুর্গার মূর্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যীশুমাতা মেরীর ক্রোড়স্থিত স্বর্গীয় শিশুর মধ্যে দার্শনিক কোৎ মানব-সমষ্টি বা হিউম্যানিটির চিত্র দেখিয়াছিলেন। র‍্যাফেলের ম্যাডোনা-মূর্তি যে কোৎ-এর কল্পনাকে উদ্দীপিত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভূদেববাবুর সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, কোৎ-এর ধারণা অসম্পূর্ণ। যদি এখানে জননীমূর্তিকে প্রকৃতি ও সন্তানকে মানবের প্রতিনিধি ধরা হয়, তথাপি তাহাতে ত্রুটি থাকিয়া যায়। কেননা, জড় ও চৈতন্যের মধ্যে কালগত পৌর্বাপর্য নাই, এইজন্য তন্ত্রে মাতা ও সন্তানের পরিবর্তে ভর্তা ও ভার্যার কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু গণেশ-জননী দুর্গার ধ্যানে যে মাতৃমূর্তি কল্পিত হইয়াছে, তাহা ম্যাডোনার মূর্তির চেয়েও অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ।

ভূদেববাবু তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও তন্ত্র সম্বন্ধে কোন স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেন নাই। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য।

বাংলার বিদ্রোহী কবি মধুসূদন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যের রসধারা আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন। তিনি 'অতলান্ত সাগরের দীক্ষা' গ্রহণ করিলেও বাংলার ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁহার অন্তরের যোগসূত্র কখনও ছিন্ন হয় নাই। তাই বিলাসের লীলা-নিকেতন পাশ্চাত্ত্য ভূমিতে অবস্থানকালে তিনি বিজয়া-সম্পর্কে সনেট রচনা করিয়াছেন—

"যেয়ো না রজনি, আজি লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে।
উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।
বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে;
পেয়েছি উমায় আমি; কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে কহ, লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে?
তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে।
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।"

মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কবি-কৃতি মেঘনাদ-বধের তৃতীয় ও পঞ্চম সর্গে তান্ত্রিক প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দের সঙ্গে প্রমীলা যেখানে রণ-রঙ্গিণী মূর্তিতে লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিতেছেন, সেখানে মধুসূদন বলিতেছেন,

"নাচিলা দানব-বালা, হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,
কিংবা শুম্ভ-নিশুম্ভে, উন্মাদ বীর-মদে।"

মধুসূদনের কল্পিত 'নৃমুণ্ডমালিনী' নামটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই সর্গের ভাষায়ও শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। "টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জিল জলধি" প্রভৃতি কথাগুলি পড়িতে পড়িতে শ্রীশ্রীচণ্ডীর একটি শ্লোক—

"চক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ
সমুদ্রাশ্চ প্রকম্পিরে।
চচাল বসুধা চেলুঃ
সকলাশ্চ মহীধরাঃ॥"

মনে পড়িয়া যায়।

মেঘনাদবধের পঞ্চম সর্গে দেখিতে পাই, লক্ষ্মণ যখন অলৌকিক স্বপ্ন দর্শন করিয়া শত্রুজয়ের মানসে চণ্ডীর দেউলে গমন করিতেছেন, তখন তিনি নানা ভয়াবহ দৃশ্য-দর্শন ও শব্দ শ্রবণ করিলেন, কিন্তু বীর সৌমিত্রি তাহাতে বিচলিত হইলেন না। তারপর তিনি সুন্দরী বামাদলের বিচিত্র বিলাসলীলা দর্শন করিলেন। স্বর্গের অনন্ত-যৌবনা অমরীবৃন্দ যেন তাহাকে প্রলুব্ধ করিল। কিন্তু সে-প্রলোভনেও লক্ষ্মণের চিত্ত চঞ্চল হইল না। তিনি বলিলেন,

"হে সুর-সুন্দরী-বৃন্দ, ক্ষম এ দাসেরে।
* *
নরকুলে জন্ম মোর; মাতৃহেন মানি
তোমা সবে।"

এইভাবে বীর লক্ষ্মণ কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। যাঁহারা বীরাচারী তান্ত্রিক, তাঁহা-দিগকেও এইরূপ নানা বিভীষিকা, নানা প্রলোভনের সম্মুখীন হইতে হয়। যে-সাধক এই সব পরীক্ষায় অবিচল থাকেন, তিনিই দেবীর কৃপালাভ করেন। লক্ষ্মণও তাই মহা-মায়ার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন।

হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা' নামক খণ্ডকাব্য এককালে শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং কাব্যখানির নানা অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনা হইয়াছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন বা তাহার প্রয়াস উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইহা একটি যুগ-প্রবৃত্তি; দশমহাবিদ্যার কবি যে এই প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই। এইজন্য, তিনি দশমহাবিদ্যার পৌরাণিক ও তান্ত্রিক চিত্র অবিকৃতভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই; অনেক স্থলে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ডারউইনের ক্রম-বিকাশবাদের সহিত পৌরাণিক মূর্তি-কল্পনার সামঞ্জস্য-বিধানের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যেখানে তিনি প্রতীচ্যের

মোহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, সেখানে তিনি সত্যের স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন। দশমহাবিদ্যায় জগন্মাতা সতী সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারিণী, তিনি নিত্য, তাঁহার কখনও বিনাশ হইতে পারে না। যিনি জগন্মাতাকে জানেন বা তাঁহার শরণাপন্ন হন, তিনি সকল ভয়-ভাবনা হইতে মুক্তি লাভ করেন। হেমচন্দ্র এই তত্ত্বগুলি তাঁহার কাব্যের মধ্যে প্রতিপন্ন করিতেছেন। কিন্তু যখন তিনি ক্রমবিকাশবাদের অনুসরণে বলিতেছেন, এই পৃথিবী হইতে অশুভ ধীরে ধীরে নিরাকৃত হইবে, তখন তিনি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের শিষ্য; আবার যখন তিনি ক্রমবিকাশবাদের আলোকে দশমহাবিদ্যার (কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, বগলা, ছিন্নমস্তা, মাতঙ্গী, ভৈরবী, কমলা) অভিনব তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছেন, তখনও তিনি পাশ্চাত্ত্যের শিষ্য। কবির দৃষ্টিতে দশমহাবিদ্যার মূর্তি-কল্পনার তাৎপর্য আধ্যাত্মিক নয়, বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক। বর্বরতা হইতে সভ্যতার পথে মানুষের অগ্রগতির দশটি অধ্যায়ের চিত্রই যেন দশটি মূর্তির মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে পৌরাণিক কল্পনার সামঞ্জস্য বিধান করিতে গিয়া কবি এইরূপ গোলে পড়িয়াছেন, তাই কবি যাহা বলিতে চাহিতেছেন, তাহার সহিত মূর্তিকল্পনার সামঞ্জস্য হয় নাই। তথাপি, এ-কথা বলা যায় যে, হেমচন্দ্র অনেক স্থলে পুরাণ ও তন্ত্র হইতেই দশমহাবিদ্যার চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'য় কাপালিক ও অধিকারীর জীবনে তান্ত্রিক সাধনার দ্বৈত রূপ দেখিতে পাই। যিনি বিশ্বজনীন-রূপে নিখিল বিশ্বকে প্রতিপালন করিতেছেন, তাঁহার স্মরণ ও চিন্তনে মানুষের চরিত্র কী অপূর্ব মাধুর্যে মণ্ডিত হয়, অধিকারীর জীবনে তাহার দৃষ্টান্ত মিলে। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক বামাচারী তান্ত্রিক সাধনার চরম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আপন অর্জিত শক্তির অপব্যবহার করিয়াছেন। অনেকে মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি বিদ্যাকেই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, অনেকে আবার হিংসাত্মক ক্রুর কর্মকেই ধর্ম বলিয়া মনে করিয়া শাশ্বত 'মানবধর্ম' হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের ক্রূরকর্মা কাপালিক ধর্মের নামে এইরূপ অধর্মাচারী। কপালকুণ্ডলার জীবনে কিন্তু অধিকারী ও কাপালিক উভয়েরই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কপালকুণ্ডলা যখন স্বপ্নে ভৈরবীর আদেশ পাইয়া আত্মবিসর্জন করিতে যাইতেছেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান।'

'আনন্দমঠ'এ বঙ্কিমচন্দ্র যুগোপযোগী এক নব্য তান্ত্রিকধর্ম প্রচার করিয়াছেন। যদিও সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিয়াছেন, 'সন্তানেরা বৈষ্ণব', তথাপি সন্তানগণের ধর্ম—মৃন্ময়ী দেশজননীর মধ্যে চিন্ময়ীর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ। আনন্দমঠের ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গার মধ্যে দেশমাতৃকার ত্রিকালের তিনটি রূপ দেখাইতেছেন। সন্তানদের ভক্তির কোন ত্রুটি ছিল না, কিন্তু তান্ত্রিক সাধক বলেন, ভক্তি যদি জ্ঞানমিশ্রা না হয়, তবে উহা চরম সিদ্ধি দান করিতে পারে না। আনন্দমঠের সন্তানগণের সংকল্পও তাই সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় নাই, কেননা, উহাতে জ্ঞানের অভাব ছিল। মহাপুরুষ সত্যানন্দকে এই কথাই শিক্ষা দিয়াছেন। এইজন্য মহাপুরুষ যখন সত্যানন্দের হাত ধরিয়াছেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, "কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে, ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরিয়াছে, বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে, কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে।"

কবি নবীনচন্দ্রের চিন্তাধারায় তান্ত্রিক প্রভাবের দৃষ্টান্তস্বরূপ শুধু একটি কবিতার উল্লেখ করিব। কবিতাটির না 'শব-সাধন'। সকলেই জানেন বামাচার তান্ত্রিক সাধক নিশীথ-শ্মশানে শবের উপ বসিয়া সাধনা করেন এবং শবের জড় দেহে চৈতন্য সম্পাদন করেন। এই শব-সাধনা মধ্যে যে অমোঘ বীর্য ও অপরাজে পৌরুষের পরিচয় আছে, তাহাই নবীনচন্দ্রের কবি-কল্পনাকে উদ্দীপিত করিয়া ছিল। আবার শক্তি-সাধক আপনার ব বিদারণ করিয়া উষ্ণ রক্তে জননীর তপ করেন,—বীর সাধকের এই মাতৃপূজ

আদর্শও তাঁহার প্রাণে উদ্দীপনা জাগাইয়াছিল। নবীনচন্দ্র বলেন, পরাধীন ভারতে আবার সেই বীরাচারী তান্ত্রিক সাধকের প্রয়োজন, যিনি সর্বপ্রকার ভয় ও দুর্বলতা পরিহার করিয়া ভারতরূপী অনন্ত শ্মশানে বসিয়া স্বীয় বক্ষঃ-শোণিতে জননীর তর্পণ করিবেন। কবিতাটির প্রথম স্তবক এইরূপ—

"নিভেছে অনল? নিভেনি এখনো,
কে নিভাবে বল,—নিভিবে কেমনে?
সপ্ত শতবর্ষ জ্বলিছে এমন,
কত শত বর্ষ জ্বলিবে কে জানে?
যেই দিকে দেখি এই মহানল,
কোথায় ভারত?—অনন্ত শ্মশান,
শ্মশান—শ্মশান—শ্মশান কেবল;
রাবণের চিতা, লঙ্কার প্রমাণ!"

আর শেষ স্তবকটি এইরূপ—

"ভারত সন্তান, দেখ না মাতার
লোলজিহ্বা শুষ্ক, শুষ্ক রক্তাধর,
দেখ বাম কর করিয়া প্রসার
সদা উষ্ণ রক্ত মাগে বারংবার।
নাহি কি ভারতে হেন বীরাচারী,
আপনার বক্ষ করি বিদারণ,
করে জননীর পিপাসা নিবার
ভারত-শ্মশানে শক্তি-আরাধন।"

কবিতাটিতে কল্পনার কিছু অসঙ্গতি থাকিলেও নবীনচন্দ্রের হৃদয়াবেগ যেন ইহাতে গৈরিক নিঃস্রাবের মত উৎসারিত হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে "বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা" মিলিত হইলেও তিনি প্রধানত ছিলেন তান্ত্রিক সাধক, শ্রীরামপ্রসাদের ভাবসাধনার উত্তরাধিকারী। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহায়তায় তিনি তান্ত্রিকী সাধনা করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ শক্তি সাধনার আদর্শকে অধ্যাত্ম জগতে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই,—আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও শক্তি সাধনার উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি যে আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, তাহা সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ, ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের সমন্বয়ের আদর্শ। তিনি যে তান্ত্রিক সাধকের দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন, "নাচুক তাহাতে শ্যামা" নামক বাংলা কবিতায় ও "কালী দি মাদার" নামক ইংরেজী কবিতায় তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

আচার্য কেশবচন্দ্র মাতৃভাবে ভগবদুপাসনার মধ্যে এক বিশেষ মাধুর্য আস্বাদন করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের নববিধানে যে সমন্বয়-সাধনার আদর্শ স্থাপন করা হইয়াছে, উহাতে মাতৃভাবে উপাসনার এক বিশিষ্ট স্থান আছে। কেশবচন্দ্রের অনুগামী ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের (চিরঞ্জীব শর্মা) রচিত "আমায় দে মা পাগল করে" গানটি গাহিতে গাহিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন।

বিগত শতাব্দীতেই বাংলার বীরাচারী সাধক ও সিদ্ধপুরুষ বামা খ্যাপার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের সাধনা যে তান্ত্রিক সাধনা, সে-কথা সকলেই জানেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম মনীষী শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব তন্ত্রশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও ক্রিয়াকুশলতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। জাস্টিস উড্রফ তাঁহার নিকট তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শিবচন্দ্রের রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে 'তন্ত্রতত্ত্ব' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মনস্বী কালীপ্রসন্ন ঘোষের রচিত 'মা না মহাশক্তি' গ্রন্থখানি একালে প্রায় দুষ্প্রাপ্য। এই গ্রন্থে লেখক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে শক্তিপূজার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। লেখকের উপর হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ পণ্ডিতগণের প্রভাব প্রবল, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোতে লেখক চণ্ডীর যে তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা' কাব্যেও তান্ত্রিক প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

আমরা দেখিলাম, উনিশ শতকের বাঙালী মনীষিগণ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করিলেও বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। যদি তাঁহারা অনেক তথাকথিত অতি-আধুনিক লেখকের মত 'সর্বসংস্কারমুক্ত' (সর্বহারাও বলা চলে) হইতেন, তবে তাঁহারা বঙ্গবাণীকে এমন শ্রীসম্পন্ন করিতে পারিতেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণের আবির্ভাবও একটি আকস্মিক ঘটনা নয়। উনিশ শতকের বাংলায় ধর্মান্দোলনের ইতিহাসের শেষ পর্যায়ে রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে বাংলার নিজস্ব সাধনাই জয়যুক্ত হইয়াছে। যদি তন্ত্র কথাটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করি এবং বৈষ্ণবীয় তন্ত্রকেও তন্ত্রের অন্তর্গত করি, তবে বলিতে হয়, বিগত শতাব্দীতেও তান্ত্রিক সাধনাই বাংলা দেশের দুইজন মহাপুরুষের মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উনিশ শতকের বাঙালী মনীষীদের জীবন হইতেও আমরা এই শিক্ষাই গ্রহণ করিব যে, অগ্রগতির নামে আমরা কিছুতেই জাতীয় ঐতিহ্য বা সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিব না। আবার কোন কোন বাঙালী মনীষী প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারার সমন্বয়-সাধন করিতে গিয়া যেমন বিভ্রান্ত হইয়াছেন, আমরা তেমন বিভ্রান্ত হইব না। পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিক বা নৃতত্ত্ববিদের উক্তিকেও আমরা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব না। শ্রদ্ধাবান ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া আমরা প্রাচীন সংস্কৃতির আলোচনা করিব এবং অতীত ঐতিহ্যের আলোকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করিব।

কম্পানীর ডিরেক্টার মিস্টার সান্যালের মেয়ে-কেরানী আমদানি করার ইচ্ছা কোনকালেই ছিল না, কিন্তু হঠাৎ কেমন একটু মামায় পড়ে গেলেন।

ইণ্টারভিউএর জন্যে ডাকাও হয়নি লতিকাকে, পরশু যেন তারিখ, ও দুদিন আগেই এসে স্লিপ-প্যাডে নিজের নামটা লিখে আর্দালিকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে। মিস্টার সান্যাল একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে কাগজটার দিকে হেঁটমুখে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, "আসতে বলগে।"

লতিকা এসে দাঁড়াতে এক নজরে একবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিলেন। সাজ-গোজ সাদামাটা, পায়ে স্যাণ্ডাল, বয়স বছর কুড়ি-একুশ, বেশী সুন্দর নয়। তিন সেকেণ্ডও লাগল না, জিজ্ঞেস করলেন, "কী দরকার?"

উত্তর হল "অ্যাকাউণ্ট সেকশনে একজন কেরানীর দরকার বলে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়..."

"দাঁড়িয়ে কেন? বস।...কিন্তু আমি পুরুষ কেরানী চাই।"

লতিকা বসল; কুণ্ঠিতভাবে অল্প একটু হেসে বলল, "সে-রকম কিছু স্পষ্ট লেখা ছিল না, তাই..."

"মেয়ে-কেরানী চাইলেই সেটা লেখা থাকে; নয় কি?"

"শিক্ষা যখন আপনারা আমাদেরও দিচ্ছেন..."

"সুতরাং কেরানী হতে হবে?"

"শখ করে পুরুষেরাও হয় না। আমাদের যখন বেরুতে হয়, তখন আরও দায়ে পড়েই ত।...এটুকু আপনাকে স্বীকার করতেই হবে।"

শেষেরটুকু একটু আবদারের সুরে বলে তর্কটাকে যেন খানিকটা নরম করে দিল।

"এমন কী দায়ে পড়েছ? ছেলেমানুষই ত তুমি।"

"সেইজন্যেই দায়টা আরও বেশী। বাবার পড়াবারই শখ ছিল, যখন আই-এ পড়ি, মারা গেলেন। দাদা বললেন, তুই পড়, বাবার একটা ইচ্ছে; তারপর যখন বি-এর রেজাল্টটা বেরুল, তিনিও..."

"থাক্।...চাকরি করতেই হবে? মানে, কিছু রেখে যাননি তাঁরা?"

"মাকে, বুড়ো হয়েছেন তিনি; আর একটি ছোট ভাই, এইটথ ক্লাসে পড়ছে।" আবার সেইরকম একটু হাসল।

একটু চুপচাপ গেল। তারপর মিস্টার সান্যাল বললেন, "পারবে কাজ করতে?"

"ঠিক ত বলতে পারছি না এখন।"

মিস্টার সান্যাল একটু চকিত হয়েই আরও মুখটা তুলে চাইলেন; একটা পুরুষ উমেদার হলে উত্তরটা অন্তত অন্যরকম দিত। বললেন, "যদি না পার, আমায় আবার হ্যাঙ্গামাটা পোয়াতে হবে ত। বিজ্ঞাপন দেওয়া—তাতে খরচও আছে, তারপর আবার ইণ্টারভিউ..."

লতিকা মুখটা নিচু করে রইল একটু, তারপর কথাটা যাতে ঔদ্ধত্যের মত না শোনায়, সেইজন্য একটু কুণ্ঠিতভাবে হেসে বলল, "বিজ্ঞাপনের খরচটা আমার মাইনে থেকে কেটে নেবেন।"

মিস্টার সান্যালও হেসে বললেন, "মন্দ নয়। এ ফেয়ার প্রপোজাল। কিন্তু হ্যাঙ্গামাটা?"

আবার দৃষ্টি নামিয়ে নিল লতিকা, বল "মেয়ের মতনই ত দয়া করেছিলেন ব একটা সান্ত্বনা থাকবেই বরাবর।"

একটু চুপচাপ করে কলিং বেলের মাথ পিনটা আস্তে আস্তে ঘোরাতে লাগলে মিস্টার সান্যাল, তারপর সেটা টিপে দিলে আর্দালি এলে বললেন, "জনার্দনবাবু ডেকে দাও।"

জনার্দনবাবু এলেন। ঢিলেঢালা স্থ দেহ, মাথার চুল প্রায় সবকটিই পাকা, গ গিলে কোট, বেশী গরম না থাকে ঘামছেন এবং একটু একটু হাঁপাচ্ছেন।

মিস্টার সান্যাল বললেন, "এই মে জনার্দনবাবু—হ্যাঁ, তোমার নামটা জি করা হয়নি।"

"লতিকা—মিস লতিকা চৌধুরী।"

"শুনলেন।...এই দেখ! তুমি দরখ করেছ ত?"

"না হলে কোন্ সাহসে আসব বলু

"সেই অ্যাসিস্ট্যাণ্টের পোস্টটা জনা বাবু। পরশু ইণ্টারভিউ ছিল না? কজ ডেকেছেন?"

"পাঁচজন।"

"পাঁচখানা চিঠি ইশু করে দিন: আর কষ্ট করবে। লতিকা আপনার টেবি বসবে। কাজ পিক আপ করুক আ কাছে; তারপর মাসখানেক পরে রিপোর্ট দেবেন, সেটা বুঝে কনফারমে ...যাও।—আজ একটু দেখিয়ে শুনিয়ে সকাল সকালই ছেড়ে দেবেন।"

ওরা চলে গেলে একটা সিগারেট

গালে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে টানতে লাগলেন।

একমাসের মধ্যে তিনটে দিন কেটে গেল। জনার্দনবাবু কাজ দেখিয়ে দেন, ঘাড় গুঁজে একমনেই করে যায় লতিকা। নিজের কাজের চাপ বড় বেশী, তায় আবার কতকগুলো রিটার্নের তাগিদ রয়েছে; কয়েকদিনের মধ্যেই দাখিল করতে হবে, তবু মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, নিজে হতে বড় একটা প্রশ্নাদি করে না। তবে একটা দোষ, কথা কিছু উঠলে তার সঙ্গে কিছু অবান্তর কথা এনে ফেলে, যা লেজারের নিতান্ত বাইরের। তা ওটা মেয়েমাত্রেরই দোষ। কী আর করা যাবে?

একটা মোটা খাতার কাজ শেষ করে, অভ্যাসমত খাতাটা আওয়াজ করেই বন্ধ করে ঘুরে চাইলেন জনার্দনবাবু, প্রশ্ন করলেন, "তোমার হল ওটা?"

"হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই, এই হয়ে এল, আর একটু বাকী।"

"শেষ করে ফেল। কেমন বোধ হচ্ছে? ভাল লাগছে কাজ?" খাতা থেকে হাত সরিয়ে বেশ সোজা হয়ে বসেন জনার্দনবাবু।

লতিকার নাকটা একটু কুঁচকে ওঠে, একটু লজ্জিত হাসি ওঠে মুখে, সেটা বোধ হয় ওর মুদ্রাদোষ। বলে, "খালি ঠিক দেওয়া, খালি ঠিক দেওয়া..."

"এখন ঐ চলবে; আইটেমগুলো টেন, তারপর প্যাচানো হিসেব..."

"ও বাবা! এইতেই মাথা ঘুরে যায়।... যা হবে বুঝতেই পারছি। বাড়িতে আমি বলেও দিয়েছি মাকে, জ্যাঠামশাই। বলেছি একমাসের চাকরি, তারও খানিকটা মাইনে কেটে নেবে..."

"কেটে নেবে! কেন?"

"ঐ যে বললুম না আপনাকে কাল? নতুন বিজ্ঞাপনের টাকাটা আমিই গচ্ছে নিয়েছি ত।"

"নাঃ, তা কখনও কাটে? মানুষটা ওপরেই কড়া, ভেতরটা তালশাঁস একেবারে। আর চাকরিই বা যাবে কেন? মন দিয়ে শেখ কাজ।"

ক্ষুব্ধকণ্ঠে উত্তর হল, "শিখতেই হবে, উপায় কী বলুন?"

তারপর মনে পড়ে গেল লতিকার, একটু উদ্বেগের স্বরেই বলল, "ও জ্যাঠামশাই, আপনার টিফিন করা হয়নি যে এখনও!"

জনার্দন তাঁর ছোট চেম্বারটির বাইরে হলের বড় ঘড়িটার দিকে চাইলেন। বললেন, "কাজের চাপ, মনেই থাকে না মা..."

"বের করুন টিফিন বাক্সটা। আর আমি একটা কাজ করেছি, না জিজ্ঞেস করেই জ্যাঠামশাই। ট্রাম থেকে নেমে আসতে আসতে রাস্তার ধারে বেচছে দেখে হঠাৎ খেয়াল হল..."

নিজের ড্রয়ার টেনে কাগজে-মোড়া একটা মাঝারী সাইজের চিনেমাটির প্লেট বের করল। বলল, "না জ্যাঠামশাই, আপত্তি করবেন না। দামটা না হয় দিয়ে দেবেন, নিয়ে নেব আমি। বাক্সর মধ্যে থেকেই টেনে টেনে ভেঙেচুরে খান, ও আমি দেখতে পারি না চোখে। মাসখানেক পরে যখন আমি থাকব না, যা খুশি করবেন।"

জনার্দনবাবুর সেকশনে তাঁর থার্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট বিকাশবাবু একটা খাতায় দস্তখত করাতে এসে দেখলেন, টেবিলের মাঝখানে প্লেটে খাবার সাজিয়ে আহার করছেন জনার্দনবাবু। লতিকা কুঁজো থেকে জল গড়াচ্ছিল, গেলাস হাতে করে উঠে এল। দস্তখতটার জন্য অপেক্ষা করতে হল। গল্প দুজন থেকে তিনজনের মধ্যে চারিয়ে পড়ল।

দিন সাতেক পরে বিকাশবাবু খুঁজে পেতে একটা কাজের অজুহাত বের করে একটা খাতা হাতে করে মিস্টার সান্যালের চেম্বারে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

একটা নূতন কিছু করলে পাঁচজনের মতামতটা জানতে ইচ্ছা করে, প্রয়োজন থাক বা না-ই থাক। খাতাটা দেখতে দেখতে মিস্টার সান্যাল বললেন, "একটা নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করলুম বিকাশবাবু।"

"বোধহয় মেয়েটিকে আমাদের সেকশনে নেওয়ার কথা বলছেন স্যার।"

"হ্যাঁ, কী রকম মনে হচ্ছে?"

বিকাশবাবু জনার্দনবাবুরই প্রায় সম-

বয়সী, কাজে প্রবেশ করেছেন কিছু আগেই। তবে একটু আয়েসী মানুষ, কাজের চেয়ে আর পাঁচটা কথা নিয়ে থাকতেই ভাল লাগে। এতে জনার্দনবাবু যে ক্রমে ক্রমে শীর্ষস্থান অধিকার করে বসলেন আর উনি যে প্রায় যথাস্থানেই রয়ে গেলেন এর জন্য উগ্র কোন-রকম আক্রোশ না থাকলেও সুযোগমত দু-একটা কথা কানে তুলে দিতে পারলে এক ধরনের আনন্দই পান। প্রশ্নটা শুনেই সংগে সংগে উত্তরটা না দিয়ে একটু মুখ টিপে হাসলেন।

উত্তর না পেয়ে খাতায় নিবদ্ধদৃষ্টি হয়েই আবার করলেন প্রশ্নটা মিস্টার সান্যাল, "বললুম; আপনারা হচ্ছেন অফিসের সিনিয়ার লোক। কেমন দেখছেন মেয়েটিকে?"

"আপনার সিলেকশন, ভাল না হয়ে যায়? তবে..."

"তবে...?" মুখ তুলে চাইলেন।

"যাই না ত ও'র চেম্বারে বড় একটা, নেহাত দরকার পড়ল দস্তখতটা নিতে, কি কোন দরকারী কথা জিজ্ঞেস করতে, গেলুম একবারটি; তা পড়বি ত পড় আমার নজরেই..."

মিস্টার সান্যাল একেবারে সোজা হয়ে বসলেন, হাতের কলমটা হাত থেকে টেবিলে পড়ে গেল, কি নিজেই রেখে দিলেন, ঠিক বোঝা গেল না, নির্বাক ঔৎসুক্যে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

"কথাটা হচ্ছে, আপনার সিলেকশন, মেয়েটি ত বেশ চৌকশই বোধ হচ্ছে, তবে তাকে শেখালে তবে ত শিখবে সে। আমি যদি উলটে তার কাছে গোকুল-পিঠে ক' করে তোয়ের করতে হয় তার হদিস শিখতে যাই..."

"গোকুল-পিঠে!"

"সাতদিন এসেছে মেয়েটি, এর মধ্যে দুদিন হঠাৎ দরকারে গিয়ে পড়েছিলুম ওঁর কামরায়। প্রথম দিন তেমন কিছু নয় মেয়েটি প্লেটে খাবার গুছিয়ে-গুছিয়ে দিয়েছে। দেখলুম আগেকার চেয়ে একটু তোয়াজ হয়েছে, মেয়েটি সামনে দাঁড়িয়ে খাওয়াচ্ছে। তা ভাবলুম, করুক, মেয়ে ছেলের মন, একটু ছিরি আসবেই ঘরটায়..."

"হুঁ...আর কোন দিন..."

"আজ্ঞে, আজই।...দস্তখতটা করিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসেছি, আপনি ডেকে পাঠালেন।"

"আজও গোকুল-পিঠে?"

"আজ্ঞে, ওটা আজই দেখলুম স্যার। সেদিন ছিল না, মিছে কথা বলি কেন। সেদিন শুধু গুছিয়ে-গাছিয়ে বাড়ির মত একটু তোয়াজ করা। আজ এদিককার আর সব জিনিসের সংগে প্লেটে গুটি চারেক গোকুল-পিঠে। আমি যখন গেলুম, ঐ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। অন্নপূর্ণা পাঠশালের মেয়ে সেইখানেই শেখাত সব। কী ক লাগে, কীভাবে করতে হয় উনি তারিফ তারিয়ে খেয়ে যাচ্ছেন, আর..."

"আচ্ছা, আপনি যান।" শুনতে শুনতে খাতাটার এক জায়গায় একটা টিক দিয়ে দস্তখত বসিয়ে সামনে ঠেলে দিলেন। বিকাশবাবু চলে গেলে, সিগারেটের টিন খুলে একটা সিগারেট বের করে নিলেন।

একটু পরে জনার্দনবাবুর ডাক পড়ল।

"আপনার রিটার্নটা শেষ হল জনার্দনবাবু?"

"প্রায় হয়ে এল স্যার।...একটু—কী বলে..."

"আমারও ভুল দেখুন না, ঠিক এই সময় আবার লতিকাকে দেখিয়ে শুনিয়ে দেওয়ার ভারটাও দিলুম আপনার ওপর চাপিয়ে। তা হপ্তাখানেক ত হল, কী রকম দেখছেন..."

"পরিষ্কার মাথা স্যার। বাছিয়ে নিয়েছেন ত আপনি, এর মধ্যেই খা পি আপ করেছে, অন্য কেউ হলে..."

"তাই আমি ভাবছিলুম, এবার না হয় গিয়ে বিকাশবাবুর কাছে বসুক..."

কলিং বেলটাতে একটা টোকা মারতে আর্দালি এসে দাঁড়ালে বিকাশবাবুকে ডেকে দিতে বলে আবার জনার্দনবাবুকেই ব চললেন, "বিকাশবাবুর ফুরসুতও আছে আর আপনার এদিকটা ত খানিক দেখলও। কী বলেন?"

একটু অন্যমনস্কই হয়ে গিয়েছিলে

জনার্দনবাবু। প্রশ্নটায় সচেতন হয়ে উঠে বললেন, "আজ্ঞে মন্দ কী ...মানে, এইটেই ভাল ব্যবস্থা হবে। রিটার্নগুলোর জন্যে ঠিক মনও ত দিতে পারছি না ওর দিকে..."

বিকাশবাবু এসে দাঁড়ালেন। মিস্টার সান্যাল সিগারেটের ছাইটা ঝেড়ে বললেন, "একটা কথা ভাবছিলুম বিকাশবাবু— জনার্দনবাবুরও তাই মত—বলছিলুম, লতিকা না হয় আপাতত আপনার সঙ্গেই বসুক— প্রিলিমিনারি আইডিয়া কতকগুলো ত পেয়েই গেছে ওঁর কাছে। তাহলে আপনার টেবিলটা না হয় ও ভিড়ের মধ্যে থেকে একটু আলাদা করেই নেবেন? ধরুন হলের উত্তর কোণটায়...একটা নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করছি ত?"

• •

দুটো দিন কেটে গেল। বিকাশবাবুর চেয়ারটা খালি, কী একটা কাজে অন্য ডিপার্টমেণ্টে গেছেন। যানও বেশী, গেলে একটু বিলম্বও হয়। লতিকা খাতা খুলে বাঁ হাতে কপালটা রেখে ... একটা কথা ভাবছিল। ওদিকে কী কথা হয়েছে, বিকাশবাবু তার হাসির জের মুখে করে এসে বসলেন। বললেন, "যত্তো সব!...তোমার ওটা হল?" ঘাড়টা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন, "কৈ, শেষ করনি ত?"

"করে দিচ্ছি এক্ষুনি।" বলে লতিকা মুখ কাত করে একটু লজ্জিতভাবে হাসল।

"কী ভাবছিলে যেন!...তোমার মার শরীরটা আজ কী রকম?"

"কী করে বলি? চাকরি করছি বলে আজকাল আবার খারাপ থাকলেও লুকোন।"

"তবেই দেখ! অথচ তুমি যে একটু মন দিয়ে চটপট করে শিখে নেবে...অথচ, ওঁর এদিকে খুবই আগ্রহ, একটা নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করছেন ত। আজও জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি ত বলে যাচ্ছি—বেশ পিক-আপ..."

"ভাল কথা মনে পড়ে গেল জ্যাঠামশাই, আপনার মেয়েকে কাল এসেছিল দেখতে?"

বিকাশবাবুর হাসি-হাসি মুখটা একটু নিষ্প্রভ হয়ে গেল। বললেন, "এসেছিল, হল না মা।"

"নিশ্চয় গান আর হাতের কাজের জন্যে?"

"হাতের কাজের নমুনা দেখে গানের কথা আর তুললেও না। তবে ওপর দেখলেও ত অজ পাড়াগাঁ। আমিই হপ্তায় দুটো দিন কাটাই। তাও পুরো দুটো দিনই বা কোথায়! তাইতেই যেন হাঁপিয়ে উঠতে হয়। তাই মনে করছি মাস কয়েকের জন্যে না হয় কলকাতাতেই একটা ছোটখাট বাড়ি ভাড়া করে চলে আসি, তারপর মেয়ে-টিউটর রেখে গানের আর সেলাই, হাতের কাজ এই সবের একটু ট্রেনিং দিয়ে—জোগাড় হয় ত এইখানেই বিয়েটা দিয়ে..."

"নিয়ে আসুন জ্যাঠামশাই, নিশ্চয় নিয়ে আসুন, আর দু মত করবেন না। অন্য জায়গায় নয়, আমাদের পাড়াতেই, আমি বাড়ি ঠিক করছি। আর ট্রেনিং-এর জন্য আপনি অন্য ব্যবস্থা কী করতে যাবেন? দুটোতেই আমি নিজে এমন তালিম দিয়ে দোব!"

মুখটা উৎসাহে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। বিকাশবাবুর মুখেও হাসি-হাসি ভাবটা ফিরে এসেছে; প্রশ্ন করলেন, "তুমি জান?"

"কত প্রাইজ পেয়েছি। গান আমার ত সাবজেক্টই ছিল ম্যাট্রিকে!"

"সত্যি নাকি?"

আলোচনা চলে। প্ল্যান তৈয়ের হয়। অবশ্য চাপা গলাতেই। তবে এমন নয় যে, যারা হলের এদিকেই থাকে, একটু কান পেতে থাকলে তাদের শুনতে বিশেষ অসুবিধা হবে। বিকাশবাবুর এদিক দিয়ে একটা অবহেলার ভাব আছেই। লতিকাও হলের দিকে পিছন করে বসে; আশে পাশে কাদের কলম থেমে গেল, খোঁজ রাখে না।

স্বভাবটা মুক্ত আর সপ্রতিভ, হয়ত গ্রাহ্যও করে না।

বলে, "সে ত পরের কথা, ব্যবস্থা করতে করতেও কিছুদিন হয়েই যাবে। এর মধ্যে আমি এক মতলব ঠাউরেছি জ্যাঠামশাই... এই দেখাই আপনাকে।"

সুদৃশ্য কাঠের হ্যাণ্ডেল-দেওয়া একটি র‍্যাশন ব্যাগ নিয়ে আসে অফিসে, তার মধ্যে থেকে ছোট বড় কয়েকটি নক্‌শার কাজ বের করল, বলল, "এইগুলি নিয়ে যান বাড়িতে জ্যাঠামশাই, যদি এর মধ্যে কেউ দেখতে আসে ত..."

"কাতুর বলে চালিয়ে দোব?" একটু বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন বিকাশবাবু।

"কিচ্ছু দোষ নেই জ্যাঠামশাই; আমাদের পাড়ার কটা মেয়ে এই দৌঁখয়ে পার হয়ে গেল।" একটু গম্ভীর হয়ে, আর কতকটা যেন আক্রোশের বশেই বলে লতিকা, "ও যেমন কুকুর তেমনি মুগুর!...মেয়েদের যেগুলো আসল দরকার, সে-সব বাদ দিয়ে যেগুলো সেকেণ্ডারি, সেগুলোর ওপর

যাই না ত ওঁর চেম্বারে বড় একটা

বয়সী, কাজে প্রবেশ করেছেন কিছু আগেই। তবে একটু আয়েসী মানুষ, কাজের চেয়ে আর পাঁচটা কথা নিয়ে থাকতেই ভাল লাগে। এতে জনার্দনবাবু যে ক্রমে ক্রমে শীর্ষস্থান অধিকার করে বসলেন আর উনি যে প্রায় যথাস্থানেই রয়ে গেলেন এর জন্য উগ্র কোন-রকম আক্রোশ না থাকলেও সুযোগমত দু-একটা কথা কানে তুলে দিতে পারলে এক ধরনের আনন্দই পান। প্রশ্নটা শুনেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটা না দিয়ে একটু মুখ টিপে হাসলেন।

উত্তর না পেয়ে খাতায় নিবদ্ধদৃষ্টি হয়েই আবার করলেন প্রশ্নটা মিস্টার সান্যাল, "বলুন; আপনারা হলেন অফিসের সিনিয়ার লোক। কেমন দেখছেন মেয়েটিকে?"

"আপনার সিলেকশন, ভাল না হয়ে যায়? তবে..."

"তবে...?" মুখ তুলে চাইলেন।

"যাই না ত ওঁর চেম্বারে বড় একটা, নেহাত দরকার পড়ল দস্তখতটা নিতে, কি কোন দরকারী কথা জিজ্ঞেস করতে, গেলুম একবারটি; তা পড়বি ত পড় আমার নজরেই..."

মিস্টার সান্যাল একেবারে সোজা হয়ে বসলেন, হাতের কলমটা হাত থেকে টেবিলে পড়ে গেল, কি নিজেই রেখে দিলেন, ঠিক বোঝা গেল না, নির্বাক ঔৎসুক্যে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

"কথাটা হচ্ছে, আপনার সিলেকশন, মেয়েটি ত বেশ চৌকশই বোধ হচ্ছে, তবে তাকে শেখালে তবে ত শিখবে সে। আমি যদি উলটে তার কাছে গোকুল-পিঠে কী করে তোয়ের করতে হয় তার হদিস শিখতে যাই..."

"গোকুল-পিঠে!"

"সাতদিন এসেছে মেয়েটি, এর মধ্যে দুদিন হঠাৎ দরকারে গিয়ে পড়েছিলুম ওঁর কামরায়। প্রথম দিন তেমন কিছু নয়, মেয়েটি প্লেটে খাবার গুছিয়ে-গুছিয়ে দিয়েছে। দেখলুম আগেকার চেয়ে একটু তোয়াজ হয়েছে, মেয়েটি সামনে দাঁড়িয়ে খাওয়াচ্ছে। তা ভাবলুম, করুক, মেয়ে-ছেলের মন, একটু ছিরি আসবেই ঘবটায়.."

"হুঁ...আর কোন দিন..."

"আজ্ঞে, আজই।...দস্তখতটা করিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসেছি, আপনি ডেকে পাঠালেন।"

"আজও গোকুল-পিঠে?"

"আজ্ঞে, ওটা আজই দেখলুম স্যার, সেদিন ছিল না, মিছে কথা বলি কেন? সেদিন শুধু গুছিয়ে-গাছিয়ে বাড়ির মতন একটু তোয়াজ করা। আজ এদিককার আর সব জিনিসের সঙ্গে প্লেটে গুটি চারেক গোকুল-পিঠে। আমি যখন গেলুম, ঐ নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল। অন্নপূর্ণা পাঠশালের মেয়ে—সেইখানেই শেখাত সব। কী কী লাগে, কীভাবে করতে হয়—উনি তারিয়ে তারিয়ে খেয়ে যাচ্ছেন, আর..."

"আচ্ছা, আপনি যান।" শুনতে শুনতেই খাতাটার এক জায়গায় একটা টিক দিয়ে দস্তখত বসিয়ে সামনে ঠেলে দিলেন। বিকাশবাবু চলে গেলে, সিগারেটের টিনটা খুলে একটা সিগারেট বের করে নিলেন।

একটু পরে জনার্দনবাবুর ডাক পড়ল।

"আপনার রিটার্নটা শেষ হল জনার্দন-বাবু?"

"প্রায় হয়ে এল স্যার।...একটু—কী যে বলে..."

"আমারও ভুল দেখুন না, ঠিক এই সময় আবার লতিকাকে দেখিয়ে শুনিয়ে দেওয়ার ভারটাও দিলুম আপনার ওপর চাপিয়ে।... তা হপ্তাখানেক ত হল, কী রকম দেখছেন?"

"পরিষ্কার মাথা স্যার। বাজিয়েই নিয়েছেন ত আপনি, এর মধ্যেই যা পিক আপ করেছে, অন্য কেউ হলে..."

"তাই আমি ভাবছিলুম, এবার না হয় গিয়ে বিকাশবাবুর কাছে বসুক..."

কলিং বেলটাতে একটা টোকা মারলেন আর্দালি এসে দাঁড়ালে বিকাশবাবুকে ডেকে দিতে বলে আবার জনার্দনবাবুকেই বলে চললেন, "বিকাশবাবুর ফুরসুতও আছে—আর আপনার এদিকটা ত খানিকটা দেখলও। কী বলেন?"
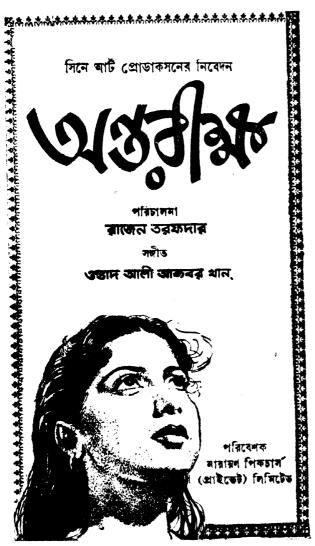
একটু অন্যমনস্কই হয়ে গিয়েছিলেন

জনার্দনবাবু। প্রশ্নটায় সচেতন হয়ে উঠে বললেন, "আজ্ঞে মন্দ কী?...মানে, এইটেই ভাল ব্যবস্থা হবে। রিটার্নগুলোর জন্যে ঠিক মনও ত দিতে পারছি না ওর দিকে..."

বিকাশবাবু এসে দাঁড়ালেন। মিস্টার সান্যাল সিগারেটের ছাইটা ঝেড়ে বললেন, "একটা কথা ভাবছিলুম বিকাশবাবু—জনার্দনবাবুরও তাই মত—বলছিলুম, লতিকা না হয় আপাতত আপনার সঙ্গেই বসুক—প্রিলিমিনারি আইডিয়া কতকগুলো ত পেয়েই গেছে ওঁর কাছে। তাহলে আপনার টেবিলটা না হয় ও ভিড়ের মধ্যে থেকে একটু আলাদা করেই নেবেন? ধরুন হলের উত্তর কোণটায়...একটা নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করছি ত?"

• •

দুটো দিন কেটে গেল। বিকাশবাবুর চেয়ারটা খালি, কী একটা কাজে অন্য ডিপার্টমেণ্টে গেছেন। যানও বেশী, গেলে একটু বিলম্বও হয়। লতিকা খাতা খুলে বাঁ হাতে কপালটা রেখে কী একটা কথা ভাবছিল। ওদিকে কী কথা হয়েছে, বিকাশবাবু তার হাসির জের মুখে করে এসে বসলেন। বললেন, "যত্তো সব!...তোমার ওটা হল?" ঘাড়টা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন, "কৈ, শেষ করনি ত?"

"করে দিচ্ছি এক্ষুনি।" বলে লতিকা মুখ কাত করে একটু লজ্জিতভাবে হাসল।

"কী ভাবছিলে যেন।...তোমার মার শরীরটা আজ কী রকম?"

"কী করে বলি? চাকরি করছি বলে আজকাল আবার খারাপ থাকলেও লুকোন।"

"তবেই দেখ! অথচ তুমি যে একটু মন দিয়ে চটপট করে শিখে নেবে, অথচ, ওঁর এদিকে খুবই আগ্রহ, একটা নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করছেন ত। আজও জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি ত বলে যাচ্ছি—বেশ পিক-আপ..."

"ভাল কথা মনে পড়ে গেল জ্যাঠামশাই, আপনার মেয়েকে কাল এসেছিল দেখতে?"

বিকাশবাবুর হাসি-হাসি মুখটা একটু নিষ্প্রভ হয়ে গেল। বললেন, "এসেছিল, হল না মা।"

"নিশ্চয় গান আর হাতের কাজের জন্যে?"

"হাতের কাজের নমুনা দেখে গানের কথা আর তুললেও না। তার ওপর দেখলেও ত অজ পাড়াগাঁ। আমিই হপ্তায় দুটো দিন কাটাই। তাও পুরো দুটো দিনই বা কোথায়। তাইতেই যেন হাঁপিয়ে উঠতে হয়। তাই মনে করছি মাস কয়েকের জন্যে না হয় কলকাতাতেই একটা ছোটখাট বাড়ি ভাড়া করে চলে আসি, তারপর মেয়ে-টিউটর রেখে গানের আর সেলাই, হাতের কাজ এই সবের একটু ট্রেনিং দিয়ে—জোগাড় হয় ত এইখানেই বিয়েটা দিয়ে..."

"নিয়ে আসুন জ্যাঠামশাই, নিশ্চয় নিয়ে আসুন, আর দুমত করবেন না। অন্য জায়গায় নয়, আমাদের পাড়াতেই, আমি বাড়ি ঠিক করছি। আর ট্রেনিং-এর জন্য আপনি অন্য ব্যবস্থা কী করতে যাবেন? দুটোতেই আমি নিজে এমন তালিম দিয়ে দোব!"

মুখটা উৎসাহে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। বিকাশবাবুর মুখেও হাসি-হাসি ভাবটা ফিরে এসেছে; প্রশ্ন করলেন, "তুমি জান?"

"কত প্রাইজ পেয়েছি। গান আমার ত সাবজেক্টই ছিল ম্যাট্রিকে!"

"সত্যি নাকি!"

আলোচনা চলে। প্ল্যান তোয়ের হয়। অবশ্য চাপা গলাতেই। তবে এমন নয় যে, যারা হলের এদিকেই থাকে, একটু কান পেতে থাকলে তাদের শুনতে বিশেষ অসুবিধা হবে। বিকাশবাবুর এদিক দিয়ে একটা অবহেলার ভাব আছেই। লতিকাও হলের দিকে পিছন করে বসে; আশে পাশে কাদের কলম থেমে গেল, খোঁজ রাখে না। স্বভাবটা মুক্ত আর সপ্রতিভ, হয়ত গ্রাহ্যও করে না।

বলে, "সে ত পরের কথা, ব্যবস্থা করতে করতেও কিছুদিন হয়েই যাবে। এর মধ্যে আমি এক মতলব ঠাউরেছি জ্যাঠামশাই... এই দেখাই আপনাকে।"

সুদৃশ্য কাঠের হ্যাণ্ডেল দেওয়া একটি ফ্যাশন ব্যাগ নিয়ে আসে অফিসে, তার মধ্যে থেকে ছোট বড় কয়েকটি নক্শার কাজ বের করল, বলল, "এইগুলি নিয়ে যান বাড়িতে জ্যাঠামশাই, যদি এর মধ্যে কেউ দেখতে আসে ত..."

"কাতুর বলে চালিয়ে দোব?" একটু বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন বিকাশবাবু।

"কিচ্ছু দোষ নেই জ্যাঠামশাই; আমাদের পাড়ার কটা মেয়ে এই দেখিয়ে পার হয়ে গেল।" একটু গম্ভীর হয়ে, আর কতকটা যেন আক্রোশের বশেই বলে লতিকা, "ও যেমন কুকুর তেমনি মুগুর!...মেয়েদের যেগুলো আসল দরকার, সে-সব বাদ দিয়ে যেগুলো সেকেণ্ডারি, সেগুলোর ওপর

যাই না ত ওঁর চেম্বারে
বড় একটা

ঝোঁক দেওয়া এত বেশী করে, ও আমি বুঝি না জ্যাঠামশাই। আর, তাতেও যদি মনে খুঁতখুঁতি থাকে আপনার, আমি কথা দিচ্ছি—বিয়ে হওয়ার আগে আমি আপনার মেয়ের হাত দিয়ে ঠিক এই জিনিস বের করিয়ে দোবই; তাহলে ত আর ঠকান হল না?"

হাসে; আবার আলোচনা হয়। এক সময় একটু সচকিত হয়ে ঘাড় উল্টে ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলে ওঠে; "এই দেখুন, ভুলেই গেছি! জ্যাঠামশাইয়ের খাবারটা ঠিক করে দিয়ে আসি। ভাববেন, দেখেছ, টেবিল ছেড়ে গেছে ত আর সম্বন্ধই নেই। বুড়োমানুষ..."

কয়েক পা গিয়ে আবার ফিরে এসে দেরাজ টেনে ব্যাগটা বের করে নিল। একটু সকুণ্ঠ হাসি ফুটেছে মুখে, বিকাশবাবু একটু বেশী করে গলাটা নামিয়ে প্রশ্ন করলেন, "আজ গোকুল না পাল্লি?"

"যান, আপনি ত খাবেন না, বলছি এত করে।" একটু ঠোঁট-টিপে হেসে চলে গেল।

দিন চারেকের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন, ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা কানে গেল মিস্টার সান্যালের; এবার ত আর চেম্বারের মধ্যেও না; তা ভিন্ন জনার্দনবাবু খুব সূক্ষ্মভাবে একটু কলকাটিও টেনে থাকবেন নিশ্চয়। চিন্তার মধ্যে একটা গোটা সিগারেট পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল, তারপর কলিং বেল টিপলেন। আর্দালি এলে বললেন, "হারানবাবু..."

হারানবাবু অ্যাকাউন্ট সেকশনে সেকেণ্ড অ্যাসিসট্যাণ্ট, জনার্দনবাবুর পরেই। বয়স্থই, ওঁদের দুজনের চেয়ে ছোট; পঞ্চাশ-বাহান্নর মধ্যে। একটু ফিটফাট, এবং ডিসপেপসিয়া প্রভৃতি কয়েকটি রোগ থাকায় খানিকটা খুঁতখুঁতেও।

এসে দাঁড়ালে বললেন, "ঐ মেয়েটির কথা বলছিলুম, আপনাদের সেকশনে সেদিন যেটিকে ভর্তি করলুম। আমার ইচ্ছে একবার ওকে সেকশনের সব রকম কাজের একটু করে আইডিয়া দিয়ে তার পর ওর নিজের হাতে কাজ দিই। জনার্দনবাবু আর বিকাশবাবু, দুজনের কাছেই হপ্তাখানেক করে বসেছে, এবার আপনি খানিকটা বুঝিয়ে শুনিয়ে দিন। তার পর ওর কনফারমেশনের কথা বিবেচনা করাও আপনার রিপোর্টের ওপর।"

"যেমন বলেন, স্যার।"

"মেয়েটি বুদ্ধিমতী। তবে ছেলেমানুষ, আর মেয়েছেলেই ত, অফিসের ফরম, মানে নিয়ম-কানুন—কীভাবে চলতে হয়—সেটা জানে না।"

হারানবাবু একটু কুণ্ঠিত হাসির সঙ্গে টিপ্পনী করলেন, "সেটা আমাদের কাছেই ত শিখবে স্যার, আমরাই যদি চিনে দিই..."

"সেই। একটু নজর রাখতে হবে।... তাহলে..."

বেল টিপতে আর্দালি এসে দাঁড়াল। বললেন, "বিকাশবাবু..."

এলে প্রশ্ন করলেন, "লতিকা আপনার কাছে ত কাটাল কটা দিন; কীরকম দেখলেন?"

"বেশ শার্প। হাঁ করলে বুঝে নেয়।"

"তাহলে আপনাদের দুজনের কাজ ত দেখলই, এবার হারানবাবুর কাজের নেচারটাও একটু বুঝে নিক। ওঁকে সেই জন্য ডেকেছি। আমার ইচ্ছে সবার টেবিল থেকে একটু ঘুরিয়ে আনি ওকে। হ্যাঁ, তাহলে হারানবাবু, আপনি দিন কতকের জন্যে ঐ কোণটায় গিয়ে বসুন—বিকাশবাবু যেমন বসছিলেন। আপনারাও একটু নজর রাখবেন বিকাশবাবু..."

"সেকি বলছেন স্যার!...আপনি একটা নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করছেন—সবারই দায়িত্ব আমাদের..."

দুটো দিন গেল। তৃতীয় দিন লতিকাকে জনার্দনবাবুর চেম্বারেই বসতে হল,

সেদিন সমগ্র জাতির কাছে এক মহামঙ্গলের দিন, যেদিন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, প্রেমময় চৈতন্যদেব আবির্ভূত হলেন এই পৃথিবীতে, করুণার অমৃত হাতে নিয়ে। চৈতন্যদেব দুহাতে বিলিয়ে গেলেন অপার করুণা—উদ্ধার হয়ে গেল দুই বাংলা। যারা বঞ্চিত তাঁর পথে পড়ল, তারা সকল নিয়ে ফিরে গেল, যারা দুঃখী তারা সৌভাগ্য নিয়ে গেল; মৃত লোকের দেহ পড়েছিল তাঁর চলার পথে, সে মহাপ্রভুর করুণার স্পর্শে পুনর্জীবন লাভ করল।

● প্রাচীন ঐতিহ্য ভারতের যে চিকিৎসা বিজ্ঞান তারও নির্দেশ হল—কুষ্ঠ ও আর্তকে পুনর্জীবন দান করা। সেই নির্দেশই অনুসরণ করে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি গত ৬০ বছরের যাবত ধবল-কুষ্ঠ ও নানা প্রকার কঠিন চর্মরোগগ্রস্ত রোগিগণকে রোগ মুক্ত করে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে তাদের সুস্থ, সহজ ও সুন্দর জীবন।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, কবিরাজ।
১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। (ফোন শিবপুর: ২৩৫৯)
শাখা—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯ (পূরবী সিনেমার পাশে)।

L. A. A.

হারানবাবুর অনুপস্থিতির জন্য। চতুর্থ দিন খাতা খুলতে খুলতেই কথাটা তুলল লতিকা, "আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কাকাবাবু?"

"হ্যাঁ। দেখ না, পেটটা ভাল ছিল না। তবু আসছিলুমই একরকম না খেয়ে, হঠাৎ কোমরের ব্যথাটা চাগিয়ে উঠল, আর বেরুতে দিলে না।"

"বাত নিশ্চয়, কাল আবার অমাবস্যা ছিল ত।"

"অমাবস্যায় বাড়ে, না? বলে বটে অনেকে, যদিও ডাক্তারেরা মানতে চায় না।"

খোলা খাতার ওপর হাতটা রেখে ঘুরে চাইলেন হারানবাবু।

লতিকাও তর্কের ভঙ্গি নিয়ে ঘুরে বসল। বলল, "ডাক্তারে না মানলেই যে মিথ্যে হয়ে যাবে, তা ত হতে পারে না কাকাবাবু। আমার মার রয়েছে, দেখছি ত। একাদশীটা সামলে যায়, উপোস করতে হয় ত; কিন্তু অমাবস্যার দিন..."

"কাবু করে ফেলে?"

"মাকে ঠিক কাবু করে ফেলতে পারে না। একটা মাদুলি ধারণ করেছেন, তার ওপর টোটকা করেন একটা..."

"কাজ হয় টোটকাতে?"

"মার টোটকা? নিজের মা বলেই বলছি না, বড় বড় বিলিতী ওষুধের দোকান হার মানে। আর ত বিলিতী ওষুধ ঢুকতেও দেন না বাড়িতে..."

"সত্যি নাকি?"

"ওঁর বিশ্বাস, ডাক্তারেরাই মেরে ফেললে বাবাকে। আপনার ত অনেক দিনের ডিসপেপসিয়াও আছে শুনলুম।"

"আজ পাঁচ বছর থেকে নাগাড়ে ভুগছি।"

"এক মাসের মধ্যে চাঙ্গা করে দেবে, এমন ওষুধ আছে মার কাছে। আপনার হাঁপানি আছে?"

"নেই একেবারে বলতে পারি না—মনে হয় যেন একটু একটু টান আসে মাঝে মাঝে..."

"তাহলে এই সময় সাবধান হয়ে যাওয়া ভাল কাকাবাবু। গাছ-গাছড়া চেনেন? মার কাছ থেকে জেনে এসে বলে দিলে জোগাড় করে নিতে পারবেন?"

"দু-একটা চিনতে পারি হয়ত।"

"ও ঠিক হয়ে যাবে। কোন হাঙ্গামা করতে হবে না আপনাকে। আমি বিকাশ-জ্যাঠামশাইকে এই প্যাটার্নের বইটা দিয়ে আসি কাকাবাবু। এক্ষুনি আসছি..."

এবার কথাটা পেঁছুতে আরও কম সময় লাগল; নূতন এক্সপেরিমেণ্টের আলোচনাই ত চলছে আজকাল অফিসে। তবে একটা সিদ্ধান্ত করে উঠতে এবার আরও সময় লাগল মিস্টার সান্যালের।

সেলস-ম্যানেজার নরহরিবাবুকে ডেকে পাঠালেন।

লোকটি ফার্মের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। এবং সেই জন্য একটু স্পষ্টবক্তাও। এবং সেই জন্য নিতান্ত নিরুপায় হলেই ডাকেন মিস্টার সান্যাল। বিপদের কথাটা বললেন। ওঁর ডিপার্টমেণ্টে নেওয়া সম্ভব হবে কি?

ভ্রূ দুটো কুঁচকে একটু হাতমুখ নেড়েই কথা বলা অভ্যাস নরহরিবাবুর। বললেন, "না স্যার, এমনি জোর করে দেন, উপায় থাকবে না। তবে যদি জিজ্ঞেস করেন—করেসপনডেন্স রেকর্ডস, অ্যাডভারটাইজ-মেণ্ট, কোনও ডিপার্টমেণ্টেই পাঠাতে পরামর্শ দোব না। ...ও একটা পাকা গিন্নী এনে অফিসে তুলেছেন কোথা থেকে স্যার! কাকে গোকুল-পিঠে, মুগসাগলি, সরুচাকলি ভাজাপুলি খাওয়াতে হবে; কার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, তালিম দিয়ে তোয়ের করে দিতে হবে, সব ওর ভাবনা। তারপর শুকনো গাছগাছড়ায় ত টেবিল বোঝাই করে ফেলছে স্যার! ঐ এক ফোঁটা মেয়ে টোটকায় সেকেলে বুড়ীদের নাক কাটে। দেখে যাচ্ছি মুখ বুজে—একটা এক্সপেরি-মেণ্ট করছেন আপনি—জিজ্ঞেসও করেননি, ওপরপড়া হয়ে বলতেও পারি না..."

মিস্টার সান্যাল একটু সংকুচিত হয়ে বললেন, "মেয়েটি বড় দুঃস্থ নরহরিবাবু, তাই ছাড়াতেও পারছি না। বড় ভালও এদিকে..."

"ভাল একশবার; দেখছি ত। তা বলে অফিসটা ত দিদিমাবুড়ির সংসার নয় স্যার।

•

সাপ্লায়ার টি
কোম্পানী

ভারতীয় চা-এর
বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

মফঃস্বলের খরিদ্দারগণকে যত্ন সহকারে মাল সরবরাহ করা হয়।

সেল ডিপো:—
৯৯, নেতাজী সুভাষ রোড ও
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬১৫০

আন্তর্জাতিক চাউল কমিশন কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে।

কানাঘুষোতেই শুনেছিলুম, আপনি নাকি ওকে অ্যাকাউণ্ট্‌স সেকশনের সবটুকু ঘুরিয়ে আনবেন। বলব-বলব মনে করছিলুম, এমন সময় আপনি নিজেই ডেকে পাঠালেন। বলছিলুম—আর এগুনো ঠিক হবে না স্যার—আমার মত এই—অর্থাৎ, আপনি যেমন ভাল বোঝেন..."

মিস্টার সান্যাল একটু বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলেন, "বুঝলুম না ত নরহরিবাবু! আর এগুনো—মানে?"

"অ্যাকাউণ্ট্‌সে এখন ত চারজন, সলিল এখন ঐ সেকশনেরই কাগজপত্র দেখছে ত..."

অপ্রতিভ হয়ে উঠলেন মিস্টার সান্যাল। বললেন, "না, না, তা কি পারি নরহরিবাবু—তা কখনও পারি? এ'রা ট্রেনিং দেবেন, দিতে পারেন, তাই পাঠিয়েছিলুম। সলিল কী ট্রেনিং দেবে?...মানে...নাঃ—আচ্ছা, আপনি আসুন—দেখি কী করা যায়..."

সলিল সান্যাল পুত্র ও'র। ইউরোপ ঘুরে এসে সম্প্রতি অফিসের অভিজ্ঞতা অর্জন করছে মাসকয়েক থেকে। ওদিককার কটা বিভাগ শেষ হয়ে গিয়েছে। এইবার অ্যাকাউণ্ট্‌সটা শেষ করে বেচাকেনার বাজারটা ঘুরে ফিরে দেখবে।

সলিল অবশ্য নিজেই ট্রেনিং-এ রয়েছে, ও আর কাকে ট্রেনিং দেবে। তবু নরহরিবাবুর মন্তব্যে ওর কথাটা মনে খুব আনাগোনা করতে লাগল। ও যে এই ডিপার্টমেণ্টেই এখন রয়েছে, এটা অতটা খেয়ালই হয়নি। নইলে...নইলে এ নূতন একসপেরিমেণ্টটা করতে যেতেন কি ভরসা করে?"

এবার উপর্যুপরি দুটো সিগারেট পুড়িয়ে ফেলতে হল মিস্টার সান্যালকে। এবার একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করতেও পুরো-পুরি চারটে দিন লেগে গেল। মাঝখানে সলিল এসে পড়ায় ব্যাপারটা ত আরও জটিল হয়েই পড়েছে। অনেক ভেবেচিন্তে শেষ-পর্যন্ত লতিকাকে নিজের চেম্বারে ডেকে পাঠালেন।

এলে বললেন, "বস।...ইয়ে—বলছিলাম—তোমার প্রোবেশনারি পিরিয়ডটা ত শেষ হয়ে এল, আর মাত্র দুটো দিন বাকী, কী রকম মনে হচ্ছে? পারবে কাজ?"

"ও'রা তিনজনে ত রিপোর্ট দেবেন..."

"একজনের পেট পুলিপিঠে-গোকুল-পিঠেয় ভর্তি, একজনের মেয়ের বিয়ের অনেকটা সুরাহা করে ফেলেছ, একজনের ডিসপেপসিয়া-হাঁপানির..."

মুখটা বেশ গম্ভীর। লতিকার চোখ দুটি ছল-ছল করে উঠেছে। এমন আতুর-ভাবে মুখের পানে চেয়ে আছে যে, আর এগুতে পারলেন না। লতিকাই কথা কইল। বলল, "বড় কষ্ট হয়। বুড়ো মানুষ, দেখলুম জলটি পর্যন্ত গড়িয়ে নিতে হয় নিজেকে। ...আমায় ছাড়িয়েই দিন, সত্যিই পারব না..."

"সত্যিই পারবে না তুমি, নইলে এবার ভেবেছিলুম নিজের চেম্বারেই নিয়ে এসে বসাব তোমায় দিনকতকের জন্যে; ওদিকটা ত হল। তা আমার আবার যেমন খাবার লোভ, তেমনি হরেকরকমের ব্যাধি, আর..."

"আর লজ্জা দেবেন না আমায়, আমি না হয় নিজেই রেজিগনেশন্ দিচ্ছি—আজই..."

"তাই দেবে?...না হয় ও'দের রিপোর্ট তিনটে আসুক না...বেশ, এখন যাও। একটু ভাববার সময় নাও বরং।"

সেদিন সন্ধ্যায় লতিকাদের বাড়ির সামনে একটি মোটর এসে হর্ন দিয়ে দাঁড়াল। লতিকাই এসে দরজা খুলে দিল। মিস্টার সান্যাল আস্তে আস্তে নেমে ওর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, "তোমার মার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আছেন তিনি বাড়িতে?"

বিমূঢ়ভাবে মাথাটা একটু হেলিয়ে লতিকা জানাল, আছেন; নিয়ে গেল ভিতরে। তিনিও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিমূঢ়ভাবেই দাঁড়ালেন সামনে। মিস্টার সান্যাল নমস্কার করে বললেন, "আমি লতিকাদের অফিসের সায়েব; যদিও চেহারায় বা পোশাকে সেটা সাব্যস্ত করতে পারছি না আপনার কাছে..."

লতিকাকে বললেন, "তুমি যাও মা, তোমার নামে নালিশ আছে তোমার মার কাছে, শুনতে পারবে না।...বরং দেখ ত, জনার্দনবাবুর জন্যে যা তোয়ের করেছিলে তার ঝড়তি-পড়তি কিছু আছে কিনা হে'সেলে..."

ফাইলেরণ্

(A Sure Remedy for FILARIA)

যে কোন দুরারোগ্য গোদ ও ফাইলেরিয়া রোগে নিশ্চিত আরোগ্য। ২৪ ঘণ্টায় জ্বর, ব্যথা ও ফোলা কমে। নূতন অবস্থায়—১৸৹ পুরাতনে—১১৸৹ ডাক-মাশুল ১৸৹ স্বতন্ত্র অগ্রিম প্রেরিতব্য।

মেডিকো সাপ্লাইং কর্পোরেশন

পোষ্ট বক্স—১৩৬, কলিকাতা-১

(সি ৫৯৬২)

বিবাহ হইয়া গেল। আমার বয়স নয় বৎসর, কনের সাত। সন ১৩০৫ সাল। ফাল্গুনে মা[illegible]ন হইল এবং ন্যাড়া মাথাতেই টোপর পরিয়া বিবাহ করিয়া আসিলাম। কনের রং একটু রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে হইলে কাল না বলিয়া ময়লাই বলিতে হয়। ছোটখাট ধরন, মুখচোখের গড়নেও সুন্দরী বলা চলে না। বিবাহে কিছুই পাওয়া গেল না। না টাকাপয়সা, না গহনাপত্র, দান, আংটি, গরদের জোড়ও নয়। যেন শ্বশুর মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক কন্যাদান দিয়াই কৃতার্থ করিলেন। কারণটা যেখানে হউক অন্য একদিন বলিব।

মাঝেমাঝে শ্বশুরবাড়ি আসিতাম। সে-সময় যাঁহাদের সঙ্গে ঠাট্টার সম্বন্ধ তাঁহারা, এমনকি শ্বশুরবাড়ির গুরুজনেরাও আমাদের দুজনকে লইয়া নানারকমে একটু আমোদের সুযোগ ত্যাগ করিতেন না। দুই একটি উদাহরণ দিই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ির ছেলে, যদিও অভিভাবক কেহ ছিলেন না, তথাপি আমার একটু গোঁড়ামি ছিল। বাড়িতে শ্রীশ্রীমদনগোপাল প্রভুর সেবা আছে, বিধবা মাসিমার হাতে লালনপালনের ভার, সুতরাং আচার-নিয়মেও কঠোরতা বড় কম ছিল না। উপনয়নের পর হইতেই ত্রিসন্ধ্যা করি, কিন্তু সেটা যথাসম্ভব তিন বেলাই বাড়ির বাহিরে পুকুরঘাটে সারি। তুলসী গাছে জল দেওয়া অভ্যাস করিয়াছিলাম, তাই একটা লোটা হাতেই স্নান করিতে যাইতাম। শ্বশুরবাড়িতে একদিন স্নান করিয়া ফিরিয়া দেখি, এক জায়গায় আসন পাতা হইয়াছে, সামনে কোশাকুশিও রহিয়াছে এবং সেখানে কয়েকজন কিশোরী যুবতী দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই তাঁহারা বলিলেন, "এই যে, অচল (কনের নাম অচলবালা) সব ঠিক করে রেখেচে, আহ্নিক কর।" আর একদিন ভাত খাইতে বসিয়াছি, জল নাই, গণ্ডূষ করিবার জন্য জলের অপেক্ষা করিতেছি, কনের পিসিমা বলিলেন, "এই যে বাবা, অচলই ব্যস্ত হয়ে পড়েচে, জল নিয়ে যাচ্চে।" অন্য একদিন জলঝড়ের পর শ্বশুরবাড়িতে ফিরিতেছি, কে যেন বলিল, "ওহে, অচল তোমার জন্যে বড্ড ভাবছিল, তোমার নাম ধরে কত ডাকছিল।" ইহার পরিণামফল ভাল হয় নাই। মনের মধ্যে কেমন একটা বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছিল। প্রথম যৌবনেও আমি অচলকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতাম।

মাতামহী কল্যাণেশ্বরী দেবী গ্রহণী রোগে তনু ত্যাগ করেন। সেদিন তিনি পূর্বাহ্নেই সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে পর দুপুরের দিকে হরিনামের মালা জপ করিতে করিতে সজ্ঞানে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। আশ্চর্যের বিষয়, মাতামহীর তিনটি কন্যাই এই ব্যাধিতে লোকান্তরিতা হন। আমার মায়ের পরলোকগমনের পর মাসিমা দারুণ গ্রহণী রোগে কিছুদিন খুবই কষ্ট পাইয়াছিলেন। সেই অবস্থাতেই আমাদের জন্য রান্নাবান্না করা, সংসারের দেখাশোনা সব কাজই তাঁহাকে করিতে হইত। অবশ্য প্রভুজীউর সেবার পালায় অন্যলোকে ভোগ রাঁধিয়া দিত। নিকটবর্তী গ্রামের একজন হাতুড়ে চিকিৎসকের ঔষধে এই ব্যারাম ভাল হইয়াছিল। চিকিৎসক জাতিতে বাউড়ী, তাই সমস্ত উপকরণ লইয়া আমাদের বাড়িতে আসিয়া ঔষধ তৈয়ার করিয়া দিয়া গিয়াছিল। দুধের সরের মোড়কে ঢাকিয়া এই ঔষধ গিলিতে হইত। পাঠশালা হইতে আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া মুড়ি ও গুড় আমরা নিজেরাই লইতাম। গুড় একটু বেশীই খাইতাম। মাসিমা একটা ভাঁড়ে আমাদের জন্য গুড় বাহির করিয়া রাখিতেন। মাসিমার ঔষধও একটি মাটির ভাঁড়েই ছিল। একদিন গুড় ভ্রমে এই ঔষধ মুড়িতে মাখিয়াছিলাম। এক গ্রাস মুখে দিয়াই

তৃষ্ণার জল আলোকচিত্রী শ্রীবীথি সরকার

বুঝিলাম ইহা গুড় নহে। বারবার মুখ ধুইয়া জিভ ছুলিয়াও সমস্ত দিন মুখের তিক্ততা যায় নাই। সমস্ত দিন অনাহারে ছিলাম। পরে জানিয়াছিলাম কুড়চি চূর্ণের সঙ্গে আরও কয়েকটি চূর্ণ পুরানো গুড়ের সহিত পাক করিয়া ঐ ঔষধ তৈরি হইয়াছিল।

সন ১৩১৪ সালে মাসিমা পুনরায় গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইলেন। সেই রোগেই তাঁহার দেহান্ত হইল। বাউড়ী চিকিৎসক তখন পরলোকে। তাঁহার উত্তরাধিকারীর উপর আস্থা রাখিতে পারিলাম না। নিকট-বর্তী গ্রামের এক ব্রাহ্মণ কবিরাজি ও ডাক্তারি করিতেন। তাঁহার চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। মাসিমাও আর ঔষধ খাইতে সম্মত হইলেন না। বলিলেন, "আমি এই রোগেই মরিব। তোরা ঔষধের জন্য ব্যস্ত হস না।" আমরা দুই ভাই একই বাড়িতে দুই সহোদরা ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলাম। এই অসুস্থতার দিনে দুই ভগিনীতে মাসিমার যেভাবে সেবাযত্ন ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, ইতিপূর্বে আমি অন্যত্র তাহা দেখি নাই। দুই হাতে রোগিণীর মলমূত্র পরিষ্কার, ঘনঘন বিছানা পরিবর্তন, বিছানা ও পরিধেয় কাপড় কাচিয়া শুকান, দিনে দশবার গা মুছান, নিয়মিত খাওয়ান, ঘরে ধূপধুনা দেওয়া, ক্লান্তি নাই, বিরক্তি নাই, মুখে কোন কথা নাই। এমনই দিনের পর দিন। বড়বৌ বাড়ির রান্নাবান্না আদি কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। মাসিমায়ের সেবার ভার ছোটই বিশেষভাবে নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন। আমি দিবারাত্রি মাসিমায়ের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতাম। এই সেবা আমাকে আকৃষ্ট করিল, আমি অচলবালার —প্রায় নিরক্ষরা পল্লীবধূর—গুণে মুগ্ধ হইলাম, তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিলাম। কিন্তু সে-ভালবাসার* আশু ফলও শুভ হইল না।

কয়েক ক্রোশ দূরবর্তী বাঁধ-নবগ্রামে মাসিমায়ের শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুরের কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউকে তিনি এক বৎসর অন্তর নিজ বাড়িতে আনিয়া একাদিক্রমে সাত মাসকাল প্রভুজীউ-এর সেবাপূজা নির্বাহ করিতেন। কয়েক বিঘা জমির ধান, প্রজা-বিলি দেবত্র জমির কয়েক টাকা খাজনা এবং কয়েকটির শিষ্যের দেওয়া বার্ষিক প্রণামী মাত্র পাইয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। বাঁধ-নবগ্রামে একজন অবস্থাপন্ন শিষ্য ছিলেন। শিষ্য রামনাথ ঘোষ, জাতিতে সদ্গোপ, মাসিমাকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। জমির ধান এবং খাজনার টাকা ইনিই আদায় করিয়া দিতেন। ঠিক স্মরণ নাই, রামনাথের শ্রাদ্ধ অথবা তাঁহাদের বাড়ির আর কাহারও শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিমন্ত্রণপত্র আসিল। মাসিমায়ের অসুস্থতার সংবাদ বাঁধ-নবগ্রামে জানান হইয়াছিল। তথাপি আমাদের দুই ভাই-এর একজনকে শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত থাকিবার জন্য পত্রে সনির্বন্ধ অনুরোধ ছিল। মাসিমা দাদাকে যাইবার জন্য বলিয়াছিলেন, দাদা অসম্মত হওয়ায় আমাকে জেদ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে যোগ দিলেন ছোটবধূ। "মা বলিতেছেন—যাও। মাসিমাকে আমরা মা ই বলিতাম। আমি ত আছি, মায়ের কোন অযত্ন হইবে না। না গেলে মা মনে বড় কষ্ট পাইবেন। এই অসুখের সময় মা মনে কষ্ট পাইলে ব্যারাম বাড়িয়া যাইতে পারে।" ইত্যাদি ইত্যাদি। বাঁধ-নবগ্রাম গিয়াছিলাম, কিন্তু বাড়ি ফিরিয়া মাসিমাকে আর দেখিতে পাই নাই। দুই দিন পর প্রহরখানেক বেলায় বাড়ি ফিরিলাম। গ্রামের বাহিরে মা কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, পূর্বদিন দাদা মায়ের শবদেহ লইয়া বক্রেশ্বর তীর্থে রওনা হইয়া গিয়াছেন। এই মর্মান্তিক দুঃখ আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই। পত্নী যতদিন জীবিত ছিলেন, কোন কাজে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করি নাই। বোধহয় অনুরোধও রক্ষা করি নাই। যদিও কোন অনুরোধ তাঁহার ছিল না বলিলেও চলে। মাসিমায়ের পরলোকগমনের পর হইতেই সংসারে ভাবনার দিক দিয়া আমি একাকী।

সন ১৩১৯, প্রসবের জন্য পত্নী পিত্রালয়েই ছিলেন। সংবাদ আসিল, আমার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। নাপিত বড়-রকমের একটি পিতলের ঘড়া বিদায় লইয়া

চলিয়া গেল। মাতামহ-বংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশ। ব্রাহ্মণ যজমানের বাড়িতে সেকালে বাসনকোশন মন্দ মিলিত না। দাদার সময় যজমান-সংখ্যা বাড়িয়াছিল। সুতরাং ঘড়া-থালা-বাটির অভাব ছিল না। দাদার সন্তান বাঁচিতেছে না। পর পর কয়েকটি পুত্র-সন্তান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমার পুত্রলাভের সংবাদে দাদা-বড়বৌ খুব খুশী হইলেন। গ্রামে আমাদের আত্মীয় বলিতে বড় কেহ ছিলেন না। মঙ্গলডিহি গ্রামে দুই-একঘর আপনারজন আছেন, তাঁহাদের নিকট সংবাদ পাঠান হইল। কিন্তু আমাদের পক্ষ হইতে নবজাতককে কেহ দেখিতে গেলেন না। অশুভ আশঙ্কায় দাদা সম্মত হইলেন না। আমার কেমন যেন লজ্জা করিতে লাগিল। এমনই করিয়া তিন মাস গত হইয়া গেল। শ্বশুর-বাড়ির বিরূপ-সমালোচনার দুই-এক টুকরা হাওয়ায় ভাসিয়া আসিতেছিল। তাহার অংশবিশেষ মঙ্গল-ডিহিতে পৌঁছিল। অবশেষে আমাদের মাতৃ-স্থানীয়া দাদার অভীষ্টদেবী সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন।

তাঁহার মধ্যমপুত্রের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। মা বলিলেন, "তোমার শ্বশুরবাড়ির নিকটবর্তী গ্রাম মাস্তুপুরে আমার ভাইঝির ছেলের অন্নপ্রাশন। এখানেও নিমন্ত্রণ আসিয়াছে, তোমাদের বাড়িতেও পত্র গিয়াছে। বনবিহারীকে (মধ্যম পুত্র) নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পাঠাইতেছি, তুমিও যাও। বৌমা কী মনে করিতেছে! বড় দুঃখ পাইবে। তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই বা কী বলে? তিন দিন পরেই অন্নপ্রাশন। তোমরা কালই চলিয়া যাও। নাতিকে দেখিয়া মাস্তুপুরে যাবে। খোকাকে কিছু দিতে হইবে, দুবরাজপুরে কিছু মিষ্টিও কিনিয়া লইও। আর বেশী কিছুর দরকার নাই।"

বনবিহারী কুড়মিঠায় আসিল। তাহাকে লইয়া গরুর গাড়িতে লক্ষ্মীনারায়ণপুরে (শ্বশুরবাড়ি) রওনা হইলাম। সাত আট ক্রোশ রাস্তা, ওই রাত্রেই বাহির হইয়াছিলাম, দুবরাজপুরে সূর্যোদয় হইল। বনবিহারীর চা খাওয়া অভ্যাস, হাত মুখ ধুইয়া চা-পর্ব শেষ করিল। রসগোল্লার সের চারি আনা, আড়াই টাকায় এক হাঁড়ি রসগোল্লা কেনা হইল। দুবরাজপুর হইতে তিন ক্রোশ পথ, প্রহরখানেকের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণপুরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। শ্বশুরবাড়ির লাগাও পূর্বে শ্বশুর-বংশের কুলদেবী 'কালীমায়ের মন্দির, অগ্রহায়ণ মাসে মায়ের বার্ষিক পূজা হয়। গ্রামের প্রবেশমুখেই একটা কোলাহল শুনিতেছিলাম। গাড়োয়ান কুবাণ মন্দিরের পাশে লইয়া গিয়া গাড়ি খুলিল। শ্বশুর-বাড়ি হইতেই ভীষণ কান্নার রোল উঠিতে-ছিল। গাড়ির শব্দ পাইয়া কে একজন বাড়ির বাহিরে আসিয়া আমাকে দেখিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিল। অমনি কান্নার শব্দও চতুর্গুণ হইয়া উঠিল। অনতিপরেই খুড়শ্বশুর-মহাশয় একটি মৃতশিশুকে দুই হাতে পাথালি কোলে তুলিয়া লইয়া আমাদের পাশ দিয়া শ্মশান অভিমুখে রওনা হইয়া গেলেন। আমরা গাড়িতেই বসিয়া ছিলাম। উজ্জ্বল-গৌরবর্ণের শিশুটিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া দেখিলাম। সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানের পথে ছুটিতে গিয়া গাড়ির কিছু দূরে বাহির দুয়ারেই যিনি আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন, তাঁহাকেও দেখিলাম। সুতরাং বুঝিবার কিছুই বাকী থাকিল না। দৃশ্যটি আজিও চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে।

সব দেশেই সমাদৃত
সুনিপুন
শিল্পপ্রতিভায়
মৌলিকতায়
আধুনিকতায় ও নির্ভরতায়
গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট
এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
১৬৭/সি ১৬৭ সি/১, বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১২ গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস
ফোন-৩৪-১৭৬১
ব্রাঞ্চ-বালিগঞ্জ-২০০/২/সি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-২৯ ফোন- ৪৬-৪৪৬৬
শোরুমের পুরাতন ঠিকানা ১২৪, ১২৪/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর-৮০৮

দণ্ডকারণ্য

বিশাল, বিচিত্র-দর্শন ভূখণ্ড। কোথাও কোমল-তৃণমণ্ডিত মসৃণ ক্ষেত্র, কোথাও সমুচ্চ ও মস্তকোপরি হরিদ্বর্ণ চন্দ্রাতপ, কোথাও খর্বকায় দুর্ভেদ্য গুল্মারণ্য কোথাও দিগন্ত-বিস্তৃত উচ্চাবচ ধূসর প্রান্তর। আর্যাধিকারের প্রান্তদেশে অবস্থিত সার্ধচতুঃসহস্রবর্গক্রোশব্যাপী এই জনবর্জিত মহান্ বনপদের নাম দণ্ডকারণ্য।

ফাল্গুনের পূর্ণিমাতিথি আগতপ্রায়। চম্পকসুরভিত দক্ষিণবায়ু অলসমন্থর গতিতে প্রবাহিত। অগ্নিপ্রভ কিংশুকশীর্ষে পুষ্পস্তবকাবৃত কোকিল তারস্বরে স্বীয় সদ্য-আগমনবার্তা অদৃশ্যা প্রেয়সীকে জ্ঞাপন করিতেছে।

সাগর-বায়ুস্পর্শে উচ্ছলিত-যৌবনা গোদাবরী সফেন তরঙ্গভঙ্গে বহিয়া চলিয়াছে। নদীতটে বকুলবৃক্ষতলে কোমল শষ্পশয্যা সদাস্খলিত পুষ্পে ও বৃন্তে আচ্ছন্ন। সেই কোমলশয্যায় আসীন হইয়া এক পুরুষ ও এক নারী বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন।

পুরুষ নবকিশলয়তুল্য, সজলজলদকান্তি। নারী বিদ্যুৎপ্রভা। তৃণশয্যায় পুরুষ অর্ধ-শয়ান, দক্ষিণ কফোণি ভূসংলগ্ন, উত্থিত দক্ষিণ করতলে দক্ষিণ-গণ্ড সংস্থাপিত। নারী তাঁহার বক্ষঃপ্রান্তে উপবিষ্টা, একটি বাহু আলসভরে পুরুষের দেহের উপরে ন্যস্ত, অন্য হস্তের চম্পক-কোরকতুল্য অঙ্গুলিচয় পুরুষের বামকরের অঙ্গুলিজালে সন্নিবিষ্ট হইয়া স্বীয় উৎসঙ্গে রক্ষিত। উভয়ে বাক্যালাপ চলিতেছে। স্বর মৃদু, বাক্য হ্রস্ব ও দীর্ঘ-বিলম্বিত। নারীর ভাষা মাধুর্য-বিহ্বল, পুরুষের কণ্ঠ সরস-গম্ভীর।

পুরুষ বলিতেছিলেন, "রাজ্য যাক, দুঃখ

করি না। আমার কেবল এই দুঃখ, তোমাকেও দুঃখভাগিনী করিলাম।"

নারী কহিলেন, "আবার ঐ কথা! কতবার না বারণ করিয়াছি?"

"সত্য কথা বলিব, তাহার বারণ কিসের?"

"সত্য কথা, না ছাই। তোমার সঙ্গে রহিয়াছি, আমার দুঃখ কোথায়?"

"সঙ্গে থাকিলে ত চতুর্বর্গ লাভ হইল। রাজার নন্দিনী, রাজকুলবধূ, রাজৈশ্বর্য তোমার অবশ্যপ্রাপ্য। রাজপ্রাসাদের সুখ-সম্ভ্রম-ঐশ্বর্যে বঞ্চিত হইয়া এই নির্জনে পর্ণকুটিরে বন্যজীবন যাপন করিতেছ, ইহা আমার দুঃখ নয়?"

"না। রাজপ্রাসাদের রাজকীয় কোলাহল, জনসমুদ্রের অবিরাম তরঙ্গ-কল্লোল আর ঝটিকোচ্ছ্বাস—তাহার মধ্যে তুমি একদিকে থাকিতে, আমি একদিকে পড়িয়া থাকিতাম, দিবাবসানে বারেক সাক্ষাৎ হইত কি হইত না। তাহার উপরে যৌবরাজ্য, তারপর কালক্রমে রাজ্যলাভ। রাজলক্ষ্মীর অঞ্চলাবৃত তুমি, অহর্নিশ রাজকার্যে পরিবৃত হইয়া রাজৈশ্বর্যে রাজাসুখে নিমগ্ন থাকিতে; আমি খণ্ডিতা নায়িকামাত্র হইয়া শ্বাসতপ্ত উপাধানকে অশ্রুসিক্ত করিয়া রজনী যাপন করিতাম। তাহার চেয়ে এই ভাল। এখানে শুধু তুমি আর আমি, আর সঙ্গী আছে অখণ্ড অবসর। রাজাসুখে আমার প্রয়োজন নাই—আমি বনবাসিনী, বনকন্যা।"

"একটু মৃদুস্বরে বল। লক্ষ্মণ শুনিয়া ফেলিবে।"

সীতা চকিতে দৃষ্টি ক্ষেপণ করিয়া কহিলেন, "শুনিতে পাইবে না, অনেক দূরে আছে।"

রাম কহিলেন, "তাহা বটে।"

বস্তুত, লক্ষ্মণকে লইয়া ইঁহাদের উদ্বেগ ছিল না। ইঁহারা জানিতেন, লক্ষ্মণ স্বতই এরূপ স্থলে অবস্থান করেন, যেখান হইতে ইঁহাদের অঙ্গরক্ষা করা যায়; কিন্তু ইঁহাদের বিশ্রম্ভালাপ কর্ণগোচর হইয়া তাঁহাকে প্রত্যবায়গ্রস্ত করিতে পারে না। তথাপি রাম সীতাকে সতর্ক করিলেন, তাহার কারণ

আলো

দীপ্তি লন্ঠন কখনও খারাপ হয় না আর এর ব্যবহারে ২০ ভাগ কেরোসীন খরচ কম হয়। এই লন্ঠন গঠনে মজবুত আর দেখতে সুন্দর।

আরো আলো

ভারতের জীবন স্পন্দিত হয় তার গ্রামে। দুশো বছরেরও বেশী এই গ্রামগুলি অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে ছিল। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আজ এই অন্ধকার ক্রমশঃ বিদূরিত হচ্ছে। এই উৎসবমুখর দিনগুলিতে 'দীপ্তি' শুধু আপনার গৃহই আলোকিত করবে না আপনার মনেও এনে দেবে নূতন আলো।
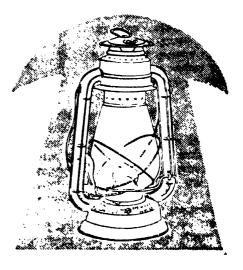
লক্ষ লক্ষ গৃহ আলোকিত করে

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ

হেড্ অফিস্ঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ — ফ্যাক্টরী: আগড়পাড়া এষ্টেট

এ-সকল কথা একান্তই দুইজনের কথা; মৃদুকণ্ঠে বলিতে হয়, মৃদুকর্ণে শুনিতে হয়। সশব্দে উচ্চারিত হইলে মন শিহরিয়া উঠে, বুঝি বিশ্বসুদ্ধ লোকে শুনিয়া ফেলিল।

লক্ষ্মণ ধনুর্বাণহস্তে তাঁহার অভ্যস্ত স্থানে—অন্যূন দ্বিশতহস্ত-ব্যবহিত একটি শিংশপা-তরুতলে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার দৃষ্টি নদীর পরপারে নিবদ্ধ।

মুহূর্তের জন্য উভয়ের দৃষ্টি সেইদিকে ফিরিল। সীতার অধর হাস্যরঞ্জিত হইল, কহিলেন, "নিকটে থাকিলেও শুনিতে পাইত না। উহার এখন উর্মিলাকে মনে পড়িতেছে।"

রামের মুখ ঈষৎ বিষণ্ণ হইল, কহিলেন, "তাহা বটে।"

সীতা কহিলেন, "তোমারই অন্যায়। উর্মিলাকে লইয়া আসা অত্যন্ত উচিত ছিল।"

রাম কহিলেন, "কিন্তু উর্মিলা ত আসিতে চাহে নাই।"

সীতা কহিলেন, "আহা, চাহিবে কি? সে কি নিজের মুখে বলিবে ভাসুর-ঠাকুরের সঙ্গে আমিও বনে যাইব?"

রাম কহিলেন, "কিন্তু ভাসুর হইয়া আমিই-বা কী করিয়া বলিতাম, উর্মিলাও চলুক?"

সীতা কহিলেন, "তুমি কেন। লক্ষ্মণের ত বলা উচিত ছিল, পত্নিরতে, ইচ্ছা কর, আমার অনুগামিনী হও।"

রাম কহিলেন, "লক্ষ্মণ বলিবে? তবেই হইয়াছে। বলা উচিত ছিল তোমার।"

সীতা কহিলেন, "তাহা ত বটেই। বলিতাম আর অযোধ্যাসুদ্ধ পুরস্ত্রীরা ছি-ছি করিয়া উঠিত, দেখ কি গৃহভাঙ্গিনী বধূ, চলিল ত পিতৃকুলের অন্য কন্যাটিকেও টানিয়া লইয়া চলিল। তাহার উত্তর তুমি দিতে?"

রাম অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলেন; কহিলেন, "তাহা বটে।"

সীতা কহিলেন, "ঐ এক কথা শিখিয়া রাখিয়াছ, 'তাহা বটে'। নিজের একটা স্বাধীন মতামত যেন কিছুতেই থাকিতে নাই।"

রাম উত্তর করিলেন না। তাঁহার মন অকস্মাৎ অযোধ্যার পুরপ্রান্তে ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

সীতা তাঁহার বাহু ধরিয়া নাড়া দিলেন। "কী ভাবিতেছ?"

রাম নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "ভাবিতেছি? কিছুই না।"

সীতা কহিলেন, "এমন হঠাৎ গম্ভীর হইয়া যাও, রাগ ধরে। আচ্ছা, আমরা আর কতদিন এই বনে থাকিব?"

রাম অন্যমনে কহিলেন, "কি জানি।"

"আহা, কিছুই জান না। কতদিন হইল আমরা অযোধ্যা ছাড়িয়া আসিয়াছি?"

"অযোধ্যা ছাড়িয়া? তা—প্রায় বার বৎসর হইল।"

ও বাবা, এরই মধ্যে বার বৎসর? . তবে ত আর দুইটি বৎসর মোটে।"

রাম মুখ ফিরাইয়া তাকাইলেন। "মোটে? দুই বৎসর, কম সময় হইল?"

"হইল না? বারটা বৎসর—কোথা দিয়া কাটিয়া গেল টেরই পাইলাম না। দুই বৎসর কাটিতে আর কয়দিন লাগিবে? তার-পরই ফের সেই রাজপুরীতে, হট্টগোল আর রাজনীতি আর অশান্তি। তার চেয়ে এই ভাল আছি। কাজ নাই আর ফিরিয়া। ভরতের রাজ্য ভরতই ভোগ করুক।"

রাম আবার অন্যমনস্ক হইলেন, "ফিরিব না?"

"না। এই বনেই থাকিব।"

"পারিবে? তুমি রাজার কন্যা, রাজকুলে প্রতিপালিতা—"

"সেইজন্যই ত। রাজার ঘরে জন্মিয়াছি, রাজান্তঃপুরে বর্ধিত হইয়াছি। রাজ-প্রাসাদের সুধা-ধবল পাষাণপ্রাচীর দেখিয়াছি, রত্ন-আভরণ পরিয়াছি, উন্মুক্ত বনপ্রান্তর দেখি নাই, পুষ্পকিশলয়ের স্পর্শ কখনও পাই নাই। দাসদাসীর সেবা পাইয়াছি, বন্দীর স্তুতিগীত শুনিয়াছি, তরুপল্লবের বীজনস্পর্শ কোনদিন চিনি নাই, বনবিহঙ্গের স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গীত শুনি নাই। তোমার রাজ্য, তুমি যাইও। আমি ফিরিব না—আমাকে এই বনে রাখিয়া যাইও।"

রাম সকৌতুকে চাহিলেন। কহিলেন, "আমি ফিরিয়া গেলে একা একা তখনও ভাল লাগিবে?"

'লাগিবে' বলিতে গিয়া সীতার চক্ষু অকস্মাৎ জলপূর্ণ হইয়া উঠিল, সরোষে কহিলেন, "জানি না, যাও।"

অশ্রু সংবরণ করিয়া কহিলেন, "এমন করিয়া বলিবে, শুনিতে বুক কাঁপিয়া উঠে।"

রাম কহিলেন, "তুমিই ত বলিলে,

অ্যাটলাস সাইকেল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ
সোনেপত · দিল্লীর নিকটে

রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালের ষ্টাফ, পুলিশ, রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ এবং রাজ্য-সমূহে সাইকেল সরবরাহকারী হিসাবে ভারত সরকারের সহিত মূল্যের চুক্তিতে আবদ্ধ।

তোমাকে ফেলিয়া আমাকে একা চলিয়া যাইতে।"

সীতা কহিলেন, "বলিয়াছি বেশ করিয়াছি। কেহ যাইবে না, তুমিও যাইবে না, আমিও যাইব না, চিরজীবন এই বনেই থাকিব দুইজনে। লক্ষ্মণকে শুধু ফিরিয়া পাঠাইয়া দিব।"

"লক্ষ্মণ যাইবে না?"

"যাইতেই হইবে। ঊর্মিলা?"

"তাহা বটে।"

সীতা কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন, তারপর সহসা কহিলেন, "কতদিন আসিয়াছি, বলিলে? বার বৎসর?"

"হাঁ।"

"বল ত, তখন তোমার আমার বয়স কত ছিল?"

"তুমি বল ত?"

"আমার খুব মনে আছে। একেবারে মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি—

ভর্তা মম মহাতেজাঃ বয়সা সপ্তবিংশকঃ।
ত্রয়োবিংশ হি বর্ষাণি মম জন্মানি গণ্যতে॥

"মানে? আজ, এখন?"

"মোটেই না। তখন। আজ, এখন, তাহার অর্থ কি বলিতে চাও, সেদিন আমার মোটে এগার বৎসর বয়স ছিল? এগার বৎসর বয়সেই বলিয়াছিলাম, পতিবিরহিতা পুরীতে সকলের কৃপাপাত্র হইয়া কিছুতেই থাকিব না?"

"বলিলেই বা। পতিব্রতারা সব পারে!"

"রাগাইও না আমাকে, বলিতেছি। আচ্ছা, তাহা হইলে এখন আমাদের বয়স কত হইল?"

রাম কহিলেন, "সেই কথাই ত বলি। উনচল্লিশ বৎসর বয়স হইল আর কি। মাথায় টাকপড়া আরম্ভ হইল বলিয়া।"

"কক্ষনো নয়। উনচল্লিশ বৎসরে পুরুষ-মানুষ বুড়া হয় না। আমারই বরং ভয়—পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স হইল। কোনদিন দেখিব তুমি আবার সাজিয়াগুজিয়া কাহার স্বয়ংবর-সভায় যাত্রা করিয়াছ।"

রাম কহিলেন, "করিয়া লাভ নাই। ধনুক ভাঙার মত জোর আর কি এখন হাতে আছে?"

তারপর গম্ভীর মুখে কহিলেন, "বহু-পত্নীত্বের ফল ত প্রত্যক্ষ দেখিলাম।"

রামের করপুটে সীতার মুষ্টি দৃঢ়তর হইল। কহিলেন, "ভয় নাই। পঁয়ত্রিশ হউক আর পঁচানব্বই হউক, বৃদ্ধা আমি এখনও হই নাই।"

রাম সস্নেহ-নেত্রে সীতার ভীতি-ব্যাকুল মুখের পানে তাকাইলেন, কহিলেন, "তাহা বটে। কে বলিবে বনবাসের বার বৎসরে তোমার বয়স বার বৎসর বাড়িয়াছে। বরং

Color-fast

LIPSTICK

Inspiration to longer-lasting lip beauty

Max Factor's Color-Fast is the non-smear lipstick with the thrillingly lustrous sheen that goes on so easily, yet won't come off until you take it off.

MAX FACTOR

HOLLYWOOD

Available in Seven Exciting New Shades

At all Leading Cosmetic and General Stores

GIA SCALA Star of Universal Internationals
"FOUR GIRLS IN TOWN"

Aiyars LS 5

SOLE AGENTS IN INDIA: ORIENT COSMETICS PRIVATE LTD: MADRAS, BOMBAY, CALCUTTA.

আমার ত মনে হয় বার বৎ॰॰ আরও কমিয়াই গেল বা।"

সীতা কহিলেন, "তাহার অর্থ? আমাকে এগার বৎসরের খুকীর মত দেখাইতেছে?"

রাম কহিলেন, "অবিকল।"

"বেশ, তাই। কিন্তু বল ত, কেন বয়স বাড়ে নাই?"

"সোজা কথা। খাইতে না পাইয়া। ক্রমাগত ফলাহার অর্ধাহার আর অনাহার, এতে কি বয়স বাড়ে?"

"আজ্ঞে নহে। এত অফুরন্ত মুক্তবায়ু আর মুক্ত আনন্দ খাইতে পাইয়া। সেই-জন্যই ত ইচ্ছা করে না আবার লোকালয়ে ফিরিয়া যাই।"

রাম কহিলেন, "লোকালয়ে তোমার এত বিতৃষ্ণা?"

"হাঁ। লোকালয় নীচতা আর হিংস্রতার লীলাভূমি। বন ভাল। বনে সিংহ থাকে, ব্যাঘ্র থাকে; কৈকেয়ী থাকে না, মন্থরা থাকে না।"

রাম কহিলেন, "কিন্তু এই দণ্ডক যদি জনাকীর্ণ স্থান হইত?"

"তবে এখানেও থাকিতাম না, তোমাকে লইয়া আরও দূরে, আরও নির্জন কোন স্থানে পলাইয়া যাইতাম, যেখানে স্বার্থ আর হিংসার চক্রান্ত-জাল তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না।"

রাম আবার মুখ ফিরাইলেন, সীতার মুখের দিকে—জলভারাক্রান্ত দুইটি আয়ত নয়নের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হিংসা-কুটিল মানবসমাজের চক্রান্ত-কণ্টকিত রাজ-নীতির একটি আঘাতে এই কোমল হৃদয়টিকে বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে; দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের অন্তেও তাহার বেদনা তিলমাত্র কমে নাই।

কিন্তু সত্যই কি সেই মানবসমাজ হইতে ইহাকে চিরদিন দূরে সরাইয়া রাখিতে তিনি পারিবেন? আর মাত্র দুইটি বৎসর, তারপর পিতৃসত্যের অবসান। তাঁহাকে তখন রাজ্যে ফিরিতেই হইবে। ভরতের সহিত সত্যরক্ষা করিতে হইবে। তিনি জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র; রাজ্যের প্রতি, প্রজার প্রতি জন্মলব্ধ কর্তব্যভার স্কন্ধে তুলিয়া লইতে তিনি বাধ্য। অতএব সীতাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। তারপর? মানবসমাজ-বিমুখী এই উত্তীর্ণপ্রায়যৌবনা কিশোরীর মনকে সে-সমাজের অপিনদাহ হইতে সর্বথা রক্ষা করিতে যদি না পারেন?

সীতার মনে এত কথা উঠিতেছে না; ফাল্গুন-সায়াহ্নের মৃদু পবনের মতই সে মন ক্রীড়াচঞ্চল। কহিলেন, "এত কী ভাবিতেছ?"

"কিছুই না।"

"আচ্ছা, এই দণ্ডকারণ্য, এখানে মানুষ নাই কেন? এ কাহার রাজ্য?"

"রাজ্য? কাহারও নহে। আর্য-অধিকার এ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই। আর্য-বিক্রমে বিতাড়িত অনার্য জাতিরা স্বীয় অধিকার-বিচ্যুত হইয়া ক্রমশ দক্ষিণ দেশে সরিয়া গিয়াছে—এই দণ্ডক এখনও তাহাদেরই অধিকারভুক্ত। কিন্তু আর্যজাতির নিকট-সংস্পর্শে আসিতে তাহারা অনিচ্ছুক, অতএব তাহারাও এই অঞ্চলে আর বসবাস করে না। বস্তুত ইহা উভয়পক্ষীয় অধিকারের মধ্যবর্তী একটি অ-পক্ষীয় অধিকারস্বরূপ হইয়া আছে। এইজন্যই ইহা জনহীন।"

"তবে আমরা আসিয়াছি কেন? অনার্যরা ত আপত্তি করিতে পারে?"

"আশ্রয়হীন বনবাসীরূপে আসিয়াছি, আমরা ক্ষণিকের অতিথি মাত্র। তাই আপত্তি করে না। বিজয়ী সেনার বেশে এই দেশ অধিকার করিতে আসিলে অবশ্যই আপত্তি করিত।"

"আচ্ছা, এই দেশ কি চিরদিনই এইরূপ জনহীন থাকিবে? কোনদিন লোকালয়ে পরিণত হইবে না?"

"চিরদিনের কথা কী করিয়া বলিব?"

"তুমি জান। তুমি সর্বশাস্ত্রবিৎ, এইটুকু ভবিষ্যৎ গণিয়া বলিতে পার না?"

"ভবিষ্যৎ গণনা করিতে নাই। যাহা অজ্ঞেয় রাখা বিধাতার অভিপ্রায়, তাহাকে অজ্ঞাত থাকিতে দেওয়াই সুবুদ্ধি।"

"তাহা হউক, সে-কথা নিজের বেলায়। এ ত অন্যের কথা।"

রাম কিছুক্ষণ নিঃস্তব্ধ, ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন, "বেশ, বলিতেছি। এখনও বহুকাল এই দেশ জনবর্জিত থাকবে। তারপর, বহু শতাব্দী বহু সহস্রাব্দ গত হইলে এই দেশ একদা অকস্মাৎ জনবহুল প্রদেশে পরিণত হইবে।"

"অকস্মাৎ কেন? ইহাকে জনবহুল করিবার মত এত লোক অকস্মাৎ আসিবে কোথা হইতে?"

"আসিবে, দূর দেশ হইতে—এই জম্বু-দ্বীপের একেবারে পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্ত হইতে।"

"তাহারা কে? অনার্য?"

"না। আমরা প্রথম আর্যসন্তান এই দেশে ক্ষণিক বসবাস করিয়া গেলাম। তাহারা আসিবে স্থায়ী বাসস্থাপনের আশায়। তাহারাও আর্যসন্তান।"

একটি ছোট পাখী আমাকে বলেছিল...

যে

গ্রীমল্ট সিরাপ

সর্দিকাশি এবং সব রকম শ্বাসনালীর পীড়ায় সেরা ঔষধ। আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন— তিনিও একথা সমর্থন করবেন!

ল্যাবোরেটোরার গ্রীমল্ট
প্যারিস ★ নিউইয়র্ক ★ কলিকাতা

"অর্থাৎ, আমাদেরই দূর-ভবিষ্যৎকালের বংশধর ?"

"বলিতে পার। আশ্চর্য, আমরা যেমন ভাগ্যক্রমে নির্বাসিত স্বগৃহচ্যুত হইয়া এখানে আসিয়াছি, তাহারাও আসিবে তেমনই ভাগ্য-হত হইয়া, বিনা-অপরাধে নিজস্ব পিতৃভূমি হইতে বিতাড়িত বিচ্যুত হইয়া।"

"কেন ? সেখানেও কি কেকয়ী আছে, মন্থরা আছে ?"

"কেকয়ী-মন্থরাকে দোষ দিও না। তাঁহারা ভাগ্যবিধাতার হাতের অক্ষ-পার্টি মাত্র।"

"তারপর ? এখানে আসিয়া কতদিন থাকিবে তাহারা ? চিরদিন ? না আমাদেরই মত, পরিমিত কালমাত্র থাকিয়া আবার সেই পিতৃভূমিতে ফিরিয়া যাইতে পারিবে ?"

"ভবিষ্যৎ অন্ধকার। জ্যোতিষশাস্ত্র তাহার মধ্যে আলোকের আভাসমাত্র দেখিতে পায়, তাহার পরে সমস্তই অনুমান। আমরা সত্যই আবার অযোধ্যায় ফিরিব কি না, বা ফিরিলে কবে কিভাবে ফিরিব, ফিরিয়াই বা কেমন থাকিব, তাহা কি স্থির জানি ?"

সীতার মুখ বিমর্ষ হইল। কহিলেন, "ভাল লাগিতেছে না। চল কুটিরে যাই।"

"চল।"

রাম ও সীতা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই, দূরে ক্ষীণ বংশীবং ধ্বনি শ্রুত হইল, লক্ষ্মণ-নিক্ষিপ্ত একটি শর উড়িয়া আসিয়া রামের পদপ্রান্তে ভূমিতে প্রোথিত হইল।

রাম শরটি তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, তাহার কংকপত্রে পত্ররস দ্বারা একটি চক্ষু অঙ্কিত হইয়াছে। কহিলেন, "আমার দর্শনপ্রার্থী কেহ আসিতেছে।"

সীতা কহিলেন, "এই বেলাশেষে কে আসিল ?"

রাম কহিলেন, "দেখা যাক।"

দূরবর্তী লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া রাম সম্মতিসূচক শিরঃসঞ্চালন করিলেন।

মুহূর্তকাল পরে মধ্যদেশজাত গুল্ম-শ্রেণীর অন্তরাল হইতে একটি লাবণ্যময়ী তরুণী নিষ্ক্রান্তা হইল, সাবলীল লঘু পদক্ষেপে তাঁহাদের সমীপবর্তিনী হইল।

তরুণী শ্যামবর্ণা কিন্তু অপূর্ব অঙ্গ-সৌষ্ঠবের অধিকারিণী। বস্ত্রে আভরণে ঐশ্বর্যের পরিচয় আছে, কিন্তু প্রগল্‌ভতা নাই। গতি ও ভঙ্গী স্বচ্ছন্দ, জড়তাবর্জিত, সুমার্জিত রুচির দ্যোতক। আসন্ন গোধূলির রক্তিম ছায়া সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া তাহাকে অপরূপ শ্রীতে মণ্ডিত করিয়াছে।

রাম কহিলেন, "তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছ ? কে তুমি ?"

তরুণী কহিল, "আমার পরিচয় কী দিব। আপাতত ধরিয়া লউন আমি এই বনভূমির অধিস্বামিনী।

"অধিষ্ঠাত্রী, বনদেবী ?"

তরুণী হাসিল, নৃত্য-চপলা নির্ঝরিণীর চরণে-চরণে উপল-নূপুর বাজিয়া উঠিল। কহিল, "দেবী নহি, বরং বলিতে পারেন রাক্ষসী। আমি লঙ্কেশ্বর রাজশ্রী রাবণের অনুজা, নাম শূর্পণখা। এই বনভূমি আমার অধিকার, প্রমোদ-বিহার-ভূমি। আপনাকে এই দেশে সমাগত দেখিয়া স্বাগত-সম্বর্ধনা জানাইতেছি।"

রাম কহিলেন, "রাজভগিনী, তুমি কি স্বভাবতই একক-চারিণী ?"

"আমি স্বৈর-চারিণী। আমার রক্ষক-বাহিনী আছে, তাহারা আমার ইচ্ছাক্রমে আমার অনুবর্তী হয়। আপাতত আমি একাকিনী।"

রাম কহিলেন, "রাজভগিনী, আমার অভিবাদন গ্রহণ কর। আমার নিকটে কী প্রয়োজন, জ্ঞাপন করিলে অনুগৃহীত হইব।"

"কিংবা অনুগৃহীত করিবেন।"

"সে কিরূপ ?"

"বলিতেছি। ইনি কে ?"

"আমার পরিচয় জান কি ?"

"জানি। না জানিলে কি বলিতে চান, অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সম্ভাষণার্থিনী হইয়া এই সায়ংকালে একাকিনী আমি আসিয়াছি ?"

রাম কহিলেন, "কিন্তু তাহা হইলে ত ইঁহারও পরিচয় সহজেই অনুমান করা উচিত। ইনি সীতা, আমার ধর্মপত্নী।

"সহজেই অনুমান, কেন ?" শূর্পণখা আর্যভাষা ত্যাগ করিয়া রাক্ষসী-ভাষায় কহিল, "পূর্ণিমাস্নাত বসন্ত-সন্ধ্যায় রাজপুত্রের সহচারিণী যে কেবল তাঁহার ধর্মপত্নীই হইবেন, অন্য কেহ হইতে পারেন না, এমন কোন কথা আছে ?"

রামের ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "সীতা, তুমি কুটিরে যাও।"

"কেন ?"

"যাও।"

সীতার অধরোষ্ঠ কম্পিত হইল, তারপর দৃঢ় ও সূক্ষ্ম হইয়া চাপিয়া বসিল। কহিলেন "না।"

রাম তাঁহার সেই বিদ্রোহ-ভঙ্গী চাহিয়া দেখিলেন, তারপর আবার মুখ ফিরাইলেন। কহিলেন, "আমার নিকটে তোমার কী প্রয়োজন ?"

শূর্পণখা রাক্ষসী ভাষায় কহিল, "সকল প্রয়োজনই কি উচ্চারণ করিয়া বলিতে হয় ? মনে বুঝিয়া লইলে পাপ হয় ?"

(সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক)

—হেড অফিস—

২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

ফোন : ২২—৫৯৮৮ ও ৫৯৮৯

—ব্রাঞ্চ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট ও খুলনা

উপযুক্ত জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়।

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শ্রীযুত এন. ব্যানার্জি, এম-এ, জেনারেল ম্যানেজার

রাম কহিলেন, "তুমি রাক্ষসীভাষায় কথা কহিতেছ কেন? এখনই ত আর্যভাষায় কথা কহিলে।"

"আর্যভাষা আমি ভাল জানি না। দু-একটা বাক্য বলিতে পারি, সে মুখস্থ আবৃত্তি মাত্র।"

"তোমার বাচনভঙ্গিতে ত তাহা মনে হয় না।"

"রাজকুল-কন্যা, বাচনভঙ্গির সৌষ্ঠবটুকু শিখিতে হইয়াছে। কিন্তু তোমার কথা-গুলিও ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। অপরিচিতা নারীর উপরে অনুগ্রহ করিয়া আমার এই ভাষায় কথাগুলি বলিবে কি?"

"অনার্য-ভাষায় আমি কথা বলি না।"

"অনার্য-ভাষার অপরাধ?"

"অনার্য-ভাষা অমার্জিত। আপনি-তুমিতে প্রভেদ করে না।"

"কী বলিলে বুঝিতে পারিলাম না। আর্যভাষা আমি যেটুকু জানি তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে। দয়া করিয়া আমার এই ভাষায় বল।"

"যদি বলি ও ভাষা আমি জানি না?"

"তাহা সত্য কথা হইবে না।"

"বেশ, তোমার আনন্দেই বলিতেছি।" রাম রাক্ষসী-ভাষা ধরিলেন, "অনার্য-ভাষায় কথা বলিতে আমার ভাল লাগে না।"

"কেন?"

"অমার্জিত ভাষা। ইহাতে আপনি-তুমির প্রভেদ নাই।"

"আপনি-তুমির প্রভেদ কি ভাষার প্রভেদ? মানুষের প্রভেদ। অন্তরের প্রভেদ।"

শূর্পণখার কণ্ঠে মাদকতা।

সীতা রামের হস্ত আকর্ষণ করিলেন, কহিলেন, "ও কীরূপে আমার কথা বলিতেছে তুমি?"

রাম সীতার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। শূর্পণখাকে কহিলেন, "এ-কথার অর্থ?"

"অর্থ, আমি প্রথম সম্ভাষণে 'আপনি' সম্বোধন করিয়াছিলাম। তুমিই প্রথমে 'তুমি' বলিলে। কেন?"

"তুমি বয়ঃকনিষ্ঠা বলিয়া।"

"শুধুই তাই? আর কিছুই নয়?"

সীতা আবার রামের হাতে চাপ দিলেন, মৃদুস্বরে কহিলেন, "কী বলিতেছে?"

রাম এবারেও উত্তর দিলেন না। শূর্পণখাকে কহিলেন, "তোমার কি আর কোন প্রয়োজন আছে? আমি কুটিরে যাইব।"

"এত ত্বরা কেন?"

"সায়ংসন্ধ্যার সময় হইয়াছে।"

"সন্ধ্যামুহূর্তের এই চন্দ্রকিরণকে, বকুল-সুরভিত পবন-বীজনকে উপেক্ষা করিয়া বদ্ধ গৃহকোণে বসিয়া মন্ত্রজপ করিবে? এই দোষেই আর্যজাতি রসাতলে গেল।"

সমস্তই বলিবার ছিল। শোনে কে?

রামের ভ্রূ আবার কুঞ্চিত হইল। কহিলেন, "আর কিছু বলিবার আছে?"

"সমস্তই বলিবার ছিল। শোনে কে?"

"না শুনিলে যখন ছাড়িবেই না, বলিয়া ফেল।"

"বলি। আমি এই বনে থাকি। তোমরা—তুমি—প্রত্যহ এই বনে এই নদীতীরে ভ্রমণ কর, আমি দূর হইতে দেখি। বহুদিন দেখিতেছি। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, বসন্ত-সন্ধ্যার এই ভ্রমণ কি প্রত্যহই শুধু নিজের একমাত্র ধর্মপত্নীর সহিত করিতে হইবে? ভাল লাগে?"

রাম স্থির দৃষ্টিতে রাক্ষসীর মুখের দিকে চাহিলেন। কহিলেন, "তোমার এই প্রগল্ভ বাক্যের উদ্দেশ্য?"

"কিছু বোঝ নাই? হইতেও পারে, তুমি আর্যবংশধর।"

রামের মুখে ক্ষীণ হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। কহিলেন, "অত জোরে বলিও না। আমি যাহাই হই না, ইনি খাস মিথিলাধিপতি। আভীরিণী নহেন, তবুও মৈথিলী।"

শূর্পণখারও অধরপ্রান্ত কঠিন-হাস্যরঞ্জিত হইল, কহিল, "আমিও রক্ষঃ-কন্যা।"

রাম কহিলেন, "অর্থাৎ তোমরা দুইজনে এইখানেই একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধাইতে চাও?"

বলিতে বলিতে নিজের মুষ্টিধৃত সীতার করাঙ্গুলিতে ঈষৎ চাপ দিলেন। সীতার অঙ্গুলিতে কোন প্রতি-স্পন্দন জাগিল না। তিনি তখন স্পন্দ-রহিতা, নির্বাক হইয়া পর্যায়ক্রমে উভয়ের মুখের দিকে চাহিতেছেন, সহজাত-সংস্কারবলেই উভয়ের বাক্যালাপের মর্ম অনুমান করিয়া লইতেছেন।

শূর্পণখা কহিল, "দ্বন্দ্বযুদ্ধ কেন করিব। উঁহাকে কুটিরে পাঠাইয়া দিলেই ত হয়।"

রাম কহিলেন, "যাইবে না। দেখিলে না, প্রথমেই ত বলিলাম যাইতে।"

"ভাল করিয়া বল। আর্যনারীরা পতির একান্ত আজ্ঞাকারিণী হন, শুনিয়াছি।"

"এরূপ ক্ষেত্রে হন না। বিশেষত মিথিলা-নন্দিনীরা। তুমিই বরং যাও।"

"ধিক। আমি নারী, উপযাচিকা হইয়াও—তুমি পুরুষ? ধিক্ ধিক্! লজ্জা করে না?"

"খুব করিতেছে। এখন যাও।"

"আমি যাইব না।"

"যাও।"

"না।"

সীতা সহসা সজীব হইয়া উঠিলেন; রামের অত্যন্ত নিকটে আসিয়া, মুখ তুলিয়া কানে কানে কহিলেন, "লক্ষ্মণের কাছে পাঠাইয়া দাও।"

রাম মৃদুস্বরে কহিলেন, "ছিঃ।"

সীতা কহিলেন, "ছিঃ নয়। দাও না, বলিতেছি।"

রাম একবার সীতার দিকে চাহিলেন। তারপর শূর্পণখাকে কহিলেন, "দেখ, সত্যই বলিতেছি, ইঁহাকে অতিক্রম করা আমার সাধ্য নয়। ধর্মসাক্ষী ইঁহাকে বিবাহ করিয়াছি, ইঁহার প্রতি আমি সত্যে বদ্ধ। আমি সত্যসন্ধ, জান ত?"

পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

শূর্পণখা কহিল, "সতাই সব? আর নারীর হৃদয় কিছু নয়?"

রাম কহিলেন "সে-হৃদয় ত আমার প্রতিই সত্যবদ্ধ নহে। তুমি বরং এক কাজ কর। আমার ভ্রাতাকে প্রার্থনা কর।"

"দূর!"

"দূর নহে। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ, উহার চেহারা আমার চেয়ে অনেক ভাল। তুমি এতদিন আমার প্রতিই বদ্ধদৃষ্টি হইয়াছিলে, তাই উহাকে ভাল করিয়া দেখ নাই। আর, এইমাত্র আমাদের হিসাব হইতেছিল, আমার বয়স ঊনচল্লিশ ছাড়াইয়া গিয়াছে, মাথায় টাক পড়া আরম্ভ হইয়াছে। লক্ষ্মণের কেশ এখনও ভ্রমরকৃষ্ণ— একেবারে কুঞ্চিত কেশদাম।"

শূর্পণখা লক্ষ্মণকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। লক্ষ্মণের দৃষ্টি তখনও একইভাবে গোদাবরীর অপর তীরে নিবদ্ধ হইয়া আছে। বহুক্ষণ পরে কহিল, "উঁহার পত্নী নাই?"

রাম কহিলেন, "আছে। তিনিও বিদেহ-নন্দিনী।"

"তবে?"

"তিনি সঙ্গে আসেন নাই। অযোধ্যাতেই আছেন। লক্ষ্মণ আপাততঃ ঘোর বিরহী।"

"আচ্ছা।"

বলিয়া শূর্পণখা মন্থর-গতিতে লক্ষ্মণের দিকে যাত্রা করিল।

রাম সীতাকে নিকটে আকর্ষণ করিলেন। সীতা রামের স্কন্ধলগ্না হইলেন, অত্যন্ত দূরমুষ্টিতে তাঁহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "ওর সঙ্গে অত কথা বলিলে কেন?"

"কী বলিলাম, তুমি বুঝিয়াছ?"

"বুঝিয়াছি। তুমি বল ত, লক্ষ্মণের কাছে পাঠাইতে কেন বলিলাম?"

"কি জানি।"

"তবে কেন পাঠাইলে?"

"তুমিই ত বলিলে।"

"আমি বলিলাম বলিয়াই তুমি সব করিবে?"

"করিবই ত। আমি-কি তোমার মত? তোমাকে কুটিরে যাইতে বলিলাম, তুমি গেলে না।"

"হাঁ, যাই আর কি, তোমাকে ঐ রাক্ষসীর হাতে সমর্পণ করিয়া।"

"রাক্ষসী কী করিত আমাকে? খাইয়া ফেলিত?"

"বিচিত্র কি। দুঃখটা ত ভুলিতে পারিতেছ না। স্বয়ংবরের লোভ তখন-কি মিথ্যা বলিতেছিলাম?"

"স্বয়ংবর কোথায়, এ ত স্বয়ংবধূ।"

"তাহাও সাময়িক-মাত্র। সেইজন্যই ত লক্ষ্মণের কাছে পাঠাইয়া দিলাম।"

"লক্ষ্মণ যদি প্রলুব্ধ হয়?"

"ঐ ত হইতেছে।"

রাম চাহিয়া দেখিলেন। লক্ষ্মণ তখনও দূরবদ্ধ-দৃষ্টি, শূর্পণখা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মিনতির স্বরে কী বলিতেছে।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, তরুশাখায় বিহগকাকলী নিস্তব্ধ হইয়াছে, বায়ু মৃদুতর, চন্দ্রকিরণ প্রখরতর। সেই অখণ্ডিত নিস্তব্ধতার মধ্যে শূর্পণখার স্পষ্ট তীক্ষ্ম স্বর তাহাদের কাণে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল:

"চাহিয়া দেখ, একবার চাহিয়া দেখ আমার দিকে। দেখিলে তোমার চক্ষু পীড়িত হইবে না। অত কুৎসিত আমি নই।"

কম্পিত, ব্যথিত কণ্ঠ, প্রতিটি অক্ষরে অশ্রু যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। রামের দীর্ঘশ্বাস পড়িল, কহিলেন, "হতভাগিনী! মায়া হইতেছে।"

সীতা কহিলেন, "রাক্ষসী মায়া।"

লক্ষ্মণের মৃদু, গুরুগম্ভীর স্বর ভাসিয়া আসিল, "বৃথা অনুনয়, কল্যাণি। আমি নারীর মুখ দেখি না।"

"মিথ্যাবাদী। ঊর্মিলার মুখ দেখ নাই তুমি? সে কি পুরুষ?"

"ঊর্মিলা আমার ধর্মপত্নী। পরস্ত্রী নয়।"

সবার রুচিতে উত্তম
মেসিনে প্রস্তুত
সন্তোষ
বিস্কুট, রুটী ও
সল্টক্রেকার
সন্তোষ বিস্কুট কোঃ
প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা

কেন কলিকাতার বহু পরিবার পছন্দ করেন

"লিণ্ডসে"

(১) লিণ্ডসের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কাপড় ধোলাই'এর খরিদ্দার রং করান সম্পর্কেও আগ্রহশীল।
(২) এই কোম্পানীর শতকরা ৭৫ ভাগের উপর নূতন খরিদ্দার সন্তুষ্ট গ্রাহকগণের সুপারিশক্রমেই এসেছেন।
(৩) গ্রাহকগণের সেবায় আমরা সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত। কলিকাতার 'লিণ্ডসে'তে গ্রাহকই সম্পূর্ণ প্রভু। এই প্রভু কি পছন্দ করেন?

(১) উৎকৃষ্ট কাজ
(২) দামের বিনিময়ে সর্বোৎকৃষ্ট কাজ
(৩) কার্যদক্ষতা
(৪) সেলস কর্মিগণের হাবভাব এবং মনোভাব
(৫) দ্রব্যাদি প্যাক করার ব্যবস্থা
(৬) স্টোরের চেহারা
(৭) লিণ্ডসে'র কারিগরির উপর আস্থা
(৮) খুব কম দাবী (ক্লেম)
(৯) উদারভাবে তৎপরতার সহিত দাবী মিটান
(১০) চাহিদা বা বিশেষ প্রয়োজন সম্পর্কে অনুমান
(১১) গ্রাহক হওয়ার জন্য গর্ব
(১২) সমস্ত গ্রীষ্মকাল ধরে মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ রাখার সুযোগ

লিণ্ডসে ডাইং এণ্ড ক্লিনিং
কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
(বিশ্বস্ত এবং দায়িত্বশীল)
২১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩
ফোন : ২৩-৩৫০৯

ফোন : ২২-৩২৭৯ গ্রাম : কৃষিসখা

দি
ব্যাঙ্ক অফ্ বাঁকুড়া লিমিটেড

সেণ্ট্রাল অফিস : ৩৬নং স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা—১

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়
ফিঃ ডিপোজিটে—শতকরা ৪, ও সেভিংসে—২৷৷০ টাকা সুদ দেওয়া হয়

জেঃ ম্যানেজার : শ্রীরবীন্দ্রনাথ কোলে

অন্যান্য অফিস : (১) কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা (ফোন : ৩৪-৩৯৪৯) (২) বাঁকুড়া

"আমিও পরস্ত্রী নহি, কাহারোই স্ত্রী নহি। আমি স্বৈরচারিণী।"

"আমি স্বৈরচারী নহি।"

"শোন শোন আমার কথা। অমন নিষ্ঠুর হইও না।"

"নিষ্ঠুরতার কথা এ নয়। আমি ব্রতবন্ধ ব্রহ্মচারী।"

"তবে তোমার দাদা আমাকে তোমার কাছে পাঠাইলেন কেন? কেন বলিলেন তুমি বিরহী?"

"দাদা তোমাকে বোকা বানাইয়াছেন। তোমাকে নাচাইয়া মজা দেখিয়াছেন, বৌদিকে মজা দেখাইয়াছেন।"

"কেন? আমাকে উপেক্ষা তিনি করিতে পারেন, উপহাস কেন করিবেন?"

"বৌদির ভয়ে। বৌদিকে দাদা অত্যন্ত ভালবাসেন, আবার তেমনই ভীষণ ভয় করেন। তুমি বৌদির সম্মুখেই ঐ সব কথা বলিয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলে। তাই তিনি বৌদিকে প্রসন্ন করিবার জন্য এই কর্মটি করিয়াছেন।"

"এটা তাঁহার ধর্ম হইল?"

"আত্মরক্ষায় অধর্ম নাই।"

সীতা ব্রীড়া-জড়িত কণ্ঠে কহিলেন, "কী আপদ, এ-সকল কথা এত চেঁচাইয়া বলিতেছ কেন?"

রাম কহিলেন, "তোমাকে শুনাইতেছে। শোধ তুলিয়া লইতেছে।"

শূর্পণখা একমুহূর্ত মূঢ়দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তারপর দুই হাতের অঞ্জলিতে মুখ ঢাকিল। তারপর ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে মাটিতে বসিয়া পড়িল। বসিয়াও কাঁদিতেই থাকিল।

লক্ষ্মণ একইভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাম কহিলেন, "যাঃ। আমার ভারি বিশ্রী লাগিতেছে।"

সীতা কহিলেন, "আহা, মরিয়া যাই।"

রাম কহিলেন, "তুমি নিষ্ঠুর। অমন করিয়া কাঁদিতেছে, তোমার মায়া লাগে না?"

"না। ও কী করিতে আসিয়াছিল, মনে আছে? আমার কাছ হইতে তোমাকে চুরি করিয়া লইতে। ঐ শূর্পণখা না হইয়া যদি ওর ভাই রাবণ আমাকে চুরি করিতে আসিত, তুমি কী করিতে? আহারে বাছারে, বলিয়া আমাকে তাহার রথে তুলিয়া দিতে?"

রাম দাঁতে দাঁত ঘষিয়া কহিলেন "তাহাকে সবংশে নির্বংশ করিতাম।"

সীতা কহিলেন, "আমি উহাকে একটু-খানি উপহাস মাত্র করিয়াছি। নিষ্ঠুর হইলাম আমি? আহা!"

রাম কহিলেন, "যাক। হইল ত, এখন চল, কুটিরে যাই।"

সীতা কহিলেন, "হয় নাই, দাঁড়াও। আচ্ছা, তুমি ত বলিলে, বহুদূর ভবিষ্যতে একদিন আমাদেরই অজ্ঞাত বংশধররা এই দণ্ডকারণ্যে বাস করিতে আসিবে।"

"হাঁ।"

"সেদিন ত এই শূর্পণখার বংশধর-বংশধরীরাও থাকিবে এখানে?"

"থাকিবে কি?"

"বল না। আজ যেমন এই শূর্পণখা তোমাকে লুব্ধ করিতে আসিল, সেদিনও ত ইহার সন্তানরা আমাদের সেই সন্তানদিগকে এমনই করিয়া প্রলুব্ধ করিতে আসিবে?"

রাম অন্যমনে কহিলেন, "সম্ভব।"

"শুধু 'সম্ভব' কেন। বল, নিশ্চয়ই। কিন্তু, তুমি স্থিতপ্রজ্ঞ, ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে। তাহারা যদি না পারে? যদি প্রলুব্ধ হয়?"

রাম নীরব।

সীতা আবার কহিলেন, "বল না। তুমি না হয় আগে থাকিতেই জানিতে এটা রাক্ষসের দেশ, রাক্ষসীর মায়া এখানে আছে। তাহারা কি অতটা জানিবে, অতটা সতর্ক থাকিবে?"

রাম অন্যমনস্ক। ধীরে ধীরে, আত্মগত স্বরে কহিলেন, "তাহা বটে। তাহারা আসিবে বিপর্যস্ত হইয়া, পলায়নের মুখে ভাসিয়া। এখানে ফল মেলে কিনা, জল মেলে কিনা, শস্য হয় কিনা, তাহার সন্ধান লইতে হয়ত চেষ্টা করিবে। শূর্পণখা আছে কিনা, স্বর্ণমৃগ আছে কিনা তাহা ভাবিতে সময় পাইবে কি?"

সীতা কহিলেন, "স্বর্ণমৃগ কী?"

রাম সচকিত হইয়া কহিলেন, "ও কিছু নয়।"

"বল না।"

"এখন নয়, পরে জানিবে। চল কুটিরে যাই।"

"দাঁড়াও।"

"আর দাঁড়াইয়া কী হইবে?"

"দেখ না। আমার আরও কাজ আছে।।"

সীতা একমুহূর্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। নিশ্চল, শ্বাস হইতেছে না, নিষ্পলক চক্ষুর একাগ্র দৃষ্টি লক্ষ্মণের উপরে নিবদ্ধ।

টাকা চালু রাখা আজকের দিনে দেশের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক প্রয়োজন।

হেড অফিস: ৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

লক্ষ্মণ সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলেন, ভূতলে উপবিষ্টা রাক্ষসীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "শোন।"

রাক্ষসী ক্রন্দন সংযত করিল, মুখ তুলিল না।

লক্ষ্মণ কহিলেন, "আমার কাছে কাঁদিয়া কোন ফল নাই। আমি ব্রতবদ্ধ। ব্রতভঙ্গ করিতে যদি যাই, ব্রতের বলে সেই মুহূর্তেই আমার প্রাণ বহির্গত হইবে। আমার ব্রতভঙ্গ হইবে, কিন্তু তুমি আমাকে পাইবে না। তুমি যাও, আমার দাদাকেই পাইবার চেষ্টা কর।"

শূর্পণখা নতমুখেই কহিল, "কিন্তু তুমিই ত বলিলে তোমার দাদা তোমার বৌদিকে কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারেন না।"

"আরে, বৌদি থাকিলে তবে ত অতিক্রম। তুমি রক্ষঃকন্যা, স্ব-ধর্ম বিস্মৃত হইতেছ কেন। নিজমূর্তি ধারণ কর, বৌদিকে খাইয়া ফেল। তাহা হইলেই দাদা নিষ্কণ্টক হইবেন, তুমিও অক্লেশে আমার নূতন বৌদি হইয়া বসিবে।"

রাক্ষসী উঠিয়া দাঁড়াইল। চক্ষু মুছিল। নাক মুছিল। তাহার নয়ন উজ্জ্বল হইল, মুখ উদ্ভাসিত হইল। গাঢ়স্বরে কহিল, "ঠিক বলিয়াছ। তুমি আমার যথার্থ সুহৃৎ। তোমাকে ধন্যবাদ।"

বলিয়া অকস্মাৎ বিভীষণা মূর্তি ধারণ করিয়া সীতার দিকে ছুটিয়া আসিল।

সীতা আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "লক্ষ্মণ!"

লক্ষ্মণের ধনু চক্ষের পলকে উদ্যত হইল, শাণিত শর-ফলকে চন্দ্রকিরণ প্রতিবিম্বিত হইল।

রাম ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "লক্ষ্মণ, নারী!"

রাক্ষসী সীতার নিকটবর্তিনী হইল। সীতা সভয়ে রামের পশ্চাতে সরিয়া গেলেন।

লক্ষ্মণের ধনুতে টংটংটং করিয়া প্রায় একত্রেই তিনটি শব্দ বাজিয়া উঠিল। শূর্পণখা একটি দীর্ঘায়িত 'উঃ' ধ্বনি করিয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ মাটিতে লুটাইল, তারপর উঠিয়া বসিল। দুই চক্ষে মৃত দৃষ্টি, দুই কর্ণ ও নাসিকা ছিন্ন, রক্তের ধারা ফিনকি দিয়া বাহির হইতেছে। উঠিয়া রামকে সম্মুখে দেখিবামাত্র সে আবার মুখ নত করিল। নিজের হতশ্রী মূর্তি রামকে আর দেখিতে দিল না, বিকীর্ণ কেশজালে ও দুই করপুটে মুখ যথাসাধ্য আবৃত করিয়া, অন্ধ-পদক্ষেপে দৌড়াইয়া বনমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

লক্ষ্মণ নিকটে আসিলেন, নতমস্তকে দাঁড়াইলেন।

রাম কহিলেন, "লক্ষ্মণ, এ কী করিলে?"

লক্ষ্মণ কহিলেন, "দেবীর আদেশ।"

রাম সীতার দিকে চাহিলেন।

সীতা কহিলেন, "হ্যাঁ, আমিই লক্ষ্মণকে আদেশ পাঠাইয়াছিলাম।"

"কী আদেশ?"

"উহার নাক কাটিয়া দিতে। আর্য-সন্তানের হাতে প্রগল্ভা রাক্ষসী বিকৃতাঙ্গী হইয়া গেল,—এই কাহিনী প্রচারিত হইবে, লোকস্মৃতিতে অমর হইয়া থাকিবে। উত্তর-কালের আমাদের সেই বংশধরদিগকে এই রাক্ষসীর বংশধরীরা আর প্রলুব্ধ করিতে আসিবে না। চল, কুটিরে যাই।"

বাঙালীর মনে প্রায় একটা অভিযোগ ঘনিয়ে উঠতে দেখা যায়ঃ সর্বভারতীয় রাজনীতিতে সে কোণঠাসা, সেখানে তার আর কোনও স্থান নেই। আগে বাঙালী, অন্তত উত্তর ভারতের সর্বত্র দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করে এসেছে। শুধু সরকারের বড় চাকুরিয়া হিসেবে নয়, বড় ডাক্তার উকিল হিসেবেও সর্বত্র তার অগ্রাধিকার ছিল। তার উপর সবচেয়ে বড় কথা, অখিল-ভারতীয় রাজনীতিতে তার স্থান ছিল সর্বপ্রথম। সারা ভারতের চেতনা সঞ্চার ও রাজনৈতিক সংগঠনের কাজে বাঙালীই প্রথম স্থান অধিকার করে ছিল, তার নেতৃত্ব ছিল অবিসম্বাদিত। আজ বাঙালী সেই আসন হতে চ্যুত হয়েছে। তার এমন কোনও নেতা নেই যার কম্বুকণ্ঠ সারা ভারতের আকাশ-ময় গমগম করে বাজে, যার নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠতে পারে। বেশী দূরের কথা কি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তেমন-ভাবে আসন দেবার উপযুক্ত বাঙালীই আজ বেশী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ভারতীয় জনগণের নেতৃত্ব ত দূরের কথা। অন্যান্য প্রদেশেও এখন শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট হয়েছে, সেখানে আর উকিল ডাক্তারের অভাব নেই। সুতরাং সেখানেও বাঙালীর স্থান স্বাভাবিক-ভাবেই সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। তার উপর শুধু বাইরের মার নয়, ঘরেও বাঙালী মার খেয়েছে প্রচণ্ড। বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ফল সকলেই উপলব্ধি করছেন। বাঙালী তার সভ্যতা সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে অখণ্ড সত্তায় বর্তমান ও বর্ধমান ছিল, আজ তার মূলে আঘাত লেগেছে। একদিকে ছিন্নমূল পথাশ্রয়ী বাস্তুহারার দল, অন্যদিকে অনভাব-প্রপীড়িত সমস্যাজর্জরিত পশ্চিমবঙ্গ। এতে সংস্কৃতি বাঁচবে কী করে? জাতের মধ্যে ক্ষমতাবান শক্তিশালী নেতার উদ্ভবই বা হবে কেমন করে? প্রচণ্ড আঘাতে যে-জাত মুহ্যমান, কোনরকমে জীবনরক্ষা করতেই ব্যতিব্যস্ত, যারা ভিক্ষা-পাত্র হাতে ভারতের প্রান্তবাসী হয়ে আছে, তারা সর্বভারতীয় নেতৃত্ব করবে কেমন করে?

বস্তুত গত শতাব্দীর তুলনায় এ-শতাব্দী বাঙালীর হটে আসার যুগ—সে-কথা প্রমাণ করবার জন্য কোনও বিস্তারিত তর্কের আবশ্যক করে না। বাঙালীর মনে একটা অভিমান আছে—সারা ভারত বুঝি তার উপর অকরুণ, সকলেই বুঝি তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে, তাই তার ভাষা অন্যত্র নির্যাতিত হচ্ছে, রাজনীতিতে সে উপযুক্ত মর্যাদা পাচ্ছে না, ব্যবসার ক্ষেত্রে তার স্থান নেই, অন্য প্রদেশ থেকে সে বিতাড়িত হচ্ছে। এরকম দুঃসময়ে এই ধরনের অভিমান হওয়া বিচিত্র নয়, দু-একক্ষেত্রে এরকম অভিমানের হয়ত কিছুটা সংগত কারণও থাকতে পারে। কিন্তু আজ এই কঠিন সংকটের মধ্যে শুধু অভিমান করে সারা ভারতের উপর দোষারোপ করে বসে থাকা কোনও কাজের কথা নয়। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায়, সারা ভারতই আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তই করছে, তখনই ভাবতে হবে, শুধু বিহার নয়, উত্তর প্রদেশ নয় বা শুধু উত্তর ভারত নয়, দক্ষিণ ভারতও আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে কেন? সারা ভারত আর কারও বিরুদ্ধেই বা চক্রান্ত করছে না কেন? সকলেই বেছে বেছে কেবল বাঙালীরই বিরুদ্ধে লাগবে, তারই বা হেতু কী? শুধু কি এটা নিছক চক্রান্ত? এসব কথা গভীরভাবে না ভেবে বাঙালী যদি অভিমানভরে অপরকে দোষ দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে এবং সকল দায়িত্ব সেইখানেই শেষ করে দেয়, তাহলে বাঙালীর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলে মনে হয় না। সুতরাং এই প্রশ্ন খুব গভীর-ভাবে বিবেচনার সময় এসেছে।

এই প্রসঙ্গ খুব বড় প্রসঙ্গ, স্বল্প পরি-সরের আলোচনায় এ-প্রসঙ্গ শেষ হবার নয়। কিন্তু একটা মৌলিক কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া গেল, সবাই বাংলার বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাটাও মনে রাখতে হবে যে, ইতিহাসের গভীর কারণ না থাকলে এরকম হতে পারে না, হলেও সফল হয় না। একটা জাত ওঠে একটা জাত পড়ে—এ কি শুধু চক্রান্তের ফল? ইংরেজের বিরুদ্ধে নেপোলিয়নের সময় হতে হিটলারের সময় পর্যন্ত কত চক্রান্তই ত হয়েছে, কিন্তু সেই সব অত্যন্ত শক্তিশালী চক্রান্তও সফল হয়নি কেন? টয়েনবী তাঁর সুবিখ্যাত আলোচনায় সভ্যতার উত্থানপতনের যেসব মৌলিক কারণ নির্দেশ করেছেন এবং উদাহরণ দেখিয়ে-ছেন তা হতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, এই উত্থান-পতনের পিছনে কতকগুলি গভীর কারণ আছে। সেইসব কারণ না থাকলে শুধু চক্রান্ত বা শুধু সাহায্যের জোরে পতন-অভ্যুদয় ঘটে না। যেটা বাহ্য সেইটাকেই আন্তর বলে মনে করলে আমরা আসল কারণে পৌঁছতে পারব না এবং উদ্ধারেরও পথ খুঁজে পাব না। সুতরাং একটু গভীরে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

॥ ২ ॥

এই গভীর কারণগুলি কী? বর্তমান প্রবন্ধে তার বিস্তারিত আলোচনা না করে মাত্র দুটি তিনটি কথার উল্লেখ করব। প্রথমেই অবশ্য বলা যায় যে, সমাজের গতি সাধারণত চংক্রমণ-গতি; ঘুরে ঘুরে সে চলে, কিছুটা অগ্রসর হবার পর আবার সাময়িকভাবে তাকে পিছু হটতে হয়, আবার সে কালে এক ধাপ এগিয়ে উপরে ওঠে। অবিচ্ছিন্ন ঊর্ধ্বরেখায় অগ্রগমন সমাজ-বিবর্তনের সাধারণ চেহারা নয়। নতুন অংকুর উদ্ভিন্ন হবার আগে তাকে কিছুকাল মাটির গভীরে লুকিয়ে থাকতেই হয়। সে-হিসেবে উনিশ শতকের আশ্চর্য বিকাশের পর বাঙালী-সমাজ যদি কিছুকালের জন্য সর্বদিকে স্তব্ধ হয়ে থাকে, সেটা খুব আশ্চর্যের কথা নয়। বাঙালীচিত্ত এতকাল ধরে এত আশ্চর্য ফসল ফলিয়েছে যে, কিছু দিনের জন্য চিত্তক্ষেত্রের বিশ্রাম প্রয়োজন হয়েছে, এত তাড়াতাড়ি

আবার সেরকম ফসল সে ফলাতে পারবে না। নতুন সৃষ্টির শক্তি সঞ্চিত হবার জন্য কিছু সময় চাই। সে-হিসেবে হয়ত বলা চলে, বাংলার এই পশ্চাদপসরণ সাময়িক, কালে আবার নতুন ফসল ফলবে।

এ-কথাটার মধ্যে সত্য নেই তা নয়, অনেকখানি সত্য আছে। কিন্তু এই কথাটাই যদি সম্পূর্ণ সত্য হত তাহলে হয়ত চিন্তার কিছু ছিল না। আশ্বাস থাকত কিছুকাল পরে বাঙালীচিত্তে আবার অজস্র ফসল ফলাতে থাকবে এবং তার ফলে সে তার হৃত গৌরব ফিরে পাবে। কিন্তু ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এই আশ্বাসে সম্পূর্ণ আস্থা রাখা কোনও কাজের কথা মনে হয় না। যুগে যুগে দেশে দেশে এমন উদাহরণ ভূরি ভূরি দেখা গিয়েছে, যাকে সাময়িক বিরতি বলে মনে হয়েছিল তা আসলে স্থায়ী বন্ধ্যাত্ব। এক একটি সভ্যতাও শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে যায়। বিশেষত ইতিহাস দাঁড়িয়ে থাকে না, তার গতিবেগ অত্যন্ত তীব্র। একটি সভ্যতা সাময়িকভাবে ফসল ফলাতে পারছে না বলে তার উপর কৃপা করে অন্য সকলে চুপ করে বসে থাকবে না, তারা চলতে থাকবে। আর এই নতুন সভ্যতা যদি পূর্বের সভ্যতার চেয়ে উৎকৃষ্টতর সভ্যতা হয়, তাহলে জগতের চেহারাই যাবে পাল্টে, নতুন সভ্যতাই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হবে এবং পুরনো সভ্যতা আর কোনকালেই মাথা তুলতে পারবে না। সুতরাং বাঙালীচিত্তের সাময়িক কর্মবিরতি বলে এখন চুপ করে বসে থাকা অনায়াসেই চলত যদি ইতিহাস সচল বস্তু না হত। কিন্তু যদি চারপাশের ভারতবর্ষ চলতে থাকে, নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে থাকে এবং তার ফলে ভারতবর্ষের ধারাটাই যায় পালটিয়ে অথচ সে-সময়ে নতুন যুগে বাঙালী যদি আবার নতুন তেজে অগ্রসর না হতে থাকে, তাহলে আশংকার কারণ ঘটে বৈ কি।

সেইজন্য বাঙালীর বর্তমান অবস্থা এবং বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবতে গেলে ইতিহাসের এই গভীর গতির সংগে মিলিয়েই ভাবতে হয়। বর্তমান প্রসংগে ইতিহাসের দুটি কথার মাত্র অবতারণা করতে চাই।

॥ ৩ ॥

তার মধ্যে প্রথম কথা হল বাঙালী চিরকালই খাপছাড়া। শুধু একালে নয়, প্রাচীন কালেও অনেক সময়ই দেখা যাবে সারা-ভারতবর্ষ যা ভাবছে বাঙালী তা ভাবছে না, বরং আলাদা কিছু ভাবছে। আর্যাবর্তের বাইরে এই বাংলা দেশ, এখানে এলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল, উত্তর ভারতের সভ্যতার সংগে এর যোগাযোগ ছিল কম। তার উপর বাংলা ছিল শবর চণ্ডালদের দেশ—এমনই দেশ যে, ইতিহাসের সুদূর কাল দূরে থাক, অপেক্ষাকৃত একালেও বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ্য আচার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আদিশূরকে পশ্চিম হতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আমদানি করতে হয়েছিল। নানা জাতির সংমিশ্রণে এই দেশ; এখানকার সমাজ আলাদা, কৌমপ্রথা আলাদা, আচার ব্যবহার আলাদা। অনার্য জাতি, পীতমংগোল জাতির সংগে অবিরত সংমিশ্রণ ঘটেছে এদেশে, ব্রাহ্মণ্য সমাজ-কাঠামোর সংগে অবিরত-যুক্ত হচ্ছে আদিম সমাজের কাঠামো। সুতরাং আশ্চর্যের কথা কি, এই প্রাচ্য প্রত্যন্ত থেকেই যত প্রোটেস্টান্ট ধর্মের উদয় হবে—বৌদ্ধ-ধর্ম জৈন ধর্ম। এও আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, পরে এই দেশেই বৌদ্ধ ধর্মের এক ধারা শেষ পর্যন্ত তান্ত্রিকতার সংগে মিশে গিয়ে আবার হিন্দু ধর্মের একটি প্রধান স্রোত হয়ে দাঁড়াবে; (যখন সারা ভারতে শংকরের নেতৃত্বে বৌদ্ধ বিতাড়নের পর বেদান্ত ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল, তখন বাংলায় কিন্তু তা হল না, বাংলায় আরও বহুকাল বৌদ্ধ ধর্মের জের রয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত অভ্যুত্থান হল বৈষ্ণব ধর্মের।) অথবা এখানে যখন বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুত্থান হবে সে-ধর্ম ভাসিয়ে দেবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোর বর্ণ-শাসনকে, টেনে নেবে শূদ্র ও অন্ত্যজ জাতিকে। এ-ও বা আশ্চর্যের কথা কি যে অন্যত্র চলে প্রাচীন ন্যায়, কিন্তু এখানে চলবে নব্যন্যায়—অন্যত্র চলে অন্য স্মৃতি কিন্তু এখানে চলবে রঘুনন্দনের স্মৃতি; অন্য জায়গায় বেশী চলবে বেদ-বেদান্তের চর্চা, এখানে চলবে কাব্য ব্যাকরণের; অন্য জায়গার প্রধান উৎসব হবে গণেশ বা রামচন্দ্রকে নিয়ে, অথচ এখানে হবে দুর্গাপুজো কালীপুজো, যার প্রচলন উত্তর ভারতের অন্যত্র কোথায়ও বিশেষ নেই। এই বিশেষভাবে স্বতন্ত্রভাবে ভারতের প্রধান ধারা হতে বিযুক্ত হয়ে নিজের মত চিন্তা করা বাংলার বহুকালের অভ্যাস। বস্তুত এটা শুধু অভ্যাস নয়, বাংলার সমাজ-গঠন ও তার উপাদানগুলির সংমিশ্রণ, তার সাংস্কৃতিক পটভূমিকা, তার আবহাওয়া—সবই তার চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্যের কারণ ও কার্য হয়ে এসেছে। সেইজন্য এখানে সব সময়েই দেখা যাবে, সারা ভারত যে-পথে চলছে, বাংলা প্রায়ই সে-পথে চলছে না। আর বিদ্রোহের যা চিরাচরিত লক্ষণ তা অত্যন্ত ব্রিলিয়াণ্ট হয় (হতেই হবে, তা না হলে প্রচলিত ভাবধারার

বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে কী করে ?), কিন্তু সবসময় বেশীদিন স্থায়ী হয় না।

এই পটভূমিকায় উনিশ শতকের বাঙালীর কথা ভাবা যাক। ঐরকম অভ্যাস তার মজ্জাগত ছিলই। তার উপর বাংলার তট-ভূমিতেই আছড়ে পড়ল পশ্চিমী সভ্যতার ঢেউ। আনল নতুন চিন্তার ধারা, সন্ধান দিল নতুন জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজত্বের, প্রতিষ্ঠিত করল যুক্তির রাজত্ব, আর আনল চিন্তার স্বারাজ্যের। ভট্টাচার্যের বিধান কেবল ভট্টাচার্যের বিধান বলেই মেনে নেব না, তাকে যুক্তি দিয়ে যাচাই করে নেব। দি এজ অব রীজন-এর সূত্রপাত হল। যে এজ অব রীজন দেখা না দিলে আধুনিক যুগের সূচনা হয় না কোনও দেশেই। এই নতুন ভাবধারা আমাদের চিন্তাজগতে যে আলোড়ন তুলল, তা বাংলায় শুধু প্রথম এসেই প্রবল তাই নয়, বাংলার চিত্তও তার জন্য প্রস্তুত ছিল। আবহাওয়া অনুকূলে ছিল।

এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে, বেশী কথা বিস্তারিত বলবার দরকার নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, যখন সারা ভারতবর্ষ পুরনো সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে বসে ছিল, ইংরেজরা তাতে আঘাত করলে ধর্ম নষ্ট হল বলে আহত হচ্ছিল, সে-সময় বাংলা দেশ সেইসব সংস্কারকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে নতুনকে সাগ্রহে বরণ করে নিতে উন্মুখ হয়েছিল। এক হিসেবে বলা যায়, গোটা উনিশ শতক যদি বা না হয়, উনিশ শতকের প্রথম তিন পাদ ত নিশ্চয়ই, বাংলার একাগ্র সাধনাই ছিল কী করে নতুনকে প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজে ও জীবনে গ্রথিত করা যায়। কোন সময় সে নতুনের আগ্রহে আত্মহারা হয়ে পুরনোকে সবলে অস্বীকার করেছে, তার মধ্যে কিছুই ভাল দেখতে পায়নি, সম্পূর্ণ ভেসে গিয়েছে নতুনের টানে। সমাজে এর উদাহরণ ইয়ং বেঙ্গল দল। সাহিত্যে এর প্রতিফলন মাইকেল মধুসূদনের কাব্য। নায়ক রাম নয়, রাবণ। সে বিদ্রোহীদের নেতা। তাঁর ছন্দ বাঁধন ভেঙে প্রবল কল্লোলে প্রবাহিত হল। এমন ব্যাকরণ ব্যবহার করলেন যাতে পণ্ডিতেরা বিভীষিকা দেখতে লাগলেন। পণ্ডিতদের উপর মাইকেলের কটাক্ষের অন্ত ছিল না। আবার কোন সময় সেই যুগের সমন্বয় সাধনার প্রাণপণ প্রয়াস। পুরনোকে কুসংস্কার বলে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে নয়, পুরনোকে যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করে তার মধ্য দিয়েই নতুনকে প্রতিষ্ঠিত করে। এর চরম উদাহরণ বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর বললেন না স্মৃতি কিছু নয়, কিন্তু সেই স্মৃতি থেকেই এক বিধান বার করে বিধবা-বিবাহ চালু করে দিলেন। শাস্ত্রে হয়ত চিরকালই আছে কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ, কিন্তু সে-বচন মানত কে ? মেয়েরা চিরকালই ত অজ্ঞানের অন্ধকারে কুসংস্কারের মধ্যে নিমজ্জিত থাকতেন। কিন্তু পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর আবার সেই শাস্ত্রবচনের উদ্ধার করলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলিত করলেন। আসলে তখন সামাজিক প্রয়োজন ঘটেছিল স্ত্রীশিক্ষার—সেটা চালু করতেই হবে। ইয়ং বেঙ্গলের দল হলে খোঁজ করবার দরকারও মনে করতেন না শাস্ত্রে কী আছে। বিদ্যাসাগর সেই প্রবল সামাজিক প্রয়োজনকে অনুভব করেছিলেন বলেই এ-কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি শাস্ত্র-বচন খুঁজে বার করতেও ভোলেননি। আর এক সমন্বয় বঙ্কিমচন্দ্র।
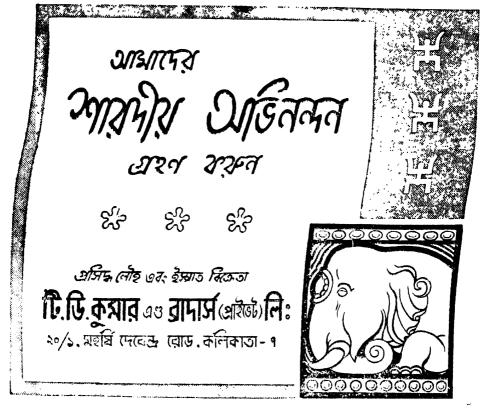
বেদান্তে মিল এবং কৃষ্ণচরিত্র, এ-সবেরই তিনি পুনর্বিচার করেছেন সে-যুগের সামাজিক প্রয়োজনের দৃষ্টিভঙ্গীতে। বস্তুত এই দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি এতদূর অগ্রসর ছিলেন বলেই যখন মার্কস যুবা, তাঁর লেখা কেউ পড়েনি, সে-সময়ই বঙ্কিমচন্দ্রের হাত দিয়ে "সাম্য" ও "বঙ্গদেশের কৃষক" বেরিয়েছিল।

বস্তুত বাংলাদেশের উনিশ শতকের ইতিহাসই তাই। নতুন যুগের প্রথম প্রশ্ন তোলেন রাজা রামমোহন। হিন্দুধর্মটা কী? সে কি শুধু ভট্টাচার্যের বিধানের পাতাতেই আবদ্ধ? শুধুই প্রচলিত সংস্কারের বেড়া-জাল? না, তার পিছনে কোনও শাস্ত্র আছে? থাকলে সেই শাস্ত্রেরই পুনর্বিচার করি না কেন? এই হতেই বৈদান্তিক সূত্রের প্রতিষ্ঠায় তিনি তৎপর হলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাহিনীই বা কী? অর্থনৈতিক ইতিহাসে তাঁর যেমন বিশিষ্ট স্থান আছে (সে-কথা পরে বলছি) তেমনি চিন্তার রাজ্যেও তাঁর স্থান আছে। হিন্দু কলেজ সংস্থাপনে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন দেশের লোক। প্রেসিডেন্সী কলেজ হয়েছিল বাঙালীর আগ্রহে। ইংরেজী সংস্কৃতের মধ্যে ইংরেজীর পক্ষে প্রথম ওকালতি করেছিলেন কোনও ইংরেজ নয়, তাঁরা বরং সংস্কৃত পঠন-পাঠন ও টোল-পাঠশালার বদলে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করতে ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু কারা বারবার ইংরেজীর জন্য ইংরেজকে তাগিদ দিচ্ছিলেন? সে বাংলারই চিন্তানায়কেরা। সতীদাহ বন্ধ করতে ইংরেজ প্রথমে সাহসী হয়নি, কিন্তু সতীদাহ বন্ধ করার আন্দোলনে অগ্রণী হয়ে দাঁড়ান রামমোহন ও দ্বারকানাথ।

এরকম ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। মোদ্দা কথাটা হল, ভারতবর্ষের মুখ যখন একদিকে ফেরান ছিল, যখন সে অতীতকেই আঁকড়ে ধরে বসে ছিল এবং কালের ধাক্কায় সেই অতীতের এক-একটা অংশ খসে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে 'গেল গেল' 'সব গেল' বলে আর্তনাদ করছিল, তখনই বাংলাদেশের চিত্তক্ষেত্রে নতুন যুগের নতুন চিন্তাধারার গুঞ্জনধ্বনি ক্রমে প্রবল হতে প্রবলতর আকার ধারণ করেছে। আমি অন্যত্র বলবার চেষ্টা করেছি (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা-দিবস-সংখ্যা—"বাঙালীমন ও সিপাহীবিদ্রোহ" প্রবন্ধ) যে, সিপাহী বিদ্রোহে উত্তর ভারত সাড়া দিলেও বাঙালী-মন বিশেষ সাড়া দেয় নি। অথচ বাঙালী তার আগে বহুদিন হতেই সংগ্রাম চালিয়ে আসছিল, যে-সংগ্রাম পণ্ডিত নেহরুর ভাষায় ফিউডাল নয়, যার মধ্যে বর্তমান-কালের চেহারার আভাস পাওয়া যায়। যথা পাইক বিদ্রোহ (১৭৯৯), বিষ্ণুপুরের বিদ্রোহ (১৭৮৯), সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, রঙপুরের বিদ্রোহ (১৭৮৩ সন) ইত্যাদি। তা ছাড়া গত শতকে বাংলার কৃষকদের সব চেয়ে বড় আন্দোলন নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। সেই প্রবলপরাক্রান্ত এবং শাসকশক্তিসমর্থিত নীলকরদের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষক রুখে দাঁড়িয়েছিল, যার খবর ইতিহাস ও সাহিত্যের পাতায় লেখা হয়ে রয়েছে। শুধু কি তাই? কর্মের ক্ষেত্র বাদ দিয়ে যদি চিন্তার ক্ষেত্র আলোচনা করা যায়, তাহলেও দেখা যাবে, সেখানেও নতুন যুগের চিন্তাধারা দেখা যাচ্ছে। ১৮৬৬ সনের হিন্দু মেলা; রাজনারায়ণ বসুর রচনাবলী; বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্রের উদ্দীপ্ত ইঙ্গিত; বিদ্যাসাগর কর্তৃক বেদান্তপাঠের পরিবর্তে ইংরেজী পড়ানোর আগ্রহ; সুরেন্দ্রনাথের অভ্যুদয় ও ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা—এই সব উদাহরণ থেকেই বোঝা যায়, বাংলার চিন্তাধারা ও কর্মধারা যে-পথে চলেছিল সে-পথ পিছন দিকে ফিরে যাবার নয়, সে-পথ সামনের দিকে। তা না হলে ভারতের অন্য কোথায়ও এমনটি ঘটেছে কি যে, স্বামীজীর মত একজন বৈদান্তিক পর্যন্ত মায়াপ্রপঞ্চ আর সোঽহংতত্ত্বে ডুবে না থেকে বললেন দরিদ্রনারায়ণের কথা ভাব?

সুতরাং আধুনিক চিন্তাধারা ও কর্মধারা

উৎসাহ ও প্রাণ প্রাচুর্যের জন্য

বেশীর ভাগ প্রসূতিকেই পিউরিটি বার্লি দেওয়া হয় কেন?

কারণ পিউরিটি বার্লি

(১) সন্তান প্রসবের পর প্রয়োজনীয় পুষ্টি যুগিয়ে মায়ের দুধ বাড়াতে সাহায্য করে।

(২) একেবারে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরী ব'লে এতে ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট বার্লিশস্যের পুষ্টিবর্ধক গুণ সবটুকু বজায় থাকে।

(৩) স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সীল করা কৌটোয় প্যাক করা ব'লে খাঁটি ও টাট্‌কা থাকে — নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে।

ভারতে এই বার্লির চাহিদাই সবচেয়ে বেশী

PYI-1 PTY 272

"মায়েদের জানবার কথা"

পুস্তিকাটির জন্য লিখুন :— অ্যাটলান্টিস (ইস্ট) লিমিটেড (ইংল্যাণ্ড-এ সংগঠিত)

ডিপার্টমেন্ট এফ বি-পি-২, পোঃ বক্স ৯০০৮, কলিকাতা-১৬

বাংলাদেশেই প্রথম আরম্ভ হয়েছিল, যে-সময় ভারতবর্ষের অন্য প্রান্তে তার বিশেষ কোনও চিহ্ন ত ছিলই না, অতীত যুগের মোহই খুব বেশী পরিমাণে তাদের মন ভুলিয়ে রেখেছিল। কাজেই পূর্বেও যেমন ভারতবাসী হতে অনেকখানি স্বতন্ত্র হয়ে বাঙালী চিন্তা করে এসেছে, এবারও তেমনি স্বতন্ত্রভাবেই বাঙালী চিন্তা করতে শুরু করল। কিন্তু এবার একটি তফাত ছিল—এবং সেই তফাত ছিল বলেই বাঙালী তখন সর্বভারতের নেতা হয়ে উঠেছিল।

সে-তফাতটা কী? সে-তফাতটা হচ্ছে এই যে, পূর্বে পূর্বে বাঙালী যখন প্রোটেস্টান্ট হয়েছে তখন সে তা হয়েছে নিজের সামাজিক প্রয়োজনে, ভারতবর্ষের প্রয়োজন মেটাবার জন্য নয়। কিন্তু এবার সে যে-পথে চলছিল কালক্রমে তাতে সে ভারতবর্ষের—সারা ভারতবর্ষের—সামাজিক প্রয়োজন মেটাবার একমাত্র নেতা হয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল। কারণটা অত্যন্ত সহজ। অতীতের দিক্ থেকে ভারতের মুখ যেমন যেমন ভবিষ্যতের দিকে ফিরতে লাগল, তেমনি তেমনি সে আধুনিক চিন্তাধারায় ও কর্মধারায় উদ্বুদ্ধ হতে লাগল। সে-সময় বাংলার পক্ষে নেতৃত্ব পাওয়া খুবই স্বাভাবিক কারণ সেই পথে বাংলাই অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল। তাই যখন স্বদেশী আন্দোলন শুরু হল, তখনও অখিল-ভারতীয় কংগ্রেস আবেদন-নিবেদনের পালা কাটিয়ে ওঠেনি, কিন্তু বাংলাদেশেই শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে বিপ্লবের বহ্নি প্রথম জ্বলে উঠেছিল। এই পটভূমিকা মনে রাখলে সেই বহ্নি যে ব্যাপকভাবে বাংলাতেই প্রথম জ্বলল, সেটা খুব আশ্চর্যের কথা নয়।

॥ ৪ ॥

এ-পর্যন্ত তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, তার নিজস্ব সামাজিক ঐতিহাসিক ও অন্যান্য কারণে বাঙালী বেশিরভাগ সময়ই স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করে এসেছে। কখনও কখনও সে সারা ভারতের নেতৃত্ব হয়ত পায়নি, কিন্তু সারা ভারতের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সে নিজের চিন্তাধারাকে রক্ষা এবং প্রতিষ্ঠিতও করতে পেরেছে। আবার যখন ইতিহাসের ঘটনাচক্রে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, সারা ভারত পরে যে-পথে চলবে যে-চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হবে, বাংলা অনেক পূর্ব হতেই তার অনুশীলন করে আসছিল তখন বাংলা স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে। সে ভারতের চিন্তাধারায় আত্মবিলোপ করেনি, সারা ভারতই তার চিন্তাধারা গ্রহণ করেছে।

এখন তাহলে শেষ কথায় আসা যাক। তাই যদি হবে, তাহলে বাঙালী আজ পিছিয়ে পড়ছে কেন? এখনকার অবস্থার কারণ কী?

এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আর একটি কথা বুঝতে হবে। সে-কথাটি হল অর্থনীতির কথা। সে-কথাটি না বুঝলে বিশেষ করে এ-যুগের কোনও প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে আগের যুগে সারা ভারতের অর্থনীতির একটা মোটামুটি সর্বজনীন প্যাটার্ন ছিল। এক এলাকার সঙ্গে অন্য এলাকার বিশেষ কোনও তফাত ছিল না। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতির সঙ্গে ভারতবর্ষ যখন সংযুক্ত হয়ে পড়ল, দেশে রেলগাড়ি চলতে লাগল, একজায়গার জিনিস বহুদূরের বাজারে গিয়ে বিক্রি হতে লাগল, সাগরপারের সঙ্গে বাণিজ্য চলতে শুরু হল, এ-দেশের টাকা বিদেশে চলে যেতে শুরু হল, দেশে কিছু কলকারখানাও স্থাপিত হতে লাগল তখন দেশে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে চুরমার হয়ে নতুন অর্থনৈতিক চেহারা দেখা দিতে শুরু হল। পূর্বে, সবজায়গাতেই অর্থনৈতিক চেহারা ও তাগিদ প্রায় একই-

পৃথিবীখ্যাত
পেয়ারার জেলী

শ্রীকিষণ দত্ত এণ্ড কোং
১২৮, মিড্‌ল রোড, কলি:—১৪

তিস্তা ভ্যালী টী
সিণ্ডিকেট
পাইকারী চা ব্যবসায়ী
সদর কার্যালয়:—জলপাইগুড়ি
ফোন: জল ২২৯
শাখা:—১৩, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
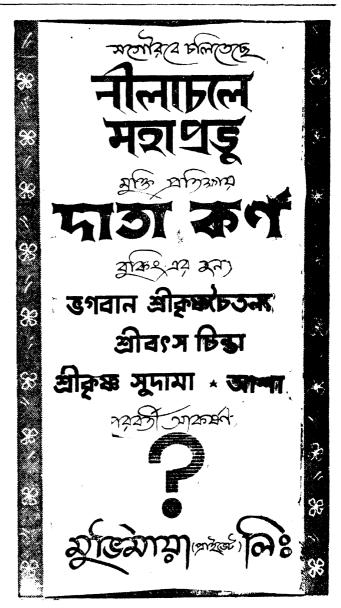
রকম ছিল বলে হয়ত সেটাকে সমান ধরে নিয়ে কেবল সামাজিক-ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করলেই সে-এলাকার বিশিষ্টতার সন্ধান মিলত। কিন্তু এখন আর তা রইল না, কেননা এই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রচণ্ড ধাক্কায় এক এক জায়গার চেহারা এক একরকম হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং এ-কালের কোনও আলোচনায় সামাজিক ঐতিহাসিক বিশিষ্টতার সংগে অর্থনৈতিক কাঠামো এবং তার ইংগিতও আলোচনা না করলে বর্তমানের কোনও অবস্থার প্রকৃত কারণ বুঝতে পারা যাবে না।

উনিশ শতক বাংলার পক্ষে সত্যসত্যই সুবর্ণযুগ। পূর্বেই আলোচনা করেছি, সে-সময় চিন্তারাজত্বে বাংলা নায়কত্ব করছিলই। কিন্তু সেই সংগে এ-কথাও সত্য যে, ইতিহাসের বিস্ময়কর ঘটনাবিন্যাসে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রও তার চরম সহায় হয়েছিল। এই দুয়ের আশ্চর্য সম্মিলন ঘটেছিল বলেই উনিশ শতকে বাংলা এত বড় হয়েছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের কিছুটা সুফল বাঙালীও প্রথম দিকে পেয়েছিল, কারণ তখন কিছু বাঙালী স্বতন্ত্রভাবে ব্যবসাও করত। রামদুলাল সরকারের জাহাজ অতলান্তিক সমুদ্রেও পাড়ি দিত বলে জনশ্রুতি আছে। প্রিন্স দ্বারকানাথের ইতিহাস কী? দ্বারকানাথ নিজে একজন ব্যারিস্টারের কাছে আইন পড়েছিলেন; অনেক রাজা মহারাজার ল-এজেণ্ট ছিলেন; কিছুকাল নিমকীর দেওয়ানি করলেন সরকারের অধীনে; তার পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করলেন। সে-ব্যবসা কিন্তু সেকালের প্রচলিত মুতসুদ্দিগিরি নয়। কিশোরীচাঁদ মিত্র দ্বারকানাথের জীবনীতে লিখছেন, Before his (i.e. Dwarkanath's) time the **ne plus ultra** of opulent natives in the mercantile line was to serve as Banians to European firms. Their commercial **aspiration** went no further than to supply funds to **Belati kooties,** obey their behests as **mooch-huddees,** and pocket the **dustoree.** It never entered into their heads to launch into speculation or make shipments on their own account. The idea of "no venture, no gain" was considered by them as frought with imminent danger; safety and slavery were their motto...... Dwarkanath established the firm of Messrs. Carr, Tagore and Co... Hence no small credit was due to Dwarkanath for thus setting up as an independent merchant. এই ব্যবসার সংগে সংগে দ্বারকানাথ ইউনিয়ন ব্যাংকও প্রতিষ্ঠা করলেন। ব্যাংক ও ব্যবসা যুক্তভাবে চালাতে লাগলেন। তার সংগে তাঁর নীলের কারখানা ছিল বিভিন্ন জায়গায়, বহরমপুরে ছিল রেশমের কারবার, রামনগরে চিনিকল ছিল। তা ছাড়া জমিদারি ত ছিলই। নতুন ধনতান্ত্রিক ব্যবসায় ভারতবর্ষের ভাগ্যে যদি কিছুটা সুযোগ মিলেছিল, সে-সুযোগ তখনকার বাঙালীরা যথেষ্ট গ্রহণ করেছিল। সুতরাং তখন চিন্তার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, অর্থনীতিক —নব অর্থনীতির—ক্ষেত্রেও বাঙালীর নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত।

ধনতান্ত্রিক বাণিজ্যের আক্রমণ এ-দেশে কঠিন হতে কঠিনতর হবার সংগে সংগে এ-সব সুযোগ বাঙালীর ক্রমে কমে গিয়েছিল এ-কথা সত্য কিন্তু কমতে কমতেও কিছুটা সুযোগ বাঙালী অনেকদিন পেয়ে এসেছে যা ভারতবর্ষের অন্যত্র ঘটেনি। মোটামুটি বলা যায়, এইরকম স্বাধীন ব্যবসায়ের পর্যায় ক্রমে ক্রমে সংকুচিত হয়ে এলে তখনও বাঙালী অনেকদিন বেনিয়ান-মুতসুদ্দিগিরি করে এসেছে। তৃতীয় পর্বে অভ্যুদয় হল চাকরির। বড় চাকরি ছোট চাকরি। ডেপুটি-গিরি হতে কেরানীগিরি। তার সংগে বুদ্ধিজীবীর নানান পেশা। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার। অন্য প্রদেশে ত তখনও ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহই দেখা যায়নি, স্যার সৈয়দ আহমেদ হয়ত মুসলমানদের কিছুটা উপদেশ দিতে শুরু করেছেন ইংরেজীর জন্য। কাজেই যখন কবরেজি হাকিমির উপর বিশ্বাস চলে গেল, ফারসীদুরস্ত উকিলেরা অচল হয়ে

সকল উৎসবে—
মনোরম নক্সায়
মোটা, মাঝারি ও মিহি
শাড়ী ও ধুতির
নৈবেদ্য রচনায়—
আরতি কটন মিলস্ লিঃ
দাশনগর, হাওড়া।
হেড অফিস—২৯নং স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা—১
টেলিগ্রাম—মারভেলাস
ফোন—হাওড়া ৩৬৭৩—৪ এবং ২২—১৩৬১—৩ লাইন।

গেল, ইংরেজী আইনের নীতিতে এখানকার আইন গড়ে উঠল, তখন এই ইংরেজী-নবিশদেরই ডাক পড়ল। সুতরাং সেকালে এ-ক্ষেত্রেও বাঙালী যে অন্তত সারা উত্তর-ভারতে নেতৃত্ব করবে, সেটা খুবই স্বাভাবিক।

॥ ৫ ॥

আজ বাঙালী মার খাচ্ছে তার দুটো বড় কারণ আছে। অন্যান্য ছোট কারণগুলি আপাতত বাদ দিচ্ছি। তার প্রথম বড় কারণ হচ্ছে, চিন্তাজগতে বাঙালীর মনের ধারা একটা মোড়ের মাথায় থমকে এসে দাঁড়িয়েছে। জোয়ার-ভাটার মাঝামাঝি সময়ে যেমন জল স্থির হয়, মধ্যে মধ্যে ঘূর্ণিও খায়, বাঙালীর মনের ধারারও এখন খানিকটা সেই রকম অবস্থা। উনিশ শতকে যে কয়েকটা বড় জিনিসকে ভিত্তি করে তার বিকাশ আরম্ভ হয়েছিল, এবং যে-সামাজিক পরিবেশ সেই বিকাশের পথে সহায় হয়েছিল, এখন সে-সমস্তই নিঃশেষিত ও রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। তার উপর ভিত্তি করে আর এগনো চলছে না। এখন নতুন সমাজ-কাঠামোর মধ্যে নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ না হলে পরবর্তী যুগ আরম্ভ হবে না। এবং বলা বাহুল্য, সে-উন্মেষ হতে দেরি হবে, কেন না এখন আর মধ্যবিত্তের সে-অবস্থা নেই। ম্যানহাইম প্রমাণিত করেছেন, মধ্য-বিত্তই চিন্তাধারার পথিকৃৎ এবং মধ্যবিত্ত না থাকলে নব নব চিন্তাধারার উন্মেষের দেরি হয়। বাংলায় আজ মধ্যবিত্ত সমাজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, তাদের পক্ষে এখনই চিরাচরিত চিন্তানায়কত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। সেইজন্য বাংলা ও বাঙালী কিছুকাল ধরে চিন্তাধারায় ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে, সামনে এগোচ্ছে না। অন্যান্য প্রদেশে এখন মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ছে এতকাল বাদে গড়ছে, যা বাংলায় গত শতকে গড়ে উঠেছিল। সুতরাং সারা ভারতে সেই মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে, কারণ সারা-ভারতে সামাজিক কাঠামোর যে-ভাবে বিকাশ হচ্ছে তার সঙ্গে তাদের বিরোধ ত নেই-ই, বরং তারা সেই বিকাশেরই সৃষ্টি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হয়। ভবিষ্যৎবাণী কখনই নিরাপদ নয়, ভুল হতে পারে। তবুও চারপাশের অবস্থা দেখে একটা কথা মনে হয়। বাংলায় মধ্যবিত্ত এককালে খুব সুস্পষ্ট এবং প্রভাবশালী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল, কালের অমোঘ নিয়মে তা এখন সম্পূর্ণ ভেঙেচুরে যাচ্ছে। অন্যান্য প্রদেশে সে-সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়নি, এখন হচ্ছে। কিন্তু এখন যে-মধ্যবিত্ত শ্রেণী অন্যত্র দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণীর কিছুটা পার্থক্য আছে। বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল বেশির ভাগ বুদ্ধিজীবীর দল, সেজন্য তাদের নেতৃত্ব তাদের বিত্তের উপর নির্ভর করত না। বিত্ত যে কিছু ছিল না তা নয় কিন্তু বুদ্ধির কথাটাই ছিল বড়। কিছুকাল আগের বাংলার কথাই ধরা যাক না কেন। বৈকুণ্ঠ সেন, অম্বিকা মজুমদার, অশ্বিনী দত্ত প্রভৃতি এক এক দিকপাল বাংলার এক এক প্রান্তে বসে ছিলেন যাঁদের কথায় সেই সব প্রান্ত উঠত বসত। এখন হয়ত তাঁদের চেয়ে বিত্তশালী উকিল বা শিক্ষকের অভাব হবে না, এখন হয়ত ধনী ব্যবসায়ী বাঙালীও খুঁজলে পাওয়া যাবে, কিন্তু তাদের মত প্রভাব কি এঁদের আছে? অন্য প্রদেশে যে মধ্যবিত্তের উদয় হচ্ছে দেখছি তাতে বুদ্ধির স্থানও আছে, কিন্তু বিত্তের উপর ঝোঁকও প্রচুর। প্রধানত বুদ্ধির নেতৃত্ব না থাকলে বিত্তের নেতৃত্ব কিছুকাল চলতে পারে বটে কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

তা ছাড়া এ-কথাও ঠিক যে, অনুন্নত দেশ ভারতবর্ষে যে অর্থনৈতিক সংঘাত আরম্ভ হয়েছে তাতে মধ্যবিত্ত, বিশেষত বিত্তাশ্রয়ী মধ্যবিত্তের রাজত্ব শেষ পর্যন্ত ভেঙে যেতে বাধ্য। বাংলায় আগে গিয়েছে, অন্যত্রও পরে যাবে। তলার শ্রেণীগুলিরও চেতনা জাগরিত হচ্ছে, তারাও বাবুমশায়দের কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। এই অবস্থা হলে কে নেতৃত্ব করবে, কী পথে ভারতবর্ষের

বিকাশ হবে সে-কথা ভাবতে হবে। সে-সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা ঠিক নয় কিন্তু একটু স্বচ্ছন্দেই বলা যায় যে, সেই অবস্থার জন্য আগে থেকে যদি কেউ মহড়া দিতে আরম্ভ করে থাকে—সে এই বাংলাদেশই, কারণ যা ভারতবর্ষে দুদিন পরে ঘটবে এখন থেকেই বাংলায় তা ঘটেছে। বাঙালী যদি আত্মহারা ও দিকভ্রান্ত না হয়ে সেই ভবিষ্যৎ কালের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে, নতুন সমাজের সম্বন্ধে চিন্তাধারা সুস্পষ্ট ও কার্যক্রম স্থির করতে পারে তাহলে সারা ভারতে যেদিন সেই অবস্থা ঘটবে তার নেতৃত্বের জন্য আহ্বান বাঙালীর কাছে এসে পৌঁছবেই।

তা ছাড়া আরও একটা কথা আছে। সেটা অর্থনীতির কথা। পূর্বেই বলেছি, গত শতকে যখন বাঙালীর বিকাশ হয়েছিল তখন চিন্তাধারা এবং অর্থনীতি উভয়েই তার বিকাশের সহায় হয়েছিল। এখন অবস্থাটা কী? চিন্তাধারার বিপর্যয়ের কথা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, কিন্তু এ-কথাও মনে রাখা দরকার যে, ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাও বাঙালীর বিকাশের সহায়ক নয়।

গত শতাব্দীতে ভারতবর্ষ নিজস্ব ধনতান্ত্রিকতার পথে যাত্রা করেনি। তখন এ-দেশে বৈদেশিক ধনতান্ত্রিকতার একচ্ছত্র আধিপত্য, তারই উচ্ছিষ্ট খুদকুড়ো পেয়েই আমরা সন্তুষ্ট। তার উপর বাঙালীর ব্যবসা-পর্যায় শেষ হয়ে গিয়ে সে যখন চাকরির পর্যায়ে প্রবেশ করল তখন থেকে সে ভারতীয় ধনতান্ত্রিকতার পথ হতে সম্পূর্ণ সরে গেল। একদিকে কিছু বুদ্ধিজীবীর পেশা, অন্যদিকে কৃষি—বিদেশী ধনতান্ত্রিকতার এই চরম ফল এদেশে ফলল। কাজেই কালচক্রে যখন স্বদেশী ধনতন্ত্রের সঙ্গে বিদেশী ধনতন্ত্রের রফা করবার দরকার হল তখন তার আসন প্রতিষ্ঠিত হল বোম্বাইয়ে—কলকাতায় নয়।

ভারতবর্ষে ধনতন্ত্র জন্ম হতেই বিকলাঙ্গ। মার্ক্স যে বলেছিলেন ইতিহাসে এমন একটা সময় আসে যে-সময় ধনতন্ত্রও একটা বৈপ্লবিক অংশ গ্রহণ করে, সে-চেহারা তার এ-দেশে কোনকালেই দেখা যায়নি। অন্য দেশের মত সে এদেশে তীক্ষ্ণ আঘাতে সামন্ততান্ত্রিকতাকে উৎখাত করতে পারেনি, সারা দেশের উৎপাদনকে ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত (Commercialised) করতে পারেনি। কিন্তু তবু এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এদেশে বিকলাঙ্গ হলেও ধনতান্ত্রিকতার উদ্ভব হয়েছে অনেককাল হতেই এবং সে-পথে ভারতবর্ষ অনেকদূর অগ্রসরও হয়েছে। আজ সেই কারণেই সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর প্রয়োজন খুব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে, আজও ভারতবর্ষে ধনতান্ত্রিকতার খরনখরস্পর্শ তীব্র হয়ে আছে।

যখন ভারতবর্ষ পুরো সমাজতন্ত্রবাদের অনুগামী হয়ে যাবে তখন অন্য কথা। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে অর্থাৎ ধনতন্ত্রের রাজত্ব মোটামুটি বজায় থাকছে, ততক্ষণ এ-কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, ভারতবর্ষ শাসিত হবে ভারতবর্ষের ধনতান্ত্রিক রাজধানী হতে। এবং সে-রাজধানী বোম্বাইয়ে থাকতে পারে, রাজস্থানে থাকতে পারে, আজকাল উত্তর-প্রদেশেও গড়ে উঠেছে, কিন্তু সে-রাজধানী কলকাতায় নেই। সুতরাং এদিক দিয়েও সারা ভারতে বাঙালীর প্রতিষ্ঠা নেই।

এ-অবস্থার প্রতিকার এ নয় যে, বাংলায় ভারতীয় নব্য ধনতান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠা হক। কারণ আজকের জগতে ধনতন্ত্রের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। সুতরাং যদি অর্থনীতির ক্ষেত্রেও বাঙালী প্রাধান্য চায়, তাহলে সে-ক্ষেত্রেও তাকে ভবিষ্যতের দিকে মুখ ফেরাতে হবে। যা আসছে তারই নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য তার প্রস্তুতি প্রয়োজন। সুতরাং সুষ্ঠু বেগবান গতিশীল কার্যকরী সমাজতান্ত্রিকতা কী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেই মহড়াই বাঙালীকে দিতে আরম্ভ করতে হবে।

ভারতবর্ষের অন্য প্রান্তের চেয়ে এগিয়ে এগিয়ে চলাই বাঙালীর অভ্যাস। বরাবরই সে তা করে এসেছে। হয়ত এই কারণেই সময়ে সময়ে সবাই খাপছাড়া বাঙালীর উপর বিরক্ত হয়েছে। রাজাজীর উক্তি এখনও অনেকের মনে আছে—ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পথে বাংলা ও পাঞ্জাব যদি বাধা হয় তাহলে ও দুটিকে বাদ দিয়েই ভারতের স্বাধীনতা হক। কিন্তু তাতে বাঙালী দমেনি, কারণ তাকে যদি অগ্রগমনের জন্যই খাপছাড়া হতে হয় তাহলে তাকে তা হতেই হবে, কারণ পুরোগামীদের যাত্রা সবসময়ই নিঃসঙ্গ। আজ বাঙালী মার খাচ্ছে বটে, কিন্তু যদি মননে ও কার্যে, চিন্তায় ও সমাজগঠনে নতুন সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ চেহারা সে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তাহলে তার নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষকে আবার ফিরে আসতেই হবে।

নাম-মাত্র মুল্যে কিনুন

আমেরিকায় তৈরি ওভারস্থু পরে পায়ের জুতো বৃষ্টি কাদা থেকে বাঁচান। দু'রকমের পাওয়া যায়:

১। রাবার সোল দেওয়া ক্লথ টপ (উপরাংশ কাপড়ের তৈরী) ওভারস্থু ৪৲ টাকা প্রতি জোড়া। ২। ক্লিপ দেওয়া অল রাবার (সম্পূর্ণ রবারের তৈরী) ওভারস্থু ৫৲ টাকা প্রতি জোড়া। টারপুলিন, বিভিন্ন সাইজের তাবু ও অন্যান্য দ্রব্যাদিও পাওয়া যায়।
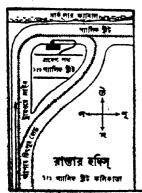
রবিবারেও দোকান খোলা থাকে

আর্মি সারপ্লাস স্টোর্স

১১, গ্যালিফ ষ্ট্রীট (বাগবাজার ট্রাম টারমিনাস)
কলিকাতা টেলিফোন: ৫৫-৩৮৮৮

ASSF-SB-57-

ইতিহাসের উপাদান

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

এখানে উনবিংশ শতাব্দীর কথা বলিতেছি। তবে মহাকাল হইতে একটি অংশ বিচ্ছিন্ন কা[illegible] সম্ভব নয়। পূর্বাপর কতক সময়ের কথাও এ প্রসঙ্গে আসিয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর কথা বলিতে গেলে পূর্বেকার অষ্টাদশ শতাব্দীর কথাও কিছু বলিতে হইবে। পরবর্তীকালের সম্বন্ধেও হয়ত কিছু বলা প্রয়োজন হইবে। ঐতিহাসিক আলোচনা-গবেষণা এবং ইতিহাস-রচনার নূতন ধারা প্রবর্তিত হইয়াছে বেশী দিনের কথা নয়। ইউরোপ খণ্ডেও এই রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে মাত্র গত শতাব্দীর শেষার্ধে। এদেশেও ইতিহাস-রচনার আকর-বস্তুর অনুসন্ধান এবং প্রয়োগ শুরু হয় মাত্র অর্ধশতাব্দী পূর্বে। সিস্টার নিবেদিতা প্রাচ্য রীতির শিল্পকলার প্রবর্তনকে অভিনন্দিত করেন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তদীয় শিষ্যপ্রধান আচার্য নন্দলাল বসুর চিত্রের ব্যাখ্যাতা ছিলেন নিবেদিতা। সেইরূপ ইতিহাস-রচনার নূতন ধারাকেও তিনি স্বাগত জানান। একটি রচনায় সেই অর্ধশতাব্দী পূর্বে 'অধ্যাপক' যদুনাথ সরকারকে তাঁহার নূতন প্রয়াস ও প্রযত্নের নিমিত্ত সপ্রশংস উল্লেখ করেন।

ইতিহাস বলিতে এতদিন আমরা 'রাজা-রাজড়া'র কাহিনী বুঝিতাম। রাজাদের জন্ম-মৃত্যু, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি বুঝিতাম; সাধারণ মানুষের কথা তাহাতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। ক্রমে ইতিহাস-রচনার ভোল ফিরিয়াছে। কোন দেশের ইতিহাস এখন আর শুধু রাজরাজড়ার নামাবলী মাত্র নয়, সাধারণ মানব-সমাজের সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, উন্নতি অবনতি—এইসব বিষয় ইহাতে মুখ্য স্থান লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশের ইতিহাসও এতদিন গতানুগতিক পন্থায় লিখিত হইতেছিল; কিন্তু তাহা সত্যিকার 'ইতিহাস' হয় না। এই ধরণের তথ্যাভিত্তিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস আরম্ভ হইয়াছে অল্পদিন মাত্র। বিগত শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রযত্ন ইতিপূর্বে যে কিছু কিছু হয় নাই এমন নহে। "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" বইখানির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইহাতে আধুনিক রীতি অনুসৃত না হওয়ায় অনেক স্থলে অসঙ্গতি, অতিশয়োক্তি, অনুল্লেখ ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। কিন্তু সামাজিক ইতিহাস রচনায় এ গ্রন্থখানি 'পথিকৃৎ'-এর সম্মান অবশ্য পাইবে। এখন, এই যুগের ইতিহাস রচনা-কালে যে-যে উপকরণের উপর আমাদের বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হয়, সে সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করিব। এক্ষেত্রেও একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। এ সময় শাসন ব্যবস্থার প্রভাব ক্রমশ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সমাজের বিভিন্ন স্তরেও অনুভূত হইতে থাকে। কাজেই সে সম্বন্ধেও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জ্ঞান থাকা দরকার।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত মোটামুটি দুইশত বৎসর এদেশে ব্রিটিশ জাতির শাসনকাল, যদিও তাহাদের আবির্ভাব বাণিজ্যব্যপদেশে ঘটিয়াছিল বহুপূর্বে। কোন দেশের বা জাতির ইতিহাস শাসকজাতির কার্য-কলাপের আলোচনা ব্যতিরেকে পূর্ণ হইতে পারে না। একারণ ইহার বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করিবার আবশ্যক হয়। শাসনের বিভিন্ন বিভাগের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত রিপোর্ট বা কার্যবিবরণ রহিয়াছে। এ সকল হইতে শাসক জাতির মনোভাব যেমন প্রকট হয় তেমনি শাসিতদের কথাও ইহা হইতে অনেকটা জানা যায়। যে বিভাগে ইহা রক্ষিত হয় তাহাকে 'রেকর্ডস্' বিভাগ বলে। ভারত সরকারের এই রেকর্ডস্ বিভাগের নাম ছিল 'ইম্পিরিয়াল রেকর্ডস্'; স্বাধীনতার পর ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'ন্যাশনাল আর্কাইভস্ অব ইণ্ডিয়া''। শাসন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত বহু মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ দলিল দস্তাবেজ এখানে রক্ষিত আছে। এই সকল দলিল দস্তাবেজের নির্দেশ পুস্তকও কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহা হইতে এমন বহু বিষয় উদ্ধার করা হইয়াছে যাহা হইতে ভারতবাসীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। দুই একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি খোলসা করা যাইতে পারে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কার্যবিবরণের পাণ্ডুলিপি হইতে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার একটি প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি 'সিপাহী যুদ্ধে'র উপরে যে ইতিহাস-পুস্তক রচিত হইয়াছে, তাহার প্রচুর মালমশলা সংরক্ষিত আছে জাতীয় দপ্তরখানায়। ভারত সরকারের মত প্রাদেশিক সরকারসমূহেরও দপ্তরখানা আছে। বাংলা সরকারের দপ্তরখানা হইতে বাংলার শিক্ষা-সাংস্কৃতিক বিষয়ক অনেক তথ্য জানা যাইতে পারে। কিছু কিছু ইতিমধ্যেই উদ্ধার করা হইয়াছে।

সরকারী দপ্তরখানার মত বিভিন্ন শিক্ষা-সাহিত্যমূলক প্রতিষ্ঠানেরও রেকর্ডস্ বা দপ্তরখানা থাকা সম্ভব। আমাদের দেশে নানা কারণে বহু প্রতিষ্ঠানের 'রেকর্ডস্' সংরক্ষিত হয় নাই। অথচ এক-একটি প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস বা আনুষঙ্গিক ইতি-বৃত্ত প্রণয়নে ইহার গুরুত্ব অত্যধিক। মনীষী রাজনারায়ণ বসু এই মর্মে বলিয়াছেন যে, এক-একটি মানুষের মত এক-একটি প্রতিষ্ঠানেরও জীবন আছে। ইহার জীবন-কথা নিহিত আছে উক্ত রেকর্ডসে। এই রেকর্ডস্ বা দপ্তরের মধ্যে নানা বিষয়ক দলিলই থাকে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ-সভার প্রোসিডিংস্ (প্রায়শ অমুদ্রিত), বাৎসরিক রিপোর্ট বা কার্যবিবরণ (প্রায়শ মুদ্রিত) নিজ নিজ ইতিহাসের প্রধান আকর। কোন কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে, যেমন সংস্কৃত কলেজে এইসব রেকর্ডস সযত্নে রক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল দলিলের ভিত্তিতে সংস্কৃত কলেজের প্রথম যুগের একখানি প্রামাণিক ইতিহাস (১৮৫৮ সন পর্যন্ত) রচিত হইয়াছে। অধ্যক্ষ-সভার প্রোসিডিংস্ বা কার্যবিবরণ (অমুদ্রিত) যে কতখানি কার্যকর, হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের ইতিহাস রচনায় তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছি। পরে শিক্ষাবিষয়ক বাৎসরিক সরকারী রিপোর্টে, কি সংস্কৃত কলেজ, কি হিন্দু কলেজ, কি মেডিক্যাল কলেজ—প্রতিটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের বিবরণ প্রদত্ত হইত। এই সকল বিবরণ সংক্ষিপ্ত হইলেও প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের জীবনবৃত্ত রচনায় ইহা অতীব প্রয়োজন। এসব রিপোর্টে কিছু কিছু ভুল থাকা যে সম্ভব নয় তাহা বলি না, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উহা যাচাই করিয়া লইবার উপায়াভাব। এই সকল রিপোর্টকে সুধীবৃন্দ আকর গ্রন্থের মর্যাদা দিয়া থাকেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম দিককার ইতিহাস রচনাকালে সরকারী রিপোর্টগুলির অপরিহার্যতা লক্ষ্য করিয়াছি। এখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধেই একটু বেশি করিয়া বলিতেছি। ১৮৫৫ সনের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষা বিভাগ
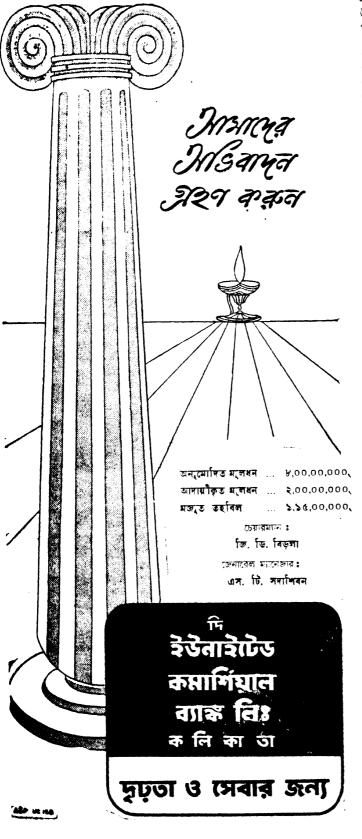
সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একটি কমিটির উপর অর্পিত ছিল। ঐ সন হইতে ইহা পুরোপুরি সরকারী বিভাগে পরিণত হয়। তখন বাংলাদেশে এই বিভাগের কর্তা হইলেন 'ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইন্‌স্ট্রাকশন', বা শিক্ষা-অধিকর্তা। ক্রমে বাৎসরিক রিপোর্টের সংস্কার সাধিত হইল। নানা কারণে পূর্বের মত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিশদ বিবরণ ইহাতে স্থান পায় নাই। কিন্তু কতকগুলি নূতন নূতন বিষয় ইহাতে সংযোজিত হইল। তথাপি যত সামান্যই হউক না কেন, এই সকল তথ্য বড়ই কাজে লাগিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট স্কুল (বর্তমানে কলেজ) অব আর্টস (এখন কলামহাবিদ্যালয় নামে আখ্যাত)-এর কর্তৃত্বভার ১৮৬৪ সন হইতে সরকার গ্রহণ করেন। আর্ট স্কুলে উহার পুরাতন নথি-পত্র খুঁজিয়া পাইলেন না। ইহার প্রথম দিককার ইতিহাস খুঁজিতে হইলে শিক্ষা-অধিকর্তার বাৎসরিক রিপোর্টের আশ্রয় লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। এখানে বেথুন স্কুল ও কলেজের কথা একটু বিশেষভাবে বলিতেছি। সরকার ইহার কর্তৃত্ব-ভার লন ১৮৫৬ সনে। এই ব্যাপারের কিছুকাল পর হইতে সরকারী শিক্ষা-রিপোর্টেও ইহার কথা স্থান পাইতে থাকে। প্রতিষ্ঠাবধি প্রথম দশ বৎসরের (১৮৪৯—১৮৫৯) কথা এখানে বলিতেছি না। ১৮৬০ সন হইতে ১৯৪৯ সন পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটির জীবনবৃত্ত রচনাকালে ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। অন্যান্য বই-পুঁথি-পত্র-পত্রিকা হইতেও তথ্যাদি পাইয়াছি। কিন্তু এই রিপোর্টগুলি মূল আকরের কাজ করিয়াছে।

শিক্ষা-সহায়ক এবং সাহিত্য-ভিত্তিক কোন কোন প্রতিষ্ঠানের কথা কিছু বলি। ন্যাশনাল লাইব্রেরি, একটি নিছক গ্রন্থাগার হিসাবে, সবচেয়ে পুরনো। ইহার 'পূর্বজ' হিসাবে কলিকাতার পাবলিক লাইব্রেরির নাম করা যাইতে পারে। কারণ ইহাকেই মূল ভিত্তি করিয়া প্রথমে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি (এখনকার ন্যাশনাল লাইব্রেরি) প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি ১৮৩৫ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৫-১৯০৩, প্রায় অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তখন ইহার বাৎসরিক রিপোর্টগুলির প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করিয়াছি। কলিকাতার সবচেয়ে পুরনো সাহিত্যবিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান—এশিয়াটিক সোসাইটি। ইহার হস্তলিখিত প্রোসিডিংস্ দেখিয়াছিলাম বহুপূর্বে। এখনও ইহা সংরক্ষিত হইতেছে কি না জানি না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এ এফ্ রুডল্ফ্ হর্নলে এবং প্রমথনাথ বসুর সম্পাদনায় এশিয়াটিক সোসাইটির সেণ্টিনারী ভল্যুম বা শত-বর্ষ ইতিহাসগ্রন্থ ১৮৮৪ সনে প্রকাশিত হয়। সোসাইটির বিভিন্ন বিভাগের ইতিহাস রচনায় অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল, নিঃসন্দেহ। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির (১৮১৮—১৮৩৩) একখানি মাত্র মুদ্রিত রিপোর্ট পাইয়াছিলাম। ইহার

কথা বলিতে গিয়া আমাকে বিশেষভাবে অমুদ্রিত প্রোসিডিংস-এর উপর নির্ভর করিতে হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বয়স পঁয়ষট্টি বৎসর। ইহার অধ্যক্ষ-সভার অমুদ্রিত কার্যবিবরণের উপর মুখ্যত নির্ভর করিয়া 'পরিষৎ-পরিচয়' সংকলন করা হইয়াছিল। এক দিকে যেমন অমুদ্রিত প্রোসিডিংস আকর, তেমনি এখানিও আকর-গ্রন্থ হিসাবেই মান্য। অপরাপর প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও ঐ একই কথা। কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত সভার পুরা এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভার আংশিক ইতিহাস রচনাকালেও ঐ প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক রিপোর্ট, কাগজপত্র এবং অমুদ্রিত প্রোসিডিংস-এর গুরুত্ব সম্যক বুঝা গিয়াছে। বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা, ভারত-সংস্কার সভা প্রভৃতির কথা আলোচনাকালেও উহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক রিপোর্টগুলির উপর আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি এই কারণে যে, উহার অমুদ্রিত প্রোসিডিংস 'গোপনীয়' বলিয়া অনেকের অনধিগম্য থাকিয়া যায়; আবার এগুলি সংরক্ষণের সুব্যবস্থা না থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নষ্ট হইয়া যায়। বাৎসরিক রিপোর্টগুলিই এক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। কিছুকাল পূর্বে জনৈক বন্ধু বাংলা দেশের অর্ধশতাব্দীর পুরনো গ্রন্থাগারগুলি রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তখন তিনি এই রিপোর্টগুলির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। কত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কথা এই রিপোর্টগুলির অভাবে অজানা থাকিয়া যাইতেছে। উত্তরপাড়া হিতকরী সভা এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান। ১৮৬৪ সনে ব্যাপক উদ্দেশ্য লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারেই ইহা সমধিক উদ্যোগী হয়। সরকারী শিক্ষা-রিপোর্টেও ইহার কৃতিত্বের কথা উল্লিখিত হইত। সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে বহু বালিকা বিদ্যালয় ইহার সহায়তায় পরিচালিত ও প্রতিপোষিত হইত। অর্ধশতাব্দীরও উপর এই সভা এ প্রকার সমাজকল্যাণকর কার্যে একান্তভাবে নিয়োজিত ছিল। সভার দু'একখানি কার্যবিবরণ মাত্র দেখিয়াছি। এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের জীবনবৃত্ত-রচনায় বার্ষিক কার্যবিবরণ যে কতখানি কার্যকর তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গত শতাব্দীর শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক বিভিন্ন সভা-সমিতির কথা আলোচনা করিতে গিয়া উহার বার্ষিক রিপোর্টের অভাব অনুভব করিয়াছি। অমুদ্রিত কার্যক্রমবিবরণ হয়ত পাইবার উপায় নাই, কিন্তু মুদ্রিত রিপোর্টগুলিও যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই সকল রিপোর্টই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাণ, জীবনবৃত্ত রচনার আকর-স্বরূপ।

প্রোসিডিংস, রিপোর্ট প্রভৃতি ব্যতিরেকে এমন আরও কতকগুলি আকর আছে যাহা বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস রচনায় সাহায্য করিয়া থাকে। সমসাময়িক সমাজ-জীবন ও অবস্থার উপরও এসব কম আলোকপাত করে না। এই প্রসঙ্গে চিঠিপত্র, ডেস্‌প্যাচ, দিনলিপি বা রোজনামচা এবং আত্মজীবনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিঠিপত্র বা আত্মজীবনী বিভিন্ন সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। কাউপারের পত্রাবলী ইংরেজী সাহিত্যের একটি গৌরব। রবীন্দ্রনাথের বিরাট চিঠিপত্র বাংলা সাহিত্যকে যে সমৃদ্ধ করিয়াছে তাহা কি বলিতে? কিন্তু এগুলি এক হিসাবে ইতিহাসেরও আকরস্বরূপ হইয়া থাকে। রাজা রাধাকান্ত দেবের পারিবারিক গ্রন্থালয়ে আমি পাঁচ কি ছয় ভলুম চিঠিপত্রের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি দেশী-বিদেশী মনীষিগণকে যেসব পত্র দিয়াছিলেন তাহাদের হুবহু নকল করাইয়া যাইতেন। প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসন, অধ্যাপক ব্রুনো, অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর প্রভৃতিকে লেখা পত্রের নকল উহাতে আছে এবং আমি উহার কিছু কিছু প্রকাশিতও করিয়াছি। আবার বিভিন্ন সমাজসেবী, কল্যাণকর্মীকেও তিনি পত্র লিখিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে বেথুন সাহেব এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (মহর্ষি) নাম উল্লেখ করিতে হয়। বিলাতের বন্ধুদেরও তৎকালীন অবস্থার কথা জানাইয়া পত্র লেখেন; যেমন—সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সর্ এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট এবং হিন্দু কলেজের প্রথম ইউরোপীয় সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন আরভিন। তৎকালীন ইংরেজী শিক্ষা, সংস্কৃতচর্চা, স্ত্রীশিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে এই সকল পত্রে তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে। ব্যক্তিগত মতামত ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে ইহার গুরুত্ব এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পরবর্তীকালে লিখিত ও প্রকাশিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের চিঠিপত্র হইতে ঊনবিংশ

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

(স্থাপিত ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯০৬ সাল)

অনুমোদিত, বিলিকৃত এবং বিক্রীত

মূলধন	...	৫,৫০,০০,০০০,
আদায়ীকৃত মূলধন	...	৩,০০,০০,০০০,
রিজার্ভ ফাণ্ড	...	৩,১০,০০,০০০,

—হেড অফিস—

মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই।

শাখাসমূহ

কলিকাতা—২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড (মেইন অফিস), ২০১, হ্যারিসন রোড, বড়-বাজার এবং ৩, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ সাউথ। আমেদাবাদ—ভদ্রা (মেইন অফিস), এলিস ব্রিজ, গান্ধী রোড, মানেক চক ষ্টেশন রোড। বোম্বাই—আন্ধেরী, বান্দ্রা, বুলিয়ন এক্সচেঞ্জ, কোলাবা, কলবাদেবী, মালাবার হিল। অমৃতসর, ব্যাঙ্গালোর, ভুজ (কাচ), কোয়েম্বাটোর, দিল্লী, গান্ধীধাম (কাচ), হায়দরাবাদ (ডেকান), জামসেদপুর, জুনাগড়, কোঝিকোড (পূর্বতন কালিকট), মাদ্রাজ, নাগপুর, নাগপুর সিটি, নিউ দিল্লী, পালানপুর, পুণা, পুণা সিটি, রাজকোট, সোলাপুর, সুরাট, ভেরাভল।

বৈদেশিক শাখাসমূহ

লণ্ডন—১৭, মুরগেট, লণ্ডন, ই. সি. ১। এডেন, ডার-এস-সালাম, জিঞ্জা, কামপালা, করাচী, মোম্বাসা, নাইরোবী, ওসাকা, সিঙ্গাপুর, টোকিও।

পৃথিবীর সমস্ত প্রধান দেশে এজেন্টস ও করেসপণ্ডেন্টস রহিয়াছে।

পরিচালকবৃন্দ—স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর, ব্যারনেট, জি. বি. ই., কে. সি. আই. ই., চেয়ারম্যান; মিঃ আম্বালাল সরাভাই; স্যার জোসেফ কে., কে. বি. ই.; মিঃ রামনিবাস রামনারায়ণ; মিঃ ভগবানদাস সি. মেটা; মিঃ কৃষ্ণরাজ এম. ডি. থ্যাকারসে; মিঃ এ. ডি. শ্রফ; মিঃ মদনমোহন মঙ্গলদাস; মিঃ এন. কে. পেটিগারা; স্যার বিঠল. এন. চন্দভারকর।

জেনারেল ম্যানেজার—

মিঃ টি. আর. লালোয়ানী।

কলিকাতা কমিটি

মিঃ জগমোহনপ্রসাদ গোয়েঙ্কা,

মিঃ এন. বি. ইলিয়াস।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ভার লওয়া হয় এবং অনুমোদিত আমানতকারীদের লেটার অফ ক্রেডিট দেওয়া হয়।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কারবারের আদানপ্রদান হয়।

— সিকিউরিটি হাউস —

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

শহরের ভীড় ছেড়ে
কল্যাণীতে চলুন
মহানগরীর কল-কোলাহলের বাইরে,
প্রকৃতির শান্ত-সবুজ পরিবেশে,
সুন্দর উপনিবেশ এই কল্যাণী।
ছকে-বাঁধা ছোট-বড় বাড়ী,
কর্মক্লান্ত দিনান্তের শেষে
মনে মনে জনে জনে শান্তি দিবে আনি।
সুবিধে ও
স্বাস্থ্যের দিক থেকে
আদর্শ
বাসস্থান
১৮৮এ, রাসবিহারী এ্যাভিনিউতে একটি সেল্‌স্ প্রমোশন অফিস খোলা হয়েছে। কল্যাণী সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় সম্পর্কে উক্ত অফিসে সন্ধান পাবেন।
পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত
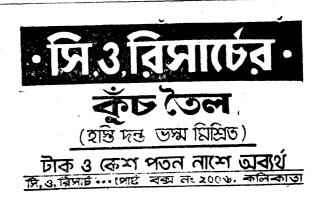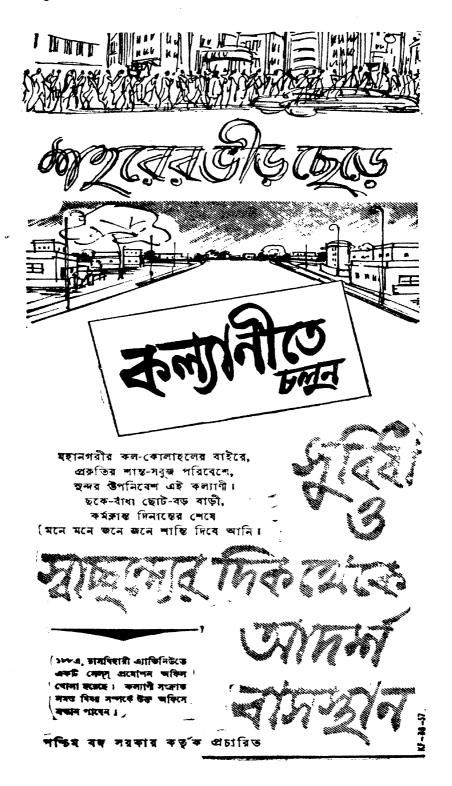
শতাব্দীর শেষার্ধের বিভিন্ন আন্দোলনের সূত্র আমরা ধরিতে পারি। সিপাহী যুদ্ধকালে রাসেল লন্ডন 'টাইমস্'-এর বিশেষ সংবাদদাতা হইয়া আসেন। উক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহার ডেস্প্যাচ বা পত্র সিপাহী যুদ্ধের বিভিন্ন দিকের বহু জট খুলিয়া দিয়াছে। সরকারী ডেস্প্যাচেও, কর্তৃপক্ষের মতামত প্রকাশিত হইলেও, অনেক বিষয়ের নির্দেশ বা বর্ণনা যে থাকে তাহা বলাই বাহুল্য।

দিনলিপি বা রোজনামচা এবং আত্মজীবনীর কথা একটু বলি। দিনলিপিতে প্রতিটি দিনের ঘটনা, ব্যক্তিগত মন্তব্য সমেত, সাধারণত লেখা হইয়া থাকে। ইহাতে অনেক সময় পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের কথা এরূপ থাকে যে, তাহা প্রকাশ করা উত্তরপুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। একারণ হয়ত দিনলিপিগুলি অমুদ্রিত অবস্থায় থাকিয়া অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গত শতাব্দীর বিখ্যাত নেতা রামগোপাল ঘোষের এবং তাঁহার বন্ধু রাধানাথ শিকদারের দিনলিপির সন্ধান পাইয়া আমি প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে রামগোপালের দৌহিত্রের নিকট যাই। তিনি এ দুইখানির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও আমাকে দেখিবার সুযোগ করিয়া দেন নাই। তবে রাধানাথ শিকদারের দিনলিপির ভিত্তিতে তিনটি প্রবন্ধ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'আর্যদর্শন' মাসিকে বাহির হইয়াছিল। তাহা হইতে এমন বহু তথ্য পাওয়া গিয়াছে যাহা অন্যত্র পাইবার উপায় ছিল না। রামতনু লাহিড়ীর দিনলিপি এক খন্ড দেখিয়াছি। এখানি তাঁহার বার্ধক্যে—শেষ জীবনে লেখা। ইহাতে বিশেষ কিছু পাই নাই, তবে দুই-একটি কথা, যেমন—'Derozio, O my Guru' প্রভৃতি কথা হইতে হিন্দু কলেজের ছেলেরা ডিরোজিওকে কতখানি মান্য করিতেন তাহা বুঝা যায়। রাজনারায়ণ বসুর দিনলিপি এক খন্ড একবার মাত্র দেখিয়াছি তাঁহার দূরসম্পর্কীয় এক কুটুম্বের নিকটে। দ্বিতীয়বার দেখিতে চাহিলে তিনি আমাকে ইহা আর দেন নাই। পরে শুনিয়াছি, ইহাতে নাকি অনেক 'অবাঞ্ছিত' কথা ছিল! সদ্যপরলোকগত অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের পিতা অধ্যক্ষ কৈলাসচন্দ্রের দিনলিপি বহু খণ্ডে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। দীনেশচন্দ্র একদা ইহা হইতে কিছু কিছু আমাকে পড়িয়া শোনান। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের বহু অজ্ঞাত বা স্বল্পজ্ঞাত বিষয় ইহা হইতে জানা যায়। ইতিহাসের আকর হিসাবে দিনলিপির মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আত্মজীবনীতেও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় বিস্তর থাকে, কিন্তু সমসাময়িক ঘটনা, সামাজিক সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং কখন কখন ধর্মসম্বন্ধীয় এত সব বিষয় থাকে যাহা ঐ যুগের জাতীয় ইতিহাস রচনায় বিশেষ সহায় হয়। এইখানে কয়েকখানি আত্মজীবনীর মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত থাকিব, যথা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, রাজনারায়ণ বসুর আত্মজীবনী, শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত এবং বিপিনচন্দ্র পালের ইংরেজী আত্মজীবনী (১৯০০ সন পর্যন্ত)। পাল মহাশয়ের "আমার সত্তর বৎসর"-এও (প্রবাসীতে ক্রমশ প্রকাশিত) সমসাময়িক বাঙালী জীবনের এক বিশেষ দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছে।

এপর্যন্ত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত দুইটি আকরের কথা বলিয়াছি। এখন একটি মুদ্রিত আকরের কথা বলিব। ইহার গুরুত্ব মাত্র অল্পকাল পূর্বে উপলব্ধ হইয়াছে। ছাপাখানার দৌলতে এটি সম্ভব হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনায় ইহা আদৌ সম্ভবপর ছিল না। ইহা হইল সে যুগের পত্র-পত্রিকা। ইউরোপে, বিশেষত ব্রিটেনে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে পত্র-পত্রিকা মুদ্রণ সুরু হয়। ইহার ফলে ইউরোপে যে সব বিদ্রোহ, বিপ্লব বা আন্দোলন হয় তাহার ইতিহাস রচনা অত দ্রুত সম্ভব হইয়াছে। একজন মনীষী বলিয়াছেন, "লন্ডন 'টাইমস্'-এর ফাইল না দেখিলে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস রচনা আদৌ সম্ভব নয়। এই উক্তির মধ্যে যে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে তাহা অবশ্য স্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে আর একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের একটি মূল্যবান্ উক্তির কথাও স্মরণ হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের সত্যিকার ইতিহাস লিখিতে

আধুনিক চশমা ও Zeiss B/L পাথরের জন্য
দি কুমিল্লা অপটিক হাউস
২৫৬এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

হইলে ব্রিটিশ মিউজিয়মে গিয়া বসিতে হয়। এ উক্তির যাথার্থ্য তো রমেশচন্দ্র দত্ত অনেকটা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। যাক্ সে কথা।

সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ-স্বরূপ। সমাজে, রাষ্ট্রে যখন যাহা ঘটে ইহাতে তাহার ছাপ প্রতিফলিত হয়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র উদ্দেশ্যপত্রে এই মর্মে লিখিয়াছিলেন শিশির-কুমার ঘোষ। বর্তমানকালে অবশ্য একথা তেমন খাটিবে না, কেননা, এখন দল প্রবল; বিরুদ্ধ দলের সংবাদপত্র একই ঘটনাকে বিকৃত করিয়া প্রায়শ প্রকাশ করিয়া থাকে। একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতেছি। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সভা হইল। পরদিন একখানি সংবাদ-পত্র লিখিলেন, সভায় লোক হইয়াছিল পাঁচ হাজার; আর একখানি লিখিলেন এক হাজার; তৃতীয়খানি লিখিলেন—দু' শ'। কাহার কথা মানিব? ভাবী ঐতিহাসিক বন্ধুরা সত্য নির্ণয় করিতে গিয়া কতখানি বিপদে পড়িবেন একবার ভাবিয়া দেখুন! সেযুগেও দল ছিল, মতানৈক্য ছিল, কিন্তু এত বাড়াবাড়ি ছিল না। কাজেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসকারের পক্ষে ঐ সময়কার পত্র-পত্রিকা তথ্যের আকর হইয়া আছে। সেদিন এক ইতিহাসের অধ্যাপক সেযুগের সংবাদপত্রের উক্তি যে প্রামাণিক নয় তাহার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত দুর্দশাগ্রস্ত সুতাকাটুনীদের পক্ষে জনৈক শান্তিপুর নিবাসিনীর পত্রের উল্লেখ করেন। এ পত্র মহিলার লেখা নয়—তাঁহার দৃঢ় মত। এখানে পত্রখানির লেখক মহিলা কিনা তাহা বিবেচ্য নয়, কেননা উহা নিতান্তই গৌণ; পত্রখানির মর্ম যুক্তিসহ এবং তথ্যানুগ কিনা তাহাই বিবেচ্য। গত শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে বিলাতী বস্ত্র ও সুতা এদেশের বাজারে খুব আমদানী হইতে থাকে। ইহার ফলে তাঁত ব্যবসায়ের সবিশেষ হানি হয়, সুতাকাটুনীদেরও দুঃখ দৈন্যের অন্ত ছিল না; আর এই সুতাকাটুনীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন নারী। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। ঐ সময়ের শিল্প-বিপ্লবের আলোচনাকালে বহু গবেষক একথা বলিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ হইতেই এদেশে পত্র-পত্রিকা ছাপার হরফে প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রথম পত্রিকার সম্মান প্রাপ্য হিকির 'বেঙ্গল গেজেট'-এর। ইহার পর ক্রমে ক্রমে আরও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। 'বেঙ্গল হরকরা', 'ক্যালকাটা মান্থলি জর্ণাল', 'ক্যালকাটা গেজেট', 'গবর্ণমেণ্ট গেজেট', এইরূপ আরও কয়েকখানি। এ সকল সংবাদপত্র হইতে একখানি সংকলন-পুস্তক বাহির করেন ডব্লিউ ডব্লিউ সীটন-কার। এখানিও মনে হয় প্রথম সংকলন-পুস্তক। দ্বিতীয় স্থানের গৌরব প্রাপ্য লণ্ডনস্থ 'এসিয়াটিক জর্ণাল' হইতে প্রকাশিত একখানি গ্রন্থের। লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হইলেও এই পত্রিকাখানি প্রাচ্য খণ্ডের (কাজেই ভারতবর্ষেরও) নানাবিষয়ক আলোচনায় পূর্ণ থাকিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে আরও কয়েকখানি সংবাদপত্রের উদয় হয়। ইহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকখানির মাত্র নামোল্লেখ করি, যথা—'ক্যালকাটা জর্নাল', 'জনবুল' (পরে 'ইংলিশম্যান'), 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'বেঙ্গল হেরাল্ড', 'ক্যালকাটা কুরিয়ার', 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া' (পরে 'ষ্টেট্সম্যানে'র সঙ্গে যুক্ত), 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সার', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'সিটিজেন', 'মর্ণিং ক্রনিক্ল', 'বেঙ্গলী', 'ইণ্ডিয়ান মিরর' ও 'ন্যাশনাল পেপার'। বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'সমাচার দর্পণ', 'সম্বাদ কৌমুদী', 'সমাচার চন্দ্রিকা',

'সংবাদ প্রভাকর', 'সম্বাদ ভাস্কর', 'সোমপ্রকাশ', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'সুলভ সমাচার'। 'জ্ঞানান্বেষণ' এবং 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক পত্রিকা। অমৃতবাজার পত্রিকা প্রথমে বাংলা, পরে বাংলা-ইংরেজী এবং সর্বশেষে সম্পূর্ণ ইংরেজী সংবাদপত্রে পরিণত হয়। এই সকল পত্রিকার কোন কোনটির ফাইল মোটেই পাওয়া যায় না। কয়েকটির কিছু কিছু পাওয়া যায়; সাধারণত ইংরেজী কাগজগুলির ফাইল বেশির ভাগই সংরক্ষিত আছে। মুখ্যত 'সমাচার দর্পণ' হইতে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' দুই খণ্ডে সংকলন করিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধ লেখক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রথম তিন বৎসরের ফাইল হইতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' (প্রথম খণ্ড) নামে সংকলন করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'সুলভ সমাচার' ভিত্তিক সংকলন পুস্তকখানিরও এখানে উল্লেখ করিতেছি। সমসাময়িক ইংরেজী সংবাদপত্রসমূহ হইতে রামমোহন রায় সংক্রান্ত বিস্তর তথ্য সংকলিত একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন ডক্টর যতীন্দ্রকুমার মজুমদার। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' হইতে ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং 'বেঙ্গলী' ও 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশিত প্রখ্যাত সাংবাদিক গিরীশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলী সংগ্রহ করিয়া শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ যথাক্রমে দুইখানি সংকলন-পুস্তক বহু পূর্বে বাহির করিয়াছিলেন। পত্র-পত্রীগুলির এই সংকলন-পুস্তকগুলিও আংশিক আকর-স্বরূপ।

আংশিক বলিয়াছি এইজন্য যে, সংকলন-কার্যে সংকলকের ব্যক্তিগত শিক্ষা, রুচি এবং মতামতের কতকটা প্রাধান্য ঘটিয়া থাকে, যেমন সীটন-কারের গ্রন্থে হইয়াছে। আবার কোন কোনখানি সংবাদবহুলও নয়; সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বা রচনার সমষ্টি। ইহা হইতে আশানুরূপ তথ্য সংগ্রহ আদৌ সম্ভব নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর সংবাদপত্রগুলি কতখানি আলোকপাত করে বলিয়া শেষ করা যায় না। শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, শাসন ব্যবস্থা, অর্থনীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি নানা বিষয়ের আকর বা নির্দেশ পাওয়া যায় এই সকল পত্র-পত্রিকায়। আবার এমন সব আলোচনা বা বিবরণ ইহাতে, বিশেষত বাংলা সংবাদপত্রে আছে যাহাতে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এদেশে সরকারী ও বেসরকারী ইউরোপীয়দের মধ্যে একটা বিরুদ্ধ ভাব প্রবল ছিল। বেসরকারী ইংরেজ সম্পাদিত ও পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি রাজনীতিক্ষেত্রে 'অপোজিশন' (বা ন্যায়ানুগ বিরুদ্ধ দল)-এর কার্য করিত। সরকারের সমালোচনার জন্য তাঁহাদিগকে যথেষ্ট ত্যাগস্বীকার করিতে হইত। 'ক্যালকাটা জর্ণাল'-এর সম্পাদক 'জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম' নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হন; এদেশে বসিয়া রাজা রামমোহন রায় সরকারী আইনের প্রতিবাদে নিজ ফার্সী পত্রিকা বন্ধ করিয়া দেন। এই কার্যের মধ্যে রাজনীতিক্ষেত্রে যে জাতীয় মনোভাবের শুরু, তাহা ক্রমশ বর্ধিত হইয়া স্বাধীনতা আন্দোলনের আকার ধারণ করে। স্বাধীনতা আন্দোলনের আনুপূর্বিক ইতিহাস-রচনায় প্রধান আকর সে যুগের সংবাদপত্র। দুইটিমাত্র উদাহরণ দিতেছি। গত শতাব্দীর মধ্যভাগের নীল-আন্দোলন সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর ফাইল অবশ্য পঠিতব্য। পরে, 'সরকারী কমিটি-কমিশন এ উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু গোড়ায় নীল আন্দোলন যেরূপ ব্যাপক আকার ধারণ করে তাহা পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায়ই পরিব্যক্ত হইয়াছে। সিপাহী যুদ্ধের যথাযথ বিষয়ও ধারাক্রমে ইহাতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় উদাহরণ—'হিন্দু মেলা'। এই মেলাকে 'জাতীয় মেলা' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। জাতীয়তাবোধের উন্মেষে ইহার কৃতিত্ব যে কত তাহা এক কথায় কি বলিব? এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির আনুপূর্বিক ইতিহাস জানিতে হইলে সে যুগের পত্র-পত্রিকার আশ্রয় লইতেই হইবে।

শুধু রাজনীতি নয়, মনুষ্য জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধেও ইহাতে নানা তথ্য সংরক্ষিত আছে। একটু আগে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। নিজের কার্যক্রম হইতে এখানে দুই একটি কথা বলি। এক সময় বিখ্যাত পার্শী ধনী ও দানবীর রুস্তমজী কাওয়াসজীর জীবনী আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। তখন বহু বৎসরের 'ফ্রেন্ড-অফ্ ইণ্ডিয়া'র ফাইল ধারাবাহিকভাবে দেখি। তখন উপলব্ধি করিয়াছি, একটি বিষয়ের অনুসন্ধানে রত থাকিলেও সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিকের আলোচনায়ও ইহা কত অপরিহার্য। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারতবর্ষীয় সভার প্রথম পঁচিশ বৎসরের ইতিহাস লেখার কাজে কয়েক বৎসর পূর্বে হাত দিয়াছিলাম। সভার প্রথম দশ বৎসরের বাৎসরিক রিপোর্ট ও কাগজপত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সংবাদপত্র হইতে তথ্য সংগ্রহে লাগিয়া গেলাম। 'ন্যাশনাল লাইব্রেরি'তে সে যুগের ইংরেজী সংবাদপত্র প্রায় সবই সংরক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু ধারাবাহিকভাবে খুব কমই পাওয়া যায়। এই দশ বৎসরের তথ্য সংগ্রহ করিতে গিয়া ইংরেজী বাংলা বহু সংবাদপত্রের শরণ লইতে হয়। 'বেঙ্গল হরকরা', 'ইংলিশম্যান্', 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার', 'সিটিজেন', 'মর্ণিং ক্রনিকল্', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'সংবাদ প্রভাকর' প্রভৃতির উল্লেখ করিতেছি। রুস্তমজী কাওয়াসজীর বেলায় যেমন দেখিয়াছি, এ সময়ও সেইরূপ, বরং

শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকারের
রচনার পরিমাণ যেমন বিস্ময়কর, তেমনই নানা বিচিত্র বিষয়ে তাঁহার দখলও অসামান্য। বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে তাঁহার লেখনীর অবাধ সঞ্চরণের ক্ষমতা দেশের জ্ঞানী-গুণী সমাজের মনোযোগ বিশেষভাবেই আকর্ষণ করিয়াছে।
তাঁহার লিখিত
৩৬টি গল্পের সংকলন
গল্প সংগ্রহ
মূল্য ঃ পাঁচ টাকা
গল্পগুলির পটভূমি নির্বাচনেও তাঁহার বৈচিত্র্যপ্রীতি লক্ষণীয়। বাংলা ও বাংলা দেশের বাহিরের নানা ধরণের পরিবেশ তাঁহার গল্পে স্থান পাইয়াছে।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯

আমাদের ধুতি ও শাড়ী সকলেরই আদরনীয়
এবং মূল্য অপেক্ষাকৃত সস্তা।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
বিদ্যাসাগর কটন মিলস লিমিটেড
সোদপুর (২৪ পরগণা)
—সিটি অফিস—
১১নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তার চেয়ে বেশী প্রত্যক্ষ করি—বাঙালী-জীবন তখন কত কর্মচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। রাজনীতি ত জীবনের অতি সামান্য অংশ জুড়িয়া আছে। মানুষ প্রতিদিন উন্নতির কত দিকে ঘা মারিতেছে। শিক্ষা, বাংলা-শিক্ষা, সংস্কৃতচর্চা, আলোচনা-গবেষণা, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, পুস্তক প্রণয়ন, সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা, শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন—কত দিকে বাঙালী জাতি কখন ইউরোপীয়দের সহযোগে,, কখন-বা স্বাধীনভাবে, অগ্রসর হইয়াছে। ইহা ত মাত্র একটি দশকের কথা বলিতেছি। ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম দশকেও এই প্রাণ-চাঞ্চল্য সমানে চলিয়াছে। তাহার ছাপ পত্র-পত্রিকারূপ জর্ণালে পরিস্ফুট হইয়াছে। দৃষ্টান্ত বাড়াইব না। না হইলে সাময়িকপত্র—যেমন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বামাবোধিনী পত্রিকা, মধ্যাস্থ প্রভৃতি হইতেও যে কত তথ্য প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা বলিতে পারিতাম। পত্র-পত্রিকা ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস-রচনার একটি অমূল্য আকর, সন্দেহ নাই।

গত শতাব্দীর জাতীয় ইতিহাসের পক্ষে আর একটি আকর সম্পর্কে এখানে বিশেষ ভাবে কিছু বলিতেছি। ইহা হইল 'পার্লামেণ্টারী পেপার্স'। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে পার্লামেণ্টের বিধি অনুযায়ী প্রতি কুড়ি বৎসর অন্তে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে জবাবদিহি করিতে হইত। পার্লামেণ্ট এ নিমিত্ত কমিটি কমিশন বসাইয়া শাসন সংক্রান্ত নানা তত্ত্ব-তল্লাস লইতেন, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে সাক্ষ্য আহ্বান করিতেন। রাজা রামমোহন রায় ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এইরূপ লিখিত সাক্ষ্য পার্লামেণ্ট-নিযুক্ত কমিটির নিকট পেশ করিয়াছিলেন। ১৭৭৩, ১৭৯৩, ১৮১৩, ১৮৩৩ এবং ১৮৫৩ সনে কোম্পানির সনন্দ নূতন করিয়া প্রদত্ত হয়। প্রত্যেকবারেই কমিটি নানা বিষয়ে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করেন। তাঁহাদের রিপোর্ট ও সাক্ষ্যাদি দ্বারা যেসব দলিলপত্র সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে এক কথায় 'পার্লামেণ্টারী পেপার্স' বলা হয়। কোম্পানির আমলে ভারতবাসীর অর্থনীতিক অবস্থা, রাজ-নৈতিক অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য নানা বিষয়েই আলোচনা হইত। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের বহু নির্দেশ, বিস্তর তথ্য উহাতে মিলিত। ভারতবর্ষ-শাসনে ভারতবাসীর অধিকার বিষয়ক একখানি দলিলের মাত্র এখানে উল্লেখ করিব। ১৮৫৩ সনে কোম্পানির সনন্দ আইন বিধিবদ্ধ হইবার প্রাক্কালে কলিকাতাস্থ ভারতবর্ষীয় সভা হাউস্ অফ কমন্স এবং হাউস অফ্ লর্ডস-এ একটি সুদীর্ঘ আবেদন-পত্র পাঠান। এই আবেদনপত্রে শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় আলোচিত হয় এবং সর্বশেষে এই কথা বলা হয় যে, ভারতীয় আইনসভার দুই-তিন তৃতীয়াংশ ভারতবাসী না হইলে শাসনে নিজ অধিকার বহাল হইবে না। ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এই আবেদনপত্রখানি এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ইহার ব্যবহার ব্যতিরেকে কোনো ইতিহাসই সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

ঊনবিংশ শতাব্দী সমগ্র জগতেই একটি বিশেষ গৌরবময় যুগ। ষোড়শ শতাব্দীও নানাদিক দিয়া গৌরবের দাবি রাখে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাবসমৃদ্ধি এবং কর্ম-চাঞ্চল্যের নিকট উহা একেবারেই ম্লান হইয়া যায়। ভারতবর্ষ পরাধীন হইলেও ইহার আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া আসে এই শতাব্দীতে। রাজা রামমোহন রায় হইতে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত বহু ধর্মপ্রবর্তক সমাজ-সংস্কারক, চিন্তানায়ক, কবি, দার্শনিক, সাহিত্যসেবী ও বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় হইল। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিভাগে কর্ম-তৎপরতা দেখা দেয়। ইহার ছাপ স্পষ্টতই পড়িয়াছে সমসাময়িক সাহিত্যে, পত্রপত্রিকায়, বই, পুথিতে। বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টাসমূহ জাতিকে সঞ্জীবিত ও কর্মতৎপর করিয়া তোলে। এই সকল বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, অর্থাৎ গত শতাব্দীর বাঙালীর নবজাগরণের কাহিনী রচনা করিতে হইলে প্রত্যেক রচনা-প্রয়াসীর মূলে যাইতে হইবে। অর্থাৎ ইতিহাসের আকর বা উপাদান যথা-সম্ভব আয়ত্ত করিতে হইবে। এই আকর বা উপাদানগুলির কিছু কিছু উল্লেখ এখানে করা হইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন কোন গ্রন্থ বা ঘটনারও উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। জাতীয় জীবনের বিপুল প্রয়াস সম্পর্কে আকর-ভিত্তিক ইতিহাস-রচনা কোন এক ব্যক্তির কর্ম নয়, তিনি যতই শক্তিশালী ও প্রতিভাশালী হউন না কেন। এজন্য একদল ইতিহাস-কর্মী চাই। রাধানাথ শিকদার সম্পর্কে ডক্টর ফিলিমোরের অনুসন্ধিৎসা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। আমার একটি প্রবন্ধের উপরে কত রাজ্যের প্রশ্নই না তিনি করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুসন্ধিৎসা প্রত্যেক ইতিহাস-রচয়িতার মুখ্য ধর্ম হওয়া উচিত।

দিনাজপুর জেলায় বর্তমান সময়ে সাঁওতাল আছে ৯৪,৯১০ জন। ইহার মধ্যে পুরুষ ৪৮,৫৮২ এবং নারী ৪৬,৩২৮ জন। ওরাও' এবং মুণ্ডাও বাস করে এই জেলায়। ওরাও'এর সংখ্যা ২০,৬৭৪; এবং মুণ্ডার ৮,৩৭৪ জন। ওরাও'এর মধ্যে নারীর সংখ্যাই অধিক; এবং মুণ্ডার সমাজে নারীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যা প্রায় এক হাজার বেশী। মেদিনীপুর জেলার পরেই এই জেলাতে সাঁওতাল ওরাও প্রভৃতির আধিক্য।

এই জেলাতে ইহাদিগের মোট সংখ্যা ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ছিল ৭৪,৫০১; ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ১০৯,৬২০; ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ১২০,২১১; ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ১৩০,৩২৮ এবং ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ১২৩,৯৫৮।

১৮৮১ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই দিনাজপুর জেলায় সাঁওতালের সংখ্যা বাড়িয়াছে। অবশ্য, তখন সাঁওতাল বলিতে সাঁওতাল, ওরাও, মুণ্ডা সকলকেই বুঝাইত। ইহারা সকলেই সাঁওতাল পরগনা হইতে মালদহ জেলার ভিতর দিয়া দিনাজপুর জেলায় আসিয়াছিল। ১৯১১ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সংক্রামক ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের জন্য ইহাদের সংখ্যা কিছু হ্রাস পায়। এবং তাহার পর হইতে পুনরায় সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

জেলার মোট জনসংখ্যার তুলনায় পূর্বে সাঁওতালদের অনুপাত ছিল ৭%; এখন হইয়াছে প্রায় ১৭%।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে একজন ইংরেজ খাসমহাল অফিসারের চেষ্টায় প্রথম সাঁওতালরা দিনাজপুরে আসে। ইহারা প্রথমে জঙ্গলা অনাবাদী স্থানে আসিয়া বাস করে। জমির মালিকের হুকুম লইয়া জঙ্গল পরিষ্কার করে, জমি আবাদ করে। কিছু-দিন পরে খাজনা দাবি করিলেই তথা হইতে উঠিয়া পুনরায় বিনা খাজনার অনাবাদী জমি চাষ করিবার চেষ্টা করে। প্রথমে অবশ্য দলবদ্ধ হইয়া মণ্ডলের মারফত খাজনা দেয়। ইহাদের চেষ্টায় এই জেলার অনাবাদী জমির পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া আসিয়াছে। জঙ্গল পরিষ্কার হইয়াছে, কৃষির উন্নতি দ্রুত হইয়াছে।

ইহারা যখন প্রথম এই জেলায় আসে তখন দক্ষিণ অংশেই বসবাস করিয়াছিল। এখন জেলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণ অংশে বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ, বংশীহারিতে শতকরা ২০ জনের বেশী সাঁওতালের বাস। তপনে শতকরা ১০ হইতে ২০ জনের বাস। পশ্চিমে সব স্থানেই সাঁওতালের সংখ্যা ৫% হইতে ১০%। একমাত্র হেমতাবাদে ৫%। গঙ্গারামপুরে নাই।

ঘরবাড়ির গড়নে, পোশাক-পরিচ্ছদে, খাদ্যে, শিকারপ্রিয়তায়, নৃত্যগীতে সাঁওতালেরা এখনও নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে। ইহারা থাকেও ভিন্ন পাড়ায়। বাঁশের বাঁশির তান, মহিষের গলার ঘণ্টার টুং-টাং, মাদলের বাজনা কানে আসিলেই বুঝিলাম, সাঁওতালপাড়ায় আসিয়াছি। কাছাকাছি একই কৃষি-বৃত্তিতে থাকিয়া সাঁওতালের জীবন আনন্দময়, আর স্থানীয় বাঙালী কৃষকদের জীবন কাটে গম্ভীর পরিবেশে।

রাজবংশী মেয়েদের চেয়ে সাঁওতাল মেয়েরা বাহিরে চলাফেরা করে বেশী। সাঁওতাল মেয়েরা দূরের হাটে মাঠে যতটা যায়, রাজবংশী মেয়েরা ততটা পছন্দ করে না।

এই জেলায় এখনও সাঁওতালদিগের বড় উৎসব "পৌষনা পরব", ফাগুয়া ও চৈত্র পরব। নূতন শস্য উঠিবার পর পৌষনা পরব হয়। পচাই পান ও নাচগান সকল পর্বেরই অঙ্গ। পরবের দিন মেয়েরা খোঁপায় ফুল গুঁজিয়া এক কাঁধের উপর আঁচল ফিরাইয়া বুক ঢাকিয়া কোমরে বাঁধে। হাতে ও পায়ে পরে রূপার অলঙ্কার একে অপরের হাত জড়াইয়া অর্ধচক্রাকারে তরঙ্গের গতিতে মাদলের তালে তালে নাচে।

ভিন্ন সমাজের আওতায় থাকিয়া ইহারা এখনও সাঁওতাল জীবনের বড় সম্পদ সত্য ও সরলতা হারায় নাই। নিজেদের রীতি-নীতি, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখিয়াছে।

স্থানীয় সমাজের সহিত তাহাদের বিবাহ এখনও হয় নাই।

বাঙালীর জীবন যে সাঁওতালকে একেবারে প্রভাবিত না করিয়াছে তাহা নয়। তাহাদের উপর প্রভাব সবচেয়ে আগে নজরে পড়ে। বাঙালীর বাঁশিও তাহারা বাজায়। অবশ্য মাতৃভাষা ছাড়ে নাই। তবে ইহাদের ভাষার শব্দসম্পদ, পরিচ্ছন্নতা ও সহজ জীবনের ছোঁয়াচ যে স্থানীয় বাঙালী সমাজে লাগিতেছে তাহার আঁচও পাইতেছি। দুই তিন পুরুষের প্রবাসী সাঁওতাল দেখিয়া বুঝিতেছি, এখানে বসবাসের ফলে তাহাদের স্বাস্থ্যের বা অঙ্গের গড়নের বিশেষ কোনও পরিবর্তন না হইলেও ক্রমশ পার্থক্য কমিয়া আসিতেছে। দিনাজপুরপ্রবাসী সাঁওতাল-দিগের উপর বাঙালীর সংস্কৃতির জয় দেখিতেছি দুই-তিন পুরুষেও সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই।

য়ুরোপের পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, সাঁওতালগণ অ্যানিমিস্ট, অর্থাৎ প্রকৃতি-পূজক।

শ্রীযুক্ত গেইট্ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের আসাম সেন্সাস' রিপোর্টে অ্যানিমিস্টদের ধর্মবিশ্বাস আলোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, "একজন সর্বশক্তিমান জীবের উপর তাহাদের একটা ভাসা-ভাসা অথচ সাধারণ বিশ্বাস আছে। সেই সর্বশক্তিমান মানুষের কল্যাণকামী। সুতরাং তাঁহার পূজার আবশ্যকতা নাই। তাঁহার নীচেই কতকগুলি প্রেতাত্মা আছে, যাহারা মানুষের কল্যাণ দেখিতে পারে না। তাহাদের প্রভাবেই মানুষের যত দুঃখকষ্টের সৃষ্টি। পূজা ও বলি দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখা দরকার। তাহারাই বৃক্ষের, পর্বতের, ঝরনার ও পূর্বপুরুষদের আত্মা।"

দিনাজপুরের সাঁওতাল, ওরাও মুণ্ডা-দিগের ধর্মবিশ্বাস বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহাদিগকে আর অ্যানিমিস্ট বা অহিন্দু বলা যায় না।

শুধু দিনাজপুর কেন, সারা ভারতেই আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহাদিগকে অ্যানিমিস্ট ছাপ দিয়া হিন্দুর গণ্ডীর বাহিরে রাখা যুক্তিযুক্ত কিনা তাহা ধীরভাবে পুনর্বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে। অনুরূপ বিশ্বাসের বহু নর-নারী যদি হিন্দু নামে পরিচিত হয়, তাহা হইলে আদিবাসীর অপরাধ কী? এই বিভেদের পশ্চাতে বিদেশী শাসনের দুরভি-সন্ধি থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু, তাই বলিয়া স্বাধীন ভারতবাসী সত্যপ্রতিষ্ঠায় বিমুখ থাকিবে কেন?

দিনাজপুর জেলায় সাঁওতালদিগের মধ্যে হিন্দু, আদিম প্রকৃতি-পূজক ও খৃষ্টধর্মী এই তিনই আছে।

	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
হিন্দু	২০,০০৪	৩১,২৬২	৭৭,৬৮৫
আদিম (প্রকৃতি-পূজক)	৮৯,৬১৬	৮৮,৯৮৯	৪৮,৮৮৭
খৃষ্টধর্মী	৬২৪	......	৩,৭৫৬

সমারির হিসাব হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ২০ বৎসরে এই জিলায় হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত সাঁওতালের সংখ্যা বাড়িয়াছে প্রায় তিনগুণ। সাঁওতাল পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুঝিতেছি যে, সাঁওতাল-দিগেরও আকাঙ্ক্ষা হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত থাকা। তাই তাহারা 'হরম মাঝি'র (দলের পূর্ব-পুরুষ) পূজা করে, আবার কালীপূজাও করে।

অনেক বৎসর আগে শ্রীকাশীশ্বর চক্রবর্তী নামে এক ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত প্রভাবে এই জিলায় প্রায় ৭।৮ শত ঘর সাঁওতাল "সত্যং শিবং সুন্দরম্" মন্ত্র গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়াছিল। বৎসরে একবার তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া কালীপূজা করিয়া থাকে। যাহারা এই মন্ত্র গ্রহণ করে নাই তাহাদিগেরও বিশ্বাস যে, তাঁহারা হিন্দুসমাজের লোক। এই ব্যক্তিগত মিলনের ফলে সাঁওতালদিগকে খৃষ্টধর্মী করিবার বাধা হইয়াছে কিনা ঠিক বুঝিতেছি না। হওয়াটা অসম্ভব নয়।

আর একবার দেখিয়াছি, হিলিতে শুদ্ধি-যজ্ঞ করিয়া হাজার হাজার সাঁওতালকে হিন্দু করা হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে খৃষ্টান সাঁওতালও ছিল। এতগুলি নরনারী যখন হিন্দুধর্মের বা সমাজের আওতায় থাকিতে চায়, তখন জননেতাদিগের এই বিষয়ে কি কোন কর্তব্য নাই? শুধু শুদ্ধিযজ্ঞ করিয়া হিন্দু করিলেই চলিবে না। এই নবহিন্দু-দিগের জীবনে আর্থিক বনিয়াদ যদি পাকা না হয়, হিন্দুসমাজে তাহারা যদি সমান অধিকার না পায়, তাহা হইলে খৃষ্টান মিশনের অধিকারসাম্যের ও অর্থের হাতছানি তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিবে না কি? বাংলার সীমান্তের স্থানগুলি ঘুরিলে এই সমস্যাই বড় হইয়া চোখে পড়ে। আদিমের সহিত বাঙালীর সাহচর্য, সহযোগিতা আর উপেক্ষা করা যায় না।

তাই অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয় বলিয়াছিলেন, "যে সকল শক্তির দৌলতে জাতি গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার ভিতর আদিম নরনারীর শক্তি অন্যতম। হাজারভুজা বাঙালী জাতির ইহারা একটা বড় ভুজ। ইহারা নাক-গুনতিতে আজও বেশী নয় বটে, কিন্তু ইহাদের শক্তি না পাইলে বাঙলার নরনারী আজ অনেক বিষয়েই খাটো ও দুর্বল থাকিতে বাধ্য। আজ উত্তরবঙ্গের জলপাই-গুড়ি হইতে শুরু করিলে দিনাজপুর, মালদহ, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়ার পথে মেদিনীপুর পর্যন্ত সোজা দক্ষিণে হাঁটিয়া আসিলে দেখিতে পাই, মুণ্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল-এর খেতখামার, আর ইহাদের সহিত তথাকথিত বাঙালীদের হাটেবাজারে লেনদেন। * * * আদিমেরা এক হিসাবে বাঙালী হিন্দুসমাজ দখল করিয়া বসিতেছে বটে, কিন্তু অপরদিকে বাঙালীর হিন্দুধর্মও আদিমসমাজে দিগ্‌বিজয় চালাইতেছে। * * * আদিম-বাঙালীতে সংমিশ্রণের ফলে একটা তাজা বাঙলার উদ্ভব হইতেছে।" "

গ্রাম: "কনকোর্ড"

ফোন: ৪৬—৩৮১৯
৪৬—১০৩৭

চ্যাটার্জি ব্রাদার্স
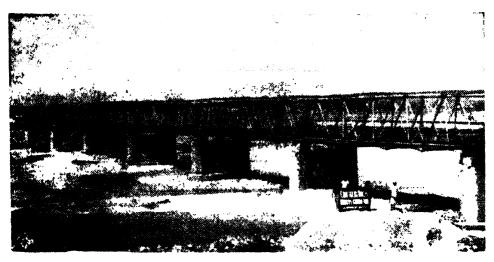
বিল্ডারস্ এণ্ড আর্কিটেকটস্
১৪/এ, প্রতাপাদিত্য রোড, কলিকাতা—২৬

আমাদের নির্মিত
চেল্ ব্রিজ (জলপাইগুড়ি) এন, এইচ ৩১
(শিলিগুড়ি-কুচবিহার রোড)

আমরা নির্মাণ করি:

* আর, সি, ব্রিজ
* আর, সি, ফ্রেমড্ স্ট্রাকচার
* আর, সি, ওয়েল ফাউণ্ডেশন
* আর, সি, পাইলিং ওয়ার্কস্
* ফ্যাক্টরি বিল্ডিংস
* সিনেমা হাউস

বাংলা নাটক ও নাট্যশালা

শ্রীপ্রভাংশু গুপ্ত

নাট্যশালার উন্নতি ও পুষ্টি ভাল নাটক ছাড়া হতে পারে না। নাট্যসাহিত্যে যে-সব দেশ এগিয়েছে, সে-সব দেশের নাট্যশালাও নাট্য-সাহিত্যের হাত ধরে সমান তালে সামনের দিকে চলেছে। এই সত্যটুকুই চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ে প্রতি দেশের নাট্যশালার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে। নাট্যসাহিত্যে যে-দেশ এগুতে পারেনি, নাট্যশালাও সে-দেশে পঙ্গুর মত চলেছে কোনগতিকে।

অবশ্য এ-কথা সত্য, নাটকের চরিত্রগুলি মঞ্চের উপর জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলতে গেলে প্রতিভাবান অভিনেতার ও কুশলী অভিনেত্রীরও দরকার। এ সম্বন্ধে যেমন কোন মতদ্বৈধ নেই, তেমনি এ-কথাও ঠিক যে, অভিনেতা প্রতিভাবান হলেও তিনি নিরেট ও নিকৃষ্ট নাটকে প্রাণ দিতে পারেন না। নাটক ও অভিনেতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একের বৈশিষ্ট্য ও গুণের অভাবে আর-একটা দিক নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার নিছক সাহিত্য হিসেবে নাটক পড়ে রস গ্রহণ করতে পারা যায় না।

নাট্যশালার দিক দিয়ে নাটক বড় না অভিনেতা বড়, এই তুলনামূলক আলোচনা আমার বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু বাংলার নাট্যশালার ক্রমোন্নতির পথে নাটকের, তথা নাট্যকারের অবদান সম্বন্ধে কিছুটা বলতে চাই।
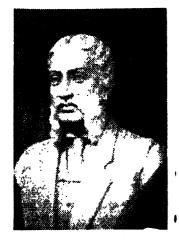
মহাকবি শ্রীমধুসূদন

১৭৯৫ সনে রুশীয় লেবেডেফ প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালার উদ্বোধনের দিন থেকে আরম্ভ হয় বাংলার নাট্যশালার আদিযুগ। কিন্তু ঐ রঙ্গমঞ্চ বাংলায় অভিনীত হলেও কোন মৌলিক বাংলা নাটক মঞ্চস্থ হয়নি। দুখানা ইংরেজী নাটকের অনুবাদ বাংলা নাটকে রূপান্তরিত করে মঞ্চে রূপ দেওয়া হয়েছিল। ১৭৯৫ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত বাংলার নাট্যশালা বলতে কিছু ছিল না। মৌলিক বাংলা নাটকের তখনও জন্ম হয়নি।

রামনারায়ণ তর্করত্ন

১৮৩১ সনে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা নাটকের অভাবে সেখানে ইংরেজী নাটক এবং সংস্কৃত নাটকের ইংরেজী অনুবাদ নাট্যাকারে রূপান্তরিত করে মঞ্চস্থ করা হয়।

প্রথম অভিনীত পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটক নন্দকুমার রায়ের "অভিজ্ঞান শকুন্তলা"। অভিনয়ের কাল ১৮৫৭ সন। তার আগে "বিদ্যাসুন্দর" নাটক অভিনীত হয়েছিল, কিন্তু ঐ "বিদ্যাসুন্দর" সমালোচকের দৃষ্টিতে নাটক হিসেবে পূর্ণাঙ্গ নাটক নয়। "অভিজ্ঞান শকুন্তলা" নাটকের রচনাকাল ১৮৪৫। এর আগে দু-চারখানা বাংলা নাটক লেখাও হয়েছিল এবং তা ছাপাও হয়েছিল, কিন্তু সেগুলির কোনটাই অভিনীত হয়নি। কাজেই সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

১৮৫৭ সন বাংলার নাট্যশালার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। কারণ ঐ বৎসরে "অভিজ্ঞান শকুন্তলা" মঞ্চস্থ হবার পর বাংলার বড় কোন নাট্যশালায় ইংরেজী নাটক অভিনীত হয়নি, কারণ মৌলিক বাংলা নাটক তারপর থেকেই ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগল। সেকালের কলকাতার প্রখ্যাত ধনী সাতুবাবুর বাড়িতে "অভিজ্ঞান শকুন্তলা"র অভিনয় হয়েছিল।

যে-সব নাটক রচিত ও মঞ্চস্থ হবার পর বাংলার নাট্যশালার রূপ বদলে যাচ্ছিল এবং নাট্যশালা এক-একটা ধাপ এগিয়ে যাচ্ছিল, আমি তারই সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

"অভিজ্ঞান শকুন্তলা" নাটকের পর নাট্যশালার দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাটক রামনারায়ণ তর্করত্নের লেখা "কুলীন কুলসর্বস্ব"। এইখানিকে বাংলার প্রথম সামাজিক নাটক বলা যেতে পারে। এর আগে রচিত নাটকগুলি সবই পৌরাণিক। এই নাটকের অভিনয় হয় প্রথম ১৮৫৮ সনের মার্চ মাসে।

এরপর যে দুখানি নাটক বাংলার নাট্যশালায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল,—সে দুখানি পৌরাণিক। নাট্যকার স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ। তাঁর প্রথম নাটক "বিক্রমোর্বশী"র অভিনয়-তারিখ ২৪শে নবেম্বর, ১৮৫৭। দ্বিতীয় নাটক "সাবিত্রী-সত্যবান"। বিদ্যোৎসাহিনী

মহাকবি গিরিশচন্দ্র

সোল এজেন্ট:—এম, এম, খাম্বাটাওয়ালা, আমেদাবাদ—১।
এজেন্ট:—সি, নরোত্তম এণ্ড কোং, বম্বে—২।
MPS
কলিকাতা—৯

রঙ্গমঞ্চে এ-দুখানি মঞ্চস্থ হয়েছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ শুধু নাটক রচনাই করেননি, এই নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তিনিই অগ্রগণ্য ছিলেন। তাছাড়া "বিক্রমোর্বশী" নাটকে তিনি স্বয়ং পুরুরবার ভূমিকায় কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন।

১৮৫৭ পর্যন্ত বাংলার নাট্যশালা যেটুকু অগ্রসর হল, তাতে নাট্যকার হিসেবে তিন-জনের দান অমূল্য। প্রথম নন্দকুমার রায়, দ্বিতীয় রামনারায়ণ তর্করত্ন এবং তারপর কালীপ্রসন্ন সিংহ।

এরপর ১৮৫৮ সনে বাংলার বিখ্যাত বেলগাছিয়া নাট্যশালার উদ্বোধন হয়। পাইকপাড়ার রাজাদের উদ্যানে এই নাট্যশালা স্থাপিত হয়েছিল। এই নাট্য-শালার ঐতিহাসিক মর্যাদা ও গুরুত্ব বড় কম নয়। কারণ সে-যুগের বহু বিশিষ্ট ও শিক্ষিত ব্যক্তি এই নাট্যশালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেকালের সমালোচক-দের মতে, "কি নাট্যশালার সাজসজ্জায়, কি গীতবাদ্যে, কি অভিনয়ে এরূপ সর্বাঙ্গ-সুন্দর নাট্যাভিনয় বাংলা দেশে কখনও দেখা যায় নাই।" এই নাট্যশালাতেই প্রথমে দেশীয় ঐকতান বাদন প্রবর্তন করা হয়েছিল।

ঐ মঞ্চে প্রথম নাটক অভিনীত হয়েছিল রামনারায়ণ তর্করত্নের "রত্নাবলী" নাটক। অভিনয়-তারিখ ১৮৪৮ সনের ৩১শে জুলাই। তৎকালীন পত্রিকা "হিন্দু পেট্রিয়ট" "রত্নাবলী"র ও ঐ নাট্যশালার ভূয়সী প্রশংসা করে মন্তব্য করেছিলেন, "যাঁহাদের দ্বারকানাথ ঠাকুর, মেরেডিথ পার্কার, হোরেস উইলসন, হেনরি টরেন্স এবং চৌরঙ্গী ও সাঁসুসি থিয়েটারের কথা স্মরণ আছে, তাঁহাদের নিকট ভারতীয় নাটকের পুনরভ্যুদয় ও বিশুদ্ধ আমোদের প্রতি অনুরাগ পুনঃ প্রতিষ্ঠার সংবাদ খুব আনন্দের বিষয় বলিয়া মনে হইবে।"

"রত্নাবলী" নাটক আরও একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। "রত্নাবলী" নাটকের অভিনয় দেখে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মনে নাটক রচনা করবার প্রেরণা আসে। ফলে রচিত হয় "শর্মিষ্ঠা"। ১৮৫৯ সনের ৬ই সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় "শর্মিষ্ঠা" অভিনীত হয়।

সে-সময়ে কলকাতার অলি-গলিতে শৌখিন নাট্য-সম্প্রদায়ের দল দেখা গিয়ে-

ভারত সরকারের নিযুক্ত চা-বাগানের সার সরবরাহকারী ও যাবতীয় ফসলের সুসম সার প্রস্তুতকারক।

অধিক ফসল ফলাইতে হইলে জমিতে সার প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন। আমাদের বহু পরীক্ষিত ধান, আলু, পাট ও অন্যান্য যাবতীয় ফসলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সার আপনার জমিতে প্রয়োগ করিয়া অধিক ফসল ফলাইয়া লাভবান হউন।

মূল্যতালিকা ও প্রয়োগ বিধির জন্য উপরোক্ত ঠিকানায় সত্বর খোঁজ করুন।

এ, তালুকদার এণ্ড কোং

(ফার্টিলাইজারস) প্রাইভেট লিঃ

১৫নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

ফোন নং : ২২—৭৭১২
টেলিগ্রাম : প্ল্যাণ্টলাইফ

(সি ৬১২৯)

ছিল এবং অভিনয়ের উপযোগী মৌলিক নাটকেরও দরকার হয়ে পড়েছিল খুব। ফলে দু-চারখানি ভাল নাটকও রচিত হয়েছিল। সে-সময়ে স্বনামধন্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মাইকেল মধুসূদনকে এক পত্রে লেখেন, "এক্ষণে দেশে নাট্যশালা ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিতেছে। দুঃখের বিষয় এগুলি বেশীদিন স্থায়ী হয় না। তবু এগুলি সুলক্ষণ বলিয়াই গণ্য করা উচিত: কারণ, ইহাদের দ্বারা বুঝা যায় যে, আমাদের মধ্যে নাটক সম্বন্ধে রুচির প্রসার হইতেছে।"

এরপরে উল্লেখযোগ্য নাটকখানি সামাজিক। উমেশচন্দ্র মিত্রের লেখা "বিধবা বিবাহ" নাটক। ১৮৫৯ সনের ২৩শে এপ্রিল মেট্রপলিটান থিয়েটারে এই নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল। স্বয়ং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই অভিনয় দেখে নাটকের ও অভিনয়ের বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৫ সনে ঐ নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয় "বিদ্যাসুন্দর"। বাংলা প্রহসন বা হাস্যরসাত্মক নাটকের জন্ম পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটারের দৌলতেই, একথা নিঃসন্দেহভাবে বলা যেতে পারে। পৌরাণিক নাটক ছাড়াও এই নাটাশালায় "যেমন কর্ম তেমনি ফল", "বুঝলে কিনা", "উভয় সংকট" ও "চক্ষুদান"—এই প্রহসনগুলি অভিনীত হয়েছিল। "বুঝলে কিনা" নাটকখানির রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। বাকী তিনখানি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচনা। অনেকের মতে এই তিনখানির নাটাকার রামনারায়ণ তর্করত্ন—কারণ রামনারায়ণের লিখিত আত্মকথায় জানা যায়, ঐ তিনখানি প্রহসন প্রস্তুত করে তিনি উক্ত রাজা বাহাদুরের নিকট যথাযোগ্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন।

এর পর জোড়াসাঁকোর প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটির নাট্যশালায় মাইকেল মধুসূদনের প্রহসন "একেই কি বলে সভ্যতা" অভিনীত হয়েছিল। অভিনয়-তারিখ ১৮৬৫ সনের ১৮ই জুলাই। মাইকেলের "কৃষ্ণকুমারী" নাটক ১৮৬৮ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারি ঐ নাট্যশালায় মঞ্চস্থ হয়েছিল। "কৃষ্ণকুমারী" বাংলার প্রথম ঐতিহাসিক নাটক।

ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকো থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ ১৮৬৫ সনের জুন মাসে সংবাদপত্রে বহুবিবাহ বিষয়ে একখানি ভাল নাটকের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। পরে এই নাটক রচনার ভার দেওয়া হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর। হিন্দু নারীদের দুরবস্থা এবং জমিদারের অত্যাচার—এই দুটি বিষয় সম্বন্ধে ভাল সামাজিক নাটকের জন্যও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। রামনারায়ণ বহুবিবাহ বিষয়বস্তু নিয়ে "নব-নাটক" রচনা করেছিলেন। ঐ নাটকের প্রথম অভিনয় ১৮৬৭ সনের ৫ই জানুয়ারী।

এর পর উল্লেখযোগ্য নাটক মনোমোহন বসুর "রামাভিষেক"। ১৮৬৮ সনে বহুবাজার থিয়েটারে নাটকখানি মঞ্চস্থ হয়েছিল। ঐ নাটককারের "সতী" মঞ্চস্থ হয় ১৮৭৪ সনের ৭ই জানুয়ারি।
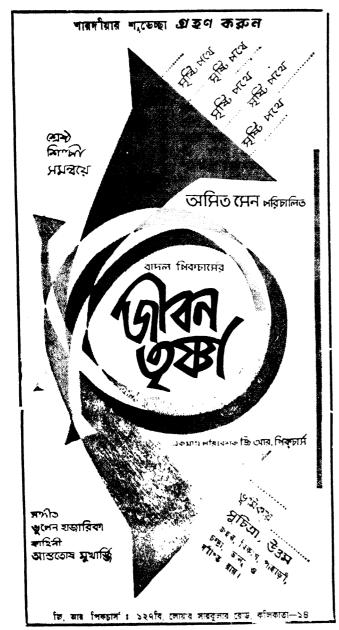
যে-সময়ের আলোচনা করছি, সে-সময়ে আর যে কয়েকখানি ভাল বাংলা নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছিল সেগুলি হল কালিদাস সান্যালের "নলদময়ন্তী", মাইকেলের "পদ্মাবতী", দীনবন্ধু মিত্রের "নবীন তপস্বিনী", "সধবার একাদশী" হরিমোহন কর্মকারের "জানকী বিলাপ"।

১৮৭২ সনে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ ন্যাশনাল থিয়েটারের পত্তন হয়। তার কিছু আগেই বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাগবাজারের শখের দল অভিনয় করেছিলেন দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" ও "জামাই বারিক"।

পেশাদার থিয়েটারের প্রথম যুগে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস নাট্যাকারে মঞ্চস্থ হয়েছিল। যেমন "কপালকুণ্ডলা"। অভিনয়ের তারিখ ১৮৭৪, ৭ই ফেব্রুয়ারি। এ ছাড়াও অভিনীত হয় "মৃণালিনী" ও "বিষবৃক্ষ"। নট ও নাট্যকার অমৃতলাল বসুর প্রথম নাটক "হীরকচূর্ণ" অভিনীত হয়েছিল ঐ রঙ্গমঞ্চেই। তারিখ ২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৭৫। এর আগে বেঙ্গল থিয়েটারে "দুর্গেশনন্দিনী" অভিনীত হয়। তারিখ ২০শে ডিসেম্বর, ১৮৭৩।

বাংলার নাট্যশালার প্রথম যুগের বিশিষ্ট নাট্যকারদের নাম রামনারায়ণ তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মনোমোহন বসু।

পেশাদারী থিয়েটারের প্রথম যুগে নাট্যশালার পরিপুষ্টি হয়েছিল নট ও নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের বহু নাটকের আশ্রয় নিয়ে। মৌলিক নাটকের অভাব তথা রঙ্গমঞ্চের চাহিদার জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। আজও "প্রফুল্ল", "বলিদান", "সিরাজদ্দৌল্লা", "জনা" নাট্যসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

এর পর নাট্যকার ডি এল রায়ের ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "সাজাহান" ও "মেবারপতন" এককালে নাট্যশালায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদের "প্রতাপাদিত্য", "আলিবাবা", "নরনারায়ণ" প্রভৃতি নাটক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নাট্যকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিমেয়। অনেকগুলি নাটক তিনি রচনা

একটি আদর্শ সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠান

দি কমনওয়েল্‌থ এসিওরেন্স

কোম্পানী লিঃ

হেড অফিস :—পুণা

স্থাপিত—১৯২৮

প্রধান কার্যালয় : ৮২, মেডোস্‌ ষ্ট্রীট, ফোর্ট, বোম্বাই—১

দৃঢ়তম আর্থিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত "কমনওয়েল্‌থ" সন্তোষজনক সেবা দ্বারা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

আপনার সাধারণ বীমা বিষয়ক যাবতীয় প্রয়োজনের জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

কলিকাতা শাখা : ১২ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

টেলিগ্রাম—কমওয়েল্‌থ • টেলিফোন—২২-১৪৮১

করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নাটক রচনায় গতানুগতিক পথ অবলম্বন করেননি। বাংলার রূপক নাটক তাঁরই সৃষ্টি। গীতি-নাট্যে ও নৃত্য-নাট্যেও তাঁর দান অপরিসীম। তাঁর নাটকগুলির বিষয়-বস্তু কবিমনের সঙ্গে ছন্দ বজায় রেখে অনবদ্যরূপে ফুটে উঠেছে। "রক্তকরবী" শুধু একখানি ভাল রূপক নাটক নয়, বিশ্ব-নাট্যসাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপক নাট্য। নৃত্যনাট্য "চণ্ডালিকা", গীতি-নাট্য "মায়ার খেলা", রঙ্গনাট্য "চিরকুমার সভা", নাট্যকাব্য "বিদায় অভিশাপ" এবং আরও ঐ প্রকার বহু নাটক তিনি রচনা করে গিয়েছেন। প্রতিটি নাটক নাট্যসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

বাংলা নাট্যশালার নবযুগের আরম্ভ ১৯২১ সনে। এর প্রথম দিকে বাংলার নাট্য-ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ হয়ে থাকবে প্রথম অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "কর্ণার্জুন" ও দ্বিতীয় যোগেশ চৌধুরীর "সীতা"। বিরাট প্রতিভাবান অভিনেতা ও নাট্যাচার্য শিশির-কুমার ভাদুড়ীর সাধারণ রঙ্গালয়ে আবির্ভাবও সেই সময়ের একটা বড় ঘটনা। শিশিরকুমার-প্রযোজিত সীতা অভিনীত হয় নাট্যমন্দিরে ১৯২৪ সনের ৬ই আগস্ট। সমালোচকদের মতে "সীতা" নাটকের অভিনয়ে বাংলার নাট্যকলা অতুলনীয় হয়ে দেখা দিল। এর আগে ১৯২৩ সনে ১০ই জুন স্টার থিয়েটারে আর্ট থিয়েটার প্রযোজিত "কর্ণার্জুন". বাংলার নাট্যশালার উন্নতি ও অগ্রগতিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

বাংলার পেশাদার রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর নবযুগে যে-সব নাট্যকার নাটক রচনা করে বাংলার থিয়েটারের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন, তাঁরা হলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশিকান্ত বসু, বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, মন্মথ রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

স্থানাভাবে এবং এযুগের নাট্যকারদের নাটক সম্বন্ধে অনেকে সুপরিচিত থাকায় আমি এইসব নাট্যকারদের এক একখানি বিশেষ প্রখ্যাত নাটকের নাম উল্লেখ করছি মাত্র। "মোগল-পাঠান"—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়; "কর্ণার্জুন"—অপরেশচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়; "বাঙ্গালী"—ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়; "নবাবী আমল"—নির্মলশিব বন্দ্যো-পাধ্যায়; "বঙ্গে বর্গী"—নিশিকান্ত বসু; "মিশরকুমারী"—বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত; "সীতা"—যোগেশচন্দ্র চৌধুরী; "কারাগার" —মন্মথ রায়; "গৈরিক পতাকা"—শচীন্দ্র-নাথ সেনগুপ্ত; "মাটির ঘর"—বিধায়ক ভট্টাচার্য; "জাহাঙ্গীর"—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলার নাট্যশালার আদিযুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত, নাট্যশালার উন্নতিবিধানে নাট্যকারদের অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণে প্রথম যুগের ইতিহাসের তুলনায় দ্বিতীয় যুগের ইতিহাসের কথা কম বললাম এই কারণে যে, দ্বিতীয় যুগের ইতিহাসের সঙ্গে সকলেই প্রায় অল্পাধিক পরিচিত।

কুঁচতৈলম্ (হস্তিদন্ত ভস্ম মিশ্রিত) — টাক, চুল ওঠা, মরামাস বন্ধ করে। ছোট ২৲, বড় ৭৲, **হাবড়ার আয়ুর্বেদ ঔষধালয়**। ২৪নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, ভবানীপুর, কলিঃ; ফোনঃ ৪৮-৩৩৮২। এল, এম, মুখার্জি, ১৬৭, ধর্মতলা ও চণ্ডী মেডিক্যাল হল।

জনগণের সেবায় নিয়োজিত সেই পুণ্য

স্মৃতি স্বদেশী যুগের—

বঙ্গলক্ষ্মী

আজও জনগণের দ্বারা সমাদৃত—মাতৃ পূজায় ও নিত্য ব্যবহারে—

—বঙ্গলক্ষ্মীর—

ধুতি……………………………শাড়ী

অপরিহার্য্য

ভারতের প্রাচীনতম গৌরবময় প্রতিষ্ঠান

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্, লিমিটেড

হেড আফিস—৭নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৩

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুধু আমাদের সামাজিক আর অর্থনৈতিক জীবনকেই নাড়া দেয়নি, কাল-বৈশাখীর ঝড়ের মত তা আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনকেও বেশ বড় রকমের ধাক্কা মেরেছে। সেই ধাক্কার তাল সামলিয়ে উঠতে কিছুদিন সময় লাগেই। নতুন ভাবধারার জোয়ার সাহিত্যে, শিল্পে প্রকাশ পেতে চায়, কিন্তু তার নিজস্ব রূপ জনসাধারণের কাছে স্বীকৃতি পায় অনেক দেরিতে। ততদিন পর্যন্ত নতুন আর পুরনোর মধ্যে চলে দ্বন্দ্ব।

আমাদের রংগমঞ্চে এখন চলছে সেই দ্বন্দ্বের যুগ। গিরিশচন্দ্রের সময় থেকে অভিনেতাপ্রধান নাট্যধারার যে প্রবর্তন হয়েছিল, তা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে এল বলতে গেলে এক রকম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই। ঐ একই সময় কলকাতার বুকে গড়ে উঠল বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী। প্রথম দিকে এইসব নাট্যগোষ্ঠী জনসাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। কারণ তারা ভেবেছিল, এ বোধহয় একরকম শখের থিয়েটার। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, দেখা গেল অনেকগুলি দল নিয়মিত নাটক পরিবেশন করে দর্শকের চিত্ত জয় করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে এ-ধরনের দল গড়ে ওঠার সুবিধে বিশেষ ছিল না। তার প্রধান কারণ, শিক্ষিত ঘরের মেয়েরা তখন অভিনয়ের জন্য এগিয়ে আসতেন না। স্বাধীনতার পর থেকেই দেখা যায়, বিভিন্ন দলে মেয়েরা অভিনয় করছেন। ঠিক পেশা হিসেবে নয়, নেশার তাগিদই সেখানে বেশী। এইসব দল যে নাটক পরিবেশন করেন, তা কোন বিশিষ্ট অভিনেতার "স্টার ভ্যালু"র উপর নির্ভর করে নয়। ছোট, বড় প্রত্যেকটি ভূমিকার যাতে নিখুঁত অভিনয় হয়, সেই চেষ্টা থাকে বলেই এদের অভিনয় হয় সর্বাংগসুন্দর। শুধু অভিনয় নয়, নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যেও যথেষ্ট অভিনবত্ব থাকে। নাটক বাছাই করার সময় এইসব নাট্যগোষ্ঠী বক্স অফিসের উপর নজর রাখে না, তাই রসোত্তীর্ণ নাটক বেছে নিতে তারা সাহসী হয়। এইসব কারণেই খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলি নাট্যগোষ্ঠী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

অবশ্য এ থেকে সাধারণ "রংগালয়"ও কম শিক্ষালাভ করেনি। "শ্যামলী" মঞ্চস্থ হবার আগে পর্যন্ত বেশ কিছুদিন পেশাদার মঞ্চ মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে ছিল। পাঁচটি প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে একমাত্র "শ্রীরংগম" কোনরকমে নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখে। এই দুরবস্থার প্রধান কারণ, পেশাদার রংগমঞ্চের পুরনো নাটকগুলি দর্শকের মনকে আর আনন্দ দিতে পারছিল না। অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও বেশী বয়েস হয়ে যাওয়ায় সবরকম চরিত্রে যথাযথ রূপ দিতে অসমর্থ ছিলেন। তাঁদের নামের আকর্ষণে যতদিন লোক যাবার গিয়েছিল, তারপর আর যায়নি। যে-কোন নাট্যাভিনয়ের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ যে "টীম্ ওয়ার্ক" তা এঁরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন। সেই জন্যেই দর্শকেরা এই সময় থেকে সাধারণ রংগালয় ছেড়ে নাট্যগোষ্ঠীর অভিনয় দেখতে বেশী ভিড় করেন। এখানে তাঁরা পেলেন নতুন নাটকের সন্ধান, নতুন শিল্পীর পরিচয় আর সুসংযত "টীম্ ওয়ার্ক"। এইসব দলের জনপ্রিয়তার কারণ বিশ্লেষণ করে আজকের সাধারণ রংগালয়ের পরিচালকেরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছেন। এখন আর সেখানে আগের মত যুবককে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধকে যুবক সাজান হয় না। বয়স অনুযায়ী শিল্পী নির্বাচন হয়। দর্শক যে শুধু নায়ক-নায়িকার অভিনয় দেখে খুশী হয় না, তা উপলব্ধি করে এখানেও টীম-ওয়ার্কের উপর নজর দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু যা পাওয়া যাচ্ছে না, তা হল নাটক। নাটকের নামে এখন যা চালান হচ্ছে তা হল উপন্যাসের বা গল্পের নাট্যরূপ। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের সাহায্যে অনেকগুলি দৃশ্যের মধ্য দিয়ে কোনরকমে একটি গল্প বলা। নাটকের কোন ধর্মই তাতে থাকে না। ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করা হয় আলোর চমকে আর বাজনার ঝংকারে। এদিক দিয়ে ভাবতে গেলে, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, দ্বিজেন্দ্রলালের পর আর কোন নাট্যকারের কাছ থেকেই সত্যিকারের রসোত্তীর্ণ নাটক পাওয়া যায়নি। যে দু-একজন নাট্যকারের নাম আমরা শুনতে পাই, তাঁদের নাটক হয়ত রংগালয়ে সুনাম অর্জন করেছিল, কিন্তু সে খুবই অল্প সময়ের জন্যে। সাধারণ রংগালয়ের কথা ছেড়ে দিলেও, শৌখিন দলেরাও আর সে-সব নাটক এখন মঞ্চস্থ করে না। এর প্রধান কারণ, সেই সময় নাট্যকারেরা বিভিন্ন রংগালয়ের সংগে যুক্ত বিশিষ্ট অভিনেতা

ভারতীর
শারদ উপহার

সুশীল মজুমদার
পরিচালিত
এস আর প্রোডাকসন্সের
আগামী চিত্রনিবেদন

হিন্দীচিত্র
প্রেমনাথ ও বীণা রায়
অভিনীত

জাগীর

☆

মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির ডালি

পুনর্মিলন
•
মধুমালতী
•
পরাধীন
•
ভাঙ্গা গড়া

☆

পরিবেশক:
ভারতী ফিল্মস্
১৭৯/১এ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বা অভিনেত্রীকে সামনে রেখে নাটক লিখেছিলেন। যাতে তাঁরা প্রধান চরিত্রে ভাল করে রূপ দিতে পারেন। সেইজন্যে বিখ্যাত নটনটীদের অভিনয়গুণে নাটকগুলি জনপ্রিয় হয়েছিল, লেখার জন্যে নয়।

সাধারণ রংগালয় ভাল নাটক না পেলেও বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী প্রায়ই সহজ সুন্দর মৌলিক নাটক পরিবেশন করে। এ কম আশার কথা নয়। মনে হয় যথাযথ উৎসাহ পেলে নবীন নাট্যকারেরা হয়ত রসোত্তীর্ণ নাটক লিখতে পারবেন। আরও আনন্দের কথা, কলকাতা শহরে আজকাল যে-সব নাট্য-প্রতিযোগিতা বা নাট্যোৎসবের আয়োজন হয়, তাতে মৌলিক নাটকের উপরই জোর দেওয়া হয় বেশী। এর ফলে বিভিন্ন নাট্য-গোষ্ঠী মৌলিক নাটক সংগ্রহের জন্য নবীন নাট্যকারদের লিখতে উৎসাহ দেন।

সাধারণ রংগালয়ের বেলা যেমন বলা যায়, এদের মঞ্চ আছে, নাটক নেই, তেমনি নাট্য-গোষ্ঠীদের বেলায় ঠিক উল্টো। অর্থাৎ এদের নাটক আছে, কিন্তু মঞ্চ নেই। যে-সব নাট্যগোষ্ঠী আজ জনপ্রিয় হয়েছে, যাদের অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন পড়লে দর্শকেরা টিকিট কাটতে চান, তাদের সাধারণ রংগালয় ভাড়া দেওয়া হয় না। ভয়, পাছে তাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিরুপায় হয়ে এইসব নাট্যগোষ্ঠীকে যেতে হয় চৌরংগী অঞ্চলের মঞ্চে। সেখানকার ভাড়া এত বেশী যে, অনেক টিকিট বিক্রি হলেও ঘরে কোন পয়সা আসে না। এর কোনরকম বিহিত হওয়া আশু প্রয়োজন। দেশের সরকার যদি এ-বিষয়ে অবহিত হন, তাহলে হয়ত এইসব নাট্যগোষ্ঠী অল্প পয়সায় নাটক মঞ্চস্থ করার একটা জায়গা পেতে পারে। "ন্যাশানাল থিয়েটার"এর স্বপ্ন এই নাট্য-গোষ্ঠীদের একমাত্র আশা। কলকাতা শহরে এমন একটি রংগালয়ের প্রয়োজন যেখানে অন্তত হাজার দর্শক বসতে পারবে এবং মঞ্চটিও মোটামুটি মাঝারি সাইজের হওয়া চাই। অন্ততপক্ষে যার গভীরতা পঁয়ত্রিশ ফুট এবং সামনের বিস্তার চল্লিশ ফুট। এ-মঞ্চে আলোকপাত ও মঞ্চসজ্জার সবরকমের আধুনিক সরঞ্জাম থাকা চাই। শুধু কলকাতায় নয়, বাংলার ছোট বড় বিভিন্ন শহরে এই ধরনের মঞ্চ হওয়া উচিত, যেখানে নাট্যগোষ্ঠীরা ন্যায্য ভাড়ায় তা ব্যবহার করতে পারে। তবেই ভ্রাম্যমাণ নাট্যগোষ্ঠীগুলি বাংলার বিভিন্ন শহরে অভিনয় করে আসতে পারবে।

শুধু মঞ্চেরই অভাব নয়, এর উপর আছে প্রমোদ-করের চাপ। টিকিট বিক্রি করে কোন অপেশাদার দলকে অভিনয় করতে হলে গড়ে শতকরা বিশ ভাগ টাকা প্রমোদ-কর হিসাবে সরকারকে দিতে হয়। এরই চাপে দরিদ্র নাট্যগোষ্ঠীগুলি আজ বিপর্যস্ত। অথচ পেশাদার মঞ্চকে সরকার প্রমোদ-করের হাত থেকে রেহাই দিয়েছেন। স্থায়ী নাট্যগোষ্ঠী-গুলি যদি অবিলম্বে এর হাত থেকে রেহাই না পায়, তাহলে বাংলার এই নবনাট্য আন্দোলনের গতি অপ্রতিহত রাখা কঠিন হবে।

আর একটা অভাবের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হল নাটক সমালোচনার অভাব। এদেশে নাট্যানুষ্ঠানের প্রকৃত সমালোচনা হয় না বললেই চলে। তবে ভরসার কথা এই যে, আজকাল কয়েকটি পত্রিকা প্রকৃত সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা বুঝতে পেরেছেন এবং তাঁরা গঠনমূলক সমালোচনা করেন। এঁদের সমালোচনা থেকে নাট্যগোষ্ঠীরা যথেষ্ট উপকৃত হয়। প্রয়োজনমত সমালোচনা অনুযায়ী দোষ গুণ উপলব্ধি করে নাটকটিকে আরও সুন্দর ও শোভন করে তোলে। শুধু তাই নয়, দর্শকরাও সেই সংগে যথেষ্ট উপকৃত হন। সমালোচনার উপর আস্থা থাকলে দর্শকরা বিভিন্ন নাট্য-গোষ্ঠী-অভিনীত অনেক নাটকের মধ্যে থেকে তাঁদের দেখবার উপযুক্ত নাটক বেছে নিতে পারেন।

সকলের চেয়ে বড় কথা, আজকাল নাটক দেখবার উৎসাহ খুব বেড়েছে। সবাক চিত্র আসার পর অনেকে ভয় পেয়েছিলেন, টিকিটের দাম বেশী এবং দৃশ্যে সিনেমার সংগে পাল্লা দিতে না পারার জন্যে হয়ত রংগমঞ্চ দর্শক আকৃষ্ট করতে পারবে না। সে-ভয় এখন কেটে গিয়েছে। হাজার হাজার দর্শক রংগমঞ্চে ভিড় করছে। নাটকের শতাধিক রজনী অভিনয় সাধারণ রংগালয়ে চলছে। এমনকি বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীও যে-সব ছোট ছোট মঞ্চে বা বড় মঞ্চে অভিনয় করছেন, সেখানেও দর্শকের অভাব হচ্ছে না। রংগমঞ্চ আবার তার হারান গৌরব ফিরে পেয়েছে। এ-সুযোগ হারালে চলবে না। এই নবনাট্য-আন্দোলনকে জয়যুক্ত করতেই হবে। তার জন্যে চাই নতুন নাট্যকার, নতুন শিল্পী নতুন দৃষ্টিভংগী। তবেই বাংলা নাটকের এতদিনের ঐতিহ্যকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারব। স্তিমিত প্রদীপের মত নয়, উজ্জ্বল শিখার মত।

সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক

চণ্ডীর মাতৃভাবনা

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

গীতা এবং চণ্ডী, এই দুই শাস্ত্রের প্রশ্নই মূলত এক। কিন্তু এক হইলেও এই দুইয়ের [illegible] এবং উত্তরসূত্রে সেই প্রশ্নের সমাধানের রীতিতে পার্থক্য রহিয়াছে। গীতায় ধর্মাধর্ম, কর্তব্য কী, কী অকর্তব্য, ইহা বিনির্ণয়ের ভিতর দিয়া মানব-জীবনের মৌলিক প্রশ্নের সমাধান করা হইয়াছে। দেশ, কাল, পাত্রের বিচারনিষ্ঠ পরিপ্রেক্ষায় অনেকটা নৈতিক দিক হইতে এই আলোচনার সূচনা। পক্ষান্তরে চণ্ডীতে ধর্মাধর্ম, কর্তব্যাকর্তব্য বিনির্ণয়ের পথে না গিয়া যাহাতে শাশ্বত এবং সার্বভৌম মানবধর্মের প্রতিষ্ঠা, সেই সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে চিত্তবৃত্তির সংযোগের ধারাটি ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গীতার প্রশ্নকর্তা অর্জুন জ্ঞাতি এবং স্বজনগণের আসক্তিতে পড়িয়া তাঁহাদের অনিষ্টাশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছেন। সেক্ষেত্রে কোন্ পথে জীবনকে পরিচালিত করিলে তাঁহার কল্যাণ হইবে, ইহাই জানিতে চাহিয়াছেন। এ-ক্ষেত্রে দৃষ্টি তাঁহার নিজের দিকে স্বনিষ্ঠ। চণ্ডীর প্রশ্নকর্তৃদ্বয় সুরথ এবং সমাধিও অনুরূপে আসক্তির আকর্ষণে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সেই আসক্তির মূলে যে সর্বজনীন সত্য রহিয়াছে —যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী—তাহারই স্বরূপ জানিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং গীতার প্রশ্ন অনেকটা অপেক্ষিত, কিন্তু চণ্ডীর প্রশ্ন সোজাসুজি ভগবৎ-তত্ত্বে সমীহিত। চণ্ডীর জিজ্ঞাসায় গীতার ন্যায় প্রশ্নের পর প্রশ্নের পর্যায় নাই। প্রশ্ন এক, উত্তরেও একটানা একটি গান এবং প্রাণময় সেই গানের প্রশ্নের সমাধান। চণ্ডীর ঋষি সকলের হৃদয়ে সংস্থিত সত্যকে উদ্দীপিত করিয়া ধরিয়াছেন। ইহার ফলে আমাদের মন ব্যবসায়া বৃত্তিমূলক গতিবেগ লাভ করিয়াছে এবং বৈলক্ষ্য ব্যাপাশ্রয় বা অভীষ্টসিদ্ধির পথে অগ্রগতির পথে অনর্থকর অবান্তর অন্তরায়সমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। এখানে নিজেদের ভাবের সূত্রেই আমরা জীবনের মূলীভূত সত্যের উদার প্রভাবটি অনুভব করি। নিজেদের জানাচেনার মধ্যেই বৃহত্তর আত্ম-ভাবনার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই।

চণ্ডীর ঋষি বলিয়াছেন, এই যে আসক্তি, যাহাকে বলা হয় মায়া, ইহা মায়েরই খেলা। মহামায়ারই ইহা মায়া। মহামায়া আমাদের সকলের মা। প্রকৃতপক্ষে এই মায়া কখন নহে, ইহার মূলে মায়েরই আকর্ষণ রহিয়াছে। এই মায়া মিথ্যা নয়। তুমি, আমি, এই মায়ার অমেয়ত্ব, ইহার পরম মহত্ত্ব, মহতী ইহার মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না ইহা ঠিক, কিন্তু সেজন্য সেই মায়ার স্বভাব কিংবা প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই; আমাদের জন্য মায়ের টান কিছু কমে নাই। প্রত্যুত মহামায়ার মায়া যাহা আভাসরূপে আমাদের মনে প্রতীত হইতেছে, তাহাতেও মায়ের মায়ার গভীরতারই উদ্দীপনা আমাদিগকে প্রতিমুহূর্তে চেতনা দিতেছে। এই যে পাখিটি নিজে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও তাহার শাবকদিগকে আদরের সঙ্গে আহার যোগাইতেছে, পাখির এই যে মায়া, ইহাও সেই মহামায়ারই মায়া। বিশ্বেশ্বরী যিনি, যিনি সকলের জননী, তাঁহার নিখিলাত্ম ভাবটিই পক্ষীর শাবক পালন এবং পোষণের ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইতেছে। নিজের মায়া বা ইচ্ছাশক্তিকে বহুভাবে বিভক্ত

ডিস্ট্রিবিউটর্স :—হিন্দুস্থান ট্রেডিং কর্পোরেশন
৭০, গণেশচন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা—১৩

অগ্রগামী প্রোডাকসন্সের
নিবেদন
তারাশঙ্করের
ডাক হরকরা
শ্রেঃ কালী ব্যানার্জী
শোভা সেন
সাবিত্রী চ্যাটার্জী
সুরারোপ
সুধীন দাশ গুপ্ত
ডিলুক্স পরিবেশিত
পারশমল-দীপচাঁদ

দেবকীকুমার বসুর
পরিচালনায়
ডিলুক্স নিবেদিত
সোনার কাঠি
ভূমিকায় :: নীতীশ ॥ ভারতী ॥
প্রশান্ত ॥ আশীষ ॥ তপতী ॥
শিখারাণী ॥ শ্রাবণী ॥
সীমা দত্ত ॥
সুরারোপ :: রাজেন সরকার

কিশোর প্রোডাকসন্স-এর
প্রথম নিবেদন
কিশোরকুমার • মালা সিংহ
অনীতা গুহ অভিনীত

পরিচালনা :: কমল মজুমদার
সুরসৃষ্টি :: হেমন্তকুমার

করিয়া ইচ্ছাময়ী মা তাঁহার মাতৃত্বে পূর্ণত্ব আস্বাদন করিতেছেন। সন্তান না হইলে মাতৃভাবের পূর্ণত্ব সাধিত হয় না, সেইরূপ মাকে না পাইলেও সন্তানের পিপাসা মিটে না। তুমি, আমি, আমরা সকলে যে ক্ষুদ্র আসক্তি বা মায়ার বন্ধনের মধ্যে পড়িয়াছি, ইহার একটি নিগূঢ় তাৎপর্য আছে। সে-তাৎপর্য হইল মায়ের মাধুর্য অমিয়ত্বে আস্বাদন এবং ইহাই আমাদের জীবনের পক্ষে পরম প্রয়োজন। ফলত আমাদের এই আসক্তি মাতৃভক্তির বীজস্বরূপে আমা-দিগকে নিত্যজীবনের অভিমুখে উন্মুক্ত রাখিয়াছে। ইহা জীবনের পূর্ণত্ব অভি-ব্যক্তির মূলে শক্তি দিতেছে, এবং মাতৃ-প্রেমের এই যে প্রবৃত্তি, ইহার নিবৃত্তি নাই। আমা-দের দিক হইতেও নাই, মায়ের দিক হইতেও নাই। মা চাহিতেছেন, আমরা তাঁহার ছোট ছেলেটি হই, আবার আমরাও সকল ছাড়িয়া মহামায়া আমাদের মায়ের কোলে ছুটিয়া যাইবার জন্যই উতরোল রহিয়াছি। এমনই মায়ের মায়া। নিতুই নূতন রসে ইহার অনুভূতির রীতি।

সুতরাং মায়া, মিথ্যা এমন বিচার করিতে গেলে গোলই বাড়িবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 'যদিদং কিঞ্চ তৎ সত্য-মিত্যাচক্ষতে'। সত্য, মিথ্যা, সৎস্বরূপ আত্মাতে তুল্যরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকাতে সকলই সত্য। বস্তুত গুণমায়া, জীবমায়া, যোগমায়া, এইভাবে মায়ার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিতে গেলে তাহার পার পাইবে না। মহামায়ার মহতী মায়াকে নিজেদের বুদ্ধি-বিচারে মাপিতে যাইও না। তাঁহার অসীম মায়ার ঔদার্য এবং মাধুর্যকে উপলব্ধি কর। তোমাদের জন্য বিশ্বজননীর তাপে তাঁহার ভাবে নিজদিগকে ডুবাইয়া দাও। তোমাদের জীবনের ক্ষুদ্র আসক্তি মাতৃভক্তিতে পরি-পূর্তি লাভ করিবে। বিন্দুকে আশ্রয় করিয়া বিন্দুবাসিনীর মমত্ব-সম্বন্ধে তোমরা জড়িত হইয়া পড়িবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যক্ত, অব্যক্ত—যত ভাব আমাদের উপলব্ধিতে আসিতেছে, সকল মিলাইয়াই মহামায়ার মায়ার খেলা চলিতেছে। পরা-অপরা প্রকৃতি সকল রীতির মূলে অব্যাকৃত এবং অব্যয়স্বরূপে তাঁহার অবস্থিতি। সৎ এবং অসৎ, সব লইয়া তিনি সমগ্রা, সন্তানের প্রতি পরম মায়ায় উদগ্রা। মহামায়ার মায়ার বাহিরে কোনো মায়া নাই। বস্তুত মহামায়ার এই সাকল্য ভাবটি বা সামগ্রিক স্বরূপটি অব্যয় বীজস্বরূপে বিশ্বকে বিধৃত রাখিয়াছে। সেই মায়ারই ছায়ায় বিশ্ব একনীড় হইয়াছে, মহৎ আলয়ে আশ্রয় পাইয়াছে। সব ভাব লইয়া মহামায়া এই মায়ের ভগবত্তা। কোনটি তাঁহার অন্তরঙ্গ, কোনটি বহিরঙ্গ শক্তি, মায়ের কৃপার তরঙ্গের স্পর্শ মনের মূলে না পাওয়া পর্যন্তই ছাড়া ছাড়া এমন বিচার চলে। মায়ের হাসিটি চোখে পড়িলে সকল জুড়িয়া, সকল বিচার ডুবাইয়া রসের ধারা

ছড়াইয়া পড়ে। সর্বশক্তিস্বরূপিণী রূপে আমরা তাঁহাকে চিনি।

মহামায়া মহাশক্তি, তিনি আদ্যাশক্তি। কিন্তু এই শক্তি কি শক্তিমান হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু? মাতৃভাবের সাধক ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, মা একাধারে পুরুষ এবং প্রকৃতি। তিনি পুমান্, তিনিই স্ত্রী। ভগবতীর ভাবে তিনি ভগবান্। প্রকৃত পক্ষে পুরুষ ভাবটি মাতৃপ্রেমের বৈভব এবং বিলাস। বেদের নাসদীয় সূক্ত, রাত্রিসূক্ত এবং দেবীসূক্তে তাঁহার এই স্বরূপই অভিব্যক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব সাধকগণ ভগবৎ-প্রেমের মাধুর্যে যে পরম বীর্য অযাচিত করুণা বা ঔদার্যস্বরূপে আস্বাদন করিয়া থাকেন, মায়ের মহিমাই সে-ক্ষেত্রে পৌরুষ-স্বরূপে কাজ করে। এই দিক হইতেই শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবী নারায়ণের পৌরুষ। রাধারানীকে পাইয়া ত শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী-বশে পুরুষত্ব। বস্তুত শ্রীকৃষ্ণ সর্বোচিত্তা-কর্ষক মন্মথমদনস্বরূপে যে নিজ রসটি আস্বাদন করিতেছেন, তাঁহার মূলে শক্তি-স্বরূপিণী মায়ের উদার প্রেমের অলঙ্ঘ্য বীর্যের সঞ্চার-চাতুর্যই কাজ করিতেছে। করুণা, বাৎসল্য-রসে পৌরুষে ঔজ্জ্বল্য লাভ করিয়াছে। শক্তির অভিমানই শক্তিমানের প্রাণ; তাঁহার শক্তিবীজ তাঁহার নিজত্ব-লীলা; রসপ্রাচুর্যে তাঁহার ব্যক্তিমাধুর্যের আধান; শক্তিমান শক্তিকে নিজ করিয়াই প্রভবিষ্ণু হইয়া থাকেন। বস্তুত মহামায়াই পরম বস্তু। সর্বসাধ্যশিরোমণি হইলেন এই জননী এবং মায়া এই মহামায়ারই তন্ত্র বা খেলার ধারা, নিজ ভাব আস্বাদনের রীতি। এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট করিতে গিয়া চণ্ডীর ঋষি বলিলেন—'পরমাসি মায়া'। ফলত মহামায়ার এই মায়া বা শক্তিকে শক্তিমান হইতে পৃথক করিতে গেলে পরব্রহ্মের রস-স্বরূপত্ব এবং আনন্দ-স্বরূপত্বকেই অস্বীকার করা হয়। শক্তিমান আর 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়' কোনভাবেই আর বাকি থাকেন না। তিনি উড়িয়া যান।

প্রত্যুত পরমতত্ত্বের প্রকাশ এবং বিলাসকে আমরা যেভাবেই উপলব্ধি করিতে যাই না কেন, তাঁহার মায়া—অন্য কথায় আত্মভাবে আমাদের সহিত তাঁহার ব্যূঢ় এবং নিগূঢ়

২৮/১, গড়িয়াহাট রোড (গোল পার্কের সামনে), কলিকাতা—১৯

শারদীয়ায়
আমাদের নূতন বই

কাজী নজরুল ইস্‌লাম
বনগীতি ... ২॥০
সর্বহারা ... ১॥০
জুল্‌ফিকার ... ২৲
চক্রবাক (বাঁধাই) ... ২।০
ফণিমনসা ... ১॥০
সঞ্চয়ন ... ১॥০

জগদানন্দ বাজপেয়ী
জন ও জনতা ... ২॥০
(জীবনের সত্যিকারের আলেখ্য)
মণি-কাঞ্চন ... ১॥০
(কবিতা সঙ্কলন)

লা-অ চা-অ
রিক্‌সাওয়ালা ... ৪॥০
(বিখ্যাত চীনা উপন্যাস)
অনুবাদ: অশোক গুহ

আঁদরে মালরো
সাংহাই-এ ঝড় ... ৫৲
বিখ্যাত উপন্যাস
অনুবাদ: অশোক গুহ

বিভুরঞ্জন গুহ ও শান্তি দত্ত
শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েকপাতা ... ৯৲
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ।

অনিল বসু
বিদেশের লেখা ... ২৲
(বিদেশী শ্রেষ্ঠ গল্পের মর্মানুবাদ)

বামাপদ ঘোষ
সজাব ধরিত্রী ... ৩৲
আধুনিক কালোপযোগী সার্থক রসোত্তীর্ণ উপন্যাস

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ষোলকলা ... ২৲

Dr. P. C. Chowdhury
MODERN ASTRONOMY RS. 9/-

নলেজ হোম
৫৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

আপনার কি জন্যে হিন্দ্ কেনা উচিৎ

হিন্দ্ সাইকেল বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তৈরী হয় এবং দীর্ঘদিন সুষ্ঠু রকম কাজ দেয়।

দামে, মজবুত গড়নে এবং সুষ্ঠু কাজে হিন্দ্ যে কোন সাইকেলের থেকে বেশি সুবিধার!

হিন্দ্ সাইকেল লিমিটেড, ২৫০ ওয়ারলী, বোম্বাই ১৮।

সম্বন্ধের সূত্রে তাঁহাকে অনুভব করিতে হয়। নতুবা ব্রহ্মবস্তুতে ভগবত্তার ভাব বর্তে না। চণ্ডী বলেন, 'শ্রীঃ কৈটভারি-হৃদয়ৈক-কৃতাধিবাসা, গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃত-প্রতিষ্ঠা'—মা, তুমিই কৈটভারি নারায়ণের হৃদয় জুড়িয়া খেলিতেছে। মা, শঙ্কর তোমাকেই সর্বভাবে প্রতিষ্ঠা দিতেছেন ইত্যাদি। প্রকৃত প্রস্তাবে নারায়ণ এবং শঙ্করের পৌরুষে মায়ের সন্তান-স্নেহের মাধুর্য-বীর্যের বিস্তার, তাঁহারই লীলা-রসবিলাসের উত্তুঙ্গ-তরঙ্গ-রঙ্গের উচ্ছ্বাস। নারায়ণ এবং শঙ্কর মায়েরই আনন্দ-রসোজ্জ্বলা পরমকলার চিৎ বিভূতি এবং সব বিভূতি লইয়াই তিনি ভগবতী। হরি-হর ব্রহ্মা, ইঁহারাও মায়ের মহিমার পার পান না। মায়ের মাধুরীতে তাঁহারাও মজেন; তাঁহারা মাকেই ভজনা করেন।

মায়ের এই মায়া কেমন? সপ্তশতী স্তবে মাতৃভাবের রস-প্রভাবের উপচয় আমরা অন্তরে অনুভব করি, তাহার পরিচয় পাই। রসভূয়িষ্ঠ সেই স্তব আমাদের অন্তরে মায়ের শ্রেষ্ঠ লীলাকে প্রমূর্ত করিয়া তোলে। আমরা মাকে দেখি। বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল জীব গোস্বামী বলিয়াছেন, সাক্ষাৎ দর্শনেই স্তবের স্ফুরণ হয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই পরম সত্যটি উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন, ভক্ত মায়ের প্রেমে ডুবিয়া 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বরের আদরটি অন্তরে জড়াইয়া এবং তাঁহার মুখে মাতৃ-মহিমা কীর্তনে শ্রবণকে নিমগ্ন করিয়া সাধক মায়ের রূপ দেখিয়াছেন, দেখিয়া শিখিয়া লইয়াছেন। স্তবের ভিতর দিয়া সর্বতোভাবে চিদানন্দের উদ্দীপ্ত এবং আমাদের অনুভূতিতে চিন্ময় লীলারসের এমন পরিব্যাপ্তির মহিমা শ্রুতিতে পরিকীর্তিত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—

সমুদ্রাদূর্মির্মধুমাং উদারদুপাংশুনা
সমমৃতত্বমানট্।
ঘৃতস্য নাম গুহ্যং যদস্তি জিহ্বা দেবানাং
অমৃতস্য নাভিঃ॥

অর্থাৎ অমৃতের সমুদ্র হইতে তরঙ্গের আকারে এই জগতের উদ্ভব ঘটিয়াছে। স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ সেই দেবতার মধুময় নাম বেদসমূহে গূঢ়ভাবে নিহিত আছে। সেই নামরসের অনুধ্যানে যাঁহারা নিমগ্ন, তাঁহারা দেবতা। তাঁহাদের জিহ্বা হইতে অমৃতের উৎস খুলিয়া যায়। স্তবের এমনই মহিমা। এই স্তবই সংকীর্তন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন, "সংকীর্তন-যজ্ঞে তাঁর করে উপাসনা, সেই সে সুমেধা।" তাঁহারা অন্য দেবতার সেবা ছাড়িয়া গীতার ভগবদুক্তি অনুসারে যাঁহারা এই সুমেধাসম্পন্ন, তাঁহারা অন্য দেবতার সেবা ছাড়িয়া শ্রীভগবানকেই চাহেন। চণ্ডীর মাতৃভাবনা এইভাবে পরমতত্ত্বে একান্ত এবং জীবন্ত। চণ্ডী বলিয়াছেন—'বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবী'। সর্বদেবময়ী সেই দেবীকে জানিলেই সব জানা হইল।

শ্রুতি এই মায়ের অপরিমেয়া মায়ার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। ঋক্‌মন্ত্রে

মুদ্রণে
নূতনত্ব এনেছে
পি. জি. প্রেস
৪৪, শান্তিরাম রাস্তা বালী থানার সামনে
বালী, হাওড়া

আপনি কি জানেন? (ইতিহাস)

১৮৫৬ সালে ড্রেসডেন সহরে লিওনহার্ডি সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় কালি প্রস্তুত করেন।

কাজল কালি

সব রং কালির মধ্যে ব্লু-ব্ল্যাক্ কালিই সেরা

ব্লু-ব্ল্যাক কালির মধ্যে আছে কি? (বিজ্ঞান)

ব্লু-ব্ল্যাক কালির মধ্যে ট্যানিক-অ্যাসিড্ ও আয়রন থাকাতে বৈজ্ঞানিকপ্রক্রিয়া (chemical action) কাগজে লেখা ব্লু রংটিকে ক্রমে ক্রমে গভীর কালো করে তোলে। তাই ব্লু-ব্ল্যাক কালির লেখা হয় পাকা লেখা। ডুবো জাহাজ সমুদ্র থেকে তুলে দেখা গেছে ভাল ব্লু-ব্ল্যাক কালির লেখা ধুয়ে, মুছে যায়নি।

আপনার কলমে ব্লু-ব্ল্যাক্ কাজল কালি ব্যবহার করুন।

রয়েল-ব্লু, গ্রীণ, রেড্, ব্ল্যাক ও ব্রাউন কালিও পাওয়া যায়।

কেমিক্যাল এসোসিয়েশন (কলিকাতা)

৫৫ ক্যানিং স্ট্রীট - কলিকাতা ১

ফোন: ৩৪-১৯১৯ গ্রাম: কাজলকালি

সুন্দর স্যানিটারী ব্যবস্থা নগরের তথা গৃহের স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য অব্যাহত রাখে।

দীর্ঘদিন সুনামের সহিত টিউবওয়েল, প্লাম্বিং এবং স্যানিটারী ব্যবসায়ে নিয়োজিত

কুমারস স্যানিটারী এম্পোরিয়াম

৯৩৮, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড : কলিকাতা-২৬

ফোন—৪৬-১২২০

...রব সন্তানস্নেহের উদগ্র লীলার জ্বালা ...য়াছে। সেই জ্বালামালাকে মেখলা করিয়া মা জাগিয়াছেন। অগ্নিময়ী জননীর সেই প্রেমের আঁচ অন্তর যদি স্পর্শ করে, তবে কে না তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়ে? আমাদিগকে তাঁহার শরণাগতি অবলম্বন করিতেই হয়। শ্রুতিমন্ত্রে এই শরণাগতিই প্রনিহিত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তিং
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাং
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ।

মা আমাদের অগ্নিবর্ণা। সন্তানের জন্য তপস্যার তাপে জ্বলিয়া দিগন্তরে জ্বালা-ব্যাপ্ত করিয়া মা দীপ্যমানা। অব্যাকৃত হইয়াও এই সন্তান-স্নেহ বহুভাবে বহুরূপের ভিতর দিয়া তাঁহার প্রণয়-বিবৃতিতে স্ফূর্তি পাইতেছে। আমাদের সকল কর্ম-সাধনার সূত্রে আমরা তাঁহারই প্রেরণা উপলব্ধি করি। কর্মের প্রেরয়িত্রী তিনি এবং কর্মফলের দাত্রীও তিনি। তাঁহার শরণাগতি লইলে আর ভীতি কোথায়?

উৎকৃষ্ট গৃহসজ্জা ও উপহার সামগ্রী

এবং

হাতে ছাপা মনোরম শাড়ী, চোলিপিস, হাতে বোনা সিল্ক বা সুতীর ছোট জামা, নানা রকম খেলনা প্রভৃতি আমাদের এখানে প্রস্তুত হয়।

গ্রামের কারিগরদের সাহায্য করা ও কুটিরশিল্পের উৎকর্ষ সাধন করা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

বেঙ্গল হোম ইনডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশন

৫৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং
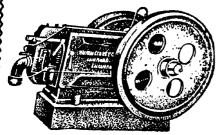
১৩৮, ক্যানিং ষ্ট্রীট—দোতালা, কলিকাতা—১

বামার লরী অ্যান্ড কোম্পানী লিঃ ও জেমস্ ওয়ারেন অ্যান্ড কোম্পানী লিঃ-এর সোল এজেণ্ট

লিষ্টার ব্ল্যাকষ্টোন ডিজেল্ ইঞ্জিন
লিষ্টার পাম্পিং সেট
এবং যাবতীয় স্পেয়ার পার্টস

স্যাঙ্কস ডিজেল ইঞ্জিন
স্যাঙ্কস্ পাম্পিং সেট (পালসোমিটার পাম্প সহ) এবং যাবতীয় স্পেয়ার পার্টস

কৃষি ও সেচ কার্যের জন্য লিষ্টার ও স্যাঙ্কস পাম্প এবং ধান তেল ও আটা কলের জন্য লিষ্টার ব্ল্যাকষ্টোন ও স্যাঙ্কস ইঞ্জিন। বিশ্বস্ত দোকান থেকে সেরা জিনিষ কিনুন

ইলেকট্রিক মোটর, জেনারেটিং সেট, ষ্টীম বয়লার, ষ্টীম ইঞ্জিন প্রভৃতির একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ফোন : ২২—৫২৭৫

গ্রাম—মাঁসনারিজ

তাঁহার মায়ার বিশ্ববীজে মজিয়া তাঁহার করুণার উদার প্রভাবে আমরা স্বভাবের পথে তাঁহাকে পাইব। মাতৃপ্রেমের সম্বন্ধে আমাদের পথের বাধা স্বচ্ছন্দে দূর হইবে। মায়ের মধুর সুরে মন প্রাণ তখন ভরপুর এবং মাধুর্যের ধর্ম হইল অবিদূর। মাতৃ-মাধুর্যের স্পর্শে মাকে আমরা নিকট হইতে নিকটে পাইব! ঘটে-পটে সর্বত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করিব।

মা নিত্যপূর্ণা, কিন্তু সন্তানকে লইয়াই মায়েরও এই পূর্ণতা, মাতৃ-মাধুর্যের সর্বোত্তম বিলাস। মায়ের ঐশ্বর্য অনন্ত, অশেষ তাঁহার বৈভব। কিন্তু সন্তান-স্নেহে তাঁহার সেই ঐশ্বর্য, সেই যে বৈভব, সব মাধুর্যে লুকাইয়া যায়। মায়াবদ্ধ জীবের ব্যষ্টি-চেতনার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই মহীয়সী মায়ের সমষ্টি-বেদনা, তাঁহার সমূহ ছায়া কায়া ধরিয়া সাড়া দেয়। যিনি বিশ্বজননী, তিনি ভক্তের কাছে ছোট মেয়েটি হইয়া ধরা দেন। মহানির্বাণতন্ত্র বলেন—'কিশোরী কলকণ্ঠা সা কলনাদ-নিনাদিনী।' আমি আসিয়াছি—এই ধ্বনি আমাদের কানে জাগাইয়া ক্লৈব্যনাশিনী কামরূপিণী তাঁহার করুণার কেলিকলা তিনি মেলেন। নিজের মমত্বকে মেলিয়া দেন। 'তুমি আমার' ইহা ত চিরন্তন সত্য, কিন্তু সে-সত্য আমাদের দৃষ্টিতে উপাহিত। 'আমি তোমার'—এই মধুর ধ্বনি কানে জাগাইয়া তবে মা আমাদের আপন হন।

মাকে এমনভাবে পাইবার জনাই সাধকের আকিঞ্চন। গায়ত্রী ছন্দে মায়ের পরম মায়ার মাধুর্য-বীর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। গায়ত্রী, সাবিত্রী, সরস্বতী এই ত্রয়ী—রস-সংস্পর্শে শ্রুতিচ্ছন্দে গীতি উঠিয়াছে—

"কাত্যায়নং বিদ্মহে, কন্যাকুমারিং ধীমহি
তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।"

কাত্যায়ন ঋষির কাছে মা তুমি কন্যারূপে ধরা দিয়াছিলে, সেই লীলাটি দেখাও। মা তুমি মেয়ে হইয়া আসিয়া রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছিল, সেই মাধুর্যের পরম-বীর্যে আমাদের অন্তর স্পর্শ কর। এদেশের সাধক মাকে এমনই আপন করিয়া পাইতে চাহিয়াছে। বাঙালীর মাতৃসাধনা এই আত্ম-ভাবনাতেই উজ্জ্বল, এবং লাবণ্যের জ্যোৎস্নায় ঝলমল হইয়া উঠিয়াছে। বাঙলার সাধক মায়ের রূপসাগরে ডুব দিয়া সপ্তশতী ছন্দে আনন্দে মায়ের মাধুরী কীর্তন করিয়াছেন—

দুর্গে, স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষ জন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি
দারিদ্র্য-দুঃখ হারিণি কাত্বদন্যা
সর্বোপকার করণায় সদার্দ্রচিত্তা।

কা ত্বদন্যা—তুমি বিনা আর কেহ নাই। তোমার চরণে শরণাগতি মা এইটুকু শুধু চাই।

কিংবদন্তী অনুসারে ঘটকর্পর মহাকবি ছিলেন এবং যশোধর্মদেব বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম শুধু নয়—"ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ" রূপে প্রায় যুগ্মচর ছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, মহাকবি ঘটকর্পরের রচনার মধ্যে আজ ঘটকর্পর-কাব্য ও নীতিসার গ্রন্থ ব্যতীত আর কোনও গ্রন্থ অবশিষ্ট নেই।

ঘট-কর্পর বা ঘট-খর্পর শব্দের অর্থ কলসীর কানা। মহাকবি ঘটকর্পর তাঁর ঘটকর্পর কাব্যের শেষে বলেছিলেন—

"জীয়েয় যেন কবিনা যমকৈঃ পরেণ
বহেয়মুদকং তস্মৈ ঘটকর্পরেণ।"

অর্থাৎ যদি অন্য কোনও কবি আমাকে যমকে পরাজিত করতে পারেন, তা হলে আমি তাঁকে কলসীর কানায় করে জল এনে দেব। তার অর্থ—তিনি যমক প্রয়োগে নিজকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতেন। কবি হিসেবেও তিনি যে কালিদাসকে পর্যন্ত কুকবি ভাবতেন, তার প্রমাণ পাই তাঁর "নীতিসার" গ্রন্থের একটি কবিতায়, যেখানে তিনি বলেছেন, "যে কবি বলেছেন যে, হিমাচলের অনন্তগুণের মধ্যে হিম দোষ বলে পরিগণিত হয় না (কুমারসম্ভব, ১, ৩), সে কবি নিশ্চয় কবি-নাপিত; কবি হয়েও তিনি জানেন না যে, দারিদ্র্যদোষ গুণরাশি নাশ করে দেয়।" পরবর্তী যুগে বাণভট্টের সঙ্গে ময়ূরভট্টের যেমন রাজসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, এঁদের দুজনের মধ্যেও তেমনি একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, এটি সূচিত হয়।

ঘটকর্পরের সঙ্গে কালিদাসের যে ক্ষেত্রে নিকট সম্বন্ধ, সেটি হচ্ছে দূতকাব্যের বিষয় এবং মৌলিক রচন-পদ্ধতি নিয়ে। প্রিয় ও প্রিয়ার মধ্যে দূত-সংপ্রেরণ নিশ্চয়ই সনাতন-কালসম্মত। কিন্তু সাহিত্যে তার প্রথম আবির্ভাব ঋগ্বেদে—যেখানে ইন্দ্র সরমাকে দূত করে পাঠাচ্ছেন পণিদের কাছে (১০, ১০৮)। কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে দেখতে পাই, সীতার কাছে রামচন্দ্র হনুমানকে দূত করে পাঠাচ্ছেন; মহাভারতে দময়ন্তী নলের কাছে হংসকে দূত করে পাঠিয়েছেন (৩, ৫৩৩, ১—২)। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যুধিষ্ঠির কর্তৃক কৌরব সভায় দূতরূপে প্রেরিত হয়েছেন। মহাভাগবত-পুরাণে জরাসন্ধের কারারুদ্ধ নৃপতিগণের একজন রাজা কৃষ্ণসকাশে দূতরূপে প্রেরিত হয়েছেন; রুক্মিণী শিশুপালের সঙ্গে বিবাহে ভীতা হয়ে একজন ব্রাহ্মণকে দূত করে পাঠিয়েছেন;

বাংলায় সোভিয়েত-সাহিত্য

মাকারেঙ্কোর
বিশ্ববিখ্যাত বই
রোড টু লাইফ
যে বই ছায়াচিত্রে আলোড়ন এনেছিল।
প্রতি স্কুল-কলেজ ও লাইব্রেরীর অপরিহার্য।
তিন খণ্ড একত্রে—১৪৫০

লেভ তলস্তয়ের
শৈশব, কৈশোর যৌবন ৫।০

তুর্গেনিভের
রুদিন ৩৲

ওয়াই উসপেনস্কায়ার
আওয়ার সামার ৫৲

এ সেরাফিমোভিচের
দি আয়রন ফ্লাড ৪॥০

এ কাজানসেভের
এগেনস্ট দি উইণ্ড ৩।০

ছোটদের
সোনার ঝাঁপি ৩৲
রুশ গল্প-সঞ্চয় ২॥০

আলেক্সি মুসাতভের
চাষ করি আনন্দে ৪৲

কে গাঙ্গুলী অ্যান্ড কোং (প্রা) লিঃ
১ কলেজ রো ॥ কলিকাতা—৯ ॥

রাজ-জ্যোতিষী

বিশ্ববিখ্যাত শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ, হস্তরেখা বিশারদ ও তান্ত্রিক, গভর্ণমেণ্টের বহু উপাধি প্রাপ্ত রাজ-জ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রীহরিশ চন্দ্র শাস্ত্রী যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়া এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা কোপিত গ্রহের প্রতিকার এবং জটিল মামলা-মোকদ্দমায় নিশ্চিত জয়লাভ করাইতে অনন্যসাধারণ ক্ষমতাবর্জন করিয়াছেন। তিনি প্রশ্নগণনায়, কর কোঠি নির্মাণে অদ্বিতীয়। দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট মনীষিবৃন্দ নানাভাবে সুফল লাভ করিয়া অযাচিত প্রশংসাপত্রাদি দিয়াছেন। তাঁহার সহিত যোগাযোগ করে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হউন।

সদ্য ফলপ্রদ, কয়েকটি জাগ্রত কবচ

শান্তি কবচঃ—পরীক্ষায় পাশ, মানসিক ও শারীরিক ক্লেশ, অকাল মৃত্যু প্রভৃতি সর্ব দুর্গতি নাশক, সাধারণ—৫, বিশেষ—২০,।

বগলা কবচঃ—মামলায় জয়লাভ ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ও সব কার্যে যশস্বী হয়। সাধারণ—১২,; বিশেষ—৪৫,।

সামুদ্রিক রত্নঃ—গুণী, জ্ঞানীব্যক্তি ও পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দ দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত। হস্তরেখা দৃষ্টে নিজের ভাগ্য জানিবার শ্রেষ্ঠ বই। মূল্য ৫, টাকা মাত্র। সর্বত্র পাওয়া যায়।

হাউস অব এস্ট্রোলজি

১৪১।১সি, রসা রোড, কলিকাতা-২৬

(ফোন ৪৮-৪৬৯৩)

(হাজরা পার্কের পূর্বে)

মথুরাবাসী শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে মাতাপিতা ও গোপীদের নিকট উদ্ধবকে দূত করে পাঠিয়েছেন(মাধব কবীন্দ্র তাঁর "উদ্ধব-দূত" নামক সংস্কৃত দূত-কাব্যে উদ্ধবকে পুনরায় গোকুল থেকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে দূত করে পাঠিয়েছেন); ভাগবত-পুরাণে হংসদূত (১০, ৯০, ২৪), পদাঙ্ক-দূত (১০,৩০, ২৪-২৬), ভ্রমর-দূত (১০,৪৭,১১) প্রভৃতিরও অভাব নেই (বলা বাহুল্য, পরবর্তী যুগে এই সব বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সুন্দর দূতকাব্য বঙ্গদেশেই রচিত হয়েছে)। যা হক, ভাগবত-পুরাণের তারিখ নিয়ে সন্দেহ থাকলেও, রামায়ণ ও মহাভারত যে কালিদাসের ও ঘটকর্পরের বিষয়-বস্তুর দিক থেকে উপজীব্য হতে পারে, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এটি অবিসংবাদিত সত্য যে, কালিদাস বাল্মীকি কর্তৃক বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। এবং মেঘদূতের প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্র কর্তৃক সীতার নিকট হনুমৎ-প্রেরণের বিষয়টুকু যেন কালিদাসের মনে লেগেই আছে। মেঘ যেখান থেকে যাবে, সেই পর্বতের নাম রামগিরি এবং সেখানকার আশ্রম জনক-তনয়ার স্নানোদকে পরিপূত। মেঘ যখন পৌঁছবে যক্ষপ্রিয়ার কাছে, তখন যক্ষিণী তাকে দেখে সেইরকমই সুখী হবেন, হনুমানকে দেখে সীতা যে-রকম সুখী হয়েছিলেন—(উত্তর-মেঘ, ১০৫—ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলী-বোন্মুখী সা)।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে মহাভারতের দময়ন্তী-নল-হংসের সঙ্গে ঘটকর্পরের সাদৃশ্য সর্বাধিক। এখানে প্রিয়া প্রিয়ের কাছে বর্ষাগমে মেঘকে দূত করে পাঠাচ্ছেন। এখানে প্রেরক উভয়ক্ষেত্রে নারী, ঘটকর্পরের নায়িকা দময়ন্তীর সহধর্মিণী—বচনভঙ্গিও একই প্রকারের।

এ থেকে এটি সত্যই প্রমাণিত হয় যে, কালিদাস ও ঘটকর্পর একে অন্যের কাছে বিষয়বস্তু নিয়ে ঋণী নন। সুসদৃশ বিষয়-বস্তুর রূপ তাঁরা আদিকবি ও ব্যাসদেবের অমর কাব্যেই দেখে ধন্য হয়েছিলেন। তা হলে ঘটকর্পর-কাব্য এবং মেঘদূত-কাব্য—এই দুটি গ্রন্থের মধ্যে কোন গ্রন্থটি আগে রচিত হয়েছে? তা প্রমাণ করার উপায় কী?

ঘটকর্পর যমক-প্রয়োগের অহংকার করেছেন, কিন্তু মহাকবি কালিদাস ত এই সব কৃত্রিমতা ভালই বাসতেন না। কিন্তু তবু রঘুবংশে কিছু যমক-প্রয়োগ তিনি করেছেন—সেটি কি ঘটকর্পরের স্পর্ধা চূর্ণ করার জন্য? নীতি-সার নিশ্চয়ই কুমারসম্ভবের পরে রচিত হয়েছিল। কিন্তু মনে হয়, ঘটকর্পর-কাব্য কালিদাসের অতি পরিণত বয়সের মেঘদূত ও রঘুবংশ রচনার পূর্বেই রচিত হয়েছিল। কালিদাসের গ্রন্থের সৌষ্ঠব, পারিপাট্য, ভাব-গাম্ভীর্য, ভাষা-পারিপাট্য—কোন বিষয়েই ঘটকর্পর-কাব্য মেঘদূতের সমকক্ষ নয়। "মেঘদূত" রচিত হওয়ার পরে ঘটকর্পর ঐ গর্বোক্তি করতেন বা করতে পারতেন বলে মনে হয় না।

মেঘদূতের সঙ্গে ঘটকর্পর-কাব্যের আকৃতিতেও যেমন পার্থক্য (ঘটকর্পরে মাত্র ২৩টি কবিতা) আছে, তেমনি বর্ণিত বিষয়েও পার্থক্য আছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে ঘট-কর্পরের মৌলিকরূপটি এতদিন বর্তমান যুগের সংস্কৃতবিদ্‌গণের চোখে প্রকৃত অবস্থায় ধরা পড়েনি। আমাদের তুলনামূলক সমালোচনার ফলে দেখতে পাই যে, পরবর্তী যুগে ঘটকর্পরের প্রভাবেও সুন্দর সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন মদনকারের কৃষ্ণলীলা। অবশ্য পরবর্তী যুগের সাহিত্যিকগণের উপর মেঘদূতের যে অতুলনীয় প্রভাব দৃষ্ট হয়, তার তুলনায় ঘটকর্পরের প্রভাব নিশ্চয় অতি সামান্য॥

পাড়ের বৈচিত্র্যে ও কাপড়ের উৎকর্ষে

মোহিনী মিলের

ধুতি ও শাড়ী

বাজারের সেরা

আপনার নিকটবর্তী ডিলারের নিকট আজই খোঁজ নিন

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—চক্রবর্ত্তী, সন্স এণ্ড কোং

রেজিষ্টার্ড অফিস—২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১

এই সংখ্যার অলংকরণ করিয়াছেন শ্রীঅন্নদা মুন্সী, শ্রীঅমল বিশ্বাস, শ্রীঅরুণ দাস, শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর দত্ত, শ্রীঅহিভূষণ মালিক, শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার, শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচন্দ্রনাথ দে, শ্রীনিতাই দে, শ্রীবিমল দাস, শ্রীমঞ্জরী উকিল, শ্রীমাখন দত্তগুপ্ত, শ্রীরণেন আয়ন দত্ত, শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ, শ্রীসমর দে ও শ্রীসমীর সরকার।

সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য, ৬নং সুতারকিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১
আনন্দ প্রেস হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পূজার দিনগুলি মধুময় হউক

দেশের ও জাতির সেবায় নিয়োজিত

॥ বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান ॥

সিদ্ধেশ্বরী

কটন মিলস্

প্রাইভেট লিঃ

মিলস্ঃ	অফিসঃ
অনন্তপুর	৫৮, ক্লাইভ স্ট্রীট
হাওড়া	কলিকাতা—৭

ফোন ঃ ৩৩—৩৭৫৯

নিত্য প্রয়োজনীয় ধুতি ও শাড়ী

"উৎসবমুখর এই দিনগুলি আমাদের মনে নতুন ক'রে এই প্রেরণা জাগাক, যাতে আমরা আরও কর্মশক্তির উৎসাহ পাই, যাতে আমরা গ'ড়ে তুলতে পারি সুসমৃদ্ধ ও গৌরবোজ্জ্বল

সোণার বাংলা"

বাঙ্গালী শিল্পে ও বাণিজ্যে আর পিছিয়ে নেই—

তারই প্রতীক—

মান্না মণ্ডল

এণ্ড

মল্লিক কোং

প্রসিদ্ধ চাউল ব্যবসায়ী

হাওড়া অফিসঃ	কলিকাতা অফিসঃ
রামকৃষ্ণপুর,	৫৮, ক্লাইভ স্ট্রীট
চড়াঘাট	ফোন—৩৩-৩৭৫৯
ফোন—৬৭-২৩২০	

সহযোগী প্রতিষ্ঠানঃ

সিদ্ধেশ্বরী কটন মিলস্ প্রাঃ লিঃ
অনন্তপুর টেক্সটাইলস্ লিঃ
সিদ্ধেশ্বরী রাইস মিলস্ প্রাঃ লিঃ
আটেশ্বরী রাইস মিলস্ প্রাঃ লিঃ
বিশালাক্ষ্মী রাইস মিলস্ প্রাঃ লিঃ
গঙ্গা রাইস মিলস্
শৈলেন্দ্র রাইস মিলস্
অন্নপূর্ণা রাইস মিলস্
সিংহবাহিনী রাইস মিলস্
জগদ্ধাত্রী রাইস মিলস্
লক্ষ্মীনারায়ণ রাইস মিলস্
নারায়ণী রাইস মিলস্
শশী রাইস মিলস্
কমলা রাইস মিলস্
অমল রাইস মিলস্
শ্রীদুর্গা রাইস মিলস্

আজকের এই শিল্প-অগ্রগতির দিনে ক্ষুদ্রতম অবদান

তাঁত ও হোসিয়ারী শিল্পের প্রয়োজন মেটাতে

সর্বাধুনিক যন্ত্রসমন্বিত সুতাকল

অনন্তপুর

টেক্সটাইলস্

লিমিটেড

মিলস্ঃ	অফিসঃ
অনন্তপুর	৫৮, ক্লাইভ স্ট্রীট
হাওড়া	কলিকাতা—৭

ফোন ঃ ৩৩—৩৭৫৯

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
মাতৃপূজা (সম্পাদকীয়)—		১
বিবেকানন্দের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত (প্রবন্ধ)—	ডঃ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন	২
উৎকোচ তত্ত্ব (গল্প)—	পরশুরাম	৫
রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা (প্রবন্ধ)—	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন	৯
আর এক দিক (গল্প)—	বনফুল	১৫
বৈষ্ণব সাধনায় মা (প্রবন্ধ)—	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন	১৮
ইভান সের্গেভিচ তুর্গেনেফ (প্রবন্ধ)—	সৈয়দ মুজতবা আলী	২০

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
কবিতা		২৩—৩০
ধূম-পাহাড় জঙ্গম-দ্বীপ—	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	২৩
তোমার আমার—	জীবনানন্দ দাশ	২৩
সহযোগী—	শ্রীবিষ্ণু দে	২৩
ফিরে ফিরে ডাক—	শ্রীমণীশ ঘটক	২৪
উদয়ন-নাট্য—	শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য	২৪
সারাদিন ধরে হাপর ফুঁসেছে—	শ্রীঅরুণ মিত্র	২৪
পাতা আর ফুল—	শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২৪
ঘর থেকে পথে—	শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র	২৫

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত
অধ্যাপক শ্রীবৈদ্যনাথ শীল প্রণীত

বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা ৮৲

সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আলোচনা ও গবেষণা। ইহা একাধারে সাধারণ পাঠক, ছাত্র, শিক্ষক সকলেরই একান্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত

বাংলা সাহিত্য ছোটগল্পের ধারা ৬৲

(উত্তর ভাগ — প্রথম পর্ব)

জগদীশ গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অতি-আধুনিক লেখকদের ২৫টি ছোট গল্পের সংকলনে বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের বিশেষ অগ্রগতির ধারা দেখান হইয়াছে।

অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

কবিগুরু ৩৷৵০

অধ্যাপক নিরঞ্জন চক্রবর্তী প্রণীত

ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীকার ও বাংলা সাহিত্য

দাশরথি রায়, রসিকচন্দ্র রায়, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস প্রমুখ প্রখ্যাত পাঁচালীকারগণের সাহিত্যকর্মের বিস্তৃত আলোচনা—ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের একটি অলিখিত অধ্যায়।
পাঁচালীকারগণের উপর ইহাই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়রহিত গ্রন্থ।
[শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে]

শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ

সঙ্গীত সোপান ৩৷৵০

গীতশিক্ষার্থীদের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত একখানি অভিনব পুস্তক।

মহাজাতি প্রকাশক কলিকাতা—১২ ফোনঃ ৩৪-৪৭৭৮

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
ইনক্লুয়েঞ্জা	শ্রীদিনেশ দাস	২৫
সেদিন	শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী	২৫
ঘোড়ার চাল	শ্রীসন্তোষ মুখোপাধ্যায়	২৬
সম্রাট	শ্রীউমা দেবী	২৬
তিমি	শ্রীকৃষ্ণধন দে	২৬
পাইলট অজিত নাগ	শ্রীমণীন্দ্র রায়	২৭
কবিতার জন্য	শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য	২৭
এ-ঘর ও-ঘর	শ্রীরাজলক্ষ্মী দেবী	২৭
কেবল আসতে থাকে	শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	২৮
প্রতিধ্বনি	শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী	২৮
পরিণামী	শ্রীবিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮
আরশি	শ্রীঅরুণকুমার সরকার	২৯
শেষ বি এন আর মেল	শ্রীনরেশ গুহ	২৯
এক-একটি দুপুরে	শ্রীচিত্ত ঘোষ	২৯
আসমুদ্র	শ্রীঅরবিন্দ গুহ	২৯
দৃশ্য-কাব্য	শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	৩০
অন্য দেশ	শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৩০
জাদুকরী	শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ	৩০
অবর্তমানে	শ্রীমানস রায়চৌধুরী	৩০
উপন্যাস		
রূপসী রাত্রি	শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩১—১৩১
হত্যাকারী (গল্প)	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	১৩২
পরিকল্পনা, কৃষি ও গ্রামীণ সমাজ (প্রবন্ধ)	শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ	১৩৫
নীলকর (গল্প)	শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪১
প্রাগৈতিহাসিক (গুর্কাণ্ডিকা)	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	১৫০
হেস্টিংসের সময় কলিকাতার ইংরাজ সমাজ (প্রবন্ধ)	শ্রীসরলাবালা সরকার	১৫৫
কোন কুলবধূর কথা (গল্প)	শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ	১৬১

ব্যাঙ্ক অফ চায়না

(চীনদেশে সমিতিবদ্ধ, সদস্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ)

প্রধান অফিস - পিকিং, চীন।

বোম্বাই অফিস,
স্যার পি মেটা রোড,
বোম্বাই।

কলিকাতা অফিস,
১৫, ব্র্যাবোর্ণ রোড,
কলিকাতা।

সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টস সহ

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

পৃথিবীর প্রধান কেন্দ্র সমূহে করস্পণ্ডেণ্ট
ও শাখা আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

মৈমনসিংহ-গীতিকা (দীনেশ সেন)	১২·০০
কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (শ্রীকুমার ও বিশ্বপতি)	১০·৫০
লালন-গীতিকা (মতিলাল দাস ও পীযূষ মহাপাত্র)	৭·০০
এগারটি বাংলা নাট্যগ্রন্থের দৃশ্য-নিদর্শন (অমরেন্দ্র)	৬·০০
বাংলা আখ্যায়িকা-কাব্য (প্রভাময়ী দেবী)	৬·৫০
কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী (সত্য ভট্টাচার্য)	১০·০০
প্রাচীন কবিওয়ালার গান (প্রফুল্ল পাল)	১৫·০০
অভয়ামঙ্গল (দ্বিজরামদেব-কৃত) (আশুতোষ দাস)	৭·০০
বিচিত্র-চিত্র-সংগ্রহ (অমরেন্দ্র রায়)	৪·০০
পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল (নলিনী দাশগুপ্ত)	১২·০০
শিব-সংকীর্ত্তন (রামেশ্বর-কৃত) (যোগীলাল)	৮·০০
দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা (শ্রীশ চট্টোঃ)	২০·০০
জ্ঞান ও কর্ম্ম (গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)	৬·০০
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস (মোহিত মজুমদার)	২·৫০
রায়শেখরের পদাবলী (যতীন্দ্র ও দ্বারেশ)	১০·০০
বাংলা ছন্দের মূলসূত্র (অমূল্যধন)	৪·৫০
নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস (কল্যাণী মল্লিক)	১৫·০০
পাতঞ্জল যোগদর্শন (হরিহরানন্দ)	৯·০০
বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ (শ্রীশচন্দ্র)	৩·০০
উপনিষদের আলো (মহেন্দ্র সরকার)	৩·৫০
গীতার বাণী (অনিলবরণ রায়)	২·০০
বাঙ্গালীর পূজাপার্বণ (অমরেন্দ্র রায়)	৪·০০
বাংলার বাউল (ক্ষিতিমোহন সেন)	২·০০
রামদাস ও শিবাজী (চারুচন্দ্র দত্ত)	৪·০০
বাংলা চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য (গিরিজাশঙ্কর)	৭·০০
বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (সুনীতি চট্টোঃ)	৩·০০
শাক্ত পদাবলী (অমরেন্দ্র রায়)	২·৫০
ভারতীয় সভ্যতা (ব্রজসুন্দর রায়)	১·০০
সাহিত্যে নারী স্রষ্টী ও সৃষ্টি (অনুরূপা দেবী)	৬·০০
শিক্ষার বিকিরণ (রবীন্দ্রনাথ)	·৬২
বাংলার ভাস্কর্য (কল্যাণ গঙ্গো)	২·০০
দুর্গাপূজা চিত্রাবলী (চৈতন্যদেব চট্টোঃ)	১·৫৬
ভারতীয় বনৌষধি (সচিত্র) (কালীপদ) ১ম ১০·০০, ২য় ৬·০০, ৩য় ৬·০০	
শারীরবিদ্যা (Physiology) (রুদ্রেন্দ্র)	১২·০০
জ্ঞানদাসের পদাবলী (হরেকৃষ্ণ ও শ্রীকুমার)	১০·০০
বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (প্রমথ চৌধুরী)	·৫০
বাংলা নাটক (হেমেন্দ্রপ্রসাদ)	৫·০০
বঙ্কিম-পরিচয় (অমরেন্দ্র রায়)	·৬২
গিরিশচন্দ্র (হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত)	২·৮১
বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা (অজর সরকার)	২·০৬
সাঙ্গীতিকী (দিলীপ রায়)	২·৫০
প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তমোনাশ)	১২·০০
শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ (গিরিজাশঙ্কর)	৩·৫০
বাংলা সাহিত্যের কথা (সুকুমার)	২·৫০
বাঙ্গলা বচনাভিধান (অমরেন্দ্র)	৩·৫০
পদাবলী-সাহিত্য (কালিদাস রায়)	৬·০০
বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল (আশুতোষ)	১০·০০

* কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে **"প্রকাশন-বিভাগ"** কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৮, হাজরা রোড, কলিকাতা—১৯ এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।
* নগদ মূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়স্থ **বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ-বিক্রয়-কেন্দ্র** হইতেও পুস্তকগুলি পাওয়া যায়।

উৎসবের অঙ্গ

ফিলিপস্

* * *

উৎসব মূর্ত হয়ে ওঠে আলো আর সংগীতে।
উৎসবের আনন্দ পরিপূর্ণ করে তোলে
ফিলিপস্-এর অগণিত শিল্প-সম্ভার।
ফিলিপস্-এর শিল্প-স্পর্শে আপনার উৎসব
মুহূর্তগুলি মধুর হয়ে উঠুক।

ফিলিপস্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

PSPH 87

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
পত্রবিলাস (গল্প)	শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র	১৬৯
বিশ শতকের ভাবনা (প্রবন্ধ)	শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল	১৭৭
রক্তের বদলে রক্ত (বড় গল্প)	শ্রীমনোজ বসু	১৮১
আধুনিক কবিতায় ব্যঞ্জনা (প্রবন্ধ)	শ্রীশিবনারায়ণ রায়	২০৫
ক্ষত (গল্প)	শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২১১
কলকাতার ঋতুরঙ্গ (রম্যরচনা)	শ্রীসুশীল রায়	২১৮
প্রতীক্ষা (গল্প)	সম্বুদ্ধ	২২১

আনন্দমেলা ২২৫—২৪৮

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
শুভেচ্ছা	মৌমাছি	২২৫
বড়াই কীসের? (পুরাণের গল্প)	শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত	২২৬
বীর রাজা সীতারাম (ইতিহাসের গল্প)	শ্রীযামিনীকান্ত সোম	২২৭
খোশ-গল্প	শ্রীনরেন্দ্র দেব	২২৮
মালঞ্চ (আবৃত্তি-নাটিকা)	শ্রীরাধারানী দেবী	২৩০
রাজপুত্তুর (কবিতা)	আশরাফ সিদ্দিকী	২৩০
অট্টালিকা ও ডিঙিগ (রূপক)	শ্রীঅখিল নিয়োগী	২৩১
বাঘের চোখ (হাসির গল্প)	শ্রীলীলা মজুমদার	২৩২
আশ্বিনের কবিতা (কবিতা)	শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩৩
সহযাত্রী (গল্প)	শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র	২৩৪
পাখির ফাঁকি (রূপক)	শ্রীমনোজিৎ বসু	২৩৫
পুজোর ছুটি এলো (কবিতা)	শ্রীপ্রভাকর মাঝি	২৩৭
তিড়বিড়ে সিং (খেলা)	শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র	২৩৭
পড়ছে গাছের ঝরাপাতা (ধাঁধা)	শ্রীসময় দে	২৩৮
জগৎটা মিথ্যার (হাসির কবিতা)	শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩৯
মা দুর্গা (কবিতা)	শ্রীচণ্ডী সেনগুপ্ত	২৩৯

★ আশা ভোঁসলে
★ প্রতিমা ব্যানার্জি
★ হেমন্ত মুখার্জি
★ ইলা চক্রবর্তী-র

নেপথ্য কণ্ঠ সমৃদ্ধ

আসিতেছে !

সরোজ মুখার্জি

প্রযোজিত

চিত্রনাট্য ও সংলাপ : প্রেমেন্দ্র মিত্র

পরিচালনা : অগ্রণী

সঙ্গীত : ভি, বালসারা

পরিবেশক : কনক ডিস্ট্রিবিউটার্স

Chitralipi 2

রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত পনেরোখানি ছবি এই খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। মূল চিত্রের বিচিত্র বর্ণসমারোহ প্রতিলিপিতে যথাসাধ্য রক্ষিত হয়েছে। সূচনায় রবীন্দ্রনাথ-লিখিত My Pictures নামে একটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। কাগজের মলাট ১০·০০, কাপড়ে বাঁধাই ১৮·০০

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Early Works

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে রক্ষিত অভিসারিকা, বুদ্ধ ও সুজাতা, ওমর খৈয়াম, ঋতুসংহার প্রভৃতি তেরোখানি চিত্রের রঙিন প্রতিলিপি। শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী স্টেলা ক্রামরিশ ও শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখিত আলোচনা সহ।
কাগজের মলাট ১৩·০০, কাপড়ে বাঁধাই ১৮·০০

শ্রীনন্দলাল বসু

An Album Of Nandalal Bose

এই চিত্র-সংগ্রহে শিল্পীর বহু প্রধান চিত্রের বহুবর্ণ প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে। যথা—সতী, অহল্যা, পার্থসারথি, উমা, বীণাবাদিনী, পোয়ে-নৃত্য, মন্দিরা-নৃত্য, নটীর পূজা, গান্ধীজির ডাণ্ডিযাত্রা, পথহারা, কোণারক, পদ্মা, চৈতন্যের টোল, বরযাত্রা, প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি মোট ঊনত্রিশখানি পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি। এ ছাড়া বহু পেন্সিল ও কালিকলমের স্কেচ। কাপড়ের মলাট ২০·০০

বিশ্বভারতী ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

ছাত্রদের সর্বাকছু প্রয়োজনীয় জিনিষের একমাত্র নির্ভরযোগ্য স্থান

সকলের গর্বের বিষয় !
ভাল জিনিষের জন্য ভাল দোকান !!

জ-ন-তা স্টো-র্স

৫, ধর্মতলা স্ট্রিট, কলিকাতা।

আসুন! দেখুন !!!
যা আপনি চাইছেন
যা আপনার সামর্থ্যে কুলায়
যা একেবারে হাল ফ্যাসানের

পুরুষ, মহিলা ও শিশু পরিধেয়ের সুচারু সমাবেশ

"তৈরী জামার একটি দোকান"

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
সোনার হাসি (রূপকথা)	শ্রীশৈলেন ঘোষ	২৪০
রামছাগলে কাণ্ড (হাসির গল্প)	বন্ধুভূতুম	২৪৩
আমাদের হাত (প্রবন্ধ)	শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	২৪৪
মাঝি ভাই (কবিতা)	শ্রীবাসুদেব গুপ্ত	২৪৫
জোনাকি (কবিতা)	শ্রীদিব্যেন্দু পালিত	২৪৫
ময়নার গল্প (কবিতা)	শ্রীশংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	২৪৫
বড় শিকারীর প্রথম শিকার (গল্প)	শ্রীগৌরীশংকর ভট্টাচার্য	২৪৬
টুকুন বুবুন (কবিতা)	শ্রীশ্যামলকুমার চক্রবর্তী	২৪৭
ছিপের শিকার (ব্যাংগচিত্র)	শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ	২৪৭
চলল চাঁদের দেশে (ছড়াছবি)	শ্রীবিমল ঘোষ ও শ্রীরেবন্ত ঘোষ	২৪৮
ছেঁড়া তমসুক (গল্প)	শ্রীসমরেশ বসু	২৪৯
কাচের দেওয়াল (গল্প)	শ্রীআশাপূর্ণা দেবী	২৬১
চণ্ডিদাস সম্পাদন (স্মৃতিকথা)	শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন	২৬৯
ঈর্ষা (গল্প)	শ্রীরমাপদ চৌধুরী	২৭০
অন্ধকার হয়ে এলে (গল্প)	শ্রীবিমল কর	২৮১
আমাদের কৃষি-সমস্যা (প্রবন্ধ)	ডঃ শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার বসু	২৮৭
শঙ্কাহরণ (গল্প)	শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	২৯২
কবিতা পাঠের ভূমিকা (প্রবন্ধ)	শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর	৩০০
শিবলিংগ রহস্য (প্রবন্ধ)	শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত	৩০৪
সিনেমা কি আর্ট? (প্রবন্ধ)	শ্রীজ্যোতির্ময় বসুরায়	৩০৯
বাংলা সামাজিক নাটক (প্রবন্ধ)	শ্রীপ্রভাংশু গুপ্ত	৩১৪

ধবল বা শ্বেতি
(Leucoderma)

দুরারোগ্য নহে, স্বল্পব্যয়ে ও অল্পদিনে নিশ্চিহ্ন হয়। পুরাতন ও হতাশ রোগীর বিশ্বস্ত চিকিৎসাকেন্দ্র। সাক্ষাৎ বা পত্রালাপ—ডাঃ কুণ্ডু (Dermatologist). ৬৪।৯, নরসিং এভিনিউ, কলিকাতা—২৮।
Leucoderma Research & Cure Centre
(সি ২৩০৮)

পূজা বাজার কোরতে
বেশী খরচ হয়ে গেলেও

চা আপনাকে কিনতে হবেই, তবে ভাল চা কিনবেন তা হোলে দাম দিয়ে সার্থক হবে। আমাদের এখানে এলেই

ভাল চা পাবেন।

—টী মার্চেন্টস—

বি, কে, সাহা
প্রাইভেট লিমিটেড
৭, পোলক স্ট্রীট,
১৩১।১এ, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট।

= পূজায় =
শ্রেষ্ঠ উপহার

রূপচর্চায় 'ওটি' ট্যালকাম পাউডার ও স্নো সর্বজন কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত।

ওটি'র প্রসাধন সামগ্রী.
গুণ, গন্ধ ও মূল্যের
বিচারে শ্রেষ্ঠ নির্বাচন।

শুধু চাইবেন

উৎকর্ষ ও
দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য
বিখ্যাত

ইউনিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ

৩৭, মসজিদবাড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

এজেণ্টস্ ঃ তারা সাইকেল ষ্টোর্স

১৭-১৯, আর জি কর রোড, কলিকাতা-৪

আনন্দময়ীর আগমনে প্রিয়জনকে

সাজাতে "গহনা" চাই—

সর্বজন সমাদৃত
বিশ্বস্ত ও
আধুনিক
স্বর্ণশিল্পী

ফোন:-৪৮-৪৬৩৯

ন্যাশনাল জুয়েলারী ওয়ার্কস্

২০, কালীঘাট রোড • কলিকাতা-২৫

ব্রাঞ্চ—১২২, আশুতোষ মুখার্জি রোড

॥ ন্যাশনালের কয়েকটি বই ॥

ছোট গল্প

ননী ভৌমিক
চৈত্রদিন

কাহিনী

পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী
ডাগনাদিহির মাঠে

আলোচনা

হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী এম, পি
GANDHIJI
a study ৫·৫০

ভ্রমণ:

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
অবিস্মরণীয় চীন ৩·০০

অনুবাদ সাহিত্য

লিওনিদ সলোভিয়েভ
বুখারার বীর কাহিনী ৩·৫০

মিখাইল শলোখফ
সাগরে মিলায় ডন ৬·০০

পিয়তর পাভলেংকো
জীবনের জয়গান ৪·০০

অধ্যাপক এ. এল. কারানভ
মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ
৭·০০

ইলিন ও সেগাল
মানুষ কি করে বড়ো হল ৩·৫০

॥ সোবিয়েতের বই ॥

রুশ চিরায়ত সাহিত্য
আই. তুর্গেনিভের
RUDIN ১·৮৭

ম্যাক্সিম গর্কির
FOMA GORDEYERV ২·৬২

আধুনিক উপন্যাস
ই. কাজাকেভিচ
Spring on the Oder ২·৬২

ই. মালটসেভ
Heart and Soul ২·২৫

সোবিয়েত বিজ্ঞান গ্রন্থ
I. V. Michurin,
the Great

এ. বাখারেভ:
Transformer of Nature ০·৭৫

টি. লাইসেংকো:
Situation in Biological
Science ০·৩৭
Agrobiology ৫·৬৯

আই. পাভলভ:
Selected Works ২·৮১

রাজনীতি

J. V. STALIN
Collected Works
Vol. 1—7 each 1.50:
Vol. 8-13 each 1.25

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলিকাতা ১২
শাখা : ১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩
V/o Mezhdunarodnaja Kniga
Moscow 200, U.S.S.R.

যেথায় সবচেয়ে
বেশী দরকার

পল্লীবাংলার দুর্দশা বর্ণনার ভাষা নেই। কৃষি-জমির যা পরিমাণ, তাতে কোটি কোটি লোকের অন্নসংস্থান অসম্ভব। আধুনিক শিল্প-সংস্থা পশ্চিম-বাংলায় যা কিছু আছে, তার সবটাই কলিকাতার আশেপাশে একটা ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ। এর উপর আছে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুগণের সমস্যা : লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল সর্বহারা নরনারী পল্লী-বাংলার সর্বত্র আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। অথচ কোথাও কারো পক্ষে কর্ম-সংস্থানের কোন উপায় নেই। এ পরিস্থিতির অবসানের জন্য 'বেঙ্গল টেক্সটাইল' যথাসাধ্য করছে এবং পশ্চিমবাংলার পল্লী অঞ্চলেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজারে যেখানে বহুসংখ্যক উদ্বাস্তু বসবাস আরম্ভ করেছেন এবং বেকার স্থানীয় লোকও রয়েছে প্রচুর, সেখানেই বেঙ্গল টেক্সটাইল মিলটি স্থাপিত হয়েছে।

COSSIMBAZAR
KATWA
BURDWAN
HOOGHLY
CALCUTTA

অনগ্রসর এলাকায় আধুনিক যন্ত্র-শিল্পের প্রতিষ্ঠার ফলে যে অদ্ভুত পরিবর্তন হয়, তার অন্যতম দৃষ্টান্ত-স্থল কাশিমবাজার। আজ সেখানে সকলের চোখে আশার আলো মনে নবীন ভারতের নাগরিকত্বের গৌরব দীপ্ত, কণ্ঠে কণ্ঠে এগিয়ে চলার সংগীত।

বেঙ্গল টেকস্টাইল মিলস লিঃ

অন্যতম ডি, এন, চৌধুরী শিল্প প্রতিষ্ঠান

মিলস—কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবাংলা।

হেড অফিস—পি-৪৯, বি, কে, পাল এভেন্যু কলিকাতা—৫।
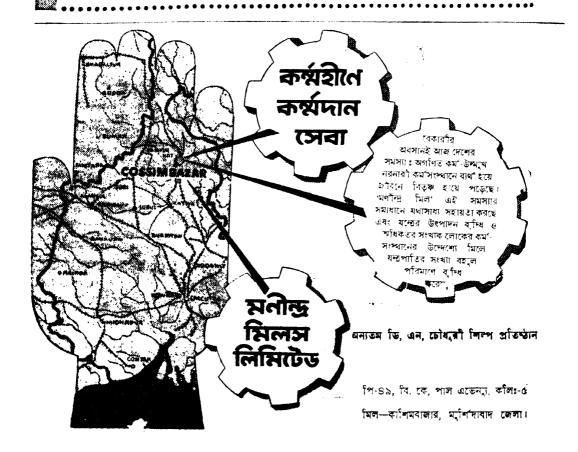
ভ্রমণে ও জরুরী কাজে রাশিয়ান এবং এক্সেলসার (ইংলিশ) অদ্বিতীয়।
এখনও কিছু পাবেন

একসেলসার

রাশিয়ান

(ইংলিশ)
১ H. P.
মজবুত
দ্রুতগামী
অভিনব, অথচ
তেল খরচ কম
দামেও সুবিধা।

১½ H. P.
৩½ H. P.
কলকব্জায়,
স্থায়িত্বে ও
কর্মশক্তিতে
আপনাকে বিস্মিত
কোরবে।

—ঃ এজেণ্টস ঃ—

সাইকেল হাউস

টেলিফোন ঃ ২৩—১২০৫

১৭৮/এ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিঃ-১৩

অপচয় নিবারনের

জন্যে হিমকক্ষে মাল রাখুন !

ব্যক্তিবিশেষ বা জাতি যার দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হোক না কেন, অপচয় নিবারণ উৎপাদন বৃদ্ধির মতই গুরুত্বপূর্ণ। অপচয় নিবারণের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা প্রচলন করে "বঙ্গশ্রী আইস" জাতির সেবায় ব্রতী রয়েছে। "বঙ্গশ্রী"র হিমকক্ষে সব রকমের পচনশীল দ্রব্যই প্রায় অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবিকৃত থাকে। হিমকক্ষে আলু, ডিম, মাছ, মাখন, ফল, দামী ঔষধপত্র প্রভৃতি রাখলে সেগুলি পচে নষ্ট হয় না। "বঙ্গশ্রী"র বরফ ও শুদ্ধ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানসম্মত।
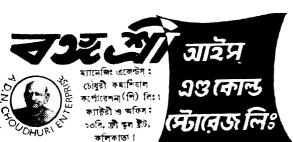
দেব সাহিত্য কুটীরের
• নূতন বই •
পূজাবার্ষিকী

অপরাজিতা-৪৲

ঠানদিদির থলে-৩৲

সুনির্মল বসুর
বরণ ডালা - ২৲

আশাপূর্ণা দেবীর
গল্প ভালো আবার বলো-২৲

ঠাকুরমার ঝুলি—৩৲

ভূত পেত্নী দত্যি দানা—৩৲

• পূজা বার্ষিকী •

নব পত্রিকা ৪৲

দেবালয় ৪৲

জয়যাত্রা ৪৲

প্রভৃতি ২৭ খানা বার্ষিকী

বিশ্ব পরিচয় ৮৲

[পৃথিবীর ইতিহাস]

মনে রাখবেন—

সরস্বতী পূজার সময়

শুকতারা

দ্বাদশ বর্ষে পড়বে

বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা
পাঠিয়ে গ্রাহক হউন।

পত্র লিখিলে প্রায় ১০০০ রকম
পুস্তকের তালিকা পাঠান হয়

দেব সাহিত্য কুটীর — কলিকাতা ৯

দি দিল্লী ক্লথ এণ্ড জেনারেল মিলস কোম্পানী লিঃ, দিল্লী

DCM-1634

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের পক্ষে সোল ডিষ্ট্রিবিউটর্স
[illegible] কোং, ৮৭ খেংরাপটি স্ট্রিট, কলিকাতা

শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনী

শিল্পী রাম মহারানা, ওড়িশা

খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুশুণ্ডীপরিঘায়ুধা॥
সৌম্যাঃ সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।
পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী॥ শ্রীশ্রীচণ্ডী
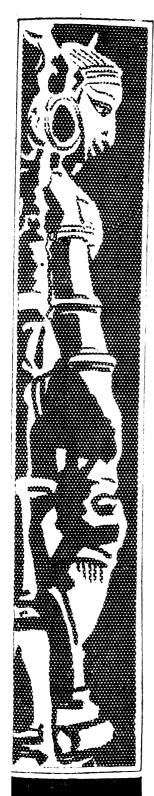
বৎসর ঘুরিয়া আসিল। শরতের নির্মল শ্যামশোভা বাঙলার বুকে আবার হাসিয়া উঠিয়াছে, আর তাহারই মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন মা।

মা আসিয়াছেন; এ মা কাহারও একার মা নহেন; এ মা সকলের মা;—সর্বজননী, বিশ্বজননী, জগন্মাতা প্রভৃতি নামে এই মায়ের সম্বোধন ও আবাহন। যিনি জগতের জননী, যিনি বিশ্বের জননী তাঁহার আরাধনার উপলক্ষ্য বলিয়াই শারদীয়া পূজা "মহাপূজা"—বাঙালীর এই অনুষ্ঠান কেবল জাতীয় উৎসব নহে, সর্বজনীন উৎসব। যাঁহাকে বলি জগতের মা তাঁহাকে সমাদরে ঘরে লইয়া আসি, কখনও কাতর চিত্তে ডাকিয়া বলি মা, কখনও স্নেহাতুর কণ্ঠে বলি দুহিতা—

"আমার উমা কই গিরিরাজ
কোথা মম নন্দিনী"

ইহা কেবল সংগীতের ভাষা নহে। ইহা বাঙালীর অন্তরের অন্তস্তলের ভাষা। যিনি জননী তিনিই কন্যা; যিনি কন্যা তিনিই আবার জননীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা। গিরিরাজ-দুহিতা বাঙালীর কাছে একাধারে জননী ও কন্যা উভয় রূপেই দেখা দিয়াছেন। এক দিকে তিনি স্নেহের আশ্রয়, অপর দিকে তিনি স্নেহের অবলম্বন।

এই মা; বঙ্কিমের ধ্যানে যিনি দেখা দিয়াছিলেন; বাঙলার অগণিত সাধকের ভক্তিপরিপ্লুত সাধনার ধারায় যিনি অভিষিক্ত হইয়াছেন। বাঙালী ভক্তিপ্রবণ, বাঙালী ভাবপ্রবণ। আমরা ভাবমুখে থাকিয়া মায়ের সাধনা করি; মাকে ডাকিয়া আত্মহারা হই; মায়ের স্নেহাশ্রয় লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠি। বৎসরের মধ্যে একবার জননী বাঙালীর গৃহপ্রাঙ্গণ আলোকিত করিয়া দেখা দেন। সারাবৎসর আমরা তাহারই আশায় থাকিয়া দিন গুনি।

মাতৃপূজার পবিত্র অঙ্গনে আজ সকলের প্রতি আমাদের আহ্বান; সকলের প্রতি সমান আবেদন। জননীর মধ্যে একদিকে যেমন করুণা অপরদিকে তেমনি শক্তি—উভয়ের সমন্বয়ে মাতৃমূর্তির অপরূপ মহিমা। এই মহিমার সমুজ্জ্বল প্রকাশের সম্মুখে আমরা আজ নতমস্তকে আসিয়া দাঁড়াইব এবং হৃদয়ের আর্তি জানাইয়া বলিব—

"সমস্ত চরাচর ব্যাপিয়া মাতৃরূপে যাঁহার অধিষ্ঠান, তাঁহার চরণেই বারবার আমাদের প্রণাম নিবেদন করি।"
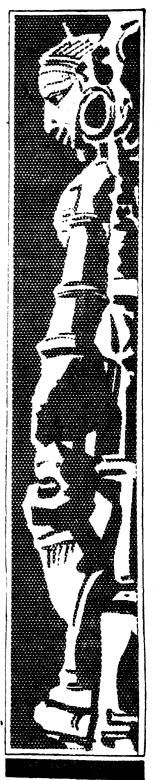
বিবেকানন্দের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত

ক্ষিতিমোহন সেন

রবীন্দ্রসংগীতে একটি বিখ্যাত গানে আছে, "করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে, কোথা নিয়ে যায় কাহারে?"

এই গানটিকে শুধু অধ্যাত্ম পথের সূচনা বলে মেনে নিলে চলবে না। অনেক অপূর্ব সত্য ও গভির কথা এই গানটিতে প্রকাশ পেয়েছে।

অধ্যাত্ম সত্যে আলো পেয়েছি, এই দাবি জানাতে না পারলেও একথা বলতে পারি, জীবনে এমন অনেক জিনিস পেয়েছি, যার সম্ভাবনা আগে-পিছে কোথাও কিছু দেখিনি।

আমার ভাগ্য এমন যে, প্রথম রবীন্দ্র-সংগীত শুনতে পাই কাশীতে। আর যাঁর কণ্ঠে সেই গানটি ধ্বনিত হয়েছিল, তাঁর নাম শুনলে অনেকেই বিস্মিত হবেন। গানটি কাশীতে গেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। অনেক স্থানে আমি এই কথাটি সংকোচের সঙ্গে বলেছি। সম্প্রতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তমণ্ডলী দ্বারা প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি অতি প্রিয় গান একখানি বইয়ে মুদ্রিত আকারে পেয়েছি। গানটি:

এ কী এ সুন্দর শোভা। কী মুখ হেরি এ।
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ,
প্রেম উৎস উথলিল আজি
বলো হে প্রেমময়, হৃদয়ের স্বামী
কী ধন তোমারে দিব উপহার।

স্বামী বিবেকানন্দ অপূর্ব গাইয়ে ছিলেন। তাঁর বিবেকানন্দ নামটিও নাকি ভক্ত কেশব সেন মহাশয়ের কাছে পাওয়া। কথাটি বোঝাতে গেলে তখনকার দিনের আরও দু-একটি কথা বলা দরকার।

বিবেকানন্দের পূর্ব-আশ্রমের নাম শ্রীনরেন্দ্র দত্ত। এবং যে-পরিবারে তাঁর জন্ম, সে-পরিবারে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ছিল।

সাহিত্য, বিশেষত রূপক, সাধকদের মস্ত সহায়। প্রায় হাজার বছর আগে বাংলা দেশেই এই রূপকের জন্ম।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ, তাঁদের অন্তরাত্মার তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় রচনা করেন। এবং সে-অভিনয়ে শ্রীমহাপ্রভুও অংশ নেন।

এই রূপকজাতীয় নাটক লেখার পদ্ধতি আমাদের এদিকে বোধ হয় বাংলা দেশেই প্রথম দেখা যায়। প্রায় হাজার বছর পূর্বে মধ্যভারতের ভক্তরাজা কীর্তিসিংহের দরবারে বাঙালী কবি বর্ধমানবাসী শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র প্রথম রূপক "প্রবোধ-চন্দ্রোদয়" রচনা করেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, ভক্তির সহায়রূপে রূপক রচনা বাংলা দেশেরই এক মহৎ কীর্তি। প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ের কয়েক শতাব্দী পরে মহাপ্রভুর সময়ে নূতন লেখক এলেন কবি কর্ণপুর। তারও কয়েক শতাব্দী পরে এই বাংলা দেশেই আবার দেখা গেল চিরঞ্জীব শর্মার নববৃন্দাবন নাটক। নববৃন্দাবন নাটকে বিবেক ও বৈরাগ্য নামে দুইটি সুকণ্ঠ শিশুর আবির্ভাব কল্পিত হয়। নরেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেনের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। ভক্ত কেশবচন্দ্র নরেন্দ্রনাথকে বিবেক বলেই ডাকতেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁকে নিজ মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করতে গেলেন, তখন ভেবেছিলেন কী নাম হবে।

নরেন্দ্রানন্দ চলতে পারে কি?

এ সময়ে তাঁর মনে এল শ্রীকেশবচন্দ্র নরেন্দ্রনাথকে বিবেক বলে ডাকেন। তিনি বিবেকের সঙ্গে আনন্দ যোগ করে নরেন্দ্রনাথের নাম বিবেকানন্দ রাখলেন।

কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই সব ঘটনায় তা ভাল করেই বোঝা যায়।

কাশীতে বিবেকানন্দকে যে-কয়জনের মধ্যে দেখা যেত, তাঁদের সকলকেই সন্ধ্যায় যজ্ঞেশ্বর তেলীর বাড়িতে পাওয়া যেত। আমি রোজই সেখানে গিয়েছি। তখন আমরা ছেলেমানুষ। সে-বাড়িতে আমাদের প্রবেশের কোন বাধা ছিল না।

বিবেকানন্দের গান শুনেছি। আর একজন সুকণ্ঠ "বৈরাগ্য" যিনি শ্রীমন্মনীন্দ্রধন দে। তাঁর গান শুনেছি পরে কলকাতায়। তাঁকে কাশীতে কখনও পাইনি। কাশীতে আর-দুটি গান বিবেকানন্দের কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল। সব কটি গানই রবীন্দ্রনাথের—

মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।
ভেবেছিলেম ঘরে রব, কোথাও যাব না—
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বলো কী করি॥

সখী, আমার দুয়ারে কেন আসিল
নিশিভোরে যোগী ভিখারী।
কেন করুণ স্বরে বীণা বাজিল।
আমি আসি যাই যতবার চোখে পড়ে মুখ তার,
তারে ডাকিব কি ফিরাইব তাই ভাবি লো

আর একটি রামপ্রসাদী গান প্রতিদিনই স্বামীজীর কণ্ঠে শোনা যেত:

হৃৎ কমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মন পবনে দোলাইছে দিবস রজনী ও মা॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা।
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্ম স্বরূপিণী ও মা॥
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়।
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ও মা॥
যে দেখেছে মায়ের দোল,
সে পেয়েছে মায়ের কোল।
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী ও মা॥

সুর ভৈরবী হলেও বাংলা দেশের বিশেষ রূপটি এতে ধরা পড়েছে। গারা ভৈরবী সুর বাঙালীর অতি প্রিয়।

• • •

এ-কথা বলতে পারি সে-যুগে রবীন্দ্র-নাথের লেখা পড়তে বইয়ের সাহায্য পেয়েছি। আর রবীন্দ্রসংগীত শুনেছি এক মহাপুরুষের কণ্ঠে।

সে-সময়ে কাশীতে রবীন্দ্রনাথের নাম কেউ শোনেনি বললেই হয়।

এরই পর বরিশাল থেকে এক তরুণ বয়সের উকিল কাশীতে তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে এলেন। নাম, বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথের একজন অসাধারণ ভক্ত।

বাংলার বাইরে বাঙালীদের সাহিত্যজ্ঞান তখনকার দিনে ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আমরা দু-একজন তবু বাংলা জানতাম। অনেকের বাংলা অক্ষরপরিচয়ও হয়নি। বাংলা জানতাম কথাটা একটু পরিষ্কার করা দরকার। কাশীতে সে-সময়ে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় পৌঁছয়নি। বটতলার ছাপা শিশুবোধক বলে একটি শিশুপাঠ্য চটি বই ছিল। ইস্কুলে এবং বাড়িতে পড়ান হলেও শিশুদের উৎসাহ সঞ্চারিত হবে এরকম কিছু ছিল না। বর্ণমালার পরেই দাতা কর্ণের উপাখ্যান এবং তার পর গঙ্গার স্তব ইত্যাদি:

বন্দে মাতা সুরধুনী পুরাণে মহিমা শুনি
পতিতপাবনী পুরাতনী।

এতে শিশুমন আকৃষ্ট হত না।

শিশুবোধক ছাড়া অন্য বই, যেমন

কালিকাপুরাণ, কাশীখণ্ড, কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ অল্প বয়সে যাঁদের ভাগ্যে পড়বার সুযোগ হয়েছে, তাঁরা পরম ভাগ্যবান।

এই রকম সব শ্রোতাদের কাছে বিপিন দাশগুপ্ত মহাশয় রবীন্দ্রনাথের কথা যখন আলোচনা করতেন, আমরা শুধু স্তব্ধ হয়ে শুনেছি।

রবীন্দ্রনাথের গান বা তাঁর বাণীর মধ্যে বেশ একটু বিশেষত্ব আছে। অনেক গান এমনভাবে অন্তর থেকে বাইরে এসেছে যে, শুনে হঠাৎ মনে হয়, এই বিশেষ উপলক্ষ্যেই বুঝি এই গীত বা বাণী রচিত হল। অথচ শাশ্বত ভিত্তিই বা সাধারণ সত্যই তার উৎস এবং মূল।

প্রথম যেদিন কলকাতা জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁর কাছে যাই, গুরুদেবের কণ্ঠে সেদিন শুনলাম—

কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই—
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই॥

ঠিক এই রকমেরই একটি কারণে কেউ কেউ তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত গান প্রায় হারাতে বসেছিলেন। জনগণমনঅধিনায়ক আজ জাতীয় সংগীত হিসেবে দেশ গ্রহণ করেছে, অথচ এই গানটির জন্য যে কত লোককে বোঝাতে হয়েছে, সে-কথা ভাবতেও ক্লান্তি আসে।

যেবার কবি বিলেতে গিয়ে—বলতে গেলে জগৎ-বিখ্যাত হয়ে দেশে ফিরে এলেন, সেটা তাঁর তৃতীয় বিদেশযাত্রা। এই বিদেশ ভ্রমণ গীতাঞ্জলি-যাত্রা নামেও বিখ্যাত।

কবির শরীর খুব খারাপ। বিলেতে তাঁর অপারেশনের দরকার হবে।

এই যাত্রার প্রারম্ভে তাই সবাই উদ্বিগ্ন তিনি এত বড় শল্যচিকিৎসা সইতে পারবেন কি না। ভোরবেলা শান্তিনিকেতন থেকে তাঁকে রওনা হতে হবে। আমরা যাব তাঁকে বিদায় দিতে। হঠাৎ অন্ধকার দূর হতে-না হতে শুনি বাইরে তাঁর কণ্ঠধ্বনি। অপরূপ সুরে তিনি গাইছেন এবং গাইতে গাইতে আমাদের ঘরের দিকে আসছেন—

ফিরায়ে দিনু দ্বারের চাবি,
রাখি না আর ঘরের দাবি—
সবার আমি প্রসাদবাণী চাই॥
পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো, ভাই—
সবারে আমি প্রণাম করে যাই॥

শান্তিনিকেতন থেকে রওনা হওয়ার আগের দিন এই গান তিনি রচনা করেছিলেন।

এইভাবে তিনি অনেক আনন্দও পরিবেশন করে গিয়েছেন।

এই অসুখের কথায় মনে পড়ে অন্তের পীড়ায় তাঁকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। আশ্রমে তখন একজন কর্মী ছিলেন, তিনি হোমিও-প্যাথি চিকিৎসাও করতেন। তিনি উমেশ-চন্দ্র বাগচী। কলকাতায় তখনকার বিখ্যাত চিকিৎসক প্রতাপ মজুমদার মহাশয়ের আত্মীয়। কবি তাঁকে ডেকেছেন ওষুধের জন্য। বাগচী মহাশয় ওষুধ নির্বাচনের জন্য তাঁকে জেরা করতে আরম্ভ করলেন। সেইটেকেই পরে কবিগুরু আনন্দরসে অমরত্ব দিয়ে গিয়েছেন। কবিগুরু সে সময়ে গেয়েছিলেন—

যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা
তোমায় জানাতাম।
কে-যে আমায় কাঁদায় আমি
কী জানি তার নাম॥

রবীন্দ্রনাথকে যতক্ষণ আমরা তাঁর সাধনার মধ্যে না দেখি, ততক্ষণ তাঁকে চিনতে পারাই অসম্ভব। আমাদের দেশে সাধনার কথা হলেই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের কথা এসে পড়ে। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ গুরু-শিষ্য এই সম্বন্ধটি অতি পবিত্র ও মহৎ বলে স্বীকার করে গেছেন।

তবে তিনি অচলায়তন লিখলেন কেন?

ভাল জিনিসই বিকৃত হলে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। তার প্রমাণ আমরা সন্ত সাহিত্যেও পাই। মধ্যযুগে প্রেমধর্ম নিয়ে অনেক সাধক ভুল করে গিয়েছেন। তবু কি প্রেমকে বাদ দিতে পারা যায়?

মধ্যযুগের মহাবুবী ধর্মসাধনার কথা শুনতে পাই। মহাবুবী প্রেমের ধর্ম। অর্থাৎ সুফীমতের প্রেমধর্ম। প্রশ্ন হল এই যে, প্রেমের ধর্ম কেন বিকৃত হল? প্রেমের ধর্ম বলেই তা বিকৃত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

মোট কথা ধর্ম যদি সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুসংগত হয়, তবে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ সাধনার প্রাণকে রক্ষা করে। এই সম্বন্ধ যদি অসংগত ও বিকারগ্রস্ত হয়, তবে এই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের চাইতে বিপজ্জনক আর কিছু হতে পারে না।

ছুটির আকাশ — আলোকচিত্রী শ্রীঅমিয় তরফদার

জননী

শিল্পী শ্রীসুরেন কর

রবীন্দ্রভারতীর সৌজন্যে

॥ পরশুরাম ॥

উৎকোচ তত্ত্ব

কনাথ **পাল** জেলা জজ, অতি ধর্মভীরু, খুঁতখুঁতে লোক। তিনি সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকেন পাছে ধূর্ত লোকে তাঁকে দিয়ে কোনও অন্যায় কাজ করিয়ে নেয়। ছ মাস পরেই তাঁকে অবসর নিতে হবে, জজিয়তির শেষ পর্যন্ত যাতে দুর্নীতির লেশমাত্র তাঁকে স্পর্শ না করে সে সম্বন্ধে তিনি খুব সতর্ক। উৎকোচ তত্ত্ব বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা তাঁর আছে, সময় পেলেই তার জন্যে তিনি একটি খাতায় নোট লিখে রাখেন। আজ রবিবার, অবসর আছে। সকালবেলা একতলায় তাঁর অফিসঘরে বসে লোকনাথ নোট লিখছেন।—

কৌটিল্য বলেছেন, মাছ কখন জল খায় আর রাজপুরুষ কখন ঘুষ নেয়, তা জানা যায় না। কিন্তু একটি কথা তিনি বলেন নি—ঘুষগ্রাহী অনেক ক্ষেত্রে নিজেই বুঝতে পারে না যে সে ঘুষ নিচ্ছে। পাপ সব সময় স্থূলরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না, অনেক সময় সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে দেখা দেয়, তখন তার স্বরূপ চেনা বড়ই কঠিন। স্পষ্ট ঘুষ, প্রচ্ছন্ন ঘুষ, আর নিষ্কাম উপহার—এদের প্রভেদ নির্ণয় সকল ক্ষেত্রে করা যায় না। মনে করুন, রামবাবু একজন উচ্চপদস্থ লোক, তাঁর অফিসে একটি ভাল চাকরি খালি আছে। যোগ্যতম প্রার্থীকেই মনোনীত করা তাঁর কর্তব্য। শ্যামবাবুর জামাই একজন প্রার্থী, যথানিয়মে দরখাস্ত করেছে। শ্যামবাবু রামবাবুকে বললেন, আপনার হাতেই তো সব, দয়া করে আমার জামাইকেই সিলেক্ট করবেন, হাজার টাকা দিচ্ছি, বাহাল হয়ে গেলে আরও হাজার দেব। এ হল অতি স্থূল ঘুষ, নির্লজ্জ পাকা ঘুষখোর কিংবা দুর্বলচিত্ত লোভী ভিন্ন কেউ নিতে রাজী হয় না। অথবা মনে করুন, রামবাবুর সঙ্গে শ্যামবাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। এক হাঁড়ি সন্দেশ এনে শ্যামবাবু বললেন, কাশী থেকে আমার মা এনেছেন, খেয়ো। আমার জামাইকে তো তুমি দেখেছ, অতি ভাল ছোকরা। তার দরখাস্তটা একটু বিবেচনা করে দেখো ভাই, তোমাকে আর বেশী কি বলব। এও স্থূল ঘুষ, যদিও পরিমাণে তুচ্ছ। কিন্তু ধরুন, কোনও অনুরোধ না করে শ্যামবাবু এক গোছা গোলাপফুল দিয়ে বললেন, আমাদের মধুপুরের বাগানে হয়েছে। এ হল সূক্ষ্ম ঘুষ, এর ফল নিতান্ত অনিশ্চিত, তবে নিরাপদ জেনেই শ্যামবাবু দিতে সাহস করেছেন। আশা করেন এতেই রামবাবুর মন ভিজবে। আবার মনে করুন, রামবাবুর মেয়ের অসুখ, শ্যামবাবুর স্ত্রী এসে দিন রাত সেবা করলেন, অসুখও সারল। এক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রীর সেবা অনুচ্চারিত অনুরোধ অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম ঘুষ হতে পারে, অথবা নিঃস্বার্থ পরোপকারও হতে পারে, স্থির করা সোজা নয়। রামবাবু যদি দৃঢ়চিত্ত সাধুপুরুষ হন তবে শ্যামের জামাইএর প্রতি কিছুমাত্র পক্ষপাত করবেন না, তবে অন্যভাবে অবশ্যই কৃতজ্ঞতা জানাবেন। কিন্তু রামবাবু যদি বন্ধুবৎসল কোমলপ্রকৃতির লোক হন তবে শ্যাম-গৃহিণীর সেবা হয়তো জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁকে প্রভাবিত

করবে। এ ছাড়া বাঙ্ময় ঘুষ আছে যার আর্থিক মূল্য নেই, অর্থাৎ খোশামোদ বা প্রশংসা। নিপুণভাবে প্রয়োগ করলে বুদ্ধিমান সাধুলোকও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়—

লোকনাথের নোট লেখায় বাধা পড়ল। দরজা ঠেলে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঘরে এসে বললেন, কেমন আছ লোকনাথ বাবাজী, অনেক কাল তোমাদের দেখি নি। সেকি, চিনতে পারছ না? আরে আমি হলুম তোমাদের মোহিত পিসেমশাই, বেহালার মোহিত সমজদার। কই রে, পারুল কোথা আছিস, এদিকে আয় না মা।

হাঁকডাক শুনে লোকনাথ-গৃহিণী পারুলবালা এলেন। আগন্তুক লোকটিকে চিনতে তাঁরও কিছু দেরি হল। তার পর মনে পড়লে প্রণাম করে বললেন, মোহিত পিসেমশাই এসেছেন? উঃ কি ভাগ্যি!

অগত্যা লোকনাথও একটা নমস্কার করলেন।

মোহিত সমজদার হাঁক দিলেন, রামবচন, জিনিসগুলো এখানে নিয়ে আয় বাবা। মোহিতবাবুর অনুচর বাইরে অপেক্ষা করছিল, এখন ঘরে এসে মনিবের সামনে চারটে বাণ্ডিল রাখল।

একটা কার্ডবোর্ড বাক্স পারুলবালার হাতে দিয়ে মোহিতবাবু বললেন, আসল কাশ্মীরী শাল, তোর জন্যে এনেছি, দেখ তোর পছন্দ হয় কিনা।

শাল দেখে পারুলবালা আহ্লাদে গদ্‌গদ হয়ে বললেন, চমৎকার, অতি সুন্দর।

মোহিতবাবু বললেন, লোকনাথ বাবাজী, তোমার তো কোনও শখই নেই, শুধু বই আর বই। তাই একটা ওআলনট কাঠের কিতাবদান মানে বুক র‍্যাক এনেছি। আর এই বাক্সটায় কয়েক গজ কাশ্মীরী তাফতা আছে, একটা শাড়ি আর গোটা দুই ব্লাউজ হতে পারবে। আর এই চুবড়িটায় কিছু মেওয়া আছে, পেস্তা বাদাম আখরোট কিশমিশ মনাক্কা এই সব!

[illegible] হয়ে লোকনাথ বললেন, আহা কেন এত সব এনেছেন, এ যে বিস্তর টাকার জিনিস। না না, এসব দেবেন না।

মোহিতবাবু বললেন, আরে খরচ করলেই তো টাকা সার্থক হয়। তোমরা আমার স্নেহপাত্র, তোমাদের দিয়ে যদি আমার তৃপ্তি হয় তবে দেব না কেন, তোমরাই বা নেবে না কেন?

পারুলবালা বললেন, নেব বই কি পিসেমশাই, আপনার স্নেহের দান মাথায় করে নেব। তার পর, এখন কোথা থেকে আসা হল? দিল্লী থেকে? পিসিমাকে আনলেন না কেন? তিনি আর ছেলেমেয়েরা সব ভাল আছেন তো?

—সব ভাল। তাদের একদিন নিশ্চয় আনব। অনেক কাল পরে কলকাতায় এলুম, বেহালার বাড়িখানা যাচ্ছেতাই নোঙরা করে রেখেছে। একটু গোছানো হয়ে যাক তার পর তোর পিসীকে নিয়ে একদিন আসব। নানানানানা, চা-টা কিছু নয়, আমার এখন মরবার ফুরসত নেই, নানা জায়গায় ঘুরতে হবে। আজ চললুম। ঝড়ের মতন এলুম আর গেলুম, তাই না? কিছু মনে ক'রো না তোমরা, আবার একদিন আসব।

পারুলবালাকে প্রশ্ন করে লোকনাথ জানলেন, মোহিতবাবু তাঁর আসল পিসে নয়, পিসের ভাই। ছেলেবেলায় তাঁর বাপের বাড়িতে আসল পিসের সঙ্গে তাঁর এই ভাইও মাঝে মাঝে আসতেন, সেই সূত্রে পরিচয়। তার পর কালে ভদ্রে তাঁর দেখা পাওয়া যেত। মোহিতবাবু নানা রকম কারবার ফেঁদেছিলেন। কোনওটারই এখন অস্তিত্ব নেই, কিন্তু সেজন্যে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মনে হয় না। তাঁর অবস্থা ভালই, বড় বড় লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে। এখন তিনি কি করেন জানা নেই।

লোকনাথ তাঁর অফিসঘরে বসে ভাবতে লাগলেন। মামার শালা পিসের ভাই, তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই। মোহিতবাবুর স্নেহ হঠাৎ উথলে উঠল কেন? বহুকাল আগে লোকনাথ তাঁর শ্বশুরবাড়িতে এই কৃত্রিম পিসেমশাইটিকে দেখে থাকবেন, কিন্তু এখন মনে পড়ে না। আপাতত মোহিতবাবুর কোনও দোষও ধরা যায় না, তিনি বহুমূল্য উপহার দিয়েছেন কিন্তু কিছুই চান নি। হয়তো দিন দুই পরেই একটা অন্যায় অনুরোধ করে বসবেন।

লোকনাথ তাঁর পত্নীকে বললেন, দেখ, তোমার পিসেমশাইএর জিনিসগুলো এখন তুলে রাখ, হয়তো ফেরত দিতে হবে। ওই সব দামী দামী উপহারের জন্যে অস্বস্তি বোধ করছি, তাঁর মতলব বুঝতে পারছি না।

পারুলবালা বললেন, মতলব আবার কি, আমাদের ভালবাসেন তাই দিয়েছেন।

—উনি তোমার আপন আত্মীয় নন, ওঁর নিজের ছেলেমেয়েও আছে, তবে হঠাৎ আমাদের ওপর এত স্নেহ হল কেন?

—খুঁত ধরা তোমার স্বভাব। থাকলই বা নিজের ছেলেমেয়ে, পরের ওপর কি টান হতে নেই? পিসেমশাই বড়লোক, উঁচু নজর, তিনি দামী জিনিস উপহার দেবেন তাতে ভাববার কি আছে? তোমাকে তো ঘুষ দেন নি।

—যাই হক, তুমি এখন ওগুলো ব্যবহার ক'রো না।

পারুলবালা গরম হয়ে বললেন, কেন করব না? এমন জিনিস তুমি কোনও দিন আমাকে দিয়েছ, না তুমি তার কদর জান? পিসেমশাই যদি ভালবেসে দিয়ে থাকেন তবে তুমি বাদ সাধবে কেন? আর, দামী জিনিস তোমাকে তো দেন নি, আমাকে দিয়েছেন। তুমি যে কাঠের র‍্যাকটা পেয়েছ সেটা না হয় ফেরত দিও।

লোকনাথ চুপ করে গেলেন।

দু দিন পরে মোহিতবাবু আবার এলেন। সঙ্গে তাঁর পত্নী আসেন নি, একজন অচেনা ভদ্রলোক এসেছেন।

মোহিতবাবু বললেন, বাড়ির সব ভাল তো লোকনাথ? ইনি হচ্ছেন শ্রীগিরধারীলাল পাচাড়ী, মস্ত কারবারী লোক, আমার বিশিষ্ট বন্ধু। ইনি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন।

লোকনাথ ভাবলেন, এইবারে পিসের গোপন কথাটি প্রকাশ পাবে। জিজ্ঞাসা করলেন, কি প্রস্তাব?

—আচ্ছা বাবাজী, তোমার সার্ভিস শেষ হতে আর কত দেরি?

—এখন এক্সটেনশনে আছি, ছ মাস পরেই শেষ হবে।

—তার পর কি করবে স্থির করেছ?

—কিছুই করব না, লেখাপড়া নিয়ে থাকব।

হাত নেড়ে মোহিতবাবু বললেন, নানানানানা, বসে থাকা ঠিক নয়। তোমার শরীর ভালই আছে, মোটেই বুড়ো হও নি, তবে রোজগার করবে না কেন? শাস্ত্রে বলে, অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। তুমি হচ্ছ প্রাজ্ঞ লোক, অর্থ উপার্জনের সঙ্গেই বিদ্যাচর্চা করবে। যা বলছি

গিরধারীলাল পাচাড়ী স্মিতমুখে এসে বললেন, নমস্কার হুজুর

বেশ করে বিবেচনা করে দেখ বাবাজী।

মোহিতবাবু তাঁর মাথাটি এগিয়ে দিয়ে বিশ্বস্তভাবে নিম্নকণ্ঠে বললেন, এই গিরধারীলাল পাচাড়ীজী হচ্ছেন সিকিম স্টেটের মস্ত বড় কনট্রাক্টার। পশম কম্বল কাঠ মৃগনাভি বড়-এলাচ চিরেতা মাখন ঘি এই সব জিনিস ওখান থেকে এদিকে চালান দেন, আবার সুতী কাপড় চাল গম তেল চিনি নুন কেরোসিন প্রভৃতি ওখানে সপ্লাই করেন। সিকিমের আমদানি রপ্তানি এঁরই হাতে, মহারাজও এঁকে খুব খাতির করেন, নানা বিষয়ে পরামর্শ নেন। মহারাজ এঁকে বলেছেন,—বলুন না গিরধারীবাবু, নিজেই বলুন না।

গিরধারী বললেন, শুনুন হুজুর। মহারাজ তাঁর বড় আদালতের জন্যে একজন চীফ জজ চান। ওখানকার লোকদের ওপর তাঁর বিশ্বাস নেই, মনে করেন সবাই ঘুষখোর। ভাল লোকের খোঁজ নেবার ভার আমাকেই দিয়েছেন, তাই আমি মোহিতবাবুকে ধরেছিলাম। এঁর কাছে শুনেছি আপনিই উপযুক্ত লোক, যেমন বিদ্বান বুদ্ধিমান তেমনি ইমানদার সাধুপুরুষ।

লোকনাথ বললেন, জজের দরকার থাকে তো সিকিম সরকার ভারত সরকারকে লিখলেন না কেন?

মোহিতবাবু বললেন, লিখবেন লিখবেন। মহারাজ নিজে লোক স্থির করবেন তার পর ইণ্ডিয়া গভরমেণ্টকে লিখবেন, অমুককে আমার পছন্দ, তাঁকেই পাঠানো হক। কোনও বাজে লোক দিল্লি থেকে আসে তা তিনি চান না। খুব ভাল পোস্ট, দশ বছরের জন্যে পাকা। এখানকার হাইকোর্ট জজের চাইতে বেশী মাইনে, চমৎকার ফ্রী কোআর্টার্স, ফ্রী মোটরকার, আরও নানা সুবিধে। তুমি যদি রাজী হও তবে গিরধারীজী নিজে গিয়ে মহারাজকে বলবেন।

লোকনাথ বললেন, আমি না ভেবে বলতে পারি না।

—ঠিক কথা, ভাববে বইকি। বেশ করে বিবেচনা করে দেখ, পারুলের সঙ্গেও পরামর্শ কর, অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে। কিন্তু বেশী দেরি ক'রো না, মহারাজ তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা সেট্‌ল করতে চান, ইনি আবার চায়না জাপান বেড়াতে যাবেন কিনা। দিন কতক পরে আবার দেখা করব।

লোকনাথের অস্বস্তি বেড়ে উঠল, তিনি আবার ভাবতে লাগলেন। এই পিসেমশাইটি অদ্ভুত লোক, কেবল অনুগ্রহই করছেন, এখন পর্যন্ত প্রতিদান কিছুই চাইলেন না। দেখা যাক, আবার যেদিন আসবেন সেদিন তাঁর ঝুলি থেকে বেরাল বার হয় কিনা।

দু সপ্তাহ পরে মোহিতবাবু একাই এলেন। এসেই ম্লান মুখে বললেন, গিরধারীলালজী আসতে পারলেন না, তাঁর মনটা বড়ই খারাপ হয়ে আছে।

—কি হয়েছে?

—আর বল কেন, ভদ্রলোক মহা ফেসাদে পড়েছেন।

মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে আছে, রামশরণ পোদ্দারের ছেলে শিবশরণের সঙ্গে। কিন্তু শিবশরণের মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে, এখন বেলে খালাস আছে। ছোকরা এদিকে ভালই, তবে বড়লোকের ছেলে, কুসঙ্গে পড়ে একটু চরিত্রদোষ ঘটেছিল। ব্যাপারটা কাগজে পড়ে থাকবে, প্রায় আট মাস আগেকার ঘটনা। তবলাওয়ালা লেনে তিতলীবাঈ নাচওআলী থাকত, তার কাছে শিবশরণ যেত, তার দু-চারজন বন্ধুও যেত। দুপুর রাতে তিতলী যখন বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছিল তখন কোনও লোক তার পিঠে ছোরা মেরে পালিয়ে যায়। তিতলী বেঁচে আছে, কিন্তু খুবই জখম হয়েছে। পুলিস শিবশরণকেই সন্দেহ করে চালান দেয়। আমাদের সকলেরই আশা ছিল যে শিবশরণ খালাস পাবে, কিন্তু সম্প্রতি ম্যাজিস্ট্রেট তাকে দায়রা সোপর্দ করেছেন। ভাবী জামাইএর এই বিপদে গিরধারীলাল পাচাড়ী অত্যন্ত দমে গেছেন, তাঁর মেয়েও কান্নাকাটি করছে। তবে আমি বেশ ভালই জানি যে ছোকরা একবারে নির্দোষ, তার কোনও বন্ধুই এই কাজ করে সরে পড়েছে।

লোকনাথের মুখ লাল হল। বললেন, দেখুন, এ সম্বন্ধে আমাকে আর কোনও কথা বলবেন না। সেসন্সে আমার কোর্টেই কেসটা আসবে।

প্রকাণ্ড জিব কেটে মোহিতবাবু বললেন, অ্যাঁ, তাই নাকি? নানানানানা, তা হলে তোমাকে আর কিছুই বলা চলবে না। তবে গিরধারীর জন্যে আমার মনটাও বড় খারাপ হয়ে আছে। আচ্ছা, মকদ্দমাটা ভালয় ভালয় চুকে যাক, শিবশরণ খালাস পেলেই গিরধারীবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে সিকিম রওনা হবেন। বসো বাবাজী, চললুম।

পাঁচ দিন পরে লোকনাথ তাঁর অফিস ঘরে বসে কাগজ পড়ছেন, হঠাৎ গিরধারীলাল পাচাড়ী স্মিতমুখে এসে বললেন, নমস্কার হুজুর।

লোকনাথ বিরক্ত হয়ে বললেন, দেখুন পাচাড়ীজী, সেদিন মোহিতবাবুর কাছে যা শুনেছি তার পর আপনার সঙ্গে আমি আর কোনও কথা বলতে চাই না। আপনি এখন যান।

গিরধারীলাল হাত নেড়ে বললেন, আরে রাম রাম, সেসব কথা আপনি একদম ভুলে যান। রামশরণ আমার কেউ নয়, তার বেটা শিবশরণও কেউ নয়। সে খালাস পাবে কি না পাবে, তাতে আমার কি।

—কেন, সে তো আপনার ভাবী জামাই।

—থুঃ। আমার বেটা বলেছে, ওই লুচ্চা খুনী আসামীকে সে কিছুতেই বিয়া করবে না। এখন হুজুর যদি তাকে ফাঁসিতে লটকে দেন তাতে আমার কোনও ওজর নেই।

লোকনাথ বললেন, ওই কেস আমার কোর্টে আসবে না, অন্য জজের এজলাসে যাবে। আপনাদের প্রস্তাবের পর আমি আর এই মামলার বিচার করতে পারি না।

—বড় আফসোসের কথা। বদমাশটাকে হুজুর যদি কড়া সাজা দিতেন তো বড় ভাল হত। আচ্ছা, ভগবান সব কুছ মঙ্গলের জন্যেই করেন। তবে আমার বড়ই নুকসান হল, শিউশরণকে সোনার ঘড়ি, হীরা বসানো কোটের বোতাম, আংটি এই সব দিয়েছিলাম, তা আর ফেরত দেবে না বলেছে। হুজুর যদি ওকে দশ বছর কয়েদ দিতেন তো ঠিক সাজা হত। ওই মোহিতবাবুর মারফত আরও কিছু খরচ হয়ে গেল।

—আমাকে যে সব উপহার দিয়েছিলেন তারই জন্যে তো?

—হেঁ হেঁ, যেতে দিন, যেতে দিন।

—বলুন না, আপনার কত খরচ পড়েছিল?

গিরধারীলাল তাঁর নোটবুক দেখে বললেন, দুটো শাল এগার শ টাকা, তাফতা দেড় শ টাকা, কিতাবদান পঁয়তাল্লিশ টাকা, মেওয়া ছত্রিশ টাকা, ট্যাক্সি ওগয়রহ ষোল টাকা, মোট তেরো শ সাতচল্লিশ টাকা।

আশ্চর্য হয়ে লোকনাথ বললেন, শাল তো একখানা ছিল।

—বলেন কি! একটা আপনার আর একটা শ্রীমতীজীর জন্যে কিনবার কথা। ওই শালা মোহিতবাবু একটা শালের দাম চুরি করেছে। দেখে নেবেন, আমি ওর গলায় পা দিয়ে সাড়ে পাঁচ শ টাকা আদায় করে নেব। আমার সঙ্গে বেইমানি চলবে না, জরুর আদায় করব।

—তা করবেন। বাকী সাত শ সাতানব্বুই টাকার একটা চেক আমি আপনাকে দিচ্ছি, আমার জন্যে আপনার লোকসান হবে না। একটা রসিদ লিখে দিন।

গিরধারীলাল যুক্ত কর কপালে ঠেকিয়ে বললেন, ও হোহোহো, হুজুর একদম সচ্চা সাধু মহাত্মা আছেন, খুদ ভগবান আছেন, আপনার দয়া ভুলব না।

—সিকিমের চাকরিটাও চাই না।

গিরধারীলাল পাচাড়ী সলজ্জ প্রসন্ন মুখে দন্তবিকাশ করে বললেন, হেঁহেঁহেঁ।

চেক নিয়ে পাচাড়ীজী প্রস্থান করলেন। লোকনাথের গ্লানি দূর হল, তিনি সোৎসাহে উৎকোচ তত্ত্ব রচনায় মনোনিবেশ করলেন।

Bohar

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা

প্রবোধচন্দ্র সেন
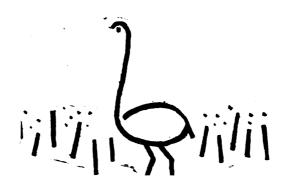
ধর্ম শব্দের অর্থ নিয়েই অনেক তর্ক আছে। ভারতীয় ভাষায় এ-শব্দটির একাধিক অর্থ দেখা যায়। মানুষের চতুর্বর্গ বলতে বোঝায় ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। দেখা যাচ্ছে ধর্ম ও মোক্ষ দুটি স্বতন্ত্র বস্তু। ধর্মশাস্ত্র বলতে বোঝায় আইন-শাস্ত্র। মন্বাদির ধর্ম-শাস্ত্র মোক্ষশাস্ত্র বলে গণ্য নয়। পক্ষান্তরে উপনিষদ্ ধর্মশাস্ত্র বলে স্বীকৃত নয়। ধর্ম-শাস্ত্রের লক্ষ্য সমাজরক্ষা, আর মোক্ষশাস্ত্রের লক্ষ্য সমাজ ও সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি-লাভের উপায়নির্দেশ। মোক্ষলিপ্সুরা তাই বৈরাগ্য অবলম্বন করে সমাজ ত্যাগ করেন। তথাপি ধর্ম ও মোক্ষকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয় না; প্রাচীন কালেও হত না। বস্তুত ধর্ম ও মোক্ষ পরস্পরনিরপেক্ষ নয়। ধর্মসাধনার লক্ষ্য বা চরম পরিণতি মোক্ষ বা মুক্তি। মোক্ষ বা মুক্তির স্বরূপনির্ণয়ই মোক্ষশাস্ত্র বা অধ্যাত্মশাস্ত্রের অভিপ্রায়। কিন্তু এ-বিষয়ে মতভেদের অভাব নেই। এই মত-ভেদের ফলেই এতগুলি দর্শন এবং তার এত-গুলি ভাষ্য ও টীকার উৎপত্তি। এইজন্যই ভারতবর্ষে ধর্ম ও দর্শন এমন অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। ভারতবর্ষের বাইরে তা নয়। ভারত-বর্ষে ধর্ম প্রধানত আচার ও অনুষ্ঠানমূলক, আর অধ্যাত্মচিন্তা দর্শনশাস্ত্রের এলাকাভুক্ত। ফলে ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনা অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের চিন্তা এবং আচারের মধ্যে বিরোধেরও অন্ত নেই। দেহাত্মবাদ আমরা স্বীকার করি না, অথচ গয়ায় পিণ্ড না দিলে আত্মার মুক্তি হয় না এই বিশ্বাসও ছাড়তে পারি না। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি ইত্যাদি বুলিও ছাড়ি না, আবার জাতি-ভেদ তথা মূর্তিপূজার আচার-অনুষ্ঠানেও বিরত হই না। ধর্মসাধনা ও অধ্যাত্মসাধনার এই বিরোধ মেটাবার প্রয়াসই আধুনিক যুগের লক্ষণ। রামমোহনের সময় থেকেই এই প্রয়াস চলে আসছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনায় তার পরিণতি বলা যেতে পারে।

জীবনসাধনা ও অধ্যাত্মসাধনার ঐকান্তিক সমবায়ই আধুনিক যুগে ধর্মসাধনা বলে স্বীকৃত। নবযুগের এই ধর্মসাধনা অমোঘ-ভাষায় ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্র-সাহিত্যে।

ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্, ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সহজবোধ্য নয়, একথা আধুনিক কালেও স্বীকার্য। রবীন্দ্রস্বীকৃত ধর্মতত্ত্বও অনায়াসবোধ্য নয়। ধর্মতত্ত্বের বহু মুখ। রবীন্দ্রস্বীকৃত ধর্মতত্ত্বের সর্বতোমুখী আলোচনা অল্প পরিসরের মধ্যে সম্ভব নয়। পূর্বে এক প্রবন্ধে এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার অন্য দু-একটি দিক্ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অন্য এক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজের চিন্তাধারা সম্বন্ধে লিখেছেন,—

"যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত।......কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে।"

—কালান্তর (১৩৫৫), পৃঃ ৩৪২।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তাতেও কালে কালে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। তাই ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার না করলে তাঁর ধর্মচিন্তার স্বরূপ নিরূপণ সম্ভবপর নয়। কিন্তু এই ধর্মচিন্তার ইতিহাস রচনা অনায়াসসাধ্য নয় এবং অল্প কথায় বোঝানোও সম্ভব নয়। তাই অপূর্ণতার তথা ভ্রান্তির আশঙ্কা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের ধর্মচিন্তার দু-একটি দিকের একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় মত-পরিবর্তনের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। জগৎ ও জীবনকে অস্বীকার করে অসীমের মধ্যে 'নিজের সত্তাসীমাকে বিলুপ্ত' করবার সাধনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

"এক সময় বসে বসে প্রাচীন মন্ত্রগুলিকে নিয়ে ঐ আত্মবিলয়ের ভাবেই ধ্যান করে-ছিলুম। পালাবার ইচ্ছে করেছি, শান্তি পাইনি তা নয়। বিক্ষোভের থেকে সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া যেত। এভাবে দুঃখের সময় সান্ত্বনা পেয়েছি। প্রলোভনের হাত থেকে এমনিভাবে উদ্ধার পেয়েছি। আবার এমন একদিন এল যেদিন সমস্তকে স্বীকার করলুম, সবকে গ্রহণ করলুম।"

—মানুষের ধর্ম (১৯৪৬), পৃঃ ৯২।

দেখা যাচ্ছে ধর্মের ক্ষেত্রেও একবার তাঁকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় 'ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত' সমাজ ও জীবনের কর্মক্ষেত্র থেকে পালিয়ে দুঃখবিক্ষোভের মধ্যে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভের প্রয়াস করতে হয়েছিল, আবার এক্ষেত্রেও তাঁকে বলতে হয়েছিল 'এবার ফিরাও মোরে', বলতে হয়েছিল—

"মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পরি
বাঁধা সবার কাছে।"

কখন ও কীভাবে তাঁর মনে এই বৈরাগ্য-প্রবণতা দেখা দিয়েছিল আর কীভাবে তিনি তা কাটিয়ে ওঠেন, তা ঔৎসুক্য ও সন্ধানের বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

ধর্মের এক রূপ আছে যা সর্বকাল ও সর্বদেশকে আশ্রয় করে, তাকে বলতে পারি নিত্যধর্ম বা বিশ্বধর্ম। রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন 'মানুষের ধর্ম'। দেশে কালে তার অভিব্যক্তি ঘটে, কিন্তু তাতে ভেদ বা বিভাগ ঘটে না। কেননা এই ধর্ম সর্বমানবের অন্তর্নিহিত স্বভাবকে আশ্রয় করে প্রতিষ্ঠিত। তাই এই ধর্ম সর্বকালীন ও সর্ব-জনীন। কিন্তু ধর্মের আর-এক রূপ আছে যা কোনও বিশেষ মত বা মন্ত্রকে আশ্রয় করে থাকে এবং যাকে অবলম্বন করে দেশে কালে নানা ধর্মসংঘ বা সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। এই সাম্প্রদায়িক ধর্ম যে-অংশে নিত্যধর্মাশ্রয়ী সে-অংশে তা সত্য; অন্য অংশে তা কোন প্রয়োজন সিদ্ধির অনুকূল হতে পারে, কিন্তু সেই অনিত্য অংশে তা সত্য নয়। অথচ ওই অনিত্য অংশেই সাম্প্রদায়িক ধর্মের বিশিষ্টতা, এই অনিত্য অংশের বিশিষ্টতাই এক ধর্মকে অন্য ধর্ম থেকে পৃথক্ করে রাখে; শুধু পৃথক্ নয়, বিরুদ্ধ করে রাখে। তার ফলে কত মারামারি কাটাকাটি যে পৃথিবীর ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে রেখেছে তার ইয়ত্তা নেই। সাম্প্রদায়িক ধর্মগত মত-সংঘর্ষের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করি—

"মনুষ্যত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেবতার উপলব্ধি মোহমুক্ত হতে থাকে, অন্তত হওয়া উচিত। হয় না যে তার কারণ, ধর্মসম্বন্ধীয় সব-কিছুকেই আমরা নিত্য[1] বলে ধরে নিয়েছি। ভুলে যাই যে, ধর্মের নিত্য আদর্শকে শ্রদ্ধা করি বলেই ধর্মমতকেও নিত্য বলে স্বীকার করতে হবে এমন কথা বলা চলে না।......ধর্ম সম্বন্ধে সাধারণত এই

ভুলই ঘটে; সম্প্রদায় আপন মতকেই বলে ধর্ম, আর ধর্মকেই করে আঘাত। তার পরে যে বিবাদ, যে নির্দয়তা, যে বুদ্ধিবিচারহীন অন্ধসংস্কারের প্রবর্তন হয় মানুষের জীবনে আর-কোনো বিভাগে তার তুলনাই পাওয়া যায় না।"

—মানুষের ধর্ম (১৯৪৬), পৃঃ ৪২—৪৩

অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক ধর্মমতকেই শাশ্বত ধর্ম বলে মানুষ ভুল করে। নিত্যতাহীন সাম্প্রদায়িক ধর্মমতকেই ধর্মের নিত্য আদর্শ বলে ভুল করার অবশ্যম্ভাবী ফল সাম্প্রদায়িক ধর্মের পারস্পরিক সংঘাত। শুধু তাই নয়, এই ধর্মসংঘর্ষ নিত্যধর্মকেও আঘাত করে। ফলে মানুষ স্বধর্মভ্রষ্ট হয়, অর্থাৎ মানুষের ধর্ম বা মনুষ্যত্বেরই হানি ঘটে। তাই কবি 'পরিশেষ' গ্রন্থের 'ধর্মমোহ' কবিতায় বলেছেন—

"ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে,
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।.....
হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ় জনেরে বাঁচাও আসি।......
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো॥"

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে শাশ্বত, মানবধর্মের বিকার, তথা সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতা (ধর্মমূঢ়তা) ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্মের গণ্ডীর (ধর্মকারার) প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিমুখতা কতখানি আন্তরিক ছিল। সাম্প্রদায়িক ধর্মের সংকীর্ণতা তাঁর চিত্তকে সর্বদাই পীড়িত করেছে।

ধর্মসম্প্রদায় ও সম্প্রদায়গত ধর্মমত, এই দুইএর কোনটাই রবীন্দ্রচিত্তে সাড়া জাগাতে পারেনি, বিশেষত তাঁর শেষ জীবনে। তাই দেখি ১৯৩৬ সনে জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছেও তিনি অকুণ্ঠকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন"। ব্রাত্য মানে সম্প্রদায়বহির্ভূত, 'পংক্তিহারা', 'জাতিহারা'। মন্ত্রহীন মানে অদীক্ষিত, কোন সাম্প্রদায়িক দীক্ষামন্ত্র যে গ্রহণ করেনি। 'আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন', আমার বিশ্বাস এটাই রবীন্দ্রনাথের সত্য পরিচয়। অর্থাৎ ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন non-sectarian (ব্রাত্য) ও creedless (মন্ত্রহীন)। Creed কথার মূলগত মানে বিশ্বাস (faith); অতএব creed বা মন্ত্রহীনতার তাৎপর্য দাঁড়ায় বিশ্বাসহীনতা। সমস্ত সাম্প্রদায়িক ধর্মই প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি বাঁধা বিশ্বাসের উপরে। এই বিশ্বাস যুক্তিনিরপেক্ষ, তাই তাকে বলা যায় অন্ধবিশ্বাস। আর এই বাঁধা বিশ্বাসই ধর্মমত বলে গণ্য হয়। এক কথায় creedএরই নামান্তর ধর্মমত, dogma বা doctrine। আর এই জাতীয় ধর্মমতকে যে রবীন্দ্রনাথ নিত্যসত্য বলে স্বীকার করতেন না, সে-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক ধর্মের এক আশ্রয় বাঁধা doctrineএ বিশ্বাস, আর-এক আশ্রয় কতকগুলি নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান। এই উভয় দিক্ থেকেই রবীন্দ্রনাথের চিত্তবৃত্তি ছিল সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রতিকূল। ধর্ম হল faith বা বিশ্বাসের বস্তু, যুক্তি বা reasonকে সে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে এবং যেখানে এড়ান সম্ভব নয়, সেখানে যুক্তিকে নিজের অনুকূলে নিযুক্ত করতে চেষ্টিত হয়। যে-যুগে রবীন্দ্রনাথের জন্ম সে-যুগে বিশ্বাস মর্যাদাভ্রষ্ট হয়ে যুক্তিকে তথা বিজ্ঞানকে আসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যুগধর্মকে বরণ করে নিয়েছিলেন। তাই তিনি কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মেরই অনুবর্তী হতে পারলেন না, শেষ পর্যন্ত তিনি non-conformist বা ব্রাত্য হয়েই রইলেন।

"মন্দিরের রুদ্ধদ্বারে এসে আমার পূজা
বেরিয়ে গেল দিগন্তের দিকে—
সকল বেড়ার বাইরে।"

—পত্রপুট, ১৫

'সকল বেড়ার বাইরে' মানে সকল সম্প্রদায়ের বাইরে।

জানি এই মত অনেকেরই মনঃপূত হবে না। তাই প্রমাণ দিয়ে সংশয় দূর করতে চেষ্টা করছি। পূর্বেই বলেছি, যে-যুগে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সে-যুগটা ঐকান্তিক ধর্মবিশ্বাসের অনুকূলে ছিল না; সে-যুগে যুক্তি ও বিজ্ঞান ধর্মের বিশ্বাসকে মর্যাদাভ্রষ্ট করেছিল। এই ধর্মসংশয় ও ধর্মদ্রোহ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে বলেছেন—

"যদিও এই ধর্মবিদ্রোহ আমাকে পীড়া দিত, তথাপি ইহা যে আমাকে একেবারে অধিকার করে নাই তাহা নহে। যৌবনের প্রারম্ভে বুদ্ধির ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এই বিদ্রোহিতা আমার মনেও যোগ দিয়াছিল। আমাদের পরিবারে যে-ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই।"

—জীবনস্মৃতি, ভগ্নহৃদয়

এই উক্তি ১৯১২ সনের। এর বহুকাল পরে ১৯৩৩ সনে এ-সম্বন্ধেই আরও স্পষ্ট ভাষায় নিজের অসাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের কথা ব্যক্ত করেছেন।—

"আমার জন্ম যে-পরিবারে সে-পরিবারের ধর্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ্ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর-আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে আমার সব সংস্কারই বৈদিক মন্ত্রদ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে। আমি ইস্কুলপালানো ছেলে। যেখানেই গণ্ডী দেওয়া হয়েছে সেখানেই আমি বনিবনাও করতে পারিনি কখনও। যে-অভ্যাস বাইরে থেকে চাপানো তা আমি গ্রহণ করতে অক্ষম। কিন্তু পিতৃদেব সেজন্যে কখনও ভর্ৎসনা করতেন না। তিনি নিজেই স্বাধীনতা অবলম্বন করে পৈতামহিক সংস্কার ত্যাগ করেছিলেন। গভীরতর জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার স্বাধীনতা আমারও ছিল। একথা স্বীকার করতেই হবে, আমার এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য কখনও কখনও তিনি বেদনা পেয়েছেন। কিছু বলেননি।"

—মানুষের ধর্ম, পৃঃ ৭৮—৭৯।

সন্দেহ নেই যে, ধর্মের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সম্প্রদায়ের গণ্ডী মানেননি; ব্রাহ্মধর্মের তথা পারিবারিক ধর্মের গণ্ডীও মানেননি, পিতা মনে বেদনা পাওয়া সত্ত্বেও। ধর্ম ও জীবনতত্ত্ব বিষয়ে তিনি স্বাধীন চিন্তাকে আশ্রয় করে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেছিলেন। ফলে রবীন্দ্রনাথ যে-জীবনধর্মকে অনুবর্তন করেছিলেন তা ছিল সর্বসম্প্রদায়নিরপেক্ষ। এই অসাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র জীবনধর্মকেই তিনি অভিহিত করেছেন 'আমার ধর্ম' নামে। এই 'আমার ধর্মের' পরিচয়-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"সকল মানুষেরই 'আমার ধর্ম' বলে একটা বিশেষ জিনিস আছে। সেইটেকেই সে স্পষ্ট করে জানে না। সে জানে আমি খৃস্টান, আমি মুসলমান, আমি বৈষ্ণব, আমি শাক্ত ইত্যাদি। কিন্তু সে যে-ধর্মাবলম্বী বলে জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্ত আছে সে হয়তো সত্য তা নয়। নাম গ্রহণেই এমন একটা আড়াল তৈরি করে দেয়, যাতে নিজের ভিতরকার ধর্মটা তার নিজের চোখেও পড়ে না।"

—আত্মপরিচয়, তৃতীয় প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ কোন রকম সাম্প্রদায়িক নাম গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না, এমন কি ব্রাহ্ম নামে পরিচিত হতেও কুণ্ঠিত ছিলেন; কেননা তাতে তাঁর স্বতন্ত্র জীবনধর্মটাই প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়।

একমাত্র বৌদ্ধধর্ম ছাড়া আর সমস্ত ধর্মেরই প্রধানতম অঙ্গ দেবোপাসনা বা ঈশ্বরোপাসনা। দেবতা বা ঈশ্বরে বিশ্বাস, উপাসনার প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস এবং তদনুরূপ রীতিপদ্ধতি ও আচার অনুষ্ঠানই ওসব ধর্মের মূলকথা। কিন্তু বুদ্ধিবিচার বা যুক্তিতর্ককে এড়িয়ে চলা চাই। বুদ্ধিবিচারের পথে পা বাড়ালেই চিরাচরিত ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত পড়ে। রবীন্দ্রনাথ যুক্তিবিচারের যুগে, age of reasonএই আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তিনি

যুগধর্মকে অস্বীকার করেননি। ওই যুক্তির যুগে বিশ্বাসের ধর্ম সর্বতোভাবেই প্রতিহত হয়েছিল।

Lyellএর Principles of Geology এবং Malthusএর Essay on Population, এই দুটি গ্রন্থের সূত্র ধরে ডারউইন ও ওয়ালেস একই সঙ্গে অভিব্যক্তিবাদের পত্তন করেন ১৮৫৮ সনে। পরের বৎসরই (১৮৫৯) ডারউইনের বিখ্যাত গ্রন্থ Origin of Species প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শুধু বিজ্ঞানজগতে নয়, ধর্মজগতেও প্রবল আলোড়ন উপস্থিত হয়। তৎপূর্বেই বেন্থাম, কোঁত, মিল-প্রমুখ মনস্বীরা তর্কবিচারের সাহায্যে সমগ্র পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে ঈশ্বরবিশ্বাসকেই টলিয়ে দিয়েছিলেন। এবার তার সঙ্গে এসে যোগ দিল বিজ্ঞানবিদ্যা। ডারউইনের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের পরের বছরই (১৮৬০) হার্বার্ট স্পেন্সর তাঁর সুবিখ্যাত Synthetic Philosophy গ্রন্থের সূত্রপাত করেন। তারপর ছত্রিশ বৎসরের (১৮৬০—৯৬) সাধনায় তিনি দশ খণ্ডে উক্ত গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এই গ্রন্থে তিনি অভিব্যক্তিবাদকে ধর্ম, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োগ করে মানুষের বহু সংস্কারেরই অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, জীববিদ্যার ক্ষেত্রে 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' (survival of the fittest) এবং ভগবৎতত্ত্বের ক্ষেত্রে 'অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়' (unknown and unknowable), এই দুটি সুপরিচিত কথা হার্বার্ট স্পেন্সরেরই উদ্ভাবিত। তাঁর রচনাসমূহ তৎকালীন নাস্তিকতাবাদের বা অজ্ঞেয়বাদের (agnosticism) আগুনে বহু প্রকারে ইন্ধন জুগিয়েছিল। তখনকার দিনে যাঁরা বিজ্ঞান ও বিচারের সহায়তায় ধর্মবিশ্বাসে তথা ঈশ্বরবিশ্বাসে পুনঃ পুনঃ আঘাত করছিলেন, তাঁদের মধ্যে চার্লস লায়েল, টমাস হাক্সলি ও আর্নেস্ট রেনানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৩ সনে এই তিনজনের তিনখানি বই প্রকাশের ফলে খ্রীষ্টানধর্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাস যে মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিল তার তুলনা নেই। বই তিনখানি হল যথাক্রমে লায়েলের Antiquity of Man, হাক্সলির Man's Place in Nature এবং রেনানের Life of Jesus। অতঃপর ১৮৭১ সনে প্রকাশিত হয় ডারউইনের Descent of Man এবং ওয়ালেসের Theory of Natural Selection। অতঃপর বিজ্ঞানের এই প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে চিরাগত ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে পূর্বতন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকার আর কোনো সম্ভাবনাই রইল না।

অবিশ্বাস, ধর্মদ্রোহ ও নাস্তিকতার এই ঢেউ এদেশে আসতেও বেশী দেরি হয়নি। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের ধর্মান্দোলনের পাশে-পাশেই এই ধর্মসংশয়ের স্রোত চলছিল বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে। ইউরোপ থেকে একদিকে যেমন খ্রীষ্টানধর্মের প্রবাহ এসেছিল এদেশে, অপর দিকে তেমনি নাস্তিক্যভাবের ধারাও এসেছিল। ডিরোজিও এবং আলেকজাণ্ডার ডাফ, কারও প্রভাব কম ছিল না। ফলে কৃষ্ণমোহনের ন্যায় নিষ্ঠাবান্ খ্রীষ্টান এবং কৃষ্ণকমলের ন্যায় নৈষ্ঠিক নাস্তিকের যুগপৎ আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। কালক্রমে বোধ করি নাস্তিক্যের ও সংশয়ের ধারাই প্রবলতর হয়েছিল। নাস্তিকতা ও সংশয়বাদের আওতায় যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিরাও আছেন। এই সংশয়বাদের ঢেউ বাংলাদেশে চলেছিল ঊনবিংশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত। প্রথমে ছিল কোঁত ও মিলের প্রভাব প্রবলতর, পরে প্রবলতর হয় স্পেন্সার ও হাক্সলির প্রভাব। এই নাস্তিকতার ছাপ পড়েছে বাংলা সাহিত্যেও। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে আছে—

"নাস্তিকের এক দলের সঙ্গে
মিশলাম গিয়ে রঙ্গে,
হিউম মিল আর হার্বার্ট স্পেন্সার
পড়তে লাগলাম সঙ্গে।"

এই দুই লাইনেই তখনকার দিনের বাংলাদেশের একটি ছবি পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩—১৯১৩) স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩—১৯০২) এবং রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১—১৯৪১) প্রায় সমকালীন। কাজেই তিনজনই যে একই যুগপ্রভাবের আওতায় এসেছিলেন তা বিচিত্র নয়। স্বামী বিবেকানন্দ যে এক সময়ে প্রবল সংশয়ের দ্বারা অভিভূত হয়েছিলেন তা সুবিদিত। রবীন্দ্রনাথও যে তার থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি তার প্রমাণ আছে তাঁর নিজের রচনাতেই।—

"তখনকার কালের য়ুরোপীয় সাহিত্যে নাস্তিকতার প্রভাবই প্রবল। তখন বেন্থাম, মিল ও কোঁতের আধিপত্য। তাঁহাদেরই যুক্তি লইয়া আমাদের যুবকেরা তখন তর্ক করিতেছিলেন।..... নাস্তিকতা আমাদের একটা নেশা ছিল।.....একদল ঈশ্বরের অস্তিত্ববিশ্বাসকে যুক্তি-অস্ত্রে ছিন্নভিন্ন করিবার জন্য সর্বদাই গায়ে পড়িয়া তর্ক করিতেন।..... অল্পকালের জন্য আমাদের একজন মাস্টার ছিলেন, তাঁহার এই আমোদ ছিল। আমি তখন নিতান্ত বালক ছিলাম, কিন্তু আমাকেও তিনি ছাড়িতেন না।...... আমি প্রাণপণে তাঁহার সঙ্গে লড়াই করিতাম, কিন্তু আমি তাঁহার নিতান্ত অসমকক্ষ প্রতিপক্ষ ছিলাম বলিয়া আমাকে প্রায়ই বড়ো দুঃখ পাইতে হইত। এক-এক দিন এত রাগ হইত যে কাঁদিতে ইচ্ছা করিত।......

"যদিও এই ধর্মবিদ্রোহ আমাকে পীড়া দিত, তথাপি ইহা যে আমাকে একেবারে অধিকার করে নাই তাহা নহে। যৌবনের প্রারম্ভে বুদ্ধির ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এই বিদ্রোহিতা আমার মনেও যোগ দিয়াছিল। আমাদের পরিবারে যে ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই।"

—জীবনস্মৃতি, ভগ্নহৃদয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পৈতৃক সংস্কারকে গ্রহণ করতে পারেননি, রবীন্দ্রনাথও তেমনি তাঁর পৈতৃক ধর্মপদ্ধতিকে স্বীকার করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিতের পাঠক জানেন যে, ধর্ম ও সমাজগত বহু বিষয়েই তিনি পিতৃস্বীকৃত আদর্শের অনুবর্তী না হয়ে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কীভাবে সংশয়বাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন ও সংশয়কে কতখানি স্বীকার করেছিলেন, সংক্ষেপে তারও একটু পরিচয় দেওয়া যাক। রবীন্দ্রচরিতকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "স্পেন্সর ছিলেন সে যুগের ভাঙনপন্থী যুবকদের গুরু-স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ স্পেন্সরের ভক্ত ছিলেন।" (রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮৬)। রবীন্দ্রসাহিত্যের মনোযোগী পাঠকমাত্রই এই উক্তির সত্যতা স্বীকার করবেন। 'জীবনস্মৃতি' থেকেই জানা যায় যে, বিলাতে বাসকালে আঠার বছর বয়সেই তিনি স্পেন্সরের সদ্যপ্রকাশিত (১৮৭৯, জুন) Data of Ethics বইখানি পড়েছিলেন। বিলাত থেকে ফিরে এসেও তিনি নানা প্রবন্ধে স্পেনসরের মত প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্পেনসরের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। ফলে নানা বিষয়েই তাঁর মতামত তথা তাঁর সাহিত্য স্পেনসরের দ্বারা অল্পাধিক প্রভাবিত হয়েছিল। রবীন্দ্রসাহিত্যের শেষ পর্যায় পর্যন্ত যে অভিব্যক্তিবাদের গভীর ছাপ দেখা যায় তা তিনি প্রধানত আহরণ করেছিলেন স্পেনসরের গ্রন্থাবলী থেকে, একথা সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং ধর্মব্যাপারে সংশয় এবং ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়বাদও তিনি অনেকাংশে স্পেনসরের কাছেই পেয়েছিলেন এ-কথা মনে করা অযৌক্তিক নয়। রবীন্দ্রসাহিত্যে তৎকালীন বৈজ্ঞানিক মতবাদ (বিশেষত অভিব্যক্তিবাদ) তথা সংশয় এবং অজ্ঞেয়বাদের অনুসন্ধান করার বিশেষ

সার্থকতা আছে। কিন্তু সে আলোচনার অবকাশ নেই এই প্রবন্ধে। তবু এ-বিষয়ে ইঙ্গিতমাত্র দিয়েই এ-আলোচনা শেষ করব। ১৮৮৭ সনে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে কবির প্রাণে প্রশ্ন জেগেছে—

"এ নিষ্ঠুর জড়স্রোতে প্রেম এল কোথা হতে
মানবের প্রাণে?......
এমন মায়ের প্রাণ যে বিশ্বের কোনোখান
তিলেক পেয়েছে স্থান সে কি মাতৃহীন?...
এ কি দুই দেবতার দ্যূতখেলা অনিবার
ভাঙাগড়াময়?
চিরদিন অন্তহীন জয়পরাজয়?"
—সিন্ধুতরঙ্গ, মানসী।

পরের বৎসরে (১৮৮৮) রচিত 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' কবিতাটিতেও দেখি কবি জড়জগতের বৈজ্ঞানিক স্বরূপকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু জড়জগতে স্নেহপ্রেমের আবির্ভাবের কোনো ব্যাখ্যা পাচ্ছেন না।—

"হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানবহৃদয়...
কে তারে ভাসালে হেন জড়ময় সৃজনের
স্রোতে?
কে তুমি শুনিছ বসি, হে বিধাতা,
হে অনাদি কবি,
ক্ষুদ্র এ মানবশিশু রচিতেছে প্রলাপজল্পনা?
সত্য আছে স্তব্ধ ছবি যেমন উষার রবি,
নিম্নে তারি ভাঙেগড়ে মিথ্যা যত
কুহককল্পনা।"
—নিষ্ঠুর সৃষ্টি, মানসী।

দেখা যাচ্ছে স্নেহপ্রেমের কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পেয়ে কবির অতৃপ্ত হৃদয় বিধাতা বা 'সত্যে'র অস্তিত্বকে স্বতঃস্বীকার্য বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তাঁর হৃদয়ের সংশয়ের স্পন্দন কবিতাটির প্রত্যেক পংক্তিতেই অনুভব করা যায়।

'শূন্য গৃহে' কবিতাটিতেও ওই একই সুর ধ্বনিত হয়েছে,—'সমস্ত মানবপ্রাণ বেদনায় কম্পমান, নিয়মের লৌহবক্ষে বাজিবে না ব্যথা!'

এই সময় থেকে ঊনবিংশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্ম ও ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর অনুরাগের নিদর্শন বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় (যথা ব্রহ্মসংগীত), তাকেও কবির মর্মগত বলে মনে করা যায় না। কিন্তু তা বলে রবীন্দ্রচিত্ত কোন সময়েই এ-বিষয়ে একান্তভাবে উদাসীন ছিল, এ-কথাও বলা যায় না। 'চিত্রা' কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় (১৮৯৬) আছে—

"দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব
অভিসারে
তার কাছে, জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে? জানি না কে,
চিনি নাই তারে,—
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি
রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তরপানে
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি।"

কে সে, জানিও না, চিনিও না।—কিন্তু তবু সে-ই যে চিরন্তন মানবযাত্রীর শেষ লক্ষ্য এই দৃঢ় বিশ্বাসও আছে। এই হচ্ছে রবীন্দ্রচিত্তের প্রথম ও শেষ যুগের সত্য-পরিচয়, এ-কথা মনে করবার হেতু আছে।

কিন্তু বিংশ শতকের প্রায় আরম্ভকালে 'প্রশ্নোপনিষদ্' রচনার সময় (১৯০০) থেকে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি (১৯১৪) রচনার সময় পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী যুগে রবীন্দ্রচিত্তে গভীর ধর্মবিশ্বাস ও ভক্তি-প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তার প্রমাণ আছে তৎকালীন সাহিত্যে। তবে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের এই ভক্তিবিশ্বাস অন্যের ভক্তিবিশ্বাস থেকে স্বতন্ত্র।

যা হক, পরবর্তী কালে তাঁর চিত্তের এই ভগবদ্‌বিশ্বাস ও ভক্তি যে রূপান্তর গ্রহণ করে, সে-কথা তাঁর নিজের উক্তিতেই সুপ্রকাশ।—

"এমন করে দিন গেল;
আজ আপন মনে ভাবি—
'কে আমার দেবতা,
কার করেছি পূজা।'
শুনেছি যাঁর নাম মুখে-মুখে,
পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে,
কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।
তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব বলে
পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।
আজ দেখছি প্রমাণ হয়নি আমার জীবনে।
কেননা, আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।
মন্দিরের রুদ্ধদ্বারে এসে আমার পূজা
বেরিয়ে চলে গেল দিগন্তের দিকে—
সকল বেড়ার বাইরে.........
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে।"
—পত্রপুট, পনরো (১৯৩৬)

রবীন্দ্রনাথের পূজা ধাবিত হয়েছে দেবতার কাছ থেকে মানুষের দিকে। একথার বিশদ বিশ্লেষণের স্থান এ-প্রবন্ধে নেই। তবে একথা বলা প্রয়োজন যে, এই মানব-পূজা মানে ব্যক্তিমানবের পূজা নয়, যে বিশ্বসত্তা সর্বমানবের অন্তর্লোকে নিত্য-প্রকাশমান তারই পূজা। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাই উদ্ধৃত করি।—

"আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহা-মানবের মধ্যে, যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।......আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা,—তারি বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।"
—আত্মপরিচয়, পঞ্চম প্রবন্ধ (১৯৩১)

সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ, এই যে মানবসত্য, তাকেই 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে (১৯৩৩) বলা হয়েছে 'মানবব্রহ্ম'। পরিণত বয়সের রবীন্দ্রনাথ এই মানবব্রহ্মেরই পূজারী। এই তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা আছে 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থেই। উদ্ধৃত অংশটিতে যে নরদেবতার কথা বলা হয়েছে, তারই নামান্তর মানবব্রহ্ম।

এই নরদেবতার চিন্তা যে পরিণত বয়সেই রবীন্দ্রনাথের মনে দেখা দিয়েছিল তা নয়। তাঁর অল্প বয়সের রচনাতেও এই আদর্শের আভাস নাই।—

"কোথা মানবের জয় উঠিছে জগৎময়
ওইখানে মিলিয়াছে নর-নারায়ণ।"
—মানসী, কবির প্রতি নিবেদন (১৮৮৮)

এখানে নর ও নারায়ণের মিলন অর্থাৎ সাযুজ্য ঘটেছে, সারূপ্য ঘটেনি; নর থেকে নারায়ণের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকৃত হয়নি। অতঃপর গীতাঞ্জলিতে (১৯১০) পাই—

"হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে নমি
নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।"

এখানে নর ও দেবতার অভিন্নতা ঘটেছে, কিন্তু নির্বিশেষরূপে নয়। অভিন্নতা সত্ত্বেও উভয়ের স্বাতন্ত্র্যহানি ঘটেনি। গীতাঞ্জলির অন্যান্য রচনাতেও এই বিশিষ্টাদ্বৈত রূপের সাক্ষাৎ পাই। যথা—

"অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায়
তুমি ফেরো
রিক্তভূষণ দীনদরিদ্র সাজে—
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।"
কিংবা
"তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে
চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।"

গীতাঞ্জলির সময়ের এই নরদেবতা তখনও কোনো তত্ত্বের আশ্রয় পায়নি। কিন্তু পরবর্তী কালের নরদেবতা বা মানবব্রহ্ম একটি সত্য উপলব্ধি ও সুস্পষ্ট তত্ত্বের উপরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এখানে তার বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন।

এখানে একটি প্রশ্ন অনিবার্যরূপেই দেখা দেবে। রবীন্দ্রস্বীকৃত এই নরদেবতা বা মানবব্রহ্মের সঙ্গে বিশ্বদেবতা বা পরমব্রহ্মের সম্বন্ধ কী? তাঁর পূজা নিবেদিত হয়েছে কার কাছে—মানবব্রহ্মের কাছে, না পরমব্রহ্মের কাছে। এ-প্রশ্নের উত্তর এই যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যজীবনে এই বিশ্বদেবতা বা পরমব্রহ্মকে মানেন বলেই 'কল্পনা' করেছিলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যেই পূজা নিবেদনের 'প্রয়াস' করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর এই কল্পনা ও পূজার প্রয়াস সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি, তখন তাঁর পূজা ধাবিত হল বিশ্বদেবতার কাছ থেকে মানবদেবতার কাছে এবং সার্থকতার মধ্যে 'সমাপ্ত হল দেবলোক থেকে মানবলোকে'। এই উত্তরের যাথার্থ্য কবির উক্তিতেই স্বীকৃত হয়েছে পূর্বোদ্ধৃত 'পত্রপুটে'র কবিতায়।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বদেবতা বা পরম ব্রহ্মের কাছ থেকে পূজা প্রত্যাহার করলেন, কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করেননি। তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার না করেও পূজা প্রত্যাহার করলেন কেন, তার উত্তর আছে রবীন্দ্রনাথের উক্তিতেই।

"পরম মানবিক সত্তাকে পেরিয়ে গিয়েও পরম জাগতিক সত্তা আছে। সূর্যলোককে ছাড়িয়ে যেমন আছে নক্ষত্রলোক।...... মানবিক সত্তাকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক জাগতিক সত্তা, তাঁকে 'প্রিয় বলা বা কেন কিছুই বলার কোনো অর্থ নেই। তিনি ভালমন্দ সুন্দর-অসুন্দরের ভেদবর্জিত। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে পাপ পুণ্যের কথা উঠতে পারে না। অস্তীতিব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে। তিনি আছেন, এ ছাড়া তাঁকে কিছুই বলা চলে না।" —মানুষের ধর্ম, ১৯৪৬, পৃ ৩৩

অর্থাৎ যিনি জগতের পরম সত্তা, তিনি নৈর্ব্যক্তিক নির্বিশেষ বা নির্গুণ; তিনি আছেন, এ ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আর কিছুই জানাও যায় না, বলাও যায় না। যাঁকে প্রিয়-অপ্রিয় কিছুই বলা যায় না, তাঁকে পূজা নিবেদনেরও কোন অর্থ হয় না।

কিন্তু পরম জগৎসত্তার যে মানবিক রূপ, সর্বমানবের মধ্যে যাঁর প্রকাশ, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ, তিনি সগুণ, তিনিই মানবব্রহ্ম, তাঁকেই পূজা নিবেদন করা চলে।

"যিনি আমাদের দর্শনে শাস্ত্রে সগুণ ব্রহ্ম তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সর্বেন্দ্রিয়প্রতিভাসম্। অর্থাৎ মানুষের বাহিরিন্দ্রিয় অন্তরিন্দ্রিয়ের যতকিছু গুণ তার আভাস তাঁরই মধ্যে। তার অর্থ এই যে, মানবব্রহ্ম, তাই তাঁর জগৎ মানবজগৎ। এ ছাড়া অন্য জগৎ যদি থাকে সে আমাদের সম্বন্ধে শুধু যে আজই নেই তা নয়, কোন কালেই নেই।"

—মানুষের ধর্ম (১৯৩৬), পৃ ৩৪

এই শেষ কথাটির অর্থ এই যে, অতিমানবিক অতএব নির্বিশেষ পরম ব্রহ্মের অস্তিত্ব যে নেই তা নয়; কিন্তু তা আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে নেই, সুতরাং আমাদের বুদ্ধি বা হৃদয় দিয়ে তাঁকে জানতে পারি না এবং জানতে পারবও না। অর্থাৎ তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, হার্বার্ট স্পেন্সরের ভাষায় unknown and unknowable।

এই যে নরদেবতা বা মানবব্রহ্মের উপলব্ধি এবং জ্ঞান ও পূজার ক্ষেত্রে পরম ব্রহ্মের অস্বীকৃতি, তা রবীন্দ্রনাথের 'মানব সত্য' প্রবন্ধে আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যাত হয়েছে।

"আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তাঁর কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান্ পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে—তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা, আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্ত কখনোই ছাড়াতে পারে না।......তার বাইরে কিছু থাকা না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান।"

—মানুষের ধর্ম, পৃ ৯১-৯২

দেখা যাচ্ছে শেষ বয়সেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার উপরে স্পেনসরের প্রভাব একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি।

মৃত্যুর অত্যল্পকাল পূর্বে রচিত (২৭ জুলাই ১৯৪১) একটি কবিতাতেও তাঁর এই মনোভাব স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি,
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিমসাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি,
পেল না উত্তর॥

—শেষ লেখা, ১৩

মানবচিত্তের যা গুণ, রবীন্দ্রস্বীকৃত নিখিল মানবের চিৎসত্তারূপে যে মানবব্রহ্ম তাঁরও সেই গুণ, তদতিরিক্ত অন্য গুণের কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না; কেননা, 'প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা?' গুণাতীতের ধারণাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

গুণাতীতের অস্বীকৃতিকেই নাস্তিকতা বলা যায় না। জড়বাদীই আসল নাস্তিক। রবীন্দ্রনাথ জড়বাদী ছিলেন না কোনও কালেই। কিন্তু নাস্তিক মাত্রেরই প্রতি শ্রদ্ধাহীনও ছিলেন না। কেননা, নাস্তিক হলেই যে অধার্মিক হতে হবে এমন কোন কথা নেই। বস্তুত ঊনবিংশ শতকের ইউরোপে তথা বাংলা দেশে মানবসত্যনিষ্ঠ এমন অনেক ব্যক্তি ছিলেন, ঈশ্বরবিশ্বাসী না হওয়া সত্ত্বেও যাঁরা সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোঁত ও মিল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের নাম করা যেতে পারে। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"কোনো ব্যক্তি নাস্তিক হতে পারে, কিন্তু সেই নাস্তিক যাকে সত্য বলে জানে, দূরদেশে ভাবীকালে সেও তাকে সার্থক করবার জন্য প্রাণ দিতে পারে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই।"

—মানুষের ধর্ম (১৯৩৬), পৃ ১৩।

এমন মানবকল্যাণপরায়ণ সত্যনিষ্ঠ নাস্তিকের প্রতি রবীন্দ্রনাথ কতখানি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তার প্রমাণ আছে চতুরঙ্গ গ্রন্থের 'জ্যেঠামশায়' চরিত্রচিত্রণে। প্লেগগ্রস্ত মুসলমান চামারদের সেবা করতে গিয়ে জ্যেঠামশায়ের মৃত্যু হল। তাঁর গোঁড়া ধার্মিক ভাই হরিমোহন ব্যঙ্গের সুরে বললেন, 'নাস্তিকের মরণ এমনি করিয়াই হয়।' ভাইপো শচীন সগর্বে উত্তর দিল, 'হাঁ।' এই সগর্ব উত্তরের মধ্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠও শুনতে পাই।

নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।

—ধর্মমোহ, পরিশেষ

এখানেও কল্যাণনিষ্ঠ নাস্তিকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। নাস্তিকও বিধাতার বর পায়, এই উক্তিতেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ নিজেকে নাস্তিকপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করতেন না। কিন্তু নাস্তিক কোন্ বিধাতার বর পায়? বলা বাহুল্য, এই বিধাতা বিশ্ববিধাতা নন, ইনি জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ মানববিধাতা। বস্তুত নাস্তিকরা নিখিল মানবাত্মার সঙ্গে অন্তরে অন্তরে সারূপ্য অনুভব করে বলেই

মানবকল্যাণে আত্মোৎসর্গ করতে উৎসুক। (চার্বাকপন্থী নাস্তিকরা অবশ্য এদের পর্যায়ভুক্ত নন।) সুতরাং এরা নিজেদের নাস্তিক বলে পরিচয় দিলেও, রবীন্দ্রনাথের মতে এরা যথার্থ নাস্তিক নয়। বরং উক্ত সারূপ্য উপলব্ধির জন্য এদেরই যথার্থ আস্তিক ও সোঽহংধর্মী বলে স্বীকার করতে হয়।

বুদ্ধদেব ভগবৎতত্ত্বের আলোচনায় বিরত থাকতেন, একথা সুবিদিত (মানুষের ধর্ম, পৃ ৩৬)। এজন্য তিনি সাধারণত নাস্তিক বলেই গণ্য হয়ে থাকেন। কিন্তু তিনি ছিলেন বিশ্বমৈত্রীর উপাসক। "বুদ্ধদেব উপদেশ দিলেন,—সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ মৈত্রী পোষণ করবে:... মা যেমন আপন আয়ু ক্ষয় করেই নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে, তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি মনে অপরিমাণ দয়াভাব পোষণ করবে।" (মানুষের ধর্ম, পৃ ৬৪)। বুদ্ধদেব এই উপদেশ দিতে পেরেছিলেন, কেননা তিনি 'মানবদেবতাকে মানুষের মধ্যে জেনেছিলেন।' এই যে মানুষের মধ্যে দেবতার উপলব্ধি এবং তার ফলে বিশ্বের প্রতি অপরিমাণ মৈত্রীভাব পোষণ, একেই বলে 'ব্রহ্মবিহার'। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যামতে এই ব্রহ্মবিহার হচ্ছে আসলে মানবব্রহ্ম-বিহার। আর, তাঁর মতে নিজের অন্তরের মধ্যে বিশ্বমানবের উপলব্ধিই হচ্ছে সোঽহং-তত্ত্বের মূল কথা এবং সে হিসাবে সোঽহংতত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন বলেই বুদ্ধদেব ব্রহ্মবিহারের উপদেশ দিতে পেরেছিলেন।

পূর্বে বলেছি জড়বাদীরাই আসল নাস্তিক। কিন্তু সাধারণত নাস্তিক তাদেরই বলা হয় যারা নিজের অন্তরের বহির্ভূত কোনো সত্তাশক্তির অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। পূর্বে বলেছি রবীন্দ্রনাথ জড়বাদী ছিলেন না এবং নিজেকে তিনি নাস্তিবাদীদের পংক্তিভুক্ত বলেও মনে করতেন না। কিন্তু উক্ত সাধারণ স্বীকৃত সংজ্ঞা মেনে নিলে তাঁকেও নাস্তিকই বলতে হবে। কেননা, অন্তত শেষ জীবনে তিনি নিজের অন্তর থেকে স্বতন্ত্র কোনো দেবশক্তি বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

বৃহদারণ্যকে একটি আশ্চর্য বাণী আছে,
অথ যোঽন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে
অন্যোঽসৌ অন্যোঽহম্ অস্মীতি
ন স বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাম্।
(বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১।৪।১০)

"যে মানুষ অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, সেই দেবতা অন্য আর আমি অন্য এ-কথা ভাবে, সে দেবতাদের পশুর মতোই।...যে দেবতাকে আমার থেকে পৃথক্ করে বাইরে স্থাপন করি তাঁকে স্বীকার করার দ্বারাই নিজেকে নিজের সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দিই।"

—মানুষের ধর্ম (১৯৩৬), পৃ ৫৬-৫৭

দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ নিজের বাইরে স্থিত কোন দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। বৃহদারণ্যকের মতে যারা এরকম বহিঃসত্ত্ব দেবতার অস্তিত্ব মানে তারা দেবতাদের পশুর মতই; আর রবীন্দ্রনাথের মতে তারা পৌত্তলিক, যদিও তাদের পৌত্তলিকতা কাঠপাথরের চেয়ে 'সূক্ষ্মতর উপাদানে রচিত।' পক্ষান্তরে আশঙ্কা করি উক্ত প্রকার বহির্দেববাদীরা বৃহদারণ্যককে বলবেন অশাস্ত্র এবং রবীন্দ্রনাথকে বলবেন নাস্তিক।

রবীন্দ্রনাথের মতে অবশ্য কল্যাণব্রত নাস্তিকরাও বস্তুত মানবধর্মী আস্তিক। স্বামী বিবেকানন্দের এই বিখ্যাত উক্তিটিও এখানে স্মরণীয়—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

স্বামীজীর এই জীবপ্রেমের বাণী আর রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মের বাণী কার্যত এক, কিন্তু তত্ত্বত পৃথক্। অর্থাৎ প্রয়োগের দিক্ থেকে উভয়ের বাণীর পরিণাম এক, কিন্তু তত্ত্বগত উপলব্ধির দিক থেকে এই দুই বাণীর উৎসস্থল পৃথক্, যদিও উৎসস্থল-দুটির মধ্যবর্তী ব্যবধানও খুব বেশী নয়।

এ-কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মানবদেবতা ও মানবধর্মকে আশ্রয় করে পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথের মন যে সাধনাকে স্বীকার করেছিল তাতে সুগভীর ধ্যান ও জ্ঞান, অপরিমাণ প্রেম বা বিশ্বমৈত্রী, ঐকান্তিক ত্যাগ ও কর্মনিষ্ঠার অবকাশ ছিল, কিন্তু ভক্তি ও প্রার্থনার অবকাশ ছিল না। তাই দেখতে পাই, তাঁর শেষ বয়সের রচনায় জ্ঞান ও প্রেমের কর্ম ও ত্যাগের কথা পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণেই, কিন্তু ভক্তি ও প্রার্থনার কথা নেই বললেই হয়।

একটা বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ কবি ও মনীষী। মনীষীর কাজ সত্যের উপলব্ধি ও প্রকাশ, আর কবির কাজ কল্পিত অনুভূতির মায়া সৃষ্টি করা। অতি অনায়াসে যে-কোন মুহূর্তে অতি সূক্ষ্ম অনুভূতির মায়া সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের তুলনা মেলে না, আর সে-মায়ার আবির্ভাব ঘটে আমাদের অলক্ষ্যেই। ফলে অনেক সময়ই মায়ানুভূতিতে সত্যোপলব্ধি ভ্রম ঘটবার আশঙ্কা থেকে যায়।

"কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়।
দুদিন দিয়ে ঘেরা ঘরে তাইতে যদি এ[illegible]
ধ[illegible]
চিরদিনের আবাসখানা সেই কি শূন্যময়
জয় অজানার জয়।"

এটি ১৯১৮ সন বা তার কাছাকা[illegible] সময়ের রচনা। তখনও রবীন্দ্রনাথের ম[illegible] মানবদেবতা ও মানবধর্মের আদর্শ স্পষ্ট রূপ ধারণ করেনি। তখনও যে অজান[illegible] জয়কীর্তন করা হল সে অজানা কে? স্প[illegible] করে বলবার উপায় নেই। তবে এটা ঠি[illegible] যে, এই অজানা পরলোকই হক কিং[illegible] পরলোকের (তথা ইহলোকের) অ[illegible] দেবতাই হন, তাঁর উপরে আস্থা ও নির্ভরে[illegible] অভাব নেই এ-রচনাটিতে। এই 'জা[illegible] আস্থা ও নির্ভর রবীন্দ্রনাথ মনে পোষ[illegible] করেছেন জীবনের শেষ পর্যন্ত।

'সমুখে শান্তিপারাবার' এই সুবিখ্যা[illegible] গানটি রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে[illegible] রচনা। এই গানের শেষ লাইন 'প[illegible] অন্তরে নির্ভয় পরিচয় মহা-অজানার[illegible] এই মহা-অজানা কে? মানবব্রহ্ম না জগদ[illegible] ব্রহ্ম? যদি তিনি মানবব্রহ্ম হন ত[illegible] তাঁকে মহা-অজানা বলবার সার্থকতা কী[illegible] হৃদিস্থিত হৃষীকেশ বা মানবদেবতা [illegible] আমাদের অজানা হতে পারেন না, যখন[illegible] নিজেকে জানি তখনই তাঁকেও জানি[illegible] যদি তিনি পরমব্রহ্ম হন তাহলে তাঁর কা[illegible] ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা করবার সার্থকতা কী[illegible] বস্তুত সমগ্র গানটিতেই পুরোপুরিভাবে[illegible] উক্ত মহা-অজানার উপরে নানাবিধ মানবি[illegible] গুণ আরোপ করা হয়েছে। অথচ শে[illegible] বয়সে রবীন্দ্রনাথ গুণাতীত জগৎসত্তাকে[illegible] জ্ঞানাতীত বলেই ঘোষণা করেছেন সুস্পষ্ট[illegible] ভাষায়। আর যে গুণময় পরম মানবসত্তাকে তিনি স্বীকার করেছেন, তিনি ত[illegible] অজানা নন। গানটি আসলে রচিত হয়েছিল[illegible] 'ডাকঘর' নাটকে বিশেষ পাত্রের গাইবার জন্য। রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের অভিমতের সঙ্গে এটির কোনও সামঞ্জস্য নেই।

সর্বশেষে বলা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার যে-ব্যাখ্যা এ-প্রবন্ধে করা গেল তা অভ্রান্ত এমন দাবি আমি করি না। কোন বিষয়েই কেউ অভ্রান্ততার দাবি করতে পারে বলে আমি মনে করি না। তা ছাড়া, এ-প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত মত যে আমার ব্যক্তিগত মতের অনুরূপ একথা ধরে নেবারও কোন হেতু নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় গভীরতর জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তা ও স্বতন্ত্র মত পোষণের অধিকার আমারও আছে।

"রক্তটা কী রকম দেখলেন ডাক্তার বাবু—"

"ভাল নয়। হিমোগ্লোবিন বড্ড কম। আর বি, সি, ডাব্লিউ বি, সি-ও কম।"

"তা হলে, কী করব—"

"কয়েকটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি। দুটো খাবার, আর একটা ইনজেকশনের—"

"রক্ত পরীক্ষার জন্যে কত দিতে হবে?"

"আপনার কাছে কিছু নেব না। ইনজেকশনটা কিনে আনুন, আমি দিয়ে দেব, ফি দিতে হবে না।"

"রক্তে কী দোষ বললেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"রক্তটা পাতলা হয়ে গেছে আর কি। যে-সব জিনিস যে পরিমাণে থাকা উচিত, তা নেই।"

"ও, তাই নাকি! রক্ত পাতলা হয়ে যাবার কারণ কী?"

"অনেক কারণ থাকতে পারে। এক কথায় বলা যায় কি চট করে? এখন যা বললুম, তাই করুন।"

"আমার বুক ধড়ফড়টা ওই জন্যেই তা হলে?"

"হ্যাঁ। তাই ত মনে হচ্ছে।"

অতুলবাবু তাঁহার কোটরগত চক্ষুর দৃষ্টি আমার মুখের উপর খানিকক্ষণ নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

"ওষুধগুলোর দাম কী রকম পড়বে বলতে পারেন—"

"ঠিক বলতে পারব না, আমার ত ওষুধের দোকান নেই। দেখুন না খোঁজ করে।"

"আচ্ছা, থ্যাংক ইউ।"

অতুল রায় আমাদেরই পাড়ার লোক। বয়স হইয়াছে, কিছুদিন পরেই রিটায়ার করিতে হইবে। ছেলেমেয়ে অনেকগুলি। বড় ছেলেটির বয়স আঠার বৎসর। উপর্যুপরি দুইবার ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করিয়াছে।

অতুলবাবু বলেন, "ছেলের দোষ নেই মশাই। স্কুলে আজকাল পড়াশোনা কিছু হয় না। প্রত্যেকটি মাস্টার টিউশনি করে বেড়ায়, স্কুলে এসে ঘুম মারে। তার উপর পড়ানো হয় হিন্দীতে। ওরা অর্ধেক বুঝতেই পারে না। তা ছাড়া বাঙালী ছেলে বলে প্রত্যেক বিহারী মাস্টারের বিষদৃষ্টি তার উপর। সুযোগ পেলেই কম নম্বর দিয়ে দেয়। যে দু-একজন বাঙালী মাস্টার আছেন, তাঁরা ভরসা করে বাঙালী ছেলেদের দিকে ভাল করে নজর দিতে পারেন না, পাছে বিহারী মনিবরা চটে যান। এ অবস্থায় ছেলে কখনও পাস করতে পারে? ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত যে উঠতে পেরেছে এই যথেষ্ট।" তাহার পর একটু থামিয়া অতুলবাবু বলিয়াছিলেন, "সিংজীকে তেল দিচ্ছি রোজ। তিনি ভরসা দিয়েছেন, ম্যাট্রিকটা পাস করলে তাঁর অফিসে ঢুকিয়ে নেবেন। কিন্তু তিনি যা করতে বলছেন, তা করব কিনা এখনও ঠিক করতে পারিনি—"

"কী করতে বলছেন তিনি?"

"বলছেন, আপনার ছেলের নাম বদলে দিন অ্যাফিডেবিট করে। কাননকুমার বদলে খুবলাল করে দিন। রায় উপাধি ঠিক আছে। অনেক বিহারী ভুঁইহারদের উপাধি রায় হয়। কায়স্থও রায় আছে! সিংজী বলছেন, বাঙালী নাম দেখলে উপরে থেকে কেটে দেবে। কী করব তাই ভাবছি। ওর ঠাকুমা অনেক শখ করে নামটা রেখেছিলেন—"

অতুলবাবুর প্রথম সন্তান কন্যা, ডাকনাম রিনি। তাহার দূরসম্পর্কের এক মাসী শান্তিনিকেতনে পড়িতেন। তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নির্ভুল সুর এবং নানারকম নাচের নিখুঁত মুদ্রা, পদবিন্যাস প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি অসুস্থ হইয়া বায়ুপরিবর্তন-মানসে অতুলবাবুর বাড়িতে কিছুদিন ছিলেনও। সেই সময় রিনি নাচ-গানে তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়াছিল। ভাগ্যিস লইয়াছিল, তাই সে এখন মাসে পঁচাত্তর টাকা রোজগার করিয়া বৃদ্ধ বাবার সংসার-ভার লাঘব করিতেছে। তাহার মাসী তাহাকে যাহা শিখাইয়া দিয়াছিলেন তাহার চর্চা সে ছাড়ে নাই। নানা কৌশলে এবং অনেকের খোশামোদ করিয়া এখন বেশ নৃত্য-গীত-পটীয়সী হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাহাকে নেকনজরে দেখিয়াছেন এবং তাঁহারই সুপারিশের জোরে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে সে নাচ-গানের শিক্ষয়িত্রী

হইয়া বাহাল হইয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নেকনজর যাহাতে আরও কৃপা-কোমল হয়, সেজন্য তাহাকে সপ্তাহে দুই-তিন দিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলোয়

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

(স্থাপিত ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৬ সাল)

অনুমোদিত, বিলিকৃত এবং
বিক্রীত মূলধন— ৫,৫০,০০,০০০ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন—৩,০০,০০,০০০ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল— ৩,১০,০০,০০০ টাকা

হেড অফিস:
মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই।

—শাখাসমূহ—

কলিকাতা—২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড (মেইন অফিস), ২০১, হ্যারিসন রোড, বড়বাজার এবং ৩নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, সাউথ। আমেদাবাদ—ভদ্রা (মেইন অফিস), এলিস ব্রিজ, গান্ধী রোড, মানেক চক, স্টেশন ব্রাঞ্চ। বোম্বাই—আন্ধেরী, বান্দ্রা, বুলিয়ন এক্সচেঞ্জ, কোলাবা, ফোর্ট, কলবাদেবী, মালাবার হিল। অমৃতসর, বাঙ্গালোর, ভুজ (কাচ), কালিকট, কোয়েম্বাটোর, দিল্লী, গান্ধীধাম (কাচ) হায়দরাবাদ (ডেকান), জামসেদপুর, জুনাগড়, মাদ্রাজ, নাগপুর, নাগপুর সিটি, নিউদিল্লী, পালানপুর, পুণা, পুণা সিটি, রাজকোট, সোলাপুর, সুরাট, ভেরাভল, বিশাখাপত্তনম।

বৈদেশিক শাখাসমূহ—লণ্ডন ১৭, মুরগেট, লণ্ডন, ই, সি, ২। এডেন, ডার-এস্-সালাম, জিঞ্জা, কামপালা, করাচী, মোম্বাসা, নাইরোবী, ওসাকা, সিঙ্গাপুর, টোকিও।

পৃথিবীর সমস্ত প্রধান দেশে এজেন্টস ও করেস্পণ্ডেন্টস্ রহিয়াছে।

পরিচালকবৃন্দ—স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর, ব্যারনেট, জি-বি-ই, কে-সি-আই-ই, চেয়ারম্যান, মিঃ আম্বালাল সরাভাই, স্যার জোসেফ কে, কে-বি-ই, মিঃ রামনিবাস রামনারায়ণ, মিঃ ভগবানদাস সি মেটা, মিঃ কৃষ্ণরাজ এম, ডি, থ্যাকারসে, মিঃ এ ডি শ্রফ, মিঃ মদনমোহন মঙ্গলদাস, মিঃ এন, কে, পেটিগারা, স্যার বিঠল এন চন্দাভরকার। জেনারেল ম্যানেজার—মিঃ টি, আর, লালওয়ানী।

কলিকাতা কমিটি—মিঃ জগমোহনপ্রসাদ গোয়েঙ্কা, মিঃ এন, বি, ইলিয়াস।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ভার লওয়া হয় এবং অনুমোদিত আমানতকারীদের লেটার অফ ক্রেডিট দেওয়া হয়।

ব্যাংক সংক্রান্ত কারবারের আদানপ্রদান হয়।

এস, কে, চৌধুরী
এজেন্ট।

গিয়া হাজিরা দিতে হয়। অতুলবাবু নিজে গিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া আসেন।

তাঁহার অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেহই সুস্থ নয়। নানারকম ব্যাধি লাগিয়াই আছে। আমি পাড়ার ডাক্তার, বিনা পয়সাতেই দেখি। তবু মাঝে মাঝে খবর পাই, তিনি আমার ঔষধ না খাওয়াইয়া হোমিওপ্যাথি করিতেছেন। তাঁহার নিজেরই ছোট একটা হোমিওপ্যাথি বাক্স আছে, দুই-একখানা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বাংলা বইও আছে। অনেক সময় নিজেই চিকিৎসা চালান। নিজের বুক ধড়ফড়ানির চিকিৎসা নিজেই করিতেছিলেন, কিন্তু হালে পানি না পাইয়া আমার নিকট আসিয়াছেন।

বৈকালবেলা অতুলবাবু আবার দেখা দিলেন।

"আপনি যে প্রেসক্রিপশান লিখে দিয়েছেন, তার দাম কত জানেন? দু শিশি ট্যাবলেটের দাম সাড়ে ন টাকা। আর ইনজেকশনের দাম প্রতিটি আমপুলে আড়াই টাকা। আপনি ছটা ইনজেকশন দিতে চাইছেন। তার মানে পনের টাকা। পনের আর সাড়ে নয়ে সাড়ে চব্বিশ টাকা। সাত দিনেই শেষ হয়ে যাবে। এ-চিকিৎসা করা কি আমার পক্ষে সম্ভব?"

অতুলবাবু তাঁহার কোটরগত দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কী বলিব, ভাবিয়া পাইলাম না। যাহার ঔষধ কিনিবারই সামর্থ্য নাই, তাহার চিকিৎসা করিব কী করিয়া?

"হাসপাতালে চেষ্টা করে দেখুন না, যদি পান—"

"কোথায় আছেন আপনি স্যার। হাসপাতাল গরিবদের জন্যে নয়, হোমরা-চোমরা অফিসারদের জন্যে। ভাল ভাল দামী ওষুধ বিনা পয়সায় ও'রাই পান। গরিবদের কাছে ঘুষ চায়। বিনা পয়সায় কিছু হয় না ওখানে। কোন্‌খানেই বা হয়! ওই যে গভর্নমেণ্ট পোলট্রি খুলেছে, ওর একটি ডিম, কি একটি মুরগী কি বাইরের লোকের পাবার উপায় আছে? সব ওই অফিসারদের পেটে যাচ্ছে—"

অতুলবাবু যখন কথা বলেন, তখন একটানা খানিকটা বলিয়া যান, তাহার পর হঠাৎ থামিয়া নির্নিমেষে মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন। তাহাই করিলেন।

বলিলাম, "তা হলে খাওয়াটা একটু ভাল করুন। দুধ, মাছ—"

"বাজারে চুনো মাছের সের কত করে জানেন? দেড় টাকা। পাকা মাছের দিকে ত চাওয়াই যায় না। দুধ টাকায় পাঁচ পো, মাংস আড়াই টাকা তিন টাকা সের। আ এগার আনা, পটল আট আনা, ধুঁদ আট আনা. সেদিন একটা ছোট্ট ক কিনতে গেলুম, দাম বললে আট আ ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে এলুম। খাও ভাল করব কী করে? কনট্রোল দোকা গুলোতে গমও পাওয়া যাচ্ছে না আজকা সব ব্ল্যাক মার্কেটে। অথচ রোজই এ করে মিনিস্টার এরোপ্লেনে উড়ে এ বক্তৃতা মেরে যাচ্ছে। আমাদের চিকিৎ কে জানেন? মরণ। তাঁকে 'কল'ও দি রোজ, কিন্তু আসছেন কই—"

আবার তিনি তাঁহার কোটরগত চক্ষু দৃষ্টি আমার মুখের উপর খানিক নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

"আচ্ছা চললুম। থ্যাংক ইউ—"

'থ্যাংক ইউ'টা দিতে তিনি কখন ভুলিতেন না।

দিন সাতেক পরে একটি নূতন সমস্যা জড়িত হইতে হইল। ভাষাসমস্যা। বিহ বিশ্ববিদ্যালয় নোটিশ জারি করিয়াছে এইবার সকলকে হিন্দীর মাধ্যমে পরী দিতে হইবে। মাতৃভাষা চলিবে না। গরম হইয়া উঠিল। সংবিধান-বিরো এ কী কাণ্ড! এই সেদিনই ত রাজেন প্রসাদ হায়দরাবাদে বলিয়াছেন যে, জো করিয়া কাহারও উপর হিন্দী চাপানো হই না। অথচ তাঁহার নিজের প্রদেশেই কথা অমান্য করিতেছে। কিছুতেই সহ্য করা হইবে না। দরখাস্ত লিখি বসিলাম। তাহার পর একটি ছোকরাকে ধরিয়া বলিলাম, "বাঙালীদে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সই করিয়ে নিয়ে এস তারপর মুসলমানদের বাড়িতে যেতে —এই খাতাটাও নাও, কিছু কিছু চাঁদা আদায় কর।"

ছোকরা বলিল, "আচ্ছা—"

বলিয়া কিন্তু সে কুণ্ঠিতমুখে দাঁড়াই রহিল।

"দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

"আমার সাইকেলটার পিছনের চাকা একটু জখম হয়েছে। ভাবছি হেঁটে যে পারব কি—"

"পিছনের চাকা সারিয়ে নাও এক্ষনি—"

যুবকটি আরও কুণ্ঠিত হইল। তাহা পর মাথা চুলকাইয়া বলিল, "হাতে এক পয়সা নেই ডাক্তারবাবু। চার পাঁচ টাক লেগে যাবে—"

রোক চড়িয়া গিয়াছিল।

"তুমি সারিয়ে নাও। যা লাগে আমি দেব—"

যুবক দরখাস্ত লইয়া সোৎসাহে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া যাইবার একটু পরেই অতুল-বাবুর গলা শোনা গেল।

"ডাক্তারবাবু, এই দেখুন—"

দেখিলাম, তিনি রাস্তায় দাঁড়াইয়া বাজারের থলিটি আমাকে তুলিয়া দেখাইতেছেন। থলির ভিতর হইতে এক-গোছা লাল শাকের পাতা দেখা যাইতেছে। কী দেখাইতেছেন, তাহা ঠিক বুঝিলাম না।

"কী দেখাচ্ছেন? আসুন না—"

অতুলবাবু রাস্তা পার হইয়া আমার ক্লিনিকে ঢুকিলেন।

"লাল শাক মশাই। জিতেনবাবু বলছিলেন, এ খেলেও নাকি হিমোগ্লোবিন বাড়ে। এ-ও চার আনা সের—"

অতুলবাবু চলিয়া যাইতেছিলেন।

বলিলাম, "শুনুন, একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছি। সই করে দেবেন তাতে। আর পারেন ত কিছু চাঁদাও দেবেন—"

"কী ব্যাপার?"

"দেখবেন, দরখাস্ততেই লেখা আছে সব।"

দিন তিনেক পরে অতুলবাবু পুনরায় দেখা দিলেন।

"আপনার দরখাস্তে সই করিনি ডাক্তারবাবু। আমাদের মাতৃভাষার উপর যা নির্যাতন হচ্ছে, তা আমি জানি। কিন্তু সই করতে পারলাম না। ওপর-ওলাকে চটাবার সাহস নেই। সিংজী ঘোর হিন্দীওলা। ও'র সুনজরে থাকলে রিটায়ার করবার পর এক্সটেনশনও পেতে পারি। এ-সব দরখাস্তে সই করলে আমার আখের মাটি হয়ে যাবে। আপনার বাংলা দেশ আর বাংলা ভাষা আমাকে খেতে দেবে, না পরতে দেবে? কোন বাঙালী কোন বাঙালীকে সাহায্য করবে? কেউ করবে না। সুতরাং যারা আমাকে খেতে পরতে দিচ্ছে, তাদের মন রেখে চলতে হবে। আগে ইংরেজদের সেলাম করতুম, এখন এদের করি। বাঁচতে হবে ত আগে, তারপর ভাষা।"

তাহার পর তিনি কোমরের গোঁজে হইতে একটি সিকি বাহির করিয়া বলিলেন, "আমার সাধ্যমত চাঁদা আমি কিছু দিচ্ছি, কিন্তু দেখবেন আমার নামটা যেন খাতায় লিখবেন না! যদি কিছু লিখতেই চান, এক্স ওয়াই জেড লিখে দেবেন—"

সিকিটি টেবিলের উপর রাখিয়া অতুলবাবু তাঁহার কোটরগত চক্ষুর দৃষ্টি আমার উপর খানিকক্ষণ নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

"আচ্ছা, চললুম। যাই হক, আপনি যে এসব করছেন, এটা খুবই ভাল কথা। থ্যাংক ইউ—"

অতুলবাবু চলিয়া গেলেন।

বাংলার বাহিরে যেসব নিম্ন-মধ্যবিত্ত চাকুরে বাঙালী বাস করেন, তাঁহাদের জীবন-সমস্যার আর একটা দিক সহসা যেন দেখিতে পাইলাম।

দমিয়া গেলাম একটু। সই করেন নাই বলিয়া অতুলবাবুর উপর রাগ করিতে পারিলাম না।
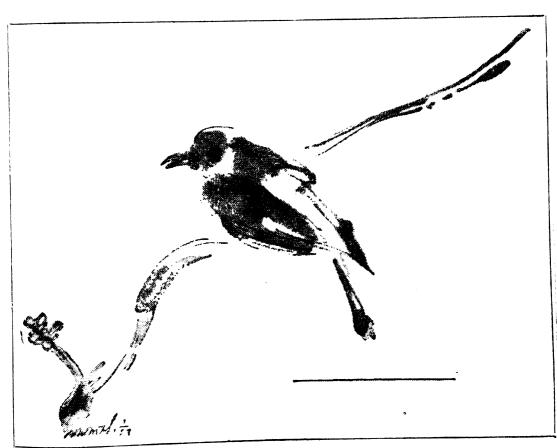
শাখার আশ্রয়ে

শিল্পী শ্রীগোপাল ঘোষ

বৈষ্ণব সাধনায় মা

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

ষ্ণব সাধকদের মতে ভগবান পূর্ণ শক্তিমান এবং পূর্ণ শক্তিমত্তায় তিনি রসময়, তিনি আনন্দময়, তিনি প্রেমময়। তাঁহার রসময়ত্ব, তাঁহার আনন্দ-স্বরূপত্ব প্রেমের পথেই পরিস্ফূর্তি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে ভগবৎ-প্রেমের স্ফূরণ, তাহার আস্বাদনই জীবের পক্ষে পরম প্রয়োজন। ফলত, রস এবং আনন্দের সঙ্গে প্রেমের নিত্য সম্বন্ধ এবং ভগবৎ-প্রেমের সম্পর্কে গিয়া জীব অংশীস্বরূপে ভগবানের সেবায় সর্বার্থসিদ্ধি লাভ করে। সেই রসময় তাঁহার অমৃতময় স্বরূপধর্মে প্রতিষ্ঠিত হন।

এই প্রেম লাভ করিবার উপায় কী? এ সম্বন্ধে আচার্যগণের সিদ্ধান্ত এই যে, 'জীব নিস্তারিব এই ঈশ্বরস্বভাব'। ভগবান জীবকে চাহেন; চাহেন প্রেমেরই দায়ে। প্রেম তাঁহার স্বরূপধর্ম। এই ধর্মের পরিস্ফূর্তি না ঘটিলে তাঁহার রসময়ত্ব এবং আনন্দস্বরূপত্ব পূর্ণত্ব লাভ করে না: তাঁহার পূর্ণত্ব অপূর্ণ থাকিয়া যায়, ভাবের ক্ষেত্রে অভাব ঘটে এবং তিনি তাঁহার স্বভাব হারাইয়া ফেলেন। কিন্তু অভাবের মধ্যে কে পড়িতে চায়? সুতরাং "কৃষ্ণকে নাচায় প্রেম।"

শ্রীভগবান অনন্তগুণসম্পন্ন। তাঁহার নব নব গুণগণ। কিন্তু এই সব গুণের মধ্যে বাৎসল্য-গুণই সর্বপ্রধান। আচার্য রামানুজ 'আশ্রিত-বাৎসল্যৈক জলধি।' বলিয়া তাঁহার গুণগান করিয়াছেন। তাঁহার এই বাৎসল্য অপার কারুণ্য-সৌশীল্যে উজ্জ্বল্য লাভ করে এবং তাঁহার স্বরূপ-শক্তির সর্বতোভাবে অভিব্যক্তি ঘটায়। ভগবৎবাৎসল্যের রসঘন লাবণ্যলীলা সাক্ষাৎ সম্পর্কে জীবের অন্তরকে স্পর্শ করিয়া মাতৃত্বের পরম মহিমায় তাহাকে উজ্জীবিত করিয়া তোলে। এই দিক হইতে বিচার করিতে গেলে বাৎসল্যরসের উজ্জীবনাত্মক এই যে লীলা ইহাই ভগবানের স্বভাবের মূলে পরমভাব। এইটি তাঁহার নিজ বীজ। ইহার সম্পর্কেই শ্রীভগবানের মাধুর্যবীর্যের প্রকাশ ও বিলাস এবং জীবের অবীর্যের নিরসনে স্বরূপধর্মের উজ্জীবন সাধিত হয়। ফলত, শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা আনন্দময়ী তাঁহার এই শক্তির আশ্রয় ব্যতীত ভক্তের প্রয়োজন মিটে না; আবার ভগবান জীবের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধসূত্রে প্রেমরস আস্বাদ করিতে পারেন না। প্রত্যুত, সেই রস আস্বাদনে বঞ্চিত থাকিলে ভগবানের আনন্দময়ত্ব সিদ্ধ হয় না; কারণ প্রেমের সম্বন্ধ ব্যতীত রস কোথায়, আনন্দ কোথায়? বৈষ্ণব সাধনায় যুগল উপাসনার মূলে এই নিগূঢ় তত্ত্বটি নিহিত আছে। লক্ষ্মীদেবীর কৃপা ব্যতীত লক্ষ্মী-নারায়ণের সাধনা সার্থকতা লাভ করে না; সীতাঠাকুরানীর কৃপার স্পর্শে রামনাম চিন্ময় রসধর্ম উজ্জীবনে সামর্থ্য লাভ করে; রাধারানীর অনুগ্রহ-সংস্পর্শে চরাচরে শ্রীকৃষ্ণের রসিকশেখর নটবরস্বরূপে সর্বচিত্তাকর্ষক রূপ উজ্জ্বল হইয়া ফোটে। সুতরাং শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণই বলুন, শ্রীসীতারামই বলুন শ্রীরাধাকৃষ্ণই বলুন, গৌরীশংকরই বলুন, লীলারসানুরাগী যাঁহারা সাধক তাত্ত্বিক বিচারে শক্তিমৎ পরতত্ত্বই তাঁহাদের সমর্চনীয়। বস্তুত, চিন্ময় আনন্দরস সম্পর্কে দেহাত্মবুদ্ধি লয় করিয়া লীলা-মাধুর্যে নিমগ্ন হইতে হয়। সেই অবস্থায় ভগবৎ-কৃপার প্রগাঢ় রস-সংস্পর্শ মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে উজ্জীবিত করিয়া দেহের প্রতিটি কোণে উপচাইয়া পড়ে। বস্তুত, আমাদের জড় মনের এই স্তরে ভগবৎ-কৃপার এই প্রভাবটি মাতৃভাবের সর্বাত্মময় ছন্দের সম্বন্ধেই উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে মাতৃ-কৃপার স্পর্শ অন্তরে না পাইলে কাম জয় হয় না এবং কামকে জয় করিতে না পারিলে সাক্ষাৎ সম্পর্কে ভগবৎ-প্রেম উপলব্ধি করা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে।

বাংলার বৈষ্ণব সাধকগণ রসানুভূতির পথে এই পরম সত্যটি একান্তভাবে উপলব্ধি করেন। তাঁহারাও বলিয়াছেন, "হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন, হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ।" রাধারানী স্বমাধুর্যে কৃষ্ণকে বশ করিয়া তাঁহার সেবারস-আস্বাদন জীবের পক্ষে সুলভ করিয়া দেন। প্রকৃতপক্ষে অভীষ্ট যদি সমুদ্দিষ্ট থাকে, তবে তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জমে না। বশে আসিলে তবে রস। সর্বভাবে অভীষ্টের একান্ত সান্নিকর্ষজনিত রসের উপচিতিতে ভ[...] সেবার সৌলভ্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যেই জী[...] অন্তর-ধর্মের সর্বতোময় প্রদীপ্তি স[...] হইয়া থাকে। বাংলার বৈষ্ণব রস-সাধ[...] কৃষ্ণকে বশ করিবার পক্ষে রাধারা[...] সৌন্দর্য এবং মাধুর্যের লীলাটিই বি[...] ভাবে উন্মুক্ত হইয়াছে; অন্য পক্ষে জী[...] প্রতি তাঁহার করুণার বাৎসল্য বা মাতৃ[...] ভাবটি গৌণ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া [...] হয়। কিন্তু এই বিচার নিতান্তই পরো[...] ফলত, এই রস-সাধনার পক্ষে যাঁ[...] কিয়ৎ পরিমাণেও অনুভূতি লাভ করিয়া[...] রাধারানীর করুণার বিভঙ্গী তাঁ[...] উপলব্ধি করিয়াছেন। ভাগবত ব[...] অনুভূতিই সাধনার প্রাণপদার্থ [...] অনুভূতির পথেই জীবের স্বরূপধ[...] উদ্দীপ্ত ঘটে। এই অনুভূতির ম[...] আত্মমায়া অন্য কথায় ভগবানের কৃপা [...] জীবকে আপন করিবার জন্য তাঁহার ই[...] শক্তি কাজ করে। 'কৃষ্ণের সকল ই[...] শ্রীরাধিকাতে রাজে', সুতরাং রাধারানী[...] আশ্রয় করিয়া এবং তাঁহার করুণাকে বী[...] স্বরূপে অবলম্বন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত-হৃ[...] কারুণ্যে এবং লাবণ্যলীলায় উদ্ভিন্ন হ[...] উঠেন, নহিলে তাঁহার প্রীতি সাধ[...] অনুভূতির উপযোগী রস সঞ্চার-সম[...] লাভ করে না। ব্যাপারটি আবার এমন [...] মধুর রসের নিবিড় সম্বন্ধের স্বাচ্ছ[...] রাধারানীর করুণার খেলা অর্থাৎ তাঁ[...] মাতৃত্বের মহিমার চাতুর্য রঙ্গময় যে আস[...] সাধকের অন্তরে উদ্দীপিত করে তাহা[...] প্রেমের তরঙ্গে বিভিন্ন ভাবের বি[...] অনেকটা বিলীন হইয়া যায় এবং অপরিচ্ছি[...] লাবণ্য লীলারসের সান্দ্র সম্বন্ধের আব[...] অনুভূতির রাজ্যে বিবর্ত উত্থিত হয়, সাধ[...] মহাভাবে নিমগ্ন হন। কিন্তু কারুণ[...] আলম্বনে ভগবৎ-প্রেমমাধুর্যের তাৎ[...] এবং লাবণ্য বিস্তারের এই লীলা অত্য[...] গূঢ় এবং গভীর। কবিরাজ কৃষ্ণদ[...] গোস্বামী দাস-গোস্বামীর আনুগত্যে রাধ[...] রানীর রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া এ[...] লীলারসের বিন্যাস করিয়াছেন। "কারুণ্যা[...] মৃতধারায় স্নান প্রথম, তারুণ্যামৃতধার[...] স্নান মধ্যম—লাবণ্যামৃতধারায় তদুপরি[...] স্নান"—গোবিন্দানন্দিনী গোবিন্দমোহিনী[...] স্মিতালীবর্গবলিতা শ্রীরাধার অভিসারে[...] ইহাই উদ্যোগপর্ব। প্রকৃতপক্ষে অপ্রাকৃ[...] এই লীলা। মন শুদ্ধ না হইলে এই লীলা[...] অপরিচ্ছিন্ন ভাবটি অন্তরে উপলব্ধি[...] হইতে পারে না। কাম সম্পর্ক অতিক্র[...] করিয়া প্রেমের রাজ্যে এখানে উদয়—জ[...] আসক্তির এই অবস্থায় লয় ঘটে[...] শ্রীভগবানের সঙ্গে এখানে সাক্ষাৎ সম্পর্কে

অচসভাবে সংশ্লিষ্ট, গোঁজামিলের কারবার এই অবস্থায় চলে না। সমুন্নত উজ্জ্বল রসের অতি গূঢ় এই রাজ্যে অনুপ্রবেশ সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। সাধারণ জীবের পক্ষে মাতৃভাবকে অবলম্বন করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হওয়াই এ-রকম অবস্থায় শ্রেয়। বাংলার অধ্যাত্মভাবনায় এই সত্যটি উপেক্ষিত হয় নাই; পক্ষান্তরে ইহা সর্বতোভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। বাংলার বৈষ্ণব সাধনার ক্রম-বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিলে এই সত্যটি সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে।

বৈষ্ণবের আরাধ্যতত্ত্ব শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা-কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ। 'নিতাই বিহনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই', ঠাকুর নরোত্তমের ইহাই নির্দেশ। ঠাকুর বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দগুরুর মহিমা কীর্তন করিয়া বলিয়াছেন—'তুমি চৈতন্যের ভক্ত, তুমি মহা-ভক্তি, তুমি সঙ্গী, তুমি সখা, তুমি মহাশক্তি।' নিত্যানন্দ প্রভু দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মধুর সর্বভাবের অধিকারী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত নবদ্বীপধামে তাঁহার যখন প্রথম মিলন ঘটে, তখন মাতৃভাবে তাঁহার বিভোর অবস্থা, "শিশুমতি নিত্যানন্দ পরম বিহ্বল। বালকের প্রায় যেন বচন চঞ্চল॥" বাল্যভাবে নিত্যানন্দ শচীদেবীর পদধূলি লইতে গেলেন, তিনি ছুটিয়া পলাইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার চরণ স্পর্শ করিবে, এই ভয়! কিন্তু পরিশেষে বাৎসল্যের প্রভাবে তাঁহাকে পড়িতেই হইল। "আরবার আসে আই দুইজনে দেখে.. বৎসর পাঁচক শিশু দেখে পরতেকে।" শচীমাতা মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ এই দুইজনের দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিলেন, তাঁহারা দুইজনেই পাঁচ বৎসর বয়সের শিশু, একের বর্ণ কৃষ্ণ, অপরে শুক্লবর্ণ। শ্রীবাসের সহধর্মিণী মালিনী দেবীর প্রতি নিত্যানন্দ প্রভুর মাতৃভাবে বিভাবিত বাৎসল্য-লীলাটি বৃন্দাবনদাসের লেখনীতে বিচিত্রভাবে বিলসিত হইয়াছে। নিত্যানন্দ শ্রীবাসের ঘরে আছেন—"আপনে তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়। পুত্রপ্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়।" নিত্যানন্দের অলৌকিক লীলার এই বিভূতি দেখিয়া মালিনী দেবী স্তুতি করেন। "হাসে নিত্যানন্দ তাঁর শুনিয়া স্তবন, বাল্যভাবে বলে মুই করিব ভোজন।"

নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখিয়া মালিনী দেবীর স্তন হইতে পীযূষধারা ক্ষরিত হয়, বাল্য-ভাবে নিত্যানন্দ প্রভু তাহা পান করেন। 'ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ যে সব মনোভাব, গোপীগণে গোপ্য যে সকল অনুভাব' নিতাইয়ের এমনই লীলা। মাতৃভাবে বিভাবিত এই লীলামাধুর্যের গূঢ় তাৎপর্যটি অবশেষে প্রকট হইয়া পড়িল। শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় নিত্যানন্দ প্রভুর গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। যুগল লীলা-মাধুরী দর্শনে তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—নিত্যানন্দপ্রভু "বালাভাবে দিগম্বর রহে দাণ্ডাইয়া, কাহারে না করে লাজ পরানন্দ পাইয়া।"

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া এখানে জগজ্জননীর মহিমময়ী মূর্তিতে প্রকটিতা। শ্রীমন্মহা-প্রভুর তাঁহারই ভাবে লীলারস বিলাস। শ্রীমৎ বৃন্দাবনদাস এই তত্ত্বটি উদ্ঘাটন করিয়া লিখিয়াছেন, "যখন যেভাবে গৌর সুন্দর বিহরে, তার অনুরূপ রূপ নিত্যানন্দ ধরে।" শ্রীখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্তির বামে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শ্রীমূর্তি বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমৎ নরহরি ঠাকুরের ভ্রাতা রঘুনন্দনের পুত্র ঠাকুর কানাই এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ঠাকুর কানাই শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর একান্ত অনুগত ছিলেন। ছয় গোস্বামীদের মধ্যে কেহ শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল মূর্তি ভজন-সম্বন্ধে উপদেশ করেন নাই। কিন্তু এই ভজন-পদ্ধতি যে তাঁহাদের অনুমোদিত ছিল না, তদ্দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয় না। ঠাকুর কানাই শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীমূর্তি মহাপ্রভুর বামভাগে যখন প্রতিষ্ঠিত করেন, নরহরি ঠাকুর তখন প্রকট ছিলেন; সুতরাং তিনি এই সাধন-পদ্ধতি অনুমোদন করিয়াছিলেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও খেতুড়ীতে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীনিবাস আচার্য এবং ঠাকুর নরোত্তম বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীগণের, বিশেষভাবে শ্রীল জীব, গোপাল ভট্ট ইঁহাদের, সাধন পদ্ধতিতে ব্যতিক্রম করিবেন, ইহা মনে করা যায় না। অথচ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গোস্বামীগণ তাঁহাদের কোনগ্রন্থে দেবী-বিষ্ণুপ্রিয়া-লীলাতত্ত্ব বিবৃত করেন নাই; একমাত্র কবি কর্ণপূর শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ভূশক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গৌর-লীলায় এই দেবীর স্বরূপটি কী? কবিরাজ গোস্বামীর মতে শ্রী, ভূ, লীলা, শক্তি পরব্যোমপতি চতুর্ভুজ—মহৈশ্বর্যময় নারায়ণের চরণসেবা করেন। কিন্তু গৌরলীলা শুদ্ধ মাধুর্যময়। সুতরাং "কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো নশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে", ভূদেবীস্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর তত্ত্বটি মহাভারতোক্ত এই ব্যাসবাক্য হইতেই আস্বাদনের চেষ্টা করিতে হয়। শ্রীমৎ রামানুজের মতানুবর্তী আচার্যগণ অনেকে কৃষি অর্থে জীবকে উদ্ধারের জন্য শ্রীভগবানের স্বাভাবিক আকর্ষণ বা অনুকম্পাই বুঝিয়াছেন। এইরূপে প্রেম-স্বরূপিণী রাধারানীর জীবের প্রতি অনু-গ্রহের সর্বাতিশয়ী প্রকর্ষের বিগ্রহ স্বরূপিণী গৌররঙ্গিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়ার কৃপাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় অবলম্বন করিতেই হয়। জীবের দুঃখে দেবীর বিরহ-বেদনার তাপটি যদি অন্তরে না লাগে তবে প্রেমের ভাব জাগে কি? প্রকৃত প্রস্তাবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার মর্ত্যলীলায় বৈষ্ণব সাধনায় মাতৃ-মাধুর্যের যে বীর্য সঞ্চারিত হয়, বাংলার সমাজ-জীবনে তাহা মানব-প্রেমের নবাভ্যুদয় সূচনা করে।

পরে নিত্যানন্দসঙ্গিনী ঈশ্বরী জাহ্নবা দেবীর লীলায় বাংলার বৈষ্ণব সাধনায় মাতৃ-ভাবের সেই লহরী সম্প্রসারিত হয়। জাহ্নবা মায়ের বাৎসল্যে বান ওঠে। ব্রজ-মণ্ডল এবং গৌড়মণ্ডল প্রেমের সে-বন্যায় পরিপ্লুত হয়। রাধাকুণ্ড, বৃন্দাবনধাম, যাজীগ্রাম, শ্রীখণ্ড, যেখান হইতে ভক্তের আহ্বান আসিয়াছে, জননী জাহ্নবা সেই-খানেই ছুটিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার স্নেহধারায় নির্বিশেষে সকলকে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

অদ্বৈতগৃহিণী শ্রীসীতাঠাকুরানী মাতৃ-মাধুর্যের অবদান বাংলার বৈষ্ণব সাধনাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। সীতাঠাকুরানী গৌরপ্রেম অযাচিতভাবে সর্বত্র বিলাইয়া-ছেন। "বস্তুতত্ত্বে সর্ব অবতারী গৌররায়, যে যৈছে পূজার তারে সেই তৈছে পায়।" ইহাই তাঁহার বাণী। তাঁহার শিষ্যবর্গকে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াসহ গৌর ভগবানকে অর্চনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বস্তুত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে বাংলায় মাতৃভাবের যে উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হইয়া সমাজের সকল স্তর পরিপ্লাবিত করে, ভারতের ইতিহাসে তাহার তুলনা বিরল। শুধু ভারত কেন, সমগ্র জগতের অধ্যাত্ম-আন্দোলনের ইতিহাসে ইহার তুলনা মিলে কিনা সন্দেহ। করুণার এমন খেলাটি শুরু না হইলে সম্ভবত মহাপ্রভুর প্রেমের সাড়াটি আমরা এমন বুক ভরিয়া পাইতাম না; বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই কায়া ধরিতে পারিতেন না। মহাবদান্য মহাপ্রভুর প্রেমলীলার মাধুর্যমূলে মাতৃ-মহিমার এই কারুণ্যরসে আমাদের চিত্ত যদি কিঞ্চিন্মাত্র নিষিক্ত হয় তবেই আমরা ধন্য হইতে পারিব। আমাদের জাতীয় জীবনের বর্তমান গভীর নৈরাশ্যের মূলেও আশার আলো আবার আমাদের দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিবে এবং আমাদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি অভিনব প্রাণধারায় সঞ্জীবিত হইবে।

ইভান সের্গেভিচ তুর্গেনেফ

সৈয়দ মুজ্‌তবা আলী

ত ৩রা সেপ্টেম্বর ইভান তুর্গেনেফের ৭৫তম মৃত্যু বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ-উপলক্ষে বহু দেশ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আপন আপন সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন। কলকাতা বেতার কেন্দ্র পর্যন্ত সেদিন তাঁকে স্মরণ করেছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আজ এ'র, কাল ও'র কত লোকের মৃত্যুবার্ষিকী, জন্মবার্ষিকী নিত্য নিত্য হয়ে যাচ্ছে, সেগুলোর হিসেব রাখতে যাবে কে?

যার যে রকম খুশি, এর বেশী কিছু বলা যায় না।

তাই জানি, আমরা যখন গোরস্তানে যাই, তখন খুঁজি আপন প্রিয় ও পরিচিতজনের কবর। যখন কোনও নূতন লাইব্রেরিতে ঢুকি তখন খুঁজি আপন প্রিয় লেখকের বই। তাই তুর্গেনেফের শতবার্ষিকী না হয়ে ৭৫তম মৃত্যুদিনও আমার ও আমার মত বয়স্কদের মনে দোলা লাগিয়েছে। তরুণরা লাইব্রেরিতে যে-রকম নূতন বইয়ের সন্ধান নেয়, ক্ল্যাসিকস্ পড়ে না, ঠিক তেমনি তারা তুর্গেনেফ কিংবা হাইনের শতাব্দী-প্রয়াণও স্মরণ করে না; তারা স্মরণ করে র‍্যাঁবো কবে হোঁচোছিলেন, ভেরেন কবে কেসেছিলেন।

তা তারা করুক। কিন্তু যখন দেখি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক এবং তথাকথিত শিক্ষিত লোকও সদম্ভে বলে বেড়াচ্ছেন, র‍্যাঁবোর কাছে রবি ঠাকুর শিশু, মাইকেলের অমিত্রাক্ষর উডেন্ (কাষ্ঠরস) এবং সম্পাদক-মণ্ডলীও সেগুলো পরম শ্রদ্ধাভরে ছাপাচ্ছেন তখন এ'রা যে তুর্গেনেফকে স্মরণ করবেন না সে ত জানা কথা। শুধু তাই নয়, এখন আপনার আমার পক্ষে তুর্গেনেফ কিংবা সত্যেন দত্তকে স্মরণ করতে হলে লণ্ডনে রঞ্জিন হওয়ার মত রীতিমত সংকট-সংকুল—রাষ্ট্রভাষায় যাকে বলে 'খতরনাক্'—স্কন্ধোপরি মুণ্ড-শিরের প্রয়োজন!

আমি মুসলমান। আমার শাস্ত্রে আছে বিধর্মীর ভয়ে আল্লা রসুলকে বর্জন করা মহাপাপ। আমার সাহিত্যধর্মে গুরু-মুর্শীদ হয়ে আছেন রবি ঠাকুর, হাইনে, তুর্গেনেফ, মাইকেল। আজ এ'দের অস্বীকার করতে পারব না—র‍্যাঁবো-এলিয়ট সম্প্রদায় যতই শক্তিশালী হন না কেন।

এবং আমার মনের গোপন কোণে একটা অহেতুক ক্ষীণ আশা আছে যে, তুর্গেনেফ-প্রীতিতে আমি একেবারে একা নই। 'বড়ো রাজা প্রতাপ রায়ে'র মত 'বরজলালের' হাত ধরে আমাকে একাকী সভাস্থল ত্যাগ করতে হবে না। প্রতাপ রায়ের সমকালীন শ্রোতা সে-সভাতে আর কেউ ছিল না। আমার কিন্তু এখনও অনেক মুরুব্বী আছেন। তাঁরা তুর্গেনেফ সম্বন্ধে আমার চেয়ে ঢের ঢের ভাল লিখতে পারেন, কিন্তু লেখেন না, কারণ তাঁরা জানেন, পাগলা গারদে সুস্থ লোকের লক্ষণ দেখানো পাগলামি, ভেক যেখানে রব

তুর্গেনেফ

ছেড়েছে সেখানে কোকিলের পক্ষে মৌনই শ্রেয়—'ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিল জলদাগমে।'

তুর্গেনেফের মন্দ ভাগ্য সম্বন্ধে তিনি নিজেই সচেতন ছিলেন। তিনি থাকতেন বিদেশে—জার্মানি এবং ফ্রান্সে—এবং সেখানে বসে বসেই তিনি জানতে পেতেন কী ভাবে ক্রমে ক্রমে তিনি দস্তেফ্‌স্কি, তলস্তয় এমন কি কবি নেক্রাসফেরও বিরাগভাজন হয়েছেন। 'বিরাগভাজন' বললে বোধ করি কমই বলা হল। তুর্গেনেফ শেষের দিকে রীতিমত এ'দের বিদ্বেষভাজন হয়েছিলেন।

বিদ্বেষ আসে হিংসা থেকে। এ'দের সবাই বড় লেখক। জীবিতাবস্থায়ই এ'রা দেশে প্রচুরতম সম্মান পেয়েছিলেন। তবে দূর-দেশবাসী প্রবাসী নিরীহ ('নিরীহ' কেন সে কথা পরে হবে) তুর্গেনেফ তাঁদের ক্রোধের কারণ হয়েছিলেন কেন?

এ-তত্ত্বটি বুঝতে পারলেই জানা যাবে লেখক হিসাবে তুর্গেনেফের অপ্রতিদ্বন্দ্ব মাহাত্ম্য কোন্‌খানে?

দস্তেফ্‌স্কি ও তলস্তয় জানতেন সৃষ্টি-ক্ষেত্রে এ'দের আপন মাহাত্ম্য কোন্‌খানে। দস্তেফ্‌স্কি তাঁর প্রতি চরিত্রের গভীর তম অন্তঃস্থলে পৌঁছে গিয়ে তার সুখ দুঃখ, তার দুর্বলতা মহত্ত্ব, তার প্রচেষ্টা এবং ভাগ্যে দ্বন্দ্ব, সমাজ-প্রবাহের খরস্রোতের বিরুদ্ধে তার উজান চলার আপ্রাণ প্রয়াস কিংবা সে-স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে ভেসে যেতে যেতে তাকে প্রাণ ভরে অভিসম্পাত—এসব-কিছু লোহার কলম দিয়ে পাথরের উপর খোদাই করতে পারেন ভাস্করের মত দৃঢ়পেশী সবল হস্তে। প্রত্যেকটি চরিত্র তাঁর হাতে যেন দৈত্যের হাতে প্রজাপতি। চোখে একসুরে, বুকে অসীম করুণা। তাঁর লেখা পড়ে মনে হয় একটা বিরাট এঞ্জিন আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। খেলার এঞ্জিন যত তেজেই এগিয়ে আসুক না কেন, জানি, ভাল করেই জানি সামান্য কড়ে আঙুলটি তার সামনে ধরলেই সে থেমে যাবে, কিন্তু দস্তেফ্‌স্কির এঞ্জিন পিঁপড়ের গতিতে এলেও তার সামনে যে পড়বে তার আর উদ্ধার নেই। অরসিকতম পাঠকেরও সাধ্য নেই, তাঁর বর্ণনা পড়ে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তা না শুনে না বুঝে থাকতে পারে। কিংবা বলব, কুমির যে-রকম ছাগলের বাচ্চার ঠ্যাং কামড়ে ধরে ডুব দেয় নদীতে, দস্তেফ্‌স্কি সে-রকম পাঠককে নিয়ে ডুব দেন মানব-চরিত্রের অতল সায়রে। এবং আশ্চর্য, সেখানে মণি-মুক্তার সঙ্গে সঙ্গে যে ক্লেদ-পঙ্ক দেখি তার প্রতিও ত ঘৃণা হয় না। মাতাল বাপের উচ্ছৃঙ্খলতায় সরলা কুমারী রাস্তার বেশ্যা হয়ে বাপকে মতলামোর পয়সা জোগাচ্ছে—কই, লোকটাকে ত খুন করতে ইচ্ছে করে না। তার অসহায় অবস্থা দেখে শুধু ভগবানকে শোধাতে ইচ্ছে করে, 'একে বিবেকহীন পাষণ্ডরূপে জন্ম দিলে না কেন? এরও তা হলে কোন দুঃখ থাকত না, আমরাও অকরুণ হৃদয়ে তাকে খুন করতে পারতুম। কিন্তু এ সব বোঝে, এ ত সব-কিছু জানে। তবে এই ঝঞ্ঝা-ঝড়ের ঘূর্ণিবায়ুর মাঝখানে মানুষকে তুমি প্রজাপতির মত সৃষ্টি করলে কেন?' কিংবা হয়ত অতখানি চিন্তা করার শক্তিই পাঠকের থাকে না। মোহামান হয়ে যায় পাঠক সেই বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার সামনে—সমস্তজীবন বয়ে বেড়ায় তার অনপসরণীয় স্মৃতি।

তলস্তয়ের রঙ্গমঞ্চ ভুবন-জোড়া বিরাট।

পাত্রপাত্রীদের নাম ভুলে যাই, কিন্তু তারা ভুলিনে। তারা রঙ্গমঞ্চে নাচছে যে আপন কোণে আপন আপন মণ্ডলী নিয়ে। প্রত্যেকের আপন নৃত্য সামঞ্জস্য রেখেছে তার মণ্ডলীর সঙ্গে, মণ্ডলী সামঞ্জস্য রেখেছে আর আর মণ্ডলীর সঙ্গে কখনও বা দুই কিংবা তিনটি মণ্ডলী একে অন্যকে ভেদ করে মিশে এক হয়ে গিয়ে আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে—আর সব কটি মণ্ডলীর এ-কোণে ও-কোণে যে-কটি ছন্নছাড়া আপন মনে নাচছে তাদেরও সঙ্গে নিয়ে গড়ে তুলেছে সেই বিরাট ভুবন। বাস্তব জীবনেও আমরা এ-রকম ভুবনের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাইনে। তলস্তয় কতখানি পেয়েছিলেন কে জানে কিন্তু তাতে কিই বা যায় আসে। তাঁর কল্পনার ভুবন আমাদের বাস্তব ভুবনের চেয়ে ঢের ঢের বেশী প্রত্যক্ষ, অঙ্গে অঙ্গে প্রাণবন্ত।

তলস্তয় কখনও কবিতা রচনা করেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি কবি। তাঁর জাদুমন্ত্রী দণ্ড দিয়ে তিনি যে-রকম আমাদের কল্পনার অতীত বস্তু সৃষ্টি করতে পারেন ঠিক তেমনি আমাদের নিত্যকার চেনা বস্তু—যে বস্তু বহুদর্শনের ফলে তার বৈশিষ্ট্য তার নবীনতা হারিয়ে ফেলেছে—তিনি সামনে তুলে ধরেন সেই চেনা রূপেই, অথচ মনে হয়, 'কী আশ্চর্য, একে এত দিন ধরে লক্ষ্য করিনি কেন?' এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও জেনে যাই যে, একে আর কখনও ভুলব না। তাই তাঁর পাত্রপাত্রী দেশে কালে সীমাবদ্ধ নয়। দস্তেয়েফস্কির চাষা বৎভাস ভদ্‌কা না পেলেও সে রুশ চাষা; তলস্তয়ের চাষা অন্তহীন স্তেপের উপর দিয়ে ভেঙে চলেছে বরফের পাথার, সরাইয়ে ঢুকে সে তার চামড়ার ছেঁড়া ওভারকোট স্টোভের পাশে শুকোতে দেয়, আইকনের সামনে বিড় বিড় করে সে মন্ত্র পড়ে ডান হাতের তিন আঙুলে ডাইনে থেকে বাঁয়ে ক্রস্ করে, কিন্তু বার বার ভুলে যাই সে বাঙালী চাষা নয়। অবাক হয়ে ভাবি, বসিরুদ্দি, পাঁচু মোড়ল, নিজ্‌জান নভ্‌গরদের দিকে চলেছে কেন?

মহাভারতের পরেই ওয়ার অ্যাণ্ড পীস্!

তুর্গেনেফ দস্তেয়েফস্কির মত প্রত্যেক চরিত্রের গোপনতম অন্ধকারে বিদ্যুল্লেখা দিয়ে আলোকিত করতে চান না। তার কারণ বোধহয় তুর্গেনেফ নখ-শির, আপাদমস্তক ভদ্রলোক। কোন ভদ্রলোক পরিচিত অপরিচিত কারও গোপন চিঠি পড়ে না—হাতে পড়লেও, কারও হাতে ধরা পড়ার ভয় না থাকলেও। ঠিক তেমনি তার চরিত্রের গোপন দুর্বলতা তার অজানাতে সে জানতে চায় না, প্রকাশ করতে তার মাথা কাটা যায়—সে ত বেনের কাজ, গোয়েন্দার ব্যবসা। ভদ্র তুর্গেনেফ তাঁর নায়কনায়িকার দিকে তাকান শিশুর মত সরল চোখে তারা কথাবার্তায়, আচারব্যবহারে যতখানি আত্ম-বিকাশ করে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট, তাঁর পক্ষে সেই যথেষ্ট। শার্লক হোম্‌সের মত আতশ কাচ দিয়ে তিনি তার জুতোর দাগ পরীক্ষা করেন না, পোয়ারোর মত তাকে ক্রস-এগজামিনেশনের ঠেলায় কোণ-ঠাসা করে অট্টহাস্য করে ওঠেন না, 'ধরেছি, ধরেছি, তোর গোপন কথা কতক্ষণ লুকিয়ে রাখবি, বল্!'

অথচ শিশুর কাছে কেউ কোন জিনিস গোপন রাখে না। কবি মাত্রেই শিশু। তার চোখে ছানি পড়েনি। প্রতিমুহূর্তে সে এই

মপাসাঁ

প্রাচীন ভুবনকে দেখে নবীন রূপে।

রুশদেশে পুশকিনের পর যদি কোন কবি জন্মে থাকেন, তবে তিনি তুর্গেনেফ। তলস্তয় কবি সৃষ্টিকর্তা হিসেবে, আবিষ্কর্তারূপে, আর তুর্গেনেফ কবি অন্য অর্থে। পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কুৎসিত কিংবা যার দিকে কারও দৃষ্টি যায় না এসব-কিছু তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিত্ব দিয়ে। তিনি অন্য কবির মত অবাস্তবকে বাস্তব করেন না, বাস্তবকে অবাস্তব করেন না। বাস্তব অবাস্তব দুইই তাঁর কবি-মনের স্পর্শ পেয়ে আপন আপন সীমা ছাড়িয়ে তৃতীয় সত্তায় পরিণত হয়। ঘৃত-প্রদীপ শুষ্ক কাষ্ঠ দুইই তাঁর কবিত্ব-শিখার পরশে আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে। কিংবা বলব, শীতের শিশির যেমন তার শুভ্র পেলব আস্তরণ দিয়ে মধুর করে দেয় সদ্য-ফোটা ফুলকে, শুকনো পাতার অঙ্গ থেকে ঘুচিয়ে দেয় তার সর্ব কর্কশতা। ওপারের ঝাউবন, এপারের কাশ, ঘাস, সর্বোচ্চ শাল বকায়ন থেকে আরম্ভ করে রাস্তার পাশের নয়ানজুলি—সবাই যেন সূক্ষ্ম মসলিনের অবগুণ্ঠন পরে সৌন্দর্যের গণতন্ত্রে কৌলীন্য পেয়ে গিয়েছে।

এই কবিত্বপ্রতিভাকেই হিংসা করতেন দস্তেয়েফস্কি, তলস্তয়, নেক্রাসফ ত্রিমূর্তি। নেক্রাসফ্ স্বয়ং কবি কিন্তু তিনি জানতেন যে-জিনিসের পরশ পেয়ে শুকনো গদ্য গান হয়ে নেচে ওঠে সেইটির পূর্ণ অধিকার আছে একমাত্র তুর্গেনেফের। আঙ্গিকের উপর এ-রকম অখণ্ড অধিকার ত্রিমূর্তির কারও ছিল না। তাঁদের কোন বিশেষ রচনা হয়ত তুর্গেনেফের রচনা অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের কিন্তু তুর্গেনেফ তাঁদের শ্রেষ্ঠতম রচনাকে তাঁর আঙ্গিকের স্পর্শ দিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রচনা করে দিতে পারতেন। দস্তেয়েফস্কি তলস্তয় যেন লিখেছেন কবিতা। তুর্গেনেফ যে-কোন মুহূর্তে তার যে-কোন একটিকে সুর লাগিয়ে গানের রূপ দিয়ে দিতে পারতেন। আর তুর্গেনেফের প্রত্যেকটি রচনা যেন গান, তার গায়ে আর হাত দেবার উপায় নেই—তা সে গানের মূল্য কবিতার চেয়ে কম হক আর বেশীই হক।

সে-যুগে ভাষা, ছন্দের রাজা ছিলেন ফ্রান্সের ঔপন্যাসিক ফ্লবের। তাঁর শিষ্য এবং মানসপুত্র মপাসাঁ তখনও গুরুর মজলিসে আতরদান, গোলাপ-পাশ এগিয়ে দেন। তুর্গেনেফ ফ্লবেরের বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু। ফ্লবেরকে চিঠি লেখার সময় মপাসাঁ লেখেন 'গুরুদেব', তুর্গেনেফকে লেখার সময় লেখেন, 'গুরু এবং সখা'। ফ্লবেরের আকস্মিক মৃত্যুতে মপাসাঁ যখন শোকে অভিভূত হয়ে অন্ধের মত এদিক ওদিক হাতড়াচ্ছেন তখন তুর্গেনেফ শেষবারের মত দেশের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়েছেন রুশে। মপাসাঁ তাঁকে চিঠি লিখে খুঁজেছেন সান্ত্বনা। লিখছেন, 'জীবনের সব কটি আনন্দের দিনও ত আমার এই দুঃখের দিনটার ক্ষতিপূরণ করতে পারছে না।'

তার তিন বছর পর গত হলেন তুর্গেনেফ।

এবারেও হয়ত তিনি কোন সাহিত্যিক বন্ধুকে চিঠি লিখে সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন। তখনকার দিনের ফ্রান্সের সব বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গেই তুর্গেনেফ, ফ্লবের মপাসাঁর বন্ধুত্ব ছিল। ভিক্তর হু(য়ু)গো, এদমোঁ দ গঁকুর, এমিল জোলা, আলফঁস দদে এঁদের কাউকে হয়ত তিনি লিখেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয়, ফ্লবের গত হলে শোক নিবেদন করা যায় তুর্গেনেফকে, কিন্তু তুর্গেনেফ গত হলে লেখা যায় আর কাকে? বঙ্কিমের মৃত্যু-সংবাদ রবীন্দ্রনাথকে জানিয়ে

হয়ত সান্ত্বনার বাণী চাওয়া যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গত হলে বাঙালী জানাবে কাকে?

মপাসাঁ এর অনেক আগেই ফ্রান্সের বিখ্যাত পত্রিকায় তুর্গেনেফ সম্বন্ধে প্রশস্তি লিখেছিলেন। এবারে তিনি যেটি লিখলেন, সেটি বড়ই করুণ। মপাসাঁর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাবলীতে এ-দুটি থাকার কথা কিন্তু আজ যখন মপাসাঁকেই লোকে স্বীকার করতে চায় না—যদি বা করে তাও তার তথাকথিত অশ্লীল গল্পের জন্য—তখন তাঁর প্রবন্ধ পড়তে যাবে কে? তবু বলি আনাতোল ফ্রাঁসের রম্যরচনাকে যদি সত্য ও সুন্দরের অভূতপূর্ব অনির্বচনীয় সঙ্গম বলে ধরা হয়, তবে সে-দুটির উৎস খুঁজতে হবে মপাসাঁর রচনায়। তাঁর ছোটগল্পের সর্বত্র পরিচিত শৈলীতেই সেগুলো লেখা। ছোট ছোট শব্দ, ছোট ছোট বাক্য আর তার মাঝে মাঝে অকস্মাৎ দীর্ঘায়তন দীর্ঘকলেবর উদ্দাম উত্তাল শৈলধারার মত দ্রুতগামী বাক্যবিন্যাস। মন্দাক্রান্তার পাঁচটা হ্রস্বের পর দুটো দীর্ঘ এলে যে-রসের সৃষ্টি হয়।

এর অনুবাদ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। সারাংশ নিবেদন করি।

"রুশ দেশের মহান ঔপন্যাসিক ইভান তুর্গেনেফ ফ্রান্সকে আপন দেশরূপে বরণ করেছিলেন। এক মাস অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করার পর তিনি গত হয়েছেন।

"এ-যুগের অত্যাশ্চর্য লেখকদের তিনি অন্যতম। সঙ্গে সঙ্গে সাধু, সৎ, অকপট ও বন্ধুবৎসল সমাজের তিনি ছিলেন সর্বাগ্রণী। এ রকম লোকের দেখা মেলে না।

"তাঁর বিনয় ছিল আত্মাবমাননার কাছাকাছি: কাগজে তাঁর সম্বন্ধে কেউ কিছু লিখলে তিনি তা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। একাধিকবার তাঁর সম্বন্ধে উচ্চ প্রশস্তি সংবলিত রচনা তাঁকে যেন মর্মাহত করেছে; কারণ তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে রাজী হতেন না যে, শুধু সাহিত্য ভিন্ন অন্য কোন বিষয় নিয়ে রচনা লেখা হক। সাহিত্য কিংবা কলা-সমালোচনাকে পর্যন্ত তিনি প্রগল্‌ভ বাক্যবিন্যাস বলে মনে করতেন। একবার কোন এক সাহিত্য-সমালোচক তাঁর একখানা বই সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাতে তিনি রীতিমত আহত হয়েছিলেন। তাঁর সে বেদনা-বোধে ছিল লেখকের ব্রীড়া—শুধু বিনয় তার কাছে নতমস্তক হয়।

"আজ গত হয়েছেন এই মহান পুরুষ; তাঁর সম্বন্ধে সামান্য কিছু নিবেদন করি।

"প্রথমবার তাঁকে দেখি গুস্তাফ ফ্লবেরের পার্টিতে।

"দরজা খুলতে ঘরে ঢুকলেন দৈত্য বিশেষ। রুপালী মাথা—রূপকথায় যাকে বলে রজতশির। লম্বা-লম্বা সাদা চুল, রুপালী চোখের পলক আর বিরাট সাদা দাড়ি—সত্যই যেন খাঁটি রুপোর অতি মিহিন তার দিয়ে তৈরী। ঝকঝক্ চক্‌চক্ করছে, প্রতিটি রশ্মিকণা যেন তার উপর থেকে ঠিকরে পড়ছে। আর সেই ধবলিমার মাঝখানে শান্ত সুন্দর মুখচ্ছবি। নাকচোখ যেন একটু বড্ড বেশী ধারালো। সত্যই যেন বরুণদেবের শির—চতুর্দিকে ধবল জলের ঢেউ তুলেছেন—কিংবা আরও ভাল হয়, যদি বলি, অনন্তদেব, বিশ্বপিতার মুখচ্ছবি।

"অতি দীর্ঘ দেহ—বিরাট, কিন্তু দেহে মেদচিহ্ন নেই। আর সেই বিশালবপু, অতিকায় পুরুষটির চলাফেরা, নড়াচড়া একেবারে শিশুটির মত—বড় ভীরু ভীরু ভাব। অতি মিষ্ট মৃদু কণ্ঠে কথা বলেন, কেমন যেন মনে হয়, পুরু জিভ শব্দের ভার যেন সইতে পারছে না। কখনও কখনও কথা বলতে বলতে একটু আটকে যান যেন, ঠিক মনের মত কথাটি ফরাসীতে কী হবে সেটা খোঁজেন আর প্রতিবারেই চমৎকার ঠিক শব্দটি খুঁজে পান। এই সামান্য থমকে যাওয়াটা তাঁর বচনভঙ্গীতে লাবণ্য এনে দিত।

"গল্প বলতে পারতেন অতুলনীয় মধুর ভঙ্গীতে। সামান্যতম ঘটনাকে তিনি সেই ভঙ্গীর পরশ লাগিয়ে রসের স্তরে তুলে নিতে পারতেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভার মূল্য আমরা ভাল করেই জানতুম কিন্তু আসলে তিনি সর্বজনপ্রিয় ছিলেন অন্য কারণে। তাঁর চরিত্রের শিশুর মত সরলতা ছিল সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য; এক দিক দিয়ে এই প্রতিভাবান উপন্যাসিক পৃথিবী পরিক্রমা করেছেন, তাঁর যুগের তাবৎ গুণী-জ্ঞানীকে তিনি চিনতেন, মানুষের পক্ষে যা পড়া সম্ভব তার সব কিছুই তাঁর পড়া ছিল, ইয়োরোপের সব ভাষা আপন মাতৃভাষার মত বলতে পারতেন অথচ অন্য দিক দিয়ে তাঁর আর পাঁচজন বন্ধুবান্ধবের কাছে যা কিছু অতিশয় সামান্য সাধারণ তারই সামনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে মানতেন, ভাবতেন, এটা হল কী ক

"সাহিত্য বিচারের সময় তিনি ও পাঁচজনের মত সব-কিছু বিশেষ ভিতর আবদ্ধ হয়ে বিশেষ দৃষ্টিবিন্দু দেখতেন না। পৃথিবীর তাবৎ সাহি খুব ভাল করে পড়া ছিল বলে সবস সমন্বয় করে তারই বিরাট পটভূমিতে পৃথিবীর এক প্রান্তে প্রকাশিত একখ তুলনা করতেন অন্য প্রান্তে প্রকাশি ভাষায় লিখিত আরেকখানা বইয়ের তাই তাঁর সমালোচনা আমাদের কা বিশেষ মূল্য পেত।

"তাঁর বয়স হয়েছিল, তাঁর স জীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল অথচ : সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ছিল আধু এবং সর্বাপেক্ষা প্রগতশীল। প্লটের আর থিয়েটারী কৌশলে ভর্তি উ তিনি দু চোখে দেখতে পারতেন না, বলতেন, 'জীবন' কিছু না, শুধুমাত্র হবে উপন্যাসের উপাদান—তাতে প্লটের কৌশল থাকবে না, থাকবে না অ অসম্ভব কীর্তিকাহিনী।

"তাঁর মতে উপন্যাস আর্টের সর্বা রূপ। গোড়ার দিকে রূপকথার ছল তাতে ব্যবহার করা হত এবং উপ এখনও তার থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পা নানা রকম রোমান্টিক আর আকাশ-ক কল্পনা উপন্যাসকে এত দিন ধ করেছে। এখন আস্তে আস্তে মানুষের বোধ শুদ্ধ হতে চলেছে। এখন সস্তা ছলাকলা বর্জন করে উপন্যাসকে হবে সরল, তাকে জীবনের আর্ট রূপে ধরতে হবে যাতে করে একদিন সে জী ইতিহাস রূপে গণ্য হতে পারে।

"আজ তাঁর প্রতিভাপ্রসূত কাব্যস বিশ্লেষণ করা যাবে না—যদিও জানি সৃষ্টি রুশ সাহিত্যের সর্বোচ্চ সৃষ্টির পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। তাঁর প্রিয়তম মহাকবি পুশকিন, লেরমন্তফ ঔপন্যাসিক গগলের সৃষ্টির পাশাপা তাঁর রচনার স্থান। রুশদেশ যাঁদের চিরকৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখবে তাঁদেরই একজন। ইনি রুশকে দিয়ে চিরঞ্জীব সম্পদ, অমূল্য নিধি। ইনি দিয়ে এমনই সম্পূর্ণ আর্ট, এমন সব সৃষ্টি বিস্মরণ অসম্ভব; তিনি দিয়েছেন এক গৌরব যে-গৌরবের মূল্য নি অসম্ভব, যার আয়ু অন্তহীন এবং দেশের অন্য সর্বগৌরব সে অনায়াসে অ ক্রম করে যায়। এঁর মত লোকই দে জন্য এমন কিছু করে যান যার কাছে প্রি বিসমার্ক তুচ্ছ; পৃথিবীর সর্বভূমির মহাজনের কাছে এঁরা নমস্য হন।"

কবিতা

ঘুম-পাহাড় জুড়ন-দ্বীপ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কোথায় যাবে? ঘুম-পাহাড়?
জুড়ন-দ্বীপ?
তুহিন শিখর তুষার-কণা মেখে ঘুমায়!
ভাবছ, আছে নীল সাগরের নন্দিনী
ঢেউগুলি যার সামনে ফণা
আপনি নামায়!

ঘুম-পাহাড়ে একটি চুড়ো খুঁজতে চাও
মেঘেরা যার দেখায় না মুখ
ঢেকে-ই রয়!
স্মৃতির যত কালিমা সব মুছিয়ে দিয়ে
কুয়াশা নয়,
শুভ্র বুঝি বাতাস-ই বয়!

ঘুম-পাহাড়ে কী পেতে চাও,
বিস্মরণ?
পৌঁছবে না, ভাবছ ধুলো-ধোঁয়ার লেশ!
শুধু নিথর নীলের ধ্যানে নিমগ্ন
দুলবে দুটি মুগ্ধ আঁখি
নির্নিমেষ!

কিংবা বুঝি চূর্ণ সোনা
বালির গায়
এলিয়ে হৃদয় ঢেউএর ধ্বনি শুনতে চাও?
—সাগর-পাখি যেমন ডানা ছড়িয়ে ভাসে,
ফেনার ছিটের সঙ্গে মেলায়
শুনাতাও!

কোথায় পাবে? ঘুম-পাহাড়!
জুড়ন-দ্বীপ!
ক্লান্ত মনে মরীচিকার কারসাজি!
সে-ই তালি দেয় ছেঁড়া কাঁথার কল্পনায়
কাঁথার মায়া ছাড়তে যেজন
নয় রাজী!

আছে-ই তবু আছে কোথাও ঘুম-পাহাড়।
জুড়ন-দ্বীপও নয়ক অলীক স্বপ্নসার।
এই শহরের রাস্তা সারাও,
বাড়াও ত।
পায়ে পায়েই জুড়ন-দ্বীপ আর ঘুম-পাহাড়।

তোমার আমার

জীবনানন্দ দাশ

তোমার আমার ভালবাসার এই
পথ ছাড়া পথ নেই
জেনে নদীর জলে চেয়ে দেখি
কালো নদীর রঙ মিশেছে এসে।

এই দু' রঙই ভাল
সাদা পাখির কালো,
কালের পাখি সাথী
উড়ছে দেশে দেশে।

তোমার আমার ভালবাসা—তা কি
একটি পাখি—একটি সাদা পাখি;
সময় কি তার পথ দেখিয়ে দিয়ে
সঙ্গে চলে ভেসে।

সাদা পাখিই কালো পাখি কি-না
চিনি না আমি চিনি না চিনি না;
কালো সাদার ধাঁধার ব্যথা সব
ফুরিয়ে গেছে তোমায় ভালবেসে।

সহযোগী

বিষ্ণু দে

তুমি আর আমি সহযোগী এই কথাটা শহরে রটে।
তুমি রূপকার রূপসী, তোমাতে প্রাণ পায় সুন্দর;
আমিও রূপের কারিগর, আঁকি দেয়ালে কাপড়ে পটে,
তোমাতে আমাতে মান চায় সুন্দর।

তোমার তারিফে হাতে পাই গতি কাজ শেষ হয় দ্রুত,
তোমাকে দেখতে খুশি লাগে বেশ নিছক দেখার খুশি।
রূপসী গায়ের হাওয়ায় আমার মন চলে সম্ভৃত।
তোমার শতেক ভক্তজনকে কোন মুখে আমি দুষি!

অভিযোগ শুধু তোমারই জন্যে, আজন্ম পেলে মালা,
তোমার মায়ের রূপের সঙ্গে দৈর্ঘ্য দিয়েছে পিতা;
শিশুর মাধুরী আদর পেয়েছে, সহজে ফুটেছে বালা;
তাই অভিযোগ, আজও হতে চাও পথে ঘাটে ঈপ্সিতা!

তুমি আমি নাকি সহযোগী বলো, তোমার রূপের বৈভব
অপাত্রে কেন বিলাও হাজারে হাজারে?
দেখ দিকি সহকর্মিণী, আমি রূপশিল্পীর গৌরব
কখনও কি বই চৌরঙ্গির বাজারে?

ফিরে ফিরে ডাক

মণীশ ঘটক

সদর রাস্তা এ'দো গলিঘ'ুজি হাফ্ শহর ও বস্তি,
পেরিয়ে ত এলে, পে'াছেও গেলে। না না, তাতে আর দোষ কী!
মওকা পেলেই দাঁও মেরে দেবে, তালিম পোক্ত বেশ যে,
বাঁচবার যে সে ঠিক বে'চে যাবে, মরবার যারা টে'সবে।

সিধে রাস্তার রাহী যারা ছিল তারা কি এখনো ধ'ুকছে?
কাঠ-ঠোকরার মত বে-ফয়দা লোহা-গাছে ঠোঁট ঠুকছে?
বিজলীর তারে বসে জোড়া ঘুঘু বিষণ্ণ সুরে কাঁদছে?
ঝাঁ করে ঝাঁপিয়ে খুনখারাবির মতলব বাজ ফাঁদছে?

দুনিয়ার হাল এখনো বেচাল হয়নি বলেই ভাবনা,
পে'াছে যাওয়াই পেয়ে যাওয়া নয়, বাকী থাকবেই পাওনা।
পে'াছে ত গেলে। কী পেলে কী পেলে—মন লাগাবেই তাগাদা,
ফাঁকা মুঠো এ'টে ঘামলে কী হবে, পাওয়ার এলেমই আলাদা।
ফিরে ফিরে ডাক দেবেই আবার বাঁকাচোরা গলি, বস্তি,
না পাওয়া পাওয়ার নাগাল না পেলে, ভাবছ কি পাবে স্বস্তি?

সারাদিন ধরে হাপর ফুঁসেছে

অরুণ মিত্র

সারাদিন ধরে হাপর ফ'ুসেছে। এইবার শান্ত হল। আমি ঠায় সামনে বসে এই সময়টার দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। অনেকেই আমার কাছে এসেছে এবং অবাক হয়ে আমাকে দেখেছে। তারা মনে করেছে আমি আগুনে ঝাঁপ দেবার এক পতঙ্গ, জ্বলে যাওয়ার আহ্লাদে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছি। আমার শরীরে মেঘের নেশা তারা টের পায়নি। সুতরাং বিশ্বাস করতে পারেনি এই সময়টা পর্যন্ত আমি টি'কে থাকব।

তাপ ছে'কে ছে'কে আলোর ছোপ আমি আপাদমস্তক মেখেছি। তোমার অন্ধকার লেগে তা ঝঙ্কৃত হবে বলে। আমার চামড়ার নীচে যে মৃত্যু থমকে রয়েছে তার পটভূমিতে এই আলো তোমার সামনে ধরব বলে।

আমার আলস্য নিয়ে মেঘের খেলা একদা আমি দেখেছিলাম। প্রসন্ন মাটি দেখেছিলাম। তারপর আর তাদের সন্ধান নেই। কিন্তু বসে বসে আমি ভেবেছি সমুদ্র ত আমার চেনা, তার বাষ্পের হাওয়ায় আমি ছড়িয়ে গিয়েছি। ভেবেছি ঘুমন্ত সব বীজ আমি ছ'ুয়ে আছি। তাই অপেক্ষা করে থাকা গেল।

ধুলোর ফুলকিগুলো এখন নরম হবে, তোমার মন্তরের জন্যে স্থির হয়ে শোবে। ভোজবাজি কখন শুরু হবে সেই আগ্রহে আমি কতবার যে তাদের মুঠোয় ধরেছি আর ফেলে দিয়েছি তার ঠিক নেই।

এবার এস। তোমার চুলের রাতে ঝরোঝরো বৃষ্টি নিয়ে তুমি এস।

উদয়ন-নাট্য

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

(বাসবদত্তাকে)

তোমার দৃষ্টিই গেছে বৃষ্টি হয়ে সমস্ত শরীরে
আমি মেঘ-ধূসরে তাকাই;
তারপর কিছু নেই; থাকে দূর পাহাড়ে রাখা-ই
বিষণ্ণ বর্ষার এক স্মৃতি।

সে-পাহাড়ে যাইনি যে ফিরে
শরতে না, বসন্তে না, থাকবে কি মনে,
নির্জন অতিথি
যদি থাকে মন কারো নিদ্রার গোপনে?

স্বপ্নেও তোমাকে পেলে হত!
দেখতাম সেই চোখ যা দেখে কেটেছে দিনগুলো!
আসত হয়ত কানে——চোখ মুছে বলা ঃ
"কই কাঁদিনি ত আমি—" আবার মধুর ধরা-গলা

তোমার ব্যথার মুখ খুলে গিয়ে আমায় সতত
অপরাধে করছে যে ক্ষত
ভোলাতে তা ভোলো
শূন্য ঘরে জ্বলা॥

পাতা আর ফুল

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

যে পাকা পাতাটি খসল হলুদ, বুকের
তলায় এখনও শ্বেতাভ শ্যাম কোমল।
জলের গোপনে যে গভীর টান, সুখের
শিহর ঃ শরতে মধুমাস মায়াফল।

গর্ভের যত ফুল চুনী আর পান্না
রক্ত,
কোন্ অতীতের শিল্পের সেই কর্ম!
রক্ত ক্ষরার সুখ দুঃখের কান্না
গাঢ় রূপ নিটোলের নিখ'ুত কি মর্ম-
যন্ত্র!
পাতা আর ফুল——
মর্ত্যের ও সত্যের যুগল কুমার।
সৃষ্টির মূলে না কি চোখেরই এ ভুল
প্রৌঢ়ার বুকে দাগ পাপড়ি চুমার!

ঘর থেকে পথে

হরপ্রসাদ মিত্র

সব স্পর্শাতুর ক্ষণ রেখে যাবে
যেমন জোয়ারে—
কূলের কাহিনী যায় জলের বুকেতে,
ফুল, ঘাস, আবর্জনা, পদচিহ্ন বনভোজনের।
প্রত্যাশা মিলিয়ে যায়
যেমন শূন্যেতে।

তবু যা বলছ, বলো।
বলো, সূর্য অনির্বাণ; প্রেম
অশেষ অমৃতবিন্দু।
বলো, রাত্রি জন্মের প্রহর।
মানুষ দুর্বার, আত্মা সুদুর্গম,
জীবন অক্ষয়।

অন্ধকারে তৃষ্ণা, তিক্ত, কটু, বনা শ্রান্তির ওপরে
চকমকি ঠুকে ঠুকে আশা জেবলে
চলো ছাদে যাই—
সিঁড়িতে মাংসের পাঁক,
দেয়ালেতে হাড়ের জড়তা,
আকাশে আবদ্ধ মেঘ,
মনে সেই সুন্দর মায়াবী
ইন্দুমতী চলে গেছে; রাত্রে পথে—
যেমন পথিক
আলোটা সরিয়ে নিলে
বাড়িটাতে বাড়ে অন্ধকার,
তেমনি একলা রাস্তা।।

রাস্তা, তুমি কেঁদনাক আর—
ফুল, ঘাস, আবর্জনা—
সৃষ্টি আর সৃষ্টির সংহার
সমস্ত মিলিয়ে দেখো।
চলো, পথে যাই।

সেদিন

জগন্নাথ চক্রবর্তী

সেদিন বসন্ত-মাস, ফুলের আদরে বন ঢাকা;
সেদিন, প্রথম সেই দিন
নাম ধরে ডাকা।

উঠেছিল রাতে কত তারা, মনে নাই—রাখি নাই মনে
শুধু জানি অসংখ্য গোলাপ
ফুটেছিল বনে।

অন্ধকারে কহিলাম 'যাই'—হাতে শুধু রেখে গেলে হাত
সেদিন বসন্ত-মাসে ফুল
ফুটেছিল সারা দিন রাত।

ইনফ্লুয়েঞ্জা

দিনেশ দাস
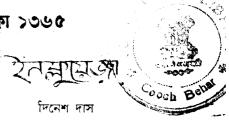
একটি ভাল্লুক শুধু উদ্যত নখরে
চুপ করে
দিনরাত বসে থাকে
আমার ঘরের চৌকাঠে।

কখনো সে বাড়িয়ে লোমশ হাত
একমুঠো চুল ধরে টান দেয়। কখনো হঠাৎ
আমার মুখের পরে ঝুঁকে পড়ে, কেন জানিনি তো
হয়ত দেখে কি আমি জীবিত কি মৃত?
তার তপ্ত নিঃশ্বাসের তোড়ে
আমার রক্তের স্রোত ধোঁয়া হয়ে ওড়ে:
তারপরে মৃত ভেবে ছেড়ে দেয় কখন আমাকে,
তবুও মাথার কাছে দরজার ফাঁকে
ওত পেতে বসে থাকে
লোলুপ
শরীর নিয়ে বড় এক বাদামী ভাল্লুক।

দিনের একটি চোখ—তাও বন্ধ হয়,
রাতের বাঁকানো চোখ কানা,
ফুটন্ত রক্তের ঢেউ ভেঙে পড়ে শিরায় শিরায়,
রাত্রি ভেঙে হয় সাতখানা।
নক্ষত্রের কাতর চিৎকার:
ছাদ চৌচির হয়—কড়ি যায় খুলে,
দেয়ালের ইটগুলো খসে পড়ে এধার-ওধার।
আর সেই বিরাট ভাল্লুক থাবা তুলে
বিছানায় নামে,
আমার এক-একটি হাড় খুলে নিয়ে
চিবোয় আরামে।

রাত্রি বড় হয়:
জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম:
বেদনার ক্ষুরধার তরবারী জবলে ওঠে অবাক বিস্ময়;
কখন শিকার ফেলে ভাল্লুক পালায়:
কপালে শুধুই জাগে ক্লান্তি আর বিন্দু বিন্দু ঘাম,
শিশিরের বিন্দু জাগে গাছে গাছে সবুজ ছায়ায়।

কোথাও নতুন পাখি ডাকে,
ডাকে-ডাকে নাম তার বলে ফাঁকে ফাঁকে,
সে-সুর ধমনী ছোঁয়, ছুঁয়ে যায় হাড়ের ভিতর—
পৃথিবীর হয় রূপান্তর।

ঘোড়ার চাল

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১
মারা অত সহজ নয়—
একটি আছে
আরেকটির জোরে।

ঘোড়াগুলো বাঘের মত খেলছে।

তোমাদের রাজাগুলোকে সামলাও হে,
নইলে
এই কিস্তিতেই মাৎ হে।

ঘোড়াগুলো বাঘের মত খেলছে।

২
মরুভূমির কড়াইতে টগবগ
টগবগ করছে
ফুটন্ত তেল—

ভাগো !

রবারের বনে বনে ঝুলছে
দড়ির ফাঁস—

পালাও !

লোভের কাঁটা-মারা জুতোগুলো
পায়ে পায়ে বেঁধে
ছিঁড়ছে।

৩
চাল ফেরত নেই—
সারা পৃথিবীটাকে বাজি রেখে
আমাদের খেলা।

ওদের বল ওরা যেভাবেই সাজাক
আমরা আড়াই ঘরের পাল্লায়
ওদের পাব।

ঘোড়াগুলো বাঘের মত খেলছে।

উমা দেবী

দুহাতে ও মুখ তুলে নয়নের পথে
দেখেছি তোমার মন—
ভদ্র ও সুন্দর—সমাহিত, মরমী, প্রবল !
    রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের মতন।
স্পষ্টতায় প্রসন্ন সহাস ভদ্র,
রহস্যস্পন্দনে চিরচঞ্চল সুন্দর,
কেন্দ্রগত আবেগের অতল গভীরে সমাহিত,
সমবেদনায় মৃদু মরমী কোমল,
আর আত্মজিজ্ঞাসার আশ্রয়ে প্রবল।

ওই মনঃসমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে চিরহিল্লোলিত হয়ে
পৃথিবীর গান আর মাটির সুঘ্রাণ বুকে বয়ে
শিশিরের আর্দ্রতায় হৃদয়ের কেশর ভিজিয়ে
বিবশ বাহুতে হিমশীতল সুরভি এক রজনীর আলিঙ্গন নিয়ে
সুগন্ধ ফুলের আর সুপক্ব ফলের ঘ্রাণে মন্থর—মন্থর—
ক্রমে ক্রমে ডুবে গিয়ে সমস্ত অন্তর
পৌঁছাতে কি পারবে না অজানার অকূল গভীরে
আত্মার রহস্যতীর্থে আনন্দ-মন্দিরে ?

—যেখানে সমস্ত আশা—অজস্র রঙিন আশা ক্রমে নিভে গিয়ে
সন্ধ্যার মেঘের মত অন্ধকার আকাশে হারিয়ে
খুঁজে পাবে আরো এক নিভৃত আকাশ
অন্য এক সুরভি বাতাস,—
এই মনঃসমুদ্রের দিগন্ত পেরিয়ে
অন্য এক রাজত্বের
অন্য এক সম্রাটের
পদতলে পৌঁছবে না গিয়ে ?

শ্রীকৃষ্ণধন দে

উতল সাগর হয় তোলপাড় ওঠে দুর্বার ঢেউগুলি,
নভ-সীমানায় মেঘের মিছিল নেমে আসে বুকে পথ ছু
ওঠে ঝড়, ডাকে বাজ কড়্ কড়্, নাচে বিদ্যুৎ ঢেউ ছু
শিলাদ্বীপগুলো হয়ে যায় গুঁড়ো, দিন নেভে যেন এক
সাগরে সাগরে ভাসিয়া বেড়াই, সাগরে সাগরে যাই ডু
উত্তর হতে দক্ষিণে যাই, পশ্চিম হতে যাই পুবে।
মীন-সম্রাট আমি সিন্ধুর, জলধারে রচি ছত্র াই,
লুপ্ত যুগের শেষ মহাবলী, সঙ্গী কোথাও খুঁজে না

ঊর্মিশিখরে মোর পথ চিনে সিন্ধু-শকুন যায় উড়ে,
অক্টোপাসেরা জোটে এসে পাশে, লকলকে বাহু দেয় ছু
প্রবালদ্বীপেরা পথ হতে টানে, মগ্ন শৈল নেয় কোলে
আমি ছুটে চলি দলি চলোর্মি সাগরফেনার হিন্দোলে
বিষুব-সীমায় লভি আশ্রয় নামে যবে শীত-কুজ্ঝটি
হিমশৈলের তলে বাঁধি বাসা নিদাঘ-তপ্ত মাস কটি।
রুদ্র সূর্য-কিরণে দেখেছি ঘন বাষ্পের মেঘ ওঠে,
তুষার-মরুর বক্ষে দেখেছি নিশীথ-রবির রঙ ফোটে।

আদিম পৃথিবী সরে গেছে কবে, ইতিহাস মরে কাল
হায় রে মানুষ, শেষ স্মৃতি তার কেড়ে নিতে চাও হায়
তরী নিয়ে ফেরে লোভাল মানুষ সাগরে সাগরে দল
সন্ধানে মোর, ঘূর্ণাবর্তে ভয়াল মৃত্যু নেয় সেধে।
সাগরের নীলে ছুটে চলি আমি, আকাশের নীল জল !
তটে তটে বাজে হাততালি আর ঢেউয়ে ঢেউয়ে দেয় চুম,
প্রথম সৃজনলীলায় ধরণী দিয়েছে বিপুল ছন্দ যে
তারি শেষ সুর বহি আজো বুকে, ঘাতক মানুষ অন্ধ

পাইলট অজিত নাগ

মণীন্দ্র রায়

যে-আকাশে সূর্য ওঠে, অথবা যেখানে
সকালে সন্ধ্যায় মেঘে পাহাড়, পশুর, মানুষের
অলৌকিক মূর্তি জাগে, যাইনি কখনো
সে বিপুল খেলাঘরে। দেখেছি কেমন ওড়ে পাখি
শূন্যকেই বুকে বেঁধে; মাঝরাতে একা
লণ্ঠন জ্বালিয়ে চাঁদ হেঁটে পার হয়
তারার জোনাকিজ্বলা নীল তেপান্তর—
আর ঘরে বসে স্তব্ধ মনে
বুঝেছি ছুটন্ত ঘোড়া অকস্মাৎ লাগামের টানে
কী দুরন্ত গতি রোখে বাঁকানো গ্রীবায়।
আমাদের ইচ্ছা অশ্রু তাই চিরদিন
হৃদয়ের আবিষ্কারে খোঁজে এক স্বকীয় আকাশ।

কেউ কি পেয়েছে সেই অবগাহনের
রক্ত-অনুরণিত আস্বাদ?
পাইলট অজিত নাগ চৌরঙ্গীর ঘনিষ্ঠ আসরে
বলল সেদিন তার বৈমানিক অভিজ্ঞতা : কানে
গতির গর্জন, দোলা, নীচে মেঘ, কখনো বা মাটি
ছবি-ছবি মাঠ নদী শহর সমুদ্র বাড়িঘর,
এবং ইত্যাদি। শুনে ভেবেছি এবার
লোভ স্বন্দ্ব রিরংসার হিংস্র ঘোলাজলে
হয়ত বা শতদল ফুটবে—হৃদয়
তুচ্ছের সংকীর্ণ সীমা পার হলে, একা
হয়ত উদাত্ত প্রতিমুহূর্তের মৃত্যুর আভায়
জীবনের অন্য মানে দেখবে। কিন্তু, না,
পাইলট অজিত নাগ হেসে হেসে বলল : যেহেতু
সময়কে তুড়ি দিয়ে ছুটি, তাই পৃথিবী মুঠোয়
ধরেছি, যেমন এই তরল আধার—
বলে এক চুমুকেই সব শূন্য; এবং তখনি
ভাঙে সে ঝনঝন শব্দে কাঁচ; যেন কাহিনীর শেষ,
যেন অত সহজেই জানালায় এসে ফিরে যায়
শতচক্ষু রাত্রির আকাশ।

পাইলট অজিত নাগ ভাবে কি জীবন পরিহাস!

কবিতার জন্য

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

একটি কবিতার জন্য উন্মনা
হৃদয়ের বর্ণনা নেই।
সেই হৃদয় আবেগময় সমুদ্র
ভোরের বেলাভূমে গানে প্রাণময়,
আবার কখনো রৌদ্রশেষের মেঘলা
উঁচু পাহাড়ের একলা বিষণ্ণ চূড়া।

এই পৃথিবীর জন্যই কবিতা
যেখানে গাছের মত ফুল ফোটাই,
ছায়া দিয়ে রৌদ্রের পাড় বুনি,
আষাঢ়ের বৃষ্টিতে পাতার কাকলিতে
অস্পষ্ট দৃশ্য আর অস্ফুট শব্দ নিয়ে
শেষে রূপে বাঙ্ময় হই।

শব্দের ধ্বনি আমাকে হরণ করে,
রূপ কোথায় নিয়ে যায় আমাকে,
কোন অজ্ঞাত গন্ধে বিহ্বল,
আমার হৃদয়ের শতদল
আমি খুঁজে পাই না
কার স্পর্শে এমন উন্মনা।

চোখ বুজে ঘরে বসে থাকি
তবু চোখের ভিতরে পৃথিবী,
আমি একা একাই থাকি
তবু চিন্তার ভিড়ে চলতে পারি না,
একটি কবিতার জন্য উন্মন,
স্ব-হৃদয়ের বর্ণনা নেই।

এ-ঘর ও-ঘর

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী

এ-ঘরে এস না, এ-ঘরে জানালা, হাওয়া—
এ-ঘরে দেয়ালে স্তব্ধ ঝাউয়ের ছায়া।
তার চেয়ে চল ও-ঘরে,
জিনিস গিশগিশ,
খাট, আলনা, চেয়ার,
আধ-বোনা এক ভুল সোয়েটার,
ট্রাংকের পাশে এক ফোঁটা বুঝি ধুলো।
এ-ঘরে এস না, এ-ঘরে জানালা, ঝাঁকে ঝাঁকে তারাগুলো।
তার চেয়ে চল ও-ঘরে,
গড়াই
ভাঁজ-বিছানায়; আধ-খোলা খোঁপা জড়াই,
সবাই
মুখোমুখি বসে খুঁজে পেতে আনি,
যে যা কথা জানি,
অচল দিনের পাল হক ফুলোফুলো।
এ-ঘরে এস না, এ-ঘরে জানালা, ঝাঁকে ঝাঁকে তারাগুলো।
এ-ঘরে যে মন-কেমন;
না-দেখা
একা
ল্যাম্পপোস্ট আলো-ছায়া আঁকে
দেয়ালে; ঝাউয়ের ফাঁকে ফাঁকে
হাওয়া হু-হু করে,
আর মনে পড়ে।
এ-ঘরে জানালা, তারাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে।
এ-ঘরে কী করে ভুলবে, বল না, তাকে?

কেবল আসতে থাকে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কেবল আসতে থাকে। রুদ্রদিনে রাত্রির অমায়
দারুণ বৈশাখীদাহে, আষাঢ়ে শ্রাবণে ধারাজলে,
স্বর্ণাভ শারদ রোদে, মাঘের তুষার-মহিমায়
পাহাড়, অরণ্য, মাঠ ভেঙে-ভেঙে কী এক কৌশলে

সে আসতে থাকে স্থির সহজ অভ্যাসে। কুয়াশায়
কিংবা কালো মেঘের গুমোটে মুখ আবছা আঁধার—
তবু বোঝা যায় তার মুখে ক্ষত, তীব্র যাতনার
চিহ্ন তার নিদ্রাহীন চোখে। বার-বার সে ভাসায়

আলোর উজ্জ্বল দীপ সাগরের ঢেউ-অন্ধকারে
অসহায় নাবিকের কথা ভেবে। মেঘ-কালো রাতে
বাতাস মূর্ছিতপ্রায় বজ্রে ও বিদ্যুতে। ঝাউবন
দিশেহারা। তবু সে আসতে থাকে বিক্ষুব্ধ জোয়ারে
দ্রাঘিমায় দ্রাঘিমায় বিচ্ছুরিত হয়ে। দুই হাতে
সে সরায় অন্ধ বাধা। সে আসলে দুর্মর যৌবন॥

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

হাতক দরপনে আকাশ অকূলে
দেখে দেখে যে বাঁধল বৈকালে চুল
কনক কটোরী 'পরে গীমক হার
প্রতি নিশ্বাসে হল কম্পিত যার
নতুন কালের প্রাতে তাকেও তো হবে হতে
প্রকৃতির এক গোছা বিবর্ণ ভুল—
সময়ের হাতে স্রেফ্ ভাঙার পুতুল!

নিয়ে গেছে কবেকার কে চোর আষাঢ়
দেহক সরবস গেহক সার
অবেলার আলো-লাগা তন্ময়ী পড়শী মেয়ের
শরীরোত্থ বর্ণ-ফেন মদিরাক্ষ মৌসুমী প্রহরে
অকারণ খুশী হয়ে যখন উছলে পড়ে
দেখি আর মনে আসে সেই ছবি অনপনেয়ের।

এ গজগামিনী তু বড়ি সেয়ান,
কনক কলস ঘন রস ভরি তাই
হৃদয়ে চোরায়সি আঁচরে ঝাঁপাই॥
ঘর থেকে ঘরে যেতে গাইলে যা গুন্ গুন্ গান—
ভেসে গেল কেশগন্ধী বৈকালী বাতাসে
তবুও ত ক্ষণ-মোহে প্রাণে গান আসে—
নয়নক অঞ্জন ভরে আছে ভুলে
গর্বিনী ভাবো শুধু রাত আছে চুলে।
আরো পরিণামী নির্মঙ্কুশ নিয়ে
অন্য কারো মহারাত্রি রয়েছে দাঁড়িয়ে
অনাদি অচেনা রাত আছে প্রতীক্ষায়
চুলের——ফুলের——সব দেহের সীমায়।

প্রতিধ্বনি

গোবিন্দ চক্রবর্তী

পাহাড়ী গোধূলির প্রায়ান্ধকারে
বাদামী রঙের ঘোড়া ছুটিয়ে
কে যেন নক্ষত্রবেগে মিলিয়ে গেল
শাল-পলাশের বনান্তরে,
সন্ধ্যার প্রথম-তারার দিকে তার চোখঃ
সেই দিকেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে
বার বার তার ঘো

এ-অঞ্চলে নতুন এসেছি—
অচেনা দিগন্ত।
তবু শুনেছি যেটুকু জনশ্রুতিঃ
ঐ অরণ্যে কেউ যায় না।
ঐ অরণ্যের শেষ কোথায়—কেউ জানে না।
আর ভুল করে যে পা বাড়ায়
সে আর ফেরে না, ফেরার পথ খুঁজে পায়
একেক মধ্যরাত্রে
শুধু নাগারা-টিকারা বাজে পাহাড়ে
ভয়াবহ আগুন জ্বলে, আর
গ্রাম ছেড়ে সব পালায়

মিলিয়ে-আসা অশ্বক্ষুরধ্বনির প্রতি
উৎকর্ণ হয়ে
যখন ভাবছি ঐ দুঃসাহসীর কথা—
একটি পাহাড়ী জনতা এসে থমকে দাঁড়াল
আমারই বাংলোর সুমুখে
তাদেরও বিস্ময়াবিষ্ট অঙ্গুলিনির্দেশ
ঐ অরণ্যে—
তাদেরও বিস্ফারিত দৃষ্টিতে প্রশ্নের সমারোহ

মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি
এখনও কত-না দিগন্তে।
ডোডো পাখির কঙ্কালের মত
এখনও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে
কত-না মৃত ইতিহাসের রহস্যবিস্ময়
সভ্যতার মরুপ্রান্তরে ও সাগরে-পাহাড়ে।

ভূগোলের সংকীর্ণ সীমারেখায়
এ-পৃথিবী কতই বা বড়!
এই ত সে-দিনও আবিষ্কৃত হল
আরেক বিলুপ্ত মহাদেশঃ
'গণ্ডোয়ানা'

গ্রামান্ত গোধূলির অশ্বক্ষুরধ্বনি
কত-না প্রশ্নের প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে গেল
মুহূর্তে আমার মনে,
একেবারে হঠাৎ——।

আরশি

অরুণকুমার সরকার

পুরনো পাড়ায় টো-টো করে ঘুরি
যাকে চাই তাকে কাছে পেতে চাই।
যাকে চাই তার মুখের আদল
অনতিদূরের গ্যাসের আলোটা।

কাঁপছে. হাওয়ায় শিউরে উঠছে
দেখছে নিজেরই বিস্মিত মুখ
ক্ষয়ে যাওয়া ইটে যেখানে কান্না
জমে জমে সাত টুকরো আরশি।

ছাতা নেই, মনে স্মৃতি ঝরছে
আমিই কি তবে গ্যাসের আলোটা!
নির্জন পথে থমকে দাঁড়াই
বিনিদ্র রাতে শব্দ ঝরছে।

বর্ষণশেষে খোলা জানালায়
সে কার দৃষ্টি ছিন্নভিন্ন
তারই আরশিতে বিস্মিত হব
তাকে চাই তাকে কাছে পেতে চাই।
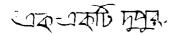
চিত্ত ঘোষ

এক-একটি দুপুরের দীর্ঘ ছায়া রেখায় রেখায়
নির্জন বিস্ময়ে ডুবে শূন্যতাকে পায়
দীঘির গভীর জলে। উৎসুক বৃষ্টিকে নেয়ে পরিচ্ছন্ন গাছ
আয়নায় মুখ দেখে। হয়ত কিছুই নয়,
জলের শ্যাওলা মেখে মাছ
আশ্চর্য সাঁতরায়, ভোবে। মেঘে মেঘে
শ্রাবণের দু চোখ কোমল।

মেঘে মেঘে বৃষ্টি ঝরে, কেঁপে ওঠে এক দিঘি জল
জলের বুদ্বুদ। এপারের ঘাট ছেড়ে ওপারের ঘাটে
চঞ্চল মনের ঢেউ দল বেঁধে হাঁটে
ছায়া ভেঙে ভেঙে। মাটির প্রার্থনা ছুঁয়ে তৃপ্ত অমায়িক
ভাঙা দেয়ালের পাশে সভা করে বিচিত্র শালিখ
অন্তরঙ্গ ঘাসে। এবং হলুদ গানে দু চোখের ঘুম ঢেলে ঘুঘু
কিছুতে পারে না ভরতে শূন্য ঘর তবু!
সেই গাঢ় নিঃসঙ্গতা, ছায়া
ছড়ানো পাতার স্তূপে কী নির্মম নিষ্ফল মৃগয়া—
এ-শূন্যতা দীর্ঘ, দূর, সাদা
এ-মাটি বৃষ্টিতে ভিজে কাদা।

শেষ বি. এন. আর মেল

নরেশ গুহ

পৃথিবীর সব হাওয়া ছিপ ফেলে আড়ে বসে আছে;
গড়াল দুপুর।
কোনও চারে মাছ নেই. খাড়া ছায়া ক্রমে.হেলে যায়,
ফিরে আসে দূর
অসীমের উঁচু ডাঙা ঘুরে দেখে ক্লান্তডানা চিল
শিমুলের শীর্ণ ডালে। অতিকায় রোদে মেলা নীল
আকাশে একাকী বড়। পথঘাট শুয়ে আছে, আর
নদীর প্রচ্ছন্ন তীরে ঠোঁট চাটে মুগ্ধ জল, শোনে তার
অভ্যস্ত আহার
উজ্জ্বল রুপোলী বালু ঝিরিঝিরি ঝরে, ঝরে যায়,
এখন বিকেল।
জানি না কোথায় তুমি, কে তোমাকে নিয়ে গেল,
নিল শেষ বি. এন. আর মেল।

আসমুদ্র

অরবিন্দ গুহ

মনে রেখ রসভারনম্র অন্ধকারের কাহিনী।
তুমি সন্ধ্যাবেলা গৃহপালিত ছায়ার ভালবাসা
কিংবা বলি অসীমতা করতলে নিও। মায়াবিনী
আলো জ্বলে সায়াহ্নের অপরূপ দিগন্তে। যে-ভাষা,
যে-ছন্দ সত্যানুসন্ধ কিন্তু দীপ্ত সংখ্যাহীন শোকে,
তা তুমি আমাকে দিলে প্রত্যাশার প্রোজ্জ্বল পলকে।

কিন্তু ক্ষয় হয়ে এল এই যৌবনের পরমায়ু।
প্রেম নয়, নাকি প্রেম ? আমি এই ঐশ্বর্যের ভারে
শোকার্ত, গর্বিত। আমি সংসারের প্রাঙ্গণের বায়ু
চন্দনে চিত্রিত করি স্নিগ্ধ স্তব্ধতার অন্ধকারে।
তুমি মনে রেখ বৃষ্টি পদ্মপত্রে; মনে রেখ, তুমি
আমাকে দিয়েছ প্রেম, যে-প্রেমের অর্থ মরুভূমি।

তুমি ভালবাসা দিলে অনুরূপে, আমি চিরঋণী;
শরীরের লক্ষ তটে সহস্র তরঙ্গধ্বনি বাজে।
ধারাস্নাত কিন্তু তপ্ত সায়াহ্নের কম্পিত কাহিনী
মনে রেখ। আমি বর্তমানে মরুভূমির জাহাজে
আশ্রিত। সম্মুখে রিক্ত, রুক্ষ, দীর্ঘ। যাত্রা শেষ হবে,
অথবা বিলুপ্ত হব প্রকৃতির বিখ্যাত বিপ্লবে ?

না, লুপ্ত হব না। আমি হৃদয়ের সহচররূপে
ভবিষ্যতে সুনিশ্চিত লাবণ্যের সমুদ্রের দ্বারে
উপনীত হব। তুমি ?. তোমাকে যৌবন চুপে-চুপে
যথারীতি পরিত্যক্ত রেখে গেছে শান্ত অন্ধকারে।
ঋতুর বিচিত্র টানে দেশান্তরে উড়ে যায় পাখি;
যে আমাকে শূন্য করে, আমি তাকে পূর্ণ করে রাখি।

দৃশ্য-কাব্য

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

রোদ্দুরে যাই, রোদ্দুরে যাই মিলিয়ে
শরীর বিলিয়ে, বিধাতার চেয়ে শক্তিতে কিছু কম,
মানবিকতায় কিছু বেশী, তাই কিছু-কিছু বিভ্রম;
আয়ুর শরতে রঘুবংশের দিলীপ আমার রাজা,
সূর্যের কাছে শুধু আমৃত্যু দেহত্যাগেই বাঁচা;
মাঝে-মাঝে তবু সিঁড়ি ভেঙে নামি রুগ্‌ণ হৃদয় নিয়ে,
রুগ্‌ণ রূপকে ছায়া-নট সাজি : মালবিকাগ্নিমিত্রম্‌।

আত্মহত্যা করতে গিয়েও বারবার ফিরে আসা
নিজের বাড়িতে, নিজের বাড়ির ছাতে
চামেলি-মেয়েরা চৌকাঠ গড়ে মৃদুল সবল হাতে,
পুরুষ কবিকে সংহত দেখে ভয় পেয়ে যায় যম,
দেয়ালে নিজের বিশেষ রক্ত : আ মরি বাংলা ভাষা।

রবীন্দ্রনাথ মৌলি পাহাড়, জলপ্রপাত আমি;
দুঃখ ত আর বলি না ইনিয়ে-বিনিয়ে,
কবিতায় বাঁচে প্রজ্ঞাশাসিত অসুস্থ পাগলামি,
রোদ্দুরে যাই, রোদ্দুরে যাই মিলিয়ে॥

অন্য দেশ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

হিরণ্ময়, আমরা কাল অন্য এক দেশে চলে যাব
বিবর্ণ ধূসর চোখে তুমি শুধু থাকবে হিরণ্ময়
কয়েকটি যুবক-দস্যু আমরা কাল লাল রক্তে আকাশ ভেজাব
জ্বলন্ত মশাল নিয়ে পোড়াব দিগন্ত আর রাত্রির আশ্রয়!

এক জীবন নিতান্তই ওষ্ঠ উল্টে যাব পার হয়ে
ধুলো উড়বে অশ্বক্ষুরে, ধুলো, ধুলো।—পৌরাণিক বিহঙ্গের মত
ডানায় সূর্যকে ঢাকবে,—সন্ধ্যা এক বারাঙ্গনা কেঁপে উঠবে ভয়ে
অলঙ্কার ছুড়ে ফেলবে মন্দির চূড়োয় কিংবা জলে ইতস্তত।

তুমিও আমার সঙ্গে নিরুদ্দেশে এস, হিরণ্ময়,
কী হবে এখানে এই বিবর্ণ, বিস্বাদ, দীর্ঘ দিনে
স্বেদ থেকে সোনা করছ, চোখের জ্যোতিতে তবু কিসের সংশয়
নগরীতে কত লোক আজও কত ক্রীতদাস
নিয়ে যায় নানা দামে কিনে।

তুমি যার কৃপা চাও সে তোমার পৌরুষ-প্রত্যাশী
উঠে এস, হিরণ্ময়, অভিমান-অন্ধ-কূপমণ্ডূকতা থেকে
আমরা সবাই জেন, মূঢ়তার ছদ্মবেশী-মূর্তি ভালবাসি
সবাই অচেনা থাকি, চিরকাল, তাই প্রত্যহ নিজ মুখ দেখে।
কাল আমরা চলে যাব আদিম দস্যুর সাজে অন্য এক দেশে
কোন দেশে? যারা জানত তাদের রক্তের স্রোত দেখ ওই
গোধূলিতে মেশে।

জাদুকরী

পরিমলকুমার ঘোষ

এ আমি এ কার সঙ্গে কথা কইছি বকুল, পারুল
হে পলাশ, সূর্যাস্তের সঙ্গিনী পলাশ, তুমি বল,
এ আমি এ কার সুরে কথা বাঁধছি, কার টলোম
মায়াবী দৃষ্টির দীপে তুলে ধরছি আকাঙ্ক্ষার ফুল

এ কার আহ্বানে আমি উঠে আসি মৃত্যুর উপরে
নৃত্যপর যন্ত্রণায়, এ কোন আনন্দে রেখে প্রাণ
জন্ম-অন্ধকার ছুঁয়ে তবু রাখি আলোর সম্মান,
প্রাণের গভীরে ফের ডুব দিই কী সুখের ঘোরে?

কে আমাকে অন্ধকারে রাত্রি জানে; সূর্য আলো হা
আলো থেকে অন্ধকারে অবিচ্ছিন্ন পিপাসার দাহে
কে আমার যাওয়া-আসা, ভালবাসা বেঁধেছে বিবাহে
নিষ্ঠুর সংকল্পে ফুল ফুটিয়েছে আমার বাগানে?

কঠিন সে জাদুকরী, আমার স[illegible]স্বে তার লোভ,
আমাকে নেবে না তবু; শুধু মৃদু অঙ্গুলিহেলনে
কাছে ডাকবে, ঠেলে রাখবে, সান্নিধ্য এড়াবে সযত্নে
অদূরে দাঁড়িয়ে দেখবে লেলিহান তৃষ্ণার বিক্ষোভ।

অবর্তমানে

মানস রায়চৌধুরী

তুমি চলে গেলে। এই মূঢ়, নগ্ন আঁধারের ভার
এখন বইতে হবে আমাকেই। নিঃসঙ্গতা তীক্ষ্ণ ক্ষুর
করাতে দ্বিখণ্ড করবে আমার বিশ্রাম
থাকবে বিছানা ছেয়ে স্বপ্নহীন অনিদ্রার ঘাম।

কে আমার অবসাদ নেবে রাত্রিশেষে
পরিবর্তে দিয়ে যাবে বকুলের সিক্ত ভালবাসা
শিশির-ছড়ান ভোরে। কণ্ঠভরা মাতাল পিপাসা
কে মেটাবে বাসন্তিক বাষ্পমেশা হাওয়ার আবেশে।

পড়ে থাক তুমিহীন ঢেউ দিয়ে ঘেরা শূন্যতায়—
শয্যাটা ভয়াল দ্বীপ বিষাক্ত উদ্ভিদে ভরা, যেন অতিকা
জন্তুর নির্জন বাসা—আমি তার সরস আহারে
হয়ত মহার্ঘ ভোজ্য। ফিরে এলে চিহ্ন পাবে পরিত্যক্ত হ

Cooch Behar

এখানে একটি নদী আছে না? সেই দিকে নিয়ে চল।

আহা, কী না-জানি নাম নদীটার। কথায় কথায় কতবার বলেছে। দু অক্ষরের ছোট নাম, ডাক-নাম। কে আর তখন নদীর নাম শোনে, নদীকেই প্রত্যক্ষ করে। সে-নদী কথার নদী, হাসির নদী, স্তব্ধতার দুই পারে সান্নিধ্যের নদী।

খরা না ক্ষীরা, আশ্চর্য, মনে করতে পারছে না। তবু ডাক-নামটি শুনলে বোবা মনও গুন গুন করে ওঠে। দূরের মানুষ চলে আসে কাছটিতে।

"তোমাদের এখানে নদীর নাম কী?" রিকশাওলাকেই জিজ্ঞেস করল সুপ্রভাত।

"খড়ে।" বিড়ি ধরাতে ধরাতে বললে রিকশাওলা।

কী উদ্ভট নাম, কদাকার নাম। ডাক-নামের কোন জাত-ধর্ম নেই, অর্থানর্থ নেই, যা মনে আসে, যা মুখে আসে রেখে দিলেই হল। ভেবে দেখেও না, এর ফল কী দাঁড়াতে পারে, কী ভীষণ পস্তাতে পারে মানুষ। সারা জীবন একটা ভয় বা লজ্জা হয়ে থাকতে পারে ডাক-নাম। বিদ্রূপের কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকতে পারে চিরদিন।

কিন্তু যেই মুহূর্তে অনুরাগের সুরটি এসে লাগবে, কোথায় বা বিদ্রূপের খোঁচা, কোথায় বা লজ্জার কুয়াশা। অনুরাগের সুরটি আনবার জন্যেই তো ডাক-নাম। পোশাকীকে আটপৌরে করা। সরকারীকে বৈঠকী। যা জবড়জং, তা নিমেষে খোলসা করে দেওয়া।

সোহিনীর ডাক-নামটি না জানি কী!

আশ্চর্য, এতদিন জিজ্ঞেস করেনি কি বলে! মনে হয়নি বুঝি? কেন মনে হল না? কে বলবে! আজ বুঝি এতদিন পরে খোঁজ নিতে ইচ্ছে করছে। মনে হচ্ছে আজ বুঝি অনায়াসে বলা যায়। একবার না, সহস্রবার। মনে মনে নয়, শুনিয়ে শুনিয়ে। যখন-তখন।

"খড়ে? সে আবার একটা কী নাম!" আপত্তি জানাল সুপ্রভাত, "খড়িমাটির দেশ ত আর নয়। না কি প্রচুর খড় হয় এ-অঞ্চলে?"

"কিন্তু মশাই, ভাল নামটি ভারী সুন্দর।" স্টেশনের বাইরে রিকশা-স্ট্যান্ডের সামনে যে ভিড় হয়েছিল, তার মধ্যে থেকে কে একজন বললে।

"কী ভাল নাম?"

"জলাঙ্গী।"

জলাঙ্গী! যেন চমকে উঠল সুপ্রভাত। এমনও একটা নাম হয় নাকি নদীর? এমন গভীর মদির নাম!

জলাঙ্গী নাম নদীর না হয়ে সোহিনীর হলেই ঠিক হত। ঐ নামটির মতই সে ঠান্ডা, নম্র, ধীরস্থির। তার অঙ্গে জল, চক্ষে জল, অন্তঃকরণে জল।

"জল কোথায় মশাই?" কে আরেকজন নামের বাচ্যার্থে বিরক্তি জানাল, "একটা ছিটেফোঁটাও নেই। মাঠঘাট খাক হয়ে গেল। গরু-বাছুর পার হচ্ছে এখন পায়ে হেঁটে।"

"কিন্তু বর্ষায়? যখন বর্ষা নামবে?"

বক্তাদের চোখের দিকে তাকাল সুপ্রভাত। দুজনের চোখেই ভয়ঙ্করের স্পর্শ।

"তখন আর দেখতে হবে না। মরা নদী রণচণ্ডী হয়ে উঠবে। দুকূল ছাপিয়ে যাবে উন্মাদের মত। গেল বছরই কী হল বলুন না।" একজন তাকাল আরেকজনের দিকে। "বন্যায় ভাসিয়ে দিল দেশ-গাঁ। তখন সে আরেক চেহারা।"

তখন আর জলাঙ্গী নয়, তখন তরঙ্গাঙ্গী। তখন ক্ষুধা, বাহুতে বিস্তার, নিশ্বাসে যন্ত্রণা। তখন শু[illegible] উত্তাল অশান্তি।

এই অশান্ত মূর্তিটিই দেখতে বড় সাধ সুপ্রভ[illegible] ঝড়ের রাতে মাথাকোটা অন্ধ নদীর চেহারা। এ[illegible] প্রতিবেশিতায় নদীর নামই নিল সোহিনী, রূপটি নি[illegible] জল ত খালি শীতল নয়, জল প্রবলও। কখনও কখনও দাঁতে দুর্দান্ত।

সোহিনী শুধু বলে, "ধৈর্য ধর।" বলে একটু হ[illegible] আবার বলে, "শুধু এটুকু কথা বলবার জন্যেই ধৈর্যের প্রয়োজন। কত ধৈর্যের পথ হেঁটে এসেই না তবে যায়, ধৈর্য ধর।"

"সোহিনী, তুমি কী কৃপণ, কী কঠিন!"

"আমি ধরিত্রী। আমি সহিষ্ণুতা।"

"আর আমি?" চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সুপ্রভাত: "প[illegible] কানন ধৈর্য হারায় রঙের ঝড়ে।"

হেসেছিল সোহিনী। বলেছিল, "তুমি কি [illegible] সদাগর? তুমি সুগন্ধের সদাগর। তাইতেই ত তোমার [illegible] শক্তি, অনেক সুধা।"

সেবার আসানসোলে কোন এক দিদির বাড়ি বে[illegible] গিয়েছিল সোহিনী। খবর পেয়ে সুপ্রভাতও [illegible] নিয়েছিল। যে-যে জায়গা, যে-যে দিন দেখতে যাবার সোহিনী ঠিক-ঠিক নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রভাতকে। সু[illegible] সবর্জমানে উপস্থিত হয়ে দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে [illegible]রে নিতে সুপ্রভাতের বেগ পেতে হয়নি। তারপর সেতু ধরে সহজেই খুঁজে পেয়েছিল স্বভাবকে।

একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে পড়েছিল সোহি[illegible] ঝোপে-ঝাড়ে বাঘ-ভালুক আছে, এমন উড়ো খবর কে শুনেছে সে-অঞ্চলে! কিন্তু ভারী একটা নিশ্বাসের শুনে জানোয়ার ভেবে সোহিনী সত্যিই আঁতকে উঠে[illegible] তাকিয়ে দেখল, আর কেউ নয়, সুপ্রভাত।

একমুখ হাসি নিয়ে বললে, "এস।"

ঘাসের উপর পাশ ঘেঁষে বসল সুপ্রভাত।

সোহিনী বললে, "ঐ দূরের পাহাড়টা দেখছ? দূরে ব[illegible] কেমন সুন্দর, তাই না? যেন একটা মখমলের তাঁবু। হয় ঐখানে গিয়েই থাকি। কিন্তু কাছে গেলেই দেখব, [illegible] পাহাড় আর জঙ্গল, শুধু কর্কশের সমাবেশ, নিষে[illegible] কাঁটাতার। নিকটই রূঢ়, দূরই মনোহর। তাই না?"

"পুরোপুরি নয়। কাছের পাহাড়েরও একটা রূপ অ[illegible] মহিমা আছে।" সোহিনীর একখানি হাত তুলে নিল সুপ্রভ[illegible] ঘামে-নরম লতানো এলানো হাত নয়, স্পষ্ট, শক্ত, বিশ[illegible] হাত। নিস্পৃহতায় বিশুদ্ধ। বললে, "দূরে মদিরা, বি[illegible] কাছেই খাদ্য। আর খাদ্য ছাড়া প্রাণ বাঁচে না সোহিন[illegible] একটু কি নিজের দিকে আকর্ষণ করতে চাইল সুপ্রভা[illegible] নিস্পৃহ নির্মম হাতে আনতে চাইল কি একটু সমর্প[illegible] উষ্ণতা?

"ধৈর্য ধর।" হাতের ঔদাসীন্যে শৈথিল্য ঘটতে দিল সোহিনী। বললে, "কালের ফলই মিষ্টি, অকালের [illegible] তেতো।"

"কালের ক্যালেন্ডার নিয়মের দেয়ালে টাঙানো থ[illegible] না কোনদিন। যদি মন্ত্র ঠিক থাকে, অকাল-বোধনের পু[illegible] সফল হয় সোহিনী।"

হয় না। মন্ত্রে ভুল হয়ে যায়। চঞ্চল হতে গেলেই উচ্চারণে ছন্দ-চ্যুতি ঘটে।'

বড় বেশী দার্শনিক হয়ে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে অবাস্তবের কুহকে। সরল সাদামাঠা হবার চেষ্টা করল সুপ্রভাত। কাছে ঝুঁকে পড়ে বললে, "কেউ নেই ধারে-কাছে।"

"কে বললে?" সুন্দর করে হেসে উঠল সোহিনী। গায়ের আঁচলটা একটু টান করে সরে বসল, আঁচল ত নয়। একটা যেন শক্ত পাথরের দেয়াল। বললে, "আমরাই ত আছি। আমরাই ত দেখছি আমাদের। আমরাই বা আমাদের কী বলব!"

অসম্ভব। স্নায়ু শিরায় ছটফট করে উঠল সুপ্রভাত। দস্যুর মত ভেঙে দেওয়া যায় না এই নিষেধের দুর্গ, এই নিষ্প্রাণতার স্তূপ?

আবার সেই পুরনো সুরে ফিরে গেল সোহিনী: "শোন, শুধু খিদে পেলেই চলে না। খাওয়ারও একটা পরিবেশ চাই পরিবেশন চাই। ভুখা কি দুহাতে খায়? শোন, ধৈর্যই সুর, ধৈর্যই লাবণ্য।" যে ছেলের ঘুম আসে না তাকে যেমন তার মা ঘুম পাড়ায় তেমনি স্নেহ যেন সোহিনীর স্বরে।

মাটির থেকে একটা ঢিল তুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে মারল সুপ্রভাত। বললে, "ধৈর্য ধরার সাধন আমার নয়, আমার বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন।"

চোখের কোণে ছোট্ট একটু হাসির ঝিলিক তুলল সোহিনী। "বাঁধন আগে পড়ুক—"

"সে ত বৈধতার কথা, স্বত্ব-স্বামিত্বের কথা। এই যে এখন একটু নিষেধের শীত, আবরণের কুয়াশা, অনধিকারের খোলা মাঠ জীবনে এ-পরিবেশ আর পাব কোথায়?" কী রকম প্রার্থীর মত শোনাল সুপ্রভাতকে।

কানের কাছে মুখ আনল সোহিনী। স্বর গাঢ় করল। "বলি—"

সুপ্রভাত উন্মুখ হয়ে রইল।

"বলি, চাকরি জোটাতে পেরেছ?"

যেন মুখের উপর প্রহার করল প্রশ্নটা। কথার মধ্যে যেন ব্যঙ্গের বিষ ঢালা। তোমার চাকরি বাকরির কন্দরে—এমনি একটা মোলায়েম প্রশ্নই যেন উপযুক্ত ছিল। কিংবা কাজের জন্যে এত যে চেষ্টাচরিত্র করছ কোথাও হল কোন সুবিধে? কোথাও আশা পেলে? তা নয়, বৃশ্চিকদংশন, গ্রাস যে মেলেছ আচ্ছাদন আছে? পাহাড়ে যে উঠতে চাইছ আছে তোমার নিশ্বাসের ক্ষমতা?

গম্ভীর হয়ে গেল সুপ্রভাত। মনে হল, তার যদি শক্তি থাকত, যদি কাঁদাতে পারত সোহিনীকে। যদি তাকে ব্যাকুলতায় কাদা করে ফেলতে পারত!

যদি বলাতে পারত, তোমার নিটোল আর্থিক সাফল্যকে নয়, তোমার সামাজিক মূল্যবত্তাকে নয়, খাঁটি তোমাকেই ভালবাসি। যদি বলাতে পারত, তুমি পাশে থাকলে ঝড়ের রাতে মাঝিমাল্লাহীন ডিঙিতে ভেসে পড়তে পারি সমুদ্রে। যদি বলাতে পারত, তুমি যদি দূরে থাক তা হলে চিরন্তন রাত্রি শবরীর মত জেগে কাটাই।

যে করে হক চাকরি একটা যোগাড় হবেই। তারপর দেখা যাবে। দেখা যাবে উচাটন করা যায় কিনা সোহিনীকে, তার দুই চোখে আনা যায় কিনা কান্নার ভরা কোটাল!

কাঁদাবে অথচ নিজে কাঁদবে না। এ কেমনতরো কথা! সুপ্রভাতের ইচ্ছে হয় এমন একটা মামলা দেখতে যেখানে মেয়ে আকুল অথচ পুরুষ কঠিন। সুপ্রভাত নিজে কেন এমন হতে পারল না? সে বেশ কল্পনা করে আনন্দ পায় সোহিনী তার জন্যে অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করছে আর সে চোখ ফিরিয়েও দেখছে না। কত সোহিনীর সাধ্যসাধনা আর সুপ্রভাত নিশ্ছিদ্র নিশ্চুপ। বেশ ভাল লাগে ভাবতে। কিন্তু তা কি হবার? একটু চেষ্টা করে দেখলেই বা ক্ষতি কী। কঠিন হয়েই ত কঠিনকে ভাঙতে হয়। মুখ ফিরিয়ে নিলেই ত দেখা যায় বিমুখকে। প্রত্যাখ্যানই ঔদাসীন্যের প্রতিষেধ। সুপ্রভাতের ইচ্ছে হল গম্ভীর হয়, অপমানিত বোধ করে, 'আচ্ছা তুমি বোস' বলে উঠে পড়ে সহসা।

কী দরকার। তবু এখনও ও কাছে রেখেছে, ঘা দিতে গেলে কে জানে হয়ত পথে বসাবে!

বড় ভয় করে সুপ্রভাতের। রোদ্দুর হয়ে সে ছায়া খুঁজে বেড়াচ্ছে, যদি সে-ছায়াটি তার জীবনে না পড়ে। সুরের লোভে ঢিলে তার আঁট করতে গেলে তারটুকু না ছিঁড়ে যায়।

কী দেখেছে সে সোহিনীর মাঝে! যদি তা সে জানত। যদি কেউ জানত!

দাঁড়াও না। এর শোধ তুলব। পুরুষ মানুষ আকাশ ফুঁড়ে না হক মাটি খুঁড়েই চাকরি যোগাড় করব একটা। তারপর বিয়ে করব। উদ্ধতাকে বশীভূত করব, বিশৃঙ্খলকে বিলোড়িত। দেখব তখন কোথায় থাকবে স্পর্ধা, কোথায় বা অনুকম্পা!

হ্যাঁ, ধৈর্য না ধরে উপায় নেই।

"এই যে তোমরা এখানে।" দিদির দেওর স্বয়ম্ভু গাঙুলি পাইপের খোলটা হাতের মুঠোতে চেপে ধরে সামনে এসে দাঁড়াল। "জানি পাখিরা দাঁড় ছেড়ে ডালে এসে বসেছে। এবং বেশ মগডালে। ইউরোপেও তাই দেখেছি—"

"এ দেখতে ইউরোপে যেতে হয় না।" উঠে পড়ল সোহিনী। স্যান্ডেলে পা ঢোকাতে-ঢোকাতে বললে, "ভিড় যদি মনঃপূত না হয় তাহলে না পালিয়ে উপায় কী।"

"তা হলে ত একলা পালায়।" পাইপ মুখে না থাকলেও দাঁতের দু পাটি প্রায় যুক্ত করে কথা বলারই অভ্যেস স্বয়ম্ভুর। "দুটিতে মিলে কেটে পড়ে কে?"

"একলা পালানো মানে চোটা," সোহিনী বেশ হাসিহাসি মুখে বললে, "দুটিতে পালানো মানেই ছুটি।"

এ ত পষ্টাপষ্টি সুপ্রভাতের পক্ষ ধরেই কথা বলছে সোহিনী। আর সকলকে নিয়ে তার ভিড়, সুপ্রভাতকে নিয়েই তার ছুটি, এ ত শুধু স্বীকারোক্তি নয়, এ ঘোষণা। এ প্রায় সংসারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিদ্রোহীর কথা। তবু ভয় যায় না সুপ্রভাতের। এখনও তার চাকরি হয়নি। আর স্বয়ম্ভু চাকরির মনিহারি দোকানের শো-কেসের জিনিস। একটা বিদেশী ফার্মের উপরতলার চাকুরে। তারপর এখনও একক। সুতরাং সর্ব অর্থে বলবান।

"তাহলে রসভঙ্গ করলুম বল!" করুণায়-তাকানো বিজ্ঞের মত বললে স্বয়ম্ভু।

"ভঙ্গ ছিল বলেই ত রসের এত দাম।" বেশ সমানে-সমানের মত বলছে সোহিনী: "কাজের পর-পর দেয়ালগুলো ছিল বলেই ত ছুটিটা মাঠের মত।"

"বেশ তবে ছোট মাঠ দিয়ে।" ডান হাতটা অর্ধেক শূন্যে তুলে হতাশার ভঙ্গি করে স্বয়ম্ভু বললে, "গাড়ির দেখা নেই।"

"একটারও নেই?"

"স্টেশন-ওয়াগনটা আছে।"

"করে। কার না করে!" সোহিনী সুন্দর করে হাসলঃ "ভয় আছে বলেই ত জয়। ভয় আছে বলেই ত বেঁচে সুখ, ভালবেসে সুখ।"

এখন এসব কথা সুপ্রভাত কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। জানলা দিয়ে শুধু দেখতে পাচ্ছে ওদের। রাস্তার পাশে দুজনে দাঁড়িয়েছে ঘন হয়ে। নৈকট্য থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে এখন তাদের কথা গাঢ়, স্বর অস্ফুট। তাদের শব্দের চেয়ে নীরবতাই এখন বেশী উচ্চারিত। একটা উচ্ছৃংখল গতির দ্যুতিতে ফেটে পড়বার জন্যে তারা ঔৎসুক্যে মন্থর হয়ে রয়েছে।

একটা নতুন যন্ত্রণা সুপ্রভাতকে বিদ্ধ করল সর্বাংগে। এ-যন্ত্রণা এর আগে আর কোনদিন সে টের পায়নি। ছেলেবেলায় হাতে যে একবার বিছে কামড়েছিল তার চেয়েও এ অসহ্য। এ-যন্ত্রণা দিশেহারা করে ফেলে, আর যন্ত্রণায় দিশেহারারাই খুন করে আত্মহত্যা করে। যুক্তির নামগন্ধ নেই এতে, নেই বা ক্ষমার লেশস্পর্শ। এ অসহায়ের ঈর্ষার যন্ত্রণা।

কিন্তু একটু স্থির হয়ে যুক্তি প্রয়োগ করলে অনায়াসে ক্ষান্ত হতে পারত সুপ্রভাত। তার তুলনায় স্বয়ম্ভু জোনাকির কাছে চাঁদ, ফিঙের কাছে ময়ূর। ছোট আদালত থেকে সেরা আদালত, সর্বত্রই স্বয়ম্ভুর মামলা তার বিরুদ্ধে ডিক্রি হয়ে আছে। স্বয়ম্ভুর দিকেই সোহিনী হেলবে-খেলবে তাতে আর বিচিত্র কী! যতই সে আসুক কলকাতা থেকে বেড়ানর টানে, খোলা-মেলা একটু আঁচলের হাওয়া পাবার লোভে, আজকের বেড়ানটা যে স্বয়ম্ভুর সংগে সোহিনীকে ভিড়িয়ে দেওয়া, এ আর এখন বুঝতে বাকি নেই। আর গাড়ি যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে পরে ফিরে আসবার জন্যে এ হচ্ছে স্বয়ম্ভু-সোহিনীর একত্র উধাও হবার চক্রান্ত। আর যে সংযম ও কাঠিন্য সুপ্রভাতের বেলায় অপরিহার্য ছিল তা যে এখন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, তা স্পষ্ট দেয়ালে লেখা আছে কয়লা দিয়ে। আসলে সুপ্রভাতের মন ক্ষুদ্র না হলে অনায়াসে বুঝতে পারত এক্ষেত্রে সোহিনীর কোনও ত্রুটি নেই—বদান্যই দাক্ষিণ্যকে আহ্বান করে। স্বয়ম্ভু বদান্য বলেই সোহিনীও সুদক্ষিণ। স্বয়ম্ভু খোলা মাঠ বলে সোহিনীও মুক্তবায়ু। আর সুপ্রভাত ছোট-ঘরের বাসিন্দে বলেই সেখানে সোহিনী স্বভাবতই সংকুচিত, তার না আছে গন্ধ না আছে ঢেউ। সে-দোষ সোহিনীর নয়, সে-দোষ সুপ্রভাতের। মনের এ বদ্ধ অবস্থায় সব তার উদার-বুদ্ধিতে বোঝবার কথা নয়—তাই তার ইচ্ছে হল ওয়াগন থেকে নেমে পড়ে, কাউকে কিছু না বলে চলে যায় আরেক দিকে। রাস্তার একটা বাস ধরে, হেঁটে-নেমে যে করে হক ফিরে যায় তার হোটেলে। পরের ট্রেনেই কলকাতায়। জনতার আবরণে নিজের কাছেই নিজের মুখ ঢাকে।

ভালবাসাই কি ভালবাসা পাবার একমাত্র যোগ্যতা? শুধু ভালবাসার জোরেই কি দাবি করা যায় সাধুতা আর ত্যাগ বা একলক্ষ্য সমর্পণ! সংসারে কিছুই যখন স্থির নেই, ভাল-বাসাই বা থাকবে কেন? তারও ঋতুবদল আছে, লোক-লোকান্তর আছে। অবধারিত রাম রাজা হবে তবুও ত সে চলে গেল বনবাসে। সুপ্রভাত স্থির ছিল বলে তার উচ্ছেদ হতে পারবে না এমন কোন কথা নেই। হ্যাঁ, এক মুহূর্তেই হতে পারে। এক মুহূর্তেই প্রলয়ের ঝড়, একটি কটাক্ষেই সাম্রাজ্যের সর্বনাশ।

ঈর্ষার ফল পরের শ্রীতে কাতরতা নয়, নিজের কুশ্রীতায় কাতরতা। আমিই নিকৃষ্ট, আমিই অকর্মণ্য।

কালো বিন্দুর মত কী একটা ছুটে আসছে পুব থেকে।

"দেখছ?" জিজ্ঞেস করল স্বয়ম্ভু।

"একটা গাড়ি না?" উদ্বেল চোখে তাকাল সোহিনী।

"হ্যাঁ, আমারই গাড়ি।"

এখন আর প্রতিবাদ নেই সোহিনীর। যেন সে মেনে নিয়েছে চরম স্বত্ব বলে কিছু নেই, সত্য যা আছে তা শুধু মনে। যখন যার তখন তার এই ভাবনায়। মুখে শুধু বলল, "উঃ, কী ভীষণ জোরে আসছে।"

"কালো ফিতের মত সোজা ঢালা পথ—ফাঁকা পেলেই স্পিডে পেয়ে বসে। বেশী শূন্যতায়ই বেশী সাবধানতা।" তারপর একটু বোধ হয় ব্যক্তিগত হতে চাইল স্বয়ম্ভু: "বেশী টাকা থাকলেই অপব্যয়ের ঐশ্বর্য।"

"শুধু টাকা থাকলে? হৃদয়ে ঔদার্য থাকা চাই।"

"টাকাই ঔদার্য আনে। নিন্দাই আনে দুঃসাহস।"

গাড়িটা এসে পড়ল।

ড্রাইভার কী একটা কৈফিয়ত দিতে চাইছিল, স্বয়ম্ভু কানেও তুলল না। শুধু সোহিনীকে বললে, "ওঠ।"

"কে চালাবে?"

"ভয় নেই, আমি নয়। আমি তোমার পাশেই থাকব।"

"তাই ভাল। দাঁড়ান, আমার হ্যাণ্ডব্যাগটা নিয়ে আসি। ওয়াগনে ফেলে এসেছি।" বলে আনন্দচপল পায়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে ফিরে এল সোহিনী।

এসেই ঘোষণা করল সোল্লাসে, "ছেলের দল, তোমাদের ডেকেছেন স্বয়ম্ভুবাবু। যার খুশি যাও তার গাড়িতে, স্পিড এনজয় কর।"

ছেলের দলে হুল্লোড় পড়ে গেল। এক দঙ্গল ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়িতে। চলুন, ছাড়ুন, স্পিড দিন।

গাড়িতে-ওয়াগনে ভিড় কী ভাবে চালাচালি হবে বয়স্কদের সমস্যা ছিল, সোহিনী তা অতি সহজে সমাধান করে দিল। সোহিনী যে নিজেই গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ওয়াগনে এসে ঢুকতে পারে, এটাই কেউ হিসেবে আনেনি।

সুপ্রভাতের পাশে বসল। বললে, "খুব ভয় পেয়ে গিয়ে-ছিলে বুঝি?"

"মোটেও না। আমি জানতাম ওয়াগনই তোমার পছন্দ।" সরল নিশ্বাসে বললে সুপ্রভাত।

এদিকে গাড়ির হুইল নিজেই নিয়েছে স্বয়ম্ভু। ছেলেদের উদ্দেশ করে বললে, "গান জান?"

সমস্বরে হেসে উঠল ছেলেরা। "কোরাস হলে গাইতে পারি।"

"হ্যাঁ, কোরাসই গাইব সকলে। ধর।" মহাস্ফূর্তিতে স্বয়ম্ভু গান ধরল, ছেলেরাও সচিৎকার ধুয়ো তুলল: "আমাদের যাত্রা হল শুরু, এখন ওগো কর্ণধার, তোমারে করি নমস্কার। এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না তো আর। তোমারে করি নমস্কার।"

"ওগো কর্ণধার, ঐ ত বুঝি নদী এসে গেল। আর কত বাইবে তোমার রিকশা?" রিকশাওলাকে প্রশ্নে হঠাৎ সন্ত্রস্ত করল সুপ্রভাত, "কিন্তু এদিকে তোমার বাড়ি কই?"

"কার বাড়ি নাম বলতে পারেন না, আমি কোথায় কী খোঁজ করি বলুন ত!" রিকশাওলা গাড়ি ঘোরাল।

"তোমাকে ত বলেছি বাড়ির নাম 'অজানা'।" মুখ বাড়িয়ে বললে সুপ্রভাত, "এর বেশী আর ঠিকানা জানা নেই।"

"আহা, যার বাড়ি সেই ভদ্রলোকের নাম কী?" বিরক্ত হয়েছে রিকশাওলা।

"তা জানলে তোমাকে কি আর বলি না এতক্ষণ?"

"কে থাকে সে বাড়িতে?"

"কে? একটি মেয়ে।'

সে আবার কেমনতরো নাম। রিকশাওলা প্রশ্ন করল, "খালি একা মেয়ে? ওমার কেউ থাকে না?"

"জানি না, খোঁজ করিনি। এক কাজ কর না। পোস্টাপিসে জিজ্ঞেস কর।"

"এদিকে পোস্টাপিস কোথায়? এ ত ভারী ঝামেলায় পড়লাম দেখছি।" রিকশাওলা ভাবলে, তবে বাজারের দিকেই যাই, সেখানেই যদি চিনে নিতে পারে। তাও বা চিনবে কী করে, এখানে আর কখনও আসেনি বলছে। তা ছাড়া বাজারের দিকে নদী কই?

"ও মশাই," গ্রীষ্মের দুপুরে পথে একটা লোক পাওয়া দুর্ঘট—মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল সুপ্রভাত, "'অজানা' কোথায় বলতে পারেন?"

"অজানা? সে আবার কী জিনিস?" হাঁ হয়ে গেল ভদ্রলোক।

"একটি বাড়ির নাম। নদীর পারে একটা বাড়ি। নিশ্চয় গেটে কিংবা দেয়ালে নেম-প্লেট আছে।"

আগে-আগে যাদের জিজ্ঞেস করেছে তারা সরাসরি 'না' বলেছে, এ-ভদ্রলোক অন্যরকমভাবে বলল, "অজানাকে কি কখনও জানা যায়?"

সত্যি, এ কার সন্ধানে চলেছে, কোন্ অজানার সন্ধানে? নইলে এই মাংসঝলসানো গরমে ঠিক-দুক্কুর বেলার গাড়িতে কেউ আসে? সকাল-সন্ধ্যার ট্রেনও ত ছিল সুবিধেমত। একেবারে ধনুকছোঁড়া তীরের মত বেরিয়ে পড়েছে। কোথায় বিঁধবে কে জানে, ছিলা থেকে ত বেরিয়ে আসি। আশ্চর্য, কী শক্তি তাকে টেনে আনল এমন করে, সমস্ত হিসেবের অঙ্ক বানচাল করে দিয়ে? সে কি একটা কাপড়ের পুঁটুলিতে জড়ানো কখানা হাড়ের টুকরো? আর এমন সে শক্তি, আর কিছুকে জানতে দেয়নি, দেখতে দেয়নি, পথের ধারে দাঁড়াতে দেয়নি একদণ্ড। নইলে এতদিনের আলাপ, সোহিনীর বাপের সে খবর করেনি, কী নাম, কী করে, ওকালতি না ডাক্তারি ব্যবসা না ঠিকাদারি, তাও না। সোহিনী ছাড়া আর কিছু নেই, আর কেউ নেই। সোহিনীর বাইরে আর সব অপ্রাসঙ্গিক। ধ্রুবতারার বাইরে আর সব তারা খালিকণা!

দরদরানো ঘামে রিকশাওলাকে কী রকম কালো মসৃণ দেখাচ্ছে! তার চাকার তলায় পথও যদি মসৃণ হত। আর এখানকার রিকশার হর্নের আওয়াজ কী অদ্ভুত রকম করুণ! যেন কেঁদে-কেঁদে উঠছে। পথ ছেড়ে দাও বলছে না, পথ কোথায় বলে দাও বলছে। কে দাঁড়ায়, কে বলে, কে দেখিয়ে দেয়!

একটি যুবক যাচ্ছে সাইকেলে করে।

"মশাই, শুনুন—"

কে দাঁড়ায়! কিন্তু আশ্চর্য, যুবক নেমে পড়ল সাইকেল থেকে!

"অজানা কোথায় বলতে পারেন?"

ভেবেছিল মুখিয়ে উঠবে। কিংবা মুখের এমন একখানা উদাসীন ভাব করবে যা কথার চেয়েও কর্কশ।

"ও, হ্যাঁ, শিবনাথ ডাক্তারের বাড়ি ত?"

ঢোক গিলল সুপ্রভাত। বললে, "সে-বাড়িতে সোহিনী বলে—"

"ও, হ্যাঁ, তাঁর মেয়ে। হ্যাঁ, এই রাস্তাই, তবে গাড়িটা ফেরাতে হবে। ঐ যে দেখছেন সামনে গাছ, ওখানে নেমে ছোট্ট এক চিলতে মাঠ পেরিয়ে এগিয়ে গেলেই অজানা।" যুবক তার সাইকেলে লাফিয়ে উঠল: "যান, আমি আসছি।"

কত সহজ! কত কাছেই, হাতের নাগালের মধ্যেই আছে! শুধু একটুখানি পথ দেখিয়ে দেওয়ার অভাব। শুধু একটি অনুকূল মনের উৎসুক স্পর্শের প্রতীক্ষা। সে স্পর্শটি যদি ঠিক-ঠিক এসে লাগে দূরের দুরূহও অজানা থাকে না, আর যদি না পাওয়া যায় সেই স্পর্শ, এ-পারকেই মনে হয় পরপার, কাছের মানুষকেই মনে হয় সাত জন্মের অচেনা।

মনের এক চুলের ফারাকে এক রাজ্যের তফাত। যদি যুবকটি এত সহজে দেখিয়ে না দিত—কী না-জানি নাম যুবকটির—তাহলে এই দুর্দান্ত রোদে কোথায় কি ঘুরে বেড়াত উত্তর-পশ্চিম! না দেখালেও ত পারত। অক্লেশে বলতে পারত, জানিনে মশাই। কিংবা সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে একবার সোজা করে তারপর ডাইনে-বাঁয়ে দুবার বেঁকিয়ে বলতে পারত, তারপর কাউকে জিজ্ঞেস করে নেবেন। অত আয়োজনেরই বা দরকার কী! সাইকেল করে যাচ্ছিল সাইকেল করে চলে যাবে। জানা থাকলেই কি মনে পড়ে? না কি মনে পড়লেই কেউ নেমে পড়ে সাইকেল থেকে! একেকটা মন কি সুন্দর সোনামাখা, আবার একেকটি মন কি একতাল সিসে! আলাদা-আলাদা কেন? এক মনেরই কত রকমফের, কত রোদ-জ্বলা দুপুর কত বা তারা-জাগা রাত্রি। শুধু এক অনুপল বা এক পরমাণুর ব্যবধান। সুইচে সূক্ষ্ম একটি তারের মৃদু একটু কারসাজি। যে বোবা সে কখন ডেকে ওঠে নাম ধরে আবার যে নামডাকা সে রুদ্ধ বোবা হয়ে যায়। যে সিসে সেই কষ্টিপাথরে সোনার দাগ ফেলে, আবার যাকে সোনা বলে জানি সেই সোনার মুহূর্তে সিসে।

কিন্তু, যাই বল, বাড়ি দেখাক ত দেখাক, তাই বলে ও-ও ও-বাড়ি আসবে কেন? ও কি তবে এ-বাড়িরই একজন? সোহিনীর দাদা?

ফালি মাঠটুকু পেরিয়েই পাওয়া গেল বাড়ি। একেবারে নদীর গা-ঘেঁষা। মাঝখানে ডালপালামেলা ছায়াছড়ানো একটা কী গাছ। নাম জানে না সুপ্রভাত, জেনে দরকারই বা কী! হিজল বকুল সীসু জামরুল যা হক কিছু হক না। ঘরের মধ্যে সোহিনী, তার শিয়রের জানলার কাছে গাছ আর গাছের পরেই নদী—আর সমস্ত কিছু আস্বাদ করবার মত তার একটি মন, আকাশের সমস্ত আগুন যেন তুষার হয়ে গেল। চিত্তে যার স্নেহ থাকে দেহে আবার তার দাহ কী!

আকাশের মর্জিটাই দেখ না। রুদ্ররোষে জ্বলছে কিন্তু কখন কী হাওয়ায় উড়িয়ে আনবে কালো মেঘের মমতা, রুপোর ধারায় বৃষ্টি ঢালবে, একই শীতল মৈত্রীর পঙ্‌ক্তিতে বসিয়ে দেবে মানুষে মাটি গাছ নদী পশু পাখিকে। রোদে যে কাছের মানুষের বেশী দেখতে দেয় না বৃষ্টিতে সেই আবার দূরের মানুষ অদেখা মানুষকে দেখিয়ে ছাড়ে।

"এই যে আপনার অজানা—" রিকশাওলাও চিনতে পেরেছে বাড়িটা। দেয়ালের গায়ে বাড়ির নাম আলকাতরায় লেখা।

"কত দেব?" পকেট থেকে ব্যাগ বের করল সুপ্রভাত।

রিকশাওলা একটা লম্বাইচওড়াই হেঁকে বসল।

"এত?" দরটা যাচাই করে নেবে ধারে-কাছে কাউকে দেখা গেল না। যে-বাড়ির নাম করে এসেছে তার দরজা-জানলা আদ্যন্ত বন্ধ।

শুধু নদীর দিকে শিয়রের জানলাটি খোলা। বাড়িটার আকৃতি-প্রকৃতি বুঝে নেবার জন্যে নেমেই সে এক পা গিয়েছিল নদীর দিকে, আর পলক ফেলতে না ফেলতেই সব সে দেখে নিয়েছে। দেখে নিয়েছে দুপুরের খাওয়া সেরে ঘর প্রায় অন্ধকার করে তার দেয়ালঘেঁষা খাটে শুয়ে সে ঘুমোচ্ছে কাত হয়ে। নদীর সঙ্গে অনেক দিনের চেনা বলেই শিয়রের জানলাটা বন্ধ করেনি যদি নদী মাঝে-মাঝে পাঠায় তার স্নেহশ্বাস। চোখের একটি কণিকাতেই সে দেখে নিয়েছে, সোহিনী শাড়ির পাড় থেকে বালিশে এলানো ভেজা চুলের কাঁড়ি। কিন্তু

সোহিনীর পাশে শুয়ে আরেকটি যে মেয়ে—ঐ মেয়েটি কে? ঘুমুচ্ছে না, একটা পাতাখসা ঢিলেমলাট বাঙলা উপন্যাস পড়ছে, তার মানে ঘুমব-ঘুমব করছে। আসানসোলে সোহিনীর দিদিকে দেখেছিল, এ কি তবে তার ছোট বোন, নাকি মফস্বলের ঠাণ্ডা মেয়ে, পাড়াসুবাদের বন্ধুনী?

প্রথমে কিছু খানিকটা দিল রিকশাওলার হাতে। এটা কী? চড়, না, লাথি? খ্যাক খ্যাঁক করে উঠল রিকশাওলা। পারে ত পয়সাগুলো সোয়ারির মুখের উপর ছুঁড়ে মারে, নয় ত বা নর্দীর দিকে। এত দৌড়ঝাঁপ করে এত কাণ্ডের পর বাড়িতে নিয়ে এল—এই মাথাভাঙা রোদ্দুরে—তারপর কিনা এই বিবেচনা, এই ব্যবহার? তুমুল তোলপাড় করতে লাগল রিকশাওলা।

তবু, সুপ্রভাত লক্ষ্য করে দেখল, বাড়িঘর যেমন নিসাড় তেমনি নিসাড়।

"এত হৈচৈ করছ কেন? দেখ না কত দিই? এক খাবলায় কি সমস্ত ওঠে?"

এবার যা দিল, যা রিকশাওলা চেয়েছিল তারও চেয়ে কিছু বেশী। হিসেবে কিছু ভুল হল কি না চোখ বড় করে ভাবছিল রিকশাওলা, সুপ্রভাত বললে, "ঠিক আছে। রোদে কি মেহনত হল বল ত তোমার? ঐ যে সামান্য একটু বেশী, এ তোমার বকশিস।"

এ যে না চাইতেই জল নয়, ফসল। প্রাপ্যেরও অতিরিক্ত, এ রিকশাওলার কল্পনার বাইরে। মুহূর্তে তার মনের বদল হয়ে গেল। বললে, "চলুন, আপনার বাক্সটা বাড়ির রোয়াক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি। সবাই বুঝি আরামে ঘুম মারছে। কি, খুব কষে নাড়ুন না কড়াটা।"

"আহা, ঘুমুচ্ছে ঘুমুক, কতক্ষণ ঘুমুবে?" রিকশাওলার মধ্যে নতুন মনের স্বাদ পেয়ে সুপ্রভাত হঠাৎ প্রশ্ন করল: "তোমার নাম কী?"

"আমাদের আবার নাম!" কথাটা চাপা দিল রিকশাওলা। বললে, "আবার স্টেশনে ফিরে যাবার জন্যে রিকশার দরকার হবে?"

"হবে। কালই ফিরব।"

"কখন ফিরবেন, কোন্ ট্রেনে? আমায় বলে দিন আমি এসে ঠিক নিয়ে যাব।"

"মোটে এক রাত্রির মামলা। কাল সকাল বেলা ফার্স্ট ট্রেনেই ফিরব।"

"ফার্স্ট ট্রেনে? সে ত মাছতরকারির ট্রেন। সেটা সুবিধের হবে না, সেকেণ্ডটাতে যাবেন।"

"না, দেরি করবার সময় নেই। আমার শুধু অদ্য-রজনী।" নিজের মনেই হাসল সুপ্রভাত: "ভোর না হতেই পলায়ন।"

"ঠিক আছে। রাইট টাইমে আমাকে হাজির পাবেন দরজায়।"

"তোমার নাম কী এবার বল।"

"নাম?" লাজুক হাসিতে প্রীতির রস মিশিয়ে রিকশাওলা বললে, "আমার নাম গফুরালি। নাম আপনার কষ্ট করে মনে রাখতে হবে না, করেক্ট টাইমে আমি ঠিক আসব দেখবেন গাড়ি নিয়ে। আদাব।"

নিজের মন অমৃতে ভরে আছে বলেই না রিকশাওলাকে আনন্দ পৌঁছে দিতে ইচ্ছে হল। ভাগ্যের হাতে নিজের পাওনার বেশী পেয়েছে বলেই না ইচ্ছে হল রিকশাওলাকেও তার পাওনার বেশী পাইয়ে দিই। আমিই তার সৌভাগ্যের রূপ ধরি। এককণা আনন্দের দামে তার এক মুহূর্তের মন, এক ইতিহাসের সাম্রাজ্য, সাফকবালায় কিনে নিই।

যেতে-যেতে গফুর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আরেকবার, ভদ্রলোক দরজা এখনও খোলা পেল কিনা। কতক্ষণ অমনি দাঁড়িয়ে থাকবে বাইরে?

২

কতক্ষণ রাখবে দাঁড় করিয়ে? দেখি না তোমার ঘুম ভাঙে কি না।

সোহিনীর গায়ের অনেকখানি ধরে ঠেলা মারল পরমা: "ওলো, ওঠ্, কে যেন এসেছে।"

"কোথায়? ঘরে?" ঘুমের অন্ধকার থেকে বললে সোহিনী।

"নারে, বাইরে।"

"চোর?"

"তোর মুণ্ডু। মনে হচ্ছে কোন অতিথি-আত্মীয়। ভরদুপুরের ট্রেনটিতে এসেছে। একটা রিকশারও যেন আওয়াজ পেলাম—"

"অতিথি-আত্মীয় ত দরজার কড়া নাড়ে না কেন?" সোহিনী পাশ ফিরল। শুধু পাশ ফিরল নয়, ঘুমের নির্বিঘ্নতায় প্রশস্ত হল।

"ঐ!" উপুড় হয়ে দু কনুয়ের উপর ভর রেখে কান খাড়া করল পরমা: "জুতোর পায়চারি শুনেছিস না?"

"তারপর বুঝি গানের গলাসাধা শোনাবি। রক্ষে কর বাপু, একটু ঘুমুতে দে। তোর নিজের যদি না আসে, হাতপাখাটা আছে, একটু হাওয়া কর।"

"কিন্তু সত্যি করে বলু," গায়ের উপর পড়ে জোড় করে সোহিনীর চোখ খোলাল পরমা: "একটা মানুষের চলাফেরা তুই শুনতে পাচ্ছিস না?"

"কতক্ষণ চুপচাপ থাক্, তুইও আর শুনতে পাবি না।" গালের নীচে হাত রেখে কাত হয়ে আবার চোখ বুজল সোহিনী: "নইলে এখন উঠে অতিথি সৎকার করতে গেলেই হয়েছে। ঘুমকে ঘুম নষ্ট, সৎকারকে সৎকার!" হাঁটু দুটো একত্র সঙ্কুচিত করে গলাটা উঁচু করে রইল: "পাইচারিটা থেমে গেলে খবর দিস?"

এ একটা কথা হল? এক পায়ে হাল্কা লাফ দিয়ে নেমে পড়ল পরমা। রাস্তার দিকের জানলার দু পাল্লার মাঝখানে যে ফাঁক আছে, তাতে চোখ রাখল।

ছিটকে চলে এল খাটের কাছে। উত্তেজিত হয়ে বললে, "মাইরি, একজন ভদ্রলোক—"

"কত বয়স হবে?"

"ছোকরা-ছোকরা। তোর পাশে দাঁড়ালে বেশ মানাবে।"

"তাহলে তোর পাশে দাঁড়ালেও।" এত সব তর্কতথা বলছে, তবু চোখ মেলছে না সোহিনী। "যে পাশে দাঁড়ায় সেই মানিয়ে যায়। যে যোগী হয়ে আসে সেই ভোগী হয়ে দেখা দেয়। পাশে দাঁড়িয়ে সব ভদ্রলোকই ছোকরা-ছোকরা।"

"চোখে চশমা আছে।"

"তা হলে নীলুদা নয় ত?" এবার কি চোখ মেলল সোহিনী?

"আহা, তোর নীলুদাকে যেন আমি চিনি না!" দাঁড়া, জানলার ফাঁকে আবার চোখ রাখল পরমা। পরমুহূর্তেই ফিরে এসে বললে, "পকেটের রুমাল কখন শেষ হয়ে গিয়েছে, কোঁচাতেও আর কুলোচ্ছে না—"

"কোঁচা? প্যাণ্টকোট নয়?"

"এখন সুটকেস থেকে তোয়ালে বের করে সবিস্তারে ঘাম মুছছে।"

"ব্লাডপ্রেসার আছে বোধহয়।" ঘুমের রেশটুকু আবার ধরতে চাইল সোহিনী: "জিজ্ঞেস করে দ্যাখ ত বাবার কাছে কোন রুগী কি না।"

ওদের বাড়ির লোক, তা কিনা পরমাকেই জিজ্ঞেস করতে হবে। কিন্তু কী করা যায়, অলস ভিতু মেয়েকে যখন বন্ধু করেছে তখন তার দায়িত্ব একটু না নিয়ে উপায় কী!

আধখানা জানলা খুলে পরমা জিজ্ঞেস করল, "কাকে চান।"

"সোহিনী আছে? সোহিনী?"

জানলা থেকে তাড়াতাড়ি সরে গেল পরমা। যখন কোন উত্তর দিল না, তার মানেই আছে। কিন্তু বহালতবিয়তে আছে কি না বোধহয় এটুকুই গেল খোঁজ করতে।

দু হাতে প্রবল নাড়া দিল ঘুমন্তীকে। "ওলো, ওঠ্, তোর কাছে এসেছে। তোকে চায়।"

ভয়ে মুখ পাংশু হয়ে গেল সোহিনীর। এলোমেলোকে তাড়াতাড়ি যা হক গুছিয়েগাছিয়ে দাঁড়াল গিয়ে জানলায়। নিমেষে কণ্ঠস্বরও বিবর্ণ হয়ে এল: "এ কী তুমি? এই অসময়ে?"

ওপার থেকে উত্তর এল: "হ্যাঁ, একটা খবর আছে।"

তবু তক্ষুনি-তক্ষুনি, দরজা খুলছে না সোহিনী। তবু, তার মতে, এখনও যেন অসময়। খবর ছিল, একদিন পরে বললেই ত হত।

কিন্তু কে জানে কী খবর! এমন হয় ত খবর যে এক-দিনেরও তর সয় না। ভয়ের আবার একটা কালো ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়ল সোহিনীর উপর।

কানের কাছে মুখ আনল পরমা: "এ তোর সুপ্রভাত না?"

মুখ টিপে হাসল সোহিনী: "হ্যাঁ, সন্ধিপ্রহর।"

"তবে দরজা খুলে দিচ্ছিস না কেন?"

"দাঁড়া, দিচ্ছি।"

নিজেকে, এরই মধ্যে, টুকটাক পরিপাটি করছে। যতদূর সম্ভব শ্রী আর শালীনতা আনছে পোশাকে। অসময়ে এসেছে কেন তারই যেন শোধ তুলছে, শাসন করছে।

তুই একটা কী সোহিনী! পরমা মনে মনে ধিক্কার দিয়ে উঠল। কোথায় উত্তাল হয়ে দরজা খুলে দিবি, হাত ধরে টেনে আনবি ঘরের মধ্যে, তা নয়, চুল ঠিক করছিস, আয়নায় মুখ দেখছিস। সব সময়েই তোর হিসেব, ফলটা দেখে নিয়ে অঙ্ক কষা, নীচের অন্ধকারটা বুকে নিয়ে সিঁড়ি ভাঙা। কোথাও তোর যেন একটু অসতর্ক হবার সুখ নেই। একমাত্র যে অসময়ে আসতে পারে জীবনে, সেই এসেছে তোর দুয়ারে, দেখিস তোর যেন না চলে যায় সুসময়।

পরমার ইচ্ছে হল, দু হাতে নিজেই খুলে দেয় দরজা। অসময়ের আগন্তুককে অভ্যর্থনা করে।

যার অসময় বলে কিছু নেই তার এক নাম মৃত্যু, আরেক নাম বুঝি প্রেম। সে নিয়ত বাসিন্দে নয়, সে আগন্তুক। সে নবাগত।

ভদ্রলোককে কেমন না জানি দেখতে! একনজরে তখন যেন কিছুই দেখা হয়নি। কে লোক দেখে, কে বা ভদ্রতা— প্রেমের ক্ষেত্রে শুধু প্রেমকে দেখ। আকাশভরা রোদ্দুরকে দেখ। বন্ধ দরজার বাইরে দেখ নিশ্চল প্রতীক্ষাকে।

ছিমছাম ভদ্র সাজল সোহিনী, প্রায় যেন অপরিচিত। ধীরে ধীরে, একটুও প্রায় শব্দ না করে, দরজা খুলল।

"বাবাঃ, কতক্ষণ লাগে তোমার দরজা খুলতে!" সুটকেসটা হাতে নিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল সুপ্রভাত: "শিগগির এক গ্লাস জল খাওয়াও।"

"এ বেয়াড়া ট্রেনটায় এলে কেন?" সোহিনী তবুও আপত্তি করতে ছাড়ে না।

"আর বেয়াড়া! বিষয়টাই ত তাই আগাগোড়া।" যেন তৃষ্ণার কথা ভুলে গিয়েছে এমনি তৃপ্তিতে বললে সুপ্রভাত: "ফার্স্ট ট্রেন ধরব বলেই বেরিয়েছিলাম বাড়ি থেকে। ধরতামও। কিন্তু স্টেশনে পৌঁছেই মনে পড়ল হঠাৎ, ইস, জিনিসটা ত নিয়ে আসিনি সঙ্গে করে! যদি জিনিস না দেখলে বিশ্বাস না কর। তাই ফের ফিরলাম বাড়ি। জিনিস নিয়ে আবার যখন এলাম স্টেশনে, তখন নিদারুণ ভাগ্য, দ্বিতীয় ট্রেনটা বেরিয়ে যায়নি।"

কী জিনিস? আশ্চর্য, জানতে চাইল না সোহিনী। শুধু বললে, "আগামীকাল বিকেলেই ত দেখা হতে পারত কলকাতায়।"

"আগামী কাল? আজকের দুপুরের কাছে আগামী কালের বিকেল! হাতের পাখির কাছে ঝোপের পাখি! আজকের দুপুরটা আছে বলেই ত আগামী কালের আশা। কী বল, জামাটা খুলে ফেলি?" বলার অপেক্ষা না করেই সুপ্রভাত গা থেকে ঘামে-সপসপ জামাটা খুলে ফেলল।

ভঙ্গি একেবারে জয়ীর মত। খাটের পাতা বিছানার এক-ধারেই বসে পড়ল। ভাবখানা এমন, শেষ গেঞ্জিটাও বুঝি খুলে ফেলে!

কিন্তু পরমা—পরমা কাছে আছে বলেই রক্ষে।

বিছানাটায় অসংস্কৃতির চিহ্ন বর্তমান—এই ভেবে মনে-মনে কুণ্ঠিত হল সোহিনী। একেবারে সময় দিতে চায় না, এমন দুর্দান্ত হলে কি চলে? যেটুকু সময় পেয়েছে নিজেকেই শোধন করেছে, বিছানাটার মার্জন হয়নি। পরমাও ত তাড়াতাড়ি একটু টান করতে পারত চাদরটা।

চমৎকার হবে। বাবা-মা সব আত্মীয়স্বজন এসে দেখুক ভরদুপুরবেলায় কে এক অপরিচিত যুবক তার ধামসানো বিছানার উপর খালি গায়ে বসে আছে।

"একটা পাখা নেই?" ঘরের চারদিকে ক্ষিপ্রচোখে তাকাল সুপ্রভাত। দেখল, বিজলীর আলো আছে কিন্তু পাখা নেই। পয়েণ্ট থাকলেও বসেনি এখনও। পুবের জানলা দিয়ে তাকাল নদীর দিকে। নদী নির্নিশ্বাস। নদী নিরর্থক।

সোহিনীর দিকে হাত বাড়াল সুপ্রভাত। বললে, "একটা হাতপাখা নেই?"

পিছনে, বিছানার উপরেই পড়ে ছিল। সোহিনী পরমার দিকে ইঙ্গিত করল: "দে ত পাখাটা।"

তখন থেকে, জল দেয়নি এক গ্লাস। এখন একটু পাখা করতে নারাজ। কুঁজো না হয় দেখতে পাচ্ছি না ঘরে, কিন্তু পাখাটা ত খানিক আগেই হাতের মুঠোতে ধরা ছিল। একটু হাওয়া করতে পারত ত অন্তত। এ কেমনতরো শালীনতা!

পাখাটা কুড়িয়ে নিল পরমা। নিজেই হাওয়া করতে লাগল সুপ্রভাতকে।

"ছি, ছি, আপনি কেন?" বাধা দিতে গেল সুপ্রভাত, কিন্তু বাধায় হটবার মতন নয় কখনও পরমা। আরও জোরে সে পাখা চালাতে লাগল। আরও জোরে। সোহিনীর সমস্ত নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ প্রতিবাদে। শ্রান্তের প্রতি যত না সেবা, অকর্মার প্রতি তত তিরস্কার।

"ইনি কে সোহিনী?"

"আমার বন্ধু, পরমা। বি-এ।"

"উপাধি দিয়ে বলার কী দরকার!" পাখা করতে-করতে বললে পরমা, "বল্ না পাড়ার মেয়ে। ছেলেবেলার সই।"

পরমার পরিচয় কত সহজেই দেওয়া গেল। কিন্তু

সুপ্রভাতের পরিচয় পরিবারের মধ্যে কী ভাবে সে ঘোষণা করে! এত তাড়াহুড়ো করলে কি চলে! বলাকওয়া নেই, গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজা নেই, একেবারে সটান এসে হাজির। আসরে গান ধরবার আগে তবলায় খানিক হাতুড়িও ত ঠুকতে হয়। সোহিনীকে ত একটু সময় দিতে হয় তা-না-না-না করতে। প্যাঁচ না কষেই কুন্ঠিত। সুপ্রভাত সরকার, এম-এ, এককালের নামজাদা কলেক্টর দ্বিজপদ সরকারের ছেলে, অমুক রাস্তায় অমুক নম্বরের বাড়ি—বললেই মা-বাবা যথেষ্ট মানবে? অনেক কথাই কি অনুক্ত থাকবে না? কতদিনের আলাপ, কোন্ সাহসে বাড়ি চড়াও হয়েছে, কী তার মতলব, এসব প্রশ্ন কি চাইবে না উঁকি মারতে? কতক বলে কতক চেপে গিয়ে সব কথা কি সমীচীন ভাবে বোঝাতে পারবে? আর যাকেই হক, মাকে ফাঁকি দেওয়া চলবে না। আর, ধরা পড়ে গেলেই মার ধারাল চোখ বলে বসবে, ছি ছি, তোর পেটে এত! আমাকে লুকিয়েছিস এতদিন?

একদিন জানাতে ত হতই। সে-কথারও একটা স্থান-কাল ছিল, ঝাড়াই-বাছাই ছিল। ঢাকঢোল পিটিয়ে প্ল্যাকার্ড মেরে এমনিভাবে রাষ্ট্র করার মধ্যে কোন ছন্দ নেই, সুষমা নেই। এমন ভরদুপুরে বেআব্রু হওয়ার মধ্যে।

কেন নেই? পরমা ঐ যা বললে, উপাধি বাদ দিয়ে সারটুকু বললেই ত হয়। বললেই ত হয়, আমার বন্ধু। আমার মনোনীত।

কথা শুনে মা ঘরের ঘুপচি কোণে মুখে কাপড় দিয়ে কাঁদতে বসবেন, আর বাবা, বাবার যা মুখ খারাপ, বলে উঠবেনঃ ধাপ্পাবাজ।

দিব্যি গুছিয়ে-গাছিয়ে এনেছিল, সব তছনছ করে দিল। পাড়ের কাছে ভিড়েছিল প্রায় নৌকো, হড়বড় করে ডুবিয়ে ছাড়ল। খোলা পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে কেউ যদি হঠাৎ উদ্দাম নাচতে শুরু করে, নৌকো বাঁচে কী করে?

"যাই, মাকে বলি গে—" অগত্যা না বলে উপায় কী সোহিনীর?

তুই একটা কী! পরমার কালো চোখের বাঁকা কটাক্ষ সোহিনীকে ধিক্কার দিয়ে উঠল। তুই নিজে এই অবস্থাটা সামলাতে পাচ্ছিস না? ছুটেছিস মার সঙ্গে রফা করতে? কিসের রফা? কিসের বোঝাপড়া? তুই তোর নিজের দাবিতে তোর ডিক্রি হাসিল করে নে। তারপর সেই ডিক্রি জারি করে নিয়ে নে তোর খাসদখল।

তুই স্বাধীন না? সাবালিকা না? তুই না কলকাতার ইস্কুলের এক শিক্ষিকা? নিজের পায়ে দাঁড়ান রোজগেরে মানুষ?

সামান্য রোজগার। ট্রেনিং পাস করে কলকাতার কর্পোরেশনের স্কুলে টিচারি করি। থাকি মেয়েদের একটা আধা-ছাত্রী আধা-কেরানি মেসে। নিজের খরচখরচা বাদে কী বা বাঁচাতে পারি বল। কটা টাকাই বা মাকে পাঠাতে পারি মাস-মাস? আমার টাকার উপর পরিবার নির্ভর করে নেই, দেখতেই পাচ্ছিস, আমাদের এমন কোন অভাবের সংসার নয়। তাই আমি কবেই ছাড় পেয়েছি বিয়ে করার। আমার মা-বাবা জানেন আমার নিজের একটা মত আছে, আর আমিও জানি আমার মা-বাবার একটা মন আছে। তাই ওঁরা যদি নির্বাচন করেন সেটা আমার মতের বিরুদ্ধে হতে পারবে না, আর আমি যদি নির্বাচন করি, আমি দেখব, সেটা তাঁদেরও মনোগত হয়। মতে-মনে সংঘর্ষ না হয় সেইটাই দেখা দরকার। সেইটেই আমি দেখতে চেয়েছি বরাবর। কিন্তু এখন সব প্রায় ভেস্তে যাবার সামিল।

আমি যদি জোর করে বলি ঠিক হচ্ছে আর মা-বাবা যদি জোর করে বলেন ঠিক হচ্ছে না, তা হলেই ত সংঘর্ষ। যা এড়াতে চাই তাইতেই জড়িয়ে পড়া।

এড়াতেই বা চাইবে কেন? যা সত্য তাই উজ্জ্বল তাই পবিত্র। সত্যের জন্যে ছাড়তে পারবে না মা-বাপ? যদি পারত বলে উঠত পরমা।

কী সত্য কে জানে, পালটা জবাব ছিল সোহিনীর, তবে আত্মসুখই সত্য নয়। আত্মসুখেই সুখ নেই। আমার যে সুখ অন্যকে আহত করে, অন্যের শুভসমর্থন কুড়িয়ে আনতে পারে না, তা আমাকে স্বস্তি দেয় না। আর সে-সম্ভোগে সুখ কোথায় যে-সম্ভোগে স্বস্তি নেই?

মিথ্যে কথা। যদি পারত ঝঙ্কার দিয়ে উঠত পরমাঃ কাউকে-না-কাউকে বঞ্চিত না করে লাঞ্ছিত না করে সাধ্য নেই তুমি সুখী হও। তোমার সুখ মানেই কোথাও না কোথাও আর কারু দুঃখ।

"যাই, মাকে ডেকে আনি—" আরেকবার বলল সোহিনী।

"এক গ্লাস জল নিয়ে আসিস।" মনে করিয়ে দিল পরমা।

গলা ত সোহিনীর নিজেরই শুকিয়ে যাচ্ছে, পেলে সেই আগে কেড়ে খায়। কিন্তু খবরটা মাকে বললে মারও তেষ্টা পেয়ে যাবে। পাট-ওঠা সংসারে আগন্তুক অতিথিকে নিয়ে কী বিড়ম্বনায় পড়তে হবে না-জানি। এমন একটা সময় বিকেলের চা দেওয়া যায় না, দুপুরের ভাত ত দূরস্থান। আর বাবা বেচারীর দুপুরের এই একটু তন্দ্রা, এটার অকালমৃত্যু ঘটবে। যেখানে ভালবাসা সেখানে কেন এই অকারণ রূঢ়তা এই ছন্দ-ভ্রংশ? সুন্দর একটি সুনীতি বজায় রেখে কেন হতে পারে না এর প্রস্ফুটন?

হঠাৎ খোলা দরজা দিয়ে বাইরে নজর পড়ল সোহিনীর। রৌদ্রদগ্ধ হাহাকারের শূন্যতায় হঠাৎ একটা সান্ত্বনার ছায়া! সাইকেলে একটা লোক।

আর কে! নীলুদা!

"এ কী, নীলুদা, তুমি কোত্থেকে?" দরজার কাছে উথলে এল সোহিনী।

"আমিও যে এলাম এই ট্রেনে—" কী কতগুলি জিনিস এনেছে সাইকেলে বেঁধে তাই খোলবার চেষ্টা করতে লাগল নীলাদ্রি।

সোহিনী ছুটে চলে এল বাইরে। দড়ির বাঁধন আলগা করতে পারে এমন তার সাধ্য নেই, তবু সামনে গিয়ে দাঁড়াল। যেন সামনে দাঁড়ানটাই বাঁধন খোলার সাহায্য। বললে, "এসব কী এনেছ নীলুদা?"

"দুটো ডাব।" বাঁধন খুলতে পেরেছে নীলাদ্রি।

"ডাব? ডাব দিয়ে কী হবে?"

"কী আবার হবে? খাবে।"

"কে, আমি?"

"তোমাকে যদি দেয় তবে তুমিও।" নীলাদ্রি প্রায় শাসনের সুরে বললে, "বলি, ভদ্রলোক উঠেছেন ত তোমার এখানে? কই, কোথায়?"

মুহূর্তে পাংশু হয়ে গেল সোহিনী। অতর্কিতে আবার চোখের সামনে ভয় দেখল, কালো ঠাণ্ডা ভয়। ভালবাসার জানলা খুলে তাকালে ভয় ছাড়া আর কিছুই কি চোখে পড়বার নয়? দূরে কোথাও কি একটা তারা নেই, পাহাড়ের চূড়া নেই, শুধুই কি পায়েহাঁটা মরুভূমির মাঠ?

"কে ভদ্রলোক?" মেয়েলি অভ্যাসবশে তবু জিজ্ঞেস করল সোহিনী।

"বা, রাস্তায় দেখা হল যে। চারদিকে শুধু তোমাকে খুঁজছেন, অজানাকে। গরমে-ধুলোয় একেবারে হাক্লান্ত।

ভাগ্যিস দেখা হয়ে গেল আমার সঙ্গে, অনায়াসেই দেখিয়ে দিলাম পথ। নইলে গোলোকধাঁধায় কতক্ষণ যে ঘুরতে হত তা কে জানে?” দিব্যি প্রশান্তমুখে হাসল নীলাদ্রি।

আশ্চর্য, একেবারে রব তুলে এসেছে। পাণ্ডলাইট জেলে, ব্যান্ড বাজিয়ে। সদর-মফস্বল সর্বত্র সচকিত করে। এমনকি, নীলুদার হাতেও পৌঁছে দিয়েছে হ্যান্ডবিল। শুধু দেখা দিয়ে আসেনি, একেবারে চেনা হয়ে এসেছে। শুধু একটিমাত্র জিজ্ঞাসায় জানিয়ে দিয়ে এসেছে হৃদয়ের আদিম সম্ভাষণ!

বুকের দুরুদুরু চেপে রাখবার চেষ্টায় সোহিনী বললে, “ওটা আবার কী?”

“চেন না জিনিসটা? টেবলফ্যান।” দড়ির বাঁধন থেকে মুক্ত করে নীলাদ্রি বললে, “এটা যোগাড় করতেই ত দেরি হয়ে গেল। প্লাগ-পয়েন্ট আছে না?” বলে ফ্যান নিয়ে ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকল। যেন প্রায় কলম্বসের আবিষ্কার এমনি উল্লসিত হয়ে বললে, “আছে। আমার ধারণা ভুল হবার নয়।”

একটা উঁচুমতন টুল যোগাড় করে তাতে বসিয়ে দিল ফ্যানটা। কোন গভীরে ক্ষুদ্র একটি স্পর্শের সঞ্চার হল, হুহু শব্দে ঘুরতে লাগল ফ্যান। নির্জীব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। হাওয়ার ঢেউ ডুবিয়ে দিল সুপ্রভাতকে।

পাখাটা তারই উদ্দেশে, তারই দিকে তাক করা, সুপ্রভাত একটু লজ্জিত বোধ করতে চাইল। কিন্তু লজ্জা একটা কুসংস্কার ছাড়া আর কী! আর তা ছাড়া সুখ মানেই ত নির্লজ্জতা। সংসারে বিধাতা একেকজনকে এমন কদর্যভাবে সুখী করেন যে, লজ্জা বলে কিছু থাকলে নিজেই মুখ লুকতেন।

যাক, অন্তত গা থেকে গেঞ্জি খুলে ফেলার লজ্জা থেকে বাঁচা গিয়েছে।

“আঃ—” হাওয়া খাচ্ছে সুপ্রভাত, আর আরামের আওয়াজ তুলল নীলাদ্রি। যেন অতিথি ঠাণ্ডা হলে সেও ঠাণ্ডা।

কত আর বওয়াবে নীলাদ্রিকে দিয়ে, ডাব দুটো সোহিনীই নিয়ে এল হাতে করে।

পকেট থেকে ছুরি বের করল নীলাদ্রি।

“পকেটে ছুরি নিয়ে বেড়ান নাকি?” হাতের পাখা বন্ধ হয়ে যাবার কথা, সেটা এখন দু পা এগিয়ে এসে নীলাদ্রির প্রতি প্রয়োগ করলে পরমা।

“না, না, আমি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র।” যেন অপরাধীর মত বললে নীলাদ্রি, “শুধু ডাবের মুখটা ছাড়াবার জন্যেই সাময়িক প্রয়োজনে নিয়ে এসেছি দোকান থেকে। আর কোন মহৎ প্রয়োজন এর নেই।” পরমার হাওয়াটুকু সে গায়েও মাখল না। বললে, “তা ছাড়া সম্বল থাকলেই কি সব সময়ে তা মহৎ প্রয়োজনে লাগান যায়?”

ছুরি দিয়ে মুখটা খানিকক্ষণ চাঁছল। তারপর ফলাটা বিদ্ধ করে দিল ভিতরে। সোহিনীর মনে হল জল নয়, রক্ত বেরিয়ে আসবে বোধ হয়। টাটকা লাল রক্ত।

খাটের পাতা বিছানার একধারেই বসে পড়ল

"এ কে খাবে?" খাটের উপর পা তুলে মৌরশী হয়ে বসেছে, প্রশ্ন করল সুপ্রভাত।

"যিনি তৃষ্ণার্ত তিনি খাবেন।" নীলাদ্রি সুপ্রভাতের দিকে ডাবটা হাসিমুখে বাড়িয়ে ধরল।

"ডাব খেলে তৃষ্ণা যায় নাকি? আমি এক গ্লাশ ঠাণ্ডা সাদা জল চাই।"

"জল আসছে। তার আগে ডাবটা খেয়ে ফেলুন। এটা খাবেন ওষুধ হিসেবে, শরীর ধাতস্থ করতে। নিন ধরুন, রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি ত আর কম করেননি।"

যেন একা সুপ্রভাতই ঘুরেছে। তবু ত রিকশার মাথায় ঢাকনি আছে, কিন্তু সাইকেল?

দ্বিতীয় ডাবটার দিকে করুণ চোখে তাকাল সোহিনী। নীলাদ্রিকে লক্ষ্য করে বললে, "ওটা তুমি নাও।"

"পাগল, না, মাথাখারাপ! আমি কি কখনও ক্লান্ত হই, না, দগ্ধ হই?" নীলাদ্রি এগুলো সুপ্রভাতের দিকেঃ "কী, গলা উঁচু করে খেতে পারবেন না?" বলেই বুঝতে পারল ভঙ্গিটা শিষ্ট হবে না, সুশালীন হবে না। "কিন্তু স্ট্র এখানে কোথায় পাব?"

"খড়কুটো চাই না। একটা কাচের গ্লাস হলেই যথেষ্ট।" হাসল সুপ্রভাত।

"হ্যাঁ, গ্লাস, কাচের গ্লাস। গ্লাসই ভাল। নিঃশেষে উপুড় করে ঢালা যাবে, বোঝা যাবে কতটুকু এর সঞ্চয়।" ব্যস্ত হয়ে পরমার হাতে ডাবটা সমর্পণ করে নীলাদ্রি নিজেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করল।

সোহিনীকেই উচিত ছিল পাঠান। কিন্তু, আহা, থাক, তাকে ঠাঁইনাড়া করে লাভ কী! এত সব ঝক্কি পোয়াবার মত তার কি কায়দাকানুন জানা আছে! অনর্থক হাঁসফাঁস করে মরবে। কী বলতে কী বলবে, কী ধরতে কী ফেলবে তার ঠিক নেই। যতক্ষণ পারে, থাক্ ফাঁকায়-ফাঁকায়। থাক্ কাছাকাছি।

খাবার আগে পরমাকে উদ্দেশ করে বললে, "ধর, লক্ষ্মণ হয়ে থাক কিছুক্ষণ।"

নীলাদ্রি সটান চলে এল শৈলবালার ঘরে।

"কী করছেন মাসিমা?"

বাসি খবরের কাগজটাকে বিছানার চাদর করে শৈলবালা নাক ডাকাচ্ছেন।

দেয়ালে ফোটান তাকের উপর কটা পেয়ালা ডিশ কাচের গ্লাশ সাজান। সংসারের এজমালি বাসনের এরা সগোত্র নয়। এরা আলাদা, কুলীন। এরা যত না বাসন তত আসবাব। মধ্যবিত্ত শৌখিনতা। এদের ধ্বনিও আলাদা। পিরিচে চামচের শব্দ, ক্ষুধার্ত হৃদয়ের কাছে নতুন এক রোমাঞ্চের সুর।

একটা গ্লাস তুলতে গিয়ে একটা পেয়ালা ছিটকে পড়ল মাটিতে।

"কে?" চোখ গোল করে তাকালেন শৈলবালা। ঘুমের ঘোর তবু কাটেনি বোধ হয় এমনি অদ্ভুত সেই ভঙ্গিঃ "সে কী? তুমি? নীলু? তুমি কোত্থেকে?"

"কাঁচড়াপাড়া থেকে।"

"তা ত জানি। কিন্তু এখানে, এই ঘরের মধ্যে কিসের জন্যে?" সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসলেন শৈলবালা।

"কাচের গ্লাস নিতে এসেছি।" পায়ের কাছে পেয়ালার ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে নীলাদ্রি বললে, "হাতে আলগোছে এমনিতে উঠে এলেই হয়, তা নয়, পাশের নিরীহ চুপচাপ পেয়ালাটাকে না ফেলে না ভেঙে না গুঁড়ো করে ছাড়বে না।"

"কাচের গ্লাস দিয়ে কী হবে?"

"বাড়িতে ভদ্রলোক অতিথি এসেছেন, ডাব খাবেন।"

"কে অতিথি?" তক্তপোশ থেকে নেমে পড়লেন শৈলবালাঃ "নাম কী? থাকেন কোথায়?"

"যতদূর বুঝতে পারছি, কলকাতায়। নাম? নাম অবান্তর।"

কৌতূহলে তীক্ষ্ন হলেন শৈলবালাঃ "তুমি চেন না?"

"আগে চিনতাম না, এখন যেন চিনি-চিনি মনে হচ্ছে!" সাদা সুস্থ দাঁতে হেসে উঠল নীলাদ্রি।

"উনি কোথায়? ও'কে খবর দাওনি?" শৈলবালা স্বামীর ঘরের দিকে লক্ষ্য করলেন।

"আপনাদের কারু কাছে আসেননি। এসেছেন সোহিনীর কাছে।"

"কার কাছে?" কথাটা যেমন খারাপ, সুরটাকে তেমনি কর্কশ করলেন শৈলবালা।

"সোহিনীর কাছে।" একটু বা গম্ভীর হল নীলাদ্রিঃ "সোহিনীর কলকাতার কোন বন্ধু!"

"কলকাতার বন্ধু?" দিনে-দুপুরে শৈলবালা যেন ভূত দেখলেন, ভয়ে এমনি ম্লান হয়ে গেল তাঁর মুখ। ডাকাত পড়লে প্রতিবেশীদের ডাকা যেত, এখন কাকে ডাকবেন ভেবে পেলেন না। এখন বুঝি প্রতিবেশীরাই ডাকাত।

চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়াল নীলাদ্রি। কেন, কলকাতার বন্ধু হতে দোষ কী? সোহিনী যখন কলকাতাতেই থাকে, তখন বন্ধু ত কলকাতারই হবে।

আগাগোড়া সব সময়েই কলকাতা থাকে কোথায়? শনি-রবিবার ত এখানে চলে আসে নিয়ম করে। ছুটিছাটায়ও ত গরহাজির কলকাতা থেকে।

হপ্তায় পাঁচদিন যে নিয়ত বাস করে কলকাতায় তাকে আপনি এখানকার বাসিন্দে বলবেন? তা ছাড়া দু-একটা ছুটি ত মাঝে মধ্যে সফর থেকে বাদ পড়ে। পড়ে না? সে সব বাদের মধ্যেই ত সংবাদের গন্ধ।

কোন কোন ছুটি বাদ পড়েছে মনে মনে হিসেব করতে গিয়ে অন্ধকার দেখলেন শৈলবালা।

সে কি দু-চার মাসের কথা? সেই কবে আই-এ পাস করে কলকাতা গিয়েছে, ট্রেনিং পাস করে নিয়েছে টিচারি। গঙ্গা দিয়ে তারপর কত জল বয়ে গেল, পথ দিয়ে কত মানুষের ভিড়। জলের মধ্য থেকে কেউ একটা ঢেউ কুড়িয়ে নেবে না, ভিড়ের মধ্য থেকে বন্ধু?

কিন্তু বরাবর থেকেছে ত একটা মেয়েদের হস্টেলে। সেখানে কত কড়াক্কড়।

না, তর্ক করতে হয় মাসিমার সঙ্গে। উপায় নেই, ধর-লক্ষ্মণ হয়ে আরও খানিকক্ষণ থাকতে হবে পরমাকে।

হস্টেলে ঢোকা-থাকা নিয়ে কঠোরতা থাকতে পারে, কিন্তু বাইরে পথঘাট বেকড়ার। পার্ক আছে, স্টেশন-প্ল্যাটফর্ম আছে, সিনেমার ম্যাটিনি আছে। রেস্তরাঁ, লেক, ট্যাক্সি। ফণা নামান ফিটন। তারপরে চারিদিকে এই বিশৃঙ্খলা, ছুটোছুটি, এলোমেলোমি। এই যুদ্ধের ব্ল্যাক-আউটের কলকাতা। বিমান-আক্রমণের শেলটার। স্লিট ট্রেঞ্চ।

আমার মেয়ে সে-রকম নয়।

কোন রকম আবার। সব মেয়েই সে-রকম, এক রকম। আমি বলছি, এমত সব অবস্থায় কলকাতায় বন্ধু সংগ্রহ করা আয়াসের নয়। এ নিয়ে আপত্তি করতে যাওয়া অনর্থক। মেয়েকে যখন চরতে দিয়েছেন তখন তাকে ধরতেও দিয়েছেন। আর কখন ফ্লুর মত পান-বসন্তের মত মনের মানুষের ছোঁয়াচ লাগবে কেউ জানে না। আর সে-মানুষের কলকাতা-

হাওড়া নেই, সদর-খিড়কি নেই। শীত-শরৎ নেই। বৃষ্টি হলেই বৃষ্টি। জ্বর হলেই জ্বর।

কিন্তু আমাকে এতদিন এসব বলোনি কেন?

আমাকেই কি বলেছে! এ-সব কি কেউ বলে? এ-সব ক্রমে জানতে পায়। প্রথমে প্রচ্ছন্নে রোপণ, দ্বিতীয়ে গভীরে সঞ্চার, তৃতীয়ে অঙ্কুর। তারপরে যখন পল্লব জাগে তখনই কথা পল্লবিত হতে শুরু করে। শেষকালে যখন ফল আসে তখনই লোকে চরমকে দেখতে পায়। এই চরম দেখাবার জন্যেই হয়ত এসেছে আগ বাড়িয়ে। প্রবলশব্দ পা ফেলে।

এতদূর!

কে জানে হয়ত বা আরও দূর। যতদূরই হক, যখন অভ্যাগত, ভাব করতে এসেছেন, সেবাচর্যা করতে হয় একটু।

"বলে দাও, এসব চলবে না এখানে।" যেন কেউ হাতের বালা ছিনিয়ে নিতে এসেছে এমনি গর্জে উঠলেন শৈলবালা।

"কী সব?"

"ঐ তোমাদের ভাব-টাব চলবে না।" আবার ঝঙ্কৃত হলেন।

"ভাব-টাব বলুন—" হাসতে লাগল নীলাদ্রি। চলে গেল গ্লাস নিয়ে।

যাই, ওঁকে, সোহিনীর বাবাকে বলিগে। কিন্তু তার আগে একটু উঁকি মেরে দেখে যাই কে এল! কে এমন বন্ধু এল বাড়িতে!

পা টিপে-টিপে এগুলেন শৈলবালা। বারান্দায় গিয়ে খোলা জানলা দিয়ে সন্তর্পণে উঁকি মারলেন।

আতঙ্কে মুখ তাঁর কালো হয়ে উঠল।

কেমন গৌরবর্ণ কান্তিমান ছেলে! ছাঁচে ঢালা নয়, হাতে-হেতেরে গড়োপিটে পরিষ্কার করা। নিশ্চয়ই বামুনের ছেলে, তাঁদের আল-এলেকার বাইরে। সন্দেহ কি, এক মাঠের জমি নয়, এক গাছের ছাল নয়। জোড়াতাড়া চলবে না, হবে না এক লপ্ত। কিন্তু এক মন হলে কী না হতে পারে? ভাবলেন একবার শৈলবালা। একমন হলে সমুদ্র পর্যন্ত শুকোয়। শুকোক, কিন্তু জাতের বাইরে বিয়ে হতে পারে না।

তাড়াতাড়ি চলে গেলেন স্বামীর ঘরে।

শিবনাথও ঘুমুচ্ছেন।

হুড়মুড় করে তাঁর গায়ের উপর এসে পড়লেন শৈলবালা। বোঁটা-খসা ফল পাবার জন্যে যেমন শিউলি গাছকে নাড়া দেয়, তেমনি করে তাঁকে দু হাতে ঝাঁকাতে লাগলেন। "ওঠ, ওঠ, বন্ধু এসেছে।"

"কী?" অনেক পরে চোখ চাইলেন শিবনাথ ঃ "বন্দুক নিয়ে এসেছে? কে বন্দুক নিয়ে এল? মিলিটারি?"

"বন্দুক নয়, বন্দুক নয়। আমার পোড়া কপাল! বন্ধু, সোহিনীর কে এক বন্ধু এসেছে।"

"বন্ধু, তা আসুক না!" প্রায় ধমকে উঠলেন শিবনাথ ঃ "পাড়ায় কত তার সই-স্যাঙাত আছে, এসেছে কেউ।"

"মরণ আর কাকে বলে! বন্ধুনি নয় গো, বন্ধুনি নয়, বন্ধু, পুরুষ বন্ধু।"

"তাতে ক্ষতি কী?" পাশ ফিরলেন শিবনাথ ঃ "জন্তুই বন্ধু হয়, পুরুষ বন্ধু হতে পারে না?"

"সে কী বলছ? শেষ পর্যন্ত সোহিনী পুরুষ-বন্ধু করবে?"

"কেন, বাধা কী? নিজের পায়ে চলা স্বাধীন রোজগেরে মেয়ে, সে একটা বন্ধু জোটাতে পারবে না? যদিও পুরুষ শেষ পর্যন্ত জন্তুই হয়ে দাঁড়ায়, গোড়াতে বন্ধুর বেশবাস পরেই দেখা দেয়। দিতে হয়। তাই দিয়েছে।"

"তুমি তোমার মেয়েকে বাঁচাবে না?"

"কত দিক থেকে বাঁচাব? একদিকে বোমা, আরেকদিকে দুর্ভিক্ষ, আবার আরেকদিকে বন্ধু। যে নিজে না বাঁচে সাধ্যি নেই কেউ তাকে বাঁচায়।"

"তাই বলে তোমার বাড়িতে দিন-দুপুরে ও বন্ধু আনবে?"

"রাত-দুপুরে আনলেই বা কী করতে পারতাম!"

"ছি ছি," ধিক্কার দিয়ে উঠলেন শৈলবালা ঃ "তুমি এর একটা বিহিতব্যবস্থা করবে না? কে ঐ ছেলেটা তোমার মেয়ের কাছে এল জানতে পেরেও খোঁজ করবে না তুমি? জিজ্ঞেস করবে না ছেলেটাকে? ও যদি অন্য জাতের ছেলে হয়! নির্ঘাত অন্য জাতের, উঁচু জাতের ছেলে। নইলে অমন ফটফটে রঙ হয়? মসৃচড়া চেহারা হয়? ওগো ওঠ না, একটু আলাপ কর না গিয়ে। কিছু একটা হয়ে-বসলে তাড়াবার উপায় থাকবে না—"

"মেলা ফ্যাচফ্যাচ কর না।" হুমকে উঠলেন শিবনাথ ঃ "ঘুমুতে দাও, আমাকে তিনটের সময় কলে বেরুতে হবে।" আবার পাশ ফিরলেন ঃ "তুমি তোমার মেয়েকে অত বোকা ঠাওরাও কেন?"

"বোকা, সব মেয়েই বোকা। আগুনের কাছে সব ঘি-ই বোকা।" সাহসে ভর করে আবার ঠেলা মারলেন শৈলবালা ঃ "তুমি একটু ওঠ। বন্ধুটাকে তাড়াও।"

গর্জনে যা হয়নি স্তব্ধতায় তা হল। চোখ বন্ধ করে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলেন শিবনাথ।

স্বয়ং মেয়ের দপ্তরেই সামিল হওয়া ভাল। যদি স্বাধীনতার ঝলস দেখাতে চাও মা-বাবার চোখের বাইরে, সমাজের চৌকাঠের বাইরে।

খালি পায়ে ছুটে এল নীলাদ্রি। বললে, "উনুনটা ধরাতে হয় মাসিমা।"

"এই অবেলায়?"

"ভদ্রলোককে দুটো ফুটিয়ে দিতে হয়।"

"কেন, হোটেল নেই শহরে? হোটেলে উঠতে বল না।" বেআন্দাজী জোরে বলে ফেললেন শৈলবালা।

"অতিথিকে কি সেকথা বলা যায়?"

"না যায় ত, তোমার এত যখন দরদ, তখন নিজের বাড়িতে নিয়ে যাও। গেলাও গণ্ডেপিণ্ডে।"

হায়, আমার বাড়ি! আমার কী না আপনি জানেন মাসিমা! কত ছোটবেলা থেকেই জানেন। এই বছর আড়াই কাঁচরাপাড়া রেলোয়ে স্টোর্সে খুদে কেরানীর কাজ করছি, ভাতা নিয়ে মাস-মাইনে এক শ সাঁইত্রিশ টাকা বারো আনা। সুস্থ মানুষ, দু বছর আগে, ভাত খেয়ে আঁচাচ্ছেন, বাবা হঠাৎ পড়ে গেলেন। বাঁ অঙ্গ অবশ হয়ে গেল। দুর্ধর্ষ রুগী নিয়ে সমস্ত সংসার জেরবার। হেসে-খেলে যাচ্ছিল যে নৌকো, চড়ায় ঠেকে প্রায় ডুবতে বসল। ভাই নেই, একপাল বোন, একটারও বিয়ে হয়নি। বড়টা নার্স হতে না পেরে ভ্যাকসিনেটার হয়েছে, সামান্য আয়, দ্বিতীয়টা সেলাইয়ের ট্রেনিং নিয়ে বসে আছে বাড়িতে। আরগুলো ছোট, ইস্কুল থেকে নামকাটা হয়ে ঘ্যানরঘ্যান করছে রাতদিন। তারপর এটার অসুখ ওটার বিসুখ, এটার অমুক জ্বালা ওটার অমুক লজ্জা। চালে-বেড়ায় এত বড় সব ফুটো গোঁজা দিয়েও আর মিল দেওয়া যাচ্ছে না। সেই নিত্য-অভাবের সংসার কি অতিথির জায়গা?

মার চড়া আওয়াজ শুনে সোহিনী বেরিয়ে এল। মার পাশ কাটিয়ে সোজা চলে গেল মার ঘরে। সারা গায়ে রোদের ঝলস দিয়ে। ভাবখানা এই, যা হবার তা হক। যখন বাড়িতেই

এসেছে তখন বাড়িরই দায়িত্ব। রাখতে হলে রাখুক, তাড়াতে হলে দিক তাড়িয়ে। অমন দায়িত্বহীনের মত আসে কেন? এতটুকু গোপনতা নেই শালীনতা নেই। তাড়াহুড়ো করে ব্যস্ত হাতে দরজা-জানলা খুলে ফেলার চেষ্টা। স্ক্রু-কব্জা আলগা হয়ে গেল কি না, খিল-ছিটকিনি ছিটকে পড়ল কি না, সেদিকে নজর নেই। অসহিষ্ণুতার চরম শাস্তি এবার কুড়িয়ে নিক। কোথায় একটি ঝরনার ধারার মত আসবে তা নয়, বন্যার জলের মত এসেছে। আর এমন কাণ্ড, পথ থেকে একেবারে নীলুদাকে নিয়ে এসেছে লুট করে। ছি ছি, নীলুদা ছাড়া যেন আর কারু কাছ থেকে পথের হদিস নেওয়া যেত না। ছোট শহর, নদীর ধারে একটা নতুন বাড়ি, এ বার করতেই নীরপত্রের একেবারে সপ্তদ্বীপ পরিক্রমণ করতে হল। বেশ ত, বাড়ি দেখতে এসেছ, বাড়ি দেখ। বাড়ি দেখে বাড়ি ফের।

"এ ছেলেটা কে?" ঘরে ঢুকে শৈলবালা জিজ্ঞেস করলেন। "কী জাত? বামুন?"

"না। আমাদের জাত।" নতমুখে বললে সোহিনী।

শুধু এটুকুতেই নিশ্চিন্ত নন শৈলবালা। আরও দু-পা কাছে এগিয়ে এলেন। প্রশ্ন করলেন, "ঘর?"

জানি না—এমনি একটা ঝলসানো উত্তর আশা করেছিলেন শৈলবালা। কিন্তু সোহিনী স্পষ্ট চোখের দিকে তাকিয়ে কোণ থেকে একটু ঝিলিক মেরে বলল, "পালটা ঘর।"

বুকের চাপটা খানিক নামল শৈলবালার কিন্তু সহজ নিশ্বাসের জন্যে মুক্ত মাঠের হাওয়া চাই যে। জলের মধ্যে ভাসতে-ভাসতে শুধু একটা খুঁটি পেলেই ত চলে না, পাড়ে যাবার জন্যে নৌকোরও দরকার। অনশনে শুধু খাদ্য জুটলেই চলে না, চাই আবার তা হজম করবার ক্ষমতা। শুধু ঘর হলেই চলে না, চাই আসবাব, চাই চুনকামে চাকচিক্য।

"লেখাপড়া কদ্দূর?"

"এম এ পাস—ফার্স্ট ক্লাশ—"

নৌকো বুঝি এগিয়ে আসছে মাঝ-নদীতে, খুঁটি-ধরা ডুবন্ত লোকটাকে পাড়ে তুলে নিতে। উচ্ছলকণ্ঠে শৈলবালা বললেন, "সোনার টুকরো ছেলে। কার ছেলে? জানিস?"

একটু বিজ্ঞ হাসি হাসল সোহিনী। জানতে পারতপক্ষে কোন ত্রুটি করিনি। বললে, "দ্বিজপদ সরকার যিনি কলেক্টর হয়ে রিটায়ার করেছিলেন, তাঁর ছেলে।"

"বলিস কী?" মেয়েকে প্রায় আঁকড়ে ধরলেন শৈলবালাঃ "এ ত জানাশোনার মধ্যে। দ্বিজপদ সরকার ত মারা গেছেন শুনেছি—"

"হ্যাঁ, কিন্তু কলকাতায় বাড়ি করে রেখে গেছেন।"

"বাড়ি? তাই না?" চোখ বড় করলেন শৈলবালা। এতক্ষণ ভয়ে বড় ছিল, এবার বুঝি লোভে! "ক' ছেলে দ্বিজপদবাবুর?"

"চার।"

"এটি?"

"কনিষ্ঠ। নাম সুপ্রভাত সরকার।"

"বাড়িতে তাহলে ওয়ান-ফোর্থ অংশ আছে। কী বলিস?"

"নিশ্চয়ই আছে। পার্টিশন যখন হয়নি।"

"পার্টিশন হয়নি, না?" হাসিতে আবার আকর্ণবিস্তৃত হলেন শৈলবালাঃ "বা, তা হলে ত চিরকালের জন্য মাথা গোঁজবার ঠাঁই নিটুট রইল। কী করে ছেলে?"

"সেই ত গোলমাল।" লজ্জায় হাসল সোহিনী, মনে হল হয়ত এখানেই হেরে যাবে মায়ের কাছে। "কিছুই করে না। কাজ কাজ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে হন্যে হয়ে, এই প্রায় দু বছর। আমি বলে দিয়েছি আগে চাকরি পরে বাকরি, বাকি সব। আর চাকরি বলতে টিঙটিঙে হিলহিলে চেহারার রোগাপটকা নয়, দস্তুরমত ঘি-দুধ খাওয়া মজবুত পালোয়ান।"

"তার মানে?" যেন এখুনি সুপ্রভাতের পক্ষ টানছেন শৈলবালা।

"তার মানে এক-শ দু-শতে হবে না, অন্তত তিন শতে স্টার্ট।"

"হবে, হবে, এমন বাছেরবাছ ছেলে", শৈলবালা দরজার দিকে পা বাড়ালেনঃ "শাঁসালো চাকরি একটা জুটিয়ে নেবেই। নিজেদের বাড়ি আছে, পরীক্ষার পাস আছে, মুরুব্বির জোর কোন না আছে, এ ছেলের আর বসে থাকতে হবে না—"

শৈলবালা নিজেই আর বসে থাকতে পারলেন না। ক্ষিপ্র পায়ে ছুটে চলে গেলেন সামনের ঘরে, সোহিনীর ঘরে।

দেখলেন সুটকেস হাতে দাঁড়িয়ে আছে সুপ্রভাত।

"এ কী, চললে কোথায়?"

"হোটেলে।"

"ছি ছি, সে কী কথা?" চারদিকের অন্ধকারে আলো খুঁজতে লাগলেন শৈলবালা, "নীলু, নীলু কোথায় গেল?"

পরমা তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে, দু-একটা কথা কইছে কি না কইছে। এখন শৈলবালাকে পেয়ে সহজ হতে পারল সহজে। বললে, "নীলুদা বাইকে করে বেরিয়ে গেছে।"

"কোথায়?"

"যাবার সময় বলে গেল দেখি ভদ্রলোককে আর কোথায় তুলতে পারি।" টেবলফ্যানের হাওয়ায় পরমার কপালের কাছেকার কোঁকড়ান চুলগুলি সাপের মত মাথা তুলে তুলে নাচছে : "ভাল কোন হোটেল কিংবা অন্য কোন বাড়ি।"

"না না, আমরা থাকতে তুমি যাবে কোথায়?" শৈলবালা গায়ে-পড়ার মতন হয়ে বললেন, "এ-শহরে আমরা ছাড়া আপনার লোক আর তোমার কে আছে?" উথলে উঠলেন শৈলবালা : "বস, আমি তোমার স্নানের জল দিচ্ছি বাথরুমে। আমাদের টিউবওয়েলের জলের ঠাণ্ডা বলে খুব সুনাম আছে। তেল-তোয়ালে নিয়ে আসি আর সাবান—বস বাবা, বস।"

"না, বসব না।" সুপ্রভাত সুটকেসের হাতলটা আরও শক্ত করে ধরল। "হোটেল না জোটে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম আছে। সোহিনী—সোহিনীকে একবার ডাকুন।"

"সোহিনী উনুন ধরাচ্ছে।" অনেক কথাই এখন অনর্গল বলতে পারছেন শৈলবালা এবং অনেক কথা যে বলে সে কিছু মিথ্যা বলে। এক পা এগিয়ে আবার ফিরলেন দু পা : "দুটো ফুটিয়ে দেবে, না লুচি তৈরি করবে?"

কথা যেন কানেই তুলল না সুপ্রভাত। বললে, "সোহিনীকে একটু দরকার। ওর জন্যে একটা জিনিস আছে।"

জিনিস? কই? চারদিকে ব্যাকুল হয়ে তাকালেন শৈলবালা। তবে কি সুটকেসের মধ্যে? পকেটে?

"ডাকুন। ওকে জিনিসটা একবার দেখিয়ে চলে যাই।"

দেখিয়ে? দিয়ে নয়? মনে মনে ছটফট করে উঠলেন শৈলবালা। পরমাকে বললেন, "যাও, ডেকে নিয়ে এস ত ভিতর থেকে। দেখ ত, রান্নাঘরেই আছে বোধ হয়।"

পরমা সোহিনীকে তার মায়ের ঘরেই পেল। দিব্যি শুয়ে আছে টান হয়ে। কী আশ্চর্য, পারছে শুয়ে থাকতে! চোখ চেয়ে নেই, ঘুমের খনিতে নামিয়ে দিয়েছে অন্ধকারে।

না নামিয়েই বা করে কী। এত ঝামেলা পোষায় না সোহিনীর। যা হবার তাই হক। যাদের বাড়ি তারা বুঝুক। যেমন গাওনা তেমন পাওনা নিয়ে চলে যাক।

"সে কী রে, শুয়ে পড়লি কেন?" গায়ে ঠেলা দিল পরমাঃ "তোকে ডাকছে।"

"ডাকুক।" ঘুমো-ঘুমো চোখ তুলে তাকাল সোহিনীঃ "আমার এমন মিষ্টি ঘুমটা মাটি করে দিল।"

"কিন্তু এই কি তোর ঘুমোবার সময়?"

"তবে কি আমার দু হাত তুলে নাচবার সময়?" চোখে আর মেঘ নেই, রোদের টাটকা ঝাঁজ জাগলঃ "দ্যাখ দিকি কেন এই হৈ চৈ জানাজানি, লোকডাকাডাকি? কেন

মুখের উপরে এই হেডলাইট? সুন্দর করে নিরিবিলিতে ফুলটাকে দে না ফুটতে? কেন এই মাটি ওপড়ান?"

"তোর জন্যে কী একটা জিনিস এনেছে। তার জন্যেই ডাক।" পরমা বার দুয়েক বেশী চোখ নাচাল: "আর বোধহয় শেষ ডাক। জিনিসটা দেখিয়েই চলে যাবে।"

"জিনিস? সে আবার কী?" বিকেলের রোদ যেমন চলে যায় তেমনি ঘুমটুকু সরে গেল চোখ থেকে। সোহিনী নড়ে-চড়ে উঠল।

হ্যাঁ, জিনিসের কথা একটা বলেছিল বটে। আনন্দের অহঙ্কারে কত কথাই ত বলেছে তখন তত গায়ে মাখেনি। কিন্তু এখন ত আর ঢিলেমি করলে চলবে না। কী জিনিস! একটা না কেলেঙ্কারি করে বসে! ধড়মড় করে উঠে বসল সোহিনী। ছি ছি, হয়ত একটা শাড়ি কিনে এনেছে, কিংবা কে জানে, কি ঘেন্না, হয়ত একটা গয়না! এসব পৌরাণিক গ্রাম্যতা এখনও যে কাটিয়ে উঠতে পারেনি তাকে সোহিনী সত্যি ভালবাসতে পারল কী করে?

সতর্ক করে দেবারও হয়ত সময় নেই। হয়ত মার সামনেই বলে ফেলবে, দিয়ে ফেলবে। কৃতিত্ব ফলাবে। দেখাবে এই বুঝি বশীকৃত করার প্রশস্ত উপায়। সোনার উপায়!

দ্রুতপায়ে সোহিনী আবার গেল সামনের ঘরে, প্রথম ঘরে। যখন এসেই পড়েছে তখন সবটুকুই দেখে যাবে, তাই পরমাও অনুসরণ করল।

সোহিনীকে দেখতে পেয়েই পকেট থেকে একটা ভাজকরা খাম বের করল সুপ্রভাত। খামটা সোহিনীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "পড়।"

এ আবার কী! কতরকম ভয়ের মধ্যেই ফেলছে এনে লোকটা। চোখ নাক ঠোঁট কেমন শুকনো টান টান হয়ে গেল। কোন দুর্ঘটনা নয়ত? কিংবা কোন নালিশের নোটিশ? কোন গোপন শত্রুর পত্র? বেনামিতে কোন কলঙ্ককথা?

চিঠিটা হাতে নিয়ে পড়তে লাগল সোহিনী। চোখ কপালে নেই, এ আবার কেমনতরো পড়া?

শ্বাসরোধ করে একটি নিটোল বিন্দুর মত দাঁড়িয়ে রইলেন শৈলবালা। চিঠি পড়া সাঙ্গ করে কী শব্দে ধ্বনিত হয় সোহিনী তারই অপেক্ষায় কান ধারাল করে রেখেছেন। সাইরেনের সময়ও এমন উৎকর্ণ থাকেন না।

পড়ে তার মানে করতে এত দেরি করছে কেন সোহিনী? একবার পড়ছে, দুবার পড়ছে, আগা পড়ছে, তলা পড়ছে, পাশ পড়ছে। শুধু পড়ছে না, দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এ পিঠ দেখছে, ও পিঠ দেখছে, খাম দেখছে, ডাকটিকিটের উপর পোস্টাপিসের ছাপ দেখছে। এ যেন আদালতের দলিল তজদিগ! শৈলবালার ইচ্ছে হল সোহিনীর হাত থেকে কেড়ে নেন চিঠিটা, হলই বা না ইংরিজীতে লেখা, ঠেকেঠেকে পড়ে ভাসা-ভাসা যা তিনি অর্থ করতে পারবেন তা নিশ্চয়ই সোহিনীর চেয়ে আগে হবে।

আস্তে আস্তে এ কী হতে লাগল! সোহিনীর মুখ ভরে যেতে লাগল হাসিতে। টলটল তলতল করে উঠল। ভুরু ঠোঁট নাক চিবুকের রেখাগুলি জলভরা তুলির টানে নরম-নরম হয়ে এল, সাদা জল নয়, সোনার জল। খানিকক্ষণ কথা বলতে পারল না সোহিনী।

"কী হল?" শৈলবালা ঠেলা দিলেন: "কিসের খবর?"

মুখে খাবারপোরা অবস্থায় যেমন লোকে কথা কয় তেমনি গদগদ হয়ে বললে সোহিনী, "সুপ্রভাতের চাকরি হয়েছে। শুরুতেই সাড়ে তিন শ।"

"বলিস কী?" শৈলবালার সাধ হল এখুনি এক ঝাঁক উলু দিয়ে ওঠেন। কী দেখবেন, কী বুঝবেন কে জানে, ব্যাকুল হয়ে হাত বাড়ালেন মেয়ের দিকে: "দেখি, দেখি—"

সোহিনী ছাড়ল না চিঠি, এখুনি যেন তা ছাড়বার নয়। এ যেন আরও একটু নেড়েচেড়ে দেখবার মত, আরও বারকতক ডলিয়ে বোঝবার।

"তোর বাবাকে খবর দে।" উছলে উঠলেন শৈলবালা। কে খবর দেবে, কারু নড়ন-চড়ন নেই, সুতরাং তিনি নিজেই চললেন ব্যস্ত হয়ে। প্রায় হালকা পায়ে।

ঘুমন্ত স্বামীর ঘরে গিয়ে হামলা দিলেন: "ওগো, শুনেছ, সুপ্রভাতের চাকরি হয়েছে—"

"কার?" খ্যাঁক করে উঠলেন শিবনাথ।

"সুপ্রভাতের।"

"সে আবার কে?" শিবনাথ ঘুমভাঙা লাল চোখে কটমট করে তাকালেন।

"ওমা, তুমি তাকে চেন না? দ্বিজপদ সরকারের ছেলে, কলেক্টর না কণ্ট্রাক্টর ছিলেন যিনি, বছর দুই গত হয়েছেন, তাঁর ছোট ছেলে সুপ্রভাত।" হঠাৎ গলা গম্ভীর খাদে নামিয়ে বললেন, "সোহিনীর কাছে তোর যে বন্ধু এসেছে, সে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ চিনি বই কি, খুব চিনি। দ্বিজপদ সরকারকে কে না চেনে? তিনি এসেছেন?" ধড়মড় করে উঠে বসলেন শিবনাথ।

"ইডিয়ট!" শৈলবালার দু পাটি দাঁতে সম্মুখ সংঘর্ষ হল: "তিনি কেন আসতে যাবেন? তাঁর ছেলে ছোট ছেলে, আমাদের সুপ্রভাত। এম-এ পাস, দেখ না গিয়ে কেমন হীরের টুকরো চেহারা। সোহিনীর বন্ধু, ইংরিজীতে কী বলে বল না, তার চাকরি হয়েছে। সোনার চাকরি। গোড়াতেই সাড়ে তিন শ।"

"বল কী? কোথায় সে? কী চাকরি?" পুরোপুরি না সামলেই নেমে পড়লেন শিবনাথ।

"গিয়ে একবার দেখই না নিজের চোখে।" যেন ওঁচানো চেলাকাঠে তাড়া করলেন শৈলবালা: "যার বাড়িতে অতিথি এসেছে সেই কিনা অচেতন! আদর-আপ্যায়ন না করলে ফিরে যাবে যে, তখন কী হবে! যাও, আস্তে আস্তে কথাটা গিয়ে পাড়, কবে যাবে কলকাতায়, কবে তার দাদাদের মত নেবে, দাদারাই যখন অভিভাবক—"

মুখ কাঁচুমাচু করলেন শিবনাথ: "চাকরি হল অন্যের আর খাটনি বাড়ল আমার! আমাকে আবার ওসব হাঙ্গামায় কেন? রুগীপত্তর নিয়ে নিরীহ মফঃস্বলে পড়ে আছি—"

"তাই বলে তুমি মেয়ের বিয়ে দেবে না? বাপের পক্ষে সামাজিক প্রস্তাব করবে না একটা?"

"মেয়ে এতদূর পেরেছে আর বাকিটুকুও সেরে নেবে। সামাজিক হতে গেলেই খরচ বেশী।" কাছাকোঁচায় প্রকৃতিস্থ হলেন শিবনাথ: "বিয়ের আপিসে গিয়ে সাক্ষী রেখে একটা দলিল সই করে দিলেই খোলসা। চালাকি দিয়ে মহৎ কাজ হয় না, যে বলেছে ভুল বলেছে। চালাকি দিয়ে বিয়ে হয়, আর কে না মানবে, বিয়ে একটা মহৎ কাজ—"

এবার যে কাঠ উদ্যত করলেন শৈলবালা তা জ্বলন্ত কাঠ। বললেন, "চালাকি দিয়ে যে মহৎ কাজ হয় সে হচ্ছে তোমার ডাক্তারি। যাও, আর জুতো পরতে হবে না, খালি পায়েই চলে যাও। দেরি হলে হোটেলে গিয়ে উঠবে—হোটেল!" সে একটা কী ভীষণাকার জিনিস, দু হাতের দশটা আঙুল মুখের কাছে তুলে শৈলবালা দাঁতে মুখে বিকৃত ভঙ্গি করলেন।

খাটের তলা থেকে স্যান্ডেল জোড়াও কুড়িয়ে নেওয়া হল না। পড়িমড়ি করে ছুটলেন শিবনাথ।

"বস বাবা বস, দাঁড়িয়ে কেন?" শিবনাথ উচ্ছ্বসিত হলেন: "বা, টেবলফ্যান এসে গিয়েছে বুঝি? শুধু ডাব, বরফ আনতে পারেনি কেউ? দে," মেয়ের দিকে তাকালেন: "স্নানের জল দে তুলে। কতক্ষণ ধরে এসেছে, এখনও এতটুকু হুঁশ নেই! কী পড়ছিস ওই চিঠি?"

বিজয়িনীর মত চিঠিটা বাবার দিকে বাড়িয়ে দিল সোহিনী।

সত্যি সত্যিই চাকরির চিঠি। মুখের

বাজারের স্তুইফোড্ ঠনকো সদাগর নয়, দস্তুরমত নামকরা শিকড়গাড়া আমেরিকান ফার্ম। স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন চিঠি, কাল থেকেই শুভারম্ভ। ধাপে ধাপে উন্নতি, হার যা বিদেশীদের প্রাপ্য। প্রায় ধারণা-ভাবনার বাইরে।

শিবনাথ চিঠিটাকে কপালে ঠেকালেন। বললেন, "তোমার কৃতিত্ব সন্দেহ নেই, কিন্তু বাবা শুধু নিজের জোরে হয় না। এ তোমার বাবার আশীর্বাদ, আমাদের আশীর্বাদ—"

এক ঝলক ধুলোর ঝড়ের মত নীলাদ্রি সাইকেলে করে হাজির। বললে, "ডাকবাংলোটাই ঠিক করে এসেছি। হোটেল-টোটেল এখানে সুবিধের নয়। চলুন, দেরি করবেন না, একটা রিকশা নিয়ে নেব মোড়ের থেকে—"

"নাও নাও, রান্না চড়িয়ে দাও।" শৈলবালাকে উদ্দেশ করে উল্লাসের ইস্তাহার জারি করলেন শিবনাথ : "কিছু বাজার চাই ত বেশ বল নীলুকে। ডিম দই মিষ্টি।" পরে নীলাদ্রির দিকে তাকিয়ে: "তোমার ডাকবাংলোর ডাক আছে আর আমার পর্ণকুটীরের ডাক নেই? ডাক কি আড়ম্বরের? ডাক আন্তরিকতার।" পরে সোহিনীকে লক্ষ্য করে: "কী জলটল দিলি?"

"দিচ্ছি।" এতক্ষণে যেন পায়ের বেড়ি খুলে গেল সোহিনীর। ছুটে ভরাভর্তি এক গ্লাস ঠান্ডা জল নিয়ে এসে হেসে সুপ্রভাতের হাতে দিল। জল দিতে হলেও বুঝি প্রাণে জল চাই।

"বাবাঃ, এতক্ষণে খাবার জল পেলুম।"

সুখ বুঝি মানুষকে নির্লজ্জ করে। কিছু ভেবে বলেনি, তবু বলে ফেলল সোহিনী, তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল: "সব পাবে।"

"ডিম দই মিষ্টি—" নীলাদ্রি সোহিনীর দিকে তাকাল।

"না না, ওসবে দরকার নেই। আমি নেক্সট ট্রেনেই ফিরে যাব।" সুপ্রভাত দরজার কাছ বরাবর একটু নড়ল-চড়ল।

"সে কখনও হয়? হতে পারে?" শিবনাথ কলমের এক আঁচড়ে মামলা উড়িয়ে দিলেন: "অতিথি অপীত-অভুক্ত হয়ে ফিরে গেলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়।" বলে সুটকেসটা তুলে নিয়ে ভিতরের ঘরে রাখতে গেলেন। "তাছাড়া, চিঠিটা এখনও আমার হাতে।"

আরও একটু দুর্বল প্রতিবাদ করল সুপ্রভাত: "কালকেই আমার জয়েন করার কথা।"

"বেশ ত, রাতটা থাক, ফার্স্ট ট্রেনে যেও।" চোখের দিকে তাকিয়ে কি না তাকিয়ে টুক করে বসে ফেলল সোহিনী।

দেখতে পাচ্ছ না কী হয়ে গেল দেখতে-দেখতে। রোদে হলদে হয়ে যাওয়া শুকনো ডাঙায় ঝিরঝির করে জল নেমে এল। চোখজুড়োন সবুজ হয়ে গেল চারদিক। দেখছ না জংধরা লোহার দরজা খুলে গেল আলগোছে। যে মুষ্টি প্রতিরোধে বদ্ধ হয়েছিল তা খুলে গেল নরম হয়ে। যে দূরে প্রত্যাখ্যানে নিশ্চল ছিল নিজের থেকে কাছে চলে এল হেঁটে হেঁটে।

এমনও হয়!

মনের একটুখানি এদিক-ওদিক, আর তাতে কোথায় যাচ্ছিলাম নাম-না-জানা শূন্যতার বন্দর এখন দেখি একেবারে গ্রামের চালু ঘাটটিতে এসেই নোঙর নিয়েছি। সব নদীই পৌঁছে দেয় যদি হালের বাঁকটুকু ঠিক থাকে।

এখন দেখছি এসে ভালই করেছ, বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। কত সহজে চালু হয়ে গেল কথাটা। শুধু চালু হওয়া নয়, কথাটা কেমন কাছিয়ে এল। নিজেকে শুধু আবির্ভূতই করলে না, প্রতিষ্ঠিত করলে। শুধু ভাসা-ভাসা নয়, হাতের উপর হাতের চাপরাখা সমর্থন আনলে। সন্দেহের গম্বুটের মধ্যে বওয়ালে স্বীকৃতির প্রসাদবায়ু। তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি।

আর সত্যি, কী আশ্চর্য তোমার আকাঙ্ক্ষার প্রবলতা! আগুনের মত দেখতে। আর, আগুন দেখতে কী সুন্দর! কী লোভনীয়! সোমবার কলকাতায় দেখা করেই দিতে পারতে খবরটা, হয় স্কুল ফেরত রাসবিহারীর মোড়ে, নয়ত আগে থেকে কোন ঠিক করা জায়গায়। মার্কেটের গোল চাতালে নয়ত পর্দাটানা রেস্তরাঁর কামরায় নয়ত সারকুলার রোডের পার্কের নিরিবিলিতে। সে বলায় শুধু বলাই হত, এমনি করে এক ডাকে জয় করে নেওয়া হত না। শুধু চলে যাওয়া হত, সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া হত না। তোমার উৎসাহকে বলিহারি। ঔৎসুক্যকেও।

এখুনি যাবে কি। আহা, কত শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে এসেছ, একটু সেবা নিয়ে যাও, স্পর্শ নিয়ে যাও।

"তাছাড়া", আগের কথার জের টানল সোহিনী: "এখনও কোনও কথা হল না—"

আর যায় কোথা! গান্ডীব খসে পড়ল হাত থেকে। মাঝখানে পাঞ্জাবিটা পরেছিল আবার তা খুলে ফেলল সুপ্রভাত।

নীলাদ্রি ফোড়ন দিল: "তাছাড়া, মফঃস্বলের শহর, বিকেলে চারদিক ঘরে ফিরে একটু দেখুন। ব্রিজ, গির্জে, কলেজ—"

হাইকোর্ট! ভাগ্যিস হাইকোর্ট বলেনি। মনের বক্রতাটুকু সুপ্রভাতের ঠোঁটে ফুটে উঠল বোধহয়।

সোহিনীর ভাল লাগল না। বললে, "কিন্তু এখানে নদী ত দেখবার।"

নদী শুনলেই মন আনচান করে ওঠে। পুবের খোলা জানলা দিয়ে সুপ্রভাত তাকাল বাইরে। কিন্তু এ কী চেহারা! জল দেখা যায় না, শুধু একটানা একটা ফাঁকা রেখা শুষ্ক হাহাকারের মত তাকিয়ে আছে। এর চেয়ে তোমার নদী, অগাধ ঢেউয়ের নদী, অনেক বেশী সুন্দর। তোমার নদীই স্নিগ্ধ করে, শুদ্ধ করে, তৃপ্ত করে। সুপ্রভাত মধুমাখা চোখে পরিপূর্ণ করে দেখল সোহিনীকে।

"যদি বল ত" নীলাদ্রি বললে, "একটা গাড়ি যোগাড় করে নিয়ে আসি। ইচ্ছে করলে কিছুটা দূরেও ঘুরে আসা যায়।"

"ভগবান রক্ষে করুন! রামশাকল একটা গাড়িতে চড়ে মফস্বলের শহর ঘুরি!" সুপ্রভাত উচ্ছলোর সুরে আনন্দে।

এতে অবিশ্যি সোহিনীরও অনিচ্ছা। যেটুকু বা বাকি ছিল মোটরের শব্দে চতুর্দিক চিচি পড়ে যাক। নীলুদা ত গাড়িতে আসবে না। নীলুদা সেই সাইকেলে। তাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে সে আসবে পিছু-পিছু ব্রিজ দেখাতে, গির্জে দেখাতে, কলেজ দেখাতে, সে এক কেলেঙ্কারির সগোত্র। দরকার নেই গাড়ি চড়ে। কলকাতায় অনেক গাড়ি, অনেক গির্জে ব্রিজ।

"তার চেয়ে এক কাজ কর—" নীলাদ্রিকে লক্ষ্য করল সোহিনী: "বিকেলে এখানে ছোটখাটো একটা জলসা বসাও।"

"জলসা?" আঁক করে উঠল সুপ্রভাত:

"ভিড়ের গান?"

"ভিড় আবার কী! আসলে নীলুদাই গাইবে। আর," পরমার দিকে তাকাল সোহিনী: "আর পরমা যদি গায় এক-আধটা।"

"আপনি গাইবেন?" কৌতূহলের চেয়ে যেন উৎসাহই বেশী এখন সুপ্রভাতের।

পরমা হাসল। বললে, "সোহিনী এখন সর্বত্রই গান দেখছে। ওর এখন পাথরেও গান, নিথরেও গান। ওর কথা গ্রাহ্য করবেন না। সব কথা নয় অবিশ্যি—আমার সম্বন্ধে কথাটা। তবে নীলুদা যদি গায় সে একটা শোনবার মত—"

"তোমার সেই গানটা নীলুদা—" পরমার কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে উচ্চ হল সোহিনী: "যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল মম তব অকৃপণ করে—কী আশ্চর্য যে শোনায়!"

নীলাদ্রির অকৃতী চেহারার দিকে করুণ চক্ষুর ছায়া ফেলল সুপ্রভাত। বললে, "কই, নাম শুনিনি ত।"

"সেই ত মফস্বলী গুণীদের ট্র্যাজেডি। কেউ তাদের কল্কে দেয় না, নাম শোনে না।" নীলাদ্রির পক্ষে যেন উকিল হয়ে দাঁড়াল সোহিনী: "কিন্তু যদি তুমি ওর গান শোন তোমার ইচ্ছে হবে বলতে, তুচ্ছ কেরানীগিরি

ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও তোমার কুনো এঁদো শহর, চলে যাও কলকাতায়, মহানগরীর জনতায় প্রাণের জন্যে গান দিও না, গানের জন্যে প্রাণ দাও।"

সূক্ষ্ম একটি ব্যঙ্গের রেখা এঁকে সুপ্রভাত বললে, "অত সময় কই শোনবার! তাছাড়া, যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে কে শোনে গান!"

"যুদ্ধের মধ্যেও শোনে।" জোর দিল সোহিনী: "গান সব সময়েই গান। আকাশ সব সময়েই আকাশ।"

ভালবাসা সব সময়েই ভালবাসা, পরমার ইচ্ছে হল এটুকুও সোহিনী বলুক শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সোহিনী খাদের কিনারায় এসে হঠাৎ থেমে পড়ল।

আবার সওয়াল ধরল সোহিনী: "নীলুদার যদি গান শোনে তবে মনে প্রশ্ন জাগবে মূল্য দেবে কাকে? যে গান লিখেছে তাকে, না, যে গান গেয়েছে তাকে?"

হো-হো শব্দে হেসে উঠল সুপ্রভাত। "এও আবার প্রশ্ন নাকি? সব সময়েই, যে লিখেছে তাকে। কে গাইত যদি বা যিনি লিখবার তিনি না লিখতেন!" হাসির শব্দেই মামলা নস্যাৎ হয়ে গেল।

কিন্তু উকিল সব সময়েই কথা কয়। মুখের উপর বিরুদ্ধ রায় পাবার পরেও তর্ক করে। তাই সোহিনী বললে, "কিন্তু লেখকই বা কী করত যদি কেউ না গাইত তার গান?"

মামলা কি মক্কেলের, না, উকিলের নিজের? আবার হাসির শব্দে ফেটে পড়ল সুপ্রভাত: "সবাই পড়ত, স্রেফ পড়ত। পারো না হক কিছু অন্তত রস নিত, অন্তত কবিতার রস। কী দরকার আমার গায়কের? আমি নির্জনে বসে পড়তাম আর আমি নিজে গাইতে না পারলেও আমার মনে, সকলের মনেই যে বাউলবৈরাগী আছে, সে গেয়ে উঠত।"

"থাক্, দরকার নেই জলসায়।" সোহিনী নথি গুটোল: "বিকেলে নদীর পাড়ই অপরূপ। ছায়া করে আসবে আর হাওয়া দেবে অফুরন্ত।"

"নদীর পাড়ও কিছু নয় যদি নিভৃতি না থাকে। আসলে অপরূপ হচ্ছে নিভৃতি।"

এও কি একটা খোঁচা নাকি সুপ্রভাতের? সোহিনী বললে, "নিভৃতি মনে। বাহ্যিক পরিবেশের নয়। মনই পরিবেশ।"

"আমি বলি উলটো। পরিবেশই মন। পরিবেশটি অনুকূল হল মনও সাড়া দিল। চিঠি এল চাকরির অমনি বেজে উঠল জলতরং।"

ব্যস্তসমস্ত হয়ে শৈলবালা ঘরে ঢুকলেন। দুহাত নেড়ে বলতে লাগলেন, "নও বাথ-রুমে সব রেখে এসেছি, যাও স্নান করে এস। রান্নাও চাপিয়ে দিয়েছি স্টোভে। তুমি, নীলু," নীলাদ্রিকে লক্ষ্য করে বললেন, "তুমি আর কী করতে আছ?" কথাটা যেন কেমন বেকায়দার হল, মুহূর্তে সামলে নিলেন, "অনেক ঘোরাফেরা করেছ রোদ্দুরে, যাও এবার বাড়ি গিয়ে স্নানাহার করে ঠান্ডা হও। আর তুমি—" পরমার দিকে তাকালেন শৈলবালা।

পরমাই বা কী করতে আছে? ঘরের মধ্যে ঠিক দুপুরের মতই আটপৌরে নয় যেন শাড়িটা, শৈলবালার মনে হল, একটু যেন বেশী। চুলটা কি একটু বেশী ঠিক করা? ওর দিকে একটু বেশী কচকচ তাকাচ্ছে নাকি সুপ্রভাত? কী দরকার বাপু পরের ঘরোয়া ব্যাপারে পা মাড়াও। ভিড় না বাড়িয়ে ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে যাও, নিজের চরকায় গিয়ে তেল দাও। কে না জানে বাপু প্রত্যেক মেয়েই ঈর্ষার একটি বারুদঘর। কখন কোন ফাঁক দিয়ে এক কণা আগুন এসে পড়বে, অমনি তার চণ্ডমূর্তি। কুকথা বলতে শুরু করবে, স্বনামে-বেনামে ভাওচি দেবে। শেষ পর্যন্ত বলবে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, আমি যে ছিলাম কাছে কাছে, অন্তত পাশের ঘরে। মেয়ের শত্রু মেয়ে। আর সে শত্রু জঘন্যতম।

"না আমি যাই।" আঁচলে দোলা দিল পরমা।

সোহিনী ধরে ফেলল। মায়ের দিকে তাকিয়ে বললে, "না, পরমা থাক্।"

শকুন্তলার বুঝি অনসূয়াকে দরকার। ফুলের দরকার পত্রচ্ছায়ার। দরজার দরকার একটি পর্দার অন্তরাল।

পরমা থাকল। ধাপ্পাবাজ অঙ্কের আরও ক' ধাপ দেখে যাক পরমা। কী করে কড় গুনে-গুনে হিসেব মিলিয়ে প্রেম করা যায় স্বচক্ষে দেখে যাক তার উদাহরণ। দুই ভুজ সমান হলে দুই ভিত্তিকোণও সমান হবে এ সার্থক জ্যামিতি। কিন্তু দুই হৃদয় সমান হলে জাত-পাত বংশ-বিত্ত পাস চাকরি সব আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিলে যাবে লোকতন্ত্রে এ কোথাও লেখা নেই। সমস্ত মেলবার পর এগিয়ে গিয়ে বিয়ে কর, বুঝি। সমস্ত মেলবার পর পৌঁছিয়ে গিয়ে প্রেম কর এ কি দুর্ঘটনা। দেখেশুনে বিয়ে হয়, এ দেখি দেখেশুনে প্রেম। যেচে-বেছে তেমন লোকের সঙ্গেই প্রেম কর যার চেহারাটি উত্তম, জাতি গোত্রে যে খাপ খায়, বিদ্যায় যে বাজারে বিকোয়, অবস্থায় যে কুলীন, যে পথে কোথাও এতটুকু কাঁটা খোঁচা নেই, ঠোকা-ঠুকি নেই, উঃ, কী নিখুঁত ও নিপুণ কারুকাজ! ছোটমনের বদহিসেবের যোগ-ফল!

পরমা, এ তোমার হিংসে ছাড়া কিছু নয়। সোহিনীর দোষ কী! নিয়তিই তাকে কুসুমের পথ করে দিয়েছে, মাখনের স্তূপের ভিতর দিয়ে ছুরি চলে যাওয়ার পথ। তার জন্যে এতটুকু কোথাও বাধা রাখেনি, আঘাত রাখেনি, ঘাসের মতই সহজ করে দিয়েছে, ঘুমের মধ্যে নিশ্বাসের মত সহজ। ওর শ্রীতে কাতর হওয়ার কোন মানে নেই। নরম-ভিতু মানুষ, স্নেহে-সোহাগে মানুষ হয়েছে, ও খোলা মাঠে লড়বে কী করে? তাই ও কেল্লার দিক দেখেছে, মজবুত কেল্লা। আহা, ও সুখী হক, শান্তি পাক, ওর হিসেব মিলুক।

পরমা থাকবে এ শৈলবালা পছন্দ করলেন না। আর সুপ্রভাত বুঝল, দুপুরটা অদানে-অভ্যাহ্নণে গেল।

খাইয়ে-দাইয়ে সোহিনীর ঘরে আপাতত বিছানা করে শৈলবালা সুপ্রভাতকে শুইয়ে দিলেন। বললেন, "বাবা, একটু গড়িয়ে নাও। টেবলফ্যানটা হয়ে ভালই হয়েছে। যদি একটু ঘুম আসে ত আসুক।"

ঘুম এলেও মন্দ ছিল না, এলেন শিব-নাথ।

"চলবে?" হাতে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই। বদান্যতার সীমা ছাড়ালেন শিবনাথ।

যদি বা চলত, ভাবী গুরুজনকে সম্মান দেখাবার প্রয়োজনে কুণ্ঠিত হল সুপ্রভাত। বললে, "না, দরকার নেই।"

এর পর চলে যাও গুটিগুটি, তা নয়, খাটের একধারে বসলেন শিবনাথ। বাড়ি-ঘরের কথা, আত্মীয়স্বজনের কথা, আসন্ন শুভকর্মের কথা জিজ্ঞেস করা তা নয়, পাড়লেন কিনা যুদ্ধের কথা। "কী মনে হয় তোমার অবস্থা?"

"ভাল।" সংক্ষেপে সারতে চাইল সুপ্রভাত।

"কে জিতবে মনে হয়?"

যেন তার মনে হওয়ার উপরেই সব নির্ভর করছে এমনি গম্ভীর মুখ করে সুপ্রভাত বললে, "আমরা।"

"আমরা মানে? ইংরেজরা?" মুখ শুকিয়ে গেল শিবনাথের।

"আমরা মানে আমরা। ফোকটে আমরা স্বাধীন হয়ে যাব। পরের চাল পরের কলা কিন্তু ব্রত করব আমরা।"

পরিহাসের ছোঁয়াচে মুখভাব নরম হবার কথা কিন্তু শিবনাথ যেমন কঠিন তেমনি কঠিন। "তা হলে ত বড় বিপদ হবে।" যেন মূর্তিমান আতঙ্ক দেখছেন।

"এই আমাদের স্বাধীন হওয়া?"

"নিশ্চয়। কে আমাদের তখন দেখবে-শুনবে? আমরা চালাব কী করে?"

"বিপদ আবার কী! পড়ে পাওয়া বিছানায় দিব্যি দিবানিদ্রা দেব।"

ইঙ্গিতটা এতক্ষণে বুঝলেন। বললেন,

"হ্যাঁ, তুমি একটু বিশ্রাম কর। আমার রুগী দেখতে বেরুবারও সময় হল—"

ভাগ্যিস বিছানায় শোয়া মাত্রকেই তিনি রুগী ভাবেন না। পাশ ফিরল সুপ্রভাত।

পাশের পশ্চিমের ঘরে শৈলবালার খাটে সোহিনী আর পরমা শুয়েছে। আর শৈলবালা নড়ে চড়ে টুকিটাকি কাজ করছেন এটা-সেটা। যখন একবার উঠে পড়েছেন তখন অনেক ঘুমন্ত কাজও চোখের সামনে জেগে-জেগে উঠছে। হাত উদ্যত করলে অনেক কাজই হাতের কাছে মাথা পাতে।

"তোরা দেখি শুয়ে পড়লি—" ক্ষীণকণ্ঠে একটু যেন অনুতাপ করলেন শৈলবালা। "ও ঘরে গিয়ে একটু গল্প-টল্প করলে—বেচারা একেবারে একা—"

চোখবোজা দুই বন্ধু চুপ করে রইল।

পালিয়ে না যায়! স্পষ্ট হয়ে উঠলেন শৈলবালা! দেখলেন ও ঘরে নয়, এ ঘরেই সুটকেস, আর সুটকেসের মধ্যেই সোহিনী পুরে রেখেছে তখন চিঠিটা। আর কথা হয়েছে শেষ রাত্রের ফার্স্ট ট্রেনটাতেই যাবে। গোটা একটা রাত থাকবে এখানে।

হ্যাঁ, ও ত তাঁদেরই অনুরোধ। তাঁরাই ত অকালে-বিকেলে ছাড়তে চাননি তাকে। কী একটু ভাল করে খাওয়াতে পারলুম না, এই রাতটা অন্তত থেকে যাও। এ ত তাঁদের কথা। ফার্স্ট ট্রেনটাতে গেলে হেসে-খেলে দিব্যি আপিস করতে পারবে। এ ত তাঁদেরও আশ্বাস। না, পালাবে কেন? পালাবার জন্যে কি কেউ আসে?

কাজের ঢেউয়ে আবার কখন রান্নাঘরে গেছেন শৈলবালা।

পরমা চোখ চেয়ে বললে, "তোর কি মনে হয় নীলুদা আবার আসবে?"

"আসা ত উচিত নয়।" চোখ না মেলেই বললে সোহিনী।

কিন্তু রোদ পড়-পড় হতেই নীলাদ্রি এক গাড়ি নিয়ে হাজির। এবং আনতে পেরেছে বলে বেশ খানিকটা গর্বে ডগমগ। বলছে, "বিপিন জোয়ারদারের সেই ভাঙা লজঝরটা নয়, ডিরিকুইজিশন করা নতুন গাড়ি, এখানকার ইনসিয়োরেন্স ম্যানেজারের। লম্বা ড্রাইভ যদি দিতে চাও তাও আটকাবে না, আকণ্ঠ পেট্রল আছে। রাত আটটা পর্যন্ত মেয়াদ।"

এও একটা প্রস্তাব! গাড়ি নেওয়া মানেই আরও কতকগুলো প্যাসেঞ্জার নেওয়া। ঐ দেখ না গাড়ির শব্দে আশে-পাশের বাড়ি থেকে দঙ্গল-দঙ্গল শিশু বেরিয়ে এসেছে। সোহিনীর সঙ্গে কার কী খাতির, যতদূর ধরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে। ছেঁকে ধরবে। কটা বা কোলেই চড়ে বসে কিনা ঠিক নেই। আগে ছিল গুরুজনের ভয়, এখন দাঁড়াবে লঘুজনের। এ বেড়ানর অর্থ কী? কী সুবিধে?

"না, না, গাড়িফাড়ির দরকার নেই।" হাতের এক নিষ্ঠুর মুদ্রা করে বাতিল করে দিল সুপ্রভাত।

"হ্যাঁ, গাড়ি ফিরিয়ে দাও।" সোহিনীও সায় দিল।

"উনি ত ফার্স্ট ট্রেনে ফিরবেন," নীলাদ্রি তাকাল সোহিনীর দিকে, "তবে সে সময় কি আসতে বলব?"

"না না," প্রায় ধমকে উঠল সুপ্রভাত: "আমার রিকশা ঠিক করা আছে।"

"রিকশাদের কথা বলবেন না," তবু কথা বলবে নীলাদ্রি: "কখন কে রাস্তা থেকে টেনে নেবে ঠিক নেই। একটা নির্ভরযোগ্য গাড়ি থাকতে—"

রূঢ় কটাক্ষ করল সোহিনী। তার অর্থ, নিরস্ত হও, পরোপকারে আর প্রসারিত হতে হবে না।

কী ভেবে হঠাৎ উল্লসিত হল সুপ্রভাত। সোহিনীকে জিজ্ঞেস করল, "তুমিও ত কালই ফিরছ।"

"সন্দেহ কী, কাল যখন সোমবার—"

"তবে আমরা ত একসঙ্গেই ফিরতে পারি, ফার্স্ট ট্রেনে—"

সে না জানি কী চমৎকার হবে, এই এক সঙ্গে ট্রেনে যাওয়া, এক কামরায়। ঐ রাত-সীমান্ত ট্রেনে নিশ্চয়ই ফাঁকা কামরা পাওয়া যাবে, নিচু ডালে না হয় মগডালে। একটা ছোটার মধ্যে তাদের স্থির হয়ে থাকা, ঘন হয়ে থাকা, এর না জানি কী রকম স্বাদ! চোখের সামনে আস্তে আস্তে অন্ধকার আবছা হতে থাকবে, সবুজ হয়ে ভোর জাগবে, প্রথমে সবুজ, আস্তে আস্তে সোনা, পরে হীরে, সে না জানি কেমন চোখমেলা! প্রচ্ছন্ন রহস্যলোক থেকে তারা ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হবে পরিপূর্ণ স্পষ্টতায়, সে না জানি কেমন চলে আসা, কেমন ফেলে আসা। মন্দ কি, গাড়িটা তা হলে আসুক।

সোহিনী বললে, "আমি থার্ড ট্রেনে ফিরব। আমি ঐ ট্রেনটাতে ফিরি।"

শৈলবালা ওদিক সেদিক আছেন বটে, কিন্তু কান আছে এদিকে। বলে উঠলেন, "সে ত সঙ্গে কেউ থাকে না বলে। এখন যখন ভাল সঙ্গী আছে—"

ভাল সঙ্গী! সুপ্রভাতের দিকে চেয়ে লজ্জায় একটু হাসল সোহিনী। বললে, "বা রে, আমি অত সকালে উঠতেই পারব না।"

"বা, তাহলে আমাকে কে জাগিয়ে দেবে?" সুপ্রভাত ছটফট করে উঠল।

নীলাদ্রি বুঝি কিছু বলতে যাচ্ছিল, মানে, সেই হয়ত জাগিয়ে দিতে আসতে পারে—সোহিনী আবার ভুরু তুলে শাসন করল তাকে।

শৈলবালা এলেন উদ্ধার করতে। বললেন, "আমিই পারব তুলে দিতে। আর যদি একজনকে পারি," মেয়ের দিকে তাকালেন: "দুজনকেও পারব।"

"না," সোহিনী তবু ঘ্যানঘ্যান করে উঠল: "অত ভোরে যাবার আমার কী দরকার! সোমবারে আমার পিরিয়ড বারটায়। থার্ড ট্রেনটায় আমার সুবিধে। আমি স্নান করে খেয়ে দেয়ে বসে-জিরিয়ে যেতে পারি। স্টেশন থেকে সোজা চলে যেতে পারি স্কুলে। আমার ত আর আপিসে প্রথম জয়েন করা নয়।"

সুপ্রভাত বুঝল সকলের চোখের উপর দিয়ে একসঙ্গে ফর্সা-না-হওয়া ঝাপসা ট্রেনে ভ্রমণ করাটা সোহিনীর শালীনতায় বাধছে। এটার মধ্যে থেকে যাচ্ছে কোন অধৈর্যের ঝাঁজ, কোন বা স্থূলে হস্তের অবলেপ। কিন্তু যে রাতটা আসছে কালো হয়ে, ভারী হয়ে, একান্ত হয়ে, তাকে সে কী বলবে? কী করে সরাবে সেই জগদ্দলন বোঝা? হ্যাঁ, থাকা আলাদা ঘরে ত নিশ্চয়ই, কিন্তু পাশাপাশি ঘরে, এক বাড়িতে, এক ছাদের নীচে। আর যেখানে দরজা খুলে দিলেই নদী আর নদীর কোল ঘেঁষে অবাধ ঘাসের নিমন্ত্রণ। শালীনতা রাখতে হলে ত আশ্রয় দেওয়াই বিড়ম্বনা।

তখন থেকেই লক্ষ্য করছে সুপ্রভাত, তার শোবার জায়গাটা এ-ঘরে, সোহিনীর ঘরে হবে না। সোহিনীর ঘর সোহিনীরই থাকবে। ও পাশে উত্তরদিকে যে সংলগ্ন ঘর আছে তাতেই তার বিছানা হচ্ছে। সুপ্রভাত ভেবেছিল নিজের ঘরটা তাকে ছেড়ে দিয়ে সোহিনী পশ্চিমে তার মায়ের ঘরে চলে যাবে, রাতটা কাটাবে মার সজাগ রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে। তেমন একটা ভঙ্গি বোধহয় মর্যাদায় বাধে যখন উত্তরেই একটা বাড়তি ঘর আছে আর সেখানে যখন আছে সব সরঞ্জাম। তাড়াতাড়িতে ও-ঘরটা প্রস্তুত করা যায়নি বলেই দুপুরের বিশ্রামের ব্যবস্থাটা সোহিনীর ঘরেই হয়েছিল—সেটা সাময়িক—কিন্তু রাতের বিস্তৃত শান্তির জন্যে একটি নিজস্ব নির্জনতা দরকার, তাই এই কেতাদুরুস্ত আয়োজন। সত্যি, মেয়ের ঘর সে নেবে কেন ঘুমের জন্যে, মেয়ের পবিত্র সুস্মিত ঘর! তার জন্যে একটা অব্যবহৃত আনকোরা ঘরই সমীচীন।

কিন্তু মনে রেখ, সেটাও পাশের ঘর। যে বৃক্ষে আশ্রয় নিয়েছ তারই তলদেশে গুহা। ঘুরে-ফিরে হাওয়ার চলাচল দেখতে গিয়ে দরজার কলকব্জাও দেখে এসেছে সুপ্রভাত, কোন্ দরজা কোন্ দিক থেকে খোলে, আর অপরপক্ষে আত্মরক্ষারই বা কী

সুযোগ! উত্তরের দরজার খিল সুপ্রভাতের ঘর থেকে খুলবে আর পশ্চিমের দরজার খিল সোহিনীর ঘর থেকে। বিপরীত দিকে দুটোরই রয়েছে খাড়া ছিটকিনি। তুমি খিল খুললে কী হবে, আমার দিক থেকে ছিটকিনির বাধা।

কিন্তু মধ্যরাত্রিতে যখন ঘুম নামে এবং ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে ঘোর নামে তখন মাঝে মাঝে রক্ষী-আরক্ষী প্রহরীরাও নিদ্রায় শিথিল হয় আর দরজার অন্য দিকের খাড়া ছিটকিনিও টুক করে নেমে পড়ে নিজের থেকে।

প্রথম ইনিংসটা দেখে যাবে এই ভেবেছিল পরমা, এইখানেই বোধহয় প্রথম ইনিংস শেষ। এখন থেকে সে বাড়তি, সে অবৈধ। এখন থেকে সে বেসুরো, সে বেরঙা। তাই সে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে বলল, "এবার তবে আমি যাই।"

"এখুনি?" সোহিনীও যেন আর আগ্রহের জোর পাচ্ছে না।

"এবার প্লেন এয়ার-পকেটের মধ্যে গিয়ে পড়ছে, তাই আগে থেকেই নেমে যাই—"

সোহিনী তার পিঠে চড় কসল, তার আগেই সে পিঠ সরিয়ে নিয়ে ছুট দিয়েছে।

নীলাদ্রিও চলে যাচ্ছিল, শৈলবালা ডাকলেন। বললেন, "দুটো মুরগি আনতে পারবে?"

"সোহিনীর অতিথির জন্যে?" এতটুকু বিচলিত হল না নীলাদ্রি: "এনে দিচ্ছি।" ফিরিতে চলে গেল সাইকেলে।

হঠাৎ দুজনে দুঃসহ ফাঁকা হয়ে গেল। নিরাবরণ স্তব্ধতায় ঢাকা পড়ল দুজনে। যেন কেউ কাউকে চেনে না, দেখেওনি কোনদিন। যেন হঠাৎ ডাক দিয়েছে সাইরেন আর দুজন লোক আশ্রয়ের আশায় দুদিক থেকে একসঙ্গে স্লিট-ট্রেঞ্চের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসল আর মুহূর্তে কঠিন অপরিচয়ের অন্ধকার জ্বলে উঠল সোনা হয়ে। কত সহজেই অনড় অন্ধকারকে সবলে সরিয়ে দেওয়া যায়। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সুপ্রভাত। 'হেরি হেরি না পূরল আশ।' এ যেন 'আঁখি পালটিতে নহে পরতীত।'

বললে, "এবার আমি জয়ী। উঃ, তোমার বন্ধুটা কী নির্দয়!"

"কে, পরমা?" সোহিনী ভাবল আবার তার দিকে নজর কেন?

"সর্বক্ষণ তোমাকে গ্রাস করে আছে। দয়ামায়া ত নেই, বুদ্ধিশুদ্ধিও নেই।"

"ওর দোষ কী। আমিই ওকে আটকে রেখেছি।"

"কিন্তু ভবিষ্যৎকে তুমি আটকাতে পারবে? পারবে এই রাত্রকে? গুহা থেকে বেরিয়ে আসা শ্বাপদ রাত?"

"আস্তে—" গলাটা ঝাপসা করল সোহিনী।

"আমি জয়ী।" বারেবারে বলতে ভাল লাগছে সুপ্রভাতের: "অয় তুমি আমাকে কী করে ফেরাতে পার?"

"এখনও খেলার এক রাউন্ড বাকি আছে।"

"কিছু বাকি নেই। প্রথমে বললে, পড়া শেষ কর। করলুম। বললে, শুধু পাশ করলেই চলবে না। উচ্চ চূড়ায় জ্বলতে হবে। তাই হলুম, নিলুম ফার্স্ট ক্লাস। বললে, চাকরি যোগাড় কর, করলুম, বেশ মোটা-সোটা থাকিয়ে চাকরি। সব বাধা সরালুম একে একে। বাংলার সুসন্তান এর বেশী আর কী করতে পারে?"

"এখনও এক বাধা বাকি।"

"সে ত শুধু একটা রুটিন অনুষ্ঠানের। তোমার বাবাকে বল না দিনক্ষণ যত শিগগির সম্ভব নিয়ে আসুন এগিয়ে—"

"সে ত হবেই। কিন্তু আরও একটা গিঁট আছে—"

"সে আবার কী।"

"একটা বাড়ি, অন্তত ফ্ল্যাট।"

শৈলবালা কান ঠিক খাড়া করে রেখেছেন। বারান্দা থেকে এলেন বেরিয়ে: "কেন, নিজের বাড়ি কী হল?"

উৎসাহিত সুরেই বললে সুপ্রভাত, "সে ত আছেই। তবে সেটায় বড় হাবজাগোবজা ভিড়, যাকে বলে হচপচ। সেখানে পোষাবে না আমাদের। সব সময়েই হৈ চৈ, হার্লি-বার্লি। সীমা-সরহদ্দ নেই, নেই মনের মতন গা হাত পা মেলা স্বাধীনতা। হাঁ, বাড়ি একটা নেবই নিশ্চয়।"

বাড়ির এখন অভাব নেই কলকাতায়। খবর একটা পেয়েছি পার্ক সার্কাসের দিকে, তোমার ইস্কুলের কাছে। এখন কোথায় দীনেন্দ্র স্ট্রীট আর তখন একেবারে ঝাউ-তলা। চল, একদিন গিয়ে দেখে আসি দুজনে।

"দাদাদের সঙ্গে বনিবনা হয় না নাকি?" শৈলবালা বুঝি ভাবিত হলেন।

"না না, তেমন কিছু নয়।" আশ্বস্ত করল সুপ্রভাত: "বিষয় থাকলেই শরিক আর শরিক থাকলেই ঠোকাঠুকি। বরং আলাদা হয়ে থাকলেই দাদারা আশীর্বাদ করবেন, তাঁদের একখানা ঘর বাড়বে।"

"সবই তাদের ঘর নাকি?" শৈলবালা যেন ফোঁস করলেন ওপার থেকে।

"আহা, আমার স্বত্ব মারে কে, ভাগ-বাটোয়ারার স্বত্ব, বিক্রি-বিলির স্বত্ব। কথাটা তা নয়। কথাটা হচ্ছে ও বাড়িতে থাকা মানে হাটের বারোয়ারি আটচালায় বাস করা—"

"তাছাড়া", সোহিনী বললে, "ও-বাড়িতে থেকে আমার চাকরি করা পোষাবে না। স্বাধীনতার জন্যেই যখন বিয়ে—" ঘাড় ছোট করে ছোট খুকির মত লজ্জার ভঙ্গি করল সোহিনী।

শৈলবালা সরে গেলেন।

"তবে দেখতে পাচ্ছ বাড়িও তৈরি।" দর্পিত দুটো পা ফেলে সুপ্রভাত এগিয়ে এল সোহিনীর দিকে: "তবে এবার ফেরাও মোরে নয়, এবার কেমনে ফেরাবে মোরে?"

তন্ময় চোখে তাকাল সোহিনী। বললে, "সাধ্য কী তোমাকে ফেরাই? তুমি কোথাও এতটুকু ঠেকলে না। যা বললাম সব সংগ্রহ করে আনলে। বনের থেকে কস্তুরী, সমুদ্রের থেকে মুক্তো—"

"এবার তবে আকাশ থেকে চাঁদ নিয়ে আসতে দাও। মেঘশূন্য আকাশের কলঙ্ক-শূন্য চাঁদ। কী, তুমি আমার বউ না?"

কথার এক মুঠো ফাগ মুখের উপর ভেঙে পড়ল। আনন্দে ঝলমল করে উঠল সোহিনী। চোখের পাতা নাচতে লাগল। বললে, "এখনও তার একটু দেরি আছে।"

"এখনও দেরি?"

"আগে সাতপাক ঘুরি, সিঁথেয় সিঁদুর পরি—"

"উঃ, প্লিজ, তুমি আর সেকেলে থেক না। একটু দয়া কর। অনুরাগের কাছে কিসের আইন, কো বিধিঃ কো নিষেধঃ?"

"কিন্তু অনুরাগের কাছেই শ্রী, সংযম, ত্যাগ—"

"জানি জানি তুমি ইস্কুল মিসট্রেস, তুমি শিক্ষিকা—শত ধুলেও রশুনের বাটিতে গন্ধ লেগে থাকবেই—"

"আমি ছাত্রী, আমি তোমার শিষ্যা। দয়া ত তুমি আমাকেই করবে। দখলই বড় নয়, বড় কথা স্বত্ব।"

"আমার স্বত্ব কি হয়নি?"

"নিশ্চয়ই হয়েছে, তাকে এবার সত্য হয়ে উঠতে দাও। আর দুটো দিন, দুটো দিন শুধু—এত অপেক্ষা করতে পারলে—ভাল-বাসাই ত পারে অপেক্ষা করতে—"

বৈকালিক জলখাবারে আহ্বান করলেন শৈলবালা। কী পাইনি তার হিসেব মিলিয়ে কী দরকার, যা পেয়েছি তাইতেই হাত ডোবাই। আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে পড়ল সুপ্রভাত।

মুর্গি নিয়ে নীলাদ্রি হাজির। একেবারে কেটে ছাড়িয়ে এনেছে। মহা খুশী শৈল-বালা। ইচ্ছে হল নীলাদ্রিকেও নিমন্ত্রণ করেন। জিজ্ঞেস করি সোহিনীকে। সোহিনী বারণ করলে।

যাবার আগে নীলাদ্রি ডাকল সোহিনীকে।

কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, "আমি কি শেষরাত্রে আসব? ফার্স্ট ট্রেনের আগে?"

এক মুহূর্তে ভাবনার রাজ্যের আকাশ-পাতাল ঘুরে এল সোহিনী। কী বলবে ভেবে পেল না।

"যদি তুমি বল, যদি কোনও দরকার হয়—"

কী ভেবে হঠাৎ বলে ফেলল সোহিনী, "এস—তোমার কষ্ট হবে, তবু তুমি এস—"

"আমার কোন কষ্ট নেই—" বাইকে করে চলে গেল নীলাদ্রি।

গা ধুয়ে একটু ফিটফাট হয়ে নিল সোহিনী। যেন ফোটা ফুলের উপর নতুন বৃষ্টির কটা ফোঁটা পড়ল। বললে, "চল, নদীর ধারটায় ঘুরে আসি।"

যদি পাহাড় দাঁড়িয়ে থাকত পুরনো হয়ে যেত। যে নিশ্চল সেই শেষে উপেক্ষায় স্তূপীভূত। যে চলে সেই ডাকে। নদীর নাম শুনে মনও তাই চলি-চলি করে ওঠে। সাত সামনে থাকলেও তার রহস্য ফুরয় না কোনদিন। যার রহস্য ফুরয়, সম্ভাবনা ফুরয় সেই মরে থাকে।

"চল।"

বেরুল দুজনে। নদীর ধার ধরে হাঁটতে লাগল। কিন্তু কোথায় কী রাষ্ট্র হয়েছে, হাওয়ার আগে কথা ছোটে, কৌতূহলী মেয়ে-পুরুষ ছিটকে-ছিটকে আসছে এদিক-ওদিক। তারা যেন মহিমান্বিতকে দেখছে না, অভিনবকে দেখছে। দৃষ্টিতে জয়ীর জন্যে সংবর্ধনা নেই, যেন অদ্ভুতের জন্যে অসুস্থ কৌতুক। যেন রাজপুত্রকে দেখছে না, দড়িবাঁধা চোরকে দেখছে।

ঘরে-বাইরে কোথাও স্থান নেই, স্থৈর্য নেই।

"চল ফিরে যাই।" সোহিনী বলল।

"এখন ফিরে গিয়ে কী করবে?"

"মশার পিনপিন শুনব আর খাতা দেখব।" হাসল সোহিনী।

"খাতা?"

"আমার ঘরে তাকের উপর একরাশ খাতা দেখনি? পরীক্ষার খাতা। ওগুলো সঙ্গে নিয়ে এসেছি। কিছুতেই এর থেকে ত্রাণ নেই। যতদিন মাস্টারি ততদিনই খাতা।"

"তার মানে যতদিন জীবন ততদিনই খাতা।" সুপ্রভাত ফোড়ন দিল।

"হ্যাঁ, খাতাতেই শয়ন পাতা। আর কী সব লেখে মেয়েগুলো। 'দম্পতি' মানে লিখেছে কী জান?

"কী?"

"দম্পতি মানে যে পতির দম আছে।"

হো-হো-হো করে হেসে উঠল সুপ্রভাত। বললে, "তাহলে 'জম্পতি' মানে যে পতি লাফাতে, জম্প করতে ওস্তাদ। চল তোমার সঙ্গে কাগজ দেখি গে।"

বাড়ি ফিরে এল দুজনে। কী করে রাতের খাবার আগেকার সময়টুকু কেটে গেল কে বলবে! মফস্বলের রাত অল্পেই নিঝুম হয়ে এল, গাছেগাছালিতে মাঠে-নদীতে থমথম করতে লাগল। খাওয়া দাওয়া সেরে যে যার ঘরে প্রস্থান করল। খিল পড়ল চার ঘরের।

আলো নেবাবার আগে ঘরের চারদিকে আরেকবার তাকাল সুপ্রভাত। নতুন খাটে পরিপাটি প্রশস্ত বিছানা, টেবিলে ঢাকা-দেওয়া খাবার জল, শিয়রে ছোট টর্চ, মশারি ফেলা। টেবলফ্যানটাও এঘরে এসেছে, ঘুরছে সশব্দে। যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন নিখুঁত কিন্তু শিব অনুপস্থিত। এ যেন দেনমার্কের যুবরাজ ছাড়াই হ্যামলেট। সভাপতি ছাড়াই সভা। বেশ শব্দ করে জানান দিয়েই খিল দিল সুপ্রভাত। আলো নিবিয়ে ঢুকল মশারির নীচে, শুয়ে পড়ল। পদ্মনাভকে স্মরণ করল, যেন ঘুম আসে।

ওপারে নিজের ঘর থেকে ছিটকিনি তুলে দিল সোহিনী। শব্দ করে, জানান দিয়ে। দেবার আগে ঠেলে দেখল দরজা সত্যিই বন্ধ কিনা ওদিকে।

পশ্চিমের দরজা খুলে শৈলবালা এলেন সোহিনীর কাছে। বললেন, "আমার দিকের দরজাটা খোলা থাক।"

যেন ওটা সোহিনীর পালানর রাস্তা আত্মরক্ষার রাস্তা এমনি শোনাল কথাটা। যেন সম্ভাব্য কোন ডাকাতির বিরুদ্ধে তোড়জোড়। খাতা থেকে মুখ তুলে সোহিনী বললে, "শুধু ভেজিয়ে রাখ।"

শৈলবালা চলে গেলেন নিজের ঘরে।

আরও কতক্ষণ নম্বরের যোগ দিতে গিয়ে ভুল করে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল সোহিনী। ছি ছি, আলো জ্বালিয়েই শুয়ে পড়েছে। আলোই কি রক্ষাকর্তা? যখন অন্ধকার আসে তখন সমস্ত আলোকে পর্যুদস্ত করেই আসে। না, অন্ধকারকে কী ভয়! আলো নিবিয়ে দিল সোহিনী। অবগাহন স্নানের মতই অন্ধকার।

কিন্তু ঘুম কি আসে? না আসুক। অঘুমে মেশা এই অন্ধকারই বা কি আশ্চর্য! অন্ধকারে চোখ চেয়ে থাকা। মনে পড়তে লাগল আসানসোলের অদূরে সেই কয়লা-খাদের কথা। সেই সেবার দিদির সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে খাদে নেমেছিল তারা, সুপ্রভাতও ছিল যেমন থাকবার। ধরিত্রীর ত্বক-মাংসের নীচে কোথায় কোন প্রচ্ছন্ন শিরা বেরিয়েছে তারই থেকে কালোরক্ত শুষে নাও নিঃশেষে। খাঁচায় করে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে নামা, কত অতল গভীরে তা কে জানে! ভীষণ ভয় করছিল সোহিনীর। চোখ চেয়ে তাকিয়ে হাত বাড়িয়েও যেন ধরবার-ছোঁবার কিছু নেই চারদিকে। নামছে ত নামছেই, কোন অন্ধ অধঃপতনের আনন্দে। না, শেষ পর্যন্ত থামল খাঁচাটা, যেখানটায় থামল সেটা একটা চাতালের মত, দেয়াল কয়লা মেঝে কয়লা, সিলিং কয়লা। সবচেয়ে শান্তি ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে আর যাতে তার জেল্লা বাড়ে, তাই পাশে-উপরে চুনকাম করা হয়েছে। বেশ ঘর ঘর মনে হচ্ছে এখন, মনে হচ্ছে না মহীরাবণের বাড়িতে এসেছি। দেয়াল চিরে চিরে লম্বা লম্বা কালো সুড়ঙ্গ চলে গিয়েছে একটানা, কাটা কয়লার সরু সরু পথ, কতদূরে কে জানে লণ্ঠনের মিটি-মিটি আলোতে কাজ করছে মালকাটারা। চল দেখবে চল, বুকের মধ্যে সেই সব কালো পথ যেন আঁকুপাঁকু করে ওঠে। চল আরও দূরে আরও গভীরে আরও অন্ধকারে। হয়ত যেখানে গিয়ে পৌঁছবে, সেখানে এক ছিটে লণ্ঠনের আলো নেই, নেই একটাও বা নিশ্বাসের রেখা—তবু চল। না, লোক আছে, আলো আছে, আশা আছে—ট্রামে বোঝাই করে স্তূপ স্তূপ কয়লা আসছে কাজের মুখ থেকে। আছে শক্তি ও স্বাস্থ্যের উত্তাপ, নতুন নির্মাণের দুঃসাহস।

হঠাৎ সোহিনীর হাত ধরে আকর্ষণ করল সুপ্রভাত। সরীসৃপ পথের দিকে ইঙ্গিত করে বললে, "যাবে ঐ পথ দিয়ে খানিকটা?"

"মরে যাব।" এমনি ভয় পেয়েছিল সোহিনী।

"মৃত্যুকে এত ভয়?"

"মৃত্যুকে তত নয় যত বা তোমাকে।" হাসবার চেষ্টায় নির্ভয় হতে চেয়েছিল সোহিনী।

"কিন্তু মৃত্যু একেবারে বুকের কাছে এসে পড়লে আর ভয় নেই।"

"না, তখন আর নেই। তখন তার আলিঙ্গনে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ।"

আলো-করা জায়গাটুকুতে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্তে বলতে পারল সোহিনী।

"মৃত্যু ধৈর্যের অপেক্ষা রাখে না—বলা নেই কওয়া নেই সমারোহে সামনে এসে দাঁড়ায়—"

বলতে বলতেই কী কারসাজিতে কে জানে, ইলেকট্রিক অফ হয়ে গেল। সেই ছোট আশ্রয়ের দ্বিধাটুকুও ভরে গেল ভেসে গেল অন্ধকারে। খাঁচার ঘণ্টা বন্ধ হল, বন্ধ হল ট্রামের ঝকঝক। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল আর্তনাদ করে উঠল। বয়স্করাও হৈ-চৈ শুরু করলেন।

সোহিনীর মনে হল, মৃত্যুই বুঝি এসেছে বাহু মেলে। হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছে তাকে অন্ধকারে। কিন্তু যদি ধরতেই না পারে কে করে সমর্পণ! শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই চেষ্টা করে এড়াতে।

কী আশ্চর্য, শুয়ে শুয়ে ভাবছে

LIBRARY
Cooch Behar

'দম্পতি' মানে শিখেছে কী জ্ঞান?

প্রভাত, কত কাছেই ছিল সেদিন সোহিনী, ায় বাহু ঘেঁষে, বুড়ো আঙুলের নীচে, কন্তু যেই অন্ধকার হয়ে গেল, পিচঢালা ন্ধকার, সতর্ক দ্রুততায় ঠিক দূরে সরে াল পিছলে। যেন বহুদিনের মহড়া াওয়া রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য। ব্যাকুল হাত াড়িয়েও যা ধরতে পেল সুপ্রভাত তা এক- াল কয়লা একতাল সোহিনী নয়। কী ঃসহ সে নৈরাশ্য! যে মেয়ে মরতে বসেও রে না, তার না জানি কিসের স্নায়ু। যেন ত্যুর চেয়েও আকাঙ্ক্ষাই ভয়ের। মৃত্যু লুষিত করে না, আকাঙ্ক্ষাই কলুষিত রে। প্রায় অপমানের মতই মনে হয়েছিল প্রভাতের। কিন্তু আর একটা নতুন ংকল্পে দৃঢ়তর হবার আগেই টুক করে ালো জ্বলে উঠল। প্রসন্নতায় ঝলমল রে উঠল চারদিক। সুপ্রভাত দেখল, াহিনী কাছেই দাঁড়িয়ে। হাসছে মুখ টপে টিপে।

একটা থামা বাস্ ধরবার জন্যে ছুটেছিল একটা লোক। বাসের কাছে পৌঁছবার আগেই বাস ছেড়ে দিল। তাকে পিছু পিছু খানিক ছুটতে দেখলে থামবে তারই আশায় লোকটাও ছুটল। থামো থামো হয়েও বাসটা থামল না। সেই না-থামা বাসের পিছে ছুটন্ত লোকটার মতই নিজেকে বোকা বোকা লাগল সুপ্রভাতের। যেন অপ্রত্যক্ষ কোন আরোহীর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের শর বিঁধল তার চামড়ায়।

হ্যাঁ, সমস্ত উদ্যোগ-প্রয়োগ তাকেই করতে হবে। সবই যদি বিধিবদ্ধ হয়, রুলটানা হয়, কপাট-চৌকাঠের নক্শা মানা হয়, তাহলে আর জীবনের স্বাদ থাকে না। আর কেনই বা সব সময়েই এই হিসেবের কাছে নিয়মের কাছে কাঙালপনা। দুর্গমের দুর্গ জয় করব এই ত জীবনের ডাক। উন্মেষের জন্যে উন্মোচনের জন্যেই ত যত কান্না সংসারে, আর তারই বিরুদ্ধে যত বাধা যত নিষেধের জারিজুরি।

সুপ্রভাত উঠে পড়ল। যা অবধারিত, নিরূপিত, সে কেন মান পাবে না? নিঃশব্দ নিজের দিক থেকে খিল খুলল। টানল দরজা। অবধারিতই দাঁড়িয়ে আছে ওপারে। ওপার থেকে ছিটকিনি তোলা।

আবার ধীরে ধীরে ঢুকল মশারির নীচে। গুহার মধ্যে পরাস্ত পশুর মত।

মাঝে মাঝে তন্দ্রাভরা তপ্ত একটা ঘোর আসে নীড়ে-বসা পাখির মত ঘন হয়ে, আবার কখন তা শূন্যে চলে যায় পাখা ঝাপ্টে। কিছুতেই একটানা গা-ঢালা ঘুম আসছে না সোহিনীর। একবার নদীর দিকের জানলা খুলে বসে রইল অনেকক্ষণ। নদী নয় ত চিরন্তনকালের একটি সহজ জিজ্ঞাসা। সহজ প্রশ্নই সবচেয়ে কঠিন, কিন্তু সহজ উত্তর তার চেয়েও দুরূহ। কী রাক্ষস গরম, ঘাসের একটি ডগাও নড়ছে না। চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে আবার শুয়ে পড়ল সোহিনী।

কী হয় ছিটকিনি খুলে দিলে? যে আসবে সে ত তার সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে

যার কাছে সে বেশী প্রতিশ্রুত। যে নির্ধারিত তার প্রতি কেন এই অবিশ্বাস? এই পরম উৎসব-রাত্রির লগ্ন কি আর আসবে? যা একদিন আসবে তা আপোসের জিনিস, বৈধতায় নিশ্চিন্ত, বৈধতায় বিস্বাদ। তাতে কি থাকবে এই উজ্জ্বল প্রসঙ্গ? উপন্যাসের মাঝখানের একটা পরিচ্ছেদ হয়ে লাভ কি, একটা ছোটগল্পের শেষ হওয়া ঢের ভাল।

এতদূর পর্যন্ত এসে কেউ কি ফিরিয়ে দেয় এ-রাত্রি?

কে সে অনিদ্র, সোহিনীকে আবার টানে, চুপ করে শুয়ে থাকতে দেয় না! সোহিনী আবার এক ঝটকায় উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। পরে গুটি গুটি এগুলো উত্তরের দরজার দিকে। রুদ্ধ নিশ্বাসে। এতটুকুও ভুল হল না। নিঃশব্দে এপারের ছিটকিনিটা নামিয়ে দিল।

আবার এসে শুল তার বিছানায়। বর্ষার আশায় খেত-মাঠ যেমন চুপ করে থাকে, তেমনি চোখ বুজে রইল।

আহা, কত শান্ত আর নিষ্পাপ সোহিনী, কত ছন্দোবদ্ধ। ঘুম-মাখা চেতনার মধ্যে থেকে ভাবছে সুপ্রভাত। আহা, ওকে ব্যস্ত করে লাভ কী, ওকে ছিন্ন করে সুখ কার। ও ত তার হবেই, তার আছেই। ও যে ছিটকিনিটা তুলে রেখেছে তা ভয়ে নয় প্রত্যাখ্যানে নয়, শ্রদ্ধায়, স্বীকৃতিতে। শ্রীকে মানা শৃঙ্খলাকে মানা সুষমাকে মানাই ত সত্যিকার ভালবাসা। আহা, শ্রান্ত পাখি, ও ঘুমোক। ওর দেহমন তার নির্ভয় নীড় হক।

কত উদার, প্রশস্তবুদ্ধি এই সুপ্রভাত। মোছা মোছা চেতনার মধ্যে থেকে ভাবছে সোহিনী। খিল খুলে একবারও পরখ করে দেখছে না সত্যি কোথাও প্রতিরোধ আছে কিনা। অন্তত একটা শব্দ করেও জানান দিচ্ছে না, আমি জেগেছি আমি জেনেছি। কত মার্জিত সম্ভ্রান্ত। সমস্ত শূন্যকে মন্থন করে আসছে না তুফান হয়ে। তাকে অনায়াসের মৃত্তিকা করতে চায়নি। তার সহিষ্ণুতাকে চায়নি লজ্জা দিতে। তাকে রেখে দিয়েছে স্থিরসুন্দর প্রতিমার মহিমায়। বলেবুদ্ধিতে কত সমর্থ, আহা, ওর ঘুম প্রগাঢ় হক।

গফুরালি ঠিক সময়ে, ঠিক সময়ের আগেই এসে হাজির। এসে দেখে কে একজন লোক সাইকেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে সদরের কাছে।

জিজ্ঞেস করল গফুরালি, "বাবু ওঠেনি!"

"তুমি হর্ন দাও না। আমার বেলের চেয়ে তোমার হর্নের বেশী জোর।"

হর্ন দিতে লাগল গফুর। ডাকতে লাগল, "বাবু, আমি এসেছি।"

এক লাফে উঠে পড়ল সুপ্রভাত। এ কী, সোহিনীকে ডাকতে হয়, সবাইকে ডাকতে হয়। এখনও ওঠেনি দেখছি কেউ। কী বিপদ, দরজার খিলটা তখন আর লাগায়নি বুঝি। ভেজান দরজার পাল্লা ধরে টান দেবার আগেই হাঁক পড়লঃ "ও সোহিনী ওঠ, ছিটকিনিটা খুলে দাও। রিকশা ঠিক এসে গেছে।"

দেরি হচ্ছে দেখে নিজেই টানতে গেল দরজা—এ কী, দরজার ছিটকিনি নেই।

সোহিনীর ঘরে ঢুকে দেখল সোহিনী ছোট্টটি হয়ে শিশুর মত ঘুমুচ্ছে। সুপ্রভাতের ইচ্ছে হল দু হাতের পর্যাপ্ত স্পর্শে ওকে জাগিয়ে দিই। কিন্তু তার আগে শৈলবালা ঢুকে পড়েছেন, ডাকছেন, "ওঠ ওঠ সোহিনী, সুপ্রভাতের যাবার সময় হল।"

এক ঝটকায় উঠে পড়ল সোহিনী। আলো জ্বালাল। ঘরের সব জানলা-দরজা খুলে দিল ঝটপট। শেষরাত্রের পরিচ্ছন্ন হাওয়াকে স্পর্শ করল সর্বাঙ্গে।

চোখে-মুখে জল দিতে দিতে সোহিনী বললে, "যাব, সি-অফ করতে যাব।" হঠাৎ নজর পড়ল ভাল করেঃ 'নীলুদা, নীলুদাও এসে গিয়েছ দেখছি।"

উপায় নেই, রিকশাতেই বসতে হল দুজনকে। আর নীলাদ্রির যে সাইকেল সে সাইকেল।

বিশুদ্ধ ব্যবধান রেখে আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নীলাদ্রি। রাস্তাঘাট নির্জন, ক্বচিৎ এক-আধটা দোকানের এক-পাট দরজা খুলেছে। আকাশের গায়ে গায়ে এখনও অন্ধকারের লাবণ্য।

সোহিনীর হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল সুপ্রভাত। যেমন আকাশের একটি তারা মাটির একটি ফুল, তেমনি এই স্পর্শ, এই স্পর্শের আকর্ষণ। সুপ্রভাত বললে, "তুমি কী ভাল!"

ভোরের শিশিরের মতন চোখে সোহিনী বললে, "তুমি আমার চেয়েও।"

স্টেশনের থেকে বেশী দূরে নয়, রিকশার সামনের চাকা পাঙ্কচার্ড হয়ে গেল।

এখন উপায়? নেমে পড়ল দুজনে। যা দু-একটা রিকশা আছে রাস্তায় সব সোয়ারীর কেরায়া। বাকী পথটুকু না হয় হেঁটেই গেলাম, কিন্তু কুলি পাই কোথায়? সুটকেসটা বয় কে?

রাস্তার ধারে আধ-খোলা একটা দোকানে সাইকেলটা গুঁজে দিয়ে নীলাদ্রি বললে, "দিন আমাকে। এ আর ভারী কী!"

হাতে করে স্টেশনে বয়ে নিল নীলাদ্রি। সুপ্রভাত তাকে লক্ষ্য করে বললে, "টিকিটটা কাটব কোথায়?"

"দিন আমাকে—" নীলাদ্রি হাত বাড়িয়ে টাকা নিল।

আজেবাজে ক্লাস নয়, সেকেণ্ড ক্লাস, মনে করিয়ে দিল সুপ্রভাত। নীলাদ্রি এগিয়ে চলল টিকিটঘরের দিকে।

সহসা সোহিনী তার পিছু নিল। সুপ্রভাতকে বলে গেল, "ভুল করে আবার দুখানা টিকিট না করে বসে। আমি যে পরে যাব এ জানে কিনা—"

একটু দ্রুত পা চালিয়েই টিকিট-ঘরের কাছে নীলাদ্রিকে ধরল সোহিনী। চাপা ধমকের সুরে বললে, "তুমি কি মাল বইতে টিকিট করতে এসেছ নাকি?"

থমকে দাঁড়াল নীলাদ্রি। বললে, "তুমি কি এতে খুশী হচ্ছ না?"

"না, কখনো না।" দাঁতে দাঁত চেপে সোহিনী বললে, "তুমি আর কারু কুলি নও চাকর নও।"

কথাটা বলেই আবার স্বস্থানে সুপ্রভাতের কাছে ফিরে এল। বললে, "বারণ করে দিয়ে এলাম।"

"যা টাকা দিয়েছি তাতে দুখানা টিকিট বোধ হয় হয় না।"

"কে জানে কমতিটা হয়ত নিজের থেকেই পুরে দিত।" সোহিনী বুঝতে পারছে কথাটা জুতসই হচ্ছে না, তবু না বললে নয় বলতেই হবে।

টিকিট নিয়ে এল নীলাদ্রি। ছাড়ো ছাড়ো ট্রেন প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়ে। এবার উঠে পড়লেই হয়।

কামরাটা আগাপাশতলা বন্ধ। সুপ্রভাত তাকাল নীলাদ্রির দিকেঃ "একটু উঠে জানলা-টানলাগুলো খুলে দিলে হত।"

এ কি নীলাদ্রির কাজ? সে মুখ ফিরিয়ে রইল। কাশ্মীরের পোস্টার দেখতে লাগল দেয়ালে।

সুপ্রভাত নিজেই উঠল। নিজেই জানলাগুলো খুলল পর পর। পাখা চালু আছে কিনা দেখল। দেখল বাথরুমের চেহারা।

একটা ঝাড়ুদার ডাকলে হত। কাকে বলি?

"তোমার নীলুদা গেল কোথায়?"

"কে জানে কোথায়?" শূন্য চোখে দূরের দিকে তাকাল সোহিনী।

"আচ্ছা, কে এই নীলুদা?" প্রতিদ্বন্দ্বীর কোটের মধ্যে আনতে গেলে সে যে কড়ে আঙুলেরও সমান নয় এ তার চেহারা-চরিত্র দেখেই বোঝা যাচ্ছে। একটা আস্তানাহীন স্বদেশী-স্বদেশী চেহারা। কিন্তু চেহারা-চরিত্রই ত সব নয়, কার মনের জড় কোথায় গিয়ে জট পাকায় কে বলবে! তাই একটু নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া মন্দ কী।

"নীলুদা? ও আমাদের পাড়ার ছেলে! ছেলেবুড়ো সকলের নীলুদা!" বলার

সুরটাকে শেষ পর্যন্ত ফিকে করে দিল সোহিনী।

পরমাও অমনিধারাই বলেছিল যখন সোহিনীর অসাক্ষাতে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল সুপ্রভাত। বলেছিল, সরকারী দাদা।

বেসরকারী যদি কিছু থাকেও তাড়িয়ে দাও। কাটা দাগের উপর ছোঁসা-পাশে আমার নাম লিখবে তা চলবে না। পৃষ্ঠা ওলটাও, স্লেটটাকে নিদাগ করে ফের শুরু কর। জীবন মানেই পৃষ্ঠা ওলটানো।

"কী করে?"

"ছোটখাটো কী একটা কেরানীর কাজ করে—" যেন উল্লেখ করবার মত কিছু নয় এমনি সোহিনীর ভাব।

"কলকাতায়?"

"না, না, কাঁচড়াপাড়ায়—" রাজধানীর উপযুক্ত নয়, সুতরাং আরও যেন উপেক্ষার যোগ্য, সোহিনীর সেই ভঙ্গি।

"গ্র্যাজুয়েট?"

সোহিনীর ঠোঁটে অনুকম্পা: "আই-এ, থার্ড ডিভিসন। তাই ত ভাল মেকলটা পেল না শুনেছি।"

"অবস্থা?"

এবার ঘৃণায় নাক কুঁচকোল সোহিনী: "হতশ্রদ্ধ গরিব—ঘাড়ে আবার এক দঙ্গল আইবুড়ো বোন—"

এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না জিজ্ঞেস করলেও চলত। উচ্ছ্বসিত হয়ে সোহিনীর দিকে হাত বাড়াল সুপ্রভাত: "তুমি উঠে এস না।"

"বেশী দেরি নেই ট্রেন ছাড়বার।"

"তা হক, লক্ষ্মীটি, তুমি এস।"

"তুমিও ত নামতে পার—" অকুণ্ঠিত হাত বাড়াল সোহিনী।

"খিল-ছিটকিনি দুই-ই খোলা, তাই না?" হো হো হো করে হেসে উঠল সুপ্রভাত: "চল না এইভাবে, যেমনটি আছ, উঠে পড না হাত ধরে। বেশ একটা পালানো-পালানো ভাব হয় তাহলে। লোকে বলবে, সি-অফ করতে এসে চলে গিয়েছে। ট্রেন বেছে টাইম টেবল দেখে টিকিট কেটে যাবার মধ্যে বাহাদুরি কী!"

"তার চেয়ে তুমিই নেমে এস না। লোকে বলবে চাকরি না নিয়ে বাবু বউ আনতে গিয়েছেন—"

দুটো করে দুবার ঘণ্টা দিল। খানিকটা পিছনে গিয়ে একটা হেঁচকা টান মেরে ট্রেনটা চলতে লাগল সামনে।

প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা হতেই নীলাদ্রিকে দেখা গেল দূরে। এমনিতেই দেখা হত, তবু হাত তুলে ডাকল সোহিনী।

কাছে এলে নীলাদ্রি বললে, "কী, তুমি গেলে না?"

"আহা, আমার কি এই ট্রেনে যাবার কথা?"

"কথা বলে কিছু নেই সংসারে, কাজ, কাজই আসল।" একটু বোধহয় গম্ভীর হল নীলাদ্রি: "চলে যাওয়াই শেষ কথা।"

"শেষ বলে কিছু নেই।" এক সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বললে সোহিনী।

"তাহলে তুমি যাবে না?"

"আমি পরের ট্রেনটাতে যাব।" বললে সোহিনী।

"সেটা ত সেকেণ্ড ট্রেন—আমার ট্রেন। তোমার ত থার্ড।"

"কথা বলে কিছু নেই কাজই আসল।" নীলাদ্রির কথাই সোহিনী পুনরুক্তি করলে। পরে বললে, "তোমার ট্রেনে, সেকেণ্ড ট্রেনেই যাব, আর তোমার সঙ্গে।"

"আমার সঙ্গে? সে ত কাঁচড়াপাড়া—"

"কোনো পাড়া-পল্লীতে নয়, একেবারে লোকালয়ের বাইরে, অনেক অনেক দূরে—"

হাসল নীলাদ্রি। চলতে চলতে বললে, "ম্যাপটিতে যে জায়গা আঁকা নেই সেই জায়গায়?"

"হ্যাঁ, সেই জায়গায়। তোমার সাইকেলটার দিকে আর ফিরে তাকিও না, ওটাকে কোথাও বনে-জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এস। খালি হাত-পা হও। তারপরে দুই হাতে তুলে নাও আমাকে—"

"এ যে অনেক পুরোনো কথা বলছ।"

"পুরোনোই ফিরে ফিরে আসে নতুন হয়ে।" সোহিনী বললে, "পুরনো কথাই আর পুরোনো হয় না। কেন, কেন, তুমি আমাকে জোর করে নিয়ে যেতে পার না, নীলুদা?"

"আমার ক্ষমতা কই?"

"তোমার ক্ষমতা নেই, কিন্তু কী অসম্ভব আশ্চর্য তোমার ক্ষমতা নীলুদা! কত তুমি বইতে পার, শুধু একটা সুটকেস নয়, বিরাট গন্ধমাদনের ভার—কত তুমি সইতে পার, কত দুঃখ কত অপমান—"

নীলাদ্রি হাসল। বললে, "সে ক্ষমতা ত তোমার।"

"আমার?"

"তোমার ছাড়া আর কার! যে এই ভালবাসা ডেকে আনতে পারে সেইই ত ভীষণ, সেইই ত মহৎ—"

"নীলুদা, চল না ঐ নিরালায় গিয়ে বসি।" হাঁটতে হাঁটতে প্ল্যাটফর্ম ফুরিয়ে দিয়ে বললে সোহিনী, "ঐ ঘাসের উপর। এখুনি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না, আর তোমার সেকেণ্ড ট্রেনের ত এখনো দেরি আছে।"

লাইনের ধারে একটা কালভার্টের নিচুতে ঢালা ঘাসের উপরে বসল দুজনে। লোকজন নেই, দূরে স্টেশন-প্ল্যাটফর্মের নিবু-নিবু আলো শেষের শ্বাস গুনছে। অন্ধকার এখনও আকাশের গায়ে লেগে আছে একমেটে হয়ে। সমস্ত শূন্য জুড়ে শুধু পাখিদের বাসা ছাড়বার উদ্যোগ।

"আমি আর ভোর হতে চাওয়া এই রাত্রি।" সোহিনীর স্বরে বুঝি বা ভিজে হাওয়ার আমেজ লাগল: "আমি আলোই জ্বালতে পারলাম, ভোর হতে পারলাম না। নীলুদা, আমি কেন এত ভীরু, এত দুর্বল?"

"তার জন্যেই ত তোমার জন্যে এত মায়া—"

বৃষ্টির ফোঁটাও বুঝি বা পড়-পড় হল। বললে সোহিনী, "কেন আমি তোমার জন্যে পারলাম না কুচ্ছ সইতে? কেন কলঙ্কের কুলো নিতে পারলাম না মাথায়?"

সোহিনীর হাতের উপর নীলাদ্রি হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বললে, "তোমাকে কি ভিখারিনীর সাজ মানায়? তুমি অমর্ত-লোকের ধন, তোমাকে কি বাঁধতে পারে দরিদ্রের বস্ত্রাঞ্চল? রাজেন্দ্রাণী হয়ে তুমি বিরাজ করবে সংসারে, তোমার দেহে মনে সেই প্রদীপ্ত প্রতিশ্রুতি। আমি কি তোমার সেই স্বপ্ন ভেঙে দিতে পারি?"

"কত লোকে ত দেয়, নীলুদা।" নিজের হাত ছেড়ে দেওয়া নয়, নীলাদ্রির হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল সোহিনী: "কেন তুমি তাকে ক্ষমা করবে যে শুধু আরাম চাইল, সোয়াস্তি চাইল, স্বাচ্ছন্দ্য চাইল? যে প্রাণ নিল না শুধু স্থান নিল?"

"তাই ত স্বাস্থ্য।" বললে নীলাদ্রি, "স্থান না হলে প্রাণ বাঁচে কই?"

"জান, কাল রাতে আমার এক ফোঁটা ঘুম হয়নি, দুচোখের পাতা পারিনি এক করতে। ইচ্ছে করছে এই আধোজাগা ভোরের আলোয় এই ঠাণ্ডা ঘাসের উপর তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে ঘুমোই।" সোহিনী সত্যি সত্যিই গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল। সরে বসল নীলাদ্রি। নিজের বাহুকেই উপাধান করল সোহিনী।

"তুমি এমন কেন নীলুদা? তুমি কেন আমাকে ছেড়ে দেবে? কেন আমাকে জোর করে বেঁধে রাখবে না? কেন আমাকে বিপদে ফেলে বন্দী করবে না খাঁচায়? কেন আমার পালাবার পথ বন্ধ করে দেবে না একেবারে?"

"ছি, এসব তুমি কী বলছ!" সোহিনীর চুলে হাত বুলোতে লাগল নীলাদ্রি।

"লোকে কি আর পড়ে না সেই অবস্থায়?" উদ্বেল হয়ে বলতে লাগল সোহিনী, "পড়লে সেইভাবেই অনুপাত খোঁজে। পরিবেশের সঙ্গে মীমাংসা করে। খাঁচায় পোরা বাঘিনী দেখনি? সে-বাঘিনী কি বাঁচে না, না, তার কাটে না দিনরাত? নীলুদা, তুমি আমাকে ছেড়ে দিও না,

জন্মাতে দিও না বিরজায়িনীর মত, আমাকে তুমি কালো করে দাও, উপহাসের হাত থেকে তোমার পৌরুষকে ত্রাণ কর। নীলুদা—" দুহাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল সোহিনী।

নীলাদ্রি বললে, "ওঠ, একটা গান গাই।"

"তুমি কেন এই হেয় এই অধমকে এখনো ভালবাসবে?"

"ভালবাসা কি কেউ বাসে? ভালবাসা আসে।" গলায় সুর আনবার চেষ্টায় ক্ষীণ আওয়াজ তুলল নীলাদ্রি।

"তুমি আমাকে তুচ্ছ আবর্জনার মত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারবে না, পারবে না দেহে মনে প্রাণে বাকো দাবানল ঘৃণা করতে, এ আমি সহ্য করতে পারব না, নীলুদা। আমাকে দয়া কর। দয়া করে ঘৃণা কর আমাকে। যাতে ঘৃণা করতে পার তাই কর। আমি ছোট, অপদার্থ। তোমার অমর্তলোকের ধন নই, আমি ধুলো আমি ছাই—আমাকে বিন্দুমাত্র মূল্য দিও না, নীলুদা।"

নীলাদ্রির কণ্ঠে সুর আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল।

মুখ তুলে চাইল সোহিনী, জলমলিন মুখ। বললে, "জানতাম তুমি মাটির মানুষ, আসলে তুমি পাষাণ।"

"পাষাণ মাটি ছাড়া আর কী!" বললে নীলাদ্রি, "ধ্যানের মন্ত্র পেলেই মাটি পাষাণ হয়ে ওঠে। আমিও তেমনি ভালবাসার মন্ত্রে পাষাণ হয়েছি।"

"কিছু নয়।" উঠে বসল সোহিনী, মাথার চুল ঠিক করতে লাগল। বললে, "এ শুধু তোমার শুকনো ব্রহ্মচর্যের স্পর্ধা।"

"প্রেম বলেই ব্রহ্মচর্য।" স্নেহঢালা প্রগাঢ় স্বরে বললে নীলাদ্রি, "ব্রহ্মচর্যের চেয়েও প্রেম বড়।" গান ধরল নীলাদ্রি:

> "ভয় করব না রে বিরহবেদনারে
> আপন সুধা দিয়ে ভরে দেব তারে॥
> চোখের জলে সে যে নবীন রবে
> ধ্যানের মণিমালায় গাঁথা হবে
> পরব বুকের হারে॥"

গানের পরে আর কথা নেই। মন যেন শান্ত হল, দৃঢ় হল, পবিত্র হল। উঠে পড়ল দুজনে। নীলাদ্রি বললে, "তুমি ত বাড়ি ফিরবে। কাউকে দিয়ে খবর পাঠিও আমার সাইকেলটা যেন এসে নিয়ে যায়। আমি সেকেণ্ড ট্রেনে।"

রিকশা করে হুড়মুড় করে বাড়ি ফিরে এল সোহিনী। সাজ সাজ রব তুলল, চারদিকে বিকীর্ণ করতে লাগল তার অস্তিত্বের অমৃত। কী আনন্দ, কী আনন্দ, দোলে মুক্তি দোলে বন্ধ। হাটের ধুলো তার গায়ে লাগেনি, দামধরা আঁটা ঢাকঢের পেন্‌ ফোটোন তার গায়ে, অনাঘ্রাত ফুল হয়েই যেতে পারবে দেবতার অর্চনায়।

শিবনাথ বললেন, "আমি কাল-পরশুই যাব কথা ঠিক করতে।"

"কাল-পরশু কেন? আজই বিকেলের ট্রেনেই যাও না। যত তাড়াতাড়ি হয়। শেষে নুন আনতে না পান্তা ফুরয়। আর মা, তুমিও যেও। দেখে-শুনে অর্ডার-ফরমাস সব দিতে হবে দোকানে। অন্তত স্যাকরার দোকানে—শুভস্য শীঘ্রং—"

থার্ড ট্রেনের মেয়ে-কামরাতে উঠেছে সোহিনী।

"এ কী, তুমি গীতালি না?" দরজা ঠেলে কে একটি মেয়ে উঠতে যাচ্ছে কামরায়, সোহিনী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

"ও, তুমি, সোহিনী?"

"তুমি যাচ্ছ নাকি কলকাতায়?"

ঢোঁক গিলল গীতালি। বললে, "বলতে পাচ্ছি না। একজনকে খুঁজছি।"

"কাকে?"

"তার এখনও ঠিক নেই।" শুকনো হাসি হেসে নেমে গেল গীতালি।

কী যেন বিপদে পড়েছে! এক কামরায় যেতে চায় না, কেটে পড়তে চায়। এই সেদিন ভাল বিয়ে হল গীতালির, তার আবার এই ছন্নমতি চেহারা কেন? কে জানে কেন? হয়ত অহঙ্কার। অহঙ্কার ত জাঁকিয়ে বসে, পানা কাটে না। তারপরে তার কী এমন হারানো-হাবানো চেহারা হয়! কী দরকার পরের ঘরে আড়ি পেতে? আমি নিজের রুটি গরম করি।

তিন

একটা কুকুরকে শিকল দিয়ে জানলার শিকের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে কলেজের এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে সে দৃশ্যটা একদিন দেখেছিল পরমা। আপ্রাণ প্রয়াসে যতদূর শিকলটাকে টানা যায়, তীক্ষ্ম শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে আর অবোলা ভাষায় আর্তনাদ করছে। যাকে দেখছে, চেনা বা অচেনা, স্ববাসী কি প্রবাসী, তাকেই লক্ষ্য করে দু পা তুলে দাঁড়াচ্ছে, সামনের পা দুটো নাড়ছে—অবিশ্রান্ত আর অনর্গল কান্নায় মিনতি করছে। ভাষা বোঝার দরকার হয় না, অর্থটা এমন স্পষ্ট। বলছে, খুলে দাও খুলে দাও আমার বাঁধন, আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছুটতে দাও খুশিমত।

পরমার মনে হয়েছিল যত কষ্ট আছে তার মধ্যে বন্ধনের কষ্টটাই বুঝি সব চেয়ে কঠিন। আর সব কষ্ট হয় শারীরিক নয় মানসিক, আর এ কষ্ট, স্বাধীনতা হারানর কষ্ট, শারীরিক-মানসিক এক সঙ্গে। প্রথমে অসহায় করে রাখা তারপর অপমান করা। শুধু দড়ি দিয়ে বাঁধা নয়, সাপ দিয়ে বাঁধা। কিন্তু মানুষ ত কুকুর নয় যে কাকুতি-মিনতি করবে, মানুষ জোর করে ছিন্ন করবে তার নাগপাশ। দেশও তাই তার মুক্তির আন্দোলনে জোর আনছে, আনছে ভেঙে-ফেলার তোলপাড়। বুঝেছে আপোস রফায় যা পাওয়া যায়, যা পাওয়া যায় তুইয়ে-বুইয়ে, কাটছাঁট করে তা নয় প্রাকৃতিক স্বাধীনতা, তা তামাসার নামান্তর। গোল-মালে ফাঁকতালে যা পাওয়া যায় তা হাতের জিনিস, প্রাণের জিনিস নয়।

ক্ষুধা খাদ্যের নয়, অমৃতের। দেহের নয়, প্রাণস্পর্শের।

বিধাতা এসে বললেন, পরমা, যা তোমার অভিলাষ বর নাও।

পরমা উল্লসিত হয়ে উঠল: দেবে? তুমি এত কৃপণ, তুমি দেবে হাত ভরে?

বুক ভরে দেব। কিন্তু সাবধান, একটি মাত্র বরের বেশী পারবে না চাইতে। জীবনে যা তোমার শ্রেষ্ঠ অভিলাষ তাই একবার চেয়ে নাও।

জীবনে কী আমার শ্রেষ্ঠ অভিলাষ সেইটি বিবেচনা করবার জন্যে আমার তবে সময়ের দরকার। আমাকে তবে সময় দাও।

তোমার তা হলে সময়ই নেওয়া হবে পরমা, পরমরমণীয় সেই বর আর নেওয়া হবে না।

তবে আমি কী করি?

যা তোমার উপস্থিততম তাই নাও। মুহূর্তের সূক্ষ্মাতীক্ষ্ম চূড়ায় যে দুলছে তাকে।

তাকে?

হ্যাঁ, উপস্থিততমই পরিপূর্ণতম।

কিন্তু পরিপূর্ণতমই কি উপস্থিততম?

সেই উত্তর তোমার। ক্ষণখণ্ডের মধ্যেই শাশ্বত আছে কি না এ তোমার আবিষ্কার। বীণা শুধু কাঠ আর তার কি না নাকি তারই মধ্যে আছে আশ্চর্য গীতধ্বনি, অকিঞ্চিৎকরের মধ্যেই অপরূপ এ শুধু তুমিই বলতে পার।

হ্যাঁ আমিই বলতে পারি, আমিই বলব। আমি নিঃশঙ্ক যেহেতু যে নিদারুণ সেই আমার প্রিয়, আমার শ্রেষ্ঠ।

সন্ধ্যার কত আগেই ফিরেছে পরমা, তার মা রাজেশ্বরী পূজার ঘরে জপে যাচ্ছিলেন, মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠলেন: "কোথায় গিয়েছিলি?"

সম্ভ্রান্ত উত্তর ছিল, তবু পরমা কথা কইল না।

"আবার সেই লোকটার কাছে?"

"লোকটা ?" মুখে-চোখে ঝলসে উঠল পরমা।

"তবে কি ভদ্রলোক বলব ? চাষা, ইতর, ছোটলোক—" নামে বসলেন রাজেশ্বরী।

"নামী কলেজের মানী প্রোফেসর, তুমি তা ভুলে যাচ্ছ কেন ?"

"ভুলে যাচ্ছি ? মাষ্টার হয়ে ছাত্রীকে যে বখায় যে কুশিক্ষা দেয় অন্যায় পথে চালনা করে—"

"অন্যায় ?" আবার ঝলসে উঠল পরমা।

"শুধু অন্যায় ? অসৎ।" যত বিষ আছে এক সঙ্গে ঢাললেন রাজেশ্বরী।

"বিয়ে করতে চাওয়া অসৎ ?"

"একশবার অসৎ। মাস্টার হয়ে ছাত্রীকে যে স্ত্রী ভাবে সে ঘোরতররূপে কুৎসিত। তার লালসার চেয়ে জঘন্য আর কিছু হতে নেই।"

"ছাত্রী ? কে ছাত্রী ? আমি আর এখন তাঁর ছাত্রী নই। আমি বি-এ পাশ করে বেরিয়েছি।"

"তুমি দিগ্বিজয় করে বেরিয়েছ ! বলতে মুখ তোর খসে পড়ল না পোড়ারমুখী ?" রাজেশ্বরীর ইচ্ছে হল মেয়ের মুখে এক চড় মারেন : "ছাত্রী অবস্থাতেই ত প্রেমের অঙ্কুর গজিয়েছ তুমি ! বই পড়বার নাম করে প্রেমে পড়া !"

"সে ত তুমিই পাঠিয়েছ আমাকে তাঁর কাছে, তাঁর বাড়িতে, তাঁর কোচিং ক্লাসে।" পরমা বললে শান্ত মুখে, "আর তাঁর অসুখ হলে তাঁকে একটু দেখতে-শুনতে। কোচিং ক্লাসে ফি-টা যাতে একটু কম করেন, কিংবা ফ্রি-ই করে দেন, তার জন্যে তোমার সাধনাও ত কম ছিল না। বাড়িতে ডেকে এনে কত তাঁকে তুইয়েছ-বুইয়েছ। কত খাইয়েছ পিঠে-পায়েস—"

"তখন কি জানি তোমার পেছে পেখম লুকন আছে ?" ধিক্কার করে উঠলেন রাজেশ্বরী : "তখন কী জানি একটা শিক্ষিত লোক গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের স্বাভাবিক পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করবে ?"

"বিয়ে করলে কি পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয় ?"

"ও একটা বিয়ে ?" রি-রি করতে লাগলেন রাজেশ্বরী : "ঐ লোকটার মুখের দিকে দেখেছিস তাকিয়ে ?"

কথাটা ঝঙ্কারের মত লাগল বুকের মধ্যে। সত্যি, পরমা কি দেখেছে তার মুখ ? আশ্চর্য, সে মুখ সে এখন মনেও আনতে পারছে না। সে কি মুখ, না, প্রতিভার দীপ্তি, প্রতিভার ক্লান্তি, প্রতিভার রিক্ততা !

মনে পড়ে পুরীর মন্দিরে জগন্নাথ দেখতে গিয়েছিল একবার। সেদিন কী একটা উৎসব উপলক্ষে অসম্ভব ভিড় ছিল। মন্দিরের গহ্বরে দিন না রাত্রি বোঝা যায় না, জমজমাট অন্ধকার, শুধু কটা তেলের প্রদীপ জ্বলছে। যে পারে সেই আলোর আভাতেই দেখে নাও বিগ্রহ। ভিড়ের চাপে চেপটে গিয়ে কে কোথায় পিছলে পড়ছে তার ঠিক নেই। সেই ভিড়ের মধ্যে একটি কিশোরী ওড়িয়া-বউকে দেখেছিল পরমা। কোন দূরান্ত গাঁ থেকে এসেছে, মুখে সেই একটি তৃণান্ত কোমলতা; সেই ছায়াচ্ছন্ন রহস্যালোকে ভয় খাওয়া চোখে কী যেন সে খুঁজে বেড়াচ্ছে উদ্ভ্রান্তের মত। তার সঙ্গের লোকেরা তাকে ঘন ঘন তাড়া দিচ্ছে, দেখ, দেখ—পরমা লক্ষ্য করে দেখল, ভিড়ের চাপে বউটির মুখ বিগ্রহের থেকে ঘুরে গিয়েছে বিপরীত দিকে, শূন্য শুভ্র দেয়ালের দিকে, আর সেই বউটি তদ্গত মনে প্রগাঢ়স্বরে বলছে, দেখছি, দেখছি ! তার দুই চোখে অগাধ বিস্ময়, পরিপূর্ণ আনন্দের জ্যোতি। সেই বউটি কি দেয়াল দেখছে না জগন্নাথ দেখছে ? আর সেই জগন্নাথ কি বিকল বিকৃত ? নাকি সকল-সুন্দর-সন্নিবেশ ?

"ও লোকটা তোর চেয়ে বয়েসে কত বড় তা তোর খেয়াল আছে ?" রাজেশ্বরী আরেক ঘা হাতুড়ি মারলেন।

মুখ নিচু করল পরমা। বললে, "তিনি আমার চেয়ে সব বিষয়েই বড়।"

"বিষয়ে কে বলতে যাচ্ছে ? বয়সে, বয়সে। তোর দ্বিগুণ ওর বয়েস, তা তুই জানিস ?"

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। পরমা সরে গিয়ে রেলিং ধরল। বাইরের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললে, "জানি। ঠিক দ্বিগুণ নয়। আটত্রিশ-উনচল্লিশ হবে।"

"একেবারে কার্তিকের বয়েস !" দুই হাত নেড়ে বীভৎস ভঙ্গি করলেন রাজেশ্বরী।

দূরে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ত স্বরে বললে পরমা, "কার্তিক চিরকুমার, তেমনি ভালবাসাও চিরনতুন। ভালবাসার বয়েস নেই।"

"তাই বলে একটু দ্বিধাও থাকবে না ?"

"না, দ্বিধাও নেই। ভালবাসা যে স্পর্শমণি। স্পর্শমণি পুজোর ঘরের ফলকাটা বঁটি আর কসাইয়ের হিংসার খড়্গ দুই-ই সোনা করে। সে নির্দ্বন্দ্ব, নির্বিবাদ।"

"কিন্তু রুচি বলে ত একটা পদার্থ আছে। এতদিন তবে তোকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম কী করতে ?" রাজেশ্বরী চোখে আঁচল চাপালেন।

এবার রেলিং থেকে ঘুরে দাঁড়াল পরমা। বললে, "লেখাপড়া শিখিয়েছিলে যাতে বিয়ের কাজে লাগতে পারে। যতদিন বিয়ে না হয় ততদিন শূন্য পূরণের জন্যেই লেখাপড়া। সেই লেখাপড়া দিয়েই আমি যদি

একেবারে কার্তিকের বয়েস

আমার কাম্যফল সংগ্রহ করে থাকি তাহলে আপত্তি কী?"

"কিন্তু ফলের চেহারাটা ত দেখবি।" দাঁতে-দাঁতে ঘসলেন রাজেশ্বরী।

"কন্যা বরয়তি রূপং এই বরাবর শুনে আসছি। কিন্তু রূপ কি শুধু চেহারায়?" রেলিঙে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে তেমনি উদাসীন সুরে বললে পরমা, "রূপ কি শুধু মাংসের, শুধু হাড়মাসের? তা ছাড়া ফলের চেহারায় কী হবে যদি তা মাকাল হয়? যদি তাতে স্বাদগন্ধ না থাকে?"

"এতে খুব স্বাদ গন্ধ! বলি স্বাদ গন্ধের খবরও নেওয়া হয়েছে নাকি?" রাজেশ্বরীর মুখে আটকাল না এতটুকু।

"মা!" চিৎকার করে উঠল পরমা। মুখ আবার ফিরিয়ে দিল রেলিঙের দিকে।

"তা ছাড়া ও-লোকটার যে বউ আছে সে-খবর জানিস?"

রেলিঙের থেকে শরীরের অনেকটা ঝুঁকিয়ে দিল পরমা। উত্তর করল না।

"কী, জানিস?"

"জানি।"

তবু এতটুকু আক্ষেপ নেই মেয়েটার? রাজেশ্বরীর ইচ্ছে হল হাতের চন্দনের বাটিটা পরমার মুখের উপর ছুঁড়ে মারেন। তার পাষাণের মত ঐ স্থির মুখটা ক্ষতে-রক্তে অন্য রকম করে দেন।

"কী জানিস?" দু পা এগিয়ে গেলেন রাজেশ্বরী।

"সব জানি। সব আমাকে তিনি বলেছেন।"

"বলেছেন! কৃতার্থ করেছেন! যার বউ আছে সে আবার বিয়ে করে কী করে?"

"এমন কোন আইন নেই, অন্তত এখন পর্যন্ত নেই, যে বাধা হতে পারে।"

যেন বাধা হওয়াটাই বড় কথা। বাধা নেই যা হল কিন্তু তোমার একটা প্রবৃত্তি বলে কিছু নেই, অভিপ্রায় বলে? তোমার মনোনয়ন কি হাটমাঠের?

"আইন! আইন শিখছেন মেয়ে!" রাজেশ্বরী ব্যঙ্গেও পারঙ্গম: "হাতিঘোড়া গেল তল, বেঙো বলে হাঁটুজল। আইনের কথা বলে কে? বলি নীতি বলে কিছু নেই? আগের স্ত্রী বেঁচে থাকতে যে আবার বিয়ে করতে চায় তার মত দুর্বৃত্ত আর কে আছে, কে থাকতে পারে?"

"আমি সব শুনেছি। সব জেনেছি। অনেক ছেলেবেলায় তাঁর বিয়ে হয়েছিল, বাপমার শাসনের চাপে পড়ে। সেই স্ত্রীকে তাঁর পছন্দ হয়নি—"

"যত পছন্দ হয়েছে ছাত্রীকে!"

"সে স্ত্রীর মধ্যে কোন কিছুই তিনি পাননি, না সুরা না সুধা, সে গেঁয়ো, অশিক্ষিত, কুশ্রী, সেকেলে—"

"কিন্তু অপরাধী নয়। সংসারে তুমিই একমাত্র পুণ্যের শিখা, রূপের ডিপো, শিক্ষার ফাট বিসুবিয়স—"

"তার সঙ্গে নলিনেশবাবুর কোন সম্পর্ক নেই।"

"তা থাকবে কেন? যত সম্পর্ক ছাত্রীর সঙ্গে। স্ত্রী যদি অশিক্ষিত হয় তুই একটা অগামারা-আকাট মূর্খ। সম্পর্ক নেই! স্ত্রীকে সে মাস মাস টাকা পাঠায় তা জানিস?"

"পাঠিয়েছিলেন কয়েক বছর। আজ প্রায় পাঁচ-ছ বছর পাঠান না। স্ত্রীই লিখে পাঠিয়েছেন আর তাঁর টাকার দরকার নেই। কানপুরে না জোনপুরে কোথায় কোন মাতাজীর আশ্রমে আছে, তার আর সেখানে কোন অভাব নেই, অভিযোগ নেই, নেই বা কোন সংসারে অভিরুচি। সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে তাঁদের।"

"হয়েছে তোর মাথার। এই বেলা তোর আইনের ভাঁড়ে মা ভবানী। বলি হিন্দু বিয়ের কখনো বিচ্ছেদ হয়?"

"না হয় ত হওয়া উচিত।" মুখ ফিরিয়ে বললে পরমা। "সমাজ বড় হলে আইনও একদিন বড় হবে।"

"তাই হবে। যে এক স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে সে আরেক স্ত্রীকেও ত্যাগ করবে।" রাজেশ্বরীকে শোনাল প্রায় অভিশাপের মত।

তাকেও তুচ্ছ করল পরমা। বললে, "করতে হয় করবেন। সেইখানেই ত আমার ভালবাসার অভিস্নান। প্রত্যেক প্রেমের মধ্যেই ভয় জেগে থাকে, এখানেও থাকবে। তার জন্যে ভয় করে লাভ কী? আগুন যে পোহায় ধোঁয়া তাকে সইতেই হয়।"

"তবু তুই সমস্ত জেনে-শুনে ঝাঁপ দিবি?" রুখে দাঁড়ালেন রাজেশ্বরী।

"কী করব, আমার জীবনে পরমাশ্চর্য যে সেইভাবেই এসেছে। হিসেবের খাতায় অঙ্ক মিলিয়ে আসেনি, আসেনি সমতল সামঞ্জস্যের পথ দিয়ে। এসেছে কলঙ্কীর বেশে, হয় ত বা ভয়ঙ্করের রূপ ধরে, তবু এই এই আমার পরমসুন্দর।" মায়ের দিকে তাকাল পরমা: "তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর।"

"আশীর্বাদ করব?" হাতের চন্দনের বাটিটা সজোরে ছুঁড়ে মারলেন রাজেশ্বরী। বাটিটা লাগল এসে পরমার কণ্ঠার কাছে। জায়গাটা কেটে গেল। রক্তের সঙ্গে মিশল এসে চন্দন।

"দেখব এ বিয়ে তুমি কী করে ঘটাও।" রাজেশ্বরী পুজোর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

কাটা জায়গাটা আঁচল দিয়ে চেপে ধরে পরমা বললে, "তেজ তোমার একলারই আছে তা মনে কর না। আমি তোমার মেয়ে, তোমার তেজে আমারও উত্তরাধিকার।"

বারান্দার দেয়ালে বাবার একটি তেলছবি টাঙান। মমতাভরা স্থির চোখে খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল পরমা। দেখতে-দেখতে জল দাঁড়িয়ে গেল। মা যেমন ঘুমন্ত শিশুর মুখে হাত বুলিয়ে আদর করে তেমনি করে ছবির কাঁচের উপর হাত বুলুতে লাগল। মনে মনে বললে, বাবা, তুমি থাকলে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে বুঝতে, আমাকে আমার ব্রতোদ্ধারে সহায্য করতে। অন্ধকার করে শত ঝড় উঠলেও তুমি ঠিক পৌঁছে দিতে তীরে, আমার পূর্ণঘাটের ঘাটে। বল, দিতে না? তুমি জান, আমি জানি, কে না জানে, মেয়েই মেয়ের শত্রু।

একটু যেন আগেই ফিরেছেন আজ মণিলাল। এসেই ডাক দিলেন, "রাজু।"

পুজোর ঘরে আজ আর মন বসাবার উপায় নেই। রাজেশ্বরী উঠে এলেন। বললেন, "আমাকে ডাকছেন?"

"মেয়েকে আটকাও।" জামার বোতাম এক এক করে খুলতে খুলতে বললেন মণিলাল, "নলিনেশ নাকি ছুটির দরখাস্ত করেছে।"

কী যেন সাংঘাতিক খবর এমনি আতঙ্কিত মুখ করলেন রাজেশ্বরী।

"আর সে ছুটির কারণ নাকি বিয়ে করবে সম্প্রতি। আর ছুটি নাকি বেশ লম্বা ছুটি।" মণিলাল জামাটা গা থেকে খুলে ফেললেন একটানে।

রাজেশ্বরীর মুখে যেন কে ছাই মাখিয়ে দিল। বললেন, "ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেছে?"

"না, এখনো হয়নি। পরশু মীটিং হবে কমিটির, তাতে উঠবে দরখাস্ত।"

"তুমি ত কমিটিতে আছ, দাদা—"

"তা ত আছি।" ভাবখানা এই মণিলালের কিসে আমি না আছি এই শহরে?

"তবে দেখ ছুটি যেন না পায়। ওর দরখাস্ত যেন নাকচ হয়। বউ বেঁচে থাকতে আবার বিয়ে কী? কাকে বিয়ে? আর বিয়ে করতে এক মাসের ছুটি চাইছে কোন হিসেবে?" রাজেশ্বরী তুমুল করে উঠলেন।

"বোধ হয় একেবারে হনিমুন করে ফিরবে—"

"ওকে কলেজ থেকে বরখাস্ত করে দাও দাদা।" রাজেশ্বরী শক্ত করে চেপে ধরলেন খাটের বাজু।

"তা না হয় করব কিন্তু মেয়েকে সামলে দে। মেয়েকে শায়েস্তা কর। কর নজরবন্দী। আমরা যদি ঠেকাতে পারি কার সাধ্য মাথা গলায়। কথায় বলে, আপনার ঘর সামাল কর পরে গিয়ে পরকে ধর।" মণিলাল বসলেন চেয়ারে: "কনে যদি না পায় ত কিসের বিয়ে! সর্বক্ষণ যা

ছুটোছুটিই করতে হয় কিসের ছুটি!

পাশের বারান্দা থেকে সব শুনেছে পরমা আর আনন্দে সারা শরীরে রুপুলী ঝরনার মত ঝিরঝির ঝিরঝির করে কাঁপছে। ভয় নয় অপমান নয় যন্ত্রণা নয়, শুধু আনন্দ। আর কিছুতে নয়, নলিনেশ পেশ করেছে দরখাস্ত। কিছু একটা করেছে। পেরেছে করতে।

বীরহস্তে বীরমাল্য নেবে এই বড় সাধ পরমার। লোভকে সে বলি দেবে না, বীর্যকে সে প্রসাদ দেবে। তাকেই সে বরণ করবে যে হরণ করতে প্রস্তুত।

তাই অকুতোভয় পরমা। রাক্ষস তাকে যতই বন্দী করুক আছে তার উম্ধর্তা।

একটা প্রাচীন গুহার মত নলিনেশকে মনে হত পরমার। আস্তে আস্তে আসত, ভয়ে ভয়ে বসত দূরে দূরে। মনে হত কঠিনের ঘরে গম্ভীরের বসতি। তমিস্রের ঘরে উদাসীনের। যেন তুষার-চূড়ায় শিব বসেছেন ধ্যানাসনে। অচঞ্চলের সম্ভাষণে। প্রাণ নেই তাপ নেই ধ্বনি নেই, শুধু নিগূঢ়ের শুধু গভীরের নিমন্ত্রণ।

পরমার ইচ্ছে করত একটু বসে থাকি নেশীক্ষণ। অনুভব করে করে অন্ধকার গহ্বরের দু-একটা বা সিঁড়ি খুঁজি। দুর্গমের দুয়ার খুলে দেখি না কোথাও পাই কি না একটু সহজের আভাস, সবুজের ইঙ্গিত। দেখি না চিতাভস্মের নীচে আছে কি না চন্দন, দর্পের নীচে আছে কি না দারিদ্র্য। দেখি না জটাজালের নীচে আছে কি না জাহ্নবী।

কে জানে লীলাচ্ছলেই হয়ত অকিঞ্চন সেজেছেন। শুষ্ক বল্কলের নীচে আছে বুঝি তপ্ত প্রাণসুধা। স্তব্ধতার নীচে গীতলহরীর ইন্দ্রজাল।

এমন একটা অস্তিত্ব যা প্রতীক্ষা করায়। প্রতীক্ষা করাবার মত শক্তিসম্পদ রাখে। গুহাই ত বসিয়ে রাখতে পারে অন্ধকারে। অরণ্য তার গহন নির্জনে। দেখ কিছু ঘটে কি না! স্তব্ধীভূত গুঞ্জরিত হয় কি না! শিলীভূত শিহরিত হয় কি না! সন্ন্যাসী অরণ্যে জাগে কি না বসন্ত-বন্যা! দেখ, দেখ। দেয়ালে জাগে কি না জগন্নাথ!

কলেজে কে ধরবে-ছোঁবে নলিনেশকে! বলার এত দুর্ভেদ্য তার বর্ম, মুখে এমন এক কৌতুক-কৌতুহলহীন নির্লিপ্ত। কিন্তু যখন কাব্য পড়েন, আবৃত্তি করেন, মনে হয় কী অপূর্ব রসের সমুদ্র তাঁর বুকের মধ্যে, কী নিবিড় অনুভবের উত্তাপ! অন্তরে ভালবাসা না থাকলে দুঃখ না থাকলে কেউ এমন ভাল পড়াতে পারে? পড়াতে গিয়ে নিজে হয়ে উঠতে পারে কবিতা! কতদিন বুকের মধ্যে আবৃত্তির সেই ধ্বনি নিয়ে পরমা ঘুমিয়েছে, কণ্ঠস্বরের সেই আকুতি সমস্ত মর্তবন্ধনের ওপার থেকে ডাক দিয়েছে তাকে। যেন মর্তশিশুর কাছে মৃত্যুর ডাক। ভেবেছে এমন মানুষের সহজ রূপটি না জানি আরও কত বিচিত্র, এই কণ্ঠস্বরের সহজ সম্ভাষটি না জানি আরও কত রহস্যমদির' সেই অলক্ষ্যকে দেখবে না কোনদিন? শুনবে না সেই অগম্যকে? কলেজের পড়া পড়ে নোট মুখস্ত করেই বন্ধ করবে বই?

গুটি গুটি দুটি-চারটি মেয়ে আসতে লাগল নলিনেশের বাড়ি, কোন তৈরী-করা প্রশ্ন নিয়ে, যাতে তার উত্তরের সূত্রে নলিনেশ খানিকটা বলে, পড়ে, বোঝায়, চকিতে এক টুকরো সোনার মেঘ হয়ে ওঠে। একাই বাঁকা, দলে খল নেই। আর সে-দলের অগ্রণী পরমা। আমরা সবাই এলাম। যদি বিরক্ত না হন যদি হাতে সময় থাকে একটু পড়ে শোনান রবীন্দ্রনাথ, কি অন্য কিছু—

উদারসৌম্য চোখে তাকাল নলিনেশ। যেন সে চাহনির অর্থ, সকলে মিলে এলে কেন, তুমি কেন একা এলে না? তা হলে আমার হাতে অনেক সময় থাকত, এক বিন্দু রক্তও বিরক্ত হত না।

নিশ্চয় এ সব ভুল মানে করছে পরমা। প্রস্তরে কি কখনও শ্যামলের স্বাক্ষর ফোটে? দুঃসাধ্যের দেশে সুলভের আতিথ্য? মানে ভুল হক কিন্তু যেমন ভুল মানে করে সে ভুল নয়। গুহার মধ্যেই মিলে যায় গুপ্তধন।

কবিতা পড়াতে লাগল নলিনেশ, আর পরমার মনে হল সন্ধ্যার আরতির আলোকে দেবতার মুখ দেখছে। নিস্তব্ধ গম্ভীরের মুখ।

সেই থেকে মেয়েদের আগ্রহে কোচিং ক্লাসের পত্তন করল নলিনেশ। হ্যাঁ, মাইনে দিও ভাগ করে।

দুখানা ঘরে এক চিলতে বাড়ি, একটা বিদেশী চাকরের হেপাজতে। কোনটা যে বসবার আর কোনটা যে শোবার পার্থক্য করা যাচ্ছে না। দু ঘরেই তক্তপোশ আর চেয়ার, টেবিল আর তাকের বোঝাই, আর টাল-টাল বইয়ের ঢিবি। মোটা থেকে চটি, ছেঁড়াখোঁড়া থেকে রেক্সিনে-বাঁধাই। তাক উপচে নেমে পড়েছে মেঝেয়, টেবিল থেকে ছিটকে এলিয়ে পড়েছে তক্তপোশে। দু ঘরের দুটো তক্তপোশেই ভাগাভাগি করে বিছানা পাতা। এ ঘরে নয় ও ঘরে যেখানে খুশি বস, খাড়া হয়ে বসতে না চাও ত পা ছড়িয়ে গা এলিয়ে, আর যদি ঘুম পায় ক্লান্তিতে, কোনটা সত্যিই শোবার ঘর বলে যদি দ্বিধা থাকে, তবে এখানেই নিমগ্ন হয়ে যাও। কী আশ্চর্য ঔদাসীন্য, শোবার জায়গা বলেও একটা স্থিরতা নেই, চলাবসার নেই কোথাও সীমারেখা। এত বিশৃঙ্খলা, কিন্তু কিছুই যেন স্বকৃত নয়, কৃত্রিম নয়, সমস্ত মিলিয়ে একটি উচ্ছৃসিত সরলতা। সমস্ত কিছু বেষ্টন করে বিরাজ করছে একটি ধী ও ধ্যানের ধূপগন্ধ। চারদিকে বইয়ের ঢেউ আর তার মধ্যে এক নির্জন দ্বীপে এক নিরাসক্ত নিরঞ্জন সন্ন্যাসী তপস্যায় বসেছে এই বারে বারে মনে হয়েছে পরমার। আর এক মনে হয়েছে এ কি নিরর্থকের তপস্যা নয়? এ কি নয় রিক্ততার ছদ্মবেশে সিক্ততার প্রতীক্ষা? ধ্যানচ্ছলে বিরহ-উদ্‌যাপন?

কেমন না জানি হয় যদি একবার একটু জেগে ওঠে! সে না জানি কী ভয়ালসুন্দর রোমাঞ্চ! প্রচণ্ডতাণ্ডব শিবের যদি একবার উমার কথা মনে পড়ে যায়! কী না জানি সে দারুণ মধুর রোমাঞ্চ যদি নিবিড় নিকষে একটি স্বর্ণরেখার বিকার ফুটে ওঠে! যদি সে কঠিন গম্ভীরের [illegible] লাগে একটু স্নেহদ্রব অন্তরঙ্গতার রঙ।

প্রাচীন গুহাই তাই অন্তরের গভীরে গভীরে আকর্ষণ করে পরমাকে। ধ্বনি নেই, কিন্তু কেমন না-জানি তার প্রতিধ্বনি! কেমন না-জানি সেই প্রচ্ছন্নের নিম্নস্বর!

যখনই আসে নিজেরই অজানতে এটা-ওটা একটু গুছিয়ে দেয় পরমা। অবিশ্যি সেটা সমুদ্রের থেকে এক চামচ জল তোলা, কিন্তু সমুদ্রে যে সে চামচ ডোবায় সেইটেই দুঃসাহসিক স্বপ্ন! অন্তত স্বপ্নেও দুঃসাহস থাকবে না, এ কেমনতর সংকীর্ণতা! তাই দুঃসাহসের স্বপ্ন-দেখা মন এও একেকবার চেয়ে বসে—কথা বলার উত্তেজনায় অসতর্ক চুলের সরু একটা গুচ্ছ যে নেমে এসেছে তার চোখের উপর তা সযত্নে সরিয়ে দেয় আঙুলে করে।

"তোমরা সবাই এসেছ একটু চা করে নাও না উদ্যোগ করে।" বললে নলিনেশ, কিন্তু লক্ষ্য করল পরমাকে।

চাকরটা কোথায় গেছে আড্ডা দিতে। দেখ না কোথায় কী আছে, নিজেরাই সব সরেজমিনে তদন্ত করে নাও। কোথাও আড়াল-আবডাল নেই, হোঁচট খাবার মত নেই কোথাও ইট-পাটকেল।

এগিয়ে এসে পরমাই হাত লাগাল। খুঁজেপেতে সব গোছগাছ যোগাড়যন্ত্র করে নিল। কোথায় কী ফাঁক আছে তার ফিকির বার করল। কেমন একটা পিকনিক-পিকনিক মনে হচ্ছে। কঠিনের ঠাসবুনোনের মধ্যে কল-হাস্যের বুটি টাঁকল।

নলিনেশ বললে, "চায়ের সঙ্গে কবিতা বেশ খাপ খায়। বা, কী সুন্দর রঙ বের করেছ—কী সুন্দর গন্ধ! কন্ডুতে কিছু নেই

শুধু শিল্পীর কৌশল। খালি কোশলই নয়, শিল্পীর মনের মাধুরী।"

এটুকু প্রশংসা পরমার ব্যক্তিগত। আশ্চর্য, নলিনেশ ব্যক্তিগত' হতে জানে!

সেদিন কোচিং ক্লাসের পর আর-আর মেয়েরা চলে যাচ্ছে, পরমা যেন একটু পিছিয়ে থাকছিল। একটু যা ঘুরঘুর করছিল অকারণে। হঠাৎ নলিনেশ তার কাছে এসে বললে অস্ফুটস্বরে, "তুমি একটু আগে আগে আসতে পার না?"

পরমার বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। যেন স্বপ্নে পাওয়া মন্ত্রের মতই আশ্চর্য এই অস্ফুটস্বর। কণ্ঠস্বর এমনি ছায়াচ্ছন্ন করতে পারে নাকি নলিনেশ এবং তা পরমার সম্পর্কে? গুহায় শুধু গর্জনই নেই, গুঞ্জরণও শোনা যায় তাহলে? বাইরে যতই জয়ঢাক থাক, ভিতরে আছে বুঝি একটি শঙ্খের শব্দ! নিজের দেহের রক্তের রুনু-রুনু পরমা যেন শুনতে পেল কান পেতে।

কেন এমন হল? কেন ঈশ্বর সহসা তার স্বরকে ছায়াচ্ছন্ন করে দিলেন? আর কেন সেই স্বর বেছে-বেছে তারই কানে এসে বাজল?

কলেজে প্রথম যখন রোল কল্ করে, নলিনেশ নাম ধরে ধরে ডেকেছিল একেক করে। পরমার নাম আসতেই বলে উঠল, "বা, বেশ নাম।"

লজ্জায় মৃদু একটু হেসেছিল পরমা—সে হাসি স্বভাবসংলগ্ন হাসি যা একটু মিষ্টি কথা শুনলেই মেয়েরা হাসে। কিন্তু আজ কী বলল নলিনেশ?

"আমাকে একটু আগে আগে যেতে বলেছে, মা।" রাজেশ্বরীর কাছে অনুমতি চাইল পরমা।

"তা যা না।" একবাক্যে সায় দিলেন রাজেশ্বরী, "ভিড়ের মধ্যে কি পড়াশোনা হয়? একটু আগ বাড়িয়ে গেলে ফাঁকা পাবি, কিছু নিতে পারবি সাজেশ্‌শান।"

"হ্যাঁ, সেই জন্যেই—" তাড়াতাড়ি একটু সাজগোজ করতে গেল পরমা।

"অনার্সটা যাতে রাখতে পারিস—"

"শুধু রাখা নয় মা, পাওয়া।"

"বিশেষ যদি সাহায্য পাস কেন পাবি না?" রাজেশ্বরী আশ্বস্ত করলেন।

আগে আগে একা একাই সেদিন চলল পরমা। ছাত্রীর চেয়ে একটু বেশী মন নিয়ে সাজগোজ। আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজের চোখকেই চোখ ঠারল, না, এ এমন আবার সাজ কী! ব্লাউজের হাত শাড়ির পাড় আর জুতোর স্ট্র্যাপ—এর ম্যাচ কোন ছাত্রীই বা না করে! না, তা নয়। বেরুবার সময়, বাড়ির বাগানে যে গন্ধরাজ ফুটেছে তারই একটা হঠাৎ ছিঁড়ে নিয়ে খোঁপায় গুঁজল। পিছনের ফুলটা চোখে দেখতে না পেলেও মনে মনে দেখল। না দেখলেও ফুলের গর্বিত গন্ধ-টুকু ত দিব্যি টের পাচ্ছে। পরমার সর্ব-দেহেই ত এখন এই গর্বগদগদ গন্ধ।

এমনিতে হেঁটে যায় দল পাকিয়ে রাস্তা জাঁকিয়ে, আজ এক একা রিকশা নিল। তুলে দিল ঢাকনা। পথে অঞ্জলি-দীপালিদের বাড়ি পড়বে ওরা দেখে ফেলবে তার জন্যে নয়, কেননা ওখানে পৌঁছেই ত ওরা বুঝবে ওদের ফেলে আগেই চলে এসেছে পরমা। সে কৈফিয়ত যা দেবার তা না হয় দেবে তৈরি করে। কিন্তু কতক্ষণ আগে থাকতে চলেছে এটুকু ওরা না দেখুক না বুঝুক।

সেই প্রথম তার একা হবার লগ্ন। সেই একা হতে যাওয়ায় না-জানি কীরকম হাওয়া, কী রকম আলো। সেই সব স্তব্ধতার না-জানি কোন দেশী ভাষা, সেই সব অন্য-মনস্কতার না-জানি কী সরলার্থ। সেই একাকিত্বের কাছাকাছি হওয়া মানেই যেন সমুদ্রের কাছাকাছি হওয়া। প্রথমে বোঝা যায় না এখানে সমুদ্র আছে, ক্রন্দনগর্জনের টুঁ-টিও শোনা যাচ্ছে না কোথাও, দেখা যাচ্ছে না সাদা হয়ে যাওয়ার শূন্য হয়ে যাওয়ার ভূমিকা। হঠাৎ, চকিতে, বলা-কওয়া নেই, বিন্দুমাত্র প্রস্তুত হতে না দিয়ে সব গাছপালা বাড়িঘর আড়াল-দেয়াল সরিয়ে সবলে আবির্ভূত হল সমুদ্র—অবিনশ্বরের বিস্তার—আনন্দে নিষ্পলক হয়ে রইল পরমা। প্রথমে বোঝা যায় না অন্তরেই বসে আছে এই সমুদ্র। অবিনশ্বর নির্জনতা।

নিশ্চয়ই প্রথমে লেখাপড়া নিয়ে কথা শুরু হবে, তারপর আস্তে আস্তে কথা উঠবে গন্ধরাজ ফুল নিয়ে এবং আস্তে আস্তে কথায় মিশবে এমনি একটি সুগন্ধ যা গন্ধ-রাজেরও অধিক। একলা হবার সুগন্ধ কতটুকু না-জানি আজ হিজিবিজি হবে। জানি হিজিবিজিই হবে, তার থেকে বেরুবে না কোন ছবির কাঠামো। তবু হিজিবিজিই হক, একসারসাইজ খাতার বাইরে খাপছাড়া কাগজে পেন্সিলের আঁকিবুঁকি। হিজি বিজিই কী অপার্থিব!

পরমা ভাবল নিশ্চয়ই বাড়িতে পাবে না। আগে আসবে বলে এত আগে আসবে এ কোন হিসেবেই কেউ ভাবতে পারে! হয়ত বেরিয়ে গিয়েছে, নয়ত কে জানে অসময়েই ঘুমিয়ে পড়েছে কি না! কী বিচ্ছিরি, যদি ঘুম ভাঙাতে হয় আচমকা! সে না হয় কলেজ থেকে ফিরে প্রায় হন্যে হয়েই ছুটে এসেছে, কিন্তু এ-পক্ষকে একটু ক্লান্তি অপনয়ন করবার সুযোগ না দিলে চলবে কী করে! তোমাদের আর কী, তোমরা ত শুধু শোন, অর না শুনলেই বা তোমাদের মারে কে! কিন্তু আমি কেবল বকি, অনর্গল খই ফোটাই, আমার উনুনে একটু কামাই না দিলে চলবে কেন? তা হক, বিকেল বেলা কি ঘুমোবার সময়? মন্দ নয়, থাকুন ঘুমিয়ে। যে ঘুময় তাকে জাগান কি এতই অসাধ্য? কুম্ভকর্ণ যে কুম্ভকর্ণ, সেও জেগেছিল শেষ পর্যন্ত।

দোরগোড়ায় চেয়ার পেতে বসে নলিনেশ খবরের কাগজ পড়ছে।

"সে কী স্যার," পরমা চোখে বিস্ময়ের ঝিলিক দিল: "আপনি খবরের কাগজ পড়েন?"

"কি বল? এত হাঁকডাকওয়ালা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হরফ, চোখ না পড়ে করে কি—" আবার খবরের কাগজেই চোখ রাখল নলিনেশ।

"কী লেখে এত কাগজে?" ঘরের মধ্যে পা বাড়াল পরমা।

"কী-হয় কী-হয় সব খবর। একটার পর একটা দিনেরাতে ঘটেই চলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা যে তিমিরে সে তিমিরে। হয় ইংলণ্ড নয় জাপান নয় জার্মানি নয় রাশিয়া। যে কুঁজো সে কি আর চিত হয়ে শুতে পারে কোনদিন?"

আর যে কানা সে কি সামনের বস্তু দেখতে পারে কোনদিন? কানা কালা আঁধা শুনেছি, কিন্তু নাকেও যে ঘ্রাণ নিতে জানে না তাকে লোকে কী বলে?

আজ কি খবর বলবার পাঠ নিয়েছে নাকি নলিনেশ?

"তোমার আর-সব বন্ধুরা কোথায়?" কাগজের থেকে মুখ না তুলেই বললে।

"তারা আসছে। কিন্তু," আরও এক পা এগিয়ে চমকে উঠল পরমা, "এসব আপনি করেছেন কী!"

"কী করেছি?" যেন কোন অপরাধের প্রতিবাদ করছে এমনি রুক্ষ গলায় বললে নলিনেশ। সহসা চোখে চোখ পড়ল। হীরের কুচির সঙ্গে দেখা হল রোদের কণার। খবরের কাগজটা ভাঁজ করে গুছিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, "ও, তুমি এসেছ। আমি ভেবেছিলুম কে না কে।"

আমি কে-না-কে? পরমার মনে হল অভিমান করে, কিন্তু কার উপর করবে? সে যে ঐ সঙ্গে এও বললে, তুমি এসেছ?

এ তুমিটির মধ্যে আলতো করে এক আঁচড় তুলি কি বেশী পড়েনি? একরেখা রঙ কি বেশী চড়েনি? একটু শোনা যায়নি কি প্রচ্ছন্নের নিস্বন?

"কিন্তু এসব আপনি কী করেছেন?" আবার ঝঙ্কার দিল পরমা।

"কী করেছি?" আবার প্রতিবাদ করল নলিনেশ।

"ঘরদোর এমন গুছিয়েছেন সুন্দর করে?"

লজ্জিতমুখে দুর্বল একটু হাসল নলিনেশ, আর তাকে সহসা আত্মভোলা

শিশুর মত দেখাল। বললে, "তুমি আসবে বলে ঘরের একটু শ্রী বদলাবার চেষ্টা করেছি।"

"আমি ত রোজ আসি—"

"সে ত বহুবচনে আসা, আজ একবচনে এসেছ।" নলিনেশ আর একটা চেয়ার টেনে আনল। বললে, "শ্রীকে এতদিন ঘরের দাওয়াতে বসিয়েছি, আজ মনে হল সিংহাসনে বসাই। বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

ইঙ্গিতটা যেন এই, পরমাই মূর্তিমতী শ্রী। সেই যেন জলকে নির্মল ও বাতাসকে নিরাময় করে দেবে। চতুর্দিক থেকে আনবে স্বাস্থ্য ও শক্তির উদ্দীপনা।

"আপনি বললেন না কেন, আমি আরও আগে আসতাম। সব নিজে থেকে দিতাম গোছগাছ করে। এতদিন কই বলেননি ত হাত লাগাতে।" উঁচু হয়ে নিচু হয়ে এদিক-সেদিকে উঁকি মেরে বলতে লাগল পরমা: "ঐ দেখুন ছিরি, ক্যালেণ্ডারের পৃষ্ঠা এখনো দু মাস পিছিয়ে আছে। তাকের উপর খবরের কাগজটার নীচে পুরু এক ধুলোর কম্বল, বইগুলো বেশির ভাগই হেঁটমুণ্ড। আর ম্যাগাজিনগুলো পর পর সাজিয়েই যখন রেখেছেন, মাসওয়ারি রাখতে পারেননি?"

"তবু ত থাকথাক রাখতে পেরেছি গুছিয়ে—" নিজের প্রশংসা নিজেই করল।

"তাই দেখছি বটে। খবরের কাগজখানাও কেমন ভাঁজ করে রাখলেন।" হাসল পরমা: "অন্য দিন দেখেছি হাওয়ায় হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঘরে-মেঝেয় ছুটোছুটি করছে।"

"সব তুমি আসবে বলে।"

দুই চোখে মধু নিয়ে তাকাল নলিনেশ। দোহারা চেহারার দীর্ঘকায় মেয়ে, স্থিরে-অস্থিরে একটি নিষ্কলঙ্ক দীপশিখা। চলছে বলছে যেন জ্বলছে সব সময়। মাথার চুল ঘন হয়ে গুচ্ছীকৃত হয়ে কপালের আধখানা ঢেকে রেখেছে। তার অল্প নীচেই পরিচ্ছন্ন করে টানা ঘন ভুরুর ডানামেলা। তার নীচে নীড়বসা অচঞ্চল দুটি পাখির মত চক্ষু। ঠোঁট দুটি মনে হয় সব সময়েই সিক্ত হয়ে আছে। হাসিটি সব সময়েই প্রস্ফুটিত। শুধু মুখের হাসি নয়, সমস্ত দেহই আদ্যোপান্ত প্রফুল্ল।

ত্রুটি কি নেই? আছে হয়ত। নাকটা কেমন নিরীহ, চিবুকের ডৌলটি কেমন ভোঁতা—কে অত খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে? সব মিলিয়ে একটি পুজোর প্রতিমা, মর্তের ঘরের একটি আনন্দস্তব। তারপর চোখে যখন স্নেহ জাগে তখন আর কোথায় ত্রুটি?

মনে মনে কবিতার দুটো লাইন আওড়ায় নলিনেশ:

তোমার স্নেহের দুটি লোচন
করুক সকল ত্রুটি মোচন।

নতুন একটা সমালোচনার বই এসেছে তাই নিয়ে কথা শুরু হল। আর পরমার ভয় শুরু হল, কথা যখন একবার শুরু করেছে সব বুঝি মাটি হয়ে যায়। আর বুঝি সেই গম্ভীর মুখে শোনা যাবে না চপল-মদির অস্পষ্টতা। লঘুতার মধ্যে নিগূঢ়ের সংকেত। তা হলে কী হল আগে এসে? ছি-ছি, এইসব ব্যাখ্যাব্যাকরণে কী হবে—যেনাহংনামৃতাস্যাম—গোটাকয় • নয় প্রেমের কবিতা পড়, সংস্কৃত কি ফরাসী, অন্তত পদাবলী নয় জয়দেব! নয়ত বিস্মৃত কলেজটাকেই কেন টেনে আন নিভৃত ঘরের মধ্যে?

ছি ছি, এখনও বকবে। নলিনেশের কথায় পাওয়া মানে ভূতে পাওয়া। কত বিদ্যে ফলাবে, কত কোটেশান ঝাড়বে, ফুট-নোটের নজির দেবে, পিনফুটোন থেকে শুরু করে হাতে মাথা কাটবে তার ঠিক নেই। থামতেই জানে না। থামতে জানাটা যে কত বড় জানা তা কবে বুঝবে নলিনেশ! কবিতা গল্প উপন্যাস শেষ হয়, জীবন শেষ হয়, তবু সমালোচকের কথার শেষ হয় না। আর, কথা ত কত বিষয়েই আছে। যা কথা সব নিজের দোকানদারি? দোকানের বাইরে নেই কি খোলা মাঠ, পরমাবিরাম সমুদ্র?

কী বলছে কিছুই শুনছে না পরমা। কী বলবে তারই জন্যে কান পেতে আছে।

দুটি সরু বালাই ডান হাতে, নড়াচড়ায় মাঝে মাঝে ঠুং ঠুং শব্দ হচ্ছে—বাঁ হাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকাল পরমা। এখুনি যে এসে পড়বে অঞ্জলি-দীপালিরা। পিরিয়ডের ঘণ্টা বেজে যাবে। ঘণ্টাই যদি বাজিয়ে দেবে তবে কেন এই উৎসবের সুর? কেন তবে স্নানযাত্রা?

না, কথা বলতে চাচ্ছে বলাকে—এমনি মনে হল পরমার। বলবার কথাটি ঠিকমত খুঁজে পাচ্ছে না বলেই মামুলি চালাচ্ছে। চিট করবার আগে মাঠ দেখে নিচ্ছে, রক করে যাচ্ছে। ভক্তি খুঁজে পাবার আগে আওড়াচ্ছে মুখস্থ মন্ত্র। এসব কথা নয়, ধ্বনি, বোঝাবার জন্যে নয়—বাজাবার জন্যে।

হঠাৎ বইয়ের থেকে মুখ তুলে নলিনেশ বললে, "তোমার নামটি কী সুন্দর!"

"সে কথা আপনি প্রথম দিনই বলেছিলেন কলেজে।"

"হ্যাঁ, সেদিন নামটিকেই বলেছিলাম, আজ তোমাকে বলছি। কে রেখেছে তোমার নাম?"

"কে রেখেছে?" কৌতুকে পরমার চোখ জ্বলতে লাগল: "কই, কোনদিন জিজ্ঞেস করিনি ত!"

"মনে হয় আমিই রেখেছি।" বেশ বলতে পারল নলিনেশ।

আপনি রেখেছেন?" কথাটার পাশ কাটিয়ে দ্রুত সরে যাওয়া নয়, কথার গোলোকধাঁধার মধ্যে সাধ করে পথ হারানো।

"তা ছাড়া আবার কে!" নির্জনতা ক্রমেই সাহস দিচ্ছে নলিনেশকে। বললে, "তুমিও জান না এ নাম আমার রচনা।"

"এ নামে আবার বাহাদুরি কী!"

"প্রথমা নয়, মধ্যমা নয়, চরমা নয়—পরমা। তুমি এমন একটি বাতি যে নেভে না, দগ্ধ করে না, যাতে ধূমলেশেরও স্পর্শ নেই।" কথার পর কথা সাজাচ্ছে নলিনেশ, "যে শুধু আনন্দের নিত্য আভাটি জাগিয়ে রাখে। তুমি অমৃতবর্তি—"

আমি মুণ্ডু—এমনি একটা কিছু বলে হেসে উড়িয়ে দিলেই হয়, তা নয়, বরং বলতে ভালো লাগল পরমার, "এ ত আমার নামের অর্থ, আমার নিজের কী!"

"ও, তুমি জান না বুঝি ভক্তের কাছে নাম আর নামী একই বস্তু।"

"তবে ভক্তের আর ভাবনা কী। নাম নিয়ে থাকলেই তার চলে যায়—"

"চলে যায়। যা তত্ত্ব তাই বাস্তু। যা বাস্তু তাই তত্ত্ব। সূর্য ত প্রকাশ হয়েই আছে, আমারই শুধু চোখ খোলবার অপেক্ষা।"

"শুধু চোখ খুললেই হবে? ঘরের জানলা-দরজা খুলতে হবে না? বাইরের আলোকে আনতে হবে না ঘরের মধ্যে?"

খানিকক্ষণ কথা বলতে পারল না নলিনেশ। সামান্য ছাত্রী সমুচ্চ পণ্ডিতকে পরাস্ত করল বোধ হয়।

এ যেন আর কিছু নয়—শুধু কথা-কথা খেলা। যাত্রারম্ভে ত মেঘের গর্জন শোনা যায় না, দেখা যায় না বিদ্যুৎজিহ্বার কশা, তাই সব খেলা-খেলা মনে হয়। যে পথ কণ্টকসংকুল তাকেই মনে হয় কথার কুসুম দিয়ে সুকোমল। কোথায় যে দুর্যোগের রক্তচক্ষু জেগে আছে তার আভাসটিও চোখে পড়ে না।

"কিন্তু যার ঘরদোর নেই?" অস্বাস্থ্যের মত প্রশ্ন করল নলিনেশ।

"সে ফাঁকা মাঠে গাছের খোঁজ করবে। রোদ মানেই ছায়া। শক্তি মানেই শান্তি।"

তার অর্থ, বলতে চাও, প্রেম মানেই বিয়ে? এমনি একটা কথা এসেছিল জিভে, সংযত করল নলিনেশ। তার মানেই চলে এস মাটি থেকে পাত্রে, জল থেকে বরফে, প্রতীক থেকে প্রত্যক্ষে—কিংবা সেই হৃদয়-ভরা কবিতার লাইনটা—অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ—সবই কেমন পুরোনো-পুরোনো ঠেকছে। নলিনেশ বললে, "তার মানেই বীজগণিত খুঁজে বেড়াবে পাটী-গণিতকে।"

এমন সময় অঞ্জলি-দীপালির দল এসে পড়ল। যূথিকা আর লিপিকা আর অর্চনা।

"ওমা, তুই এখানে?" তেরছা করে গালে সকলের হাত উঠল।

"কখন এলি শুনি?" বললে, একজন—শেষের জন, লিপিকা!

"এই ত খানিকক্ষণ।" এতটুকু ঢোক গিলল না পরমা।

"আমরা সব কত ব্যস্ত।" বললে অঞ্জলি, প্রথমজন।

"একটু দোকানে যেতে হয়েছিল।" একটা-কি ছবির ম্যাগাজিনের উপর ঝুঁকে পড়ে বললে পরমা, "তাই ঘুরে এসেছি।"

"আমাদের ভাবনা হল অসুখ করল নাকি?" এ দীপালির ভর্ৎসনা।

"অসুখ না সুখ?" লিপিকা একটু হেসে পড়ে বললে যূথিকার কানে কানে, "দেখছিস চেহারাটা কেমন আন্ডারলাইন করেছে!"

যূথিকার আরেক কানে অঞ্জলি বললে, 'আর ঘরদোরের এ কী ভোলবদল!"

"কী করে এলি?" দীপালির প্রশ্ন সরাসরি।

"কী করে আবার!" ঘুরেফিরে একজনকে একদিকেই লক্ষ্য করছে দেখে বিরক্ত হল পরমা, "কেন আমার দুটো পা নেই?"

মিথ্যেকথাগুলো দিব্যি বলে যেতে পারছে পরমা, কেননা একমাত্র যিনি খণ্ডন করতে সক্ষম, তিনি, স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে পরমা, তারই পক্ষে। আর ছোট ছোট এই মিথ্যেকথাগুলোকে নলিনেশ অনুভব করছে ছোট ছোট স্পর্শের মত। আর এও ভাবছে, মিথ্যেকথাই বা কী অপূর্ব করে বলতে পারে সত্যিকথা! সন্দেহ কী, পরমার পক্ষেই নলিনেশ। পক্ষ দিয়েই সে ঢেকে রাখবে পরমাকে।

বক্তৃতার আশ্রয় নিল নলিনেশ যাতে এই সব ছোটখাট প্রশ্ন ও তাদের ভিতরকার ভয়াবহ বিস্তীর্ণ ফাঁক সব ডুবে যায় এক-সঙ্গে। আর কথায় একবার পেয়ে বসলে নলিনেশ, কে না জানে, অতিমাত্রিক।

এক সঙ্গেই ফিরল মেয়েরা। এবং সারা-পথ কচাল করতে করতে। যদি দোকানেরই দরকার ছিল, কই কলেজে ত বলে নি। কেন কাউকে স্লিপ দিয়ে পাঠিয়ে জানান যেত না, কেন ওদেরকে বসিয়ে রাখল এতক্ষণ? মিতাকার যা ব্যবস্থা তার ব্যতিক্রমে কেন ওর উদ্বেগ হবে না? বা, দুর্ঘটনা হতে নেই? যদি হঠাৎ দরকার পড়ে, জানাবার সময় না থাকে লোক না থাকে, যেতে পারব না দোকানে? কিন্তু কিনবে কে, কিনবে কী, জিনিস কই? বা, কিনতে হবে এমন কি মাথার কিরে আছে, জিনিস যদি পছন্দ না হয়, যদি দরে না বনে! তার মানেই তাই। যা নৈবেদ্য তাই চাকলা। তবুও ছাড়ন নেই। সময়ের হিসেব, দোকানের দূরত্ব, জিনিসের প্রয়োজন অথচ তা না-কেনা এই সব চুলচেরা বিশ্লেষণের পরে একটি স্থির-সিদ্ধান্তের প্রতি ইঙ্গিত। সেটি হচ্ছে বন্ধুদের প্রতি তাচ্ছিল্য। বন্ধুদের টেক্কা মারার চেষ্টা।

"বুঝলি না, আমরা বাজে তাস দুরি-তিরি আর ইনি একেবারে রঙের টেক্কা।" টিপ্পনী কাটল যূথিকা।

"এ দিয়ে কী হবে? বেশী নম্বর পাবে?" অর্চনা চোখ টিপল।

"আর নম্বর কি পরীক্ষার খাতায়, না, জীবনের পাতায়?" এটা অঞ্জলির মুখসাট।

"আর ওঁরই বা এই বিবেচনা কেন? কোচিং ক্লাসের ঘণ্টা একলা পরমার অনুকূলে বাড়বে কেন?" টাকাপয়সার হিসেবের কথা তুলল দীপালি।

"বা, একস্ট্রা পেমেণ্ট আছে যে পরমার—" লিপিকা তুলি বুলোল।

"তাই পেয়েই ভুলেছেন ভোলানাথ। সেটা বুঝি গাঁজার কলকে। তাই আঁখি ঢুলুঢুলু—"

"ছি ছি, তোদের একটু লজ্জা করল না?" পরমা খাপ্পা হয়ে উঠল, "একজন গণ্যমান্য গুণী লোক, গুরুজন, তাঁকে টানছিস?"

"যা টানবার তুইই টানবি?" অর্চনা বললে, তার আগের কথার খেই ধরে।

"তাই এত সাজগোজ—"

"এই মেঘডম্বর—"

"রণবেশ—"

"বা, আমি সাজতে পারব না?" মুখিয়ে উঠল পরমা।

"এ ত ছাত্রী হয়ে যাওয়া নয় পাত্রী হয়ে দাঁড়ান।" অঞ্জলি বললে।

"বেশ ত একশবার দাঁড়াব।" আগুনে ঘিয়ের মত তেড়েফুঁড়ে উঠল পরমাঃ "তোদের কে বারণ করছে? তোরাও যা না, দাঁড়া না গিয়ে!"

"আমরা কি ময়না না টিয়ে! না কি ময়ূর!" বললে অর্চনা।

লিপিকাকে চিমটি কেটে যূথিকা বললে, "আমরা হচ্ছি কাক। আমাদের কি শিস আছে না পেখম আছে!"

"ছিরি আছে না ছাঁদ আছে! চঞ্চু আছে না ঠোঁট আছে!" এ যোজনা লিপিকার।

"তা ছাড়া আমাদের বাগানে কি গন্ধরাজ ফোটে?" দীপালি ঠোঁট বেঁকাল।

গন্ধরাজ! বুকের মধ্যে টুং করে বেজে উঠল পরমার।

"দেখলাম যে তাঁর টেবিলে।" দীপালি বললে, "তুই না দিলে ও এল কোত্থেকে? তোর বাড়িই ত গন্ধরাজের জন্যে প্রসিদ্ধ।"

চট করে খোঁপায় হাত দিল পরমা। আশ্চর্য, খোঁপায় ফুল নেই।

খুট খুট খুট খুট—হৃৎপিণ্ড ফাটাফাটা শব্দ করতে লাগল। যেন আর পিয়ানোর আওয়াজ নয় ঘোড়ার খুরের শব্দ। যেন নির্জন পথের উপর দিয়ে কে আসছে ঘোড়ার উপর চড়ে। শোনা যাচ্ছে তারই এগিয়ে আসার আওয়াজ।

কখন হাত বাড়িয়ে খোঁপার থেকে তুলে নিয়েছেন অলক্ষ্যে। তারপর টেবিলের উপর রেখে দিয়েছেন। কী আশ্চর্য, একটুও টের পায়নি ত, আঙুলের কী নিপুণ কারুকলা! কই, দেখেওনি ত টেবিলে! চোখ কি পরমার সব সময়ে বইয়ের দিকেই ছিল না কি তাঁর মুখের দিকে। আর, দেখতে পেলে কী করত শুনি? রুষ্ট হয়ে প্রশ্ন করত কেন চুলে হাত দিয়েছেন? না কি নিজের জিনিস নিজেই ফেরত নিয়ে আসত চুরি করে? যদি ধরা পড়ে যেত সকলের সামনে, যদি তিনি হাতে চেপে ধরে বাধা দিতেন? না কি জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিত বাইরে? টাটকা গন্ধভুরভুর ফুল কি বাইরে ফেলে দেবার! না কি যেমন ছিল তেমনি থাকতে দিত টেবিলে? লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত সে মুগ্ধ চোখে।

যে ছোঁয়া তখন টের পায়নি তারই শিহর যেন লাগল তার চেতনায়। দূরশ্রুত কোন গান যেন শূন্যে মিলিয়েও শূন্য হয় না।

কিন্তু মেয়েদের জিভে যখন একবার শান পড়েছে তখন তারা লকলক লকলক করবেই। ছোট ছোট কথার ছোট ছোট কাদার দাগ ছিটাতে লাগল চারদিকে। পরমা ভাবল, আর যাব না, কোচিং ক্লাস থেকে নাম কাটিয়ে দেব, খুব মান হয়েছে, দরকার নেই আর অনাসে'।

কিন্তু পরদিন যথাসময়েই আবার হাজির হল পরমা। যথাসময়ে মানে আগে আগে।

আজকে তার পোশাক সাদামাটা, চুল আবাঁধা। আর গন্ধরাজের গুচ্ছ সে হাতে করে ধরে এনেছে সারাপথ।

কিন্তু ঘরদোরে আজ আবার এ কী ভোজবাজি!

"কী হল ঘরদোর এমন অগোছাল যে?" ঘরে ঢুকলে যে কেউই এ—প্রশ্নই প্রথমে করবে। ভয়মাখা চোখে পরমা তাকাতে লাগল এখানে-ওখানেঃ "কোন জিনিস খুঁজে পাচ্ছিলেন না বুঝি? না কি ইঁদুর না সাপ?"

নলিনেশের চোখে ভয় নেই, কৌতুক। দেখাদেখি পরমাও চোখের তাকানটা তরল করল।

বললে নলিনেশ, "তুমি কাল বলেছিলে না তোমাকে জানালে তুমিই নিজে এসে গোছ-গাছ করে দিতে, তাই জিনিসগুলি শখ করে বিশৃঙ্খল হয়ে রয়েছে। তোমার হাতের স্পর্শের ধ্যান করছে বোধ হয়।"

"দাঁড়ান, দিচ্ছি গুছিয়ে।" ত্বরান্বিত হবার

ভাব করল পরমা। বললে, "নিন, ফুলগুলি ধরুন।"

"ফুল!" যেন প্রথম দেখছে এমনি গোবেচারা মুখ করল। বললে, "এ ফুল আমার? আমাকে দিচ্ছ?"

"তবে আর কাকে! নিন, ধরুন। ছাই একটা ফুলদানিও নেই আপনার ঘরে!"

যেমন প্রসাদ নেয় তেমনি দুটি হাত জোড় করে নিল নলিনেশ। বললে, "পাওয়াতেই সুখ জমানতে নয়। যে পেয়ে সুখী তার মন কাব্যের আর যে জমিয়ে সুখী তার মন বাণিজ্যের। আমরা বাণিজ্যের ঘরে নই, আমরা কাব্যের ঘরে।"

"কাল বুঝি চুরি করেছিলেন খোঁপার থেকে?" চোখে কালো কটাক্ষ পুরে জিজ্ঞেস করল পরমা।

"তার দুঃখে বিমর্ষ হয়ে আছি। কিন্তু আজ তোমার অকৃপণ আত্মসমর্পণে আমার সে লজ্জা মুছে গেল, ধুয়ে গেল—"

"তার মানে, চুরির জন্যে পুরস্কার পেলেন।" কালো চোখের সূক্ষ্ম কটাক্ষ আরও একটু ঘন হল। পরমুহূর্তেই হালকা হবার চেষ্টা করে বললে, "যাই, আপনার ঘরের রুগ্‌ণতাকে সুস্থ করি।" আঁচলটা কোমরে রাশিভূত করে স্তূপীকৃত বিশৃঙ্খলার মধ্যে হাত দিল পরমা।

"কিন্তু আমি তোমাকে কী পুরস্কার দেব?" নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেমন যেন গ্রাম্য ও স্পষ্ট শোনাল নলিনেশকে।

"নম্বর?" চোখের পাতা কাঁপতে লাগল পরমার, "কিন্তু অপরাধ হয়ে যাবে। কনটেম্পট হয়ে যাবে!"

"বল।" ভাবখানা তোমার সাতখুনের একটাও আমলে আনব না।

"পরীক্ষার খাতায় নম্বর একটু বেশী দেবেন।"

গম্ভীর হয়ে গেল নলিনেশ। বললে, "আমার হাতে নম্বর নিয়ে কী হবে? শেষ পরীক্ষায় ভাগ্যের খাতে নম্বর নিতে পার তবেই ত পাস।"

কথার পিঠে কথা, বলে ফেলল পরমা, "কে জানে আপনিই আমার ভাগ্য।"

কাজ সেরে স্থির হয়ে বসল পরমা। এবার একটা কিছু পড়া আরম্ভ হক।

প্রদোষের প্রচ্ছায় থেকে চলে আসুক দিনের আলোর সারল্যে। আলোছায়ারফেলা বনের সংকীর্ণ পথ থেকে প্রকাশ্য প্রশস্ত রাজপথে।

বই অবিশ্যি একটা হাতে নিয়েছে নলিনেশ, কিন্তু তার কথাটা একেবারেই বই ঘেঁষে এল না। এল খাস্তি ঘেঁষে। তাও শাখার পল্লবে নয়, একেবারে শেকড় ধরে।

নলিনেশ জিজ্ঞেস করল, "তোমার কে কে আছে?"

খানিকক্ষণ কী চিন্তা করল পরমা। পরে চোখ নামিয়ে একটি বিষণ্ণতার ছায়া ফেলে বললে, "কেউ নেই!"

এইখানেই শেষ করে দিতে পারত কথাটা কিন্তু সাহসের অন্ত নেই পরমার। এই সাহসেই সে উজ্জ্বল, এই সাহসেই সে ধারাল। চোখ তুলে বললে, "আপনার কে কে আছে?"

এক পলক দ্বিধা করল না নলিনেশ, বললে, "আমারও কেউ নেই। সেই দিক দিয়ে আমার-তোমার ষোল আনা মিল।" পরে একটু দার্শনিক হবার চেষ্টা করল, "আসলে কারুরই কেউ নেই—প্রত্যেকেই আমরা বিশুদ্ধরূপে নিঃসঙ্গ, নিঃশেষরূপে নিঃসঙ্গ। কিন্তু আমরা যখন সামাজিক জীব, বাস্তবে আমাদের কিছু কাছাকাছি লোকজন থেকে যাবেই। সেই দিক থেকে জানতে চাই তোমার নিকট-আত্মীয় কে কে আছে, কে তোমার অভিভাবক—"

গড়গড় করে বলতে লাগল পরমা, এতটুকু ঠেকল না। ঘরের কথা না পরের কথা কিছু ভাবল না দিশপাশ। যেন সব বলা যায়, বলা শেষ হয়ে গেলেও যা না-বলা থাকে তাও যেন না-বলবার নয়। বিরলে বসে যে অন্তর্যামীর শোনবার কথা, প্রতিকার করুন আর নাই করুন, সে যেন এইখানে।

যেমন প্রত্যেক মধ্যবিত্ত সংসারীর লক্ষ্য, দাদামশাইও বেশ ভাল ঘর বর দেখেই মায়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। বাবা ছিলেন ফরেস্ট-অফিসর, বিয়ের ছ বছর পর কী একটা বুনো জ্বর হল, আটচল্লিশ ঘণ্টা অজ্ঞান থেকে মারা গেলেন। আমার বয়স তখন প্রায় পাঁচ আর আমার ছোট ভাইয়ের দুই। মায়ের কী মতি হল ভাসুরের সংসারে না গিয়ে এলেন তাঁর বাপের বাড়ি। আর এমন বিধিলিপি পরের বছরেই দাদু চোখ বুজলেন। দিদিমা থেকেই বা কী না-থেকেই বা কী, অনুগমন করলেন স্বামীকে। আমরা পুরোপুরি মামার বুড়ো আঙুলের তলায় এসে পড়লাম। শাসনে-শোষণে ঝাঁঝরা হয়ে যেতে লাগলাম। শাসনের সঙ্গে আওয়াজ মিলিয়ে শোষণ বলছি না, সত্যিসত্যি রাহাজানি। শাসন করবেন পীড়ন করবেন যুক্তিহীন কড়াক্কড় করবেন, এ না হয় বরদাস্ত করা যায়, কিন্তু তাই বলে লুট, হরির লুট?

"কে তোমার মামা?" কাহিনীটা শেষ না হতেই কৌতূহলের খোঁচা মারল নলিনেশ।

"আমার মামাকে চেনেন না? মণিমোহন হাজরা—"

"বা, উকিল মণিমোহনবাবু? আমাদের কলেজ কমিটির মেম্বর?"

"তিনি কিসের মেম্বর নন? খেলার মাঠ থেকে কংগ্রেস, ব্যাঙ্ক থেকে পৌরশালা, এ আর পি থেকে শ্মশান সর্বসভার শোভাধর তিনি। এবং সবখানেই তাঁর ছাড়পত্র তদবির। ওকালতিতেও তাই। উকিল শুনি হয় আইনে, ইনি উকিল তদবিরে। পৃথিবীতে এতদিন বীরেরই মূল্য জানতাম, এখন দেখছি তদবিরের। সাফল্যের হাতি বাঁধা সদরে নয়, খিড়কির দরজায়।"

তারপর বল কী বলছিলে লুঠতরাজের কথা।

বাবা বিবেচক ছিলেন, বিয়ের পরেই মোটা অঙ্কের করেছিলেন ইনসিওর, পৈতৃক এজমালি ভূসম্পত্তিও মন্দ ছিল না। সব চলে এল মামার জিম্মাদারিতে। মামা আদালতে দরখাস্ত করে আমাদের অভিভাবক হলেন, আমাদের দুই অপোগণ্ড নাবালকের, আমার আর আমার ছোটভাই মলয়ের। মা মেয়েছেলে, অভিভাবকের অ বা আইন-আদালতের আ বোঝেন না, মামাই তাঁকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে লাগলেন। আজ নাবালকের এটা দরকার, কাল ওটা দরকার—খোরপোশ, লেখাপড়া, প্রাইভেট টিউটরের মাইনে, বইয়ের দাম, চিকিৎসা, তেন-তেন, নানান বায়নাক্কায় টাকা তুলতে লাগলেন, মুঠ মুঠ টাকা। প্রায় ঢাকের দায়ে মনসা বিকল। এও না হয় হল যেমন-তেমন পরে রব তুললেন নাবালকদের মাথা গোঁজবার জন্য একখানা বাড়ি করে দেবেন। রব তুললেন নীরবে, মানে, শুধু আদালতের কানে কানে। ভাঁওতা মেরে এজমালি জমি-জমার অংশও মেরে দিলেন। এ নিয়ে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ কায়েম হয়ে গেল। এমনি করে আস্তে আস্তে সমস্ত নগদ টাকা জমি-জিরাত আত্মসাৎ করলেন। আমাদেরই টাকায় তাঁর নিজের পসার, স্ত্রীর গয়না, মেয়ের বিয়ে পর্যন্ত হয়ে গেল। একখানা বাড়ি পর্যন্ত তুললেন, এখন শুনতে পাচ্ছি এ-বাড়ি মামীর বেনামীতে। যার ঘোড়া তার ঘোড়া নয় চেরাগদারের ঘোড়া। আমরা দুই ভাইবোন অবোলা দুই পশুর মত মূর্খ চোখে তাকিয়ে রইলাম।

"আর তোমার মা?" জিজ্ঞেস না করে পারল না নলিনেশ।

"তিনি কী করবেন, রোদে-বাদলে সব সময়ে ঝুঁকে রইলেন দাদার দিকে। বললেন, এ দুঃসময়ে দাদা না দেখলে কোথায় ভেসে যেতাম নাবালকদের নিয়ে। মা যদি তেমন লেখাপড়া শিখতেন, যদি থাকত তাঁর বিষয়-বুদ্ধি, যদি থাকত টাকা-পয়সা নিয়ে কাজ-কারবার করবার যোগ্যতা, তাহলে আমরা এমনিভাবে বয়ে যেতাম না। থাকার ঘর থেকে চলে আসতাম না না-থাকার ঘরে,

আচাক্য মাঠের মধ্যে, রাস্তার কিনারে। আজ আমাদের বাড়ি নেই, ঘর নেই, টাকা নেই, কড়ি নেই—কিছু নেই। যার কিছু নেই, সে কী করবে? কিন্তু যার সব ছিল, অথচ যে লুণ্ঠিত, পর্যুদস্ত, সে কি চুপ করে থাকবে? কিন্তু বলুন, কোথায় জানাবে সে ফরিয়াদ, কোন্ আদালতে?"

"এখন তাহলে তোমাদের কী করে চলে?"

"এখনও আছে নিশ্চয়ই কিছু তলানি, তার থেকে। এ পর্যন্ত অপব্যয় করা দূরের কথা, স্বাধীনমত, যত সামান্য হক, হাত-খরচের টাকা কাকে বলে বুঝলাম না। তুচ্ছ খাতা পেন্সিল কেনার খরচও মামা-মামীর মুখাপেক্ষা। অথচ সব আমার টাকা, কৌটো ভরা, ঝাঁপি ভরা, বাক্স ভরা। কে তার হিসেব দেখে, কে বা নেবে তার পাওনা বুঝিয়ে? সে-পাওনার ডিক্রি জারীই বা কোন্ কোর্টে, কোন্ জন্মে? গরুকে যেমন রাখাল মারে, কসাইয়ে মারে, তেমনি ড্যাবড্যেবে চোখ মেলে পড়ে পড়ে মার খেলাম। নাবালক, বাক্যহীন নির্বুদ্ধিতা, অসহায়তার জড়পিণ্ড, পরের কথায় বাহিত-চালিত হবার খেলনা। শুধু ধনিক-শ্রমিক, জমিদার-প্রজার কথাই শুনেছেন, শুনেছেন অভিভাবক আর নাবালকের কথা?"

"এখন তবে উপায়?" নলিনেশের সুরে দুশ্চিন্তার টান।

"উপায়?" হাসল পরমা। "উপায় আপনি।"

"আমি?" আদালতের লোকজন উঁকি-ঝুঁকি মারছে কিনা, সন্ত্রস্ত হল নলিনেশ।

"হ্যাঁ, আপনি ছাড়া আর লোক কই?" হাসিতে আরও একটু প্রাঞ্জল হল পরমা: "আপনি যদি ভাল নম্বর দিয়ে পাশ-টাশ করিয়ে দেন, তবে একটা চাকরি পেয়ে সুস্থ হই।"

"চাকরি?" স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই আবার সাধ করে কথা ঘোরাল নলিনেশ: "মেয়েদের সে সনাতন চাকরি আছে, তাই নিয়ে ফেললেই বা মন্দ কি।"

"তাতেও টাকা লাগে।"

"টাকা লাগে?" যেন নতুন শুনছে নলিনেশ এমনি অবাক হবার ভাব দেখালে।

"লাগে না? সেই বি-এ, এম-এ পাশ মেয়েকেও দাঁড়াতে হচ্ছে পণ্যের বাজারে, দেখায় বটে দেখান হচ্ছে না কিন্তু বিশেষ করেই দেখান হচ্ছে। তারপর যদি-বা অগবটা কাটল, নগদ দাও, সোনাদানা দাও, তৈজস-আসবাবে ঘর ভর। মেয়েরা শখের করাত, পড়ানতেও খরচ, সরানতেও খরচ। জুড়তে খরচ, পড়তে খরচ। মেয়েরা আগাগোড়াই একটা বকেয়া বাকি, একটা নিলাম-ইস্তাহার।

"তাছাড়া—" বলতে বলতে থেমে গেল পরমা।

যেন কী একটি গভীর কথা গোপন করছে এমনি শোনাল সহসা। এখনও গোপন করবার কিছু আছে নাকি। প্রদীপের পলতেটা উস্কে দিল নলিনেশ:

"তাছাড়া—"

"তাছাড়া আমি দেখতে কুচ্ছিত।"

"তাই নাকি?" নিশ্বাস ফেলল নলিনেশ।

"ঘরে-বাইরে সবাই তাই বলে।" স্বর গম্ভীর করল পরমা, "আমার কোন ভবিষ্যৎ নেই।"

"অতীত আছে?"

আচমকা চোখের উপর চোখ পড়ল। লঘুতার ছোঁয়াচ লাগল কণ্ঠে। বললে "তাও নেই।"

"ঘরে না হয় মামা-মামী আছে, বাইরে শত্রু কে?"

"দেখুন না, ক্লাসের মেয়েগুলো কাল আমার সঙ্গে কী ঝগড়া করল।"

"কী নিয়ে? তুমি কুচ্ছিত বলে?"

"প্রায় তাই। আমি অপদার্থ, তবু আপনি আমাকে একটু স্নেহ করেন, তাই ওদের মর্মশূল।"

"করি না কি?" খেইছেঁড়া বকার মত আমতা-আমতা করতে লাগল নলিনেশ: "কে বললে? কই আমি জানি না ত।"

লজ্জা পেল পরমা। কানের কাছের চূর্ণ চুলের ক্ষীণ গন্ধ দুটিও যেন কাঁপতে গেল। পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার নিজের প্রশ্নে, "আমার কথাই এক ধামা শোনাচ্ছি আপনাকে। আপনার কথা বলুন—"

"আমার আবার কোন কথা?"

"বা, আপনার বাড়িঘরের কথা। কাছা-কাছি লোকজনের কথা। বলুন না। শুনতে ইচ্ছে করছে খুব।"

কী অদ্ভুত সাহস! যেন জবানবন্দি নিচ্ছে। তারও চেয়ে বেশী। জবাবদিহি নিচ্ছে। সম্ভ্রান্ত বলে সমীহ করছে না। গণ্ডির বাইরে রাখছে না।

হাতের বইয়ের পৃষ্ঠা ওল্টাতে-ওল্টাতে বললে নলিনেশ, "আরেকদিন বলব।"

এখানেও ইতি টানে না পরমা। ঘাড় কাত করে বললে, "ঠিক বলবেন ত? হুবহু?"

"তুমি যদি শোন—"

"শুনি মানে? গরু-ঘোড়া নই, কিন্তু কান দুটো আমার নড়ছে আগ্রহে।" হাসল পরমা।

নলিনেশেরই সাহস নেই। পাশ কাটাতে চাইল, "বলব আরেকদিন। এখন একটু পড়ি।"

কোন কবিতাটি পড়বে পৃষ্ঠা খুঁজে বের করছে নলিনেশ, কিন্তু চোখ কবিতার উপর না পড়ে পড়ল পরমার একখানি হাতের উপর। টেবিলের প্রান্ত পেরিয়ে ডান হাতখানি, হাতের অনেকখানি, পড়ে আছে শিথিল হয়ে। অনেক রিক্ত আর শ্রান্ত উৎসুক অথচ উদাসীন। এ যেন আর এক রকম কবিতা। শুধু আত্মার অনুভবের নয়, যেন তার চেয়েও বেশি শরীর স্পর্শের। নলিনেশের ইচ্ছে হয় ছোঁয়, ধরে, একটু বা ধরে থাকে। কোন প্রকাশ্য ছুতো করে নয়, অসাবধানে ঘটে গিয়েছে সযত্নে এমনি একটা কৌশল তৈরি করে নয়, বেশ প্রশস্ত করে, প্রগাঢ় করে। নদীর উপর যেমন বৃষ্টি পড়ে, জলের উপর জল, তেমনি এক স্নিগ্ধতার সঙ্গে আর এক আর্দ্রতা মিশিয়ে দেয়, ঢেলে দেয় উপুড় করে।

না, থাক্, কী হবে ওকে অকারণে ব্যস্ত করে? নীড়ের মধ্যে পাখা মুড়ে ঘুমিয়ে আছে পাখি, সংকীর্ণ অস্তিত্বের উষ্ণতায়, কী হবে ওর ঘুম ভাঙিয়ে? মুড়িয়ে পাখায় চাঞ্চল্য এনে? এ প্রত্যক্ষ স্পর্শের কী ব্যাখ্যা, অনর্থক দুর্ঘটনা না অস্পষ্ট আশ্বাস, না কি শুধুই স্থূল ইঙ্গিত—এ বিচারের মধ্যে ফেলে ওকে ক্লান্ত করে কী লাভ? নির্জন হলেই পুরুষ আত্মবিস্মৃত হয় এ পঙ্কিল প্রশ্নেরও বা অবকাশ রাখা কেন? না না না নিজেকে সবলে সংহত করল নলিনেশ। যেমনটি আছে থাক তেমনটি। যেন দৈবপ্রেরিত সংগীতের একটা সুর দেখছে। আগানের সুরে আঙুলগুলি কি নড়ে উঠল? কথা কয়ে উঠল? ডেকে ডেকে উঠল?

না, যেমনটি আছে তেমনটি থাক। শুধু থাক এই ক্ষণিক সখ্য, এই নিরলংকার নির্ভীত। বেশী হলেই কি বেশী? বেশী ভাবতে পারলেই বেশী।

পড়া শুরু করল নলিনেশ।

হাত সরিয়ে নিল পরমা। জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আপনি বিয়ে করেছেন?"

যেন নড়া দাঁতে সজোরে কামড় পড়ল। এমনি ভাব করল নলিনেশ। কিন্তু কী বলে উত্তরে! আর একদিন বলব বলা যায় না। পাশ কাটাতে গেলেই সটান ফেল। যখন বুঝেই নেবে তখন মুখোমুখি হওয়াই ভাল। "করেছিলাম।" স্পষ্ট করেই বললে নলিনেশ।

"করেছিলাম মানে? মারা গেছেন স্ত্রী?" উকিলি জেরাকেও হার মানাল পরমা।

"প্রায়।"

"প্রায় মানে মরেও বেঁচে আছেন?"

"ঠিক উলটো। বেঁচেও মরে আছেন।"

"আরেকদিন বলবেন, বুঝলেন? ঐ কুন্দলীরা এসে পড়ছে।" শাড়িতে সতর্ক কটা রেখা ফুটিয়ে অসম্পৃক্ত হয়ে বসল পরমা।

হুড়মুড় করে এসে পড়ল মেয়েরা।

"তোমাদের সকলের জন্যে পরমা একটা করে ফুল এনেছে।" সবাইকে একটা করে বিতরণ করল নলিনেশ। সবাই খুশির টাটকা রঙে ঝলমল করে উঠল। এত অল্পেই খুশি করা যায় মানুষকে।

সবাই যখন পেল, তখন সকলেই এক দলে, এক দখলে।

তবু, তারই মধ্যে টিপ্পনী কাটে অঞ্জলি। "আমরা হচ্ছি ভাঁট ঘেঁটু, আশশ্যাওড়া, আর ও হচ্ছে গন্ধরাজ—"

"গন্ধরানী বল।" এ-চিমটিটা দীপালির।

শ্রেষ্ঠ বোঝাতে হলে রাজাই উপযুক্ত। বললে নলিনেশ, "রানী শ্রেষ্ঠ নয়, রাজাই শ্রেষ্ঠ। রামপ্রসাদ বললে, রাজা আমার মা মহেশ্বরী—"

"তা হক।" বললে যূথিকা, "কিন্তু ও একাই শ্রেষ্ঠ হতে যাবে কেন? ও যদি গন্ধরাজ, আমরা কেউ রূপরাজ কেউ ছন্দরাজ কেউ বা কবিরাজ।"

"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে—" লেজুড় জুড়ল লিপিকা।

"তার মানে," অর্চনা লক্ষ্য করল নলিনেশকে, "তার মানে এইখানে রাজা আপনি।"

সবাই হেসে উঠল। বয়ে গেল এক ঝাপটা সুগন্ধের হাওয়া।

"তার মানে," আরও জের টানল অর্চনা, "এই রাজত্বে সকলের অধিকার। কোথাও এতটুকু পাখাপাতা নেই, অর্থাৎ পক্ষপাত নেই—সমদর্শন।"

আবার হাসল মেয়েরা। পরমাও হাসল। ফেরবার পথেও হাসির জলস্রোত।

"ওরে, ওকেই ধর। ওই আমাদের মুরুব্বি—"

"মোটেও না। ও আমাদের সই।" যূথিকা ঢলে পড়ল।

"শুধু সই না, ও আমাদের মই।" বললে অঞ্জলি, "ওকে ধরেই আমাদের ওঠা, আমাদের পার হওয়া।"

এতটা যেন সহ্য হল না লিপিকার: "কেন, এত কেন? আমরাও সব মা-ষষ্ঠীর সন্তান। সবাই এক পদার্থ দিয়ে তৈরী।"

"অন্তত সবাই আমরা এক নৌকোর সোয়ারি।" লেজুড় জুড়ল দীপালি: "এক ঝাড়ের বাঁশ।"

"কিন্তু," খিল খিল করে হেসে উঠল অঞ্জলি: 'কিন্তু ঐ এক ঝাড়ের বাঁশে কাউকে দিয়ে মা-দুর্গার কাঠামো কাউকে দিয়ে হাড়িমুচির ঝাড়ু ডান্ডা।"

"ফল পৃথক হক," গম্ভীর মুখ করে বললে অর্চনা, "কিন্তু আমাদের এক যাত্রা।"

চোখে মুখে সায় দেয়া হাসি থাকলেও পরমা কি মনে মনে আরও বেশী গম্ভীর?

ঐ কুম্‌সীরা এসে পড়েছে

সে কি জলের কাছে এসে একটা সাঁকো খুঁজে বেড়াচ্ছে?

"সুন্দর বলেছিস," বললে পরমা, "আমাদের এক যাত্রা। এক দুর্লভ আবিষ্কারের জন্যেই আমাদের মহৎ অভিসার।"

পরদিন নির্ধারিত সময়ের যেমন আগে আসে তেমনি এসেছে পরমা, কিন্তু একী, দোর-গোড়ায় ঘুরঘুর করছে অর্চনা।

"তুই!"

"ফল পৃথক হক কিন্তু যাত্রা এক।" হাসি লুকবার জন্যে আঁচলের ডগাটা মুখের কাছে তুলল অর্চনা।

"বেশ ত আয় না। এক বুদ্ধি ভাল দুই বুদ্ধি আরো ভাল।" পরমা বললে।

একটা সংগত কারণ দেখানো উচিত। তাই বললে অর্চনা, "একটু এ পাড়ায় এসেছিলাম। জানিস ত এইদিকেই আমার মাসিমার বাড়ি। পেলাম না মাসিমাকে, তাই ভাবলাম এগিয়ে গিয়ে তোর জন্যে অপেক্ষা করি।"

"কারণ ছাড়া কে আর আগে আসে?"

পরমা গলা নামাল: "এখন ভাবছি ভদ্রলোক না বেশী চার্জ করে বসেন। এক ঘণ্টার কথা, এখন প্রায় দেড় ঘণ্টার দাখিল—"

"তুই যদি একস্ট্রা দিস আমিও দেব না হয় ধার ধরে করে।"

"বা, দুজন এক সংগে!" উদ্বেল কণ্ঠে অভ্যর্থনা করল নলিনেশ। অর্চনার মনে হল এ আসলে হতাশার সুর, দুজনকে এক সংগে দেখে ম্লান হয়ে গিয়েছে মনে মনে। আর পরমার মনে হল আসলে এ সুর উল্লাসের, অর্চনাই বা কি কম বাঞ্ছনীয়! অর্চনাই ত ক্লাসের সেরা মেয়ে। তাছাড়া দেবতারও অগোচরে কখন কোন্ চক্ষের স্পর্শে হৃদয়ের কনক দ্বার খুলে যায় কে বলতে পারে।

এক দেশের বুলি আর এক দেশের গালাগাল। একজনের উল্লাস আর একজনের হতাশা।

সেদিন আর সেই পরিবেশ কই? শুধু পড়া আর ব্যাখ্যা, শুধু বাক্যের ঝিকিমিকি। যেন রুদ্ধদ্বার পাষাণের ঘরের মধ্যে মুক্তির

অপেক্ষা করছে পরমা। শুধু একটা শুকনো প্রান্তর ধু ধু করছে বাইরে, যতদূর চোখ যায় এক কণা ঘাস নেই, আশা নেই। শুধু শূন্যতার ঢালা অন্ধকার।

"এই পর্যন্ত থাক্।" উঠে পড়ল নলিনেশ।

ফিরে যাবার আগে একটু বোধ হয় পিছিয়ে থাকছিল পরমা। একটু উসখুস, একটু বা গড়িমসি। সমস্ত দিনটা বৃথা গেল সেই দীর্ঘশ্বাসটি জানাবার জন্যেই এই চাঞ্চল্য।

টুক করে নলিনেশ কখন কাছে চলে এল, বললে অস্ফুটে, "আগে আসার চেয়ে শেষে যাওয়াটাই বেশী দামী।"

"শেষে যাওয়া?"

"হ্যাঁ, থেকে যাওয়া—"

কষ্টে একটু হাসল পরমা। তাকাল অগ্রবর্তিনীদের দিকে। বললে, "তার আর সুবিধে কই?" বলে খাতা-বই গুছিয়ে নিয়ে সঙ্গ ধরল বন্ধুদের।

ছি ছি ছি, নলিনেশের মন অশান্তিতে ভরে উঠল। কেন অমন করে আদরভরা ধূসর সুরে কথা বলতে গিয়েছিল সে? কেন আবার নিরীহ মৃগশাবককে ব্যস্ত করল অকারণে? কেন আবার দিল তাকে নিজের পরিমিত আয়তন ভোলবার যন্ত্রণা? আবার একটু গম্ভীর হতে হল পরমাকে, অন্তরের গভীর থেকে টেনে বের করতে হল নিম্নস্বরের গাঢ়তা! চোখে মুখে আনতে হল ক্লেশের কাঠিন্য! কেন, কেন সে কষ্ট দিল পরমাকে? ভয়ের কষ্ট অস্পষ্টতার কষ্ট। কেন সে থাকতে দিল না জাগ্রত ঘুমের মধ্যে? দুপুরবেলা ঘন বৃষ্টির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে বিকেলে ঘুম ভাঙার পর যেমন একটা দ্বিধার ভাব হয় এটা সত্যি বিকেল না সকাল, সেই বৃষ্টি-নেশাভরা অবুঝ ঘুমের মধ্যেই থাকতে দিল না কেন অনেকক্ষণ? কেন রূঢ় হাতে চকমকির পাথর ঠুকল?

নিজের কাছেই নিজেকে ছোট লাগল নলিনেশের। সেও কি ছোট ছোট হিসেবের ছোট ছোট সুবিধের দোকান খুলেছে? ছি ছি, এবার থেকে পরমাকেও কি সে নিযুক্ত করবে সুবিধের সন্ধানে? শিকারী হয়ে হরিণকে সে বলবে তুমি গহনবনে যতই পালিয়ে বেড়াও না কেন তুমিই তৈরি করে দাও আমার সন্ধানের সদুপায়? ছি ছি, সে কি শিকারী?

পরদিনও আগে আগে না এলে পারত! আজ ধরা পড়ল দীপালির কাছে।

"তোরও এ-পাড়ায় মাসির বাড়ি নাকি?" ঘরে ঢোকবার মুখে রাস্তায় দাঁড়িয়েই পরমা বললে।

গলার স্বরে যে কাঁটা আছে সেটা নির্ভুল বিঁধল দীপালিকে। বললে, "বাড়ি মাসির না থাক্ কিন্তু রাস্তা ত মামার। বাড়িতে না হয় খিল পড়ে, কিন্তু রাস্তা ত চিরন্তন খোলা।"

"রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতেই এসেছিস নাকি? আয় ভিতরে।" পরমা এগুল ঘরের দিকে।

বুঝতে পারল, মেয়েদের সার্থক যে ভূমিকা, সেই চরবৃত্তিতেই নেমেছে বন্ধুরা। তাকে একলা থাকতে দেবে না কিছুতেই। পাছে নতুন কোন ইঙ্গিত সে কুড়িয়ে নেয়, নতুন কোন আলোর সরলতা। পাছে এক যাত্রায় পৃথক ফল চেয়ে বসে।

শুধু কি প্রশ্নপত্রের বেলায়, শুধু কি পরীক্ষার ক্ষেত্রে? কে না জানে মেয়েদের প্রশ্ন আরও গহন, তাদের পরীক্ষার ক্ষেত্র আরও দূর-স্থলে।

ঘরে ঢুকে বইখাতা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে পরমা বললে, "এক রতি সোনা তায় ত্রিশজন স্যাকরা।"

প্রথমটা হকচকিয়ে গেল নলিনেশ, কী ব্যাপার বুঝতে পারল না। পরে ঘরের বাইরে চোখ পাঠিয়ে দেখতে পেল আর এক অঞ্চলের আভাস। মুহূর্তে খোলসা হয়ে গেল।

কিছু বলবে না ভেবেছিল তবু সমস্ত ভাবনা ছাপিয়ে এসে পড়ল কথা। কথাই কথাকে টেনে আনে। ইশারাই সাড়া আনে ইশারার। সামান্য কথা, কিন্তু কী তার অসহ্য শক্তি! সাধ্য কি তুমি স্তব্ধ থাক। কথাই তোমাকে কথা কইয়ে ছাড়বে।

"অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হলেও অনেক স্যাকরাতে সোনা নষ্ট হয় না।" পরমার হাসি-হাসি মুখের পর হাসি-হাসি চোখ ফেলল নলিনেশ: "শেষ পর্যন্ত একজনের গায়ে গিয়ে ওঠে।"

কিন্তু রাগের ঝলস যায় না পরমার। হাসি-হাসি মুখেই সেই তপ্ত ঔজ্জ্বল্যটাকে বাঁচিয়ে রেখে বললে, "আপনি ত কানকাটা সোনা। কানকাটা সোনা কি কেউ গায়ে পরে?"

কথাটা কি অপমানের মত লাগল না? প্রায় গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়ার মত?

তাই ত লাগা উচিত। কিন্তু নলিনেশের মনে হল এ প্রায় আত্মীয়স্পর্শ, সাহৎ সম্ভাষণ। সংঘর্ষ যে করে সেও ত নিকটেই আসে। অপমান ত সেই করতে পারে যে জানে অন্তরঙ্গ কথা, যে জানে গোপন ঘরের পরিচয়। বাইরে আপনার যে সুলভ চাকচিক্য আছে তা খাঁটি নয় তা আবরণ মাত্র আমি সেই আবরণের নীচে জেনেছি আপনার আসল তত্ত্ব—আপনার দুর্গতি আপনার দৈন্য আপনার গৃহান্তিক হাহাকার। যে এভাবে বলে সে কি আঘাতের চেয়েও বেশী করে ছোঁয় না?

"কিন্তু সোনা সোনাই।" তৃপ্তির সুরে বললে নলিনেশ, "শ্মশানে পাঠাবার আগে মৃতের দেহ থেকেও সোনাদানা খুলে রাখে। স্থানের বিচার কে করে যদি তার হৃদয়ের জিনিস সোনা হয়! এ কী তুমি বাইরে কেন?" চঞ্চল অঞ্চল-ছায়াকে উচ্ছলকণ্ঠে ডাক দিল: "এস ভিতরে এস।"

জ্বালা এখনও লেগে আছে পরমার গলায়। বললে, "দেখবেন সোনা বাইরে ফেলে আঁচলে গ্রন্থি দেবেন না যেন।"

"যে দুঃসাহসী গ্রন্থি দিতে জানে তার গ্রন্থির মধ্যেই সোনা।" বাইরে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে নলিনেশ বললে, "আসলে আমরা সোনাও চিনি না, পূর্ণ বিশ্বাসে পারিও না গ্রন্থি দিতে।"

কী দরকার ছিল এ কথাগুলি বলার! কথায় সাহস দেখান খুব সহজ, তাই না? মনে মনে নিজেকে আবার সতর্ক করল নলিনেশ।

"আমরা আপনার সময়ের উপর অযথা হস্তক্ষেপ করছি।" কুণ্ঠিত হয়ে বললে দীপালি।

হস্তক্ষেপ নয়, পদক্ষেপ।" পরমা সংশোধন করতে চাইল।

"ও একই কথা।" দীপালি বললে।

"মোটেও না। হাত দিয়ে হাত চেপে ধরা আর পা দিয়ে পা মাড়ান এক কথা নয়।" পরমা হাসতে চাইল কিন্তু পারল না ফোটাতে।

তাই বলে দীপালিকে একা দোষ দিয়ে লাভ কী? পরমাও ত এক তুলিতেই রং করা।

"তাই চল, আমরা চলে যাই," সর্পিল দৃষ্টিতে পরমাকে আকর্ষণ করল দীপালি? "ঠিক টাইম ধরে আসা যাবে আবার।" তারপর হাত ঘুরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে: "কোচিং ক্লাসের পিরিয়ড শুরু হতে এখনও আধ ঘণ্টা বাকি।"

"যেতে হলে তুই যা।" একেবারে ছেলেমানুষি ঝগড়াটে সুর বের করল পরমা।

"আপনিই বা কেন সিডিউলের আগে এভেইলেবল হন?" এবার দীপালি লক্ষ্য করল নলিনেশকে: "কেন আগে থাকতে দরজা খোলা রাখেন? কেন বিশ্রামের ব্যাঘাত করতে দেন আমাদেরকে?"

কথা বলার দরকার নেই তবু বলতে হয় কথা। অবস্থাই কথা বলায়। কঠিন বরফের মধ্যে কত বন্যা বাঁধা আছে তা বরফেরও জানা থাকে না।

"না, না, সে কী কথা!" আতিথেয়তায় উদ্বেল হয়ে উঠল নলিনেশ: "মাঝে

মাঝে বিশ্রামের ব্যাঘাতটাই সংগীতের বিশ্রাম। আর দরজা বন্ধ করে রাখি এমন রূঢ় স্পর্ধা যেন না হয়। অবাঞ্ছনীয়কে যদি ঠেকাতে যাই তা হলে যে অভাবনীয়কেও হারাব। অন্তরের জিনিস বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে। তাই যে আসে আসতে দাও, যখন ইচ্ছে তখন। কে সত্যি অমৃতের অবকাশ হয়ে উঠবে কে জানে!"

গ্যাঁট হয়ে বসল দীপালি। সামনে একটা টুল ছিল তার উপর। রাগে সেও যথেষ্ট স্ফীত হয়েছে, টুলটাকে মুছে ফেলেছে এক পোঁচে। বললে, "একজনের যদি অধিকার আছে আর একজনেরও আছে। পরিচ্ছন্ন মাঠ আর অপক্ষপাত। সমান যখন মাইনে তখন সমান সুযোগ। আপনার দিক থেকে বলছি না, আমাদের দিক থেকে। বিশেষত আমরা যখন এক মামলার আসামী।"

মেয়েটা কী বোকা! পরমার সারা শরীর রি-রি করে উঠল। এক টিকিট যখন কেটেছে তখন উঠবে না হয় সবাই এক ক্লাসে, কিন্তু সবাই যেন জানলা পায়! এমন কামরা ভাবো ত যেখানে সকলের জন্যে জানলা। এমন থিয়েটার ভাবো ত যেখানে রঙ্গমঞ্চ থেকে সমান দূরত্ব রেখে বসতে পারে দর্শক। খেতে সবাইকে সমান দিলে কিন্তু খিদে সবাইকে কে সমান দেয়, কে বা দেয় হজম করবার সমান শক্তি। যেন প্রবেশে সমান অধিকার থাকলেই আবেশে থাকবে সমান নৈপুণ্য। যেহেতু সবাই এক পড়া পড়েছে এক মাইনে দিয়ে, সবাই এক সঙ্গে এক ব্র্যাকেটে প্রথম হবে। যেহেতু সবাই সেজেগুজে বসেছে সার বেঁধে সবাইকেই ভাল লাগবে। যেন সকলের মধ্যে থেকেও এমন বিশেষ একজন হতে নেই যে অনুপম যে অদ্বিতীয়। যে একমুঠো বালির মধ্যে থেকেও এক কুচি হীরে।

এমন ছেঁদো কথাও কেউ বলে। এমনি আভাভরা অর্থভরা চোখে তাকাল পরমা।

এখন কী কথা বলে নলিনেশ, কী কথা নিয়ে দুজনের মধ্যে, পরমা ও দীপালির মধ্যে, একটি সমান রেখা বজায় রাখে? কাল অর্চনার বেলায় যা করেছিল তাই করবে? যুদ্ধের কথা, দুর্ভিক্ষের কথা, গণ-আলোড়নের কথা—এই সব কাগুজে ব্যাপার নিয়েই আলোচনা চালাবে, না কি খুলে ধরবে কবিতার বই, না কি চুপ করে থাকবে?

চুপ করেই থাকি। বইয়ের পাতা ওলটাই। নয়ত পাশের ঘরে গিয়ে গা ঢাকা দিই।

ছি ছি, যে স্তব্ধতা কত মহৎ অর্থ বহন করতে পারে, যে একটি অশ্রুতগম্য সংগীত, তাকে এমন করে অপব্যয় করা উচিত হবে না। তার চেয়ে কথা কই। বরং পরমার মুখে এখন যে একটি অহেতুক বেদনার ছায়া পড়েছে, কথার ফাঁকে-ফাঁকে সেই নম্র ছায়াটি দেখি। এমনি দেখাটা দেখা নয় দেখা যাবেও না, ফাঁকে-ফাঁকে দেখাটাই দেখা। যেন পাতার ফাঁকে-ফাঁকে দেখছি দূরের চন্দ্রোদয়।

সেদিন ক্লাস যখন ভাঙো-ভাঙো, অর্চনা ও-ঘর থেকে একটা মোটা বই নিয়ে এসে বললে, "স্যার, আপনি হাত দেখতে জানেন?"

"হাত দেখতে?" আকাশপড়া আওয়াজ করল নলিনেশ।

"একগাদা বই যে আপনার এ বিষয়ে।" বললে অর্চনা, "কাল দেখেছি ঘেঁটে-ঘেঁটে। সব দাগান, নোট করা। ভাসা ভাসা নয়, তলিয়ে দেখা। দেখুন না, একবার দেখে দিন না হাতটা—"

"দেখুন না, দেখুন না—" চারদিক থেকে হাত বাড়াল মেয়েরা।

"ও সব আমি কিছু জানি না দেখতে।" নলিনেশ সরাসরি কেটে পড়তে চাইল।

"জানেন না? তবে অত পড়াশুনো করেছেন কেন?" অর্চনা নাছোড়বান্দা।

"ও শুধু সময় কাটাবার জন্যে। আর মিলিয়ে মিলিয়ে দেখবার জন্যে আমার হাতেও কিছু আসবে কি না কোনদিন।" নলিনেশ প্রায় দীর্ঘশ্বাস ফেলল: "আছে কি না বিস্মৃততম আশার ধূসরতম ইশারা।"

"দেখুন না আমাদেরও আছে কি না।"

"আমাদেরও আসবে কি না।" হাতগুলি লকলক করতে লাগল।

"তোমাদের ত দুটি মাত্র প্রশ্ন।" একটি হাতও স্পর্শ করল না নলিনেশ।

"দুটি মাত্র?"

"হ্যাঁ, এক প্রশ্ন, পাস করতে পারবে কি না। আর প্রশ্ন, বিয়ে, আই মিন, চাকরি জুটবে কি না। চাকরি, আই মিন, বিনি পয়সার রাজভোজ।"

"বেশ ত, তাই বলে দিন না দয়া করে।"

"সে ত কপাল দেখেই বলা যায়।"

"কপাল দেখে?"

"হ্যাঁ সকলের কপালেই অন্ধকার।" নিজের মুখও অন্ধকার করতে চাইল নলিনেশ: "কারু কপালেই নেই সূর্য-বিন্দু—"

"সে ত সবাই দেখতে পাচ্ছে। এ বলায় বাহাদুরি কী!" অঞ্জলি এগিয়ে এল: "হাত দেখে বলুন।"

"হাতের ধন হাতে রাখ। যার-তার সামনে বের করে ধর না। কখন কে গোপন কথা ফাঁস করে দেবে বিপদে পড়বে। তা ছাড়া" নির্লিপ্ত ভাব করল নলিনেশ: "হাতি নিজের গা দেখে না। যে মহৎ তার ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা-ব্যথা নেই। সে শুধু বর্তমানের কারবারী। বর্তমানেই তার ভবিষ্যতের ভিত। আর, না জানার মধ্যেই ত সুখ। কে প্রাণ ধারণ করত যদি সব জানা হয়ে থাকত। কবে মরব এ যদি নিখুঁত জানতাম আগে থেকে, তবে আর কিছু কাজকর্ম হত না, জীবন শুধু দিন গোনার ভয়ার্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। ঈশ্বরে যে এত মজা তার কারণ তাকে কোনদিন জানা যাবে না বলে। যদি সবাই জেনে ফেলতে পারত ঈশ্বরকে, তাহলে বেচারার হেনস্তার আর অবধি থাকত না। অতি পরিচয়ে সে নিতান্ত খেলো তুচ্ছ যৎসামান্য হয়ে যেত। না জানার মধ্যেই জীবনের নমস্কার—"

"আচ্ছা, আচ্ছা, কিছু জানাতে হবে না আপনাকে।" কর্তৃত্ব করবার সুরে বললে অর্চনা, "আপনি শুধু আমাদের মোটামুটি রেখাগুলি বুঝিয়ে দিন কোনটার কী সংকেত—"

"হ্যাঁ, দিন, দিন—" গোপন কথা ফাঁস হয়ে যেতে পারে বলায় হাতগুলি সংবৃত হয়েছিল, আবার সেগুলি দুলে দুলে উঠল: "মোটামুটি জানতে পারলেও বেশ চাল মারা যাবে। বেআন্দাজী ঢিলও দু-একটা লেগে যাবে তাক বুঝে।"

"অন্তত কোনটা হেড-লাইন লাইফ-লাইন লাভ-লাইন—"

এটুকু আবদার না হয় মেটান যায়। ভাসা ভাসা দুটো আপাতসুন্দর কথা।

আচমকা একটা হাত টেনে নিল নলিনেশ, নমুনাটা স্পষ্ট করবার জন্যে প্রসারিত করে ধরল। বললে, "এই দেখ, এইটে হচ্ছে হেড লাইন, আর এটা লাইফ লাইন—"

"স্যার, লাভ-লাইনটা কোথায়?" সব মাথা যেন এক সঙ্গে ঝুঁকে পড়ল।

সহসা নলিনেশের হাতের মধ্যে নমুনার হাতটা থরথর করে উঠল। তখনই বলেছি হাত কখনও দেখাতে নেই, কখন কোন্ রেখায় কোন্ প্রচ্ছন্নের ঘুম ভাঙে বলা যায় না। তাই বলে অত ভয় পাবারই বা কী হয়েছে? বিস্তৃত হাত সঙ্কুচিত হয়ে যাবার মতন এমন কী অঘটন! যতই হাতটা মেলে-মেলে দিচ্ছে নলিনেশ ততই তা বুজে বুজে যাচ্ছে। ডগালে লতার কচি আগার মত কাঁপছে আঙুলের মাথা। যেন কী লুকোতে চাচ্ছে প্রাণপণে! কঠিন শিলালিপি হয়ে আর নেই, শিশিরমাখা পদ্মপাতা হয়ে গিয়েছে। যেন নলিনেশের হাতের মধ্যেই আশ্রয় খুঁজছে।

অজান্তে এ কার হাত তুলে নিয়েছে নলিনেশ!

হাত ছেড়ে দিল তক্ষুনি। বললে,

'ল্যাভের কি কখনও লাইন হয়? ও কি কখনও রেখা ধরে চলে? ওর হয় হুইর্ল, ঘূর্ণি।"

"আছে, আছে ও হাতে?" সকলে আবার উত্তেজিত হল।

"সেটা এত সূক্ষ্ম যে সাদা চোখে দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ লাগে।" কথার পিঠে আবার বলতে হল নলিনেশকে।

মেয়েগুলো তবুও চঞ্চল হয়ে রয়েছে. পরমাকে পারে যদি আরও একটু কোণে ফেলতে। তাই তাদের নিরস্ত করবার জন্যে নলিনেশ বললে, "কখনও কখনও কারু কারু হাতে এত মোটা করে বোঝানো থাকে যে ম্যাগনিফাইং গ্লাসও লাগে না। দেখি তোমার হাত। দেখি—"

যার দিকেই হাত বাড়ায় সেই ভয় পেয়ে গুটিয়ে যায়। ওরে বাবা, পালাই। ইনি বলেন, শুধু রেখা নয় একেবারে ঘূর্ণাবর্ত। শেষকালে দ'কে পড়ে প্রাণ যাক আর কি!

সবাই বেরিয়ে গেল, কিন্তু পরমার ওঠবার নাম নেই।

"কীরে যাবিনে পরী?" রাস্তা থেকে ডাক দিল অর্চনা।

পরমা স্পষ্ট পাথরের গলায় বলতে পারল, "না, আমার একটু দেরি হবে।"

হট্টগোলে সবাই বোধ হয় শোনেনি পরমাকে। অঞ্জলি অর্চনাকে ঠেলা মেরে বললে, "কীরে, চল্—"

"দাঁড়া, পরমা আসুক।" অর্চনা বললে।

এবার অঞ্জলি হাঁক পাড়ল।

দিব্যি নিটোল গলায় বললে পরমা, "আমার কাজ আছে। তোরা যা, আমি পরে যাব।"

"বুঝলি না, ও এখন অণুবীক্ষণ লাগাবে।" বললে যূথিকা।

ঘরের মধ্যে নলিনেশ হঠাৎ ত্রস্তব্যস্ত হয়ে উঠল। হাফশার্টটা পরতে পরতে ও টেবিলের তলায় পা দিয়ে জুতো দুটোকে টানতে টানতে নিজের মনে বলে উঠল, "আমাকে এখুনি একবার ইস্টিশনে যেতে হবে। বিকেলের ট্রেনটার আসবার সময় হয়ে গিয়েছে? এই, এই রিকশা। এখন বেরুলে ধরতে পারব? ওরে ও চয়ন সিং—" চাকরকে ডাকতে লাগল: "দরজাটা বন্ধ কর—"

"পালাচ্ছেন?" জিজ্ঞেস করল পরমা।

"না, হঠাৎ এক বন্ধুর আসবার কথা! যদি ইস্টিশানে দেখতে না পায় মহা কেলেংকারি হয়ে যাবে।" ত্রস্তব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ল নলিনেশ। রিকশায় চাপল। পিছনের পর্দা সরিয়ে তাকিয়ে দেখল, পরমা ঠিক তার বন্ধুদের সঙ্গ ধরেছে।

শুধু মুখে সাহস নেই বুকেও সাহস আছে। কী সুন্দর মার্জিত মসৃণ গলায় বললে, তোরা যা আমি পরে যাব। তার মানে আমি একলা থাকব একলা হব কিছুক্ষণ। কী দুর্দান্ত বিদ্রোহ! ঠিক ঠিক কী জানি কথাটা! আমার কথা আছে নয়, আমার কাজ আছে। সন্দেহ কি, কথাই একটা প্রকাণ্ড কাজ। কখনও কখনও কাজের •শক্তির চেয়ে কথার শক্তি বেশী জাগ্রত।

ধর না কেন গান্ধীর ছোট্ট এই একটা কথা: কুইট ইণ্ডিয়া। এর মধ্যে কত তেজ, কত দীপ্তি। ন্যায়ের তেজ সত্যের দীপ্তি। সাধ্য কী প্রতিপক্ষ এর কোনও জবাব দিতে পারে। সাধারণ ডাকাতের মত এও বলতে পারে না, দাঁড়াও, বাড়ি আর একটা নিই খাচ্ছে পেতে। সেই মন্ত্র তটুকু সময় দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত নয়। উচ্চারিত হয়েছে কি তুমি উৎখাত হয়ে গিয়েছ।

কী কথা না জানি বলার আজ পরমা! তার উপস্থিতির বাঁশিতে উঠত না জানি আজ কোন সুর! হয়ত কোনও কথাই বলত না, পারত না বলতে। তবু সেই স্তব্ধতাটিই শোনাত সুন্দর মত।

আজও অনেক বাকি করা হয়েছে আকারণে। প্রথমে দীপালির সঙ্গে ঐ সংঘাত, তারপর নিরালির কী প্রবঞ্চনা, এত হাত থাকতে পরমার হাতখানিই তুলে নিল তার হাতে। এবং হস্তরেখার কথা কি না এই হাত থেকেই বের করে ফেলেছে মুদ্রা! আর মুদ্রাকরের এমন প্রমাদ নেই হাতে হাতের মধ্যে পড়ে গেল, মিশে গেল, ভরে গেল কানায় কানায়। হাতের মধ্যে শোনা গেল বুকের ধুকধুক। কোথায় বিজ্ঞানের হাত হবে, তা নয়, কাব্যের হাত হয়ে উঠল। সামান্য রেখায় যা আঁকা থাকার কথা তা ফুটে উঠল সমস্ত অস্তিত্বে।

কে জানে সমস্তই এক বাণ্ডিল মিথ্যে কি না! এক চৌত্ত রংমশাল!

পরদিন ঠিক কাঁটায় কাঁটায় এল পরমা। এক সুতো এদিক-ওদিক নয়। কথায়-বার্তায় একেবারে মাপাজোকা, আঁটসাঁট। একটু কোথাও ঢিল নেই, সারা শরীরে যেন গুমোট করে রয়েছে। বুকের কিনারে শাড়ির পাড় বা কানের কিনারে চুলের গুচ্ছ যে নিপুণ অভ্যাসবশেই শাসন করা উচিত তাতে পর্যন্ত প্রযত্ন নেই। একেবারে নির্ভীক গাম্ভীর্যে রেখারন্ধ্রহীন হয়ে বসে আছে।

এই স্তব্ধ গাম্ভীর্যটুকুই বা কী সুন্দর, কী সুন্দর বা ঠাণ্ডা কাঠিন্য। একবিন্দু শিশির নেই, দুপুরের উঠোনের মত খটখটে। যেন ভাবের লতাপাতা নেই, পরিষ্কার প্রস্ফুট ব্যাখ্যা। কাব্যের কুয়াশা নেই, যেন পদের শব্দার্থ।

কেন তুমি গম্ভীর? কাল কেন আমার বিদ্রোহকে মান দেননি, সকলকে প্রত্যাখ্যান করে একলা হতে চাননি কেন আমাকে নিয়ে? কেন তুমি স্তব্ধ? কাল কেন ভীরুর মত বাড়ি ছেড়ে নিজের এলেকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন? এমন কেউ যায়? আপনার ঘরে কি আগুন লেগেছিল? ঢুকেছিল কালনাগ? তাই দেখুন না, হাত টেবিলের উপর পর্যন্ত রাখিনি, কোলের শীতলে ডুবিয়ে রেখেছি। মন অর এখানে নেই, চলে গেছে মৌনের মহাদেশে।

সেই মহাদেশেই ত বেরিয়েছি ভ্রমণে।

যথাযুক্ত বই নিয়ে বসল নলিনেশ। পড়া শুরু করল।

তবু পরমার চাঞ্চল্য নেই। তার অমনোযোগই যেন আর-একটি কবিতা। মধুরের অঞ্জন যদি একবার চোখে লাগে তখন অনাকাঙ্ক্ষাও মধুময়। অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকাটিও সংযোগ। তখন রাগও সুন্দর বিরাগও সুন্দর। প্রশ্নের চোখও সুন্দর প্রত্যাখ্যানের চোখও সুন্দর।

কতক্ষণ পরে পড়া বন্ধ করে নলিনেশ হঠাৎ হাঁক দিল: "চয়ন সিং!"

চয়ন সিং থালায় করে এক সঙ্গে রসগোল্লা নিয়ে হাজির।

"আজকে আর শুধু বাক্যের মিষ্টি নয় ভোজ্যের মিষ্টি।" বললে নলিনেশ।

"এর মানে? আজ কী ব্যাপার?" মেয়েরা বলে উঠল।

"কোনও উৎসব?" জিজ্ঞেস করল অর্চনা।

"উৎসব ত নিশ্চয়ই। তারজন্যেই উৎসব [illegible] না, [illegible]।"

"আজ বুঝি আপনার জন্মদিন?"

"আমি [illegible] তাই আমার জন্ম?" নলিনেশ [illegible] করল: "যখন বাড়ি ছাড়ব, ওয়ার [illegible] হবে, তখন করব জন্মদিন।"

"তবে উদ্দেশ্য নেই উপকরণ আছে?" অঞ্জলি বললে।

"বলতে পার, এ আমার সমদর্শন-সমানতন্ত্র।" ঘোষণার মত করে বললে নলিনেশ।

হৈ হৈ করে উঠল মেয়েরা। গুনে দেখল প্রত্যেক জনের জন্যে চারখানা করে রসগোল্লা। ওরে বাবা, চারটে করে প্রত্যেকে? তা রসগোল্লা!

"হ্যাঁ, মিষ্টিমুখ বলতে রসগোল্লাই অব্যর্থ। কেননা রসগোল্লাই মুখভরা। কই হাত লাগাও।" তাড়া দিল নলিনেশ।

বেরালের গলায় কে ঘণ্টা দেয়, সব হাত গুটিয়ে রইল। সব একেকটি লজ্জা লটবহর। লাট যদি বন্ধ হয় বতর তাই বিস্তার।

"নে, হাত পাত্।" বলা-কওয়া নেই হঠাৎ পরমা এগিয়ে এল, যেন সেই খাওয়া

এমনি সম্রাজ্ঞীর মত ভাব করে পরিবেশন করতে লাগল। তারপর নলিনেশের দিকে এগিয়ে এসে বললে, "কই পাতুন হাত। ধরুন।"

অকিঞ্চনের মত হাত পাতল নলিনেশ।

চোখের কোণে কালো বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল, ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের রক্তিমা। পরমা বললে, "খুব ত সমদর্শন! নিজেও ত নিলেন বড় হাত পেতে। সুতরাং চব্বিশটে রসগোল্লা সাতজনের মধ্যে দিন সমান ভাগ করে।"

আমি কই নিলুম। তুমি দিলে। আমার জিনিসকে তোমার জিনিস করে ফেললে। এর কি আর ভাগ হয়? তুমি একক, তুমি অখণ্ড।

দেখলি? আর-আর মেয়েরা চোখ-টেপাটেপি করল। দেখলি? কেমন আমাদের মাথার উপর দিয়ে ট্যানজেন্ট মেরে দিলে? আর দেখলি ভাগের কারুকার্য? আমাদের পাঁচজনের প্রত্যেককে চারটে করে গিলিয়ে স্যারকে দিলে দুটো, নিজেও নিলে দুটো। স্যারে-ম্যাডামে সমতুল।

এখন এ নিয়ে আপসোস করার মানে হয় না। তখন ঝাঁপিয়ে পড়লেই পারতে। নিলেই পারতে বিতরণের ভার। তোমার-আমার গরজ শুধু নেবার, দেবার নয়। যারা শুধু নেয় তারাই সমানাধিকার খোঁজে, তার যে দেয়, এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেয়, সে অগ্রণী, তার অধিকারই সর্বাগ্রে।

এখন জল! জল দাও।

গ্লাস মাত্র দুটো। একটা নলিনেশের জন্যে, আর একটা মেয়েদের।

যেন পরমা ছাড়া আর কেউ দিতে পারত না, যেন কেউ আর নেই ধারে কাছে। ভাবখানা এমন যেন যত দায় আর গরজ পরমার নিজের। যেন সবাই তারা পরমার নিমন্ত্রিত।

"দাঁড়া, আগে ওঁকে দিই।" যেন সমস্ত অনুষ্ঠানের বিধায়কই পরমা।

ঘরের কোণে ফুটো নর্দমার কাছে টুলের উপর জলের কুঁজো। কুঁজোটা সামান্য কাত করে একটু জল ঢেলে ডান হাতের আঙুলের ডগা কটি ধুলো পরমা। গ্লাসটা টেনে এনে জল ভরালেই হয়, তা নয়, কুঁজোটা নলিনেশের কাছে এগিয়ে নিয়ে তার হাতে-ধরা শূন্য গ্লাসে উপুড় করে ঢেলে দেবার ভীষণ শখ হল। খানিকটা জল গ্লাস ছাপিয়ে উপচে পড়ুক এই বুঝি অভিলাষ! যখন দিই কলসী কাত করে করে, গ্লাস মেপে মেপে দিই না, একেবারে উপুড় করে দিই, উজাড় করে দিই। এত প্রতীকের ব্যাখ্যা করেন, দৈবাৎ বোঝেন যদি এই নিদর্শন।

ডান হাতে কুঁজোর গলা ধরে নলিনেশের দিকে এগিয়ে গেল পরমা। হাত-বাড়ান গ্লাসে জল ঢেলে দেবে, এমন সময় কী হল, হাতের কুঁজোটা ভেঙে পড়ল মাটিতে।

আর সঙ্গে-সঙ্গেই তীক্ষ্মকণ্ঠে করুণ আর্তনাদ।

কী হল? কী হল? সবাই ঘিরে এল পরমাকে।

পরমা পা চেপে বসে পড়েছে মাটিতে। কাঁপছে থরথর করে। শুধু কাটাছেঁড়া নয়, ডান পায়ের ছোট দুটি আঙুল, তৃতীয় ও চতুর্থ, থেঁতলে গিয়েছে। এত ডাকাবুকো মেয়ে, প্রাণে স্বাস্থ্যে রক্তিম, সে কি না যন্ত্রণায় এলিয়ে পড়ছে।

পায়ে জুতো ছিল না?

না, জল দেবার আগে খুলে নিয়েছে পা থেকে। আর জুতো ত ঐ স্যান্ডেল, থাকলেই বা কী হত? খুরতোলা কুঁজো, হক না কেন পুরনো বা তলা-ক্ষয়া, জলের ভার নিয়ে পড়েছে, লাগতই, বিশেষ যখন আঙুল-সই হয়ে পড়েছে। কিন্তু হাতে করে গলা ধরে তুলতে যাবার কী হয়েছিল? মেয়ে ত নয় ডাকাতের সর্দার। চয়ন সিংকে ডাকলেই ত হত। খাবারের থালা ও এনেছে, জলও ত ওরই দেবার কথা।

এ-সব কথা বলতে হয় বলছে যারা অক্ষম দর্শক। যারা বিরত দর্শক।

কিন্তু পরমা যে বসে থাকতে পারছে না। ঢলা পাতার মত এলিয়ে পড়ছে।

জল, জল নিয়ে এস। জলপটি দাও। পাখা কর মাথায়। বরফ, বরফ পাওয়া যায় না? বরফ কোথায় মফস্বলে?

এখন বালতি বালতি জল আনছে চয়ন সিং। জলপটি দিচ্ছে নলিনেশ। মেয়েদের কেউ কেউ ধরে বসে আছে, কেউ নলিনেশের হাতে ধরা পটির উপর ফোঁটা ফোঁটা জল ঢালছে, কেউ বা পাখা করছে সজোরে। আর পরমা কাঁদছে, কাঁপছে, একছে-বেঁকছে।

আঙুলের হাড় ভেঙে গিয়েছে বোধ হয়। কিংবা তারও চেয়ে বেশি কি না কে জানে। সন্দেহ কী, নিয়ে যেতে হয় হাসপাতালে। ওরে ও চয়ন সিং, একটা রিকশা ডাক।

কান্না ব্যথা পরিবেশটাকে ঠিক ঠিক বুঝতে দিচ্ছে না। শাড়ি শায়ার নীচের দিকের অনেকটা যে ভিজে গিয়েছে, চুলে-আঁচলে নেই যে সেই শিক্ষিত শৃঙ্খলা, এ এখন কে লক্ষ্য করে! এখন শুধু যন্ত্রণা, যন্ত্রণা ছাড়া কিছু নেই। নলিনেশ যে তার বাঁ হাতে পায়ের পাতাটা ধরে বসে আছে এ আর এক যন্ত্রণা।

যন্ত্রণার পরিপ্রেক্ষিতে আর্তনাদও আনন্দ। ব্যথার জায়গায় রূঢ় স্পর্শটিও সুধান্বিত।

পরমাকে মেয়েরা ধরাধরি করে তুলে দিল রিকশায়। অঞ্জলি ধরে বসল পাশ ঘেঁষে।

এ্যাডকো লিমিটেড, কলিকাতা-২৭। সিটি সেলস্ ডিপো : ১৭নং পোলক স্ট্রীট

এরই মধ্যে যেতে যেতে মুখ বাড়িয়ে দেখল পরমা, নলিনেশ পালাল কোথায়? ঝুঁকি নিতে যার ভয়, হৈ-হ্যাঙ্গাম যে সইতে পারে না সে ত উলটো দিকেই মুখ করবে। না, কেটে পড়েনি নলিনেশ, আর-একটা রিকশা নিয়ে চলেছে পিছু পিছু।

কী রকম পাগলের মত হয়ে গিয়েছে ভদ্রলোক। নলিনেশের জন্যে মায়া করছে পরমার। কী অকারণ ব্যস্ত করলাম! এ-সবে একেবারে অভ্যস্ত নয়, ঘরকুনো ভাল মানুষ, তার উপরে কী অকরুণ উৎপাত! কী করবে কোথায় যাবে কাকে ডাকবে কেন ডাকবে কী রকম নোঙরছেঁড়া চেহারা। কোঁচাটা অগোছাল, পাঞ্জাবির বোতামগুলো খোলা, চুলগুলোতে উপর-উপর একবার হাত বুলন পর্যন্ত নেই। কটা নোট আর খুচরো পয়সা বুক-পকেটে তুলে নিয়ে এসেছে খাবলা মেরে, মনিব্যাগে গুছিয়ে আনবারও যেন সময় ছিল না। কিন্তু কী আশ্চর্য, দেখ, এই দুঃসময়ে ফাউন্টেন পেনটা নিয়েছে কী করতে? হায় হায়, কলমই যেন তার বাহন যেমন গণেশের ইঁদুর, নারদের ঢেঁকি। শত্রু আক্রমণ করেছে, পাশাপাশি রিভলভার আর কলম রয়েছে টেবলের উপর, নলিনেশ বুঝি কলমই তুলে নেয়। কলমই যেন তার পয়, তার সাঁজোয়া। একবার এও লক্ষ্য করল পরমা, পায়ের জুতো একজোড়ার কি না, না এক পাটি লপেটা, আর এক পাটি অ্যালবার্ট।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত উদ্ধার ত করে দিল। হৈ চৈ পছন্দ করে না। কিন্তু দরকারের সময় করতেও বা ছাড়ল কই? পায়রার খোপে বকবকম করতেই যে ভালবাসে, দরকার বুঝে সেও বেরিয়ে আসে বাইরে। হাসপাতালের ডাক্তারদের কেমন তাড়া দিল থরথরে গলায়, এখানে যদি ব্যবস্থা না হয় বোঝেন কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে, এবং এক্ষুনি, ট্রেনের দেরি থাকলে মোটরে। বাড়িতে খবর পাঠাল, কোর্টে মণিলালকে, প্রিন্সিপ্যালকে—এলাহি ব্যাপার। সকলে জানলে সকলে বণ্টন করে নিলে পরমার ব্যথাটা যদি কমে, যদি সে তাড়াতাড়ি ভাল হয়।

তারপর ভিড় বাড়লে এক ফাঁকে সটকান দেয়। আমার আর এখানে থেকে কাজ কী! আমি ভিড়ে নই, আমি নিবিড়ে।

পরদিন বইখাতা নিয়ে এসেছে আবার মেয়েরা। যে একটু আগে আসত ও একটু পরে যাবার চেষ্টা করত সেই শুধু আসেনি। যে তীর তূণের থেকে বেরিয়ে এসে আবার তূণে ফিরে যেত না, বিঁধে থাকত। এখন আগে-পিছে শান্তি। অবাধ অনুদ্বেগ।

জিজ্ঞেস করল নলিনেশ, "কেমন আছে তোমাদের বন্ধু?"

"হাসপাতাল থেকে বাড়ি গেছে। বেঁধেছেঁদে দিয়েছে।"

"কী বলছে ডাক্তার?"

"হপ্তাতিনেক শুয়ে থাকতে হবে।"

নির্বিঘ্ন হয়ে পড়াতে বসল নলিনেশ। এবং খুব ভাল পড়াল। তার নিজের ধাতে নিজের আয়ত্তে। মন ও চোখের সম্পূর্ণ বিশ্রামে। কেউ নেই আর নিরন্তর দুশ্চিন্তা হয়ে। হৃৎপিণ্ডের উপর থাবা উঁচিয়ে। এক বৈঠার ডিঙি নৌকোর উপর মেঘ-থমথমে আকাশে ঝড়ের ভ্রূকুটি হয়ে। বর্ষাসবুজ মাঠে শরতের নীলরোদ পড়েছে, চারদিকে আজ কাঁচা সোনার প্রসন্নতা।

পড়ান শেষ করে এক পেয়ালা চা খেয়ে কি না-খেয়ে বেরিয়ে পড়ল নলিনেশ।

এ-অলি যাই ও-গলি না-যাই এমনি অলিগলি ঘুরতে লাগল। কী হবে গিয়ে? ভাল আছে পাকা খবর ত পেয়েই গেছি, তবে কী দরকার তাকে ব্যস্ত করে, তার শাকের আঁটির উপর কাঠের বোঝা হয়ে! কিন্তু না যাওয়াই কি ভদ্রতা? শিষ্টজনের প্রতিধ্বনি? তার বাড়িতে তাকেই জল দিতে গিয়ে জখম হল, একটু সজল সমবেদনা জানিয়ে আসবে না, একটু নিভৃত অনুতাপ? এমন এক কুঁজো রেখেছে যা পুরনোর চেয়েও পুরনো, তলা-ক্ষয়া, জলের ভারেই দুর্বহ—সেই জন্যে একটু লজ্জাও প্রকাশ করে আসবে না? প্রথম ধাক্কা ত অভিভূত হতেই কেটে গেল, কিছু বলতে-কইতে সময় দিল কই? কিন্তু, না, থাক কী দরকার—আবার গলির মোড় ঘুরল নলিনেশ। অন্ধ শাসনের কয়েদখানার মত বাড়ি, হয়ত কোথাও আলোর ফোকর নেই, কড়িকাঠের ফাঁকে কোন ঘুপচিতে হয়ত একটা চড়ুইও এসে বাসা বাঁধেনি, সেই বাড়ির ডোবার জলে ঢিল মেরে লাভ কী? হয়ত তাতে পরমাকেই ঘোলা করা হবে, সেই বাড়ির পরিবেশে কিছুতেই সে নলিনেশকে খাপ খাওয়াতে পারবে না আর পারবে না বলেই তার খোঁড়া পা আরও বেশী হোঁচট খাবে। আহা, যেমন শুয়ে আছে, জলের উপরে একটি স্থির মেঘের ছায়ার মত, তেমনি শুয়ে থাক। কিন্তু বল, যাই বল, সে কি একটু প্রতীক্ষা করে নেই? তার যন্ত্রণার মধ্যে আর-এক যন্ত্রণার? ভিড়ের মধ্যে সেই যে পায়ে হাত রেখেছিল নলিনেশ, ব্যথার মধ্যে আর-এক ব্যথা—তার কি ইচ্ছে নেই এবার সে হাত একটু কপালে এসে রাখুক! কেন, কপালে কেন, পায়েই, যেখানে ব্যথা সেখানেই, কিংবা ব্যথা পেরিয়ে ব্যাণ্ডেজ যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক তার উপরটুকুতে। আবার মোড় ঘুরল নলিনেশ।

সন্ধ্যা হয় হয়, মণিলাল হাজরার বাড়িতে এসে ঢুকল। নীচে বাইরের ঘরে কত-গুলো লোক নিয়ে বসেছে মণিলাল। ঠিক মক্কেল মক্কেল গোবেচারা চেহারা নয়, কারও সঙ্গে কোন নথির পুঁটলি নেই, সব কেমন আলগা লোকের ভিড়, সাপচোখো কান খাড়া রাখা ফিসফিসে গলার শেয়াল-পণ্ডিত। এদেরই বলে তদবিরকার। এরাই জুরির ধরে, দারোগা ধরে, আমলা ধরে। সাক্ষী ভাঙায় পক্ষ ভাঁড়ায় এক দলিল পাচার করে অন্য দলিল সামিল করে। এই সব ধরাধরির এপার-ওপারের সাঁকো যারা, মণিলাল হাজরা তাঁদেরই একজন।

ঘরে এসে ঢুকতেই সন্ত্রস্ত হল দলবল। চেনা নিশ্বাসের মধ্যে অচেনা নিশ্বাসের গন্ধ লাগল বোধ হয়। সামলে সুমলে বসল সবাই মক্কেলের মত মুখ করে।

না, ভদ্রলোক। সন্নেসী সাজা কাম-নেমি নয়, নয় প্লেনড্রেসের টিকটিকি। আরে নলিনেশবাবু না? চিনতে পারলেন মণিলাল। আসুন আসুন বসুন। কাঠের বেঞ্চির এক পাশে বসল নলিনেশ। ছাত্রী কেমন আছে খোঁজ করতে এসেছেন? ভাল আছে, শুয়ে থাকতে হচ্ছে এই যা। সামনে পরীক্ষা, এই যা কণ্টক।

সেনকো সাইকেল উড়ে চলে

আর যেমনই মজবুত,
তেমনই সস্তা
তার উপর সব রকম
রাস্তায় চালান যায়

সেনকো ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ
৫২।২ ষষ্ঠীতলা রোড, কলিকাতা—১১ । ফোন ঃ ৩৫-৩১২৮

"হ্যাঁ, বেশ পড়ছিল—" আড়ষ্টের মত বললে নলিনেশ।

"দেখুন ত কী কপালের গেরো। কত কষ্টে মানুষ করছি বলুন।" পুরনো কথা এক গাদা চিবুতে লাগলেন মণিলাল : "এখন যদি একটা বছর নষ্ট হয় কতগুলো আমার লোকসান।"

"না, নষ্ট হবে কেন?" অন্তঃসার-শূন্যের মত শোনাল।

এক বছর নষ্ট হওয়া মানেই পাত্রানর বাজারে এক বছর পিছিয়ে যাওয়া। পিছিয়ে যাওয়া মানেই লাবণ্যের কারবারে দেউলে হওয়া। অভিভাবক হওয়া কি কম ঝকমারি?

এ সব শুনে কী পুণ্যার্জন হবে! নলিনেশের মনে হল, আর কী, বিবরে ফিরে যাই, ফিরতি-ইঁদুর হই।

তবু আর-একবার চেষ্টা করল • যোগান দিতে। বললে "বাড়িতে, আমার বাড়িতে, কোচিং ক্লাসে, সম্পূর্ণ নিরাপদ জায়গায়, দুর্ঘটনা। আর দুর্ঘটনার হেতু কী? না, সামান্য একটা জলের কুঁজো। ভাল করে দেখতেও পেলুম না কোথায় ঠিক লাগল! কী তুচ্ছ কারণ থেকেই যে প্রকাণ্ড ঘটে যেতে পারে—"

কথার থেকে সারটুকু শুধু সংগ্রহ করলেন মণিলাল : "হ্যাঁ, কোচিং ক্লাস। দেখুন ওতে আবার বাড়তি খরচ। দেউলের উপর আবার সোনার চুড়ো। আর এই হাসপাতালেই কম গেল নাকি বেরিয়ে? জজ সাহেবের কাছে টাকা চাইতে গেলেই বলবে বিল কই, ভাউচার কই, এস্টিমেট কই?"

কিসের টাকা, কিসের বিল, হতভম্বের মুখ করল নলিনেশ।

পরমার বাবা কিছু টাকা, যৎসামান্যই হবে, রেখে গিয়েছিল। যেহেতু পরমা নাবালক, মামা মণিলালই আদালতে অভিভাবক হয়ে সে-টাকার খবরদারি করছে। মানুষ করতে সবই প্রায় বেরিয়ে গিয়েছে, যৎকিঞ্চিৎ গুড়োনি-তলানি থাকলেও থাকতে পারে বা কিন্তু আসল খরচ যে শেষ পারানির খরচ, বিয়ের খরচ, তার ব্যবস্থা এই আমাকেই দেখতে হবে। এই পর্যন্ত কম দেখিনি মশাই। কার আঙিনায় কে বা নাচে। নিজের জ্যাঠা-খুড়ো ছিল সেখানে ঠাঁই হল না, চড়লেন এসে আমার কাঁধে। আমার ভোজনের চাল চর্বণে যাচ্ছে। তবু যদি মানুষ করতে পারি, পার করতে পারি, সমুদ্রে ভেলা বাঁধছি। তায় কি খরচের কামাই আছে? এই দেখুন না, কিছুর মধ্যে কিছু না, পা ভেঙে বসল। এখন ডাক্তারে-হাসপাতালে ওষুধে-ব্যাণ্ডেজে এক জাহাজ অর্থব্যয়।

ছাত্রী কেমন আছে খোঁজ করতে এসেছেন?

হাড় দুখো গজিয়ে ছাড়ল।

যে কথাটা বিঁধছিল নলিনেশকে তার উপরে আঙুল রেখে বললে, "নাবালক কী বলছিলেন, পরমার কি আঠার এখনও হয়নি?"

মণিলাল হাসলেন, "এমনিতে আঠারতেই সাবালক কিন্তু সম্পত্তি চালাবার ব্যাপারে নাবালকত্ব একুশ পর্যন্ত। একুশ হতে এখনও কয়েকমাস দেরি। তার আগে বিয়েটা চুকিয়ে দিতে পারলেই মুক্তিপত্রের সম্পাদন হয় আমার।"

"একটি ভাই আছে না?" কথার পিঠে বলতে হল নলিনেশকে।

"আর বলেন কেন? নিষ্কর্মা চাষার বিশখানা কাস্তে।" মণিলাল বললেন, "তবে সেটা বেটাছেলে, একটা কিছু ছিন্নে-উপায় হবে। মেয়েই ভুষ্টিনাশ। হরিভক্তি উড়িয়ে দেয় মশাই—"

বসে বসে এ-সব বিষয়-আশয়েরই আলোচনা করবে নাকি? যাই তবে উঠি। ফিরি নিজের শ্রীপাটে।

"বাবা, পিসিমা আপনাকে ডাকছেন।" খালি গায়ে হাফপ্যান্টপরা ছেলে এসে বললে।

ভিতরে চলে গেলেন মণিলাল।

তবু কী একটা আশা, মাতৃগত শিশুর

মত বসে রইল নলিনেশ। কাতরোক্তির শক্তি নেই কিন্তু অকাতর স্তব্ধতার শক্তি আছে।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা। বাকি পড়াটা শেষ করে নিতে হয়।" ফিরে এলেন মণিলাল : "হ্যাঁ, এই যে আছেন। পরমার মা বলছিল পরমার বাকী পড়াটার যদি একটা বন্দোবস্ত করে দেন। তা আমি বললুম, কেন হবে না? তিনি যখন আছেন আর মাইনে যখন তাঁকে দেওয়া হচ্ছে—" বলতে বলতে নলিনেশকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে সিঁড়ির কাছে রাজেশ্বরীর সঙ্গে সামিল করে দিলেন।

তাঁর তক্তপোশে ফিরে এসে বসলেন মণিলাল।

ডাকলেন ভোলানাথকে, তদবিরকারদের মধ্যে যে সব চেয়ে বিচক্ষণ। হেন কাজ নেই যা তার অসাধ্য। ভাঙা ঘটে যে জল আনতে পারে, আগুন আনতে পারে কাপড়ে বেঁধে। তেল নেই জল আছে ত, দেখবে তাতেই প্রদীপ জ্বালাব।

"ওহে ভোলানাথ, দুখানা এবার ডাক্তারের সার্টিফিকেট জোগাড় কর আর ডিসপেনসারি থেকে একটা ওষুধ-বিক্রির ক্যাশমেমো। ঠিকমত সিল-টিল দিয়ে অথেনটিকেট করে নিও। এই তক্কে ফের কিছু টাকা তুলি।"

চোখ পিটপিট করে ভোলানাথ সায় দিল। শনির যেমন আনন্দ রন্ধ্রে প্রবেশ করে, ভোলানাথের আনন্দ তদবিরে প্রবেশ করে।

রাজেশ্বরীর সঙ্গে নলিনেশ উপরে, দোতলায়, ছোট একটা ঘরে এসে ঢুকল। এইটিই বুঝি পরমার ঘর। দেয়ালে-বেঁধা তাকে বই থেকে শুরু করে টুকিটাকি প্রসাধনের জিনিস, টেবিলেও বইখাতার স্তূপ আর ওদিকে আলনাতে কাপড়-চোপড়। ঘরে ঢুকে প্রথমটা মনে হল পরমা নেই এখানে, শুধু তার ছোঁয়া ভরা মনের গন্ধটিই ভুরভুর করছে হাওয়ায়। কিন্তু এক পলক পরে দৃষ্টি স্থির হতে পরমা স্পষ্ট হয়ে উঠল। নিচু তক্তপোশে বসে আছে পরমা—পিঠে এক ঢাল চুল। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ডান পা-টি ছড়ান, বাঁ-পাটি উঁচু করে রাখা, হাত দুখানি বাঁ-পাকেই জড়িয়ে আছে আর বাঁ হাঁটুর উপরে চিবুক। চোখে চোখ পড়তেই হেসে উঠল পরমা। হাঁটুর উপর থেকে চিবুকটি তুলল না বলেই হাসিটি কেমন গভীর ও অন্তরঙ্গ মনে হল। নির্বাক মুখখানি যেন শান্তির সুরে কানে কানে কথা বলা।

যে টুলটাতে বসে পরমা পড়ে, রাজেশ্বরী দেখলেন সেটা কোথায় স্থানান্তরিত হয়েছে। আলগা একটা আসন না দিলে ভদ্রলোক বসবেন কোথায়? তাড়াতাড়ি তিনি টুল আনতে ছুটলেন।

গুলি ছোঁড়বার আগেকার মুহূর্ত। এখন কেমন আছে শুধু এইটুকুই ত প্রশ্ন, কিন্তু কী অদম্য আকর্ষণে নলিনেশ একেবারে তক্তপোশের ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। আর সেই প্রশ্নটির সঙ্গে একটি ছোট স্নেহস্পর্শের মিশেল না হলে অর্থ মুক্তি পায় না, তাই মনে হল তাকে একটু ছুঁই। ম্লানচ্ছায়া নির্জন অরণ্যের মত ঐ যে তার চুল, তার উপর হাত রাখি, কিংবা তার ব্যাণ্ডেজের শেষ ও শাড়ির শুরুর মাঝখানে যে একটু ফাঁকা পা আছে সেই নিঃস্ব নগ্ন পায়ের উপর।

"এখন কেমন আছ?" বলে নলিনেশ ঠিক ব্যাণ্ডেজের উপর হাত রাখল।

সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাল্টা জিজ্ঞেস করল পরমা, "কী, পারলেন না পালাতে?"

"আমি বুঝি পালাই?" যে ফুল ফুটল না তারই মধুকণার জন্যে মৌমাছি বুঝি গুনগুন করে উঠল।

"জানলা দিয়ে দূর থেকে দেখলাম আপনি আসছেন।" বসবার ভঙ্গির রদবদল করল না পরমা, শুধু হাঁটুর উপর ডান গালখানি কাত করে রাখল। বললে, "মনে হল আমাদের বাড়িতে আমার কাছেই আসছেন বোধ হয়। কিন্তু অনেকক্ষণ যায়, সাড়াশব্দ আর পাই না। বুঝলাম মামার চৌকাঠেই ঠেকে গেছেন। ব্যূহ প্রবেশের মন্ত্রটি তখন পাঠালাম মায়ের হাতে। বললাম, মা, মাস্টারমশাই এসেছেন, তাঁকে ডাক তাঁর মাস্টারিতে—"

"আমি বুঝি শুধু মাস্টার?"

"তবে কী? শুধু পুরুষ?"

"না, তা কেন?" আমতা-আমতা করতে লাগল নলিনেশ: "শুকনো পুঁথি হতে যাব কেন, কেনই বা শুধু একটা রক্তমাংসের সমাহার? মোট কথা আমি কিছুই নই, আমি অপূর্ণ আমি অযোগ্য।"

মা টুল নিয়ে এলেও থামল না পরমা। বললে, "আপনিই ত বলেছেন বাক্যের সমস্ত অপূর্ণতা সংগীত তার রসে ভরে তোলে। রেখার সমস্ত রিক্ততাই চিত্রের আনন্দে প্রাণ পায়। তেমনি জীবনে এমন কি কিছু নেই যা সমস্ত অযোগ্যতাকেও ঢেকে দেয়, ভরে দেয়, ডুবিয়ে ভাসিয়ে তলিয়ে দেয় অতলে?"

রাজেশ্বরী ভাবলেন কোন পাঠ্য কাব্যের তত্ত্বকথা হচ্ছে হয়ত। টুলের উপর বসলে নলিনেশকে বললেন, "আপনার ক্লাসটা এ ঘরে তুলে আনলে ক্ষতি কী?"

নলিনেশ দ্বিরুক্তি করল না। বেশ ত তাই আনব।

কিন্তু পরমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল : "না, না, এঘরে জায়গা কোথায়? মেয়েরা বসবে কোথায় বইখাতা নিয়ে? আমার ঘরে ক্লাস হলে সমদর্শনই না থাকে কী করে?"

"তা হলে কী হবে?" রাজেশ্বরী চিন্তিত মুখে বললেন।

"কী আর হবে! ও'র ক্লাস থেকে নাম কাটা যাবে।" পরমা তার বাঁ হাঁটুটা ছেড়ে দিল। যেন শিথিল করে দিল সর্বাঙ্গ।

"পরীক্ষার এত কাছে এসে এমনভাবে কাটা পড়লে সাংঘাতিক ক্ষতি হবে।" রাজেশ্বরী ছাড়লেন না কথাটা।

"পা-ই কাটা পড়ল তায় নাম।" আরও ঢলে পড়ল পরমা। বালিশে মাথা রাখল।

"এক কাজ করলে কেমন হয়?" নলিনেশ তার নির্লিপ্ততার সীমানা পেরল।

মা আর মেয়ে তাকিয়ে রইল উৎসুক হয়ে।

"আমার বাড়িতে সরকারী ক্লাসটা সেরে সন্ধের দিকে এখানে আসব না হয়।" পরমার মুখের দিকে তাকাল নলিনেশ : "আবার পড়াব নতুন করে।"

ROYAL COLLEGE

Opp. Sealdah.
NEAR TOWER HOTEL

Full course in		Typing	Shorthand
6 months	..	Rs. 6	Rs. 12
3 months	..	Rs. 10	Rs. 15
1 month	..	Rs. 15	Rs. 20

(Success Assured)

N.B. ALSO WE GIVE TUITION BY POST

Branches : 5, Dharamtolla St.,
16/17, College St., & 108, South Sinthree Rd.,
Dum-Dum.

খুশিতে টলটলে চোখে হাসল পরমা। ক্ষণিকের খেলার আকাশে জ্বলল যেন রামধনু। দুটো খামখেয়ালী মেজাজ, রোদ আর বৃষ্টি, তারই জাদু দিয়ে তৈরি এই হাসি। পরমা নড়ে-চড়ে উঠল। বললে, "আপনার খুব পরিশ্রম হবে।"

নলিনেশ বললে, "কখনও কখনও পরিশ্রমই বিশ্রাম।"

কিন্তু রাজেশ্বরীর বিশ্রাম অন্যত্র। যদি এই বাড়তি পড়ানর জন্যে নলিনেশ আর-একটা পুরো ঘণ্টার টাকা দাবি করে বসে তা হলেই ত কেলেঙ্কার।

বললেন, "মাইনেটা কী হবে?"

গম্ভীর মুখে নলিনেশ বললে, "যা দিচ্ছিল তাই।"

মহা-উৎসাহে রাজেশ্বরী জলখাবার আনতে গেলেন।

নিভৃত হবার ছায়াটি আবার পরমার চোখে পড়ল। বললে, "সবাই টুকরো টুকরো পাবে আর আমি পুরো, আস্ত? এই আপনার সমদর্শন?"

নলিনেশ বলে ফেলল, "এ আমার পরম দর্শন।"

সাহসে বুক বাঁধল পরমা। ভেঙে ভেঙে উঠে বসল। বললে, "কিন্তু যা দিচ্ছিলাম তাই শুধু নেবেন কেন? অতিরিক্তের জন্যে অতিরিক্ত নেবেন না?"

"না। নাল্পে সুখমস্তি এ আমার কথা নয়। আমার অল্পেই সুখ। অল্পই আমার অপরিসীম।"

"আপনি নেবার কথা ভাবছেন কি না, তাই অল্পের কথা ভাবছেন।" পরমা তাকাল কী রকম করে: "কিন্তু যে দেয় সে অল্পের ধার ধারে না, সে শ্রাবণের প্লাবনের মত নিরর্গল হয়ে ওঠে।"

মমতার চোখও এমন মদির হয় কে জানত। কথাও এমন আলোজ্বালান। কী রকম একটা রঙিন ভয় আচ্ছন্ন করল নলিনেশকে। ভাগ্যিস টুলটায় বসে ছিল, তাই পারল বসে থাকতে। ঢোক গিলে বললে, "কিন্তু পাত্র যদি ফুটো হয় ধরি কী করে? যদি মণ্ডপই না থাকে দেবী এসে বসবেন কোথায়?"

"অন্তরে যদি বস্তু থাকে তবে দেবীর মণ্ডপ লাগে না।"

"দেবীরা এ কথা বলেন বটে, কিন্তু তাদের আসল নজর উপকরণে।"

"কোন্‌টা উপকরণ আর কোন্‌টা অপকরণ সে নির্বাচন দেবীর।" সমানে সমানে বলল পরমা।

"পূজারীর কোনও নির্বাচন নেই?"

"কী করে থাকবে? সে শুধু তার পুজো, অন্তরের ভালবাসা নিয়ে বসেছে। সে বসল কেন? কে তাকে বলেছিল বসতে?"

"কে তাকে বলেছিল বসতে!" কথাটা ভারি ভাল লাগল। নলিনেশ সরবে আওড়াল কথাটা।

"এখন দেবী জানেন তিনি আসবেন কিনা। এলেই বা কোথায় দাঁড়াবেন, কোথায় বসবেন, কোথায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবেন।"

ম্লান চোখে হাসল নলিনেশ। বললে, "সে-পূজারীর অপরাধ ত সে শুধু বসেছিল।"

"অপরাধ ঘোরতর। বসেছিল উত্তরাস্য হয়ে। উত্তরের প্রতীক্ষায়।" পরমা নড়ে-চড়ে উঠল যেন অনেকগুলি সোনার বাটিতে রূপোর কাঠির আঘাতে বেজে উঠল জলতরঙ্গ। বললে, "দেবী এসে উত্তর দিলেন। বললেন, তুমি ত শুধু রহস্যের পূজারী নও, তুমি রহস্যের ডুবুরীও। তুমি দুর্গমকে পার হবে, অতলকে অধিগত করবে, তোমার কীর্তি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে আমার শক্তিকে।"

"দেবী ফিরে যাবেন।" নলিনেশ শব্দ করে হেসে উঠল: "দেখবেন এ পক্ষীরাজ ঘোড়া নয়, এ পক্ষাঘাতের ঘোড়া। ঘটে শূন্য, চোটে ভটচাজ্জি। দেবী ফিরে যাবেন। মড়াকাঠ তুলবেন না চড়কে।"

"আপনি জানেন না দেবীকে।" পরমা আবার শুয়ে পড়ল: "দেবী সফলকে খোঁজেন না, সুন্দরকে খোঁজেন।"

"হায় হায়, দেবীর চোখে সফলই যে একমাত্র সুন্দর।" শ্বাস ফেলল নলিনেশ।

রাজেশ্বরী জলখাবার নিয়ে এলেন। সন্ধ্যার ঘোর লেগেছে, সুইচ টেনে আলো জ্বালালেন। হঠাৎ সব যেন ঝলমল করে উঠল। পরমাকে মনে হল সোনার ধারায় অভিষিক্ত স্থির একটি মেঘের টুকরো। না, ওদিকে তাকিয়ে কাজ নেই, স্নেহ করে

খেতে দিয়েছেন তাই খেয়ে যাই সাধ্যমত। অন্তরের চোখ বন্ধ করে তাকাই এখন বাস্তবের চোখে।

"মা, ওঁকে চা দিলে না?" পরমা ব্যস্ততার আভাস আনন্দ স্বরে : "উনি যে খুব চা খেতে ভালবাসেন।"

তুমি আমার সব জান, এমনি একটু পরিহাসের ইচ্ছা হয়েছিল নলিনেশের, কিন্তু কে জানে, উত্তরে আবার কী বলে বসে! হ্যাঁ আনছি বই কি চা, তৈরি হচ্ছে। রাজেশ্বরী আবার ছুটলেন। না, না, দরকার নেই, খাওয়া হয়ে গিয়েছে, এই গ্লাসের জলে হাত ধুচ্ছি আমি। রাজেশ্বরী ফিরলেন না, ভালই করলেন। যাবার আগের মুহূর্তে নলিনেশ আবার একটু একা হল।

কিন্তু কী নলিনেশ করতে পারে? রুমালে হাত মুছতে মুছতে দু পা এগুতে পারে তক্তপোশের দিকে। বলতে পারে বড়জোর, "আমি এবার যাই।"

যাই বলে দ্বিধা করবার দরকার কী ছিল, এতে আবার অনুমতি নেওয়ার কথা কোথায়? আমি এখন চললুম এ বলে সোজা প্রস্থান করাই ত যথাযোগ্য।

পরমা হাত বাড়াল নলিনেশের দিকে। আর তখন তাকে সোনায় ধোয়া রাশীভূত মেঘ মনে হল না, মনে হল কূলে-কূলে ভরা স্বচ্ছ নদী ছলছল টলটল করে উঠেছে। পরমা বললে, "পায়ের পাতা পেতে উঠে দাঁড়াতে পারি এমন আমার সাধ্য নেই। আপনি আমাকে একটু তুলে নিয়ে যাবেন ঐ জানলার কাছে? টুলটার উপর বসিয়ে দেবেন? আমি আপনার যাওয়া দেখব?"

যেন সামনে কাঁটাতারের বেড়া এমনি হঠাৎ থমকে দাঁড়াল নলিনেশ।

জিজ্ঞেস করল, "ডাক্তার কী বলেছে?"

"বলেছে অবিমিশ্র শুয়ে থাকতে।"

"মাস্টার না মান ডাক্তারকে মান।"

তবু কি চলে যাবার সিঁড়ি পাওয়া যায়? রাজেশ্বরী চা নিয়ে এসেছেন। তাড়াতাড়ি প্লেটে করে ঢেলে ফেলে-ছড়িয়ে খেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল নলিনেশ।

রাত্রে অঘুমে-অন্ধকারে মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করল আর যাবে না ওখানে। এমন সস্তায় বিকিয়ে যাবার কোন মানে হয়? পাঁচজনে পঁচিশ টাকা করে দিত, ঘণ্টাখানেকের মত পড়ান, মফস্বলের বাজারে চলে যেত একরকম। কিন্তু এ কেমনতর ছলনা? একশ টাকায় এক-ঘণ্টা পড়িয়ে আর এক ঘণ্টা মাত্র পঁচিশ টাকায়? হিসেবেরও একটা ভদ্রতা আছে সীমা-সহরদ্দ আছে—এ যে একেবারে নষ্ট সর্বস্ব দেউলিয়ার কাণ্ড। পাগল কি গাছে ফলে, আক্কেলেতে পাগল বলে! অন্যান্য প্রফেসররাও বা কী বলবে? নেপথ্যনাট্যে প্রতিবাদ না করুক তাদের বাজার-দর মাটি করবার জন্যে অন্তত বিরুদ্ধতা করবে। দলে থেকে মূলে আঘাত করা সাজে না। নিজের দাঁত দিয়ে নিজের জিভ কাটা।

"পরমার কী হল?" পড়তে এসে মেয়েরা জিজ্ঞেস করলে।

"কী আর হবে? অসুস্থ হলে পড়বে কী করে?" মুখে কঠোর রেখা ফোটাল নলিনেশ।

অসুস্থ! যেন স্বভাবের নিয়মেই অসুখ হয়েছে! যেন বা নিজের হঠকারিতায়ই দুর্ঘটনা। মশাই, আপনাকেই জল দিতে গিয়েছিলাম এবং তা সর্বাগ্রে, নগ্ন পায়ে। আপনার তৃষ্ণায় জল, তাপে ছায়া ও ক্লান্তিতে শুশ্রূষা হতে গিয়েই আমার এ দুর্দশা। আর বলিহারি কার্পণ্য, একটা কুঁজো রেখেছেন, মান্ধাতার থেকে দানসূত্রে পাওয়া, ঘরে না রেখে মিউজিয়মে পাঠালে নাম থাকত। আর এ ত আসলে পায়ে মারা নয় মাথায় মারা। শিরে সর্পাঘাত।

তা ছাড়া কথা দিয়ে এসেছে। শুধু তাকে নয়, তার মাকে। শিক্ষায় দীক্ষায় মানী লোক, কথার খেলাপ করে কী করে? করা উচিত? সত্যের কাছে অর্থ তুচ্ছ। আর সব হিসেব অকর্মণ্য। হয়ত প্রতীক্ষা করে আছে। আজ নিশ্চয়ই চুল ঘনচ্ছায়াচ্ছন্ন অরণ্য হয়ে নেই, আজ বোধ হয় তা বেণীতে সংযত; শাড়িতে শৈথিল্য-বিস্ফার নেই, আজ বোধ হয় তা শাসনে দৃঢ়ীভূত। আজ সে সজ্জন ছাত্রী, প্রতীক্ষায় প্রস্তুত, আজ সে নিশ্চয়ই রূপবর্ণহীন স্তব্ধ মরু। তার আজকের রূপটিই খাঁটি। আজ নিশ্চয়ই আরাম পাবে নলিনেশ। কাল একেবারে অনির্বচনীয়ের বাগ্‌না হয়েছিল। অরূপ সমুদ্রে রূপের ঢেউ হয়ে। আজ সংসারতটে স্বচ্ছ একটি সরোবর।

মামুলী ক্লাসটা তাড়াতাড়ি শেষ করেই রিকশা নিল নলিনেশ। চয়ন সিং খাবার দিতে চেয়েছিল, কী দরকার, ও-বাড়িতেই ত মিলে যাবে বরাদ্দ।

যা ভেবেছিল, পরমা আজ অনেক সতর্ক, অনেক সচেতন। তার ভঙ্গিতে আর সেই লাস্যের আলস্য নেই। সব রেখাগুলি আজ সজাগ, খরস্পষ্ট। আজ প্রথম দর্শনে হাসল না পর্যন্ত। তার দুই পাশে বই-খাতার স্তূপ। সবচেয়ে কঠিন, তক্তপোশের থেকে বেশ খানিক দূরে রাজেশ্বরী চেয়ার-টেবিল পেতেছেন নলিনেশের বসবার জন্যে। টেবিলটা যেন কড়া পাহারার বেড়া। পরিবেশটাই বিমুখ বিস্বাদ। ফুল নেই ফসল নেই শূন্য একটা সাজি এমনি মনে হল নলিনেশের। ইচ্ছে হল সব [illegible] বেষ্টন ডিঙিয়ে গিয়ে ঐ ওর পাশটিতে গিয়ে বসি। মানুষের সেই আদিম প্রার্থনাটি ওর কানে কানে বলি গাঢ়ভাবে: হে পূষণ, হে পরিপূর্ণ, তোমার হিরন্ময় পাত্রের আবরণ-টুকু দূর করে দাও। তোমাকে দেখি। দেখি তুমি যা আমিও তাই, একই রহস্যে আমরা উচ্চারিত, আমরা উজ্জ্বল।

না, টেবিল-চেয়ারই ভাল। মাস্টারের পক্ষে টেবিল-চেয়ারই স্থির আশ্রয়।

পড়াতে শুরু করল নলিনেশ, আর তা বেশ উচ্চকণ্ঠে। মনে কোথাও ভাবান্তর নেই, যেন শুধু বিষয়েই সে নিবিষ্ট, ব্যক্তিতে নয়, এই কথাটাই যেন চাইল ঘোষণা করতে।

জানলার বাইরে সোনার হরিণ এসে দাঁড়িয়েছে বইয়ের ফাঁকে তাকিয়ে এমনি আবার মনে হল। থাক্ থাক্, দাঁড়িয়ে থাক্, দূরে থেকেই তাকে দেখি, সমস্ত চোখের দৃষ্টিটিকে সোনা করে তুলি। সেই ত ধ্যানের চোখে অসীমের দূতীকে দেখা। কী হবে তাকে ধরতে গেলে? হরিণ পাব; সোনা পাব না। মাংসের বাজারে পাব না সেই দৈবত নৈবেদ্য।

গলা নামিয়ে হঠাৎ পরমা বললে, "আপনার স্ত্রীর কথা বলুন।"

নলিনেশের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। পাশ কাটাতে চাইল। বললে, "বলেছি ত আর-একদিন বলব।"

"আবার কবে বলবেন শুধু দিন চলে যাচ্ছে। জানেন, কাল রাতে আপনার স্ত্রীকে স্বপ্ন দেখেছি।"

"বল কী!" নলিনেশ অবাক হবার চেষ্টা করল: "কেমন দেখতে?"

"অপরূপ। আর কী সুন্দর যে সেজেছেন! মাথায় আরমানী খোঁপা, ভুরুতে খয়েরের টিপ, সিঁথেয় ঢালা সিঁদুর। পরনে কস্তাপাড় গরদ, গা বোম্বাই গয়না, উপর কানে পিপুল পাতা থেকে শুরু করে পায়ের দশ আঙুলে চুটকি। কেন এমন দেখলুম! বলুন না তাঁর গল্প। সেদিন বলেছিলেন—"

"কী বলেছিলাম?"

"বলেছিলেন বেঁচেও মরে আছেন। যদি বেঁচেই আছেন, যেমনি থাকুন না কেন, দুজনে থাকবেন না কেন একসঙ্গে?"

হ্যাঁ একটু বলা ভাল, হাতের তাস মুঠোয় চেপে লুকিয়ে রেখে লাভ নেই। পরমার জানা উচিত ভাগ্যের দাবার ছকে কোন্ ঘরে রয়েছে কোন্ উপসর্গ। চাপায় পড়ে বড়ে হয়ত এখন নিশ্চল, কিন্তু ভাগ্য আবার কখন কোন্ চাল এঁচে তাকে টিপে বসে কে জানে! হ্যাঁ, জানিয়ে রাখা ভাল যাতে পরমা চিনতে পারে তার চৌহদ্দি, বুঝতে পারে, তার হাতের আটকেল, খতাতে পারে তার আয়ব্যয় লাভলোকসান। যাতে আকার-আয়তনের সে হদিস পায়, শুনতে পায় বা একটু অব্যক্তের দীর্ঘশ্বাস।

হ্যাঁ, ছোট্ট করে বলি।

ছেলেবেলায়, কলেজে সবে পড়ি, বাবা-মা বিয়ে দিয়েছিলেন—

"ছি ছি করলেন কেন বিয়ে? কেউ করে?" পরমা যেন অভিভাবিকার মত সেই অপরিণত বয়সের ছেলেকে তিরস্কার করে উঠল।

"বাবা-মার খেয়ালী শাসনের ঊর্ধ্বে মাথা তুলতে পারলাম না। ও-পক্ষ বিলেত যাবার খরচটরচ কী দেবে বলেছিল, হিসেবে ভুল হয়ে গেল। তাই নিয়ে দু'পরিবারে বনতি হল না। শুধু তাই নয়, দেখা দিল বিকট শত্রুতা। ফলে মেয়েটা নারকোলের ছিবড়ের মত ছিটকে পড়ল তার বাপের বাড়িতে—"

"তাকে ত্যাগ করলেন বলুন—" পরমার এটা নির্ব্যক্তিক জেরা না ব্যক্তিগত প্রতিবাদ বোঝা গেল না।

নলিনেশ হঠাৎ পড়াতে লাগল উচ্চরোলে। পরমাও অভিনিবেশে তন্ময় হল। এখানে-ওখানে আশেপাশে রাজেশ্বরীর পায়ের শব্দ প্রখর হয়ে উঠেছে।

সে শব্দ অগোচর স্তিমিত হয়ে এলে সন্ধির স্বাক্ষরের মত পরমা উৎসুক চোখ রাখল নলিনেশের মুখের উপর। আগের কথার জের টেনে নলিনেশ বললে, "নার-কোলের ছিবড়েকে ত্যাগ করাই চলে। তার বাবা, দুর্ধর্ষ বাবা গেলেন তা দিয়ে দড়ি বানাতে। মেয়েকে লেখাপড়ায় গুণে-গানে চৌকস করতে, কিন্তু কিছু হল না—মেয়েটা বোকা।"

"বোকা!" মুখের সরসতা মিইয়ে গেল পরমার। এ যেন বিদ্যাবুদ্ধির তুঙ্গশৃঙ্গের মাথায় উঠে সমস্ত মেয়েজাতটাকেই তুচ্ছ করছে নলিনেশ। আর সে জাতের মধ্যে পরমাও অন্তর্ভুক্ত। কে জানে এ হয়ত বা পরমাকে উদ্দেশ করে পরোক্ষ তিরস্কার। যেন পরমাও বোকা।

"বোকা নয় ত কী। তিন বার ম্যাট্রিক দিল তিনবারই ফেল করল। একেই বলে ম্যাট্রিকে হ্যাটট্রিক করা। আর বার কতক চালালেই গঙ্গারামের সহধর্মিণী হতে পারত। একবার কী হল শোন। রাষ্ট্র হয়ে গেল পাস হয়েছে, পাসের লিস্টিতে নাম

উঠেছে নাকি। পরে দেখা গেল, ফট্, পাস করেনি, গাড্ডু। কী ব্যাপার? জানা গেল যাকে লিস্টি দেখে খবর আনতে বলেছিল, তাকে ভুল রোল নম্বর দিয়েছে। বোঝ! যে নিজের রোল নম্বর ভুল করে সে কী নিরেট!"

কী নিষ্ঠুরের মতন বলছে, এক তিল দয়ামায়া নেই। একটা অক্ষম মেয়ের ব্যর্থতায় কেউ এত খুশী হতে পারে পরমা ভাবতে পারত না। মনে মনে যদিও বা হয়, বলবার সময় অন্তত ঢাকাঢুকি দিয়ে বলে। তা হলে পরমাও যদি ফেল করে এমনি নখে-দাঁতে খুশী হবে নলিনেশ, কালো নিশ্বাস ফেলে বিষ ওগরাবে চার দিকে। কিন্তু পরমা কে? পরমা ত শুধু ছাত্রী। কত ছাত্রী ফেল করছে আকছার!

ম্লান মুখে পরমা জিজ্ঞেস করলে, "ত্যাগ করলেও খবরটবর রাখতেন ঠিক?"

"ঠিক রাখতাম না, তবে কানে আসত। তুমি কান পেতে না থাকলেও কানে লোকে খবর তুলে দেয়।"

"তারপর কী হল?"

"ওর বাবা ওকে নার্সিং শিখতে দিল। যে ছেলের লেখাপড়া হয় না, তাকে যেমন কবরেজি পড়তে দেয়।"

"নার্সিংএ কী হল?" পরমার জিজ্ঞাসা বহুদূর।

"ঘষামাজার অবস্থাতেই টোল খেয়ে গেল। কানে এল বেজায় নাকি ঘুমোয়। যে ঘুমোয় সে ত রুগীকেও ঘুম পাড়িয়ে ছাড়বে। সুতরাং সেখানেও হল না।"

কী রকমভাবে বলছে দেখ। পরমাও একটু না হেসে পারল না। বললে, "তারপর?"

"তারপর, তারপর চাদর ধরল।"

"চাদর ধরল?" পরমা ত অবাকঃ "তার মানে?"

তার আগেই রাজেশ্বরীর শুরু হয়েছে আনাগোনা। বউদির সঙ্গে কী নিয়ে কথা কাটাকাটি করছে। সুতরাং নলিনেশ আবার বক্তৃতায় বিস্ফারিত হল। এবং বক্তৃতা যে কত খাঁটি তার প্রমাণে ইংরেজীর তুবড়ি ফোটাল।

আবার শব্দজাল অপসৃত হতেই পরমা প্রশ্ন করলঃ "চাদর কী বলছিলেন? বিছানার চাদর?"

"না। গায়ের চাদর।" নলিনেশ অবিচলিত মুখে বললে, "উনি, এখন ও'কে সম্ভ্রম করে বলতে হয়, উনি চাদর ধরলেন। তার মানে উনি ব্রহ্মচারিণী হলেন।"

"ব্রহ্মচারিণী?" পরমা ভুরু কুঁচকোলঃ "বিয়ের পর আবার ব্রহ্মচারিণী!"

"স্বামী-পরিত্যক্তা যখন তখন ব্রহ্মচারিণী বই কি।" নলিনেশ বইয়ের উপর চোখ রেখে বললে, "স্বামী যদি স্ত্রী ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে পারে স্ত্রীই বা স্বামী ত্যাগ করে ব্রহ্মচারিণী হতে পারবে না কেন? আর ব্রহ্মচারিণী হওয়া মানেই গায়ে চাদর জড়ান। যে মেয়ে ধর্মের পথে পা বাড়ায়, ঢপ-কীর্তন গায় বা আশ্রমমঠে ঢোকে সেই চাদর গায়ে দিয়ে মানী সাজে। চাদরে দর বাড়ায়।"

"কী করবে? আদরিণী যখন হতে পারল না তখন চাদরিনী না সেজে উপায় কী?" পরমা ছোট-ছোট ঢেউ তুলে ভঙ্গিটা বদলাবার চেষ্টা করল। বললে, "কিন্তু কেমন দেখতে আপনার স্ত্রী?"

এক কথায় প্রকাণ্ড এক কালির পোঁচড়া দিল নলিনেশঃ "স্বপ্নে যাই দেখ, আসলে শ্যাওড়াগাছের পেত্নী।"

একটু কি হালকা হল পরমা? নাকি ভূত দেখল?

"তবে জান ত, মেয়েদের রূপ তাদের নিজেদের দাবিতে নয় পুরুষের অনুমতিতে। মেয়েদের রূপ পুরুষের উপচার, পুরুষের আরোপ। তাদের দেহে নয়, পুরুষের স্নেহে। তাই ভালবাসা হলে ছুঁচুন্দরীও সুন্দরী। কথায় বলে পিরীতের পেত্নীও ভাল।"

"তবে তাকে নিয়ে এলেই হয়।" কেমন রং-রং শোনাল পরমাকে। তার বুকের ভিতরটা কি আবার হাঁসফাঁস করে উঠেছে?

"সে-পথ বন্ধ।"

"বন্ধ? কেন? কী হয়েছে?"

"আত্মীয়বন্ধুদের তাগিদে আমি একবার তাকে আনতে গিয়েছিলাম, কিন্তু সে আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। ব্রহ্মতেজ দেখাল বলতে পার। বললে, মাতাজীর আশ্রয় পেয়েছি, আর আমি সংসারে ফিরব না। আমি তবু তখনও সম্পূর্ণ ফিরিনি আমার কর্তব্য থেকে। যা আশ্রমের চেহারা দেখলাম, ভিখিরীর আস্তানার চেয়েও অধম। তখন চাকরিতে এসেছি, মাস মাস তাকে টাকা পাঠাতে লাগলাম। দিব্যি সে-টাকা সে নিল, মনে হল এই সেতু ধরেই হয়ত, লক্ষ্মী আর কোথায়, লক্ষ্মীপেঁচা চলে আসবে। কিন্তু কয়েক মাস পরে মনি-অর্ডার রিফিউজড হয়ে এল—বলে পাঠাল, মরে যাব তাও স্বীকার তবু তোমার টাকা ছোঁব না—"

"তবে কয়েক মাস নিয়েছিলই বা কেন?" সব জিনিসটা পরমার তন্ন-তন্ন করে দেখা চাই।

"বোধহয় প্রথম ক'মাস মাতাজীই হাতিয়েছিলেন। পরে কীভাবে জানাজানি হতেই চাদরিনী এক কলমে এক খোঁচা কালিতে, ক্রুদ্ধ লাল কালিতে, নাকচ করে দিলেন। সেই থেকে চরম ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।"

এবার গৃহাগত ছেলেদের গোলমাল শুরু হয়েছে বাড়িতে। এ কোলাহলে বিবাদ নেই। তাই ভ্রূক্ষেপ না করে পরমা জিজ্ঞেস করলে, "হিন্দু বিয়ের কি বিচ্ছেদ হয়?"
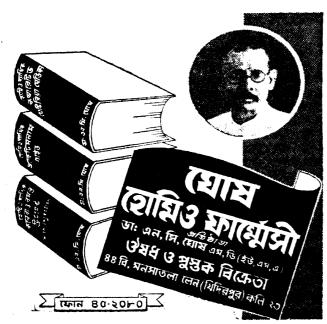
"হয় না শুনেছি। কিন্তু আইন করলেই হয়। ঝাঁকে ঝাঁকে হয়।" নলিনেশ আবার বইয়ের মধ্যে চোখ ডোবাল: "কিন্তু বিচ্ছেদ ত শুধু বাইরে নয়, বিচ্ছেদ একেবারে মূলে, গভীরে। তাকে আমার পছন্দই হয়নি—স্থূলে-অস্থূলে কোন দিক থেকেই নয়—"

"কিন্তু আপনার প্রতিই বা কেন তার এই বিতৃষ্ণা? কী স্পর্ধায় টাকাটা পেরেছিল সেদিন প্রত্যাখ্যান করতে?"

"বললাম না, মূঢ়তা। গোড়ায় অবিশ্যি মায়ের পীড়ন, সংসারের লাঞ্ছনা, আমার অবজ্ঞা ও অসহযোগও ছিল। কিন্তু যাই বল, সব মিলে অমোঘ আশীর্বাদ!"

"আশীর্বাদ!"

"হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যের বোঝা নেমে গেছে ঘাড়ের থেকে।"

"কিন্তু যদি আবার একদিন আসে?" চোখে কালো আতঙ্ক, ঘুরে তাকাল পরমা।

পরমার জন্যে মন করুণায় ভরে গেল কানায় কানায়। নলিনেশ সরল মুখে বললে, "আর আসবে না।"

"যদি আসে? ধরুন যদি দৈবাৎ আসে।" পরমার বুকের মধ্যে এক অদৃশ্য সর্প বারে বারে ছোবল মারছে।

"যদি আসে দেখবে দরজা বন্ধ। হেরে যাবে, ফিরে যাবে, নেমে যাবে।"

"কিন্তু সত্যি করে বলুন আপনি কি তাকে একটুও ভালবাসেননি? বাসেন না?" প্রথম অন্ধকারে যেমন সন্ধ্যাতারা আশায় উজ্জ্বল হয়ে তাকায় তেমনি করে তাকাল পরমা।

আবার তার জন্যে নলিনেশের মায়া হল। বললে, "না, কোন দিন না।"

নলিনেশ চলে গেলে পরমা রাজেশ্বরীকে বললে, "বড্ড গোলমাল হয় মা, পড়া জমতে চায় না।"

"বেশ ত, দরজা ভেজিয়ে দিলেই পারিস।" রাজেশ্বরী বললেন উদারস্বরে। পরে আবার কী ভেবে একটু সংশোধন করলেন: "অন্তত এক পাল্লা—"

সেদিন নলিনেশ এলে রাজেশ্বরী নিজেই দরজা ভেজিয়ে দিলেন বাইরে থেকে। বেশ সাহস করে দুটো পাল্লাই জুড়ে দিলেন মুখে মুখে। মুখের কাছে ফাঁক থাকল একটুখানি। সেইটিই যেন রাজেশ্বরীর সদা-সতর্ক ধূর্ত চোখ। আমি চোখ রাখলে সাধ্য কি কিছু ঘটতে পারে অমাত্রিক?

পড়ার মাঝখানে হঠাৎ পরমা জিজ্ঞেস করে বসল, "আপনার স্ত্রী আপনাকে চিঠি লেখে? লিখেছে কোন দিন?"

পীড়িত মুখে নলিনেশ বললে, "আঃ আর স্ত্রীর কথা নয়, আজ বন্ধুর কথা।"

"বন্ধু?"

"হ্যাঁ বন্ধু, একত্র সংযুক্ত হয়ে দুটি পাখি এক বৃক্ষশাখায় বসে আছে। তারা সুপর্ণ, তাদের সুন্দর ডানা, একটির ডানা সংসারে আর একটির নীলাম্বরে। কিন্তু আশ্চর্য, বসে আছে ঘেঁষাঘেঁষি করে, সযুজ হয়ে, গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে—"

"কী করছে তারা?"

"একটি পাখি স্বাদু পিপ্পল খাচ্ছে—আর একটি রয়েছে অনশনে। একটি ভোক্তা আর একটি সাক্ষী। একটি উন্মুখ আর একটি উদাসীন। এরা একাকী হয়েও পরস্পরে সংযুক্ত, বিচ্ছিন্ন হয়েও পরস্পরে নিষক্ত—আর, পরমা, এরাই সার্থক বন্ধু।"

"বন্ধু? শুধু বন্ধু?"

"হ্যাঁ শুধু বন্ধুতাই আনন্দের। বন্ধুতার জাগরণেই সমস্ত ভালবাসার পরিণাম, বলতে পার, পরিপাক। ভালবাসা নিছক স্বার্থসুখের ভাল লাগাই হয়ে থাকে যদি বন্ধুকে না পায়। বন্ধুকে পাওয়া মানেই সুন্দরকে পাওয়া। আর যা সুন্দর তাইতেই অনন্তের স্পর্শ।"

"আপনার কথাগুলিই শুধু সুন্দর।" হাসির মধ্যে সূক্ষ্ম একটি ব্যঙ্গ লুকিয়ে রেখে বললে পরমা।

বললে, "বন্ধুতা মানে নিদাঘের দিনে আধ গ্লাস জল। আধ গ্লাস জলে আমি বিশ্বাস করি না।" বইয়ে মুখ ঢাকল পরমা।

ঘরের স্তব্ধতা নিটোল একটি মুক্তোর মত ঘন হয়ে উঠল। মনে হল, এই স্তব্ধতা দুটি হৃৎপিণ্ডের শব্দ দিয়ে তৈরী।

রাজেশ্বরী নলিনেশের বিষয় জানলেন সব পরমার জবানিতে। বিনা দোষে যাবজ্জীবন নির্বাসিত, এমনি করুণায় দেখলেন নলিনেশকে। নিজে উপযাচক হয়ে আনতে গেল, তবু স্ত্রী এল না। টাকা পাঠালেও প্রত্যাখ্যান করল, একেই বলে দুরাচার। দর্প যখন ভেঙে যাবে, তখন যেন একবার দেখতে পাই চেহারা। ধর্ম স্বামীর সংসারে নয়, স্বামীজীদের সংস্রবে এর চেয়ে বড় অ-নীতি আর কী হতে পারে? যে ধর্ম লোকালয়কে দেবালয় করতে জানে না, তার আবার কিসের দাম, কিসের দাবি? সারা জীবন কেমন নিষ্পত্র তপস্বীর মতন কাটাবে—সমস্ত পথে যে পাথেয়, আর সমস্ত রোগে যে ওষুধ, সেই স্ত্রীই ওর নেই, থেকেও নেই। রাজেশ্বরীর মায়া পড়ল। নিজের হাতে খাবার তৈরী করে খাওয়াতে লাগলেন।

সেদিন নীলাম্বরী শাড়ি পরেছিল পরমা। হঠাৎ দেখে নলিনেশের মনে হয়েছিল, এ যেন শরীর নয়, অন্ধকারের ঝরনা। স্নিগ্ধ বাহুর উপরে কালো ব্লাউজের লাল পাড়টি যেন বিদ্যুতের সঙ্কেত।

পড়ার মধ্যে মগ্ন হয়ে ছিল, হঠাৎ তাকিয়ে দেখল, দরজা ভেজান আছে কিনা। আছে। শুয়ে শুয়েই একটু এগিয়ে আসবার চেষ্টা করল পরমা। বললে, "আজ আপনাকে একটি কথা বলব।"

ভয়ের কথা এমনি মনে হল নলিনেশের। দৃষ্টিকে নিরাসক্ত করে তাকাল মুখের দিকে। বললে, "কী কথা?"

বলতে কি পারে? বসনে-বেষ্টনে, আড়ালে-আবডালে জড়িয়ে রয়েছে সে না-বলা কথার সুগন্ধ। ছড়িয়ে পড়ছে খণ্ডে-পর্ণে বিরলে বাহুল্যে ঝিলিকে-ঝিকিমিকিতে।

"বল না কী কথা?" শুনবে বলে ভয়, অথচ শোনার জন্যে ছুঁচের মত আগ্রহ।

"বলতে লজ্জা করছে।" শুধু চোখ দুটি বাইরে রেখে বইয়ে মুখ ঢাকল পরমা।

"যদি লজ্জা পাও, তাহলে বল না।" নির্লোভ মুখে বললে নলিনেশ।

"অন্যায়ের লজ্জা নয়, আনন্দের লজ্জা।" বইটা আস্তে আস্তে মুখ থেকে সরাতে লাগল পরমা।

কেন কান ফিরিয়ে নিই, শুনি না কী এমন কথা আছে পৃথিবীতে। সাধারণ আটপৌরে চলতি মানুষের কথার মধ্যে কী আছে এমন কল্পলোকের অমৃত! কী এমন ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা!

"বল।" শুধু শ্রোতার কান নয় রসিকের হৃদয়টাও উন্মুক্ত করে রাখল নলিনেশ।

"আপনাকে আমার খুব—" পরমা বইয়ে আবার আনেত্র মুখ ঢাকল।

"ভাল লাগে?"

"দূর! এ কি একটা বলবার মত কথা?" আকুল চোখে হেসে উঠল পরমা।

"তবে?"

"আপনাকে আমার খুব তুমি বলতে ইচ্ছে করে।" কালো নিঝুম চোখে তাকিয়ে রইল পরমা।

একবিন্দু কথা, কিন্তু উচ্ছল ঢেউয়ের মত ভেঙে পড়ল বুকের উপর। হৃদয়ের চোরকোঠায় কে যেন হাতুড়ির ঘা মারল।

নির্জীব কণ্ঠে নলিনেশ বললে, "পারবে না বলতে।"

"পারব না?"

"না, মুখে আটকে যাবে। চিঠিতে হলে বরং পারতে। কথায় অসম্ভব!"

"কেন অসম্ভব?"

"আমি তোমার চেয়ে কত বড় বয়সে!"

"কী আপনার বুদ্ধি!" পরমা পরিহাসের লঘিমা আনল ভঙ্গিতেঃ "ভালবাসা, থুড়ি, বন্ধুতায় বুঝি বয়স আছে? চার পাপড়ির ছোট্ট একটু জুঁই ফুলের সঙ্গে সপ্তাশ্ববাহন সূর্যের বন্ধুতা! এমন প্রচণ্ড-প্রতাপ যে ভগবান, তাকেও অধমাধম ভক্ত 'তুমি' বলে সম্বোধন করে। আর আপনি এমন কী বড়, এমন কী মোগল-পাঠান এসেছেন যে, সব সময়ে কুর্নিশ করতে হবে?"

"কই, এতক্ষণেও ত পারলে না। একটা—"

"একবারেই কি পারা যায়?" অসহায়ের মত হাসল পরমা। "আস্তে আস্তে কষ্ট করে অভ্যাসটা অর্জন করতে হয়।"

"তোমার এই কষ্টার্জিত অভ্যাসে প্রয়োজন নেই।" উঠে পড়ল নলিনেশ।

"আপনিও ত আমাকে কষ্টার্জিত অভ্যাসে শুধু দূর দূর করছেন।" ব্যথাভরা বিশাল চোখে তাকিয়ে রইল পরমা।

"হ্যাঁ, একটু দূরত্ব বজায় রাখাই সমীচীন, সম্ভ্রান্ত। আজ আমার একটু কাজ আছে, আমি চললাম।" নলিনেশ তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল।

পরদিন বৈকালিক ক্লাসে অর্চনা অনুপস্থিত। দীপালির হাতে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছে। চিঠিটা একটা দুঃসহ দংশন।

লিখেছেঃ জ্বর হয়েছে, যেতে পারছি না, বিছানায় শুয়ে আছি। সুতরাং নিজের স্থাপিত নজির অনুসরণ করে দয়া করে সন্ধ্যায় আমার বাড়ি আসবেন ও আমাকে পড়িয়ে যাবেন। এক সূর্যেই আমাদের ধান শুকনো।

কী সব শত্রু চারদিকে পুষেছি দেখ! গৃহীর শত্রু চোর আর চোরের শত্রু চৌকিদার। দয়ার শত্রু ক্রোধ, সুখের শত্রু ঈর্ষা। মেয়েগুলোর দয়া ত নেই-ই বরং উল্টে এক একটি বিষের পুঁটলি। তারপরে আবার কুলোপানা চক্র।

নলিনেশ ঝঙ্কার দিয়ে উঠলঃ "তোমাদের অসুখ করুক, আর আমি তোমাদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে পাঠশালা খুলি।"

অঞ্জলি বললে, "কেন খুলবেন না? আমরা কি বানভাসা?"

কে যে কী তা নলিনেশ কী জানে! সে শুধু এইটুকু জানে এ দোকানদারি বন্ধ করে দিতে হবে। কোচিং ক্লাস করে বাড়তি আয়ে আর দরকার নেই।

না, নেই। অরণ্য-গভীরেই বাস করি এখন থেকে। বৃক্ষের নিশ্বাসে শুনি শুধু তার পায়ের শব্দ। যে আসে-আসে অথচ আসে না কোনদিন। দূর হতে তাই শুধু তার বসনের সুবাস। আর তার সে-শাড়ি দ্রৌপদীর শাড়ি।

সন্ধ্যা হতেই পাটভাঙা জামা কাপড় পরল নলিনেশ। আয়নায় দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াল। এ কী, সে চলেছে কোথায়! না, তাকে চূড়ান্ত কথাটা বলে দিয়ে আসি। আর ভাগ্য যদি আজ দয়া করে, শুনে আসি তার গহ্বরগহন আত্মার গভীরতম স্বর, নির্মল নিষ্কল নির্ভয় সম্বোধন।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হচ্ছে। দূরের মর্মর তা হলে এখনও বন্ধ হয়ে যায়নি। মা এত মুক্তহস্ত হতে পেরেছেন অথচ নলিনেশের বসবার টেবিল চেয়ার তক্তপোশ থেকে রেখেছেন অস্বাভাবিক দূরে। আর নলিনেশও এমন কড়ায় ক্রান্তিতে কঠোর, আসবাব দুটোর এক ইঞ্চি স্থানচ্যুতি ঘটায় না। আজ পরমার ইচ্ছা হল ওদুটোকে কাছে টেনে নিয়ে আসে।

ছোট ঘর, দরজার থেকে বেশী দূরে নয় ব্যাপারটা। আর সিঁড়ি দিয়ে উঠে দু পা। গিয়েই দরজা।

পা এখনও সবল সক্ষম হয়নি আর তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে পরমা টলে পড়তে চাইল। ছোট দুটো হালকা টেবিল-চেয়ার, তারা যেন দুটো সামান্য কাঠের অনড় বস্তু নয়, তারা যেন দৈত্যাকায় শত্রু, সবলে ঠেলে বাধা দিতে চাইল। কোথাও কিছু ধরবার নেই আঁকড়াবার নেই। মাথা ঘুরে মেঝের উপর পড়ে যাচ্ছিল পরমা, নলিনেশ ছুটে এসে দু বাহুর মধ্যে তাকে কুড়িয়ে নিল। এ যেন শুধু বাইরে থেকে সাহায্য করা নয়, ভিতরে নিয়ে এসে আশ্রয় দেওয়া। খঞ্জের কাছে এ শুধু লাঠি নয়, একটা অনাথ লতার কাছে অনেক ডালপালা মেলা বলবান গাছ।

যেটুকু ধরবার কথা এ কি তারও চেয়ে বেশী? যতক্ষণ ধরবার কথা এ কি তারও চেয়ে অনেক? একটু রুদ্ধ নিশ্বাসের ভগ্নাংশ সময়ের বেশি হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু পরমা তার মুখের উপর পেল একটা পুরো নিশ্বাসের স্পর্শ। আর ঘনপুঞ্জ স্তব্ধতার মধ্যে শুনল সেই অব্যক্ত সম্বোধন যা সে সেদিন শত চেষ্টা করেও পারেনি মুখে আনতে।

দু হাতে আস্তে আস্তে পরমাকে শুইয়ে দিল বিছানায়।

তারপর যথাস্থিত দূর চেয়ারে বসে নলিনেশ বললে, "হঠাৎ একটা জরুরী চিঠি পেয়েছি, আজ রাত্রেই আমাকে কলকাতা যেতে হবে। পড়ান বন্ধ থাকবে আপাতত। সেই খবরটাই তোমাকে দিতে এসেছিলাম। বসবার সময় নেই।"

উঠে চলে গেল নলিনেশ। নীচে রাজেশ্বরীর সঙ্গে দেখা হলে তাঁকেও সেই

ঘরে বসিয়া সব কিছুই ভিঃ পিঃতে খরিদ করুন—

১২৫৲ টাকা হইতে রেমিংটন টাইপরাইটার, ব্যাটারী সেট রেডিও, সাইকেল, গ্রামোফোন, হারমোনিয়ম ও সকল রকম বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি

ইণ্ডিয়া টাইপরাইটার এজেন্সি

১২নং পাঁচু খানসামা লেন, শিয়ালদহ, কলিকাতা-৯

কথা বললে। মণিলালের সঙ্গে দেখা হলে মণিলালকেও।

আর একা ঘরে শুয়ে শুয়ে পরমা কাঁদতে লাগল। কাঁদতে লাগল। কাঁদতে যে এত ভাল লাগে এই প্রথম জানল জীবনে।

চিরকাল শুনে এসেছে কান্না দুঃখের। দুঃখের মধ্যে ঐ কান্নাটাই ত মুক্তি। আর মুক্তি কখনও দুঃখের হয়?

আকাঙ্ক্ষার স্পর্শে দাহ আর উন্মাদনা এই মনে মনে জানত পরমা। কিন্তু জীবনে এই প্রথম দেখল আকাঙ্ক্ষার স্পর্শও কত শীতল কত অমল কত সাহস্য হতে পারে। এ আকাঙ্ক্ষা যেন পরমাকে অতিক্রম করে আর কোন পরমের দিকে আকাঙ্ক্ষা।

পরদিন যথাসময়ে মেয়েরা এসে দেখল কোচিং ক্লাসের দরজা বন্ধ। চয়ন সিং খুলে দিল দরজা। বললে, "কাল রাত থেকে বাবুর খুব অসুখ—"

সাহস করে ঢুকল মেয়েরা। দেখল চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে নলিনেশ। দাড়ি কামায়নি, চুল উসকোখুসকো, রুক্ষ উপবাসী চেহারা। অর্চনা জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে।"

"জ্বর। গায়ে হাতে পায়ে ব্যথা।" চোখ রীতিমত করুণ করল নলিনেশ।

যেরকম সাহস আজকাল মেয়েদের, কপালে হাত দেবে নাকি?

নলিনেশ বললে, "যেরকম দুর্দান্ত ব্যথা, মনে হয় মায়ের দয়া হবে।"

যা ভেবেছিল তাই, মেয়েগুলি গুটি গুটি পালাল ঘর ছেড়ে! কিন্তু কে জানে এসব চালাকি কিনা! হয়ত দিব্যি সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে যাবেন তাঁর প্রধানার বাড়ি, দাড়ি কামিয়ে, মুখে পাউডার ঘসে। রাজকীয় সমারোহে।

পরমাদের বাড়ির আনাচে কানাচে উঁকি-ঝুঁকি মেরে নলিনেশের টিকিও খুঁজে পেল না কেউ।

সেই থেকে ব্যবধান। সেই থেকে বিচ্ছেদ।

পাখি দুটি কত কাছাকাছি, কিন্তু আসলে তারা কত দূর, মর্ত আর স্বর্গ, সীমা আর ভূমা। তুমি আমার তাই হয়ে থাক। নিকট হয়েও দূর, দূর হয়েও বুকের মধ্যে। তোমাকে আমি দূরে-অদূরে সীমায়-ভূমায় আস্বাদ করতে চাই। তোমাকে কড়ায়-গণ্ডায় বুকে নিতে চাই না, তোমার মাঝে থাক আমার অনেক হিসাবের গরমিল। তোমাকে চাই না তন্ন তন্ন করে দেখতে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, তোমাকে দেখতে চাই ধ্যানের চোখে, অধ্যাত্মলোকে। তোমাকে ক্ষণকালের জাল ফেলে ধরতে চাই না। তুমি আমার চিরকালের ইন্দ্রজাল। তোমার সঙ্গে আমার একজন্মের নয়, জন্মান্তরের সৌহৃদ্য।

এমনি গেল পরীক্ষার শেষ হবার আগে পর্যন্ত।

তারপর যেদিন পরীক্ষার শেষ হল সেদিন ঘোরতর বর্ষা। সন্ধ্যায় পিচঢালা অন্ধকার, বন্ধ দরজায় শব্দ হল—ঠুক ঠুক। খুলুন, খুলুন, মনে হল বা মানুষের কণ্ঠ। জানলাটা একটু ফাঁক করে তাকিয়ে দেখল, আর কে হতে পারে, পরমা। সঙ্গে ঐ একটা না লোক কিসের?

দরজা খুলে দিল নলিনেশ আর এক-রাশ ঝড়ের মত ঢুকে পড়ল পরমা। ঝড়ের মত বললে, "লোকটাকে শিগগির বিদায় করুন। হ্যাঁ, রিকশওয়ালা। বার আনা ভাড়া। আমার ব্যাগ আনতে মনে নেই। আজ ঝড়। আজ আমার পরীক্ষার শেষ।"

"দিয়ে দিচ্ছি।" থতমত খেয়ে গেল নলিনেশ।

রিকশা বিদায় হতেই পরমা বললে—বলার দরকার ছিল না—"দরজা বন্ধ করে দিন।"

দরজা বন্ধ করে নলিনেশ বললে, "একেবারে ভিজে গেছ।"

"আপাদমস্তক ভিজে গেছি। দেখুন না হাত দিয়ে।"

পরমার মাথার উপরে, চুলে, হাত রাখল নলিনেশ। তারপর তার স্নানচিক্কণ স্নিগ্ধ-শ্রী সিক্ত মুখখানিতে।

"দেখুন না। জলে ভিজে হাত পা আমার কেমন ফর্সা হয়ে গিয়েছে। দাঁড়িয়ে আছেন কী? শিগগির, আপনার একটা ধুতি আর পাঞ্জাবি দিন, আর সম্ভব হলে একটা চাদর। ভয় নেই, আমি ব্রহ্মচারিণী হব না।"

কী সাংঘাতিক মেয়ে! কী অপরূপ মেয়ে।

"দাঁড়িয়ে আছেন কী! আপনার কি ইচ্ছে আমার ডবল নিউমোনিয়া হক।" পরমা তার পায়ের নীচের শাড়ির ঘেরটা হাতে করে টিপে জল বার করতে লাগল। "কাপড়জামা না দিন, পাশের ঘরে বন্ধ হয়ে থাকুন ভদ্রলোকের মত। আমি এঘরে বসে একলা একলা আপন মনে আমার কাপড়-চোপড় শুকিয়ে নিই।"

"সর্বনাশ। রাত শেষ হয়ে যাবে যে।"

"হলে হবে। আপনার যেমন ব্যবস্থা।"

"ব্যবস্থা ভালই।" নলিনেশ আলো না জ্বালা পাশের ঘরের দিকে তাকাল, ঝাপসা গলায় বললে, "এখুনি হাতে সম্মার্জনী নিয়ে আসবেন বেরিয়ে।"

"আসবেন বেরিয়ে!" পরমার সমস্ত মুখ-টুকু ভয়ে একেবারে উড়ে গেল: "এসেছেন?"

"এসেছেন বৈকি। তাঁর ঘরদোর, তিনি আসবেন না?" পাশের ঘরের দিকে শাণিত চোখ ফেলল নলিনেশ!

পরমা কী রকম যেন হয়ে গেল। তার শরীরের নীলাভ মেঘচ্ছায়াটি সরে গেল বিবর্ণ হয়ে। কাঁপা পায়ে ঘুরে গিয়ে বসল চেয়ারে, হতাশায় গা এলিয়ে দিয়ে। বললে, "বেশ ত, ভালই ত, তবে ত শাড়ি ব্লাউজই বাড়তি পাওয়া যাবে। নিন, বলুন আপনার স্ত্রীকে।" তারপরের কথাগুলি শোনাল স্বগতোক্তির মত: "বৃষ্টিতে পথে ভিজে গেলে কেউ কোন আশ্রয়ে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে যায় না? আর যদি সেটা কোন চেনাশোনার বাড়ি হয়, আর সেখানে যদি শুকনো জামা-কাপড় পাওয়া যায়, নেয় না বদলে? ভিজে কাপড়ে বসে থেকে প্লুরিসি করায়?"

তবু নলিনেশের দিক থেকে কোনও চাঞ্চল্য নেই দেখে পরমা নিজেই আবার উঠে পড়ল। পা টিপে টিপে প্রায় গুড়ি মেরে এগুতে লাগল পাশের ঘরের দিকে। দরজা খোলা, ঘর অন্ধকার। ইতি-উতি তাকাল তীক্ষ্ণ চোখে। পরে সোজা হয়ে ঘরে দাঁড়িয়ে বললে নলিনেশকে, "ঘর ত ফাঁকা।"

"কিন্তু ভয় ত ফাঁকা নয়।"

"উঃ, আপনি কী দয়ামায়াশূন্য।" নিজের বুকের মাধ্যখানে হাত রাখল পরমা: "দেখুন, কী ভীষণ কাঁপছে এখানটা।"

নলিনেশ বললে, "কিন্তু কাঁপুনিটা ত একদিন সত্যি হতে পারে।"

"যখন হবার তখন হবে। আর আমি জানি তা হবে না। সে আসবে না। পারবে না আসতে।" এবার চেয়ারের দিকে না গিয়ে বিছানা-তোলা শতরঞ্চি-পাতা তক্ত-পোশের উপর বসে পড়ল পরমা। হাত তুলে গুচ্ছীভূত চুলের বাঁধনটা খুলে নিল ঝুপ করে। সেই এক ঢাল চুল। এক আকাশ বৃষ্টি।

টুপ টুপ করে জল পড়তে লাগল চুলের
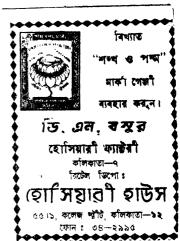
থেকে। জল কি তার চোখের পলকেও।

পরমা বললে, "আপনি আমাকে মিছি-মিছি ভয় দেখাচ্ছেন। আমি জানি এ-বাসা এ-দুর্গ আমার। আমি লক্ষ্মণের মত না ঘুমিয়ে আগলাব আপনার দরজা। দেখি কে ঢোকে।"

"তাতে আমার সুবিধে কী!" কথার পিঠে কথা এসে গেল নলিনেশের: "একে ত ঘুমুবে না, তায় ঘরের মধ্যে না থেকে থাকবে কিনা দোরগোড়ায়। আমার রাতও গেল ভাতও গেল।"

দুজনে চোখোচোখি হতেই হেসে উঠল, একসঙ্গে: "শোন, বৃষ্টিটা এখন একটু ধরেছে—আমি বলি কি—"

"আপনি কী বলবেন আমি জানি। কিন্তু আমি বাড়ি ফিরে যাবার বায়না করে আসিনি।" নড়েচড়ে উঠল পরমা।

"সে কী? এখানে থাকবে?"

"যদি থাকতে দেন ত নয় কেন? আসলে ভিতু ত আমি নই, ভিতু আপনি।"

"তা ভয় ষোল আনা বাদ দিতে পারছি কই? অন্তত লোকের ভয়, লোকে কী বলবে?"

"লোকে বলতে আর কিছু বাকি রাখছে! লোক না পোক! লোকের কথা শুনব না সত্যের কথা শুনব?" মাথা নোয়াল পরমা। নুয়ে-পড়া মাথার থেকে এলোচুল ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে।

"কী সত্য সব সময়ে এক নজরে চেনা যায় না। অপেক্ষা করতে হয়।" নলিনেশ কয়েক পা হাঁটল, ধরি-ধরি করেও ধরল না চুলের গোছা। বললে, "কখনও কখনও সত্যের ছদ্মবেশ পরেই ভুল দেখা দেয়, পরমা।"

"দিক।" পরমা উঠে দাঁড়াল: "ভুলই আমার ভাল। ভুলই আমার সুন্দর।"

পৃথিবীখ্যাত

পেয়ারার জেলী

শ্রীকিষণ দত্ত এন্ড কোং

১২৮, মিডল রোড, কলিঃ—১৪

কৃশরেখা নদীর পারে নীল নিবিড় বন-চ্ছায়া দেখছে নলিনেশ। ঐখানেই যেন চিরদিনের অগম্য অলকা। সেই বনের পথে হারিয়ে যাওয়ার জন্যেই যেন জীবনের ডাক। নিশ্বাসে আজও যার ঘ্রাণ নেওয়া হয়নি, সেই বনপথের শেষেই ফুটেছে সেই অনাঘ্রাত ফুল।

"আপনি অপেক্ষা করুন। আমি করতে রাজী নই। ঝড়ের মত তাই ছুটে এসেছি।" অন্ধকারের শিখার মত জ্বলতে লাগল পরমা।

"ঝড়ের মত আবার চলে যাবে বলে।"

"হ্যাঁ, যাব, কিন্তু আপনাকেও নিয়ে যাব সঙ্গে করে। আপনাকে আপনার এই প্রৌঢ় বয়সের নিশ্চিন্ত ঘেরের মধ্যে থাকতে দেব না।" পরমা এগুল দরজার দিকে: "কই, আপনার চয়ন সিংকে ডাকুন, একটা রিকশা নিয়ে আসুক।"

কত অল্পই পেয়েছি জীবনে এইবার আপসোস হল নলিনেশের। কত অল্পই জেনেছি। কত অল্পই ছুঁয়েছি হাত দিয়ে। অল্পে সুখ নেই এইবারেই সমস্ত প্রাণ শিশুর মত কেঁদে উঠল। যা পাইনি তাই অমূল্য, যা ধরিনি তাই বৃহৎ, যা আস্বাদ করিনি তাই সুধা।

তবু অভ্যাসবশে নলিনেশ বললে, "তবু ঝড়ের মত না এসে রোদের মত আসতে হবে। সব দিক দেখে-শুনে আটঘাট বেঁধে বাধা-বেড়া সরিয়ে-ঝরিয়ে। যাতে হিসেবে না ভুল থাকে।"

পরমা বললে, "কিন্তু ভালবাসা কি হিসেব টোকা, ওজন করা? না, সবঢালা?"

"সবঢালা।" নলিনেশের মুখ থেকে বেরিয়ে এল অজান্তে।

রিকশা এসেছে, বারান্দায় দু পা এগিয়ে দিতে এল নলিনেশ। বৃষ্টিতে মাঠঘাট বাড়িঘর সব কেমন অচেনা লাগছে, কেমন যেন নতুন রঙের অন্ধকার চারদিকে।

নলিনেশ হাত ধরল পরমার, যেমন যাবার আগে একটু ধরে। কিন্তু অসম্ভব একটা কথা বললে। সাধারণ হিসেবে যা অসম্ভব, বর্ষায় তাই সহজ, সুসাধ্য। বর্ষা না হলে ভাবাও যেত না। এমন কথা বলা যায় কখনও!

বললে, "এতক্ষণ কথা বললে, কই, একবারও ত 'তুমি' বললে না।"

হৃদয় যেন গলে গেল। পরমা বললে, "আপনি বলুন।" প্রার্থনার মত মুখখানি উঁচু করল।

"বা আমি ত বলছিই।"

"নতুন করে বলুন, একান্ত করে। এও ত মুখেরই কথা। এত বৃষ্টিতেও আমি সিক্ত হইনি। আমাকে স্নিগ্ধ করুন।" বারিপূর্ণ অধরপুট মেলে ধরল পরমা।

নলিনেশের কী হল? নত হল, দ্রব হল, অজস্র হল। আমি যদি সরস না হই, তবে তোমাকে স্নিগ্ধ করি কী করে?

তারপরে আবার দেখা পরীক্ষার ফল বেরুলে। এবং সেটা প্রাঞ্জল দিনের আলোয়।

"জানেন ত আমি পাস করেছি আর অনার্স নিয়ে। কোন ক্লাস জিজ্ঞেস করবেন না জানি। তবু আদায় করতে যে পেরেছি একটা মান এই আমার যথেষ্ট। এখন আর একটা মান, আমার আসল মান পাই, তা হলেই বাঁচি।"

ছুটির দিনের দুপুরবেলা। যথারীতি শুয়ে শুয়ে পড়ছিল নলিনেশ, ধড়মড় করে উঠে বসল। বললে, "জানতুম তুমি আবার আসবে।"

"আসব না মানে? আপনি আমাকে ছুঁয়ে দেননি? আর জানেন না বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা?"

"জানি।"

"আর এটা কি জানেন আমি আর আপনার ছাত্রী নই?"

"তবে তুমি কী?"

"আমি কর্ত্রী।" রোদের স্পষ্টতায় ঝলমল করছে পরমা। "সুতরাং যা বলছি শোন। তোমার স্ত্রীর জমান চিঠিগুলো বার কর।"

আমার স্ত্রীর আবার চিঠি কোথায়? কোনদিন লিখেছে নাকি যে থাকবে? কেন, টাকার প্রাপ্তি সংবাদও দেয়নি? সে ত মাতাজী নিত। আর যখন শেষ লিখে পাঠাল, চাইনে টাকা? তখনই বা চিঠি কোথায়? তখন ত লালকালিতে পিওনের হাতে 'রিফিউজড' লেখা।

"কী নাম তোমার স্ত্রীর? উঃ, অসম্ভব—"

"কী অসম্ভব?"

"এই 'তুমিটা'।" পরমা লাজুক চোখে হাসল: "আমার আপনিই ভাল। বলুন আপনার স্ত্রীর নাম কী?"

"উমাশশী"।

"উমাশশী?" তীক্ষ্ণ চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল পরমা। বললে, "দেখুন, আমার মনে হচ্ছে আপনার বিয়ে-টিয়ে কিছু হয়নি। শুধু আমাকে একটা ধোঁকা দিচ্ছেন—আপনার স্ত্রী-ফি কিচ্ছু নেই।"

নেই ত নেই। কিন্তু যদি এসে একদিন উদয় হন, তখন যেন বল না, আমাকে কেন ঠকালেন, কেন অপমান করলেন, কেন সব কথা বলেননি আগেভাগে? খুঁতে জানলে, কে আপনাকে প্রশ্রয় দিত? আমার হাতের তাস খুলে দেখানই ভাল। রং নেই ফেরাই নেই শুধু দুরি-তিরি। তখন না বল, জানলে এই তাসওয়ালাকে কে খোঁড় করে।

সংসার ত ভয়ের সংসার, প্রলয়ের সংসার, সেখানে কেউ মাথা পাতে? স্বামীর ভালবাসার নিশ্চয়তা কী! রুক্মিণী ছেড়ে কখন আবার সত্যভামার দিকে হেলবে তার ঠিক আছে?

"তোমাদের যখন এত অমত তখন যাব না ও-পথে।" পরমা সরল মুখে বললে।

অন্নপথ্যের দিনে জ্বরো রুগীর যেমন আহ্লাদ তেমনি অন্তরে-অন্তরে খুশী হলেন রাজেশ্বরী। এত সহজেই মেয়ে বশ মানবে ধারণা করতে পারেননি। অসম্ভবের চেহারাটা বোধ হয় তাঁর কাছে স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমশ। শুধু বিকৃতির নয়, বিপত্তির চেহারা। রাজেশ্বরী মেয়ের রুক্ষ মাথায় তেল ঘষতে বসলেন।

কূজনহীন পাখির মত কটা দিন স্তিমিত হয়ে রইল পরমা। কোথাও গেল না, বেরুল না, দাঁড়ালও না একবার জানলায়। শুয়ে-বসে কাটাল আর মনে মনে শুধু এই দীপটি জেবলে রাখল, ছুটির দরখাস্ত করেছেন আর তা বিয়ে করবেন বলে।

কিছু তবু একটা করেছেন এতদিনে। কিন্তু কার সঙ্গে না জানি বিয়ে।

একটা চিঠি লিখবে লুকিয়ে? কাকে দিয়ে খাম আনাবে, কাকে দিয়ে ফেলবে বাক্সে? যদি ধরা পড়ে যায়! এ-বাড়িতে কেউ তার মিত্র নেই, মলয় পর্যন্ত শাসনের ভয়ে থরহরি। এটা লংকাপুরী। এখানে রাবণের রাজত্ব আর তার বোন শূর্পণখার।

তার প্রথম চিঠির এমনি করে জাত যাবে! দরকার নেই চিঠিতে। তুমি কী করতে আছ? যাকে বিয়ে করবে সে ত বন্দিনী। তার কী করবার! তুমিই ত জারি করবে মুক্তির পরোয়ানা। লালকালির প্রজাপতি ওড়ানো চিঠি।

ছুটি মঞ্জুর হল না, কমিটির শেষ মিটিং থেকে বাড়ি ফিরে এসে ঘোষণা করলেন মণিলাল।

কী ব্যাপার? রাজেশ্বরী এলেন ছুটতে ছুটতে। পরমাও দেয়ালে কান পাতল।

In every walk of Life
Pioneer's Quality Vests
PIONEER BUILDINGS B.T. ROAD, CAL-
PIONEER KNITTING MILLS LTD

কমিটি বললে, কাকে বিয়ে করবে নাম বাতলাও।

নলিনেশ বললে, আমি তা প্রকাশ করতে বাধ্য নই। আমি বিয়ে করছি, আমার ছুটির দরকার, কমিটির কাছে এইটেই প্রশ্ন, কাকে বিয়ে করছি এটা অবান্তর, অবমাননাকর।

কমিটি বললে, কমিটির সন্দেহ হচ্ছে এ-দরখাস্ত খাঁটি নয়। তাই তা নির্ধারণ করবার জন্যে নাম দরকার, ধাম দরকার, যাতে সহজে যাচাই করতে পারে কমিটি। যদি তদন্তে জানা যায় এমন কোন প্রস্তাব আদৌ কোথাও নেই, তা হলে ছুটির দরখাস্ত ভুয়ো সাব্যস্ত করতে দেরি হয় না।

আমার বিয়ে করবার ইচ্ছেটা যদি খাঁটি হয়, তা হলেই যথেষ্ট। বিয়েটা সত্যি ঘটে উঠবে কি না, সেটা জিজ্ঞাস্য নয়। বললে নলিনেশ। এমনও হতে পারে আমি পাত্রী দেখে নেব ছুটির মধ্যে।

কিন্তু দরখাস্তে বলা হয়েছে, বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়ে গিয়েছে, এখন তা সম্পন্ন করবার জন্যেই ছুটি। আমাদের নাম-ধাম দরকার কোথায় সেই সম্পাদনার সম্ভাবনা।

কমিটির একজন মেম্বর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললে, আপনি ত বিবাহিত এবং সেই স্ত্রী এখনও বেঁচে। এই অবস্থায় আবার বিবাহ কিসের?

সে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং যাকে বিয়ে করছি তার। এ নিয়ে কমিটির কিছু মাথা ঘামাবার নেই। এ যুক্তি নলিনেশের।

সেই জন্যেই ত ঠিকানাটা বেশি দরকার এইটেই তদারক করবার জন্য যে সেই ভাবী স্ত্রী জানে কি না ব্যাপারটা। নাকি তার চোখে ধুলো দেওয়া হয়েছে?

আর একজন সভ্য চেঁচিয়ে উঠল: সেই সঙ্গে আগের স্ত্রীর ঠিকানাটাও দরকার। এবং তাঁকেও এটা জানান দরকার, সমাজের দিক থেকে মানবতার দিক থেকে যে, তাঁর পতিদেবতা দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করছেন। হয়ত এতে তাঁর সম্মতি নেই সমর্থন নেই।

এ কি মফস্বলী দুষ্কাণ্ড! আমার ছুটির মধ্যে আমার স্ত্রী, ভাবীই হক ভূতপূর্বই হক, আসে কোত্থেকে? এ-তর্ক কিছুতে ছাড়বে না নলিনেশ।

আসে দরখাস্তের সত্যাসত্য বিচারের প্রসঙ্গে। এবং এ-আসাটা সমীচীন ত বটেই স্বাভাবিকও। এ উত্তর কমিটির। যদি কেউ স্ত্রী অসুস্থ বলে ছুটি চায় এবং যদি কমিটির সন্দেহ হয় তার স্ত্রী নেই, তা হলে কমিটি সেই সন্দেহের নিরাকরণের জন্যে প্রমাণ চাইতে পারে না? একশবার পারে। সুতরাং নামধাম দিতে হবে।

"নামধাম পারব না দিতে।" নলিনেশ দৃঢ়স্বরে বললে।

"তা হলে ছুটি না-মঞ্জুর।" কমিটি এক বাক্যে রায় দিল।

"তা হলে বেশ," কথার পিঠে কথা এসে গেল, বললে নলিনেশ, "আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।"

পরমার বুকটা ছাঁত করে উঠল।

"দিয়েছে? তাই দিক। তাই দিক।" রাজেশ্বরী মনে মনে করতালি দিয়ে উঠলেন: "ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খাক।"

"মৌখিক হলে চলবে না, সরকারীভাবে ইস্তফাপত্র দাখিল করতে হবে। তা এখনও করেনি। করলেই গ্রহণ করবে তা কমিটি। এরকম ঔদ্ধত্য, কমিটির নির্দেশকে মুখোমুখি অবমাননা করার চেষ্টা, এ ক্ষমার অযোগ্য। কমিটি এমন প্রফেসর চায় না যে কপট, দুর্বিনীত, মিথ্যাবলম্বী।"

"তা' হলে চাকরিটা যাবে?" রাজেশ্বরী আনার ফোঁপিয়ে উঠলেন।

"আর কণামাত্র সম্মানবোধ আছে সেই এর পর দিয়ে দেবে ইস্তফা।" বললেন মণিলাল।

"উঃ, ঘরপোড়া তা হলে পালাবে এই দেশ ছেড়ে?"

"না পালায় ত তাড়িয়ে ছাড়ব। কোন ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিতে এসেছেন বুঝবেন এবার বাছাধন।"

চাকরি গেলে খাবে কী? ফ্যাফ্যা করে ঘুরে বেড়াবে। টিউশনিও জুটবে না। না বা নোট লেখা। খুঁটি না থাকলেই ঘর পড়বে। খুঁটি না থাকলেই লড়বে না আর মেড়া। বাঁচা যাবে।

তখন, পরমার ঘরের দিকে ক্রুর চোখে তাকালেন রাজেশ্বরী, তখন সেই চাকরিহারা বাউণ্ডুলে লোকটার বিয়ের বাজারে দাম কী? ফক্কা! চাকরিশূন্য মানুষ না গঙ্গাশূন্য দেশ। সে-দেশে কে বাস করে? না ভজনশূন্য মালা। সে-মালা কে ফেরায়?

একে ঝুনো বয়স তার উপরে বেকার। যেন উজান নায়ে উল্টো বাতাস। এ নৌকোয় যে চড়বে সাধ করে তার নির্ঘাত ভরাডুবি!

কিন্তু কী আশ্চর্য, আর খবর নেই, নলিনেশ চাকরিতে জবাবপত্র দিল কি না। নাকি কিল খেয়ে কিল চুরি করল? ছুটি মঞ্জুর হল না, বিয়ে ছুটে গেল, সর্বসমক্ষে অপদস্থ হল, তত্রাচ আবার করতে গিয়েছে চাকরি? মানুষটা একটা পুরুষ না?

কী করবে না করে!

কী করবে না করে? রক্তের নদীতে তুফান উঠল পরমার। জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাবে খালি পায়ে। এক আকাশ তারার চেয়ে দু মুঠো আথার ছাই তার বেশী হল? একটা আশ্চর্য আরম্ভের চেয়ে বেশী দামী হল তার সেই দিনানুদৈনিক অভ্যেস? এত ভয় কিসের?

আপনি ত বিবাহিত এবং সেই স্ত্রী এখনও বেঁচে

কাকে ভয়? অভাবকে? সংগ্রামকে? দুর্নামকে? একসঙ্গে গড়ব একসঙ্গে লড়ব, না হয় একসঙ্গেই হারব। তাতে কী? তবু ত থাকব আমরা পাশাপাশি। অর্জুন আর চিত্রাঙ্গদা।

সত্যি, কি না জানি হল শেষ পর্যন্ত! মনে-মনে কী রকম যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। হয়ত এখানে আর নেই। হয়ত নিজে-নিজেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সরে পড়েছে একা একা। নইলে ঐ অপমান কি কারু সহ্যের এলেকায়? যদি তাদের না-মঞ্জুরি মেনে নাও ও সেই সঙ্গে যদি ইস্তফা না দাও, তা হলে তার মানে দাঁড়ায়, তুমি কৃতদার হয়েও একটি কুমারী মেয়েকে তার অজ্ঞাতে ও অসম্মতিতে আঘ্রাণ করতে চলেছ! এর চেয়ে বড় কদাচার বড় প্রবঞ্চনা আর কী হতে পারে? তাই লোকে পাছে ভাবে সে অপরাধী, তাই সে সসম্মানে চম্পট দিয়েছে হয়ত।

তার মান শুধু ঐটুকু? নিজের ঐ মুষ্টিমেয় বিবেক!

তবু—তবু সে যাক সব ছেড়ে-ছিঁড়ে। দেখাক তার পৌরুষপ্রতাপ। কিছু একটা সে প্রমাণ করুক।

"ওমা, তুমি কী মনে করে?" কাকে দেখে রাজেশ্বরী উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

"বা, আমার যে আজ বিয়ে। কই, পরমা কই? সে এতক্ষণও কেন যায়নি আমাদের বাড়ি? তাকে ছাড়া কি বিয়ে হয়? আমাকে তবে সাজাবে কে? তাই তাকে বাড়ি বয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। পরমা! পরমা!" সদাজাগা পাখির মত কলধ্বনি করে উঠল সোহিনী।

"কোথায় বিয়ে হচ্ছে?"

"ওমা, সে কি, চিঠি পাননি?"

"চিঠিতে কি সব কথা লেখা থাকে?"

অলিখিত সব কথা বললে সোহিনী। কেমন জাতে-গোত্রে মিল, বয়সের অনুক্রমে, কেমন দাবিদাওয়াশূন্য, তা ছাড়া কেমন কৃতকর্মা, গুণী, কলকাতায় বাড়ি, চাকরি, বয়স আন্দাজে মোটা মাইনে। সব দিক দিয়ে নিখুঁত, মসলিন-মোলায়েম। কিন্তু, পরমা, পরমা কই?

"শরীরটা কদিন থেকে ভাল নেই। উপরে শুয়ে আছে নিজের ঘরে।" বললেন রাজেশ্বরী।

পায়ে যেন রুপোর নূপুর বাজছে এমনি ছুটতে ছুটতে উঠে গেল সোহিনী।

"তোর বিয়ে?" ব্যাকুল হয়ে সোহিনীর প্রসারিত ডান হাত চেপে ধরল পরমা: "আশ্চর্য, ঠিকই শেষ পর্যন্ত হল? কোথাও এতটুকু আঁচড় কাটল না? গায়ে একটু ছড় লাগল না? একটা কাঁটা ফুটল না পায়ে?"

"একেবারে পুষ্পিত পথ।" সোহিনী মগডালে ফোটা বিরল ফুলটির মত হাসল: "একেবারে মাখনের মধ্য দিয়ে ছুরি চালানো।" পরমাকে কেমন হালকা, ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। বাদলার ছায়ায় ঢাকা পড়া দরিদ্র জ্যোৎস্নার মত। তার আঙুলগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সোহিনী বললে, "চলতে চলতে কারু পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়, কারু জুতোর মধ্যে একটি কাঁকর পর্যন্ত ঢোকে না। পথ কিছু নয়, পৌঁছুনই হচ্ছে কথা।"

"পৌঁছুন?" অনেক দূর থেকে যেন শোনাল পরমাকে: "পাওয়াই হচ্ছে কথা। কেউ-কেউ না পৌঁছেও পায়, আবার কেউ-কেউ পৌঁছেও দেখে পাইনি।"

"এ প্রশ্ন চিরকালের।" যেন শোকার্তকে মামুলি কথায় সান্ত্বনা দিচ্ছে এমনি শোনাল সোহিনীকে: "কিন্তু দৈবের দয়ায় এমনও ত হতে পারে পৌঁছুন আর পাওয়া মিলেছে একসঙ্গে, এক সঙ্গমে। যেমন রবীন্দ্রনাথের গান। কথা আর সুর একত্র।"

"নীলুদার খবর কী?"

গভীর রক্তের স্তর থেকে নিগূঢ় আভা সোহিনীর মুখে ছড়িয়ে পড়ল। বললে, "দুর্দান্ত খাটছে। কলাপাতা থেকে গ্যাস লাইট। কোথায় শামিয়ানা কোথায় শতরঞ্চি! যাকে বলে ঘরঝাট থেকে বৈষ্ণববন্দনা। যতই বলি, নীলুদা, তোমার কেন মাথা-ব্যথা, সে বলে, তুমি বিয়ের কনে, ঘাড় গুঁজে বসে থাক, তুমি কিছু বলতে এস না। আমাকে খাটতে দাও—আমি না করব ত করবে কে? আজ আমার রানীর অভিষেক।"

নীলুদার কথা শুরু হলে থামতে চায় না সোহিনী, আজও না, মৃত্যুর মুখে পড়েও না। বাইরের নকশা-কাটা বিস্তীর্ণ পারিপাট্যের নীচে কোথায় কোন ভাঁজে বুনটে একটু ফাট আছে তা কে দেখে!

"নে, ওঠ, যাবিনে?" হাত ধরে টানল পরমার।

"মাকে বল।"

"বা, মাসিমাকে ত বলবই।" এসে পড়েছেন রাজেশ্বরী। "মাসিমা, আপনিও চলুন।"

রাজেশ্বরী দেখছেন হিংসের চোখে আর পরমা তৃপ্তির। রাজেশ্বরী ভাবছেন, কী নিটোল কপাল করেই এসেছিল মেয়েটা, পাষাণে শস্য ফলিয়ে ছাড়ল। আর তাঁর অদৃষ্টে এই অপেয়ে মেয়ে যেন বৈরাগীর বাড়িতে বলিদান। একটা পছন্দ নেই, হায়া নেই, কাকে-ঠোকরান দরকচা-পড়া ফল, তাই দিতে চলেছে দেবতার নৈবেদ্যে। সমূহ বিপদ এখন কেটে গিয়েছে, কিন্তু মাছরাঙার কলঙ্ক যায় না, কখন আবার কোন বেঘোরে নজর পড়ে তার ঠিক কী।

গেলেই খরচ, অন্তত একটা রুপোর সিঁদুরের কৌটো, সহ্য হবে না কিছুতেই। নিজের অনুপস্থিতির ক্ষতিপূরণ বাবদ বললেন, "পরমাই ত যাচ্ছে।"

"তা ত যাচ্ছে। কিন্তু বলুন, সকালেই ওর যাওয়া উচিত ছিল না? সন্ধ্যা হয়ে এল তবু ওর দেখা নেই বলে আমি নিজেই চলে এসেছি। নইলে বিয়ের কনে কি এখন তার কোণ ছাড়ে? বিয়ে অথচ পরমা নেই, কী বলব, যেন গীত আছে কৃষ্ণ নেই। নে, ওঠ, একটু বেঁধেছেঁদে ঘষেমেজে নে।"

সোনার আলোধরা রূপোর দীপদানের মত দেখতে হল সোহিনী।

এত ভরা-ভর্তিতেও কেউ হয়? সব পেয়েছি-র দেশও তা হলে আছে জীবনের মধ্যে? সোহিনীর আনন্দকে পরমা ভাবতে চাইল নিজের আনন্দ বলে, তার সাফল্যকে নিজের সাফল্য। এ পূর্ণতার চেহারার কাছে কে আর নিজেকে শূন্য বলে ভাবে? এমন ত নয় পূর্ণতা কোথাও মেলে না সংসারে। যদি কোথাও তার অস্তিত্ব থাকে, যেমন এখন দেখছে তার চোখের সামনে, তা হলে সেও পূর্ণ।

"বিয়ের লগ্ন কটায়?" জিজ্ঞেস করল পরমা।

"মধ্যরাত্রে।"

"তা হলে ফিরবি কী করে?" বাধা দেবে মাকে শুনিয়ে বললে।

"নেই বা ফিরলি।" সোহিনী রাজেশ্বরীর দিকে তাকাল: "নেই বা ফিরল আজ রাত। কাল সকালে ফিরবে। বাসর-জাগুনীদের মধ্যে ও থাকবে না এ হতেই পারে না।"

"সারারাত!" রাজেশ্বরী হাঁসফাঁস করে উঠলেন: "তা তুমি যদি ওকে দেখ—"

"আমাকে কে দেখে তার ঠিক নেই—" সোহিনী সোৎসাহে বলে উঠল।

"দাঁড়াও, তা হলে মণিলালকে জিজ্ঞেস করি। অভিভাবকের মত নেওয়া দরকার।"

মণিলাল বললেন, "আমার সঙ্গে ফিরবে।"

তখন তাঁকে নিয়ে পড়ল সোহিনী। পরমা কি এমনি একজন উটকো লোক যে শুধু নিমন্ত্রণ খেয়েই চলে যাবে? ও আমার কতদিনের বন্ধু, সোদরতুল্য ছায়া, বিষম সময় ও পাশে না থাকলে সাহস দেবে কে? কে আমার আনন্দের টিপ্পনী হবে? বীথিকা-লিপিকারা থাকছে, দীপালি-অঞ্জলি-অর্চনা-কল্পনা! ও ও তাদেরই একজন, আমার আপনজন। আমার আসরে আর সকলে পিদিম, ও-ই ঝাড়লণ্ঠন।

"বেশ, যাক, কিন্তু আমি কাল ভোর-বেলা গিয়ে নিয়ে আসব।" ফরমান দিলেন মণিলাল।

শাড়ি পরছে পরমা, কাছে গিয়ে বললে সোহিনী, "আমার বিয়েতে আমাকে কী দিবি?"

"বল্, কী চাস?"

চাওয়া কঠিন, দেওয়া কঠিনতর।

রিকশা নিল দুজনে।

বিয়ের লগন কাটিয়ে এসেছে, হঠাৎ রব উঠল পাওয়া যাচ্ছে না কনেকে। সাজা-গোজা অবস্থায় এইখানে এই মেয়েদের ভিড়ের মধ্যেই ত ছিল, গেল কোথায় সোহিনী?

কোথায় আবার যাবে? যত সব অকারণ হৈচৈ। বাথরুমে গিয়েছে।

হ্যাঁ, বাথরুমেই গিয়েছে। ঢুকে বন্ধ করে দিয়েছে দরজা। পরমাকে আগেই পাঠিয়েছে সেখানে, তারপর এখন নিজে ঢুকল। ছোট ঘরে দুজনে দাঁড়াল মুখো-মুখি। যেন ঘড়ির পেণ্ডুলাম এখন স্তব্ধ।

নিজের দু হাতের দুগাছি চুড়ি খুলে পরমার দু হাতে পরিয়ে দিল সোহিনী। বললে, "বিয়ের লগ্ন আজ শুধু আমার নয়, তোরও। আর নে এই কিছু টাকা।" হাতের মুঠোর মধ্যে গুঁজে দিল ভাঁজকরা কটা নোট।"

"টাকা?"

"হ্যাঁ, টাকা। তেল ছাড়া তৈর নেই, তেমনি টাকা ছাড়া প্রেম নেই। নে, রাখ বুক পকেটে।" সোহিনী নিজেই পরমার ব্লাউজের মধ্যে হাত ভরে দিল। "আর শোন কদমতলার কাছে রিকশা দাঁড় করান আছে, নীলুদাকে বলেছি, সেই রেখেছে ঠিক করে। জানাশোনা বিশ্বাসী রিকশা। পারবি যেতে?"

"খুব পারব।" দ্রুত অথচ গভীর রোমাঞ্চের মধ্যে অকস্মাৎ এসে পড়েছে, গায়ের সমস্ত রক্তবিন্দু যেন লাল হয়ে উঠেছে পরমার।

"ব্ল্যাক আউটের রাত, ভয় করবে না ত?"

"করবে না।"

"নীলুদাকে দিতে পারতাম সঙ্গে, কিন্তু কেউ দেখলে অন্য মানে না করে বসে।" সোহিনী প্রায় আইনের ধার দিয়ে হাঁটল: "এ সব ক্ষেত্রে গোড়াতে একাই বেরুনো উচিত। নিজের দায়িত্বে। তা হলে নিজের থেকে বেরিয়ে আসাই হয়, অন্যের বার করে নেওয়া হয় না—"

"অত ব্যাখ্যার দরকার নেই।" ছুঁচের মুখে মুহূর্তের ডগায় এসে পরমা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।

"আর শোন, যদি পথে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে, বলবি, আমার বিয়েতে এসেছিলি, এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছিস।"

"বাড়ি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, নলিনেশবাবুর বাড়িই এখন তোর বাড়ি। সে বাড়ির নাম করবি। সতী নারীর মত মামার বাড়ির নাম করবিনে। যদি বলে মণিলাল হাজরা আপনার কে হয়, বলবি, চিনিনে। বলবি নলিনেশ সরকারই আমার সব। ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব—পারবি না বলতে?"

"প্রাণ ভরে পারব।"

"আর আমার সঙ্গে সঙ্গে বেরুবি না, ঘর খানিকক্ষণ অন্ধকার রেখে পরে বেরুবি। ফাঁক বুঝে বেরিয়ে পড়বি রাস্তায়। খানিকটা হেঁটে কদমতলায় রিকশা পাবি। যদি দেখিস সেখানে একাধিক রিকশা, তখন গফুরালির কোনটা জিজ্ঞেস করবি। ভাড়া-টাড়া দিতে হবে না। সিধে চলে যাবি বৈকুণ্ঠে।"

বিয়ে-বাড়ির ভিড়ের থেকে পিছনে বেরিয়ে এল পরমা। হুডতোলা রিকশা, ঠিক, এইটেই গফুরালি। চল, জান ত কোথায়? জানি। যদি আরও দূরে যেতে বলেন ত আরও দূরে।

অন্ধকার রাত, ছুরির ফলার মত অন্ধকার, নির্জন রাস্তা, অচক্ষু গহ্বরের দিকে যা নেমে গিয়েছে, অচেনা রিকশাওয়ালা, কে জানে বা ছদ্মবেশী কতগ্ন—তবু উত্তেজনার তাপের মধ্যে ভয়ের ঠাণ্ডা হাতকে ঢুকতে দিল না পরমা। অগাধ আশ্বাসের মত জেগে রয়েছে একটি অতন্দ্র আকাশ সমস্ত না-জানার পরেও যে জানা, সমস্ত ভুলের পরেও যে নির্ভুল।

ভারী পায়ের জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে খারেকাছে, একটা টর্চের আলোও তার গায়ের উপর ছিটকে পড়ল। গেঁয়ো মফস্বলী শহরে জংগী অত্যাচারের কথা কানে এসেছে অনেক—গা-হাত-পা ভার হয়ে উঠল পরমার। কিন্তু না, এলেকা ঠিক পার করে নিয়েছে গফুরালি।

পরমার মনে হল আসল ভয় সামনে। সে-ভয়ের প্রতিকার কী, প্রতিরোধ কোথায়? সে-ভয়ের বিরুদ্ধে আক্রম-বিক্রম করবারও পথ নেই। উপায় নেই আর্তনাদে দীর্ণ করি শূন্যতা। রুদ্ধ মত্ত হই। কারু কাছে বা অভিযোগ করি, সাহায্য চাই। আগুন জ্বালাই কাগজে।

সে-ভয় নিষ্ক্রিয়তার ভয় অমনোযোগের ভয়। যদি বলে আমি প্রস্তুত নই, আরও কিছুকাল দিন গুনি। যদি বলে, তুমিও আরও কিছুকাল প্রতীক্ষা কর। যাচাই করে দেখ। যা চাও তাই সত্যি আমি কিনা।

চাওয়াটাই পাওয়া। আর পাওয়াটাই হচ্ছে চাওয়া। যদি সত্যি পেতে চাও পেয়ো না। কে জানে হয়ত এমনি ফাঁকা দর্শনের বুলি আওড়াবে।

হয়ত চোখের সামনে পরমা দেখবে কে এক মন্ত্রহারা গুণী। সুর-খোয়ানো গায়ক। কোন অকৃতী কবির পরিত্যক্ত পাণ্ডুলিপির মতই পড়ে আছে এক কোণে। ধুলিমাখা হয়ে। ধ্বনি নেই স্পন্দ নেই তরঙ্গ নেই।

তা হলে কী করবে পরমা? কাঁদবে? সাধবে? চুল ছিঁড়বে? মাথামুড় খুঁড়বে? কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঝগড়া করবে? গঞ্জনা দেবে? শঠ-কপট বলবে?

তারপর ফিরে আসবে বাড়ি? ছোট মাছধরা জালে কুমির ধরতে পারল না বলে বুক চাপড়াবে?

গফুরালি বলেছিল যদি দরকার হয় ত আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথা তাকে বলে দেয়নি সোহিনী।

Cooch Behar

যেন গফুরের কথা ফলে, গফুর যেন পরা হয়। যেন বাড়বাড়ন্ত হয় সোহিনীর।

তার চেয়ে আরও ভয় যদি নলিনেশ না থাকে। যদি আর তাকে না দেখে পরমা। ছুটি দিল না বলে যদি রাগ করে কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে যায় কলকাতা।

তবু বেকারের চেয়ে বেগার ভাল। তবু তার পৌরুষের প্রমাণস্বরূপ কিছু একটা করেছে। কোথায় গেছে ঠিকানা না জানাক, তবু তার কাজে ইস্তফা দেওয়ার সাহসের মধ্যেই রয়েছে তার চরিত্রের ঠিকানা। সে-ঠিকানায় জীবনের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিঠি দেব প্রত্যহ।

সে-ঘটনার মধ্যে তবু যেন আশা আছে। চাষার আষাঢ় মাস আছে। ঘৃত ছাড়া যজ্ঞ নেই। তাই আশা ছাড়া বাসা নেই।

এখন যাক, পরে নিশ্চয়ই দেখা হবে একদিন। কী অবস্থায় হবে, তখন কি শুধু সরল বাঁশ না বাঁশের পাবে ছিদ্র, কে জানে! তবু যেন আর-একবার দেখা হয়। আর-একবার যেন সে মুখের নিশ্বাস ফেলে বাঁশিতে।

ভগবান, যেন তার বাড়িঘর সব অন্ধকারে মোড়া থাকে। ঘুমের অন্ধকার নয়, পলায়নের অন্ধকার।

কিন্তু পরমার বুকের মধ্যিখান দিয়ে হঠাৎ একটা ফিনফিনে তরোয়াল চলে গেল যখন দেখল দরজার দু পাল্লার ফাঁক দিয়ে সরু একটা আলোর রেখা বাইরে এসে লুটিয়ে পড়েছে।

আছে? জেগে আছে?

বিলাসী ঠুকঠুক নয়, একেবারে দুই হাতে ডাকাতপড়া ধাক্কা মারতে লাগল পরমা। ওঠ, দোর খোল, আমি এসেছি।

যদি দোর না খোলে! যদি চিনতে পাচ্ছি না বলে! দুষ্মন্তের মত যদি ফিরিয়ে দেয় শকুন্তলা!

বই পড়ছিল নলিনেশ। উঠে দরজা খুলে দিল।

নাগিনী নদীর মত তোলপাড় করে উঠল পরমা। "শিগগির উঠুন, চলুন, কোথায় কী আছে ভাবতে হবে না, কাল কী করবার তাও নয়, বেরিয়ে পড় এইমাত্র। হ্যাঁ, এই-মাত্র, এই মুহূর্তে। রিকশা নিয়ে এসেছি, বান্ধব রিকশা।"

"কোথায় যাবে?" ধূসর দিগন্তের দিকে চেয়ে বললে নলিনেশ।

"বলতে পারতাম যেদিকে দু চোখ যায়, কিন্তু আপাতত ইস্টিশানে। কতক্ষণ পরেই ডাউন একটা ট্রেন যায় সেই ট্রেনে, কলকাতায়।"

"উঠব কোথায়?" মেলার ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া শিশুর মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল নলিনেশ।

তিন সংগী — শিল্পী শ্রীগোপাল ঘোষ

"তা আমি কী জানি! তোমার—আপনার দায়িত্ব আপনি জানেন।"

তবু যেন অথই, পায়ে মাটি পাচ্ছে না নলিনেশ। এমনি অসহায় ভাব করল।

"আপাতত কোন হোটেলে।"

"টাকা? টাকা কোথায়?" নলিনেশ হাতড়াতে লাগল।

"কেন, নেই কিছু টাকা? যা কিছু সামান্য—"

"খুলে দেখ না মনিব্যাগ। ঐ ত টেবিলের উপর পড়ে আছে। এখন মাসের প্রায় শেষ, এখন হাত খালি—"

"দরকার হবে না। আমার কাছে টাকা আছে।"

তোমার কাছে? কত, ভাগ্যিস জানতে চাইল না নলিনেশ। জানতে চাইলেও উত্তর প্রস্তুত ছিল পরমার। অসংখ্য, অজস্র, অফুরন্ত। শুধু সোহিনীর উপহার নয়, এ টাকা আছে মানে জীবনে সাহস আছে, বিশ্বাস আছে, উৎসাহ আছে।

"হোটেলে কতদিন থাকব?" নলিনেশ এমন ভাব করল যেন এ-ও পরমাই বলে দেবে।

"বেশীদিন নয়। সুপ্রভাত নতুন বাড়ি-ভাড়া নিয়েছে, বিয়েটা চুকে গেলেই সেখানে সংসার পাতবে—তখুনি আমরা সেখানে থাকতে যাব। যতদিন আমাদের না একটা আস্তানা হয়।"

এ ত দেখছি লম্বা প্রোগ্রাম! আর নলিনেশই তার ক্লান্তকায় সভাপতি। উপায় নেই, একবার যখন নিমন্ত্রণ নিয়েছে, কার্ডে নাম ছাপতে দিয়েছে, তখন নির্ঘণ্টের শেষ ধাপ পর্যন্ত যেতে হবে, বিদায়-সংগীত পর্যন্ত।

দোকানে ঢুকে পকেটকাটার মতন মুখ করে নলিনেশ বললে, "আমার চাকরি?"

"ছাড়েননি?"

"কই আর ছাড়লাম।

"সমস্ত অপমান হজম করলেন?" দুই চোখে কালো আগুনে ঝলসে উঠল পরমার।

"তাও না। তীর যখন ছুঁড়েছি, তখন আর তা ফেরান যাবে না।" হাত বাড়িয়ে ব্র্যাকেট থেকে গায়ের পাঞ্জাবিটা তুলে নিল নলিনেশ। "ছুটি নিয়ে করব ভেবেছিলাম, পরে দেখলাম ছুটি পেয়েও ত করা যায়। আশেপাশে কতই ত ছুটি আছে। মিছি-মিছি চাকরি খুইয়ে লাভ কী? দু'দিন আগে আর পরে। তাড়াহুড়ো না করে ধীরেসুস্থেই ত ভাল—"

ধীরেসুস্থেই জামাটা গায়ে দিল নলিনেশ। মনিব্যাগ আর কী কী সব দরকারী কাগজপত্র কুড়িয়ে ভরে নিল পকেটে। চয়ন সিংকে ডাকল, আড়ালে নিয়ে গিয়ে কী কী বোঝাল তাকে। চুলটা আঁচড়াল। কোঁচাটা ঠিক করল। আটপৌরে স্যান্ডেল ছেড়ে পোশাকী জুতো পরল। যেন কলেজ যাচ্ছে। কিংবা বাজারে যাচ্ছে।

ধীরেসুস্থেই সব দেখছে পরমা।

"কিন্তু কিছুই ধীরেসুস্থে হবার নয়—নতীশক্তি যখন দরজায় এসে দাঁড়ায়।" দবিয় হাত বাড়িয়ে পরমার হাত ধরল নলিনেশ। বললে, "তুমি ত আমার হাতে পড়নি। আমিই তোমার হাতে পড়েছি। তোমার সোনার তরী কোথায়?

গফুরালি হর্ন বাজাল।

"চল—"

কিন্তু এই কি সেই ডেকে নেবার বুকে তুলে নেবার কণ্ঠস্বর? আবেগ নেই, আগুন নেই, উত্তাপ নেই, উল্লাস নেই। ষড়যন্ত্রের যে একটু ফিসফিসানি থাকে, তাও পর্যন্ত নেই। অন্তত যোগসাজসের চুপচাপ। তাও না। যেন কোন প্রবন্ধ পড়া মিটিঙে যাবার কথা, তাই যাচ্ছে এক-সঙ্গে। সাদামাঠা কাষ্ঠ কণ্ঠ। সুর নেই, রঙ নেই, গন্ধ নেই।

এই বুঝি তার সেই অভিসারের রাত, এই বুঝি সে দৈন্যের দেশ থেকে চলেছে প্রাচুর্যের দেশে। দাসীর পদ ছেড়ে রানীর পদে। ঘুপসি মফস্বল ছেড়ে দীপজ্বলো রাজধানীতে।

কিন্তু উপকরণ কে দেখে! সুধা কোন্ পাত্রে আছে কে দেখে তার কারুকার্য। এ, এমন সুধাপাত্র উজাড় করে উপুড় করে ঢেলে দিলেও তার এক ফোঁটা ক্ষয় হয় না।

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?" রিক্‌শা চলতে শুরু করলে জিজ্ঞাসা করল পরমা।

"ঐ যে বললে ইস্টিশানে—"

"সেখান থেকে?"

"সেখান থেকে টিকিট কেটে ট্রেনে চড়ে কলকাতা।" সমস্ত ছক যেন মুখস্থ নলিনেশের: "কলকাতায় প্রথমটা হোটেল, পরে দু-তিনদিনের মধ্যেই সোহিনীরা তাদের নিজের বাড়িতে গেলে সেখানে। সেখানে বিয়েটা সমাধা করেই আবার এখানে স্বধামে।"

"এখানে ফিরব আমরা?" পরমা নিজেই এবার নলিনেশের হাত চেপে ধরল: "আমি ভেবেছিলাম আর বোধ হয় ফিরব না।"

"বা, তা কেন? মরু-বিজয়ের কেতন ওড়াব না এসে? কমিটির মুখের কাছে তুড়ি বাজাব না? ধরব না চাকরি?"

কী জ্বলন্ত আনন্দ! একটি জ্বলন্ত শিখা মাথায় ধরে এখানেই সাম্রাজ্য স্থাপন করব। আর ভয় নেই, মহৎ যুদ্ধে জয়ী বীর সৈনিকের মত দাঁড়াব সকলের সামনে। দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-দ্রোহ নেই। দুর্ভাগ্য নেই। কুমারী মৃত্তিকা ফলন্ত হয়ে উঠেছে।

"তবে এ-কটা দিন যে চাকরি থেকে গরহাজির থাকবেন?"

"কলকাতা থেকে ক্যাজুয়েল লিভের দরখাস্ত পাঠাব। কারণটা এবার বিয়ে দেব না। দেব অসুখ, দাঁতের ব্যথা। দন্তের ব্যথা না ঘন্তের ব্যথা। ছুটি, অল্পদিনের ছুটি—এতে কমিটি লাগবে না, মঞ্জুর হয়ে যাবে।"

কিছুক্ষণ কাটল চুপচাপ। রাতের নিরালা হাওয়া ঠাণ্ডা হাতে আদর বিলতে লাগল।

"আকাশের নীলোজ্জ্বল থালায় কত হীরের টুকরো দেখেছ?" নলিনেশ বললে সামনের দিকে তাকিয়ে: "গুনে নাকি শেষ করা যায় না। কিন্তু আমি গুনে দেখেছি দুটি টুকরো কম।"

"কম?" অন্ধকারে চোখ বড় করে তাকাল পরমা।

"সে দুটি আমার হাতের মধ্যে।" পরমার দুটি চোখ স্পর্শ করল নলিনেশ।

পরমা বললে, "আমার কোন দাম নেই।"

"টিকিট কেটে পিন দিয়ে গায়ে সাঁটা নেই বুঝি? দাম জিনিসে নয়, দাম দিতে পারার মধ্যে, দেখতে পারার মধ্যে। মধ্যরাত্রির আকাশের কী দাম থাকত যদি আমরা না এমনি পথে বেরিয়ে তাকে দেখতুম। তেমনি তোমার দাম আর কিছুতে নয়, আমার আনন্দের মধ্যে, আশ্চর্য হয়ে যে দেখতে পাচ্ছি তোমাকে, সেই আশ্চর্য দৃষ্টির মধ্যে।"

সব চর্যেরই শেষ আছে, আশ্চর্যেরই শেষ নেই।

"কলকাতায় আপনার কোন আত্মীয়ের বাসা নেই?"

"না, আছে বৈকি।"

তবে হোটেলে না উঠে তেমন কোন আত্মীয়ের বাড়িতে উঠলে ভাল হত না? আর কিছুর জন্যে নয়, দ্বিতীয় জামাকাপড় নেই কারও, নেই বা বিছানাপত্র। হোটেলের লোক কী ভাববে?"

বাড়ির লোকও স্বর্গ ভাববে না। জামা-কাপড় বিছানা বালিশ কিনে নেব কলকাতা পৌঁছেই। আর যা যা দরকারী। মনিব্যাগে টাকা না থাক্, ব্যাংকে আছে কিছু খুদ-কুঁড়ো। সে-সবে তোমার ভাবনা নেই। ভাবনা যা আছে, তা হচ্ছে উমাশশী। আত্মীয়ের মেলায় গেলে সেইটেই ভয়, কখন না পিঁপড়ের পায়ে হেঁটে হেঁটে তার কানে গিয়ে খবর ওঠে। হয়ত শেষে দেখবে জৌনপুরে-কানপুরে নেই, আছে যাদবপুরে না মোমিনপুরে, আর এখন তার খাণ্ডার মূর্তি। উমাশশী ছিল, এলোকেশী হয়ে গিয়েছে।

"আমি ওসবে আর এখন ভয় পাই না।" নলিনেশের বাহুর পাশে গাল রাখল পরমা।

"হোটেলকে ভয় পাও?"

"তাও না। আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই আমি নির্ভয়।"

"আবার আপনি?" ধমক দিয়ে উঠল নলিনেশ।

পরমা হাসল। বললে, "এখন সহজে আসছে পারছি না তুমিটা। মনে হচ্ছে সে-রাতটা না কেটে যাবার আগে আসবে না ঠিকঠাক।"

"কোন্ রাত? বিয়ের রাত?" জিজ্ঞেস করল নলিনেশ।

"হ্যাঁ, তাই—"

থার্ড ক্লাস কামরায় কাঠের বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে পরমা। গাঁয়ের মাঠে সন্ধ্যা হয়ে এলে অন্ধকার যেমন ঘাসে হাত রেখে শোয় তেমনি শুয়েছে। আশার রংমশাল নয়, বিষাদের মেঘচ্ছায়া। কিছুতেই শুনল না, দমল না। ঠেকান গেল না। ঝড়ের বাড়ি খাওয়া পাখি বনের পাতার কুঞ্জ ছেড়ে খাঁচায় এসে ঢুকল। নিজে ধরা দিয়ে গৃহস্থকে খুশি করতে চাইল। তোমার অগাধ দুই পাথার আলোড়নই আমার আনন্দ ছিল, কেন সংকুচিত হতে চেয়ে বঞ্চিত হতে গেলে? যদি বিশ্রাম করতেই চাইলে, এক পাখির বন্ধু যে আর এক পাখি, এক ডালে পাশাপাশি বসা, তেমন কেন বন্ধু হলে না? শুধু তুমি জানতে আর আমি জানতাম তুমি আমার মর্মের গেহিনী নর্মের সহচরী। আমার অনাবশ্যকের অবকাশ। আমার হাতের ছাড়-চিঠিটি চিরকাল তোমার বুকে করে রাখতে। কেন তুমি অনেক রাত না নিয়ে শুধু সেই রাত, এক রাত, বারে বারে একই রাত নিতে গেলে?

মাথার চুল কপালকে ছোট করে কতদূর পর্যন্ত নেমে এসেছে। সেই কপালের কাছেকার চুলে হাত বুলুতে লাগল নলিনেশ। এক ঝলক মেয়ে কিন্তু এক আকাশ আলো। এই হাড়মাসের হিজিবিজির মধ্যে কোথায়

সেই অলৌকিকের ঠিকানা। লোকে বলে অলৌকিক বলে কিছু নেই। এই যে পরম-সুন্দর প্রেম যে পাঁককে সোনা করে তুচ্ছকে অসীম, হাড়মাসের কাঠামোতে প্রতিমার লাবণ্য আনে এ কি অলৌকিকের কম?

একটা মধ্যবিত্ত হোটেলে ঘর নিল, ছোট ঘর, একটিমাত্র প্রাণীর পক্ষেই পরিমেয়। মানপাতাতেই কুলবে তেঁতুল-পাতায় কুলবে না এ কে বললে? যদি হয় সুজন তেঁতুল পাতায় দুজন।

ম্যানেজারের খাতায় স্পষ্ট করে সত্য নাম-পরিচয়ই লিখলে নলিনেশ। সত্যের মত স্বস্তি নেই। ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্য, যে যাই বলুক, একমাত্র সত্যই স্বচ্ছ। সব সওয়া যায় হাসিমুখে যদি সত্য বুকে থাকে। শুধু সত্য দিয়েই সব সুন্দর।

ম্যানেজার একবার তাকিয়েছিল তেরছা চোখে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত, যুদ্ধে যখন সমস্ত কিছু বিপন্ন, সমস্ত কিছু ঘোলাটে, তখন কে আর তলায়। উপর উপর চলে যাও।

আইনের কী সব বাধানিষেধ তারই খোঁজে বেরিয়েছে নলিনেশ আর পরমা তার ছোট ঘরের ক্ষণিক সংসারিতে অনাগত ভয়ের পাড় বুনেছে। একেবারে যেন ধর্মশালার মত ঘর না নেয়, লাগে যেন গৃহস্থালির সুর। নতুন রোদের প্রসাধন, যদি কিছু কিছু না থাকে তা অনেক নলিনেরই নিভৃতি। শুভ্রতাই বেশী উচ্চারণ পাক। কোনো ধাপ পড়ুক। কিছু সহজ থাক এখানে-ওখানে।

অতিথির ঘরে কি আইন থাকে? অন্তরিক্ষের দেশে কে দেখে প্রাঙ্গণের সীমানা?

এইবার বুঝি গভীর রাতে সেই গুহা, সেই প্রাচীন মৌন কথা কয়ে উঠবে? সেই পর্বতচূড়ায় কেউ ওঠেনি, সেই পর্বতচূড়ায় দাঁড়াবে গিয়ে দুজনে? যে নির্জনতম সমুদ্রতীরে কেউ কোনদিন যায়নি সাহস করে সেইখানে বসে তারা ঢেউ দেবে? যে ঈশ্বরকে দেখা যায়নি কখনও দেখবে সেই পরিপূর্ণকে!

কিন্তু এমনি করেই আসবে, এ কি কেউ ভেবেছিল? এমনি করে!

সকালবেলাই হোটেলে পুলিশের আনাগোনা।

কী ব্যাপার?

আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে। নলিনেশকে বললে দারোগা।

নলিনেশ পড়ল পরোয়ানা। বললে, "এ কি দণ্ডবিধির আইন, না দণ্ডকারণ্যের?"

"সে-কথা কোর্টে গিয়ে বলবেন।"

"তা ত বলবই। কিন্তু আপনাকেও বলি। যে মেয়ে গ্রাজুয়েট সে নিজের ইচ্ছায় ঘর ছাড়তে পারবে না?"

"নিজের ইচ্ছায় কিনা সেইটেই জিজ্ঞাস্য। নাকি ফড না ফোর্স—" মোটা মোটা গলায় বললে দারোগা।

"বেশ ত জিজ্ঞেস করুন না ভদ্রমহিলাকে।" প্রশান্ত চোখে পরমার দিকে তাকাল নলিনেশ। মুখ টিপে টিপে হাসছে পরমা। যেহেতু নলিনেশ প্রশান্ত পরমাও সপ্রতিভ।

"সে যা হয় জিজ্ঞেস করব থানায় গিয়ে, আপনার অগোচরে।" হাতের রুলের ডগাটা উঁচিয়ে করল দারোগা: "এখন এসব প্যাক করুন।"

এক রাতের হাটের বেসাতি গোটাতে বসল পরমা। কখনো বলে নতুন হাটে যত যায় তত ফিরায় না। এ কি তা হল? পাটের জিনিস নষ্ট গেল।

"তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না, এঁরাই সব গুছিয়ে করবেন।" নলিনেশ বাধা দিল: "আমরা এখন আসামী আর এসব আমানত। এখন আমাদের প্রোগ্রাম কী?"

"আপাতত এখানকার থানায়—"

"আমাদের দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবেন? দুজনকেই?" নলিনেশ স্বর বেশ তরল রাখতে পেরেছে। "এক হল না তা হলে। নতুন গ্রন্থিতে বাঁধা হব পীড়িত।"

সমস্ত হোটেল ভেঙে পড়েছে, শুধু হোটেল নয়, রাস্তা-পার্ক, সামনের-পাশের যত জনতা-জানালা। অবশ্য এখনও আসেনি, কিন্তু আসতে পথে বাকি নেই। কার বিবাহিত স্ত্রী বার করে নিয়ে এসেছে, কেউ বললে ডাকাতি করে, কেউ বললে আরও বীভৎস কাহিনী। বস্তু একটা নাম অজানা। যার মনের যাতে স্বাচ্ছন্দ্য সে তাতেই রূপ দেখাচ্ছে।

পুলিশের লোক ট্যাক্সি নিয়ে এল। পরমার মনে হল বিয়ের পর যেত যখন শ্বশুরবাড়ি এমনি কি ভিড় হত দরজায়? এত কৌতূহলাকুল দৃষ্টির জনতা কি সংবর্ধনা করত তাকে?

এমনিতে হলে মাথায় ঘোমটা থাকত, চোখে থাকত কাজলের কালিমা, হয়ত বা বিষাদের নম্রতা। কিন্তু এখন, এখন বেশ ভাল লাগছে দেখতে, মাথায় ঘোমটা নেই, উন্মুক্ত প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাতে পারছে চারপাশে, একটা বা ক্ষমা ও অনুকম্পার সঙ্গে, ভঙ্গিতে স্পষ্ট জয়ের প্রফুল্লতা। মেয়েটার কী সাহস লোকে বলুক, কী সত্যের ঔজ্জ্বল্য তার চোখে-মুখে। লোকে বলুক তাকে বার করে এনেছে না সে-ই বার করিয়েছে। থানা-আদালতে মন্দ কি, পরমা তা হলে একবার দাঁড়াতে পারে সকলের সামনে, উচ্চকণ্ঠে জানাতে পারে তার বাঞ্ছিত সত্য কথা। সে না জানি কত বড় সুখ, কত বড় গর্ব। সূর্য কখনও তার পূর্বদিক ত্যাগ করে না। তেমনি আমিও ত্যাগ করি না আমার সত্য, আমার পূর্বদিক।

"এখানকার থানার পর কোথায় যেতে হবে?" ট্যাক্সিতে জিজ্ঞেস করল নলিনেশ।

"যেখান থেকে আপনাদের অ্যারেস্ট করার রিকুইজিশন এসেছে, সেই মফঃস্বলের শহরে আপনাদের পাঠিয়ে দেব।"

"বলেন কী! আবার সেইখানে?" এবার যেন নলিনেশ ম্লান হয়ে গেল।

কলকাতা চিহ্নহীন মানুষের ময়দান, সেখানে কারু কোনও রেখার স্পষ্টতা নেই, কিন্তু ছোট মফস্বল শহরে সব সময়েই তুমি নির্দিষ্ট, নম্বর-মারা। কী না-জানি সোরগোল উঠবে, তোলপাড় করবে সমস্ত শহর। তখন আর শুধু পুরুষ আর নারী নয়, তখন এক প্রোফেসর আর ছাত্রী। গাড়ি চাপা দিলে যেমন লোকে ভাবে গাড়ির চালকই দোষী, রেলে মাল খোয়া গেলে রেলই চোর, ধর্মঘট হলে, আহা, ধর্মঘটী না-জানি কত বঞ্চিত, তেমনি এক্ষেত্রে সন্দেহ কী, নলিনেশই অপরাধী, নলিনেশই দণ্ডনীয়। এই সেই প্রোফেসর, জ্বলন্ত চোখের দাগনি দিয়ে সবাই ছ্যাঁকা দেবে তাকে, বলবে, এই সেই কলাকার যে একটি নিরীহ নিষ্কলুষ মেয়েকে পথভ্রষ্ট করেছে। কে জানে, অপাঙ্গচক্ষে আইনেরও হয়ত সেই ভাব!

"কেমন লাগছে?" পরমার দিকে তাকাল নলিনেশ।

"অসামান্য!" নির্ভয়ে, অগ্রপশ্চাৎ গ্রাহ্য না করে পরমা নলিনেশের হাতের উপর হাত রাখল। বললে, "যে অবস্থাতেই হক, কলঙ্কে বা কর্দমে তোমার পাশে যদি আমি থাকতে পাই তাহলেই আমি অক্ষত। তখন আমার শ্রীঘরও শ্রীধাম।"

"একসঙ্গে থাকতে দেবে কই?" ভবিষ্যতের ভয়াবহ ছবি আঁকল নলিনেশ: "তুমি ভিকটিম-গার্ল, তোমাকে নিয়ে যাবে তোমার বাড়িতে, আর আমার স্থান পুলিশ-হাজতে, যেহেতু আমিই অভিযুক্ত। জামিন দেবে কিনা জানি না। দিলেও দাঁড়াবে কে? মনে হচ্ছে এর পিছনে আইন নেই শুধু আক্রোশ আছে। তোমার মামা মণিলালের আক্রোশ আর তার সে আগানে অন্যান্যদের বিদ্বেষের ইন্ধন। চতুর্দিকে যদি গোলমাল ওঠে, তখন নিঃশব্দও হঠাৎ তাতে কণ্ঠ মেলায়।"

"আমাকে আবার বাড়িতে পুরবে?" চোখে-মুখে অন্ধকার দেখল পরমা। নিবিড় করে আঁকড়াল নলিনেশের হাত।

"তোমার উপর নির্যাতন চালাবে। তোমাকে শেখাবে-পড়াবে। বলতে বলবে, আমিই তোমাকে ফুসলিয়ে বার করে এনেছি। ছাত্রী অবস্থায় সাহচর্যের সুযোগ নিয়ে তোমার মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি

করেছি যে, তুমি আমার স্ত্রী আর সেই ভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে—'

"একবার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলতে দেবে ত আমাকে?" পরমা ছটফট করে উঠল।

"তা দেবে হয়ত। তুমিই ত মামলার মূল গায়েন। কিন্তু যখন তুমি বলতে দাঁড়াবে, তখন তোমার মেরুদণ্ড বেঁকে গিয়েছে, অনেক জল পড়ে পড়ে একদিন যা পাথর ছিল তাই হয়ে উঠেছে তলতলে কাদা। যেমন হয় মেয়েদের বেলায়।"

"অসম্ভব। এত কিছুর পর আর কী আমি বলতে পারি?"

"কত কিছুর পর কত কিছুই বলতে পারে মেয়েরা। বলতে পার, শাড়ি-গয়নার প্রলোভন দেখিয়েছি, মানে ঝকঝকে বাড়ি আর ছিপছিপে গাড়ির, কিংবা চাকরির প্রলোভন কিংবা বিদেশে পড়বার স্কলারশিপ পাইয়ে দেবার। কী ভাবে বলাবে তোমাকে, তোমার উকিলমামা আর তাঁর তদবিরকারেরাই জানেন।"

"আর তাই বলব আমি? আমি বুলি-পড়া পাখি?" পরমা ফোঁস করে উঠল।

"কী করবে, তোমার মায়ের চোখের জল ঠেলবে কী করে?"

"রাখ। সব মা-ই প্রথমে তেজ দেখায়, পরে মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর মেনকা হয়ে যায়। পার্বতীর মা মেনকা। মায়ের কথা আমি ধরি না। অশ্বত্থের মতন ছায়া নেই মায়ের মতন মায়া নেই। আমি ভাবছি অন্য কথা, অন্য রকমের ভয়।"

"অন্য রকম?"

"হাঁ, ধর, আমাকে বাড়ির মধ্যে আটকে ফেলল, আর, তারপর পুলিশ মামলা চালাল না। তোমাকে ছেড়ে দিল, আর তুমি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলে। তখন আমার কী দশা!" সর্ব অঙ্গে শিউরে উঠল পরমা।

"তখন আমাকে নখে-দাঁতে লড়তে হবে বাইরে থেকে।" নিজেরও অগোচরে নলিনেশের হাতের মুঠ বুঝি দৃঢ় হল: "তোমাকে চিৎকার করে দাবি করতে হবে। অবৈধভাবে আটকে রেখেছে এই মর্মে নালিশ করতে হবে। এমন সাপ নেই যে তুমি তাকে পায়ে মাড়াবে অথচ সে তোমাকে কামড়াবে না।"

"সে ত সাপ, মাটির জীব, আর তুমি মাটির মানুষ।" পরমা আবার হাত রাখল হাতের উপর: "আমার ভয় হচ্ছে তুমি না নিষ্ক্রিয়তায় ডুবে যাও। অনেক জেরবার হয়েছ, যদি ভাব, আর কেন নিজেকে ক্লান্ত করি। দড়ি ছেড়ে দিই এবার।"

এমন ইচ্ছেও হয় নাকি, হতে পারে নাকি? সমস্ত বর্তমানকে অন্ধকার করে দিয়ে চোখ বুজল নলিনেশ। সে ইচ্ছেটি কেমন দেখতে চাইল অন্ধকারে। আবার তার সেই পরিচিত পরিমিত জীবনের উষ্ণতায় সে ফিরে গিয়েছে, এলোমেলো একাকী বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুমচ্ছে গা ভরে। উদ্বেগ নেই উত্তেজনা নেই শোক নেই শূন্যতা নেই—যেমন সে এক খেদহীন খ্যাতিহীন শান্তি। সেই আবার চারদিকে বইখাতা ছড়ান, ছন্দ-হীনতার স্বাচ্ছন্দ্য, আবার সেই নিঃশব্দ অনুভবের অলোকলোকে ঘুরতে যাওয়া।

"কী কথা কইছ না কেন?" পরমা একটু ঠেলা দিল।

নলিনেশ বললে, "ভাবছি তোমার কল্পনা কতদূর যায়।"

"সব রকমই ত মনের মধ্যে আসে।"

"তাই দেখছি। আমিও কেমন এসেছি তোমার মনের মধ্যে।"

যা ঠিক ভেবেছিল নলিনেশ। মফস্বল শহরে স্টেশন থেকেই ভিড়। থানায় কিছুটা বা পাতলা ছিল, আদালতে লোকারণ্য। স্কুলের ছেলেরা পর্যন্ত কেউ দিয়েছে। হাঁ, কাঠগড়ায় গিয়েই দাঁড়াল নলিনেশ। সত্যের জন্যে প্রেমের জন্যে বলি হতে এসেছে এমনি মুখ করতে চাইল, কিন্তু জনতার মুখে তার এতটুকুও প্রতিবিম্বন দেখল না। কাউকে খুন করে এসেছে এমনি হলেও বুঝি দেখতে পেত মমতার ছায়া করুণার কান্তি। এখন চারদিকে শুধু ঘৃণা, ধিক্কার, নির্বাক তিরস্কার।

যা ভেবেছিল। মণিলাল সব মোক্তারদের হাত করেছে। এমন কেউ নেই যে নলিনেশের পক্ষে একটা জামিনের দরখাস্ত করে। ভেবেছিল সহকর্মী কেউ আসবে তার সাহায্যে। কিন্তু না, কেউ আসেনি। সমস্ত শহর, সমস্ত মধ্যবিত্ত ভদ্র সমাজ তার উপর ক্রুদ্ধ, খড়্গহস্ত। এত বড় অনাচারকে সামান্যতম প্রশ্রয় দিতেও কেউ রাজি নয়।

পরমা অস্থির হয়ে উঠল। সে ত খাঁচার মধ্যে নয়, সে ত কিছু করতে পারে বাইরে থেকে। এখনও কিছু পারে। নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তা হলে ত তার নিজের উপরেই ফিরে আসছে। হৃৎপিণ্ড তাল ভুল করতে লাগল। কিন্তু কী সে করবে, কাকে বলবে, কাকে ধরবে? আর সে এমনি জড়পদার্থ বলেই নলিনেশ চলে যাবে হাজতে?

হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখল নীলুদা।

বিয়ের পর সোহিনী চলে গেলেও আসর গুটনর পালা এখনও শেষ হয়নি, তাই নীলাদ্রির কাঁচড়াপাড়ায় ফিরে যেতে দেরি হচ্ছিল, এমন সময় কানে এল এই ব্যাপার। তবে আর কথা নেই, এগতে হবে নীলাদ্রিকে। রুদ্ধ দ্বারকে অনর্গল করতে হবে।

কে তার নলিনেশ? কেউ নয়। তবে তার কেন এই মাথাব্যথা। মাথাব্যথা পরমার জন্যে। কে তার পরমা? তার সোহিনীর বন্ধু। পরমার কষ্ট মানে সোহিনীর কষ্ট, পরমার বিপদ মানে সোহিনীর বিপদ। কে তার সোহিনী? তার সোহিনী!

"ওঁকে যে করে পারুন জামিনে খালাস করে আনুন।" পরমা হাতের দুগাছি সোনার চুড়ি খুলে দিল নীলাদ্রিকে। বললে, "এ চুড়ি সোহিনীর দেওয়া। আমার প্রথম পাথেয়।"

নীলাদ্রি নিল তা হাত পেতে। বললে "তুমি ভেব না। মোক্তার না জোটে আমি ওপাড়া থেকে উকিল নিয়ে আসছি।" বলেই তার সাইকেলে উঠে ছুট দিল।

পুলিস ভেবেছিল পরমার একটা বিরুদ্ধ বিবৃতি পাওয়া যাবে হয়ত। কিন্তু নীলাদ্রির সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের পর আর সে আশা রইল না। আরও কিছুকাল প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দিলেন, পরমাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হক।

যাবার সময় নলিনেশের মুখের দিকে তাকাতে চাইল পরমা, কিন্তু চোখের সঙ্গে চোখ মেলাতে পারল না। তোমাকে অকারণে ম্লান করে দিয়ে গেলাম, রেখে গেলাম পরিত্যক্ত অরণ্যে। আমি কোন সুখে আর ঘরে থাকব। আমার কালকের রাতের পর আজকের রাত কী করে কাটবে?

পরমাকে তার মামাবাড়িতে পৌঁছে দেবার সময় দারোগা বললে মণিলালকে, "মেয়েকে দিয়ে যদি আসামীর বিরুদ্ধে না বলাতে পারেন তবে সব বৃথা। দেখুন ভাঁজিয়ে-ভাঁজিয়ে—"

মেয়েকে ঘরে পুরে দরজায় আবার শিকল দিলেন রাজেশ্বরী।

এদিকে উকিল যোগাড় করেছে নীলু। বললে, "মশাই, এ নিয়েও থানা-পুলিস হয় নাকি?"

"কিছুমাত্র না। শুধু জবরদস্তি।" চশমার কাচ মুছে বললে উকিল, "শুধু হায়রানি।"

বললে কী হবে, ম্যাজিস্ট্রেট জামিন দিল না। ছাত্রীর সঙ্গে যাত্রী হওয়া, এ নিদারুণ অনাচার। বাছাধন একদিন থাকুক হাজতে। বিবেকদংশন না হক মশকদংশনটা কী বস্তু উপভোগ করুন।

নলিনেশকে নিয়ে চলল হাজতে।

বেড়া আগুনের মত দেশজোড়া আন্দোলন হচ্ছে, বন্ধনছেদনের আন্দোলন, কত লোক জেলে গেল ফাঁসি গেল বুকে পেতে গুলি খেল আর সে কিনা সেই পরিবেশে রাজদ্বারে এসেছে একটা মেয়ের প্রতি আসক্তিতে। যদি সামনে সে এখন আয়না পেত, দেখত, প্রতিচ্ছায়ায় নলিনেশ নয়, কে এক বিকৃতবুদ্ধি উন্মাদ।

জামিনের দরখাস্ত নিয়ে নীলাদ্রি গেল জজের কাছে। উকিলের থেকে সব শুনে হাকিম বললেন, "এ কী হুজ্জত, প্রাইমা ফেসি কেস কই?"

"নাথিং। নট এ জট।"

"মেয়ে কী বলে? স্টেটমেণ্ট আছে?"

"নিতে সাহস করেনি পুলিশ।" চশমার কাচ মুছল উকিলঃ "মেয়ে বলে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে বেরিয়ে এসেছে—"

"তবে পুলিশ ফাইন্যাল রিপোর্ট দিচ্ছে না কেন?"

"দেবে শেষ পর্যন্ত। শুধু নাকাল করা, কদিন একটু নাকানি চোবানি খাওয়ান।"

"কি না জানি নাম বললেন মেয়েটির? পরমা—প্রেমা—চেনা চেনা মনে হচ্ছে যেন।"

"আমাদের মণিলালবাবুর ভাগ্নী। গার্জিয়ানশিপ মামলা আছে এ কোর্টে, সেখানেই বয়স লেখা আছে ঠিকঠাক।"

প্রাসঙ্গিক নথিটা আনালেন হাকিম। দেখলেন, পরমার বিয়ে আসন্ন এই অজুহাতে তার নামের বাকি টাকা থেকে তুলে নেবার জন্যে দরখাস্ত করেছেন মণিলাল, তার সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত গার্জিয়ান। এদিকে বিয়ের নামে টাকা তোলবার দরখাস্ত, ওদিকে বিয়ে আটকাবার জন্যে পুলিশী পরোয়ানা। টাকা তুলতে পারেনি ত এখনও? না, পারেনি। কোর্ট থেকে বিয়ের খরচের এস্টিমেট চাওয়া হয়েছে, দশদিন বাদে তার তারিখ। আর ওয়ার্ড, পরমা একুশ হচ্ছে কবে? গোনা-গুনতি সাত দিন পর।

হাকিম গার্জিয়ানকে মানে মণিলালকে হুকুম করলেন সাত দিন অন্তে পরমাকে তাঁর কাছে হাজির করিয়ে দিতে হবে। আর নলিনেশকে সামান্য জামিনে খালাস দিয়ে দিলেন।

"ওরে ও চয়ন সিং, তুই আছিস?" নলিনেশ বাইরে থেকে হাঁক দিলঃ "তবে দরজা খুলে দে, আমি এসেছি।"

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে দরজা খুলে দিল চয়ন। জিজ্ঞেস করল, "কোথায় ছিলেন বাবু এ কদিন?"

"কোথায় আবার থাকব! এখানেই ছিলুম। এই আমার সেই বাড়িঘর, বই-খাতা, বিছানা-বালিশ। এই আমার সেই তুই আর আমি। নে, দাড়ি কামাবার জল দে, স্নানের জল ঠিক কর, কী রান্না করেছিস? জানিস বেফাঁস একটা মামলায় জড়িয়ে গেছি, সাত দিন পরে আবার তারিখ পড়েছে। ঐটুকু হাঙ্গাম না থাকলে, উঃ, কী মজাটাই যে হত। আবার তোকে এক প্লেট রসগোল্লা আনতে বলতাম, আর তা আমি আর তুই দুজনে মিলে সাবাড় করতাম টপাটপ।" চয়ন হাসল একগাল।

কাজেই জেল দিনটা বাড়াবার জন্যে কলেজে দরখাস্ত পাঠাল নলিনেশ। আর দিনের দিন ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে গিয়ে হাজির হল।

পরমাও এসেছে তার মামার সঙ্গে। সাজে-গোজে জাগা মনের ছোঁয়া লাগিয়ে। নলিনেশ তাকাতে চাইল তার চোখের দিকে। ঘুমে জড়ান না-ভোলা রাতের চোখের দিকে। কিন্তু ধরতে পেল না। ফিরেছে না ফেরেনি নিভেছে না নেভেনি কী লেখা আছে চোখের কালো কালিতে তা কে জানে! আসবে এও ভয়, চলে যাবে সেও ভয়। ভয় কি কিছুতেই যাবে না? জয় করেও ভয় যায় না। এই কি ভালবাসার ধারা? খোঁজা শেষ হলেও কি খোঁজার শেষ নেই?

পুলিস ফাইন্যাল রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট নলিনেশকে 'ডিসচার্জ' করে দিল।

"আর আমি?" শিহরসুন্দর চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলে পরমা।

"আপনি যেখানে খুশি যেতে পারেন। একলা কিংবা যার সঙ্গে আপনার খুশি।" বললে ম্যাজিস্ট্রেট।

নলিনেশ একটু অপেক্ষা করল বারান্দায়, একটু বা সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে। কিন্তু কই কেউ ত তার আঁচলের উত্তাপ নিয়ে দাঁড়াল না গা ঘেঁষে। দুই চোখে মুক্তোরত কাননের আনন্দ নিয়ে। বুকে সুপ্ত বিহঙ্গের নীড় নিয়ে। বরং, এ কী নিদারুণ, মণি-লালের সঙ্গে চলে গেল ভিন্ন পথে।

একটা রিকশাতে করে অনেকক্ষণ শহর ঘুরল নলিনেশ। রাস্তাঘাট দোকানপাট লোকজন গাড়িঘোড়া সব যেন অপরূপের পোশাক পরেছে, রিকশার ঘুরন্ত চাকায় যেন কোন নতুনের ভাষা—তুমি যেখানে খুশি যেতে পার, যদি চাও ত একা-একা, দূরে-কাছে আড়ালে-আদালে সদরে-মফস্বলে। মুক্তির মত সুখ নেই, মুক্তির মত রোমাঞ্চ নেই।

তবু, দেরি করে যখন বাড়ি ফিরল তখন এ কি আশা করেনি বাড়ির মধ্যেই দেখতে পাবে সে মূর্তিমতী মুক্তিকে?

"কেউ এসেছিল?" চয়ন সিংকে জিজ্ঞেস করল নলিনেশ।

"কেউ না।"

তবে শূন্যতাই কি মুক্তি? শুভ্রতাই কি নিশ্চিন্ততা? কিন্তু শূন্যতারও যে শেষ প্রান্তে একটি রেখা আছে, শুভ্রতায়ও যে লেগে আছে একটি কালিমার স্বপ্ন!

বারান্দায় মণিলাল অপেক্ষা করছে, জজের খাস কামরায় ভীরু পায়ে একা-একা ঢুকল পরমা। বসুন, না বস, কী বলবে এক পলক ভাবতে চেষ্টা করলেন হাকিম। পরে বললেন, "বস।"

প্রকাণ্ড টেবিলের ধার ঘেঁষে পাশের চেয়ারে বসল পরমা। সামান্য সূচীপত্র কোন বিরাট গ্রন্থের নির্দেশ হতে পারে উপর-উপর কে বোঝে?

"তোমার বিয়ে হচ্ছে?" জিজ্ঞেস করলেন হাকিম।

লাজুক হাসির লাবণ্য লাগল মুখে। কোন কথা বললে না।

"যদি এ সময় তোমাকে কিছু টাকা দিই কেমন হয়?"

"টাকা?" চমকে উঠল পরমা। চোখে যেন আলাদিনের প্রদীপ জ্বলে উঠলঃ "আপনি—"

"না, আমি না। তোমার নিজের টাকা।"

"আমার নিজের?"

"তোমার নিজের মানে তোমার বাবার। তোমার বাবা তোমার নামে আলাদা করে অনেক টাকাই রেখে গিয়েছিলেন, অথচ খরচ হতে হতে এখন তার সামান্য কিছুই আছে, যদি বল ত তোমাকে দিতে পারি। তোমার একুশ বছর পূর্ণ হয়েছে, তুমি সম্পত্তির ব্যাপারে সাবালক হয়েছ, তাই এ-টাকা তোমার প্রাপ্য। নেবে?"

"কত?" জিজ্ঞেস না করে পারল না পরমা।

"দু হাজার।"

"এত?" এ লোভের চেয়েও বেশী।

"হ্যাঁ, এ টাকার মালিক এখন তুমি—এ তোমার টাকা, তোমার নিজের কবজায়, নিজের এক্তিয়ারে। তুমি এখন তা ওড়াও-পোড়াও দান-খয়রাত কর তোমার ইচ্ছে।"

"এখুনি পাব?" পরমার চোখ চকচক করে উঠল।

"এখুনি। এই মুহূর্তে। হাতে-হাতে। নগদ। একশ টাকার, যদি বল ত, দশ টাকার নোটে—"

যেন চোখের সামনে অন্ধকার দেখল পরমা। বললে, "এত টাকা কী করে নেব? যদি কেউ কেড়ে নেয়?" বারান্দার দিকে ভুরু বেঁকিয়ে ইঙ্গিত করল।

সে ভ্রূকুটির মানে বুঝলেন হাকিম। বললেন, "হ্যাঁ, সে ভয়ের কথা আমি জানি। তাই আমি তোমার সঙ্গে লোক দিচ্ছি, তোমাকে ব্যাঙ্কে নিয়ে যাবে। সেখানে তুমি সেভিংস অ্যাকাউণ্ট খুলবে, টাকাটা রেখে দেবে জমিয়ে। তারপর যখন দরকার চেক কাটবে। খুব কায়দা করে সই করবে নিজের নাম।"

দুঃসহ রোমাঞ্চ। চতুর্বর্গের অর্থটাই বুঝি বাকী ছিল, তাও অকৃপণ ভাগ্য মিলিয়ে দিল অহেতুক। চেয়ারের মধ্যে নিজেকে যেন ধরে রাখতে পারছে না পরমা, উছলে উছলে উঠছে।

নাজিরকে ডেকে টাকাটা পাইয়ে দিলেন সত্যি সত্যি। একথাম ভর্তি একগাদা নোট। মণিলালকে বললেন, "এ-টাকাটা

এখন ও ব্যাংকে রাখবে, ভালই হবে, কী বলেন?" আর আমলাকে বললেন, "ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে আমি ফোন করে দিয়েছি, যান, সব পাকাপাকি করে দিয়ে আসুন।"

আমলা পরমাকে নিয়ে রওনা হল। আর কোন তার কর্তৃত্ব নেই, মণিলাল তাকিয়ে রইল হতাশের মত।

ব্যাংকে গিয়ে পরমা বললে, "হাজার টাকা জমা রাখব। আর বাকীটা আমার হাতে থাকবে।"

অনেক উদ্দীপ্ত অপব্যয়ের স্বপ্ন দেখছে বুঝি পরমা। খরচে ক্ষয় হয়ে যাওয়া উড়ুন তুবড়ির জাইফুল।

আমলা বললে,—"যা আপনার খুশি।"

চেকবই আর পাসবই নিয়ে রানির মত উঠে দাঁড়াল পরমা। স্বাধীনতার ঘরে সামর্থ্যের চাবি মিলল এতদিনে।

এখন কোন্ দিকে যায়! যদি কিছুদিন আগে এ টাকাটা তার হাতে আসত ত কোন দিকে যেত! রিকশা নিয়ে অগত্যা পরমা চলল তার মামার বাড়ির দিকে।

"কী হল?" মেয়েকে ফিরে আসতে দেখে অনেক কিছু আশা করে রাজেশ্বরী এগিয়ে এলেন।

"ছেড়ে দিয়েছে।"

"আর তুই? তুই ছেড়ে দিয়েছিস?"

পরমা চুপ করে রইল।

যখন নিজের থেকে ফিরে এসেছে তখন ঈপ্সিত অনুকূলে মনে মনে এই ব্যাখ্যাই করলেন রাজেশ্বরী, কিন্তু মণিলাল বাড়ি ফিরে এসে অন্যরকম রব তুললেন। এ পর্যন্ত বলে এসেছেন—মেয়েকে আটকা, বন্ধ কর, এখন বলতে শুরু করলেন,—তাড়িয়ে দে, ঘরের বার করে দে। ওকে আর এখন বাড়িতে রেখে লাভ কী? জাত-মান সব ত দিয়েছেই, টাকাকটাও দিয়ে এল।

"দিয়ে এল?" মণিলালের স্ত্রী আর্তনাদ করে উঠলেন।

আমার টাকা আমি যাকে খুশি দেব, এমন করে বললে না পরমা। শুধু বললে, "আমি কী জানি, কোর্ট থেকে হুকুম হল ব্যাংকে টাকাটা সরিয়ে রাখতে, তাই রেখেছি।"

"তার মানেই তাই। প্রেমের ইনকাম-ট্যাক্স।" এবার মামিমা থেই ধরলেন।

মেয়ের সঙ্গে বন্ধ ঘরে নিভৃত হলেন রাজেশ্বরী। আর নিভৃত হতেই পরমা এক-রাশ টাকা রাজেশ্বরীর শাড়ির আঁচলে বেঁধে দিল। বললে, "মা, এ আমার টাকা, এ আমি তোমাকে দিলাম।"

লোভালু চোখে তাকালেন রাজেশ্বরী। কণ্ঠস্বর ঝাপসা করে বললেন, "কত?"

পরমাও গলা নামাল: "হাজার। সাবধানে রেখে দাও তোমার কাছে। মলয়ের টাকাও আমি বাঁচিয়ে দেব। মামাকে সরিয়ে আমিই নতুন গার্জিয়ান হব তার। ওকে নিয়ে যাব আমার কাছে। আমি আর অযোগ্য নই অশক্ত নই। আমাকে তুমি আশীর্বাদ কর।"

রাজেশ্বরীর মন বুঝি মোড় ফিরল। কণ্ঠস্বরে করুণা মিশিয়ে বললেন, "কিছুতেই ফিরবিনে?"

"ফেরবার পথ আর নেই মা।" মাকে প্রণাম করল পরমা। বাবার ফটোতে হাত বুলিয়ে আদর করল সস্নেহে। মাকে দেখতে বলল খিড়কির দিকটা নিরিবিলি কিনা।

আজ রাজেশ্বরীর কত ভাবনা: "পারবি যেতে একা একা?"

"পারব। আর কত দূরেই বা যাচ্ছি—" পরমা বেরিয়ে গেল।

দেখল বারান্দায় বসে আছে চয়ন সিং। বাবু? ঘুমচ্ছেন। এখন মোটে সন্ধ্যা, এখনি ঘুম? বাবু বলছেন, একশ বছর নাকি ঘুমোননি, এক রাতে পুষিয়ে নেবেন।

ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল পরমা।

"ও বাঁদর, আলো জ্বাললি কেন? বললুম না তখন—সে কী, তুমি—তুমি এসেছ?" নলিনেশ চোখ কচলাতে লাগল।

"তবে কি ভেবেছিলে আর আসব না?"

"ঠিক অতদূর ভাবিনি। তবে মনে হয়েছিল তোমাকে আবার বাঁধতে আর আমাকে লড়াই করতে হবে নতুন করে।" আরামে চিত হল নলিনেশ: "এসেছ না শ্মশানে শান্তি নেমেছে। এবার হাত লাগাও নিজের সংসারের পিয়ানোতে—টুং টাং টুং টাং। আমি শুয়ে-শুয়ে শুনি—"

"নিজের সংসার, না শিবের সংসার!" হাসতে চাইল পরমা।

"ও একই কথা। শিবোহং, শিবোহং।" বুকের উপর দুই হাত যুক্ত করল নলিনেশ: "তারপর একটু রান্নাবান্নাটা দেখ, পেট ভরে খাও, তারপর বিস্তীর্ণ নিদ্রা দাও। তুমিও নিশ্চয় আমারই মত এখন ঘুমের জন্য পিপাসিনী—"

"আজ্ঞে না, উঠুন, ঘুমবার সময় নেই—" কী অদ্ভুত লাগছে গলা থেকে পরিহাসের সুর বের করতে। "গা তুলুন সূর্যদেব।"

"যদি কোন কিছুর সময় থেকে থাকে তা হচ্ছে ঘুম। সূর্য যে কেন একদিন কাজুলেভ লিভ নেয় না, তা কে জানে।" আবার পাশ ফিরল নলিনেশ: "আজ আর সংকীর্ণ হবার দরকার নেই। থানা থেকে আমানতী জিনিসপত্র সব দিয়ে গেছে, মায় বিছানা। আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদ-খানি—"

"তারপরেই 'ভোরে উঠেছি।' তোমাকে রাতেই উঠতে হবে।" নলিনেশের একটা পা ধরে টানতে লাগল পরমা: "মধ্যরাতে আবার ট্রেন ধরতে হবে কলকাতার। এখনও সব কিছুই বাকী। বিয়েটাই হয়নি এখনও।"

জগদ্দল পা, নাড়ায় কার সাধ্য?

নলিনেশ নিঝুমের মত বললে, "কী দরকার! এই ত বেশ আছি। তুমিও বেশ আছ। ধুতুরার বনে মালতী হয়েই ফুটে থাক অজস্র—"

"শুধু ফুটে থাকব?" এবার হাত ধরে টানাটানি শুরু করল পরমা: "শুধু বেশ? শুধু সাজগোজ?"

গায়ের জোরে পারছে কই পরমা? তবে? গলায় ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল অব-শেষে। অসহায়ের মত মুখ করে উঠে বসল নলিনেশ। মাথা চুলকোতে লাগল। সে কি আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে, নিরাভ, নিষ্কবচ? একটু খেলো একটু গুজোলো। একটু বা অকেজো। একটু বা অসার! দেবের পাখা কি এখন অনাদরের ঘরে নেমে যাচ্ছে?

উপায় নেই। অজানার পাহাড়চূড়া থেকে এখন যে সে নেমে এসেছে প্রাত্যহিকতার সমতলে!

"উপায় নেই। তবে আবার প্যাক কর। চল কলকাতায়। অনুষ্ঠানটা সেরে আসি।" শুকনো গলায় বললে নলিনেশ।

কত কারুকার্য দরকার হাত দেহে মনে, কত কাঠিন্য ও ধৈর্য, সেই দূরত্বকে ও গাম্ভীর্যকে নিয়ে আসতে। আবার তার সঙ্গে মেশাতে হবে ক্ষমা আর স্নেহ যাতে না বৈরাগ্য বলে দেখায়, না বা নিষ্ঠুরতা!

সেই মধ্যরাত্রির ফিরতি ট্রেনের কামরায় আবার পাশাপাশি বসেছে দুজনে। বেঞ্চের পিঠে ঠেস দিয়ে ঘাড় কাত করে ঘুমোচ্ছে নলিনেশ। পরমার ঘুম নেই। বাইরে দূরের অন্ধকার দেখছে আর মাঝে মাঝে নলিনেশের মুখ। অনেক কান্নার পর রুগ্ণ শিশু যেমন ঘুময় তেমনি দেখাচ্ছে তাকে। কে বলবে একজন জ্ঞানী গুণী বিদ্বান বিদগ্ধ, বীতরাগশীততাপ, অনু-ভবের অগম্য দেশের যাত্রী—মনে হচ্ছে অনাশ্রয়, অনুপায়, গৃহহারা।

কত না-জানি আরও ক্লান্ত আরও দগ্ধ করব তাকে। এমন কথাও পরমা না ভাবছে তা নয়। বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে তার মসৃণ জীবন থেকে। হয়ত বা আচারভ্রষ্ট হয়েছে, মূলচ্যুত। মায়ায় দু চোখ ছলছলিয়ে এল পরমার। যেন কিছু নয়, হাতের উপর একটু হাত রাখল লুকিয়ে।

কলকাতায় পৌঁছেই পার্কসার্কাসে সোহিনীদের নতুন ফ্ল্যাটে হাজির হল দুজনে।

সুপ্রভাত আর সোহিনী হাত বাড়িয়ে ডেকে নিল।

"সব ঠিক করে ফেলেছি।" সোহিনী

বললে, "আজ অধিবাস, কাল বিয়ে।" কলকলিয়ে উলু দিয়ে উঠল।

ঘরদোর সুন্দর সাজিয়েছে গুছিয়েছে। সাফল্যের ঢেউ উথলে দিয়েছে চারদিকে। ছিটিয়ে দিয়েছে সিঁদুর-রঙা আনন্দের পিচকারি। কৃতকর্মতার চেকনাই।

নীচের তলার ফ্ল্যাটটা খালি আছে সেটা পরমা নিতে পারে ইচ্ছে করলে। একটা বাড়ীতে ঘর থাকলই বা না কলকাতায়, ভাড়া যখন সাধ্যের মধ্যে। তা ছাড়া সোহিনী যখন প্রতিবেশী।

"তা ছাড়া," সুপ্রভাত বললে, "বিয়ের নোটিশ যখন এখান থেকে দিতে হবে তখন এখানে একটা বাসা থাকা উচিত। আইনে বলছে অন্তত এক মাসের রেসিডেন্স—"

আবার হাঙ্গামা। মিইয়ে গেল নীলনেশ। নোটিশ দাও, বসে থাক, দিন গোন, সাক্ষী জোটাও, সই সাবুদ কর—হাজার রকম বায়নাক্কা। মরি তাতে খেদ ছিল না, এ যে কাঁটাবনের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া।

মুখে বললে, মন্দ কি। এতদিন একা একা মফস্বলে ছিল সে একরকম, এখন বিয়ের পর আত্মীয়-স্বজনের বাড়বে না আনাগোনা? সব সময়ে একঘেয়ে মফস্বলী সবুজের পরে ফুটুকই না একটু রাজ-ধানীর সোনার জল। মাঝে মাঝে একটু বা ক্ষুধা বাড়াবার উপবাস। দুরকমের দুটো সংসার, একই উপকরণে দুটো আলাদা স্বাদের রান্না। মন্দ কি! তারপর যদি বি-টি পড়ে পরমা। যদি চাকরির জন্যে বা বেরতে হয় চেষ্টায়।

"ঐ বড় বাড়িটা কাদের সোহিনী?" জিজ্ঞেস করলে পরমা।

"মিস্টার সি. সি চৌধুরী, রিটায়ার্ড আই. সি. এস-এর।"

"বাংলা নাম কী?"

"কেউ জানে না।" বললে সোহিনী, "সাহস করে একদিন গিয়েছিলাম পাড়া বেড়াতে, কুকুরের যন্ত্রণায় ঢুকতে পারলাম না।"

আশেপাশের প্রতিবেশীদের খোঁজ নিচ্ছে পরমা। "ঐ বাড়িটা কার রে?"

"কোনটা? যেটার দোতলার বারান্দায় ফুলের টব? ওটা গীতালির। চিনিস গীতালিকে? কী করে চিনবি? আমার সঙ্গে পড়ত, তুই ত আমাদের নীচে। ঐ ত ছেলে নিয়ে এসেছে বারান্দায়। দ্যাখ দ্যাখ ছেলেটা কেমন গুটি গুটি হাঁটছে।"

"গীতালি বোস?" যেন চিনল পরমা।

"হ্যাঁ, বিয়ে করে ব্যানার্জি হয়েছে।" কানের কাছে মুখ আনল সোহিনী: "আর, এই বছর খানেক।"

আর বাকী সব?

হিন্দু মুসলমান অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান জু

যদি এ-সময় তোমাকে কিছু টাকা দিই, কেমন হয়?

পশ্চিমী-দাক্ষিণী সব আছি আমরা পাশা-পাশি। জায়গার নাম সার্কাস, তাই খেলোয়াড়-জানোয়ার ক্লাউন-ক্রিমিন্যাল সব রকমই থাকবে। কিন্তু, শোন্, হ্যাঁ রে, নীলুদার কোন খবর রাখিস?

পাঁচ

বাসুদেব ব্যানার্জি অফিসে বেরুচ্ছে, ডাকপিওন চিঠি নিয়ে এল। তিনখানা খামের চিঠি, ঠিকানা পড়ে দেখল তিনখানাই গীতালির।

গীতালি এগিয়ে দিতে এসেছিল, চিঠি তিনটে তার হাতে দিয়ে হাসিমুখে বাসুদেব বললে, "তোমার কী ভাগ্য। তোমার কত আত্মীয় বন্ধু—"

"আমার পাস্ট কত বড়—" শরীরে ঢং ফুটিয়ে পরিহাস করল গীতালি।

গীতালি যা করে যা বলে সবই সুন্দর দেখে বাসুদেব। তার যা সব ত্রুটি তাও যেন সত্য নয়, ছলনার নামান্তর। বাসুদেব বললে, "আর পাস্ট মাত্রই গৌরবময়, কী বল?" হাত তুলে টা-টা জানিয়ে ছুট দিল ট্রাম ধরতে।

এক-এক করে চিঠি খুলতে লাগল গীতালি।

মনে পড়ল, যখন বিয়ে হয়, গীতালি

জিজ্ঞেস করেছিল বাসুদেবকে ঃ "আমার নামে অনেক দুর্নাম শুনেছ?"

"কই, না ত।" যেন হতাশার মত মুখ করল বাসুদেব। ভাবখানা এই—যখন গীতালির সম্পর্কে, তখন দুর্নামও সুন্দর। একটু থেমে নিয়ে বললে ঃ "তা ছাড়া দুর্নাম খানিকটা জেল্লাস। চরিত্রের নুন। যার একটু দুর্নাম নেই তার যেন জোরও নেই ধারও নেই।"

রসে হাস্যে হৃদয়ে ভরা মানুষ। জীবনের থালায় এমন আশ্চর্য-মনোহরকেও পরিবেশন করে ভাগ্য এ একেবারে অজানা। অজানা আছে বলেই ত আমিও আছি। অজানা আর কে, আমারই হৃদয়ের তন্তু দিয়ে সে বোনা। আমিই অজানা। নইলে কে জানত আমিও আবার দেখব রোদে স্বাদ, অন্ধকারে মধু, মানুষের মুখেই দেবতার মুখ। শুধু অশ্রুজলেই এত তৃপ্তি। এই অজানা দৃষ্টি অচেনা অনুভব ত আমারই মধ্যে লুকনো ছিল। অন্ধকূপের বাইরে যে আছে অপরিমেয় স্বভাব-নিশ্বাস এ ত আমার আবিষ্কার। জীবন যে নির্মম সমর্পণ নয়, নিঃশেষ সমর্পণ এ ত আমার প্রবন্ধ।

বাসুদেবের সামনে সরকারিভাবে যখন গীতালি প্রথম এসে দাঁড়াল, খোলা-ঢালা পোশাকে, সদ্য স্নান করে, ভাবতেও পারেনি, এত সহজেই ভুললে ওর চোখ। সে কি তার নিজের গুণ, না ওর চোখের পবিত্রতা! হায়, তার নিজের গুণ! মা যদিও একবার বলেছেন, মাঝে খুব ভুগল টাইফয়েডে, তাই এত কাহিল-রোগাটে দেখাচ্ছে, ওর দুই চোখ তাই ক্ষমা করে নিল, শোধন করে নিল। বললে, "তা অসুখ বিসুখ ত হতেই পারে—"

সঙ্গে একজন বন্ধু নিয়ে এসেছিল, দাদারা বললেন, "কিছু জিজ্ঞেস করবেন নাকি?"

"বি. এ. পাস করা মেয়েকে আর কী জিজ্ঞেস করব?"

তবু গলার স্বরটা একটু দেখা দরকার। মুখচোখের ভঙ্গিই বা কেমন হয় কথার সময়! তারপর যদি একটু হাসান যায়! কেমন দাঁড়ায় না জানি দাঁতের সার।

বাসুদেব জিজ্ঞেস করল "গান জানেন?"

ঘাড় হেলাল গীতালি।

"গাইবেন?"

বলল না গলাধরা আছে। বা বাজনা নেই। বা বই লাগবে। বা অন্য কোন জাঁটের কথা। স্বচ্ছন্দে গান ধরল। মুক্ত কণ্ঠে বই না দেখে বাজনার সাহায্য না নিয়ে। মুখস্থের গান নয়, প্রাণভরা গান।

বন্ধু রসিকতা করবার চেষ্টা করল ঃ "সাধে কি আর গীতালি নাম?"

"আলি বা আবলি যখন তখন ত একাধিক গাইতে হয়।" বললে বাসুদেব।

এতটুকু আয়াস নেই আড়ম্বর নেই, গীতালি আর-একখানা গান গাইল।

গীতার এক দাদা জিজ্ঞেস করল বাসুদেবকে, "আপনি গান জানেন?"

"আমার ত এক গুণ নয় আমার ডবল গুণ।" গম্ভীর হল বাসুদেব।

"তার মানে?" গীতালিও তাকাল উৎসুক হয়ে।

"আমার গুনেগুনে। মানে আমি গুনে-গুনে করি।"

সবাই হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গীতালিও। তার দাঁত দেখা গেল। মাজা-মাজা মিছরির দানার মত সুন্দর দাঁত।

বাসুদেব বলে ফেলল, "ঠিক আছে।"

ঠিক আছে। এ শব্দপথ যে কবে কে চালু করেছে বাংলা ভাষায় কে বলবে। একটু যেন বোকার মত শোনাল। একটু বয়ে সয়ে দেখে-শুনে বলতে হয়। কিছুই কি ঠিক আছে, না থাকে? কেউ-কেউ বলবে ঝটিতিই ঠিক নীতি, দাঁও ফসকাতে দিতে রাজী নয় ছোকরা। নগদে আসবাবে দশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে, তার উপরে মার গয়না, এ-জোনামাঠে কেউ ছাড়ে না। যদি পাই রূপোর কুচি, কথায় বলে মুচিকেও করি শুচি।

চাকরিদার ছেলে, উন্নতি বুঝতে সমধিক বোঝে, তাই সবাই বললে রূপ না দেখে রূপোচাঁদ দেখেছে।

কিন্তু মুক্ত গগনে এসে গীতালি ছাড়া আর কে বেশী জানে বাসুদেব দেখেছে সাঁচ্চা রূপোর চাঁদ।

গীতালি জিজ্ঞেস করেছে ঃ "আচ্ছা, তুমি কাউকে ভালবাসনি?"

"দাঁড়াও, হিসেব করে নিই।" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হিসেব করবার ভান করল বাসুদেব। পরে বললে, "বেসেছি হয়ত।"

"তবে তাদের কাউকে বিয়ে করলে না কেন?"

"কেন? তোমাকে বলি।" খুব বিজ্ঞের মত মুখ করল বাসুদেব ঃ "যেখানে ভালবাসার পরে বিয়ে সেখানে বিয়েতেই শেষ। আর যেখানে বিয়ের পরে ভালবাসা সেখানে ভালবাসাটা অশেষ। আগেরটাতে শুধু পৌঁছন, পরেরটাতে অতিক্রম করে যাওয়া। তাই তুমি আমার গন্তব্যের চেয়ে বেশী আমার লক্ষ্যের চেয়েও দূর।"

"কিন্তু কেন, কেন তুমি আমাকে ভালবাস?" আরও ভালবাসা পাবার জন্যেই অমনি করে বলে গীতালি ঃ "কেমন করে আসে এ ভালবাসা।"

"এ যেন মাটিকে বলা কেন তুমি ফুল ফোটাও? কবিকে বলা কেমন করে তোমার কবিতা আসে?"

প্রথম পরিতুষ্ট প্রেমের সংস্পর্শে এসে সব পুরুষই বাক্যে ও ব্যবহারে একটু ভাবুক হয়। নইলে বাসুদেব এমনিতে ফেল কড়ি মাখ তেল-এর লোক। এখন সে যেন মাখতে না পেলেও কড়ি ফেলতে রাজী। তুমি কারুর চেয়ে কম নও। তোমার মধ্যে এমন কিছু আছে—কী আছে ঈশ্বরও বলতে পারে না—যাতে তুমি সকলের চেয়ে মূল্যবান। আমার স্পর্শের তিলকেই তুমি অসাধারণ।

সব শেয়ালের এক রা। সব গভর্নমেন্টেরই শেষ পর্যন্ত গুলিচালান।

গীতালি বললে, "কিন্তু তুমি হয়ত জান না আমি চোরাবালি।"

বাসুদেব উদার প্রশান্তিতে হাসল। বললে, "চোরাবালিই আমার ফসলের খেত।"

এক-এক করে তিনটে চিঠিই পড়ল গীতালি। তৃতীয় চিঠিটা সবচেয়ে ছোট আর সেটা, সেটুকু পড়তে পড়তেই, চোখে যেন অন্ধকার দেখল, পায়ের অন্ধকার। চেয়ারের উপর বসে পড়ল, বসে পড়ল নয়, ভেঙে পড়ল। চুলের খোঁপাটা কাঁধ বেয়ে পিঠে গড়িয়ে পড়ল, গায়ের উপর থেকে শাড়ির আঁচল খসে পড়ল এক পাশে। একটি মুহূর্তের চূড়ার উপর এসে তন্ময় হয়ে গিয়েছে গীতালি।

না, বসবার সময় নেই। কৃতনিশ্চয় হতে দেরি কিসের?

উঠে বাড়ির লোকদের—এক খুড়শ্বশুর আর শাশুড়ী থাকেন, আর তাঁদের দুই ছেলে-মেয়ে এখন স্কুলে-কলেজে আগে ব্যাপারটা তারপর রাস্তার ওপারে একটা ডিসপেনসারিতে গিয়ে ঢুকল।

ফোনটা ব্যবহার করতে পারি? করুন।

রিসিভারটা তুলে নিল গীতালি।

"হ্যালো। শুনেছ?"

"কে?"

"আমি গীতি?"

"কী ব্যাপার?"

"চিঠিগুলো ত পড়ে গেলে না। তৃতীয় চিঠিটা খারাপ।"

"কেন, কী হয়েছে?" বাসুদেবের স্বর আধচমকা।

"আমার সেই মীরাদির কথা বলিনি তোমাকে—আমার সেই মামাতো বোন—"

"হ্যাঁ, বলেছ হয়ত। তার কী হয়েছে?"

"সাংঘাতিক অসুখ। মর-মর। আমাকে ভীষণ দেখতে চায়। দিদি হলে কী হবে, পড়তাম এক সঙ্গে। গলায়-গলায় ভাব ছিল—" গুরুত্ব বোঝবার জন্যে কথাটা পল্লবিত করছে গীতালি।

"হ্যাঁ ছিল, এখন কী করতে চাও?"

সংলাপটা তাড়াতাড়ি সারতে চায় বাসুদেব।

"যেতে চাই। আর এই দুপুরের ট্রেনে।"

"লাঞ্চ টাইমে আমি বাড়ি আসছি, তখন সব ঠিকঠাক করে দেব।" বাসুদেব রিসিভার প্রায় নামিয়ে রাখে আর কি।

"শোন, হ্যালো, হ্যাঁ," ধরতে পেরেছে গীতালি: "শোন, অতক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না। মুমূর্ষু রুগী, পত্রপাঠ যেতে লিখেছে। একজনের অন্তিম ইচ্ছাটি রাখবার জন্যে প্রাণপণ করা উচিত। আমি এখুনি, আধ ঘণ্টার মধ্যেই, নেয়ে খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি—"

"একা পারবে যেতে?" বাসুদেবের প্রশ্নে স্নেহঘন উদ্বেগ।

"আহা, পঞ্চাশ-ষাট মাইলের ত মামলা—তোমাকে ভাবতে হবে না। কত দূরের রাস্তা একা একা পাড়ি দিয়ে এলুম এ ত পাছ-দুয়োর।"

"একটা পিওন-টিওন দেব সঙ্গে?"

"খোদ পেয়াদাই যখন সঙ্গে নেই তখন খুদে পেয়াদা নিয়ে কী হবে?" পরিহাসের সুর আনল গীতালি।

"শোন, বেশী করে টাকা নিও। কাকা-কাকিমাদের বুঝিয়ে বল ব্যাপারটা। আর পৌঁছেই ওয়্যার কোর।" প্রায় কান্না-কান্না ছোঁয়াচ লাগাল স্বরে: "ভেবেছিলাম আজ দুজনে সিনেমায় যাব নয় ত—"

রিসিভার রেখে দিয়েছে গীতালি।

পড়ি-মরি করে স্নান করল, নাকে-মুখে গুঁজল কি না-গুঁজল, তারপর ঘরে ঢুকল কাপড় বদলাতে। আপাদমস্তক আয়নায় নিজেকে দেখবে না ভেবেও দেখল একবার, স্থির হয়ে ভাবল সাজগোজ বা গয়নার ছিটে ফোঁটা গায়ে রাখবে কি না। গয়না ত পরে খুলে ব্যাগে রাখলেও চলবে, কিন্তু পরবে কী? রঙিন না সাদা? গায়ে কি একটা কুহেলিকার পর্দাচাদর ফেলবে, না কি স্পষ্ট হয়ে থাকবে তার দারিদ্র্যে?

কী কথা ভাবছে সে এখনও? তার চিঠি—চিঠিটা কই?

ত্বরিত বিস্মৃতিতে আটপৌরে শাড়ি পরল, গায়ে সেই ছন্দে নিরও ব্লাউজ। আর হাতে একটা কাঁধ-ঝোলান ব্যাগ।

কাকিমা বললেন, "কবে ফিরবে?"

আশ্চর্য, সে-কথাটা চিন্তা করেনি ত! মনে মনে একটু হিসেব করল গীতালি। বললে, "কতক্ষণ আর লাগবে? ওখানে—সেখানে—তারপরে যা হয়—হ্যাঁ, কাল, একদিন—একদিন লাগুক—হ্যাঁ, কাল, কালকেই ফিরে আসব।" পরে মনে-মনে জিভ কাটল। এ সে কী হিসেব করছে! পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে, "মর-মর রুগী কখন কী হয় কে জানে! এক-আধদিন দেরিও হতে পারে বা।" আবার ঘরের দাঁড়াল সিঁড়ির মুখে এসে: "না, বাঁচুক মরুক, আমি দেরি করি কেন? আমার দেরি করবার কারণ কী? না, তিনি ফিরলে বলবেন কালকেই ফিরে আসব।"

ট্যাক্সি নিল গীতালি।

মানিকতলার মোড়ে নেমে একটা খেলনা কিনল। তারপর আরও খানিকটা পুবে এগিয়ে এসে বাগমারির দিকে ঢুকল। একটা গলির মোড়ে দাঁড় করাল গাড়ি। এর পরে বাঁ-হাতি একটা কয়লার গুঁড়ো-ফেলা সরু গলি, সামনে সরফেলা ঘোলা-জলের বড় পুকুর, তার এদিককার দু ধারে সারবাঁধা বস্তি। সেটায় ঠিক ভিতরের রোয়াকের ধার ঘেঁষে নারকোলগাছ উঠে গিয়েছে সেটাই মেনকা-দির আস্তানা। দু-একবার আগে এসেছে গীতালি, এদিক ওদিক বাড়ি আরও বেড়ে গেলেও চিনতে দেরি হল না।

দোরগোড়াতে কস্তুরী বসে।

"এই যে বাপু এসেছ। ধড়ে প্রাণ এল। আর দুজনের ত দেখা নেই।"

"কী হয়েছিল মেনকাদির?"

"এ-সব বস্তিতে যা হয়।" চিত হাতে ভঙ্গি করে কস্তুরী বললে, "কলেরা।"

"কলেরা?" ভয়ে গীতালির মুখ এতটুকু হয়ে গেল। চোখ কপালে তুলে তাকাতে লাগল এ-পাশ ও-পাশ।

"আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সাবাড়।" লেপটে বসেছে কস্তুরী, উঠতে চায় না। "হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলাম, কিছু করতে পারল না। কত লোকের প্রাণদান করেছে কিন্তু ওঁর প্রাণ কেউ দিতে পারল না—"

"খোকা কেমন আছে?" ঢোঁক গিলে জিজ্ঞেস করল গীতালি।

"ভাল আছে।"

"আর দুজনের যে আর দুজন ছিল—"

"ওরাও।" ভাগ্যের বিধানে বিশেষ নয় কস্তুরী। বললে, "ওরা কি কেউ মরতে এসেছে? ওরা কিছুতেই মরবে না বলেই ত এই গেরো।"

"কোথায় খোকা?" ভিতরে আরো একটু পা বাড়াল গীতালি।

চিঠিগুলো ত পড়ে গেলে না

"কোথায় আবার! ঘরে। ঘুমুচ্ছে—"

সন্তর্পণে উঠল রোয়াকে। ঘরের দরজা খোলা। বাইরে থেকে উঁকি মারল। না, ঘরে রুগী কেউ নেই, তিনটি শিশু পাশাপাশি শুয়ে ঘুমুচ্ছে। একটি ছেলে দুটি মেয়ে।

ওই, ওই যে তার খোকন। ঠুঁটোর মতন মুঠো করে শুয়ে আছে চিত হয়ে। দিব্যি কাজল পড়িয়ে দিয়েছে দেখ। টেবোটেবো গালে কেমন ভারিক্কি ভারিক্কি ভাব করেছে! কই, না, ভারিক্কি কোথায়! চিবুকের খাঁজটিতেও স্পষ্ট একটি খুশির টান। তাকে চিনতে পেরেছে বুঝি। গীতালির বুকটা খালি-খালি লাগতে লাগল। ইচ্ছে হল ঐ আনন্দপুঞ্জটাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে একটু কাঁদে। কতদিন কাঁদেনি গীতালি। কাঁদিতে যেন ভুলে গিয়েছে।

তোমাকে পৃথিবীতে আনতে পেরেছি, বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি, যেখানে নিষ্ঠুর অন্ধকারের ওপারে আছে একটি শুকতারা। জন্মের কণ্টকবৃন্তের পর জীবনের পুষ্পোচ্ছ্বাস।

তারই জন্যে কান্না।

কিন্তু, না, এখন বুকের মধ্যে ধরতে গেলে ঘুম ভেঙে যাবে, কাঁদতে থাকবে, তখন যদি না আর শান্ত করা যায়।

কস্তুরী উঠে এল ঘরের মধ্যে। বললে, "এবার নিজের ছেলে নিজের কাছে নিয়ে যাও দিদি।"

"নেব।" নইলে চিঠি পেয়ে আসার মানে কী। "কিন্তু," গীতালি ভাবনাধরা গলায় বললে, "কিন্তু এ নার্সিং হোম কি তুলে দেবে?"

"আর নার্সিং হোম! যিনি নার্স ছিলেন তিনিই যখন চলে গেলেন তখন একে আর কী করে রাখা যায় বল।"

"কেন, তুমি রাখবে?"

"আমি কি ডাক্তারি জানি? কাটতে-ফুঁড়তে জানি? আমি ত শুধু ধাই।"

"আর গঙ্গা?"

"ও ত ঝি।"

"ও কোথায়? দেখছি না ত।" গীতালি উসখুস করল।

"বাজারে গেছে। আসবে এখুনি। বোস একটু। গাড়ি এনে দেবে'খন। বাচ্চাটাকে এবার নিয়ে যাও কোলে করে।"

"এখুনি?" গীতালি যেন হোঁচট খেলে চলতে-চলতে।

"যখন এসে পড়েছ তখন আর দেরি করে লাভ কী।" শিশুগুলোকে কস্তুরী পাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগল।

"আগে ঠিক করি কোথায় নিয়ে যাই। কোথায় রাখি। তারপর—" যেন ডুবজলের ভিতর থেকে গীতালি বললে।

"সে কী, দেরি কেন, দেরি চলবে না। এখন এসব ঝামেলা কে পোহাবে? দিদি ছিলেন—সে একদিন গেছে। এখন কে দেখবে-শুনবে? না নেবে ত," কস্তুরী মুখ বাঁকাল : "ভেসে যাবে, টেঁসে যাবে—"

"কাল—কাল নিয়ে যাব।" তারপর কুণ্ঠিতের মত বললে, "এ মাসের টাকা ত দেয়া আছে।"

"সে আর আছে নাকি কিছু? মেনকাদির অসুখেই সব শেষ হয়ে গেছে।"

"আর ও, দুই বাচ্চার কী হবে?" খোকনকে রেখে আর দুজনকে ইঙ্গিত করল গীতালি।

"সকলেরই এক হাল। দুদিন অপেক্ষা করব, তারপর লোকজন যদি কেউ না আসে বস্তিতে কাউকে বেচে দেব নয় ত কোন ভিখিরীর আড্ডায়। নয় ত—"

"নয় ত—" কত ভয়ের মধ্যে দিয়ে কেটেছে এ আবার আরেক নতুন ভয়।

"নয় ত," থামল না কস্তুরী : "নয় ত আর কী! পড়ে থাকবে একলা ঘরে। না খেতে পেয়ে মরে যাবে শুকিয়ে। এ দোকানপাট আমরা আগলাতে পারব না। আমাদের মাইনে দেবে কে?"

গঙ্গা এসে দাঁড়াল বাজার নিয়ে। সবাই আবার বেরুল ঘর থেকে। এক গাল হেসে বললে, "বাপ্, এসেছ, বেশ করেছ। এবার নিয়ে যাও যার যা আঁচলে সোনা। নিজের কাছে রাখতে নার বাপের কাছে রেখে এস; মনের অগোচর পাপ নেই, মায়ের অগোচর বাপ নেই। মেনকাদি ছিলেন সব সামলে সুমলে। এখন বাচ্চাগুলি যদি পুলিশের হাতে গিয়ে পড়ে তা হলে কোন্ বাড়িতে সাপ বেরুবে—লাভ হবে কী? লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাবে।"

ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করল গীতালি। কস্তুরীর হাতের মধ্যে নোটটা গুঁজে দিয়ে বললে, "আর-একদিন আমাকে সময় দাও। আমি কাল যা হক ব্যবস্থা করব।"

"যদি না আস?"

"তা হলে আরও একদিন।" ব্যাকুল হয়ে বললে গীতালি।

"না বাপু, পারব না এত দেরি সইতে।"

"যদি নিতান্তই না আসি, তা হলে যা ভাল বোঝ কর। আমি তখন আর কী বলব।" গীতালির দুই চোখ ছলছল করে উঠল। আর-একবার ঢুকল ঘরের মধ্যে। ইচ্ছে হল জাগিয়ে দিয়ে ওর একটু শব্দ শুনি। হয় কান্না নয় হাসির আওয়াজ। ওকে আদর করি। বুকের মধ্যে বেঁধে ছুটি মাঠ দিয়ে।

আর, শোন, এই খেলনাটা ওকে দিও। ও ত বুঝবে না এ ওকে কে দিল? যদি আর না আসি ওকে বল যেন এই রাঙা ঘোড়ায় চড়ে আমার কাছে চলে আসে একদিন। ব্যাগের থেকে খেলনা ঘোড়াটা বের করে কস্তুরীকে দিল।

তারপর বেরিয়ে এল সটান। স্টেশনে এসে ট্রেন ধরল।

মফস্বল শহরে যখন এসে পৌঁছল তখন রঙ্গমঞ্চের উইংসের ফাঁকে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা উঁকি ঝুঁকি মারছে, পূর্ণ প্রত্যক্ষ হয়নি।

খানিকক্ষণ স্টেশনে হেলাফেলা করল। খিদে পেয়েছে, লজ্জা কী, লুকিয়ে কিছু খেয়ে নিল। অন্ধকারটা একটু ডাঁসাল হক ততক্ষণ। তারপর বেরিয়ে এসে রিকশা নেব। দুজনেই, আমি আর রিকশা, মাথায় তুলে দেব ঘোমটা।

শুধু পাড়ার নাম নয়, রাস্তা ও বাড়ির নাম করলে। হাঁকডেকে বাড়ি। নামেই সবাই তটস্থ।

"বাবু বাড়ি আছেন?" গেট পেরিয়ে এসে ভিতর-দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করলে।

না, নেই, সিনেমায় গেছেন কিংবা বেরিয়ে গেছেন কিংবা কোন বন্ধুর বাড়ি, এমনি হয়ত বলবে। যদি তাই বলে, আবার আসব। যে করে হক, মধ্য রাতেই হক, ধরবই ধরব।

যদি বলে, আছেন কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে হুল্লোড়ী আড্ডা দিচ্ছেন বা তাস খেলছেন, তা হলে? তা হলে বলব, বলগে নিরালায় দেখা করতে এসেছেন এক ভদ্রমহিলা।

কিন্তু যদি শোনে, এখানেই নেই, চলে গিয়েছে বাইরে, বিদেশে, কবে ফিরবে কেউ জানে না, তাহলে কী করবে?

তাহলে ফিরে যাব। যা থাকে অদৃষ্টে, ছেলেকে বুকে নিয়ে ঝাঁপ দেব।

সমুদ্রে? হ্যাঁ, সমুদ্রে। যে সমুদ্র প্রত্যাখ্যানই করে না, মাঝে মাঝে আশ্রয়ও দেয় সেই সমুদ্রে। জলের সমুদ্রে নয় ভালোবাসার সমুদ্রে।

"বাবু আছেন?"

"কোন্ বাবু?"

"মেজবাবু। অরবিন্দবাবু।"

"আছেন।"

"আছেন? তা হলে বল একজন ভদ্রমহিলা দেখা করতে এসেছেন।"

"যদি নাম জিজ্ঞেস করেন?"

"বল গীতালি বোস, না, না, গীতালি ব্যানার্জি দেখা করতে এসেছে।"

দাঁড়িয়ে রইল উত্তেজনায় সংযত হয়ে। কতক্ষণ পরে ভিতর-দরোয়ান ফিরে এসে বললে, "আসুন।"

"নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন?" সঙ্গে যেতে-যেতে জিজ্ঞেস করল গীতালি।

"না। এমনি বলতেই নিয়ে আসতে বললেন।"

এখনও শুধু ভদ্রমহিলা বললেই, আগ্রহ উত্তেজিত হয় দেখছি। কী নাম কী ধাম কী প্রয়োজন কোন কিছু অনুরাগেই আর কৌতূহল নেই।

কোন দুঃস্থ নারী অর্থসাহায্য চাইতে এসেছে এ বুঝলে সকালে আসতে বলত। এটা কি দুঃস্থের ভিক্ষা নেবার লগ্ন? নিশ্চয়ই দরোয়ানের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে আগন্তুকার বয়স কত, কিংবা সভাস্থ হবার যোগ্য কি না। নইলে এই উদার উদ্যোগের কারণ কী?

নীচের নিরাভরণ একটা ঘরে দরোয়ান বসাল গীতালিকে। এ-বাড়িতে এর আগে আর কোনদিন আসেনি তাই জানে না এ ঘরটা কোন্ জাতের। বসবার না শোবার না প্রতীক্ষা করবার।

ইচ্ছে করলে কিন্তু আসতে পারত একদিন।

•সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেল। নিশ্চয়ই অরবিন্দের শব্দ। কিন্তু কে জানে হয়ত দেখবে, হাতে রাইফেল নয় ক্যামেরা, সেই মেজবাবু। কলকাতার গলিতে বর্ষা এল বলে কতদিন উৎসুক হয়ে তাকিয়েছে বাইরে, দেখেছে এক পশলা বৃষ্টি নয়, একটা ট্রাক চলে গেল, এ শুধু তার এঞ্জিনের কোলাহল।

কী আশ্চর্য, আলো জ্বালায়নি ভোগ সিং। সুইচ টেনে আলো জ্বালাল অরবিন্দ।

"এ কী! এ কে! তুমি? তুমি কোত্থেকে?"

গলার স্বরে প্রচণ্ড ক্রোধ—শুধু ক্রোধ নয়, ঘৃণা।

"বস। বলছি।" গীতালি জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল।

কিন্তু কীভাবে কথাটা আরম্ভ করবে বুঝতে পারল না। কলকাতার রাস্তায় মাঝে মাঝে দেখেছে একটা মোটর-গাড়ি বিগড়ে গিয়েছে, ভিতরে মধ্যবিত্ত মেয়ে-ছেলে, গাড়ি কিছুতেই নড়ছে না আর পিছনে ট্রাম দাঁড়িয়ে পড়ে অনবরত ঘণ্টা দিচ্ছে। তখন গাড়ির ভিতরকার আরোহীকে যেমন মূর্খ দেখায়, তেমনি মূর্খ দেখাচ্ছে গীতালিকে। কিন্তু স্থির পায়ে যখন একবার এসেছে তখন স্থির স্বরে পাড়তেই হবে কথাটা।

তার আগে নিজেই অরবিন্দ কথা পেড়েছে। বললে, "তোমার ত এ-বাড়িতে আসবার কথা নয়। তবে এলে যে বড়?"

"পথ ভুলেও ত লোকে আসে। এমনি কত এসেছে আগে-আগে!" চোখ স্থির রেখে নিশ্বাস রুদ্ধ করে গীতালি বললে।

"জান আমি বিয়ে করেছি?" তপ্ত হয়ে উঠল অরবিন্দ।

"জানি।" সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে অর্ধনিম্নস্বরে গীতালি বললে, "বউ কোথায়?"

সেই নামিত কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করল অরবিন্দ। বললে, "বাপের বাড়ি।"

"তা হলে ত ভালই হল।" লঘু হবার চেষ্টা করল গীতালি: "তা হলে তোমাকে অনেকক্ষণ পাওয়া যাবে।"

"আমার অনেকক্ষণ বসবার সময় নেই।" অরবিন্দ বাঁকানো ধনুকের মত উদ্যত হয়েই আছে: "আর যে এ বাড়ি কোনদিন ঢুকবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল সেই বা কেন আসে পথ ভুলে এ আমার বুদ্ধির অগম্য।"

"আমি আমার নিজের প্রয়োজনে আসিনি, তোমার প্রয়োজনে এসেছি।" বললে গীতালি।

"আমার প্রয়োজন?"

"হ্যাঁ, তোমাকে তোমার জিনিস ফিরিয়ে দিতে এসেছি।"

"আমার জিনিস!" সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল অরবিন্দ।

"হ্যাঁ তোমার ছেলে।"

"আমার ছেলে!" অরবিন্দ তর্জন করে উঠল: "আমার ছেলে কোথায়? তুমি এ-সব কী বলছ অন্যায় কথা?"

"অন্যায় কথা!" শব্দ করে হেসে উঠল গীতালি। বললে, "যা তুমি তোমার বিবেকের বিবেকে জান, যা সকলে জানে, যা জলের মত প্রমাণিত, তা নিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলে কেন? কাকে শোনাবার জন্যে? তোমার বউ ত নেই কোথাও আশেপাশে। তবে কেন এই আস্ফালন?"

"আস্ফালন তুমিও কম করনি।"

"শোন, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসিনি, পরামর্শ করতে এসেছি।" বসবার ভঙ্গিতে স্নিগ্ধ আলস্য আনল গীতালি: "ছেলেটা যে নার্সের কাছে হয় ও যার কাছে সে এ দু বছর মানুষ হচ্ছিল সে হঠাৎ মারা গেছে। কলকাতায় কেউ নেই তার সেই নার্সিং হোম চালু রাখে। সুতরাং ছেলেকে সরাতে হবে। কোথায় রাখি তাকে? তুমি ছাড়া আর তার বলশালী আশ্রয় কোথায়? তাই তোমার হাতে সঁপে দিতে এসেছি।"

"ছেলের মা কে?"

"আমি।" সত্য ও সারল্যের চূড়া স্পর্শ করে আছে গীতালি: "আমি যদি তোমার স্ত্রী হতাম আর তোমাতে-আমাতে যদি এমনি বিচ্ছেদ হত তা হলে, তুমি বাপ, তুমিই আইনে ছেলের আশ্রয়দাতা অভিভাবক হতে। কাজে কাজেই তোমারই অগ্রাধিকার।"

"আমি আধখানা নেব কেন?"

"আধখানা?"

"হ্যাঁ। আমি মা-ছাড়া ছেলে নেব কেন?" অরবিন্দ তার চেয়ারের হাতলটা শক্ত করে চেপে ধরল: "আমি দুজনকেই নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি, তুমিই ত—"

দু হাতে মুখ ঢাকল গীতালি।

মা যখন ঘরদোর অন্ধকার করে রুদ্ধ-শ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন বল্, কে, তখন গীতালি এক ডাকে বললে, অরবিন্দ। কে অরবিন্দ? ঐ যে সিনেমা-হাউসের মালিক হেরম্ব দাস, পেট্রল পাম্প আছে দুটো, তার দ্বিতীয় ছেলে। দাদারা আরও ভাল চিনলেন। ঐ যে বখা উড়নপেকে নচ্ছার ছেলেটা, রাঙা মুলো, খালি ফাংশান করে বেড়ায় আর একটা টুরার কারে করে ঘোরে, ইয়ারবক্সিদের নিয়ে, কখন বা নাটকের পাত্র-পাত্রীদের দিয়ে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বা সীমান্ত-রেখার মেয়ে, সঙ্গে দুই শিকারের যন্ত্র, রাইফেল আর ক্যামেরা, সেই অপোগণ্ড অপদার্থকে পছন্দ করলি? ছি ছি ছি! এখন কী বলে সেই হতচ্ছাড়া? জানি না, জানি না, গীতালি মুখ ঢাকল দু হাতে।

দাদারা অরবিন্দকে গিয়ে ধরলেন। প্রথমটা পাশ কাটাতে চাইল অরবিন্দ। তুমুল করবে, পুলিস লেলিয়ে দেবে, কোর্টে তুলবে, আরও অনেকভাবে নাকাল করবে, জাতসাপের মাথায় পা দিয়েছ, আর যার মান যায় সে প্রাণ পর্যন্ত নিতে পারবে—তারে ও তখন অরবিন্দ রাজী হল। দাদার জয়ীর মত বাড়ি ফিরলেন। মাকে বলতে মারও বুকের ভার লাঘব হল।

কিন্তু অসম্ভব ব্যাপার। গীতালি কিছুতেই এ সন্ধিতে রাজী নয়, কিছুতে নয়। আমি কিছুতেই আর ওর ছায়া গিয়ে দাঁড়াতে পারব না, কিছুতেই পার না ছুঁতে। না না না। ও আমার সঙ্গে ছলনা করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমার মুহূর্তের অসাবধানতার সুযো নিয়েছে, ও কপট ধূর্ত মিথ্যাবাদী—

"যাই হক, এখন আর ফিরে যাব রাস্তা কই? তোর নিজের জন্যে না হ অন্তত যে আসছে তার জন্যে এ ব্যবস্থ মানতেই হবে। না মেনে সমাধান সমাপ্তি নেই—" বললেন মা-দাদারা।

কিছুতেই না। যেখানে ভালবাসা থা সেখানে সব দেওয়া যায় সব নেওয়া যা আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে-হেঁটে প্র করা যায় আগুনে। কিন্তু যেখানে বিন্দু স্নেহ নেই বিবেক নেই হিতব নেই, যেখানে শুধু প্রতারণা, অশ্রদ্ধা অপ সেখানে পারব না সাড়া দিতে।

ও যদি ধূর্ত হয় তুইও ধূর্ত হ।

ঐ অপঘাতের চেয়ে আত্মহত্যাও ভ

তবে এর পরিণাম কী হবে?

যা হয় তা হবে। আমি ভুল ক আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করব। আমি দ

পৃথিবীর মুখোমুখি. জীবনের সঙ্গে সমক্ষ সংঘাতে। পেছপা হব না। পাপ করে থাকি, নিজেই প্রক্ষালন করে যাব।

উদ্দণ্ড অত্যাচার চুর্ণল গীতালির উপর। কিন্তু মেয়ে টলে না, ভাঙে না, উহু করে না একবার।

দেখা যায় প্রায় ক্ষেত্রে পুরুষই কেটে পড়ে, কিন্তু মেয়ে এমন অবস্তুবাদী হয় এ বিপর্যয় কাণ্ড কেউ ভাবতেও পারে না। আগে এ কলঙ্ক মুছে ফ্যাল এ লজ্জা চাপা দে, তারপরে যত খুশি সংগ্রাম কর, বিদ্রোহ কর, যা খুশি কর।

এ কলঙ্ক মোছবার নয় কিছুতেই, এ লজ্জা যাবে না চাপা দেওয়া।

মায়ের গুরুদেব আছেন, সহজানন্দ স্বামী, শহরের উপান্তে বিরাট আম-বাগানের মধ্যে আশ্রম করে থাকেন, তাঁর কাছে আনা হল গীতালিকে।

ক্ষমা ও সান্ত্বনার খনি, শ্যামস্নিগ্ধ আশ্রমে সৌম্য সুন্দর সন্ন্যাসী, সব শুনলেন ধৈর্য ধরে।

কিন্তু তাঁরও মীমাংসা তাই। বললেন : "যখন গ্রহণ করতে চাচ্ছে তখন আর কথা কি।"

"ও হচ্ছে ওর কথার কথা, মুখের কথা।" বললে গীতালি, "কোন রকমে লেপাফা ঠিক রেখে তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ফলের ছিবড়ের মতন বিচির মতন। একবার অপমান করেছে, দ্বিতীয়বার সইতে পারব না।"

অনেক বোঝালেন স্বামীজী।

"কিন্তু ধরুন, যা স্বাভাবিক ছিল, ও যদি রাজী না হত? তাহলে আমি কী করতাম? আমি ওকে বুঝেছি। ওর হাঁ বলা না-বলারই ছদ্মবেশ।" গীতালির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ শাড়ির পাড়ের খানিকটা দু হাতে ছিঁড়ে ফেলল লম্বা করে। বললে, "আমি বিধবা, আমি বিধবা হয়েছি। যে লগ্নে আমার বিয়ে সেই লগ্নেই আমার বৈধব্য। আমার স্বামী মৃত। মেয়ে কি সসন্তান বিধবা হয় না?"

"আত্মহত্যাও ত করে।" মার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

না, মরব না, কেন মরব? আমি যুঝব প্রাণপণে। দেখব স্থান পাই কি না, মাটির মালিন্য মুছে ফেলে উঠতে পারি কি না ফুল হয়ে। যে রুগ্‌ণ সে কি আর সুস্থ হতে পারবে না, যে হৃতসর্বস্ব তার কি নেই আর সার্থক হবার অধিকার? জীবন কি এত ক্ষুদ্র? ঈশ্বর কি এত কৃপণ? দুঃখ কি অফলদায়ী?

"ভবিষ্যৎ ভাবছ? কী করবে তবে?" ঘোরাল মুখে স্বামীজী জিজ্ঞেস করলেন।

"আশ্রম করব।"

"আশ্রম করবে!" যীশুখৃষ্টের মতন করে হাসতে চাইলেন স্বামীজি।

"এই শূন্য আশ্রম নয়, পূর্ণ আশ্রম। যে সমস্ত শিশু এমনি অনাথ, পরিত্যক্ত, অকাঙ্ক্ষিত, যাদের স্থান সমাজ করে দিয়েছে ভিক্ষুকের আড্ডায়, জেলখানায়, নর্দমায়, আস্তাকুঁড়ে, তাদের বিকলাঙ্গ পঙ্গু জীবন থেকে উদ্ধার করবার জন্যেই আশ্রম। আপনি সাহায্য করবেন আমাকে। সাহায্য না করেন আশীর্বাদ করবেন।"

কিন্তু পরিবার এ সব মানতে চায় না। এ শুধু মেয়ের মুখে চুনকালি নয়, সমস্ত পরিবারের মুখে।

দাদারা লুকিয়ে তাই ডাক্তার আনলেন। ডাক্তার যাই বলুক, গীতালি কিছুতেই রাজী হল না। তখন ডাক্তারই মেনকার নার্সিং হোমের খবর দিলে। মেনকা শুধু খালাসই করে না প্রতিপালন করে। যতদিন টাকা দাও ততদিন তোমার। না দাও ত আমার।

এ ব্যবস্থা সুস্থতর। নিজেও বাঁচল শিশুও বাঁচল। শিশু বাঁচল দেহের হত্যা থেকে, গীতালি বাঁচল আত্মার হত্যা থেকে। আর যদি একবার কেউ বাঁচে তার বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা বাড়তেই থাকে। সব আগুনই নেভে, কিন্তু বাঁচবার আগুনে বাজবার আগুনে নিভতে চায় না।

শুধু ক্ষতচিহ্নের উপর সময়ের ভস্মস্তূপ চাপা দিতে হবে। তাই দাদারা শহর বদলালেন, বাসা নিলেন কলকাতায়। আর সময়ের হাত ধরে একদিন চলে এল বাসুদেব। নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।

গীতালি মুখ সরিয়ে নিল হাত থেকে। বললে, "সে একদিন গেছে। বুঝতে পারিনি নিজের অনুপাত। পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম, কী যন্ত্রণা যে পেয়েছি তা আমিই জানি। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা, ভুলের যন্ত্রণা, ভুল করে ফিরিয়ে দিয়েছি তোমাকে। তুমি উৎসুক আর আমি কিনা উদাসীন। সেদিন আমি ভুল করেছিলাম বলে তুমি আজ ভুল কর না।"

"না, এতে ভুল করবার কী আছে!" চোখের দৃষ্টি ভাল করে বিছিয়ে দিয়ে তাকাল অরবিন্দ।

"শত হলেও তোমারই ত ছেলে। তোমার হাড়ের হাড় রক্তের রক্ত। একে তুমি নর্দমার ইঁদুরের মতন বয়ে যেতে দেবে? তুমি ত একেবারে স্নেহহীন নও। আজ যতই কেননা দূরে-দূরে দাঁড়িয়েছি আমরা, একদিন ত ছিল, একদিন ত অন্তত—" গাঢ় আবেগে চোখ নত করল গীতালি।

"তুমি আমাকে কী করতে বল? তোমার প্রস্তাবটা শুনি।"

"ছেলেকে তোমার কাছে রাখ। ঠিক এ বাড়িতে না হক, অন্য কোথাও, কিন্তু তোমার চোখের সামনে, তোমার তত্ত্বাবধানে। তোমার ছেলে তোমার কাছে থাকবে এই আমার সাধ, আমার শান্তি। নইলে ও কোথায় চোর ডাকাত পকেটমারের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে, মদ চোলাই করবে, ওয়াগন ভাঙবে, ট্রাম পোড়াবে, এ আমি সইতে পারব না। আমার মুখের ভাত আর চোখের ঘুম বিষ হয়ে যাবে। তার বদলে তোমার কাছে আছে, তার বাবার কাছে—"

"ছেলে কোথায়? এনেছ?"

"না আনিনি। তুমি আমার সঙ্গে চল, কলকাতায় সেই মেনকাদির নার্সিং হোমে, তোমার হাতে তোমার ছেলেকে পৌঁছে দিই—"

"আমি ত সেই নার্সিং হোমের রাস্তাটাস্তা চিনি না, আর আমাকেই বা তারা চিনবে কেন?"

"বা, কী বললাম, আমিই তোমাকে নিয়ে যাব সঙ্গে করে। কাল ভোরের ট্রেনে। দেখবে তোমারই মত নাকমুখ, তোমারই মত রঙ—"

"আজ রাত্রে তবে থাকবে কোথায়?" উঠে দাঁড়াল অরবিন্দ।

"কেন, এইখানে, তোমাদের বাড়িতে।" সাফল্যের চূড়া স্পর্শ করে আছে গীতালি এমনি তার দুঃসাহসের সুর।

কপট, ধূর্ত, প্রবঞ্চক। চিৎকার করে তীব্র কণ্ঠে ভর্ৎসনা করতে ইচ্ছে হয়েছিল অরবিন্দের। কিন্তু নিজেকে সংযত করল। চেয়ার আর টেবিলের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললে, "শোন। ছেলে-ছাড়া মাকে নিতে আমার প্রবৃত্তি নেই। ভোগ সিংকে বলব তোমাকে একটা রিকশা ডেকে দিতে?"

"না, আমি একাই পারব।" অসমান পা ফেলতে ফেলতে বেরিয়ে গেল দীপালি।

আর মন স্থির করতে দ্বিধা নেই। ছেলে বুকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঝাঁপিয়ে পড়বে বাসুদেবের ক্ষমার সমুদ্রে, ঔদার্যের সমুদ্রে, ভালবাসার নীল জলে। স্বীকৃতি আছে বলেই মার্জনা করবে, শ্রান্ত আছে বলেই তৈরী করবে শান্তির পরিবেশ। আবার নতুন করে একটি শৈশব-আলোতে আলিঙ্গনের সঙ্গে সমর্পণের শুভদৃষ্টি হবে, স্থৈর্যের সঙ্গে আকুলতার।

রাতটা স্টেশনে, ওয়েটিং রুমে কাটাল। ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝি, তাই ট্রেন ধরতে সেই ফার্স্ট ট্রেন। ফিরে এল নার্সিং হোমে।

"কী, জায়গা ঠিক হয়েছে?" জিজ্ঞেস করল কস্তুরী।

"হয়েছে।"

মীরা-দিকে দেখতে গিয়েছিলাম, মীরাদি এই দু বছরের ছেলেটাকে রেখে মারা গিয়েছে।

কেউ নেই ছেলেটাকে যত্ন করে, তাই সংগে করে নিয়ে এসেছি, এমনি করে বললেও ত মন্দ হয় না। কিন্তু না, কেমন যেন সত্যি-সত্যি শোনাচ্ছে না, তা ছাড়া মীরাদির সংগে সম্পর্কটা ধরা ছোঁয়ার মধ্যে। সত্য সরল কথা বলায় অনেক শান্তি, অনেক তৃপ্তি। সত্যই প্রক্ষালন। সত্যই নীল আকাশ।

কুড়ি টাকা কস্তুরীর হাতে দিয়ে বললে, "যদি এক কাজ করতে পার।" গংগাকে আরও দশ টাকা দিল, বললে, "তুমি ছাড়া এ-কাজ হবার নয়, কিছুতেই নয়।"

"কী কাজ?" দুজনে জিজ্ঞেস করল এক সংগে।

"আজ শেষ রাত্রে খোকনকে বেশ করে কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে আমাদের বাড়ির বাইরের রোয়াকে চুপ করে রেখে আসবে।" এদিক ওদিক তাকিয়ে চক্রান্তঘন গাঢ়স্বরে বললে গীতালি: "আমি জেগে থাকব বাইরের দিকে চেয়ে। যখন ছেলে রেখে পালাবে তার প্রায় সংগে সংগে আমি নেমে আসব, আর ছেলে কাঁদুক বা না-কাঁদুক তুলে নিয়ে ছুটব উপরে আর খালি বলব—পেয়েছি, পেয়েছি, আমার না-পাওয়া ধন পেয়েছি—"

হাত পাতল গংগা। বললে, "দশ টাকায় হবে না, আরও দশ টাকা লাগবে।"

তাই দিল বার করে। বললে, "ওকে একেবারে শক্ত রোয়াকের উপর শুইয়ে দিও না। ওর মাথায় ছোট্ট একটা বালিশ নিয়ে এস। কী, পারবে?"

"খুব পারব। তবে আজ যদি না পারি?"

কাল নিয়ে এস।"

"পরশুর মধ্যে ঠিক পৌঁছে দেব। আগে থেকে সব ঘাঁতঘোঁত দেখে আসতে হবে। এখান থেকে ত রাত করে বেরুনো যাবে না, ট্রাম বাস নেই, পাহারায় ধরবে। তাই কাছাকাছি, হাঁটার পথের মধ্যে ডেরা একটা খুঁজে নিতে হবে, সেখান থেকেই তাক বুঝে ফাঁক খুঁজে রেখে আসব ছেলে।"

"কেমন আছেন মীরাদি?" বাড়ি ফিরলে জিজ্ঞেস করলে বাসুদেব।

"এ যাত্রা রক্ষা পাবেন মনে হচ্ছে।" হাতে কিছু রসদ এখনও রাখল গীতালি: "তবে ক্রাইসিস পুরো কাটেনি এখনও। কোলের ছেলেটাকে নিয়েই বেশী মুশকিল, কেউ তেমন নেই দেখে-শোনে।"

আধ-চাওয়া চোখে সমস্ত রাত কাটিয়েছে শুয়ে-বসে। বারে-বারে উঠে রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে দেখেছে নীচের দিকে, কোন কাপড়ের পুঁটলি দেখে কি না, শোনে কিনা কোন শিশুকণ্ঠের কান্না। আর মনে মনে আকুল প্রার্থনা করেছে, বাসুদেবের চোখে যেন

রাতটা স্টেশনে, ওয়েটিং রুমে কাটাল

সমুদ্রের ঘুম নামে, অপার-বিশাল ঘুম। অসংশয়ের ঘুম।

পরদিন রাত্রে স্বরাভরা চোখে নামছে নীচে, টের পেয়েছে বাসুদেব। একী, কোথায় যাচ্ছ ?

"একটা বেরাল কাঁদছে শুনতে পাচ্ছ না ? আমাদের বাড়ির মধ্যেই বোধ হয়। নীচে, বোধ হয় ঘুঁটে-কয়লার ঘরটাতে। দেখে আসি।" কোণ থেকে একটা ছড়ি কুড়িয়ে নিল গীতালি : "ওটাকে না তাড়াতে পারলে ঘুম আসবে না কিছুতেই।"

বেরাল ছানা দেখা গেল না কোথাও। তবে এ কান্না কি তার নিজের বুকের মধ্যে ? একটি শাশ্বত নিরাশ্রয় শিশুর নিষ্ফল কাকুতি ?

আরও এক রাত কাটল। কাঙাল কান শুনতে পেল না সেই কান্নার আনন্দ।

তবে কি আর-একবার খোঁজ করে আসবে ? খোকন ভাল আছে ত ? আর কোন ব্যাধি ন ত বিপদ ? অন্য কোন ব্যাঘাত ? বুকের মধ্যে হাহাকার করে উঠল, অরবিন্দই এসে নিয়ে যায়নি ত ছল করে ?

ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝি গীতালি। হঠাৎ দরজায় শব্দ হতে লাগল : "বউমা, ওঠ ওঠ।"

কাকিমার গলা। আগুন-ছোঁয়া তুবড়ির মত উঠে পড়ল গীতালি। দরজা খুলে বাইরে এসে বললে, "কী ? চোর ?"

"না কে একটা বাচ্চা শিশু আমাদের রোয়াকে শুয়ে কাঁদছে।" ভয়াপ্লেল গলায় বলছেন কাকিমা : "কে কখন ফেলে গেছে কে জানে !"

"ছেলে, না মেয়ে ?" তরতর করে গীতালি নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

"কী জানি কী। একটা কাপড়ের পুঁটলির মধ্যে থেকে একটা শিশুর কান্না।" কাকিমাও নামলেন।

বাসুদেবও নামল।

ভালই হল। রোয়াক-ঘেঁষে কাকিমার ঘর, কাকিমাই প্রথম চাক্ষুষ সাক্ষী। তিনিই বলতে পারবেন বাইরে থেকে কে কার ছেলে রেখে গিয়েছে দোরগোড়ায়।

দরজা খুলে বাইরে গিয়ে ব্যাকুল হাতে শিশুটাকে কুড়িয়ে নিল গীতালি। সেই চোখ সেই নাক, সেই চিবুকের খাঁজ। উদ্বেল বুকের মধ্যে চেপে ধরল। ঘরের মধ্যে ফিরে এসে বাসুদেবকে বললে, "দেখ, দেখ, কী ফুটফুটে সুন্দর !"

বাসুদেব গম্ভীর হয়ে বললে, "কার, না কার ছেলে ঘরে তুলছ না জেনে—"

"যারই হক যখন ফেলে গেছে দরজায় তখন ঘরের লোককে নিতেই হবে হাত বাড়িয়ে। যদি কাঁচ শিশুর একটু সেবা বা শুশ্রূষার দরকার হয় দিতেই হবে গৃহস্থকে।" ধৈর্যের প্রতিমা জননীর ভাষায় কথা বললে গীতালি।

"আমার মনে হয় যেমনটি ছিল তেমনটি রেখে দিলেই ভাল হত।" বাসুদেব মুখ ঘোরাল করল : "পুলিশকে খবর দিতাম।"

"পুলিশকে খবর দেবে কী ?" প্রায় ঝামটে উঠল গীতালি : "এ কি মরা ছেলে যে কোন অপরাধ সন্দেহ করবে ? দিব্যি জলজ্যান্ত ছেলে, তাজা সুস্থ—"

"তবু কে জানে এর মধ্যে কোন অপরাধের গন্ধ আছে কি না।"

হাওয়ায় যেন বারুদ শুঁকল বাসুদেব।

"বড় জোর হতে পারে চুরি। চুরি হলে ফেলে যাবে কেন ?" একটা প্রায় সোহাগ-ঢালাই প্রশ্ন করেছে এমনি ভাব করল গীতালি।

নস্যাৎ করে দিল বাসুদেব। বললে, "এমনও হতে পারে ছেলের হাতে-গায়ে গয়না ছিল তাই নেবার জন্যে চুরি করেছে তারপর গয়না খুলে নিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে ছেলে—"

"চোর বুঝি অমনি বিছানা-বালিশ শুদ্ধু ফেলে আনে ?"

"আপত্তি কী ? তার লক্ষ্য হচ্ছে গয়না, তাই আর সবে তার লোভ নেই। কী অবস্থায় চুরি তার সম্ভব ও সুবিধের ছিল তা চোর জানে। কিন্তু আমি সে-কথা ভাবছি না।" দু কদম পায়চারি করল বাসুদেব : "আমি ভাবছি যাদের ছেলে তারা না জানি কোথায় খুঁজছে হন্যে হয়ে। সুতরাং থানায় একটা খবর দেওয়া উচিত।"

"দাও না, কে বারণ করছে ?" গীতালি প্রায় মুখিয়ে উঠল : "ছেলেটা কাঁদছে। হয়ত খিদে পেয়েছে। ওকে কি তোমার একটু খেতে দিতেও আপত্তি ?"

"এ-রকমভাবে আঁকড়ালে থানায় খবর দিই কী করে ?"

"তা হলে দিও না। এতে ভয় পাবার কিছু নেই।" বললে গীতালি : "পথে একটা হারানো ছেলে কুড়িয়ে পেলে তাকে কি কেউ ঘরে আনে না ? না, যার সত্যিকার ছেলে খোঁজ পেলে তাকে দিয়ে দিতে দ্বিধা করে ?"

"কিন্তু বিপদের কত রাস্তা কে জানে !" অন্ধকারে রোয়াকে এসে দাঁড়াল বাসুদেব।

"কিন্তু সমূহ এ ছেলেটার বিপদ দেখবে ত !" কান্নাধরা ছেলেকে শান্ত করবার জন্যে দোল দিতে লাগল গীতালি।

বাসুদেব রাস্তায় নেমে এদিক-ওদিক ঘুরে এল। কোথাও কোন সূত্র নেই, বাষ্পের কণাটি পর্যন্ত নেই।

ফিরে এল বাসুদেব। বললে, "তুমি দেখছি একটা খেলনা পেয়েছ।"

"সত্যিকার যখন পাব তখন পাব। যত-দিন না পাই এই খেলনাটা নিয়েই খেলি।" বলতে এতটুকু বাধল না গীতালির।

"বিপদে পড়বার ভয় ত রইলই, তার উপর আবার দুঃখ পাবার ভয়।"

"দুঃখ ?" চমকে উঠল গীতালি।

"কে কখন নিজের বলে দাবি করে বসে ঠিক কী !"

"দাবি করলেই ত হবে না, প্রমাণ করতে হবে।"

"প্রমাণ করা কঠিন হবে না যেহেতু মামলায় কোন প্রতিবাদী নেই। একতরফা ডিক্রি হয়ে যাবে এক ডাকে।"

"যখন হবে ত হবে। তুমি এখন দরজাটা বন্ধ করে দাও ত। বাচ্চাটার কত না জানি খিদে পেয়েছে, কতদিন ধরে না জানি বেচারা উপবাসী।" বলে ছেলের মুখটা আতপ্ত বুকের মধ্যে গুঁজে দিল গীতালি। সর্ব-শরীরে কাঁপতে লাগল স্থির হয়ে।

ঠিক যা বলেছিল বাসুদেব। খামে এক চিঠি এসে হাজির, লিখেছে শ্যালকে থেকে কে এক আগমনী আদক।

লিখেছে সে মেনকার বোন। জন্মে অবধি তার ছেলে মেনকার কাছে মানুষ হচ্ছিল। সেখান থেকে সেই ছেলে চুরি হয়ে গিয়েছে। খবর এসেছে সেই ছেলে আপনার বাড়িতে। সুতরাং আমি যাচ্ছি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে। কবে ও কখন যাব ঠিক করে জানাবেন।

পত্রপাঠ উত্তর দিল গীতালি : "যে কোন দিন দুপুরবেলা দুটো থেকে তিনটের মধ্যে আসবেন।"

ঐ সময়টা বাসুদেব নির্বিঘ্নরূপে আপিসে। বাদীর দাবির বিরুদ্ধে কীভাবে প্রতিঘাত করতে হবে, জানাতে হবে প্রতিবাদ, সেই পদ্ধতিটা সে নাই দেখল।

কিন্তু বাসুদেবকে সব কথা জানতে দেওয়াই ত উচিত ছিল, অন্তত এখন, এই আগমনীর আবেদনের সময়। গোড়াতে সেই কথাই ত ভেবেছিল যখন অরবিন্দের কাছ থেকে ফিরে আসে প্রত্যাখ্যাত হয়ে। কিন্তু কী ভেবে কেন যে মন হঠাৎ বাঁকা পথ ধরল, ঘুর-পথ, কে বলবে ! যেন শেষ পর্যন্ত বাসুদেবকেই তার ভয়। যে সমুদ্রে নিশ্চিন্ত নিঃশেষ ঝাঁপ দেবে ভয় সেই সমুদ্রকেই।

খোলার বস্তির অধিবাসিনী, এমনিই দেখাতে আগমনীকে, যদিও এরই মধ্যে সাধ্যমত সে সম্মানিত প্রসাধন করেছে।

আশিরপদনখ একবার তাকে দেখল গীতালি। বললে, "এখানে যে তোমার ছেলে আছে কে বললে ?"

"গঙ্গা।"

"এ ছেলে যে তোমার তার প্রমাণ কী ?"

"কস্তুরী।"

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দান

রবীন্দ্রভারতীর সৌজন্যে

মুদ্রণ : বেঙ্গল অটোটাইপ কোং
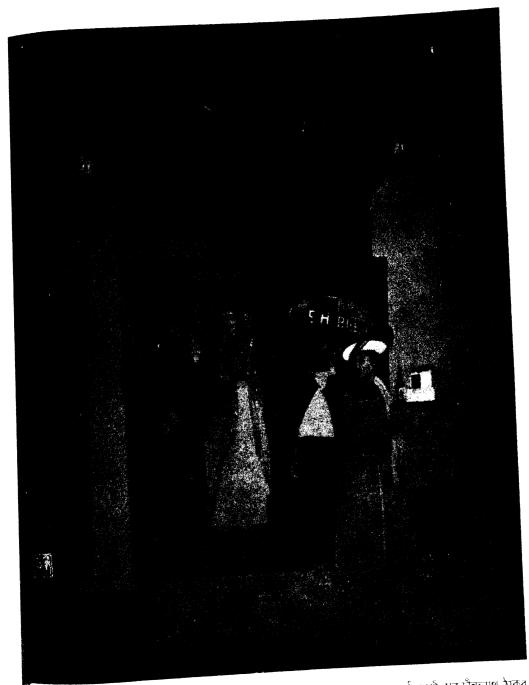
"ওরা কেউ এসেছে তোমার সঙ্গে "

"না।"

"তবে যাও মামলা করগে। ফৌজদারি দেওয়ানি যা খুশি।" সত্যের আগুনে আলো হয়ে উঠেছে গীতালি ঃ "ছেলে আমি দেব না। ছেলে আমার।"

"আপনি বললেই হবে? আমার ছেলে। কই নিয়ে আসুন ত দেখি।" আগমনী শেষ চেষ্টা করল।

"তুমি চাইলেই তোমার কোলে ছেড়ে দেব এ তুমি মনে কর না।" গীতালি ঋজু দেহে দৃঢ়তার রেখা টানল ঃ "জিজ্ঞেস করি তুমি যদি মা তবে হারান ছেলের খবর পেয়ে তখুনি ছুটে এলে না কেন? কেন দিনক্ষণ ঠিক করে দেখা করতে চাইলে?" কী একটা বলতে চাচ্ছিল আগমনী, গীতালি বাধা দিল ঃ "শোন, কস্তুরী আর গঙ্গাকে কুড়ি টাকা করে দিয়েছি, মনে হচ্ছে তুমি পাশের বস্তিতে থাক, তোমাকেও কুড়ি টাকা দেব। এ-পথে আর পা বাড়িয়ো না। কী, নেবে টাকা?"

"না, দরকার নেই।" চোখ নামাল আগমনী।

"কেন, অনেক পেয়েছ বুঝি?"

গীতালির চোখের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ঠিকরে পড়ল আগমনীর চোখ।

"কে দিয়েছে?"

আগমনী আর পারল না লুকতে। বললে, "অরবিন্দবাবু।"

আরও কিছু পরিচয় দিতে যাচ্ছিল বুঝি, গীতালি বললে, "বুঝেছি।"

ছয়

পাশের জমিটা বিক্রি হয়ে গেল।

"কে কিনল?" জিজ্ঞেস করলে চৌধুরী, মিস্টার সি সি চৌধুরী। বাংলা নাম যে চন্দ্রচূড় চৌধুরী এ স্বয়ং সি সিই ভুলতে বসেছেন।

"আমাদের জাতগোত্রের কেউ নয়।" উত্তর করলেন চৌধুরানী, মন্দিরা দেবী ঃ "শুনলাম কে না কে এক মশলার ব্যবসাদার।"

"মশলার ব্যবসাদার!" ইজিচেয়ারে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন চৌধুরী, খবরের কাগজ হাত থেকে মাটিতে খসে পড়ল ঃ "বাড়ি করবে নাকি?"

"তবে কি ফেলে রাখবে?" চায়ের টেবিলটা গুছতে গুছতে ঝঙ্কার দিলেন মন্দিরা ঃ "তখনই বলেছিলাম গোটা জমিটা কিনে ফেল। দু আধেকে দুটো বাড়ি হবে। একটাতে, বড়টাতে, আমরা থাকব, আর একটাতে দেখেশুনে ভাড়াটে বসাব। যাকে তাকে নয়, দেখেশুনে। আমাদের দলের, লাইনের, অন্তত ব্রাহ্ম লাইনের লোক বেছে।" মানুষের কত রকম দুঃখ আছে। মনোমত প্রতিবেশী হবে না, এও এক দুঃখ।

"সত্যি, ভীষণ ভুল হয়ে গেছে। লোকটা টাকার কুমির বোধ হয়।" মুখেচোখে অস্বস্তি ফুটে উঠল চৌধুরীর।

"কে জানে, টাকার হিপোপটেমাসও হতে পারে।" মন্দিরা মূর্তিমতী ঝাঁঝ।

"তাহলে! যদি আমাদের চেয়ে বড় বাড়ি তৈরি করে ফেলে?" দমধরা রুগীর মত উঠে বসলেন চৌধুরী।

"ফেলবেই ত।" টেবিলের উপর জিনিস ফেলার শব্দ করলেন মন্দিরা।"

"উপায়? তাহলে উপায় কী হবে?"

বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস লিমিটেড

শুভ শারদোৎসবে

আপনাদিগকে

শুভেচ্ছা ও সাদর সম্ভাষণ

জ্ঞাপন করিতেছে

অফিস ঃ
৬৩, রাধাবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা
ফোন ঃ ২২—৪৯৭৬

মিলস্ ঃ
রিষড়া, শ্রীরামপুর
হুগলী
ফোন ঃ শ্রীরামপুর ৩২০

"কলা চুষবে।" অঙ্গুষ্ঠ দেখালেন মন্দিরা। মুখখানা গোল করে বললেন, "গ্রহণের চাঁদ হয়ে থাকবে।"

"তুমি ওদের বাড়ির প্ল্যান দেখেছ?"

"আমি কোত্থেকে দেখব?"

"দাঁড়াও কর্পোরেশনে খোঁজ নি। আর সিভিল লিস্টটা একবার দাও ত, দেখি কে আছে ডিস্ট্রিক্ট জজ, একটা ইনজাংকশান হানতে পারি কিনা—"

সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন চৌধুরী। কিন্তু যেহেতু আই সি এস, সূর্য অস্ত যাবে না কোন দিন। নাগপাশে বাঁধলেও গরুড় এসে জোটে। মরেও রাম মরে না। আর সব চাকরি ফুরয়, এ ফুরলেও জুড়য় না। এর থেকে ছাড়ান পেলেও ছোড়ান পাবে না কোন দিন।

"কিন্তু এত বড় দক্ষিণ পাবে কোথায়?" আপন মনে বলে উঠলেন চৌধুরী: "এত বড় ফ্রণ্টেজ? এত বড় গেটওয়ালা বাগান?"

"তবু ও-বাড়ি উত্তরে দাঁড়াবে ত গা ঘেঁষে।" গা যেন ঘিন ঘিন করে উঠল মন্দিরার।

"দাঁড়াক। ও ত পশ্চাৎ। পশ্চাতে চাব না মোরা, মানিব না দিক।" চৌধুরী কাব্য করে উঠলেন: "এমন দক্ষিণ থাকতে কে আসবে টেক্কা দিতে? যতই ঘেঁষে দাঁড়াক কুঁকড়ে থাকবে।"

"তা হয়ত থাকবে, কিন্তু কী আপদ!" যেন কী সর্বস্বান্ত চেহারা মন্দিরার: "ছাদের উপর দাগধরা কাঁথা-তোশক শুকতে দেবে, চারপাশ থেকে শাড়ি কাপড় ঝোলাবে, ছেলেরা ছাদে ঘুড়ি ওড়াবে, ডাণ্ডাগুলি খেলবে, ক্রিকেট খেলবে—"

"বল না, আর বল না—" দু হাত দিয়ে কান চেপে ধরলেন চৌধুরী।

"বিকেলে নিজেদের ছাদে হয়ত বেড়াতে উঠেছি, দেখব পাশের বাড়ির ছাদে কয়লার গুল দিয়ে রেখেছে কিংবা ঘুঁটের পাহাড় জমা করেছে—" যেন বিভীষিকা দেখছেন মন্দিরা।

এর মধ্যেও সান্ত্বনা খুঁজছেন চৌধুরী। বললেন, "যাই বল আগেই অত ভয় পাই কেন? বাড়ি আগে হক, দেখি না কে বসত করে! মসলাওয়ালার বাড়ি হলেও এমন হতে পারে নিজে না থেকে ভাড়া দিয়ে দেবে। আর এও আশা করা যাক সে-ভাড়াটে ভদ্রলোকই হবে শেষ পর্যন্ত।"

আপাতত সেই আশাতেই উত্তাপ খুঁজেন মন্দিরা। গাল পুরে কটা পান খান।

একটা প্রায় চৌকো প্লট। পূর্বদিকে বড় রাস্তা, ট্রাম রাস্তা। দক্ষিণদিকেও বেশ একটা চওড়া রাস্তা ট্রাম রাস্তা থেকে বেরিয়ে গিয়েছে পশ্চিমে। সেই কোণেই চৌধুরীর বাড়ি, কিন্তু দক্ষিণে মুখ করা। উত্তরের দিকে প্লটের খানিকটা ফাঁকা, সেইখানেই মসলাওয়ালা সুবোধ সরখেলের বাড়ি উঠছে। তার উত্তরে আবার একটি গলি পুবে-পশ্চিমে টানা।

চৌধুরীর বাড়ি ত নয়, প্রাসাদ। তেতলায়, ছাদের একধারে ঠাকুরঘর।

চৌধুরী জানতেন হাল আমলে ঠাকুরঘরও একটা আভিজাত্যের চিহ্ন। এবং সে ঠাকুর-ঘর বসবে সংসারের হট্টগোলের মাঝখানে নয়, একেবারে ঘরের চূড়োতে, সম্ভ্রান্ত নির্জনতায়।

ফুলকাটা দামী পাথরে দেয়ালে-মেঝেতে চেকনাই ফুটিয়েছেন। বিগ্রহ রাধাকৃষ্ণের। মূর্তিটিই কেমন শালীনশোভন। জগন্নাথ, তাঁর মতে, কিম্ভূত; শিবলিঙ্গ অশ্লীল আর কালী? বীভৎস।

রাধাকৃষ্ণটিই বেশ। পটলচেরা চোখে বাঁশি হাতে কৃষ্ণ কেমন দাঁড়িয়েছেন কোমর বেঁকিয়ে। আর লজ্জা-মাখান মিষ্টিমুখে রাধিকার ঠাটটিও কেমন মোলায়েম।

কিন্তু এদিক দিয়েও মন্দিরার সুখ নেই পুরোপুরি। চাকরিতে থাকতে এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে দীক্ষামন্ত্র নিয়ে চৌধুরী প্রার্থিত ফল পেয়েছিলেন, তারই জন্যে সেই গুরুকেই চৌধুরী আঁকড়ে আছেন। জোর করে মন্দিরার কানেও গুঁজে দিয়েছেন সেই অনুস্বার-বিসর্গ। মন্ত্র যাই হক, কুব্জা বা প্যারী, মন্দিরার আপত্তি নেই, তাঁর আপত্তি ঐ গুরুটিতে। গুরুই তাঁর বেপছন্দ। মাথায় জটা, গায়ে ছাই, বুকে-গলায় গুচ্ছের মালা, পরনে গান্ধীর চেয়েও ছোট কানি। ফোর-ফিফ্‌থ্‌ নেকেড ফকির। ভীষণ বুনো আর গেঁয়ো, সাংঘাতিক রকম সেকেলে। কদাচিৎ কখনও যখন আসে কলকাতায়, শাঁসাল শিষ্য চৌধুরীর বাড়িতে এসে ওঠে, মন্দিরা মনে মনে রি-রি করতে থাকেন। লোকজনকে ডেকে এনে সভায় বসিয়ে দেখাবার মত চেহারা নয় এই দুঃখই মর্মে ধ্বনি জ্বালায় সারাক্ষণ। কতক্ষণে বোঁচকা বেঁধে বিদায় হবে তারই প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গোনেন।

তার চেয়ে বেশ একখানা ছিপছিপে, ছিম-ছাম চেহারার গুরু হত, পরনে সোনালী রঙের পাতলা গরদ, গায়ের উপর তেমনি ধারা ফুরফুরে চাদর, দরকার হলে তথৈবচ পাঞ্জাবি, ঘাড়ে-কাঁধে কোঁকড়ান চুলের গুচ্ছ, চাঁচাছোলা মুখ, গলায় কনকচাঁপার মালা—ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হতেন মন্দিরা। মন যেখানে প্রশস্ত না হয়ে সঙ্কুচিত হয়, মুখের উপর চোখ না পড়ে ভুঁড়ির উপর পড়ে, সেখানে মাথা ঠুকে সুখ কোথায়?

শবরীর প্রতীক্ষা রামের জন্যে মন্দিরার প্রতীক্ষা একটি হালফ্যাসানের গুরুর জন্যে।

যুদ্ধ থেমে গিয়েছে। বাড়ি উঠেছে সরখেলের।

মসলার ব্যবসাদার তাতে আর সন্দেহ নেই। ছোট-ছোট ঠোঙার মত একরাশ ঘরে যেন একটা দোতলা মুদিখানা। যতই উঁচু করুক চৌধুরী-বাড়ির ছাদ ছুঁতে পারেনি। "শুধু পয়সা থাকলেই চলে না।" ওদিক থেকে টিপ্পনী কাটেন মন্দিরা: "মাথা উঁচু করতে হলে বুকও দরাজ হওয়া দরকার।"

পুব-সদর বাড়ি, ট্রাম-রাস্তার দিকে মুখ-করা। যেটা চৌধুরীদের পিছন সেটাই সরখেলদের ডান হাত। মাঝখানে যে এক-ফালি জমির ফাঁক সেটা চৌধুরী-বাড়িরই লগ্ন। সে-ফাঁকটা আছে ট্রাম-রাস্তা বরাবর, কিন্তু আশ্চর্য কৌশলে পিছনের দিকে সে-ব্যবধানটা প্রায় মেরে দিয়েছে সরখেল। চৌধুরী-বাড়ির ছাদের উত্তর আর সরখেল-বাড়ির ছাদের পশ্চিম প্রায় ঘেঁষে বসেছে। কর্পোরেশনে লড়তে গিয়েছিলেন চৌধুরী, কিন্তু কায়দা করতে পারেননি। প্লটটার এমনি নাকি ছিরি যে পিছনের ফারাকটা ফালাও করা যাবে না। এখন মামলার ফিকির খুঁজছেন।

তবু ও-বাড়ির ছাদ নিচু, এতেই চৌধুরীদের শান্তি। কিন্তু সরখেলরা সে-শান্তি বেশী দিন স্থায়ী হতে দিল না। ছাদের উপর চিলেকোঠা বানাল। আর সে চিলে

কুঁচতৈলম (হস্তিদন্ত ভস্ম মিশ্রিত) টাক, চুলওঠা, মরামাস স্থায়ীভাবে বন্ধ করে।
ছোট ২, বড় ৭। হরিহর আয়ুর্বেদ ঔষধালয়, ২৪নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, ভবানীপুর, কলিঃ
ষ্টঃ এল এম মুখার্জি, ১৬৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, চণ্ডী মেডিক্যাল হল, বর্নাফিল্ডস লেন, কলিঃ।

কোঠার ছাদ চৌধুরীদের ছাদের প্রায় সমান-সমান হয়ে উঠেছে। তখন চৌধুরীরা কী করে? যেটুকু ফাঁক ছিল সেটুকু লক্ষ্য করে কতগুলি লোহার শিক বাড়িয়ে দিল সরখেলদের দিকে। শিকগুলি আর কিছুই নয় তিরস্কারের তর্জনী। ছোট হয়ে উঁচু নজরে তাকিয়ো না। বাইরে বলে বেড়াচ্ছেন এদিক দিয়ে একটা ঝুল-বারান্দা করব কিংবা ফালতু একটা সিঁড়ি উঠবে পিছন দিয়ে। আসলে একটা মামলা ফাঁদবার তক্কে আছেন।

"ও-বাড়িতে কে এল ভাড়াটে?" মিসেসকে জিজ্ঞেস করলেন চৌধুরী।

"কে এক জজ শুনেছি।"

"জজ?" আকাশ থেকে পড়লেন চৌধুরী।

"কে শুনেছি ছোট আদালতের জজ।"

হো-হো-হো করে হেসে উঠলেন চৌধুরী: "তাই বল। চুনোপুঁটি নয়, একেবারে কাতলা!"

ছোট আদালত কি? বড় ছেলের বউ মীনাক্ষী জিজ্ঞেস করলে।

যে আদালত ছুটিয়ে মারে, যেখানে কেবল ছোটাছুটি। বোঝাতে চাইলেন চৌধুরী। নইলে আদালত ছোট নয়। ইয়া পেল্লায় পাঁচতলা দালান। তবে যদি বল লোক ছোট চাবি ছোট মন ছোট তাহলে আলাদা কথা।

হঠাৎ কুকুরের গর্জন শোনা গেল। নিশ্চয়ই কোন অপ্রত্যাশিত আগন্তুকের উপর হামলে উঠেছে। এখন ত কারও আসবার কথা নয় তাই কুকুরটা ছাড়া, শেকলছুট। যাকে তাড়া করেছে, সে পড়ি-কি-মরি করে ছুটেছে, পিছনে কম্পাউণ্ডের লাল কাঁকরের রাস্তায় তার দ্রুতব্যাকুল জুতোর শব্দেই তা স্পষ্ট। মন্দিরা ডাকলেন, "বেয়ারা! জয় অমন করছে কেন?"

কুকুরটাকে ধাতস্থ করল বেয়ারা। কিন্তু এ কী? বেয়ারার হাতে একটা কাগজের টুকরো। যাকে তাড়া করেছিল সে তবে দেখা করতে এসেছে!

ভবতোষ চন্দ। নাম দেখে চিনতে পারলেন না। নামের নীচে পরিচয় লেখা। জজ, স্মল কজ কোর্ট। উপায় কী। ডাক।

বলতে হল না, অন্তর্হিত হলেন মেয়েরা, মন্দিরা আর মীনাক্ষী।

ধীর পায়ে ভীত গোল চোখে ঢুকল ভবতোষ।

পাজামা আর ড্রেসিং গাউনে শেষ অভিজাত চৌধুরী বললেন, "বসুন।"

তবু যা হক আজ বসতে বলেছেন চৌধুরী। সেই আর-এক দিন—

"আচ্ছা, আমাদের কি আগে কখনও দেখা হয়েছিল?"

"আজ্ঞে হাঁ, হয়েছিল।" জায়গাটার নাম করল ভবতোষ। সালটাও চিহ্নিত করল।

চৌধুরী বললেন, "বসুন।"

মনে আনতে পেরেও মনে করতে পারলেন না চৌধুরী।

সেদিন বসতেও বলেননি। স্টেশন থেকে সোজা কোর্টে এসে চার্জ নিতে হয়েছিল ভবতোষকে, এমন সময় ছিল না যাতে সাহেবের বাড়িতে গিয়ে দেখা করা চলে। তাই লাঞ্চ-টাইমে কার্ড পাঠিয়ে খাসকামরায় এসেছিল দেখা করতে। ঘরে ঢুকে গড় করে দাঁড়াল ভবতোষ, হাঁড়িমুখে একটু আভার ছায়েরও দাগ পড়ল না। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজেই ভবতোষ বসল চেয়ারে। ইংরিজীতে বলল, "আজ জয়েন করলাম স্যার। আপনাকে পে-রেস্পেক্ট করতে এসেছি।"

টুঁ শব্দটি করলেন না চৌধুরী। কী আশ্চর্য, কার্ড অনুমোদন করেই ত ডেকেছেন, তবে এখন কেন এই স্তব্ধতা। চাপরাসীকে দিয়ে বলালেই পারতেন এখন হবে না। আর কী বা দেখা করার উদ্দেশ্য। একটা রুটিন ভিজিট, মামুলী

সেলাম। কিন্তু দেখ না এমন একখানা মুখ করে রয়েছেন যার নাম অভদ্রতা ছাড়া কিছু নয়। হীনাবস্থাদের প্রতি অসৌজন্য দেখানর মধ্যেও বোধহয় একরকম মাদকতা আছে।

একটা টেবিলের চারধারে স্তূপীভূত রেকর্ড সাজান। ঘুরে ঘুরে পাইচারি করে করে সই করছেন আর চাপরাসী পর-পর উপরের নথি সরিয়ে নিচ্ছে ও নীচের নথিকে তুলে ধরছে। বসে বসে পায়ে বাত ধরা সম্ভব তাই এমনি চলতে-চলতে সই করার ব্যবস্থা। সই সারা হলে ভবতোষ আশা করল এবার বুঝি প্রভু মুখ খুলবেন। মুখ খুললেন বটে, কিন্তু তাঁর স্টেনোর কাছে। একটা অর্ডার ডিকটেট করতে বসলেন। দু লাইন বলেই উঠে পড়লেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে দাঁড়ালেন গিয়ে জানলায়। স্টেনো পালাল। পদাঙ্ক অনুসরণ করল ভবতোষ। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আমি এখন যেতে পারি?" চৌধুরী ফিরেও তাকালেন না।

কিন্তু তাকালেন। একেবারে মর্মের মধ্যে। ভাবখানা, এখানে দেখা করতে আসার প্রয়োজন কী! এত যদি পে-রেস্পেক্ট করারই ইচ্ছে যথারীতি বাড়ি যেতে পারনি? শুকনো হাতে 'পে' হয়? গাছের বলে আম বা পুকুরের বলে মাছ বা আমাদের দেশের স্পেশ্যালিটি বলে বাসন বা হাতির দাঁতের কোন জিনিস আনতে পারনি? কথায় বলে যেখানে আবাদ সেইখানে

ভারতে সর্বাপেক্ষা ফাইন
সিল্ক, কটন ও উলের
গেঞ্জী প্রস্তুতকারক

দেশবন্ধু হোসিয়ারী
ফ্যাক্টরী

১০০এ, গড়পার রোড, কলিকাতা—৯
ফোন : ৩৫—৪৫৮৩ * গ্রাম : নিটকুল

উৎপত্তি। চোরের আনন্দ অন্ধকারে। পেয়াদার আনন্দ বকশিশে।

জজ? জজ আর কিছুই নয়, পেয়াদার জেয়াদা।

সেই চৌধুরী আজ কথা কইলেন এবং অদ্ভুত, বাংলায়। বললেন, "কিন্তু আমি ত এখন রিটায়ার করেছি। আমি আর আপনার জন্যে কী করতে পারি? কী ক্ষমতা আমার আছে?"

"কোন কিছু করবার জন্যে আমি আসিনি।" বহু কষ্টের অভ্যাস, ভবতোষ ছোট হয়ে বললে।

"তবে?" বিনা প্রয়োজনে কেউ আসতে পারে কারও কাছে বিশেষত উঁচু-নিচুর লোক, ভাবতে পারেন না চৌধুরী।

"আপনি আমার পরবর্তী দরজার প্রতি-বেশী, নেক্‌স্ট্‌ডোর নেইবার, তাই প্রতি-বেশী হিসেবে দেখা করতে এসেছি।"

"কলকাতার আবার নেইবার। ও-সবে আমি বিশ্বাস করি না।"

"তবু এক পাড়ার মধ্যে থাকা—"

"ও-সব কিছু না।" দৈবজ্ঞের মত বললেন চৌধুরী: "সবাই নিজের নিয়ে মত্ত। আপনি বাঁচলে বাবার নাম। আপনি রাঁধি, আপনি কাঁদি, এই জগৎসংসার—"

"তা ত বটেই।" সায় দিল ভবতোষ। সায় না দিয়ে উপায় কী! চৌধুরী এমন এক দেশ থেকে এসেছেন যার নাম সব-জানা সব-বোঝা সব-করতে-পারার দেশ। বরং একটু জুড়ে দিল: "তোর তেল আঁচলে ধর আমার তেল ভাঁড়ে ভর। সবাই যে যার নিজের স্বার্থে মশগুল।"

"তবে দেখুন, একটা কথা—" চৌধুরী হঠাৎ অনুভব করলেন আলাপের এক সমতলে ঘেঁষে বসছেন বুঝি, তাই নিজেকে সতর্ক করে ছোঁয়া বাঁচিয়ে দূরে সরিয়ে নিলেন: "আপনার ছাদটা যেন নোংরা করে রাখবেন না। মধ্যবিত্ত অভ্যেসগুলো বড় কদাকার।"

"দোতলায় আরও একজন ভাড়াটে আছেন কিনা, আর ছাদটা এজমালি—" ভবতোষ আত্মদোষস্খালনের চেষ্টা করল।

"লোকটা কী করে?"

"ডাক্তারি।"

"নিজে ডাক্তার নয়, করাটা ডাক্তারি।" একটা চোখের উপরকার ভুরু তুললেন চৌধুরী।

"প্রায় তাই। সামনের কোন এক ডিস-পেনসারিতে বসে। রুগি-টুগি বেশী দেখি না, যা রোজগার সার্টিফিকেটে।"

খুব পীড়িত বোধ করছেন এমনি মুখের ভাব করলেন চৌধুরী। বললেন, "কিন্তু নিজের বাড়ি-ঘরের যে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন তাও ত ঐ এক জাতেরই। ইজ অ্যাডভাইজড টু টেক এবসলিউট রেস্ট—তাই না?" হেসে উঠলেন চৌধুরী।

পরনিন্দায় আবার সমতল হচ্ছেন বুঝি। তাই আবার সামলালেন নিজেকে। বললেন, "আমরা সবাই যদি সাবধান না হই তাহলে পাড়ার অ্যারিস্টোক্র্যাসিটা বজায় রাখি কী করে? তা ছাড়া পশ্চিমের ঐ বাত্রিশভাজা বস্তিটা—উঃ, ফ্রাইটফুল—"

"কলকাতায় ভাল করে বোমাই পড়ল না—" ভবতোষ আপসোস করল।

"যা বলেছেন! বোমায় ও-সব ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।"

বোমা বেছে-বেছে শুধু বস্তির উপরেই পড়ুক, চৌধুরী-চন্দদের বাড়িগুলি ঠিক থাক, নিটুট থাক। তা হলেই হল। আপনার ঢাকা থাক পরের বিকিয়ে যাক।

লাল কাঁকরের রাস্তায় শোনা গেল আবার কার ভারী পায়ের জুতোর আওয়াজ। এবার কিন্তু ডাকল না কুকুর। কেন ডাকবে! আগন্তুক যে আগে থেকে দিনক্ষণ ঠিক করে এসেছে। সময় বুঝে কুকুরকে সামলান হয়, সময় বুঝে লেলানো। আগে থেকে যে এপয়েণ্টমেণ্ট করে আসে তাকে কুকুর উদ্বাস্ত করে না, যে অঘোষিত অবাঞ্ছিত তারই উপর কুকুর সমুদ্যত।

"আরে ভৌমিক যে, এস এস।" হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করলেন চৌধুরী: "তারপর, খবর কী?"

"খবর খুব খারাপ।" ভয়ার্ত চোখ করল ভৌমিক।

"খারাপ! কেন, কী হয়েছে?"

"আমরা স্বাধীন হতে চলেছি।" দুই হাত চিৎ করে নিঃস্ব হবার মত ভঙ্গি করল ভৌমিক।

"তা খবর গোলমেলে বটে, কিন্তু এত হতাশ হবার কী হয়েছে। বস।"

ভৌমিক বসল। বললে, "না, কয়েদীকে জেলখানা থেকে ছেড়ে দিলে সে কি হতাশ হয়? সেও স্বাধীন হয়।" সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল ভবতোষের দিকে। বেফাঁস কথা বলা ঠিক হচ্ছে কিনা কে জানে!

চোখাচোখি হল। চিনতে দেরি হল না। চৌধুরীর বল লাইনের বাইরে চলে গিয়েছে বটে, কিন্তু ভৌমিকের বল এখনও মাঝমাঠে। তাঁরা একই মাঠের খেলোয়াড়।

নবাগতকে নমস্কার করল ভবতোষ।

"কোথায় বাড়ি," জিজ্ঞেস করল ভৌমিক।

"এই পাশেই।" ভবতোষ উঠে পড়ল। বুঝল ময়ূরের সভায় ছাতার পাখি শোভা পায় না।

অশেষ সান্ত্বনার মত চৌধুরী বললেন, "আবার দেখা হবে!"

ভবতোষ তাইতেই ভরপুর। তা ছাড়া

কুকুর এখন শৃঙ্খলিত, তার চিৎকার এখন রিটায়ার করা অফিসারের মত নির্বিষ, সেটাও একটা শান্তি।

"ছোট আদালতের জজ।" ভবতোষ চলে গেলে চিনিয়ে দিলেন চৌধুরী।

"জজ নয়, রেজিস্ট্রার।" সংশোধন করল ভৌমিক।

"ও একই কথা। যা চালভাজা তাই মুড়ি।"

"কিন্তু ইংরেজের কাণ্ডটা একবার দেখুন।" ভৌমিক চেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিল: "এমন জমিদারি কেউ তাচ্ছিল্য করে ছেড়ে দেয়! সাধ করে কেউ বৈরাগী হয়!"

"না হয়ে উপায় কী!" চৌধুরী সিগারেট এগিয়ে দিয়ে নিজেও একটা ধরালেন: "ডাইনে-বাঁয়ে দু দিক থেকে খোঁচা—এক গান্ধী আর-এক সুভাষ—হাটের জিনিস হাটে ফেলে মাঠ নিয়েছে বাছাধন। বিবাগী না হয়ে যায় কোথায়!"

"কিন্তু বলুন মাইনে-পেনশন পুরো-পুরি পাব?" মুখ অন্ধকার করল ভৌমিক।

রুপোলী একটি রেখা টানলেন চৌধুরী। বললেন, "সব রফায় হবে ত, দফারফা নাও হতে পারে। ইংরেজ আর যাই হক ধূর্ত। তপস্বী হলেও বিড়ালতপস্বী। এতদিন যাদের কোল দিয়েছে, তাদের একেবারে ঝোলছাড়া করবে না।"

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ভৌমিক বললে, "আমার কিন্তু তা মনে হয় না।"

"তোমার কী মনে হয়?"

"মনে হয় আমাদের মাইনেও পাঁচশ হয়ে যাবে। নৃশংস কষ্ট পাওয়া ত্যাগী দেশ-প্রেমীর দল, ত্যাগ ও কষ্টের আদর্শ তুলে ধরবে দেশের সামনে, কুটিরে থাক, শালু-কার্পেট বাদ দাও, ট্রেনের থার্ড ক্লাসে ট্র্যাভেল কর, নিজের কাপড় নিজে বোন—তাহলেই গেছি—আর তাই হয়ত হবে অদৃষ্টে।"

"একমাত্র ভরসা কী জান?" দৈবজ্ঞের মতন বললেন চৌধুরী।

"কী?"

"আজকের যাঁরা ত্যাগী-প্রেমী তাঁরা যদি একবার গদিতে বসতে আকৃষ্ট হন! গদা ধরার অর্থই ত গদির জন্যে। যদি একবার তাঁরা ফাঁদে পা দেন, যদি শক্তির মদে চুমুক দেন ভুল করে—"

"তা হলে?"

"তা হলেই কেল্লাফতে। তা হলেই সব বজায় থাকবে।" চৌধুরী সিগারেটে ছেলে-ছোকরার মত দীর্ঘ টান মারলেন: "ইংরেজ চলে গেলেও ইংরেজের ভূত থাকবে। ব্যুরো-ক্রেসি থাকবে, ব্রাউন ব্যুরোক্রেসি। কোটপ্যাণ্ট থাকবে, আমলাতন্ত্র থাকবে, মন-মেজাজ থাকবে। সেই খেতাব বা প্রাইজ, সেই খানাপিনা, শালু-কার্পেট। তা হলে আমরাও থাকব, আমাদের মাইনে-পেনশনও থাকবে—"

অতটা স্বপ্ন দেখতে সাহস হয় না ভৌমিকের। নীচের ঠোঁট পুরু করে সে বললে, "কিন্তু আমার মনে হয় ছবিটা আর-এক পিঠের। এরা সব খাটামোটা পোড়-খাওয়া কর্মী, রোদেজলে মানুষ, জেলফেরত নিষ্কাম সন্ন্যাসী, এরা গান্ধীর চেলা, গীতার জ্বলন্ত ভাষ্য, এরা টোপ গিলবে না কিছুতেই। এরা কিছুতেই নেবে না মসনদ—"

"তা হলেই অন্ধকার।" অন্ধকার আনতে না আনতেই আবার আলোর ঝলক দিলেন চৌধুরী: "কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কিছুতেই এরা লোভ সামলাতে পারবে না। সে পেরে-ছিল মহাভারতের—পঞ্চপাণ্ডব—" হঠাৎ থামলেন চৌধুরী: "তুমি ত মহাভারত পড়েছ—"

"কোন্ ছেলেবেলায়, পড়েছি মনে হচ্ছে।"

"পঞ্চ পাণ্ডবের নাম জান ত?"

"জানি বোধহয়।" মাথা চুলকতে লাগল ভৌমিক: "কী করেছিল তারা?"

"কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধজয়ের পরে জয়ফল ত্যাগ করে চলে গেল মহাপ্রস্থানে—" বলতে যেন ফুলে উঠলেন চৌধুরী: "কিন্তু সাধারণ মানুষ ত পাণ্ডব নয়, তারা শুধু তাণ্ডব। তাণ্ডবের শেষে চাই-ই এক প্লাস সিদ্ধির শরবত। জয়ের পর দুধমধু পেলে সাধারণ মানুষ তাই খেতে বসে। ভাবে আমি ত খাই-ই, ভাগ্নেদেরও ডেকে এনে খাওয়াই। বুঝলে হে ভৌমিক, একেই বলে নেশা, সিদ্ধির শরবত।"

"ও! তা হলে ত বেঁচে যাই। সে সিদ্ধির শরবত অফিসাররা ছাড়া আমরা ছাড়া ঘুঁটবে কে? কিন্তু—"

ভৌমিক মুখ আবার মেঘ-মেঘ করল: "আমার মনে হয় এরা দাঁতে ভাঙবার পক্ষে শক্ত বাদাম, এঁরা অফিস নেবে না, তুচ্ছ ভূষিমালের কারবারী এরা নয়—"

"তাই যদি হয়, এরা যদি দরবারের বাইরে থেকে যোগ্যতম ব্যক্তি দিয়ে দেশ চালাতে দেয় গান্ধীর আদর্শের অনুরূপে নিজেরা ধূলোট না করে, তা হলে দেশের চেহারা

অন্নেষবস্ত্রে স্বাস্থ্যশ্রীতে উথলে উঠবে, তাহলে তোমার আমার পাঁচশ টাকায় ক্ষোভ থাকবে না। কিন্তু ভৌমিক, সে-আশা বৃথা—"

"কেন ?"

"যে বিলিতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করে জেলে গিয়েছিল সেও আশা করবে আমি উজির নাজির হব। নইলে জেল খাটলুম কেন? ফয়দা কী?"

"জেলখাটাটাই ছাড়পত্র।"

"হ্যাঁ, এই হবে ভ্যালুজ। তখন কাপড়ের দোকানের পিকেটার মদের দোকানের পিকেটারকে, একই দলের লোককে, সুযোগ-সুবিধে করে দেবে। ঐ চলবে তখন অলাত-চক্র। তাই মাভৈঃ, তুমি যা বলেছ, চাকা ঘোরাবার রক্ত-পোক্ত লোক চাই, চাই ইস্পাতের লোক। তাই ইস্পাতের লোক আমরা, আমরা ঠিক থেকে যাব। সব ঠিক থাকবে। মায় লাটবাড়ির বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত।"

"কিন্তু যাই বলুন, আমি এসব বিশ্বাস করি না।" ভৌমিক বললে, "এরা সব নাড়া-বুনে কীর্ত্তনে হয়নি। এরা কাস্তে ছেড়ে নেবে না কিছুতেই করতাল।"

"তাই যদি হয়, তবে আমরা সত্যি স্বাধীন হব।" চৌধুরীর গলা থেকে প্রায় কাকুতির স্বর বেরুল: "আমাদের দাও একবার সত্যি স্বাধীন হতে।"

চৌধুরীদের বাড়ি থেকে ফিরে ভবতোষ নিজের বাড়িতে ঢুকল নিজের বাইরের ঘরে। উত্তর দিকের ছোট ফ্ল্যাটটা সদয়শিব ডাক্তারের। নীচে দক্ষিণের ফ্ল্যাটে বাড়িওলা নিজে, ডান দিকের ছোট ফ্ল্যাটটা দু ভাগ করা, সামনের দিকে মানে রাস্তার দিকের ঘরে থাকে দুজন ব্যবসায়ী পাঞ্জাবী হিন্দু, পিছনের দিকে দেবানন্দ ঘোষাল, পেটের যন্ত্রণায় ভোগে আর চিৎকার করে।

উপরে নীচে বাড়িতে ঢোকবার সরকারী এজমালী প্যাসেজ, খানিকটা যৌথ থেকেই বাঁ দিকে উপরে উঠবার সিঁড়ি।

"দাদা, আমি এসেছি, আমি এসেছি—" সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পায়ে কে উঠতে লাগল উপরে।

ভরাট গলার জমাট কণ্ঠস্বর। ভবতোষের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাইরের ঘরে বসে কাজ করছিল, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আরে কে? ফরিদ?"

"আমি এসেছি। দাদা যেখানে ভাইও সেখানে।" পর্দার বাইরে থেকে মে-আই-কাম-ইন বলে ঢোকা নয়, পর্দা আছে কি নেই কে খেয়াল করে, সেই দুর্বার অজস্রতায় ঢোকা। মুক্ত মাঠের হাওয়া নিয়ে।

হাত বাড়িয়ে ভবতোষ ফরিদকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। চেঁচিয়ে উঠল: "ও টুকটুক, দেখে যা কে এসেছে।"

ক্লাস টেন-এ পড়ে টুকটুকি, নিঃসঙ্কোচে ছুটে এল। ওমা, কাকবাবু যে। নিচু হয়ে প্রণাম করল ফরিদকে। চেঁচিয়ে উঠল: "মা, দেখবে এস কাকাবাবু এসেছে।"

আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে রান্নাঘর থেকে নীলিমা এল একমুখ আনন্দ নিয়ে। ফরিদ বললে, "নমস্কার বউদি—"

"সালেহা কেমন আছে?" মুখভরা মিষ্টি নিয়ে জিজ্ঞেস করল নীলিমা।

পুরনো কথা মনে পড়ল বুঝি?

ঘাটে স্টিমার লেগেছে। সালেহাকে নিয়ে ফরিদ নামছে আর নীলিমাকে নিয়ে উঠছে ভবতোষ। ঘাট থেকে স্টিমার পর্যন্ত যে পাতা-সিঁড়ির প্যাটাতন তাতে দু দলের দেখা। সালেহার গায়ে বোরখা, নীলিমা ত মুক্ত চন্দ্রের পসরা।

নীলিমাকে দেখেই হাত জোড় করে ফরিদ বললে, "নমস্কার বউদি।"

"একতরফা হলে চলবে না," ভবতোষ এগিয়ে এল: "দাঁড়াও, আমিও বউমাকে ছালাম করব। ওঁর মুখ খোলা পেয়েছ আর এঁর মুখ ঢাকা থাকবে এ হতে পারে না।"

সবাই হেসে উঠল আর তার মধ্যে মুখের ঢাকনিটা মাথার উপর তুলে দিল সালেহা।

"আদাব বউমা।" বললে ভবতোষ।

নমস্কার বউদি—ফরিদ এ কথা বলতেই মনে পড়ে গেল সেদিনের সেই স্টিমার-ঘাটের ঘটনা।

"কী রান্না করেছেন?" কৌতুককণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ফরিদ। "আচ্ছা, এবেলা থাক্। নোটিশ দিয়ে যাই রাত্রে এসে নাস্তা করব।"

"কেন, থাকবে কেন?" নীলিমা চলে গেল রান্নাঘরে।

ভবতোষ জিজ্ঞেস করলে, "এলে কবে?"

"এই ত এইমাত্র।" ধপাস করে বেতের চেয়ারে বসে পড়ল ফরিদ: "বাড়িতে মাল-পত্র নামিয়ে রেখে এই আসছি এখানে ছুটতে-ছুটতে। কী গো টুকটুক, তোমার বন্ধুর খবর জানতে চাইছ না?"

"সে কী। আসেনি হাসিনা?" আর্ত-নাদের মত করে বললে টুকটুকি।

পর্দার আড়াল থেকে হাসিমুখ বেরুল একখানা। "সে কী, আসেনি হাসিনা। হাসিনার খবর এত পরে! হাসিনা ত আর এখন মেওয়া-মিছরির নয়, হাসিনা এখন ধুলোবালি।"

ঘরে ঢুকল হাসিনা। পরনে রঙিন শাড়ি, মাথায় বিনুনিখসা ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল। চোখে ঘুমে-মোছা বাসা সুর্মার রেখা। পাতলা ছিপছিপে মেয়ে, রাখালিয়া বাঁশির মিঠে সুরের টান।

"ওমা, তুই এসেছিস?" দু হাত চেপে ধরল টুকটুকি: "তুই না এলে শহর-মুলুক অন্ধকার। তুই নেই বলে জানিস, আমার আকাশে একটা তারা কম ওঠে।"

"ইস্? আমি আসমানের তারা? আমি দূরের জিনিস?" ডাগল-দীঘল চোখ মেলল হাসিনা: "কক্খনও না। আমি মাটির প্রদীপ।"

"তুমি আমাদের হাসনুহানা।" বললে ভবতোষ।

হাসিনার গলার আওয়াজ পেয়ে রান্নাঘর থেকে আবার ছুটে এল নীলিমা: "আমাদের হাসিহাঁ এসেছিস?"

"হাসিহাঁ মানে?" ভবতোষ অবাক মানল।

"ও ত হাসির না নয়, ও হাসির হাঁ।" বললে নীলিমা: "জীবনে ও হাসিকেই হাসিল করতে এসেছে।"

ভবতোষ আর নীলিমার পা ছুঁয়ে সেলাম করল হাসিনা।

শুধু হঠাৎ ভেসে আসা এক ঝলক বা এক পশলা হাসি নয়, হাসির একটি নিরন্ত নির্ঝর একসাজি ফুল এক হ্রদ জ্যোৎস্না। স্রোতের জল যেমন আলোতে-আঁধারে সব সময়েই চিকচিক করে তেমনি প্রাণের পবিত্রতায় সব সময়েই হাসছে হাসিনা। বিজলীকেও স্থির ভাবা যায়, কিন্তু হাসিনা সব সময়েই চঞ্চল, সব সময়েই তার চমক-ভাঙা সদাজাগর ভাব। সব সময়েই তার চোখে বিস্ময়ের রামধনু। তার হাত-পা যদি নাও চলে, নাচবে তার চোখ, নড়বে তার ঠোঁট, বদলাবে তার মুখে ছায়া আর সব সময়েই বয়ে যাবে হাসির হাওয়া, হাসির বৃষ্টির জল। মনে হয় হাসিনা একলা হাসে না, হাসে তার শাড়ি-জামা বিনুনি-ফিতে, তার আগল-পাগল কালো চুলের ঢেউ।

"তোর স্কুলেই ভর্তি হব, আর জানিস

ও তোরই ক্লাশে।" বললে হাসিনা।

"আমাকে ছেড়ে তুই যাবি কই? আর তোকে ছাড়াই বা আমি থাকি কী করে?" বললে টুকটুকি, "দুই মলাট না হলে কি বই হয়? দুই পার না হলে কি নদী? দুই পাখা না হলে কি পাখি?"

"ওরা যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল।" বললে ভবতোষ।

"মোটেও না।" হাসিনা সারা শরীরে হাসির প্রতিবাদ তুলল। বললে, "আমরা দুই বৃন্তে এক ফুল। আমরা দুই দেহ কিন্তু এক রক্ত। দুই মানুষ কিন্তু এক মন। দুই বাসিন্দে এক ঘর, একদেশ। দুই ধর্ম কিন্তু এক ভক্তি, এক ভালবাসা।"

এক মফস্বলী মহকুমা শহরে পাশাপাশি বাড়িতে থাকত এরা, মাঝখানে শুধু একটা সরকারী পুকুর। এ-ঘাটে এ সরে ও-ঘাটে ও। এক জল। এ-ঘাটে ঢেউ দিলে কাঁপতে-কাঁপতে ও-ঘাটে গিয়ে লাগে, ও-ঘাট থেকে ঢেউ দিলে এ-ঘাটে। এ-বাড়িতে যখন চণ্ডীপাঠ হয় তখন ও-বাড়ি শোনে, ও-বাড়িতে যখন মৌলুদ শরিফ পাঠ হয় তখন এ-বাড়ি। এ-বাড়িতে ও নেমন্তন্ন খায়, ও-বাড়িতে এ দাওয়াতে। সন্দেশের কী সুন্দর, কী মিষ্টি, আবার দরুদের আওয়াজ! ও দেবীর থানে গিয়ে বটের ঝুরির সঙ্গে সুতো বাঁধে। এ দরগায় গিয়ে মোমবাতি জ্বালায়। সন্ধ্যারাত্তিরে কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠলে ও কান পাতে আর এ তন্ময় হয়ে শোনে যখন আজান পড়ে মসজিদে।

এ-বাড়িতেও মাছের কাঁটা ও-বাড়িতেও মাছের কাঁটা।

একটা বেরাল দু বাড়িতে আনাগোনা করে। টুকটুকি ভাবে এ আমাদের। হাসিনা ভাবে এ আমাদের। হাসিনা নাম রেখেছে ইসাবেল, টুকটুকি নাম রেখেছে সিদ্ধেশ্বরী। আমাদের বেরাল সিদ্ধেশ্বরী তোমাদের বাড়ি এসেছে? টুকটুকি একদিন হাসিনাদের বাড়িতে এসে হাজির। আমাদের বেরাল ইসাবেল তোমাদের বাড়ি এসেছে? হাসিনা টুকটুকিদের বাড়িতে এসে উপস্থিত। ওমা, এই যে আমার ইসাবেল। কে বললে? কী ভীষণ, এই যে আমার সিদ্ধেশ্বরী। দুজনেই ধরতে গেল বেরাল। বেরাল চম্পট দিল। দেখা গেল দুজনের হাত দুজনের হাতের মধ্যে বাধা।

বৃষ্টি নেমেছে কতদিন। ঝপ ঝপ ঝম ঝম, শেষ দিকে ঝিম ঝিমুনি। এ-জানলায় এ, ও-জানলায় ও, পুকুরের উপর বৃষ্টি পড়া দেখেছে। জলের উপর জল পড়ার খেলা, জল পড়ার শব্দ। পুকুরের জল কেমন বাড়ছে, সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে এসে কোন বাড়ির দিকে আগে হাত বাড়াল তার মাপজোক। জল কাকে বেশী ভালবাসে তাই নিয়ে গবেষণা। কিন্তু বৃষ্টিতে পুকুরের জল বেড়েছে বলে তাদের স্ফূর্তি করার মানে হয় না, যেহেতু নদীর জলও বেড়েছে। আর নদীর জল বাড়তেই ফাটল ধরেছে বাঁধে, রন্ধ্র দিয়ে বোনা চাষাদের সোনার ফসল ভেসে যায় বুঝি। আর দুজনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও খোদার কাছে ফরিয়াদ জানাই। যে যেখান থেকে যাই বলি না কেন, গাঁও-গেরামের লোক বাঁচুক, মাঠের ধান রক্ষা পাক, সকলের হাল-হাতিয়ার ঠিক থাক্।

কথা আলাদা হক, সুর এক, কান্না এক, মানে এক।

"দাদা, এক গ্লাস পানি দিন—" কপালের ঘাম মুছে ফরিদ বললে।

ভবতোষ বললে, "পানি নেই, জল দিতে পারি।"

"জল খাই না, পানি চাই।" জোর গলায় বললে ফরিদ।

"পানি নেই ত দেব কোত্থেকে? জল চাও ত দিতে পারি অঢেল।" ভবতোষও নাছোড়।

"একটা লোকের পিয়াস মেটাতে দিলেন না দাদা?" ফরিদ হাসি-হাসি করুণ মুখ করল।

করুণ-করুণ হাসিমুখ করে ভবতোষ বললে, "পানীয় থাকতে যে তেষ্টা না মেটায় তাকে লোকে কী বলে!"

ফরিদও কিছুতেই জল বলবে না, ভবতোষও কিছুতেই পানি দেবে না।

তবে এক কাজ করা যাক, দুজনে সন্ধি করলে।

পর্দার আড়াল থেকে

"ওয়াটার দিতে পারি।" বললে ভবতোষ।

"তাই দিন, ওয়াটার দিন।"

"ভায়া, এই হল ইংরেজ।" ভবতোষ বললে।

গ্লাসে করে জল নিয়ে এল টুকটুকি। জল খেতে খেতে ফরিদ বললে, "যা বলেছেন এই হল ইংরেজ। তোমাকে আমাকে দিয়ে লাঠালাঠি করিয়ে শেষকালে মাথায় ওয়াটার ঢালবে।"

"মাথা ঠাণ্ডা ত হবেই না, শুধু কাদা হবে।" ভবতোষ জের টানল আগের কথার।

"তাই ত ওরা চায়। ওদের কাদা আর আমাদের কাঁদা। কাদায় পড়ে কাঁদা—"

"তুমি জয়েন করছ কবে?" অন্য কথায় আসতে চাইল ভবতোষ।

"কাল।"

"কিন্তু, তোর কিন্তু আজ বিকেলেই জয়েন করা চাই।" টুকটুকির দিকে একটি হাসন্ত তর্জনী তুলে ধরল হাসিনা।

নীলিমা চা আর খাবার নিয়ে এল।

এক থালায় সবাই একত্র থাবা মারল। এক রসনায় এক রস, এক স্বাদ।

"যাস কিন্তু বিকেলে—" আঁচল ভরা হাসির জুঁই ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেল হাসিনা। চলে গেল ফরিদ।

বিকেলে ত যেতে বলে গেল হাসিনা, কিন্তু যাওয়া কি সহজ? সেজে গুজে বেরুচ্ছে, নীচে দোরগোড়ায় বসে আছে সেই ছোঁড়াটা।

সেই ছোঁড়াটা আর কেউ নয়, বাড়িওলা সরখেলের ছোট ছেলে, আভাস। দুবারের বার টায়েটুয়ে ম্যাট্রিক পাশ করে পর পর দু বছর আই-এ ফেল করে এখন ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাপের ইচ্ছে ছেলেকে গ্র্যাজুয়েট করে, ছেলে বলে, আমার গ্র্যাজুয়েশি কিছু হবে না, আমাকে দোকানে ঢোকাও, ব্যবসা শিখি। সরখেল বলে, বড়টা ঢুকেছে ঢুকুক, তুই লেখাপড়া শিখে মানুষ হ, আমার মুখটা শুধু রুপোর আলোয় নয় সোনার আলোয় উজ্জ্বল কর্। বংশ কি শুধু ব্যবসা নিয়েই থাকবে, কেউ তোরা একটু বিদ্যা ও গুণের স্বাদ নিতে দিবিনে? শুধু টাকা, একটু মান পাব না সভায়?

কী বুদ্ধি, সংসারে ধনীই একমাত্র মানী। টাকা থাকলে মেড়াকান্ত দেশের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত।

এই নিয়ে বাপের সঙ্গে তুমুল হয়ে গিয়েছে ছেলের। বাপ বলে, আবার পড়, পড়তে হবে আবার; ছেলে বলে, পড়ায় মন যায় না, মাথায় রাখতে পারিনে কিছুই। দোকানে না ঢোকাও আমাকে আলাদা ব্যবসা করবার জন্যে পয়সা দাও। তোমার পয়সা আছে কী করতে? পচতে?

"লেখাপড়া না করবি ত বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে।" আঙুল দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দিল সরখেল।

"তোমার বাড়ি?" কোমরে হাত রেখে বললে আভাস।

"আমার নয় ত তোর?"

"আমারও নয় তোমারও নয়। যারা তিল-তিল রক্তকে তিল-তিল জল করে এই বাড়ি গড়েছে গেঁথেছে সেই সব মুটে-মজুর মিস্ত্রি যোগাড়েদের, মেহনতী দুনিয়ার—"

বাপেরা মুখেই বলে বটে, বেরিয়ে যা, কিন্তু ফিরে এসেই প্রথমে খোঁজ নেয় ছেলে ফিরেছে কিনা, অন্তত এসেছিল কিনা খেতে।

তাই আর-আরদের মত আভাসও আধখানা বেরিয়েছে। রাস্তার মোড়ে অদূরে যে ডাইং-ক্লিনিংএর দোকান আছে তাতে ছোট্ট একটু রক, সেইটিই পাড়ার ছেলেদের একান্ন পীঠের এক পীঠ। সবাই যে বসতে পারে ঠাসাঠাসি করে তা নয়, বেশির ভাগই দাঁড়িয়ে থাকে। আড্ডার গুণে দাঁড়ানই বসা। শেকড় যদি ঠিক থাকে ডাল-পালা মেলুক না বাইরের দিকে। ডালপালা মেলেই ত শেকড়ের আনন্দ।

শেকড় হচ্ছে আভাস। বর্তমানে সে চিৎ-হাত হলেও ভবিষ্যতে সে বাড়ির মালিক এই গর্বেই সে অধিপতি। আর তাকে ঘিরে আছে তার সাঙ্গোপাঙ্গেরা, বিভূতি আর মন্মথ, এলেম জেলেম জুল-

ক্লব, এমন কি অ্যাংলোদের গোমেজ। ড্রামের সঙ্গে পিপে জুটেছে, ভাঙা ঢোলের সঙ্গে তালকানা বাজিয়ে।

এদের কাজ কি শুধু আড্ডা দেওয়া? শুধু রকের আরক খাওয়া? মোটেই না। এদের অনেক মহৎ কাজ। এদের কাজ পাড়া-বেপাড়ার অত্যাচার দমন করা। অনেক অলিখিত অত্যাচার।

কী তোমার ঝুলিতে? ময়লা কাগজ কুড়োও? মিথ্যে কথা। তোমার ঝুলি অনাবশ্যক ফুলে আছে, নিশ্চয়ই এর মধ্যে বাচ্চা ছেলে কি মেয়ে আছে, তুমি নিশ্চয় ছেলেধরা। ওরে পালাচ্ছে লোকটা।

ধর্ ধর্ মার্ শালাকে। ওরে চল্ চল্ ঐ মোড়ে কে গাড়িচাপা পড়েছে—গোম ড়াকে মুচির পার্বণ—চল্, ড্রাইভারটাকে মেরে আসি দু ঘা। বেশী তেড়িবেড়ি করে আগুন লাগিয়ে দেব গাড়িতে। স্ট্রাইকের দিন কে যাচ্ছে রে রিকশা চেপে! ধর্ ধর্, আটকা, ঠ্যাং ভেঙে দে। কী হয়েছে মশাই? পকেট মেরেছে? থানায় নিয়ে যাচ্ছেন? শেষকালে ত নানা ভুজুং করে ছাড়া পেয়ে যাবে, দু ঘা এখুনি বসিয়ে দিন না মশাই। সাহস নেই? ওরে, হাত লাগা। ওখানে আবার কিসের জটলা রে? বিনা টিকিটের রেল সোয়ারী ধরেছে। ট্রেনে জায়গা দিতে পারে না, তার আবার টিকিট! কারা ওরা? কলেজের ছাত্র। আমাদের সব এক্স-ফ্রেন্ড। চল্ ছিনতাই করে নিয়ে আসি। অত বড় প্যাণ্ডেল করেছে, কিসের জলসা মশাই ওখানে? গান হচ্ছে? গান হচ্ছে ত বাইরে মাইক দেয়নি কেন? উচ্চাঙ্গ সংগীত কিনা, সকলের ত বোঝবার নয়। ওরে কী বলছে শোন, আমরা নাকি বুঝব না উচ্চাঙ্গ সংগীত! ঢিল ছোঁড় ঢিল ছোঁড় এন্তার, ধসিয়ে দে খসিয়ে দে প্যাণ্ডেল। অত ভিড় কিসের? ইস্কুলের ফাংশান হচ্ছে। আমরা ঢুকতে পাই না? কার্ড লাগে ঢুকতে। সিট ত খালি আছে, আমাদের কটা কার্ড দিলেই ত চুকে যায়। কোন্ আক্কেলে? ওরে, আক্কেল দেখাতে এসেছে। ক্র্যাশ কর্, গেট ক্র্যাশ কর্, ইলেকট্রিকের তার কেটে দে।

এমনি অনেক রকম অবিচার অত্যাচার আছে শহর-রাস্তায়। তারা ছাড়া কে আছে এ-সব প্রতিকারের কথা ভাবে, পথ দেখায়?

কিন্তু সবচেয়ে বড় অত্যাচার টুকটুকি। টুকটুকির উঠতি বয়স, ভরা ঘাটের মত ছলছলে যৌবন।

কী অহংকার দেখেছ মেয়েটার। ভুলেও একবার চোখের দিকে তাকায় না। কথা বলা আকাশের কথা, গলা দিয়ে একটা আওয়াজ পর্যন্ত বের করে না। সামনে পড়ে-খোড়া পড়লেও ত লোকে 'হেট' বলে, তাও পর্যন্ত না। গরবে গা দুলিয়ে যাচ্ছে। এমন ভাব, দুনিয়ায় এ নতুন বয়স যেন ওর একলার। আর কারও হয়নি বা হবে না। ওই শুধু একমাত্র ঈদের চাঁদ, রূপনগরের রাজধানী। চাঁছা বেতের মত দীর্ঘ আর কৃশ, যেন সপাং করে গায়ে পড়বার জন্যে মুখিয়ে আছে। আভাসের বাপের উপর রাগ একটাও পয়সা দেয় না বলে। টুকটুকির উপর রাগ একটাও নম্র চাউনি দেয় না বলে। কুকে আর প্যাঁচায় যেমন সম্পর্ক, যেমন সম্পর্ক আদায় আর কাঁচ-কলায় তেমনি আভাসে টুকটুকিতে।

"সরুন, সরে দাঁড়ান।" উপর থেকে এক ধাপ বাকি থাকতে বললে টুকটুকি।

কথা বলেছে। অন্নপথ্যের দিনে জ্বোরো রুগীর যেমন আনন্দ, মনে মনে তেমনি ফূর্তি হতে লাগল আভাসের। কিন্তু চিরদিন যেমন বলে এসেছে তেমনি ভাবেই বললে, "এটা কমন প্যাসেজ। নীচের কমন প্যাসেজের ধারেই আমাদের বাড়ি। এখানে দাঁড়াবার আমার ষোল আনা অধিকার।"

"অধিকার নেই কে বলছে!" টুকটুকি ঝংকার দিল: "কিন্তু ভদ্রমহিলা দেখলে পথ থেকে সরে দাঁড়ানই ভদ্রতা। সরুন।"

সমস্ত ন্যায়ের জোর টুকটুকির দিকে, তাই আভাস নড়বে না মনে করেও শেষ পর্যন্ত সরে দাঁড়াল রাস্তায়।

ছোট ভাইকে নিয়ে সে যাচ্ছে হাসিনাদের বাড়ি। বাড়ি দূরে নয়, হাঁটার মধ্যে। কিসের ভয় যে রিকশা নেব? নাক উঁচু করে সোজা চলে যাব সামনে চেয়ে।

সঙ্গে সঙ্গেই পিছু পিছু চলল আভাস, হাতছানি দিয়ে আরও ডেকে নিল দুটোকে। "ওরে শুনেছিস? ভদ্রমহিলা—ভদ্রমহিলা চলেছেন।"

তাড়াতাড়ি কয়েক পা এগিয়ে এল আভাস। অমনি ছড়া কাটল:

"ভদ্রমহিলা—
এ কি কথা কহিলা!"

টুকটুকির সর্বশরীর পুড়ে যেতে লাগল। ছোট ভাই সাধনকে বললে, "ভূতগুলো আসছে এখনও পিছনে?"

"আসছে দিদি।"

আবার ছড়া কাটল:

"ভদ্রমহিলা—
উঁচু জুতো স-হিলা
কত ঘা-ই সহিলা।"

"আসুক।" ভাইকে কাছে টানল টুকটুকি। "তাকাসনি পিছনে, চলে আয়।"

ইস্কুল থেকে আসতে-যেতে সব সময়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আভাস। ইস্কুল দূরের পথ নয়, এক মুঠো টাকা দিয়ে বাসে যাবার কোন মানে হয় না। পথের কতগুলো কুকুর খেঁকাবে তার জন্যে সে নিজে জরিমানা দেবে? কখনও না। উৎপাতকে উৎখাত করব।

সেদিন আবার ইস্কুলের পথে আভাস। খানিকটা পথ ছুটে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে একটি ল্যাম্পপোস্টের নীচে। যেই পাশ দিয়ে যাচ্ছে টুকটুকি অমনি ছড়া কেটেছে আভাস:

'টুকটুকি লো টুকটুকি
হবি বুকের ধুকধুকি'

রুখে দাঁড়িয়ে টুকটুকি বললে, "চড় মেরে গাল উড়িয়ে দেব।"

ডাকাত গ্রেপ্তার হলে দারোগার যেমন আহ্লাদ তেমনি বিহ্বল গলায় আভাস বললে, "মারবে চড় মার না, গাল বাড়িয়ে দিচ্ছি।" সত্যি-সত্যি গাল কাত করল: "চড় ত হাত দিয়ে মারবে আর তা ভাগ্যবান এই গালের উপর। লোকে বলবে চড় আমি বলব আঁচড়। কই, মার না।"

"জুতো মারব।" প্রায় খাঁড়া তুলল টুকটুকি।

"তাই মার। তোমার সেই জুতো সোনালী লতার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখব।"

বাবাকে বলেছে কতবার। ভবতোষ বলে, "চালাক হও, চালাকি করে চলাফেরা কর, যাতে দেখা না হয়, যাতে সুযোগই না পায়। একা একা যাও কেন?"

"রাজ্যে গভর্নমেণ্ট নেই? ও কি বাঘ যে ওর ভয়ে একা একা চলা যাবে না? তুমি পুলিশে খবর দাও।"

"বাড়িওলার সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলে বিপাকে পড়ব।" ভবতোষ বললে, "ও পক্ষের সঙ্গে লড়াই না করে নিজে সতর্ক হওয়াই ভাল। সঙ্গে চাকরটাকে নিও কিংবা আমি আমার আর্দালীকে বলে দেব।"

আমি খুকী? আমাকে চাকরের হাত ধরে ট্রাম রাস্তা পার হতে হবে, ইস্কুলের গেট পর্যন্ত যেতে হবে নির্ভয়ে! আর সব সময়েই যেন হাতের কাছে পাওয়া যায় চাকরকে। সেই ধর না সেদিন দিদির বাড়ি যাচ্ছি বাসে, সঙ্গে লোক ছিল, ঠিব তাল বুঝে উঠেছে আভাস। পাশের সংগীটাকে বলছে, "আমি কী করব বাংলা ভাষায় টুকটুকির সঙ্গে ধুকধুকি ছাড়া আর কিছু মিল হয়? আর এ হতে পারে বুজরুকি। টুকটুকি বে টুকটুকি করবি কত বুজরুকি? সেটা একই রকম বদখদ। বাস থামিয়ে সঙ্গে অভিভাবক, ভগ্নীপতি, ট্যাক্সি নিলেন কিন্তু ফেরবার পথে বাসে, শ্যামবাজার প মাথা থেকে ফিরছে, আবার সেই আভাস এবার বলছে, হসন্তটা খুব স্মার্ট। টুকটু

নয় টুকটুক। টুকটুক টুকটুক, বুক করে ধুকপুক। সাপে কাটা হয়ে আছি করে দাও ঝাড়ফুঁক। কই এবার ট্যাক্সি নিতে পারলেন জামাইবাবু? মুখ বুজে সহ্য করে গেলেন। আমি শুনেও শুনছি না এমনি ভাব করে রইলাম। আরও মেলে—উৎসাহিত হয়ে পাশের সঙ্গীকে বলছে আবার আভাস : টুকটুক টুকটুক, আমি এক অজবুক, তবুও বাছতে মোরে কর না কো ভুলচুক।

ভবতোষের আর্দালী উদয়প্রতাপ যখন সঙ্গে থাকে তখনও বাছাধনরা ঢিল দেয় না। একটু দূরে-দূরে থাকে এই যা। কিন্তু যখনই একা বা ছোটখাটো চলনদারের সঙ্গে বা মেয়েদের সঙ্গে, তখন আবার তারা শামুক থেকে সাপ হয়ে ওঠে। যেমন বরফের উপর 'শি' চলে তেমনি ফুটপাতের উপর স্যান্ডেল চালিয়েই এগিয়ে আসে তারা।

এত ত মেয়ে আছে যাওয়া-আসা করে ইস্কুলে-কলেজে, সবাইকে ফেলে তুই শুধু আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাস কেন? নতুন মেঘে শিলাবৃষ্টি ত একলা আমিই নই, এই ত আমার সঙ্গে জয়া আছে, তার দিকে নজর দিতে পারিস না? ওও ত আমারই সঙ্গে পড়ে এক ক্লাসে, আমারই মত দোতলার বাসিন্দে, তোর বাবার ভাড়াটে। ওর বাবা সদাশিব ডাক্তার, চিনিস ত তাকে, স্টেথিসকোপের মালা গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, লাগ্‌ না তার পিছনে। আমার বাবার মত সে গোবেচারা নয়, আমার বাবার মত সে শুধু কলম সার করে বসেনি, তার অনেক ছোরা-ছুরি আছে, অনেক ছুঁচ-কাঁচি, তার গর্তে গিয়ে নাক ঢোকা না। দ্যাখ না তোর জুলুম সে কী করে বরদাস্ত করে। তুই 'ফলো' করছিস তোকেও সে 'ফলো' করাবে, করাতে-করাতে একেবারে নিয়ে আসবে ফাটকের ফটক পর্যন্ত। তারপর ঠেলে দেবে জঠরে।

সেদিন সকালের দিকে জয়ার সঙ্গে যাচ্ছে ইস্কুলে, পিছনে সেই অবধারিত আভাস।

"দ্যাখ্ ত, ছোঁড়াটা আসছে কি না পিছনে—" টুকটুকি থামল এক পা।

জয়া তাকাল পিছন ফিরে। অনেক দূরে দূরে আসছে আভাস। ক্রমশই পদক্ষেপ বড় করছে। তা আসুক না। ইচ্ছে হলে ছুটুক না ঊর্ধ্বশ্বাসে। রাস্তা কি খালি টুকটুকির?

"তা আসছে আসুক না।" জয়া খিটখিটে গলায় বললে, "তোর কী হয় এলে?"

"দ্যাখ্ দিকি কী বিচ্ছিরি, একটুও ভাল লাগে না—" প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে টুকটুকি : "যেখানে যাব সেখানে ও।"

এত গরব কেন? যেখানে যাবে সেখানে ও। মনে মনে পাখা ঝাপটাল জয়া। এখন কি টুকটুকি একা-একা যাচ্ছে? নতুন আখের মত মিষ্টি কি শুধু একলা টুকটুকিই?

"নিজের সম্বন্ধে তোর এত দেমাক কেন বলতে পারিস?" জয়া এবার স্পষ্ট হয়ে উঠল : "ও তোকেই ফলো করছে এ তুই ভাবিস কেন? রাস্তায় কি তুই একলাই শুধু মেয়ে? আর কি কেউ নেই যাকে ফলো করা যায়?"

হিংসের কাঁটালতা জয়া। দু চক্ষে

দেখতে পারে না টুকটুকিকে। [illegible] সময়েই অহংকারে ডিঙ্গি মেরে চলেছে। যুধিষ্ঠিরের কীর্তি যেমন সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন ওর তেমনি কীর্তি ও স্বশরীরে যৌবন পেয়েছে। ভাবখানা এই, সবাই যেন তার দিকে ঘাড় উঁচু করে গো-চক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে, ও যেন বোমা ফেলতে আসা জাপানী প্লেন। জয়া না হয় সম্প্রতি ম্যালেরিয়ায় ভুগে উঠেছে, কিন্তু তাই বলে সে কাঠকুড়ুনি নয়, অমন চলন-হেলন সেও দেখাতে পারে। শুকনো কাঠে সেও ফুটতে পারে কাঠগোলাপ। ভেলকির থলি শুধু টুকটুকিরই হাতে নেই।

কী আসে-যায় তোর? থোড়াই কেয়ার করি এমনি ভাব দেখিয়ে চলে গেলেই চলে। কে কী বলে না-বলে তাকায় কি না-তাকায়, তোর গায়ে ফোস্কা পড়ে? আর, জিজ্ঞেস করি, তোরই বা একা-একা বেরুনোর ঠেকা কী! আফিস-বাজার করিস না, কত্তই আর তোর বেরুবার কথা! সঙ্গে সব সময়ে একটা আস্ত-মস্ত লোক নিলেই হয়! তোর ইচ্ছে ও যেমন জগন্নাথ হয়েছে তুই তেমনি সুভদ্রা হ। মানে ও তোকে বিরক্ত করুক আর তুই জ্বলে-পুড়ে ঝলসা হতে থাক্।

"দ্যাখ্ না আসছে কিনা– "

"কে বলে তোর জন্যে আসছে?" দাঁড়িয়ে পড়ল জয়া: "আসতে দে। আসছে আমার জন্যে। আমার সঙ্গে ওর কথা।" বেণীর একটা পিঠের উপর রেখে আর-একটা বুকের উপর টানল।

"ভাল, ভাল, তোরা কথা ক, আমি পালাই।" এগিয়ে গেল টুকটুকি।

কিন্তু কই, দাঁড়াল না কেন জয়া? আর আভাসই বা কেন তাকে নিয়ে জনান্তিক হল না?

কী আপ্রাণ পরিশ্রম করছে ছেলেটা! কত মাইল হাঁটছে, কত যুগ বসে আছে, কত ক্ষুধতৃষ্ণা বিসর্জন দিয়েছে? চায় কী ছেলেটা?

উল্টোডিঙি গিয়েছে টুকটুকি, সেখানে ডিঙি নিয়ে গিয়েছে আভাস, বাঁশবেড়ে গিয়েছে, সেখানেও বেড়েছে বাঁশ হয়ে, আবার যদি কোনদিন সরসুনায় যায় দেখবে সর্ষে বুনে রেখেছে আভাস।

এড়ান যায় না, তাড়ান যায় না, নড়ান যায় না—চায় কী ছেলেটা?

একদিন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে হয়!

ইচ্ছে করে সেদিন রবিবার সকালেই একা-একা বেরিয়ে পড়ল টুকটুকি। মাকে বললে হাসিনার বাড়ি যাচ্ছি। ভেবেছিল সময়টা বেটাইম, হয়ত দেখতে পাবে না। কিন্তু হাঁড়ির সঙ্গে যেমন শরা, ফাইলের সঙ্গে যেমন ফিতে, ঠিক উদয় হয়েছে আভাস।

নতুন রাস্তা নিল টুকটুকি। কম লোকজনের রাস্তা। ঠিক সেই পথেই নির্ভুল সারল্যে আভাস চলে এসেছে।

ফুটপাতে দাঁড়াল টুকটুকি। খানিক দূর এগিয়ে আভাসও থামল। আশ্চর্য, এ ফাঁকা-ফাঁকা রাস্তায় মেয়েটা দাঁড়াল কেন? কোথায় যাবে? এদিকে ত ট্রাম-বাস নেই। তবে কি কারু সঙ্গে মিট করবে? আগে থেকে ঠিক করে এসেছে? বাবা, যাই পার আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। আমি তোমাকে সর্বক্ষণ চোখে চোখে রেখেছি। তোমার কী গতিবিধি, তোমার কী আলোছায়া সব আমার মুখস্থ। সোম থেকে শুক্র, তারপর আধখানা-ছুটি শনি, পুরো-ছুটি রবি—সব আমার নখের আয়নায়। যেমন বিমান অফিসে বসে বলে দেওয়া যায়, কোন্ শূন্যে কোন্ প্লেন ছুটেছে, তেমনি আমি আমার ঘরে বসেই বলে দিতে পারি তুমি এখন কী করছ, কোথায় আছ, কখন আবার দেখতে পাব তোমাকে। বাড়ি থেকে কবে বেরুবে না এবং কবে বেরুবে, বেরুলে কখন বেরুবে, কোথায় যাবে, কার সঙ্গে যাবে, কীভাবে যাবে, থাকবেই বা কতক্ষণ, আমি সব বলে দিতে পারি। গাঁথতে না পারলেও গুনতে পারি হুবহু। আর, সব সময়েই দেখেছ, তুমি যেখানে যাচ্ছ বা গিয়েছ, আমিও সেইখানে, পথে ও গন্তব্যে, দু শ গজ দূরেই হক বা দু হাজার গজ দূরেই হক। আর, তোমারও এমন অভ্যাস, সব সময়েই তুমি আমার জন্যে একভাবে না অন্যভাবে উচাটন। আমি না মরতেই আমার ভূত দেখছ তুমি। খেতে শুতে বসতে দাঁড়াতে চলতে ফিরতে সব সময়ে তোমার ভয় এই বুঝি আভাসের আভাস মিলল। একভাবে না হক অন্যভাবে তোমাকে জাগিয়ে রেখেছি তোমাকে রাগিয়ে রেখেছি।

তোমাকে জানিয়ে রেখেছি।

আমার ত অন্য কোন উপায় নেই, পদ্ধতি নেই, কী করে জানাই? আমার চেহারা সুন্দর নয়, আমি ছাত্র হিসেবে অপদার্থ। আমার কোন গুণ নেই, গাইতে পারি না, বাজাতে পারি না। কবিতা লিখতে পারি না, ছবিও তুলতে পারি না ক্যামেরায়। যে বখা আর হতচ্ছাড়া, সে আর কী করে জানায়? তাই তোমাকে বিরক্ত করি, তোমাকে খেপিয়ে রাখি। তোমাকে ত আলো করতে পারি না, জ্বালাতন করতে পারি। মুঠো মুঠো পারি শুধু ঘৃণা কুড়োতে।

কিন্তু তুমি যে আর একজনের জন্যে নিরিবিলি খোঁজ, আর-একজনের জন্যে যে তুমি উৎকণ্ঠিত তা কে জানত! আমি না হয় ধুলোর ধুলো তৃণের তৃণ, কিন্তু এমন ত কেউ আছে যার জন্যে তুমি নির্জন, যার জন্যে তুমি উৎসুক। তা হলেই হল। তা হলেই আমার তৃপ্তি।

কাকে যেন হাত তুলে ইশারায় ডাকছে টুকটুকি। কাকে? পিছন ফিরে ব্যস্ত হয়ে তাকিয়ে দেখল একবার আভাস। কই, তার আগে-পিছে কেউ ত নেই রাস্তায়। এ কী অঘটন, তাকেই ডাকছে আঙুল নেড়ে, হাতছানি দিয়ে?

হ্যাঁ, আপনাকেই ডাকছি। কেন, কেন আমার পিছে-পিছে ঘোরেন সর্বদা? কেন আমাকে এক দণ্ড তিষ্ঠতে দেন না শান্তিতে? কেন অসভ্যের মতন ছড়া কাটেন? কী চান আপনি? কী আপনার অভিসন্ধি? স্পষ্ট করে বলুন। নয়ত চলুন আমার সঙ্গে থানায়। আপনার বাবা আপনাকে ছেড়ে দিয়েছেন কিংবা আমার বাবা গা মাখতে চান না বলে ভাবছেন কেউ আপনাকে শাসন করবার নেই, দেশ থেকে রাজত্ব উঠে গিয়েছে। এমন [illegible] ভাববেন না। আমিই এর হেস্তনেস্ত করব, অনেক সহ্য করেছি, আর নয়—এমনি করেই বলবে নিশ্চয়ই।

কোনদিন ভয়ের লেশমাত্র ছিল না। আজ কাছে এগতে ভয় করতে লাগল আভাসের।

"এ কী, আমাকে ডাকছ?" অবিশ্বাস্য, তবু স্তিমিত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল আভাস।

"হ্যাঁ, তোমাকে।" স্পষ্ট স্থির কণ্ঠে বললে টুকটুকি।

হঠাৎ চক্ষু পেলে অন্ধের কী রকম হয় কে জানে, আভাসের মনে হল সমস্ত দিশ-পাশ, রাস্তাঘাট, দোকান-পসার, দালান-বালাখানা ঝলমল করে উঠেছে। সমস্ত কিছু যেন নতুন কী একটা পোশাক পরে দাঁড়াল। আর সে-পোশাক আভাসের নিজেরও পরনে।

একটি মুহূর্ত, কিন্তু মনে হল দরিদ্র যেন হঠাৎ রত্ন পেয়েছে কুড়িয়ে। আভাস স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, "কেন বল ত?"

"এই দেয়াল বেয়ে যে লতা উঠেছে তাতে কেমন নীল-নীল ফুল ফুটেছে দেখছ—" দুই চোখ স্বপ্নপরিপূর্ণ করে তাকাল টুকটুকি।

"হ্যাঁ, অপরাজিতা।" সুন্দর করে উচ্চারণ করল আভাস।

"এ আমাকে ছিঁড়ে দিতে পার?"

আকাশের চাঁদ নয়, সামান্য ফুল চাইছে টুকটুকি।

"পারি। কিন্তু যাদের বাড়ি তারা যদি কিছু বলে!"

"তা বলতে পারি না। যদি বাড়ির লোকের তত লক্ষ্যই হবে তা হলে লতাটা

বাইরের দিকে বাড়তে দিত না। ভিতরদিকেই টেনে রাখত।” টুকটুকি মাথার চুলটা একটু ঠিক করল: “আমার হাত যায় না, আমার হাত গেলে আমি নিজেই পাড়তাম। দেয়ালটা যাচ্ছেতাই উঁচু। পারবে উঠতে?”

এর চেয়েও দুঃসাধ্য কাজ করে দিতে পারে, ডাঙায় ডিঙি চালাতে পারে, এমনি বীরত্বের ভাব করল আভাস। বললে, “পারব, তবে ঐ দিক থেকে ঘুরে আসতে হবে।”

“দেখ যদি পার।” যেন কতদিনের চেনা এমনি সুরে ফোটাল টুকটুকি: “গাঢ়নীল ফুল। আমার নীল ভারী পছন্দ।”

প্রায় বশে এনে ফেলেছে। আশ্চর্য ও অসম্ভব জোর এসেছে আভাসের শরীরে, ইলেকট্রিক পোস্ট ধরে উঠে বড় রাস্তার দিক থেকে ধরেছে দেয়াল। পা রাখতে পারে এমনি একটুখানি পরিসর দেয়ালের, ভাগ্যিস কাচের টুকরো বসান নেই, তারই উপর পা ফেলে ফেলে এগতে লাগল সন্তর্পণে। পা পিছলে পড়ে গেলেই চিত্তির। বেশ উঁচু দেয়াল, নামার সময়ও খুব সাবধান।

লতা ধরে ফুল ছিঁড়ল আভাস। বললে, “নাও।”

নীচে থেকে আঁচল পাতল টুকটুকি। উপর থেকে আভাস ফেলতে লাগল আঁচলে। এক দুই তিন। বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়, কে কখন তাড়া দেয়, পিছু হটে পোস্ট বেয়ে নামতে গেলেও অনেকক্ষণ লেগে যাবে, এখান থেকেই লাফ দিই।

আঁচলটা তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিল টুকটুকি। আশ্চর্য, আভাস কি ফুল? সে কি টুপ করে পড়তে পারে আঁচলে?

“পায়ে চোট লাগেনি ত?” শুশ্রূষার সুরে জিজ্ঞেস করল টুকটুকি।

“না। লাগবে কেন?” হাত-পা ঝেড়ে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল আভাস।

“তা হলে দেখ কত শক্ত কাজ তুমি করতে পার।” এক পা কাছে এসে বললে টুকটুকি।

“চুরি করা শক্ত কি!”

“অত্যন্ত শক্ত। সাহসই ত শক্ত।” একটা ফুল চুলের বিনুনিতে গুঁজল টুকটুকি: “এমনি পোস্ট বেয়ে ওঠা, দেয়াল দিয়ে হাঁটা, দেয়ালের উপর থেকে লাফ দিয়ে পড়া—শক্ত বই কি। নির্জীব পোস্ট বা দেয়াল হওয়ার চেয়ে একটা বীর চোর হওয়াও ভাল।”

লজ্জিত মুখে হাসল আভাস। বললে, “চৌর্যই বল বীর্যই বল সব তোমার জন্যে।”

“আমার জন্যে অনেক তাহলে করতে পার তুমি?”

“অনেক।”

“যা বলি তাই?”

মাটির দিকে মুখ করে রইল আভাস।

“তাহলে আমাকে তুমি বিরক্ত কর কেন সব সময়?” আবদারের সুর এসে গেল টুকটুকির: “কেন সব সময় যন্ত্রণা দাও?”

“তুমি বিরক্ত হও খুব?” ভাসা ভাসা চোখে তাকাল আভাস।

“ভীষণ।”

“খুব যন্ত্রণা পাও?”

“সাংঘাতিক।”

“তাহলে আর বিরক্ত করব না।” আভাসের মুখটা আলো হয়ে উঠল: “আর দেব না যন্ত্রণা।”

“ঠিক?”

“এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি—” অভ্যাসবশেই যেমন বলে তেমনি বলে ফেলল আভাস, কিন্তু কাকে ছোঁবে? ছোঁয়া কি এতই সোজা?

“আমি শান্তিতে থাকি এ কি তুমি চাও না?” রাজহাঁসের মত ভঙ্গিতে চিবুক উঁচু করল টুকটুকি।

“চাই।”

“তাহলে আর এস না আমার পিছু পিছু। ঘুরঘুর কর না। যেখানে সেখানে গিয়ে হাজির হয়ো না।” মমতার মধুচাক যেন ভেঙে দিল টুকটুকি: “আমরা ত এক বাড়িতেই থাকি, একটু-আধটু দেখা হওয়াতে আমাদের বাধা কোথায়? বাড়িওলা আর ভাড়াটের মধ্যে কি ভাব হয় না? কেন তুমি রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করবে? তুমি ভাল হয়ে থাক, ভাল হয়ে লেখাপড়া শেখ। এই নাও তুমিও দুটো ফুল নাও—কত কষ্ট করে পেড়ে দিলে।”

আশ্চর্য, হাত পাতল আভাস।

কোনদিন হাতে করে ফুল ধরেছে ভাবতে পারে না, কিন্তু এ ত শুধু ফুল নয়, এ টুকটুকির হাত, পুষ্পময় স্পর্শ।

অভাবনীয়ের অবতারণা হল।

বন্ধুরা এসে বললে, “কী রে, কী হল, আজকাল আসিস না কেন আড্ডায়?”

এমনধারা উত্তর শুনবে কেউ কল্পনাও করেনি। আভাস গম্ভীর মুখে বললে, “পড়ছি। পরীক্ষা দেব।”

“মাইরি?”

“দেখি না চেষ্টা করে।”

“বৃথা চেষ্টা। আর কোনদিন পারবি না পাশ করতে।”

“আগে-আগে তাই ভাবতাম।” আভাস জানলা দিয়ে তাকাল বাইরে: “এখন মনে হচ্ছে পারব।”

“নে, বাবা, যা খুশি কর্। এখন কিছু পয়সা দে, সিনেমা দেখে আসি—” বন্ধুরা হাত পাতল। একজন বললে, “শেষ সিনটা যা করেছে মাইরি, এমন একখানা প্যাঁচ যে আপনা থেকেই মুখ দিয়ে সিটি বেরিয়ে আসে।”

আগে-আগে বন্ধুদের রেস্ত-রসদ যোগাড় করেছে আভাস। এবং মায়ের কাছে হাত পেতেও যখন পায়নি তখন বাবা নয়ত দাদার পকেট মেরেছে। নয়ত লুকিয়ে চাবি দিয়ে মায়ের দেরাজ খুলেছে। আজও সে-সকল উপায় তেমনি প্রশস্ত আছে কিন্তু মনে সমর্থন নেই। মনে হচ্ছে যে-হাত টুকটুকিকে ছুঁয়েছে তা দিয়ে আর ম্লান কাজ সম্ভব নয়।

পকেট হাতড়ে দুটো টাকা বের করে দিয়ে দিলে বন্ধুদের। বললে, “এই নে, এর বেশী আর নেই, পারবও না এর বেশী—”

“ওরে চলে আয়, আভাস ভাল হচ্ছে—” বন্ধুরা টিটকিরি দিয়ে উঠল।

সত্যি কী ভাল লাগছে এই ভাল হওয়ার সুর! চারদিক থেকে ঝরে পড়ছে সুধাবচনের সুধাপরশের পাপড়ি। যেদিকে তাকায় সেদিকেই দেখে একটি অমল মুখের আনন্দ। একটি সৎসাহসের হাতছানি।

কিন্তু দেবানন্দ ঘোষাল ভাল হবে কবে?

নীচে পিছনের দিকে এক ঘরের ভাড়াটে, সে আর তার স্ত্রী করুণা আর তার মধ্যম ছেলে অসিত। দেবানন্দের বয়স প্রায় পঞ্চান্ন, পেটে কী এক দুর্দান্ত ব্যথা, থেকে থেকে চেঁচাচ্ছে তারস্বরে। কেউ বলে, ক্যানসার, কেউ বলে আলসার, কতরকম নাম, কতরকম উপনাম। হাসপাতালে ঘুরে এসেছে দুবার, কাটাছেঁড়াও হয়েছে, তবুও সুরাহা হয়নি। জৈব দৈব কিছুই বাকী নেই, এখন শুধু চিৎকার সার। আত্মীয়স্বজনেরা বলে, এ শুধু তার দেহের যন্ত্রণা নয়, এ তার প্রাণের আর্তনাদ। বড় ছেলের শোক অনেকদিন ভুলে গিয়েছিল কিন্তু ছোট ছেলের শোকটাই তাকে দগ্ধাচ্ছে তিলে তিলে।

সরল মুখে তরল চোখ, বার বছরের ছেলে, অনিত, হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল গলায় কী একটা অপারেশানের জন্যে। বাইরে থেকে অপারেশান, তেমন কিছু কঠিন হবার কথা নয়। রোগাটে দুর্বল ছেলে, ভয় ছিল ক্লোরোফর্ম সামলাতে পারবে কিনা। কিন্তু না, সব ঠিকঠাক হয়ে গেল, বিপদ কেটে গেল দেখতে-দেখতে। ঘা-ও প্রায় শুকিয়ে এসেছে, ছেলের খালি বায়না—বাবা, কবে বাড়ি যাব? দিন ঠিক হয়েছে, সকালে নার্স ব্যাণ্ডেজটা খুলে দেবে, সুস্থ ছেলে নিয়ে বাড়ি ফিরবে দেবানন্দ। করুণা দরজা ধরে তাকিয়ে আছে বাইরে।

ঐ আবার দেবানন্দ গর্জন করে উঠেছে!

আশেপাশের লোকের মনে হয় এ রোগের যন্ত্রণা নয়, নয় বা শোকের আর্তি, এ এক উন্মত্ত আত্মার দুর্দম অভিযোগ।

নার্স ব্যাণ্ডেজ খুলছে, বিছানার পাশে টুলে বসে আছে দেবানন্দ। অনিতের চোখে বাড়ি ফিরে যাবার ছুটিভরা স্বপ্ন।

ব্যাণ্ডেজের শেষ প্রান্ত সেফটিপিন দিয়ে আঁটা নয়, আলগা গেরো দিয়ে বাঁধা। ফাঁসের দুটো অংশের যেটা ছোট সেটা ধরে টান মারলেই ব্যাণ্ডেজ খুলে যায় সহজে। কী ভুল হল নার্সের, বড় অংশটা ধরে টান মারল আচমকা। গেরোটা আঁট হয়ে বসল, আর খোলা যায় না বাঁধন। একটা কাঁচি, কাঁচি নেই কোথাও? হন্তদন্ত হয়ে নার্স কাঁচির জন্যে ছুটল। ব্যাণ্ডেজ খুলতে এসেছে, একটা কাঁচি নিয়ে আসেনি। কে জানত, ঘটবে এমন দুর্বিপাক! নিয়তি যেন হাতে ধরে ফাঁসের বড় টুকরোটাই তুলে দিল নার্সের হাতে। নার্স অনেক খোঁজাখুঁজি করে কাঁচি এনেছে কোত্থেকে। ততক্ষণে সমস্ত বাঁধনের বাইরে চলে গিয়েছে অনিত।

পাগলের মত বাড়ি ফিরে এসে দেবানন্দ সর্বপ্রথমে কী করল? করুণার যত কিছু পুজো-আচ্চার সরঞ্জাম ছিল, যত পট-ঘট মূর্তি-বিগ্রহ সব একত্র করে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। করুণা বললে, "আমি তাহলে কী নিয়ে থাকি?"

তারপরেই অসুখে পড়ল দেবানন্দ। দেবানন্দ হাসল, বললে, "এই ত পেয়েছ তোমার জিনিস। সেবা, সেবাযত্ন। আর আমি? আমি কী পেয়েছি জান?"

অট্টহাস্য করতে চেয়েছিল দেবানন্দ, কিন্তু ব্যথায় মর্মন্তুদ আর্তনাদ করে উঠল: "আর আমি পেয়েছি এই চীৎকার।"

গগনানন্দ স্বামী এসেছেন ভবতোষদের বাড়ি, সেখানে কীর্তন হবে সন্ধ্যায়। ভবতোষ আর নীলিমা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনে-জনে নিমন্ত্রণ করে এসেছে। করুণা স্বামীর রোগশয্যার পাশে বসে হাতে হাত বুলুতে-বুলুতে বললে, "যাব?"

"দিশী গান শুনতে যাবে ত যাও না—"

কিন্তু এমন খুশির তরঙ্গ তুলল করুণা যেন এ শুধু দিশী গান নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী। এত বেশী যে জানলা দিয়েও বাইরে তাকে ফেলা যায় না। জানলা কোথায়? জানলাটাই ত ভুল। যা বার তাই ভিতর।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল দেবানন্দ: "যেখানে যাচ্ছ সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস কর কোনটা তিনি বেশী শোনেন, আগে শোনেন? কীর্তন, না ক্রন্দন? কোনটা তাঁর কাছে বেশী মিষ্টি লাগে? কীর্তন, না ক্রন্দন? জিজ্ঞেস কর, ভুলে যেও না।"

ভবতোষ আর নীলিমা অনেক কসরত করে কুকুরের পাশ কাটিয়ে যথাক্রমে চন্দ্রচূড় আর মন্দিরা দেবীকে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছে। যদি যান, আমাদের গুরুদেব আসছেন। আর তাঁর কীর্তন যদি শোনেন—

"পাষাণও জল হয়ে যাবে?" একটু কী ব্যঙ্গের সুর মেশালেন চৌধুরী? "কিন্তু আমরা তার চেয়েও কঠিন। আমরা ইস্পাত।"

"তা ছাড়া" গাম্ভীর্যে মুখ গোলালো করে মন্দিরা বললেন, "তা ছাড়া, আমাদেরও গুরুদেব আছেন।"

চৌধুরী-দম্পতি গেলেন না কীর্তনে। হীনাবস্থার লোক, ভাড়াটে বাড়ির বাসিন্দে, পাঠ বা কীর্তনের জন্যে একটা হলঘর নেই, ছাদের উপর মেরাপ বেঁধেছে—সেখানে কি আমাদের মানায়? তারপর কে না কে এক আখড়ার বাবাজী, কেমন গায় কে জানে!

কিন্তু দেখ, দেখ, কত মোটর এসে দাঁড়িয়েছে চন্দদের বাড়ির সামনে। তা হলে বেশ একজন কেষ্টবিষ্টু সাধু, যোগ্যগোত্র-হীন কেউকেটা নয়। ঐ ত ঐ দেখ নামছে। লম্বা লোটানো গরদের ধুতি, হাঁটু-ঝুল পাঞ্জাবি, বা, খাসা দেখতে ত সাধুকে। দুধে-আলতা রং, কাকপক্ষ চুল, স্বপ্নবিভোর চক্ষু, যেমনটি আমি খুঁজেছিলাম। নেমন্তন্নে গেলে একবার নিইনি তখন আর কী করে যাই, দ্রুতপায়ে ছাদে উঠলেন মন্দিরা। লাউডস্পীকার বসিয়েছে এদিকে। কী হৃদয়-ভুলানো গান! শুধু পাষাণ নয়, ইস্পাতও গলতে থাকে।

সুর বদলালেন মন্দিরা।

চৌধুরী বললেন, "এ কি সম্ভব?"

"কেন নয়? ইংরেজকে খেদিয়ে অন্য গুরু বসাচ্ছ না? এবং দরকার হলে তাকে খেদিয়ে অন্যতর?" মন্দিরা চিঠি লিখছেন গগনানন্দকে। বললেন, "মন্ত্রী বদল চললে মন্ত্রবদল চলবে না? মন্ত্রবদল বলেই ত মন্ত্রী বদল।"

কত লোক কিউ করে দাঁড়িয়ে দর্শন পায় না, চিঠির লেটারহেড ও ফোন নম্বর দেখে গগনানন্দ গাড়ি চেয়ে পাঠালেন এবং গাড়ি এলে নিজেই এলেন দর্শন দিতে।

আর দর্শন মানেই দীক্ষা।

"আগের মন্ত্র ছেড়ে দেব?" চৌধুরী তখনও যেন খুঁত খুঁত করছেন।

গগনানন্দ বললেন, "আগেরটা ধ্বনি, এখনই মন্ত্র। মন তোর মন্তোর। তোমার মন যখন নতুন বস্তু চাইছে তার মানেই আগের মাল আর বিকোচ্ছে না বাজারে।"

তারপর বাড়িতে কীর্তন দিলেন মন্দিরা। সেদিন চন্দদের দরজায় ক'খানা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল? আজ গুনে দেখ, দশগুণেরও বেশী পুবে-দক্ষিণে সমস্ত রাস্তা গাড়িতে ছয়লাপ। বেছে-বেছে গাড়িওয়ালাদেরই নেমন্তন্ন করেছেন চৌধুরী। এতে বিশেষ সুবিধে এই, জুতো রাখবার জন্যে আলাদা জায়গা বা সতর্ক বন্দোবস্ত করতে হয় না। ভক্তরা তাঁদের জুতো গাড়িতেই নিশ্চিন্তে রেখে আসতে পারেন আরামে।

আমারই বঁধুয়া আনবাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া। ভবতোষ ধরল সাধুকে। "প্রভু, কীর্তন কি শুধু এখন ও-পাড়ায়?"

দেখছ না কত আলো, কত মালা, কত জাঁকজমক! কত বড় হলঘর, ঝালরওলা ঝাড়লন্ঠন, বেদীতে কত পুরু গদি, কত বেশী ফ্যান, কত সম্ভ্রান্ত জনতা! তুমি ত ঘরের লোক হে!

নতুন গুরুকরণ করে তবুও চৌধুরীর সুখ নেই। যেহেতু চন্দদের মতন লোক এখন তাঁর গুরুভাই।

সাত

এই? এরই জন্যে এত?

এটা এখন সুপ্রভাতের জিজ্ঞাসা।

এই। এরই জন্যে এত।

এটা এখন সোহিনীর বিবৃতি।

একটাতে বিস্ময়ের চিহ্ন আর-একটাতে দাঁড়ি।

স্নান করে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে সুপ্রভাত জিজ্ঞেস করলে, "তোমার ছুটি কটায়?"

"তিনটেয়।" চুলে তেল মাখছে সোহিনী: "কেন বল ত?"

"আর কিছুক্ষণ পরে হলে আমার আফিসের গেটে তোমাকে মিট করতে বলতাম।" ছেলেমানষী সুরে বললে সুপ্রভাত।

"মিট ত নিত্যি করছি। আবার আফিসের গেটে কেন?" খুকীর মত হেসে উঠল সোহিনী: "মিট করে তারপর কী হত?"

"কোথাও কোন কাফে কি হোটেলে খেতে যেতাম," ব্যাকরণ একবারের জায়গায় তিনবার করছে সুপ্রভাত: "ঠাকুরটার রান্নায় অরুচি ধরে গেছে।"

বাঁ হাতের তেলোতে ছোট্ট গোল করে খানিকটা তেল নিয়ে চুলের ডগাগুলো একত্র করে ঘষছে সোহিনী। বললে, "বল না কী খেতে চাও, আমি নিজেই রান্না রেঁধে দেব।"

"কী যে খেতে চাই তা কি আমি জানি আর কী যে সেই রান্নার মশলা তা বা কি তুমি জান?"

দূর একটা ক্লান্তির সুর যেন এসে লাগল কিন্তু হাসির ঝাপটায় তা উড়িয়ে দিতে দেরি হল না সোহিনীর: "তিনটের সময় ফ্রি হবে কি? আজ তোমাকে কয়লা যোগাড় করতে বেরুতে হবে না? আর বড়বাজার থেকে কিছু শার্টিং-শাড়ি?"

"আজ কী বার?" চমকে জিজ্ঞেস করল সুপ্রভাত।

বারটা মনে পড়িয়ে দিল সোহিনী। এই বার না আর বার। সব যেন এক রঙে রঙা, এক তাপে গালাই করা। একবার

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে সুপ্রভাত জিজ্ঞেস করল, "তোমার ছুটি কটায়?"

দুইবার তিনবার। এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাবার পর শূন্য এক আকাশের একঘেয়েমি।

হ্যাঁ, একবার। প্রথম বার। সাবিত্রী উষার সেই প্রথম উন্মোচন। তারপরে? তারপরে আর কিছু নেই। শুধু পুনরাবৃত্তি, শুধু পুনরুল্লেখ। বারে বারে একই রেখার উপরে একই রেখা বুলনো।

এরই জন্যে এত কেঁদেছে সুপ্রভাত? এত সেধেছে? দেয়ালে এত মাথা কুটেছে? ঠোঁট-ফাঁক-করা তীর্থের কাকের মত বসে আছে চৌকাঠের বাইরে? এরই জন্যে? এই সোফা-সেটি পর্দা-কুশান ঢাকনি-সুজনি? শুধু একটু চিকনের চিকমিক? গোল টেবিলটার নীচে ছোট এক টুকরো কার্পেট, চায়ের পাটের জন্যে একটি গরম কোট, নয়ত লেপের একদিকে, বাইরের দিকে, দেখনখুশি সিল্ক! শুধু ক'টি মধ্যবিত্ত চেকনাই, শুধু ক'টি হিত-মিত উত্তেজনা!

এরই জন্যে এতদিনের লঙ্ঘন, এতদিনের নিছনি?

এই একতাল ঠাণ্ডা অভ্যেস, বিস্বাদ আলস্যের জন্যে? ক'টি ধোলাই করা কথা, মহড়া দেওয়া ভঙ্গি? শত রাত্রির অভিনয় নয়, নয় বা তিনশত রাত্রির—কিন্তু নিরন্ত রাত্রির অভিনয়: মুখস্থের উন্মত্ততা।

সুপ্রভাতের ইচ্ছে ছিল সোহিনী চাকরিটা আর না করে। তার সেই শিক্ষয়িত্রীর সাজটা বদলে ফেলে, সেই শিক্ষয়িত্রীর স্বাদ। সে এখন একটি প্রতীক্ষমাণা গোপনচারিণীর ভূমিকা নেয়। গহনকক্ষের অন্ধকারে বন্দিনী রাজকন্যার। মোট কথা, আবার যদি সে দুর্লভের জাল বুনতে পারত চারদিকে। অন্তত যদি সে নামত রাজনীতিতে। যদি বিপ্লবের ঝলস আনতে পারত চোখেমুখে। সিঁথিতে সিঁদুর নয়, যদি হত তা বিদ্রোহ-বিদ্যুতের রসনা। হাতের নিরীহ কলম যদি হয়ে উঠত কাস্তে বা তকলি, যে কোন নিশান। যদি বা নামতে পারত পর্দায় বা মঞ্চে বা মাইকের সামনে। আরও কতরকমই ত চাকরি ছিল মেয়েদের। যদি বা হত নার্স বা মিডওয়াইফ বা অন্তত ট্রেনের ফিমেল-চেকার।

এ সবই অবাস্তব কল্পনা, সুপ্রভাত তা বোঝে। তার আসল কথাটা হচ্ছে এই, যদি একটু অচেনা-অচেনা লাগত সোহিনীকে, তার কাজের জন্যে, তার সাজের জন্যে, তার পরিপার্শ্বের জন্যে। যদি এক শিশি মিকশ্চারের এক দাগ—যে কোন দাগ—ওষুধ না হত! খেলো জোলো আর সস্তা। যদি সে আবৃত্তি না হয়ে থাকতে পারত সৃষ্টি হয়ে। শেষ না হয়ে বিশেষ হত।

চালু চাকরি কি কেউ ছাড়ে, না, কেউ ছাড়তে বলে? সংসারে আয় বাড়ছে আর

আয়ই যখন সাংসারিক প্রতিপাদ্য, তখন কি কেউ তা বাদ দেয়? তাই সদরে এক তালায় দুই চাবি, একটা সুপ্রভাতের কাছে, আর একটা সোহিনীর, কে কখন ফেরে কিছু ঠিক নেই। এবং উভয়েই আশা করে যেন আমি গিয়ে ওকে বাড়িতে হাজির পাই।

বেশির ভাগ দিন সোহিনীই আগে ফেরে। কিন্তু তার ত এক-আধদিন ইচ্ছে করতে পারে সুপ্রভাত আগে ফিরে সব তদারক করিয়ে রেখেছে, চায়ের টেবিল সাজানো, ঘরদোর ফিটফাট, বারান্দায় তার একটু উদ্দীপন পাইচারি। কিন্তু তা বড় একটা হবার নয়। বেশির ভাগ দিন সুপ্রভাতেই আসে দেরি করে। এবং সমস্তই সহজ-সুলভের সজ্জা পরে আছে দেখে আবার নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

এক-আধদিন জিজ্ঞেস করে সোহিনীঃ "এত দেরি হল ফিরতে?"

"এই দুর্ঘটের দিনে কোথায় চাল, কোথায় কাপড় তাই খুঁজে-খুঁজে ফিরছি—" সুপ্রভাত হাসে। পরে প্রায় দার্শনিকের ধূসরিমায় চলে এসে বলেঃ "সঞ্চিত যা আছে তাকে মোটেই উদ্বৃত্ত মনে হয় না।"

এতক্ষণে যেন বলতে পেরেছে কথাটা। উদ্বৃত্ত নেই কার মধ্যে? স্বীকার করতে বাধা কী, তার নিজের মধ্যে। সোহিনীর ত বেশ এখনও সম্ভাবনা আছে, জৈব অর্থেই আছে, সে মা হতে পারবে। কিন্তু সুপ্রভাত নিজে? সে নিঃসম্বল-নিঃশেষ। প্রেমিক, স্বামী, পিতা—কিছুতেই কিছুই সে পায়নি, পারেও না। তার পিপাসার নির্বাণ নেই। এবং কোন পুরস্কারই নেই।

তাই কোথায় অন্ন কোথায় বস্ত্র এই শুধু সুপ্রভাতের সন্ধান নয়, আরও এক সন্ধানে সে উদ্‌ভ্রান্ত—কোথায় ভালবাসা? কোথায় সেই অনুভূতির পূর্ণিমা?

বিরাট নির্জন প্রাসাদ, অগণন তার কক্ষ, একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছে সুপ্রভাত—এমনি নিজেকে সে কল্পনা করে। দিনের আলোয়, প্রথম পাওয়ার উত্তেজনার আলোয়, সব ঘর সে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে দেখে-দেখে ফিরেছে, এখন বুঝি অন্ধকার হয়ে এল, দেয়ালের পর দেয়াল, আনাচের পর কানাচ সে হাতড়ে-হাতড়ে বেড়াচ্ছে, খুঁজে পাচ্ছে না আলো জ্বালবার সুইচ। যদি হাতে দৈবাৎ একটা ঠেকছে, টেনে টিপে দেখছে অনেক মেহনত করে, জ্বলছে না আলো, যদিও নিখুঁত করে লাইন পাতা, যদিও নিটুট ঝুলছে সব বাল্‌ব্‌। হঠাৎ আবিষ্কার করল সুপ্রভাত মেইনই অফ্‌ হয়ে আছে। যে বিন্দুটি সমস্ত আলোর উৎস সেইটিই মৃত। তাকে দৃঢ় স্পর্শে, আঘাতের স্পর্শে উজ্জীবিত করতে হবে। কিন্তু কোথায় মেইন? কোথায় সেই অগ্নিমূল?

সোহিনী যা চেয়েছিল পেয়েছে। ঠাট, লেপাফা, সাইনবোর্ড। তার উজ্জ্বল অক্ষরের বিজ্ঞাপন। কিন্তু সুপ্রভাত যা চেয়েছিল সে কি তা পায়নি?

কিছু একটা নিশ্চয়ই সে পেয়েছে, তার প্রতীক্ষার পর্যাপ্তি, এক ঘর আরাম, এক বিছানা ঘুম—কিন্তু তাই কি সে চেয়েছিল?

তবে সে কী চেয়েছিল?

কী চেয়েছিল? উত্তর পেয়েছে সুপ্রভাত। সে সোহিনীকে কাঁদাতে চেয়েছিল।

খাওয়া খাওয়াই নয় যদি তাতে নুন না থাকে। পাওয়া পাওয়াই নয় যদি তাতে না থাকে কান্না।

শুধু সুপ্রভাত একলা কেঁদেছে, একতরফা। সোহিনী এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলেনি। তার দুই চোখে আতঙ্ক ছিল, শাসন ছিল, কাঠিন্য ছিল—মমতাও ছিল—ছিল প্রশান্তি, ছিল সহিষ্ণুতা। অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু এক ফোঁটা জল ছিল না। চোখের জলে বালিশ ভেজান দূরের কথা, আঙুলের ডগাটুকুও চোখের কোণে এনে ঠেকায়নি। একটু উন্মনা হয়নি উতলা হয়নি সুপ্রভাতের জন্যে। বরং কী নির্মমের মত তিল-তিল যন্ত্রণা দিয়েছে সুপ্রভাতকে। সেই ট্যানটালাসের মত আকণ্ঠ জলে ডুবিয়ে রেখেছে অথচ নিদারুণ তৃষ্ণায় যেই সুপ্রভাত চুমুক দেবার জন্যে মুখ বাড়িয়েছে অমনি সরিয়ে নিয়েছে জল। মর্মমূলে বসে রক্ত চুষছে অহর্নিশ। হাঁটা-পথ কাঁটা-পথে ধাওয়া করিয়ে ফিরেছে, একের পর এক বেড়া টপকিয়ে ছেড়েছে। প্রথমে, শেষ পরীক্ষাটা পাস করে, পরীক্ষার কাছাকাছি এসে ধুয়ো তুলেছে মনুজায় চূড়ায় এসে উঠতে হবে। অনিদ্রচক্ষে রাত্রিদিন পড়েছে সুপ্রভাত, কত নিস্তৃত ও গভীর, আর সে কি জাগ্রত শক্তির তপস্যা! এক-একবার হাল ছেড়ে দিয়েছে, এ দুস্পার জলধি পারবে না উত্তীর্ণ হতে, বইয়ের উপর মুখ গুঁজে বসে কেঁদেছে। আবার মুখ তুলে চোখ মুছেছে কাপড়ে, ঝাপসা অক্ষরকে ক্রমে-ক্রমে স্পষ্ট হতে দিয়েছে। তারপর চূড়ো ছুঁয়ে যখন পাস করল, ভাবল, সোহিনী এবার তাকে একটু কিনারায় ছুঁতে দেবে। সোহিনী তাকে ফিরিয়ে দিল, বললে, ধৈর্য ধর। একটা চাকরি যোগাড় কর আগে। সোহিনী জানে না সেদিন, সেই ফিরে যাবার দিন, মাঠের ধারে একটা বন্ধুর মতন গাছের তলায় বসে সে কেঁদেছিল। হ্যাঁ ধৈর্য না ধরে উপায় নেই, আর, স্বর্গ-মর্ত কর্ষণ করে, যে করে হক, যোগাড় করতেই সে চাকরি।

হন্যের মতন সুপ্রভাত দ্বার থেকে দ্বারে, থান থেকে থানে, ঘুরে বেড়িয়েছে। একটা মাস্টারি বা কেরানীগিরি হলে ত চলবে না, চাই একটা দামী প্যাকেটের উপহার। সেই কঠোর সাধনার পর যখন আবার সে জয়ী হল, চাকরি পেল, তখন আবার হুকুম জারি করল সোহিনী, বললে, বাড়ি চাই আলাদা। নিজের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা বাড়ি ভাড়া করল সুপ্রভাত। তবেই বিয়ে করল, পারল বিয়ে করতে।

উপায় কী! সনাতন বিয়ে করা ছাড়া যখন সোহিনীকে পাবার আর কোন পথ নেই তখন ধৈর্য ধরে বসে, থেকে-থেকে বিয়েই করবে সে। তার জন্যে যত কষ্ট সহ্য করবার, করবে। যত হুকুম তামিল করবার করবে। যত উপেক্ষা হজম করবার করবে। তারপর একবার বিয়ে হয়ে গেলে, যখন সে আবার অস্তিত্বের কারাগারে বন্দী হয়ে যাবে, তখন এই সমস্ত যন্ত্রণার শোধ তুলব। তখন তাকে কাঁদাব, প্রাণ ভরে কাঁদাব, তার হাতে কত দুঃখ পেয়েছি তার নিকেশ করাব। ওর মধ্যে যদি দুঃখ না থাকে, তবে আমার মধ্যেও মূল্য থাকবে না।

জলের তিলক থাকে না, কিন্তু অশ্রুজলের তিলক থাকে। আমার কপালে সোহিনীর হাত থেকে আমি অশ্রুজলের তিলক নেব।

কিন্তু এ কি অসম্ভব কথা, এখনও কিনা সোহিনী হুকুম করে চলেছে আর তাই কিনা নির্বিবাদে নির্বাহ করছে সুপ্রভাত। যা কিছু সর্ত সমস্তই উত্থাপন করছে সোহিনী, সুপ্রভাতের শুধু সমর্থনের পালা। সুপ্রভাত যেন এখনও নিস্তেজ, এখনও নির্মূল্য। তার মূল্য নেই যেহেতু সোহিনীর মধ্যে তার জন্যে কোন বেদনা নেই।

যদি মূল্য চাই মুক্তি চাই, সোহিনীর মধ্যে জাগাতে হবে বেদনা।

"তোমার নীলুদা ত কাঁচড়াপাড়া থেকে শেয়ালদা সেকশনে বদলি হয়ে এসেছে," সুপ্রভাত বললে, "তাকে একটা চিঠি লিখলে পার। জান তার ঠিকানা?"

"জানি। কিন্তু তাকে চিঠি লিখতে যাব কেন?" ইস্কুলের খাতা দেখছিল সোহিনী, পেন্সিলের ডগাটা ঠোঁটের উপর এনে ঠেকাল।

"আমি আর পারি না ঘুরতে-ঘারতে।" অসহায় শিশুর মতন সোহিনীর কোলের কাছে বসে পড়ল সুপ্রভাতঃ "কোথায় চাল কোথায় চিনি হন্দ হয়ে গেলাম। তোমার নীলুদাকে লিখলে—তোমার পরোপকারী বন্ধু—একটা সুরাহা হয়ত করে দিতে পারে।"

সোহিনী গম্ভীর হয়ে গেল। নত চোখে নিবিষ্ট হল খাতায়।

"ওরা রেলের লোক ত, ব্ল্যাক-হোয়াইট অনেক ঘাঁতঘোঁত জানা সম্ভব। একবার দেখতে পার লিখে। যদি সহায়ের হাত

বাড়িয়ে দেয় ত ভাই, নইলে হায়-হায় করবার জন্যে ত আমি আছিই।"

তোমার সংসারের সওদা নীলুদা যোগাড় করবেন কেন এ তীক্ষ্ণ প্রশ্নটা জিভের ডগায় এসেছিল সোহিনীর, কিন্তু কী ভেবে জিহ্বাকে দমন করলে। বরং সুপ্রভাতের শেষ কথাটায় একটু হাসির আমেজ আনল মুখে। বললে, "তাঁর কী রকম কাজ কিছুই জানি না—"

"সেই জন্যেই ত লেখা—" ফোড়ার মুখটা একটু উস্কে দিল সুপ্রভাত।

"বিপদে পড়লেই লোককে লেখা যায়, আর" নিজেরও অজানতে হৃদয়ের নিবিড় নিভৃতি থেকে সুর বেরিয়ে এল সোহিনীর: "তেমনি বিপদ হলে, মনে হয়, তিনি পারবেন না না-এসে—কিন্তু—" স্বামীর দিকে তাকাল সোহিনী।

"কিন্তু এর চেয়ে আর কী বিপদ কল্পনা করা যায়!" জামার বোতাম আঁটতে লাগল সুপ্রভাত: "উনুনে কয়লা নেই হাঁড়িতে চাল নেই, এক কথায় চাল-চুলো কিছু নেই, অথচ পকেটে টাকা আছে, যাকে বলে স্থান আছে সংস্থান নেই—স্বাভাবিক গৃহস্থের পক্ষে এই ত কঠিনতম বিপদ। লিখে দেখই না কী হয়। যদি কিছু উপকার করতে পারে মন্দ কী—" জুতো দুটো পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে গেল সুপ্রভাত।

অতীতের মধ্যে ফেলে দিয়ে গেল সোহিনীকে। নিঃশব্দের গভীর গুঞ্জরণের মধ্যে।

সুখের দিনে কি নীলুদাকে ডাকা যায়? তাকে ডাকা যায় দুঃখের দিনে ভয়ের দিনে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবার পূর্বমুহূর্তে। যে নদী নাম হারিয়ে একলা বসে কাঁদে সেই নদীর পারে।

চারদিকে এ কি সোহিনীর সুখের আড়ত নয়, প্রাচুর্যের গোলাবাড়ি? এর মাঝে কি ডাকা যায় নীলুদাকে?

নীলুদার মতন কি লোক হয়? তক্ষুনি সমস্ত মন বলে উঠল একতালে। সে সুখে-দুঃখে সমান-স্রোত। যেমন দুঃখের প্রতি তার করুণা তেমনি সুখের প্রতি তার সৌহার্দ্য। তুমি সুখী হও তুমি নিরাময় থাক তুমি সর্বত্র মঙ্গল দর্শন কর এ শুধু নীলুদাই বলতে পারে।

কিন্তু বল এ কি আমার সুখ? এ কি আমার সাফল্য? শুধু ঠাট, শুধু লেপাফা, শুধু সাইনবোর্ড। তোমাকে বলতে দোষ নেই, আর তোমাকেই বলতে পারি, এ ঠাটের বাইরেই শুধু চাকচিক্য, ভিতরে কেবল খড়, এ লেপাফার বাইরেই শুধু ফিটফাট ভিতরে চিঠি নেই একছত্র, আর এ সাইনবোর্ডের অক্ষর যতই বৃহৎ ও উজ্জ্বল হক এর আসলেই বানান ভুল।

তবু এই বানান ভুলের বিজ্ঞাপনেই আমার ব্যবসা করে যেতে হবে?

আর, বল, তুমিই বল, এ কি আমার সাফল্য? আমি সমাজের কাছে জিততে গিয়ে জীবনের কাছে, নিজের কাছে হেরে আছি। আমি তৃপ্ত হতে চেয়েছি দীপ্ত হতে চাইনি। যে আগুনে আলো হবার কথা সেই আগুনে আমি বাসী রান্না গরম করতে বসেছি। কিন্তু না করেই বা আমি করি কী! আমার কি তার চেয়ে বেশী ক্ষমতা আছে? আমি সাধারণ, আমি মধ্যবিত্ত, আমি অগণ্য নগণ্যেরই একজন, তবু জানি আমার ট্র্যাজেডি তুমি বোঝ, আমার শত দৈন্য দৌর্বল্যের প্রতি তোমার ক্ষমাও অফুরন্ত।

উনি বলে গেলেন, তবে লিখব নাকি নীলুদাকে? খামে নয়, পাছে কী ভাবেন চিঠি খোলবার আগের মুহূর্তে, সামান্য ছোট্ট একটা পোস্টকার্ড। কী লিখবে? আমার চাল-চিনি বাড়ন্ত, ছি, এ কি কখনও লেখা যায়? তবে কী লেখা যায়? সুপ্রভাত যে বলে গেল লিখে দাও। কী ভাবে লিখতে হবে তার কোনও আভাস দিল না। সুপ্রভাত কী বলবে! তার অন্তরের কথা সোহিনী ছাড়া আর কে জানে। কিন্তু নীলুদা তুমি এস, কত দিন তোমাকে দেখি না, তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে—এমনি করে লিখলেও ত আসবে না। তবে কী লিখবে, কেমন করে লিখবে?

একটা পোস্টকার্ড নিয়ে বসল সোহিনী। লিখল: নীলুদা, বড় বিপদ, তুমি একবার এস।

আসবে এতে? বয়ে গিয়েছে। তোমার বিপদ, তাতে আমার কী! তোমার বিপদের মধ্যে গিয়ে আমি আবার বিপদে পড়ি আমি এমন নির্বুদ্ধি নই। তুমি সুখ নিয়েছ আমাকে আনন্দ নিতে দাও।

আর যদি এসে উপস্থিত হয়, জিজ্ঞেস করে, কী বিপদ, তা হলে কি বলতে পারবে রেশনের চাল গিলতে পারছি না, কয়লা, যার আর-এক নাম কালো মিছরি, তা পাচ্ছি না কোথাও বাজারে। যদি বলতে পারেও, শুনে উঠে চলে যাবে রাগ করে। বলবে, আমি কি চোরাবাজারের দালাল না আমি তোমার নায়েব-গোমস্তা? রাগ করে চলে যাওয়াই ত উচিত। তবু যদি একবার আসে, দেখতে পাই একটু, তার সেই দীর্ঘচ্ছন্দ শ্যামল শরীর, শরীর নয় শুধু একটা বলিষ্ঠ নিস্পৃহ উপস্থিতি—আর যদি রাগ করবার আগে একটু গান শোনায়!

ভয় করব না রে বিদায়বেদনারে
আপন সুধা দিয়ে ভরে দেব তারে॥

পত্রপাঠ হাজির হল নীলাদ্রি। আশ্চর্য, কলকাতাতেও তার সাইকেল।

"এই যে এসেছেন।" প্রসন্নমুখে সুপ্রভাতই তাকে অভ্যর্থনা করল: "আজকাল বুঝি এখানেই পোস্টেড?"

"হ্যাঁ, শেয়ালদায়।" চার দিকে ব্যস্ত চোখে তাকাতে লাগল নীলাদ্রি। বিপদের লক্ষণ ত দেখতে পাচ্ছে না কোথাও। তবে কি বিপদ একলা সোহিনীর? এমন কী বিপদ হতে পারে যা সোহিনীর একলার, যাতে সুপ্রভাত জড়িত নয়? কিন্তু সোহিনী কোথায়?

"আছেন কোথায় এখানে?"

"ভবানীপুরে।" ঠিকানা দিল নীলাদ্রি। ভাবল, এমন কি হতে পারে যে-ঠিকানায় চিঠি দিয়েছে সোহিনী, সে শুধু একলা সোহিনীর জানা!

ঠিকানা শুনে উৎফুল্ল হবার ভাব করল সুপ্রভাত। বললে, "আমাদের সাবেক বাড়ি, এজমালি বাড়ির কাছে।" বলেই সোল্লাসে ডেকে উঠল: "সোহিনী! সোহিনী!"

সোহিনী কি পাশের ঘরে একটু সাজ-গোজ করছে? তার আটপ্রহরের ধুলো-বালির গায়ে মাখছে কি একটু সোনার রেণুর প্রসাধন?

ঠিক তাই। সিঁদুরে আর গয়নায় স্পষ্ট হয়েছে সোহিনী। প্রখর হয়েছে তার শাড়ির বৈশিষ্ট্যে। হাসতে-হাসতে ঘরে ঢুকে বললে, "আমার চিঠি পেয়েছ বুঝি—"

"হ্যাঁ, কিন্তু," হতভম্বের মত তাকিয়ে থেকে নীলাদ্রি বললে, "কিন্তু কী বিপদ লিখেছ—"

স্বামী-স্ত্রীতে হেসে উঠল। সোহিনী বললে, "বস বলছি।"

নিশ্চিন্ত অনুভব করে বসল নীলাদ্রি। পাশের একটা সোফাতে বসে সোহিনী বললে, "আমাদের ত তুমি ছেড়েই দিয়েছ, কোন খোঁজখবরই আর নাও না। তাই যদি আমাদের বিপদ শুনলে তুমি একটু উৎসুক হও—"

এত ভণিতার কি প্রয়োজন! তাই একটু অসহিষ্ণু হয়ে নীলাদ্রি বললে, "কী দরকার তাই বল।"

"দুনিয়ায় দরকারই বুঝি সব?" দুঃসাহসে ভর করে, তবু কথা বলছে সোহিনী।

"দরকার অদরকার, বল না কী করতে হবে?" নীলাদ্রি ছটফট করতে লাগল।

উপায় নেই, ব্যবসা-বাণিজ্যেরই মানুষ নীলাদ্রি। সুতরাং বলে ফেলাই ভাল। আর কিছু নয়, ব্ল্যাক থেকে কিছু চাল, চিনি, কয়লা যোগাড় করে দিতে হবে তোমাকে। নির্লজ্জের মত বলতে লাগল সোহিনী। কিছু কাপড়-চোপড়, মশারির থান, বিছানার চাদর, দুটো ছাতা। যা যখন জুটে যায় হাতের কাছে। আমরা অন্ধিসন্ধিও জানি না, জানলেও লোকবল নেই যে উদ্ধার করি।

তুমি করিতকর্মা, অসাধ্যসাধক। তাই তোমার কাছে শরণ নিচ্ছি—

"আর আমার সেই ওষুধটা?" সুপ্রভাত মনে করিয়ে দিলঃ "প্রেসক্রিপশানটা দিয়ে দিও নীলুদাকে।"

"বল, এ-সব বিপদ নয়?" সোহিনীর চোখেমুখে কাকুতির কালিমা।

"নিশ্চয়ই, একশবার বিপদ।" একবাক্যে সায় দিল নীলাদ্রি, একটু কণ্ঠক্লেশ অপমান অনাদর গায়ে মাখল না। বললে, "তুমি এক কাজ কর। একটা লিস্টি কর, কী কী জিনিস আর কটা বা কতটা সমূহ দরকার। আর তাই বুঝে টাকা দাও।" লজ্জা ও পীড়া এবার দেখা দিল মুখেঃ "আমার অবস্থা ত জান।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব গুছিয়ে-গাছিয়ে লিখে দাও নীলুদাকে, আর সম্প্রতি এই একশটা টাকা দিচ্ছি।" পাশের শোবার ঘর থেকে টাকা নিয়ে এসে দিল সুপ্রভাত। বললে, "তোমরা বস। আমি একটু বেরুচ্ছি—" তার পর সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে চেঁচিয়ে উঠলঃ "নীলুদাকে খাইয়ে দিতে কিন্তু ভুলো না।"

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই সোহিনী শাড়িতে-গয়নায় উসখুস করে উঠল। বললে, "নীলুদা, আমার দিকে তাকাও।"

নীলাদ্রি তাকাল। দু হাত থেকে সোনার চুড়ির গোছা খুলে ফেলেছে সোহিনী, তাকিতে আঁচলে চুলেও কেমন অসাবধান হয়ে উঠেছে। বললে, "নীলুদা, আমার কি শুধু অন্নবস্ত্রের ক্ষুধা?"

"জানি না।" সোফা থেকে ওঠবার আগেকার মুহূর্তে নীলাদ্রি তার দেহে প্রস্তুতির কাঠিন্য আনলঃ "কিন্তু যার অন্ন-বস্ত্রের অভাব মিটে গেছে, মাথার উপরে জুটেছে যার একটি আচ্ছাদন তার আর কী ক্ষুধা থাকতে পারে ভেবে পাই না।"

"পাও, শুধু মুখে বল না। অনেক ক্ষুধা, অনন্ত ক্ষুধা। আচ্ছা নীলুদা," অযত্নকে এতটুকুও সংশোধন করছে না সোহিনী, আতুর চোখে তাকিয়ে বললে, "তুমি কি মনে কর আমি সুখী?"

"নিশ্চয়ই। এমন স্বামী এই ঘরদোর সচ্ছল-স্বচ্ছন্দ সংসার এ ত ইন্দ্রাণীর সুখ।"

"নীলুদা, আমার অন্তরে সুখ নেই।"

"অন্তরে সুখ ভাবলেই অন্তরে সুখ।" নীলাদ্রি উঠে পড়লঃ "আমার বসবার সময় নেই, তোমার লিস্টিটা শিগগির লিখে দাও আর সেই প্রেসক্রিপশান—"

মৃত্তিকার প্রার্থনার মত ঋজু দেওদার গাছ যেন উঠে দাঁড়াল মাঠের মধ্যে। তন্ময় চোখে তাকিয়ে থেকে সোহিনী বললে, "নীলুদা, তুমি আরও কত সুন্দর হয়ে উঠেছ।"

নীলাদ্রি হাসল, বললে, "আমাকে তুমি

তন্ময় চোখে তাকিয়ে থেকে সোহিনী বললে—

সুন্দর দেখছ বলেই আমি সুন্দর। তেমনি নিজেকেও তুমি সুখী দেখ, পরিপূর্ণ দেখ, তা হলেই তুমি সুখী, তা হলেই তুমি পরিপূর্ণ।" হাত বাড়াল নীলাদ্রি: "লিস্টি দিতে হবে না, ও আমি মনে রাখতে পারব। কিন্তু প্রেসক্রিপশানটা চাই—"

"দিচ্ছি।" ত্বরান্বিত বিশৃংখলায় উঠে পড়ল সোহিনী। পাশের ঘর থেকে প্রেসক্রিপশান নিয়ে এল: "তুমি এক্ষুনি চলে যেও না, চা খেয়ে যাও।" ব্যাকুল হয়ে হাত ধরল নীলাদ্রির।

নীলাদ্রি সস্নেহে হাত ছাড়িয়ে নিল। সমস্ত উত্তাপ আর সৌরভ নিরোধ করল ধীরে ধীরে। বললে, "সন্ধে হয়ে গেছে, অফিস থেকেই সটান এসেছি এখানে। পরে আবার যেদিন জিনিস নিয়ে আসব চা খেয়ে যাব।"

"তুমি আমাকে আর ভালবাস না।" চোখে অভিমান ভরে বললে সোহিনী।

"এতক্ষণ পরে এই বুঝি তুমি সিদ্ধান্ত করলে।" নীলাদ্রি ভাঁজকরা প্রেসক্রিপশানটা পকেটে পুরল।

সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে সোহিনী বললে, "পরমারা নীচের ফ্ল্যাটে আছে—"

"পরমারা মানে?"

"পরমা আর তার প্রফেসর স্বামী নলিনেশ। কী, দেখা করে যাবে?"

"তুমি বলছ দেখা করে যেতে? ওদেরও কি দরকার?" নীলাদ্রি থামল এক পা।

"না না," শতমুখে ঝংকার দিয়ে উঠল সোহিনী: "না, ওদের দরকার নেই। এমনি বলছি কথার কথা। জিনিস পাও কি না পাও আবার এস কিন্তু। যদি পার একটা চিঠি দিয়ে এস।"

কদিন পরে বিকেলে একটা থার্ড ক্লাস ছ্যাকড়া গাড়ি দাঁড়াল দোতলা ফ্ল্যাটের গলির মুখে। গাড়িতে করে এক বস্তা চাল ও এক বস্তা কয়লা নিয়ে এসেছে নীলাদ্রি। উঠল দোতলায়। দেখল বসবার ও শোবার ঘর নিয়ে ফ্ল্যাটের যে ভাগটা আলাদা তাতে সামনেই তালা ঝুলছে। রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ইত্যাদি নিয়ে আর-একটা যে ভাগ আছে, তাতে ভাঁড়ারটা বন্ধ, রান্নারটা খোলা। রান্নাঘরের এক পাশে শুয়ে ঠাকুর ঘুমুচ্ছে ও দুভাগের মাঝখানে যে চাতাল তাতে তাস খেলছে বাড়ির চাকর ক্ষেত্র আর তার দলবল।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দেই কান খাড়া করেছিল ক্ষেত্র। খানিক পরেই বুঝেছিল এ-শব্দে ভয় পেয়ে খেলা ভেঙে দেবার কিছু নেই। এ আগন্তুক শব্দ।

"বাবু বা মা কেউ এখনও ফেরেননি।" শব্দটা সিঁড়ির মুখে আসতেই ক্ষেত্র ঘোষণা করল।

"কখন ফিরবেন?" নীলাদ্রি থমকে দাঁড়াল।

"কখন ফিরবেন বা কে আগে ফিরবেন কেউ বলতে পারে না।" হঠাৎ নীলাদ্রির দিকে চোখ পড়তেই ক্ষেত্রর ঠাহর হল। উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললে, "ও আপনি? চিনেছি আপনাকে।" তারপর গলাটাকে ঝাপসা করল: "মাল এনেছেন?"

চাকরের ধরনটা কী রকম অদ্ভুত মনে হল। তবু নীলাদ্রি বললে, "এনেছি।"

"আমি এ-বাড়ির চাকর। আমার কাছে রেখে যেতে পারেন।"

"না, বাবুরা কেউ আসুন। তাদের হাতেই দিয়ে যাব। আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করি। তোমরা বস্তা দুটো নামিয়ে রাখ।"

খেলা আর হল না। বন্ধ দরজার বাইরে একটা টুলের উপর বসে অপেক্ষা করতে লাগল নীলাদ্রি। জীবনে এ তার ভঙ্গি নয়। কিন্তু কী করবে, যদি চাকরের দল মাল কিছু পাচার করে তাই পাহারা দেওয়া দরকার। নিজের মনেই হাসল একবার নীলাদ্রি। কার মাল কে পাচার করে আর কেই বা তার চৌকিদার!

"ও মা, তুমি এসেছ!" কলকল করে উঠল সোহিনী: "তোমাকে বলেছিলুম একটা খবর দিয়ে আসতে। তুমি যেন কেমন!" হাত-ঘড়ির দিকে তাকাল, হিসেব করে দেখল সুপ্রভাতেরও ফিরতে বেশী দেরি নেই। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ল সত্যি-সত্যি কেন নীলাদ্রির আসা: "কী, পেয়েছ কিছু?" চাবি দিয়ে তালা খুলল সোহিনী।

নীলাদ্রি রান্নাঘরের দিকে ইঙ্গিত করল। দেখে এসে আহ্লাদে দশখানা হয়ে পড়ল সোহিনী। নীলাদ্রির হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে তাকে সোফায় বসিয়ে দিলে। বললে, "ইচ্ছে করলে তুমি কী না করতে পার। শুধু আমার বেলায়ই কিছু করলে না। আমাকে কাঙালিনী করে রাখলে।"

"তোমাকে আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী করেছি।" ভরাট গলায় বললে নীলাদ্রি।

"বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীই মর্তে সীতা। আর যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ।"

"আর হ্যাঁ, এই নাও সেই ওষুধ।" পকেট থেকে প্রেসক্রিপশান আর ওষুধ বার করল নীলাদ্রি। কথা ঘুরিয়ে দিতে চাইল।

কিন্তু কথা আবার ফিরিয়ে আনে সোহিনী। বললে, "এত তুমি করছ এর তুমি কোন দাম নেবে না?"

"দাম ত অনেক আগে থেকেই নেওয়া হয়ে আছে। এ আমি ত শোধ দিচ্ছি।" নীলাদ্রি উঠে পড়ল। বললে, "তোমার ছুটি হয়ে গেলেও আমার এখনও ছুটি হয়নি। আমাকে আবার এখন অফিসে ছুটতে হবে।"

"কে বললে আমার ছুটি হয়ে গেছে?" গভীর বিলোল কটাক্ষ করল সোহিনী: "আমার ছুটির এখনও ঢের বাকী।" তবু নীলাদ্রিকে চলে যেতে দেখে আবার দরজার কাছে ঘেঁষে এল: "তোমার আজও কিছু খাওয়া হল না। বল আবার কবে আসবে?"

"শুক্রবার। সেদিন কিছু কাপড়চোপড় পাবার কথা আছে।"

"ঠিক এস। জিনিস পাও কি না পাও লক্ষ্যও কর না। আর দেখ," হাতঘড়ির দিকে সোহিনী তাকাল আর-একবার, সময়ের ব্যবধানের আবার হিসেব করল, তারপর স্বর গাঢ় করল: "আর দেখ ঠিক দুক্কুরবেলায় এস। অনেকক্ষণ সময় হাতে নিয়ে। সেদিন খেতে হবে কিন্তু।"

"তাই আসব।" দ্রুত পায়ে চলে গেল নীলাদ্রি।

সুপ্রভাত বাড়ি এলে সৌভাগ্যের সূচীপত্র খুলে ধরল সোহিনী। সরু ধবধবে চাল আর, সত্যি, মিছরির তালের মতই কয়লা। আর এই দেখ তোমার ওষুধ।

খুশিতে উজ্জ্বল হল সুপ্রভাত। বললে, "আমার সঙ্গে দেখা হল না। আবার কবে আসবে বলেছে?"

"দিনক্ষণ কিছু বলে যায়নি। কিছু কাপড়চোপড় পাবার কথা আছে। বলেছে পেলেই চলে আসবে একদিন।"

জনান্তিকে ক্ষেত্রকে ডাকল সুপ্রভাত। জিজ্ঞেস করল, "আবার কবে আসবে বলেছে?"

গলাটা লম্বা করে প্রায় কানের কাছে মুখ এনে ক্ষেত্র ফিসফিসিয়ে বললে, "শুক্কুর-বার। ঠিক দুক্কুরবেলা।"

শুক্রবার, দুপুরবেলা, ঘড়িঘন্টা ঠিক করা ছিল না। নীলাদ্রিই আগে এসে পড়ল। শাড়ি-শার্টিংএর নমুনা কিছু এনেছে সঙ্গে করে, যদি পছন্দ হয়। এসে দেখল সোহিনী তখনও ফেরেনি। এ-ভাগের দরজায় তালা মারা, ও-ভাগের দরজায় ছিটকিনি তোলা। চাকরদের তাস খেলার আড্ডা আজ বসেনি। নিঝঝুম বাড়িঘর। শুধু চাতালে টুলটি রাখা আছে সন্তর্পণে।

কাপড়ের বাণ্ডিলটা টুলের উপর রেখে পাইচারি করতে লাগল নীলাদ্রি। একটু আগেই বোধ হয় এসে পড়েছে। কী করবে, আজ অফিসে এই সময়টাই অবসর।

কতক্ষণ পরেই সোহিনী এসে হাজির। রোদে-গরমে, ধৈর্যে-আবেগে দগ্ধ হচ্ছে বেশে-বাসে। "জানি এসেই তোমাকে দেখতে পাব। তবু কী রকম ছুটেছি দেখ না।" হাসিতে-খুশিতে উছলে পড়ছে ঝলক দিয়ে। ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে চাবি খুঁজতে লাগল সোহিনী। বললে,

"জান, তোমার জন্যে আজ স্কুল পালিয়েছি আমি।"

"আমার জন্যে, না শাড়ি-শার্টিং-এর জন্যে?"

"তাই বটে?" তালায় চাবি পরাল সোহিনীঃ "দাও না শাড়ি-শার্টিং বাইরে ছুঁড়ে। কে চায় ওসব জঞ্জাল?"

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পাখাটা খুলে দিল সোহিনী। কাপড়ের বাণ্ডিলটা কুড়িয়ে নিয়ে নীলাদ্রি তাকে অনুসরণ করল। সোফায় বসে কাগজের মোড়কটি সরিয়ে নীলাদ্রি বললে, "এই দেখ, এরকম শাড়ি, এ তোমার পছন্দ?"

মুখোমুখি আর-একটা সোফায় বসে আলস্যে একটু শিথিল হল সোহিনী। বললে, "ও কে দেখে? যাকে সাজাবে ধরে নিয়ে এসেছ, তাকে দেখ। বলি, সে তোমার পছন্দ?"

"সে আমার পছন্দ-অপছন্দের বাইরে। সে আমার সোহিনী—শোভিনী। চিরন্তনী।"

"সোহিনী মানে ত সোহাগিনীও হয়, তাই না নীলুদা?"

"সে তুমি তোমার স্বামীর সোহাগিনী বলে।"

"আচ্ছা, নীলুদা, আমাকে তুমি পাওনি বলে তোমার দুঃখ হয় না?"

নীলাদ্রি অবাক হবার ভাব করল। বললে, "কে বললে তোমাকে পাইনি? তোমাকে না পেলে কি তোমার কাছে আসতে পারি, বসতে পারি, তোমার দুটো উপকার করে দেবার অধিকার পাই দুহাতে?"

সোহিনীর চোখ ছলছল করে উঠল। বললে, "নীলুদা, এত অল্প তোমার আকাঙ্ক্ষা?"

"অল্প হতে যাবে কেন? আমার ত কুশলের আকাঙ্ক্ষা। কুশলের আকাঙ্ক্ষা কি কখনও অল্প হয়? তোমার ভাল হক, তোমার সুখ হক এ কি কখনও আমি ছোট করে, অল্প করে বলতে পারি?"

সোজা হয়ে উঠে বসল সোহিনী। বললে, "আগে ভাবতাম নীলুদা তুমি উদাসীন, পরে মনে হত তুমি নির্মম, এখন মনে হচ্ছে তুমি দুর্বল, তুমি ভীরু—"

"ভীরু?"

"তা ছাড়া আবার কী।" বাইরের খোলা দরজার দিকে একবার তাকাল সোহিনীঃ "আমি এখন কত স্বাধীন, কত নিরাপদ, অথচ তোমার একটুও সাহস নেই।"

"আমার সাহস নেই?" যেন ঘা খেল নীলাদ্রি, এমনি নিশ্বাস ফেলল। বললে, "আমার সাহস ছিল বলেই ত আবার দেখতে পারলাম তোমার মুখ, নিজের মুখও দেখাতে পারলাম তোমাকে। সেই সেদিন আমার কাছে তুমি চিরদিনের মত ঘৃণিত হয়ে যেতে চেয়েছিলে, আমি সেই অপমৃত্যু থেকে তোমাকে উদ্ধার করেছি—শুধু তোমাকে নয়, নিজেকেও। সেই আমার সাহস। আর সেই সাহসেই উজ্জ্বলের সামনে দাঁড়িয়েছি উজ্জ্বল হয়ে।"

সোহিনী চাঞ্চল্যে মর্মরিত হয়ে উঠল। বললে, "নীলুদা, কথা ছাড়। আমি উজ্জ্বল নই, আমি মলিন। আমার আর যা-ই থাক বা যতই থাক, আমি তুমি ছাড়া অপূর্ণ—"

নীলাদ্রি উঠে পড়ল। বললে, "সেই অপূর্ণতাই প্রাপ্তি। মিলনের মূর্তি ক্ষণিকের মূর্তি, কিন্তু বিরহের মূর্তি শাশ্বত শুভ্রতা দিয়ে তৈরি। সে-মূর্তি ভাঙে না, মোছে না, দাগ ধরে না, শীতে গ্রীষ্মে, রোগে-জরায় সব সময়েই নিটুট থাকে, নিখুঁত থাকে। সেকি, কথাই বলবে শুধু, এক গ্লাস সরবত বা এক কাপ চা খেতে দেবে না?"

"দিচ্ছি, চাকরটা যেন কোথায় গেছে। এক কাজ কর নীলুদা।" সোহিনী নীলাদ্রির হাত ধরল, অনুনয়ের সুরে মিশিয়ে বললে, "তোমার ত হাতে ঢের সময় আছে, শোবার ঘরে চল। সেখানে বিছানায় বিশ্রাম কর, আমি তোমার জন্যে চা করে আনি—"

"কেন, ক্ষেত্তর এখনও আসেনি?" পাশের ঘর থেকে, অন্ধকার শোবার ঘর থেকে সুপ্রভাত কথা কয়ে উঠল।

এক দোয়াত কালো কালি কে ঢেলে দিল সোহিনীর মুখে। তার রঙ-রোদ, রাগ-রাগিণী সমস্ত এক নিমেষে উবে গেল। তালাবন্ধ অন্ধকার ঘরে কী করে আসতে পারল, থাকতে পারল সুপ্রভাত। বাইরে থেকে ঢোকবার আর ত কোন দ্বিতীয় পথ নেই। বাথরুমের দরজা দিয়ে? সে ত সব সময় ভিতর থেকেই খিল দেওয়া, জমাদার এলে একবার তা খুলে দেওয়া হয়—সে ত রোজ সকালে। আর আজ সুপ্রভাত বেরিয়ে যাবার পর সোহিনী বেরিয়েছে, আর সে সময় সমস্ত খিল ছিটকিনি যে আটকান ছিল, এতে সে নিঃসন্দেহ। তবে কি শোবার ঘরের জানলা ভেঙে ঢুকেছে, নীচ থেকে পাইপ বেয়ে?

কে জানে কি!

এত বড় ভয়ের সামনে কোনদিন দাঁড়ায়নি সোহিনী, যখন সুপ্রভাত বেরিয়ে এল নিজের থেকে। যেন কিছুই জানে না। কিছুই শোনেনি—দেখেনি, যেন এতক্ষণ ঘুমিয়েছিল, এমনি ভাব করে পরিষ্কার মুখে বললে, "ক্ষেত্তরটা কোথায় গেল বল ত?"

সোহিনী কথা বলল না, মুখ তুলল না, কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। আর নীলাদ্রি আস্তে আস্তে দু-পা এগিয়ে এল দরজার দিকে।

"অফিসে শরীরটা খারাপ হল বলে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম বাড়ি।" যেন সুপ্রভাতই অপরাধী, তারই ব্যাখ্যা বর্ণনা দরকারঃ "দরজা খুলে তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। খোলা তালাটা কড়াতে ঝুলেছিল বাইরে, তাড়াতাড়িতে তার মুখের চাবিটা তুলে নেওয়া হয়নি। আর বুদ্ধিমান চাকর, ভেবেছে বাবু বুঝি ভুল করে চাবি না দিয়েই বেরিয়ে গেছেন বাড়ি থেকে। একবার ভেতরে উঁকি মেরে দেখ কী অবস্থা, তা নয়, তালায় চাবি ঘুরিয়ে দিব্যি চলে গেছেন আড্ডা দিতে। এদিকে আমি যে আমার নিজের ঘরে বন্দী, তা আর ওর খেয়াল নেই।"

সোহিনী ভিতরে-ভিতরে থরথর করে কাঁপছে, এত গরমেও তার শীত করছে, আশ্চর্য, সে নড়তে-চলতেও পারল না, বসে পড়ল, ভেঙে পড়ল সোফায়। দু হাঁটুর উপর দু কনুই রেখে বদ্ধ আঙুলের উপর চিবুক রেখে গুম হয়ে রইল।

দরজার কাছ বরাবর এসে নীলাদ্রি বললে, ঘরের মধ্যে কে আছে না আছে কোন দিকে না তাকিয়ে, "আর দুটো জিনিস এখনও বাকী—মশারি আর দুটো ছাতা। দেখি যোগাড় হয়ে যাবে হয়ত।"

তারপর বাইরে বেরিয়ে আবার ঘরের মধ্যে উঁকি মেরেঃ "আবার যদি কখনও দরকার হয়—"

"ভদ্রলোককে ডাক।" সুপ্রভাত অস্থির হয়ে বললে, "বা, ভদ্রলোকের কী দোষ!"

পাষাণীভূত হয়ে রইল সোহিনী।

"বা, শরবত কিংবা চা করে দাও। বোঝা কয়ে কতদূর থেকে এসেছেন শ্রান্ত হয়ে। ডাক। বিশ্রাম করতে বল, বিছানা পেতে দাও।"

দু হাতের আঙুলগুলি মেলে ধরে তাতে মুখ ঢাকল সোহিনী।

শুনতে পেল নীলাদ্রির নেমে যাবার শব্দ।

নেমেই বা কোথায় যায় এখন নীলাদ্রি? বিপদে রক্ষা করবে সোহিনীকে, এ সে তাকে কোন বিপদের মুখে রেখে গেল? একেবারে না এলেই পারত! বিচ্ছেদের পর এই ত স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, কেউ কারু খবর রাখে না, মুখ-দেখাদেখি থাকে না পর্যন্ত। কেন তার এই স্পর্ধা হতে গিয়েছিল যে, সে নিরভিমানে সোহিনীর উপকার করবে, এবং সোহিনী যাকে নির্দিষ্ট করবে, তার। খুব উপকার সে করে দিয়ে এসেছে। যে অহঙ্কার করে এমনি করেই সে গুঁড়ো হয়ে যায়।

আর কোন দিন যেন দেখা করতে না

ছোটে। হিসেব করে যে টাকাটা বাঁচবে তা যেন পাঠিয়ে দেয় মানি-অর্ডারে।

পরমা না জানি কেমন আছে। একবার তাকে দেখে গেলে কেমন হয়!

এই বুঝি পরমাদের ফ্ল্যাট। গলি দিয়ে বাইরে এলেই খোলা রাস্তার উপর সদর। মন্দ কি, একবার উঁকি মারি। দেখি সে কেমন স্বাধীন, সে কেমন নিরাপদ!

এ-ফ্ল্যাটেও ঢুকতেই প্রথমে বসবার ঘর, পিছনে শোবার। বসবার ঘরের দরজা খোলা। যায় কি না যায় ঘুরঘুর করতে লাগল নীলাদ্রি।

ঘরের মধ্যে নলিনেশ বসে আছে আর তার মুখোমুখি আর-একটা চেয়ারে বসে আছে একজন মহিলা। মাঝখানে একটা ছোট টেবিল। ঘরটা কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া, বিরলভূষণ। সোফা-গালচে কিছু নেই, একটা শাড়ি সেলাই করে পর্দা। কটা তক্তার কটুক্তি। এই দারিদ্র্যের মাঝখানে ঐ সম্ভ্রান্ত মহিলাটি কে? টেবিলের উপর যখন তার হাত-ব্যাগটা আছে, তখন নিশ্চয়ই সে পরমা নয়, সে বাইরের লোক। তাছাড়া এ পরমার চেয়ে অন্যরকম, গায়ে এর ভারী বয়সের ঢেউ।

কিন্তু ভরদুপুরে নলিনেশ বাড়ি কেন? সুপ্রভাত না-হয় মাথার ব্যথার দরুন অফিস পালিয়েছে, কিন্তু নলিনেশের কলেজ কি আজ ছুটি? এ ত কলকাতা, এখানে নলিনেশের কলেজ কোথায়? একবার বন্ধক ত চিরকাল বন্ধক, তেমনি একবার মাস্টার ত চিরকাল মাস্টার। কলকাতায় এসে খোলা পায়নি কোন কলেজ?

"আসুন, আসুন, নীলুদা—" নলিনেশ চিনতে পেরেছে।

যে মহিলাটি উপস্থিত ছিলেন, তাঁকে উদ্দেশ করে নলিনেশ বললে, "এই সেই নীলুদা, যার কথা বলছিলাম তোমাকে, যিনি সেদিন উকিল ধরিয়ে জামিন পাইয়ে দিয়েছিলেন, যিনি সেদিন বাধা দিয়েছিলেন শহীদ হতে—"

যাক, সুর ঠিক ধরতে পেরেছে নীলাদ্রি, যেহেতু তার মুখে রসিকতার হাসিটি এখন ফুটন্ত। নীলাদ্রি বললে, "পরমা কোথায়?"

মহিলাটির দিকে ইঙ্গিত করে নলিনেশ বললে, "ইনিও এসে এই প্রশ্ন করেছিলেন। পরমা আমার কাছেই আছে, আমাকে এখনও ত্যাগ করেনি, তবে—"

"বাড়িতে আছে?"

"হ্যাঁ, না, সম্প্রতি বাইরে বেরিয়েছে একটু। বেশী দূরে নয় হয়ত, এই কাছেই, কাস্টমস অফিসের বাসুদেব ব্যানার্জির বাড়িতে। তিনি একটা মেয়ে-ইস্কুলের কর্তা, যদি সেখানে পরমার একটা চাকরি হয়—"

"তাহলে চাকরির সন্ধানে বেরিয়েছে বল।" ভদ্রমহিলা ফোড়ন কাটল।

"কী আর করা! আমি যখন বেকার!" পাঁজর ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলল নলিনেশ।

এ আবার আরেক কাহিনী। জলছাড়া মাছের মত অস্বস্তি লাগতে লাগল নীলাদ্রির। দোরগোড়ায় সাইকেলটা তার আছে এই তার একমাত্র আরাম।

নলিনেশ বললে, "বসুন না। বোধ হয় বেশী দেরি হবে না। লোক নেই, নইলে আনতাম ডাকিয়ে।"

"আর একদিন আসব। আজ একটু কাজ আছে।" নলিনেশ সাইকেলটাকে চেনমুক্ত করল, তারপর চলে গেল একটানা।

মহিলাটি ঠেস দিয়ে বললে, "এমন বিয়ে করলে যে, তোমাকে একেবারে নিষ্কর্মা বেকার করে দিল!"

"আর বল না। একেবারে সর্বস্বান্ত।"

"কত ত প্রতিজ্ঞা করেছিলে কত বড়ফট্টাই, কত লম্বাইচওড়াই, কিছুতেই বিয়ে করব না। বিয়ে করা মানেই হ্যানো, বিয়ে করা মানেই ত্যানো—" মহিলা জিভের সঙ্গে সঙ্গে ভঙ্গিটাও বাঁকা করলেনঃ "বিয়ে যে করে সে অমুক, বিয়ে যে করে সে তমুক—কত ত কংগ্রেসী বক্তৃতা—সব ভেসে গেল?"

"সব।"

"কী দুর্বার সেই শক্তি মেয়েটার একবার দেখলে হয়!" মহিলা তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল নলিনেশের চোখের মধ্যেঃ "কী দেখে ভুললে!"

"কিছু না। রজনীগন্ধার ডাঁটের মত রিক্ত একটা মেয়ে, উপরের দিকে একথোপা সাদা ফুল, চুল আর চোখ আর ভুরু— কী যে দেখলাম কে জানে। যে দেখাল, সে-ও জানে না কী দেখাল!"

"তুমি একটা ঝানু মাস্টার আর ও তোমার কাঁচ ছাত্রী—" জিভ ত নয়, যেন দাঁত তুলল মহিলা।

কাতর মুখ করে নলিনেশ বললে, "এসব কথা অনেক হয়ে গিয়েছে, অনেক অনেক। দয়া কর, তুমি আর ওকথা তুলো না।"

টেবিলের উপর রাখা তার হাত-ব্যাগের স্ট্র্যাপটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে মহিলা বললেন, "তোমার ত কত চুলচেরা বিচার, যাকে তুমি বলতে যাথার্থ্য নিরূপণ, কত তোমার যান্ত্রিক বাস্তব বুদ্ধি, হিতাহিত তৌল—কিছু দিয়েই রুখতে পারলে না নিজেকে?" এ তিরস্কার না অভিমান কে বলবে!

নলিনেশকে কেমন হতাশের মত শোনালঃ "নিজেকে পারলেও ওকে পারলাম না। আমি ত ভিজে কাঠ কিন্তু ও দুর্দান্ত আগুন। কতটা আগুনে জ্বলে ভিজে কাঠ তার সমস্ত শৈত্য শব্দ ও ধোঁয়ার পর বিশুদ্ধ জ্বলে উঠতে পারে, তুমিই বোঝ—"

"বুঝেছি। সব সুবোধেরই এক গোয়াল।" রাগে যেন আরও একটু স্পষ্ট হল মহিলা, "এক চিলতে একটা পুঁচকে মেয়ের কাছে হেরে গেলে?"

"তোমাকে কী বলব, অনেক কসরত করেছি—অনেক প্রক্রিয়া, তবু কিছুতেই পারলাম না। যখন অকস্মাৎ প্লাবন বন্যা আসে, তখন সব বাঁধই বালির বাঁধ হয়ে যায়।"

"আমি এই ধসে-যাওয়া, গলে-যাওয়া বাঁধ দেখতে আসিনি।" বললে সেই মহিলা, তার ব্যাগের স্ট্র্যাপটা নাড়তে-নাড়তেঃ "সেই বন্যা-কন্যাকে দেখতে এসেছি।"

এ যেন রাগ নয়, এ যেন বিদ্বেষ। যা এই মহিলা করতে পারেনি, কোন মহিলাই করতে পারেনি তা এক মফঃস্বলের নিষ্পালিশ নিরীহ মেয়ে করতে পারল, এ

আসুন, আসুন, নীলুদা—

যেন কিছুতেই সহ্য করা যাচ্ছে না গা পেতে। এ শুধু নলিনেশের হার নয়, সমস্ত সুষমাথীর হার। সমস্ত বয়স্ক ও সম্ভ্রান্ত সমাজের মুখে চুনকালি আর যে প্রতিদ্বন্দ্বী-হীন হয়েও জয়ী হয়, গুণে নয়, খাতিরে প্রাধান্য পায়, তার প্রতি রোষ যেন কিছুতেই নিবতে চায় না। তুষের আগুনের মতই জ্বলতে থাকে।

"শুধু বিধ্বস্ত বাঁধই নয়," নলিনেশ আচ্ছন্নের মত বললে, "তার পরেকার এই সারশূন্য শস্যশূন্য মাঠটাও দেখ। দেখ না এই কী হয়ে গেছি!"

"কী হয়ে গেছ?" একটু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল বোধ হয় মহিলা। একটা ছেঁড়া-বোতাম পাঞ্জাবির নীচে গর্ত-ওলা গেঞ্জির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। দুদিন যে দাড়ি কামায়নি, তা যেন শুধু আলস্যের নয় দৈন্যের প্রতীক। ঔদাস্যের আর-এক মানে যে বিরক্তি, তা যেন চার পাশে পরিস্ফুট।

কী হয়ে গিয়েছ! মহিলার সুরে একটু কি করুণার সুর লাগল? ঘৃণার বদলে একটি মানবিক আবেদন?

তবে শোন, তারপর কী হল।

মণিলাল যখন মামলায় কাবু করতে পারল না, কলঙ্কের ধুলোয় যখন পারল না ধাঁধিয়ে দিতে, তখন জাত মারতে চাইল, তার মানে ভাত মারতে চাইল। সংসারে যার ভাত নেই, তারই জাত নেই।

কলেজ-কমিটিতে নালিশ নিয়ে গেল মণিলাল। পাঠদশায় যে শিক্ষক ছাত্রীকে নিয়ে সরে পড়ে, সে কলেজের শিক্ষক থাকতে অনুপযুক্ত, তার চরিত্র আদর্শের অপঘাত। সরে পড়া কি বলছেন, বিয়ে করা, সুষমার মধ্যে আশ্রয় পাওয়া। সমস্ত রসের সমগ্রতায় নিমগ্ন হয়েও সমাজে আবদ্ধ থাকা। ওসব তত্ত্বকথা ছাড়। কমিটি বললে, যা লটপট করেছ সমস্ত শহরে ঢিঢিক্কার। ভালয় ভালয় কাজে ইস্তফা দাও। তারপর যথা ইচ্ছা তথা যাও।

মুখ কাচুমাচু করে নলিনেশ বললে, কাজে ইস্তফা দিলে খাব কী?"

"ওরকমভাবে বলবার কী হয়েছে লক্ষ্মী-ছাড়ার মত?" পরমা ধমকে উঠলঃ "বলগে, যখন বিয়ে হয়েছে, তখন পরমা ছাত্রী নয়, তখন সে বেরিয়ে এসেছে কলেজ থেকে, তখন সে বিয়ে বয়সে সর্বঅর্থেই সাবালিকা, তখন সে ছুকরী নয় ধাড়ি, মেয়ে নয় মহিলা। বলগে, কী মিনিমুখোর মত থাক?"

নলিনেশ কমিটিতে নিজেই সওয়া করলে। পরমার যুক্তি একটাও বাদ পড়ল না

কমিটি বললে, ওটা টেকনিক্যাল যুক্তি আসলে ঘনিষ্ঠতা বা আন্তরিকত কালক্রম কলেজে থাকাকালীন। অথ মতিচ্ছন্ন ব্যবহারটা করেছ পড়াতে-পড়াতে ডিম এখনই ফুটুক, তা দিয়েছ পড়

চৌধ্বেন সুতরাং আদর্শের দিক থেকে এ নিন্দনীয়।

"এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, এতে কলেজের কোন মাথাব্যথা নেই।" নলিনেশ বললে।

"কারু মনঃপীড়া, কারু শিরঃপীড়া।" কমিটি প্রত্যুত্তর করল: "আসলে কলেজের সুনামে দাগ পড়বে। যে দেখবে, সেই বলবে, এই সেই গুণধর। একটা শুধু কথাই হেঁটে বেড়াবে সারাক্ষণ, এই কলেজের মেয়েরা মাস্টারের সঙ্গে ধৃষ্টতা করে আর মাস্টাররা ছাত্রীর সঙ্গে ইয়ারকি দেয়। মেয়েরা সন্ত্রস্ত হবে, অভিভাবকেরা কুণ্ঠিত, আর সৎ শিক্ষকেরা লজ্জায় মাথা তুলতে পারবে না। সুতরাং কথা বাড়িও না। লেজ গুটও। একটা খতমী দরখাস্ত ঝাড়।"

"চাকরি ছেড়ে দেওয়া মুখের কথা?" পরমা গর্জে উঠল: "বিশেষত স্বিস্থ হবার দায়িত্ব নেবার পর?"

"অসম্ভব।" সায় দিল নলিনেশ।

যদি নিজের থেকে না ছাড় আমরা তাড়িয়ে দেব। কমিটি ঘোষণা করল।

কোন আইনে?

গণতন্ত্রের আইনে। ভোটের জোটে। গভর্নিং বডির সমস্ত সভাই হাত তুলেছে তোমার বিরুদ্ধে। অপরাধ? প্রফেসন্যাল মিসকণ্ডাক্ট। চাকরিগত অপপ্রয়োগ। উকিল যদি তার মক্কেলনীকে বিয়ে করে, অর্থ গ্রাস করতে এসে যদি অর্ধ গ্রাস করে বসে অর্ধাঙ্গিনী বানায়, তা হলে কি আইনের আওতায় পড়ে, না, তার সনদ বাতিল হয়? তেমনি মাস্টার যদি বিদ্যাদান করতে এসে প্রাণ দিয়ে ফেলে, মাইনে নিতে গিয়ে যদি হাতখানাও পকেটস্থ করে, তাহলে কেন তার চাকরি যাবে? দস্তখত বিনে যেমন দলিল মিথ্যে, তেমনি চাকরি বিনে জীবন মিথ্যে।

কিন্তু কমিটির ধ্বজার মুষ্টি কিছুতেই শিথিল হল না। যা করবার কর, চাকরি থেকে ডিসচার্জ করে দিল নলিনেশকে।

"এই অত্যাচার তুমি সইবে?" পরমা দাউ-দাউ করে উঠল।

"কিন্তু কী করব?" নলিনেশ তার পুঁথি-পত্রের পাহাড়ের দিকে সাদা চোখে তাকিয়ে রইল।

কী করবে? পরমা গেল কলেজে একটা ধর্মঘটের ধ্বনি তুলতে। কিন্তু কারুরই গা বিশেষ গরম হল না। ছেলেরা সিঁদুর দেখে ইঁদুর হয়ে গেল আর মেয়েরা বেজি। ছেলেদের নৈরাশ্য মেয়েদের হিংসে। যদি সাদা সিঁথিতে আসতে সমতল ভাবতুম কাঁধে কাঁধ মেলাতুম, ধুয়ো দিতুম। আমরা ঘরপোড়া গরু আর তুমি এখন সিঁদুরে মেঘ। তাছাড়া তুমি আর এখন আমাদের কলেজের ছাত্রী নও।

"ও! এবেলায় আমি আর এখন কলেজের ছাত্রী নই!" পরমা টিটকিরি দিয়ে উঠল: "কিন্তু উনি ত তোমাদের প্রোফেসর!"

অরণ্যে রোদন সার। ছাত্র-ছাত্রীর দল মুখ ফিরিয়ে নিল।

সারা বছরের ধুমধাম একদিনে শেষ হয়ে যাবে? এর কোন বিহিত হবে না?

নলিনেশের গায়ে ঠেলা মারল পরমা। বললে, "ওঠ, মামলা কর।"

"মামলা করলেই গামলা-গামলা খরচ।" বললে নলিনেশ।

"হক খরচ। টাকা আমি দেব।"

"তুমি?"

"হ্যাঁ, আমার টাকা তবে আছে কী করতে?"

চেক-বই বের করল পরমা। জীবনে প্রথম চেক কাটল। আর তা নলিনেশের বরাবর। বীরাঙ্গনার মত বললে, "যাও অন্তত চেকটা ভাঙিয়ে নিয়ে এস। তারপরে উকিলের বাড়ি দুজনে যাব একসঙ্গে।"

"উকিল পাব না এখানে।" নলিনেশ আবার ঠাণ্ডা জল ছুঁড়লে।

"যদি না পাই কলকাতা থেকে আনব। সামনের কাক না আসুক দূরের কাক আসবে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না।"

যে ছিল একদিন অধরা মাধুরী, জীবনের কুহকিনী দুরাশা, সে এখন মামলার তদ-বিরকার হয়ে উঠল। একবার নিয়ে গিয়ে-ছিল ফৌজদারিতে এখন জলে ডোবাল দেওয়ানির দ'কে। মাঝখানে কলেজ কমিটির সঙ্গেও কম ঝাপটাঝাপটি গেল না। বিয়ের ব্যাপারে নোটিশ ও রেজেস্ট্রি নিয়েও লুৎফরাক্কা অনেক। বিয়ের দরুন যদি শুধু মালি-মোকদ্দমাই করতে হয় তাহলে রোমান্সে রোমাঞ্চ আর থাকবার নয়। প্রেমের খেলা যদি শুধু খাজনা দিতে দিতেই বয়ে যায় তাহলে বাজনা বাজবে কখন?

দুজনের এখন কথা হচ্ছে মামলার পরের তারিখ কবে আর কোন তদবিরটা করতে হবে এবং কীভাবে। উকিলের বাড়ি যাও, দফায়-দফায় টাকা দাও, একটা দরখাস্ত করতে হলে দশটা তার নকল কর, নকল বিরুদ্ধ পক্ষের উকিলের বাড়ি গিয়ে দিয়ে এস, আর মামলার ডাক পড়ে কি না-পড়ে সারাক্ষণ বসে থাক বারান্দায়। উকিলের কায়দাই হচ্ছে ভুল তারিখ দিয়ে বেকায়দায় পয়সা নেওয়া, তাই কজ-লিস্ট ঘেঁটে নিজেই তারিখ সংগ্রহ কর আর তা নিতে পেশকারের হাতে কিছু গুঁজে দাও। এদিক ওদিক আরও কত যে আছে কাঙালের হাত, অন্ত নেই। হাকিমের আরদালীও তাক বুঝে নাক নাচায়। জেরবার হয়ে গিয়েছে নলিনেশ।

"আর নয়, এবার চল কলকাতায় যাই।" বললে নলিনেশ।

"মামলা?" যেন বুকের হাড় এমনি পরমা চেঁচিয়ে উঠল।

"জাহান্নমে যাক। কতদিনে শেষ হবে তার ঠিক নেই। আর শেষ হলেও নিষ্পত্তি আছে নাকি? এখানে হলেও, আপিল আছে, তারপর তস্য আপিল, প্রপিতামহ-আপিল। চূড়ান্ত হবার আগেই আমরা চূড়ান্ত হয়ে যাব, চাকরি পাবার আগেই পেয়ে যাব লাকড়ি।"

"না, না, অবিচারের প্রতিকার চাই।" মুখস্ত বুলির মত বলে উঠল পরমা।

"তার জন্যে অনির্দিষ্ট সময় চুপচাপ বসে থাকতে হবে?" বিরক্তির সুরে বললে নলিনেশ: "রোজগারের পথ দেখতে হবে না? এখানে একটা টিউশানি পর্যন্ত নেই। যা দুটো সামান্য পয়সা আছে তাই তুলে তুলে খাব আর মামলার খোরাক না হাতির খোরাক জোগাব এ অসম্ভব বুদ্ধি। নাও, ওঠ প্যাক কর, এবার আমি তাড়া দিচ্ছি, তবে এই পালানোর জন্যে রাত্রের ট্রেনের দরকার নেই।"

"না, তা কী করে হয়? মাঝপথে এসে মামলা ছেড়ে দেব?" বিয়ের ব্যাপার জিতেছে, মামলার ব্যাপারেও জিতবে, এই প্রগাঢ় বিশ্বাস পরমার। বিয়ের পরে সারা শহর ডঙ্কা মেরে বেড়িয়েছে, চাকরি ফিরে পেয়ে কমিটির সকল সভ্যকে মায় তার মামাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবে। পরমার কাছে জয়ের জৌলুসেরই যেন বেশী দাম। কিন্তু এই কি সেই জয়ের চেহারা? জীবিকা নেই প্রতিষ্ঠা নেই চারদিকে বদান্য নয়নের প্রসন্নতা নেই, কর্মহীনতার নাগপাশে বাঁধা থাকবে নির্জীব হয়ে এ অসহনীয়। পরমার ইচ্ছে, তাই থাক, সবাইকে দেখিয়ে বেড়াও,

আমরা খাসা আছি, বেশ আছি, আমাদের কিছু অসুবিধে হচ্ছে না, আমরা আমাদের স্বত্ব সাব্যস্ত করে সকলের মুখের উপর তুড়ি মেরে আবার বহাল হব স্বস্থানে। অন্য জায়গায় কাজ নিয়ে ফেললে এই জয়ের স্ফূর্তি পাব কোথায়? শুধু কৃপণ জীবিকাই সম্বল, জয়ের প্রত্যাশায় তপস্যা করা কিছু নয়?

এই নিয়ে বিরোধ বাধল দুজনে। শেষ পর্যন্ত মীমাংসা হল এই শহরের বাসা তুলে দিয়ে দুজনে কলকাতা গিয়েই থাকবে, সোহিনীদের বাড়ির নীচের ফ্ল্যাটে এবং সেখান থেকেই মামলার জোগান দেবে। অন্যত্র চাকরির সংস্থান দেখবে আর শেষ পর্যন্ত যদি মামলা পায় অর্থাৎ যদি জেতে তখন বিবেচনা করে দেখবে ওখানে ফিরে গিয়ে কমিটির বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবে কিনা। ইতিমধ্যে কলকাতায় যদি ভাল একটা কিছু জুটে যায় কপালগুণে—

"কপালগুণে?" পরমা ঠাট্টা করে উঠল। তার মানে নিজে কিছু চেষ্টা করবে না? চিরাচরিত আলস্যে অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে?

"কপালগুণে ছাড়া আর কী! তোমার কপালগুণে!" দুই চোখে স্নেহ আনতে চাইল নলিনেশ: "সকলেই সিঁদুর পরে কপালগুণে ঝলক মারে। দেখ তুমি পার কিনা মারতে। আর জান ত, তোমার গরবে গরবিত আমি রূপস তোমার রূপে।"

একটুও হাসল না পরমা। কলকাতায় আসার পর থেকে তার মুখে আর হাসি নেই। রোদ্দুরের নীলে আকাশ-ওড়া পাখির পাখার রুপোলী স্ফূর্তি নেই ওর মধ্যে, এখন শুধু ক্ষুদ্র পরিধির কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে ঘানি টানার দাসত্বের ক্লান্তি।

"আর আমার দিকে তাকিয়ে দেখ।" মহিলাকে উদ্দেশ করে আগের কথায় ফিরে গেল নলিনেশ: "দেখ এই কী হয়ে গেছি!"

"কেন, চাকরি জোটেনি কিছু?" জিজ্ঞেস করল মহিলা।

"বৈষ্ণবের শোভা যেমন কপনি তেমনি মাস্টারের শোভা টিউশান। সকালে-বিকেলে দুটো টিউশান শুধু জুটেছে, মূলে কোন চাকরি নেই। এক কলেজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে বলে আর এক কলেজ নিচ্ছে না হাত বাড়িয়ে। পরমা বলছে অন্য চাকরি দেখ, অন্য চাকরি মানে কেরানীগিরি। বোঝ আমার দুর্দশা। ছিলাম কোকিল, হতে চলেছি শালিক। ছিলাম কাব্যসাহিত্যের জগতে, এখন ঢুকছি কলমপেষার জাঁতাকলে। খেরোবাঁধানো খাতার ঘুরুলিতে। ছিলাম রাজা হলাম কিনা মিস্টার সিমসন!"

"তোমার বই কোথায়?"

"হ্রস্ব উ এসে হ্রস্ব ইকে গ্রাস করেছে। প্যাকিং বাক্সে আছে বন্ধ হয়ে। ওদের মুখের দিকে তাকাতেও সাহস হয় না।"

"আর মামলা?"

"মামলা ডিসমিসড ফর নন-প্রসিকিউশন।"

"তবে এখন উপায়?" শুধু নাটকীয় হবার জন্যেই বললে মহিলা।

"উপায় তুমি।"

"আমি?"

"তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমাকে বাঁচাতে পারে।"

"আমি? আমি কী করে বাঁচাব?" আগাপাশতলা তাকাতে লাগল মহিলা।

"তুমি যদি দয়া করে উমাশশী হও।"

"তার মানে? আমি ত উষসী।" মহিলা আবার তার হাতব্যাগে হাত রাখল।

"তুমি যে উষসী, উষসী গুহ, তা কে না জানে!" গৌরবের ভাব করল নলিনেশ: "তুমি ইনসিওরেন্সের এজেন্ট, তুমি ন্যাশনাল সেভিংস বেচ, তুমি গার্লগাইডের কর্ত্রী, তোমার অনেক প্রতাপ ও প্রতিপত্তি, এও সকলের জানা। তবু এও কারু অজানা নয় যে, একদিন তুমি অনায়াসে উমাশশী হতে পারতে। আর আমি, আমিই তোমাকে উষসী করে রেখেছি।"

"কিন্তু উমাশশী কে?" উষসী আকুল হয়ে উঠল।

"আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী।" হেসে উঠল নলিনেশ।

"তুমি কি পাগল হয়েছ?" চোখ বড় করে তাকাল উষসী।

"প্রেমিক হতে হলে পাগল হতে হয় মাঝে মাঝে।"

"কথাটা যদি স্পষ্ট করে বল—" উষসীর ভঙ্গি তখনও উচ্চকিত।

"বলেছি।" নলিনেশ আরও একটু অন্তরঙ্গ হয়ে বসল: "পরমাকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্যে বহুতর চেষ্টা করেছি। শেষ পর্যন্ত বলেছি, শুধু ওকে নয়, সমস্ত শহরময় রাষ্ট্র করে দিয়েছি, আমি বিবাহিত, আমার স্ত্রী আছে, জীবিত, শুধু-জীবিত নয়, জীবন্ত পূর্ণাঙ্গ এবং সচল—অর্থাৎ সোজা বাংলায় জ্যান্ত, আস্ত ও চালু স্ত্রী—তবুও—"

"তবুও?" উস্কে দিল উষসী।

"তবুও মেয়ে দমে না, মেয়ে কমে না। জেদ কেবল বাড়তেই থাকে—"

"তার মানে বিশ্বাসই করেনি যে, তুমি বিবাহিত।" উষসী জেরা করা উকিলের মত বললে, "যদি বিবাহিতই হবে তবে স্ত্রী কি কাছে থাকবে না, সংসার করবে না স্বামীর সঙ্গে?"

"তার একটা কারণ খাড়া করেছিলাম।" নলিনেশের মিথ্যার জন্যে এতটুকু অনুশোচনা নেই: "বলেছিলাম স্ত্রীর সঙ্গে আমার ঝগড়া, অবনতি, ... সে আলাদা হয়ে থাকে, তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, না দৈহিক না লৈখিক। যেমন কর্তব্য, ক'মাস মাসোয়ারা পাঠিয়েছিলাম, পরে তা সে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছে। সেই থেকেই সম্পূর্ণ ছাড়াছাড়ি—"

"একেবারে পুরোপুরি ছেদ করতে গেলে কেন?" শাসনের কটাক্ষ হানল উষসী: "আবদ্ধ অবস্থায় আছে, অসুস্থ অবস্থায় আছে, দু পাঁচ দশ মাস পরে আসবে, এমনি একটা রব তুললেই হত। তাহলেই ত ঘেঁষত না মেয়েটা।"

"উষসী, ঐটুকুই মায়া। একেবারে ঘেঁষবে না এও যে প্রাণে সয় না। ঘেঁষুক অথচ ভয় দেখুক এই চেয়েছিলাম। যদি ভয় দেখে নিজের থেকে লেজ গুটিয়ে নেয়। তা নিক। সর্বক্ষণ এই ভয় রেখেছিলাম বাঁচিয়ে যে, যে-কোন মুহূর্তে হাজির হতে পারে উমাশশী। স্ত্রীত্বের দাবি কোনদিন তামাদি হয় না, ছেঁড়া সুতোয় পাক দিয়ে আবার পাকাতে পারে গোলমাল। দেখ, ভেবে দেখ এসব ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে কিনা, শেষে যেন আমাকে দুষো না।" নলিনেশ চেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিল: "প্রলয়ঙ্করী মেয়ে, বললে, না, ভয় করি না। আসুক সে, আমার প্রেমের শক্তিতে তাকে আমি পরাভূত করব। যে স্বামী-ছাড়া হয়ে থাকে, স্বামীর সঙ্গে ঘর করে না, যে পরিত্যক্ত, তার আবার কিসের দাবি? একবার তেজ দেখ মেয়ের!"

"তার তেজের কারণ," উষসী শান্তমুখে বললে, "তুমি প্রথম স্ত্রী থাকতে তাকে বিয়ে করছ। যখন তাকে বিয়ে করছ তখন নিশ্চয়ই তার প্রতি আসক্তিই তোমার ষোল আনা, প্রথমার প্রতি এক আধলাও নয়। তার দোষ কী, সেই বিশ্বাসেই সে তেজস্বিনী।"

"হ্যাঁ, আমাকে বলেও ছিল সে-কথা।" নলিনেশ চেয়ারের এ-হাতল থেকে ও-হাতলে ভর বদলাল: "বলেছিল তুমি যখন আমাকে বিয়ে করছ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে স্পষ্ট দিনের আলোয়, তখন তার মানেই হচ্ছে উমাশশীর প্রতি তোমার মন নেই—মন উঠে গেছে—তাহলে আমার ভয় কিসের?"

যে দিক থেকেই নিজেকে দেখুন প্রধান কথা হল বর্ণ-মাধুর্য

মনোরম কান্তি লাভের উপায়গুলো খুবই সহজ।
মুখখানি একবার ধুয়ে,
সামান্য খানিকটা হিমানী স্নো মেখে
ফের তাকিয়ে দেখুন আয়নায়।
আপনার বর্ণ-কান্তির আশ্চর্য পরিবর্তন
দেখে অবাক হয়ে যাবেন।

স্নো
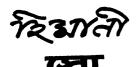
আপনার ত্বকের বর্ণাভা
জাগিয়ে তুলবে

**হিমানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-২**

"তুমি কী বললে?" প্রশ্নালু চোখে তাকাল উষসী।

"আমি বললাম, 'তবু বলা কি যায়, মানুষের মন হাওয়ায়-ওড়া খড়কুটোর মত, কখন কোন নিশ্বাসে কোন দিকে ভেসে যাবে কেউ জানে না।' ঝংকার দিয়ে উঠল মেয়ে, বললে, 'আমার মনের মাশুলে সে মন আমি ষোল আনা উশুল করে নিয়েছি, উমাশশীর সাধ্য কি তাতে ভাগ বসায়? উমাশশীর উমা বিসর্জনে আর শশী অস্তাচলে, অমাবস্যায়'!"

"এত?"

"এত উষসী, তুমি এখন একবার আমার সেই পরিত্যক্ত উমাশশী হও।" পস্টাপস্টি উষসীর হাত ধরল নলিনেশঃ "তুমি একবার তাকে পরীক্ষা কর, দেখ তার কেমন আন্তরিকতা! তার ভালবাসায় কেমন সে নির্বিচল। আর দেখ তোমাকে সে কী করে হটায়! তার স্পর্ধার শিলা কতদূর ওঠে।"

"তুমি আছ বেশ।" হাত ছাড়িয়ে নিল উষসীঃ "উমাশশী সাজতে গিয়ে আমি এখন অকারণে সিঁদুর পরি।"

"না, না, তার বন্দোবস্তও করে রেখেছি।" নলিনেশ আবার একটু হাত বাড়াল কিন্তু এবার উষসী সরল নাঃ "বলে রেখেছি, উমাশশী মাতাজীর আশ্রমে ব্রহ্মচারিণী হয়েছে, সন্ন্যাসিনীর আগের স্তর। সংসার-চিহ্ন সব মুছে ফেলেছে গা থেকে। তাই," হাসল নলিনেশ ঃ "তাই তোমাকে সিঁদুর পরতে হবে না, শুধু বাংলামতে আঁচলটা একটু খুলে-মেলে গায়ে জড়ালেই হবে। আর চুল? আলগা খোঁপাটা ভেঙে ফেলে ছড়িয়ে দিতে পারবে না পিঠময়! আর মাথার কাপড়টা নামাও। ব্রহ্মচারিণীরা চিরকন্যা।"

"সে মেয়ে আশ্রমবাসিনী ব্রহ্মচারিণী," তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল উষসীঃ "সে আবার ফিরে আসবে কেন?"

"মানুষের মন, বিশেষত মেয়েদের মন কখন কী কাণ্ড বাধায়, দেবতারাও জানে না। সে কথাটাও তাকে বলা আছে।"

"বলা থাক," দু হাত তুলে খোঁপাটা ঠিক করল উষসীঃ "ও সবের মধ্যে আমি নেই। আমি যা আমি তাই। আমি উষসী, আমি উমাশশী হতে যাব কেন?"

"উষসী আর উমাশশীর মধ্যে শুধু একটি 'মা'-এর তফাত। 'মা' বাদ দিলেই উমাশশী উষসী। তুমি মা নও, তোমাকে মা হতে কেউ বলছেও না, সুতরাং মা বাদ দিয়ে উমাশশী হতে তোমার বাধা কী। তুমিই খাঁটি আদি ও অকৃত্রিম।"

ভাল করে বিস্তৃত করে তাকাল একবার নলিনেশ। একদিন ফিরিয়ে দিয়েছিল বলে বারেবারেই ফেরত দিতে হবে এমন কথা ভারতে-ভাগবতে কোথাও লেখা নেই। মানুষ ত এক মন নিয়ে বাস করে না, যে মন ফেরায় সে মনই আবার হাত বাড়ায় দিনান্তরে। স্পর্শে যে মন জাগে না সে মন শূন্যতায় জাগে। বলে যাবার সময় শোনে না চলে যাবার সময় কাঁদে। সুতরাং যে উষসী একদিন বন্ধ দরজা ছিল সে এখন মুক্ত মাঠ হতে পারবে না কিংবা যে একদিন মুক্ত মাঠ ছিল সে এখন বন্ধ দরজা হতে পারবে না এমন কথা অবাস্তব।

বরং একটি প্রৌঢ়ত্বের উষ্ণ সহানুভূতি আছে ওর আঁচলের বাহুল্যে। ভারী বয়সের দৃঢ়তা, ভারী বয়সের গাঢ়তা। বুঝবে-শুনবে ভাল, রাখবে-ঢাকবে বেশী। পরিচয়ের মৃণাল জলের অনেক গভীর পর্যন্ত পাঠিয়ে দেবে। বন্ধুত্ব যদি হৃদ্য হতে হয় তবে বয়সে একটা সামীপ্য থাকা বিধেয়। আর বেশী দেরি নেই যখন ঝগড়ার সময় পরমা তাকে বুড়ো বলবে, পেকোচুলো বলবে, ক্রমে ক্রমে আরও কত কী গঞ্জনা। এবং কিছু নলিনেশ ফিরিয়ে দিতে পারবে না, কেননা তখনও পরমা নিটুট নিখুঁত নিভাঁজ। একটিও দাঁত পড়েনি, চোখে চালশে লাগে নি, মাথাভরা জমাট চুল তখনও ঘন কোঁকড়ানো কালো কুচকুচে। সামান্য ঝগড়াতেও সমান হবার মুখ পাবে না কোনদিন।

"কেন মেয়েটাকে কষ্ট দেবে?" বলল উষসী।

"আমাকে কম কষ্ট দিয়েছে এ পর্যন্ত?" তাপে-ক্ষোভে যেন দগ্ধ হচ্ছে নলিনেশ, "আমাকে ভেঙেচুরে দিয়েছে, উৎখাত করে আমাকে আমার শিকড় থেকে। তাম এ ত তার জানা কথা। আমি কিছু লুকোইনি, আমার হাতের সমস্ত ত খুলে ধরেছি। যখন সে জানল যে, আম স্ত্রী আছে আর যে-কোন মুহূর্তে সে এ তার দাবি তুলতে পারে তখন সে সেক শোনেনি কেন, কেন রেহাই দেয় আমাকে? আজ সেই সংঘর্ষের ল উপস্থিত, যে সংঘর্ষের জন্যে সব সময়ে প্রস্তুত। কতদিন ব্যঙ্গ করে বলেছে আমা কই তোমার উমাশশী কই? আজ তু এসেছ। তুমিই সেই উমাশশী।"

উষসী কটাক্ষ করল। আর সেই কটা দেখল, শ্যামল-শান্তের প্রকাশ যে নিস্ত বনস্পতিরূপে এতদিন দেখে এসে নলিনেশকে সে একটা সামান্য লতার আক নিশ্চেষ্ট-নিষ্প্রাণ! সমস্ত গ্রন্থিলে জটিলত শিথিল করতে না পারলে আর তার ম নেই।

দোষ কার? গাছের না লতার? গাছ ত দাঁড়িয়ে থাকে, লতাই এগিয়ে আসে। না কি গাছই হাতছানি দেয়?

ঐ, ঐ আসছে পরমা।

রাস্তায় দেখা গেল পরমাকে। রোদ থেকে বাঁচবার জন্যে মাথার কাপড়টা একটু বিস্তৃত করে মেলা ছাতার মত।

"যাও যাও শিগগির ভেতরে যাও।" গায়ের প্রায় ঠেলা মারল নলিনেশ: "উমাশশী সাজ। এদিক ওদিক ঘোর ফের, তোমার বাড়িঘর এমনি ভাব দেখাও।"

আশ্চর্য, উষসী কথা শুনল, তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল ভিতরে।

পরমা ঘরে ঢুকলে নলিনেশ জিজ্ঞেস করল, "কিছু হল সুবিধে?"

"গীতালিদি তার ছেলে নিয়েই মত্ত।" খুব রাগ-রাগ ভাব পরমার: "তারপর অক্লরও একজন আসছে সে নিয়ে অহংকার। বলে আমি বহু সন্তানে বিশ্বাসী। তারপর এমন বিশ্রী, আমাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি শাস্ত্রীয় না বৈজ্ঞানিক?"

"আসল কথা কী হল?" নলিনেশ গম্ভীর মুখে মনে করিয়ে দিল।

"চাকরির কথা? এত মশগুল যে, স্বামী নাকি বললেই ভুলে গেছে—"

"তখনই বললাম সটান বাসুদেববাবুর সঙ্গেই দেখা কর।"

"সে ত তুমি করলেই ভাল হয়, তা তুমি নড়বে না এক পা।"

"বুড়ো হয়ে যাচ্ছি যে—" চোখ নামাল নলিনেশ।

"যাচ্ছি কি গেছি। শুধু বুড়ো নয়, গঙ্গার পোলের ওপার—হাবড়া, বুড়ো-হাবড়া। বেশ, আমিই যাব। শুধু আমার জন্যে নয়, খোদ তোমারও জন্যে। একেবারে কেরানি না হয় আরেকটু উঁচু কোন পদের —এ কী," হঠাৎ থমকে গেল পরমা, টেবিলের উপর ফেলে রাখা লেডিজ ব্যাগ লক্ষ্য করে বললে, "এ-ব্যাগ কার?"

যেন যার ব্যাগ তার প্রতি কী গভীর মমতা এমনি ভাবের থেকে নলিনেশ বললে, "বুড়ির। বুড়ি এসেছে।"

মুখচোখ কুটিল হয়ে উঠল পরমার: "কে বুড়ি?"

মুখ এতটুকুও কালো বা গলা এতটুকুও খাটো না করে নলিনেশ বললে, "উমাশশী। উমাশশী এসেছে।" স্বরে কত বিরক্তি ও দুর্ভাবনা থাকবে, কত ক্রোধ ও প্রত্যাহার তা নয়, তার বদলে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য, যেন বা স্নিগ্ধ অভ্যর্থনা।

ভিতরে-ভিতরে কাঁপতে লাগল পরমা। জিজ্ঞেস করলে "এখানে কী করতে এসেছে?"

"কী করে বলি। জিজ্ঞেস করে দেখ না।" নিস্পৃহের মত বললে নলিনেশ।

"জিজ্ঞেস করে দেখব মানে?" সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল পরমা: "তুমি জিজ্ঞেস করনি?"

"সময় পেলাম কই? ঘরে ঢুকেই টেবিলের উপর ব্যাগটা রেখে ভিতরে ঢুকে গেল। শুধু বললে, আশ্রম ছেড়ে দিয়েছি।"

"তার মানে এখানে থাকবে?" রাগে পুড়তে লাগল পরমা।

"ভাবভঙ্গি দেখে ত তাই মনে হয়।"

"মনে হয়? তবে ওকে ঢুকতে দিলে কেন? কেন সরোজবাবুর মত মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলে না? সরোজবাবুর বেলায় ত সঙ্গে মা ছিল—"

সরোজবাবুর কথা শুনেছে নলিনেশ। যে শহরে তারা ছিল সেই শহরে সরোজ ছিল উঁচু খোপের সরকারী পায়রা। এক স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিল। দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে সুখনীড় করেছে, একদিন দুপুরবেলা প্রথমা স্ত্রী এসে হাজির, সঙ্গে প্রবল ছাড়পত্র হিসেবে শাশুড়ীকে অর্থাৎ সরোজের মাকে নিয়ে। রিকশা থেকে নামছে দেখে দরজা বন্ধ করে দিল সরোজ। সমস্ত শহর ভেঙে পড়ল তবু সরোজ দরজা খুলল না। কারুর সাধ্য নেই, আইনের পর্যন্ত নয় যে, তাকে দিয়ে দরজা খোলায়। রাস্তার উপর ঘণ্টা কয়েক বসে থেকে মা আর প্রথমা স্ত্রী ফিরে গেল ইস্টিশানে।

নলিনেশ বললে, "শুনেছি সরোজবাবুর দ্বিতীয় স্ত্রীই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তুমি বাড়িতে থাকলে না কেন? তাহলে তুমিই পারতে বন্ধ করতে।"

"আমি কি তোমার প্রাণেশ্বরীকে চিনি?"

"একজন আত্মীয় ভদ্রমহিলার বাড়িতে ঢোকবার মুখে কী করে যে দরজা বন্ধ করে দেওয়া যায় ভেবে পাই না।" তার পুরনো মাস্টারিমাখা মুখে নলিনেশ বললে, "সরোজ-বাবু যে দিয়েছিলেন, তিনি তার প্রথম স্ত্রীকে খারাপ বলে সন্দেহ করতেন, তাই। কিন্তু উমাশশী সম্বন্ধে তেমন কিছুই বলবার নেই। সে বরাবর আশ্রমে কাটিয়েছে।"

"আশ্রম দেবস্থান আর তোমার তিনি পুণ্যের প্রতিমূর্তি।" পরমা এ-ঘরে থাকবে না পাশের ঘরে যাবে স্থির করতে পারছে না।

"কেউ এলে পর তাকে ঠাণ্ডা হয়ে বলা যায় বা তর্ক করে বোঝান যায় যে, তোমার এখানে স্থান নেই বা দরকার হলে রূঢ়স্বরে বলাও যায়, চলে যাও বাড়ি ছেড়ে। আগে থেকেই তাকে ঠেকানো যায় কী করে? এখন যখন চলে এসেছে তখন তুমি তাকে বলে-কয়ে দাও না তাড়িয়ে।"

"তোমার বাড়ি তোমার প্রাণের আত্মীয়, আমি বলতে যাব কেন?" পরমা টেবিলের একটা ধার জোর করে চেপে ধরল: "তুমি বলবে।"

"আমি ত বললাম কিন্তু আমার কথা যদি না শোনে! তখন ত ঘাড় ধরে গায়ের জোরে বার করে দিতে পারব না!"

"কেন পারবে না? চোর-ডাকাত হলে কী করতে? যে অনধিকার প্রবেশ করেছে তার আবার কিসের ওজুহাত?"

"এখন কে অনধিকারী এ আবার মামলার কথা।" তিক্তবিরক্ত মুখ করল নলিনেশ: "এক মামলা গেছে আরেক মামলার রব তুল না।"

"তার মানে, তাকে রাখতে চাও ঘরে, থাকতে চাও তার সঙ্গে?" পরমার দুই চোখে আগুন হয়ে অশ্রু বেরল।

"এক আকাশে কি সূর্য-চন্দ্র থাকে না?"

"বেশ, তাই থাক।" বলে বিদ্যুৎবেগে পরমা পাশের ঘরে, শোবার ঘরে এসে ঢুকল। দেখল কে এক ভদ্রমহিলা ঘরের মধ্যে নড়া-চড়া করছে আর টুকটাক জিনিসপত্র ঘাঁটছে আলতো হাতে।

বুঝতে পেরেছে কে, তবু হুমকে উঠল পরমা: "কে, কে আপনি?"

মুখে মিষ্টি হেসে কণ্ঠে মধু ঢেলে উষসী বললে, "তোমার দিদি।"

ওসব আগ্রামী ঢঙে ভুলবে না পরমা। ঘাড় ঝাঁকি দেরে বললে কর্কশকণ্ঠে, "আমার দিদি-টিদি কেউ নেই।"

"দিদি না থাক নাই থাক, কিন্তু তুমি আমার ছোট বোন। বল, তাতেও আপত্তি?"

"তাতেও আপত্তি। কারু ছোটবোন-টোন আমি হতে পারব না, কখনও না।" দুই চোখ ছাপিয়ে জল এসে গেল পরমার। তবু যথাসাধ্য সামলে নিয়ে বললে, "কী চাই আপনার? কেন এসেছেন এখানে?"

"কেন এসেছি? বলব?"

"বলুন।"

"ভয় পাবে না ত?"

"ভয় পেতে-পেতে ভয় লয় হয়ে গিয়েছে।" কান্নায় প্রায় ভেঙে পড়ে পরমা।

"বলব? এই ভয়হীন সুন্দর মেয়েটাকে দেখতে এসেছি।" সত্যি, খানিকক্ষণ উষসী একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। মাঠগোঠের মেয়ে, মুক্ত দিগন্তের। দুই চোখে ভরা সদাজাগ্রত আনন্দের স্বপ্ন। কিন্তু এমন নিয়তি, এ মেয়েকেও চোখের জলে স্নান করতে হবে!

"আমাকে দেখছেন কি, ঐ কীর্তিমানকে দেখুন—"

"না, তুমিই দেখবার, তোমাকেই দেখছি। দেখছি সে কী আশ্চর্য শক্তি কী বিশুদ্ধ সুর যার বলে আর কেউ যা পারেনি তুমি তাই সম্ভব করলে।" উষসী এগিয়ে এসে হাত ধরল পরমার।

দাঁড়িয়ে নিয়ে পরমা বললে, "আর বেশি [illegible] না। আমি এখুনি চলে যাচ্ছি।"

"সে কী? চলে যাবে কেন?"

"হ্যাঁ, আপনি এসেছেন, আপনার আশ্রম এবার বিস্তার করুন সংসারে। আপনি থাকুন আমি যাই।" দরজার দিকে পা বাড়াল পরমা। ভদ্রমহিলা ভাল, কটুকণ্ঠে কলহ করতে হল না, বেশ শান্ত সমাপ্তিতেই ইতি টানা যাচ্ছে।

দরজা রোধ করে দাঁড়াল উর্বসী। বললে, "এত সহজেই হেরে গেলে?"

"গেলাম। বুঝতে পারছি আমার রহস্যের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। পরিহিত কাপড়ের মত আমি পরিচিত হয়ে গিয়েছি। আর পরাজয়ের তবে বাকি কী। আপনি থাকুন, রাজত্ব করুন। আমি পথ ধরি।" একবস্ত্রে বেরুতে চাইল পরমা।

দু হাত দিয়ে তাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরল উর্বসী। বললে, "আমাকে তুমি কেন ভুল করছ? আমি উমাশশী নই, উমাশশী বলে কেউ নেই পৃথিবীতে, আমি উর্বসী—উর্বসী গুহ। তুমি আমার সঙ্গে চল ও ঘরে।" টানতে-টানতে পাশের ঘরে নিয়ে এল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নলিনেশ! সরে গেল দরজার দিকে। বুঝল উর্বসীই হেরে গিয়েছে। এবং সেই সঙ্গে সে নিজে।

উর্বসী তার টেবিলে-থাকা ব্যাগ থেকে কার্ড বের করে দেখাল। বললে, "এই দেখ, আমি উমাশশী কি কোনও শশীই নই, আমি উর্বসী গুহ। আর এই দেখ, তোমার জন্যে কী এনেছি।" বলে মখমলের খাপ থেকে ছোট অথচ সুন্দর একটা নেকলেস বার করে ধরল। পরমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললে, "বল আমি তোমার দিদি নই?"

"দিদি হতে পারেন," এতক্ষণে চোখের মধ্যে তাকাতে পারল পরমা: "কিন্তু ভয় তাতে বাড়ল কই কমল না।"

"ও ভাবছে," ও পাশ থেকে নলিনেশ ফোড়ন দিল: "ও ভাবছে উমাশশী ও উর্বসীতে আসলে কোন তফাত নেই।"

"তফাত অনেক, তফাত প্রচণ্ড।" ব্যাগটা দ্রুত হাতে গুছিয়ে নিল উর্বসী। বললে, "তোমরা বস আমি যাই।"

"সে কি," পরমার দিকে তাকিয়ে তাড়া দিল নলিনেশ: "দিদিকে এক পেয়ালা চা খাওয়াবে না? কিংবা এক গ্লাস সরবত?"

"তোমার আত্মীয়, তুমি খাওয়াও।" পরমা রুখে উঠল।

"না তেষ্টা নেই শরীরে। কোন কিছুর দরকার নেই। আমি চলি।" চলে গেল উর্বসী।

"কী, যাওনা পিছু পিছু?" খেঁকিয়ে উঠল পরমা।

"কী দরকার। মনই যেতে পারে।"

গলার হারটা খুলে ফেলল পরমা, ভাবল জানলা দিয়ে ফেলে দিই ছুঁড়ে। পরে ভাবল, শত্রু হলেও সোনা, কখন কী কাজ দেয় ঠিক কি।

সন্ধের আগে স্বয়ং বাসুদেব এসে হাজির।

নলিনেশ ভাবল কোন কাজের খবর নিয়ে এসেছে বুঝি। পরমাও খুশি-খুশি। কিন্তু বাসুদেব যা এনেছে তা আনন্দের খবর নয়, আতঙ্কের খবর। বললে, "সুপ্রভাতকে ডাকুন।"

রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে গলা উঁচু করে নলিনেশ হাঁক পাড়ল। বললে, "নীচে আসুন, বাসুদেববাবু ডাকছেন।"

সুপ্রভাত নীচে আসতেই উপরে উঠে গেল পরমা। দেখল দীর্ঘদিন রোগভোগের পর অতিক্লেশে উঠে বসেছে সোহিনী। যেন পঙ্গপালের দল উড়ে গিয়েছে মাঠের উপর দিয়ে।

বললে, "ও তোর কী হয়েছে সোহিনী?"

কথা বলার লোক পেয়ে, সহজ ছন্দে নিশ্বাস ফেলবার পরিবেশ পেয়ে যেন বাঁচল সোহিনী। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল দরজার দিকে। পরমা ত বটেই, নির্ভুল পরমার কণ্ঠস্বর। কিন্তু সোহিনী এ কাকে দেখছে? যেন বাসাহারা অন্ধকারে পাখাঝাপটান পাখি। উঠে দাঁড়াল সোহিনী, "এ তোর কী হয়েছে পরমা?"

"কে জানে কি।" পরমা সোহিনীর হাত সোহিনী, "হয়ত তোর যা হয়েছে আমারও তাই।" তারপর একটু থেমে, হাত ধরে টান দিয়ে: "চল নীচে চল। বাসুদেববাবু ফিসফিস করে কী সব বলছেন ভয়ের কথা। চল শুনি গে।"

ভয়ের কথায় পাংশু একটু হাসির রেখা ফোটাল সোহিনী। ভাগ্যের নিষ্ঠুর চাতুরীর কাছে যারা বলি তাদের আবার ভয় কী।

"এ আরেকরকম ভয়।" অজানতে পরমার গলাও আচ্ছন্ন হয়ে এল, "আরেকরকম দুর্দিন।"

"চল দেখি গে।" যেন অনেক বাঁধন থেকে লঘু হল সোহিনী, খুশির একটু বা লহর তুলল শূন্যে। আরেক ভয়ে এ ভয় ডুবে যাক হারিয়ে যাক। আরেক দুর্দিনে মুছে যাক আজকের দুঃসময়।

সোহিনী-পরমা নীচে নেমে গেল।

গোল হয়ে বসে বাসুদেব নলিনেশ আর সুপ্রভাত কথা কইছে। বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই, আলাউদ্দিন, যে পুলিশের ডি-আই-জি, সে বাসুদেবের বন্ধু। সে খবর পাঠিয়েছে বাসুদেবকে, এই অঞ্চলে গোলমাল আসন্ন।

গোলমাল, কিসের গোলমাল?

যেমন কলকাতায় নানান এলাকায়, নানান পকেটে হচ্ছে ইদানীং। দাঙ্গাহাঙ্গামা লুটতরাজ। কাটাকাটি। রক্তারক্তি।

এখানে আমরা ত শান্ত, প্রতিরোধে সমস্ত সামর্থ্যের বহির্ভূত, এখানে আমাদের উপর হামলা করবে কেন?

ও সব যুক্তির কথা মামলার সওয়াল-জবাবের কথা ছাড়ুন। বিপদ আসছে তার প্রতিষেধে প্রস্তুত হোন। একটা বাড়ি তৈরির পক্ষে একটা গাছের অস্তিত্বই যথেষ্ট প্রতিরোধ যথেষ্ট প্রতিবন্ধক। গাছ বলতে পারে, আমি ত নিরীহ নির্বাক, আমাকে কাটবে কেন? আমাকে রেখে ওদিক থেকে ঘুরে গিয়ে বাড়ি করলেই হয়। বাড়ির কর্তা বললে, না, তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশ ঘেঁষেই আমার বাড়ি উঠবে। ও জায়গাটাই যে আমার মনেরমত। আর তোমার সান্নিধ্য আমার মতে অকল্যাণ। তোমাকে তাই না উচ্ছেদ করে আমার সুখ নেই স্থিতি নেই। অন্তত সুখস্থিতির ধারণা নেই। সুতরাং হট যাও, কাটা পড়।

এ গাঁজাখুরির কথা দুমাস আগে থেকে শুনেছি যেদিন আবদুল রসিদ ডে হল সেদিন থেকে। ওদের আন্দোলনও ত ইংরেজেরই বিরুদ্ধে। সেদিক থেকে আমরা ওরা এক নৌকোর সোয়ারি। এক নৌকোর সোয়ারি কখনও নাও ডোবায়?

তবু কাণ্ডারি হুঁশিয়ার হতে আপত্তি কি? দেখলে না সেদিন কেমন খোলা মশাল নিয়ে প্রকাণ্ড মিছিল করল, শেষকালে আগুন লাগাল কাঠের গোলায়। দেখলে না? কাঠের গোলা ইংরেজের?

লাগাক আগুন, ও সব বিচ্ছিন্ন ঘটনা, খুচরো গুণ্ডামি। ওতে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। তা ছাড়া ডি-আই-জি কেন কী উদ্দেশ্যে এ খবর পাঠিয়েছে, কী তার আসল মতলব কে জানে। 'প্যানিক' বা ভয়-খেকো হয়ে মনোবল হারানোর কোন মানে হয় না। এ-মত সুপ্রভাতের। তা ছাড়া আলাউদ্দিন নামে কোন লোক বন্ধু হতে পারে এ তার অবিশ্বাস্য।

তবু নলিনেশের মন খানিকটা যুক্তিঘেঁষা। বললে, মন্দ কি, সাবধানের বিনাশ নেই। হ্যাঁ, পাড়ার সকলকে জানান দিয়ে রাখা ভাল কথা। সম্পদে একলা বিপদে একত্র। অবিশ্যি, আমরা পিছন দিকে আছি, আমাদের দিকে দৃষ্টি তত সজাগ নাও হতে পারে। চোখ পড়বে বেশি সরখেল চন্দ চৌধুরীদের উপর। চলুন ভবতোষকে জানিয়ে আসি। সরখেল থাকলে সরখেলকেও।

আর চৌধুরীকে?

তার কী ভয়? তার ফটকে বাঁধা মস্ত কুকুর, কত তার দরোয়ান-চাকর, বন্দুক-ধারী কত সেপাই-পাইক, সে এ-সবে গ্রাহ্যও করে না। সে ত টিন দিয়ে তৈরি নয় ইস্পাত দিয়ে তৈরি, তার পিছনে রাজশক্তির প্রশ্রয় প্রসাদ। সে এ-সব ভয়ের কথা কানেও তুলবে না।

কানে তোলা উচিত নয়। সুপ্রভাত আবার ব্যক্ত করল অভিমত। দিব্যি লোক-জন গাড়িঘোড়া চলেছে রাস্তায়। হাসছে খেলছে কোলাহল করছে ছেলেরা। বারান্দায় মেয়েরা এসে দাঁড়াচ্ছে, ফিরিওলা-দের থেকে জিনিস কিনছে, সাজগোজ করে রাস্তায়ও বেরিয়েছে কেউ-কেউ। সিনেমার চলেছে। নিত্যদিনের সুস্থ চেহারা। ঐ ত গ্যাসওয়ালা মই নিয়ে বেরিয়েছে। আলোকে খচিত হয়ে উঠছে নগরী। কৃষ্ণপক্ষের প্রথম প্রহরের চাঁদ উঁকি দিয়েছে পুব দিগন্তের বেড়া ধরে।

বাসুদেব-নলিনেশ ঘুরুক বাড়ি-বাড়ি, সুপ্রভাত ওসব গুজবে বিশ্বাস করে না। মুখে মুখে গুজব কথাই আজব কথা হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু মনের গোপন গহনে পরমা-সোহিনী কামনা করতে লাগল আসুক কালো রাত, কালো ঝড় তুলে কালো সমুদ্রের ঢেউ। ভাসিয়ে নিয়ে যাক, তলিয়ে নিয়ে যাক, অতল পাতালে নিশ্চিহ্ন করে দিক।

শরীরে বড় ব্যাধি হলে ছোট আঘাতের যন্ত্রণা যেমন ভুলে যায় মানুষে, তেমনি সেই ভয়ের প্লাবনে দূর হয়ে যাক এসব ক্ষুদ্র সংশয় ছলনা, দুঃখ-গ্লানি, নীচতা-দীনতার অশান্তি। বিরোধ-বিচ্ছেদের ভয় নয়, প্রত্যক্ষ উদ্যত মৃত্যুভয়।

মুখস্থ মৃত্যু নয়, রক্তাক্ত মৃত্যু।

বুকের উপর লুব্ধ প্রেমিকের চুম্বন নয়, আততায়ীর নৃশংস অস্ত্রের তীক্ষ্ম স্পর্শ।

আট

সকাল থেকেই পাড়াটা কেমন যেন বুকচাপা রুগীর মত ছোট-ছোট নিশ্বাস ফেলছে। কেমন একটা জবুর জবুর ছ্যাঁক-ছেঁকে ভাব। এখানে-ওখানে মহল্লার মাতব্বরদের জটলা। গুজগুজ ফিসফিস ইতিউতি তাকান। যেন ঈদের চাঁদ দেখা গেল কিনা, খবর এল কিনা টেলিগ্রামে, তারই জন্যে উসখুস। যেন কোন উপর-ওয়ালার ফরমানের প্রতীক্ষা।

না, কিছু নয়, বৃষ্টি হয় না, অথচ একটুকরো ঘন কালো মেঘ করে আকাশের কোণে, তেমনি চেহারা। বাকী আকাশে দিব্যি ঝলক-দেওয়া রোদ।

কোর্টে গেল ভবতোষ। বন্দুকটা কোর্টের মালখানায় আছে। আর্দালিকে বললে নিয়ে যেতে। বলা যায় না আত্মরক্ষায় লাগতে পারে বন্দুক। একটা ফাঁকা আওয়াজেই হয়ত সমস্ত পরিষ্কার। "আর শোন," আরদালীকে বললে ভবতোষ, "তুমিও থেকে যেয়ো মিশির।"

"বহুত আচ্ছা।" বন্দুক হাতে পেয়ে মিশিরের বুকের ছাতি আরও ফুলে উঠল।

জয়া বললে, "আমি যাব না ইস্কুলে। কী সব গোলমাল লাগতে পারে। বাবা বারণ করে দিলেন।"

টুকটুকি বললে, "আমি যাব। আভাস বলেছে এগিয়ে দেবে ইস্কুল পর্যন্ত।" আভাস সিঁড়ির নীচেই ট্রাউজার্সে বেল্ট আঁটছে। তাকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠল টুকটুকি, "কী নেবে ত সঙ্গে করে?"

"নেব। নেব বলেই ত পোশাক পরলাম। চলে এস।" নীচে থেকে তাড়া দিল আভাস।

জয়ার ইচ্ছে হল সেও যায়। কেমন ভয়-ভয় করবে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে কেমন গা ছমছম করবে সারাক্ষণ, কী মজাই না হত আজ স্কুলে গেলে! আর আভাস সঙ্গে থাকলে কেউ তাদের জলের ছিটেটি পর্যন্ত দিতে পারবে না। সব গুণ্ডারাই ত আভাসের চেনা। কিন্তু একবার বারণ করে দিয়ে এখন আর যাব বলা যায় না। মন কেমন করতে লাগল জয়ার। দাঙ্গা হবে—তার চেয়েও এ যেন বেশী সন্তাপ।

"কী, ভয় নেই ত কিছু?" টুকটুকি আর-একবার মনে করিয়ে দিল।

"কিসের ভয়? আমাকে সব্বাই চেনে। আপনা-আপনি ভাবে।" অপাঙক্তেয়দের সঙ্গে একদিন অন্তরঙ্গ হয়ে মিশেছিল বলে গর্বের ভাব করল আভাস: "আমাকে চেনে না তারাও ফুল প্যান্ট দেখে ঘাবড়ে যাবে, ঠিক করতে পারবে না। এখনও ঘটনা ত কিছু ঘটেনি। ঘটলে পাজামা পরে নেব। লুঙ্গিও আছে খোপ-খোপ—"

"তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছ রক্ষী হয়ে এই ত যথেষ্ট ঘটনা।" অন্য অর্থে বললে টুকটুকি। মহীয়সীর মত বললে।

তাইতেই আভাস পরিপূর্ণ। বললে, "যতক্ষণ জানবে তুমি আমার লোক কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করবে না। হ্যাঁ, পাশাপাশি চল। পা মিলিয়ে। যাতে লোকের বুঝতে সন্দেহ না হয় তুমি আমার আপনার।"

ডাক্তার শিবসদয়ও ডিসপেনসারিতে গেল গলায় স্টেথিসকোপের মালা ঝুলিয়ে। বললে, আমাকে ছাড়া কারু ত্রাণ নেই। রামে মারলেও আমি রাবণে মারলেও আমি। আমি দল বেদলের বাইরে। আমিই বরের ঘরের মাসি কনের ঘরের পিসি।

সোহিনী বললে সুপ্রভাতকে, "কী, আফিসে যাবে নাকি?"

"বা, আফিসে যাব না কেন?" টাই বাঁধতে বললে সুপ্রভাত, "যত সব বাজে গুজব। এ অঞ্চলে কিচ্ছু হবে না, পারে না হতে।"

"আমারও সেই মত।" স্বামীর সঙ্গে সায় দিতে পেরে শান্তি পাচ্ছে সোহিনী। বললে, "তবু যদি পাও কারও গাড়িতেই ফিরো।"

"না, না, দিব্যি ট্রাম-বাস আছে, পরের গাড়ির ভরসা করতে যাব কেন?" পরে সোহিনীর দিকে এক পা এগিয়ে এসে বললে, "কী, তোমার ভয় করবে না ত?"

"না, নীচে পরমারা আছে, ভয় কী!

কী ভাল লাগছে স্বামীর সঙ্গে অন্য ভয়ের কথা কইতে।

"হ্যাঁ, ভয় কী! দরজা-জানলাগুলো বন্ধ করে রেখে দিও। কাউকে বুঝতে দিও না ভিতরে তুমি আছ।" তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে বললে সুপ্রভাত: "হ্যাঁ, তোমার কী ভয়, তুমি ত স্বাধীন, তুমি ত নিরাপদ—"

"কী, যাবে না টিউশানিতে?" পরমা জিজ্ঞেস করল নলিনেশকে।

"মাথা খারাপ! এমন একটি সোনার ওজুহাত পেয়ে কেউ কামাই না করে ছাড়ে?" আলস্যে বিস্তৃত হল নলিনেশ।

"চারদিকের চেহারা দেখে ভয়ের কিছু আছে বলে ত মনে হয় না।" স্বাভাবিক হতে পেরে যেন স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছে পরমা।

শুষ্কত্বক্
ব্রন
মেচেতা
ছুলী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য্য
Basant Malati
বসন্ত মালতী
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২
১, টাকারস্ লেন, ব্রডওয়ে, মাদ্রাজ—১
সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

"চারদিকের চেহারা দেখতে গিয়ে নিজের চেহারাখানা যেন দেখিও না বাইরে।" বললে নলিনেশ : "ভয়ের প্রত্যক্ষ এখনও কিছু নেই বটে, কিন্তু কেমন যেন একটা থমকানো ভাব। একটা ঝড় যেন খানিক-ক্ষণের জন্যে স্থগিত হয়ে আছে আকাশে। কেমন ভারী ভারী হাওয়া, লোকজনের মুখচোখে কেমন ঘোর-ঘোর। তা ছাড়া চিহ্নিত দিন ত কাল, শুক্রুরবার।"

"আচ্ছা যদি আমাদের বাড়ি আক্রমণ হয়?" পরমার গলা ফ্যাকাসে শোনাল।

"আমাদের বাড়ি আক্রমণ করবে কেন? নীচের তলায় গরিব এক মাস্টার, উপরের তলায় ফোতো এক সাহেব। আমাদের বাড়িতে কি সোনাদানা আছে, না নগদ টাকার কুড়? কোন কোন বাড়িতে যেতে হবে তা এদের লেখা আছে লিস্টিতে। তবে ঝড়তি-পড়তি কিছু ঢুকে পড়তে পারে, টাকাপয়সা বা জিনিসপত্রের লোভে নয়, সর্বভোগের সার যুবতী স্ত্রীর লোভে—"

"যদি সত্যি আসে?" পরমা নলিনেশের বাহু আঁকড়ে ধরল। অনেকদিন পর সজ্ঞানে স্পর্শ করল স্বামীকে।

যেন কিছু নয় যেন ডাল-ভাত এমনি করে বললে নলিনেশ, "যদি আসে লড়াই করব। আততায়ীর হাতে প্রাণ দেব। তোমার কী হবে জানি না, কিন্তু যাই হক, একবারটি অন্তত ভাবতে পারবে নলিনেশ নয়ই বুড়ো হক অকর্মণ্য হক, স্ত্রীর ধর্মরক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে।"

"না, অমন করে বল না।"

"করতে পারব কি না কে জানে, বলতে দোষ কী!" নিজের মনে হাসল নলিনেশ : "দাও, বাজারের থলেটা দাও, বাজারটা একবার ঘুরে আসি।"

"মীনাক্ষী!" পুত্রবধূকে ডাকলেন চৌধুরী। বললেন, "একবার প্রদোষকে ডেকে দাও।"

পাঞ্জাবি-পাজামা-চটিপরা ব্যারিস্টার ছেলে কাছে এসে দাঁড়াল।

"কেমন বুঝছ?" জিজ্ঞেস করলেন চৌধুরী।

"কাণ্ডকারখানা হয় ত কিছু হবে, কিন্তু আমাদের দিকে আসবে না।" দিব্যজ্ঞের মত বললে প্রদোষ।

"আমাদের দিকে আসবে না! যেহেতু আমরা ইংরেজের খাসবরদার! কিন্তু সেই ইংরেজ কি আছে?"

"কচ্ছপের মত কামড় দিয়ে আছে।"

"তাকে থাকা বলে না। কামড়টাই শুধু আছে, কচ্ছপ নেই। সুতরাং," গলা নামালেন চৌধুরী : "গুলিবন্দুক মজুত আছে?"

"আছে।"

"ছুঁড়তে পারবে?"

কান চুলকোল প্রদোষ। "পারব।"

"জুয়েলারি রেখেছ কোথায়?"

"বাক্স-আলমারি থেকে সরিয়েছি। কাঠের আলমারির পিছনে ছোট-ছোট কাঁটা পুঁতেছি। তাতে সার-সার রেখেছি ঝুলিয়ে। দেয়ালঘেঁষা আলমারি, কেউ সন্দেহ করতে পারবে না।" দেয়ালও যাতে শুনতে না পায় তেমনি করে বললে প্রদোষ।

"ভাল করেছ। ছাদে ইট-পাটকেল মজুত আছে?"

"আছে।"

"কিন্তু ছুঁড়বে কে?"

প্রদোষ আবার কান চুলকোল। "লোক-জনেরই অভাব বাবা।"

খোকনকে জল-ভর্তি টবে বসিয়ে স্নান করাচ্ছে গীতালি। খোকন নিজে যেমন স্নান করছে তেমনি জলের উপর প্রবল থাপ্পড় মেরে-মেরে মাকেও স্নান করাচ্ছে। দুই স্নানে তার ডবল আনন্দ।

গীতালি বললে, "গোলমাল বাধলে আলাউদ্দিন সাহেব জিপ পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন?"

"বলেছে ত।" বললে বাসুদেব।

"তা হলে আর ভাবনা কী!"

"তবে গোলমালে ঠিক সময়ে মনে থাকলে হয়।" বাসুদেবের কী একটু সন্দেহ হল?

"আগেই সন্দেহ কর কেন? আগে গোলমাল হক।" ছেলেকে বুকের উপর চেপে ধরে শাড়ির আঁচলে তার ভিজে গা মোছাতে-মোছাতে গীতালি বললে, "আমার ত মনে হয় তেমন বিশেষ কিছুই হবে না। ভয় যতক্ষণ না আসে ততক্ষণই ভয়। ভয়ের ভয়, ভূতের ভয়ই তাই আমাদের বেশী।"

বাসুদেব চিন্তিত মুখে কী ভাবতে লাগল।

"তুমি আফিসে যাবে ত?" ভাবনায় ছেদ ঘটাল গীতালি।

"বা, যাব বই কি।" তাড়া খেয়ে উঠে পড়ল বাসুদেব।

"আফিসের গাড়ি আনিয়ে নিলেই পারতে।"

"আজ ত অমনি যাই। কাল থেকে দেখা যাবে।"

রাত পোহালে কী না-জানি হয়, ভাবতে-ভাবতে সটান পায়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরল ভবতোষ। কার্জন পার্ক পেরিয়ে চৌরঙ্গী ধরে পার্ক স্ট্রীটের মধ্য দিয়ে যত [illegible] পারে লোকজনের [illegible] নিতে-নিতে। নগরজীবনের প্রাণস্পন্দের ছন্দ যদি মনে এই আশ্বাস আনে বারে বারে, যে কালও থাকবে এমনি স্বাভাবিক। ঘুরবে চাকা হাঁটবে মানুষ খুলবে দোকান বাজার। এক রাতেই রূপসী নগরী অরণ্যে মিলিয়ে যাবে না।

পথে যেতে ওয়েলেসলিতে ভূপেন ডাক্তারের চেম্বারে খানিক বসে গেল।

"কীরে, তোদের ওখানে ত হবে কাল।" নিজে মির্জাপুরের দিকে থাকে, প্রায় নিশ্চিন্ত এলেকায়, তাই নির্মমের মত পারল পরিহাস করতে।

"কিছু না—" সবলে নস্যাৎ করল ভবতোষ : "আমাদের এলেকা খুব ঠাণ্ডা, কোথাও কোন খিরকিচ নেই। আর যেখানে দু হাতের এক হাতই পঙ্গু সেখানে তালি বাজবে কী করে?"

মুখে বলে বটে কিন্তু মনের মধ্যে ভয় থাবা ওঁচায়। যতই এলেকার মধ্যে ঢোকে ততই গা-হাত-পা ভারী হতে থাকে।

"দাদা, দাদা—" রাত দশটার সময় কে ডাকছে বাইরে!

কেন কে জানে সরখেলরা অনেক আগেই সদর বন্ধ করে দিয়েছে, উপরের ঝুল-বারান্দা থেকে ভবতোষ দেখল, ফরিদ।

ঝড়ের মত তাড়াতাড়ি নেমে এল ভবতোষ। কী ব্যাপার? কিছু হবে-টবে?

"কিছু বলা যায় না।" ফুটপাথে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই বললে ফরিদ : "তবে জনতা যদি এবার বোঝে আমরাই রাজা আর আমাদের দমন করতে বা শাসন করতে কোনও রাষ্ট্র জেগে নেই তা হলে কিছু না হওয়াটাই বিচিত্র। তবে কিছু হক বা না হক, ভয় পাবেন না, বউদিকেও ঘাবড়াতে বারণ করবেন—আমি আছি।"

আমি আছি। এ যেন একা ফরিদের কথা নয়, আর-একজনের। ভবতোষ ফরিদের হাত চেপে ধরল। ফরিদ বললে : "যান, শুয়ে পড়ুন গে।"

ভোর হল। কাক-মুরগি ডাকল। পথে কাগজওয়ালা রুটিওয়ালা চাওয়ালা বেরুল। কোথায় কী! সব যে-কে-সে। ট্রাম বেরিয়েছে। কচি রোদ গাছের পাতায় ও রাস্তার পিচে সমান ঝিকমিক করে উঠেছে। কলে জল এসেছে। উনুনের ধোঁয়া উঠছে বাড়ি-বাড়ি।

সকাল আটটায় মিছিল বেরুলে। মাইলের পর মাইল, লোকের পর লোক। কী আশ্চর্য,

মেয়েরা পর্যন্ত আছে। লাবণ্য ও লালিত্যের [illegible] ধ্বনি আছে পতাকা আছে কিন্তু [illegible] গেল না, না বা ফেনিল প্রমত্ততা। বরং বেশ একটা স্ফূর্তির আবহাওয়া। শ্রী ও শৃঙ্খলার প্রতি অনুগত। শুনতে না হক ভালই লাগল দেখতে। এধারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে ভবতোষরা, ওধারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চৌধুরী-বাড়ি। এবং যা এতদিন হয়নি এতক্ষণ ধরে হয়নি, পরস্পর পরস্পরকে। চোখভরা বোবা বন্ধুতার দৃষ্টিতে।

সোহিনী বললে, "আজ ত আফিস কোর্ট ছুটি, মিছিল বেরুবার পর থেকে এ অঞ্চলে ট্রাম নেই, তুমি কেন বেরুচ্ছ?"

"ওরে বাবা, ভীষণ জরুরী একটা কাজ পড়ে আছে আফিসে, না গেলেই নয়। তা ছাড়া," সুপ্রভাত জানলা দিয়ে তাকাল দূরে মিছিলের দিকে: "না যাওয়ারই বা কারণ কী! ঘটনার মধ্যে শুধু ত একটা মিছিল। ট্রাম এ-অঞ্চলে না থাক্‌ অন্য অঞ্চলে পাব। তা ছাড়া পায়ে-হাঁটা লোককে আটকাবে কে? আটকাবেই বা কেন?" সুপ্রভাত বেরিয়ে গেল।

বেলা তিনটে পর্যন্ত চলল শোভাযাত্রা। আনন্দ কোলাহল। রঙ্গতরঙ্গিণী।

এই? শেষ পর্যন্ত স্ফূর্তির হাওয়াতেই উড়ে গেল ভয়ের মেঘ? ঝড়ের পত্র? মনে মনে হাসল ভবতোষ। মিশিরকে বললে ফিরে যেতে।

মিশিরও গিয়েছে, ডেকে উঠেছে কোটালের বান। দঙ্গলে-দঙ্গলে বেরিয়ে আসছে লোক হৈ-হৈ করতে-করতে। হাতে লাঠি বল্লম শাবল তরোয়াল। ওরা কারা? ওরা লুঠেল, লুঠ করতে বেরিয়েছে।

রাস্তার মোড়ে একটা রেডিওর দোকান লুঠ হয়ে গেল। একটা বাসনের দোকান। একটা মুদিখানা।

ছুরি চলল এদিক ওদিক।

মল্লিক বাজারে ঢুকে পড়েছে একদল, দরাজ-হাতে শুরু হয়েছে লুটতরাজ। দরকার-অদরকার যে যা পারছে নিচ্ছে ঝুড়িতে করে, ছালায় পুরে, ঠেলায় চাপিয়ে। লুঠেরাদের মধ্যে আবার পড়ে গিয়েছে কাড়াকাড়ি। তোরা আবার মারামারি করিস কেন? জিনিসের অভাব কী? এক বাজারে না কুলোয় আরও কত শত বাজার আছে কলকাতায়। খোদ লাল-বাজারই যখন আমাদের তখন সব বাজারেই আমরা লাল।

হ্যাঁ, লাল। বাজার না ছাড়ে আগুনে লাগিয়ে দে। নীচে রক্তের লাল, উপরে আগুনের লাল।

"মীনাক্ষী!" পুত্রবধূকে ডাকলেন চৌধুরী: "প্রদোষকে পাঠিয়ে দাও।"

প্রদোষ এলে চৌধুরী বললেন, "ফোন করে দিয়েছ?"

"দিয়েছি।" প্রদোষ বললে।

"কোথায়?"

"সর্বত্র।"

"সর্বত্র?" হাঁ করে রইলেন চৌধুরী। তাঁর নীচের ঠোঁটটা কাঁপতে লাগল: "কোথাও পেলে?"

"কোথাও না। কোথাও কোনও কনেকশান নেই।"

পুলিশ নেই ফৌজ নেই রাষ্ট্র নেই মন্ত্রী নেই। দয়া নেই ক্ষমা নেই বিচার নেই ভালবাসা নেই।

"তা হলে কী হবে?" চৌধুরীর মাথার সব কটি চুল যেন খাড়া হয়ে উঠল।

"সত্যি কী হবে?" ছুটতে ছুটতে নীচে নেমে এল সোহিনী: "উনি ত এখনও এলেন না। রাস্তায় ছুরি চলেছে, সব বলছে লোকেরা, কোথায় কী করে তাঁর তবে খোঁজ করব—"

নলিনেশ বললে, "স্ট্যাবিংএর খবর পেয়েছে তাই এ পথে আর পা বাড়ায়নি। ভালই করেছে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। এখন কে কোথায় খোঁজ করবে?"

"আমি যাব খোঁজ করতে!" ক্ষেত্র এগিয়ে এল।

বিষাক্ত চোখে তার দিকে তাকাল সোহিনী। চাকর-মুনিবে এ আবার নতুন কী ষড়যন্ত্র কে বলবে! নিজে ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ থেকে চাকরের হাতে চাবি রেখে দেওয়ার মতনই হীন কোন বোঝাপড়া হয়ত।

"এখনও ত ঠিক পাড়ার মধ্যে কোনও গোলমাল নেই, যা হচ্ছে দূরে-দূরে, এন্টালি-মৌলালির দিকে।" বললে ক্ষেত্র: "এ দিকটা ত এখনও বেশ নর্মাল—" দু-একটা ইংরিজী বলে ক্ষেত্র: "তা ছাড়া দক্ষিণ দিকে চলে যাব, সে দিকটা ত আমাদের কিসসু ভয় নেই। আমার মনে হচ্ছে—"

সকলে তাকাল ক্ষেত্রর দিকে।

"আমার মনে হচ্ছে বাবু ভয় পেয়ে সটান তাঁদের ভবানীপুরের বাড়িতেই চলে গেছেন। ছুটে গিয়ে একবার দেখে আসব?"

নলিনেশ হাসল। সোহিনীর দিকে তাকিয়ে বললে, "তার মানে ও পালিয়ে যেতে চাইছে। যে নিজের থেকেই পালাতে চায় তাকে আটকে রেখে লাভ নেই। তাকে যেতে দেওয়াই ভাল।"

ক্ষেত্র দক্ষিণ দিকে পা চালাল। খানিকটা এসে চারদিকে তাকিয়ে একটা বিড়ি ধরাল। গান ধরল গুনগুনিয়ে।

নলিনেশ জিজ্ঞেস করল, "আপনার ঠাকুরটা আছে?"

"না থাকার মধ্যে।" হাসবে না কাঁদবে ভেবে পাচ্ছে না সোহিনী: "দেয়ালের কোণে মিশে গিয়ে কাঁপছে ঠকঠক করে। মুখে বিড়বিড় করে কী বলছে অনবরত।"

"বোধ হয় জগন্নাথের নাম বলছে।"

"তুমি কোন্‌ নাথের নাম করবে [illegible] জানে!" কুঞ্চিত কুটিল চোখে নলিনেশকে বিদ্ধ করল পরমা।

আশ্চর্য, ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়ে গা ঢাকা দিতে পারল সুপ্রভাত! যেমন চাক তেমনই মুনিব। আলাদা বাসা নিয়ে থাক গোড়াগুড়ি থেকেই সুপ্রভাতের ইচ্ছে ছি না। আজ, এখন, একসঙ্গে সবাই থাকা কেমন নিশ্চিন্ত নির্ভয় হতে পারত। থা একা, স্বাধীন-উদ্দাম, যাতে নীলাদ্রির সা মিলতে পারে—এ কি তারই প্রতিবাদ, তা প্রতিশোধ?

না, ফিরতি পথের বিপদও ত অস্বীক করবার নয়। যদি সেই জন্যেই পিছু হ গিয়ে থাকে ত বিচক্ষণতারই পরি দিয়েছে। অত সহজ করেই বা ভাব কেন? যদি সুপ্রভাতের নিজেরই হ থাকে কোন কঠিন বিপদ? চোখে অন্ধক দেখল সোহিনী।

"রান্নাবান্না আজ হবে?" জিজ্ঞে করল নলিনেশ।

"আর রান্নাবান্না!" স্বাদহীন শু গলায় সোহিনী বললে।

"বা, আমি রাঁধছি। আমার এখ খাবি।" সংশয়বঙ্কিম চোখে পরমা আ বিদ্ধ করল নলিনেশকে: "যা হবার আমরা দুজনে একসঙ্গে।"

"আমরা দুজনে একসঙ্গে।" সিঁড়ি [illegible] ছুটতে ছুটতে উঠে এল হাসিনা।

এ কী ভয়ঙ্কর কথা! তুমি এখানে [illegible] করে! ঘরের দরজা খুলে ভবতোষ [illegible] নীলিমা বিবর্ণ হয়ে গেল।

"আব্বা দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁ দিয়ে গেলেন।" ঘরের মধ্যে চলে [illegible] উজ্জ্বল নির্মল মুখে বলতে লাগল হাসি "সদর খুলিয়ে পাঠিয়ে দিলেন উপ পাছে কেউ দেখে ফেলে চলে গে তাড়াতাড়ি।"

"এ কী, তোমাকে আমরা রাখব কোথা ব্লটিং কাগজের মত শোষা, সাদা গিয়েছে মুখ, বললে ভবতোষ।

"কেন, টুকটুকির পাশটিতে।" স্তব্ধীভূত টুকটুকির হাত ধরল হাসি "আব্বা বললেন, আমাদের বাড়ি যদি হত তাহলে আপনাদের সব্বাইকে আম

ওখানে নিয়ে যেতাম। বাড়ি ছোট বলেই একা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আপনাদের বিপদে আপনাদের পাশে গিয়ে যাতে দাঁড়াতে পারি—"

এত দয়া এত ক্ষমা এত বিচার এত ভালবাসাও ভাবা যায় সংসারে!

"কিন্তু তুমি আমাদের পাশে দাঁড়াবে কি!" এক ফুঁয়ে প্রদীপ নিবে গিয়েছে এমনি মুখে বললে নীলিমা, "তোমাকে নিয়ে আমাদের বিপদ ত বাড়বে। ওরা যখন বুঝবে তোমাকে আমরা এখানে এনে লুকিয়ে রেখেছি আটকে রেখেছি, তখন ওদের অত্যাচার আরও মর্মান্তিক হবে—"

"মোটেও না।" অগাধ সরল সজীব মুখে বললে হাসিনা, "যদি দাঙ্গাবাজরা বাড়িতে ঢোকে হামলা করে, আমি বলব—খবরদার, ওরা আমাদের লোক, ওদের ওপর চলবে না জুলুম, চলবে না জবরদস্তি। বলে কোরান-শরিফ তেলাওয়াত করব, পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ পড়ে দেব দরকার হলে—কিছু করতে পারবে না ওরা দেখবেন—"

"তুমি সমস্ত রাত থাকবে এ-বাড়ি?" কপালে চোখ তুলল নীলিমা।

"থাকব। থাকব টুকটুকির পাশে। সারারাত আমরা দুজনে খোদাকে ডাকব, খোদার রহম চাইব—" তারপর নীলিমার দিকে এগিয়ে এসে কানে-কানে বলার মত করে বললে, "আব্বা বলে দিলেন—গায়ে কেউ গয়না রাখবেন না। ওদের কেবল লুটের দিকে লক্ষ্য—"

টুকটুকি বললে, "হাসিনা, তুই কি স্বর্গের দেবী?"

"মোটেও না। আমি মাটির মানুষ। আমি তোর বন্ধু।"

ছাদের উপরে যে চিলেকোঠা তাতে ভবতোষের আছে একটা ডালাভাঙা কাঠের বাক্স। চাকর ভূষণকে সঙ্গে নিয়ে নীলিমা উপরে গেল সেই কাঠের বাক্সে হাবজা-গোবজা জিনিস পুরতে, যত রাজ্যের বাজে অখাদ্য জিনিস, ঘুঁটে গুল নারকোলের ছোবড়া, তারই তলায় লুকিয়ে রাখল গয়না-ভরা ন্যাকড়ার পুঁটুলি।

হাসিনা বললে, "আর আব্বা বলে দিলেন বন্দুক লাঠি যদি কিছু থাকে তা যেন লুকিয়ে ফেলা হয়। ইট-লোহা মজুত থাকলে যেন তা ছোঁড়া না হয় ডাকাতদের উপর—"

"সে আর বলতে।" ভবতোষ সায় দিল: "যদি হাজার-হাজার লোক আসে একটা বন্দুক-লাঠি কী করবে? বরং ওসব ব্যবহার করলে ফল হবে উল্টো। প্রাণে-মানে কাউকে বাঁচতে হবে না। সব বুঝি, মা, সব বুঝি। তুমি এসেছ তুমি আছ এই আমাদের নির্ভয়—ঈশ্বরকে কোনদিন ভাবিনি—আজ বসি এই আমাদের ঈশ্বরের আশীর্বাদ—"

নীচের তলার লোকেরা, মানে সরখেলের পরিবার উঠে এসেছে ছাদে। ডাক্তারের পরিবারও। শুধু করুণা দেবানন্দকে ছাড়েনি।

ছাদে ঘুরে ঘুরে সব তদারক করছে আভাস। চিলেকোঠার ছাদে উঠে শিক ধরে ধরে—একটা ধরে আর একটাতে পা রেখে কায়ক্লেশে চলে যাওয়া যাবে চৌধুরী-দের ছাদে। সন্দেহ কি, চৌধুরীদের বাড়ি বেশী মজবুত, বেশী সুরক্ষিত। কিন্তু পুরুষরা পারলেও মেয়েরা কি পারবে? অনেকটা উঁচু থেকে যেন লাফ দিতে হবে ও ছাদে। পারবে কি টুকটুকি!

ভবতোষ আর নীলিমাকেও ছাদে পাঠিয়ে দিল হাসিনা। বললে, "আমি আর টুক-টুকি থাকি ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে। আক্রমণ হলে আমরাও ছাদে যাব।" তারপর হাসল সেই ভুবনমোহন হাসি: "আগেই কৌতূহলের বাজারে আমার ভেলকির ঝাঁপি খুলে দিই কেন?"

যে যা পেরেছে খেয়ে নিয়েছে, বেশির-ভাগই উপবাস। টুকটুকি আর হাসিনা ভাগাভাগি করে কিছু বিস্কুট আর সন্দেশ খেয়েছে, তাই তাদের রাজভোগ।

সব ঘরে আলো নেভানো। রাস্তায় শুধু লাঠির ঠকঠক। ভারী পায়ের চলাফেরার শব্দ। আর মাঝে-মাঝে ঘোষণা: "এসব বাড়িও লুঠ করা হবে। এসব বাড়িও।"

ছাদ থেকে দেখা যায় কাছে-দূরে জ্বলছে আগুনের শিষ। তারও ঊর্ধ্বে জ্বলছে আকাশের চাঁদ, জ্বলছে তারার হীরের টুকরো। যেন রক্তাক্ত আকাশে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন।

তাহলেও যেন বড় বেশী অন্ধকার। আলো, দিনের আলো, সহজ-স্বভাবের স্পর্শ এসে চোখে লাগুক। এই অন্ধকারের অবসান হক।

সারারাতই শুধু লাঠি ঠকঠক। ভারী পায়ের শব্দ। আর থেকে থেকে হিংস্র গলার হুমকি।

ভোর হতেই ভোরের মত হাসল হাসিনা। বললে: "কালরাত্রি কেটে গেছে আর ভবে ভয় নেই। খোদার কুদরতের শান কে বলতে পারে! এবার আমি বাড়ি যাব জেঠিমা।"

"একা যাবে কী করে?"

"না, ঐ ত আব্বা আসছেন।" দূর থেকে দেখা গেল ফরিদকে।

ফরিদের হাতে মেয়েকে নির্বিঘ্নে সমর্পণ করতে পেরে শান্তি পেল ভবতোষ। কিন্তু দূরে-দাঁড়ানো জনতার দৃষ্টি এড়াতে পারল না। জনতা অনুসরণ করল ফরিদকে।

দেখল, ফরিদ তাদের লক্ষ্যের বিরুদ্ধ নয়, কিন্তু তাদের অভিযান ... স-কন্যা ও-বাড়িতে যাওয়া কেন এবং তা শাস্তার মূর্তিতে না হয়ে ত্রাতার মূর্তিতে, বন্ধুর মূর্তিতে কেন?

হাসিনা বললে, "ওরা যে আমাদের আপনার লোক।"

"ওরা কখনও আমাদের আপনার হয়?" গর্জে উঠল ভিড়ের থেকে।

"কখনও নয়, কখনও নয়।" একদল ভবতোষের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

হাসিনাকে বাড়িতে রেখে ফরিদ আবার এল ভবতোষের সাহায্যে। তখন জনতা জোয়ারের জলের মত ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। সাধ্য নেই সেই ঢেউ ভেদ করে ফরিদ। কতগুলি লোক তাকে ধরে ঠেলতে ঠেলতে হটিয়ে দিতে লাগল, ঠেলতে ঠেলতে একেবারে ট্রাম ডিপো পর্যন্ত। অত দরদ বা মুরোদ দেখাতে এস না। মারা পড়বে। এতিম মাজুর ঢের পাবে দুনিয়ায়।

জঙ্গীর দল বাঁশের ঘা মারছে সদরে।

"সব ছাদে যাও, সব ছাদে এস।" উপরে-নীচে সমানে গরজাতে লাগল ভবতোষ।

রাত্রির পর যে যার সংসারে ফিরেছিল, ভেবেছিল বিপদ বুঝি কেটে গিয়েছে, দিন এল মানে আরাম এল, হঠাৎ আবার এ কী ধূমকেতু! উপরে-নীচে শুরু হয়ে গেল ছুটোছুটি। চাপা কণ্ঠের ভয়ার্ত চীৎকার।

দরজায় বাঁশের উদ্ধত আস্ফালন।

করুণা স্বামীকে আঁকড়ে ধরল প্রাণপণে। যেন তার বিস্তৃত পক্ষ দিয়ে আবৃত করবে স্বামীকে। যেন স্বামীর এই নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যেই রয়েছে তার আশ্রয় তার অব্যাহতি।

শান্তস্বরে দেবানন্দ বললে, "ওঠ। তুমিও ছাদে যাও।"

"না-না, যাব না, যাব না তোমাকে ছেড়ে।"

"না ছেড়ে গেলে লাভ হবে কী! তোমাকে জোর করে ছাড়িয়ে নেবে। তাতে কি আমার রোগ সারবে? মাঝখান থেকে তোমাকে হারাব। যাও, ওঠ, দেরি কর না।"

"তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে।"

"এমন দয়া কি ওদের হবে?" দেবানন্দের দুই চোখ চকচক করে উঠল। বললে, "আমাকে মারুক না মারুক, তোমাকে দয়া করুক। তুমি বাঁচ। তুমি বাঁচ। যাও। পালাও।"

করুণাকে দেবানন্দ ঠেলে পাঠিয়ে দিল ছাদে।

সদর ভেঙে পড়ল।

নীলিমাকে ভবতোষ বললে, "আমি সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়াই। জনতার মুখোমুখি

হই। তুমি দোতলার দরজা বন্ধ করে দিয়ে ছাদে পালাও।"

ভবতোষ সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল। পিছনের দরজা বন্ধ করল।

"কে তোমাদের লীডার?" সাহসে ভর করে রুখে দাঁড়াল ভবতোষ।

"আমরা সবাই লীডার।" জনতা এক-বাক্যে শব্দিত হয়ে উঠল।

যাকে কাছে পেল তারই গলা জড়িয়ে ধরল ভবতোষ। বোকার মত শোনাচ্ছে তবু বললে, "কেন আমাদের আক্রমণ করছ? আমরা সরকারী কর্মচারী। তোমরাই ত সরকার, আমরা ত তাই তোমাদের লোক।"

"আমাদের লোক! দেখ্ ত লেটারবক্সে কী নাম লেখা?"

চন্দ। মার, মার ছুঁড়ে লেটারবক্স। দুর্বৃত্তদের একজন ভবতোষের দিকে লেটারবক্স ছুঁড়ে মারল। ভবতোষের কপাল কেটে রক্ত ঝরতে লাগল অঝোরে।

ভেঙে ফেলল দ্বিতীয় দরজা, দোতলার দরজা।

শুধু এ-বাড়ি নয়, আশে পাশে আরও বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে একসঙ্গে।

দিন বলে মনে হয় না, মনে হয় নিঝুম রাত। লোকালয় বলে মনে হয় না, মনে হয় জঙ্গল। মানুষ বলে মনে হয় না, মনে হয় দুঃস্বপ্নের ছায়ামূর্তি।

হালদারের বাড়িও চড়াও হয়েছে।

হালদারের বাড়ির সকলে ছেলেমেয়ে ছোট-বড়ো সবাই জড় হয়ে বসেছে গোল হয়ে। স্তব্ধ হয়ে মৃত্যুনাম জপ করছে। লেটারবক্সে নাম দেখ, কার বাড়ি। শুনতে পেল বাইরে থেকে গর্জন হচ্ছে জনতার। কে একজন পড়লে, হায়দর, এল হায়দর। আরে, এ ত আমাদের লোক। একে ছুঁসনে। চলে আয় বেতাকব।

একেবারে হুবহু, আলাউদ্দিনের জিপ এসে গিয়েছে। এখন, এই-ই ত বিপন্ময় মুহূর্ত, ঠিক সময়ে পৌঁছে গিয়েছে বন্ধু।

দরজা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে বাসুদেব আর তার আড়ালে গীতালি। আর তার আড়ালে কাকীমা।

একটি পলক ফেলবার পর্যন্ত সময় নেই, এখুনি, এই অবস্থায়, যেমনটি আছেন উঠে পড়ুন জিপে। মোড়ে ঠেঙাড়ের দল তৈরী। নক্ষত্রবেগে বেরিয়ে যেতে হবে।

জিপে আরও কজন মহিলা ও শিশু আছে। সব আলাউদ্দিনের ব্যক্তিগত বন্ধুতার সুতো দিয়ে বাঁধা।

চলে আসুন। শিগ্‌গির শিগ্‌গির।

"তুমি ওঠ।" গীতালিকে বললে বাসুদেব, "আমি খোকনকে নিয়ে আসছি উপর থেকে।" বাসুদেব ছুটল উপরে।

কাকীমাকে আগে তুলে গীতালিও উঠে বসল। কিন্তু খোকনকে নিয়ে বাসুদেবের নেমে আসতে কি একটু দেরি হচ্ছে? সাজ-গোজের কী দরকার? এমনি বুকে করে নেমে এলেই ত হয়!

আর এক বিন্দুও দেরি করবার সময় নেই ড্রাইভারের।

"খোকন, আমার খোকন—" চিৎকার করে উঠল গীতালি।

"পারি ত পরের ট্রিপে নিয়ে যাব।" ড্রাইভার বেরিয়ে গেল তীরের মত।

দাঙ্গাবাজদের সঙ্গে ভবতোষও দোতলায় নিজের ঘরে ঢুকে পড়েছে। ওরা খুঁজছে লুঠের মাল আর ও খুঁজছে টিঙচার আয়োডিন আর তুলো।

র‍্যাকেটের থেকে একটা ধুতি তুলে নিয়ে ফালা দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে ব্যাণ্ডেজ তৈরি করল ভবতোষ। কিন্তু মাথায় বেঁধে দেয় কে? ডাক্তার ত ছাদে শিক ধরে ডিঙবার চেষ্টা করছে। নিজের হাতে মাথার ব্যাণ্ডেজটা কিছুতেই ভবতোষ কায়দা করতে পারছে না, বারে বারেই ফসকে ফসকে যাচ্ছে।

লোঠেলদের থেকে কে একজন এগিয়ে এসে বললে, "দিন, আমি ঠিক করে দিচ্ছি।"

মুখটা চেনা-চেনা লাগছে।

"আমাকে চেনেন। আমি আপনার ডিম-ওলা।" হাত লাগিয়ে পরিপাটি করে বেঁধে দিল ব্যাণ্ডেজ।

"তুমি কী পেলে?" জিজ্ঞেস করল ভবতোষ।

"কিছুই পাইনি, যদি আপনার হাত-ঘড়িটা দেন—" ডিমের মতন চোখ মেলে তাকাল ডিমওলা।

ভবতোষ খুলে দিল হাতঘড়ি।

পালাচ্ছে, পালাচ্ছে, মেয়েরা পালাচ্ছে ছাদ দিয়ে, রাস্তার ওপার থেকে তুমুল শব্দ উঠল। ভবতোষ উঠতে চাইল ছাদে, তাকে বাধা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নীচে নামিয়ে দেওয়া হল। আপনি আবার দল বাড়াতে যাচ্ছেন কেন? আপনি আপনার আলাদা পথ দেখুন। মেয়েরা কোথায় পালাবে? চৌধুরী-বাড়ি ত? সেখানে যাচ্ছি আমরা এর পর।

"হ্যাঁ সেইখানে চল।" কে আর-একজন বললে, "মরা জিনিসের বোঝা আর টানতে পারি না। এবার একটু জ্যান্ত জিনিসের বোঝা চাই—"

ভবতোষ নীচে নেমে এল। বাড়ির পিছন দিকের দরজা দিয়ে চাইল বেরুতে। একটি অল্পবয়সের সুকুমার ছেলে দেখে তাকে কাছে ডাকল। বললে, "তুমি ত ছাত্র?"

"হ্যাঁ স্যার—"

"তবে আমাকে তুমি একটু সাহায্য করবে? কোন নিরাপদ বাড়িতে পৌঁ[ছে] দেবে দয়া করে?"

"আসুন স্যার—"

"তোমার হাতে এটা কী?"

একটু লজ্জিত হল ছেলেটি। বল[লে,] "একটা টাইপরাইটার।"

ভবতোষ লক্ষ্য করে দেখল তারই টা[ইপ]রাইটার। বললে, "ভালই হল ওটা পে[য়ে।] তুমি ছাত্র তোমার ওটা কাজে লাগবে।"

খিড়কির দরজা দিয়ে পিছনের গ[লিতে] এল ভবতোষ। এমন দৃশ্য দেখবে স্ব[প্নেও] তা ভাবেনি। চৌধুরীর যে লোহ[ার] নিষেধের তর্জনী হয়ে ছিল তা[ই] আহ্বানের সঙ্কেত হয়ে উঠেছে। সেই ধরে-ধরে পার হচ্ছে এ ছাদের লোক, ঐ ছাদে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল হাতে সব[াইকে] নিমন্ত্রণ করছে চৌধুরী। নিজে বাড়িয়ে বাড়িয়ে লুফে নিচ্ছে। [লাফিয়ে] গিয়ে যাতে চোট না পায় তার জন্যে ছ[াদের] উপর নিজ-হাতে বিছিয়ে দিচ্ছে [লেপ] তোষক। ওরে, আমার লোক বড় কম, [তোরা] সকলে আয় আমার কাছে, সকলকে [নিয়ে] আমি একত্র হই, এ বাড়িতেও হয়ত আসবে, তা আসুক, কিন্তু ওরা দেখু[ক] আমি একা নই, আমি সকলের সঙ্গে সম[ান]।

"এটা মনসুর ডাক্তারের বাড়ি। খুব [ভাল] লোক। দরজায় ঘা দিন।" ছাত্র ছে[লেটি] বললে।

দরজায় ঘা দিতে বেরুল মন[সুর]। নমস্কার করে বললে, "মাপ করুন। [আশ্রয়] দিতে গেলে আক্রান্ত হব।" দরজা [বন্ধ] করে দিল সজোরে।

চলুন পাশেই রহমান সাহেবের [বাড়ি]। তাঁর ওখানে অনেক দুঃস্থ পরিবার [আশ্রয়] নিয়েছে। আপনাকে উনি [ফেরাবেন] কী করে? উনি যে পুলিস অফিস[ার]।

"স্যার—" নলিনেশের দরজায় [ঘা] মারল।

"কে?"

"আমাকে আপনি চেনেন। শিগ[্‌গির] খুলুন দরজা।"

না খুললেই বা করবে কী, দরজাটা ফাঁক করল নলিনেশ। ফাঁক করতেই যুবক ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে বললে, "আমি মাহবুব। চিনতে পা[রছেন?] আমি আপনার ছাত্র।"

নলিনেশ আমতাআমতা করতে [লাগল।] হবে হয়ত। ছাত্রের মুখের দিকে [কি] তাকিয়েছি কোনদিন। কিন্তু কী [এমন] ব্যাপার সঙিন। এ বাড়ি আক্রান্ত [হবে] ঠিক হয়েছে।

"এ বাড়িতে আছে কী?"

"তর্ক করার বেশী কথা বলার সম[য় নেই] স্যার। এ বাড়িতে দুজন সুন্দরী

স্ত্রীলোক আছেন। তাই নজর পড়েছে গুণ্ডাদের। বউদিদিদের ডাকুন, আমার সঙ্গে দিয়ে দিন এখুনি। নিয়ে যাই ওদের। ভয়ঙ্কর জটলা শুনে এসেছি রাস্তায়।"

বউদিদিদের ডাকবার দরকার নেই, সোহিনী-পরমা নিজের থেকেই চলে এসেছে ঘরের মধ্যে।

"কী, যাবে এর সঙ্গে?" প্রশ্ন করল নলিনেশ।

"আমার সঙ্গে গেলেও যাবেন, ওদের সঙ্গে গেলেও যাবেন।" কীরকম একটা অদ্ভুত জোরের সঙ্গে বললে মাহবুব, "তবে আমার পক্ষে বলবার কথা, আমি ছাত্র। স্যারের আমাকে চেনবার কথা, যদিও ঠিক মনে করতে পারছেন না মনে হচ্ছে।" তারপর পরমার দিকে তাকিয়ে, "আপনি আমাকে কী করে চিনবেন? আমি আপনার আগে বেরিয়ে এসেছি। এখন আছি পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে—"

আমি ছাত্র—এর চেয়ে বিশুদ্ধতার পরিচয় আর হতে নেই।

"যাব।" বললে পরমা।

"আমিও।" সোহিনী পরমার হাত ধরল।

"তা হলে যত যা গয়না আছে পরে আসুন গা ভরে। আর একটা করে ভারী চাদর, পর্দাই হক আর সুজনিই হক, মোটা করে গায়ে জড়িয়ে নিন। আর টেনে লম্বা করে ঘোমটা দিন।"

উর্মিলার দেওয়া হারটাও ফেলে গেল না পরমা।

"আসুন—" মাহবুবের সঙ্গে চলে গেল পরমা, সঙ্গে গেল সোহিনী।

এখন নলিনেশ একা ঘরে কী করবে? কী আর করবে! গান গাইতে ত জানে না। কবিতা পড়বে।

আততায়ীর দল ঢুকে পড়েছে দেবানন্দের ঘরে।

"কী, তুমি বুঝি ডিঙতে পারনি?" ছুরি হাতে কে একজন জিজ্ঞেস করলে ঝুঁকে পড়ে।

"তুমি যদি দয়া করে দাও আমাকে পার করে। দেবে?"

"আমি?"

"হ্যাঁ, আমি চোখ বুজি আর তোমার ঐ অস্ত্রের স্পর্শটা আমূলে ডুবিয়ে দাও আমার বুকের মধ্যে, আর আমি মুহূর্তে শুধু এই বাড়ির ছাদ নয়, পৃথিবীর ছাদ ডিঙিয়ে চলে যাই—"

"আমার বয়ে গেছে। বাক্স প্যাঁটরা কী আছে তাই খুলে দেখাও—"

আর-এক দল ঢুকেছে বাসুদেবের বাড়ি। ঘর-দোর সব হাট করে খোলা। ভিতরে নেই কোন লোকজন, জিনিসপত্র যেমন-কে-তেমন সাজান-গোছান। ঘরের লোক কোন ফাঁকে সরে পড়েছে খিড়কি দিয়ে। কিন্তু এ কী, এ ছেলে কার?

একা-একা অনেক কেঁদেছে, অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে, এখন বুঝি ঘরের মেঝেতে বসে আপন মনে খেলছে খেলনা নিয়ে।

লোক দেখতে পেয়েই খোকন কেঁদে উঠল, হাত বাড়িয়ে দিল। বললে, "মা যাব।"

ছোরাটাকে বাগিয়ে ধরে ছেলেটাকে কোলে নিল লোকটা। আর-একজনের কোলে চালান করে দিয়ে বললে, "এই এটাকে থানায় জিম্মা করে দিয়ে আয়।"

"চল্, তোকে তোর মার কাছে নিয়ে যাই।" সেই আগন্তুকের কোলে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল খোকন।

আর-এক দল ঢুকেছে নলিনেশের বাড়ি।

সব আনাচ-কানাচ খোঁজাখুঁজির পর তারা বললে, "এ বাড়িতে যে দুজন আওরত ছিল তারা কোথায় গেল?"

"তাদের একজন এসে নিয়ে গেছে।"

"আমাদের কেউ?"

"জানি না, তবে নাম বললে মাহবুব।"

"বাস্, তা হলেই হল। তুমি তা হলে আছ কী করতে?"

একজন ছোরা উঁচিয়ে এল, বললে, "দেব নাকি সাবড়ে?"

"আমি ত সবচেয়ে দামী জিনিস সারেন্ডার করে দিয়েছি, কোন বাধা দিইনি, লড়াই করিনি, তবে আমাকে মারবে কেন?" কাতর মুখে বললে নলিনেশ।

"ছোড় দো। যাকে হক আমাদের একজনকেই যখন দিয়ে দিয়েছে তখন একে আর মেরে কাজ নেই। তবে," আগের কথার পুনরুক্তি করল: "তবে এই খালি ঘরে বসে আছ কেন?"

"তারা যদি কোনদিন ফিরে আসে তবে কোন্ মূর্তিতে ফিরে আসে তা দেখবার জন্যে।" নলিনেশ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

আসল হামলা চৌধুরীর বাড়ি।

কোথায় কি দুর্গের দুয়ার, লোহার ফটক সব কুণখণ্ড হয়ে গেল। সেই ধূর্ত কুকুরটা গেল কোথায়? ওটাকে আগে শেষ কর। ওটা কম জ্বালিয়েছে? যখনই রাস্তা দিয়ে গিয়েছি গলা লম্বা করে খেঁকিয়েছে, আমাদের মানুষ বলেই গ্রাহ্য করেনি।

নীচে কোথাও দেখা গেল না কুকুরটাকে। ক করে যাবে? সমস্ত বিপন্ন ভয়ার্তদের মত সেও আশ্রয় নিয়েছে ঠাকুরঘরে। এবং একেবারে চৌধুরীর কোলের মধ্যে। কী কৌশলে চৌধুরী তাকে শান্ত করে রেখেছেন। ও বুঝেছে [illegible] চেঁচালেই প্রভুর বিপদ। তাই বাধ্য শিশুর মত চুপ করে আছে।

প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন লোক ঢুকে পড়েছে, হাতে চিত্রবিচিত্র প্রহরণ। আর, একেই বলে লুঠ, বিশ্বের ভাঁড়ার যেন সঞ্চয় করে রেখেছেন চৌধুরী। কিন্তু এদের গয়নাগাটি কোথায়? সবই কি ব্যাঙ্কে? আটপৌরে গয়নার কিছু উদ্বৃত্ত কি তোলা থাকে না? সেসব কোথায়? সব বাক্স স্যুটকেস আলমারির দরজাই ত খোলা পাচ্ছি কিন্তু ওদের হৃৎপিণ্ড কোথায়? বিরক্ত হয়ে বাক্স-স্যুটকেস ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল, বিরক্ত হয়েই ধাক্কা মেরে মেঝেতে ফেলে দিল আলমারি। আলমারির পর আলমারি। ঝন ঝন ঝন ঝন। সে-শব্দ রক্তে তুফান তুলল চৌধুরীর। আর মন্দিরার। ইচ্ছে হল, গুলী-ভরা বন্দুকটা নিয়ে এসে দাঁড়াই সোজা হয়ে। সবচেয়ে আপসোস হল সামনের বস্তির গোয়ালাগুলো পালিয়ে গিয়েছে আগে আগে, তাদেরকে দূরে ঠেলে রেখেছেন চিরকাল, আপন করেননি। তারা যদি নিজেদের আপন বলে বুঝতে পারত, পালিয়ে না যেত, আর সবাই একজোট হতে পারতাম, দেখতাম এ দাঙ্গা কার, মানুষের না, পশুপালের!

এখন এ নিয়ে অনুতাপ করা বৃথা। কুকুর কোলে নিয়ে চুপ করে বসে থাক।

আহা, একেই বলে লুঠ, লুঠপাট, লুঠমার—একেই বলে লুটেপুটে খাওয়া। গয়না নিয়ে লুঠেরাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল,

হই। তুমি দোতলার দরজা বন্ধ করে দিয়ে ছাদে পালাও।"

ভবতোষ সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল। পিছনের দরজা বন্ধ করল নীলিমা।

"কে তোমাদের লীডার?" সাহসে ভর করে রুখে দাঁড়াল ভবতোষ।

"আমরা সবাই লীডার।" জনতা এক-বাক্যে শব্দিত হয়ে উঠল।

যাকে কাছে পেল তারই গলা জড়িয়ে ধরল ভবতোষ। বোকার মত শোনাচ্ছে তবু বললে, "কেন আমাদের আক্রমণ করছ? আমরা সরকারী কর্মচারী। তোমরাই ত সরকার, আমরা ত তাই তোমাদের লোক।"

"আমাদের লোক! দেখ ত লেটারবক্সে কী নাম লেখা?"

চন্দ। মার, মার ছুঁড়ে লেটারবক্স। দুর্বৃত্তদের একজন ভবতোষের দিকে লেটারবক্স ছুঁড়ে মারল। ভবতোষের কপাল কেটে রক্ত ঝরতে লাগল অঝোরে।

ভেঙে ফেলল দ্বিতীয় দরজা, দোতলার দরজা।

শুধু এ-বাড়ি নয়, আশে পাশে আরও বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে একসঙ্গে।

দিন বলে মনে হয় না, মনে হয় নিঝুম রাত। লোকালয় বলে মনে হয় না, মনে হয় জঙ্গল। মানুষ বলে মনে হয় না, মনে হয় দুঃস্বপ্নের ছায়ামূর্তি।

হালদারের বাড়িও চড়াও হয়েছে।

হালদারের বাড়ির সকলে ছেলেমেয়ে ছোট-বুড়ো সবাই জড় হয়ে বসেছে গোল হয়ে। স্তব্ধ হয়ে দুর্গানাম জপ করছে। লেটারবক্সে নাম দেখ, কার বাড়ি। শুনতে পেল বাইরে থেকে গর্জন হচ্ছে জনতার। কে একজন পড়লে, হায়দর, এল হায়দর। আরে, এ ত আমাদের লোক। একে ছুঁসনে। চলে আয় বেতাকর।

একেবারে হুবহু, আলাউদ্দিনের জিপ এসে গিয়েছে। এখন, এই-ই ত বিপন্নয় মুহূর্তে, ঠিক সময়ে পৌঁছে গিয়েছে বন্ধু।

দরজা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে বাসুদেব আর তার আড়ালে গীতালি। আর তার আড়ালে কাকীমা।

একটি পলক ফেলবার পর্যন্ত সময় নেই, এখুনি, এই অবস্থায়, যেমনটি আছেন উঠে পড়ুন জিপে। মোড়ে ঠেঙাড়ের দল তৈরী। নক্ষত্রবেগে বেরিয়ে যেতে হবে।

জিপে আরও ক'জন মহিলা ও শিশু আছে। সব আলাউদ্দিনের ব্যক্তিগত বন্ধুতার সুতো দিয়ে বাঁধা।

চলে আসুন। শিগগির শিগগির।

"তুমি ওঠ।" গীতালিকে বললে বাসুদেব, "আমি খোকনকে নিয়ে আসছি উপর থেকে।" বাসুদেব ছুটল উপরে।

কাকীমাকে আগে তুলে গীতালিও উঠে বসল। কিন্তু খোকনকে নিয়ে বাসুদেবের নেমে আসতে কি একটু দেরি হচ্ছে? সাজ-গোজের কী দরকার? এমনি বুকে করে নেমে এলেই ত হয়!

আর এক বিন্দুও দেরি করবার সময় নেই ড্রাইভারের।

"খোকন, আমার খোকন—" চিৎকার করে উঠল গীতালি।

"পারি ত পরের ট্রিপে নিয়ে যাব।" ড্রাইভার বেরিয়ে গেল তীরের মত।

দাঙ্গাবাজদের সঙ্গে ভবতোষও দোতলায় নিজের ঘরে ঢুকে পড়েছে। ওরা খুঁজছে লুঠের মাল আর ও খুঁজছে টিঙচার আয়োডিন আর তুলো।

র‍্যাকেটের থেকে একটা ধুতি তুলে নিয়ে ফালা দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে ব্যাণ্ডেজ তৈরি করল ভবতোষ। কিন্তু মাথায় বেঁধে দেয় কে? ডাক্তার ত ছাতে শিক ধরে ডিঙবার চেষ্টা করছে। নিজের হাতে মাথার ব্যাণ্ডেজটা কিছুতেই ভবতোষ কায়দা করতে পারছে না, বারে বারেই ফসকে ফসকে যাচ্ছে।

লেঠেলদের থেকে কে একজন এগিয়ে এসে বললে, "দিন, আমি ঠিক করে দিচ্ছি।"

মুখটা চেনা-চেনা লাগছে।

"আমাকে চেনেন। আমি আপনার ডিম-ওলা।" হাত লাগিয়ে পরিপাটি করে বেঁধে দিল ব্যাণ্ডেজ।

"তুমি কী পেলে?" জিজ্ঞেস করল ভবতোষ।

"কিছুই পাইনি, যদি আপনার হাত-ঘড়িটা দেন—" ডিমের মতন চোখ মেলে তাকাল ডিমওলা।

ভবতোষ খুলে দিল হাতঘড়ি।

পালাচ্ছে, পালাচ্ছে, মেয়েরা পালাচ্ছে ছাদ দিয়ে, রাস্তার ওপার থেকে তুমুল শব্দ উঠল। ভবতোষ উঠতে চাইল ছাদে, তাকে বাধা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নীচে নামিয়ে দেওয়া হল। আপনি আবার দলে বাড়াতে যাচ্ছেন কেন? আপনি আপনার আলাদা পথ দেখুন। মেয়েরা কোথায় পালাবে? চৌধুরী-বাড়ি ত? সেখানে যাচ্ছি আমরা এর পর।

"হ্যাঁ সেইখানে চল।" কে আর-একজন বললে, "মরা জিনিসের বোঝা আর টানতে পারি না। এবার একটু জ্যান্ত জিনিসের বোঝা চাই—"

ভবতোষ নীচে নেমে এল। বাড়ির পিছন দিকের দরজা দিয়ে চাইল বেরুতে। একটি অল্পবয়সের সুকুমার ছেলে দেখে তাকে কাছে ডাকল। বললে, "তুমি ত ছাত্র?"

"হ্যাঁ স্যার—"

"তবে আমাকে তুমি একটু সাহায্য করবে? কোন নিরাপদ বাড়িতে পৌঁছে দেবে দয়া করে?"

"আসুন স্যার—"

"তোমার হাতে এটা কী?"

একটু লজ্জিত হল ছেলেটি। বললে, "একটা টাইপরাইটার।"

ভবতোষ লক্ষ্য করে দেখল তারই টাইপ-রাইটার। বললে, "ভালই হল ওটা পেলে। তুমি ছাত্র তোমার ওটা কাজে লাগবে।"

খিড়কির দরজা দিয়ে পিছনের গলিতে এল ভবতোষ। এমন দৃশ্য দেখবে স্বপ্নেও তা ভাবেনি। চৌধুরীর যে লোহদণ্ড নিষেধের তর্জনী হয়ে ছিল তাই এখন আহ্বানের সংকেত হয়ে উঠেছে। সেই দণ্ড ধরে-ধরে পার হচ্ছে এ ছাদের লোক, আর ঐ ছাদে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল হাতে সবাইকে নিমন্ত্রণ করছে চৌধুরী। নিজে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে লুফে নিচ্ছে। লাফাতে গিয়ে যাতে চোট না পায় তার জন্যে ছাদের উপর নিজ-হাতে বিছিয়ে দিচ্ছে গদি-তোষক। ওরে, আমার লোক বড় কম, তোরা সকলে আয় আমার কাছে, সকলকে নিয়ে আমি একত্র হই, এ বাড়িতেও হয়ত ওরা আসবে, তা আসুক, কিন্তু ওরা দেখে যাক আমি একা নই, আমি সকলের সঙ্গে সমবেত।

"এটা মনসুর ডাক্তারের বাড়ি। খুব ভাল লোক। দরজায় ঘা দিন।" ছাত্র ছেলেটি বললে।

দরজায় ঘা দিতে বেরুল মনসুর, নমস্কার করে বললে, "মাপ করুন। আশ্রয় দিতে গেলে আক্রান্ত হব।" দরজা বন্ধ করে দিল সজোরে।

চলুন পাশেই রহমান সাহেবের বাড়ি তাঁর ওখানে অনেক দুঃস্থ পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। আপনাকে উনি ফেলবে কী করে? উনি যে পুলিস অফিসার।

"স্যার—" নলিনেশের দরজায় কে টোকা মারল।

"কে?"

"আমাকে আপনি চেনেন। শিগগির খুলুন দরজা।"

না খুললেই বা করবে কী, দরজাটা একটু ফাঁক করল নলিনেশ। ফাঁক করতেই এক যুবক ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বললে, "আমি মাহবুব। চিনতে পারছেন? আমি আপনার ছাত্র।"

নলিনেশ আমতাআমতা করতে লাগল। হবে হয়ত। ছাত্রের মুখের দিকে কি তাকিয়েছি কোনদিন। কিন্তু কী ব্যাপার?

ব্যাপার সাঙ্ঘাতিক। এ বাড়ি আক্রান্ত হবে ঠিক হয়েছে।

"এ বাড়িতে আছে কী?"

"তর্ক করার বেশী কথা বলার সময় নেই স্যার। এ বাড়িতে দুজন সুন্দরী যুবতী

স্ত্রীলোক আছেন। তাই নজর পড়েছে গুণ্ডাদের। বউদিদিদের ডাকুন, আমার সঙ্গে দিয়ে দিন এখুনি। নিয়ে যাই ওদের। ভয়ংকর জটলা শুনে এসেছি রাস্তায়।"

বউদিদিদের ডাকবার দরকার নেই, মোহিনী-পরমা নিজের থেকেই চলে এসেছে ঘরের মধ্যে।

"কী, যাবে এর সঙ্গে?" প্রশ্ন করল নলিনেশ।

"আমার সঙ্গে গেলেও যাবেন, ওদের সঙ্গে গেলেও যাবেন।" কীরকম একটা অদ্ভুত জোরের সঙ্গে বললে মাহবুব, "তবে আমার পক্ষে বলবার কথা, আমি ছাত্র। স্যারের আমাকে চেনবার কথা, যদিও ঠিক মনে করতে পারছেন না মনে হচ্ছে।" তারপর পরমার দিকে তাকিয়ে, "আপনি আমাকে কী করে চিনবেন? আমি আপনার আগে বেরিয়ে এসেছি। এখন আছি পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে—"

আমি ছাত্র—এর চেয়ে বিশুদ্ধতার পরিচয় যেন হতে নেই।

"যাব।" বললে পরমা।

"আমিও।" মোহিনী পরমার হাত ধরল।

"তা হলে যত যা গয়না আছে পরে ফেলুন গা ভরে। আর একটা করে ভারী চাদর, পর্দাই হক আর সুজনিই হক, মোটা করে গায়ে জড়িয়ে নিন। আর টেনে লম্বা করে ঘোমটা দিন।"

উর্বশীর দেওয়া হারটাও ফেলে গেল না পরমা।

"আসুন—" মাহবুবের সঙ্গে চলে গেল পরমা, চলে গেল মোহিনী।

এখন নলিনেশ একা ঘরে কী করবে? কী আর করবে! গান গাইতে ত জানে না। কবিতা পড়বে।

আততায়ীর দল ঢুকে পড়েছে দেবানন্দের ঘরে।

"কী, তুমি বুঝি উড়তে পারনি?" ছুরি হাতে কে একজন জিজ্ঞেস করলে ঝুঁকে পড়ে।

"তুমি যদি দয়া করে দাও আমাকে পার করে। দেবে?"

"আমি?"

"হ্যাঁ, আমি চোখ বুজি আর তোমার ঐ অস্ত্রের স্পর্শটা আমূলে ডুবিয়ে দাও আমার বুকের মধ্যে, আর আমি মুহূর্তে শুধু এই বাড়ির ছাদ নয়, পৃথিবীর ছাদ ডিঙিয়ে চলে যাই—"

"আমার বয়ে গেছে। বাক্স প্যাঁটরা কী আছে তাই খুলে দেখাও—"

আর-এক দল ঢুকেছে বাসুদেবের বাড়ি। ঘর-দোর সব হাট করে খোলা। ভিতরে নেই কোন লোকজন, জিনিসপত্র যেমন-কে-তেমন সাজান-গোছান। ঘরের লোক কোন ফাঁকে সরে পড়েছে খিড়কি দিয়ে। কিন্তু এ কী, এ ছেলে কার?

একা-একা অনেক কেঁদেছে, অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে, এখন বুঝি ঘরের মেঝেতে বসে আপন মনে খেলছেই খেলনা নিয়ে।

লোক দেখতে পেয়েই খোকন কেঁদে উঠল, হাত বাড়িয়ে দিল। বললে, "মা যাব।"

ছোরাটাকে বাগিয়ে ধরে ছেলেটাকে কোলে নিল লোকটা। আর-একজনের কোলে চালান করে দিয়ে বললে, "এই এটাকে থানায় জিম্মা করে দিয়ে আয়।"

"চল্, তোকে তোর মার কাছে নিয়ে যাই।" সেই আগন্তুকের কোলে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল খোকন।

আর-এক দল ঢুকেছে নলিনেশের বাড়ি। সব আনাচ-কানাচ খোঁজাখুঁজির পর তারা বললে, "এ বাড়িতে যে দুজন আওরত ছিল তারা কোথায় গেল?"

"তাদের একজন এসে নিয়ে গেছে।"

"আমাদের কেউ?"

"জানি না, তবে নাম বললে মাহবুব।"

"বাস্, তা হলেই হল। তুমি তা হলে আছ কী করতে?"

একজন ছোরা উঁচিয়ে এল, বললে, "দেব নাকি সাবড়ে?"

"আমি ত সবচেয়ে দামী জিনিস সারেন্-ডার করে দিয়েছি, কোন বাধা দিইনি, লড়াই করিনি, তবে আমাকে মারবে কেন?" কাতর মুখে বললে নলিনেশ।

"ছোড় দো। যাকে হক আমাদের একজনকেই যখন দিয়ে দিয়েছে তখন একে আর মেরে কাজ নেই। তবে," আগের কথার পুনরুক্তি করল: "তবে এই খালি ঘরে বসে আছ কেন?"

"তারা যদি কোনদিন ফিরে আসে তবে কোন্ মূর্তিতে ফিরে আসে তা দেখবার জন্যে।" নলিনেশ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

আসল হামলা চৌধুরীর বাড়ি।

কোথায় কি দুর্গের দৃঢ়তা, লোহার ফটক সব তৃণখণ্ড হয়ে গেল। সেই ধূর্ত কুকুরটা গেল কোথায়? ওটাকে আগে শেষ কর। ওটা কম জ্বালিয়েছে? যখনই রাস্তা দিয়ে গিয়েছি গলা লম্বা করে খেঁকিয়েছে। আমাদের মানুষ বলেই গ্রাহ্য করেনি।

নীচে কোথাও দেখা গেল না কুকুরটাকে। কী করে যাবে? সমস্ত বিপন্ন ভয়ার্তদের মত সেও আশ্রয় নিয়েছে ঠাকুরঘরে। এবং একেবারে চৌধুরীর কোলের মধ্যে। কী কৌশলে চৌধুরী তাকে শান্ত করে রেখে-ছেন। ও বুঝেছে এখন, "চেঁচালেই প্রভুর বিপদ। তাই বাধ্য মিস্ত্রির মত চুপ করে আছে।

প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন লোক ঢুকে পড়েছে, হাতে চিত্রবিচিত্র প্রহরণ। আর, একেই বলে লুঠ, বিশ্বের ভাণ্ডার যেন সঞ্চয় করে রেখেছেন চৌধুরী। কিন্তু এদের গয়নাগাঁটি কোথায়? সবই কি ব্যাঙ্কে? আটপৌরে গয়নার কিছু উদ্বৃত্ত কি তোলা থাকে না? সেসব কোথায়? সব বাক্স সুটকেস আল-মারির দরজাই ত খোলা পাচ্ছি কিন্তু ওদের হৃৎপিণ্ড কোথায়? বিরক্ত হয়ে বাক্স-সুটকেস ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল, বিরক্ত হয়েই ধাক্কা মেরে মেঝেতে ফেলে দিল আলমারি। আলমারির পর আলমারি। ঝন ঝন ঝন ঝন। সে-শব্দ রক্তে তুফান তুলল চৌধুরীর। আর মন্দিরার। ইচ্ছে হল, গুলী-ভরা বন্দুকটা নিয়ে এসে দাঁড়াই সোজা হয়ে। সবচেয়ে আপসোস হল মানুষের বস্তির গোয়ালাগুলো পালিয়ে গিয়েছে আগে আগে, তাদেরকে দূরে ঠেলে রেখেছেন চিরকাল, আপন করেননি। তারা যদি নিজেদের আপন বলে বুঝতে পারত, পালিয়ে না যেত, আর সবাই একজোট হতে পারতাম, দেখতাম এ দাঙ্গা কার, মানুষের না, পশুপালের!

এখন এ নিয়ে অনুতাপ করা বৃথা। কুকুর কোলে নিয়ে চুপ করে বসে থাক।

আহা, একেই বলে লুঠ, লুঠপাট, লুঠমার—একেই বলে লুটেপুটে খাওয়া। গয়না নিয়ে লুঠেরাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল,

[illegible] ছাড়, গয়না কি কমতি পড়েছে? উপরে [illegible] ভারী গয়না, জ্যান্ত গয়না।

ঠাকুরঘরের দরজায় প্রবল আঘাত মারতে লাগল।

মন্দিরা দরজা খুলে দিলেন। বললেন, "যা চাইবে তাই দেব, শুধু মেয়েদের গায়ে হাত দেবে না।"

"বেশ, তাই।" রাজী হল লড়ায়ের দল: "তবে বেটাছেলেদের আমাদের হাতে দিয়ে দিন।"

তার মানে কী? বেটাছেলেদের কাটবে একেক করে, নীচে নিয়ে গিয়ে?

উপায় নেই, সর্ত করেছেন। নইলে মেয়েদের দিয়ে দিন।

না, ছেলেরাই বলি হবে। সব কিছুর চেয়ে মেয়েদের মান বড়। একে-একে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ছেলেদের, নীলিমা চেঁচিয়ে উঠল: "ভূষণ ভূষণ কোথায় গেল?"

সব ফেলে চাকরের জন্যে কান্না!

ডাক্তার বললে, "সে আবার ছাদ ডিঙিয়ে চলে গেছে বাড়ির ছাদে।"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল নীলিমা। যাক, বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। বেঁচে গিয়েছে এ যাত্রা।

পুরুষ সবাই নেমে গেল কিন্তু কাপড়-চোপড়ের তলায় প্যাণ্ট-পরা ওটা কার পা নড়ছে? পাশে বসে জয়া প্রাণপণে তাকে ঢাকাচুকি দেবার চেষ্টা করছে, নিজের কাছে টেনেটুনে এনে আড়াল করতে চাইছে, কিন্তু বারেবারেই এঁকেবেঁকে বেরিয়ে আসছে পা। ও কে? ও এখানে কেন?

"ও আমার ছেলে, আভাস।" বললেন সরখেলের স্ত্রী: "ছাদ থেকে লাফিয়ে নামতে বাঁ পায়ের গোড়ালির হাড় ভেঙে ফেলেছে। এখন উঠতে পাচ্ছে না। দাঁড়াতে পাচ্ছে না—"

সেই ফুল তুলতে গিয়ে আরও কত উঁচু দেয়াল থেকে লাফিয়েছিলাম, কিচ্ছু হয়নি—আর আজ কিনা এই সামান্যটুকু লাফাতে গিয়ে পায়ের হাড় টুকরো টুকরো হয়ে গেল—

"ওসব বুঝি না, পুরুষ এখানে কেন?" আততায়ী ঝকঝকে ছোরা তুলল আভাসকে লক্ষ্য করে।

মুহূর্তে কী হয়ে গেল কে বলবে? টুকটুকি হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই আততায়ীর হাত চেপে ধরল। বললে, "ও আমার লোক—"

কী বা গায়ের জোর টুকটুকির, ঐ ত পাতলা ছিপছিপে হিলহিলে মেয়ে, কিন্তু যেন জাদুমন্ত্রের ঘোর লাগল। আততায়ী ফিরিয়ে নিল ছোরা, টুকটুকির দিকে সলজ্জ চোখে তাকিয়ে বললে, "ঠিক আছে, থাক্ ও আপনাদের সঙ্গে। কিন্তু রাস্তায় ঐ একটা মিলিটারি লরি দাঁড়িয়ে আছে না? দাঁড়ান দেখে আসি—"

আশ্চর্য, ঐ লোকটার সঙ্গে-সঙ্গে কী ইঙ্গিতে নেমে গেল তার দলবল।

যে দু-একজন নামল না তারা ছোরা তুলে রইল সিঁড়ির মুখে কেউ যেন না এদিকে উঁকি মারতে আসে।

রহমানের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভবতোষ মিলিটারি লরি দেখতে পেল। রহমানকে গিয়ে বললে, "ঐ লরিকে ডাকান।"

"তার আগে একটা ট্যাবলেট খেয়ে ফেলুন। মাথার ঘাটা না বিগড়োয়।"

রহমান ওষুধ দিল।

"ওষুধ পরে হবে। আগে ডাকান লরি।"

"কাকে পাঠাব?"

"কাকে পাঠাবেন মানে? আপনি নিজে যান। ইউনিফর্ম পরুন।" ভবতোষ জোর গলায় বললে, "আপনার কর্তব্য আপনাকে ডাকছে। উঠুন।"

রহমান ইউনিফর্ম পরল। কিন্তু তার ছেলেরা বাপকে ছেড়ে দিতে নারাজ। বললে, "লরি এমনি এসে তুলে নিয়ে যায় নিক। কিন্তু এ বাড়িতে আশ্রিত আছে আর তাদের উদ্ধারের জন্যে বাবা নিজে তৎপর হয়ে লরি ডেকে এনেছেন দোরগোড়ায়, এ জানাজানি হলে বাবা খুন হয়ে যাবেন।"

"আপনি ট্যাবলেট কটা খান, একটু বিশ্রাম করুন—দেখি আরও কতক্ষণ লাগে—" বললে রহমান।

সেই আততায়ী ফিরে এল মেয়েদের কাছে। বললে, "চলুন, লরিতে তুলে দিচ্ছি—"

মন্দিরা চেঁচিয়ে উঠলেন, "আর ছেলেরা, ছেলেরা কোথায় গেল? মিস্টার চৌধুরীর কুকুর?"

আততায়ী হাসল: "সব নীচে আছে। যদি একজনের লোক বাঁচে সবাইকার বাঁচবে।"

কিন্তু আভাসকে কী করে নামান হবে?

"আমরা কাঁধে করে নামাব।" বলল আততায়ী ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা।

আততায়ী আভাসকে কাঁধে ফেলল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তার কানে কানে বললে, "কাঁধে [illegible] তোকেই মারতে ছোরা তুলেছিলাম।"

আশেপাশের ফিরিঙ্গী পরিবারের লোক-গুলো বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে, হাসাহাসি করছে। [illegible] দেখেও তাদের হাসাহাসি। ভয়বিহ্বল মানুষের অসহায় আর্তনাদ শুনেও।

মিলিটারি লরির ড্রাইভারও ফিরিঙ্গী। সে বললে, "হিন্দুদের নিয়ে যাবার অর্ডার নেই।"

"গায়ে কি লেখা আছে কার কোন ধর্ম?" আভাসের দলের লোকেরা ছেঁকে ধরল ড্রাইভারকে: "এরা সব আমাদের লোক নিয়ে যেতেই হবে।"

"বেশ, যাব কিন্তু শ্যামবাজার, বালিগঞ্জ নয়।"

এলগিন রোড অঞ্চলে চৌধুরীর শালার বাড়ি, আপাতত সেখানে নিয়ে চল।

কুকুর কোলে নিয়ে বসেছেন চৌধুরী। লরি স্টার্ট দিল। দিতেই কুকুর উঠল শব্দ করে।

দুপুরের দিকেই নীলাদ্রির সঙ্গে সুপ্রভাতের দেখা।

"নীলুদা, আপনি একবার যাবেন খোঁজ করতে? একা ফেলে চলে এসেছি।"

"কী করে পারলেন আসতে?" ধিক্কার-ভরা চোখে তাকাল নীলাদ্রি।

"যেতেই পারলাম না। চারদিকে তখন কোপাকুপি চলেছে। তাছাড়া," সুপ্রভাত নির্লিপ্তের মত বললে, "নলিনেশবাবু আছেন, পরমা আছে।"

"কিন্তু দোতলায়, তার সংসারে ত সে একলা।" প্রায় ধমকে উঠল নীলাদ্রি। "তার সমস্যা নিয়ে তাকে কে দেখে?"

"না, সে বলেছে সে স্বাধীন, সে নিরাপদ।"

তাই নিয়ে খোঁটা দেবার সময় এই? ছোটলোক কোথাকার।

পোশাক পালটাল নীলাদ্রি। সাইকেলে করে বেরিয়ে গেল উত্তরে। বলেছিলে না আমি ভীরু, আমি দুর্বল! তোমাকে উদ্ধার করতে পারব কিনা জানি না। তবে এ যেন কোনদিন তোমার কানে যায়, আমি যাত্রা করেছিলাম, চেষ্টা করেছিলাম—তোমার কুশলেই মেনেছিলাম আমার কুশল বলে।

"আমার খোকন! আমার খোকন!" সমানে কাঁদছে গীতালি।

যে বাড়িতে জিপ তাকে ছেড়ে গিয়েছে সে-বাড়িতেই এসেছে বাসুদেব। বলছে: "ঘরের ভিতরে তখন ঢুকে গিয়েছে দাঙ্গা-দারেরা। আমাকে ভিতরে থাকতেই দিল না, উঠতেই দিল না উপরে। কত বললাম ছেলে আছে উপরে, নিয়ে আসি, কে শোনে কার কথা!"

"আমার খোকন! আমার খোকন!" কান্নার আর বিরাম নেই গীতালির।

নরখেলদের ফ্ল্যাটে নীচে যে দুজন পাঞ্জাবি আছে, তাদের সোনারুপোর দোকান। তাদের ঘরে ঢুকে ভূষণ বললে, "আমাকে বাঁচান, ছাদ বেয়ে আমাকে তাড়া করেছে।"

ঠেঙাধারীর দল পাঞ্জাবীদের ঘরে চড়াও হল।

পাঞ্জাবীরা বললে, "আমরা তোমাদের লোক।" আর ভূষণকে দেখিয়ে: "ও আমাদের।" বলে অজু করে নামাজ পড়তে বসল।

ছেড়ে দিল বিশ্বাস করে। ওরা চলে গেলে কোঁচড়ের ভিতর থেকে গয়নার পুঁটলি বের করল ভূষণ। সঙ্গে সঙ্গে দু পাটি বিকশিত দাঁত। বললে, "আজকের দিনে যে পারে সেই খাবে। কষুন, দাম কষুন, ওজন করুন।"

কিন্তু কে একজন এ-বাড়িতে চিৎকার করছে না?

এগিয়ে গেল ভূষণ। হ্যাঁ, দেবানন্দ ঘোষাল। ব্যথায়-যন্ত্রণায় অসহায় একাকিত্বে আর্তনাদ করছে।

"কিছু খবর বলতে পার?"

"লরি করে কোথায় গিয়েছেন। আসবেন নিশ্চয়ই শিগ্‌গির। যতদিন না আসেন আমি সব দেখব-শুনব। আমি ত নেমক-হারাম নই। বাবুরা ছাড়লেও আমি ত ছাড়তে পারি না বাড়িঘর।"

সন্ধ্যার দিকে ভবতোষের জন্যে গাড়ি করে দিল রহমান। ভবানীপুরে মাসীর বাড়ি, সেদিকে চলল। কাছাকাছি এসে দেখল যে, একটা লোককে কারা এলোধাবাড়ি বাঁশপেটা করছে।

গাড়ি থেকে নেমে বাধা দিল ভবতোষ: "এ কী ওকে মারছেন কেন? ও কী করেছে?"

"ও কী করেছে! ঐ যে আপনার মাথায় ব্যান্ডেজ, আপনাকে তবে মেরেছে কে? লজ্জা করে না বলতে?"

"আমাকে মেরেছে কি এই নিরীহ রাজ-মিস্ত্রী, নয় কি এই শিশিবোতলওয়ালা বা ছাতাসেলাই?"

"হ্যাঁ, ওরাই মেরেছে।"

"মোটেই নয় ভাই, মোটেই নয়।" ভবতোষ গম্ভীর স্বরে বললে, "আমাকে মাথায় যে মেরেছে সে ইংরেজ।"

লাঠি তুলে নিল আততায়ীরা। আহত লোকটিকে লরিতে বসিয়ে নিরাপদ এলেকায় পৌঁছে দিল ভবতোষ।

এবার আগুন জ্বলেছে ওদিকে, নিকিরি-পাড়ায়, দর্জিদের বস্তিতে, দেখেশুনে ছোট একখানা শালকরের দোকানে।

এদিকে রাস্তার জনতা কমে-কমে আসছে, ফুরিয়ে আসছে হৈ-হল্লা। কী ব্যাপার? ভয় ধরে গেছে, লরিবোঝাই হয়ে শিখেরা আসছে। আসুক, এবারই তবে বইবে হাওয়া।

সমস্ত ভয়ের ঊর্ধ্বে নির্ভয় আকাশ, সমস্ত আগুনের ঊর্ধ্বে তারাগুলির ইশারা।

রাষ্ট্র হয়ে গেল, যারা যারা উদ্ধার পেয়েছে সমস্তে হয়েছে থানায়, করায়া থানায়। পার ত সেইখানে একবার ঘুরে এস।

তারার প্রত্যাশাভরা সন্ধ্যার আকাশের মত গীতালি বললে, "আমি যাব।"

"তুমি গিয়ে কী করবে? আমিই দেখে আসি।" বললে বাসুদেব।

"না, আমি যাব।" চোখের দিকে চেয়ে কান্নাভরা তীক্ষ্ণ চিৎকার করল গীতালি। তুমি শুধু আমাকে চেনোনি, আমিও তোমাকে চিনেছি।

দুজনেই গেল, গীতালি আর বাসুদেব।

সুপ্রভাত বাড়ি ফিরে এসে দেখল তার ঠাকুর অমলেট তৈরি করে দিয়েছে আর পেলেটে চামচের শব্দ করতে করতে তাই পরিপাটি করে খাচ্ছে নলিনেশ।

"শুনেছেন সব?" জিজ্ঞেস করল নলিনেশ।

"শুনেছি। যাক, প্রাণে যে মারেনি।" বললে সুপ্রভাত।

"না, প্রাণে মারেনি, আমাকেও না আপনাকেও না।" খেতে লাগল নলিনেশ।

"কিন্তু বসে আছেন কেন?" তাড়া দিল সুপ্রভাত: "থানায় চলুন। খোয়া জিনিস দিচ্ছে সেখানে।"

"আমি ত মাহবুবের জন্যে বসে আছি।"

"এই আপনার ধারণা? মাহবুবে বাড়িতে দিয়ে যাবে? হয় সে আদৌ ফিরবে না, নয়ত থানায় পৌঁছে দেবে। চলুন দেখে আসি।"

অপরাধী যেমন থানায় যায় তেমনি করে গেল দুইজন। কোমরের দড়ি অদৃশ্য ভাগ্যের হাতে।

"এই যে খোকন! আমার খোকন!" ঝাঁপিয়ে পড়ল গীতালি। বুকের মধ্যে আঁকড়ে রইল পাগলের মত।

এই যে সোহিনী—

এই যে পরমা—

অক্ষত, অব্যাহত, সমগ্র।

গ্রহণের আলো পড়েছে সর্বত্র। সে আলোয় চিনল পরস্পরকে। হাত ধরল। রূপসী রাত্রি আবার স্বপ্ন বুনল মিলনের।

ঘরে বাইরের সমস্ত দীপই নেবে, কিন্তু তারাগুলি নেবে না। গ্রহণের স্পর্শ সরে যায়, চাঁদ জেগে থাকে অক্ষয়।

"নীলুদা, নীলুদা কেমন আছে?" ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল সোহিনী।

"চোট বিশেষ গুরুতর হয়নি।" বললে সুপ্রভাত: "ফিরেছে হাসপাতাল থেকে।"

"চল দেখে আসি।"

"চল।" সোহিনীর হাত ধরল সুপ্রভাত

হত্যাকারী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

এবারে এসে নূতন বউ মলয়ার ভাবটা যেন কীরকম কীরকম। প্রথম বারে এসে [illegible] দিন পনর ছিল, তাতে অন্যরকম মনে হয়েছিল। বয়স কম বলে সঙ্কোচ-জড়তার ভাগ একটু বেশী, তবু তারই মধ্যে বেশ হাসি-খুশি, মেলামেশা; সমবয়সী ননদ-দেওর, কিংবা পাড়ার মেয়েদের মধ্যে রইল ত অল্পবয়সের যে স্বাভাবিক চঞ্চলতা তাও ফিরে এসেছে মাঝে মাঝে, অবশ্য বড়দের কেউ কাছে-পিঠে না থাকলে। এবার একেবারে অন্যরকম।

সর্বদাই বিষণ্ণ কী একটা যেন চিন্তা নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছে। সঙ্গ এড়িয়ে চলতে চায়। উপরে ঠাকুরঘরের সঙ্গে লাগান যে ঘরটি আছে সেইটি দেওয়া হয়েছে ওদের, সেইখানেই কাটায় বেশীক্ষণ, ভাবটাও এমন যে, সেইখানেই তাকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় সমস্ত দিন রাত ত যেন বাঁচে। কী যে করে ঠিক বোঝা একটু কঠিন, কেননা ঘরটা সিঁড়ির ঠিক পাশেই, উঠলেই পায়ের শব্দ হয়। তবে ওরই মধ্যে লুকিয়ে সন্ধান নেওয়ার যারা চেষ্টা করেছে—দেওর-ননদ-পাড়ার মেয়ে, তারা দেখেছে, বালিশ জড়িয়ে চুপ করে শুয়ে আছে, কিংবা ঘুরে-ফিরে এখান-ওখানটা ঝাড়ছে, মুছছে, গোছাচ্ছে। মুখে কিন্তু সেই উদ্বেগের ভাব, যেন কোথায় কী হচ্ছে, মনটা সেইখানে রয়েছে পড়ে।

জিজ্ঞেস করেছেন সবাই "বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে?"

মাথা নেড়ে জানায়—না। সেটা অবশ্য বিশ্বাস করে না কেউ। তবে ছেলেমানুষ বউ, আজকাল যেখানে বাইশ-তেইশ হয়ে যাচ্ছে সেখানে মোটে পনর বছরেরটি, মাথা নাড়াটার কোন মূল্য নেই। কিন্তু সেকথা ধরলেও একটু যেন বাড়াবাড়ি বলেই মনে হয় না? শাশুড়ী একটু মুখ ভারই করেন মাঝে মাঝে। ডাকপিয়নের খোঁজটা যে একটু বেশী সেটা বোঝা যায়, কিন্তু এদিকে এত কেন? আর চিঠি যখন আসছেই প্রায় বাপের বাড়ির; আজ এর কাছ থেকে, কাল ওর কাছ থেকে। ......উনি যখন ন বছরেরটি তখন এ-বাড়ির চৌকাঠ মাড়ান। ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ করেও ত বছর পনর হল।

শ্বশুর একটু গভীরের দিকে যান। এমনও ত হতে পারে যে, পারিবারিক ব্যাপারে কিছু একটা দুশ্চিন্তার কারণ দেখে এসেছে বধূ, সাধারণ চিঠিতে সাধারণ কুশল খবরটা থাকলেও সেটা প্রকাশ পাচ্ছে না। অনেক ভেবে চিন্তে বৈবাহিককে একখানা চিঠিও দিলেন—এবার বধূমাতার মনটা যেন একটু বেশী খারাপ, ঠিক ছেলেমানুষের প্রথম শ্বশুরঘর করতে আসার মত নয়। কোন বিশেষ কারণ যদি থাকে যা এখানে তিনি ভিন্ন কেউ জানবার অধিকারী নয় ত তারই জন্য একটি ৭৪॥ অঙ্ক দেওয়া খামে জানিয়ে যেন তাঁকে নিরুদ্বেগ করা হয়। বাড়ির কেউই তা পড়বে না। দিন দিনই যেন বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন।

উত্তর এল খুব উদ্বেগপূর্ণই। এঁদের থেকে গোপনীয় এমন কিছু হয়নি যা নিয়ে মলয়ার উদ্বেগের কোন কারণ থাকতে পারে। ওঁর ছোট ভাই গিরিশের বিবাহ নিয়ে একটু গোলযোগ চলছিল, সেটা এঁদের জানাই। মলয়া কাকার ভক্ত, তাই নিয়ে মনটা খারাপ থাকা সম্ভব ছিল, কিন্তু তারও যে সুরাহা হয়ে এসেছে, মত দিয়েছে গিরিশ, একথা জেনেই গেছে মলয়া। সুতরাং সেদিক দিয়েও উদ্বেগের কিছু নেই। যাই হক ওকে আলাদা পত্র দেওয়া হচ্ছে, তাতে ৭৪॥ থাকবার কোন দরকারও নেই। আর, নিজে একবার আসবারও চেষ্টা করবেন, না হয় গিরিশকেই দেবেন পাঠিয়ে; সে একটু বাইরে গেছে, ফিরে এলেই।

শ্বশুর বধূকে কাছে টেনে নিয়ে নিজের সামনে চিঠিটি পড়ালেন। প্রশ্ন করলেন, "এই নিয়ে ভাবছিলে মা? হল ত, নতুন কাকী আসছেন, একটা খাওয়া পাওনা রইল মার কাছে......মা হয়ত বলবে—নতুন বেয়ান এনে দিলাম আসবার সঙ্গে সঙ্গে, আপনিই ত খাওয়াবেন।"

শ্বশুরের কাছে ভাল থাকে, ঠাট্টাটুকুতে হাসিও ফুটল মুখে। কিন্তু শ্বশুর লক্ষ্য করলেন বেশীক্ষণ টিঁকল না সে-হাসি। খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরের কথা এটা, বিকেলে নজর পড়তে দেখেন, আবার সেই মনমরা ভাব, কোথায় যেন পড়ে রয়েছে চিন্তাটা, চোখে উদ্বেগ......

একটু তলিয়ে ভাবেন বলেই একটা সম্ভাবনার কথা মনে হল। ছোট শহর এঁদের, তা ভিন্ন বাড়ির চালও পুরানো-

ঘেঁষা, তাইতে নিশ্চয় অপেক্ষাকৃত বড় শহরের মেয়ের অসুবিধা হচ্ছে। বললেন, "একটা ভাল সিনেমা এসেছে রাণাঘাটে, যাব মনে করছি; যাবে মা তুমি? তাহলে চল, কে কে যাবে তুমিই ঠিক করবে, সবাই আমার নতুন মায়ের খোসামোদ করুক।"

সেই হাসিখুশি, খানিকটা চঞ্চলতার ভাব ফিরে এল যাওয়ার হুজুগের মধ্যে, জেরটা পরের দিন পর্যন্ত চলল। শ্বশুর বেশ উৎফুল্ল হয়েছেন রোগ-নির্ণয় আর চিকিৎসায়। অভ্যাসের মধ্যে থেকে এভাবে রাশ মুখে টেনে রাখা যে ভুল হচ্ছে এটা বুঝতে পারা গেল। এর পর আবার নূতন ঘরের অভ্যাসগুলোই ত যাবে সয়ে। একেবারেই অতটা কড়াকড়ি নয়।

বাকি থাকে বই পড়ার অভ্যাস।

কিন্তু নভেল-নাটক ত হাতে তুলে দেওয়া যায় না। জিজ্ঞেস করলেন, "ভাল বই-টই পড়বে? আনিয়ে দোব?"

বধূ লজ্জায় একেবারে এতখানি জিভ বের করল। বড় মিষ্ট লাগল শ্বশুরের; এরা কেমন আসতে না-আসতেই নেয় নিজের ঘর চিনে! সস্নেহে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "আরে রামঃ, আমি কি নভেল নাটকের কথা বলছি মা? দেখেছই বাড়িতে তার পাটই নেই। বই ভালও ত আছে। একটা গীতাঞ্জলি আনিয়ে দোব 'খন, চমৎকার বই, যখন ইচ্ছে হবে পড়বে। বাড়িতে আছেই, তবু তোমার জন্যে একটা ভাল সংস্করণ আনিয়ে দোব কেমন?"

বধূ খুব খুশী হয়ে মাথা নাড়ল।

সেদিন রইল জেরটা।

সকালে অতটা বোঝা যায় না। বিকালে ঘুমিয়ে ওঠার পর থেকেই আসে ও-ভাবটা বেশী করে; কারণ যাই হক, খাওয়া দাওয়ার পর উপরে গিয়ে সেই চিন্তাটা নিয়েই রেন পড়ে বধূ। তার পরদিন দেখা গেল, দু'দিন ভাল থাকার পর মনটা যেন আরও বেশী করে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় গিয়েছে ভরে। একটা ভয়, এখনই যেন কী একটা হয়ে পড়বে, তারই আয়োজন যেন চলছে কোথায়।...... ঘোরাফেরার মধ্যে নিজেকে সাধ্যমত সংযত করে রাখবার চেষ্টা করছে, তবু দৃষ্টিটা কিসের আশঙ্কায় যেন ঠিকরে-ঠিকরে পড়ছে হেথায়-হোথায়।

চিন্তার কারণ হয়ে উঠল। মস্তিষ্কের কোন দোষ নেই ত বধূর?

আজ আবার একটা নূতন উপসর্গ দেখা দিয়েছে। শ্বশুর বাইরের ঘরে ছিলেন, সন্ধ্যার আগে একটু বেড়াতে বেরন, তারই উদ্যোগ করছেন, ছোট মেয়ে রাধা এসে চোখ বড় বড় করে চাপা গলায় বলল, "বাবা, দেখবে এস শিগ্গির!"

নূতন বধূকে নিয়ে একটু হুজুগ পড়ে গিয়েছে, বিশেষ করে ছোটদের মধ্যে, একটু বিরক্ত হয়েই প্রশ্ন করলেন, "হয়েছে কী?"

রাধা জানাল, বউদিদি কাঁদছে। এখন পর্যন্ত নীচে নামেনি, ঘুম থেকে উঠল কিনা দেখতে গিয়েছিল, দেখে, জানলার কাছে বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ও ডাকতেই আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ঘুরে চাইল।......ছুটে বলতে এসেছে রাধা।

চিন্তিতভাবে বাড়ির দিকেই পা বাড়ালেন শ্বশুর। উপরেই যাচ্ছিলেন দেখেন, বধূ নেমেই এসেছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল, বললেন, "একটা পান নিয়ে এস ত মা তাড়াতাড়ি সেজে।"

পানটা নেওয়ার সময় একটু আড়ে লক্ষ্য করে দেখলেন, চোখ দুটি সত্যিই যেন সদ্য মোছা, একটু ফোলা-ফোলাও। একটু অপ্রতিভ রয়েছে বলে কিছু আর বললেন না, সদর-দরজা পেরিয়ে একটু চিন্তিত-ভাবেই ছড়িটা দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে গেলেন।

সেইদিনই সন্ধ্যার খানিকটা পরে ব্যাপারটা চরমে এসে পৌঁছল—

স্বামী পঙ্কজ ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে কলকাতায় একটা গবর্নমেণ্ট আপিসে কাজ করে। সন্ধ্যার পর একটু আড্ডা দেওয়া অভ্যাস আছে। কিন্তু নূতন বিবাহ, তার উপর বধূর এইরকম মানসিক অবস্থা, এদিকে অনিয়ম হয়ে যাচ্ছে। আজ একটু বেরুবে ঠিক করেছে।

আজ শ্বশুরবাড়ি থেকে বধূর নামে একখানি চিঠি এসেছে। আপিসে বেরুবার সময় রাস্তায় পিয়নের সঙ্গে দেখা হয়। আরও সব চিঠি ছিল, ও মলয়ের চিঠিটা রেখে দেয়। চিঠিটা খামে, তবে ৭৪৷৷ দেওয়া নয়। ভেবেছিল, এরকম গোলমেলে ব্যাপার যাচ্ছে, একবার পড়ে নিয়ে তারপর দেবে, কিন্তু কী ভেবে আর পড়েনি।

চিঠি এসেছে, মনটা ভাল থাকবে বধূর, একবার ক্লাবে বেরুতে পারবে আজ—এই কথাগুলোই মনে বড় হয়ে ছিল, তাড়াতাড়ি

অন্ধকারের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে

[illegible] দিকেই ছিল মনটা। এসেই যে চিঠিটা দিয়ে দেখে[illegible] আর হয়নি। বেরুবার সময় মনে পড়তে ওর হাতে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ওর নিজের মনেরও যেন স্থিরতা নেই। ক্লাবে গিয়ে কেবলই মনে হতে লাগল, কী ছিল চিঠিটায় জেনে আসলে হত এত তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে না পড়ে। বেশ মন বসছে না, চক্ষুলজ্জার খাতিরেই যতটা দরকার অপেক্ষা করল পঙ্কজ, তারপর বেরিয়ে পড়ল। নূতন বিবাহের সতর্ক চক্ষু, বুঝল বধূ নীচে নেই; সোজা উপরে চলে গেল। গিয়ে দেখে বধূ জানলার গরাদে ধরে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডাকল, "মোলু?"

বধূ চকিত হয়ে ঘুরে চাইল একবার, সঙ্গে সঙ্গে আবার মুখটা ফিরিয়ে, হাতেই তাড়াতাড়ি চোখ দুটো মুছে নিয়ে ঘুরে প্রশ্ন করল, "কী?"

"ও কী, তুমি কাঁদছ নাকি! কেন?"

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পিছনে দাঁড়াল। কাঁধে হাত রেখে বলল, "কাঁদছ কেন? কী হয়েছে? কোন খারাপ খবর ছিল চিঠিতে? ...ক'দিন থেকেই তোমার কী হয়েছে মোলু ...কাউকে বলছও না..."

উলটে বুকে মুখ লুকিয়ে একেবারে হু-হু করে কেঁদে উঠল মলয়া। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল পঙ্কজের, বিয়ের ছুটির পর কাজের চাপের জন্য তারও যেন দেখবার ফুরসত হয়নি ভাল করে, খোঁজ নেওয়া হয়নি। বুকে মাথাটা চেপে পিঠে হাত বুলতে বুলতে বলল, "চুপ কর, কী হয়েছে বল আমায়—বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে বেশী এবার? চিঠিতে কোনও..."

"কাকা রতনমণিকে মেরে ফেলেছেন..."

"সে কী!!...কী সর্বনাশ!!...কাকা?..."

একবার বাঁধ ভেঙে গিয়ে কান্নাটা আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

"চিঠিতে খবর এল?"

মুখে কথা নেই। মাথাটা নড়ছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অসহ্য যন্ত্রণাতে স্বামীর বুকে কপালটা শুধু ঘষছে মলয়া। সঙ্গে সঙ্গে কান্না; 'হ্যাঁ-না' কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

"চিঠিটা কোথায় দেখি?"

কিছু বলে না, একজন—প্রাণের একজনকে কাছে পেয়ে লহরে লহরে শুধু কান্নাই উচ্ছ্বসিত হয়ে চলেছে। একেবারে এরকম উৎকট সংবাদ, দোষও ত দেওয়া যায় না। পঙ্কজ যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

চিঠিটা খুঁজে বের করতে হয়। পিঠে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলল, "চল মোলু, লক্ষ্মীটি, কেঁদে না। কী হয়েছে দেখছি আমি, একেবারে অমন কিছু নয় নিশ্চয়..."

সব ছেলেমেয়েদের সরিয়ে নীচে তিনজনের পরামর্শ হচ্ছিল। চিঠিতে তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি। মলয়ার চিঠিতে কাকার কথা একটু বেশী করে থাকেই, এতেও আছে, কিন্তু এক, এখনও বাড়ি ফেরেননি, অনেকদিন চিঠি নেই, এটুকু ছাড়া ত আর কোনও কথাই নেই। এতেই কি কাকা-ভক্ত ভাইঝি তাঁকে খুনে ফেরার আসামী বলে ধরে নেবে?......খুনের সম্ভাবনাই বা কী থাকতে পারে? রতনমণি মেয়েটিই বা কে?......বিবাহের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আছে এ-ব্যাপারে? যার জন্য ভাইঝির মনে এ-সন্দেহ গড়ে উঠতে পারে?

কেউ কিছু আন্দাজ পাচ্ছেন না। শাশুড়ী বলছেন—ক্রমাগতই ভাবে কাকার কথা, আজ বোধ হয় তাই থেকেই কোন উৎকট স্বপ্ন দেখে থাকবে।

যাই হক না কেন, এ-অবস্থায় আপাতত করা যায় কী? পঙ্কজ না হয় একবার ঘুরে আসবে বহরমপুর থেকে? কর্তা গেলে বধূ একটু সন্দিগ্ধও হয়ে পড়তে পারে। তাঁর থাকাটা দরকারও।

পঙ্কজ জানাল, তার আর ছুটি পাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

তা হলে? জবাবী টেলিগ্রামই না হয় করে দেওয়া হবে সঠিক অবস্থা জানবার জন্য?

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, এ-সম্বন্ধে আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটি না করে কর্তা বধূকে সঙ্গে করেই একবার হয়ে আসুন।

তাই হল। সকালে উঠেই বললেন, "আমার বহরমপুরে হঠাৎ একটু কাজ পড়ে গেল। নতুন মাও একবার হয়ে আসবে নাকি গো?"

পরের দিনের কথা। মনটা খুবই খারাপ হয়ে রয়েছে। সন্ধ্যার পর ক্লাবে গিয়েছিল পঙ্কজ, কিন্তু আজ আরও সকাল সকাল চলে এসেছে।

খুবই ভার হয়ে রয়েছে মনটা, কিছুই ভাল লাগছে না। চিঠি বিছানার চাদরের নীচে রেখেছিল কাল, সেটা বের করতে গিয়ে গন্ধ পেয়ে একটি শুকনো বকুলের মালার সন্ধান পাওয়া গেল। তুলে নিয়ে বুকে চেপে বারকয়েক শুঁকল পঙ্কজ, কত কী যে উথলে উঠেছে মনে!—কেন এমন হচ্ছে? সত্যই কি মাথার কোন দোষ আছে? পেয়েই কি হারাতে হল?

বার দুই চিঠিটা পড়ল, কিছুই ত ধরা যায় না তেমন।

তোশক তুলে চিঠিটা আবার রেখে দিতে গিয়ে মনে হল ঠিক ঐখানটায় গদির নীচে কী একটা যেন রয়েছে। পাতলা গদি, একটু উঁচু হয়ে রয়েছে।

তুলে দেখে একখানা একেবারে আনকোরা নূতন বই, দোকানের গন্ধও যায়নি এখনও ভাল করে।

কম্পিত হস্তে তুলে নিয়ে প্রথম পাতা খুলতেই বইয়ের টাইটেল আর লেখকের নাম নজরে পড়ল। "শুভলগ্ন", লেখক হচ্ছেন গিরিশ ভৌমিক। তারপর, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেসব আর দেখবার ফুরসত হল না। সাড়ে তিনশ পাতার একখানি নভেল। কিসের আবিষ্কারে বুকটা ধড়ফড় করছে পঙ্কজের। ক্ষিপ্রগতিতে পাতা উলটে শেষের দিকে আসতে মিনিট কুড়ি বোধ হয় লাগল না। কেউ কাছে থাকলে দেখত চোখে মুখে প্রায় মলয়ার উৎকণ্ঠাই পড়ছে এসে।

তারপর একেবারে শেষের কাছাকাছি একটা পাতায় এসে দৃষ্টি গেল আটকে। অশ্রুর ফোঁটায় পাতাটি কয়েক জায়গায় ডুমো-ডুমো হয়ে ফুলে রয়েছে। দু-তিনটি পংক্তির উপরে যেন সার-বন্দি হয়েই—যেখানে লেখা রয়েছে "উলুধ্বনি জেগে উঠল। এদিকে রতনমণি একবার যেন কার কথা ভেবে শূন্যে চেয়ে নিয়ে ছোরাখানা আমূলে নিজের বুকে বসিয়ে দিয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।"

খেয়েদেয়ে শুতেই যাচ্ছিল পঙ্কজ, কিন্তু মনে একটা আক্রোশও রয়েছে। মেয়ে দেখা ইত্যাদিতে তার কোন হাত ছিল না, এ-বাড়ির নিয়ম নয়। বাবাই দেখেছেন শুনেছেন সব করেছেন।...তাঁকেও বাদ দিল না আজ সুযোগ পেয়ে। গর্জাতে গর্জাতেই নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে—

"বুঝি সব, এটা উচিত, ওটা উচিত নয়, কিন্তু নিজেকে অভ্রান্ত মনে করাও ত ঠিক নয়। বাড়িতে গীতা ভিন্ন কিছু ঢোকবার জো নেই, আর ঐ দেখ গে চারশ পাতার বীরভদ্র এক নভেল। চার মাস খোঁজ-খবর নিয়েও যা কেউ টের পাননি, আমি তিনটে দিন থেকেই তার সন্ধান পেয়ে এসেছি—বাড়িতে তিন-তিনটে লেখক—একটা ঝুনো, দুটো ডাঁসা—হরদম একে ওঠাচ্ছে, ওকে নামাচ্ছে, একে মারছে, ওকে বাঁচাচ্ছে এণ্ডা-বাচ্চা, মেয়েমদ্দো সব নভেল-নাটকে জারান ওবাড়ির...এখন আর কী হবে? ভোগ—ঘাড়ে করে করে ঘুরে নিয়ে বেড়াও—এ-রোগ মজ্জায় মজ্জায় সেঁদিয়ে গেছে, আর সারে?..."

পরিকল্পনা, কৃষি ও গ্রামীণ সমাজ

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, সে পরিকল্পনা মারফত শিল্পের দিকে অগ্রসর হতে চলেছে। কৃষি হতে শিল্প, শিল্প হতে বাণিজ্য, এই হল অর্থ-নৈতিক বিবর্তনের চিরপরিচিত যাত্রাপথ। জগতের যে-সব দেশ সমৃদ্ধি লাভ করেছে—বিশেষত খাস পশ্চিমী দেশগুলি—তারা এইভাবেই এগিয়েছে। এখন যখন প্রাচ্যের অনগ্রসর দেশগুলি অর্থনৈতিক উন্নতি করতে চাচ্ছে তারাও যে সেই পথেই অগ্রসর হতে চাচ্ছে না তা নয়। আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্পের উপর ঝোঁক পড়েছে যথেষ্ট বেশী। সেদিন সংবাদপত্রে পড়া গেল, চীনের একজন মন্ত্রী উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন, মাটির তলায় ঘুমন্ত ধাতুর ঘুম ভাঙাতে হবে, শহর ও শিল্প গড়ে তুলতে হবে।

"We shall stir up the minerals which have slumbered underground for hundreds of millions of years. We shall control the waters, conquer the calamities of wind and weather and humble nature to our service. Factory chimneys shall arise in all cities, great and small throughout the land, all places where productive labour is carried on shall hear the music of machinery and electricity will send its light and power to the remotest village." (China Today, June 25, 1958)

এইভাবে শিল্পের দিকে ঝোঁক পড়েছে দেশে দেশে।

এর প্রতিফলন আমাদের পরিকল্পনাতেও। আমাদের প্রথম পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের বিভিন্ন খাতে যে ব্যয়বরাদ্দ ছিল তার সংগে দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ তুলনা করলেই বোঝা যায়। হিসাবটি তুলে দিচ্ছি:—

	প্রথম পরিকল্পনা		দ্বিতীয় পরিকল্পনা (বর্তমান অবস্থা)	
	টাকা (কোটি)	%	টাকা (কোটি)	%
১। কৃষি ও সম্প্রসারণ ব্লক ...	৩৫৭	১৫·১	৫১০	১১·৮
২। সেচ ও বিদ্যুৎ ...	৬৬১	২৮·১	৮২০	১৮·২
৩। শিল্প ও খনি ...	১৭৯	৭·৬	৯৫০*	২১·১*
৪। যানবাহন ও যোগাযোগ ...	৫৫৭	২৩·৬	১,৩৪০	২৯·৮
৫। সমাজসেবা	৫৩৩	২২·৬	৮১০	১৮·০
৬। বিবিধ	৬৯	৩·০	৭০	১·৬
	২,৩৫৬	১০০·০	৪,৫০০	১০০·০

এর সংগে চীনের পরিকল্পনাটিও তুলনীয়। তাঁদের প্রথম পরিকল্পনায় বিভিন্ন খাতের ব্যয়বরাদ্দের হিসেব তুলে দিচ্ছি:—

মহাচীনের প্রথম পরিকল্পনায় বিভিন্ন খাতে ব্যয়বরাদ্দ

	(১০ লক্ষ ইউয়ানের হিসেবে)	মোট ব্যয়ের শতকরা
১। শিল্পের বিভিন্ন বিভাগ ...	৩১,৩২০	৪০·৯
২। কৃষি, জলসংরক্ষণ ও বন ...	৬,১০০	৮·০
৩। যানবাহন, পোস্ট, টেলি-কমিউনিকেশন বিভাগ ...	৮,৯৯০	১১·৭
৪। ব্যবসা ব্যাংক ও স্টকপাইলিং বিভাগ ...	২,১৬০	২·৮
৫। সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগ ...	১৪,২৭০	১৮·৬
৬। শহরের জনস্বার্থমূলক কাজ (Urban Public Utilities) ...	২,১২০	২·৮
৭। অর্থনৈতিক বিভাগগুলির জন্য চলতি মূলধন (Circulating capital for economic departments) ...	৬,৯০০	৯·০
৮। অর্থনৈতিক বিভাগের জিনিসপত্র মেরামত ও বদলি ...	৩,৬০০	৪·৭
৯। অন্যান্য অর্থনৈতিক বিষয় ...	১,১৮০	১·৫

(First 5 Year Plan for Development of the National Economy of the People's Republic of China.)

কাজেই শিল্পের উপর কী নিদারুণ ঝোঁক পড়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

।। দুই ।।

অনগ্রসর দেশে শিল্পের উপর ঝোঁক পড়বে এ-কথা স্বাভাবিক। কোন দেশই চিরকাল কাঁচামাল রপ্তানি এবং শিল্পদ্রব্য আমদানি করে আর্থিক বুনিয়াদ শক্ত করতে পারে না, তার অর্থনৈতিক উন্নতিও তাতে সম্ভব হয় না। কিন্তু সেইসংগে একথাও ভুললে চলবে না যে, কৃষি এবং কৃষিপ্রধান জনসংখ্যাকে উপেক্ষা করে এই অগ্রগতি হওয়া সম্ভব নয়। বরং শিল্প অগ্রগতির জন্যই কৃষির উন্নতি প্রয়োজন। কারণটি একটু খুলে বলি। জাতীয় সঞ্চয় ও জাতীয় মূলধন না বাড়লে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি হবে না। আমাদের প্রথম পরিকল্পনায় যে-সব হিসেব দেওয়া হয়েছে তা হতে দেখা যায় মূলধনের সঞ্চয় গড় হিসেবে ১৮২০—১৯১৩ সনে ছিল জাতীয় আয়ের ১০%

যুক্তরাষ্ট্রে (১৮৬৯—১৯১৩) শুধু নীট জাতীয় [illegible] ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ১৩ হতে ১৬ ভাগ; জাপানে (১৯০০—১৯০৯) ১২%; পরে তা ১৭% হয়েছিল। রুশদেশে স্থির হয়েছিল জাতীয় আয়ের ২৫% হতে ৩৩% উন্নতির জন্য লগ্নি করা হবে; ওখানকার দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দেখা যায় ১৯২৮ হতে ১৯৩৮ সনের মধ্যে অন্ততঃ শতকরা ২০% লগ্নি হয়েছে। আমাদের মূলধন জমেও কম, আবার তার মধ্যে লগ্নি হয় আরও কম। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থির হয়েছিল প্রথম বছর শতকরা ৫% লগ্নি, ১৯৫৫—৫৬ সনে তা বেড়ে দাঁড়াবে ৬৪/৫% লগ্নি। কাজে অবশ্য এর চেয়ে বেশী হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার রিপোর্ট হতে দেখা যায় আমরা তার চেয়ে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছি। তা প্রথম পরিকল্পনায় হয়েছিল ৭·৩%, এবার ধরা হয়েছে ১০·৭(১)। কাজে অবশ্য তা আরও কম দাঁড়াবে বলে মনে হয়। কারণ তখন বলা হয়েছিল জাতীয় আয় যদি ১৩৪৮০ কোটি টাকা হয় এবং পরিকল্পনা যদি ৬২০০ কোটি টাকার হয় তাহলেই ঐ হার দাঁড়াবে। জাতীয় আয়ের হিসেব এখনও পাওয়া যায়নি, কিন্তু সকলেই জানেন পরিকল্পনা কার্যত ৪৫০০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। কাজেই এ-কথা বোধ হয় নির্ভয়েই বলা যেতে পারে যে, লগ্নির হার হয়ত শেষ পর্যন্ত ১০% দাঁড়াবে না। সুতরাং প্রথম কথা হল, আমাদের উন্নতি দ্রুততর করতে হলে লগ্নি আরও বেশী হওয়া দরকার।

কিন্তু এটা কী করে সম্ভব? অন্যান্য দেশের মত ২০% বা ১৫% দূরে থাক, ১০% হারই আমরা বজায় রাখতে পারছি না, তাই বজায় রাখতেই আমাদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হচ্ছে। অতখানি চাপ দেশ সহ্য করতে পারছে না, করভার খুব বাড়ছে, মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে, দাম বাড়ছে, সেইজন্য থেকে থেকে পরিকল্পনারও বদল করতে হচ্ছে। এ-অবস্থায় আমরা লগ্নি ও জাতীয় আয় কীভাবে বাড়াতে পারি?

এর উত্তর কৃষির মধ্যে খুঁজে পেতে হবে। আমরা শিল্পের জন্য যতই চেষ্টা করি না কেন, তার দ্রুত অগ্রগতির পথে কতকগুলি দুর্লংঘ্য বাধা আছে। অনেক মৌলিক যন্ত্র বিদেশ থেকে আনতে হয়, বৈদেশিক মুদ্রার হাঙ্গামাও আছে, জিনিসও সব সময় পাওয়া যায় না। দেশে শিক্ষিত শিল্পীরও অভাব আছে, যথেষ্ট সংখ্যক শিল্পী শিক্ষিত করে নিতেও সময় লাগে। এই সব কারণে যত তাড়াতাড়ি ইচ্ছা করা যায় তত তাড়াতাড়ি শিল্পায়ন কাজে ঘটে ওঠে না। তাছাড়া পূর্বেই বলেছি, আমাদের জাতীয় আয়ের সর্ববৃহৎ অংশ আসে কৃষি হতে; কাজেই যদি কৃষির সামান্য উন্নতিও হয় তাহলে মোটের উপর যে-পরিমাণ জাতীয় আয় বাড়বে, শিল্পে তার চেয়ে অনেক বেশী উন্নতি না হলে সে-পরিমাণ আয় বাড়বে না।

এদিক থেকে কৃষির উন্নতির দরকার ত আছেই, কিন্তু সব কথাটা এখানেই শেষ নয়। এর চেয়েও অনেক বড় আর-একটা কথা আছে। সেটা হল, শুধু চাষ ও চাষীর ভালর জন্যই যে কৃষির উন্নতি দরকার তা নয়, শিল্পের উন্নতির জন্য তা আরও বেশী দরকার। কথাটা কেমন আপাতবিরোধী শোনায় বটে, কিন্তু আসলে মোটেই তা নয়। কটি কথা এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। (১) কৃষির অংশে টাকা জমলে সেই টাকা পরিকল্পনার কাজে পুনর্নিযুক্ত হতে পারে। কৃষিপ্রধান দেশে পরিকল্পনার প্রধান অর্থ আসে এই দিক থেকেই। প্রত্যেক চাষী যদি পাঁচ শ টাকার সেভিং সার্টিফিকেট কিনতে পারত তাহলে পরিকল্পনার প্রয়োজন অর্থের জন্য কারও দরজায় ধর্না দিতে হত না। (২) শিল্পের মাল কিনবে কে? যদি দেশের অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যের চরমসীমায় উপস্থিত হয় তাহলে দেশে শিল্প থাকলেই বা কী হবে, তার উৎপন্ন জিনিস কিনবার লোক কোথায় থাকবে? শিল্পের ভবিষ্যৎ ত নির্ভর করে বাজারের উপর, আর এইরকম কৃষিপ্রধান দেশে ক্রেতারা ত অধিকাংশই কৃষিজীবী। সত্যি কথা বলতে, তুলনায় মধ্যবিত্ত শহরবাসী লোক আর কটি? সে-হিসেবে এদের হাতে অর্থ না থাকলে শিল্পজাত মাল বিক্রিও হবে না, শিল্পেরও উন্নতি হবে না।

এই কথাটা সকলেই বোঝে, অন্ততঃ বোঝা উচিত। এমন কি, যে চীন শিল্পোন্নতির দিকে প্রবল ঝোঁক দিয়েছে সেখানেও এই কথাটার উপলব্ধি আছে। তাঁদের Programme for Agricultural Development in the People's Republic of China 1956-57 (Revised Draft) হতে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি—

"Socialist industry is the core of our national economy, but agricultural development occupies a vital place in our socialist construction. Agriculture supplies industry with food and raw materials, at the same time, the more than 500 million rural population provide our industry with the biggest domestic market in the world. In this sense, without agriculture there could be no industry in our country. It is utterly wrong to belittle the importance of agricultural work".

তা ছাড়া চীনের আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, তার পরিকল্পনার প্রায় সব টাকা এসেছে চলতি সঞ্চয় থেকে। পিপলস ব্যাঙ্ক বেশিদিন কারবার আরম্ভ করেনি, বিদেশ হতেও ব্যক্তিগত মূলধন আসেনি। যতদূর খবর পাওয়া যায়, সঞ্চয় হতেই এ-টাকা জোগাড় হয়েছে। চীন এখনও শিল্পে অগ্রসর হয়নি। সুতরাং এই সঞ্চয় চাষীদের নিকট থেকেই এসেছে এবং পরিকল্পনায় লগ্নি হয়েছে এ-কথা আন্দাজ করলে বোধ হয় খুব ভুল হবে না।

সুতরাং মোদ্দা কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে, কৃষির উন্নতি না হলে ভারতবর্ষেও পরিকল্পনা চলবে না, এমন কি শিল্পায়ন হবে না। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে সংকট উপস্থিত হয়েছে, তা পর্যালোচনা করলেও সেই কথা বোঝা যায়। পরবর্তী অনুচ্ছেদে সেই কথাটাই আলোচ্য।

।। তিন ।।

ভারতবর্ষের দুটি পরিকল্পনার মধ্যে প্রথম পরিকল্পনা কৃষিপ্রধান এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনা শিল্পপ্রধান একথা সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচনার সময় কথাবার্তায় আলাপ-আলোচনায় বার বার শোনা গিয়েছে, আমাদের কৃষির সমস্যার ত সমাধান হয়ে গিয়েছে, এইবার তা হলে শিল্পের উপর আরও ঝোঁক দেওয়া যাক। বস্তুত সেসময় কয়েক বছর ভাল ফসলও হয়েছিল, দেশে তেমন খাদ্যাভাবও ছিল না, খাদ্য আমদানি কমেও গিয়েছিল। তার ফলে কৃষি সম্বন্ধে দেশে একটা নিশ্চিন্ততার ভাব যে দেখা যায়নি, তা নয়। কিন্তু সে সময় যে প্রকৃত অবস্থাটা ভাল করে বুঝে দেখা হয়নি, পরবর্তী সংকট হতেই তা প্রমাণিত হয়। এমন কি পণ্ডিত নেহরুও সেদিন (২২।৮।৫৮) লোকসভায় খাদ্য সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে তিনি পর্যন্ত খুব অকপটেই স্বীকার করেছেন, খাদ্য-সমস্যা যে এত জটিল, তা আগে বোঝা যায়নি।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খাদ্য উৎপাদনের এই হিসেবটি দেওয়া আছে—

খাদ্যশস্য উৎপাদন

(১০ লক্ষ টন)

১৯৫১-৫২	৫২-৫৩	৫৩-৫৪	৫৪-৫৫	৫৫-৫৬ (অনুমান)
৫১·২	৫৮·৩	৬৮·৭	৬৫·৮	৬৫

্তে মনে হয়, খাদ্যশস্য উৎপাদন ্ছে। কিন্তু আসল প্রয়োজনের তুলনায় বেড়েছে? তাহলে খাদ্য আমদানির নবটাও ধরতে হয়—

তা মাত্র ১২৭ কোটি(২)। দেশের লোকের হাতে সম্ভবত টাকা নেই। যদি গ্রামীণ এলাকায় টাকা থাকত, তাহলে ক্ষুদ্র সঞ্চয়

খাদ্য আমদানি

১৯৪৭	১৯৪৮	১৯৪৯	১৯৫০	১৯৫১
২৩,৩৪,০০০	২৮,৪১,০০০	৩৭,০৬,০০০	২১,২৫,০০০	৪৭,২৫,০০০
৯৩·৯৯ কোটি	১৯৯·৭২ কোটি	১৪৪·৬০ কোটি	৮০·০৭ কোটি	২১৬·৭৯ কোটি
১৯৫২	**১৯৫৩**	**১৯৫৪**	**১৯৫৫**	**১৯৫৬**
৩৮,৬৪,০০০	২০,০৩,০০০	৮,০৮,০০০	৭,০০,০০০	১৪,২০,০০০
২০৯·০৭ কোটি	৮৫·৯৩ কোটি	৪৭·০২ কোটি	৩৩·১১ কোটি	৫৬·৩৪ কোটি

পর খাদ্য আমদানি আবার যথেষ্ট ড়্ছে। হিসেবটা হাতের কাছে নেই, কিন্তু ন্র স্মরণ হচ্ছে, তাতে পরের বছর দানি দাঁড়িয়েছে ৩৭ লক্ষ টন এবং ৯ কোটি টাকার মত। এবছর হয়ত ও বাড়বে।

এই হিসেব হতে কী বোঝা যায়? প্রথম কল্পনার সময় সৌভাগ্যক্রমে কয়েক সুবৃষ্টি হয়েছিল, ভাল ফসল হয়ে- । তাই বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানিও কমে গিয়েছিল, বৈদেশিক মুদ্রা বেঁচে য়েছিল, প্রথম পরিকল্পনাও খুব সহজে ল হয়েছিল। আবার যেই বর্ষা হচ্ছে না, ল ফলছে না, বিদেশ হতে খাদ্য দানি করতে হচ্ছে, বৈদেশিক মুদ্রা হয়ে যাচ্ছে, অমনই পরিকল্পনায় ট দেখা দিয়েছে। সুতরাং একথা কার করে নেওয়া ভাল যে, পরিকল্পনা ল করতে হলে অন্যান্য দিক ঠিক রাখবার সঙ্গে কৃষির দিকটা খুব বেশীরকম রাখতে হবে, তা নইলে পরিকল্পনাই টগ্রস্ত হবে। অন্য কারণও থাকতে র, কিন্তু একক কারণ হিসেবে এইটেই চেয়ে বড় কারণ একথা অত্যুক্তি নয়। ষয়ে আরও চিন্তার কারণ আছে। ত সরকারের হিসেবে দেখা যায়, ঋণ ক্ষুদ্র সঞ্চয় কম হচ্ছে। ১৯৫৬-৫৭ সনে ছিল ২০০ কোটি, ১৯৫৭-৫৮ সনে

বেশী হত। শহরের ব্যবসায়ীরা ত সাধারণত বেশী টাকার বড় বড় ঋণপত্রই কেনে। ক্ষুদ্র সঞ্চয় করে মধ্যবিত্ত লোক এবং গ্রামাঞ্চলের লোক। এর চেয়ে আরও পরিষ্কারভাবে এই কথাটা বোঝা যায় ঋণ ছেড়ে দিয়ে শুধু ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের হিসেব ধরলে—

ক্ষুদ্র সঞ্চয় (লাখ টাকা) (৩)

	মোট			পোস্ট আফিসের সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট—	ন্যাশনাল সেভিং সার্টিফিকেট—
	মোট পাওনা	মোট পরিশোধ	নীট পাওনা	নীট পাওনা	নীট পাওনা
১৯৫১-৫২	১,৪৫,২৬	১,০৬,৭২	৩৮,৪৫	১২,৮৩	১৭,৮৬
১৯৫২-৫৩	১,৪৬৮৩	১,০৬,৭৮	৪০,০৫	১৭,৮৩	১৮,৪৯
১৯৫৩-৫৪	১,৫২,৭৮	১,১৪,৮১	৩৭,৯০	১৪,২৬	২০,২৯
১৯৫৪-৫৫	১,৭৭,৩২	১,২২,১৩	৫৫,১৯	২৪,৬০	১৯,৭৮
১৯৫৫-৫৬	২,০২,৪৩	১,৩৫,১৭	৬৭,২৬	৩৭,০১	১৯,২৭
১৯৫৬-৫৭ (আনুমানিক)	২,১৯,৮৩	১,৬৩,৪১	৫৬,৪২	২৬,০৪	১১,১২

এই হিসেবটিকে খাদ্য উৎপাদনের হিসেবের সঙ্গে মিলিয়ে নিন—যোগাযোগ স্পষ্ট। ১৯৫২-৫৩ সনে ভাল শস্য হয়েছিল, পরের বছর আরও অনেক বেশী—সবচেয়ে বেশী। এখানে দেখা যাচ্ছে, মোট সঞ্চয় ১৯৫৪-৫৫ সনে আগের চেয়ে বেশী হয়েছিল, '৫৫-৫৬ সনে সবচেয়ে বেশী। জাতীয় আয়ের হিসেবেও ঠিক এই কথাই প্রতিফলিত হয়েছে(৪)—

অবশ্য হিসেবগুলি constant priceএ না হয়ে current priceএ হওয়ায় হিসেবটার একটু হেরফের হতে পারে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দামের হেরফেরের যে হিসেব দিয়েছেন (Currency & Finance Report, 1956-57, p 108) তাতে দেখা যায়, কৃষিজ পণ্যের তুলনায় শিল্পে দাম কম বাড়লেও খুব কম নয়, কিন্তু সেই সূক্ষ্ম হিসেবের মধ্যে না গিয়েও মোটামুটি এ-কথা নিশ্চয়ই বলা যায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের সঙ্গে এরও যোগাযোগ স্পষ্ট। দেখা যাচ্ছে শিল্প ইত্যাদিতে ধীরে ধীরে বেড়েছে, কিন্তু যে বছরই ভাল ফসল হয়েছে সেই বছরই জাতীয় আয়ে কৃষির দান বেড়ে গিয়েছে। ১৯৫৩-৫৪ সনের হিসেব দেখলে এ-কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে বছর আভ্যন্তরে জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০·৭ ভাগ এসেছিল কৃষি হতে। এর

পরেও কি কৃষিপ্রধান অংশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে? সুতরাং আমার প্রথম মোদ্দা কথা হল পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য গ্রামীণ অংশকে সবল করতে হবে। প্রথম পরিকল্পনায় তা হয়নি। সুবৃষ্টির ফলে যে সাফল্য তা বুনিয়াদী সাফল্য নয়—সেইটেকে বুনিয়াদী সাফল্য বলে মনে করলে আমরা কঠিন

In Rs abja—current prices

	১৯৪৮-৪৯	১৯৫০-৫১	১৯৫২-৫৩	১৯৫৩-৫৪	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৫-৫৬	৫৬-৫৭
কৃষি	৪২·৫	৪৮·৯	৪৮·১	৫৩·১	৪৩·৫	৪৫·৩	৫৬·৯
(মোটের শতকরা ভাগ %)	(৪৯·১%)	(৫১·৩%)	(৪৯·০%)	(৫০·৭%)	(৪৫·৩%)	(৪৫·৪%)	(৪৯·৮%)
খনি, শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প	১৪·৮	১৫·৩	১৭·০	১৭·৭	১৮·০	১৮·৫	১৯·৭
(%)	(১৭·১%)	(১৬·১%)	(১৭·৩%)	(১৬·৯%)	(১৮·৭%)	(১৮·৫%)	(১৭·৩%)
ব্যবসা, যানবাহন ও যোগাযোগ	১৬·০	১৬·৯	১৭·৮	১৮·০	১৮·১	১৮·৮	১৯·৩
(%)	(১৮·৫%)	(১৭·৭%)	(১৮·১%)	(১৭·২%)	(১৮·৮%)	(১৮·৮%)	(১৬·৯%)
অন্যান্য	১৩·৪	১৪·৪	১৫·৪	১৬·০	১৬·৫	১৭·৩	১৮·১
(%)	(১৫·৫%)	(১৫·১%)	(১৫·৭%)	(১৫·২%)	(১৭·২%)	(১৭·৩%)	(১৫·৯%)
নিজের দেশের নীট উৎপাদন—ফ্যাক্টর কস্টে (Net domestic production at factor cost)	৮৬·৭	৯৫·৫	৯৮·৩	১০৪·৮	৯৬·১	৯৯·৯	১১৪·০
	(১০০·২%)	(১০০·২%)	(১০০·১%)	(১০০·০%)	(১০০·০%)	(১০০·০%)	(৯৯·৯%)

স। তার পাশে পাশেই বহু জমি জলাভাবে পড়ে আছে দেখা যায়। বিশেষত ইদানীং পুকুর বা দিঘিগুলিও মজে এসেছে, তা হতে আগের মত আর সেচ হয় না। তার ফলে বহু জমিতে ভালরকম চাষ হচ্ছে না, অনেক বছরই শস্যের ক্ষতি হচ্ছে। অথচ যাঁরা এই এলাকার সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা সকলেই জানেন, এখনও বহু নদী আছে (ব্রহ্মাণী, দ্বারকা, কানা ময়ূরাক্ষী ইত্যাদি) যার জল নষ্ট হচ্ছে। পূর্বকালে গ্রামের লোকের প্রথা ছিল বালির বাঁধ বেঁধে এইসব নদীর জল হতে সেচ দেওয়া। এতে অর্থব্যয় নেই। এখন যদি ভাল করে খোঁজ-খবর নেওয়া যায়, কতগুলি জায়গায় এরকম বাঁধ দিলে সবচেয়ে বেশী বাঁধ দেওয়া যায়, কী করে পরস্পরের মধ্যে জল নিয়ে ঝগড়া না করে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে ময়ূরাক্ষীর বাইরেও লক্ষ লক্ষ একর জমিতে জল সরবরাহ হতে পারে। তার জন্য প্রয়োজন জমি ও জলের সম্পূর্ণ হিসেব, জমির contour, জমির প্রকৃতি, ফসল কী হয়, ফসলের প্যাটার্ন বদলিয়ে আরও লাভজনক করা যায় কিনা—এসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব নিয়ে সামগ্রিক পরিকল্পনা। আমাদের বর্তমান পরিকল্পনা এতদূর অগ্রসর হয়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্য যেমন স্থায়ী হয়ে উঠছে, আমাদের চেষ্টাও তেমনি বৃহত্তর ব্যাপকতর এবং তীব্রতর হতে হবেই। তেমনি এই অঞ্চলেই যেখানে বীরভূমের উচ্চভূমি শেষ হয়ে ভাগীরথীর সমতট আরম্ভ হল, সেই ভূমি-সন্ধিতে বহু বিল আছে (তেলকর, পাটনা, বেলুন সাঁকুরা প্রভৃতি)। আপাতত এই জল ব্যবহারের কোনও ব্যবস্থা নেই—যাদের জমি বিলের ধারে তারা গরম কালে কিছু কিছু বোরো ধান চাষ করে মাত্র। কিন্তু যদি এই-গুলিতে মাঝারি সাইজের পাম্প বসান যায় (সোনারপুরে আড়াপাঁচের মত বৃহৎ পাম্প নয়) এবং সে-জল যদি ঠেলে উপর পর্যন্ত তোলা যায় তাহলে উপরের জমিতে আউস বা আমন সেচ পাবে, আর তলার জমিতে বিলের জল একটু কমায় আরও বেশী বোরো ধান হতে পারবে — একসঙ্গে দু-দিকে উপকার হবে। এইরকম উদাহরণ অজস্র দেওয়া যায়।

এর সঙ্গে আর একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। সেটি হল অর্থনীতির কথা। আমি বারবার বলবার চেষ্টা করেছি, খাদ্য-সমস্যার যেমন সমাধান করতে হবে, তার সঙ্গে অর্থনৈতিক সমস্যারও সমাধান করতে হবে। বস্তুত অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান না হলে খাদ্য-সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গটি এতই বড় যে, এই উপলক্ষ্যে তার পুরোপুরি আলোচনা সম্ভব নয়। চার পাঁচটি কথামাত্র উল্লেখ করব—

(১) আমরা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নতির প্রধান কৌশল ঠিক করেছি, অর্থ ঢালতে পারলেই সেই অর্থ সমাজ-দেহে সঞ্চালিত হতে থাকবে, ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়তে থাকবে। পশ্চিমী দেশ হতে আমরা এই তত্ত্বটি আমদানি করেছি। পশ্চিমী দেশে এই তত্ত্ব অবশ্যই খাটে, কেননা সেখানে উপকরণ সবই তৈরী, অর্থ পেলেই অর্থনৈতিক চাকা ঘুরতে থাকবে। কিন্তু এ-দেশে সে অবস্থাই নেই। যন্ত্রপাতি সব প্রস্তুত আছে? ব্যবসার সব ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে? সংসার চালাবার যথেষ্ট অর্থ মজুদ আছে, যে-টাকা পেলে সেই টাকা ব্যবসাতেই লগ্নি হবে, সংসারের প্রয়োজন মেটাতে যাবে না? (এই প্রসঙ্গে একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করি। ১৯৫৬ সনে মুর্শিদাবাদের কান্দী মহকুমায় দারুণ বন্যা হয়েছিল। একটি ছেলে এসে মহকুমা শাসক মহাশয়কে বলল, বন্যায় পড়ার বই ভেসে গিয়েছে, বই কিনবার জন্য সাহায্য করুন। মহকুমা শাসক বললেন, বাবা, আমি বই কেনার সাহায্য দেবার অনুমতি চেয়েছি সরকারের কাছে, এখনও অনুমতি আসেনি, এখন কী করতে পারি বল। ছেলেটি বলল, এখন ত আপনি Cattle purchase loan দিচ্ছেন, তা-ই দিন, তা হতেই চালিয়ে নেব। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।) কাজেই এখনকার অর্থনীতিক কাঠামোর মূলে প্রবেশ করতে হবে এবং আরও অনেক বেশী সক্রিয়ভাবে সমাজকে উৎপাদন ও বণ্টনে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

(২) আমি ক্রমশই অনুভব করছি, মিশ্র অর্থনীতি আর যেখানেই চলুক, ভূমি ও ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রায় অচল হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা ভেবে দেখা দরকার। মিশ্র অর্থনীতির একটা বড় কথা হল ব্যক্তি-গত মালিকানার নির্বাধ অধিকার এবং স্বচ্ছন্দ কেনাবেচা। আজও আমাদের কৃষি ও গ্রামকে আমরা এই ধারণা অনুসারে পরি-চালিত করতে চাচ্ছি। ধরা যাক, প্রকৃত চাষীকেই জমির মালিক করা হল। তারপর তাদের স্বচ্ছন্দ বিক্রয়ের অধিকার থাকলে আবার জমি যে অকৃষক মহাজনদের হাতে যাবে না, তার নিশ্চয়তা কী? সুতরাং এইখানে সমাজ বা রাষ্ট্রকে বলবার দরকার হয়েছে, আমি তোমায় মহাজনদের কাছে জমি বিক্রি বা বন্ধক রাখতে দেব না, মহাজনের কাছে যে টাকার জন্য তুমি যাচ্ছিলে, সেই টাকা আমি ধার দেব, তোমার চাষের জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থ সরবরাহ করবে সরকারই। তা নইলে শুধু নিষেধাত্মক ব্যবস্থায় ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। 'না' বলবার সঙ্গে সঙ্গে সজোরে সাহসের সঙ্গে 'হাঁ' বলার দিন এসেছে। তার অর্থই হচ্ছে অন্তত এইদিক হতে মিশ্র অর্থনীতি সম্পূর্ণ তুলে দিয়ে পুরোপুরি সমাজতন্ত্রের দিকে যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে হবে। তা ছাড়া উপায় নেই। এই কথাই ত দিকে দিকে। ধান কেনা, ধান হতে চাল তৈরী করা, সেই চাল বাজারে চালান করা—এসবে মিলগুলির অবাধ অধিকার, সময় সময় সামান্য কিছু নিয়ন্ত্রণ হয় এই মাত্র। সবটাই ব্যক্তিগত মালিকানার 'পবিত্র' অধিকার হতে উদ্ভূত। তেমনি যারা চাল বিক্রি করে তাদেরও অবাধ অধিকার। সেই সঙ্গে কাজের বেলায় দেখছি, বহু সময়েই লোভের বশবর্তী হয়ে দাম যথেচ্ছ চড়িয়ে দেবার অবাধ অধিকারও কায়েম হয়ে বসেছে। এ-জিনিস চলতে পারে না। কাজেই এইসব দিকে সমাজায়ত্ত ব্যবস্থা না করতে পারলে গ্রামীণ অর্থ-জীবনের পুরো কাঠামোটা সুষ্ঠুভাবে বেঁধে দিতে পারা যাবে না। চাষী জমির মালিক হবে, এটা প্রথম ধাপ। কিন্তু তারপরের ধাপই হল তার অর্থাৎ চাষের প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে, তার ব্যবস্থা করতে হবে, সমবায় করতে হবে, এমন কি গ্রাম ও শহরে খাদ্য বিক্রয় ব্যবসাও সমবায়ের মাধ্যমে করার চেষ্টা করতে হবে, অর্থ সরবরাহ করতে হবে—এইভাবে তাদের অর্থ-নৈতিক জীবনের পুনর্গঠন করে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত এই কথাই সত্য যে, জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০% যে অংশ থেকে আসে, তাদের অর্থ সঞ্চয় বাড়লে তবেই আমরা জাতীয় পরিকল্পনা সহজে সফল করতে পারব(৫)।

---

* এইবার ক্ষুদ্র শিল্প ও বৃহৎ শিল্প পৃথক দেখান হইয়াছে। ক্ষুদ্র শিল্পে ১৬০ কোটি (৩.৬%), বৃহৎ শিল্পে ও খনিতে ৭৯০ কোটি (১৭.৫%), দুয়ে মিলিয়া ৯৫০ কোটি (২১.১%)।

(১) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, পৃষ্ঠা ১১।

(২) Appraisal and Prospects of the Second Five-Year Plan, May 1958: Planning Commission, p. 13.

(৩) Currency and Finance Report 1956-57, p. 183.

(৪) Estimates of National Income, 1948-49 to 1956-57, p. 2, Central Statistical Organisation, Government of India.

(৫) এই প্রসঙ্গে Capital (14-8-58) পত্রিকায় প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখের প্রবন্ধের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নীলকর

সেদিন সন্ধ্যার পর আমরা মাত্র তিনজন সভ্য ক্লাবে উপস্থিত ছিলাম—আমি, বরদা এবং এক জন নূতন সভ্য, হিরণ্ময়বাবু। ইনি সম্প্রতি সিগারেট ফ্যাক্টরিতে চাকরি লইয়া এখানে আসিয়াছেন। সন্ধ্যা কাটাইবার জন্য ক্লাবের সভ্য হইয়াছেন। বেশ মিশুক ও রসিক লোক।

ফাল্গুন মাস। খোলা জানলা দিয়া বাতাস আসিয়া টেবিলের উপর পাট-করা খবরের কাগজখানাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, মাথার উপর বিদ্যুৎবাতিটা প্রখরভাবে জ্বলিতেছে। আমরা দুই-চারিটা অনাবশ্যক কথা বলিয়া নীরব হইয়া পড়িয়াছি। বরদা কড়িকাঠের দিকে তন্ময় চক্ষু তুলিয়া বোধকরি নূতন ভৌতিক গল্প উদ্ভাবন করিতেছে। হিরণ্ময়বাবু লম্বা একটা হোল্ডারে সিগারেট জুড়িয়া টানিতেছেন এবং থাকিয়া থাকিয়া বরদার দিকে কটাক্ষপাত করিতেছেন। আমি ভাবিতেছি—

হঠাৎ হিরণ্ময়বাবু বলিলেন, "বরদাবাবু, আপনি নাকি ভূত দেখেছেন?"

চমকিয়া মুখ তুলিলাম। বরদাকে এই প্রশ্ন করা আর পাগলকে সাঁকো নাড়িতে বারণ করা একই কথা। হিরণ্ময়বাবু নূতন লোক, বরদাকে এখনও ভাল করিয়া চেনেন নাই। আমি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম।

বরদা কড়িকাঠ হইতে চক্ষু নামাইয়া তন্ময় দৃষ্টিতে হিরণ্ময়বাবুর পানে চাহিল। এবং ঠিক এই সময় বিদ্যুৎবাতি নিবিয়া ঘর অন্ধকার হইয়া গেল। অতর্কিত ঘটনায় হিরণ্ময়বাবু হেঁচকি তোলার মত একটা শব্দ করিলেন।

হিরণ্ময়বাবুর প্রশ্নের সঙ্গে আলো নিবিয়া যাওয়ার কোনও অনৈসর্গিক সংযোগ আছে তাহা মনে করিবার কারণ নাই। কিছু-দিন হইতে এই ব্যাপার ঘটিতেছিল, হঠাৎ আলো নিবিয়া সমস্ত পাড়াটাই নিরালোক হইয়া যাইতেছিল। বৈদ্যুতিক কর্তারা বলিতেছিলেন, লাইনের দোষ হইয়াছে। কিন্তু দোষ ধরিতে পারিতেছিলেন না। আজও তাহাই হইয়াছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে আলো জ্বলিবে না।

অন্ধকারে বসিয়া আছি। প্রথম কথা কহিল বরদা, তাহার কণ্ঠস্বরে বেশ একটু পরিতৃপ্তির সুর ধরা পড়িল। যেন তাহার গল্পের পরিবেশ রচনার জন্যই আলো নিবিয়া গিয়াছে। সে বলিল, "ভূত আমি অনেক দেখেছি, হিরণ্ময়বাবু। দিশী ভূত, বিলিতী ভূত, ভালমানুষ ভূত, দুর্দান্ত ভূত। মানুষ যেমন হরেক রকমের আছে ভূতও

তেমনি। কিন্তু গত পৌষ মাসে যে-ভূতটিকে দেখেছিলাম, তার মতন অশ্লীল ভূত জীবনে দেখিনি।"

বরদার গল্প ফাঁদিবার টেকনিক আমাদের জানা আছে। গোড়াতেই চমকপ্রদ একটা কথা বলিয়া শ্রোতাদের হতবুদ্ধি করিয়া দেয়, তারপর শ্রোতারা সামলাইয়া উঠিবার আগেই গল্প শুরু করে। তখন আর তাহাকে থামাইবার উপায় থাকে না। উপরন্তু আজ হিরন্ময়বাবু অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন, বলিলেন, "অশ্লীল ভূত কী রকম! কাপড়চোপড় পরে না?"

বরদা বলিল, "ঠিক ওরকম নয়। ভূতকে অশ্লীল কেন বলছি তা বুঝতে হলে গল্পটা শোনা দরকার। গত পৌষ মাসে আমি মজঃফরপুরে গিয়েছিলাম—"

গল্প আরম্ভ হইয়া গেল। অন্ধকারে হিরন্ময়বাবুর সিগারেটের অগ্নিবিন্দুটি থাকিয়া থাকিয়া স্ফুরিত হইতেছে, দক্ষিণা বাতাস খবরের কাগজ লইয়া ফর্ ফর্ শব্দে খেলা করিতেছে, তাহার মধ্যে বরদার নিরালম্ব কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি:—

"মজঃফরপুর জেলায় আমাদের সামান্য জমিজমা আছে। জায়গাটার নাম নীলমহল। আগে সাহেবরা নীলের চাষ করত। তারপর নীলের চাষ যখন উঠে গেল তখন আমার ঠাকুরদা ওটা কিনেছিলেন। এখন সেখানে ধান হয়, আখ হয়, আম-লিচুর বাগানও আছে। দু-চার ঘর প্রজা আছে। আমাদের সাবেক নায়েব শিবসদয় দাস সেখানে থেকে সম্পত্তি দেখাশোনা করেন। দাদা শীতকালে গিয়ে তদারক করে আসেন।

"এ-বছর দাদা লম্বেগো নিয়ে বিছানায় শুলেন। কী করা যায়? ধান কাটার সময়, আখও তৈরী হয়েছে। এ সময় মালিকদের একবার যাওয়া দরকার। শিবসদয়বাবু অবশ্য লোক ভালই, বিপত্নীক নিঃসন্তান মানুষ, চুরি-চামারি করেন না। কিন্তু সম্প্রতি তিনি তাড়ি এবং অন্যান্য ব্যাপারে বেশী আসক্ত হয়ে পড়েছেন; কাজকর্ম ভাল দেখতে পারেন না, প্রজারা লুটেপুটে খায়। সুতরাং আমাকেই যেতে হল।

"ছেলেবেলায় দু-একবার নীলমহলে গিয়েছি, তারপর আর যাইনি। মজঃফরপুর শহর থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে; সাম্পানী নামে একরকম বলদ-টানা গাড়ি আছে, তাতেই চড়ে যেতে হয়। পৌষের মাঝামাঝি একদিন বিকেলবেলা গিয়ে পৌঁছলাম। ওদিকে তখন প্রচণ্ড শীত পড়েছে।

"আগে খবর দিয়ে যাইনি, আগে খবর দিয়ে গেলে জমিদারির প্রকৃত স্বরূপ দেখা যায় না, কর্মচারীরা ধোঁকার টাটি তৈরি করে রাখে। গিয়ে দেখি কাছারি-বাড়ির সামনে তক্তপোশ পেতে শিবসদয়বাবু রোদ্দুরে বসে বসে বৃহৎতন্ত্রসার পড়ছেন, তাঁর সামনে এক কলসী তাড়ি। রোদ্দুরে তাড়ি গেঁজিয়ে কলসীর গা বেয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে।

"আমাকে দেখে শিবসদয় বড়ই অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন, তারপর এসে পায়ের ধুলো নিলেন। তিনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, কিন্তু আমি মালিক, তার উপর ব্রাহ্মণ। পায়ের ধুলো নিয়ে আমতা আমতা করে

বললেন, 'আগে খবর দিলেন না কেন? খবর পেলে আমি ইস্টিশনে গিয়ে—'

"মনে মনে ভাবলাম, খবর দিলে তাড়ির কলসী দেখতে পেতাম না। ন্যাকা সেজে বললাম, 'দাদা আসতে পারলেন না, তাঁর কোমরে বাত হয়েছে। হঠাৎ আমার আসা স্থির হল।' তারপর কলসীর দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটা কী?'

"শিবসদয় এতক্ষণে সামলে নিয়েছেন, বললেন, 'আজ্ঞে, তালের রস। শীতটা চেপে পড়েছে, এ-সময় তালের রসে শরীর গরম থাকে। একটু হবে নাকি?'

"বললাম, 'না। অনেকদিন বেহারে আছি বটে কিন্তু তাড়ি এখনও ধরি নি। আমার জন্যে বরং একটু চায়ের ব্যবস্থা করুন।'

"শিবসদয় 'হলধর' বলে হাঁক দিলেন। কাছারি-বাড়ির পিছন দিক থেকে হলধর এসে আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি আমার পায়ের কাছে মাটিতে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল। হলধরকে চিনি, মাঝে মাঝে ধান বিক্রির টাকা নিয়ে নাগপুরে আসে। বুড়ো লোক, জাতে কাহার কিংবা ধানুক, চোখ দুটো ভারি ধূর্ত। কাছারিতে চাকরের কাজ করে আর বিনা খাজনায় দু-তিন বিঘে জমি চাষ করে।

"শিবসদয় বললেন, 'ছোটবাবুর জন্যে চা আর জলখাবার তৈরি কর।'

"হলধর বলল, 'চা জলখাবার! আজ্ঞে— মা—মাসি কস্তুরীকে এখনি ডেকে আনছি। সে সব জানে।'

"হলধর ত্রস্তসন্ত্রস্তভাবে বাইরে চলে গেল, বোধহয় গ্রামে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কস্তুরী কে?'

"শিবসদয় একটু থমকে বললেন, 'কস্তুরী —হলধরের নাতনী।'

"শিবসদয় আমাকে কাছারিতে নিয়ে গিয়ে বসালেন। কাছারি পাকা বাড়ি নয়, পাশা-পাশি তিনটে মেটে ঘর, সামনে টানা বারান্দা, মাথায় খড়ের চাল। ভিত বেশ উঁচু, কিন্তু অনাদরে অবহেলায় মাটি খসে খসে পড়ছে। চালের অবস্থাও তথৈবচ, কতদিন ছাওয়া হয়নি তার ঠিক নেই। তিনটে ঘরের একটাতে দপ্তর, মাঝের ঘরটা শিবসদয়বাবুর শোবার ঘর, তার পাশে রান্নাঘর। তিনটে ঘরের অবস্থাই সমান; মেঝেয় ধুলো উড়ছে, চালে ফুটো। শিবসদয়ের উপর মনটা বিরক্ত হয়ে উঠল। তাড়ি খেয়ে খেয়ে লোকটা একেবারে অপদার্থ হয়ে পড়েছে। নেহাত পুরনো চাকর, নইলে দূর করে দিতাম।

"শিবসদয় বোধহয় আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন, কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'আমার বড় চুক হয়ে গেছে। আপনি আসবেন জানলে সব ফিটফাট করে রাখতাম। নিজের জন্যে কে অত করে! যা হক, এবার ধান কাটা হলেই চালটা ছাইয়ে ফেলব।'

"মন একটু নরম হল। কাছারি থেকে নেমে এসে বললাম, 'চায়ের দেরি আছে, আমি ততক্ষণ চারদিক ঘুরে দেখি। ছেলে-বেলায় দেখেছি, ভাল মনে নেই।'

শিবসদয় বললেন, "চলুন আমি দেখাচ্ছি।"

"দুজনে বেরুলাম। সত্তর-আশী বিঘা চাষের জমি, তার মাঝখানে বিঘে চারেক উঁচু জায়গা; এদেশে বলে ভিঠ জমি। এই উঁচু জায়গাটার উপর আমাদের কাছারি। আগে এখানে নীলকর সাহেবদের কুঠি ছিল। মাঝখানে মস্ত একটা পুকুর; এই পুকুরে নীলের ঝাড় পচিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার কড়ায় সেদ্ধ করে নীলের ক্বাথ বার করত। এখন পুকুর মজে গেছে, যেটুকু জল আছে তা পদ্ম আর কলমির দামে ভরা। পুকুরের উঁচু পাড়ের একধারে সারি সারি সাহেবদের কুঠি ছিল, এখন কেবল ইটের স্তূপ। পুকুরের আর এক পাড়ে কাতার দিয়ে এক সারি বিরাট উনুন; উনুনের গাঁথুনি পাকা, তাদের ওপরে এখনও কয়েকটা লোহার কড়া বসান রয়েছে। এই সব কড়ায় নীল সেদ্ধ হত, এখন মরচে ধরে ফুটো হয়ে গেছে। তবু আছে, সাহেবরা যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনি পড়ে আছে।

"এই চার-বিঘে-জোড়া ভগ্নস্তূপের চার-দিকে ঝোপঝাড় জন্মেছে। বড় বড় গাছ গজিয়েছে। একটা বিশাল সূচীপর্ণ ঝাউ-গাছ হাত-পা মেলে পুকুরের ঈশান কোণটাকে আড়াল করে রেখেছে। বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেরালে মনে হয়, সবুজ সমুদ্রের মাঝখানে পাথুরে দ্বীপের উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি। ধানের খেত, আখের খেত, আম-লিচুর বাগান; বিকেলবেলার পড়ন্ত রোদ্রে তার উপর বাতাসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আম-লিচুর বাগানের কোলে প্রজাদের গ্রাম, মোট কুড়ি-পঁচিশটা খড়-ছাওয়া কুঁড়ে ঘর। বড় সুন্দর দেখতে।

"কিন্তু দেখতে যতই সুন্দর হক, এখান-কার আবহাওয়া ভাল নয়। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে নিজের অগোচরেই একটা কাঁটা আমার মনে বিঁধতে লাগল। কোথায় যেন একটা বিকৃত পচা অশুচিতা লুকিয়ে আছে, ঢাকা নর্দামার চাপা দুর্গন্ধের মত। নীলকর সাহেবেরা শুধু অত্যাচারী ছিল না, পাপী ছিল। এমন পাপ নেই যা তারা করত না। তাদের পাপের ছাপ যেন এখনও এ জায়গা থেকে মুছে যায়নি। মনে পড়ল, দাদা বলেছিলেন,—নীলমহলের বাতাসে ম্যালে-রিয়ার চেয়েও সাংঘাতিক বিষ আছে; ওখানে বেশীদিন থাকলে মানুষ অধঃপাতে যায়, অমানুষ হয়ে যায়।

"ফিরে আসতে আসতে হঠাৎ চোখে পড়ল, ঝাউগাছটার আড়ালে একটা পাকা ঘর। আঙুল দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'ওটা কী?'

"শিবসদয় বললেন, 'ওটা কোৎঘর।'

"'কোৎঘর! সে কাকে বলে?'

"'নীলকরদের আমলের ঘর। প্রজারা বজ্জাতি করলে সাহেবেরা তাদের ধরে এনে ওই কোৎঘরে বন্ধ করে রাখত। খুব মজবুত করে ঘর গড়েছিল, যেন লখীন্দরের লোহার ঘর।'

"চলুন ত দেখি।"

"গিয়ে দেখি ঝাউগাছের আওতায় ছোট একটি ঘর। খুব উঁচু নয়, বেঁটে নিরেট চৌকশ, জগদ্দল পাথরের মত মজবুত ঘর। চব্বিশ ইঞ্চি চওড়া দেয়াল, মোটা-মোটা-গরাদ-লাগান জানলার লোহার কবাট খোলা রয়েছে, দরজার লোহার কবাটও খোলা। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম; ইট কাঠ দরজা জানলা কিছুই নষ্ট হয়নি, ষাট-সত্তর বছর ধরে দিব্যি অটুট রয়েছে।

"মনে হল, কোৎঘর কিনা, তাই অটুট আছে। সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে, তার জায়গায় অন্য শাসনতন্ত্র আসে, কিন্তু কারাগার ঠিক খাড়া থাকে। মানুষ যখন সমাজ গড়েছিল তখন কারাগারও গড়েছিল, যতদিন একটা আছে ততদিন অন্যটাও থাকবে।

"দোরের কাছে গিয়ে ভিতরে উঁকি মারলাম। মেঝে শান-বাঁধান, দেয়ালের চুন-কাম এখনও বোঝা যায়। আমি শিবসদয়কে বললাম, 'ঘরটা ত বেশ ভাল অবস্থাতেই আছে। ব্যবহার করেন না কেন? দরজা জানলা কি জাম হয়ে গেছে?'

"শিবসদয় 'আজ্ঞে—' বলে থেমে গেলেন। আমি দরজার কবাট ধরে টানলাম; মরচে-ধরা হাঁসকলে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ হল বটে, কিন্তু বেশ খানিকটা নড়ল। আমি শিব-সদয়ের পানে তাকালাম। তিনি উৎকণ্ঠিত-

ধবল একজিমা, বাতরক্ত, ছুলি, মেচেতা ব্রণাদির দাগ ও বিবিধ চর্মরোগ মুক্তির বিশ্বস্ত চিকিৎসা-কেন্দ্র। হতাশ রোগী পরীক্ষা করুন। (সময় ৪—৮), ২০ বৎসরের অভিজ্ঞ চর্মরোগ চিকিৎসক—**পণ্ডিত এস, শর্মা,** (দেশবন্ধু আয়ুর্বেদ ভবন), ২৬।৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯।

রান্নাঘর থেকে নেমে এল

ভাবে বললেন, 'সন্ধে হয়ে এল. চলুন এবার ফেরা যাক।'

"সূর্যাস্ত হয়েছে কি হয়নি, কিন্তু ঝাউ-গাছতলায় ঘোর ঘোর হয়ে এসেছে। কাছারি-বাড়ি এখান থেকে বড়জোর এক শ গজ। আমি দরজা ছেড়ে পা বাড়ালাম। ঠিক এই সময় আমার কানের কাছে কে যেন খিসখিস শব্দ করে হেসে উঠল। আমি চমকে ফিরে তাকালাম। কেউ নেই। উপর দিকে চোখ তুলে দেখলাম, ঝাউগাছের ডালগুলো একটা দমকাহাওয়া লেগে নড়ে উঠছে। তারই শব্দ। কিন্তু ঠিক মনে হল যেন চাপা গলার হাসি।

"পুকুরের পাড় দিয়ে অর্ধেক পথ এসেছি, শিবসদয় একটু কেশে বললেন, 'কোৎঘরের জানলা দরজা বন্ধ করা যায়, কিন্তু বন্ধ থাকে না। আপনা-আপনি খুলে যায়।'

" 'তার মানে?' আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

"শিবসদয় বললেন, 'সেই জন্যেই ঘরটা ব্যবহার করা যায় না। ওতে সাহেব থাকে।'

" 'সাহেব থাকে! কোন্ সাহেব?'

" 'আজ্ঞে, আছে একজন।' শিবসদয় একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, 'এখন চলুন, রাত্রে বলব।'

"একটু বিরক্ত হলাম। লোকটা কি আমাকে ভূতের গল্প শুনিয়ে ভয় দেখাতে চায় নাকি? পীরের কাছে মামদোবাজি?

"যাহক কাছারিতে ফিরে এসে দেখলাম, পূর্ণকুম্ভটি স্থানান্তরিত হয়েছে; তক্তপোশের উপর কম্বল পাতা তার উপর ফরাস, তার উপর মোটা তাকিয়া। গদিয়ান হয়ে বসলাম। পশ্চিম আকাশে তখনও বেশ আলো রয়েছে, কিন্তু বাতাস ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। শিবসদয় ঘরে গিয়ে একটা বালাপোশ গায়ে জড়িয়ে চৌকির কোণে এসে বসলেন। বোধহয় এই ফাঁকে শরীর-গরম-করা সঞ্জীবনী সুধা সেবন করে এলেন।

"এই সময় একটা মেয়ে রান্নাঘর থেকে নেমে এল; দু হাতে বড় কাঁসার থালার উপর চায়ের পেয়ালা আর জলখাবারের রেকাবি। চলনের ভঙ্গীতে বেশ একটু ঠমক আছে, হিন্দীতে যাকে বলে লচক্। উঠন্ত বয়স, নিটোল পুরন্ত গড়ন। গায়ের রঙ ময়লা বটে, মুখখানাও সুন্দর বলা চলে না। পুরু ঠোঁট, চোয়ালের হাড় চওড়া, চোখের দৃষ্টি নরম নয়। কিন্তু সব মিলিয়ে একটা দুরন্ত আকর্ষণ আছে—

"হলধরের নাতনী কবুতরী।

"আমার সামনে থালা রেখে আমার মুখের পানে চেয়ে হাসল, সাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠল। সহজ ঘনিষ্ঠ প্রগল্‌ভতার সুরে বলল, 'ছোট মালিককে এই প্রথম দেখলাম।'

"আমি উত্তর দিলাম না। শিবসদয়ের দিকে তাকালাম। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি চা খাবেন না?'

"শিবসদয় অস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'আমি খাই না।'

"কবুতরী আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, 'ছোট মালিক, দেখুন না চায়ে মিষ্টি হয়েছে কি না!' গলায় এতটুকু সঙ্কোচ নেই।

"চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে।'

"কবুতরী বলল, 'আর নিমকি? খেয়ে দেখুন না!'

"আমি নিমকিতে কামড় দিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে।'

"কবুতরী তবু দাঁড়িয়ে রইল। আমি তার দিকে একবার তাকালাম, সে আমার পানে অপলক চোখ মেলে চেয়ে আছে। মুখে ঘনিষ্ঠ নির্লজ্জ হাসি।

"শিবসদয় তার দিকে না তাকিয়েই একটু অপ্রসন্ন স্বরে বললেন, 'কবুতরি, দাঁড়িয়ে থেকো না, তাড়াতাড়ি রান্নার কাজ সেরে নাও। বাবু ক্লান্ত হয়ে এসেছেন, সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়বেন।'

"কবুতরী আরও খানিক দাঁড়িয়ে রইল, তারপর অনিচ্ছাভরে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

"আমি জিগ্যেস করলাম, 'আপনার রান্না কি কবুতরীই করে?'

" 'হ্যাঁ।'

" 'ওর ঘরে কে কে আছে?'

"একটু চুপ করে থেকে শিবসদয়ম্রিয়মাণ স্বরে বললেন, 'ও হলধরের কাছেই থাকে। একটা স্বামী ছিল, বছর খানেক আগে ওকে ত্যাগ করে চলে গেছে।'

"শিবসদয়ের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। এতক্ষণ যা চোখে পড়েনি হঠাৎ তাই দেখতে পেলাম। তাঁর শীর্ণ চেহারা, নিষ্প্রভ চোখ, ঝুলে-পড়া আলগা ঠোঁট,—তার সাম্প্রতিক জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস যেন ওই মুখে লেখা রয়েছে। বুড়ো বয়সে তিনি শুধু তালরসেরই রসিক হননি, অন্য রসেও মজেছেন। পরকীয়া রস। কবুতরী ছোট ঘরের স্বৈরিণী মেয়ে, সে তাঁকে গ্রাস করেছে। কিন্তু কবুতরী শিকারী মেয়ে, বড় শিকার সামনে পেয়ে সে ছোট শিকারের পানে তাকাবে কেন? কবুতরীর ভাবভঙ্গী থেকে শিবসদয় তা বুঝতে পেরেছেন। তাই তাঁর মনে সুখ নেই।

"অথচ যখন বয়স কম ছিল, শিবসদয় তখন সচ্চরিত্র ছিলেন। লেখাপড়া বেশী না জানলেও মনটা ভদ্র ছিল। পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত তিনি আমাদের মুঙ্গেরের জমি-

জমা দেখতেন। কাজকর্মে দক্ষতা ছিল, অবৈধ লাভের লোভ ছিল না। আর আজ নীলমহলে এসে তাঁর এই অবস্থা! এটা কি স্থানমাহাত্ম্য? ম্যালেরিয়ার চেয়েও সাংঘাতিক বিষ তাঁর রক্ত দূষিত করে দিয়েছে?

"চা-জলখাবার শেষ করে বললাম, চলুন, ভেতরে গিয়ে বসা যাক। বাইরে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

"হলধর ঘরে ঘরে লণ্ঠন জেলে দিয়েছে। আমরা দপ্তরের মেঝেয় পাতা গদির ওপর গিয়ে বসলাম। শিবসদয় মূর্চ্ছভঙ্গ হয়ে আছেন, মাঝে মাঝে চোখ বেঁকিয়ে আমার পানে চাইছেন; বোধহয় বোঝবার চেষ্টা করছেন কবুতরীর দিকে আমার মন কতটা আকৃষ্ট হয়েছে।

"জিগ্যেস করলাম, 'রাত্রে শোবার ব্যবস্থা কী রকম? আমার সঙ্গে লেপ বিছানা সব আছে।'

"শিবসদয় বললেন, 'শোবার ঘরে আপনার বিছানা পেতে দিয়েছি। আমি এই গদির ওপরেই রাত কাটিয়ে দেব।'

"সিগারেট ধরিয়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসলাম। বললাম, 'এবার কোৎঘরের সাহেবের গল্প বলুন।'

"'একটু বসুন, আমি রান্নার খবরটা নিয়ে আসি।' বলে শিবসদয় উঠে গেলেন। মিনিট পাঁচেক পরে আবার ফিরে এসে বসলেন। গন্ধ পেয়ে বুঝলুম, শুধু রান্না পরিদর্শন নয়, শীতের অমোঘ মুষ্টিযোগও বেশ খানিকটা টেনেছেন; তাঁর চোখে মুখে সজীবতা ফিরে এসেছে।

"বললেন, 'আপনি কি সাহেবের কথা কিছুই জানেন না?'

"'কিছু না। কেউ কিছু বলেনি।'

"শিবসদয় তখন আরম্ভ করলেন, 'আমারও শোনা কথা। হলধর আর গাঁয়ের পাঁচজনের মুখে যা শুনেছি তাই বলছি।—আশী-নব্বুই বছর আগেকার ঘটনা। তখন নীলকর সাহেবদের ব্যাবসা গুটিয়ে আসছে, জার্মানির কারখানায় নকল নীল তৈরী হয়েছে। সেই সময় এখানে যে-সব সাহেব থাকত তাদের মধ্যে একটা ছোঁড়া ছিল ভয়ংকর পাজি। এখানকার নীলচাষীরা তার নাম দিয়েছিল 'বিল্লি-সাহেব'। প্রজারা কিছু করলে তাদের ধরে এনে হাসতে হাসতে যে-সব যন্ত্রণা দিত, তা শুনলে এখনও গা শিউরে ওঠে। গ্রীষ্মকালে হাত-পা বেঁধে রোদ্দুরে সারা দিন ফেলে রেখে দিত, শীতের রাত্তিরে পুকুরে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখত। আঙুলের নখের উপর পেরেক ঠুকে দিত। আর, কমবয়েসী মেয়েমানুষ দেখলে ত রক্ষে নেই। অন্য সাহেবরাও দরকার হলে প্রজাদের উপর অত্যাচার করত, ধরে এনে কোৎঘরে বন্ধ করে রাখত; কিন্তু বিল্লি-সাহেবের তুলনায় সে কিছুই নয়। বিল্লি-সাহেব রোজ নতুন নতুন যন্ত্রণা দেবার ফন্দি বার করত। অন্য সাহেবেরা তাকে সামলাবার চেষ্টা করত, কিন্তু পেরে উঠত না।

"'একবার একটা প্রজা দাদনের টাকা নিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিল, সাহেবেরা তার সোমত্ত বউকে ধরে এনে কোৎঘরে বন্ধ করে রেখেছিল। বউটার উপর অত্যাচার করার মতলব তাদের ছিল না। প্রজাটাকে জব্দ করাই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু বিল্লি-সাহেব মনে মনে অন্য ফন্দি এঁটেছিল। দুপুর-রাত্রে অন্য সাহেবেরা যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন সে কোৎঘরের তালা খুলে ঘরে ঢুকল।

"'বউটার কাছে ছোরাছুরি ছিল না। কিন্তু তার দু হাতে ছিল ভারী ভারী রুপোর বালা, এদেশে যাকে বলে কাঙনা। তাই দিয়ে সে মারল বিল্লি-সাহেবের রগে। সাহেব সেইখানেই পড়ে মরে গেল। বউটা পালাল।

"'অন্য সাহেবেরা জেগে উঠেছিল; তারা ব্যাপার দেখে ভয় পেয়ে গেল। তখন দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ বেরিয়েছে, লং সাহেব তার তর্জমা করে জেলে গেছে; এ সময় যদি এই ব্যাপার জানাজানি হয়, তা হলে আর রক্ষে থাকবে না। সাহেবেরা সেই রাত্রেই কোৎঘরের মেঝে খুঁড়ে বিল্লি-সাহেবকে কবর দিলে। তারপর মেঝে আবার শান বাঁধিয়ে ফেললে। বাইরে রটিয়ে দিলে, বিল্লি-সাহেব দেশে ফিরে গেছে।

"'এই ঘটনার দু-তিন বছরের মধ্যেই নীলের ব্যাবসা উঠে গেল, সাহেবেরা জমিদারি বিক্রি করে দেশে চলে গেল। আপনার ঠাকুরদা নীলমহল কিনলেন।

"'কোৎঘরটা সেই থেকে পড়ে আছে। শুনেছি, গোড়ার দিকে ঘরটাকে গুদাম হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, ওর দরজা জানলা বন্ধ রাখা যায় না, যতবার বন্ধ করা হয়, ততবার খুলে যায়। এমন কি দরজায় তালা লাগালেও ফল হয় না, তালা আপনা-আপনি খুলে যায়। তাই সকলের বিশ্বাস, বিল্লি-সাহেব ওখানে আছে।'

"শিবসদয় চুপ করলেন। আমিও খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'বিল্লি-সাহেবের ভূতকে কেউ দেখেছে?'

"'আজ্ঞে না, কেউ কিছু চোখে দেখেনি।'

"'আপনিও দেখেননি?'

"'না—কিন্তু অনুভব করেছি। একটা দুষ্ট প্রেতাত্মা আছে।' বলে শিবসদয় চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালেন।

"'আপনি প্রেতাত্মা বিশ্বাস করেন? [illegible] ভূত মানেন?'

"আজ্ঞে, সে কী কথা! প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করব না! আত্মা যদি থাকে প্রেতাত্মাও আছে।'

"'তা বটে।'

"যাঁরা আত্মার অস্তিত্বই বিশ্বাস করেন না তাঁদের কাছে এ যুক্তির কোনও মূল্য নেই। কিন্তু বিশ্বাসের একটা মূল্য আছে।

"কোৎঘরের ব্যাপারটা হয়ত একেবারে বুজরুকি নয়। ভূতপ্রেত সম্বন্ধে আমার একটু কৌতূহল আছে। ভাবলাম, ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। বিল্লি-সাহেব যদি সত্যি থাকে, অজ্ঞ চাষাভুষোর অলীক কুসংস্কার না হয়, তা হলে সেটা জানা দরকার।

"রাত্রি আটটার মধ্যে খাওয়া সেরে নিলাম। শিবসদয়ও আমার সঙ্গে বসলেন। রান্না বেশী নয়; ফুলকা রুটির সঙ্গে বেগুনপোড়া, হিঙ দিয়ে ঘন অড়র ডাল, মাংস, পুদিনার চাটনি আর ক্ষীর। মাংস কোথায় পেল কে জানে, হয়ত আমার জন্যেই পাঁঠা কেটেছিল। কিন্তু কবুতরী মাংসটা রেঁধেছিল বড় ভাল। এ-দিশী রান্না; একটু ঝাল বেশী, তার সঙ্গে আদা পেঁয়াজ রসুন বাটা আর আস্ত গোলমরিচ। খাওয়া একটু বেশী হয়ে গেল।

"খেয়ে উঠে আঁচাতে আঁচাতেই শীত ধরে গেল। আর বসলাম না, একেবারে শোবার ঘরে গেলাম। শিবসদয়ও সঙ্গে সঙ্গে এলেন।

"একটা তক্তপোশের উপর পুরু বিছানা পাতা হয়েছে, ঘরের কোণে হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলছে। আমি সঙ্গে একটা ইলেকট্রিক টর্চ এনেছিলাম, সেটা সুটকেস থেকে বার করে বালিশের পাশে রাখলাম। তারপর বিছানায় বসে সিগারেট বার করলাম। ঠান্ডায় আঙুলগুলো কালিয়ে গেছে, হাড়ে কাঁপুনি ধরেছে।

"শিবসদয় আমার অবস্থা দেখে একটু কেশে বললেন, 'এখানকার ঠান্ডা আপনার অভ্যেস নেই, লেপে শীত ভাঙবে না। কিন্তু—'

"'কিন্তু কী?'

"'যদি এক পেয়ালা গরম তালের রস খেয়ে শোন, তা হলে আর শীত করবে না'।

"একটু কড়া সুরেই বললাম, 'না।' তারপর সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'আপনি শুয়ে পড়ুন গিয়ে। কাল সকালে আপনার খাতাপত্তর দেখব।'

"শিবসদয় আর কিছু বললেন না, আস্তে আস্তে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

"আমিও আলোটা কমিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছি। নানা রকম চিন্তা মনে

আসছে...শিবসদয় আমাকে তাড়ি ধরাবার চেষ্টা করছেন......কবুতরী চেষ্টা করছে বড় শিকার ধরবার......যদি বেশী দিন এখানে থাকি আমার মনের অবস্থাটা কী রকম দাঁড়াবে?......বিল্লি-সাহেব—উঃ নীল-কর সাহেবগুলো কী শয়তানই ছিল......

"লেপের মধ্যে শরীর গরম হয়ে আসছে, সিগারেট শেষ করে চোখ বুজে শুয়ে আছি। এত তাড়াতাড়ি ঘুমন অভ্যেস নেই, তবু একটু তন্দ্রা আসছে—

"হঠাৎ চোখ খুলে গেল। দেখি, কবুতরী বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কমান লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় তাকে দেখে আমার যেন দম বন্ধ হয়ে এল; কখন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছে জানতে পারিনি।

"আমি চোখ খুলেছি দেখে কবুতরী আমার মুখের কাছে ঝুঁকে চাপা গলায় বলল, 'ছোট মালিক, আপনি থকে আছেন, আপনার পা টিপে দিই?'

"ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম: 'না, দরকার নেই। তুমি যাও।'

"কবুতরী মোটেই অপ্রস্তুত হল না, সহজ-ভাবে বলল, 'আচ্ছা। কাল ভোরে আমি আপনার চা তৈরি করে আনব। এখন ঘুমিয়ে পড়ুন।' সে ছায়ার মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"আমি কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর উঠে দরজা বন্ধ করতে গেলাম। দরজায় হুড়কো থাকবার কথা, কিন্তু হুড়কো নেই। বাইরের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার কোনও উপায় নেই। কী করা যায়? দরজাটা ভাল করে চেপে দিয়ে এসে শুলাম।

"আমি সাধু-সন্নিসি নই, আবার লুচ্চা-লম্পটও নই। নিজেকে ভদ্রলোক বলে মনে করি। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে। জীবনে প্রলোভন এসেছে, কিন্তু প্রলোভন যে এমন দুর্নিবার হতে পারে তা কখনও কল্পনা করিনি। মনের মধ্যে যে-সব চিন্তা আসতে লাগল সেগুলোকে ভদ্র চিন্তা বলতে পারি না। এ যেন নর্দমার পাঁক নিয়ে নোংরামির হোলিখেলা। সঙ্গে সঙ্গে কবুতরীর ওপর রাগও হতে লাগল; রাগ হতে লাগল তার চুম্বকের মত আকর্ষণ করার শক্তির ওপর। ছোটলোকের মেয়ে! নির্লজ্জ নষ্ট মেয়ে-মানুষ! পুরুষ-হ্যাংলা রক্তচোষা সুর্পণখার জাত!

"কণ্টকশয্যায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভাঙল একেবারে শেষরাত্রে। দেখি, লেপের মধ্যে ঠাণ্ডায় জমে গেছি। বাইরে একটা হাড়-কাঁপান হাওয়া উঠেছে; সেই হাওয়া কুলকুল করে ঘরে ঢুকছে। কিন্তু ঢুকছে কোথা দিয়ে? টর্চ জেলে চারদিকে ঘোরালাম। মাথার দিকে একটা ছোট জানলা আছে বটে, কিন্তু সেটা বন্ধ। দরজাও চাপা রয়েছে। মাটির দেয়ালে আলো ফেলে দেখলাম, কোথাও ফুটোফাটা আছে কি না। কিন্তু নেই। তারপর টর্চের আলো গিয়ে পড়ল চালের নীচে। সেখানে একটি মস্ত ফুটো। শেষরাত্রের হাওয়া সেই ফুটো দিয়ে ঢুকছে।

"নিরুপায়, চালের ফুটো বন্ধ করা যায় না। আগাপাস্তালা লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলাম; কিন্তু হাড়ের কাঁপুনি গেল না। মনে হল, এই সময় শিবসদয়বাবুর তালের রস পেলে কাজ হত। হাত-ঘড়িতে দেখলাম, পাঁচটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকী আছে। এখনও সকাল হতে দেড় ঘণ্টা। বিছানায় উঠে বসে সিগারেট ধরালাম।

"গোটা তিনেক সিগারেট পর-পর টানলাম, কিছু হল না। শীতের চোট চাড়ে ওঠে না। ভাবছি এবার কী করব, লণ্ঠনটাকে কোলে নিয়ে বসলে কেমন হয়! এমন সময় দোর ঠেলে কবুতরী ঘরে ঢুকল। তার হাতে চায়ের পেয়ালা ধোঁয়াচ্ছে। বাক্যব্যয় না করে পেয়ালা হাতে নিলাম। এক চুমুকে দুই-ই তিতটা যেন পড়ে গেল। কিন্তু শরীরের মধ্যে তৃপ্তি ভরে উঠতে লাগল। রক্ত গরম হওয়ার তৃপ্তি।

"কবুতরী হেসে বলল, 'সিগারেটের গন্ধ পেয়ে বুঝলাম, ছোট মালিকের ঘুম ভেঙেছে।'

"বললাম, 'তুমি কি বাড়ি যাওনি?'

"সে বলল, 'না। রান্নাঘরে উনুনের পাশে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছি নইলে মালিকের চা তৈরি করতাম কী করে?'

"চা শেষ করে পেয়ালা তার হাতে দিলাম, বললাম, 'আর এক পেয়ালা নিয়ে এস।'

"সে একগাল হেসে ছুটে চলে গেল। আশ্চর্য মেয়ে! কী অসম্ভব খাটতে পারে, শরীরে ক্লান্তি নেই। ভোরবেলা মালিকের চা তৈরি করে দেবার জন্যে সারা রাত উনুনের পাশে শুয়ে থাকতে পারে। অথচ অন্য দিকে আবার—

"দ্বিতীয় পেয়ালা চা এনে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'যাই, রাত্তিরের এঁটো বাসন-গুলো এই বেলা মেজে ফেলি। দরকার হলেই আমাকে ডাকবেন কিন্তু—আঁ?' ঘাড় বেঁকিয়ে হেসে কবুতরী চলে গেল।

"সেদিন বেলা নটার সময় দপ্তরে গিয়ে বসলাম, শিবসদয়কে বললাম, 'ও ঘরে আর আমি শোব না। আজ থেকে কোৎঘরে আমার শোবার ব্যবস্থা করুন।'

"শিবসদয় ঘাবড়ে গেলেন: 'কোৎঘরে! কিন্তু—'

"আমি বললাম, 'কিন্তু কী? বিল্লি-সাহেব? বিল্লি-সাহেবের সঙ্গে আমি বোঝা-পড়া করব, আপনার ভাবনা নেই।'

"তারপর প্রায় সারা দিনটাই কাজেকর্মে কেটে গেল। হিসেব নিকেশ, জমা খরচ, আম-লিচুর বাগান জমা দেওয়ার ব্যবস্থা, ধান কাটা এবং বিক্রির ব্যবস্থা। প্রজারা খবর পেয়েছিল আমি এসেছি, তারা এসে সেলাম করে গেল। কেউ এক টাকা, কেউ আট আনা সেলামি দিলে।

"দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে আমার নতুন শোবার ঘর তদারক করতে গেলাম। দুপুরের আলোয় জায়গাটা মোটেই ভুতুড়ে বলে মনে হল না। দিব্যি ঝরঝরে। হলধর ঘরটা ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে রেখেছে, একটা তক্তাপোশ ঢুকিয়েছে। দেখে-শুনে ফিরে এলাম। কোৎঘরে ভূত থাকে থাক্, ছাদে ফুটো নেই।

"বিকেলবেলাটাও কাজে-কর্মে কাটল। যত সন্ধে হয়ে আসতে লাগল, শিবসদয় ততই শঙ্কিত হয়ে উঠতে লাগলেন। শেষে রাত্রে খেতে বসে বললেন, 'দেখুন, আমার ভয় করছে। যদি কিছু ঘটে—'

"বললাম, 'কিছু ঘটবে না। বরং এ ঘরে শুলেই নিউমোনিয়া ঘটবার সম্ভাবনা আছে।'

"কবুতরী পরিবেষণ করছিল, খিল খিল করে হেসে উঠল। ও যখন থেকে শুনেছে আমি কোৎঘরে শোব, তখন থেকে ওর মুখে চোখে বিদ্যুৎ খেলছে। মনে মনে কী বুঝেছে কে জানে! কিন্তু ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয়, ভূত-টুত ও বিশ্বাস করে না। ভয়ের ভেবেছে—

"শিবসদয় কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'মালিকের সামনে হাসছিস! তোর সহবৎ নেই?'

"কবুতরী হাসি থামাল বটে, কিন্তু তার চোখ-মুখে চাপা কৌতুক উপচে পড়তে লাগল।

"রাত্রি সাড়ে আটটার সময় কাছারি-বাড়ি থেকে বেরুলাম। কবুতরী দাঁড়িয়ে রইল। শিবসদয় লণ্ঠন নিয়ে আমার আগে আগে চললেন, হলধর আর একটা লণ্ঠন নিয়ে পিছনে চলল। আকাশে এক ফালি চাঁদ আছে। কনকনে ঠাণ্ডা, কিন্তু হাওয়া নেই।

"কোৎঘরে পৌঁছলাম। দরজা জানলা খোলা রয়েছে; ঘরে বোধহয় ধুপধুনো দিয়েছিল, এখনও একটু গন্ধ লেগে আছে। তক্তপোশের উপর বিছানা পাতা, লেপ বালিশ সব আছে। এক কোণে গেলাস-ঢাকা জলের কুঁজো।

"হলধর ধূর্ত চোখে আমার পানে চেয়ে বলল, 'সব ঠিক আছে বাবু?' বুড়োটা সব জানে, সব বোঝে, কিন্তু বেশী কথা কয় না।

"টর্চ, সিগারেটের টিন, হাত-ঘড়ি বালিশের পাশে রাখলাম, ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে বললাম, 'সব ঠিক আছে। তোমরা এবার যাও। জানলাটা আপাতত খোলা থাক্,

পরে বন্ধ করব। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যেয়ো।'

"শিবসদয় একটু খুঁতখুঁত করলেন, তারপর লণ্ঠন নিয়ে বাইরে গেলেন। হলধর নিজের হাতের লণ্ঠনটি একটু উস্কে দিয়ে তক্তপোশের শিয়রের কাছে রাখল, ধূর্ত চোখে আমার পানে চেয়ে ঘাড় হেলিয়ে যেন ইশারা করল, তারপর ঘরের বাইরে গিয়ে লোহার দরজা ভেজিয়ে দিলে। মরচে-ধরা হাসকলে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ হল। আমি একা।

"জানলাটা খোলা, তার ভিতর দিয়ে চৌকশ খানিকটা দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। আমি গিয়ে জানলাটা পরীক্ষা করলাম। জানলায় ছিটকিনি আছে, ভিতর থেকে বন্ধ করা যায়। পাল্লা দুটো নেড়ে দেখলাম, সচল আছে, দরকার হলে বন্ধ করা যাবে।

"ফিরে এসে বিছানায় বসলাম। তরিবত করে সিগারেট ধরাতে গিয়ে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, আলোটা আস্তে আস্তে নিবে আসছে। তেল ফুরিয়ে গেল নাকি? কিন্তু তা ত হবার কথা নয়, সমস্ত রাত জ্বলবে বলে হলধর লণ্ঠনে তেল ভরে দিয়েছে। তবে—?

"আলোটা দপ্‌দপ্ করল না, কমতে কমতে নীল হয়ে নিবে গেল, যেন কেউ কল ঘুরিয়ে নিবিয়ে দিলে। ঘর অন্ধকার। জানলা দিয়ে কেবল বাইরের ফিকে জ্যোৎস্না দেখা যাচ্ছে। আমি মনটাকে শক্ত করে নিয়ে আবার সিগারেট ধরাতে গেলাম। ক্যাঁচ্ করে একটা শব্দ হল; চোখ তুলে দেখি, লোহার দরজা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে।

"তারপর কানের কাছে শুনতে পেলাম খিসখিস হাসির শব্দ। ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। হাসি কিন্তু বন্ধ হল না, কানের কাছে খিসখিস শব্দ চলতে লাগল। এবার আর ঝাউপাতার শব্দ বলে ভুল করবার উপায় নেই। হাসিই বটে। একটা অসভ্য অশ্লীল হাসি।

"হাসি অনেক রকম আছে। প্রাণখোলা হাসি, বিদ্রূপের প্যাঁচান হাসি, মুরুব্বিয়ানার গাম্ভারী হাসি, কাষ্ঠ হাসি। এ হাসি ও-ধরনের নয়। এ হাসির বর্ণনা করা শক্ত। এ হাসি শুনলে মনে হয় এর পিছনে অকথ্য নোংরামি লুকিয়ে আছে, যে হাসছে তার মনের পাঁক শ্রোতার গায়ে লেগে যায়। গা ঘিনঘিন করে।

"আমার গা ঘিনঘিন ত করলই, উপরন্তু শিরদাঁড়া সিরসির করে উঠল। কতটা ভয় কতটা ঘেন্না বলতে পারব না। তবে ভূত আছে, বিলি-সাহেব চাবাদের অলীক কল্পনা নয়।

"ভূতের সঙ্গে গা-শোঁকাশুঁকি আমার নতুন নয়। জানি, ভয় পেলেই বিপদ। আমি জোর করে নিজেকে শক্ত করে নিলাম। তারপর সিগারেট ধরালাম। নিবে-যাওয়া লণ্ঠনটা নেড়ে দেখলাম, তাতে তেল ভরা রয়েছে।

"লণ্ঠন আবার জ্বালালাম। লোহার দরজা টেনে আবার বন্ধ করলাম; তারপর খোলা জানলাটা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে দিলাম। দেখি এবার কী হয়!

"ইতিমধ্যে হাসি থেমে গিয়েছিল। আমি বিছানায় এসে বসলাম। লণ্ঠনটা আর নিবল না। কিছুক্ষণ পরে আর এক রকমের শব্দ কানে আসতে লাগল। এ শব্দও খুব মৃদু; যেন একটা কুকুর নিশ্বাস টেনে টেনে কী শুঁকছে আর ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বন্ধঘরে সিগারেটের ধোঁয়া তাল পাকাচ্ছিল, হঠাৎ মনে হল, প্রেতটা সেই গন্ধ শুঁকছে নাকি? হয়ত যখন বেঁচে ছিল খুব সিগারেট খেত—

"একটা অত্যন্ত দুষ্ট-প্রকৃতির অতৃপ্ত ক্ষুধিত প্রেতাত্মা এখানে আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রেতাত্মাদের শরীর ধারণ করবার ক্ষমতা থাকলেও দৈহিক অনিষ্ট করবার ক্ষমতা বেশী নেই। পাশ্চাত্ত্য দেশে Poltergeist নামে এক রকম বিদেহাত্মার কথা জানা আছে, যারা শূন্যে ঘরে বাসন-কোসন ভাঙে, টেবিলের উপর থেকে জিনিস ঠেলে মাটিতে ফেলে দেয়, আরও নানা রকম
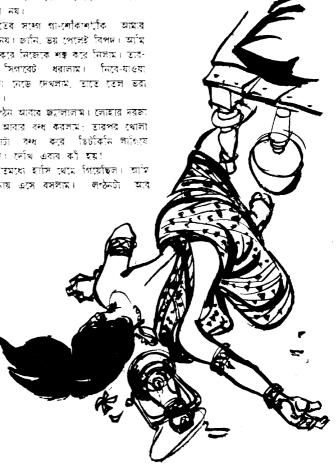
হঠাৎ চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল

ছোটখাট উৎপাত করে, কিন্তু এর বেশী কিছু করতে পারে না। বিল্লি-সাহেব বোধ হয় সেই জাতের ভূত।

"সিগারেট শেষ করে ফেলে দিলাম। ঘড়িতে দেখলাম ন'টা বেজে গেছে। এই পরিবেশের মধ্যে ঘুম যদিও সুদূরপরাহত, তবু লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

"খুট্! ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, জানলার ছিটকিনি খুলে গেছে। পাল্লা দুটো আস্তে আস্তে খুলছে। সঙ্গে সঙ্গে দরজার কপাটও। উঠে বসলাম। অমনি কানের কাছে ফিসফিস হাসি। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

"টর্চ হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে গেলাম। দোরের সামনে পায়চারি করতে লাগলাম। কী করা যায়? জানলা দরজা বন্ধ করে লাভ নেই, যতবার বন্ধ করব ততবার খুলে যাবে। সারা রাত দরজা জানলা খোলা থাকলে নির্ঘাত নিউমোনিয়া কিংবা প্লুরিসি। ফিরে যাব? কিন্তু ফিরে গেলে শিবসদয় মাথা নেড়ে বলবেন, 'আমি আগেই বলেছিলাম!' কবুতরী খিলখিল করে হাসবে। না, তার চেয়ে যেমন করে হক এই ঘরেই রাত কাটাতে হবে। যায় প্রাণ যাক প্রাণ।

"ঘরে গিয়ে আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে শুলাম। শুয়ে শুয়ে শুনছি। ঘরের মধ্যে একটা অদৃশ্য প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার খসখস পায়ের শব্দ। কখনও কানের কাছে জঘন্য অশ্লীল হাসি। একবার গব্ গব্ শব্দ শুনে মুণ্ডু বার করে দেখি, ঘরের কোণে কুঁজোটা কাত হয়ে পড়েছে, গব্ গব্ শব্দে জল বেরুচ্ছে। আমি আবার লেপ মুড়ি দিলাম।

"ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। ভূতের সংসর্গ অনেকটা গা-সওয়া হয়ে এসেছে, এইভাবে যদি রাতটা কেটে যায় মন্দ হবে না। বোধ হয় একটু তন্দ্রাও এসে গিয়েছিল, হঠাৎ চমকে উঠলাম।

"'ছোট মালিক!'

"মাথা বার করে দেখি, কবুতরী। এতক্ষণ ভূতের কার্যকলাপ দেখে যা হয়নি এবার তাই হল, বুকটা ধড়াস করে উঠল। আমি কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসলাম: 'তুমি! তোমার এখানে কী দরকার?'

"লণ্ঠনের আলোয় কবুতরীর দাঁত ঝকঝক করে উঠল। সে বলল, 'ছোট মালিককে দেখতে এলাম।'

"আমার গলাটা বুজে এল, বললাম, 'তোমার কি ভূতের ভয় নেই?'

"কবুতরী খিলখিল করে হাসল। এখানে চাপা সুরে কথা বলার দরকার নেই, বলল, 'মালিক কাছে থাকলে ভূতের ভয় কিসের?'

"এই সময় চোখে পড়ল, কবুতরীর পিছনে ঘরের দরজা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

"'ও কী? ও কী!' বলে আমি লাফিয়ে বিছানা থেকে নামলাম।

"তারপর—এক বিশ্রী কাণ্ড।

"কবুতরী হঠাৎ চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। আমি সম্মোহিত হয়ে দেখছি, সে ওঠবার চেষ্টা করছে, কিন্তু উঠতে পারছে না; প্রাণপণে শুধু চেঁচাচ্ছে। যেন একটা অদৃশ্য মূর্তির সঙ্গে সে ধস্তাধস্তি করছে। তার গায়ের কাপড় আলুথালু হয়ে যাচ্ছে।

"আমি আর থাকতে পারলাম না। এ অবস্থায় কী করা উচিত ছিল জানি না, কিন্তু আমি ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে এলাম। দরজা তখনও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি। পাছে বন্ধ হয়ে যায় এই ভয়েই বোধ হয় পালিয়ে এলাম।

"বাইরে এসে দেখি, একটা লোক ছুটতে ছুটতে এদিকে আসছে। হলধর! কাছেই কোথাও ঘাপটি মেরে ছিল, কবুতরীর চিৎকার শুনতে পেয়েছে। হলধর এখানে কেন, এ প্রশ্ন তখন মনে আসেনি; পরে বুঝেছিলাম, হলধর কবুতরীকে কোৎঘরে পৌঁছে দিতে এসেছিল, তারপর ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে কাছেই বসে অপেক্ষা করছিল।

"'কী হয়েছে—কী হয়েছে বাবু?' হলধর হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়াল। আমি কী বলব, দরজার দিকে শুধু আঙুল দেখিয়ে বললাম, 'কবুতরী!'

"দরজা তখন বন্ধ হয়ে গেছে। ভিতর থেকে কবুতরীর চিৎকার আর গোঙানির শব্দ আসছে।

"হলধর দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমিও গেলাম। যে দরজা বন্ধ করে রাখা যেত না, সেই দরজা এখন আর খোলা যায় না। দুজনে ধরে টানতে লাগলাম; অতি কষ্টে একটু একটু করে দরজা খুলল। দেখি, লণ্ঠনটা উলটে গিয়ে দপদপ করছে। কবুতরী লণ্ঠনের কাছে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। আমরা ঢুকতেই সে যেন ছাড়া পেল। তার চুল এলোমেলো, কাপড় ছিঁড়ে গেছে, পাগলের মত চেহারা। সে উঠে চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। হলধর তার পিছনে পিছনে ছুটল। আমি কী করব ভাবছি, কানের কাছে সেই অসভ্য বেয়াড়া হাসি শুনতে পেলাম। আমিও ছুটলাম—"

এই সময় ইলেকট্রিক বাতি কয়েকবার চোখ মারিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এতক্ষণ অন্ধকারের পর তীব্র আলোকে বরদার মুখ ফ্যাকাশে দেখাইল। সে আলোর দিকে একবার চোখ তুলিয়া নীরস স্বরে বলিল, 'এই গল্প। দু দিন পরে আমি নীলমহল থেকে চলে এলাম। কবুতরী সেই যে কোৎঘর থেকে পালিয়েছিল, আর তাকে দেখিনি, সে রাত্রে সে কী অনুভব করেছিল তা জানা হয়নি। তবে যতটুকু চোখে দেখেছিলাম তা থেকে অনুমান করা শক্ত নয়।" হিরণ্ময়বাবুর দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিল, "অশ্লীল ভূত কেন বলেছিলাম বুঝতে পেরেছেন?"

হিরণ্ময়বাবু আমাদের একটি করিয়া সিগারেট দিলেন, নিজে একটি ধরাইলেন। বলিলেন, "খাসা গল্প। শুধু ভূত নয়, রসও আছে। তবে আলো নিবে না গেলে এতটা জমত কি না বলা যায় না।" বলিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

কাল ঃ ৪০৬২ খৃস্টাব্দ, অপরাহ্ণ ॥
স্থান ঃ চিড়িয়াখানা ॥

[চিড়িয়াখানার একাংশ মাত্র দৃষ্টিগোচর, সম্মুখে লোহার শিকওয়ালা একটি বৃহৎ খাঁচা। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিলে যেমন দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন কোলাহল শুনিতে পাওয়া যায় সব তেমনি, কিন্তু স্থান আলিপুর, নয়, যেহেতু কাল অনেক পরবর্তী।
মাঝে-মাঝে পশুর গর্জন ও চিৎকার শোনা যাইতেছে, সেই সঙ্গে দর্শকগণের আনন্দ-কৌতূহলধ্বনি।
এমন সময়ে একজন বয়স্ক দর্শকের সহিত একদল বালক-বালিকার প্রবেশ—স্পষ্টত তাহারা শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষামূলক ভ্রমণে আসিয়াছে।]

শিক্ষক ॥ অনেক ঘুরে তোমরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছ, এই গাছতলায় বসে বিশ্রাম কর।

১ম ছাত্র ॥ স্যার, চানাচুর কিনে দিন।

শিক্ষক ॥ এই চানাচুর-অলা দে দেখি বাবা।

[চানাচুরের ঠোঙা হাতে দিল]

শিক্ষক ॥ কত দাম রে?

চানাচুর-অলা ॥ ছে পয়সা ঠোঙা।

শিক্ষক ॥ ঠোঙা নয় ঠেঙা, এ যে গালে চড় মেরে পয়সা নেওয়া।

[ছাত্র-ছাত্রীরা চানাচুর খাইতে লাগিল।]

২য় ছাত্র ॥ স্যার, ফিরব কখন?

শিক্ষক ॥ এখনি ফিরব কেন? এখনও কিছু বাকী আছে।

১ম ছাত্র ॥ নিশ্চয় বাকী আছে। আচ্ছা স্যার ক্যাঙারু দেখালেন না ত।

শিক্ষক ॥ ক্যাঙারু এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। হাজার বছর আগে অনেক ছিল।

২য় ছাত্র ॥ আচ্ছা স্যার, সিংহের কথা যে বইয়ে পড়েছি, দেখলাম না ত।

শিক্ষক ॥ ও এখন বইয়ে মাত্র আছে।

১ম ছাত্র ॥ কোথায় গেল?

শিক্ষক ॥ লোপ পেয়েছে।

১ম ছাত্র ॥ লোপ পেল কেন?

শিক্ষক ॥ সে অনেক কথা। ওর মধ্যে প্রাণিতত্ত্ব, জীবাণুতত্ত্ব প্রভৃতির রহস্য জড়িত।

৩য় ছাত্র ॥ স্যার, বানরগুলো কী চমৎকার!

শিক্ষক ॥ অবশ্যই চমৎকার। কিন্তু প্রাণিতত্ত্বের বইয়ে সেকালের বানরের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তার কাছে এ-সব কিছুই না।

৩য় ছাত্র ॥ কেন স্যার।

শিক্ষক ॥ সে-সব বানর ছিল ঠিক মানুষের মত, কেবল কথা কইতে পারত না।

১ম ছাত্র ॥ মানুষ কী স্যার?

শিক্ষক ॥ কেন রে, প্রাণিতত্ত্বের বইয়ে পড়িসনি, এক রকম অদ্ভুত প্রাণী।

১ম ছাত্র ॥ কোথায় গেল?

শিক্ষক ॥ লোপ পেয়েছে।

১ম ছাত্র ॥ হঠাৎ লোপ পেতে গেল কেন?

শিক্ষক ॥ ওর মধ্যে অনেক কথা, বড় হলে জানতে পারবি।

২য় ছাত্র ॥ স্যার, এই খাঁচাটা খালি কেন?

শিক্ষক ॥ খালি নয়, এটা দেখাব বলেই ত এনেছি তোদের।

সকলে ॥ দেখান স্যার, দেখান।

শিক্ষক ॥ ভয় পাবিনে ত?

কেহ কেহ ॥ ভয় পাব কেন? একটেঙে ভালুক দেখলাম, তিনমুখো শেয়াল দেখলাম, উড়ন্ত সাপ দেখলাম—এখানে এমন কী আছে যে, ভয় পাব?

শিক্ষক ॥ ঐ নোটো আর যাদবকে সরিয়ে দে, ওরা ভয় পাবে।

নোটো ও যাদব ॥ কখ্‌খনো না! ভয় পাব ইস্! আমরা ব্যায়াম করি, ছোলা ভিজা খাই, ভয় পাব আমরা!

কেহ কেহ ॥ কই স্যার, প্রাণী কই?

[শিক্ষক খাঁচার রক্ষককে শুধাইল]

শিক্ষক ॥ কীহে, সর্দার, জন্তু দুটো গেল কোথায়?

সর্দার ॥ জন্তু দুটো গোসল করছে।

[সকলে হাসিয়া উঠিল]

একজন ॥ জন্তু আবার গোসল করে। এর পরে শুনতে হবে খানা খায়।

সর্দার ॥ খায় বই কি!

কেহ কেহ ॥ না জানি কীরকম জানোয়ার।

শিক্ষক ॥ সর্দার, দেখ ত হল কিনা! একটু শব্দ কর না, বেরিয়ে আসবে।

[সর্দার একটা পটকা ফাটাইল, অমনি সবেগে লাফাইয়া বাহিরে আসিল জানোয়ার নয়, দুটো মানুষ, পুরুষ ও রমণী, অত্যন্ত ভীত উদ্বিগ্ন তাহাদের ভাব। এই অপ্রত্যাশিত জন্তু দর্শনে বালক-বালিকারা বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল। নোটো ও যাদব ব্যায়াম ও ছোলাভিজা সত্ত্বেও ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়া ছুটিয়া পালাইল।
মানুষ দুটার গায়ে ও পরনে পশুচর্ম ও বল্কল, পা, মাথা খালি। যে-মনুষ্যজাতিকে আমরা এখন জানি ইহারা তাহাদের উত্তরপুরুষ সন্দেহ নাই; কিন্তু কালক্রমে প্রায় দু-হাজার বছরের

যে কোন সময়ে
যে কোন স্থানে
যে কোন অনুষ্ঠানে

আপনাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়

খাটাউ

ভয়েলে

দি খাটাউ ম্যাকাঞ্জি স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ, মিলঃ বাইকুল্লা, বোম্বাই। অফিসঃ লক্ষ্মী বিল্ডিং, ব্যালার্ড এষ্টেট, বোম্বাই-১

খাটাউ মিলস্ খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র—১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-

SISTA'S KMS-173

ব্যবধানে মুখশ্রীতে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে ছ তাহাদের। কপাল অপ্রশস্ত, চোয়াল উঁচু, নাসিকা স্থূল, অধরোষ্ঠ পুরু, চক্ষু জ্যোতিহীন তাহাদের। তাহাদের ভাষাটাও সাধারণের দুর্বোধ্য। তাহারা নিতান্ত বিরক্ত ও রুষ্টভাবে খাঁচার মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল।]

১ম ছাত্র॥ স্যার, এ দুটো কী?

শিক্ষক॥ বইয়ে যে মানুষের কথা পড়েছিস—এরা সেই মানুষ, অর্থাৎ সেই মানুষেরই উত্তরপুরুষ।

১ম ছাত্র॥ অনেকটা যে আমাদের মতই দেখতে।

শিক্ষক॥ দেখতে এক রকম হলেই কি এক হবে?

২য় ছাত্র॥ আচ্ছা স্যার, বইয়ে যে পড়েছি মনুষ্য জাতি সভ্য ছিল, ঘরবাড়ি, কল-কব্জা, রেল-টেলিগ্রাফ তৈরি করেছিল, এ-সব কি সত্যি?

শিক্ষক॥ অনেক গবেষণার ফলে ওসব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, মিথ্যা বলি কী করে?

৩য় ছাত্রী॥ তবে মানুষের এমন জন্তুর দশা কেন? ওদের ভাষা যে দুর্বোধ্য।

শিক্ষক॥ তোমার আমার পক্ষে দুর্বোধ্য, কিন্তু ঐ সর্দারের পক্ষে নয়, ও চেষ্টা করে শিখে নিয়েছে। সর্দার, ওরা বলছে কী।

সর্দার॥ সর্বদা যা বলে থাকে, এখনও তাই বলছে। বলছে একবার ছাড়া পেলে যুদ্ধ করে সব নিকেশ করে দিত।

১ম ছাত্র॥ যুদ্ধ কাকে বলে স্যার।

শিক্ষক॥ ঐ যে নোটো আর যাদব মাংসের ভাগ নিয়ে যা করে।

১ম ছাত্র॥ সে ত মারামারি।

শিক্ষক॥ মারামারি হয় দু-চারজনে, দু-চার লাখ হলে হয় যুদ্ধ।

১ম ছাত্র॥ কিন্তু তেমন হতে যাবে কেন?

শিক্ষক॥ ওটা মনুষ্যত্বের পরিণাম।

১ম ছাত্র॥ মনুষ্যত্ব কাকে বলে স্যার?

শিক্ষক॥ পড়বার সময়ে ফাঁকি দিস্‌ এখন মনুষ্যত্ব কাকে বলে স্যার! মনুষ্যত্ব কিনা মানুষের স্বভাব! আর মানুষ যা ঐ সম্মুখে দেখছিস।

২য় ছাত্র॥ ওদের পূর্বপুরুষ?

শিক্ষক॥ হাঁ, তা বলতে পারিস।

২য় ছাত্রী॥ স্যার, এ দুটো জন্তুকে কোথায় পাওয়া গেল?

শিক্ষক॥ ঐ ত খাঁচার গায়ে লেখা আছে, পড়ে দেখ না।

[কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী পড়িতে লাগিল]

একজন॥ হিমালয়ের দক্ষিণ মণ্ডলে কোন গুহার মধ্যে প্রাপ্ত।

অন্য একজন॥ মনুষ্য জাতি যদি লোপ পেয়ে থাকে, তবে এ-দুটো টিকে থাকল কীভাবে?
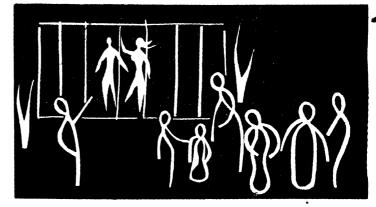
জন্তু-জানোয়ারের আবার কষ্ট

শিক্ষক॥ তা থাকবে না কেন? লোপ পেতে পেতেও দু-চারটা থেকে যায়।

১ম ছাত্র॥ আচ্ছা স্যার, ওদের খুব কষ্ট না?

শিক্ষক॥ কষ্ট হবে কেন, বেশ খাচ্ছে-দাচ্ছে, আরামে আছে, গুহার মধ্যেই ত ছিল কষ্টে।

২য় ছাত্র॥ নিজের জাতের সঙ্গে মিশতে পারে না, খাঁচায় বন্ধ আছে।

শিক্ষক॥ দূর বোকা। জন্তু-জানোয়ারের আবার কষ্ট।

একজন ছাত্র॥ আচ্ছা স্যার, মনুষ্য জাতি হঠাৎ লোপ পেতে গেল কেন?

শিক্ষক॥ পণ্ডিতেরা অনেক রকম কারণ নির্দেশ করে থাকেন। কেউ কেউ বলেন, পঞ্চম তুষার যুগের সূত্রপাতের ফলে খাদ্যাভাব ঘটে, মনুষ্য জাতি লোপ পায়। আবার কেউ কেউ অনুমান করেন যে, তুষার যুগের অবসানে উত্তরমেরু আর দক্ষিণমেরুর তুষার-গলা জলে পৃথিবী প্লাবিত হয়ে যাওয়ার ফলে ওরা লোপ পায়। কিন্তু একদল বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেছেন যে, মনুষ্য জাতির আবিষ্কৃত অস্ত্রই মনুষ্য জাতির লোপের যথার্থ কারণ।

কেহ কেহ॥ ওদের আবিষ্কৃত অস্ত্রে ওরা লোপ পাবে কেন?

শিক্ষক॥ সেই অস্ত্র ব্যবহারের ফলে কেবল মনুষ্য জাতি নয়, পৃথিবী থেকে প্রাণের শেষ কণিকাটি অবধি লোপ পায়—দীর্ঘকাল পৃথিবী নিষ্প্রাণ অবস্থায় পতিত পড়ে থাকে। তারপরে আবার দেখা দেয় প্রাণ, উদ্ভিদ, জীবজন্তু আর সর্বশেষে আমাদের মত র‍্যাশনাল বীইং বা বুদ্ধিমান জীব।

১ম ছাত্রী॥ সমস্ত আজগুবি ব্যাপার—যুদ্ধে নাকি এমন কাণ্ড হয়।

২য় ছাত্রী॥ আমারও বিশ্বাস হয় না। পণ্ডিতদের সব বানানো কথা।

শিক্ষক॥ নারে না, পণ্ডিতদের কথা অবিশ্বাস করতে নেই, তাঁরা যে সব জানেন।

একজন॥ তাই বলে এমন কী অস্ত্র সম্ভব, যাতে সাকুল্য প্রাণ লোপ পায়।

অনেকে॥ যত সব বাজে কথা।

[ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চের আলো কমিয়া আসিতে আসিতে এক সময়ে যাবতীয় দৃশ্য ফেড আউট হইয়া গেল। তারপরে যখন আবার আলো জ্বলিল, প্রকাশিত হইল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দৃশ্য।

সুসজ্জিত সুবৃহৎ একটি হল-ঘর। ডায়াসের উপরে আট দশখানি গদি-আঁটা চেয়ার, সম্মুখে টেবিল, প্রত্যেক সদস্যের জন্য এক-একটি মাইক্রোফোন। পৃথিবীর সাতটি আণবিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সাতজন সদস্য উপবিষ্ট। সময়: ১৯৬২ সন। তখন পর্যন্ত নিম্নোক্ত সাতটি রাষ্ট্র আণবিক অস্ত্র আবিষ্কারে সক্ষম হইয়াছে—মার্কিন, সোভিয়েট রাশিয়া, ব্রিটেন, চীন, ভারত, ফ্রান্স ও বেলজিয়ম।

বর্তমান রাষ্ট্র সঙ্ঘ ও নিরাপত্তা কমিটি ভাঙিয়া গিয়াছে। তার বদলে "আণবিক রাষ্ট্র-সঙ্ঘ" নামে নূতন কমিটি গঠিত হইয়াছে। এখন সেই সর্বময় কমিটির অধিবেশন চলিতেছে।

হলঘরের দেয়ালে পূর্বোক্ত সাতটি রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা ও একটি "ভূমণ্ডল" স্থাপিত। দরজার কাছে একখানি চৌকিতে সভাকক্ষের একমাত্র দ্বাররক্ষক উপবিষ্ট। লোকটা ভারতীয়, খাস ছাপরা জিলার অধিবাসী, নাম মিছিরলাল। অনেক অনুরোধ উপরোধেও সে জাতীয় পোশাক পরিত্যাগ করিয়া কোট প্যান্টালুন ধরিতে রাজি হয় নাই। হঠাৎ কোন্ সূত্রে তাহার এমন সৌভাগ্য হইল যে, ছাপরা জেলা হইতে আণবিক রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বাররক্ষক-পদে সে উন্নীত হইল? আর কিছুই নয়, বিখ্যাত পয়েন্ট-ফোর প্রোগ্রাম অনেক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটাইয়াছে সংসারে। মিছিরলাল সেইরূপ এক কাণ্ড। সে চৌকির উপরে বসিয়া খৈনি প্রস্তুত করিতেছে। তাহার বয়ঃক্রম পঁয়ষট্টি।

হলঘরের পিছনে কয়েকটি ফ্রেঞ্চ উইন্ডো শ্রেণীর দরজা-জানলার সম্মিলিত রূপ। এইসব অবকাশপথে মানুষ ও বাতাস অনায়াসে আনাগোনা করিতে পারে—বাহিরের দৃশ্য দেখিতেও অসুবিধা হয় না। মধ্যাহ্ন কাল।

হলঘরের ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর অবকাশ-পথে একটি পথ দেখা যাইতেছে, পথে পথিকের আনাগোনা আছে। এমন সময়ে দেখা গেল যে, উৎসববেশে সজ্জিত একদল তরুণ ও তরুণী পাশাপাশি গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। সভাস্থ সদস্যগণ তাহাদের দেখিতে পাইলেন না কেন না তাহারা পিছনে আছে। তাহাদের গানও যে সদস্যগণের কানে প্রবেশ করিল এমন মনে হয় না। এখন "চিড়িয়াখানায়" দৃষ্ট মনুষ্যজন্তু তরুণ-তরুণীর চেহারার সঙ্গে ইহাদের চেহারার একটা দূরগত ঐক্য আছে, এক অথচ এক নয়। বর্তমান দৃশ্যের তরুণ-তরুণী হালের মানুষ; "চিড়িয়াখানার" তরুণ-তরুণী কোন্ ভবিষ্যতের জীব, মনুষ্যোচিত বা দৈব ভাব লোপ পাইয়া পাশবিক ভাব ফুটিয়াছে তাহাদের চোখে-মুখে; সবই স্থূল, সবই রূঢ়। তাই বলিয়াছি, এক অথচ এক নয়।]

তরুণ-তরুণীর গান

মধুময় এ পৃথিবী
সুধাময় নভ-তল
বিদায়ের আঁখিসম
বেদনায় ছলছল।
তৃণবনে প্রজাপতি
ওড়ে সদা লঘু গতি
পাখায় স্বপন ধরি,
ধরি যাই চল চল।
ফুলের শিশিরসম
কাঁপে সুখ নিরুপম
কতটুকু আয়ু তার
কে বলিবে বল বল।

[গান থামিয়া গেল। দেয়ালের ঘড়িতে বারোটা বাজিল। বাহিরে বারোবার কামান-ধ্বনি হইল। সদস্যগণ বুঝিলেন যে, শুভমুহূর্ত সমাগত, তখন সকলে সাড়ম্বরে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন আণবিক রাষ্ট্রসংঘের সভাপতি মহা-ঘোষণা আরম্ভ করিলেন। ভারত রাষ্ট্র সভাপতি।]

ভারত-রাষ্ট্র॥ বন্ধু রাষ্ট্রগণ, পৃথিবীর যাবতীয় রণভয়কাতর নরনারী অবধান কর, মহাআশ্বাসবাণী শ্রবণ কর, আণবিক রাষ্ট্রসংঘের অভয় অশোক আনন্দময় ঘোষণা সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণ কর। আমরা আণবিক রাষ্ট্রগণ যুদ্ধ-পন্থা পরিহার করে চিরমৈত্রী-ব্রত অবলম্বন করলাম, আমরা আণবিক অস্ত্র ব্যবহার, আণবিক অস্ত্র নির্মাণ, আণবিক অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করলাম। চিরাচরিত অস্ত্রও আমাদের বর্জনীয়। কোনদিন কোন কারণে কোনরূপ অস্ত্র আমরা ব্যবহার না করতে কৃত-সংকল্প। পৃথিবী থেকে যুদ্ধের বিভীষিকা দূরে হক, মানুষে মানুষে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মৈত্রী অক্ষয় হক, শান্তির সত্যযুগ অবতীর্ণ হক পৃথিবীতে। যাবচ্চন্দ্রদিবাকর আমাদের শান্তি সংকল্প অটুট থাকুক।

[সভাপতির উপবেশন, অন্যান্য সদস্যের উল্লাসজনক করতালি। পুনরায় বারোবার কামান গর্জন।

বাহিরে পূর্বোক্ত তরুণ-তরুণীর গান। গান থামিয়া গেলে সদস্যগণ যখন আসন ত্যাগ করিতে উদ্যত, এমন সময়ে একজন প্রবীণ ব্যক্তি সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়স আশির কম নয়, গায়ে ও পরনে খদ্দরের পাঞ্জাবি ও ধুতি, পায়ে চপ্পল, হাতে লাঠি, চোখে কালো চশমা, মস্তক মুণ্ডিত। চেহারা অনেকটা শ্রীরাজাগোপালাচারির মত—অথচ তিনি নন।

মিছিরলাল তাঁহাকে দেখিয়া চিনিল, দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিল।]

মিছিরলাল॥ রাম, রাম, হুজুর।

[উক্ত প্রবীণ ব্যক্তির পুরো নাম 'প্রাচ্য দেশের প্রবীণ ব্যক্তি'। আমরা সংক্ষেপে তাঁহাকে প্রবীণ ব্যক্তি বলিব।]

প্রবীণ ব্যক্তি॥ আরে মিছিরলাল যে, এখানে কী করে?

মিছিরলাল॥ হুজুর, দুনিয়া অতি নাগরদোলাকা মাফিক হো গৈ। পয়েণ্ট ফোর হুকুমসে হাম ইধার আয়া, আউর এক হামিল্টন সাহেব ছাপরা জজ আদালতমে চাপরাশী হো গৈ।

প্রবীণ ব্যক্তি॥ বাঃ বাঃ, তা কেমন লাগছে?

মিছিরলাল॥ বহুত আচ্ছা হুজুর। লেকিন হুজুর এক এক বখত মালুম হোতা কি সারা দুনিয়া এক বড়িয়া পাগলাগারদ বন গৈ।

প্রবীণ ব্যক্তি॥ মন্দ বলনি। একবার দেখে আসি ব্যাপারটা কী?

[প্রবীণ ব্যক্তি সদস্যগণের দিকে অগ্রসর হইলে সভাপতি শুধাইলেন—]

সভাপতি॥ আপনি কে?

প্রবীণ ব্যক্তি॥ পরিচয় অনাবশ্যক। এই মাত্র পৃথিবীর রণভয়-কাতর যে নরনারীকে সম্বোধন করলেন আমি তাদেরই একজন।

সভাপতি॥ কী চাই?

প্রবীণ ব্যক্তি॥ আপনাদের মহদুদ্দেশ্যের জন্যে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

সভাপতি॥ সেজন্যে এতদূর আসা নিষ্প্রয়োজন ছিল।

প্রবীণ ব্যক্তি॥ কেবল সে জন্যে আসিনি, সামান্য দু-একটা বিষয় জিজ্ঞাস্যও ছিল।

সভাপতি॥ কী শুনতে পাই?

প্রবীণ ব্যক্তি॥ আণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা আর কোবাল্ট বোমায় মিলে সবশুদ্ধ কতগুলো এ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে?

সভাপতি॥ বিরাশি হাজার।

প্রবীণ ব্যক্তি॥ বেশ, যুদ্ধ ত পরিত্যক্ত হল, এবারে ঐ বোমাগুলোর কী গতি হবে?

সভাপতি॥ ওগুলো সব নষ্ট করে ফেলা হবে।

প্রবীণ ব্যক্তি॥ কী উপায়ে।

সভাপতি॥ ধরুন উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুতে নিয়ে গিয়ে ফাটিয়ে দেওয়া হবে।

প্রবীণ ব্যক্তি॥ হিসাব করে দেখা গিয়েছে তাতে এমন বরফ গলবে যে, ভূভাগ যাবে তলিয়ে।

সভাপতি॥ মনে করুন হিমালয়ের দুর্গম স্থানে নিয়ে গিয়ে ফাটিয়ে দেওয়া হবে।

প্রবীণ ব্যক্তি॥ হিমালয়ের চিরতুষার গলে সমস্ত ভারতবর্ষ যাবে ভেসে।

সভাপতি॥ ধরুন দূর মহাসমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফাটিয়ে দেওয়া হল।

প্রবীণ ব্যক্তি॥ তবে এত আড়ম্বর করে যুদ্ধ বন্ধ করবার কী প্রয়োজন ছিল?

সভাপতি॥ কেন?

প্রবীণ ব্যক্তি॥ বিরাশি হাজার বোমার আণবিক বিষ সম্পাতে জীবের সমূলে লোপ অনিবার্য।

সভাপতি॥ এখন আমরা অনায়াসে চন্দ্রলোকে ও অন্যান্য গ্রহে রকেট পাঠাতে সক্ষম। মনে করুন বোমাগুলো গ্রহান্তরে পাঠিয়ে ফাটিয়ে দেওয়া হল।

প্রবীণ ব্যক্তি॥ তাতে লাভ হবে এই যে, পৃথিবীটার বদলে খাস সৌর-জগৎটার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে।

সভাপতি॥ আচ্ছা, মনে করুন ওসব কিছুই করা হল না, প্রত্যেক আণবিক রাষ্ট্র নিজ নিজ হেফাজতে বোমাগুলো রেখে দিল। ক্ষতি কী?

প্রবীণ ব্যক্তি॥ ক্ষতি আর কী! আণবিক রাষ্ট্র সরকারের বদল হলে নূতন সরকার অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবে অস্ত্রগুলো।

সভাপতি॥ কিন্তু আণবিক রাষ্ট্র যে যুদ্ধ বর্জন করতে কৃতসংকল্প।

প্রবীণ ব্যক্তি॥ আণবিক রাষ্ট্র নয়, আণবিক রাষ্ট্রের বর্তমান সরকার যুদ্ধ বর্জনে কৃতসংকল্প। নূতন সরকার নূতন নীতি গ্রহণ করবে না কে বলল। তাছাড়া চিরকাল রাষ্ট্রের হাতেই আণবিক অস্ত্র থাকবে, এমন কে বলল? রাষ্ট্রের বিত্তশালী একদল লোক জোটবদ্ধ হয়ে আণবিক অস্ত্র তৈরি করলে ঠেকাবার উপায় কী?

সভাপতি॥ সেটা হবে বেআইনী।

প্রবীণ ব্যক্তি॥ আণবিক অস্ত্র যার হাতে, আইন তার পক্ষে। এমন অনেক ক্ষুদ্র রাষ্ট্র আছে যেখানকার সংঘবদ্ধ বিত্তশালী লোকদের ক্ষমতা রাষ্ট্রের ক্ষমতার চেয়ে

দত্ত এণ্ড পাইন ব্রাদার্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
৯১/১, বহুবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
ফোন: ৩৪-৩০৬৪

অনেক প্রবল। কার্যত তারাই রাষ্ট্র। আর এক দেশের বিত্তশালী সঙ্ঘ আণবিক অস্ত্র তৈরি করলে অন্য দেশের বিত্তশালী লোকেরাও তৈরি করবে।

সভাপতি॥ সরকার তাদের নিষেধ করবে।

প্রবীণ ব্যক্তি॥ না, সরকার তাদের পরোক্ষে উৎসাহদান করবে আণবিক অস্ত্র নির্মাণে।

সভাপতি॥ কেন?

প্রবীণ ব্যক্তি॥ কেন কি! সরকার আণবিক অস্ত্র বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে—বিত্তশালীরা এখন তাদের বেনামদার, তাদের হাতে রথচক্র ধারণ করবে সরকার।

সভাপতি॥ তবে আণবিক অস্ত্র ধ্বংসের উপায় কী?

প্রবীণ ব্যক্তি॥ আমি ত কোন উপায় দেখি না। মরুতে, মেরুতে, দুর্গম গিরিশিখরে, দুস্তর মহাসমুদ্রে কোথায় বর্জন করবে ওদের? মহাশূন্যে চন্দ্রলোকে, গ্রহান্তরে কোথায় নিক্ষেপ করবে ওদের? স্বোপার্জিত দুষ্কৃতির মত ওরা অপরিহার্য।

সভাপতি॥ আমরা সৃষ্টি করেছি আর আমরা ধ্বংস করতে পারব না?

প্রবীণ ব্যক্তি॥ সৃষ্টি পর্যন্ত স্রষ্টার অধিকার তারপরে আর নয়।

সভাপতি॥ ওরা কি তবে চিরকাল মানুষের সংগে থেকে যাবে?

প্রবীণ ব্যক্তি॥ চিরকাল! চিরকাল! করাল ধূমকেতুর মত বিষপুচ্ছে পৃথিবীকে বেষ্টন করে ওরা নিত্য আবর্তিত হতে থাকবে, অদৃষ্টের উদ্যত মুষলের মত ওরা নিত্য দোদুল্যমান হয়ে থাকবে তোমাদের সাধ্য কি ওদের বর্জন কর।

সভাপতি॥ কিন্তু আমরা যে যুদ্ধ বর্জন করেছি, এখন ওগুলো—

[মিছিরলাল সভাপতির উদ্দেশ্যে বলিল]

মিছিরলাল॥ রাম রাম হুজুর, হামকো ছুট্টি দেনা।

সভাপতি॥ ছুটি, ছুটি নিয়ে কী করবে?

মিছিরলাল॥ গোঠিয়া বেচে গা।

সভাপতি॥ ঘুঁটে বেচবে? কেন, হঠাৎ ঘুঁটে বেচতে যাবে কেন?

মিছিরলাল॥ আভি ত লড়াই লাগে গা, গোঠিয়া কা বহুত দাম হোগা, হাম গোঠিয়া কা বাবসা কিয়ে গা।

সভাপতি॥ লড়াই আর লাগবে না।

মিছিরলাল॥ আলবত্ত লড়াই লাগে গা।

সভাপতি॥ না, লড়াই লাগবে না, আমরা যুদ্ধ বর্জন করে হুকুম দিয়েছি।

মিছিরলাল॥ হুকুম দেওয়ার আপনারা কে?

সভাপতি॥ আমরা রাষ্ট্রপতি, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, ডিক্‌টেটার।

মিছিরলাল॥ আপনারা নৈবেদ্যের চূড়ার

ঊর্ধ্বমুখী — আলোকচিত্রী শ্রীনীরদ রায়

মোণ্ডা, দেখতে সুন্দর, কাজে কিছু নন।

সভাপতি॥ তবে হুকুম দেওয়ার কর্তা কারা?

মিছিরলাল॥ যাদের হাতে ক্ষমতা।

সভাপতি॥ আমাদের হাতে সর্বময় ক্ষমতা।

মিছিরলাল॥ (প্রবীণ ব্যক্তির প্রতি) দেখুন হুজুর, ওঁরা কী বলছেন! ওদের হাতে নাকি ক্ষমতা। (সভাপতির প্রতি) ক্ষমতা সিপাহিসালারদের হাতে, ক্ষমতা কারখানার এঞ্জিনিয়ার ম্যানেজারদের হাতে, ক্ষমতা অফিসের সেক্রেটারি সাহেবদের হাতে। তারা যা করবে তাই হবে, তারা যা বোঝাবে তাই বুঝবেন আপনারা।

সভাপতি॥ তারা জানে যে, আমরা কর্তা।

মিছিরলাল॥ তারা বুঝিয়েছে যে, আপনারা কর্তা, তাই আপনারা বুঝেছেন যে, আপনারা কর্তা।

সভাপতি॥ কেন তারা এমন বোঝাবে?

মিছিরলাল॥ আপাতত এতেই তাদের সুবিধে। আবার প্রয়োজন হলে ভিন্ন রকম বোঝাবে।

সভাপতি॥ কী সেটা?

মিছিরলাল॥ তাদের হুকুম ছাড়া সরকারী মেশিনের এতটুকু হাতলটা পর্যন্ত নড়বে না।

সভাপতি॥ অসম্ভব।

প্রবীণ ব্যক্তি॥ আদৌ অসম্ভব নয়। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আজকের দিনে সমস্ত রাষ্ট্রে আর সমস্ত শ্রেণীর রাষ্ট্রে যথার্থ ক্ষমতার আধার হল বুরোক্র্যাট, টেকনোক্র্যাট, আর জেনারেল স্টাফ। তারা যা করবে, বলবে, ভাববে, তাই হবে। এক চুল এদিক ওদিক হওয়ার উপায় নেই।

সভাপতি॥ আমরা তবে কী?

প্রবীণ ব্যক্তি॥ ঐ মিছিরলাল যা বলেছে নৈবেদ্যের চূড়ার মোণ্ডা, আপনারা ইণ্ডিয়া রবার স্ট্যাম্প।

মিছিরলাল॥ এহি বাত হ্যায়, ঠিক বাত হ্যায়, সাচ্চা বাত হ্যায়।

সভাপতি॥ আর জনসাধারণ?

প্রবীণ ব্যক্তি॥ তারাও নিজেদের কর্তা ভাবে? নয়? যেমন তারা কর্তা, তেমনি আপনারা কর্তা! আসল কর্তা আজকের দিনে টেকনোক্র্যাট, ব্যুরোক্র্যাট আর জেনারেল স্টাফ!

সভাপতি॥ কিন্তু যুদ্ধ বাধলে তাদের কী লাভ?

প্রবীণ ব্যক্তি॥ ষোল আনা লাভ!

মিছিরলাল॥ এহি বাত হ্যায়, সাচ্চা বাত হ্যায়, ঠিক বাত হ্যায়।

প্রবীণ ব্যক্তি॥ জেনারেল স্টাফ, টেকনোক্র্যাট, ব্যুরোক্র্যাট, তিনের এক সংগে আর সমান লাভ যুদ্ধে।

সভাপতি॥ মরবে ত ওরা আগে।

প্রবীণ ব্যক্তি॥ কোন্ দিন কোন্ সেনাপতিটা যুদ্ধে মরেছে? ওরা থাকবে বিশতলা মাটির নীচে। আধুনিক যুদ্ধে একমাত্র সেনাপতিরাই নিরাপদ। তখন আপনারাই পরামর্শ দেবেন ওদের নিরাপদে থাকতে—সেটা নাকি রাষ্ট্রের স্বার্থ।

সভাপতি॥ কিন্তু মানবসমাজ লোপ পেলে ওদের বেঁচে থেকে কী লাভ?

প্রবীণ ব্যক্তি॥ বেকার হয়ে, ক্ষমতাহীন হয়ে বেঁচে থেকেই বা কী লাভ?

সভাপতি॥ কেমন?

প্রবীণ ব্যক্তি॥ প্রত্যেক সৈন্যের পিছু কতজন করে শ্রমিক, সুদক্ষ, অদক্ষ, আধাদক্ষ কারিকর নিযুক্ত আছে বলতে পারেন? সৈনিকের পায়ের বুট জুতো থেকে মাথার টুপি, অস্ত্রশস্ত্র গোলা বারুদ, যুদ্ধের হাজার রকম সাজ সরঞ্জাম তৈরি করছে যারা। খুব কম করে সৈনিক পিছু ১৫ থেকে ২০জন নিযুক্ত। এখন দেশে এক লক্ষ সৈন্য থাকলে তাদের পিছু ১৫ থেকে ২০ লক্ষ কারিগর সর্বদা খাটছে। এরপরে হিসাব করুন কী বিপুল মূলধন খাটছে এই ব্যাপারে। তারপরে হিসাব করুন কত সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানা! জটিল আর বিপুল কলকব্জা!

এগুলোর পিছনে রয়েছে হাজার হাজার বিশেষজ্ঞ—টেকনোক্র্যাট আর ম্যানেজার! আর আছে বিশাল জেনারেল স্টাফ। আর এ দুয়ের মাঝখানে আছে সরকারী অফিসের ব্যুরোক্র্যাট—নানারকম সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি প্রভৃতি। এরা তিন শ্রেণীতে মিলে রাষ্ট্র চালাচ্ছে—আপনারা রাষ্ট্রতরণীর গলুইয়ের উপরে খোদিত কাঠের ময়ূরপংখী! শোভা, শোভা, নির্জীব, নিষ্ক্রিয় শোভা!

সভাপতি॥ কিন্তু বুঝলাম না যুদ্ধে তাদের কী লাভ?

প্রবীণ ব্যক্তি॥ যুদ্ধ বর্জিত হলে পৃথিবীতে দেখা দেবে বৃহত্তম বেকার সমস্যা। হাজার হাজার কারখানা অচল, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার! ম্যানেজার, টেকনোক্র্যাট, ব্যুরোক্র্যাট, জেনারেল স্টাফ মুহূর্তে নির্বীর্য ক্ষমতাহীন হয়ে পড়বে। কে তা চায় বলুন। যুদ্ধে ওদের স্বার্থ।

সভাপতি॥ যুদ্ধে ওদের মৃত্যু।

প্রবীণ ব্যক্তি॥ শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।

সভাপতি॥ তবে কী উপায়?

প্রবীণ ব্যক্তি॥ উপায়? কোন উপায় নেই। "পালাইতে পথ নাই যম ধায় পাছে।" যেমন আণবিক বোমা নিরাপদে বর্জন করবার উপায় নেই তেমনি এখন আর আসল কুরুক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তনের পথ নেই। নিয়তি, নিয়তি, একেই বলে নিয়তি।

সভাপতি॥ এই যদি নিয়তি হয়, তবে অশুভস্য কালহরণং কি শ্রেয়ঃ নয়?

প্রবীণ ব্যক্তি॥ হরণ করবার মত বেশী কাল পাবেন মনে হয় না।

সভাপতি॥ কেন?

প্রবীণ ব্যক্তি॥ আপনাদের যুদ্ধবর্জন ও চিরমৈত্রীর সংকল্প পরিজ্ঞাত হওয়া মাত্র তারা বিশ্ব-রাষ্ট্রতরণীর হাল করায়ত্ত করে নেবে। এই যুদ্ধবর্জন-সংকল্প মহাযুদ্ধ সূচনার সংকেত হলে বিস্মিত হব না।

[এমন সময় মিছিরলাল উল্লাসে ছুটিয়া প্রবেশ করিল—কিছুক্ষণ আগে সে বাহিরে গিয়াছিল।]

মিছিরলাল॥ হো গয়া, হো গয়া, লড়াই শুরু হো গয়া।

সভাপতি॥ কে বলল?

মিছিরলাল॥ ইউনিভার্সাল রেডিওনে কহা।

সভাপতি॥ নিশ্চয় আণবিক যুদ্ধ নয়।

মিছিরলাল॥ ওয়াশিংটন, লণ্ডন, প্যারিস, মস্কো, দিল্লী কুছভি নেহি। বহুত বহুত সেলাম হুজুর।

সভাপতি॥ কিধার যাতা?

মিছিরলাল॥ নোকরি ছোড়কে যাতা। হাম গোঠিয়া বেচেগা—গোঠিয়া বহুত মাংগা হোগে। "বেরিলিকা বাজারমে লাঠি গিরারে, ওর পানি গিরারে"—

[গান করিতে করিতে প্রস্থান]

সভাপতি॥ তবে কি মানবজাতির শেষ মুহূর্ত সমাসন্ন?

প্রবীণ ব্যক্তি॥ "শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।"

[ঘরের বাহিরে পূর্বোক্ত পথে পূর্বোক্ত তরুণ তরুণীর গান—

ধীরে ধীরে সমস্ত অন্ধকার হইয়া ফেড আউট হইয়া গেল। পুনরায় যখন আলো জ্বলিল নাট্যারম্ভে বর্ণিত চিড়িয়াখানার দৃশ্যটি উদ্ঘাটিত হইল।]

১ম ছাত্র॥ যত সব বাজে কথা! যুদ্ধে নাকি সব ধ্বংস হয়ে যায়।

শিক্ষক॥ যায় রে যায়—পণ্ডিতদের গবেষণা মিথ্যা হতে যাবে কেন।

১ম ছাত্র॥ স্যার, জানোয়ার দুটো খেলা দেখায় না?

শিক্ষক॥ ওহে সর্দার, ছেলেরা যে খেলা দেখতে চাইছে।

সর্দার॥ মনে হচ্ছে জন্তু দুটোর মন আজ খারাপ, তা নইলে এতক্ষণ কত খেলা দেখাত।

শিক্ষক॥ একটু চেষ্টা করে দেখ না, তোমাকে খুশী করে দেব।

[তখন সর্দার দুইটা কাঠি খাঁচার মধ্যে ফেলিয়া দিতেই পুরুষ জন্তুটা কাঠি দুইটা কুড়াইয়া লইয়া বেহালার মতো বাজাইতে লাগিল—মেয়েটা অবোধ্য ভাষায় গান শুরু করিল।]

সর্দার॥ শুনুন হুজুর ওদের গান।

শিক্ষক॥ একী ভাষা হে!

সর্দার॥ ওদের ভাষা ঐ রকম—এ ত আর আমাদের ভাষা নয় যে বুঝতে পারা যাবে।

[তখন সকলে যেন শুনিতে পাইল ওদের গানের সংগে সংগীত রাখিয়া কোন সুদূর ইতিহাসের কণ্ঠ হইতে অতিশয় ক্ষীণ সুরে ধ্বনিত হইতেছে পূর্বে শ্রুত সেই সংগীত।]

শিক্ষক॥ আঃ গোল করিসনে, শোন শোন গান শোন।

১ম ছাত্র॥ গান কোথায় স্যার, ও যে ঝিঁঝিঁ ডাকছে।

শিক্ষক॥ ঝিঁঝিঁর ডাক নয় রে, গান। কী বল সর্দার।

সর্দার॥ কী জানি হুজুর, গান কি ঝিঁঝিঁর ডাক জানিনে—আমি মাঝে মাঝে ঐরকম শুনতে পাই।

শিক্ষক॥ চুপ করে শোন্ দেখি—ভাষাটা বোঝা যাচ্ছে না বটে; কিন্তু সুরটা মন্দ নয়, বেশ মধুর, বেশ করুণ।

[গানের সংগে সংগে সমস্ত দৃশ্য অন্ধকারে ফেড আউট হইয়া মিলাইয়া গেল।]

যবনিকা।

এজেন্ট
ইম্পিরিয়াল ওয়াচ কোং
১৫৪, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬০৩৬

হেস্টিংসের সময় কলিকাতার ইংরাজ সমাজ

Cooch Behar

শ্রীসরলাবালা সরকার

রাজের চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন ফ্রান্সের একজন লেখক। সেই চরিত্র-অংকনের মধ্যে ফরাসী জাতির স্বাভাবিক রসিকতার সঙ্গে তিনি এমন কতকগুলি কথা বলিয়াছেন যাহা বিশেষ মূল্যবান।

তিনি বলিয়াছেন, "ছুঁচের মত ইংরাজ অন্যের অধিকারে গিয়া প্রবেশ করিয়া ক্রমশ এমন 'ফাল' হয় যে, যে-ঘরে সে ঢোকে, সে-ঘরের সবটাই তাহারই দখলে যায়, তখন 'যার ধন তার ধন নয়' এই প্রবচন সার্থক হইয়া যায়। প্রার্থী হইয়া যখন ইংরাজ আসে, তখন তুমি যদি দয়া করিয়া তোমার উঠানের এক কোণে এক হাত জমি তাহাকে দাও, দেখিতে দেখিতে সে এক হাত জমিকেই চার হাত করিয়া লইবে, ক্রমশ আট হাত হইয়া যাইবে সেই চার হাত জমি।"

উপনিবেশ-স্থাপন-বিদ্যায় কুশলী ইংরাজ দেশে দেশে যেভাবে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে তাহার ইতিহাস কে না জানেন? তবে ইতিহাসের সাক্ষ্যও সব সময় প্রামাণিক নয়, কেননা ইতিহাসে অনেক সময় যে ভক্ষক তাহাকেই রক্ষক রূপে প্রতিপন্ন করা হয়।

ইংরাজ বহুদেশেই যখন প্রথম পদার্পণ করিয়াছিল, তখন তাহার যে রূপ ছিল ক্রমশই সেরূপ পরিবর্তিত হইয়া গিয়া অন্য-রূপে পরিণত হইয়াছে। যেমন, আমেরিকার বনভূমিতে প্রথম ইংরাজ আসে নিজের দেশ হইতে নির্বাসনদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীরূপে বনে বা জংগলে যেখানে হউক একটু আশ্রয় পাইবার দারুণ আকাঙ্ক্ষার মূর্তি ধারণ করিয়া, আর ভারতবর্ষরূপ উপমহাদেশে ইংরাজ আসিয়াছিল বেচাকেনা করিয়া কিছু অর্থোপার্জনের আশায়। তাহাদের সেই রূপ ক্রমশ কীভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে, ইতিহাস-পাঠক তাহা নিশ্চয়ই জানেন।

নৈতিকতার গর্বে গর্বিত ইংরাজ দেশে দেশে ধর্মপ্রচারক পাঠাইতেছে পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার মহান্ উদ্দেশ্যে। পূর্বোক্ত ফরাসী লেখক তাঁহার গ্রন্থে এক জায়গায় লিখিয়াছেন, "নানা জাতি বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া যুদ্ধ করে, কিন্তু বিবেচক, নীতিজ্ঞ ও পরিণামদর্শী ইংরাজ যুদ্ধ করে বাণিজ্য বিস্তারের জন্য। তাহারা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ, সসাগরা পৃথিবীতে শান্তি ও শৃংখলা যাহাতে স্থাপিত ও রক্ষিত হয় সেইজন্যই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ইংরাজ যে-কোন জাতিকে জয় করিয়া নিজের অধীনে আনে, তাহা কেবল সেই জাতির যাহাতে ইহলোকে উন্নতি ও পরলোকে সদ্গতি হয় সেই মহান্ উদ্দেশ্যে। ইংরাজের পররাজ্য অধিকার এক হিসাবে অধিকারই নয়, বিনিময় মাত্র অর্থাৎ 'তোমাদের দেশ শাসন করিবার ভার আমরা নিজের কাঁধে লইতেছি, তাহার বদলে দিতেছি সভ্যতা এবং অনন্ত নরক হইতে উদ্ধারের তরণীস্বরূপ আমাদের বাইবেল।' ইহাই অন্যের রাজ্য অধিকার সম্বন্ধে ইংরাজের নিজের পক্ষের সওয়াল বা যুক্তি।"

মিশনারী সম্প্রদায় ভারতবর্ষের কেবল শহরে নগরেই নয়, বনে জংগলে ও পাহাড়েও ছড়াইয়া পড়িয়াছেন ধর্মশাস্ত্রের পতাকা লইয়া। একদিক দিয়া ইহারাই ইংরাজ সাম্রাজ্যের খুঁটিস্বরূপ। অবশ্য এই মিশনারিগণের মধ্যে যথার্থ মহৎপ্রকৃতির মানুষও ছিলেন, যেমন উইলিয়াম কেরী। ইহাদের দ্বারা দেশের উপকার বা ক্ষতি হইয়াছে সে-বিচার এখন নিরর্থক, কেননা যাহা অনিবার্য, যাহা হইবার তাহা হইয়াই গিয়াছে।

আমাদের এই প্রবন্ধে হেস্টিংস যখন ভারতবর্ষের গবর্নর-জেনারেল এবং ইম্পাইজা ইম্পে ছিলেন প্রধান বিচারপতি, সেই সময় ভারতের প্রবাসী ইংরাজ সমাজের সামাজিক অবস্থা ও রীতিনীতি সম্বন্ধেই সংগৃহীত তথ্য হইতে কিছু বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব।

হেস্টিংস ও ইম্পাইজা ইম্পে এই যুক্ত-নামের সংগে সংগেই মনে পড়িয়া যায় আর একটি নাম, সে-নাম মহারাজা নন্দকুমার। মনে পড়িয়া যায় রোহিলা যুদ্ধের কথা, কাশীতে রাজভবনে রানীদের উপর যে-সব অত্যাচার হইয়াছিল তাহার করুণ কাহিনী। আবার সেই সংগে মনে পড়ে হেস্টিংসের বিবাহের ব্যাপারে তখনকার ইংরাজ সমাজে যে-ভাবে আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল, হেস্টিংসের নিজের দলের ও অপর দলের উচ্চপদস্থ ইংরাজগণ যে-ভাবে বিভিন্ন ধরনে এ-সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়াছিলেন সেই সকল বর্ণনা। মেকলেও এ-সম্বন্ধে একটি বর্ণনা দিয়াছিলেন।

মেকলে বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষ যে এক মহাসম্পদশালী দেশ, তখনকার দিনে ইংলণ্ডের লোকেদের এইরূপই ধারণা ছিল। তখন ইংলণ্ডে একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, ভারতের প্রত্যেক নগরে একটা করিয়া 'প্যাগোডা' গাছ আছে, সেই গাছটিকে নাড়া দিলেই মোহর ঝরিয়া পড়ে। ভারতের নগরসমূহের রাজপথে সোনার মোহর ছড়াইয়া আছে, কুড়াইয়া লইতে পারিলেই হইল।"

কিন্তু ভারতে আসা সহজ নয়, তাই দলে দলে ইংরাজ সে-সময় ভারতে আসিতে পারে নাই। যাহারা ভারতে আসিত এবং ভারত হইতে অর্থ অর্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইত, ইংলণ্ডের লোকেরা তাহাদের 'নবাব' বলিত।

'নবাবি' করা সাধারণ ইংরাজের অভ্যাস নয়, অভিজাত শ্রেণীর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। মেকলে বলিয়াছেন, "যাহারা ভারতে আসিয়া এইভাবে নানা অবৈধ উপায়ে ধন অর্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়া নবাবিয়ানা দেখাইত, তাহারা প্রায়ই নিম্নশ্রেণীর ইংরাজ, চোর-ডাকাতও ইহাদের মধ্যে আছে। ভারতে আসিয়া প্রাচ্যের আবহাওয়ায় ইহারা নবাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, জাঁকজমক ও প্রভুত্বপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, তাই ইহারা নিজেদের দেশের জীবনযাত্রার সংগে আর নিজেদের খাপ খাওয়াইতে পারে না। অভি-জাত বংশীয়েরা তাহাদের আমল দেন না, অগত্যা ইহারা জাঁকজমক দেখাইয়া স্বদেশ-বাসীর চোখ ধাঁধাইতে চাহিত।"

ইংলণ্ডে অভিজাত সম্প্রদায় এক স্বতন্ত্র শ্রেণী, তাঁহারা পূর্বপুরুষের ধনের ও পদবীর অধিকারী, তাঁহাদের সহিত সাধারণ ইংরাজের কোন মিল নাই। এককথায় সাধারণ ইংরাজ ব্যবসায়ীর জাত। ব্যবসায়ই তাঁহাদের জীবনের অবলম্বন। তবে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে যে-সব কনিষ্ঠ সন্তানকে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে হয় তাঁহারা দেশ-বিদেশে চাকুরির সন্ধানে যান। মোটের উপর সকলকেই প্রায় খাটিয়া খাইতে হয়। কাজেই অনেক দাসদাসী রাখিয়া নবাবি করিবার সুযোগ তাঁহাদের হয় না।

কিন্তু এ-দেশে আসিয়া তাঁহারা যখন এক-একটি খুদে নবাব হইয়া যান তখন

প্রত্যেক শিশিতে একখানি করিয়া গিফট্ কূপন আছে!

PEARLINE-PARIS PRIVATE LTD. P. O. Box 493, BOMBAY 1.

প্রত্যেকেরই আয় যেমন বাড়ে ব্যয়ও সেইরকম বাড়িয়া যায়। তখন তাঁহাদের সেবার জন্য নিযুক্ত হয় দাসদাসী, হুঁকাবরদার, কেনা দাসদাসী এবং সেই দাসদাসীদের কাজকর্ম দেখিবার জন্য আবার একজন করিয়া পরিচালক, যাহাদের সরকার বলা হয়।

এইসব চাকর-চাকরানী লইয়া মনিবকে ঝঞ্ঝাটও কম পোহাইতে হয় না। তাহারা কাজ না করিয়া কুঁড়েমি করে, অবাধ্যতা করে, সুবিধা পাইলে চুরি করে। মনিব তাহাদের শাসনে রাখিতে পারেন না, কেননা তাহা করিতে গেলে পরিশ্রম করিতে হয়। কাজেই শাসনের ভার দিতে হয় আইনের হাতে।

১৩০৩ সালে শ্রীযুত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় 'প্রাচীন কলিকাতায় ইংরাজ সমাজ' সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধে তিনি ইংরাজ সমাজের চাকর-দাসীদের শাসন সম্বন্ধে একটি কৌতুককর বর্ণনা দিয়াছিলেন, সেই বর্ণনা হইতে এখানে কিছু তুলিয়া দিতেছি।

১নং মামলা। জন রিংওয়েলের বাবুর্চি মনিবের অনুমতি না লইয়াই চলিয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাহার স্থানে আর একজন লোক রাখা হয়। পরদিন ফিরিয়া আসিয়া সে আবার কাজে বহাল হইবার দাবি করে এবং যে লোকটিকে রাখা হইয়াছিল তাহাকে প্রহার করে।

শাস্তি—কর্মচ্যুতি এবং দশ ঘা বেত্রাঘাত।

২নং। এণ্ডার্সনের ক্রীতদাসী পলাইয়া যায় ও ধরা পড়ে।

শাস্তি—প্রভুর নিকট পুনঃপ্রেরণ ও পাঁচ ঘা বেত্রাঘাত।

৩নং। কাপ্তেন স্কট তাঁহার গাড়ি মেরামত করিবার জন্য একজন গাড়ি-মেরামতকারীকে দিয়াছিলেন, সে এ পর্যন্ত গাড়িটি মেরামত করে নাই।

শাস্তি—দশ জুতা।

৪নং। রামসিং নিজেকে ছুতার বলিয়া পরিচয় দিয়া কর্নেল ওয়াট্সনের বাড়িতে কাজে ভর্তি হইয়াছিল, কিন্তু পরে জানা গেল যে, সে ছুতার নয়, সে নাপিত।

প্রতারণার অপরাধে তাহার শাস্তি প্রথমে দশ ঘা বেত্রাঘাত, তারপর কয়েদীর গাড়িতে তুলিয়া ঢোল বাজাইতে বাজাইতে সমস্ত কুলীবাজার ঘুরাইয়া আনা।

৫নং। জেকব জোসেফের বাবুর্চি একটা পিতলের ডেকচি আর বাটনা বাটিবার শিল-নোড়া চুরি করিয়াছে, কিন্তু সে চুরি স্বীকার করিতেছে না।

শাস্তি—যতদিন সে জিনিসগুলি না

ফিরাইয়া দিবে ততদিন তাহাকে জেলে থাকিতে হইবে।

৬নং। কাস্টওয়ালের মেথরানী বিয়ারের খালি বোতলগুলি চুরি করিয়া ভক্তরাম নামে এক দোকানীকে বিক্রয় করে।

শাস্তি—মেথরানীর দশ বেত এবং ভক্তরামের বিশ বেত। তাহার পর দুইজন অপরাধীকে একটা গরুর গাড়িতে চড়াইয়া ঢোল পিটানর সঙ্গে তাহাদের অপরাধ কী তাহা জানাইতে জানাইতে সমস্ত শহরটা ঘুরাইয়া আনা।

কয়েদীদিগকে শাস্তি দিবার আরও এক বিশেষ রকমের গাড়ি ছিল। মিস গোল্ডবর্ন নামে এক ইংরাজকন্যা গাড়ি সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা এইরূপঃ—

"গাড়ির চাকাগুলি চোদ্দ ফুট উঁচু, চাকার যেখানে খুরা সেখানে একটি কাঠের খাঁচা ঝুলান আছে, খাঁচাটা লোহার সলা দিয়া ঘেরা দুইজন কয়েদীর তাহাতে জায়গা হইতে পারে। গাড়ি চলিবার সময় সেই ঝুলন্ত খাঁচায় অবরুদ্ধ কয়েদী পিঞ্জরায় আবদ্ধ পশুর ন্যায় সিপাহীবেষ্টিত অবস্থায় লোকচক্ষুর দৃষ্টিপথে পড়িত। সঙ্গে সঙ্গে কী অপরাধে এই শাস্তি, ঢোল পিটাইয়া তাহা ঘোষণা করা হইত।"

ক্রীতদাস প্রথাও সরকারীভাবে সমর্থন করা হইত, 'কলিকাতা গেজেট' নামক সরকার পরিচালিত সংবাদপত্রে দাসদাসী বিক্রয় সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনও বাহির হইত।

কাউন্সিলের মেম্বরদের মধ্যেও দুই দল ছিল। বারওয়েল হেস্টিংসের পক্ষে ছিলেন, ফ্রান্সিস ও ক্লেভারিং ছিলেন বিপক্ষে।

হেস্টিংসের বিবাহের সময় ফ্রান্সিস তাঁহার ভাবী স্ত্রীর সম্বন্ধে নানাভাবে কুৎসা রটনা করেন। তিনি বলেন যে, পাত্রীর বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর, সে এক জার্মান চিত্রকরের পত্নী বলিয়া পরিচিতা, সেই তথাকথিত স্বামীর ঔরসজাত তাহার তিন-চারটি সন্তানও আছে, সেগুলির বয়সও নিতান্ত কম নয়। সেই মহিলাটি বিবাহের পূর্বেই চারি বৎসর ধরিয়া হেস্টিংসের সহিত স্ত্রীর মতই বসবাস করিতেছে। অবশ্য মহিলাটির আচার-ব্যবহার বেশ মার্জিত, মনে হয় যৌবনকালে সুন্দরীও ছিল। ইলাইজা ইম্পে কন্যাকর্তারূপে কন্যা সম্প্রদান করিবেন কিন্তু ইম্পের পত্নীর সঙ্গে পাত্রীর এমনই বিরোধ যে, এক বৎসর হইতে তাঁহাদের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ আছে।"

হেস্টিংসের এক প্রিয়পাত্র সঙ্গে সঙ্গে এক বিবৃতি দিলেন, "শ্রীমতীর বয়স মাত্র ২৬ বৎসর। ইনি অতি চতুরা, পরম রূপবতী ও বুদ্ধিমতী। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ বন্দরে হেস্টিংসের সহিত ইঁহার পরিচয় হয়।" পরিশেষে স্থির হয় পাত্রীর বয়স ৩৩ বৎসর।

ইহার পর যেরূপ সুললিত ভাষায় এই পরিণয় ও প্রণয়-কাহিনী সম্বন্ধে যে বর্ণনাটি দিলেন তাহা এইরূপঃ—

"১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 'ডিউক অব গ্রাফটন' নামক জাহাজের যাত্রী হইয়া ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতবর্ষে আসেন। ঐ জাহাজেই 'ইমহফ' নামক একজন জার্মান যাত্রীও সস্ত্রীক ভারতে আসিতেছিলেন। তিনি ব্যারন বলিয়া সকলের কাছে নিজের পরিচয় দিতেন। পূর্বে সম্পত্তিশালী ছিলেন, সম্প্রতি দুঃস্থ হইয়া পড়াতে যাহাতে স্বর্ণভূমি ভারতবর্ষে আসিয়া চিত্রবিদ্যার সাহায্যে সহজেই প্রচুর অর্থ অর্জন করিতে পারেন সেই আশায় ভারতে আসিতেছিলেন।

"ব্যারনেস যুবতী এবং সুন্দরী। তাঁহার মানসিক অনুশীলনও ছিল, এবং তাঁহার ব্যবহারও ছিল চিত্তাকর্ষী। তিনি তাঁহার স্বামীকে ঘৃণা করিতেন, স্বামীর সহিত তাঁহার মনের মিল ছিল না। তিনি তাঁহার সহযাত্রী হেস্টিংসের সহিত আলাপে মুগ্ধা হইয়াছিলেন এবং হেস্টিংসও যে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত তাহা বুঝিতে পারিয়া সুখী হইয়াছিলেন।

"এই জাহাজে যাত্রা এবং ভারতযাত্রী জাহাজ এক বিচিত্র স্থান। জাহাজ-ভ্রমণের দীর্ঘ সাহচর্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বন্ধুত্ব অথবা শত্রুতা যেমনভাবে গড়িয়া উঠে তেমন আর অন্যত্র হয় না। সুদীর্ঘকালব্যাপী এই জলযাত্রা স্বভাবতই দারুণ একঘেয়ে এবং বিরক্তিকর। সুতরাং যে-কোন একটা ঘটনা হক,—যাহাই হক—সে ঘটনাটি, একটা পাখিই আসিয়া জাহাজে উড়িয়া পড়ুক অথবা একটা হাঙ্গর দৃষ্টিপথে পতিত হক, একখানি জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হক কিংবা একজন যাত্রী জাহাজ হইতে সমুদ্রে পড়িয়া যাক, সব কিছুতেই ঐ একঘেয়ে ভাবের মধ্যে একটু বৈচিত্র্য অনুভব হয়।

"জাহাজে সময় কাটানর জন্য যাত্রিগণ নানা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতেন। যাঁহারা ভোজনবিলাসী, তাঁহারা আহারের দিকেই মনোযোগ দিতেন, আবার অনেকে পরস্পর ঝগড়া বা প্রেমালাপে সময় কাটাইতেন। জাহাজে এই ঝগড়া ও প্রেমালাপের বিশেষ অবসর আছে, কেননা যাত্রীদের বাধ্য হইয়া একসঙ্গে থাকিতে হয়। নিজেকে নিজের কাবিনরূপ খাঁচায় আবদ্ধ করিয়া রাখা ছাড়া পরস্পরের সঙ্গপরিহারের অন্য কোন উপায় নাই। সব সময়ই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গী, একত্রে ভোজন, একত্রে ব্যায়াম ও একত্রে আমোদ-প্রমোদে যোগদান। সবই একত্রে। যে কোন জাহাজযাত্রী তাহার সহযাত্রীকে ইচ্ছা করিলে আনন্দও দিতে পারে আবার বিরক্তও করিতে পারে। জনসমাজে একজনের দোষ বা গুণ বহুদিন অপরের অজ্ঞাত থাকিয়া যাইতে পারে। কিন্তু জাহাজে একত্রবাসের ফলে, অনেক সময় আকস্মিক কোন ঘটনা বা বিপৎপাতে একের মনের ভাব সহজেই অপরের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই জাহাজেও সেইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। ব্যারনেস ইমহফ এবং হেস্টিংস উভয়েই এক জাহাজের যাত্রী, একজন অবিবাহিত এবং অপরজন আত্মসম্মানজ্ঞানহীন স্বামীকে আন্তরিক ঘৃণা করেন, উভয়েই অসাধারণ মানসিক গুণাবলীর অধিকারী। আবার ঘটনাক্রমে হেস্টিংস সেই সময় পীড়িত হইয়া পড়িলেন, এবং ব্যারনেস তাঁহার নারীজনসুলভ কোমলতা ও সহৃদয়তার বশবর্তিনী হইয়া পীড়িতের সেবার ভার লইলেন। রাত্রিজাগরণ করিয়া অনিদ্রায় তাঁহার রোগশয্যাপার্শ্বে রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন। জাহাজ মাদ্রাজের তীরভূমিতে পৌঁছিবার পূর্বেই হেস্টিংস ব্যারনেসের প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়িলেন। হেস্টিংসের প্রেম ও ঘৃণা উভয়ই অতি প্রবল এবং তাঁহার চরিত্রগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার ন্যায়ই এগুলি স্থায়ী, গভীর ও আন্তরিকতায় সুদৃঢ়। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে, তাঁহার এই প্রেম ইহা সাময়িক মনোভাব মাত্র নয় এবং বিলম্বে বিলুপ্ত হইবারও নয়।

"ব্যারনেসের স্বামী ইমহফ এই বিবরণ শুনিলেন এবং অর্থলোভে হেস্টিংসের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি স্বীকার করিলেন যে, তাঁহার পত্নী যদি বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আদালতে প্রার্থনা জানান তাহা হইলে যাহাতে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় সেজন্য তিনিও যতটা পারেন সাহায্য করিবেন এবং এ-বিষয়ে তাঁহার স্ত্রীর সুবিধা করিয়া দিবেন। এই কথাবার্তার সময় ইহাও স্থির হইল যে, পূর্বস্বামীর সহিত বিবাহবিচ্ছেদ হইবার পরে হেস্টিংস যখন আইনসঙ্গতভাবে ব্যারনেসকে পত্নীরূপে লাভ করিবার অধিকারী হইবেন তখন ব্যারনেসের পূর্বজাত সন্তানগুলির ভরণপোষণের দায়িত্বও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।"

তখনকার দিনে বিবাহবিচ্ছেদ সহজ ছিল না। হেস্টিংসকে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। সেজন্য ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যে নাটিকার যবনিকা প্রস্তাবনায় উত্তোলিত হইয়াছিল ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সেই নাটিকার যবনিকাপাত হইল। ব্যারন ইমহফের পত্নীত্ববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর ৮ই আগস্ট স্বামী-পরিত্যক্তা ব্যারনেসের মহাসমারোহে ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের

সহিত শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল, এবং তদ্‌বধি তিনি হেস্টিংসের পদবীর অধিকারিণী হইয়া ভারতপ্রবাসিনী ইউরোপীয় মহিলাগণের মধ্যমণিস্বরূপা হইয়াছিলেন।

হেস্টিংসের বিবাহে কলিকাতার সমস্ত পদস্থ ইংরাজই নিমন্ত্রিত হইয়া বিবাহ-উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। হেস্টিংসের শত্রুপক্ষ বা মিত্রপক্ষ উভয় পক্ষের কেহই এই নিমন্ত্রণে বাদ যান নাই। ক্লেভারিং নিজের অসুস্থতা জানাইয়া বিবাহ-উৎসবে উপস্থিতির অক্ষমতা নিবেদন করিয়াও রেহাই পান নাই, হেস্টিংস স্বয়ং তাঁহার গৃহে গিয়া তাঁহাকে বিবাহ-উৎসবে যোগ দিবার জন্য সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। শোনা যায়, রুগ্‌ণাবস্থায় এই টানাটানির ফলে তাঁহার অসুখ বাড়িয়া যায় এবং সেই অসুখেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ফ্রান্সিসের সঙ্গে হেস্টিংসের ডুয়েল লড়াই আর একটি বিশেষ ঘটনা। যাহাতে এই ডুয়েল না হয় সেজন্য ফ্রান্সিস অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু হেস্টিংস ডুয়েলের জন্য বদ্ধপরিকর। এই সময় হেস্টিংসের চাকরি যাইবার সম্ভাবনাও ছিল, তাই তাঁহার ভারতের গভর্নরি বজায় থাকিতে থাকিতেই যাহাতে যুদ্ধটা হইয়া যায়, তাহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত, তাই তিনি যদি ডুয়েল লড়াইয়ে মারা যান তবে স্ত্রীর যাহাতে ভবিষ্যতে অর্থকষ্ট না হয় সেজন্য এক ভারতীয় ব্যবসায়ীর কাছে নিজের বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া তিন লক্ষ সিক্কা টাকা ধার চাহিলেন, এবং ব্যবসায়ী তাহা দিতে বাধ্য হইলেন। অবশ্য ধার বলিয়া লওয়া হইলেও এই ধার যে কখনও শোধ হইবে না ইহা জানিয়াই ধার দেওয়া হইয়াছিল।

ডুয়েলে ফ্রান্সিস বা হেস্টিংস কেহই মারা যান নাই, তবে ফ্রান্সিস গুরুতর আহত হইয়াছিলেন এবং আহত ফ্রান্সিসকে বেলভেডিয়ার প্রাসাদে স্থানান্তরিত করা হয়। হেস্টিংস সেই সময় পীড়িতকে দেখিতে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াও পীড়িতের সম্মতিলাভ করিতে পারেন নাই।

ফ্রান্সিস সাহেব একজন বিখ্যাত জুয়াড়ী ছিলেন। জুয়াখেলায় অনেকে সর্বস্বান্ত হন, কিন্তু অনেক ইংরাজ জুয়ার দৌলতে ধনী হইয়াছিলেন এবং সেই ধনলাভকারী ভাগ্যবান জুয়াড়ীগণের মধ্যে ফ্রান্সিস সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাভারতে আছে যে, পাশা খেলার সাহায্য লইয়া দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন এবং নলরাজাও পাশা খেলাতেই সর্বস্ব হারাইয়াছিলেন।

তখনকার ইংরাজ সমাজে পাশা খেলার দ্বারা শত্রুনির্যাতন-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। জুয়ায় হারাইয়া শত্রুকে প্রথমে সর্বস্বান্ত, এবং পরে ঋণী করিয়া ঋণদায়ে জড়িত প্রতিপক্ষকে নিজের কবলের মধ্যে আনয়ন করা, ইহাও শত্রুনির্যাতনের একটি উপায়স্বরূপে ভারতপ্রবাসী ইংরাজ সমাজে গৃহীত হইয়াছিল।

প্রবাসী ইংরাজ ভারতে আসিয়া যদিও নবাবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রাণটি হাতে লইয়া দিন কাটাইতে হইত। কলেরা, বসন্ত, ডেঙ্গুজ্বর প্রভৃতি প্রাচ্যদেশীয় নানারকম ব্যাধি ত আছেই, তাহার উপর আছে শতমারী সহস্রমারী

দি জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিঃ

দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী লিঃ অব ইংলণ্ড-এর প্রতিনিধি L 52 B

চিকিৎসকের চিকিৎসা। ডাক্তারেরা পাল্কি করিয়া বাড়ি বাড়ি গিয়া এক মোহর দর্শনীতে রোগী দেখিতেন। চিকিৎসা ছিল প্রধানত রক্তমোক্ষণ অর্থাৎ রোগীর দেহ হইতে রক্ত বাহির করিয়া লওয়া। রোগী সবল হউক বা নিতান্ত দুর্বল হউক, তাহার দেহ হইতে খানিকটা রক্ত বাহির করিতেই হইবে। সুতরাং রোগীর রোগে মৃত্যু না হইলেও চিকিৎসার মাহাত্ম্যেই অনেক সময় তাহার মৃত্যু হইত।

বস্তুত ইংরাজগণের ভারতবর্ষে আসিয়া বাঁচিয়া থাকাটাই তাঁহাদের পক্ষে সৌভাগ্যের পরিচয়। শীতপ্রধান দেশের পরিবেশে যাঁহারা আজন্ম কাটাইয়াছেন, তাঁহাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পরিবেশে দিন যাপন, যাঁহারা শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত তাঁহাদের অলসভাবে জীবনযাপন, ইহার উপর প্রচুর মদ্যপান ও অতিভোজন, নানা-ভাবে কলুষিত প্রমোদ উপভোগ প্রভৃতি সত্ত্বেও যে তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিতেন, সেইটিই আশ্চর্য, এবং তাঁহাদের জীবনীশক্তি যে কিরূপ প্রবল ছিল ইহাতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্ষাকালে অনেকেই জ্বরে পড়িতেন; যাঁহারা এক বৎসর বর্ষা কাটাইয়া উঠিয়াছেন তাঁহারা তখন বন্ধুবান্ধবদের আহ্বান করিয়া মহাসমারোহে ভোজ দিতেন। 'যাক্, এবারটা তো বেঁচে গিয়েছি' এই মনের ভাবটিই ছিল এই ভোজের ব্যাপারের কারণস্বরূপ।

হ্যাডলেন তাঁহার এক বন্ধুকে একবার লিখিয়াছিলেন, "আশা করি এই পৃথিবীতেই আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হইবে। এখন পর্যন্ত তো বাঁচিয়া আছি, কিন্তু যদি আর কখনও নিজের ইচ্ছায় এ-দেশে আসি তবে আমি যেন জাহান্নামে যাই।"

প্রবাসী ইংরাজের ভারতবর্ষের সহিত প্রধানত অর্থ অর্জনের সম্বন্ধই ছিল। অন্তরের সম্বন্ধ খুব কম স্থানেই দেখা যাইত। তবে ভারতে বাস করিতে করিতে তাঁহারা অনেক স্থলে ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিলেন। আলবোলায় তামাক খাইবার প্রচলন এত বেশী ছিল যে, কাহাকেও পত্র লিখিয়া আমন্ত্রণ জানাইলে সেই পত্রেই হুঁকোবরদারকেও সঙ্গে আনিতে হইবে কি না তাহাও জানাইয়া দিতে হইত।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, অথচ পাখার কোন ব্যবস্থা ছিল না। হাতপাখাতেই সকলকে গ্রীষ্ম নিবারণ করিতে হইত, তাহার পর টানাপাখার প্রচলন হয়। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে অথবা ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম টানাপাখা প্রচলিত হয়।

সে-সময় বেশী ইংরাজ মহিলা এ-দেশে আসিতেন না, সেজন্য নারী লইয়া পুরুষ-মহলে কাড়াকাড়ি ছিল। অনেক সময় নারী সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতেই ডুয়েল লড়াই হইত। অনেক ইংরাজ দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটাইতেন, দেশীয় নারীদের লইয়াই তাঁহারা সংসারী হইতেন।

কলিকাতার ইংরাজ সমাজে চরিত্রের কোন বালাই ছিল না, তাই ইঁহারা পাদরীদের পছন্দ করিতেন না। যদিও এই ধর্ম-যাজকেরাই এক হিসাবে অন্য দেশের উপর জেতৃজাতির প্রভাব দৃঢ়প্রতিষ্ঠার সহায়-স্বরূপ, কিন্তু কলিকাতার ইংরাজ সমাজের এই ধর্ম-প্রচারকদের সঙ্গে হৃদ্যতা তো ছিলই না বরং বিষম শত্রুতা ছিল। ইতিহাসে দেখা যায় যে, জাতি যখন কোন দেশ জয় করিয়াছে, প্রথমেই সেই বিজিত দেশের অধিবাসীদের নিজেদের ধর্মমতে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। পর্তুগীজ, ডাচ, স্পানিয়ার্ড প্রভৃতি সকল জাতির সম্বন্ধেই এই কথা বলা চলে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে ভারতবর্ষে ইহার ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিজের অধিকারভুক্ত এলাকায় ধর্মযাজকদের বাস করিতে দিতে চাহিতেন না। ধর্মযাজকেরা ছিলেন তাঁহাদের নিকট 'অবাঞ্ছিত ব্যক্তি'। তাঁহাদের হাতে তখন এমন ক্ষমতা ছিল যে, যে-ব্যক্তিকে তাঁহারা অবাঞ্ছিত বলিয়া মনে করিতেন তাহাকে সরাসরি জাহাজে তুলিয়া ইংলণ্ডে চালান করিয়া দিতে পারিতেন। সেইজন্য ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরি যখন কলিকাতায় আসেন তখন তাঁহাকে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে লুকাইয়া থাকিতে হইয়াছিল, পাছে তাঁহার ধর্মপ্রচারের খবর শাসকদের কানে যায়। কেরি সাহেবের পরে মার্শম্যান ও ওয়ার্ড নামে অন্য দুইজন ধর্মপ্রচারকও এই একই কারণে ইংরাজের অধিকার ত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন।

ধর্মপ্রচারকদের উপর এরকম ব্যবহারের কারণ কী? এই প্রশ্নের উত্তরে এ-কথা বলা যায় যে সে-সময়ের ধর্মপ্রচারকগণ যথার্থই ধার্মিক ছিলেন। তাঁহারা প্রবাসী ইংরাজদের এই যথেচ্ছাচার কোন মতেই সমর্থন করিতে পারিতেন না। পরবর্তী কালের বহু প্রচারক যে-ভাবে শাসকগণের সহযোগিতা করিয়া রাজশক্তির আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের সে-রকম মনোবৃত্তি ছিল না। তাঁহারা শাসকগণের অন্যায় কার্যের সমর্থন না করিয়া বরং প্রতিবাদ করিবারই চেষ্টা করিতেন। সেই কারণেই যথেচ্ছাচারী শাসকগণ তাঁহাদের যথেচ্ছাচারে এই যাজকদের বাধা বলিয়াই মনে করিতেন। তাহা ছাড়া এইসব ধর্মপ্রচারক মুখে প্রতিবাদ না করিলেও মনে মনে যে তাঁহাদের অন্যায় কার্যের সমর্থন করিতেছেন না, তাহা মনে মনে অনুভব করিয়া তাঁহারা মানসিক অশান্তিও অনুভব করিতেন। তাই সে-সময়ের প্রবাসী ইংরাজ প্রচারকেরা যদিও তাঁহাদেরই স্বদেশী, তবুও তাঁহাদের সহ্য করিতে পারিতেন না।

বহু ছোকরা সিভিলিয়ান অর্থাৎ ইংরাজ কেরানী তখন সরকারী আপিসে কাজ করিত। তাহাদের কাজের সময় ছিল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা হইতে রাত্রি নয়টা শীতকালে, এবং গ্রীষ্মকালে রাত্রি নয়টা হইতে রাত্রি বারোটা। আর দিনের কাজ বেলা দশটা হইতে দেড়টা পর্যন্ত।

বৈকালে সকলেই বেড়াইতে বাহির হইত। কেহ পায়ে হাঁটিয়া, কেহ ঘোড়ায় চড়িয়া, আবার কেহবা ফিটন গাড়িতে। নৌকায় গঙ্গাবক্ষে বৈকালিক ভ্রমণেও অনেক লোককে বাহির হইতে দেখা যাইত।

আহারের সময় ছিল নয়টায় প্রাতর্ভোজন এবং বেলা দুইটার সময় ডিনার বা মধ্যাহ্ন-ভোজন। প্রত্যেকবারই প্রচুর ও নানাবিধ উপকরণ পরিবেশিত হইত। ইহা ছাড়া রাত্রিতেও ভূরিভোজনের ব্যবস্থা ছিল। রাত্রে পুরুষগণ প্রত্যেকে চারি বোতল মদ এবং মহিলাগণ প্রত্যেকে এক বোতল মদ গ্রহণ করিবেন—ইহাই ছিল সাধারণ নিয়ম, কিন্তু প্রায়ই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত।

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই আলবোলায় তামাক খাইতেন। এই ধূমপানের সময় কোন মহিলা যদি কোন পুরুষের আলবোলা তামাকু সেবনের জন্য গ্রহণ করিতেন, তবে তাহা সেই পুরুষের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ-প্রদর্শন বলিয়া মনে করা হইত।

জলপথে ও স্থলপথে এক দেশ হইতে দেশান্তরে যাইতে হইলে নৌকা ও পাল্কি যানরূপে ব্যবহার করা হইত। ডাক বিভাগের উপরেই সাহেব লোকেদের দূরদেশে যাইবার পাল্কির ব্যবস্থার ভার ছিল এবং পুলিস বিভাগের উপর ছিল নৌকা সরবরাহের ভার।

নৌকাপথে দূর স্থানে যাইতে হইলে কোন্ স্থানে যাইতে কত সময় লাগিবে তার একটা মোটামুটি হিসাবও ছিল: কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ যাইতে কুড়ি দিন, ঢাকায় যাইতে সাঁইত্রিশ দিন, পাটনায় যাইতে ষাট দিন, কাশী যাইতে পঁচাত্তর দিন, কানপুরে যাইতে নব্বই দিন, ফারুক্কাবাদ যাইতে একশ পাঁচ দিন লাগিবে, ইহাই ছিল মোটামুটি হিসাব।

পুলিসের ব্যবস্থা এবং পথঘাটের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। কলিকাতা নগরীকে শহর না বলিয়া এক হিসাবে জঙ্গলও বলা চলিত। এমন অপরিচ্ছন্ন ও এমন অস্বাস্থ্যকর স্থান যে, বর্ণনা করিয়া তাহা বুঝান যায় না। রাস্তার কোথাওবা

কাদা আবার কোথাওবা বিষম ধুলো। তবে অবশ্য কলিকাতার যে অংশে ইউরোপীয়েরা বাস করিতেন সে-দিকের রাস্তা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার থাকিত। পুলিসের উপরেই ছিল শহর পরিষ্কার রাখিবার ভার।

চোর ও ডাকাতের উপদ্রব খুবই ছিল। পথে চলা মোটেই নিরাপদ ছিল না। ডাক লইয়া রানাররা জঙ্গলপথে চলিতে গিয়া অনেক সময় ডাকাতের হাতে এবং কখনও বা ব্যাঘ্রের কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইত। ডাকের মাসুল ছিল:

আড়াই তোলা ওজনের চিঠির মাসুল বারাকপুরের জন্য এক আনা, মুর্শিদাবাদের জন্য দুই আনা, ভাগলপুর ও ঢাকার জন্য তিন আনা, কাশীর জন্য সাত আনা।

ওজন বেশী হইলে মাসুলও সেই অনুপাতে বেশী লাগিত।

সংবাদপত্র প্রকাশ ও মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতির জন্য প্রধানত উইলিয়াম কেরি প্রমুখ পাদরীগণকেই কৃতিত্বের জন্য প্রশংসার অধিকারী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

১৭৬৮ খৃীষ্টাব্দে বোল্টন নামে এক ব্যক্তি কলিকাতার প্রকাশ্য স্থানগুলিতে একটি বিজ্ঞাপন দেন যে, তিনি একখানি হাতে-লেখা সংবাদপত্র বাহির করিবেন।

এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া শাসক সম্প্রদায়ের মাথার টনক নড়িল, "এ আবার কী ব্যাপার? কোথায় কী ঘটিল না ঘটিল সেই সংবাদ জনসমাজে প্রচার করা? কেন বাপু, এ সব লইয়া তোমার এত মাথাব্যথা কেন? এ রকম বিপজ্জনক ব্যক্তিকে কখনই এদেশে রাখা উচিত নয়।" সুতরাং তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ইংলণ্ডে চালান করিয়া দেওয়া হইল।

ইহার এগার বৎসর পরে ১৭৮০ খৃীষ্টাব্দে একখানি ছাপান সাপ্তাহিক পত্র বাহির হইল। হিকি নামে এক ব্যক্তি এই কাগজের সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন। কাগজখানির নাম ছিল 'হিকিজ বেঙ্গল গেজেট'। এ-কাগজও গভর্নমেণ্ট চলিতে দিলেন না। ১৭৮০ খৃীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি কাগজখানি বাহির হইয়াছিল। ঐ বৎসরেই উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারিগণকে গালি দেওয়া ও তাঁহাদের কুৎসা প্রচারের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া ১৪ই নভেম্বর কাগজখানি বিলুপ্ত হইল। যে ইংরাজ কর্মচারীদিগের কুৎসা প্রচার করা হইয়াছিল, তাঁহারা বড় কেওকেটা নন। তাঁহারা স্বয়ং গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এবং প্রধান বিচারপতি ইলাইজা ইম্পে।

কিন্তু "মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী"? আবার সেই কাগজ বাহির হইতে লাগিল। কোথা হইতে ছাপা হইতেছে এবং কীভাবে তাহা প্রচারিত হইতেছে তাহার কোন হদিস পাওয়া গেল না। কিন্তু কাগজখানি সতেজে ও পূর্ণ উদ্যমে চলিতে লাগিল। এই কাগজে হেস্টিংসের একটি নূতন নামকরণ করা হইল "মংহেডেড গ্রাণ্ড টার্ক"। প্রধান বিচারপতির দুইটি নামকরণ করা হইল—একটি বেনামীতে ঠিকাদারি লইবার জন্য, সে নাম Pool bundy এবং অপর নাম Judge Giffreys এবং পাদরী জনসনের নাম Indus Iscariot, পাদরী কিয়ার ন্যানডারের নাম Mammon আর তিনি নিজে নাম লইলেন "The true born Englishman."

গভর্নমেণ্টও তখন নিজের পক্ষের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিলেন, পত্রিকার নাম 'ইণ্ডিয়া গেজেট'। পত্রিকার বহুলপ্রচার যাহাতে হয় সেজন্য গভর্নমেণ্ট ডাক বিভাগকে আদেশ করিলেন যে, এই পত্রিকা ভারতবর্ষের সর্বত্র বিনা মাসুলেই পাঠাইতে হইবে।

পাদরী কিয়ার ন্যানডারই এদেশের প্রথম প্রটেস্টাণ্ট পাদরী। ইঁহার উপর হিকির রাগের কারণ যে, ইনি গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেন। গভর্নমেণ্টের গেজেটের ছাপিবার অক্ষর সরবরাহের ভারও ইনি লইয়াছিলেন। ইনি এদেশের এক ধনী ইংরাজ মহিলাকে বিবাহ করিয়া ধনী হন, এবং ব্যবসাগিরি করিতে আরম্ভ করেন। "ওল্ড মিশন চার্চ" গির্জাটি তাঁহারই অর্থে প্রতিষ্ঠিত।

১৭৮১ খৃীষ্টাব্দে হিকির নামে গভর্নমেণ্ট হইতে ২ নম্বর নালিশ রুজু করা হয় এবং হিকিকে জেলে যাইতে হয়। হাজতে থাকার সময় পর্যন্ত তিনি কাগজ চালাইয়াছেন। বিচারে তাঁহার দুই হাজার টাকা জরিমানা ও এক বৎসরের জেল হয়। কিন্তু তখনও কাগজ বন্ধ হইল না। ইহার পর হেস্টিংস তাঁহার নামে মানহানির নালিশ করিয়া পাঁচ হাজার টাকা ড্যামেজ বাবদ ডিক্রি পাইলেন। হিকি জরিমানা দিতে না পারিয়া জেলেই রহিয়া গেলেন এবং জেল হইতেই কাগজ চালাইতে লাগিলেন। তখন দেনার দায়ে তাঁহার ছাপাখানাটি ক্রোক করিয়া লওয়া হইল, এবং কাগজও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ইহার পর সেই সাহসী সম্পাদকের কী হইল কিছু জানা যায় না।

ইহার পর যে-কয়খানি সংবাদপত্র পর পর বাহির হয় সেগুলির নাম ক্যালকাটা গেজেট, বেঙ্গল জার্নাল, ওরিয়েণ্টাল ম্যাগাজিন নামক মাসিক পত্রিকা, এবং ক্যালকাটা ক্রনিকল। সবগুলিই গভর্নমেণ্টের নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা।

কাউন্সিলের সদস্যগণ কেহই সন্তুষ্ট ছিলেন না, স্বয়ং গভর্নর-জেনারেল ঘুষখোর এবং প্রধান বিচারপতি তাঁহার সহায়। হেস্টিংসের জীবন-চরিতকার গ্লেগ সাহেব লিখিয়াছেন, হেস্টিংসের আমলে ইংরাজ ব্যবসায়ীরা ব্যবসার নামে লুণ্ঠন করিত। তাহাদের লুণ্ঠনের ভয়ে কেবল বাংলাই নয়, বিহারের জনগণও সন্ত্রস্ত থাকিত। হেস্টিংস পাটনা যাইবার পথে দেখিয়াছিলেন পল্লীর পর পল্লী জনশূন্য। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন যে, ইংরাজ-ব্যবসায়ীদের আগমন-সম্ভাবনায় পল্লীবাসিগণ দোকানপাট বন্ধ করিয়া ও ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে।

কলিকাতার ইংরাজ সমাজে ছিল যথেচ্ছাচারের রাজত্ব এবং এ-দেশের লোকই সেই যথেচ্ছাচারে সাহায্য করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিত।
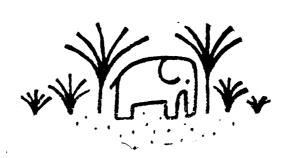
কোন কুলবধূর কথা

সন্তোষকুমার ঘোষ

একেবারে নতুন লোক।

একে এ-পাড়ায় কেউ দেখেনি। প্রথম দিন যখন এল, তখন তাদের ভরা-দুপুর, চড়া রোদ, চারদিক খা-খা করছে। আমাদের বারান্দার রেলিঙে একটা কাক, রকে একটা কুকুর, রাস্তায় কচিৎ একটা ফিরিওয়ালা।

ছেলেমেয়েরা কখন ইস্কুলে গিয়েছে, উনিও এই খানিক আগে নিত্যকার পানটি মুখে পুরে নিত্যকার অফিসে গেলেন। সব পাট চুকিয়ে আমি স্নান সেরেছি, কাপড় শুকোতে দেব বলে এসেছি বাইরে। তারটা বড় উঁচু, সহজে নাগাল পাইনে, বুড়ো আঙুলে ভর দিয়েও না। চাকরটাকে বলি, ওটা নিচু করে দিস, সে বলে দেব, দেয় না, বা দিতে ভোলে, এদিক ওদিক চেয়ে আমাকে রোজই ছোট্ট একটু লাফ দিতে হয়। তিন ছেলের মা, ছি।

সেদিন লাফিয়েও তারটা ছুঁতে পারলুম না, ব্লাউজটা ফসকে পড়ল একেবারে নীচে। ঝুঁকে পড়ে দেখছি, কোথায় পড়ল, নর্দমায় না রকে, তখনই লোকটাকে দেখতে পেলুম।

নতুন লোক বলেই দেখলুম, নইলে চেহারা এমন কিছু চোখে পড়বার মত নয়। সামনের যে-বাড়িটা আজ মাসখানেক ধরে খালি পড়ে আছে, সেটাকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে। দরজা-জানালা সবই বন্ধ, তবু লোকটি একটু ইতস্তত করে এগিয়ে গেল, দু'ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়াল রকে। দরজাটাকে আস্তে আস্তে ঠেলল একবার। খুলল না। জোড়া কড়ায় মস্ত একটা তালা ঝুলছে তাও কি লোকটা দেখতে পায়নি।

অবাক হয়ে আমি নতুন মানুষটার বিচিত্র কান্ডটা দেখছিলুম। একটু হয়ত মজাও পেয়ে থাকব। নইলে, ব্লাউজটা কুড়িয়ে আনতে চাকরকে ত নীচে পাঠিয়েই দিয়েছিলুম, ওখানে আর দাঁড়াবার দরকার ছিল না।

দরজা খুলল না। একটু অপ্রতিভ একটু-বা হতাশ হয়ে লোকটা রক থেকে নেমে ফের পথে এসে দাঁড়াল। ঘাড় উঁচু করে বাড়িটাকে আবার দেখল খানিক, চোখ নামিয়ে নিল। আসলে বোধ হয় নামাতেই হল। মেঘের খোসা খসে গিয়ে তখন রোদ্দুরের হলদে শাঁস বেরিয়ে পড়েছে, বাড়িটা ও উত্তর-মুখী, বেশীক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না। একবার মনে হল ওর চোখ দুটি যেন জুলজুল করছে। হয়ত অক্ষম লোভে। কিংবা রোদেরই জ্বালায়।

যেদিক থেকে এসেছিল, লোকটি সেদিকে ফিরল না, সামনের দিকে চলতে শুরু করল। তবে জোরে জোরে পা ফেলে নয়, যদিও ওর বয়সী পুরুষের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক হত। আস্তে আস্তে এগোচ্ছিল, মাথাটা সামনের দিকে হেলানো, যেন কী ভাবছিল। যেন যারা দেড়শ দুশ টাকার জন্যে রোজ সকালে সময়কে বাঁধা রেখে ফের সন্ধ্যায় খালাস করে আনে, ও তাদের একজন নয়। অঢেল সময় ও অনায়াসে অপচয় করতে পারে, পুরোপুরি না খেয়ে দু-তিনটে সিগারেট যেমন ইতিমধ্যে ছুঁড়ে ফেলে ফেলে নষ্ট করেছিল, তেমনই। একটা গাড়ি আসছিল, জায়গা বেশ ছিল, তবু লোকটা সরে একেবারে ড্রেন ঘেঁষে দাঁড়াল। দাঁড়াতে চায় বলেই নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বেঁধে নিল। নইলে আমার সন্দেহ, বাঁধবার দরকারই ছিল না।

ফিতে বাঁধল, রুমালে ঘাম মুছল, ফিরে দাঁড়াল। তারপরে, অবাক হয়ে দেখি, লোকটা আবার এদিকেই আসছে।

আসুক, আমার কী। আমি ত দোতলার, বারান্দার রেলিং শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে আছি।

দেখলুম, বন্ধ বাড়িটার পাশের ছোট দোকান থেকে লোকটা সিগারেট কিনছে। কিনল, কিন্তু ধরাল না, কেননা, আমি

৬

অনুমান করলুম, ওর পকেটের পুরনো প্যাকেটটায় নিশ্চয়ই এখনও সিগারেট আছে। পয়সা দিতে দিতে লোকটি দোকানীকে কী জিজ্ঞাসা করল, আঙুল দিয়ে ইশারা করল বাড়িটার দিকে, দোকানীও কী যেন জবাব দিল, আমি শুনতে পেলুম না।

নতুন লোকটি ততক্ষণে ফের চলতে শুরু করেছে। এবার আগেকার মত ঢিমে-তালে নয়, ব্যস্ত ভাবেও নয়, স্বাভাবিক চালে।

আমার এখনও অনেক কাজ বাকী। ভিতরে যাব, শোবার ঘরের বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে বড় করে সিঁদুরের একটি ফোঁটা পরব। রোজ যেমন পরি। লক্ষ্মীর পটের সামনে বসে স্তব পরব। সব শেষে হেঁসেলে যাব, এক থালা ভাত বেড়ে নেব, আরেক থালা আলাদা করে রাখব, ওটা চাকরের। এত বেলায় খিদে থাকে না, পিত্তি পড়ে যায়, তবু খাই। মাছের ল্যাজা আর পুঁই চচ্চড়ি দিয়ে পুরো থালাটাকেই শেষ করি। খাওয়াটা আজকাল যেন পুষ্টির জন্যে নয়, নেশার জন্যে; নইলে দুপুরের ঘুমটুকু হয় না। না হলে মাথা ধরে, থেকে থেকে তেষ্টা পায়, গা ম্যাজম্যাজ করে। বিকালের খাটুনি খাটতে পারি না। কিন্তু যেই ভরপেট খাওয়া হল, অমনই টুপ করে একটা পান ফেলে দিলুম গালে, ঠোঁট টুকটুকে হল কি না একবারটি দেখে নিয়েই পাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম নীচে। হাত-পাখাটা হাতে নিয়ে প্রথমে তার ডাঁট দিয়ে মারলুম গলার ঘামাচি, জামা-টামা একটু আলগা করে দিলুম, এখানে আর কে দেখছে।

তারপর হাতের পাখা হাতেই থাকে, হাওয়া খাওয়া বিশেষ হয় না, চোখ জড়িয়ে আসে, পাখাটা ঠকাস করে মাটিতে পড়ে, চমকে উঠি, ফের চোখ বুজি। জানি, একটু পরে আমার নাক ডাকবে, ভিজে এলো চুলের ডগা শুকবে, কিন্তু গোড়া ঘামে আরও ভিজবে হবে। সিঁদুরের ছোট্ট ফোঁটাটা ছড়িয়ে ছড়িয়ে রক্ত-জবার মত দেখাবে।

আমার নাকি নাক ডাকে। উনি বলেছেন। ওঁরও ডাকে। আমি শুনেছি। কিন্তু নিজেরটা কেউই শুনিনি। ভগবান অন্তত দুটো ব্যাপারে আমাদের অসীম করুণা করেছেন। এক, নিজের চেহারা অহরহ দেখতে পাই না। দুই, নিজের নাকের ডাক শুনি না। নইলে মানুষ আরও অনেক বেশী দুঃখ পেত।

লোকটাকে কেন প্রথম দিনই চোখে পড়েছিল, পরে অনেকবার ভেবেছি। একটা কারণ, নতুন বলে। আমাদের এই নির্জন গলিতে বাইরের লোকজন ত বেশী আসে না। জানলা দরজা সব বন্ধ থাকে, দুপুরে বৌ-ঝিরা পড়ে পড়ে ঘুময় বলে ফিরিওয়ালার ভিড়ও কম। যে ক'জন আসে, তাদের আমি চিনি। একজন আসে সকালের দিকে, দুয়ারে দুয়ারে পুরন কাগজ চেয়ে চেয়ে ফেরে। একটু বেলায় এসে একজন হাঁকে 'চন্দন ধূ-উ-প।' তারও অনেক পরে, একজন পিতলের বাসন মাথায় করে একটা বাটি কাঁসরের মত বাজিয়ে জানান দিয়ে চলে যায়। একই পশ্চিমা লোক শীতকালে কমলা লেবু আর গরমে আম বয়ে আনে। মাঝে মাঝে আসে শিল-খোদাই। এদের সকলকেই আমি চিনি। কিনি-না-কিনি, ডাক শুনলেই বারান্দায় এসে দাঁড়াই। চিনি খেলনা-ওয়ালাকেও, ঝুমঝুমি বাজিয়ে যে রোজ গলিটা পার হয়ে যায়। বেলফুলওয়ালা আসে না, এ-পাড়ায় ফুলটুলের শখ কারও নেই।

এরা ছাড়া বাইরের লোক আসে কদাচিৎ। সেই কবে গলা অবধি ঘোমটা ঢেকে শঙ্খ আর উলুধ্বনির মধ্যে মোটর থেকে নেমেছিলুম, পা কাঁপছিল, বুক কাঁপছিল, চোখের পাতা বুজে আসছিল, তারপর আট-দশ বচ্ছর হয়ে গেল, আমি প্রথম দু'বার বাচ্চা বিইয়ে রোগা আর শেষ-বারে থপথপে মোটা হয়ে গেলুম, কত চুল উঠে গেল, লুকিয়ে লুকিয়ে পাকল কত, কিন্তু গলিটা একটু-ও বদলাল না ত।

সেই সকাল হতে না হতে কারা ঘোলা জলের নল খুলে রাস্তা ধুয়ে দিয়ে যায়, কেউ উঠে পড়বার আগেই তারা সরে পড়ে, রাতজাগা গ্যাসের আলোটা ক্লান্ত চোখ বোজে। বিজলী তারে ওই ঘুড়িটা, মনে হয়, এ-গলির জন্মদিন থেকেই ওখানে লটকে আছে। রোদে জলে কাগজের রঙই শুধু একটু একটু করে ধুয়ে গেছে। মোড়ের হলদে রঙের বাড়িটা—প্রথম দিন থেকেই দেখছি ছাতের কার্নিসের খানিকটা ভাঙা, আজও ভাঙাই আছে। মেরামত করার কথা কারও বুঝি একবারও মনে হয়নি। অন্যের কথায় কাজ কী, আমাদের এই বাড়িটারই ত সদর দরজার ছিটকিনি ভাঙা, একটু হাওয়া হলেই কবজাগুলো কুকুরের মত কেঁউ কেঁউ করে, তখন ভাবি, আর নয়, কালই মিস্ত্রী ডেকে সারিয়ে নেব, কিন্তু পরদিন ভুলে যাই। একটি দিন হুবহু আর সব কটি দিনের মত; যেন মিলে তৈরি শাড়ি, রঙে, নকশায়, আকারে এক।

ছোট্ট পাড়া ত, এ-গলির লোকজনদেরও আমি চিনে ফেলেছি। কর্তাদের বেশির ভাগই সদাগরি অফিসের জ্যেষ্ঠ থেকে কনিষ্ঠ কেরানী। সকালে বাজার করেন, বাজার থেকে ফিরে অফিস। ঘাড়ের কাছে হলদে ছোপ-ধরা পাঞ্জাবি, মুখে পান। সন্ধ্যার মুখে সবাই বাড়ি ফেরেন।

আমার স্বামীও। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেলেই বুঝি, ছটা বেজেছে—দু-পাঁচ মিনিট এদিক হতে পারে।

আমারও গা ধোয়া হয়ে যায় তার আগেই। উনি আসেন, একটু হাঁপান, হাসেন, কোঁচার খুঁট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খান, ক্যাম্বিস কাপড়ের চেয়ারটায় গা ঢেলে দেন। ঘাম শুকলে হাত বাড়িয়ে বলেন, "দেখি।"

না, না, আমাকে না, আমাকে চান না,

Latest Models

T U 222—Rs. 300|-   T U 298—Rs. 215|-
T U 254—Rs. 390|-   T U 0724—Rs. 495|-
T U 926—Rs. 575|-
T B 299—Rs. 215|-   T B 243—Rs. 325|-

Authorised dealer
GRAMO—RADIO EMPORIUM
80B, Vivekananda Road, Calcutta. Phone : 34-2835

তখন চান না, রাত না হলে চাইতে নেই। উনি জলের গ্লাসটা চান।

আমি গ্লাসটা ও'র হাতে তুলে দিই। ঢক ঢক করে সবটা খেয়ে উনি বলেন, "আঃ।" কোন দিন বা আমার কপালের যত্ন করে পরা টিপটাও চোখে পড়ে। বলেন, "বাঃ।" অব্যয় দুটির প্রথমটি তৃপ্তির, পরেরটি প্রশস্তির।

তখন ও'র আর কিছু চাই না, সকালে খবরের কাগজটাতে শুধু চোখ বুলিয়ে অফিসে গিয়েছিলেন, এখন সেটা আদ্যোপান্ত পড়বেন।

সেই অবসরে আমি একটিবার বাইরে এসে দাঁড়াব। আকাশের প্রথম তারাটিকে দেখব। টবে অনেক যত্নে কয়েকটি বেলফুল ফুটিয়েছি, তার একটিকে খোঁপায় পরব। দশ বছর ধরে এই একটুখানি ছেলেমানুষি নিজের জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছি।

আশে পাশে তাকালে যে-কয়টি বাড়ি চোখে পড়ে, বুঝি তার একটিও আমাদের থেকে আলাদা নয়। এক ছাঁচে ঢালা মানুষ, একই গলির খাপে বন্দী, তাদের কাজের ফিরিস্তিও ত একই রকমের হবে।

এরা সকলেই বাড়ি ফিরে এক গ্লাস জল, আর গা-ধুয়ে ফিটফাট, সিঁদুরের টিপ-পরা বৌকে পায়।

পায়, কোন দিন নেয়, কোন দিন নেয় না। কিন্তু ঠিক সময়ে ঘুময়। কলের যে ঘড়ি, সেও কখনও দেরি করে ফেলে, দম ফুরিয়ে বিকল হয়। এরা দেরি করে না, বিকল হয় না। কেননা, মনে ভয় আছে। পাছে সকালে উঠতে দেরি হয়, দেরি হয় বাজার করতে, অফিসে যেতে? নিয়মের যে শিকল দিয়ে এরা সময়কে বেঁধে রেখেছে, গিঁট আলগা হয়ে সেটা যদি খুলে যায়?

কথায় কথায় কোথায় এসে পড়েছি। বলছিলুম ওই নতুন লোকটার কথা।

বিয়ে, বিয়োন, আর দু-একটি মৃত্যু ছাড়া আর কিছুর নড়চড় আজ অবধি যেখানে হয়নি, আমাদের সেই পাড়ায় হঠাৎ একটা বাড়ি খালি হল। সেই বাড়িটা দেখে গেল লোকটা।

সুপুরুষ নয়, আগেই বলেছি। রোগা হ্যাংলা, মাথায় খাটো, মুখের রঙ কেমন পোড়া-পোড়া, ঝলসান। এ-পাড়ার সব বাবুদের থেকে আলাদা। আলাদা বলেই ত চোখে পড়েছিল।

এ-পাড়ার বাবুরা, আমাদের উনিও তাদের একজন, প্রায় সকলেই গৌরবর্ণ। শহর পত্তনের কালটা এঁদের পূর্ব পুরুষদের চোখে দেখা। কোম্পানির আমলে দাপটও ছিল অনেকের। এখনও বড় বড় হৌসে উত্তরাধিকার সূত্রে এক একটি ভারী চেয়ার দখল করে আছেন। এঁরা বাড়িতে বাবু, অফিসেও ছোট, মেজ বা বড়বাবু। পরিপাটি টেড়ি কাটেন, চেন-ঘড়িতে সময় দেখেন, চৌকাটে দাঁড়িয়ে স্মরণ করেন ইষ্ট-দেবতাকে, লেট হবার ভয়ে তাড়াতাড়ি পা চালান যখন, চাবির সঙ্গে পকেটের পান-ভর্তি ডিবেটা ঠোকাঠুকি করে ঠন ঠন করে বাজে।

সে-পাড়ায় ওই আঁটো খাকির প্যান্টের খাঁজে ঢিলে শার্ট গোঁজা লোকটাকে একটু বেখাপ্পা লাগে বই কি।

দ্বিতীয় দিন এল সন্ধ্যার ঠিক মুখে মুখে। ট্যাক্সি চেপে। নামল ওই খালি বাড়িটার সামনেই।

প্রথম দিন একটু ভিতু, অনিশ্চিত ভাব দেখেছিলুম, আজ সে-সবের চিহ্নমাত্র নেই। পকেট থেকে বার করল চাবি, এক মোচড়ে তালা খুলল।

বাসাটা ও ভাড়া নিয়েছে বুঝলুম। বাড়িওয়ালার কাছ থেকে চাবি চেয়ে এনেছে।

স্বামীকে বললুম, "ও-বাড়িতে বুঝি ভাড়াটে এল।"

স্বামী তখন খবরের কাগজে সোনা-রুপার দরের পৃষ্ঠাটা পড়ছিলেন, কিছু বললেন না।

ঠাস ঠাস করে ও-বাড়ির জানালাগুলো খুলে গেল, শব্দ শুনলুম। লোকটা তবে ভিতরে গিয়েছে, ঘরে ঘরে দেখছে নতুন বাড়ি, লাইট নেই, ফসফস করে এক একটি দেশলাই জ্বালছে, কয়েক সেকেন্ড পরেই নিবছে সেগুলো। লোকটার মাথা খারাপ নাকি। কাঠি খরচ করে করে ফতুর হয়ে যাবে যে। একটা মোমবাতিও কি সঙ্গে করে আনতে পারেনি?

কিন্তু আমারই বা এ কী হয়েছে, আধ-অন্ধকার বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে ওর কান্ডকারখানা দেখছি কেন? যত খুশি কাঠি ও জ্বালুক না, আমার কী।

কিছু না। কিন্তু মজাও ত মন্দ না। থাকতে এসেছে, অথচ সঙ্গে মালপত্র কিছু আনেনি। আনলে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে নিত। আরও অবাক কান্ড এই, ট্যাক্সিটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। ওকে মিটিয়ে দিতেও লোকটা ভুলে গেল নাকি।

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলছে, নিবছে, যেন জোনাকি, আর সেই অল্পায়ু, অস্বস্তিকর আলোয় দেখছি একটা ছায়া-ছায়া মানুষ ঘরের ভিতর ঘোরাঘুরি করছে। আগের ভাড়াটেরা কাঠের কোন ভাঙা জিনিস, বুঝি ফেলে গেছে, লোকটা ঘর্ঘর করে সেটাকে টেনে নিয়ে বাইরে ফেলল। ঝুপঝুপ শব্দ হল একবার, খানিকটা চুনবালি দেয়াল থেকে খসল। ওকে একবার শব্দ করে হেঁচে উঠতেও শুনলুম। হাঁচি হবে না! যা ধুলো জমেছে ঘরটায়, মাসখানেকের মধ্যে ঝাঁট পড়েনি ত।

আমি সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে সব দেখছি, শুনছি। যেন আমাকে আমারই ভিতরকার কেউ, মন্ত্র পড়ে ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখে ও-বাড়ি বেড়াতে গিয়েছে।

একটু পরে দেশলাই আর জ্বলল না। ভাবলুম, বাঁচা গেল, ওর সব কাঠি ফুরিয়েছে। এবার খাপছাড়া মানুষটাকে অন্ধকার গিলে খাক।

তা ত নয়, লোকটা এখানে থাকতেই আসেনি। খানিক পরে দেখি, দরজায় ও ফের তালা দিচ্ছে। ট্যাক্সিটা এতক্ষণ ঝিমচ্ছিল, হঠাৎ জেগে উঠে যেন রেগে গেল; জ্বলে উঠল ওর দুটি চোখ, গর্জন করে রাতের রহস্যময় সওয়ারীকে ধমক দিল।

পর দিন যতবার রাস্তায় গাড়ির শব্দ হল, তত বার বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম, মালপত্র নিয়ে লোকটা বুঝি এই আসে, এই আসে।

এল না। সেদিন না, তার পর দিন না। সপ্তাহ ঘুরে গেল, তবু না।

সেদিনও যাবার আগে পানওয়ালার দোকানে সিগারেট কিনেছিল, কী যেন বলে গিয়েছিল ওকে। মাঝে মাঝে লোভ হয় জিজ্ঞেস করি, কবে আসবে বলেছে।

স্বামীকে বলি, "বাসাটা ভাড়া নিল, তবু এল না, লোকটা কেমন বল ত?"

স্বামী বলেন, "তোমার-আমার কী।"

কিছু না। তবু, পাড়ায় নতুন লোক এলে, একটু কৌতূহল হয় না?

একটু কৌতূহল, একটু অস্বস্তি, হয়ত একটু হতাশাও। আর কিছু না। আর সব ঠিক যথাপূর্ব চলছিল। উনি বাঁধা টাইমেই অফিসে বেরুচ্ছিলেন, ফিরছিলেন। ঠিক সওয়া ছটায় সিঁড়িতে ঠকঠক জুতোর শব্দ শুনছিলুম।

সপ্তাহের শেষের দিকে এক দিন সন্ধ্যায় মনে হল রাস্তায় ভারী একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। তখন কলঘরে ছিলুম, তাড়াতাড়ি একটা শাড়ি জড়িয়ে বেরিয়ে এলুম।

না, ও-বাড়ির নতুন ভাড়াটে নয়।

খেলনাওয়ালা। ঠেলাগাড়ি করে ওর রকমারি বেসাতি এনে আমাদের দরজায় দাঁড় করিয়েছে।

ঠিক তখনই আমার স্বামী ফিরলেন। ঘড়িতে বেজে এগার।

কী হল, অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠলুম, "আচ্ছা, এক দিনও কি তোমার একটুও দেরি হতে নেই?"

উনি অবাক হলেন। ফর্সা, গোল, ভরা-ভরা মুখে যেন সামান্য আঘাতের চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখলুম। বললেন, "কেন, দেরি হবে কেন।"

নগরের স্যানিটারী ব্যবস্থা নগরের তথা গৃহের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য অব্যাহত রাখে

★

দীর্ঘদিন সুনামের সহিত টিউবওয়েল, প্লাম্বিং এবং স্যানিটারী ব্যবসায়ে নিয়োজিত
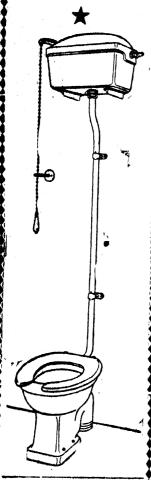
কুমারস্ স্যানিটারী এম্পোরিয়াম

১৩৮ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড
কলিকাতা-২৬ ● ফোন : ৪৬-১২২৩

ততক্ষণে আমিও লজ্জা পেয়েছি। কথাটা আসলে ও-ভাবে বলাই ঠিক হয়নি। বললুম, "না, মানে, ধর, ফেরবার পথে কোন দিন পুরনো কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, কিংবা—"

বাধা দিয়ে উনি বললেন, "দেখা হয় না। হলে, সারা দিন খাটাখাটুনির পর, সে রকম লোককে দূর থেকে দেখতে পেলেই আমরা পাশ কাটিয়ে যাই।"

"ট্রাম-বাসও দেরি করে না?"

এবার সগর্ব হাসিতে স্বামীর মুখ ভরে গেল।—"করে। তখন নেমে পড়ি, বাকী পথ হাঁটি। সাধে কি বৌবাজারে আছি। লালদিঘি থেকে হেঁটে আসতেও লাগে মোটে পনর মিনিট।"

ঠাণ্ডা গলায় বললুম, "ও"। ওকে বোঝান যাবে না মাঝে মাঝে দেরি—অনেক দেরি—করে ফিরলে কেন ভাল লাগত। সন্ধ্যা থেকে ছটফট করতুম, একবার ঘরে যেতুম, আবার ছুটে বাইরে আসতুম, ঘড়ি দেখতুম ঘন ঘন, বুক কাঁপত, সেই ভয়ের, সেই সুখের ও কী বুঝবে।

সত্যিই লোকটা এক দিন এল। ভোর বেলা নামল একটা রিকশা থেকে। ময়লা রঙের মুখটা দাড়িতে ছেয়েছে—পোড়ামাটির উপরে খানিকটা ছাই ছড়িয়ে দিয়েছে যেন কেউ। পরনে ডোরাকাটা নীলচে পাজামা—কিন্তু শুনেছিলুম এটা ঘুমবার পোশাক, এসব পরে কেউ রাস্তায় বেরয় নাকি।

একটা ছোট সুটকেশ, আর নতুন শতরঞ্জি জড়ান, ওটা কী, বিছানা বোধ হয়, ওর জিনিসপত্র মোটে কি এই। সঙ্গে লোকজনই বা কই। এত বড় বাসা ভাড়া নিয়েছে লোকটা, খানচারেক ঘর, একলা বাস করবে বলে? সঙ্গে একটা চাকর পর্যন্ত নেই। ওর দেখাশোনা করবে কে, লোকটা খাবেই বা কোথায়। হোটেলে! তবে ত সেখানেই একটা ঘর ভাড়া নিতে পারত—অনেক কম খরচে কুলিয়ে যেত। এখানে কম করে বাড়ি ভাড়াই শ খানেকের উপর পড়বে যে।

এমন খামখেয়ালী, অদ্ভুত ধরনের লোক আমি কখনও দেখিনি। দেখিনি বলেই দেখতে শুরু করলুম, ফুরসত পেলেই এসে দাঁড়াতুম বারান্দায়, অভ্যাসটা যেন নেশায় দাঁড়িয়ে গেল।

দেখি, কোথা থেকে একটা ঝাঁটা নিয়ে এসেছে, প্রাণপণে সাফ করছে ধুলো। কিন্তু দরজাটা বন্ধ করে নেয়নি, হাওয়ায় ধুলোর রাশি ফের সারা ঘরেই ছড়িয়ে পড়ছে, আনাড়ি আর কাকে বলে।

খানিক বাদে বেরিয়ে কোথা থেকে নিয়ে এল একটা টুল, তার উপরে দাঁড়িয়ে একটা পাখা ঠিক করলে। এ-সব কাজ দিব্য জানা আছে দেখছি, লোকটা ইলেকট্রিক মিস্ত্রি নয় ত? তবে মিস্ত্রি হলে কি এমন বাসা ভাড়া নিতে পারত।

খাট নেই, মেঝেতেই বিছানা পাতল পরিপাটি করে। তার পর সব কটি বালিশ কোলের কাছে জড় করে, বুকে জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। এবার ঘুমবে। চোখ দেখেই বুঝেছিলুম, ক্লান্ত। ক'রাত্তির ওর ঘুম হয়নি ওই জানে। লোকটা কেমন-কেমন, সে ত প্রথমেই টের পেয়েছিলুম, হঠাৎ মনে হল অসচ্চরিত্রও নয় ত। কোথায় ছিল ভাবতে ভাবতে ভিতরে গেলুম। সংসারের সব কাজ পড়ে আছে

দুপুরে ফিরে এসে দেখি, তখনও ও পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছে। পাশ-বালিশগুলো কখন চলে গেছে পায়ের নীচে, মাথারটাও যথাস্থানে নেই, জানালা খোলা পেয়ে খানিকটা রো[দ] এসে পড়েছে বিছানায়, বিরক্ত লোকটা কনু[ই] দিয়ে মুখ ঢেকেছে, তবু জানলাটা বন্ধ কর[তে] ওঠেনি।

নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, কাজ নে[ই] আছে শুধু পড়ে পড়ে ঘুমন; যেন অ[...] কোথাও ঘুমতে পেত না, নিশ্চিত ম[...] এখানে ঘুমতে পারবে বলেই কুম্ভক[র্ণ] লোকটা এত বড় বাসাটা ভাড়া নিয়ে[ছে] গড়িয়ে-ছড়িয়ে শোবে বলে।

কাকের ডাক শুনেছিলুম। মাঝে মাঝে ম[নে] হয় এই গলিটাই যেন কা-কা করে ও[...] দূরের আকাশে কলের চিমনিটাও দে[...] ছিলুম। সারা দিন নিজের কলঙ্ক ও নি[...] রটায়।

তক্ষুনি টের পেলুম, লোকটা উঠে[...] হাই তুলছে। উঠে বসল। তাকাল এদিকে[...] আমাদের বারান্দার দিকেই। সর্বনাশ, লো[...] আমাকে দেখে হাসল নাকি। বুক ঢিপ [...] করছিল, তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়লুম

সেদিন ঘুমতে পারিনি। আয়নায় নিজে[কে] দেখেছি। অর্থাৎ নিজের বাইরেটা[...] আমাকে দেখে হাসবে কেন। তিনটে বা[...] মা হয়ে থপথপে হয়ে পড়েছি, চোখে ক[...] চুল পাতলা, আমাকে দেখে লোকের ও[...] বরং হাসিই পাবে, কিন্তু ওভাবে হা[...] কেন। ওসব হাসি-টাসির পাট কবে [...] গেছে।

সন্ধ্যাবেলা দেখলুম, ও-বাড়ির দর[জায়] ফের মস্ত সেই তালা।

ছোট খুকিটার জ্বর হয়েছিল। [...] সারা রাত ওকে নিয়ে জাগতে হয়েছে, [...] ও-বাড়ির কোন ঘরে আলো জ্বলতে দে[খি...] কোন্ চুলোয় আজ আবার রাত কা[টাতে] গেল, কে জানে।

লোকটা আবার নিরুদ্দেশ। পুরো [...] ঘুরতে চলল, সেই যে সেদিন দ[...] ঘুমিয়ে সন্ধ্যায় বেরিয়ে গেছে, তার

থেকে আর পাত্তা নেই। দরজায় বিশ্বাসী তালাটায় জং ধরে গেল।

এখানে খাবি না, থাকবি না সে ত টের পেয়েই গিয়েছি, কিন্তু দুপুরেও যদি এক-বারটি ঘুমতে না আসিস তবে বাসা ভাড়া করা কেন বাপু। মনে মনে লোকটাকে কত ধমকালুম।

মনে মনে কেন, আমার স্বামীকেও বললুম। উনি বললেন, "ক্রিমিন্যাল। লোকে বাসা খুঁজে খুঁজে হন্যে হয়ে যায়, আর ও একটা বাসা নিয়ে আটকে রেখেছে?"

ক্রিমিন্যাল। শুনে শুনে কথাটার একটা আন্দাজী মানে ধরে নিয়েছিলুম। যারা খুন-খারাবি, চুরি-ডাকাতি করে, তারাই ক্রিমিন্যাল। আর সেদিন রাত্রেই কথাটার যেন প্রমাণ পেলুম।

চুপি চুপি লোকটা এল, চোরের মত নিঃশব্দে দাঁড়াল ওর নিজেরই বাড়ির রকে। তালার ফোকরে চাবি লাগাল। ও জানে না, ওকে আর একজন লক্ষ্য করছে। আমি।

নিজের বাসা, তবু ওর এই চোর-চোর ভাব কেন। ভিতরে গেল লোকটা, এত দিন পরে এসেছে, ঘরে ইঁদুরের আস্তানা আর আরশোলা নিশ্চয়ই হয়েছে, আর ধুলো ত আছেই। তবু ও আলো জ্বালাল না। কালো জলের মত অন্ধকারে তলিয়ে গেল। আমি অবাক, কাঠ, নিস্পন্দ; দেখছি।

কারণ নেই, তবু সেদিন একটু যেন ভয় পেয়েছিলুম। বেশ ত ছিল বাড়িটা খালি পড়ে, ভাড়াটে এল কেন। এল যদি, সে এমন হল না কেন, যে এখানকার সব কিছুর সংগে মিলে যায়? সে কেন এমন খাপছাড়া আলাদা ধরনের; আমরা ত ধরেই নিয়ে-ছিলুম, ও পালিয়ে গিয়েছে, দিন দুই ঘুমিয়ে টের পেয়েছে, এত বেশি ভাড়া টান-বার সাধ্য ওর নেই, তাই চম্পট দিয়েছে। ভেবেছিলুম, দরজায় আবার "টু-লেট" নোটিশ পড়ল বলে।

পড়বার আগেই ও ফিরে এল কিন্তু। নিজেরই ঘরে ঢুকল, যেন দরজা দিয়ে মাথা সোজা করে নয়, নুইয়ে, সিঁদ দিয়ে।

আর আমার ভয়টাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হল। লোকটা ঘরে ঢোকবার মিনিট-কুড়ি পরে আরও দুজন লোক এসে ও-বাড়ির দরজায় দাঁড়াল, তাদের মুখ দেখতে পেলুম না, ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল, তাদের দেহও কেমন ছায়া-ছায়া, ওরা সন্তর্পণে কপাটে টোকা দিল।

প্রায় সংগে সংগেই দরজা খুলে গেল। লোকটা যেন ওদেরই অপেক্ষা করছিল।

অন্ধকার অবশ্য আগন্তুক দুটিকেও গ্রাস করল। আলো তখনও জ্বলল না।

ক' মিনিট কেটেছিল সেদিন? ঠিক বলতে পারব না। আমার কোলের বাচ্চাটা একবার হঠাৎ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, তাকে থাপড়ে চাপড়ে ফের ঘুম পাড়িয়ে চলে এলুম। টের পেলুম আমার স্বামী একবার আলো জ্বাললেন, বাথরুমে যেতে। ফিরে এসে বললেন, "তুমি শোওনি?"

কথা না বলে শুধু ঘাড় নাড়লুম।

"ঠাণ্ডা লাগিও না," বলে উনি ফের গলা অবধি চাদর-ঢাকা দিলেন।

আমি নির্নিমেষ চোখে চেয়ে দেখলুম, আগন্তুক দুজন আবার বাইরে এসেছে, পিছন-পিছন বাসাটা যে ভাড়া নিয়েছে, সে-ও। রকে দাঁড়িয়েই ওরা ফিসফিস করে কী যেন বলাবলি করলে, লোক দুজন আকাশের দিকে চাইলে, একজন হাত বাড়িয়ে দেখলে বৃষ্টি থেমেছে কিনা, তার পর রাস্তায় নেমে এল।

দরজা আবার বন্ধ হল ভিতর থেকে।

বাদলার রাত, তখনও থেকে থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, হাত-পা হিম, তবু আমাকে পুরো এক গ্লাস জল খেতে হল। এত দিনে আমি বুঝে নিয়েছি, লোকটার স্বরূপ। কত কী-ই ত এত দিন ভেবেছি, কিন্তু এতটা ত কখনও সন্দেহ করিনি।

গোয়েন্দা গল্প বরাবরই আমার প্রিয়, বিখ্যাত অনেক দস্যু-নেতার কীর্তির কথা পড়েছি। ও নিশ্চয় সেই সব চরিত্রেরই একজন, কোন গুপ্ত দলের নায়ক; যারা এসেছিল, তারা তবে কী। ওর চর। এই বর্ষার রাত্রেই ওদের যত কাজ। মুখোস পরে, মোটরে চড়ে, ওত পেতে থাকে নির্জন রাস্তার মোড়ে। আস্তিনে লুকোন পিস্তল, সুযোগ এলেই ইস্পাতের নীল নলে বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে। পর পর কয়েকটি রক্তাপ্লুত দেহ লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

আজ রাতে নিশ্চয়ই তেমন কোন অঘটন ঘটবে কোথাও, এতক্ষণ ধরে এই অন্ধকার ঘরে তারই ষড়যন্ত্র হল।

সকালে খবরের কাগজটা তন্ন তন্ন করে পড়লুম, কিন্তু রোমহর্ষক একটিও ঘটনার কথা কোথাও লেখা নেই।

তবে কাল যা দেখেছি, তা স্বপ্ন না মায়া।

লোকটার সংগে চোখাচোখি হল। জানলার সামনে একটা টেবিল, এক মনে কী লিখছে। লম্বা-লম্বা চুল কপালের খানিকটা ঢেকে রেখেছে, সেগুলো সরাতেই একবার মাথা তুলল, চোখাচোখি হল তখনই। বড় বড় চোখ, অত্যন্ত উদাস দৃষ্টি, ঈষৎ ক্লান্ত। সেই ক্লান্ত চোখে কাল রাতে আমার কল্পিত দুর্বৃত্ত দস্যু-নেতার চিহ্নমাত্র দেখলুম না।

তবে কি আমি ভুল করেছি।

এমনই আলাদা ধরনের বলেই ওকে ভুল বুঝেছি? কী জানি।

আচ্ছা এমনও ত হতে পারে, দস্যু নয়, আসলে উনি কোন রাজনৈতিক দলের নেতা—ওঁর নামে পুলিশের হুলিয়া বেরিয়েছে, ছদ্মবেশে তাই গা-ঢাকা দিয়ে আছেন এখানে? বিপ্লবী যুগের কত নেতার বিষয়েই ত এমন কাহিনী পড়েছি। দেশ স্বাধীন হয়েছে বটে, কিন্তু উনি আর ওঁর দলের লোকেরা যেমনটি চেয়েছিলেন, ঠিক তেমন হয়নি। তাই গোপনে গোপনে আজও বিশ্বস্ত কয়েকজন অনুচরের সংগে পরামর্শ করেন, কোন পথে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছন যায়। ওঁরা যা করছেন, সে-কাহিনী আজ ত জানা যাবে না, যদি যায় ত অনেক বছর পরে। হয়ত এক দিন খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ওঁদেরই কীর্তি-কাহিনীতে মুখর হবে। কাল রাতে ভয় পেয়েছিলুম, আজ সকালে শ্রদ্ধায় আমার অন্তর পূর্ণ হয়ে গেল।

অসভ্য, বদমাস, বর্বর।

আমি হাঁপাচ্ছিলুম। ফুঁশছিলুম ঘরে ফিরে, জানালার শিক ধরে। আমার বিষ নেই, ছোবল নেই, থাকলে ঢেলে দিতুম, ওকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে আসতুম। বুঝিয়ে দিতুম, পরের ঘরের বউয়ের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসবার সাজা কী। চোখ তুলে কোন অপরিচিত মেয়ের দিকে চাইবার সাহস ওর আর কোন দিন হত না।

আজ সকালে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলুম। আমার মরণও হয় না, কেন যে ওর ঘরের দিকে এতবার চাই। ও কি চুম্বক, না জাদু জানে।

আজও কী লিখছিল, মাথা নিচু করে, কিন্তু খারাপ লোক ত, একটা বাড়তি চোখ ওদের মাথার পিছনে থাকে। টের পেয়ে থাকবে, আমি এসে দাঁড়িয়েছি। দেখলুম, লেখা ফেলে উঠে দাঁড়াল, এল জানালার সামনে, আর, আমি নির্ভুল দেখতে পেলুম, আমার দিকে চেয়ে, আমারই চোখে চোখ রেখে, বিশ্রী, অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে হেসে উঠল। আমার ভুল হয়নি; আমরা, মেয়েরা, এমন-কি মায়েরাও, ও-সব চাউনি চট করে চিনি ও-সব হাসির মানে ঠিকই বুঝে নিই।

আরও সাহস দেখ লোকটার, সিগারেট ধরাল একটা, ধোঁয়াটাকে জিভ দিয়ে দড়ির মত পাকিয়ে পাকিয়ে জানালার বাইরে, যেন আমাকেই লক্ষ্য করে, ছুঁড়ে দিতে থাকল হঠাৎ শুনলুম, ও গান গাইছে।

"কী মোহিনী জান বঁধু,
কী মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে
নাহি তোমা হেন।"

এ-সব গান ভদ্রসমাজে কেউ গায় না। ওর গলায় সুর নেই, কিন্তু জোর বিলক্ষণ আছে। অসুরদের থাকে।

কী ভেবেছে ও। আমি যে মাঝে মাঝে

একটা হাত দিয়ে গাল চেপে ধরেছে

বাইরে এসে দাঁড়াই, সে ত কাজ থাকে বলে। কাপড় শুকতে দিই, দরকার হলে ফিরি-ওয়ালাকে ডাকি। তা ছাড়া ঘরের ভিতরে বসে থেকে থেকে হাঁফ ধরে যায় না? হলামই বা মেয়েমানুষ, তাজা হাওয়া খেতে আমাদেরও কি সাধ হয় না?

আমার উচিত ছিল, তক্ষুনি ঘরে চলে আসা। অথচ আসিনি। যতক্ষণ না ওর গান শেষ হল, সিগারেটটা টেনে টেনে শেষ করে এনে বাইরে ছুঁড়ে দিল, ততক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম।

ফুঁসছি এখন, এই ঘরের মধ্যে ফিরে এসে। সাপিনী যেমন করে লেজ আছড়ায়, তেমনই অক্ষম রোষে ফুলছি।

লম্পট, বদমাস একটা, ওকেই কিনা আমি লাঞ্ছিত, বিপ্লবী নেতা মনে করেছিলুম? মেয়েমানুষের আর কত বুদ্ধি হবে।

ওকে আমি চিনে নিয়েছি কাল বিকালেই।

কড়কড়ে পাতলুনের উপর হাওয়াই কামিজ চাপান, আজকালকার বা ফ্যাশন; চুল পরিপাটি করে পিছন দিকে ওলটান, একগাছিও অগোছাল নেই; পায়ে চকচকে মশমশে ব্রাউন জুতো, গাড়ি থেকে নামল। সঙ্গে দুটি মেয়ে। তোমার মুখে আগুন। (আগুনই ত, ঠোঁটের সিগারেট ত কখনও নিবতে দেখিনে।)

ওরই পিছে পিছে ঘরে ঢুকল মেয়ে দুটি। খুট-খুট-খুট-খুট—জুতোর উঁচু গোড়ালিটা যেন ওদের দেমাকের মাপে অর্ডার দিয়ে তৈরি করে নিয়েছে। পাউডারের গুঁড়ো-ছড়ান মুখের রঙ কটকটে; নখ আর ঠোঁট টকটকে। নির্ঘাত এই মাত্র কারও বুক চিরে রক্ত খেয়ে উঠে এল।

তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, দেখতে ত কিছু পেলুম না, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ছুটোছুটি লুটোপুটি আর খিলখিল হাসি শুনলুম। যেন হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে ও-ঘরের জমাট ধুলো ধুইয়ে দেবে। মাঝে মাঝে দুপদাপ শব্দ শুনি; আসবাব টানাটানি করে তচনচ করছে। তুমি একলা পুরুষ মানুষ, দু-দুটো বয়সের মেয়েকে ভর-সন্ধ্যায় ডেকে এনে তোমার এত হাসাহাসি কিসের। তারপর এক ঘণ্টার বেশি হয়ে গেল, ওদের আর সাড়া পাইনে। আজ কি ওরা তবে যাবে না? রাতটা ওখানেই কাটাবে? একটি পুরুষ আর দুটি মেয়ে? সর্বনাশ।

খানিক বাদে লোকটাকে বেরিয়ে আসতে দেখলুম। সিগারেট কিনল—বোধহয় দু-তিন প্যাকেট। দোকানীকে একটা দশ টাকার নোট দিল। ভাঙানি না গুনেই রাখল পকেটে।

এবার খানিকটা এগিয়ে দাঁড়াল খাবারের দোকানের সামনে, ঠোঙা ভরে মিষ্টি কিনল, টাকা দিল—এবারও দশ টাকার নোট।

কথায় কথায় নোট ছড়াও—তোমার মতলব আমি বুঝে নিয়েছি। টাকা ভাঙিয়ে খুচরো করে রাখতে চাও। কে জানে, এত নোট তোমার আসে কোথা থেকে। কাল যদি সকালে পুলিশ এসে হানা দেয়, তোমার বাসায় খুঁজে পায় নোট জাল করার যন্ত্রপাতি, তবু অবাক হব না। তুমি সব পার, এই নিরীহ গলিতে শনি হয়ে ঢুকেছ; আর ওই রকম ফাঁকা বাড়িতেই ত তোমাদের কাজ কর্মের সুবিধে।

তবু ভাল, রাত নিশুতি হবার আগেই মেয়ে দুটিকে বিদায় দিলে। কেলেঙ্কারিটা পুরো না করে আমাকে বাঁচালে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর চারজন পুরুষ মানুষকে ডেকে আনলে কেন। ওরা কারা। সকলের হাতেই ছোট-ছোট প্যাকেট, ওগুলো কিসের। মনে হচ্ছে যেন জামা-কাপড়? ওর মধ্যে আবার সোনারুপো, আফিম-টাফিম নেই ত। নোট জাল কর তা-ত জানি, তুমি আবার পাকিস্থানে গোপনে মাল চালান দাও নাকি। আর সেই জন্যেই এখানে, শহরের এই অন্দরের গলিতে ঘাঁটি করেছ? কাল সকালে স্বামীকে সব বলে আমি যদি পুলিশ ডাকি? যদি তোমাকে ধরিয়ে দিই?

তোমার ঘরে আলো জ্বলল, কনেকশন পেয়ে গেছ দেখছি। একটা চৌকিও এনেছ। টেবিল আর আলমারিটা কবে জোগাড় করলে, টের পাইনি ত। চৌকিটায় বিছিয়ে দিলে একটা পাটি, দু-প্যাক তাস খুলে ছড়িয়ে দিলে। মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি, আর পয়সার ঝনঝন শুনি। এই জন্যেই কি দু-দুটো দশ টাকার নোট ভাঙিয়েছ, বন্ধুদের সঙ্গে রাত জেগে জুয়া খেলবে বলে? কোন বিদ্যেই দেখছি তোমার অজানা নেই। তা গোটা কয়েক গ্লাস আর একটা বোতল খুলে নিয়ে বসলে না কেন, তা হলেই সোনায় সোহাগা হত।

সেই থেকে জ্বলছি। ওরা কখন গেল, রাত্রে না ভোরে, জানি না। কিন্তু আজ সকালে, নির্লজ্জ অসভ্য লোকটা, হাসল কেন আমার দিকে চেয়ে, কেন অপমান করল। এখন ওকে আমি জব্দ করি কী করে।

তখনও জানতুম না, আমাকেই আরও জব্দ করবার ও ফন্দী আঁটছে। জানালার শিক ধরে ফুঁসছি, তখনই আমার ছেলে দুটি ঘরে এল, দুজনের হাতেই এক মুঠো করে টফি।

"কোথায় পেলি, কোথায় পেলি এসব।" ওদের ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম। টফি সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল, কাঁদো-কাঁদো মুখ করল দু-জন। ইশারায় ও-বাড়ির জানালা দেখিয়ে দিল।

"কেন নিয়েছিস, কেন নিয়েছিস, ওর দেওয়া জিনিস হাত পেতে। চাইতে গিয়েছিলি ?"

"না, ডেকে দিল।"

"আর কী করল, বল্। টফি দিল, দিয়ে কী বলল তোদের। বলতেই হবে।"

"কিছু বলেনি মা। শুধু আদর করেছে।"

"আর ?"

"বলেছে, মাঝে মাঝে এস তোমরা, আমি ছেলেপুলেদের খুব ভালবাসি। আর—"

রুদ্ধশ্বাসে বললুম, "আর কী।"

"আর, বলেছে, তোমাদের নামে সুন্দর করে দুটো ছড়া বানিয়ে রাখব। তোমরা এসে শিখে নিও, কেমন ?"

ছড়া ? লোকটা ছড়া বানাতেও জানে ? ও কি তবে কবি। আমার উত্তেজনা কমে এসেছিল, মুহূর্তে লোকটার লম্বা এলোমেলো চুল, বড়-বড় চোখের উদাস দৃষ্টি, খাপছাড়া স্বভাব—সব কিছুর যেন আলাদা মানে দেখতে পেলুম। তাই কি ও জানালার পাশে বসে থাকে, লেখে, সিগারেট ধরায়, লেখে, থেকে থেকে গুনগুন করে গান গেয়ে ওঠে ? আশ্চর্য, আমাদের চেনা কিছুর সঙ্গে না মিললেই আমরা মানুষকে কত ভুল বুঝি !

ফিসফিস করে ছেলেদের বললুম, "আর, আমার কথা কিছু, বলল না রে ?"

"কই মা, না-ত !"

"কিচ্ছু না, একেবারে কিচ্ছু না ?" জোরে, এক নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করে ফেলে নিজেই লজ্জা পেলুম। কী করেই বা বলবে। রুচিসম্পন্ন শিল্পী মানুষ, সে কি না-আলাপী পরের বউ সম্পর্কে অশোভন কৌতূহল দেখাতে পারে।

তবু ত ভয় পেলুম। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, বাড়িতে কেউ নেই, দরজা খুলে দিয়েই পিছিয়ে এলুম।

এমন বীভৎস রূপ কোন মানুষের দেখিনি। চোয়াল চুইয়ে রক্ত পড়ছে, একটা হাত দিয়ে গাল চেপে ধরেছে, রক্ত পড়ছে কনুই গড়িয়েও। শার্টের বুকের কাছটায় ছোপ-ছোপ লাল লেগেছে।

ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, "ডেটল আছে আপনার বাড়িতে, কিংবা আয়োডিন ? এই দেখুন কেটে ফেলেছি—দাড়ি কামাতে গিয়ে—"

ওর গলা কাঁপছিল। তখনও রক্ত চুইয়ে পড়ছে, থামছে না। যে হাত দিয়ে ক্ষতটা চেপে ধরেছিল সেটা দিয়েই চুল সরাতে গেল, কপালের কাছেও লেগে গেল খানিকটা রক্ত।

আর ঠিক তখনই আমি ভয় পেলুম।

"না না, কিছুই নেই," বলে উঠলুম প্রায় চেঁচিয়ে, "আপনি যান—যান এক্ষুনি।" ওর মুখের উপরেই দরজাটা বন্ধ করে দিলুম।

তারপর কাঁপতে কাঁপতে উঠে এসেছি উপরে। গালে হাত চেপে লোকটা রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি পড়ছে। ওর কপালের দাগটা কি সেই জলে ধুয়ে গেল। ঘরে ঢুকে লোকটা ছটফট করতে থাকল, একবার বিছানায় পড়ল লুটিয়ে, একবার উঠে আয়নার সামনে দাঁড়াল। মুখ ফ্যাকাশে, রক্ত পড়ছে দরদর ধারে, ও নিজেও বুঝি ভয়

পেয়েছে। খুলে ফেলেছে একটা কৌটো, চাপ-চাপ স্নো ঠেসে ঠেসে বন্ধ করতে চাইছে রক্তস্রোত। ওকে কী করুণ, অসহায় আর সুন্দর দেখাচ্ছে, কী বলব।

তখনই গভীর মায়া আর মমতা বোধ করলুম। ধিক্কার এল নিজের উপরে। কেন ওকে ফিরিয়ে দিলুম এভাবে, কেন আহত মানুষটার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলুম। ডেটল, আয়োডিন আমার বাসায় ত সবই ছিল।

টেবিলের উপরে মাথা হেলিয়ে লোকটা নেতিয়ে আছে। জানি না, রক্ত-পড়া থেমেছে কিনা। যদি না থামে, যদি ফোঁটা ফোঁটা করে সব রক্ত বেরিয়ে যায়? ও কি তখনও ওই ভাবেই পড়ে থাকবে, এখন টেবিলের উপর মাথা রেখে যেমন আছে? কোন সাড়া থাকবে না, হয়ত ও মরেই যাবে।

মরে যাবে, কিন্তু কেউ জানবে না। যদি এই বিচিত্র মানুষটার বন্ধুদের কেউ কোনদিন ফিরে আসে, দরজা ঠেলে সাহস করে ঘরে ঢোকে, তবেই নির্জন এই বাড়িতে গোপন একটি মৃত্যুর খবর পাবে। তার আগে নয়।

আর, সেই মৃত্যুর কারণ হব আমি।

তিরস্কার করলুম নিজেকে। আর আশ্চর্য, তিরস্কার করলুম ওকেও। একা-একা একটা নিঃসঙ্গ ঘরে বাস করে নিজের অপঘাত মৃত্যু যে নিজে ডেকে এনেছে। কেন ও এমন রহস্যময়, কেন ও এত অস্থির, কেন সাবধানে সব কাজ করে না, শতকরা নিরেনব্বই জন মানুষ যা, ও কেন তা নয়। এমন অগোছাল, অসহায়, অসাবধান যদি, তবে কেন ও নিজের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে থাকে না। তারা অন্তত দেখাশোনাটা করতে পারত। এতখানি বয়স পর্যন্ত কাউকে কি ও আপন করতে পারেনি।

সৃষ্টিছাড়া মানুষটা তবে এই গলিতেই মরতে এল কেন।

মরেনি, তবে লোকটা দিন চারেকের জন্যে উধাও হয়েছিল।

মাল-বোঝাই লরি ও-বাসার সম্মুখে এসে দাঁড়াতে, তাড়াতাড়ি বারান্দায় এলুম।

সেই লোকটাই। হাফ-শার্ট আর পা-জামা পরনে, কুলিদের হুকুম দিয়ে দিয়ে সব জিনিস ঘরে তুলে ফেলল। একটা ট্যাক্সি থেকে একটু আগেই নেমে গিয়েছে একটি বউ, মাঝবয়সী না তরুণী তখন দেখতে পাইনি, কোলে কাঁথায় জড়ান একটা বাচ্চা, আর পিছনে পিছনে এক পাল ছেলে-মেয়ে। গুনে দেখিনি, তবে অন্তত চার-পাঁচজন হবে।

লোকটা এতদিনে তবে ওর বউ নিয়ে এল।

সারাদিন ওদের আর দেখতে পেলুম না। আভাসে বুঝলুম, ধোয়া-মোছা ঘর-সাজাবার পালা চলছে।

বউটির সঙ্গে আলাপ হল বিকালের দিকে। গা ধুয়ে, টিপ পরে জানলার কাছে এসেছে, চোখে চোখ পড়তেই একটু হাসল।

দোহারা চেহারা, বয়স ত্রিশ-বত্রিশ, মুখে শ্রী আছে, তবে অপরূপ কিছু নয়।

বললুম, একটা কথা দিয়ে শুরু করতে হয় তাই জানা আছে, তবু বললুম, "আজই এলেন বুঝি?"

ঘাড় কাত করে মিষ্টি হেসে বউটি বলল, "হ্যাঁ।"

"কিন্তু বাড়িটা ত ভাড়া নেওয়া হয়েছে মাসখানেকের ওপর?"

"হ্যাঁ, ভাই। উনি হঠাৎ বদলি হয়ে চলে এলেন। এসেই বাসাটার খোঁজ পেলেন, হাত-ছাড়া করেননি। আমার ত আসবার উপায় ছিল না, দেখছেন না?"

দোলনায় শোয়ান বাচ্চাটাকে দেখিয়ে বউটি আবার বলল, "বাপের বাড়িতে ছিলুম। শরীরটা একটু সেরে উঠতে এখানে এলুম।"

আমি বললুম, "ও।"

বাচ্চা হবে বলে বউ আসতে পারছিল না, বাড়িটা তাই এতদিন ফাঁকা পড়ে ছিল?

দিব্যি হাসিখুশি, বউটি কথা বলতে পেলে সহজে ছাড়ে না। আমিও কথা বলছিলুম, দেখি, সেই দুটি মেয়ে ঘরে ঢুকছে। একদিন যারা সন্ধ্যাবেলা এসেছিল।

আমি প্রমাদ গনলুম। ওরা একেবারে দিন বুঝে এসেছে। হাতে-নাতে ধরা পড়ে যাবে যে।

বউটি বললে, "আমার ভাসুরঝি। দুটিই এখানে হস্টেলে থেকে কলেজে পড়ে।" ফিরে ওদের দিকে চেয়ে বলল, "তোরা একদিন এসে ওর ঘরটা গুছিয়ে দিয়ে গিয়েছিলি, না? চিঠিতে খবর পেয়েছি।"

তখনই ওর স্বামী ঘরে ঢুকলেন। মাথায় অল্প একটু ঘোমটা টেনে বউটি সরে দাঁড়াল।

সরে এলুম আমিও।

অনেক খবরই আমি গল্পে-গল্পে জেনে নিয়েছি। ভদ্রলোক কাজ করেন। রেল না প্লেন কোম্পানি, কী বলল যেন। কোনদিন দিনে ডিউটি, কোনদিন রাতে। রাতে কাজ পড়লে দিনে পড়ে পড়ে ঘুমোন। আবার ট্যুরও আছে। ওঁকে মাঝে মাঝে বাইরেও যেতে হয়। বেশ কয়েকদিনের জন্যে বাড়িতে ওঁর টিকিটির দেখা মেলে না।

পরদিন সকালে ভদ্রলোক শাক-সবজি-ভর্তি থলে হাতে ঝুলিয়ে বাজার থেকে ফিরলেন, আমার স্বামীর পিছে-পিছেই। একটুও রহস্য নেই, একেবারে পরিষ্কার দেখতে পেলুম। ঘণ্টাখানেক পরে ধুতি আর পাঞ্জাবি পরে আবার বেরুলেন, অফিসে যাবেন। চৌকাঠে দাঁড়িয়েই একটি পান পুরলেন মুখে।

ফিরে এলেন ছটায়। ছেলেমেয়েরা মেঝের মাদুর পেতে গোল হয়ে বসল, চা এল, চুমুক দিতে দিতে উনি ওদের ধমক দিলেন। বুঝলুম, পড়াশোনার খবর নিচ্ছেন।

আমার আর ভয় নেই, ভাবনা নেই।

জানি, পরদিন সকালে রোদ্দুর যেই এসে পড়বে উনি রকে এসে বসবেন; কোলের বাচ্চাটাকে শুইয়ে ডলে ডলে তেল মাখাবেন।

তারপর, একদিন বউয়ের সঙ্গে সংসারী খরচ নিয়ে খিটিমিটি করছেন, তা-ও হয়ত শুনতে পাব।

Cooch Behar

পত্রবিলাস

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

দেরাজটা আধখানা টানতেই সব দেখা গেল।

নীল ফিতে দিয়ে বাঁধা চিঠির তাড়া। তাড়া নয়, গুচ্ছ। তাড়া বলে মিনতির দিদিরা। মিনু মনে মনে বলত, গুচ্ছ। পুষ্পগুচ্ছ, পত্র-গুচ্ছ, কবিতাগুচ্ছ।

ঘরে কেউ নেই, ধারেকাছে কেউ নেই। সবাই ব্যস্ত। মিনুর বিয়ের জন্যেই ব্যস্ত রয়েছে সবাই। দিদির সংগে মা বেরিয়েছেন মার্কেটিং-এ। বাবাকেও টেনে না নিয়ে ছাড়েননি। বীথিদি আর ছোড়দা গাড়ি নিয়ে বাকী নিমন্ত্রণগুলি সারতে গিয়েছে। অন্য লোকজন রান্নাঘরে, ভাঁড়ারঘরে, আর জামাই-বাবুরা সবান্ধবে ব্রীজ খেলায় মত্ত। মিনতির এই নিজস্ব নির্জন ঘরখানিতে কেউ আর এখন আসবে না। যদি বা আসে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে টোকা দেবে, অনুমতি চেয়ে নেবে।

মিনতি সময় পাবে। এমন কি দুঃখ জানিয়ে অবাঞ্ছিত আগন্তুককে ফিরিয়ে পর্যন্ত দিতে পারে। কেউ আসবে না। তবু দেরাজটা ভাল করে টানবার আগে মিনতি উঠে গিয়ে আধখোলা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল। তারের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি টেনে দিল ঘননীল রঙের পর্দা। তারপর ফিরে এসে নিশ্চিন্তে নতজানু হয়ে বসল দেরাজের কাছে। এবার পুরো দেরাজটাই টেনে নিল। বুকে এসে লাগল মেহগনি কাঠের স্পর্শ। নিজের মনেই একটু হাসল মিনতি। কিছুদিন আগেও শরীর এত খারাপ ছিল যে, এসব অনুভূতি প্রায় ছিলই না।

ফিতে-বাঁধা রাশ রাশ চিঠিতে দেরাজটি এবার কানায় কানায় ভরে উঠেছে। আর একখানা চিঠি রাখবারও যেন জায়গা নেই। আর জায়গা নেই বলেই যেন চিঠির পালা শেষ হয়ে যাচ্ছে। দু দিন পর থেকে যে জীবন শুরু হবে তার কোন কোণেই এই চিঠিগুলির আর জায়গা হবে না।

অথচ গত পাঁচ বছর ধরে এই চিঠিগুলি মিনতির একমাত্র—একমাত্র না হক, প্রধান অবলম্বন ছিল। এক-একখানা চিঠিকে কতবার করে যে সে পড়েছে, তার ঠিক নেই। এক একখানা চিঠি আসবার অপেক্ষায় সে যে কত অধীর মুহূর্ত কাটিয়েছে, আজ আর তার হিসাব নেওয়া যায় না। শুধু স্মৃতিতে তার পুরো স্বাদ ধরাও পড়ে না।

চিঠিগুলিকে কিছুদিন হল কালানুক্রমে আলাদা আলাদা ভাবে ভাগ করে সাজিয়ে বেঁধে রেখেছে মিনতি। প্রথমে এই বুদ্ধি হয়নি। গোড়ার দিকে যেমন তেমন করে রেখে দিত। সবগুলিই যে ড্রয়ারে রাখত তা নয়। বরং ড্রয়ারে প্রথম প্রথম রাখতই না। তখনকার চিঠিগুলির মধ্যে ত কোন গোপনতা ছিল না। প্রায় কিছুই ছিল না বলতে গেলে। টেবিলের উপর দিনের পর দিন সে সব চিঠি পড়ে থাকত। হয়ত কোন চিঠি থাকত নভেলের পত্রচিহ্ন হিসাবে, কোনখানা উড়ে যাবার ভয়ে ডিকশনারির তলায় চাপা, চায়ের কাপের ঢাকনি হিসাবেও গোড়ার দিকে কোন কোন চিঠিকে ব্যবহার করেছে মিনতি। খামগুলির উপর গোলাকার দাগগুলি বোধ হয় এখনও দেখা যাবে। ভাবতে এখন লজ্জা করে মিনতির। ছি ছি ছি, কী নির্বোধ, কী উদাসীনই না ছিল তখন সে! অথচ তখন—শুধু তখন কেন, তার ঢের আগে থেকেই উৎপলকুমার রায় বেশ প্রতিষ্ঠিত গায়ক। রেডিওতে তাঁর রবীন্দ্র-সংগীত যখন হয়, বাড়ির সবাই উৎকর্ণ হয়ে শোনে। পরিবারের প্রত্যেকের কাছে এবং মিনুর বন্ধু-বান্ধব সকলের কাছেই উৎপলকুমার তাঁর নামে আর কণ্ঠমাধুর্যে শুধু পরিচিতই নন, প্রিয় গায়কদের একজন। বেশ বিক্রি তাঁর রেকর্ডগুলির। যাঁরা রবীন্দ্র-সংগীত ভালবাসেন, সেগুলি তাঁরা সযত্নে সঞ্চয় করেন।

তবু মিনতির কাছে তাঁর চিঠিগুলির বেশী সমাদর ছিল না। অতি-সাধারণ মামুলি চিঠি। দু-চার লাইনেই শেষ। "সুচরিতাসু, আপনার চিঠি পেয়েছি। আমার প্রোগ্রাম আপনার ভাল লেগেছে শুনে খুশী হলাম। শুভেচ্ছা ও প্রীতি-নমস্কার নিন।"

এই ধরনের চিঠিই প্রথম প্রথম আসত। পোস্টকার্ডে কি সস্তা কাগজে কোনরকমে দায়-সারা চিঠি। যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে জবাব দিয়েছেন। মিনতির অত দামী রঙিন প্যাডের কাগজের বদলে ভাল একখানা কাগজ ব্যবহারের কথাও ভদ্রলোকের মনে হয়নি। হলেনই বা তিনি বিখ্যাত ব্যক্তি। তাঁর অবজ্ঞার দানকে মিনতি অহেতুক আদর করতে যাবে কেন?

মিনতির বড়দিদি নীতি কিন্তু তখন মিনতির এই ঔদাসীন্যের নিন্দা করত: "ছি ছি ছি, তোর এ কী স্বভাব মিনু। চিঠিগুলি যদি ভাল করে রাখতেই না পারিস, তাঁকে চিঠি লিখিস কেন, তাঁর কাছে থেকে চিঠির জবাব চাসই বা কেন?"

মিনতি প্রতিবাদ করত, "কে বলল যে চাই? তিনি না চাইতেই লেখেন।"

ছোড়দি বীথি বলত, "লিখবেন না?

তিনি যে আমাদের মিনুকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছেন।"

পরিহাসের সূচগুলি মনে গিয়ে বিঁধত মিনতির। তার দিদিরা সামনে থাকতে তাকে দেখে কেউ মুগ্ধ হবে না এ-কথা সে ভাল করেই জানে। নীতির মত চোখ-মুখের গড়ন নেই তার, বীথির মত নেই রঙ, স্বাস্থ্য আর দেহসৌষ্ঠব, তাকে দেখে মুগ্ধ হবে কে? তা ছাড়া, দিদিদের মত তার বিদ্যাও নেই। ওরা দুজনেই এম এ পাশ করেছে। আর মিনতি বি এ-র চৌকাঠ পার হতে গিয়ে একবার ইকনমিকসে হোঁচট খেল, দ্বিতীয়বার পড়ল অজ্ঞান হয়ে। সেই থেকে মিনতির অসুখ আর সারেনি। প্রায়ই মাথা ঘোরে, ঝিমঝিম করে। মালদ শহর থেকে শুরু করে কলকাতার নামজাদা ডাক্তাররা পর্যন্ত কেউ কিছু করতে পারেননি। হার মেনে বলেছেন, তার ব্যাধিটা মনের, তার ব্যাধিটা মানসিক ছাড়া কিছুই নয়। মিনুর বাবা মানসিক রোগের ডাক্তারকে দেখাবার উদ্যোগ করেছিলেন। মিনু কিছুতেই রাজী হয়নি। সে বলেছে, "আমার মনের চিকিৎসা আমি নিজেই করতে পারব বাবা, কোন মনস্তাত্ত্বিকের দরকার নেই।"

মিনতি জানত, তার দিদিরা যেমন তাকে ভালবাসে, তেমনি গোপনে গোপনে একটু অবজ্ঞাও করে। আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব সব মহলেই অনুকম্পা কুড়োতে হয় মিনতিকে। তার দূরসম্পর্কের এক জেঠিমা সেবার তার মাকে বলেছিলেন, "তোমার এই মেয়ে পার করতে বেশ একটু বেগ পেতে হবে ভাই।"

কথাটা আড়াল থেকে মিনতি শুনে ফেলে। তারপর থেকে জেঠিমা কি জেঠতুতো ভাই-দের সঙ্গে সে আর কোন সম্পর্ক রাখেনি। এমনি আস্তে আস্তে অনেকের সঙ্গেই সম্পর্ক ছেদ মিনতি ঘরের কোণে আশ্রয় নি রোগ হয়েছিল এই নির্জনবাসের সহায়। জ্বরজারি মাথাব্যথা লেগেই থাকত। কারও সঙ্গে না মিশবার, কোথাও না যাবার অজুহাত থাকত হাতের কাছে।

মিনতির মত মেয়েকে কারও যে চোখে পড়বে, একথা ভাবাই যায় না। কিন্তু আশ্চর্য, উৎপল রায়ের পড়েছিল। তিনি সেবার মালদহের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে দলবল নিয়ে গাইতে এসেছিলেন। মিনুর ছোড়দা সেই অনুষ্ঠানের একজন পাণ্ডা। যুগ্ম সেক্রেটারিদের একজন। উৎপলবাবুকে নিজেদের বাড়িতেই তুলেছিল এনে। সঙ্গে আরও দু-একজন গায়ক ছিলেন। অভ্যর্থনা, আলাপ-পরিচয়, গল্প-সল্পের ভার ছোড়দা আর দিদিরাই নিয়েছিল। মিনুর স্থান ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে পিছনে। তবু অটোগ্রাফ নিতে গিয়ে আলাপ হয়ে গেল। নীতি আর বীথি দুজনেরই তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তারা অটোগ্রাফের বাতিক পার হয়ে এসেছে অনেকদিন। মিনু মাঝে মাঝে তখনও দু-একজনের স্বাক্ষর ধরে রাখে।

খাতাটা হাতে নিয়ে তার পাতাগুলি উলটে যেতে যেতে উৎপলবাবু মিনুর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, "বাঃ, এ ত দেখছি সবই বড় বড় বিখ্যাত ব্যক্তিদের অটোগ্রাফ। এর মধ্যে আমি কেন?"

তখন বছর পঁয়ত্রিশেক বয়স উৎপলবাবুর। পাতলা ছিপছিপে গড়ন। গায়ের রঙ না ফরসা না কালো। সুপুরুষ নন, বলিষ্ঠ পুরুষ নন। তীক্ষ্ণাগ্র নাক নেই, চোখ দুটি শ্রুতিমূলে পৌঁছবার অনেক আগেই থেমে গিয়েছে। ঈষৎ পুরু ঠোঁট আর চাপটা চিবুককে মুখের ডৌলকে সুশ্রী কোনরকমেই বলা চলে না। তবু উৎপলবাবুর মধ্যে কোথায় যেন শ্রী আছে বলে মিনতির মনে হয়েছিল। পরে মিনু ভেবে দেখেছে সেই শ্রী তাঁর হাসি আর কথা বলবার ভঙ্গিতে। দাঁতগুলির সুষম সুন্দর গঠনে। কিন্তু গড়নের সৌন্দর্য ত মানুষের বাইরের। শুধু দন্তপংক্তি মানুষের হাসিকে কতখানি সুন্দর করে তুলতে পারে, যদি তাঁর অন্তর প্রীতি আর প্রসন্নতায় ভরা না থাকে। তাঁর কথাগুলিও যে মিনতির ভাল লেগেছিল তা কি শুধু উচ্চারণের স্পষ্টতা আর কণ্ঠস্বরের মিষ্টতার জন্যে? মোটেই তা নয়। মিনতি এ নিয়েও তারপর অনেক ভেবে দেখেছে। কথা হল খেয়া নৌকো। তা হল এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে পৌঁছবার জন্যে, এক অন্তর থেকে আর এক অন্তরে পারাপারের জন্যে। নইলে সে-যাত্রায় পুরো একটি দিনও ত মিনুদের বাড়িতে ছিলেন না তিনি, এরই মধ্যে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে অত অন্তরঙ্গ তিনি কী করে হলেন।

একটু ভেবে নিয়ে অটোগ্রাফ-খাতায় শেষ পর্যন্ত সই করেছিলেন উৎপলবাবু। নাম স্বাক্ষরের আগে এক টুকরো কবিতাও লিখেছিলেন,

"যদিও জানি না
এ নামের মানে আছে কিনা।"

মিনুর বড়দি নীতি বলেছিল, "বাঃ বেশ হয়েছে ত। আপনার কি কবিতা লেখারও অভ্যাস আছে নাকি?"

তিনি হেসে বলেছিলেন, "এখন আর নেই। ছেলেবেলায় একটু আধটু ছিল।"

বীথি বলেছিল, "কিন্তু কী বিনয় আপনার! যাই বলুন, পুরুষের অত বিনয় আমার ভাল লাগে না। তাঁরাও যদি অহংকারী না হন, দাম্ভিক না হন, হবে কে?"

নীতি বলেছিল, "আমাদের বীথি পৌরুষ আর পরুষতাকে এক বলে"

মিনতি এ-তর্কে যোগ দে উৎপলবাবুও যে যোগ দিয়েছিলেন তা নয়। তিনি শুধু স্মিতমুখে ওদের দুজনের বাগযুদ্ধ দেখেছিলেন।

ফাংশন সেরে আসরের সুখ্যাতি আর মালা নিয়ে উৎপলবাবুর ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় এগারটা হয়েছিল। তার একটু আগে দিদিদের সঙ্গে মিনুও ফিরে এসেছে। নিজের টেবিলে এক টুকরো কাগজ রেখে গিয়েছিল তা আর পায়নি। পরে বুঝল বীথির শত্রুতা। সে তৎক্ষণে সেই কাগজের টুকরো উৎপলবাবুর হাতে পৌঁছে দিয়েছে।

"দেখুন, আপনার কবিতার সেই জবাব। মিনুকে কবিতা লিখলে আর রক্ষা নেই। সঙ্গে সঙ্গে ও ছড়া কেটে তার জবাব দেবে।"

উৎপলবাবু উৎসুক হয়ে বলেছিলেন, "দেখি দেখি।"

তারপর তাঁর সুরেলা সুমিষ্ট গলায় আবৃত্তি করেছিলেন,

"নামের মান জানে পঞ্চজনে
নামের মানে জানি আপন মনে।"

নিজের কবিতা অন্যের কণ্ঠে শোনার যে সুখ তা সেই প্রথম পেয়েছিল মিনু।

কাগজটুকু তিনি পকেটে রেখে দিতে দিতে বলেছিলেন, "এযাত্রায় এই হল আমার সেরা মানপত্র।"

মিনু বলেছিল, "বাঃ, ওটা নিয়ে যাচ্ছেন কেন?"

তিনি হেসে বলেছিলেন, "আপনি কি নিয়ে যাওয়ার জন্যেই দেননি?"

মিনতি ভারী লজ্জা পেয়েছিল, তারপর মৃদু আপত্তির সুরে বলেছিল, "মোটেই না। বীথিদি ওটা আমার টেবিল থেকে চুরি করে এনেছে। আপনি ডাকাতি করছেন।"

কথা শেষ করে মিনু সেখানে আর দাঁড়ায়নি। নিজের কথায় নিজেই সে লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। ছি ছি ছি, কী নির্লজ্জ, কী প্রগল্‌ভাই না তিনি মনে করছেন মিনুকে! বীথির রূপ আছে। ওর মুখে সব কথাই মানায়। কিন্তু মিনুর আছে কী! সে কোন্‌ লজ্জায় মুখ বাড়ায়, মুখ তোলে, মুখ খোলে?

পরদিন ভোরের গাড়িতে উৎপলবাবু চলে গিয়েছিলেন। স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল মিনুর। কিন্তু হল না। স্টেশন বেশ দূরে। শহর থেকে মোটরে করে সেখানে যেতে হয়। গাড়িতে ঠাঁই কোথায়? উৎপলবাবুর দলবলে তা ভরে গেল। সি অফ করবার জন্যে শুধু ছোড়দাই সঙ্গে গেলেন।

মিনু চুপে চুপে এক ফাঁকে ড্রয়িংরুমে গিয়ে দেখে ঘরটা খাঁ-খাঁ করছে। অ্যাশট্রেতে সিগারেটের টুকরো আর ছাইয়ে ভরতি। খালি প্যাকেটগুলি পড়ে রয়েছে কার্পেটের উপর। কিন্তু ইজিচেয়ারের হাতলে কিছু ভাল নিদর্শনও ফেলে গিয়েছেন। রেখে গিয়েছেন মালাগুলি। ভুলে গেলেন নাকি? দিদিরা কী করছিল? অত যে কাছাকাছি ছিল, একবারও কি মনে করিয়ে দিতে পারেনি? নাকি ইচ্ছা করেই রেখে গিয়েছেন?

জুঁই ফুলের মালাটি বেছে নিয়ে নিজের খোঁপায় জড়িয়েছিল মিনতি। তাই দেখে বীথির কী ঠাট্টা! মুখের কাছে মুখ এনে গুনগুন করে গেয়েছিল,—

"মালা হতে খসে পড়া ফুলের একটি দল
মাথায় আমার ধরতে দাও গো ধরতে দাও।

কিন্তু তুই শুধু একটি দল নিয়ে খুশী হসনি, পুরো একটি মালাই তুলে নিয়েছিস।"

মিনতি রাগ করে বীথির গায়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল মালা। বলেছিল, "এই নে। একটা বাসী ফুলের মালা, তাই নিয়ে অত! যতক্ষণ

এই হল আমার সেরা মানপত্র

ছিলেন তোর দিকেই ত তাকিয়ে ছিলেন। তাতেও হয়নি?"

বীথি বলেছিল, "ভুল করছিস। আমাকে শুধুই চোখ দিয়ে দেখে গেছেন। মন দিয়ে দেখেছেন কেবল তোকে।"

মিনতি বলেছিল, "আর বড়দিকে?"

বীথি হেসে বলেছিল, "ওকে বোধহয় শুধু নাক দিয়ে শুঁকে গেছেন।"

বড়দি তাড়া করে এসেছিল, "ফাজিল কোথাকার!"

সেই থেকে শুরু। সেই কাগজের টুকরো, কবিতার টুকরো থেকে। উৎপলবাবু কলকাতায় গিয়ে ছোড়দার কাছে পৌঁছ-সংবাদ দিয়েছিলেন। তাতে শেষের দিকে মিনতির কথা ছিল। তার কবিতা নাকি উৎপলবাবুর খুব ভাল লেগেছে। তাঁর বন্ধুদেরও।

ছোড়দা হেসে বলেছিলেন, "মিনুকে আর পায় কে! ও বোধহয় মাসখানেকের মধ্যে খানকয়েক মহাকাব্য লিখে ফেলবে।"

কিন্তু মহাকাব্য লেখবার শক্তি কই মিনুর? না একটি জীবন দিয়ে লিখতে পারল, না কোটি কোটি অক্ষর দিয়ে। কাব্য হল না, গল্প হল না, উপন্যাস হল না, কিছুই হল না। লিখল শুধু চিঠি, টুকরো কবিতা আর ডায়েরি। কিছু না পারার, কিছু না হওয়ার, কিছু না পাওয়ার বিলাপে ভরা।

সেই ডায়েরির পাতা মাঝে মাঝে চিঠির আকারে কপি করে পাঠিয়েছে উৎপলবাবুকে। নিজের মনে মনে কথা বলা পৌঁছে দিয়েছে আর একজনের কানে। কিন্তু [illegible] পৌঁছেছে কি না কে জানে!

চিঠি মিনুই আগে লিখেছিল। ছোড়দার চিঠিতে তার নামের উল্লেখ দেখে সে আর না লিখে থাকতে পারেনি। তাঁর মধুর কণ্ঠের—তার চেয়েও বেশী তাঁর মধুর ব্যক্তিত্বের সুখ্যাতি করেছিল, নিজের মুগ্ধ হৃদয়কে প্রায় সেই প্রথম চিঠিতেই ধরে দিয়েছিল মিনতি।

তার জবাবে এসেছিল সাধারণ চিঠি, মামুলি চিঠি। হয়ত প্রথমেই ধরা দিতে চাননি। কিংবা পরখ করে নিতে চেয়েছিলেন। আর মিনতি শোধ নিয়েছিল সে-সব চিঠি অনাদর করে; চিঠিগুলিকে যেখানে সেখানে ফেলে রেখে, চায়ের কাপ, দুধের কাপ, পথ্যের বাটির ঢাকনি হিসাবে ব্যবহার করে। কিন্তু তাতে কি সব জ্বালা, সব তৃষ্ণা, সব আকাঙ্ক্ষা ঢাকা পড়েছে? পড়েনি। শেষ পর্যন্ত একখানা চিঠিও হারাতে দেয়নি মিনতি, এক টুকরো ছেঁড়া কাগজ পর্যন্ত না। সব দিয়ে গুচ্ছ বেঁধেছে, ঐতিহাসিকের মত সাল তারিখ দিয়ে

অনুযায়ী সাজিয়েছে। এই চিঠিগুলির মধ্যে ধরা আছে দুজনের একটি সম্পর্কের ক্রমবিকাশের ইতিহাস। তার অর্ধেক আছে এখানে; মিনুর কাছে। বাকী অর্ধেক আর-একজনের কাছে আছে কি না কে জানে? তিনিও কি মিনুর মত একখানি একখানি করে সব পাওয়া চিঠি সঞ্চয় করে রেখেছেন? মিনুর চিঠিগুলি দেখতে অনেক সুদৃশ্য। রঙিন খামে রঙিন প্যাডের কাগজে অতি যত্ন করে লেখা। কেউ গুছিয়ে রাখলে ভালই দেখায়। কিন্তু তার বদলে মিনু যে চিঠিগুলি পেয়েছে, তার প্রায় প্রত্যেকখানিই সাধারণ সরকারী খামে মোড়া। কাগজগুলি বেশির ভাগই সাদা আর সস্তা। বাইরে থেকে এই চিঠিগুলির কোথাও কোন রঙ নেই। রঙ শুধু এর কথাগুলির মধ্যে। তবু মিনতির মাঝে মাঝে মনে হয়েছে শুধু তার লেখা চিঠিগুলিই নয়, তার পাওয়া চিঠিগুলিও রঙিন হক, কাগজগুলি দামী হক। যেমন দিদিদের চিঠিগুলি হয়। রঙ দেখলেই চেনা যায় সেগুলি কোন রসে ভরা। কিন্তু লিখি-লিখি করেও উৎপলবাবুকে এ নিয়ে কোন কথা লিখতে লজ্জা করেছে মিনতির। ছি ছি ছি, এ রঙ কি বাইরে থেকে লাগাবার, মুখ ফুটে চেয়ে নেওয়ার? এর জন্যে কি কোন কথা নিজে থেকে বলা যায়? মিনতির মনে হয় এদিক থেকে মেয়েদের দাবি অনেক কম। তাদের চোখ খুশী হবার জন্যে পুরুষের রঙিন পোশাক দাবি করে না, মণিমুক্তার অলঙ্কারের ফরমায়েশ করে না। পুরুষের অনাড়ম্বর বেশ আর ভূষণহীনতায় তার দীনতার কথা মনে হয় না। কিন্তু পুরুষের চোখ কি অত অল্পে খুশী হয়? জমকালো শাড়ি গয়নায় সেজে না গেলে তারা কি কোন মেয়ের দিকে তাকায়?

মিনু জানে জমকালো পোশাক তাকে মানায় না। সেজন্যে শাড়ির চড়া রঙ, আর গয়নার আধিক্য সে চিরকাল এড়িয়ে চলেছে। আবরণে আভরণে, ভোজনে শয়নে কোথাও কোন বিলাস নেই তার। শুধু চিঠিতে আছে। তার চিঠি থাকবে দামী কাগজে লেখা, তার পাতার রঙ থাকবে গাছের পাতার মত, তার ভাষায় থাকবে ফুলের সৌন্দর্য, আর প্রচ্ছন্ন সৌরভ। সে সৌরভ শুধু ভাষায় আসে না যদি তাতে প্রাণের স্পর্শ না থাকে।

আটপৌরে আবরণ নিয়ে যে-সব চিঠি উৎপলবাবুর কাছ থেকে এসেছে তা যদি আর কেউ লিখত মিনতি দূর করে ছুঁড়ে ফেলে দিত। এর আগে অনেক মেয়ে-বন্ধুর সঙ্গে চিঠি লেখালেখি চলেছে। তাদের বিয়ে হবার পরে প্রায় সব বন্ধ। উৎপলবাবুই প্রথম অনাত্মীয় পুরুষ যাঁর সঙ্গে চিঠির আত্মীয়তা শুরু হয়েছে। তাঁর এক-একখানা চিঠি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কতবার করে যে পড়েছে মিনু, তার ঠিক নেই। ভাষা ত সংকেত, ভাষা ত এক ধরনের ইশারা ছাড়া কিছু নয়। সেই সংকেতের ভিতর থেকে কী নিগূঢ় অর্থ বের করা যায়, কথার সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে, মনের কোন্ গোপনতম গহ্বরে পৌঁছান চলে বার বার সেই চেষ্টা করেছে মিনতি। না করে উপায় ছিল না। এ ত দিদিদের দাম্পত্যপত্র নয়। যার আবরণের জন্যে শুধু একখানা খামই যথেষ্ট। চিঠি ভরে যে কথাগুলি মিনতির

কাছে এসে পৌঁছয় শুধু খাম ছিঁড়লেই কি তার অর্থ ধরা পড়ে? সেই নিহিত অর্থ কখনও থাকত প্রকৃত বর্ণনায়, কখনও থাকত সংগীতের তত্ত্ব আলোচনায়, কখনও থাকত উদ্ধৃত গানের কলিতে কলিতে লুকনো।

আর এই লুকনো পথেই ত অভিসারের আনন্দ। যে পথের রেখা ইশারায় মত দেখা যায় কি যায় না সেই অস্পষ্ট পথই যে মিনুর একমাত্র পথ।

তবু সেই গোপনতা মাঝে মঝে ধরা পড়তে লাগল। বড়দিরা থাকে দিল্লিতে। জামাইবাবু সেক্রেটারিয়েটে কাজ করেন। বাপের বাড়িতে বেশী আসতে পারে না বড়দি। কিন্তু বীথির শ্বশুরবাড়ি এই মালদতেই। সে প্রায়ই আসে। সপ্তাহে একদিন দুদিন এসে না থাকলে বাবা অস্বস্তি বোধ করেন।

বেড়াতে এসে বীথি মাঝে মাঝে খুলে ফেলে মিনুর চিঠি। পড়ে আর মুখ টিপে টিপে হাসে।

মিনুর বুঝতে বাকী থাকে না এই হাস্যরসের উৎসটা কোথায়। রাগ করে বলে, "আমার চিঠি কেন পড়লি? বিয়ের পর তোর ভদ্রতাবোধটুকুও গেছে।"

বীথি হাসে: "অত চটছিস কেন? এ ত বরের চিঠিও নয়, প্রিয়বরের চিঠিও নয়। আমাদের পারিবারিক বন্ধুর চিঠি। ওতে কোন গোপন কথা লেখা আছে যে, তুই লুকিয়ে রাখবি।"

পরিহাসটা বিষাক্ত তীরের মত মিনুর বুকে গিয়ে বেঁধে। লুকবার কিছু নেই সেই ত সবচেয়ে বড় দুঃখ। এর চেয়ে সত্যিই যদি ঢেকে রাখবার মত কিছু থাকত, এমন প্রচণ্ড মারাত্মক রকমের কথা যা পড়তে গিয়ে দারুণ লজ্জা পেত মিনু, তা হলেই যেন সবচেয়ে খুশী হত মিনু। কিন্তু তা ত হবার নয়। তাই বলে চিঠিগুলিতে একেবারেই যে কিছু নেই তাই বা কী করে বলে! চিঠির ভিতর থেকে কিছুই পাওয়া যায় না কিংবা দাতার কিছুই দেওয়ার ইচ্ছা নেই মিনুর মন একথা মানতে চায় না।

একদিন গিয়ে মিনতি মার কাছে নালিশই করে বসল, "আচ্ছা মা, ছোড়দির এ কী স্বভাব বল ত!"

মা বললেন, "কী হল তোদের আবার?"

মিনু বলল, "ছোড়দি কেন আমার চিঠি পড়বে! এত চিঠি পেয়েও ওর আশ মেটে না? ওর মেয়ে-বন্ধু আছে, ছেলে-বন্ধু আছে, জামাইবাবুও শিকাগো থেকে সপ্তাহে সপ্তাহে চিঠি লেখেন। তবু কেন আমার চিঠির দিকে ওর বাজপাখির মত চোখ?"

বীথি হেসে বলে, "খবরদার বাজপাখির চোখ বলবিনে। আমাকে সবাই বলে মৃগাক্ষী, মীনাক্ষী, ময়ূরাক্ষী—আর তুই বাজের সংগে একটা বাজে তুলনা দিলেই হল?"

মাও হাসেন: "তা বাপু তোমারই দোষ। তুমি কেন ওর পার্সনাল চিঠি দেখবে?" তারপর মিনুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেন, "আচ্ছা, উৎপলবাবুই বা সপ্তাহে সপ্তাহে তোকে অত কী লেখেন বল্ ত? আর তুই বোধহয় সপ্তাহে দুখানা লিখিস। এত কী যে কথা জমে ওঠে আমি ত বুঝতে পারিনে। আমার ত দু লাইন লিখতেই গায়ে জ্বর আসে। নীতির শাশুড়ী মাসখানেক হল সেই যে একখানা চিঠি দিয়েছেন, আজ পর্যন্ত তার জবাব দিতে পারলাম না।"

প্রতিবাদ করে করে চিঠিগুলির উপর এক সময় স্বাধিকারের প্রতিষ্ঠা করে মিনতি। তার চিঠি বীথিও খোলে না। খুললে মিনু কষ্ট পায়, তার অসুখ বাড়ে বলেই বোধহয় তাদের এই সহৃদয় বিবেচনা।

সব সময় যে বড় চিঠি আসত তা নয়, মাঝে মাঝে দু-এক লাইনে, দু-একটি কবিতার লাইনে উৎপলবাবু চিঠি শেষ করতেন।

তারপর ফের পুরো চিঠি শুরু হত। মিনুর রোগশয্যায় ওষুধপথ্য ফল আসত। সেই সংগে খামেভরা চিঠিগুলি আসত। প্রায় কোন সপ্তাহই বাদ যেত না। প্রথম প্রথম সেই চিঠিগুলির মধ্যে কিছু থাকুক বা না থাকুক মিনুর মনে হত এই সুনিয়মে আসাই যে ভালবাসা। নিয়ম? তেতো ওষুধের মতই নিয়ম মিনুর কাছে প্রায় বিষ। নাওয়া খাওয়া বিশ্রামের কোন নিয়মই ওর মানতে ইচ্ছা করে না। শুধু চিঠির নিয়মই নিয়ম হয়েও ব্যতিক্রম। চিঠি লিখতে ভাল লাগে মিনুর। পেতে আরও ভাল লাগে। কিন্তু একথা যে কতখানি সত্যি, তার ঠিকমত যাচাই হয় না। কখনও মনে হয় লিখতেই তার বেশী ভাল লাগে। লিখে যাওয়াই যে পাওয়া। নিজেকে দিতে দিতেই যেন নিজেকে পাওয়ার স্বাদ বেশী করে মেলে।

শুয়ে শুয়ে যে চিঠিগুলি পেত মিনু সেগুলিতেই যেন অন্তরঙ্গ সুর বেশী বাজত। এ-সব চিঠির অনেক তার মুখস্থ হয়ে আছে।

"তোমার অসুখের কথা যত শুনি, নিজের স্বাস্থ্যের জন্যে তত আমার লজ্জা বাড়ে। মনে হয় আমি যেন একা একা একান্ত স্বার্থপরের মত জীবনের সমস্ত সুখ-সম্পদকে ভোগ করে চলেছি। গান আছে গানের কলেজ আছে, দলবল নিয়ে ছুটোছুটির শেষ নেই। আমার আজ আগ্রা, কাল দিল্লি, পরশু বোম্বে, তরসু মাদ্রাজ। অবশ্য শুধু একার জন্যে নয়, একটি প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখবার আমি ভার নিয়েছি। তাতে আরও কয়েকজনের জীবিকা জড়িয়ে আছে। অজুহাত আছে আমার। এমনও হয় সেই অজুহাতে আমি আমার আসল কাজকে ফাঁকি দিই। আরও যে কত ফাঁকিতে জীবন ভরে ওঠে তার আর ঠিক নেই। তবু এত কাজ আর এত ফাঁকির মধ্যেও মাঝে মাঝে নির্জনে নিঃসঙ্গ মুহূর্ত আসে। তা কাজ দিয়েও ভরা নয়, আবার ফাঁকি দিয়েও ভরা নয়। সেই দুর্লভ এক-একটি ক্ষণে আমি একজনের কথা ভাবি। আকাশের এক-একটি নিঃসঙ্গ তারার মত এমনি দু-একটি নিবিড় মুহূর্ত ছাড়া যাকে আমি আর কিছুই দিতে পারি নে।"

আর একখানা চিহ্নিত চিঠি টেনে নিয়ে খুলে পড়ল মিনু: "তুমি জানতে চেয়েছ তোমার মধ্যে আমি কী দেখতে পেয়েছি? এই প্রশ্ন করে তুমি অত সংকুচিত হয়েছ কেন? এ-জিজ্ঞাসা কি শুধু তোমার একার? তা ত নয়। তোমার আমার সকলেরই। যাদের অনেক আছে, তারাও এ জিজ্ঞাসা করে, যাদের কিছু নেই তারাও। কিন্তু কিছু নেই বলে কাউকে অপমান করবার অধিকার কি আমাদের আছে? আমি কিছু দেখতে পাইনি, আমার চোখ এড়িয়ে গেছে, বড়জোর এই কথাটাই বলতে পারি। দুটো চোখ আছে বলেই আমরা কি সবাইকে পুরোপুরি দেখতে পাই! আমিও যেমন অনেককে দেখিনে, আমাকেও তেমনি অনেকে দেখেও দেখে না।

"তোমার মধ্যে আমি কী দেখতে পেয়েছি, তার চেয়ে তোমাকে যে আমি দেখতে পেয়েছি, এই সত্যই আমার কাছে বড়। নাও ত দেখতে পারতাম। চোখ এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। তোমার মধ্যে দর্শনীয় কিছু কম আছে বলে নয়। যারা চোখকে প্রলুব্ধ করে, আকৃষ্ট করে, তাদেরও ত দেখেছি। কখনও লুকিয়ে, কখনও আড়-চোখে, কখনও বা সোজাসুজি। কিন্তু সেই চোখের দেখাকে কতক্ষণই বা মনে রাখতে পেরেছি?

"জীবনে এই দুর্ভাগ্যই ত বেশী ঘটে যখন আমরা একজন দেখি, আর একজন দেখিনে। কিংবা রূপের চেয়ে বিরূপতাকে দেখি, গুণের বদলে দোষের আকরকে দেখতে পাই। কিন্তু দুজনেই যখন পরস্পরকে দেখি, তখন তিল আর তিল থাকে না, তিলোত্তম হয়, তিলোত্তমা হয়ে ওঠে।

"তোমার কথার জবাব তোমার কথাতেই দিতে হয়। তোমার মধ্যে এমন একজনকে দেখেছি যাকে আমিও নির্ভয়ে নিঃসংকোচে জিজ্ঞাসা করতে পারি 'আমার মধ্যে তুমি কী দেখলে?"

উৎপলবাবুর এ-চিঠি মিনু অনেকবার

পড়েছে। রোগে আরোগ্যে, বিকালে সন্ধ্যায়, গভীর রাত্রে মেঘে-ঢাকা বর্ষার দিনে, ফুট-ফুটে কোজাগরী জ্যোৎস্নায় রাত জেগে জেগে এ-সব চিঠি পড়েছে মিনু। কোন কোন মুহূর্তে রোমাঞ্চিত হয়েছে, মুগ্ধ হয়েছে আবার এমন দুঃসময় এসেছে যখন সন্দিগ্ধও কম হয়নি! এই যে পরতে পরতে কথার স্তর এর মধ্যে কোথাও কি সত্য বলে কিছু আছে? আন্তরিকতা আছে? এই কথায় ভরা চিঠিগুলি ছাড়া তার অন্য প্রমাণ কই? যে ভালবাসে সে কি অত কথা বলতে ভালবাসে? ভালবাসা কি শুধু মূককে বাচাল করে? বাচালকেও মূক করে না? দুঃসহ সন্দেহ হয়েছে মিনুর। আর সেই সংশয়ের জ্বালায় নিজেই ছটফট করেছে। চিঠিগুলিকে মনে হয়েছে অভিশাপের মত। এতে যে যত সুখ তত যন্ত্রণা তা কি আগে জানত!

মার কাছে অসুখের কথা বলে রেহাই পেয়েছে। কিন্তু বীথির কাছে ত তা পাবার জো নেই। সে ধরে ফেলেছে। অন্ধকারে ছাদের আলিসায় বসে নিজের হাতের মধ্যে মিনুর শীর্ণ মুঠি চেপে ধরে রেখেছে বীথি। যেন কিছুতেই আর ছাড়াছাড়ি নেই। সামনে অন্ধকারে কলনাদে বয়ে চলেছে বর্ষার মহানন্দা। খাপে-ঢাকা বাঁকা তলোয়ার শুধু ঝিলম নয়, যে-কোন নদী যে-কোন নদ, যে-কোন নারী, যে-কোন নর। তার খাপের বাঁকা তলোয়ার অকস্মাৎ এসে বিঁধতে পারে যে-কোন বুকে, যে-কোন মুহূর্তে।

বীথি আস্তে আস্তে বলেছে, "মিনু, তুই ওসব চিঠি লেখালেখি ছেড়ে দে।"

মিনু বলেছে, "কেন বীথিদি?"

বীথি জবাব দিয়েছে, "ছেড়ে না দিলে তোর অসুখ সারবে না। আমরা প্রথম প্রথম ভাবতাম চিঠি পাওয়া, চিঠি লেখা তোর পক্ষে রিক্রিয়েশনের কাজ করবে। তুই যখন আনন্দ পাস—। কিন্তু এ যে দেখছি হিতে বিপরীত হল।"

মিনু বলেছিল, "বীথিদি, সত্যিকারের কোন আনন্দে দুঃখের মিশেল নেই বল ত?"

বীথি চটে উঠে বলেছিল, "তোর ওসব বস্তাপচা তত্ত্বকথা রাখ্ ত! আনন্দের স্বাদের সঙ্গে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার স্বাদের কোন মিল নেই। ও-সব কবিদের কল্পনা-বিলাস। তুই আমার শাড়ি-গয়নার বিলাসিতা নিয়ে ঠাট্টা করিস, কিন্তু মানসিক বিলাসিতা আরও খারাপ।"

মিনু এ-কথার কোন জবাব দেয় নি।

বীথি বলেছিল, "তা ছাড়া সে ভদ্রলোকের স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে, সংগীত-সঙ্গিনীদেরও অভাব নেই। তুই কোন্ আশায়—"

মিনু তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বীথির মুখ চেপে ধরেছে, "চুপ কর্ বীথিদি, চুপ কর্। তুই এত ভালগার হতে পারিস আমার ধারণা ছিল না।"

সেখান থেকে উঠে মিনু সেদিন নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিয়েছিল। সে-রাত্রে আর খায়নি, ঘুমোয়ওনি। তারপর মিনু ইচ্ছা করেই পত্রধারাকে বন্ধ করে দিল। তার চিঠি-লেখালেখির যখন এমন অপব্যাখ্যাই হয় দরকার নেই লিখে। কিন্তু না লিখে যে বড় কষ্ট। মনে হয় জীবনের স্রোতই যেন শুকিয়ে গিয়েছে। গ্রীষ্মের মহানন্দার মত তাতে শুধু বালি, শুধু বালি।

সে না লিখলেও পর পর একখানা নয়, দুখানা চিঠি এল উৎপলবাবুর। মিনু পড়ল, বার বার পড়ল, কিন্তু জবাব দিল না। বেশ মজা। তিনি ভাবুন তিনি উদ্বিগ্ন হন। তাঁর মনে এই বিশ্বাস আসুক যে, মিনুর খুব শক্ত অসুখ হয়েছে আর সেই অসুখে ভুগে ভুগে সে মরে গিয়েছে। এক-জন যদি এমন হঠাৎ মরে যায় আর একজন যদি তা কিছুতেই জানতে না পারে, আর না জানতে পেরে দূর দূরান্তর থেকে সে যদি সারা জীবন তাকে চিঠি লিখে যায়, তা হলে বেশ হয়। চিঠির পর চিঠি, চিঠির পর চিঠি। মিনু নেই কিন্তু তার উদ্দেশ্য চিঠিগুলি আসছে বেশ লাগে ভাবতে। তার সমাধি ফুলের বদলে চিঠির স্তবকে ভরে উঠছে বেশ লাগে ভাবতে। তাকে কি এমন ভাল কেউ বাসে না যে তার কাছ থেকে চিঠির জবাব না পেয়েও সে চিঠি লিখে যাবে? মিনু বেঁচে না থাকলেও আর-একজন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তার উদ্দেশে শুধু চিঠি পাঠাবে?

মিনু তার ডায়েরিতে লিখে রাখল কথা-গুলি। যেন নিজেকে নিজে চিঠি লিখছে। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করছে। কিন্তু সব প্রশ্নের জবাব কি নিজের দিতে ইচ্ছা করে? জীবনটাকে আগাগোড়া কি অত বড় একটা পরীক্ষার খাতা ভাবতে ভাল লাগে যে, যা লিখবে মিনু নিজেই লিখবে, তার লেখা কেউ লিখে দেবে না, তার কথা কেউ বলবার থাকবে না?

প্রশ্নের জবাব মিলতে দেরি হল না। দিন দুই বাদেই ছোড়দা একখানা টেলিগ্রাম নিয়ে এসে হাজির। হেসে বলল "কী রে, তোরা কি ঝগড়াঝাঁটি করেছিস নাকি?"

মিনু অবাক হয়ে বলল, "ঝগড়া আবার কার সঙ্গে ছোড়দা?"

ছোড়দা হেসে বলল, "আবার কার সঙ্গে? দিল্লিতে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম করতে গিয়েও ভদ্রলোকের স্বস্তি নেই। আমাদের অফিসে টেলিগ্রাম করেছেন। তুই কেমন আছিস জানতে চান। একেবারে প্রিপেড টেলিগ্রাম।"

লজ্জায় মিনু নিজের ঘরের কোণে এসে মুখ লুকোল। ছি ছি ছি, তার জন্যে টেলিগ্রাম! বাবা মা ছোড়দারা কী ভাবলেন!। সব যে ধরা পড়ল! টেলিগ্রামের সাংকেতিক অক্ষরগুলি শুধু ত সংকেতের মধ্যে গোপন রইল না। হীনবুদ্ধি পোস্টমাস্টার তাকে যে আবার ভাষায় ধরে দিয়েছেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, এই সীমাহীন লজ্জার সঙ্গে, এক গোপন আনন্দের ধারাও এসে মিশে গেল। 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।' সে ভুবন নিশ্চয়ই শুধু বাইরের ভুবন নয়।

যুক্ত বেণীর মত দুটি ধারা ঘিরে ধরল মিনুকে। ধরা পড়বার লজ্জা, আর ধরা পড়বার গর্ব। ধরা দেওয়ার ভয় আর ধরে দেওয়ার পরিতৃপ্তি। কে বলে আনন্দের ধারা অবিমিশ্র, একস্রোতা? বীথি কিছু জানে না, কিছু জানে না। জীবনের কত স্বাদ যে বিষাদের মোড়কে মোড়া বীথি তার কিছু জানে না।

শুধু টেলিগ্রাম নয়, কলকাতা থেকে এল কয়েকখানা নতুন রেকর্ড। উৎপলদা তার নামেই পাঠিয়েছেন। মিনুর নামে।

গ্রীষ্মের পরে এসেছে বর্ষা। মিনুর জানলার তলা দিয়ে মহানন্দা ভরে উঠেছে, ছুটে চলেছে। সে চলার শেষ নেই, দিগ্-বিদিক্‌জ্ঞান নেই।

মিনুর ঘরে বাজে বর্ষার গান,—

"আজ আকাশের মনের কথা
ঝরঝর বাজে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে॥"

মিনুর গলায় সুর নেই, সে গভীর রাত্রে নিজের মনে আবৃত্তি করে—

"শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে
পড়ুক ঝরে
তোমারি সুরটি আমার মুখের পরে
বুকের 'পরে॥"

ডাক্তারের নিষেধ অগ্রাহ্য করে মিনু জানলা খুলে দিয়ে তার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। শিক-গুলির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেয়। মিনুকে বাধ্য হয়ে মানতে হয় এই শিক-গুলির বাধা। কিন্তু বাইরের প্রবল বর্ষণ কি কোন বাধা মানে? সে ঝাপটায় ঝাপটায় মিনুর সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দেয়, তার সমগ্র সত্তাকে ছিনিয়ে নিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

মিনু আবৃত্তি করে—

"যা কিছু জীর্ণ আমার, দীর্ণ আমার,
জীবনহারা,
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে
সুরের ধারা।
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার 'পরে,
ভুখের 'পরে
শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে,
পড়ুক ঝরে।"

আশ্চর্য, এত ভিজেও মিনু এবার আর

অসুখে পড়ে না। বাবার ডাক্তারবন্ধু হেসে বলেন, "তুমি ভাল হয়ে গেছ মা। অসুখটা ত তোমার আসলে—। এবার তুমি যা ইচ্ছে তাই খেতে পার, যেখানে খুশী যেতে পার। এখন থেকে তুমি পুরোপুরি স্বাধীন।"

স্বাধীন? কতটুকু স্বাধীনতা আছে মিনুর? শুধু মিনুর কেন? যে কোন জনের? ডাক্তার তাঁর বাধা তুলে নিলেই কি সব বাধা উঠে যায়?

বর্ষার পরে শরৎ গেল, শীত গেল। মহানন্দা আবার শীর্ণা, নিরানন্দা। কিন্তু মিনুকে সেই যে বর্ষা এসে ছুঁয়েছিল কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল, তার যেন আর সরে যাওয়ার মন নেই।

সবাই বলছেন, "তুই সেরে গেছিস মিনু, ভাল হয়ে গেছিস।" বাবা-মার এই কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা নিগূঢ় অর্থ আছে। মিনু টের পায়। টের পেয়ে তার ভাল লাগে না। অত ভাল ত সে হতে চায়নি। এমন সারা ত সে সারতে চায়নি।

তার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে চক্রান্ত চলেছে। পাত্রের খোঁজ চলছে অনবরত। বক্স নম্বর দিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। ছি ছি ছি! চিঠিপত্রও নাকি আসতে শুরু করেছে। এ-চিঠিও চিঠি।

আমগাছগুলিতে বোল ধরেছে। ডালগুলি যেন ভেঙে পড়ে-পড়ে। মিনু দিনরাত জানলা খুলে রাখে। হাওয়ায় মুকুলের গন্ধ আসে। মালদহের বাস করেও পাকা আম মিনু ছোঁয় না। পাকা আমের গন্ধ সে ভালবাসে না। সে শুধু মুকুলের ভক্ত। যতক্ষণ দিনের আলো থাকে, মিনু চেয়ে চেয়ে দেখে গাছগুলির মাথায় মাথায় এই পুষ্পবৃষ্টি। তারপর আলো নিভে গেলে অন্ধকারে সেই সৌরভ যেন আরও ঘন হয়, ঘনিষ্ঠ হয়ে কাছে আসে। যেন বেশবাসের সঙ্গে মিলে থাকতে চায়।

গন্ধের পরে সুর। কিন্তু সে-সুরেও গন্ধেরই কথা।

উৎপলদার নতুন রেকর্ড বেরিয়েছে,—

'মন যে বলে চিনি চিনি
যে গন্ধ বয় এই সমীরে।'

চিনি চিনি, কিন্তু সত্যিই চিনি কি?

তারপর যা ঘটবার তাই ঘটেছে। ফলে গিয়েছে ঘটকালির ফল।

বাবা মিনুকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। মাও আছেন, বীথিও আছে। কিন্তু মিনুকে রেখে সবাই বেরিয়ে গেল। বাবা তাঁর চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে তার দিকে চেয়ে বললেন, "জলপাইগুড়ির ওই সম্বন্ধটাই ঠিক করলাম মিনু।"

সে জানে এই কথা শোনাবার জন্যেই তাকে ডাকা হয়েছে। মিনু মুখ নিচু করে বসল, "আমাকে এ-সব কথা কেন বলা! আমি ত আগেই বলে দিয়েছি, বিয়ে আমি করব না।"

বাবা বললেন, "সে কথা শুনেছি। কিন্তু তোমার 'না' বলার কোন মানে নেই।"

মিনু মুখ তুলে বলল, "কেন?"

বাবা বললেন, "ছেলে হক মেয়ে হক যারা কোন জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা নিয়ে থাকে কি দেশের কাজে যারা নিজেদের উৎসর্গ করে রাখে, তাদের বিয়ে না করার মানে বুঝতে পারি। কিন্তু তোমাদের মত মেয়ের পক্ষে বিয়ে না করার কোন অর্থ নেই।

মিনু আবার মুখ নামাল।

বাবা বললেন, "এতদিন তোমার অসুখ-বিসুখ ছিল, কিছু বলি নি; কিন্তু এখন ত তোমার সে-সব নেই—।"

মিনু বলল, "কী করে জানলে যে নেই। বাবা, তুমি নামজাদা ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু তুমি ত ডাক্তার নও।"

বাবা বললেন, "মিনু, বাপকে কখনও উকিল হতে হয়, কখনও ডাক্তার হতে হয়, কখনও গুরু হয়ে ঠিক পথ দেখিয়ে দিতে হয়। তার দায়িত্ব অনেক।"

মিনু বুঝতে পারল প্রতিবাদ নিষ্ফল। সে মনে মনে বলল, "জানি জানি, বাপকে সবই হতে হয়। শুধু কবি হতে নেই, শিল্পী হতে নেই, প্রেমিক হতে নেই।"

নহবত এখনও আসেনি, কিন্তু সারা বাড়িতে বিয়ের বাজনা বাজছে। মিনুকেও আগে থেকেই বিয়ের সাজ না সাজলে চলবে না।

গৌহাটি কলেজে বড়দা প্রফেসর। সেখানে টেলিগ্রাম গিয়েছে। তিনি যেন অবিলম্বে সস্ত্রীক চলে আসেন। ছোড়দাও ছুটি নিয়েছে অফিস থেকে। কাছে আছে বলে চাপটা তার উপরেই বেশী। নিমন্ত্রণের চিঠি ছাপানো হয়েছে। কিন্তু ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধুদের ত শুধু ছাপানো চিঠি দিলে চলে না। তাই চিঠি লেখা চলছে। বাবা লিখছেন, মা লিখছেন, দিদিরা লিখছে। আজ সবারই চিঠি লেখার পালা।

কিন্তু এত কাজ এত ব্যস্ততার মধ্যেও মা আসল কথাটা তোলেননি। মিনুকে

একান্তে ডেকে নিয়ে তার পিঠে একটু হাত বুলিয়ে দিয়েছেন, তারপর কপালের উপর থেকে দু-এক গাছি চুল সরিয়ে দিতে দিতে বলেছেন, "সেই চিঠিগুলির কী করলি ?"

মিনু এক মুহূর্তে চুপ করে থেকে বলেছে, "কী আবার করব ?"

মা বলেছেন, "নষ্ট করে ফেল। লক্ষ্মী মেয়ে। ওগুলি দিয়ে ত আর কোন দরকার নেই। কিছু নেই যদিও তবু পড়ে যদি কেউ কিছু ভাবে।"

মিনু কোন কথা বলেনি।

মা বলেছেন, "কিসে কী হবে। শেষে অশান্তির শেষ থাকবে না।"

মিনু মাকে আশ্বাস দিয়েছে, "ভেব না। যা করবার আমি ঠিকই করব।"

বীথিরও চিন্তা ওই চিঠিগুলি নিয়ে। কেউ ত হিতৈষিণী কম নয়। দু-দুবার জিজ্ঞাসা করেছে বীথি, "চিঠিগুলির কী করলি ?"

মিনু বলেছে, "এখনও কিছুই করিনি।" বীথি বলেছে, "করে ফেল্। যা করবার এখনই ডিসাইড করে ফেল্। নষ্ট করতে যদি না চাস যার চিঠি তাকে ফিরিয়েও দিতে পারিস।"

বীথি পরামর্শ দিয়েছে।

মিনু বলেছে, "ছিঃ।"

বীথি বলেছে, "ছিঃ কেন? শুনেছি অনেকেই ত এমন করে।"

মিনু বলেছে, "তুমি ভেব না, যা করবার আমি ঠিকই করব।"

ফেরত দেওয়ার কথায় মন সরেনি মিনুর। সে নিজের কোন লেখা ফেরত চায় না। এ যেন কাগজের অফিসে গোপনে পাঠানো নিজের কবিতা ফেরত পাওয়া। এ-পাওয়ার মত বড় হারানো আর নেই। সে যেমন নিজের লেখা ফেরত চায় না, নিজের চিঠি ফেরত চায় না তেমনি অন্যের চিঠি ফেরত দিলে তার যে কী অপমান তাও সে বোঝে। চিঠি লেখা আর-একজনের চিঠির জন্যে, নিজের চিঠি ফেরত পাওয়ার জন্যে ত নয়। পালা যখন শেষ হয়ে যায় চুপ করে থাকতে হয়; গান যখন শেষ হয়ে যায় চুপ করে থাকতে হয়। যে গান আর যে শোনে তাদের কারও বলবার দরকার হয় না, 'শেষ হল'। যতিচিহ্নের জন্যে একটি একটি দীর্ঘশ্বাসই যথেষ্ট।

দেরাজ থেকে চিঠির তাড়াগুলি একে একে বাইরে নামাল মিনু। সন তারিখ মিলিয়ে ইতিহাসের মত সাজানো। একটি সম্পর্কের ইতিহাস। রাজা নেই রানী নেই, ছোটখাট মান-অভিমান ছাড়া যুদ্ধ নেই, বিগ্রহ নেই, তবু এক টুকরো ইতিহাস আছে। মিনু একবার ভেবেছিল চিঠিগুলিকে নতুনভাবে সাজাবে। সন-তারিখের ফিতেয় না বেঁধে নতুন ধরনে বাঁধবে। যে চিঠিগুলি তাড়াতাড়িতে লেখা নয়, কাজের চাপে যে-সব চিঠি কুঁকড়ে ছোট হয়ে পড়েনি কিংবা কথার চাপে যে চিঠিগুলিতে রসের স্বল্পতা ঘটেনি, যে চিঠিগুলি কয়েকটি মধুর মুহূর্তকে সত্যিই বুকে করে ধরে রেখেছে, মিনু বেছে বেছে সেই চিঠিগুলিকে আলাদা করে রেখে দেবে। তার স্বাদ যে আলাদা। শুধু চিঠি কেন, প্রিয়জনের সব কথা, কাজ আর আচরণের ভিতর থেকে প্রিয়তমকে বেছে নেওয়ারও এই রীতি। তার প্রকাশ তার শ্রেষ্ঠ দানে, তার প্রকাশ তার শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলিতে, তার প্রকাশ তার শ্রেষ্ঠ গানে।

আজ সব ছাই করে দেওয়ার দিন এসেছে।

হ্যাঁ, এগুলি পুড়িয়ে ফেলাই ভাল। তাতে নিজে খাক হয়ে যাবে মিনু, তবুও। সত্যিই ত চিঠিগুলি কী হবে রেখে! এগুলির মধ্যে কটি কথা খাঁটি, কটি শব্দ অন্তরের স্পর্শ পেয়েছে তার ঠিক কি! আন্তরিকতাই যদি থাকবে তা হলে অন্তত আর একবার তিনি এসে দেখা করতে পারতেন। কিন্তু নিজে থেকে আসা দূরের কথা এখানকার সংস্কৃতি-পরিষৎ অনেক সাধাসাধি করেও তাঁকে আনতে পারেনি। প্রতিবারেই অন্য কোন কাজ তাঁকে আটকে রেখেছে, অন্য প্রোগ্রামের সঙ্গে সংঘাত বেধেছে। কেন আসেননি, মিনু জানে। পাছে তাকে দেখে আরও খারাপ লাগে। পাছে চিঠির ছলনা চোখের দৃষ্টির কাছে ধরা পড়ে যায়। মিনু সব জানে, সব বুঝতে পারে।

সেইজন্যেই কলকাতায় মিনুর কয়েকবার যাওয়া সত্ত্বেও একবারও দেখা হয়নি। তিনি কোথাও-না-কোথাও প্রোগ্রাম করতে বেরিয়েছেন। কি অন্য কোন আকস্মিকতা তাঁর সহায় হয়েছে।

চিঠিগুলির যে অর্থ মিনু করেছে হয়ত সবই তার নিজের মনের বানানো। তিনি বানিয়েছেন একরকম করে, মিনু বানিয়েছে আর একরকমে। মুখের কথার মাটির মূর্তিতে সে মনের কথার রঙ লাগিয়েছে। আজ সেই মিথ্যার মূর্তির বিসর্জনের সময় এসেছে। সে নিরঞ্জন জলেই হক আর আগুনেই হক—একই কথা।

দেরাজ থেকে চিঠিগুলি টেনে বার করে মিনু মেঝের উপর স্তূপাকার করল। দেশলাইটায় আট-দশটা কাঠি আছে। পাঁচটি বছরের পক্ষে একটি কাঠিই যথেষ্ট। মিনু জ্বালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু কাঠিগুলিতে কি বারুদ নেই! একটাও যেন জ্বলতে চায় না। বিরক্ত হয়ে মিনু কয়েকটা কাঠি ছুঁড়ে ফেলে দিল। শেষ পর্যন্ত একটি জ্বলল। কিন্তু জ্বলন্ত কাঠিটা একবার এদিকে সরে আর একবার ওদিকে সরে। যেন চিঠিগুলিকে তা পোড়াতে আসেনি, আরতি করতে এসেছে।

"কী করছিস তুই।"

বীথির চাপাগলায় মিনুর চমক ভাঙল। ফিরে তাকাল মিনু। বীথি কী করে এল? তবে কি দরজায় খিল দিতেও মিনু ভুলে গিয়েছিল! বীথি বলল, "ঘণ্টা দুই হয়ে গেল যে! এতক্ষণ লাগে! যা করবার তাড়াতাড়ি কর্। ওঁরা যে এসে পড়ছেন।"

আধপোড়া নিবন্ত কাঠিটা দুটি আঙুলের ফাঁক থেকে আপনিই ঝরে পড়ল।

ক্লান্ত আর্ত অস্ফুট স্বরে মিনু বলল, "দিদি, আগুনে দিতে পারলাম না ভাই, জলেই দিতে হবে।"

বীথি মিনুর দু চোখের দিকে তাকাল। তাকিয়ে তাকিয়ে বুঝল, সে জল মহানন্দার নয়।

দু পা এগিয়ে এসে বীথি ছোট বোনকে আরও কাছে টেনে নিল, বলল, "আমার হাতে তুই সব ছেড়ে দে মিনু, তোর কোন ভয় নেই।"

মিনু মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, "বীথিদি, এর পরও দু-একখানা চিঠি হয়ত আবার আসবে। সেগুলি রিডাইরেক্ট করবার দরকার নেই। সেগুলি আমি আর খুলতে আসব না। তোরাও যেন কেউ না খুলিস।"

বীথি বলল, "কেউ খুলবে না বোন, তোর কোন ভয় নেই।"

বিংশ শতকের ভাবনা

শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল
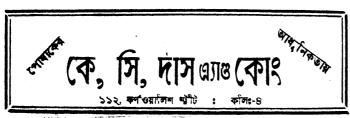
কোন শতাব্দীরই প্রারম্ভ সেই শতাব্দীর বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হয়ে সূচিত হয় না, তার প্রথম পাদের অনেকাংশ পূর্ব শতাব্দীর জের টেনেই চলে। পর শতাব্দীর এলাকায় পূর্ব শতাব্দীর এই যে অনুপ্রবেশ, এর পরিণাম ভোগও যে তাকে না করতে হয় তা নয়। যে রূপ নিয়ে সে ঢোকে সেরূপ তার অক্ষুণ্ন থাকে না, ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অবশেষে তার অবলুপ্তি ঘটে। নদী সমুদ্রের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যেমন করে সমুদ্রের মধ্যেই তার রূপ বিলীন করে দেয় তেমনই।

বিংশ শতাব্দীতেও তেমনই ভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। আত্মতৃপ্ত স্বচ্ছন্দ জীবন, স্বপরিমণ্ডলে নিরুদ্বেগ প্রসন্নতা, ন্যায়-নীতি-ধর্মবোধে অপ্রশ্ন নিশ্চিন্ততা, জীবন ও প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্যে মুগ্ধতা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ এই রূপ নিয়েই বিংশ শতাব্দীতে পদক্ষেপ করেছিল, প্রথম প্রথম রূপ-বদল তার যা হচ্ছিল, তা ছিল এত নিঃশব্দ-সঞ্চারী যে, অনুভবের নিকষে সে যাদের পরিচিতি যেন উহ্যই থেকে যাচ্ছিল। তার চেহারার হঠাৎ একটা রূপান্তর ঘটল প্রথম মহাযুদ্ধের ঝাঁকুনি খেয়ে, চোখ চেয়ে দেখা গেল, চেনা রূপটার রাতারাতি যেন আদল বদলেছে, কিংবা পুরনো খোলসটা বদলে নূতন রকমের একটা খোলসে সে গা ঢেকে নিয়েছে। সে-খোলসের ফাঁক-ফোকর দিয়ে আগেকার চেহারাটা মাঝেসাঝে উঁকি-ঝুঁকি না মারে তা নয়, কিন্তু তাতে তার নূতন রূপসম্ভাবনা বিপর্যস্ত হয় না। এখানে বলে নেওয়া ভাল যে, শতাব্দীর অনুপ্রবেশ বলে আমি শতাব্দীর ধ্যান-ধারণার অনুপ্রবেশই বুঝতে চেয়েছি।

প্রথম মহাযুদ্ধের ঝাঁকুনির যে কথা বলেছি, তাতে প্রথম যা হল, তা হল পুরনো যা-কিছু—ন্যায়, নীতি, বিশ্বাস, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যবস্থা, মানবিক ও পারিবারিক সম্পর্ক সব কিছুর উপর সংশয়, সংশয় কেন বিদ্বেষ এবং অবিশ্বাস। এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই, জোয়ার যখন প্রথম আসে তখন সামনে যা কিছু পড়ে তাকে সে ভাসিয়ে নিতে চায়ই। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও নূতন ভাবের প্লাবন যখন এসেছিল, তখন তাও এই ভাবেই এসেছিল।

সব শতাব্দীরই ভাবধারা আলোচনা করতে বসে একটা কথা সব সময় মনে রাখা প্রয়োজন: সমাজ-জীবনে ভাবের বুনানি এতই জটিল ও ঠাসা যে, তা থেকে কোন একটা ভাবকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা এবং বলা যে এইটাই এ-শতাব্দীর ভাবধারা, সব সময় নিরাপদ ত নয়ই; সম্ভবত ঠিকও নয়। কারণ পূর্বের এক শতাব্দীর মাত্র নয়, অনেক অনেক শতাব্দীর ভাবনার মিশাল—জ্ঞাত-বা-অজ্ঞাতসারে—নব কালের ভাবধারার সঙ্গে থেকে যায়। যেমন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নাস্তিক্য দর্শনের অনেক ভাবনার সঙ্গে এ-যুগের চিন্তার অনেক সামঞ্জস্য দেখে বিস্মিত হতে হবে। যৌন জীবনের যে অকুণ্ঠিত রহস্য-উদ্ঘাটনের প্রয়াস এ-যুগের চিন্তাধারায় দেখা যায়, ভারতীয় পৌরাণিক বা ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যেও তা অপ্রতুল নয়। তবে যে-কালে যে-ভাবের রঙ অন্য সব রঙের চেয়ে উজ্জ্বলতর হয়ে ফুটে ওঠে, যেগুলো নূতন বলেই হক, কিংবা নব-আবির্ভাবের সচেতনতার জন্য হক বিশেষ করে চোখে পড়ে, সেগুলোকেই আমরা নূতন কালের ভাব-ধারা বলে চিহ্নিত করতে চাই। কাজেই কোন যুগের এই সব ভাবনা নিয়ে আলোচনা করার অর্থ অন্য ভাবনাগুলোর অস্বীকৃতি নয়, নূতন ভাবনাগুলোর স্বীকৃতি মাত্র।

যা হক, এই সংশয় ও অবিশ্বাসকে বাহন করে যে ভাবনাপ্রবাহ সমাজ-জীবনে প্রবেশ করল, তার প্রথম কাজ হল পুরনো আস্থার দুর্গদ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত হানা। বাগ্বিদ্রূপের আশ্রয় নিয়ে, উল্টো আদর্শ প্রচার করে, এমন কি অহেতুক এমন সব বস্তুর আমদানি করে যাতে পুরনো মনের সংরক্ষণশীলতা আহত হয়, নূতন ভাববাহিনী মানুষের চিন্তার আকাশে বেশ একটা কোলাহলের সৃষ্টি করেছিল। এতে যে আতিশয্য ছিল, এবং বেয়াড়া রকমেরই ছিল, তা অস্বীকার করা চলে না; কিন্তু আগেই বলেছি, এ-বাড়াবাড়ি কিছু এ-যুগেরই বৈশিষ্ট্য নয়, আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন নূতন ভাবনার জোয়ার এসেছিল তখন তাও এমনই ভাবেই এসেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নব্যবঙ্গের পানাসক্তি, গোমাংস-ভক্ষণ, অনাচারপ্রবণতা ইত্যাদিকেও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। আর সত্যই ত, পুরনোকে যদি কোণঠাসা বা স্থানচ্যুত করা না যায়, তা হলে নূতনের ঠাঁই-ই বা কী করে হবে! তাই যখনই নূতন চিন্তাধারা আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে তখনই প্রথম দিকটায় চলে একটা ভাঙনের পালা।

কিন্তু নবাগতের তাণ্ডব দেখে ভাঙনটাই সব, এ মনে করলে এর প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হবে। নূতন চিন্তা পুরাতনকে একদিকে যেমন কোণঠাসা করতে উদ্যোগী হল, সঙ্গে সঙ্গে জগৎ ও জীবনকে নূতন করে দেখবার প্রয়াসও তাঁদের মধ্যে জাগ্রত হয়ে উঠল। এ কাজে তাদের সহায় হল বিংশ শতাব্দীর নব্য বিজ্ঞান আর সরবে প্রচারিত মার্ক্সীয় দর্শন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান বিশ্বের মধ্যে একটা অবিচল নিয়মতন্ত্রের আবিষ্কার করে বিশ্বকে এক নিয়মনিষ্ঠ যন্ত্রীর ইঙ্গিতে পরিচালিত সুনিয়মিত যন্ত্র বলে মনে করেছিল, তাকেই 'সনাতন সার্বভৌমিক সত্য' ধরে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। কিন্তু এই সুনিশ্চিত বিশ্বাসের মূলে সবলে নাড়া দিল রাদারফোর্ড, ম্যাক্স প্ল্যাংক, নীলস বোর, আইনস্টাইন প্রমুখ নব্য-বিজ্ঞানীরা। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পুরাতন বিশ্বাসের ভিত্তি-ভূমিতে যেমন চিড় ধরালেন পূর্বোক্ত মনীষীরা ও আরও অনেক বিজ্ঞান-তাপস, মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমনই বিপর্যয়কর কাণ্ড ঘটালেন জর্মান মনীষী ফ্রয়েড আর রুশীয় বিজ্ঞানী প্যাভলভ। এর সঙ্গে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক দর্শনে নূতন তত্ত্বের আশ্বাস নিয়ে এই নূতন পথসন্ধানীদের সম্মুখে এসে দাঁড়াল মার্ক্সবাদ। সদ্যঃসংঘটিত রুশীয় বিপ্লবের সাফল্যে মার্ক্সবাদে নূতন মহিমা সংযোজিত হল।

নূতন যুগের বিহঙ্গমেরা নূতন জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রখর আলোতে নিজেরা ত চমকিত, পুলকিত ও বিভ্রান্ত হলেনই,

প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের
নূতন বই প্রকাশিত হয়

আমাদের পুরস্কারপ্রাপ্ত বই

আকাদমী পুরস্কার
প্রেমেন্দ্র মিত্রের
সাগর থেকে ফেরা ৩, (কাব্য-গ্রন্থ)
মনোগাঢ় কাব্যে জীবনের গভীরতম উপলব্ধি ও উল্লাস। ভারতরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত, আকাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত।

রবীন্দ্র পুরস্কার
প্রেমেন্দ্র মিত্রের
সা গ র থে কে ফে রা ৩,
বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে রাজ্য সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত

লীলা পুরস্কার
লীলা মজুমদারের
হলদে পাখীর পালক (ছোটদের উপন্যাস) ২,
মহিলা লেখিকার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৫৮)

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার
প্রেমেন্দ্র মিত্রের
ঘ না দা র গ ল্প ৩,
শিশুসাহিত্যে ভারতরাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত

শরৎ-স্মৃতি পুরস্কার
প্রেমেন্দ্র মিত্রের
স্বনির্বাচিত গল্প ৪,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎ-স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৫৫)

শরৎ-স্মৃতি পুরস্কার
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
কাঞ্চন-মূল্য (উপন্যাস) ৪,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎ-স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৫৭)

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭
গ্রাম : কালচার ফোন : ৩৪—২৬৪১

স্থানাস্থানাভেদে এই তীব্র আলোক-সম্পাত করে সকলকেও চকিত, বিস্মিত ও বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করলেন। ক্ষুধার্ত যেমন সম্মুখে মনোহর লুব্ধক খাদ্যসম্ভার দেখলে গোগ্রাসে উদরস্থ করে, কিন্তু হজম করার শক্তির অভাবে অচিরেই অজীর্ণের উদ্‌গার তুলতে থাকে, এঁরাও তেমনই জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত রহস্য হৃদ্‌গত হওয়ার আগেই আচার্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। ফলে আবর্জনা সৃষ্টি হল প্রচুর পরিমাণে, সঙ্গে কিছু খাঁটি বস্তুও যে না পাওয়া গেল তা নয়।

এঁরা কেউ বা প্রত্যক্ষভাবে আর কেউ বা অপ্রত্যক্ষ হলেও নিশ্চিতভাবে এক প্রলয়ংকর যুদ্ধের যে ভয়াবহ পরিণাম দেখতে পেলেন, তাতে দেখলেন ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে প্রাপ্ত নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ স্বস্তিময় জীবনের ভিত এক রূঢ় আঘাতে ধ্বসে গিয়েছে, মানুষের বহু যত্নে পোষিত ও বহু আয়াসে গঠিত আদর্শের প্রতিমাগুলি 'a heap of broken images' অর্থাৎ ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে; অনিশ্চয়তা জীবনের সর্বক্ষেত্র আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাঁরা অনুভব করলেন, অস্থায়িত্বের যে ঝড় উঠেছে তাতে ব্যক্তি, সমাজ আর অর্থনীতিক, রাষ্ট্রিক জীবন ত বটেই, বহু যুগের সাধনায় গঠিত সভ্যতার সমগ্র ইমারতটাই বুঝি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

Falling towers,
Jerusalem, Athens, Alexandria,
Vienna, London,
Unreal.

সব ভেঙে চুরে একাকার হয়ে যাবে, ভিয়েনা আর লণ্ডন প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রভূমিগুলিরই পথানুসরণ করবে। একদিকে এই অনিশ্চয়তা আর-একদিকে নব্য-বিজ্ঞানের রহস্যময় অস্পষ্টতা এ কালের চিন্তার মধ্যে এক অদ্ভুত নৈরাশ্যের উদ্ভব ঘটাল। যুদ্ধোত্তর কালের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ও এই নৈরাশ্য সৃষ্টিতে কম ইন্ধন যোগায়নি। নৈরাশ্যবিমূঢ় চিত্তেরই এ প্রশ্ন স্বতঃ-উৎসারিত—

Was it for this the clay grew tall?

এই নৈরাশ্যের প্রতিক্রিয়া সামাজিক মানসে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল, তাকে মুখ্যত দু ভাগে ভাগ করা চলে—এক ভোগবাদ, আর উপেক্ষাবাদ বা বলা যেতে পারে নব্য-বৈরাগ্যবাদ। আপাত-দৃষ্টিতে এদের পরস্পরবিরোধী মনে হলেও এরা একটি বোঁটায়ই ধৃত দুটি ফল। পৃথিবীতে জীবন, মানুষের সাধনা, শিল্প, সাহিত্য সবই যখন অনিশ্চিত, মানুষেরই এক বিকৃত মনোবৃত্তির খেয়ালের উপর নির্ভরশীল, তখন ধৈর্য, সংযম, শান্তি, নিষ্ঠা সবই অর্থশূন্য ছেঁদো কথা। অতএব লুটে নাও 'দু দিন বই ত নয়'। ঠিক একই ঢালের আর-এক পিঠে দেখা গেল মুদ্রিত রয়েছে নব্য-বৈরাগ্যবাদের মন্ত্রগুলি—

Is then nothing safe?
Can we not find
Some everlasting life
In our one mind?

এই নব্য ভোগবাদ ও নৈরাশ্যবাদের আসরে ধর্ম, ভগবান, সাধনা, পূজা, উপাসনা এদের আসন বড় একটা মিলল না, (টী টি এস এলিয়টের চার্চ-প্রীতির কথা মনে রেখেই বলছি), যদিও বা মাঝে মাঝে এদের আসরে ডেকে আনা হল, তা শুধু এদের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, হাস্য পরিহাস বা করুণার নির্মম বাণে বিদ্ধ করার জন্যে।

এই ভাব-বিপ্লবের ঢেউ আমাদের দেশেও এসে না লেগেছিল তা নয়, যদিও স্বীকার করতেই হবে যে প্রথম মহাযুদ্ধ আমাদের দেশে এমন কিছু বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেনি, যাতে ইউরোপীয় মনোভাবের অনুরূপ মনোভাব আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা অনেক দিন ধরেই পাশ্চাত্ত্যের অনুগামিত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেছি, আর বস্তুর চেয়ে চিন্তা দ্রুতগামী বলে বাস্তব প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ার আগেই ভাবপ্লাবনের কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করে বসেছিলাম। তাই এ-সময়কার এবং তার পরবর্তী কালেরও বাংলার চিন্তাধারা অনুসরণ করলে তার পরিচয় প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যাবে।

ইউরোপীয় মানসিক রাজ্যে যখন ভাবদ্বন্দ্ব চলছে, তখন সেখানকার ভাবুক সমাজের অনেকেই রুশিয়ার আচরণ ও ভাবাদর্শের মধ্যে তাঁদের আশ্রয় ও অবলম্বন খুঁজে পেলেন। ১৯১৭ সনের রুশীয় বিপ্লবের পরে রুশীয় সমাজে ইউরোপীয় রাষ্ট্রিক সামাজিক বিপর্যয়ের লক্ষণগুলিও যেমন পরিস্ফুট হয়ে দেখা দিল তাদের সমাধান-ও-গঠন-প্রয়াসও তেমনই মানুষকে নূতন ভাবে ভাবিত করে তোলার উপাদান-উপকরণ যোগাতে সাহায্য করল। এ-কথা না বললে সত্যের অপলাপই করা হবে যে, নূতন যুগের এই চিন্তা-বিপ্লবের ক্ষেত্রে রুশীয় চিন্তা ও আচরণ সব দেশেই প্রচুর পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সমস্ত যুগেরই চিন্তার অভিব্যক্তির ধারা অনুসরণ করলে একটা জিনিস সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে যে,

ভাবপ্লাবনের প্রথমাবস্থায় তরঙ্গের যে উদ্দামতা থাকে ধীরে ধীরে তা স্থিতির দিকে অগ্রসর হয়ে চলে, এবং উদ্দামতা শান্ত হয়ে এলে সে বুঝতে পারে, নূতনত্বের অধীরতায় সে পুরাতনের সব কিছু যেমন নির্বিচারে উপেক্ষণীয় বা বিনাশযোগ্য মনে করেছিল, বস্তুত তার সব তেমন অকেজো নয়, তার অনেকগুলিই তার জীবনের পোষণ লালন ও প্রসাধনের জন্য অপরিহার্য। তখন সে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের একটা ভাবসমন্বয় সাধনের জন্য প্রয়াসী হয়। তাই ঐ কালের ভাবগুরু রুশিয়ার চিন্তানায়ক মহাবিপ্লবী লেনিনের শেষ জীবনের এ-উক্তি করুণত্বে অভিনব হলেও সমস্ত যুগের চিন্তার অভিব্যক্তির ধারারই অনুসারী। যে লেখাটি থেকে নিম্নে উদ্ধৃতি দিচ্ছি মহামতি লেনিনের সেটিই শেষ লেখা। এতে আক্ষেপ করেই তিনি বলেছেন—

"....our experience of the first five years has fairly crammed our heads with disbelief and scepticism. These qualities assert themselves involuntarily when, for example, we hear people dilating at too great length and too flippantly on "proletarian" culture. We would be satisfied with real bourgeois culture for a start, and we would be glad, for a start, to be able to dispense with the cruder types of pre-bourgeois culture, i.e. bureaucratic or serf culture, etc. In matters of culture, haste and sweeping measures are the worst possible things. Many of our young writers and Communists should get this well into their heads."

লেনিন তার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেই যা বুঝেছিলেন, রুশিয়ারই তা বুঝতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। আর শিক্ষা-বিদ্যা গরীয়সী বলে অন্যান্য দেশ এ জিনিসটা বুঝতে আরও খানিকটা সময় নিল, যদিও কেউ বা প্রথম উদ্দীপনার অন্তে, কেউ বা নূতন ভাবধারার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মোহভঙ্গের ফলে, বিলম্বে হলেও এই স্থিতিতে এসেই পৌঁছল।

যখন এই স্থিতির পালাটা অভিনীত হয়ে চলেছে সেই সময়ই এসে গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

যদিও ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইদানীং কাল পর্যন্ত আমরা ইউরোপীয় চিন্তার অনুগামিত্বই করে এসেছি, তবু প্রথম মহাযুদ্ধের কাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল পর্যন্ত আমাদের দেশে যে চিন্তার বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে বা যে পরিবেশ সেই চিন্তা-বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুরণে সহায়তা করেছে, একটু থেমে তার অতি সংক্ষিপ্ত একটা পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত বলে মনে করি।

প্রথম মহাযুদ্ধ ক্ষান্ত হওয়ার প্রায় অব্যবহিত পরেই মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষে এক অভিনব সংগ্রামের সূচনা করলেন। এ-সংগ্রাম শুধু ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তির সংগ্রাম নয়, প্রচলিত চিন্তাধারা, জীবনদর্শনের বিরুদ্ধেও এক স্পর্ধিত জেহাদ। যে অহিংসা ব্যক্তিগত জীবনের সাধন হিসেবে এতদিন গণ্য হয়ে আসছিল, গান্ধীজী তাকে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক প্রয়োগের পদ্ধতিতে দেশকে দীক্ষা দানের আহ্বান জানালেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও হিংস্র সংগ্রামের পরিবর্ত হিসাবে অহিংসাকে অস্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করে যুদ্ধকে পাশবিক স্তর থেকে মানবিক স্তরে উন্নীত করার দাবী তিনি পেশ করলেন। শুধু তাই নয়, তিনি এ-কথাই মানুষকে বিশেষ করে বোঝাতে চাইলেন যে, মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে পথটিও পরিশুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন। অসত্য-পঙ্কিল পথের ক্লেদ লক্ষ্যকেও ক্লেদাক্ত করে তোলে, আর সেই লক্ষ্যের ক্লেদ নূতন পথকে পঙ্কিলতায় আবিল করে ফেলে। ফলে যে পাপচক্রের সৃষ্টি হয়, তার থেকে মুক্তি পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। গান্ধীজী সূচনাতেই শুদ্ধ পথের পথিক হওয়ার নির্দেশ দিয়ে সেই অশুভ চক্র-সৃষ্টির সম্ভাবনাকেই বিদূরিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর জীবন, কর্ম ও চিন্তার আর একটি প্রভাব যা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল তা হল, সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের মহিমাস্বীকার। নিজেকে দেশের জনজীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে তিনি যেমন জনজীবনকে মহিমান্বিত করেছিলেন, তেমনই যাঁরা জনজীবনের সঙ্গে ব্যবধান রচনা করে নিজেদের বৈশিষ্ট্যের দর্পে মত্ত ছিলেন, তাঁদের একটু থমকে নিজেদের জীবনধারার ঔচিত্য সম্বন্ধে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। প্রসঙ্গত এখানে বলে রাখা ভাল যে, গান্ধীজী নিজে এ নূতন পথের পথিক হয়েছিলেন, জীবনে ও আন্দোলনে এর প্রয়োগ শুরু করেছিলেন, অনেক আগে থেকেই অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। ভারতের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ও প্রসার ব্যাপকতর আবেদন সৃষ্টি করেছিল মাত্র।

যা হক, এ কথা স্বীকার না করলে অসত্য বলা হবে যে, গান্ধীজীর উপদিষ্ট পথ প্রত্যক্ষত অন্য দেশের ত নয়ই, এ-দেশেরও খুব বেশী মানুষের গ্রহণীয় হয়নি। মতবাদ হিসাবে এর বিরুদ্ধতা করেছেন এমন শক্তিমান লোকের সংখ্যাও কম নয়। তবু এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে, দৃশ্যত না হলেও তাঁর এই অভিনব ভাবনার নিঃশব্দ-সঞ্চারী প্রভাব মানুষের চিরাগত প্রত্যয়ের মূলে বেশ একটা নাড়া দিল এবং শুধু ভারতবর্ষের নয়, পৃথিবীর মানুষ এর নিরিখে তাদের কর্ম না হলেও ভাবনাকে বাজিয়ে নিতে চাইল। গান্ধীজীর প্রভাব-পরিব্যাপ্ত মণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে তার মধ্যেই যাঁরা পরিবর্ধিত হয়েছেন, তাঁদের পক্ষে গান্ধী-যুগের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের জীবন ও ভাবনার রূপান্তর অনুধাবন করা সহজসাধ্য হবে না বটে, কিন্তু এই দু-কালের অভিজ্ঞতা-লব্ধ মানুষের কাছে এর পার্থক্য সহজেই ধরা পড়বে বলে মনে হয়। আজকের জগতে কম্যুনিজমের অভিপ্রেত লক্ষ্যকে স্বীকৃতি দিয়েও তার আয়ত্তিতে অবলম্বিত হিংস্র পন্থার প্রতি পৃথিবীর চিন্তাশীল মহলে যে বিরূপতা, অন্তত তার সার্থকতা সম্বন্ধে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে, প্রসন্ন প্রশান্ত জীবনবোধের প্রতি যে আকর্ষণ চিন্তাশীল মনে দেখা যাচ্ছে, জীবনসত্তার

ভারতের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান
ন্যাশনাল হোমিও লেবরেটরী
১১০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪
অভিজ্ঞ কেমিষ্টের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত করা হয়।
বহু সরকারী এবং বেসরকারী চিকিৎসালয়ে আমাদের ঔষধাদি সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে।
মূল্য তালিকার জন্য লিখুন।
ব্যবসায়ীগণকে বড় অর্ডারের উপর উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়

নব-মূল্যায়নের যে অভীপ্সা মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয়ে উঠেছে, এমন কি রুশিয়ার সাম্প্রতিক চিন্তায় নৈতিক আদর্শের যে স্বীকৃতি অভিব্যক্ত হচ্ছে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বনিয়াদ গঠনের যে নব-প্রচেষ্টা এখন চলছে, পৃথিবীর জনমনে শান্তির জন্য যে অত্যাগ্রহ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, প্রতিবাদের সম্ভাবনা আছে জানা সত্ত্বেও এর পিছনে গান্ধীজীর আদর্শের নিঃশব্দ প্রভাব ক্রিয়াশীল বলে আমি মনে করি। এ কালে পৃথিবীর ভাবনা-ক্ষেত্রে এ-ই ভারতের দান, এ দানে শুধু ভারতের নয়—পৃথিবীর চিন্তাধারাও প্রভাবিত হয়েছে, বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার্য যে, প্রথম মহাযুদ্ধ মানুষের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, আর তার ভাবাভিব্যক্তি যে ভাবে ঘটেছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ঠিক সে ভাবে হয়নি। মোটামুটি বিশ বছর কালের মধ্যেই দুটো মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে প্রথম মহাযুদ্ধের আঘাত মানুষের মনে যে বিভ্রান্তি, যে অনিশ্চয়তা ও যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তাদের মানসিক বিপর্যয় ঠিক সে-ভাবে ঘটায়নি। মানুষ যুদ্ধ জিনিসটাকে অনেকটা আত্মস্থ হয়ে গ্রহণ করতে পেরেছিল। এ-যুদ্ধে পার্থিব বিপত্তি যদিও ঘটেছিল অনেক বেশী তবুও মানুষের মনোমূল সে-পরিমাণে স্থিতিচ্যুত হয়নি। ফলত এ-কালে যে চিন্তার অভিব্যক্তি ঘটেছিল, এবং যে চিন্তা এখনও প্রবহমাণ ও পরিপূরণাপেক্ষ তা মানসিক বৈকল্যের লক্ষণে সে ভাবে চিহ্নিত নয়। এই চিন্তাধারারই দু-একটি সূত্র উপলব্ধি করার চেষ্টা এখানে করব।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল এক ভয়াবহ সম্ভাবনার সৃষ্টি করে। সে-সম্ভাবনা হল পৃথিবীর বুক থেকে মানুষের নিঃশেষ বিলুপ্তির। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে মহামারণাস্ত্রের প্রলয়াভাস মাত্র দেখা গেল, সেই মারণাস্ত্রেরই সাধনায় যুদ্ধোত্তরকালে পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্রগুলো মেতে উঠেছে। বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন, সে সব অস্ত্র যদি আর তৈরি নাও হয়, তা হলেও আজ পর্যন্ত যা জমে উঠেছে তাই বহু সহস্র বৎসরের সাধনার ফল সমেত সমস্ত মানুষ জাতির অবসান ঘটানর পক্ষে পর্যাপ্ত। কিন্তু তবু এই প্রলয়-সাধনার নেশা কাটেনি, এ যেন ছিন্নমস্তার স্বশির ছেদন করে নিজেরই শোণিতপানের বিকট উল্লাস। সব দেখে শুনে মনে হয়, একদল ক্ষিপ্ত মানুষের হাতে যেন পৃথিবীর পরিচালনার ভার ন্যস্ত রয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি এই উভয় কালে রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে একটা লক্ষণ উল্লেখনীয়। তা হল এই যে, প্রথম মহাসমর পরিসমাপ্ত হওয়ার পরে কিছুটা কাল অন্তত পূর্ণ শান্তির না হক, ক্লান্তির একটা নিস্তব্ধতা অনুভব করা গিয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে মল্লদের তাল ঠোকার ভাবটা যেন ঘুচলই না, মনের দিক দিয়ে সবাই যেন একেবারে মারমুখো হয়ে আছে।

কিন্তু সাধারণ মানুষ, মানবমারণযজ্ঞের ঋত্বিক-হোতৃ-উদ্গাতৃচক্রের বাইরে যারা, যারা 'টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল', যারা 'বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে,' তারা, আর যাঁরা তাঁদের 'জীবনের মহামন্দ্রধ্বনি'কে কাব্যে, সাহিত্যে, গানে আর দর্শনে বাগ্‌রূপ দেয়, তাঁরাও কি ঐ ভাবেরই ভাবুক, মরণ-যজ্ঞের সমিধই যুগিয়ে চলেছেন? একেবারে কেউ চলেননি, সে-কথা বলা অবশ্য ঠিক হবে না। যাঁরা অহর্নিশ চুল্লি জ্বালিয়ে মরণবস্তু তৈরি করছেন, তার অন্ধিসন্ধি বাতলাচ্ছেন, যাঁরা উন্মাদনার জয়ঢাক পিটাচ্ছেন, তাঁদের ও-দল থেকে বাদ দেই কী করে! কিন্তু সত্যের খাতিরে এ-কথা বলতেই হবে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ অন্তত মনের দিক দিয়ে, ও-ভাবের ভাবুক হতে নারাজ।

তার প্রধান কারণ হল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যে সর্বধ্বংসী বীভৎস রূপ তারা দেখেছে, তাতে তারা যে যুদ্ধ সম্বন্ধে উৎসাহী নয়, তা বহু ভাবে, বহু ভাষায় বিচিত্র মাধ্যমে তারা ব্যক্ত করেছে। এ-কালীন চিন্তায় শান্তির কামনা ভাবনাবিলাস মাত্র নয়, জীবনসত্যেরই অকপট অভিব্যক্তি।

এই সময়ের মধ্যে নব্য-বিজ্ঞানও পরিণতির দিকে অনেক পরিমাণে এগিয়ে গিয়েছে। ফলে তার প্রারম্ভের ধূসরালোকে অনুপলব্ধ জ্ঞানের অর্থাৎ অল্পবিদ্যার যে আন্দোলন অবিজ্ঞানী ভাবুক মহলে শুরু হয়েছিল, তা থিতিয়ে গিয়ে অনেকটা স্থৈর্যের মধ্যে স্থিত হয়েছে। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের শুধু ভয়াবহ রূপটাই নয়, তার শুভংকর রূপটাও অনেকটা প্রকট হয়ে উঠেছে। ফলত রাষ্ট্রিক চক্রান্তে যে মহতী বিনষ্টির সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে, তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে মানুষ মরণের নয়, জীবনের জয়গানেই মুখর হয়ে উঠেছে। প্রলয় আসন্ন হয় যদি তা হক না। মানুষ ভাবনা দিয়ে তাকে মেনে নিতে চাইছে না। নৈরাশ্যকে জীবনে সম্মানিত আসন দিতে সে আর আজ রাজী নয়।

অন্যদিকে কার্ল মার্ক্স ও ফ্রয়েডের মধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের পরকালীন মানুষ যে নব্যবেদের আবিষ্কার করেছিল, যাদের যৌনতা আর আর্থিকতাবাদের অভ্রান্তির পারস্য কাব্য, সাহিত্য আর ভাবুকতার এক স্থূলস্বকেই প্রকট করে তুলছিল, অভিজ্ঞতার আলোকপাতে তাদের তাত্ত্বিক গোলামিলগুলি স্পষ্ট হয়েই ধরা পড়ল। ফলত তার আস্ফালনও যে বহু পরিমাণে খর্ব হয়ে পড়ল, আজকের কাব্যসাহিত্য আলোচনা করলে সহজেই তা ধরা পড়বে।

ভগবানকে এ-কালে আর ঠিক আসামী করে কাঠগড়ায় দাঁড় করান হয় না, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লক্ষীভূতও তিনি বড় একটা হন না, আধুনিক চিন্তায় তিনি একেবারে অনুপস্থিতই থাকেন, নয়ত তাঁকে এক নৈর্ব্যক্তিকস্বরূপে এসে উপস্থিত হতে হয়। এ-উপস্থিতি নির্দিষ্ট কোন মতবাদকে অবলম্বন করে নয়, জীবনের অনুভূতিজাত একটা প্রত্যয়কে বাহন করে। তাই অধিকাংশ আধুনিক মানুষ নাস্তিক বলতে যা বোঝায় তাও নয়, আবার আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী ক্রিয়ান্বিত নৈষ্ঠিকও নয়, এক পরম ও চরম সত্য সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধৃতিই তার অবলম্বন। এই অস্পষ্ট ধৃতিরই বহিঃপ্রকাশ তার মানবতাবোধে। সমস্ত মানুষের মধ্য দিয়ে যে শক্তি ও সত্য পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, আধুনিক মানুষ নানা দিক থেকে তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টায় আজ নিরত হয়েছে। তার অর্থ এ নয় যে, এর আগের যুগের মানুষও তা করেনি। করেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁরা যে দৃষ্টি নিয়ে যে প্রেরণায় তাকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন, আজকের মানুষের দেখা আর ভাবা ঠিক সে-জাতের হওয়া সম্ভব নয়। তার কারণ সে-যুগের আর আজকের মানুষ এক নয়, তার সমস্যাও আজ শুধু ভিন্ন নয়, জটিলতরও বটে।

অবশ্য একথা আমার অজানা নেই যে, পৃথিবী যখন বিপুলা আর মানুষও যখন অগণ্য, তখন আধুনিক মানুষের যে ভাবনা-চিত্র যেভাবে আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি, অন্যরূপেও তা বোঝান যেতে পারে। আমি শুধু এখানে সেই মৌলিক প্রত্যয়-গুলিকেই তুলে ধরতে চেয়েছি, যেগুলিকে বলা চলে সদর্থক (পজিটিভ)। আধুনিক ভাবনার নঞর্থক (নেগেটিভ) দিকটার দিকে নজর আমি ইচ্ছা করেই দিইনি। কারণ আমি বিশ্বাস করি, সদর্থক চিন্তাই জীবনের সত্যকার ভিত্তি গড়ে তোলে, অবশ্য নঞর্থকের পিছুটান যদি সে কাটিয়ে উঠতে পারে।

রক্তের বদলে রক্ত

মনোজ বসু

দু শ বছরের মায়া কাটিয়ে ইংরেজ তল্পিতল্পা বাঁধছে, সেই সময়ের গল্প।

লাহোর। শান্ত শহর। কিন্তু ভিতরে ভিতরে মানুষ আর-এক রকম। দিব্যি চলেছে বড় রাস্তা দিয়ে, থেমে গিয়ে হঠাৎ পিছনে তাকায়। ছোরা মারে কি না কেউ ওদিক থেকে! মেয়েরা একা-দোকা বেরোয় না, সন্ধ্যা না হতেই ঘরে ঢুকে খিল দেয়। দলে দলে লোক এসে পড়ছে বাইরে থেকে, তাদের মুখে নানান খবর। কোন গাঁয়ে নাকি শিখেরা দল বেঁধে হামলা দিয়ে যত মুসলমান নিপাত করেছে। ডেপুটি কমিশনার নিজে তদারকে ছুটলেন। মিছে কথা, বাজে গুজব। কিন্তু শহরের কেউ বিশ্বাস করে না। বলে, ঘুষ খেয়ে চেপে দিচ্ছে।

একদিন, এক কাণ্ড হল। মড়া পুড়িয়ে ফিরছে—কোথা থেকে একদল এসে পথ আটকে তাদের গায়ে পিচকারি মারে। হোলির দিনে এই রকম ঘটে কোন কোন মহল্লায়—মুসলমান ছেলেরাও মাতামাতি করে হিন্দুর সঙ্গে। কিন্তু আজকে ফাগ নয়, কেরোসিন। কেরোসিনে কাপড়-চোপড় ভিজিয়ে দেশলাই-কাটি জ্বেলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে। ধরে গেল কারও কারও কাপড়। কাপড় ফেলে তারা ছোটে। হাততালি আর উৎকট হাসির শব্দ গলি-ঘুঁজির ভিতর থেকে।

সেই লেগে গেল। দিনমানটা এক রকম, রাত্রি হলেই তাণ্ডবের শুরু। গুলির আওয়াজ। হঠাৎ বা আর্তনাদ উঠল : দোহাই বাবা সকল, রক্ষে কর, রক্ষে কর—। বোমা ফাটছে দুড়ুম-দাড়াম। ছাত ভেঙে পড়ল যেন কোনদিককার। রাস্তার আলো নেই, আলোর পোস্ট ভাঙা, তার ছেঁড়া।

সকালবেলা খবর পাওয়া যায়ঃ রঙমহালে লুঠপাট, গুমতি বাজারে খুন। যত বেলা হচ্ছে, খবর আসে দূর-দূরান্তর থেকে। ইস্কুল-কলেজ বন্ধ, ছেলেপুলে বাড়ির ভিতরে দুয়োর এঁটে আটকে রেখেছে। স্টেশন লোকে লোকারণ্য। অমৃতসরের ট্রেন ছাড়ল। গাড়ির ভিতরে যত মানুষ, ছাতের উপর তার ডবল। দুয়োর ধরে

ঝুলছেই বা কত! কামরার নীচে চাকার পাশে লোহার উপরেও মানুষ সেঁধিয়ে আছে।

অত বড় মেয়ো-হাসপাতাল, দু-তিন দিন তারা গেট বন্ধ করেছে। জায়গা নেই। নরেশ তেজচান-হাসপাতালের ডাক্তার। এক মিলওয়ালা বাপের নামে বানিয়ে দিয়েছে। আয়তনে বড় না হক, ব্যবস্থা ভাল। নতুন আজ চারটে তাঁবু খাটান হল উঠানে, আধ ঘণ্টার ভিতরে সব ভরতি। সহকারী আনোয়ার বলে, সরে পড়ুন ডাক্তার সাহেব। আর নয়। যত দেরি হবে, মুশকিলে পড়বেন। হাসপাতাল বলে রেহাই দেবে, মনে হয় না।

কিন্তু বললেই হয় না। যাবে কোথায়? বেরুবে কোন্ কায়দায়? ঝাড়া-হাত-পা একলা মানুষ নয়। স্ত্রী আর দুই মেয়ে। দুই সোমত্ত মেয়ে—নীরা আর ইরা। বললেই অমনি বেরুন যায় না।

কারফিউ। সন্ধ্যা ছটা থেকে সকাল ছটা। হাসপাতাল-বাড়ির তেতলার উপর কোয়ার্টার। ঘুম হয় না। মেয়ে দুটো ওঘরে, তারাও ঘুমোয়নি ঠিক। এমন সব রাতে ঘুমের কথা ওঠে না। সারা রাত্রি স্বামী আর স্ত্রীর শলা-পরামর্শ। কথা-বার্তার মধ্যে হঠাৎ অমলা কেঁদে পড়ে: "বোনটার কী হল জানিনে। চিঠি দেয় না কতদিন। কলকাতা শহরও পোড়া দেশের বাইরে নয়। তার উপরে হল পার্ক স্ট্রীট জায়গা।"

নরেশ বলে, "দুর্বুদ্ধি। পার্ক স্ট্রীট ছাড়া মেয়ে-হস্টেল ছিল না যেন আর।"

অমলা বলে, "কে ভাবতে পেরেছে, এত শিগগির আমরা স্বাধীন হয়ে যাচ্ছি? স্বাধীনতা মানেই মাথা ভাঙাভাঙি? ঠাকুরপোকে এত করে লিখলাম খোঁজখবর করে হস্টেল থেকে তাকে সরিয়ে আনতে—"

কথাবার্তা মাঝপথে থেমে যায়। বাইরের রাস্তায় গণ্ডগোল তুমুল হয়ে উঠেছে। অনেক মানুষের মিলিত হাহাকার। সন্তর্পণে জানলা খুলে দেখে, আগুন দিয়েছে অদূরের বস্তিতে। চারিদিক আলোয়-আলোময়। দিনমান হয়ে গিয়েছে।

লছমন সিং চেনা লোক, পাড়ার মধ্যে মুদিখানার দোকান। এদেরও জিনিসপত্র আসে লছমনের দোকান থেকে। দোকানে আগুন দিয়েছে। সর্বস্ব যায়। পাগলের মত হয়ে লছমন বেরিয়ে পড়েছে। ফায়ার-ব্রিগেডে ফোন করবে—হয়ত বা সেইজন্য। দুড়ুম—

অমলা হায় হায় করে ওঠে: "দেখ দেখ, গুলি করল লছমনকে। পড়ে গেল রাস্তার উপর। উঃ—"

নরেশ তিক্ত কণ্ঠে বলে, "কারফিউ চলছে। পথে বেরুন বে-আইনি এখন।"

"কিন্তু আগুন দিয়ে গেল যখন কারফিউয়ের ভিতর? মিলিটারি তখন কোথায় মুখ লুকিয়ে ছিল?"

গুলি চলছে এদিক-সেদিক। জানলার কবাট ভেজিয়ে ফাঁক দিয়ে এরা দেখছে। ঘরে থেকে নিশ্চিন্ত নয়—ঘরের ভিতরে গুলি এসেও মানুষ খুন হয়ে গিয়েছে। লছমন পড়েছে হাসপাতালের একেবারে সামনে। বউ চেঁচামেচি করছে, আরও সব চেঁচাচ্ছে। বেরিয়ে আসতে পারছে না, তাদেরও লছমনের দশা হবে। মরেনি লছমন, হাত-পা ছুঁড়ছে। হাসপাতাল থেকে কয়েক-পা পথ। কিন্তু কড়া আইন—চোখের উপরে দেখেও তুলে আনবার জো নেই। প্রাণ নিয়ে লোফা-লুফি—ডাংগুলি খেলার মতন। এই সস্তা জিনিসটা সম্পর্কে কারও আর মায়া-মমতা দেখা যাচ্ছে না।

ছটায় কারফিউ অন্তে নরেশ লছমনের কাছে গেল। আর কিছু করতে হবে না। শেষ।

অমলা কিন্তু অস্থির: "পালাতে হবে যেমন করে হক। যদি কিছু না-ও হয়, ভয়ে ভয়ে মরে যাবে। ইরা-নীরার কী চেহারা হয়েছে দেখ না!"

মেয়েদের সামনে কোন কথা তোলে না। আহা, সুখ ভুলে গিয়েছে ওরা দু বোন। শুকনো মুখে বেড়ায়—খায় না, ঘুমোয় না। বেয়াড়া বয়সটাই মস্ত বড় অপরাধ তাদের। বাপ-মার অশান্তির দুই কাঁটা—দিবারাত্রি খচ-খচ করে বেঁধে। ছেলে ছিল সকলের ছোট। সেটা বসন্তে গিয়েছে, মা-শীতলা নিয়ে নিয়েছেন দু বছর আগে। ভাগ্যিস গিয়েছে, নয়ত তাকে নিয়েও মুশকিল হত। মেয়ে দুটোও গেল না কেন? তা হলে নির্ঝঞ্ঝাট, পালাবার কোন দায় থাকত না। পালে পালে মানুষ মরছে—বেঁচে থাকার যে হাঙ্গামা মরা অনেক সোজা তার চেয়ে। কিন্তু সোমত্ত মেয়ে ত সহজে মেরে ফেলে না। মরার বেশী অনেক কিছু ঘটে।

অমলা বলে, "তোমার উপরওয়ালাদের ধর। সরকার থেকে ব্যবস্থা করুক।"

করবে ঘোড়ার ডিম। নরেশ ভালমত

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক)

হেড অফিসঃ—২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

ফোনঃ—২২—৫৯৮৮ ও ২২—৫৯৮৯

— ব্রাঞ্চ —

বড়বাজার শ্যামবাজার ভবানীপুর
বসিরহাট ও খুলনা

উপযুক্ত জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়

সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শ্রীযুত এন ব্যানার্জি, এম-এ,
জেনারেল ম্যানেজার।

জানে। বরঞ্চ ব্যবস্থা করছি বলে একেবারে হাতের মুঠোয় নিয়ে ফেলবে। পায়ের নীচের মাটিই ত নেই—কিসের তবে ভরসা? পুলিশে গুলি করে নিরীহের উপর। যেমন ঐ লছমনকে দেখা গেল চোখের সামনে। সরকারের মন্ত্রী নিজের জন্য বাড়তি পেট্রোল নিয়ে লুঠেরাদের দিয়ে দেয় ঘরে ঘরে আগুনে দেবার জন্য। পেনাল কোডের মতে খুন-রাহাজানি বড় অপরাধ, সে কেবল বইয়েরই লেখা। মুসলমানের কাছে তার চেয়ে অনেক বড় অপরাধ—হিন্দু বা শিখ হওয়া। মুসলমানও ঠিক সেই রকম হিন্দু-শিখের কাছে।

আরও তিনটে দিন গেল। আগে যা-হক যৎসামান্য আবরু ছিল, সে বালাই চুকেছে। সৈন্যেরা দল বেঁধে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে রাস্তা দিয়ে চলে গেল। যত্রতত্র ছুঁড়ছে—যে দিকে যায় যাক, যার গায়ে লাগবার লাগুক। চলে গেল সৈন্যেরা। প্রায় তার পিছন ধরে বেরিয়েছে অন্য এক দল। পেট্রোল ও কেরোসিনের টিন হাতে হাতে। আর স্টিরাপ-পাম্প—লড়াইয়ের সময় এ-আর-পি যা ঘরে ঘরে দিয়েছে। আগুনে দিচ্ছে বাড়ি বাড়ি। আগুনে ধরে গেলে বাড়ির লোক বেরিয়ে পড়ল, তখন যেমন খুশি মার ধর, লুটতরাজ কর। তেজভান-হাসপাতালেও একদিন ঢুকে পড়ল। নীচের তলায় রোগীদের ঘরে ঘুরছে। দেখে শুনে বেরিয়ে গেল। কী মতলব, কে জানে? কিন্তু এবার গিয়েছে বলে আর যে আসবে না, তার কোন মানে নেই। সেবারে উপরে উঠবে। কোল্যাপসিবল-গেটে তালা এঁটে কতক্ষণ ঠেকানো?

নরেশ ডাক্তার দুই মেয়ের হাত ধরে পাগলের মত এঘর-ওঘর করছে। কী করি? যাই কোথায়? কোনখানে লুকেই গিয়ে?

আবদুল পুরনো বেয়ারা। কাঁচাপাকা দাড়ি, মাথায় পাগড়ি। বার বার সে ছুটে আসছে: "ডাক্তার সাব, থাকবেন না এখানে, বেরিয়ে পড়ুন। মেলা হাতিয়ারপত্তর নিয়ে আসছে। পিছনের পাঁচিল টপকে চলে যান, ইলেকট্রিক-মিস্ত্রির মই এনে রেখেছি।"

বেয়ারার সামনে বিশেষ করে মুসলমানের সামনে দুর্বলতা দেখান যায় না। নরেশ ধমক দিয়ে ওঠে, "আচ্ছা, আচ্ছা, নিজের কাজে যাও। তোমায় ফঁপরদালালি করতে হবে না।"

তাড়া খেয়ে আবদুল মুখ চুন করে সরে গেল। পুরনো লোক, হাসপাতালের কাজে ঢুকেছিল আঠার বছর বয়সে। এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। ভাল লোক বলে জানা আছে, কিন্তু এ-বাজারে কাউকে বিশ্বাস নেই। হাসপাতালের পাকা বাড়ি, মজবুত দুয়ার জানলা, বিপদের মুখে লড়া যাবে, তবু খানিকক্ষণ।

অমলা কেঁদে বলে, "ঘরে আটকে রেখে পুড়িয়ে মারবে! জতুগৃহ-দাহন!"

"বাইরে মাঠের উপরে ত এই কষ্টটুকুও করতে হবে না। এক এক কোপে সাবাড়। সেই মতলব ওদের।"

"আবদুলও ঐ দলে?"

"এমনি ত আথছার হচ্ছে। ভরসা দেয়, আশ্রয়ের লোভ দেখিয়ে জপিয়েজাপিয়ে খপ্পরের মধ্যে নিয়ে ফেলে। আবদুলেরও সেই এক পরিচয়—জাতে মুসলমান। আমরা হলাম হিন্দু, কাফের—ওদের চিরশত্রু।"

আবদুল নেমে আবার গেটে চলে গিয়েছে। সেই ফাঁকে নরেশ এক বুদ্ধি করল। এক্স-রে ছবি তোলা হয়, তার পাশে ডার্ক রুম। চারজনে সেখানে ঢুকে দরজা দিল। এ-ও ঘর একটা, বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারবে না। ছোট্ট ঘর, দম আটকে আসে। বহাল-তবিয়তে দম নেবার দিন কোনদিন আর আসবে কি না, কে বলতে পারে!

আবদুল যা বলেছে—আবার একটা দল হামলা দিল অনতিপরেই। হাঁকডাকে মনে হয়, দল প্রকাণ্ড। কানে গেল, রোগীদের ভিতর কে-একজন চেঁচাচ্ছে, "ধর্ম ছাড়ছি। কলমা পড়ব। যা খাইয়ে তোমাদের বিশ্বাস হয়, তাই খেতে দাও।" দুড়ুম-দাড়াম বন্দুকের আওয়াজে তার কথার জবাব। কোল্যাপসিবল-গেটে হাতুড়ি মারছে, গেটের শিক খুলে খুলে ছুঁড়ছে ঝনঝনিয়ে।

আবদুলকে ধরে ফেলেছে: "ডাক্তার কোথা?"

"ডাক্তার সাব?" হি-হি করে দাঁত মেলে হাসে আবদুল, হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

"কালীবাড়ি চলে গেল যে ডাক্তার।"

"গিয়ে পৌঁছেছে?"

"পৌঁছল আর কোথা? রাস্তায় পড়ে আছে। হি-হি-হি। হাতের মাথায় পেয়ে দিল গরদানে কোপ বসিয়ে।"

"বিবি আর বালবাচ্চা?"
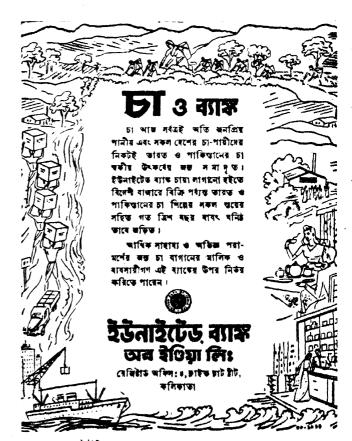
"খতম বিলকুল। পাশাপাশি পড়ে আছে, দেখগে যাও। বুদ্ধিটা আমিই বাতলে দিলাম—বেরিয়ে পড়। ঘর থেকে বেরিয়ে অমনি দলের মুখে পড়ে গেল।"

নরেশ ডাক্তারের ঘরদুয়োর তন্নতন্ন করছে। লরি রয়েছে সঙ্গে, বাক্স-পেঁটরা টেবিল-চেয়ার খাট-বিছানা ভাল জিনিস যত-কিছু বয়ে বয়ে লরিতে তুলে ফেলল।

হঠাৎ চুপচাপ, গোরস্থানের মত নিঃশব্দ। রেজিমেণ্ট দেখা দিয়েছে হয়ত মহল্লায়, দেখে সরে পড়ল। আবার আসবে। এই একটুখানি লুকোচুরির ভাব রয়ে গিয়েছে এখনও। এরা জানে ওরাও জানে, তবু মিলিটারি বলে খাতির দেখানো। গুরুজনের সামনে হাতের আড়াল করে সিগারেট খাওয়ার যেমন বিধি।

কিছুক্ষণ গেল। ডাক্তারের দরজায় আবদুল টোকা দিচ্ছে। ফিসফিস করে বলে, "চলে গেছে শয়তানের বাচ্চাগুলো। চারটে বেমারি ঘায়েল করে গেল। যাবে কোথা? তোলা রইল। বিচার হবে রোজ কেয়ামতে। বাইরে আসুন ডাক্তার সাব। কী কাণ্ড করে গেছে দেখুন!"

কী আশ্চর্য, গোপন আশ্রয় আবদুল জানত তবে! জেনে-শুনে কিছু বলল না! ধাপ্পা দিল, বেরিয়ে চলে গিয়েছে নরেশ ডাক্তারেরা সব, পথে পড়ে মরে আছে।

হাসে আবদুল, তারও মধ্যে গলা কেঁপে যায়ঃ "কী করব, আমার এই খোকি দিদিরা—মুখ দিয়ে তাদের ইন্তেকালের কথা বলতে হল। তাই আর খোঁজাখুঁজি করল না। খুঁজলেও পেত না। হাসপাতালের ভিতরে এমন জায়গা, কোন লোক ধরতে পারে না।"

"তুমি ঠিক ধরেছ।"

"দেখলাম তোমাদের ঢুকতে। মন ভারী উতলা ছিল ডাক্তার সাব। শয়তানদের মতলব জানতাম। হাসপাতাল বলে রেহাই নেই, ডাক্তার বলে খাতির নেই। ভাবলাম, জায়গাটা দেখে রাখি, সে-মুখো যেতে দেব না, জান আগলে ঠেকাব। একটা ঝোঁক কাটল ডাক্তার সাব, কিন্তু শেষ নয়। পালাতে হবে, ঘাঁটির মধ্যে পড়ে থাকলে রক্ষে হবে না। এখন দিনমানে বেরুনো বেয়াকুবি হবে। রাত্রিবেলা।"

অমলা হাত জড়িয়ে ধরে আবদুলের। বলে, "খোকা মারা গেছে, তুমি আমার বড় ছেলে আবদুল। নিজেদের কথা ভাবিনে—নীরা ইরা তোমার এই বোন দুটো। এদের নিয়ে কী করব, তুমি ঠিক করে ফেল বাবা।"

হাসপাতালের পিছনে বাগিচা। নিশি-রাত্রে মই বেয়ে ওরা পাঁচিলের উপর উঠল। লাফ দিয়ে পড় এবার ওদিকে। আবদুল মৃদুস্বরে তড়পাচ্ছেঃ "কী হচ্ছে ডাক্তার সাব? ঐ উঁচুতে বসে থাকলে হবে না। দুশমনের নজরে পড়ে যাবে।"

তারপরে খেয়াল হল, "আচ্ছা বোকা ত আমি! ডাক্তার সাব পারেন লাফাতে, জেনানা তিনজন পারবে কেন?"

তড়বড় করে মই বেয়ে সে-ও পাঁচিলে উঠল। মইটা তুলে নিয়ে ওদিকে লাগাবে। হল না। টিলার উপরে হাসপাতাল—পাঁচিলের বাইরে অনেকখানি নিচু, মইয়ে নাগাল পায় না। আবদুল তখন ওধারে লাফিয়ে কাঁধের উপরে মইয়ের গোড়া ধরেঃ "নাম, তাড়াতাড়ি নেমে পড়, আমার ঘাড়ের উপর দিয়ে নেমে যাও।"

যাবে গুরুদ্বারে। গুরুদ্বার-হরগোবিন্দ, ভাল পাহারার বন্দোবস্ত সেখানে, বিস্তর লোক গিয়ে জমেছে। সদর রাস্তায় আল্লা-হো-আকবর। নীরা আঁতকে ওঠে, ওরে বাবা! কাঁচ মেয়ের অন্তরাত্মা শুকিয়ে ওঠে আবদুলও ভাবছিল কি এই সব? একবার খিঁচিয়ে উঠলঃ "হারামির বাচ্চাদের আল্লাহ্ বোবা করে দেয় না কেন?"

চার-পাঁচ শ আশ্রয় নিয়েছে গুরুদ্বারে। মানুষ দেখে সাহস হয়। কতদিনের উদ্বেগের পর রাত্রিটুকু এক ঘুমে কাটল। তোড়জোড় হচ্ছে, শোনা গেল, এইখান থেকে লরিতে তুলে নিয়ে স্টেশনে স্পেশাল-ট্রেনে তুলে দেবে। ট্রেন একছুটে একেবারে সীমান্তের পারে গিয়ে নিশ্বাস নেবে।

সকালটাও গেল ভালয় ভালয়। বস্তা কয়েক আটা আর চিনি এসে পড়েছে। তাল তাল আটা মাখতে লেগে গিয়েছে মেয়েরা। বেশ দুটো দল হয়ে দাঁড়াল, রান্নার দিকটায় মেয়েরা পুরুষদের ঘেঁষতে দেবে না। তৈরী হলে খেতে এসে বস, স্পেশাল-ট্রেনের কতদূর কী হল, এখন বরঞ্চ সেই খবর নাও। বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে—কড়া মিলিটারি পাহারায় রাত দুটোয় গাড়ি ছাড়বে। এরা বলছে, রাতে নয়, রাত্রিবেলা কেউ বেরুচ্ছে না, গাড়ি এসে সাইডিংয়ে থাকুক, দিনের আলোয় সকালে দল বেঁধে রওনা।

এই সব হচ্ছে, এর মধ্যে মিলিটারি একদল দেখা গেল। রাত্রে কিংবা কাল সকালে—সেইটে বোধ হয় পাকাপাকি করতে এল। হাতে হাতে বন্দুক; খোলা তলোয়ার ঝকমকিয়ে নাচাচ্ছে কজনে। তলোয়ার দেখে ভয় হয়ে যায়। সৈন্যের হাতে খোলা তলোয়ার কেন? যে যেদিকে ছিল ঘরে ঢুকে পড়েছে। মিলিটারি, না খাকী পোশাকের ধাপ্পা? যারা পাহারায় ছিল, তারাই বা কী করছে? ঢুকে পড়ল এরা কেমন করে?

ঘরের ভিতরে কটা লোকেরই বা জায়গা! মানুষের চাপে চাপে দম নেওয়া যায় না। বাইরের গর্জন এলঃ "বেরিয়ে এস, এক্ষুনি—এক মিনিটের মধ্যে। হাতিয়ার সমস্ত এই তেঁতুলতলায় এনে রাখ। তল্লাশি করে কিছু পাওয়া গেলে কুচি কুচি করব।"

বিধি এই বটে! যথাসর্বস্ব ফেলে চলে যায়, মনটা বোঝাই করে নিয়ে যায় আক্রোশ।

"ডোরা"র সর্বাধুনিক সলভেণ্ট S, S-D যুক্ত কালি, সেণ্ট, স্নো, পা উ ডা র, সিঁদুর, আলতা, তেল, ক্রিম ও লাইমজুস্ সর্বোৎকৃষ্ট। ১৫১, আপার সার্কুলার রোড ঃ কলি-৬

সীমানা পার হয়ে গিয়ে নানান ছুতোয় সেদিকে হাঙ্গামা বাধায়।

হাতিয়ার নেই-নেই করেও তিন-চার জনের বোঝা। টমি-গান থেকে কলম্-কাটা ছুরি। মসমস করে কজনে ঘুরে ফিরে দেখে এল। না, খালি হাত। লোহা-ইস্পাত এক টুকরা নেই কারও কাছে।

দ্বিতীয় হুকুম ঃ "সোনা রুপো টাকা-পয়সা যার কাছে যা আছে, রেখে যাও হাতিয়ারের পাশে। তল্লাশিতে কিছু মিললে আমরা কিন্তু জানের জন্য দায়ী থাকব না।"

নিঃসম্বল করে প্রাণটুকু মাত্র রেহাই দিয়ে যাবে, হুকুম-হাকামে এই বোঝা যাচ্ছে। তাই সই। পরের হুকুমঃ "মেয়েপুরুষ দুদল হয়ে বসে পড় দুদিকে। মেয়েরা উত্তর দিকে ডরমিটরির পিছন দিকটায়। পুরুষরা উঠানে। একজন কেউ লাইন ছাড়া হয়ে থাকে না যেন। খবরদার।"

দক্ষিণ প্রান্তে পুরনো গাছপালা অনেক। বাগিচাও বলা যেতে পারে। নিচু ডালপালা, ডালে ঝুলন্ত লতাপাতা—সব সুদ্ধ মিলে সবুজ দেয়ালের মতন। চক্ষুলজ্জা আছে যাই হক। হয়ত এই দিনের বেলা মাথার উপরে খর সূর্য জ্বলছে বলেই। সাক্ষী না থাকে যাতে বাইরের কেউ। দশ-বার জনের এক-একটা দল গেঁথে ডাক দিচ্ছে, "চলে এস তোমরা।" বিয়ে-বাড়ি পাত্তা পড়েছে যেন, ডাকছে। জায়গা সংকীর্ণ বলে বেশী অতিথি একবারে নিচ্ছে না। নিয়ে যাচ্ছে লতাপাতার কুঞ্জবনের আড়ালে। যেতে চায় না—আর্তনাদ। তলোয়ার নিয়ে কোন্ দিক দিয়ে অমনি ধেয়ে আসে জন পাঁচিশ-ত্রিশ। পাঁঠা-বলির সময় খাঁড়াহাতে কামারের চেহারা যেন। চেঁচামেচি যেন মন্ত্রবলে থেমে যায়। হাত নেড়ে ইশারা করেঃ "চলে এস ভালয় ভালয়।" চলল গুটি-গুটি পরম বশম্বদ ভাবে। সে দিকটায় কী যে হচ্ছে—যে রকম শব্দ-সাড়া হওয়া উচিত, তেমন কিছু নয়। সঠিক জানা যাবে একটু-খানি পরেই—কারও দেরি হবে দশ মিনিট, কারও বা আধ ঘণ্টা। চোখের দেখাই শুধু, গল্পটা অন্য কাউকে বলবার জন্য ফিরতে দেবে না।

মেয়েদের টানা লাইন---ডরমিটরির কানাচে বসিয়ে আব্রুটা রেখেছে। মায়ের দুপাশে ইরা আর নীরা। নীরা মুখ নিচু করে থাকে মাটির দিকে। সেদিক দিয়ে ইরার কিছু সুবিধা—খোকা যেবার মারা যায়, ইরাকেও বসন্তে ধরেছিল। বসন্ত সারল, কিন্তু মুখখানা শতচ্ছিদ্র মৌচাক বানিয়ে গেল। বিয়ে দেওয়া মুশকিল হবে, বাপ-মা কতদিন বলাবলি করেছে নিজেদের মধ্যে। আজকে তবু অনেকটা সোয়াস্তি এই মেয়েটার ব্যাপারে।

ফলের ঝুড়ি নিয়ে একদল এল। বলে, "মুখ শুকনো। খিদে পেয়েছে তোমাদের। খাও।"

আবার বলে, "দুধ খাবে ত তার ব্যবস্থাও আছে। বেশী নয়, গলা ভিজিয়ে নেবার মত।"

একজনে তার মধ্যে ফিক করে হেসে বলে, "জন্মের শোধ খেয়ে নাও।"

সেই লোকটা কেমন করে তাকায় নীরার দিকে। নীরা বলে, "মা, আমার ভয় করছে।"

একা নীরা নয়, আরও চার-পাঁচটির উপর ঐ রকম তাক। নীরা বলে, "মা গো! কী হবে ও মা?"

অমলা বলে, "খোকার বসন্ত হল, ইরার হল--তোকে ছুঁল না। না খেয়ে না ঘুমিয়ে আরও যে রূপের ডালি সাজিয়ে বসেছিস।"

সেই লোকটা তাড়া দিয়ে উঠলঃ "ফিস-ফিস গুজগুজ--হচ্ছে কী তোমাদের? যা খাওয়ার খেয়ে শেষ করে ফেল।"

লাইনের গোড়ার দিককার একটা মেয়েকে চিলে ছোঁ মারার মত একজনে গিয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে নীরার সামনের সেই লোকটারও দৃষ্টি ধকধক করে ওঠে। চোখের ঢেলার চেয়ে বুলেট অনেক কোমল। নেবুর কোয়া দুটো শেষ করবার অবকাশ দিচ্ছে। বেশী গড়িমসি হলে তা-ও বোধহয় দেবে না। কুয়ো একটুখানি দূরে—হঠাৎ উঠে নীরা লাফ দিল কুয়োর ভিতরে। নীরা পথ দেখাল—আরও গোটা দুই পড়ল তার পিঠ-পিঠ।

কী হল! কী হল!—করে ছোটে সবাই কুয়োর পাড়ে। অমলা যেন পাথর, সেই এক জায়গায় অর্থহীন দৃষ্টি মেলে বসে আছে। তোলপাড়। জল তোলার বালতি দড়িতে বাঁধা—বালতি নামিয়ে দিয়ে উপর থেকে হুংকার দিচ্ছেঃ "দড়ি এঁটে ধর্। কানে যাচ্ছে না? দড়ি টেনে উপরে তুলব, প্রাণে বেঁচে যাবি।"

কথায় হল না ত বালতি কিছু উপরে তুলে দড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। যতটা নজর চলে, মেয়েরা জলের উপর মাথা ভাসান দিয়ে আছে। ঠনাস ঠনাস করে বালতির ঘা পড়ে মাথায়। শেষটা বালতি জলে ডুবিয়ে ওজনে ভারী করে ছেড়ে দিচ্ছে। যাক মাথা চৌচির হয়ে। তবু সাড়া আসে না কুয়োর ভিতর থেকে। ভয় পায় না, হুকুম শোনে না।

অমলা খিঁচিয়ে ওঠে ইরার উপর: "তুই কী করিস রে ওখানে? চলে আয়, বস এসে যেমন ছিলি।"

একটা লোক রেগে ছুটে এসে এক লাথি। লাথির ঘায়ে উলটে পড়ে অমলা।

"শয়তানী, তুই ত শিখিয়ে দিলি মেয়েটাকে। ফিসফাসিয়ে তাই শেখাচ্ছিলি। খোয়াবটা দেখ্ তবে চোখের উপরে।"

নতুন ইট গাদা করা। গুরুদ্বারের বাড়তি ঘর হচ্ছিল। ঝুপঝাপ ইট ফেলছে কুয়োর ভিতরে। এ-ও এক আচ্ছা মজা। আরও

এবার পূজোয় আমাদের বিখ্যাত গেঞ্জী—4 Seasons, 3 Aces, Florida & 3 Flowers ব্যবহারে ও উপহারে আনন্দ বর্ধন করুন।

প্রস্তুতকারক ঃ

অমর টেক্সটাইল ওয়ার্কস

১১৭বি, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৫

বিশ্ববিখ্যাত
জ্যোতির্ব্বিদ

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জ্যোতিষার্ণব

রাজজ্যোতিষী এম-আর-এ-এস (লণ্ডন) প্রেসিডেণ্ট অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি (স্থাপিত ১৯০৭ খৃঃ) ইনি দেখিবামাত্র মানব জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোষ্ঠী বিচার ও প্রস্তুত এবং অশুভ ও দুষ্ট গ্রহাদির প্রতিকারক শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি, তান্ত্রিক ক্রিয়াদি ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচাদির অত্যাশ্চর্য শক্তি পৃথিবীর সর্বশ্রেণী (অর্থাৎ ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিংগাপুর, জাভা, প্রভৃতি দেশস্থ মনীষীগণ) কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

জ্যোতিষ সম্রাট

বহু পরীক্ষিত কয়েকটি অত্যাশ্চর্য কবচ

ধনদা কবচ—ধারণে স্বল্পায়াসে প্রভূত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্মীর কৃপালাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্তব্য)। সাধারণ ব্যয়—৭৷৵৹ শক্তিশালী বৃহৎ—২৯৷৵৹, মহাশক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক—১২৯৷৵৹ **সরস্বতী কবচ**—স্মরণশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষায় সুফল—৯৷৵৹, বৃহৎ—৩৮৷৵৹ **বগলামুখী কবচ**—ধারণে অভিলষিত কর্মোন্নতি, উপরিস্থ মনিবকে সন্তুষ্ট ও সর্বপ্রকার মামলায় জয়লাভ এবং প্রবল শত্রুনাশ। ব্যয়—৯৵৹, বৃহৎ শক্তিশালী—৩৪৵৹, মহাশক্তিশালী—১৮৪৷৹ (এই কবচ ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়ী হইয়াছেন) **মোহিনী কবচ**—ধারণে চিরশত্রুও মিত্র হয়, ১১৷৹, বৃহৎ ৩৪৵৹ মহাশক্তিশালী ৩৮৭৸৵৹

প্রশংসাপত্র সহ ক্যাটালগের জন্য লিখুন।

হেড অফিস—৫০-২ (অ) ধর্মতলা ষ্ট্রীট (প্রবেশপথ ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট), "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন", কলিকাতা—১৩ ফোনঃ ২৪-৪০৬৫ বেলা ৪টা—৭টা। **ব্রাঞ্চ অফিস**—১০৫, গ্রে ষ্ট্রীট, "বসন্ত নিবাস", কলিকাতা—৫ প্রাতে ৯টা—১১টা ফোনঃ ৫৫-৩৬৮৫।

মানুষ এগিয়ে আসে। অনেক হাতে ইট পড়ছে। আগে জলে পড়ার আওয়াজ আসছিল, এখন আর নয়—ইটের উপর ইট। আর সেই ইট পড়ার তালে তালে অমলা হাততালি দেয়ঃ "খাসা হচ্ছে, খাসা। দিব্যি হচ্ছে। আর ভয় রইল না আমার নীরাকে নিয়ে।"

ইরা ছটফট করে কাটা-কবুতরের মত। কুয়োর ভিতর মাথা নামিয়ে দিয়েছে—দেবে নাকি লাফ? হেঁচকা টানে কে একজন বুকের কাছে টেনে নিল। এ কোন্ মানুষ—আবদুল! আবদুল-দাদা. তোমায় দেখতে পেলে নীরা কুয়োর জলে যেত না। চেনা যায় না আবদুলকে এই নতুন সজ্জায়। মাথায় দিয়েছে ফেজ-টুপি, গায়ে মেরজাই। এই দলের মধ্যে ষোল-আনা এখন এদেরই। আড়কোলা করে ইরাকে নিয়ে নিয়েছে। "এক বাড়িতে ছিল, আসনাই আছে বুঝি?" সকলে নানান দিকে ফ্যা-ফ্যা করে হাসেঃ "কত হুরী-পরী কত দিকে—এই চেহারায় বউরা হল?"

আরও কী হত, কে জানে? হঠাৎ এক ভোজবাজি। লোকগুলো দৌড়চ্ছে। দৌড়ে বেরিয়ে গেল, একজনও আর নেই। মিলিটারি বড়কর্তা কেউ এসে পড়ল নাকি? আর এক হতে পারে—এখানকার যত-কিছু লভ্য, সমস্ত উশুল হয়ে গিয়েছে। আছে মানুষগুলো. মানুষ মেরে হাতেরই সুখ, গাঁটের মুনাফা নেই। হয়ত নতুন শিকারের খবর হয়েছে, তাই সবাই ছুটে বেরুল।

সরকারী বন্দোবস্ত নড়চড় হবে না। পরের দিন যথাসময়ে লরির বহর এসে দাঁড়াল গুরুদ্বারের দরজায়। দু-তিনখানায় মানুষ উঠল, কপালগুণে তখন অবধি যারা বেঁচে রয়েছে। লরি মিছিল করে পৌঁছে দিল স্টেশনে। স্পেশ্যাল ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে।

এর মধ্যে আবদুল কখন প্লাটফরমে ঢুকে পড়েছে। বাইরের কাউকে আসতে দেবে না, সে কেমন করে ঢোকল খোদায় মালুম। ইরাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। কালকের টুপি-মেরজাই নেই। তবু চিনে ফেলে দু-চারজন। এখানে আজ এক জাতের লোক, এক রকমের মনের ব্যথা। তার মধ্যে ভিন্ন একটিকে পেয়ে গিয়েছে। রে-রে করে ঘিরে ধরল। দাড়ি ছিঁড়ছে, ঘুষির পরে ঘুষি মারছে। কপাল ফেটে চোয়াল ছিঁড়ে দাঁত ভেঙে রক্তারক্তি। অমলা দেখেছে কামরার জানলা দিয়ে। আহা, একটা দিনে একেবারে বুড়ী হয়ে গিয়েছে অমলা। দুহাত তুলে সে চেঁচাচ্ছে, "মের না গো। ও আমাদের আবদুল—"

আবদুলের গায়ে যেন সাড় নেই। এ-সব যেন কিছুই নয়। ব্যাকুল হয়ে সে বলে, "গাড়ি ছাড়ে। ইরা-খোকিকে তুলে নাও মা। তোমার দৌলত তোমার কাছে পৌঁছে দিলাম, খোদার কাছে আমি খালাস।"

পড়ে গেল টলতে টলতে। পুলিশ ছুটে এল, নয়ত শেষই করে দিত ঐ প্ল্যাটফরমের উপর। গাড়ি ছাড়ল। তখন আবদুল উঠে দাঁড়িয়েছে আবার। প্ল্যাটফরম পার হয়ে যায় গাড়ি। ভিন্ন জাতের ঐ আদরের মানুষ ক'টিকে শেষ দেখা দেখে নিচ্ছে।

এ হল লাহোরের কথা। লাহোর অনেক দূর। চলে আসুন কলকাতা শহরে। লাহোরের খবর এসে পড়েছে। আরও নানা অঞ্চলের খবর। দুনিয়া আজ বড় ছোট, কোন-কিছু চাপা থাকে না। সত্যি যা ঘটেছে, পথ ঘুরতে ঘুরতে তার উপরেও ডালপালা জুড়ে যায়।

কলকাতা শহরের রানীবাগান পট্টি। মসজিদ রাস্তার উপরে। মসজিদের পাশ দিয়ে গলি। গলি ধরে যান এগিয়ে। উল্টো দিকে ঘরবাড়ি। একটা দরজা। দরজায় ঢুকে পড়ে এক ফালি ফাঁকা জায়গা সামনে। গৌরবে উঠান। কল-পায়খানা উঠানের উপর. এদিকে সেদিকে চালাঘর। খোলার চাল, টিনের চাল। অগণ্য ছোট ছোট খোপ চালের নীচে। মানুষ অগুনতি। এই হল রানীবাগান। কোন্ রানী কবে বাগান বানিয়েছিল, নামটাই আছে—রানী নেই, বাগানের গাছপালা পড়ে মরুক, হালে দুটো গাঁদা-দোপাটি বসাবেন তার এক হাত জায়গা মিলবে না কোন দিকে।

ওর ভিতরে গোটা তিনেক খোপ নিয়ে আলিমের বাসা। বুড়ী মা, বউ আর বাচ্চা ছেলে। এই পাড়ায় জন্ম, ছোট্ট বয়স থেকে এখানে মানুষ। মিত্তিরদের পাকাবাড়ি ছিল মসজিদের পশ্চিমে রাস্তার সদরের উপর। এখন যেটা মিত্র নিবাস—দরজার পাশে মারবেল পাথরে নাম লিখে দিয়েছে। পৈতৃক ধারদেনায় বাড়ি বিক্রি হয়ে যায়, ভূষণ মিত্তির নিলেন। সেই সময় হাতে কিছু টাকাও এসে পড়েছিল। টাকাটা নষ্ট করেনি, বুদ্ধি করে টুপির দোকান করেছে চাঁদনিতে। আর কাছাকাছি এই টিনের ঘরে এসে উঠেছে। মিত্র নিবাসে জোর তাসের আড্ডা। আটটায় দোকান বন্ধ করে আলিম সেখানে এসে বসে। আড্ডা ভাঙতে রাত দেড়টা দুটো। ঘুময় নটা অবধি। ঘুম থেকে উঠেই দু মগ জল মাথায় ঢেলে দুটো নাকে-মুখে গুঁজে ছুটল চাঁদনিতে। গিয়ে দোকান খুলবে। এই হল জীবন। আছে বেশ।

এই সংসারে কিছু দিন থেকে ভাগনী এসে উঠেছে। লায়লা। কলেজে পড়ে।

চাকুরে বাপের মেয়ে, এমন সব জায়গায় থাকবার কথা নয়, কিন্তু হঠাৎ বাপ মরে যাওয়ার কলকাতার বাসা তুলে দিতে হল। মা নেই, সৎমা। বাসা তুলে তিনি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে গাঁয়ের বাড়ি উঠলেন। লায়লা কী করে? শেষ পরীক্ষার মাস সাতেক বাকি, লেখা-পড়াতেও ভাল, হঠাৎ এই সময় ইস্তফা দিয়ে গাঁয়ে গিয়ে উঠতে মন চায় না। আলিম বলে, "তবে চলে আয় গরিব মামার ঘরে, কষ্টেসৃষ্টে কাটিয়ে দে এই কটা মাস এগজামিন অবধি।"

ছিল বেশ। একদিন এমনি আড্ডা চলছে। মিত্র নিবাসের ভূষণ মিত্তির বললেন, "কিছু মনে কর না বাবা আলিম। সকাল সকাল তুমি ঘরে চলে যাও।"

"কেন?"

"ন্যাকা ছেলে! চলে যাও, তাই বলছি। দিনকাল বুঝতে পার না!"

আলিম হেসে ওঠে: "মুশকিল হয়েছে চাচামশায়, এখন এই এগারটা রাত্রে বাড়ি গিয়ে ঢুকলে আমার বুড়ী মা অবধি ঘুম ভেঙে লাফিয়ে উঠবে। ভাববে, অসুখ করেছে ঠিক। নয়ত এত সকাল-সকাল ফেরে কেন?"

হাসল বটে, কিন্তু মনের ভিতরে কাঁটা খচখচ করে বিঁধছে। সত্যি কিছু বোকা নয়। রানীবাগানের বার-আনা মানুষ সরে পড়েছে। কলের নীচে বসে যতক্ষণ খুশি চান কর, কেউ কিছু বলতে আসে না।

লায়লার সকালবেলা কলেজ। সেও দেখি চুপচাপ ঘরের মধ্যে। আলিম বলে, "তোর কী হল?"

"কলেজে যাব না। রেলে চাপবার উপায় নেই—রেলের পথেও শুনতে পাই গোলমাল হচ্ছে। নয়ত দেশে চলে যেতাম। এখানে ভাল লাগে না। এগজামিন দেব না।"

"হল কী রে?"

"কলেজের মেয়েরা দেখতে পারে না আমায়। প্রফেসারদেরও সন্দেহ।"

চোখ টলটল করে আসে, আর বেশী বলতে পারে না। গলায় গলায় ভাব যাদের সঙ্গে, হঠাৎ তারা যেন কী রকম হয়ে গেল! এমন যে সুজাতা, সে অবধি। একটা দিন না দেখলে এই রানীবাগান অবধি হুট করে চলে এসেছে, সেই সবিতা পাশ কাটায় এখন, অন্য বেঞ্চিতে বসে। নানা জায়গায় হাঙ্গামার খবর আসে, লায়লার দিকে চোখ পাকিয়ে চায়, সে-ই যেন দায়ী। কথাবার্তা তাকে আড়াল করে বলে। সে যেন চর, শুনে গিয়ে সমস্ত বলবে জাতভাইদের কাছে। দম আটকে আসে। আবার যদি ভাল সময় আসে, তখন যাবে কলেজে। তার আগে নয়।

লায়লা বলে, "মামী ভয় পেয়ে গেছে। পাবারই কথা। সময় থাকতে ভেবেচিন্তে কিছু কর মামা। শেষটা কিন্তু পালাবার পথ পাবে না।"

আলিম খাচ্ছিল। মুখ তুলে আশ্চর্য হয়ে বলে, "পালাব কেন রে?"

লায়লা রাগ করে বলে, "রানীবাগানের আর সবাই পালাচ্ছে কেন? বল-শক্তি তোমার চেয়ে কম? চারিদিক বিলকুল ফাঁকা হয়ে গেল, তুমি কিছু দেখতে পাও না। চোখ বুজে বেড়াও তুমি।"

অবহেলার হাসি হেসে আলিম বলে, "ওরা আর আমি! তিন পুরুষ বসতি এ-পাড়ায়। গলা চড়িয়ে কেউ কিছু বলতে আসুক, অমনি দেখবি পাড়ার ছেলেরা সেই লোকের টুঁটি চেপে ধরেছে। নতুন এসেছিস, তুই জানিসনে—আলিমদার নামে চারিদিকে সিন্নি পড়ে যায়।"

খেয়ে-দেয়ে যথারীতি দোকানে বেরুল। আলিমের বউ বলে, "দেখলে ত? ঐ রকম। কী করবে কর তুমি এখন। আমাকেও অমনি যা-হক বলে দিয়ে নাক ডেকে ঘুমোয়। নিজেদের জন্যে ভাবিনে, আমার ঐ নীলুফার—"

কথা তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নেয় লায়লা। সইতে পারে না। আট বছরের মামাতো ভাইকে ডাক দেয়, "শুনে যাও নীলু। বড্ড মজা তোমার। পড়াশুনো নেই, মস্তব বন্ধ, এমনি বার মাস চললে খুব ভাল হয়, না? সে হবে না। বই নিয়ে এস, আমি পড়াব।"

আলিম সেদিন একেবারে সন্ধ্যারাত্রে ঘরে ফিরল। মিত্র নিবাসে সবে গিয়ে বসেছে, চায়ের বাটিটাও হাতে নেয়নি, ভূষণ মিত্তির বললেন, "তুমি আর এস না বাবা আলিম। মানুষজন গরম। আমার বাড়ির উপরে শেষটা যদি কিছু হয়, বিপদের অন্ত থাকবে না।"

আলিম নিশ্চিন্ত সুরে বলে, "কিছু হবে না চাচামশায়। আমার যে পাড়া। চিরকালের বসতি—আমার আব্বাজান জীবন কাটিয়ে গেছেন। তাঁরও আব্বা—"

ভূষণ বলেন, "সে আমি বুঝি আলিম। আগে ছিল পাড়াগাঁ জায়গা—জানাশুনো ভাবসাব সকলের মধ্যে। এখন কত উটকো লোক এসে পড়েছে—তারা কি বোঝে, তোমার এখানে কত জোর? তোমার আমার আর কোন খাতির নেই। পাঞ্জাবিরা ক্যাম্প খুলেছেন আবার এই পাড়ার ভিতরে। ভিখারির বেহদ্দ হয়ে এসে কত মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। মনে মনে তাদের বিষের জ্বলুনি। তাই বলছি, যাও তুমি এক্ষুনি। ঘরে গিয়ে বসগে।"

হাসতে হাসতে আলিম বলে, "বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন চাচামশায়?"

"এই তুমি বুঝলে বাবা? চাচা বলে ডাক, সামাল করে দিচ্ছি তাই। এমন অবস্থা, আমরা আগুনে দাঁড়ালে আমাদেরও রেহাই করবে না।"

ঘাবড়ে গেল আলিম। পায়ে পায়ে বাড়ি এসে ভাগনীকে ডাকে, "কী করা যায় লায়লা? এই জায়গাটুকু ছাড়া দুনিয়ার কোনখান চিনিনে। খুলনার কোন্‌খানে

বাড়ি ছিল, আব্বার মুখে ছোট্টবেলা শুনেছিলাম, গাঁয়ের নামটাও মনে নেই। কোন্ চুলো খুঁজে বেড়াই এখন বল দিকি? কোন্ ভরসায় সব সুদ্ধ বেরিয়ে পড়ব?"

লায়লা বলে, "ঝাউতলায় মোবারক মোল্লার সঙ্গে দেখা কর মামা।"

ভ্রূ কুঁচকে আলিম বলে, "কেন? লোকটা ভাল নয় শুনেছি। বাংলা দেশেরও নয়। বাইরে থেকে এসে গরম গরম বুলি ছাড়ছে।"

"কিন্তু কাজিৎকর্মা লোক। আমাদের মতন যারা ফাঁকে ফাঁকে আছে, সকলকে নিয়ে এক জায়গায় করছে। হামলার ভয় থাকবে না।"

আলিমের কণ্ঠ হাহাকারের মত শোনায়: "হায় নসিব! আমার আপন কোট ছেড়ে দিয়ে কোথাকার কোন্ মোল্লার দোয়ায় বাঁচতে হবে? সে-লোকের মুখের জবানই ত অর্ধেক বুঝব না। বলিসনে আমায় ওসব, আমার দ্বারা হবে না।"

আর একটি কথা না বলে না খেয়ে সটান সে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল। আলিমের বউ কেঁদে বলে, "শুনলে ত? ও নড়বে না, তাসের আড্ডা হয়েছে কাল। আড্ডা থুয়ে এক-পা কোথাও যাবার জো নেই। এইখানে কবর হবে আমাদের। কেউ থাকবে না, আম্মা-নীলু-তুমি-আমি সকলে যাব। ও নিজেও যাবে।"

লায়লা তাড়া দিয়ে ওঠে: "আঃ, কী সব বল মামী? চুপ কর বলছি। চারদিকে এই অবস্থা—কুডাক ডাকতে ডর লাগে না তোমার?"

নানীর কাছে গেল লায়লা। মামী সঙ্গে চলল। নানীকে সুপারিশ ধরবে। মাকে খুব মান্য করে আলিম। তিনি বললে যদি শোনে।

"মামাকে তুমি একবার বলে দাও নানী, কালকেই চলে যাক ঝাউতলা রোডে। মোবারক মোল্লার সঙ্গে দেখা করে আসুক।"

নানী আর-এক মানুষ। পানের বাটা এনে পান সাজতে বসল পা ছড়িয়ে দিয়ে। কুটুর-কুটুর করে সুপারি কাটে। বলে, "দিদি, একটা পান খা—"

অধীর কণ্ঠে লায়লা বলে, "পান আমি কবে খেয়ে থাকি?"

"খাসনে ত অভ্যেস কর্। শালিকের মতন হলদে ঠোঁট দুলাভাইয়ের মনে ধরবে না।"

আলিমের বউ ফিসফিসিয়ে বলে, "দেখলে? চৌদিকে বেড়া আগুন—এখন হাসি-মস্করার সময়! যেমন মা তেমনি ছা, ওরা ঐ রকম।"

বুড়ী বলছে, "ঘরে নেবে না তোকে। আমার পান-খাওয়া রাঙা মুখ দেখে মজে যাবে দুলাভাই। আমায় নিয়ে দোর দেবে। সারারাত ছাঁচতলায় তুই ছটফট করবি, তখন কিন্তু গাল দিতে পারবিনে।"

"না, গালমন্দ দেব না, ছাঁচতলাতেও যাব না। ঘরে বসে ডিবে ডিবে পান সেজে পাঠাব তোমাদের। তোমরা মুখ আরও রাঙা কোরো। তোমার সে দুলাভাই কোন্ চুলোয় জানিনে, যেদিন আসবে তুমিই ঘর কোরো নানী, আমি শরিক হতে যাব না। আমি লেখাপড়া করব, পাস করব, বিলেত যাব। কিন্তু বর দিয়ে দিচ্ছি, তার দেনমোহর চাই। আগাম চাচ্ছি—আজকেই। সেই জন্যে এসেছি।"

মোলায়েম সুরে আবদারের ভঙ্গিতে বলল, "দরবারে এসেছি নানী গো। মামী আর আমি দুজনে এসেছি।"

বউ অন্ধকারের দিকে ছিল, সেদিকে এতক্ষণ নজর পড়েনি। ব্যাপার কিছু ঘোরাল বুঝে জিজ্ঞাসা করে, "কী?"

"গোড়াতেই ত বললাম। তুমি কানে নিলে না। চলে যেতে হবে এ-বাড়ি ছেড়ে, এ-পাড়ায় থাকা যাবে না।"

শেষ অবধি শোনবার তর সয় না, বুড়ী খেপে উঠল, "কে থাকতে দেবে না শুনি? কার চালে চাল দিয়ে বসত করি? থাকব এখানে চিরকাল। কে তাড়াতে চায়—মাথায় তার কড়কা পড়ুক, মুখের উপরে মুড়ো-ঝাঁটা। কে কী বলেছে শুনি?"

বউ লায়লার হাত ধরে টানে: "নাও, হল ত? চলে এস।"

বাইরে এসে শুনতে পাচ্ছে, হামানদিস্তায় পান ছেঁচছে বুড়ী। ঠনাঠন—ঠকঠক, ঠনাঠন-ঠকঠক। জোরটা আজ বড্ড বেশী। যারা ওদের যেতে বলছে, পান না [illegible]রে তাদের মাথা হলেও ছেঁচে তাল পাকিয়ে যাবে।

লায়লা নিজেই চলে গেল ভোরবেলা। সে এক দেখবার বস্তু। অগণ্য মানুষ এসে জুটেছে রাস্তার দুপাশের সমস্তগুলো বাড়ি নিয়ে। যাদের বাড়ি, তারা একটা-দুটো ঘর নিজেদের জন্য রেখে বাকী সব মেহমানদের দিয়ে দিয়েছে। এলাহি ব্যাপার—ঘড়ির কাঁটার মতন নিখুঁত কাজকর্ম। মোবারক মোল্লা আর তাঁর সাথী-শাগরেদ পাগল হয়ে খাটছেন।

লেখাপড়া-জানা বুদ্ধিদীপ্ত মেয়ে লায়লা—শতেক কাজের মধ্যে মোল্লা সাহেব সামনে বসিয়ে খাতির করে তার কথা শুনলেন। আর একজন—মোল্লা সাহেবের ডান হাত বলে মনে হয়—চিনে ফেলল: "আলিম—আরে চাঁদনিতে যার টুপির দোকান? এক নম্বরের বদমাস। মোসলমান হয়েও বড় দুশমন সে আমাদের। চাঁদনিতে মীটিং করতে গেলাম, চাঁদা চাইলাম। আলিম বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, এক পয়সাও চাঁদা দেব না আমরা কেউ।"

আদ্যোপান্ত শুনে মোবারক মোল্লা রাগে গরগর করছেন: "বেইমান, কমবখত্! চুড়ি বের করলেন তাড়াতাড়ি। বাক্স-ভর চুড়ি—মোটা কাচের সাদামাঠা বস্তু। বলেন "লাহোর লড়াই ফতে করে ফেলল, আম দের কিছু হয় না। হয় না এদেরই জন্য চুড়ি পাঠিয়েছে তারা মাতব্বররা হাতে পরা বলে।"

পুরনো ইট একখানা টেবিলের উপরে বলেন, "মসজিদ ভেঙেছে, তার ইট। কি না পারি ত এই ইট মাথায় ঠুকে মরা উচি অল্লাদের জাতের। তোমরা সবাই চলে এ তোমাদের আশ্রয় দেব। কিন্তু আলিম মিঞ জান-মানের দায়িক হতে পারব না। হিন্দ জায়গা হবে ত তার এখানে জায়গা নেই

এক ঘর লোকের মধ্যে লজ্জায় অপম মাথা নিচু করে লায়লা ফিরে এল। আ

হাঁপানিতে দৈবশক্তি

বিস্ময়কর আবিষ্কার নহে, মহাপুরুষের দান। ১ মাত্রা সেবনে চির আরোগ্যের গ্যারাণ্টী। রোগীর বয়স ও রোগ কত দিনের জানাবেন। শ্রীকমলা দেবী, কাঁঠালপোতা, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

প্রভাতের সুখ-স্মৃতি

'সাপ্লায়ারের চা'

পাইকারী ও খুচরা চা বিক্রেতা

সেল ডিপো:—

৯১, নেতাজী সুভাষ রোড,
৮এ, লালবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা—১

ফোন: ২২-৬১৫০

তেল মাখতে মাখতে শুনছে। বলে, "ইঁটের গায়ে লেখা আছে নাকি মসজিদ থেকে ভেঙে-আনা? বুঝিস না, অমনি সব বলে লোক খেপাচ্ছে।"

"কিন্তু মামা, চাঁদনির মীটিঙে অপমান করেছিলে তুমি ও'দের। চাঁদা দেবে না বলেছিলে।"

আলিম বলে, "চাঁদা তুলছিল গোলমাল বাধাবার মতলবে। তাই বুঝে সকলকে আমি মানা করলাম: দোকান করে খাই, হাঙগামার মধ্যে নেই আমরা।"

"সে রাগ পুষে রেখেছে। এই দেখ, চুড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে তোমার জন্য। চুড়ি পরে জেনানা হয়ে তোমায় অন্দরে যেতে বলেছে।"

নানী বুড়ী কোথায় ছিল, ছিনিয়ে নেয় সেই চুড়ি: "বাঃ, বেশ চকসই চুড়ি, মানাবে ভাল। পর্ দিকি দিদি। রোস্, আমি পরিয়ে দিচ্ছি।"

এই হল আলিমের মা। সেকেলে বুড়ো মানুষ—একভাবে দিন কাটিয়েছে, একালের অতশত বোঝে না। চুড়ি পরিয়ে দিয়ে কেমন হয়েছে, নাতনীর সুডোল হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে।

মন ভাল নেই। খেয়েদেয়ে আলিম দোকানে বেরুল। ট্রামে এসপ্লানেড গিয়ে নেমেছে। চাঁদনিরই অন্য এক দোকানদারের সঙ্গে দেখা। বন্ধুলোক। সে সামাল করে দেয়: "খবরদার, আর এক পা এগিও না।"

"কী হয়েছে?"

"কে কোন্ দিক দিয়ে মেরে বসবে, ঠিক কী?"

আলিম বলে, "শহর ত দু এলাকায় ভাগ হয়ে গেছে। বাপের জন্মেও ভাবতে পারিনি এমন। চাঁদনি ত আমাদের—মুসলমানের ঘাঁটি। আমার তবে ভয়টা কিসের? আমায় কিছু বলবে না।"

"জানবে কী করে কোন্ জাতের তুমি? মানুষের গায়ে ত মার্কা মারা থাকে না। দাড়ি রেখেছ, লুঙি পরেছ? তোমার পরনে প্যাণ্টালুন—হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সর্বজাতে যা পরে থাকে।"

"কিন্তু লুঙি পরে ত এই এন্দুরেও আসতে পারতাম না। ওদিককার হিন্দুপাড়া থেকেই ঠুকে দিত।"

হো-হো করে আলিম হেসে উঠল এক মজার কথা মনে পড়ে। বলে, "তবে ত ব্যাগে রকমারি পোশাক নিয়ে চলাফেরা করতে হয়। এই এন্দুরে আসব ধুতি পরে কোঁচা ঝুলিয়ে। ধুতি ছেড়ে এখান থেকে লুঙি। ধর্মতলা ছাড়িয়ে ফের আবার লুঙি বদলে ফেল। গতিক বুঝে ভোল পালটাও, তবে আর ভাবনা কিছু নেই।"

হাসি দেখে বন্ধু অবাক হয়ে যায়। হাসতে ত লোকে ভুলে গিয়েছে। মাথার উপরে খড়্গ, তার মধ্যেও প্রাণখোলা এমন হাসি হাসতে পারে, তবে আর ভয় কোথায় মানুষের? দুর্ভাবনা কী এমন করতে পারে?

বন্ধু বলে, "গোয়ার্তুমি কর না। চাঁদনিতে গিয়ে লাভটাই বা কী? খদ্দের নেই, দোকান খুলে কী হবে? লুঠপাটের ভয়ও আছে। হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, তা ছাড়া আছে চোর-ছ্যাচোড়-দাঙগাবাজের আর এক জাত। এই বাজারে রুজি-রোজগারের মওকা খুঁজে বেড়াচ্ছে। মুসলমান-হিন্দু সকলকে এক সঙ্গে নিয়ে এই জাতটা।"

ফিরল আলিম। হাসুক আর যা-ই করুক, মনটা খারাপ যাচ্ছে আজ সকাল থেকে। আনমনা হয়ে যাচ্ছিল। পিছন থেকে হঠাৎ ছোরা বসিয়ে দিল। বুঝতে পারেনি গোড়ায়। ঢিল এসে পড়ল যেন গায়ে, অথবা চিল পড়ে ঝাপটা দিয়ে গেল। পিছন ফিরে দেখল, দুটো লোক দৌড়ে পালাচ্ছে। মিত্র-নিবাসের ঠিক সামনে। প্রায় দোরগোড়ায়। পলকের মধ্যে ঘটল। আলিম চেঁচাচ্ছে, "আমায় ছোরা মেরেছে চাচা মশায়। কেষ্টদা, লালুভাই, বেরিয়ে পড় তোমরা। ধর ধর, ঐ পালায়—"

মেজ ছেলে কেষ্টকে নিয়ে ভুবণ মিত্তিরের দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। পাড়ার উৎপাত হয়ে উঠেছে। খাওয়ার সময়টা বাড়ি আসে, বাকি সময় পাত্তা পাওয়া যায় না। লোকের মুখে নানান কথা তাদের সম্বন্ধে। দাঙগার এই সময়ে সেই কেষ্ট বিষম কারিৎকর্মা হয়ে উঠেছে। মিত্র সংঘ বলে এক টিমটিমে ক্লাব তাদের—হঠাৎ দেখা গেল, সংঘের দুর্গতি অবস্থা কেটেছে। রমারম পয়সাকড়ি খরচ করে। পাড়ার মধ্যে এমন ছেলে—কেষ্টর বলেই আলিমের বল অনেক-খানি। কিন্তু কেউ বাড়ি নেই আজ। টলতে টলতে যেন নেশার ঘোরে চলেছে। আর নিভন্ত আলোর সকলখানি উত্তাপ নিয়ে চিৎকার করছে, "ছোরা মেরেছে আমায়। আমি আলিম বলছি। ছোরা মেরে আমার পাড়ার ভিতর দিয়ে পালিয়ে গেল।"

আশ্চর্য কাণ্ড! জনমানব নেই, কেউ সাড়া দেয় না। মসজিদের গলিতে ঢুকে চেঁচাচ্ছে। জুম্মাবারে আজ মসজিদ খা-খা করছে। বাড়ির দরজায় গিয়ে ঘা দিল, "ওমা, দোর খুলতে বল শিগগির। দাঁড়াতে পারছি না। আমায় মেরে দিয়েছে।"

এত রক্ত ছিল—এ আল্লা, ভলকে ভলকে সব বেরিয়ে আসছে। দেখে ভিরমি লাগে। দোরের গোড়ায় আলিম গড়িয়ে পড়ল।

সারা কলকাতা জুড়ে দাঙগার আগুন। দাউ দাউ করে জ্বলছে। লাহোর কিংবা যে জায়গার কথাই বলুন, পিছিয়ে নেই কারও চেয়ে। দুনিয়া জোড়া দু-দুটো লড়াইয়ের ঝড় পাশ কাটিয়ে গেল শুধুমাত্র কয়েকটি বোমা ফেলে। মনে বুঝি আপসোস ছিল—তা বিনি লড়াইয়ে মানুষ মারার শখ আচ্ছা করে মিটিয়ে নিচ্ছে।

এত বড় রানীবাগানের ভিতর কুল্যে তিনটে মেয়েলোক, আর দুই বাচ্চা। দিন-রাত দুয়োর দিয়ে আছে, আর আল্লার কাছে দোয়া পাড়ছে। তাঁর অজানা কিছুই ত নেই—কোন এক অঘটন ঘটিয়ে উদ্ধার করে দিন। হয়ত কোন মহাপ্রাণ মোটর ছুটিয়ে এসে থামলেন মসজিদের গলির মুখে: গাড়িতে চলে এস তোমরা, কোন ভয় নেই। ছোরা-লাঠির সামনে দিয়ে গাড়ি সাঁ করে ছুটে বেরুবে, বেকুব হয়ে তাকিয়ে থাকবে দুশমন। নিয়ে গিয়ে খাবার দেবে। দেদার পেট ভরে খাওয়াও বাচ্চাদের, নিজেরা যত ইচ্ছে খাও। দুনিয়ায় কত আজব ঘটছে, এমনি একটা-কিছু হয় না?

আলিমের মা বুড়ী চুপ হয়ে গিয়েছে। জারগা নিয়ে চিরকালের জোর আর নেই। ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। আশির কাছাকাছি বয়স, এতকাল যেমন দেখে এসেছে, কোন-কিছুর দলে মেলে না। মানুষের ছায়া দেখলে ভয়। সদর-দরজার আংটায় বড় তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। বাইরে থেকে তালা দিয়ে পাঁচিল বেয়ে অনেক কষ্টে উপরে উঠে চালে চালে ভিতরে এসে পড়ল। করছে লায়লা—তার এইসব বুদ্ধি। ঐ একজনই কেবল মাথা ঠিক রেখেছে: সাহস-হিম্মতে জোয়ানপুরুষকে

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

রায়সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত কবিরত্ন, এম, এ, প্রণীত

আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ যোগী কাশীর সুবিখ্যাত "গন্ধবাবা"র বিস্তৃত জীবনী ও উপদেশ। ৭৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। নানা সংবাদপত্রে ও পত্রিকায় বিপুল প্রশংসাপ্রাপ্ত। উপন্যাসের মত সুপাঠ্য অথচ বহু তত্ত্বকথায় পূর্ণ।

মূল্য—পাঁচ টাকা মাত্র।

—প্রাপ্তিস্থান—

এ, কে, দত্তগুপ্ত

৬১, লেক এভেনিউ, কলিকাতা-২৬

(সি ১৬৮৯)

ছাড়িয়ে যায়। বাইরে থেকে লোকে বুঝবে, রানীবাগান বিলকুল ফাঁকা, সমস্ত প্রাণী পালিয়েছে। নিজেদের কামরাতেও ঠিক এই রকম—সামনের দরজায় তালা, অন্য সব দরজা ভিতর থেকে খিল আঁটা। দিন কাটে রাত্রি কাটে। আল্লাকে ডাকে মনে মনে। ঘরের মধ্যেও ফিসফিসিয়ে কথা বলতে ভয়। দেয়াল ফেটে আওয়াজ বেরিয়ে পড়বে, জেনে যাবে মানুষ আছে ভিতরে। এক ফোঁটা নীলুফার অবধি কেমন সব বুঝে ফেলেছে, খিদে পেলেও কাঁদে না, ঝিমিয়ে পড়ে না।

ঘরে কিছু মুড়ি ছিল, পানি ছিল কলসি ভরা—পুরো দিনরাত্রি কেটে গেল বাসী মুড়ি আর পানি খেয়ে। ভয় কিছু গা-সওয়া হয়ে এল। আর লায়লা ত ঐ রকম—সে বলে, "কেউ না বেরও আমিই রসুই-ঘরে গিয়ে চাল ফুটিয়ে আনি। শুকিয়ে মরতে হবে, তার চেয়ে কেউ এসে কেটে রেখে যাক মামার মত।"
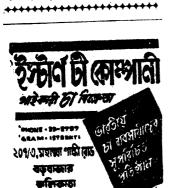
দিন দুয়েক পরে ঠিক দুপুরবেলা এক-কাণ্ড। টিনের চালে যেন মানুষ। সন্তর্পণে পা ফেলছে—তবু যত সামান্যই হক, আও-য়াজ মাথার উপরে। দুঃসাহসী লায়লা একটুখানি জানলা খুলে উঁকিঝুঁকি দেয়। দেখা যায় না। খুট করে আস্তে আস্তে ওদিককার দুয়ার খোলে। বউ ছুটে এসে হাত টেনে ধরে।

"ছেড়ে দাও মামী। মানুষই ঠেকছে। কদিন এমন থাকতে পারবে? আমরা আছি, কেউ জানে না। পুলিশই বা টের পাবে কী করে বল. উদ্ধার করবে কেমন করে? দেখতে দাও কী ধরনের মানুষ। সে-মানুষ আমায় দেখতে পাবে না।"

চেনা মানুষ গো! রহমান খাঁ। এই-খানে ছিল সে আর তার ফুফা দুজনে একটা খোপ নিয়ে। খাসি-পাঁঠার দোকান বাজারে। ভাড়া বেশী বলে কিছুদিন পরে চলে যায়।

রহমান খাঁকে দেখে আলিমের বউ বাইরে আসে। রহমানও খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে: "সকলে জানে, রানীবাগান একদম খালি। তোমরা রয়ে গেছ এর মধ্যে? এমনি হালে? কী দিগদারি এই হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হয়ে, গরিব মানুষ আমরা কোথায় যাই, কী খাই? একলা নই, দশজন আমরা। গোস্তর দোকান সকলের। বাজারের লাগোয়া বস্তিতে থাকতাম, আর থাকা যাবে না। দিনের চেয়ে রাত্রে ভয় বেশী। সরাব খেয়ে হল্লা দিয়ে বেড়ায়। কী গতিকে কালকের রাত্রিটা কেটেছে, আজ থাকলে রক্ষে হবে না কোন রকমে।"

যাচ্ছিল থানায়। গিয়ে পড়লে জান বেঁচে যাবে হয়ত। বেরিয়ে পড়েছে সেই কখন। লোকের নজর বাঁচিয়ে, গলিঘুঁজি ভেঙে নানান ঘুরপথে এইটুকু আসতে এত সময় লেগে গেল। এবারে ট্রামরাস্তা। আর হবে না, দশটা মানুষ একসঙ্গে ত নয়ই। রানী-বাগানের একটা খোপে লুকিয়ে-চুরিয়ে খানিকটা সময় কাটান যায় কিনা, সেইজন্যে মসজিদের গলিতে ঢুকে পড়েছে। একা রহমান পাঁচিল বেয়ে উঠল ভিতরের গতিক বোঝবার জন্যে। আর ন-জন বাইরে রয়েছে।

আলিমের বউ আকুল হয়ে বলে, "না না, এখানে নয়। তুমি ধর্মবাপ রহমান খাঁ, আরও কত ছাড়া-বাড়ি আছে, এদিকে তাক কর না। জানাজানি হবে। আমার নীলুকে বাঁচাতে পারব না।"

লায়লা তাড়া দেয়, "চুপ কর মামী। মাথা ঠাণ্ডা কর। রহমান খাঁ ওদের রেখে থানায় চলে যাচ্ছে। জীপগাড়ি নিয়ে আসবে। পুলিশের জিম্মায় সকলে আমরা চলে যাব। তিন মেয়েলোক পড়ে আছি, এরা এই এত-জন এসে পড়ল, তা-ই বা কত বড় ভরসা! আল্লার মেহেরবানি। এত ফরিয়াদ করছিলে, তিনি এনে দিলেন। চাবি নাও রহমান, চারিদিক দেখেশুনে তবে তালা খুলবে।"

সদর-দরজা খুলে ন-জনকে ঢুকিয়ে দিল। রহমান খাঁ দাঁড়ায় না। বলে, "চললাম। যেমন ছিল, বাইরে থেকে তালা দিয়ে যাচ্ছি। চাবি আমার কাছে থাক্। সাজ না লাগতে এসে পড়ব।"

লায়লা বলে দেয়, "থানায় গাড়িমসি করে ত ঝাউতলা রোডে মোবারক মল্লিককে ফোন করে দিও ওখান থেকে। তারা এসে পড়বে।"

প্রেম সিং বড্ড মনমরা হয়ে পড়েছে। লাহোর জেলায় ঘর—ঘরবাড়ি চুলোয় যাক, যা শোনা গেল, গ্রামের নিশানাই মিলছে না আর এখন। মানুষ মেরে গ্রাম পুড়িয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। ষাট-পঁয়ষট্টিজন নিয়ে বৃহৎ সংসার তাদের, তার মধ্যে একটি প্রাণীরও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

খালি ট্যাক্সি নিয়ে আস্তে আস্তে যাচ্ছিল। দেখে, মসজিদের দেয়াল ঘেঁষে মানুষ দাঁড়িয়ে। দেয়ালের সঙ্গে মিলে নিশ্চিহ্ন হতে পারলে বেঁচে যায় যেন। অতগুলো জোয়ান মরদ অমন নির্জীবের ভাবে রয়েছে—এ-পাড়ার মধ্যে ওরা কোন্ জাতের মানুষ, সেটা কিছু বলে দিতে হয় না। গাড়িটা আড়ালে রেখে প্রেম সিং চুপিসারে দেখছে। কী সর্বনাশ, বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে নিল সব-গুলোকে! একেবারে পাড়ার ভিতরে!

ট্যাক্সি চালানো মাথায় উঠে গিয়েছে প্রেম সিংএর। ক্যাম্পে ছুটল সকলকে খবর দিতে। রানীবাগানে একপাল গুণ্ডা এসে ঢুকেছে—আবার বুঝি তেমনি কাণ্ড ঘটায় আমাদের দেশে ঘরে যা হয়েছিল। তারা তৈরী হয়ে এসেছে বিস্তর হাতিয়ারপত্র নিয়ে। কত লোক? বিশ-পঞ্চাশ ত হবেই। কী রকমের হাতিয়ার? বন্দুক-ছোরা বল্লম-সড়কি সমস্ত।

সকাল থেকে জোর গুজব, এই তল্লাট চড়াও হবে আজ রাত্রে। রেল-পুলের কাছে অগণিত লোক জড় হয়েছে, স্বচক্ষে দেখে এসেছে কারা নাকি। সঠিক সময় অবধি বলে দিচ্ছে—অষ্টমী তিথি, রাত একটা নাগাদ চাঁদ ডুবে যাবে—রাস্তার আলো ত জ্বলেই না আজকাল— থমথমে অন্ধকারে সেই সময়ে মার-মার কাট-কাট করে এসে পড়বে। এখন প্রেম সিংএর কাছে এই ব্যাপার শোনার পর কিছুমাত্র আর সন্দেহ রইল না. রেলের পুল দিয়ে সামনাসামনি তারা ধেয়ে আসবে। আর এই একটা দল আগেভাগে এসে লুকিয়ে আছে, ঠিক

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ (২য় সং)

(জন্মনিয়ন্ত্রণে মত ও পথ)

—সর্বাধিকবিক্রীত জনপ্রিয় তথ্যবহুল সুলভ সংস্করণ—মূল্য ডাকব্যয় সহ ৫৬ নয়া পয়সা কেবলমাত্র M.O-তে অগ্রিম প্রেরিতব্য। ভিঃ পিঃ করা হয় না। মূল্য ডাকটিকিটেও দিবেন না।

মেডিকো সাপ্লাইং কর্পোরেশন

১৪৬নং আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

আধুনিক চশমা ও Zeiss B/L পাথরের জন্য

দি কুমিল্লা অপটিক হাউস

২৫৬এ, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

কোলের ওপর টেনে নিয়ে গেল। আরও কাছে এল আমার। বলল, 'তুমিও আমাকে ক্ষমা কর নরেশ। তুমি, আমি, প্রভাত, শংকর কেউই আমরা ভিন্ন হয়ে যেতে পারব না আর। তাই কোনদিনই আর আমরা এসব পারব না।'"

নরেশ নিশ্বাস নেবার জন্য একবার থামল। আবার বলল, "এই, এই আমার একমাত্র অপরাধ বিজুর কাছে, তোদের কাছে। এই—এই—।"

বলতে বলতে তলিয়ে গেল নরেশের গলার স্বর।

কিন্তু প্রভাত আর শংকরও তখন নিশি-পাওয়া জড়ের মত মুখ ঢেকে বসেছে। ওই একই অপরাধ, ভিন্ন জায়গায় একইভাবে ওরাও করেছে বিজুর কাছে।

একইভাবে প্রভাত অন্ধকার রাত্রে বিজুকে একা বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়ে সেই গাছ-তলায় দু হাতে টেনে এনেছিল কাছে। একইভাবে, বিজুর দুটি ঠোঁটের পিপাসায় ছাতি ফেটে গিয়েছিল তার। কিন্তু তার মনে হয়েছিল বিজুর ঠোঁট যেন শবের ঠোঁট। ঠান্ডা, রক্তহীন, অনড়, শক্ত। পরমুহূর্তেই প্রভাতের বুকের মধ্যে একটা ভয়ংকর সর্ব-নাশের মত মনে হয়েছিল, বিজুকে চির-দিনের জন্য হারাবে সে। কিন্তু বিজুই তার ঠোঁটের স্পর্শ দিয়ে নির্ভয় করেছিল তাকে। শুধু সেই ঠোঁটে কোন অকূল থেকে ভেসে আসা নোনা স্বাদ ছিল। সেই ঠোঁট নেড়ে সে বলেছিল, 'তা হলে আর দুজনের কাছে আমাকে মরতে হয় প্রভাত।'

একইভাবে এক বর্ষার রাতে, রেলের অন্ধকার ওভারব্রীজের নীচে শংকর বিজুর দুটি হাত চেপে ধরেছিল, যে হাত চেপে ধরার মধ্যে পুরুষ তার কিছুই গোপন রাখতে পারে না। তার বড় বড় চোখ দুটিতে দপদপ করে পতঙ্গ পড়ছিল। বিজু শুধু অপলক চোখে তাকিয়ে ছিল রেল লাইনের দিকে। একইভাবে সে শংকরকে শাসন করেছিল। একই কথা বলেছিল, সে স্বৈরিণী হলে একই প্রাপ্য তিনজনকে দিতে পারত। তা যখন নয়, তখন বন্ধুত্বকে রক্ষা করার প্রয়াসই বিজুর জীবনে অক্ষয় হয়ে থাক।

বিজু বন্ধুত্বকে রক্ষা করেছিল। ওদের আত্মনাশের আর বন্ধুত্বের দুর্গের অটল প্রহরী বিজু। তবে? ওদের তিনজনের সর্বক্ষণের ছায়া আর কেউ ভেদ করেছিল নাকি? ভেদ করে কোথায় যাবে? বিজুরই কাছে ত? যে-বিজু তাদেরই সঙ্গে মরছিল আর বাঁচছিল। তাদের ফিরিয়ে এনেছিল, বারণ করেছিল, ভালবেসেছিল।

রাত হয়েছে। ঠাস্ ঠাস্ করে গণেশ কাফের দরজা বন্ধের শব্দে ওদের চলে যাবার নির্দেশ দিচ্ছে। ওরা উঠে পড়ল।

কিন্তু পরস্পরকে কেউ ওরা ছেড়ে দিতে পারবে না।

বাইরের রাস্তা ধোঁয়ায় আর কুয়াশায় আবছা। শীতার্ত পথটা নরকের মত জন-হীন আর নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

কালকে ওরা কিছুই না জেনে, ফিরে যেতে পেরেছিল। আজকে ওরা ফিরে যেতেও পারছে না। বিজুর যে কলংক শহর ধিক্কার দিয়ে হেসেছে, সেই একই ধিক্কার দিতে গিয়ে, আর সকলের মত বিজুর বাবার চোখের সামনেও এই ত্রিমূর্তিই হয়ত ভেসে উঠবে। চির কলংকটা তাদেরই জন্য থেকে যাবে।

উত্তরদিকেই চলল ওরা। নিশিস্যাকরার

একটি আদর্শ সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠান

দি কমনওয়েল্থ এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

হেড অফিস ঃ—পুণা

স্থাপিত—১৯২৮

প্রধান কার্যালয় ঃ—৮২, মেডোস্ ষ্ট্রীট, ফোর্ট, বোম্বাই—১

দৃঢ়তম আর্থিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত "কমনওয়েল্থ" সন্তোষজনক সেবা দ্বারা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

আপনার সাধারণ বীমা বিষয়ক যাবতীয় প্রয়োজনের জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

কলিকাতা শাখা ঃ ১২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

টেলিগ্রাম—কমনওয়েল্থ ঃ টেলিফোন—২২-১৪৮১

আমবাগানের ধারটাই টানছে যেন ওদের। একজন হনহন করে তাদের পার হয়ে গেল হেঁটে। যেতে গিয়ে লোকটা যেন চমকে গেল তাদের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ যেন থমকে গেল এক মুহূর্তে। কুয়াশায় অস্পষ্ট দেখা গেল লোকটার উস্‌কোখুস্‌কো চুল। বড় বড় উন্মাদ চোখ দুটিতে চকিতে যেন একটা ভয়ের ঝিলিকও চমকাতে দেখা গেল। এক মুহূর্তমাত্র। তারপরেই, আরও দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল।

কে? চেনা-চেনা লাগল যেন মুখটা? ব্রজেন না?

মনে হতেই ওদের তিনজোড়া চোখ, চোখাচোখি করল আর ওদের মনের মধ্যে সহসা কেমন চমকে উঠল। যেন কী একটা ঘটে গেল ওদের মধ্যে, আর সে মুহূর্তেই তিনজনে ছুটে গেল ব্রজেনের দিকে। ছুটে গিয়ে, ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনজনেই। মুহূর্তমাত্র সময় না দিয়ে, টুঁটি ধরে নিয়ে গেল সামনের সরু গলির মধ্যে।

কেন ঘিরে ধরল তিনজনে ব্রজেনকে, নিজেরাই জানে না। শুধু ব্রজেনের মুখে যেন ওরা কী দেখতে পেয়েছে। দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছে। যদি কিছু জানে ব্রজেন, বলুক। ঘোচাক সন্দেহ।

ব্রজেন হাঁপাচ্ছে। এই শীতে ওর একটিমাত্র পাতলা জামার বোতাম খোলা। প্যাণ্টটা জুতো ছাড়িয়ে নেমে গিয়েছে, ধুলোয় লুটোচ্ছে, যেন খুলে পড়বে এখনি। সেটাকে ও ধরে আছে এক হাতে। সারা গায়ে ধুলো মাখা, যেন কোথায় গড়িয়ে এসেছে। ভয় নয়, চোখে ওর অস্থির উন্মাদ অস্বাভাবিক চাহনি।

যেন্‌সুরো ভাঙা গলায় দ্রুত বলল, "কী, কী চাও তোমরা? বিজু, বিজুর খবর?"

বিজু। বিজু। ওই নামটা ওরা কারও মুখ থেকে আর শুনতে চায় না। দাঁতে দাঁত চেপে ওরা তাকিয়ে রইল ব্রজেনের দিকে। যদিও চোখে ওদের বিস্ময় চাপা থাকছে না। কেবল প্রভাতের হাতে ছুরিটা চকচক করছে। যেন সময় হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে সে।

আবার, একই গলায় আরও তীব্রভাবে বলল ব্রজেন, "বিজুর খবর চাও তোমরা? বিজুর?" বলতে বলতে ওর উন্মাদ চোখ দুটোতে হঠাৎ জল দেখা গেল। আর দু হাত বাড়িয়ে ধরল প্রভাতের হাত। প্রায় ক্রুদ্ধ গর্জনের সুরে, বলল, "তবে মার, মার, আমাকে মার।"

ওরা তিনজনেই যেন দারুণ বিস্ময়ে একটা ভয়ংকর কিছুর কাছ থেকে সরে দাঁড়াল।

ব্রজেনের গলা ক্রমেই অতলে ডুবতে লাগল। তবু অস্থির গলায় বলল, "হ্যাঁ, আমি, আমি সে-ই। আমাকে তাড়াতাড়ি মার, মেরে ফেল। আমি, আমি সে-ই। আমি তাকে তিন মাস আগে সাত শ টাকা দিয়েছিলাম। সে আমার কাছে এসে চেয়েছিল। নইলে তার বাপকে, তার মা-ভাইবোনকে বাড়িওয়ালা এক রাত্রে বাইরে বার করে দিত। দু বছরের বাড়িভাড়া, আমি তাকে দিয়েছিলাম একটা সর্তে। যে-সর্তে আমি তার পেছনে ছায়ার মত ঘুরেছি। ছায়ার মত।"

ওরা তিনজনেই যেন ওত পেতে দাঁড়াল ব্রজেনকে টুকরো টুকরো করবার জন্য। ব্রজেনের গলা সহসা আরও চড়ল। বলল, "মার, প্রভাত, শঙ্কর, নরেশ, মার আমাকে। আমি সেই, বিজু যাকে সবচেয়ে বেশী ঘেন্না করত, যার কাছে শুয়ে তাকে মরার যন্ত্রণা পেতে হয়েছিল। যার ঠোঁটে, মুখে সে থুথু দিয়েছিল, অভিশাপ দিয়েছিল। তবু তার নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়েছিল; আমি সেই, যে তাকে তবু লোভীর মত ছিঁড়ে খেয়েছে, অনেকদিনের লালসায়। আমি সেই, যে তাকে শেষবারের মত মেরেছে। মার, মার আমাকে।"

কিন্তু খুনের নেশা কোথায় গিয়েছে তিনজনের। একটা অবিশ্বাস্য ভয়ংকর কাহিনী শুনে তিনজনেই যেন চলচ্ছক্তি-রহিত, বিহ্বল হয়ে গিয়েছে। শুধু একটা উন্মাদ জন্তু, তাদের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে মৃত্যুভিক্ষা করছে।

মৃত্যুভিক্ষার আর্তনাদ ওরা শুনছে, কিন্তু এখনও যেন সেই বিজুই ওদের হাত ধরে রেখেছে, যে তাদের সব পঙ্কিলতা আর পাশ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। মনে হল, ব্রজেনকে খুন করার নিষ্ঠুরতাকে বিজুই যেন দু হাত দিয়ে আগলে ধরে রেখেছে। ওরা দেখল, সেই পাঁশ-আস্তীর্ণ ত্রিভুজের ভিটেটায় এখনও ফুলটা ফুটে আছে, অম্লান।

সহসা ব্রজেনের গলার স্বর মোটা আর স্পষ্ট শোনাল। বলল, "মারতে পারলে না তোমরা। আমি কাল রাত্রি আটটা থেকে চব্বিশ ঘণ্টা বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। ঘুরেছি, সে বেঁচে থাকলে আজীবন তার পিছে পিছেই ঘুরতাম।"

আবার ওর চোখে সেই উন্মাদ ভাব পুরোপুরি ফিরে এল। প্যাণ্ট হেঁচড়ে হেঁচড়ে, টলতে টলতে চলে গেল। গেল সামনের ঝুপসি জঙ্গলের দিকে।

ওরা তিনজন তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে। তখনও ওদের নড়বার ক্ষমতা ছিল না। হয়ত ব্রজেন রেল-লাইনে মরতেই গেল। যাক। ওরা ফেরাতে যাবে না। কারণ, ওদের বুকের মধ্যে তখন ফেটে পড়ার একটা ভয়ংকর যন্ত্রণা টনটন করছে। তিনটি বুকে বিজুই তখন ফিস্‌ফিস করে যেন বলছে, কেন, কেন বিজু মরেছে?

বশেষে ওরা গেল।

অনেক বকে, অনেক বকিয়ে, অনেক হেসে, অনেক হাসিয়ে, নিজেরা জ্বলে আর এদের জ্বালিয়ে, শেষ অবধি মধ্যরাত্রি পার করে তবে এদের রেহাই দিল। বলে গেল, "চললাম বাবা, আর থাকলে গাল দেবে তোমরা।"

বিয়ের বরকনেকে জ্বালিয়ে মারবার প্রথা আমাদের দেশ ছাড়া আর কোন দেশে আছে কি না, এবং প্রথাটা কত বর্বর, সেই নিয়ে ছোট্ট একটু ভাষণ দেবে ঠিক করছিল দীপংকর, কনের কাছে মুখ রক্ষার্থে। কারণ এটা দীপংকরদের বাড়ি! আর দীপংকর স্বপ্নেও জানত না যে, ওর বাড়ির সেই শান্তশিষ্ট মেয়েগুলো একটা সুযোগ পেয়েই এত বাচাল হয়ে উঠবে। সভ্য মানুষের অবদমিত বর্বরতাকে মাঝে-মাঝে মুক্তি দেবার জন্যেই যে উৎসব ব্যাপারটার সৃষ্টি, সমাজ সংগঠক চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরই বিশেষ চিন্তার ফল হচ্ছে—যত রাজ্যের উৎসব আর অনুষ্ঠান, এ-কথা কোনদিন তলিয়ে ভেবে দেখেনি বলেই বোধ করি দীপংকরের এই অবাক হওয়া। আর সেই জন্যেই বোধ করি তার বাসর ঘরে চন্দ্রাবলীদের বাড়ির তরুণীদের উদ্দাম-উল্লাসকে "অসহ্য" বলে মন্তব্য প্রকাশ করে বসতে বাধেনি।

এখন এদের বাচালতায় লজ্জায় লাল হয়ে সবসমেত এই প্রথাটাকেই নিন্দা করবে বলে কথা গোছাচ্ছে, এমন সময় নতুন কনে চন্দ্রাবলী ফুলের মালাটা গলা থেকে খুলে ফেলতে ফেলতে স্থির গম্ভীরভাবে বলে বসল, "আপনার প্রেমপাত্রীটিকে দেখলাম।"

এর আগে পাঁচজনের মধ্যে একবার "আপনি" সম্বোধন শুনে দীপংকর ভেবে রেখেছিল ওইটা নিয়ে বৌকে কিছু পরিহাস করবে। ভালই হল, আলাপ-আলোচনার জন্যে কিছু উপকরণ মজুত থাকল।

কিন্তু এখন আর "আপনি" সম্বোধন কানে বাজল না। শেষ কথাটাই বাজের মত বাজল। চমকে উঠল দীপংকর, ভীষণ-ভাবে চমকে উঠল, বুঝি বা মানে বুঝতেও কিছুক্ষণ লাগল। তারপর বুঝে সমঝে খুব পরিষ্কার করে আস্তে বলল, "তোমার কথাটার ঠিক মর্মগ্রহণ করতে পারলাম না।"

"না পারাটা আশ্চর্যের! মর্মস্থলে পৌঁচেছে অবশ্যই—" বলে বিছানা থেকে একটা বালিশ নামিয়ে নিয়ে নীচে কার্পেটের উপর শুয়ে পড়ল চন্দ্রাবলী।

রূপকথার কাহিনীতে আছে মায়া-কন্যারা নাকি—একটি মাত্র মন্ত্র পড়ে মানুষকে পাথর করে দিতে পারত। রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র কোটালপুত্রের দল শিকারে গিয়ে অরণ্যের মধ্যে সহসা সেই মন্ত্র নিথর।

রূপকথার যুগ গিয়েছে, কিন্তু মায়া-কন্যারা আজও আছে। আজও তারা পারে একটি মাত্র শব্দমন্ত্রে রাজপুত্রদের পাথর করে দিতে।

অনেকক্ষণ পাথর হয়ে বসে রইল দীপংকর।

চন্দ্রাবলী এ সন্দেহ করল কী করে, সে-কথা ভেবে নয়, বসে রইল তার ভবিষ্যতের রঙ দেখে।

এ কী হল। কোথায় ছিল এই নাগিনী? দীপংকরকে ছোবল হানবার জন্যেই কি এতদিন বিষের পুঁজি জমিয়ে তুলছিল সে? জীবনটার চেহারা তবে কী হবে দীপংকরের?

উজ্জ্বল আনন্দময় একটা কিছু হবে, এ আশা ছিল না অবশ্যই। তবু ত মেনে নিয়েছিল অবস্থাকে, সংকল্প করেছিল মানিয়ে নেবে নিজেকে, কিন্তু এই একটি মাত্র মন্ত্রেই যে ধূলিসাৎ হয়ে [illegible] সে-সংকল্পের বনেদ।

অনেকক্ষণ পরে মনে এল চন্দ্রাবলী এ-সন্দেহ করল কেন! কে বলল? আরতির পক্ষে কি সম্ভব? নাঃ সে সম্ভব নয়! কিন্তু আর কেই বা? যে বালুনদী বরাবর বালুকণার আস্তরণের নীচ দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে, কোনদিন উদ্‌ঘাটিত হয়নি, তার সন্ধান অপরে দেবে কী করে?

তবু—আরতি? অসম্ভব।

ডেকরেটরদের লোক এসে অনেক আড়ম্বরে ঘরটা সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছে। কারণ দীপংকর বাড়ির ছোট ছেলে। হক তার বয়স ত্রিশোর্ধে, তবু ওপরওলাদের সাধ বাধা মানবে কেন?

ঘরটা রেশমে মখমলে পর্দায় কার্পেটে ফুলে আলোয় ভারাক্রান্ত, তার মাঝখানে শুধু চন্দ্রাবলীকেই দেখাচ্ছে—পাখির মত হালকা। ছোট হালকা শরীর, শুয়ে আছে গুটিয়ে সুটিয়ে ছোট্ট হয়ে, পরনের শাড়ি ব্লাউজগুলোও যেন প্রজাপতির ডানার মত হালকা কোমল পেলব। চেয়ে থাকতে থাকতে অন্যমনস্কের মত সম্পূর্ণ অবান্তর একটা কথা ভাবল দীপংকর।

এ-কাপড়কে কী বলে? সিল্ক? শিফন? নাইলন? বিয়ের বাজারের সময় এই শব্দগুলি বারবার কানে এসেছিল।

কিন্তু ওই সুকুমার আবরণের মধ্যে এমন কাঠিন্য আশ্রয় নিয়েছে কী করে?

দীপঙ্কর অবশ্য পারে ওকে অবহেলা করতে, ওকে বাদ দিয়ে নতুন করে নিজের জীবনের ছক কাটতে, যে ভুল হ'য়ে গিয়েছে, সেটা ছাড়া অন্য ভুল না করতে, কিন্তু তার আগে ত জানতেই হবে চন্দ্রাবলীর এ-সন্দেহ হল কোন সূত্রে!
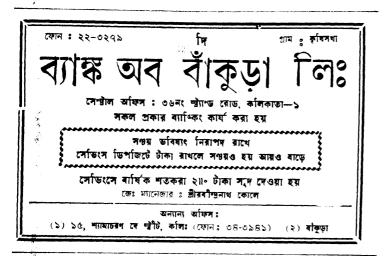
পূজার দিনে—উৎসব অনুষ্ঠানে প্রিয়জনের উপহারে

সর্বজন প্রশংসিত বিখ্যাত **সামারকুল** (জালি), **স্বস্তিকা**, **ইনটারলক্‌** ও অন্যান্য ক্রাউন মার্কা প্লেন গেঞ্জী পরিচ্ছদের এক অবিস্মরণীয় অবদান।

KALIGHAT HOSIERY FACTORY
231, RASHBEHARI AVENUE
CALCUTTA 19

জানতেই হবে। না জানলে চলবে না—দীপঙ্করের।

খাট থেকে তাই নেমে এল দীপঙ্কর।

চন্দ্রাবলীর কাছাকাছি বসে পড়ে বলল, "তোমাকে একটা কথা অন্তত সোজা স্পষ্ট বলতে হবে।"

চন্দ্রাবলী ঘুমের ভান করল না, ভান করল না অভিমানের, স্পষ্ট সুরেই বলল, "জানি কী জানতে চান। তার উত্তর হচ্ছে ও-কথা কাউকে বলে দিতে হয় না।"

দীপঙ্কর তীব্র স্বরে বলে উঠল "তোমার বয়েস কত শুনতে পারি?"

"স্বচ্ছন্দে! ছাব্বিশ।"

ছাব্বিশ! আশ্চর্য হল দীপঙ্কর, দেখে মনে হয় কুড়ির নীচে।

এরপর আর ত বলা চলে না—"এত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলে কবে?" কিন্তু ছোবল কি শুধু নাগিনীরাই হানে?

দীপঙ্করের মুখের পেশীতে একটা কুঞ্চন দেখা দেয়, যেটাকে নাকি হাসিও বলা চলে।

"আলাপ হল আমার প্রেমপাত্রীর সঙ্গে?"

চন্দ্রাবলী উঠে বসল। রঙিন আলো ছড়িয়ে রইল ওর মুখে চোখে সর্বাঙ্গে। ঝিকিয়ে উঠল গায়ের নতুন গহনা। বলল, "হল বৈ কি।"

"কেমন লাগল?"

আর একটা কুঞ্চন দীপঙ্করের মুখের পেশীতে।

চন্দ্রাবলী একটু তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলল, "আর যাই হক পছন্দর প্রশংসা করা চলে না।"

"সে-ত্রুটিটা ত অপর ক্ষেত্রে শুধরে নেওয়া গেছে—" দীপঙ্কর উঠে দাঁড়িয়ে একটা হাই তোলার ভঙ্গী করে বলল, "মন্দ হল না! দুটো মিলিয়ে একটাই হল।"

"তার মানে?" অসতর্কে বলে ফেলল চন্দ্রাবলী।

"মানে আর কি—" বিছানায় শুয়ে পড়ে দীপঙ্কর বালিশটা কাত করে বসিয়ে নিয়ে আর একটা হাই তুলে বলল, "একবারের সওদা দেহবিহীন হৃদয়, আর একবারের সওদা হৃদয়বিহীন দেহ, অতএব—"

"ইতর।"

অস্ফুট এই শব্দটা কি কানে এল দীপঙ্করের? আর কানে এল বলেই কি মুখের পেশীর বিকৃতিটা একটু বেশী স্পষ্ট হল?

দু বাড়ির লোক অবাক হয়ে গেল দীপঙ্করের নতুন সিদ্ধান্ত শুনে। এটা কী হ'ল? যে-লোকটা বিদেশ থেকে ছুটি নিয়ে এসেছে বিয়ে করতে, সে ছুটির

শেষে ফেরবার সময় বৌকে নিয়ে যাবে এটাই ত স্বাভাবিক। স্থিরও ছিল তাই। কিন্তু দীপঙ্কর একলা যেতে যায়।

কেন? কেন?

এমনি। থাকুক না শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে, শিক্ষা সহবত হক। ইচ্ছে না হয়, মা বাপের কাছে থাকুক গে। দীপঙ্করের ত কোন অসুবিধে নেই ওখানে। অদ্ভুত ভাল চাকর বাকর রয়েছে।

চাকর? তাতে সব হবে?

কেন নয়? এ যাবৎ ত' বেশ চলে যাচ্ছিল।

কেউ বলল ঢং, কেউ বলল 'আদিখ্যেতা', কেউ বলল 'মান-অভিমানের পাঠ নেওয়া হচ্ছে।' বলল অবশ্য বেশির ভাগ চন্দ্রাবলীর কাছেই। আর—যাবার আগের দিন দুপুরে চন্দ্রাবলী সরাসর দীপঙ্করের কাছে গিয়ে সোজাসুজি বলল, "আমি বিলাসপুর যাব।"

"বিলাসপুরে যাবে! অর্থাৎ?" ঠিক বুঝতে পারল না দীপঙ্কর এটা কী। অভিভাবক-পক্ষের শিক্ষা? সে-শিক্ষা নিয়েছে চন্দ্রা?

চন্দ্রাবলী এক পলক দেখে নিয়েই বলল, "না কেউ কিছু শিখিয়ে দেয়নি আমায়—" তারপর একটু হেসে উঠে বলল, "আর ঘরে বেশী মন-কেমনও করছে না। শুধু যেটা লোকচক্ষে স্বাভাবিক, সেইটি করতে চাই।"

"আমার জীবনে স্বাভাবিকের স্থান কম।" বলল দীপঙ্কর।

চন্দ্রাবলী দৃঢ় গলায় বলল, "সেটা আপনার ভাগ্য। তার জন্যে আমি কেন লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হব? সংসারের পাঁচজনের কাছে যেটা ঠিক, তেমনি জীবন আমি চাই, অন্তত দৃশ্যত।"

দীপঙ্কর একবার দেখল তাকিয়ে ও-মুখের কোনখানে কোমলতার অথবা দুর্বলতার ছাপ আছে কি না। সেই দুর্বলতার ছল কি না এটা!

নাঃ! সে-মুখ কাচের পুতুলের মত সুন্দর আর কঠিন। মৃদু হেসে বলল, "কিন্তু আমি যদি না চাই?"

"ভেতরের জীবনটা চলুক আপনার ইচ্ছে অনুযায়ী, বাইরেটায় চলবে না।"

"অর্থাৎ আইনের দাবি মানতে হবে?" বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল দীপঙ্করের মুখে। কিন্তু এ-হাসি চন্দ্রাবলী দেখেও দেখল না, বলল, "হ্যাঁ। আর সেটা অস্বীকার করতেও পারেন না।"

"তা অবশ্য পারি না। বেশ ঠিক আছে। যেতে পার চল।"

স্বামীর সংগে বিদেশে বাসায় আসার পটভূমিকা চন্দ্রাবলীর এই। সে-পটভূমিকায় ছবিটাও আঁকা হচ্ছে তেমনি। যেন একটা কাচের দেওয়ালের দু পাশে দুজন দাঁড়িয়ে রয়েছে, দুজনে দুজনকে দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট নির্ভুল, শুধু কেউ কাউকে ছুঁতে পারছে না। অথচ এ-দেওয়াল ভেঙে ফেলবার গরজও নেই ওদের। বরং দেওয়ালের দুদিক থেকে আঘাত-প্রত্যাঘাতের খেলাটাতেই ঝোঁক বেশী।

এই সৃষ্টিছাড়া জীবনের সাক্ষী কেউ নেই, তাই বোধ করি কোনদিন কোন কারণেই পদ্ধতির পরিবর্তনও ঘটছে না।

এক দীপঙ্করের সেই অদ্ভুত ভাল চাকর রামলাল। তাকে আর কে গ্রাহ্য করছে? সে এখনও তেমনি ভাল। শুধু ওর কাজ বেড়েছে, একজনের জায়গায় দুজনের সেবা।

স্বামী-স্ত্রীর জীবনযাত্রার পদ্ধতিটা এই। সকাল বেলা রামলাল চা দিয়ে যায়, দীপঙ্কর একা নীরবে বসে খায়, খেয়ে খবরের কাগজখানা মুখের সামনে তুলে ধরে। চন্দ্রাবলী ধীরে সুস্থে এসে বাকী পেয়ালাটায় দুবার করে চা ঢেলে খায়, তারপর উঠে গিয়ে গৃহিণীজনোচিত মর্যাদার ভংগীতে চাকর বাকরকে এটা ওটা নির্দেশ দেয়, রামলালকে 'বাবু'র খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে বাহুল্য একটু উপদেশ দেয়, তারপর নিজের ঘরে গিয়ে বইপত্র সেলাই ইত্যাদি নিয়ে বসে।

চাকর-মহলে তাদের নিয়ে সমালোচনায়

স্রোত বয়, আর তাদের মাধ্যমে পাড়াপড়শীর বাড়িতেও। এ-দিকটায় অবশ্য বাঙালী বেশী নেই, দু একজন যাঁরা আছেন, প্রথম প্রথম এসেছিলেন তাঁরা আলাপ করতে, কিন্তু চন্দ্রাবলীর হিম-শীতল অভ্যর্থনায় সে-চেষ্টা থেকে বিরত হয়েছেন তাঁরা।

দুপুরে বাড়িতে খেতে আসে দীপংকর, লাগু বল্ল ত লাগু, ভাত বল্ল ত ভাত! বরাবরই আসে। মোটর-বাইকটার শব্দ হতেই রামলাল তটস্থ হয়ে টেবিল সাজায়, কুকারে চাপানো গরম ভাত থালায় ঢেলে পরিপাটি করে বাড়ে, দাঁড়িয়ে থাকে হুকুমের আশায়।

চন্দ্রাবলীর খাওয়া হয়ে গিয়েছে কখন, ও তখন কোনদিন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোয়, কোনদিন বা বই পড়ে।

মোটর-বাইকের শব্দটা দুবার করে শুনতে পায়, এল আর গেল। সে-শব্দের ধাক্কায় কাচের দেওয়ালের গায়ে ফাটল ধরতে দেখা যায় না।

সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফেরে দীপংকর, কোনদিনই তখন বাড়ি থাকে না চন্দ্রাবলী। বেড়াতে যায় এখানে সেখানে। হয়ত বা স্টেশন বরাবর। যখন ফেরে, তখন দীপংকর বেড়াতে বেরিয়ে গিয়েছে।

আর রাত্রে?

রাত্রে নাকি মানুষ দুর্বল হয়ে যায়, বোকা হয়ে যায়, ব্যক্তিত্ব হারায়, মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে বসতে দ্বিধা করে না! রাত্রি ছলনাময়ী, রাত্রি নিষ্ঠুর, রাত্রির হাতে নাকি জাদুদণ্ড!

রাত্রির নামে এমন অনেক খ্যাতি আর অখ্যাতি আছে। কিন্তু এদের কাছে সেই অসীম শক্তিময়ীও হার মেনেছে। অথচ আয়োজনের ত অন্ত নেই তার! সে কোনদিন বা আনে জ্যোৎস্নার বন্যা, সে-বন্যার ঢেউ খেলে বাগানে উঠোনে ঘরে, জানলার পথ ধরে বিছানায়, কোনদিন আনে অন্ধকারের নিথর রহস্য, অদৃশ্য কোন জগতে কোন মায়াবিনীর নূপুর বাজতে থাকে, তার শব্দ-শিহরণ গাছের পাতায় পাতায় দেওয়ালের গায়ে গায়ে ফিসফিসিয়ে ওঠে, কোনদিন আলোছায়ার লুকোচুরিতে বাতাস চঞ্চল হয়ে ওঠে, কিন্তু এদের ঘরের দরজা থেকে ফিরে যায় তারা মাথা হেঁট করে। এত আয়োজনেও দরজার খিল খুলে পড়ে না। আসে ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাতের দুরন্ত রাত্রি, আসে অসহায় হিমরাত্রি, আসে বাতাস-আছড়ে-পড়া শরৎ বসন্তের এলোমেলো রাত্রি, এদের দরজার কপাট নড়ে না। বরং সে-সব রাতে খিল আটকানোর শব্দটা যেন একটু বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দুজনেই যেন কী এক যুদ্ধজয়ের সংকল্প নিয়ে মরণপণ করে বসে আছে, কেউ পরাজয় মানবে না।

কথা কি বন্ধ ওদের?

না, একেবারে বন্ধ কই? তা হলেও ত সেই অভিমানের ফাটল থেকে দেওয়াল ভেঙে পড়বার আশ্বাস থাকত। কথা বন্ধ নেই। কথা আছে। হয়ত কোনদিন দীপংকর বলে, "আজ ফিরতে রাত হবে।"

চন্দ্রাবলী সেলাইয়ে চোখ রেখে বলে, "আচ্ছা, রামলালকে বলব।"

হয়ত চন্দ্রাবলী বলে, "বংশী দেশে যাবার জন্যে ছুটি চাইছিল—"

"তাই বুঝি। কদিনের জন্যে?"

"তা ঠিক জানি না, তোমাকে বলতে বলেছিলাম, সাহস পাচ্ছে না।"

"সাহসের কী আছে! ছুটি দিয়ে দিও, অফিসের চাপরাশীকে বলে দেব, ওর সন্ধানে লোক থাকে।"

হয়ত দীপংকর বলে, "তোমার বাবা আমায় চিঠি দিয়েছেন, অনেকদিন তোমায় দেখেননি বলে—"

চন্দ্রাবলী সহজভাবে বলে, "আমাকেও লিখেছেন।"

"যেতে চাও ত ব্যবস্থা করে দিতে পারি।"

"দরকার হবে না।"

"আমার ছুটি পেতে ত ঢের দেরি!"

"তাড়াই বা কী?"

হয়ত দীপংকর বলে, "এ কী, তুমি রান্না করছ যে? রামলাল কোথা গেল?"

"কী দরকারে হঠাৎ বাজারে গেছে।"

"এত ব্যস্তর কী আছে? ও এলেই হত?"

মাশেডেটের 'হাতী মার্কা' কর্ক ও কর্ক প্রোডাক্টস্-এর জন্য আপনার আমদানী লাইসেন্স ব্যবহার করুন। যোগাযোগ করুনঃ—

জে বি দস্তুর এণ্ড কোং

২৮, গ্যাণ্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

"ব্যস্ত হইনি। ভাতটা পুড়ে যাচ্ছে কি না দেখতে এসেছিলাম—" বলে রান্নাঘর থেকে চলে আসে চন্দ্রাবলী। 'আপনি' গিয়ে বরং 'তুমি'টাও এসে গিয়েছে কথার পিঠোপিঠি।

এমনি করেই চলছিল। বোবা রাত্রি আর অসাড় দিনগুলো নিয়ে, কিন্তু হঠাৎ এই জমাট অবস্থাটার উপর একটা ঢিল এসে পড়ল! একটা পোস্টকার্ডের চিঠি।

এ-চিঠি অপ্রত্যাশিত।

এ-চিঠি আরতির।

ও লিখেছে অফিসের কী কাজে ওকে নাকি কয়েকটা দিনের জন্যে বিলাসপুরে আসতে হচ্ছে, অতএব কোথায় আর থাকবে, দীপঙ্কর ওখানে থাকতে? পারিবারিক একটা সম্পর্ক আছে, কাজেই প্রস্তাবটা অসম্ভবও নয়, অসঙ্গতও নয়। এই সম্পর্কের বালুস্তরের নীচে দিয়েই ত সহজে প্রবাহিত হতে পেরেছিল সেদিনের সেই ঝিরিঝিরি নদীটি।

চিঠিখানা দীপঙ্কর চন্দ্রাবলীর সামনে ফেলে দিয়ে বলল, "কী উত্তর দেব?"

চন্দ্রাবলী চমকে তাকাল দীপঙ্করের দিকে, তারপর আবার পোস্টকার্ডটার দিকে, আর কোনদিন যা না করেছে তাই করে উঠল। হেসে উঠল খিলখিলিয়ে।

দালান থেকে রামলাল চমকে উঠল, তারপর বুকে হাত দিয়ে বোধ করি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চলে গেল বংশীকে খবর দিতে।

হাসি থামলে বলল চন্দ্রাবলী, "আমায় জিজ্ঞেস করছ?"

বিচলিত হল না দীপঙ্কর। মৃদু গম্ভীর হেসে বলল, "জিজ্ঞেস করতে ত বাধ্য। বাড়ির গৃহিণী যখন।"

"তা বটে! ঠিক আছে, আসতে লিখে দাও।"

"দেব?"

"আমার দিক থেকে কোন বাধা নেই। ভয় নেই, অতিথির অমর্যাদা হবে না।"

পোস্টকার্ডটা তুলে নিল দীপঙ্কর। একবার বুঝি যাবার জন্যে পা বাড়াল, তারপরই হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলে বসল, "অতিথির অমর্যাদা হবে না, তা জানি। কিন্তু গৃহকর্তার?"

চন্দ্রাবতী একটু অবাক-অবাক চোখে তাকাল।

দীপঙ্কর আর একটু কাছে সরে এসে একটু ঝুঁকে বলল, "এই কটাদিন গৃহকর্তার মর্যাদা রক্ষার ভার নিতে পার না?"

"কথাটার ঠিক মানে বুঝছি না।"

দীপঙ্কর বোধ করি একটু ইতস্তত করল, কয়েক পা পায়চারি করল, তারপর হঠাৎ খুব কাছাকাছি এসে ব্যগ্রভাবে বলল, "এই কটা দিন আমাদের একটু অন্যভাবে থাকা কি সম্ভব হয় না?"

"অন্যভাবে মানে?" সত্যিই বুঝি বুঝতে পারছে না চন্দ্রাবলী।

"মানে? মানে—ইচ্ছে হচ্ছে না যে, ও এসে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা দেখুক।"

"ও-হো-হো-হো-হো!" আবার, হেসে উঠল চন্দ্রাবলী, বুঝলাম। "তোমার প্রেমপাত্রীর সামনে মান রাখতে এ-কটাদিন অভিনয় করতে হবে আমাকে। কেমন? তাই না?"

দীপঙ্কর শান্তভাবে বলল, "সেটা কি একেবারেই অসম্ভব?"

"অসম্ভব আর কী? 'অসম্ভব' বলে সংসারে সত্যিই কিছু আছে নাকি।"

"তা বটে! কিন্তু আমার প্রার্থনাটা খুব নির্লজ্জ হল না?"

"এমন আর কী?"

"কিন্তু কারণটা ত জানতে চাইলে না?"

"ওমা এ ত জলের মতন সোজা, আবার জিজ্ঞেস করে জানতে হয় নাকি?

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল দীপঙ্কর কী অদ্ভুত অন্যরকম দেখাচ্ছে চন্দ্রাবলীকে। হাসলে মানুষের চেহারা এত বদলে যায়?

নিজে থেকে এবার একটা কথা বলল চন্দ্রাবলী। বলল, "বেচারা মেয়েটা! তোমার বিরহে জীবনটাই বরবাদ দিল, আর তুমি দিব্যি—কিন্তু ওকে বিয়ে না করবার হেতু?"

"কত অহেতুক জিনিসও সংসারে মস্ত

শারদীয় অভিনন্দন জানাই
নলিন বিহারী শেঠ
এণ্ড সন্স
প্রসিদ্ধ লোহ ব্যবসায়ী
ডি ২১, জগন্নাথ ঘাট (লোহাপটী),
কলিকাতা-৭ ফোনঃ ৩৩-২৪৭৭

অলঙ্কার শিল্পে চিরন্তন ভাবধারা
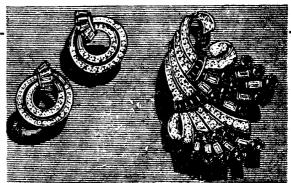
যুগান্তের ঐতিহ্যই গ'ড়ে তোলে
শিল্পীর নিখুঁত নির্মাণ কৌশল।
ভারতীয় অলঙ্কার শিল্পের সুনিপুণ কুশলতা
সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের মূর্ত প্রতীক।

পি, বি, সরকার এণ্ড সন্স
সন্ এণ্ড গ্রাণ্ডসন্স অব্ লেট বি, সরকার
৮৯, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-২০, ফোন—৪৭-৩০৯৩

একটা হেতু হয়ে দাঁড়ায়!" বলে আস্তে আস্তে চলে গেল দীপংকর।

চন্দ্রাবলী স্টেশনে গেল।

হৈ হৈ করে অভ্যর্থনা করল আরতিকে, "ভাগ্যিস-যাই এখানে অফিসের কাজ পড়ল, তাই পায়ের ধুলো পড়ল মশাইয়ের। কদিনের মেয়াদ? মাত্র চারদিন? ওমা! তা চলবে না। ইচ্ছে করে খাতাপত্র জটিল করে ফেলে বলে পাঠাও, আরও সময় লাগবে।"

আরতি বোধ করি এতটা আশা করেনি, কারণ বিয়ের সময় দেখেছিল চন্দ্রাবলীকে। ভাবল, যাক, দীপংকর তাহলে সুখী হয়েছে।

ভেবে সুখী হল কি?

কে জানে। আরতিদের মত গম্ভীর আত্মস্থ মেয়েদের মনের কথা বোঝা যায় না।

চায়ের টেবিলে হাসির ঝড় তোলে চন্দ্রাবলী, "ও মা কী কাণ্ড! চা খাওনা তুমি? কাজ কর কিসের জোরে? যাক গেলই হল, আমি এক পেয়ালা বাড়তি খেয়ে নিই। কী দেব তাহলে, কফি? কী গো, তুমিও কি অতিথির সংগে কফি খাবে নাকি? বল ত দিই তাই।"

অভিনয়ের প্রস্তাবটা দীপংকরেরই, তবু ও যেন অপ্রতিভের একশেষ হয়ে পড়ছে। কিন্তু চন্দ্রাবলী একাই একশ। আরতির স্বাভাবিক গাম্ভীর্যও ওর হাসি-কৌতুকের ঝড়ে ধুলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে।

রান্নাঘরে বসে রামলাল বলে, "ব্যাপার কী বল ত বংশী?"

"বোধ হয় কিছু খেয়েছে।" বংশী বিজ্ঞভাবে বলে।

"ধ্যেত। কী বাজে বকিস?"

"বাজে নয় রে। আগে অন্য অন্য ঘরে আমি দেখেছি। পেটে 'কিছু' পড়লেই প্যাঁচামুখ লোকগুলো ফূর্তিবাজ হয়ে যায়।"

কিন্তু বংশীর কথা বুঝি এক হিসেবে ঠিক।

চন্দ্রাবলী যেন কী এক নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছে। ও নিজে হাতে রেঁধে অতিথিকে খাওয়াবে, তাকে জোর করে টেনে নিয়ে বেড়াতে যাবে, গান গেয়ে শোনাবে, কবিতা আবৃত্তি করিয়ে শুনবে, আর মুহূর্তে মুহূর্তে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠবে দীপংকরের সঙ্গে ব্যবহারে।

এই দেখ! শুয়ে পড়লে মানে? বেড়াতে যাওয়া হবে না? ইস! আবদার কত! 'আলস্য করতে ইচ্ছে করছে!' ও সব চলবে না। ওঠ শীগগির।......ও কি, উনি বোঝাতে চান আমার রান্না একেবারে অখাদ্য। ......আচ্ছা তুমি রোজ কী বলে অফিস যাচ্ছ? অতিথির সম্মানার্থে একটা দিনও অন্তত ছুটি নেবে ত?

দীপংকর যেন দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে।

ভেবেছিল নিজের বঞ্চিত জীবনের গ্লানিটা যাতে নিতান্ত স্পষ্ট হয়ে না ওঠে আরতির চোখে, এটুকু অন্তত করুক চন্দ্রাবলী। আরতি যেন দীপংকরকে করুণা করবার সুযোগ না পায়। কিন্তু চন্দ্রাবলী যেন আর এক যুদ্ধজয়ের খেলায় বিভোর।

যেখানে এক গণ্ডূষ জলে কাজ মিটত, সেখানে চন্দ্রাবলী বন্যা বহাচ্ছে।

রাত্রে—প্রথম রাত্রেই, নিজের ঘরে দুটো বিছানা করে ফেলে চন্দ্রাবলী আরতির হাত ধরে দীপংকরের ঘরের দরজায় উঁকি মেরে এক গাল হেসে বলেছিল "আমি আরতির সংগেই শুচ্ছি, বুঝলে? সারারাত রাজ্যের আজেবাজে গল্প করে কাটাব।"

আরতি অপ্রতিভ হয়ে বলল, "আরে সে কী? ছি ছি। না।"

চন্দ্রাবলী এ-আপত্তি উড়িয়ে দিয়ে হেসে হেসে বলে, "না কেন! ও ত চির দিনের, তুমি হলে দুদিনের।"

আরতি রাগ দেখিয়ে বলে, "ওর সংগে আমার তুলনা কিসের?"

"আচ্ছা বাপু, তুলনা না হয় নাই হল অতুলনীয়ই উনি। কিন্তু দু-একদিন ঘ বদল করতে ভাল লাগে। ভারী ইচ্ছে ক এক একদিন এ-ঘরটায় শুতে। শুয়ে শু কেমন ওই ঝাউ গাছের মাথা নাড়া দেখা য এ-ঘর থেকে। তা একা ত শুতে পারি ন আর বাড়ির কর্তাটি লোহার সিন্দুক এ রেখে অন্যত্র শুতে রাজী নয়।"

স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে দীপংক ওর মনে হয় বুঝি ঘুমের জগতে রয়ে এ কী অসম্ভব সম্ভব। আর স্তম্ভিত হ থাকে বুঝি ঝাউগাছের ওই ঝিরঝিরে পা গুলো। যাদের প্রত্যেকখানির গায়েই ব বিনিদ্র রাত্রির দীর্ঘশ্বাস লেখা আছে।

নিরালায় আরতিকেই পেতে চাইবে, এ হত দীপংকরের পক্ষে স্বাভাবিক, কি পাশার ঘুঁটি কখন যে কোথায় গিয়ে প চন্দ্রাবলীকেই নিরালায় আবিষ্কার ক চায় দীপংকর। যেন কোথাকার কোন এ মরচে-পড়া তালা খুলে পড়েছে, আর দরজা খোলা ঘরের মধ্যে থেকে ছ পড়েছে অগাধ ঐশ্বর্য! এ-তালার কোথায় ছিল?

কিন্তু চন্দ্রাবলীর রহস্য কে বুঝবে?

হয়ত দীপংকর কাছাকাছি এসে দা চন্দ্রাবলী দিব্যি গলা খুলে বলে, দেখ কাণ্ড! এখনও তুমি স্নান ব যাওনি? এরপর 'দেরি হয়ে গেল' লাফাবে।"

কোন এক সময় দীপংকর কঠিন

বলে, "তোমার অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্যে সার্টিফিকেট দেওয়া উচিত।"

চন্দ্রাবলী হাসে, "শুধু ওই জন্যে? আরও কত কারণে পাওয়া উচিত। কিন্তু কী তুমি বল ত?" গলা চড়িয়ে বলে ওঠে, "আরতি এল আর তুমি সেই রামলালের ওপর ভরসা করে বসে আছ? নিজে একটু বাজারে টাজারে যাবে ত?"

ওঘর থেকে শুনতে পেয়ে আরতি বলে ওঠে, "দোহাই মিসেস দীপঙ্কর, তোমার যত্নের ঠেলা একটু কমাও।"

চন্দ্রাবলী বলে, "ইস কমাব বৈ কি! এত সুসময় আমার আর কবে আসবে!"

দীপঙ্কর খুব চাপা গলায় বলে, "তোমার কষ্ট হচ্ছে না?"

"কষ্ট! ওটা আমার অভিধানে নেই।"

যাবার আগে আরতি বলল নিভৃতে, "খুব খুশী হলাম দীপঙ্কর, তোমার ঘর আর ঘরণী দেখে! সত্যি বলতে একটু ভাবনাই ছিল।"

"এমনও ত হতে পারে ভাবনার কারণটা ঠিকই আছে, এর সবটাই ফাঁকি।"

"না তা হতে পারে না। মেয়েমানুষের চোখ ভুল দেখে না।"

"কিন্তু মেয়েমানুষ কথাটা সব সময় ভুলিয়ে ভুলিয়ে ভুল বলে, তাই নয় কি?"

"সব সময় নয় দীপঙ্কর। তুমি আমার ছেলেবেলার খেলার সাথী। তুমি সুখে আছ স্বচ্ছন্দে আছ, এটা ভাবতে ভাল লাগবে।"

স্টেশনে তুলে দিতে এল ওরা দুজনেই। আরতিকে আবার আসবার জন্যে অশেষ অনুরোধ জানাল চন্দ্রাবলী।

ফেরার সময় এক মোটরে দুজনে চুপ।

যেন সমুদ্রে হঠাৎ বাতাস বন্ধ হয়ে গেল। বাড়ির কাছাকাছি এসে এক সময় দীপঙ্কর বলে উঠল, "খুব ঠকান গেল আরতিকে, কী বল?"

"হ্যাঁ খুব।" বলল, চন্দ্রাবলী।

"আরতি বলে গেল 'তোমাদের দেখে খুশী হলাম।' বলল, 'মেয়েমানুষের চোখ ভুল দেখে না।'

"কথাটা খুব ঠিক বলেছেন।"

সহসা ওর মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে দীপঙ্কর বলে ওঠে, "আচ্ছা যদি এমন হত ওর ধারণাটাই নির্ভুল।"

"হতে কি না পারে?"

"ধর তাই হল। ধর ও যা ভেবে গেল তাই সত্যি।"

"কোন সময় হয়ত তাও অসম্ভব হবে না।"

মুখটা ফিরিয়ে নিতে চায় চন্দ্রাবলী, নইলে বুঝি এতদিনের সঞ্চিত মর্যাদা ভূমিসাৎ হয়ে যায়। কিন্তু নিতে দেয় না দীপঙ্কর, তেমনি ধরে থেকে ব্যগ্রভাবে বলে বসে, "তবে এখনই বা হতে পারে না কেন চন্দ্রা?"

চন্দ্রাবলী প্রায় জোর করেই মুখ নামাল।

"কী অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল এই কটা দিন! জীবনের এই স্বাদ থেকে আমরা ইচ্ছে করে কেন বঞ্চিত আছি, বলতে পার চন্দ্রা?"

চন্দ্রাবলী আস্তে আস্তে বলে, "হয়ত আমারই ভুলে। যাকে শ্রদ্ধা করা উচিত ছিল, তাকে ঈর্ষা করেছি।"

ভাঙল বুঝি কাচের দেওয়াল!

কে জানে কখন চিড় ধরেছিল, তিলে তিলে দীর্ঘকাল ধরে, না সাময়িক এক ঘূর্ণি ঝড়ের ধাক্কায়?

গভীর স্বরে বলল দীপঙ্কর, "না চন্দ্রা, আমাকে দোষ স্বীকার করতে দাও। আমিও ত কোনদিন বুঝতে চাইনি তোমায়, বোঝাতে চাইনি নিজেকে।

মোটরের পথ শেষ হল।

যে ঘরে দুটি মেয়ে এই কটাদিন কাটিয়ে গিয়েছে সে ঘরে এসে বসল ওরা। ঝাউপাতা কাঁপছে ঝিরঝির!

"কিন্তু আরতি?" বলল চন্দ্রাবলী।

"আরতি! সে জীবনের অন্য ক্ষেত্র বেছে নিয়েছে চন্দ্রা। সেখানে সে সম্পূর্ণ।"

মোটরের পথ সহজেই শেষ হল, কিন্তু রেলগাড়ির পথটা দীর্ঘ, সহজে শেষ হবে না। 'জীবনের অন্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ' মেয়েটা বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে থাকে, মানুষ কত ভুল ধারণা নিয়েই কাটায়। এতদিন যেটাকে সে দামী পাথর ভেবে এসেছে, সেটা কাচের টুকরো মাত্র।

কার্ল ওমেস এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

কর্তৃক প্রস্তুত

কৃষি যন্ত্রপাতি

* সিড ড্রিল * হুইল হো
* জাপানী প্যাডী থ্রেসার * জাপানী প্যাডী উইডার
* উইনোয়ার * সিড ড্রেসার

ইত্যাদি ইত্যাদি

ফার্ম ও বাগানের যন্ত্রপাতি

* ৩-কাটা কাল্টি-ভেটার * রেক
* ডিগিং ফর্ক * সয়েল মিক্সার
* অল শিয়ার উইডার ইত্যাদি, ইত্যাদি

এবং চা বাগানের যন্ত্রপাতি

ইস্পাতের আসবাবপত্র

হাই প্রিসিসন টুল, ডাইজ, ফিক্সচার ও নানাবিধ মেকানিকাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

প্রধান অফিসঃ
২৮, ওয়াটারলু স্ট্রিট, কলিকাতা—১
ফোন নং—২৩-৬১২৭।
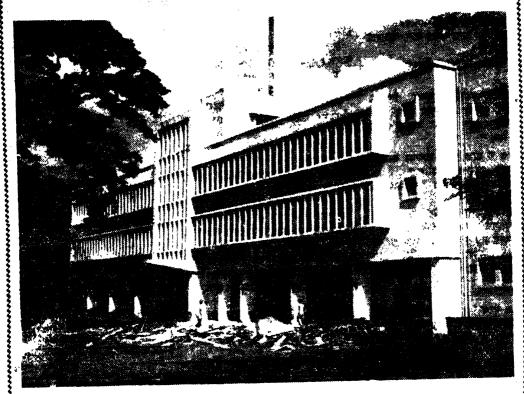
জাতির সমৃদ্ধি নির্ভর করে
বিভিন্ন পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়নে

এডমিনিষ্ট্রেটিভ বিল্ডিং আলীপুর বডিগার্ড লাইনস্

চ্যাটার্জী ব্রাদার্স

বিল্ডার্স এণ্ড আর্কিটেক্টস্

ফোনঃ ৪৬-৩৮১৯
৪৬-১০৩৭

১৪এ প্রতাপাদিত্য রোড
কলিকাতা ২৬

গ্রাম "স্ক্যাফোল্ড"

চণ্ডিদাস সম্পাদন

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বী রভূম-বিবরণ' ২য় খণ্ড ছাপা হইয়া গিয়াছে। কাগজে প্রশংসাও হইয়াছে। কিন্তু কেহ পড়ে না। বীরভূমের লোকেও কেনে না। একদিন ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বীরভূম-বিবরণ, পড়িয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "ও-সব রাজা-মহারাজার লেখা বই আবার কি পড়িব?" আমি বলিলাম, "রাজা-মহারাজার লেখা নয়। অনেক খাটিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। আমিই লিখিয়াছি।" তিনি বলিলেন, 'তাহা হইলে পড়িয়া দেখিব।"

অথচ এই খণ্ডে চেদীরাজ কর্ণদেবের এক সামন্তের শিলালিপির প্রতিলিপি ছিল। নর্মদা নদীর তীরে ত্রিপুরী ছিল ইঁহার রাজধানী। জীবনের প্রায় ষাট বৎসর ধরিয়া ইনি দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। ইনি বাংলায় আসিয়াছিলেন এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে কতদূর আসিয়াছিলেন, কোথায় পালরাজাদের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল কেহ জানিত না। আমি পাইকোড় গ্রামে (বীরভূমে মুড়ারই স্টেশনের নিকটে) চেদীরাজের নামাঙ্কিত তাঁহার এক সামন্তের শিলালিপি আবিষ্কারপূর্বক প্রমাণিত করিয়াছিলাম যে, কর্ণদেব রাঢ় দেশে আসিয়াছিলেন। সম্ভবত পাইকোড় গ্রামাঞ্চল তাঁহার কোন সামন্তের শাসনেও ছিল এবং এইখানেই তিনি পালযুবরাজ বিগ্রহপালের করে আপন কনিষ্ঠা কন্যা যৌবনশ্রীকে সম্প্রদান করিয়া পালসম্রাট নয়পালের সঙ্গে বৈবাহিক সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। আচার্য হরপ্রসাদ এই লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। হরপ্রসাদের অনুরোধে কলিকাতা জাদুঘরের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত এই লিপির প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর স্বনামধন্য ঐতিহাসিক স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার প্রথম খণ্ড 'বাঙলার ইতিহাস'এর দ্বিতীয় সংস্করণে এই লিপির উল্লেখ করিয়াছিলেন।

এইবার 'বীরভূম-বিবরণ' ৩য় খণ্ড ছাপিতে হইবে। পূর্ব পূর্ব বার বিশ্বকোষ প্রেসের উপরের ঘরে থাকিতাম, এবং প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বিশ্বকোষ প্রেসেই 'বীরভূম-বিবরণ' ছাপা হইত। এবারকার 'বিবরণ'এ নানুরই প্রথম প্রবন্ধ আর চণ্ডিদাস প্রসঙ্গই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে। চণ্ডিদাস লইয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটিল। মতান্তর মনান্তরে দাঁড়াইল। আমি উপরের আশ্রয় এবং প্রেস ত্যাগ করিলাম। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব আমার বিরুদ্ধে লেখা সত্ত্বেও আমার পৃষ্ঠপোষক ও ছাপাখানার খরচ-দাতা বীরভূম-হেতমপুরের মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী আমাকে সমর্থন করিলেন। আমি অন্যত্র বাসা করিলাম এবং অন্য ছাপাখানায় বইখানি ছাপিতে দিলাম। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল চণ্ডিদাস লইয়া।

চণ্ডিদাসের পদ কীর্তনীয়ার মুখে বাল্য-কাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। নীলরতন মুখোপাধ্যায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে যে 'চণ্ডিদাস-পদাবলী' ছাপাইয়াছেন, তাহার মূল পুঁথিখানিও সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু গোল বাধাইয়াছেন বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ। তিনি বাঁকুড়া জেলা হইতে চণ্ডিদাস-ভণিতা-যুক্ত এক পদাবলীর পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছেন। নানান টীকা-টিপ্পনী দিয়া সেই পুঁথি সম্পাদন করিয়াছেন। এমন সুসম্পাদিত পুঁথি পূর্বে দেখি নাই। তার উপর আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর তাহার একটি সুলিখিত সুন্দর ভূমিকা জুড়িয়া দিয়াছেন। সুতরাং সমস্যায় পড়িয়া গেলাম। বসন্তরঞ্জনের সম্পাদন ও রামেন্দ্রসুন্দরের ভূমিকা এক দিকে, আমার আবাল্য সংস্কার অন্য দিকে। কাহাকে রাখি, কাহাকে ফেলি। এদিকে বসন্তরঞ্জনের পুঁথির ভাষাগুলি এক-একটি সঙিগনের খোঁচা। প্রবেশ করিতে গেলেই আচড় লাগে।

আচার্য হরপ্রসাদ ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া বসন্ত-রঞ্জনের পুঁথির ভাষাতত্ত্বটা কিছু কিছু বুঝিয়া লইলাম। তৃতীয় খণ্ড 'বীরভূম-বিবরণ' বাহির হইয়া গেল। আচার্য হরপ্রসাদ ভূমিকা লিখিয়া দিলেন। দুঃখের বিষয়, পুস্তক বাহির হইবার পূর্বেই আমার পৃষ্ঠপোষক, বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয় পরলোকগমন করেন। মহারাজকুমার মৃত্যু-কালে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অফিসিয়াল ট্রাস্টীর হাতে দিয়া গিয়াছিলেন। বীরভূমের প্রথম শ্রেণীর একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এফিডেবিট করিয়া তাঁহার নিকট দরখাস্তপূর্বক বহু ঝঞ্জাটেই আমার প্রাপ্য আদায় হইয়াছিল।

আমার বাসা ছিল বোধহয় শ্রীদাম পালের লেনের একটা বাড়ির একাংশে। স্বনামধন্য রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ও সেই সময় ঐ অঞ্চলে থাকিতেন। তাঁহার সঙ্গেও চণ্ডিদাস লইয়া আলোচনা করিতাম। 'বীরভূম-বিবরণ' ৩য় খণ্ডে নানুর চণ্ডিদাস ও ছাতনা প্রভৃতি লইয়া বিস্তৃত আলোচনা ছিল। কলিকাতার বাসা তুলিয়া বাড়ি গিয়াছি। হেতমপুরের রাজ-এস্টেটের সঙ্গে দেনা-পাওনাও মিটিয়াছে। এমন সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রস্তাব গেল 'চণ্ডিদাস'-পদাবলী সম্পাদন করিতে হইবে। সাহিত্য পরিষৎ সম্পাদক-সংঘ গঠন করিয়া দিলেন—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ, অমূল্য-চরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (অধ্যাপক) এবং আমি। পরিষদের সম্পাদক তখন যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়।

চণ্ডিদাস পদের পাঠান্তর এবং নূতন পদ সংগ্রহ করিবার জন্য আমি ঢাকায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়াছিলাম আরও নানা স্থানে। সংক্ষেপে ঢাকার কথাটাই বলিব। ঢাকা-পুঁথিশালার অধ্যক্ষ ছিলেন খ্যাতনামা পণ্ডিত ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে। পুঁথিশালার জহুরী ছিলেন সুবোধ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি তাঁহার নিকট ও ডক্টর দে মহাশয়ের নিকট বহু সাহায্যই পাইয়াছিলাম। ঢাকায় গিয়া একবার জগন্নাথ হলে অতিথি হিসাবে ছিলাম। খরচ দিয়া-ছিলেন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। তারপর যতবার গিয়াছি ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্ট-শালীর বাড়িতে গিয়া উঠিতাম। তিনি ঢাকা জাদুঘরের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ঢাকা জাদুঘরে অনেক দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা ও অন্যত্র-দুর্লভ মূর্তি সংগৃহীত হইয়াছিল। জাদুঘরের পুরানো পুঁথির সংখ্যাও বড় কম ছিল না। এই সহৃদয় সাহিত্যরসিক বন্ধু-বৎসল ঐতিহাসিক বহুদিন হইল সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পুণ্যস্মৃতি আমার হৃদয়ে উজ্জ্বল হইয়া

আছে। কৃষ্ণনগর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে তিনি ঐতিহাসিক শাখায় সভাপতিত্ব করিতে আসিয়াছিলেন। কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "সংবাদ পাইয়াছি, আমার জ্যেষ্ঠ জামাতার মৃত্যু হইয়াছে। মেয়ের কোন খবর না লইয়াই চলিয়া আসিয়াছি।" সংবাদ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন আসিলেন?" সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "কর্ত্তব্য।" সেই যাত্রায় তিনি কলিকাতা ঘুরিয়া গিয়াছিলেন। বোধহয় কলিকাতাতেই তাঁহার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ।

ঢাকা হইতে ফিরিয়া কবি প্যারীমোহন সেনগুপ্তের ভাড়া-বাড়ির বাহিরের একটি কুঠরি লইয়া একাকী থাকি। ভাড়া মাসে দশ টাকা। একটা স্টোভ কিনিয়া নিজে রাঁধি, খাই। কিন্তু রোজ সুনীতি চাটুজ্যের বাড়ি যাই। বসন্তরঞ্জন তাঁহার পুঁথির নাম দিয়াছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'। আমরা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর নিকষে কষিয়া চণ্ডিদাসের পদের আলোচনা করি। 'বীরভূম-বিবরণ' ৩য় খণ্ড সম্পাদনের সময় একদিন রাগিয়া ডক্টর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম দিয়াছিলাম 'পারদর্শী'। বলিয়াছিলাম, "সাগরপার হইতে ফিরিয়া আপনি এমন পারদর্শী হইয়াছেন যে, বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধেও আপনার মত মানিয়া লইতে হইবে।" এখন আর সে-রাগ নাই। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর অপূর্ব কবিত্ব আমায় মুগ্ধ করিয়াছে। একটা বিষয় কেহ দেখে নাই। আমি সেটা দেখাইয়া দিলাম। আদিরসাত্মক গ্রন্থের দুইটা ভাগ থাকে—একটা বিপ্রলম্ভ, অন্যটা সম্ভোগ। এই দুইটার আবার চারি-চারিটা বিভাগ। উজ্জ্বলনীলমণির ধারা অনুসরণ করিয়া বৈষ্ণব গীতিকারগণ বিপ্রলম্ভের চারিটি বিভাগ স্বীকার করেন—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং প্রবাস। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-পূর্ব যুগে এ-বিভাগ ছিল না। এমন কি, শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী পণ্ডিতরাজ জগন্নাথও উজ্জ্বলনীলমণির বিভাগ স্বীকার করেন নাই। শ্রীচৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে আদিরসের চারিটি ধারার নাম ছিল—পূর্ব্বরাগ, মান করুণ এবং প্রবাস। করুণাখ্য বিপ্রলম্ভের লক্ষণ হইল, "যূনোরেকতরস্মিন্ গতবতি লোকান্তরং পুনর্লভ্যে" (সাহিত্যদর্পণ)—'যুবক-যুবতী দুজনের মধ্যে একজনের লোকান্তর ঘটিবে। এবং পুনরায় সেই দেহেই মিলন ঘটিবে।' তবেই তাহাকে করুণাখ্য বিপ্রলম্ভ বলা চলিবে। যুবক-যুবতীর একজনের মৃত্যু হইলেও সেই দেহে মিলন হওয়া চাই। মৃতদেহ অবিকৃত থাকিবে এবং পুনরায় সেই দেহে প্রাণসঞ্চার ঘটিবে—যেমন 'কাদম্বরী'তে চন্দ্রাপীড়। আবার লোকান্তর অন্য লোকেও হইতে পারে— যেমন শকুন্তলায় কশ্যপাশ্রমে মিলন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এ আমি সেই করুণ আবিষ্কার করিলাম। পরিষৎ-পত্রিকায় 'রসশাস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নাম দিয়া একটা প্রবন্ধও লিখিলাম। বসন্তরঞ্জন বলিলেন, "আপনার প্রবন্ধটা আমি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর ভূমিকায় ছাপিয়া দিব।" কিন্তু ছাপেন নাই।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর পুঁথিখানি লইয়া যিনি সর্বাধিক আলোচনা করিয়াছেন, পুঁথির পাঠোদ্ধারে যিনি বসন্তরঞ্জনের প্রধান সহায় ছিলেন, তিনি প্রথম সংস্করণ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এ একটি খণ্ডের নাম দিয়াছিলেন 'বালখণ্ড'। এই খণ্ডেই করুণাখ্য বিপ্রলম্ভের উদাহরণ আছে। আমি এই নাম সংশোধন

করিয়া দিই। এই খণ্ডের প্রকৃত নাম 'বাণখণ্ড'।

কবি প্যারীমোহনের বাসায় একটি কুঠরিতে থাকি। রোজ সকালে ডক্টর সুনীতি-কুমারের বাড়ি যাই। এক-এক দিন ফিরিতে দেরি হয়। তখন আর রাঁধিতে ইচ্ছা করে না। চিঁড়া-দই আনিয়া খাই। কলিকাতায় এমন দিন গিয়াছে—হাতে চারি আনা মাত্র পয়সা আছে। দুই পয়সার চিঁড়া, এক পয়সার দুইটি কলা আর আধ পয়সার দই ও আধ পয়সার চিনি মাখিয়া খাইয়া দিন কাটাইয়াছি। তখনকার দোকানে আধ পয়সার চিনি ও আধ পয়সার দই পাওয়া যাইত। একদিনকার ঘটনা বলি।

ডঃ সুনীতিকুমারের বাড়িতে বসিয়া আছি। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' লইয়াই আলোচনা চলিতেছে। এমন সময় অভিনয়জগতে নূতন ধারার প্রবর্তক, সুপণ্ডিত, সুরসিক, স্বনামধন্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া সুনীতিকুমার তাঁহাকে বলিলেন, "শোন্, বেলা প্রায় বারটা বাজে। গেরস্থ-বাড়ি, এ-সময় আর যাসনে। ডাল-ভাত যা হয় দুটি খেয়ে যা।" মুখ হইতে চুরুট সরাইয়া হাসামুখে শিশিরকুমার সম্মতি জানাইলেন। আমি উঠিয়া পড়িলাম।

বলিতে ভুলিয়াছি এই সময়টা কোন দিন বৈকালে আমি স্টার থিয়েটারে (তখন আর্ট থিয়েটার লিঃ হইয়াছে) যাইতাম। কোন দিন বা সাহিত্য-পরিষদে রামকমল সিংহ এবং তারাপ্রসন্ন পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। একদিন বৈকালে সাহিত্য-পরিষদে গিয়াছি। সুনীতিকুমার আমাকে একান্তে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি বিলেত-ফেরত আপনি জানেন?" আমি বলিলাম, "আজ্ঞে, জানি।" সুনীতি-কুমার বলিলেন, "আচ্ছা, আমাদের বাড়িতে খেতে আপনার কোন আপত্তি আছে?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন বলুন ত?" তিনি বলিলেন, "সেদিন দুপুরে ভাদুড়ীকে খেতে বললাম। আপনাকে কিছু বলিনি, এজন্যে বাড়ির মেয়েরা আমাকে খুব তিরস্কার করেছে।" আমি বলিলাম, "প্রায় রোজই ত যাই।" সুনীতিকুমার বলিলেন "তা নয়, একজনকে বলেছি, আর-একজনকে ফিরিয়ে দিয়েছি—এটা খুব অন্যায় হয়ে গেছে। যাক, কাল রাতে আপনাকে আমা-দের বাড়িতে খেতে হবে। রাত্রে আপনি কী খান?" আমি বলিলাম, "ভাত খাই।" এটা বলার আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের গ্রামাঞ্চলে তথাকথিত শূদ্রবাড়িতে ব্রাহ্মণগণ তরকারি ও মাছের ঝোল দিয়া লুচি খাওয়া দোষের মনে করেন না। কিন্তু ভাত! ওরে বাপ রে! আমি ভাবিলাম, লুচি বলিলে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যদিই কিছু মনে করেন! সুনীতিকুমার ভোজনবিলাসী মানুষ। সুতরাং আহারের আয়োজনটা প্রায় রাজসিক হইয়াছিল।

চাটুজ্যে মহাশয়ের বাড়িতে গেলে ফিরিতে দেরি হইত। ছুটির দিন হইলে ত কথাই ছিল না। তবে তাঁহার খাবার সময় বুঝিয়া ঠিক উঠিয়া আসিতাম। এমনই দিন-তিনেক রান্নাবান্না হইয়া উঠে নাই। একদিন বিকালে স্টার থিয়েটারে গিয়াছি। স্টার থিয়েটারের এখন অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু সেকালে থিয়েটারের উপরের তলায় একটি ঘর ছিল। সেই ঘরে নাট্যকার অপরেশচন্দ্র প্রত্যহই আসিয়া বসিতেন। এবং এই ঘরে ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,

(দে ২০০৫)

বেংগল ইমিউনিটি কোং লিঃ

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু মনীষী আসিয়া আড্ডা জমাইতেন। আমি উপস্থিত হওয়া মাত্র সেদিন অপরেশচন্দ্র বলিলেন, "এই যে, কলকাতায় শ্রী কিছু ফিরেছিল, কিন্তু স্বভাব যাবে কোথা! চেহারাটা আবার রাঢ়ের কাঠামোতে ফিরিয়া এনেছেন দেখছি।" অপরেশচন্দ্রের আতিথেয়তার কথা সেকালে একটা গল্পের মত ছিল। খাবার অবশ্য প্রচুর আসিল, খাইলামও অনেক। তারপর নিজের দুরবস্থার কারণটা জানাইলাম। সেখানে স্বনামধন্য রাজেন্দ্রনাথ কবিরাজের জামাতা শ্রীঅনাথ কবিরাজ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

অনাথ কবিরাজ মহাশয় হঠাৎ গম্ভীর-ভাবে বলিলেন, "কাল তিনটের সময় এখানে যদি আসেন আমার খুব উপকার হয়। এখানেই আসবেন, তারপর আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব।" অনাথ কবিরাজের উপকার, আমার মত ক্ষুদ্র লোকের দ্বারা! আমি বিস্ময়ের সঙ্গে সম্মতি দিলাম এবং পরদিন যথাসময়ে স্টার থিয়েটারের ত্রিতলে উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখি, তৎপূর্বেই অনাথনাথ সশরীরে হাজির হইয়াছেন। অপরেশচন্দ্র তখনও আসেন নাই। কবিরাজ মহাশয় আমাকে সঙ্গে লইয়া একেবারে আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের অন্যতম কর্ণধার বাঘা অ্যাটর্নি সতীশচন্দ্র সেনের বাড়িতে গিয়া উঠিলেন। সতীশচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র সুশীলচন্দ্র আমাদিগকে স্বাগত জানাইলেন। সংবাদ পাইয়া সতীশচন্দ্রও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্ষণপরেই দুই থালা ফল এবং মিষ্টান্ন ও জল লইয়া ঠাকুর-চাকর দেখা দিল। খাওয়ার পর অনাথ কবিরাজ সতীশ সেনকে বলিলেন, ব্রাহ্মণভোজনের দক্ষিণা দিতে হইবে। সতীশচন্দ্র উত্তর দিলেন, "আদেশ করুন।" অনাথনাথ বলিলেন, "একটি কুকার চাই। ব্রাহ্মণের আজ তিন দিন খাওয়া হয় নাই।" সতীশচন্দ্র বলিলেন, "একজনের মত হলেই হবে ত?" আমি বলিলাম, "না, দুজনের মত চাই।" সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণী কি এখানে? না, এখানেও কৌলীন্য ফাঁসিয়াছেন? আর নয় ত—!" আমি বলিলাম, "আমরা বীরভূমের লোক, ভাত বেশী খাই। সুতরাং আপনাদের একজনের কুকারে আমার কুলবে না।" সতীশচন্দ্র উত্তর দিলেন, "কাল সন্ধ্যায় স্টার থিয়েটারে এসে নিয়ে যাবেন।" কুকারটি পরদিনই পাইয়াছিলাম। অন্নকষ্টও ঘুচিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতা বাস কপালে সহিল না। সম্পাদক-সংঘের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় পুঁথিপত্র লইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিলাম। প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) একদিন আমাদের ডাকিয়া মিটমাটের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আচার্য হরপ্রসাদের উপদেশে আমি আপসে সম্মত হই নাই।

পরে পরিষৎ হইতে প্রস্তাব যায়, আমি ডঃ সুনীতিকুমারের সঙ্গে কাজ করিতে সম্মত আছি কি না? আমি সম্মত হই এবং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুকিয়া রোডের বাসাতেই আশ্রয় গ্রহণ করি।

সুনীতিকুমারের আবৃত্তিভঙ্গি যেমন শুদ্ধ তেমনই চমৎকার। মেঘদূত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রিয়কাব্য। শুনিয়াছি কাব্যটি তাঁহার নিত্যসংগী এবং ইউরোপ-আমেরিকাও ঘুরিয়া আসিয়াছে। আমি মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট মেঘদূত শুনিতাম। কত দেশের কত গল্প! নানা কারণে এক-একদিন কাজ শেষ হইতে রাত্রি একটা বাজিয়া যাইত।

সুকিয়া রো হইতে হিন্দুস্থান রোডে একটা ভাড়া বাড়িতে তিনি উঠিয়া যান। হিন্দুস্থান রোডে অভ্যাসটি তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন।

সুনীতিকুমারের নূতন বাড়ি তখন তৈয়ারী হইতেছে। হিন্দুস্থান পার্কে গৃহ-প্রবেশের দিন উপস্থিত ছিলাম। তারপর কতবার নিমন্ত্রিত হইয়া সে-বাড়িতে গিয়াছি। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে গিয়া দুই-দশ দিন এক মাস দেড় মাস কাটাইয়া আসিয়াছি। চট্টোপাধ্যায় দম্পতি আমাকে একজন আত্মীয়রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন।

হিন্দুস্থান রোডের বাসায় থাকিতেই বোধহয় 'চণ্ডিদাস' প্রকাশিত হইয়াছিল। এত বিলম্বের কারণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নানা কাজে ব্যস্ত থাকিতেন।

আমাদের সম্পাদিত 'চণ্ডিদাস'এ আমরা গুটি চব্বিশ পদ খাঁটি চণ্ডিদাসের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। চণ্ডিদাস যে তিনজন ছিলেন, সে-বিষয়ে আমার কোন সংশয় নাই। আদি চণ্ডিদাস যে বীরভূম-নানুরে বাস করিতেন, সে-বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি। আজকালকার ছাত্রছাত্রীগণ পুরনো পুঁথি সংগ্রহে তেমন মনোযোগ দেন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎও এ-বিষয়ে যেন অনেকটা ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছেন। পদাবলীর অধ্যাপকগণকেও এ দিকে আগ্রহশীল বলিয়া মনে হয় না। আমাদের সম্পাদিত 'চণ্ডিদাস' প্রকাশিত হইবার পর একমাত্র ডক্টর মহম্মদ সহীদুল্লাহ্ ভিন্ন আর কাহাকেও তেমন উল্লেখযোগ্য আলোচনা করিতে দেখি নাই।

শারদীয়ার আনন্দে...
টসের
পূজা স্পেশাল চা
এ. টস এণ্ড সন্স
কলিকাতা

এক সময় শান্তনুকে আমরা উপহাস করতাম। উপহাস করবার মতই একটা কাজ করে বসেছে তখন শান্তনু। বি. এ. পাস করার আগেই বিয়ে করে বসেছে। তাও একেবারে ডল-পুতুলের মত একটা গ্রাম্য মেয়েকে। গ্রাম্য, অশিক্ষিত, তেরো-চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে গলা অবধি ঘোমটা টেনে যেদিন সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিন না হেসে পারিনি। মনে হয়েছিল, নাকে মুক্তোর নাকছাবি না থেকে নথ থাকলেই যেন বেশী মানাত।

সহপাঠীদের সকলকে অবশ্য বরযাত্রী যাবার জন্যে বলেনি শান্তনু। খবরটা সকলের জানবার কথাও নয়। কিন্তু দেখা গেল সারা কলেজে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে, শান্তনু বিয়ে করছে।

গোলগাল ফরসা নাদুসনুদুস চেহারার শান্তনুর মুখে-চোখে এমনিতেই কেমন একটা বোকা-বোকা ভাব ছিল। দুলে দুলে ঘাড় কাত করে হাঁটত সে, দুলে দুলে ঘাড় কাত করে ক্লাসে ঢুকত। আর তা দেখে মেয়েরা, যারা আড়াআড়ি করে পাতা কয়েকটা বেঞ্চিতে আমাদের স্পর্শ বাঁচিয়ে বসত, তারা পরস্পরের সঙ্গে চোখের ইশারায় কী যেন বলাবলি করে ঠোঁট টিপে টিপে হাসত।

তাদের সেই চাপা হাসিটা কিন্তু সশব্দে খিলখিল করে উঠল শান্তনু যেদিন হলদে চিঠির তাড়া নিয়ে নিমন্ত্রণ জানাতে এল।

অন্য কেউ হলে হয়ত চেপে যেত। কিন্তু শান্তনু বলে ফেলল, বউ তার গ্রামের মেয়ে, ইস্কুলে ফিফ্‌থ্ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে। বয়েস তেরো কি চোদ্দ। আর সব শেষে বললে, "মা বলেছে, দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর।"

খবরটা আমার কাছ থেকে শুনল নীলিমা, নীলিমার কাছ থেকে সমস্ত মেয়ে-মহল। হাসির হুল্লোড় উঠল তাদের মধ্যে।

ওঠবারই কথা। কারণ এ-কলেজের কোন ছাত্র তখন পর্যন্ত বিয়ের কথা কল্পনাও করেনি। ছাত্রীদের মধ্যে দু-দশজনের সিঁথিতে যদিবা সিঁদুর উঠেছিল, তবু তারা সিঁথির পাশের চুলগুলো ফাঁপিয়ে কীভাবে যেন সিঁদুরের রেখাটুকু ঢাকবার চেষ্টা করত। অর্থাৎ তখন কি ছাত্র কি ছাত্রী, আমাদের সকলের মনেই একটা রঙিন না-যায়-ধরা না-যায়-ছোঁয়া স্বপ্ন কুয়াশার মত জমে আছে। চোখে চোখে কত কী কল্পনা! হৃদয়ে অনেক রোমাঞ্চ!

নাকে নথ পরলে যাকে ভাল মানাত, শান্তনুর সেই জড় পদার্থের মত বউটিকে দেখে মনে মনে আমি গর্বিত না হয়ে পারিনি। কারণ নীলিমার মত মেয়ে আমাদের কলেজে আর-একটিও ছিল কিনা সন্দেহ। নীলিমার চেহারায় এমন একটা কিছু ছিল যার জন্যে সকলের চোখ গিয়ে পড়ত তারই উপর। রূপসী ছিল না নীলিমা, কিন্তু রূপে তার শ্রী ছিল। তার চেয়েও বেশী ছিল মুখেচোখে সপ্রতিভ ভাব। মুখের পেশীতে কোন কুঞ্চন না ফেলেও শুধু চোখ-জোড়া তার এত মধুর ভাবে হাসত, এত স্নিগ্ধ ছিল তার গলার স্বর যে তার সঙ্গে শুধু কথা বলার জন্যে অনেকেই লুব্ধ ছিল।

সেদিনই ক্লাস পালিয়ে প্রতিদিনের মত নিরুদ্দেশভাবে এ-গলি সে-গলি বেড়াতে বেড়াতে এক সময় নীলিমা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল।—"রসগোল্লার বউকে দেখে এলেন?"

শান্তনুর গোলগাল চেহারার জন্যে মেয়েরা তাকে ঠাট্টা করে 'রসগোল্লা' নাম দিয়েছিল।

বললাম, "হ্যাঁ, দেখে এলাম।"

"কেমন দেখতে? পান্তুয়া, না লেডি-গিনি?" বলে আবার হেসে উঠল নীলিমা।

বললাম, "লেডিগিনিই বলা চলে, যেমন কালো, তেমনি গোলগাল।"

নীলিমা হেসে বললে, "এইবার আপনিও একটা বিয়ে করে ফেলুন, অমনি একটা গেঁয়ো মেয়ে দেখে। দিব্যি রান্নাবান্না করে দেবে, কলেজে আসার আগে পান সেজে দেবে......"

সায় দিয়ে বললাম, "হ্যাঁ, আর বছরে বছরে একটি করে......"

কথা শেষ করার আগেই হয়ত হেসে লুটিয়ে পড়ত নীলিমা, কোন রকমে আমার কাঁধে হাত রেখে সামলে নিল বটে, কিন্তু তার বুকের-কাছে-ধরা বইখাতার স্তূপ ছিটকে পড়ল রাস্তার উপর। সেগুলো কুড়িয়ে দিতে দিতে লক্ষ্য করলাম, গলির মোড়ের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুটি বয়স্কা গৃহিণী সকৌতুকে কী যেন বলাবলি করছে আমাদের সম্বন্ধে।

তাড়াতাড়ি দুজনেই পাশের গলিতে ঢুকে পড়লাম। কারণ লোকচক্ষুর দৃষ্টিতে বড় অস্বস্তি বোধ করতাম তখন। আর বুঝতে পারতাম না, কেন ষাট বছরের বুড়োও ফিরে তাকাত আমাদের দিকে, খোঁড়া ভিখিরীটাও কেন ড্যাবড্যাব করে তাকাত! আর মিষ্টির দোকানের সামনে উনোনের ঠাণ্ডা ছাইয়ের গাদায় কুস্তি লড়তে লড়তে ল্যাংপেঙে রাস্তার ছেলেগুলো কেন ছুটে এসে নীলিমার কাছে পয়সা চাইত!

এখন বুঝতে পারি। কতই বা বয়স তখন আমাদের! কুড়িও পার হয়নি। নীলিমার বয়স কিছু কম। আর তখন আমি যদিও একখানা বাঁধানো খাতা নিয়ে কলেজে আসি, নীলিমা কিন্তু আসত একরাশ বই-খাতা দু হাতে আড়াআড়ি করে বুকে চেপে। তাই সকলেই হয়ত বুঝতে পারত, আমরা কলেজ পালিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ক্রমশ নেশাটা আমাদের দুজনকেই এমন ভাবে পেয়ে বসল যে, বলা চলে কলেজ পালাবার জন্যেই আমরা কলেজে আসতাম। দুপুরের রোদে টো-টো করে ঘুরে বেড়াতাম কোনদিন, কখনও বা নির্জন কোন চায়ের দোকানে। যেদিন সময় বেশী পেতাম, চলে যেতাম চিড়িয়াখানায়, মিউজিয়মে চাঁদপাল ঘাটে। ইডেন গার্ডেনের সবুজ ঘাস—কিংবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গাছের ছায়ায় বসে বসে কীভাবে যে সন্ধে হয়ে যেত টের পেতাম না। কখনও অনর্গল আজেবাজে অর্থহীন কথায়, কখনও নিশ্চুপ স্তব্ধতায় শুধু পরস্পরের সান্নিধ্যটুকু উপভোগ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত।

পরীক্ষার তখন মাত্র কয়েকটা মাস বাকী। তবু পরীক্ষার কথা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে পড়িয়ে দিল শান্তনু।

হঠাৎ একদিন এসে বললে, "পরীক্ষা দেওয়া আর হল না, কলেজ ছেড়ে দিচ্ছি।"

"কেন?" বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

শান্তনুর চোখ ছলছল করে উঠল। বললে, "এ কলেজে পড়ার এত ইচ্ছে ছিল আমার......"

বললাম, "পড়লি না কেন? কে বাধা দিচ্ছে?"

শান্তনু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললে, "এখানে মেয়েরাও পড়ে জানতে পেরে মা বললে, বিয়ে না করলে পড়া চলবে না। এখন বলছে, চাকরি না করলে, রোজগার না করলে বউকে এনে রাখা চলবে না। কী করি বল্? তোরা কিন্তু বেশ আছিস, ভাই।"

না হেসে পারিনি তার দুর্দশায়। তারপর যখন শুনলাম কোন একটা আপিসে চাকরি পেয়েছে সে, পড়া ছেড়ে দিচ্ছে, তখন তাকে রীতিমত নির্বোধ মনে হয়েছিল। চাকরি কি পালিয়ে যাচ্ছে? পড়া শেষ করে করা যেত না?

নীলিমা শুনে হেসে উঠল।—"হরিপদ কেরানী এবার আকবর বাদশা হবে। আপনিও একটা চাকরি যোগাড় করে নিয়ে কলেজ ছেড়ে দিন না।"

বললাম, "দেব, এখন নয়, কয়েক বছর বাদে। আর তখন যদি বেগম পাই বাদশা হতে বাধবে না।"

নীলিমার সুন্দর শরীরটা উচ্ছল হাসির তোড়ে কেঁপে কেঁপে উঠল। শাড়ির আঁচলটায় ডান হাতখানা মুড়ে দাঁতে তার প্রান্তটুকু চেপে বললে, "কলেজে-পড়া মেয়ে ত আর বেগম হবে না, তার জন্যে লেডি-গিনি খুঁজতে হবে।"

কিন্তু আমি জানতাম, স্পষ্ট করে ভালবাসার কথা কোনদিন উচ্চারণ না করলেও, ভবিষ্যতের একটি শান্ত সংসারের ছবি আমাদের কারও মনে উদয় না হলেও, আমরা পরস্পরের ওপর একটা অস্বাক্ষরিত স্থির-বিশ্বাসের দাবি মেনে নিয়েছিলাম। মেনে নিয়েছিলাম বলেই সে-কথাটা কোনদিন প্রকাশ করে বলিনি, সে-কথাটা শোনবার জন্যে কোনদিন আগ্রহ প্রকাশ করিনি।

শুধু পরীক্ষা পাস করে নীলিমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, "এবার?"

"চাকরি নাও।"

পরীক্ষা পাস করে নীলিমা এসে প্রশ্ন করেছিল, "এবার?"

মনোমত
সুন্দর, সস্তা আর মজবুত
জিনিষ যদি চান তা হ'লে
আরতির
"রাণী রাসমণি"
শাড়ী ও ধুতি কিনুন।
কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে তাহ'লে, দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।
আরতি কটন মিলস্ লিঃ
দাশনগর, হাওড়া।

"আবার পড়।"

অর্থাৎ তখন আমরা পরস্পরের উপদেষ্টা

সুযোগ পেয়ে একটা চাকরিতে ঢুকে পড়লাম সেই সময়ে। আর ভাবলাম, এইবার বলি নীলিমাকে নতুন সংসারের কথা। যদিও তখন মনে মনে বেশ একটা সন্দেহ ছিল, এই রোজগারে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখা নির্বুদ্ধিতা কিনা! কিন্তু তা যে এতখানি নির্বুদ্ধিতা বুঝতে পারতাম না, যদি না সিনেমা-হল্ থেকে বেরিয়ে এসেই শান্তনুর সঙ্গে দেখা হত।

শান্তনুকে দেখতে পেয়েই আমার হাতে একটা চিমটি কেটে কৌতুকে হেসে উঠল নীলিমা। যেন শান্তনুর চেহারাটাই হাস্যকর। বললে, "রসগোল্লা। তোমার বন্ধু।"

শান্তনু তখন ফিরে তাকিয়েছে।

বললাম, "কী রে, কী খবর?"

নীলিমা আঁচলে হাসি ঢেকে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। আর তার দিকে তাকিয়ে শান্তনুর মুখে কেমন একটা অস্বস্তির ছাপ পড়ল।

তবু কিন্তু-কিন্তু করে বললে, "বেশ আছিস তোরা। আমি ভাই নাজেহাল হয়ে গেলাম। এক শ টাকা মাইনে, এদিকে দুটো বাচ্চা। ছোটটা, মেয়েটা ভুগছে ক' মাস থেকে, ডাক্তারের খরচ দিতেই ফতুর হয়ে গেলাম।"

আরও অনেক দুঃখের কথা বলল শান্তনু। শেষে জিজ্ঞেস করল, "বিয়ে করেছিস?"

বললাম, "না।"

শান্তনু হেসে বললে, "তোর কী, শিক্ষিত শহুরে মেয়ে বিয়ে করবি, দরকার হয় দুজনেই চাকরি করে দিব্যি সংসার চালাতে পারবি। যাক, চলি ভাই, ছেলেটার জন্যে আবার ওষুধ নিয়ে যেতে হবে।"

শান্তনু চলে গেল। আর তার দুর্দশার কথা শুনে নীলিমা হেসে কুটিকুটি।

তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললে, "আমি বাবা ও-সবের মধ্যে নেই। চাকরিবাকরি একটা না করে......"

আমারও মনে হল, কথাটা মোটেই যুক্তিহীন নয়। স্বপ্ন দেখা এক জিনিস, আর তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া অন্য। অর্থই পরমার্থ এ-যুগে, তার অভাবে কত সুখের সংসারও বিস্বাদ হয়ে যায়। কত উন্মাদ সমুদ্র নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়।

এ-কথাটা বোধহয় আমার চেয়েও ভাল করে বুঝত নীলিমা। তাই পড়া শেষ করেই একটা চাকরির জন্যে উঠে-পড়ে লাগল সে। আর শেষ পর্যন্ত একটা মেয়েদের ইস্কুলে চাকরি পেয়েও গেল।

তারপর একটা বিশেষ দিন দেখে আমাদের পরস্পরের স্থিরবিশ্বাসকে স্বাক্ষরিত রূপ দিলাম। উঠে এলাম এই ছোট্ট ফ্ল্যাটে।

এতদিন শান্ত সংযত ছিল নীলিমা। বাস্তবের মাটি থেকে এতটুকু পা তুলতে রাজী হত না। কিন্তু এই নতুন ঘরের হাওয়ায় কী যেন এক নেশা ছিল। উচ্ছল উন্মাদনায় নেচে উঠল ওর চোখের তারা। এই প্রথম বোধহয় স্বপ্ন দেখতে শুরু করল।

কোত্থেকে একটা বাচ্চা চাকর যোগাড় করে আনল, তাকেই রান্নার কাজ শিখিয়ে নেবে। চল, একটা কুকার কিনে নিয়ে আসি, কমলাদি বলছিল, রান্নার খুব সুবিধে। খাট কী হবে, একটা তক্তাপোশ হলেই চলবে। রেণুদি, ভূগোলের টীচার, বলছিলেন যে, চেয়ার-টেবিল নিলামে কিনলে অনেক সস্তা। জানলার পর্দাটা পালটে আনবে, সবুজ রঙ আমার বিষ লাগে। চল, তোমার সঙ্গে আমিও বাজার যাব। এই যা, তালাই কেনা

হয়নি যে! না, না, কেনা তোশকে শুতে পারব না। মড়া নিয়ে যাওয়ার কিনা কে জানে! তার চেয়ে নতুন তৈরী করিয়ে নাও। দুদিন কি মাদুরে শোয়া যাবে না! একটা ফুলদানি কিনে আনব ইস্কুল থেকে ফেরবার সময়, কেমন।

সত্যি, দেখে দেখে বিস্মিত হতাম। দুদিনেই ছোট্ট ফ্ল্যাটের দুখানা ঘর কী সুন্দর করে সাজিয়ে তুলল নীলিমা। জীবনের কোথাও যেন যতি নেই, ছেদ নেই। সংসারের কোথাও যেন কুশ্রীতা রাখবে না, গ্লানি রাখবে না।

ছায়ানট চিত্র প্রযোজিত

'যেতে নাহি দিব'

পরিচালনা — সরোজ কুশারী
চিত্রগ্রহণ — সন্তোষ গুহরায়
শিল্পনির্দেশনা — গৌর পোদ্দার
শব্দগ্রহণ — জে. ডি. ইরাণী
সম্পাদনা — শিব ভট্টাচার্য
রূপসজ্জা — শৈলেন গাঙ্গুলী
স্থির চিত্রগ্রহণ — অলক দে
ব্যবস্থাপনা — রাজকুমার রায়চৌধুরী

ভূমিকায়—কালী ব্যানার্জি, সুমিত্রা মিত্র, বাণী গাঙ্গুলী, শিলা পাল, সমর কুমার, বেচু সিং ও অন্যান্য জনপ্রিয় শিল্পিগণ।

"ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে চিত্রগ্রহণ চলিতেছে"

আনন্দের স্রোতে, রোমাঞ্চের মত্ততায় গা ভাসিয়ে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। আশা করেছিলাম এমনি করেই বুঝি সমস্ত জীবনটা কেটে যাবে। কিংবা কে জানে, জীবনের কথাই হয়ত তখন ভাবতাম না। জীবন যে এত দীর্ঘ তা জানতাম না।

আমাদের দুজনের মনেই তখন একটি নেশা। পরস্পরকে চমকে দেবার নেশা। কোন-কোনদিন তাই আপিসের ছুটি হওয়ার অনেক আগেই ফিরে আসতাম। কোনদিন নীলিমা ফিরে আসত অনেক দেরিতে। তার প্রতীক্ষায় বসে থেকে বিরক্ত-হয়ে-ওঠা আমার মুখটা দেখতে নাকি বেশ মজা লাগে। বলত নীলিমা।

এমনি করেই দিন কেটে যাচ্ছিল। শুধু দুঃসহ লাগত মাঝে মাঝে যখন নাইট ডিউটি দিতে হত। অথচ সেটুকু সহ্য না করেও উপায় ছিল না। খবরের কাগজের আপিসে বার্তা-বিভাগের চাকরি, সে কেন জানতে চাইবে একটি নতুন-বাঁধা হৃদয়ের বার্তা।

নীলিমা মাঝে মাঝে অনুযোগ করত, "ও-চাকরি তুমি ছেড়ে দাও।"

বলতাম, "দেব, তার আগে অন্য একটা জুটিয়ে নিয়ে।"

কিন্তু জুটিয়ে নেব বললেই কি জোটে? না কি চাকরি করতে করতে সে-উদ্যম সকলের থাকে?

তবু তারই মাঝে রোমাঞ্চ বুনে নিতাম। চেষ্টা করতাম, যাতে পরস্পরকে চমকে দেওয়ার নেশাটা না কেটে যায়।

তাই সেদিন নাইট-ডিউটি সত্ত্বেও শরীর খারাপের নাম করে ফিরে এলাম। গলির চৌকো ধোঁয়াটে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ।

ঘরে ঢুকেই বললাম, "আজকের এমন সুন্দর রাতটা তোমাকে ছেড়ে থাকতে ইচ্ছে হল না, চল, ছাদে গিয়ে বসি।"

চোখ কপালে তুলল নীলিমা। বিছানার ওপর স্তূপীকৃত খাতার রাশি দেখিয়ে বললে, "বেশ, আর ঐ পরীক্ষার খাতাগুলো কে দেখবে? কালকেই শেষ দিন, ফেরত দিতে হবে।"

সারা রাত বিছানায় শুয়ে ছটফট করলাম, ঘুমবার চেষ্টা করলাম। আর হঠাৎ মাঝ-রাতে ঘুম ভেঙে যেতেই দেখলাম, নীলিমা তখনও টেবিল-ল্যাম্পের নীচে ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষার খাতা দেখছে। নিজেকে শান্ত করলাম এই ভেবে যে, প্রতিদিনই ত আর পরীক্ষার খাতা দেখতে হবে না নীলিমাকে।

এদিকে ক্রমশ টের পাচ্ছিলাম একটা সংসারকে সচল রাখতে দুটো রোজগারের চাকাও যথেষ্ট নয়। তাই উপরি আয়ের চেষ্টা করতে হত। আর সেই উপরি আয়ের আশাতেই সুযোগ পেলে দু-চারটে প্রবন্ধ লিখতাম। দু-চারখানা বই আর পত্রিকা

প্লেটপাল্টে দেখে 'ভারতের পররাষ্ট্রনীতি' বা 'স্বাধীনতা ও মহাত্মাজী' ধরনের প্রবন্ধ লেখা ত এমন কিছু শক্ত নয়। দু-দশ টাকা যদি আসে ত মন্দ কি!

ভোরবেলায় উঠে খাতা-কলম নিয়ে হয়ত লিখতে শুরু করেছি, অমনি নীলিমা এসে বললে, "এই, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, চল. আজ রেণুদি আমাদের দুজনকে চায়ের নেমন্তন্ন করেছেন। তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন—"

"কিন্তু প্রবন্ধটা যে আজকেই চাই।"

মুখ থমথম করে উঠত নীলিমার।—"তা বলে সামাজিকতা মানবে না? নেমন্তন্ন করেছেন—"

বাধ্য হয়েই উঠতে হত। কিন্তু তখন বোধ-হয় বুঝতে পারতাম না যে ভিতরে ভিতরে একটু একটু করে নীলিমার উপর আমি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছি।

সংসারের চাকাকে সচল রাখতে হলে কিছু উপরি আয় যে প্রয়োজন তা নীলিমাও যে বুঝত তার প্রমাণ পেলাম দিন কয়েক পরেই।

সারাদিন আপিস করে ভিড় ঠেলে বাসে উঠে বাসায় ফিরতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। বড় ক্লান্ত লাগছিল। বাসায় ঢোকার আগেই নীলিমার গলা শুনলাম। বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, "এতবার বললাম মনে থাকছে না কেন? চণ্ডাশোক ধর্মা-শোকে রূপান্তরিত হলেন কেন? কী দেখে অনুশোচনা হল তাঁর?"

কী ব্যাপার? ঢুকেই দেখি, একটি বছর বারো বয়সের মেয়ে মাথা নিচু করে বসে আছে, আর নীলিমা পড়াচ্ছে তাকে।

পাশের ঘরে এসে বসলাম। সমস্ত শরীর ক্লান্ত লাগছিল, মন বিরক্ত হয়ে উঠল। কানের কাছে তখনও নীলিমার গলা ভেসে আসছেঃ কলিঙ্গ যুদ্ধজয়ের পর শত শত সহস্র সহস্র মৃতদেহ দেখিয়া সম্রাট অশোক...

নটা বাজার পর ছাত্রীকে বিদায় দিয়ে উঠে এল নীলিমা। মৃদু হেসে বললে, "আজ থেকেই শুরু করলাম। বলিনি তোমাকে, মাসে পঁচিশ টাকা করে দেবে, শুধু সন্ধের সময়টা পড়াতে হবে।"

সমস্ত মন যেন বিষিয়ে উঠছিল নীলিমার বিরুদ্ধে, নিজের অদৃষ্টের বিরুদ্ধে। হ্যাঁ, কখন থেকে যেন অদৃষ্ট মানতে শুরু করে দিয়েছিলাম।

আমার মুখের ভাবে বোধহয় মনের ঝড়টা টের পেল নীলিমা। কৌতুকের হাসি হেসে এসে দাঁড়াল আমার পিছনে। ওর নরম সরু সরু আঙুলগুলো আমার চুলের মধ্যে কাঁকুইয়ের মত টানতে টানতে বললে, "রাগ কোর না, লক্ষ্মীটি। দুটো টাকা যদি পাওয়া যায়, রাণুদি কমলাদিও ত ট্যুইশনি করেন। তা ছাড়া তোমার খাটুনি ত কত বেশী, আমার মোটেই কষ্ট হয় না।"

মন নরম হয়ে গেল মুহূর্তে। বেচারী। আমার জন্যেই ত......

সব বুঝতাম। কিন্তু সব বুঝেও নীলিমার বিরুদ্ধে এভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠব একদিন, আমি নিজেও কল্পনা করিনি।

মাস কয়েক পরের কথা। নাইট ডিউটি দিয়ে ফিরে এলাম ভোরবেলায়। খিদেয় পেট জ্বলছে, ক্লান্ত শরীর, অথচ......

বাড়ি পৌঁছেই দেখলাম, নীলিমা সেজে-গুজে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই প্লেটে ঢেলে চা খাচ্ছে। বেশ একটা তাড়াহুড়োর ভাব মুখে চোখে।

বললাম, "কী ব্যাপার?"

হাসল নীলিমা।—"মর্নিং স্কুল শুরু হল যে। স্টোভে জল চড়িয়ে দিয়েছি, চা-টা তুমিই করে নিও, আর কিছু খাও ত চাকরটাকে বোল......"

বলেই দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল সে।

সে এক দুঃসহ জ্বালা। দিনের পর দিন। ভোরবেলায় ফিরে আসি, আর নীলিমা ছুটতে ছুটতে চলে যায় মর্নিং স্কুলে। রাত জাগতে হবে বলে এগারোটার মধ্যে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ি, নীলিমা কখন ফেরে টেরও পাই না। সন্ধেব সময় ঘুম থেকে উঠে দেখতাম নীলিমার ছাত্রী এসে হাজির হয়েছে। কানের পাশে পাঠ্যপুস্তকের ঘ্যান-ঘ্যানানি ভাল লাগত না, বেরিয়ে পড়তাম। একা একা ঘুরে বেড়াতাম রাস্তায়, পার্কে, যেখানে খুশি।

নটার সময় ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে আপিসে বেরিয়ে যেতাম। বাড়িতে একা বসে থাকার চেয়ে যেন বাইরে একা থাকাও অনেক রমণীয়। নীলিমাকে পেয়ে নীলিমার সান্নিধ্যের লোভে যে বন্ধুদের ভুলে গিয়েছিলাম, তাদেরই খুঁজে বেড়াতাম, খুঁজে

বের করতাম কখনও কখনও।

তবু, এক-একদিন হঠাৎ মনে রোমাঞ্চ জাগত। মনে হত নীলিমার উপর যেন অবিচার করছি।

সেদিন দুপুরের সীফ্‌ট্ শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে হঠাৎ মনে হল, বহুদিন সিনেমা দেখিনি। নীলিমাকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমা দেখিনি বহুদিন।

একেবারে দুখানা টিকিট কেটে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। রবিবার, সুতরাং নীলিমার ছাত্রী থাকবে না আজ।

এসে বললাম, "চল, সিনেমা দেখে আসি, টিকিট কেটে এনেছি।"

চোখ কপালে তুলল নীলিমা।—"না জিগ্যেস করেই টিকিট কাটলে?"

"কেন? ছাত্রী ত নেই আজ।"

নীলিমা হাসল, বিমর্ষ হাসি।—"ছাত্রী নেই, কিন্তু আমিই ছাত্রী এখন। সামনের হপ্তায় পরীক্ষা দিতে হবে, পাস করলে মাইনে বাড়বে কিছু।"

বললাম, "তা হলেই বা। পরীক্ষা ত আজ নয়।"

"বাঃ রে, সব ত ভুলে গেছি, ঝালিয়ে নিতে হবে না একটু!"

অনুরোধ করলাম, বললাম, "টাকার চিন্তা তোমাকে করতে হবে না।" তবু শুনল না নীলিমা। বললে, "আহা, শুধু টাকার জন্যেই নাকি! ইস্কুলের সব টীচার দিচ্ছে, সবাই পাস করবে আর আমি যদি ফেল করি? প্রেস্টিজ বলে ত একটা কথা আছে।"

বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এলাম। টাকা, প্রেস্টিজ, ইস্কুল, ট্যুইশনি, পরীক্ষার খাতা! সারা শরীর রী-রী করে উঠল। না, প্রয়োজন নেই নীলিমার। দেখি রাস্তায়, ঘাটে, পার্কে কোথাও কোন চেনা লোক পাওয়া যায় কিনা! তাকে নিয়েই সিনেমা দেখে আসব।

ভাগ্যক্রমে দেখাও হয়ে গেল। হাতে ছাতা, ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতো, পিঠটা কুঁজো হয়ে গিয়েছে। প্রথমটা চিনতে পারিনি। সামনাসামনি হতেই থমকে দাঁড়ালাম।—"শান্তনু না?"

শান্তনু হাসল।—"কী খবর? বিয়েটা করেছিস?"

বললাম, "করেছি। নীলিমাকে। তুই দেখেছিস তাকে। কিন্তু তাকে বিয়ে করে এই দুর্দশা, একা একা সিনেমা দেখতে যাচ্ছি। চল্ তুইও।"

খুশীই হল শান্তনু। বেশ বুঝল অর্থাভাবে বেচারা সিনেমা দেখতে পায় বহুদিন।

সিনেমা দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে শুধু বললে, "বাঃ, বেশ ছবিটা। বউকে নিয়ে এলে হত। একা একা দেখলাম, শুনে এত চটবে!"

সিনেমা থেকে ফিরতে ফিরতে শান্তনু হঠাৎ বললে, "চল্, একটু চা খেয়ে যাবি আমার বাসায়।"

বললাম, "চল্। তোর বউয়ের সঙ্গেও আলাপ হবে।"

শান্তনু ঠিক সেই আগেকার মতই বোকা-বোকা লজ্জার হাসি হাসল। সঙ্কোচের সঙ্গে বললে, "আলাপ করবি? কী আলাপ করবি, গেঁয়ো বউ ত আমার।"

ছোট্ট একতলার একখানা ঘর, একফালি বারান্দা। পুরনো বাড়ি, দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়েছে কোথাও কোথাও। আর সারা ঘরখানা জিনিসপত্রে ঠাসা। তক্তপোশ, তোরঙ্গ, একটা মোড়া, দেয়ালে-ঝোলানো একটা কাপড়ের টিয়াপাখি, মা-কালীর একখানা বাঁধান ছবি, তিনটে ক্যালেন্ডার। এক-সময় এ-ঘরে দু মিনিট থাকতে হলে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। কিন্তু কেন জানি না, বেশ ভালই লাগল।

বিছানার উপর একটা রোগা মেয়ে ঘুমোচ্ছিল। আর ছেলেটাকে কোলে করে নিয়ে এল শান্তনু। ফিসফিস করে কী যেন বলে এল ওদিকের বারান্দায়। বুঝলাম শান্তনুর স্ত্রী রান্না করছে।

বিছানার উপর থেকে তালপাতার পাখাটা নিয়ে গেল শান্তনু। দরজার এ-পাশ থেকে যেটুকু দেখা যায়, দেখলাম শান্তনু বসে বসে উনুনে হাওয়া করছে।

একটু পরেই একটা প্লেটে করে কিছু ফল নিয়ে এসে দাঁড়াল শান্তনুর স্ত্রী। একটু রোগা হয়েছে, কালো হয়েছে আগের চেয়ে। ঘোমটা কমেছে তার। তবে সেই লাজুক [illegible] [illegible] এখনও

বললাম, "এসব কী হবে, আমি ফল খাই না। চা দিন বরং।"

প্রস্তুতকারক:—এন, সি, আর্য্য স্নাফ এণ্ড সিগার ফ্যাক্টরী
মাল সরবরাহ ও অন্যান্য বিস্তৃত বিবরণের জন্য কলিকাতা অফিস
৯২এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ—১২তে লিখুন।

শান্তনুর স্ত্রী হেসে বললে, "গাঁয়ের ঘরে আম কলা ছাড়া আর কী দেব বলুন. এসেছেন যখন খেতে হবে।"

খেলাম, তৃপ্তির সঙ্গেই খেলাম।

শান্তনুর স্ত্রী কাজের ফাঁকে ফাঁকে এল, কথা বলল, একবার ঘুমন্ত মেয়েটাকে পাখা করতে করতে গায়ে হাত দিয়ে বললে, "জ্বর ছেড়েছে বোধহয়।"

শান্তনু বললে, "মেয়েটা বড় ভুগছে। একটা সারে ত আরেকটা হয়।"

শান্তনুর স্ত্রী বললে, "আজ ত দক্ষিণেশ্বর যাব ভেবেছিলাম, ওর জ্বরটার জন্যেই যাওয়া হল না।"

"দক্ষিণেশ্বর!" বিস্মিত হয়ে বললাম, "কেন?"

শান্তনুর স্ত্রী হাসল। বললে, "বেড়াতে। আমরা ত রবিবারে রবিবারে বেড়াতে যাই। কখনও বেলুড়, কখনও দক্ষিণেশ্বর।" শান্তনুর স্ত্রী একটু পরে সশব্দে হেসে উঠে বললে, "কিন্তু সবচেয়ে মজা হয়েছিল ডায়মণ্ডহারবার গিয়ে। বলব?"

বলে কৌতুকের চোখে তাকাল সে শান্তনুর দিকে। শান্তনু হাসল, ইশারায় নিষেধ জানাল।

বললাম, "আর অন্য দিনগুলো কী করিস?"

শান্তনু হাসল। স্ত্রীর সঙ্গে একবার চোখাচোখি করে হেসে বললে, "উনি আসার পর থেকে কিছু করবার সময় কই? সকালে বাজার যাই, দাড়ি কামাই, আপিস যাই। আর বিকেলে দু মিনিট ফিরতে দেরি হলে ও দরজা খুলবে না। তাই ফিরে এসে ছেলে-মেয়েগুলোকে দেখি একটু, ও রান্না করে।"

"ব্যস, আর কিছু না?" প্রশ্ন করলাম সবিস্ময়ে।

শান্তনু হেসে বললে, "এই উনুনে পাখা-টাখা করে দিই, কয়লা ভেঙে দিই, ও বেচারী একা আর কত করবে বল্।" তারপর লাজুক হাসি হেসে শান্তনু বললে, "তোরা ত বেশ আছিস, অভাব নেই, দুজনে রোজগার করিস. ..."

বিদায় নিয়ে চলে এলাম আর একা একা আমার নির্জন নিঃসঙ্গ বাসার পথ ধরে আসতে আসতে মনে মনে বললাম, শান্তনুকে আমি ঈর্ষা করি, শান্তনুকে আমি ঈর্ষা করি।

নীলিমা তখনও গুনগুন করে কী যেন মুখস্থ করছে। পরীক্ষার পড়া, প্রেস্টিজের পড়া, মাইনে বাড়ানর পড়া।

বললাম, "পড়া রাখ তোমার, শোন, আজ রসগোল্লার বাড়ি গিয়েছিলাম। অভাবের সংসার হলেও......"

খিলখিল করে হেসে উঠল নীলিমা।—"লেডিগিনিকে দেখলে?"

"দেখলাম। এত সামান্য রোজগার, তায় একটা ছেলে একটা মেয়ে, কিন্তু......"

নীলিমা হঠাৎ হেসে উঠল। বললে, "ও-ভাবে অভাব-অনটনে সংসার করার শখ যে কেন হয় ওদের!"

বলল বটে, কিন্তু মনে হল নীলিমাও যেন লেডিগিনিকে ঈর্ষা করে।

আর সঙ্গে সঙ্গে, কেন জানি না, শান্তনুর কথাটা মনে পড়ল।—তোরা ত বেশ আছিস, অভাব নেই, দুজনে রোজগার করিস......

কথাটা যেন সমস্ত দেহেমনে সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে দিল। সান্ত্বনা এই-টুকুই যে, শান্তনুও আমাদের ঈর্ষা করে।

পূর্বপুরুষদের দান

তখনো ইতিহাস লেখা হয়নি। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে মানুষ যে ফসল প্রথম ফলাতে সুরু করেছিল তা হচ্ছে বার্লি। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। খৃষ্টজন্মের তিন হাজার বছর আগেকার মিশরের মিনার-এর যে ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে যে শস্যের নিদর্শন রয়েছে তা বার্লি বলেই পণ্ডিতেরা বলেন। তাছাড়া, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী ও স্পেনের প্রাচীন সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতেও বার্লির প্রাচীনত্বের প্রমাণ মেলে। খৃষ্টজন্মের ২৭০০ বছর আগে সম্রাট সেংনুঙ্‌ এর চাষ সুরু করেছিলেন চীনে।

আমাদের সংস্কৃত পুরাণ ও শাস্ত্রাদিতে যবের উল্লেখ রয়েছে। মহেঞ্জোদড়োয় সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের মধ্যেও জানা গেছে যে বার্লির ফলন খৃষ্টজন্মের ৩০০০ বছর আগে ভারতবর্ষে ছিল। বেদে যবের উল্লেখ থেকে আরো মনে হয় ধান বা গম চাষের অনেক আগেই ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য ছিল বার্লিশস্য। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা বার্লির পুষ্টিকর গুণগুলির কথা জানতেন। পালা-পার্বণ ও উৎসবে এবং প্রাত্যহিক আহার্য ও পানীয় হিসেবে বার্লির ব্যবহার ছিল। এই কারণে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে বার্লিশস্য একাত্ম হ'য়ে আছে।

আজো বার্লি মানুষের একটি বিশিষ্ট খাদ্য। বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে অসংখ্য মানুষ বার্লির পানীয় দিয়েই জীবনধারণ করে। বার্লিশস্য থেকে উৎপন্ন পার্ল বার্লি ও গুঁড়ো বার্লি সহজে হজম হয় এবং শারীর ক্রিয়ার সহায়ক ব'লে রুগ্নদের জন্যেই এর বহুল ব্যবহার।

শস্য উৎপাদন পদ্ধতি ও যান্ত্রিক উন্নয়নের ফলে বার্লির চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। 'পিউরিটি বার্লি' প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিঃ-এর সর্বাধুনিক কারখানায় উঁচুজাতের বার্লিশস্য থেকে স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বার্লি তৈরী হয়। এই জন্যেই 'পিউরিটি বার্লি' রুগ্ন, শিশু ও প্রসূতিদের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। যুবা ও বৃদ্ধরাও এই বার্লি খেয়ে উপকার পান।

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিঃ (ইংল্যাণ্ডে সংগঠিত)

PTY 3084

আমার জন্মদাতা পিতা এবং গর্ভধারিণী জননীকে আমি দেখিনি। কোথায়, কোন শহরে অথবা গ্রামে আমার জন্ম হয়েছিল আমি জানি না। হয়ত ভোরের দিকে এই পৃথিবীর বাতাসে আমার প্রথম নিশ্বাসটি নিয়েছি। দুপুরে, সন্ধ্যায় কিংবা রাত্রেও হতে পারে; আমি জানি না। কে জানে, তখন গ্রীষ্ম না বর্ষা, শরৎ বা শীত, কি বসন্ত!

॥ ২ ॥

ছেলেবেলায়, একটু বয়স হবার পর, আমি আমার বাবা এবং মার চেহারা মনে মনে গড়ে নিয়েছিলাম। আমার একটুও সন্দেহ ছিল না আমার বাবা এবং মার চেহারাটি অবিকল ওই-রকমেরই। এ-ব্যাপারে আমার বিশ্বাস ছিল দৃঢ়। লম্বা আধ-ফরসা মোটা মোটা হাড়অলা রুক্ষ বদমেজাজী শ্যামলালবাবুকে আমি মনে-মনে বাবা বলতাম। এবং বাবার কথা ভাবতে বসলে শ্যামলালবাবুকে দেখতাম।...টকটকে ফরসা, গোলগাল, কিসের যেন আটা-মাখান হাসি-হাসি মুখ, পুরু ঠোঁট এবং চোখে কাজল কি সুর্মাটানা চাঁপারানীর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আমি মনে মনে কতবার মা মা বলেছি। চাঁপারানীকে আমার মা বলে ডাকতে ইচ্ছে হত স্পষ্ট পুরো গলায়। ডাকিনি কখনও।

॥ ৩ ॥

শ্যামলালবাবু আমায় ইজের জামা কিনে দিতেন। একবার ক্যাম্বিসের জুতো কিনে দিয়েছিলেন। চাঁপারানী আমায় দু-বেলা খেতে দিত। একবেলা ডাল-ভাত-তরকারি; অন্যবেলা শ্যামলালবাবু এবং চাঁপারানীর পাতকুড়নো। পাতকুড়নো খাবার সময় আমি প্রায়ই মাংসর হাড়, চর্বির ডেলা, গলা আলু, মাছের কাঁটা ছালটাল পেতাম। রাত্রের এই খাওয়া পেতে অনেক রাত হত—কোনও কোনও দিন আমি সদর-দরজার সামনে কলঘরের কাছটায় বসে বসে ঘুমিয়ে পড়তাম—তবু এই রাতের পাতকুড়নো খাওয়াই আমার ভাল লাগত। ওই খাবারের গন্ধ এবং স্বাদের জন্যে আমি সারা রাত বসে থাকতে পারতাম।

॥ ৪ ॥

চাঁপারানী আমায় অ-আ ক-খ চিনিয়েছিল। শ্যামলালবাবু আমায় 'কথামালা' কিনে দিয়েছিল। বাজারের চা-বাবু আমায় ফোর ক্লাসের বই পর্যন্ত পড়িয়েছিল এবং পিয়ারীচরণ সরকারের ফার্স্ট বুকের সাতান্ন পাতা। সাতান্ন পাতায় গরিব বেচারী অন্ধ লোকটির কথা ছিল। চা-বাবু আমায় পড়িয়েছিল, বেচারী অন্ধ, আকাশ মাটি গাছ এমন কি মানুষ পর্যন্ত দেখতে পায় না, তার খুব কাছাকাছি থাকলেও নয়।... পড়াটুকু পড়িয়ে চা-বাবু বলেছিল, "এক হিসেবে তুমিও অন্ধ।"

॥ ৫ ॥

হ্যাঁ, এক হিসেবে আমি অন্ধই ছিলাম। শ্যামলালবাবু, বদমাস, মাতাল, চোর,—আমি জানতাম না। চাঁপারানী বেশ্যা আমি কী করে জানব!

॥ ৬ ॥

তারপর অনেকদিন খাওয়ার কষ্ট পেয়েছি। দিনের বেলায় চা-বাবুর দোকানে ফাই-ফরমাস খাটলে দু চারটে পয়সা, এক আধ টুকরো শুকনো পাঁউরুটি পেতাম। রাত্রে কালাচাঁদের হোটেলের কাছে ঘুর-ঘুর করতাম কুকুরের মতন। চাঁপারানীর কথা মনে পড়ত, সেই মাংসের হাড় চর্বি, মাছের কাঁটা, গলা আলুর গন্ধ ও স্বাদের কথা ভাবতাম।

॥ ৭ ॥

আমার ইজের জামা ছিঁড়ে গেল, পা অনেককাল খালি। তখন বেশ শীত পড়ছে। রেল স্টেশনের মিঠাইঅলা পানঅলাদের দোকানের কাছে আমি রাত কাটাতাম। টিনের চাঁদোয়ার তলায় সেখানে অনেক লোক জমত। স্টেশনের কুলিকাবারি, ভিখিরি, পোঁটলা-পুঁটলি বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে থার্ড ক্লাসের যাত্রী, দু তিনটি কুকুর। শেডের তলায় কুলিরা এক জায়গায় গোল করে আগুন জ্বালাত। সবাই চেষ্টা করত আগুনের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকতে। কুলিরা গালাগাল দিত। রাত প্রায় ফুরিয়ে

"মহৎ কাঁজের প্রচেষ্টা থেকেও
আনন্দ ও সুখ উৎসারিত হয়"
— জহরলাল নেহেরু

আনন্দের উৎস

প শ্চি ম ব ঙ্গ স র কা র

[illegible], যখন সবাই মুড়ি দিয়ে তালগোল পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত, আমি আগুনটার কাছ ঘেঁষে আরাম করে শুয়ে পড়তাম।

॥ ৮ ॥

একদিন ভীষণ এক আগুনের স্বপ্ন দেখলাম। কোথায় কোন মহল্লায় যেন আগুন লেগেছে। আকাশ লাল, পাখির দল চিৎকার করে উড়ছে, গল-গল করে ধোঁয়া উঠছে এক পাশে, শব্দ হচ্ছে কিসের এক, বহু মানুষের কলরব দূর থেকে ভেসে ভেসে আসছিল।...আগুন দেখে আমারও ছুটে যাবার ইচ্ছে করছিল। যেতে পারছিলাম না। আমি নিজেকেই দেখছিলাম, নিজের অসহায়তাকে। কী ভীষণ ছোট্ট আমি, এতটুকু মাত্র—এক হাত কি তার চেয়েও বুঝি ছোট। কথা বলতে জানি না, চোখে দেখতে পাই না, গলা দিয়ে শুধু কান্না আর [illegible]।

॥ ৯ ॥

স্বপ্নটা দেখার পর থেকে আমার কেন [illegible] বিশ্বাস জন্মে গেল, যেদিন আমি [illegible]লাম—সেদিন আশে পাশে কোথাও ভীষণ এক আগুন লেগেছিল। আমার বাবা সেই আগুন নেবাতে ছুটে গিয়েছিল, আর ফেরেনি; আমার মা আমায় নিয়ে শুয়ে ছিল। মা এবং আমি একা ছিলাম।

॥ ১০ ॥

রাস্তা থেকে একটা লোক আমায় একদিন হাতের ইশারা দিয়ে ডাকল। লোকটা দেখতে সুন্দর, খুব সুন্দর। তার মাথায় কোঁকড়ানো চুল, চোখে সোনার চশমা। কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকটাকে আমি দেখলাম। বড়লোক, ভদ্রলোক, আমি ভাবলাম। তাকে খুব ভাল লেগে গেল আমার।...ভদ্রলোক আমায় একটা কাজ করে দিতে বলল। একটা দুআনি আমার হাতে ফেলে দিয়ে বলল, কাজটা করে দিতে পারলে পুরো দুটো টাকা আমায় দেবে।

॥ ১১ ॥

কাজটা সোজাই ছিল। আসলে ওটা কোনও কাজই নয়, মানুষ তার জন্যে এক আধলাও খরচ করে না। তবে বড়লোকদের কথা আলাদা, টাকা-পয়সার মায়া তাদের নেই। ভদ্রলোক কাগজে মুড়ে আমায় যে ওষুধের শিশিটি দিয়েছিল, আমি ঠিক জায়গায় সেটি পৌঁছে দিলাম। চাঁপারানীর চেয়ে অনেক কম বয়সের ভারী সুন্দর একটি মেয়ে সেই শিশি নিল। মেয়েটি, জানি না কেন, কাঁদছিল। তার চোখ মুখ ফ্যাকাসে। বুকের কাছে হাত দিয়ে শাড়ির আঁচলটা সে হাতের উপর দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত ছড়িয়ে রেখেছিল। মেয়েটির কপালে আমি সিঁদুর দেখতে পাইনি। ওষুধটি নিয়ে আঁচলের তলায় রেখে ও বলল, বিড়বিড় করে, "ছাই হবে।" কেন বলল, আমি জানি না।...রাস্তায় এসে সেই সুন্দর-মতন ভদ্রলোক এবং বড়লোকটিকে আমি দেখতে পেলাম না। এ-পাশ ও-পাশ কত খুঁজলাম, কোথাও নেই। গোটা একটা দিনই প্রায় আমি লোকটাকে খুঁজেছি, তার কাছে আমার দু টাকা পাওনা, কিন্তু কোথাও আর তার টিকি দেখা গেল না। লোকটা জোচ্চোর।

॥ ১২ ॥

স্টেশনে চায়ের দোকানে আমি যখন কাজ করছি ছ টাকা মাস-মাইনেয়, একটি ছেলের সঙ্গে আমার খুব ভাব হল। তার নাম পার্বতী। সে মিঠাইয়ের দোকানে কাজ করে। তার চোখ ট্যারা, মুখে বসন্তের গর্ত-গর্ত দাগ। পার্বতী আমার চেয়ে বয়সে একটু বড়। আমায় সে চুরি করতে শেখাল, চা বেচার পয়সা মারতে। পার্বতী বুঝিয়ে দিয়েছিল, চুরি যে করে না সে গাধার বাচ্চা। পয়সা না মারলে দোকানের মালিক তলব বাড়াবে না। চুরি করে করে পার্বতী এখন পনর টাকা পর্যন্ত মাইনে বাড়িয়েছে।...পার্বতী আমায় আরও কত কি শিখিয়েছিল। একদিন একটা দেহাতী মেয়ে রাতে আমাদের দোকানের কাছে আর পাঁচটা যাত্রীর মতন ঘুমোচ্ছিল, পার্বতী তার দিকে আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে আমায় অনেক কিছু শেখাল।

॥ ১৩ ॥

পার্বতীর কথামতন একদিন আমরা পকেটে এক দেড় টাকা নিয়ে এবং পানঅলা কাশীর কাছ থেকে বেনারসী খয়েরের পাঁচ ছ খিলি করে পান সাজিয়ে হাতে করে এক জায়গায় গেলাম। এ-রকম জায়গা আগে আর আমি দেখিনি। একটা মেয়ে-ছেলে পার্বতীর গলা জড়িয়ে ধরে গান গেয়ে উঠল। আর একটা মেয়েছেলে হাত পেতে আমার পানের দোনা এবং পকেটের সব পয়সা নিয়ে নিল। তারপর বলল, আহা চাঁদ রে—তুই সোনা ভগবান রে ভগবান। যা ছোঁড়া বাড়ি যা...

॥ ১৪ ॥

সেই সুন্দর চেহারার লোকটাকে একদিন স্টেশনে পেয়ে গেলাম। বললাম, "কই আমার টাকা দিন।"...লোকটা প্রথমে আমায় চিনতেই পারল না। পরে বলল, "টাকা—কিসের টাকা। যাকে ওষুধ নিয়ে গিয়ে দিয়েছিলি সে বাবা মরে কবে ভূত হয়ে গেছে। বেশি ঝটফট করবি না, পুলিস ধরিয়ে দেব। বেটা বিষ দিয়ে এসে আবার টাকা! হেট্...শালা মারব এক থাপ্পড়—।" মেয়েটি মরে গেছে! ভয় বিস্ময় এবং বেদনায় আমি কাঠ হয়ে গেলাম।

॥ ১৫ ॥

আমার তারপর থেকে খুবই ভয় করত। পুলিস দেখলে বুক কাঁপত, গা হাত অসাড় হয়ে যেত। কোনও পুলিসের লোক চা খেতে এলে আমি বেশী বেশী চা দিতাম, অনেকটা করে দুধ এবং চিনি।

॥ ১৬ ॥

পার্বতী একদিন পালিয়ে গেল। তার কাছে আমার চুরির সব টাকা গচ্ছিত করা ছিল। আমরা ঠিক করেছিলাম, এক শ সোয়া শ করে টাকা জুটলে এই লাইনের অন্য একটা স্টেশনে গিয়ে চা-মিঠাইয়ের দোকান করব।...কিন্তু পার্বতী পালাল। মাস খানেক পরে—চায়ের দোকানের হাত-বাক্স ভেঙে গোটা কুড়ি টাকা নিয়ে আমিও পালালাম। একটা পুলিস তার আগের দিন সারারাত আমাদের দোকানের সামনে বেঞ্চিতে বসে ছিল।

CAPS\S.B
দিল্লী, কোলকাতা, বোম্বাই অথবা মাদ্রাজ নয়, পিকিং অথবা মস্কো, লণ্ডন অথবা নিউইয়র্ক, কোনটাই নয়, কিন্তু সে একটা দেশ। ধরা যাক, দেশটির নাম হযবরল। এখানকার অধিবাসিরা বাঙালী। পোষাকে, আচারে, ব্যবহারে, সব কিছুতেই তারা ঘোর বাঙালী। দেশটা ছোট, খুব ছোট। কিন্তু শৃঙ্খলার বদলে এখানের বিশৃঙ্খলা পর্বতপ্রমান। নীতিবিহীন স্বৈরাচারী শাসন এখানে সদাই বিরাজমান।
এখানকার নিয়মকানুন এমনই বিচিত্র যে কোন সুস্থ, সামাজিক ও নীতিজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সহ্যাতীত। তাই রাজধানীতে এই সম্পর্কে অভিযোগ পৌঁছেছে। তাঁরা তদন্তের জন্য একজন বিশেষ পদমর্য্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তিকে হযবরলতে পাঠানোর মনোস্থ করেছেন। তাঁর আসার পর যে সমস্ত অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটলো তাই নিয়েই:
ছায়া চিত্রের এর
রাজধানী থেকে
গোগোল রচিত 'ইনস্পেক্টার জেনারেল' অবলম্বনে
চিত্রনাট্য মৃণাল সেন পরিচালনা নির্মল মিত্র
সঙ্গীত নচিকেতা ঘোষ
শ্রেষ্ঠাংশে উৎপল দত্ত · কালী বন্দ্যো · মঞ্জু দে · মঞ্জুলা বন্দ্যো
জহর · জীবেন · হরিধন · শ্যামলাহা · অমর · মানি শ্রীমানী
· পরিবেশনা · সুপার পিকচার্স ·

॥ ১৭ ॥

আমি আগে কখনও নদী দেখিনি। গাড়িটা মস্ত রেলের পুল পেরিয়ে এক জায়গায় থামল। আমি নেমে পড়লাম। কতক মেয়েছেলে কয়লা কুড়োচ্ছে, দরজা-খোলা মালগাড়ির মধ্যে পা ঝুলিয়ে বসে এক ছোকরা বাঁশি বাজাচ্ছে, ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে নদীর। আম গাছে বোল ধরার মতন একটি গাছে অজস্র পাখি।

॥ ১৮ ॥

ব্যাবসাটা চলল না। আমারই ভাল লাগল না। সের আড়াই আটার বিস্কুট, ঘড়ির কাঁটার মতন মস্ত এক কাঁটা, গোল ঘর আঁকা ছক—এক থেকে পঁচিশ পর্যন্ত নম্বর, আর ঘণ্টি নেড়ে নেড়ে ঘুরে বেড়ানো—আমার পোষাল না। আমার কাঁটাটায় কোনও রকমের দোষ ছিল। যে ঘোরাত তার ভাগ্যেই দশ পনর বিশ উঠত। এক পয়সায় দশটা বিশটা বিস্কুট দেওয়া যায় না।

॥ ১৯ ॥

এক মারোয়াড়ীর গুদোমে আলু আর গুড় তোলার কাজ করলাম। কী দুর্গন্ধ গুদোমের মধ্যে! পচা আলু, পচে পচে পাঁক হচ্ছে, গুড়ের মধ্যে কাদাজল, তামাক-পাতার জল, মেটে কাদা, আখের আঁশ-মেশান হত। টোপকা টোপকা মাছি, পিঁপড়ে, কতকগুলো ভীমরুল সারাদিন ভোঁকে থাকত। একদিন একটা ভীমরুল আমার গালে কামড়াল। কী জ্বালা তার!

॥ ২০ ॥

কাচের কারখানায় একটা কাজ জুটে গেল। কারখানাটা প্রায় নদীর কাছে। ওখানে লণ্ঠনের চিমনি, মোটা মোটা কাচের গ্লাস বাটি তৈরি হত। আর কী আশ্চর্য, আমাদের যে সাহেব ছিল—তার মাথার চুল কাচের মতনই সাদা। আমি ভাবতাম, কাচের কারখানায় কাজ করে করে সাহেবের মাথার চুল অমন হয়েছে। একদিন আমারও হবে।

॥ ২১ ॥

আমাদের ছোট মিস্ত্রীর বাড়িতে আমি থাকতাম। ছোট মিস্ত্রী গাঁজা খেত। তার বউ ছিল বোবা। বড় কলসির মতন ফুলো মোটা বউটাকে ছোট মিস্ত্রী মাঝে মাঝে আদর করত, নয়ত বেশির ভাগ দিনই মারত। বোবা বউটা গলায়-কাপড়-পুরে-দেওয়া কুকুরের মতন বিশ্রী করুণ শব্দ করে কাঁদত।

॥ ২২ ॥

ছোট মিস্ত্রীর মেয়ে কৌশল্যা একদিন আমার চটের বিছানায় পাশে এসে শুয়েছিল রাত্রে। আমি ঘুমোচ্ছিলাম। বাইরে খুব বৃষ্টি পড়ছিল। জল পড়ছিল আমাদের খোলার ঘরে। আমার গা নেড়ে কৌশল্যা ডাকল, একটু জায়গা চাইল পাশে। আমি কৌশল্যাকে চুমু খেলাম, কৌশল্যা আমায় চুমু খেল। ভোরবেলায় ছোট মিস্ত্রী আমায় মেরে আধমরা করে ফেলল। আমার হাতের কব্জি মচকে গেল, কপাল ফেটে রক্ত, পিঠের শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে।

॥ ২৩ ॥

নদীর তীরে একটা লোককে পোড়াতে এনেছিল। তখন শীতকাল। মিঠে গরম ঝকঝকে রোদ। আলুথালু বাতাস বইছে। বালিপড়া চরে গোরু মোষ চরছিল কটা। লোকটাকে খুব করে ঘি মাখিয়ে চিতায় চড়িয়ে দিল। আমি কাউকে পোড়াতে দেখিনি। অবাক হয়ে দেখছিলাম। ঘিয়ের সুন্দর গন্ধ ছুটছিল। আমি দু চার বার মাত্র ঘি খেয়েছি। চাঁপারানীরা রাত্রে তাদের যে উচ্ছিষ্ট আমায় খেতে দিত তার মধ্যে ঘিয়ের গন্ধ থাকত। আমি ভাবছিলাম, আমি মরে গেলে কেউ ঘি মাখাবে না, কেউ নতুন কাপড় পরিয়ে দেবে না। একটা কোকিল আশেপাশে কী সুন্দর করেই ডাকছিল তখন। অথচ চিতা জ্বলে উঠল।

॥ ২৪ ॥

ভয়ংকর শীত। আমার গায়ে ছেঁড়া একটা জামা। হেঁটে হেঁটে মেলায় যাচ্ছি। সামনে লাল ধুলো উড়িয়ে ক্যাঁকিয়ে ক্যাঁকিয়ে গোরুর গাড়ি যাচ্ছে, ঝরঝরে ফটফট ডাক মেরে মোটর-গাড়িও চলে গিয়েছে দু একটা। দু দশ জন মানুষ পায়ে হেঁটেও চলেছে। দেহাতী এবং ভদ্র বাবু বিবিরা। খুশিতে হাসছে, চলছে, কমলালেবু খাচ্ছে। মন্দিরটা মাইল তিন দূরে। মেলা সেখানে।

॥ ২৫ ॥

পাহাড়ের পাথরের খাঁজে মন্দির, পাথরের ছোট ছোট ঘর, ধর্মশালা, হাঁড়ি-কাঠ। অনেক লোক এসেছে। ভদ্রলোক এক রাশ, বউ, মানুষ, মেয়ে, ছেলের দল। তারা দাপাদাপি করছে। ছুটোছুটি, হাসাহাসি। দেহাতীরা মেলা বসিয়েছে। একটা নাগরদোলা উঠছিল, নামছিল, নামছিল, উঠছিল।

॥ ২৬ ॥

আহা, মন্দিরের কাছে ভিড়ে একটি মেয়ে দেখলাম। টুকটুকে রঙ, হাঁটু ছড়ানো চুল, ডাগর চোখ, পাখির পালকের মতন ভুরু। এই মেয়ে পরী। এত সুন্দর কাউকে আর দেখিনি।

॥ ২৭ ॥

মেয়েটি এই থাকে—এই হারিয়ে যায়। আমি তন্ন-তন্ন করে খুঁজি। মেলার কাছে একবার দেখতে পেলাম—তারপর কোথায় মিলিয়ে গেল। খুঁজে খুঁজে এবার পেলাম মন্দিরের পিছন দিকে, নদীর জলে পা ডুবিয়ে বসে। তার পাশে এক বাবু। বসে থাকতে থাকতে আবার উধাও।...সারাটা দুপুরই সে যেন আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলল।...শেষ দুপুরে নদীর ধারে পাথরে বসে গাছের ছায়ার তলায় মেয়েটি ফলটল মিষ্টি খাচ্ছিল। আমি কাছে যেতেই পাশের বাবুটিকে কী বলল যেন। বাবু
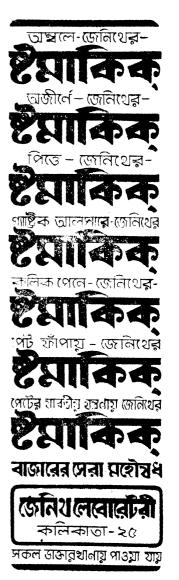
আমার ডাকলেন, 'এই ছোঁড়া এদিকে আয়।' মেয়েটির আরও কাছে যেতে পারছি ভেবে আমি দৌড়ে পাথর টপকে কাছে গেলাম, একেবারে কাছটিতে।...বাবু তাঁর পায়ের চকচকে জুতোটা খুলে আমার দু গালে দু ঘা মারলেন, জোরে...বেশ জোরে। বললেন, "হারামজাদা সোআইন...ভদ্দর-লোকের জিনিসের পেছনে ফেউ লাগা। হারামজাদা কোথাকার।" আমি চলে আসছিলাম। মেয়েটি হাসছিল আর কী বলছিল। বাবু বলছিলেন, "ইতর ভদ্র সবাই তোমার রূপে মজে যায় আশা, কী আর করবে।"...মেয়েটির নাম আশা। আশা আশা।

॥ ২৮ ॥

বিকেল হল। মেলা ভাঙল। সবাই ফিরছে। সবাই। দোকানপত্র উঠছে। গোরুর গাড়ি জোতা হল। মটর-গাড়ি স্টার্ট দিল। দেহাতীরা গান গাইছে। বাবু ছোকরারাও গান গাইছে। বউমারা জুতো পায়ে দিয়ে টুক টুক করে হাঁটছে। পাতা উড়ছে, সারাদিনের খাওয়া দাওয়ার পর। পাথর সাজিয়ে তৈরি উননগুলো পোড়া কাঠ আর ছাই নিয়ে পড়ে আছে।

॥ ২৯ ॥

সন্ধ্যে হয়ে এল। ধর্মশালায় দু পাঁচটি মাত্র যাত্রী। শীতের খর বাতাস বইছে।

॥ ৩০ ॥

নদীর ধারে অভুক্ত এঁটোকাঁটা ছড়ানো খাবার খুঁজতে গিয়েছিলাম। ভীষণ খিদে আমার। বাঁশের ঝোপের কাছে হঠাৎ দেখলাম সেই মেয়েটি। আশা...আশা। তাকে দেখে আমি পালাচ্ছিলাম। পায়ের শব্দ পেয়ে সে ডাকল। একটুক্ষণ দেখলাম তাকে। আশা একা। ধীরে ধীরে কাছে গেলাম। আশা বলল, "অন্ধকার হয়ে গেলে আমি আর কিছু দেখতে পাই না, কানা হয়ে যাই। তুমি আমায় মন্দির পর্যন্ত পেঁাছে দাও।"..আশা হাত বাড়িয়ে দিল তাকে ধরে ধরে পথ ঠাওর করে নিয়ে যাবার জন্যে।...আশার হাতে চুড়ি বালা। আমি দেখলাম। আশার গলায় সুন্দর হার। কানে দুল।...আমি তার হাত ধরলাম। সন্ধ্যে ঘন হয়ে এসেছে।

॥ ৩১ ॥

উঁচু শক্ত ধারালো শ শ বছরের পুরনো মিশকালো পাথরের খাঁজের মধ্যে, বাঁশ-ঝোপের আড়ালে, অল্প অল্প জলে, অন্ধকারে আশার শরীর নিস্পন্দ হয়ে গেল। অন্ধকারেই আশা-রা মরে।...সমস্ত গহনা আমার কাছে, পুঁটলি করে বাঁধা ছেঁড়া জামার কাপড়ে। শীতের ছোবলও আর গায়ে লাগছে না আমার।

॥ ৩২ ॥

মন্দিরের পাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে যাবার সময় এক বৃদ্ধা মহিলা হঠাৎ বললেন, "কোথায় যেন আগুন লেগেছে গো!"...মেলার দিকে না ধর্মশালার দিকে কোথায় আগুন লেগেছিল। লাল আঁচ উঠছিল একটা।

॥ ৩৩ ॥

রাত্রে শুয়ে শুয়ে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম—এই আগুন সেই আগুন, আমার জন্মের সময় যেটা লেগেছিল। আমার বাবা আগুন নেবাতে ছুটে গিয়েছিল, মা আর আমি অসহায় হয়ে পড়ে ছিলাম।

॥ ৩৪ ॥

আগুনটা আমার গায়ে এবং মনে লেগেছে এতকাল পরে। মা পুড়েছে; বাবা মরেছে আশাকেও আমি মেরেছি।

পুণ্য স্মৃতি স্বদেশী যুগের—

বঙ্গলক্ষ্মীর

ধুতি - শাড়ী - লঙক্লথ

মাতৃপূজায় ও নিত্য ব্যবহারে অপরিহার্য্য

ভারতের প্রাচীনতম গৌরবময় প্রতিষ্ঠান

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ

হেড অফিস—৭নং চৌরঙ্গী রোড

কলিকাতা—১৩

চাষ করা হয়েছে, তার ফলও ভাল পাওয়া গিয়েছে। ১৯৫৬-৫৭ সন পর্যন্ত মাত্র ২৩·৭৪ লক্ষ একর জমি এই পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। মোট জমির তুলনায় এর অংশ অতি নগণ্য। জাপানী পদ্ধতিতে চাষ করে একর-প্রতি ফলনের হার ১৩·৩ মন থেকে প্রায় ২০ মনে বেড়েছে। এই কাজ যদি ত্বরান্বিত করতে হয়, তা হলে প্রতি গ্রামে সরকারকে ডেমনস্ট্রেশন ফার্ম খুলতে হবে। চাষীদের দেখাতে হবে যে, নতুন পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলনের হার বাড়বে।

ভূমি সংস্কার: চাষীর যদি জমির উপর মালিকানা স্বত্ব না থাকে ত চাষের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। আমাদের জমিদারী প্রথা চালু ছিল। মোট জমির শতকরা ৪৩ ভাগ জমি জমিদারের অধীনে চাষ-আবাদ হত। ১৯৫১ সনে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় ভারত সরকার ঠিক করলেন চাষের জমিতে চাষীর অধিকার যদি না দেওয়া যায়, তা হলে চাষের উন্নতি হবে না। সেইজন্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি চালু করবার আয়োজন করলেন।

(১) প্রজা এবং সরকারের মধ্যে মধ্যস্বত্ব লোপ, (২) প্রজার খাজনা কমানো এবং উচ্ছেদ রহিত করা, (৩) পরিবার-পিছু সর্বোচ্চ জমি বেঁধে দেওয়া এবং বাকী জমি চাষীদের মধ্যে বিলি-ব্যবস্থা, (৪) সমবায় পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা।

নিম্নলিখিত তালিকাতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের কাজ কতটা এগিয়েছে, তা দেখান হয়েছে।

জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের কাজ

	লক্ষ একর	মোট জমির শতকরা
জমিদারী প্রথার আওতায় জমির পরিমাণ	৩৪,৩৮	৪৩%
কত পরিমাণ জমিতে উচ্ছেদ হয়েছে	৩০,৬০	৩৮%
অবশিষ্ট	৩৭৮	৫%

উপরের তালিকা থেকে দেখা যাবে যে, উচ্ছেদের কাজ বেশ ভালভাবেই চলছে, শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ জমি বাকী আছে। প্রজাদের অনেক জায়গায় খাজনা কিছু কমান হয়েছে। সরকার কয়েকটি বিলের সাহায্যে প্রজাদের বিনা কারণে উচ্ছেদ বন্ধ করেছেন। পরিবার-পিছু সর্বোচ্চ জমি বেঁধে দেবার কাজ এখনও করা সম্ভব হয়নি। জাতীয় নমুনা পর্যবেক্ষণ এ-বিষয়ে রাশি-তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং তাঁদের রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন।

গ্রামাঞ্চলে ৬·৫ কোটি পরিবার বাস করে। এদের মধ্যে প্রায় ১·৫ কোটি পরিবারের কোন জমি নেই, আর শতকরা মাত্র এক ভাগ পরিবারের ৪০ একরের বেশী জমি আছে। যে-সকল পরিবারের কোন জমি নেই বা যাদের দুই একরের কম জমি আছে তাদের যদি সবাইকে দুই একর জমি দিতে হয়, তা হলে প্রয়োজন হবে ৬০০ লক্ষ একর জমি। যদি আমরা ধরে নিই, কোন পরিবার ২০ একরের বেশী জমি রাখতে পারবে না, তা হলে আমরা ৬৩০ একর জমি পেতে পারি। তা হলে আমরা বলতে পারি, সারা ভারতবর্ষে পরিবার-পিছু সর্বোচ্চ কুড়ি একর জমি এবং সর্বনিম্ন দুই একর জমির ব্যবস্থা করা খুব শক্ত নয়। সমস্ত প্রদেশে এক জমির পরিমাণ রাখা সম্ভব হবে না, জমির অবস্থার উপর নির্ভর করবে।

সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বংশপরম্পরায় জমি ভাগ হতে হতে এখন এমন পর্যায়ে এসেছে যে, অনেক জমিতে উন্নত ধরনের চাষ করা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ তার আয়তন হয়েছে অত্যন্ত ছোট। সেইজন্য প্রয়োজন হয়েছে ছোট ছোট জমি একসঙ্গে করে বড় জমি তৈরী করা, যার আয়তন হবে অন্তত দশ একরের মতন। তারপর সমবায় পদ্ধতিতে ঐ জমি চাষ করা হবে। যদি সম্ভব হয়, সমবায় পদ্ধতিতে আরও বড় জমি চাষ করা যায়, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমার মনে হয়, বড় কৃষি-সংস্থা সমবায় পদ্ধতিতে চালানো সম্ভব নয়।

কৃষির উন্নতির জন্য গো-জাতির উন্নতি আশু প্রয়োজন। আমাদের দেশে গরুর লালনপালনের উপর মোটেই নজর নেই, যার ফলে চাষের কাজ মোটেই ভালভাবে হয় না। সরকারও এ-বিষয়ে সচেতন, কিন্তু এর উন্নতির কাজ মোটেই হচ্ছে না।

কোন স্বাধীন দেশের পক্ষে উপরোক্ত অবস্থা মোটেই গর্বের নয়। বর্তমান প্রবন্ধে কৃষির উন্নতির জন্য যে ব্যবস্থাগুলির কথা বলা হয়েছে, তা সুষ্ঠুভাবে কাজে পরিণত করতে পারলে দেশে খাদ্যের অভাব দূর হবে এবং সেই সঙ্গে প্রভূত বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সম্ভাবনা আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, একরে কুড়ি মন খাদ্যশস্য উৎপন্ন করা মোটেই শক্ত নয়। এটা সম্ভব হলে আমাদের দেশের চাহিদা মিটিয়ে আমরা অন্যান্য দেশে রপ্তানি করতে পারি। প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, লোকসংখ্যা এত বেশী যে, খাদ্য সংস্থান করা আমাদের সম্ভব নয়। আসল সমস্যা উৎপাদন বৃদ্ধি, লোকসংখ্যা নয়। আমাদের সেই দিকে নজর দিতে হবে। কিন্তু এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, যদিও ভারত সরকার পরিকল্পনায় উপযুক্ত ব্যবস্থাগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু কাজে তা অল্পই পরিণত হচ্ছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, সরকারের এই কাজগুলি করার জন্য যে বিভাগগুলির উপর ভার দেওয়া আছে, তাঁরা ঠিকমত কাজ করতে পারছেন না। বিভাগীয় কর্মচারীদের অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে এবং যে শাসনযন্ত্রের সাহায্যে এ-কাজ করার চেষ্টা হচ্ছে, সে-যন্ত্র এ-কাজের উপযুক্ত নয়। যে শাসনযন্ত্র ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষে তৈরী করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল কাগজপত্তর ঠিক রাখা, কাজ করা নয়, আমরা সেই শাসনযন্ত্রের সাহায্যে কাজ করার চেষ্টা করছি। তার ফল হয়েছে এই যে, কাজ এগুচ্ছে না। ভারত সরকার যদি কৃষির দ্রুত উন্নতি চান, তা হলে দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন করতে হবে।

সকাল থেকে সংকীর্তন শুরু হয়েছে। মৃদঙ্গের শব্দে কান পাতা দায়। সারা গলি মোটরে ঠাস বোঝাই। পায়ে-হাঁটা ভক্তেরও কমতি নেই। ছেলে, বুড়ো জোয়ানবয়সী ভোর থেকে ভিড় জমিয়েছে।

সামনের মাঠে মেরাপ বাঁধা হয়েছে। উঁচু বেদী। ফুল দিয়ে সাজানো। সেখানেই দীক্ষা দেওয়া হবে। এক সঙ্গে প্রায় শ দেড়েক লোক দীক্ষা নেবে। সবাই তৈরী। দেহে আর মনে। অন্তত বাইরের হাবভাব দেখে তাই মনে হচ্ছে।

গুরুদেব এখনও আসেননি। আসতে দেরি আছে। হাওড়া থেকে তাঁকে সোজা বরানগর নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অম্বুজ মল্লিকের বাড়ি। বিরাট লোহার কারবারী, মাঠে তিনটে অস্ট্রেলিয়ান ওয়েলার। মরশুমের সময় খুরের ঘায়ে ধুলো নয়, টাকা বৃষ্টি করে। এ ছাড়াও অন্য কারবার আছে।

স্ত্রী খুব ভক্তিমতী। ছেলেপুলে নেই। বছরে দু বার করে বাবার আশ্রমে যান। দিন দশেক করে কাটিয়ে আসেন। দু হাতে টাকা ছড়ান। মুঠো মুঠো টাকা।

নদীর ধারে বাবার থাকবার নতুন বাড়িটা অম্বুজবাবুর স্ত্রীর দানে তৈরী। শ্বেত-পাথরের মেঝে, মন্দিরের প্যাটার্নের থাম। লাল সিমেণ্টের রোয়াক। গেটের উপর শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা আছে, এটি গুরুদেবের সেবার নিবেদিত করেছেন দাসী সুনয়নী দেবী। সুনয়নী, অম্বুজ-বাবুর স্ত্রীর নাম।

অম্বুজবাবুও পরম ভক্ত। ধনদৌলত, পসার পরাক্রম সব কিছুই গুরুদেবের কৃপায়। গুরুদেব এলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। লোহার কারবারের খাতাপত্র সব ছোঁয়ান তাঁর শ্রীপাদপদ্মে। খুব ইচ্ছে, কোন সুযোগে যদি ঘোড়া তিনটেকে একবার গুরুদেবের মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারেন। কোনরকমে একবার তিনটের অঙ্গস্পর্শ করাতে পারলে আর দেখতে হবে না। তাদের জন্ম সার্থক। তা ছাড়া শনিবার শনিবার মাঠে একেবারে ভেল্কি দেখিয়ে দেবে। ইদানীং ইহুদী বিলজোরিরা বড্ড লাফালাফি শুরু করেছে।

কাজেই গুরুদেব সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এখানেই কাটাবেন। ফেরার মুখে তাঁকে একবার শ্যামবাজার ছুঁয়ে আসতে হবে। ভক্তের বিশেষ অনুরোধ। রাখহরি চাটুজ্যে। দুর্দান্ত মামলাবাজ। প্রায় হাইকোর্টেই বসতি বললে হয়। বাপ রাম-হরির সুদের কারবার ছিল। সেই কল্যাণে গোটা ছয়েক বাড়ি কুক্ষিগত করেছেন। মারা গেলেন একেবারে আচমকা। ফিরোজা-বাঈয়ের গান শুনতে শুনতে হাঁটু চাপড়ে তারিফ করতে গিয়েই সামনে ঝুঁকে পড়লেন, আর চোখ খুললেন না। ডাক্তার বললে, হার্টের ব্যাপার: কিন্তু পাড়ার পাঁচ-জন বললে, ওই জিনিসটার বালাই ত রাম-হরির কোন কালেই ছিল না। দরিদ্র আত্মীয় দূরে থাকুক, ভিখিরীরাও কোনদিন এক পয়সা পেয়েছে এমন কথা কেউ বলতে পারবে না।

রামহরি ত গেলেন। কিন্তু পাঁচ ছেলে রইল। উইল করার সময় পাননি, কাজেই বাড়ি নিয়ে কামড়াকামড়ি। গড়াতে গড়াতে কেস প্রিভিকাউন্সিলে। এর মধ্যে দুটি ছেলে চোখ বুজল, বিষয়ের মায়া না করেই। বাকী রইল তিনজন। রাখহরি জাল উইল খাড়া করেছিল। একেবারে বাপের সই। রামহরি বেঁচে থাকলেও বুঝতে পারতেন না। তাও খুব সুবিধা হচ্ছিল না।

রাখহরি মনমরা। কেস হারলে বেশ টলমল অবস্থা। এমন সময় কে একজন গুরুদেবের সন্ধান দিল। রাখহরি আর দেরি করেনি। রাত্রের ট্রেনেই রওনা হয়ে-ছিল। পেটকাপড়ে মোটা টাকা বেঁধে। ভেবেছিল, টাকাগুলো উকিলে ত খাচ্ছেই এবার গুরুদেবও কিছু খান। যদি বরাত ফেরে।

সব শুনে গুরুদেব কিন্তু চটে লাল। জোর করে পা ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিলেন "ছি, ছি, সংসারের কথা, এসব পাপ কথা তুই আমায় শোনাতে এসেছিস! বিষয় ত বিষ। সেই বিষের জ্বালায় নিজে জ্বলছিস সেই জ্বলুনির ভাগ আমায় দিতে এসে-ছিস! পাষণ্ড কোথাকার!"

রাখহরি পা ছাড়েনি। পায়ে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বলেছে, বিপদে ভক্তকে ভগবান না দেখলে আর কে দেখবে ঠাকুর?"

কথার সঙ্গে সঙ্গে পেটকাপড়ে বাঁধা নোটের গোছাটা গুরুদেবের পায়ের কাছে ফেলে দিয়েছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক। অনেক কাকুতি মিনতি কাঁদাকাটার পর পাষাণ গললো।

গুরুদেব বললেন, "খরচ আছে। য করতে হবে। ওপক্ষের উকিল, সাক্ষী সবাই

একত্র করতে হবে। মামলায় তো জয় হবেই।"

তাই হল। আরও হাজার দুয়েক খসল রাখহরির, কিন্তু মামলা জিতল। ভাই দুটোকে রাস্তায় ঠেলে ছখানা বাড়িতে নিজের দখল কায়েম করল।

সেই থেকে গুরুদেবের উপর অগাধ ভক্তি। বসবার ঘরে গুরুদেবের প্রকাণ্ড ছবি। চারধারে চন্দনের ফোঁটা। বছরে একবার করে উৎসব হয়। গুরুদেবের জন্মদিনে। খুব ধুমধাম। বিস্তর লোকজন খায়।

সংসারে স্ত্রী নেই রাখহরির। কোন বন্ধন নেই। একটি মেয়ে। তার ভালই বিয়ে হয়েছে। একটি ছেলে ছিল, ডাক্তারি পড়তে বিলেত গিয়ে আর ফিরে আসেনি। অনেক চেষ্টা করেছিল রাখহরি। একবার ছেলেটাকে এনে গুরুদেবের কাছে নিয়ে যেতে পারলে হয়ত সুরাহা হত, কিন্তু ছেলে এ-দেশে আসতে নারাজ। ওখানেই হয় ত বিয়ে-থা করে সংসার পেতেছে।

রাগে রাখহরি ছেলের সংগে আর কোন সম্পর্কই রাখেনি।

বরানগর, শ্যামবাজার শেষ করে গুরুদেবের ফিরতে বিকেল। অনেক দূর দূর থেকে ভক্তরা এসেছে। অনেকেই চোখে দেখেনি, কেবল নাম শুনেছে।

অবশ্য বছর দশেক আগে কেউ নামও শোনেনি। হঠাৎ কাগজে হৈ-চৈ। মেদিনীপুরের এক গ্রামে এক সাধুর উদয় হয়েছে। মাথায় রুদ্রাক্ষ ঠেকিয়ে যাকে যা বলছেন, তাই ফলে যাচ্ছে। কানা-খোঁড়া অন্ধ-আতুর দলে দলে ছুটেছে। রোগগ্রস্ত লোকেরা এমন সুযোগ ছাড়ল না। ডাক্তার বদ্যি আশা ছেড়েছে, হোমিওপ্যাথও কাত, এবার সাধুর শরণ নিতে দোষ কী! অবিশ্বাসীদের কথা আলাদা। তাদের কিছুতে বিশ্বাস নেই। কিন্তু মানুষ ত বিশ্বাস নিয়েই বাঁচে।

যারা ফিরে এল তারা নানান কথা বলল। কেউ কেউ মুখ বেঁকাল। বলল, ধাপ্পা। আবার কেউ ভক্তিতে গদগদ। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দু চোখের ধারা। সাধু নয়, দেবদূত। রোগীর যন্ত্রণা দূর করতে আর পাপীর পাপের বোঝা কমাতে মর্ত্যে নেমেছেন। যাদের রোগ সারেনি তাদের দিকে কটাক্ষ করে বলল, বিশ্বাস চাই, নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে দেওয়া চাই, তবেই সাধুর কৃপা হয়। খুঁতখুঁতে মন নিয়ে গেলে কেবল যন্ত্রণাই বাড়ে। রোগের উপশম হয় না।

বছর দুই তিন। সাধু থেকে গুরুদেব। অশ্বত্থতলা থেকে একেবারে প্রমোশন পাকা দালানে। বাঘছাল ছেড়ে সিল্কের গেরুয়া। খালি পা আর নয়, হরিণের চামড়ার চটি। রোগীর বদলে ভোগী এসে ঘিরে ধরল।

গুরুদেবের বয়স কত কেউ জানে না। দেখলে মনে হয় চল্লিশ বিয়াল্লিশ, কিন্তু মূর্খ ভক্তদের প্রশ্নের উত্তরে গুরুদেব হাসেন। হাত দিয়ে দেহের দিকে দেখিয়ে বলেন, "কোনটার বয়স জানতে চাস, এটার?" আবার বুকে হাত দিয়ে বলেন, "না, এটার? খাঁচার বয়স আর পাখির বয়স কি এক রে? বাইরের খোলসটাকে তো ফেলে রেখে চলে যাব। ছেঁড়া জামা কাপড় ফেলে দেয়ার মতন। পোশাকের বয়স দিয়ে মানুষের বয়সের হিসাব করবি?"

খোলস ফেলে দেওয়ার কথায় নারী ভক্তরা হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। গলায় আঁচল দিয়ে সাষ্টাংগে প্রণাম করে বলে, "মূর্খের অপরাধ নিও না প্রভু। তুমি সরে গেলে আমাদের কী গতি হবে? মনের জ্বালা জুড়তে কার কাছে ছুটে আসব?"

গুরুদেব পদ্মাসনে বসে দক্ষিণ হাত তোলেন। বরাভয়ের ভঙ্গিতে। সমবেত জয়-ধ্বনিতে আর সব আওয়াজ চাপা পড়ে যায়।

মোড়ে মোটর দেখা যেতেই সবাই চিৎকার করে উঠল। কালো গাড়ি। অম্বুজ মল্লিকের নিজের গাড়ি। বনেটের উপর গেরুয়া নিশান পতপত করে উড়ছে। গুরুদেব আসছেন। নাম-সংকীর্তনে আকাশ ভরে উঠল। ছেলে মেয়ে পুরুষ সবাই সুর মেলাল সংকীর্তনে। শাঁখের আওয়াজে পাড়া মাত।

গৃহস্বামী আদিনাথ কুণ্ডু স্ত্রীকে পাশে নিয়ে পথের উপর দাঁড়ালেন। পরনে গরদের জোড়। কপালে চন্দনের ফোঁটা। স্ত্রী লবঙ্গলতা। এক সময়ে হয়ত লতা ছিলেন কিন্তু আজ চেহারা সহকার তরুকেও হার-মানানো। শুধু কোমরের বেড়ই যে কত তা নন্দ স্যাকরা বলতে পারবে। দিন দশেক আগে সে-ই মাপ নিয়েছিল। একে এই চেহারা, তার উপর বাতের ব্যাপার আছে। তাই পিছনে একটা চেয়ার রাখা হয়েছে। কোমর কনকন করলে চেয়ারে বসে একটু করে জিরিয়ে নিচ্ছেন।

মোটর থামল। গুরুদেব নামলেন। একটি ভক্ত সিটের উপর পাতা বাঘছালটি হাতে করে নিল। পায়ের ধুলো নেবার জন্য কাড়াকাড়ি।

গুরুদেবের মুখে বিরক্তির ছিটেফোঁটা নেই। স্মিতহাস্য করছেন। একপাল শিশুর খেলা দেখছেন যেন।

বহু কষ্টে আদিনাথ গুরুদেবের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। লবঙ্গলতা পিছিয়ে পড়েছেন। ভিড়ে এগোতে সাহস করেননি। কোনরকমে কোমরে চোট লাগলে আর মাস-তিনেক পালঙ্ক ছাড়তে পারবেন না।

PUJA Greetings
এই উৎসবের দিনে
আপনাদিগকে
প্রীতি-শুভেচ্ছা
জ্ঞাপন করি
এন এন মোহন
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডায়ার মিকিন ব্রুয়ারীজ লিঃ
সোলান ব্রুয়ারী • কসৌলী ডিষ্টিলারী • লক্ষ্ণৌ ডিষ্টিলারী
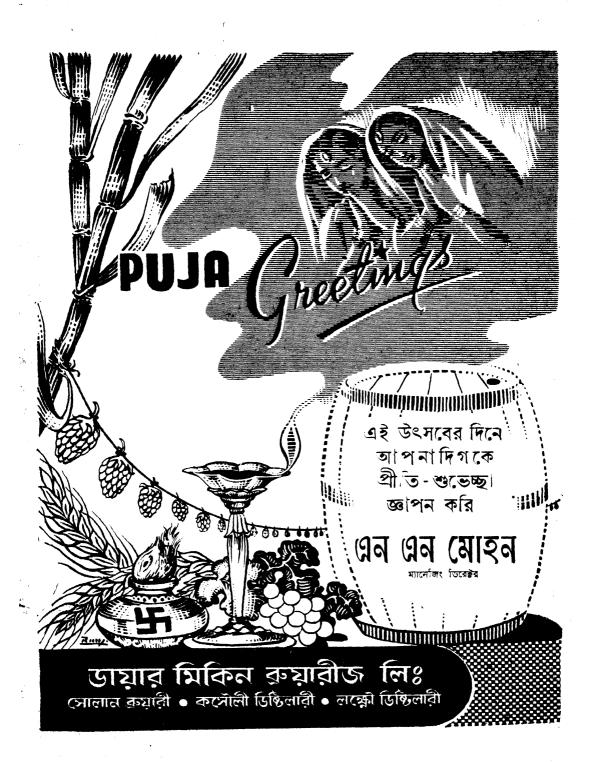
আদিনাথকে দেখে গুরুদেব মুখ খুললেন, "মা জননী কই? তোমার শক্তি?"

আদিনাথ ভিড়ের মধ্যে একবার নজর চালালেন। লবঙ্গলতাকে চোখে পড়ল না। শক্তি কোন ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে বোধহয় গতর সামলাচ্ছেন। গুরুদেবের দিকে চেয়ে বিব্রত গলায় বললেন, "ভিড়ের জন্য এগোতে পারছেন না। শরীরটাও দুর্বল।"

গুরুদেব সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলেন। সামনের ঘরে ধূপধুনো জ্বলছে। আলপনা দেওয়া। রাশি রাশি শ্বেতপদ্ম। মাঝখানে কার্পেট বিছানো। মণ্ডপে যাবার আগে প্রভু একটু বিশ্রাম করবেন।

এখানে বাইরের ভিড় কম। কেবল আদিনাথবাবুর আত্মীয় কুটুম্বরা রয়েছেন আর খুব অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী। তাও সবাই চৌকাঠের বাইরে। প্রভুর কাছে কেবল আদিনাথ আর লবঙ্গলতা।

আদিনাথ শেয়ার মার্কেটের নামকরা দালাল। এক সময়ে অবস্থা খারাপের দিকে ছিল। যে শেয়ার ছোঁন, তাই ডিগবাজি খায়। সব যায়-যায় অবস্থা। সেই সময় ধর্মের দিকে ঝুঁকেছিলেন। জ্যোতিষী, দৈবজ্ঞ, রত্নধারণ এ-সব করতে করতে গুরুদেবের খোঁজ। কাচের টুকরো কুড়োতে কুড়োতে মানিক পাওয়ার সামিল। গিন্নী একটু খুঁতখুঁত করছিলেন। প্রভুর মুখ দেখে যেন মনে হয় বয়স বড্ড কম, কিন্তু আপত্তি টেঁকেনি। প্রভুর মুখে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনে লবঙ্গলতা ভিজে গিয়েছিলেন। সংস্কৃত ত নয়, যেন খই ফুটছে। নিশ্চয় ভাল ভাল কথা বলছেন। আর দ্বিরুক্তি করেননি, দেরিও নয়। যুগলে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

তারপর ধাপে ধাপে আদিনাথের বরাত ফিরেছে। দুর্জনে অবশ্য নানাকথা বলে। ব্যবসার মূলধন সম্বন্ধে বিশ্রী ইঙ্গিত। একসময়ে মামা আর ভাগনে দুজনে মিলে ব্যবসার পত্তন করেছিলেন। আদিনাথবাবু আর তাঁর মামা। মামা চোখ বুজতেই কারবার পিছলে একেবারে আদিনাথবাবুর মুঠোয় এসে গিয়েছিল। গোটা তিনেক নাবালক ছেলেমেয়ে নিয়ে মামীমা যাতায়াত করেছিলেন, ধরণা দিয়েছিলেন আদিনাথবাবুর কাছে। কিন্তু সুবিধা হয়নি। কী করে হবে? মারা যাবার দিন পনের আগে মামা ভাগনের কাছে তাঁর নিজের অংশ বিক্রি করে গিয়েছেন। তার দলিলও আদিনাথবাবু মামীমাকে দেখালেন। কপাল চাপড়ে বললেন, "কারবারের ত ডুবন্ত অবস্থা। নেহাত মামা, কিছু ত আর বলতে পারি না। তাঁর ভাগটা ঘাড়ে নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। জেলে না যেতে হয়! উঃ, মামা এত দেনা করলেন কেন? অন্য কোন রোগ ছিল নাকি?"

মামীমা আর কিছু বলেননি। আঁচলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন। আদিনাথবাবুও আর কোন খোঁজ-খবর নেননি।

আজ বছর তিনেক ধরে আদিনাথবাবু চেষ্টা করছেন। নতুন বসতবাটিতে একবার গুরুদেবের পায়ের ধুলো যাতে পড়ে। গুরুদেবের ফুরসতই হচ্ছে না। প্রত্যেক বছরেই আশা দেন, কিন্তু হয়ে আর ওঠে না।

এবারে গুরুদেব নিজের থেকেই সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। কলকাতায় আসবেন আর উঠবেন আদিনাথ কুণ্ডুর বাড়িতে।

অবশ্য উদ্দেশ্যও একটা ছিল। মহৎ উদ্দেশ্য। আশ্রম বাড়ানো হচ্ছে। উপাসনা-ঘর আর অতিথিশালাটা না বাড়ালে আর চলছে না। গুরুদেবের জন্মদিনে নানাদিক থেকে লোক আসে। ঘরের অভাবে উঠানে, পথের ধারে, বনেবাদাড়ে সব শুয়ে থাকে, এ-দৃশ্য দেখে গুরুদেব ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন। নিজের শয্যা যেন কাঁটার বিছানা বলে মনে হয়। শুতে পারেন না, সারাটা রাত ছুটোছুটি করেন।

নানা জায়গায় আবেদন পাঠিয়েছেন। কাজও হয়েছে। প্রায় রোজই মনিঅর্ডারে টাকা আসছে। নানাদিক থেকে। কিন্তু কলকাতাই আসল। জাঁদরেল ভক্তরা সব এইখানে। এমন একটা মহৎ কাজে তাদের বাদ দিলে চলে না। তাই গুরুদেব স্বয়ং এ-কাজের ভার নিয়েছেন। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে তাদের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

লবঙ্গলতার দিকে ফিরে গুরুদেব স্নেহ-ভরা গলায় বললেন, "জননীর শরীর কেমন?"

লবঙ্গলতা ভিড়ের পাশ দিয়ে উঠবার সময় কে একজন ধাক্কা দিয়েছে। কনকন করছে কোমরটা। মুখ বেঁকিয়ে বললেন, "সবই আপনার দয়া বাবা। এমনিতে ভালই আছি, ওই বাতটা মাঝে মাঝে চাগা দিয়ে ওঠে—"

গুরুদেব কথা শেষ হবার আগেই আশ্বাস দিলেন, "ব্যাধি মনে করলেই ব্যাধি। নাম জপ কর মা, নাম জপ কর। তুচ্ছ দেহের কথাটা আর মনেই থাকবে না।"

"অষ্টপ্রহর ত তাই করছি বাবা।"

এতক্ষণ লবঙ্গলতা অবশ্য বিড়বিড় করছিলেন, কিন্তু সেটা নামজপ, না যে আবাগের বেটা কোমরে লাগিয়ে দিয়েছে তার বাপান্ত ঠিক বোঝা গেল না।

গুরুদেব অন্তর্যামী। সব বুঝেই রহস্য করছেন কি না কে জানে! দোষ কাটাবার জন্য লবঙ্গলতা ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন।

বাইরে নামসংকীর্তন আরও জোর। মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ ছিল, লুচি আর হালুয়াভোগের পর আবার পুরোদমে শুরু হয়েছে। আওয়াজ যেন আরও জোরালো।

কলিকাতার এজেণ্ট : শাহা ব্যাভিশ এণ্ড কোং, ১২৯, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গুরুদেব তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে স্থির হয়ে পড়ছেন। সমাধির সগোত্র। মুখে মৃদু হাসির আভাস। দেহটা তেরোর-দুই শ্যামলাল সরকার লেনে রয়েছে বটে, কিন্তু মনটা উধাও। মাটি, জল, আকাশ ছাড়িয়ে আরও ঊর্ধ্বলোকে।

হঠাৎ কীর্তন ছাপিয়ে নারীকণ্ঠের আর্তস্বর উঠল। গুরুদেব চমকে চোখ খুললেন। দু চোখে বেদনার মেঘ।

"কে কাঁদে? এমন দিনে কে কাঁদে?"

চৌকাঠে-জমাট-বেঁধে-বসে-থাকা নারী-পুরুষের দল পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখল। ব্যাপারটা সবাই জানে না, কয়েকজন জানে। কিন্তু এমন কথা প্রভুর গোচর করা যায় না। পাপ হয়। যে বলবে, পাপ তাকেও স্পর্শ করবে। আদিনাথ কুণ্ডু চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। কোন শব্দ তাঁর কানে পৌঁছেছে, মুখ দেখে মনে হল না। লবঙ্গলতা অবশ্য মুখটা সিঁটকেই রয়েছেন। কোমরের ব্যথাতেই বোধ হয়।

গুরুদেব আর কিছু বললেন না। নামরসে বিভোর। এ-নামের বুঝি তুলনা হয় না। পশুপক্ষী, স্থাবর জঙ্গম অন্তরীক্ষ সব চুঁইয়ে ঝরে পড়ছে নামের মধু। তাপিত ব্যথিত চরাচরের উপর সান্ত্বনার প্রলেপের মতন। হিংসা, অসূয়া, দ্বেষ সব দূরে যায় এ নামের গুণে, মানুষ পাগল হয়।

আর্তকণ্ঠস্বর যে কার সেটা আদিনাথ আর লবঙ্গলতা দুজনেরই জানা।

কোথায় এমন সময়ে গুরুর শরণ নেয় মানুষ, কিন্তু পোড়ারমুখী সরযূর সবই উল্টো ধারা। তিনকূলে দেখবার মধ্যে ত ওই বিধবা মা। সহায় নেই, সম্বল নেই, তা ছাড়া এমন মেয়ে ত গলার কাঁটা। না সধবা, না বিধবা। বিয়ে হয়েছিল পাঁড়াগাঁয়ে। বিষয়-সম্পত্তি জমিজেরাত সবই ছিল, কিন্তু কপালে সইল না মেয়ের। আগুনের মতন রূপ, সেই রূপে শুধু স্বামীর ঘরই জ্বালাল না, নিজের কপালও পোড়াল। চুপি চুপি কার হাত ধরে স্বামীর ভিটে ছাড়ল। মুখ ধুতে নদীর কূলে গেল, মেয়ে আর ফিরল না। চারদিকে হৈ-চৈ। স্বামী জীবনলাল তন্ন তন্ন করে সব খুঁজল, শেষকালে শ্বশুরবাড়ি চড়াও হয়ে এসে শাশুড়ীকে যা মুখে আসে, তাই বলে গেল।

শাশুড়ী কাঁদবারও সময় পেল না। মাথায় হাত দিয়ে অবাক হয়ে বসে রইল।

মেয়ে ফিরল মাস তিনেক পরে। রুক্ষ চুল, ছেঁড়া শাড়ি, শীর্ণ চেহারা, কিন্তু দু চোখে আগুন।

মা তেড়ে গিয়েছিল ঝাঁটা নিয়ে, কিন্তু মেয়ের চোখের দৃষ্টি দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এ ত সহজ মানুষের দৃষ্টি নয়! তবে কি পাগল হয়ে গেল সরযূ!

সরযূ পাগল হয়নি। দাওয়ায় বসে প্রত্যেকটি কথা বলল। মুখ ধুতে নদীতে নেমেছিল, গাছের ঝোপের পাশ থেকে নৌকা এসে দাঁড়াল। পলকের মধ্যে সরযূর মুখ বেঁধে তাকে নৌকায় নিয়ে তুলেছিল জন দুয়েক লোক। মুখে কাপড় বাঁধবার আগে প্রাণপণে সরযূ চিৎকার করেছিল। সে-চিৎকার স্বামীর কানেও গিয়েছিল। কিন্তু বীরপুঙ্গব একটু এগিয়েই ব্যাপার দেখে তীরবেগে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, নৌকা মাঝদরিয়ায় না যাওয়া পর্যন্ত আর বাইরে আসেনি।

তারপর!

তারপরের কাহিনী কি মুখ ফুটে বলতে হবে সরযূকে! তব বেশবাসে, আলুলায়িত চুলে, চোখের দৃষ্টিতে কি সে-কাহিনী ফুটে ওঠেনি!

মা সরযূকে তাড়িয়ে দেয়নি। সঙ্গে নিয়ে গ্রাম ছেড়েছিল।

মেয়ে কিন্তু অবুঝ। সাজপোশাক করে, পাশের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা। দরকার হলে এ-বাড়ি ও-বাড়ি বেড়িয়েও আসে। এত বড় মেয়ে এটুকু বোঝে না। এরকম করে বেড়ালে স্বামীর দেওয়া অপবাদটাই সত্যি হয়ে দাঁড়াবে।

কিছু বললেই সরযূ ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে, কেন, আমার দোষটা কোথায়? নিজের পরিবারকে রক্ষা করার যার সাধ্য নেই, তার আবার বিয়ে করা কেন? লোকের নামে অপবাদ দিয়ে সে বেড়ায় কোন্ সাহসে?

সমাজের সাহসে, পুরুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সাহসে। কিন্তু এ-কথা কে বোঝাবে সরযূকে!

এমনি যখন অবস্থা তখন লবঙ্গলতার চিঠি গেল সরযূর মার কাছে।

সরযূকে নিয়ে এমন করে ভুগছিস কেন অন্ন? গুরুদেবের কাছে নিয়ে আয়, তিনি মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দিলেই সে শান্ত হয়ে যাবে। ফণা গুটিয়ে নিস্তেজ হবে।

নিয়ে ত যাবে মেয়েকে, কিন্তু এই বেশে? এক মাথা কালো চুলের রাস। টকটকে রঙ। পরনে রঙিন শাড়ি, পানের রসে দু ঠোঁট লাল। টানা চোখে বিদ্যুতের দাহ। এমন মেয়েকে কি গুরুদেবের সামনে নিয়ে যাওয়া যায়? ঘৃণায় তিনি মুখ ফিরিয়ে নেবেন। যে অনুতপ্ত নয়, কুকর্মের জন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই, বেদনাবোধ নেই, তাকে কী হবে দীক্ষা দিয়ে? জমি না তৈরী হলে, বীজ পুঁতে লাভ?

তবু অন্নপূর্ণা সরযূকে নিয়ে এল বোনের বাড়ি। গুরুদেবের কথা কিছু জানাল না। শহরে বেড়াতে যাচ্ছি। মাসীর বাড়ি। বাস্, এইটুকুই সরযূ জানল।

প্রথম কয়েকদিন সরযূর বেশ স্ফূর্তিতেই কাটল। জানলা দিয়ে এ-বাড়ি ও-বাড়ি কথাবার্তা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে লোক-চলাচল দেখা। মাসী-মেসোর সঙ্গে গল্প। কিন্তু একদিন নাপিত এসে দাঁড়াতেই মেয়ে চেঁচামেচি শুরু করল। ঘরের মধ্যে ঢুকে গালিগালাজ, সকলের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার। সুবিধা হল না, বিধবা মায়ের কাছে জোর চলত, আবদার খাটত, কিন্তু এখানে মেসোর ধমকে চুপ করে গেল।

একেবারে ন্যাড়া নয়, কদমছাঁট চুল। পান খাওয়া বন্ধ, রঙিন শাড়ি পরাও। মেয়ের পাউডারের কৌটো মা আগেই সরিয়ে রেখেছিল। স্বামী আছে অথচ ঘরে নেয় না, এমন কথায় আরও পাঁচ কথা উঠবে। অথচ সিঁথির সিঁদুর মুছতেও মায়ের ভরসা হল না। স্বামী নিরুদ্দেশ। কোন খোঁজখবর নেই। মেয়ে প্রায় বিধবারই সামিল। বার বছর না হওয়া পর্যন্ত শুধু

শাঁখা সিঁদুর বজায় রেখেছে। আর মাছ খাওয়া।
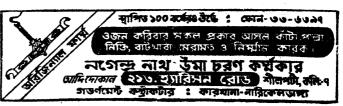
গুরুদেব আসবার আগের দিন মা আর মাসী অনেক করে বোঝাল। মন্ত্র নিতে হবে। এপারের ভাবনা ত শেষ, এবারে ওপারের কথা ভাবতে হবে। এ-জন্মটা ত এমনি কাটল, যাতে পরের জন্মে সুখী হয় তার সাধনা করতে হবে।

তেজী ঘোড়ার মতন মেয়ে ঘাড় বেঁকাল।

"না, ওসব আমি পরব না। ফোঁটা কেটে, তিলক কেটে দিনরাত মন্তর জপা আমার দ্বারা হবে না।"

মাসী বোঝাবার চেষ্টা করলেন, মা কিন্তু খাপ্পা। "এসব করবি না ত কী করবি আবাগী? নিজের মুখে ত ভাল করে চুন-কালি লেপেছিস, এবার আমার মুখ পোড়াবি।"

"আমি যেমন আছি, তেমনি থাকব।"

"হ্যাঁ, তুমি ধিঙ্গিপনা করে বেড়াবে আর পাঁচজনে অকথা কুকথা আমাকে বলবে। ওসব চলবে না, মন্ত্র তোকে নিতে হবেই।"

সরযূ দেয়ালে ঠেসান দিয়ে চুপচাপ বসে রইল। দুচোখ-ভরা জল। নিজের শোকে, না চুলের শোকে, ভাল বোঝা গেল না।

গুরুদেব আসবার দিন আবার বোঝানো শুরু হল মেয়েকে। মা মাসী ত রইলই, আরও দু-একজন বয়স্থা পড়শীও যোগ দিল।

"কত ছোট ছোট মেয়ে বিধবা হয়, সারা-জীবন কত কষ্ট পায়, গুরুদেবের পায়ের তলায় এসে শান্তি পায়। আশ্রমে এমন কত মেয়ে রয়েছে। সাধন ভজন করছে, ঠাকুরের নামগান, ইষ্টদেবের আওতায় দিন কাটাচ্ছে।"

লবঙ্গলতা গতবার আশ্রমে গিয়ে গুরু-দেবকে রাজী করিয়েছেন। বলেছেন সরযূর কথা। গুরুদেবের শ্রীচরণ ছাড়া আর কোন গতি নেই মেয়েটার।

গুরুদেব সব শুনে চোখ বন্ধ করেছেন। দুটো হাত কোলের উপর রেখে বিড়বিড় করে বলেছেন, "এ তোমার কী খেলা দয়াময়! মানুষকে আগুনে ঝলসিয়ে এ তোমার কী নিষ্ঠুর আমোদ।"

দীক্ষাদান শুরু হল। লবঙ্গলতাই বলে-ছিলেন, যা ছিরির মেয়ে! ওকে আর ভিড়ের মধ্যে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই। কী করে বসবে, সমস্ত উৎসবটাই পণ্ড হবে। তার চেয়ে সব হয়ে গেলে গুরুদেবকে বলে আলাদা করে ওকে মন্ত্র দিলেই হবে।

তাই ঠিক হল। এ বিধি নয়, তাও গুরুদেব রাজী হলেন।

মণ্ডপে তিলধারণের ঠাঁই নেই। শাঁখ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গের শব্দে জমজমাট। প্রত্যেককে কাছে ডেকে গুরুদেব কানে কানে বীজমন্ত্র দিলেন, সে বসে বসে তাই জপতে লাগল। গুরুদেবেরও জ্ঞান নেই। ভাবে উন্মত্ত। ক্লান্তি নেই, বিরাগ নয়। নানা বয়সের পুরুষ নারী সকলকে সস্নেহে কাছে ডাকছেন। মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছেন, তারপর মন্ত্র দিচ্ছেন কানে।

ওর মধ্যেই কানে মন্ত্র দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দু-একজন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। বাতাস, জল, চারদিকে হৈ-হৈ রব। গুরুদেব হাত তুলে ব্যস্ত হতে বারণ করলেন। কোন ভয় নেই, এ-মূর্ছা যত দেরিতে ভাঙে ততই ভাল। এ-মূর্ছায় অপার আনন্দ।

কাছে-বসা দু-একজন জাঁদরেল ভক্ত প্রশ্নও করলেন, "এমন কেন হয় বাবা?"

গুরুদেব হাসলেন: "কড়া ইনজেকশন শরীরের মধ্যে দিলে আনচান করে না শরীর? এও তাই। বিষয়বিষে টইটুম্বুর

দেহমন, অমৃতের স্পর্শ পেয়ে একটু বেসামাল হবে বইকি।"

শেষ হতে প্রায় ছটা। গুরুদেব উঠে দাঁড়ালেন। ভলেণ্টিয়ারের দল ছুটে এসে পথ করে দিল। এবার বিশ্রাম। সারাদিনের ক্লান্তির পর কিছু আহার করবেন। ততক্ষণ নামগান চলবে পুরোদমে। একটানা।

সিঁড়িতে পা দিয়েই গুরুদেব চমকে উঠলেন। আবার সেই আর্তস্বর। এ-স্বর মানুষের গলার বলে যেন মনেই হয় না। তীরবিদ্ধ কোন জন্তুর অন্তিম চিৎকারের মতন। অবশ্য মানুষ ত মায়াবদ্ধ জীব, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ আর মাৎসর্যের তীর অনবরত তাকে বিঁধছে। এক তিল শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না।

সিঁড়ির চাতালেই লবঙ্গলতা দাঁড়িয়েছিলেন। গুরুদেব উঠতেই হাত জোড় করে বললেন, "বাবা, এবার মেয়েটার একটা গতি করুন।"

হাত তুলে গুরুদেব শান্ত হবার ইঙ্গিত করলেন। মৃদু হেসে বললেন, "তোর সেই বোনের মেয়ের কথা বলছিস ত?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"চল্‌, পাগলীটা কোথায় আছে দেখি।"

একেবারে কোণের ঘরে সরযূকে রাখা হয়েছিল। যাতে তার কান্নার আওয়াজ মণ্ডপে না পৌঁছায়। অন্য ভক্তদের দীক্ষায় ব্যাঘাত না ঘটায়।

হাঁটুর উপর মুখ গুঁজে সরযূ গুমরে গুমরে কাঁদছিল। গুরুদেব, দীক্ষা, মন্ত্র, এসবের মানে বোঝবার বয়স তার হয়েছে। এসবের মানে এ-জীবনের সুখ, সাধ, কামনা বাসনার ইতি। মনের ইচ্ছাকে পুড়িয়ে ছাই করে তার বিভূতি গায়ে মেখে ওপারের সাধনা করার ভড়ং দেখাতে হবে। পৃথিবীর সমস্ত প্রয়োজন সরযূর ফুরিয়ে যাবে। ছাব্বিশ বছর বয়সে কেন তার এই শাস্তি! আর-একজনের অপরাধের জন্য তার এই জীবনব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধন!

না, কিছুতেই সে দীক্ষা নেবে না, আশ্রমে যাবে না, গুরুদেবের সামনাসামনি দাঁড়াবে না।

গুরুদেব এগিয়ে যেতে লবঙ্গলতা ভয় পেলেন। সরযূর মাও। কিছু বলা যায় না। যা মেয়ের মতিগতি, আঁচড়ে কামড়ে গুরুদেবকেই হয়ত উত্যক্ত করে তুলবে।

সে কথা বলতে গুরুদেব মুখে অমায়িক হাসি ফোটালেন।

"ভাবিসনি রে, সব ঠিক হয়ে যাবে। নদীর লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি সমুদ্রে পড়লেই সব শান্ত।"

দরজায় শব্দ হতেই সরযূ ফিরল।

অল্প আলো। আবছা দেখা গেল দীর্ঘকায় এক মূর্তি। পরনে গৈরিক বাস। মুখে স্বল্প হাসির আভাস।

দু-এক মিনিট। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুরুদেব নিরীক্ষণ করলেন। আবার হেসে বললেন, "কোন ভয় নেই, আমার কাছে এস। আমি ত রয়েছি তোমার দুঃখ ঘোচাবার জন্য।"

গলার স্বর কানে যেতেই সরযূ সোজা হয়ে দাঁড়াল। মানুষটা ত অপরিচিত নয়। এক স্বর, এক বলার ভঙ্গি।

দ্রুত যবনিকা সরে গেল। চাঁদের আবছা আলোয় নৌকার ছই থেকে বেরিয়ে এসে সেদিনও এই একই কথা বলেছিল। এমনি অভয় দেবার ভাষায়।

সেদিন সরযূ ভুল করেছিল। বন্যার হাত থেকে বাঁচবার আশায় আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল। প্রাণ বাঁচিয়েছিল, ধর্ম বাঁচাতে পারেনি।

বাইরের আবরণ বদলে এসেছে বলেই সরযূ বুঝি আবার ভুল করবে! আবার নিজেকে হারাবে মধুর আশ্বাসবাণীতে।

না।

হিংস্র বাঘিনীর মতন সরযূ দৃপ্তভঙ্গিতে দাঁড়াল। আর আত্মসমর্পণ নয়, প্রয়োজন হলে আত্মবিলুপ্তি।

স্ট্যাণ্ডার্ড নার্সিং হোম
৪/২এ, ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রসূতি মায়েরা হাসপাতালের
ভীড় না বাড়িয়ে আমাদের সার্জনদের তত্ত্বাবধানে সামান্য খরচে প্রসবের ও সর্বপ্রকার অস্ত্রোপচারের সুযোগ গ্রহণ করুন। এখানে জেনারেল সার্জারী চক্ষু, কান, নাক ও সমস্ত স্ত্রীরোগের সার্জারী চিকিৎসা করা হয়। রোগীদের দীর্ঘকাল রেখে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত আছে।
ডাঃ মিসেস রায়

কবিতা পাঠের ভূমিকা

শ্রীকালিদাস রায়

বিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পঞ্চভূতে' "কাব্যের তাৎপর্য" নিবন্ধে বলেছেন — "কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়, তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। * * অনেকে বলেন আঁটিটাই ফলের প্রধান অংশ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহার প্রমাণ করাও যায়। কিন্তু তথাপি অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি ফলের শস্যটি খাইয়া তাহার আঁটি ফেলিয়া দেন। তেমনি কোন কাব্যের মধ্যে যদিবা কোন বিশেষ শিক্ষা থাকে তথাপি কাব্য-রসজ্ঞ ব্যক্তি তাহার রসপূর্ণ কাব্যাংশটুকু লইয়া শিক্ষাংশটুকু ফেলিয়া দিলে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা আগ্রহসহকারে কেবল শিক্ষাংশটুকুই বাহির করিতে চাহেন আশীর্বাদ করি তাঁহারাও সফলকাম হউন এবং সুখে থাকুন। আনন্দ কাহাকেও বলপূর্বক দেওয়া যায় না। কুসুম্ভ ফুল হইতে কেহবা তাহার রঙ বাহির করে, কেহবা তৈলের জন্য তাহার বীজ বাহির করে, কেহবা মুগ্ধনেত্রে তাহার শোভা দেখে। কাব্য হইতে কেহবা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহবা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহবা নীতি, কেহবা বিষয়জ্ঞান উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন—আবার কেহবা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না। —যিনি যাহা পাইলেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন-কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না—বিরোধে ফলও নাই।"
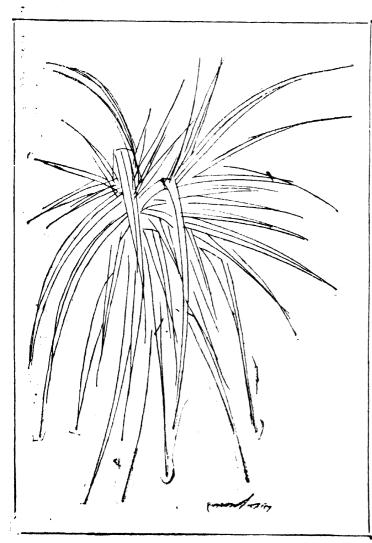
পত্রালি　　　　শিল্পী শ্রীগোপাল ঘোষ

কাব্যবিচারের মূল কথা এই অনুচ্ছেদেই উপনিবদ্ধ আছে। এত সহজ সরলভাবে কাব্যধর্মের সার কথা আর কেউ বলেননি। কবিগুরু বলতে চেয়েছেন—রসই কবিতার পক্ষে মুখ্য, তা ছাড়া অন্য কিছু যদি পাওয়া যায়, তবে তা গৌণ। রসপিপাসু চিত্তে অন্য কিছুর প্রত্যাশা না করেই কবিতা পাঠ করতে হবে, তথা তত্ত্ব সংশিক্ষা ইত্যাদি যদি পাওয়া যায়, তবে তা উপরি পাওনা, সে পাওনাকে উপেক্ষা করলেও চলে। সমালোচক ও সাহিত্য-পাঞ্জিকারদের কাজ গৌণ বস্তুর সন্ধান। রসবিচার ও সমালোচনা এক নয়। রস উপভোগ ও তত্ত্ব-জ্ঞানলাভও এক নয়। রসানন্দ ও বোধানন্দ এক বস্তু নয়।

গাভীর দুগ্ধের দিকে যার প্রখর দৃষ্টি, তার কাছে গাভীর আপীনটাই বড়। বৎসলতার প্রতিমূর্তি গাভীর বৎসের অঙ্গলেহন-বিগলিত মাতৃমমতা তার মর্ম স্পর্শ করে না বা তার চোখে পড়ে না। হংসের ডিম্বেই যার প্রয়োজন হংসের গ্রীবাভঙ্গাভিরাম রূপটি তার উপভোগে আসে না।

হৈমবত প্রদেশে যারা স্বাস্থ্যোন্নতিসাধন, ঐশ্বর্যপ্রদর্শন অথবা বিলাসকেলি-কুতূহলচরিতার্থ করবার জন্য ভ্রমণে যায়, হিমালয়ের রাজশ্রী ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য তাদের মুগ্ধ করে না। এমন কি, তীর্থ-দর্শনের জন্য যারা যায়, দেবতাত্মা সর্বদেব-ময় হিমালয়ের উদাত্ত মহিমা তাদের চোখে পড়ে না।

কাব্যেও যারা গৌণ অবান্তর বস্তুর সন্ধান করে, কাব্যের মুখ্য দান হতে তারা বঞ্চিত হয়।

কাব্য মুক্তাফলের মত। আয়ুর্বেদীর

চোখে এর ভস্মটারই মূল্য বেশী। মুক্তাকে অলংকার করে যারা পরে, তাদের কাছে মুক্তার দুর্লভতাই গৌরবের বস্তু। কথিত আছে মোগল-রাজপুরনারীদের মুক্তাচূর্ণ ছিল তাম্বূলের উপাদান। মুক্তার প্রকৃত গৌরব ও মূল্যবত্তা তার অঙ্গের ছায়াতারল্য বা লাবণ্যে। শব্দকল্পদ্রুমে এ লাবণ্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছে—

মুক্তাফলেষুচ্ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে॥

এই যে লাবণ্য, তাই উৎকৃষ্ট কবিতার সর্বাঙ্গে টলটল করতে থাকে। এই লাবণ্য যাকে মুগ্ধ করে সেই হল কাব্যের আসল জহুরী।

কবিতা মুক্তার সঙ্গে অন্য কারণেও উপমেয়। সমুদ্রগর্ভের শুক্তির মধ্যে বালুকণা প্রবেশ করে একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করে। এই আঙ্গিক অস্বস্তিকে নিরাময় করবার জন্য শুক্তিদেহ হতে একটা রসের ক্ষরণ হয়। তাই ঘনীভূত হয়ে মুক্তার সৃষ্টি করে। অধিকাংশ কবিতাই এই মুক্তার মত অপ্রকৃতিস্থ কবিচিত্তের একটা অস্বস্তিময় অবস্থার সৃষ্টি। এই অস্বস্তি সিসৃক্ষার আকুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। এ. ই. হাউসম্যানের উক্তি এই কথার সমর্থন করে—

If I were obliged, not to define poetry, but to name the class of things to which it belongs, I should call it a secretion; whether a natural secretion like turpentine in the fir or a morbid secretion like the pearl in the oyster.

আদিকবিতার জন্মকথায় এই সত্যেরই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ব্যাধের শর কেবল ক্রৌঞ্চের বুকে নয়, আদিকবির বুকেও আঘাত করে একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করেছিল। সেই অস্বস্তিই রামায়ণী ধারার উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল।

কবিমনে কবিতাসৃষ্টির গূঢ় সূত্র একটা এতে পাওয়া যায়। সকল সৃষ্টির মূলে এইরূপ একটা অস্বস্তি থাকে। পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টিতেই এই অস্বস্তির নিরসন,—তারই নাম সৃষ্টির আনন্দ।

কবির সৃজনীশক্তি যে পাঠকের চিত্তেও সৃজনীশক্তি উদ্রেক করে, তাও এইভাবে। এইভাবেই কবিচিত্তের সঙ্গে পাঠকচিত্তের সাধর্ম্য নিরূপিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

কবি কথামালঞ্চের মালাকার। বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর মালঞ্চে অনেক ফুলই ফুটত। মালিনী রাজপুরীতে সে ফুল যুগিয়ে মূল্য আদায় করত, তাতে তার অন্নবস্ত্রের সংস্থান হত। এতে অসাধারণতা কিছু নেই। 'সুন্দর' এসে সেই ফুলে এমন মালাই গাঁথলেন প্রাণের আকূতি দিয়ে, যাতে 'বিদ্যাদেবী'ও বাঁধা পড়লেন। কবিই এই 'সুন্দর'। কোন কথাই নতুন নয়, সবই পুরাতন, ফুলের মতই রাশি রাশি কথা মুখে মুখে ফুটছে, সেই কথা বেচে অনেকেই অন্ন সংস্থান করে। পুরাতন কথাগুলিকে কবি একটি আবেগময় ভাবসূত্রে এমন করেই গাঁথেন, যাতে পণ্ডিতদের 'বিদ্যা'ও মোহিত হয়ে কবির বশীভূত হয়ে পড়ে।

কবিকল্পনার কাজ আর রসায়নের কাজ একই। বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ দুই অর্থেই কবিকর্ম রসায়ন ছাড়া আর কিছু নয়। ধাতু, ক্ষার, দ্রাবক ইত্যাদির মত সব ভাবই

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য-সুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥"
[গীতা ১৭ অঃ ৮ম শ্লোক]

'আয়ু, উৎসাহ, শক্তি, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্ধক এবং রসসমন্বিত, স্নিগ্ধ, স্থায়িগুণবিশিষ্ট আনন্দদায়ক আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয়।'

কে, সি, দাশের
রসোমালাই ও রসগোল্লা
উক্ত সর্বগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিক আহার

বায়ুশূন্য টিনে রসগোল্লা বহুদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে বলিয়া দূরান্তরে পাঠাইতে বিশেষ সুবিধাজনক

কে, সি, দাশ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা

অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। ন্যায্যমূল্যে পছন্দসই চশমার জন্য নির্ভরযোগ্য স্থান:
ঘোষের আই ক্লিনিক এণ্ড অপটিক্যাল ইনডাস্ট্রী
৪৯০, জি, টি, রোড, শিবপুর, হাওড়া

পুরাতন। রাসায়নিক মিলনে ঐসব ধাতু-ক্ষারাদি এমন অভিনব রূপ ধারণ করে যে, তাতে উপাদানগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বাহ্যত বিলুপ্ত হয়ে যায়। কবিচিত্তের রসাগারে তেমনি বিভিন্ন ভাবের রাসায়নিক মিলন ঘটে, তাতে পুরাতন ভাবগুলিই নব-কলেবর লাভ করে। কবিগুরু তাই বলেছেন—

"যাহা ছিল চিরপুরাতন
তারে পাই যেন হারাধন।"

রসজ্ঞ পাঠক চিরপুরাতন হারাধনকে অভিনবরূপে ফিরে পাওয়ার গভীর আনন্দ লাভ করে। অতএব, ভাব তথ্য তত্ত্ব ঘটনা দৃশ্য বা কাহিনী নতুন নয় বলে সৎ কবিতাকে উপেক্ষা করা চলে না, সৃষ্টিটা নতুন অপূর্ব ও সর্বাঙ্গসুন্দর হল কিনা তাই দেখতে হবে। আমাদের মনে কত দৃশ্যের, কত ঘটনার, কত ভাববস্তুর রূপ-রূপান্তরের ছায়াপাত হচ্ছে দিনের পর দিন। এই রূপচ্ছায়াগুলি (Imageries) গৃহিণীপনার অভাবে আমাদের মনো-ভাণ্ডারে বিশৃঙ্খলভাবে বিকীর্ণ হয়ে পড়ে থাকে।

কবিকল্পনার গৃহিণীপনার গুণে কবির মনোভাণ্ডারের রূপ হয় স্বতন্ত্র। ঐ মনো-ভাণ্ডার চিত্রশালায় পরিণত হয়। কবিতা এই চিত্রশালার সৃষ্টি। যাদের মনে ঐ সকল রূপচ্ছায়া বিশৃঙ্খল হয়ে রইলেও সংরক্ষিত থাকে, বিলুপ্ত হয় না, তারাই কবির সৃষ্টিতে মোহিত হয়, কবিকল্পনার গৃহিণীপনার মহিমা তারাই বোঝে, অন্যের পক্ষে এর কোন মূল্য নেই।

আমাদের চিত্তে ভাবের সঙ্গে অনুভূতির অবিরত সংঘর্ষ ঘটছে, মাঝে মাঝে মিলনও ঘটছে। আমরা এই মিলনকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারি না। কবি-চিত্তে এই মিলন যখন রাজযোটকতা লাভ করে, তখনই কবির প্রতিভা তাতে প্রাণ-বীজ বপন করে। সেই বীজ জীবদেহের স্বাভাবিক উন্মেষধর্ম অনুসরণ করে সজীব, সুষম, সুসমঞ্জস ও চিরন্তন সৃষ্টি হয়ে ওঠে। যারা ঐরূপ মিলনের মাধুর্য উপভোগ করে, কিন্তু তাকে প্রাণবীজের অভাবে চিরন্তন করে তুলতে পারে না, তারাই কবির সৃষ্টির মহিমা সহজে উপলব্ধি করে। তারাই কবির আদর্শ পাঠক। অন্যের পক্ষে কবির রচনাপাঠ 'শুকের পঠন' মাত্র।

কাব্যলক্ষ্মী যখন আসেন, তখন তিনি তাঁর নিজস্ব ছন্দ-সুর-ভাষার বাহনে আরোহণ করেই আসেন। কবিতা তার আকৃতিপ্রকৃতি, পরিমিতি, পরম্পরা, পরিণতি সবই সঙ্গে করে কবির লেখনীমুখে আবির্ভূত হয় অর্থাৎ কবির মনের মধ্যেই তার অধিকাংশ রচিত হয়, কবির লেখনী শুধু রঙের উপর রসান চড়ায়। 'কবি রচনা করেন' না বলে 'কবির মনে রচিত হয়' বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়। এ ই হাউসম্যান কবিতারচনার প্রথম স্তরের প্রসঙ্গে বলেছেন—

I think the production of poetry, in its first stage, is less an active than a passive and involuntary process

প্রথম স্তরটি যেন কাব্যপ্রতিমার একমেটে দোমেটে দুইই। এই তত্ত্ব ব্যক্ত করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে জীবনদেবতা, অন্তর্যামী ইত্যাদির কল্পনা করতে হয়েছে। কোন উৎকৃষ্ট কবিতা পড়লেই রসজ্ঞ পাঠকের কাছে এই তত্ত্বটি সহজে উপলব্ধি হয়।

যে-সকল কবিতা কবির মনের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপ লাভ করবার আগেই বাণী-রূপ পায়, কবির সেই সকল কবিতাই অপকৃষ্ট রচনা, অকালপ্রসূত সন্তানের মত দুর্বল, অকালপক্ক ফলের মত অস্বাদু।

কবিতার রসনিষ্পত্তি হয় কবি ও রসজ্ঞ পাঠক উভয়ের ভাবধারার মিলনে। অতএব রসোপলব্ধি ব্যাপারে পাঠকের দায়িত্ব অল্প নয়।

এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত চার চরণই চরম কথা—

"একাকী গায়কের নহে তো গান
মিলিতে হবে দুইজনে।
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা
আরেক জন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ
তবে সে কলতান উঠে।
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে
তবে সে মর্মর ফুটে।"

অনেকের ধারণা আছে, তথাকথিত উচ্চ-শিক্ষা থাকলেই বুঝি কবিতার রসবোধে অধিকার জন্মে। এ-ধারণা ভ্রান্ত। রসবোধের জন্য স্বতন্ত্র সাধনা ও অনুশীলন করতে হয়, আদর্শ রসজ্ঞের উপদেশমত। সকল কবিতা সকল পাঠকের জন্য নয়। এক এক শ্রেণীর কবিতা এক এক শ্রেণীর পাঠকের জন্য। সকল শ্রেণীর কবিতার রস উপলব্ধি করতে পারে এমন পাঠক দুর্লভ।

সংস্কারমুক্ত মনে কবিতা পাঠ করতে হবে, কিন্তু বাসনামুক্ত মনে পাঠ করলে চলবে না। কোন কবিতার ভাব-বস্তু ও অন্যান্য উপাদান উপকরণ সম্বন্ধে যার ধারণা নেই, তার পক্ষে সে কবিতার রস গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই ধারণাকেই 'বাসনা' বলে।

কবিতাপাঠকালে পাঠক যদি তাতে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নেন, তা হলে পরমান্নে কর্পূর-সংযোগের মত ফল হবে।

চেতোদর্পণ মার্জিত না হলে অর্থাৎ পাঠকের মন সংস্কারের মালিন্য হতে মুক্ত

না হলে তাতে কবিতার ভাবরূপ সম্যক প্রতিফলিত হয় না।

পাঠকের যদি কবিতার টেকনিক সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকে, তা হলে তার কাছে গদ্য-পদ্য দুইই সমান।

ভবভূতি সমানধর্মার প্রত্যাশায় দৃশ্যকাব্য রচনা করেছিলেন। সকল কবিই, তাঁর মত মুখে না বললেও তাই করেন। কবির সংগে সাধর্ম্য না থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাব্যপাঠ ব্যর্থ হয়।

বৈষ্ণব পদাবলীর রস আস্বাদ করতে হলে কীর্তনের সুরে সংযোগে তা শুনতে হয়, নাটকের রস উপভোগ করতে হলে রঙ্গমঞ্চে তার অভিনয় দেখতে হয়। কবিতার রস উপভোগ করতে হলে সুকণ্ঠে তার আবৃত্তি শুনতে হয় কিংবা সযত্নে আবৃত্তি করে পড়তে হয়। একবার চোখ বুলিয়ে কেবল মোটামুটি ভাবটাই জানা যায়। উৎকৃষ্ট কবিতা ধ্বনির সংগে যুগনদ্ধভাবে পরিকল্পিত। অতএব ধ্বনি বাদ গেলে, শ্রুতির সংগে সহযোগিতা বর্জন করলে পুরো রস উপভোগ সম্ভব নয়।

সংস্কৃত আলংকারিকরা বলেছেন—

পাঠাদিতগুণাপি সৎ কবিভণিতিঃ
কর্ণেষু বর্ষতি মধুধারাম্।

অর্থবোধ না হলেও উৎকৃষ্ট কবিতা কেবল যথাযথ আবৃত্তির গুণে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এই উপভোগকে বলে অপ্রবন্ধ উপভোগ। গীতিকবিতার পক্ষে এই অপ্রবন্ধ উপভোগের মূল্য কম নয়।

কবিতার সুরেরও একটা বাণী আছে—সে বাণী রসজ্ঞের শ্রুতি ধরতে ও বুঝতে পারে। কবিতার নিজস্ব ভাষা যদি না-ই বোঝা যায়, সুরের ভাষা বুঝলেও রসাস্বাদন ঘটে। রচনাকালে কবি এই সুরের ভাষা বা বাণীর দিকেও লক্ষ্য রাখেন। সুরধ্বনির ভাষা কবিতায় অস্ফুট হয়ে থাকে, আবৃত্তির গুণে তা সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

কবিতায় বাগ্‌বিন্যাসের সৌষম্য, মাধুর্য এবং সূক্ষ্ম কারুকলা মনে মনে পড়লে হারিয়ে যায়। আবৃত্তিতে সে সব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তা ছাড়া ভাবধারার উদাত্ত ও অনুদাত্ত লীলা এবং হৃদয়াবেগের তরঙ্গায়িত গতি আবৃত্তিতেই বাঙ্ময় রূপ লাভ করে।

দেবপ্রয়াগ

আলোকচিত্রী শ্রীআনন্দ মুখোপাধ্যায়

শিবলিঙ্গ-রহস্য

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

বলিঙ্গের পূজা হিন্দু-সমাজে অতিপ্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত। উহা কোনও সম্প্রদায় বিশেষে নিবদ্ধ নয় অর্থাৎ কেবল শৈবগণই শিবলিঙ্গের পূজা ও সম্মান করেন অন্য সম্প্রদায়ের লোক করেন না এরূপও নহে। সকল সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণই চিরকাল উহা করিয়া আসিয়াছেন। উহা তুচ্ছ, ইতরশ্রেণীর লোকের যোগ্য এরূপ মনে করেন নাই। শিবরাত্রি পর্বে বৈষ্ণবেরাও নির্জল উপবাস ত করেনই, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেককে রাত্রি জাগিয়া চারিপ্রহরে চারিবার শিবলিঙ্গপূজা করিতে বাল্যে গ্রামে বাসকালে দেখিয়াছি। অবশ্য অন্য দিনেও, সম্ভবত প্রত্যহই, ইঁহারা শিবপূজা করিতেন। কিঞ্চিৎ পরিণত বয়সে কাশীতে অদ্বৈতাচার্যের বংশধর এক গোস্বামী বন্ধুর বাসায় আমি এক সপ্তাহ ছিলাম, তাঁহাকে প্রত্যহ শিবপূজা করিতে দেখিয়াছি। শালগ্রামপূজা কেবল ব্রাহ্মণ জাতীয় পুরুষগণ করিতে পারেন, ব্রাহ্মণীদের পক্ষে উহা নিষিদ্ধ। অন্য-জাতীয় পুরুষের পক্ষেও তাহা নিষিদ্ধ, স্ত্রীলোকের ত কথাই নাই। কিন্তু শিবলিঙ্গপূজা স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে সকল বর্ণের লোকের পক্ষেই অনুমোদিত। সেইজন্য এই পূজা সকল সম্প্রদায়েই প্রচলিত।

কিন্তু ইহার জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও এই পূজার ইতিহাস, বিশেষত শিবলিঙ্গের মূলীভূত তত্ত্ব একাল পর্যন্ত রহস্যাবৃতই রহিয়া গিয়াছে। লিঙ্গ শব্দটির একটি অর্থ অতিপ্রচলিত; উহার সহিত শিবলিঙ্গের আকারের কিছু সাদৃশ্য আছে। সেইজন্য সাধারণ লোকের পক্ষে বিভ্রান্ত হওয়া আশ্চর্যজনক নহে। এ-বিষয়ে পুরাণকারগণেরও কিছু দায়িত্ব আছে; প্রাচীন জনসাহিত্যেও তদনুসারে নানা অশ্লীল গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রুতির দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বসকল নানা চিত্তাকর্ষক আখ্যানাদি দ্বারা সহজে লোকের বোধগম্য করাই ছিল পুরাণসমূহের মূল লক্ষ্য। বেদবহির্ভূত অনেক নূতন নূতন দেবতা, তাঁহাদের উপাসনাপদ্ধতিসহ, উহাতে স্থান ও সমর্থন পাইয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহাদের সমধিক প্রচারেরও সুবিধা হইয়াছে। বৈদিক দেবতারাও পুরাণে রূপ পরিবর্তন করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত অনেক পাঠকেরই সম্ভবত বিদিত। দুই-একটি উল্লেখ করিব।

বেদে বিষ্ণু হইতেছেন সূর্যের নামান্তর। পুরাণে এবং সম্ভবত তৎপূর্বে প্রচলিত হিন্দু ধর্মে তিনি হইয়াছেন শংখচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ দেবতা। "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং" ইত্যাদি বৈদিক বচনটির অর্থ ছিল সূর্য নভোমণ্ডল পরিক্রমণ করিতে তিন স্থানে পদ স্থাপন করেন। ঐ তিন স্থানের অর্থ ছিল, পূর্ব পশ্চিম দিগন্ত ও আকাশের মধ্যবিন্দু। পুরাণে এই সহজ সত্যটি বামনাবতারে বলিকে ছলনার জন্য বিষ্ণু কর্তৃক এক পদ দ্বারা দ্যুলোক এক পদ দ্বারা মর্ত্যলোক ব্যাপ্ত করিয়া স্থানাভাবে তৃতীয় পদ বলির মস্তকে স্থাপন পূর্বক তাহাকে পাতালে লইয়া তাহার ভক্তির পুরস্কারস্বরূপ তথাকার আধিপত্যদানের গালভরা গল্পে রূপান্তরিত হইয়াছে। বেদে বৃত্র মেঘমালা; নির্মল আকাশের নামান্তর ইন্দ্র উহা ভেদ করিয়া পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করেন। পুরাণে বৃত্র স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য কামনায় ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী অসুর।

বেদের শিক্ষাকে সাধারণ লোকের চিত্তরঞ্জক করিবার জন্য পুরাণে অশ্লীলতার সাহায্যও গ্রহণ করা হইয়াছে। দুইটি দৃষ্টান্ত দিব। বেদে পুরুষসূক্তে পুরুষকে সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ বলিয়া তাহার বিভুতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইন্দ্র প্রাচীনতম ঋক্‌সূক্তগুলিতে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলেন। তাঁহার সর্বদ্রষ্টৃত্ব প্রকাশ জন্য তাঁহাকে সহস্র-লোচন বলা স্বাভাবিক সাহিত্যরীতি-সম্মত। ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু, তাঁহার দেববিভূতিমাত্র তাহাতে সংশয় নাই। পুরাণে এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রের কামুকত্ব, তৎপরবশতাহেতু ছলনাপূর্বক গৌতমপত্নী অহল্যার সতীত্বনাশ, তাহার ফলে গৌতমের শাপে তাঁহার সর্বঅঙ্গে হাজার স্ত্রী-চিহ্নের উৎপত্তি এবং পরে সেই চিহ্নগুলিরই লোচনাকারে পরিণতির গল্প কল্পিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য—পরস্ত্রীগমন দেবরাজের পক্ষেও মহাপাপ, মানুষের ত কথাই নাই, এবং তজ্জন্য ভীষণ দণ্ড (ইহলোকে বা পরলোকে) অনিবার্য এই শিক্ষা দেওয়া। তুলসীপত্র একটি পরম উপকারী বস্তু। আয়ুর্বেদে বিল্বপত্র ও তুলসীপত্রের বহু গুণ বর্ণিত। অতি উপকারী বস্তু বলিয়াই শিবপূজায় বিল্ব-পত্রের ও বিষ্ণুপূজায় তুলসীপত্রের প্রচলন হইয়া থাকিবে। এখন তুলসী শব্দটি অভিধান মতে স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া পুরাণকার এক গল্প ফাঁদিবার সুবিধা পাইয়াছেন। তুলসী হইলেন রাধিকার সখী, কৃষ্ণের সহিত তাঁহার অনুচিত রকমের ঘনিষ্ঠতা রাধিকার সহ্য হইল না। ফলে তাঁহারই শাপে তুলসী ধর্মধ্বজ রাজার কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন এবং শংখচূড় দৈত্যের পত্নী হইলেন। কৃষ্ণ তখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি শংখচূড়ের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সতীত্বহানি করেন। কৃষ্ণের এমন যে প্রিয়া তিনি বৃক্ষাকার ধারণ করিলে তাহার পত্র কৃষ্ণের পূজায় দিলে তিনি অবশ্যই অত্যন্ত প্রীত হইবেন। অতএব ঐ পূজার সকল উপচার তুলসীযুক্ত করিয়া নিবেদন করা কর্তব্য এই শিক্ষা দেওয়া হইল।

সুবিখ্যাত 'গোল্ডেন বাউ' নামক সুবৃহৎ (১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ) গ্রন্থের প্রণেতা সার্ জর্জ ফ্রেজার (১৮৫৪—১৯৪১) এবং তাঁহারও বহু পূর্ব হইতে যে সকল মহাজন আফ্রিকা প্রভৃতি নানা ভূখণ্ডের অনুন্নত আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রচলিত আচার, ধর্মমত, কুসংস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়াছেন তাঁহারা ঐরূপ অনেক জাতির মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের গুপ্ত অঙ্গের অনুরূপ প্রস্তরখণ্ডাদি পূজিত বা অন্যরূপে সম্মানিত ও ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছেন।

এই আচারের নাম দেওয়া হইয়াছে ফ্যালিক ওয়রশিপ—লিঙ্গোপাসনা; মাতৃ-গর্ভে সন্তানের উৎপত্তি ও যথাকালে তাহার জন্ম একটা রহস্যাবৃত ব্যাপার। রহস্যাবৃত বলিয়াই উহা ধর্মের গণ্ডীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, কেননা উহা সৃষ্টি রক্ষার সহায়। জগৎসৃষ্টির মূলেও আদি স্ত্রী-পুরুষ এবং তাহাদের জীবোচিত মিলন অনুমিত হইয়াছে। ঐ ব্যাপারটির শুভাশুভ উভয়বিধ পরিণামজনক শক্তি আছে বলিয়া তৎসংশ্লিষ্ট অঙ্গের সংস্কারও প্রচলিত হইয়াছে। এইভাবেই আদিতে লিঙ্গোপাসনা প্রবর্তিত হইয়াছে মনে করা

হয়। একমতে সন্তান জননের ধারণা হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মত গ্রাহ্য নহে। 'অ্যান অ্যানালিসিস অব ম্যাজিক অ্যাণ্ড উইচক্র্যাফ্‌ট' নামক গ্রন্থে জি ডবস্‌ অলিভার বলিয়াছেন, "There are tribes in Australia to this day who are unaware of the relation between sexual connection and child-birth."

অস্ট্রেলিয়াতে এখনও অনেক জাতি আছে, যাহারা যৌন মিলনের সহিত সন্তান জন্মের কোনও সম্বন্ধ আছে—ইহা জানে না। অথচ ইহাদের মধ্যে একপ্রকার ধর্ম-সংস্কার বেশ প্রবল। যাহা হউক, ইহাও সত্য যে, অনেক অনুন্নত জাতির মধ্যে লিঙ্গোপাসনা প্রচলিত ছিল, এবং হয়ত এখনও আছে। এককালের সভ্যতম গ্রীক সমাজেও দেবতাবিশেষের উপস্থোপাসনার সহিত একটি অতি বীভৎস আচার অনুষ্ঠিত হইত। তাহার বিবরণ আর দিতে চাই না।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ যখন এদেশে আসিলেন এবং এখানে শিবলিঙ্গ পূজিত হইতে দেখিলেন এবং এদেশের সাধারণ লোকের তদ্বিষয়ক ধারণার বিষয় শুনিলেন, তখন তাঁহারা উহাতে তাঁহাদের বহুশ্রুত ফ্যালিক ওয়রশিপ-এরই আর একটি দৃষ্টান্ত পাইলেন। এমন কি, শালগ্রামও স্ত্রীঅঙ্গের প্রতীক, এরূপ মত এদেশের কোনও শিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকের মুখে না শুনিলেও তাঁহারা তাহা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। শালগ্রাম যে কোনও স্ত্রী-দেবতার প্রতীক নয়, পুং-দেবতা বিষ্ণুর প্রতীক, এ সত্য তাঁহারা লক্ষ্য বা গণ্য করিলেন না।

শিব বৈদিক দেবতা নহেন, এইজন্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলিলেন, সম্ভবত আর্যগণ এদেশে আসিয়া যে সকল অনার্য জাতিকে পরাজিত ও বশীভূত করিয়া সমাজমধ্যে অন্ত্যজ জাতিরূপে স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, লিঙ্গরূপে শিবের পূজা উহাদের নিকট হইতেই আর্যেরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে প্রচলিত মতে অনার্যগণ সভ্যতা বিষয়ে আর্যদিগের তুলনায় অত্যন্ত হীন ছিল। বৈদিক সাহিত্যে অনার্যদিগকে 'শিশ্নদেবাঃ' (উপস্থ যাহাদের দেবতা; শিশ্ন=উপস্থ) বলিয়া বিদ্রূপ করা হইয়াছে। সুতরাং তাহারা যে লিঙ্গপূজক ছিল, তাহাতে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ কিন্তু ঐ শব্দটির অর্থ করিয়াছেন, কামাতুর। বেদোত্তর সংস্কৃত সাহিত্যে (এবং বাঙলায়ও) 'শিশ্নোদরপরায়ণ' এই শব্দটির প্রচুর

কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ তৈল — ঋষিরাজ ব্রাহ্মী আমলা কেশতৈল

"........এই তৈল আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ কবিরাজগণের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়। ইহার বিশুদ্ধতার উপর সন্দেহ করিবার অবকাশ থাকে না।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক

প্রিন্সিপাল—গোবিন্দসুন্দরী আয়ুর্বেদ কলেজ,
সভাপতি অখিল ভারত আয়ুর্বেদ কংগ্রেস।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

চরক ক্যামিকাল ওয়ার্কস (প্রাইভেট) লিঃ

১৬১/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

Sulekha
WORKS LTD.

সুলেখানুরাগীদের প্রতি

বন্ধুগণ,

সুলেখা কালির বর্তমান জনপ্রিয়তার পশ্চাতে একদিকে রহিয়াছে ইহার ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষ, অন্যদিকে রহিয়াছে আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা। আজ কৃতজ্ঞচিত্তে সেকথা স্মরণ করি।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, সুলেখার এই জনপ্রিয়তার সুযোগ লইয়া কতিপয় অসাধু ব্যক্তি বাজারে জাল কালি চালাইতেছে। এজন্য আমরা অবশ্য ক্রমে ক্রমে জাল-নিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছি।

এদিকে আবার কিছুদিন হইল, আর-এক শ্রেণীর অসাধুতা দেখা দিয়াছে। হুবহু সুলেখার কার্টন, দোয়াত, লেবেল, ছাপ— মনে হইবে যেন সুলেখা কালি-ই। কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন, সুলেখা নয়, অন্য কোন নামের কালি। অথচ সুলেখার সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্যযুক্ত। প্রতারণার আর এক অভিনব পন্থা!

সুলেখানুরাগী সকলকেই এ সম্বন্ধে সজাগ করিয়া দিতে চাই। সেই সঙ্গে জানাইতে চাই, যে-সকল শিল্প দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় করিতে সচেষ্ট তাঁহাদিগকে এই সকল দুর্নীতির হাত হইতে রক্ষা করা দায়িত্বশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অন্যতম কর্তব্য।

আপনাদের

[illegible]
ননীগোপাল মৈত্র

ডাইরেক্টারস, ম্যানেজিং এজেন্টস্
সুলেখা ওয়ার্কস্ লিমিটেড

সুলেখা পার্ক
কলিকাতা-৩২
মহালয়া, ১৩৬৫

প্রয়োগ আছে, উহার অর্থ কামুক ও পেটুক।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের উক্তরূপ আলোচনার বহুকাল পরে হারাপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর আবিষ্ক্রিয়া ও তথায় খননকার্যের ফলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৈদিক যুগের আর্যগণের তুলনায় অনার্যগণ অসভ্য ত নয়ই বরং বিশেষরূপে সভ্যতরই ছিল। এই বিষয়ে মৎসংকলিত একটি প্রবন্ধ চারি বৎসর পূর্বে 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা'য় মুদ্রিত হইয়াছিল। কৌতূহলী পাঠক বিস্তৃততর বিবরণ স্টুয়ার্ট পিগট লিখিত 'প্রি-হিস্টরিক ইণ্ডিয়া' নামক পুস্তকখানিতে পাইবেন।

উহাতে পাঠক ইহাও পাইবেন—"There is also evidence of some form of phallic worship with representations of male and female generative organs."
তথায় লিঙ্গপূজার প্রকারবিশেষেরও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে পূজার নিদর্শন ঠিক বুঝা যায় না; সেইজন্য কেহ কেহ বলিয়াছেন, সম্ভবত উর্বরতা-বৃদ্ধির জন্য শস্যক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ-চিহ্নানুকারী বস্তুসকল রাখিয়া দেওয়া হইত; এরূপ প্রথা অন্যত্র দেখা গিয়াছে। ইহা হইলেও ঐ সকল বস্তুর একটা শক্তি ও তজ্জন্য মর্যাদা অবশ্যই স্বীকৃত হইত। অন্য কোনও কোনও লেখক কিন্তু এই বিষয়টি উল্লেখযোগ্যই মনে করেন নাই। সে যাহা হউক, ঐ আচারটি সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে ইহাও অনুমান করা যায় যে, কালক্রমে অনার্য জাতির লোকেরা বহুসংখ্যায় আর্য সমাজে স্থান পাইলে নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে লিঙ্গপূজা কোনও না কোনও প্রকারে প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পা উভয়ত্র নারীর আকারের বহু মৃন্মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ঐগুলি খুব সম্ভব ক্রীড়নক মাত্র ছিল না; পুরুষাকার মৃন্মূর্তি পাওয়া যায় নাই। অনুমান করা হইয়াছে, ইতিহাস-পূর্ব যুগের বেলুচিস্থানের ন্যায় উক্ত অনার্য সমাজে মাতৃভাবে দেবতার উপাসনা অধিক প্রচলিত ছিল এবং উক্ত মূর্তিগুলি সম্ভবত পুরোহিতের সাহায্য ব্যতীতই গৃহদেবতারূপে গৃহে গৃহে পূজিত হইত। পুরোহিতের কথা বলা হইয়াছে এইজন্য যে, উক্ত দুই স্থানেই পুরোহিতদের প্রবল প্রতাপ ছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, যদিও কোনও মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। এক স্থানে একটি মন্দির থাকিতে পারে এরূপ অনুমান করা হইয়াছে। একটি সীলে এক স্ত্রী-মূর্তির উদর হইতে উৎপন্ন একটি বৃক্ষ দেখা যায়; ইনি ভূদেবী হইবেন। একটি সীলে অশ্বত্থ বৃক্ষের ডালে এক দেবতাকে দেখা যায়। সম্ভবত দেবাধিষ্ঠিতরূপে অশ্বত্থবৃক্ষের পূজা হইত। এই আচারও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুসমাজে সংক্রমিত হইয়াছিল মনে করা যায়। অশ্বত্থবৃক্ষের সম্মানের আরও নিদর্শন আছে। উন্নত-ককুদ বৃষভের মূর্তিও বহু সীলে পাওয়া গিয়াছে। ইহারা সম্ভবত ধর্মের ষাঁড়ের পূর্বজ।

সে যাহা হউক, আমাদের বিশেষ প্রয়োজন হইতেছে উভয় শহরে একাধিক সীলে প্রাপ্ত একটি পুরুষ দেবতার মূর্তি লইয়া। ঐ দেবতা ত্রিমুখ শৃঙ্গধারী, যোগাসন বিশেষে উপবিষ্ট—
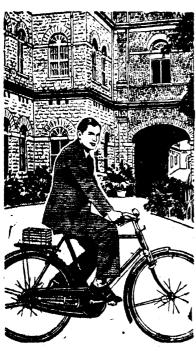
এম্ব্যাসী মার্সিরাইজড্ স্যুট

পরুন

পারিপাট্যে অতুলনীয়

● রকমারি মনোরম রঙ-এর খুব সুলভ মূল্যে

● গুণ, বুনন ও ফিনিশ-এর দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ

Krishna FABRICS

কৃষ্ণ ফেব্রিকস্

মার্সিরাইজড্ স্যুটিংস্ এন্ড শার্টিংস্

পপলিন — তসর

শ্রীকৃষ্ণ স্পিনিং এন্ড উইভিং মিলস্ (প্রাইভেট) লিঃ, ব্যাঙ্গালোর—২

K.M—4

"A male god, horned and three faced, sitting in the position of a yogi, his legs bent double heel to heel." (পিগট)। একটি সীলে মূর্তিটি চারিটি বিভিন্ন পশু দ্বারা বেষ্টিত, পদপার্শ্বেও দুইটি হরিণ আছে। খুব সম্ভব ইনি হিন্দু দেবতা যোগিরাজ পশুপতির পূর্বরূপ। সম্ভবত ইনি চতুর্মুখ ছিলেন, এক মুখ সীলে দেখান সম্ভব হয় নাই, পশু চারিটি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—এই চারিদিকের রক্ষক; দেবতা চারি মুখ দ্বারা বোধ করি চারিদিকে দৃষ্টি করিতেন; পশুগুলি উত্তরকালের দিক্পতিগণের বাহন ঐরাবতাদি দিগ্গজের পূর্বগামী।

এখন শিবপূজার প্রসঙ্গে আসা যাউক। শিব বৈদিক দেবতা নহেন, ইহা স্বীকার্য। পুরাণে দক্ষযজ্ঞের যে বিবরণ আছে, তাঁহাও ইহার একটি প্রমাণ। প্রজাপতি দক্ষ শিবকে দেবতার সম্মান দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন, ফলে তাঁহার যজ্ঞ পণ্ড হইল, দক্ষের মুখে শিবনিন্দা শুনিয়া পুরোহিত মহর্ষি ভৃগু হাসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দুই পাটি দাঁত ভাঙিয়া দেওয়া হইল (তজ্জন্য এখনও যজ্ঞে ভৃগুর জন্য উদ্দিষ্ট চরু দন্তহীন লোকের ভোজনযোগ্য করা হয়।), আর দক্ষের মুণ্ডপাত এবং তৎস্থলে ছাগমুণ্ড যোজিত হইল। বুঝা যায়, শিবকে আর্যসমাজে প্রচলিত হইতে কিছু বেগ পাইতে হইয়াছিল। পুরাণে তিনি অসুরদিগের (অনার্য জাতির) মুরুব্বি। রামায়ণে তিনি রাবণ কর্তৃক পূজিত, মহাভারতে বাণাসুরের আরাধ্য। যখন তিনি আর্যগণের দেবতা হইলেন, তখন অগ্নি ও রুদ্র এই দুই দেবতার স্থান যুগপৎ গ্রহণ করিলেন। শিবমহিম্নঃ স্তোত্রে আছে শিবের অষ্টমূর্তির যে ভিন্ন ভিন্ন নাম, যথা—ভব, শর্ব, রুদ্র, পশুপতি, উগ্র, মহাদেব, ভীম ও ঈশান, তাহার প্রত্যেকটিতে শ্রুতির সমর্থন আছে—"অস্মিন্ প্রচরতি শ্রুতিরপি"। উহার টীকায় মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন, এই নামগুলি "বহ্নিনামস্বেন সমাম্নাতানি"—অগ্নির নামরূপেই শ্রুতিতে উল্লিখিত। এক শ্রুতিতে তিন দেবতা প্রধান বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছেন, আদিত্য, বায়ু ও অগ্নি। আদিত্যের স্থান দ্যুলোক, বায়ুর অন্তরিক্ষ, অগ্নির ভূলোক। অগ্নি যেমন মানুষের মঙ্গলকর তেমনই ধ্বংসকার্যেও পটু। প্রথম ভাবে তিনি শিব (মঙ্গলকর) দ্বিতীয় ভাবে প্রলয়ের দেবতা রুদ্র। এইভাবে শিব দক্ষাদি সমাজপতিদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও শুধু দেবগণ মধ্যে স্থান পান নাই, শ্রেষ্ঠ তিন দেবতার অন্যতম হইয়াছেন। মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পার সীলসমূহে তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট। আর্যপূজিত শিবও মহাযোগী এবং যোগী বলিয়া মহেশ্বর। কালিদাস বলিয়াছেন—ঈশ্বর এই শব্দ কেবল শিব সম্বন্ধেই প্রযোজ্য ও অন্বর্থ—"যস্মিন্ ঈশ্বর ইতি অনন্যবিষয়ঃ শব্দো যথার্থাক্ষরঃ।" যোগী বলিয়া শিব সর্বপ্রকার বিভূতিসম্পন্ন। বিভূতি শব্দের অর্থ অণিমা-লঘিমা ইত্যাদি যোগসিদ্ধি। ঐ শব্দের আর একটি অর্থ ভস্ম। এই দ্বিতীয় অর্থ ধরিয়া প্রাকৃতজনকে বুঝান হয়—শিব সর্বদা গায়ে ভস্ম মাখিয়া থাকেন। শিব জগতের পিতা এবং তাঁহার শক্তি পার্বতী জগন্মাতা। কালিদাস লিখিয়াছেন,—"জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ।"

এইরূপে পিতৃভাবে শিবের ও মাতৃভাবে পার্বতীর পূজাই হিন্দুসমাজে প্রচলিত। শিবলিঙ্গের কল্পনা কোথা হইতে আসিল, তাহা পরে বলিতেছি। যখন আসিল তখন হয়ত অনার্য জাতির সহিত মিশ্রণের ফলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে কোনওপ্রকারে লিঙ্গপূজা প্রবর্তিত হইয়া থাকিবে। হয়ত লিঙ্গের সহিত আকার-সাদৃশ্যে উচ্চশ্রেণীর সাধারণ লোক বিভ্রান্ত হইয়া শিবলিঙ্গের ঊর্ধ্বভাগ পুরুষাঙ্গের প্রতীক এবং নিম্নভাগ অর্থাৎ

ফোন নং ৪৬-২৭৮৭
মায়া হোসিয়ারি মিলস্
"বুনন জগাত অপ্রতিদ্বন্দ্বী"
২২৫এ, রাসবিহারী এভিনু্য, কলিকাতা-১৯

পাল ব্রাদার্স
সর্বপ্রকার লৌহ ব্যবসায়ী
রেজিষ্টার্ড সিমেণ্ট ডিলার্স
২৬, সারপেণ্টাইন লেন, কলিকাতা-১৪
ফোন : ২৪-২৭৮৮
সিমেণ্ট অফিস ও গুদাম—
আর, এন, গুহ রোড, দমদম
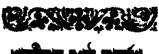
শারদীয়ার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ
সত্যজিৎ রায় পরিচালিত
তারাশঙ্করের
জলসাঘর
রাধা পূর্ণ প্রাচী
চলিতেছে

চিরনূতন চিত্রাবলী
পৌরাণিক
প্রহলাদ
জয়দেব
হরিশ্চন্দ্র

আন্তর্জাতিক খ্যাতিতে উজ্জ্বল
পথের পাঁচালী
অপরাজিত
পরশ পাথর
অযান্ত্রিক

উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত
ওরা থাকে ওধারে
সদানন্দের মেলা

নিউ থিয়েটার্সের
মহাপ্রস্থানের পথে
রামের সুমতি

অরোরা পরিবেশিত

যাহা পরে গৌরীপট্ট নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহা স্ত্রীঅঙ্গের প্রতীক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। পুরাণকারগণও তাঁহাদের চিত্তরঞ্জনের জন্য ঐ সিদ্ধান্তের অনুকূলে নানা গল্প ফাঁদিয়াছেন। একটা বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। শিবলিঙ্গ পূজার সহিত কোনও স্থলে কোনও কালে কোনও অশ্লীল আচার সংশ্লিষ্ট হয় নাই। মনিয়ার উইলিয়ামস্-এর সুবিখ্যাত হিন্দু-ধর্মের সবিস্তার আলোচনাপূর্ণ পুস্তকে এ সত্য স্পষ্টাক্ষরে স্বীকৃত হইয়াছে। সুসভ্য গ্রীসদেশেও ইহা দেখা যায় নাই, সেকথা পূর্বে বলিয়াছি।

শিব-পার্বতীর পূজায় তাঁহারা জগতের মাতা-পিতা বলিয়াও বটে, অন্য কারণেও বটে—কামাচারের সংস্পর্শ আসিতেই পারে না। পুরাণেই আছে—শিবের প্রতি অস্ত্র-প্রয়োগ করিবার উপক্রমেই তাঁহার তৃতীয় নেত্র হইতে প্রসূত অগ্নিতে কামের দেবতা কন্দর্প ভস্মীভূত হন। অপরন্তু, ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা সন্ধ্যার রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে ধর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলে সন্ধ্যা মৃগীরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করেন। ব্রহ্মাও মৃগরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হন। এই অতিগর্হিত আচরণ লক্ষ্য করিয়া শিব ব্রহ্মার শাসন জন্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে ব্রহ্মা ব্রীড়াবশত মৃগাকার নক্ষত্রপুঞ্জের আকার ধারণ করিয়া নভোমণ্ডলে রহিয়া গেলেন। এই নক্ষত্র-পুঞ্জ মৃগশিরা নামে জ্যোতিষশাস্ত্রে পরিচিত। শিবনিক্ষিপ্ত শরও হস্তানক্ষত্র-রূপে তাহার সন্নিধানেই আছে।

আমরা দেখিয়াছি শিব যোগী। যোগীর স্বাভাবিক শান্ত-সমাহিত প্রসন্ন তেজঃ-প্রচুর প্রতিমূর্তি বুদ্ধমূর্তিতে চিরপ্রকট হইয়া রহিয়াছে, জগতে যাহার তুলনা অন্যত্র নাই। শিল্পাচার্য হ্যাভেল তাঁহার একখানি পুস্তকে লিখিয়াছেন, ভারতীয় ভাস্করগণ এই অপূর্ব মূর্তির শিল্পাদর্শ (motif) কোথায় পাইল, এই কথা তিনি বহুকাল ধরিয়া ভাবিয়াও কোনও সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। পরিশেষে একদিন গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল—

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমাস্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥

(যেমন নিবাতস্থ অর্থাৎ বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থিত দীপ কম্পিত হয় না, আত্মযোগ-রত যতচিত্ত যোগীর উহাই উপমা।) তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমস্যা সম্যক্ সমাধান হইয়া গেল। নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপই বুদ্ধ-মূর্তির শিল্পাদর্শ।

হ্যাভেলের প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে কবি কালিদাস যোগরত শিব সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ
নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্।
(কুমারসম্ভব)

প্রাণায়াম দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু সকলের নিরোধ হেতু নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত (শিবকে কামদেব দেখিলেন)।

শিবলিঙ্গ সেই নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপ—যোগিরাজাধিরাজের যোগ্য প্রতীক। শিব-লিঙ্গের যে অংশকে গৌরীপট্ট বলা হয়, তাহা যোগীর আসনবদ্ধ নিম্নাঙ্গ; ঊর্ধ্ব ভাগটি কালিদাসের ভাষায় "পর্যঙ্কবন্ধস্থির-পূর্বকায়।" মহেঞ্জোদারোর পশুপতি মূর্তি সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে, "Sitting in the position of a yogi, his legs bent double, heel to heel." পুরাণেও এক স্থানে বলা হইয়াছে (শিব-মহিম্নঃ স্তোত্রের ১০ম শ্লোকের যাহা মূল), অনলস্কন্ধবপুঃ অর্থাৎ তেজঃপুঞ্জ-মূর্তি শিবের স্থূল রূপের (লিঙ্গরূপের) সীমা নির্ণয়ের জন্য ব্রহ্মা স্বর্গের দিকে আর বিষ্ণু পাতালে গিয়াও অন্ত না পাইয়া ভক্তিশ্রদ্ধাভরে স্তব করিতে থাকিলে শিব স্বয়ং তাঁহাদিগের নিকট নিজ স্বরূপ ব্যক্ত করেন। ফলত স্থির জ্যোতিঃশিখাই যে শিবলিঙ্গ নামক প্রতীকটির আদর্শ, ইহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই। ভারতবর্ষে নানা ক্ষেত্রে মোট দ্বাদশটি 'জ্যোতির্লিঙ্গ'ও প্রসিদ্ধ; ভক্তগণ তদ্বিষয়ক একটি স্তোত্র নিত্য পাঠ করেন। এহেন মহিমময় বস্তুটিকে গুপ্তেন্দ্রিয়ের প্রতীক মনে করা লজ্জাকর বিড়ম্বনা। এই ধারণাই অসম্যগ্‌দর্শী নিন্দাতৎপর পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগকে হিন্দু-ধর্ম সম্বন্ধে অপপ্রচার করিবার সুযোগ দিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত
পল্লীবাংলার মৌখিক সাহিত্যের
সামগ্রিক পরিচয়
বাংলার লোক-সাহিত্য

প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা
সাহিত্যের অধ্যাপক
শ্রীভবতোষ দত্ত সম্পাদিত
ঈশ্বর গুপ্ত রচিত
কবিজীবনী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
সমর গুহ প্রণীত
উত্তরাপথ

ডক্টর শচীন বসু প্রণীত
সীতার স্বয়ংবর,
সাতসমুদ্র

বিশ্বভারতী, বিনয় ভবনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ,
ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজের শিক্ষা ও মনস্তত্ত্বমূলক গবেষণাগারের
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক
শ্রীকুলদাপ্রসাদ চৌধুরী, এম্. এ. (লণ্ডন)
প্রণীত
ছেলে মানুষ করা
ছেলেরা মিথ্যা কথা বলে কেন? অহেতুক ভয় পায় কেন? প্রতিকার কি?

ভিঃ পিঃ-তে যে কোন পুস্তক অর্ডার দিলেই সরবরাহ করা হয়।

ক্যালকাটা বুক হাউস ঃঃ ১।১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২
ফোন: ৩৪-৫০৭৬

সিনেমা কি আর্ট?

জ্যোতির্ময় বসুরায়

কাব্য, চিত্রকলা, সংগীতের মত সিনেমাকে কি বিশুদ্ধ, মহৎ শিল্পমাধ্যম বলে গ্রহণ করা যায়? অথবা, একদা ছাপাখানা রসবিতরণের (জ্ঞানের কথাটা আপাতত মুলতবি থাক) যে-ভূমিকা নিয়েছে, আজ কি তা ছোট-বড় নানা যন্ত্রে আকীর্ণ ফিল্ম-স্টুডিও নামক বিরাট আজব ঘরটির উপর অর্পিত? দেশেবিদেশে এই প্রশ্ন কিছু-দিন ধরে উঠেছে। প্রশ্ন এসেছে, কিন্তু তার সর্ববাদিসম্মত মীমাংসা এখনও হয়নি। মীমাংসা এই মুহূর্তে হয়ত সম্ভবও নয়, কারণ সিনেমা নিয়ে সারা পৃথিবী ধরে নিরন্তর পরীক্ষা চললেও আজও বুঝি এ-সম্পর্কে শেষ কথাটি সুনিশ্চিতভাবে বলবার সময় আসেনি।

না আসুক। বিপুলা এই পৃথিবীতে পরীক্ষার ব্যাপ্তি নিরবধি। কিন্তু যুক্তি ও মত চরম সিদ্ধান্তের আশায় বসে থাকে না। ঘটনার সংগে সংগেই তা গড়ে ওঠে। এবং সবাক চলচ্চিত্র আবিষ্কৃত হবার সাতাশ বছর পর আজ সিনেমা-আর্ট কি আর্ট নয়, আর্টফর্ম হিসাবে এর কতটুকু স্বীকৃতি প্রাপ্য, এসম্পর্কে দুটি স্পষ্ট এবং বিপরীত মত পাওয়া যায়। এই দুটি মত এবং যে-যুক্তির সূত্রে সেই মত গড়ে উঠেছে তা-ই এখানে আলোচ্য।

বিদগ্ধ, চিন্তাশীল জনেদের মধ্যে একদল বলেন, সিনেমা বিংশ শতকের প্রধান এবং সর্বোত্তম আর্ট-ফর্ম। তাঁদের কথা হল সিনেমার সাফল্য নির্ভর করে বিষয়বস্তুর চিরন্তন আবেদনের উপর এবং আর্টের লক্ষ্যও তা-ই। স্রষ্টার একান্ত নিজস্ব চিন্তা দিয়ে সিনেমা ভারাক্রান্ত করা চলে না, এখানে ইংরেজীতে যাকে 'আইভরি টাওয়ার' বলে তার কোন স্থান নেই (কারণ সেক্ষেত্রে ছবি সবার মন জয় করে নিতে পারে না)। সকলে যার রসগ্রহণ করতে সক্ষম সিনেমাকে তা-ই দিতে হয় বলেই তা মহৎ আর্ট। অন্যান্য শিল্পকলা আজ এই মহৎ উদ্দেশ্য থেকে সরে এসেছে; এ-কালের এই অতি প্রয়োজনীয় কাজটি নিয়েছে সিনেমা। যে-কাজ প্রাচীন যুগে ছিল মহা-কাব্যের, মধ্যযুগে ছিল নাট্যকলার, সেই কাজ এখন সিনেমার। (বিখ্যাত ফরাসী চিত্র-পরিচালক জাঁ রেনোয়া সিনেমার শিল্পগত সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ আশাবাদী। তবে তিনি এর ব্যবসায়িক দিকটিকে শিল্পের অন্তরায় বলে মনে করেন—অন্তত এ-ব্যাপারে তাঁর কিছু সংশয় আছে। তিনি কেবল এইটুকু আশা করেন যে, এমন দিন শীঘ্রই আসবে যখন টেলিভিশন সিনেমার জনগণের সহজ, সস্তা, মনরাখা জিনিসটুকু আত্মসাৎ করে নেবে এবং তখন সিনেমার বিশুদ্ধ শিল্পমাধ্যম হয়ে থাকতে আর কোন বাধাই থাকবে না।)

তাঁরা এ-কথা স্বীকার করেন যে, বহু-জনকে আনন্দ দিতে গিয়ে সিনেমাকে অবশ্যই অনেক ক্ষেত্রে নিম্নস্তরের বা স্থূল রসের ব্যাপারী হতে হয়। সেই সংগে তাঁরা জোরের সহিত বলেন যে, পৃথিবীতে মন্দ বইয়ের সংখ্যা ভাল বইয়ের চেয়ে অনেক বেশী, কিন্তু তার জন্য কি কেউ লেখা জিনিসটাকে দোষ দেবে? এবং তাঁরা আরও বলেন যে, গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে শিল্পকলার ক্ষেত্রে সিনেমা যা দিয়েছে, অন্য কোন আর্টের দান তার কাছাকাছি নয়।

তাঁরা বিশ্বাস করেন, চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে দর্শককে বিরাট একটি প্রশ্নের মুখোমুখি করে দেওয়া যায়—তাঁকে শুধু-দিন-যাপনের গ্লানির শৃঙ্খল থেকে, তার অনিবার্য তুচ্ছতা, হীনতা থেকে মুক্তি দিয়ে মহৎ একটি আবেগের সংগে একাত্ম করান যায়। একটি রসোত্তীর্ণ উপন্যাস, গল্প বা নাটক, একটি সার্থক তৈলচিত্র, একটি সুর-সমৃদ্ধ সুরচিত গান অথবা একটি ভাবময় ছন্দোবদ্ধ কবিতা রসিকজনকে আনন্দানু-ভূতির যেস্তরে নিয়ে যেতে পারে, চলচ্চিত্র সেই ক্ষমতার অধিকারী বলেই তাঁদের ধারণা।

* * *

অন্য পক্ষ ঠিক এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁদের যুক্তিও অসার নয়। তাঁরা মনে করেন, মহৎ আর্টের পর্যায়ে উপনীত হবার পথে সিনেমা যেসব বাধার সম্মুখীন হয় তা অনতিক্রম্য। প্রথমেই তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, সত্যকার রসস্রষ্টা যখন তাঁর লেখনী বা তুলি নিয়ে বসেন তখন তিনি কার কথা ভাবেন এবং কেনই বা তিনি লিখতে বা আঁকতে বসেন? তাঁদের মতে লেখক বা শিল্পী আর যে-কথাই ভাবুন ক্রেতাদের অথবা সমালোচকদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করেন না। ঔপন্যাসিক বা গল্প-লেখক তখন তাঁর কল্পিত পাত্র-পাত্রীর মনের গহনে বাস করেন—তাদের চিন্তা ও কার্য-কলাপের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের শিল্পী-

'রাজধানী থেকে' চিত্রে মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মঞ্জু দে

STANDARD BATTERIES LTD., BOMBAY

Distributors for W. Bengal, Assam, Bihar & Orissa :
BENGAL AUTOMOBILES
25-B, Park Street, Calcutta.

শ্নের বিকাশ হতে থাকে। জীবনের কোনটি ক্ষেত্রে যে উপলব্ধি তাঁর হয়েছে তাকে প্রকাশ করবার অব্যক্ত এক প্রেরণা তাঁকে লেখনী গ্রহণ করতে বাধ্য করায়। এ শুধু প্রেরণা নয়, এ এক মনোযন্ত্রণা। লেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ যন্ত্রণার লাঘব হয় না। না লিখে নিজের কাছে পরিত্রাণ নেই বলেই তিনি লেখেন। তাঁর সেই সৃষ্টির রাজ্যে মাত্র একজন ব্যক্তি তখন বাস করে—লেখক নিজে। নিজেকে তৃপ্ত করাই তাঁর প্রধান এবং একমাত্র কাজ।

এ-পক্ষের মতে সব মহৎ শিল্পকর্মের উদ্ভব এইভাবে হয়—চিত্রকরের ছবি, ভাস্করের মূর্তি, সুরকারের গান, কবির কবিতা। এক কথায় 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক' (এবং সেই আর্টের সংজ্ঞা এবং স্বরূপ নির্ধারণ করেন শিল্পী নিজে) : এই হল শিল্পীর মূলমন্ত্র। এ থেকে বিচ্যুত হলেই শিল্পী স্বধর্মচ্যুত হবেন। স্বধর্ম বর্জন করে শিল্পী খ্যাতি অর্জন করতে পারেন, কিন্তু সে-খ্যাতি তাঁর শিল্পীজীবনকে সার্থক করে না। কেবলমাত্র বর্ণনার ছটা আর কলা কৌশলের মনোহারিত্ব দিয়ে লেখক বহুজনকে নিমেষে চমকিত করতে পারেন, কিন্তু জনপ্রিয়তাই যদি তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবে শেষ পর্যন্ত তাঁকে যেতে হয় আত্মবঞ্চনার পথে।

দ্বিতীয় পক্ষের মতে 'আর্ট-ফর-আর্টস-সেক' মন্ত্র সিনেমায় অচল। যে অনুপ্রেরণায় লেখক ও চিত্রকর সৃষ্টি করেন সিনেমায় তার স্থান নামমাত্র, অথবা আদৌ নেই। এখানে সবটুকুই হিসাব করা, মাপা। প্রথমত, দর্শক ছাড়া সিনেমার অস্তিত্ব অকল্পনীয় এবং এই দর্শক একান্তভাবেই সমকালীন। কোন প্রযোজক (তাঁর নিজের রুচি যতই উন্নত হক) ছবিতে হাত দেবার আগে সর্বাগ্রে দর্শকের রুচির কথাই ভেবে দেখেন। দর্শকের সহনীয়তার মাত্রার সঙ্গে সন্ধি করে তিনি ছবিকে আর্টের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার কথা কল্পনা করতে পারেন। কোন শিল্প-সচেতন পরিচালক ব্যবসায়ের দিকটা যদি উপেক্ষা করতে চান, তবে তাঁর সহকর্মীদের কেউ কেউ হয়ত তাঁর সাহস ও নিষ্ঠার প্রশংসা করতে পারেন, কিন্তু শিল্পপতির কাছ থেকে তিনি পাবেন উপহাস। কেন? কারণ, একটি চলচ্চিত্রের জন্য যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে টিকিট যাঁরা কেনেন তাঁদের ভূমিকা কাটাসৈনিকের অনুরূপ মনে করা চলে না। তাঁদের মানতেই হবে চিত্রনির্মাতাকে। (পাশ্চাত্যের জনৈক সফল প্রযোজককে বক্স-অফিস ছবি করার জন্য সমালোচকরা ঠাট্টা করলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন একটি অর্থপূর্ণ প্রশ্নের মধ্য দিয়ে : "আপনারা কি মনে করেন, আমি চিত্রনির্মাণের কাজে নেমেছি আমার স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্যে?" সাধারণভাবে সব প্রযোজকেরই মনের কথা এই।) ব্যবসায়কে তার মর্যাদা দিতে হলে 'আর্ট-ফর-আর্টস-সেক' ধারণাকে বিসর্জন দিতে হয়। লক্ষ লোকের মন রাখতে গেলে আর্টের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়তে হয়।

এ-ছাড়াও যুক্তি আছে। লেখক লেখেন, চিত্রকর আঁকেন আপন উপলব্ধির সঙ্গে সৃষ্টির ক্ষমতার সমন্বয় ঘটিয়ে। নিজের প্রতিভায়, নিজের ক্ষেত্রে তাঁদের সৃষ্টির উদ্ভব। সিনেমা কার সৃষ্টি? এখানে নানা মুনির সমাবেশ। কাহিনীলেখক, চিত্রনাট্যকার, সংলাপ-রচয়িতা আছেন, অভিনেতৃবর্গ, সংগীত-পরিচালক আছেন, আছেন আলোক-চিত্রশিল্পী, শব্দধারক, কলানির্দেশক, সম্পাদক এবং আরও বহুবিধ কলাকুশলী।

"দীপ জেলে যাই" চিত্রের একটি দৃশ্যে সুচিত্রা সেন

সবার উপরে অবশ্য একজন আছেন—পরিচালক। তিনি লেখকের রচনা পরিবর্তন করতে পারেন এবং শিল্পী ও কলাকুশলীরা বাচনিক অর্থে তাঁর নির্দেশ ও ইচ্ছার অধীন। নাট্যবোধ থেকে আরম্ভ করে অভিনয়, সংগীত এবং কলাকৌশলের সকল বিভাগ সম্পর্কে পরিচালকের প্রকৃষ্ট জ্ঞান থাকা একান্তই দরকার। একজনের কাছে এত-খানি দাবি করা যায় কি না সে-সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলেও এ-কথা স্বীকার করতে হয় যে, কোন ছবি পরিচালকের একার সৃষ্টি নয়। একখানি ছবির পিছনে পরিচালকের অনেকদিনের ভাবনা থাকতে পারে, কিন্তু সেই ভাবনাকে যাঁরা রূপ দেন তাঁদের অংশ সামান্য নয়। এবং অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পী ও কলাকুশলীদের কাজে তাঁদের নিজস্ব শিল্পবোধের ছাপও পাওয়া যায়। আরও একটি যান্ত্রিক অসুবিধার ব্যাপার আছে। অভিনয়, সংগীত, দৃশ্য-রচনা, শব্দের সুসমঞ্জস প্রয়োগ ইত্যাদি কাজে পরিচালকের বড় রকমের হাত থাকলেও তিনি পর্দায় এ-সব কাজের প্রতিফলন দেখে তৃপ্ত না হতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁর কী করণীয়? তোলা ছবির অংশ ফেলে দিয়ে আবার তোলা? কিন্তু তারও একটা সীমা আছে।

যে পরিচালক যান্ত্রিক এবং অন্যান্য বহুবিধ বাধা অতিক্রম করে একখানি সার্থক ছবি করতে পারেন তিনি শুধু নিখুঁত ক্র্যাফট্‌স্‌ম্যানশিপের পরিচয় দেন: সিনেমাকে আর্ট বলে যাঁরা স্বীকার করেন না তাঁদের এই মত। তাঁদের যুক্তি হল এই যে, সিনেমা দর্শককে যেটুকু রসোপলব্ধির সুযোগ দেয় তা আসে গল্প এবং তার উপস্থাপনের উৎকর্ষের মধ্য দিয়ে। একটি রসোত্তীর্ণ গল্প লেখকের সৃষ্টি; তার সার্থক চিত্রায়ণে মূলবস্তুর একটি ছায়াকে পাওয়া যায়, আসলকে নয়। কাহিনীর সুষ্ঠু উপস্থাপনে এবং শিল্পীদের সংবেদনশীল অভিনয়ে গল্পের আবেদন দর্শকের মনে পৌঁছতে পারে; এবং তা পৌঁছয় আবেগের মধ্য দিয়ে। লেখক তাঁর চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, মনের কথা, সূক্ষ্ম অনুভূতিকে ভাষার মধ্য দিয়ে যে রূপ দিতে পারেন, চলচ্চিত্রে সেই রূপ পরিস্ফুট হওয়া সম্ভব নয়। চোখের দেখার মধ্য দিয়ে পাত্র-পাত্রীর দুঃখ-সুখের অংশ নেওয়া এক জিনিস, আর চিন্তা ও অনুভূতির মধ্য দিয়ে লেখকের কল্পলোকে প্রবেশাধিকার লাভ এবং তাঁর রচনার রস-

...ার করা আর এক বস্তু। তাই কোন বিখ্যাত বই পড়ে যে রসাস্বাদ করা যায়, ছবিতে তার অংশমাত্রই লভ্য।

...পর্দায় কাহিনী উপস্থাপনের উৎকর্ষ নির্ভর করে প্রধানত তিনটি জিনিসের উপর: চিত্রনাট্য, অভিনয় ও পরিবেশ। প্রথম দুটি জিনিস নাট্যকলার অন্তর্গত, যদিও সিনেমায় এদের আঙ্গিকে বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যাঁরা সিনেমা উৎকৃষ্ট শিল্প-মাধ্যম বলে স্বীকার করেন না, তাঁদের মতে, মঞ্চের অভিনয়ে যে রসসৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, বহু ভিন্ন ভিন্ন 'শট'এর যোগফল সিনেমার অভিনয়ে তা থাকে না। সিনেমার নিজস্ব জিনিস: পরিবেশ, এ-কথা অবশ্য, তাঁরা স্বীকার করেন। এই একটি ব্যাপারে সিনেমা যা পারে, থিয়েটার তা পারে না তা তাঁরা মানেন। সুষ্ঠু পরিবেশের সহায়ে কাহিনীকে দর্শকের কাছে বিশ্বাস-যোগ্য করে তোলা যায়। তবু, তাঁরা বলেন, পরিবেশ কাহিনীর বহিরঙ্গ মাত্র, অন্তরের জিনিস নয়। দৃশ্য, শব্দ ও সংগীতের মধ্য দিয়ে কাহিনীর অনেকখানি হয়ত পরিস্ফুট করা যায় কিন্তু তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

সিনেমার বিশুদ্ধ আর্ট-ফর্ম হয়ে ওঠার পথে বাধা-অসুবিধা এবং শিল্প-মাধ্যম হিসাবে এর সম্ভাবনা সম্পর্কে যেসব যুক্তি উপরে উপস্থিত করা হয়েছে তার মধ্যে যেমন সত্য আছে, তেমনই বহুলাংশে তা তর্কসাপেক্ষ। আপাতত, তৃতীয় মত হিসাবে এখানে, তর্কের অবকাশ না রেখে, এইটুকু বলা যায় যে, সিনেমা বিভিন্ন শিল্পকলার সঙ্গে দর্শকের পরিচয় করিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে, অন্তত তার প্রতি দর্শককে জিজ্ঞাসু করে তুলতে পারে। ব্যবসায়িক দিকটি বজায় রেখেও সিনেমা সাহিত্যের প্রতি, সংগীতের প্রতি, নৃত্যকলার প্রতি রসিক দর্শকের অনুরাগ বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই দিক থেকে বিচার করলে শিল্পকলার বিকাশে সিনেমার পরোক্ষ দান অনস্বীকার্য। আর একটি কথা। রসসৃষ্টির প্রমাণ তার গ্রহণে (যেমন পুডিং-এর প্রমাণ ভক্ষণে)। এই গ্রহণ ব্যাপারটি যুক্তি-তর্ক, এসথেটিক্সের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ সব নাকচ করে দিতে পারে। রসসৃষ্টির পথে শতেক বাধা পেয়েও কোন ছবি দর্শকের মনে গভীর রসোপলব্ধির অনুভূতি এনে দিতে পেরেছে এমন দৃষ্টান্ত আছে। এমন ছবি আছে যা বহু বছর দেখার পরেও দর্শক ভুলতে পারেননি, যার বিশেষ কয়েকটি মুহূর্ত তাঁর মনে চিরদিনের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে। পৃথিবীর কয়েকটি ছবিতে মহৎ শিল্পকলার এই লক্ষণ বর্তমান। তবে কি এগুলি শুধু নিয়মের ব্যতিক্রম?

সরোজ কুশারী পরিচালিত "যেতে নাহি দিব" চিত্রে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী গঙ্গোপাধ্যায় ও শীলা পাল

বাংলা সামাজিক নাটক

প্রভাংশু গুপ্ত

সমাজের ছবি যে-নাটকে নানা চরিত্রের ভিতর দিয়ে প্রতি-ফলিত হয়ে থাকে, তাকে বলা হয় সামাজিক নাটক। যুগধর্ম অনুযায়ী সমাজের রূপ-পরিবর্তন হয়,—সংগে সংগে সৃষ্টি হয় নব নব সমস্যার। পুরনো সমস্যা নতুনের আগমনে আশ্রয় নেয় বিস্মৃতির অন্তরালে,—তা থাকে খেচে শুধু ছাপার হরফের ভিতরেই।

আজকে বাঙালীর জীবনে শ্বেতাংগ নীলকরের অত্যাচার নেই। একদা বহু-প্রচলিত কুলীনের বহুবিবাহের সমস্যা নেই। কাজেই আজকের দিনের রচিত নাটকে অতীত দিনের সমস্যার চিত্র দেখবার আশা করলে নিরাশ হতেই হবে। কিন্তু এককালে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণ' নাটকে এবং রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' নাটকে সেকালের সমাজ-চিত্রের যে নিখুঁত ছবি আঁকা হয়েছিল, তা শুধু বাংলার নাট্য-জগতে একটা বিরাট বিস্ময়েরই সৃষ্টি করেনি,—বাংলা নাট্য-সাহিত্যকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

[সেকাল ও একাল]

সেকালের সামাজিক নাটকের সংগে বর্তমানের সামাজিক নাটকের মিল নেই। সেকালের সামাজিক নাটক রচনা করা হ[ত] সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে। এ[বং] তার ভিতর নীতি-কথারও প্রাচুর্য ছিল খু[ব]। একালের সামাজিক নাটকে সমাজ-জীবনে[র] সমস্যাই নিছক নাটকীয় ঘাত-সংঘাতে[র] ভিতর দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে, তার পিছনে সমস্যা সমাধানের নীতি-কথা বা কো[ন] ইংগিত নেই।

বাংলা সামাজিক নাট্য-সাহিত্যে[র] ইতিহাসকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভ[ক্ত] করা যেতে পারে; প্রথম যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ। প্রথম যুগ ১৮৫২ স[ন] থেকে পেশাদার রংগালয় স্থাপিত হবা[র] পূর্ব পর্যন্ত—১৮৭২ সন। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের এই সময়কাল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—পৌরাণিক নাটকের প্রাধান্য। তা হলেও এই সময়ে যে অল্প কয়েকখানি সামাজিক নাটক আত্মপ্রকাশ করেছিল, তা

হেমন্তকুমার দেয়াশী এণ্ড ব্রাদার্স প্রাইভেট লিঃ
২১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড • কলিকাতা-৭
ফোন: অফিস—৩৩-১৬৩৬ • মেটাল ইয়ার্ড—৩৭-২৩৩০

শারদীয় প্রকাশ

সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা

● ডাঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য ● মূল্য : টাকা ৬·৫০

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস বঙ্গভাষায় ইহাই সর্বপ্রথম। সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনাও এই গ্রন্থ-অন্তর্ভুক্ত।

শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য

● খগেন্দ্রনাথ মিত্র ● মূল্য : টাকা ৭·০০

১৮১৮ হইতে ১৯১৮ পর্যন্ত একশতকের শিশু-সাহিত্যের ইতিহাস। শিশু-সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীর দীর্ঘকালীন অধ্যবসায় ও সাধনার অবদান বর্তমান গ্রন্থ। বঙ্গভাষায় এরূপ গ্রন্থের ইহাই সর্বপ্রথম প্রকাশ।

পথে প্রান্তরে

—২য় পর্ব— ● বেদুইন ● মূল্য : টাকা ৩·৫০

'পথে প্রান্তরে'র ১ম পর্বে গ্রন্থকার পাঠকসমাজের নিকট সুপরিচিত এবং সাহিত্য-শিল্পীরূপে স্বীকৃত। ২য় পর্বে গ্রন্থকারের শিল্প-নিপুণতার চরম উৎকর্ষতার পরিচয় বিদ্যমান।

মধুমিতা

● সরোজকুমার রায় চৌধুরী ● মূল্য : টাকা ৩·৫০

'ময়ূরাক্ষী' ও 'গৃহকপোতী'র লেখকের পরিচিতি সাহিত্যক্ষেত্রে বিধৃত। বাক্-সংলাপে সরোজকুমারের দক্ষতা বর্তমান উপন্যাসে স্বাক্ষরিত।

আমার ভালুক শিকার

● শিবরাম চক্রবর্তী ● মূল্য : টাকা ২·৫০

কিশোরদের জন্য লিখিত হইলেও বয়স্করা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। বঙ্গসাহিত্যের 'ওডহাউসের' হাস্য ও ব্যঙ্গরসে জারিত অভিনব ও বিচিত্র চরিত্রের নূতন আবির্ভাব।

প্রাক্-শারদীয়

বক্তব্য	● ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	● মূল্য : টাকা ৫.০০
রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন	● ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য	● মূল্য : টাকা ৫.০০
ভারতীয় মহাবিদ্রোহ	● প্রমোদ সেনগুপ্ত	● মূল্য : টাকা ৮.০০
পরিভাষা কোষ	● সুপ্রকাশ রায়	● মূল্য : টাকা ১০.০০
স্তালিন যুগ	● আনা লুইস্ স্ট্রং	● মূল্য : টাকা ৩.২৫
তাপসী (উপন্যাস)	● প্রফুল্ল রায়চৌধুরী	● মূল্য : টাকা ৩.৫০
গৃহকপোতী (উপন্যাস)	● সরোজকুমার রায়চৌধুরী	● মূল্য : টাকা ৩.৫০
দুরন্ত নদী (উপন্যাস)	● আনা লুইস্ স্ট্রং	● মূল্য : টাকা ৪.৫০

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিঃ

৭২ মহাত্মা গান্ধী (হ্যারিসন) রোড, কলিকাতা—৯

মূল্য নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে বড় কম নয়।

[প্রথম সামাজিক নাটক]

বাংলার প্রথম পূর্ণাংগ সামাজিক নাটক বলতে রামনারায়ণ তর্করত্নের "কুলীন-কুলসর্বস্ব" নাটক,—রচনাকাল ১৮৫৪ সন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা দেশে সমাজসংস্কারের আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। তারই প্রভাব এসে পড়ে নাটকে এবং এইভাবে সামাজিক সমস্যামূলক কাহিনীর ভিত্তিতে নাটক রচনা করা হতে থাকে। পৌরাণিক নাটক তথা দেব-দেবীর মাহাত্ম্যমূলক নাটকের জনপ্রিয়তা ও প্রচলন সর্বাধিক থাকলেও বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, পণপ্রথা, ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকদের দুর্নীতি ও মদ্যপান, নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচার ইত্যাদি বহু সমস্যা নিয়ে নাটক লেখা হয়েছিল।

একালের সামাজিক নাটকের সংগে আর একালের সামাজিক নাটকের বিষয়বস্তুর মিল থাকতে পারে না। যুগের পরিবর্তনের সংগে কতকগুলি সামাজিক নাটক অচল হয়ে যায়। আজকের দিনে বিধবাবিবাহ-

সমস্যা নিয়ে নাটক লিখলে ও তা মঞ্চস্থ হলে দর্শকের ভিড় হবে না। কিন্তু আজকের দিনে বাস্তুহারা সমস্যা বা শিক্ষিত বেকার-সমস্যা নিয়ে নাটক লিখলে ও অভিনীত হলে দর্শকের অভাব হবে না।

তবে একটা কথা। যেমন ক্লাসিক সাহিত্যের মৃত্যু নেই এবং তার জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে যুগধর্মের বালাই নেই, তেমনি যে-সব নাটক ক্লাসিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত, সেগুলি কালকে অতিক্রম করে বেঁচে থাকে এবং সেগুলি মঞ্চস্থ হলে দর্শকরা সাড়া দেন। ক্লাসিক সাহিত্যের মর্মকথা সীমাবদ্ধ নয়। দেশ-কাল-পাত্রকে ছাড়িয়ে তা চিরদিনই নতুন থাকে।

যেমন দীনবন্ধু মিত্রের সামাজিক নাটক-গুলি। 'সধবার একাদশী' বা 'নীল-দর্পণ' নাটকে সেকালের বাংলার বিব্রত সমাজ-জীবনের ছবি এমন বলিষ্ঠভাবে পরিস্ফুট যে তা চিরকালই বাঙালীকে আকর্ষণ করবে।

যাই হক, 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের পর উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' ও রাম-নারায়ণ তর্করত্নের 'নব-নাটক' বাংলার নাট্য-সাহিত্যের প্রথম যুগের দুখানি উল্লেখযোগ্য নাটক।

রামনারায়াণ তর্করত্নের 'নব-নাটক' নাটকের বিষয়বস্তু বহুবিবাহ-সমস্যা। এই 'নব-নাটক' রচনার একটা ইতিহাস আছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে একটি থিয়েটার ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়। নাটক-নির্বাচন, অভিনয়-ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য পাঁচজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। নাম জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি। ১৮৬৫ সনের জুন মাস নাগাদ ঐ কমিটি 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' পত্রিকায় বহুবিবাহ বিষয়ে একখানি নাটক রচনা করবার জন্য সেকালের লেখকদের অনুরোধ করেন। কয়েকদিন পরেই ঐ বিজ্ঞাপন সরিয়ে নিয়ে রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর ঐ নাটক রচনার ভার দেওয়া হয়।

ফলে সৃষ্টি হয় 'নব-নাটক'। রচনার তারিখ ১৫ই বৈশাখ, ১২৭৩ সাল।

[দীনবন্ধু মিত্র]

দীনবন্ধু বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। বাংলা সামাজিক নাটক লিখে দীনবন্ধু প্রভূত যশ অর্জন করেছিলেন। বাংলার নাট্য-সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চের পুষ্টিসাধনে দীন-বন্ধুর দান অমূল্য বললেও চলে।

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর দুটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম—"তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয়, তাঁহার

প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্বব্যাপী সহানুভূতি।"

এই দুটি গুণের জন্য দীনবন্ধু সামাজিক নাটক রচনায় বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিলেন।

দীনবন্ধুর প্রধান সামাজিক নাটকগুলি এই:—নীল-দর্পণ, লীলাবতী, সধবার একাদশী।

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের মধ্যযুগ—১৮৭৩ থেকে ১৯০০ সন পর্যন্ত। মনোমোহন বসু এই সময়ে কয়েকখানি পৌরাণিক নাটক রচনা করলেও সামাজিক নাটক তিনি লিখেছিলেন মাত্র দুখানি। 'প্রণয়-পরীক্ষা' এবং 'আনন্দময়'। মনোমোহন বসুর পর নাট্যকার হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সামাজিক নাটক রচনা করেননি।

[গিরিশচন্দ্র]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর সমসাময়িককালে (১৮৭৭—১৯১২) নাট্যকার হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিভার আলোয় সে-কালের নাটক রচনার টেকনিককে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে-

ছিলেন। সমালোচকের মতে "একান্ত আত্ম-সচেতনতার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ সমাজ-চৈতন্য দ্বারাই তাঁহার নাট্যসাহিত্য সঞ্জীবিত হইয়াছিল।"

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলি তাঁর পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকগুলির সমপর্যায়ের না হলেও নাটক হিসাবে সেগুলিকে প্রথম শ্রেণীর বলা চলে। সামাজিক নাটক রচনা করার দিকে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। নিছক নাট্যমঞ্চের প্রয়োজনের খাতিরে তিনি সামাজিক নাটক রচনা করেছিলেন।

তাঁর প্রধান সামাজিক নাটকগুলির নাম—'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'হারানিধি', 'মায়াবসান', 'গৃহলক্ষ্মী', 'আয়না', 'শাস্তি কি শান্তি'।

রসরাজ অমৃতলাল বসু প্রহসন রচনায় যশ অর্জন করেছিলেন। তিনি একখানি মাত্র পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক রচনা করেছেন—'তরুবালা'।

দেবযানী

প্রসাধন সামগ্রীর রাণী

কয়েকটি অনবদ্য অবদান
* ট্যালকম পাউডার
* ফেস পাউডার
* স্নো, ক্রীম
* সুবাসিত তৈল
* নেল পালিস কুমকুম
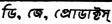
প্রসাধন দ্রব্য প্রস্তুতকারক
'মার্কেন্টাইল বিল্ডিংস'
৯নং, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : ২২-৩১১৯

ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়

শরতের সোনার হাসি যদি শিশুর মুখে দেখতে চান তাদের হাতে তুলে দিন

ঢ্যামকুড়্‌কুড়্‌

অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী ও জ্যোতিভূষণ চাকী
সম্পাদিত
১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিঃ ২৫
(সি ২১৪৮)

(সি ২০৯২)

পরেশনাথ দত্ত এণ্ড সন্স
প্রাইভেট লিঃ
৯৪, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিঃ—১২
ফোন :—৩৪-৩৬২৯
শাখা :—১২৮ রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা—২৯

সমর্থটিতে বেরিয়ে পড়বে পিছন দিক দিয়ে। খুবলাল লড়াইয়ের ফেরত। সে মাথা নাড়ে: "ঠিক ঠিক, সাঁড়াশি-ব্যূহ বলে একে। পাকা-মাথা কাজ করছে ওদের ভিতর। খুব সম্ভব মিলিটারি লোক আছে ওদের মধ্যেও।"

কেউ বলে, পুলিশ ডাক। কর্তাদিকে কত ডাক এখন পুলিশের—ডাকলেই আসবে কিনা? কেউ কেউ আবার দু পয়সা করবার তালে ঘুরছে এই মওকায়। পয়সা ছাড় সব কাজকর্ম শিকেয় তুলে অমনি তোমার পিছু ছুটবে। পুলিশের ভরসা করে থাকলে হবে না।

লড়াই-ফেরত খুবলাল আস্ফালন করে: "কাউকে লাগবে না। চোখ মেলে শুধু কাজকর্ম দেখে যাও। মচ্ছব ত সেই রাত দুপুরে, সাঁড়াশি-ব্যূহের পিছন-হাত তার আগে বেমালুম ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে। হৈ-চৈ কর না, কোন চিন্তা নেই।"

তালা ভেঙেছে অতি নিঃশব্দে। দলবল সতর্ক হয়ে এগুচ্ছে। সরু এক উঠানের ফালি— অত মানুষ ঢোকবার জায়গা কোথা? বন্দুক বাগিয়ে বলে, হাত তোল। নড়াচড়া করবে না। যেমন আছ, ঠিক তেমনি থাকবে।

দাওয়ায় গুটিসুটি হয়ে তারা আছে। টর্চ ফেলে দেখে। বুক ছেড়ে সবাই কেঁদে উঠল।

"চুপ!"

গর্জন শুনে সঙ্গে সঙ্গে তারা নিঃশব্দ। সাঁড়াশি-ব্যূহের সৈন্যবাহিনী যদি হয়, অতিশয় সভাভব্য সৈন্য। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, তোবড়ানো টিনের স্যুটকেস কিংবা ছেঁড়া গামছার পুঁটলি। একজনের সঙ্গে একটা তামার বদনাও দেখা গেল। রণজয় সম্বন্ধে ষোল-আনা নিঃসংশয় এক্ষেত্রে।

হুইসিল বেজে উঠল এমনি সময়ে দুবার। সংকেত। সরে যেতে হবে সকলের, কেউ থাকবে না। মসজিদের মুখে খুবলাল দাঁড়িয়ে নজর রাখছিল। আবর্জনা আঁস্তাকুড় কাঁচা-ড্রেন মেথরের যাবার রাস্তা—সুড় সুড় করে যে যেদিক দিয়ে বেমালুম গায়েব হয়ে গেল।

স্বয়ং এ সি অর্থাৎ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার দলবল নিয়ে এসে পড়েছেন থানা থেকে। দুখানা জীপ, রহমান খাঁ সঙ্গে। গিয়ে পৌঁছেছিল তবে রহমান খাঁ, নিয়েও এসেছে।

গোলমালের খবর পেয়ে কেষ্ট মিত্তিরও চলে এসেছে মিত্র সংঘের ছেলেদের নিয়ে। হায়-হায় করছে সে, বুক চাপড়াচ্ছে: "সেই—সেই এলেন স্যার, আর খানিক আগে যদি পৌঁছতেন। আমরাও খবর পেলাম অনেক পরে। কিছু আর করবার নেই, সমস্ত খতম।"

এ সি বললে, "কী করা যাবে! বসেও ছিল লোকটা অনেকক্ষণ। তাগিদ দিচ্ছিল। একেবারে এক সঙ্গে লেগেছে। সর্বক্ষণ ছুটোছুটি, তবু পেরে ওঠা যাচ্ছে না। এক নজর দেখে যাই চলুন, আর কী হবে।"

বাড়ির ভিতরে চললেন সকলে। গাড়িতে ও'দের সঙ্গে ছোকরা মানুষ একটি এসেছে। তাকে বলছেন, "কেষ্টবাবুর কথা হচ্ছিল—ইনি সেই। সংঘের অফিস অবধি আপনাকে আর যেতে হল না। বড় সাহায্য করছেন। এ'রা না থাকলে আরও যে কী হত বলতে পারিনে।

কেষ্ট মিত্তির ঘাড় নেড়ে আর্তকণ্ঠে বলে, "আর লজ্জা দেবেন না স্যার। বাড়ির কাছে বলতে গেলে উঠানের উপর এই কাণ্ড, আমাদের মুখ দেখাবার উপায় রইল না।"

ছেলেটির পরিচয় দিয়ে দিচ্ছেন এ সি: "শ্যামবাজার রিলিফ-স্কোয়াড থানায় পৌঁছে দিয়ে গেল ভদ্রলোককে। পার্ক স্ট্রীটের হস্টেলে এর আত্মীয়া থাকতেন, তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। শুনে এলেন, আমাদের এলাকায় কোথায় নাকি তাঁদের অনেক মেয়ে এসে উঠেছেন। আমি আপনার কথা বললাম, কেউ যদি পারেন সে আমাদের কেষ্টবাবু। এ-অঞ্চল নখদর্পণে ওঁদের।"

দাওয়ার উপরে এবং সংকীর্ণ উঠানটায় গোনাগুনতি নটা লাস। একটা ত একেবারে দরজার কাছ এসে পড়েছে। হয়ত পালাচ্ছিল, কিংবা পা ধরে বাঁচবার জন্য ছুটে এসেছিল। চোখে এ সমস্ত সয়ে গিয়েছে, মন অবধি ছোঁওয়া লাগে না আর ইদানীং। রক্ত পড়া একেবারে বন্ধ হয়নি, দেহে হয়ত বা এখনও উত্তাপ পাওয়া যাবে।

একজনে বাতলে দিল, "ঘরের মধ্যেও আছে স্যার।"

ঘরে অন্ধকার জমজমাট হয়ে আছে।

রেডিও শিক্ষার বাংলা বই
প্রাকৃটিক্যাল ও থিওরিটিক্যাল
ঘরে বসে নিজ হাতে প্রস্তুত করুন
বেতার তথ্য-(দুই খণ্ড)-৮৲ প্রতি খণ্ড
পুস্তকালয় ও রেডিও প্রতিষ্ঠানে পাইবেন
নীল রেডিও ১৪, দুর্গা পিথুরী লেন, কলিকাতা-১২

আমাদের মিলজাত দ্রব্য
উৎসবের আনন্দ
পরিপূর্ণ ক'রে তুলবে

'কাকাতুয়া' মার্কা ময়দা
'হ্যারিকেন' মার্কা ময়দা
'গোলাপ' মার্কা আটা
'ঘোড়া' মার্কা আটা

প্রস্তুতকারক:
দি হুগলী ফ্লাওয়ার মিলস কোং লিঃ
দি ইউনাইটেড ফ্লাওয়ার মিলস কোং লিঃ

ম্যানেজিং এজেণ্টস:
শ ওয়ালেস এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা ও হাওড়ার ১০০টির অধিক খুচরা দোকান হইতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে আটা ও ময়দা জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের জন্য পাওয়া যাইতেছে। নির্ধারিত মূল্যের অধিক না দেওয়ার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করা হইতেছে।

নিবেদক:
চৌধুরী এণ্ড কোং
৪/৫ ব্যাংকশাল স্ট্রীট, কলিকাতা—১

মেজের টর্চ ঘুরিয়ে তবে দেখা গেল। বুড়ী আলিমের মা আশি বছর অবধি নিজের জায়গায় দেমাক করে একেবারে নিস্তব্ধ হয়েছে। আলিমের বউয়ের কোলে জড়ানো নীলুফার। আর লায়লা।

কেষ্ট মিত্তির আর্তনাদ ওঠে, "আঁ, আলিমদার বাড়ির ওঁরা যে! চলে গেছেন শুনেছিলাম। মরতে পড়ে ছিলেন এই জায়গায়?"

বেরিয়ে এসে এ সি সিগারেট ধরালেন: "চললাম, রথতলা হয়ে নকুল বাবুর বস্তি। সেখান থেকে মতিদর্জির লেন। তারপর আর যেখানে খবর হয়।"

পুলিশের জীপ বেরিয়ে গেল, রহমান খাঁ গেল ঐ সঙ্গে। আর কী গরজ, দলবলের গতি হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কেষ্ট মিত্তিরের ভিন্ন মূর্তি। নিশ্বাস ছেড়ে বলে, "যাক বাবা, হাঙ্গামা চুকল। সবগুলো সাবাড় নাকি রে?"

"সব, সব—"

"বুঝিস। সাপ ঘাঁটা দিয়ে ছাড়ে না।"

অজানা ভদ্রলোক রয়েছেন, সেটা হুঁশ ছিল না। বলে ফেলে কেষ্ট মিত্তির বেকুব হল। বলে, "বলুন শুনি কী হয়েছে? মেয়েটি হস্টেলে থাকতেন? কতটা কী শুনে এলেন, বলতে বলতে আসুন।"

সংঘের অফিসে নিয়ে চলেছে। লাহোরের সেই নরেশ ডাক্তারের ভাই সুরেশ। অমলার চিঠি ঘুরে ঘুরে দিন পনর পরে কাল এসে পৌঁছেছে। বেরিয়েছিল তাঁর বোন লীলার খোঁজে। কিন্তু এই অবস্থা।

লাহোরের কথায় কেষ্ট মিত্তির চমকিত হয়। যে কেউ শোনে, সে-ই অমনি হবে। বলে, "সেইখানে আছেন? আরে সর্বনাশ! খবরের কাগজে ত যা-তা লেখে, আপনার দাদা কী লিখছেন বলুন ত?"

"কোথায় তাঁরা, তা-ই জানা যাচ্ছে না। দু হপ্তা আগের ঐ এক পাতা চিঠি। তারপরে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম যাচ্ছে, জবাব আসে না। অমৃতসরে দাদার এক বন্ধুকে লিখলাম—হাসপাতাল ছেড়ে তাঁরা বেরিয়ে পড়েছেন, এই অবধি জানা গেছে। তার পরের খবর কেউ বলতে পারে না।"

কেষ্ট মিত্তির বলে, "তবে দেখুন। আক্রোশটা আর অন্যায় বলবেন কিসে?"

বিতৃষ্ণায় সুরেশের মন ভরে যায়। থানার লোক এই মানুষকে কেষ্টবিষ্টু ভেবে রেখেছে! স্পষ্টাস্পষ্টি দাঙ্গাবাজগুলো অনেক ভাল এদের চেয়ে। বলে, "রিলিফ স্কোয়াডের লোক আমি, মেডিকেল কলেজে পড়ি—পুরো না হলেও ডাক্তারও খানিকটা বটে। আমার কাছে ওসব বলবেন না। আমার কাজ মানুষ বাঁচান, মানুষ মারা নয়।"

তবে সুরেশের জন্য অনেক করল কেষ্ট মিত্তির। পাঁচ-ছ জায়গায় নিয়ে গেল সঙ্গে করে। উইমেনস হস্টেলের মেয়েও পাওয়া গেল কিন্তু লীলা দেবীর খবর কেউ বলতে পারে না। রাত হয়ে গিয়েছে, এখন আর কিছু হবে না। আবার ফিরে এসেছে পাড়ার মধ্যে।

কেষ্ট মিত্তির বলে, "কাল আবার দেখব। কোনরকম হদিস পেলে আপনাকে জানিয়ে দেব। আমাদের লোক গিয়ে খবর দিয়ে আসবে। কিন্তু রাত্রে এখন ফিরে যাবেন নাকি?"

সুরেশ বলে, "স্কোয়াডের গাড়ি চলে গেছে, যাব কিসে? এক মাস্টার মশায় আছেন কাঁসারিপাড়ার মেসে। একদিন হঠাৎ দেখা, তাঁর মেসের সামনে। খুব টানাটানি করলেন। ভাবছি, সেইখানে যাব কি না?"

"সেই ভাল, গোঁয়ার্তুমি করা ঠিক নয়। এপাড়ায় নির্ভাবনায় ঘুমতে পারবেন। পালা করে সমস্ত রাত আমরা টহল দিয়ে বেড়াই। একটা কথা শুনে রাখুন—সমস্ত কলকাতা পুড়ে জ্বলে ছাই হয়ে যাবে, আমাদের এলাকায় কিছু হবে না। এত শক্তি রাখি আমরা।"

মানুষটা যত খারাপই হক, পরের জন্য কিন্তু করে। সদ্যচেনা একজনের সঙ্গে এত ঘোরাঘুরির কী গরজ পড়েছিল?

কেষ্ট মিত্তির হঠাৎ বলে, "সাহস আছে কী রকম মশায়?"

কী ভেবে বলছে বোঝা যায় না। আবার বলে, "বলুন না—"

"ভিতু নই।"

"ভূতের ভয় করে না ত? রাত্তির হয়েছে, তাও বুঝে দেখুন।"

কেষ্ট মিত্তিরের বলার ধরনে সুরেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। বলে, "মড়া কাটতে হয় আমাদের। লাস-ঘরের পাশের ওয়ার্ডে ডিউটি দিতে হয় সারারাত।"

"এও লাস-ঘর বটে। চলুন। একলা যেতাম। কিন্তু আপনাকে পাচ্ছি ত ভেবে দেখলাম, একজন সাথী নিয়ে যাওয়াই ভাল।"

বলবার ঢঙে রহস্যের আভাস। সুরেশ বলে, "কোথায় যাচ্ছি বলুন ত? কদ্দূর? মানে মাস্টার মশায়ের মেসে যাব ত, খুব বেশী রাত হলে মুশকিল।"

কেষ্ট হেসে বলে, "ওসব নয়, ভয় হচ্ছে সেই কথা বলুন। তা যাচ্ছেন যখন, অনেক বা বলতে কী! কাছেই যাচ্ছি। রানী বাগানে—যেখানটা পুলিশে আপনাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন, মানুষ মরে সারি সারি পড়ে আছে।"

আবার বলে, "টর্চ নিভিয়ে দিন। রাস্তা জ্বালবেন না। ঐসব বাড়ি থেকে দেখাবে সবাই চেনে আমায়। ভাববে, কেষ্ট এই রাতে কোথায় যায়?"

টর্চ নিভিয়ে সুরেশ বলে, "আমিও তা ভাবছি এই রাত্রে লুকিয়ে-চুরিয়ে অব সেখানে যাবার গরজটা কী হল?"

চুপচাপ চলল দুজনে কয়েক পা। কেষ্ট মিত্তির তারপরে জবাব দেয়, "দেখতে পাবেন এখনই। লোকগুলো হানা দেবার মতলবে পাড়ায় ঢুকেছিল। খালি হাতে আসে বুঝতে পারছেন। সেইসব মালের খোঁজে যাচ্ছি। পুলিশ চায়, আমরা খালি হা

মডার্ণ ডেকরেটর্স
শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়
৬৫এ, ডবলু, সি, ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলি-৬, ফোন: ৩৫-২৫৪৯

এবার পূজার
নতুন রেকর্ড
আমাদের কাছে দেখে-শুনে-বেছে নিন!
রেডিও টেকনিকস
— অভিজাত পল্লীর পরিচিত বিপণি —
৬৪-এ, যতীন্দ্রমোহন এভেনিউ (গ্রে স্ট্রীট জংসন), কলিকাতা-৫ ফোন: ৫৫-৪৮৩১

হায় গৃহহারা — শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু
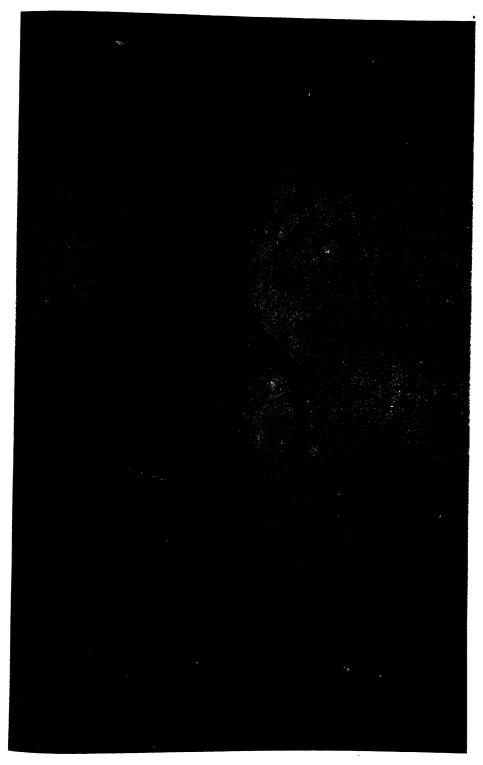
ডন করে বেড়াই। সে ত কাজের কথা নয়।"

চলেছে। রাস্তায় আলো নেই। থমথম করছে চারিদিক। শহর কে বলবে? ছিল হয়ত কোন একদিন। নরনারীর চলাচলে হাসিহল্লায় গাড়ির ভিড়ে এই রাস্তায় চলা যেত না। সে যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা—কোন রাক্ষসে নিঃশেষ করে খেয়ে গিয়েছে। প্রেতপুরীর মধ্যে দুটি প্রাণী—তারাও যেন আর এই লোকে নেই।

রানীবাগানে ঢুকতে গিয়ে কেষ্ট মিত্তির সামাল করে: "দেখে শুনে ভাই, মাথা নিচু করে।" হঠাৎ গলা আরও নিচু করে বলে, "মাল নিয়ে এসেছেন তো সঙ্গে?"

সুরেশ তাকাল তার মুখের দিকে। কেষ্ট হেসে বলে, "মাল বুঝলেন না? যার খোঁজে এসেছি এখানে। রিলিফের কাজে ঘুরছেন, পার্ক স্ট্রীট অবধি ঘুরে এসেছেন, মাল সঙ্গে নেই—বলেন কী মশায়?"

মালকোঁচা মারা ধুতি, ঝোলানো শার্ট। শার্ট উঁচু করে তুলে কেষ্ট কোমরে-গোঁজা রিভলবার দেখিয়ে দিল: "এই দেখুন মাল। তবে আপনি মশায় নিঃসম্বল বেড়াচ্ছেন শুধু শুধু ঐ অত বড় ব্যাগ বয়ে?"

সুরেশ বলে, "ব্যাগে কিছু ওষুধপত্তর আছে, ফ্লাস্কে আছে জল। বলেছি ত, আমাদের কাজ মানুষ বাঁচানো। এই সম্বলই আমাদের।"

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কেষ্ট বলে, "কান মন্তরে এখানে চিঁড়ে ভিজবে না। সতীশ দাশগুপ্তরা বুকে পেটে ভাল ভাল শ্লোগান লিখে এসেছিলেন। তা বলে কেউ রেহাই পেল? সে-ও ঐ পার্ক স্ট্রীটে। কপালজোরে আপনি ফিরেছেন। এমন বেকুবি কদাচ আর করবেন না, খবরদার।"

দাওয়ায় একটা লাসের মাথার কাছে পোঁটলা পড়ে। উবু হয়ে বসে কেষ্ট মিত্তির অতি সতর্ক ভাবে পুঁটলি খোলে। মেয়ের নতুন শাড়ি, শিশুর উপযোগী হাফ-প্যান্ট ও গেঞ্জি। আর গালার চিরুনি—ফুটপাথে চার পয়সা ছ পয়সায় যা বিক্রি হয়। খেলো জিনিস সমস্ত। কবে কিনে রেখেছিল, অতি বড় সংকটের মধ্যে পুঁটলি ফেলে আসেনি। বাড়ি ফেরা যদি ঘটেই, শুধু হাতে গিয়ে দাঁড়াবে না। "দূর—" বলে কেষ্ট মিত্তির বাঁহাতে ঠেলে দিল ঐসব। যা খুঁজছি, সেসব কোথা? ঘরের স্যুটকেসটার দু দিকে দুটো তালা। তালার বহর দেখে আশা হয়, এর মধ্যে কিছু মিলতে পারে। সুপারি-কাটা জাঁতি পাওয়া গেল একটা। জাঁতির মাথা ঢুকিয়ে চাড় দিতে—কোন্ মান্ধাতার আমলের জিনিস—তালা খুলে পড়ল ওদিককার। মাংসের দোকান করে—কিন্তু দেখুন দিকি, আস্ত একটি শুভংকর ভিতরে ভিতরে। কাল খেরোয় বাঁধা অতিকায় জাবেদা খাতা। দোকান খোলার পয়লা রোজ 'ইলাহি ভরসা' লিখে হিসাব ধরেছে, তাবৎ কালের মধ্যে বিড়ির খরচ আধেলা পয়সাটাও বাদ পড়েনি। কোন উপরওয়ালার জন্যে প্রতিটি দিনের হিসাব রেখে চলে গিয়েছে। আর চিঠিপত্রের গাদা, পোস্টকার্ডই প্রায় সমস্ত, যেখান থেকে যা-কিছু এসেছে এক টুকরা ফেলেনি। সমস্ত ফেলে এসে বাক্সবন্দী কাগজের গাদা বয়ে বেড়াচ্ছিল লোকটা।

মিত্র সংঘের বহুদর্শী সেক্রেটারি কেষ্ট মিত্তির। কাগজপত্র ঝেড়েঝুড়ে দেখে কেষ্ট ওদিকে গজর-গজর করছে: "যত ভূষিমাল। আসল বস্তু কী হয়ে গেল?"

তিক্ত কণ্ঠে সুরেশ বলে, "ঝানু লোক ত আপনি। এদের লড়াইয়ের সিপাহী কোন্ বিবেচনায় ঠাওরালেন শুনি? পুঁটলি দেখেও বুঝলেন না?"

কেষ্ট বলে, "পিস্তল-বন্দুক না হক, টাকা-পয়সা থাকবে কিছু। তাই বা উড়ে গেল কোথায়?"

সেই খোঁজে লাস হাতড়াচ্ছে। যেটা কাত হয়ে পড়ে ছিল, জুতোর আগায় ঠেলে ঠেলে চিত করে দিচ্ছে। কোমর টিপে গাঁট খুলে দেখছে। সুরেশের উপর খিঁচিয়ে ওঠে, "টর্চ ঠিক করে ধরুন, নড়াবেন না। আলো এদিকে-ওদিকে পড়ছে।"

পাচ্ছেও দু-পাঁচ টাকার নোট। একুনে পঁচিশ-ত্রিশ হল বোধহয়। টুক-টুক নোট খুঁটে নেওয়ার যে ব্যাকুলতা—এটাই আসল, এতক্ষণে বোঝা গেল। সুরেশের গা ঘিনঘিন করে। কী লোকের সঙ্গে পাকেচক্রে এ কোথায় এসে পড়ল! শ্মশানঘাটে মড়া পুড়িয়ে চলে গেলে ডোমেরা যেমন খোঁজা-খুঁজি করে পয়সাকড়ি ছিটকে পড়েছে কি না কোথাও। খই পড়ে আছে কি না। কাপড়-চাদর কি মাদুর-কাঁথা কোন্ দিকে ফেলেছে। শিয়াল-শকুনে খেঁজে হাড়গোড় কতটা কী পড়ে রইল। ঠিক সেই ব্যাপার।

সুরেশ বলে উঠল, "আমি যাই। সইতে পারছি না।"

কেষ্ট উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি বলে, "আর একটুখানি। ঘরের ভিতরটায় একবার নজর বুলিয়ে চলে যাই।"

ঘরে পা দিয়ে সুরেশ টর্চ নিভিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে দাঁড়াল।

হল কী মশায়?"

সুরেশ তিক্ত কণ্ঠে বলে. "আপনি যে রকমের লোক—ছাড়বেন না সে জানি। কিন্তু আমার সামনে নয়। চোখ মেলে আমি দেখতে পারব না।"

কেষ্ট বলে, "এ কী, অন্ধকারে ফেলে রেখে সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছেন যে?"

সুরেশ দাঁড়ায় না, বেরিয়ে পড়ল। গলিতে এসে পড়েছে। পিছন পিছন কেষ্ট। কৈফিয়তের ভাবে সে বলে, "নতুন মানুষ আপনি। কী ভাবছেন জানিনে। কিন্তু আলিমদাও সংঘের একজন। জানতাম না যে ও'র বাড়ির লোক পড়ে আছেন এখনো। তা হলে জীবন দিয়ে রুখতাম।"

সুরেশ বলে, "বলছি ত তাই। যা করবার সংঘের মানুষে ডেকে এনে করবেন। আমি কেন এর মধ্যে থাকব?"

কেষ্ট বলে, "আনব বইকি! কেষ্ট মিত্তিরের এক ডাকে এক্ষুনি বিশটা ছোঁড়া ছুটে আসবে। এসে পড়েছিলাম, তাই ভাবলাম চুকিয়ে যাই একেবারে। বেশী জানা-জানি হতে দেওয়াও ঠিক নয়। টর্চ নিয়ে মশায় ত ফরফরিয়ে বেরিয়ে এলেন। কাজ তো বলে আটকে থাকবে না। সকালবেলা ঘরে শালা এসে পড়বার আগেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে।"

কথা না বাড়িয়ে সুরেশ হন হন করে কাঁসারিপাড়ার দিকে চলল। মোড় ঘুরে কেষ্ট মিত্তিরের আড়াল হয়ে থমকে দাঁড়ায়। ঘড়িতে দশটা। মাস্টার মশায়ের সঙ্গে যত খাতিরই হক, এর পরে মেসের দরজার কড়া নাড়া ঠিক হবে না। মানুষজন আতঙ্কগ্রস্ত—হয়ত বা পাড়াসুদ্ধ হৈ-হৈ
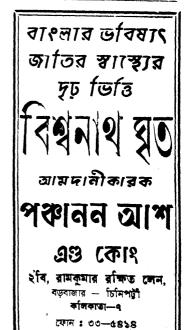
করে উঠবে।' এমনি সব ভাবছে সুরেশ। কিন্তু ভয় ধরিয়ে গেল যে কেষ্ট মিত্তির। রাত পোহাবার আগেই সংঘের দলবল গিয়ে পড়বে। পা দুখানা চলে যায় আবার রানীবাগানে, রক্তাক্ত দাওয়ার বীভৎস লাসগুলো যেখানে পথ আটকে পড়ে রয়েছে। লাস ডিঙিয়ে সামাল হয়ে ঢুকতে হয় ঘরের মধ্যে। মা আর শিশু জড়াজড়ি হয়ে মাঝখানটায়। কোণের দিকে বুড়ি মানুষটা। পানের ডাবর কাত হয়ে গড়াচ্ছে। আর ওপাশে—কই, নেই ত!

লহমার দেখা বটে, চোখ তা হলে ভুল দেখেনি। ঘরের মধ্যে পা দিয়েই দেখেছিল, মেয়েটার মুঠো-করা হাত খুলে গেল। আর মনে হল, চোখ পিটপিট করছিল—চোখ বুজে গেল অমনি সংগে সংগে। কেষ্ট মিত্তির পিছনে ছিল, সে টের পায়নি। নিমেষে মাত্র দেখেই সুরেশ তাই টর্চ নিভিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

সেই মেয়ে ইতিমধ্যে মরণশয্যা থেকে উঠে পালিয়ে গিয়েছে। ভাল। খুব ভাল। সংঘের লোকেরা খোঁজাখুঁজি করতে আসছে অনতিপরেই। খুঁজবে অবশ্য টাকাকড়ি জিনিসপত্র কোথায় কী পড়ে আছে—মানুষের চেয়ে যার ঢের ঢের বেশী দাম। কিন্তু ঘরের চারটে মড়ার মধ্যে একটা গায়েব হয়ে গেল, তার জন্যেও তন্নতন্ন করবে।

আলিমের বউ-ছেলে ও আলিমের মার নাড়ি টিপে দেখে। না, এদের নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই। তাদের সব কষ্ট চুকে-বুকে গিয়েছে।

বাইরে এসে মনে হল ছায়া সরে গেল যেন একটা। চলন্ত ছায়া। মানুষ অথবা প্রেত? মানুষ হলে পলক না ফেলতে মিলিয়ে যায় কী করে? অপঘাতে মরে গিয়ে মানুষ প্রেতমূর্তি নিয়েছে। সেটা অবশ্য হাসির কথা। সুরেশ সাহসী ছেলে, তবু জনহীন মৃত্যুপুরীর মধ্যে গায়ে তার কাঁটা দিয়ে ওঠে। সেই মেয়ে, কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু এত দূর তা ভাবতে পারেনি। জীবন বাঁচানর শেষ চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ছুটেছে। মানুষ ছাড়া মানুষের বড় ভয় আর কাকে?

দাওয়ার পাশে ছোট্ট ঘেরা জায়গাটুকু—রান্নাঘর বুঝি! তারের জালের বেঁটে আলমারি—এটা-ওটা ফাটকি-নাটকি রাখে। টর্চ তুলে ধরেছে সুরেশ, কিন্তু অত করে দেখবার কী? ঐ ত সে আলমারির গা ঘেঁসে। ঢাকা পড়েনি, গোটা মানুষ আড়াল করবার মতন ও-বস্তু নয়। প্রাণপণে মুখ চেপে রেখেছে আলমারির জালের উপর, গুটিসুটি হয়ে আছে—খরগোশ বিপদের সময় ঝোপে মাথা গুঁজে যে-রকম চুপচাপ থাকে।

"উঠে আসুন—"

সাড়া দেয় না। বরঞ্চ আলমারির সংগে লেপটে যেন শূন্যাকার হতে চায়। সুরেশ বলে, "অমন করে বাঁচতে পারবেন না। বোকামি করেন কেন?"

মনে করল, শাসানি। চোখ তাকিয়ে চেয়ে লায়লা ফ্যাঁস করে উঠল, "এগিয়েছ ত মেরে ফেলব। খবরদার!"

হাত দুটোই ত খালি। মেরে ফেলবে কি হাতের থাবড়ায়? কথার সংগে মুখের চেহারার সংগতি নেই। কথায় আস্ফালন, মুখে আতংক। ডাক্তারী কেতাবে পেয়েছে এমনি অবস্থার কথা।

লায়লা বলে, "কাছে এস না, আমার ছোরা আছে।"

সুরেশ শান্ত ভাবে বলে, "ছোরাটা ফেলে দিন তবে। দিয়ে আপনি আসুন। কনুইটা ত বিষম ফুলেছে দেখছি। হাড় ভাঙল কিনা কে জানে? একবার দেখব আপনাকে।"

কণ্ঠস্বরে চোখের দৃষ্টিতে কী দেখল লায়লা, আলমারির উপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়াল। আবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে আছে। সুরেশ বলে, "বড্ড তাড়া। এক্ষুনি চলে যেতে হবে এখান থেকে। আবার সব আসছে।"

লায়লা বলে, "আমায় মারবে না তুমি?"

"আমার কোন ক্ষতি করেননি, মারতে যাব কেন?"

"আমি যে মোসলমান—"

সুরেশের চোখে জল আসবার মত হল। সামলে নিয়ে বলে, "আমি ডাক্তার। ব্যাগে আমার গুলি-গোলা নয়, ওষুধ আর ব্যাণ্ডেজ। আমার কাজ বাঁচান। আগে আমি আপনার কনুইটা দেখব। নাড়িটাও দেখতে হবে।"

বাইরে এল, উঠানের উপর। বন্ধ ঘরের মধ্যে মরামানুষগুলোর সংগে সুস্থ সমর্থ সুরেশেরও মনে হচ্ছিল, দম বন্ধ হয়ে যায় বুঝি! বাইরে চাঁদের আলো। নারকেল-গাছ কোন্‌দিকে, তার দীর্ঘ ছায়া পড়ে উঠানটুকু চিরে যেন দুভাগ করেছে। ছায়া দেখে বোঝা গেল, চাঁদ উঠেছে আকাশে। নইলে শহরে কে কবে ঘাড় তুলে চাঁদ দেখতে যায়?

লায়লার বাঁহাতখানা তুলে ধরে টর্চ ফেলে কনুইয়ের আঘাত দেখছে। মুখের দিকে নজর পড়ে শংকিত হল—সর্বনাশ, পড়ে যাবে বুঝি অচেতন হয়ে। প্রাণপণ চেষ্টায় সামলাচ্ছে। শত্রু জেনে উত্তেজনার মধ্যে ছিল, এইবারে এলিয়ে পড়ছে। ব্যাগের মধ্যে ব্রাণ্ডি আছে শিশিতে, ফ্লাস্কে জল। ফ্লাস্কের গ্লাসে জল ঢেলে তাড়াতাড়ি তাতে কিছু ব্রাণ্ডি দিয়ে বলে, "খেয়ে ফেলুন।"

লায়লা ইতস্তত করে। সুরেশ বলে, "ভাবছেন কী? বিষ দিচ্ছিনে।"

সহসা লায়লা ডুকরে কেঁদে ওঠে, "বাঁচতে আমি চাইনে। আমার মামার এক ফোঁটা বাচ্চা অবধি বাঁচতে পেল না, আমি বাঁচব কেন?"

কিছু বিরক্ত হয়ে সুরেশ বলল, "সে যা হক করবেন। আমি আপনার গার্জেন নই, চিরকাল পাহারা দিয়ে বেড়াব না। কিন্তু কাপুরুষেরা ছোরা কি লাঠি তুলে ধরবে, তার নীচে মাথা পেতে দেবেন—আমি থাকতে তা হতে পারবে না, এইটে জেনে রাখুন।"

এক নজর চেয়ে দেখে লায়লা গ্লাস হাতে নিয়ে ঢক করে গালে ঢেলে দিল। প্রশ্ন করে, "কোন্ জাত আপনি সত্যি করে বলুন।"

"ডাক্তার—।" বলেই মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ল: "না, মিথ্যে কথা বলা হল। পাস করিনি, সার্টিফিকেট নেই। কিন্তু দেদার রোগী পেয়ে চুটিয়ে ডাক্তারি করে নিচ্ছি।"

তারপরে বলে, "হাঁটতে পারবেন তো? হাঁটতেই হবে। গাড়ি নিয়ে কে হাজির আছে আমাদের জন্যে? রানীবাগানটা তাড়াতাড়ি পার হয়ে নিন। তারপরে আস্তে আস্তে যাওয়া যাবে।"

খানিক পথ গিয়ে লায়লা একটা গ্যাসের আলো ঠেসান দিয়ে দাঁড়ায়, "আর পারছিনে।"

"পারতেই হবে। জিরিয়ে নিন এক মিনিট। দেখুন, এ বড় নাছোড়বান্দা ডাক্তার—রোগী হলে তার নিস্তার নেই।"

লায়লা রাগের ভংগিতে বলে, "হাত ধরতে হয় তা হলে। ভর দিয়ে যেতে পারি। খালি খালি মুখের বক্তৃতায় ডাক্তার হয় না।"

"শুধু কেবল নেতা হওয়া যায়।"

ভারী তৃপ্তি এতক্ষণে সুরেশের। পাতাল-বাসিনীর মুখে এইবারে একটু কল হাসির ঝিলিক। এ-ও তার চিকিৎসার ভিতরে। ক্ষমতা বটে মেয়েটার, মনে মনে সুরেশ তারিফ করছে। এমনি অবস্থার মধ্যে

ভাবছেন কী? বিষ দিচ্ছিনে

পড়লে পুরুষমানুষ হয়েও সে বোধ করি পাগল হয়ে যেত।

লায়লা বলে, "যাচ্ছি কোথা বলুন ত? এরকম যাওয়ায় বিপদ আছে। পুলিশ নেই, আইন নেই—"

একটু থেমে ঢোক গিয়ে নিয়ে বলে, "মাথার উপরে আল্লাহ্‌তালাও নেই।"

মেসের সামনাসামনি এসে পড়েছে তারা। সুরেশ বলে, "আপনার নাম ত জানিনে। আসল নামের গরজ নেই। ঠিক করে নিন, নাম কী হবে। বুঝতেই পারছেন, কী ধরনের নাম। মেসে অবশ্য পুরুষমানুষের ব্যাপার—মেয়েলোকের নাম কেউ জিজ্ঞাসা করতে আসবে না। তবু ঠিক করে রাখা ভাল। এর কাছে একরকম ওর কাছে অন্য-রকম না হয়ে যায়।"

রাস্তার দিকে একটা ঘরে আলো। জোর আলোচনা চলছে জনকয়েকের। কিছু কিছু কানে আসে। এখনকার দিনে ঐ যা একটা প্রসঙ্গ—দাঙ্গা। উচ্ছ্বসিত হয়ে একজন বলছে, "গোড়ায় ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ভেড়া-ছাগল জবাই করে করে হাত সেট হয়ে আছে, পারা যাবে না ওদের সঙ্গে।"

সুরেশ তাকিয়ে দেখে, লায়লার মুখ কাগজের মতন সাদা হয়ে গিয়েছে। স্নিগ্ধ স্বরে বলে, "ভয় কিসের! এ ছাড়া অন্য কী আশা করতে পারেন এখানে? ধরুন, আপনার সঙ্গে আমি গিয়ে পড়েছি আপনা-দের কোন ঘাটিতে। আপনাকেও ঠিক এই লজ্জার দায়ে পড়তে হত। আজকের এই অবস্থা বলে নয়, ধোঁয়াচ্ছে এ-ব্যাপার অনেক কাল ধরে। দশ-বিশ বচ্ছর। আমার মুসলমান বন্ধুদের বাড়ি গিয়েছি। গেলেই তারা অমুকবাবু বলে একবার ডেকে নেয়। ওয়ার্নিং। সামাল হয়ে কথাবার্তা বল, ভিন্ন জাতের লোক। আমি বলতাম, হতভাগা তোরা নূর রেখে দিস না কেন? তবে ত হাঙ্গামায় পড়তে হয় না! থুতনিতে নূর থাকা আর নূর না থাকা—দু-জাতের দু-রকম নিশানা হয়ে যায়।"

হাসি-গল্পে লায়লার মন হালকা করছে। দরজায় ধাক্কা দিল, কড়া নাড়ছে জোরে। নীচের ঘরের তার্কিকরা চুপ করে গেল। উপরতলা থেকে একজন মুখ বাড়িয়ে বলে, কে?"

"কালীপদবাবুকে ডেকে দিন। বলুন সুরেশ—বাগবাজারের সুরেশ রায়। বালিকা-শিক্ষালয়ে যখন ছিলেন, আমার ভাইঝিদের উনি পড়াতেন।"

"মাস্টার মশায়, কে একজন আপনাকে ডাকছেন। সঙ্গে মেয়েলোক।" বলে সে হাঁক দিয়ে উঠল "কী করছ ঠাকুর? মেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, দরজা খুলে ভিতরে আসতে দাও!"

কালীপদ মাস্টার চোখ মুছতে মুছতে নেমে এলেন: "কী ব্যাপার, এত রাত্রে কোথা থেকে?"

"রাতটুকু এখানে থেকে যাব মাস্টার মশায়। উপায় নেই। এখন পথে বেরনো যায় না। এমনই দেখুন, কী কান্ড করেছে! অল্পের জন্য বেঁচে এসেছেন।"

মাথার ঘন চুলে চাপ-চাপ রক্ত, রক্তাক্ত কাপড়-চোপড়। ফুলো হাতখানা লায়লা ডান হাতে ধরে রেখেছে। অবস্থা দেখে কালীপদ মাস্টার হায়-হায় করে উঠলেন। মেসের মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে আসছে, ঘুম থেকে উঠে আসছে কেউ কেউ। ছোটখাট ভিড় হয়ে দাঁড়াল। সুরেশের মাথায় বুদ্ধি খুলে গেল হঠাৎ। বলে, "আমার বউদির বোন। আপনি সেই নীরা-ইরাকে পড়াতেন, তাদের মাসী। পার্ক স্ট্রীটে উইমেনস হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করতেন। হস্টেলের উপর হামলা। এঁকে মড়া ভেবেছিল। পুলিশ নিয়ে আমরা গিয়ে পড়লাম। মড়ার গাদার মধ্যে যেভাবে পড়ে ছিলেন, আমরাও তাই ভেবেছিলাম গোড়ায়।"

কালীপদ মাস্টার বিষম উত্তেজিত হয়ে-ছেন, "পশু—পশু! ফুলের মত কচি মেয়ে—আ-হা-হা। যেন শিলে রেখে আদা-মরিচের মতন থেঁতো করেছে।"

কালীপদ মাস্টার ছুটোছুটি করছেন। ম্যানেজারের সঙ্গে শলাপরামর্শ হল। সুরেশকে বললেন, "মেস জায়গা বুঝতে পারছ। পুরো ঘর নিয়ে কেউ আমরা থাকি-নে। তোমায় নিয়ে কথা নয়, একটা মাদুর পেতে যেখানে হক পড়তে পার। কিন্তু মেয়েলোকের বেলা তা হয় না। আলাদা জায়গা চাই ত বটে। আর যেরকম অবস্থা, নরম বিছানা না হলে শুতেই পারবে না।"

বলতে বলতে কাঁদ-কাঁদ হয়ে উঠলেন: "মা-জননী, কার মুখ দেখে আজ তোমার সকাল হয়েছিল গো?"

ম্যানেজার বলেন, "গাঙ্গুলী মশায় দেশে গেছেন, তাঁর তক্তাপোশ-বিছানা খালি। বিভূতিবাবুর এতক্ষণে ত এক ঘুম কাবার। আপনি তাঁকে বলুন মাস্টার মশায়। ঘুম যেটুকু বাকী আছে, অন্য কোন ঘরে গিয়ে সেরে নিতে। এক ইস্কুলে কাজ করেন, আপনার কথা তিনি ফেলতে পারবেন না।"

মোটামুটি এইরকম ঠিক করে ম্যানেজার বিভূতিকে ডেকে তুললেন: "মাস্টার মশায় বলছেন, তাঁর ঘরের মেঝের তোশক-চাদর পেতে নিন গে।"

বিভূতি ভ্রূকুটি করে বলে, "কেন, শুনি? পুরো মাসের সিট-ভাড়া চুকিয়ে দিয়েছি। মেঝেয় শুতে যাব কেন?"

কালীপদ তাড়াতাড়ি বলেন, "না বিভূতি, তুমি তক্তাপোশে শোও, আমার বিছানটা নামিয়ে রেখ, মেঝেয় শোব আমি। এই সুরেশদের সঙ্গে বিশেষ জানাশোনা আমার। ওদের আত্মীয়া। পার্ক স্ট্রীটে আটকা পড়ে গিয়ে, দেখছ না, কী অবস্থা করেছে।"

বিভূতি লায়লার দিকে তাকাল। আপাদ-মস্তক তাকিয়ে দেখল।

"কোথায় থাকতেন ইনি?"

"পার্ক স্ট্রীটের হস্টেলে থাকত মেয়েটি—

"ওঃ! আর এই ভদ্রলোক আপনার জানাশোনা, এঁর আত্মীয়া বলছেন?"

জেরার ভঙ্গিতে সুরেশ ঘাবড়ে যায়। চিনে ফেলল নাকি?

কালীপদ বলেন, "একটা রাত্রির জন্য কষ্ট কর বিভূতি। দেখ, এ-অবস্থা তোমার আমার সকলের হতে পারে।"

বিভূতি বলে, "আপনি বলছেন, করি তবে কষ্ট। ভাল চেনা আপনার সঙ্গে ত বটে?"

গজরগজর করতে করতে বিছানা তুলে নিয়ে সে কালীপদর ঘরে যায়। কালীপদ বলেন, "মানুষটা ঐরকম রগচটা। কাঁচা ঘুমে ডেকে তুলেছে বলে রাগ হয়েছে।"

এ-দিকটা একরকম হল, কিন্তু খাওয়ার কী? রান্নাঘরের পাট চুকেছে, বাসন-মাজা ঘর-ধোওয়া অবধি সারা। কাঁচা চাল চাট্টি মিলতে পারে, কিন্তু উনুনে নতুন কয়লা সাজিয়ে ফুটিয়ে দেবে কে? আর এই সমস্ত করতে করতেই ত সকাল হয়ে যাবে।

কালীপদ দুঃখ করে বলেন, "একদিন আসতে বলেছিলাম। এমন অবস্থার মধ্যে এলে, দোকান থেকে দুটো মিষ্টি এনে জল খেতে দেব সে উপায় নেই। তোমাদের বাড়ি পড়াতে যেতাম, একগাদা করে খাবার আসত।"

সুরেশ বলে, "বড্ড কষ্ট দিচ্ছি মাস্টার মশায়। কিন্তু সত্যিই কিছু না-হলে চলবে না। আমি খাব না। ও'র জন্যে। মুখ দেখেই তা বুঝতে পারছেন।"

দেখ এখন কার ঘরে কী আছে। সতীশ-বাবু দিলেন বিস্কুট দুখানা। তারিণীবাবুর কৌটোয় বাসী মুড়ি। ভূদেববাবু দেশ থেকে পাটালি এনেছিলেন, তার কখানা বের করে দিলেন।

সুরেশ বলে, "বাঃ বাঃ, রাজসূয় আয়োজন। এর উপরে রয়েছে কুঁজো ভরতি জল। খাওয়া শোওয়া দুই-ই তোফা। বুদ্ধি করে আপনাদের এখানে এসে পড়েছি, তাই।"

ঘরের মধ্যে লায়লা খাচ্ছে। বারান্দায় বেঞ্চির উপর মাস্টার মশায় গল্প জমিয়ে নিলেন।

"নীরা-ইরা কত বড় হল এদ্দিনে! নরেশবাবু সেই চাকরি নিয়ে গেলেন, আসেননি তারপরে কলকাতায়?"

সুরেশ বলে, "এবারে আসছেন। থাকা যাচ্ছে না আর ওদিকে। আসতেই হবে।"

"কোথায় যে থাকা যায় দুনিয়ার মধ্যে! থাকার এই নমুনা দেখতে পাচ্ছ না?" জোরে এক নিশ্বাস ফেললেন কালীপদ। বললেন, "এলে আমায় একটু খবর দিও। দেখে আসব। বড্ড বুদ্ধিমতী মেয়ে নীরা—ওদের দেখতে ইচ্ছে করে।"

সুরেশ সগর্বে বলে, "বরাবর ইংরেজীতে ফার্স্ট হয়ে আসছে। যেসব ইস্কুলে পড়েছে—ধরুন, কসমোপোলিটান জায়গা, সর্বজাতের মেয়ে পড়ে, খাস বিলাতেরও আছে। নীরার সঙ্গে কেউ পারে না। আপনি গোড়াপত্তন করেছিলেন মাস্টার মশায়, সেই জোরে চলছে।"

কালীপদ মাস্টার ঘাড় নাড়েন। "উঁহু, কত ছেলেমেয়ে পড়াই আমি। পড়ানোই কাজ। ওরকম ধীশক্তি আর আমি দেখিনি। তোমার অন্য ভাইঝি ইরার কথা ত বলছিনে। সেও ভাল মেয়ে, কিন্তু ঠাণ্ডা স্বভাবের। ওরকম তীক্ষ্ণ নয়।"

তারপরে গভীর কণ্ঠে বললেন, "বেঁচে-বর্তে থাক, শতেক পরমায়ু হক। দেখ, পড়াশুনোয় কখনও যেন অবহেলা না হয়। সরোজিনী নাইডু ইংরেজীতে পদ্য লিখতেন, তাঁকে ছাড়িয়ে যাবে ও-মেয়ে।"

সুরেশের মন ভরে যায়। লাহোরের নানা ভয়াবহ খবর, আর দাদার মোটে চিঠিপত্র নেই—বড় অস্বস্তিতে দিন যাচ্ছিল। কিন্তু সৌম্যমূর্তি পলিতকেশ শিক্ষক মশায় প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। ঋষিতুল্য এ-মানুষের কথা মিথ্যা হবে না। ভাল আছে নীরা-ইরা ভাল আছেন ও'রা সকলে।

লায়লার উদ্দেশে কালীপদ বললেন, "শুয়ে পড় এবারে মা। বিছানাপত্তর ঠিক আছে ত? আসছি আমরা একবার ভিতরে।"

বলছেন, "নির্ভাবনায় ঘুমোও মা। সমস্ত শহর রসাতলে যাবে, এ-পাড়ার কিছু হবে না।"

কোণে দাঁড়-করানো বেঁটে সাইজের লোহার রড—সেটা নিয়ে এসে শিয়রের কাছে রাখলেন।

সুরেশ আশ্চর্য হয়ে বলে, "এটা কী হবে মাস্টার মশায়?"

"কিছু না, কিছু না। তবে সাবধানের মার নেই। কতজনে বালিশের তলে ছোরা রেখে ঘুময়। সড়কি-বল্লম চকচকে করে কেউ পাশে রাখে। নিরস্ত্র কেউ আজকাল থাকে না, নিদেন পক্ষে ছুরি-চাকু যা হক একখানা গাঁটে গুঁজে রাখবে। কিন্তু কিছুই হবে না মা, একটা পটকা ফোটাতেও সাহস করবে না কোন বেটা এদিকে এসে।"

এই প্রবোধ দিতে যাওয়াই কাল হল। এক ঘরে একলা থাকবে না মেয়ে। কিছুতে
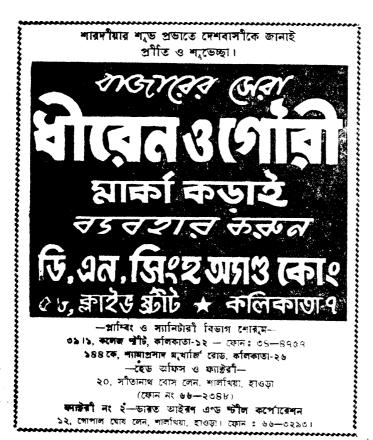
না। ভয়ে পাংশ‍ু ম‍ুখ। টপটপ করে জল গড়াচ্ছে দ‍ুগাল বেয়ে। কিন্তু করা যাবে কী? মেসের ঝি ভাত বেড়ে নিয়ে অনেকক্ষণ আগে চলে গিয়েছে। সে থাকলে না হয় বলে-কয়ে দেখা যেত, একটা রাত্রি এখানে কাটাতে পারে কি না! এখন নির‍ুপায় একেবারে। কিন্তু কানে নিচ্ছে কে এ-সব? বলতে গেলে ডবল হয়ে যায় কান্না।

স‍ুরেশ বলে, "কী ম‍ুশকিল দেখ‍ুন দিকি!"

কালীপদ নিম্নস্বরে বলেন, "তুমি ডাক্তারি পড়, তোমায় আমি কী বোঝাব? মাথা ঠিক স‍ুস্থ নয়, তা হলে এমনধারা করে? যে-কাণ্ড গিয়েছে ছেলেমান‍ুষের উপর দিয়ে! আমারই অন্যায় অমন করে বিনিয়ে বিনিয়ে বলা। ব‍ুঝতে পারিনি।"

অতিশয় মোলায়েম কণ্ঠে বোঝাতে লাগলেন, "শ‍ুয়ে পড় মা, ঘ‍ুমোও। ঘ‍ুমনো তোমার পক্ষে বড্ড দরকার, শরীর খানিকটা হাল্কা হবে। আমরা এই বেঞ্চিটার উপর বসে রইলাম। সারারাত জেগে থাকব। শোন, আমার এক মেয়ে আছে দেশের বাড়িতে। সেই মেয়ের নাম নিয়ে বলছি, কেউ এদিকে ঘাড় তুলে তাকাতে পারবে না। ব‍ুড়ো মান‍ুষের কথা অবিশ্বাস কর না, নির্ভয়ে ঘ‍ুমোও।"

এমনি অনেক রকম বলার পর লায়লা দরজা দিল। হ‍ুড়কো বন্ধ করল, ছিটকিনি এঁটে দিল। অনেকক্ষণ সাড়াশব্দ নেই। শ‍ুয়ে পড়েছে—ঘ‍ুমিয়েও পড়েছে মনে হয়। যা কষ্ট গিয়েছে, শ‍ুলেই আপনি চোখ ব‍ুজে আসবে। আহা, কষ্ট-ভাবনা ভুলেছে এতক্ষণে ঘ‍ুমের মধ্যে।

স‍ুরেশ বলে, "আপনি এবারে ঘরে যান মাস্টার মশায়। দ‍ুজনের কী দরকার? দরকার একজনেরও নেই, সে আপনি জানেন আমিও জানি। কিন্তু আমার কোন কষ্ট নেই—ঘরে না শ‍ুয়ে বেঞ্চির উপরেই না হয় শ‍ুলাম। রিলিফ-স্কোয়াডের কাজ—রাস্তায় টহল দিতে দিতে কত রাত্রি কেটে যায়। বড্ড ঘ‍ুম ধরল ত ফ‍ুটপাথের উপরেই কোন দেয়াল ঠেশ দিয়ে বসে পড়লাম। আপনাকে বিস্তর কষ্ট দিলাম। হাত জোড় করে বলছি, এবারে শ‍ুয়ে পড়‍ুনগে। নয়ত আমার অপরাধের অন্ত থাকবে না।"

বলাবলিতে কালীপদ উঠে চলে গেলেন। বয়স হয়েছে, এই জোয়ান য‍ুবাদের সঙ্গে কষ্ট সয়ে পেরে উঠবেন কেন? বেঞ্চির উপরে বাঁহাত বালিশের মত মাথার নীচে দিয়ে স‍ুরেশ চোখ ব‍ুজে ছিল। ধড়মড় করে এক সময় উঠে বসল। দোর খ‍ুলে বেরিয়েছে লায়লা, তার পাশে দাঁড়াল। শেষ রাত্রি, খণ্ড-চাঁদ পশ্চিম দিগন্তে চলেছে। চাঁদের আলোয় জ্বলছে তার চোখ দ‍ুটো।

স‍ুরেশ সহজ ভাবে বলে, "ঘ‍ুম হচ্ছে না?"

"আপনি ঘ‍ুমচ্ছেন, মাস্টার মশায় ত লম্বা-লম্বা কথা বলে সরে পড়লেন, এর উপরে আমি ঘ‍ুমলে মেরে দিয়ে যেত এতক্ষণে।"

"যেমন কাণ্ড মাস্টার মশায়ের! কী সব বলে গেলেন, তাই এখনও মাথায় ঘ‍ুরছে। মারতে কার বয়ে গেছে? চেনেই না কেউ।"

চোখ বড় বড় করে ভীত কণ্ঠে লায়লা বলে, "চেনে হয়ত ঐ বিভূতিবাব‍ু। কেমন করে তাকাচ্ছিল! আমায় মেরে ফেলবে।"

স‍ুরেশ তাচ্ছিল্যের ভাবে উড়িয়ে দেয়ঃ "উঁহ‍ু, কেমন করে চিনবে?"

"কত জায়গায় দেখতে পারে। তখন ত জানিনে। হল-ভরা মান‍ুষ—বর্ষামঙ্গলের গান গেয়েছি তার মধ্যে। লোকটার বাঁকা-বাঁকা কথা শ‍ুনলেন না? কিন্তু এবারে আর ইঁদ‍ুর হয়ে লাঠি খাব না। আমি আগে মারব।"

কাপড়ের নীচে থেকে লোহার রডখানা বের করল লায়লা। বলে, "সারাক্ষণ ম‍ুঠোয় নিয়ে তৈরী হয়ে ছিলাম। বসে বসে পারিনে। দ‍ুয়োর খ‍ুলে এগিয়ে দেখলাম, এল কদ্দ‍ুর। অনেকটা গিয়েছিলাম।"

স‍ুরেশ সভয়ে ভাবছে, সকাল কতক্ষণ পরে আর? একে নিয়ে বের‍ুতে পারলে যে হয়! চলে যাক আপন কোর্টে—প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়ে স‍ুরেশের দায়িত্ব খালাস। শ‍ুধ‍ু কন‍ুই আর ম‍ুখ নয়—তার চেয়ে অনেক কঠিন—মাথার চিকিৎসা আগে দরকার। অনেক ব্যাপার। এমন মেয়ে সঙ্গে রাখা বিপদ। রাক্ষ‍ুসে মেয়ে—কখন কাকে মেরে দেয়, কী কাণ্ড ঘটিয়ে বসে!

লায়লা বলে, "আপনি অঘোরে ঘ‍ুমচ্ছেন—দেখে যেন খ‍ুন চেপে উঠল। মেরে দিই মাথায় এক বাড়ি। রক্তের বদলে রক্ত। মেরে নিজেও মরতাম—বিষ আছে আমার কাছে।"

হাসিম‍ুখে স‍ুরেশ বলে, "দিলেন না কেন বাড়ি? ঘ‍ুমিয়ে ছিলাম—মাথা ছাতু ছাতু হয়ে যেত, কোন-কিছ‍ু জানতে পারতাম না।"

হাসি দেখে লায়লার উত্তেজনা বেড়ে যায়, "বলছি আপনাকে, আমার সামনে অত নিশ্চিন্ত হয়ে ঘ‍ুমবেন না। বাড়িতে একটা ম‍ুরগি জবাই হলে আমি ছ‍ুটে পালাতাম, কাঁদতাম। আগের সে-মান‍ুষ আর নই। মান‍ুষ মারা কিছ‍ুই নয়, মরাও কত সহজ! আমাদের অতটুকু নীল‍ু পর্যন্ত মরতে পারে, আমি পারব না?"

বড় ত বলতে ভেঙে পড়ে। আগ‍ুন নিভে গেল চোখের জলের ধারায়। বলে, "সঙ্গে বিষ নিয়ে ঘ‍ুরছি কতদিন থেকে। অথচ কী আশ্চর্য, লাঠির পিট‍ুনি খাচ্ছি, বিষের কথা তখন মনে পড়ল না। জ্ঞান হলে দেখি, বাড়ির সবাই মড়া—আমিই শ‍ুধ‍ু বেঁচে আছি। বাঁচতে কে চায়? বেঁচে রয়েছি অন্ততপক্ষে একটা লোক বদলি নিয়ে যাব বলে। আপনাকে খ‍ুন করতে যাচ্ছিলাম। দিব্যি করে বলছি। কী করে সামলেছি? দেখ‍ুন আর কষ্ট দেবেন না লোভ আমার সামনে এমনি করে মেলে রেখে।"

স‍ুরেশ নির্বিকার কণ্ঠে ডাক্তারী ব্যবস্থা দেবার ভঙ্গিতে বলে, "শোন গিয়ে এবারে। ঘণ্টাখানেক রাত আছে। ঘ‍ুমতে পারলে কষ্ট কমবে। ভাল হয়ে যাবেন।"

লায়লা আক‍ুল হয়ে বলে, "আবার ভাল হব আমি? বলে দিন। সত্যি করে বল‍ুন। আমোদ-আহ্লাদ করে বেড়াব, কলেজের বর্ষা-মঙ্গলে গান গাইব, নানীর সঙ্গে খ‍ুনস‍ুটি করব বাড়ি গিয়ে? দ‍ুনিয়া উল্টে গেছে, কেমন করে হব?"

কঠিন আদেশের মত স‍ুরেশ শ‍ুধ‍ু বলে, "ঘরে যান—"
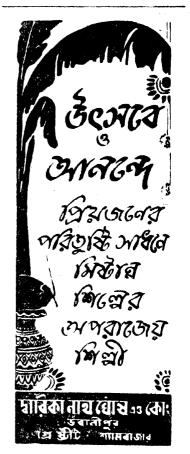
(সি ২১১৫)

দিনমান—নতুন দিন। ঘোর থাকতেই মেসের কজন বেরিয়ে পড়েছে। ট্রাম রাস্তা অবধি ঘুরে দেখে নতুন দিনের হালচাল বুঝে আসবে—রাত্রে কী পরিমাণ তাণ্ডব হল।

না, খবর বেশ ভাল। বাস বেরিয়েছে আজ রাস্তায়।

লায়লা নীচে নেমে দাঁড়িয়েছে। সুরেশ বিদায় নিচ্ছে, "যাই তবে মাস্টার মশায়।"

"খবরদার নিয়ে সামাল হয়ে যাবে। বাগবাজার যাচ্ছ ত এখন?"

"তা ছাড়া আর কোথায়? বাস চলছে শুনতে পেলাম। নিয়ে গিয়ে মায়ের হেপাজতে দিই। তিনি নিয়ে বিছানায় শোয়াবেন। সেবাশুশ্রূষা আমার মার মত কেউ পারে না। আমি হাতুড়ে, কিন্তু অতগুলো পাস করেও দাদাকে মার কাছে ধমক খেতে হয়। ঘাড় হেঁট করে দাদা মেনে নেন।"

রাস্তায় নেমেই লায়লা মাথায় কাপড় তুলে দেয়। এক লজ্জাবতী বউ। খরকণ্ঠে বলে, "বাড়ি নিয়ে তোলবার মতলব করছেন? কক্ষনো না, কক্ষনো না! বাগবাজারের কথা জানি। বাঘের মুখ থেকে নিয়ে সাপের ছোবলের নীচে ফেলবেন! কক্ষনো আমি যাব না।"

সুরেশ বলে, "রক্ষে করুন, আপনাকে নিয়ে যাব বাড়িতে? রাত্রে উঠে যে কাণ্ড করলেন—মেসের লোক বলেই আপনাকে শুইয়ে দিয়ে ঘরে ঘরে খিল দিয়েছিল, গৃহস্থবাড়ি হলে চাপা থাকত না। খুট করে শব্দ হলে 'কী হয়েছে' 'কী হয়েছে' করে মা এসে পড়তেন। কুটুম্ব বলে পরিচয় দিয়েছি, কুটুম্ব মেয়েকে এই অবস্থায় বাড়ি নেওয়া ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। তাই বলতে হল। কোথায় যাবেন বলে দিন এবারে।"

"পার্ক সার্কাসে—ঝাউতলায় যাব। মোবারক মোল্লার কাছে।"

"তাই চলে যান। আত্মীয় লোক?"

লায়লা বলে "মুসলমান। মুসলমান ছাড়া আত্মীয় কোথায় আমাদের? আর সব ভুয়া, মুখের কথা। অসময়ে কর্পূরের মত উবে যায়। আমার মামাকে দিয়েই দেখলাম।"

সুরেশ বলে, "বাস যখন ধর্মতলা দিয়ে যাবে, আপনি টুক করে নেমে পড়বেন। ওটা আপনাদের এলাকা, দিব্যি চলে যাবেন, কেউ কিছু বলবে না।"

নির্জন রাস্তা, কদাচিৎ দুটি একটি মানুষ—তাতেই লায়লা জড়সড় হয়ে দাঁড়ায়। সুরেশ একসময় বলল, "মাথার কাপড় ফেলে দিন বরং। আরও বেশী করে নজর পড়ে। ঘোমটার রেওয়াজ উঠে গেছে।"

লায়লা বলে, "রেওয়াজটা ভাল ছিল তাই আজ ভাবছি। ঘোমটা কেন, বোরখাও ছিল। আমার মা-দাদী সব পর্দানসিন ছিলেন। কেন সমস্ত তুলে দিলাম? কেন আমরা আগ বাড়িয়ে পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে যাই?"

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ায়, "এ-পথে যাব না—"

"ট্রাম-রাস্তার সোজা পথ এইটেই ত—"

লায়লা বলে, "সোজা পথ আর আমাদের নয়। গলিঘুঁজি খুঁজুন। আমার মামার বড় ক্লাকের পাড়া, আমি কলেজে যেতাম রানীবাগান থেকে বেরিয়ে। কত লোক দেখত। আজকে দেখতে পেলে ছেড়ে দেবে না।"

শিশুদের

সুস্থ ও সবল করে তোলার পক্ষে আদর্শ টনিক

ডোঙ্গরে বালামৃত

কে, টি ডোঙ্গরে এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ বম্বে—৪

শাখাঃ—বিরহানা রোড, কানপুর

তাই হল। চোরের মত সাপের মত সহজ মানুষের ভাল পথ এড়িয়ে এক গলুর জায়গায় তিন গলি পথ ঘুরে পৌঁছল বড়-রাস্তায়। ঘোমটা ফেলে হাত ধরে যাচ্ছে এখন সুরেশের। ভেবে দেখেছে এইটে বেশী নিরাপদ। হাত ধরে ঘনিষ্ঠ হয়ে যে পথ চলে, সে কি আর ভিন্ন জাতের কেউ? হিন্দু-ঘাঁটির মধ্যে সুরেশের যদি ভয় না থাকে, তারও নেই। বাসে উঠে সুরেশের পাশটিতে বসে পড়ে। তখন ত একেবারে নিঃশঙ্ক।

ফাঁকা গাড়ি, প্যাসেঞ্জার অতি অল্প। টিকিট করতে গিয়ে সুরেশ কন্ডাক্টরকে বলে, "আমার শ্যামবাজার। ধর্মতলায় ইনি নেমে যাবেন।"

কন্ডাক্টর শিউরে ওঠে, "আরে সর্বনাশ! তা-বড় তা-বড় জোয়ান পুরুষে পারে না, উনি নামবেন কোন্ সাহসে? বোমা ফাটছে মিনিটে মিনিটে, বন্দুক ছুড়ছে।"

সুরেশ লায়লার দিকে তাকাল। লায়লা বলে "টিকিট যেখানকার হয় হক, যাই ত আগে সেখানে।"

কন্ডাক্টর চলে গেলে ফিসফিসিয়ে বলল, "জাতের পরিচয় ভগবান গায়ে লেখেননি। তা হলে কি নিয়ে যেত বাসে চড়িয়ে, দিত টিকিট? অবশ্য ভাবছি, পরিচয় যদি লেখা থাকত বাস থেকে ধর্মতলায় নেমে পড়াই নিরাপদ। বোমা-বন্দুক আমায় বাদ দিয়ে ছাড়ত।"

বাস এসপ্লানেড ছেড়ে ধর্মতলা-মুখো আসতেই বোঝা গেল, নামবার কথাই উঠতে পারে না। নক্ষত্রবেগে দৌড় দিয়েছে, প্রাণপণে যেন ছুটে পালাচ্ছে—করাল সর্বনাশের মুখ থেকে। দোকানপাট বন্ধ, গাড়িঘোড়া চলছে না। ফুটপাথের এখানে ওখানে একটি দুটি মানুষ—পুলিশ বা পাজামা পরা। মনে হয়, কটমট করে তাকাচ্ছে এদিকে। অথবা মনই হয়ে গিয়েছে এই রকম, ভাল চোখে যেন ওরা তাকাতে পারে না। ছুট দিয়ে একেবারে বউবাজারের মোড় অবধি এসে বাস থেমে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

কন্ডাক্টর বলে ওঠে, "বাব্বা—"

এক রসিক প্যাসেঞ্জার বলল, "গাড়ির টায়ার ফাটত ঐ ধর্মতলার উপরে, কিংবা যদি কলকব্জা বিগড়াত?"

অন্য সবাই খিঁচিয়ে ওঠে, "কু-ডাক ডাকবেন না মশায়। এগুলো জীবন চ্যাংড়ামির বস্তু নয়। নিতান্ত দায়ে পড়ে প্রাণ হাতে করে বেরুনো।"

সুরেশ বলে, "এইখানে এবার নামতে পারেন।"

চোখ বড় বড় করে লায়লা তাকায় তার দিকে: "পারি বইকি! ভারবোঝা কত আর বইবেন? কিন্তু এখান থেকে কার কাছে কী উপায়ে যাব, যদি একটু বলে দিতেন! বিষের ক্যাপসুল রয়েছে যখন, শেষ উপায় অবশ্য আছেই। কিছু ত বললেন না! আচ্ছা, নেমেই যাই।"

অভিমানের সুর রীতিমত। বাস ছেড়ে দিল, নামবার কোনই লক্ষণ নেই। এ-জায়গায় নেমে যাবেই বা কোথা—সুরেশ ভেবে দেখছে। মুখ ফিরিয়ে আছে লায়লা। রাগ করেছে, কথা বলবে না। বাড়ি নিয়েই তুলতে হল তবে। উপায় কী?

পথের মাঝে আরও গোটা দুই বিপজ্জনক জায়গা—লায়লার নিজের জাতের মহল্লা। কিন্তু একটা মানুষ টুপ করে ছেড়ে দেওয়া যায় না ত বাসের জানলা দিয়ে? জায়গা-গুলো নির্বিঘ্নে পার হয়ে শ্যামবাজার এসে পড়েছে। পথে লোকজন এবারে। এমন কি সিনেমা-হাউসেরও কোলাপসিবল গেট খোলা, কাঁদুনে চোখে লোক ঘুরে ঘুরে দেয়ালের ছবি দেখছে। এক প্যাসেঞ্জার উল্লাসে বলে উঠল, "আর ভয় নেই—"

অনেকে নেমে গেল। উঠলও কয়েকটি। লায়লার বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সুরেশ সান্ত্বনা দেয়, "ভয় কেটে গেছে, শুনলেন ত? পরের স্টপে আমরা নামব।"

সেই লোকটা আবার বলে, "জোরে একটা নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না। চেঁচাই, লাফাই, নাচ-গান-হল্লা যা-ইচ্ছে করি এবারে।"

সুরেশ বলে, "শুনছেন? নাচতে গাইতেও পারা যায় এখন। আপনাদের বর্মা-মুল্লুকের মত। আসুন, নেমে পড়ি—"

পা যেন চলতে চায় না লায়লার। সুরেশ বলে, "মুষড়ে গেলেন কেন? বলছিল ওরা, শুনতে পেলেন না? কোন ভয় নেই।"

"সে কি আমার?"

"আপনারও। থাকছেন খুব বেশী ত আজকের দিনটা। আপনাকে বাড়ি রেখেই আমি থানায় চলে যাব। থানা থেকে গাড়ি করে ঝাউতলা পৌঁছে দেবে।"

লায়লা দাঁড়িয়ে পড়ল: "সোজা আমায় থানায় নিয়ে যান। আপনাদের বাড়ি যাব না, কক্ষনো না। আপনি থাকবেন না, অন্য লোকের কাছে থাকতে পারব না আমি।"

কালকের ঐ কাণ্ডের পরে দোষও দেওয়া যায় না। সুরেশের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে, খানিকটা পরিচয় হয়েছে—তার কথা আলাদা। একলা একটি প্রাণী কেমন করে কোন ভরসায় থাকবে হিন্দুর বাড়ি? কিন্তু উপায়ও নেই কিছু। হুট করে থানায় নিয়ে যাওয়া চলে না। হালচাল বুঝে দেখতে হবে আগে। সরকারী চাকর বলেই থানার মানুষ জাত-বেজাতের অতীত নয়—হিন্দু আছে, মুসলমান আছে। আজেবাজে লোকও অনেক থাকে থানায়।

মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

(একটি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক)

এই নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্তোষজনক কাজে আপনি খুসী হবেন

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ কারবারের সুবিধা আছে

চেয়ারম্যান: রায় বাহাদুর এস, সি, চৌধুরী

ডিরেক্টর: শ্রী ডি, এন, ভট্টাচার্য

জেনারেল ম্যানেজার: শ্রী আর, এম, মিত্র, বি-এ, এ-আই-আই-বি

১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে

সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টের

সুদের নূতন বর্ধিত হার শতকরা বৎসরে ২½% হইতে ৩% পর্যন্ত প্রবর্তন করা হয়েছে।

বিস্তৃত বিবরণ ব্যাঙ্কের যে কোন শাখা বা আফিসে পাওয়া যাইবে।

হেড আফিস: ৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

বিশেষ এই ডামাডোলের দিনে। লায়লার পরিচয় চাউর হয়ে গেলে বিপদ শুধুমাত্র তার নয়।

সেইসব বুঝিয়ে বলে, "অবুঝ হবেন না। দোহাই। বাড়িতে আমার একলা মা। আর এক বুড়োমানুষ চাকর। মা প্রায় ঠাকুরঘরেই পড়ে থাকেন—"

একটুখানি থেমে বলে, "আরও সুবিধা, বিষম শুচিবেয়ে তিনি। মুরগি-টুরগি খাই, জাতবিচার করিনে—পেটের ছেলে হয়ে এই অনাচারে আমরাই মায়ের কাছাকাছি হতে পারিনে। দু-চার ঘণ্টার ব্যাপার, চুপচাপ থাকবেন, তারপরেই ত নিজের কোটে পৌঁছে যাচ্ছেন।"

বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়ে। উপর থেকে ভারী গলার হাঁক আসে, "কে?"

"আমি সুরেশ। আমাদের মধুকে ডাকছি।"

মধুসূদন ছাতে কাপড় মেলে দিচ্ছিল। উঁকি দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে বলে, "আসছি দাদাবাবু, দাঁড়াও।"

গণ্ডগোলের সময় দিনরাত এখন দুয়োর দিয়ে রাখে। লায়লার দিকে ফিরে সুরেশ বলল, "আপনার নাম কিন্তু লীলা।"

"লীলা নয়, লায়লা। কিন্তু নাম আপনি কী করে জানলেন?"

সুরেশ বলে, "আমার বউদির বোনের নাম লীলা। লীলা বিশ্বাস। লায়লা না বলে সংক্ষেপ করে লীলা বললেন। সুবিধে এই, আপনাদের খোদাতালা কিম্বা আমাদের ভগবান গায়ের উপর জাত লেখে দেননি। কথাবার্তা এক বাংলায়, চেহারায় এক বাঙালী— নামটা নিজেদের এক্তিয়ার বলে তাই নিয়েই যত গণ্ডগোল।"

লীলা, লীলা—বার দুয়েক রপ্ত করে নিল লায়লা। বলে, "বেশ হয়েছে। আসল নামের কাছাকাছি। ভুল করে এর কাছে একরকম ওর কাছে অন্যরকম বলে ফেলবার ভয় রইল না। কিন্তু আপনি বললেন, মা ছাড়া কেউ নেই। অন্য গলা শুনলাম যে কার?"

"ও'রা উপরের ফ্ল্যাটের। আলাদা সিঁড়ি, আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। সংসারে আছেন শুধু মা।"

দরজা খুলে মধুসূদন অবাক হয়ে তাকায় লায়লার দিকে। লায়লা সংকুচিত হয়ে পড়ে।

"মাকে ডাক মধু। ঠাকুরঘরে, না রান্না-ঘরে?" কণ্ঠ গভীর হল সুরেশের। বলে, "মায়ের আমার মোটমাট তিন জায়গা—গঙ্গার ঘাট, ঠাকুরঘর আর রান্নাঘর। এর বাইরের দুনিয়া চেনেন না।"

মধু বলল, "চান করা হয়ে গেছে মা'র। চন্দন ঘষছেন। ঠাকুরঘরে গিয়ে বসবেন এইবার।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নবনলিনী বেরিয়ে এলেন। চন্দনের বাটিতে ঘষা সারচন্দন। গন্ধে আমোদ করে তুলেছে। কপাল জুড়ে চন্দন লেপা, পরনে তসরের থান। ঠাকুর-ঘরের দিকেই যাচ্ছিলেন মা।

থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন: "কাল সেই সকালবেলা বেরিয়ে গেলি, এত করে বলি, সারাদিন যা করে বেড়াস, রাত্তিরটা বাড়ি চলে আসবি...হ্যাঁ রে, লক্ষ্মী মেয়েটাকে চিনতে পারছিনে ত!"

"বউদির বোন। যার জন্যে বউদি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।"

লায়লা ইতিমধ্যে গলায় আঁচল বেড় দিয়ে নবনলিনীর পায়ের গোড়ায় গড় হয়ে প্রণাম করল—পুত্রবধূর বোন হয়ে ঠিক যেমনটি করতে হয়। বাঃ রে, লায়লা জানে দেখি অনেক!

ক্ষতচিহ্নে ভরা ফুলে-ওঠা মুখের দিকে চেয়ে নবনলিনী শিউরে উঠলেন, "কী হয়েছে? অ্যাঁ, কী কাণ্ড করেছে গো?"

"পার্ক স্ট্রীটে ছিলেন ত। লাঠি পেটা করে তারপরে মড়া ভেবে ফেলে দিয়েছিল।"

নবনলিনী শিউরে উঠলেন।

বোধ করি আরও বেশী করুণা কাড়ার মতলবে সুরেশ বলল, "এই দেখছ মা, আর শাড়ির নীচে হাতখানা যদি দেখ তাকিয়ে। অদ্ভুত সহ্যশক্তি, তাই অমনি দাঁড়িয়ে আছেন। এতটা পথ হেঁটে চলে এলেন। অন্য কেউ হলে চেঁচিয়ে তোলপাড় করত।"

ডান হাতে ধরে রেখেছে জখমি বাঁ হাত-খানা। নবনলিনী তাড়াতাড়ি হাতের কাপড় সরিয়ে দিলেন। ঠাকুরঘরে যাচ্ছিলেন তসরের শুচি কাপড় পরে, ঠাকুরের কথা ভুলে গেলেন। আহা রে, হাতের পাতা থেকে কনুই অবধি ফুলে ঢোল। ব্যাকুল হয়ে বললেন, "জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, দাঁড় করিয়ে রেখেছিস কোন্ আক্কেলে এই এতক্ষণ?"

মায়ের ভাবনার জবাব দেয় সুরেশ: "কেমন করে বুঝব যে, জ্বর হয়েছে। নাড়ি ধরে দেখিনি, উনিও বললেন না কিছু।"

নবনলিনী আরও রেগে উঠলেন। "নাড়ি না দেখিস, মুখে একটিবার তাকিয়ে দেখিসনি? শুইয়ে দিতে পারিসনি? ডাক্তারি, না কচু শিখছিস, পোড়ারমুখো কোথাকার!"

সুরেশ বলে, "কোন্ বিছানায় কোথায় শোবেন, তুমি এসে দেখিয়ে দেবে ত! নইলে আবার বকাবকি—"

"হ্যাঁ, বকাবকি করতাম! দাঁড়িয়ে মাথা ঘুরে পড়ুক তাই বলে। অন্য বিছানা না পেলে আমারটা ত রয়েছে ঐ পড়ে।"

লায়লাকে জড়িয়ে বুকের মধ্যে নিয়ে তাড়াতাড়ি বিছানায় শুইয়ে দিলেন তাঁর নিজের বিছানা। দু চোখ ভরে যায় জলে। চোখ মুছে বলতে লাগলেন, "শহরে আছিস ভুলেও কোনদিন বুড়ী মার কাছে আসিসনি। আজকে কী দশায় এলি মা গো, পোড়া চোখ দিয়ে কেমন করে তাকাই?"

গঙ্গাস্নান ছাড়া কোথাও বেরোন না নবনলিনী, কারও সঙ্গে মেশেন না। ক

বিনামূল্যে

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠের ৫০,০০০ প্যাকেট নমুনা ঔষধ বিতরণ। ভিঃ পিঃ ৮০। চর্মরোগ-চিকিৎসক কবিরাজ শ্রীবিনয়শঙ্কর রায়, পোঃ সালিখা, হাওড়া। রাঞ্চ—৪৯বি হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। ফোনঃ ৬৬-৩৬৪২।

(সি ২০১৯)

রাজ জ্যোতিষী

বিশ্ববিখ্যাত শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ, হস্তরেখা বিশারদ ও গভর্ণমেণ্টের বহু উপাধিপ্রাপ্ত রাজ-জ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রীহরিশ্চন্দ্র শাস্ত্রী, হাউস অব্ এস্ট্রোলজি

ফোন ৪৮—৪৬৯৩

১৪১/১সি, রসা রোড, কলিকাতা—২৬। যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়া এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা কোপিত গ্রহের প্রতিকার এবং জটিল মামলামোকদ্দমায় নিশ্চিত জয়লাভ করাইতে অনন্যসাধারণ। তিনি প্রশ্ন গণনায়, করকোষ্ঠী নির্মাণে ও জটিল ক্ষয়রোগ আরোগ্য করাইতে অদ্বিতীয়। নানা দেশের মনীষিগণ উপকৃত হইয়া প্রশংসাপত্রাদি দিয়াছেন।

সদ্য ফলপ্রদ কয়েকটি জাগ্রত কবচ।

শান্তি কবচ—পরীক্ষায় পাশ, মানসিক ও শারীরিক ক্লেশ, অকাল-মৃত্যু প্রভৃতি সর্ব দুর্গতি নাশক, সাধারণ—৫,, বিশেষ—২০,।

বগলা কবচ—মামলায় জয়লাভ, ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ও সর্ব কার্যে যশস্বী হয়। সাধারণ—১২,, বিশেষ—৪৫,।

সামুদ্রিক রত্ন

গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি ও পত্রিকার সম্পাদক-বৃন্দ দ্বারা উচ্চপ্রশংসিত। হস্তরেখা দৃষ্টে নিজের ভাগ্য জানিবার শ্রেষ্ঠ বই। মূল্য—৫, টাকা মাত্র। সর্বত্র পাওয়া যায়।

কোন্ বয়সে কলকাতা দেখেছেন, এখনও ভেবে আছেন শহর ঠিক সেইরকম আছে। এইটুকু আঘাত দেখে অধীর হয়েছেন। আঘাতের তাড়সে রাতে একটু জ্বর এসেছে, তাই নিয়ে খামোকা সুরেশকে যাচ্ছেতাই করলেন। আতঙ্ক ছিল লায়লার। এখন লজ্জা। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে।

ঘণ্টা খানেক কেটে গিয়েছে। বার্লি রান্না করে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে বাটি ভরতি করে দিয়ে নবনলিনী আবার এক দফা স্নান করে ঠাকুরঘরে ঢুকেছেন। বাটির একটুও যাতে অবশিষ্ট না থাকে, তদারকির ভার সুরেশের উপর। জুলুম। অতখানি মানুষের পেটে ধরে নাকি? কিন্তু খেতেই হবে, বেচারা মায়ের কাছে নয়ত গালি খেয়ে মরবে আবার। লায়লার জন্য গালি খাবে।

"কী কাণ্ড বলুন ত আমায় নিয়ে!"

সুরেশ সগর্বে বলে, "মা যে!"

লায়লার কণ্ঠ একটু বুঝি কাঁপলঃ "আমার মা নেই। ছোট্ট বয়সে মারা গেছেন, মনেও পড়ে না। সত্যিকারের মা কী রকম, জানিনে। কিন্তু উনি কী তাই বলুন। আরাম করে এমনি পড়ে থাকলে ত হবে না।"

সুরেশ বলে, "দোষ আপনার। পায়ের উপর পড়তে গেলেন কেন? আপনাদের ত ওরকম করে না। দূরে দূরে নমস্কার সেরে দিয়ে আধুনিকা ভেবে মা এড়িয়ে যেতেন।"

লায়লার কুণ্ঠিত মুখে চেয়ে সামলে নেয় আবার, "কেন করলেন, বুঝি। কোন দিক দিয়ে সন্দেহের কিছু না থাকে। ভালই ভেবেছিলেন অবশ্য। কিন্তু ঐ করতে গিয়ে জ্বর ধরা পড়ে গেল।"

লায়লাও ছাড়বার মেয়ে নয়, বলে, "ওসব কিছু নয়। শুনেছেন ত? প্রণামের ছুতো করে ছুঁয়ে দিলাম। ওঁরা হলেন মুসলমানের মেয়ে ছুঁয়ে। খানিকটা শোধ নিয়ে নিলাম।"

"তা বেশ করেছেন। শোধ এবার আপনার উপরে। শুয়ে পড়ে থাকুন দু দিন চার দিন। বার্লি খান।"

লায়লা বলে, "ভাল অষুধপত্তর খাইয়ে শিগগির জ্বরটা সারিয়ে দিন।"

"আমি? কী দায় পড়েছে। বকুনি খাওয়ালেন আমায় মায়ের কাছে। আমার ডাক্তারির অপযশ হয়ে গেল।"

লায়লা অধীর হয়ে বলে, "থানায় যাবেন বলেছিলেন আমায় দাঁড়াতে রেখেই। গেলেন না ত!"

"তখন কি জানি, জ্বর বাঁধিয়ে বসে আছেন? জ্বরো রুগীকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমিও গালি খেলাম। গালিতে মার কোন বাছবিচার নেই, নিজের ছেলে বলে রেহাই হল না। বার্লি খেয়ে আপনার ঘুমবার কথা। ঘুমন। তারপরে আমি যাব।"

"ঘুমতে হবে হুকুমমত?"

খুব খানিকটা ঝগড়া করল লায়লা, কিন্তু ঘুমিয়েও পড়ল একটু পরে। জ্বরে দেহের ব্যথায় কতদূর অবসন্ন হয়ে পড়েছে, বিশ্রামের কী প্রয়োজন, তা সে নিজেই জানত না। সেই ঘুমিয়ে পড়ল, জাগল সন্ধ্যার তখন অল্প একটু বাকি। মধুকে জিজ্ঞাসা করল। সুরেশ ফিরেছিল একবার, দুপুরের খাওয়া সেরে আবার বেরিয়ে গিয়েছে। নবনলিনী এসে বার বার গায়ে হাত দিয়ে দেখছেন। সুরেশ দু-তিন রকম ওষুধ এনে দিয়েছে—ঘড়ি দেখে খাইয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। রাত্রে সুরেশ বোধ হয় আজ আসবে না, কাজ বেশী ওদের রাত্রিবেলা। তা ত হবেই, ভয়াল সরীসৃপেরা অন্ধকারে চুপি চুপি বেরোয় ত। রাস্তায় রাস্তায় পাহারা দিয়ে ঘুরছে তারা। কালীপদ মাস্টারকে যেমন বলল, একটুখানি হয়ত চোখ বুজেছে কোন ফুটপাথের উপরে পাশাপাশি [illegible] নিয়ে। লায়লার মাথার নীচে বালিশ ছিল, নবনলিনী আবার দুই পাশবালিশ এনে দুই পাশে দিয়েছেন, আরাম হবে। নিজে শুয়েছেন মেঝের মাদুর পেতে তার উপর কম্বল বিছিয়ে। মনে মনে হাসছে লায়লাঃ জাত গেল গো মা-জননী। এত নিষ্ঠায় জাতধর্ম বাঁচিয়ে আছ, গেল সমস্ত বরবাদ হয়ে। জানতে যদি কার জন্যে এত করছ, যদি আমার জাতের খবর রাখতে!

সকালবেলা ঢুলতে ঢুলতে সুরেশ ফিরল। অর্থাৎ ফুটপাথে চেপে বসে একটু আধটু চোখ বুজবারও ফুরসত হয়নি কাল রাত্রে। লায়লাকে দেখে আরক্ত চোখ আনন্দে বিস্ফারিত হল। "বা রে, হাতের ফুলো একেবারে নেই। দেখলেন আমার ডাক্তারি? মা ত গোমুখ্যু আরও কত কী বলে দিলেন। আপনিও মনে মনে ভাবলেন, হয়ত বা সত্যি তাই। উঁচু করে তুলুন দেখি হাতটা। লাগছে না, একটুও ব্যথা নেই—কী বলেন?"

ব্যথা একটু আছে বইকি, হাত তুলতে গিয়ে লাগে। কিন্তু ছেলেমানুষের মতন উল্লাস আর পরিতৃপ্তির মধ্যে সে-কথা প্রকাশ করতে ইচ্ছে হয় না। হাসিমুখে লায়লা চুপ করে থাকে।

সুরেশ জাঁক করে, "ডেকে কথা বলে আমার ওষুধ! দেখলেন?"

দুষ্টুমির সুরে লায়লা বলে, "লড়াই এই উপকারটা করেছে। যক্ষ্মা ক্যানসার আর এক শ গণ্ডা ব্যাধিতে ভুগে ভুগে রোগী মরে মরুক, কিন্তু একটা অঙ্গ ছিঁড়ে পড়ে গেলেও মানুষ দুদিনে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। এমনি সব ওষুধ বেরিয়েছে দোকান থেকে, বড়ি কিনে খেয়ে ফেল, বাস্‌। এর পরে গলা কেটে দুখানা করে ফেললেও জোড়া দেওয়া যাবে বোধহয়। করতেই হবে। মানুষ না থাকলে আবার নতুন লড়াই বাধানো যাবে কাদের নিয়ে?"

তারপর বলে, "থানায় গিয়ে খোঁজ নিয়েছেন কাল? পাঠাবার কী ঠিক হল?"

ছেলে আগের কথারই কী জবাব দিতে যাচ্ছিল সুরেশ। হাসি থামিয়ে বলে, "আপনার কষ্ট হচ্ছে এখানে?"

লায়লা বলে, "বড় কষ্ট। এত নরম বিছানায় আমি শুইনে। বুড়ো মানুষ মেঝেয় কম্বল পেতে পড়ে থাকবেন, খাটের উপরে ঘুম হয় না আমার। ঘুমের ভিতর উ'-আঁ করেছি কি তক্ষুনি উঠে মুখের উপর ঝুঁকে এসে পড়বেন। এ-সমস্ত পারিনে আমি। আর আপনি কী সাংঘাতিক লোক, এই মাকে নিয়ে কত ভয় দেখিয়েছিলেন। শুচিবেয়ে মানুষ—ছোঁবেন না, কথা বলবেন না, ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে হাঁটবেন, আরও কত কী!"

সুরেশ বলে, "কী জানি, আমারও ত নতুন লাগছে। আমাদের বেলা কখনও এমন দেখিনি। কিংবা হতে পারে, আমাদের বোন হয়নি ত, একটা মেয়ের জন্য মনে মনে লোভ ছিল মায়ের।"

লায়লা বলে, "অথচ জানি কত ঠুনকো এই সম্পর্ক। যে মুহূর্তে জাতের পরিচয় পাবেন, গঙ্গাস্নান করবেন, পণ্ডিতের কাছে ছুটবেন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিতে। ছদ্মপরিচয়ে রয়েছি—উনি যা জানেন, আমি তা নই। জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে চেহারা পালটে যাবে। রূপকথার রাজরানী হঠাৎ যেমন রাক্ষসের চেহারা নিয়ে দাঁড়ায়। সে-কথা ভাবতে পারিনে আর আমি, পাগল হয়ে উঠি। কবে পালাতে পারব, তাই বলে দিন।"

বলতে বলতে সত্যিই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। মেসের সেই রাত্রিবেলার মতন। সুরেশ তাড়াতাড়ি বলল, "থানায় গিয়েছিলাম কাল। কথাবার্তাও হয়েছে। থানাওয়ালার গাড়ি এসে আপনাকে তুলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু থানার গাড়ি এখনে আনা চলে না। ঠাণ্ডা মাথায় বুঝে দেখুন সমস্ত। যা করতে হবে, গোপনে। লোকে বুঝতে না পারে। আপনি ত চলে গেলেন, তারপরে আমাদের উপর শোধ তুলবে। জেনেশুনে কী জন্যে আশ্রয় দিই আপনাকে?"

লায়লা চুপ করে শুনে যাচ্ছে। সুরেশ বলে, "আমার মায়ের কাছেও গোপন রাখব। টের পেলে রাক্ষসের মূর্তি উনি ধরবেন না, এটা জেনে রাখুন। ঠিক উল্টো। যত মন্দই হক, সংস্কার একটা এত কাল ধরে লালন করে আসছেন। সংস্কারের খাতিরে ঝেড়ে ফেলতে হবে, কিন্তু বিষম কষ্ট হবে ও'র। ভেবে দেখুন আমার মায়ের কথা।"

লায়লা বলে, "তা হলে উপায়টা কী! চিরকাল এমনি মুখ লুকিয়ে থাকব?"

"আর একটু সেরে উঠুন আপনি। ধরুন বেড়াতে বেরুলাম একদিন, বেড়াতে বেড়াতে আপনাকে থানার হেপাজতে দিয়ে এলাম। মাকে বলব, তুমি যেতে দিচ্ছ না, ট্যাক্সি ডেকে জোর করে উনি মাসীর বাড়ি চলে গেলেন। মা আর কী করবেন—বেপরোয়া একগুঁয়ে বলে খুব একচোট গাল পাড়বেন আধুনিকতার নামে। চুকেবুকে গেল। সব দিক ভেবে আমি এই ঠিক করছি। কী বলেন আপনি?"

লায়লা বলে, "ব্যথাফুলো একেবারে সেরে গেছে। বেড়াতে যেতে আজও ত পারি।"

সুরেশ হেসে বলল, "বলে দেখুন না মাকে। তাঁর ঘর থেকে বেরুনো আমার ডাক্তারী ব্যবস্থায় হবে না। উল্টে গালি খাব। উতলা হবেন না, কদিন আর—চারটে পাঁচটা দিন। আপনারও এখন ত হাত-পা মেলে বিশ্রামের দরকার।"

সেদিন বড্ড হাসিখুশী লায়লা। হাসতে হাসতে বলে, "ঠাকুরঘরে ঢুকেছিলাম কাল। সমস্ত ছুঁয়ে লেপে দিয়েছি।"

সুরেশ গম্ভীর হল: "বুঝতে পেরেছি। মা ঠিক টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। ধর্মে বোধ হয় গুনাহ হল আপনার।"

লায়লার মুখে কথার খই ফুটছে। আগাগোড়া বলতে লাগল: "কাল নির্জলা একাদশী গেছে। তা আমায় বললেন, চন্দন ঘষতে পারিস? পাটার উপরে চন্দনকাঠ ঘষা এমন কী শক্ত কাজ! ঘাড় নাড়লাম। বললেন, আয়। চন্দন ঘষতে লাগিয়ে দিলেন।"

সুরেশ বলে, "ভোগান্তিগুলোও বলুন ঐ সঙ্গে। কাপড় ছাড়লেন গঙ্গাজল ছিটালেন গায়ে মাথায়। হস্টেলে বসবাস করার দরুন চামচে খানিক গোবর খেতে হল কিনা সঠিক জানিনে। এত কাণ্ড করে তবে ঢুকতে হয়েছে। আমার মাকে আমি জানিনে? বলুন সত্যি কি না?"

তারপরে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "ভাল করেছেন আপনি। জানি না কি করে এত সংস্কারমুক্ত হলেন। কিন্তু খুব বুদ্ধির কাজ করেছেন।"

হাসিরহস্য নয়, অন্তর দিয়ে বলছে। লায়লাও গম্ভীর হল: "সত্যি বলছেন, ভাল করেছি আমি?"

সুরেশ বলে, "সামান্য মানুষ আমি, ঠাকুরের জাত নিয়ে দুর্ভাবনা করিনে। আপনাকে মা ভালবেসেছেন। মা জানেন, হিন্দুর মেয়ে আপনি। ঠাকুরঘরের ঐ অভিনয়টুকু যদি না করতেন, বড় ব্যথা লাগত আমার মার মনে। সেই কষ্ট হতে দেননি। আপনি বড় ভাল, ভারী দরদ আপনার।"

সকালবেলা এই কথাবার্তা, এমনি হাসাহাসি। সুরেশ যথারীতি বেরিয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে বিষম কাণ্ড। উপরের ফ্ল্যাটের একটি লোকের কৌতূহল লক্ষ্য করা যাচ্ছে লায়লার আসার দিন থেকেই। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেরবার মুখে জানলার দিকে

দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)
"গ্রহযজ্ঞ" প্রদত্ত বলিয়া ১।২নং মিলিত কবচ গ্রহশান্তিতে, বিপদ উদ্ধারে, শত্রু পরাজয়ে, ভয় নিবারণে, অভীষ্টসিদ্ধিতে ও সৌভাগ্য আনয়নে অসীম শক্তিসম্পন্ন, জগতে অদ্বিতীয় ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। কোন নিয়ম নাই। মূল্য—১৫্। স্পেশাল—১৫০্।
ডি, এন্, সেন, এম-এ, বি-এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ বিঃ দেওঘর (বিহার)

উঁকিঝুঁকি দিয়ে যান। দাঁড়িয়েও থাকেন। লায়লার নজরে পড়ে জানলাটা বন্ধ করে দিয়েছে, কোন সময়ে খোলে না। সেই মানুষটা আজ মা মা করে বাড়ির ভিতর ঢুকলেন: "থার্মোমিটারটা দিন একবার মা, খোকার টেম্পারেচার দেখব।"

মা বলে ডাকছেন নবনলিনীকে। মাতৃপ্রাণ পুত্রটির এতদিনের মধ্যে সাড়া পাওয়া যায়নি। মা কোথায় রে মধু? —বলতে বলতে একেবারে লায়লার ঘরের মধ্যে।

নবনলিনী গঙ্গাস্নানে গিয়েছেন। রোজই যান—আজ অন্তত দশ বছর ধরে। পাড়াসুদ্ধ জানে, উপরের ইনিই জানেন না শুধু? সামনাসামনি দাঁড়িয়েছেন। এবং তিলেক বিস্ময়ের চিহ্ন দেখা যায় না মুখে। বরঞ্চ টিপে টিপে হাসছেন।

"লায়লা ত আপনি। এখানে রয়েছেন?"

নিরর্থক বুঝেও ইঁদুরে থাবা তোলে শিকারী বিড়ালের দিকে, দেখেছেন? লায়লা বিস্ময়ের ভান করে বলে, "আপনার ভুল হচ্ছে।"

"ভুল? হতে পারে। চশমা অনেক দিন আগে নেওয়া, বদলাতে হবে। লায়লা নন আপনি, কে তবে?"

"লীলা—লীলা বিশ্বাস আমার নাম।"

"বটে! আমি অমল সাধুখাঁ—আমাকেও বোধহয় দেখেননি কখনও। কিন্তু আমি এক লায়লাকে জানি। বর্ষা-মঙ্গল পালা করলেন। গান-বাজনার তালিম দিতে সেই সময় আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন। খুব ভাল গান করেন সেই লায়লা, ভারী মিঠে গলা। তখন দাঙ্গার সময় নয়। এখন শুনি, হিন্দু-পাড়ায় লায়লারা সব লীলা হচ্ছেন, মুসলমানপাড়ায় জয়নারানরা হচ্ছেন জয়নুদ্দিন। হতেই হবে, যে বিয়ের যে মন্তোর।"

ফিরে চলে যাচ্ছেন। লায়লার একটুও ভয়ের ভাব দেখানো চলবে না। তা হলে সর্বনাশ! বলে, "থার্মোমিটার নিতে এলেন, কই, নিয়ে যান।"

"ও হ্যাঁ, দিন।"

সেই থার্মোমিটার দেবার সময় আরও চোখোচোখি হল। অসহায় শিকারকে বাঘ যখন কবলের মধ্যে পায়, এমনি বুঝি তার জ্বালাময় চোখ।

নবনলিনী ফিরে এলে লায়লা বলল, "আমি চলে যাই।"

"হল কী? এখানে জল-বিছুটি মারছে কে তোমায়?"

এমনি তাঁর জবাব। যাবার কথা পাড়তে দেবেন না। কিন্তু লায়লা কেমন করে আর চুপচাপ থাকে? বলে, "পিসীর ওখানে যাব। সেখানেই ত যাবার কথা। জ্বরে আটকে গেলাম।"

"তা বটে, ও'রা ব্যস্ত হচ্ছেন। পোস্ট-কার্ড আছে, দু ছত্র লিখে দাও যে, অসুখ সেরেসুরে চলে যাবে।"

লায়লা বলে, "সেরেই ত গেছি—"

নবনলিনী চটে উঠলেন: "তাই তুমি বোঝ! সেই বুদ্ধি থাকলে ত! জ্ঞানবুদ্ধি থাকবে ত পার্ক স্ট্রীটে পড়ে থেকে মার খাবে কেন? আগেই বেরিয়ে পড়তে, এমন দশা হত না।"

সেই আদি-পর্ব মহাভারত আরম্ভ করলেন। দিনে রাতে যা শুনতে হচ্ছে। লায়লা জেদ ধরে বলে, "যেতেই হবে আমায়। সুরেশবাবু বাড়ি এসে ব্যবস্থা করে দেবেন।"

ভ্রূকুটি করলেন নবনলিনী। বলেন, "এসেছ নিজে ইচ্ছে করে। কিন্তু যেখানে এসেছ, যাওয়াটা তাদের ইচ্ছেয়। দুয়োর ধরে আটকাব। ক্ষমতা থাকে, ধাক্কা মেরে যেও চলে।"

অধীর কণ্ঠে লায়লা বলে, "জোর করে আটকান হচ্ছে কিন্তু—"

"হচ্ছেই ত। তোমার মাথা ভাল হয়নি। পাগলকে আটকে রাখতে হয়।"

রায় দিয়ে ভিজে কাপড় সপসপ করে নবনলিনী চলে যাচ্ছিলেন। দরজা অবধি গিয়ে ভেঙে পড়লেন একেবারে। দু চোখে জল ছাপিয়ে পড়ে। বললেন, "লীলা, তুই কি পাথর? আমার নরেশের কোন খবর নেই। নানান ভয়ের কথা শুনি। সুরেশটা ত পথে পথে রাত্রিদিন। তুই আছিস—তোর সঙ্গে বকাবকি করে তোর জন্যে এটা-ওটা কাজ করে কোন রকমে তবু মনের ভাবনা ভুলে থাকি। তুই চলে যাসনে মা। তা হলে কী নিয়ে থাকব?"

মায়ের এই দশা, আর বাড়ির ছোটকর্তা ওদিকে পথে পথে পরহিত করে বেড়াচ্ছেন! দিনের মধ্যে আজ বাড়ি আসার ফুরসত হল না। রাত্রিবেলা কাজ পড়ে বেশী, তখন ত নয়ই। ভাবতে গিয়ে লায়লা দিশা পায় না। মন খুলে দুটো কথা বলবে সে মানুষ নেই। অমল সাধুখাঁ লোকটা দৃষ্টিতে সংকটের পূর্বাভাস দিয়ে গেল—সে এখন কী করবে, কোথায় পালাবে কোন্ কৌশলে?

পোস্টকার্ড নিয়ে লিখল চিঠি। ফুফু অর্থাৎ পিসী সম্পর্কের কেউ নেই তার কোন চুলোয়—একটা-কিছু বলতে হয়, তাই বলেছিল। লিখল চিঠি ঝাউতলায় মোবারক মোল্লাকে। বেঁচে আছি, রয়েছি—এই ঠিকানায়, যা করবার করুন। চিঠি লিখে মধুকে দিয়ে দিল ডাকে ফেলতে।

এদের কী—আমি চলে গেলে কে কী করবে এদের? স্রেফ বেকবুল যাবে: মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিল, বুঝতে পারিনি। মোবারককে চিঠি লেখা ছাড়া অন্য কিছু মাথায় এল না। মরতে পারব না, কেন মরব? দুনিয়া জুড়ে এত মানুষ বেঁচে থাকবে, আমি কী জন্যে বঞ্চিত হব জীবন থেকে? কী অপরাধে? সাধুখাঁ সময় বেশী দেবে না, চোখের ক্রূর দৃষ্টি দেখে বোঝা গেল।

একদিনের দুর্ভাবনায় লায়লার আবার সেই গোড়ার দিনের চেহারা। সকালবেলা সুরেশ ফিরল। এক-গলা কথা জমে আছে—তার কোন্‌টা আগে বলে, কোন্‌টা পিছনে! বলে, "আপনাদের উপরের সাধুখাঁ লোকটা আমার চেনা। গানের সুর দিতে গিয়েছিল, তখন বড্ড দরদ দেখাত আমার উপর। ভাল ভাল কথা বলত। হাত টেনে ধরে দেখাতে গেল কোন্ পজিশন নেব গান গাওয়ার সময়। যাচ্ছেতাই ধমক দিলাম। সবাই হেসে উঠল। সে অপমান মনে পুষে রেখেছে। কায়দায় পেয়েছে, শোধ নেবে।"

সুরেশও শঙ্কিত হয়েছে। ফর্সা মুখ পাংশু। বলে, "পাড়ায় ওর মস্ত বড় দল। দলটা কনসার্টের—এখন তবলা-বাঁশি ফেলে ডাণ্ডা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর থাকা চলবে না আপনার। একটা দিনও নয়।"

ব্যাকুল হয়ে লায়লা বলে, "আমি কী করব! এমন যে মা, তিনিও বেঁকে দাঁড়িয়েছেন। দরজা আটকে থাকবেন।"

"দরজার নীচে নামতেও ত ভয়।

নবনলিনী বেরিয়ে এলেন

যত গুণ্ডা ওদের দলে। তাদের কি আর বলেনি সব কথা? হয়ত বা নজর রেখেছে পথে। এমনি তবু বাড়ির ভিতরে, পথে পা দিলে ক্যাঁক করে টুঁটি ধরবে।"

এমনি সময় ট্যাক্সি দাঁড়াল বাইরে। আক্রোশ-ফাটা কান্না। বিধবার বেশে অমলা এসে আছড়ে পড়ল উঠানে। তার কোলের মধ্যে ইরা। সুরেশ ছুটে গেল। নবনলিনী সুক্তির কড়াই নামিয়ে রেখে এদের চায়ের জল চাপাচ্ছিলেন, তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন এক মুহূর্ত, তারপরে একছুটে ঠাকুরঘরে গিয়ে দড়াম করে দরজা এ'টে দিলেন।

আর লায়লা ঘরের মধ্যে কোন্‌খানে লুকবে, দিশা পায় না। কোন্ দেয়ালের গায়ে, কোন্ পাতালের তলায়?

সুরেশ আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে হঠাৎ যেন জেগে উঠল। ইরার কাছে গিয়ে হাত ধরে টানেঃ "শোন্ ইরা। একটা কাজ করতে হবে মা, আয় এদিকে।"

অমল সাধুখাঁ উপর থেকে ইতিমধ্যে নেমে এসেছে। তার কনসার্টের দল বাইরে। বীরত্ব জাহির করছে। রাস্তায় জনতা।

অমল চিৎকার করছে, "ভাই-ভাইঝিকে কোতল করল, আর এমনি মহাপ্রাণ আমরা, তাদেরই একটিকে মহারানীর মত অন্দরে শুইয়ে সেবা দিচ্ছি।"

জনতার গর্জন ওঠেঃ "কোথায় আছে বের কর। নখের বদলে নখ, দাঁতের বদলে দাঁত। রক্তের বদলে রক্ত।"

নরেশ ডাক্তারের ছোট মেয়ে ইরা—বসন্তে ঝাঁঝরা-মুখ কুরূপ কুৎসিত ইরা বারান্দার প্রান্তে চুপি চুপি সুরেশকে বলে, "তাই কাকাবাবু। স্টেশনে আবদুল-দাদার রক্ত দেখে এসেছি। ঘুষির পর ঘুষি মারছে মুখে রক্ত দরদর করে পড়েছে। মাসীকে আমরা কিছুতে ছাড়ব না। ঠিক তাই।"

বের করে দাও শিগগির। নয়ত বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে মানুষ।

লায়লা বেরিয়ে দাঁড়াল। কিছুই যেন বুঝতে পারে না, সম্মোহিত হয়ে আছে। অথবা ঘুমিয়ে স্বপ্নের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে শতেক চক্ষুর সামনে।

ইরা কে'দে উঠল, "মাসী ইনি—আমাদের লীলা মাসীমা। আমি চিনি মাসীকে। না কাকাবাবু?"

কান্নাকাটির পর ক্লান্তিতে অমলা থেমেছিল একটু। চোখ বুজে ছিল। লীলার নামে চোখ মেলে এদিক-ওদিক তাকায়। গর্জন করে ওঠে কেশর-ফোলানো সিংহীর মতঃ "না, বোন নয় আমার। মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা।"

ইরা তবু বলছে, "মাসীই ত। মা, তুমি চিনতে পারছ না। বলে দাও না কাকাবাবু। মা আর একবার চেয়ে দেখ ভাল করে।"

খিল খুলে গেল ঠাকুরঘরের। নবনলিনী বেরিয়ে এলেন। স্তব্ধ শোকাহত মূর্তি। সকলের দিকে চেয়ে বললেন, "আমার সর্বনাশের মধ্যে হল্লা কর না তোমরা অমন ভাবে। আমি চিনি ভাল করে। আমার ছেলে গেছে, নাতনি গেছে। আমার এমন বউমা—শোকেতাপে তারও মাথার গোলমাল। মায়ের পেটের বোন চিনতে পারছে না।"

পক্ষীমাতার মত লায়লাকে বুকের মধ্যে করে নিলেন। বললেন, "এখানে কেন মা? চলে আয় তুই আমার সঙ্গে।"

ঠাকুরঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে দড়াম করে আবার দরজা দিলেন।

• • •

অনেক পরে দুপুরবেলা মোবারক মোল্লা এলেন। সঙ্গে লোকজন আর পুলিশ। চিঠি পেতে দেরি হয়েছে, পেয়েই ছুটেছেন। বাড়ি এখন শান্ত। খাওয়া শেষ করে লায়লা হাত ধুচ্ছে। মোবারক সামনে চলে এলেনঃ "চল। কোন ভয় নেই। আর্মড-পুলিশ সঙ্গে, আর কেউ আটকাতে পারবে না।"

লায়লা বলে, "আটকে রেখেছে কে বলল? সেই রকম কি দেখছেন? ভাবী এসে পড়লেন, আজ আমি যাব না। আপনার সঙ্গে ত নয়ই।"

মোবারক আগুন হয়ে বলেন, "খামোকা তবে চিঠি লিখে পাঠালে কেন? কী দরকার বল?"

"দরকার একটু আছে—"

দু হাতের কাচের চুড়ি দু গাছা খুলল। বলে, "এ চুড়ি আপনি দিয়েছিলেন, মনে পড়ে? মামার নাম করে দিয়েছিলেন—আমার উদার আপনভোলা মামা। চুড়ি পরে মেয়ে-মানুষ হয়ে মামাকে অন্দরে ঢুকতে বলে-ছিলেন। চুড়ি আপনার ফেরত নিয়ে যান মোল্লা সাহেব।"

বলতে বলতে গলা প্রখর হয়ে ওঠে, দু ফোঁটা আগুনেই বুঝি গড়িয়ে পড়ে গাল বেয়েঃ "কাপুরুষ আপনারা। চুড়ি পরে অন্দরে ঢুকে পড়ুন। মানুষে যেন মুখ না দেখে। মানুষ সোয়াস্তিতে থাকুক, মানুষে বাঁচুক।"

বিস্তর অকথা-কুকথা বলে মোবারক মোল্লা চলে গেলেন। লায়লা ব্লাউসের ভিতর থেকে ছোট্ট কৌটা বের করল। কৌটার ভিতরে সাদা ক্যাপসুল। সুরেশের দিকে চেয়ে বলে, "আমি নিরস্ত্র নই। আপনার কাছে মিথ্যা দেমাক করিনি। এই বিষ মুঠোয় করে নিয়ে সাধুখাঁর দলের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার এই হাতিয়ার। ভেবে রেখেছিলাম, মরব। মেরে মরব—যারা আমার নানীকে মেরেছে, মামাকে মেরেছে, এক ফোঁটা নিষ্পাপ নীলুফারকে অবধি মেরেছে। কিন্তু বাঁচবার গরজ আজকে আমার। আর বাঁচাবার। খুব বেশী করে বাঁচব। এ-জিনিস আমি কাছে রাখব না।"

বিষের ক্যাপসুল লায়লা নর্দামায় ছুড়ে দিল।

GOVERNMENT LIBRARY Cooch Behar

আধুনিক কবিতায় ব্যঞ্জনা

শিবনারায়ণ রায়

ভাষা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বৈয়াকরণরা অভিধা, তাৎপর্য এবং লক্ষণার মধ্যে প্রভেদ নিরূপণ করেছিলেন। কতকগুলি ধ্বনির সন্নিবেশ থেকে একটি অখণ্ড শব্দ উৎপন্ন হয়। যখন বার বার ব্যবহারের ফলে একটি বিশেষ শব্দের সঙ্গে একটি বিশেষ অর্থের যোগ সাধারণ-স্বীকৃতি বা প্রসিদ্ধি লাভ করে, তখন সেই অর্থকে সেই শব্দের অভিধা বলা চলে। আবার কতকগুলি শব্দ বিশেষভাবে সন্নিবিষ্ট হয়ে একটি বাক্যরচনা করলে তা থেকে একটি অখণ্ড বাক্যার্থ আমাদের মনে প্রতিভাত হয়। যে-সব শব্দ ঐ বাক্যের উপাদান, পৃথক পৃথক ভাবে শুধুমাত্র তাদের আভিধানিক অর্থ থেকে বাক্যার্থের এই অখণ্ডতা পাওয়া যায় না; বাক্যের গঠনের মধ্যে বিভিন্ন শব্দার্থের অন্বয়ের ফলে অর্থের এই সমগ্রতা সাধিত হয়ে থাকে। এরই নাম তাৎপর্য। তা ছাড়া বাক্যের মধ্যে শব্দের আর-এক ধরনের প্রয়োগ হামেশাই দেখা যায়। যে-কোনও শব্দের একটা সাধারণ-স্বীকৃত বা প্রসিদ্ধ অর্থ ত থাকেই; তা ছাড়া সেই অর্থের কাছাকাছি বা তারই অনুরূপ অন্য অর্থেও তা অনেক সময় ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন কলম বলতে আমরা একটা বিশেষ জিনিস বুঝে থাকি; কিন্তু তলোয়ারের চাইতে কলমের ক্ষমতা বেশী এ-কথায় "কলম" লেখকের নির্দেশ দিচ্ছে। এটি শব্দের লক্ষণা।

আলঙ্কারিকরা বললেন, এ-তিনটি ছাড়াও ভাষার আর-একটি বিশেষ শক্তি আছে; এবং এই শক্তির ক্রিয়ার ফলেই সাধারণের ব্যবহৃত ভাষা সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হয়। অভিধা, তাৎপর্য, লক্ষণা থেকে আমরা পাই বাচ্যার্থ; সাহিত্যিক এই বাচ্যার্থের সাহায্য নিয়ে অথচ তাকে অতিক্রম করে বাক্যে আর-একটি প্রতীয়মান অর্থ সঞ্চার করেন, আর তারই নাম ব্যঞ্জনা। ভাষার এই ব্যঞ্জনা-শক্তি না থাকলে ভাব, আবেগ এবং অভিজ্ঞতা রসে রূপান্তরিত হতে পারত না। এবং নৈয়ায়িকের বিশ্লেষণে ব্যঞ্জনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকৃত হলেও, সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-রসিকদের অপরোক্ষ অভিজ্ঞতায় এর আস্বাদন বারংবার পরীক্ষিত। ধ্বনিকার তাই বলেছেন, যেমন অঙ্গনা-দেহে অবয়বের অতিরিক্ত এক লাবণ্য উদ্ভাসিত হয় তেমনি মহাকবিদের বাণীতে বাচ্যার্থকে আশ্রয় করে তার অতিরিক্ত আর-একটি প্রতীয়মান অর্থ অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। এটিই ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা। অভিনবগুপ্ত আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের "লোচন"-টীকায় বিশদ করে দেখিয়েছেন যে, এই ধ্বনি দ্বারাই রস প্রতীত হতে পারে। যে "অপূর্ববস্তু-নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা" প্রতিভার লক্ষণ তারই সামর্থ্যে সাহিত্যিক ব্যাকরণ-অভিধানের নিয়ম মেনে নিয়েও প্রচলিত শব্দের এবং শব্দসমাবেশের মধ্যে বাচ্যার্থের অতিরিক্ত ব্যঙ্গ্যার্থের পরিস্ফুটন ঘটান।

অবশ্য স্রেফ প্রতিভার দোহাই পেড়ে কোনও কিছুরই অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা করা চলে না, আলঙ্কারিকরাও তা করেননি। রসকে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর বলার পরেও যাঁরা রসের ভাব, বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী ভাব প্রভৃতি উপাদান এবং কলাকৌশল বিশ্লেষণ করতে গিয়েছিলেন, তাঁরা-যে ভাষাতে কী পদ্ধতিতে এবং কোন্ প্রক্রিয়ায় ব্যঞ্জনা আসে এটিরও খুঁটিনাটি বিচার করতে চাইবেন এটা ত স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে আনন্দবর্ধন এবং অভিনবগুপ্তের বিচার শ্রদ্ধাভাজন শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের কল্যাণে আধুনিক বাঙালী পাঠকের কাছে সমধিক পরিচিত। কিন্তু বোধহয় সংস্কৃত ভাষায় এ-রহস্যের সব চাইতে পরিচ্ছন্ন এবং সূক্ষ্ম আলোচনার সন্ধান মিলবে অভিনবগুপ্তের সমকালীন আলঙ্কারিক কুন্তল বা কুন্তকের 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থে। কুন্তক ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার বদলে "বক্রতা" শব্দ ব্যবহার করেছেন। ভামহ লিখেছিলেন, "শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যং"। কুন্তক প্রস্তাবটিকে বিশদ করে দেখালেন যে, শব্দ এবং অর্থ দুয়ের মধ্যেই আহ্লাদসৃষ্টির সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ-দুয়ের বিন্যাসের মধ্যে মিল না ঘটলে কাব্যের চমৎকারিত্ব আসে না। মানে না-বুঝেও সৎ কবিতা শুধু কানে শুনে আনন্দ পাওয়া যায়। এ আনন্দের কারণ হল শব্দবিন্যাসের অন্তর্নিহিত সঙ্গীতধর্ম। অন্য ধারে শুধু অর্থসম্পদের দ্বারাও কোনও বাক্য পাঠককে আনন্দ দিতে পারে। কিন্তু যখন কোনও বাক্যে ছন্দ-এবং-ধ্বনিবিন্যাস অর্থবিন্যাসের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরস্পরের সমৃদ্ধি ঘটায় এবং একটি সমগ্র সত্তায় সমঞ্জসা লাভ করে, তখনই ভাষা সাহিত্য হয়ে ওঠে। এই সমগ্রতার সামঞ্জস্যের ফলে শব্দরূপ বাচক এবং অর্থরূপ বাচ্যকে অতিক্রম করে ভাষায় একটি নতুন সামর্থ্য সঞ্চারিত হয়—এরই নাম বক্রতা। দার্শনিকপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের মতে এখনকার সমালোচকরা যাকে এস্থেটিক কোয়ালিটি বলেন, কুন্তক "বক্রতা" কথাটিতে তারই সূচনা করেছিলেন। এর যেটি অন্তরঙ্গ দিক (অর্থাৎ এর ফলে চেতনায় যে হ্লাদরসের আস্বাদ হয়) তাকে কুন্তক বলেছেন সৌভাগ্য; আর যেটি বহিরঙ্গ (অর্থাৎ শব্দার্থের বিশিষ্ট সন্নিবেশের ফলে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়) তার নামকরণ করেছেন লাবণ্য। কোন্ কোন্ কারণ এবং প্রক্রিয়ার ফলে কাব্যদেহে এই সৌভাগ্য এবং লাবণ্য সঞ্চারিত হয় কুন্তক তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় উন্মেষে বিস্তারিতভাবে তার বিশ্লেষণ করেছেন। সংস্কৃত-সাহিত্য থেকে প্রভূত উদাহরণ-সহযোগে বিভিন্ন প্রকারের বক্রতা বিষয়ে তাঁর এই আলোচনা অলঙ্কারশাস্ত্রে এক অসামান্য সংযোজন।

ফলত ধ্বনি, বক্রতা বা ব্যঞ্জনা-সমন্বিত হওয়ার ফলেই সাধারণ-প্রচলিত ভাষা সাহিত্যের ভাষায় বিকাশলাভ করে। এবং সাহিত্যের মধ্যে কবিতা হল ব্যঞ্জনা-সামর্থ্যে সব চাইতে সমৃদ্ধ। প্রাচীন হিন্দু আলঙ্কারিকদের যেন প্রতিধ্বনি করে আধুনিক কবি এজরা পাউণ্ড তাই বলেছেন, গাঢ়তম ভাষাই কবিতা। অথচ শিশুবয়স থেকে এমন বহু রচনা আমাদের পড়তে হয়, অভিভাবক, শিক্ষক এবং টীকাকারদের মতে যারা নাকি কবিতা, কিন্তু যাদের মধ্যে ব্যঞ্জনার আভাস পর্যন্ত আমরা কখনও খুঁজে পাই না। আলঙ্কারিকদের পরিভাষা অনুসারে এরা আসলে কবিতা নয়, চিত্রকাব্য মাত্র। আমরা এদের পদ্য আখ্যা দিতে পারি। কবিতার পাশাপাশি পদ্য সব দেশেই চিরকাল লেখা হয়ে আসছে; কারণ সৃষ্টি-প্রতিভা না থাকলেও যাঁদের রচনার প্রবৃত্তি অদম্য, এজাতীয় ব্যক্তিরা কোন দেশে-কালেই দুর্লভ নন। তবে বিপদ তখনই ঘটে যখন নানা কারণে কবিরা পর্যন্ত স্বভাবোক্তি এবং 'অর্থব্যক্তির নামে ব্যঞ্জনা বিষয়ে

উদাসীন হয়ে ওঠেন। তার ফলে যা সৃজিত হয় তাকে ঠিক পদ্য বলা যায় না। কারণ কুন্তকোক্ত সৌভাগ্য সে-রচনা পুরোপুরি বর্জিত নয়, কিন্তু অব্যুৎপত্তিকৃত দোষে তার রস ফিকে, তার প্রতীয়মানতা ক্ষীণ, সহৃদয়ের হৃদয়ে অনুরণন জাগাবার সামর্থ্য তার সীমাবদ্ধ। এ-অবস্থায় কাব্যে বাচ্যার্থ এবং ভাব মুখ্য হয়ে ওঠে, এবং ফলে তার দেহে লাবণ্য বা আভা ম্লান হয়ে আসে। এই অবক্ষয় থেকে কবিপ্রতিভাকে বাঁচাবার জন্যে তখন প্রয়োজন হয় ব্যঞ্জনার রহস্য নিয়ে নতুন করে বিচার বিশ্লেষণ, কবিধর্ম বিষয়ে কবিদের অনিবষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কাব্যের ইতিহাসে এমনিতর অবস্থাকেই বোধহয় কালান্তর আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

॥ দুই ॥

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ইয়োরোপীয় কবিতার ইতিহাসে এমনিতর এক কালান্তর সূচিত হয়েছিল। আঠার শতকের চতুর কবিরা অলঙ্কারপ্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন; তাঁদের রচনায় বামনোক্ত শ্লেষ, সমতা, সমাধি, উদারতা, অর্থপ্রতীতি ইত্যাদি গুণের অভাব ছিল না; কিন্তু তাঁদের কল্পনায় অলঙ্কার প্রায়শই ব্যঞ্জনার সঙ্গে অন্বিত হয়ে ওঠেনি। এ'দের কাব্যাদর্শের প্রতিবাদে আঠার শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের গোড়ায় ইয়োরোপীয় সাহিত্যে যে রোমান্টিক আন্দোলন গড়ে ওঠে তাতেও সাধারণভাবে ব্যঞ্জনা হয়ে রইল গৌণ, মুখ্য হয়ে উঠল একধারে ভাব বা আবেগ এবং অন্যধারে দার্শনিকতা। এ-প্রস্তাবের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম কীটস; এবং কোলরিজের কয়েকটি আশ্চর্য কবিতা সম্বন্ধেও এ-কথা খাটে না। তবু মোটা-মুটিভাবে বোধহয় বলা চলে যে, ওয়ার্ডসওয়র্থ-বায়রন-শেলী, লামার্তিন-ভিনী-উগো-মুসে, মানজনি-লেওপার্দি, শিলার-নোভালিস-হোয়েলডারলিন প্রমুখ কবিদের রচনায় ব্যঞ্জনা অনুপস্থিত না থাকলেও তা প্রায়শই ভাক্ত: আবেগের প্রাবল্য অথবা তাত্ত্বিকতার গুরুভার অথবা উভয়ের মিলিত চাপে ধ্বনির বিচ্ছিত্তি-সাধন অনেকটাই যেন অবহেলিত। এ-অভিযোগ হয়ত স্বয়ং গোয়েটের বহু কবিতা সম্বন্ধেও করা চলে। এ'দের প্রত্যেকেরই কবি-প্রতিভা সংশয়োর্ধ্ব। তবু স্বীকার করতে হয় এ'দের অনেক কবিতাতেই ভাষার ব্যঞ্জনাশক্তি সম্যকভাবে স্ফুরিত হয়নি।

রোমান্টিক মানসে বাচ্যার্থের প্রতি অনুরাগ যখন ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠেছে, তখন ব্যঞ্জনার প্রতি নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এক মার্কিন কবি: এডগার অ্যালান পো (১৮০৯—১৮৪৯)। পো গল্পলেখক হিসেবেই সমধিক পরিচিত; কিন্তু পশ্চিমী কাব্যের ইতিহাসে আধুনিক যুগের প্রবর্তনে তাঁর দান কম নয়। তিনি বোঝালেন, কবিতার ফল জ্ঞান নয়, নীতিবোধ নয়, তার ফল একান্তভাবেই আনন্দ। আর এই আনন্দ সৃজিত এবং সঞ্চারিত হয় নিখুঁত শব্দবিন্যাসের মারফৎ ইন্দ্রিয়জাত আবেগকে ভাবধৃত আবেগে রূপান্তরিত করে। দীর্ঘ কবিতা, তিনি লিখলেন,

স্ববিরোধী এবং সে-কারণে অসম্ভব; কারণ আনন্দের স্বাদ বেলাক্রম বজায় রাখা যায় না, আর তাই কবিতা দীর্ঘ হলে তা বাচ্যার্থপ্রধান হয়ে উঠতে বাধ্য। কবির কাজ হল সঙ্গীতধর্মী স্বল্প শব্দে আনন্দময় গূঢ় ব্যঞ্জনার উদ্বোধন। তাঁর সমকালীন ফরাসী কবি-ঔপন্যাসিক তেয়োফিল গোতিয়ে (১৮১১—১৮৭২) শিল্পের স্বতঃসিদ্ধ মূল্যের উপরে জোর দিয়ে রোমান্টিক কাব্যের পরতন্ত্রতার প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু পো কিংবা গোতিয়ে প্রথমশ্রেণীর কবি ছিলেন না; তাঁদের উভয়েরই শিষ্য বোদলেয়ারের (১৮২১—৬৭) অসামান্য কবি-প্রতিভা স্বীকৃতি লাভ করার ফলেই তাঁদের কাব্যাদর্শ পশ্চিমী কাব্যের ইতিহাসে কালান্তর ঘটাতে পারল। বোদলেয়ার কুটিল অভিজ্ঞতার সংক্ষ্যাতিসূক্ষ্ম ইঙ্গিত-গ্রামকে শব্দার্থের নিখুঁত অর্কেস্ট্রায় অভিব্যক্ত করে কবিকর্মের কেন্দ্রে ব্যঞ্জনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটালেন। তর্ক করে নয়, তাঁর নিজেরই রচিত কবিতার অপরোক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করে তিনি দেখালেন যে, লৌকিক স্তরে যে-ভাব হয়ত নিতান্তই তুচ্ছ, সাকার, ব্যঞ্জনার সঙ্গে অন্বিত হয়ে তাই হৃদয়ের চমৎকারিতার কারণ হতে পারে। এবং এ-দাবিও তিনি করলেন যে, ব্যঞ্জনা শুধু বাচ্যার্থ এবং ভাবের উপাদানকে আমূল রূপান্তরিত করে না, ব্যঞ্জনার প্রয়োজনে ব্যাকরণ এবং অভিধানের নিয়মলঙ্ঘনেও কবির পূর্ণ অধিকার আছে।

ব্যঞ্জনা-সামর্থ্যে বোদলেয়ার যে-কোনও যুগের এবং যে-কোনও ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম; তা ছাড়া গত একশ বছরে আধুনিক কবিতার যে বিশেষ মেজাজ এবং রীতি গড়ে উঠেছে, তার উপরে তাঁর গভীর প্রভাব সর্ববাদিসম্মত। স্বভাবতই এ-প্রভাব প্রথমে ফরাসী কবিদের মধ্যে স্পষ্টতা পায়; পরে তা ইংরেজী, জার্মান, রুশ, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, মায় সম্প্রতি-কালে বাংলা কবিতাতেও প্রসার লাভ করেছে। এই মেজাজ এবং রীতির মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র্য থাকলেও সমগ্রভাবে একে বোধ হয় সিম্বলিস্ট বা প্রতীকতন্ত্রী আখ্যা দিলে বিশেষ ভুল হবে না। প্রতীকতন্ত্রের প্রথম এবং হয়ত এতাবৎ সার্থকতম কবি বোদলেয়ার নিজেই; কিন্তু কাব্যাদর্শ-রূপে এর প্রথম এবং প্রধান প্রবক্তা হচ্ছেন স্তেফান মালার্মে (১৮৪২—১৮৯৮)। জীবিকার জন্যে মালার্মেকে প্রায় সারা-জীবন সামান্য ইস্কুল-মাস্টারি করতে হয়েছিল; আর সেই বৃত্তিগত অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে তিনি কোজাগর সাধনায় কিশুদ্ধ রূপের প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। বিদ্যালয়ের স্বল্পবুদ্ধি, অভ্যাসাগ্রয়ী সহ-কর্মীরা স্বভাবতই এই উদাসিক, দুস্পকায়, অন্বিষ্ট, প্রতিভাবান পুরুষটিকে বিশেষ পাত্তা দেননি। কিন্তু রু দ্য রোমে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে সপ্তাহে সপ্তাহে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যে-সব তরুণ এবং প্রবীণ শিল্পী-দের সমাগম হত, তাঁদের কাছে তিনি ছিলেন কবিগুরু। এখানে আসতেন ভার্লেন, রেনী ঘিল, পিয়ের লুই, আঁদ্রে জিদ, পোল ভালেরি, আসতেন ম্যানে, হুইসলার, আর্থার সাইমনস। ঘরের দেয়ালে ম্যানের আঁকা পোর্ট্রেট, গোগ্যার কমলারঙা উডকাট, আর রদ্যাঁ-র ফন্ ও নিমফ্; আর ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে কাঁধে মোটা পশমের শাল, হাতে তামাকের পাইপ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা মালার্মে মৃদু স্বরে এঁদের কাছে ব্যাখ্যা করতেন প্রতীকতন্ত্রী কাব্যাদর্শ। একটি গল্প আছেঃ এটি মালার্মে-শিষ্য ভালেরীর কাছে পাওয়া। উনিশ শতকের একজন সেরা ছবি-আঁকিয়ে দেগা-র সনেট লেখার শখ ছিল। একদিন আর-একজন ছবি-আঁকিয়ের বাড়িতে বসে দেগা দুঃখ করছিলেন, "দেখ, সারাদিন ধরে চেষ্টা করলাম, তবু সনেটটা রূপ নিল না। অথচ আমার মনে ত ভাবের দারিদ্র্য নেই।" "দেগা," মালার্মে বললেন, "ভাব দিয়ে ত সনেট হয় না, সনেট হয় কথা দিয়ে।" কথার শব্দার্থময় দেহে যে-জাদুতে ব্যঞ্জনার দীপ্তি দেখা দেয়, মালার্মে তাকেই বলেছেন কবিত্ব। মালার্মের মতে এই দীপ্তির কেন্দ্রে থাকে কোনও প্রতীক, যে প্রতীকের মধ্যে ভাবনা-অভিজ্ঞতা-আবেগের বিচিত্র বহুবাচনিক উপাদান-সম্ভার অর্থ এবং সঙ্গীতময় একটি সমগ্র রূপে কেলাসিত। কবির কল্পনায় কোন দুর্লভ রহস্যময় মুহূর্তে একটি প্রতীক উদ্ভাসিত হয়; কিন্তু কবিতার কেন্দ্রে তার সার্থক প্রতিষ্ঠা নিরলস অনুশীলন-সাপেক্ষ। প্রতীকের আবির্ভাব ভাষায় ব্যঞ্জনার সঞ্চার করে, কিন্তু সে-ভাষা "গোষ্ঠীর ভাষা" নয়, সে হল কবির স্বোপার্জিত বৈদগ্ধ্যের দ্বারা পরিপুষ্ট এবং পরিমার্জিত ভাষা। এ-বৈদগ্ধ্যের জন্যে চাই একধারে ভাষার সাঙ্গীতিক সামর্থ্য নিয়ে নিরলস পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অন্যধারে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জীবন-ব্যাপী অনুশীলন।

প্রতীকতন্ত্রী মালার্মে ব্যঞ্জনাকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করলেন বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে; প্রতীকতন্ত্রী র‍্যাঁবো (১৮৫৪—১৮৯১) তার উৎস সন্ধান করলেন ব্যক্তির অবচেতনায়। বোদলেয়ার যে দুই আপাত-বিরোধী ধারাকে তাঁর কবিতায় মিলিয়ে-ছিলেন, মালার্মে এবং র‍্যাঁবো তাদের দুই স্বতন্ত্র পথে প্রবাহিত করলেন। র‍্যাঁবো-কল্পিত বিভিন্ন প্রতীকের ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করতে হলে অরফিউস-এর মত প্রাক্-চৈতন্যের অন্ধকার লোকে অবতরণ করতে হয়। র‍্যাঁবোর মতে কবি দ্রষ্টা (Voyant); কিন্তু অস্তিত্বের যে সামান্য অংশ যুক্তি এবং সামাজিক ঔচিত্যবোধের ছকের মধ্যে মানচিত্রিত হয়েছে তাতেই তাঁর চোখ ঠেকে যায়নি, তার পিছনে অস্তিত্বের যে বিরাট জটিল নিয়তপরিবর্তনশীল, মন্দ বিশৃংখলা বর্তমান তার সমগ্র রূপটির তিনি সন্ধানী। এই অবচেতন সমগ্রতার বীক্ষণপ্রয়াস থেকেই তাঁর বিভিন্ন প্রতীকের জন্ম এবং এই প্রয়াসের সূত্রেই তাঁর ছন্দ এবং ভাষা ব্যঞ্জনাগর্ভ। আধুনিক কবি-কল্পনা প্রতীকতন্ত্রের এই দুটি ধারার কখনও একটিকে, কখনও অন্যটিকে অবলম্বন করে প্রবাহিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের ইঙ্গ-মার্কিনী কাব্যে ইমেজিস্ট আন্দোলনের উপরে মালার্মে-কল্পিত কাব্যাদর্শের প্রভাব উল্লেখ করা চলে। অন্যধারে এরই কিছু পরে দক্ষিণ এবং মধ্য ইয়োরোপে যে স্যুররেয়ালিস্ট আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, গীওম আপলিনেয়ার মারফত র‍্যাঁবোর সঙ্গে তার যোগ যেমন গভীর তেমনি প্রত্যক্ষ। তবে এ শতকের যাঁরা শ্রেষ্ঠ কবি তাঁদের অধি-কাংশই তাঁদের কাব্যব্যঞ্জনায় এই দুই ধারাকে মেলাবার চেষ্টা করেছেন। এবং ফলে তাঁদের সঙ্গে যে-পূর্বসূরীর আত্মীয়তা সব চাইতে ঘনিষ্ঠ, তিনি মালার্মেও নন, র‍্যাঁবো-ও নন, তিনি হলেন শার্ল
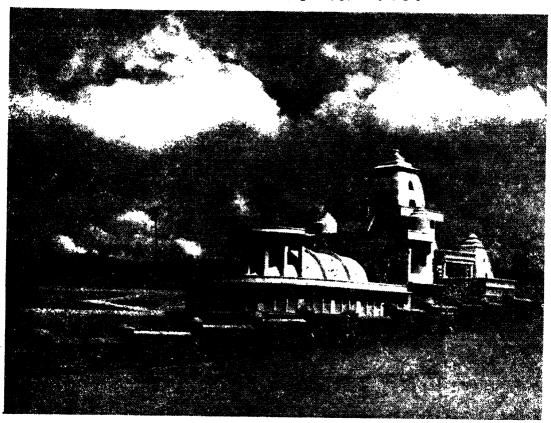
গান্ধী-স্মারক (কন্যাকুমারিকা) আলোকচিত্রী শ্রীঅনিল দত্ত

বোদলেয়ার। পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নবৃত্তির কবিপ্রতিভা সত্ত্বেও, আমার বিশ্বাস, এদিক থেকে রিল্‌কে, ভালেরি, **ইয়েটস এবং এলিয়ট বোদলেয়ার-এরই যথার্থ উত্তরসাধক।**

॥ তিন ॥

যদিচ সম্পূর্ণভাবে ব্যঞ্জনাহীন কবিতা অকল্পনীয়, তবু সাহিত্যের ইতিহাসে এ-ধরনের যুগ মোটেই দুর্লভ নয় যখন এক-আধজনকে বাদ দিলে অধিকাংশ কবিই ভাষার ব্যঞ্জনা-সামর্থ্য বিষয়ে নিরুৎসুক এবং ফলে যখন কবিতা এবং পদ্যের মাঝখানের ব্যবধান যেন আর দুর্লঙ্ঘ্য ঠেকে না। ব্যঞ্জনা-ব্যাপারে অমনোযোগের ফলে কবিতায় বাচ্যার্থ মুখ্য হয়ে উঠবে এটাই প্রত্যাশিত। এবং বাচ্য-প্রধান রচনা সহজবোধ্য বলে তার সাধারণ পাঠক বেশী। কিন্তু আলঙ্কারিকেরা যাকে "রসাস্বাদন-চমৎকারচর্বণা" বলেন সেই বিশেষ জাতীয় অনুব্যবসায় বা অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি না থাকায় যাঁরা রসিক পাঠক, এ-ধরনের রচনার প্রতি তাঁরা স্বভাবতই বীতরাগ। আধুনিক কবিদের অনেক দোষ থাকতে পারে: কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যঞ্জনা বিষয়ে ঔদাসীন্যের অভিযোগ, আমার বিশ্বাস, একেবারেই অসঙ্গত।

আধুনিক কবিরা নানা পদ্ধতিতে শব্দার্থে ব্যঞ্জনা-সঞ্চারের প্রয়াস পেয়েছেন। কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমেই আসে ভাষার সংগীতধর্মের কথা। কুন্তক লিখেছিলেন:

অপর্যালোচিতেঽপ্যর্থে
বন্ধসৌন্দর্যসম্পদা।
গীতবদ্‌হৃদয়াহ্লাদং
তদ্বিদাং বিদধাতি যৎ॥

পো এবং তাঁর অনুসরণে মালার্মেও এই তত্ত্বের উপরে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। "একটি পংক্তি" মালার্মে লিখেছেন, "অল্প কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ধ্বনি-কম্পন, আর দেখ, ব্যঞ্জনার স্বতঃসিদ্ধ পূর্ণতা গড়ে উঠল।" র‍্যাঁবোর মতে প্রতি স্বরবর্ণেরই নাকি একটি নিজস্ব রঙ আছে: "এ" কালো, "ই" সাদা, "আই" লাল, "ইউ" সবুজ, এবং "ও" নীল। এটা নিশ্চয় বাড়াবাড়ি; কিন্তু অধিকাংশ আধুনিক কবিই সচেতন যে কানের দিক থেকে শব্দদের হাল্কা এবং ভারী, মসৃণ এবং রোমশ, স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ, আংশিক স্বচ্ছ ইত্যাদি ভাগ করা চলে এবং ধ্বনির সার্থক নির্বাচন ও পারম্পর্যের ভিতর দিয়ে বাক্যে বিচিত্র ব্যঞ্জনা সঞ্চার করা যায়। ধ্বনিগত ব্যঞ্জনার প্রয়োজনে তাঁরা অনেকসময় ব্যাকরণের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছেন, অভিধান-বহির্ভূত শব্দ উদ্ভাবন করেছেন। এ-শতকের কবিদের মধ্যে শ্রীমতী এডিথ সিটওয়েলের কবিতায় এর বিস্তর উদাহরণ মিলবে। তাঁর 'কালেক্টেড পোয়েমস'এর ভূমিকায় এ-বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ইঙ্গিতময় ব্যবহার। পশ্চিমী সংস্কৃতির দুই প্রধান উৎস এদিক থেকে

আধুনিক কবিদের খুব কাজে লেগেছে। একধারে গ্রেকো-রোমান-পুরাকাহিনী এবং অন্যাধারে খৃীষ্টীয় উপাখ্যান থেকে বিচিত্র চরিত্র এবং ঘটনাকে তাঁরা অনেকেই প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের অপরোক্ষানুভূতির রসায়নে এসব প্রাচীন উপাদান যেমন নবীন অর্থ পরিগ্রহ করেছে, তেমনি এদের সূত্রে দু-তিন হাজার বছরের স্মৃতির অনুরণন অভিজ্ঞতার প্রকাশকে অসামান্য বিচ্ছুরিতশালী করে তুলেছে। আধুনিক কবিতায় এর উদাহরণ অসংখ্যঃ যেমন মালার্মের "ফন্", ভালেরীর নার্সিসাস কি "নিয়তি" দেবীরা, ক্লোদেল-এর অ্যানিমাস এবং অ্যানিমা-র রূপক-কাহিনী, রিলকের অর্ফিউস অথবা দেবদূতগণ, ইয়েটস-এর, লেডা, পাউণ্ডের ওডিসিউস, এলিয়টের টিরেসিয়াস অথবা হোলি গ্রেল, এডিথ সিটওয়েলের ডাইভ্স এবং ল্যাজারাস ইত্যাদি। শুধু ধর্ম এবং পুরাকাহিনী নয়, ইতিহাসের মধ্যেও এঁরা প্রতীক খুঁজেছেন: পাউণ্ডের "সর্গমালা" (Cantos) অথবা জন পের্স-এর "হাওয়ারা" (Vents) কাব্যে তার অনেক উদাহরণ মিলবে।

কিন্তু আধুনিক কবিতায় ঐতিহ্যের সব চাইতে ব্যঞ্জনাময় প্রয়োগ হল কাব্য-দেহে পূর্বসূরী কবিদের স্বীকরণ। ব্যাপারটায় কিছু অভিনবত্ব নেই। কালি-দাসের কাব্যে বাল্মীকির প্রতিধ্বনির সঙ্গে রসিক পাঠকমাত্রেই পরিচিত। কিন্তু, ব্যঞ্জনার উপায় হিসেবে এ-পদ্ধতির এত বিচিত্র এবং ব্যাপক প্রয়োগ প্রাগাধুনিক কবিতায় দেখা যায় না। আধুনিক কবিরা তাঁদের উপমায় শব্দার্থবিন্যাসে, অলঙ্করণে পূর্বসূরী কবিদের রচনাকে প্রয়োজনমত উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে থাকেনঃ ফলে পাঠকের স্মৃতিতে মূর্ছনা জাগে এবং কাব্যদেহ ব্যঞ্জনাগর্ভ হয়ে ওঠে। প্রতিভা-সম্পন্ন কবির হাতে এ-পদ্ধতি যে কতখানি সার্থক হতে পারে এলিয়টের কবিতার সঙ্গে যাঁর কিছুমাত্র পরিচয় আছে তিনি অবশ্যই তার খবর রাখেন। ওভিড্, দান্তে, শেক্সপীয়র, ওয়েবস্টার, ডান, মার্ভেল, গোল্ডস্মিথ, বোদলেয়ার, ভার্লেন প্রমুখ কবিদের প্রতিধ্বনি এলিয়টের কাব্যে বারবার নিগূঢ় ব্যঞ্জনার সঞ্চার করেছে।

ব্যঞ্জনার আর-এক পদ্ধতি হল অবচেতন থেকে প্রতীক আহরণ। সম্ভবত র‍্যাঁবোই প্রথম এর ব্যাপক প্রয়োগ করেন; পরবর্তী-কালে আপলিনেয়ার, ব্রেঁত, মিশো, আংশিক-ভাবে পের্স, এলুয়ার এবং আরাগঁ, লর্কা, অডেন, ডিলান টমাস প্রমুখ অনেকেই মগ্নচেতন থেকে কবিকর্মের উপাদান সংগ্রহ করে ভাষার ধ্বনিসম্পদ বাড়িয়েছেন। পের্স-এর ভাষায় স্বপ্নের ভস্মাবশেষ থেকে কবিকল্পনার উদ্ভব। মানুষের বহু নিরন্ধ কামনা স্বপ্নের জগতে প্রতীকীরূপ ধারণ করে মুক্তি পায়; এসব প্রতীক যখন কবিতায় ব্যবহৃত হয়, তখন ছন্দের সঙ্গে অন্বিত হয়ে তা পাঠকচৈতন্যে এক গূঢ় এবং তীব্র অনুব্যবসায়-বিশেষের উদ্রেক করে। তার আভিধানিক অর্থ তখন গৌণ হয়ে অবচেতনিক ব্যঞ্জনা মুখ্য হয়ে ওঠে। এদিক থেকে ফ্রয়েড-য়ুঙ প্রমুখ মনোবিশ্লেষকদের আবিষ্কার আধুনিক কবি-কল্পনায় গভীর প্রভাব

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

ফেলেছে। অন্য ধারে আধুনিক কবিরা নৃতত্ত্ব থেকেও ব্যঞ্জনার উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। আদিম সমাজে মানুষ যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা থেকে বিমূর্ত কল্পনায় আরোহণে অভ্যস্ত হয়নি, তখন তার অস্তিত্ববোধ মীথ্ আকারে প্রকাশ পেত। এখনও পৃথিবীতে বহু আদিম জাতি বর্তমান, যাদের ভাবনা-কল্পনা মুখ্যত মীথ্-আশ্রয়ী। নৃতাত্ত্বিকেরা এসব মীথ্ সযত্নে সংগ্রহ ক'রে তাদের নানাভাবে তুলনা এবং বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন ও করছেন। তাঁদের গবেষণার ফলে এদের মধ্যে মানবীয় অস্তিত্বের একটি অত্যন্ত সবর্ণীকৃত নিস্তারূপের আভাস ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। আধুনিক কবিরা অনেকেই নৃতাত্ত্বিকদের দ্বারা সংগৃহীত এই সব আদিম কাহিনী থেকে প্রতীক সংগ্রহ করে ভাবের সাধারণীকরণের এবং ব্যঞ্জনা-বৃদ্ধির প্রয়াস পেয়েছেন। ফ্রেজারের "গোল্ডেন বাও"-এর সঙ্গে এলিয়টের "ওয়েস্ট ল্যান্ডের" সম্পর্কের কথা কে না জানে!

কিন্তু খৃষ্টধর্ম, গ্রেকো রোমান পুরা-কাহিনী, মনোবিকলন-শাস্ত্রের অবচেতন বা নৃতাত্ত্বিক-সংগৃহীত আদিম মীথলজি ছাড়া ইন্দ্রিয়গোচর বিশ্বপ্রকৃতিও আধুনিক কবিদের মনে সার্থক প্রতীকের বহু উপাদান জুগিয়েছে। পশু-পাখি, গাছ-পালা, আকাশ-সমুদ্র, আলো-অন্ধকার, সব কিছুর মধ্যেই কবি-কল্পনা অভিনব অর্থের ইঙ্গিত আবিষ্কার করতে পারে। এরা শুধু বাহ্যবস্তু বা ঘটনা নয়ঃ এদের সান্নিধ্য এসে কবির সৃষ্টিশীল চৈতন্যে যেসব বিচিত্র অনুরণন জাগে, এরা তখন তারই প্রতীক। উদাহরণঃ বোদলেয়ারের সিন্ধু-শকুন, মালার্মের রাজহাঁস, পের্স-এর সমুদ্র এবং বাতাস, এডিথ সিট্ওয়েলের সূর্য এবং সোনালী শস্যখেত, এলিয়টের লাইলাক, রিলকের ডুমুরগাছ, লরকার জলপাই-বীথি, গাঁজোর জেলি ফিশ্। এর প্রতিটি প্রতীকই বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে এক-একটি স্বতঃসিদ্ধ এবং নিগূঢ়, প্রাতিস্বিক এবং অসামান্য, অনুব্যবসায় দ্বারা ব্যঞ্জিত।

॥ চার ॥

ব্যঞ্জনা বিষয়ে অবহিত হওয়ার ফলে আধুনিক কাব্যের যেমন সমৃদ্ধি ঘটছে, অন্য ধারে তেমনি এক সংকটের সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ সাধারণ পাঠক আধুনিক কবিতার আবেদনে সাড়া দিতে অপারগ। এর কারণ নানা, কিন্তু তার মধ্যে প্রধান একটি হল এই যে, আধুনিক কাব্যের ব্যঞ্জনা উপভোগ করতে হলে যতখানি বৈদগ্ধ্য এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিশীলতা প্রয়োজন, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তা অর্জন করা প্রায় অসম্ভব। এবং যেহেতু আধুনিক সমাজ এবং শিক্ষার ঝোঁক ব্যবহারিক দক্ষতা এবং সাফল্যের উপরে, মনের বিকাশ এবং ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মতা সাধনের উপরে নয়, সে-কারণে কবি এবং সাধারণ পাঠকের মধ্যে এই ব্যবধান কমার সম্ভাবনাও বিশেষ দেখি না। এতে পাঠকের লোকসান সুস্পষ্ট, কিন্তু কবিদেরও বোধহয় খুব পুলকিত বোধ করার কারণ নেই। কারণ যদিচ একদা এলিয়ট তাঁর ওয়েস্টল্যান্ড কাব্যের পিছনে নিজেই কিছু টীকা-ভাষ্য জুড়েছিলেন, তবু কোনও সৎ কবিই বোধ-হয় ভট্টির অনুকরণে একথা বলে সুখী বোধ করবেন না যে, তাঁদের কাব্য শুধু বিদগ্ধজনের জন্যে, তা ব্যাখ্যার দ্বারা বোধ্য এবং ফলে তা সাধারণ পাঠকের অগম্য।

ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্যমুৎসবঃ সুধিয়ামলং।
হতা দুর্মেধসশ্চাস্মিন্ বিদ্বৎপ্রিয়তয়া ময়া॥

বাচ্যার্থপ্রধান কাব্য কাব্য নয়, পদ্যমাত্র। অপরপক্ষে ব্যঙ্গ্যার্থের অনুশীলন যদি কবিকর্মকে গুহ্যসাধনায় পর্যবসিত করে, তবে সেও ত কাব্যের এক ধরনের অপমৃত্যু। নব্য ফরাসী কবিদের মধ্যে যিনি সম্ভবত সবচাইতে প্রতিভাবান, সেই রেনী শার লিখেছেন, মানুষের এক অংশের প্রতীক গাছ, আর-এক অংশের প্রতীক পাখি। কাব্যে গাছ পায় মাটি, পাখির মেলে আকাশ। আধুনিক কবিতায় পাখিরা ত ডানা মেলেছে; কিন্তু গাছদের শুকিয়ে যাবার আভাসও কি চোখে পড়ছে না?
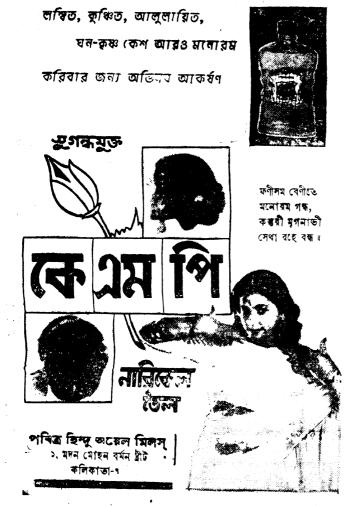
পাবলিক লাইব্রেরি থেকে আনা, 'পাতা মুড়িবেন না' ছাপ মারা এবং পাতায় পাতায় মোড়া জীর্ণ বাংলা উপন্যাসখানা পড়বার চেষ্টা করছিল সিতাংশু। রাত এগারটার কাছাকাছি, অসহ্য গরম। জানলা দিয়ে বাতাস আসছিল না, তা নয়, কিন্তু তাতে আগুনের ছোঁয়া। দিনে দুর্দান্ত গরম থাকলেও সন্ধ্যার পরেই নাকি সাঁওতাল পরগনার সুশীতল বাতাস বইতে থাকে, এমনি একটা জনশ্রুতি তার শোনা ছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, রাত তিনটের আগে সেই বিখ্যাত 'শীতল হাওয়াটি' প্রবাহিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

বইটি প্রেমের উপন্যাস এবং শুরু হয়েছে পাইন বনের ভিতরে একটি আঁকা-বাঁকা পথের উপর; কুয়াশা কেটে গিয়ে পাইনের উর্ধ্বমুখী কণ্টকপত্রে সোনালী রোদ পড়েছে—দুধারে বরাশ ফুল ফুটেছে রাশি রাশি, আর ওভরকোটের পকেটে হাত দিয়ে একটি মেয়ে আশ্চর্য গভীর চোখ মেলে দূরের নীল পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক সেই সময়—

ঠিক সেই সময়েই বিরক্ত হয়ে সিতাংশু পর পর কয়েকটা পাতা উল্টে গেল। এই দুর্ধর্ষ গরম, ইলেকট্রিকবিহীন এই বাড়ি, নিঃসঙ্গ এই জীবন—এর ভিতরে শীতল পাহাড়ের কবোষ্ণ রোমান্স তার কল্প-কামনা অনেকটা মেটাতে পারত; কিন্তু সিতাংশুর প্রতিক্রিয়া অন্যরকম হল। কেন এমন বাজে বই লেখা হয়, কেই-বা সেটা ছাপে এবং যদিই-বা সেটা ছাপা হয়, তা হলে পাতাগুলো দিয়ে মুড়ির ঠোঙা তৈরি না করে পাঠককে যন্ত্রণা দেবার জন্য লাইব্রেরিতে রাখা হয় কেন, এই ধরনের গোটাকয়েক আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা তার মনের ভিতর ঘুরপাক খেয়ে গেল।

কিন্তু লাইব্রেরির বইয়ের আরও একটা আকর্ষণ আছে। সে হল অনাহূত টীকাকারদের মন্তব্য। বাঁধাইয়ের দুধারের সাদা পাতায়, বইয়ের মার্জিনে রসিক পাঠক-দের নানা রকম স্বতোৎসারিত উচ্ছ্বাস। যেমনঃ 'বাঃ, বেশ বেশ—একেই বলে খাঁটি প্রেম', 'একসেলেণ্ট' কিংবা 'মণিকার এইরূপ চিন্তা করা অন্যায়। হিন্দু নারী হইয়া সে পরপুরুষের' ইত্যাদি ইত্যাদি। তাছাড়া কাঁচা হাতের কিছু কিছু অশ্লীল মন্তব্যও থাকে। আর বই যদি পাঠকের ভাল না লাগে, তা হলে লেখকের উদ্দেশে যে-সব মন্তব্য বর্ষণ করা হয়, ভদ্রলোক সেগুলো জানতে পারেন না বলেই আত্ম-হত্যা করেন না।

অতএব সিতাংশুও কালিদাস ছেড়ে মল্লিনাথ পড়া শুরু করল। একটি নয়—অন্তত পেন্সিলে আর কালির লেখা গুটি-সাতেক মল্লিনাথের সন্ধান পাওয়া গেল। কাছাকাছি কোনও হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্ট থাকলে সঠিক সংখ্যাটা বলতে পারতেন।

কিন্তু তাই বা ভাল লাগে কতক্ষণ। গরম—কদর্য গরম। হাওয়াটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জানলার বাইরে কালো ব্রোকেডের পর্দার মত টানা অন্ধকার—তার ভিতর দিয়ে দু-তিনটে ইউক্যালিপটাসের বাকলহীন শুভ্রতা অতিকায় কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে। মিউনিসিপ্যালিটির একটা কেরোসিনের আলো জানলার প্রায় মুখো-মুখি ছিল, সেটা সন্ধে না লাগতেই নিবে গিয়েছে। ঘরের দেওয়ালে লণ্ঠনের আলোয় নিজের যে ছায়াটা পড়েছে—সেটাকে পর্যন্ত সিতাংশুর অসহ্য বোধ হতে লাগল। ওটা যেন তার মনের ছায়া—বিকৃত, অর্থ-হীন, অশোভন, অশালীন; বাইরের অন্ধকারে গিয়ে ওটা দাঁড়ালেই ভাল হত—তার প্রত্যেকটা অঙ্গভঙ্গিকে এমনভাবে ক্যারি-কেচার করবার প্রয়োজন ছিল না।

এবার পূজায়

নতুন রেকর্ডে গেয়েছেন

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস"

কুমার শচীন দেববর্মণ (আধুনিক) P 11933
শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র (রবীন্দ্র-সংগীত) N 82795
মান্না দে (আধুনিক) N 82796
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (আধুনিক) N 82797
তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (আধুনিক) N 82798
কুমারী বাণী ঘোষাল (আধুনিক) N 82799
শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (অতুলপ্রসাদী) N 82800
কুমারী আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায় (আধুনিক) N 82801
সনৎ সিংহ (আধুনিক) N 82802
সতীনাথ মুখোপাধ্যায় (আধুনিক) N 82803
শ্যামল মিত্র (আধুনিক) N 82804
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী তপতী ঘোষ (ফিল্ম) (কৌতুক নক্সা) N 82805
তালাত মামুদ (আধুনিক) N 82806

কলাম্বিয়া

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য (আধুনিক ও রাগপ্রধান) GE 24905
গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (আধুনিক) GE 24906
পান্নালাল ভট্টাচার্য (শ্যামা-সংগীত) GE 24907
কুমারী গায়ত্রী বসু (আধুনিক) GE 24908
গীতশ্রী কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় (ধর্মমূলক) GE 24909
কুমারী ইলা চক্রবর্তী (আধুনিক) GE 24910
হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (আধুনিক) GE 24911
শ্রীমতী লতা মঙ্গেশকর (আধুনিক) GE 24912
শ্রীমতী আশা ভোঁসলে (আধুনিক) GE 24913
শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (আধুনিক) GE 24914
শ্রীমতী গীতা দত্ত (আধুনিক) GE 24915
দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় (আধুনিক) GE 24916

সম্পূর্ণ তালিকা ডীলারের কাছে দেখুন।

The Hallmark of Quality

ঘাম ঝরছে না—সারা শরীর যেন জ্বালা করছে। একবার স্নান করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু—

ঠিক নাটকীয়ভাবে সেই সময় শব্দটা শুনেল সিতাংশু। পরিষ্কার শুনতে পেল। ইঁদারার গায়ে দড়ি ঘষার খস্ খস্ আওয়াজ, বাঁশের একটা মৃদু গোঙানি আর ছলাৎ ছলাৎ করে জলের কলধ্বনি।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল সিতাংশু। লণ্ঠনটা কমিয়ে দিয়ে পা টিপে টিপে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর কপাটটা ইঞ্চি তিনেক ফাঁক করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দিলে সামনের দিকে।

বাড়ি যতই ছোট হক—তারের বেড়া ঘেরা কম্পাউণ্ডটা অনেকখানি। সিতাংশুর ঘর থেকে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে তার ইঁদারা। এই অন্ধকারে একটা ঝাঁকড়া পিপুল গাছ আরও অন্ধকার ছড়িয়েছে তার উপর। তবু স্পষ্ট দেখল সিতাংশু। কে একজন ইঁদারা থেকে জল তুলছে—বালতি উপরে টানার সঙ্গে সঙ্গে তার নুয়ে-পড়া শরীরটা সোজা হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে।

হিংস্র ক্রোধে দাঁতে দাঁত চাপল সিতাংশু। এই ব্যাপার! এই জন্যেই অতখানি টলটলে জল দু দিনের ভিতরেই বালিতে এসে উঠছে! সন্দেহ একটু ছিলই—এইবার বোঝা গেল সব। জল চুরি হচ্ছে!

একটা বিশ্রী উপন্যাস। কুৎসিত গবন। নিঃসঙ্গ নির্বাসিতের মত জীবন। ইলেক্‌ট্রিকের আলোহীন ঘরে নিজের ছায়ার ভ্যাংচানি। তার উপর চুরি? সিতাংশুর মাথায় আগুন জ্বলল।

দরজা বন্ধ করে সে ঘরে ফিরে এল। কী করা যায়? তাড়া করলে তারের বেড়া ডিঙিয়ে পালাবে।—ধরা যাবে না। অসম্ভব আশায় চারদিকে একবার সে তাকিয়ে দেখল —কোনও মিরাকলে একটা বন্দুক যদি এই মুহূর্তে হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাহলে আর ভাবনার কিছু থাকে না। কিন্তু বন্দুকের বদলে পাওয়া গেল একটা মশারির স্ট্যান্ড।

আর দেরি করা যায় না। জলের বালতি নিয়ে একবার তারের বেড়া টপকে চলে গেলে আইনত সিতাংশুর আর কিছুই বলবার নেই। সুতরাং যা করতে হয়—এক্ষুনি।

মশারির স্ট্যান্ডটা শক্ত করে ধরে পিছন দিয়ে ঘুরে সিতাংশু ইঁদারার দিকে এগোতে চেষ্টা করল। চোর তখনও নিবিষ্টচিত্তে জল তুলছে। জলের ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ সিতাংশুর জ্বালাধরা রোমকূপগুলোকে পুড়িয়ে দিতে লাগল। তারপর যখন আর এগনো চলে না—যখন প্রায় দশ-বার গজের মধ্যে এসে পড়েছে, যখন আর এক পা বাড়ালেই চোর তাকে দেখতে পাবে, তখন হাতের ডাণ্ডাটা সে ছুঁড়ে মারল সবেগে।

নির্ভুল লক্ষ্যভেদ! একটা মৃদু আর্তনাদ করে চোর মাটিতে ঘুরে পড়ল।

কিন্তু সিতাংশুর হাত-পা জমে গিয়েছে তৎক্ষণাৎ। গরম, বিরক্তি আর ক্রোধে অতখানি অন্ধ না হলে আরও আগেই সে বুঝতে পারত। একটি মেয়ে।

কী সর্বনাশ! রোম্যান্টিক উপন্যাসের পাতা থেকে একেবারে নারীহত্যায়!

কে বলে, পশ্চিমের গরমে ঘাম হয় না? মুহূর্তে ঘেমে উঠল সিতাংশু, ভিজে গেল গেঞ্জি, জিভটা চলে যেতে চাইল গলার ভিতর, মাথাটা একেবারে ফাঁপা হয়ে গেল। এইবার?

মেয়েটা নড়ে উঠল। উঠে বসতে চেষ্টা করছে। যাক—একেবারে খুন হয়নি তা হলে—বেঁচে আছে এখনও! সন্তর্পণে কাছে এগোল সিতাংশু।

একটুকরো চাঁদ উঁকি দিয়েছে আকাশে। পিপুল গাছের পাতার ভিতর দিয়ে ম্লান খানিকটা আলো এসে পড়েছে মেয়েটির মুখে। চিনতে পেরেছে সিতাংশু। পিছনের বাড়িতে পোস্ট অফিসের যে নতুন ভদ্রলোকটি এসেছেন—তাঁরই কেউ হবে। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়নি—কিন্তু মেয়েটি কয়েকদিনই চোখে পড়েছে।

সিতাংশু সামনে আসতে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। চাঁদের আলোতেও দেখা গেল, তার কপাল বেয়ে রক্ত পড়ছে। আর সেই সঙ্গে শোনা গেল, ফোঁপানো কান্নার স্বরঃ এক বালতি জল নিতে এসেছিলাম আপনার ইঁদারা থেকে, সেজন্যে এমন করে আমায় মারলেন।

আগেই মরমে মরে গিয়েছিল সিতাংশু, এবার মিশে গেল মাটিতে।

"আমায় ক্ষমা করবেন। মানে, আমি ভেবেছিলুম,"

"কী ভেবেছিলেন?" কান্নার ভিতর থেকে এবার ঝাঁঝ বেরিয়ে এল, "কোনও পুরুষমানুষ? যেই হক্ না—এক ফোঁটা জলের জন্যে তাকে আপনি খুন করতে চাইবেন? আপনি না ভদ্রলোক?"

গলার স্বরে বোঝা যাচ্ছে, ব্যাপারটা খুব গুরুতর হয়নি। ভরসা পেয়ে রাগ হল সিতাংশুর। এক ফোঁটা জলই বটে! এদিককার সমস্ত ইঁদারাই প্রায় শুকিয়ে মরুভূমি—সিকি মাইল রাস্তা পেরিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির একটা টিউবওয়েল ভরসা। তার ইঁদারায় যে দু-চার বালতি জল আছে, তা-ও এ-ভাবে লুট হতে থাকলে মাথায় খুন চাপা অন্যায় নয়।

কিন্তু সে-কথা বলল না সিতাংশু।

"এসে চাইলেই পারতেন।"

"চাইলেই যেন দিতেন আপনি।"

স্পষ্ট পরিষ্কার কথা। না—দিত না সিতাংশু। এই দুঃসময়ে অতখানি উদারতা তার নেই। কোনও মহিলা সম্পর্কেও না। বিব্রত হয়ে সিতাংশু বললে, "থাক ও-সব কথা। আপনার কপালটা কেটে গিয়েছে মনে হচ্ছে। দাঁড়ান—আয়োডীন এনে দিচ্ছি।"

"খুব হয়েছে, আর উপকার করতে হবে না। কপাল ফাটিয়ে দিয়ে জলের দাম তো আদায় করলেন। কী করব এখন? জলটা নিয়ে যাব; না আবার ঢেলে দেব ইঁদারায়?"

সিতাংশু অপ্রস্তুত হল। আশ্চর্যও হল বই সঙ্গে। একটুও আত্মসম্মান নেই মেয়েটার—এত কাণ্ডের পরেও ভুলতে পারেনি জলের কথাটা!

"ছি, ছি, কী যে বলেন। চলুন, আমিই পৌঁছে দিয়ে আসছি জলটা—"

কোথা থেকে এসে পড়ল টর্চের আলো। মুখ তাকাল দুজনেই।

পোস্ট অফিসের সেই ভদ্রলোক। পিছনের বাড়ির নতুন ভাড়াটে।

"কী হয়েছে বলু?" টর্চের আলোয় মেয়ের কপালের রক্ত একরাশ সিঁদুরের মত ঝকঝক করে উঠল: "কী করেছিস আবার?"

সিতাংশু পাথর হয়ে গেল। আর বলুই জবাব দিলে।

"অন্ধকারে ইঁদারার ওপর পড়ে গিয়েছিলুম কাকা। ইনি ছুটে এসে—"

তারের বেড়া টপকে ভিতরে এলেন ভদ্রলোক।

"তোকে হাজারবার বারণ করলুম, এত রাতে জলের দরকার নেই, তবু হতভাগা মেয়ের কানে গেল না। তোর জন্য শেষে একটা কেলেঙ্কারিতে পড়ব এ আমি ঠিক জানি। নে চল—" বালতিটা তুলে নিয়ে ভদ্রলোক সিতাংশুর দিকে তাকালেন, "কিছু মনে করবেন না মশাই, এই মেয়েটার জ্বালায় আমার একদণ্ড স্বস্তি নেই। কপালে যে আমার কত দুঃখ আছে সে কেবল আমিই জানি। আপনার ঘুম নষ্ট হল, অপরাধ নেবেন না।"

সিতাংশু কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুযোগ পেল না। বিহ্বলতার ঘোর কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই কাকা ভাইঝি তারের বেড়া পার হয়ে চলে গিয়েছেন। ফিকে চাঁদের আলোয় দুটো অবাস্তব ছায়ামূর্তি।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে নিচু হয়ে মশারির স্ট্যাণ্ডটা তুলে নিলে সিতাংশু। এটা কি চোখে পড়েনি ভদ্রলোকের? না, পড়া অসম্ভব। অসহ্য গরম নিঃসঙ্গ ঘরটার দিকে যেতে যেতে সিতাংশু নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে চাইল, কে ভাল অভিনয় করেছে? বলু, না তার কাকা?

সারাটা রাত আর ভাল করে ঘুম এল না, কাটল অস্বস্তিভরা তন্দ্রার ভিতর। চোখ কচলাতে কচলাতে সিতাংশু যখন বারান্দায় এসে দাঁড়াল, তখন তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল রোদে চারদিক ভরে উঠেছে। রাস্তার ওপারে ইউক্যালিপটাসের সারি পেরিয়ে কাঁকর-মেশান ঢেউখেলান মাঠ—তার ভিতরে একটা খাপছাড়া সাদা বাড়ি রোদে জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে। দূরের রুক্ষ পাহাড়টা পড়ে আছে অপরিচ্ছন্ন বন্য মহিষের মত—তার পত্রহীন গাছপালা আর বড় বড় ন্যাড়া পাথর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকেও।

সব শ্রীহীন—সবকিছু আগুনে দিয়ে ঝলসান। মেঘনাপারের সিতাংশু বিরস বিতৃষ্ণ মুখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মনে পড়ল, একদিনের ছুটি নিয়ে তার ছোকরা চাকর ধনিয়া নিজের 'গাঁওমে' গিয়েছিল—আজ চতুর্থ দিনেও সে ফেরেনি। পেয়ে যাওয়া খুবসম্ভব বাজে কথা—বেশী মাইনেতে আর কোথাও কাজে লেগেছে। ওর দোষ নেই। ভদ্রলোকই যদি জল চুরি করতে পারে—

মেঘনাপারের সিতাংশু সেনগুপ্ত দীর্ঘ-শ্বাস ফেলল। শাহারা মরুভূমি নয়—বাংলা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে একশো মাইলের মধ্যেই যে জল চুরি করবার দরকার হয়, মেঘনার কালো অথই জলের দিকে তাকিয়ে সে কথা কে ভাবতে পারত!

কিন্তু ও-সব তত্ত্বচিন্তা এখন থাক। আপাতত সিতাংশুকে নিজের হাতে চা করতে হবে, রান্নার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। তবু তো আজ বাজারে যাওয়ার সমস্যা নেই – কাল অফিস থেকে ফিরবার সময় বুদ্ধি করে আলু আর ডিম নিয়ে এসেছিল। নাঃ, আর দেরি করা চলে না।

মুখ ধুতে ইঁদারার পাড়ে আসতেই চোখে পড়ল। তিন চার ফোঁটা রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে আছে। আত্মগ্লানিতে সিতাংশু সে-দিকে আর তাকাতে পারল না। মেয়েটিকে একবার একা পাওয়া দরকার, ভাল করে ক্ষমা চাইতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে একসময় যাবে নাকি ও-বাড়িতে? কিন্তু আলাপ পরিচয়টাই যখন হয়ে ওঠেনি এ পর্যন্ত, তখন—

অন্যমনস্কভাবে ইঁদারায় বালতি নামিয়ে-ছিল, অন্যমনস্ক হয়েই টেনে তুলল। তবে তৎক্ষণাৎ সমস্ত অনুতাপ মুছে গেল—পা থেকে জ্বলে উঠল মাথা পর্যন্ত। অর্ধেক জল, অর্ধেক বালি।

আরও অর্ধেক শুকিয়ে গিয়েছে ইঁদারা, কাল ওভাবে চুরি না হলে আজকের দিনটা কুলিয়ে যেত। চাকরটা থাকলেও যা কথা ছিল, এখন তাকেই গিয়ে সিকি মাইল দূরের টিউবওয়েল থেকে জল আনতে হবে। আর যা ভিড় সেখানে!

দুত্তোর!

কুঁজোর জলে চা খাওয়া কোনরকমে চলতে পারে। স্নানের আশা নেই। অফিস যাওয়ার পথে খাওয়ার জন্যে ঢুকতে হবে হোটেলে। সিতাংশুর মনে হতে লাগল, মশারির স্ট্যাণ্ড দিয়ে ঘা কয়েক ওই ভদ্র-লোককেই বসিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। সবই জানতেন—অথচ কেমন ন্যাকামি করে গেলেন। আর মেয়েটা—সেই বলু! অবশ্য রক্তপাত না হলেই খুশী হত সিতাংশু; কিন্তু ভাণ্ডার ঘা তার যে একেবারেই পাওনা ছিল না, এই মুহূর্তে সে তা ভাবতে পারল না।

অফিস থেকে বেরিয়ে, রাস্তায় চা খেয়ে বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আবার সেই ঘর, সেই গরম, লণ্ঠনের আলোয় নিজের কদাকার ছায়া আর সেই বাংলা উপন্যাসটা। লণ্ঠনটা জ্বালাতে জ্বালাতে সিতাংশুর মনে হল, তারপর আরও অনেক রাতে ইঁদারার থেকে আবার কেউ হয়ত

পূজোয় প্রিয়জনদের হাতে উপহার দেবার মত
বুক রিভ্যুর কয়েকখানি বই:—
উপন্যাস:—বীরেন্দ্র দত্ত
উপনদী শাখানদী—৪৲
আনন্দ বাগচী—কাশীরাম দাস কহে—২॥০
(যন্ত্রস্থ)
শ্রীমনতোষ—আফটার কেয়ার কলোনী ৩৲
কাব্যগ্রন্থ—মোহিত চট্টোপাধ্যায়
আষাঢ়ে শ্রাবণে
যে কোন সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাবেন।
কমিশন সহ আমরা সত্বর সরবরাহ করি।
আজই পত্র লিখুন, অন্যান্য পুস্তকের জন্য
বুক রিভ্যু, ১১।১, হেমচন্দ্র স্ট্রীট,
কলিকাতা-২৩

(সি ১৬৮৭)

(সি ১৯৬৯)

জল চুরি করতে আসবে, যদিও আজ বালতি ভরে বালিই উঠবে কেবল। কিন্তু কে আসবে? বুলু? না—বুলু আর আসবে না।

যদি বুলুই আসে? একটা অসম্ভব কল্পনায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সিতাংশু। তা হলে আজ কী করবে সিতাংশু? দূর থেকে দেখা, পিপুল-পাতার জ্যোৎস্নায় আধখানা দেখা আর একটি ছোট টর্চের আলোয় এক ঝলক দেখা বুলুর মুখের সামনে আজ লণ্ঠনটা তুলে ধরবে সে। দেখবে, কাল রাত্রে কতখানি ক্ষত সে মেয়েটির কপালে এ'কে দিতে পেরেছে—কতটা লিখে দিতে পেরেছে নিজের স্বাক্ষর।

"আসতে পারি?"

বুলু নয়—তার কাকা। সেই অনেক রাতের প্রত্যাশিত সময়টির অনেক আগেই এসে পড়েছেন তিনি।

সিতাংশু চমকে মাথা তুলে বললে, "আসুন।"

বুলুকে লণ্ঠনের আলোয় দেখতে চেয়েছিল সিতাংশু, দেখল তার কাকাকে। বছর পঁয়তাল্লিশেক বয়েস হবে। শক্ত ভারী গোছের বেঁটে মানুষ। কপাল থেকে মাথার আধখানা পর্যন্ত মসৃণ টাক। সিতাংশুর জারুল কাঠের চেয়ারটায় সশব্দে আসন নিলেন।

"আলাপ করতে এলুম। আমার নাম বিরাজমোহন মল্লিক। আপনি?"

"সিতাংশু সেনগুপ্ত।"

"দেশ?"

সিতাংশুকে বলতে হল।
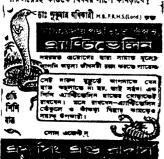
"তাই বলুন—আমাদের ইস্ট বেঙ্গলের লোক। চেহারা দেখে আমারও তাই মনে হয়েছিল।"

পূর্ববঙ্গীয়ত্ব এমনভাবে তার শরীরে লেখা আছে, এ-খবরটা এতদিন সিতাংশুর জানা ছিল না। মৃদু রেখায় হাসল সে।

"তা একা আছেন এখানে? ফ্যামিলি কোথায়?"

"মা-বাবা কলকাতায় থাকেন।"

"ওয়াইফ?"

বাঙালীর স্ত্রীকে বাংলাভাষায় ওয়াইফ বললে ভারী কুশ্রী শোনায় সিতাংশুর কানে। তবু এবারেও সে অল্প একটু হাসল। বললে, "তাঁকে এখনও জোটাতে পারিনি।"

"বলেন কী, ব্যাচেলার!" বিরাজবাবু বিস্মিত হলেন, "তিরিশ ত পেরিয়ে গেছেন বোধ হয়।"

"হাাঁ বছর দুই হল।"

"তবু এখনও বিয়ে করেননি! বুড়ো বয়েসে যে ছেলের রোজগার খেয়ে যেতে পারবেন না!"

সেই দুশ্চিন্তায় সিতাংশুর রাত্রে ঘুম হচ্ছিল না। তবু এবারে ভদ্রতার হাসি হাসতে হল।

"বাবা-মা-ই বা কী বলে চুপ করে আছে।" বিরাজবাবু স্বগতোক্তি করলেন, বিমর্ষভাবে চুপ করে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড। তারপর এলেন অন্য প্রসঙ্গে :

"কিন্তু এই জলের কষ্ট ত আর সহ্য হয় না মশাই। মরুভূমিতে এলুম নাকি?"

"সেইরকমই ত মনে হচ্ছে।"

"মিউনিসিপ্যালিটিতে কড়া করে একখানা দরখাস্ত দিলে কেমন হয়?"

"আসছে বছর গ্রীষ্মকালে সে-দরখাস্ত নিয়ে ও'রা আলোচনা করবেন।"

"যা বলেছেন!" সক্ষোভে বিরাজবাবু মাথা নাড়লেন, "স্বাধীনতার পরেও এরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল। এ-দেশের উন্নতি হতে মশাই আরও পাঁচ শ বছর।"

তারপর আধঘণ্টার মত নির্বাক শ্রোতার ভূমিকায় নিঃশব্দে বসে রইল সিতাংশু। এ-সব ক্ষেত্রে সাধারণত যা যা বলবার থাকে, বিরাজবাবু কিছুই তার বাদ দিলেন না। গোটা তিনেক সিগারেট খেলেন এবং সামনে অ্যাশ্-ট্রে থাকতেও ছাই ঝাড়লেন মেঝের উপর। আর সিতাংশু কালকের মত নিজের ছায়া দেখতে লাগল লণ্ঠনের আলোয়, কান পেতে শুনতে লাগল বাইরে মাঠের ভিতর দিয়ে হু হু করে বয়ে যাচ্ছে হাওয়া, আর ইউক্যালিপটাসের পাতাগুলো ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে তাতে।

শেষ পর্যন্ত বিরাজবাবু উঠলেন।

"একটা লোকই তা হলে রাখা যাক, কী বলেন? দু বেলা টিউবওয়েল থেকে আমাদের দু বাসায় জল দেবে। টাকাটা দেওয়া যাবে ভাগাভাগি করে।"

"সে ত বেশ কথা।"

"দেখি তবে চেষ্টা করে—" দরজার দিকে পা বাড়িয়েছেন বিরাজবাবু, সেই মুহূর্তেই প্রায় মুখ ফস্কে প্রশ্নটা বেরিয়ে এল সিতাংশুর।

"আপনার ভাইঝি কাল পড়ে গিয়েছিলেন —কেমন আছেন আজ?"

অদ্ভুত দৃষ্টিতে বিরাজবাবু সিতাংশুর দিকে তাকালেন। লণ্ঠনের আলোয় মেক-আপ করা অভিনেতার মত দেখাল তাঁকে।

"কে বুলু? বুলু ঠিক আছে। সাংঘাতিক মেয়ে মশাই—অল্পে ওর কিছু হয় না। মাটিতে পু'তে দিলে কাঁটাগাছ হয়ে বেরুবে।" বিরাজবাবু বেরিয়ে গেলেন।

আজও রাত বারোটা পর্যন্ত একা ঘরে ছটফট করল সিতাংশু, সেই বাংলা উপন্যাসখানার পাতা ওলটাল, রসিক পাঠকদের টীকা-টিপ্পনীগুলো পড়বার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আজ আর অক্ষম বিরক্তিতে নয়—সেই অসম্ভব দুরাশায় সে কান পেতে বসে রইল। কয়েকবার উঠে গেল দরজার কাছে, চোখ মেলে দিলে জ্যোৎস্নার জাফরি-কাটা পিপুল গাছটার তলায়। বুলু আজ আর আসবে না সে জানে, তবু এই রাত, এই গরম—আর উত্তেজিত স্নায়ুর একটা বিচিত্র কুহকে সিতাংশু রাত আড়াইটে পর্যন্ত প্রতীক্ষায় জেগে রইল। তারপর বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে এল, ক্লান্ত অবসাদ ঝিমিয়ে এল শরীর, আর ঘুমের ঘোরে সিতাংশু স্বপ্ন দেখল, মেঘনার কালো জলের উপর দিয়ে গিরিমাটির বন্যা ছুটে চলেছে!

বুলু এল না।

সে রাতে নয়, তার পরের রাতে নয়, তারপরের রাতেও নয়। সিতাংশু কেমন একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণায় পীড়িত হতে লাগল। আশ্চর্যভাবে লুকিয়ে গিয়েছে মেয়েটা। যখন তাকে দেখবার কোনও কৌতূহল ছিল না, তখন কতবার পিছনের বাড়ির বারান্দায়—খোলা জমিটুকুতে কতভাবে তাকে সে দেখেছে। সেদিন সে বুলুকে মনে রাখতে চেষ্টা করেনি—দরকারও ছিল না। সেই আধ-খানা দেখা, ঝিলিমিলি জ্যোৎস্নায় এক-টুকরো দেখা আর বিরাজবাবুর টর্চের আলোয় রক্তের সি'দুরমাখানো একটুখানি শুভ্র ললাট, এর বেশী আর কিছু মনে আনতে পারে না সিতাংশু। সে শুধু একবার দিনের আলোয় দেখতে চায় বুলুকে —দেখতে চায় তার কপালে—

দেখা হয় বিরাজবাবুর সঙ্গে। বাজারে, অফিসের পথে।

"জল পাচ্ছেন ঠিকমত?"

"পাচ্ছি।"

"জষ্টি মাস পার হয়ে গেল মশাই,

অল্পাস্থায়ী—কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব মোটামুটী একটা নির্দিষ্ট ঋতুতে হ'য়ে থাকে; মানুষ তখন প্রতিষেধক প্রভৃতির ব্যবহার দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে পারে।

কিন্তু আপনি বলতে পারেন না, কখন আপনার প্রতিবাসীকে, অথবা—ঈশ্বর না করুন—আপনার পরিবারেরই কাউকে বিষধর সাপে কামড়াবে!

(সি ১৯৬০)

এখনও বৃষ্টি নেই এক ফোঁটা। কী করা যায় বলুন তো।"

কী আর করা যেতে পারে। আকাশের উদ্দেশে বৃষ্টির জন্যে একখানা দরখাস্ত লেখা যেতে পারে—এমনি একটা জবাব আসে ঠোঁটের কোনায়। কিন্তু বিরাজবাবুকে সত্যিই ও-কথা বলা যায় না।

আর জিজ্ঞাসা করা যায় না বুলুর কথা। খবরের কাগজ চাইবার কিংবা বাড়িতে ডিক্সনারি আছে কিনা জানবার যে-কোনও একটা উপলক্ষ নিয়ে বিরাজবাবুর বাসায় একবার যে যাওয়া যায় না তা-ও নয়। কিন্তু কিছুতেই পেরে ওঠে না সিতাংশু। নিজের এই ছেলেমানুষি কৌতূহলের উগ্রতা তাকে যত বেশী পীড়ন করে, ততখানিই লজ্জা দেয়।

কেন যে বুলুর ক্ষতচিহ্নিত কপালটাকে একবার দেখবার জন্যে এই পাগলামি তাকে পেয়ে বসেছে, সিতাংশু নিজের কাছেই তার কোনও কৈফিয়ত খুঁজে পায় না। বুলুর কাছে ক্ষমা চাইবে একবার? বলবে, আমাকে যত বড় পাষণ্ড ভেবেছেন আমি তা নই? কোনও মেয়ের গায়ে হাত তোলা দূরে থাক, ছেলেবেলার সীমা পার হয়ে নিজের ছোট-ভাইকে পর্যন্ত কোনদিন একটা চড়-চাপড়ও মারিনি? আর বুলুর কপালের দিকে তাকিয়ে নিজের অপরাধের সে পরিমাপ করতে চায়, জেনে নিতে চায়, কোনও বড় ক্ষতি সে করেনি, ছোট্ট একটুখানি দাগ, দু-দিন পরেই মিলিয়ে যাবে?

ঠিক কী বলতে চায় সিতাংশু জানে না। কেবল অর্থহীন মনোযন্ত্রণার পীড়ন। ভূতের মত ভাবনাটা তার উপর চেপে বসেছে, নিজেকে কিছুতেই ছাড়াতে পারে না তার হাত থেকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুলুও এল।

আজও ঠিক তেমনি উত্তপ্ত সন্ধ্যা। লণ্ঠনের আলোয় নিজের বিকৃত ছায়া দেখতে দেখতে ক্ষেপে গিয়ে সিতাংশু বাতিটা নিবিয়ে দিয়েছিল। তারপর ইজিচেয়ার পেতে চুপ করে বসে ছিল জানলার কাছে—বাইরে কংকালের মত দাঁড়িয়ে ছিল বল্কলবিহীন ইউক্যালিপ্‌টাসের সারি—যেন কোন নিবন্ত চিতা থেকে উঠে আসা বাতাস ঝরঝরিয়ে তাদের পাতা ঝরাচ্ছিল।

"আসব?"

দরজার ফ্রেমে একটি মেয়ের ছায়াশরীর। সিতাংশুর সমস্ত সত্তা একটা নিঃশব্দ চিৎকারে ভরে উঠল। বুলু! বুলু ছাড়া আর কেউ নয়—কেউ হতেই পারে না। তবু জিজ্ঞাসা করলে, "কে?"

"আমি বুলু।" একটা চাপা হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল, "আপনার জল চুরি করতে এসেছিলুম।"
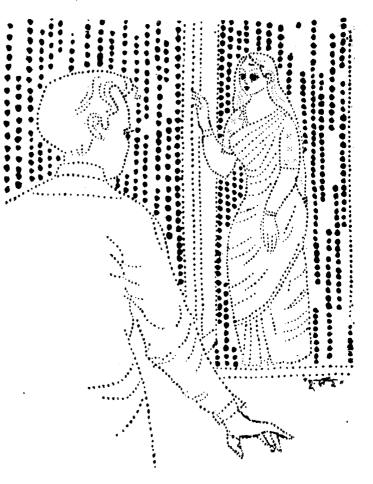
দরজার ফ্রেমে একটি মেয়ের ছায়াশরীর

"আর লজ্জা দেবেন না।" উদগ্র আহ্বানে সিতাংশুর শিরাগুলো টান-টান হয়ে উঠল, "বসুন, আলোটা জ্বালি।"

"আলো জ্বালবার দরকার নেই—খামোখা রাস্তার লোকের চোখে পড়বে। শুধু একটা কথা বলতে এলুম। এখুনি চলে যাব।"

চেষ্টা করেও সিতাংশু গলার কাঁপন থামাতে পারল না। বললে, "কিন্তু আপনাকে আমারও বলবার কিছু আছে।, সেদিন যে অন্যায় আমি করে ফেলেছি—"

"অন্যায় আপনি করেননি। আমার যা পাওনা, তাইই পেয়েছি। আমি সত্যি সত্যিই চোর।"

"ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন।" আবছা অন্ধকারেও হাত জোর করল সিতাংশু। "আপনি জানেন না, আমি যে সেই থেকে কী লজ্জায়—"

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ছায়ারূপিণী বুলু। যেন অনেক দূর থেকে, অথচ স্পষ্ট সুরেলা গলায় বললে, "আগে আমার কয়েকটা কথা শুনুন—তারপরে লজ্জা পাবেন। আমি আজ আপনার কাছে কেন এসেছি জানেন? আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়ে যে দুঃখ আপনি পেয়েছেন, সেই দুঃখ থেকে আপনাকে মুক্তি দেব বলে। তাছাড়া কাল আমি চলে যাব এখান থেকে—যাওয়ার আগে আপনাকে সামনে রেখে নিজের কথা-গুলো বলে যাব। ইচ্ছে হলে শুনতে পারেন, না-ও শুনতে পারেন।" আস্তে আস্তে এগিয়ে টেবিলের পাশটিতে বসে পড়ল বুলু।

আর কেমন থমকে গেল সিতাংশু, মুহূর্তে বুলু যেন তাকে অনেকখানি দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। বিহ্বলভাবে বললে, "আপনি যে কী বলছেন, আমি—"

"এখুনি বুঝতে পারবেন। আপনার ইঁদারা থেকে দু বালতি জল নিতে

এসেছিলুম, সেটা বড় কথা নয়। শুনুন, আমি চোর হয়েই জন্মেছি। হাতের সামনে কোনও জিনিস দেখলে আমি, আর লোভ সামলাতে পারি না। সে টাকা হক, পেন্সিল হক, একটা ফুলই হক। ছেলেবেলা থেকে পাড়ার কোনও মেয়ে আমার সঙ্গে খেলত না—কোনও বাড়িতে ঢুকলেই আমাকে তারা তাড়িয়ে দিত। মেয়েদের বই খাতা চুরির জন্যে ইস্কুল থেকে বার বার আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছে—শেষে অসহ্য হয়ে বিদায় করেছে। আমার দু বছর বয়সে মা মারা যান—দেবীর মত পবিত্র ছিলেন তিনি। বাবা ছিলেন স্কুলের হেডমাস্টার—সারা জীবন সততারই সাধনা করেছেন। অথচ আমি—"

বুলু থামল, কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে গলা। সান্ত্বনা দেওয়া উচিত ছিল সিতাংশুর, ভাষা খুঁজে পেল না।

বুলু বলে চলল, "দশ বছর বয়সে বাবা আমায় ছেড়ে গেলেন, এলুম কাকার কাছে। কাকা আমার স্বভাব বদলাবার অনেক চেষ্টা করেছেন, চাবুক দিয়ে মেরেছেন, সারা পিঠে আমার দাগ পড়ে গিয়েছে, অথচ কিছুতেই আমি পারি না। না খেতে দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রেখেছেন, বেরিয়েই আমি ফিরিওলার ঝুড়ি থেকে কমলালেবু চুরি করেছি।"

সিতাংশু একটা অস্ফুট আর্তনাদ করল। বুলু উঠে দাঁড়াল—সরে গিয়ে সিলুয়েত্ ছবির মত ঠাঁই নিলে দরজার ফ্রেমে।

"ভয় পাচ্ছেন, না?" কান্নামেশানো হাসির আওয়াজ এল বুলুর, "সত্যি, ভয় আপনি পেতে পারেন। আমি এক্ষুণি আপনার টেবিল থেকে ঘড়ি কিংবা কলম যাহক একটা তুলে নিতে পারি। হাত আমার এমনি রপ্ত হয়ে গেছে যে, আপনি টেরও পাবেন না।"
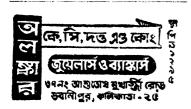
নার্ভাসভাবে গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিলে সিতাংশু। ছেলেমানুষের মত বললে, "কিন্তু আমি তবুও—কিছুতেই—"

"বিশ্বাস করতে পারেন না—না? অনেকেই পারে না। ভাল করে আমাকে যদি দেখেন আপনি, স্বীকার করবেন, আমি সুন্দরী। রূপটা আমার গুড্ কণ্ডাক্টের সার্টিফিকেট। কিন্তু আমাকে যারা চিনেছে, তারা কখনও ভুল করবে না।"

সিতাংশু আবার গলাটা পরিষ্কার করে নিলে। কিন্তু এবার আর কথা বেরুল না মুখ দিয়ে।

বুলু বলে চলল, "আমি জানি—এ আমার রোগ। কাকাকে কতবার বলেছি, আমার চিকিৎসা করাও—আমি সেরে যাব, এ আমি আর সইতে পারছি না। কাকা বলেন, মারই হচ্ছে এ রোগের ওষুধ। তোর বিয়ে দিতে পারব বলে আশা নেই, তবে কোনোদিন যদি দিতেই পারি, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বেশ করে ঠ্যাঙানি খেলেই রোগ পালাবার পথ পাবে না।"

আচ্ছন্নভাবে বসে রইল সিতাংশু। বাইরে মাঠের ভিতর থেকে হাওয়ার গোঙানি ভেসে এল।

"বাইশ বছর বয়স হল আমার, এ লজ্জা আমি আর সইতে পারব না। তাই ঠিক করেছি, কাল ভোরের ট্রেনে কলকাতায় চলে যাব। কাকা যেতে দেবেন না, টিকিটও কাটতে দেবেন না—পালিয়েই যেতে হবে আমাকে। গিয়ে আমি ডাক্তার দেখাব, ভাল হতে বাঁচতে চেষ্টা করব। শুধু যাওয়ার আগে আপনাকে বলতে এসেছি, অন্যায় আপনি করেননি, চোরকে তার পাওনা শাস্তিই দিয়েছিলেন।"

পরক্ষণেই দরজার ফ্রেম থেকে মিলিয়ে গেল বুলু। একটা লঘু পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

স্বপ্ন—মায়া—মতিভ্রম? চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করল সিতাংশু—পারল না, কিছুতেই পারল না। কে যেন হিপনটাইজ করে তাকে নিশ্চল প্রস্তরে পরিণত করে দিয়েছে।

একটা দমকা হাওয়ায় ইউক্যালিপটাসের কয়েকটা বড় পাতা এসে সিতাংশুর গায়ে মাথায় ছড়িয়ে পড়ল।

সিতাংশুর ঘোর ভাঙল পরদিন।

আজ আর উজ্জ্বল সকাল নয়। এতদিনের অগ্নি-দহনের পর পৃথিবীর প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে—আকাশ মেঘে অন্ধকার—সাধু বহত পারবেশান! ঝিম ঝিম বৃষ্টি নেমেছে বাইরে। নামুক—আকাশ উজাড় করে নেমে আসুক। খরা মাটিতে নতুন অঙ্কুর মাথা তুলুক—শুকনো ইঁদারাগুলো জলে ভরে উঠুক, আর বুলু—

আর বুলু। স্বপ্ন—মায়া—মতিভ্রম। একটা অবিশ্বাস্য কাহিনী। বিচিত্র বিকৃতির নাগপাশে পাকে পাকে জড়ানো—তিলে তিলে মরে যাচ্ছে সে। আজ সকালের ট্রেনেই তার কলকাতা পালিয়ে যাওয়ার কথা। বাঁচুক—বেঁচে উঠুক বুলু। প্রার্থনার মত উচ্চারণ করল সিতাংশুঃ এই বন্ধন থেকে সে মুক্তি পাক—এই অভিশাপের গণ্ডী পার হয়ে সূর্যস্নাত জীবনের মধ্যে তার উত্তরণ ঘটুক।

"ভয় পাচ্ছেন? জানেন, এক্ষুনি আপনার টেবিল থেকে ঘড়ি, কলম—যা কিছু—"

কথাটা কানের মধ্যে বেজে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের দিকে তাকাল সিতাংশু। ঘড়ি, কলম, চশমা, সব ঠিক আছে। কিন্তু ব্যাগ? মনিব্যাগটা?

কালকে পাওয়া মাইনের দুশ পঁচিশ টাকা আছে ব্যাগে। পুরো দুশ পঁচিশ টাকা। একটা পয়সাও খরচ হয়নি।

পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিল সিতাংশু। নেই। টেবিলের টানায়। সেখানেও নেই। না—বালিশের নীচেও না।

মুহূর্তে চোখে অন্ধকার। একটু আগেকার প্রার্থনা বীভৎস অভিসম্পাত হয়ে ফিরে এল গলায়। হিপনটিজমই বটে। [illegible] জানলাতে [illegible] বিচিত্র সন্ধ্যার [illegible] সুযোগে সিতাংশুর নির্বোধ আচ্ছন্নতাকে আরও ঘনীভূত করে নিয়ে ব্যাগটা তুলে নিয়ে সে সরে পড়েছে।

সিতাংশু ছুটল বিরাজবাবুর বাসায়।

"[illegible] আপনার ব্যাগ নিয়েছে?" চিৎকার করে বিরাজবাবু ফেটে পড়লেন, "আমার কী সর্বনাশ করেছে জানেন? গিন্নীর চার ভরি হার—ছ গাছা চুড়ি—সব নিয়ে সেই রাতে সরে পড়েছে।"

[illegible] সেফটিপিনটুও বাদ গেল।

"কী [illegible] বিরাজবাবু?"

"থানায় চলুন—আর কী করবার আছে?" মোটা ভারী চেহারার বিরাজবাবুকে নরখাদকের মত দেখাতে লাগল, "ক্রিমিনাল মশাই—বর্ন ক্রিমিনাল! ওই লজ্জাতেই দাদা অসময়ে মারা গেছেন। কিন্তু শাসন করেছি মশাই, তাকে চামড়া তুলে দিয়েছি, দেওয়ালে ঠুকে ঠুকে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছি, তবু স্বভাব ও গেল না। মেয়েছেলে, তায় আমাদের বংশের—কী করে যে এমন হল, ভাবতেই পারা যায় না। চলুন থানায়—ও-মেয়ের জেলখানাই দরকার।"

ঘরের ভিতর বিরাজবাবুর স্ত্রীর ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্না। "দুধ দিয়ে আমি কাল সাপ পুষেছিলুম—আমার সর্বনাশ করে গেল—"

বিরাজবাবু আরও খেপে গেলেন। হাত ধরে টানতে লাগলেন সিতাংশুর।

"চলুন, চলুন, আর দেরি করবেন না।"

এখনও বোধ হয় জশিডি পেরোতে পারেনি।"

বলু ফিরল সন্ধ্যের পর। পুলিশ তাকে ফিরিয়ে এনেছে আসানসোল থেকে।

কিন্তু ততক্ষণে সিতাংশুর মনের আগুনটা নিবে গিয়েছে। সারা দিনের অশ্রান্ত বৃষ্টিতে পৃথিবীর মাটি স্নিগ্ধ হয়েছে, সুগন্ধ শীতল ভিজে বাতাস শরীর জুড়িয়ে দিয়েছে। আর চুপচাপ বসে বসে সিতাংশু ভাবছিল, কী দরকার ছিল দুশ পাঁচশ টাকার জন্যে অতখানি পাগলামি করবার? বাড়ি থেকে টাকা আনিয়ে [illegible] এ-যাত্রা তার চলে যেত, কিছু ধারও হয়ত হত, সেটা শোধ দেওয়া যেত আস্তে আস্তে। কেন সে করতে গেল এ-সব? হয়ত বলু নিজেই যাবে সাইকোলজিস্টের কাছে, এই টাকাটা দিয়ে নিজের চিকিৎসা করাবে, সুস্থ, স্বাভাবিক, সুন্দর হয়ে উঠবে। বলুকে যে পাপ সে করেছিল—এই টাকাটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত হত খানিকটা। কেন এতটা হীন হয়ে গেল সিতাংশু, কালকের সেই উদ্বিগ্ন বলুকে সে ভুলে গেল কী করে?

এমন সময় প্রায় সাড়ে সাতটায় এলেন বিরাজবাবু।

"চলুন, চলুন। [illegible] পেয়েছেন।"

লাফিয়ে উঠে বলল সিতাংশু, "কোথায়?"

"থানায়।"

[illegible] একটা। [illegible]

"[illegible], আমি পারব না।"

"[illegible] না কি? তাহলে যান। খবর পাঠিয়েছে থানা থেকে।"

"আমার শরীর খারাপ।"

নিষ্ঠুর হাসি হাসলেন বিরাজবাবু।

"আপনার তৈরি মন, তবে সেন্টিমেন্ট ভারি দুর্বল। কিন্তু আমার অনেক গয়না চুরি গেছে। উঠুন—চলুন শিগগির—"

একটা মৃতদেহের মত সিতাংশুকে টেনে তুললেন রিকশায়। তারপর থানাতে।

থানাশুদ্ধ লোকের কৌতূহল-ভরা চোখের সামনে একটা টুলে বসে আছে বলু। রুক্ষ চুল, ভাষাহীন চোখ। সামনের দেওয়ালের দিকে স্থিরদৃষ্টি। আজ সারাদিন সে স্নান করেনি, খেতে পায়নি।

চোরের মত একবার বলুর দিকে তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ পিছনে সরে গেল সিতাংশু, লুকিয়ে পড়তে চাইল। এইবার বলুকে সে সম্পূর্ণ দেখেছে—দেখেছে কপালে এক ইঞ্চি লম্বা কাটা দাগটা এখনও শুকোয়নি। সিতাংশুর স্বাক্ষর।

কিন্তু সম্পূর্ণ কি দেখেছে সিতাংশু? না দেখবার সাহস নেই তার। সাহস নেই বলুর আরক্ত ভাষাহীন চোখের দিকে সে তাকায়।

দারোগা বললেন, "এই দেখুন গয়না। হার, চুড়ি—"

বিরাজবাবু প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন টেবিলের ওপর। বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ—এ সবই আমার স্ত্রীর—"

বলু কথা বললে এইবার। সেই শান্ত, [illegible] গলা। যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে।

"না, কাকীমার গয়না আমি নিইনি। ওসব আমার মায়ের জিনিস। কাকীমার কাছে ছিল।"

"মায়ের জিনিস!" পৈশাচিকভাবে বিরাজবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "তোমরাও হারামজাদা! চোর!"

বলু আবার শান্ত গলায় বললে, "আমি জানি ও সবই আমার মায়ের। কাকীমার কোনও জিনিসই আমি ছুঁইনি।"

বিরাজবাবু বলুর উদ্দেশে প্রকাণ্ড একটা চড় তুলেছিলেন, দারোগা তাঁকে ধমক দিলেন, "থামুন, আপনার স্ত্রী এসে গয়না সনাক্ত করবেন, আপনি গণ্ডগোল করবেন না।" তারপর সিতাংশুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "শ খানেক ক্যাশ টাকা পেয়েছি, কিন্তু আপনার ব্যাগ পাওয়া যায়নি।"

বিরাজবাবু বললেন, "ব্যাগটাও বোধ হয়—ওকি অমন কাঁচা চোর নাকি? আপনি ওকে চেনেন না স্যার—ও যে—"

"আঃ!" দারোগা আবার ধমক দিলেন একটা।

বলুর উদাস বিষণ্ণ স্বর শোনা গেল, "আমি ও'র ব্যাগ নিইনি। আমার নিজের চুড়ি বিক্রি করে—"

বিরাজবাবু আবার ভেংচে উঠলেন, "ওরে আমার সত্যবাদী যুধিষ্ঠির রে! নিজের চুড়ি বেচে উনি—"

আর নয়। এর পরে আর কোনমতেই দাঁড়ান চলে না। চোরের মত নিঃশব্দে পালিয়ে এল সিতাংশু। শুধু পথে আসতে আসতে বার বার মনে হলঃ আজ সারাদিন বলুর খাওয়া হয়নি।

ব্যাগটা কিন্তু পাওয়া গেল। অফিসের ড্রয়ারেই রেখে এসেছিল।

এ-সন্দেহও সিতাংশুর মনে জাগতে পারত। কিন্তু সন্ধ্যায় এসে যদি এমনভাবে নিজের কথা না বলত বলু, যদি বিরাজবাবুর বাড়ি থেকে গয়নাগুলো সে না নিত, যদি সত্যিই সে কলকাতায় পালাতে না চাইত তা হলে—

ব্যাগটাকে তৎক্ষণাৎ পকেটে লুকিয়ে ফেলল সিতাংশু। এখন থানায় যাওয়া যায়? বলা যায়, বলু তার টাকা নেয়নি? ভুল করে সে মিথ্যে এজাহার দিয়েছিল?

কিন্তু আর কি সম্ভব? তাতে নিজের উপরেই বিপদ টেনে আনা হবে। কেন তুমি এমন কাজ করলে? কেন একজন নির্দোষের মিথ্যে নালিশ করে—

নাঃ, সে মনের জোর নেই সিতাংশুর। তাছাড়া এই হয়ত ভাল হল। জেলেই থাক বলু। পাক দুঃখ, পাক লজ্জা। হয়ত এ থেকেই বলু ভাল হয়ে উঠবে; যে সহজ স্বাভাবিক সুন্দর জীবনের মধ্যে সে যেতে চেয়েছিল, হয়ত তারই প্রস্তুতি হবে এখান থেকে।

বাইরে বৃষ্টি। দগ্ধ মাঠে নতুন অঙ্কুর। ইঁদারায় নতুন জল। বলুর চোখেও কি বর্ষা নেমেছে এখন।

আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকাল। একটা রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্নের মত। আর তখনই দেখতে পেল সিতাংশু। বলুর জীবনের দিগ্-দিগন্ত জুড়ে অমনি একটা ক্ষতের স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছে সে।
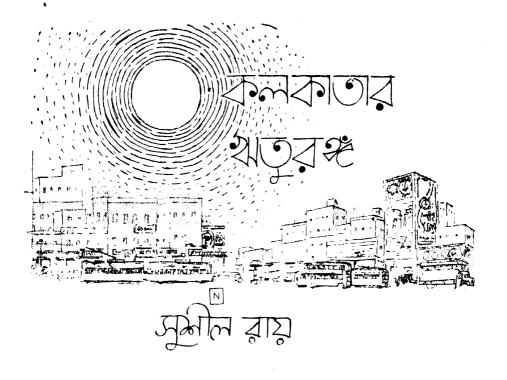
খের খুব কাছে টেনে নিয়ে এলে দেখা যায় না পুঁথির অক্ষর। ভাল করে দেখার জন্যে কতটা দূরে রাখতে হবে তার মাপ আছে। এক-এক জনের কাছে এই মাপ এক-এক রকমের। এটা নির্ভর করে চোখের তেজের উপর।

খুব কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে নেই তেলছবি। এটা নিয়ম। কাছে দাঁড়ালে ব্রাশের আঁচড়-গুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ছবি হয়ে যায় আবছা।

আসলে সব জিনিসই একটু তফাতে দাঁড়িয়ে দেখা ভাল। এতে দেখাটা ভাল হয়। দূরে থেকেই ত বন ঘন বলে বোধ হয়, বনের গভীরে ঢুকলে চোখের সামনে ছড়িয়ে পড়ে গাছেরা, ঘন বন আর ঘন থাকে না।

যে-কোন মানুষকেও একটু তফাত থেকে দেখতে পারলে ভাল। তা হলে তার জ্ঞান বুদ্ধি বা বিবেচনা ঘন বলে মনে হবে। কাছে এলেই সব তরল বলে ঠেকে। এতে বিচারে ভুল হবার সম্ভাবনা।

এই শহরে আছি, এই শহর-কলকাতায়। এর গভীরে ঢুকতে হয় প্রত্যহ, কিন্তু একে দেখি তফাতে বসে। ডেরা নিয়েছি শহরতলীতে—শহরের উপকণ্ঠে।

ইঁটকাঠকংক্রিটের নিবিড় অরণ্যের ঘিঞ্জি এলাকায় যারা বাস করে এই শহরের, তাদের অনেকেই শহরের উপর খড়্গহস্ত, তারা অভিসম্পাত দেয় এই লোকালয়কে—এর নিপাতই বুঝি কামনা করে তারা। তাদের এই অকারণ রুদ্রমূর্তি দেখে আমার মায়া হয় তাদের উপর। হায়, এরা শহরবাসী, তাই এরা চিনতে পারেনি এই শহরকে; যে তাদের আশ্রয় দিয়েছে নিজের আত্মার নিবিড়ে, তাকে আত্মীয় বলে স্বীকার করেনি এরা। ভগবান এদের কল্যাণ করুন।

আশ্রয়দাতাকে ধিক্কার দেওয়ার রীতি, ঠিক জানিনে, হয়ত চালু হয়েছে এর থেকেই। উপকার যে করেছে তার অপকার করতে না পারলে শান্তি না পাবার রীতিও বুঝি এসেছে এখান থেকেই।

তা আসুক। কিন্তু বড় মজার শহর এই কলকাতা। যারা একবার কিছুকাল বাস করেছে এখানে, তারা যত ধিক্কারেই ধিক্কৃত করুক একে, তবু একে ছেড়ে থাকতে আর পারবে না। লৌহহৃদয় ঐ মানুষদের নিবিড় আকর্ষণে টানতে থাকে এই শহর—এমনি অসাধারণ চুম্বকশক্তিতে এ শক্তিমন্ত।

জানিনে, এর নামই বুঝি ব্যক্তিত্ব।

ব্যক্তিত্বশালীরা কখনও টলে না। বিপদে বা সম্পদে তার মূর্তি এক।

দারুণ দুর্দিনের মত যখন এর সর্বাঙ্গের উপর ছড়িয়ে পড়ে প্রবল শীতের প্রচণ্ড বিক্রম, তখনও মিনারে-গম্বুজে-প্রাসাদে সমুন্নতশির এই শহর অটল আর অনড় মূর্তিতে দাঁড়িয়ে থাকে অবিচলিত ভঙ্গিতে। দুঃখের পরেই সুখ আছে, রাত্রির পরেই যেমন সুপ্রভাত। শীতের পরেই তেমনি আসে বসন্তের সম্পদ। ঋতুর এই পরিবর্তন ঘটে বটে এখানে, কিন্তু শহরের রীতি এতে বদলায় না বিন্দুবিসর্গ।

হাওড়ার পুল থেকে আরম্ভ করে মনুমেন্টের পাদদেশ পর্যন্ত এই যে দীর্ঘ এলাকা, টালা থেকে ট্যাংরা হয়ে টালিগঞ্জ পর্যন্ত এই যে অজগরের মত সর্পিল কালো পিচের রাস্তা—এর বদল হবে কোথায়? কংক্রিটের গায়ে কি ফুল ফোটে? ফোটে না। তাই পাপড়িও ঝরে যায় না। প্রাসাদের চূড়ায় ফল ধরে না, গম্বুজের গলা জড়িয়েও পাক খেয়ে ওঠে না কোনও মাধবী কিংবা লবঙ্গ-লতিকা, পিচের বুকেও ফুটে ওঠে না কোনও পঙ্কজ।

ফুটে উঠবার কিংবা ফলে উঠবার অবসর নেই যেখানে, সেখানে খসে পড়ার বা ঝরে পড়ার বেদনার স্থান কোথায়?

বনে উপবনে পাহাড়ে প্রান্তরে আনন্দ বেদনা হর্ষ উল্লাস ক্লান্তি শান্তি নিক্ষেপ
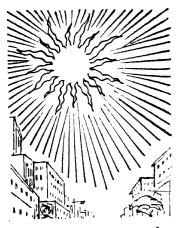
সবচেয়ে চটকদার যে ঋতু

করতে করতে ঋতুরা যখন একে একে পা দেয় এই শহরের এলাকায়, তখন বিহ্বলিত বিস্ময়ে তারা লক্ষ্য করে তাদের হাতের জাদুযষ্টির ছোঁয়ায় পুলকিত পুষ্পিত রোমাঞ্চিত কিংবা শিহরিত হয়ে উঠছে না এই শহর।

গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত তবু আসে রীতিমত। এ যেন অনেকটা পুরাণের সেই ঋষিদের ধ্যানভঙ্গ করার জন্যে কিন্নরীদের ব্যাকুলতার মত। কিন্তু সেই সুরসুন্দরীদের নৃপুরনিক্কণে ঋষির ধ্যানই শুধু ভাঙেনি, ঋষির ঋষিত্বও গিয়েছে। কিন্তু এই মহানগরীর নগরীত্ব যাওয়া দূরের কথা, ঋতুবালিকাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও ধ্যানভঙ্গ হয় না এর।

যে কংক্রিট দিয়ে এই শহর তৈরী, এর ধ্যানও বুঝি সেই কংক্রিটের মতই কঠিন।

রিপুর সংখ্যা যত ঋতুর সংখ্যাও তত—ছয়। আদিরিপুর হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করা কঠিন; আদিঋতুর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া আরও কঠিন। আমাদের এই শহর যত অটল আর অবিচল থাক্, আদিঋতু সমেত তিনটি ঋতুর কাছে অবশ্য পরাভব স্বীকার করতে হয় একে। শহরের নিজের ধ্যান অবশ্য তাতে ভাঙে না, কিন্তু শহরবাসীর ধ্যানধারণা চুরমার হয়ে যায় এতে। গ্রীষ্ম বর্ষা আর শীত—এরা হচ্ছে সেই তিনটি ভাগ্যবতী ঋতু।

অন্য তিনটি বার বার অভিসারে এসেছে এর দুয়ারে, কত সাজে সজ্জিত করেছে নিজেদের অঙ্গ, কত মোহনীয় মূর্তি ধারণ করেছে বর্ষের পর বর্ষ; কিন্তু তাদের সমস্ত প্রয়াস নিষ্ফল হয়ে গিয়েছে একেবারে।

নববধূর ন্যায় সলজ্জ পদপাতে এর দুয়ারে এসেছে শরৎ। কাশকুসুমের ন্যায় শুভ্র বসনে কৃশ অঙ্গ আবৃত করে, শঙ্খের ন্যায় ধবল মেঘের ওড়না দিয়ে বিকশিত-পদ্মসদৃশ নিজের মুখ আচ্ছাদিত করে এর দুয়ারে এসে আবির্ভূত হয়েছে এই সুন্দরী। কিন্তু ঐ সৌন্দর্য যত লোভনীয় হক, এ শহরে শোভা পায় না ওকে। তাই ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে তাকে। এখানে সাড়া পায়নি সে।

ঠিক অমনি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে হেমন্তকেও। এ যেন এসেছে অনেকটা নিরাভরণ বেশে। অঙ্গে কোনও রত্নালংকার নেই, পরিধানে শুধু মাত্র একটি বস্ত্র, অন্তর্বাসে আবৃত করেনি শরীর। এ যেন এসেছে, অন্য কোনও অভিপ্রায়ে নয়, অনঙ্গের বার্তা বহন করে। দুই চোখে আকুতি, দুই বাহুতে আলিঙ্গনের লালসা, সর্বাঙ্গে লাবণ্যের বন্যা। এত ষত্ন ও এত কামনা সত্ত্বেও এ শহরের সিংহ-দরজা থেকেই ফিরে যেতে হয়েছে একে।

অবিকল ঐভাবেই ফিরে গিয়েছে বসন্তও। মধুমূর্তি ধারণ করে মধুরিপু পূরণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সমাগত হয়েছিল সে এখানে। অলকে ফুলহার, কণ্ঠে ফুলমালা ধারণ করে ক্লান্ত চরণে সে এল। কিন্তু ব্যর্থ তার এই আগমন।

মোট কথা, এ শহর ষড় ঋতুর শহর নয়,

এলোখোঁপায় মালা জড়িয়ে—

এ শহর তিন ঋতুর। শরৎবালা হেমন্তবালা বসন্তবালা নামগুলোও মানায় না এখানে। ওসব নাম বড় গ্রাম্য, বড় সেকেলে। কেবল সৌন্দর্য আর লাবণ্য দিয়েই মোহিত করা যায় না এখানে, এখানে বাড়তি গুণ চাই, চটক চাই।

বার্নিশ-করা ফার্নিচারের পাশে এনামেল-করা মুখ না হলে মানাবে কী করে!

এ কী দশা?

অনেকটা এই ধরনের চাহিদা এই শহরের। এইজন্যেই শরৎ হেমন্ত আর বসন্ত এখানে কোনও আদর পেল না।

সবচেয়ে চটকদার যে-ঋতু, সবচেয়ে তেজী আর সবচেয়ে দাপটদার, তার খাতিরও এখানে তার দাপটেরই অনুপাতে সবচেয়ে বেশী। তার নাম গ্রীষ্ম। বছরের আধখানা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে এ একা। এর হাত থেকে শহরকে উদ্ধার করবার জন্যে অদূরে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকে বর্ষা ও শীত। তারা দাঁড়িয়েই থাকে, মাসের পর মাস কেটে যায়, কিন্তু তাদের হাতে শহরকে সমর্পণ করে বিদায় নিতে চায় না এই গ্রীষ্ম। হয়ত বর্ষার কবলিত হয় এ-শহর, কিন্তু অচিরেই আবার তার হাত থেকে কেড়ে নেবার মত করে এ এগিয়ে আসে।

শহরতলিতে বসে আমরা বলি, "বর্ষা এল। উঃ, তবু কী গরম!"

বেশ আছি এখানে—এই শহরে, এই শহরতলিতে। গরমে ভাজা-ভাজা হয়ে যাচ্ছি যখন, তখন আকাশের দিকে চেয়ে ভাবছি—মেঘ কত দূরে, কত দূরে মৌশুমি?

কলকাতার রূপের কোনও বদল নেই। লোহাই বল, কাঁসাই বল, পিতলই বল, আর পাথরই বল—আগুনের মত গরম করলেও তার চেহারার কোনও বদল হয় না। কিন্তু মানুষের কথা আলাদা। যখন এক-এক ডিগ্রী করে উঠতে থাকে তাপ, তখন পরিতাপ আরম্ভ করি আমরা। কিন্তু পরিতাপের কারণ কী, বুঝতে পারিনে। বাতাসে জলের ভাগ তখন কম, তাই গরমটা তখন শুকনো। গরম বাতাসের হলকা এসে গায়ে লাগে। সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে

যেন পড়ে গেল। এইভাবে পড়তে পড়তে আমরা সকলে হয়ে উঠি বিদগ্ধপুরুষ।

এত সহজে বিদগ্ধপুরুষ হওয়া আর কোথায় সম্ভব! বৈদগ্ধ্য লাভ করার জন্যে কত অধ্যয়ন কত মনন কত ক্লেশ কত শ্রম করতে হয় মানুষকে। কিন্তু এখানে কত সহজে লাভ করা যায় সেই মর্যাদা। এর জন্যে নিজের এতটুকু চেষ্টার পর্যন্ত দরকার হয় না। এর জন্যে এই শহরের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত আমাদের।

এর পর, আবহাওয়াবিদ্‌দের ভাষায়, বাতাসে যখন আর্দ্রতা এল তখন সোনায় সোহাগা। গরম থেকেই গেল, তার সঙ্গে এল ঘাম। অসহ্য গুমটে ঘর্মাক্ত কলেবরে বসে বসে যতই অতিষ্ঠ হয়ে উঠি-না কেন, যতই অন্দর থেকে আক্ষেপ ভেসে আসুক-না কেন "সিদ্ধ হয়ে গেলাম, সিদ্ধ হয়ে গেলাম", বৈঠকখানা ঘরে বসে আমরা সহজেই নিজেদের সিদ্ধপুরুষ বলে ঘোষণা করতে পারি।

এত সহজে সিদ্ধিলাভ আর কোনও তপস্যায় হতে পারে বলে ত জানিনে। যে শহর আমাদের এমন সিদ্ধিদাতা, আমরা নিশ্চয়ই হস্তিমূর্খ, তাকে গণপতির মর্যাদা দিতে তা না হলে আমরা ভুলে যাই কেন!

গ্রীষ্মের কবল থেকে কীভাবে উদ্ধার করা যায় শহরকে, এই বিষয়ে পরামর্শ-সভা আরম্ভ হয় আকাশে, এ-কোণ ও-কোণ থেকে এসে একত্র হয় মেঘের জটলা। মনুমেণ্টের পাদদেশের মীটিংএর মত অনেক তর্জন-গর্জনের পর ভঙ্গ হয় সেই সভা। কোনও পথ পাওয়া যায় না।

অবশেষে নিতে হয় ভিন্নপথ—মনোহরণের পথ। মেঘের ডম্বরু বাজিয়ে বিদ্যুতের আলোকসম্পাত করে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয় নর্তকী। দু পায়ে বুঝি বেজে ওঠে নূপুর।

হঠাৎ চমকে উঠি, বামাকণ্ঠের ধমক শুনি, "কবিত্ব রাখ। আ, কী আরাম! বৃষ্টি নামল।"

যখন বৃষ্টি নামল, তখন কলম সরিয়ে রেখে একটু কান পেতে শোনা যাক ঐ নব-ধারাপাত। কার যেন নামের নামতা মৃদু-কণ্ঠে আবৃত্তি করতে ইচ্ছে করে এখন। কিন্তু পরিস্থিতি এখন আলাদা, এখন অন্য কোনও নাম উচ্চারণ করা কঠিন। তাই মনে মনে আবৃত্তি করি সেই নামতাই।

পুরো এক ঝাঁক বৃষ্টি হওয়া মাত্র ডুবে গেল শহরের পথঘাট। যানবাহন অচল। জামাকাপড় শুকবার জায়গা নেই। রবারের জুতো পায়ে দিয়ে নিঃশব্দপদপাতে ভিজতে ভিজতে এসে পৌঁছলাম ডেরায়।

"এ কী দশা!"

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, "জান না, পুরুষের দশ দশা, কখনও হাতি কখনও মশা! সেদিন ছিলাম সিদ্ধপুরুষ, আজ সিক্তমার্জার।"

চরম রোমাঞ্চকর খেলা আরম্ভ হয় শহরের ময়দানে। কখনও এ হারে-হারে, কখনও ও যায়-যায়। গ্রীষ্মে আর বর্ষায় এই হুটো-পাটি। জল একটু ধরে আর অমনি ঝাঁঝাঁ করে ওঠে রোদ। জলে আর রোদে যেখানে এই প্রতিযোগিতা, সেখানে শরতের আর হেমন্তের দাঁড়াবার জায়গা কোথায়?

ঠিক গ্রীষ্মের পরে, না, বর্ষার পরে, ঠিক ধরা যায় না—হঠাৎ একদিন এসে হাজির হয় শীত। কনকনে হাওয়া আসে উত্তর থেকে।

ন্যাপথলিনের গন্ধমাখা আলোয়ান সোয়েটার বা কোট নেমে আসে দেরাজ থেকে। পিঠ দিয়ে অর্কের কিংবা পেট দিয়ে হুতা-শনের সেবা করার অবকাশও নেই অবসরও নেই। তাই দিনের বেলা কোটে বা র‍্যাপারে সর্বাঙ্গ ঢাকতে হয়, রাত্রে লেপ-মুড়ি দিতে হয়। সারারাত লেপের তলায় কুকুরকুণ্ডলী হয়ে শুয়ে শীতে কাহিল হয়ে ভোরে উঠেই হঠাৎ গুমট গরম। চারদিকে কুয়াশা।

বর্ষাকে ঘায়েল করে এবার শীতের উপর আক্রমণ আরম্ভ করেছে গ্রীষ্ম। শীতের মৌজ সারা গায়ে মেখে নেবার আগেই গরমের পদধ্বনি যেন বেজে ওঠে কানের মধ্যে। শীতে গরমে টাগ-অব-ওয়ার চলে কয়েক দিন। তারপরেই হঠাৎ খতম হয়ে যায় শীত।

বললাম, "কোটের ঘাড়ই ময়লা হল না, এর মধ্যে পালাল শীত। এবার আবার এটা পাঠাতে হয় ধোলাই করতে।"

"তা হক। আর সহ্য হয় না শীত। জামাকাপড় সাফ রাখা দায়। কল-কারখানার সব ধোঁয়া এসে জমে বাড়ির হাল হল যাচ্ছেতাই। এর চেয়ে গরম ভাল।"

বসন্তকে ডিঙিয়ে গরম এসে উপস্থিত হয়, স্বাগতম্ জানাবার আগেই।

কংক্রিটে ফুল ধরে না বটে, কিন্তু ফাটল ধরে। কী ফুল ওটা, কী ফুল? থমকে দাঁড়িয়ে দেখি। চৌরঙ্গীর উপর শ্বেত-পাথরের মত দুধসাদা ঐ বাড়িটার দোতলার একটা ফাটল দিয়ে দেখা দিয়েছে একটি চারা, সেই চারার চূড়ায় টুকটুকে রাঙা একটি ফুল।

কারও যেন চোখে না পড়ে ঐ ফুলটা। শহরের এই সদর রাস্তার ধারে, কী দুঃসাহস, উঁকি দিয়েছে ঐ বসন্ত? কারও চোখে পড়লেই শাবল আর সিমেণ্ট দিয়ে নিশ্চয় বন্ধ করে দেওয়া হবে ঐ ফাটা জায়গাটা। কোনও বিবর থেকে বিষধর কোনও সাপ উঁকি দিলেও বুঝি এতটা আতঙ্ক হত না আমার।

মনটা ভারী হয়ে গিয়েছে, গুমট হয়ে গিয়েছে। কী গতি হল ওই চারাটার পরদিন দেখতে হবে ভাবতে ভাবতে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমের মধ্যেই বার বার শুনছি কার যেন ডাক। ধীরে ধীরে ঘুম ভেঙে যেতেই, হ্যাঁ, যা ভাবিনি কখনও, তাই। কোকিল। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে ঐ গলা।

উঠে বসে কিছুক্ষণ শুনলাম ঐ ডাক। একটু বুঝি আতঙ্কই হল, ভাবলাম, উড়ে যাক; উড়ে যাক, পালিয়ে যাক। নইলে—

চারাগাছটার কী গতি হল জানা হয়নি। ও-রাস্তা দিয়ে আসিনি ইতিমধ্যে। আসল কথা হচ্ছে—ভুলেই গিয়েছি তার কথা। অসহ্য গরমে এখন দাপাদাপি করছি এখানে।

তবু ছাড়া যায় না এ-শহর। মাত কি অমৃত জানিনে, ও যেন টানতে থাকে সবাইকে নিজের কাছে। এর একেবারে হৃদয়ের কাছে গেলে একে বুঝি জানা যাবে না ভাল করে, তাই আছি এই তফাতে।

গড়িয়াহাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে লোক চলাচল দেখছি, আর হাওয়া লাগাচ্ছি গায়ে—ঘাম শুকবার জন্যে। কাছেই বুঝি তৈরী হয়েছে একটা বাগান। রজনীগন্ধার ঝাড় দাঁড় করিয়ে জড় হয়েছে একদল মালাকর। ফুলের বাহার দেখে খুশী হয়ে উঠছে মন।

এলোখোঁপায় সাদাফুলের মালা জড়িয়ে কে চলে গেল ও? যার নামের নামতা আওড়াই, সে?—না, অন্য কেউ?

দু পা এগিয়ে গিয়ে বললাম, "দেখি হে, এক ডজন রজনীগন্ধা, আর একটা গোড়ের মালা।"

বাড়ির পথে হাঁটা দিলাম, হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেদিনের কথাটা। সত্যিই, কেন যেন আজ মনে হতে লাগল—গরমই ভাল।

শিবু বললে, "ভাত দে।" চণ্ডী বললে, "দেব না।" শিবু বললে, "কেন?" চণ্ডী বললে, "সাত দিন ধরে কাজে বেরুসনি, ভাত আমি গড়াব?"

সহজ কথা। অবশ্য বলাটা দুজনের এত সহজে হল না, এত সংক্ষেপেও নয়। কোন দিনই তা হয় না। শিবু রোগা দুর্বল মানুষ। স্বভাবটাও শান্ত। নেহাত দায়ে না পড়লে হৈ-চৈ করে না। চণ্ডী সেটা পুষিয়ে নেয়, দুজন ছেড়ে চারজনের সমান চেঁচাতে জানে—সে-ভাষার জোরও যেমন, তোড়ও তেমন। শিবুর ঠাকুরদাদা নাকি (শিবু বলে) তাকে বলত, এককুড়ি-একটা বউ এনে দেব তোর, ঘরভরা বউ হবে। শিশু শিবু পুলকিত চিত্তে শুনত। কথা ফলেছে—চণ্ডী একাই একুশ, একাই শিবুর ঘর ভরে রেখেছে। আয়তনে না হক, মহিমায়। দশ-ভুজা চণ্ডী নামটা রেখেছিল, কী নাম সেই ঋষির?

অবশ্য একা চণ্ডীকে দোষ দিয়েও লাভ নেই। চণ্ডী চেঁচিয়ে, ঝগড়া যখন ধরে তখন তার মুখের বাঁধ থাকে না। এ-কথা সবাই জানে। কিন্তু, জানে কি, কতখানি সইতে হয় তাকে? শিবুটা হতচ্ছাড়া, স্বভাব-কুঁড়ে। খেটে পয়সা আয় করতে তার আপত্তি, নাকি তার মান যায়। চণ্ডীর ঠেলা খেয়ে মাঝে মাঝে বেরয়, দু-চার দিন করেও থাকে কাজকর্ম, আবার এসে ঘরের কোণে ঢোকে। চণ্ডী সয়, অনেক সয়ে যায়। বেশী খাবার বেশী পরবার শখ তার নেই, দুজনের দুটো পেট ভরবার মত পেলেই হল। তাও না হয় হক, সেই একপুরুষের একটা পেট ভরাবার মতও হক অন্তত। তাইতেই রাজী চণ্ডী। একবেলা দুবেলা উপোস দিলে তার কিছু হয় না। কিন্তু সেটুকুনও যেদিন থাকে না, শিবুর পাতে ধরে দেবার মত চালেরও খোঁজ থাকে না ঘরে, অথচ শিবু পরম ঔদাস্য নিয়ে চুপ করে বসে থাকে, তখন চণ্ডীর আর সয় না। তখন তার পেটের আগুন মাথায় চড়ে যায় তারপরে জিভ বেয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, প্রতিবেশীরা প্রমাদ গনে।

অথচ বেচারা শিবুই বা কী করে বল। তার গায়ে জোর নেই, বুদ্ধির জোর আরও কম। এর উপরে মেজাজ থাকলেই হয়েছিল।

সেইটুকুন বাঁচিয়েছেন ভগবান, রাগ বলে পদার্থ তার দেহে দেননি। খুব যখন অসহ্য হয় চণ্ডীর কথা, তখন মনে মনে গজগজ করে, ভাবে—যেতাম মরে ত জব্দ হত, 'মাছ খাওয়া ঘুচে যেত'। বলে না, 'মাছ খাওয়া' ঘোচে না তাদের জাতে। তা ছাড়া মাছ ত এমনিতেই কত খাচ্ছে, দুবেলা খাচ্ছে। জব্দ হত—আর দাঁত খেঁচানোর কেউ থাকত না বলে, একা একা পেট ফুলে মরতে হত বলে।

আর কাজে বেরয়নি বলে যে রাগ করছে চণ্ডী—কাজে বেরিয়ে কী করে? কাজ আর কিছু নয় তার, রেলের কাজ। সরকারী চাকরি ঠিক নয়। তবে হ্যাঁ, সরকারী চাকরে-দের চাকরি বজায় রাখার চাকরি তার বটে। তার কাজের ফলে সরকারী কর্মচারীদের কিছু কাজ বাড়ে, কিছু কাজ করবার মওকা জোটে। শিবুরা যদি কাজ ছেড়ে দিত, তবে এই কর্মচারীদেরও করবার কিছু থাকত না, অতএব সরকার থেকেই তাদের চাকরি ছাড়িয়ে দেওয়া হত, এদিক থেকে অন্তত দেশবাসীর উপকার, সুতরাং দেশের উপকারই করছে শিবুর দল।

অথচ নিজেকে শ্রান্ত করে বিপন্ন করেও তাদের কর্মসংস্থান, অন্নসংস্থান যে করে দিচ্ছে এরা, তার প্রতিদানে কী মিলছে, জানেন? তারা মানে সেই অকৃতজ্ঞ উপকৃত সরকারী কর্মচারীরা দিনরাত লেগে আছে, কী করে শিবুর কর্মপ্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করবে; বাধা যদি না নেহাত দেওয়া গেল ত ,তার লব্ধ ফলে ভাগ বসাবে, কষ্টে উপার্জিত অন্ন (যেদিন নেহাত জুটল কপালে) সুস্থমনে বসে যাতে গলাধঃকরণ না করতে পারে, তার ব্যবস্থা করবে মরে বেঁচে। এতে রাগ না হয় কার! আমি

নেহাত নিঃস্বার্থ নির্বিকার লেখক—লিখতে লিখতে আমারই রাগ ধরে যাচ্ছে। শিবু অতি শান্ত লোক বলেই রাগে না, ধুত্তোর বলে কাজ ছেড়ে দেয় না। খুব যখন বিশ্রী লাগে, দু-চারদিনের জন্য ধর্মঘট করে, কাজে না বেরিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে যায়, এই মাত্র। এবারের ব্যাপারও তাই, শুধু ধর্মঘটের মেয়াদটা দু-তিনদিন না থেকে দিন সাতেক হয়ে গিয়েছে। তাই চণ্ডীর রাগ।

কিন্তু দোষ যে দিই কাকে, বলা শক্ত। ক্রমাগত না খেয়ে থাকতে আর ঘরের লোকটাকে না খাইয়ে রাখতে হলে মেজাজ ঠাণ্ডা থাকবার কথা নয়। চণ্ডীর মেজাজ এমনিতেই কিছু চড়া, জ্বালা সয়ে সয়ে আরও চড়া হয়ে গিয়েছে ক্রমাগত। দরকারও। সে জানে, খেঁচানি না খেলে শিবু ঘর ছেড়ে নড়বে না। অতএব শিবুর মুখ চেয়েই তাকে খেঁচানি কিছু বেশী করে ঝাড়তে হয়—আহারার্থে এবং ঔষধার্থে।

শিবুকেও পুরো দোষ দিলে অবিচার হবে। বাপদাদা জমি-জিরেত রেখে যায়নি। থাকার মধ্যে একটি খোড়ো ঘর। রেখে গেলেও বিশেষ কিছু হত না, কারণ এদেশের মাটিতে ফসল কিছু হয় না—এক কাঁকর বুনে কাঁকরের ফল ছাড়া। লেখাপড়া জানে না যে বিদেশে বেরুবে। গায়ে জোর নেই যে মজুর খাটবে। আর থাকলেই বা তাকে খাটাচ্ছে কে? সব মহাজনেরই ত তার মতন দশা।

অতএব তার বরাতে বাকী রইল সেই এক এবং অদ্বিতীয় কাজ, রেলের কাজ, মানে, ট্রেন থেকে মাল সরানোর কাজ। স্টেশনে যাও; যেন যাত্রী, এমনভাবে একটা কামরায় উঠে পড়; গাড়ি ছাড়বার মুখে আবার টুক করে নেমে যাও—সুবিধেমত যদি হাতের কাছে থাকে একটা ছোটখাটো সুটকেস হক, পোঁটলা হক ভুলক্রমে হাতে নিয়ে।

কিন্তু তাই কি শুভেলাভে হবার জো আছে! পুলিস আর পাহারাওলার কথা বলেছি। এদের দয়াতে যে তাদের চাকরি, সে-কথা মনে রাখবার মত নরাধম তারা নয়। আর তাদের যদিবা ফাঁকি দিয়ে বা ভাগ দিয়ে এড়ান গেল, রয়েছেন চক্কোত্তি মশায়। অবস্থাপন্ন লোক। জায়গা জমি আছে, তেজারতি আছে। তার উপরে আছে এদের উপরে দয়া-দাক্ষিণ্য, আশেপাশে পাঁচ-সাতখানা গ্রামে হাতের-কারবারী যে কজনা, তাদের একমাত্র আশ্রয়। হাতানো মাল নিয়ে বাজারে বেচতে যাওয়া এদের পক্ষে সম্ভব নয়। ঘরে রেখে ভোগ করা আরও অসম্ভব। তখন ভরসা রইলেন একলা চক্কোত্তি মশায়। তিনি অবিশ্যি সামলে দেন। মাল যাই হক না কেন, নিয়ে নিতে তাঁর আপত্তি নেই। আপত্তি, তার ন্যায্য দাম দিতে। মাল ত মেলে পুরনো কাপড়-চোপড়, কত বা তার দাম! তিনি আবার দেবেন তার—টাকায় তিন আনা হল ত অশ্বমেধ যজ্ঞ হল। সব বারে হয় না ত, একবার এই শিবুই পেয়ে গিয়েছিল আদত সোনার হার একগাছা, কিছু না হবে ত ভরি-তিনেক। বাজারে দাম হত কম করেও আড়াই শ। চক্কোত্তি দিলেন তিরিশ। 'না' বললে পার পাবে না, তাঁকে না দিয়ে ফিরিয়ে যদি নিয়ে আসে দারোগাবাবু অচিরাৎ জেনে যাবেন কার হার কোথায় আছে। এর পরে আর ধর্মজ্ঞান থাকে না মানুষের, কাজেকর্মে প্রবৃত্তিও থাকে না, রাত জেগে জেলের দায় ঘাড়ে নিয়ে কাজ করা, সবই যদি নিজে না খেয়ে পরের পেট ভরাবার জন্যে হল, তবে সেই না খেয়ে ঘরে শুয়ে থাকলেই হয়, পরের পেট মিথ্যা কেন ভরানো!

তবু যা হক এতদিন চলছিল। খান-চারেক ট্রেন চলত দিনে রাতে, এক খেপ না এক খেপ কিছু মিলে যেতই। পোলাও মাংস হত না, ডালভাতটা জুটত। এখন গাড়ি কমে হয়েছে দুখানা, তার একখানা দিনের বেলায়—যা ভরসা রাতের গাড়িখানায়। তাও, দেশ স্বাধীন হল ত গাড়িও স্বাধীন হয়েছে। কবে কখন আসবে ঠিকানা নেই।

গাঁ-দেশ, সবাই সবার চেনা। ছোট একটু-খানি স্টেশন, রোজ রোজ অনন্তকাল ধরে প্ল্যাটফর্মে বসে থাকা যায় না, কুলোকের নজর পড়ে। হত, গাড়ি সময়ে আসত সময়ে ছাড়ত, তবু ভাবনা ছিল না—সময়মত স্টেশনে ঢুকে সময়মত বেরিয়ে চলে আসা যেত ভিড়ের মধ্যে। এ কবে কখন গাড়ি আসবে ঠিক-ঠিকানা নেই—প্ল্যাটফর্মে ঢুকে চির-কাল বসে থাকা যায় না, বাইরে ঘুর ঘুর করে কাটানো আরও মুশকিল। এক এক দিন এমনও হয়েছে, এই আসে এই আসে করে সারা রাতটাই কেটে গেল, রাজার নন্দিনী গাড়ি হেলেদুলে এসে পৌঁছলেন বেলা নটায়, বোঝ।

তবু ওরই মধ্যে যা করে হক একরকম চালিয়ে নিচ্ছিল শিবু। যেত স্টেশনে, মোট-ঘাট সঙ্গে দেখলে 'বাবু কুলি' বলে গিয়ে দাঁড়াত, কোনদিন হয়েও যেত দু-চার আনা পয়সা। সেটা ফাউ। তবু তাতে লাভ ছিল। স্টেশনে যাবার আসবার একটা ছুতো হল, হয়ত সুটকেস একটা হাতে করে বেরিয়ে আসারও পথ হত, লাগসই চেহারা দেখে কোন এক যাত্রীর পিছন পিছন হেঁটে এলেই হল, কিন্তু সমস্তই উল্টে গিয়েছে হালে। জল নেই, ধানের চেহারা খারাপ। দায়ে পড়ে দু-একজন করে অনেকেই স্টেশনের পথ চিনে ফেলেছে। তাতে সমূহ বিপদ। আনাড়ি লোক হলে হঠাৎ ধরা পড়ে, হৈ চৈ ফেলে দেয়। তার ফলে মারা পড়ে পেশাদাররা। অন্য কাজে যা হক তা হক, এ-কাজে অ্যামেচার (নামটা অবশ্য জানে না শিবু) কর্মী অচল, নিজেও মরে পরকেও মারে। এবারেও হয়েছে তাই। রাতের গাড়ি দাঁড়াবে মিনিট তিনেক। তারই মধ্যে এক কামরায় কোন্ আনাড়ি কার মালে হাত দিয়েছে, মাল সরাতে পারেনি। নিজে সরে যেতে পেরেছে, কিন্তু লোক সজাগ হয়ে গিয়েছে। কে জানে কার কথা, তার পরেই আর এক আনাড়ি গিয়ে উঠেছে সেই কামরায়। তারপরে যা হবার, ধরা পড়ে গিয়েছে। আর তার পরেই মার যাকে বলে। তার ত যা হবার হল, এখন কিছুদিনের মধ্যে আর ওদিকে পা বাড়ানোর জো নেই কারও। এমনিতে হয়, মাল নেমে যায়, মালিক টের পায় পরে, কোথায় কোন্ স্টেশনে নেমে গেল খোঁজ হয় না। এ একেবারে খোদ স্টেশনে দাঁড়ানো গাড়িতে! এখন এর দোলানি মরে জল স্থির হতে সময় নেবে। ততদিন কাজেই শিবুর ভাগ্যে বেকারত্ব আর উপোস। করবারও কিছু নেই। উপোস দিতে অবশ্য শিবু পারে, পারতেই হয়। কিন্তু খালি পেটের উপর চণ্ডীর চণ্ডী-পাঠ অসহ্য হয়ে ওঠে তার, অথচ করবেই বা কী। এ যা হল, তার হুকুম রদ হবে না। সারাদিনে ট্রেনও সাকুল্যে ঐ একটি। দূরের স্টেশনে গিয়ে দেখা যায় অবশ্য। বড় জংশন স্টেশন খুব দূরেও নয়। কিন্তু ভরসায় কুলোয় না। এক ত বাইরে বিদেশে যেতে হলে রেস্ত চাই—বিনা টিকিটে আর ছেঁড়া কানি পরে রোজ বেড়ানো যাবে না, ধরা পড়ে যাবে। সাজবার পয়সা তার নেই। সেজেগুজে টিকিট কিনে রোজ রোজ ট্রেনে চড়তে গেলেও লোকের চোখ এড়াবে না। তায় আবার জংশন স্টেশন, তার কায়দা আলাদা, আলো বেশী। পাহারা-দার বেশী, সেখানকার ঘোঁতঘাত শিবুর অজানা। আনাড়িদের দোষ দেয়, সেখানে গেলে শিবুই আনাড়ি। আর সেখানকার নিজেরই দল রয়েছে কত। শিবুকে তারা ঘেঁষতে দেবে কেন?

অতএব শিবু মনকে স্থির করে ফেলেছে। যা হবে না তা নিয়ে সে মন খারাপ করে না। গোটা দশ পনর দিন অন্তত চোখ মুখ বুজে কাটিয়ে দেওয়াই একমাত্র করণীয়। কিন্তু চণ্ডী তা দিতে দিলে ত।

ভাত চেয়েছিল, সহজ কথায় যদি বলত—চাল নেই, শিবুর রাগ হত না। হাঁড়িতে চাল না থাক্, বাড়িতে চাল আছে, তারই বাতা গুনে কাটিয়ে দিতে পারত দিনটা। হল না, চণ্ডী এমন ভাষা ছুটিয়ে দিল যে সে শুনে মরামানুষ উঠে দাঁড়ায়। তাও আবার বললে, কখন?

সকাল থেকে বাইরে বেরিয়েছিল শিবু। রোজগারের আশায় যতটা না হক, অন্তত

বিস্মৃতির আধারে—এখানে ওখানে ঘুরে এর ওর তার সঙ্গে দুটো কথাবার্তা কয়ে এলেও ত দিনটা কেটে যায় একরকম। চণ্ডীর সেও এক আক্রোশ। তাকে যখন বাড়ির মধ্যে একা একা বসে ভাবতে হচ্ছে, তখন তাকে ফেলে রেখে শিবু বাইরে আড্ডা দিয়ে ভাবনা ভুলে থাকতে যায় কোন্ লজ্জায়! অতএব শিবু ফিরে আসতেই তাকে সবেগে আক্রমণ করেছে চণ্ডী। রোদে ঘুরে ঘুরে তেষ্টা পেয়েছিল বেচারার, জল চেয়ে খাবারও ফুরসত দেয়নি।

অতএব কোনদিন যা হয় না তাই হয়ে গেল, শিবুরও রাগ বেড়ে গেল। বললে, "ধুত্তোর সংসার, আজ বিষ খেয়েই মরব আমি।"

চণ্ডী তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিয়ে দিলে। বললে, "তাই মরগে যা। মুরোদ কত, বিষ খাবি, কিনবি বা কী দিয়ে? সে পয়সা থাকলে ত তাই দিয়েই চাল কিনতিস।"

শিবু আর কথা কইলে না, সোজা পিছন ফিরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। জল আর খাওয়া হল না। চণ্ডী পেছন থেকে ডেকে বললে, "আর ফিরিসনে এই বলে দিলাম।"

বেরিয়েছিল, তবু হয়ত ফিরত শিবু। অন্তত একটু আড়াল দিয়ে কোথাও বসে জিরিয়ে নিত খানিক। তাও আর হল না—সোজা হন হন করে সে হেঁটেই চলল।

বাড়ি, পাশের বাড়ি। তার পরের বাড়ি, ক্রমে পাড়াটাই পার হয়ে গেল। পথের পাশে পুকুর পড়ল দুটো তিনটে। প্রথম একটা দুটো ত চোখেই পড়ল না রাগের মাথায়। তার পরেরটা চোখে পড়ল। তেষ্টায় আর রাগে তখন নাভি থেকে ব্রহ্মতালু অবধি জ্বলছে। ভাবলে নেমে জল খেয়ে নেবে। তার পরেই রাগ বেড়ে উঠল। না, খাবে না জল। এত যার হেনস্থা তার আবার জল খাবার শখ কিসের!

মাঠের আল ধরে সোজা এগিয়ে চলল। সংকল্প তখন স্থির হয়ে গিয়েছে। মরেই যাবে সে। বিষ খেয়ে নয়, রেলে কেটে। রেলের গাড়ি তার আহার যুগিয়েছে এত-দিন। আর যখন যোগালে না তখন মরাটাও সেই গাড়ির হাতেই হয়ে যাক। স্টেশনের দিকে গেলে চলবে না, লোকের চোখে পড়বে। আর মরা নিয়েই যখন কথা, অতদূরে ঘুরতে বা যায় কে!

এই ত সামনে দুখানা মাঠ, তার পরেই লাইন। উত্তর থেকে সোজা এসে পশ্চিমে দমকা বাঁক নিয়েছে, বাঁকের মুখে গাছ-পালাও আছে কতকগুলো। সেইখানে বাঁকের ওধারে শুয়ে থাকবে লাইনে মাথা দিয়ে। ছায়াও পাওয়া যাবে খানিক, আর ইঞ্জিন-ওলারাও বাঁকের এধারে থেকে টের পাবে না ওখানে কেউ শুয়ে আছে। যখন দেখবে তখন আর রুখতে পারবে না। তাই ভাল। মরে যাবে। বাড়িতে আর ফিরবে না সে। হক, চণ্ডী জব্দ হক। যখন জানবে শিবু মরেছে তখন হয়ত—কী করবে চণ্ডী? কাঁদবে? মাথা খারাপ! স্বস্তি পেয়ে যাবে বরং। তাই হক, স্বস্তিই পাক সে। শিবু ত আর দেখতে আসবে না, দুঃখু হক, চণ্ডীর কথা ভেবে আর কী হবে!

রাস্তা ছেড়ে আল ধরল শিবু, মাঠ ফুঁড়ে সোজা এগিয়ে চলল। ছায়া পড়েছে পায়ের তলায়। সূর্য ঠিক মাথার ওপরে। তার মানে বেলা বারটা হল। গাড়ি আসবে ধর সাড়ে বারটায়। আসুক না আসুক সময়মত পৌঁছতে ত হয়। যা কপাল, গাড়িও হয়ত তাকে ফেলেই চলে যাবে।

বেশী সময় নেই, পা চালিয়ে না গেলে হবে না। শিবু পা চালালে।

আল ধরে ওধার থেকে আসছিল জাদু খুড়ো। প্রতিবেশী। বললে, "এত বেলায় এদিকপানে কেন রে?"

শিবু বললে, "হুঁ।"

"যাচ্ছিস কোথা?"

শিবু বললে, "হুঁ।"

আর দাঁড়াল না। কে যায় অত কৈফিয়ত দিতে! জাদুখুড়ো দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছন থেকে হেঁকে বললে, "হল কী কারে তোর?"

শিবু জবাব দিলে না। আরও জোরে হেঁটে চলল।

চণ্ডীর একটা অলৌকিক শক্তি আছে, প্রতিপক্ষ কেউ থাক্ বা না থাক্ সে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে। শ্রোতার অভাবে তার বলার বাধা হয় না। শিবু রণে ভঙ্গ দিলে, কিন্তু তার রণবাদ্য থামল না, একা-একাই চালালে কিছুক্ষণ। তারপর ক্রমে থামল। খানিক বসে শুয়ে রইল। তারপর আবার উঠে কাজে লাগল।

ঘর-দুয়োর ঝাঁট দিলে গোছালে। রান্না নেই তাই হেঁসেল কাড়াও নেই। সব সেরেসুরে, ঘরের দোরে শিকলি টেনে বেরুল। খান চারেক বাড়ি তফাতে তার সইয়ের বাড়ি। হাতের রুপোর খাড়ু খুলে দিয়ে বললে, "এই দুটো রেখে আমাকে চাল ডাল দে।"

সই বললে, "খাড়ু রেখে দে তুই, চাল ডাল দিচ্ছি, নিয়ে যা।"

চণ্ডী রাজী নয়। বললে, "অমনি নেব না।" সই বললে, "তবে বেরো। আর কখনো সই বলে ডাকবি ত ঠ্যাং ভেঙে দেব।"

চণ্ডী কেঁদে ফেললে। স্বামী যার দুঃখ বোঝে না, পরের সহানুভূতি তার সহ্য হয় না। দুই সখীতে অনেক চোখ মোছামুছি হল, নিজের নিজের স্বামীর দোষ কীর্তন করে পরস্পরকে সান্ত্বনা দেওয়া হল। তার পর চোখমুখ মুছে চাল ডাল নিয়ে চণ্ডী ঘরে ফিরল।

ফিরে এসে উনুনে আঁচ দিলে। ভাত রাঁধল, ডাল রাঁধল, উঠোনে ঢ্যাঁড়স ফলেছে, কুমড়ো ফুল ফুটেছে, তাই তুলে এনে ভাজল, রেঁধে-বেড়ে বসে রইল। আশা ছিল তার অনেক আগেই শিবু ফিরে আসবে। রান্না যখন শেষ তখনও কিন্তু শিবু এল না। চণ্ডীও খেলে না। হেঁসেল তুলে বসে রইল। তারপর উঠে গিয়ে ঘরে শুয়ে রইল অনেকক্ষণ।

তখনও এল না শিবু। এমন কোনদিন হয় না। বাইরে বেরিয়ে আকাশপানে তাকাল। দেখলে বেলা পশ্চিমে হেলে গিয়েছে। তখন তার ভয় ধরল। ঘর বন্ধ করে বেরিয়ে গেল, সইয়ের বাড়ি। বললে, "এখন কী করি?"

সই শুনে বললে, "ভাবনার কথা হল।"

চণ্ডী বললে, "কোনদিন ত এমন হয়নি।"

সই বললে, "যারা ঠাণ্ডা আবার তারাই আংরা। তোরই ত দোষ। কথা যখন বলিস তখন কি মাপ রেখে বলিস?"

চণ্ডী কেঁদে বললে, "আমারই দোষ। ভাত চাইলে, দিলুম না। বললুম মরগো যা। এখন কী করব বল্।"

সই বললে, "কান্না রাখ্, কাঁদবার সময় অনেক পাবি। আগে খুঁজে দেখ গেল কোথায়।"

সই গিয়ে সয়াকে বলল। সে-বেচারী মাঠে খেটেখুটে এসে খেয়েদেয়ে ঘুম লাগাচ্ছিল।

শুনে বললে, "এতই যদি কান্না ত বলাটা কেন? যাই দেখি শুধিয়ে কেউ দেখেছে কিনা।"

প্রথমটা কেউ বলতেই পারে না। তার পরে খবর মিলল, জাদুখুড়োর কাছে। সে বললে, "হ্যাঁ দেখেছি ত, মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছিল।"

"মাঠ পেরিয়ে? কেন গো? সেদিকে ত কিছু নেই।"

"থাকবে না কেন, রেলের লাইন আছে। তার ওধারে বাড়ি আছে। শিবের বাপের পিসির বাড়ি।"

অসম্ভব নয়। সয়া ফিরে এল শিবুর বাড়িতে। চণ্ডী আর সই প্রতীক্ষা করছিল তার। সব শুনে চণ্ডী বললে, "অন্যের বাড়িতে গেছে? কক্ষনো নয়। তা সে যাবে না। রেল লাইনেই গেছে নিশ্চয়।" বলতে বলতে কেঁদে ফেললে, বললে, "আমি বুঝেছি, যা বলেছে তাই-ই করেছে সে।"

সই বললে, "আগেই কেঁদে মরছিস কেন? যা দেখ্ গিয়ে আগে, দেখা পাস কিনা। তুমি যাও গো সঙ্গে।"

চণ্ডী বললে, "না, আমি একা যাব।"

"পারবি?"

"খুব পারব।"

চণ্ডী ঘরে ঢুকল, ছোট্ট একটা গামলা

নিয়ে তাতে ভাত ডাল যা রেঁধেছিল সব চেপেচুপে ঠেসেঠুসে ভরে নিলে।

সই বললে, "ও কী করছিস?"

চণ্ডী বললে, "ভাত চেয়ে চলে গেছে। দেখা পাই ত খাইয়ে আসব।"

"কেন, বাড়িতে ফিরিয়ে আনবি না?"

চণ্ডীর সব বিক্রম উড়ে গিয়েছে। বললে, "যদি ফিরে না আসতে চায়?"

সই বললে, "তাই যা নিয়ে। পাস যদি, ধর। হেঁটে বাড়ি আসতে সময়ও ত লাগবে। তার চেয়ে ভাতটা আগেই খাইয়ে দিবি।"

চণ্ডী বললে, "হ্যাঁ।"

একটা গামছাতে বেঁধে গামছাটা ঝুলিয়ে নিয়ে চণ্ডী রওনা হল। কান্না তখনও চোখ আর নাক ঠেলে ফুলে ফুলে উঠছে, দাঁতে দাঁতে চেপে তাকে সামলে নিচ্ছে।

সই বললে, "বোঝ। আসব সংগে?"

"না।"

"সেখানে দেখা না পাস যদি?"

চণ্ডীর মনে জবাব এল, তবে আমিও ফিরব না। মুখে কিছু বললে না।

গ্রাম ছাড়িয়ে গেল। পথ পেরিয়ে গেল। মাঠে নেমে আলপথ ধরলে। সামনেই পশ্চিম-সূর্য ঢলে পড়েছে। মাঠে লোক নেই। পড়ি ত মরি করে পা চলেছে। দৌড়ত, কিন্তু অভ্যাস নেই। মনে চিন্তার ঘোড়দৌড় চলেছে। রেল লাইনে গিয়েই কি পাবে তাকে? সত্যি যদি চলে গিয়ে থাকে বাপের পিসির বাড়ি? সে-বাড়িতে ঢুকতে যাবে না চণ্ডী, বাইরে থেকে খবর নেবে। যদি সেখানে না গিয়ে থাকে? তবে খুঁজে দেখতে হবে কেউ দেখেছে কি না তাকে। লোক জনকে জিজ্ঞেস করবে, রেলের লাইন ধরে ধরে হেঁটে হেঁটে যাবে। আর—আর যদি সত্যি তাই হয়ে থাকে? সত্যি যদি গলা পেতেই দিয়ে থাকে গাড়ির তলায়? কড়া-কড় করে চেপে দুই চোখ বন্ধ করলে চণ্ডী। মাথাটাকে বার বার করে নেড়ে বললে, "না না না।" আর সত্যি যদি হয়ে থাকে তাই, সেও আর ফিরবে না।

সেও সেই লাইনেই মাথা রেখে শুয়ে পড়বে তবে। আবারও গাড়ি আসবে।

কথাটা ভেবে খুব একটা নিশ্চিন্ত হয়ে গেল চণ্ডী। মন যখন স্থির হয়ে গিয়েছে, তখন আর ভাবনাই বা কী, ছটফটানিই বা কিসের!

একখানা মাঠ পার হল। দুখানা মাঠ পার হল। তার পর লাইন। লাইনে উঠে দু দিকে তাকিয়ে দেখলে, শেষের দিকে এত জোর ছুটেছে আর তার পরে লাইনের খাড়া পাড় বেয়ে দৌড়ে উঠেছে। বেদম হাঁপাচ্ছে তখন। দূরের কিছু দেখতে পাচ্ছে না—সব ঝাপসা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দম সামলালে, চোখ রগড়ে মুছে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে, ডান দিকের লাইন সোজা চলে গিয়েছে স্টেশনের দিকে। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইল। কিছু নেই কোথাও—না, কেউ হাঁটছে না, কেউ শুয়ে আছে মনে হচ্ছে। সেদিকে কিছু না পেয়ে পিছন ফিরল। সেদিকে লাইন একটুখানি গিয়েই বাঁক ফিরেছে। বাঁক অবধি কেউ নেই তার ওধারে দেখা যায় না। চণ্ডী সেই দিকে হেঁটে এগিয়ে গেল। বুকের মধ্যে ঢিপ্‌ঢিপ্ করছে, দম খালি আটকে আটকে আসছে। বেলা শেষ। লাইনের ওপরে ছায়া পড়ে গিয়েছে। সূর্য আর লাইনের মাঝখানে বড় বড় গাছের সার। গাছের তলায় ছায়া আর অন্ধকার। বাঁকের মুখে পৌঁছুতেই বুক ধড়াস করে উঠল, দুই হাঁটু থর থর করে কেঁপে উঠল হাঁটবার শক্তি হারিয়ে গেল। হাত কুড়িক মাত্র দূরে, লাইনের ওপরে আড়াআড়ি পড়ে শিবুর দেহ। হক ছায়া, তবু চিনতে চণ্ডীর ভুল হয়নি। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, মাথা ঘুরে উঠল। মনে হল সেখানেই ঘুরে পড়ে যাবে। তারপর এক ঝাঁকনি মেরে নিজেকে শক্ত করে নিলে, দাঁতে দাঁত চেপে। শ্বাস বন্ধ করে হেঁটে এগিয়ে গেল।

শিবুর দেহ লাইনের উপর গড়াগড়ি পড়ে। একটা লাইনের উপরে। ঘাড়টা নড়ছে না।

না, নড়ছে ত!

ঘুমুচ্ছে, বেশ লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলে ঘুমুচ্ছে।

চণ্ডীর মুখ চোখ কান ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। গলা আটকে এল। বসে পড়ে ঠেলা দিয়ে ডাকল, "এই, ওঠ না।"

শিবু চোখ মেলে চাইলে। তার পর উঠে বসল। বললে, "ভাত এনেছিস? বেশ করেছিস। এ শালার গাড়ি কখন আসবে, কে জানে, দে ততক্ষণ, খেয়েই নিই।"

ইউনানী ও কবিরাজী ঔষধ

সর্বপ্রকার রোগের দিল্লী ও কলিকাতার প্যাটেন্ট ঔষধের কেন্দ্র ও চিকিৎসালয়, ইউনানী ড্রাগ হাউস, ১৮, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

আনন্দ মেলা

লিখেছেন

শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত; শ্রীযামিনীকান্ত সোম; শ্রীনরেন্দ্র দেব; শ্রীরাধারানী দেবী; শ্রীঅখিল নিয়োগী; শ্রীলীলা মজুমদার; আশরাফ সিদ্দিকী; শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র; শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য; শ্রীবিমল ঘোষ; শ্রীমনোজিৎ বসু; শ্রীপ্রভাকর মাঝি; শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র; শ্রী[illegible]তপোবন বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীচণ্ডী সেনগুপ্ত; শ্রীশৈলেন ঘোষ; বুদ্ধু ভুতুম; শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত; শ্রীবাসুদেব গুপ্ত; শ্রীদিব্যেন্দু পালিত; শ্রীশংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়; শ্রীশ্যামলকুমার চক্রবর্তী ও মৌমাছি।

ছবি এঁকেছেন

শ্রীসমর দে; শ্রীকান্তি সেন; শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ; শ্রীঅহিভূষণ মল্লিক; শ্রীবিমল দাশ ও শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর দত্ত।

ফটো তুলেছেন

শ্রীরেবন্ত ঘোষ ও শ্রীঅজিত সোম।

শুভেচ্ছা

আমার ছোট্ট ও তরুণ বন্ধুরা,—

মঞ্জু-মধুর শারদোৎসব আবার এলো যে ফিরে
খুশি-হিল্লোল দেখি না তবু যে শরৎ-আকাশ ঘিরে!
এখনও বরষা-ঝঞ্ঝার মেঘ চকিতে জাগায় ভয়
সকলের মনে উদ্বেগ জাগে কি জানি কিইবা হয়!
বন্যা-ঝঞ্ঝা-পীড়নে পীড়িত আশ্রয়হারা জন
তাদের কথাই ক্ষণে ক্ষণে আজ কাঁদায় আমার মন।
তবু তোমাদের মুখে হাসি দেখি, এ বাসনা জাগে মনে
তাই এ খুশির-পসরা সাজায়ে দিলাম প্রীতির সনে।

ইতি—মৌমাছি

বড়াই কিসের?

শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

দেবাসুরের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। অসুরেরা স্বর্গে গিয়ে দেবতাদের উপর অত্যাচার করত। তাদের অত্যাচারে দেবতাদের স্বর্গে টেকা দায় হয়েছিল। কিন্তু অসুররা শেষরক্ষা করতে পারল না। দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র নিয়ে এলেন, বরুণ নিয়ে এলেন পাশ, অগ্নি আনলেন অগ্নিবাণ, পবন এলেন গদা হাতে। দেবতারা সকলে মিলে যুদ্ধ করে অসুরদের তাড়িয়ে দিলেন পাতালে।

নিশ্চিন্ত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে মহোৎসবের আয়োজন করলেন। দেবতারা সকলে উৎসবে এসে যুদ্ধের কথা বলতে লাগলেন। অগ্নি বললেন, "আমি বাণ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়েছি অসুর-ব্যাটাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে। তাই তো তাদের ঠাঁই নিতে হয়েছে গিয়ে অন্ধকারপুর পাতালে।" পবন বললেন, "গদার বাড়িতে গোদা অসুরদের হাড়গোড় কি আমি আস্ত রেখেছি। সিধে হয়ে হাঁটার জো নেই আর বাছাধনদের।" বরুণ বললেন, "পাশ দিয়ে আমি অসুর-গুলোর হাত-পা এমন ছাদনদড়ি করে ফেলে-ছিলুম, ঢাল-তরোয়াল ধরে তাদের সাধ্য কি! তাইতো তাদের পিঠ পেতে মার খেতে হয়েছে দমাদ্দম।" এই রকম এক একজনে বড়াই করে বলতেও লাগলেন, "হুঁ, আমি না থাকলে সকলের কপালে আরো কত দুঃখ ছিল, কে জানে!"

দেবরাজের সভায় দেবতাদের বড়াইয়ের কথাবার্তা চলছে, এমন সময়ে হঠাৎ চারদিক আলোয় আলোময় হয়ে উঠল। সেই জ্যোতিতে চোখ যেন ঝলসে যায়। দেবরাজ ইন্দ্র চেয়ে দেখেন, সে আলো আসছে মহাব্যোম হতে।

ইন্দ্র বরুণকে বললেন, "আপনি এগিয়ে গিয়ে দেখে আসুন তো ও জ্যোতি কিসের?"

বরুণ মহাব্যোমের কাছে যেতেই সেই জ্যোতির মধ্য হতে প্রশ্ন শোনা গেল, "কে হে তুমি?"

বরুণ নিজের নাম বলতেই আবার শোনা গেল, "বরুণ কে? তার পরিচয়টাই বা কি?"

বরুণ বললেন, "আমি জলের দেবতা।"

"কী গুণে তুমি জলের দেবতা হয়েছ? তোমার শক্তি-সামর্থ্যই বা কতখানি?"

বরুণ বললেন, "আমার শক্তির কথা কার না জানা আছে! এক মুহূর্তে আমি ত্রিভুবন জলে ডুবিয়ে মহাপ্রলয় ঘটাতে পারি।"

"বটে! তোমার সে-শক্তির পরিচয়টা একবার দাও দেখি। ঐ দেখো, তোমার পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা কুটো। ভাসাও দেখি ঐ কুটোটাকে।"

বরুণ ভাবলেন, ছোঃ। শেষে সামান্য একগাছা কুটো ভাসিয়ে শক্তির পরীক্ষা দিতে হবে আমায়! বেশ, এক ফোঁটা জলেই তো তা করা যাক। এই ভেবে তিনি প্রথমে এক ফোঁটা জল দিয়েই কুটোটি ভাসাতে চাইলেন। কিন্তু কুটো কি, সে যে জগদ্দল পাথর! ফোঁটার পর ফোঁটা, তারপর পাহাড়-প্রমাণ ঢেউয়ের পর ঢেউভাঙা জলের স্রোত বইয়ে দিয়েও সে খড়গাছা ভাসান সাধ্য কি তাঁর! নিরাশ হয়ে বরুণ মাথা হেঁট করে সেখান থেকে সরে পড়লেন।

ইন্দ্রের সভায় গিয়ে বরুণ বললেন, "নাঃ, দেবরাজ, মহাব্যোমের জ্যোতি কিসের আমার জানার উপায় হলো না। বরং তা জানতে গিয়ে আমি নিজেই অপদস্থ হয়ে এসেছি।"

এরপর দেবরাজ সে জ্যোতির খোঁজ নেওয়ার ভার দিলেন অগ্নির উপর।

অগ্নি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, তিনি অগ্নি। এক মুহূর্তে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তিনি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলতে পারেন।

বরুণের মত অগ্নিকেও শক্তির পরীক্ষা দিতে বলা হলো তার পায়ের কাছের এক-গাছা কুটো পুড়িয়ে।

অগ্নি তাচ্ছিল্য করেই প্রথমে একটা ফুলকি ছাড়লেন সেই কুটোটির উপর। কিন্তু কুটো কি, সে যে বরফের চাঁই! ফুলকির পর ফুলকি, তারপর দাউ-দাউ আগুনের গোলা ছেড়েও সে খড়গাছা পোড়াবার সাধ্য কি তার! লজ্জা পেয়ে অগ্নি মাথা হেঁট করে সেখান থেকে সরে পড়লেন।

এবারে পবনের পালা। ইন্দ্রের আদেশে পবন জ্যোতির কাছে যেতেই তাঁকেও পরিচয় দিতে হলো তাঁর নাম আর শক্তির কথা বলে। পবন বললেন, এক মুহূর্তের তাণ্ডবনৃত্যে তিনি জগৎ-সংসার লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারেন। তাঁর সে-শক্তির পরীক্ষা দিতে বলা হলো পায়ের কাছের একগাছা কুটো উড়িয়ে।

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে পবন বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা দিয়ে সে পরীক্ষা দিতে গেলেন। কিন্তু কুটোগাছা কি, সে যেন হিমালয় পাহাড়! আঙুলের পর আঙুল, তারপর হাত-পা দিয়ে হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে ঠেলেও সে কুটোটি নাড়ায় সাধ্য কি তাঁর!

মুখ কাঁচুমাচু করে পবন ইন্দ্রের সভায় ফিরে গেলেন। গিয়ে বললেন, "নাঃ, দেবরাজ, ও জ্যোতি কিসের আমার জানার উপায় হলো না। উলটে শক্তির পরীক্ষা দিতে গিয়ে নিজেই অপদস্থ হয়ে এসেছি।"

দেবতাদের আর কেউই সে-জ্যোতির কাছে যেতে সাহস পেলেন না। তখন ইন্দ্রদেব নিজেই চললেন কিসের সে জ্যোতি, তা জানতে।

কিন্তু তিনি মহাব্যোমের কাছে যেতে না যেতেই সেই জ্যোতির আলো যেন দপ্ করে নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দেখা গেল জ্যোতির্ময়ী এক নারীমূর্তি। সেই নারীর মুখে বেজে উঠল বজ্রের মত ধ্বনিতে "ইন্দ্র, দেবসভায় বড়াই হচ্ছিল কিসের? দেবতারা অসুরদের পরাজয় করেছে, এই অহংকারে সবাই মেতে উঠে-ছিলে তো? কিন্তু তোমাদের কার কি শক্তি তার পরীক্ষার পরও কি বুঝতে পারলে না কেউ, কার শক্তিতে ব্রহ্মাণ্ড চলে? সেই আদ্যাশক্তির সাহায্য না পেলে তোমাদের সাধ্য কি ছিল যুদ্ধে জয়লাভ কর। পরম-শক্তির আধার সেই পরমপুরুষেরই জ্যোতি তোমরা পূর্বে দেখেছিলে মহাব্যোমে। আর যা দেখছ এখন, তোমরা চোখের সামনে, তাও তাঁরই শক্তি। এই দুই-ই একত্রে একই শক্তির এপিঠ-ওপিঠ। আর এদের মিলনেই স্বর্গমর্ত্যপাতালে শক্তির লীলা চলে সৃষ্টির মধ্যে। নইলে কারু কি সাধ্য আছে এক-গাছা কুটো নাড়াবারও!"—বলতে বলতে সেই জ্যোতির্ময়ী মূর্তি মহাব্যোমে মিলিয়ে গেলেন।

দেবরাজ চিনতে পারলেন, কার জ্যোতি তাঁরা দেখেছিলেন। তাঁর কানে ঝংকারও উঠতে লাগল আদ্যাশক্তির বাণীর।

দেবসভায় বড়াই হচ্ছিল কিসের?

বীর রাজা সীতারাম

যামিনীকান্ত সোম

সীতারাম রাজার ঘরে জন্মাননি। রাজা হয়েছিলেন নিজের বিক্রমে আর এই বাংলাদেশকে মোগলের দাসত্ব থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন প্রবল শক্তিতে। তাঁর রাজা হওয়ার কাহিনী অদ্ভুত এবং তাঁর বীরত্ব কাহিনীও অদ্ভুত। সেই গল্প আজ শোনাই। এ হ'ল ১৬৫৮ সালের পরের কথা।

সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ ছিলেন একজন সাধারণ তহশীলদার। তাঁর মায়ের নাম দয়াময়ী। দয়াময়ীর অন্তরটি ছিল দয়ায় পরিপূর্ণ। কিন্তু গল্প আছে, এক তলোয়ার হাতে নিয়ে একবার তিনি এক-দল ডাকাতকে আক্রমণ করেন ভয়ঙ্কর-ভাবে। তাঁর রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখে ডাকাতেরা ভয়ে পালিয়ে যায়। এই রকম মায়ের ছেলে ছিলেন সীতারাম।

সীতারাম উর্দু-ফারসী জানতেন। ফরাসী ভাষাও জানতেন। কিন্তু এ সবের মধ্যে না গিয়ে তিনি যুদ্ধ বিদ্যায় ওস্তাদ হয়ে উঠলেন। তিনি লাঠি চালনায় আর তলোয়ার চালনায় এমন সুদক্ষ ছিলেন যে, শত শত যোদ্ধার মহড়া একাই নিতে পারতেন।

হঠাৎ এক ঘটনা ঘটলো। তিনি এক-জন ভয়ানক বিদ্রোহীকে দমন করে ফেললেন, মেরে ফেললেন। এই ব্যাপারে বাংলার সুবাদার নবাব সায়েস্তা খাঁর কাছ থেকে তিনি নলদী পরগনা জায়গীরস্বরূপ পেয়ে গেলেন। এতে তাঁর অবস্থার পরি-বর্তন ঘটলো। তিনি হলেন ক্ষমতাশালী। বাংলার এই সব অঞ্চলে তখন মগ দস্যুদের ভয়ঙ্কর উপদ্রব ছিল। লোকেরা প্রাণ হাতে করে ভয়ে ভয়ে থাকতো। সীতারাম এই মগ দস্যুদের দমন করেন।

সীতারামের দুজন বন্ধু জুটলেন। এক হলেন মুনিরাম রায়, দ্বিতীয় রামরূপ। রামরূপ ভয়ঙ্কর ক্ষমতাশালী ছিলেন। এই দুই বন্ধুর সহায়তায় তিনি এই অঞ্চল দস্যুমুক্তও করলেন, আরো অনেক সাহসের কাজ করলেন। তারপর মহম্মদ-পুর নাম দিয়ে এক রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর রাজধানীতে হিন্দুও ছিল, মুসলমানও ছিল। সবাই পরম সুখে বাস করতে লাগলো।

ক্রমে তিনি অসংখ্য সেনা সমাবেশ করলেন নিজের রাজধানীতে। বড় বড় কামান, গোলা-গুলি, অস্ত্রশস্ত্র—এ সব তৈরী হতে লাগলো। চতুর্দিকে বড় বড় বাজার বসে গেল। রাজধানী হলো রাজ-ধানীর উপযুক্ত।

ঔরঙ্গজেব তখন দিল্লীর সম্রাট। সীতা-রামের সুখ্যাতি শুনে ঔরঙ্গজেব এঁকে 'রাজা' উপাধি দিলেন। সীতারাম হলেন রাজা সীতারাম। রাজা সীতারাম বীর বিক্রমে রাজত্ব করতে লাগলেন। এইভাবে দিন যায়।

এর পর এক পরিবর্তন এলো। ঔরঙ্গ-জেব মারা গেলেন। সুবাদার সায়েস্তা খাঁও রইলেন না। সায়েস্তা খাঁ ভাল শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর সময়ে বাংলা-দেশে এক টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেতো। সায়েস্তা খাঁর পরে মুর্শিদকুলী খাঁ হলেন বাংলার সুবাদার। এ সময় নানা রকমের অত্যাচার নানা অশান্তি। কি উপায় করা যায়? রাজা সীতারাম ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। রাজস্ব বন্ধ করতেই সুবাদার মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তিনি হুকুম জারি করলেন যে, বাংলার আর কোন জমিদারই যেন সীতারামকে কোন বিষয়ে সাহায্য না করে। যে করবে, তার ভয়ানক শাস্তি হবে। বাংলার কোন জমি-দারই এগুলেন না তাঁর সাহায্যে। সীতারাম আগেই ভূষণা দুর্গ নিয়েছিলেন দখল করে। এখন কেউ সাহায্যে না এলেও তিনি ভয় পেলেন না। তাঁর এখন সৈন্য-সামন্ত বা গোলা-গুলি অস্ত্রশস্ত্রের অভাব কি? তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রইলেন।

দুটি দল এলো তাঁর সঙ্গে লড়তে। একদল এলো সংগ্রাম সিং নামক এক সেনাপতির অধীনে। দ্বিতীয় দল এলো দয়ারামের অধীনে। এই দয়ারাম হলেন দীঘাপাতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। সংগ্রাম সিং নৌ-পথে চললো ভূষণার দিকে। আর দয়ারাম সসৈন্যে রাজধানী মহম্মদ-পুরের দিকে।

মহম্মদপুর রক্ষা করছিলেন মহাবীর রামরূপ। আর ভূষণা দুর্গে আছেন রাজা সীতারাম স্বয়ং। রামরূপের উপর রাজধানী রক্ষার ভার দিয়ে সীতারাম নিশ্চিন্ত। রামরূপের চেহারাটি এমন বিরাট ও বীরত্বব্যঞ্জক যে, তাঁর দৃষ্টিতেই বিপক্ষ সৈন্যেরা ভয় পেয়ে যেতো। তাঁর চরিত্রবল অসাধারণ। তিনি অবিবাহিত। তিনি অসীম সাহসী ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। তাঁর দেহে এত শক্তি যে, তাঁর সমুখে এগুবে কে? তাছাড়া রাজা সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুর এ রকম, সুরক্ষিত যে, তাকে জয় করা অসাধ্য ব্যাপার।

দয়ারাম ভাবনায় পড়লেন। তাইতো, কী হবে; কী করে রামরূপকে জয় করা যাবে? কী করে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ হবে।

তিনি ভেবে ভেবে স্থির করলেন যে, রামরূপকে হত্যা করতে হবে। কী করে হত্যা করবেন? তিনি খোঁজ নিয়ে জানলেন যে, রামরূপ অতি প্রত্যুষে উঠে পূজা-বন্দনার জন্য নিকটের এক সরোবরে যান স্নান করতে। দয়ারাম গুপ্ত ঘাতকের দল নিযুক্ত করলেন। একদিন অতি প্রত্যূষে রামরূপ চলেছেন দোলঘরের পাশ দিয়ে, এমন সময় একজন ঘাতক এসে তাঁর পিঠে বর্শা বিদ্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে আর একজনও বর্শা বিদ্ধ করল। এই রকম বর্শাবিদ্ধ হয়ে তিনি পড়ে গেলেন। তখন ঘাতকেরা সকলে মিলে ঘিরে ফেলে তার মাথাটা কেটে ফেললে। সর্বনাশ হলো। এতে তাঁর সৈন্যরাও ভয় পেয়ে গেল। এবার দয়ারামের হল জয়জয়কার।

রামরূপের কাটা মাথা দয়ারাম যখন

পিঠে বর্শা বিদ্ধ করল

পাঠালেন সুবাদারের কাছে, সুবাদার মুর্শিদকুলী খাঁ রামরূপের সেই বীরত্ব-ব্যঞ্জক অতি প্রকাণ্ড কাটা মুণ্ড দেখে অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। বিশেষ দুঃখের সঙ্গে বললেন, এত বড় বীরকে মেরে ফেললে তোমরা? এঁকে না মেরে বন্দী করে আনতে পারলে না?

রামরূপের শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদে সীতারামের আশা ভরসা সব লোপ পেয়ে

খোশ-গল্প

নরেন্দ্র দেব

স্কুলের ছুটি সেদিন।

বাড়ির একদল ছেলেমেয়ে আমরা টলু, বলু, মীনু, ঘটু, টুকু, বুতু সবাই মিলে হুড়মুড় করে গিয়ে ছোটকার ঘরে ঢুকে পড়লুম।

ছোট্‌কা আমাদের দেখে বলে উঠলেন, "আরে আরে, ব্যাপার কি? দিনে-দুপুরে ডাকাত পড়লো কেন আমার ঘরে? এখানে তো লুঠ করবার মতো কিছু নেই!"

টুকুদি বললে, "আছে বৈকি। আমরা তোমার গল্প-ভাণ্ডার লুঠ করবো! তারপর, তোমার ঘাড় ভেঙে সিনেমায় ম্যাটিনি-শো দেখে আসবো।"

ছোট্‌কা বললেন, "সিনেমায় নিয়ে যেতে রাজী আছি, কিন্তু গল্প শোনাতে হবে তোমাদের আজ আমাকে।"

আমরা বললুম, "তোমার মতো কি অত গল্পের বই পড়ি আমরা যে, গল্প বলবো?"

ছোট্‌কা বললেন, "বেশ তো! গল্পের বই না পড়ো স্কুলে পড়তে যাও তো? আমাকে তোমাদের স্কুলের গল্প বলো, স্কুলের ছেলেদের গল্প বলো, মাস্টার মশাইদের গল্প বলো, দপ্তরী বেয়ারাদের গল্প বলো। খাবারওয়ালার গল্প বলো—"

ঘটু বললে, "তা বলতে পারি, কিন্তু স্কুলের গল্প কি আবার গল্প নাকি! সে তো ঘটনা! কাল কি হয়েছিল জানো? আমাদের ক্লাশে একটা নতুন ছেলে ভর্তি হল। নতুন এসেছে বলে কেউ তার সঙ্গে কথা বলছিল না। বেচারা মুখ শুকিয়ে চুপটি করে একধারে বসে আছে। দেখে আমার মায়া হল। আমিই আগে তার সঙ্গে কথা বললুম। জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমার নামটি কি ভাই?'

"ছেলেটা যেন তেড়ে উঠলো। বললে, 'এইমাত্র তো শুনলে? মাস্টার মশাইকে নাম বললুম!' আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললুম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বটে। তোমার নাম যেন কি বললে—শ্রীদুর্মুখ দমন দুর্বাসা—না? তা হ্যাঁ ভাই তোমাদের বাড়ি কোথা?'

ছাতাটা খুলতে পারলুম না

"ছেলেটা বিরক্ত হয়ে বললে, 'বাড়ির খোঁজে কি দরকার? ক্লাশেই তো রোজ দেখা হবে। কিন্তু আমার নামটা তুমি ভুল শুনেছ। আমার নাম—সুমুখরঞ্জন সৎচাষা।'

"বললুম, 'ও! তাই বুঝি!' তারপর তাকে একটু খুশী করবার জন্যে বললুম, 'তুমি যদি আজ টিফিন না এনে থাকো, আমার টিফিন আছে, দুজনে ভাগ করে খাবো?' শুনে ছেলেটা কি বললে জানো ছোট্‌কা? পাঁচ মিনিটও তো তার সঙ্গে আলাপ হয়নি। বললে, 'তুমি দেখছি একটা আস্ত গাধা! নিজের খাবার কি কেউ পরকে খাওয়ায়?' কি তিরিক্ষী মেজাজ বলো তো!"

ছোট্‌কা হেসে উঠে বললেন, "তুই বললিনি কেন, তোমার একজন স্বজাতীয়কে চিনতে এত দেরি হল কেন ভাই?"

মীনু, টুকু, বুতু, সবাই হো হো করে হেসে উঠলো! আমার তখন ছোটকার ওপর ভীষণ রাগ হলো। ছোটকা বোধ হয় সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন, "আমার কাল কি হয়েছিল জানিস? অফিস থেকে ফিরছি, এমন সময় দেখি রাস্তার ওদিক থেকে আমার এক পুরোনো বন্ধু আসছেন! অনেকদিন আগে কি একটা জিনিস কিনতে দোকানে ঢুকে টাকা কম পড়ে যায়। বন্ধুটি আমার সঙ্গেই ছিল। তার কাছে পাঁচটা টাকা ধার করে দোকানের দামটা চুকিয়ে দিই। কিন্তু টাকাটা তাকে ফেরত দিতে ভুলে যাই। সেও তাগাদা করেনি, আমারও মনে পড়েনি। কিন্তু কাল তাকে আসতে দেখেই টাকার কথাটা মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি মনিব্যাগ খুলে দেখি, মাত্র কিছু খুচরো পয়সা ছাড়া আর কিছু নেই! কী যে করি? মহা-দুর্ভাবনা হল। ভাবলুম, বোঁ করে পাশের কোনও একটা গলিতে গা ঢাকা দিয়ে ঢুকে পড়ি। কিন্তু চারদিকে চেয়ে দেখলুম, আমি তখন একেবারে বড় রাস্তার মাঝখানে! ডাইনে বাঁয়ে কোথাও একটা সরু গলিও নেই যে সরে পড়বো! আমার তো মুখ শুকিয়ে গেল! ভাবলুম, এক কাজ করি, ছাতাটা খুলে মুখে মাথায় আড়াল দিয়ে হন হন করে উল্টোদিকের ফুটপাথ ধরে সরে পড়ি। কিন্তু অদৃষ্ট বিমুখ! অনেকক্ষণ টানাটানি করেও কিছুতেই ছাতাটা খুলতে পারলুম না। কোথায় যেন স্প্রিংটা আটকে বিকল হয়ে গেছে! হতাশ হয়ে যেই মুখ তুলেছি, দেখি, বন্ধুটি একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তখন চট করে মাথায় একটা ফন্দি এল। তাকে দেখে আমি যেন খুব খুশী হয়ে উঠেছি এমনি একটা উল্লাসের ভাব দেখিয়ে বললুম 'এই যে ভাই! তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—খুব ভালই হল। সেই যে কিছুদিন আগে তুমি আমাকে পাঁচটা টাকা ধার দিয়েছিলে, ওঃ! কী যে উপকার করেছিলে সেদিন, আমি জীবনে ভুলব না! তোমাকে কিন্তু আজও আমি সে টাকাটা ফেরত দিয়ে আসবার ফুরসুত পাইনি। এমন কি তোমাকে যে একটা সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে আসবো তারও সুযোগ ঘটেনি। তা যাক, আজ যখন দেখা হয়ে গেল ধন্যবাদটাই আজ দিয়ে রাখি। সঙ্গে টাকা নেই। ওটা পরে দিয়ে আসবো।"

আমরা তো গল্প শুনতে শুনতে হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছি, আর তারপর কি হল? তারপর কি হল? জিজ্ঞেস করছি, এমন সময় গল্পের মাঝখানেই ছোটকার এক বন্ধু এসে হাজির!

টলু আর বলু তখন ছোটকার "আফ্রিকার জংগলে" বইখানার পাতা উল্টে উল্টে

বীররাজা সীতারাম (শেষাংশ)

গেল। এবার ভূষণা দুর্গই বা রক্ষা করবে কে? কারণ তাঁকে এখনই যেতে হবে সসৈন্যে মহম্মদপুরের দিকে। তিনি তখনই রওনা হলেন বিরাট এক সৈন্যদল নিয়ে। সন্ধি করতে পারতেন মোগলের সঙ্গে। কিন্তু কোন রকম সন্ধি করা তাঁর মনঃপূত হল না। তিনি সঙ্কল্প করলেন লড়বেন। আত্মসম্মান বিসর্জন দেবেন না। সংগ্রাম হল অতি ভয়ঙ্কর। অনেক দিন ধরে অনেক যুদ্ধ হল মোগলের সঙ্গে। শেষে তিনি পরাভূত হলেন, ধৃত হলেন, বন্দী হলেন মোগলের হাতে। শেষকালে বন্দী অবস্থায় কারাগারেই তাঁর মৃত্যু হলো। বাংলার শেষ হিন্দু বীরের পতন হল। বাংলার স্বাধীনতা অর্জন হয়েও রইলো না। কেন রইলো না? রইলো না। কেননা সুবাদারের ভয়ে কেউ তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে আসেননি। বাংলার অন্য রাজা-জমিদারেরা যদি অগ্রবর্তী হতেন, তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন, তাহলে ভূষণা দুর্গেরও পতন হোত না, রাজধানী মহম্মদপুরও শত্রুকবলে পড়তো না। একতার অভাবেই বাংলার স্বাধীনতা গেল—সব গেল। কিছুই রইলো না। মিলন এবং একতার অভাবই তাঁর এই দুর্দশার কারণ।

নিবিষ্ট মনে ছবি দেখছিল। ছোটকার বন্ধুর সেদিকে চোখ পড়তেই জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরাও বুঝি আফ্রিকা যাবে ?"

ছোটকা আশ্চর্য হয়ে বললেন, "আফ্রিকা! কেন ? পৃথিবীতে এত দেশ থাকতে হঠাৎ আফ্রিকা যাবো কোন্ দুঃখে ?"

ছোটকার বন্ধুটি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "ভাল কাজ পেয়েছি সেখানে। তোমরা আফ্রিকার বই টই ঘাঁটছো দেখে আমি মনে করলুম, বোধ হয় তোমরাও আফ্রিকা যাবে ?"

ছোটকা জিজ্ঞেসা করলেন, "আফ্রিকার কোথায় গিয়ে থাকবে ? য়ুগাণ্ডা, কেনিয়া, না গোল্ডকোস্ট—যেটা এখন ঘানা হয়েছে।"

টেবিল মাথায় চাপিয়ে চলেছেন

ছোটকার বন্ধু বললেন, "আমি আগে টাঙ্গানিকায় যাবো। সেখান থেকে কঙ্গো—তারপর—"

"বাস্! বাস! কিসে যাবে ? জাহাজে না প্লেনে ?" ছোটকা জানতে চাইলেন।

ভদ্রলোক বললেন, "আমি যাচ্ছি জাহাজে, কিন্তু ফিরবো প্লেনে।"

ছোটকা শুনে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বললেন, "চমৎকার! এই তো আমি চাইছিলুম। দেখ ভাই, তুমি যখন প্লেনে বাড়ি ফিরবে তখন তোমার উড়ো জাহাজখানিকে আমাদের এই বাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে আসতেই হবে। কারণ, এর চেয়ে আর সোজা পথ নেই। তুমি ভাই সেই সময় মনে ক'রে গোটা দুই আফ্রিকার জঙ্গলের জ্যান্ত সিংহকে ফেলে দিও আমাদের ছাতে। এই বাচ্চাগুলো তাহলে ভারী খুশী হবে।"

আমরা তো ছোটকার এই আফ্রিকা থেকে সিংহ আমদানির সহজ ব্যবস্থা দেখে হেসে বাঁচিনে। ছোটকা বললেন, "তোমরা হাসতে শুরু করলে কেন ? তোমরা বোধ হয় নিশ্চয় ভাবছো যে, আমার এই বন্ধুটির পক্ষে আফ্রিকার সিংহ সংগ্রহ করে আনা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি জানি, এ'র পক্ষে সবই সম্ভব! এই কিছুদিন আগে আমি এ'কে দেখি, একখানি গোল টেবিল মাথায় চাপিয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছেন! আমি তো দেখে অবাক! জিজ্ঞাসা করলুম, 'ব্যাপার কি হে ? এমন টেবিল মাথায় দিয়ে যাচ্ছো কেন ? তোমার ছাতি নেই বুঝি ?'

"ইনি বললেন, 'ছাতি নেই কি ? আমার দু-দুটো ছাতি রয়েছে! একটা এই বুকের ছাতি, আর একটা এই বগলেই রয়েছে, ছাতাওয়ালা গলির ছাতি। চেরা শিক, বেতের বাঁট—সিল্ক প্যারামেটা কাপড়—'

"আমি আরও বেশী আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলুম, 'তবে বুঝি বাড়ি বদল করছ ?'

"ইনি বললেন, 'নারে ভাই তা নয়। একটু মুশকিলে পড়েই টেবিল ঘাড়ে করে চলেছি। আমার স্ত্রী হুকুম করলেন, এই গোল টেবিলটার মাপে একখানি ইন্ডিয়ান সিল্কের ভালো প্রিন্টেড টেবিল-ক্লথ কিনে আনতে হবে। কিন্তু খুব সাবধানে দেখে শুনে মেপে আনবে যেন ছোট বড় না হয়। ঠিক মাপেরটি না হ'লে মানাবে না কিনা! এখন টেবিলটা গোল হওয়াতেই যত গোলযোগ উপস্থিত হল। লম্বা টেবিল হলে ফিতে ধরে মেপে নিয়ে যাওয়া যেতো! কিন্তু গোল টেবিলের মাপ নিই কী করে বলো ? ফ্যাসাদ বাধলো ওইখানে! গোল 'টেপ' তো আর নেই! যদি মাপে একটু ছোট বড় হয়ে যায় তাহলে আমায় মুশকিলে পড়ে যেতে হবে! স্ত্রী আর আমায় আস্ত রাখবেন না। তাই সবদিক দিয়েই কাজের সুবিধে হবে ব'লে আমি টেবিলখানাই নিয়ে যাচ্ছি দোকানে, ওরা দেখে শুনে ঠিক মাপের একখানা টেবিল ক্লথ দিতে পারবে। আমাকে আর পাঁচবার এই নিয়ে বদলাবদলি করতে দোকানে-দোকানে ছুটে বেড়াতে হবে না'!"

ঘরের ভেতর একেবারে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল! ছোটকার বন্ধুটি না তাই দেখে—দে' পিঠটান!

মিণ্টুর হাসি তখনও থামেনি। জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যাঁ ছোটকা, সত্যি বলছো ? না, বানিয়ে বলছো ? তোমার বন্ধু ভদ্রলোকটি কি সত্যিই টেবিল ঘাড়ে করে নিয়ে টেবিল ক্লথ কিনতে গেছলেন ?"

ছোটকা গম্ভীর হয়ে বললেন, "আমি যা বলি সব খাঁটি সত্যি! তা তোমরা বিশ্বাস করো আর নাই করো!"

টুকুদি বললে, "ছোটকাটা ভারী দুষ্টু! মিথ্যে যে এমন সত্যির মতো করে বলবেন যে, কার সাধ্য অবিশ্বাস করবে! কিন্তু সেদিন ছোটকা যা কাণ্ড করেছিলেন সেটা কিন্তু ভীষণ সত্যি!"

টুকুদি বললে, "বলো না ছোটকা সেটা! সেই যে, রাত তিনটের সময় তোমার ঘরে ঝন্ ঝন্ করে টেলিফোন বেজে উঠলো! তোমার ঘুম ভেঙে গেল। হয়ত আপনা আপনি কারুর বাড়ি কোনো বিপদ আপদ হয়েছে ভেবে তুমি সেই শীতের রাত্রে হুড়মুড় করে লেপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ফোন ধরলে। কে এত রাত্রে টেলিফোন করছে—হ্যালো!

"শোনা গেল পাশের বাড়ির ঘুমন্ত মুখুয্যে গানের সুরে বলছেন, 'আপনাদের কুকুরটা বড় বেসুরো একঘেয়ে চেঁচাচ্ছে মশাই! ওর ওই বেতালা বেয়াড়া ঘেউ ঘেউ বন্ধ করুন, নইলে আমার ঘুম হচ্ছে না!' ছোটকা তো রেগে আগুন! মনে মনে গাল দিলেও মুখে কিছু না বলে ফোন কেটে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। তারপরদিন ঠিক রাত তিনটের সময় তিনি

হাসির হাইড্রোজেন বোমা ফেটে পড়ল

টেলিফোনে ডেকে ঘুমন্ত মুখুয্যেকে বিছানা থেকে তুলে বললেন, 'দেখুন মশাই, কাল বড় ভুল হয়ে গেছলো আপনাকে বলতে! আমাদের তো কোনও কুকুর নেই! আপনি বোধ হয় ঘুমের ঘোরে ভুল করে কাল ও-পাশের বাড়ি বদলে এ-পাশের বাড়িতে রং নম্বরে রিং করেছিলেন! কিছু মনে করবেন না! আপনাকে এত রাত্রে কষ্ট দিলুম। কিন্তু কথাটা আপনাকে না জানিয়েও আমার কিছুতেই ঘুম হচ্ছিল না'!"

ঘরের ভিতর যেন হাসির একটা হাইড্রোজেন বোমা ফেটে পড়লো! এমন সময় বুড়ুদি' ঘড়ি দেখে বললে, "ছোটকা তিনটে বাজে! সিনেমার সময় হল। রেডি হও। আমরা এখনি তৈরি হয়ে আসছি।" ঝড়ের মতো বেরিয়ে পড়লুম সব ঘর ছেড়ে !

ছোটকাও উঠলেন সিনেমায় যাবার জন্য প্রস্তুত হতে।

আনন্দ মেলা

(দশ মিনিটের আবৃত্তি-অভিনয়)

[ছয়টি ছোট ছোট মেয়ে লাল নীল হলুদ ও সাদা বিভিন্ন রংয়ের রঙিন কাগজের ফুলের আকৃতি ফ্রকে জবা, গাঁদা, অপরাজিতা, কুন্দ প্রভৃতি ফুল সাজবে। কুন্দ সাজবে সবচেয়ে ছোট মেয়েটি। রজনীগন্ধা সাজবে ক্ষীণদেহ দীর্ঘাকৃতি মেয়ে। গাঁদা সাজবে মোটাসোটা ফর্সা মেয়ে। অপরাজিতা সাজবে কালো মেয়ে। জবার মাথায় লাল রিবন ও লাল ফ্রক, গাঁদার হলুদ রিবন হলুদ ফ্রক, এইরকমভাবে সাজ হবে]

জবা

ভোরের বেলায় সূয্যিমামা বললে—ও রাজকন্যে!
তোমায় দিলুম রংটি আমার চিরকালের জন্যে।
সূয্যিমামার অর্ঘ্যে আমায় সাজায় সবাই তাই।
চামুণ্ডা তাঁর গলার মালায় দিলেন কৃপায় ঠাঁই।
চাষীর মাটির উঠোন থেকে ফুলবাগানের সভা—
সবখানেতেই সমান আদর,—নামটি আমার জবা॥

রজনীগন্ধা

রাত্রির তরে সারাদিন ভরে চেয়ে থাকি একা একা;
সন্ধ্যাতারায় হারানো মায়ের আঁখি যেন পাই দেখা।
মহা আনন্দে খুশীর গন্ধ—অঞ্জলি দিই ছেয়ে:—
দিনে মরে যাই, রাতে বেঁচে উঠি, আমি রূপকথা-মেয়ে।
ভোরের রূপোর কাঠিতে আমার প্রাণহীন হয় দেহ;
রজনীগন্ধা, ক্ষীণতনু মেয়ে, সবাই করেন স্নেহ।

শিউলি

আগমনীর খবর নিয়ে ভোরের বেলায় আসি,
একটি রাতের ক্ষণিক আয়ু, সকাল হলেই বাসী।
কুঁড়ির থেকে মুখ বাড়ালেই ফুরোয় মায়ের আদর;
ঝাঁপিয়ে পড়ে শিশির-ঘাসে বিছোই ফুলের চাদর।
ছোট্ট হলুদ বোঁটায় সাদা পাপড়ি কটি মেলে—
শিউলি মেয়ে মর্ত্যে নামি,—শরৎঋতু এলে।

গাঁদা

হলুদ সোনার রোশনাই ভাই সারাটা শীত ভরে।
ঘাট বাট ছাদ উঠোন বাগান রাখছি আলো করে॥
উজ্জ্বল রঙের নিটোল দেহ নানান গড়ন বাঁধা,
শহর কিংবা গাঁয়ের মানুষ, সবার চেনা—গাঁদা॥

অপরাজিতা

রং যদিও মলিন, তবু সদাই হাসি আমি।
দশভুজা মায়ের পুজোয় আমার মালাই দামী॥
নীলাম্বরী জড়িয়ে থাকি, সূয্যিঠাকুর পিতা।
কারুর কাছেই হার মানি না, নাম—অপরাজিতা॥

কুন্দ

একরত্তি ছোট্টো কচি, মুখখানি টুলটুল।
গান গন্ধের ধার ধারি না, সবকিছুতেই ভুল॥
ক্ষুদে ক্ষুদে দুধে-দাঁতের মুক্তোঝরা হাসি।
নাম শুনবে?—কুন্দ কুসুম। এবার তবে আসি॥

রাজপুত্তুর / আশরাফ সিদ্দিকী

রাজপুত্তুর! রাজপুত্তুর!! তোমার তরে—তোমার তরে—
সারাটাদিন নিতুই শুধু মন যে আমার কেমন করে!
রিমিকঝিমি! রিমিকঝিমি!! বিজলীমুখর বাদল রাতে
রাজপুত্তুর! মন যে আমার বেড়ায় শুধু তোমার সাথে!
কোথায় আছে ময়নামতী? স্বপনপুরী কোথায় আছে?
কোথায় ফলে সোনার ডালে হীরার কুসুম গাছে গাছে?
সেই সেখানে সোনার খাট সোনার বরণ তনু রেখে
ঘুমাও তুমি—হঠাৎ কখন জাগলে সে কার স্বপন দেখে?
সাত-সমুদ্দুর তের নদী তেপান্তরের মাঠের শেষে
সেই সেখানে মায়ার পুরে রাক্ষসীদের নিঝুম দেশে
রাজকন্যা কংকাবতীর চোখের বারি নদী হয়ে
সেই সে দেশে নিঝুম পুরে ব্যথার সুরে চলছে বয়ে।

রাজপুত্তুর! ভাবনা কিসের? আমায় তুমি সঙ্গে নিলে
অমনি শতেক দানব আমি বধতে পারি তিলে তিলে!

দুইটি সবল পংখীরাজে দিগ্বিজয়ীর মোহন বেশে
ছুটবো মোরা পাশাপাশি মেঘের দেশে মেঘের দেশে...
পাহাড় সাগর অরণ্য মাঠ সব ছাড়ায়ে সব ছাড়ায়ে
থামবো মোরা অবশেষে নিঝুম পুরীর বটের ছায়ে!
হস্তে আমার ভয়াল ধনুক—সেই ধনুকের ভয়াল তীরে
রাক্ষসীদের শিরগুলি সব ধুলোর 'পরে ফেলবো ছিঁড়ে!

রাজপুত্তুর! বন্ধু আমার! লক্ষ্মী আমার!! তোমার তরে
সারাটাদিন নিতুই শুধু মন যে আমার কেমন করে॥

অট্টালিকা ও ডিঙ্গি

শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

কোনো এক ছোট্ট নদীর তীরে বিরাট এক অট্টালিকা। সেই অট্টালিকার পেছনে দিগন্ত বিস্তৃত ধান ক্ষেত। আর সেই ধান ক্ষেত ছাড়িয়েই চাষাদের পল্লী।

এই চাষীরাই সারাবছর ধরে সোনার ফসল ফলাত। হেমন্ত কালে যখন সোনা-ধান পাকত—বাতাসে হেলতো-দুলতো, সেই সময় চাষী-পল্লীতে আনন্দের সাড়া পড়ে যেত।

পথের পথিক দুদণ্ড সেখানে দাঁড়াতো। সামনের বটের গাছের ছায়ায় কোমরের গামছা বিছিয়ে ঝিরঝিরে শীতল হাওয়ায় গড়িয়ে তপ্ত গা-টা জুড়িয়ে নিতো।

এই সব কাণ্ড দেখে অট্টালিকা হিংসেয় ফেটে পড়ত। এত বিশাল অট্টালিকা। শত শত কামরা দামী দামী আসবাব-পত্র দিয়ে সাজানো, আকাশের মেঘ ফুঁড়ে যেন মাথা উঁচু করে রয়েছে...কিন্তু কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না: সবাই সোনা-ধানের গল্প করে। দাম্ভিক অট্টালিকা আপন মনে ছড়া কাটে—

আমি বিশাল অট্টালিকা সাত মহলা বাড়ি
আকাশ ছোঁয়া শির যে আমার
কার কাছে না হারি॥

ওদিকে চাষা-পাড়ার একটি ছোট ছেলে। তার রয়েছে একটি ছোট্ট ডিঙ্গি। যখন ক্ষেতের কাজ শেষ হয়ে যায়—ছেলেটি সেই ছোট ডিঙ্গিতে চেপে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি জমায়। নদীর ওপরের ছোট্ট ঢেউগুলি ডিঙ্গিটিকে আদর করে পিঠ চাপড়ে দেয়।।

ওদিকে ধান ক্ষেতেও সাড়া জাগে। ধান ক্ষেতের ডাকে কৃষক-কৃষাণীর দল খোলা-মাঠে ছুটে আসে, আনন্দে করতালি দিয়ে গান গায়। মা লক্ষ্মী তাদের দয়া করেছেন। সারা বছরে আর কোনো ভাবনা তাদের নেই।

চাষী-পাড়ার সকল অভাব এবার ঘুচবে।

নদী-তীরের অট্টালিকা চাষীদের আনন্দ-কোলাহল শোনে—আর হিংসেয় যেন জ্বলে মরে।

অট্টালিকার এত সৌন্দর্য—কিন্তু সেদিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। অট্টালিকার মনে হয় যে, ওই ধানের ক্ষেতকে গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। আর ওই যে চাষার ছেলের ছোট্ট ডিঙ্গিটা নদীর ধারের হিজল গাছের ডালে বাঁধা থাকে—ওটা যেন ওর চোখের বালি। নদীর ঢেউয়ের তালে তালে হেলতে দুলতে চলে,—অট্টালিকার মনে হয়, তার গা থেকে এক-খানা ইট খসিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারে ডিঙ্গিটার দিকে। তলা ভেঙে ডুবে যাক ওটা নদীর অতলতলে!

কিন্তু সকলের সব মনোস্কামনা ত পূর্ণ হয় না! তাই অট্টালিকার বিষ-দৃষ্টির সামনে থেকেও ক্ষেতের সোনাধান আরো বেড়ে ওঠে, আর চাষীর ছেলের ছোট্ট ডিঙ্গিটা তরতরিয়ে নদীর পথে এগিয়ে চলে। ছেলেটির গলার ভাটিয়ালী গান অট্টালিকার দেয়ালে এসে আঘাত করে। ঘৃণায় অট্টালিকার সারা শরীর শিউরে ওঠে।

সেই অট্টালিকার যিনি মালিক তিনি শহর-অঞ্চলে থাকেন। মাঝে মাঝে গ্রাম দেশে এসে এই অট্টালিকায় কয়েক মাস কাটিয়ে যান। তখন ঘরে-ঘরে ঝাড়-লণ্ঠন জ্বলে, সেই আলো এসে পড়ে নদীর জলে। গভীর রাতে অট্টালিকার অন্দর মহলে নাচ-গানের সাড়া পাওয়া যায়।

বহু লোক নিমন্ত্রিত হয় সেখানে। খাওয়া-দাওয়ার ধুম পড়ে যায় বেশ কয়েকদিন।

চাষী-পাড়ার লোকেরা অবাক হয়ে সেইদিকে তাকিয়ে থাকে। চাষীর ছেলেটা নদী পথে ডিঙ্গি চালাতে চালাতে হঠাৎ গানের কলি ভুলে যায়!

কিন্তু অট্টালিকার ভেতর থেকে তাদের কাছে আমন্ত্রণ আসে না।

চাষার দল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার নিজ নিজ কুটিরে ফিরে যায়।

আবার অট্টালিকার মালিক যখন শহর-অঞ্চলে ফেরে, একে একে অট্টালিকার আলোগুলি নিভে যায়। চাকর-বাকর দারোয়ানেরা সবগুলি জানলা বন্ধ করে দেয়। ফটকে পড়ে তালা-চাবি। অট্টালিকা আবার ঝিমিয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়ে।

সেবার অনেকদিন বাদে দেখা গেল—

সেই বিশাল অট্টালিকার চার পাশে লম্বা লম্বা বাঁশ বাঁধা হয়েছে।

চাষীরা খবর নিয়ে জানলে যে, আগাগোড়া বাড়িটা মেরামত করা হবে। নতুন করে রঙ

অট্টালিকার মনে হয়......

লাগানো হবে—দেয়ালে কপাটে জানালায়। আবার নতুন জৌলুস লাগবে অট্টালিকার গায়ে।

ব্যাপার কি—ব্যাপার কি?

না,—অট্টালিকার মনিবের ছেলের বিয়ে। মহাধুমধাম। অনেক টাকা খরচ হবে। শহর থেকে গোরার বাদ্যি আসবে।

ক্রমে ক্রমে আত্মীয়-স্বজনরা এসে জড় হল—সেই অট্টালিকাতে। বাড়ির সামনে বিরাট সামিয়ানা খাটানো হল। অনেক তাঁবু পড়ল সামনের মাঠে। অনেক নতুন আলো জ্বালা হল—সারা অট্টালিকা ঘিরে। কালো রাত যেন পূর্ণিমা রাতের মতো ঝলমল করতে থাকল।

বিয়ের দিন আরো অনেক বাদ্য-ভাণ্ড এলো। প্রচুর খানা-পিনা চললো। কিন্তু প্রতিবেশী চাষীর দলকে কেউ ডেকেও জিজ্ঞেস করলে না।

অনেক আলো, অনেক বাজি-পোড়ানো, অনেক আনন্দ-উৎসবের ভেতর দিয়ে অট্টালিকার মালিকের ছেলের বিয়ে শেষ হল।

আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়ল গোটা বাড়িটা। শোভাযাত্রার মশালগুলি নিভে এলো।

চাষী পাড়ার লোকেরাও ঘুমে অচৈতন্য। তাদের কেউ এই উৎসবে ডেকে আনেনি। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা দূরে থেকে বাজি পোড়ানো দেখে—ঠাকুমা-দিদিমার হাত ধরে ঘরে ফিরে গেছে।

শেষ রাত্তিরে হা-রে-রে-রে শব্দ। ডাকাত পড়েছে অট্টালিকাতে।

ডাকাতদল আগে থেকেই ওৎ পেতে বসে ছিল। এই বিয়েতে বহু সোনা-দানা-হীরে জহরৎ-এর আমদানী হয়েছে। বিয়ের পর গোটা বাড়িটা যখন ঝিমিয়ে পড়েছে, সিদ্ধি খেয়ে দারোয়ানের দল যখন অচৈতন্য, সেই সময় সুযোগ বুঝে ডাকাত দল হা-রে-রে-রে শব্দ করে অট্টালিকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সেই বিকট শব্দে চাষা-পাড়ার লোকেরা জেগে উঠল। তারা দেখতে পেলে বাইরের তাঁবু-গুলি আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলছে, অট্টালিকা লুণ্ঠন করছে—লাঠি হাতে দুষমনের মতো ডাকাত দল; আর মরা-কান্না ভেসে আসছে সেই বাড়ির অন্দর-মহল থেকে।

নাঃ, ওদেরকে বাঁচাবার আর কোনো উপায় নেই!

কত লোক যে আগুনে পুড়ে মরল—কেউ তার হিসেব রাখলে না।

সারাদিন খাটা-খাটুনির পর বাড়ির সবাই ঘুমে অচৈতন্য ছিল। তাই ডাকাত দলকে বাধা দেবার চেষ্টা কেউ করতে পারলে না।

গোটা বাড়িতে জেগেছিল শুধু বর আর কনে। তারা ডাকাতদের সাড়া পেয়ে কোন রকমে খিড়কির দরজা দিয়ে পালিয়ে এসেছে।

কিন্তু কোথায় পালাবে তারা? নদীর ধারে ছুটে এসে দেখলে, কোথাও একটি নৌকো নেই।

এখন উপায়!

কনের গা-ভরা গয়না।

একজন ডাকাত ওদের পালাতে দেখেছে। সেই ডাকাতটার দুই চোখ লোভে জ্বলছে। কনের এতগুলি সোনা-দানা-হীরে-জহরৎ-এর গয়না কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না।

মূর্তিমান যমের মতো মশাল হাতে সে ছুটে আসছে পেছনে।

বর-কনের বাঁচবার আর কোনো উপায় নেই। এমন সময় দেখা গেল—গান গাইতে গাইতে সেই চাষীর ছেলেটি ডিঙ্গি নিয়ে হিজল গাছের তলায় হাজির হয়েছে।

সহসা, তাকিয়েই সে বর-কনের বিপদ বুঝতে পারলে।

হাঁক দিয়ে বললে, ভয় কি দিদি, তোমরা আমার ডিঙ্গিতে উঠে এসো। তোমাদের দুজনকে আমি নদী পার করে দিচ্ছি। ডাকাতটা তোমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না।

ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকো বর-কনেকে নিয়ে তরতর করে এগিয়ে চললো।

ওদিকে নদীর তীরে আগুন-লাগা অট্টালিকার মনে হল—তার পুড়ে মরাই ভালো।

পরদিন সকালে সে মুখে দেখাবে কী করে?

বাঘের চোখ

লীলা মজুমদার

অঙ্কের ক্লাশে আমার বন্ধু গুপীর সব অংক ভুল হলো। আর সে-সব কি সাংঘাতিক ভুল তা ভাবা যায় না। বাঁশ গাছের অংকটার আসল উত্তর হলো পঁচিশ মিনিট, গুপীর হয়েছিল সাড়ে পাঁচটা বাঁদর। অমলবাবু তাই নিয়ে ওকে যা নয় তাই সব বললেন টললেন। গুপী শুধু অন্যমনস্ক ভাবে হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

টিফিনের সময় আমাকে বলল, "এই, ঝাল মটর খাবি?" আমি একটু অবাক হচ্ছি দেখে কাষ্ঠ হেসে বলল, "দ্যাখ, আসল জিনিসের সন্ধান পেয়ে গেছি। ওসব তুচ্ছ কথায় আমার আর কিছু এসে যায় না।"

এই বলে পকেট থেকে কাগজে মোড়া একটা ছোট্ট জিনিস বের করল। পুরু ময়লা কাগজে মোড়া, রাংতা দিয়ে জড়ানো একটা গুলি মতন। বললে, "কী, দেখছিস কী? কাগজটা একবার পড়ে দ্যাখ।"

লাল কালি দিয়ে খুব খারাপ হাতের লেখা। অনেক কষ্টে পড়লাম, 'অন্ধকারে চোখে দেখার অব্যর্থ প্রকরণ।' তারপর গিজিগিজি করে আরো কত যে কী লেখা তার মাথামুণ্ডু বুঝে উঠলাম না।

গুপী গুলিটাকে আবার কাগজে মুড়ে যত্ন করে বুকপকেটে রাখল। বললাম, "কী ওটা?"

"কী ওটা। চট করে কি আর বলা যায়? তবে সম্ভবত বাঘের চোখের মণি।"

"সেকি! তোমার না বেরাল দেখলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে, ওয়াক আসে, বাঘের চোখের মণি দিয়ে তুমি কী করবে?"

গুপী দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললে, "কাকে কী যে বলি! আরে, অন্ধকারে চোখে দেখবার গুণ পাওয়াটা কি যে-সে কথা? পারে সবাই ইচ্ছে মতো জন্তু জানোয়ার হয়ে যেতে?"

আমি তো অবাক। "আমার ছোড়দাদু কানের মধ্যে কি সব গান-বাজনা ঝগড়াঝাঁটি শুনতে পেতেন, তারপর অনেক ওষুধ টষুধ কোরে তবে সারল; এও সেই নাকি?"

গুপে রেগে গেল। বললে, "শোন্ তবে। বড়দিনের ছুটিতে মামাবাড়ি গেছলুম জানিস তো? প্রত্যেক বছর শীতকালে মামাবাড়ির সামনের মাঠে তিনদিন ধরে মেলা বসে। সে কি বিরাট মেলা রে বাপ! দেখলে তোর মুণ্ডু ঘুরে যেত। কি থাকে না ঐ মেলায়, সিনেমা, সার্কাস, হিমালয়ের দৃশ্যের সামনে চার আনা দিয়ে ফটো তোলা, দুমুখো সাপ, যাত্রাগান, কুস্তীর আখড়া, বাউল নাচ, দোকান পাট, তেলেভাজা, হাত দেখানো গণক-ঠাকুর—কিছু বাকি থাকে না।

"পাড়ার লোকে সাতদিন দুচোখের পাতা এক করতে পারে না। দুদিন আগে থাকতে গোরু-গাড়ির কাঁচকোঁচ, গাড়োয়ানদের ঝগড়া, ভিজে ঘুঁটের ধোঁয়া, আর অষ্টপ্রহর ছাউনি তোলার ঠুকঠাক। মেলার তিনদিন তো গান-বাজনা হৈ-হল্লোড়ে কান্না ঘুমুতে ইচ্ছেও করে না। তারপর দুদিন ধরে ভাঙা হাটে সস্তা দরে জিনিস কেনার সে কি হট্টগোল।

"তারপর যে যার গোরু-গাড়ি বোঝাই করে চলে যায়। মাঠের মধ্যে পড়ে থাকে কতক-গুলো উনুন তৈরীর পোড়া পাথর, খুঁটি পোতার গর্ত, ভাঙা খুরি আর ছেঁড়া চাটাই। কয়েকটি ময়লা কাগজের টুকরো আর শাল-পাতার ঠোঙা বাতাসে উড়ে উড়ে পড়তে থাকে। যত রাজ্যের নেড়ি কুত্তোরা এসে কি সব খুঁজে বেড়ায়। হঠাৎ যেন শীতটাও কি রকম ঝেঁপে আসে। সে একবার ওখানে ঐ সময় না থাকলে তুই বুঝবিনে।

"তবে যারা মনে করে, মেলা উঠে গেলেই মাঠে আর কিছু বাকি থাকে না, তারা যে কিছু জানে না এই কাগজে মোড়া জিনিসটাই তার প্রমাণ।"

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝলুম। বললুম, "ও, তুই বুঝি ওটাকে ঐ মাঠে কুড়িয়ে পেয়েছিলি, তাই বল্। তা এখন ওটাকে নিয়ে কি করতে হবে শুনি?"

গুপী উঠে পড়ে বলল, "ও! টিটকিরি হচ্ছে বুঝি? থাক তবে।" বলে সত্যি সত্যি ক্লাশে ফিরে গেল।

পরদিন ছিল শিবরাত্রির হাফ হলিডে। ধরলাম ওকে চেপে, "না রে গুপী, গুলিটার কথা বলতেই হবে। দুজনে মিলে ওর একটা হিল্লে করে নিতে পারব।"

হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকল

আসলে গুপীও তাই চায়। বললে, "বলিনি তোকে আমার মামাবাড়ির নাপিত মেঘলার কথা? রোগা সুঁটকো কুচকুচে কালো মাথায় একটাও চুল পাকেনি, তীরের মতো সোজা, এক শ হাত দূরে থেকে গাছের ওপর নাকি শকুনের চোখ দেখতে পায়; একদিনে পনেরো মাইল হেঁটে ওর গাঁয়ে গিয়ে আবার সেই দিনই ফিরে আসাকে কিছু মনে করে না। ওদিকে ও আবার দাদামশাইএর বাবারও দাড়ি কামাত। বয়সটা তা হলে ভেবে দ্যাখ্।

"তার সঙ্গে নাকি শ্যাম দেশে গেছল, সেখানে গভীর বনের মধ্যে কে এক ফুঙ্গি ওকে জল-পড়া করে দিয়েছিল, সেই থেকে নাকি ওর শরীর একটুও টসকায় না। গুম-গুম করে নিজের বুকে কীল মেরে বলে, 'তোরাই বল, কোন্ জোয়ানের শরীরে এর চে বেশী জোর।' ঐ মেঘলাই এই বড়িটা কুড়িয়ে পেয়ে আমাকে দিয়েছে।"

আমি বললুম, "কেন, তোকে দিলে কেন তুই কিছু করবি ভেবেছে নাকি মেঘলা?"

গুপী খানিক চুপ করে বলল, "আস কথা কি জানিস, মেঘলা লিখতে পড়তে জা না; বড়িটা আসলে কি ব্যাপার বুঝেই ওঠান নইলে কি আর অমনি অমনি দিয়ে দি ভেবেছিস নাকি। ভীষণ চালাক ঐ মেঘল বললে, দুমুখো সাপের ঘরের সামনেটা কুড়িয়ে পেয়েছে। বোধ হয় ফেলেই দিচ্ছিল আমি কাগজটার ওপর একটু চোখ বুলিয়ে আর কি ওকে হাতছাড়া করি। তখন ব্যা আমার কাছ থেকে পঁচিশ নয়া পয়সা নিয়ে তবে না আমাকে দিল।"

সত্যি সত্যি বলতে কি, অন্ধকারে দেখতে পাবার আমারও যথেষ্ট ইচ্ছে ছিল। গুপী কাছ থেকে কাগজটি নিয়ে আরেকবার পড়লাম একটু অদ্ভুত যে, সে বিষয়ে কোনোই সন্দে নেই। বললাম, "আচ্ছা, অন্ধকারে দেখতে পাওয়া মানেই তো অন্ধকারে আমাদের চোখ জ্বলজ্বল করবে? তার কিন্তু মে অসুবিধেও আছে।"

আছেই তো। তাই জন্যে যদি ভয় পে যাস তা হলে আর তোর এর মধ্যে এসে কা নেই। ভীতুদের কম্ম এ নয়। মেঘলা কাছে শুনেছি, ওর দাদামশাই মেলা মন্ত্রতন্ত্র জানত। যেমন, মানুষকে ছাগল কর ছাগলকে মানুষ করা, এমনি ধারা কত কি শুধু বড়িটা গিলে ফেললেই হলো না। অ সহজে হলেই হয়েছিল আর কি। নীচে সব লেখা আছে তার কোনো মানে বুঝ পারলি নাকি?

মনে হলো হয় তো সংকেতে লেখ হবেও বা। কি সব সংখ্যা টংখ্যা দেও গোড়াটা এই ধরনের—৩ উ ১ জো সো ১ সে ২ উ, মাঝে মাঝে তারা-চিহ্ন দেয়া। শুনেছি লণ্ডনের বিখ্যাত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডেও এই স গোপন সংকেত পড়বার জন্য মাইনে করা লোক থাকে। তবু একবার চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কি। তা বড়িটা গুপে কিছুতেই দেবে না শেষ পর্যন্ত বড়ি রইল ওর কাছে, কাগজ থেকে লেখাটুকু টুকে নিলাম।

গুপী বারবার আমাকে সাবধান করে দিতে লাগল। "যা তা একটা কিছু করে বসিসনে যেন। মেঘলার কাছে শুনেছি, ওরই এক মামা এক সাধুর সঙ্গে ভাব করে অন্ধকারে দেখার ওষুধ চেয়ে নিয়েছিল, কিন্তু পয়সা না দিয়েই পালিয়েছিল। তারপর থেকে মামা নিখোঁজ কিন্তু ওদের বাড়ির চারপাশে রোজ রাতে একটা বিরাট প্যাঁচাকে উড়ে বেড়াতে দেখা যেত। বড়িটা তাই আমার কাছেই রাখলুম।"

অনেক মাথা ঘামালাম লেখাটা নিয়ে। আমার পিসতুত ভাই মাকুদা কবিতা টবিতা লেখে, তাই নিয়ে প্রায়ই বকুনি টকুনিও খায়, ওর কাছে বুদ্ধি নিতে গেলাম। অবিশ্যি বড়ি ইত্যাদির কথা একেবারে চেপে গেলাম। বললাম, এগুলি একটা ওষুধের অনুপান, কিন্তু সংকেতে লেখা।

Cooch B

মাকুদা খুব মাথাটাথা নেড়ে খানিক ভেবে বলল "এ তো খুব সোজা, দে তো একটু কাগজ পেনসিল।" তারপর কাগজে লিখল তিনটে উট, এক জোড়া সোনার চেন, একটা সোডাওয়াটার, দুটো উল্লুক এইসব লাগবে আর কি। তারপর পেনসিলটা পকেটে পুরে মাকুদা উঠে পড়ে বলল, ঐ পেনসিলটা নাকি ওর। অনেকদিন থেকে পাচ্ছে না। অথচ আমি দস্তুর মতো বসবার ঘর থেকে ওটাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। থাক গে। যখন অন্ধকারে চোখে দেখতে পাব, তখন তো আর কোনো দুঃখ থাকবে না।

ঐ লেখা নিয়ে গুপীর সঙ্গে খুব একচোট তর্কাতর্কিও হয়ে গেলে। ওর এক বন্ধু আছে, ন্যাপলা, মাথাভরা তেল চুকচুকে কোঁকড়া চুল, এমনি একটা গায়ে-পড়া ভাব যে, দেখলেই পিত্তি জ্বলে যায়। আর গুপীর তো সে দিনরাত দস্তুরমতো খোসামুদিই করে; তাই দেখে গুপী আবার ওকে একেবারে মাথায় তোলে। ওকে নিয়ে এর আগেও গুপীর সঙ্গে আমার অনেকবার হয়ে গেছে। সেদিনও এক-চোট হলো।

গুপী আর লোক পায়নি, তাকে দিয়ে লেখাটা পড়িয়েছে। তার নাকি ভারী বুদ্ধি, নাকি পাশা খেলায় বড়দের হারিয়ে দেয়। সে লেখা দেখে বলেছে, ওর মানে তিন ফোঁটা উদক মানে জল, এক জোড়া সোনপাপড়ি, একদানা সোহাগা, আরো দু ফোঁটা উদক দিয়ে গুলে খেয়ে ফেলতে হবে। বুদ্ধিখানা দেখলে একবার। অথচ গুপী গলে জল। ওরকম বুদ্ধি নাকি কারো হয় না! বেশ একটা রাগারাগির পরে ঠিক হলো এখন কিছু করা নয়, এক্ষুনি স্যার এসে যাবেন বরং সন্ধেবেলা গুপীদের পেয়ারাতলায় যা হবার হবে।

সন্ধেবেলায় গিয়ে দেখি পেয়ারাতলা ভোঁ ভাঁ! জায়গাটা দস্তুরমতো নির্জন, পুরনো কালের বাগান, ঝোপঝাপে ভর্তি। দেখতে দেখতে অন্ধকার ঘনিয়ে এল, দূরে থেকে রাস্তার শব্দও শুনতে পাচ্ছিলাম, আবার কাছ থেকে বাগানের মধ্যেও নানারকম অদ্ভুত শব্দ হচ্ছিল। কে যেন সাবধানে হেঁটে বেড়াচ্ছে, লুকিয়ে থেকে কিসে যেন নিশ্বাস চাপতে চেষ্টা করছে। বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

ভয়ে ভয়ে ইদিক উদিক তাকাতে লাগলাম। গুপীর কিছু হয়টয়নি তো? গুপীই কিছু হয়নি তো? ওর কাছে তো লেখাটাও ছিল, বড়িও ছিল। যদি ঐ ন্যাপলাটার বুদ্ধি নিয়ে বড়ি গিলে বসে থাকে।

হঠাৎ আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। চেয়ে দেখি দূরে রঙন ঝোপের মধ্যে থেকে এক জোড়া সবুজ চোখ আমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে। মাটি থেকে দু হাত উঁচুতে হবে। কি আর বলব, হাত পা পেটে সেঁদিয়ে গেল। যাই হোক, গুপীর যতই দোষ থাকুক, পুরনো বন্ধু তো বটে! কিন্তু সবুজ চোখ দুটোতে মনে হলো কেমন একটা খিদে খিদে ভাব! গুপীই হয় তো ঝোপের মধ্যে থাবা গেড়ে বসে আছে, আমি একটু নড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়বে—
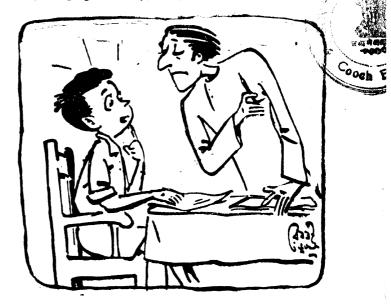
পেনসিলটা পকেটে পুরে মাকুদা উঠে পড়ল

আর দাঁড়ালাম না। যা থাকে কপালে, পড়িমরি করে ছুট লাগালাম। একেবারে বাড়িতে এসে থামলাম। সেখানেও কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? এ বাড়ি তো ওর চেনা, শুঁকতে শুঁকতে যদি এসে হাজির হয়? জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে হয়তো বা স্বচ্ছন্দে গলে যাবে।

আস্তে আস্তে জানলাটা বন্ধ করে দিলাম। সবে একটু বসেছি, দরজার বাইরে কিসের শব্দ! ছুটে গিয়ে দরজাটাকে ঠেসে ধরলাম।

বাবা জোর করে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে বললেন, "সন্ধেবেলা তোরা লাগিয়েছিস কি? ওদিকে গুপীদের ওখানে এক কাণ্ড!"

ভয়ে ভয়ে বললাম, "বেঁধে রেখেছে?"

বাবা তো অবাক! "বেঁধে রেখেছে কি! সে বিরাট এক বাদশাহী জোলাপের বড়ি কি সব দিয়ে খেয়ে একেবারে কুপোকাৎ! এখন আর নড়বার চড়বার জো নেই। ওটা নাকি ওর মামাবাড়ির কে এক নাপিত মজা করবার জন্য দিয়েছিল। যে কাগজে মুড়ে দিয়েছিল, তাতে কি একটা উল বোনার প্যাটার্ন লেখা ছিল। কাকে দিয়ে পড়িয়েছে সেটাকে, কি বলতে কি বলেছে সে, সোহাগাটোহাগা দিয়ে বড়ি খেয়ে বাছাধন সারা বিকেল ছুটোছুটি! এখন ডাক্তার এসে ঘুমপাড়ানি ওষুধ দিয়েছে। কি, শুয়ে পড়ছিস যে? তোরও কি শরীর খারাপ নাকি?"

কিন্তু গুপীদের পেছনের বাগানে তবে ও কার চোখ?

আশ্বিনের কবিতা

শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুলবাগানের টুনটুনিটা ডাকছে কাকে:
নীলমাথা ওই আবছা দূরের আকাশটাকে
চল ছুঁতে যাই,
জানিস তো ভাই
ওর ওপারেই রূপকাহিনীর স্বপ্নপুরী!

সবুজ ঘাসে শরৎ রোদের লুকোচুরি;
শিউলীফুলের গন্ধ
আগমনীর গানের সাথে পাতাচ্ছে সম্বন্ধ।
চল ছুটে যাই দুষ্টু হাওয়ার সঙ্গে আজ
ভাসিয়ে বেড়াই রূপকাহিনীর পঙ্খীরাজ,
দেশবিদেশে কই আমাদের আশ্বিনে আনন্দ।

রঙনপুরের রানী
কাশের বনে মেলে দিয়েছেন জরীর আঁচলখানি।
সেই থেকে যে কত পাখির ভিড় সেখানে;
হলুদ নদী এগিয়েছে সে-ও কিসের টানে।
নিতাই দাসের একতারাতে
জমছে খুশী সেই সুরে তার সুর ঝরাতে!

ফুলবাগানের টুনটুনিটা ডাকছে কাকে:
দিকে দিকে উঠছে সাড়া সেই সে ডাকে!

সহযাত্রী

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

নির্মল চৌধুরী মস্ত বড় ডাক্তার। খুব নাম-যশ তাঁর, পয়সারও অভাব নেই। দুখানা মোটর গাড়ি।

কিন্তু তবু নির্মলবাবুকে সেদিন বাসে চড়তে হয়েছিল। তার কারণ দুখানা গাড়িই একসঙ্গে বিগড়েছে। অবশ্য রোগী দেখার বিশেষ অসুবিধা হচ্ছিল না। কারণ, যাদের গরজ তারা নিজেরাই নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছিল। সেদিন বাসে চড়েছিলেন তিনি অন্য কারণে। মেয়েকে দেখতে যাচ্ছিলেন বালিগঞ্জে। ঠাকা ত্রিশটি মিনিট অপেক্ষা করেও যখন ট্যাক্সি পেলেন না, তখন 'দুত্তোর' বলে বাসেই চড়লেন। মনে করলেন, অনেক দিন ত ট্রামে-বাসে চড়া হয়নি—মন্দ কি!

ঠাসাঠাসি ভিড় বাসে। এমনিতেই আজকাল বাসে চড়া কষ্টকর, তায় আবার ট্রাম ধর্মঘট চলেছে। তবু সরকার অনেক বেশী বাস রাস্তায় ছেড়েছেন, নইলে কী যে হত!

বাসে গুঁতোগুঁতি করে ত উঠলেন ডাক্তারবাবু। বসবার জায়গা পেলেন না।

বসবার জায়গা পেলেন না

বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল তাঁকে, অবিরাম ধাক্কা আর বাসের হেঁচকা টান থেকে নিজেকে বাঁচাতে বাঁচাতে একেবারে রাসবিহারী এভিনিউর মোড়ে এসে প্রথম বসবার জায়গা পেলেন।

"টিকিট!"

কনডাক্টর এসে টিকিট চাইল। এর আগেও চেয়ে গেছে কয়েকবার; কিন্তু ডাক্তার চৌধুরী ইচ্ছে করেই দেননি। দু-হাতে 'রড' ধরে টাল সামলাতে হচ্ছিল, টাকাটা দেন কোন হাতে? এইবার দিলেন। কিন্তু শুধু তিনি নন, তাঁর পাশের যাত্রীটিও বোধহয় এতক্ষণে ভাড়া দেবার সুযোগ পেল—সেও একটি টাকা বার করে দিল কনডাক্টরের হাতে। দিল দিলই—অত লক্ষ্যও করেননি ডাক্তারবাবু, কিন্তু একটা ব্যাপারে হঠাৎ তিনি অবহিত হয়ে উঠলেন। কনডাক্টর তাকে পনরো আনা পয়সা ফেরত দিতেই সেই লোকটি বলে উঠল, "না, না, আমার ভাড়া অনেক বেশী হবে যে, আমি শ্যামবাজার থেকে আসছি। ভিড়ের মধ্যে অনেকবার ডেকেছি আপনাকে, আপনি শুনতে পাননি!"

ভাল করে এবার তাকিয়ে দেখলেন ডাক্তার চৌধুরী। সামান্য অবস্থার লোক, ময়লা ধুতি পরনে, গায়ে একটা জামা পর্যন্ত নেই, শুধু গেঞ্জি, খালি পা। উত্তরীয় বলতে কাঁধে একটি গামছা।

এর আগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরও অনেক সহযাত্রীকে দেখেছেন ডাক্তার চৌধুরী। ভাল ভাল দামী স্যুট-পরা ভদ্রলোক, অনেকেই অফিসের ফেরত বাসে উঠেছেন, কেমন সুকৌশলে তাঁরা এড়িয়ে যাচ্ছেন ভাড়া দেওয়ার দায়টা। কনডাক্টর হেঁকে চলে যাচ্ছে, কিন্তু তাঁরা যেন শুনতেই পাচ্ছেন না—এমনি ভাবে আর একদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দু-একজন ওরই মধ্যে আগে-পিছে করে কনডাক্টরের সান্নিধ্য বাঁচাচ্ছেন। ডাক্তারবাবুর সঙ্গেই উঠেছিলেন বৌবাজারের মোড় থেকে এক ভদ্রলোক, তাঁর বয়স অন্তত ষাট হবে। গায়ে মটকার পাঞ্জাবী, হাতে রুপো-বাঁধানো লাঠি। কনডাক্টর ভাড়া চাইতেই সংক্ষেপে 'হয়ে গেছে' বলেই ধাঁ করে নেমে পড়লেন। অথচ ডাক্তারবাবু গোড়া থেকেই দেখছেন—টিকিট তিনি কাটেননি কস্মিনকালে!

ডাক্তারবাবু একটু একটু আলাপ শুরু করলেন পাশের যাত্রীটির সঙ্গে। ওর নাম পরেশ, দরজা-জানালায় রং দেওয়ার কাজ করে। বাঁধা কোন কাজ নেই, যখন পায় তখন দুটো পয়সা আসে। তাও আজ দিনকতক কাজে যেতে পারেনি। ছেলেটার খুব অসুখ, বাঁচে কিনা ঠিক নেই। ঘরেও পয়সা নেই একটা—কয়েকদিন আগে শ্যামবাজারে এক বাবুর বাড়ি কাজ করেছিল, ছটা টাকা পাওনা। সেই টাকা নিতেই গিয়েছিল। বাবু দু-ঘণ্টা বসিয়ে মাত্র দুটো টাকা দিয়েছেন। এত দেরী হয়ে গেছে বলেই সে বাসে চড়েছে—নইলে এতগুলো পয়সা ভাড়া দেবার মত তার অবস্থা নয়।

কথা কইতে কইতে পণ্ডিতিয়ার মোড় এসে গেল। ডাক্তারবাবুকে নামতে হবে; কিন্তু পরেশও সেখানে নেমে পড়ল।

চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোথায় থাকো এখানে?"

পরেশ বলল, "এই যে, এই রাস্তায়। আর বাবু, আমাদের থাকা—বস্তির একটা ঘরে মাথা গুঁজে থাকি!"

হঠাৎ কী মনে হল ডাঃ চৌধুরীর, তিনি বললেন, "চল তোমার ছেলেকে দেখে যাই। আমি ডাক্তার।"

পরেশ ত প্রথমটা তার কানকে বিশ্বাসই করতে চায় না। তারপর যখন বুঝল যে, ডাক্তারবাবু সত্যি কথাই বলছেন, তখন তার চোখে জল এসে গেল। সে সসম্ভ্রমে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ওঁকে।

নোংরা বস্তির মধ্যে স্যাঁতসেঁতে ঘর। এমন ঘরে ঢোকা ডাঃ চৌধুরীর অভ্যাস নেই কখনও। দুর্গন্ধে ও বন্ধ হাওয়ায় যেন দম বন্ধ হয়ে আসে, তবু তিনি ঘরে ঢুকে কোনমতে ওদের একমাত্র টুলটিতে বসলেন। একটা ভাঙা চৌকীর ওপর ময়লা কাঁথায় ছেলেটা শুয়ে আছে, জ্বরে অচৈতন্য একেবারে। মাথার কাছে বসে বোধহয় পরেশের

কিন্তু বাবু, আমার কাছে ত—

বৌ, বাতাস করছে আর চোখ মুছছে!

রোগীর দিকে চেয়েই চমকে উঠেছিলেন ডাঃ চৌধুরী। হাত তুলে নাড়ী দেখতে গিয়ে চক্ষুস্থির! ভাগ্যে চামড়ার পকেট-কেসটা তাঁর সঙ্গেই ছিল। তিনি আর কথা না কয়ে তাড়াতাড়ি কেস খুলে কোরামিন বার করে ছেলেটার মুখে কয়েক ফোঁটা ঢেলে দিলেন। তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দিলেন এক ইনজেকশন।

এসব উনি করছিলেন পরেশের দিকে না চেয়েই। এইবার ওর দিকে চাইবার অবসর হল তাঁর। বললেন, "তোমার ছেলের অসুখ খুব শক্ত। আমি একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি নিয়ে এসো'গে। কাছেই আমার মেয়ের

বাড়ি, তাকে দেখে আমি এখনই ঘরে আসছি, তুমি ওষুধ আনতে আনতে আমি এসে পড়ব। আর একটা ইনজেকশন দিয়ে তবে যাবো আমি!"

পরেশের মুখে কথা নেই, গলা ওর আড়ষ্ট হয়ে গেছে ভয়ে, সংকোচে, কৃতজ্ঞতায়। কোনমতে শুধু বললে, "কিন্তু বাবু, আমার কাছে ত—"

"সে আমি জানি। এই দশটা টাকা নিয়ে যাও, ওষুধটা কিনে আনগে তাড়াতাড়ি। নাও, নাও—কোন সংকোচ করো না। ছেলের জীবনটা আগে, না তোমার চক্ষুলজ্জাটা আগে? বেশ বড় ডাক্তারখানায় যেও কিন্তু!"

পরেশ অগত্যা টাকাটা নিয়ে ছুটল চৌমাথার বড় ডাক্তারখানাটায়। সেখানকার বাবু প্রেসক্রিপশানটায় সই দেখেই চমকে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোন্ বাড়ির লোক, কার অসুখ হয়েছে?"

মানে, এত বড় ডাক্তার যখন ডেকেছে তখন বড়লোকের বাড়ি নিশ্চয়ই, আর ওষুধ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে, রোগও শক্ত অর্থাৎ বেশ মোটা খদ্দের হবে নিশ্চয়ই—একটু জেনে রাখা দরকার।

পরেশ বলল, "আজ্ঞে অসুখ আমার ছেলেরই—"

"তোমার ছেলের অসুখ? কোথায় থাকো তুমি?" কটমটিয়ে চাইলেন ডাক্তারখানার বাবুটি।

"আমি থাকি ঐ ওধারের এক বস্তিতে।"

"আর তুমি এই ডাক্তার ডেকেছ! কী বলছ তুমি? পাগল নাকি?"

"আজ্ঞে বাবু আমি কি ডাক্তার ডাকতে পারি! উনি নিজে এসেছেন দয়া করে। ওষুধের দামও দিয়েছেন তিনি!"

"ও! তাই নাকি? আশ্চর্য ত! ওঁকে পেলেই বা কোথায়? জানো তুমি, উনি কী দরের ডাক্তার? একবার রোগী দেখতে গেলে উনি চৌষট্টিটি টাকা ভিজিট নেন, খুব বড়লোক ছাড়া ওঁকে কেউ ডাকতে পারে না।"

পরেশ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ওষুধ নিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতেই বাড়ি ফিরে এল।

কিন্তু ডাক্তার চৌধুরী তারও আগে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। "এনেছ ওষুধ? দাও দাও—"

ইনজেকশন দেওয়া শেষ করে তিনি যখন পিচকিরি ধুচ্ছেন—পরেশ তাঁর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

"আপনি মানুষ নন বাবু, দেবতা। আমি সব শুনেছি—আপনি কত বড় ডাক্তার! এত দয়া আপনার! আমার ছেলেটাকে বাঁচাতে যা করলেন—এ যে কেউ বিশ্বাস করবে না!"

হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল সে। এলোমেলো কথা বলতে লাগল কান্নার ফাঁকে ফাঁকে।

"এই দ্যাখো পাগল! দয়া কি, তুমি যে আমার বন্ধু পরেশ। বন্ধুর ছেলেকে বাঁচাবার চেষ্টা করব না!"

"আমাকে আর ও-কথা বলে পাপ বাড়াবেন না। এমনিই ত আপনার দেনা জীবনে শোধ করতে পারব না।"

"দূর পাগল! তুমি আমার বন্ধু, ও আমার বন্ধুর ছেলে। এর মধ্যে দেনার কথা নেই। আমি সত্যিই বলছি পরেশ, এত দিন ধরে এত লোক দেখলাম, বন্ধুত্ব করবার মত মানুষ পাইনি। এই প্রথম পেয়েছি তোমাকে। তুমি সত্যিই আজ থেকে আমার বন্ধু। আমার সাধ্যে যদি কুলোয়, তোমার ছেলেকে মরতে দেব না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। কাল সকালেই আমি আবার আসব।"

পাখির ফাঁকি

মনোজিৎ বসু

রাজপুত্তুর কমলকুমার বেরিয়েছে শিকার করতে।

সঙ্গে হাতি নেই, ঘোড়া নেই, সৈন্য সামন্ত নেই, লোকজন কেউ নেই।

একেবারে একা। হাতে শুধু তীর-ধনুক, একটা জাল, আর একটা খাঁচা।

এ-বন ও-বন করে কত বনেই না ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু মনের মতো শিকার আর কিছুতেই মেলে না।

একদিন যায়, দুদিন যায়, তিনদিন যায়। এমনি করে পার হয়ে যায় কত-না দিন। তবু শিকার করা আর হয় না। রাজার ছেলে মুখ মলিন করে রাজবাড়িতে ফিরে আসে।

ব্যাপার দেখে সকলেই অবাক! কী এমন শিকার যে, এতদিনেও মিললো না?

রাজা শুধান, রানী শুধান, রাজবাড়ির সকলেই সে-কথা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু রাজকুমারের মুখে জবাব নেই। সে শুধু বলে, "আগে আমি শিকার ধরে, সকল কথা বলব পরে।" হেঁয়ালি শুনে সকলে আরও অবাক হয়। রাজা-রাণীর ভাবনা বাড়ে।

ব্যাপারটা কেউ-ই জানে না। জানে শুধু রাজকুমারী কিরণমালা। রাজা মানিক বর্মার একমাত্র মেয়ে সে। তারই সঙ্গে বিয়ে হবার কথা রাজা সূর্য সিংহের একমাত্র ছেলে কমলকুমারের।

রাজকুমারের মুখে জবাব নেই

পাশাপাশি দুই রাজ্যের রাজা মানিকবর্মা আর সূর্যসিংহ। শুধু রাজা নন, পরস্পরের বন্ধু।

কমলকুমার আর কিরণমালা যখন খুব ছোট, তখন থেকেই তাঁরা ঠিক করে রেখেছেন, ওদের দুজনের বিয়ে দিয়ে বন্ধুত্বকে আরও নিকট করবেন, হবেন পরস্পরের আত্মীয়।

একই সঙ্গে খেলাধুলো, একই সঙ্গে পড়াশুনো। কমলকুমারের সঙ্গে তাই কিরণমালার খুব ভাব। সেই কিরণমালা বায়না ধরেছে, তাকে একটা হলদে পাখি ধরে এনে দিতে হবে। যে হলদে পাখির মাথায় ঝুঁটি, আর বুকের কাছটা লাল। কাউকে দিয়ে সে-পাখি ধরে এনে দিলে হবে না, ধরতে হবে রাজপুত্তুর কমলকুমারকে নিজেই। তবেই তো সে বুঝবে, রাজ-কুমারের শিকারের কত দৌড়!

কিরণমালার কথা শুনে কমলকুমার

প্রথমটা খুব একচোট হেসেছিল। বাঘ নয়, সিংহ নয়, সামান্য একটা পাখি! এ-আর এমন কি শক্ত কাজ! কত বাঘ-ভাল্লুক শিকার করে এনেছে সে, সামান্য একটা হলদে পাখি, ধরতে পারবে না?

কিন্তু এখন সে টের পাচ্ছে ব্যাপারটা কত কঠিন।

হলদে পাখি সে অনেক দেখেছে বনে। কিন্তু মাথায় ঝুঁটি আর বুকের কাছটা লাল—এমন হলদে পাখি একটাও নজরে পড়লো না তার, এতদিন ঘোরাঘুরি করেও।

তবু হার মানলে না রাজকুমার।

আর একদিন ভোর-না-হতেই বেরিয়ে পড়লো একা, তীর-ধনুক, জাল আর খাঁচাটা নিয়ে।

অনেক ঘোরাঘুরির পর, রাজকুমার হঠাৎ দেখতে পেল, বনের একটা গাছের ডালে বসে আছে তার শিকার। হ্যাঁ, ঠিক যেমনটি সে খুঁজছে এতদিন ধরে। ঐ তো হলুদ বরণ গায়ের রঙ, মাথায় কেমন ঝুঁটি। ভালো করে দেখলে, বুকের কাছটাও লাল। আনন্দে সারা শরীর যেন নেচে উঠলো রাজকুমারের।

কমলকুমার তাড়াতাড়ি জালটা পেতে, তার ওপরে কিছু খাবার ছড়িয়ে দিয়ে, নিজে গিয়ে আড়াল হলো একটা গাছের পাশে। জালের দড়িটা রইলো তার হাতে।

বসে আছে তো বসেই আছে। শিকার কিন্তু আর জালে পড়ে না!

পাখিটা একবার এ-গাছে, একবার ও-গাছে উড়ে বেড়াচ্ছে।

না, ঐ তো গাছ থেকে নেমে এলো পাখিটা। আসছে, আসছে। খাবারের দিকে নজর পড়েছে তার। যাক, এবারে আর পালাবে কোথায়? জালের দড়িটা বেশ কায়দা করে ধরে রাখল কমলকুমার।

এক, দুই তিন। হলদে পাখিটা যেই না খাবারের লোভে জালে এসে পড়েছে, এমনি রাজপুত্তুর হাতের দড়িটা ধরে মারলে এক টান। আর যায় কোথায়? জালে ফাঁস লেগে গেছে! ঝুঁটিওলা হলদে পাখি এবারে বন্দী। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো রাজকুমারের মুখ।

এতদিনের পরিশ্রম তার সার্থক হলো। কমলকুমার মনে মনে বললো—'দেখে যাও রাজকুমারী, শিকার করতে পারি কি না পারি। ঝুঁটিওলা হলদে-পাখি, বুকের কাছটা লাল—আজকে থাক, দেখতে পাবে সকাল হলে কাল।'

রাত করে সে আর ঘোড়া ছুটিয়ে যাবে না মানিকবর্মার রাজপ্রাসাদে। দূর তো বড় কম নয়।

অনেক পরিশ্রম হয়েছে তার। সে আজ বড় ক্লান্ত।

এদিকে হলো এক কাণ্ড।

খাঁচার মধ্য থেকে পাখিটা হঠাৎ কথা বলে উঠলো। কমলকুমারের দিকে তাকিয়ে সে বললে, "দোহাই তোমার রাজপুত্তুর, ছেড়ে দাও আমাকে। আমাকে নিয়ে গিয়ে তোমার কী লাভ হবে? আমি তো কোন দোষ করিনি, তবে কেন বন্দী করলে আমায়? দোহাই তোমার, ছেড়ে দাও আমাকে।"

ভারী অবাক হলো রাজকুমারী পাখিটার কথা শুনে। কেমন স্পষ্ট ভাষায় কথা বলছে সে। তাহলে তো যে-সে পাখি নয়। নিশ্চয়ই ওকে জাদু করেছে কেউ। আসলে হয়তো পাখিই নয়। কমলকুমারের কী যেন মনে হলো। সে বললে, "বেশ, তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু তার বদলে কী দেবে আমায়?"

পাখি বললে, "এমন তিনটি কথা তোমায় শোনাব, যে-তিনটি কথা মেনে চললে জীবনে কোনোদিন তুমি অসুখী হবে না, আর সকল কাজেই সফল হবে তুমি।"

পাখির এই কথা শুনে রাজকুমার ভাবলে, 'তাহলে আর বাধা কি? জীবনে যখন অসুখী হব না, আর সকল কাজেই সফল হব, তখন আর পাখিটাকে নিয়ে গিয়ে কী হবে?' শেষ পর্যন্ত হলদে-পাখিটাকে সে ছেড়েই দিলে।

খাঁচার বাইরে এসে পাখিটা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

তারপর বললে, "শোনো তবে সেই তিনটি কথা। প্রথম কথা হলো—মন মানে না এমন কোনো কথা বিশ্বাস করবে না। দ্বিতীয় কথা—এমন কোনো কাজ করে পস্তাবে না, যে-কাজ আর দ্বিতীয়বার করতে না পার। তৃতীয় কথা বা শেষ কথা হলো—কখনও কোনো অসম্ভব কাজ করতে যেও না। গেলেই বিপদে পড়বে।"

পাখির কথা শুনে, কমলকুমার তো একেবারে থ! এ আর এমন নতুন কথা কি? এ-সব কথা তো সকলেই জানে। সে তখন রেগে গিয়ে বললে, "খুব কথা বললি পাখি, ভাবিস্ আমি বোকা নাকি? ফাঁকি দিয়ে পালাতে চাস্, দেখি এবার কোথায় যাস!" এই বলে সে পাখিটাকে খপ করে ধরতে গেল। কিন্তু ফুড়ুৎ করে পাখিটা গেল দূরে সরে। সেখানে থেকে বললে, "কি বোকা, কি বোকা! আমার বুকের কাছটায় যেখানে লাল, সেখানে রয়েছে একটি মানিক, সেটা যদি একবার দেখতে পেতে, তবে কি আর কথায় ভুলতে?"

পাখির এই কথা শুনে, আরও রাগ হলো কমলকুমারের। একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়ে পাখিটা কি তবে পালিয়েই যাবে? না, কিছুতেই তা হতে দেবে না সে। পাখিটাকে সে ধরবেই, যেমন করে পারে। তার বুকের ঐ মানিকটা পেতেই হবে তাকে।

এই বলে যে-গাছটায় পাখিটা উড়ে গিয়ে বসেছিল সেই গাছে উঠতে গেল কমলকুমার। কিন্তু, কিছুটা উঠতে-না-উঠতেই পা পিছলে একেবারে ধপাস। গাছের ডালে বসে হলদে-পাখিটা তখন হেসে উঠলো রাজকুমারের কাণ্ড দেখে। তারপর বললে, "আমার কথা যেমন শুনলে না, তেমনি ফল পেলে হাতে হাতে। আমি বলেছিলাম, মন মানে না এমন কোনো কথা বিশ্বাস করবে না। অথচ, তাই তুমি করলে। পাখির বুকে কখনও মানিক থাকে? দ্বিতীয় কথা বলেছিলাম—এমন কোনো কাজ করে

পা পিছলে একেবারে ধপাস

পুজোর ছুটি এলো

প্রভাকর মাঝি

পুজোর ছুটি এলো রে ঐ,
শিউলি ঝুরু ঝুরু,
হল শিশির-পড়া শুরু।
অথৈ নীলের সমুদ্দুরে
সাদা বকের দল যে উড়ে—
কচি রোদের ছোপ লেগেছে
দুব্বো ঘাসে ঘাসে।
বলতো টুটু,
আজ সেথা কি মুক্তা হয়ে হাসে?
পুজোর ছুটি এলো রে ঐ,
শিলাই নদীর কূলে,
তাই কাশের চামর দুলে।
ইস্কুলেতে গিয়েছে যে
পুজোর ছুটির ঘণ্টা বেজে—
হিমেল হাওয়া এলোমেলো
বইছে চারিপাশে।
ভাবছে বাবুল উদাস মনে—
ছোড়দি কবে আসে।
পুজোর ছুটি এলো রে ঐ,
শানাই বেজে যায়,—
এলো মনের আঙিনায়।
আয় রে পুজোর মেলায় জুটি
আনন্দে খাই লুটোপুটি—
শুকনো মুখে রয়েছে যে টানবো তারে কাছে।
পুজোর দিনে গোমরা মুখে
থাকতে দূরে আছে?

(পাখির ফাঁকি—শেষাংশ)

পস্তাবে না, যে-কাজ আর দ্বিতীয়বার করতে না পার। অথচ, সেই কাজই তুমি করলে! আমাকে ছেড়ে দিয়ে মনে মনে তুমি পস্তাচ্ছিলে, কিন্তু দ্বিতীয়বার ধরতে গিয়ে মিথ্যেই হয়রান হলে। আমার তৃতীয় বা শেষ কথা ছিল—কখনও কোনো অসম্ভব কাজ করতে যেও না। অথচ, সেই অসম্ভব কাজই করতে গেলে তুমি। গাছে চড়ে কখনও পাখি ধরা যায়? আমার ডানা রয়েছে, আমি উড়ে পালাতে পারি না? জেনেশুনেও, সেই অসম্ভব কাজই করতে গেলে তুমি। এখন পড়ে গিয়ে কেমন লাগছে? যাও, এবারে বাড়ি গিয়ে আমার কথা তিনটি মেনে চলো।"

এই বলেই হলদে-পাখি উড়ে পালালো। লজ্জায় লাল হয়ে রাজকুমার তাকিয়ে রইলো সেই দিকে। মনে মনে ভাবলে—রাজকুমারী কিরণমালার কাছে মুখ দেখাব কেমন করে!"

তিড়বিড়ে সিং

শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র

তো মরা মরা মানুষ বাঁচাতে পারো? এ আবার যেমন তেমন মরা নয়, টুকরো টুকরো করে কাটা। কী? পারো না তো? না পারো তো শিখে নাও।

নীচে এক নম্বর ছবির টুকরো টুকরো করে কাটা, অর্থাৎ হাত, পা, ধড় আলাদা করা যে লোকটির ছবি দেখতে পাচ্ছো—তিনিই হলেন স্বর্গত তিড়বিড়ে সিং। ইচ্ছা করলেই তোমাদের যে-কেউই এ'র হাত, পা-গুলো জোড়া দিতে তো পারোই, এমন কি তাঁকে জীবন্ত পর্যন্ত করে তুলতে পারো। এখন কেমন করে করবে মন দিয়ে শোনো।

প্রথমেই এক নম্বর ছবির মাপে এক টুকরো পেস্টবোর্ড বা কার্ডবোর্ড, একটা কাঁচি ও খানিকটা টোয়াইন সুতো জোগাড় করো। আর যদি রং করতে চাও তবে তোমার রং-এর বাক্সটাও হাতের কাছে রাখো। বাড়িতে যদি গঁদের আঠা থাকে তবে তাই, আর না থাকলে একটু ময়দা ফুটিয়ে লেই তৈরি করে নাও।

এবারে এক নম্বর ছবিটা কাঁচি চালিয়ে কেটে নাও। তারপর পেস্টবোর্ডটার এক পিঠে আঠা বা লেই মাখিয়ে ছবিটা তার ওপরে বেশ করে চেপে চেপে এ'টে দিয়ে একটা ভারী বই-এর তলায় চাপা দিয়ে রেখে দাও। যখন বুঝবে শুকিয়ে গেছে, তখন সেটা বার করে নিয়ে কাঁচি দিয়ে খুব

১নং ছবি
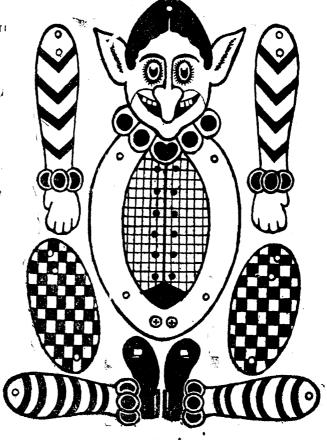
সাবধানে ধড় ও হাত-পাগুলোর প্রত্যেকটি আলাদা করে কেটে নাও। যদি রং করতে চাও, তবে তোমাদের ইচ্ছা মতো রং করতে পারো। তবে একটা হাত বা একটা পা যে-ভাবে রং করবে সেগুলির জোড়া অন্য হাত-পাগুলোও ঠিক সেইভাবে রং করবে,—নইলে খুব বিচ্ছিরি দেখতে হবে। আর একটা কথা,—কাঁচি দিয়ে হাত-পাগুলো কেটে আলাদা করবার আগেই রং করা ভালো ,কারণ ছোট

২নং ছবি

ছোট টুকরোগুলো হাতে করে ধরে রং করতে অসুবিধা হবে।

এর পর কাটা টুকরোগুলোর যেখানে-যেখানে ছোট ছোট গোল দাগ দেওয়া আছে, সেই সব জায়গায় খাতা-সেলাই-করা ছুঁচ দিয়ে ফুটো করো। তার পর দু নম্বর ছবিতে যেমন করে দেওয়া আছে (এটা অবশ্য ছবির পেছন দিক), ঠিক তেমনি করে হাত-পাগুলো সাজিয়ে ফেলো। এবারে হাতের টুকরো দুটোর এবং পায়ের মোটা (তিনটা ফোঁটা দেওয়া) টুকরো দুটোর এক দিকে পাশাপাশি দুটো করে যে ফুটো আছে, তার প্রথম ফুটোগুলো বাদ দিয়ে দ্বিতীয় ফুটোগুলোর সঙ্গে কাঁধের ও পেটের ফুটো-গুলো মিলিয়ে দু পাশে দুটো করে ছোট্ট ঝিনুকের বোতাম বা দেশলাইয়ের কাঠির দুটো করে ছোট্ট টুকরো রেখে সুতো ঢুকিয়ে দু পাশে গেরো দিয়ে আটকে দাও। সরু তার ঢুকিয়ে সেটার দু পাশের মুখ দুটো গোল করে বেঁকিয়েও আটকাতে পারো। দেখো যেন খুব টাইট্ করে এঁটে দিও না, কারণ তা হলে হাত-পাগুলো ঘুরবে না। হাত ও পায়ের ফুটোগুলো আটকানো হলে ঠিক অমনি করেই হাঁটুর জোড় আঁটকে দাও।

এইবারে আসল কাজ। দু নম্বর ছবিতে যেমনভাবে সুতো বাঁধা দেখানো আছে, এবারে ঠিক তেমনিভাবে হাত ও পায়ের ওপরের অর্থাৎ ফালতো ফুটোগুলোর ভেতর দিয়ে সুতো ঢুকিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বেঁধে দাও। তার পর একটা লম্বা সুতো নিয়ে হাতের জোড়ের সুতোটার মাঝখানে তার একটা দিক বেঁধে পরে পায়ের জোড়ের সুতোটাকে পেঁচিয়ে সেখানেও একটা গেরো দিয়ে বাকি সুতোটা ঝুলিয়ে দাও। কিভাবে এই সুতোটা বাঁধবে দু নম্বর ছবিতে তা দেখানো হয়েছে।

সব শেষে মাথার ফুটোতে সুতো বেঁধে বাঁ হাত দিয়ে সেটা ধরে ডান হাত দিয়ে নীচের ঝোলানো লম্বা সুতোটায় টান দিয়ে দেখো কি মজা হয়।

পড়ছে গাছের ঝরা পাতা..

কিন্তু তারই ভেতর হারিয়ে গেল তিন রকমের পাখী! তাদের একটি হাঁস, একটি পেঁচা আর একটি হল পায়রা। এখন খুঁজে বার করতো কোথায় আছে তারা?

শ্রীঅমর দে

জগৎটা মিথ্যার

॥ পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

মধুকের মল্লিক পয়সার আণ্ডিল;
নোট নাকি রোদে দিতো বাণ্ডিল বাণ্ডিল!
বাড়িভাড়া ছিল, আর তেজারতি কারবার;
বন্ধক রেখে দিতো সকলকে টাকা ধার।
ঘরবাড়ি, জমিজমা, গয়না বা আসবাব,
রাখতো সে সব কিছু যাতে করে হবে লাভ।
হিসাবের খাতা ছিল বাঁধানো তা চামড়ায়,
রাখতো সে সিন্দুকে পাছে কেউ হাতড়ায়।
কার কাছে কত সুদ, কোন্ দিন তাগাদার,
দেরাজের কোন্ খোপে কি দলিল কোথাকার,
কে রেখেছে কি জিনিস, কার কাছে কত পায়,
খাতা ছিল প্রাণ তার সব কিছু লেখা তায়।
কঞ্জুস বলে ছিল চারদিকে দুর্নাম,
খরচের কথাতেই গায় তার দিতো ঘাম।
একটিও পয়সা সে করতো না কভু দান,
খাওয়াটাও তার কাছে মনে হতো লোকসান।
নাম কেউ করতো না সকালে বা সন্ধ্যায়,
নাই যদি জোটে ভাত, পাছে কিছু খোয়া যায়!
রাখতো না কিছুই সে পৃথিবীর সন্দেশ
জানতো না শহরের কোথা শুরু কোথা শেষ।
জানে শুধু সোনারুপো বাজারের হালচাল;
মাঝে মাঝে কিনে রাখে কাঁচা সোনা তাল-তাল
একদিন শোনা গেলো অদ্ভুত সংবাদ—
মধুকের মল্লিক করে সব বরবাদ।
সোনাদানা যত ছিলো বেচে দিয়ে সস্তায়
ভাঙাচোরা লোহা কিনে ভরে রাখে বস্তায়।
শুনেছে সে—বিজ্ঞানে ভেল্কীর কারবার—
য়্যাটমকে গুঁতো দিলে এক হয়ে যাবে আর।
লোহা থাকবে না লোহা, সোনা হয়ে যাবে তায়
তাই সব বেচে মধু লোহা কেনে যত পায়।

কাণ্ডটা দেখে সবে ডাক্তারে দিল ডাক;
দেখে বলে—মাথা গেছে, রাঁচীতেই রাখা যাক্।
সেরে এসে দ্যাখে মধু খাতাটাই আছে তার।
নেড়ে চেড়ে শেষে বলে—জগৎটা মিথ্যার।

গোলদিঘির রায়রা — তাদের লক্কা পায়রা
ভয় পায়না কিচ্ছু — সাহস ভারী, বিচ্ছু!
ঠোঁট নাড়িয়ে নাচছে — ঠকুরে কড়াই খাচ্ছে
সাহস কি আর এমনি?—খুকু যে ভালো তেমনি।

ফটো—অজিত সোম

মা দুর্গা / চণ্ডী সেনগুপ্ত

লাক চড়াচড়, লাক চড়াচড় দুর্গাঠাকুর আসেন
শরতকালের মেঘের ভেলা বড্ড ভালোবাসেন।
গিজদা গিজর গিজদা গিজর দুর্গাঠাকুর এলেন
তিনটি দিনের বাপের বাড়ি আসার ছুটি পেলেন॥

ঢাকের সাথে বাজল কাঁসী কাঁই না না না না
ছেলেপুলে নিয়ে এলেন ভগবতী মা—।
বিদ্যে দেবেন সরস্বতী, লক্ষ্মী দেবেন ধন
কার্তিকেয় স্বাস্থ্য দেবেন। গণেশ জাগান গণ।
সঙ্গে এলো সিংহি, ময়ূর, অসুর জাগায় ত্রাস
প্যাঁচা এবং ধেড়ে ইঁদুর দুধ-ধওলি হাঁস।
গণেশ দাদার বউটি এলেন নামটি কলাবতী
ঘোমটা টেনে চুপটি থাকেন লক্ষ্মী মেয়ে অতি।
সবার উপর দাঁড়িয়ে হাসেন মা আমাদের ভালো
দশ হাতে দশ অস্ত্র মায়ের রূপে ভুবন আলো॥

টুটু মিঠু অঞ্জলি দেয় : অসুরনাশী মা,
(সবার মনের অসুর নাশো।) কাউকে ছেড়ো না॥

হিমসাগরের রঙ যেমন মুক্তো ঝরানো সাদা, শরতরানীর আকাশ যেমন হাসি-মাখানো নীল; ভোরবেলাকার সূর্য যেমন সোনা-ছড়ানো রঙিন, তেমনি যেন সকল রঙের রঙ-মেশানো ছবি-সাজানো একটি রাজবাড়ি।

আর?

সন্ধ্যারাতের একটি তারা যেমন হাসে ঝলমল, গাছের ডালে একটি পাখি যেমন নাচে ঝুমঝুম, পদ্মপাতায় শিশির ফোঁটা যেমন দোলে টলমল—রাজবাড়িতে একটি তেমন রাজকন্যে।

রাজকন্যে সাত বছরের ছোট্টটি। কন্যের মুখটি যেমন মিষ্টি, মুখের কথা তেমন মিষ্টি। গায়ের রঙটি যেমন মিষ্টি, গলার গানটি তেমন মিষ্টি। কিন্তু সবচেয়ে মিষ্টি কী? রাজকন্যের মিষ্টিমুখের হাসি। রাজকন্যে হাসলে যেন ফিনিক দিয়ে চাঁদের আলো ঝরে পড়ে।

হঠাৎ এক কাণ্ড হলো।

কী হলো?

রাজকন্যে আর হাসে না। কেন হাসে না?

চার চারটি রাত কাটলো—রাজকন্যে হাসে না।

চার চারটি দিন পেরুলো—রাজকন্যে হাসে না।

রাজকন্যের মুখ ভার। কে তার হাসি চুরি করলো? মুখ তার অন্ধকার। ছায়া-ঘেরা অন্ধকার।

রানীমা মেয়ের জন্যে কেঁদে কেঁদে চোখের জল ফেলেন। চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

রাজামশায় ভেবে ভেবে কান্না চাপেন। চাপা-কান্নায় বুক ভেঙে যায়।

তারপর কবরেজ এলো। হাকিম এলো। বদ্যি এলো। ভেবে ভেবে সারা হলো।

আমি হ্যায় বাবা, আমি হ্যায়

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, সাতশো পাতার ফর্দ এঁটে একে একে সটকে গেল। কিছুতেই কিছু হলো না। রাজবাড়িতে হায়! হায়! পড়ে গেল। অমন যে সোনার টুকরো মেয়ে, তার এ কি হলো? তারপর?

তারপর ডিডিম ডিডিম ডিম! ঢেঁড়া পড়লো। এ-রাজ্যে, সে-রাজ্যে ঢাকিরা ঢাক পিটিয়ে পিটিয়ে হেঁকে গেল, "রাজার মেয়ের মুখের মিষ্টি হাসি চুরি গেছে। রাজকন্যে হাসতে ভুলেছে। যে মেয়ের মুখে মিষ্টি হাসি ফিরিয়ে এনে দেবে, রাজা তাকে সাত-রাজ্যের একটি রাজ্যের মালিক করে দেবেন।"

ঢেঁড়া পড়লো, আশ্চর্য, কেউ এলো না।

একদিন যায়, দু-দিন যায়, তিন দিন যায়, চার-পাঁচ-ছ'দিন যায়—তবু কেউ এলো না।

হায়! হায়! সত্যি বুঝি কেউ এলো না আর। রাজকন্যে মিষ্টি মুখে, মিষ্টি হাসি আর বুঝি ফিরে পেলো না।

ছ'দিনের রাত কাটলো। রাত কেটে ভোর হলো। আলো ফুটলো। পাখি ডাকলো। সূর্যিঠাকুর মুখ তুললো। রাজকন্যের ঘুম ভাঙলো। আর ঠিক তক্ষুনি রাজবাড়ির সিংদরজায় ঘা পড়লো। কে যেন কাঁপা গলায় গেয়ে উঠলো, "জয় হোক রানীমার, জয় হোক রাজামশায়ের।"

দ্বারী হাতের লাঠি ঠুকে হাঁক দিলে, "কৌন হ্যায়?"

"আমি হ্যায় বাবা, আমি হ্যায়।"

দ্বারী সিংদরজার সামনে এলো। দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে এক থুনথুনে বুড়ি। লাঠি ধরে ঠক-ঠকিয়ে কাঁপছে।

দ্বারীকে দেখে বুড়ি বললে, "আমি রাজা-মশায়ের সঙ্গে দেখা করে গা। রাজকন্যার অসুখ হ্যায় না—অসুখ সারায়গা বলকে এখানে আসা হ্যায়।"

বুড়ির মুখের কথা আর শেষ হলো না। সঙ্গে সঙ্গে দ্বারী হাঁকলো, সেপাই ছুটলো, শান্ত্রী নাচলো, মন্ত্রী উঠলো, পাত্র-মিত্র সবাই জুটলো। সারারাজবাড়ি সরগরম, হৈ-হৈ, রৈ-রৈ। এসেছে, এসেছে।

রাজবাড়ির যেখানে তুলসীমঞ্চ—সেখানে সকালের রোদ এসে পড়েছে। রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। সেই তুলসীমঞ্চের পাশে, সকালের সোনার রোদে রাজকন্যেকে বসিয়ে, আর তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সেই বুড়ি হাঁ করে বসে রইল। হাঁ করে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ খকখক করে কেশে উঠে রাজকন্যেকে বললে, "হয়েছে মা। এবার তুমি যাও, খেলা করগে।"

তুলসীমঞ্চের পাশ থেকে রাজকন্যে উঠে গেল দাসীর ঘরে, আর কেমন গম্ভীর মুখে বুড়ি উঠে গেল রানীর ঘরে। রাজা আর রানীর ভয়ে বুক কাঠ, মুখ চুণ।

রানী কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কী দেখলেন মায়ের আমার কী হয়েছে মা?"

বুড়ি ভারীগলায় উত্তর দিলে, "তোমার মেয়ের হাসি চুরি হয়নি মা, হাসি ফুরিয়ে গেছে!"

"সে আবার কি! কেমন করে হাসি ফুরোয়?"

বুড়ি মাথাটা নেড়ে, একটু 'হে' 'হে' করে ফোকলা দাঁতে হাসতে হাসতে বললে, "হয়, হয়। কেমন জান? এই যেমন ধর সোনার বাটি ভর্তি দুধে চুমুক দিলে দুধ ফুরয়, গাওয়া ঘি ভর্তি সোনার পিদিমে আলো জ্বলতে জ্বলতে গাওয়া ঘিও ফুরয়, সোনার পিদিমের আলোও ফুরয়—তেমনি হাসতে হাসতে হাসিও ফুরয়। এতে অবাক হবার কিচ্ছু নেই।"

রানী বললেন, "তা বলে মেয়ে কি আমার আর কোনদিন হাসবে না?"

বুড়ি আবার ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে, "হাসবে গো, হাসবে। কিন্তু ব্যামোটা বড়ো কঠিন রকমের, আর দাওয়াইটা যোগাড় করাও তেমনি শক্ত। পারবে কি তোমরা?"

অমন যে সোনার প্রতিমার মত রাজরানী, অমনি বুড়ির পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে লুটিয়ে পড়লেন। লুটোপুটি খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "পারবো মা, পারবো। আমার বুকের বাছার মুখে হাসি ফিরিয়ে

আনার জন্যে যা বলবে, আমরা তাই করবো।"

বুড়িটা বললে, "তবে একটু স্থির হও মা-লক্ষ্মী। ওষুধটা মন দিয়ে শুনে নাও।"

রানী হন্তদন্ত হয়ে উঠে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কী মা? ওষুধটা কী?"

বুড়ি বললে, "হাতি।"

রাজা অবাক হলেন, "হাতি!"

রানী চমকালেন, "হাতি!"

"হ্যাঁ মা, হ্যাঁ, হাতি! একটি সাত বছরের হাতি। তোমার মেয়ের যেদিন জন্ম, ঠিক সেইদিনে জন্মেছে যে হাতি, তার কান্না যেদিন তোমার মেয়ের কানে পৌঁছবে, সেইদিনই আবার ওর হাসি ফিরে আসবে।"

রাজা গালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন, "এমন হাতি পাই কোথা!"

রানী হতাশ হয়ে কেঁদে পড়লেন, "হাতির খোঁজে যাই কোথা!"

বুড়ি বললে, "সে কথাটাও শুনে নাও। একদল লোক পুবে পাঠাও, একদল লোক পশ্চিমে হাঁটাও। একদল লোক দক্ষিণ ছাড়ুক, একদল লোক উত্তরে বাড়ুক। এই চার দল লোক চলতে চলতে যেখানে গিয়ে মিলবে, ঠিক সেখানে এই হাতিটি দেখতে পাবে।"

অমনি সাজ সাজ রব পড়ে গেল। চারদিকে চার হাজার রাজসৈন্য সাত বছরের হাতি ধরতে ছুটে দিলে। একদল যখন পাহাড় ডিঙোয়, একদল তখন নদী পেরোয়। একদল যায় গহন বনে, একদল যায় মরুর-দেশে। পাহাড় চূড়ায় শব্দ ওঠে, নদীর জলে তুফান জাগে, গহন বনে গাছের কাঁপন, মরুর দেশে বালির নাচন।

যেতে যেতে সাত মাস, সাত দিন কাটলে পর চার হাজার রাজসৈন্য এক জায়গায় এসে পড়লো।

এ এক বন। গভীর বন। এই বনে চার হাজার রাজসৈন্য তাঁবু গাড়লে। তাঁবু গেড়ে বনের এ-কোণ, সে-কোণ ঘুরে ঘুরে সাত বছরের হাতি খুঁজতে লাগল।

এক দিন যায়, দু-দিন যায়, তিন দিনের দিন হঠাৎ সবাই থমকে থামলো।

গভীর বন—গাছের ছায়ায় অন্ধকার, অন্ধকারে পথ-পাথালির চিহ্ন নেই, জনমনিষ্যির দেখা নেই—অথচ মানুষের গলার মিষ্টি গান শোনা যায় কেমন করে?

সঙ্গে সঙ্গে হুস হাস করে, চার হাজার রাজসৈন্য, চার হাজার গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে, ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে রইল। গানের সুর কাছে—আরও কাছে এলো।

তারপর কী দেখলো চার হাজার রাজসৈন্য? দেখলে ছোট্ট ছেলে একটি ছোট্ট হাতির পিঠে চেপে দুলতে দুলতে, গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে। কি মিষ্টি গান!

আর কি দেখতে হয়? চার হাজার সৈন্য সঙ্গে সঙ্গে আট হাজার হাত তুলে, হা-রে-রে-রে শব্দ করে একেবারে হাতির সামনে।

ছেলের গান চমকায় হাতির চলন থমকায়।

এক হাজার চেঁচালো, "নাম কি?"

এক হাজার চেঁচালে, "বাড়ি কোথা?"

এক হাজার চেঁচালে, "কার হাতি?"

এক হাজার চেঁচালো, "বয়স কত?"

ছেলেটা সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে বললে, "আজ্ঞে আমার নাম মংলু, হাতির নাম রাজপুত্তুর, হাতি আমার বন্ধু। হাতির বয়স সাত, আমার বয়স সাত। আজ্ঞে আপনারা কারা?"

মংলুকে আর কথা কইতে হলো না। মার-মার, কাট-কাট, ধর-ধর করে চার হাজার রাজসৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়লো হাতির ওপর। মংলুকে পাখির মত হাতির পিঠ থেকে তুলে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলে। মংলু 'ওমা গো' বলে কঁকিয়ে কেঁদে আকাশ থেকে মাটিতে আছাড় খেয়ে লুটিয়ে পড়লো। সঙ্গে

গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধল

সঙ্গে হাতির চার পায়ে লোহার শেকল বাঁধা হলো। গলায় লোহার শেকলের ফাঁস লাগলো। হেঁইও মারি জোয়ান বলে চার হাজার সৈন্য ডাক ছাড়তে ছাড়তে, সাত বছরের হাতিকে টানতে টানতে নিয়ে চললো।

"ছেড়ে দাও, আমার রাজপুত্তুরকে ছেড়ে দাও" বলে মংলু ছোট দুটি হাত বাড়িয়ে রাজসৈন্যের পায়ে পায়ে লুটিয়ে লুটিয়ে কেঁদে উঠলো। আর চার হাজার রাজসৈন্য মংলুকে পায়ে মাড়িয়ে, মাটিতে পিষে, হাতি টানতে টানতে হৈহৈ করে রাজবাড়ির দিকে রওনা দিলে। মংলু রাজপুত্তুরকে ছাড়বে না, কিছুতেই ছাড়বে না। মংলু মাটির থেকে উঠে, ছুটে গিয়ে রাজপুত্তুরের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। রাজসৈন্য মংলুকে ঠেলে দিলে। মংলু রাজসৈন্যের পায়ের ওপর লুটিয়ে কেঁদে পড়লো, "ওগো ছেড়ে দাও, ওগো ছেড়ে দাও।"

অমনি এক হাজার সৈন্য মংলুকে একটা গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেশ করে বেঁধে—গাছের গুঁড়ির মত হাতিকে টানতে টানতে, বন পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে, ঘাট পেরিয়ে মংলুর চোখের আড়ালে চলে গেল। আর মংলু গাছের বুকে মাথা ঠুকে, গাছের বুক জড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

কাঁদতে কাঁদতে দিন গড়ালো, কাঁদতে কাঁদতে রাত পেরুলো, কাঁদতে কাঁদতে ভোরের আলো ফুটলো। কিন্তু কান্না শুনে কেউ কি এলো? কে আসবে? মংলুর যে কেউ নেই, মা নেই, বাবা নেই, ভাই নেই, বোন নেই। আছে শুধু রাজপুত্তুর। তার বন্ধু, তার আপনজন। তার নিজের চেয়েও আপন—একটি হাতি!

গভীর বনে মংলু ক'দিন কাঁদলো, কেউ জানলো না। ক'দিন ধরে একটি ছোট্ট ছেলের কান্না বনে বনে, গাছে গাছে ফিরে ফিরে ঘুরলো, কেউ জানে না।

একদিন মংলুও জানতে পারল না—আলো নিভছে, না জ্বলছে। দিনের আলো ফুটছে, না রাতের কালো নামছে। দিনের পাখি ডাকছে, না রাতের পেঁচা হাঁকছে। কাঁদতে কাঁদতে মংলুর দুটি চোখের, দুটি তারা চিরদিনের মত নিভে গেল। মংলু অন্ধ।

একদিন আর পারছিল না। মংলু কাঁদতে পারছিল না। গলার কান্না থেকে থেকে ভাঙা ভাঙা বাঁশির সুরের মত ভেসে ভেসে আসছিল। এমন সময় কে যেন মিষ্টি সুরে ডাকলে, "কেঁদো না মংলু, কেঁদো না। কেউ না থাকুক—আমি তো আছি। আমি বলছি, তোমার রাজপুত্তুরকে তুমি আবার ফিরে পাবে। তোমার সব দুঃখের শেষ হবে।"—বলে কে যেন তার বাঁধন খুলে দিলে।

মংলু জানতে পারলে না। মংলু জানলো না, কিন্তু আর সবাই দেখলো। দেখলো বনের গাছ, দেখলো বনের ফুল, দেখলো বনের লতা-পাতা—এ যে বনের দেবী!

বনদেবী বললে, "তুমি আমার হাত ধর! তোমায় রাজপুত্তুরের কাছে নিয়ে যাব।"

বনদেবীর হাত ধরে, অন্ধ চোখে কাঁদতে কাঁদতে মংলু বনের পথে পা বাড়ালে।

বনের পথে মংলু কাঁদছে। রাজবাড়িতে মংলুর জন্যে রাজপুত্তুর কাঁদছে। রাজপুত্তুরের কান্না দেখে রাজকন্যে কাঁদছে। হাতির কান্না শুনে, কই রাজকন্যেতো হাসি ফিরে পায়নি?

সেদিন ভোর হলো।

রাজবাড়ির সিংদরজার সামনে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাকে ডাকছে, "রাজপুত্তুর—।"

দ্বারী তেড়ে এলো, "কে রে?"

"আমার রাজপুত্তুর কোথা? রাজপুত্তুর? কোথায় তাকে. বন্দী করে রেখেছ?" আবার ডাকলো, "রাজপুত্তুর।"

দ্বারী দেখল, একটা অন্ধ ছেলে! "হট্" বলে এক ঠেলা মেরে, ঠেলে ফেলে দিলে।

ঠিক তখুনি, রাজকন্যে দাসীর হাত ধরে, ফুলের সাজি নিয়ে সিংদরজার কাছে দিয়ে মন্দিরে যাচ্ছিল। অন্ধ ছেলের কান্না শুনে ফুলের সাজি ফেলে দিয়ে ছুটে এলো। দ্বারীর হাত ধরে আকুল হয়ে বললে, "না, না মেরো না, মেরো না ওকে।"

ছুটে এসে পথের ধুলোর থেকে হাত ধরে অন্ধ ছেলেকে তুলে নিলে। গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিয়ে বললে. "কী হয়েছে ভাই তোমার? ক্ষিদে পেয়েছে?"

"না।"

"তুমি ভিক্ষা নেবে?"

"না।"

"কাপড় চাইছ?"

"না, না, না। আমার রাজপুত্তুরকে ফিরিয়ে দাও।"

রাজকন্যে অবাক হলো। জিজ্ঞেস করলো, "কে তোমার রাজপুত্তুর? আমার তো কোন ভাই নেই!"

"তোমার ভাই কেন হবে? আমার রাজপুত্তুর। তোমাদের লোকেরা তাকে ধরে এনেছে, বেঁধে এনেছে। সে আমার বন্ধু, আমার ভাই। রাজপুত্তুর আমার হাতি।"

চমকে উঠলো রাজকন্যে। আপন মনে ভাবলো, "ও বুঝেছি। তাই দেখি কদিন ধরে হাতিশালে নতুন হাতি। ছোট্ট হাতি। তাই বলি, ছোট্ট হাতি কাঁদে কেন রাতদিন!"

রাজকন্যে দ্বারীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। চেঁচিয়ে উঠলো, "ছেড়ে দাও, পথ ছেড়ে দাও।" দ্বারী ভয়ে সরে সরে গেল। রাজকন্যে অন্ধ ছেলের হাত ধরে, বললে, "তুমি আমার সঙ্গে এসো," বলেই রাজপুরীর হাতিশালের দিকে ছুট দিলে। "রাজপুত্তুর, রাজপুত্তুর" বলে ডাকতে ডাকতে অন্ধ ছেলে রাজকন্যের হাত ধরে ছুটতে লাগলো।

আহা! হাতিশালে শেকলে বাঁধা রাজপুত্তুর কাঁদছিল। আপন মনে কাঁদছিল। তার বন্ধু মংলুর জন্যে কাঁদছিল। কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ চমকে ওঠে রাজপুত্তুর। কে ডাকে 'রাজপুত্তুর' বলে। এ যে তার চেনা গলা—এ যে তার মংলুর সুর। হ্যাঁ, সত্যিই তো—ঐ তো তার মংলু। রাজকন্যের হাতটি ধরে এগিয়ে আসছে। আর দেখতে হয়? কোথায় কান্না? কোথায় দুঃখু। আনন্দে তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। কানের পাতা নেড়ে, মাথায় শুঁড় তুলে, সারা দেহটা হেলিয়ে দুলিয়ে, নেচে কুঁদে—ডেকে উঠলো।

মংলু দু হাত বাড়িয়ে বললে, "কই? কই? কই তুই রাজপুত্তুর?"

রাজকন্যে মংলুর হাতটি ধরে, রাজপুত্তুরের শুঁড়ের কাছে পেঁৗছে দিলে। আর অমনি রাজপুত্তুর শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে মংলুকে পিঠে তুলে নিলে।

দুটি হাত দিয়ে রাজপুত্তুরের গলা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো মংলু। সে কি কান্না! সমস্ত আকাশ ভেঙে যেন মেঘের কান্না। কাঁদতে কাঁদতে বললে, "আমি আর দেখতে পাই না রে—আমি আর চোখে দেখতে পাই না। তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে আমার চোখ গেছে। কই তোর মুখখানা? কই?"

রাজকন্যেও কেঁদে ফেললে। মাহুতকে বললে, "খুলে দাও। এক্ষুনি হাতির পায়ের শেকল খুলে দাও।"

রাজকন্যের কথা—কে ঠেলবে? হাতির বাঁধন খোলা হলো। মংলুকে পিঠে নিয়ে হাতিশাল থেকে হাতি বেরিয়ে এলো।

"শোন।" রাজকন্যে কাঁদতে কাঁদতে ডাকলে, "শোন ভাই।"

হাতি দাঁড়ালো।

রাজকন্যা বললে, "আমার মুখে হাসি ফিরিয়ে আনার জন্যে তোমার রাজপুত্তুরকে আমার বাবা ধরে এনেছেন। আমার মুখের হাসির জন্যে তোমার চোখ দুটিও তুমি হারিয়েছ। একথা কেউ কোনদিন জানবে না। আমি যে ছোট্ট। জানি না তো কেমন করে তোমার এ দুঃখের শেষ করবো। আমার একটি কথা শুনবে? তুমি হাতির পিঠ থেকে নেমে একটি বার আমার কাছে আসবে?"

রাজপুত্তুর শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে মংলুকে রাজকন্যার পাশে নামিয়ে দিল। রাজকন্যা নিজের আঁচল দিয়ে মংলুর অন্ধ চোখের জল মুছিয়ে দিলে। তারপর গলার মানিকের হার আস্তে আস্তে খুলে মংলুর গলায় পরিয়ে দিলে। মংলু চেঁচিয়ে উঠলো, "না, না, চাই না আমার—"

কথা শেষ হলো না। কিন্তু একি? হঠাৎ মানিক-মালার আলো মংলুর চোখের তারায় যেন! মংলুর চোখে আলো নামছে কোথা থেকে? একটু-একটু-আরও একটু! হ্যাঁ, সত্যিই তো মংলু দেখতে পেলো, সকালের সোনার রোদ। সোনার রোদে রুপোর চাঁদের মত একটি ছোট্ট মেয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে। একি সত্যি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যিই তো! হঠাৎ মংলু হেসে উঠলো। "হা হা হা হা।" ঝরনার সুরের মত মিষ্টি হাসি, ভোরের ফুলের মত রঙিন হাসি। হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেয়ে রাজকন্যের হাতটি এসে জড়িয়ে ধরলে। ওমা! অমনি রাজকন্যের এতদিনের হারিয়ে যাওয়া হাসি হঠাৎ সারামুখখানি উছলে গেল, "হি হি হি হি।" সে কি আনন্দের হাসি। কাঁচা রোদের মত সোনার হাসি।

ভোরের ফুল, কাঁচা রোদ, ঝরনার সুর সব মিলিয়ে সে এক হাসির হাসি। সেই হাসির সুরে সুর মিলিয়ে রাজপুত্তুর মংলুকে আর রাজকন্যাকে পিঠে তুলে নিলে। নীল আকাশের নীচে, হাতির পিঠে একটি মিষ্টি ছেলে, একটি মিষ্টি মেয়ে হাসতে হাসতে দুলতে দুলতে এগিয়ে চললো।

আর কী?

আর সবাই হাসলো। হেসে কুটোকুটি হয়ে গড়িয়ে গেল। রাজকন্যে হেসেছে যে।

রাজবাড়িতে হাসির হাট বসে গে

হাতির পিঠে একটি মিষ্টি ছেলে—একটি মিষ্টি মেয়ে

রামছাগুলে কাণ্ড

'বুদ্ধু-ভূতুম'

সেবার ছুটির পর হঠাৎ কেনারামের মুণ্ডিত মস্তক দেখে আমরা প্রথমটা খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলাম। পরে অবশ্য আমাদের হর্ষ বর্ধন হয়েছিল খুবই বটে, কিন্তু ব্যাপারটা যে এমনিভাবেই ঘটবে তা আমরা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কারণ, কেনারামের মাথার কাগের বাসাটা ছিল আমাদের ছেলেমহলে এক গবেষণার বস্তু। কেশ সম্বন্ধে কেনারামকে কেউ কিছু বললেই ও জবাব দিত, "ওসব বুঝবিনে তোরা। এ সাধনার বিষয়, ধ্যানের ধন।"

কেনারামের এই ধ্যানের ধন, কাগের বাসার এই ছাগলে-মুড়িয়ে-খাওয়া অবস্থা দেখে তাই প্রথমটা আমরা ভরসা করে তার সঙ্গে কেউ কথাই বলতে পারিনি। আমাদের অবস্থা দেখে সে-ই সান্ত্বনা দিলে। বললে, "কেন ন্যাড়া হলাম জানিস? অপবিত্র হয়ে গিয়েছিলরে—একেবারে অপবিত্র হয়ে গিয়েছিল। শেষকালে ইস্টীমারের একটা রামছাগলে কিনা আমার মানংকরা পবিত্র মাথা চিবিয়ে খেলে! ব্রহ্মতালুটা চেটে দিলে। আরে রামঃ রামঃ!! রামছাগলের ব্যাপারই ঐ রকমের।"

আমরা সবাই বলি, "কী রকম? কী রকম?"

কেনারাম বলে, "চিনিসতো তোরা সবাই বোঁচা বোসকে? সেই বোঁচা বোসের পাল্লায় পড়ে সেদিন গিছলুম ইস্টীমার ঘাটে। দেখি কি, ঘাটে এসে লেগেছে পাঁচকে এক ইস্টীমারের বাচ্চা। পুক্‌পুক্‌ করে ধোঁয়া ছাড়ছে। দুলদুল করে দুলছে। আবার 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি'র মত ল্যাজে বেঁধে এনেছে মস্ত এক ফ্ল্যাট। তার একধারে গাঁট গাঁট গাদিমারা পাট। আর একধারে বস্তার ওপর বস্তা—তার ওপর বস্তা—সার সার বস্তা। সে একেবারে বস্তার গোলকধাম! তার পাশে অন্য ধারে কলসীর ওপর কলসীভর্তি গুড়। অন্যধারে বড় বড় ঝুড়িবোঝাই হংস-কুক্কুট। সবার শেষে মোটা মোটা তাড়া বাঁধা খালি গড়ুত্তৃণ। সে একেবারে মালে মালাক্কার!" কেনারাম দু'হাত বিস্তার করে মালের পরিমাণ বোঝাতে যায়।

মাঝ থেকে কপিলেশ্বর প্রশ্ন করে বসে "'গড়ুত্তৃণ' কি বস্তু বাবা?"

"এ্যাই মরেছে!" যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল, এমনি ভঙ্গিতে কেনারাম বলে ওঠে, "কোকিলেশ্বর এখনও দেবভাষা আয়ত্ত করতে পারেনি; নাও এবার উপায় করো।"

গল্পটা মাটি হয়ে যায় দেখে আমরাই কপিলেশ্বরের ওপর গর্জে উঠলাম, "এই কপি বাঁদর! চুপ করে বসে থাকবি। যা বুঝবি না, তা চোখ-বুজে দেখে নিবি।"

সকলের অনুরোধে কেনারাম আবার মুখ খুললে।

"তারপর বুঝলি, বোঁচাতে আমাতে গিয়ে উঠলাম টকাং টকাং করে লাফিয়ে সেই ফ্ল্যাটে। উঠেই না, সে কী বলবো! পাটের গাঁট পেরুতে পেরুতে গাঁটে গাঁটে বাত ধরে গেল। আমি তো কাহিল। বোঁচা দেখি তিড়িং বিড়িং করে বস্তার সারের মাঝে লাফিয়ে পড়লো। পড়লো মানে কি, উবে গেলো—স্রেফ কর্পূরের মতন উবে গেলো। আমি তো আন্দাজে পিছু পিছু গিয়ে বস্তার গাদায় পৌঁছলাম। কিন্তু কোথায় বোঁচা? আমার ইদিকে বস্তা, উদিকে বস্তা। মাথার ওপর একতলা সমান বস্তা। যাই কোথা? সে একেবারে বস্তা-বন্দী অবস্থা। ভয়ে বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। একবার 'বোঁচা' বলে আস্তে আস্তে ডাক দিলুম। কোনও সাড়া নেই।

"একপা একপা করে বস্তার গলিতে এগুতে লাগলাম। কিছুদূর গিয়ে দেখি, বোঁচারাম একটা বস্তা ফাঁক করে তার মধ্যে হাত ভরে দিয়েছে। আমি কাছে গিয়ে ওকে ধমকে বলতে যাচ্ছিলাম, 'হ্যাঁরে তোর আক্কেলখানা কি?' কিন্তু আমি হাঁ করবার সঙ্গে সঙ্গেই ও ধাঁ করে আমার মুখের মধ্যে সাদা সাদা কতগুলো পাথর পুরে দিয়ে বললে, 'খা—আসছি।' আরে আমার হাঁ আটকালে কী হবে, আমার মুখ আটকানো কি সহজ কথা। আমি কুড়মুড় করে এক কামড়ে পাথর চিবিয়ে ফেললুম। জিবটা মিষ্টি মিষ্টি লাগতে লাগলো। পাথর যে এত মিষ্টি হয় তা তো আগে জানতুম না! ছেঁড়া বস্তাটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম। এবার বুঝলুম বস্তুটা কি? তালমিছরী——এক লম্বরের তালমিছরী। আমি বোঁচাকে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে ফেললুম এবং বস্তার সামনে ধপাস করে সিট-ডাউন হয়ে গেলুম। উবু হয়ে বসে টুকুর টুকুর মুখে মিছরী ফেলছি আর চুকুর চুকুর চুষছি।"

জিবটা তালুতে টকাং করে তুলে কেনারাম আবার বলতে লাগলো, "ওঃ মধু—ঠিক মধুর মত লাগতে লাগলো! সব ভুলে গেলুম। সার্ট প্যাণ্টের যতগুলো পকেট ছিল সব ভরে ফেললুম। তারপর দুহাতে তালমিছরীর টুকরো নিয়ে এতোল-বেতোল খেলতে লাগলুম। প্রাণে পুলক এসে গেলো। ফ্ল্যাটের কাঠের মেঝেতে পা ঠুকে ঠুকে গান শুরু করে দিলুম—'তাল-পাটালী খেয়ে নন্দ নাচিতে লাগিল—আহা নাচিতে লাগিলো-া-া!'

"মৌজ হয়ে গাল ফুলিয়ে মিছরী খাচ্ছি আর গান করছি, হঠাৎ মনে হলো, সামনে বস্তার ওপর থেকে দুটো ছাগল-দাড়িওলা মাথা হুমড়ি খেয়ে আমাকে দেখছে। আমার গানের গলা পেয়ে একটা দাড়ি দুলে উঠলো। প্রশ্ন করলো, 'হেরে হেই ব্যাডা, কি করছ ইয়ানে?'

"আমি মাথা তুলে আড়চোখে দেখলুম, প্রশ্নকর্তা স্বয়ং সুখানী সায়েব (স্টীমারের মালপত্তর তদারক করেন যিনি) এবং তার পাশে একটা মোট্‌কা সোট্‌কা রামছাগল। রামছাগলটাও দাড়ি নেড়ে 'ব্যাং' বলে উঠলো।

"আমি দেখলুম—সর্বনাশ! রামছাগলেও এখানে ধমকায়। বোঁচা? বোঁচা কোথায়? বস্তার ফাঁক দিয়ে পাশে তাকিয়ে দেখি, দূরে ডাঙা যেন সরে সরে যাচ্ছে। জল থেকে গব্‌ গব্‌ একটা ভারী আওয়াজ উঠছে। স্টীমার চলতে শুরু করেছে। বোঁচা আমাকে অসহায় ফেলে সটকান মেরেছে। হতভাগা, বিশ্বাসঘাতক বোঁচা!

"সুখানী সায়েব গর্জে উঠলো, 'এ্যাঁ? হেই ব্যালেস্টরের হুত, কতা কছ না কেনে—এঁ?'

"আমি ভয়ে ভয়ে জবাব দিলুম, 'এই একটু মিছরী চাখছিলাম।'

"এ্যাঁ—মেছ্‌রী খাওন লইছ চুরি করি? বকরী-চাচা হিডারে চিং করি হেলাও দেখি, বান্দি থুই।"

'রামছাগলটা না সেই কথা শুনে, সত্যি 'ব্যা—ব্যা' করে ডেকে উঠলো। তারপর

অপবিত্র হয়ে গিয়েছিলরে

বস্তার ওপর থেকে তিড়িং করে এক লাফ দিয়ে শিং বাঁকিয়ে আমায় গ‍ুঁতুতে ধেয়ে এলো।

"একে তো ভয়ে আধমরা হয়েই গিছল‍ুম, তারপর রামছাগলের কেরামতী দেখে আমার প্রাণ উড়ে গেল। আমি 'বোঁচা—বোঁচা' করতে করতে বস্তার অলি-গলি দিয়ে চোঁ-চা জলের দিকে দৌড়তে লাগল‍ুম। ঠাকুর দেবতার দোহাই মানল‍ুম। কিন্তু কিছ‍ু হলো না। রামছাগলটা 'ব্যা—ব্যা' করতে করতে এসে বোঁক করে আমায় এ্যাসা গোঁত্তা মারলে যে, আমি খানিকটা সামনের দিকে স্রেফ উড়ে গেল‍ুম এবং কিছ‍ু বোঝবার আগেই আমার মাথাটা কয়েকটা পর পর সাজানো গ‍ুড়ের কলসীর মধ্যে ঢ‍ুকে গেল।

"আমার কি হলো, তাই দেখবার জন্য যখন চোখ মেলে চাইল‍ুম, তখন দেখি, ভাঙা কলসীর পাশে আমি গ‍ুড়-সাগরে

গ‍ুড়-মাখানো মাথা খাবলে খ‍ুবলে খাচ্ছে

গড়াগড়ি খাচ্ছি, আর স‍ুখানী সায়েবের বকরী-চাচা আমার গ‍ুড়-মাখানো মাথা চাকুম্ চাকুম্ করে খাব্‌লে-খ‍ুব্‌লে খাচ্ছে।

"আর রাগ সামলাতে পারল‍ুম না। আমার মানত-করা চুল কিনা শেষে রামছাগলে খাচ্ছে। আমি গ‍ুড়-চট্‌চটে হাতে রামছাগলের দাড়ি কষে ধরে 'হিঁয়ো জোয়ান' বলে এক টান দিল‍ুম।

"ছাগলটা আর্তস্বরে ব্যা—ব্যা করে আমাকে মাথা দিয়ে ঠেলতে লাগলো। কিন্তু তার দাড়ি তখন আমার হাতে বজ্রআঁঠার মতন আটকে রয়েছে। পার পাওয়া সহজ কথা নয়। ছাগলে মান‍ুষে শেষে দাড়ি-টানাটানি শ‍ুর‍ু হয়ে গেল। কিছ‍ু খেয়াল নেই যে, কখন জলের ধারে এসে পড়েছি। হঠাৎ পট্‌পটাং করে আওয়াজ হলো। আমি দেখল‍ুম, রামছাগলের দাড়ি হাতে আমি ঝপাং করে জলে পড়ে গেল‍ুম। জলে পড়ে সাঁতার দিতে দিতে দেখল‍ুম, স্টীমারের ফ্ল্যাটটা দ‍ূরে দ‍ুলে দ‍ুলে ছ‍ুটে চলেছে; আর তার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রামছাগলটা করুণ স্বরে দাড়ির শোকে 'ব্যা—ব্যা' করে ডাকছে।"

আমাদের হাত

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

গল্প শ‍ুনবে? তবে আমাদের এই হাত দ‍ুটির গল্পই শোন।

আমাদের দেহে যতগ‍ুলি অংগপ্রত্যংগ আছে, তার মধ্যে হাত দ‍ুটিই সবচেয়ে কাজের। আজকাল ছোট বড় স‍ূক্ষ্ম কত যন্ত্রই না তৈরী হচ্ছে! কিন্তু হাতের মত এমন সহজ, অথচ এমন কাজের যন্ত্র তৈরি করা এখনও বিজ্ঞানীদের স্বপ্নই রয়ে গেছে।

তুমি পড়ার জন্য একখানা বই হাতে নিয়েছ। তোমার হাত দ‍ুটি আলগোছে বইটি ধরে আছে। এক-একটি প‍ৃষ্ঠা শেষ হচ্ছে, অমনি হাতের দ‍ুটি বা তিনটি আঙ‍ুল পরের প‍ৃষ্ঠাটি উল্টে দিচ্ছে। এই কাজটি এমনি খ‍ুবই সহজ, কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে করতে যাও, দেখবে কি কঠিন আর কত রকমারি যন্ত্রের প্রয়োজন।

একবার ভেবে দেখো, সারাদিনে আমরা হাত দিয়ে কত রকমের কাজ করি। ম‍ুখ ধোয়া, দাঁত মাজা, মেখেজ‍ুখে খাওয়া, চিঠি লেখা, টাইপ করা, ছবি আঁকা, জামায় বোতাম লাগান, জ‍ুতার ফিতে বাঁধা, সেলাই করা, কাপড় কাচা—কত আর বলব? বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, একজন স‍ুস্থ লোক সাধারণ অবস্থায় হাত দিয়ে অন্তত হাজার রকমের কাজ করে। এই সব কাজ যদি যন্ত্রের সাহায্য করতে হত, তবে লাখ লাখ যন্ত্রেও কুলোত কিনা সন্দেহ!

সারাদিনে কতবার হাতের ওপর আমাদের চোখ পড়ে। অথচ হাত সম্বন্ধে আমরা কতটুকুই বা জানি! আমাদের হাতে যে সাতাশটি হাড়, আর উনিশ রকমের পেশী আছে, এই খবরই বা কজনে রাখি?

আমাদের চারদিকে আজ যে এত সব রকমারি জিনিস দেখতে পাচ্ছি—কাপড় জামা, টেবিল চেয়ার, বাড়ি গাড়ি, আলো পাখা,

দোয়াত কলম, বই খাতা, বাক্স তোরঙ্গ, কল কারখানা, এক কথায় যেখানে যা আছে সবই এই হাত দ‍ুটিরই দান।

বানর বা বনমান‍ুষেরও হাত আছে। কিন্তু মান‍ুষের মত নয়। আমরা আমাদের ব‍ুড়ো আঙ‍ুলটি দিয়ে আর সব আঙ‍ুল চেপে ধরতে পারি। কিন্তু বানর বা বনমান‍ুষ তা পারে না। আমাদের এই দ‍ুটি হাত এবং তাদের এই বৈশিষ্ট্য না থাকলে আমাদেরও পশ‍ুপাখির মতই জীবনযাপন করতে হত। বাস্তবিক, আমাদের মাথায় ব‍ুদ্ধি, আর এই একজোড়া হাত আছে বলেই আমরা দ‍ুনিয়ায় সবার উপর প্রভুত্ব করতে পারছি।

মান‍ুষের জীবনে হাত এতটা দরকারী বলেই হয়ত প্রাচীন কাল থেকেই এই হাত দেখে জীবনের অন্যান্য দিকেরও পরিচয় পাবার চেষ্টা চলছে। আমাদের দেশে এই নিয়ে এক সময়ে এত চর্চা হয়েছিল যে,

তার ফলে একটা আলাদা শাস্ত্রই গড়ে উঠেছে। সে শাস্ত্র নিয়ে যারা আলোচনা করে, তাদের বলা হয় জ্যোতিষী। তারা হাতের গড়ন, তার রেখা-বিন্যাস, আঙ‍ুলের গঠন ইত্যাদি বিচার করে আমাদের স্বভাব, স্বাস্থ্য, ভবিষ্যৎ জীবন ইত্যাদি অনেক কথাই নিভু‍্লভাবে বলতে পারে।

এদেশের মত অন্য দেশেও এই নিয়ে নানা গবেষণা চলছে। তফাত এই যে, এদেশে গবেষণা বন্ধ হয়ে গেছে, আর ও-সব দেশে এখনও তা নিত্যন‍ূতন ধারায় বইছে। তাদের সে গবেষণার ফলে তারা যে-সব সিদ্ধান্তে পেঁছেছে বা যা অন‍ুমান করছে, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা তোমাদের নেহাত মন্দ লাগবে না।

আমেরিকার একজন ডাক্তারের মত এই যে, হাতের মাঝের আঙ‍ুলটি যদি তাল‍ুর চেয়ে লম্বায় ছোট হয়, তা হলে মান‍ুষ স্বাস্থ্যবান্ ও স‍ুখী হয়। বড় হলে ঠিক উল্টো। আর সমান মাপের হলে মান‍ুষ ধীর স্থির হয়। এ মত কতখানি সত্য, তা তোমরা নিজেরাও যাচাই করে দেখতে পারো।

আর একজন ডাক্তারের মতে হাতের চেহারা

ও রং দেখে শরীরের অনেক অসুখ ধরা যায়। অথচ মজা এই, হাত যে এত কাজ করে, জলে ভিজে, রোদে পোড়ে, তার নিজের অসুখ খুব কমই হয়। তবে বয়স বাড়ার সংগে সংগে হাতের চেহারার পরিবর্তন ঘটে। মানুষ বুড়ো হলে, তার হাতের পিছনের দিকের চামড়া কুঁচকে যায়, শিরাগুলির রং নীল হয়। চুল পাকলে কলপ দিয়ে তা কালো করা যায়, মুখে স্নো-পাউডার মেখে খানিকটা তারুণ্য ফিরিয়ে আনা চলে, ভুঁড়ি বেড়ে গেলে বেল্ট কষে তা কমান যায়। কিন্তু বুড়ো বয়সে হাতের এই যে পরিবর্তন হয়, এ ঢাকা যায় না। তা ছাড়া বয়সের সংগে হাতের জোরও কমে যায়। হাত দিয়ে যাদের শক্ত কাজ করতে হয় এমন হাজারখানেক শ্রমিককে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, পঁচিশ বছর বয়সে তাদের হাতের যে জোর ছিল, ষাট বছর বয়সে তা শতকরা যোল ভাগ কমে গেছে।

আমাদের হাত যদিও দুখানা, বেশির ভাগ লোকই কিন্তু ডান হাত দিয়েই অধিকাংশ কাজ করে। তাদের বাঁ হাত ডান হাতকে সাহায্য করে মাত্র। কিন্তু এমন লোকও আছে, বাঁ হাত দিয়েই যারা বেশির ভাগ কাজ করে। তাদের ডান হাত শুধু বাঁ হাতকে সাহায্য করে। একটা মোটামুটি হিসেব নিয়ে দেখা গেছে, শতকরা পাঁচ ছয় জন পুরুষ, আর তিন চার জন মেয়ে বাঁ হাতেই কাজ করে। তাদের লোকে বলে—'ন্যাটা'। অবশ্য এ হিসাব যে খুব নির্ভুল, তা মনে হয় না।

কেন যে কেউ কেউ 'ন্যাটা' হয়, এ নিয়ে নানাজনের নানান মত। কেউ বলেন, এটা জন্মগত। কারো মতে এটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। জন্মের পর থেকে যে যে-হাত বেশী চালায়, বড় হয়েও সে-হাতই বেশী চলে। আবার কেউ কেউ বলেন, আমাদের হৃদ্‌যন্ত্র বুকের বাঁ দিকে থাকায় ডান হাত বেশী চলে। আবার একদলের মত হচ্ছে যে, আদিম যুগ থেকে মানুষ যুদ্ধের সময় ডান হাতে তলোয়ার বা বর্শা ধরত, আর বাঁ হাতে থাকত বর্ম। সেই থেকেই ডান হাত দিয়ে শক্ত শক্ত কাজ করবার অভ্যাস মানুষের মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে। এর কোন্ মত যে ঠিক, কোন্টা নয়—তা বলা শক্ত। তবে দেখা গেছে, বাপ বা মা একজন যদি 'বাঁ-হাতে' হয়, তবে তাদের ছেলেমেয়েদের প্রতি ছয়জনের মধ্যে একজন 'বাঁ-হাতে' বা ন্যাটা হবার সম্ভাবনা।

আমাদের হাতের আয়তনের কোন তফাত হচ্ছে কিনা, এ নিয়েও আমেরিকায় একটা পরীক্ষা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, গত পঁচিশ বছরে সেখানে মেয়েদের হাত একটু একটু করে বড় হচ্ছে, আর ছেলেদের হাত একটু একটু করে ছোট হচ্ছে। আমাদের দেশে এ নিয়ে কোন পরীক্ষা হয়েছে বলে শোনা যায়নি।

এটা বিজ্ঞানের যুগ, যন্ত্রের যুগ। কাজেই হাত ছাড়া মানুষের চলতে পারে কিনা, কিংবা হাতের মত এত সহজে সব কাজ করতে পারে এমন যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব কিনা, বিজ্ঞানীদের মনে এ প্রশ্ন জেগেছে। আর এ নিয়ে তাদের মধ্যে নানা আলাপ আলোচনাও হয়েছে এবং হচ্ছে। তাদের সকলেরই মত এই যে, হাত ছাড়া মানুষের চলবে না। যন্ত্রের উন্নতির সংগে হাতের প্রয়োজন বাড়বে বই কমবে না। আর হাতের মত সহজ অথচ কাজের যন্ত্র উদ্ভাবন করা এখনও বিজ্ঞানীদের বুদ্ধি বা কল্পনার বাইরে। ভবিষ্যতেও হয়ত তাই থাকবে।

মাঝিভাই

॥ বাসুদেব গুপ্ত ॥

নৌকা বাহো নৌকা বাহো মেঘের দেশের গান,
শুনতে পেয়ে ও মাঝিভাই করিস অনুমান।
ঘর করেছিস পাবনা জেলায়, মরতে এলি নদে
ঝড় উঠলে নৌকোখানা লুকোবি কোন হ্রদে।

নৌকা বাহো নৌকা বাহো ও মাঝিভাই এসে,
আমিও ত রাঙা নৌকা ভাসিয়ে দেশে দেশে
যেতে চাইছি, কিন্তু যেতে দিচ্ছে না যে বাবা
কুলের কাছে তাই ত বসে মিথ্যে খালি ভাবা।

গাইবান্ধায় ঘর ছিল মোর পরগনাটি বেশ :
সেখানেই ত মহাভারতের বিরাট রাজা তার
দুধেয়া গাই বেঁধেছিলেন, সেসব কথা আর—
মনে নিসনা, ঠাকুমা বলে, সেসব হল শেষ।

নৌকা বাহো নৌকা বাহো দুর্গাপুজোর দিনে :
ঢুলীরা সব বাদ্য বাজায় আমার দেশ চিনে।
তুইও মাঝি আয় রে জুটে উৎসবের রাতে,
পাত বিছালেই পেসাদ পাবি গভীর আহ্লাদে।

নৌকা বেয়ে নৌকা বেয়ে দুর্গাপুজোর শেষে,
হায় রে মাঝি নৌকো করে ঠাকুর নিয়ে গেলি।
অন্নময়ীর মুখ চুমিয়ে মা বলেছেন হেসে :
আবার নাকি আসবে মাতা, পরবে রাঙা চেলি॥

জোনাকি

দিব্যেন্দু পালিত

জানালার ফাঁক দিয়ে যায় ঠিক গোনা কী;—
কতগুলো জোনাকি!!!

মাঘের কুয়াশা ছিঁড়ে,
হিজল পাতার ভিড়ে—
উড়ে যায়, উড়ে যায়, উড়ে যায়!
মজা-দিঘি পার হয়ে আরো দূর—
দূরে যায়!

আঁধারের বুড়ি ছুঁয়ে
ফের এসে জুটেছে;—
দেখছে কী গাছে গাছে
কটা ফুল ফুটেছে!

সারা রাত ধরে শুধু হিজিবিজি শব্দের
জাল বুনে, যেন কোন্ পুরাতন অব্দের
মাঠ ঘুরে কোথা যায়! কেউ জানে—
জানে কী?
ওইসব কথা আর কামার মানে কী??

টিপ্ টিপ্ টিপ্ টিপ্ নিভছে, জ্বলছে!
রাত-জাগা ইশারায় চলছে, বলছে!
শরীরে শিশির মেখে মাঝরাতে একাকী;—
সাদা, নীল ফুটফুট্ একরাশ জোনাকি!!

ময়নার গল্প

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

এক যে ছিল ময়না,
গায়ে সোনার গয়না—
খাঁচার ভেতর ঘুরে বসতো,
দাঁড়ের পরে ঠোঁট ঘষতো,
কথা কইতো নাকো,
যতই কেন ডাকো;

লঙ্কাগুলের লোভ দেখালে,
ফুল দেখালে গাছের ডালে,
দেখেও যেন দেখতো নাকো সেটা—
কানের কাছে হোক না কাঁসি পেটা—
শুনেও যেন শুনতো না সে আর,
চুপটি করে কেবল নির্বিকার;

কোনো একদিন আমার ভুলে
কেমন করে খাঁচা খুলে
উড়ে বসলো ওদের ছাদের পাশে,
ফিক করে তার ঠোঁট দুখানা হাসে—
বলে উঠলো, আকাশ তাকে ডাকে—
মুহূর্তে সে পালালো ঐ পলাশবনের ফাঁকে॥

বড় শিকারির প্রথম শিকার

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

য।শ বাস 'নৈনিতাল'এর নাম শুনেছ? সঙ্গে সঙ্গে তোমরা জবাব দেবে—হ্যাঁ, নিত্যিদিন আমাদের বাড়ি নৈনিতালের আলু আসে, আর নৈনিতালের নাম জানব না!

আসলে নৈনিতালে কেবল আলুই নেই, শহর ছাড়িয়ে একটু এধারে-ওধারে গেলেই আছে ঘন বন, আর সে বনে যারা ঘোরাফেরা করে, বসবাস করে, তারা তোমার-আমার মতো মানুষকে নৈনিতালের আলুর মতোই খেয়ে সাবাড় করে আরামে ঢেঁকুর তুলতে খুব ভালোবাসে।

জগৎ-প্রসিদ্ধ শিকারী ও শিকার-বৃত্তান্তের লেখক জিম করবেটও এই নৈনিতালে জন্মেছিলেন। অব্যর্থ শিকারী হিসেবে দুনিয়ার সব বাঘা-বাঘা শিকারী করবেটকে সেলাম ঠুকে তারিফ করে থাকেন। এই ভদ্দরলোক কস্মিন কালে বানিয়ে-বানিয়ে শিকারের গল্প বলতে পারতেন না। অবশ্য তাঁর জীবনে যেসব রোমাঞ্চকর, সাংঘাতিক কাণ্ড-কারখানা ঘটেছে, সেগুলো কল্পনার দৌড়কে নীচের তলায় ফেলে রেখে আকাশে উড়তে পারে। কাজেই করবেট যখন নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে বসেন, তখন আমরা সবাই দম-আটকে, 'কি হল কি হল' দুশ্চিন্তায় হাঁপিয়ে মরি। তোমাদের মতো ছোট বয়স থেকেই ভদ্দরলোক জঙ্গলে ঘুরতে ভালোবাসতেন। আর জঙ্গলের পাখি-পাখালী, সাপ-খোপ, জন্তু-জানোয়ারদের ভালোবাসতেন। এমনই ভালোবাসতেন যে, হরেকরকম পশু আর পাখির ডাক হুবহু নকল করতে পারতেন তিনি। অনেক সময়ে এইরকম নকল-ডাকের চালাকির চাল মেরে বাঘ-নেকড়েদের নাকালও করেছেন। ধরো গহন বনে ঢুকেছেন তিনি বাঘের সন্ধানে। বাঘ ত কোথায় লুকিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে। করবেট চট করে ছাগলের ডাক ডাকতে লাগলেন। অমনি ব্যাঘ্র মশাই গোঁফ ফুলিয়ে হালুমে হাঁক ছাড়লেন। বাঘের মনের কথা টের পেতে করবেটের একটুও অসুবিধে হত না। বাঘের ওপর টানটা ভদ্দরলোকের নাড়ির টানের মতোই জোর-দার। তিনি বলতেন, বাঘ হল দস্তুরমতো উঁচুদরের ভদ্রলোক, বাঘের অসীম সাহস আছে আর আছে উদার মন। ভারতবর্ষের মানুষ যদি হুঁশিয়ার না হয়, তবে নেশা-ওয়ালা বোকা হিংস্র শিকারীরা বাঘের জাতকে মেরে উজাড় করে দেবে। এদেশে বাঘ না থাকলে ভারতের বনের মহিমা নষ্ট হবে, আর ভারতবাসী অমন একটি সুন্দর পশু সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে। এ হল করবেটের কথা। অথচ করবেটকে বাঘের বাঘা শত্রু বলে সবাই জানে। যে-মানুষ বাঘের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তিনি কি বাঘ মারেননি কখনো? হ্যাঁ মেরেছেন বই কি। তবে, তাঁর হাতে অকারণে কোনো বাঘ প্রাণ হারায়নি। কুমায়ুন-রুদ্রপ্রয়াগ অঞ্চলে বনের সঙ্গে গাঁয়ের ফারাক খুব সামান্যই। বন আর গাঁ-বসতি পাশাপাশি। বাঘেরা সেখানে দিনে-দুপুরে হানা দিয়ে মানুষ, গরু, ছাগলকে তুলে নিয়ে যেত। হয়তো ক্ষেতে চাষ করতে গেছে কোনো চাষী, কিংবা মাঠে ঘাস কাটতে গেছে কোনো মেয়ে—পিছন থেকে ব্যাঘ্র মশাই চুপি চুপি এসে মানুষটাকে পিঠে ফেলে আহারের ব্যবস্থা করে নিয়ে বনে ঢুকে পড়ল। করবেট এই ধরনের মতলব-বাজ বাঘ বা নেকড়েকেই কেবল শিকার করতেন। এরা খুব চালাক হয়, কিন্তু করবেটও ছেলেবেলা থেকে জঙ্গলের জানোয়ারদের দেখে দেখে তাদের রীতি-চরিত্তির ধরতে শিখেছেন। সে যদি ডালে-ডালে যায়, ত করবেট পাতায়-পাতায়।

করবেট মানুষটাই একটু ভিন্ন জাতের। অকারণে বাঘ নেকড়ে ভালুক শুয়োরকে যেমন মারতেন না, তেমনি আবার ঘুমন্ত কোনো জানোয়ারকেও খুন করা তিনি পছন্দ করতেন না। দরকার হলে ঘুমিয়ে-থাকা বাঘকে জাগিয়ে তাকে লড়াই করবার সুযোগ-সুবিধে দিয়ে তিনি বন্দুক ধরতেন। এই ধরনের গোঁয়ার্তুমির জন্যে বহুবার তিনি মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েছেন। তবু করবেট তাঁর আদর্শকে ছাড়তে পারেননি। সারাটা জীবন ধরে করবেট বিস্তর বড় বড় বাঘ মেরেছেন। নেকড়ে, চিতাবাঘ, সাপ, শিকার করেছেন, কিন্তু কস্মিন কালেও শখ করে প্রাণী হত্যা করেননি।

কতবার তাঁকে জরুরী কাজ ফেলে রেখে জঙ্গলের দৌড়তে হয়েছে—নইলে হয়তো একখানা গাঁ-ই উজাড় হয়ে যেতে পারে। দূর-দূরান্তর থেকে বিপন্ন মানুষেরা প্রাণের দায়ে তাঁর কাছে ছুটে আসত—"সাহেব তোমাকে যেতেই হবে। পর-পর সাতটা মানুষ খেয়েছে রাক্ষুসে বাঘ। আমরা তাকে বাগে আনতে পারছি না। এভাবে আর বেশীদিন থাকলে আমরা সবাই বাঘের পেটে চলে যাবো।"

ব্যস, সাহেব তখন চললেন। বেপরোয়া, দুঃসাহসী মানুষটা হৈ-চৈ করতেন না একদম। দিনের আলোতে বনের মধ্যে ঘুরে

তন্ময় হয়ে তাকিয়ে দেখছেন অপুবেণোভ।

ঘুরে ব্যাপারখানা বুঝে নিয়ে তারপর কাজ শুরু করতেন।

এই বিশ্ববিখ্যাত শিকারী করবেটের জীবনের প্রথম শিকারের গল্পটি মনে রাখবার মতো। জিম-এর চার বছর বয়সে বাবা মারা যান, বড় ভাই টম তখন থেকেই বাড়ির কর্তা হলেন। জিমের যখন বছর দশেক বয়স, তখন একদিন বড় ভাই টম বললেন, "কাল তোমাকে শিকারে নিয়ে যাবো।"

জিম খুব খুশী। এর আগে অবশ্য একবার দাদার সঙ্গেই জিম ভালুক শিকারে গিয়ে ভালুক দেখে ভয়েই আধমরা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবার কেন যেন জিম নিজের ছোট্ট বুকখানা হাপরের মত ফুলিয়ে মায়ের মনে সাহস জোগাতে লাগল—তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা!

ভালুক শিকারের দিন ওরা বেরিয়েছিল বিকেল বেলা। টম বললেন—ওসব বিকেল-টিকেলে বেরুলেই দিনটা খারাপ যায়।

অতএব ভোর চারটের সময় দুই ভাই ঘুম থেকে উঠে পড়লেন। চুপিচুপি গোছগাছ সেরে ও'রা আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন। এযাত্রায় ময়ূর শিকারই হল লক্ষ্য। সঙ্গে রসদ রইল চা আর বিস্কুট। বাড়ি থেকে মাইল সাতেক পথ হাঁটলে গারুপ্পুর জঙ্গল। সেখানে শীতের সময় গাছে-গাছে কুল পাকে। আর পাকা কুলের লোভে শুয়োর যায়, ভালুক যায়, হরিণ যায় আবার ময়ূরও যায় এন্তার। টমের সব জানা আছে—জিমকেও তিনি নিজের জানা-শোনার ভাগীদার করে তুলতে চান।

দুই ভাই অন্ধকার বনপথ দিয়ে হন-হনিয়ে চলতে চলতে টের পেলেন, বনের গায়ে ঘুম জড়ানো রয়েছে। তারপর একটু একটু করে কনকনে হাড় কাঁপানো শীতের জড়তা কাটিয়ে প্রথম মোরগ ডাক দিল। মোরগেরা দিকবিদিকে ডাকছে, একটু একটু করে আলো ফুটছে—আরও কতো রকমের পাখির ডাকে বনের ঘুম ভাঙার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

জিম ত অবাক। সকালের এমন মনোরম রূপ সে আর কখনো দেখেনি। ডানা থেকে রাতের শিশির ঝেড়ে ফেলছে পাখিরা—তার শব্দও কতো ভালো লাগছে।

ভালোভাবে আলো ফুটলেও শীতের কনকনানি কমেনি। পায়ের তলায় বড় বড় ঘাস। শুধু বড় বললে ঠিক বুঝবে না তোমরা। ঘাসগুলো টমের কোমর ছাপিয়ে লম্বা হয়ে উঠেছে, আর বেচারী জিমের চোখ বরাবর ঘাসে ঢাকা পড়েছে। ওপরের গাছ থেকে শিশির ঝরছে প্রায় বৃষ্টিরই মতো টুপটপ করে—আর এদিকে ঘাসে ঢাকা বন দিয়ে চলতে গায়ের জামা-কাপড়ও পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভিজে সপ-সপে হয়ে উঠল। তা হোক, জিমের তাতে একটুও দুঃখ নেই। চোখের সামনে ত্রিশ-চল্লিশটি ময়ূর একটা বড় গাছের ওপর রাত কাটিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। ময়ূরগুলো একে-একে উড়ে-উড়ে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে প্রথম সূর্যের কাঁচা রোদে পেখম মেলে দিয়ে শিশির-ভেজা পাখা শুকোতে লাগল।

মস্ত বড় শিমুল গাছটিতে একটি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো ময়ূর নেই—বাকি সবাই উড়ে গেছে ফাঁকা রোদে। এক এবং অদ্বিতীয় ময়ূরটি বেশ বড়সর। টম খুব খুশী মনে ছোট ভাই-এর হাতে বন্দুক দিয়ে এগিয়ে যেতে বললেন। আজকের প্রথম শিকার টম করবেন না, করবে জিম। জিম-এর সামনে একটা কুলের জঙ্গল। গাছের আড়ালে আড়ালে জিম খুব সাবধানে এগোতে লাগলেন। শিমুল গাছের ওপর ময়ূরটি এমন চমৎকার ভাবে বসে রয়েছে যে, ওটাকে মারতে কোনো অসুবিধেই হবে না জিমের। গাছটা একেবারে ন্যাড়া—একটিও পাতা নেই। শুধু অজস্র লাল ফুল ফুটে আছে।

জিম যখন খুব কাছাকাছি গিয়ে হাজির হলেন, তখনো ময়ূরটা নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে। শুকনো ডালে ময়ূরটি পেখম মেলে ধরেছে, রোদ এসে পড়েছে ওপাশ থেকে—আর রাঙা শিমুল ফুলেরা চারপাশে ঘিরে রয়েছে। ছোট্ট ছেলে জিম বন্দুকের কথা ভুলে গেলেন। অবাক বিস্ময়ে তাঁর চোখ-দুটো বড় হয়ে উঠেছে। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে দেখছেন তিনি—অপূর্ব শোভা। এক সময়ে ময়ূরটা হয়তো নিজের বিপদের গন্ধ পেয়ে উড়ে গেল। জিম-এর খেয়াল হল—ওই যাঃ, বন্দুকের ঘোড়া টেপা হয়নি। পিছন থেকে তাঁর দাদা এসে তাঁকে ভরসা দিলেন, একটা সুযোগ ফস্কে গেল, তার জন্যে দুঃখ করো না, এর পর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে। কিন্তু সেদিন কোনো পাখিই মারতে পারেননি জিম।

অনেক পরে, বুড়ো বয়সে জিম ভারত-বর্ষ ছেড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যান। এই ঘটনার প্রায় সত্তর বছর পরে যখন তিনি দুনিয়ার সেরা শিকারী বলে বিখ্যাত হয়েছেন, তখনও তিনি এদিনের কথা ভুলতে পারেননি।

টুকুন-বুবুন

শ্যামলকুমার চক্রবর্তী

টুকুন! টুকুন! ছোট্ট খুকু,
মিটমিটি তার চাহনিটুকু—
দুষ্টুমিতে ভরা;
নেই চাল তার নেইকো চুলো,
হাত পায়ে তাই মেখেই ধুলো,
কেটে বেড়ায় ছড়া।

বুবুন! বুবুন! ছোট্ট খোকা,
নয়কো হাঁদা নয়কো বোকা,
শান্তও নয় মোটে;
কাকুর কাছে খেলনা পেলে,
ফুলকো গালে ঢেউ যে খেলে—
মিষ্টি হাসি ফোটে।

শিল্পী শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ

চলল চাঁদের দেশে
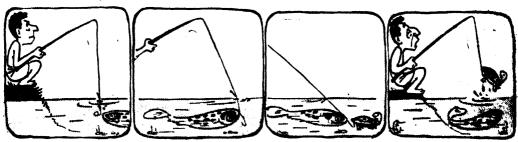
(১) খোকন-সোনার ময়ূর-পঙ্খী নাও একটা চাই
চাঁদের দেশে সাধ যে যেতে, নৌকো বানায় তাই।

(২) নৌকোখানা তৈরি হলে, খোকন মাঠে চলে
মাঠের ধারে শাপ্‌লাদীঘি! নৌকো ভাসায় জলে।

(৩) নৌকোখানা ভাসিয়ে দিয়ে, খোকন ভাবে ঠায়
ঐ নৌকো চড়ে খোকন, চাঁদের দেশে যায়।

(৪) ভাবতে ভাবতে খোকনবাবু, এমনি উদাস হয়
ঘুমিয়ে পড়ে ঘাসের বনেই, মিষ্টি হাওয়া বয়।

(৫) ঘুমজড়ানো স্বপন চোখে চমকে খোকন হাসে
হাতির দাঁতের ময়ূরপঙ্খী, তার নৌকোর পাশে!
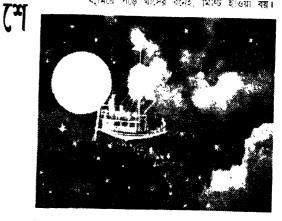
(৬) কাগজের নাও ছেড়ে তখন খোকন হেসে হেসে
চাপলো ময়ূরপঙ্খী ভেসে চললো চাঁদের দেশে।

ছড়া—শ্রীবিমল ঘোষ ফটো—শ্রীরেবন্ত ঘোষ

তখন রাত্রি প্রায় আটটা। সেই সময় খবরটা এল। একজন এসে ঠোঁটটা বেঁকিয়ে কেমন একরকমের বিদ্রূপময় অথচ নির্বিকারভাবে হেসে খুব সাধারণ গলাতেই বলল, "ওই যে, ওই সেই মেয়েটা, মারা গেছে।"

পৌষ মাস। অন্ধকার ঘনিয়েছে প্রায় ঘণ্টা তিনেক আগেই। মফস্বল শহরের সদর-অন্দর, সব রাস্তাই এতক্ষণে ফাঁকা হয়ে আসার কথা। হয়ও অন্যান্য দিন। কিন্তু আজ শনিবার। তাই এখনও কিছু লোকের আনাগোনা রয়েছে।

রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ভিড়টা একটু বেশী। কারণ দোকানপাট বেশী, আলোও বেশী আর মানুষের যাতায়াত ত আছেই। তারপর রাস্তাটা উত্তর-দক্ষিণে ক্রমেই ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, দোকানপাট কমে এসেছে।

আকাশে কুয়াশা, তারাগুলি মরা চোখের মত নিষ্প্রভ। ধুলো আর ধোঁয়ায় গোটা শহরটা উলঙ্গবাহার শাড়ির মত একটা অশ্লীলতার আবরণ জড়িয়েছে যেন। উত্তুরে বাতাসে শীতের কাঁটা। 'সিটি ফাদার' ষাঁড়টা স্টেশনের বারান্দায় উঠে পড়েছে। রাস্তার কুকুরেরা আর মানুষেরা গরম আশ্রয়ের সন্ধান করছে।

সেই সময় খবরটা এল।

দক্ষিণের ফাঁকায়, রাস্তার উপরে, সেকেলে নিচু-ছাদ, পোকা-খাওয়া কড়ি-বরগা আর চুন-বালি-খসা 'গণেশ কাফে'র ঘরে সংবাদটা এল। গণেশ কাফেতে তখন জম-জমাট আড্ডা। চায়ের কাপ-গেলাস-ভাঁড়, সবরকম পাত্রই জড় হয়েছে টেবিলের উপর। প্রায় একটা গণতান্ত্রিক ঐক্যের মত। সস্তা সিগারেট আর বিড়ির ধোঁয়ায় ঘরটিকে গ্রাস করেছে।

মালিক লুঙ্গি পরে চাদর জড়িয়ে বসে আছে কাউণ্টারে। নতুন লোক আসার সম্ভাবনা কম। এখন যারা আছে, তারা প্রতিদিনের, প্রায় সব সময়ের। অধিকাংশই স্থানীয় বেকার যুবক। কলেজ থেকে ফেল-করা, ভেগে-পড়া কিংবা পড়তে-না-পাওয়া-দের ভিড়ই বেশী। ময়লা পাজামা, ধুতি, প্যাণ্ট, ছেঁড়া জামা, উসকোখুসকো চুল আর পুরোপুরি খেতে না-পাওয়া মুখের একটা লেপটালেপটি দঙ্গল। অবশ্য এদের মধ্যে এদেরই দু-একজন ফিটফাট চকচকে, ভরপেট খাওয়া সুস্থ বন্ধুবান্ধব যে না দেখা যায় তা নয়। তবে সেটা অনিয়মিত। খাপছাড়া, করুণা-করুণা ভাব। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, পি এস পি, আর এস পি, স্কুল-কলেজ মিউনিসিপ্যালিটি, খুন-জখম-মারামারি, প্রেম-ফুসলানো-হরণ, গান-বাজনা-থিয়েটার এই শহরের আদি ও অন্ত এখানকার আলোচনার বিষয়। মায় সাহিত্য পর্যন্ত। চেঁচামেচি উত্তেজনা ত আছেই। হাসাহাসি গালাগালি আছে। হাতা-হাতিও যে নেই, তা নয়। মাঝেমধ্যে ছুরিও বেরিয়ে পড়েছে ক্রুদ্ধ হুঙ্কারের মধ্যে। হয়নি যদিও, তবু খুনোখুনির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে অনেকবার। আর এরই মধ্যে আবার কান্নাও আছে। রাত্রি আটটার সময়, আড্ডা তখন বেজায় জমজমাট। কেরোসিন কাঠের পার্টিশান দেওয়া দুটি ছোট ছোট 'ফর লেডিজ'এর খুপরিতেও আড্ডা জমেছে। যদিও লেডী নেই একজনও।

গণেশ-কাফের মালিক গণেশও আড্ডার শরিক হয়ে গিয়েছে। বাতাসহীন চাপা ঘরটায়, সস্তা সিগারেট আর বিড়ির ধোঁয়ায় একটি নরক-গুলজার-করা প্রেত-ছায়ার মত দেখাচ্ছিল সবাইকে। নানান রকমের কথা, হাসি ও বাদ-প্রতিবাদে সবাই যখন মশগুল, সেই সময়ে একটা নিত্য-নৈমিত্তিক পুরনো খবর বলার মত, হেসে নির্বিকারভাবে একজন এসে বলল, "সেই, কলোনি-পাড়ার কাছে, ভটচার্জি পাড়ার রাধু বাড়ুজ্যের মেয়ে আমাদের ফেমাস বিজু, বিজলী হে বিজলী, মারা গেছে।"

নরকটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। ছায়া-গুলি মন্ত্রপড়া জল ছিটুনোর মত অনড় নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে রইল খবরদাতার দিকে।

একটু পরে একটা মোটা গলা শোনা গেল, "কী ভাবে?"

জবাব শোনবার আগেই আর একজন বলল, "আজ বিকেলেও ত দেখেছি।"

আর একজন, "হ্যাঁ, এখানেই ত দেখেছি সন্ধের সময়।"

বলে সে একজনের দিকে তাকাল। যার দিকে তাকাল, সে দাঁড়িয়ে পড়েছে তত-ক্ষণে। তার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুজন। চব্বিশ-পঁচিশের বেশী কারও বয়স নয়। তিনজনেই প্রায় একসঙ্গে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় বলে উঠল, "হ্যাঁ, আজ আজই সন্ধেয় সে ছিল। কিন্তু কীভাবে মারা গেল? কোথায় আছে?"

যে খবরটা এনেছিল, সে বলল, "নিশি স্যাকরার আমবাগানের ধারে নর্থ কেবিনের কাছে, রেল লাইনের ওপরে।"

"রেল লাইনে?"

"হ্যাঁ। মালগাড়ির তলায় কাটা পড়েছে। আমি দেখে এসেছি। ঠিক গলার কাছ থেকে—"

"সুইসাইড নিশ্চয়? নইলে সেখানে রাত্রিবেলা কে যায়?"

ততক্ষণে সেই তিনজন বেরিয়ে গিয়েছে।

তারপরেও গণেশ কাফের নিচু-ছাদ ঘরটা খানিকক্ষণ যেন দম চেপে রইল। একটু পরে একজনের গলা শোনা গেল, "আশ্চর্য! কিছু বোঝা যায় না আজকাল।"

গণেশ ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, "সত্যি! আর এই রেল লাইনটা যেন কী মাইরি।"

কেউ কেউ উঠল। বলল, "যাই, দেখে আসি।"

সেই তিনজন তখন ছুটতে ছুটতে অন্ধকার রেল লাইন দিয়ে নর্থ কেবিনের কাছে এসে পৌঁছেছে। জায়গাটায় রাস্তার আলো আসে না। কেবিনের আলো এসে পড়বার সুযোগ পায়নি একটি গাছের জন্য। গুটি তিনেক টিমটিমে রেল-লণ্ঠন নিয়ে এসেছে কেবিনের কুলি। জি আর পি পুলিশও এসে পড়েছে। মাঝে মাঝে চমকে উঠছে তাদের টর্চলাইটের আলো। কিছু লোকের ভিড় ঘিরে রয়েছে ফোর্থ লাইনের একটা অংশ।

ওরা তিনজনে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল। লাইনের দিকে একবার তাকিয়েই একই সঙ্গে চোখাচোখি করলে তিনজনে। একটা অসহায় জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়ে উদ্দীপ্ত তিন জোড়া চোখ। তিনজনেই যেন পরস্পরকে জিজ্ঞেস করছে, এটা বিজুই ত?

হ্যাঁ। বিজুই। চোখ নামিয়ে আবার দেখল তারা বিজলীকে। ঠিক ঘাড়ের কাছ থেকে মাথাটা কেটে গিয়েছে। জড়ান রুক্ষ দীর্ঘ বেণীটা পুরোপুরি এলিয়ে পড়ে আছে লাইনের মধ্যে, কিন্তু মাথা সুদ্ধ লাল ফিতে স্লীপারের উপর। মাথাটা লাইনের মধ্যে, শাড়ি-জড়ানো দেহটি লাইনের বাইরে পাথর আর ঘাসের উপর যেন প্রায় কাত হয়ে এলিয়ে পড়ে আছে।

রেল-লাইনের টিমটিমে আলো বিন্দুর মত চিকচিক করছে বিজলীর চেয়ে-থাকা স্বচ্ছ চোখে। হা-মুখটা খোলা, ঝকঝকে সাদা দাঁতে আলো পড়েছে। কপালের রক্ত-টিপটা জ্বলজ্বল করছে এখনও। আর এদিকে ঘাড়ের কাছ থেকে খয়েরী-ডোরা কালোপাড় শাড়ির আঁচলটা ঠিক বুকের উপর দিয়ে টানা আছে। কোথাও যেন এত-টুকুও অবিন্যস্ত হয়নি। কেবল বাঁ পায়ের থেকে শাড়িটা একটু বেশী উঠে গিয়েছে, ঘুমন্ত যে-রকম উঠে যায় মানুষের। হাতের
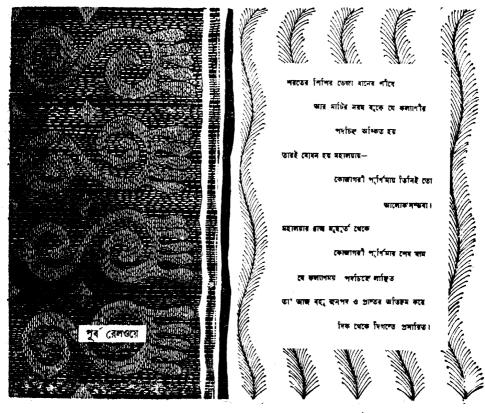
লাল কাচের চুড়িগুলির কয়েকটা ভেঙে পড়ে আছে হাতের কাছেই। বাকীগুলি সবই আস্ত আছে। কোথাও রক্ত লেগে নেই। কেবল ঘাড়ের কাছে খয়েরী ডোরা কাটা শাড়িটা পেরিয়ে লাল ব্লাউজের বুকের উপর গড়িয়ে এসেছে একদলা রক্ত। শীতের উত্তুরে হাওয়ার টানে তা এর মধ্যেই শুকিয়ে যেন বাসী হয়ে গিয়েছে।

তা ছাড়া আর সব ঠিক আছে। যেন, ঘাড়ের সঙ্গে মাথাটা জুড়ে দিলে, এখুনি বিজু ওর বিজলী চমক চমক হাসি হাসতে হাসতে উঠে বসে, চমকে দেবে সবাইকে। যে-হাসিতে এই মফস্বল শহরের সবাই কোনও না কোনও দিন একবার চমকেছে।

বিজু, হ্যাঁ বিজুই। কলঙ্ক যার অঙ্গের ভূষণ ছিল। যে-কলঙ্কিনীর কথা বলতে রসিয়ে উঠত শহরের ইতর ভদ্র। যাকে সহজলভ্য মনে করে সেই চিরকালের টোপ-ফেলাফেলি খেলা অনেক হয়েছে কিন্তু প্রচন্ড আক্রোশে গর্জাতে হয়েছে নীরবে ও সরবে। অথচ যাকে কলেজের কয়েকটা পড়ো কিংবা পড়তে পড়তে সরে-পড়া বখাে দুর্বিনীত ছেলের সঙ্গে প্রায়ই এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে নির্লজ্জের মত। সন্দেহজনকভাবেই রাস্তার উপর গায়ে গায়ে, জোরে হেসে হেসে, শহরের গায়ে জ্বালা ধরাতে দেখা গিয়েছে। এমন কি আজও দেখা গিয়েছে। এ সেই বিজলী, এই রেলে-কাটা মেয়েটা।

গণেশ কাফের ওই তিনজন আবার চোখাচোখি করল। ওরা তিনজন সেই কয়েকটা বখাে ছেলে, যাদের সঙ্গে বিজুকে দেখা যেত সবসময়। তাদের তিনজনেরই চোখের দৃষ্টি যেন গলায় দড়ি দেওয়া লাসের মত আরও উদ্দীপ্ত। একটা মহা-শূন্যের মত অশেষ বিস্ময় ও প্রশ্ন নিয়ে যেন এখুনি চোখগুলি রক্ত কিংবা জলের ফোয়ারা ছুটিয়ে ফেটে পড়বে।

বিজু বিজুই ত। যে আজ বিকেলেও তাদের তিনজনের সঙ্গে গণেশ কাফেতে ছিল। যার কথায়, হাসিতে, এমন কি রাগ ও অভিমানের মধ্যে, একবারও এই কাটা পড়ার ছায়াও দেখা যায়নি।

তবে?

ভিড়ের মধ্যে কার একটি রসাল দীর্ঘ হুঁ-উ-উ শোনা গেল। তারপর চাপা গলায়, "বড্ড বাড়িয়েছিল। বোঝ এবার।"

তিনছোড়া চোখ সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের দিকে জুটে গেল যেন খ্যাপা নেকড়ের মত। কাউকেই চেনা যায় না। রেল-লণ্ঠনগুলি বিজলীর কাছে নামান। বিজলীকে ঘিরে রয়েছে। ভিড়ের লোকগুলি অস্পষ্ট।

অচেনা আর চেনা লোকের গুঞ্জন একই-ভাবে চলছে। কে? কার মেয়ে? ও! সেই সেই মেয়ে? কী হয়েছিল?

বুঝে নাও! হয়েছিল একটা কিছু নিশ্চয়।

হবে, জানা-ই ছিল।

বিজলীর বাবা রাধুবাবুকেও দেখা গেল জি আর পি'র দারোগার পাশে। বিজুর দিকে ও'র চোখ নেই। অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন কোল-বসা চোখে। খুবই অসহায়, তবু যেন একটা অপরাধীর ভাব। বিজলীর লাস কিংবা লাস দেখতে আসা ভিড়ের কারও দিকেই তাকাতে পারছেন না।

দারোগা জিজ্ঞেস করল, "কত বয়স হয়েছিল আপনার মেয়ের?"

"তেইশ।"

"বিয়ে দেননি কেন?"

দারোগার মতই প্রশ্ন। রাধুবাবু বললেন, "সঙ্গতি ছিল না।"

"হুঁ। কী হল হে, লাস বাঁধ।"

একটি সেপাই জবাব দিল, "বাঁশ নিয়ে জমাদার আসছে স্যার।"

"হুঁ।" দারোগা আবার বলল, "থার্ড ইয়ার থেকে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল কেন আপনার মেয়ে?"

"ছ মাসের বেতন বাকী পড়েছিল, তাই।"

"উঁ, তা হলে বলছেন, কোন চিঠিপত্রই রেখে যায়নি?"

"না।"

"আঁ-হা! দেখবেন মশাই, চেপে টেপে যাবেন না, পরে মুশকিলে পড়ে যাবেন।"

রাধুবাবু যেন ধরা-পড়া চোরের মত অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন।

দারোগার টর্চলাইট একবার ঝলকে উঠল কাটা বিজলীর উপর।

লাস বেঁধে নিয়ে যাওয়ার লোকেরা এল।

ওরা তিনজন এগিয়ে গেল রাধুবাবুর কাছে। ওদের তিনজোড়া উদ্দীপ্ত চোখে একটা হিংস্র প্রশ্ন বাগিয়ে ধরা ছুরির মত চকচকিয়ে উঠল নিঃশব্দে। রাধুবাবুর কাছে তারা জানতে চায়, কী হয়েছিল।

কেন মরেছে বিজলী।

রাধুবাবু তেমনি অসহায়ভাবে তাকালেন। বললেন প্রায় চুপি চুপি, "এই যে শঙ্কর আর নরেশ এসেছ। ও, প্রভাতও এসেছ?"

হ্যাঁ, ওরা এসেছে, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। রাধুবাবু কী জানেন, সেইটি বলুন। তারা জানতে চায় তাদের, হ্যাঁ তাদের বিজু যে হাসতে হাসতে এসেছিল গণেশ কাফে' থেকে, সে কেন গলা বাড়িয়ে দিয়েছে রেলের তলে।

রাধুবাবুও ওদেরই চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। একক্ষণে দেখা গেল, ও'র কোল বসা চোখ দুটি সর্দি-জ্বরের মত ভেজা ভেজা লাল হয়ে উঠছে। দাঁতহীন ঠোঁট দুটি চাপছেন বারে বারে। বললেন, "কিছু জানিনে। বিজুর তোমরা বন্ধু। তোমরা, তোমরা কিছুই জান না?"

শঙ্কর নরেশ আর প্রভাত আবার চোখাচোখি করল। বুঝল ওরা, রাধুবাবু সত্যি কিছু জানেন না। তবে? তবে কে বলবে? কে জানে?

তিনজনেরই দৃষ্টি গিয়ে পড়ল বিজলীর উপরে। ওরা চমকে পরস্পরের হাত চেপে ধরল। যেন নইলে ছিটকে বেরিয়ে যাবে কোথাও। দেখল, বিজলীর শ্যামলী মুখখানি ওর বুকের উপর বসিয়েছে জমাদারেরা। আর বিজলী এখন চেয়ে আছে ঠিক তাদের তিনজনের দিকে।

ওরা তিনজনেই যেন নিঃশব্দে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, বি—জু! বি—জু!

জমাদারেরা লাস কাপড়ে বেঁধে বাঁশে

ঝুলিয়ে নিল। দারোগা ডাকল, "আসুন রাধুবাবু।"

ভিড় ছত্রভঙ্গ হল। একদল লেগে-থাকা মাছির মত চলল জি আর পি পুলিশ অফিসের দিকে, লাসের পিছু পিছু।

ওরা তিনজন কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তারপর আরও খানিকটা উত্তর-দিকে গিয়ে, আঁশশ্যাওড়ার জঙ্গল পেরিয়ে নির্জন আর অন্ধকার রেল-পুলটার উপরে গিয়ে উঠল। রেলিংএর উপর ভর দিয়ে, ঝুঁকে দাঁড়াল। জংশন স্টেশনের সর্পিল লাইন এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে অনেক দূর।

উপর থেকে দেখা যাচ্ছে, গোটা শহরটাকে ধোঁয়া গ্রাস করে ফেলছে।

ওদের তিনজনকেও একটা ভয়ংকর কিছু গ্রাস করে ফেলছিল। শত চেষ্টাতেও কারও গলা দিয়ে যেন একটি শব্দও বেরুল না।

কেবল নরেশ দম নিয়ে নিয়ে বলল, "বিজু-বিজুটা..."

আর কিছু বলতে পারল না। কেবল মনে পড়ল, রেজকার মত আজকেও বিজু কেমন খিলখিল করে হেসেছিল বিকেলে।

তিনজনই চুপ করে রইল। ঝিঁঝিঁর চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

বিজুর খিলখিল হাসি ওদের তিনজনের বুকেই যেন বাজতে লাগল। তিনজনেই তাকাল ফোর্থ লাইনের সেই জায়গাটায়। কিছুই দেখা যায় না। ওখানে লাইনের উপর হয়ত এখনও রক্তের দাগ লেগে আছে। হয়ত এতক্ষণে শেয়াল এসে চাটতে আরম্ভ করেছে। আর ওরা তিনজন যখন চলে যাবে পুল থেকে নেমে, গভীর রাত্রে সেই খিল-খিল হাসিটা হয়ত রেল লাইনের লোহায় বেজে উঠবে। কেননা, বিজুর গলাটা ওই লাইনের উপরেই কাটা গিয়েছে।

ওদের তিনজনকে এখন যে-কোনও লোক পুলের উপর এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে খারাপ কিছু সন্দেহ করত। যেন তিনটে ষড়যন্ত্রী কোন সর্বনাশের মতলব আঁটছে। ওদের ময়লা ছেঁড়া জামা কাপড় উসকো-খুসকো চুল, সর্বোপরি ওদের রক্তাভ চোখে কুটিল প্রশ্ন ও কঠিন প্রতিহিংসার একটা বাসনা দপদপ করছে।

মণি-হারা অজগরটার মত দারুণ যন্ত্রণায় ও আক্রোশে যেন ওরা মনের অন্ধকারে হাতড়ে ফিরছে বিজুর মৃত্যুর কারণটা। মনে পড়ছে। আজ যখন বিজু এল বিকেলে, ওরা বললে, "বিজু তুমি লেট।" বিজু বললে, "এখন থেকে লেট হতে হতে আর আসাই হবে না।" ওরা বললে, "কেন?"

বিজু হেসে বললে, "বা রে, আমার বুঝি বে-থা হবে না। তোমাদের তিনজনের সঙ্গে ঘুরলেই আমার চিরকাল চলবে?" বলে জোরে হাসল।

কিন্তু কী এসে যায় তাতে? ওকথা বিজু প্রায়ই বলত। নতুন কিছু নয়। হাঁ। লেট বিজুর প্রায়ই হত। মনে কোনও রাগ থাকলে, কিংবা এমনি রহস্য করেও কতদিন বলেছে, "আর আসা হবে না। আজকেই ইতি।" এরকম অনেক ইতি হয়েছে, কিন্তু তারপরে পুনশ্চের কোন অভাব হয়নি। সুতরাং বিজুর আজকের কথায় কিংবা ভাবে নতুন কিছুই ছিল না, যা দিয়ে শেষ-দেখাকে চিহ্নিত করা যায়।

তবে? তবে কী হল? ওরা তিনজনে একই সঙ্গে ফিরে তাকাল আবার লাইনের দিকে। তিনজনেরই যেন লাইনটার উপরে গিয়ে কপাল কুটতে ইচ্ছে করছে। কপাল কেটে কুটে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, "কেন, কেন বিজু?"

কিন্তু ওরা তিনজনেই মুখ চেপে রইল রেলিং-এ। কেননা, কপাল কুটে রক্ত-গঙ্গা করলেও লোহার লাইনটা কিছু বলবে না।

শুধু বিজুকে ঘিরে ওদের পুরনো দিনগুলি আবর্তিত হতে লাগল। সেই দিনগুলি, যখন বিজলী ব্যানার্জি ছিল ওদের সহপাঠিনী।

যখন ওরা ছিল ছাত্র। যখন ওদের জীবনে ছিল ঝড়ের বেগ, ফেনিলোচ্ছল প্রাণ আর চোখে স্বপ্নের কাজল। যখন বিজু ক্লাসে আসত রাজেন্দ্রাণীর মত, আর ওরা ছিল যেন বিদ্রোহী প্রজা। রানীর স্তুতি করত ওরা বিদ্রূপ দিয়েই, বেয়াদপির হাসি থাকত ওদের ঠোঁটে ও চোখে। কিন্তু বিজু ছুটে যায়নি প্রিন্সিপালের ঘরে। খাঁটি রাজেন্দ্রাণীর মত শুধু হেসেই শান্ত করেছে সেই বিদ্রোহীদের। যে-হাসিটা তখন থেকেই বিজুর কলঙ্কের সন্দেহ ঘনিয়ে এনেছিল সকলের মনে। আর সকলের মত ওরা তিনজনও সন্দেহ করত। কলঙ্কিনী ভেবেই ওদের বিদ্রোহ মন্ত্র ছড়িয়ে উঠতে চেয়েছে মাঝে মাঝে।

কিন্তু ছাত্র-জীবনের যেখানটায় থাকা উচিত ছিল নিশ্চিন্ত আশ্রয়, আহার আর একটু ভালবাসা, ওদের সেই আসল নোকোটাই ছিল তলা-ফুটো। জীবনে যে-ঝড়ের বেগটা ছিল, সেটা শুধু নোঙর ছিঁড়ে টেনে নিয়ে গিয়েছে সর্বনাশের মধ্যে। কলেজের প্রাঙ্গণ ছেড়ে কবে ওরা জীবনের আগুন-লাগা অঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, নিজেদেরই মনে নেই। মনে নেই, বাইরের প্রাঙ্গণে এসে কলেজের দলাদলি ভুলে, কবে ওরা তিনজন বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। বেকারি আর অনাহারের জ্বালায় কবে ওরা শহরের সেরা দুর্বিনীত ও বেয়াদপ বলে কু-খ্যাত হয়ে গিয়েছে, সে-কথা ওরাও জানে না।

আর কে এক বিজলী ব্যানার্জিকে নিয়ে কোন একদিন ওরা একটু মস্তানি করতে চেয়েছিল, সে-কথাও ওদের মনে থাকত না, যদি না তিনবছর আগের এক সন্ধ্যায়, শহরের দক্ষিণে, নিরালা রেল-কালভার্টের উপর দেখা হয়ে যেত। রাজেন্দ্রাণীর চোখের কোলে সেদিন গভীর পরিখা। চোখ দুটি বড় বেশী ভাসা ভাসা, করুণ। মুখখানি শুকনো। হাতে ভরতি বাদাম ভাজা। মুখেও দু-একটি দানা ছিল।

ওদের তিনজনকে দেখে এক মুহূর্ত বুঝি লজ্জা পেয়েছিল বিজু। পর-মুহূর্তেই সেই রাজেন্দ্রাণীর হাসি বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল তার করুণ মুখে। বলেছিল, "আপনারা এখানে?"

বিজলীকে দেখা মাত্র ওদের তিনজনেরই জিভ্ চুলকে উঠেছিল বিদ্রূপ করার

PASTEUR LABORATORIES
PRIVATE LTD.
2, CORNWALLIS STREET,
CALCUTTA-6
PHONE: 34-2674

জন্যে। মনে মনে তৈরি হয়ে উঠেছিল পিছনে লাগার ফিকিরে।

কিন্তু বিজলীর কালো চোখ দুটিতে কী জাদু ছিল, ওদের ইচ্ছে পূরণ হয়নি। বরং সেই কুখ্যাত দুর্বিনীতেরা বিজুর গায়ে-পড়া অলাপে যেন একটু থতিয়েই গিয়েছিল। বলেছিল, "এমনি।"

কিন্তু একটু রহস্যের আভাস যেন চিকচিক করে উঠেছিল বিজুর কালো চোখে। বলেছিল, "আরও কদিন দেখেছি এখানে আপনাদের।"

বলে হাতের মুঠি খুলে বাড়িয়ে দিয়েছিল তিনজনের দিকে। বলেছিল, "নিন, বাদাম খান।"

ওরা তিনজন মুখ চাওয়াচায়ি করে, বাদাম নিয়েছিল। দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল, তিনজনের মুখে উপোসের ছাপ। ছেঁড়া জামা কাপড় আর উসকোখুসকো চুলে তিনজনকে যতটা হতভাগা মনে হচ্ছিল, তার চেয়ে বেশী মতলববাজের ছাপ ছিল ওদের চোখে মুখে।

ওদের তিনজনকেই একটা অস্বস্তি ঘিরে ধরেছিল। কী বলতে চায় মেয়েটা? ওরা কেন আসে এই কালভার্টের কাছে, জানে নাকি সে? জানে নাকি ওই অদূরের সাইডিংএর পাশে থাক-দেওয়া রেল-স্লীপারগুলি সরাতে এসেছে ওরা? কেন না, স্লীপারগুলি একটি কাঠের গোলায় পৌঁছে দিলে তবে ওরা কিছু টাকা পাবে। টাকা ওদের চাই, নইলে বাঁচা যায় না। আর বাঁচবার অন্য-কোন রাস্তা ওরা আবিষ্কার করতে পারেনি।

কিন্তু বিজলী ওদের কিছুই বলেনি। শুধু সেই হাসিটুকুই লেগে ছিল ঠোঁটের কোণে। বলেছিল, "চলুন, শহরের দিকে যাওয়া যাক।"

অসম্ভব। কাজ হাসিল না করে কেমন করে যাবে ওরা? পা ঘষছিল তিনজনেই।

বিজলী আবার বলেছিল, "চলুন।"

আশ্চর্য! সে-ডাক ওরা ফেরাতে পারেনি। যেন কোন্ সুদূরে আবছায়া থেকে এক বিচিত্র রহস্যময়ী তাদের ডাক দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল হাতছানি দিয়ে। নিয়ে গিয়েছিল ওদেরই গণেশ কাফের আস্তানায়। আর নিজের খিদের নাম করে এক রাশ খাবার নিয়েছিল। বলেছিল, "টি এক্স আর এর ক্লাস টেনের মেয়েটাকে পড়াই। আজ মাইনে পেয়েছি, খাওয়া যাক।"

তখন ওদেরও চকিতে মনে পড়ে গিয়েছিল কালভার্টের কাছেই টি এক্স আর এর কোয়ার্টার। তাই বিজু তাদের দেখতে পেয়েছিল কয়েকদিন।

ওরা লোভীর মত খেয়েছিল। জানত, রাধু বাড়ুজ্যের এক পাল পুষ্যি-থিকথিক ঘরে কানাকড়িটি না থাকলেও বিজলীর অভাব নেই। তাঁর মেলাই মক্কেল।

খেতে খেতেই তিনজনের মধ্যে কে যেন জিজ্ঞেস করেছিল, "কলেজের খবর কী?"

বিজু ছোট মেয়েটির মত এক মুখ খাবার নিয়ে বলেছিল, "ছেড়ে দিয়েছি।"

"কেন?"

"টাকা নেই।"

অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল ওদের। টাকা নেই, সবাই জানত। কিন্তু এ-কথাও সবাই জানত, ব্রজেন পালের মত কাপ্তেন থাকতে, বিজলীর কোনও অভাব নেই। উৎকৃষ্ট ব্যবসায়ী নকুড় পালের নিকৃষ্ট ছেলে ব্রজেন পাল। কিন্তু নকুড়ের মতে, সে ত ভগবানের হাতে। ওই হাতটি থাকলে গাধা পিটিয়ে নাকি ঘোড়া করা যায়। আর পাল-বংশে কলেজের মুখ দেখা সে-ই ত প্রথম। অতএব, বি এ পাশ করতে দশ বছর লাগলেও ক্ষতি কী? নিকৃষ্টের পিছনে উৎকৃষ্ট টাকা থাকলেই ত গাধা একদিন ঘোড়ার মত হ্রেষাধ্বনি করতে পারবে।

সেই হ্রেষাধ্বনিরই বাসনায়, খুরেমারা নাল থেকে মাথার শিরস্ত্রাণ পর্যন্ত পোশাকে আশাকে ব্রজেন একটি পাকা অশ্ব হয়ে গিয়েছে তখন। আমেরিকান কাট কোট প্যান্টের পকেটে তার উৎকৃষ্ট টাকা বাজত ঝনঝন করে। বিশেষ করে বাজিয়ে ফিরত সে বিজলীর পিছনে। কলেজ থেকে রাধু বাড়ুজ্যের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করতে দেখা গিয়েছে ব্রজেনকে। ব্রজেনের কথা শুনে মনে হত, বিজলীর শাড়ি ব্লাউজ, বই-ফাউণ্টেনপেনটি পর্যন্ত ওর টাকাতেই কেনা।

সবাই তাই বিশ্বাস করত। ব্রজেনের সঙ্গে তখন বিজলীকে এদিকে ওদিকে দেখাও যেত। তাই, টাকা নেই শুনে ওদেরই গলায় খাবার আটকে যাবার দাখিল হয়েছিল।

বিজুর চোখে সেই রহস্যের ঝিকিমিকি আরও কয়েকটা ঘুলঘুলি দিয়েছিল খুলে। হেসে বলেছিল, "কী হল?"

একজন জিজ্ঞেস করেছিল, "ব্রজেনের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে নাকি?"

পলকের জন্য বুঝি বিজলীর চিকুর-চিকচিক চোখ মেঘে ঢেকে গিয়েছিল। ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু গিয়েছিল মরে।

পরমুহূর্তেই আবার হেসে বলেছিল, "ঝগড়া হবে কেন। যতটুকু ভাব দেখছেন, এখনও তাই আছে। ব্রজেন ত কখনও পেছন ছাড়ে না। আপনারা বোধহয় দেখেননি, ব্রজেন ছায়ার মত আমাদের পেছন-পেছন এসেছে। উঁকি দিয়ে দেখুন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, এই দিকে চেয়েই।"

ওরা উঁকি দিয়ে অবাক হয়ে দেখেছিল, সত্যি ব্রজেন বাইরে দাঁড়িয়ে। চোখে তার অপেক্ষমান কুকুরটার কৃপা প্রার্থনার দৃষ্টি। ঠোঁটে সিগারেট, দু হাত প্যান্টের পকেটে।

ফিরে দেখেছিল ওরা, বিজলীর ঠোঁটে যেন ক্লান্ত বিষণ্ণ হাসি। আর সেই ওদের তিনজনেরই, বিজলীকে বড় অসহায় মনে হয়েছিল। ওদের দুর্বিনীত বুকেও মানুষের হৃৎপিণ্ডের অবশিষ্টাংশে টনটন করে উঠেছিল যেন একটু।

বিজু কেমন একটু হেসে আবার বলেছিল, "মেয়ে হয়ে ব্রজেনের টাকা কেমন করে নেওয়া যায়, বলুন।"

সেই মুহূর্তেই বিজলীর দিকে তাকিয়ে-থাকা চোখের চাউনি একেবারে বদলে গিয়েছিল ওদের। সেই মুহূর্তেই একটি মেয়ে-জীবনের সত্যের তত্ত্বকে আবিষ্কার করে, বিজলীর নতুন পরিচয়ে অপরাধী হয়ে উঠেছিল নিজেরা।

বিজলী তখন উঠে পড়েছিল। ওদের মধ্যেই কে যেন বলেছিল, "চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

বিজলীর চোখে আবার সেই রাজেন্দ্রাণীর হাসি উঠেছিল চমকে।

বলেছিল, "ব্রজেনের জন্যে? তার দরকার হবে না। পেছনে ঘুরেই যখন ওর শান্তি, ও ঘুরুক। কিন্তু—"

বিজলীর চোখে রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল হঠাৎ। একটু থেমে বলেছিল, "কালভার্টের ওই বিচ্ছিরি জায়গাটায় আপনারা আর যাবেন না। রেলের গুড্‌সশেডের ওখানটা থেকে পুলিশে বিনা দোষেও লোক ধরে নিয়ে যায়।"

বলে সে চলে গিয়েছিল।

ওরা তিনজন যেন বিজলীতারের শক্ খেয়ে থমকে তটস্থ হয়ে গিয়েছিল।

সেই ওদের ত্রয়ীকে ঘিরে বিজলীর শুরু। সেইদিনই গণেশ কাফে থেকে গোটা শহরে মাছিরা ভ্যানভ্যান করে উঠেছিল, তিন কুখ্যাতের সঙ্গে বিজলীর মিলনের কথা। বলেছিল, যার যেথা ঠাঁই।

তারপর সে-কাহিনীও পুরনো হয়ে গিয়েছে। এই তিনবছরে, ওই তিনজনের সঙ্গে বিজু প্রতিদিন ঘুরেছে। কবে ওরা 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' হয়ে গিয়েছে। কবে ওরা চারজনের এক সর্বক্ষণের অখণ্ড জুটি হয়ে গিয়েছে, নিজেদেরও বোধহয় মনে নেই। দেখে, শহরের টোপ-ফেলা খেলোয়াড়েরা অনায়াস ভেবে অনেকবার উৎসাহিত হয়েছে আর আক্রোশে দাঁত পিষেছে। ব্রজেন পিছন ছাড়েনি, ক্ষিপ্ত হয়েছে আরও। গোটা শহরের গায়ে অনেক জ্বালা ধরেছে। আজও ধরেছে।

আজও ধরেছে এবং ধরিয়ে বিজু নিশিস্যাকরার আমবাগানের ধারে এসেছিল। কেন?

রেলপুলের উপর থেকে তিনটি অভিশপ্ত প্রেতের মত ওরা আবার ফিরে তাকাল ফোর্থ লাইনের সেই জায়গাটায়।

আর ওদের তিনজনেরই মনে হল, প্রথম দিন বিজুকে যে রহস্য ঘিরে ছিল, আজ সেই রহস্যই ওই ফোর্থ লাইনের উপরে শেষবারের জন্য গলা পেতে দিয়েছে। উদ্ঘাটনের কোন চিহ্নই সে রেখে যায়নি। শুধু তিনটি প্রেতাত্মা চিরকাল ধরে সেই রহস্যের সন্ধানে ফিরবে।

ফিরবে, আর জানতে চাইবে, কেন বিজু নিশিস্যাকরার আমবাগানের ধারে এসেছিল? বিজু তাদের কালভার্টের সেই বিচ্ছিরি জায়গাটায় যেতে বারণ করেছিল, তারা আর যেতে পারেনি। তারপরে বিজু তাদের অনেক জায়গায় যেতে বারণ করেছে, তারা যায়নি।

কিন্তু বিজু কেন নর্থ কেবিনের কাল-আঁধারে, লাইনের উপরে এসে মরেছে? কেন বিজু?

জবাব পাওয়া যাবে না। কালকের শিশিরে-ভেজা লাইনটায় কোন চিহ্নও থাকবে না। কেবল অদূরের ক্রশ লাইনের কাছে, দু ফুট উঁচু সিগন্যালের ওই লাল

আলোটা জ্বলবে। এই থিতিয়ে আসা অন্ধকারে এখন ওই আলোর রক্তাভা বেশ গুঁড়ি মেরে মেরে গিয়ে ঠেকেছে ফোর্থ লাইনের বুকে। ওই রক্তাভ রেশটা চিরন্নাত্রি ধরে দগদগ করবে একটি রক্তাক্ত ক্ষতের মত।

কিন্তু তার পরদিন রহস্যের একটি গ্রন্থিমোচন হল। সকলের জিহ্বা আর একবার লকলক করে উঠল। বিকেলের দিকে মর্গ থেকে সংবাদ এল, বিজলী গর্ভবতী ছিল।

আর ওরা তিনজন নরেশ-প্রভাত-শঙ্কর গণেশ কাফেরই 'ফর লেডীজ' খুপরিতে বসেছে মুখোমুখি। চোখে ওদের প্রজ্বলিত ঘৃণা দপদপ করছে। হিংস্র কুটিল সন্দেহে ওরা নিজেদেরই পরস্পরকে হানছে। ওদের গোটা জীবনের সব সর্বনাশ আজ নিজেদের মধ্যেই খুনোখুনি করবার উন্মাদনায় বসেছে কবুল করতে। কে? কে অকলঙ্ক বিজুকে এই কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে মেরেছে?

কবুল খেতে হবে, কেননা, তারা তিনজন ছাড়া, বিজলীর এই সর্বনাশের শরিক আর কেউ হতে পারে না। শহরের সব বিষধরদের নির্বিষ করেই এই দুর্বিনীত ছন্নছাড়া ত্রিভুজকে সে নিজেই আশ্রয় করেছিল। একটি মেয়ে যতটুকু পারে, তার সবটুকু নিয়ে সে আত্মসমর্পণ করেছিল এই তিনের কাছে; তার সব সর্বনাশ, তার সব কলঙ্ক সে বন্ধক রেখেছিল এই তিন-জনেরই কাছে, বন্ধুত্বের মূল্যে। সাহস প্রীতি আর স্নেহের মূল্যে। তাদের তিনজনকে সর্বনাশের সব পথ থেকে নোংরা বাঁতিগুদের সমস্ত আশ্রয় থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আদরের মূল্যে, বিজু তার ভিতর-দুয়ারের কপাটও দিয়েছিল হাট করে খুলে। ষাখোনি কোন সদর অন্দর। তাদের তিন-জনের পাশ-অস্তীর্ণ ত্রিভুজ-আঙিনাটায় নিশ্চিন্ত হয়ে ফুটেছিল সে ফুলের মত। তারই সুযোগ নিয়ে কে তাকে খুন করেছে প্রকাশ করতে হবে। বন্ধুত্বের হাতে নিজেকে অবশ করে ছেড়ে দেবার তমসুক ছিল তাদেরই হাতে। তারাই কেউ ছিঁড়েছে সেই তমসুক। কবুল করতেই হবে।

সেই কবুল করবার জন্যেই, তিনজনে তারা কাঠের খুপরিটার মধ্যে রুদ্ধশ্বাস হিংস্র হয়ে বসে আছে। কারও দিক থেকে কারও চোখ নামছে না। যেন প্রত্যেকেই শিকারী ও শিকার।

বাইরে গণেশ কাফে'র গুলতানি চলেছে রোজকার মতই। সেখানে তাকিয়ে বোঝবার উপায় নেই, এই একই ছাদের তলায়, একটি

সাত্য রজেন বাইরে দাঁড়িয়ে

খুপরিতে, একটা ভয়ংকর রক্তারক্তির উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে।

কুটিল সন্দেহে, চাপা [illegible] গলায় হিসিয়ে উঠল শঙ্কর, "[illegible] নয়, প্রভাত নয়, নরেশ নয়, তবে কে [illegible] আমি জানতে চাই। আর কে [illegible] আমরা ছাড়া?"

যেন [illegible] মারার আগে, কেউটের মত কাঁধ বাঁকিয়ে নরেশ গর্জে উঠল, "আমিও তাই জানতে চাই। সে যে-ই হক, আমি তাকে দু হাতে টিপে পিঁপড়ের মত মারতে চাই।"

মানুষ যখন ভয়ংকর হয়ে ওঠে, তখন তার সবটাই নাটকীয় দেখায়। প্রভাত পকেট থেকে ওর সেই বিখ্যাত বোতাম-টেপা ড্যাগারটা বার করে, খুলে রাখল টেবিলের উপর। শাণিত ছুরিটার তীক্ষ্ণ ধার আজ রক্তলোলুপতায় যেন বড় বেশী চকচক করছে। সে ছুরিটা বিজলীর সামনে যতবার খুলেছে প্রভাত, ততবারই বিজলীর দু চোখে ঘনিয়ে এসেছে অভিমান। বলেছে, "কতদিন বলেছি তোমাকে প্রভাত, ওটা আমি দু চক্ষে দেখতে পারিনে। রেখে দাও।"

বলে নিজের হাতে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। আজ বন্ধ করবার কেউ নেই।

সে বলল দাঁতে দাঁত পিষে, "তাকে প্রথম আমি পাব, সে যতবড় বন্ধুই হক, তার বুকটা আমি উপড়ে ফেলব।"

কিন্তু এ শুধু কথা। তারপর?

ছুরিটার তীক্ষ্ণ ধার ওদের তিনজনের মুখেই যেন হিংস্র হয়ে জ্বলতে লাগল। যেন হত্যা-উৎসবের আগে, মন্ত্রপূত অস্ত্রটাকে ঘিরে বসেছে ওরা ট্রাইবুদের মত।

আগে ওরা রাগে ও ঘৃণায় যখন কোন কারণে রুদ্র হয়ে উঠত, তখন বিজলী ওদের শান্ত করত। শান্ত না হলে বিজু রেগেছে। বিজু কেঁদেছেও।

আজ বিজু নেই। আজ ওরা সেই মূর্তি ধরেছে।

প্রভাত ছুরি বের করেছে। নরেশ ওর সেই কালো বিশাল শরীরটার পেশীতে পেশীতে ঘষছে। শঙ্করের রক্তাভ বড় বড় চোখ দুটিতে নেশা ধরেছে। যে-চোখ দেখলে বিজু হাসতে হাসতে আঁচলের ঝাপটা মেরেছে। বলেছে, "এই, এই রাক্ষস, চোখ করেছে দেখ।" নরেশের পেশীপুষ্ট

শরীর বিজলীর ছোট হাতখানির চাপে কোনদিন নির্দয় দুর্দান্ত হয়ে উঠতে পারেনি।

ওরা প্রতিটি দিনের পাতা উল্টে উল্টে দেখছে, খুঁজছে, পরস্পরের প্রতিটি দিনের ব্যবহার। প্রতিটি দিন, কে কবে কেমন করে হেসেছিল, কতখানি বেশী ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিল বিজুর। কোন্‌দিন কে কতক্ষণ একলা ছিল বিজুর সঙ্গে। বিজু কাকে কবে একটু বেশী স্নেহ করেছিল।

ওদের মনে এই অবিশ্বাস ও সন্দেহের জড় লুকিয়ে ছিল হয়ত। কিন্তু তখন বিজু ছিল। রামধনুর মত সে কোন কালকূট মেঘকে ঘন হতে দেয়নি। বুক চেপে হাঁটা শ্বাপদ-অন্ধকার পারেনি ফিরে আসতে। আজ ওদের সেই মন হতাশায়, অবিশ্বাস ও সন্দেহে হিংস্র। সেই শ্বাপদ-অন্ধকারটাই গ্রাস করেছে আজ তিনজনকে। তাই প্রতি-দিনের উনিশ-বিশ ঘেঁটে ঘেঁটে খুঁজছে ওরা। কে? কে হতে পারে? বিজুর নিশি স্যাকরার আমবাগানের ধারে যাবার আগে, কাল বিকেলেও কে কেমন করে কথা বলে-ছিল তিনজনে, সেটাও ভাবছে ওরা। ভাবছে, তিনজনের মধ্যে, কাকে বাঁচাবার জন্যে, ঘুণাক্ষরেও কিছু বলে নি বিজু?

একসময়ে নিজেদেরই নিশ্বাসে চমকে উঠে ওরা পরস্পরের দিকে তাকায়। তারপর টেবিলের উপর ছুরিটার দিকে। যেখানে অনেকদিন বসেছে বিজু, আর বিজুকে ঘিরে ওরা বসেছে চেয়ারে।

সন্দেহ আর অবিশ্বাস ওদের ছাড়ে না। শেষপর্যন্ত নিজেদের মধ্যে ওরা একটা রক্তা-রক্তি কাণ্ড করবে। তবু বিজুর প্রতিদিনের স্মৃতি ওদের মাঝে মাঝে আনমনা করে তুলছে।

শংকর হঠাৎ ডাকে, "প্রভাত।"

প্রভাত সন্দেহ করে আগে থেকেই রুক্ষ হয়ে জবাব দেয়, "কী?"

নরেশ দুজনের দিকেই তাকায় তীক্ষ্ম চোখে।

শঙ্কর বলে, "বেচু পাঠক তার বুড়ি দিদিকে খুন করতে চেয়েছিল, মনে আছে?"

প্রভাত ভ্রূ কুঁচকে বলে, "তাতে কী?"

"বেচু পাঠক তোকে দিয়েই খুন করাতে চেয়েছিল সম্পত্তির লোভে। তোকে নগদ দু হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল। বেচু পাঠক দরজা খুলে রাখবে রাত্রে, তুই গিয়ে শুধু বুড়ির গলাটা টিপে রেখে আসবি অন্ধকারে। বাস্ আর কিছুই নয়। এমন কি বেচু পাঠক পরে ধরিয়ে দিতে চাইলেও তোকে ধরবার কোন উপায় থাকত না।"

প্রভাত প্রায় চিৎকার করে ওঠে "কিন্তু তাতে কী হল?"

শঙ্কর যেন প্রায় চুপিচুপি বলল, "তুই তো করিসনি। বিজু তোকে বারণ করে-ছিল বলে।"

শঙ্করের গলার স্বরে প্রভাত আর নরেশ যুগপৎ চমকে ওঠে। দুজনেরই চোখে ঘৃণা আর উত্তেজনা ছাপিয়ে একটা নিশি-পাওয়া ব্যাকুলতা ওঠে ফুটে। ওদের তিনজনেরই চোখের উপর ভেসে ওঠে বিজুর মূর্তি।

হ্যাঁ, বিজু প্রভাতকে যেতে দেয়নি বেচু পাঠকের দিদিকে খুন করতে। খুন করার ভয়াবহ নারকীয়তার রূপ ওদের অনুভূতি থেকে বহুদিন বিদায় নিয়েছিল। ওদের সেই অনুভূতিটাকে ফিরিয়ে দিয়েছে বিজু।

যখন ওরা চাকরির জন্য দরখাস্তের পর দরখাস্ত করেছে, ভেড়ার পালের মত সর্বত্র লাইন দিয়েছে, চটকলের স্পিনার হবার আশাতেও গিয়েছে ছুটে আর ফিরে এসে হতাশায় অবসাদে পড়েছে ভেঙে, তখন, একটিই সৎ ও সত্যিকারের রাস্তা খোলা ছিল, মরা। খবরের কাগজের একটি শিরো-নামাকেই ওরা বাড়াতে পারত, 'অনাহারের জ্বালায় যুবকের আত্মহত্যা।'

কিন্তু তা করেনি ওরা। তারই একটা রকমফের জীবনের যত ভয়াবহ অন্ধকার সুড়ঙ্গপথগুলি বেছে নিয়েছিল। কেননা, ওরা দেখেছিল, এ-দেশে ওইটিই প্রশস্ত পথ।

সেই সময়েই বিজুর আবির্ভাব হয়েছিল ওদের জীবনে। সে আগলে দাঁড়িয়েছিল ওই অন্ধকার সুড়ঙ্গগুলি।

সেই সময় দেখেছিল, ওদের রাজেন্দ্রাণীর মুখে ঠিক ওদেরই মত উপোসের ছাপ। তখন থেকে ওরা দু পয়সার বাদাম, চার পয়সার মুড়ি, দু গেলাস চা, বিজুর সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছে। অনাহারের মধ্যেও সমস্ত লোভ জয় করেছে ওরা।

প্রভাত গোঙার মত ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, "হ্যাঁ, বিজু বারণ করেছিল। বলেছিল, বারণ না শুনলে সে মরবে। বিজু মরবে, তাই আমারও যত ঘেন্না হয়েছিল টাকার লোভে। বিজু বারণ করেছিল। বিজু তোকেও বারণ করেছিল শঙ্কর। দাশু গাঙ্গুলি তোকে পাঁচ শ টাকা দিতে চেয়েছিল, শুধু ওর অপজিট পার্টির লিডার কেদার ঘটকের নামে, একটা মেয়েমানুষকে জড়িয়ে মিথ্যে বক্তৃতা দেবার জন্যে। ঘটক মানহানির মামলা করলে টাকা দেবার চুক্তি ছিল দাশু গাঙ্গুলির। কিন্তু তুই যাসনি, বিজু বারণ করেছিল।" যেন মাতালের মত সুরহীন গলায় বলতেই থাকে প্রভাত, "বিজু তোকেও বারণ করেছিল নরেশ। ডাক্তার হালদার তোকে মাসে তিন শ টাকা মাইনের চাকরি দিতে চেয়েছিল, শুধু তার স্মাগলিং-এর কর্মীরগুলির উপর নজর রাখবার জন্যে, দলের বিশ্বাসঘাতকদের ওপর স্পাইং-এর জন্যে। সেই চাকরি তুই নিসনি। বিজু তোকে বারণ করেছিল।"

বিজু তাদের বারণ করেছিল, এই কথাটা কাঠের খুপরির মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে। বিজু তাদের ঘেন্না করতে শিখিয়েছিল। তাই তারা অন্ধ-সুড়ঙ্গগুলির মুখে পা দিয়ে ফিরে এসেছিল। তাই তারা এ-সংসারের সকল অনাহারীর সাধারণ দলেই এসে ভিড়েছিল। বাঁচতে চেয়েছিল আর সকলেরই মত রোষে ও রাগে, কষ্টে ও কান্নায়।

আর তবু উপোসী বিজু, তাদের তিন-জনের তিলে তিলে মরা মূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে কখনও চোখের জল চাপতে পারে-নি। মুখ নিচু করে, যেন অপরাধিনীর মত বলেছে, হয়ত আমার জন্যে, আমারই জন্যে তোমরা মরছ। হয়ত আমার ভুল হচ্ছে। তোমরা একটু ভাব।

কিন্তু তখন আর ভাববার কিছু নেই। একদিন যে-পথ থেকে ফিরে এসে ওরা বিজুকে ঘিরে ছিল সেই পথটাকে ওরা

তীর মার্কা
(ARROW BRAND)
যশোহরের
চিরুণী
প্রস্তুত কারক
ইউনাইটেড এণ্ড কোং
১-১এ, সুবল চন্দ্র লেন, কলিকাতা-২

ঘৃণা করতে শিখেছিল। বিজু ফিরিয়ে দিতে চাইলেও ওরা ফিরে যেতে পারত না। পারবেও না। কারণ, ঘৃণা শুধু নয়, ওরা একটি ভালবাসাকে পেয়েছিল। একটি বিজুকে পেয়েছিল, যার সঙ্গে ওরা সংসারের লাঞ্ছিতদের হাটের মিছিলে চেয়েছিল শরিক হতে।

তাই, রাজেন্দ্রাণীর শোক-বিমূঢ় চোখের জল তারা মুছিয়ে দিয়েছে। ওই কালো চোখে দপদপ করে আগুন জ্বালারই তাপ চেয়েছে তারা। মৃত্যুহীন নির্ভয়ের খিল-খিল হাসির ঝনঝনায় এ-বিশ্বসংসার কেঁপে উঠুক, তারা তাই চেয়েছে।

সেই হাসি তাই শেষদিন পর্যন্তও হেসে-ছিল বিজু। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ভয়-দুর্দশা-গ্রস্ত জীবনে সেই হাসিটাই তাদের অনেক নির্ভয়ের নিশান হয়ে ছিল।

সেই হাসিটা ছিনিয়েছে কে!

আর কারা ছিল বিজুর জীবনের সব অন্ধিসন্ধির খবর জানতে? অসহায় আর অপমানিত ভদ্রলোক রাধুবাড়ুজ্যেকে সপরিবারে, তিলে তিলে মরতে দেখেছিল তারা। শুধু তাদেরই তিনজনের জন্যে রাধু বাড়ুজ্যে তার আইবুড়ো মেয়ের কলঙ্কে মাথা নত করেছিলেন। সেই সবচেয়ে বড় কলঙ্কের গুপ্ত তথ্য কী, তা ত শুধু তারা তিনজন আর বিজুই জানত। তারা চার-জনেই শুধু জানত, সেই কলঙ্ক ছিল শুধু তাদের চারজনের হাত ধরাধরি করে বাঁচা। তাদের বন্ধুত্ব।

বন্ধুত্বের সেই সুযোগ নিয়ে, কে মেরেছে বিজুকে?

তিন জোড়া চোখের কুটিল সন্দেহ, ঘৃণার দৃষ্টি কেউ কারও উপর থেকে নামাতে পারছে না ওরা।

কিন্তু শত অবিশ্বাস সত্ত্বেও, ওদের ক্রোধের আগুনে আর তেমন করে ছুরিটার তীক্ষ্ণধার চকচক করছে না। অবসাদগ্রস্ত মনে শুধু একটা হাহাকার ওদের যেন গ্রাস করে ফেলেছে। শুধু মনে পড়ছে, বিজু ওদের কোথায় যেতে বারণ করেছিল, আগলে রেখেছিল কেমন করে। সর্বনাশীর মত কেমন করে সে তিনটি পুরুষের ছুটি থাবার উপরে নিজেকে নিশ্চিন্তে মুক্ত করে দিয়ে-ছিল।

'গণেশকাফে'র ঘরে ভিড় কমে এসেছে। ক্রমেই চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে সামনের ঘরটা। রাস্তার গাড়ি-ঘোড়ার শব্দও কমছে।

নরেশ হঠাৎ যেন ছটফট করে উঠল। ছুরিটা হাতে নিয়ে সে দ্রুত চাপা গলায় বলল, "আমি বলব, একটা কথা বলব।"

শঙ্কর আর প্রভাত দুজনেই ফিরে তাকাল তার দিকে।

নরেশ যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে, বলল, "একদিন, সেদিন তোরা দুজনে ছিলিনে, কোথায় গেছিলি। এই ঘরে, আমি আর বিজু। বিজু হাসছিল, অনেক কথা বলছিল। কিন্তু আমার কী হল, আমি জানিনে। বিজুর শরীরের দিকে সেই যেন আমি প্রথম তাকালাম। সেই যেন প্রথম জানলাম, বিজুর রূপ আছে, যৌবন আছে, আশ্চর্য সুন্দর তার গঠন। আমি পাগলের মত দু হাতে জড়িয়ে ধরলাম বিজুকে। বিজু যেন একবার কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল।"

বলতে বলতে নরেশ প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে যেন হাঁপিয়ে উঠল। কিন্তু কেউ ওকে কিছু বলল না। দুজনেই স্থির তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে নরেশের দিকে।

নরেশ আবার বলল, "জড়িয়ে ধরে আমি বার বার ডাকতে লাগলাম, বিজু বিজু। বিজুর মুখ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাকাতে আমার সাহসও হচ্ছিল না। কিন্তু একটু পরে, বিজু দু হাত দিয়ে আমার মাথাটা জড়িয়ে ধরল। বলল, 'কী বলছ নরেশ?' আমার চোখে বুঝি তখন রক্ত। ফিরে তাকালাম তার দিকে। দেখলাম, মুখে তার হাসি, কিন্তু চোখে জল। সে যে আমার মাথায় হাত দিল, তখুনি আমার কেমন হয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিলাম। বিজু বলল, 'নরেশ, বাবা কোনদিন বিয়ে দিতে পারবে না। আমি নিজে যদি করি, কাকে করব, বল? তুমি যা চাইছ, তুমি নিতে পার। শঙ্কর আর প্রভাতকে আমি কী বলব? তুমি কী বলবে?' আমার তখন পালিয়ে যাওয়া কুকুরের মত অবস্থা। আমি দু হাতে মুখ ঢেকে রইলাম। বললাম, 'ক্ষমা কর বিজু, ক্ষমা কর।' বিজু আমার দু হাত ওর

আমাদের অগণিত পৃষ্ঠপোষক, বন্ধু আর লক্ষ লক্ষ ক্রেতাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সকলের সকল শুভপ্রচেষ্টার পথ আলোকিত হউক।
'দীপ্তি' মার্কা জিনিষ যে ভাল তা আজ আর নূতন করে বলবার প্রয়োজন নেই, দীপ্তি লণ্ঠন হাজার হাজার গ্রামের লক্ষ লক্ষ গৃহ প্রতিদিনই আলোকিত করছে।
DIPTI
'দীপ্তি' মার্কা সাইকেল এক্সেসারিসও অল্প-দিনের মধ্যে তার বৈশিষ্ট আর গুণের দ্বারা সমাদৃত হচ্ছে, ইস্পাত আর পেতলে তৈরী সুন্দর আর সুমিষ্ট ভাল সাইকেল বেল।
সুদৃশ্য আর টেকসই সাইকেল পাম্প, উজ্জ্বল সাইকেল ল্যাম্প ঝাঁকানিতেও যার আলো নিষ্প্রভ হয় না। অত্যন্ত মজবুত সুদৃশ্য গঠন ইস্পাতে তৈরী সাইকেল ফর্ক যা যে কোন সাইকেলে ব্যবহার করা চলে।
শারদীয় অভিনন্দন
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ, প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আমাদের কৃষি-সমস্যা

GOVERNMENT LIBRARY
Bihar

পূর্ণেন্দুকুমার বসু

জ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে ডঃ মেঘনাদ সাহা বলেছিলেন, "যে দারিদ্র্য এবং অভাবের সঙ্গে আমাদের দেশের শতকরা নব্বইটি লোক লড়াই করিতেছে, তাহা দূর করিয়া সুদৃঢ় এবং প্রগতিশীল সচ্ছল জাতীয় জীবন যদি আমরা পাইতে চাই, তবে প্রকৃতির দান সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান আমাদের অর্জন করিতে হইবে। আমাদের ভূমিজ সম্পদ নদীর শক্তি, পৃথিবীর গহ্বরে নিহিত ঐশ্বর্য জানিতে হইবে, উহার উপর ভিত্তি করিয়া অর্থনৈতিক জীবন পুনর্গঠন করিতে হইবে, মরুভূমি এবং জলাভূমিকে চাষে আনিতে হইবে, দূরত্বের ব্যবধান ঘুচাইতে হইবে, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে মানুষের মনোভাব বদলাইতে হইবে। তবেই আমাদের প্রাচীন দেশে আমাদের জাতি সকলের সঙ্গে সমান-ভাবে মিশিয়া সুখী জীবন যাপন করিতে পারিবে।"

দেশ স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সালে, তারপর থেকে সবাই ভাবতে শুরু করেছিল যে, দেশ থেকে দারিদ্র্য এবং বেকারি দূর হবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এ দুটি সমস্যা যে কী প্রকটভাবে রয়েছে, তা নীচের তালিকা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে।

১৯৫০ সন থেকে ভারতবর্ষে জাতীয় নমুনা পর্যবেক্ষণ চলছে। এই নমুনা পর্যবেক্ষণে ভারতের গ্রামের ও শহরের আর্থিক ও সামাজিক বহু তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৫৬ সালের মে পর্যন্ত মানুষের জীবন-যাত্রার মান কেমন ছিল, তার বিবরণ নীচের তালিকায় দেওয়া হল।

জীবনযাত্রার ব্যয় (৩০ দিনের হিসাব)

জনসংখ্যার শতাংশ ঊর্ধ্ব সীমা	খরচ (টাকা) নিম্ন সীমা
৫	৩·২
১০	৬·২
২০	৯·৮
২৫	১০·৪
৫০	১৪·৬
৭৫	২২·২
৯০	৩৫·৮

উপরের তালিকা থেকে দেখা যায় যে, মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ লোক মাসে খরচ করে মাত্র ৩৲ টাকা, আর শতকরা ৭৫ ভাগ লোক মাসে খরচ করে মাত্র ২২৲ টাকা, অর্থাৎ দিনে ১২ আনা মাত্র। এরই মধ্যে খাওয়া, পরা, যাতায়াত, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি। দেশের শতকরা ৯০ জনেরও অধিক লোকের কী শোচনীয় অবস্থায় যে দিন কাটছে, তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। উপরের তথ্য থেকে ভারতের জনসাধারণের সমগ্রভাবে অর্থনৈতিক অবস্থার রূপ জানা যাচ্ছে। চোখের উপর মুষ্টিমেয় লোকের ঐশ্বর্য দেখে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করলে মস্ত ভুল করা হবে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার শতকরা ৮৮·৭ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। অতএব অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য গ্রামের এবং গ্রামবাসীর উন্নতির একান্ত প্রয়োজন। গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থা আরও সুস্পষ্টভাবে দেখা যাবে নিম্নলিখিত তালিকা থেকে। ১৯৫১ সালে গ্রামাঞ্চলের ১০,৮৭০টি পরিবারের নমুনা পর্যবেক্ষণ করা হয়। তার ফলাফল এইরূপ—

মাসিক ব্যয় হিসাবে ১০,৮৭০টি পরিবারের শ্রেণিবিন্যাস

মাসিক ব্যয় (টাকা)	শতকরা হিসাব	যোগফলাত্মক শতকরা হিসাব
৫০ টাকা পর্যন্ত	২০·৪	২০·৪
৫১—১০০	৩১·২	৫১·৬
১০১—১৫০	২১·১	৭২·৭
১৫১—২০০	১০·৪	৮৩·১
২০১—৩০০	৯·৫	৯২·৬
৩০১—৪০০	৩·৬	৯৬·২
৪০১—৫০০	১·৫	৯৭·৭
৫০১—৬০০	০·৬	৯৮·৩
৬০১—৮০০	১·০০	৯৯·৩
৮০১—১০০০	০·৩	৯৯·৬
১০০০ টাকার উপর	০·৪	

উপরোক্ত তালিকা থেকে দেখা যায়, শতকরা ৫১·৬টি পরিবারের মাসিক ব্যয় ১০০৲ টাকার কম আর শতকরা মাত্র ১৭টি পরিবারের মাসিক ব্যয় ২০০৲ টাকার বেশী। এর থেকে গ্রামবাসীর শোচনীয় অবস্থা আরও পরিস্ফুটরূপে দেখা যায়। মোট ব্যয়ের অধিকাংশ ব্যয় হয় খাদ্যে। পরের তালিকাতে কোন কোন খাতে খরচ হয়, তা দেওয়া হল। গ্রামবাসীরা যা মোট ব্যয় করেন, তার অধিকাংশ যদি খাবার জন্য খরচ হয়ে যায়, তা হলে অন্যান্য দিকে উন্নতির আশা একেবারেই নেই।

গ্রামবাসীদের ব্যয়ের শতকরা হিসাব

বিষয়	মোট ব্যয়ের শতকরা
খাদ্য	৬৫·৯৬
আলো ও জ্বালানি ...	৬·১১
পোশাক	৫·৪৯
ওষুধপত্র	১·৫৫
শিক্ষা	০·৫৩
উৎসব ও আমোদপ্রমোদ ...	৪·৮৩
তামাক ও অন্যান্য জিনিস ...	৩·৪৬
অন্যান্য খরচ	১২·০৩

উপরের তালিকাতে দেখতে পাওয়া যায়, মোট ব্যয়ের প্রায় ৬৬ ভাগ চলে যায় খাদ্যের জন্য। বাকী যা থাকে, তাও অত্যাবশ্যক জিনিসগুলির জন্য খরচ হয়। গ্রামের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতি যদি করতে হয়, তা হলেই প্রয়োজন কৃষির উন্নতি। এছাড়া ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। এ-বিষয়ে ভারত সরকারও সম্পূর্ণ সচেতন। Planning Commission লিখেছেন,

"The first five year plan accorded pride of place to programmes for agriculture and community development. This was a natural priority in a plan seeking to raise the standard of living of the mass of the people, specially in rural areas, but it was also justified in the special circumstances of shortage and inflation which existed when the plan was formulated."

আমরা দু ধরনের কৃষিজাত সামগ্রী উৎপন্ন করি। প্রথম হচ্ছে খাদ্যশস্য, যেমন গম, ধান ইত্যাদি আর দ্বিতীয় হচ্ছে তুলা, পাট, চা ইত্যাদি, যা ব্যবহার হচ্ছে বিভিন্ন শিল্পে।

ভারত সরকার কৃষির উন্নতির জন্য মোটামুটি দু ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। একটাকে তাঁরা বলছেন 'Work Scheme' আর একটাকে বলছেন Supply Scheme। 'Work Scheme'এর আওতায় পড়ে জলসেচ-ব্যবস্থা ও পতিত জমি পুনরুদ্ধার আর 'Supply Scheme'এর আওতায় পড়ে সারের ব্যবস্থা, ভাল বীজের ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই দুই দফা পরিকল্পনা কতটা কাজে পরিণত হয়েছে, সেই আলোচনাই

করব। তা করতে হলে বিভিন্ন কৃষিজাত সামগ্রীর জমির পরিমাণ ও ফসলের হিসাব সম্বন্ধে খানিকটা ধারণার প্রয়োজন। পরের দুটি তালিকাতে তা দেখানো হল। ভারতবর্ষের মোট ৮০·৬৩ কোটি একর জমির মধ্যে চাষের পরিমাণ হচ্ছে ৩৬·৩৩ কোটি একর জমি। বাকী জমিতে চাষ হয় না।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ হয় ১৯৫১-৫২ সনে আর শেষ হয় ১৯৫৬-৫৭ সনে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী আরম্ভ হয়েছে ১৯৫৬-৫৭ সন থেকে। উপরের তালিকা থেকে দেখা যাবে যে, কৃষিজাত সামগ্রীর জমির আয়তন ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে এবং সেই সংগে ফসলের

কয়েকটি কৃষিজাত দ্রব্যের জমির আয়তন (হাজার একর)

শস্যের নাম	১৯৫১-৫২	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮
ধান	৭৩,৭১৩	৭৬,৮৬৪	৭৯,৩২০	৭৯,০২৭
গম	২৩,৪০৪	৩০,৩৮৬	৩২,৮৯১	——
আলু	৬১৭	৬৯৩	——	——
আখ	৪,৭৯২	৪,৫৬৪	৫,০১৯	——
তুলা	১৬,২০৯	১৯,৯৭৮	১৯,৮৪৩	——
পাট	১,৯৫১	১,৭৩৯	১,৮৮৩	১,৭৫৪

কয়েকটি কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ

শস্যের নাম	১৯৫১-৫২	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮
চাল (হাজার টন) ...	২০,৯৬৪	২৬,৮৯৬	২৮,১৪২	২৪,৮২১
গম " ...	৬,০৮৫	৮,৫৬৯	৯,০৬২	——
আলু " ...	১,৬৮৫	১,৮৩৯	——	——
আখ " ...	৬০,৬৬০	৫৯,৩১৭	৬৬,৮৯০	——
তুলা (হাজার বেল) ...	৩,১৩৩	৪,০০১	৪,৭২৩	——
পাট " ...	৮,৬৭৮	৪,১৯৭	৪,২২১	৪,০৮৮

পরিমাণও বাড়ছে। প্রথম পরিকল্পনা পাঁচ বছরে খাদ্যশস্যের জমির আয়ত বেড়েছে শতকরা ১০·৬ ভাগ আর ফস বেড়েছে শতকরা ২৭ ভাগ। দ্বিতীয় পরি কল্পনার প্রথম বছরে আমরা দেখতে পা ফসল বাড়ছে, তারপর এ-বছর বেশ ক গিয়েছে। ১৯৫৬ সনে ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৮ কোটির মতন, প্রতি বছর বাড়ছে শতকরা ১·৩ জন করে। এ লোককে খাওয়াতে গেলে যে খাদ্যশস্যে প্রয়োজন তা আমাদের নেই। খাদ্যশস্যে চাহিদা মেটানোর জন্য ভারত সরক অন্যান্য দেশ থেকে খাদ্য আমদানি করেছেন। আমদানি ও মোট খাদ্যশস্যে পরিমাণ নীচে দেওয়া হল—

মোট খাদ্যশস্যের হিসাব (হাজার টন)

	দেশে উৎপন্ন	আমদানী	মোট
১৯৫১	৫১,১৭৫	৪,৭২৫	৫৫,৯০০
১৯৫২	৫৮,২৬৬	৩,৮৬৪	৬২,১৩০
১৯৫৩	৬৮,৭১৮	২,০০৩	৭০,৭২১
১৯৫৪	৬৬,৬০৪	৮০৮	৬৭,৪১২
১৯৫৫	৬৫,২৮৭	৭০০	৭২,২৮৭
১৯৫৬	৬৮,৬৮৬	১,৪২০	৭০,১০৬
১৯৫৭			
(আনুঃ)	৫৫,০৪৪	৩,৫৮০	৫৮,৬২৪

তালিকাটিতে দেখতে পাওয়া যাবে যে ১৯৫৪ সন থেকে খাদ্য আমদানি কমা হয়েছিল, ১৯৫৭ সন থেকে আবার বাড়ানো হয়েছে। ১৯৫৬ সনে উৎপন্ন আর আমদানি সমেত মোট খাদ্য ছিল ৭২,২৮৭ হাজার টন, এ বছর যদি শস্য ভালভাবে বিলি ব্যবস্থা হয়ে থাকে, তা হলে মাথাপিছু দৈনিক ২০ আউন্স করে পাবার কথা অন্যান্য বছর এর পরিমাণ আরও অনেক কম থাকে। শ্রীকমলেশ রায় এর সুচিন্তিত প্রবন্ধে লিখেছেন যে

"A daily intake of cereals at the rate of 1½ lbs. would provide a person with 2,400 calories which is just enough for meeting the total hunger in the toiling agricultural and working classes. Hard physical work demands 3,000 to 4,000 calories per day. This rate of consumption would place the requirement of cereals in the magnitude of some 75 million tons a year. Thus we have not been able to meet the shortage of food grains".

অতএব দেখা যায়, মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলেই আমাদের অন্তত ৭৫ মিলিয়ন টন খাদ্য লাগে। অথচ ৬৫ মিলিয়ন টনের উপর খাদ্যশস্য উৎপন্ন করতে আমরা পারিনি, সুতরাং খাদ্যশস্য যা উৎপন্ন হচ্ছে, তাতে আমাদের খাওয়া চলে না, এর থেকে আমাদের কোন মা হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় শ্রেণী

কৃষিজাত দ্রব্য আমরা প্রতিবছর বিদেশে রপ্তানি করছি। এর মোট পরিমাণ (হাজার টাকায়) নিম্নে দিলাম।

১৯৫২	১৯৫৩	১৯৫৪	১৯৫৫	১৯৫৬
৬১,৩৩৭	৫২,৫৮৭	৫৫,৭৯৬	৬০,২৫৫	৬০,৬৬৬

আমরা যেসব জিনিস রপ্তানি করি, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে চা, তামাক, তুলা ও তুলাজাত দ্রব্য, পাট ও পাটজাত দ্রব্য। উপরের সংখ্যাগুলি থেকে আমরা বলতে পারি, আমাদের রপ্তানি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে খুব বেশী বাড়েনি। কোন কোন দ্রব্য আমরা কত টাকার রপ্তানি করেছি, তার হিসাব দিলাম।

কতকগুলি কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানির হিসাব (লক্ষ টাকা)

দ্রব্যের নাম	১৯৫২	১৯৫৩	১৯৫৪	১৯৫৫	১৯৫৬
চা	৮,০৮০	১০,৩০৩	১৩,১৩১	১১,৩৫৫	১৪,৩১৬
তামাক	১,৮৩১	১,২৩১	১,১৯০	১,৩৩৬	১,৫৫১
তুলা	১,৫১২	১,১০০	৮৫২	২,৪১৭	১,৭৫৫
তুলোজাত দ্রব্য ...	৭,৩৫২	৬,৩৭৫	৭,২৩০	৬,৩৭৯	৬,২৮৯
পাট ও পাটজাত দ্রব্য —	১৬·২৪৫	০৬০	১২,১০৩	১২,৩৫৮	১১,২৪৯

এই তালিকা থেকে দেখা যাবে, রপ্তানির ব্যাপারে বিশেষ এগোতে পারছি না। সাত বছর পরিকল্পনার কাজ চলার পরও কৃষিজাত দ্রব্যের ফলন তেমন বাড়ছে না। এখন আলোচনা করা যাক, ভারত সরকার কৃষির উন্নতির জন্য কী কী ব্যবস্থা করেছেন এবং তার ফল আশানুরূপ হচ্ছে না কেন।

চাষের উন্নতি করবার জন্য সরকার এই ব্যবস্থাগুলি অনুমোদন করেছেন: (১) সেচের ব্যবস্থা, (২) পতিত জমি উদ্ধার, (৩) সারের ব্যবহার, (৪) ভাল বীজের ও উন্নত ধরনের চাষের ব্যবস্থা, (৫) ভূমি সংস্কার। মোটামুটি দেখতে গেলে এই ব্যবস্থাগুলি সুষ্ঠুভাবে কাজে পরিণত করলে কৃষিজাত দ্রব্যের ফলন দ্রুত বাড়াবার কথা, কিন্তু আমাদের দেশে তা হচ্ছে না। উপরোক্ত উন্নয়ন-ব্যবস্থাগুলির কাজ কতটা হয়েছে, তার আভাস দেব।

সেচের ব্যবস্থা: আমি আগেই বলেছি, আমাদের মোট চাষের জমির পরিমাণ ৩৬·৩৩ কোটি একর। তার মধ্যে কতটা জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে—তা নীচের তালিকায় দিলাম।

কতটা পরিমাণ জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে
(লক্ষ একর)

	১৯৪৭-৪৮	১৯৫৫-৫৬
নদী, খাল ইত্যাদি	১৯৮	২৩২
পুকুর ...	৮০	১০৫
পাতকুয়া ...	১২৫	১৬৮
অন্যান্য ব্যবস্থা ...	৬৪	৫৮
মোট ...	৪৬৭	৫৬৩

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ জমিতে সেচের

ব্যবস্থা আছে, স্বাধীনতার পর দশ বছরে আমরা শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা বাড়াতে পেরেছি। বছরের পর বছর চাষীদের বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। যে বৎসর সুবৃষ্টি হয়, সে-বৎসর চাষ ভাল হয়, নচেৎ জলের

অভাবে ভাল চাষ হওয়া অসম্ভব। ভারত সরকার কয়েকটি বড় বড় পরিকল্পনা করেছেন, যেমন দামোদর ভ্যালি, ভাখরা নাঙ্গাল ইত্যাদি, কিন্তু চাষের উন্নতির জন্য আশু প্রয়োজন ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা। যে-কোন অগ্রসর দেশে প্রায়

সাহিত্যের বিস্ময়কর অবদান!
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত
= শিশু-ভারতী =
ছোটদের বিশ্ব জ্ঞান-ভাণ্ডার। দশ খণ্ডে পূর্ণ। পুরো সেটের দাম ১০০্ টাকা
= বিদ্রোহী বালক =
দুষ্টু ছেলের কাহিনী। ২·৫০ ন. প.
রূপকথার দেশে
রূপকথার যাদুমাখা ছবি।
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

পূজায়
আধুনিক পোষাকের জন্য
ষ্টাইলো
টেলার্স এবং রেডিমেড পোষাকের ষ্টকিষ্ট
সার্ট, হাওইয়ানসার্ট, প্যান্ট প্রভৃতি সব কিছু পাবেন
২০৮-৮ রাসবিহারী এভিন্যু - বালীগঞ্জ
গড়িয়াহাট জংসন, কলিকাতা-২৯

অসংখ্য জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে, প্রকৃতির উপর আশা করে বসে থাকতে হয় না।

পতিত জমি উদ্ধার: ভারতবর্ষে চাষের উপযুক্ত, কিন্তু বর্তমানে পতিত হয়ে পড়ে আছে, এমন জমির পরিমাণ ৫.৪ কোটি একর। এর মধ্যে গত দশ বছরে জমি উদ্ধার করা হয়েছে মাত্র ১৬ লক্ষ একর অর্থাৎ শতকরা তিন ভাগ জমি। বাকী জমি এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

সারের ব্যবহার: ৩৬.৩৩ কোটি একর চাষের জমিতে সার এক রকম প্রায় দেওয়া হয় না। আবহমান কাল থেকে চাষ হয়ে আসছে, জমির পূরণ হচ্ছে না। স্বাধীন হবার পর ভারত সরকার এ-বিষয়ে একটু নজর দিয়েছেন, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সার পাওয়া যায় না।

N. Banduri & Brothers

The Biggest Manufacturers of :—

Bolts & Nuts, Rivets, Washers, Dogspires of all descriptions.

•

Government & Railway Suppliers

Works & Office : 33, Mahendra Bhattacherjee Road,
P.O. Santragachi, Howrah. Phone : 67-2868

City Office : 71|A, Netaji Subhas Road, Calcutta-1
Phone : 22-7377

Telegram : "STUDBOLTS" Howrah.

• অলঙ্কার ও সঞ্চয় •

৯১/৪ বহুবাজার স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

একর-পিছু সারের ব্যবহার

দেশের নাম			সার (পাউ
ইংলণ্ড	...	...	৩৯
হল্যাণ্ড	...	...	১৭৫
জার্মানি	...	...	১২১
ইটালি	...	...	৩২
জাপান	...	...	১৯৩
ভারতবর্ষ	...	...	৫

উপরের তালিকা থেকে দেখা য জাপান যেখানে একর-প্রতি ১৯৩ পা সার ব্যবহার করে, আমরা করি মাত্র পাউণ্ড। জমির ফলন যদি বাড়াতে জমির যা ক্ষতি হচ্ছে, তা পূরণ কর হবে। জাপান সম্বন্ধে বলা হয় "Japan has led all other Asia countries in the use of commerc fertilisers chiefly because of pr sure of land. With only 15 mill acres suited only for grazi Japan has 83 million people. La rents have been seven times much as in England and tena have had to supply seed, fertili and implements and to pay assessment and dues and erect th own houses. Clearly they need to wrest everything possible fr the soil".

আমাদের দেশের চাষীরা সারের ব্যব জানে না। তারা জমিতে কী ভাবে প্রয়োগ করতে হয়, সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ।

উন্নত ধরনের বীজ ও চাষের ব্যবস্থা

আমাদের দেশে ভাল বীজধান পাও একটি বড় সমস্যা। আমি আগে দেখিয়ে যে, চাষ যা হয়, তাতে চাষীর খাওয়া চ না, অতএব অধিকাংশ চাষী বীজধানে অভাবে চাষের সময় যে ধান সংগ্রহ কর পারে, তা দিয়ে চাষ করে। এ-ব্যবস্থা রদবদল না করলে বিঘা-প্রতি ফলনের হ বাড়বে না। ভারত সরকার এর জন্য সী মাল্টিপ্লিকেশন ফার্মের ব্যবস্থা করেছেন ১৯৫৭-৫৮ সনে ১৪১৬টি সীড ফা খোলার জন্য সরকার ব্যয় মঞ্জুর করেছেন কিন্তু সমগ্র দেশের তুলনায় এর সংখ নগণ্য, যার ফলে ভাল বীজধান পাওয় সম্ভব হচ্ছে না।

আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে উন্ন ধরনের চাষের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সংগে আমাদের বর্তমান চাষের পদ্ধতি মোটেই মিল নেই, সেইজন্য হঠা mechanised farming গ্রহণ কর আমাদের সম্ভব নয়। জাপানীরা যে পদ্ধতিতে চাষ করে, তার সংগে আমাদে কিছু মিল আছে, সেইজন্য ভারত সরকা জাপানী পদ্ধতিতে চাষের সুপারি করেছেন। আংশিকভাবে এই পদ্ধতিতে

সকলেরই গর্বের বস্তু !

ভেনাস ওয়াচ কোং

(জুয়েলার্স এণ্ড ওয়াচ মেকার্স)
জি-৪৮, নিউ মার্কেট, কলিকাতা।
ফোন : ২৪—২০৬৭

ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ!

আপনাদের যে প্রয়োজনীয় জিনিষটি এতদিন খোঁজ করিয়া কোথাও পাইতেছিলেন না, তাহা এখানে দেখিয়া নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবেন, তাহা রিষ্টওয়াচ, বৈঠকখানার বা অফিসের ক্লক ঘড়ি, উপহার দ্রব্য বা অভিনব সামগ্রী যাহাই হউক না কেন।

—সন্তুষ্টি সুনিশ্চিত—

মেসার্স ভেনাস এণ্ড কোং সর্বপ্রকার মেরামতের কাজ এক বৎসরের গ্যারাণ্টী দিয়া করিয়া থাকেন এবং পৃষ্ঠপোষকবর্গের সন্তুষ্টির জন্য ওয়াচ-প্রটেক্টরও ভেনাস প্রস্তুত করেন।

"একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়"

ভেনাস ওয়াচ কোং,
(নিউ মার্কেটের কেন্দ্রস্থল)
জি ৪৮, নিউ মার্কেট, কলিকাতা
ফোন : ২৪—২০৬৭

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের তৃতীয় পর্ব—১৯০১ থেকে আরম্ভ। এখনও সেই তৃতীয় পর্বই চলছে—তবে দেশ স্বাধীন হবার পর আর-একটা পর্ব নাট্য-সাহিত্যের আধুনিকতম যুগে আরম্ভ হয়েছে বলা যেতে পারে।

[রবীন্দ্রনাথ]

রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন গীতিনাট্য, নাট্যকাব্য, ঋতুনাট্য, নৃত্যনাট্য, রূপক নাট্য ও সাংকেতিক নাট্য। এ ছাড়া তিনি সামাজিক নাটকও রচনা করেছেন। তবে তাঁর গীতিনাট্য, নাট্যকাব্য, নৃত্যনাট্য প্রভৃতির তুলনায় সামাজিক নাটকগুলি কিছুটা নিষ্প্রভ বলা যেতে পারে—অবশ্য তুলনামূলক সমালোচনার মাপকাঠিতে। তা ছাড়া সামাজিক নাটক বলতে সচরাচর যা বোঝায়, তাঁর নাটকগুলি তা নয়—স্বতন্ত্র ধরনের। তাঁর ছোটগল্পগুলিতে বাংলা সমাজ-জীবনের যে সুস্পষ্ট ছবি দেখতে পাওয়া যায়, তা তাঁর সামাজিক নাটকে বড় একটা পাওয়া যায় না। তাঁর সামাজিক নাটকগুলির অধিকাংশই রঙ্গনাট্যের

আধুনিক রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিরা আজকাল ষ্টীলের ফার্ণিচার ব্যবহার করেন। বোম্বে সেফের তৈরী ষ্টীলের ফার্ণিচারগুলো মজবুত ও সুদৃশ্য। এগুলো আপনার অফিস ও গৃহের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবে।

বোম্বে সেফ
ষ্টীলের আসবাব পত্র প্রস্তুত কারক

বোম্বে সেফ্ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ
৫৬, নেতাজী সুভাষ রোড কলিকাতা-১ ফোন : ২২-১১৮১

শ্রীসুবোধ ঘোষের

ভারত প্রেমকথা

মহাভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য তার অজস্র প্রেম-কাহিনী। সে-প্রেমকাহিনী সকল মনের সর্বকালের আনন্দ। সে-প্রেমের রূপ বিচিত্র সুন্দর ও সুমহিম। 'ভারত প্রেমকথা' প্রেম ও প্রণয়ের সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ। আঙ্গিকের নূতনত্বে, কাহিনীর মনোহারিতায় ও ভাষার গৌরবে এক ক্লাসিক-সৃষ্টির নিদর্শন।

পঞ্চম সংস্করণ : ছয় টাকা

শ্রীসুবোধ ঘোষের
একখানি অনবদ্য ও নবতম উপন্যাস

শতকিয়া

শুধুই নবতম নয়, হয়তো সুন্দরতমও। আনন্দ আর বেদনার আপ্লুত এ এক বিস্ময়কর অবিস্মরণীয় উপন্যাস।

মূল্য : আট টাকা

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের

চিন্ময় বঙ্গ

বাঙালীর সংস্কৃতি, শিক্ষা, ঐতিহ্য প্রভৃতি বিভিন্নমুখী প্রতিভা সম্পর্কে বহুবিস্তৃত গবেষণা-গ্রন্থ। ২য় সংস্করণ : চার টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

বিবেকানন্দ চরিত

নূতন কলেবরে
নবম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।
সচিত্র। মূল্য : পাঁচ টাকা

ছেলেদের
বিবেকানন্দ

সচিত্র। ষষ্ঠ সংস্করণ : টাকা ১.২৫

শ্রীসরলাবালা সরকারের

গল্প-সংগ্রহ

বৈচিত্র্যপূর্ণ ৩৬টি গল্পের সংকলন
মূল্য : পাঁচ টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা-৯

পর্য্যায়ভুক্ত। নিছক সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি কোনও গুরুগম্ভীর সামাজিক নাটক রচনা করেননি। বোধ করি তাঁর কবি-মন এ-রকম নাটক রচনায় সাড়া দেয়নি। তাঁর প্রধান সামাজিক নাটকগুলি এই—'বশীকরণ', 'গোড়ায় গলদ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমার সভা', 'শেষরক্ষা'।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাট্যরচনা ঐতিহাসিক, প্রহসন, নাট্যকাব্য, পৌরাণিক ও সামাজিক নাটকে সীমাবদ্ধ থাকলেও ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সামাজিক নাটক রচনায় তিনি কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেননি। তিনি শেষ জীবনে দুখানি মাত্র সামাজিক নাটক রচনা করেন—'পরপারে' ও 'বঙ্গনারী'। 'বঙ্গনারী' সম্পূর্ণভাবে রচনা করার পরেই তাঁর তিরোধান হয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তিনি একখানি সামাজিক নাটকই রচনা করেছেন বলা যেতে পারে।

[অতি আধুনিক যুগ]

এরপর একেবারে নিছক বর্তমান যুগ বা অতি আধুনিক যুগ। এ-পর্যন্ত বাংলা নাট্য-সাহিত্যের দুটি ধারা চলে আসছিল—একটি রবীন্দ্র-প্রবর্তিত, অপরটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রবর্তিত। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের সঙ্গেই উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে রবীন্দ্র-প্রবর্তিত ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে। দ্বিজেন্দ্রলালের ধারাই চলতে থাকে। তারপর আধুনিক যুগে—সম্পূর্ণ নতুন ধারায় নাটক রচিত হতে থাকে। এবং সামাজিক নাটকই এই আধুনিক যুগের নাট্য-সাহিত্যের সম্পদ বলা যেতে পারে। নাট্য-সাহিত্যের প্রথম যুগে পৌরাণিক মধ্যযুগে ঐতিহাসিক ও আধুনিক যুগে, বিশেষ করে অতি আধুনিক যুগে, সামাজিক নাটক নাট্য-সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে অভাবনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।
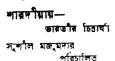
শারদীয়ায়—
ভারতীর চিত্রার্ঘ্য
সুশীল মজুমদার
পরিচালিত

ও
সাবিত্রী
অসীম
ছবি
কানু
চন্দ্রাবতী
ছায়াদেবী
মঞ্জু দে
সুপ্রিয়া
অনুপ
অভিনীত

মর্ম্মবাণী

সুর : জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ | কথা : মনোজ ভট্টাচার্য

—ঃ পরিবেশনায় ঃ—
ভারতী ফিল্মস্
১৭৯/১এ, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

পূজার দিনগুলি মধুময় হউক—
আপনাদের মনোমত—
সন্দেশ, দধি ও মিষ্টান্ন পরিবেশনে—
সেন মহাশয়
সর্ব্বজনপ্রিয় মিষ্টান্ন বিক্রেতা
শ্যামবাজার * ভবানীপুর * লেক মার্কেট
গড়িয়াহাটা * হাইকোর্ট বিল্ডিং, কলিকাতা।

আত্ম-চরিত
শ্রীজওহরলাল নেহরু
নেহরুজীর মানসিক বিকাশের ইতিহাস, চিন্তা ও চরিত্রের উদ্দাম গতিবেগের সহিত সংগ্রামের ইতিহাস, কেবল তাঁর ব্যক্তিগত কাহিনী নয়; আমাদের জাতীয় আন্দোলনের এক গৌরবময় অধ্যায়। **সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ : ১০.০০ টাকা**

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ
দ্বিতীয় সংস্করণ
শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

ভারতকথা
শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারী
ভারতের কথা নয় — মহাভারতের কথা। সহজ ও সুললিত ভাষায় গল্পাকারে লিখিত মহাভারতের কাহিনী। **মূল্য : ৮.০০ টাকা**

ভারতে মাউণ্টব্যাটেন
অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন
ভারত ইতিহাসের এক বিরাট পরিবর্তনের সময়কার বহু রাজনৈতিক ঘটনার ভিতরের রহস্য ও তথ্যাবলী। সচিত্র **দ্বিতীয় সংস্করণ : ৭.৫০ টাকা**

চার্লস চ্যাপলিন
আর জে মিনি
চার্লি চ্যাপলিনের রোমাঞ্চময় প্রণয়কাহিনী ও জীবননাট্যের অন্যান্য বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলীর প্রামাণ্য ইতিহাস। অসংখ্য চিত্রশোভিত। **মূল্য : ৫.০০ টাকা**

অ না গ ত
প্রফুল্লকুমার সরকার
বাঙলার অগ্নিযুগের পটভূমিকায় রচিত অনবদ্য উপন্যাস। **দ্বিতীয় সংস্করণ : ২.০০ টাকা**

ভ্রষ্ট ল গ্ন
প্রফুল্লকুমার সরকার
বিপ্লব-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত রোমাঞ্চকর উপন্যাস। **দ্বিতীয় সংস্করণ : ২.৫০ টাকা**

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ
প্রফুল্লকুমার সরকার
বাঙলার জাতীয় আন্দোলনে বিশ্বকবির কর্ম, প্রেরণা ও চিন্তার সুনিপুণ আলোচনা। **সচিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ : ২.০০ টাকা**

অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন)
শ্রীসরলাবালা সরকার
মূল্য : ৩.০০ টাকা

আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে
মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু
মূল্য : ২.৫০ টাকা

গীতায় স্বরাজ
ত্রৈলোক্য মহারাজ
দ্বিতীয় সংস্করণ : ৩.০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা-৯

সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা-১, আনন্দ প্রেস হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিষয় লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
মাতৃপূজা (সম্পাদকীয়)—	১
দেবী ভগবতী (প্রবন্ধ)—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন	২
সাড়ে সাত লাখ (গল্প)—পরশুরাম	৫
সীমা ও অনন্ত (প্রবন্ধ)—ডঃ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন	১০
স্মৃতির দূরবীক্ষণে (স্মৃতিকথা)—শ্রীসরলাবালা সরকার	১২
বেলা যে গেল (গল্প)—শ্রীঅন্নদাশংকর রায়	১৭
ভস্মলোচন (ছড়া)—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	২৫
সায়ন্তনী (গল্প)—শ্রীসুবোধ ঘোষ	২৬

উপন্যাস

সারারাত—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৩৩—১১১

বড়গল্প

মহাশ্বেতা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১১২—১২৮
	২৬৯—৩১০

বিষয় লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
বেহুলা (গল্প)—বনফুল	১২৯
জানলা (গল্প)—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১৩২
পতিতার পত্র (গল্প)—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৭
মোসলেম ভাস্কর্য (প্রবন্ধ)—শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪২
কণ্ঠকণ্ডূতি (গল্প)—শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী	১৪৫
আকবর বাদশা : হরিপদ কেরানী (বিচিত্র সংলাপ)—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	১৫২
মনোনয়ন (গল্প)—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী	১৫৫
অথ নাসিকা কথা (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	১৫৯
বীরভূমে থিয়েটার (স্মৃতিকথা)—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১৬২
খাওয়া (গল্প)—শ্রীমনোজ বসু	১৬৭
আম্মা (গল্প)—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী	১৭১
তিলোত্তমা (গল্প)—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৭৫
হুঁকো প্রসঙ্গ (লঘু প্রবন্ধ)—'সমুদ্রগুপ্ত'	১৮০
সঞ্জয় উবাচ (গল্প)—শ্রীনরেন্দ্র ঘোষ	১৮৩

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ভূমিকা সম্বলিত
অধ্যাপক শ্রীবৈদ্যনাথ শীল প্রণীত

বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা

দাম—৮৲

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ও
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ধারা

(উত্তর ভাগ—প্রথম পর্ব) : দাম—৬৲

অধ্যাপক নিরঞ্জন চক্রবর্তী প্রণীত

ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীকার ও বাংলা সাহিত্য

দাশরথি রায়, রসিকচন্দ্র রায়, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস প্রমুখ প্রখ্যাত পাঁচালীকারগণের সাহিত্য কর্মের বিস্তৃত আলোচনা—ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের একটি অলিখিত অধ্যায়। পাঁচালীকারগণের উপর ইহাই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়রহিত গ্রন্থ।
[শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে]

শ্রীপ্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী
নাথ ধর্ম্ম ও সাহিত্য
মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে নাথ-সহজিয়া-বৈষ্ণব-বাউল-তন্ত্র প্রভৃতি সাহিত্যের পটভূমিকায় যে 'গুহ্য-সাধনতত্ত্ব' এদেশে প্রচলিত ছিল তাহার বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক আলোচনা ইহার বিশেষত্ব। দাম—৫৲

অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়
কবিগুরু
দাম—৩৸০

শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ
সংগীতসোপান
গীতশিক্ষার্থীদের জন্য বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতিতে প্রস্তুত একখানি অভিনব পুস্তক।
দাম—৩৸০

মহাজাতি প্রকাশক কলিকাতা-১২। ফোন : ৩৪-৫৭৭৮

প্রকৃতির ক্রোড়ে শরতের সোনালী স্পর্শ।
চারিদিকে পূজার আগমনীসুরের মূর্চ্ছনা।
সার্থক হোক শান্তি আর প্রাচুর্য্যের কামনা।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

বারো মাসে তেরো পার্বণ নিয়েই তো
ভারতবাসীর জীবন ··· আর
সেই পূজা-পার্বণ ও উৎসব-অনুষ্ঠান
আলো ও সঙ্গীতের সমারোহেই হয়ে
ওঠে পরম রমণীয় ও আনন্দময়।

ফিলিপস

আনন্দোজ্জ্বল সমারোহ এনে দেয়

ফিলিপস ইণ্ডিয়া লিমিটেড

P 3856

সূচীপত্র

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
কবিতা		
বাসাবাড়ী	শ্রীবিষ্ণু দে	১৯৩
দিনলিপি : জ্যৈষ্ঠ	শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য	১৯৩
মেলা	শ্রীঅরুণ মিত্র	১৯৪
আশ্বিনে রোদ্দুর	শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র	১৯৪
খুকুর মুকুর	শ্রীকৃষ্ণধন দে	১৯৫
স্টেশন	শ্রীদিনেশ দাস	১৯৫
রঘুবাবুর দুস্তিতে	শ্রীমণীন্দ্র রায়	১৯৫
অনিচ্ছা থেকে	শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১৯৬
সাম্রাজ্য	শ্রীউমা দেবী	১৯৬
ভালোবাসি	শ্রীঅরুণকুমার সরকার	১৯৬
পারম্পরিক	শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী	১৯৭
ক্রান্তিকাল	শ্রীপ্রমোদ মুখোপাধ্যায়	১৯৭
নির্জন চেতনা	শ্রীকিরণশ... সেনগুপ্ত	১৯৭
রূপান্তর	শ্রীরামেন্দ্র দে...	১৯৮
ক্ষীণায়ু	শ্রীঅরবিন্দ গু...	১৯৮
অনেক দিনের শূন্যতা	শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৮
বোধন	শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী	১৯৯
একটি কবিতা	শ্রীঅবন্তী সান্যাল	১৯৯
স্মৃতিরেখা	শ্রীশরৎকুমার মুখোপাধ্যায়	১৯৯
আকাশ	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত	১৯৯
আয়নায় মুখ	শ্রীচিত্ত ঘোষ	২০০

কোকিলের কুহুতান প্রকৃতির এক অপার্থিব সম্পদ। বিধাতা যে কতখানি সুধা কোকিলের কণ্ঠে ঢেলে দিয়েছেন, তা ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হ'তে হয়। কোকিল কণ্ঠের এই আশ্চর্য্য সঙ্গীত মধুরতার উৎস প্রকৃতির নিঃসীম সৌন্দর্য্য। কিন্তু শিল্পীর কণ্ঠের দরদভরা প্রাণময় সঙ্গীতের উৎস চা।

Kanoi Tea

কানোই টি

বিশ্ববিখ্যাত

জ্যোতির্ব্বিদ

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জ্যোতিষার্ণব

রাজজ্যোতিষী এফ-আর-এ-এস (লণ্ডন) প্রেসিডেণ্ট অল ইণ্ডিয়া এস্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি (স্থাপিত ১৯০৭ খৃঃ) ইনি দেখিবামাত্র মানব জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোষ্ঠী বিচার ও প্রস্তুত এবং [illegible] ও দুষ্ট গ্রহ[illegible] কারক [illegible] স্বস্ত্যয়নাদি, [illegible]ক

জ্যোতিষ সম্রাট ক্রিয়াদি ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচাদির অত্যাশ্চর্য শক্তি পৃথিবীর সর্বশ্রেণী (অর্থাৎ **ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া,** চীন, **জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর, জাভা** প্রভৃতি দেশস্থ মনীষিগণ) কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

বহু পরীক্ষিত কয়েকটি অত্যাশ্চর্য কবচ

ধনদা কবচ—ধারণে স্বল্পায়াসে প্রভূত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্মীর কৃপালাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর **অবশ্য ধারণ কর্তব্য**)। সাধারণ ব্যয়—৭।।৵০ শক্তিশালী বৃহৎ—২৯।।৵০, মহাশক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক—১২৯।।৵০ **সরস্বতী কবচ**—স্মরণশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষায় সুফল—৯।।৵০, বৃহৎ—৩৮।।৵০ **বগলামুখী কবচ**—ধারণে অভিলষিত কর্মোন্নতি, উপরিস্থ মনিবকে সন্তুষ্ট ও সর্বপ্রকার মামলায় জয়লাভ এবং প্রবল শত্রুনাশ। ব্যয়—৯৵০, বৃহৎ শক্তিশালী—৩৪৵০, মহাশক্তিশালী—১৮৪।০ (এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়ী হইয়াছেন) **মোহিনী কবচ**—ধারণে চিরশত্রুও মিত্র হয়—১১।০, বৃহৎ—৩৪৵০, মহাশক্তিশালী—৩৮৭৮৵০।

প্রশংসাপত্র সহ ক্যাটালগের জন্য লিখুন।

হেড অফিস—৫০-২ (অ) ধর্মতলা ষ্ট্রীট (প্রবেশপথ ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট), "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন", কলিকাতা—১৩ ফোন: ২৪—৫০৬৫ বেলা ৪টা—৭টা। **ব্রাঞ্চ অফিস**—১০৫, গ্রে ষ্ট্রীট, "বসন্ত নিবাস", কলিকাতা—৫ প্রাতে ৯টা—১১টা

ফোন: ৫৫—৩৬৮৫

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত

পল্লীবাংলার মৌখিক সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয়

বাংলার লোক-সাহিত্য

খ্যাতনামা সাহিত্যিক

প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক

শ্রীভবতোষ দত্ত সম্পাদিত

ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিজীবনী

প্রায় সাড়ে পাঁচশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

সমর গুহ প্রণীত

উত্তরাপথ

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক

ডক্টর শচীন বসুর

সীতার স্বয়ংবর :: সাতসমুদ্র

শ্রীতারাপদ দাশ এম. এ., বি. টি

সম্পূর্ণ নূতন ধরনের বিরাট উপন্যাস

সেদিন পলাশপুরে

ডক্টর হরিহর মিশ্র

প্রণীত

নূতন সমালোচনা গ্রন্থ

রস ও কাব্য

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে রসের কথাই সাহিত্য জিজ্ঞাসার শেষ কথা। সেই রস কাহাকে বলে, রসের সামগ্রী কি কি, কেমন করিয়া কাব্যশিল্পের মাধ্যমে রস-নিষ্পত্তি হয়, রসের সংখ্যা কত, উহার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য কতখানি—এই সব প্রসঙ্গ উদাহরণ সহযোগে এই গ্রন্থের মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সুধী, সুবিদ্বান ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ। রচনাশৈলী প্রাঞ্জল, সরস ও হৃদয়গ্রাহী। ইহাতে প্রাজ্ঞ ও সাধারণ সকল পাঠকেরই রস-জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হইবে।

ক্যালকাটা বুক হাউস

১।১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

ফোন: ৩৪-৫০৭৬

বিশুদ্ধ

হোমিওপ্যাথিক

ও

বায়োকেমিক

ঔষধের

নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ড্রাম ২২ ও ২৪ নঃ পয়সা। রয়েল লণ্ডন হোমিওপ্যাথিক কলেজে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষাপ্রাপ্ত হোমিও চিকিৎসক দ্বারা পরিচালিত।

কুণ্ডু পাল এণ্ড কোং

১৭১।এ, রাসবিহারী এভেনিউ,
কলিকাতা—১৯।
(গড়িয়াহাটা মার্কেটের সম্মুখে)

সমাজ সেবার অন্তর গঠনে সহযোগিতা করুন!

"বলিষ্ঠ সমাজ গঠনের যৌথদায়িত্ব অস্বীকারের নাম আত্মহত্যা। নিছক নিজস্ব সাংসারিক আনন্দের মাঝে প্রতিবেশী অক্ষম উপেক্ষিতকে অবহেলায় ভুলে থাকায় মানবতার প্রতিকূলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তার নাম সংকুচিত জাতীয় অভিশাপ। সহ-অস্তিত্বের মন নিয়ে স্থানীয় পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিক আবশ্যকতার প্রতি একটু সহানুভূতিশীল উদার দৃষ্টিদানের নাম দেবত্ব। আজ দুঃস্থ ও দেবতার আরাধনার দিন — ব্যবসামূলক গণ-আত্মহত্যা প্রতিরোধে ব্রতী হোন।"

শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ

বঙ্গীয় সমাজ সেবী পরিষদ

পোষ্ট বক্স ২১২২, কলিকাতা-১

(সি ৯৬০৪)

পূজায় আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে

মঙ্গলা এণ্ড কোং

মঙ্গলা ও শিব গেঞ্জী

প্রস্তুতকারক

মঙ্গলা এণ্ড কোং

মঙ্গলা মোজা প্রস্তুতকারক

মঙ্গলা এণ্ড কোং

১২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩

— পরীক্ষা প্রার্থনীয় —

এজেন্সীর জন্য লিখুন

সূচীপত্র

বিষয় লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
শিশিরের মুখ—শ্রীবটকৃষ্ণ দে	২০০
গাগরীটা পড়ে আছে—শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ...	২০০
জনান্তিক—শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়	২০০
আলোছায়া—শ্রীসুনীল বসু	২০০
বইয়ের আদর (প্রবন্ধ)—শ্রীকালিদাস রায়	২০১
যুবতী-হৃদয় (গল্প)—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ	২০৩
পত্র (গল্প)—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র	২০৭
দরজা (গল্প)—শ্রীবিমল কর	২১৩
নেকনজরে (প্রবন্ধ)—শ্রীশিবতোষ মুখোপাধ্যায় ...	২১৬
প্রতিবন্ধ (গল্প)—শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	২১৯
পিকনিক (রম্য রচনা)—শ্রীবাকু আঢ্য	২৪৯
সীমান্ত (গল্প)—শ্রীপ্রফুল্ল রায়	২৫১
বেকার সমস্যা (প্রবন্ধ)—ডঃ শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার বসু ...	২৫৬
তিন দিকে জল (গল্প)—শ্রীস[illegible] বসু	২৫৯
সেতুর কথা (প্রবন্ধ)—শ্রীসু[illegible]পাধ্যায় ...	২৬৫
বাংলা ছবির বিবর্তন (প্রবন্ধ)—[illegible]সেবাব্রত গুপ্ত ...	৩১১
যাত্রা ও গীতিনাট্য—শ্রীপ্রভাংশু গুপ্ত	৩১৬

আনন্দমেলা

বিষয় লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
শুভেচ্ছা—মৌমাছি	২২৫
পরীর দেশে বিনু (রূপক কবিতা)—শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২২৬
সন্তদুর্গা (ইতিহাসের গল্প)—শ্রীযামিনীকান্ত সোম ...	২৩১

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটির

প্রাচীন ও আধুনিক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের
অপূর্ব সমন্বয়ে
নবীন পদ্ধতিতে

বাতরক্ত ও ধবল আরোগ্য

উহা ছাড়া গাত্রে চাকা চাকা দাগ, অসাড়তা, আঙ্গুলের বক্রতা, একজিমা, সোরাইসিস্, দূষিত ক্ষত ও অন্যান্য কঠিন কঠিন চর্মরোগ অল্পদিনে আরোগ্য করা হয়। সাক্ষাতে অথবা পত্রে পরামর্শ লউন এবং বিনামূল্যে বিতরণীয় পুস্তক পাঠ করুন। প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া (ফোন : ৬৭—২৩৫৯)। শাখা—৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯ (পূরবী সিনেমার পাশে)

FROM KERALA

tom

COCOANUT OIL

HYGIENICALLY PACKED
IN PLASTIC & TIN CONTAINERS

THANIPILLY OIL MILLS, COCHIN, KERALA

Enquire at

VASU BROTHERS

26, Amratolla Lane, Calcutta-1

Phone—33-4919

বিদ্যাসাগর কটন

মিলস্ লিমিটেড

মিলস্ ঃ—সোদপুর, ২৪ পরগণা।
ফোন—ব্যারাকপুর - ১৩৬।

"কিশোরী", "অনসূয়া", "দময়ন্তী"
"সরস্বতী", "কবিতা", "সবিতা"
"কাবেরী" প্রভৃতি নূতন ডিজাইনে

শাড়ী

এবং

"রবীন্দ্রনাথ", "সূর্যকান্ত", "শ্রীগণেশ"
"শ্রীরামকৃষ্ণ", "শ্রীমোহন", "২৯৯"
"ঢাকাই", "৫৩১বি", "৩৫০" প্রভৃতি
আধুনিক রুচিসম্মত

ধুতি

মিলে প্রস্তুত হয় এবং সর্বত্র
সুপরিচিত শ্রেষ্ঠ বিক্রেতার কাছে
পাওয়া যায়।

[illegible] অফিস—[illegible] স্ট্রীট, কলি-১
ফোন—[illegible]

শ্রেষ্ঠ অবদান!

স্বাদে ও গন্ধে
শ্রেষ্ঠত্বের দাবী
রাখে

সরকার পারফিউমারী ওয়ার্কস
কলিকাতা • চাম্পাহাটী • ২৪ পরগনা

বাহির হইয়াছে

ডক্টর সুধীরকুমার নন্দীর নন্দনতত্ত্ব

একথা স্বীকার্য যে এতদ্দেশে নন্দনতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনা বিরল। যে মনননিষ্ঠা এবং বিশ্লেষণী প্রয়াসের একাগ্রতা থাকিলে এই ধরণের আলোচনা করা যায় তাহার অসদ্ভাব যে একেবারে এ দেশে ঘটে নাই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ডক্টর নন্দীর গ্রন্থখানি। শিল্পের প্রকৃতি চরিত্র সম্বন্ধে এই গ্রন্থের সুনিপুণ আলোচনা কলারসিক ও বিদগ্ধজনের আনন্দ বর্ধন করিবে। টোমা রাঁলা, হেগেল, ক্রচে এবং অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ এদেশীয় এবং ওদেশীয় শিল্পী এবং নন্দনবাদীদের নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ।

পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন কেন্দ্রীয় কৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবির। মূল্য—৫ টাকা।

প্রকাশক: **প্রকাশ মন্দির** ৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯

জটীল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ

২৫ বৎসরের অভিজ্ঞ যৌনব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডাঃ এস পি মুখার্জি (রেজিঃ) সমাগত রোগীদিগকে গোপন ও জটিল রোগাদির রবিবার বৈকাল বাদে প্রাতে ৯—১১টা ও বৈকাল ৩—৮টা ব্যবস্থা দেন ও চিকিৎসা করেন।

শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক (রেজিঃ)
১৪৮, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
অগ্নি-পরীক্ষা (পুরাণের গল্প)	—শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত	২৩২
বক-বকানি (কবিতা)	—শ্রীনরেন্দ্র দেব ...	... ২৩৩
পরের সোনা দিও নে কানে (গল্প)	—শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)	... ২৩৪
গুণধর (কবিতা)	—শ্রীশৈল চক্রবর্তী ...	... ২৩৫
একাগ্রতা (জীবন-কথা)	—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র ...	... ২৩৬
কে জব্দ ?? (রহস্য গল্প)	—শ্রীলীলা মজুমদার	... ২৩৭
চাঁদের বুড়ী (কবিতা)	শ্রীশংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	.. ২৩৮
হুঁদো-ডাক্তারের ঘাড়ভারী	—বুদ্ধু-ভুতুম ...	. ২৩৯
প্যাব আর বাঘা (কবিতা)	—শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ বসু	... ২৪০
কে নেবে ভার? (নাটিকা)	—শ্রীঅমিতা ঘোষাল	... ২৪১
রাজা কা দো শিং (মজার গল্প)	—শ্রীশচীন কর	... ২৪২
গদাইকরণ (কবিতা)	—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু ...	... ২৪৩
পাঁচ মিনিটের গিন্নী (কবিতা)	—শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়	... ২৪৩
একটি অদ্ভুত ম্যাজিক	—[illegible] এ সি সরকার	... ২৪৩
টাকার খেলা (খেলা)	—শ্রী[illegible] বসু ...	... ২৪৪
বাক্সে গাছপালা (প্রবন্ধ)	—শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	... ২৪৫
ধাঁধা নয়	—শ্রীসমর দে	... ২৪৫
গাছড়ু-খাদা (কবিতা)	—শ্রীমণীন্দ্র দত্ত ...	... ২৪৬
সম্বর্ধনা (কবিতা)	—শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়	... ২৪৬
হাঁস-মুরগীর লড়াই (খেলা)	—শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র	... ২৪৭
পুতুল-বিলু (ছড়া-ছবি)	—শ্রীবিমল ঘোষ ও শ্রীদেবব্রত ঘোষ	২৪৮

কৃষ্ণা গ্লাস

কলিকাতা • বোম্বাই

হেড অফিস
১৭, রাধাবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-১
২২-১৭৫৬

পূজার অভিনন্দন

যেথায় সবচেয়ে বেশী দরকার

পল্লী বাংলার দুর্দশা বর্ণনার ভাষা নেই। কৃষি-জমির যা পরিমাণ, তাতে কোটি কোটি লোকের অন্নসংস্থান অসম্ভব। আধুনিক শিল্পসংস্থা পশ্চিম বাংলায় যা কিছু আছে তার প্রায় সবক'টিই কলকাতার আশেপাশে একটা ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ আর পল্লী-বাংলার অধিকাংশ লো[illegible]রের বেশীর ভাগ সময় বেকার থেকে দারিদ্র্য ভোগ করেন। এ [illegible] অবস্থার যথাসাধ্য প্রতিকারের জন্যই 'বেঙ্গল টেক্সটাইলে'র যাবতীয় উদ্যম। বেঙ্গল টেক্সটাইলের আধুনিক কারখানাটি স্থাপিত হয়েছে পল্লী বাংলারই কোলে — মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজারে। ফলে সেখানে আজ বহু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এখন আবার মিলটিকে অনেকখানি বাড়িয়ে তোলার কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে—যাতে আরো বেশী-সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়।

পল্লী বাংলার একটা অঞ্চল আধুনিক যন্ত্রশিল্পের যাদুস্পর্শে কতটা সজীব হয়ে উঠতে পারে, তার পরিচয় পাওয়া যায় কাশিমবাজারে। কাল যা ছিল বেকারী ও হতাশার রাজত্ব, আজ তা-ই হয়েছে আশা-উদ্দীপনা আর কর্মচাঞ্চল্যের এক অপূর্ব ছবি।

বেঙ্গল টেকস্টাইল মিলস লিঃ

অন্যতম ডি, এন, চৌধুরী শিল্প প্রতিষ্ঠান

মিলস্—কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবাংলা।

হেড অফিস—পি-৫৯, বি কে, পাল এভেনু, কলিকাতা—৫।

আনন্দের দিনগুলো
আগামী বৎসরগুলো
আনন্দময় করে তুলুন
লাইফ ইনসিওরেন্স পলিসি নিয়ে

লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

গিনি ম্যানসন

জুয়েলার্স

অলংকার শিল্পে
প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য
ও আধুনিক রুচির সংমিশ্রণে
এক অভিনব সৃষ্টির ধারক।

প্রধান শো রুম :
২২৬, রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ
কলি-১৯ • ফোন ৪৬-১৪৭২
শাখাসমূহ :
৩১, আশুতোষ মুখার্জী রোড
(যদুবাবুর বাজার) ভবানীপুর, কলি-২০
ফোন ৪৭-৩১৬৯
১, হিন্দুস্থান মার্ট, বালীগঞ্জ, কলি-২৯
ফোন ৪৬-১৪১৫
গ্রাম —"গিনিম্যান"

প্রতিদিন শুনুন

VOA ভয়েস অব আমেরিকার

সংবাদ, সংবাদ পর্যালোচনা,
অনুষ্ঠান, সংগীত প্রভৃতি

বাংলা অনুষ্ঠান

রাত্রি ৭ হইতে ৭-৩০ঃ ৪২-১৯,
২৫-২৬, ১৩-৯৪ ও ১১-৬০ মিটারে

ইংরেজী অনুষ্ঠান

সকাল ৬-৩০, ৭-৩০, ৮-৩০ঃ
২৫-৩৫ ও ১৬-৮৭ মিটারে
সন্ধ্যাঃ ৬-৩০, রাত্রিঃ ৭-৩০, ৮-৩০,
৯-৩০ঃ ৪১-৩৮, ৪২-১৯, ২৫-২৬,
১৩-৯৪ ও ১১-৬০ মিটারে

(পূর্ণ বিবরণের জন্য লিখুনঃ
VOA পোস্ট বক্স ২০৮, নয়া দিল্লী।)

মটর গাড়ী, বাস ও ট্রাকের
সকল রকম পার্টস ও
সরঞ্জাম পাওয়া যায়।

অনুসন্ধান করুনঃ

দি ওরিয়েণ্টাল মটর য়্যাকসেসারীজ এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

২৮, চিত্তরঞ্জন য়্যাভিনিউ
কলিকাতা—১২

টেলিফোন ২৩-৫৩৬৬, ২৩-৫৩৬৭
টেলিগ্রাম "চার্জমং" কলিকাতা

রাষ্টন, লিস্টার ডিজেল ইঞ্জিন
বিকো ইলেকট্রিক মোটর

ভলটাস, বামার লরী ও মার্টিন
বার্ণ-এর অনুমোদিত এজেন্ট

এস. কে. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

১৩৮, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা—১
ফোন ঃ ২২-৫২৭৩

PASTEUR LABORATORIES
PRIVATE LTD.
2, CORNWALLIS STREET,
CALCUTTA-6

রেল পুতুল

বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের এই পোড়ামাটির পুতুল কবে কোন গ্রামীন শিল্পী রূপায়িত

করেছিল কে জানে। হয়ত, সে দেশের মাটিতে

[illegible] যখন [illegible] প্রসারিত হয়েছিল; হয়ত বা তারও আগে-

লৌহযন্ত্রের আগমন কামনায় কোন লোক-শিল্পীর মানস-সৃষ্টি

এই রেল-পুতুল। শতাব্দী-প্রাচীন মানুষের কল্পনায় ও কামনায় স্বাগত এই রেলপথ।

তার নির্বিঘ্ন ও নির্ভরশীল পরিবহণে মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সম্ভব হয়ে উঠুক-

তার উৎসাহ-আনন্দ নিবিড় হোক।

পূর্ব রেলওয়ে

পুণ্য স্মৃতি স্বদেশী যুগের—

বঙ্গলক্ষ্মীর

ধুতি - লঙক্লথ - শাড়ী

মাতৃপূজায় ও নিত্য ব্যবহারে অপরিহার্য্য

ভারতের প্রাচীনতম গৌরবময় প্রতিষ্ঠান

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ

হেড অফিস—৭ নং চৌরঙ্গী রোড,

কলিকাতা—১৩

পপুলার জুয়েলার্স

সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া উন্নত কারুশিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকিয়া যে সুনিপুণ কলাশিল্পের সৌষ্ঠব এবং সৌন্দর্য্যের ধারা আনয়ন করিয়াছি তাহার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে আপনাকে সূক্ষ্ম এবং সুন্দর কারুকার্য্যের পরিচয় দানে সমর্থ হইব।

এম,বি,সরকার এণ্ড সন্স

গিনিগোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট

গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস

১৬৭,১৬৭সি/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ব্রাঞ্চ-বালিগঞ্জ-২০০/২/সি রাসবিহারী এভিনিউ কলি-২৯

শোরুমের পুরাতন ঠিকানা

১২৫,১২৫/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে

ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর — থানা-জামসেদপুর সিটি

KAMINIA
Regd OIL Regd
KAMINIA
Regd OIL Regd
AWARDED GOLD MEDAL
AT THE MYSORE EXHIBITION
Delicately perfumed oil for beautifying and increasing the growth of the hair
To be rubbed well into the roots of the hair daily
KAMINIA PERFUMERY Co
BOMBAY
কেশরত্নের যত্ন নিন
কামিনিয়া
হেয়ার অয়েল
কামিনিয়া হেয়ার অয়েলে কেশোৎপাদের বিশেষ উপাদান আছে। আপনি যখনি কামিনিয়া হেয়ার অয়েল ব্যবহার করিতেছেন তখনি আপনার কেশমূলে কেশবর্ধক উপাদানগুলি প্রযুক্ত হইতেছে ফলে সতেজ কেশগুচ্ছ আপনার কেশদামকে আপনার মুখশ্রীর উপযুক্ত এক বিশিষ্ট রূপদান করিবে।
এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ড্রাগ
অ্যাণ্ড কেমিক্যাল কোং,
বোম্বাই—২
সভ্য: ইণ্ডিয়ান সোপ অ্যাণ্ড টয়লেট্রিজ মেকার্স অ্যাসোসিয়েশন
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের পক্ষে সোল ডিস্ট্রিবিউটর
মেসার্স আর, নন্দকুমার এ্যাণ্ড কোং, ৮৭ খেংরাপটি স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রাচীন পট

শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনী

শ্রীবৃন্দাবনবিহারী মল্লিকের সৌজন্যে

খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্বতঃ ॥

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা

মহালয়া

১৩৬৬

॥ মাতৃপূজা ॥

বাঙ্গালীর ঘরে মা আসিতেছেন। কেমন সে মা? মা আমাদের দশভুজে দশপ্রহরণধারিণী। তিনি বীরেন্দ্রসিংহ পৃষ্ঠবিহারিণী। তাঁহার দক্ষিণে ঐশ্বর্যস্বরূপিণী লক্ষ্মী; বামে বিদ্যাদায়িনী বাণী। তাঁহার সঙ্গে সিদ্ধিদাতা গণেশ। এবং বলরূপী কার্তিকেয়। বাঙ্গালীর মানসলোক উজ্জ্বল করিয়া শরচ্চন্দ্র নিভাননা জননীর এই চিন্ময়মূর্তি ফুটিয়াছে। সে রূপের আকর্ষণে বাঙ্গালী নাচিয়াছে, মাতিয়াছে। শোক দুঃখ ভুলিয়া গিয়া বাঙ্গালী মাতৃপূজার অর্ঘ্যোপচার আহরণ করিয়াছে। বাংলার দিকে দিকে উঠিয়াছে গান, জাগিয়াছে প্রাণ। মাতৃপূজায় সন্তানের ঐকান্তিক সেই অবদানের সমারম্ভ প্রভাবে এদেশের আকাশে দীর্ঘদিনের পরাধীনতার পুঞ্জীভূত আঁধারে বহ্নিবীর্য বিকীরিত হইয়াছে। মেঘের কোলে সৌদামিনীর সে খেলা। দিগ্‌দাহী বজ্রানলবাহী বিদ্যুৎদামের চমকে সন্তানের দল জাগিয়াছে। ফাঁসীমঞ্চে তাহারা জীবনের জয়গান গাহিয়াছে। শোণিতের অঞ্জলী দিয়া তাহারা মায়ের পদতল রঞ্জিত করিয়াছে।

সিদ্ধি মিলিয়াছে কি বাঙ্গালীর এই সাধনায়? মাতৃপূজায় এখনও আমরা সিদ্ধিলাভ করিতে পারি নাই। মা আমাদের সন্তানের স্নেহে উন্মাদিনী। তিনি জটাজুট সমাযুক্তা। মায়ের অগণিত সন্তান আজ অন্নহীন, বস্ত্রহীন; আশ্রয়হীন তাহারা।

মায়ের শান্তি কোথায়? কে আছ মাতৃসাধক, মায়ের দুঃখ উপলব্ধি কর। আর্ত, পীড়িত, নিরাশ্রয় মায়ের সন্তানদের অশ্রু মুছাইতে আগাইয়া যাও। বীরের ব্রত গ্রহণ কর। দুর্বল যে, যে ভীরু, মায়ের সেবায় তাহার অধিকার নাই। জীবনের যত গ্লানি লইয়া পড়িয়া থাকুক সে পিছনে। তুমি আগাইয়া চল। মাতৃযজ্ঞে জীবন আহুতি দিতে প্রস্তুত হও। দুর্বৃত্তের কৃতান্তশমনকল্পে মায়ের খড়্গ দুলিয়া উঠিবে। মাতৃপূজা সার্থক হইবে।

দেবী ভগবতী

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

বাঙালী সহজভাবে মাকে পাইয়াছিল। কেমন এই মা? তিনি ভগবতী, তিনি পরমা দেবী। সহজভাবে তাঁহাকে পাওয়া কিন্তু সহজ নয়; কারণ তিনি অচিন্ত্যা, তিনি মহাব্রতা। তাঁহাকে পাইতে হইলে দুই-এক দিনের ব্রত অথবা সাধনা নহে, দীর্ঘকাল সেজন্য মহাব্রত অবলম্বন করিতে হয়। তত্ত্বজ্ঞ যাঁহারা, যাঁহারা মুনিঋষি, ইন্দ্রিয়নিচয় নিরোধ করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে পাইবার জন্য সাধনা করিয়া থাকেন। এমন যে মা বাঙালী তাঁহাকেই পাইয়াছিল; পাইয়াছিল অর্থ—দেখিয়াছিল। কারণ পাওয়া বলিলে প্রত্যক্ষতাই বুঝায়। যে বস্তু অব্যক্ত, অনির্দেশ্য, তেমন বস্তুতে আমাদের সম্বন্ধ জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে না এবং আমাদের চিত্তে তৎসম্বন্ধে ভাব জন্মে না। অথচ ভাবেই প্রত্যয়বোধ বা পাওয়া। প্রত্যুত ব্যক্ততাতেই আত্মত্বের উদ্দীপ্তি এবং সেই উদ্দীপ্তির সর্বতোময় অনুভূতিই প্রাপ্তি। এমন প্রাপ্তি বা লাভ সাধকের মনের মূলের সকল সংস্কার আলো করিয়া সর্ব সম্বন্ধে আত্মভাব বিস্তার করে এবং রূপে, রসে, স্পর্শে, গন্ধে তাঁহার অন্তরে সাধ্যতত্ত্বকেই প্রমূর্ত করিয়া তোলে। মনোময় সেই প্রমূর্ত লীলার আবর্তে সাধক সর্ব সম্বন্ধে সাধ্যতত্ত্বকে জড়াইয়া ধরিতে উন্মুখ হন। সেই উন্মুখতায় বা আকুলতায় অন্তরের ভাবটি ঘনীভূত হইয়া স্থূলে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ভাবে পরম মাধুর্য বিস্তার করে; দেবতা বিগ্রহ-রূপে সর্বভাবে সেবার স্বাচ্ছন্দ্য এবং সৌলভ্যে ভক্তের কাছে ধরা দেন।

বাঙালী এই ভাবেই মাকে পাইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্বের মূলীভূত যে সত্য বাঙালীর দেবী দশভুজার মূর্তিতে তাহারই চিন্ময় অর্থাৎ বাঙ্ময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় বিলাসই প্রকটিত হইয়াছে। ইতিহাস যাহাই বলুক, বাঙালীর ঘরে দেবী দুর্গার বিগ্রহরূপে আবির্ভাবের মূলে বাঙালীর প্রাণধর্মের পরিপ্লাবনশীল উচ্ছ্বাসই কাজ করিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে দেবী দুর্গার অনুধ্যানটি বাঙালী সাময়িক কোন প্রয়োজনবোধের প্রেরণায় বা স্বার্থকেন্দ্রিক কোন উদ্দেশ্য সাধনের তাগিদে পায় নাই। বৃহতের বেদনাতেই দেবী অখণ্ড এবং এক রসের বিগ্রহে দীপ্তি এবং দ্যুতি লইয়া বাঙালীর আঙিনায় তাঁহার উদার মাতৃমহিমার পরম মাধুর্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি নিজে আসিয়া বাঙালীকে নিজ করিয়া লইয়াছিলেন। দেবীর রূপ দেখিয়া এবং দুর্গতিহারিণী দুর্গা এই মন্ত্রবীজে মজিয়া বাঙালী ভারতকে প্রাণধর্মে সঞ্জীবিত করিবার শক্তি অর্জন করিয়াছিল। বস্তুত বাঙালীর কাছে দেবীর দুর্গারূপে এই আবির্ভাবটি পরম রহস্যময়। সাধক যাঁহারা তাঁহাদের পক্ষেই তাহা অনুভবের বস্তু। কিন্তু যাঁহারা সেই সৌভাগ্য অর্জন করেন নাই, তাঁহাদেরও পক্ষে দেবীর এই দুর্গারূপে আবির্ভাবের তত্ত্বটি অনুধ্যেয়, কারণ জাতির অভ্যুন্নতির পক্ষে তাহার একান্ত-ভাবে প্রয়োজন আছে, ফলত ঋষি বঙ্কিম-চন্দ্র যে বহ্নিবীজে জাতিকে দীক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন, তাহার সাধনায় সিদ্ধি-লাভ আজও জাতির পক্ষে ঘটে নাই। সেই মন্ত্রের সাধনায় দেবীর রূপটি যদি আমরা অনুধ্যেয় স্বরূপে গ্রহণ করিতে না পারি, তবে আধ্যাত্মিকতার কথা না হয় থাকিল, ঐহিকতার পক্ষেও আমাদের অগ্রগতির সকল প্রচেষ্টা প্রাণহীন হইয়া পড়িবে। মাকে যদি আমরা অন্তরে না পাই, তবে শুধু বাহিরের উপচার বাড়াইয়া আমরা বাঁচিব না। পক্ষান্তরে সে-পথে আগাইতে গেলে আমাদের যাহা কিছু আছে, তাহাও আমরা হারাইয়া ফেলিব। বলিতে কী, অতি আধুনিকতার এই যুগে এইসব কথা বলা অনেকটা বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বাহিরের উপচার বাড়াইবার দিকে অন্ধভাবে ছুটিয়া চলিয়াছি। এই অন্ধতা মানুষ হিসাবে নিজেদের অধিকার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছে। ইহার ফলে আমাদের অসহায়ত্ব উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে এবং স্বাধীনতার নামে জড় স্বার্থগত পশুর জীবনের পরবশ্যতার ভিতর আমরা যাইয়া পড়িতেছি। আসুরিক প্রবৃত্তি আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। নিতান্ত নির্মম, নিষ্ঠুর এবং ক্রূর সেই শক্তির গতি। ইহার পেষণে জাতির মনোমূল ক্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। আমরা আমাদের অন্তরের বলিষ্ঠ কোন আদর্শের প্রেরণা অনুভব করিতে পারিতেছি না। নিতান্ত অনাত্ম্য এই যে পরিভব ইহার প্রতিবেশে মনুষ্যত্ব আজ নির্জিত হইতে চলিয়াছে। নিঃস্ব আমাদের অবস্থা। "নিঃস্ব-জনের দুঃস্বপনের বন্ধ ঘুচানো দায় রে." কবির উক্তিটি এই সম্পর্কে মনে পড়ে। সত্যই নিঃস্ব জনকে দুঃস্বপ্নের বন্ধন হইতে মুক্ত করা বড়ই শক্ত। দেবীর কৃপা ব্যতীত এই অবস্থার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার বোধ হয় কোন উপায় নাই।

প্রশ্ন উঠিবে এই যে, দেবী বলিতে যাঁহাকে বুঝাইতে চাহিতেছি, যাঁহাকে বলিতেছি মা, তাঁহাকে পাইলে আমাদের জীবনের দুর্গতি দূর হইবে, এসব সে-কালের কথা, অতীতের ভাববিলাসিতা মাত্র। হয়ত আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ বলিবেন, প্রেতের আত্মা তোমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। সেই দেবী বা মায়ের সঙ্গে আমাদের বাস্তব জীবনের সংযোগ কতটুকু এবং তাঁহার সাধনার সঙ্গে সামাজিক চেতনা আছে কতখানি? আমরা চাই সমাজকল্যাণ, ; সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনই আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সম্পর্কে অস্পষ্ট এবং অনর্থক কোন ভাবাদর্শে ভাসিয়া গেলে আজ আমাদের চলে না, ইত্যাদি। এমন যুক্তি যাঁহারা উপস্থিত করেন, তাঁহাদের কাছে আমাদের বক্তব্য এই যে, দুর্গা এই যে দেবী, ইঁহার সহিত আমাদের জীবনের সর্বভাবে সংযোগ রহিয়াছে। এই দেবী জাতির সমষ্টি-চেতনার এবং সর্বজনীন বেদনার মনোময় বিগ্রহস্বরূপিণী। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের যতকিছু ভোগ। আমরা ত এই ভোগই চাহিতেছি এবং এই ভোগার্থেই জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমাদের মুখে মুখে আজকাল আন্তর্জাতিকতার কথা। আমরা দেশের জন্য, জাতির জন্য যতটা না ভাবি, জগতের জন্য তাহার চেয়ে আমাদের বেশী ভাবনা। বিশ্বের জন্য আমাদের সকলের বুকে ব্যথা। আমাদের যিনি মা, তিনি জগৎ ছাড়া নহেন। পক্ষান্তরে জগৎই তাঁহার মূর্তি, সমগ্র জগৎ তাঁহারই আত্মশক্তিতে পরিব্যাপ্ত। অন্য কথায় জগৎকে আপন করিবার ভাবটি লইয়াই তাঁহার প্রভাব। জগৎকে আমরা আপন

করিতে চাই, কিন্তু সে-কাজটি সম্পন্ন করিব কী ভাবে? এই আত্মভাবটি অন্তরে দীপ্ত করিয়াই ত? জগতের গাছ, মাটি, পাথর—এইগুলি দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া ত জগৎকে আপন করা যায় না। জগৎকে আপন করিয়া পাইতে হইলে আমাদের সমগ্র প্রতিবেশে আগে আত্মভাবটিকে ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হয়। আত্মভাবের এই ঘনিষ্ঠতা আবার নৈকট্যবোধকে ভিত্তি করিয়াই বিস্তার লাভ করে, অর্থাৎ আমাদের দেশ, আমাদের জাতি ইহাদিগকে যখন আমরা আপন করিতে পারি, তখনই আমরা জগৎকে আপন করিবার যোগ্যতা লাভ করি, নতুবা আমাদের মনের গোড়ায় ফাঁক থাকিয়া যায় এবং সত্যকার কোন শক্তি ব্যাপ্তিশীল সামর্থ্যে আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হয় না। বস্তুত আমরা যদি আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে না পারি, তবে পরের অনুকৃতি বা অনুগতির দ্বারা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার মত শক্তি আমাদের মিলিবে না। যে-জাতির আত্মপ্রত্যয় নাই, নিজেদের শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতির মধ্যে নিজ ভাবটিকে যাহারা সত্য করিয়া পায় নাই, তাহাদের ভিক্ষাবৃত্তিই সার হয়। মিথ্যাচারের পথে তাহারা নিজেরা বিড়ম্বিত হয় এবং জগতের নিকট হইতে ধিক্কারই লাভ করে।

এদেশের ঋষিরা বিশ্বপরিব্যাপ্ত অনন্ত শক্তির মূলে জগদেকশক্তির ব্যাপ্ত মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই প্রত্যক্ষতা তাঁহাদিগকে ঘরে-বাহিরে পারে-অপারে পরম বলে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রত্যক্ষতার এই বল বলিতে বিচার-বিতর্ক, সন্দেহ এবং সংশয়ের অতি প্রাণময় বিজয়লীলা বুঝায়, বুঝায় সব জড়িমা [illegible]। সে অনুভূতিতে [illegible] কোন কারবার নাই, সর্বত্র শুদ্ধ-প্রতিষ্ঠিত এবং সর্ব সম্বন্ধে থাকে সেখানে উদার দৃষ্টি। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মভাবের বাস্তবই লীলা। অন্য কথায় আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে আত্মশক্তির সে অবস্থায় অভিব্যক্তি তখন জড়ে চৈতন্যময় পরতত্ত্বের লাবণ্য আমাদের দৃষ্টিতে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে, এবং অনিত্য রূপ প্রতীতির ক্ষেত্রে নিত্য সত্যের সেখানে প্রকাশ ঘটে। এমন প্রকাশে আমাদের মনোবৃত্তিসমূহ অনায়াসে পরিস্ফূর্তি পায়; আমাদের মননের মূলে বীর্যময় মাধুর্য ফুটিয়া উঠে, সব সংশয় কাটিয়া যায়। তখন জীবনের সর্বত্র নির্ভয়। আমাদের জীবনের মূলে যত সমস্যা সৃষ্টি করিতেছে এই ভয়। পরস্পরের সম্বন্ধে সংশয় বা পরবোধই এই ভয়ের মূলে কাজ করে। সুতরাং ভয়কে জয় করিতে হইলে এই বোধকে অতিক্রম করা প্রয়োজন। অন্য কথায় আমাদের নিজেদের

স্কেচ শিল্পী : শ্রীনন্দলাল বসু

মনকে বদলাইয়া ফেলা দরকার। দেবী দুর্গার অনুধ্যানে মনে এই ব্যাপ্তিশীল উদ্দীপনা লাভের ভারটি বীজরূপে নিহিত রহিয়াছে। সর্বশক্তিময়ী মাকে অন্তরে না পাইলে, অন্য কথায় সকলকে আলিঙ্গন দানে সর্বদা সমুদ্যতা মায়ের লীলাটি হৃদয়ে উদ্রিক্ত না হইলে, পরবোধ নিরাকৃত হইতে পারে না। ফলত মায়ের সর্বতোব্যাপ্ত বাস্তু ভাবটি অন্তরে বীজরূপে পাইয়া সেইভাবে মজিয়া তবে ভয়কে জয় করা যায় এবং সকলের সঙ্গে সমাত্ম সম্বন্ধের বা প্রীতির ভিত্তি রহিয়াছে সেইখানে।

প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষিতিতত্ত্বে অর্থাৎ আধিভৌতিক ক্ষেত্রে খোলা কথায় আমাদের ঘরে, আমাদের সংসারে প্রত্যক্ষরূপে মায়ের কৃপার স্পর্শ না পাইলে সাধনায় দিব্যভাবের উজ্জীবন ঘটে না। যৌগিক ভাষায় মূলাধারে মায়ের আত্মভাবটি ব্যক্ত না হইলে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগিয়া উঠেন না। ফলত আনন্দময়ী দেবীকে সমগ্রভাবে যিনি পান, সাধিভূত, সাধিযজ্ঞ এবং সাধিদৈব নিজের সমগ্র চেতনার মূলে তাঁহাকে তিনি অখণ্ড রসে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সে-ক্ষেত্রে তাঁহার জীবনে সকল ভাবে মায়ের সেবা সত্য হইয়া উঠে, কর্মের কোন স্তরকে ফাঁকি দিয়া মায়ের সঙ্গে দেখাদেখি, মাথামাখি চলে না। মায়ের আত্মশক্তির যোগান এমন অভিব্যক্তি, কেমন সে রাজ্য? সাধকেরা বলেন, সেইখানে আমাদের স্বারাজ্য। সেখানে "মা-ই মোদের রাজা মা-ই মোদের রানী।" সেখানে তিনিই ব্যক্তি, তিনিই বাণী। তাঁহার চিন্ময়লীলার সেখানে উল্লাস, সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত সেখানে তাঁহার প্রকাশ। সেখানে সন্তানকে লইয়া তাঁহার ঘর। মা সেখানে ঐশ্বর্যের সকল আবরণ উন্মোচন করিয়া সন্তানের কাছে ছুটিয়া আসেন। সকলকে তিনি আলিঙ্গন করেন, চুম্বন করেন। মায়ের আদরের সেই স্পর্শ অগ্নিময়। তাহার দুরন্ত তাপে দিগন্তের আঁধার দূর হইয়া যায়, অগ্নিময়ী মায়ের

কাঠখোদাই শিল্পী ঃ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সেই আগুনের খেলায় আমাদের সকল অবীর্য দগ্ধ হয় এবং সকল গ্রন্থি, সব বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমরা তাঁহার নিকট ছুটিয়া যাই। ব্যক্তভাবে মায়ের অনুভাবের এমন যে বৈচিত্র্য, এই যে বিলাস, তাহার মাধুর্যের এমন যে চাতুর্য, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিবার নয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের নিজেদের জীবনকেই বা কতটুকু ব্যক্ত করিতে পারি? এমন অবস্থায় নিখিল বিশ্বের যিনি জননী তাঁহার স্নেহময় বিগ্রহের মাধুরী এবং চাতুরী যে অব্যক্ত থাকিবে, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে মা ব্যক্তও নহেন, অব্যক্তও নহেন। তাঁহার অব্যক্ত ভাবেও ব্যক্ত ভাবটি বেদনার বীজরূপে নিহিত থাকে এবং ব্যক্ত ভাবেই আমরা তাঁহাকে নিজরূপে জানি এবং চিনি। ব্যক্তভাবে তিনি আমাদের পক্ষে অনন্ত এবং অব্যক্ত মাধুর্য-বীর্যে সনাতনী। বাস্তবিকপক্ষে ব্যক্তভাবে তাঁহার রূপটি না দেখিলে নয়ন মেলিয়া তাঁহার অনন্ত এবং অশেষ রূপের মাধুরী পান করা যায় না। তাঁহার পাদপদ্মসেবায় প্রেমভক্তি মিলে না।

বাঙালীর দেবী দুর্গার অনুধ্যানে এই ব্যক্ত ভাবটিই বড় কথা। বৈদিক ঋষিগণ মায়ের এই ব্যক্ত ভাবটি ধরিয়াই মাকে তাঁহাদের জীবনে সত্য এবং নিত্য করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা দেবীকে মা এই-রূপে নিজেদের ঘরে, নিজেদের সংসারে পাইয়াছিলেন। কন্যারূপে তাঁহারা তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন। শব্দে শব্দে তাঁহারা শুনিয়াছিলেন মায়েরই পদধ্বনি। সেই ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে বিস্তারলাভ করিয়া তাঁহাদের শ্রুতিপথে উদিত হইয়াছিল। তাঁহারা নিখিল বিশ্বকেন্দ্রে মায়ের সম্বন্ধ অনুভব করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যক্তভাবে এমন সাধনাতেই ভক্তি লাভ হয় এবং শক্তি মিলে এবং আমাদের জীবনের সকল কর্মের ভিতর দিয়া ধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটে। সমাজের সংস্থিতিতে বিশ্ব-হিতে জাতির প্রাণশক্তির উদার অভ্যুদয় সেই পথে সম্ভব হইতে পারে।

নিঃশেষ-দেবগণ শক্তিসমূহ মূর্তি এই জননী। সকল দেবতার উপাসনা মায়ের উপাসনাতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। দেব-শক্তির তিনি আধার; সুতরাং তাঁহাকে পূজা করিলে সর্ববিধ কামনার পরিতৃপ্তি ঘটে। বস্তুত কামনার বশে পরিচালিত হইয়াই আমরা বিভিন্ন দেবতার পরিকল্পনা করিয়া থাকি। কিন্তু আন্তরিক নিষ্ঠা একেকে আশ্রয় করিয়াই জাগে এবং নিষ্ঠার অভাবে কোন সাধনাই প্রাণধর্মে বলিষ্ঠ হইতে পারে না, সুতরাং সে-পথে আমাদের প্রয়োজনও মিটে না। ফলত সর্বদেবময়ী যিনি, যিনি সর্বাত্মস্বরূপিণী, যিনি আমাদের সকলের জননী, তাঁহার পূজাতেই আমাদের জীবন সার্থকতা লাভ করে। বাঙালী এমন মাকে দেখিয়াছিল, দেখিয়াছিল সর্বৈশ্বর্য-স্বরূপিণী যিনি তাঁহাকে; দেখিয়াছিল সে পরমা দেবী যিনি ভগবতী সেই মাকে। দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে বিদ্যাদায়িনী বাণী, সঙ্গে সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং বলরূপী কার্তিকেয়, ইঁহাদিগকে লইয়া বাঙালীর দৃষ্টিতে বিশ্বজননী তাঁহার আত্মমহিমা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মাকে এমন দেখা সোজা ব্যাপার নয়। গীতার ভগবদুক্তি অন্তরে স্মরণ করিতে বাসনা জাগে, এমন দর্শন লাভ দেবতাদের ভাগ্যেও ঘটে না; কারণ "প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার, তাঁহার কৃপাতে হয় সাক্ষাৎ তাঁহার"। বাঙালী এই প্রেমের অধিকারী হইয়াছিল। সেই প্রেমের জয়, আর জয় তাঁহার যাঁহার এমন কৃপা। প্রেম যেমন নিত্য, প্রেম যেমন সত্য, কৃপাও তেমনই নিত্য ও সত্য। দেবী-পূজার শুভলগ্নে প্রেম-প্রভাবিতা দেবীর পরম কৃপা নিত্য, সত্য এবং ধ্রুব স্মৃতিতে আমাদের অন্তরে জাগ্রত হউক। আমরা জাতির সকল নরনারীর মধ্যে মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া পরম বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইব। দেবীর আবির্ভাবে অসুরের ভীতি নিরাকৃত হইবে, দেবগণের স্তুতি-গীতিতে বিশ্বের সর্বত্র প্রাণশক্তি বিচ্ছুরিত হইবে। বাঙলার মাটিতে মানুষ জাগিবে। বাঙলার মানুষের সাধনবীর্যে বিশ্বজগতে মানব-মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

নদীতীরে শিল্পীঃ শ্রীমাখন দত্তগুপ্ত

সাড়ে সাত লাখ

পরশুরাম

হেমন্ত পাল চৌধুরীর বয়স ত্রিশের বেশী নয়, কিন্তু সে একজন পাকা ব্যবসাদার, পৈতৃক কাঠের কারবার ভাল করেই চালাচ্ছে। রাত প্রায় ন'টা, বাড়ির একতলার অফিস ঘরে বসে হেমন্ত হিসাবের খাতাপত্র দেখছে। তার জ্ঞাতি-ভাই নীতীশ হঠাৎ ঘরে এসে বলল, তোমার সঙ্গে অত্যন্ত জরুরী কথা আছে। বড় ব্যস্ত নাকি?

হেমন্ত বলল, না, আমার কাজ কাল সকালে করলেও চলবে। ব্যাপার কি, এমন হন্তদন্ত হয়ে এসেছ কেন? তোমাদের তো এই সময় জোর তাসের আড্ডা বসে। কোনও মন্দ খবর নাকি?

নীতীশ বলল, ভাল কি মন্দ জানি না, আমার মাথা গুলিয়ে গেছে। যা বলছি স্থির হয়ে শোন।

নীতীশের কথার আগে তার সঙ্গে হেমন্তর সম্পর্কটা জানা দরকার। এদের দুজনেরই প্রপিতামহ ছিলেন মদন-মোহন পাল চৌধুরী, প্রবলপ্রতাপ জমিদার। তাঁর দুই পুত্র অনঙ্গ আর কন্দর্প বৈমাত্র ভাই, বাপের মৃত্যুর পর বিষয় ভাগ করে পৃথক হন। অনঙ্গ অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন, অনেক সম্পত্তি বন্ধক রেখে কন্দর্পের কাছ থেকে বিস্তর টাকা ধার নিয়েছিলেন। অল্পবয়স্ক পুত্র বসন্তকে রেখে অনঙ্গ অকালে মারা যান। কন্দর্প তাঁর ভাইপোর সঙ্গে আজীবন মকদ্দমা চালান। অবশেষে তিনি জয়ী হন এবং বসন্ত প্রায় সর্বস্বান্ত হন। পরে বসন্ত কাঠের কারবার আরম্ভ করেন। তিনি গত হলে তাঁর পুত্র হেমন্ত সেই কারবারের খুব উন্নতি করেছে।

কন্দর্প আর তাঁর পুত্র যতীশও গত হয়েছেন। যতীশের পুত্র নীতীশ এখন পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী। জমিদারি আর নেই, আগেকার ঐশ্বর্যও কমে গেছে, কিন্তু পৈতৃক সঞ্চয় যা আছে তা থেকে নীতীশের আয় ভালই হয়। রোজগারের জন্যে তাকে খাটতে হয় না, বদখেয়ালও তার নেই, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আর সাহিত্য সিনেমা ফুটবল ক্রিকেট রাজনীতি চর্চা করে সময় কাটায়। হেমন্ত তার সমবয়স্ক, দুজনে একসঙ্গে কলেজে পড়েছিল। এদের বাপদের মধ্যে বাক্যালাপ ছিল না, কিন্তু হেমন্ত আর নীতীশের মধ্যে পৈতৃক মনোমালিন্য মোটেই নেই, অন্তরঙ্গতাও বেশী নেই।

মাথায় দু হাত দিয়ে নীতীশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর বলল, ভাই হেমন্ত, মহাপাপ থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

হেমন্ত বলল, পাপটা কি শুনি। খুন না ডাকাতি না নারীহরণ? কি করেছ তুমি?

—আমি কিছুই করি নি, করেছেন আমার ঠাকুরদা।

—কন্দর্পমোহন পাল চৌধুরী? তিনি তো বহুকাল গত হয়েছেন, তাঁর পাপের জন্যে তোমার মাথাব্যথা কেন? উত্তরাধিকারসূত্রে কোনও বেয়াড়া ব্যাধি পেয়েছ নাকি?

—না, আমার শরীরে কোনও রোগ নেই। আজ সকালে পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটছিলুম। জমিদারি তো গেছে, বাজে দলিল আর কাগজপত্র রেখে লাভ নেই, তাই জঞ্জাল সাফ করছিলুম। ঠাকুরদার আমলের একটা কাঠের বাক্সে হঠাৎ কতকগুলো পুরনো চিঠিপত্র আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হয়ে

গেছি, আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়েছে। ওঃ, মহাপাপ মহাপাপ!

—ব্যাপারটা কি?

—আমার ঠাকুরদা, কন্দর্প তোমার ঠাকুরদা অনঙ্গের নায়েব-গোমস্তাদের ঘুষ দিয়ে কতকগুলো দলিল জাল করেছিলেন আর মিথ্যে সাক্ষী খাড়া করেছিলেন। তারই ফলে তোমার বাবা মকদ্দমায় হেরে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন।

—বল কি! না না, তা হতে পারে না, নিশ্চয় তোমার ভুল হয়েছে।

—ভুল মোটেই হয় নি। আমার ভগিনীপতি ফণীবাবুকে জান তো? মস্ত উকিল। তাঁকে সব কাগজপত্র দেখিয়েছি। তিনিও বলেছেন, আমার ঠাকুরদার জালজোচ্চুরির ফলেই তোমার বাবা বসন্ত পাল চৌধুরী সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন।

—তা এখন করতে চাও কি? ফণীবাবু কি বলেন?

—বললেন, চুপ মেরে যাও। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে মন খারাপ ক'রো না, পুরনো কাগজপত্র সব পুড়িয়ে ফেল, ঘুণাক্ষরে কেউ যেন কিছু জানতে না পারে।

—তাই বুঝি তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে জানাতে এসেছ? ফণীবাবু বিচক্ষণ ঝানু লোক, পাকা কথা বলেছেন, গতস্য অনুশোচনা নাস্তি। পুরনো কাসন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। আর, ও তো তামাদি হয়ে গেছে।

উত্তেজিত হয়ে নীতীশ বলল, কি যা তা বলছ, পাপ কখনও তামাদি হয় না। আমার ঠাকুরদা জোচ্চুরি করে যা আদায় করেছেন তা আমি ভোগ করতে চাই না। খতিয়ে দেখেছি, সুদে আসলে প্রায় সাড়ে সাত লাখ টাকা তোমার পাওনা। সে টাকা তোমাকে না দিলে আমার স্বস্তি নেই।

—ওই টাকা দিলে তোমার অবস্থা কি রকম দাঁড়াবে?

—খুব মন্দ হবে। কষ্টে সংসার চলবে, রোজগারের চেষ্টা দেখতে হবে। কিন্তু তার জন্যে আমি প্রস্তুত আছি।

—আচ্ছা, তোমার বাবা এসব জানতেন?

—বোধ হয় না। তিনি নিজে জমিদারি দেখতেন না, নায়েবের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। নায়েব নতুন লোক, তারও কিছু জানবার কথা নয়।

—তোমার বউকে জানিয়েছ?

—না। জানলে কান্নাকাটি করবে, শ্বশুর মশাইকে বলে মহা হাঙ্গামা বাধাবে। আগে তোমার পাওনা শোধ করব তার পর জানাব।

—বাহবা! দেখ নীতীশ, ভাগ্যক্রমে আমি নিঃস্ব নই, রোজগার ভালই করি, বেশী বড়লোক হবার লোভও নেই। ফাঁকতালে তুমি যা পেয়ে গেছ তা তোমারই থাকুক, নিশ্চিন্ত হয়ে ভোগ কর। আমি খোশ মেজাজে বহাল তবিয়তে বলছি, ওই টাকার ওপর আমার কিছুমাত্র দাবি নেই। চাও তো একটা না-দাবি পত্র লিখে দিতে পারি। আরও শোন—সাড়ে সাত লাখ টাকা না পেলেও আমার পরিবারবর্গের স্বচ্ছন্দে চলবে, কিন্তু ওই টাকার অভাবে তোমার স্ত্রী ছেলে মেয়ের অবস্থা কি রকম হবে তা ভেবেছ? তুমি না হয় একজন প্রচণ্ড সাধুপুরুষ, সাক্ষাৎ রাজা হরিশ্চন্দ্র, কিছুই গ্রাহ্য কর না, কিন্তু তোমার স্ত্রী আর সন্তানরা যে রকম জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত তা থেকে তাদের বঞ্চিত করে কষ্ট দেবে কেন? তোমার ঠাকুরদার কুকর্ম আমাকে জানিয়েছ তাতেই আমি সন্তুষ্ট, তোমারও দায়িত্ব খণ্ডে গেছে। আর কিছু করবার দরকার নেই।

সজোরে মাথা নেড়ে নীতীশ বলল, ওই পাপের টাকা ভোগ করলে আমি মরে যাব। যা তোমার হক পাওনা তা নেবে না কেন?

একটু ভেবে হেমন্ত বলল, শোন নীতীশ, আজ তুমি বড়ই অস্থির হয়ে আছ, তোমার মাথার ঠিক নেই। কাল সন্ধ্যের সময় এখানে এসো, দুজনে পরামর্শ করে একটা মীমাংসা করা যাবে, যাতে তোমার মনে শান্তি আসে। তোমার ভগিনীপতি ফণীবাবুর সঙ্গেও আর একবার পরামর্শ ক'রো।

পরদিন সন্ধ্যায় নীতীশ আবার এল। হেমন্ত প্রশ্ন করল, ফণীবাবুকে তোমার মতলব জানিয়েছ?

—হুঁ। তিনি রফা করতে বললেন।

—রফা কি রকম?

—বিবেকের সঙ্গে রফা। বললেন, ওহে নীতীশ, তুমি আর হেমন্ত দুজনেই সমান খোকা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। টাকাটা আধাআধি ভাগ করে নাও, তা হলে দুজনেরই কনশেন্স ঠাণ্ডা হবে।

—হেমন্ত হেসে বলল, চমৎকার! তুমি কি বল নীতীশ?

—ড্যাম ননসেন্স। চুরির টাকা চোররা ভাগ করে নেয়, কিন্তু তুমি আর আমি চোর নই। পরের ধনের এক কড়াও আমি নিতে পারি না। তোমার যা হক পাওনা তা পুরোপুরি তোমাকে নিতে হবে।

—আমার হক পাওনা কি করে হল? জমিদারি পত্তন করেন তোমার-আমার প্রপিতামহ মহামহিম দোর্দণ্ডপ্রতাপ মদনমোহন পাল চৌধুরী। তিনি রামচন্দ্র বা বুদ্ধদেব ছিলেন না। সেকালে অনেক দুর্দান্ত লোক যেমন করে জমিদারি পত্তন করত তিনিও তেমনি করেছিলেন। ডাকাতি লাঠিবাজি জালিয়াতি জোচ্চুরি ঘুষ—এই ছিল তাঁর অস্ত্র। তুমি নিশ্চয় শুনে থাকবে?

—ওই রকম শুনেছি বটে।

—তা হলে বুঝতে পারছ, ওই জমিদারিতে কারও ধর্মসংগত অধিকার থাকতে পারে না। পূর্বপুরুষের সম্পত্তি আমার হাতছাড়া হয়েছে তা ভালই হয়েছে।

—কিন্তু আমার তো হাতছাড়া হয় নি, প্রপিতামহ আর পিতামহ দুজনেরই পাপের ধন সবটা আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে। তুমি যদি নিতান্তই না নিতে চাও তবে মদনমোহন যাদের বঞ্চিত করেছিলেন তাদের উত্তরাধিকারীদের দিতে হবে।

—তাদের খুঁজে পাবে কোথায়, সে তো এক-শ সওয়া-শ বছর আগেকার ব্যাপার। তুমি সম্পত্তি দান করবে এই কথা রটে গেলেই ঝাঁকে ঝাঁকে জোচ্চোর এসে তোমাকে ছেঁকে ধরবে।

—তবে জনহিতার্থে টাকাটা দান করা যাক। কি বল?

—সে তো খুব ভাল কথা।

—দেখ হেমন্ত, ওই টাকাটা সদুদ্দেশ্যে খরচ করার ভার তোমাকেই নিতে হবে, আমি এ কাজে পটু নই।

—রক্ষে কর। আমি নিজের ব্যবসা নিয়েই অস্থির, তোমার দানসত্রের বোঝা নেবার সময় নেই। আর একটা কথা। সদুদ্দেশ্যে দান, শুনতে বেশ, কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি? মন্দির মঠ সেবাশ্রম হাসপাতাল আতুরাশ্রম ইস্কুল-কলেজ, না আর কিছু?

—তা জানি না। তুমিই বল।

—আমিও জানি না। আমাদের সঙ্গে ফেলু মহান্তি পড়ত মনে আছে? তার শালা ডক্টর প্রেমসিন্ধু খাণ্ডারী

সম্প্রতি ইওরোপ আমেরিকা ফার-ঈস্ট-টুর করে এসেছেন। শুনেছি তিনি মহাপণ্ডিত লোক, প্লেটো কৌটিল্য থেকে শুরু করে বেন্থাম মিল মার্ক্স লেনিন সবাইকে গুলে খেয়েছেন। চীন সরকার নাকি কনসল্টেশনের জন্যে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তুমি যদি রাজী হও তবে ডক্টর প্রেমসিন্ধুর মত নেওয়া যাবে, তোমার টাকার সার্থক খরচ কিসে হবে তা তিনিই বাতলে দেবেন।

—বেশ তো। তাঁর সঙ্গে চটপট এনগেজমেণ্ট করে ফেল।

পরদিন বিকালবেলা হেমন্ত আর নীতীশ প্রেমসিন্ধু খাণ্ডারীর বাড়ি উপস্থিত হল। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে প্রেমসিন্ধু বললেন, নীতীশবাবুর সংকল্প খুবই ভাল, কিন্তু সাড়ে সাত লাখ টাকা কিছুই নয়, তাতে বিশেষ কিছু করা যাবে না।

হেমন্ত বলল, যতটুকু হতে পারে তাই ব্যবস্থা দিন।

একটু চিন্তা করে ডক্টর খাণ্ডারী বললেন, সর্বাধিক লোকের যাতে সর্বাধিক মঙ্গল হয় তাই দেখতে হবে, কিন্তু অযোগ্য লোকের জন্যে এক পয়সা খরচ করা চলবে না। সমাজের ক্ষণস্থায়ী উপকার করাও বৃথা, এমন কাজে টাকাটা লাগাতে হবে যাতে চিরস্থায়ী মঙ্গল হয়। আচ্ছা নীতীশবাবু, আপনার ইচ্ছেটা আগে শুনি, কি রকম সৎকার্য আপনার পছন্দ?

একটু ইতস্তত করে নীতীশ বলল, আমার মা খুব ভক্তিমতী ছিলেন। তাঁর নামে টাকাটা কোনও সাধু-সন্ন্যাসীর মঠে দিলে কেমন হয়? ধর্মের প্রচার হলে লোকচরিত্রের উন্নতি হবে, তাতে সমাজেরও মঙ্গল হবে।

প্রেমসিন্ধু হেসে বললেন, অত্যন্ত সেকেলে আইডিয়া। টাকাটা পেলে সাধু মহারাজদের নিশ্চয়ই মঙ্গল হবে, তাঁরা লুচি মণ্ডা দই ক্ষীর খেয়ে পুষ্টিলাভ করবেন, কিন্তু সমাজের মঙ্গল কিছুই হবে না। তা ছাড়া আপনার মায়ের নামে টাকা দিলে তো নিঃস্বার্থ দান হবে না, টাকার বদলে আপনি চাচ্ছেন মায়ের স্মৃতিপ্রতিষ্ঠা।

লজ্জিত হয়ে নীতীশ বলল, আচ্ছা, মায়ের নামে না-ই দিলাম। যদি কোনও ভাল সেবাশ্রমে—

—সব ভাল সেবাশ্রমেরই প্রচুর অর্থবল আছে। তেলা মাথায় তেল দিয়ে কি হবে? আর, আপনার সাড়ে সাত লাখ তো ছিটেফোঁটা মাত্র।

—যদি উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্যে দেওয়া যায়?

—খেপেছেন! উদ্বাস্তুদের হাতে পৌঁছুবার আগেই বাস্তুঘুঘুরা টাকাটা খেয়ে ফেলবে। কাগজে যে সব কেলেঙ্কারি ছাপা হয় তা পড়েন না?

—একটা কলেজ বা গোটাকতক স্কুল প্রতিষ্ঠা করলে কেমন হয়?

—ভস্মে ঘি ঢাললে যা হয়। স্কুল কলেজে কি রকম শিক্ষা হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন। আপনার টাকার তার চাইতে ভাল কিছু হবে না, শুধু নতুন একদল হল্লাবাজ ধর্মঘটী ছোকরার সৃষ্টি হবে।

—তবে না হয় সরকারের হাতেই টাকাটা দেওয়া যাক। তাঁরাই কোনও লোকহিতকর কাজে খরচ করবেন।

অট্টহাস্য করে প্রেমসিন্ধু বললেন, নীতীশবাবু, আপনি এখনও বালক। হয়তো মনে করেন সরকার হচ্ছেন একজন অগাধবুদ্ধি সর্বশক্তিমান পরমকারুণিক পুরুষোত্তম। তা নয়

স্কেচ শিল্পীঃ শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

মশাই, সরকার মানে পাঁচ ভূতের ব্যাপার। কোটি কোটি টাকা যেখানে খরচ হয় সেখানে আপনার সাড়ে সাত লাখ তো সমুদ্রে জলবিন্দুর মতন ভ্যানিশ করবে।

হেমন্ত বলল, আচ্ছা আমি একটা নিবেদন করি। শুনতে পাই ভগবান এখন মন্দির ত্যাগ করে ল্যাবরেটরিতে অধিষ্ঠান করছেন, সেখানেই তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু হয়েছেন। কৃষি আর খাদ্যের রিসার্চের জন্যে কোনও ইনস্টিটিউটে টাকাটা দিলে কেমন হয়?

—হেমন্তবাবু, সে রকম ইনস্টিটিউট দেশে অনেক আছে। বলতে পারেন, ঢাক পেটানো ছাড়া কোথাও কিছুমাত্র কাজ হয়েছে?

হতাশ হয়ে নীতীশ বলল, আচ্ছা, টাকাটা যদি কোনও আতুরাশ্রমে দেওয়া যায়? অন্ধ বোবা-কালা পঙ্গু উন্মাদ অসাধ্য-রোগগ্রস্ত—এদের সেবার জন্যে?

ঠোঁটে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে ডক্টর প্রেমসিন্ধু খাণ্ডারী কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়লেন। তার পর বললেন, শুনুন নীতীশবাবু, আপনার মতন নরম মন অনেকেরই আছে, কিন্তু তা একটা মহা ভ্রান্তির ফল। যদি শক্‌ড না হন তবে খোলসা করে বলি।

সুরেন বাড়ুজ্যে যেমন বলতেন, এজিটেশন এজিটেশন অ্যান্ড এজিটেশন

নীতীশ আর হেমন্ত একসঙ্গে বলল, না না, শকুড হব না, খোলসা করেই বলুন।

—নীতীশবাবু যে সব আতুরজনের কথা বললেন, তাদের বাঁচিয়ে রাখলে সমাজের কি লাভ? ধরুন আপনি বেগুন কি ঢ্যাঁড়সের খেত করেছেন। পোকাধরা অপুষ্ট গাছগুলোকেও কি বাঁচিয়ে রাখবেন? নিশ্চয়ই নয়, তাদের উপড়ে ফেলে দেবেন, নয়তো ভাল গাছগুলোর ক্ষতি হবে। পঙ্গু আতুর জনও সেই রকম, তারা সমাজের কোনও কাজে আসে না, শুধু গলগ্রহ। যদি স্বহস্তে উৎপাটন করতে না চান তবে অন্তত তাদের বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করবেন না, চটপট মরতে দিন। দেখুন, আমাদের দেশে নানা রকম অভাব আছে, খাদ্য বস্ত্র আবাস বিদ্যা চিকিৎসা, আরও কত কি। সমাজের যারা যোগ্যতম, অর্থাৎ সুস্থ প্রকৃতিস্থ বুদ্ধিমান কাজের লোক, শুধু তাদেরই যাতে মঙ্গল হয় সেই চেষ্টা করুন, যারা আতুর অক্ষম জড়বুদ্ধি আর স্থবির তাদের সেবার জন্যে টাকার অপব্যয় করবেন না। জানেন বোধ হয়, ২৫।৩০ বৎসর পরে ভারতের লোকসংখ্যা ৪০ কোটির স্থানে ৮০ কোটি হবে। এত লোক পুষবেন কি করে? যতই কৃষিবৃদ্ধি আর জন্মশাসনের চেষ্টা করুন, বিশেষ কিছু ফল হবে না, আশি কোটি অধিবাসীর ঠেলা কিছুতেই সামলাতে পারবেন না।

—আপনি কি করতে বলেন?

—আমি যা চাই তা শুনলে নেহেরুজীর মতন র‍্যাশনাল লোকও কানে আঙুল দেবেন। আমি বলি—লীভ ইট টু নেচার। কিছুকালের জন্যে সব হাসপাতাল বন্ধ রাখতে হবে, ডাক্তারদের ইনটার্ন করতে হবে, পেনিসিলিন স্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি আধুনিক ওষুধ নিষিদ্ধ করতে হবে, ডি ডি টি আর সারের কারখানা বন্ধ রাখতে হবে। কলেরা বসন্ত প্লেগ যক্ষ্মা দুর্ভিক্ষ বার্ধক্য ইত্যাদি হল প্রকৃতির সেফটি ভাল্‌ভ, এদের অবাধে কাজ করতে দিন, তাতে অনেকটা ভূভার হরণ হবে। শায়েস্তা খাঁর আমলে দু আনায় এক মন চাল পাওয়া যেত। তার কারণ এ নয় যে তিনি ধানের চাষ বাড়িয়েছিলেন কিংবা কালোবাজারীদের শায়েস্তা করেছিলেন। তিনি প্রকৃতির সঙ্গে লড়েন নি, ফ্রী হ্যান্ড দিয়েছিলেন। আর আমাদের এখনকার দয়াময় দেশনেতাদের দেখুন, বলেন কিনা প্রাণদণ্ড তুলে দাও! আমার মতে শুধু খুনী আসামী নয়, চোর ডাকাত জালিয়াত ঘুষখোর ভেজালওয়ালা কালোবাজারী দাঙ্গাবাজ ধর্ষক রাষ্ট্রদ্রোহী—সবাইকে সরাসরি ফাঁসি দেওয়া উচিত। তাতে যতটুকু লোকক্ষয় হয় ততটুকুই লাভ। আতুরাশ্রম সেবাশ্রম হাসপাতাল আর হেল্থ সেণ্টার প্রতিষ্ঠা করলে দেশের সর্বনাশ হবে। প্রকৃতিকে বাধা দেবেন না মশাই, কাজ করতে দিন।

তার পর দেশের বাড়তি জঞ্জাল যখন দূর হবে, লোকসংখ্যা যখন চল্লিশ কোটি থেকে নেমে দশ কোটিতে দাঁড়াবে, তখন জনহিত কর্মে কোমর বেঁধে লাগবেন।

হেমন্ত বলল, তা হলে নীতীশের টাকাটার কোনও সদ্গতি হবে না?

—কেন হবে না, অবশ্যই হবে। ওই টাকায় প্রোপাগান্ডা করে লোকমত তৈরি করতে হবে, সুরেন বাঁড়ুজ্যে যেমন বলতেন, এজিটেশন এজিটেশন অ্যান্ড এজিটেশন। আমার একটা থিসিস লেখা আছে, তার লক্ষ কপি ছাপিয়ে লোকসভা রাজ্যসভা আর বিধানসভার সদস্যদের মধ্যে বিলি করতে হবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যাকে 'ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য' বলেছেন তা ঝেড়ে না ফেললে নিস্তার নেই। দেশের ওআর্থলেস রুগ্ন অথর্ব অক্ষম লোকদের উচ্ছেদ করে শুধু বলবান বুদ্ধিমান কাজের লোকদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শুনুন নীতীশবাবু হেমন্তবাবু, আগে আমাদের দেশনেতাদের নির্মম বজ্রাদপি কঠোর হওয়া দরকার, তার পর জমি তৈরী হলে মনের সাধে লোকহিত করবেন।

হাততালি দিয়ে হেমন্ত বলল, চমৎকার। গীতার 'শ্রীভগবানুবাচ' আর Nietzscheর Thus spake Zarathustraর চাইতে ঢের ভাল বলেছেন। বহু ধন্যবাদ ডক্টর খাণ্ডারী, আপনার বাণী আমরা গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখব। এই কুড়ি টাকা দয়া করে নিন, যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী। আচ্ছা আজ উঠি, নমস্কার।

ফেরার পথে নীতীশ বলল, লোকটা উন্মাদ না পিশাচ?

হেমন্ত বলল, তেত্রিশ নয়ে পইস উন্মাদ, তেত্রিশ পিশাচ আর চৌত্রিশ জবরদস্ত জনহিতৈষী। মনুস্মৃতি, মার্ক্সবাদ, গান্ধীবাদ, সবই এখন সেকেলে হয়ে গেছে, তাই ডক্টর প্রেমসিন্ধু খাণ্ডারী নতুন বাণী প্রচার করে যুগাবতার হবার মতলবে আছেন। তবে এঁর প্রলাপবাক্যের মধ্যে সত্যের ছিটেফোঁটাও কিঞ্চিৎ আছে। শোন নীতীশ, তোমার দানসত্রের ভার পরের হাতে দিও না, তাতে নিশ্চিন্ত হতে পারবে না, কেবলই মনে হবে ব্যাটা চুরি করছে। নিজের খুশিতে দান কর, সেবাশ্রমে আতুরাশ্রমে হাসপাতালে স্কুল-কলেজে, যেখানে তোমার মন চায়। যদি ভুলক্রমে অপাত্রে কিছু দিয়ে ফেল, তাতেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। কিন্তু ফতুর হয়ে দান ক'রো না। নিজের সংসারযাত্রার জন্যেও কিছু রেখো। তোমার স্ত্রী আর ছেলে মেয়ে যদি কষ্টে পড়ে, তোমাকে যদি রোজগারের জন্যে ব্যস্ত থাকতে হয়, তবে লোকসেবায় মন দিতে পারবে না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নীতীশ বলল, বেশ, তাই হবে। কিন্তু টাকাটা তো আসলে তোমার, অতএব লোকসেবার ভার তুমিই নেবে, আমি তোমার সহকারী হব।

—আঃ, তোমার খুঁতখুঁতুনি এখনও গেল না দেখছি। বেশ, টাকাটা না হয় আমারই। কিন্তু আমার ফুরসত কম, দানসত্রের ভার তোমাকেই নিতে হবে, তবে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করতে রাজী আছি। জান তো, ভক্ত বৈষ্ণব তাঁর সর্ব কর্মের ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন। তুমিও নিষ্কামভাবে লোকহিতে লেগে যাও, কর্মের ফল শ্রীকৃষ্ণের বদলে আমাকেই অর্পণ ক'রো। পিতৃপুরুষদের দেনা শোধ করে তুমি তৃপ্তিলাভ করবে, স্বহস্তে দান করে ধন্য হবে। আর, তোমার দানের পুণ্যফল আমি ভোগ করব। ফণীবাবুর ব্যবস্থার চাইতে এই রকম ভাগাভাগি ভাল নয় কি?

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

সীমা ও অনন্ত

ক্ষিতিমোহন সেন
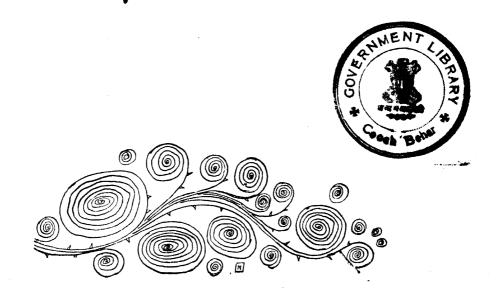
মার মাঝে অসীম তুমি......

মরমীদের একটি সার সত্য সীমার মধ্যে থেকেও অসীমের জন্য ব্যাকুলতা। এই তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথও তাঁর অপূর্ব গানে সেদিন জানিয়ে গেছেন।

ঘরের ঠিকানা হল না গো
প্রাণ করে তবু যাই যাই।

কথাটি নতুন নয়। প্রাচীন কথা নতুন গানে নতুন রূপ পেল।

পাঁচশ বছর আগে মরমী সাধক কবি রবিদাস, কবীর প্রভৃতি সন্তকবিরা গেয়ে গেছেন—

নাঁব্ না জানূঁ গাঁব্‌কা
প্রাণ কহৈ জাঁব্ জাঁব্

অর্থাৎ কোন্ গ্রামে কোথায় যেতে হবে সে খবর পাইনি। তবু প্রাণ সদাই বলছে যাই যাই।

আবার এরও হাজার বছর আগে এই তত্ত্বই উপনিষদের ঋষি জানিয়ে দিলেন দ্বা সুপর্ণা নামে অপূর্ব মন্ত্রে। সংহিতার ঋষি আরও প্রাচীনকালে তাঁর বৈদিকে মন্ত্রে গাইলেন—

কথং বা তো নেলয়তি
কথং ন রমতে মনঃ।

অর্থাৎ কেন মানুষের মনে স্বস্তি নেই। কেন সে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে স্বস্তি পায় না। অসীম আকাশে সে বায়ুর মত ভেসে যেতে চায়।

নানা দেশে নানা কালে একই রকমের সত্য আপনাকে প্রকাশ করেছে। প্রকাশ করেছে সুন্দর সুন্দর কবিতায়, গানে বা গল্পে বা কাহিনীর ভিতর দিয়ে। তাই সন্ত সাধকদিগের মধ্যে কাহিনীর এত আদর। একই কাহিনী নানা যুগে নানা দেশে আত্মপ্রকাশ করেছে।

*

এক দেশে একই গুরুর কাছে নানা রকমের ছাত্র পড়তে আসতেন। তাঁরা সবাই সুফী। একই বিদ্যালয়ে রাজার ছেলে ও চাষীর ছেলের পড়াশুনো তখনও অসম্ভব হয়নি।

দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করে অভীষ্ট বিদ্যা লাভ করে রাজপুত্র গেলেন রাজপ্রাসাদে আর চাষীর ছেলে গেলেন গাঁয়ের কুটীরে। তখন আর তাঁদের দেখাশোনা হয় না। দুই সতীর্থ বন্ধু মাঝে মাঝে গুরুগৃহের আনন্দে উচ্ছল পুরাতন দিনগুলি মনে করে খুশী হন।

বহুকাল পরে রাজপুত্রও গেছেন তীর্থ করতে এক মজারে (মুসলমান তীর্থ)। আর চাষীর ছেলেও ঘটনাক্রমে সেই দিনেই সেই মজারেই গেছেন তীর্থদর্শনে। দুই পুরাতন বন্ধুতে হঠাৎ দেখা। পুরানো কাহিনী স্মরণ করে দুজনেরই মহা আনন্দ। তারপর নানা কথাপ্রসঙ্গে নিজেদের ভরপুর করে তুলতে চাইলেন। বন্ধুত্ব যতই পুরাতন হক তবু বর্তমানে তাঁদের মধ্যে একজন সম্রাট আর-একজন কৃষক। এই ভেদবুদ্ধিটুকু ত সম্পূর্ণ দূর হয়নি। তাই রাজপুত্র হঠাৎ তাঁর চাষীবন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি ভাই এখন কী কর? চাষীর ছেলে শান্তভাবে বললেন, আমার বাবা করতেন চাষ। বাবা মারা যেতে সেই ভার এল আমার উপরে। আমি এখন চাষ ও পশুপালন করে সংসার চালাই।

রাজপুত্র প্রশ্ন করলেন, তোমার বাবা ত ইহলোক ছেড়ে চলে গেছেন, তাঁর স্মৃতি তুমি কী রকম করে রক্ষা করছ?

কৃষক তখন সংকোচের সঙ্গে বললেন, আমি গরীব, মর্মরের দালান বা কোন স্মৃতিমন্দির তৈরি করবার শক্তি আমার কোথায়? রাজসিক কোন মকবরা আমার কাছে কেউ আশাও করেন না। বাবার মাটির কবরের উপর আমি গোলাপ গাছ একটি লাগিয়েছি। গাছে ফুল ফোটে আর তার পাপড়ি নীচে চোখের জলের মত ঝরে পড়ে। এইটিই আমার গরীব বাপকে স্মরণ করবার একমাত্র উপায়। এইটুকুই আমার সাধ্যে কুলোয়।

রাজপুত্র তখন বলে বসলেন, হায় রে কপাল!

কৃষক বললেন, তোমার বাবা কি জীবিত আছেন?

রাজপুত্র জবাব দিলেন, তিনি বহুদিন হয় গত হয়েছেন। তাঁর কর্মভার এখন আমারই উপর এসে পড়েছে।

কৃষকপুত্র জানতে চাইলেন, বললেন, তুমি তাঁর স্মৃতি কীভাবে রক্ষা করছ?

রাজপুত্র বললেন, আমার ত অর্থের অভাব নেই। ত্রিশ হাজার সঙ্গ্‌-তরাশ (পাথর-মিস্ত্রী) বিশ হাজার নিরন্তর কাজ করে তাঁর সমাধি-মন্দির এই সেদিন শেষ করেছে। বেশ একটু গর্বের ভাবেই গরীব বন্ধুকে এই কথা শুনিয়ে দিলেন।

কৃষকপুত্র হাসতে হাসতে বললেন, তুমি তাঁর কী সর্বনাশ করেছ তা তিনি টের পাবেন কেয়ামতের (পরলোকের বিচারের) দিনে।

যখন আল্লা বিচারের জন্য ডাক দেবেন তখন আমার বাবা এবং তাঁর মত যত সব অকিঞ্চনের দল ডাক শুনেই মাটির কবর থেকে চট করে উঠে পড়বেন, আর আল্লার কাছে গিয়ে প্রণত হয়ে তাঁর বিচার গ্রহণ করবেন।

আর তোমার বাবা আল্লার সেই ডাক শুনে সেই পাষাণপুরীর মধ্যে বন্ধ হয়ে শত শত বছর ছটফট করতে থাকবেন। ত্রিশ হাজার পাথরকাটা মিস্ত্রী বিশ বছর ধরে নানা মালমসলা দিয়ে হাজার রকম যন্ত্রপাতির সাহায্যে বজ্রকঠিন করে দিয়েছেন—সেটা তাঁকে ভাঙতে হবে একাই। কোন সহায় তাঁর নেই, কোন যন্ত্রপাতি নেই, শুধু নিজের নখ আর আঙুলের সাহায্যে ছাড়া। বল ত ভাই, কত যুগ চলে যাবে এই বজ্রবাঁধন থেকে আপনাকে মুক্ত করতে?

এই এই কথা শুনে রাজপুত্র একেবারে বসে পড়লেন। তাঁর সেই অভিমান কোথায় গেল উড়ে। নিঃসহায়ের মত বন্ধুর দিকে চেয়ে রইলেন।

*

এই রাজপুত্র-কৃষকবন্ধু কাহিনী বহু সুফী সন্ত সাধকদের মুখে শোনা গিয়েছে। নানা জনে নানা সময়ে এই একটি কাহিনী বার বার নতুন করে আমাদের শুনিয়ে গিয়েছেন। তার কারণ কী?

বিধাতার ডাক সমানভাবে সকলের কাছেই আসে। যাঁরা অকিঞ্চন তাঁরা ভারহীন হয়ে সত্যের সেই ডাক শুনেই সাড়া দিতে পারেন। আর যাঁরা ভারচাপা তাঁরা শুনতে পেয়েও সেই মুহূর্তেই সাড়া দিতে পারেন না। এইসব ভারই আমাদের সাধনার পথে মস্ত বাধা। কত রকমেরই এইসব ভারের রূপ। ধনের ভার, মানের ভার, কুলশীল সামাজিক মর্যাদার ভার, জ্ঞানের ভার। ভারের আর অন্ত নেই।

নদীর পলিপড়া মাটি যেমন স্তরের পর স্তরে গঠিত, ভারতের সাধনাভূমিও তেমনি

অনেক জানা ও অজানা নানা স্তরে স্তরে গঠিত।

ভারতে যুগে যুগে এসেছে দলের পর মানবের দল, আর আপন আপন সাধনা দিয়ে তারা গড়ে তুলেছে ভারতীয় সাধনার প্রবাল-দ্বীপের এক-একটি স্তর। প্রভেদের মধ্যে এই যে, স্তর রচনা করে প্রবালটি মরে যায়। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর সাধকের দল যুগের পর যুগ আপন আপন সাধনা নিয়ে এখানেই জীবিত রয়ে গিয়েছেন। বৈদিক আর্যেরা এখানে আসবার আগেই ভারতে দ্রাবীড় সাধনা ছিল। তারও আগে বিচিত্র বহু বহু দ্রাবীড়-পূর্ব নানা জাতীয় সাধনা। বৈদিক আর্যদের পরে অবৈদিক আর্য ও আর্যেতর নানা শ্রেণী এদেশে এসেছে—কেউ কাউকে বিনষ্ট করেনি।

ভারতে বেদপূর্ব বৈদিক আর্য অবৈদিক আর্য, নানা শ্রেণীর ও নানা মতের অনার্য, উচ্চ-নীচ ভাল-মন্দ নানা সভ্যতা চিরদিন পাশাপাশি বাস করে এসেছে। কাউকে নিঃশেষ হতে হয়নি। চিরদিন নানা-প্রকারের মতবাদ এইভাবে পাশাপাশি বাস করাতে ভারতের চিত্ত দিনে দিনে পরমত সহিষ্ণু ও উদার হয়েছে।

বৈদিক আর্যদের ভারতে আগমনের আগে কত কত বড় বড় ধর্মমত যে এ দেশে প্রচারিত হয়ে এসেছে তা বলা কঠিন। সবই আজ স্তর-বদ্ধ হয়ে এক ভারতীয়-সাধনার ভূমি হয়ে গিয়েছে। বৈদিক আর্যদের পরেও অনেক অবৈদিক আর্যদল ভারতে এসেছে। আর্যেতর অনেক বড় বড় মতবাদও ভারত-বর্ষে এসেছে। তাদের সকলের সম্মিলিত ধর্মই আজ ভারতের ধর্ম; তাকে বৈদিক, অবৈদিক বা কোন দলবিশেষের নাম দেওয়া চলে না। বলতে গেলে বলতে হয় 'ভারতে'র অর্থাৎ 'হিন্দ'-এর ধর্ম অর্থাৎ 'হিন্দুধর্ম'। দলের নামে নামকরণ অসম্ভব বলেই দেশের নামে নামকরণ হয়েছে। এমনটি জগতে আর কোথাও হয়নি।

বেদের প্রধান কথা যজ্ঞ, কর্ম-কাণ্ড। তাদের শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্র যজ্ঞভূমি; তাদের কাম্য স্বর্গসুখভোগ। জন্মান্তরবাদ, অহিংসা, যোগ, বৈরাগ্য, নির্বাণ, ভক্তিবাদ, গুরুবাদ প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে দেব-দেবী-মূর্তি শিলা-লিঙ্গাদির পূজা, নদী-বৃক্ষ-তীর্থাদির মাহাত্ম্য প্রভৃতি বড় বড় সব মতবাদ ত বেদের প্রথম দিক দিয়ে দেখাই যায় না। ভারতের বাইরে অন্য দেশীয় আর্যদের মধ্যেও কি এইসব কোথাও দেখা যায়? তবে ভারতীয় আর্যদের মধ্যে এই ধর্ম, এই গুণ এল কোথা থেকে? এই তত্ত্বই ভারতীয় ধর্মতত্ত্বের ঐতিহাসিকদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এইসব মতবাদের মধ্যে অনেকগুলি অবৈদিক তৈর্থিকদের। তৈর্থিকদের মত বেদবাহ্য। তীর্থে তীর্থে তৈর্থিকেরা একত্রিত হয়ে ধর্ম আলোচনা করতেন। যাক্ সে অন্য কথা।

ভারতের মধ্যযুগে, ভাষা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত রচনা। এদেশে মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মে নানা ভক্ত ও মনীষীর জন্ম। তাঁদের মধ্যে কোন কোন লোক সাম্প্রদায়িক বিধি মানতেন, অনেকে আবার মানতেন না। সেই না-মানাদের দলে নামদেব, কবীর, রবিদাস, দাদূ প্রভৃতি বহু বহু মনীষী ছিলেন নিরক্ষর। নানক অক্ষর জানলেও পণ্ডিত ছিলেন না। এঁদের ভাবের গভীরতায় অবাক হতে হয়। পণ্ডিত বহু দেখা যায়, মনীষী দুর্লভ। আউল, বাউল, দরবেশ প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যে যে সব গভীর মর্মের কথা পাওয়া যায় তা পাণ্ডিত্যের মধ্যে মেলে না। এইসব মহাগুরুরা কেমন করে যে এত বড় বড় এবং মহান ভাব মানবের অন্তরে সঞ্চার করতে পেরেছেন তা দুর্বোধ্য। কাজেই দেখা যায় শাস্ত্র ছাড়াও গুরু চলে, কিন্তু গুরু ছাড়া শাস্ত্র ব্যর্থ। ব্যবহারের অতীত মাটির রসকে সরস করে তোলে বৃক্ষ, সত্যকে গ্রহণীয় করে তোলেন সদ্-গুরু।

এঁরা না থাকলে শাস্ত্র মানুষের থেকেও নেই। এঁরা যে পণ্ডিত নন তাই রক্ষে। মাতৃভাষার মধ্য দিয়েই এঁদের সব লেন-দেন।

বিমাতৃভাষার কৃত্রিম সাধনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার কুবুদ্ধি তাঁদের ঘটেনি। কবীর বলেছেন, সংস্কৃত হল কূপজল, ভাষা হল বহতা ধারা। যখন চাও পড় এই ধারায় ঝাঁপিয়ে, শরীর জুড়বে।—

সংস্কৃত কূপজল কবীরা ভাষা বহতা নীর।
জব চাহৌ তবহী কূদৌ শাংত হোয় শরীর॥

ব্যাকরণের অনেক খোন্তা-কোদাল ক্ষয় করলে কূপের মধ্যে জল পাওয়া যাবে। তার মধ্যে না আছে চলন্ত ধারার গতি, না আছে গীত।

*

গল্প দিয়ে কঠিন বিষয়কে সহজ করবার পদ্ধতিটি ভারতের। এই পদ্ধতি বিশেষ করে সুফীদের মধ্যে বেশী প্রচলিত।

সুফীদের ভাষা ও ভাবপ্রকাশের রীতি-গুলি আমাদের দেশের রীতিনীতির সঙ্গে এতটা মেলে যে তাকে অনেকে ভারতের নীতিই মনে করেছেন।

ভারতের আউল-বাউলদের এবং কবীর রবিদাস প্রভৃতি মরমীদের প্রকাশভঙ্গীটি প্রায় এই রকমেরই। কাজেই এই পদ্ধতি-গুলি আমাদের সকলেরই খুব আপন মনে হয়।

পরমহংসদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতির উপদেশ ও বাণীগুলির মহত্ত্ব এইখানে।

এই সন্তপদ্ধতি ও বাউলিয়া রীতিতে পাণ্ডিত্যের তেমন প্রয়োজন নেই। বরং প্রয়োজন হয়েছে গণ-সাহিত্য অথবা লোক-সাহিত্যের।

কাজেই এখানে পণ্ডিত মূর্খদের কাছে শিক্ষা নিচ্ছেন। এইরূপ অনেক সময়েই দেখা গিয়েছে।

আব্দার রহিম খান্খানা তাঁর ভৃত্যের কাছে কবিতা রচনার ছন্দ পেয়ে এমন খুশী হয়েছিলেন যে নূতন ছন্দে (বারোয়াঁ ছন্দে) রামায়ণ রচনা করেন।

রহিম ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। আরবী, ফার্সী, তুর্কী, এই তিন ভাষাতেই তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ—তেমনই ছিল হিন্দী ও সংস্কৃতে। রহিমের সংস্কৃত মালিনী ছন্দে লেখা কবিতা, স্তবমন্ত্রের মত ব্রাহ্মণেরাও প্রতি দোল পূর্ণিমাতে উচ্চারণ করে থাকেন।

সেই আটটি কবিতার নাম মদনাষ্টক।

কলিত ললিত মালা বা জবাহির জড়া থা।
চপল চখন বালা, চাঁদনী মেঁ খড়া থা॥
কটি তট বিচ মেলা, পীত মেলা নবেলা।
অলি বন আলবেলা যার মেরা অকেলা॥

রহিম আকবরের সভাসদ ছিলেন। একদিন সভায় কথা হয় যে, ভারতের পদ্ধতি এই যে তাঁদের দেবতারা সব তরুণ হবে।

তার মধ্যে ব্রহ্মা হলেন পিতামহ।

ব্রহ্মার পত্নী লক্ষ্মী, সরস্বতী। এর মধ্যে সরস্বতী হলেন বাক্‌বাদিনী মুখরা এবং লক্ষ্মী যাঁর চঞ্চলা অপবাদ চিরন্তন রয়েছে।

লক্ষ্মী যিনি তিনি কেন চঞ্চলা হবেন? বড় বড় পণ্ডিতেরা মাথা ঘামিয়েও বুঝলেন না। মধুসূদন সরস্বতী তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পর্যন্ত এর কোনো কিনারা করতে পারলেন না। রহিমের উপর পড়ল এই অসঙ্গতিতে সঙ্গতি স্থাপনের ভার।

ব্রহ্মা হলেন পিতামহ, কাজেই বৃদ্ধ মানুষ। তাঁর পত্নী যদি অল্পবয়সের হন তবে তাঁর চঞ্চলা হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

পুরুষ পুরাতন কী বধূ
ক্যোঁ ন চঞ্চলা হোয়॥

স্মৃতির দূরবীক্ষণে

॥ শ্রীসরলাবালা সরকার ॥

অর্দ্ধেন্দু দত্ত

পুরনো দিনের কলকাতা, প'চাত্তর-ছিয়াত্তর বছর আগে। কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, এইটাই শহরের প্রধান রাস্তা। ট্রাম চলেছে রাস্তা দিয়ে, ঘোড়ায় টানা ট্রাম। ঘোড়ার মাথায় টুপি পরানো।

ফুটপাথের একধারটা অভিজাত, সেদিকে সারি সারি কৃষ্ণচূড়াফুলের গাছ, ফুটপাথের গা ঘেঁষে কোঠা বাড়ির সারি—একতলা, দোতলা, তিনতলা বাড়ি খুবই কম।

অন্য ধারে খোলার-ছাউনি-দেওয়া ঘরের সারি, সেধারের ফুটপাথটা সরু আর কর্দমাক্ত।

আমার মনে পড়ছে, একটি মেয়ে কৃষ্ণচূড়া-গাছের পাতা নিয়ে আর হাঁড়িকুড়ি নিয়ে খেলা করছে তিরানব্বই নম্বর বাড়ির সম্মুখে। আর আশ্চর্য হয়ে ভাবছি সেই ছোট্ট মেয়েটিই কি এই বৃদ্ধা?

তিরানব্বই নম্বর বাড়িটা দোতলা; সে বাড়ির একতলা, দোতলা, রোয়াক, দোতলার বারান্দা, দোতলার পিছনের দিকের খোলা ছাদ, সেই ছাদের ই'টের-আড়াল-দেওয়া সেই খেলাঘর—এসব এখনও একেবারে ছবির মত মনের সামনে রয়েছে স্পষ্টভাবে।

বাড়ির দুটো দরজা ছিল, দুটোই রাস্তার দিকে। একটা বাড়ির ভিতরের দরজা অর্থাৎ অন্তঃপুরের। দরজা পার হয়ে রোয়াক, রোয়াকের পর চৌকো উঠোন, উঠোনে জলের কল, কলের কাছে বসে বাসনমাজার মানুষ বাসন মাজছে।

কলকাতায় তখন জলের কষ্ট ছিল না। রাস্তায় কল, আর প্রায় অনেক বাড়িতেই কল এসেছে, জলও খুব তোড়ে পড়ে। তা ছাড়া বাড়ি বাড়ি পাতকুয়া আছে, কুয়ার জল গলায় গলায়। দু হাত দড়ি দিয়েই জল তোলা যায়। পুকুরও আছে বিস্তর।

কিন্তু তবুও গঙ্গার জল আসে প্রত্যেক বাড়িতে বিধবাদের রান্না আর খাওয়ার জন্য। ঠাকুরবাড়িতে অর্থাৎ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে বিশেষ এক তিথিতে (যে তিথিতে গঙ্গার জলে নুন থাকে না) সারা বৎসরের জন্য পানীয় জল জালায় জালায় ভর্তি করে রাখা হয়; জালার মুখে গঙ্গামাটি ও মাটির সরা দিয়ে মুখটা বন্ধ করে রাখা হয়, সে জলে পোকা হয় না। যে ঘরে সেই সব জলের জালা থাকে, তার নাম জলের ঘর।

৯৩ নম্বরের বাড়িটা ভাড়াটে বাড়ি, ভাড়া ছিল কুড়ি টাকা। বাড়ির মালিক কালাচাঁদ চক্রবর্তী মশায়ের প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা। এই বাড়ির ঠিক পিছনেই, একটা সরু গলি দিয়ে সে-বাড়িতে যাওয়া যায়।

গলির অন্য পাশে পালিতদের একতলা পুরোন বাড়ি, আর তার গায়ে গায়ে আরও অনেক বাড়ি। সবগুলিই কোঠা বাড়ি আর সবগুলিই পুরোনো বাড়ি। দেখে মনে হয় সেই সব বাড়ির যাঁরা মালিক তাঁদের অবস্থা এখন খারাপ হয়ে গিয়েছে।

একটা দোতলা বাড়ির রাস্তার দিকের রোয়াকে রোজ সকালে একটি বছর-দুই বয়সের ছেলেকে একটা গেলাস হাতে করে বসে থাকতে দেখতাম।

আমার ভয় হত, ছেলেটি একা বসে আছে, যদি রোয়াক থেকে রাস্তায় পড়ে যায়। রাস্তায় ত ট্রাম যাওয়া-আসা করছে, যদি ট্রামের নীচে গিয়ে পড়ে। কী হবে তা হলে!

কিন্তু ছেলেটি এমন শান্ত, গেলাসটি হাতে নিয়ে চুপ করে বসে থাকত, একটুও নড়াচড়া করত না।

রাস্তা দিয়ে ফেরিওয়ালারা হাঁক দিয়ে যেত। সকালবেলায় দুধওয়ালা গয়লারাও যেত। তারা হাঁক দিত না। তাদের কাঁধের দুধের-কলসী-শুদ্ধ বাঁক দেখেই লোকে বুঝতে পারত এরা দুধ বিক্রি করে।

দুধারে দুটো কলসী, পিতলের ঘড়া। একটার গায়ে খোদাই করা আছে "জল-মিশ্রিত দুগ্ধ, টাকায় আট সের।" আর-একটায় খোদাই করা আছে, "নির্জ্জলা দুগ্ধ, টাকায় ছয় সের।" এরা বাড়ি বাড়ি দুধের জোগান দিত। মার মুখে শুনেছি, টাকায় আট সের লেখা থাকলেও যাদের বাড়ি ওরা বারো মাস দুধ দেয় তারা দশ সের দরেই দুধ নিত।

আমাদের দুধ দিত বিনোদের মা। রাস্তার ওপারের একটা ঘরে সে আর তার ছেলে থাকে। তার একটা দিশী গরু আছে, তারই দুধ বিক্রি করে কায়ক্লেশে দিন কাটায়। মা বলতেন, ভদ্রঘরের মেয়ে, দত্তবাড়ির বউ। বিধবা হবার পর ভাসুরেরা সব ঠকিয়ে নিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, এখন ছেলেটি নিয়ে এইভাবে দিন গুজরান করে। ছেলেটিকে একটা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে।"

রোয়াকে-বসা সেই ছেলেটি। সেই দিকেই আমার মন পড়ে থাকে। নড়ি চড়ি, আর একবার এসে দেখি ছেলেটি ঠিক আছে না পড়েই গিয়েছে!

একদিন দেখলুম, বাঁক কাঁধে এক গোয়ালা এসে দাঁড়াল তার কাছে। বললে, "কী সোনা, গেলাস নিয়ে বইসেই আছ, মুখ-খান যে কালি হয়ে গিয়েছে। দাও গেলাসে তোমার দুধ দিয়ে যাই।" বলে খোকার হাতের সেই আধসেরী গেলাসটা নিয়ে নির্জ্জলা দুধের কলসী থেকে তাতে দুধ ভর্তি করে দিলে।

তারপর জানলার দিকে চেয়ে বললে, "মা ঠান, সোনারে তুলে নান, কাগে বগে আইসে দুধের গেলাসে মুখ দিতি পারে।" যশোর জেলার মিষ্টি মিষ্টি কথা।

দেখলাম এক থানকাপড়-পরা মেয়ে বেরিয়ে এলেন তখনই ঘর থেকে, খোকাকে কোলে নিয়ে আর দুধের গেলাসটা হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

কেন যে খোকা গেলাস হাতে সকাল থেকে বসে থাকে এখন তা বুঝতে পারলাম।

মা বললেন "গয়লা ওকে বিনা দামেই দুধ দেয়। বলে—ঠাকুর দেবতারেই পুজো দিতি হয়, এ আমার গোপালের পুজো।"

চক্রবর্তী বাড়ির কথা

চক্রবর্তী-বাড়ির তিন মেয়ে, তারা প্রায়ই মার কাছে আসে। বড় ক্ষেত্রমণি, মেজো নৃত্যকালী ছোট মেনকা। সকলের শেষে, এক ছেলে, ছেলের নাম বিপিন, বছর আট-দশ বয়স, ভারি দুরন্ত, দুর্দান্তও বলা চলে।

মেয়েরা সধবা, পাড়াগাঁয়ে তাদের শ্বশুর-বাড়ি। একজনের সোনারপুর, আর দুজনের রাজপুর আর চাংড়িপোতা। মেয়েরা সুপুরি কাটে, পশমের কম্ফটার আর ছোট ছোট টুপি আর মোজা বোনে। দোকানের লোক এসে পশম আর সুপারি দিয়ে যায় ওজন করে, আবার ওজন করেই নিয়ে যায়।

গলাবন্ধ যত হাত লম্বা হবে হাত-পিছু এক আনা মজুরি। আর ছোট ছেলেদের টুপির মজুরি দু আনা, এক জোড়া মোজাও দু আনা।

মেয়েরা মার কাছে নিজেদের দুঃখের

কথা যখন বলে, মা বলেন "তুই এখানে বসে বসে কী শুনছিস? যা, ও-ঘরে যা" কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে নড়িনে, বুঝি বা না-বুঝি তাদের কাহিনী শুনি মন প্রাণ দিয়ে।

মা বলেন, "শীতের মধ্যে লেপের মধ্যে শুয়ে শুয়েই বোনো কী করে? কাঠি থেকে ঘর পড়ে যায় না?"

"না কাকিমা, ও আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। দিনে ত সময় নেই, রান্নাবান্না থেকে মসলা-পেষা, রান্নাঘর ধোয়া পর্যন্ত সব। বাবা বড় পিটপিটে মানুষ, ঝিকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেন না। আর কেনই বা দেবেন? আমরা যখন তিন-তিনটে ঝি আর রাঁধুনী আছি। মা যখন ছিলেন এত কষ্ট ছিল না, জামাইরাও তখন আসত শাশুড়ীর আদর খেতে।"

মা বললেন, "তোমাদের ত মেয়ের বিয়েতে পণ নিয়ে মেয়ের বিয়ে দেয় শুনেছি। তোমার বাবা কি জামাইদের কাছে পণ নেননি?"

"তা যদি নিতেন সে ত ভালই হত। বললেন যে, সদ্‌ব্রাহ্মণ যারা তারা কন্যা দান করে, তারা পাঁঠাপাঁঠির মত মেয়ে বেচে না। এই নিয়ে বাবার কী গুমর! বলেন, আমার মেয়ে যাবে চাংড়িপোতার ভশ্চায্যিদের গোয়াল কাড়তে? আমি ত মেয়ে বেচিনি, পঞ্চ হরিতকি দিয়ে সালংকারা কন্যা দান করেছি। সালংকারা! দেখুন কী গয়না আমাদের? সরু সরু দুগাছা রুলি, আর গলার এই সুতোর মত হার। এ বেচলে আর কত হবে, আঠারো টাকা সোনার ভরি, দু ভরিও হবে না। ভাগ্যে আমাদের সব বোনের ছেলে হয়নি, আর হবেই বা কোথা থেকে? মা যাওয়ার পর থেকে জামাইরা কি এ-বাড়িতে মাথা গলাতে পায়? তা হলে কি রক্ষা রাখেন? বলেন, মেয়ে পুষছি বারোমাস, আবার জামাই এসে পাতড়া মারবে? এরপর এণ্ডিগেণ্ডিতে ঘর ভরে গেলে তার হ্যাপা নেবে কে? এণ্ডিগেণ্ডি? ওই ত নেত্যকালীর ওই শিবরাত্তিরের সল্‌তে, একপো দুধ বরাদ্দ, তাও হজম হয় না। না আছে চিকিচ্ছে, না আছে পথ্যি। এদিকে ত খরচখরচার অন্ত নেই। বারো মাস চলছে কথকতা, রামায়ণ গেল ত মহাভারত। ঠাকুর সেবা, দোল আছে, রথ আছে, আবার রাস আছে, এই সব উচ্ছুবে বামুন বোষ্টম খাওয়ানো আছে। এই যে গাদি গাদি মেয়ে পুরুষ কথা শুনতে আসে তাদের পান দেও জল দেও এসব করি ত আমরাই, আর কে আছে? কাকিমা, দুঃখের কথা বলব কী, ছেলেটার গায়ে একটা জামা আছে কিনা সে খোঁজও নেন না, তারপর আছে বিপিনের উৎপাত। হাতে হাতে চুনটুকু নুনটুকু পর্যন্ত মা জোগালে ছেলের কি মুখের তোড়। বলে কি না, দুবেলা যে গিলছ তা আসছে কোথা থেকে সে খেয়াল নেই?" বলতে বলতে ক্ষেত্রমণি কেঁদে ফেলল।

তারপর বলল, "মা ক্ষেত্রপাল ঠাকুরের দোর ধরেছিলেন, আমি জন্মালুম, তাই ক্ষেত্রমণি নাম হল। এখন ভাবি কেন মার এ দুর্বুদ্ধি হয়েছিল, কেন শ্যামনগরে গেলেন ক্ষেত্রপালের ওষুধ নিতে। আমিই সকলের বড়, আমারই হয়েছে জ্বালা। ছেলেটা কি বাঁচবে? দেখছেন তো ওর দশা।"

আমাদের বাড়িতে আসতেন ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ী, হোমিওপ্যাথির শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। বাবা ছিলেন হোমিওপ্যাথির গোঁড়া ভক্ত।

ডাক্তার ভাদুড়ী প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসতেন, চার টাকা মাত্র ভিজিট, তাও নিতেন না সব বারে। মাঝে মাঝে জামাই প্রতাপ মজুমদারকেও সঙ্গে আনতেন। আমাকে "বুড়ী মা, বুড়ী মা" বলে ডাকতেন। কী সুন্দর চেহারা ছিল তাঁর, চোখ দুটি সব সময় ঢুলু ঢুলু, রোগীরা বলত সাক্ষাৎ মহাদেব। আবার অনেকের কাছে শুনেছি, মরফিয়া খান বলে চোখ সব সময় ঢুল ঢুল করে। কিন্তু অদ্ভুত চিকিৎসা ছিল তাঁর। ছেলেটি হাঁটতে পারত না, পিছনের দিকটা শুকিয়ে গিয়েছিল। সেই ছেলে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। তার মাসী যদি কোলে তুলতে আসত, বলতেন, খবরদার কোলে নেবে না, যত পারে দৌড়াদৌড়ি করুক। রোজ স্নান করাবে, গায়ে জামা পরাবে না। পেট ভরে ভাত মাছের ঝোল খাবে, পেটের অসুখের ভয়ে খাওয়া বন্ধ করবে না। আর রাত্রে কড়কড়ে সুজির রুটি, সুজি সিদ্ধ করে তারপর পাতলা করে বেলে রুটি সেঁকবে, কড়কড়ে হবার জন্য উনানের গায়ে রেখে দেবে।"

ছেলের মা-মাসী পথ্যের ভার দিয়ে দিয়েছিল মার হাতে, মা ছাড়া তেমন রুটি কেউ করতে পারত না। ছেলেটি তাই প্রায় সব সময় মার রান্নাঘরের দুয়ারেই বসে থাকত। মাছের ঝোল আর ভাত মা-ই করে দিতেন। মাসী যদি কোন দিন রেঁধে দিত ছেলের তা পছন্দ হত না। তাই তার মাসী হাসতে হাসতে বলত, "ভারী যে দিদিমা সোহাগী হয়েছ, এতদিন কার হাতে খেয়েছিলে?"

পালিত-বাড়ি

পালিতদের একতলা বাড়ি। দুই ভাই, কিন্তু ভিন্ন হয়েছেন তাঁরা। বড় ভাই কোন্ সাহেবের অফিসে মোটা মাইনেয় চাকরি করেন। একটিমাত্র মেয়ে, তার নাম গোলাপী। গেল-বৎসর মেয়ের বিয়ে হয়েছে। খুব ঘটা করে পুজোর সময় তত্ত্ব করেছেন মেয়ের বাবা। তারাও আবার তত্ত্ব করেছে। সেই তত্ত্বের মিষ্টি আমাদের বাড়িতে দিয়ে গেল।

মেজবাবুর অবস্থা ভাল নয়। মাইনে কম, আবার প্রায়ই অসুখে পড়েন, সে সময় মাইনে পান না। তাই মেজগিন্নির গায়ের সব গয়নাই একে একে বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

গোলাপীর বয়স বেশি নয়, কিন্তু এর মধ্যেই যেন গিন্নী হয়ে গিয়েছে। একদিন আমার মাকে বলছিল, "জানেন কাকিমা, চক্রবর্তীদের বাড়িতে আগে একজন চাকর ছিল, সে রাত্রে কর্তার পা টিপত। ছোঁড়া চাকর, বাড়িতে মেয়ের পাল, তাই তাকে ছাড়িয়ে দিলেন।" মা শুনে বললেন, "তুমি এতটুকু মেয়ে, এসব কথা কেন? ছি, ওরকম কথা আর কক্ষনো বলবে না।" শুনে বোধ-হয় তার রাগ হল, তখনই বাড়ি চলে গেল। কিন্তু তার পরদিন আবার এল, সেদিন এসে বললে, "জানেন কাকিমা, ছোটকার ঘরে আজ হাঁড়ি চড়েনি। চড়বে কী, ওই ত আয়—তারপর বারোমাস আপিস কামাই, তার পর এণ্ডিগেণ্ডি, আজ এর অসুখ, কাল ওর অসুখ। তা বাপু, যার যেমন অবস্থা তার তেমন ব্যবস্থা, অত আধিক্যেতা কেন, ডাক্তারবদ্যিরে। ওই করে করেই ত সব্বস্ব খোয়ালে কাকিমা, তা নয়ত এমন হাল হল কেন? গায়ে ছিল একগা গয়না, সেই গয়নার কি একখানাও আছে? মা কত বুঝিয়েছে, ছোটকি এমন ন্যাকার মত গায়ের গয়না খুলে দিসনি। গয়না হল মেয়েদের স্ত্রীধন, সে গয়না কি এমন করে খোয়াতে আছে? সোয়ামীর অসুখে গায়ের গয়না খুলে বাঁধা দিয়ে চিকিচ্ছে করালি, পতিভক্তি ত খুব দেখালি, কিন্তু সোয়ামী যদি নাই বাঁচে, তখন দাঁড়াবি কোথায়? কেন, বিনে চিকিচ্ছেয় কি রোগ সারে না, আর চিকিচ্ছে হলেই কি মানুষ বাঁচে। মহারানী তবে বিধবা হল কেন? রাজ-রাজড়ার বাড়ি তবে লোক মরে কেন? আমারও কি পতিভক্তি নেই? তোর ভাসুরের অসুখের সময় তা বলে কি গায়ের গয়না বাঁধা দিয়ে ডাক্তার দেখিয়েছি? বলে 'আত্ম রেখে ধম্ম।' তা কাকিমা ওই এক-ধরনের মানুষ, হিত কথা ওর মনে ধরে না।"

মা বললেন, "তোমার মা কি আজ তোমার কাকিমাকে চাল দিলেন?"

"কী বলেন? মা চাল দেবেন? কোথায় এত চাল পাবেন তিনি? বলে 'নিত্যি নেই, দেয় কে, নিত্যি রোগ দেখে কে?' ওদের ত নিত্যিই নেই-নেই।"

মা শুনে আর-কিছু বলেননি। একটা ন্যাকড়ায় কিছু চাল ডাল ও গোটা কতক

জাল্ বেঁধে আমার হাতে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন "চুপি চুপি এটা ওদের রান্নাঘরে রেখে আয়। চাল যে রেখে এলি, পূর্ণশশীকে সে কথা বলে আসিস।"

পূর্ণশশী বড় মেয়ে, গোলাপীর চেয়ে এক বছরের ছোট। বিয়ের খোঁজ খবর চলছে। রঙটা ময়লা, তারপর টাকার সংস্থান নেই। পূর্ণশশীর জ্যাঠাইমা তাই নিয়ে মাঝে মাঝে বলেন, "আমার যদি অমন কেলে মেয়ে হত, আঁতুড় ঘরেই নুন গেলাতাম। একে মৌলিকের ঘর, তায় কেলে-পেতনী, ও মেয়ে গছবে কে?"

বেচারা পূর্ণশশী গঞ্জনা শুনে ঘাড় হেঁট করে থাকে। একটিও কথা বলে না। মেয়েটি বড় শান্ত।

পৌষ-সংক্রান্তির দিন। মা লক্ষ্মীর পা এঁকেছেন সিঁড়িতে আর প্রত্যেক ঘরের দুয়ারে। এখন রান্নাঘরে গিয়ে পিঠে ভাজতে বসেছেন।

মা যশোর জেলার মেয়ে। অনেক রকম পিঠে জানেন। তবে এবার বাবা অনেক দিন অসুখে ভুগেছেন, কোর্টে যেতে পারেন নি। তাই নিয়মরক্ষা মত পিঠে করবেন এই কথা বলেছিলেন।

কিন্তু দেখলাম বিনোদের মা পাঁচসেরা ঘটির এক ঘটি দুধ দিয়ে গেল। আমি ভাবলাম এত দুধ নিয়ে মা কী করবেন, করবেনই বা কখন?

বাবার যখন অসুখ হয় [illegible] তখন নিতেন সমস্ত ভার, বাবার চিকিৎসার ভার পর্যন্ত। বাগবাজারে বাপের বাড়ি, ভাইদের কাছে কোন সাহায্যই চান না। এ সব ব্যাপারে মার নিজের সম্মানজ্ঞান ছিল খুব বেশী।

সংসার বেশ চলছে। চাকরের মাইনে, দাদার স্কুলের মাইনে, আর আমার টিচার মিস্ বিশ্বাসের মাইনে সবই মা ঠিকমত দিয়ে যাচ্ছেন। কোথা থেকে যে করেন মা-ই তা জানেন।

দেখি কী পূর্ণশশী কাঁচুমাচু মুখে ছোট ভাইটির হাত ধরে রান্নাঘরের দুয়ারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোদের ঘরে পিঠে হচ্ছে না?" পূর্ণশশীর মুখ কালি হয়ে গেল। সে উত্তর দিল না।

এমন সময় পূর্ণশশীর মা একতলার ছাদ থেকে ডাকলেন, "পূর্ণশশী! পূর্ণশশী!"

পূর্ণশশী বলল, "বাড়ি যাই কাকিমা। মা এ-বাড়ি আসতে বারণ করেছিল, কিন্তু খোকা কিছুতেই ছাড়লে না, তাই—"

"এ-বাড়ি আসতে বারণ করেছিলেন? কেন?" পূর্ণশশী থতমত খেয়ে গেল: "না, না, বারণ করেননি, জ্যাঠাইমা যখন পিঠে ভাজেন তখন তাঁর রান্নাঘরের কাছে গেলে তিনি ভারি রাগ করেন। বলেন, 'দিষ্টি দিতে এসেছ!' মা তাই বললেন, "ওবাড়ি বোধ হয় এখন পিঠে ভাজা হচ্ছে এখন আর ওবাড়ি যেন যাসনে। কিন্তু খোকাটা বড় পিঠের গন্ধ ভালবাসে। বলে যে, দিদি, আমি ত কেবল নাক দিয়ে পিঠের গন্ধ শুঁকছি, পিঠে খেতে ত চাচ্ছি না। আয় খোকা, আমরা বাড়ি যাই, মা ডাকছে।" বলে ভাইয়ের হাত ধরে চলে যেতে উদ্যত হল।

মা বললেন, "দাঁড়াও একটু।" একটা কাঁসিতে সব রকম পিঠে সাজিয়ে পূর্ণশশীর হাতে দিলেন, পায়েসও দিলেন একবাটি।

"কাকিমা, মা বকবে।" বলে পূর্ণশশী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

"না, না, বকবেন কেন, এরা খাবে আর তোমরা খাবে না? নিয়ে যাও, মা কিছু বলবেন না।"

তিনকড়ি পালের ফাঁসি

সে সময়ের একটা বিশেষ ঘটনা তিনকড়ি পালের ফাঁসি। কী আন্দোলন সে সময়!

এক পয়সা দামের বই বেরুল—
"হায় মরি কী দুঃখরাশি,
তিনকড়ি পালের ফাঁসি।"

মার মুখ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। আমাদের সঙ্গে আর হেসে কথা বলেন না। ব্রহ্মযুদ্ধের খবর যখন খবরের কাগজে বার হচ্ছিল তখনও মার মুখ এমনি গম্ভীর দেখেছিলাম।

মিস বিশ্বাস সপ্তাহে দুদিন করে আসতেন, পনেরো মিনিট বাইবেল পড়াবেন আর এক ঘণ্টার বাকী সময় ইংরাজী, বাংলা, অঙ্ক ও সেলাই করাবেন তাঁর এই নিয়ম ছিল।

আমাদের মানুষ করা ঝি দিদে: মিস্ বিশ্বাসকে সে চিনত, মাকে বলেছিল "হাজারী বিশ্বেসের মেয়ে ওই বসন্ত, ও ত পুকুরে গুগলি তুলতে যেত রোজ। ও আবার ম্যাম হয়েছে।"

মা বলতেন, "চুপ, চুপ, গিরির মা, ওসব কথা বল না, মিস বিশ্বাস শুনলে দুঃখ পাবে।"

দিদে বলত "তা, খৃষ্টান হয়ে অত মিথ্যে কথা বলে কেন? সেদিনের কথা মনে আছে, তোমাকে বললে, আমরা তিন পুরুষে খৃষ্টান। বললে, আগে যে কী জাত ছিলাম তা জানি না। জেনে শুনে এমন কথা বলে কী করে? হাসখালিতে ওদের বাড়ি, ওরা ত মোছলমান, সেবার আকালের সময় পাদরীরা নিয়ে ওদের সবাইকে খৃষ্টান করলে, কেবল ওর ঠাকুরমা বুড়িই খৃষ্টান হয়নি। ও তখন ছোট ছিল, তবে এমন ছোটও নয় যে কোন কথাই ওর মনে নেই।"

আমিও আশ্চর্য হয়েছিলাম, মিস্ বিশ্বাস ত লোক খারাপ নন; গম্ভীর স্বভাব, যীশুখৃষ্টে দৃঢ় বিশ্বাস, তবে মিথ্যাকথা বললেন কেন? মুসলমান ছিলেন এ বলতে দোষ কী ছিল? উনি কি মুসলমানদের হীন বলে মনে করেন, তাই আগে মুসলমান ছিলেন এ-কথাটা স্বীকার করতে বাধল ও'র।

মিস বিশ্বাস আমাকে ভালবাসতেন, সুখ্যাতিও করতেন, মার কাছে বলতেন "ভারি বুদ্ধিমতী মেয়ে।"

ধর্ম নিয়ে মাঝে মাঝে ও'র সঙ্গে তর্ক হত। আমি বলতাম, "খৃষ্টান ধর্মের অনন্ত নরকের কথা শুনলে আর ওরকম ধর্মে আস্থা থাকে না।"

"কিন্তু যীশুকে যে বিশ্বাস করবে তার সব পাপই ক্ষমা হবে। অনন্ত নরকের ভয় তার নেই।"

"আর যদি যীশুকে ভাল লোক বলে মনে করে, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র বলে বিশ্বাস না করে?"

তিনি বলতেন, "কিন্তু তিনি ত সত্যই ঈশ্বরের পুত্র।"

আমি বলতাম, "আমরাও তো ঈশ্বরের পুত্র। ঈশ্বর যদি সৃষ্টিকর্তা, তবে সকলেই ত তাঁর ছেলে।"

মিস্ বিশ্বাস বলতেন "সে আলাদা কথা। কিন্তু যীশু ছিলেন তাঁর একমাত্র পুত্র।"

মা বলতেন "থাক, তর্ক করে সময় নষ্ট করিসনে।" কিন্তু মাও তর্ক করতেন মিস্ বিশ্বাসের সঙ্গে। মা বলতেন, "ইংরেজরা অত্যাচারী পররাজ্যলোলুপ, কত দেশের যে তারা সর্বনাশ করেছে তার ঠিক নেই।"

আর মিস বিশ্বাস বলতেন, "ইংরেজ মহৎ জাতি, আর বীরের জাতি। সকল সময়েই সকল দেশেই তারা অত্যাচারীর হাত থেকে নির্যাতিতকে বাঁচাতে এগিয়ে গিয়েছে। এই আপনাদের দেশেই দেখুন না, আগেকার দিনে রাজারা প্রজার উপর কি কম অত্যাচার করত? ব্রিটিশ শাসনে সবই এক, রাজা প্রজার কোন তফাত নেই। মেয়েদের উপরই কি কম অত্যাচার হত সেকালে? ইংরেজ এসে 'সতীদাহ' বন্ধ করলে, তাই মেয়েদের এখন আর বিধবা হলে পুড়ে মরবার ভয় নেই।"

যেদিন এই সব তর্ক আরম্ভ হত, সেদিন মিস বিশ্বাস এক ঘণ্টার চেয়েও বেশী সময় থেকে যেতেন বলতেন, "পড়ানোর সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছে।"

ব্রহ্মের যুদ্ধের করুণ কাহিনী যখন কাগজে বের হচ্ছিল— থীবের রাজ্যচ্যুতিতে প্রজারা কী ভাবে মর্মাহত আর দুর্দশা-

গ্রস্ত হয়েছে, সোনার শিকল পরা শ্বেত-হস্তী না খেয়ে প্রাণত্যাগ করেছে, রানীরা কী রকম লাঞ্ছিত হয়েছেন, মিস বিশ্বাসের কাছে সেই কাগজটা এগিয়ে দিয়ে মা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি বলতে চান একটা স্বাধীন দেশের উপর এইভাবে পরাধীনতা চাপিয়ে দেওয়া সেও কি ইংরাজের মহত্ত্ব?"

মিস বিশ্বাস বলতেন, "থীব ছিল দারুণ অত্যাচারী, তার অত্যাচারের হাত থেকে ব্রহ্মবাসীকে বাঁচাতেই ইংরেজ এগিয়ে গিয়েছিল, এ কথা ত সকলেই জানে, আপনিও কি জানেন না? জানেন কি, এই উদ্ধারকার্যে ইংরাজের কত অর্থব্যয় আর কত সৈন্যক্ষয় হয়েছে?"

মা বলেছিলেন "সবই জানি। যুদ্ধে দেশী সৈন্যই মরেছে নিজেরই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিযুক্ত হতে বাধ্য হয়ে, গোরা সৈন্য ক'জন মরেছে? আর অর্থ-ক্ষয়ের কথা বলছেন? সে কথা না-তোলাই ভাল। ব্রহ্মদেশ লুট করে কত ধন ইংরেজের পকেটে গিয়েছে তার কোন হিসেবই নেই। রাজার শ্বেতহস্তী, পায়ে তার সোনার জিঞ্জির, তার জন্য প্রতিদিন সুগন্ধি চালের পায়েস সোনার বালতিতে করে তার মুখের কাছে ধরা হত। হাতির পিলখানা ছিল ব্রহ্মবাসীর দেবমন্দির। কত উপহার আসত প্রতিদিন তার জন্য। সেই হাতির খোরাক বন্ধ করে টেনে নিয়ে গেল ইংরেজ অন্য একটা জায়গায়। বিলাত পাঠানোর টানাহেঁচড়ায় হতে হতে হাতি মরে গেল। এ সবই ত খবরের কাগজেরই সংবাদ।"

মিস বিশ্বাস একটু হাসলেন, তাচ্ছিল্যের হাসি। বললেন, "এ যে দেখছি হস্তী-পূজো!"

সে দিন আর বিতর্ক হয়নি, মিস বিশ্বাস চলে গিয়েছিলেন।

মার সঙ্গে মিস বিশ্বাসের এইভাবে মত-বিরোধ ও বিতর্ক হত। কিন্তু সে তর্ক কখনও সীমা লঙ্ঘন করত না। আমি বুঝতে পারতাম মিস বিশ্বাস যত তর্কই করুন, মনে মনে তিনি মাকে শ্রদ্ধা করেন।

ব্রহ্মযুদ্ধের পরই বোধ হয় তিনকড়ি পালের ফাঁসির সংবাদে দেশে আবার হুলুস্থূল পড়ে গেল।

তিনকড়ি পাল নবীন পালের ছেলে। তার বাবা হোমিওপ্যাথী ডাক্তারি করেন, শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক। তিনকড়ি স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র, বয়স আঠারোর বেশী নয়।

এই বয়স নিয়েই খুব জোর দেওয়া হয়েছিল। অনেকেই দৃঢ়ভাবে বলেছিল তার বয়স ষোল বৎসরের বেশী নয়। এত ছোট ছেলের ফাঁসি হতেই পারে না।

কুসুম নামে একটি মেয়েকে তিনকড়ি খুন করেছিল, মেয়েটি ছিল পতিতা। আমি অল্প বয়সেই অনেক কিছু বুঝতাম, কিন্তু 'পতিতা' বলতে যে কী বোঝায় তা আমি তখন বুঝতে পারিনি।

তবে যে সব খবর বেরিয়েছিল তার থেকে এটুকু বুঝলাম তিনকড়ি প্রায়ই স্কুল পালিয়ে ওই মেয়েটির বাড়ি যেত, মেয়েটিকে সে ভালবাসত।

আমার অনেক কথাই তখন মনে হয়েছিল। ভালই যদি বাসত তবে তাকে খুন করলে কেন? খুন করলে বিকেলবেলায়, মেয়েটি তার চেয়ে বয়সে বড়, তবে কী করে সে খুন করলে তাকে?

এক পয়সার বইতে পড়েও কিছু বুঝলাম না, কেবল এইটুকু বুঝলাম তিনকড়ি মেয়েটির উপর খুব রেগে গিয়ে তাকে "পাপিয়সী, বিশ্বাসঘাতিনী" বলে গালাগাল দিয়ে "এই তোর উচিত দণ্ড" বলে তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছিল।

মেয়েটা ত পালিয়ে যেতেও পারত, কেন পালাল না সে? এই রকম কত কথাই যে মনে হয়েছিল আমার।

কোর্টে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে স্কুলের মাস্টাররা একবাক্যে বলেছেন, তিনকড়ি শিষ্ট শান্ত ছেলে তার পক্ষে এ খুন সম্ভব নয়।

খুনের ঘরেই তিনকড়ি ধরা পড়েছিল, আর তখন সে মরফিয়া খেয়েছিল। এই খুটোই তার বিরুদ্ধে বড় প্রমাণ।

কিন্তু প্রমাণের কোন দরকারই ছিল না, কোর্টে তিনকড়ি স্বীকার করলে, "আমিই খুন করেছি।" সুতরাং বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল। মনে হল, সমস্ত দেশের লোকের বুকে যেন বজ্রাঘাত হল।

দেশের বড় বড় লোকের স্বাক্ষরে ছোট-লাটের কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন গেল। কিন্তু সে-আবেদন মঞ্জুর হল না, তিনকড়ির ফাঁসির দিন ঠিক হয়ে গেল।

যেদিন তার ফাঁসির কথা, সেদিন মা খবরের কাগজ পড়লেন না, রান্নাঘরেও গেলেন না, আমাদের দুই ভাইবোনকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। বাবার জন্য কেরাসিন স্টোভে মাগুর মাছ—চাল আর ডাল একসঙ্গে চড়িয়ে দিলেন, এ রান্নার নাম নাকি ফিস-রাইস। বাবার অসুখ তখনও ছিল।

বিকেলবেলা আমরা ফিরে এসে দেখলাম, মা তখনও একফোঁটা জলও মুখে দেন নি, সতীশদাদা এসেছেন আমাদের বাসায়। (ভাড়া বাড়িকে বাসা বলা হত।)

সতীশ দাদা আমার পিসিমার ছেলে, পিসিমা বিধবা হয়েছেন এক ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে। ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি আমার জ্যাঠামশায়ের কাছে থাকতেন।

সতীশদাদা তিনকড়ির ফাঁসির সময় উপস্থিত ছিলেন। জেলখানার উঠোনে সেদিন দারুণ লোকের ভিড় হয়েছিল। তিনকড়ির স্কুলের ছেলেরা সবাই প্রায় ছিল, তা ছাড়া আরও অনেক লোক জড়ো হয়েছিল। তাই গভর্নমেণ্ট কড়া পুলিস পাহারা রেখেছিলেন।

সতীশদাদা বলছিলেন, "মামীমা, তিনকড়ির সে কী মূর্তি, যেন সে মস্ত এক বীর, যুদ্ধে যাচ্ছে, কি বিয়ের বর বিয়ে করতেই যাচ্ছে! হাত নেড়ে নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে, 'বিদায় আমার জন্মভূমি, বিদায় আমার ভাইয়েরা।' আর সকলেই কাঁদছে, এক-জনেরও চোখ শুকনো ছিল না।

"তিনকড়ি বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'আমার প্রাণের বন্ধুরা, আমার দেশবাসী সমস্ত ভাইয়েরা, শেষ বিদায়ের সময় তোমাদের কাছে আমার একটি অনুরোধ কেউ যেন অসৎপথে যেও না। অসৎ-পথে যাওয়ার কী পরিণাম তা ত চোখের সমুখেই দেখছ। এই জ্যান্ত মানুষটাকে এখনি গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়তে হবে ওই গর্তের মধ্যে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে জিভ বেরিয়ে পড়বে, কী দারুণ মৃত্যু! এই মৃত্যু হল পাপের প্রায়শ্চিত্ত। দেশের ছেলেরা যদি দেশের সুসন্তান না হয়, তবে তার পক্ষে এই প্রায়শ্চিত্তই বিধান। ভাল থেক ভাই সব, দেশের সুসন্তান হয়ে চরিত্রবান হয়ে দেশের গৌরব বাড়িও, বিদায়ের কালে আমার এই অনুরোধ।'

সতীশদাদা বলতে লাগলেন, "লোকেদের তখন সে কী অবস্থা! কেউ কেউ ডুকরে কেঁদে উঠল। তার পর সব শেষ, ফাঁসি হয়ে গেল, যে যার বাড়ি ফিরল কাঁদতে কাঁদতে। ও কী মাসিমা, আপনার মুখটা যে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে, মনে হচ্ছে যেন অজ্ঞান হয়ে যাবেন। তা আপনার এইরকম অবস্থা ত হবেই, জল্লাদ শুদ্ধ কেঁদে ফেলেছিল সেই সময়।"

এই সময় মিস্ বিশ্বাস এলেন। আমি তাঁকে দেখেই কেঁদে ফেললাম। তাঁকে বললাম, "মা এখনও জল পর্যন্ত খাননি, আপনি যদি একটু জল খাওয়াতে পারেন।"

তিনকড়ি পালের ফাঁসির কথা মিস বিশ্বাস হয়ত শোনেননিই, অথবা শুনেও সেটাকে তেমন গুরুত্ব দেননি।

দিদেকে ডেকে তাড়াতাড়ি জল নিয়ে আসতে বললেন, দিদে জল না এনে এক গ্লাস সরবত আনল, মা সমস্ত গ্লাসটাই খালি করলেন এক নিশ্বাসে, পাছে মনের উত্তেজনা একটুও প্রকাশ পায় সেজন্য সংযত হয়ে স্বাভাবিকভাবে বারান্দার রেলিংএ হেলান দিয়ে বসলেন।

মিস বিশ্বাস বললেন, "যান যান, এখনি গিয়ে খেয়ে আসুন। একটা খুনে ফাঁসি গিয়েছে তার জন্য আপনি উপোস করবেন?

ছি-ছি, এ কী দুর্বলতা! খুন করলে যে ফাঁসি হবে সে ত জানা কথাই। ষোল বছরের ছেলে! কিসের ষোল বছর, সতেরো-আঠারো বয়স হবেই। আর যদি ষোলই হয়, ক্ষুদে সাপকে ক্ষুদে বলে কি বাঁচিয়ে রাখা উচিত? জানেন, কতবড় শয়তান ও-ছেলেটা, একবার নাকি নিজের বাপকেই খুন করতে গিয়েছিল! আগাছা, সমাজের কলঙ্ক। ইংরেজ গভর্নমেন্টের বিচারে কখনও অবিচার হয় না।"

মা উঠে পড়লেন, রান্নাঘরের দিকেই গেলেন। কিন্তু আমি জানতাম রান্নাঘরে সে-দিন খাওয়ার মত কিছুই ছিল না।

মিস বিশ্বাসের কথাই আমি ভাবছিলুম, একটা ছেলে ফাঁসিতে ঝুলে মরল তাতে তাঁর কোনও কষ্টই হল না? এতটা নিষ্ঠুর মানুষ কেমন করে হয়?

মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এ-কথা। মা বললেন, "গোঁড়ামিই মানুষকে নিষ্ঠুর করে। মিস বিশ্বাস যে ইংরেজের গোঁড়া ভক্ত।"

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম "তোমারও কি গোঁড়ামি আছে?"

মা হেসে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, "তা আছে বইকি কিছু। না হলে ইংরেজের নামেই রাগ আসে কেন? ইংরেজের মধ্যে কি ভাল লোক নেই? এই যে হেয়ার সাহেব, বেথুন সাহেব এরাও ত ইংরেজ।"

মা আরও বললেন,—"ইংরেজ এদেশ পরাধীন করেছে, কিন্তু পরাধীন হল কেন এত বড় দেশের কোটি কোটি লোক, জন-কতক বিদেশ-থেকে আসা মানুষের কাছে? তাদের অস্ত্র ছিল, এদেরও কি অস্ত্র ছিল না? ছিল সবই কেবল ছিল না নিজের দেশের উপর সত্যকার ভালবাসা।"

মিস বিশ্বাস হিন্দু ধর্মের নিন্দা করতেন, বলতেন, "ঈশ্বর হলেন মাছ, ঈশ্বর হলেন শুয়োর—এ আবার একটা ধর্ম নাকি?"

রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলত। মাকে গিয়ে একদিন বললাম, "মিস বিশ্বাসের নিজের দেশের উপর এত রাগ কেন? আর বিদেশীর উপরই এত ভালবাসা কেন?"

মা বললেন, "কেন হবে না? বিদেশী ত ওঁর কোন অনিষ্ট করেনি। দেশের লোক খৃষ্টান বলে ঘেন্না করেছে, আর বিদেশীই দিয়েছে আশ্রয় আর সম্মান। সেদিন গিরির মার কাছে শুনলি ত ছেলেবেলায় কী কষ্টে দিন গিয়েছে মিস বিশ্বাসের, তাই তিনি সেদিনের সম্পর্কই ছেড়ে দিতে চান। নিজের আগের জাতও তাই স্বীকার করেন না। বিদেশীর কাছে শিক্ষা পেয়ে হয়েছেন কর্তব্যপরায়ণ আর নিয়মানুবর্তী। দেখিস না, যেদিন আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তোকে পড়ানোর সময় কমে যায়, সে-দিন সে-সময়টি পুরিয়ে দিয়ে তবে যান। ওঁদের মাপা সময়, তাই তার এদিক ওদিক হয় না।"

ছেলেবেলার কথায় মার প্রসঙ্গ এসে পড়ল, তাই এই লেখাটা কতকটা পারিবারিক হয়ে গেল, এটা মোটেই আমার ইচ্ছা ছিল না। তবে সেকালের দিনের জীবনযাপনের ছাপ এতে আছে, তাই লিখলাম।

GOVERNMENT LIB… Cooch B…

বেলা যে গেল

অন্নদাশঙ্কর রায়

আমি বিশ্বাস করিনে

ননসেন্স

গাঁজাখুরি

জোচ্চোর কোথাকার

ইনক্রেডিবল

লা যে গেল" শুনে লালাবাবু কী করেছিলেন মনে আছে? সেই দণ্ডেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। একবস্ত্রে। যেন ও-পাড়ায় যাচ্ছেন। তাঁর সন্ধান মিলল শেষে বৃন্দাবনে। সেখান থেকে তিনি আর দেশে ফিরলেন না। তাঁর সংসারের প্রয়োজন ফুরিয়েছিল।

তুচ্ছ একটি কথা। যে বলেছিল সে কি তাই ভেবে বলেছিল? না বোধ হয়। তবু তার ফল হলো সুদূরপ্রসারী। জমিদার লালাবাবু হলেন পরম বৈরাগী। এমনটি সচরাচর ঘটে না। তবে একেবারেই ঘটে না যে কেমন করে বলি?

বর্ধমান স্টেশনে ডাউন বম্বে মেল দাঁড়িয়ে। শরৎকালের সকাল। স্নানের ঘর থেকে সাহেবী পোশাক পরে ফিটফাট হয়ে নিজের বার্থে এসে ঠেস দিয়ে বসলেন আর্য-কুমার নন্দী। কাগজওয়ালা তাজা কাগজ হাতে হাঁক দিয়ে যাচ্ছিল। কিনলেন একখানা। আগে থেকে বলা ছিল, ছোটা হাজরি দিয়ে গেল খানসামা। খেতে খেতে পড়তে পড়তে ভদ্রলোকের আর কোন দিকে হোঁশ ছিল না, সেই অবস্থায় তাঁর একটা পা টেনে নিয়ে কাঠের বাক্সর উপর রেখে রঙ মাখাতে লাগল এক মুচির ছেলে। অনাহূত।

এমন সময় এক পাঞ্জাবী শিখ গণৎকার জানালার বাইরে থেকে হিন্দীতে বলল, "বাবুজী, দেখি আপনার হাত।" আর্য-কুমার ওসবে বিশ্বাস করতেন না। তিনি উদ্যোগী পুরুষসিংহ। পুরুষকারের দ্বারা লক্ষ্মী লাভ করেছেন। অন্য দিন হলে ভাগিয়ে দিতেন। কিন্তু পড়তে পড়তে খেতে খেতে তিনি অসতর্ক ছিলেন, আনমনে বাড়িয়ে দিলেন একখানা হাত। গণৎকার বলল, "এ হাত নয়, বাবুজী। ও হাত।" তখন ডান হাতখানা রুমাল দিয়ে মুছে বাড়াতে হলো।

ট্রেন তখন ছাড়ি-ছাড়ি করছে। মুচির ছেলে বকশিস চায়। খানসামাও সেলাম ঠুকছে। গণৎকার হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, "বাবুজী, জলদি করুন। সময় বেশী নেই।"

মানে কী? মানে তো এই যে এক্ষুনি ট্রেন চলতে শুরু করে দেবে। যাকে যা দেবার তাকে তা যদি এক্ষুনি না দেন, তো কখন দেবেন? তবু আর্যকুমারের মনে খটকা বাধল। তিনি সেই গেরুয়া-আলখাল্লাপরা পাগড়িবাঁধা দাড়িওয়ালা প্রৌঢ়কে শুধালেন, "আর কত সময় আছে?"

গণৎকার এর উত্তরে বলল, "বেলা যে গেল।"

আর্যবাবু লালাবাবুর গল্প জানতেন না। তবু তাঁরও মনে হলো, এর কী যেন একটা গূঢ় অর্থ আছে। প্রকাশ্য অর্থটা কিছু নয়। তিনি সেই গণৎকারকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করার পূর্বেই গাড়ি ছেড়ে দিল। নন্দী একখানা নোট ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। গণৎকার কিন্তু কুড়িয়ে নিল না।

স্টক এক্সচেঞ্জের পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত করে ভদ্রলোক অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, "যত সব বুজরুক। টাকা কুড়িয়ে নিয়ে করত কী? গাঁজা খেত।"

হয়তো লোকটা আশা করেছিল এক টাকার বেশী। অনেক বেশী। তাই নোট-খানা ছুঁলো না। ছোঁবে ঠিকই। যথালাভ। হকের পাওনা তো নয়। ঠকিয়ে যা পাওয়া

যায়। নন্দী অমন কত দেখেছেন। তা হলেও তাঁর মনটা বিরস হয়ে রইল। তাঁর মতো বড়লোকের সঙ্গে এমন অসভ্যতা করবে এহেন আস্পর্ধা তিনি এর আগে প্রত্যক্ষ করেননি। ঐটুকু উক্তির জন্যে একটা টাকা কি বড় কম হলো। না ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ-করা কুপে দেখে তার পাওনা অমনি বেড়ে গেল?

ঘোরদৌড় আর খেলাধুলোর পৃষ্ঠায় যখন তাঁর নজর, তখন তাঁর মন থেকে লোকটার চেহারা প্রায় মুছে গেছে। শত শত লোকের সঙ্গে তাঁর নিত্য কারবার। একটি-মাত্র মুখ তিনি কতক্ষণ মনে রাখবেন? ধরো, পাঁচ মিনিট। কিন্তু তাঁর কানে তখনো বাজছিল, বাবুজী জল্দি করুন। সময় বেশী নেই। বেলা যে গেল।

কী এর প্রকৃত অর্থ? ট্রেন ছেড়ে দেবার সময় হয়েছে। কী দেবেন দিন। সকাল-বেলাটা তো কেটে গেল। তেমন কিছু রোজগার হলো না আজ। আপনি বড়লোক। বউনি করুন। কেমন? এই তো এর মানে? এছাড়া আর কী হতে পারে?

আর্যকুমার কাগজখানা সরিয়ে রাখলেন। বিজ্ঞাপনগুলো পড়াও দরকার। কিন্তু এখন নয়। ভাবতে লাগলেন, কী হতে পারে গণৎকারের উক্তির তাৎপর্য। লোকটা কি হাত দেখেই বুঝে ফেলল যে, আর বেশী দিন পরমায়ু নেই? যা করবার করে নিন চটপট। আরো কয়েক লাখ টাকা। আরো কয়েকটা কোম্পানি পরিচালনা।

না, না, বয়স এমন কিছু হয়নি। বাহান্ন বছর বয়সে কেউ ভবের হাটে দোকানপাট গুটোনোর কথা ভাবে না। আরো আট বছর পরে না হয় রিটায়ার করা যাবে। কিন্তু ভবধাম থেকে নয়, তার আরো দেরি। ধরো, সত্তর বছর। এত টাকা আছে যখন তখন আয়ুই বা কিনতে পারবেন না কেন? আজকাল ডাক্তারির যা উন্নতি হয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষেরই জীবনের প্রত্যাশা বেড়ে গেছে। তিনি তো অপেক্ষাকৃত অসাধারণ। ইচ্ছা করলে পশ্চিমে গিয়ে বাস করতে পারেন। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় মানুষ দীর্ঘজীবী হয়। কিছু না হোক দার্জিলিং তো হাতের কাছেই। সেখানে বসতি করলে হয়।

কিন্তু হাওড়ায় পৌঁছবার আগে তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল এই ব্যাখ্যা যে, বিদায়টা শুধু কর্মক্ষেত্র থেকে নয়, মর্ত্যলোক থেকেই। এবং তার জন্যে সময়মতো আয়োজন না করলে হঠাৎ একদিন করোনারি থ্রম্বোসিস বা সেই জাতীয় কোন পরওয়ানা এসে হাজির হবে। ব্যাখ্যা বদ্ধমূল হলো বলে উক্তি বিশ্বাসযোগ্য হলো তা নয়। মানুষের মৃত্যু তো চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ নয় যে, কেউ গণনা করে বলতে পারে কবে ঘটবে। বিজ্ঞানীরা যা পারে না, তুমি ভিক্ষাজীবী গণৎকার তুমি শুধু একবার হাত দেখেই তা পারলে আর আমিও তেমনি আহাম্মক যে বিশ্বাস করে একটা টাকা দক্ষিণা দিলুম।

"আমি বিশ্বাস করিনে।" কথাটা তিনি আপন মনেই উচ্চারণ করলেন একটু ঝোঁক দিয়ে। ট্রেন ততক্ষণে হাওড়া স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে গেছে। উর্দিপরা ড্রাইভার এসে সেলাম ঠুকছে। বাড়ির গাড়ি প্ল্যাটফর্মের ধারেই মোতায়েন। কুলীরা মাল নামাচ্ছে।

"আমি বিশ্বাস করিনে। বিশ্বাস করতে পারিনে।" আবার তিনি উচ্চারণ করলেন হাওড়ার পোলের উপর দিয়ে যাবার সময় গঙ্গার দিকে তাকিয়ে। আমিহীন কলকাতায় আমিহীন গঙ্গা এমনি করে বইতে থাকবে, তা মানি। কিন্তু এত শিগগির নয়। এ কখনো হতেই পারে না যে, এক বছর পরে আমি-হীন মোটর আমিহীন পোলের উপর দিয়ে এমনি করে ছুটতে থাকবে। ইতিমধ্যেই সওয়ারি নামিয়ে দিয়ে থাকবে।

"ননসেন্স।" তিনি বলে উঠলেন স্ট্রাণ্ড রোডে পদার্পণ করে। বলা উচিত চক্রার্পণ। তারপর যখন ময়দান কেটে তাঁর মোটর হু হু করে এগোচ্ছে পার্ক স্ট্রীট অভিমুখে, তখন তিনি ড্রাইভার বেচারাকে হকচকিয়ে দিলেন হঠাৎ "ব্যাটা গাঁজা খেয়ে এসেছিল" বলে। চৌরঙ্গীর মোড়ে যখন লাল সংকেত দেখে মোটর থামল, তখন তিনি তার কাছে ক্ষমা চাইলেন।

বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে তাঁর ভবন। গাড়ি থেকে নেমেই আবার বলে উঠলেন, "আমি বিশ্বাস করিনে।" অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করেন না যে, এই ভবনে তাঁর মেয়াদ আর ছ' মাস কি এক বছর। গৃহিণীকে তাঁর প্রথম সম্ভাষণ হলো, "গাঁজাখুরি।" অর্থাৎ তিনি যা শুনে এসেছেন সেটা গাঁজা-খুরি।

"কী হয়েছে? ব্যাপার কী?" চিন্তিত স্বরে বললেন তাঁর সহধর্মিণী মনীষা।

আর্যকুমার লজ্জায় বলতে পারলেন না, এক গণৎকার বর্ধমানে কী তাঁকে শুনিয়েছে আর তা শোনা অবধি তিনি অন্য চিন্তা ত্যাগ করেছেন। কিছুতেই ঘাড় থেকে ও ভূত নামছে না। লোকটা কি সম্মোহন জানে? জোচ্চোর কোথাকার।

"কিছুই হয়নি। মাথায় ঘুরছিল একটা কথা। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।" এই বলে তিনি তখনকার মতো স্ত্রীকে বুঝ দিলেন।

কিন্তু রাত্রে ক্লাব থেকে তাস খেলে ফেরার পরও তাঁর মুখ ছিটকে বেরিয়ে গেল, "ইনক্রেডিবল।" অর্থাৎ তাঁর প্রয়াণ আসন্ন এটা অবিশ্বাস্য।

মনীষার মনে খটকা বাধল। তাস খেলায় হেরে যাওয়া এমন কী অবিশ্বাস্য ঘটনা! তিনি জানতে চাইলেন, "কেন ও কথা বললে? তোমার অবশ্য হাত ভালো ছিল।"

আর্যকুমার যেন একটা অবলম্বন পেয়ে গেলেন। "হাত ভালো ছিল বলেই তো বলছি অবিশ্বাস্য। এত ভালো হাত আমার। হাত দেখে অন্যরকম ধারণা হতেই পারে না।"

এমনি করে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ধোঁকা দিলেন। ভাবলেন, কী দরকার বেচারিকে উদ্বিগ্ন করে তোলা। মেয়েরা যেমন সরল-বিশ্বাসী, যে কোনো হতচ্ছাড়া গণৎকারের যে-কোনো অমূলক উক্তিকেই ওরা বেদবাক্য মনে করবে। মনীষা যদিও শিক্ষিতা মহিলা তবু তিনিও এসব ক্ষেত্রে সরলা অবলা। একবার এক সাপুড়ে তাঁকে একটা শিকড় গছিয়ে দিয়ে দশ টাকা নিয়ে চলে গেল। ওটা নাকি সাপের বিষের ওষুধ। ভাগনেটি বি এস-সি পাশ। সেও বোকার মতো আরো দশ টাকা দিল। তা হলে কিন্তু প্রমাণ হয় যে, ছেলেদেরও মাথায় হাত বুলোনো ঠিক তেমনি সহজ।

আর্যবাবুর দুই কন্যা। দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। এখন ঝাড়া হাত পা। বিশেষ কোনো সাংসারিক চাপ নেই। স্ত্রীর জন্যে যথেষ্ট অন্ন-সংস্থান আছে। তা ছাড়া মনীষা কেবল নামেই মনীষা নন। ইচ্ছা করলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন। সুতরাং নিছক সাংসারিক বিচারে আর্যকুমারের অকালপ্রয়াণ একটা সমস্যাই নয়।

তবু দেখা গেল তিনি সত্যি বিচলিত হয়েছেন। কাউকে বুঝতে দিলেন না কেন। নিজেকেও ভোলালেন। তাঁর যেখানে যতকিছু অ্যাসেট্‌স্ ছিল, তার একটা তালিকা তৈরি করতে বসলেন গোপনে। যেখানে যতকিছু লায়াবেলিটিস্ ছিল, তারও আরেক তালিকা। দিনের পর দিন তিনি এই নিয়ে মগ্ন রইলেন। তাঁর কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্ক সুনির্মলকে বললেন, "দেখ হে, নিজের সঙ্গে নিজের একটা হিসাবনিকাশ হয়ে থাকা ভালো। এসব তো আমি পরের জন্যে করছিনে। বাদসাদ দিয়ো না।"

নিজের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যখন তাঁর যথার্থ জ্ঞান জন্মাল, তখন তিনি মনে বেশ শান্তি পেলেন। সকলের সব পাওনা চুকিয়ে দিয়ে মোটের মাথায় তাঁর যা উদ্বৃত্ত থাকে, তার থেকে দুই মেয়েকে দশ লাখ ও স্ত্রীকে দশ লাখ দেওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। তবে তারা রাখতে জানলে হয়। কে জানে, কে কখন তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে সেই সাপুড়ের মতো দশ আর দশ মিলে বিশ লাখ টাকার হাতসাফাই দেখাবে। তাই তিনি তিনজনের নামে তিনটে বাড়ি তৈরি করে দেবেন স্থির করলেন। সেই নিয়ে চলল স্থপতিদের সঙ্গে শলাপরামর্শ। জমির সন্ধান। মালিকদের সঙ্গে কথাবার্তা। অ্যাটর্নির বাড়ি আনাগোনা। কর্পোরেশনে

ন্দর। ঠিকাদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত। তিনখানায় দুখানা হবে ম্যানসন। বিভিন্ন পরিবারকে ভাড়া দেওয়া হবে বহুসংখ্যক ফ্ল্যাট। একখানা হবে বিল্ডিংস্। এক বা একাধিক সওদাগরি কোম্পানিকে ইজারা দেওয়া হবে দীর্ঘ মেয়াদে। এত বড় কাণ্ড-কারখানা, কেউ ঘুণাক্ষরে টের পাবে না, তা কি হয়! কনিষ্ঠ জামাতা গৌতম বলল কনিষ্ঠা কন্যা দূর্বাকে। দূর্বা বলল তার জননীকে।

মনীষা বরাবর স্বামীর বিশ্বাসভাজন। এ যদি সত্য হতো স্বামী নিশ্চয় তাঁকে জানিয়ে তাঁর অনুমতি নিতেন। তিনি বললেন, 'বাজে কথা। আমাদের তেমন কোনো প্ল্যান নেই। বিজনেস থেকে টাকা উঠিয়ে নিয়ে জমিতে পোঁতা মূর্খতা। গবর্নমেন্ট যেদিন খুশি নোটিশ দিয়ে অ্যাকোয়ার করবে।"

দূর্বা বলল, "কিন্তু কয়লার খনিও তো ওরা ন্যাশনালাইজ করতে পারে।"

মনীষা বললেন, "সে সাহস ওদের হবে না। তা হলে সাহেবদের কলিয়ারিও ন্যাশনালাইজ করতে হয়। হুঁ, হুঁ। অত বড় বুকের পাটা আছে কার!"

কিন্তু একদিন একখানা দলিল দেখে মনীষা নিজেই ধরে ফেললেন, নন্দী সাহেবের ফন্দী। দলিলখানা তাঁর নামে হবে। তাঁকে সই করতে হবে।

তিনি রূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "এসব হচ্ছে কী? ও কেন?"

আর্যকুমার মুখ কাঁচুমাচু করে উত্তর দিলেন, "তোমারই স্বার্থে। আমার নয়।"

"তুমি তো জানো, বেনামী আমি পছন্দ করিনে। যা করবে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে করবে। লোকসান হয় হবে। চোরের মতো করতে যেও না। বাজারে তোমার সুনাম আছে, তুমি সৎ কারবারদার। ঐ যে ক্রেডিট ওই তোমার সিকিউরিটি।"

আর্যকুমার কেমন করে ভেঙে বলেন যে, দলিলটা বেনামী নয়। তিনি হঠাৎ হার্ট ফেল করে মারা যেতে পারেন বলেই আগে থেকে সব আটঘাট বেঁধে রাখছেন, যাতে লেশমাত্র গোলমাল না হয়। নইলে কে জানে কে কখন মামলা বাধিয়ে বসবে। মেয়ে-মানুষ লড়তে পারবেন কেন? লড়তে গেলেও তো স্বর্ণলঙ্কা উজাড় হয়।

তিনি আমতা আমতা করে বললেন, "আমাকে বিশ্বাস কর, আমি অসাধু কাজ করতে যাচ্ছিনে, তোমাকেও অসাধুতায় জড়াচ্ছিনে। মানুষের জীবন, কোনদিন আছে, কোনদিন নেই। পঞ্চাশের পর সব মানুষেরই কর্তব্য—হেঁহেঁ সব পুরুষেরই কর্তব্য—যাদের জন্যে ধন সঞ্চয় তাদেরই উপর তার ভার অর্পণ।"

"বাজে বকছ।" মনীষা রাগ করলেন এত-দিন ধরে তাঁর কাছ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে এসব করা হচ্ছে বলে। লুকিয়ে লুকিয়ে করা কি সাধুতার পরিচায়ক?

ব্রাহ্ম মেয়ে বিয়ে করে এই দশা হয়েছে হিন্দুর ছেলের। উঠতে বসতে লেকচার আর বকুনি। শুধু কি তাই? কতবার যে ভদ্র-মহিলা ছেড়ে চলে যাবার ভয় দেখিয়েছেন তার সংখ্যা নেই। ফলে আর্যসন্তানকে সত্যি সাধু হতে হয়েছে। নইলে তাঁর ক্রোড়পতি হওয়া ঠেকাত কে? সেই সঙ্গে উপসর্গগুলিও এসে জুটত। মনীষা সেদিকেও পথ রোধ করে রয়েছেন। পার্টিতে বল, ক্লাবে বল, নাইট ক্লাবে বল, যেখানেই ইনি সেখানেই উনি। একদণ্ড চক্ষের আড়াল করবেন না। ছায়ার মতো অনুগতা হবেন। হতভাগ্য স্বামী!

আর্যকুমার একবার ভাবলেন, বর্ধমানের গল্পটা শুনিয়েই দেবেন। তার পর সে ভাবনা বাতিল করলেন। কেননা তাতে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। মনীষা বলবেন, ওসব বুজরুকি বিশ্বাস কর কেন? বিশ্বাস না করলে তো এসব করার প্রশ্ন ওঠে না।

আর্যবাবুও কি বিশ্বাস করতেন? না, তিনি যুক্তিবাদী সাহেবীভাবাপন্ন বিলেত-ফের্তা বিজনেসম্যান। কে একটা পেশাদার গণৎকার কী বলেছে শুনে তিনি বিশ্বাস করবেন? অথচ তাঁর কাজে ধরা পড়ছিল যে তিনি বিশ্বাস করেছেন। স্ত্রীর সঙ্গে তর্কে তিনি ভঙ্গ দিলেন। খুলে বললেন না, কেন তিনি অমন কাজ করতে গেলেন।

কাজ কিন্তু বন্ধ রইল না। অ্যাটর্নির পরামর্শ নিয়ে দলিলও হলো। তার থেকে মনীষার নাম বাদ গেল। অগত্যা কন্যাদেরও নাম। খবরটা কনিষ্ঠা কন্যাই বয়ে নিয়ে এলো মার কাছে। মনীষা এবার বিশ্বাস করলেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্বামীর সঙ্গে বাক্যালাপ করলেন না। বিভিন্ন সূত্রে অনুসন্ধান করে জানতে পেলেন যে, খবরটা খাঁটি। তখন বাক্যালাপই করলেন না।

ঝড় ওঠার আগে অন্তরীক্ষ শান্ত হয়ে যায়। একটি পাতাও নড়ে না। একটি পাখিও ডাকে না। বেশ শীতল লাগে গরমের দিন। আর তার পরে? তার পরেই তাণ্ডব। মাথার উপর ডাল ভেঙে পড়ে, ঘর ভেঙে পড়ে। ভাঙনের আওয়াজকে, প্রাণীদের চিৎকারকে ছাপিয়ে ওঠে ঝড়ের গর্জন।

আর্যকুমার অভিজ্ঞ স্বামী। তাঁর হাড়ে হাড়ে বরফের ছোঁয়া লাগল। আসন্ন মরণের চেয়েও তাঁকে ভাবিয়ে তুলল আসন্ন সাইক্লোন। কী করবেন, কী করতে পারেন তিনি? খুলে বলবেন স্ত্রীকে বর্ধমানের ব্যাপার? কিন্তু তার পরিণাম যদি আরো ভয়ংকর হয়? "বাজে কথা" বলে দাবড়ি দেবেন গিন্নী। ভেস্তে যাবে ইমারত তৈরির আয়োজন। তখন যদি ঐ ব্যাটা গণৎকারের কথাই ফলে যায়, যদি করোনারি থ্রম্বোসিস কি হাই ব্লাড প্রেসার হয়, স্ত্রী-কন্যাদের ঠগের হাতে সঁপে দিয়ে যেতে হবে। তারা সর্বস্বান্ত হয়ে পথে দাঁড়ালে কি তাঁর আত্মা পরলোকে শান্তি পাবে?

সাত-পাঁচ ভেবে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন নন্দী। বলতে গিয়ে অবশ্য কয়েক-বার ঢোক গিলতে হলো। ভণিতাও করলেন তিনি প্রায় আধ ঘণ্টা।

"আমি পরকাল মানিনে, পরলোকে বিশ্বাস করিনে। তবু যদি পরলোক থাকে। আমি ঈশ্বর মানিনে, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিনে। তবু যদি মৃত্যুর পর আত্মা থাকে। আমি দেহবিচ্ছিন্ন অশান্তি কখনো অনুভব করিনি, অনুভব করা সম্ভব মনে করিনে। তবু যদি আত্মা অশান্তি ভোগ করে। বুঝলে, মণি। আমার যখন উপায়ান্তর আছে, তখন কেন আমি এ ঝুঁকি ঘাড়ে করে মরি? কেন একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে যাইনে? তা হলে তোমরাও নিশ্চিন্ত, আমিও নিশ্চিন্ত।"

মনীষার উত্তর হলো, 'বেশ বানিয়ে বলতে পারো কিন্তু। রামমোহনের আগে জন্মালে তুমি আমার সহমরণের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে। তাতে তুমিও নিশ্চিন্ত আমিও নিশ্চিন্ত। তোমার মনে কী আছে, বলব? তুমি চাও না যে আমি আবার বিয়ে করি।"

"আরে, নু নু নু নু না—আ! আরে, না, না, না—আ! আমি কি স্বপ্নেও কখনো ভেবেছি যে, তুমি আবার—ছি ছি ও কথা মুখে আনতে নেই।" জিব কাটলেন আর্য-পুত্র।

"হাঁ গো, হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হাঁ—আ। আমি তোমার আত্মার অন্তস্থল অবধি দেখতে পাচ্ছি। তোমার কি ধারণা যে, আমার বিয়ের বয়স চলে গেছে? কেউ বিয়ে করবে না আমাকে?" এই বলে আর্যা এমন এক কটাক্ষ হানলেন যাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল।

নন্দী সত্যি মনে করে চমকে উঠলেন। বললেন, "ছি ছি, মণি, তুমি কখনো পারো অমন কাজ? কেন তবে অমন কথা মুখে আনলে?"

"তা তোমাকে কে মাথার দিব্যি দিয়ে সাধছে এই বয়সে ইহলোক ত্যাগ করতে? কার মগজে এ চিন্তা উদয় হয়েছে, বল? তোমার না আমার? গণৎকার কিছু দক্ষিণা আশা করেছিল, তা না হলে ওর পেট চলবে কেন? ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে, তুমি অন্যমনস্ক, তোমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে, বেশী সময় নেই, যা দেবেন তা জলদি দিয়ে দিন। নোট-খানা তুমি ওর হাতে না দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে কেন? ওরও তো মানসম্ভ্রম আছে। ও কি অত লোকের সামনে উপুড় হয়ে ভিখিরীদের মতো পয়সা কুড়োবে নাকি? ট্রেন ছেড়ে দিলে তখন যেমন করে হোক

"তোমার কি ধারণা আমার বিয়ের বয়স চলে গেছে?"

তুলে নেবে। তিলকে তাল করতে তোমার জুড়ি নেই। অকারণে কষ্ট পাচ্ছ এই ক' মাস। কলকাতা শহরে কি জ্যোতিষীর লেখাজোখা আছে? তাদের একজনকে শত-খানেক টাকা ধরিয়ে দিলেই তোমার আশি বছর পরমায়ুর গ্যারান্টি পেতে পারতে। চাও তো কালকেই নিয়ে যেতে পারি, তোমার যার উপর আস্থা, তার কাছে।"

আর্যকুমার বুঝলেন সবই, কিন্তু তাঁর মন মানল না। গণৎকারের উক্তির একমাত্র ব্যাখ্যাই ঠিক। আর সব বেঠিক। কিন্তু স্ত্রীকে বোঝানো শক্ত। আরেক ব্যাটা জ্যোতিষীর কাছে গেলে সেও তাই বলবে। মনটা আরো খারাপ হয়ে যাবে। ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায়? তিনি বেঁকে বসলেন। বললেন, "কাজ কি কেঁচো খুঁড়ে?"

এবার মনীষার চাপান। "তা হলে চল কাল তোমাকে পি জি'তে দিয়ে আসি। সেখানে তোমার একটা থরো চেক-আপ হয়ে যাক। আর যদি হাসপাতালে থাকতে না চাও বল, বাড়িতেই ব্যবস্থা করি। তোমার স্বাস্থ্য বরাবরই ভালো, তবু যখন কথাটা উঠেছে তখন তোমার মনোবল আঁটে রাখার জন্যে একটা ভালোরকম পরীক্ষা দরকার। রোগের জড় ধরা পড়লে এখন থেকেই সাবধান হওয়া যাবে। সাবধানের মার নেই। ক্ষতিটা কী?"

আর্যকুমারের উত্তোর। "লাভটাই বা কী? ডাক্তার বলবে সাবধান হতে। হব সাবধান। কিন্তু তুমি কি ঠিক জান, সাবধানের মার নেই? যেমন সাবধানের মার নেই তেমনি মারেরও সাবধান নেই। কথাটা আমার নয়। তোমাদেরই গুরু-দেবের।"

মনীষা শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী। এককালে কলাকুশলা ছিলেন। সুদর্শনা তো এখনো রয়েছেন। তাঁর মুখ বন্ধ করে দিতে হলে গুরুদেবের কোটেশনই যথেষ্ট।

তিনি তর্ক করলেন, "গুরুদেবের নয়। তাঁর দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের।"

"তা হলে তো আরো গুরুতর।"

এর পর মনীষা দেবী বললেন, "দেখ, তোমার ওটা একটা ফিক্সেশন। মানসিক চিকিৎসা না করলে সারবে না। কিন্তু তাতেও তোমার আপত্তি হবে। আমি এখন তোমাকে নিয়ে করি কী? তোমাকে যদি ওই সব করতে দিই তা হলে যেই ওসব সারা হয়ে যাবে অমনি তুমি নিষ্কর্মা হবে। তোমার আর বাঁচতে ইচ্ছা করবে না। তখন তুমি যে জিনিসটিকে ভয় কর সেই জিনিসটি ঘটবে। তুমি ভাববে, গণৎকারের কথা ফলল। আমি ভাবব, তোমার অবিবেচনার ফল ফলল। তুমি কি মনে কর আমি তোমার টাকা চাই? আমি তোমাকেই চাই। যাকে বিয়ে করেছি সেই যদি না থাকল তবে আমি কাকে নিয়ে থাকব? মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের নিয়ে কি থাকতে পারি?"

"সব বুঝি, মণি। সব বুঝি। কিন্তু আমি যে মনঃস্থির করে ফেলেছি।"

"তা হলে আমাকেও মনঃস্থির করতে দাও। তুমি যখন আত্মহত্যা করবে বলেই বদ্ধপরিকর তখন আমিও দু'দিন আগে থাকতে মুক্ত হই। তুমিও আমার স্বামী নও, আমিও তোমার স্ত্রী নই। তারপর তোমার সম্পত্তি তুমি যাকে খুশি লিখে দিয়ে যাও। আমি বলবার কে?"

আর্যবাবু হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। "তার মানে কী, মনীষা? তার মানে কী? কেন তুমি অমন কথা মুখে আনলে? আমি কি কোনো দিন অবিশ্বাসী হয়েছি? কোনো দিন অন্য নারী কামনা করেছি? কেন আমার যাবার আগে আমাকে এত বড় একটা দাগা দিতে চাও? আমাকে শান্তিতে যেতে দাও, মণি। আমি যে বড়ই বেদনা পাচ্ছি। তুমি সে বেদনায় প্রলেপ মাখাবে, না জ্বালা ধরিয়ে দেবে? সবই তো তোমার ও তোমাদের। চেতনা লুপ্ত হবার আগে তোমাদের ধন তোমাদের হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।"

২

একদিন আপিস থেকে ফিরে আর্যকুমার দেখলেন, মনীষা বাড়ি নেই। কেউ বলতে পারল না, তিনি কোথায় গেছেন ও কখন ফিরবেন। একা একা চা খেলেন। তারপর একে একে টেলিফোন করলেন। "মা? না, মা তো এদিকে আসেননি।" উত্তর পেলেন একে একে। তারপর আরো কয়েক জায়গায় টেলিফোন করলেন। "মিসেস নন্দী? না, মিসেস নন্দী তো এখানে নেই।" হয়রান হলেন আর্যবাবু। হাল ছেড়ে দিয়ে ডাইভানে গড়িয়ে পড়লেন।

সেদিন সিনেমায় শোপ্যাঁর জীবনচরিত। অভিনয় করবেন পল মুনি। উচ্চাঙ্গের সংগীত হবে। কথা ছিল দু'জনে একসঙ্গে বেরোবেন। একসঙ্গে বসে ছবি দেখবেন। বাজনা শুনবেন। নয়ন ও শ্রবণ পরিতৃপ্ত হলে রসনার পরিতৃপ্তির জন্যে হোটেলে যাবেন। আগে থেকেই রিজার্ভ করা হয়েছে সিনেমার বক্স, হোটেলের টেবিল। কন্যা ও জামাতারাও যোগ দেবে।

একা একা যাওয়া যায় না। অস্থির হয়ে উঠলেন আর্যকুমার। গোসল করে ড্রেস করতে গেলেন এই ভেবে যে, ইতিমধ্যে মনীষা

এসে তাড়াহুড়ো বাধিয়ে দেবেন ঠিক। ও-রকম আগেও হয়েছে। মনীষার ধারণা, তৈরি হতে পুরুষরাই বেশী সময় নেয়। নেহাত ভুল নয়। দাড়ি কামানোর বালাই তো মেয়েদের নেই। তারপর ইংরেজী মতে ড্রেস-শার্ট পরতে যে কসরৎটা করতে হতো সেটা ইদানীং চুড়িদার পায়জামা চড়াতে গিয়ে হয়। বেয়ারার সাহায্য তাতে অপরিহার্য ছিল না, এতে অপরিহার্য। কী কল বানিয়েছে জবাহর কোম্পানি! খামোকা এই গরমে কালো শেরোয়ানী চাপিয়ে নিজের গলা টিপে নিজেকে মারতে হবে। না পরলে নয়। নন্দী হলেন জাতীয়তাবাদী বণিক।

না। মনীষার ফেরবার লক্ষণ নেই। তিনি কি তবে সরাসরি সিনেমায় গেছেন? সেইখানে দেখা হবে। হতে পারে। অসম্ভব নয়। কিন্তু এমন যদি হয় যে, আর্যকুমার সিনেমায় গেলেন আর তার পরেই মনীষা বাড়ি ফিরলেন, তখন? কী সমস্যা, বলুন দেখি! এর কী সমাধান আছে খুঁজে পাওয়া দায়। টিকিটগুলো আর্যকুমারের কাছে। সেগুলো তিনি গাড়ি করে ড্রাইভারের হাতে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, "মেমসাহেব যদি পৌঁছে থাকেন আমাকে এসে নিয়ে যেও। আর নয়তো এমনি ফিরে এসো খবর নিয়ে।"

মনীষা সে রাতে বাড়ি ফিরলেন না। সিনেমাতেও তাঁকে পাওয়া গেল না। কখনো এ রকমটি হয়নি। তবে কি তিনি রাগ করে বাপের বাড়ি গেছেন? টেলিফোনে উত্তর এলো, "কই, না?" পুলিস কমিশনার ছিলেন নন্দীর বন্ধু। তাঁকে রিং করতে হলো। তিনি বললেন, "অ্যাকসিডেন্ট হয়ে থাকলে এতক্ষণে আমরাই আপনাকে জানাতুম। আর কোনো থিয়োরি আপনার পক্ষে সম্মানের নয়। সুতরাং ধৈর্য ধরুন। শুতে যান।"

দুর্দিনের রাত পোহাতে চায় না। রাত-ভর অনিদ্রা। সকালে নিজের লোক পাঠিয়ে চার পাঁচখানা খবরের কাগজ আনিয়ে নিলেন। কাগজ হরকরার জন্যে সবুর সইল না। তন্ন তন্ন করে পড়লেন। কোথাও মনীষার বা সে রকম কারো উল্লেখ নেই। আশ্বস্ত হলেন। তা হলে দুর্ঘটনা নয়। অন্তত একটা থিয়োরি বর্জিত হলো। কলকাতা শহরে ও আশে-পাশে যতগুলো মেন্টাল হোম ছিল প্রত্যেকটাতেই গোপনে গোপনে সন্ধান করলেন তিনি। কোনো ফল হলো না। তা হলে আরেকটা থিয়োরি বর্জন করতে হয়।

মানুষটা তা হলে গেল কোথায়? শূন্যে মিলিয়ে গেল? আর্যবাবু এর রহস্যভেদ করতে পারলেন না। অসহায় বোধ করতে লাগলেন। আবার পুলিস কমিশনারকে ফোন করলেন। কেউ বে-আইনীভাবে আটক করে রাখেনি তো? আমেরিকার মতো নিষ্ক্রিয় চক্র। পুলিস কমিশনার বললেন, "এ দেশে ওরকম হয় না। আপনি ধৈর্য ধরুন। আপিসে যান।" এখন বাড়ির চাকরদের তিনি বোঝাবেন কী? মিছে কথা বলতে হয়। মেমসাহেব গড়পারে তাঁর বাপের বাড়ি গেছেন। দাদার অসুখ। কবে ফিরবেন কিছু ঠিক নেই।

কিন্তু মেয়েরা যখন টেলিফোনে খবর নেয় তখন মিছে কথা বলতে পারেন না। গলাটা কেঁপে যায়। ওরাও উৎকণ্ঠিত। দুবার তো সশরীরে এসে উপস্থিত হলো বাড়িময় বেশ করে খুঁজে দেখতে। কে জানে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছেন কি না। বড় বড় আলমারি খুলে ঝোলানো কোটে টান দেয়, খাটের তলায় উঁকি মারে। স্নানের ঘর তো এমনিতেই খোলা পড়ে আছে। বন্ধ রুম যে বাইরে থেকে তালাবন্ধ। তবু সে-সব ঘরও তল্লাস করা হয়। চাকরদের চোখে ধুলো দেওয়া শক্ত। সব জানাজানি হয়ে যায়। বড় মেয়ে পুষ্প এসে অনর্থ বাধায়। চাকরদের ধমকায়। আবার বকশিসের লোভও দেখায়। একই মুখে নরম গরম। চাকররাও একজন আরেকজনকে শাসায়। আবার খোসামোদও করে।

খবরটা আরো ছড়ায়। পড়শীদের কানে পৌঁছয়। আর্যবাবুর লজ্জার পরিসীমা রইল না। প্রতিবেশিনীরা এসে উদ্বেগ জানিয়ে যান। প্রতিবেশীরা কৌতূহল। ইলোপমেন্টের মতো শোনায় না। বয়স যে চল্লিশের ভুল দিকে। তা সত্ত্বেও কারো কারো চোখে সন্দিগ্ধ চাউনি। আর্যবাবুর মর্মে বেঁধে। তিনি লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেন। মদ। মদ ছাড়া মানুষের বন্ধু কে আছে!

এই পরিস্থিতিতে যা কিছু করা সঙ্গত ও সম্ভব সমস্তই করা হলো। কিন্তু নিরুদ্দিষ্টার সন্ধান মিলল না। সকলেই ধরে নিল যে, তিনি কলকাতায় নেই, পশ্চিমে বা দক্ষিণে চলে গেছেন। সর্বত্র চিঠি লেখা হলো, দূত পাঠানো হলো। তবে কাগজে ছবি ছাপানো হলো না, বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো না। আত্মহত্যার থিয়োরি ধরেও নদীনালা অন্বেষণ করা হলো। তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না।

বাড়ির সরকারমশায়—নেপালবাবু তাঁর নাম—একদিন সবিনয়ে নিবেদন করলেন, "সার, সবই তো একে একে করা গেল। কোনো ফল হলো কি?"

"না। সব নিষ্ফল।" নিষ্প্রাণভাবে সাড়া দিলেন আর্য।

"সার, আপনি তো কিছু মানবেন না। আপনাকে ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি?"

"নির্ভয়ে বলুন।"

তখন নেপালবাবু প্রস্তাব করলেন, "এবার নখদর্পণ করলে কেমন হয়?"

"নখদর্পণ!" বিস্মিত হলেন নন্দী। "সে আবার কী!"

সে যে কী জিনিস তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ময়মনসিং জেলা থেকে এক মুসলমান এলো, তার সঙ্গে একটি ছোট মেয়ে। বয়স আট-দশ হবে। কলকাতা শহর সে এর আগে দেখেনি, যেটুকু পথে পড়ে সেইটুকুই তার দেখা। হাওড়ার পোল, হাওড়া স্টেশনের দালান, খড়্গপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, পুরীর মন্দির, পুরীর সমুদ্রতীর, সিংহাচলমের পাহাড়, এসব কোনো দিনই তার চোখে পড়েনি, পড়ার কথা নয়। তার মাথায় আসতে পারে না, তার কল্পনার অতীত। এক হতে পারে, তার বাপের হিপনোটিক ক্ষমতা তার উপর ভর করেছিল। বাপের মনের কথাই তার মুখে ফুটছিল।

"কী দেখতে পাচ্ছ?" প্রশ্ন করলেন আর্যবাবু।

মেয়েটি তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নখের উপর দৃষ্টি রেখে উত্তর দিল, "একটা মেয়েলোক।"

"কী রকম দেখতে?" জেরা করলেন তিনি।

"খুব সুন্দর দেখতে।" মেয়েটি একটু বর্ণনাও করল।

"কত বয়স? বিশ একুশ বছর?"

"না। আরো বেশী।"

"ত্রিশ বত্রিশ?"

"আরো বেশী।"

"চল্লিশ প'য়তাল্লিশ?"

"হবে। একটা বাস গাড়ি।" মেয়েটি যেন দেখতে পাচ্ছিল সামনে।

"বাস গাড়ি? ট্রামগাড়ি নয়?" আবার তেমনি জেরা।

"না। এঁকে-বেঁকে চলে। একটা পোল। দুদিকে নদী।" বর্ণনা দিল মেয়েটি।

এইভাবে চলল অনেকক্ষণ। আর্যবাবুর প্রশ্ন আর মেয়েটির উত্তর। মেয়েটির উত্তর যে সরকারমশায়ের শেখানো নয় কিংবা এ বাড়ির আর কারো, সেবিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন আর্য। কিন্তু একটা তথ্য তিনি লক্ষ করলেন। মেয়েটি প্রত্যেকবার উত্তর দেবার আগে বাপের দিকে তাকায়। যেন মনে মনে শুধায়, এবার কী জবাব দেব, বাপজান? অথচ বাপের চোখে মুখে কোনো রকম ইশারা বা ইঙ্গিত নেই। লোকটি সমানে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে।

পাহাড়ের বর্ণনার পর মেয়েটি হাল ছেড়ে দিল। বাপ বলল, "হুজুর, ও আজ কিছু খায়নি। আর পারছে না। ওকে ছুটি দিতে মেহেরবানী হোক।"

"আচ্ছা, পরে আবার হবে", বলে সেদিন-কার মতো নন্দী সাহেব উঠলেন।

পরের দিন তাঁর অভিপ্রায় ছিল লোকটাকে অন্যত্র সরাবেন। তারপর মেয়েটিকে প্রশ্ন

নৈবেদ্য
প্রার্থিত কোনো বিষয়ে সফলতা লাভ করলে, ব্যষ্টিগতভাবেই হোক আর গোষ্ঠীগতভাবেই হোক, আমরা সকলেই চাই অর্ঘ্য-নিবেদনের মধ্য দিয়ে অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে। পশ্চিমবঙ্গের নানা অভাব। সে অভাব দূর করতে পশ্চিমবঙ্গবাসী অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। সাহস ও আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে একটি একটি করে বাধা অতিক্রম করে,—কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, পরিবহন এবং অন্যান্য বহুক্ষেত্রেই তাঁরা এনেছেন বিশেষ সাফল্য।
পশ্চিমবঙ্গবাসী এই দিয়েই সাজিয়েছেন তাঁদের অর্ঘ্যের ডালি। দ্বিগুণ কর্মশক্তি লাভ করে যাতে আরো কঠিন কাজ করতে পারেন—সেই হলো তাঁদের প্রার্থনা।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত
WBF-1-59.

করবেন। নতুন সব গোপনীয় প্রশ্ন। যথা, আর কেউ ছিল কি? আর কোনো মেয়েলোক? আর কোনো মরদলোক? কেমন দেখতে? কত বয়স?

কিন্তু সরকারমশায় এসে খবর দিলেন যে, মেয়েটি মা'কে ছেড়ে থাকতে পারছিল না। বড় কান্নাকাটি করছিল। তার বাপ তাকে নিয়ে কাল রাত্রেই দেশে ফিরে গেছে।

আপদ গেছে। জীবনে কোনো দিন যা বিশ্বাস করেননি সেই জ্যোতিষী-গণনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একে তো এই বিপত্তি। এখন নখদর্পণের প্রভাবে হয়তো স্ত্রীকে সন্দেহ করতে শুরু করবেন। যা জীবনে কোনো দিন করেননি।

আর্যকুমার কিন্তু অকস্মাৎ একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন। তিনি তাঁর নিরুদ্দিষ্টা পত্নীর অনুসরণ করবেন। মেয়েদের ডেকে বললেন, "আমি নিজেই খোঁজ করতে চললুম। খোঁজ না পাওয়া অবধি ফিরব না। এ বাড়ির ভার রইল তোমাদের উপরে, আপিসের ভার ম্যানেজারের উপরে।"

বাড়ি থেকে কখন যে তিনি বেরিয়ে গেলেন কেউ দেখতে পেলো না। দুপুরের পরে তখন চাকরবাকর আউটহাউসে শুয়ে বিশ্রাম করছে। গেটে অবশ্য দারোয়ান ছিল, কিন্তু তাকে তিনি সিগারেট কিনতে পাঠিয়েছিলেন। ড্রাইভার গাড়িবারান্দায় গাড়ির ভিতরে শোবার জায়গা করে নিয়েছিল। সাহেবকে সে টিফিনের পর আপিসে ফের নিয়ে যাবে। কেন যে তাঁর দেরি হচ্ছিল সে বুঝতে পারছিল না। ঝিমচ্ছিল।

"সর্দার ভাই!" দারোয়ান বলল বড় বেয়ারাকে। "সাহেবকে তো ডেকে সাড়া পাচ্ছিনে।"

বেয়ারা তাড়াতাড়ি মাথায় পাগড়ি দিয়ে ছুটল। ড্রাইভার বলল, "আমিও তো ডেকে সাড়া পাচ্ছিনে।"

না। সাহেব কোথাও নেই। সর্দার অতি পুরাতন ভৃত্য। সে সব দেখেশুনে বলল, "সাহেব তো কিছুই নিয়ে যাননি। খালি হাতে গেছেন। তাঁর পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি আর কাবলী জুতো, কোথাও বেড়াতে গেছেন। একটু বাদে ফিরবেন।"

আহা, সেই ময়মনসিংহের মেয়েটি সেখানে ছিল না। থাকলে তার নখদর্পণে দেখতে পেতো—একটা লোক। না, মেয়েলোক না, মরদ লোক। দেখতে ডাগর। দোহারা। বয়স? না, বিশ একুশ না। ত্রিশ বত্রিশ না। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ না। আরো বেশী। একটা বাস গাড়ি। না ট্রামগাড়ি না। এঁকে বেঁকে চলে। একটা পোল। মস্ত বড় পোল। দুধারে নদী। না, মস্ত বড় নদী না। নদীতে ইস্টিমার। ঢের ঢের ইস্টিমার। একটা দালান। খুব বড় দালান। খুব বড় ঘড়ি। একটা রেলগাড়ি। আরেকটা রেলগাড়ি। আরো একটা রেলগাড়ি। রেলগাড়ি চিকরাচ্ছে। হুস্ হুস্। হুস্ হুস্। অনেক লোক। অনেক, অনেক লোক। রেলগাড়ি চলছে। চলছে, চলছে। অন্ধকার। বেবাক অন্ধকার। রেলগাড়ি চলছে। মানুষ ঢুলছে। অন্ধকার। ফরসা। পদ্মা। পদ্মা। বাঁ দিকে পদ্মা। বেবাক পানি। ডান দিকে পাহাড়। পাহাড়। ঢের ঢের পাহাড়। ইস্টিশন। রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে।

সিংহাচলমে গিয়ে আর্যকুমার মনীষার সন্ধান করলেন। যা ভেবেছিলেন তাই। বর্ণনা শুনে পান্ডারা বলল, "হাঁ, হাঁ, সেই রকম একজনকে দেখেছিলুম বটে।" কিন্তু কবে, তা নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ। কেউ বলে, এক মাস আগে। কেউ বলে, এক সপ্তাহ আগে। তিনি তৎক্ষণাৎ সিংহাচলম ত্যাগ করলেন।

মাদ্রাজ গিয়ে প্রথমে পার্থসারথি মন্দির। তারপর কপালেশ্বর মন্দির। যা মনে করেছিলেন তাই। বর্ণনা শুনে পান্ডারা বলল, "হাঁ, হাঁ, সেই রকম একজন এসেছিলেন বটে।" কিন্তু কবে ঠিক বলতে পারল না। কালবিলম্ব না করে আর্যবাবু পক্ষিতীর্থ অভিমুখে ছুটলেন। সেখানে দুটি সাদা চিলের আবির্ভাবের পূর্বেই তাঁর অন্তর্ধান ঘটল। কারণ সেই একই। তারপর পণ্ডিচেরী তিরুবান্নামালাই, তিরুপতি, কাঞ্চীপুরম, তাঞ্জোর, তিরুচিরাপল্লী, শ্রীরঙ্গম, মাদুরা, রামেশ্বর, ধনুষ্কোটি, কুমারিকা—যেখানেই যান সেখানেই খবর পান, হাঁ, হাঁ, সেই রকম একজনকে দেখা গেছে বটে, কিন্তু কবে তা ঠিক মনে নেই।

এতগুলো লোক যা বলছে তা কি বিলকুল মিথ্যা? নিশ্চয় এসেছিলেন মনীষা। যিনি এসেছিলেন তিনি আর কোনো বাঙালীর মেয়ে নন। আর কারও বর্ণনা তাঁর সঙ্গে মেলে না। বাংলাদেশে আর কোন্ মহিলা পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও তন্বী, ক্ষীণমধ্যা, ঘনকুন্তলা? খোঁপায় ফুলের মালা জড়াতে আজকাল অনেক বাঙালীর মেয়েকেই দেখা যায়, কিন্তু মাথায় তেল দেয় না এমন একজনও নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম মনীষা। সেইজন্যে তাঁর চুল অমন কটা। আর চুল অমন কটা বলেই তো পান্ডাদের কাছে ধরা পড়ে গেলেন। আর পান্ডারা ধরিয়ে দিল আর্যকুমারের কাছে। এখন হাতে-নাতে ধরতে পারলে হয়।

অত বড় একটা ম্যারাথন দৌড়ের পর আর্যবাবুর শ্রান্ত হবার কথা। কিন্তু জীবনে তিনি কোনো দিন শ্রান্তি মানেননি। তাঁর জীবনটাই একটানা একটা ম্যারাথন। লক্ষ্মীর পশ্চাতে। এবার তিনি ধাবমান গৃহলক্ষ্মীর পশ্চাতে। তিনি দম নিতে বসলে মনীষা কি আরো এগিয়ে যাবেন না? একেবারে হাতছাড়া হবেন না? তা হলেই হয়েছে।

কিন্তু পশ্চাদ্ধাবন করবেন যে, দক্ষিণ মুখে না উত্তর মুখে? দক্ষিণ দিকে সিংহল। উত্তর দিকে কেরল। কে জানে মনীষা কোন দিকে গেছেন! যদি উত্তরে গিয়ে থাকেন তবে দক্ষিণে যাওয়া বৃথা। আর যদি দক্ষিণেই গিয়ে থাকেন তবে উত্তরে যাওয়া নিরর্থক। আর্যকুমার জনে জনে শুধালেন কেউ তাঁকে দিশা দিতে পারল না। তিনিও মনঃস্থির করতে পারলেন না। দিনের পর দিন ভারতের শেষ স্থলবিন্দুটিতে গিয়ে পদচারণ করলেন। পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর, দক্ষিণে ভারত-মহাসাগর। তিন দিক থেকে তিন সাগরের ঢেউ এসে একই স্থানে ভেঙে পড়ছে। অথচ মিশে যাচ্ছে না। অপূর্ব! অপূর্ব!

সমুদ্রের বক্ষে অগণিত শৈল। তার একটিতে বসে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখতে কত লোক যায়। আর্যবাবুও যান। বঙ্গোপসাগরে সূর্যোদয়। আরব সাগরে সূর্যাস্ত। অপরূপ! অপরূপ! যতবার দেখেন ততবার দেখতে সাধ যায়। আর্যকুমার তো জগৎজোড়া সৌন্দর্যের দিকে কখনো ভুলেও দৃষ্টিপাত করেননি। এখন সে যেন তার প্রতিশোধ নিল। অপ্রতিরোধ্য সে আকর্ষণ। আগেই তিনি দিশাহারা হয়েছিলেন মনীষাকে না পেয়ে। নতুন করে দিশাহারা হলেন তিন সাগরের রঙ্গ দেখে। এক সাগরে উদয়লীলা অন্য সাগরে অস্তলীলা দেখে।

পিছুটান তাঁর এর মধ্যেই ঢিলে হয়ে এসেছিল। কলকাতার কথা মনে পড়ে বইকি, কিন্তু ফিরে যেতে রুচি হয় না। বাড়ি বানানোর হুকুম দিয়ে এসেছিলেন। হুকুম তামিল হচ্ছে কিনা জানতে আগ্রহ নেই। কার জন্যে বাড়ি? তাঁর নিজের জন্যে তো নয়। যার জন্যে সে কোথায়! বিজনেস কেমন চলছে খবর নিতেও তাঁর কৌতূহল ছিল না। ফেল করার মতো কারবার নয়। চালু থাকবেই। নেহাত চুরি-চামারি না হলেই হলো। ইউরোপীয়ান ম্যানেজার ও-জিনিস করবে না।

কন্যাকুমারীর মূর্তি অবলোকন করাও নিত্য কর্ম হয়েছিল। একদিন সেই মূর্তির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তাঁর চোখের উপর থেকে একটা পর্দা সরে গেল। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, এই নারীতেই আছে সেই নারী।

এর পরের ইতিহাস লালাবাবুর অনুরূপ। দেশ থেকে লোকজন এলো তাঁকে নিতে।

"কর্তা, আপনি বাড়ি ফিরে যাবেন না?"

"না। এখানে আমি আনন্দে আছি। সেখানে গেলে দুঃখ পাব।"

তাঁর মেয়েরা এলো তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে। তিনি ধরা দিলেন না। বললেন, "ফেরাটা আসল কথা নয়।

পাওয়াটাই আসল। এখানে পাচ্ছি। ওখানে পাব না। কাজেই যাব না। যদি পাই, যাব।"

ভিতরে ভিতরে তাঁর আশংকা ছিল যে, সময় বোধ হয় শেষ হয়ে আসছে। গণৎকারের উক্তি মিথ্যা নয়। কিন্তু কিছুকাল পরে তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর ভয়ডর চলে গেছে। তখন গণৎকারের কথা বিশ্বাস করেছিলেন ভেবে তাঁর হাসি পেলো। পাঁচ-জন আলাপীকে নিয়ে তাঁর সময় কেটে যায় কে জানে কোনখান দিয়ে। সময়ের হিসাব রাখতেও তাঁর সময় নেই। জানবেন কী করে সময় বেশী না সময় কম?

মনীষার অন্বেষণ কি তিনি ছেড়ে দিলেন? না, অন্বেষণ চলছিল অবিরাম: কিন্তু মানচিত্র ধরে মাটির উপর নয়। ঘড়ি ধরে সময়ের ভিতরে নয়। কেন, তাড়া কিসের? তিনি কি দু'মাস পরেই মরছেন যে তাঁকে মরি কি পড়ি করে ছুটতে হবে? যারা সময়ের সুমারি রাখে, ঘড়ি ধরে পথ চলে, তারা অন্বেষণের কী জানে!

শান্তিতে ছিলেন আর্যকুমার। কোথাও যাবার তাড়া নেই। কিছু একটা করবার তাগিদ নেই। সারা জীবনে এই প্রথম সত্যিকারের ছুটি। দেশ থেকে চিঠি আসে। কেউ তাঁর জন্যে বসে নেই। কিছুই তাঁর জন্যে বসে নেই। এর চেয়ে সুখবর আর কী হতে পারে! আগে যে মনে হতো, তাঁর অবর্তমানে সবাই উচ্ছন্ন যাবে, সব বরবাদ হবে, এ কথা ভেবেও তাঁর হাসি পায়।

মেয়েরা জোর করে একটি চাকর পাঠিয়েছিল তাঁর কাছে থাকতে ও তাঁর সেবা করতে। বিপিন তার নাম। সে একদিন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "বাবু! টেলিগ্রাম।"

টেলিগ্রামখানা অশুভসূচক নয় তো? খুলতে গিয়ে আর্যবাবুর হাত কাঁপছিল। খুলেই তিনি বিপিনকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন। নইলে পড়ে যেতেন।

মনীষার টেলিগ্রাম। উনি মঙ্গলবার পৌঁছবেন।

বার বার পড়ে তৃপ্তি হলো না। মুখস্থ হয়ে গেল পাঠাবার তারিখ, ঘণ্টা, মিনিট, ডাকঘরের নাম। হিসাব করে দেখা গেল, মঙ্গলবার পৌঁছতে হলে কলকাতা থেকে রেলপথে নয়, আকাশপথে আসতে হবে মাদ্রাজ। তারপর রেলপথে। বাকীটুকু মোটরে। আর্যবাবুর আর তর সইছিল না। তিনি এক ভদ্রলোকের অনুগ্রহে তাঁর মোটরে লিফ্‌ট্‌ পেয়ে নিকটতম রেলস্টেশনে চললেন। পঞ্চান্ন মাইল দূরে।

মনীষা তাঁর স্বামীকে পথ ফুরোবার আগে তিরুনেলবেলি স্টেশনে প্রত্যাশা করেননি। প্রথম চমকটা তাঁরই।

দু'জনেই নির্বাক। সাশ্রুনেত্র। উদ্বেল-হৃদয়। মন্থরচরণ। অন্যমনস্ক।

প্রাণ খুলে কথা বলার অবসর যখন হলো তখন দু'জনে দু'জনকে শোনালেন গত সাত মাসের বৃত্তান্ত। সাতটা মাস তো নয়, সাতটা বছর। না শতাব্দী?

মনীষা কলকাতা শহরেই ছিলেন গা ঢাকা দিয়ে। এক গুজরাতী পরিবারে গভর্নেস হয়ে। তাঁদের কাছে তিনি পাটনার সাবিত্রী সিন্‌হা।

"এত নাম থাকতে সাবিত্রী কেন?"

"কেন?" মনীষা বলবেন কি বলবেন না করতে করতে বলে ফেললেন, "আমি যে সাবিত্রীর মতো প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, তোমাকে যমের অধিকার থেকে ফিরিয়ে আনব। এ-কালের সাবিত্রীর পদ্ধতি সেকালের সাবিত্রীর মতো নয়। তোমাকে অত বড় একটা শক না দিলে তোমার মরণপ্রস্তুতি বাধা পেতো না। তোমাকে অমন করে না ঘোরালে তোমার অন্য দিকে মতি যেতো না।"

"ঘোরানোর মূলে তো নখদর্পণ?"

"নখদর্পণের মূলে আমি। সরকারমশায় আমারই লোক।"

নন্দী অবাক হলেন। "বল কী! নেপাল--বাবু সমস্ত জানতেন, অথচ আমাকে জানান নি? এমন নেমকহারাম কি দুটি আছে!"

"না। অমন পরম বান্ধব দুটি নেই। কাউকেই তিনি জানতে দেননি। মেয়েদেরও না। জামাইদেরও না। প্রতি সপ্তাহেই আমাকে তোমার খবর পাঠাতেন গোপনে।"

"প্রতি সপ্তাহেই!" বিশ্বাস করলেন না আর্য। "সিংহাচলম, মহাবলিপুরম, এসব জায়গার খবর তিনি কার কাছে পাবেন যে তোমাকে পাঠাবেন?"

"কেন, তুমিই তো আপিসে টাকার জন্যে টেলিগ্রাম করতে। একসঙ্গে বেশী টাকা চাইতে না। কিন্তু চাইতে নতুন নতুন জায়গা থেকে। আমি তো ভেবেছিলুম কুমারিকায় তুমি তিন চার দিনের বেশী থাকবে না। হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস থাকলে দেখে ভাবনায় পড়ে গেলুম। অসুখ-বিসুখ হয় তো? লোকজন পাঠালুম তোমাকে ঘরে ফেরাতে।"

আর্যকুমার তখন বললেন তাঁর অন্তরঙ্গ উপলব্ধির কথা। এই নারীতে আছে সেই নারী।

"ওমা, তাই নাকি! আঁ! বল কী! সেইজন্যে কন্যাকুমারীকে ছাড়তে চাওনি? আমি নিজে না গেলে দেখছি তোমাকে নড়ানো যেতো না?" মনীষা শিউরে উঠলেন।

"আমিও প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে তোমাকে ধরতে না পেলে ফিরব না, নড়ব না। অমনি করে পেয়ে গেলুম তোমার সন্ধান। যে-তুমি বিশুদ্ধ নারীসত্তা। এস, নতুন করে বাঁচি।"

ওঁরা দুই তরুণ-তরুণী কলকাতা ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেলেন নতুন করে বাঁচতে। সময় ওঁদের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রেমেন্দ্র মিত্র
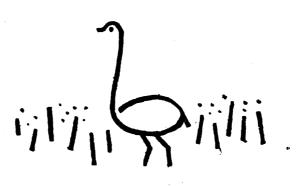
কোন্ মুলুকে চরে জানো,
ভস্মলোচন হায়না?
মড়া চিবোয়, আধমরাদের;
জ্যান্ত, ভয়ে খায় না!

জ্যান্ত এবং মরায় যেথায়
তফাৎ নাই,
হায়না হাসে সেই শ্মশানে
শুনতে পাই।

ও মড়া তুই জাগবি নে?
থাকবি গাদা ডাঁই বিনে!
নিজের খুলি খুলে ধরে'
পরম কারণ চাখ্‌বিনে?
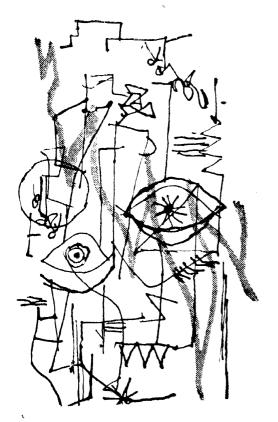
ভস্মলোচন হায়না
সব মুলুকেই স্যায়না!
লক্‌লকে জিভ্ বুলিয়ে বেড়ায়,
যেথায় তাকায় সব-ই পোড়ায়,
নিজের মুখে চায় না।

ও মড়া তুই জ্যান্ত হ,
আন দেখি সেই আয়না,
নিজের চোখে-ই নিপাত ডাকুক
ভস্মলোচন হায়না।

শব জাগানো মন্ত্র দেবে
কোন কাপালিক ভৈরবী?
অরণ্যে সার করুণ রোদন
ছড়া কেটেই যায় কবি।

সায়ন্তনী

সুবোধ ঘোষ

এক সন্ধ্যায় ফুটেছিল যে মল্লিকা; আর-এক সন্ধ্যায় ফুটে উঠলো সেই মল্লিকার বিয়ের ফুল।

অনেক আলো জ্বলছে, শানাই বাজছে, আঙিনায় আলপনা আঁকা হয়েছে, লোক-জনের ব্যস্ততা হৈ-হৈ করছে; কলকাতার ননীকাকা এসেছেন। বর্ধমানের চারুমামাও এই কিছুক্ষণ আগে পৌঁছেছেন। চারুমামার বড় মেয়ে পারুলদি, যাঁকে জীবনে কোনদিন দেখেনি মল্লিকা, তিনিও এসেছেন। রঙীন বেনারসী জড়িয়ে আর কপালে চন্দনের লবঙ্গ-তিলক এঁকে একটা শাঁখ-বাজানো সংকেতের অপেক্ষায় ঘরের ভিতরে মেঝের উপর একটা আসনের উপর বসে আছে মল্লিকা। কাজল দেওয়া চোখের কোলে লজ্জাঘন ভীরুতা, কিন্তু মুখটা হাসি ঝরাচ্ছে। এইরকম একটা উৎসবের রূপ ফুটে উঠলেই ত বিয়ের ফুল ফুটে যায়।

সেই জ্যেঠামশাই আজ আর নেই, এই মল্লিকা নামটাই যাঁর দেওয়া নাম। আজ তিনি থাকলে নিজেরই চোখে দেখতে পেতেন, তাঁর একটা ভবিষ্যৎবাণী কত সার্থক হয়েছে। সেই সন্ধ্যার সেই ফুটফুটে আর ধবধবে সাদা এইটুকু একটা মল্লিকা আজ সন্ধ্যায় সত্যিই যেন শত রঙে রঙীন একটি নতুন রূপের মল্লিকা হয়ে গিয়েছে। বলেছিলেন জ্যেঠামশাই, আমি এখনই বলে দিচ্ছি, এ মেয়ে হলো রূপচোরা মেয়ে; এখন দেখে কিছুই বুঝতে পারবে না, কিন্তু বুঝবে তখন, যখন বড়টি হবে এই মেয়ে। রূপ তখন এমন রঙ খুলবে যে, দেখনেওয়ালার চোখের পলক পড়বে না।

একটু অদ্ভুত মানুষ ছিলেন সেই জ্যেঠা-মশাই। এই আমতলা হাটেরই স্টেশনের কাছে একটা চালের আড়তে কাজ করতেন। মাথাভরা টাক আর মুখভরা দাড়ি, রোগাটে চেহারার ছোটখাট মানুষটি। আড়তের খাটুনি থেকে একটু ছুটিছাটা পেলেই সারা-দিন কালিদাস পড়তেন।

বাড়ির পিছনে ডোবার মত দেখতে ঐ পুকুরটারই পাশে নিজের হাতে ফুলের বাগান করেছিলেন জ্যেঠামশাই। রাত্রিবেলা বাগানের শিউলিগুলোর দিকে তাকিয়ে আর হেসে হেসে বলতেন—আহা! রজনীহাসিনী শেফালিকা! সকালবেলায় শালুকগুলোর দিকে তাকিয়ে বলতেন—প্রভাতকিরণবন্দিতা নলিনী।

আরও কত কি বলতেন। বসন্তানিলপ্রিয়া মাধবী, সায়ন্তনী মল্লিকা!

হ্যাঁ, জ্যেঠামশাইয়ের বাগানের মল্লিকা সন্ধ্যাবেলাতেই ফুটত। কাজেই, চালের

আড়তের কাজ সেরে সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরেই যখন শুনলেন যে, যোগেশের একটি মেয়ে হয়েছে, তখন একেবারে আঁতুড়ঘরের দরজার কাছে এসে আর সদ্যোজাতা ভাইঝিকে দেখে তখনই নাম দিয়ে দিলেন—সায়ন্তনী মল্লিকা।

জ্যেঠামশাই নিজে অবশ্য মল্লিকাকে সায়ন্তনী বলেই ডাকতেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকার সায়ন্তনী নামটাও চলে গিয়েছে। থেকে গিয়েছে শুধু মল্লিকা।

বলেছিলেন জ্যেঠামশাই, মেয়েটা যদি রাত্রিবেলা জন্ম নিত, তবে নাম দিতাম শেফালিকা। সকালবেলায় হলে, নলিনী। বসন্তকালে হলে, মাধবী। বর্ষাকালে হলে, কেতকী। আর...!

শালুর কাপড়ে বাঁধানো কালিদাসের পাতা ওলটাতে থাকেন জ্যেঠামশাই।

মল্লিকার বয়স যখন প্রায় পনর, তখনও বেঁচে ছিলেন জ্যেঠামশাই। কিন্তু সে মল্লিকার চেহারার রকম দেখে মল্লিকার মা মাঝে মাঝে দুঃখ করতে গিয়ে হেসেই ফেলতেন।

—এত কাব্যি করে বড়দা কী যে বললেন! আর কী যে হলো! সিঁটকে সিড়িঙ্গে আর গাল-ভাংগা, বড় হয়ে শ্রীমতীর রূপ ত এই দাঁড়িয়েছে।

মন্তব্যটা একদিন শুনতে পেয়েছিলেন জ্যেঠামশাই। শালুর কাপড়ে বাঁধানো কালিদাস হাতে নিয়ে প্রায় তেড়ে এসে বলেছিলেন —তুমি খুব ভুল বুঝেছ বউমা। সায়ন্তনী বড় হতে না হতেই তুমি এসব কথা কেন বলছো?

—আর বড় হবে কবে?

—না, এখনও বড় হয়নি সায়ন্তনী। এই বয়সটাকে বড়-হওয়া বয়স বলে না। এর ডবল বয়স হওয়া চাই।

—তার মানে তিরিশ?

—নিশ্চয়।

জ্যেঠামশাইয়ের একটা সাধের কল্পনা, কিংবা কল্পনার সাধ। কিন্তু তাও যে বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে। মল্লিকার বয়সটা তিরিশই হয়েছে, আর রূপটাও যে সত্যিই একটা রঙীন ফুলতা, দেখনেওয়ালার দুই চোখ অপলক করে দেবারই মত। কে বলবে এই চেহারা একদিন একটা সাদা সিঁটকে সিড়িঙ্গে চেহারা ছিল? বয়সটা যে তিরিশ হয়েছে, তাই বা বলবার সাধ্যি আছে কার?

কিন্তু শাঁখ বেজে উঠবার পরেই এত মুখর বিয়েবাড়িটা এত নীরব হয়ে গেল কেন? বর আর বরযাত্রীরা এসে যাবার পরেই যদি বিয়েবাড়ির উৎসবের প্রাণ এত স্তব্ধ হয়ে যায়, তবে তো সেই ভয়ানক সন্দেহটাই করতে হয়, ফোটা ফুল বোধ হয় ঝরে গেল।

মল্লিকাও যে তাই সন্দেহ করতে শুরু করে দিয়েছে। তা না হলে, এতক্ষণের মধ্যে একটা মানুষও মল্লিকার কাছে ছুটে আসে না কেন? যারা এতক্ষণ কাছে ছিল আর এত হাসছিল, তারা বর দেখবার জন্য সেই যে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল, যেন চলেই গেল; কেউ আর ফিরে আসে না কেন? কোথায় গেল ওরা, যাঁরা আর ধরা? বাসরঘরে হৈ-চৈ করবে বলে আগে থেকেই কোমরে আঁচল বেঁধে তৈরী হয়েছিল যারা দুজন? মা কোথায় চুপ করে লুকিয়ে রইলেন, যিনি এতক্ষণ ধরে এত কাজের চাপের মধ্যেও একটা আনমনা ব্যাকুলতার মত বার বার এসে শুধু মেয়ের মুখটি দেখেই যেন ধন্য হয়ে আবার চলে যাচ্ছিলেন? সেই পারুলদিই বা কোথায় সরে রইলেন, আর্টিস্ট পারুলদি, যিনি বলেছিলেন, বর এসে পড়লেই কেউ যেন তাঁকে জাগিয়ে দেয়। তিনি এসে নিজের হাতে মল্লিকার খোঁপাটাকে জুঁই-এর কুঁড়ির মালা দিয়ে নতুন ছাঁদে বেঁধে দেবেন। কেউ কি এখনও পারুলদিকে জাগিয়ে দেয়নি? বর তো এসে গিয়েছে।

তবে কি নতুন কোন দাবি তুলেছে বর-পক্ষ? সত্যিই কি বরপণ হিসাবে নগদ কয়েকশো টাকা ওরা পেতে চায়? কিংবা এসেই খোঁজ নিয়েছে, দানসামগ্রী হিসাবে যা দেবার কথা ছিল তা সত্যিই দেওয়া হচ্ছে কি না?

এরকম একটা কাণ্ড যে বাধতে পারে, সেটা একটু আগেই আঁচ করেছিলেন চারু-মামা। বাবাকে স্পষ্ট করে শুধিয়েছিলেন—ওরা যা বলেছে, সেটা স্পষ্ট করে বলুন যোগেশদা। পণ চাই না একথা কি সত্যিই ওরা বলেছে?

যোগেশবাবু বলেছিলেন—পণ চাই, এমন কথাও তো ওরা বলেনি।

—তার মানে এ নয় যে, ওরা পণ চায় না।

—আমি তা মনে করি না।

—বরপক্ষের মনস্তত্ত্ব আপনি কিছুই জানেন না, তাই এরকমটি মনে করে বসে আছেন। দেখবেন, ঠিক সময় বুঝে পণ দাবি করে ওরা চেপে ধরবে, আর আপনারই মত যুক্তি দেখাবে ঃ পণ চাই না, এমন কথা তো আমরা বলিনি।

—একথা বললে কী লাভ হবে ওদের? আমাকে কেটে ফেললেও তো টাকা বের হবে না।

—সেই জন্যেই ত বলছি যোগেশদা, ব্যাপারটা ওদের সঙ্গে স্পষ্টাস্পষ্টি আলোচনা করে একটু খোলসা করে নেওয়াই ভাল ছিল। শেষে বিয়ে নিয়েই একটা গণ্ডগোল না বাধে।

মল্লিকার দুশ্চিন্তার প্রশ্নগুলি ভীরু মনের বাতাসে যেন গুনগুন করে; বরপণের দাবি না হয় ওরা ছেড়েই দিল, কিন্তু দানসামগ্রীর চেহারাটা যদি ওরা আগেই দেখতে চায়, তবে কেমন করে পার পাবেন যোগেশবাবু? দানসামগ্রী বলতে ত এই; দুটো থালা, দুটো গেলাস আর দুটো বাটি। আর; একটা তোষক, একটা চাদর ও দুটো বালিশ।

মল্লিকা জানে, দান-সামগ্রীর ব্যাপারেও ওদের কোন দাবি ছিল না। বরের বাড়ির পিসির শুধু একটা অনুরোধ ছিল—দেখতে ভাল দেখাত যদি মেহগনির একটা পালঙ্ক দেওয়া হত।

—অবশ্যই দেব। চিঠি লিখে একেবারে স্পষ্ট ভাষায় এই প্রতিশ্রুতির কথা যে বর-পক্ষকে জানিয়ে দিয়েছিলেন বাবা, তাও মল্লিকার অজানা নয়।

মা অবশ্য বার বার বাবাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, কথা দিয়েও জিনিসটা না দেওয়া একটুও উচিত হচ্ছে না। যেমন করে পার, ধারের জন্য অনাদিবাবুর কাছে যদি আর-একবার হাত পাততে হয়, তাও ভাল।

বাবা বলেছিলেন—ধার পাওয়া যায় না।

মা রাগ করেছিলেন—তবে ওদের কথা দিয়েছিলে কেন?

বাবা একটুও রাগ না করে মার রাগটাকেই তুচ্ছ করলেন—ওটা একটা কথার কথা।

মা—কিন্তু শেষে যদি এ নিয়ে কোন কথা ওঠে আর কোন গণ্ডগোল হয়, তা হলে আমি কিন্তু...!
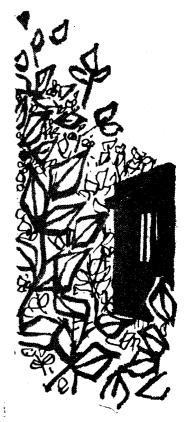
বাবা বলেন—হ্যাঁ, তা হলে আমাকে ফাঁসি দিয়ো তুমি।

এ ছাড়া আর এমন কি কারণ থাকতে পারে যার জন্যে বরপক্ষ এত বিরূপ হতে পারে? ভাল করে অভ্যর্থনা করা হয়নি? আসা মাত্র চা দেওয়া হয়নি?

তাই বা কি করে হবে? বরপক্ষকে অভ্যর্থনা করবার আর খাইয়ে-দাইয়ে সব রকমে তুষ্ট করবার দায় নিয়েছেন যিনি, তিনি হলেন ননীকাকা। শোনা যায়, এই জীবনে তিনি এযাবত পঞ্চাশেরও বেশি বিয়েতে বর, বরপক্ষ আর বরযাত্রীকে তুষ্ট করবার কাজে খেটেছেন। ননীকাকা নিজেও গর্ব করে বলেন, আমার হাতে পড়ে আজ পর্যন্ত কোন বর, কোন বরপক্ষ আর কোন বরযাত্রী অতুষ্ট থাকতে পারেনি। গোখরো সাপের মত মেজাজ, কত বরকর্তার হৃদয় গলিয়ে দিলাম!

বর, বরপক্ষ আর বরযাত্রীকে অভ্যর্থনা করতে সে ননীকাকার কাজে কথায় ও ব্যবহারে কোন ত্রুটি ঘটেছে, এটা যে কল্পনা করা যায় না। নিতান্ত অসম্ভব।

তবে আর কি কারণ থাকতে পারে? তবে বর আর বরপক্ষ কি এমন কোন সত্য জেনে ফেলেছে, যেটা গোপন রাখা হয়েছিল? তাই কি হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে উঠেছে, বর মানুষটার আশা আর বরপক্ষের বিশ্বাস? তাই কি ওরা রাগ করে যোগেশ দত্তের বাড়ির প্রথম উৎসবের আলো একেবারে নিভিয়ে দিতেই চায়?

মল্লিকার কাজল-দেওয়া চোখের কোণের লজ্জাটা হঠাৎ করুণ হয়ে যায়। শিউরে ওঠে চোখ দুটো। আয়নার দিকে তাকাতে আর ইচ্ছা হয় না।

ঠিকই ত, একটা সত্য গোপন রাখা হয়েছে। এর জন্য কিন্তু বাবাকে দায়ী করা যায় না। দায়ী হলেন মা আর জেঠিমা। বিয়ের কথা যখন চলছিল, মা আর জেঠিমাই বাবাকে বার বার মনে করিয়ে দিয়েছিলেন—ওরা মেয়ের বিষয় যা কিছু জিজ্ঞেস করবে, সবই ঠিক-ঠিক বলে দেবে; কিন্তু বয়সটা বলে দিও না।

—তার মানে?

বাবার বুদ্ধির উপর মা আর জেঠিমা, দুজনের কারও কোন আস্থা কোনদিন ছিল না। দুজনেই বলে দিলেন—তার মানে একটু কম করে বলে দেবে।

—পনর?

—না; আঠার বললেই চলবে।

আগে নিশ্চয় ওরা জানতে পারেনি; তা হলে আগেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত। এখানে এসে, মানুষের জীবনের একটা আশার শংখকে বেজে উঠবার সুযোগ দিয়ে, তারপর মানুষকে অপমান করবার এমন একটা নিষ্ঠুর কাণ্ড ওরাও করতো না।

বুঝুন এখন মা আর জেঠিমা, তাঁদের বুদ্ধির মিথ্যেটা কত মিথ্যে হয়ে গেল। বিয়ে করতে এসে, বিয়ের লগ্ন যখন আসন্ন, তখন এক ভদ্রলোক কত সহজে তাঁদেরই আদুরে মেয়ের বয়সটাকে কত সহজে অপমান করে দিল?

কিন্তু জেঠামশাইয়ের একটা ভবিষ্যদ্বাণীও যে মিথ্যে হয়ে গেল।

জেঠামশাই বলতেন ঃ কোন্ রাজপুত্তুর না সায়ন্তনীকে বিয়ে করতে চাইবে? কিন্তু তাই বলে আমাদের সায়ন্তনী কি তাকে বিয়ে করে ফেলবে? সেটি হবে না, কখ্খনো না। তোমাদের কারও পছন্দে নয়, নিজে পছন্দ করবে, তবে বিয়ে করবে সায়ন্তনী।

পছন্দ ত করেওছিল মল্লিকা। ওঘরে বসে আর বেশ জোরে জোরে চেঁচিয়ে, মল্লিকাকে শোনাবারই জন্যে, পাত্রের পরিচয় বর্ণনা করেছিলেন মল্লিকার বাবা যোগেশ দত্ত। সরকারী চাকরি করে পাত্র, বেহালাতে নিজের বাড়ি আছে, নামটা হল অনিরুদ্ধ রায়। বেশ দেখতে, বেশ স্বাস্থ্য, বেশ হাসি-খুশি মুখটি, এক কথায় বলা যায়...।

মা'ও বেশ খুশি হয়ে হাসেন। —একটু স্পষ্ট করেই শুনিয়ে দাও না, যা বলা যায়?

চেঁচিয়ে ওঠেন বাবা। —এক কথায় বলা যায়, বেশ মানুষটি।

বাবার চেঁচিয়ে-বলা এই সত্যের মধ্যে তবু কেমন-যেন একটা অস্পষ্টতা থেকে যাচ্ছে। তাই ঘরের ভিতরে চুপ করে দাঁড়িয়ে-থাকা মল্লিকার একলা মূর্তির মুখটা তবু হেসে উঠতে পারেনি। আরও একটা সত্য, যেটা জানবার জন্যে মল্লিকার আশার মনটা উৎকর্ণ হয়ে আছে, সেটাই যে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন না বাবা।

জেঠিমারও মনে বোধ হয় একটা খটকা লেগেছিল। তাই জিজ্ঞেসা করলেন—বেশ মানুষটি মানে কী?

—মানে, অনিরুদ্ধ ছেলেটি চমৎকার মানুষ।

হেসে ফেলেছিল মল্লিকা। সেই ভয়ের ছায়াটা সরে গেল। মল্লিকার আশাও নিশ্চিন্ত হয়ে গেল।

অনিরুদ্ধকে জীবনে কোনদিন দেখেনি মল্লিকা। অনিরুদ্ধর কোন ফটোও বাবা নিয়ে আসেন নি। কিন্তু মল্লিকার বিহ্বল চোখ দুটো যেন অনিরুদ্ধর হাসি-খুশি মুখটাকে দেখতে পেয়েছে।

কত সম্বন্ধ এসেছে আর চলে গিয়েছে। যেন যোগেশ দত্তের দারিদ্র্যের ভয়ানক চেহারাটাকে দেখেই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল যত ঘটকালির উল্লাস। যোগেশ দত্তের মেয়ের চেহারাটাকে দেখেও ত কোন সম্বন্ধের করুণা হয়নি। লেখাপড়া বলতে কিছুই জানে না বলা চলে, শুধু একটা সুন্দর চেহারা, তাকে ঘরের বউ করে নিয়ে যাবার জন্য পৃথিবীর ভাল-ভাল ঘরগুলির কেউই রাজি নয়। এমন কি কলতার বসুবাড়ি, যাদের সেকেলে বড়-মানুষিপনার দালানটা জীর্ণ হয়ে প্রায় ভেঙে পড়েছে, সে বসুবাড়ির ইচ্ছাটা অনেক দূর এগিয়ে এসেও শেষে পিছিয়ে গেল। যোগেশ দত্তর মত এত দরিদ্র একটা কুটুম্ব পেতে বসুবাড়ির ভাঙ্গা দালানটাও রাজি নয়।

অনেক বিয়ের প্রস্তাব যে ফিরিয়ে দেওয়াও হয়েছে। যেমন টালিগঞ্জের ভরতবাবুর ছেলের সংগে মল্লিকার বিয়ের প্রস্তাবটা। ছেলে একটা চায়ের দোকানে কাজ করে। মা আর জেঠিমা চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—তা হয় না। এর চেয়ে মেয়েকে সন্ন্যাসিনী করে একটা মঠে রেখে দিয়ে এলেই ত হয়।

মল্লিকার মনটাও ভয় পেয়ে শিউরে উঠেছিল—ছিঃ, এমন বিয়ের আগে মরে যাওয়াই ভাল।

আশা আশাভংগ ভয় আর আপত্তি: এই নিয়েই বছরের পর বছর পার করে দিতে দিতে মল্লিকার বয়সটা তিরিশে এসে ঠেকেছে। মল্লিকার জীবনটা একটু হতাশ হয়ে পড়লেও ভাগ্যটা যে একটুও হতাশ হয়ে পড়েনি, তার প্রমাণ বেহালার অনিরুদ্ধ, যে আজ আমতলা হাটের সবচেয়ে গরিবের একটা দুশ্চিন্তিত সংসারের আঙিনায় সুন্দর একটি উৎসব জাগিয়ে দিয়ে মল্লিকার হাত ধরতে এসেছে।

কিন্তু এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে, আর কোন সন্দেহ নেই, মল্লিকার ভাগ্যটাকে ঠাট্টা করবারই জন্য এসেছে অনিরুদ্ধ নামে একটা শখের বিদ্রোহ। বিয়ে হবে না। এই বেনারসী ছাড়তে হবে। চন্দনের লবঙ্গ-তিলক মুছে ফেলতে হবে। আর্টিস্ট পারুলদিকে জাগিয়ে তোলার আর কোন দরকার নেই।

এইবার শুনতেও পেল মল্লিকা; চেঁচিয়ে উঠেছেন চারুমামা। —না, এ বিয়ে হবে না।

তার পরেই বাড়ির আঙিনায়, এঘরে-ওঘরে আর দাওয়ার আনাচে কানাচে নীরব মানুষের এক একটা জটলার বুক থেকে একটা গম্ভীর আক্ষেপের সোরগোল যেন উথলে ওঠে। —না, এ বিয়ে হতে পারে না।

—কখ্খনো না।

—হওয়া উচিত নয়।

—হতেই দেওয়া হবে না।

চমকে ওঠে মল্লিকার বেনারসী জড়ানো মূর্তিটা। সোরগোলের ভাষাটা যে অদ্ভুত একটা রহস্যের ভাষা। অনিরুদ্ধ নয়, উৎসবেরই বাড়িটা যেন ইচ্ছে করে বিয়েটা ভেঙে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

এইবার ছুটে এসে ঘরের ভিতরে ঢুকে, মল্লিকার একলা মূর্তিটার বিমূঢ়তা চমকে দিয়ে চারুমামা চেঁচিয়ে ওঠেন—একটা কাণ্ডই করেছেন যোগেশদা। ছিঃ।

—কী ব্যাপার মামা? ভয়ার্ত চোখ দুটো অপলক করে বিড়বিড় করে মল্লিকা।

—লোকটার বয়স পঞ্চাশের কম নয়।

মা আর জেঠিমাও ছুটে এসে ফোঁপাতে থাকেন। —আমরা ত কখনো এমন সন্দেহ করতেই পারিনি যে...।

চারুমামা ধমক দিয়ে বল্লেন—কেন পারেন নি?

মা বলেন—ওর কথা থেকে ধারণা হয়েছিল......।

—ধন্যি আপনাদের ধারণা। আর ধন্যি যোগেশদার কথা!

—তা ত হলো; কিন্তু এখন কি উপায় হবে চারু?

মল্লিকাই চেঁচিয়ে ওঠে। —না, কোন উপায় হবে না। বিয়ে হবে না। তোমরা সবাই দয়া করে এখন একটু চুপ কর।

তোয়ালেটা হাতে তুলে নিয়ে যেন চন্দনের লবঙ্গ-তিলক দিয়ে আঁকা একটা অভিশাপের ঠাট্টাকে এই মুহূর্তে মুছে দিয়ে কপালের জ্বালা জুড়িয়ে দেবার জন্য তোয়ালেটাকে হাতে তুলে নেয় মল্লিকা। চারুমামা বাধা দিয়ে মল্লিকার হাতটা শক্ত করে ধরে ফেলেন। চারুমামার চোখ দুটোও ছলছল করে। —থাম মল্লিকা।

—কেন?

—একটু ধৈর্য ধর।

—কেন?

—একটু অপেক্ষা কর।

—কি ছাই বলছেন মামা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

—আমার বিশ্বাস, বিয়ে হয়ে যাবে।

—তার মানে?

—তার মানে, নেহাৎকার ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে নয়। অন্য কারও সঙ্গে।

—না; যাকে-তাকে ধরে নিয়ে এসে পিঁড়ির ওপর বসিয়ে দেবেন, আর আমি বেহায়ার মত...।

—না না, যাকে-তাকে ধরে এনে বসাবো কেন? একজন সৎপাত্রকেই নিয়ে এসে বসাবো।

—না, তা হয় না, হবে না। ওসব কাণ্ড থিয়েটারেতেই সম্ভব হয়। আপনি মিছে চেষ্টা করবেন না।

—আপত্তি করিস না মল্লিকা। চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

—দশ বছর ধরে ত কত চেষ্টা করলেন আপনারা। চেষ্টার ফলও ত দেখলাম। আর কেন? এখন একটু লজ্জা পেয়ে চেষ্টাটা ছেড়েই দিন।

—ছিঃ, এত রাগ করতে নেই মল্লিকা। এখনও পর পর তিনটে লগ্ন আছে। রাত দেড়টার সময় শেষ লগন। একটু চেষ্টা করবার সময় আছে মল্লিকা।

মীরা আর ধরা পুকুরপাড়ের নন্দীবাড়ির দুই মেয়ে, দুজনেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের চোখ দুটো ছলছল করছে। জেঠিমা ইশারায় মীরাকে আর ধরাকে কী যেন বল্লেন। মীরা আর ধরা তখনি এসে মল্লিকার দুই হাত চেপে ধরে। —তোমার পায়ে পড়ি মল্লিকাদি, তুমি চুপটি করে শুধু বসে থাক। মামা যখন বলছেন যে...।

হেসে ফেলে মল্লিকা, আর হাসতে গিয়ে চোখ থেকে বড় বড় জলের ফোঁটা ঝরে পড়ে।

চারুমামা উৎসাহিতভাবে বল্লেন। —আমি কথা দিচ্ছি মল্লিকা। তোর পছন্দ হবে না, এমন কাউকে বিয়ে করবার জন্য তোকে কেউ পীড়াপীড়ি করবে না।

চলে যান চারুমামা। তার পরেই আঙিনার দিক থেকে চারুমামার গম্ভীর প্রতিজ্ঞার আর-একটা আওয়াজ শোনা যায়—মল্লিকার বিয়ে হবে। কিন্তু সাবধান, যোগেশদা যেন ঘরের ভিতর থেকে এক পা'ও বাইরে না দেন।

ঘরের বাইরে এক পা বাড়িয়ে দেবার আর ইচ্ছা নেই, শক্তিও নেই যোগেশবাবুর। শুধু চারুমামা নন, রামবাবু, বিজয় আর রত্নেশ্বর; পাড়ার মানুষদের মধ্যে যারা তিনজন সবচেয়ে বেশি খুশি হয়ে আজকের উৎসবের কাজে এতক্ষণ ধরে খাটছিল, তারাও যোগেশবাবুকে গঞ্জনা দিতে ছাড়েনি। —না হয় মেয়ের বিয়ে না-ই হত; আপনি এরকম একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কাছে মল্লিকার মত বয়সের মেয়েকে গছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন কেন? কোন্ প্রাণে? কী দেখে?

কোন উত্তর দেন নি, দিতে পারেন নি যোগেশবাবু।

রামবাবু, বিজয় আর রত্নেশ্বরের সঙ্গে কী যেন পরামর্শ করেন চারুমামা। তার পর চারজনেই একসঙ্গে যেন বাইরে কোথাও যাবার জন্য একসঙ্গে চলতে থাকেন।

কিন্তু যাবার আগে আর-একবার চেঁচিয়ে হাঁক দেন চারুমামা। —শানাই বাজতে থাকুক। থামলে কেন, এই শানাইওয়ালা?

দাওয়ার উপর পাড়ার মহিলাদের ভীরু-ভীরু আর কুণ্ঠিত একটা ভিড়ের দিকে তাকিয়ে চারু মামা বল্লেন—আপনারা ওভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না ছোড়দি।

ছেলেপিলেদের হতাশ ভিড়টার দিকে তাকিয়ে বল্লেন।—তোরা একটু দৌড়দৌড়ি কর না কেন?

উৎসবের ফোটা ফুল আর ঝরে পড়তে পারলো না। আলো জ্বলে, শানাই বাজে, ছেলেপিলেরা ছুটোছুটি করে। সাজানো বরণডালার চারদিকে ঘিরে বসে বসে গল্প করেন মহিলারা।—তবে কার সঙ্গে বিয়ে হবে মেয়েটার?

মল্লিকার মা করুণভাবে হাসেন—ভগবান জানেন। চারু তো জোর গলা করে বলে গেল, ভাল ছেলের সঙ্গেই বিয়ে হবে।

ননীকাকা কোথায়? পঞ্চাশেরও বেশি বিয়েতে বর বরপক্ষ আর বরযাত্রীকে অভ্যর্থনা করবার অভিজ্ঞতা যাঁর আছে, তিনি এখন কি করছেন? তাঁর আর করবারই বা কি আছে?

ননীকাকার অভিজ্ঞতার গর্বটা এমন বিপন্ন হয়নি কোনদিন। অভ্যর্থনা করবার ডিউটি নয়, তুচ্ছ করে সরিয়ে আর ফিরিয়ে দেবার ডিউটি। এ বিয়ে হবে না, পাত্রকে দেখে কেউ পছন্দ করতে পারেনি, এ বয়সের মানুষের সঙ্গে ওবয়েসের মেয়ের বিয়ে হওয়া উচিত নয়, হতে পারে না। বর বরপক্ষ আর বরযাত্রীকে কথাগুলি স্পষ্ট করে শুনিয়ে দেবার ভার পড়েছে ননীকাকার উপর। ননীকাকাও স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিতে একটুও দেরি করেনি।

ঐ তো, সবশুদ্ধ মাত্র সাতজন। অনিরুদ্ধ রায়, তিনজন নিতান্ত অল্পবয়সের খুড়তুতো ভাই, দশ বছর বয়সের একটি খুকী ভাইঝি, এক বৃদ্ধ পুরুত ঠাকুর আর একটা চাকর।

উৎসবের এই বাড়ি থেকে একটু দূরে রামবাবুর বাড়ির বৈঠকখানায় ওদের বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখনও সেখানে বসেই আছে ওরা। আর ননীকাকা এখনও সেখানেই আছেন।

শানাই বেজে বেজে দুটি ঘণ্টা পার হয়ে গেল; তার মধ্যে রাত সাড়ে আটটার লগ্নটাও পার হয়ে গেল।

মীরা আর ধরা যতই পীড়াপীড়ি করুক, বসে বসে আর গল্প করতে পারে না মল্লিকা। অনেক চেষ্টা করেও মল্লিকাকে ওরা আর হাসাতে পারেনি। মেঝের মাদুরের উপর শুয়ে পড়েছে মল্লিকা। ঘুমিয়েই পড়েছে বোধ হয়। ধরাচূড়া পরে এভাবে অপেক্ষা করবার লজ্জাটা যে ত্রিশ বছর বয়সের প্রাণটাকে কাঁটার মত বিঁধে বিঁধে যন্ত্রণা দিচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়তে পারলেই শান্তি। মীরা আর ধরা চুপ করে বসে আর মুখ কালো করে মল্লিকার মাথায় পাখার বাতাস দিতে থাকে।

বরণডালা সাজাবার দায় মহিলাদের কাছে সঁপে দিয়ে মা আর জেঠিমা দুজনেই উঠে এসেছেন। এই ঘরের দরজার কাছে স্তব্ধ হয়ে বসে আঙিনার দিকে তাকিয়ে আছেন। ভগবান জানেন, কোথায় গিয়েছে চারু। দুর্ভাগ্যের অন্ধকার হাতড়ে কোথা থেকে যে সৌভাগ্যের খবর নিয়ে আসবে, কখনই বা আসবে, কে জানে! মিছিমিছি মেয়েটাকে মিথ্যে আশা দিয়ে শান্ত করবার দরকার ছিল না। এর পরেও

যদি মেয়েটার আশার অপমান হয়, তবে যে...।

চারুই যে আসছে মনে হচ্ছে।

জেঠিমা বলেন—হ্যাঁ, রামবাবুও তো আসছেন। রত্নেশ্বরও আসছে, বিজয় কিন্তু ওদিকে চলে গেল!

একঘেয়ে শানাই-বাজা উৎসবের প্রাণটা এতক্ষণের অপেক্ষার ক্লান্তি ঠেলে দিয়ে আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। চারুমামা ব্যস্ত-ভাবে হেঁটে এসে একেবারে মল্লিকারই ঘরের দরজার কাছে এসে থামেন ও হাঁপ ছাড়েন। —কোন চিন্তা নেই; ভাল খবর।

আমতলা হাটের যেখানে বড় বড় বাড়ি আর ভাল-ভাল রাস্তা নিয়ে একটা সৌখীন শহুরে উপনিবেশের রূপ গড়ে উঠেছে, সেখানে গিয়েছিলেন চারুমামা।

আজই যে ছেলেটি চারুমামার সঙ্গে কলকাতা থেকে একই ট্রেনের একই কামরায় আমতলা হাটে এসেছে, তারই সঙ্গে দেখা করে, কথা বলে আর কথা নিয়ে ফিরে এসেছেন চারুমামা।

চারুমামারই ছাত্র মিহির। আমতলা হাটের মিত্রভবন হলো মিহিরেরই মামা-বাড়ি। আইন পাশ করে এক সাহেব কোম্পানির মাইনে করা উপদেষ্টা হয়েছে মিহির।

—কিন্তু ছেলে কত মাইনে পায়? জিজ্ঞেস করেন জেঠিমা।

—আপনি স্বপ্নেও ভাবতে পারবেন না, কত পায়? সাড়ে সাতশো টাকা।

চারুমামার আনন্দটা একটা মাত্রাছাড়া রকমের আনন্দ হয়ে গিয়েছে; তাই সে আনন্দের গর্বটা জেঠিমাকে শুনিয়ে দিতে গিয়ে চারুমামার কথাগুলিও মাত্রাছাড়া রকমের কঠোর হয়ে যায়।

মল্লিকার মা একটু ভয়ে-ভয়ে বিড়বিড় করেন।—বয়স কত?

—বয়স বত্রিশ। আমার হাবুলের চেয়ে মাত্র এক বছরের বড়। দেখলে মনে হবে পঁচিশ।

রামবাবুর স্ত্রী বলেন—ছেলের বাপ-মা কিছুই জানতে পেলেন না, অথচ ছেলে এদিকে হঠাৎ একটা বিয়ে করে...।

—সে সমস্যা নেই। ছেলের বাপ-মা বেঁচে নেই। আপনার জন বলতে আছেন ঐ মিত্রভবনের মামা নরেশবাবু। আমি তাঁরও সম্মতি নিয়ে এসেছি।

মা আর জেঠিমা, মীরা আর ধরা, রামবাবুর স্ত্রী আর পাড়ার আর-সব মহিলার বিস্মিত বিচলিত ও হর্ষোৎফুল্ল মুখগুলির দিকে তাকিয়ে চারুমামা যেন এই গরিব বাড়ির আশার অতিরিক্ত একটা প্রাপ্তির বার্তা নিবেদন করতে থাকেন।

—যোগেশদার ভুলের কথা বলেছি; শুনে রাগ করেছে মিহির। যোগেশদার অবস্থার কথা বলেছি, শুনে মিহিরের মুখটা করুণ হয়ে গিয়েছে। মল্লিকার কথাও সব বলে দিয়েছি, একটুও বাড়িয়ে বলিনি, একটুও কমিয়ে বলিনি। মেয়ে লেখা-পড়া ভাল জানে না, বয়সটাও ত্রিশ, আর দেখতে বেশ সুন্দর; ভাল-মন্দ সবই বলে দিয়েছি। শুনে লজ্জা পেয়েছে, হেসেও ফেলেছে মিহির। মিহিরের কথা হলো, যদি আমাদের মল্লিকার আপত্তি না থাকে, তবে তারও আপত্তি নেই।

ধরা আর মীরার চোখ দুটো উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মল্লিকার কানের কাছে ফিসফিস করে দুজনে—উঠে বসো মল্লিকাদি।

চারুমামাও তাড়া দিয়ে বলেন—উঠে বস মল্লিকা।

ধরা আর মীরার দিকে তাকিয়ে বলেন—মিহির তোদের বাবার চেয়েও ফরসা। কী সুন্দর সুশ্রী চেহারা। তা ছাড়া, রেকর্ডে তোদের ওস্তাদ বাবার গলার গানও তো শুনেছি; মিহিরের গলার গান তার চেয়েও ভাল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আর মল্লিকার শুয়ে পড়ে থাকা চেহারাটার দিকে তাকিয়ে থেকে চারুমামার চোখের আনন্দটা ছলছল করে ওঠে।—নির্বন্ধ কেউ খণ্ডাতে পারে না।

উঠে বসে মল্লিকা। চারুমামার মুখের দিকে আস্তে আস্তে তাকায়, আর তাকাতে গিয়ে চোখ দুটো অপলক হয়ে যায়।

মল্লিকার চোখে যেন একটা বিস্ময়ের স্নেহ চিকচিক করছে। এ কী অদ্ভুত কথা শোনাচ্ছেন চারুমামা? যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না মল্লিকা, রূপে গুণে চমৎকার এত বড় একটা করুণা আজকের অভিশাপের অন্ধকারটার এত কাছে লুকিয়ে ছিল? এ কি সম্ভব! মল্লিকা নামে একটা অচেনা জীবনের উৎসবটা বিপন্ন হয়েছে, ব্যথিত আশা আর্তনাদ করে উঠেছে, শুনতে পেয়েই ছুটে আসতে চেয়েছে মিহির নামে একটি উদার প্রাণ।

যেন শানাই-বাজা রাত্রিটার মায়ারাগিনীর একটা গমক এতক্ষণে মল্লিকার কানের কাছে এসে পৌঁছেছে। দুঃসহ অভিমানে স্তব্ধ হয়ে ছিল মল্লিকার যে ঠোঁট দুটি, সেই ঠোঁট দুটিরই ফাঁকে ঝিরঝির করছে অদ্ভুত একটা তৃপ্তির হাসি।

চারুমামা চেঁচিয়ে ওঠেন—হ্যাঁ, এবার কেউ গিয়ে পারুলকে জাগিয়ে দিয়ে ডেকে নিয়ে আসুক। মল্লিকাকে একটু ভাল করে সাজিয়ে দিক। আর দেরি করা চলে না। আর...।

আঙিনার দিকে তাকিয়ে চারুমামা আরও ব্যস্তভাবে বলেন—এইবার বিজয় আর রত্নেশ্বর চলে যাক। মিহিরকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসুক ওরা। রাত এগারটার লগ্ন যেন আবার পার না হয়ে যায়। হ্যাঁ...।

একটু থেমে গিয়ে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে চারুমামা বলেন—হ্যাঁ, তার আগে একবার স্পষ্ট করে জেনে নিই। তোর কোন অপছন্দ নেই তো মল্লিকা? স্পষ্ট করে বল।

উত্তর দেবারই জন্য মুখ তুলে চারুমামার দিকে তাকায় মল্লিকা। একটা বিস্মিত সুস্মিত মুখ। চন্দনের লবঙ্গ-তিলক জ্বলজ্বল করছে। চারুমামা যদি এখনও স্পষ্ট করে কিছু না বুঝে থাকেন, তবে স্পষ্ট করে বলে দেওয়াই ভাল। স্পষ্ট করে বলে দেবার জন্য মল্লিকার ঠোঁট দুটো সব মিথ্যা কুণ্ঠার বাধা জয় করতে গিয়ে কেঁপে ওঠে।

কিন্তু বলা আর হলো না। ঘরে ঢুকলেন ননীকাকা।

চারুমামা চেঁচিয়ে ওঠেন—এতক্ষণে তোমার দেখা পাওয়া গেল? কোথায় ডুব দিয়েছিলে তুমি?

ননীকাকা হাসেন—আমি আমার ডিউটি করছিলাম।

—তার মানে? ওরা কি এখনও চলে যায়নি?

—না।

—কেন?

—বললে, রাত করে এখন আর কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। স্টেশনে একটা শেডও নেই। তা ছাড়া স্টেশনটাও তো কম দূরে নয়। সকাল হলেই চলে যাবে।

—এ কিন্তু বড় বিশ্রী ব্যাপার হবে ননী। ওরা কি এখনো শোনেনি যে, অন্য একটি ছেলের সঙ্গে এ বাড়ির মেয়ের বিয়ে আজই হয়ে যাবে?

—হ্যাঁ, বিজয় গিয়ে সে কথাও বলে দিয়েছে।

—তারপর?

—ওরা বলছে, ধরুন না, আমরা কন্যাপক্ষেরই লোক; আমরাও না হয় বিয়ে দেখবো; তাতে দোষ কি?

—ছোকরাগুলো বলেছে বোধ হয়?

—না। বলতে গিয়ে ননীকাকা হেসে ফেলেন।—অনিরুদ্ধবাবু বললেন।

—অনিরুদ্ধও কি বিয়ে দেখতে চায়?

—হ্যাঁ; যদি আমাদের আপত্তি না থাকে, তবে অনিরুদ্ধবাবুরও আপত্তি নেই।

—বাঃ, এ তো বড় মজার উপদ্রব?

—সত্যি কথা বলতে গেলে, কোন উপদ্রবই ওরা করেনি। ওরাই ভয় পেয়েছে আর হতভম্ব হয়ে গিয়েছে; অনিরুদ্ধবাবু অবশ্য বেশ ঠিক আছেন। অদ্ভুত!

—আশীর্বাদটা ফেরত দেওয়া হয়েছে?

—ফেরত দিতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু ফেরত নিতে রাজি হচ্ছে না।

—তার মানে? তিনভরির সোনার গয়নাটা ফেরত নেবে না?

—তাই তো বলছেন; আশীর্বাদ ফেরত নেওয়া নাকি উচিত নয়। তবে আমরা যদি নেহাতই ফেরত দিই, তাহলে ফেরত নেবে।

—ওদের চা-টা খাবার-টাবার কিছু দেওয়া হয়েছে তো?

—ওসব কর্তব্য কি আমাকে শেখাবার দরকার হয়? সবই সেধেছিলাম, কিন্তু কেউ খেতে রাজি হলো না।

ননীকাকা যেন একটা অদ্ভুত আশ্চর্য-দেশের গল্প শোনাচ্ছেন, যেখানে সব অসম্ভবই সম্ভব হয়। অনিরুদ্ধের সঙ্গে যারা এসেছে, তারা কেউ চা-খাবার খেতে রাজি হয়নি, এমন কি চাকরটাও না। চা খেয়েছেন শুধু একজন, অনিরুদ্ধবাবু। বেশ হেসে-হেসে আর ননীকাকার সঙ্গে গল্প করে করে চা খেয়েছেন।

এ-বাড়ির মানুষ এ-বিয়েতে রাজি নয়, বিয়ে হবে না; খবরটা শুনে শুধু এক মিনিট মাত্র গম্ভীর হয়ে ছিলেন অনিরুদ্ধ-বাবু। তারপরেই হেসে হেসে বললেন—আমরা কি তাহলে এখনই চলে যাব?

ননীকাকা—আপনারা বুঝে দেখুন। যদি মনে করেন যে, অসুবিধে হচ্ছে, তবে...।

অনিরুদ্ধ—আমাদের কোন অসুবিধে হবে না। ভয় হচ্ছে, আপনাদের অসুবিধে হতে পারে।

ননীকাকা—আমাদের আর কি এমন অসুবিধে হবে, দুটি ডাল-ভাত খাবেন আর...।

অনিরুদ্ধ—না না; আপনাদের ওপর ওসব কোন উপদ্রব আমরা করবো না। শুধু আজকের রাতটুকুর মত থেকে যেতে চাই। বুঝছেনই তো, সঙ্গে একটা বাচ্চা মেয়ে আছে, এতটা পথ ওকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই কষ্টের ব্যাপার হবে। তা ছাড়া, বুড়ো মানুষ পুরুত মশাইও বড় ক্লান্ত।

ননীকাকা—অগত্যা, তাহলে কি...।

ননীকাকা একেবারে স্পষ্ট করে আপত্তির কথাটা বলতে পারছেন না। বললে যেন একটু বেশি কঠোরতা করা হবে। তা ছাড়া, এত ভয় পেয়েছে আর হতভম্ব হয়ে গিয়েছে যারা, তাদের উপর বেশি কড়াকড়ি করবার কোন দরকারও হয় না।

—অগত্যা, আমি তবে বাড়ির লোকের কাছ থেকে একটু স্পষ্ট করে জেনে আসি। তার আগে আমি তো আপনাদের কোন কথা দিতে পারছি না। ননীকাকা একটু কুণ্ঠিতভাবে কথা বলেন।

অনিরুদ্ধ কিন্তু খুশি হয়ে বলেন—হ্যাঁ, তাই উচিত। ওঁদের যদি কোন অসুবিধে হয়, তবে আমরা এখনই চলে যাব।

উঠেই আসছিলেন ননীকাকা, কিন্তু হঠাৎ কি-ভেবে একটু থমকে গিয়ে প্রশ্ন করে ফেললেন—আচ্ছা, একটা কথা বলবেন?

—বলুন, কি বলবো?

—এই বয়সে আপনার বিয়ে করবার ইচ্ছে কেন হলো?

—ইচ্ছে হলো, এই মাত্র বলতে পারি।

ননীকাকা চোখ কুঁচকে নিয়ে বলেন, জিজ্ঞেস করছি; কেন ইচ্ছে হলো?

অনিরুদ্ধ রায় চোখ বড় করে হাসল—যেজন্য ইচ্ছে হয়, সেইজন্য ইচ্ছে হলো।

—কিন্তু যোগেশদার মেয়েকে বিয়ে করবার ইচ্ছে কেন? অন্য আরও কত মেয়ে তো আছে।

—যোগেশবাবুর মেয়ের চেয়ে সুন্দর মেয়ে আছে কি? আমার তো মনে হয় না।

—কিন্তু আপনার এ সন্দেহ হয়নি কেন যে, মেয়ে আপনাকে অপছন্দ করতে পারে?

—সন্দেহ হয়েছিল বইকি।

—তবে।

—ভেবেছিলাম, বিয়ের পর ক্ষমা চাইলেই চলে যাবে।

—তার মানে?

—তার মানে আপনাদের মেয়ে আমাকে ক্ষমা করে পছন্দ করে নেবে।

—এসব কথা আমার কাছেও বলতে কি আপনার...।

—না, কোন লজ্জা নেই। আপনি যখন জিজ্ঞেস করতে কোন লজ্জা বোধ করলেন না, তখন আমিই বা কেন...। তেমনি শান্ত অবিচল ও নির্বিকার একটা মনের খুশির আবেগে হেসে হেসে কথা বলে অনিরুদ্ধ।

—যাক গে, এসব তর্কের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক। আপনি কি সত্যিই মল্লিকার বিয়েটা দেখবেন?

—বলেছি তো, আপনারা যদি আপত্তি না করেন, তবে আমার কোন আপত্তি নেই।

—আপনার একটুও অস্বস্তি হবে না?

—একটুও না।

—কেন?

—একজন যোগ্য পাত্রের সঙ্গে যোগেশ-বাবুর মেয়ের বিয়ে হবে, এতে আমার তো অস্বস্তি বোধ করবার কিছু নেই।

—কোন দুঃখ?

—আপনাদের মেয়ে যদি ক্ষুণ্ণ না হয়, আর যদি সত্যিই বিশ্বাস করে যে, আমি খুশি হয়েই তার বিয়ে দেখছি; তবে আমার কোন দুঃখ নেই।

—যদি মেয়ে সত্যিই ক্ষুণ্ণ হয়?

—তাহলে বড় ভুল করবে আপনাদের মেয়ে। আমরা কাউকে ঠাট্টা করতে পারি না; আমরা সত্যিই খুশি হয়েছি ননীবাবু, আপনাদের মেয়েকে একটা অপছন্দ বিয়ের দুঃখ সহ্য করতে হলো না।

—কিন্তু মনে হচ্ছে, এরা খুব দুঃখিত হয়েছে।

—কারা?

—এই সব ছেলেরা, ঐ মেয়েটি আর এই সব যারা আপনার সঙ্গে এসেছে।

—এদের দুঃখ আমার বিয়েটা হলো না বলে। আপনাদের মেয়ের বিয়ে হবে শুনে এরা দুঃখিত নয়।

—কিন্তু এরা খেলো না কেন?

—সে জন্যে দুঃখ করবেন না।

—খুকিটির তো এতক্ষণে খুব ক্ষিদে পাওয়ার কথা।

—ক্ষিদে পেয়েছে হয়তো।

—তবু খেতে রাজি হবে কি?

—রাজি হবে না। যেতে দিন ওসব সাধাসাধির ঝঞ্ঝাট।

—কিন্তু...।

—কি?

—সব দোষ তো আপনার উপর চাপাতে পারছি না অনিরুদ্ধবাবু।

—কেন? হো হো ক'রে হেসে ওঠে অনিরুদ্ধ।

—যোগেশদা তো সব জেনে শুনেই এই বিয়ে ঠিক করেছিলেন। প্রথম দোষ আর আসল দোষ তো যোগেশদার।

—আঃ, কি যে বলেন ননীবাবু। একবার বুঝে দেখুন, সামান্য অবস্থার এক ভদ্রলোক, যার পক্ষে সংসারের সামান্য দাবী মেটানও কত কষ্টসাধ্য, সে ভদ্রলোক মেয়েকে ভাল পাত্রের হাতে দেবার মত এক গাদা টাকা কোথা থেকে পাবেন? ভাল-মন্দ পাত্র বাছাবাছি করতে পারেন, যোগেশবাবুর মনের অবস্থাটাও তো এমন নয়।

—যাই হোক, উনিই তো আপনাকে পছন্দ করেছিলেন।

—ঠিক কথা। আর সত্যি কথা, আমিও আশ্চর্য হয়েছিলাম, কি দেখে উনি আমাকে পছন্দ করলেন?

—আপনি একথা যোগেশদাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কি বললেন যোগেশদা?

—বললেন, আমি নাকি চমৎকার মানুষ। বলতে বলতে অনিরুদ্ধ রায়ের দু' চোখ থেকে অদ্ভুত একটা হাসির আভা ঠিকরে পড়ে; যেন আগুন-লাগা লজ্জার আভা।

কিন্তু মুখটাকে তেমনই একটা শান্ত-সরল খুশির আবেগে হাসিয়ে দিয়ে বলেন —বলিহারি যোগেশবাবুর ধারণা।

কত স্বচ্ছন্দে হেসে হেসে কথা বলছেন ভদ্রলোক, বেহালার এই অনিরুদ্ধবাবু? যেন একটা বৈঠকী আসরে অন্য কোন মানুষের জীবনের গল্প বলে যাচ্ছেন। সে গল্পের সঙ্গে এই অনিরুদ্ধবাবুর জীবনের কোন সম্পর্ক নেই।

ননীকাকা অপ্রস্তুত আনমনার মত বিড়-বিড় করেন—তবু ভাবতে একটু দুঃখ হচ্ছে যে...।

—ছি ছি; আপনারা একটুও দুঃখ করবেন না, ননীবাবু। বলতে গিয়ে ননীকাকার হাত ধরে ফেলেন অনিরুদ্ধ রায়।

এখানে যে-ঘরের ভিতরে একটা নীরব কৌতূহলের আসরে, যেখানে ননীকাকা এতক্ষণ ধরে গল্প বলে যাচ্ছেন, সে ঘরের সঙ্গেও অনিরুদ্ধ রায়ের এখন আর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু গল্প-বলা অনিরুদ্ধ রায়ের হাসিটার সঙ্গে যেন একটা সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে। নীরব ঘরের মনে কেমন-যেন একটা ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে হাসির এই নীরব শব্দটা। তা না হলে, নিতান্ত একটা হাসির গল্প শুনে এত গম্ভীর হয়ে যাবেন কেন মা আর জেঠিমা; এমন-কি চারুমামাও?

দেখতে আরও অদ্ভুত, মল্লিকার কপালে চন্দনের জ্বলজ্বলে শুভংগরাতিলকও কেমন যেন থমথমে হয়ে গিয়েছে।

ননীকাকার মুখটাও কেমন যেন, বেশ একটু বিষণ্ণ। ননীকাকার কৃতিত্বের পুরনো রেকর্ডটাই বোধ হয় বিষণ্ণ হয়েছে। জীবনে এই প্রথম, বর বরপক্ষ আর বর-যাত্রীকে আদর-আপ্যায়ন করা সম্ভব হয়নি। বরং অনাদর-করা বরপক্ষই খুশি হয়েছে। এটা যে গর্বহারা অকৃতিত্বেরই প্রথম রেকর্ড।

জোরে একবার কেশে, গলার ভিতরের একটা বোবা গুমোট জোর করে পরিষ্কার করে নিয়ে চারুমামা এইবার চেঁচিয়ে ওঠেন।—তুমি কিন্তু মিছিমিছি ওখানে বসে এতটা সময় নষ্ট করলে ননী।

ননীকাকা হাসেন।—তা তো করেছি। যাই হোক, এখন শুধু ওদের...।

চারুমামা—না, এখন ওখানে তোমার আর কোন কাজ নেই। এখন শুধু এদিকে...।

ননীকাকা—ওখানে একটা কাজ এখনও আছে বলেই তো বলছি।

—কি কাজ?

—আপনারা বলুন, ওরা এখন ওখানে থাকবে, না চলে যাবে? থাকলে আমাদের কোন অসুবিধে হবে না তো? সেটাই ওরা জানতে চায়।

—যদি বলি অসুবিধে হবে?

—তবে ওরা চলে যাবে।

—তবে বলে দাও, অসুবিধে আছে।

—মামা! চারুমামার মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে, আর অদ্ভুত রকমের একটা আর্তনাদের মত স্বরে ডাক দিয়ে ফেলেছে মল্লিকা।

চারুমামা অপ্রস্তুতের মত কুণ্ঠিতভাবে বলেন।—হ্যাঁ...মিছিমিছি কথায় কথায় অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল। মিহিরকে আনবার জন্যে বিজয়কে এখনই রওনা করিয়ে দিই।

মল্লিকা—না।

—রাত্রি বারটা তিরিশেও একটা লগ্ন আছে।

—না।

—না মানে কি? মিহিরকে কেউ ডাকতে যাবে না?

—না।

—তার মানে মিহিরকেও পছন্দ হয় না?

—না।

—আশ্চর্য; তাহলে বিয়ে হবে না?

—হবে।

—কার সঙ্গে হবে?

—যে এসেছে তারই সঙ্গে হবে।

—কেন?

ননীকাকাই হঠাৎ চিৎকার করে হেসে উঠে চারুমামার বিস্মিত কেন'র একটা উত্তর দিয়ে দেন।—অনিরুদ্ধবাবু চমৎকার মানুষ।

—আর মিহির বুঝি একটা...।

কথাটা শেষ না ক'রে মল্লিকারই মুখের দিকে তাকিয়ে চারুমামা একটা রুষ্ট ও বিরক্ত ভ্রূভঙ্গী হানেন—কি রে, তুই কি-বুঝলি বল? মিহির বুঝি একটা বাজে...।

মুখ ফিরিয়ে, দেয়ালের গায়ে কপাল ঠেকিয়ে দিয়ে আর ছটফট করে ফুঁপিয়ে ওঠে মল্লিকা—না মামা, মিহিরবাবু নিশ্চয় একজন চমৎকার রূপ গুণ আর দয়া, কোন সন্দেহ নেই...কিন্তু।

—যাক, বুঝেছি, আর কিন্তু-কিন্তু করতে হবে না। চারুমামা যেন শ্রান্ত স্বরে একটা ধমক দিয়ে তাঁর শেষ আক্ষেপের প্রাণটাকেই দমিয়ে দিলেন।—যাও বিজয়, আমার হয়ে মিহিরকে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে বলে দিয়ে এস...মল্লিকা যা বলেছে তাই বলে দিয়ে চলে এস।

ব্যস্ত হয়ে ওঠেন ননীকাকা। এতক্ষণে যেন কৃতিত্বের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করবার চান্স পেয়ে গিয়েছেন। ননীকাকারই চিৎকারের হাসিতে উৎসবটা এইবার উতলা হয়ে উঠতে থাকে।—তাহলে আমি এবার আমার ডিউটিতে লেগে যাই, ছোট বউদি।

রমেবাবুর স্ত্রীও আর চুপ করে থাকতে না পেরে উলু দিতে শুরু করে দিয়েছেন।

আর, ওঘরের ভিতর থেকে, এতক্ষণের বোবা ও বধিরদশার একটা বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আঙিনার উপর এসে যোগেশবাবু বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছেন—আমি তো এই কথাই বলেছিলাম, অনিরুদ্ধ চমৎকার মানুষ। মিথ্যে বলেছিলাম কি?

জেঠিমা হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন—সে মানুষটাও তো মিথ্যে বলে যায়নি। মল্লি যাকে পছন্দ করবে, তারই সঙ্গে বিয়ে হবে। তাই তো হলো।

চারুমামার গম্ভীর মুখটাও হঠাৎ হেসে ফেলে চেঁচিয়ে ওঠে।—বেশ হলো।... এবার তোরা কেউ একজন গিয়ে পারুলকে তাড়াতাড়ি জাগিয়ে তোল। মেয়েটার বিশ্রী খোঁপাটাকে জুঁই-এর কুঁড়ির মালা দিয়ে বেশ করে......।

GOVERNMENT LIBRARY * Cooch Behar *

সারা রাত

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ছেলেটা মানুষ হল না। অথচ এই ছেলেটাকে মানুষ করবার জন্যই তার কলকাতায় আসা।

পাড়া প্রতিবেশী হিতৈষী যে দু-চারজন ছিল, সবাই বলেছিল সেই এক কথা। ছেলে যদি মানুষ করতে চাও ত শহরে যাও। তাই সে তার পাঁচ বছরের ছেলে শংকরকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল শহরের সেরা শহর—কলকাতায়।

আজ সেই ছেলে তার পাঁচিশ বছরের যুবক।

এই কুড়িটি বছর ধরে কীই-না সে করেছে ছেলের জন্যে?

বিমলা ব্রাহ্মণের বিধবা। প্রথম যখন সে কলকাতায় এসেছিল, দেহে স্বাস্থ্য ছিল, সৌন্দর্য ছিল। বড় লোকের বাড়িতে রান্নার কাজ জুটিয়ে নিতে তার দেরি হয়নি।

নিজে রান্নার কাজ করেছে, আর ছেলেকে দিয়েছে ইস্কুলে।

বাবুদের বাড়ির ছেলের সংগে শঙ্কর লেখাপড়া শিখছে। গর্বে আনন্দে মায়ের বুক দশহাত হয়ে গিয়েছে। ছেলেকে কোলের কাছে টেনে এনে রাত্রে শুয়ে শুয়ে কত কথা শিখিয়েছে তাকে। বলেছে, "তুমি লেখাপড়া শিখবে, বড় হবে, তার পর যাবে তোমার গ্রামে। বর্ধমান জেলার ময়নাবুনি গ্রামে তোমার সব আছে। বাড়ি আছে, জমি আছে, পুকুর আছে, বাগান আছে, তোমার অভাব কিছু নেই। কিন্তু সে-সব তোমাকে উদ্ধার করতে হবে।"

শঙ্কর তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ। জিজ্ঞাসা করেছে, "উদ্ধার কী মা?"

বিমলা বিপদে পড়েছে। উদ্ধার কথাটার মানে নিজেও সে ঠিকমত বোঝাতে পারেনি। বলেছে, "তোমার এক কাকা আছে সেখানে। ভারী বজ্জাত। তোমার বাবার জিনিস, তোমাকে ফাঁকি দিয়ে নানারকম কৌশল করে নিজে নিয়ে নিয়েছে। তোমার সেই কাকাকে জব্দ করতে হবে। তোমার নিজের জিনিস—আবার তোমাকে কেড়ে নিতে হবে।"

এতক্ষণ পরে শঙ্কর উৎসাহিত হয়েছে। বলেছে, "ঠিক কেড়ে নেব, তুমি দেখ। মেরে কেড়ে নেব।"

বিমলা ম্লান একটু হেসেছে শুধু।

ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া হয়েছে। শঙ্কর কাঁদতে কাঁদতে এসে একেবারে আছাড় খেয়ে পড়েছে মায়ের কোলের উপর।

বিমলা কিছুতেই তাকে থামাতে পারে না! "চুপ কর্, বাবা, ছি, কাঁদতে নেই। কী হয়েছে বল্ না।"

শঙ্কর বলে না কিছুতেই। শুধু ফুলে ফুলে কাঁদে।

ওদিকে উনোনে দুধ চড়ানো রয়েছে। এক্ষুনি দিয়ে আসতে হবে গিন্নি-মার কাছে। ছেলেকে নিয়ে বসে থাকলে চলবে না।

বিমলা বাধ্য হয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে উনোনের কাছে এগিয়ে গিয়েছে।

শঙ্কর এতক্ষণে কথা বলেছে। কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, "আমাকে রাঁধুনী-বামুনীর ছেলে কেন বলবে?"

দুধটা নামাতে নামাতে বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, "কে বললে?"

শঙ্কর বললে, "রনা।"

"ও রে চুপ্ চুপ্, রনা বলিসনি, রণেন বলবি। ও যে বড়বাবুর ছেলে।"

শঙ্কর বললে, "না, বলবে না! আমি বলেছিলাম আমি তোদেরই মত বড়লোকের ছেলে। রনা আমার মাথায় একটা চাঁটি মেরে দিয়ে বললে, 'যাঃ, রাঁধুনী-বামুনীর ছেলে—বলে কিনা বড়লোকের ছেলে!'"

"ওরা কেমন করে জানবে বাবা? বস, আমি দুধটা দিয়ে আসি।"

বাঁহাতের উপর কাপড় দিয়ে বসানো গরম দুধের বাটি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে খালি খালি চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে বিমলার। ডান হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছতে গিয়ে সে আবার আর-এক বিপদ! গরম দুধ হাতের উপর ছলকে পড়ে আর-কি!

কথাটা তাকে না বললেই হত! কিন্তু না বলেই বা থাকে কেমন করে? এই সঙ্কল্প নিয়েই যে সে বেরিয়ে এসেছে সেখান থেকে!

এমনি সব ছোট-খাটো কত কথা মনে হয় বিমলার।

কত চেষ্টা করেছে সে ছেলেটাকে ভাল করে পড়াবার। বইয়ের অভাবে পাছে তার পড়ার ক্ষতি হয়, তাই প্রত্যেকটি বই সে কিনে দিয়েছে। গিন্নীমার কাছে কেঁদেকেটে বইএর দাম আদায় করেছে। হেডমাস্টারের কাছে নিজে গিয়েছে। ইস্কুলের সেক্রেটারির পা-দুটো জড়িয়ে ধরেছে। গরিবের ছেলে বলে মাইনে পর্যন্ত দিতে হয়নি।

ছেলে কিন্তু নিজেকে গরিব বলে কোনদিনই ভাবতে পারলে না।

তিন চারটে বাড়ি বদল করে বাগবাজারের ঘোষালদের বাড়িতে তখন সে চাকরি করে। মস্ত বড়লোক অরিন্দম ঘোষাল। ঘোষাল-গিন্নী বিমলাকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসেন। নাতিদের জামা কাপড় একটু পুরনো হয়ে গেলেই বিমলার হাতে তুলে দিয়ে বলেন, নাও, তোমার ছেলেকে দিও। একটু সেলাই করে নিলেই হবে।

শঙ্কর কিন্তু সেলাই-করা পুরনো জামা-কাপড় পরবে না কিছুতেই। ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায় বাড়ি থেকে।

বিমলা বসে বসে কাঁদে।

শুধু জামা-কাপড় নয়, ইস্কুলও পছন্দ হয় না শঙ্করের।

এ-ইস্কুলটা ভাল নয়, ওখানকার মাস্টারগুলো বজ্জাত, এখানকার ছেলেগুলো ছোটলোকের ছেলে, এমনি করে করে ক্রমাগত ইস্কুল বদলায় সে।

ইস্কুল বদলায় আর বন্ধু বদলায়।

বিমলা একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, "এত নতুন নতুন বন্ধু কোথায় পাচ্ছিস রে?"

শঙ্কর বলেছিল, "জোটাতে হয়।"

কম বয়সেই বেশ লায়েক হয়ে উঠল শঙ্কর।

শঙ্কর যখন ক্লাস এইটের ছাত্র, তখন হঠাৎ একদিন সে তার মাকে এসে বললে, "কাল থেকে খুব ভোরে উঠে আমি বেরিয়ে যাব। তুমি আমার জন্যে একমুঠো ছোলা ভিজিয়ে রেখ।"

বিমলা বললে, "রাখব।"

"ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে যখন আসব, তখন যদি এক-গ্লাস মিছরির শরবত দিতে পার ত খুব ভাল হয়। পারবে দিতে?"

বিমলা বললে, "খুব পারব। কিন্তু কেন বল্ দেখি? চা খাবি না?"

"না, চা আমি ছেড়ে দিলাম। কাল থেকে একটা জিমন্যাসিয়ামে যাব।"

বিমলা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকায়। বলে, "সে আবার কী?"

শঙ্কর বলে, "সে-সব তুমি বুঝবে না মা।"

মার কিন্তু বুঝতে দেরি হয় না।

দু-চার মাস যেতে না যেতেই দেখা যায়, শঙ্কর যেন ফন-ফন করে বেড়ে উঠছে। বুকের ছাতিটা হয়েছে চওড়া, মুখখানা হয়েছে ভরাট, গাল দুটো লাল।

বছর ফিরতে-না-ফিরতেই শঙ্করের চেহারাটা হয়ে উঠল দেখবার মত।

বিমলা তার দিকে ফিরে ফিরে তাকায় আর বলে, "হ্যাঁ, এমনিটি আমি চেয়েছিলাম।"

পাইকপাড়া থেকে কোন্ এক বড়লোকের ছেলে—তাকে ডাকতে আসে। ছেলেটির নাম বিমল।

শঙ্কর তার সঙ্গে বেরিয়ে যায়। বলে, "আমি ক্লাবে যাচ্ছি।"

শঙ্কর মার কাছে এসে গল্প করে। বলে, "আমি সাইকেল চালাতে শিখলাম মা। এবার একটা সাইকেল কিনতে হবে।"

বিমলা বলে, "সে-যে অনেক টাকা দাম বাবা। কোথায় পাবি অত টাকা?"

"পাব যেখানে হক। কলকাতা শহরে টাকার ভাবনা!"

বিমলা ভাবে তার বড়লোক বন্ধু জুটেছে অনেক। তারাই দেবে হয়ত কিনে।

শেষে একদিন সত্যিই দেখা গেল, শঙ্কর একটা বাইকে চড়ে বাড়ি এল। বাইকটা তুলে রাখলে ঘরের ভিতর।

তারপর প্রায়ই দেখা যায়, সে বাইকে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সময়ে খেতে পর্যন্ত আসে না। মা তার খাবার নিয়ে বসে থাকে। বাড়ি ফেরে হয়ত সন্ধ্যের পর। মা জিজ্ঞাসা করে, "সারাটা দিন কোথায় ছিলি বাবা? খেতে পর্যন্ত এলি না, আমি এদিকে ভেবে ভেবে সারা।"

শঙ্কর বলে, "তুমি ভারী বোকা, তাই ভেবে মর। বারোটার ভেতর আমি যদি না ফিরি, নিশ্চয় জানবে আমি কোথাও খেয়ে নিয়েছি। আজকাল রাইফেল প্রাক্‌টিস্ করছি কিনা, তাই একটু দূরে চলে যেতে হয় বন্দুক নিয়ে। খাবার সময় অত দূর থেকে ফিরে আসা অসম্ভব।"

রোজই তার রাইফেল প্রাক্‌টিস্ চলতে লাগল।

রাইফেল প্রাক্‌টিসের পর, কী প্রাক্‌টিস্ সে করতে লাগল কে জানে, মা শুধু তার চেহারা দেখেই মশ্‌গুল!

এমন দিনে বিশ্রী একটা অঘটন ঘটে গেল।

শঙ্করের বয়সী একটি নাদুসনুদুস ছেলে একদিন সকালে এসে ডাকলে, "শঙ্কর!"

বিমলা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। বললে, "সে ত বাড়িতে নেই বাবা।"

ছেলেটির সাজ-পোশাক দেখে মনে হল বড়লোকের ছেলে। বিমলা বললে, "একটু বস বাবা, এক্ষুনি আসবে।"

ছেলেটি দোরের কাছে দাঁড়িয়ে রইল, বসবার জন্যে এগিয়েও এল না, কথাটার জবাবও দিলে না।

বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, "কী নাম তোমার?"

ছেলেটি বললে, "বিজন।"

বলতে বলতেই সাইকেলের ঘণ্টার আওয়াজ শুনে বিজন রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলে শঙ্কর আসছে।

বিমলা আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছিল।

হঠাৎ একটা গোলমাল শুনে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে, দোরের কাছে বিস্তর লোক জড় হয়েছে। চিৎকারে গোলমালে কী হয়েছে কিছুই ভাল বুঝতে পারা যাচ্ছে না। শুধু দেখা যাচ্ছে, শঙ্কর দু-হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে সাইকেলটা আর সবাই মিলে তার উপর ঝুঁকে পড়েছে সাইকেলটা কেড়ে নেবার জন্যে।

কিন্তু তারা না পারছে শঙ্করকে সেখান থেকে সরাতে, না পারছে সাইকেলটা কেড়ে নিতে।

শঙ্কর শুধু বলছে, "সরে যাও—ছেড়ে দাও তোমরা। ছেড়ে দাও বলছি!"

চোখ মুখ তার লাল হয়ে উঠেছে।

বিমলা আর চুপ করে থাকতে পারলে না। মাথার কাপড়টা একটু তুলে দিয়ে বেরিয়ে এল দোরের কাছে। বললে, "কী হয়েছে তোমাদের?"

প্রথমে যে-ছেলেটি এসেছিল শঙ্করকে ডাকতে, সেই বিজন ছেলেটি এগিয়ে গিয়ে কাঁদ-কাঁদ মুখে বললে, "তোমার ছেলে আমার সাইকেল দিচ্ছে না।"

শঙ্কর বলে উঠল, "মিথ্যেবাদী! সাইকেল আমি দেব না। তুই কী করবি কর্!"

বিমলা বললে, "ছি! শঙ্কর!"

কিন্তু তার কথা ডুবিয়ে দিয়ে লোকগুলো আবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নানারকম মন্তব্য করতে লাগল। ভিড়ের ভিতর থেকে একটা লোকের গলা বেশ স্পষ্ট শোনা গেল, "রাঁধুনী-বামনীর ব্যাটার শখ দ্যাখো? সাইকেল চড়বে! দিয়ে দে ব্যাটা, সাইকেল দিয়ে দে!"

শঙ্কর এবার রুখে উঠল। বললে, "কী বললি? বাপের ব্যাটা হলে এগিয়ে আয়। এইখানে এসে বল, আমি তোর বাপের নাম যদি ভুলিয়ে দিতে না পারি ত'—

আবার চিৎকার! আবার গোলমাল!

শঙ্করের কাছে দাঁড়িয়ে কে একজন একটা অভদ্র মন্তব্য করে বসল। তাই না শুনে শঙ্কর তার পা দিয়ে তার পেটে এমন এক লাথি মারলে যে, লোকটা 'ওরে বাপ্!' বলে চিৎকার করে উলটে পড়ে গেল।

বিমলা চিৎকার করে উঠল, "শঙ্কর!"

শঙ্কর তার মার দিকে ফিরে তাকাতেই মা বললে, "ওর সাইকেল ফিরিয়ে দাও।"

শঙ্কর বললে, "তার আগে বলুক ও কেন এই এতগুলো লোক জড় করেছে।"

বিজন বললে, "ওরা যে বললে আমাদের পাঁচটা টাকা দাও, আমরা তোমার সাইকেল আদায় করে দিচ্ছি!"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "টাকা দিয়েছিস?"

বিজন তখন কেঁদে ফেলেছে।

কাঁদতে কাঁদতে বললে, "হ্যাঁ দিয়েছি।"

"কাকে দিয়েছিস?"

শঙ্কর জনতার দিকে তাকিয়ে দেখলে, লোকজন তখন পাতলা হয়ে গেছে।

বিজনও সে-লোকটিকে খুঁজে পেলে না, যে তার কাছ থেকে পাঁচটি টাকা নিয়েছিল।

শঙ্কর বললে, "এই নে তোর গাড়ি। ভাগ!"

বিজন তার বাইকে চড়ে চলে গেল।

তেতলার বারান্দার উপর ঝুঁকে পড়ে বাড়ির মালিক বৃদ্ধ অরিন্দম ঘোষাল আগাগোড়া দেখলেন ব্যাপারটা। দেখে তাঁর চাকরকে ডেকে বললেন, "শঙ্করের মাকে ডেকে আন!"

শঙ্করের মা তখন শঙ্করকে নিয়ে পড়েছে। বলছে, "কই তোকে ত আর বই নিয়ে বসতে দেখি না। ইস্কুলে যাস্ কিনা তাও জানি না। পড়াশোনা কি ছেড়ে দিলি?"

চট করে কথাটার জবাব দিতে পারলে না শঙ্কর।

বাইকটা বিজনকে ফিরিয়ে দিয়ে এসে অবধি কেমন যেন মনমরা হয়ে সে বসেছিল মাথা হেঁট্ করে।

কথাটার জবাব দিলে না।

বিমলা বললে, "কতদিন জিজ্ঞাসা করব করব করেও আর জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। বলতে নেই—তোর চেহারার দিকে তাকিয়ে আমি সব ভুলে গেছি।"

এমন সময় চাকর এসে খবর দিতেই বিমলা 'আসছি' বলে উপরে উঠে গেল।

উপরে যেতেই বাড়ির কর্তা বললেন, "দ্যাখো শঙ্করের মা, তোমাকে একটা কথা আজ বলা আমি দরকার মনে করছি।"

বিমলা বললে, "আপনার আশ্রয়ে আছি। আপনি আমার বাবা। বলুন।"

অরিন্দম বললেন, "ছেলেটির দিকে একটু নজর দাও।"

মাথা হেঁট করে রইল বিমলা। কথাটার জবাব দিতে পারলে না।

অরিন্দম বললেন, "আজ যা দেখলাম, তাই দেখে আমার মনে হল, ছেলেটা বোধহয় তার শরীরের দিকেই নজর দিয়েছে একটু বেশী।"

এই পর্যন্ত বলে তিনি একটু থামলেন। তারপর আবার বললেন, "তা দিক। শরীরটাও অবহেলার বস্তু নয়। কিন্তু একটু লেখাপড়া না শিখলে মনটা যে তার উপবাসী রয়ে যাবে মা।"

কারও সঙ্গে যখন তিনি কথা বলেন, তখন তার মুখের দিকে তাকাতে পারেন না, এই তাঁর স্বভাব। কথাটা শেষ করে যেই তিনি বিমলার দিকে তাকিয়েছেন, দেখলেন, বিমলা কাঁদছে।

দোরের পাশে কপাটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিমলা, আর তার দু-চোখ বেয়ে দর দর করে জল গড়াচ্ছে। এইটে যে তারও মনের কথা!

অরিন্দম বললেন, "কাঁদছ কেন মা? ছেলের ত এখনও বয়েস হয়নি।"

এতক্ষণ পরে বিমলা কথা বললে। "কী করব বাবা আপনি বলে দিন!"

অরিন্দম বললেন, "কী আর করবে, একটু শাসন কর।"

এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন পাশের দরজা দিয়ে।

কারও কান্না তিনি সহ্য করতে পারেন না।

নীচে নামবার সময় বিমলা একবার ঘোষাল-গিন্নীর ঘরের দিকে তাকালে। ঘরের মেঝেয় বসে বসে তিনি পান সাজছিলেন। একটা কথাও তিনি বললেন না।

বিমলা সিঁড়ির ওপর থমকে থামল। চোখ দুটো বেশ ভাল করে মুছে শঙ্করকে কী বলবে একবার ভেবে নিলে। রান্নাঘরের পাশে নিজের সেই ছোট ঘরটিতে এসে দেখলে, শঙ্কর তার গায়ের সার্টটা খুলে খাটের উপর চিত হয়ে শুয়ে আছে।

বিমলা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে। হাতকাটা সাদা গেঞ্জিটা চমৎকার মানিয়েছে শঙ্করকে। জিজ্ঞাসা করলে, "ঘুমুলি নাকি?"

তেমনি চোখ বুজেই শঙ্কর বললে, "না।"

"ইস্কুল যাওয়া কি তুই ছেড়ে দিয়েছিস নাকি?"

শঙ্কর জবাব দিলে না।

বিমলা আবার ডাকলে, "শঙ্কর!"

"কী?"

"তুই কি মুখখু হয়ে থাকতে চাস্?"

শঙ্কর চুপ করে রইল।

"আজকালকার দিনে লেখাপড়া শিখবি না, মুখখু হয়ে থাকবি—লোকে যে তোর সঙ্গে কথা বলবে না রে!"

শঙ্কর তেমনি শুয়ে শুয়েই বলে উঠল, "তুমি সব জান!"

বিমলা বললে, "জানি।"

শঙ্কর বললে, "বেশ বাবা বেশ, জান ত জান। চুপ কর।"

বিমলা বললে, "তাহলে তুই লেখাপড়া শিখবিনে?"

"এই কথা ওই বুড়ো বুঝি তোমাকে শিখিয়ে দিলে?"

বিমলা ছুটে তার কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, "ওরে চুপ চুপ, হতভাগা এ কী হল তোর? এ কী বলছিস? ছি!"

শঙ্কর উঠে বসল। বললে, "ঠিক বলছি।"

বিমলা বললে, "আমাকে শেখাতে হবে কেন? আমি দেখতে পাচ্ছি যে! বইএর সঙ্গে তোর সম্বন্ধ নেই, ইস্কুল যাওয়া বন্ধ করেছিস, এমনি টো-টো করে ঘুরে বেড়ালে কোনদিন মানুষ হতে পারবি, না এক পয়সা রোজগার করতে পারবি? মুখখু ছেলে থাকার চেয়ে না থাকা ভাল।

শঙ্কর উঠে দাঁড়াল। শার্টটা গায়ে দিতে দিতে বললে, "তাহলে তাই জেন।"

"কী জানব?"

বিমলা তার কাছে এগিয়ে গেল।

"জেন যে তোমার ছেলে নেই।"

কথাটা ধক করে গিয়ে বাজল মায়ের বুকে। ডাকলে, "শঙ্কর!"

শঙ্কর তখন চটি পায়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মা তার পিছু পিছু এল ঘর থেকে বেরিয়ে। উঠোন পেরিয়ে খানিকটা এগিয়েও গেল, কিন্তু তাকে ফেরাতে পারলে না।

বিমলা যেই পিছন ফিরেছে, দেখলে বাড়ির বড় বউ দাঁড়িয়ে তার জানলার কাছে। আড়ি পেতে দাঁড়ানো তার স্বভাব।

তাকে কিছু বলবার ইচ্ছা বিমলার ছিল না, তবু মায়ের মন না বলে থাকতে পারলে না। বললে, "দেখলে বউমা, জোর করে দুটো কথা বলতে গেলাম ত রাগ করে পালিয়ে গেল।"

বড় বউয়ের মুখটা কেমন যেন একরকম হয়ে গেল। বললে, "খাওয়াও আরও চুরি করে করে লুকিয়ে লুকিয়ে দুধ ঘি মাছ—"

এ বলে কী? বিমলা যেন আকাশ থেকে পড়ল। এতদিন সে কাজ করছে এ-বাড়িতে, চুরি করার অপবাদ কেউ তাকে কখনও দেয়নি।

মায়ের মন, হয়ত-বা এক-আধদিন এক-আধ টুকরো বেশী মাছ, একটু ভাল খাবার ছেলেকে সে দিতে গিয়েছে, কিন্তু ছেলে তার হাঁ হাঁ করে নিষেধ করেছে। বলেছে, "তুমি কি ভেবেছ, না খেয়েই শরীরটে আমার এমনি হয়েছে! বাইরে আমি প্রচুর খাই। বন্ধুরা খাওয়ায়।"

সেদিন মাংস রান্না হয়েছিল। শঙ্করের জন্য একবাটি মাংস বিমলা তুলে রেখেছিল। কিন্তু খাবার সময় মাংসের বাটি সে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, "তোমাদের এই 'রিচ্' রান্না আমি খেতে পারি না মা। মাংস যদি শুধু নুন দিয়ে সেদ্ধ করে দিতে পার ত আমি খেতে পারি।"

বিমলা বলেছিল, "সবই কি তোর আশ্চর্য্য বাবা?"

শঙ্কর বলেছিল, "হাতি দেখেছ মা? বড় বড় ষাঁড়, বড় বড় বাঁদর? তারা মাছ-মাংস খায় না, তবু তাদের গায়ে কীরকম জোর। শুধু শাক আর ভাত আমি যদি ভাল করে হজম করতে পারি ত আমার আর কিছু দরকার হবে না।"

সেই শঙ্করের নামে এই দুর্নাম?

বিমলা বললে, "না বউমা, শঙ্কর আমার সেরকম ছেলেই নয়। মাছ-মাংস সে খেতেই চায় না।"

বড় বউ বললে, "থাম! কার কাছে কী কথা বলছ? ছেলে তোমার কিছু খায় না! না খেয়ে খেয়েই অমনি কুঁদো বাঘের মত ফুলছে দিন-দিন।"

ছেলে চলে গেল রাগ করে। মনের অবস্থা ভাল ছিল না বিমলার। বলে বসল, "বেশ, তাহলে চুরি-চামারি যে করে না, সেইরকম একজন ভাল লোক তোমরা দেখে নাও, আমি চলে যাই।"

বড় বউ বললে, "সেই কথাই ভাবছি। নইলে তোমার এই ছেলেটি এ-বাড়িতে থাকলে আমার ছেলেরা যাবে খারাপ হয়ে।"

কথা বলতে ইচ্ছেও করে না, অথচ এই কথা শুনে কোন্ মা চুপ করে থাকতে পারে? বিমলা বললে, "আমার ছেলে ত তোমার ছেলেদের সঙ্গে মেশে না বউমা।"

বড় বউ বললে, "মেশবার দরকার হয় না। আজ যখন তোমার ছেলে সাইকেল চুরি করে ধরা পড়ল, সদর দরজায় গোলমাল শুনে

আমার ছেলেরা ছুটে যাচ্ছিল সেইখানে। আমি তাদের ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দিলাম।

"আমার ছেলে চুরি করেনি বউমা।"

"না, চুরি করেনি। নিজের ছেলেটি খুব ভাল। তোমার ছেলে একটি চোর, ডাকাত, গুণ্ডা।"

কথায় কথায় কথা বেড়ে গেল। বড় বউ বলতে কিছু বাকী রাখলে না। বিমলাও বললে।

বিমলা ভেবেছিল, গিন্নীমা এসে থামিয়ে দেবেন। কিন্তু থামিয়ে দেওয়া দূরের কথা, সন্ধের আগে দেখা গেল, রাঁধুনী একজন বামুন-ঠাকুরের সঙ্গে তিনি কথা বলছেন।

এতদিন ধরে বিমলা রয়েছে এখানে। কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছে সবার উপর। এ-আশ্রয় তার নিরাপদ বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু সব-কিছু গোলমাল হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

রাতের রান্না সকাল-সকাল করতে হয়। ছেলেরা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তাই সেদিনও সে ঠিক সময়েই রান্না চড়ালে। ঝি চাকর যেমন সাহায্য করে তেমনি করতে লাগল। বিমলা ভাবলে, তাহলে বুঝি এটা কিছুই নয়। এরা জবাব তাকে নিশ্চয়ই দেবে না।

বড় বউ তার ছেলেদের খাবার নিজে এসে নিয়ে যায়। সেদিন কিন্তু সে এল না। তার বদলে এল ছোট বউ। ছোট বউ গরিবের মেয়ে। সংসারের কাজকর্ম তাকেই বেশী করতে হয়। সেজন্য তার কোনও দুঃখ নেই। মুখে যেন হাসি তার লেগেই আছে।

রান্নাঘরে ঢুকেই সে হাসতে হাসতে বললে, "কই গো বামুন-মা, দিদির ছেলেদের খাবার আজ আমি নিয়ে যাব। আমার ওপর হুকুম হল।"

বিমলা বললে, "নিজেই দেখেশুনে নাও মা, আমার কিছু ভাল লাগছে না।"

ছোট বউ আবার হাসলে। বললে, "কেন বামুনমা, ভাল লাগছে না কেন বলছ? তুমি বুঝি ভাবছ তোমাকে তাড়িয়ে দেবে? তা আর দিতে হয় না! যে ঠাকুরটা এসেছিল সে মাইনে চাইলে তিরিশ টাকা, তার ওপর ডিম ছোঁবে না। কাপড় দিতে হবে বছরে চার-খানা, গামছা চারখানা, চুল কাটার পয়সা মাসে ছ আনা, ধোপা চার আনা, আর পানদোক্তার জন্যে রোজ দু আনা। এই না শুনে বাবা কী বললে জান? বললে, 'ব্যাটা দুদিন বাদে একটি বউ চেয়ে বসবে। তাড়াও ওকে। তার চেয়ে শংকরের মা আমাদের ভালই আছে।'"

এই বলে আবার সে ফিক-ফিক করে হাসতে লাগল।

বিমলার মনটা এতক্ষণ পরে যেন খানিকটা হালকা হল। জিজ্ঞাসা করলে, "কত্তাবাবু এইকথা বললেন? তুমি শুনলে?"

ছোট বউ বললে, "এই দ্যাখো, আমি মিছে কথা বলি? তুমি ত বাবার খাবার দিতে যাবে, তখন না-হয় জিজ্ঞাসা কর।"

ছোট বউ ঠিকই বলেছিল।

বড়কর্তা কথাটাকে হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বললেন, "দূর পাগলী! কে তোকে যেতে বলেছে এখান থেকে?"

বিমলার চোখ দিয়ে আবার জল এসেছিল। কথাটার জবাব দিতে পারেনি।

কিন্তু নীচে নেমে এসেই দেখে, এক বিপরীত কাণ্ড।

শংকর এসেছে। এসেই জিনিসপত্র গোছগাছ করছে। "ও কী রে, ওগুলো বাঁধছিস কেন?"

শংকর বললে, "এক্ষুনি আমরা চলে যাব এখান থেকে।"

বিমলা বললে, "কেন রে? এরা ত আমাকে যেতে বলেনি!"

শংকর মায়ের কাছে এগিয়ে এল। বললে, "আচ্ছা মা, তোমার কি লজ্জা-ঘেন্না কিছু নেই? রনার মা তোমাকে কী বলেছে আমি শুনেছি। তুমি চোর? তুমি চুরি করে আমাকে খাওয়াও? এর পরেও বলতে চাও—তোমাকে আমি এইখানে রাখব? না, আমি এখানে থাব?"

ছেলের এই গর্বোদ্ধত আত্মসম্মানবোধ বিমলাকে যেন সব-কিছু ভুলিয়ে দিলে। বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু যাবি কোথায় বাবা?"

শংকর বললে, "সেকথা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি সব ঠিক করে এসেছি।"

"কী ঠিক করে এসেছিস? থাকবার জায়গা?"

শংকর বললে, "আবার কী ঠিক করব?"

বিমলা বললে, "খাবি কী? আমার কাজ ঠিক করেছিস?"

শংকর বললে, "সে এখন দেখা যাবে। তুমি চল ত!"

বিমলা আবার জিজ্ঞাসা করলে "খাবি না?"

"আবার খাবার কথা বলছ আমাকে? আমার এক কথা। আমি এ-বাড়িতে একগ্লাস জল পর্যন্ত খাব না। তুমি খাবে ত খেয়ে নিতে পার। আমি খেয়ে এসেছি।"

বিমলা বললে, "গিন্নীমার কাছে যাই তাহলে একবার। বলে আসি।"

"হ্যাঁ তুমি যাও, আমি ততক্ষণ গাড়ি ডেকে আনি।"

এই বলে শংকর বেরিয়ে গেল।

বিমলা বললে গিয়ে গিন্নীমাকে। "কী করব মা, আমার ছেলে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।"

কথাটা শুনে গিন্নীমা তার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, "ছেলে তোমার এরই মধ্যে এমন লায়েক হয়েছে নাকি?"

বিমলা চুপ করে রইল। অনেক দিন এ-বাড়ির অন্ন খেয়েছে বিমলা। ছেলেটা একরকম এই বাড়ি থেকেই মানুষ হয়েছে। যেতে তার কষ্টও হচ্ছে। অথচ না-গেলেও নয়।

গিন্নীমা ডাকলেন কর্তাকে।

বিমলা বললে, "ডাকতে হবে না মা, আমিই যাচ্ছি। বাবাকে প্রণাম করে আসি।"

বিমলা কর্তার ঘরে ঢুকল তাঁকে প্রণাম করবার জন্যে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললে, "আমি তাহলে আসি বাবা। আপনা-দের দয়া আমি জীবনে ভুলব না।"

কর্তা অরিন্দম ঘোষাল বহুদর্শী মানুষ। বললেন, "তোমার পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে নিয়েছ?"

বিমলা বললে, "আমার আর পাওনা কী বাবা, আপনার অনেক খেয়েছি, অনেক পেয়েছি।"

"না না তাই কি হয় কখনও? তোমার ছেলেই হয়ত লোক-জনের কাছে বলে বেড়াবে—ঘোষালবাড়িতে মা আমার কাজ করত, মায়ের পাওনাটা মেরে দিলে। না তা হয় না।"

বলে তিনি তাঁর মোটা ডায়েরি বইটা খুলে বললেন, "তোমার ছেলের পৈতের সময় কালীঘাটে যাবার দিন নিয়েছিলে পঞ্চাশ টাকা। তার আগের দেনা পাওনা বিশেষ কিছু ছিল না। তারপর তিন টাকা, দু টাকা, এক টাকা, আবার পাঁচ টাকা—দাঁড়াও আমার সব লেখা আছে, আমি সব হিসেব করে দিচ্ছি।"

পেন্সিল নিয়ে তৎক্ষণাৎ হিসেব করে দিলেন তিনি। বললেন, "তোমার পাওনা হয়েছে তিরিশ টাকা সাত আনা। এই নাও।"

হাতবাক্সটি খুলে তিরিশ টাকা সাত আনা বিমলার হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললেন, "কাজটা ভাল করলে বলে মনে হচ্ছে না বিমলা। ছেলে তোমার দেখতেই এইরকম বড় হয়েছে, কিন্তু বয়েস ত বেশী নয়। সেই তোমাকেই কারও বাড়িতে কাজ করে ওকে খাওয়াতে হবে। যাচ্ছ, যাও।"

টাকাকটি কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়ে বিমলা আবার একটি প্রণাম করলে কর্তাকে। তারপর গিন্নীকে প্রণাম করে যেই উঠে দাঁড়িয়েছে, দেখলে বড় বউ দাঁড়িয়ে আছে দোরের কাছে।

আজই দুপুরে তাকে বলতে কিছু বাকী রাখেনি এই মেয়েটি। বিমলা তবু একবার যাবার সময় তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "চললাম বউমা।"

বড় বউ বললে, "যাও।"

বিমলা দুপা এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু চট্ করে আবার তাকে থামতে হল। পিছনে শুনলে বড়বউ বলছে, "নিমকহারাম যারা, তারা এমনি করেই যায়।"

নিমকহারাম অপবাদটা বিমলার সহ্য হল না। সেও কিছু কম করেনি এদের জন্যে। ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "কী বললে বউমা? নিমকহারাম?"

বড়বউ কিন্তু কথাটাকে চাপা দিয়ে দিলে। বললে, "কেন যাচ্ছ তা কি জানি না? কাল সকাল থেকে তুমি আমাকে হাঁড়ি ধরাতে চাও।"

বিমলা বললে, "ছোটবৌ থাকতে তুমি আবার কখন হাঁড়ি ধরেছ বউমা?"

সংসারের কাজকর্ম করে ছোটবউ শাশুড়ীর মন নিয়েছে। তাই বড়বউয়ের দুচক্ষের বিষ এই ছোটবউ। অথচ তারই নাম করে বিমলা তাকে খোঁটা দিচ্ছে ভেবে বড়বউ যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল। শাশুড়ী সামনে যদি বসে না থাকত, ছোটবউয়ের আজ নিস্তার ছিল না। ছোট-বউকে কিছু বলতে না পেয়ে বিমলাকেই সে মোক্ষম আঘাত দিয়ে বসল। বললে, "হাঁড়ি ছোটবউ ধরবে না আমি ধরব তোমাকে সেসব দেখতে হবে না। তুমি তোমার গুণ্ডা ছেলেটিকে নিয়ে যেখানে যাচ্ছ যাও। শুধু দেখ, যেন বাসন-কোসন কিছু সরিও না।"

বিমলা গিন্নীমার দিকে তাকিয়ে বললে, "মা! শুনলেন?"

বড়বউ বললে, "রাজ্যের বাসন হেঁসেলে পড়ে রয়েছে, আমি সেইজন্যে বলছি।"

গিন্নীমা বললেন, "বড়বৌমা!"

বড়বউ থামবার মেয়ে নয়। বললে, "ওর ছেলের জন্যে একটা থালা, একটি বাটি একটা গেলাস ত ও কিনেছে। বলি যাবার সময় সেগুলো ত ও নিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে আরও দু-চারটে থালা গেলাস চলে যেতে পারে ত?"

বিমলা কেঁদে ফেললে। গিন্নীমার পায়ের কাছে বসে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "এতদিন আছি মা আমি তোমার বাড়িতে, তুমি জান আর ভগবান জানেন, তোমার জিনিস আমি আমার বুক দিয়ে আগলেছি কিনা! আমার ছেলের থালা বাটি আমি এখনও তুলিনি মা, তুমি এস, তোমাকে কষ্ট করে একটিবার আসতেই হবে আমার সঙ্গে। তোমার বাড়ির একটা ছুঁচ যদি আমি নিয়ে যাই ত আমি আমার ছেলের মাথা খাই! আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়!"

এই বলে বিমলা ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

গিন্নীমা বললেন, "কাঁদে না বিমলা। ছি! ওঠ, যা!"

বিমলা ধরে বসল, "না মা, তোমাকে একটিবার আসতেই হবে। তোমার চোখের সামনে আমি বেরিয়ে যাব।"

গিন্নীমা এবার তাঁর বড়বউয়ের দিকে ফিরে বললেন, "ছি বউমা, বিমলাকে ও-কথা বলা তোমার উচিত হয়নি। আর যাই হক, ও চোর-ছ্যাঁচড় নয়।"

বড়বউ বললে, "হতেই বা কতক্ষণ মা! ছেলে যার সাইকেল চুরি করে বাড়ির সামনে কেলেঙ্কারি করতে পারে, তার মা দুটো বাসন চুরি করবে তাতে আর আশ্চর্য্যি কী?"

ঠিক এমনি সময়ে শংকর এসে দাঁড়াল। বললে, "মা, নীচে যাও।"

সে যে ঠিক এই সময় এসে দাঁড়াবে কেউ তা ভাবতে পারেনি। দোরের কাছে রিক্‌শা দাঁড় করিয়ে সে উপরে উঠে এসেছিল কর্তা গিন্নীকে প্রণাম করবার জন্যে। মায়ের কান্না শুনে সিঁড়ির আড়ালে সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তারপর বড়বউয়ের মন্তব্য শুনে সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। রাগে তার আপাদ-মস্তক রিরি করছিল। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে শংকর ঢিপ করে মাটিতে মাথা ঠুকে একটা প্রণাম করলে গিন্নীমাকে।

গিন্নীমা বললেন, "বেঁচে থাক! মানুষ হও!"

ছেলেকে দেখে বিমলা চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল।

শংকর বড়কর্তার ঘরে ঢুকল প্রণাম করবার জন্যে। ঘোষাল-মশাই ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। দেখতে পাননি শংকরকে। পায়ে হাত ঠেকতেই চমকে তাকালেন কাগজটা নামিয়ে। বললেন, "চললে? কোথায় যাচ্ছ?"

"গাছতলায়।"

বলেই শংকর বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বিমলা তখনও গিন্নীমার কাছে দাঁড়িয়ে।

শংকর বললে, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন মা, চল।"

বিমলা গিন্নীমাকে ডাকলে, "মা, এস।"

গিন্নীমা বললেন, "কী যা-তা বলছিস, যা।"

শংকর বললে, "বড় মামীমা বড়লোক, আমরা গরিব। উনি আমাদের চোর, ডাকাত, যা খুশিই বলতে চান বলুন। তুমি এস।"

বড়বউ বললে, "শুনলে মা? ছেলেটার কথা শুনলে? আমরা বড়লোক!"

কথাটার জবাব দিলেন না গিন্নীমা। তাইতে আরও রাগ হল বড়বউয়ের। চেঁচিয়ে বলে উঠল, "চোরকে চোর বলব না তো কী বলব রে ছোঁড়া?"

শংকর তার মাকে একরকম টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল বারান্দার উপর দিয়ে। বড়বউ-এর কথাটা শুনে শংকর থমকে থামল। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, "মা, অনেকক্ষণ থেকে শুনছি উনি বলছেন আমরা নাকি ও'দের বাসন চুরি করে নিয়ে যাব। তুমি এক কাজ কর মা, আমাদের বাসন বলতে ত আমার একখানা থালা, বাটি আর গ্লাস, আর তোমার একটা ঘটি। ওগুলো তুমি এইখানে রেখে যাও। বড়মামীর অনেকগুলো ছেলে, ও'র কাজে লাগবে।"

"কী বললি?"

রেগে টং হয়ে বড়বউ চিৎকার করে এগিয়ে যাচ্ছিল শংকরের দিকে। কিন্তু যেতে তাকে হল না। শংকর যে-ঘরটার পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, সেই ঘরটাই বড়বউয়ের ঘর। ঘরের দরজাটা ছিল বন্ধ। হঠাৎ সেই বন্ধ দরজাটা খুলে বেরিয়ে এলো বড়বউ-এর স্বামী—অরিন্দম ঘোষালের বড়ছেলে নিবারণ ঘোষাল। খালি গা, পরনের ধুতিটা লুঙ্গির মত করে পরা, খেয়ে দেয়ে বোধকরি শুয়ে পড়েছিল সে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই সে কিন্তু এমন একটা কাজ করে বসলো—যার জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না।

ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথমেই সে শংকরের গলাটা চেপে ধরে দেয়ালের গায়ে ঠাই করে তার মাথাটা ঠুকে দিয়ে চিৎকার করে উঠল, "আর বলবি? যা বললি আর বলবি?"

শংকরও রুখে দাঁড়িয়েছিল এর জবাব দেবার জন্যে, কিন্তু যে-লোকটির সমুখে জীবনে সে কোনদিন মুখ তুলে তাকায়নি, তাকে আঘাত সে দেবে কেমন করে?

কিছুই সে বলতে পারলে না, চোখ দিয়ে শুধু দর দর করে জল গড়িয়ে এল, আর নিবারণ তার লোহার মত সরু সরু হাত-দুটো দিয়ে বীরবিক্রমে নিরীহ সেই ছেলেটার উপর সমানে তার শক্তি পরীক্ষা করতে লাগল।

বিমলা গিন্নীমার কাছে ছুটে গিয়ে বললে, "ছাড়িয়ে দিন মা, বড়বাবুকে বারণ করুন!"

বুড়ো বাপ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন খবরের কাগজটা

GOVERNMENT * Cooch Behar
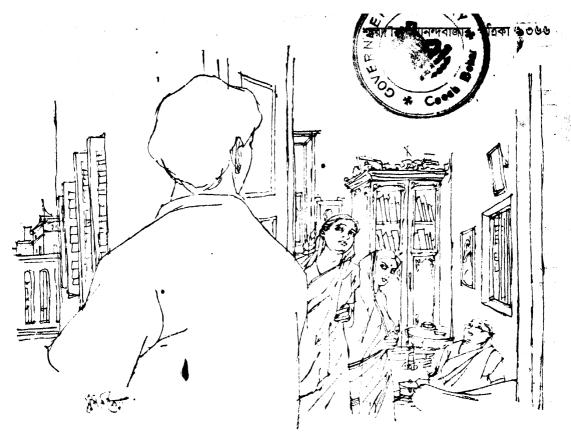
ঠিক এমনি সময়ে শংকর এসে দাঁড়াল। বললে, "মা, নীচে যাও।"

হাতে নিয়ে। ছেলেকে বলতে তাঁর সাহস হচ্ছিল না, তবু বললেন, "নিবারণ, ছেড়ে দে!"

নিবারণ বললে, "তুমি থাম। ওর এত বড় আস্পর্ধা—"

বলেই সে দুম করে তার একটা পা চালিয়ে দিলে শংকরের পিঠের উপর।

'মা' বলে যন্ত্রণায় চিৎকার করে শংকর একেবারে দুমড়ে গিয়ে পড়ল ছোটবাবুর দরজার কাছে। পেটে হাত দিয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে, ঘরের চৌকাঠটা ধরে সে সামলে নিলে।

কিন্তু ধন্য নিবারণের রাগ! হাত দুটো বোধহয় তার ভেরে গিয়েছিল। তাই সে আবার পা বাড়িয়ে তাকে মারতে গেল। কিন্তু লাথিটা গিয়ে পড়ল আর-একজনের পিঠে। ছোটবউ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দুহাত বাড়িয়ে শংকরকে তখন জড়িয়ে ধরেছে।

নিবারণ চেঁচিয়ে উঠল, "ছেড়ে দাও ছোটবউ।"

ছোটবউ ছাড়লেও না, জবাবও দিলে না, শংকরকে জড়িয়ে ধরে ভাসুরের কাছ থেকে আড়াল করে হাত দিয়ে তার চোখের জল মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করল, "খুব লেগেছে?"

শংকরের সমস্ত যন্ত্রণা যেন নিমেষেই জল হয়ে গেল। ছোট-বউয়ের মুখের দিকে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। যে-মুখে হাসি ছাড়া আর-কিছু সে কোনদিন দেখেনি, আজ দেখলে সেই আনন্দসুন্দর মুখখানি সহানুভূতিতে কেমন যেন করুণ হয়ে উঠেছে, আর টানা টানা বড় বড় চোখ দুটি তার জলে ছলছল করছে।

"চল।" বলে শংকরকে ধরে ধরে ছোটবউ সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। বিমলাও তাদের পিছু ধরলে।

বড়বউ বললে, "এই ছোটবউ আমাদের মুখ যদি না পুড়িয়ে দেয় ত কী বলেছি!"

কথাটা সে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলেছিল। ছোটবউও কথাটা শুনলে। ভেবেছিল জবাব দেবে না, কিন্তু জবাব না দিয়ে পারলে না। সিঁড়ির মুখে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "না দিদি, অত সাহস আমার নেই। আমি গরিবের মেয়ে।"

বড় বউ দুম-দুম করে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। তার স্বামী তখন এক হাতে দোরের চৌকাঠ ধরে আর এক হাত কোমরে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে হাঁপাচ্ছিল। বড়বউ বললে, "যা বলে-ছিলাম, সত্যি কিনা দ্যাখো।"

বলেই সে তার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঘোষাল-বাড়ি ছেড়ে চলে এল শংকর তার মাকে নিয়ে। আসবার সময় নিজের বাসন কখানি সত্যিই সে রেখে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু ছোটবউ রাখতে দেয়নি। নিজের হাতে তাদের কাপড়ের পুঁটলিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

পরিচ্ছন্ন একটি বস্তির এক টেরে ছোট্ট একখানি ঘর। ঘরের পাশেই একটু রান্নার জায়গা। উঠোনে একটা পেয়ারা গাছ।

নতুন একটি লণ্ঠন পর্যন্ত কিনে রেখে গিয়েছে শংকর। ঘরের ভিতর দুটো চৌকি পাতা। মাটির একটি নতুন কলসীতে জল পর্যন্ত তোলা রয়েছে।

"ওমা, এযে বেশ ঘর। কত ভাড়া? এত পয়সা তুই পেলি কোথায়?"

শংকর এসেই একটা চৌকির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল। মার কথার কোনও জবাবই দিলে না। বিমলাও আর ভরসা করলে না তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে। একটি একটি করে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে লাগল।

চৌকির উপর বিছানাটা পেতে দিয়ে বিমলা ডাকলে "শংকর,

তুই এখানে এসে শো। আমি ততক্ষণে তোর বিছানাটা পেতে দিই।"

শংকর উঠে গেল আরএকটা চৌকিতে। ঘোষাল-বাড়ির অপ্রীতিকর স্মৃতিটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। আর ভুলতে পারছে না তাদের সেই ছোটবউকে। বড়বাবু কী মারটাই না তাকে মারলে! সে মারের জবাব সে দিতে পারত। সে শক্তি ছিল তার শরীরে। কিন্তু জবাব দেওয়া দূরে থাক, একটি কথাও সে বলেনি।

বড়বাবু চিৎকার করে বলেছে, ছোটবউ ছেড়ে দাও ওকে! ছোটবউ সেকথা গ্রাহ্য করেনি। আরও জোরে সে তাকে চেপে ধরেছে। তারপর চোখের জল মুছে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, তার লেগেছে কিনা।

অনাত্মীয়া এই হাস্যধারার করুণাঘন যে মাতৃমূর্তি সেদিন সে দেখেছে তেমনটি আর দেখেনি কোনদিন। তাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে, বিহ্বল করে দিয়েছে।

তাই সে ভুলতে পারছে না কিছুতেই।

ভুলতে পারছে না—রিকশায় চড়ে তারা চলে আসছে, মা ও ছেলে। যতবার সে পিছনে ফিরে তাকিয়েছে, দেখেছে, ছোট বউ দাঁড়িয়ে আছে সদর দরজার কাছে।

এই নিয়ে তাকে অপবাদ দিয়েছে বাড়ির বড় বউ। চরিত্রে কলঙ্কের ইঙ্গিত করেছে। ছোট বউ তার জবাব দিয়েছে, "অত সাহস আমার নেই দিদি। আমি গরিবের মেয়ে।"

সে নিজেও এক গরিব রাঁধুনী-বামনীর ছেলে।

তাহলে তার এই অনুকম্পা সে গরিবের ছেলে বলে।

বিমলা বললে, "তোর জন্যে চারটি রান্না করে দেব শংকর?"

শংকর বললে, "আমি খেয়েছি মা। তুমি বিশ্বাস কর—আমি খেয়েছি।"

সারারাত মা আর ছেলে পাশাপাশি দুটো চৌকির ওপর শুয়ে। বিমলার চোখে ঘুম নেই। কতবার সে ভেবেছে—শংকরকে জিজ্ঞাসা করে তাদের চলবে কেমন করে?

কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হয়নি।

শেষে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে।

সকালে হৈ-হৈ করে ছেলের দল এসেছে শংকরকে ডাকতে।

শংকর একটা কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বসে-ছিল সংসারে কী কী আনতে হবে তার হিসেব করতে। মা তাকে বলে বলে দিচ্ছিল।

ছেলেরা আসতেই শংকর কাগজ পেন্সিল নামিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছেলেদের ভিতর একজনকে ডাকলে, "ভবেশ!"

ভবেশ এসে দাঁড়াতেই শংকর হুকুম করলে, "মাকে জিজ্ঞাসা করে কী কী আনতে হবে লিখে নিয়ে তুই বাজার চলে যা।"

এই বলে দশ টাকার একটা নোট তার হাতে দিয়ে শংকর বললে, "আমি আসছি মা।"

"কখন আসবি?"

"এসে খাব।"

শংকর বেরিয়ে যেতেই ভবেশ বললে, "বলুন মা, কী কী আনতে হবে।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কী কর ভবেশ?"

ভবেশ বললে, "আমরা কাজ করি মা।"

"কী কাজ বাবা?"

ভবেশ বললে, "ক্লাবের কাজ।"

"সে আবার কী রকম কাজ?"

ভবেশ বললে, "জিমনাসিয়াম্ কাকে বলে জানেন?"

বিমলা বললে, "না বাবা।"

"তাহলেই ত বেগড়বাই। শংকরদাকে জিজ্ঞাসা করবেন, সে ঠিক বুঝিয়ে দেবে। আপনি বলুন কী কী আনতে হবে।"

কিন্তু ভবেশ কী করে, সেকথা জানবার জন্যে বিমলা ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি। এই সূত্রে বিমলা জানতে চায় তার শংকর কী করে। তাই বাজারের ফর্দ করবার আগে বিমলা জিজ্ঞাসা করে বসল, "শংকরও কি ওই একই কাজ করে নাকি?"

ভবেশ অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। বিমলার মুখের পানে তাকিয়ে বললে, "বা বা বা, আপনি দেখছি ঠিক আমার মায়ের মতন। শংকরদাই ত আমাদের সব। আমাদের বোসবাগান ক্লাবের প্রেসিডেন্ট।"

এই বলে সে আর সময় নষ্ট করতে চাইলে না।

ফর্দ নিয়ে বাজার করতে চলে গেল।

বোসবাগান ক্লাব বেশীদিনের ক্লাব নয়। এর একটু ইতিহাস আছে।

এই পাড়াতেই বহুকালের পুরনো একটা প্রকাণ্ড বাড়ি—অনেকদিন থেকে পোড়ো বাড়ির মতন পড়ে ছিল। ঘর-গুলো জরাজীর্ণ। দরজা জানলা একটিও নেই। আগাছার জঙ্গল আর ইঁটের গাদা। লোকজন সেখানে বাস করা দূরে থাক্, দিনের বেলাতেও সাপের ভয়ে কেউ ওপথ দিয়ে হাঁটত না। তারই একটা নীচের ঘর পরিষ্কার করে নিয়ে পাড়ার কতকগুলো ছেলে ছেঁড়া চট আর চাটাই বিছিয়ে শুয়ে বসে গল্পগুজব করত। সবাইকে বলত, আমরা ক্লাব করেছি ওখানে। ক্লাবের নাম পর্যন্ত দেওয়া হয়ে-ছিল, "উত্তর কলিকাতা সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ।"

পাড়ার মুরুব্বি-মাতব্বরেরা বলতেন, "সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ না ছাই, ওর নাম দেওয়া উচিত উচ্ছন্ন সঙ্ঘ।"

নিজের বাড়ির ছেলেদের বারণ করতেন, "যাসনে বাবা ওখানে। কোনদিন সাপে কামড়ে দেবে। ওই পোড়ো বাড়িটায় অন্তত শতখানেক গোখরো সাপ বাস করে।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে!

সেবছর চারিদিকের জঙ্গল সাফ করে পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে ছেলেরা সেখানে সরস্বতী প্রতিমা এনে পুজো পর্যন্ত করে ফেললে। পুজোর দিন বিকেলে বুড়ো-গোছের একজন সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ করে এনে একটা সাহিত্য-সভা করবার মতলব তাদের ছিল, কিন্তু সভাটা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল না। গজা ছিল পুজো-কমিটির ক্যাসিয়ার। চাঁদার টাকাটা থাকত তারই হেফাজতে। পুজোটা কোনোরকমে চুকে যাবার পরেই সে বলে দিলে, "মনিব্যাগটা চুরি হয়ে গেছে।"

গজার কথা কেউ বিশ্বাস করলে না। কত কষ্টে আদায় করা চাঁদার দরুন নগদ ষাট টাকা বারো আনা ছিল তার কাছে। সবাই ভেবেছিল, পুজোর পরদিন ভাল করে একটা 'ফিস্ট' করবে। গজা দিলে সব মাটি করে।

দুটো দল হয়ে গেল। গজার একটা, হরার একটা। হরার দল বললে, "টাকাটা গজা মেরে দিয়েছে।" আর গজার দল বললে, "হরাই চুরি করেছে মনিব্যাগটা।"

প্রথমে কথা কাটাকাটি। তারপর মারামারি। হরা সবাইকার সামনে গজাকে একটা চাঁটি মেরেছিল। গজা তার প্রতিশোধ নিলে সবার অসাক্ষাতে।

হরা একদিন গিয়েছিল বেলঘরিয়া—তার বোনের বাড়ি। ফিরতে রাত্রি হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ পথের মাঝে কে যে তাকে এমন করে মেরে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তার উপর ফেলে দিয়ে গেল কেউ বলতে পারলে না। বাড়িতে খোঁজাখুঁজি, কান্নাকাটি পড়ে গেল। দুদিন পরে খবর এল, হরা হাসপাতালে।

দশদিন পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি এসে হরা বললে, পিছন থেকে কে যে তার মাথায় বাড়ি মেরে ছিল সে বুঝতে পারেনি। তবে সে যে গজা ছাড়া আর কেউ নয়—তাতে তার কোনও সন্দেহ নেই।

সবাই বললে, "গজার নামে নালিশ করে দে আদালতে। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালেই তোকে বলতে হত—গজাকে তুই দেখেছিস।"

হরা শুধু হেসেছিল একটুখানি।

তারপর একদিন দেখা গেল, হরাদের বাড়িটা ফাঁকা পড়ে আছে। বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে শোনা গেল তারা নাকি কালীঘাটে বাড়ি ভাড়া করেছে।

সে আজ অনেকদিনের কথা। দেশ তখনও স্বাধীন হয়নি।

সেই থেকে উত্তর কলিকাতা সংস্কৃতি সঙ্ঘের নাম আর কেউ শুনতে পায়নি। পোড়ো বাড়িটার চারদিকে আবার আগাছার

জঙ্গল উঠেছিল, আর ছেলেদের সেই আড্ডা-ঘরখানা দখল করেছিল একটা ধর্মের ষাঁড়।

কিছুদিন পরেই বোসবাগানের জমিদার বৃদ্ধ গণপতি সরকার লোকজন নিয়ে একটা রিক্‌শা চড়ে এসে দাঁড়ালেন সেই পোড়ো বাড়িটার সুমুখে। হুকুম হয়ে গেল বাড়িটা ভেঙে একেবারে সমতল করে দিয়ে ভাড়া দেবার জন্যে ছোট ছোট খুপ্‌রি করে দেওয়া হক।

কথাটা গজার কানে গেল।

গজা তখন গজেনবাবু। দশটার সময় খেয়েদেয়ে কোথায় কোন্ আপিসে বেরোয়, ফিরে আসে সন্ধ্যায়। কিন্তু সেদিনটা ছিল রবিবার। গজা তার বাড়ির রকে বসে বিড়ি টানছিল, পাড়ার একটা ছেলে এসে খবর দিলে, তাদের ক্লাব-ঘর ভেঙে ফেলা হচ্ছে।

ক্লাব-ঘরের অস্তিত্ব তার অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তবু চাঁদা আদায় করে ক্লাব চালানোর মহিমা এখনও সে ভুলতে পারেনি। চট্ করে বিড়িটা ফেলে দিয়ে হাতকাটা শার্টটা গায়ে চড়িয়ে চটি পরে গজা ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল বুড়ো গণপতি সরকারের কাছে। হাত দুটো তুলে চট করে একটা নমস্কার করে গজা বললে, "বাড়িটা ভেঙে ফেলছেন স্যার?"

গণপতি বললেন, "হ্যাঁ বাবা, এইখানে একটা নতুন বাড়ি হবে।"

গজা বললে "ভালই হবে। আমাদের উত্তর কলিকাতা সংস্কৃতি সঙ্ঘের জন্যে একখানা ঘর কিন্তু দিয়ে দেবেন। এখন থেকে বলে রাখছি।"

মুখটা কাচুমাচু করে গণপতি বললেন, "সংস্কৃত টোল? কত ভাড়া দিতে পারবে?"

গজা বললে, "ভাড়া কী বলছেন? এই ভাঙা ঘরে আমরা পাঁচ বছর ক্লাব চালিয়েছি, সরস্বতী পুজো করেছি—"

গণপতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। এতক্ষণে বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। বললেন, "ও। কেলাব্ করবে?"

গজা বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

গণপতি বললেন, "না বাবা। এখানে কেলাব-ফেলাব হলে আমার ভাড়াটে থাকবে না। আমি ভাড়া দেবার জন্যে বাড়ি তৈরি করছি।"

গজা বললে, "বেশ ত, ভাড়া আপনি আমাদের কাছ থেকেও নেবেন।"

গণপতি বললেন, "না, বাবা, কেলাবে তোমরা নাচানাচি দাপাদাপি করবে, আমার ভাড়াটেরা থাকতে চাইবে না ও-সব হবে না, যাও।"

গজা বেশী কথা বলবার লোক নয়। বললে, "তাহলে দেবেন না আপনি?"

"না।"

বলেই তিনি রিক্‌শায় ওঠবার জন্যে পা বাড়ালেন।

গজা বললে, "টাকাগুলো আপনার জলে ফেলবেন স্যার। নতুন বাড়িও আপনার অমনি পোড়ো বাড়ি হয়ে থাকবে।"

গণপতি রুখে দাঁড়ালেন। বললেন, "কেন?"

গজা বললে, "পরে বুঝতে পারবেন।"

"ভয় দেখাচ্ছ?"

গজা বললে, "কী যে বলেন স্যার, আপনাকে ভয় দেখাতে পারি কখনও? সারা জীবন ধরে চটা সুদে বন্ধকী কারবার করেছেন আপনি, লোকজন ত আপনার ভয়েই অস্থির, আপনাকে ভয় দেখাবে কি?"

গণপতি তাড়াতাড়ি রিক্‌শায় চড়ে বসলেন। বললেন, "চালাও।"

রিকশা চলবার আগে একবার মুখ ফিরিয়ে বলে গেলেন, "এটা মগের মুল্লুক নয়। ইংরেজের রাজত্ব।"

গজা সবিনয়ে একটি নমস্কার করে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি।"

সেই গণপতি সরকারের বাড়ি যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন একদিন তিনি বাড়ি ফিরলেন ট্যাক্সি করে। রোজ সন্ধ্যায় তিনি স্বাস্থ্যলাভ করবার জন্য গঙ্গায় যান। লাঠি হাতে নিয়ে খানিকটা পায়চারি করেন। জেটির উপর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন। তারপর হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরে আসেন।

ট্যাক্সি থেকে নেমে সেদিন কিন্তু তিনি নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দোতলায় উঠতে পারলেন না। চাকর এসে তাঁকে ধরে ধরে ওপরে নিয়ে গেল। গিয়েই শয্যা গ্রহণ করলেন। হাঁটুতে তাঁর অসহ্য যন্ত্রণা।

একমাত্র পুত্র সুরপতি সরকার তখন তার বন্ধুদের নিয়ে রাজনীতি চর্চা করছিল। চাকর এসে খবর দিলে, "বাবা ডাকছেন।"

সুরপতি বললে, "আমি এখন যেতে পারব না। কী দরকার জিজ্ঞাসা করে এস।"

চাকর আবার এসে বললে, "বাবুর খুব অসুখ। আপনি একবার আসুন।"

সুরপতি খুব বিরক্ত হল। বললে, "অসুখ না ছাই! কোনও বন্ধকী বাড়ি হয়ত হাতছাড়া হয়ে গেল।"

বন্ধুরা হো হো করে হেসে উঠল। তাদেরই ভিতর কে একজন বললে, "এই বন্ধকী করে করেই ত লাখ-পঞ্চাশেক রেখে যাবে তোমার জন্যে।"

সুরপতি গিয়ে দেখলে, একজন ঝি তার বাবার পায়ে গরম চুনহলুদ লাগাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলে, "কী হল?"

যন্ত্রণায় কথা কইতে পারছিলেন না তিনি। অতিকষ্টে বললেন, "পড়ে গেলাম।"

"পড়ে গেলেন ত চুন-হলুদ কেন, একটা ডাক্তার ডাকলেই ত পারতেন!"

গণপতি বললেন, "তোমাদের সেই এক কথা! ডাক্তার! ডাক্তার! ব্যাটারা টাকা খাবার যম। ডেকেছ কি, আট টাকা, তার চেয়ে বড় হলে ষোল টাকা। তার ওপর ওষুধ আর ইনজেক্‌সানের ঠেলায় অস্থির।"

সুরপতি জিজ্ঞাসা করলে, "ডেকেছিলেন কী জন্যে?"

গণপতি বললেন, "বলছিলাম কি, বোস-বাগানে যে-বাড়িটা তৈরি হল, ওর একখানা ঘর ওই পাড়ার ছেলেগুলোকে দিও। ভাড়া নিও না। ছোঁড়াগুলো ভারী বজ্জাত।"

গণপতি সরকারের সেই শয্যাই হয়েছিল অন্তিমশয্যা। হাঁটুতে চুনহলুদ-লেপা অবস্থাতেই তিনি মারা গিয়েছিলেন। জ্ঞান যতক্ষণ ছিল, ডাক্তার ততক্ষণ তিনি আসতে দেননি।

শেষ পর্যন্ত সুরপতি টেলিফোন করে একজন ডাক্তারকে আনিয়েছিল। ষোলো টাকা ফিও তিনি নিয়েছিলেন, দামী দামী কয়েকটা ইনজেকশানও দিয়েছিলেন, কিন্তু তখন আর কিছুতেই কিছু হয়নি। টিটে-নাসেই তিনি মারা গেলেন।

পিতার শেষ আদেশ সুরপতি কিন্তু পালন করেছিল।

বোসবাগানে গিয়ে নতুন বাড়ির একখানা ঘর দেখিয়ে দিয়ে ছেলেদের বলেছিল, "এই ঘরে তোমরা ক্লাব করবে।" আর খানিকটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল, "এইখানে হবে প্যারালেল বার, জিমনাস্টিক আর কুস্তির আখড়া। কিন্তু মনে থাকে যেন, শরীরচর্চা করতে হবে সবাইকে। নইলে শুধু নাচ-গান আর থিয়েটার করবার জন্যে আমি ক্লাব-ঘর দেব না।"

গজা আপিস থেকে ফিরেই শুনলে এই সুসংবাদ। মনে মনেই একটু হাসলে। বললে, "ভেবেছিলুম, মিছেই লেঙ্গি মারলাম বুড়োকে। যাক, কাজ হয়েছে।"

বলেই সে ছুটল সুরপতির বাড়িতে। সুরপতির সঙ্গে দেখা করে বললে, "কালই আমি জিমনেসিয়াম খুলে দিচ্ছি স্যার। আপনার যখন যা দরকার হবে আমাদের বলবেন। আমরা করে দেব।"

এই নর্থ ক্যালকাটা জিমনাসিয়ামের প্রথম ছাত্র শংকর।

ছাত্র অবশ্য জুটেছিল অনেকগুলি। কিন্তু মাসে চার আনার বেশী চাঁদা দেবার ক্ষমতা কারও নেই। কাজেই অন্য জিমনাসিয়াম থেকে উপদেষ্টা হয়ে যিনি এলেন তাঁর মাইনে দেওয়াই মুশকিল হয়ে উঠল।

গজা সুরপতির কাছে গিয়ে হাত পাতলে। দু'-চার মাস সুরপতি দিলে কিছু কিছু। গজা তার কিছুটা রাখলে নিজে, কিছুটা দিলে জিমনাসিয়ামে। তারপর সুরপতি

একদিন জবাব দিয়ে দিলে। বললে, "আমি দিতে পারব না। ক্লাব আমার নয়। তোমাদের।"

গজার কিন্তু মতলব ছিল অন্যরকম। মাসে মাসে চাঁদা আদায় হবে দশ চারশ, বড়লোকের ছেলেরা মেম্বার হবে, মুক্ত হস্তে দান করবে, মেয়েদের নাচ হবে, গান হবে, থিয়েটার হবে। মাসে একটা দুটো ফাংশান করবে, টিকিট বিক্রি হবে হাজার দেড় হাজার টাকার, তবে ত ক্লাব চালিয়ে সুখ! তা না, ছেলেরা কুস্তি লড়ে পালোয়ান হবে, দেশ উদ্ধার করবে, আর আমি ব্যাটা টাকার ভাবনায় পাগলের মত ছুটে বেড়াব?—গজা একদিন শংকরকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, "এর মধ্যে আমি নেই। পারিস ত তুই চালা।"

শংকর বললে, "আমি কি পারব চালাতে?"

গজা বললে, "দ্যাখ না চেষ্টা করে। না পারিস না পারবি।"

"কী করব তখন?"

গজা বললে, "যার ঘর তাকেই ফিরিয়ে দিয়ে বলবি—এই রইল তোমার ঘর। আমি চললাম।"

চলে অবশ্য শংকর গেল না। গেল গজা। আপিসের কাজে তাকে বোম্বাই চলে যেতে হল।

যাবার সময় বলে গেল শংকরকে, "মেয়েছেলে রইল বাড়িতে, দেখিস। দরকার হলে দু-দশ টাকা দিস।"

শংকর সায় দিয়েছিল তার মাথাটি ঈষৎ কাত করে।

এক দিকে ক্লাব চালাবার দায়িত্ব, আর একদিকে গজার সংসার। টাকা অবশ্য সে পাঠাবে বোম্বাই থেকে, কিন্তু হয়ত-বা তা যৎসামান্য।

কী করে কী করবে, শংকর ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারলে না। তখন তার বয়সই-বা কত!

গজা যাবার আগে বলেছিল, "মাথাটা কাত করিস না কোথাও, আর ভয় করিস না কাউকে।"

ঠিকই বলেছিল গজা, কিন্তু একটা কথা বলতে ভুলেছিল।

নির্ভয় হতে হলে সত্যাশ্রয়ী হতে হয়। সত্যকে ছুঁয়ে থাকলে ভয় তার পাশ ঘেঁষতে পারে না।

কিশোর বালক শংকর। কুড়ির কাছাকাছি বয়স, সুন্দর সুগঠিত দেহ, নিষ্পাপ নিষ্কলুষ মুখচ্ছবি, দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। সহায় সম্বলহীন অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়ল জীবনের এই প্রথম সংগ্রামে। ইস্কুল যাওয়া তার বন্ধ হয়ে গেল। মার কাছে খায় দায় আর দিবারাত্রি ঘুরে বেড়ায়। যেমন করে হক, ক্লাবটিকে তার বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গে ভাব করে শংকর ক্লাবে ডেকে আনে তাদের, টাকা-পয়সা আদায় করে, কোন রকমে ক্লাবের খরচ চালায়।

ওদিকে গজার বাড়িতে গিয়ে দেখে, বাচ্চা ছেলেটার অসুখ, টাকা যা এসেছিল খরচ হয়ে গিয়েছে, ডাক্তার দেখাবার পয়সা নেই। পকেটে যা থাকে, শংকর উজাড় করে ঢেলে দিয়ে আসে সেইখানে।

ক্লাবে তখন ছেলেরা বসে আছে হাত গুটিয়ে। জিমনাস্টিকের মাস্টারের পনেরটি টাকা বাকী। টাকা না পেলে তিনি কাজ করবেন না।

শংকর আসতেই মাস্টার বললে, "টাকা দাও।"

শংকর বললে, "আজ দিতে পারব না।"

"আজই ত দেব বলেছিলে।"

"বলেছিলাম। কিন্তু খরচ হয়ে গেছে। টাকা নেই।"

"নেই বললে আমি শুনব না। টাকা আমার চাই-ই।"

শংকর বললে, "মিছে কথা আমি বলি না। আমি বলছি টাকা নেই।"

মাস্টার শুনবে না কিছুতেই। ভদ্রলোক সেই এক জিদ ধরে রইল।

শংকরের অসহ্য হয়ে উঠল। মুখ তুলে বললে, "কী করতে চান আপনি?"

লোকটা ধাঁ করে একটা চড় মেরে বসল শংকরের মাথায়। —"কী করতে চান আপনি? আমাকে চোখ রাঙানো হচ্ছে? এঁচোড়ে পাকা ছেলে!"

শংকর থর থর করে কাঁপছে। "বলা শেষ হয়েছে?"

"আবার?" বলেই লোকটি শংকরের গালের উপর মারলে আর-এক চড়!

শংকর এবার আর চুপ করে থাকতে পারলে না। প্রাণপণে একটি ঘুঁষি চালিয়ে দিলে ভদ্রলোকের মুখে। মেরেই ঠিক বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। এলোপাথাড়ি ঘুঁষি চালাতে চালাতে শংকর তাকে যখন ঘরের বাইরে বের করে দিলে, দেখা গেল, লোকটির মুখ দিয়ে কাঁচা রক্তের ধারা গড়িয়ে এসেছে, আর সেই রক্তে তার সাদা জামাটা লাল হয়ে গিয়েছে।

ভদ্রলোক হেঁটমুখে বসে পড়ল বাইরে গিয়ে। মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। একটা দাঁত বোধহয় ভেঙে গিয়েছে।

একটা ছেলেকে কাছে ডেকে শংকর বললে, "এক মগ জল এনে দে।"

বলেই সে তার গায়ের জামাটা খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। বারের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, "চলে এস তোমরা। আজ থেকে আমি তোমাদের শেখাব।"

জল দিয়ে ভাল করে মুখ ধুয়ে লোকটি সেই যে সেখান থেকে উঠে চলে গেল, আর কোনদিন সে এ-পথ মাড়াল না।

সকাল বিকেল শংকর নিজেই শেখাতে লাগল সবাইকে। অনেকেই শংকরের চেয়ে বয়সে বড়, তাতে বিশেষ ক্ষতি হল না। বিপদ হল শুধু বড়লোকের ছেলেদের নিয়ে। মুগুর, ডাম্বেল, স্প্রিং, ওয়েট সবই তাদের কাছে ভারী বলে মনে হয়, কেউ কেউ গায়ের জামা খুলতে চায় না। আবার কেউ কেউ বলে, গায়ে মাটি মেখে কুস্তি লড়তে তারা পারবে না। বাড়ির দারোয়ান-গুলো দেখতে পেলে হাসবে।

একে একে সব পালিয়ে যেতে লাগল।

অথচ তারাই শংকরের একমাত্র ভরসা।

সারা ভারতবর্ষে তখন আগুন জ্বলছে। ইংরেজকে তাড়াবার জন্যে সকলেই কৃতসংকল্প।

শংকর তারই সুযোগ গ্রহণ করলে। একজন সাহিত্যিকের কাছে গিয়ে ভাল করে একটি বিজ্ঞাপন লিখিয়ে আনলে।—বাঙালী নির্বীর্য, বাঙালী বলহীন, বাঙালী কাপুরুষ, বাঙালী শুধু কেরানীর জাত। জাতির এই কলংক মোচন করা একান্ত প্রয়োজন। তোমরা সব দলে দলে চলে এস আমাদের ক্লাবে। তিনমাসে তোমাদের চেহারা ফিরিয়ে দেব। ইত্যাদি ইত্যাদি।

"নর্থ ক্যালকাটা জিমনাসিয়াম" "উত্তর কলিকাতা শক্তি মন্দির" এ-সব নাম তার পছন্দ হল না। তাই শংকর তার ক্লাবের নতুন নামকরণ করলে—"বোসবাগান ক্লাব।"

কাজ যে কিছু হল না তা নয়।

নতুন কিছু ছেলে এসে ভর্তি হল। সব গরিবের ছেলে। মাসিক বেতন চার আনার জায়গায় এক টাকা করলে, কিন্তু তবু সে তার ছাপাখানার বিলটা মেটাতে পারলে না। নতুন সাইন বোর্ডের টাকাটা দিতেই সব ফুরিয়ে গেল।

এমন দিনে গজা এল। তার চাকরির জায়গা থেকে দিনকয়েকের ছুটি নিয়ে।

শংকর অবাক হয়ে গেল তার মুখের দিকে তাকিয়ে। বললে, "এ কী চেহারা হয়েছে গজাদা? রোগা হয়ে গেছ, কুঁজো হয়ে গেছ, চোখে চশমা নিয়েছ। মনে হচ্ছে এই কমাসে বয়েস যেন তোমার অনেক বেড়ে গেছে। বোম্বাই থেকে আসছ?"

গজা বললে, "না রে ভাই, চরকির মত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে সারা দেশটা। চাকরি আবার মানুষে করে!"

শংকর বললে, "ভালই ত! কত দেশ দেখলে!"

গজা বললে, "দেশ দেখে আমার লাভ ত হল খুব। ডিসপেপসিয়া ধরিয়ে এলাম। যা খাই কিছুই হজম হয় না।"

শঙ্কর টেবিলের উপর একটা ঘুঁষি মেরে বলে উঠল, "কাল থেকে লেগে যাও এইখানে। দুদিনে তোমার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ভাল হয়ে যাবে।"

গজা বললে, "না রে না, দুদশদিনের কম্ম নয় আমি জানি। দশদিনের ছুটি পেয়েছি, দশদিন পরেই ছুটতে হবে মেদিনীপুরে। তিরিশটে টাকা দে দেখি। তুই তিনমাস কিছু দিসনি আমার বাড়িতে।"

শঙ্কর মাথায় হাত দিয়ে বসল। বললে, "কি কষ্টে যে ক্লাব চালাচ্ছি তা আমি জানি গজাদা। হাজার পাঁচেক্‌ হ্যান্ডবিল ছাপিয়েছিলাম। ছাপাখানার পঁচিশটে টাকা এখনও দিতে পারিনি।"

কথাটা গজা বিশ্বাস করলে বলে মনে হল না। বললে, "যাঃ, গুল মারবার আর জায়গা পেলি না? মাইনে করেছিস এক টাকা, মাষ্টারগুলোকে মেরে তাড়িয়েছিস, আমার দেওয়া নামটা পর্যন্ত বদলে দিয়ে চকচকে নতুন সাইনবোর্ড টাঙিয়েছিস, আমি সব বুঝি। তোর হাতে ক্লাবটা ছেড়ে দেওয়া আমার উচিত হয়নি।"

এই বলে গজা উঠে চলে গেল।

শঙ্কর কিছুক্ষণ বসে রইল মাথায় হাত দিয়ে। তারপর ভাবলে ভালই হল, কাল সকালে এসেই সে গজাদার হাতে তার ক্লাবটিকে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে।

পরের দিন সকালে এসেই দেখে, সুরপতি সরকার দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্লাব-ঘরের সামনে। সঙ্গে গজা।

গজা বললে, "এ-ই শঙ্কর।"

শঙ্কর সুরপতিকে চেনে, কিন্তু সুরপতি বোধকরি এই প্রথম দেখলে শঙ্করকে।

সুরপতি একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তার দিকে। চোখ যেন আর ফেরাতে পারে না। কিন্তু কিছু না বলে কারও দিকে তাকিয়েও থাকা যায় না। জিজ্ঞাসা করলে "ক্লাবটা কি তুমি ভাল চালাতে পারছ না?"

শঙ্কর প্রথমে বলতে চাচ্ছিল না, কিন্তু গজা রয়েছে সুমুখে দাঁড়িয়ে। কাজেই বলতে বাধ্য হল। বললে, "আজ্ঞে না, ভাল চলছে না।"

গজা বললে, "তার চেয়ে আমি বলি কি, তুই ছেড়ে দে। আমরা অন্য লোক দেখি। আমি ত এখানে থাকতে পারছি না, নইলে আমার ক্লাব আমিই চালাতাম।"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে আমি সেই কথা বলতেই এসেছিলুম। আসি তাহলে। নমস্কার।"
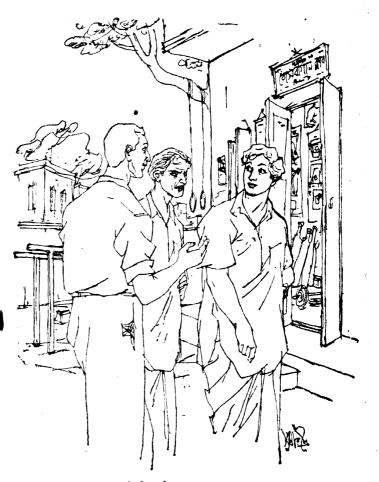
শঙ্কর যে এত সহজে ছেড়ে চলে যাবে, গজা তা ভাবেনি। যাক, ভালই হল যে-কদিন সে কলকাতায় আছে, নিজে দেখাশোনা করে সবকিছু ঠিক করে দিয়ে যাবে।

কিন্তু দেখাশোনা করতে গিয়ে দেখে খাতায় মাত্র তিরিশজনের নাম। তিরিশজন মানে তিরিশ টাকা মাসে! গজা ভাবলে অনেকের নাম বোধহয় খাতায় লেখেনি শঙ্কর।

দুদিন বসে থাকবার পরেও তাদের কোনও হদিশ মিলল না, তার উপর শঙ্কর ছেড়ে দিয়েছে শুনে তিরিশজন ছাত্রের মধ্যে কুড়িজন আসা বন্ধ করে দিলে। তখন নিরুপায় হয়ে গজা আবার সুরপতির কাছে গিয়ে হাজির হল। বললে, "শঙ্কর ছেলেটা ভালই ছিল, বুঝলেন? এখন দেখছি একেবারে বখে গেছে। যেই দেখলে আমি টেক আপ করলাম, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সব দিলে বারণ করে। যাই হক ক্লাব আমি ছাড়ব না। কলকাতায় বদলি হয়ে আসবার দরখাস্তটা আমার মঞ্জুর হয়ে গেলেই আমি এখানে ফিরে এসে দেখুন না ক্লাবটাকে কিরকম জাঁকিয়ে তুলব।"

গজার ছুটি গেল ফুরিয়ে। ক্লাব ঘর বন্ধ করে দিয়ে সে মেদিনীপুর চলে গেল।

তিনদিন যেতে না যেতেই কলকাতায় আগুন জ্বলে উঠল। লাগল হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা। কলকাতা শহরের পথে ঘাটে চলতে লাগল বীভৎস নরহত্যা আর লুঠতরাজ।

অরিন্দম ঘোষালের বাড়িটা যে-পাড়ায়, সে-পাড়াটা ছিল একেবারে নিরাপদ। নানারকমের অদ্ভুত গুজব ছাড়া তাঁর অন্দরমহলে আর কিছু প্রবেশ করেনি। কর্তাবাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি। হুকুম দিলেন, সদর দরজা বন্ধ করে রাখো। খুব দরকারী কাজ ছাড়া কেউ যেন বাইরে না বেরোয়।

বড় বউ কিন্তু প্রথম দিনেই একটা ভারী মজার খবর নিয়ে গিয়ে শ্বশুরে শাশুড়ীর কানে তুলে দিলে। বললে, "এত ত বারণ করলেন, কিন্তু শঙ্কর বেরিয়ে গেল। ওর

"ক্লাবটা কি তুমি ভাল চালাতে পারছ না?"

মা শুধু পায়ে ধরতে বাকি রাখলে, কিন্তু কিছুতেই শুনলে না।"

বড় বউ ভেবেছিল এই নিয়ে বেশ একটা হৈ হৈ হবে বাড়িতে, কিন্তু রাঁধুনি বামনীর ছেলে—বেরিয়ে গেল ত বয়ে গেল। তার জন্যে কার কী মাথাব্যাথা!

কর্তাবাবু মুখ না তুলে শুধু বললেন, "ও।"

শঙ্কর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল তার বোসবাগান ক্লাবের সুমুখে। গিয়েই দেখে, সুরপতিবাবু দাঁড়িয়ে।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি এখানে?"

সুরপতি বললে, "তোমারই খোঁজে।"

শঙ্কর বললে, "আপনারা ত আমাকে তাড়িয়ে দিলেন, তারপরেও ভাবলেন কেমন করে আমি এখানে আসব?"

সুরপতি বললে, "ও-সব কথা থাক। এখন শোন, আমাদের এই বিপদের দিনে নিজেদেরই সব ব্যবস্থা করতে হবে। তোমার দলবল নিয়ে এই পাড়াটা তুমি বাঁচাও।"

শঙ্কর বললে, "সে সাধ্য কি আমার আছে?"

"খুব আছে। চমৎকার ছেলে তুমি।"

এই বলে সুরপতি তার পিঠ চাপড়ে কাঁধে হাত দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "রাইফেল চালাতে জান?"

শঙ্কর বললে, "কেমন করে জানব? রাইফেল কোথায় পাব বলুন?"

সুরপতি বললে, "আমার আছে। আমি তোমাকে শেখাব।"

শঙ্কর তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে শুধু। বললে, "আমার একটু কাজ আছে। আমি চললাম।"

সুরপতি বললে, "না না, এসময় কোনও কাজ নয়। তোমাকে এখন আমি যেতে দেব না। যে-কদিন এইরকম গোলমাল চলবে, সে-কদিন তোমার দলবল নিয়ে তুমি আমার বাড়িতে থাবে, থাকবে। এস তুমি আমার সঙ্গে।"

শঙ্কর বললে, "এ সময় বাড়ির বাইরে থাকলে আমার মা কেঁদে কেঁদে মরে যাবে। তাকে অন্তত একটিবার দেখা দিয়ে আসতেই হবে।"

সুরপতি নিজের স্বার্থ বেশ ভালই বোঝে। জিজ্ঞাসা করলে, "বাড়িতে কে কে আছে? তোমার মা—"

শঙ্কর বললে, "আর কেউ নেই। শুধু আমার মা।"

সুরপতি বললে, "তবে আর কী! নিয়ে এস তোমার মাকে আমার বাড়িতে। মাকে আমি আলাদা ঘর ছেড়ে দেব। আমার মস্ত বাড়ি, তুমি দেখেছ বোধহয়।"

"দেখেছি। কিন্তু এখন আমাকে ছেড়ে দিন, আবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে।"

শঙ্কর তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

সুরপতি তাকিয়ে রইল তার দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে। শঙ্কর তার চোখের বাইরে চলে যাবার পর হঠাৎ মনে হল,—শঙ্করের বাড়ির ঠিকানাটা নিয়ে রাখলে হত। এই বিপদের দিনে শঙ্করের মত ছেলের একান্ত প্রয়োজন।

সুরপতির বাড়ির ত্রিসীমানায় বিপদের আশঙ্কা কিছু ছিল না, তবু সুরপতি ভয়ে যেন একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে গিয়ে স্নানাহার করেই সে তার বন্দুক আর রিভলভার নিয়ে বসল। বন্দুকের নল পরিষ্কার করলে। রিভলভারের চেম্বারে বুলেট পুরলে। বাড়ির ছাদে উঠে ফাঁকা দুটো আওয়াজ করলে, তারপর ব্রিচেস পরে শিকারীর বেশে বন্দুক হাতে নিয়ে বীরবিক্রমে বেরিয়ে পড়ল।

কথায় আছে মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। সুরপতিরও ঠিক তাই। সাজ-পোশাক পরে, হাতে বন্দুক আর চামড়ার বেল্টে রিভলভার নিয়ে এসে দাঁড়াল বোস-বাগান ক্লাবের সুমুখে।

এসে যা দেখলে, তা অবশ্য দেখবার প্রত্যাশা সে করেনি।

দেখলে, শঙ্কর তার দলবল নিয়ে ক্লাব-ঘরের সুমুখে দাঁড়িয়ে কী যেন পরামর্শ করছে। সুরপতি জিজ্ঞাসা করলে, "তখন তুমি কোথায় চলে গেলে?"

শঙ্কর বললে, "যেখানে গেলাম, সেখানে যেতে যদি আর একটু দেরি হত, তাহলে ভারি মুশকিল হত কিন্তু। বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে নিয়ে যেতে যেতে আমার একটু দেরিও হয়েছিল।"

ক্লাবঘরের দিকে তাকিয়ে সুরপতি দেখলে, কয়েকজন মেয়েছেলে রয়েছে সেখানে। জিজ্ঞাসা করলে, "ওরা কে ওখানে?"

শঙ্কর বললে, "ওদেরই ত এনে এইখানে তুললাম। গজাদার বউ, গজাদার বোন, গজাদার ছেলেমেয়ে। বাড়িতে একটা ব্যাটা-ছেলে নেই, টাকা নেই, পয়সা নেই, এর ওর কাছে চেয়ে চিন্তে আজ আর কাল দুদিনের মত ব্যবস্থা করে দিলাম।"

সুরপতি অবাক হয়ে গেল শঙ্করের ব্যবহার দেখে। এখান থেকে চলে যাবার আগে গজা তাকে শঙ্কর সম্বন্ধে অনেক কথা বলে গিয়েছে। বলে গিয়েছে, "ছোঁড়া-টাকে ক্লাবের পাশ মাড়াতে দেবেন না। ছোঁড়াটা শয়তান।"

সেই শয়তানই আজ তার পরিবারকে রক্ষা করলে।

সুরপতি জিজ্ঞাসা করলে, "ওখানে আরও ত বাড়ি আছে, তাদের কী হবে?"

শঙ্কর বললে, "সেবাড়িগুলো একটু দূরে, আর সেখানে লোক আছে অনেক। তাহলেও আজ আমরা পালা করে পাহারা দেব রাত্তিরটা।"

সুরপতি বললে, "বস্তিটা ত খালের ওপারে। সেখান থেকে অতটা ঘুরে লোক-জন এপারে আসবে ভেবেছ?"

শঙ্কর বললে, "যদি আসে—? দেখে এলাম খালের ওপার থেকে ওরা চিৎকার করছে, এপার থেকে এরা চেঁচাচ্ছে। এই চলছে দিনরাত।"

সুরপতি বললে, "আজ সারাদিন ত তুমি বাড়িছাড়া। আর তখন আমাকে বললে, বাড়ির বাইরে থাকলে মা তোমার কেঁদে কেঁদে মরে যাবে!"

শঙ্কর বললে, "ঠিক সময়ে আমি মার কাছে গিয়ে খেয়ে এসেছি। আবার রাত্রেও গিয়ে খেয়ে আসব। একটা বাইক্ পেলে ভাল হত। বিজনের কাছ থেকে চেয়েছি, দেখি যদি পাই।"

সুরপতি বললে, "আমি তোমাকে সবকিছু দিতে পারি শঙ্কর, তুমি যদি আমার কথা-মত কাজ কর।"

শঙ্কর হাসলে সুরপতির মুখের দিকে তাকিয়ে। বললে, "করব, এই হাঙ্গামাটা চুকুক।"

খালের এপারে পাহারা অবশ্য তারা দিয়েছিল। সুরপতি নিজেও একবার গিয়েছিল সন্ধ্যার পরে। দুটো আওয়াজও করে এসেছিল বন্দুকের।

সেদিন একটা ভারী মজার ঘটনা ঘটে গেল। রাত্রি তখন বোধ করি এগারটা হবে। পাড়ার সব জোয়ান ছেলেরা খুব খানিকটা চেঁচামেচি করে ক্লান্ত হয়ে একে একে সব বাড়ি চলে গিয়েছে। শঙ্করের দলের মাত্র জন পাঁচেক ছোকরা একটা গাছের তলায় বসে বসে গল্প করছে।

গল্প করছে এই ব্যাপার নিয়েই।

কে একজন বললে, "এটা কী হল বল্ দেখি? গৃহযুদ্ধ?"

ঘনা অন্যদিকে তাকিয়েছিল। বলে উঠল, "ওরে থাম। তোকে আর লেকচার মারতে হবে না। এইদিকে একবার তাকিয়ে দ্যাখ।"

সবাই তাকিয়ে দেখলে। শঙ্কর এগিয়ে এল। দূরে গজার বাড়ির দরজার দিকে আঙুল বাড়িয়ে ঘনা চুপি চুপি বললে, "কী মনে হচ্ছে?"

রাস্তার আলো গিয়ে পড়েছিল একটা গাছের উপর, অল্প সেই গাছের ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু ঝাপসা আলো পড়েছিল গজার দরজায়, তাইতে মনে হল, কে একটা লোক যেন দোরটা একবার খুলছে, আবার বন্ধ করছে।

শংকর বললে, "বাড়িতে ত কেউ নেই।"

ঘনা বললে, "নেই বলেই ত ঢুকছে।"

শংকর বললে, "চোর নিশ্চয়ই। ফাঁকা বাড়ি পেয়ে কিছু চুরি করবে বলে ঢুকেছে।"

"যেই হক, চল দেখি।"

ছুরি ছোরা লাঠি সোঁটা যা কিছু ছিল প্রত্যেকে হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল বাড়িটার দিকে।

দোরের কাছে গিয়ে দেখে ভিতর থেকে খিল বন্ধ।

"হ্যাঁ ঠিক। আমাদের আসতে দেখে ভেতর থেকে খিল বন্ধ করে দিয়েছে।"

ঘনা বললে, "সাবধান কিন্তু, অনেকে আছে। ফাঁকা বাড়ি পেয়ে এইখানে ঘাটি করেছে।"

তারু বললে, "আমরা ছ'জন মাত্র আছি। দলে যদি ওরা ভারী হয়, আমরা বেকায়দায় পড়ে যাব। দাঁড়া আরও লোক জড় করি।"

শংকর বললে, "না। কেউ যদি না থাকে ত লোকে হাসবে। পাঁচিল টপকে চল আগে ঢুকে পড়ি। দোরের কাছে কে থাকবে? তোর হাতে ধারালো টাঙ্গি আছে। তুই থাক্।"

দুটো কপাটের ফাঁকে টাঙ্গিটা ঢুকিয়ে দোরের খিলটা বাইরে থেকে খোলবার চেষ্টা করছিল ঘনা। একটু এদিক ওদিক করতেই খুলে গেল।

শংকর বললে, "আয়।"

বলে সে নিজেই আগে ঢুকে পড়ল। তার একহাতে ছিল টর্চ, আর একহাতে ছোট একটি লাঠি। টর্চ ফেলে সুইচটা দেখে নিয়ে বারান্দার আলোটা জেলে ফেললে।

কিন্তু কোথায় মানুষ? দু'খানি মাত্র ঘর। সুমুখে একটুখানি বারান্দা। বারান্দার পাশে টিনের একটি ছোট্ট ঘরের একপাশে রান্নার উনোন পাতা, আর তার পাশেই জলের কল আর চৌবাচ্চা।

দু'খানা ঘরেই তালা বন্ধ। টেনে টেনে দেখলে। খোলা গেল না।

"দোরে আর মিছেমিছি পরশুরাম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি কেন?"

ঘনাও ঘরে ঢুকল।

ছ'জন লোক তন্ন তন্ন করে' খুঁজতে লাগল। কিন্তু মানুষ ত ইঁদুর নয় যে, গর্তে ঢুকল, পাখি নয় যে, উড়ে পালাস। মানুষ একটা ছিল নিশ্চয়ই। নইলে ভিতর থেকে সদর দরজায় খিল বন্ধ করলে কে?

কে একজন বললে, "ছাতে গিয়ে ওঠেনি ত?"

কিন্তু ছাতে ওঠবার কোনও ব্যবস্থাই নেই কোথাও।

বাথরুমটা পর্যন্ত টর্চ ফেলে দেখে আসা হল। সেখানেও নেই।

পালিয়েছে তাহলে।

এই বলে শংকর রান্নাঘরের টিনটা তার হাতের লাঠি দিয়ে খুঁচে খুঁচে দেখছিল, সবাই তখন বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, এমন সময় শংকর চেঁচিয়ে উঠলো, "পেয়েছি! উঠে আয় ব্যাটা, উঠে আয়!"

হুড়মুড় করে সবাই তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। দেখা গেল, ফাঁকা চৌবাচ্চার ভেতর জড়সড় হয়ে বসে আছে একটি মানুষ। বয়স তিরিশ পেরিয়েছে কি না সন্দেহ। লাঠির খোঁচা খেয়ে সে তখন উঠে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে। মুসলমান যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পরনে লুঙ্গি, গায়ে ছেড়া ফতুয়া। মুখে দাড়ি গোঁফ।

হঠাৎ 'জয় মা!' বলে চেঁচিয়ে উঠলো ঘনা। দেখা গেল, হস্তারকের মত দু'হাত দিয়ে টাঙ্গিটা সে তখন তুলে ধরেছে।

শংকর বললে, "না।"

"না কি? আমাদের অনেককে ওরা এমনি করে মেরেছে। চৌবাচ্চার ওপর মাথাটা চেপে ধর, আমি দিই বলিদান করে।"

শংকর বললে, "চুপ কর।"

লোকটা তখন চৌবাচ্চা থেকে নেমে শংকরের পাদুটো জড়িয়ে ধরেছে।

শংকর তার চুলের মুঠি ধরে তাকে টানতে টানতে এনে ফেললে বারান্দায়। বারান্দায় ভাল আলো ছিল। লোকটা কাঁদছে, আর থর থর করে কাঁপছে। মুখ দিয়ে ভাল করে কথা বেরুচ্ছে না। খালি বলছে, "জানে মারবেন না বাবু, আমার কাচ্চাবাচ্চা আছে।"

লোকটা তোতলা। ভয়ে যেন আরও তোতলা হয়ে গেছে।

শংকরকে সরিয়ে দিয়ে তারু এগিয়ে এল। ঠাস ঠাস করে দুটি চড় মেরে তারু জিজ্ঞাসা করলে, "দলে ক'জন আছিস তোরা বল। কী মতলব করেছিলি? সঙ্গে কী এনেছিস? ছুরি? কই দেখি।"

কোমরে হাত দিয়ে দেখলে কিছু নেই।

লোকটা বললে, "আমি ও-দলের নই বাবুমশাই। আমি গজুভাইএর কাছে এসেছিলাম।"

"চোপ, ব্যাটা বলে কি না গজুভাই! গজুভাইকে ছুরি মারতে এসেছিলি?"

লোকটার পকেটে ছুরির খোঁজ করতে গিয়ে তারু বের করলে দুটি দশ টাকার নোট, আর একটি পাঁচ টাকার। পঁচিশ টাকা। আর এক পকেট থেকে বার হল চারটি বিড়ি আর একটি দেশলাই।

ঘনা বললে, "ওই পঁচিশটে টাকা কেড়ে নিয়ে দে ব্যাটাকে ছেড়ে দে।"

তারু বললে, "সেই ভাল।"

টাকা পঁচিশটা শংকরের হাতে দিয়ে তারু তাঁকে মারতে মারতে দোরের বাইরে টেনে এনে বললে, "তোদের দলের লোককে বলিস, এদিকে যেন হাঙ্গামা করতে না আসে। এলে আর বেঁচে ফিরে যেতে হবে না।—ভাগ্!"

বলে এক লাথি মেরে তাকে ছেড়ে দিতেই লোকটা প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে গেল।

বোসবাগানে হাঙ্গামা বিশেষ কিছু হল না।

সবাই বলতে লাগল, "ভাগ্যিস লোকটা সেদিন ধরা পড়ে গেল, নইলে নিশ্চয়ই একটা কিছু হত।"

তার কাছ থেকে কেড়ে-নেওয়া পঁচিশটা টাকা গজার বউয়ের হাতে দিয়ে শংকর বলেছিল, "এই দিয়ে চালাও কয়েকটা দিন। ফুরোবার আগেই গজাদার টাকা এসে যাবে।"

গজাদার টাকা আসবার আগে কিন্তু গজা নিজেই এসে হাজির হল। মেদিনীপুরে পৌঁছেই সে শুনতে পেলে কলকাতার নাকি একটা ভারী বিশ্রী ব্যাপার শুরু হয়েছে। দিনে দুপুরে মানুষের বাড়ি বাড়ি ঢুকে দুর্বৃত্তরা নাকি মেয়েছেলে সব কুচি কুচি করে কেটে দিয়ে যাচ্ছে। শহরের পথে রক্তগঙ্গা বইছে। দিনে দুপুরে পথে পথে শেয়াল-শকুনের জটলা চলছে। আরও সব দোকান-পাট লুটতরাজের ছোটখাটো ভাল ভাল খবরও সে পেয়েছিল, কিন্তু সে সব কথা এখানে অবান্তর। তার শুধুই মনে হতে লাগল, বাড়িতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই, তার উপর শংকরের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে, সুতরাং এই সর্বনাশা হত্যাকাণ্ড তার বাড়িতেও যে সংঘটিত হয়েছে, তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। চোখের সুমুখে নানারকম ভয়াবহ চিত্র ক্ষণে ক্ষণে উপস্থিত হতে লাগল। তার স্ত্রীর বয়স বেশী নয়, দেখতেও সুশ্রী, অবিবাহিতা যুবতী ভগিনী পরমাসুন্দরী, —তাদের সর্বনাশ যা হবার তা ত হয়েই গিয়েছে। আর নয়ত ছুটে পালাতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে, তক্ষুনি একটা পা দিয়েছে কেটে, তারপর কেটেছে হাত, তারপর খানিকটা মাংসপিণ্ডের মত ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় রক্তের স্রোতে ভেসে চলেছে তারা। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে দুটো হয়ত-বা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছে। দুটো বর্শা দিয়ে বিঁধে এফোঁড় ওফোঁড় করে তাদের চুপ করিয়ে দিয়েছে জন্মের মত। তারপর বাড়ির সুমুখের গাছের ডালে টাঙিয়ে দিয়েছে তাদের মৃতদেহ।

কলকাতায় ফিরে যাবার জন্যে মন তার উতলা হয়ে উঠল। কিন্তু কপর্দকহীন নিঃসম্বল অবস্থায় সেখানে গিয়েই বা কী করবে সে?

আপিসের বড়বাবু তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ সময় আপনার বাড়ি ছেড়ে আসা উচিত হয়নি গজেনবাবু।"

মাত্র এইটুকু সহানুভূতি! গজেনের চোখের সামনে সেই কাল্পনিক ভয়াবহ চিত্র ভেসে উঠল—ছেলেমেয়ে দুটোর মৃতদেহ গাছে টাঙান, তার দিকে যেন হাত বাড়িয়ে আছে।

হাউমাউ করে' কে'দে উঠল গজা। তারপর কান্না থামিয়ে বললে, "কী করব বলুন! টাকার বড় অভাব—"

কথাটা শেষ করতে হল না। বড়বাবু লোকটি দয়ালু। তৎক্ষণাৎ চল্লিশটি টাকা তার হাতে দিয়ে বললেন, "এক্ষুনি চলে যান। গিয়ে চিঠি দেবেন।"

চল্লিশটি টাকার একটি পয়সাও খরচ করেনি সে। ট্রেনের টিকিটও কেনেনি, খায়ওনি কিছু। হাওড়া স্টেশনে নেমে সত্যিই দেখেছে—শহরের সেই ভয়াবহ রূপ। কেমন করে কোন্‌দিক দিয়ে কুখ্যাত পল্লীর পথ এড়িয়ে গজা তাদের বোসবাগানে এসে ঢুকেছে তার মনে নেই। বাড়ির দিকেই যাচ্ছিল সে ছুটতে ছুটতে, পথে সুরপতির সঙ্গে দেখা। বন্দুক নিয়ে সেদিনও সে রাউন্ডে বেরিয়েছিল।

থম করে থেমে গেল গজা। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে সেই দুর্ধর্ষ গজেন সমাদ্দার। চোখ দুটো তার জলে ভরে এসেছে। কোনও কিছু প্রশ্ন করতে ভয় করছে।

সুরপতি নিজেই বললে, "বাড়িতে আপনার কেউ নেই।"

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল গজা।—"যাঃ, সব শেষ হয়ে গেছে?"

সুরপতি বললে, "না না, সবাই ভাল আছে। তবে আপনার বাড়িতে কেউ নেই। আছে ওই ক্লাব-ঘরে।"

গজা উঠে দাঁড়িয়েছে তখন। জিজ্ঞাসা করলে, "হামলা হয়েছিল বুঝি?"

সুরপতি বললে, "হয়নি। হতে পারত। যে-শঙ্করকে আপনি শয়তান বলে তাড়িয়ে দিলেন, সেই শঙ্করই বাঁচিয়েছে আপনার বাড়ির সবাইকে। বাঁচিয়েছে এই পাড়াটাকে।"

গজা তার মুখ দিয়ে একবার উচ্চারণ করলে, "শঙ্কর?"

শঙ্কর বলতেই শঙ্কর!

ঘনা আর তারুকে সঙ্গে নিয়ে শঙ্কর বোধকরি সেইদিকেই আসছিল। সুরপতি বলে উঠল, "ওই ত শঙ্কর! অনেকদিন বাঁচবে তুমি। এই মাত্তর তোমার নাম হচ্ছিল।"

সে-কথায় কান দিলে না শঙ্কর। গজা কখন এল, কেমন করে এল, তাও জিজ্ঞাসা করলে না। শুধু বললে, "ছি গজাদা, একটা পয়সাও দিয়ে যাওনি বউদির হাতে?"

গজা বললে, "দেব কোত্থেকে?"

এই বলে একটু থেমে একটা ঢোঁক গিলে বললে, "একটা ব্যবস্থা আমি করে গিয়েছিলাম, এই হাঙ্গামাটা না বাধলে হয়ত সে দিয়ে যেত তোর বউদির হাতে।"

শঙ্কর বললে, "কোথায় থাকে বল, আর একখানা চিঠি লিখে দাও, আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।"

গজা বললে, "কাছেই থাকে ওই খাল-পারে, কিন্তু আর হবে না। সে মুসলমান।"

মুসলমান!

গজা বললে, "হ্যাঁ। তোরাব আলিকে বলে গিয়েছিলাম—পঁচিশটে টাকা তোর বৌদির হাতে দিয়ে যেতে।"

কথাটা ধক করে এসে বাজল শঙ্করের বুকে। বললে, "তোরাব আলি? কেমন চেহারা বল দেখি? দেখতে কেমন?"

গজা বললে, "দেখতে আর পাঁচজন যেমন হয়। মুখে গোঁফ আছে, এইখানে চারটি দাড়ি আছে, রোগা পাতলা চেহারা, ভাল করে কথা বলতে পারে না। তোতলা।"

বুঝতে কারও বাকী রইল না। ঘনা, তারু, শঙ্কর—তিনজনেই বুঝতে পারলে। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, "জানে মের না বাবু, বাড়িতে আমার কাচ্চাবাচ্চা আছে।"

তারুর হাতটা কেমন যেন ঝিন্‌-ঝিন্‌ করে উঠল। এই হাত দিয়ে সে তাকে মেরেছিল।

শঙ্কর বললে, "পঁচিশটে টাকা সে দিয়ে গেছে। আমি বউদির হাতে দিয়েছি।"

শঙ্করের গলাটা মনে হল যেন ধরা-ধরা। রাত্রে ঠাণ্ডা লেগেছে কিনা তাই-বা কে জানে!

কোনও কিছুই চিরস্থায়ী নয় এই পৃথিবীতে।

প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল। থেমে গেল।

নরমেধ যজ্ঞশালার দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াল সত্যাশ্রয়ী এক বৃদ্ধ তাপস। মুণ্ডিত-মস্তক স্খলিতদন্ত নির্ভীক এক ভিখারী এসে দাঁড়াল মানুষের কাছে। বললে, বনের হিংস্র পশুর কাছে আসিনি আমি। এসেছি মানুষের কাছে। মানবতার পূজারী আমি। পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে তোমরা এসে দাঁড়াও আমার সুমুখে। আমি তোমাদের সেবা করব। পূজা করব তোমাদের।

হোমাগ্নিশিখা নির্বাপিত হল।

শঙ্করের আর কোনও কাজ নেই।

সুরপতি ধরলে তাকে। বললে, "এস তুমি আমার সঙ্গে। তোমাকে আমি রাইফেল চালাতে শেখাব। আজকালকার দিনে এ-সব শিখে রাখা ভাল।"

রাইফেল, রিভলবার শিখতে শঙ্করের মোটেই দেরি হল না। দশদিন যেতে-না-যেতেই সুরপতি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলে, শঙ্কর তার বন্দুক দিয়ে একটা উড়ন্ত পাখিকে নামিয়ে দিলে। দেখতে দেখতে শঙ্করের টারগেট প্র্যাকটিস অব্যর্থ হয়ে উঠল।

কিন্তু অদ্ভুত প্রকৃতির ছেলে এই শঙ্কর।

তারপর কোথায় যে সে ডুব মারলে, সুরপতি তার আর কোনও সন্ধানই পেলে না।

মায়ের তাড়া খেয়ে আবার তাকে ইস্কুলে যেতে হল।

কিন্তু ইস্কুল তখন তার নাম কেটে দিয়েছে। অনেকগুলো টাকা লাগবে।

লজ্জায় সে তার মাকে কিছু বলতেও পারলে না।

অতগুলো টাকা মা তার পাবেই-বা কোথায়।

ইচ্ছে করলে টাকা সে অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারত, কিন্তু ইচ্ছে তার কিছুতেই হল না।

ক্লাসে গিয়ে বসতেও তার ভাল লাগে না। মনে হয় যেন ছেলেগুলো সবাই তার চেয়ে বয়েসে ছোট।

চারিদিকে সেদিন রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে। অসম্ভব গরম। শঙ্কর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে বইখাতা নিয়ে। মা জানে সে ইস্কুলে গিয়েছে।

ইস্কুলের বাইরে বাঁদিকের একখানা বাড়ির ছায়ায় নতুন একখানা মোটর দাঁড়িয়ে ছিল। ড্রাইভার সামনের সিটে লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। পা দুটো দোরের বাইরে বেরিয়ে আছে। গাড়িখানা কার—শঙ্কর জানে। তাদেরই ক্লাসে পড়ে নরেন—মস্ত বড়লোকের ছেলে। লেখাপড়া করে না। পিছনের বেঞ্চে বসে থাকে। গাড়ি নিয়ে ইস্কুলে আসে। আবার সেই গাড়ি করেই বাড়ি যায়।

শঙ্কর সময়টা কাটাবার জন্যে গাড়ির দোর খুলে পিছনের সিটে গিয়ে বসল। ফুর-ফুর করে হাওয়া বইছিল। বসে বসে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, বুঝতে পারেনি।

ঘুম যখন ভাঙল, দেখলে গাড়ি তখন চলছে। পাশে বসে আছে নরেন।

নরেন হাসছে ফিক্‌-ফিক করে।

শঙ্কর বললে, "দাঁড়াতে বল, আমি নেমে যাব।"

নরেন বললে, "নামতে হবে না। চল আমাদের বাড়িতে কারম খেলবি।"

শঙ্কর বললে, "আমার খুব খিদে পেয়েছে। খাওয়াবি ত যাই।"

নরেন বললে, "খাওয়াব। কিন্তু হাঁরে, তুই এতদিন ইস্কুল আসিসনি কেন? আজও ত দেখলাম ক্লাসে ঢুকেই পালিয়ে এলি।"

শঙ্কর বললে, "একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা লাগবে। দেব কোত্থেকে?"

নরেন কী যেন ভাবলে। ভেবে বললে, "আমি যদি দিই!"

"ধেৎ! তোর টাকা আমি নেব কেন? আমার আর পড়তে ভাল লাগে না।"

নরেন বললে, "ঠিক বলেছিস মাইরি, আমারও ভাল লাগে না। কিন্তু মা ছাড়ে না যে!"

শংকর চুপ করে রইল। নরেন তার কাছে একটু এগিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করলে, "চেহারাটা আচ্ছা বাগিয়েছিস কিন্তু। কী করে বাগালি বল ত?"

শংকর বললে, "তোর এমনি হতে ইচ্ছে করে?"

নরেন খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। বললে, "করে না আবার! তুই পারিস করে দিতে?"

শংকর বললে, "নিশ্চয় পারি।"

"কী করতে হবে বল। খুব খেতে হবে?"

শংকর হাসলে। বললে, "না।"

গাড়ি এসে দাঁড়াল নরেনদের বাড়ির দরজায়। চমৎকার বাড়ি। কিন্তু লোক নেই বাড়িতে। নরেনের বিধবা মা আর সে। বাকী সব দাসদাসী।

শংকরকে নিয়ে গিয়ে নরেন প্রথমেই তার মার সংগে পরিচয় করিয়ে দিলে। বললে, "মা, আমরা একসংগে পড়ি। এর নাম শংকর। আমরা কিন্তু এক্ষুনি মাংস আর লুচি খাব।"

মা বললেন, "মাংস ত এক্ষুনি হয় না বাবা, দোকান থেকে তাহলে আনিয়ে দিতে হয়।"

"তাই দাও।"

লুচি-মাংস আনাতে দেরি হল না, কিন্তু শংকর কী যে দেখলে এই মা আর ছেলেটির ভিতর, তার পরদিন থেকে তার আর টিকিটি দেখা গেল না। নরেন তার বাড়ির ঠিকানাও জানে না যে খুঁজে বের করবে।

নরেনের মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কই রে, তোর সেই বন্ধুটি কোথায় গেল?"

নরেন বললে, "টাকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়ত। ভারী গরিব। টাকার অভাবে ইস্কুলে যেতে পারছে না।"

"কত টাকা?"

"জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিছুতেই বলতে চাইলে না।"

মা বললেন, "ভাল ছেলে। জিজ্ঞাসা করবি কত টাকা। আহা, টাকার অভাবে পড়তে পারছে না! টাকা আমি দেব।"

সেইদিন থেকে নরেন খুঁজে বেড়াতে লাগল শংকরকে।

শংকরের আর এক বন্ধু বিজন। বড়-লোকের ছেলে নতুন একটি বাইক কিনেছে। হঠাৎ তার সংগে রাস্তায় দেখা। এক

বাইকটা শংকরকে দেখাবার জন্যে বিজন বাইক থেকে নামল।

"দ্যাখো কেমন সুন্দর বাইক। কত দাম জান?"

শংকর বললে, "জানবার দরকার নেই। গরিব মানুষ, কোনদিন কিনতে ত পারব না। তবে বাইকে চড়া যদি শিখিয়ে দিস ত শিখতে পারি তোর বাইকে।"

বিজন বললে, "এস। একদিনেই শিখিয়ে দেব। বোস এইখানে।"

শংকর প্রস্তুত। বিজনের বাইকের পেছনে চড়ে তক্ষুনি চলে গেল সে বাইকে চড়া শিখতে।

শংকরের শিখতে অবশ্য দেরি হল না।

কিন্তু সব জিনিসেরই একটা নেশা আছে। বিজনের বাইক চড়ে শংকর ঘুরে বেড়াতে লাগল।

শেষে একদিন বললে, "দিন কয়েকের জন্যে দিবি তোর বাইকটা?

"কেন দেব না? নিয়ে যাও।"

সেই বাইক নিয়েই শংকর এসেছিল। এসেছিল অরিন্দম ঘোষালের বাড়িতে। এক দিন নয়, দিনের পর দিন বিজনের বাইকটি ছিল তার সংগে।

রাস্তায় বিজনের সংগে একদিন দেখা হয়েছিল, বিজন ফেরত চেয়েছিল তার বাইক। শংকর বলেছিল, "দাঁড়া না। অত ছটফট করছিস কেন?"

বিজন হয়ত ভেবেছিল, শংকর তার বাইকটা আর দেবে না। তাই সে ও-পাড়ার ছেলেদের সংগে নিয়ে গিয়ে ঘোষাল-বাড়ির সামনে যে-কেলেংকারি করে এল, শংকর সেকথা ভুলবে না কোনদিন।

ঘোষাল-বাড়ি তাকে ছাড়তে হল চির-দিনের জন্যে।

এই ছাড়ার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে-ছিল নরেন।

নরেনের মার হাতে লুচি আর মাংস খেয়ে

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar
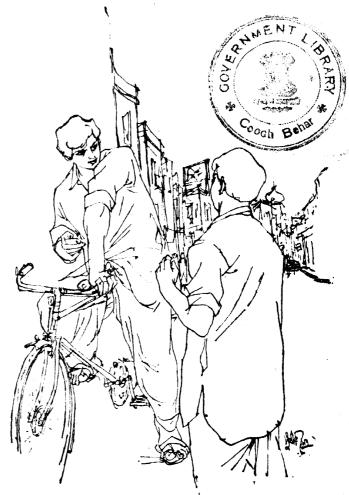
"দাঁড়া না, অত ছটফট করছিস কেন?"

যে নরেনকে সে পরিত্যাগ করে এসেছিল, আবার একদিন হঠাৎ সে তারই কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বললে, "আমাকে টাকা দিবি বলেছিলি, কই দে।"

নরেন জিজ্ঞাসা করলে, "কত টাকা?"

শংকর বললে, "আপাতত পঞ্চাশ টাকার কম নয়।"

নরেন তারপর মার কাছ থেকে পঞ্চাশটি টাকা এনে শংকরের হাতে দিয়ে বললে, "আমার শরীরটাকে তোর মত করে দিবি বলেছিলি, তার কী হল?"

শংকর বললে, "আমি যা বলব শুনবি ত?"

নরেন বললে, "শুনব।"

"পরশু সকালে এসে তোকে নিয়ে যাব। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠবি।" বলেই শংকর চলে গেল।

নরেন ভেবেছিল হয়ত সে আর আসবে না।

ভাবনাটা তার আরও বদ্ধমূল হয়ে গেল, যখন দেখলে, যার জন্যে টাকা নেওয়া, সেই ইস্কুলেও সে যায়নি। শংকরের উপর মনটা তার বিরূপ হয়েই রইল। ভাবলে, ছেলেটা জোচ্চোর।

শংকর কিন্তু সেই টাকা নিয়ে প্রথমেই গেল বোসবাগানে। উত্তর দিকে ছোট যে বস্তিটি ছিল, খুঁজে বের করলে সেখান একখানি ছোট ঘর। মাকে তার ঘোষাল-বাড়ি থেকে আনতেই হবে।

নিয়েও এল মাকে। কিন্তু যে দাম দিয়ে আনতে হল, সে-কথা মনে তার গাঁথা হয়ে রইল চিরজীবনের মত। বড়লোকেরা হয়ে রইল তার দু'চক্ষের বিষ।

নরেনকে সে কথা দিয়ে এসেছে। সে-কথা তাকে রাখতেই হবে।

বোসবাগানের ক্লাব-ঘরে তখন তালা ঝুলছে।

শংকর গিয়ে দাঁড়াল সুরপতির কাছে। চাবিটা চেয়ে এনে ক্লাব খুললে। বন্ধুদের বললে, "ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার কর। আমি আসছি।"

নরেনকে নিয়ে এল বোসবাগান ক্লাবে। শুধু নরেনের জন্যেই বোসবাগান ক্লাব আবার চালু হল।

নরেনকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগল শংকর। শরীরটাকে তার শক্ত করে তুলতে হবে। সানন্দে সে-দায়িত্ব শংকর গ্রহণ করেছে তার অর্থের বিনিময়ে।

নরেন একদিন চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করলে শংকরকে, "ইস্কুল যাওয়া তুই ছেড়ে দিয়েছিস, না রে?"

শংকর বললে, "হ্যাঁ।"

"আমারও ইচ্ছে করে। কিন্তু মার ভয়ে পারি না।"

"মাকে তুই ভয় করিস নাকি?"

নরেন বললে "কচু! বল্ না তোর কত টাকা চাই। আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।"

টাকার জন্যে তখন পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে শংকর। নরেনের দেওয়া পঞ্চাশ টাকা তার কবে খরচ হয়ে গিয়েছে।

শংকর বললে, "কেমন করে আনবি? মা তোর বকবে না?"

নরেন বললে, "মা জানলে ত!"

শংকরের মুখখানা কেমন যেন হয়ে গেল। বললে, "চুরি করে আনবি? ছি, চুরি করিস না।"

নরেন বললে, "চুরি কেন করব? গাড়ি বাড়ি টাকাকড়ি সবই ত আমার। আমিই মালিক। আমারই ত সব।"

শংকর আর-কিছু জানতে চাইলে না। বললে, "তাহলে আরও পঞ্চাশটা টাকা এনে দে।"

পরের দিন সকালে নরেন এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। অন্যদিন গাড়ি নিয়ে আসে, সেদিন এল পায়ে হেঁটে। শংকর তখন খালি গায়ে ক্রমাগত ডন টেনে টেনে শরীরটাকে গরম করছে।

নরেন বললে, "উঠে আয় দেখি একবার।"

শংকরকে সে ক্লাবঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে এমনভাবে হাসতে লাগল, মনে হল, যেন সে দিগ্বিজয় করে এসেছে।

"শংকর বললে, "হাসছিস কেন? কী বলবি বল।"

নরেন বললে, "আমার মা ত লেখাপড়া জানে না, তাই ব্যাঙ্কে আমাদের টাকা থাকে না। মায়ের সিন্দুকে আলমারিতে যেখানে সেখানে শুধু তাড়া তাড়া নোট।"

শংকর বললে, "থাকবেই ত! তোরা বড়লোক।"

নরেন আবার হাসলে। বললে, "তুই ত পঞ্চাশটা টাকা চেয়েছিলি, আমি সেই নোটের একটা বান্ডিল থেকে পাঁচখানি নোট বের করে' আনলাম তোর জন্যে। কিন্তু বাইরে এসে দেখি কি পাঁচটাই একশ টাকার নোট।"

শংকর বললে "তাতে কী হয়েছে? এক-খানা নোট ভাঙিয়ে আমাকে দে পঞ্চাশটা টাকা।"

নরেন তার পকেট থেকে ভাঁজকরা পাঁচ-খানা নোটই বের করলে, তারপর পাঁচ-খানাই শংকরের হাতে দিয়ে বললে, "এই নে আর ভাংগাতে পারি না। এখন কিন্তু আর চাইবি না।"

নরেন ভেবেছিল, মাসখানেক পরিশ্রম করলেই তার শরীরটা ঠিক শংকরের মত হয়ে যাবে। কিন্তু জন্মাবধি আদরের দুলাল শরীরটা তার গড়তে চায় না কিছুতেই। দু'বার ডন টেনেই থপ করে শুয়ে পড়ে। পাঁচবার ওঠ-বোস করলেই কোমরে হাত দিয়ে একটু দূরে গিয়ে বসে। বলে, "দাঁড়া, একটু জিরিয়ে নিই।"

শংকরের চেষ্টার ত্রুটি নেই। নিজে বার-বার দেখিয়ে দেয়।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

শেষে সব চেয়ে যা সহজ—ছোট ছেলেরা যা করতে পারে—শংকর তাকে তাই শেখায়।

দিন চার-পাঁচ শেখবার পরেই নরেন তার হাতখানা যার তার কাছে বাড়িয়ে ধরে বলতে থাকে, "দ্যাখ ত, মাসেলটা কী রকম শক্ত হয়েছে।"

বুক চিতিয়ে চিতিয়ে চলে আর বলে, "এবার মেরে দিয়েছি।"

শংকর একদিন তাকে তিরস্কার করলে। বললে, "এরকম করলে কিচ্ছু হবে না।"

নরেন বলে, "তোর হল কেমন করে?"

শংকর বলে "একদিনে হয়নি। এর জন্যে আমাকে অনেক কিছু করতে হয়েছে।"

নরেন বলে, "অনেককিছু করেছিস মানে ইস্কুল যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিস, এই ত? আমিও ছেড়ে দিচ্ছি দ্যাখ না! তখন হোল টাইম এই শরীর নিয়েই থাকব।"

শংকর বলে, "না না, ইস্কুল ছাড়িসনি। আমি ভাল কাজ করিনি।"

নরেনকে নিয়ে শংকর সত্যিই একটু বিপদে পড়ল। তারই দয়ায় তাকে আজকাল সংসারের কথা ভাবতে হচ্ছে না, বিনিময়ে সে যদি তার শরীরটা একটু ভাল করে না দিতে পারে ত অন্যায় হবে।

শংকর বললে, "কাল থেকে তোকে আমি 'আসন' শেখাব।"

'আসন' অভ্যাস করতে গিয়ে নরেন এক-দিন চিৎকার করে উঠল, "ওরে বাবারে, পাদুটো আমার ভেঙে গেল। এ আরও শক্ত। এ আমি পারব না।"

"পারবি না, মর।" বলে রাগের মাথায় শংকর তার মাথার উপর একটা চড় মেরে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

তারপর তিন দিন আর নরেনের দেখা নেই।

চারদিনের দিন যদি-বা এল ত বসে রইল চুপটি করে।

শংকর বললে, "গায়ের জামাটা খোল। আরম্ভ কর।"

নরেন বললে, "আজ থাক। ব্যায়াম করছি তাই একটু খাওয়াদাওয়া বেশী হচ্ছে কি না—পেটের অবস্থা ভাল নয়।"

শংকর বললে, "তোর কিছু হবে না নরেন।"

"নাহক গে।" বলেই নরেন তার পকেট থেকে রূপোর একটা সিগারেটের কৌটো বের করে ফেললে। তারপর কৌটোটা শংকরের সামনে খুলে ধরে বললে "খাবি?"

শঙ্কর বললে, "এ আবার কবে ধরলি?"

একটা সিগারেট মুখে দিয়ে দিয়াশলাই জ্বালিয়ে নরেন বললে, "ধরেছি।"

দেখেশুনে মনে হচ্ছে, নরেনের আর তেমন গা নেই।

একদিন আসে ত পাঁচদিন আসে না।

শঙ্করও হাল ছেড়ে দিয়েছে।

এমনদিনে শঙ্কর একদিন ক্লাবে গিয়ে শুনলে, নরেন নাকি আজকাল প্রতিদিন বই-খাতা নিয়ে দশটার সময় ক্লাবে আসে, দুটো বেঞ্চি জোড়া করে তার উপর পড়ে পড়ে সারা দুপুরটা ঘুমোয়, তারপর চারটের আগেই উঠে পালিয়ে যায়।

দুপুরে একদিন শঙ্কর তাকে গিয়ে ধরলে। "ইস্কুলে যাস না বুঝি?"

নরেন বললে, "না, ভাল লাগে না।"

শঙ্কর বললে, "ভাল কাজ করছিস না নরেন।"

নরেন বললে, "ভাল মন্দ আমি বুঝব। তুই থাম।"

শঙ্কর থামল। আর কোনও কথাই সে বললে না।

নরেনের মোটরটা একদিন সকালে ক্লাবের সমুখে এসে দাঁড়াল।

শঙ্কর ভেবেছিল, নরেন আসছে। কিন্তু গাড়ি থেকে নামল ড্রাইভার। ক্লাবের দরজায় এসে বললে, "শঙ্করবাবু আছেন?"

শঙ্কর বেরিয়ে এল।

ড্রাইভার বললে, "মা আপনাকে ডাকছেন।"

শঙ্কর গাড়ির কাছে এসে দেখে, নরেনের মা বসে আছেন গাড়িতে।

শঙ্করকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, "আমার নরেনকে তুমি কী বলেছ?"

শঙ্কর বললে, "কিছু করছে না বলে একটু বকেছি।"

মা বোধ হয় তৈরি হয়েই এসেছিলেন। বললেন, "থাক, আর সাধু সাজতে হবে না। নরেনকে তুমি ইস্কুল যেতে বারণ করেছ। বলেছ, চব্বিশ ঘণ্টা প্র্যাকটিস না করলে শরীর ভাল হবে না।"

শঙ্কর যেন আকাশ থেকে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলে, "কে বললে এ-কথা?"

"যাকে বলেছ সেই বলেছে।"

শঙ্কর বললে, "নরেনকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। আমি তাকে একবার জিজ্ঞেস করব।"

নরেনের মা বললেন, "সে আর আসবে না এখানে। তোমার ভয়ে সে একেবারে সিঁটিয়ে গেছে। তুমি তার হাত মুড়ে দিয়েছ, পা ভেঙে দিয়েছ, টাকাকড়ি কত যে নিয়েছ তা তুমিই জান। তুমি একটি গুণ্ডা, তুমি জোচ্চোর, তুমি শয়তানের একশেষ।"

মাথা হেঁট করে শঙ্কর দাঁড়িয়ে রইল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার ঝিমঝিম করছে। এ সময় নরেনকে হাতের কাছে পেলে কী যে সে করত বলা যায় না। কিন্তু নরেনের মাকে কিছুই সে বলতে পারলে না।

নরেনের মা বললেন, "তুমি আর কোন-দিন আমার বাড়ির দরজা মাড়াবে না। আবার যদি নরেনের সঙ্গে তোমাকে দেখতে পাই ত আমি কিছু বাকী রাখব না বলে দিচ্ছি।"

এই কথা বলে তিনি ড্রাইভারকে বললেন, "চল।"

গাড়ি চলে গেল। শঙ্কর তখনও সেই-খানে দাঁড়িয়ে।

নরেন বড়লোক! অরিন্দম ঘোষালের বড় ছেলেও বড়লোক।

জনকতক ছেলে ছিল ক্লাবের ভিতর বসে। তারা সবই শুনেছে। একজন বেরিয়ে এল। ডাকলে, "শঙ্কর দা!"

"উঁ।"

"তুলে আনব একদিন নরেনকে?"

শঙ্কর চুপ করে কী যেন ভাবছে। জবাব দিলে না।

"দেব নাকি আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে?"

শঙ্কর বললে, "না।"

ক্লাব-ঘরের দোরের কাছে গিয়ে বললে, "বন্ধ কর।"

"এক্ষুনি?"

"হ্যাঁ।"

ক্লাব-ঘর বন্ধ করে চাবিটা হাতে নিয়ে শঙ্কর বললে, "আমি বাড়ি যাচ্ছি।"

অরিন্দম ঘোষালের বড় ছেলে তাকে মেরেছিল। সে জ্বালা সে তখনও ভোলেনি। আজ নরেন তাকে যে-মার মারলে, সে-মারের জ্বালা যেন আরও মর্মান্তিক।

ক্লাব-ঘর বন্ধ করে শঙ্কর তার বাড়ির দিকেই যাচ্ছিল, পথের মধ্যে নাদুশ-নুদুশ এক প্রিয়দর্শন যুবক তাকে দেখেই থমকে থামল।

"চিনতে পারছেন?"

শঙ্কর তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে। চেনা-চেনা মনে হল। মনে হল কোথায় যেন দেখেছে তাকে। কিন্তু কোথায় দেখেছে মনে পড়ল না।

শঙ্কর বললে, "না, ঠিক চিনতে পারছি না।"

ছোকরা বললে, "আমি মডার্ন প্রিণ্টিং থেকে আসছি।"

শঙ্করের মনে পড়ল। বললে, "ও, আপনাদের সেই হ্যাণ্ড বিল ছাপানো বিলের দরুন পঁচিশ টাকা দেওয়া হয়নি।"

"আজ্ঞে না। পঁচিশ টাকা নয়, কুড়ি টাকা। পাঁচ টাকা দিয়েছিলেন। মাঝে আমি একবার আপনার খোঁজে এসেছিলাম। শুনলাম ক্লাবটা বন্ধ হয়ে গেছে।"

শঙ্কর বললে, "আবার বন্ধ করে দিলাম।"

ছেলেটি একটু অবাক হয়ে গিয়ে শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "আবার বন্ধ করে দিলেন?"

শঙ্কর বললে, "তা হক। তোমাদের টাকা আমি মারব না। নেবে এস।"

শঙ্করের মন-মেজাজের ঠিক ছিল না, তাই সে আপনি বলতে গিয়ে তুমি বলে ফেলেছে। বলেই কিন্তু সে তার ভুলটা বুঝতে পারলে। বললে, "আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনাকে তুমি বলে ফেললাম।"

ছেলেটি বললে, "তুমি আমাকে তুমিই বল শঙ্করদা, আমিও তোমাকে 'তুমি' বলব। শোন শঙ্করদা, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

এই ব'লে ছেলেটি শঙ্করের একখানি হাত ধরে মিনতিকাতরকণ্ঠে তাকে অনুনয় করে রাস্তার ধারে একটা গাছের তলায় নিয়ে গিয়ে বসালে। প্রথমেই নিজের পরিচয় দিলে।

বললে, "আমার নাম শ্রীহরি। মডার্ন প্রিণ্টিং আর টাইপ ফাউণ্ড্রির যিনি মালিক আমি তাঁর ছোট ছেলে। আমি কিন্তু তোমার কাছে বিলের টাকা চাইতে আসিনি শঙ্করদা। ও-টাকা তোমাকে দিতে হবে না। ওরকম কত মোটা টাকা আমাদের মারা যায়। আমি এসেছি অন্য কারণে।"

শ্রীহরি প্রথমেই তার কারণটি সবিস্তারে বর্ণনা করলে। প্রথম যেদিন সে ছাপাখানার বিল নিয়ে এসেছিল, শঙ্করকে দেখে সেইদিনই সে তার প্রেমে পড়ে গিয়েছে। চুপি চুপি কতদিন সে তার বন্ধুবান্ধবদের ডেকে এনে শঙ্করকে দূরে থেকে দেখিয়েছে কিন্তু শঙ্করের সঙ্গে কথা বলবার সাহস তার কোনদিন হয়নি।

শ্রীহরির কথা বলবার ভঙ্গীটিও অপরূপ। ফোলা-ফোলা গাল আর ছোট ছোট দুটি চোখ। হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলবার সময় আনন্দের উত্তেজনায় তার সেই চোখদুটি গালের ভিতর ঢুকে কেমন যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। কালো কালো দুটি চোখের তারা শুধু গর্তের ভিতর থেকে জ্বল জ্বল করতে থাকে।

"তোমাকে আমার কী ভাল যে লেগেছে শঙ্করদা, তা আর কী বলব? তোমার দেখাদেখি আমিও একটা ক্লাব করে ফেলেছি, আর সেইদিন থেকে খালি খালি ভাবছি, কেমন করে তোমাকে আমাদের ক্লাবে একদিন নিয়ে যাব। এই ক্লাবটা বন্ধ হয়ে গেল শুনে আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে শঙ্করদা, আমি মাইরি বলছি।"

এই বলে শ্রীহরির সে কী হাসি!

গোলাকার একটা মাংসপিণ্ডের ভিতর সাদা সাদা দাঁতগুলি দেখা যায়, খিক খিক করে' হাসে, আর দুলতে দুলতে দুহাত দিয়ে শংকরের গায়ের উপর ক্রমাগত চড় মারতে থাকে।

শংকরের মুখে কিন্তু হাসি নেই। সে যেন আরও শক্ত হয়ে গিয়েছে। ভাবছে, এ-ও নরেনের মত আর-এক বড়লোকের ছেলে।

শংকর বললে, "দাও, তোমার ঠিকানা দাও। আমি একদিন যাব তোমাদের ক্লাবে।"

সংবাদটা শুনে শ্রীহরির আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে যাবার কথা, কিন্তু শংকরের মুখের দিকে তাকিয়ে আর তার কথা বেরুল না মুখ থেকে। বললে, "এই ত গংগার ধারে ঝিলপাড়ায় আমাদের বাড়ি। ক্লাবটা ওইখানেই। তের নম্বর সুধাকান্ত রায় লেন।"

পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে' ঠিকানাটা শংকর লিখে নিলে।

শ্রীহরি বললে, "ক্লাবে আমাদের টাকার অভাব নেই, কিন্তু আমরা চালাতে পারছি না শংকরদা। বলতে ভরসা হচ্ছে না, তবু একটা কথা বলব?"

"বল।"

"তুমি আমাদের সেক্রেটারি হবে?"

শংকর বললে, "সে-সব পরে দেখা যাবে। তুমি এখন যাও।"

শ্রীহরিকে বিদায় করে দিয়ে শংকর তার বাড়ি গেল। মাকে গিয়ে বললে, "এখান থেকে চল মা, অন্য জায়গায় যাই।"

বিমলা বললে, "কেন রে, এখানে ত আমরা ভালই আছি।"

শংকর বললে, "না মা, আরও ভাল থাকতে হবে।"

আবার একটা বাড়ি খুঁজে বের করতে বেশী দেরি হল না শংকরের।

এবারেও এক গরিবের বস্তির একটেরে ছোট একখানি বাড়ি।

কোথায় যে উঠে গেল বোসবাগানের কেউ জানল না শুনল না, ক্লাব-ঘরের চাবিটা শুধু একজনের হাতে দিয়ে সুরপতির কাছে পাঠিয়ে, শংকর চলে গেল সেখান থেকে।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় ঝিলপাড়ায় গিয়ে তের নম্বর সুধাকান্ত রায় লেনের বাড়িটা খুঁজে বের করলে শংকর। টিনের একখানা লম্বা ঘর, পিছনের দিকে অনেকখানা জায়গা পড়ে আছে—আগাছার জংগলে ভরা।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে শংকর দেখলে, ঘরের ভিতর একটা সতরঞ্চি বিছিয়ে জন দশ-বারো ছোকরা বসে বসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে হিন্দী সিনেমার একটা গান গাইছে, আর শ্রীহরি একটা চেয়ারে বসে বসে তাল ঠুকছে।

শংকর ডাকলে, "শ্রীহরি!"

মুখ বাড়িয়ে শংকরকে দেখেই শ্রীহরি লাফিয়ে উঠল। "ওরে থাম থাম তোদের গান থামা। ওই দ্যাখ কে এসেছে। এস এস শংকরদা, ভেতরে এস। আজ আমাদের কী সৌভাগ্য!"

দুহাত দিয়ে টানতে টানতে শংকরকে ভিতরে নিয়ে এসে চেয়ারের উপর বসালে শ্রীহরি। সবাইকার সংগে পরিচয় করে দেবার দরকার হল না। শ্রীহরির মুখে শংকরদার নাম আর প্রশংসা শুনে শুনে তারা হয়রান হয়ে গিয়েছে।

শংকরের মুখের দিকে হাঁ করে সবাই তাকিয়ে রইল।

তা তাকিয়ে থাকবার মত চেহারাই বটে।

শ্রীহরি বললে, "আমাদের ক্লাবের নাম দিয়েছি—ঝিলপাড়া শক্তি মন্দির। ভাল নাম হয়নি শংকরদা?"

শংকর এতক্ষণ পরে একটা কথা বললে। বললে, "না।"

শ্রীহরির গালের মাংসপিণ্ডের ভিতর চোখ দুটি আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে, "কেন, কেন শংকরদা?"

শংকর বললে, "যা দেখছি তাতে ত মনে হচ্ছে—সংগীতমন্দির।"

শ্রীহরি কিন্তু অপ্রস্তুত হল না। বললে, "এস তবে, দেখবে এস।" বলেই ফট করে একটা আলোর সুইচ টিপে শংকরকে তুলে নিয়ে গেল পিছনের সেই আগাছার জংগলে। বললে, "দেখেছ কত জায়গা পড়ে আছে! আমার ইচ্ছে আছে এখানে অনেক-কিছু করবার, কিন্তু—"

বলেই তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললে, "কেমন করে করতে হয় কিছুই ত জানি না। তবে আর তোমাকে ডাকছি কেন?"

শংকর জিজ্ঞাসা করলে, "টাকা আছে ক্লাবের?"

শ্রীহরি বললে, "আছে।"

"কত?"

"তা প্রায় একশ'র কাছাকাছি।"

শংকর মৃদু একটু হাসলে। বললে, "কাল আমি আসব। টাকাটা আমার হাতে দিও। দেখি কী করতে পারি।"

পরের দিন শংকর এল। টাকাটা নিলে। কাজও আরম্ভ করলে।

প্রথমে মজুর লাগিয়ে জংগল পরিষ্কার করলে। দুটো হরাইজণ্টাল বার বসানো হল। বড় একটা আমগাছের ডালে শক্ত দড়ি দিয়ে রিং টাঙানো হল। কুস্তির জায়গা ঠিক হল। নিজের হাতে শংকর মাটি তৈরি করলে। ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়ে শ্রীহরির দেওয়া "ঝিলপাড়া শক্তিমন্দির" নামে চমৎকার একটি সাইন বোর্ড লিখিয়ে টাঙিয়ে দিলে দোরের মাথায়।

তারপর একদিন খুব ঘটা করে ঝিলপাড়া শক্তি-মন্দিরের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল।

শ্রীহরি তাদের ছাপাখানা থেকে কার্ড ছাপিয়ে আনলে। সভায় সভাপতিত্ব করলেন শ্রীহরির বাবা। প্রধান অতিথি হলেন পাড়ার একজন ধনী ব্যক্তি। যাঁরা এলেন, খুব করে তাঁদের সন্দেশ খাওয়ান হল।

টাকা জোগালে শ্রীহরি।

টাকা সে কোত্থেকে আনলে শংকর কিছু দেখলে না। জানতেও চাইলে না।

তবে শংকরকে জানলে সবাই।

সবাই দেখলে প্রিয়দর্শন স্বাস্থ্যবান এক যুবক এর উদ্যোগী। পাড়ার ছেলে শ্রীহরিকে সামনে রেখে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছে সে।

শ্রীহরি ত আনন্দে আটখানা হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তার ফুলো ফুলো গাল দুটি যেন আরও ফুলে উঠল।

পাড়ার ছেলেরা স্বাস্থ্যের চর্চায় মন দিলে। সবাই বলতে লাগল, বাহাদুর ছেলে শ্রীহরি!

শংকর রইল তার অন্তরালে। কিছুতেই চাইলে না সে নিজেকে জাহির করতে।

শংকর না চাইলে কী হবে, সবারই নজর গিয়ে পড়ল তারই উপর।

শ্রীহরি একদিন বললে, "টাকার কী হবে শংকরদা? আর যে টাকার জোগাড় করতে পারছি না।"

শংকর জিজ্ঞাসা করলে, "এতদিন চালাচ্ছিলি কেমন করে?"

শ্রীহরি বললে, "বাবা, মা, দাদা—সবারই কাছ থেকে মোটা মোটা টাকা নিয়েছি। আর কিন্তু কেউ একটা পয়সা দিতে চাচ্ছে না।"

শংকর বললে, "মেম্বার ত অনেক। তার ভেতর বড়লোকের ছেলে ত দেখি অনেক। তারা টাকা দেয় না?"

শ্রীহরি বললে, "টাকা দেবে! চাঁদার টাকা পর্যন্ত দেয় না।"

"সব তাড়িয়ে দে।"

শ্রীহরি চুপ করে রইল।

শংকর জিজ্ঞাসা করলে, "কী? ইচ্ছে করছে না?"

শ্রীহরি বললে, "না, তাড়াব কেমন করে? বলতে কেমন যেন—"

শংকর বললে, "লজ্জা করছে?"

"হ্যাঁ"

শংকর বললে, "আমি তাড়িয়ে দেব। সব গরিবের ছেলেকে মেম্বার করব। চাঁদা না দিয়ে থাকে ত তারাই থাকবে।"

শ্রীহরি বললে, "শক্তি-মন্দিরের অ্যারিস্টো-ক্রেসি চলে যাবে না? ছোটলোকের ছেলেতে ভর্তি হয়ে যাবে যে!"

শংকর যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল। "ছোট-লোক কাকে বলছিস? গরিব হলেই ছোট-লোক হয় না। আমিও গরিব।"

নিষ্ঠুর নির্মম শংকর—পাথরের মত শক্ত শংকর যেন একটা সুযোগ পেয়ে গেল বড়লোকের বখাটে ছেলেদের অপমান করবার।

"ভাল ভাল কাপড়-জামা পরতে পার, সিগ্রেট ফুঁকতে পার, আর ক্লাবের চাঁদা দিতে পার না? বেরোও সব, দূর হয়ে যাও এখান থেকে!"

কতকগুলো সত্যিই চলে গেল। দু-একজন বেঁকেও দাঁড়াল। কিন্তু বাঁকাকে সোজা করতে দেরি হল না শংকরের। মার খেয়ে তারা আর সে-রাস্তা মাড়ালে না। দূরে থেকে শংকরকে গালাগালি দিতে লাগল।

আবার কেউ কেউ চাঁদার টাকা জমা দিয়ে শংকরের আনুগত্য স্বীকার করলে।

শংকর একদিন শ্রীহরিকে বললে, চাঁদার একটা মোটা বই ছাপিয়ে নিয়ে আয় তোদের ছাপাখানা থেকে। তাতে লেখা থাকবে—দরিদ্র-ভাণ্ডার। ঝিলপাড়া শক্তিমন্দির দ্বারা পরিচালিত। বড়লোক যারা, টাকা যারা খরচ করতে পারে, তাদের ধরবি। বলবি, চাঁদা দাও। যে দেবে না, আমাকে দেখিয়ে দিবি তাকে।"

শ্রীহরি খাতা ছাপিয়ে আনলে। তারপর চলতে লাগল—চাঁদা আদায়। যেখানে যার বাড়িতে কোনও উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন, শ্রীহরির দল দরিদ্র-ভাণ্ডারের খাতা নিয়ে সেইখানে গিয়ে হাজির হয়। টাকা আদায় না করে ছাড়ে না। বিয়ের কোন শোভাযাত্রা ঝিলপাড়ার কোন রাস্তা দিয়ে পার হচ্ছে, খবর পাবামাত্র শক্তি-মন্দিরের ছেলেরা গিয়ে তাদের পথ আগলে দাঁড়ায়। বলে, "আমাদের দরিদ্র-ভাণ্ডারে ভিক্ষা দিয়ে যান কিছু।" যাঁরা দেন, তাঁরা নির্বিবাদে পার হয়ে যান, দিতে যাঁরা চান না, তাঁদের হয় বিপদ। শক্তিমান যুবকদের হটিয়ে দিয়ে পার হওয়া সম্ভব হয় না। শংকর থাকলে ত নয়ই।

সেদিন ছিল এক মস্ত বড়লোকের ছেলের বিয়ে। খুব ঘটা করে ব্যাণ্ড বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে শোভাযাত্রা পার হচ্ছে। শক্তিমন্দিরের ছেলেরা গিয়ে দাঁড়াল। বর-কর্তার গাড়ি দাঁড় করিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে শংকর বললে, "দরিদ্র-ভাণ্ডারে কিছু দিয়ে যান।"

বরকর্তা হিসেবী মানুষ। কথাটাকে গ্রাহ্যই করতে চাইলেন না। বললেন, "কনের বাপ তোমাদের পাড়ার লোক, তাঁর কাছ থেকে নাওগে।"

শংকর বললে, "তিনি যা দেবার দিয়েছেন আজ সকালে।"

বরকর্তা বললেন, "আমরা বাইরের লোক, আমরা তোমাদের চাঁদা দিতে যাব কোন্ দুঃখে?"

শংকর বললে, "আপনি বড়লোক, তার ওপর আজ আপনার আনন্দের দিন। আপনি না দিলে দেবে কে?"

বরকর্তা কিছুতেই দেবেন না! ঘাড় নেড়ে বললেন, "না, দেব না। পথ ছাড়। বেআইনী পথ আটকে রেখ না। ভাল কাজ হবে না।"

অনেকক্ষণ ধরে অনুনয়-বিনয় করলে শংকর। অনেক ভাল ভাল কথা বললে। বরকর্তার সঙ্গে যারা ছিল, তারাও বললে, "দিয়ে দাও কিছু।"

কিন্তু ভদ্রলোকের এক কথা। বরকর্তা কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন, "একটি পয়সা ওরা যদি আদায় করতে পারে আমার কাছ থেকে, তাহলে জানব বাপের ব্যাটা।"

শংকর এবার অন্য মূর্তি ধরলে। বললে, "বড়লোক আমরা অনেক দেখেছি, কিন্তু আপনার মত ছোটলোক চামার আমরা এই প্রথম দেখলাম।"

"কী বললি?" বলে একজন নেমে এল গাড়ি থেকে। নেমে এল বোধহয় শংকরকে মারবার জন্যে। যেই সে হাত তুলেছে, শংকর তার হাতখানা চেপে ধরলে। লোকটা 'গেলাম গেলাম' বলে চেঁচিয়ে উঠল। শংকর তার হাতখানা ছেড়ে দিতেই সে তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে ফিরে গিয়ে চিৎকার করে লোক জড় করতে লাগল। বললে, "গুণ্ডা—ব্যাটা শয়তান! মার ব্যাটাকে।"

চার-পাঁচখানা গাড়ি খালি করে বরযাত্রীর দল হৈ হৈ করে ছুটে এসে আগলে দাঁড়াল শক্তিমন্দিরের ছেলেদের। কিন্তু কেউ কারও গায়ে হাত তুলতে সাহস করলে না। মুখে যা আসে তাই বলে অপমান করতে লাগল।

ওদিকে ফুল পাতা দিয়ে হাঁসের মত সাজানো বরের গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে পিছনে। বরযাত্রীদের ভিতর কে একজন তখন টেলিফোন করে থানায় খবর দিয়ে দিয়েছে।

গোলমাল তখনও থামেনি। থানা থেকে একখানা জিপগাড়ি এসে দাঁড়াল। জিপ থেকে নামল দুজন কনেস্টবল। সঙ্গে একজন অফিসার।

"গেলাম, গেলাম!"

বরকর্তা নিজে গাড়ি থেকে নেমে এসে থানা-অফিসারকে নমস্কার করে বললেন, "দেখুন স্যার, দেখুন, এই গুণ্ডা ছোঁড়াগুলো রাস্তার মাঝখানে আমাদের কীরকম বেইজ্জত করছে দেখুন। আমাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে চায়।"

কে একজন বললে, "ওদিকে বিয়ের লগ্ন বয়ে যাচ্ছে, আর এদিকে পাবলিক রোডের ওপর দাঁড়িয়ে এই গুণ্ডামি।"

শক্তিমন্দিরের জন-পাঁচ ছেলে মাত্র শংকর আর শ্রীহরির সংগে দাঁড়িয়ে আছে তখন, বাকী সব পুলিস দেখেই পালিয়েছে।

পুলিস-অফিসার শ্রীহরিকে বোধহয় চিনতেন। বললেন, "ছি-ছি, বড় অন্যায় করেছ তোমরা। ওঁদের ছেড়ে দাও।"

শ্রীহরি বললে, "আমরা কিছু অন্যায় করিনি স্যার। অত বড়লোক, প্রসেশন করে ছেলের বিয়ে দিতে যাচ্ছেন, আমরা দরিদ্র-ভাণ্ডারের জন্যে কিছু ভিক্ষা চেয়েছিলাম। এরকম সবাইকার কাছেই চাই। হাসিমুখে সবাই কিছু কিছু দিয়ে যান। উনিই রুখে দাঁড়ালেন। বললেন, একটা পয়সা যদি আদায় করতে পার ত জানব বাপের ব্যাটা।"

থানা-অফিসার কৌশল করে বললেন, "থাক, তোমাদের কথা পরে শুনছি। তোমরা বোস আমার এই জিপে।" বলেই তাড়াতাড়ি শংকর আর শ্রীহরিকে জিপে তুলে দিয়ে বরকর্তাকে নমস্কার করে বললেন, "যান, আপনারা চলে যান।"

এই বলে নিজেও চট করে জিপে উঠে জিপ চালিয়ে দিলেন থানার দিকে।

শংকর জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের?"

অফিসার বললেন, "থানায়।"

বরকর্তা বললেন, "কেমন জব্দ!" বলেই তিনি তাঁর গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। সবাইকে হুকুম দিলেন হাসতে হাসতে। বললেন, "চল।"

চল বললেই চলা যায় না। এদিকে তখন আর-এক সর্বনাশ হয়ে বসে আছে। ড্রাইভারেরা এতক্ষণ গাড়ি থেকে নেমে মজা দেখছিল। গাড়ি চালাতে গিয়ে দেখে, দু-খানা চাকায় একবিন্দু হাওয়া নেই। চাকাদুটো একেবারে মাটিতে বসে গিয়েছে।

বরকর্তা বললেন, "স্টেপনি লাগাও।"

ড্রাইভার বললে, "স্টেপনি ত একটা মশাই, এদিকে দুটো চাকাই যে পাংচার।"

ওদিকে হাঁসমার্কা বরের গাড়িখানাও তাই। সে-গাড়িরও দুটো চাকায় হাওয়া নেই।

থানার গাড়িটাও তখন নাগালের বাইরে। রাগে ফুলতে লাগলেন বরকর্তা।

থানার সামনে জিপ গিয়ে দাঁড়াল। শ্রীহরি আর শংকরকে থানা-অফিসার থানার ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বললেন, "ওখানে কিছু বললাম না। কিন্তু তোমরা খুব অন্যায় করেছ।"

কৌশল করে জিপে বসিয়ে থানায় টেনে আনার জন্য শংকরের মুখখানা রাগে লাল হয়ে উঠেছিল। বললে, "আজ্ঞে না, দরিদ্র-ভাণ্ডারের জন্য কিছু চাওয়া অন্যায় নয়।"

অফিসার বললেন, "তাই বলে রাস্তার ওপর গাড়ি আটক করে?"

শংকর বললে, "গাড়ি আমরা আটকাইনি। শোভাযাত্রা কিসের জন্য জানি না, দাঁড়িয়েছিল, আর ঠিক সেই সময় আমি নিজে গিয়েছিলাম বরকর্তার গাড়ির কাছে।"

থানা-অফিসার কথা বলছিলেন আর একটা কাগজে কী যেন লিখছিলেন। লিখতে লিখতে বললেন, "তাহলেও অন্যায় করেছিলে। বাড়িতে যেতে পারতে।"

শংকর বললে, "কেন যাইনি তা আপনি বুঝবেন না।"

অফিসার তাঁর চোখদুটো বড় বড় করে তাকালেন শংকরের দিকে। বললেন, "আমি বুঝব না?"

"আজ্ঞে না। বুঝলে জিজ্ঞাসা করতেন না। কন্যাকর্তা আমাদের চেনা মানুষ, সকালে দশ টাকা দিয়েছেন, তার ওপর যখন দেখতেন তাঁর নতুন বেয়াইকে ধরেছি, তিনি তাঁকে রক্ষা করবার জন্যে এগিয়ে আসতেন, আর নয়ত দু-একটা টাকা নিজের পকেট থেকে দিয়েই আমাদের বিদেয় করে দিতেন। যাক আমরা চললাম। শ্রীহরি, ওঠ!"

অফিসার বললেন, "দাঁড়াও।"

বলেই তিনি তাঁর হাতের কাগজটা শংকরের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, "এইখানে একটা সই করে দিয়ে যাও।"

শংকর জিজ্ঞাসা করলে, "কী ওটা?"

অফিসার বললেন, "কিছু না। ওতে লেখা আছে শুধু পথের ওপর গাড়ি আটকে চাঁদা চাইতে যাওয়া অন্যায় হয়ে গেছে আমাদের। আর কখনও এমন কাজ করব না।"

"এইতে সই করতে হবে আমাকে? একা?"

"হ্যাঁ। শক্তিমন্দিরের হয়ে। অন্ বিহাফ অব ঝিলপাড়া শক্তিমন্দির।"

শংকর বললে, "শক্তিমন্দিরের আমি কেউ নই।"

এই বলে চট করে থানা থেকে সে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তা থেকে ডাকলে, "শ্রীহরি, সই করিসনি, চলে আয়।"

শ্রীহরিও বেরিয়ে যাচ্ছিল।

অফিসার উঠে দাঁড়ালেন, চিৎকার করে বললেন, "সই তুমি করবে না?"

শংকরও তেমনি চেঁচিয়ে জবাব দিলে, "না।"

"তোমার নামে আমি কেস করব।"

"করতে পারেন।"

শ্রীহরি তখন তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শংকর তার হাতে ধরে বললে, "আয়!"

যাবার জন্যে তারা পিছন ফিরল।

পিছন থেকে ও-সির গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, "ভাল কাজ করলে না কিন্তু। মনে থাকে যেন।"

শংকর কথাটার জবাব দিলে না।

পরের দিন সকালে একটা ভারী মজার ব্যাপার ঘটে গেল।

কলকাতার কাছাকাছি কোন একটা জায়গা থেকে বর এসেছিল বিয়ে করতে। লগ্ন ছিল একটু দেরিতে। বরযাত্রীরা খেয়ে-দেয়ে স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরে গেল। কথা রইল, পরের দিন সকালে এইখানে কুশণ্ডিকা সেরে টানা গাড়িতে বরকর্তা বর-কনে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন।

রাত্রে বিয়ের পর বর-কনেকে খাইয়ে কনের বন্ধুরা হৈ হৈ করে বরকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বাসর-ঘরে। সারারাত তারা নিজেরাও ঘুমোয়নি, বরকেও ঘুমোতে দেয়নি। চারিদিক ফর্সা হয়ে যাবার পর তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে বর-ছোকরাটি বেরিয়ে পড়েছিল কলকাতার রাস্তায়। চায়ের পিপাসা পেয়েছিল বেচারার। রাত্রি জেগে বিয়ে-বাড়িতে সবাই তখন ঘুমোচ্ছে। লজ্জায় চায়ের কথা কাউকে বলতে পারেনি। ভেবেছিল, পথের ধারে কোনও দোকানে বসে চট করে এক পেয়ালা চা খেয়ে নিয়েই বাড়িতে ফিরে আসবে।

কাছেই গংগা। চা খেয়ে একটা সিগারেট টানতে টানতে বর গিয়েছিল গংগার ধারে। রাত্রি-জাগরণের পর গংগার ঠাণ্ডা হাওয়া মন্দ লাগছিল না। তাই সে একটুখানি বসেছিল গংগার কিনারে। বসে ভাবছিল গত রাত্রির আনন্দের কথা। ঘুমে কিন্তু চোখ তখন তার ভেরে এসেছিল।

বেলা আটটায় কুশণ্ডিকা বসবে। আয়োজন সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বরকে ডাকতে গিয়ে দেখে বর নেই। চারিদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হল। কোথাও তাকে পাওয়া গেল না।

বাড়ির একটা ছেলে গিয়েছিল শক্তি-মন্দিরে। ফিরে এসে বললে, "ওরা বলছে, বরকর্তাকে চাঁদাটা দিতে বল, বর আমরা এক্ষুণি খুঁজে এনে দিচ্ছি।"

বরকর্তা চেঁচিয়ে উঠলেন, "এ ঠিক ওদেরই কাজ। আমি এক্ষুনি থানায় খবর দেব।"

সর্বনাশ! তার চেয়ে কেলেংকারির ব্যাপার আর কী হতে পারে? পাড়ায়-

পাড়ায় ঘরে-ঘরে জানাজানি হয়ে যাবে, এই নিয়ে বিশ্রী আলোচনা চলবে, এমন কোন্ কঞ্জুসের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিলে হরিশ মুখুজ্যে, যে-লোকটা সামান্য চাঁদা না দিয়ে পাড়ার ছেলেগুলোকে এমন ক্ষেপিয়ে দিলে যে, কুশণ্ডিকার দিন জামাই চুরি হয়ে গেল? মেয়েও ত চুরি হয়ে যেতে পারত!

রাত্রে মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বৈবাহিক সম্বন্ধ এখন পাকা। হরিশ মুখুজ্যে ছুটে গিয়ে বেয়াই-মশাইয়ের হাত-দুটো জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, "যাক, আর থানা-পুলিস করে কেলেঙ্কারি বাড়াবেন না বেয়াই, ছেলেদের চাঁদা আমি দিয়ে দিচ্ছি।"

বরকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, "কত দিতে হবে?"

হরিশ মুখুজ্যে বললেন, "ওরা যা চায়, যাতে খুশী হয়।"

"এমনি করে করে আপনারাই মাথায় তুলেছেন ওদের।"

হরিশ মুখুজ্যে বললে, "না বেয়াই, ওরা আমাদের অনেক উপকার করে। এই পাড়াটা ছিল চোরের আড্ডা। মোটরকার যাদের আছে, তারা ত পাগল হয়ে গিয়েছিল। রোজ রোজ পার্টস চুরি যেতে লাগল। পশুপতি ভট্টাচার্যের গাড়িকে গাড়ি সাফ। ওই ছেলেরাই বাঁচালে। শংকর বলে যে-ছেলেটি আছে, একদিন সে মাল সমেত ধরে ফেললে এক-ব্যাটা চোরকে, তারপর তাকে এই ক্লাবঘরে-না ঢুকিয়ে এমন মার মারলে যে, ব্যাটা তিনদিন পড়ে রইল ওইখানে। বাস্, চুরি গেল বন্ধ হয়ে।"

বরকর্তা বললেন, "ওদের শুধু মারলে কিছু হয় না। যে অভাবের জন্যে চুরি করে, সেই অভাবটা ওদের মিটিয়ে দিতে হয়।"

হরিশ মুখুজ্যে মুখ টিপে একটু হাসলেন শুধু। যে-কথা এর জবাবে বলা উচিত, নিজে কনের বাপ হয়ে বরের বাপকে সে-কথা সাহস করে বলতে পারলেন না। তাঁর ভাগনে শক্তিমন্দিরের একজন সভ্য। ডাকলেন, "সুধা!"

সুধা কাছেই দাঁড়িয়েছিল। বললে, "বলছেন কিছু?"

হরিশ মুখুজ্যে বললেন, "ডাক বাবা ওদের কাউকে। আমি এই হাঙ্গামাটা মিটিয়ে ফেলি।"

বরকর্তা বললেন, "হ্যাঁ মিটিয়ে ফেলুন। কুশণ্ডিকার যত দেরি হবে, আমাদের ফিরে যেতেও তত দেরি হয়ে যাবে।"

সুধা বললে, "ওরা কেউ এখানে আসবে না মামা, টাকা নিয়ে তোমাকেই যেতে হবে।"

বরকর্তা আবার বললেন, "হ্যাঁ যান। যা লাগে আপনিই এখন দিয়ে দিন। আমার টাকা বের করা আবার অনেক হাঙ্গামা, সুটকেশে চাবি বন্ধ করে রেখেছি। চাবিটা আবার মনের ভুলে কার চলে গেছে আমার বড় ছেলের সঙ্গে।"

এবার হাসতে গিয়েও পারলেন না হরিশ মুখুজ্যে। কন্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বোধকরি একটু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন তিনি।

সুধাকে বললেন, "একটু দাঁড়া বাবা, আমি আসছি।"

দোতলায় উঠে গিয়ে টাকা সঙ্গে নিয়ে হরিশ মুখুজ্যে নিজে গেলেন শক্তি মন্দিরে। তারপর তাঁর বড়লোক বেয়াইএর সম্মান রক্ষা করে তাঁরই নামে চাঁদা দিয়ে এলেন পঞ্চাশ টাকা।

নির্বিঘ্নে কুশণ্ডিকা সম্পন্ন হয়ে গেল।

এই মজার ব্যাপারটা নিয়ে ঝিলপাড়ার ঘরে ঘরে আলোচনা চলতে লাগল। শংকরকে যারা চিনত না তারাও চিনলে। তার খ্যাতি যেন আর-একটু বেড়ে গেল ঝিলপাড়ায়।

এদিকে যখন এই অবস্থা, ওদিকে শংকরের সংসারে তখন দারুণ অনটন।

"বিমলা বললে, বেশ ত চালাচ্ছিলি, এখন আবার এ কীরকম হল বল দেখি?"

শংকর বললে, "ভাল লাগছে না মা।"

বিমলা এতদিন বাড়িতেই বসেছিল। শংকর তাকে কাজ করতে দেয়নি।

এবার আর সে শংকরকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে না। বেরিয়ে গেল কাজের সন্ধানে।

কলকাতা শহরে বিমলার মত মেয়ের কাজের অভাব হল না। তিনদিন এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরে বেড়াবার পর চারদিনের দিন তার কাজ জুটে গেল।

যত বয়স বাড়ছে, কীরকম যেন হয়ে যাচ্ছে শংকর। কেমন যেন রূঢ়, নির্মম, নিষ্ঠুর একটা মানুষ। কেমন যেন অশিক্ষার ছাপ পড়ছে তার মুখে।

মার চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

বিমলা চঞ্চল হয়ে উঠল। এর প্রতিকার করতে হবে।

কিন্তু প্রতিকারের কোনও পথই ত তার জানা নেই। মমতাময়ী মা হলে কী হবে, তারও ত শিক্ষা দীক্ষার একান্ত অভাব।

যে-বাড়িতে কাজ পেয়েছে বিমলা, সে-বাড়ির ত্রিসীমানা মাড়াতে দেয় না শংকরকে। দুবেলা সে গামছায় বেঁধে খাবার নিয়ে আসে। মা ছেলে বসে বসে খায়।

বাড়ির গিন্নি বলেন, "হ্যাঁ গা মেয়ে, তুমি এইখানে খেয়ে গেলেই পার। বাড়িতে মাছ মাংস রান্না হয়, শুনেছি তুমি ও-সব কিছু নিয়ে যাও না। ছেলেকেও রোজ রোজ নিরামিষ খাওয়াচ্ছ কেন মা?"

বিমলা বলে, "মাছ মাংস আমার ছেলে তেমন পছন্দ করে না।"

"ছেলে কত বড়?"

বিমলা বলে, "তা কুড়ি বাইশ বছরের হল।"

গিন্নী বলেন, "ছেলে লেখাপড়া শিখছে?"

"না মা, পয়সা নেই, লেখাপড়া শেখাতে পারলাম না।"

গিন্নী বলেন, "কাজকর্ম কিছু শেখালে না কেন? রোজগার করত।"

বিমলা বলে, "রোজগার যে একবারে করে না তা নয়। তবে বুঝতেই ত পারছ মা, আজকালকার দিনে মাথার ওপর একজন কেউ না থাকলে কিছু হয় না।"

গিন্নী বললেন, "ছেলের বিয়ে দিয়ে দাও। নইলে কলকাতা শহর, ছেলে খারাপ হয়ে যাবে।"

বিমলা বললে, "ঠিক বলেছ মা। সেই চেষ্টাই করি।"

কথাটা বিমলার বেশ মনে ধরে গেল। গিন্নী-মা ঠিকই বলেছে। শংকরের মাথার উপর একটা দায়িত্ব থাকা ভাল।

তাছাড়া নিজেরও ত একটা সাধ-আহ্লাদ আছে। ছেলে-বউ নিয়ে ঘর করবার ইচ্ছে কার না হয়?

বিমলা শংকরকে কিছু জানালে না। ভিতরে ভিতরে একটি মেয়ের সন্ধান করতে লাগল।

গিন্নীমার দাসীকে একদিন সেকথা বলেছিল বিমলা। অনেককেই বলেছিল একটি মেয়ের কথা।

কিন্তু রাঁধুনী বামনীর ছেলের জন্য বউ পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। গিন্নীর দাসীকে বিমলা একদিন জিজ্ঞাসা করলে, "একটি মেয়ের কথা তোমাকে বলেছিলাম সন্ধান করেছিলে?"

দাসী তার মুখটা কেমন যেন অদ্ভুত রকমের করে বললে, "না মা, যে-সব বাড়িতে যাই, সে-সব বাড়িতে কি তোমার ছেলের জন্যে মেয়ে পাওয়া যায়? তোমার ছেলের বউ খোঁজা আমার কম্ম নয়।"

নাপিত-বউ এসেছিল গিন্নীমাকে আলতা পরাতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাটা সে শুনলে। বললে, এ-কথা আমাকে বলনি কেন মা? আমার হাতে একটি মেয়ে আছে। আমার বাড়ির পাশেই থাকে।"

নাপিত-বউকে বিমলা একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে, "মেয়েটি কত বড়?"

নাপিত-বউ বললে, "তের-চোদ্দ বছরের মেয়ে, পরমা সুন্দরী, দেখলে মনে হয় পনর ষোল বছর বয়েস। বাপ কিন্তু খুব গরিব। সে-কথা আমি আগেই বলে রাখছি।"

বিমলা বললে, "আমার ছেলে কিন্তু রাজপুত্রের মত দেখতে। নিজের ছেলের কথা নিজের মুখে বলা সাজে না। তুমি যদি একদিন বেড়াতে বেড়াতে আসতে পার আমার বাড়িতে, ত দেখিয়ে দিই আমার ছেলেকে।"

নাপিত-বউ কিন্তু আগে ছেলে দেখতে রাজি হল না। বললে, "না মা, আগে তুমি বরং একদিন এস আমার বাড়িতে। মেয়েটি তোমাকে দেখিয়ে দিই। এই ত কাছেই আমার বাড়ি। নয়ান সুর লেন ধরে সোজা চলে যাবে। রাস্তার বাঁদিকে দেখবে একটা কেষ্টচূড়োর গাছ। সেই গাছটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে—খ্যাপার বস্তি কোনদিক দিয়ে যাব। যাকে জিজ্ঞেস করবে সেই দেখিয়ে দেবে। তারপর খ্যাপার বস্তিতে ঢুকে বাঁদিকে দেখবে একটা পুকুরে ধোপারা কাপড় কাচছে। সেইখানে গিয়ে নেত্য নাপতিনীর বাড়ি খুঁজবে। ছোট ছেলেটি পর্যন্ত জানে আমার বাড়ি।"

সেই কথাই ঠিক রইল।

বিমলা বললে, "আম আর দেরি করতে চাই না মা। কালই যাব।"

বিমলা ভেবেছিল শঙ্করকে কিছু জানাবে না। কিন্তু না জানিয়ে থাকতে পারলে না। নেত্য নাপতিনীর বাড়ি যাবার আগে ছেলেকে জানিয়ে যাওয়াই ভাল। ছেলে যদি শেষে বেঁকে বসে ত সব কিছু তার মিছে হয়ে যাবে।

মা আর ছেলে দুজনেই খেতে বসেছিল। বিমলা বললে, "আমার একটা কথা রাখবি বাবা?"

শঙ্কর বললে, "তোমার কথা কবে রাখিনি মা?"

বিমলা বললে, "মানুষের মরা-বাঁচার কথা কিছু বলা যায় না বাবা, আমি যদি ঝট করে কোনদিন মরে যাই ত আমার মনের সাধ মনেই থেকে যাবে।

শঙ্কর ভেবেছিল মা বুঝি তার পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করবার কথা বলছে। বললে, "না মা, তুমি এখন মরবে না, মরতে তোমাকে আমি দেব না। ময়নাবনি আমি একদিন যাবই। তারপর তোমার অপমানের প্রতিশোধ আমি নেব, তুমি দেখে নিও।"

বিমলা বললে, "সেকথা আমি বলিনি শঙ্কর। বর্ধমান জেলায় ময়নাবনি তোকে একদিন যেতেই হবে। সম্পত্তি ফেরাতে পারবি কিনা জানি না, তবে সেখানে তোর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা একটা হবেই তা আমি জানি। আমি কিন্তু অন্য কথা বলছি।"

শঙ্কর বললে, "কী কথা বল।"

বিমলা বললে, "বউ নিয়ে ঘর করতে আমার খুব ইচ্ছে করছে বাবা, এবার তোমার একটি বিয়ে দেব। খুব ভাল একটি মেয়ের সন্ধান পেয়েছি।"

শঙ্কর কেমন যেন একটুখানি চিন্তিত হয়ে উঠল।—"বিয়ে?"

"হ্যাঁ বাবা, নিজের মেয়ে নেই, কত সাধ হয়, মেয়ের মত পিছু পিছু ঘুরবে, মা মা বলে ডাকবে, ঘরের কাজকর্ম করবে—"

কথাটা শঙ্কর তাকে শেষ করতে দিলে না। বললে, "সবই বুঝলাম মা, কিন্তু তোমার তাহলে আর পরের বাড়িতে কাজ করা চলবে না।"

বিমলা বললে, "খুব চলবে। যে আসবে সে খুব গরিবের মেয়ে। আমি কাজ করব, ওইখানে খেয়ে আসব। ভাত না আনলে ওরা আমাকে তিরিশ টাকা মাইনে দেবে। তার ওপর তুই যদি আর কুড়ি পঁচিশটে টাকা আনতে পারিস, তাহলেই তোদের দুটি মানুষের খরচ দিব্যি চলে যাবে। বউমা তোদের দুজনের রান্না করবে। আমি সব গুছিয়ে-টুছিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে দেব। তুই আর অমত করিস না বাবা।"

কথাটা শঙ্করের বেশ ভালই লাগছে। ভাল লাগবারই বয়স। সুন্দরী একটি ছোট্ট মেয়ে হবে তার জীবনসঙ্গিনী। মায়ের মনের সাধ পূর্ণ হবে। মন্দ কী?"

শঙ্কর সম্মতি দিলে।

নেত্য নাপতিনীর বাড়ি খুঁজে বের করতে একটুখানি বেগ পেতে হয়েছিল অবশ্য বিমলাকে। কৃষ্ণচূড়ার গাছও পেয়েছিল, খ্যাপার বস্তিও পেয়েছিল, পুকুরও পেয়েছিল—ধোপাও পেয়েছিল, কিন্তু যে-লোকটিকে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, সে ছিল হিন্দুস্থানী। বাংলা "বাত" সে বোঝে না বলেই হক কিংবা কাপড় কাচতে কাচতে অনামনস্ক ছিল বলেই হক, নেত্য নাপতিনীর বাড়িটা যেদিকে, ঠিক তার উলটো দিকটা দেখিয়ে দিয়েছিল সে। শেষে সারা বস্তিটা ঘুরে ঘুরে একে জিজ্ঞাসা করে ওকে জিজ্ঞাসা করে হয়রান হয়ে গিয়ে আবার ঠিক সেই জায়গাতেই ফিরে আসতে হয়েছিল তাকে।

সামনেই নেত্যর বাড়ি। বিমলাকে দেখেই সে আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়ে গিয়ে একটা আসন পেতে দিয়ে বললে, "বোস মা, আগে একটু জিরিয়ে নাও। তারপর আমি ডেকে আনছি মেয়েটাকে। পছন্দ যদি হয় ত তখন দেখা করব ওর বাপের সঙ্গে।"

বিমলা বললে, "নেত্য, তুমি আমাকে একঘটি জল দাও আগে। পা দুটো ধুয়ে নিই। ধুলোয় কাদায় পায়ের কী অবস্থা হয়েছে দ্যাখো।"

নেত্য বললে, "এস আমার সঙ্গে।"

খোলার ছোট ছোট তিনটি ঘর, কিন্তু বেশ গুছানো সংসার। বাড়িতে জলের কল নেই। বাইরের টিউবওয়েল থেকে জল ধরে আনতে হয় নেত্যকে। ছোট্ট একটুখানি জায়গা বাঁশের দরমা দিয়ে ঘিরে স্নানের ঘর করা হয়েছে। বড় বড় দুটো টিনের ড্রামভর্তি জল দেখিয়ে দিয়ে নেত্য বললে, "হাত পা ধুয়ে এস মা, আমি মেয়েটাকে ডেকে আনি।"

পাশেই দু'খানা ঘর নিয়ে থাকে বাপ আর মেয়ে। বাপের অবস্থা একসময় নাকি বেশ ভালই ছিল। নিজের একখানা ট্যাক্সি ছিল, নিজেই চালাত। স্ত্রীর মৃত্যুর পর রোগে, শোকে ভদ্রলোক একেবারে অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছে। ট্যাক্সিটা দিয়েছে তার এক শালাকে। সে-ই এখন দয়া করে যা দিয়ে যায় তাইতে তাদের সংসার চলে।

নেত্য গিয়ে ডাকলে, "ডলি!"

ডলি একটা ঝাঁটা হাতে নিয়ে ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল। বললে, "কী!"

নেত্য দেখলে তার পরনের শাড়িটা ময়লা। কাছে গিয়ে বললে, "চট করে একটা ফর্সা জামা কাপড় পরে এস ত একবার আমার সঙ্গে।"

ডলি তৎক্ষণাৎ হাতের ঝাঁটাটা নামিয়ে রেখে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ডলির বাবা একটু দূরে বসে বসে বিড়ি টানছিল আর কাশছিল। কাশির ধমকটা একটু থামলে জিজ্ঞাসা করলে, "ডলিকে কী বলছ নেত্য?"

নেত্য বললে, "ওকে একবার নিয়ে যাব আমার বাড়িতে। বিয়ের একটা সম্বন্ধ এনেছি।"

বাপ বললে, "মেলগোত্র মিলবে ত ঠিক? আমরা চাটুজ্জে। কাশ্যপ গোত্র।"

নেত্য বললে, "ও-সব পরে মেলাবে দাদা, আগে পছন্দ হক।"

বাপ আবার খানিকটা কেশে নিলে। তারপর বললে, "আগেই বলে রাখছি নেত্য, একটি পয়সা আমি দিতে পারব না।"

নেত্য এবার তার কাছে এগিয়ে এল। বললে, "তা বললে চলবে কেন দাদা? ছেলের বিয়ে ত নয়, মেয়ের বিয়ে, কিছু খরচ করতে হবে বইকি।"

"পাব কোথায়?"

নেত্য বললে "কেন, তোমার সেই শালা দেবে।"

বাপ বললে, "সে ত সবই দিচ্ছে গো। সেই ত এখন ওর গার্জেন। আমি ত গেছি।"

এই বলে আবার সে কাশতে লাগল।

কাপড় ছাড়তে এত দেরি কেন হচ্ছে?

নেত্য ঘরে গিয়ে ঢুকল। দেখলে, ডলি কাপড় জামা ছেড়ে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে।

ডলিকে দেখে বিমলার ভারী পছন্দ।

"ও মা, এ যে বেশ মেয়ে!"

নেত্য বলে, "প্রণাম কর ডলি, ইনি তোমার শাশুড়ী হবেন।"

ডলি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে হাত বাড়িয়ে বিমলার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

বিমলা আশীর্বাদ করে মুখখানি তার তুলে ধরে বললে, "না নেত্য, বয়েস তের-চোদ্দ বলেছিলে, তা নয়, আর-একটু বেশী।"

নেত্য বললে, "কি জানি মা, বল্লে ত চোদ্দ।"

মেয়ে বেশ স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী, মাথায় একমাথা চুল, গায়ের রং ফর্সা, হাত-পায়ের বেশ নিটোল গড়ন। সব রকমেই ভাল, শুধু বয়স একটু যেন কম হলেই ভাল হত।

বিমলা ভাবে, সেরমকটি পাচ্ছেই-বা কোথায়?

তা শঙ্কর তার বয়সের তুলনায় যেরকম জোয়ান, এ-মেয়ে তার সঙ্গে বেমানান হবে না।

বিমলা ডলিকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বলে, "গরিবের ঘরে যেতে তোমার আপত্তি নেই ত মা?"

কথাটার জবাব দিতে গিয়ে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল ডলি। তবু সে লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলে তার আপত্তি নেই।

বিমলা নেত্যর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, "দেখা আমার শেষ হয়ে গেছে নেত্য। দেনা-পাওনার কথা কী আর বলব। মেয়ের বাবা কিছু দিতে পারবে না তা আমি শুনেছি। আমার ছেলেকে ও'রা কবে দেখতে যাবেন জিজ্ঞাসা করে এস।"

ডলিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে নেত্য ফিরে এল।

বিমলা উদগ্রীব হয়ে বসেছিল, নেত্য বললে, "না মা, ডলির বাবা কিছু করতেও পারবে না, কিছু বলতেও পারবে না। ডলির এক মামা আছে, আমি দেখেছি—মিনিয়ে ট্যাক্সি চালায়। সে-ই ওদের সব দেখাশোনা করে, টাকাকড়ি দেয়। ডলির বাবা বললে, আসছে রবিবার-দিন দুপুরে সে যাবে আপনার বাড়ি। ছেলেকে দেখে একেবারে আশীর্বাদ সেরে দিন-টিন করে আসবে। লোকটা কিন্তু ভাল নয়, মদ খায়।"

"তা খায় ত খায়, আমাদের কী?"

বলে বিমলা উঠল। বললে "তাহলে এই কথা রইল। রবিবার আমি তাহলে সকাল-সকাল বাড়ি চলে যাব।"

এই বলে চলে যেতে যেতে বিমলা দোরের কাছে ফিরে দাঁড়াল। বললে "এই দ্যাখো, আসল কথাটাই যে তোমরা ভুলে গেছ।"

"ওমা এযে দেখছি বেশ মেয়ে"

নেত্য জিজ্ঞাসা করলে, "কী কথা?"

"আমি কিন্তু ভুলিনি।"

বিমলা তার কাপড়ের খুঁটে-বাঁধা একটি কাগজের টুকরো বের করে নেত্যর হাতে দিয়ে বললে, "আসবার সময় শঙ্করকে দিয়ে লিখিয়ে এনেছি। আমার বাড়ির এই ঠিকানাটি ওদের দিও। নইলে ডলির মামাই বল আর বাবাই বল—যাবে কেমন করে?"

নেত্য বললে, "এর জন্য আটকাত না মা। ঠিক সময়ে আমি নিয়ে আসতাম তোমার কাছ থেকে।"

বিমলার বাড়ির দোর পর্যন্ত গাড়ি যায় না।

রবিবার দুপুরে একখানা ট্যাক্সি গিয়ে দাঁড়াল বড় রাস্তায়। ট্যাক্সি থেকে নামল দুজন লোক। একজন ডলির মামা পল্টুবাবু, সঙ্গে আর-একজন ছোকরা—বোধকরি তার সাকরেদ।

বিমলার কাগজের টুকরোটি হাতে নিয়ে পল্টুবাবু ঠিক এসে হাজির হল শঙ্করের বাড়ির দরজায়।

এরা আসবে বলে দোরটা খুলেই রেখেছিল শঙ্কর। তবু সেই খোলা দরজার শিকল ধরে বারকতক নাড়া দিয়ে পল্টু বললে, "কে আছেন বাড়িতে?"

গলাটা কেমন যেন ধরা-ধরা।

মা ও ছেলে তৈরি হয়েই ছিল। শঙ্কর বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বললে, "আসুন!"

বছর-চল্লিশেক বয়স, বেঁটে খাটো কালো রঙের একটা শক্ত চেহারার মানুষ। বললে, "নাম-টাম কিসসু জানি না স্যার, এসেছি পাত্তোর দেখতে। আমি ডলির মামা। মানে, আপন-মামা নই, সম্পর্কে আঙ্কেল।"

লোকটির গায়ে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, হাতদুটো গুটনো, পায়ে কালো-রঙের পাম্প্-শু চকচক করছে, একেবারে নতুন।

শঙ্করের পিছু পিছু আসতে আসতে আঙ্কেল একবার হোঁচট খেলে। সঙ্গের লোকটি তাকে তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলালে। শঙ্কর

...র ফিরে দেখলে। দেখলে, তার চোখ দুটো লাল, কথাগুলোও কেমন যেন জড়িয়ে যাচ্ছে। তবে কি এই ভরা দুপুরে সে মদ খেয়েছে নাকি?

পল্টু নিজেই সামলে নিলে। বললে, "পায়ে চলা ত অভ্যেস নেই, হরদম মোটরেই থাকি। গাড়ি চালাই, তাই বলে গাড়োয়ান নই। ড্রাইভার। ট্যাক্সি-ড্রাইভার। নাও, জলদিজলদি সারো, এইখানে বসব?"

ঘরের ভিতর একটা চৌকি সরিয়ে দিয়ে সতরঞ্চি বিছিয়ে বসবার জায়গা করা হয়েছে। শংকর বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ এইখানেই বসুন।"

পল্টু জুতো খুলে বসল। সঙ্গের লোকটি তাকে বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসল তার পাশে।

দুটি রেকাবিতে কয়েকটি রসগোল্লা আর সন্দেশ নিয়ে ঘরে ঢুকল বিমলা। রেকাবি দুটি হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বোধহয় জল আনতে গেল।

পল্টু তাকিয়ে দেখলে। বললে, "ও, তুমিই বুঝি ছেলের মাদার?"

তাকাবার, কথা বলবার ভঙ্গি দেখে শংকরের আপাদমস্তক জ্বলে গেল। লোকটি মদ খেয়েছে কিনা কে জানে, কিন্তু অভদ্র যে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

জলের গ্লাস দুটি নামিয়ে দিতেই পল্টু আবার তাকালে বিমলার দিকে। বললে, "এ-সব কেন?"

বিমলা বললে, "মিষ্টিমুখ করতে হয়।"

পল্টু বললে, "আমার এ-সময় চলবে না। হবা, তুই খা।"

সঙ্গের ছোকরাটির নাম বোধহয় হাবা। তাকে বলবার দরকার ছিল না। সে তখন খেতে আরম্ভ করেছে। বলবামাত্র পল্টুর রেকাবির মিষ্টিগুলি সে তার নিজের রেকাবিতে তুলে নিলে।

পল্টু বললে, "কই, দেখি এবার, ছেলে-টিকে দেখি। আমার কাজ আছে। তবে হ্যাঁ, দেখবার আগেই বলে রাখি—ডলিকে আমি যেখানে-সেখানে দেব না। এতে যদি তার বিয়ে না হয় ত না হবে।"

বিমলা এবার কথা বললে। "যেখানে-সেখানে দেবেন না বলেছেন, ওদিকে মেয়ের বাপ ত বলছেন—একটি পয়সা খরচ করবার ক্ষমতা আমার নেই।"

পল্টু বলে উঠল, "হু, ইস্ দি মেয়ের বাপ? আমি সব। আমি যা বলব তা-ই হবে।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, "কত টাকা খরচ করবেন আপনি?"

পল্টু বললে, "নাথিং। ইংলিশ-মেক্ গাড়ি—যত বয়েসই হক, বাজারদর তার চড়েই আছে। ডলির মতন সুন্দরী মেয়ে—কত ব্যাটা লুফে নেবার জন্যে হা-হা করছে। সিনেমা-কোম্পানীতে দিতে চাই না, তবু ব্যাটারা খবর পেয়ে সেদিন আমাকে শ্যামবাজার ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডে গিয়ে ধরেছে। বলে, দিন ওকে আমরা হিরোইন করব।... কই দেখি, তোমার ছেলে দেখি।"

আবার 'তুমি'!

বিমলা বললে, "ছেলে ওই আপনার চোখের সামনে বসে।"

পল্টু এবার শংকরের দিকে ভাল করে তাকালে। তার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললে, "হুঁ, চেহারা ত দেখছি পাকা-পোক্ত। ফিফটিন হর্স পাওয়ার। কী করা হয় শুনি?"

শংকর যা-হক কিছু একটা বলে দিতে পারত, কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই তার মা এগিয়ে এল। বললে, "ছেলে আমার মস্ত বড়লোকের ছেলে বাবা। কপালদোষে আজ এইখানে এসে পড়েছি। বর্ধমান জেলার ময়নাবুনিতে ওর বাবার যে সম্পত্তি আছে তা যদি ও উদ্ধার করতে পারে ত ওর আর কিছু করবার দরকার হবে না, ও-ই কত লোককে খেতে দেবে।"

বড়লোকের ছেলে?

পল্টু তার লাল চোখদুটো তুলে একবার তাকালে বিমলার দিকে।

বিমলা বললে, "ময়নাবুনিতে গিয়ে খবর নিয়ে আসতে পারেন।"

"দরকার হবে না।" পল্টু বললে, "সম্পত্তি যদি উদ্ধার করতে পারে—সেই আশায় বসে আছে যে-ছেলে, সেই ছেলের সঙ্গে ডলির বিয়ে দেব? ওরে হাবা!"

সঙ্গের ছোকরাটি তখন এক গ্লাস জল শেষ করে আর একটা গ্লাসে হাত দিয়েছে।

পল্টু বললে, "এর দেখছি ইঞ্জিনেই গোলমাল। এ চালু হতে দেরি আছে। নে আর ঢক্-ঢক্ করে জল খেতে হয় না। ওঠ।"

উঠে দাঁড়াল পল্টু। সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গী হাবাও উঠল।

বিমলা বললে, "এরই মধ্যে উঠে পড়লেন?"

পল্টু বললে, "আমার গাড়ির হ্যাণ্ডেল মারতে হয় না। সেলফে হাত দিয়েছে কি চোঁ—সট্! আমার সব কাজই এমনি।"

বিমলা কী বলবে কিছুই যেন বুঝতে পারলে না। তার মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে এল, "তাহ'লে কি—"

কথাটা শেষ হল না। শেষ করতে দিলে না পল্টু। বললে, "ছেলে তার বাপের সম্পত্তি উদ্ধার করুক আগে। তারপর কথা হবে।"

বিমলা এবার স্পষ্ট পরিষ্কার ভাষায় জিজ্ঞাসা করলে, "বিয়ে কি তাহ'লে আপনারা দেবেন না?"

পল্টু পরিষ্কার জবাব দিলে। বললে, "না। চাকরি পাওয়ার-টাওয়ার হত ত না হয় সারিয়ে-সুরিয়ে নেওয়া যেত। এ হচ্ছে গিয়ে ইঞ্জিনে গোলমাল। এ-গাড়িতে আমরা হাত দিই না।"

হাবা ডিটো মারলে। ঘাড় নেড়ে বললে, "ঠিক।"

বিমলা বললে, "মেয়েটাকে আমার বড় ভাল লেগেছিল বাবা।"

শংকর উঠে দাঁড়িয়ে মায়ের দিকে কটমট করে তাকালে।

পল্টু বললে, "হে'-হে' বাবা, মেয়ে একেবারে রোল্স-রয়েস্! যেমন বডি তার তেমন ইঞ্জিন।"

বিমলা বললে, "কী জানি বাবা। আপনার কথা আমি ভাল বুঝতে পারছি না।"

শংকর রাগে ফুলছিল। এবার সে চিৎকার করে উঠলো "মা!"

পল্টু বললে, "অমন মেয়ে হাতছাড়া হয়ে গেল।' রাগ হচ্ছে?"

জবাব দিতে পারলে না শংকর। একটা জবাব মাত্র তার জানা ছিল। একটি ঘুঁষি মেরে লোকটার দাঁতগুলো সে ভেঙে দিতে পারত। সেইটেই হত এর একমাত্র জবাব। কিন্তু সে-জবাব সে দিতে পারলে না। কোথায় যেন বাধল।

পল্টু কিন্তু থামল না। জুতো দুটো পায়ে দিতে দিতে বললে, "নেত্য নাপ্তিনীর কাছে আমি সব শুনেছি। মা তোমার কোন এক বাড়িতে রান্না করে আর তুমি সেই মায়ের রোজগারে বসে বসে খাও। শুধু চেহারা দেখিয়ে বিয়ে হয় না। বাপের সম্পত্তি উদ্ধার কর আগে। তারপর বিয়ের কথা হবে। এখন থাক।"

শংকর এবার কথা না বলে পারলে না। বললে, "তখন তোমার মত ট্যাক্সি-ড্রাইভারের ভাগ্নীকে বিয়ে সে করবে না—এই যা দুঃখ।"

পল্টু বললে, "আচ্ছা দেখা যাবে। মিটার চালু রইল। তখন না হয় তুলে দেব।"

এই বলে তারা দুজনেই চলে গেল।

শংকর গিয়েছিল সদর দরজাটা বন্ধ করতে। ফিরে এসে দেখলে, মা তার বসে বসে কাঁদছে।

শংকর অবাক হয়ে থমকে দাঁড়াল। তাকে দেখেই বিমলা তার চোখের জল মুছে ফেলেছিল। শংকর বললে, "ছি-ছি, কাঁদবার কী হয়েছে মা? তুমি কাঁদছ?"

বিমলা বললে, "মানুষ করতে এনেছিলাম তোকে কলকাতায়। তা এমনি মানুষ হলি যে কেউ তোর হাতে মেয়ে পর্যন্ত দিতে চাচ্ছে না!"

শংকর বললে, "আচ্ছা দেয় কি না দ্যাখো।"

বিমলা উঠে দাঁড়াল। বললে, "আর দেখতে চাই না বাবা। দেখতে অনেক কিছু চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম তোর

বিয়ে দেব, ছেলে-বউ নিয়ে দেশে যাব। তোর বাপের সম্পত্তি উদ্ধার করে তোদের সেইখানে বসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। তা সে সব ত আমার সবই হল। এখন মরণ হলেই বাঁচি।"

শংকর আর যাই করুক, মাকে সে ভালবাসে। মা এই সব কথা বললে সত্যিই তার কষ্ট হয়। বললে, "মরতে তোমায় দেবে কে?"

এত দুঃখেও মা তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, "দিবি না মরতে?"

শংকর বললে, "না। তুমি যাতে না মর, তার ব্যবস্থা আমি করছি।"

তা ব্যবস্থা একটা সে করলে।

ঝিলপাড়া শক্তিমন্দিরের হয়ে একদিন একটা বিয়ে বাড়িতে চাঁদা আদায় করতে গিয়েছিল শংকর। সেখানে পরিচয় হয়েছিল একজন ঘটকের সংগে। রোগা-পট্‌কা নিতান্ত দরিদ্র একটি মানুষ। বিয়ের ঘটকালি আর লটারির টিকিট বিক্রি করা ছিল তার পেশা। নাম ছিল দাসু।

দাসু সেইদিন শক্তিমন্দিরের খোঁজ পেয়ে গেল। জানতে পারলে, রোজ সেখানে অনেকগুলি ভাল ভাল অবিবাহিত ছেলে ছোকরা আসে ব্যায়াম শিখতে।

তারপর থেকেই শক্তিমন্দিরে দাসুর শুভাগমন হতে লাগল খুব ঘন ঘন।

শংকর একদিন তাকে ধরে বসল, "রোজ রোজ কি জন্যে আস তুমি এখানে?"

দাসু বললে, "লটারির টিকিট বিক্রি করতে।"

শংকর বললে, "ওটা তোমার ছল। তুমি আস তোমার মক্কেল পাকড়াতে।"

দাসু নির্লজ্জের মত হাসতে লাগল।

তা সত্যি বলতে কি, লজ্জাশরমের বালাই তার ছিল না।

দাসু নিজেই একদিন বলে বসল, "ও-সব থাকলে আমাদের চলেও না।"

শংকর বললে, "না ভাই, তুমি আর এখানে এস না। আমার ক্লাবের ছেলেদের আর বিয়ের লোভ দেখিয়ো না। বিয়ে ওরা কেউ করবে না।"

দাসু বললে, "আচ্ছা, আর আসব না।"

কিন্তু তবু আসে।

রঙিন কাপড়ের ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে পা টিপে-টিপে এসেই আগে দেখে, শংকর আছে কিনা, তারপর হাসতে হাসতে ক্লাব-ঘরের ভিতরে ঢুকে বেশ জাঁকিয়ে বসে বিড়ি ফুঁকতে থাকে।

আসর জমাবার ক্ষমতা তার অসাধারণ।

কত মজার মজার গল্প শোনায়। কত বিয়ের ব্যাপারে কত লোককে সে ফাঁকি দিয়েছে, কত কুলীনের সংগে কত শ্রোত্রীয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে, কত জায়গায় ধরা পড়ে কত মার খেয়েছে—নিঃসংকোচে এই-সব কথা বলে আর ফিক ফিক করে হাসে।

শংকর তাকে দেখতে পেলেই তার ঘাড়ে একটি রদ্দা মেরে তাকে অভ্যর্থনা করে। তাই শংকরকে দেখলেই হয় সে খানিকটা দূরে সরে যায়, আর নয়ত হাত দুটো আড়াল করে বলে, "মের না মের না ভাই, মরে যাব। কী শক্ত হাত রে বাবা, মাথা ঝনঝন করে ওঠে।"

দাসু একদিন শংকরকে একা পেয়ে বললে, "তোমার যদি একটি বিয়ে দিতে পারতাম মাইরি মেয়েটা আমার পায়ের ধুলো মাথায় নিত।"

শংকর হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

দাসু বললে, "আরে ভাই, ছেলে কোথায় আমাদের দেশে? সব ত আমার মতন রোগা-পট্‌কা, আর নয়ত নাদুশ-নুদুশ একটা মাংসপিণ্ড। জোয়ান জোয়ান সুন্দর মেয়ের সংগে এই সব ছেলের বিয়ে দিই। সত্যি বলছি দেখে কষ্ট হয়।"

শংকর সেদিন বলেছিল, "থাক আর আমার বিয়ে দিতে হবে না। তুমি যাদের বিয়ে দিচ্ছ তাদেরই দাওগে যাও।"

তারপর হঠাৎ এক সময় দেখা গেল, দাসু আর শক্তিমন্দিরে আসে না। সবাই ভাবলে বুঝি এখানে তার বিশেষ কিছু সুবিধা হল না বলে সে তার আসা বন্ধ করেছে।

শংকর সেদিন একটা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ তার নজরে পড়ল, দাসু ট্রাম থেকে নামছে। কাঁধে তার সেই কাপড়ের ঝুলিটা ঠিক তেমনিই আছে। দেখে মনে হল আর একটু যেন রোগা হয়ে গিয়েছে।

শংকর তারই দিকে এগিয়ে আসছিল, কিন্তু শংকরকে প্রথমে সে দেখতে পায়নি। যেই মুখ তুলে তাকিয়ে সে শংকরকে দেখেছে, আর অমনি পিছন ফিরে দে ছুট!

শংকর ডাকলে, "দাসু!"

দাসু শুনেও শুনলে না।

বাধ্য হয়ে শংকরকেও ছুটতে হল।

একটুখানি ছুটেই দাসু তখন হাঁপিয়ে পড়েছে। শংকর কাছে আসতেই দাসু দুহাত তুলে বলে উঠল "মের না ভাই, মাইরি বলছি মরে যাব। আমার কোনও দোষ নেই, মাইরি বলছি তুমি শোন আগে।"

শংকর তার হাতখানা চেপে ধরে বললে, "আমি তোমাকে মারবার জন্যে আসিনি দাসু। শোন, তোমার সংগে আমার কথা আছে।"

মজা দেখবার জন্যে রাস্তায় লোক জড় হয়ে গিয়েছিল। শংকর তাকে নিয়ে পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল। দাসুর ভয় তখনও যায়নি। সে তখনও বলে চলেছে, "[illegible] কী করব, আচ্ছা তুমিই বল না, [illegible] হচ্ছে গিয়ে এই পেশা। জলজ্যান্ত [illegible] বড়লোক বাপ বেঁচে রয়েছে, আমি বললাম তা বিয়ে করবি ভাল কথা, চল আমি তোর বাপের কাছে যাই। তা সে বললে, না, আমি বাবাকে না জানিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করব। ওর ধারণা বি-এ পাশ না করলে বাপ বিয়ে দেবে না, আর ইদিকে ছেলে একেবারে অঘামারা অচৈতনা—বি-এ পাশ সে কখনই করতে পারবে না জানে।"

শংকর কিছুই বুঝতে পারছিল না। জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কার কথা বলছ?"

দাসু বললে, "কেন চালাকি করছ? তুমি জান না? তোমার কেলাবের ননী তোমাকে বলেনি? আমি ত তোমারই ভয়ে কেলাবে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।"

শংকর বললে, "ননী কাউকে কিছু বলেনি। আর আমিও ওদিক দিয়ে বড়-একটা যাই না।"

এতক্ষণ পরে দাসুর মুখে হাসি ফুটল। বললে, "মাইরি বলছ—কিছু জান না?"

"না, সত্যি বলছি, জানি না।"

দাসু খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। বললে, "চল না একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসি। ননীর গল্পটা তোমাকে বলি। ভারী মজার গল্প।"

শংকর বললে, "চা আমি খাই না। তোমার সংগে আমার একটা খুব জরুরী কথা আছে। চল তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাই।"

শংকরের বাড়ি এখান থেকে খুব কাছে নয়। চট করে একটা রিকশা ডেকে বললে, "ওঠ।"

দাসুর অপরাধী মন আবার কেমন যেন শংকিত হয়ে উঠল। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মারবে নাকি?

তবু শংকরের ভয়ে তাকে উঠতে হল রিকশায়।

রিকশায় উঠে দাসু একবারে চুপ। ননীর যে মজার গল্পটা সে আরম্ভ করেছিল, সেটাও কেমন যেন শেষ করবার প্রবৃত্তি তার হল না। ক্রমাগত সেই একটা কথাই তার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল।

শংকর বললে, "তারপর? ননীর বিয়ে দিয়ে দিলে?"

দাসুর ভয় এবার যেন আরও বাড়ল। ননীর ব্যাপারটা শংকর নিশ্চয়ই সব জানে। ননীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার অত বড় সর্বনাশ দাসু করে ফেলেছে। সে-কথা কি আর ননী বলেনি শংকরকে?

শংকর আবার বললে, "কী ভাবছ দাসু? আমার বাড়ি যেতে কি তোমার ইচ্ছে করছে না?"

দাসু বললে, "না না, তা কেন? এই ত যাচ্ছি।"

ছোটো পাই সে কথার ধারাটাকে অন্যদিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। বললে, "শঙ্কর, তুমি কখনও লটারির টিকিট কিনেছ?"

শঙ্কর বললে, "না ভাই, কখনও কিনিনি।"

দাস্ বললে, "মাঝে-মাঝে এক-আধটা কেনা ভাল। কখন যে কার ভাগ্যে কী লেগে যায় কিছু বলা যায় না। এই ধর না কেন, ভুতোবাবু—চল্লিশটি টাকা মাইনে পেত, সংসার চলত না কিছুতেই। আমি জোর করে কেনালাম তাকে একখানা এক টাকা দামের টিকিট। সেদিন পেয়ে গেল পনের হাজার টাকা। তা ব্যাটার কাছে গিয়ে বললাম, আমাকে কিছু তোমার দেওয়া উচিত। পনের হাজার পেলি তুই, পনেরটা টাকা দে? দিলে না কিছুতেই। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল।"

ভুতোবাবুর লটারির টাকা পাওয়ার গল্প শঙ্কর শুনতে চায়নি। চুপ করে শুনেই গেল শুধু। কোনও মন্তব্যই করলে না।

দাস্ জিজ্ঞাসা করলে, "কিনবে নাকি একটা টিকিট?"

শঙ্কর বললে "কিনব।"

দাস্ রিকশায় বসেই তার ঝুলিতে হাত ঢুকিয়েছিল। শঙ্কর তার হাতটা চেপে ধরে বললে "রিকশায় বসে কেন? বাড়িতে চল, সেইখানেই দেবে।"

তারপর দুজনেই চুপ।

দাস্ আর কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছে না বলবার মত।

কিন্তু পথ অনেকখানি।

শঙ্কর বললে, "ননীর বিয়ের কথা বললে না?"

দাস্ এবার না বলে পারলে না। বললে, "বিয়ে করবার জন্যে ননী একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিল। আসল ব্যাপার কী জান? ননীর মা মরে যাবার পর ননীর বাবা বুড়ো বয়েসে আবার একটি বিয়ে করে বসেছেন। তাই ননীর ধারণা হল, সৎমা তার বিয়ে দেবে না কিছুতেই। বি-এ পাশ-টাস ছেড়ো। হাতে তখন আমার একটিমাত্র মেয়ে। তবে মেয়েটি খুব সুন্দরী। ননী দেখলে মেয়েটিকে। দেখে অবধি নিজে ত পাগল হলই, আমাকেও পাগল করে তুললে। তখন আর কী করব বললাম, নে, কর তবে বিয়ে। কনো-পক্ষের আপত্তি হল না। ননী দেখতে-শুনতেও ভালো, বড়লোকের একটিমাত্র ছেলে। তবে হ্যাঁ বিয়ের আগে ননী তাদের বলে দিলে বিয়ে করছি, কিন্তু তোমাদের মেয়েকে আমি এখন আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে পারব না। আমি নিজে তোমাদের এখানে আসা-যাওয়া করব তারপর বাবা বুড়ো হয়েছে, সে আর কত দিন? বিয়েটা চুকে গেল।"

শঙ্কর বললে, "ভালই হল। এর জন্যে তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন, আর লুকিয়ে লুকিয়েই বা বেড়াচ্ছ কেন?"

দাস্ এইবার শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু শুকনো হাসি হাসলে। বললে, "মের না মাইরি, আমি বলছি তাহলে সত্যি কথা, শোন।"

শঙ্কর বললে, "বল।"

দাস্ একটু চাপা গলায় বললে, "বিয়েটা অসবর্ণ বিয়ে হয়ে গেল।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "বিয়ের আগে ননী সে-কথা জানত না?"

"না।"

শঙ্কর বললে, "তুমি তাকে জানাওনি?"

দাস্ অম্লানবদনে বললে, "না।"

শঙ্কর কী যেন ভাবলে, তারপর জিজ্ঞাসা করলে, "মেয়েটি ত বলছ সুন্দরী, ননীও দেখতে খারাপ নয়। তাদের দুজনের ভাব-ভালবাসা হয়েছে ত?"

দাস্ বললে "ওরে বাবা! সে খুব। লুকিয়ে লুকিয়ে খবর নিয়ে জেনেছি, ননী আজকাল দিনরাত বউয়ের কাছে পড়ে থাকে।"

শঙ্কর বললে, "তাহলে হক না অসবর্ণ। তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন?"

দাস্ এতক্ষণে যেন তার মনে একটু শান্তি পেলে। বললে, "ভয় পাব না, না? আমিও ক'দিন থেকে সেই কথাই ভাবছি।"

এ-রাস্তা ও-রাস্তা এগলি সেগলি পেরিয়ে রিকশা এসে দাঁড়াল শঙ্করের বাড়ির কাছে।

দাস্ কোনদিন শঙ্করের বাড়ি দেখেনি। আজ দেখলে।

দেখলে, বস্তির ভিতর একখানা বাড়ি। দোরের তালা খুলে ঘরে ঢুকল। ঘরদোর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একটা ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে শঙ্কর বললে, "বোস।"

দাস্ এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। শঙ্কর বললে "কী দেখছ?"

"তুমি এইখানে থাক?"

"তবে তুমি কি ভেবেছিলে আমি রাজবাড়িতে থাকি?"

দাস্ বললে, "না, তা ভাবিনি। তুমি একাই থাক এখানে?"

শঙ্কর বললে, "না। আমি থাকি আর আমার মা থাকে। মা বেরিয়ে গেছে। থাকলে তোমাকে দেখাতাম।"

বলেই সে বসল দাসুর পাশে। বললে, "দাসু, তুমি একদিন আমাকে বিয়ে করতে বলেছিলে, মনে আছে?"

বিয়ের নাম শুনে দাস্ উৎসাহিত হয়ে উঠল। বললে, "বিয়ে করবে তুমি?"

শঙ্কর বললে, "সেইজন্যেই ত তোমাকে ডেকেছি।"

দাস্ চোখ বুজে কী যেন ভাবলে। বললে, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, ভাবতে দাও। এ বাবা আর কারও বিয়ে নয়। ভাল বিয়ে না দিতে পারলে জানে মেরে ফেলবে।"

এই বলে সে তার ঝুলিতে হাত ভরে একটি খাতা বের করল। খাতার পাতায় লেখা ছিল তার মক্কেলদের নাম ঠিকানা। তাই থেকে খুঁজে খুঁজে একটি নাম ঠিকানা বের করে বললে, "এই একটিই আছে বামুনের মেয়ে—যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়া চলে।"

শঙ্কর বললে, "মাত্র একটি?"

দাস্ বললে, "হ্যাঁ ভাই, আপাতত এই একটিই আছে। বিধবা মায়ের এই একটি-মাত্র মেয়ে।"

শঙ্কর আনন্দিত হল। বললে, "বা রে বা বেশ মিলে গেছে ত! আমারও ত তাই। আমিও আমার মায়ের একটিমাত্র ছেলে।"

দাস্ বললে, "না, মেয়েটির আর একটি ছোট ভাই আছে। কিন্তু খুব গরিব।"

"গরিবই আমি চাই।"

দাস্ এই বার ভাল করে চেপে বসল। বললে, "শোন, তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে। জবাব দাও।"

দাস্ এইবার হাতে পেয়েছে শঙ্করকে। তার ভাবভঙ্গী দেখে শঙ্কর মনে মনে হাসলে। বললে, "বল, জবাব দিচ্ছি।"

দাস্ জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি আমার সঙ্গে একদিন যেতে পারবে কিনা বল।"

"কোথায়?"

"এই কালীঘাটে। শুধু যাবে। কোনও কথা বলবে না। দূর থেকে একবার তোমাকে দেখিয়ে দেব। বাস্, মুণ্ডুটি ঘুরে যাবে মেয়ের মায়ের।"

শঙ্কর বললে, "না ভাই, তা পারব না। তোমার পিছু পিছু গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব চুপ করে—তা হবে না।"

এ-সব ব্যাপারে দাসুর মাথা খুব সাফ। বললে, "তাহলে এক কাজ কর। আমি তোমাকে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ব। মিনিট কুড়ি-পঁচিশ পরে তুমি সেই বাড়িতে ঢুকে ডাকবে, দাসু! বেশ মানায় ত তুমি! আমাদের গাড়িতে যাবে বলে এইখানে ঢুকে গল্প করতে বসে গেলে? যাবে ত এস তাড়াতাড়ি।"

শঙ্কর বললে, "তা হতে পারে।"

দাস্ তার নিজের এই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় নিজেই যেন মুগ্ধ হয়ে গেল। বললে, "তারপর আর একটি কথা। তুমি কতদূর পড়েছ বল দেখি?"

শঙ্কর এবারে সত্যিই একটু বিপদে পড়ল। বললে, "আবার ও-সব কথা কেন? বলবে, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে।"

দাসুর মুখের হাসি হঠাৎ মিলিয়ে

গেল। বললে, "এইখানে একটু মুশকিলে পড়তে হবে।"

শঙ্কর কথাটাকে গ্রাহ্যই করলে না। বললে, "যাঃ! ইস্কুলের সার্টিফিকেট দেখতে চাইবে নাকি?"

দাসু বললে, "না। তা অবশ্য দেখতে চাইবে না। তবে মেয়েটি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে। মেয়ে চায় কলেজে পড়তে, আর মা চায় মেয়ের বিয়ে দিতে।"

শঙ্কর একটু ভাবনায় পড়ল। কিন্তু ভাবনার সময় তার আর নেই।

শঙ্কর বললে, "দ্যাখো দাসু, এই মাসের ভেতর বিয়ে আমাকে করতেই হবে। তোমার হাতে আর কোনও মেয়ে নেই?"

দাসু বললে, "না ভাই, বামুনের মেয়ে আপাতত এই একটিই আছে। 'অসবর্ণ' বিয়ে ত তোমার দিতে পারব না।"

শঙ্কর বললে, "না। আমার মা তাহলে আত্মহত্যা করবে।"

দাসু বললে, "তাহলে কী করি বল দেখি?"

শঙ্কর বললে, "করবে আবার কী? এইখানেই লাগিয়ে দাও। আর দেরি নয়। কালীঘাটে যেতে বলছিলে, চল কালই যাই।"

দাসু বললে, "কিন্তু মেয়ের মা যে রোজগেরে ছেলে চায়। সে চায় মেয়ে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে।"

"কেন, আমার হাতে মেয়েকে দিয়ে নিশ্চিন্ত না হবার কী আছে? বড়লোকের মেয়ে ত নয়! আর আমিই যে একদিন বড়লোক হব না তাই-বা কে বললে?"

দাসু বললে, "তাহলে কিন্তু আমাকে কতগুলো মিছে কথা বলতে হবে।"

"সেদিক দিয়ে ত তুমি ওস্তাদ। তোমার যা খুশি তাই বোল। আমার চাই বিয়ে।"

দাসু বললে, "কিছুদিন অপেক্ষা করতে পার না?"

শঙ্কর বললে, "এইবার তুমি আমার কাছে মার খাবে। অপেক্ষা করবার সময় আমার নেই।"

দাসু আবার চোখ বুজলে। ধ্যানস্থ হয়ে ভেবে নিলে বোধহয় কেমন করে কী করবে। বললে, "পর, সবকিছু ঠিক করে ফেললাম। বিয়েটাও চুকে গেল। কিন্তু তোমার যে কিছু খরচ আছে।"

শঙ্কর বেশ জোরে জোরেই বলে উঠল, আমি কুলীন ব্রাহ্মণ—ব্যাটাছেলে বিয়ে করব—আমার খরচ আছে মানে?"

দাসু আবার চোখ বুজলে। কিন্তু এবার কিছু চিন্তা করবার জন্য নয়। এবার সে চোখ বুজল ভয়ে।

শঙ্করের কথা শেষ হতেই দাসু চোখ খুলে রীতিমত ভয়ে ভয়ে বললে, "না না, আমি সেকথা বলছি না। আমি বলছি—" বলেই একটা ঢোক গিলে ভয়ের ধাক্কাটা সামলে নিলে। সামলে নিয়ে বললে, "ধর আমাকে বলতে হবে—ছেলেটি আই-এস্‌সি পাশ করে একটি বিলিতী ফার্মে কাজ করছে। এখন অ্যাপ্রেন্টিস্। হাত খরচ

"অসবর্ণ বিয়ে ত তোমার দিতে পারি না"

পায় দেড়শ টাকা। একবছর পরে মাইনে হবে—পাঁচশ টাকা। সাহেব বলছে বিলেত পাঠাব। বছরখানেক যদি বিলেতে থেকে ফিরে আসতে পারে তাহলে দেড়হাজার টাকা পাবে এখানে আসবামাত্তর। কিন্তু বিধবা মায়ের একটিমাত্র ছেলে, তার ওপর গোঁড়া বামুন—মা কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। মা বলছে, বিয়ে দিয়ে দেব। অমন রাজপুত্রের মত ছেলে—ওর আবার বিয়ের ভাবনা? বহুত লোক পেছনে লেগে গেছে। আমার খুব চেনা ছেলে। একরকম বন্ধুর মত। খবর পেয়ে ছুটলাম। ছেলে আমাকে দেখেই বললে, ভারী বিপদে পড়ে গেছি দাসু। মা বলছে আমরা গরিব মানুষ, গরিবের মেয়ে চাই। লেখাপড়া জানা মেয়ে হলে চলবে না। কিন্তু আজকালকার দিনে, আচ্ছা তুমিই বল ত দাসু, মেয়ে একেবারে লিখতে পড়তে জানবে না, সেরকম মেয়েকে বিয়ে আমি করি কেমন করে? আমি বললাম, ঠিক তুমি যেরকমটি চাইছ, সেইরকম একটি গরিবের মেয়ে আছে আমার হাতে। মাট্রিকুলেশন পাশ। ছেলে রাজি হয়ে গেল। বললে, আমি এইখানেই বিয়ে করব।"

দাসু এই এতগুলো মিথ্যা কথা অবলীলাক্রমে বলে গেল। একটুকু কোথাও আটকাল না, কোথাও থামল না।

শঙ্কর কেমন যেন একটু হকচকিয়ে গেল। বললে, "তারপর? এর [illegible] সামলাবে কেমন করে? বিয়ের পর যখন সব জানাজানি হয়ে যাবে?"

দাসু অম্লান বদনে বললে, "জানাজানি ত হবেই। তা হক না। বিয়ের পর শাশুড়ী হয়ত জিজ্ঞাসা করবে, কই বাবা, চাকরি ত তুমি করছ না? তখন বলতে পার, বিলেত যেতে রাজি হলে না বলে চাকরিটা গেল।"

কথাটা বলেই শঙ্করের মুখের দিকে একবার তাকালে দাসু। সেখানে কি ভাবান্তর হয়, দেখবার জন্যই বোধকরি তাকিয়েছিল। কিন্তু মুখ দেখে কিছুই সে বুঝতে পারলে না।

শঙ্কর কী যেন ভাবছিল। দাসু বললে, "বেশ ত এ মিথ্যেটুকুও যদি বলতে না চাও বোল না। বলবে, চাকরির কথা কই আমি ত বলিনি! কে বলেছিল? ডাকো তাকে। ঘটককে তখন কেউ খুঁজেও পাবে না। কাজেই তাড়াতাড়ি বিয়ে যদি করতে চাও, বল আমি চেষ্টা করি।"

শঙ্কর বললে, "কর। বিয়ে আমাকে করতেই হবে।"

দাসু বললে, "নিশ্চয়ই করবে। বউ হবে খুব সুন্দরী। আর তোমাদের কীরকম ভাব-ভালবাসা হয় দেখো।"

শঙ্কর বললে, "আমি কিন্তু পাশ-টাশ কিছু করিনি।"

দাসু বললে, "না করলে ত বয়ে গেল। এমন কত হয়।"

"কিন্তু আমার কী মনে হচ্ছে জান দাসু, এ-বিয়ে শেষ পর্যন্ত হবে না।"

দাসু জিজ্ঞাসা করলে, "কেন হবে না?"

শঙ্কর বললে, "বিয়ের আগে মেয়ের মা যদি আমার মার কাছে আসেন, তাহলেই সব ফাঁস হয়ে যাবে। আমার মা কখনও মিথ্যা কথা বলবে না।"

দাসু বললে, "যাতে না আসে তার ব্যবস্থা করব। তবে হ্যাঁ, একটি কাজ তোমাকে করতে হবে। বিয়ের পরেই এ-বাড়িতে বউকে এনে তুলবে না। কয়েকটা দিনের জন্যে আর-একটি ভাল দেখে বাড়ি তোমাকে ভাড়া নিতে হবে। তারপর ভাবসাব হয়ে গেলে বউকে তুমি নরকে নিতে যেতে চাইলেও তোমার সংগে সেইখানেই সে চলে যাবে।"

শঙ্কর বললে, "বাড়ি ভাড়া, বউভাত, খাট বিছানা, আমার জামাকাপড়, বউয়ের কিছু কাপড়জামা—এই সব খরচের টাকাগুলি দিতে হবে মেয়ের মাকে।"

দাসু বললে, "বললাম ত মেয়ের মা গরিব। এখন দেখি কী সে দিতে পারে।"

দাস্ সেইদিনই চলে গেল কালীঘাটে। ইন্দ্রাণীর মাকে গিয়ে এমনভাবে কথাটা বললে, যেন সে হঠাৎ একটি দুর্লভ রত্নের সন্ধান পেয়েছে তার কন্যার জন্যে। এ-রত্ন যদি হাতছাড়া হয়ে যায় ত ইন্দ্রাণীর ভাগ্য অত্যন্ত মন্দ বলতে হবে।

যে-গল্প সে শঙ্করকে বলে এসেছিল সেই গল্পই সবিস্তারে বর্ণনা করে ইন্দ্রাণীর মাকে সে এই বলে সাবধান করে দিলে যেন সে ঘুণাক্ষরে এ-কথা কারও কাছে প্রকাশ না করে। কারণ তার মত বিবাহযোগ্যা অনেক কন্যার বাপ-মা এই রত্নটির দিকে হাত বাড়িয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে টাকার।

দাস্ সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এখন বলুন মা, আপনি কীরকম খরচ করতে পারবেন। তারই ওপর সব-কিছু [illegible] করছে।"

ইন্দ্রাণীর মা বললে, "তোমাকে ত বলেছি বাবা গরিব বিধবার মেয়ে, টাকার অভাবে মেয়েটাকে কলেজে পড়াতে সাহস হল না, তাই বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই। ছোট ছেলেটাকে পড়াতে হবে, তার জন্যেও আমার কিছু রাখা উচিত। কাজেই আমি যা দেখছি, নগদ একটি হাজার টাকা ছেলেকে আমি দিতে পারি।"

দাস্ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বললে, "না মা, এরকম ছেলে এত সস্তায় পাওয়া যায় না। ছেলের মা চেয়েছে নগদ দুটি হাজার টাকা। ছেলেটি আমার খুব পরিচিত। দেখি বলে কয়ে কিছু করতে পারি কিনা।"

দাস্ সেদিন চলে গেল সেখান থেকে।

একদিন পরে আবার এল।

ইন্দ্রাণীর মা জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু কিছু করলে বাবা?"

দাস্ বললে, "মনে মনে একটা ফন্দি এঁটেছি মা, কিন্তু সেটা কি ভাল হবে? সেদিন ত আপনাকে বললাম, ছেলে চায় একটি লেখাপড়া-জানা মেয়ে, আর মা চায় লেখাপড়া-না-জানা মেয়ে। ছেলে তার জন্যে মাকে আগে থেকে কিছু না জানিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করতেও রাজী। আমি বলি কি, কোনোরকম ফন্দী-ফিকির করে ছেলেটিকে আনি এইখানে। আপনি দেখুন তাকে। দেখে যদি আপনার পছন্দ হয়, তখন কথা কইব। আগে থেকে কিছু বলব না।"

ইন্দ্রাণীর মা তখন ছটফট করছে মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে। বললে "তাই কর বাবা, ছেলেটিকে দেখি আমি। তুমি ত দেখেছ আমার ইন্দ্রাণীকে। রূপে গুণে সাক্ষাৎ ইন্দ্রাণী। যারতার হাতে ত দিতে পারব না তাকে।"

দাস্ বললে, "ছেলেকে দেখলে মাথাটি আপনার ঘুরে যাবে মা। আপনি দেখুন শুধু কোনও কথা বলবেন না।"

"সেই ভাল।"

শঙ্করকে সব-কিছু বলাই ছিল। দেখাবার ব্যবস্থা তার পরের দিনই হয়ে গেল।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি। দিনের আলোয় দেখাই ভাল।

দাস্ তার আগেই ইন্দ্রাণীর মার কাছে আসর জমিয়ে বসেছে। —"কোম্পানির গাড়ি করে বুঝি বালিগঞ্জ যাচ্ছিল শঙ্কর। পথে দেখা হতেই বললাম, আমিও ওই দিকে যাব দয়া করে যদি নামিয়ে দাও ত ট্রামে-বাসে ঝুলতে ঝুলতে যেতে হয় না। তা ছেলেটা খুব ভাল। বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল। যাবার সময় আবার তুলে নিয়ে যাব বলেছে। এই কাছেই গেছে, এক্ষুনি আসবে। আপনি দেখবেন শুধু। আজ আর কিছু বলবেন না। কাল আমি জেনে যাব আপনার মতামত।"

আগেই সব ঠিক করা ছিল। শঙ্কর বাড়ির সদর পেরিয়ে একেবারে ভেতরে এসে ডাকলে, "দাস্!"

"ওই এসেছে! দেখুন মা দেখুন।"

চুপিচুপি কথাটা বলে দাস্ তার ঝুলিটা খোঁজবার ছুতো করে খানিকটা দেরি করলে। ওদিকে শঙ্করও তার বুকটা ফুলিয়ে সার্টের কলারটা বারকতক নেড়েচেড়ে বাড়িটা ভাল করে দেখে নিলে।

"কাল আবার আসব মা, আজ চলি।"

দাস্ তার ঝুলিটা কাঁধে ফেলে, চটি পায়ে দিয়ে শঙ্করের সঙ্গে [illegible] গেল সেদিন।

শঙ্করকে কতক্ষণই-বা দেখেছিল ইন্দ্রাণীর মা। ইন্দ্রাণীকে ডেকে দেখালে বড় ভাল হত, এই আফসোসই সে করছিল, এমন সময় দাস্ এল তার পরের দিন মার মতামত জানতে।

ঘুড়িটি সত্যিই তার ঘুরেছে বলেই [illegible] হল।

দাস্ একটি কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেনি। ইন্দ্রাণীর মা তাকে দেখেই বলে উঠল, "যেমন করে হক, এই ছেলেটার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও ইন্দ্রাণীর। তোমাকে আমি খুশি করে দেব দাস্।"

"কত দেবেন মা আমাকে?"

"পঞ্চাশটি টাকা।"

"না মা, একশটি টাকা দিন, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

"একশ টাকা? বিয়ের দিন তাহলে বরযাত্রী কিছু কম করে আনতে বোল।"

দাস্ বললে "তাহলে শুনুন মা। ওর মাকে বলে যদি বিয়ে দিতে হয়, তাহলে আপনার খরচ পড়বে চার হাজার টাকা। দু'হাজার নগদ, মেয়ের বিশ ভরি সোনা, ছেলের সোনার বোতাম, রিস্ট ওয়াচ, বরদের জোড়, তারপর বরযাত্রী অন্তত জন-তিরিশেক, গায়ে-হলুদের তত্ত্ব, ফুলশয্যার তত্ত্ব, খাট, বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, আলমারি—হেন তেন সাত-সতেরো। চার হাজার টাকা কম করে বললাম, পাঁচ হাজার টাকার কম হবে না। দিতে যদি রাজি থাকেন ত বলুন, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

মা বললে, "না বাবা, অত টাকা আমার নেই।"

দাস্ বললে, "তাহলে ও-ছেলের আশা ছেড়ে দিন।"

"তবে যে বললে একশ টাকা পেলে তুমি সব ব্যবস্থা করে দেবে?"

দাস্ বললে, "সেটা হচ্ছে গিয়ে আমার মনের কথা। শঙ্করকে একবার আমি জিজ্ঞাসা করব, সে যদি রাজী হয়, আর আপনি যদি পছন্দ করেন, তাহলে হতে পারে।"

"সে কিরকম বাবা?"

"সেই যে বলেছিলাম আপনাকে। ছেলের মাকে না জানিয়ে চুপিচুপি বিয়েটা সেরে দেব। তারপর ছেলে একেবারে বউ নিয়ে বাড়ি ঢুকবে।"

ইন্দ্রাণীর মা বললে, "মা যদি তখন রাগ করে? যদি বলে ও-মেয়েকে আমি বাড়ি ঢুকতে দেব না?"

"একটিমাত্র ছেলে, তা অবশ্য বলবে না। তবে শঙ্করকে একবার জিজ্ঞাসা করতে হবে। সে যদি রাজি হয় ত—বাস, সেরে দিতে পারি কম খরচে। বিয়ের আগে শঙ্করের টাকা ধরিয়ে দেব শঙ্করের হাতে, বলব নিজের জামা জুতো কিনে নাও। তারপর বিয়ের দিন সন্ধ্যেবেলা নিয়ে আসব একখানা ট্যাক্সি করে। না বরযাত্রী না কিছু, বড় জোর ওদের পুরুত আসবে সঙ্গে। এখানে আমরা বিয়ের সব ঠিক করে রাখব। বিয়ে হয়ে যাবে পরের দিন কুশণ্ডিকা হবে, আপনি আমার হাতে হাজারটি টাকা দেবেন, আমি চুপি চুপি শঙ্করের হাতে দিয়ে বলব, তোমার গরিব শাশুড়ী ঠাকরুন লজ্জায় এ-টাকা নিজে দিতে পারলে না, তোমার উপযুক্ত সম্মানদক্ষিণা এ নয়, তবু তোমাকে এই হাজারটি টাকা নিয়ে হাসিমুখে ইন্দ্রাণীকে নিয়ে তোমার মায়ের কাছে যেতে হবে। তোমার মাকে খুশি করবার ভার তোমার ওপর।—এতে আপনি রাজি থাকেন ত বলুন—আমি শঙ্করকে গিয়ে বলি। আর যদি রাজি না হন ত ওর আশা ছেড়ে দিন। আমি অন্য ছেলে দেখি।"

ইন্দ্রাণীর মা কিন্তু শঙ্করের আশা ছাড়তে পারলে না সহজে। বললে, "তাই দ্যাখো

বাবা শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করে।"

দাসু বললে, "রাজি যদি হয় ত আর দেরি করব না মা। আসছে সোমবার ভাল একটি দিন আছে। সেইদিনই সেরে ফেলতে হবে নইলে মত আবার বদলে যেতেই-বা কতক্ষণ!"

তাই হল শেষ পর্যন্ত।

সোমবার সন্ধ্যায় ইন্দ্রাণীদের কালীঘাটের বাড়ির নীচের তলার একটি ঘরে শঙ্করের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর বিয়েটা চুকে গেল।

মাকে না জানিয়ে লোকচক্ষুর অগোচরে শঙ্করের এই গোপন বিবাহের কারণ যে শুধু ইন্দ্রাণীর মার অর্থাভাব সে কথাটা দাসু যে কতবার কতরকম করে মাকে শোনালে তার ইয়ত্তা নেই।

বিবাহের অনুষ্ঠান-আচরণের কোথাও কোনও ত্রুটি হল না। শঙ্কর একজন ভাড়া-করা পুরোহিত সঙ্গে এনেছিল। কন্যাপক্ষের পুরোহিত ছিল, নাপিত ছিল, একান্ত অন্তরঙ্গ প্রতিবেশিনী কয়েকজন ভদ্রমহিলা ছিলেন, আর ছিল ইন্দ্রাণীর চারজন ইস্কুলের বান্ধবী।

এই বান্ধবী চারজনেই জমিয়ে রাখলে বিয়েবাড়িটা।

সবাই একবাক্যে বলতে লাগল, এমন রাজযোটক সহজে হয় না। যেমন বর, তেমন কনে।

নিতান্ত ছোট বাড়ি। মাত্র খানতিনেক ঘর। তার ভেতর ইন্দ্রাণী আর ইন্দ্রাণীর ছোট ভাই যে-ঘরখানায় থাকে, সেই ঘরটিই সবচেয়ে ভাল। সেই ঘরটি ভাল করে সাজিয়ে বাসর ঘর তৈরি করেছিল ইন্দ্রাণীর বান্ধবীরা।

বিয়ের পর বর-কনেকে নিয়ে তারা সেই ঘরে গিয়ে সারা রাত ধরে হৈ-হুল্লোড় চালালে। শঙ্করকে নিয়ে কী যে তারা করবে বুঝতে পারলে না। শঙ্করের কাছে নিজেদের জাহির করবার জন্যে এমন ব্যস্ত হয়ে উঠল যে, ইন্দ্রাণী বলে যে একটি মেয়ে আছে সেখানে, সেকথা তারা ভুলেই গেল। ভুলে গেল, নববিবাহিত দম্পতির তখনও পরিচয় হয়নি।

নিজেরাই তারা নেচে গেয়ে নিজেদের ভেতর রেশারেশি করে রাত কাবার করে দিলে। ইন্দ্রাণী খাটের একপাশে শুয়ে শুয়ে ঘুমল।

পরদিন সকালেই কুশণ্ডিকা।

তার আগে দাসুর সঙ্গে শঙ্করের দেখা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দাসু বসে বসে চা খাচ্ছিল। শঙ্কর তাকে বাইরে রাস্তায় টেনে নিয়ে গিয়ে বললে, "কী হল?"

দাসু বললে, "সব ঠিক আছে। দেখছ না তোমার শাশুড়ী কী রকম ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। তা ছাড়া তোমার মাকে না জানিয়ে চুপি চুপি বিয়ে হচ্ছে। ভাবছে হয়ত কুশণ্ডিকা চুকে যাক, তার পরেই দেবে।"

"কত দেবে?"

"পাঁচশ টাকা ত নিশ্চয়ই। হাজারও দিতে পারে।"

এই বলেই দাসু চট্ করে তার পকেট থেকে একশ টাকার একখানি নোট বের করে শঙ্করের হাতে দিয়ে বললে, "এইটে রাখ তোমার কাছে। আমার ঘটকালির দরুণ এই একশ টাকা আমাকে দিয়েছে।"

"এ-টাকা আমি রাখতে যাব কেন? তোমার টাকা তুমি রাখ।"

দাসু বললে, "ঝুলিটা আমি আমিনি দেখছ না? রাখ তোমার কাছে। আমি আবার চেয়ে নেব।"

শঙ্কর বললে, "এখান থেকে গিয়েই [illegible] ওপর মা বউভাতের আয়োজন করবে। খরচ কম হবে না।"

দাসু বললে, "কিচ্ছু ভেবো না তুমি। সব ঠিক হয়ে যাবে। বউ কেমন হয়েছে বল।"

শঙ্কর বললে, "ভাল।"

কুশণ্ডিকা চুকে গেল।

সকাল-সকাল চারটি খাইয়ে দিতে হবে মেয়ে-জামাইকে। তার পরেই ইন্দ্রাণীকে নিয়ে শঙ্কর চলে যাবে তার মার কাছে। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে যাবে তার ছোট ভাই সমর।

শঙ্করকে খেতে বসিয়ে শাশুড়ী বসলেন তার সুমুখে একটি পাখা হাতে নিয়ে। বললেন, "তোমারই ওপর ভরসা করে ইন্দ্রাণীকে আমি দিলাম তোমার হাতে। তুমি ওকে দেখ বাবা। তোমার মাকে যা বলবার তুমিই বোল।"

থেমে থেমে তিনি বলতে লাগলেন, "বেয়ানের সঙ্গে পরিচয় করতে দিলে না বাবা, কী আর করব বল, আমার অদৃষ্ট। তোমার মায়ের উপযুক্ত সম্মান আমি করতে পারলাম না বাবা শঙ্কর। তোমার মা দু হাজার টাকা চেয়েছিলেন, আমি অত টাকা কোথায় পাব বাবা, আমার যা-কিছু ছিল বিক্রি করে এক হাজার টাকা দিলাম।"

শঙ্কর এতক্ষণ মাথা হেঁট করে খেতে খেতে সব শুনছিল। এবার মুখ তুলে তাকালে। জিজ্ঞাসা করলে, "দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ বাবা, কাল বিয়ের আগেই দিয়েছি দাসুর হাতে। দাসু বললে, জামাই-এর হাতে দেবেন না মা, মায়ের ভয়ে সে কি নিতে পারবে? দরকার হয় আমি নিজে গিয়ে আপনার বেয়ানের হাতে দিয়ে ওঁকে যা বলবার বলে ঠাণ্ডা করে আসব। তার পর আপনাদের বেয়ানে বেয়ানে দেখা করিয়ে দেব।"

শঙ্কর আবার জিজ্ঞাসা করলে, "কাল রাত্রে দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ বাবা, কাল রাত্রে দিয়েছি এক হাজার। বিয়ের আগে তোমার জুতো কাপড় কেনবার জন্যে দিয়েছি দু শ। আর আজ সকালে ওর ঘটকালির জন্যে দিয়েছি একশ।"

শঙ্কর তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করেই উঠে পড়ল।

শঙ্কর দাসুকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু কোথায় দাসু?

রাস্তায় পানের দোকান, চায়ের দোকান পর্যন্ত দেখে এল, কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

বিয়ের আগে পঞ্চাশটি টাকা সে তাকে দিয়েছে। দেড়শ মেরেছে সেই দিন। তার পর এক হাজার। আর শুধু সেই জন্যেই তার নিজের ঘটকালির টাকা একশ তার হাতে দিয়ে দাসু পালিয়েছে। ইন্দ্রাণীকে দেখে শঙ্করের মন ভরে গিয়েছিল, ভেবেছিল মাকে সে খুশি করতে পারবে। দেড় শ টাকা দেবে বলে এক মাসের জন্যে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে সে। নিয়েছে দাসুর কথা শুনে। বউভাতের আয়োজন করতে বলে এসেছে মাকে। দোকান থেকে ধারে জিনিস-পত্র কিনে দিয়ে এসেছে। বাবুদের বাড়ি থেকে পাঁচ-সাত দিনের ছুটি নিয়েছে তার মা। নেত্য নাপতিনীকে খবর দিতে বলে এসেছে, আর বলে এসেছে বস্তির মেয়েটার মাতাল ট্যাক্সি ড্রাইভার যে-মামাটা তাকে আর তার মাকে অপমান করে গিয়েছিল, তাকে যেন খবরটা জানিয়ে দেয় নেত্য। ইচ্ছে করলে বউভাতের নেমন্তন্ন সে খেয়ে যেতে পারে।

এ-সবই করেছে সে দাসুর কথা শুনে।

রাগে তার সমস্ত শরীর জ্বলতে লাগল। এ কী বোকার মত কাজ করলে সে। দাসুকে চিনেও চিনলে না। দাসু কোথায় থাকে কিছুই সে জানে না। তার বাড়িটাও অন্তত তার দেখে রাখা উচিত ছিল।

হতাশ হয়ে শঙ্কর ফিরে এসে বসতেই তার পুরোহিত এসে দাঁড়াল তার কাছে। বললে, "আমার পাওনাটা তাহলে মিটিয়ে দিন, আমি চলে যাই।"

"ও, হ্যাঁ।" শঙ্কর উঠে দাঁড়াল। পকেটে দাসুর দেওয়া একশ টাকার নোটখানা রয়েছে। বললে, "আসুন, নোটটা ভাঙিয়ে দিই।"

একশ টাকার নোট—ভাঙাতে হলে একটা বড় দোকানে যেতে হয়। কাছেই একটা বড় স্টেশনারী দোকান। কিন্তু শুধু ভাঙানি চাইলে দেবে না। কী কিনবে? ইন্দ্রাণীকে

কিছুই সে দেয়নি। কী দেবে? চট্‌ করে ... বলল, "খুব ভাল সেণ্ট আছে আপনার দোকানে?"

দোকানী বের করে দিলে দশ টাকা দামের ভাল একটি সেণ্টের শিশি। বললে, "এর চেয়ে ভাল কিছু আপাতত নেই।"

একশ টাকার নোটটি তার হাতে দিয়ে সেণ্টের শিশিটি সে কিনে ফেললে।

পুরোহিতমশাইকে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার পাওনা কত?"

পুরোহিত বললেন, "ঘটকমশাইয়ের সঙ্গে আমার ত কথাই হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, কুড়ি টাকা দেবেন। আসলে ব্যাপারটা কী হয় জানেন? আমরা আমাদের প্রাপ্য পাই কন্যাপক্ষের তরফ থেকে। আর পাত্রপক্ষ দেয় কন্যাপক্ষের পুরোহিতকে। কিন্তু ঘটকমশাই সে-নিয়ম বদলে দিলেন। বললেন, না, পাত্রপক্ষ দেবে পাত্রপক্ষের পুরুতকে আর কন্যাপক্ষ দেবে কন্যাপক্ষের পুরুতকে।"

অত কথা শোনবার অবসর নেই শংকরের। কুড়িটি টাকা পুরোহিতের হাতে দিয়ে বললে, "আসুন।"

পুরোহিত হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শংকর বললে, "যান, আপনি এবার ট্রামে চড়ে বাড়ি চলে যান।"

"ট্রামের ভাড়াটা? আসবার সময় অবশ্য আপনাদের সঙ্গে গাড়িতেই এসেছিলাম।"

খুচরো কিছু ছিল না শংকরের হাতে।

একটি টাকা পুরোহিতকে দিয়ে বললে, "দাসু ঘটকের বাড়ির ঠিকানা জানেন?"

পুরোহিত বললে, "আজ্ঞে না তাঁর সঙ্গে ত আমার পরিচয় ছিল না। গঙ্গার ঘাটে আমি একটা লোকের শ্রাদ্ধের পিণ্ডি দেওয়াচ্ছিলাম। উনি আমাকে সেইখানে গিয়ে ধরলেন। আমি অবশ্য জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাঁর নিবাস কোথায়? তিনি বলেছিলেন, নবদ্বীপে। আপাতত থাকেন বুঝি বেহালায়। আজ্ঞে, আর কিছু আমি জানি না।"

শংকর বললে, "আচ্ছা, যান আপনি।"

ভদ্রলোক তবু যান না!

"আবার কী?"

পুরোহিত বললেন, "আপনি আমাকে ট্রাম ভাড়ার দরুণ একটা টাকা দিলেন। আমার কাছে খুচরো পয়সা কিছু নেই, আপনাকে কত ফেরত দিতে হবে বলুন, আমি চট করে এই দোকান থেকে টাকাটা ভাঙিয়ে আনি।"

শংকর বললে, "থাক আর ফেরত দিতে হবে না আপনি যান।"

খুশী হয়ে পুরোহিত চলে গেলেন।

বাড়ির দরজায় ইন্দ্রাণীর ভাই সমর দাঁড়িয়েছিল। বললে, "আপনি ট্যাক্সি ডাকতে গিয়েছিলেন?"

শংকর বললে, "না, আমি দাসু ঘটককে খুঁজছি।"

সমর বললে, "এই দেখুন, আপনাকে বলতে আমি ভুলে গেছি—সে বাড়ি চলে গেছে। যাবার সময় আমাকে বললে, তুমি তোমার জামাইবাবুকে বলে দিও, আমি তার বাড়িতেই যাচ্ছি। সেইখানেই দেখা হবে।"

শংকর জিজ্ঞাসা করলে, "আমি তখন কোথায় ছিলাম?"

"আপনি তখন মন্ত্র বলছিলেন আর দিদির মাথায় সিঁদুর দিচ্ছিলেন।"

"হুঁ।" বলে শংকর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবতে লাগল।

সমর বললে, "ট্যাক্সি ওদিকে পাওয়া যায় না। এই দিকে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। ডাকব।"

শংকর বললে, "তোমার দিদি তৈরি হয়েছে?"

সমর বললে, "হ্যাঁ। দিদি জামা কাপড় পরে মার কাছে বসে বসে কাঁদছে।"

শংকর চমকে উঠল। "কাঁদছে? কেন?"

সমর বললে "কাঁদতে হয় যে! মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় কাঁদে না?"

এত দুঃখেও হেসে ফেললে শংকর। বললে, "ডাক একটা ট্যাক্সি।"

শংকর নতুন যে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছে, সেটাও ঝিলপাড়ায়। সেই বাড়ির সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াল।

দোরে দাঁড়িয়েছিল নেতা নাপ্‌তিনী। ছুটে গিয়ে বাড়ির ভিতর খবর দিলে সে।

বিমলা বেরিয়ে এল জলের একটা ঘটি হাতে নিয়ে। নেতার হাতে ঘটিটা ধরিয়ে দিয়ে বিমলা এগিয়ে এল গাড়ির কাছে। শংকর গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দোর খুলে ইন্দ্রাণীর সুটকেসটি হাতে নিয়ে বললে, "নাম।"

ইন্দ্রাণী নামল, সমর নামল।

শংকর ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে বললে, "প্রণাম কর। এই আমার মা।"

ইন্দ্রাণী সেইখানেই মাথা হেঁট করে প্রণাম করতে যাচ্ছিল। বিমলা তাকে জড়িয়ে ধরে বললে "থাক মা থাক। জন্ম-এয়োস্ত্রী হও সুখে থাক। এই ত কেমন সুন্দর বউ হয়েছে আমার! নেতা দ্যাখো ভাল করে। সেই মিনষেকে গিয়ে বলবে।"

একতলা বাংলোর মত বাড়ি। তিন চারখানা বড় বড় ঘর। একদিকে মস্ত বড় রান্নার জায়গা, খাবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর। সামনে একটুখানি উঠোন। চারদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

পাশের একখানা ঘরে বউয়ের বসবার জায়গা করাই ছিল। বিমলা তাদের সেইখানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে। ইন্দ্রাণীর কাছে গিয়ে বসল তার ভাই সমর।

পাশের ঘরে গিয়ে ইন্দ্রাণীর সুটকেসটা নামিয়ে শংকর ডাকলে, "মা, শোন।"

বিমলা নেতাকে বউমার কাছে রেখে শংকরের কাছে গেল।

মাকে শিখিয়ে রাখা হয়েছিল, বউ দেখে তুমি একটু অবাক হয়ে যাবে। বলবে, সে কিরে তুই কি তাহলে আমাকে না জানিয়েই বিয়ে করে ফেললি? তার পর বউ দেখে খুশি হয়ে বলবে তা বেশ করেছিস। আমি বউ চেয়েছিলাম, ঘর আলো-করা বউ পেলাম। এস মা, এস।

কিন্তু বিমলা সেসব কথা বোধ হয় ভুলেই গিয়েছে। অভিনয় সে একেবারে করতে পারলে না। এমন করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল, এমনভাবে কথা বললে, মনে হল যেন সবই সে জানে।

ইন্দ্রাণী নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়। সে জানে স্বামী তার মাকে না জানিয়ে বিয়ে করেছে। এখন সে ভাববে হয়ত—এদের সব মিছে কথা। হয়ত-বা ভাববে এরা মানুষ ভাল নয়।

বিমলা এসে দাঁড়াল শংকরের কাছে। শংকর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই বললে, "তুই যা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলি সব ভুলে গেলাম। তাছাড়া ও-সব আমি ভালও বাসি না।"

শংকর বললে, "চুপ! আস্তে কথা বল শুনতে পাবে।"

"শুনুক না! কদিন লুকিয়ে রাখবি? জানবে আমরা গরিব। জানুক না। বড়লোক সেজে কদিন থাকতে পারবি তুই?"

"আঃ চুপ করো না!" শংকর জিজ্ঞাসা করলে "দাসু এসেছিল?"

বিমলা বললে, "না আসেনি। বাড়িওলাকে কী বলে গিয়েছিলি? দু দুবার এসেছিল। লোকটার খুব মুখ খারাপ।"

শংকর মুখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

"কী ভাবছিস? এই দ্যাখ, বলতে ভুলে যাচ্ছি, দোকান থেকে ধারে জিনিস এনেছিস, তাদের লোক এসেছিল। তা এত এত ঘি ময়দা কী হবে? কত লোককে নেমন্তন্ন করবি?"

শংকর বললে, "তা করতে হবে বই-কি!"

বিমলা বললে, "তাহলে আমিও কিছু করি?"

"হ্যাঁ কর। কিন্তু তুমি যেখানে কাজ কর, তাদের কাউকে বোলো না।"

এই বলে শংকর বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ইন্দ্রাণীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে "দাস, আগেই তোমাকে খবর দিয়েছে! তাই বস!"

বিমলার দিকে তাকিয়ে বললে, "আমি

একটু ঘুরে আসি মা। নেমন্তন্নটা 'সেরে দিয়ে আসি। খাওয়াবার ব্যবস্থা কাল রাত্রে।"

দোরের কাছ পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এল শঙ্কর। পকেট থেকে দশ টাকার একটি নোট বের করে মার হাতে দিয়ে বললে, "আজ তোমার বাড়িতে দুজন নতুন মানুষ এসেছে। রাত্তিরে একটু ভাল করে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর।"

ইন্দ্রাণীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সমর চুপি চুপি বললে, "জামাইবাবু গরিব মানুষ নয় দিদি।"

ইন্দ্রাণী বললে "চুপ!"

ঠিক শ্রীহরির কাছে যাবে বলে যায়নি শঙ্কর। ভেবেছিল শক্তি মন্দিরে গিয়ে তাকে নিমন্ত্রণ করে আসবে আর সেই সঙ্গে ক্লাবের যে-সব ছেলেরা তার অনুগত—তাদেরও জানিয়ে দেবে।

কলকাতার পথে পথে সে বৃথাই সন্ধান করে ফিরছিল দাসুরে। শঙ্কর মনে মনে জানে সে পালিয়েছে। হয়ত বা কলকাতা ছেড়েই চলে গেছে।

তবু সে একবার থমকে থামল ঠিক সেই জায়গাটায়—দাসু যে-জায়গাটায় একদিন ট্রাম থেকে নেমেছিল।

এরই কাছাকাছি কোথাও সে থাকে নিশ্চয়ই। একদিন না একদিন তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবেই। মাত্র এক হাজার টাকা মেরে দিয়ে সে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে পারবে না।

ইলেকট্রিক পোস্টের গায়ে একটা হাত রেখে শঙ্কর এমনি-সব নানা কথা ভাবছে। ভাবছে, কিছু টাকার তার একান্ত প্রয়োজন। টাকা না হলে ইন্দ্রাণীর কাছে তার সম্মান থাকবে না।

বাড়িওলাকে টাকা দিতে হবে। দোকানীকে টাকা দিতে হবে। তা ছাড়াও এতগুলি লোককে ভাল করে খাওয়াতে হলে আরও সব অনেক কিছু কেনা দরকার।

এই সব কথা ভাবছে আর মনে হচ্ছে, দাসুকে এখন যদি সে হাতের কাছে পায় ত তাকে এমন শিক্ষা দেবে যে, সে এমন কাজ আর জীবনে কখনও করবে না।

হঠাৎ তার গায়ে হাত পড়তেই চমকে সে পিছন ফিরে দেখলে, শ্রীহরি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। গাল দুটো তার তেমনি ফুলে উঠেছে, চোখ দুটো তার তেমনি ছোট হয়ে গিয়েছে। "শক্তি-মন্দিরে আর যাচ্ছ না কেন শঙ্করদা, কী হয়েছে তোমার?"

"একটা লোক আমাকে ঠকিয়েছে। আমি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

"তোমাকে ঠকিয়েছে?"

কথাটা সে এমনভাবে বললে, মনে হল, শঙ্করদাকে ঠকানো তার কাছে যেন একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

শঙ্কর বললে, "চল, এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।"

শ্রীহরি বললে, "আমি এখন ছাপাখানায় যাচ্ছি শঙ্করদা।"

"চল্ ওই দিকেই যাই।"

ছাপাখানার কাছাকাছি গিয়ে শঙ্কর বললে, "শক্তি-মন্দিরের তহবিলে টাকা আছে?"

শ্রীহরি বললে, "তুমি ত জান।"

"না, আমি অনেকদিন দেখিনি।"

"আছে গোটা চল্লিশেক।"

"আর দরিদ্র ভাণ্ডারে?"

শ্রীহরি বললে, "দরিদ্র-ভাণ্ডারে আছে বোধহয় নব্বই টাকা।"

কথাটা বলতে কেমন যেন আটকাচ্ছিল শঙ্করের, তবু বললে, "তুই আমাকে শ দুই টাকা কোথাও থেকে এনে দিতে পারিস? তিন চার দিন পরে ফেরত দেব।"

শ্রীহরি বললে, "তুমি আমাদের ছাপাখানার দোরে দাঁড়াও, আমি দেখছি।"

শঙ্কর দাঁড়িয়ে রইল গেটের সামনে।

শ্রীহরি খানিক পরেই বেরিয়ে এল—দশটাকার কুড়িখানা নোট হাতে নিয়ে। শঙ্করের হাতে দিয়ে বললে, "ক্যাসিয়ারের কাছে থেকে নিয়ে এলাম। গুনে দ্যাখো।"

শঙ্কর নোট গুনছে, এমন সময় শ্রীহরির দাদা এসে শঙ্করকে বললে, "কই দেখি নোটগুলো।"

নোটগুলো একরকম সে কেড়েই নিলে শঙ্করের হাত থেকে। তারপর শ্রীহরির দিকে তাকিয়ে বললে, "তোর বেশ আক্কেল ত? ভাগ্যিস আমি দেখলাম। বলেই নোটগুলো সে পকেটে রাখলে। তারপর শঙ্করকে বললে, "না ভাই, টাকা এখন দেওয়া হবে না। তুমি অন্য কোথাও দ্যাখো। কাল শনিবার, আমাদের পেমেণ্টের দিন।"

শ্রীহরির দাদা ভিতরে চলে গেল। শ্রীহরি তার দাদার পিছনে ছুটল: "দাদা! দাদা!"

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখলে, শঙ্কর চলে গিয়েছে।

নেত্যকে বউমার কাছে রেখে বিমলা নিজেই গিয়েছিল বাজারে। বাড়িতে সবই সে ঠিক করে রেখেছে। রাত্রে খাবার লোক মাত্র তিনজন। ভাল দেখে আধসের মাংস কিনে আনলেই চলবে।

তার বস্তির বাড়িটা বেশি দূরে নয়। যদিও তালা বন্ধ করে এসেছে, তবু একবার দেখে যাওয়া ভাল।

বাড়ির আশেপাশে যারা থাকে, তারা সবাই তাকে ভালবাসে। বড় গরিব তারা। পেট ভরে দুবেলা খেতে পর্যন্ত পায় না। বাড়িতে তার বউ এসেছে। কাল বউভাত। এত এত জিনিস এসেছে বাড়িতে। এত লোক খাবে, আর এই সুযোগে তাদের কয়েকজনকে যদি ভাল-মন্দ দুটো খাইয়ে দিতে পারে, তার ছেলে বউকে তারা দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবে।

আজ না হয় সে একটা বড় বাড়িতে বাস করছে, দুদিন বাদে ওই বউ নিয়েই তাকে তার বস্তির বাড়িতে উঠে যেতে হবে। কাজেই তার প্রতিবেশী কয়েকজনকে বলে যাওয়া ভাল।

বাজারে যাবার পথে তাই সে ছেলেতে মেয়েতে জন দশবারো লোককে বলে গিয়েছিল। বলে গিয়েছিল, কাল সন্ধ্যে-বেলা তোমরা যাবে আমার ওই বাড়িতে, কাজকম্ম কিছু করে দেবে আর আসবার সময় চারটি খেয়ে আসবে।

পেট ভরাবার জন্য দুবেলা দুটি অন্ন আর লজ্জা নিবারণের জন্য একখণ্ড বস্ত্রই যাদের জীবনের একমাত্র চাওয়া, বিয়ে-বাড়িতে চারটি খেয়ে আসবার নিমন্ত্রণ পাওয়াকে তারা দুর্লভতম সৌভাগ্য ছাড়া আর কী ভাবতে পারে?

বাজার থেকে বিমলা ফিরে আসবার আগেই দেখলে, ফিরিওলা রামু এসে হাজির হয়েছে।

বিমলা আসতেই নেত্য বললে, "আমি এবার আসি।"

বিমলা বললে, "কাল একটু সকাল-কাল এস নেত্য। তোমার কত্তাটিকেও আসতে বোলো। এইখানেই খাবে তোমরা।"

"আসব।" বলে নেত্য চলে গেল।

"বউমা কোথায়?"

"চানের ঘরে গেছে। ওই ত এসেছে।"

রামু ফিরিওলা বুড়ো মানুষ। মুখে মাত্র দুটি কি তিনটি দাঁত। মাথার চুল সব সাদা। হাতজোড় করে উবু হয়ে বসে আছে দোরের বাইরে। ইন্দ্রাণীকে দেখেই বলে উঠল, "আহা হা হা, ই যে পিতিমের মতন বউ হয়েছে দিদিঠাকরুণ! যেমন ছেলে, তেমনি বউ।"

বিমলা বললে, "তুমি ছিলে না বাড়িতে, তাই তোমার নাতনীকে বলে এসেছিলাম।"

রামু বললে, "তাই শুনেই ত ছুটে আসছি দিদি, বলি, বউ ঠাকরুণকে দেখে আসি। কাল আবার আসব। চারটি পেসাদ পেয়ে যাব। নাতনীটাকেও নিয়ে আসব ত দিদি?

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার নাতনীকেও নিয়ে আসবে বই-কি!"

রামু জিজ্ঞাসা করলে, "তা ই বাড়ীটা কদিনের জন্যে ভাড়া নিয়েছ দিদি?"

"সে-সব আমি জানি না রামু, শঙ্কর জানে।"

রামু বললে, "তা এইরকম বাড়ি না হলে

"ইযে পিতিমের মতন বউ হয়েছে"

কি চলে? বেয়াই বাড়ির কুটুম্বজন সব আসবে, বস্তিতে বিয়ে দিলে তাদের বসবার দাঁড়াবার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত দিতে পারতে না। দেখেশুনে মনে হচ্ছে বেশ বড়লোকের বাড়িতেই ছেলের বিয়ে দিলে।"

"হ্যাঁ, তা দিলাম।" বলেই বিমলা চলে গেল রান্নাঘরে।

রামু কিন্তু থামল না। বললে, "তা হ্যাঁ গা মা-লক্ষ্মী, গরিবের বাড়িতে বিয়ে হ'ল, বস্তিতে গিয়ে থাকতে পারবে ত? হাঁড়ি ধরতে পারবে ত?"

ইন্দ্রাণী শুনলে সব। জবাব দিলে না।

রামু বললে, "তবে সুজনের রান্না। শংকরের দাদাবাবুর আর নিজের। শাশুড়ী ত চলে যাবে বাবুদের বাড়িতে রান্না করতে।"

ইন্দ্রাণী কথা বললে। চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলে, "শাশুড়ী রান্না করে?"

রামু বললে, "কী আর করবে মা? দাদাবাবু যতদিন রোজগার না করবে, ততদিন মাকে এ-কাজ করতেই হবে। হ্যাঁ, বাহাদুর তোমার শাশুড়ী বৌরানী। দুটি বেলা গামছায় বেঁধে ভাত-ডাল-তরকারি ছেলের জন্যে বয়ে বয়ে আনছে। কিন্তু ছেলেও রাজপুত্তুরের মতন দেখতে, গায়ের ক্ষেমতা খুব। ও-ছেলে একদিন বড় হবে, মেলা টাকা রোজগার করবে। তখন আর কোনও দুঃখ থাকবে না। তাই যেন হয়, হে ভগবান, তাই যেন হয়!"

এই বলে সেইখানেই মাথাটি মাটিতে ঠেকিয়ে রামু ইন্দ্রাণীকে একটি প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

"আজ চলি মা-লক্ষ্মী। কাল আবার আসব। কোথায় গো দিদিঠাকরুন, আমি চললাম দিদি, দুয়োরটি বন্ধ করতে হবে যে।"

বিমলা বোধকরি রান্নাঘর থেকে শুনতে পেল না।

সমর চোখ বুজে শুয়ে ছিল ইন্দ্রাণীর কাছে। তাকে তুকে দিয়ে ইন্দ্রাণী বললে, "যা সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয়।"

রামু চলে গেল। কিন্তু দরজাটি বন্ধ করতে গিয়ে সমর বিপদে পড়ল। আবার একজন ভদ্রলোক দোরের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

"শঙ্করবাবু কোথায়?"

সমর বললে, "বেরিয়ে গেছেন।"

"নে বাবা, এ আমি কার পাল্লায় পড়লাম! তার মা কোথায়?"

সমর বললে, "রান্না করছে।"

ভদ্রলোক সেইখান থেকে চিৎকার করে বললেন, "ওগো মা, শুনছেন? আমি আবার এসেছিলাম। ছেলেটিকে না-জেনে না-শুনে শুধু চেহারা দেখে ভুলে গেলাম আমি। অগ্রিম টাকা না নিয়ে কাউকে আমি ভাড়া দিই না। আর এইখানে গেলাম ফেঁসে।"

"এ কী কথা বলছেন আপনি?"

বিমলা বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। "কখন আপনার ভাড়া দেবার কথা ছিল?"

ভদ্রলোক বললেন, "আজ সকালে।"

বিমলা বললে, "না, বিয়ের কনে কুশণ্ডিকা সেরে সকালে আসতে পারে না। আসে বিকেলে। এখনও সন্ধ্যে হয়নি। টাকা যে দেবে, এসেই সে বেরিয়ে গেছে। আপনার সংগে তার এখনও দেখা হয়নি। আর আপনি একেবারে পাগল হয়ে গেলেন?"

"পাগল হয়েছি কি সাধে মা? লোক-জনের কাছে আপনার ছেলেটি সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে পাগল হবারই কথা।"

বিমলা বেশ রেগে রেগেই জিজ্ঞাসা করলে, কী শুনেছেন?"

"শুনেছি যা, সে আর আপনার শুনে কাজ নেই। আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। শুনেছি ছেলেটি গুণ্ডা। ভাড়া ত পাবই না। এমনকি মেরে তাড়িয়ে দিতে পারে। তাই বলছি কি, হাত জোড় করে বলছি—ভাড়া আমার চাই না। আপনারা আজ আমার বাড়িটি ছেড়ে দিন।"

বিমলা বললে, "বেশ কথা আপনার! কাল আমার বউভাত। আর আজ আমার বাড়িটি ছেড়ে দিন! যান, আপনি কাল আসবেন। কাল আমার বাড়িতে কাজ। পরশু আসতে পারেন ত আরও ভাল হয়।"

এই বলে বাড়িওলা ভদ্রলোককে একরকম জোর করে বের করে দিয়ে বিমলা দোরটা দিলে বন্ধ করে।

"ছেলে আপনার গুণ্ডা! ভাড়া হয়ত না পেতে পারি! কথা শোনো মিনষের!"

গজগজ করতে করতে বিমলা আবার রান্নাঘরে চলে গেল।

শ্রীহরির কাছে টাকা না চাইলেই ভাল করত শংকর।

অথচ টাকা তার চাই। টাকা না পেলে তার সম্মান থাকবে না। হঠাৎ মনে পড়ল বোসবাগানের সুরপতিবাবুকে। সুরপতি-

বাবু তাকে ভালবাসেন। টাকা চাইলে হয়ত-বা দিতেও পারেন।

এদিকে বাড়িতে রয়েছে তার সদ্য-বিবাহিতা তরুণী স্ত্রী। পরমাসুন্দরী ইন্দ্রাণী। এখনও তার সঙ্গে ভাল করে তার পরিচয় পর্যন্ত হয়নি।

বোসবাগানের পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়েও শঙ্কর ফিরে এল। আজ থাক, কাল যাবে সুরপতিবাবুর কাছে।

বাড়ি ফিরেই শঙ্কর দেখলে, একটা ঘরের মেঝেয় শতরঞ্চি বিছিয়ে শুয়ে আছে ইন্দ্রাণী। সময় তাকে দরজা খুলে দিয়ে আবার তার কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

রান্নাঘরে ছিল বিমলা। শঙ্কর তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বিমলা বললে, "কীরকম ছেলে রে তুই! বাড়িওলার টাকাটা ওখান থেকে এসেই ফেলে দিলিনে কেন? যা-তা বলে অপমান করে গেল।"

"অপমান করে গেল?"

"হ্যাঁ। বললে আজ সকালে দেবার কথা ছিল। বললাম না তোকে, সকালে একবার এসেছিল? আবার এখন এসে একেবারে গুণ্ডা ফুণ্ডা কত কী! ছি ছি, বউমার সামনে—আমার মাথা কাটা গেল।"

একে শঙ্করের মনের অবস্থা খারাপ ছিল, তার ওপর আরও খারাপ হয়ে গেল।

মা আবার বললে, "টাকা নিয়ে এলি শ্বশুরবাড়ি থেকে, আমার হাতে দিয়ে গেলেই পারতিস, ফেলে দিতাম মিনসের মুখের ওপর। আর তোকেই-বা কী বলব বাবা? একেবারে দেড়শ টাকার বাড়ি ভাড়া করে বসলি! এইবার বিয়ে হল, ভালই হল—নিজে এবার যা একবার ময়নার নিতে, ভাল করে দেখে শুনে আয়, তারপর কিছু রোজগারপাতি কর। আমার আর ভাল লাগে না বাবা।"

কথাগুলো শঙ্করের ভাল লাগছিল না। বললে, তুমি "থাম ত মা। কাল ওর টাকা আমি দিয়ে দেব।"

"হ্যাঁ, তাই দিয়ে দিস।"

এই কথা বলেই মা অন্য কথা পাড়লে। "শাশুড়ী কেমন বললি না ত?"

শঙ্কর বললে, "ভাল।"

বিমলা বললে, "বউমা খুব ছেলেমানুষ নয় কিন্তু। তোর চেয়ে বছরখানেকের ছোট হবে হয়ত।"

"হুঁ।"

"লেখাপড়াজানা মেয়েদের খুব অহংকার হয় গরিবের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে না।"

শঙ্কর চুপ করে রইল।

বিমলা বললে, "বেয়ান বোধহয় খুব আদর দিয়ে মানুষ করেছে। কাজকর্ম কিছু শেখায়নি। দ্যাখ আবার, আমরা কপালে কী হল কে জানে!"

শঙ্কর একটা কথাও বললে না।

"এর চেয়ে আমি যে-মেয়েটাকে দেখে এসেছিলাম সেইটেই ছিল সত্যিকার গরিবের মেয়ে। আমাদের সঙ্গে খাপ খেত ভাল।"

শঙ্কর এতক্ষণ পরে কথা বললে। কথাটা বোধকরি তার ভাল লাগল না। বললে, "কী জানি বাবা, কী মেয়ে তুমি দেখে এসেছিলে। তার মামাটা আমাদের রীতিমত অপমান করে গেল, বললে এ-ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব না, তবু ভুলতে পারছ না তার কথা। কেন, বউ কি তোমার দেখতে খারাপ হয়েছে?"

"না রে, আমি সেকথা বলছি না। আমি বলছি, এই যে, আমি রাঁধতে এলাম, বাড়িতে একটা ঝি নেই, একটা চাকর নেই, অন্য মেয়ে হলে ছুটে আসত আমার হাতের কাজ কেড়ে নিতে। বিয়ের কনেকে অবশ্য কাজ করতে আমি দিতাম না, কিন্তু ওরও ত একটা কর্তব্য ছিল। কই, তুই বল না!"

কথাটা অবশ্য খুব চুপি-চুপি বললে বিমলা।

শঙ্কর বললে, "দাঁড়াও আজ আমি ওকে বলব সে কথা।"

বিমলা আবার সাবধান করে দিলে, "দেখিস যেন এই নিয়ে প্রথম দিনেই ঝগড়াঝাঁটি করিস না।"

দক্ষিণদিকের সবচেয়ে ভাল ঘরটিতে বেশ পরিপাটি করে বিছানা পেতে দিয়েছিল বিমলা। ছেলে বউ শোবে ওই ঘরে।

ধরতে গেলে আজই তাদের প্রথম পরিচয়।

শঙ্করকে আগে খাইয়ে দিয়ে ইন্দ্রাণীকে আর সময়কে নিজের কাছে বসিয়ে আদর করে খাওয়াতে চেয়েছিল বিমলা। ইন্দ্রাণী কিন্তু খেলে না ভাল করে। গোমড়া মুখে করে বসে নাড়াচাড়া করলে শুধু। বিমলা যে এত কথা বললে, একটা জবাব দেওয়া দূরে থাক, একবার মুখ তুলে তাকালে না ইন্দ্রাণী।

বিমলা যা ভেবেছে ঠিক তাই। তার সমস্ত আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

সাধাসিধে একখানা শাড়ি পরেছিল ইন্দ্রাণী। বিমলা বললে, "ও কাপড়টা তুমি ছেড়ে দাও বউমা। ভাল একখানা শাড়ি পর।"

ইন্দ্রাণী বললে, "না থাক।"

শাড়িখানা কিছুতেই ছাড়ল না সে। সেই শাড়ি পরেই শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

শঙ্কর ঘরে ছিল না। সে তখন বাইরে দাওয়ার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে বসে কী যেন ভাবছিল।

বিমলা বললে, "ওখানে বসে কেন রে? যা ঘরে যা। আমি খিল বন্ধ করব।"

যাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে বসে শঙ্কর। বলবামাত্র উঠে এল।

ঘরে ঢুকে দেখলে, ইন্দ্রাণী খোলা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। শঙ্কর দোরটা বন্ধ করে দিয়ে খাটে গিয়ে বসল। ইন্দ্রাণীর দিকে তাকালে। লজ্জা করছিল একটুখানি, তবু সে হাত বাড়িয়ে ইন্দ্রাণীর কোমরটা জড়িয়ে ধরে তাকে নিজের কাছে টেনে আনলে।

শঙ্কর ভেবেছিল সে অতি সহজে এগিয়ে এসে হাসতে হাসতে তার গায়ের উপর ঢলে পড়বে, লজ্জায় তার বুকে মুখ লুকোবে। কিন্তু সে-জাতের মেয়েই নয় ইন্দ্রাণী। এগিয়ে এল বটে শঙ্করের কাছে, কিন্তু সোজা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "আমার মাকে আপনি এরকম করে ঠকালেন কেন?"

ইন্দ্রাণীর মুখ থেকে প্রথমেই সে একথা শুনবে সে-আশা করেনি। তবে এ প্রশ্নের জন্যে শঙ্কর প্রস্তুত হয়েই ছিল। বললে, "আমি ঠকালাম? তোমার মাকে?"

ইন্দ্রাণী বললে, "হ্যাঁ। আপনি দেড় শ টাকা মাইনের চাকরি করেন, সায়েব আপনাকে বিলেত পাঠাতে চাচ্ছে—আপনি আই-এস্‌সি পাশ করেছেন, এই সব মিথ্যে কথা বলে আমার সর্বনাশ করবার কী দরকার ছিল আপনার?"

শঙ্কর বললে, "কে বলেছে এ-সব কথা? আমি বলেছি?"

ইন্দ্রাণী বললে, "আপনি নাই-বা বললেন, বলেছে আপনার ঘটক।"

শঙ্কর হেসে উঠল। "ঘটক ত আমার নয়। ঘটক তোমার মায়ের। আমাকেও সে তোমার মায়ের সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছে।"

"কী বলেছে?"

"বলেছে, তোমার মা খুব বড়লোক। তোমার মায়ের হাতে মেলা টাকা আছে।"

"আছেই ত।"

শঙ্কর বললে, "ছাই আছে। তাই তিনি একটা পয়সাও দিতে পারলেন না আমাকে"।

ইন্দ্রাণী বললে, "দিয়েছে ত এক হাজার টাকা।"

"একটা পয়সাও না। আমার হাতে তিনি একটা পয়সা দেননি।"

ইন্দ্রাণী বললে, "ঘটকের হাতে দিয়েছে।"

শঙ্কর বললে, "তাই সে ঘটকের আর টিকিটি দেখা যাচ্ছে না। সেই টাকা নিয়ে ঘটক পালিয়েছে।"

"সেও কি আমার মায়ের দোষ?"

শঙ্কর বললে, "না, আমার দোষ।"

ইন্দ্রাণী বললে, "লেখাপড়াজানা মেয়ে আপনার মা পছন্দ করেন না বলে লুকিয়ে

"তুমি আমাকে বিয়ে করতে গেলেন, সে-দোষটা কার?"

"আমার।" শংকর এবার ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "সে-দোষটা সত্যিই আমার, কারণ তোমাদের ওই ঘটক দাসু তোমার সম্বন্ধে এমন সব কথা বলেছিল আমাকে, যার জন্যে আমি একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিলাম তোমাকে পাবার জন্যে।"

এই বলে ইন্দ্রাণীকে সে তার কোলের কাছে টেনে আনলে। এবার আর ইন্দ্রাণী পারলে না নিজেকে ঠিক রাখতে। বললে, "হুঁ। তা কেন হবে? আমার মায়ের সঙ্গে তোমার মায়ের দেখা হয়ে গেলে পাছে সব ফাঁস হয়ে যায় তাই তুমি গেলে লুকিয়ে বিয়ে করতে।"

শংকর বললে, "যাক, এতক্ষণে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নামলে।"

ইন্দ্রাণী এবার শংকরের চোখের উপর চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করলে, "বল্ল সত্যি কিনা!"

"কী সত্যি? কী বলব?"

ইন্দ্রাণী বললে, "তোমার মা ভাত রাঁধে।"

"সে-খবরও পেয়েছ?"

ইন্দ্রাণী বললে, "আমি সব জানি। কতক্ষণ লুকিয়ে রাখবে?"

"লুকিয়ে রাখতে ত চাইনি।"

ইন্দ্রাণী বললে, "তুমি রোজগার করতে পার না?"

শংকর বললে, "লেখাপড়া জানি না যে।"

"তাহলে লেখাপড়া-জানা মেয়ে বিয়ে করতে গেলে কেন?"

শংকর বললে, "তার কাছে শিখব বলে।"

ইন্দ্রাণী এতক্ষণ পরে হেসে ফেললে। মুক্তোর মত শুভ্র সুন্দর দাঁতগুলি দেখা গেল, কালো দুটি চঞ্চল চোখের তারাও যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

শংকর এবার তাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বিছানার উপর তুলে এনে চেপে ধরলে।

ইন্দ্রাণী বললে, "কী জোর রে বাবা! সত্যিই তুমি একটি ডাকাত।"

"হ্যাঁ, আমি তাই।"

শংকর আর তাকে কোনও কথা বলবার অবসর দিলে না। ইন্দ্রাণীর সুন্দর মুখখানি নিজের মুখ দিয়ে চেপে ধরে, বাঁহাত বাড়িয়ে আলোর সুইচটা নিবিয়ে দিলে।

পরের দিন সকালে বাড়িওলা আবার এসে হাজির!

বিমলা তাঁকে দেখেই বলে উঠল, "ওরে ও শংকর, ভদ্রলোকের রাত্তিরে ঘুম হয়নি। ওঁর টাকাটা দিয়ে দে।"

বাড়িওলা বললেন, "হ্যাঁ দিন। আমি একেবারে রসিদ কেটে এনেছি।"

শংকর এসেই বললে, "কী মশাই, কী বলেছেন আপনি?"

"কই কিছুই ত বলিনি।"

শংকর বললে, "নিশ্চয় বলেছেন। আমি গুণ্ডা, আমি জোচ্চোর, আমি আপনার টাকা মেরে দেব—এ-সব আবার কীরকম কথা?"

এরকম ভাবে যে শংকর তাঁকে আক্রমণ করবে, সে কথা তিনি ভাবেননি। তিনি কাঁচুমাচু করতে লাগলেন। "না না, ও-সব কিছু নয়, মানে তুমি ত—"

শংকর ধমক দিয়ে উঠল, "খবরদার 'তুমি' বলবেন না। আমি আপনার চেয়ে বয়েসে ছোট হলেও আপনার মত লোক আমাকে 'তুমি' বলবে—সে আমি সহ্য করব না।"

"আচ্ছা বেশ, তুমি বলব না। টাকাটা দিন আমি চলে যাই।"

কোনোরকমে টাকাটা নিয়ে তিনি পালাতে পারলে বাঁচেন।

শংকর বললে, "বে-আইনী টাকা নিতে এসেছেন, তার ওপর মুখের চোটপাট দ্যাখো!"

বিমলা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বললে, "অত সব কথায় কাজ কী বাবা, টাকা দেব বলেছিস, দিয়ে দে। প্যাঁচানো কথা আমি ভালবাসি না।"

শংকর চেঁচিয়ে উঠল, "তুমি থাম।"

"মুখের হুমকি দিয়েই ত থামিয়ে দিয়েছিস চিরকাল।"

বাড়িওলা বললেন, "ওই দেখুন, আপনার মা হলেন গিয়ে সাচ্চা মানুষ, উনি ঠিক বলেছেন।"

শংকর বললে, "না, ঠিক বলেননি। আপনাকে টাকা আমি আজ দেব না। আজ আমার বাড়িতে কাজ। কাল সকালে আসবেন। টাকা নিয়ে যাবেন। এখন আপনি থানায় যেতে চান যান, আদালতে যেতে চান যান। এই আমার শেষ কথা।"

বাড়িওলা বিমলাকে শুনিয়ে শুনিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "দেখুন মা, দেখুন—"

"মা কী দেখবেন? বেশী চেঁচামেচি যদি করবেন ত আমিই থানায় যেতে বাধ্য হব। তখন সেই মাসের শেষে টাকা পাবেন। যান আপনি।"

এবার আইনের কথা। সত্যিই যদি ছোঁড়াটা এইরকম কিছু করে বসে, বাধ্য হয়ে তাকে এক মাস পরে টাকা নিতে হবে। তার চেয়ে—

বাড়িওলা বললেন, "বেশ, তবে আমি কালই আসব।"

কিন্তু কী দুঃখে যে সে-কথা তিনি বললেন, তা তিনিই জানেন। পিছন ফিরে ঘোঁত ঘোঁত করে বলে গেলেন, "তাহলে যা শুনেছি, সেই কথাই সত্যি।"

কথাটা শংকর শুনতে পেলে, চেঁচিয়ে বললে, "আবার?"

বলে যেই সে দোরের বাইরে পা বাড়িয়েছে বাড়িওলা পিছন ফিরে দেখেই দে ছুট!

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বউয়ের ব্যবহার দেখে বিমলা বিশেষ খুশি হতে পারেনি।

কোন্ মা-ই বা হয়?

শংকর দোর বন্ধ করে ফিরে আসতেই বিমলা আপনমনেই বলতে লাগল, "তুই যদি ভাল হবি ত আমার এ দুর্দশা কখনও হয়। গুণ্ডার মতন চেহারাটা বাগালেই মানুষ হয় না। পেটে একটু বিদ্যে থাকা দরকার।"

শংকর বললে, "মা, একটু থামবে?"

তার ভয় শুধু বউ বুঝি শুনতে পায়।

মা কিন্তু থামল না। থামতে পারলে না। আজও সে নিজেই কাজ করে মরছে। বউ তেমনি হাত গুটিয়ে বসে আছে।

বিমলা বললে, "দূর, দূর, এ-জীবন আর রাখতে ইচ্ছে করে না।"

শংকর বললে, "কেন। কী, হল কী তোমার?"

বিমলা রাগ করেই বললে, "কিছুই হয়নি। মিথ্যে কথা, চালাকি, প্যাঁচ-পয়জার আমি ভালবাসি না। সোজা সত্যি পথে আমি চলতে চাই, তাতে আমার যা হয় তাই হবে।"

শংকর বললে, "বেশ বাবা, তাই চল তুমি। আমি খারাপ, আমি বজ্জাত, আমি লেখাপড়া শিখিনি, আমি গুণ্ডা—"

বিমলা বললে, "হ্যাঁ, তাই ত। টাকা পেলি তবু ওই ছ্যাঁচড়া লোকটাকে যা-তা বলে অপমান করে তাড়িয়ে দিলি। এটা কি তোর ভাল হল? এত টাকা দিয়ে বড়মানুষি দেখাবার জন্যে কী দরকার ছিল তোর এই বাড়ি ভাড়া নেবার?"

শংকর বললে, "তাও কি তোমাকে দেখাতে হবে?"

"না, কিছুই আমাকে দেখাতে হবে না, চোখ বুজে থাকতে হবে। আর তোর জ্বালায় আমাকে জ্বলেপুড়ে মরতে হবে।"

শংকর বললে, "আমার জ্বালায় কখন তুমি জ্বলেপুড়ে মরলে? দ্যাখো, মিথ্যে কথা বোল না।"

"বিমলা বললে, "আমি মিথ্যে কথা বলি?"

শংকরের এই একটি কথায় বিমলার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল। বললে, "তুই শেষে আমাকে এই কথা বললি শংকর?"

বলতে বলতে গলার আওয়াজ তার বন্ধ হয়ে গেল। চোখ দিয়ে দরদর করে জলের

ধারা গড়িয়ে এল। সর্বশরীর তার থর-থর করে কাঁপতে লাগল। তেমনি কাঁদতে কাঁদতেই বললে, "মাকে অপমান থেকে বাঁচাবার জন্যে নিজে দেখে-শুনে বিয়ে করলি। নিজের পেটে এক ফোঁটা বিদ্যে নেই আর লেখাপড়াজানা পাশকরা একটা মেয়ে নিয়ে এলি বিয়ে করে। ফর্সা রং দেখে। একদিনেই তার গোলাম হয়ে গেলি। দেমাগে মাটিতে পা পড়ছে না মেয়ের। গোমড়া মুখ করে বসে আছে। একটা কথা পর্যন্ত বলে না। আমি যেন ওর বাঁদী।"

শঙ্করের আর সহ্য হল না। বললে, "চেঁচাও তুমি। আমি চললাম।"

এই বলে সে উঠে চলে গেল।

যাবার সময় বলে গেল, "মানিয়ে নেবার ক্ষমতা তোমার নেই তা আমি জানি। আগুন না জ্বালিয়ে তুমি ছাড়বে না।"

বিমলা রাগের মাথায় বললে, "সত্যি যা তাই বলব, তাতে আগুন জ্বলে ত জ্বলুক।"

মার উপর রাগ করেই শঙ্কর বেরিয়ে-ছিল।

ইন্দ্রাণী তার কথাগুলো নিশ্চয়ই শুনেছে। শুনে কী ভাবলে কে জানে। যা ভাবে ভাবুক।

শঙ্করের চাই টাকা। তা সে যেমন করেই হক। দাসু তাকে এই বিপদে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছে। মুখ ফুটে কাউকে সেকথা সে বলতে পর্যন্ত পারছে না। এখ
নিজের সম্মান যদি বাঁচাতে হয় ত ন
কিছু টাকা ছাড়া কোনও পথ নেই।

বেলা দুটো পর্যন্ত এখান-ওখা কে
বৃথাই ঘুরে মরল। কোথাও একটা
পেলে না। হঠাৎ তার মনে পড়ল স খবে
বাবুর কথা। সুরপতি তাকে ভা নাড়ার
হয়ত বা এই বিপদের দিনে তা ট গিয়ে
সাহায্য করতে পারেন।

শঙ্কর সেইদিকেই যাচ্ছিল। হ
ঝিলপাড়া
রাস্তা দিয়ে একটা মোটর-ব
গ, একজন
মোটর-বাইকের ওপর বসে,
একটা রুমাল
পোশাক পরে এক যুবক। শ
ই উঁকি মারছে
দেখেই তাকে চিনতে পার
তার সহপাঠী নরেন।
া না শঙ্করের।
সামনে নরেনের মা তাে
করেছিল, সেকথা সে সার
বুঝতে পারলে
না।

হাত ছাড়িয়ে
শঙ্কর ডাকলে, "নরেন।
পারত, কিন্তু
নরেনও চিনতে পেরে
ঘড়ার বেল্টের
বোধকরি তার ইচ্ছে ছিল
হল না। বিশ্রী
মোটর-বাইকটাকে একটু
থাবে এক্ষুনি।
অনায়াসে পালিয়ে যেতেও
ত পারবেন না।
কী জানি কেন পালি
গধ সে করেনি।
...থামিয়ে
গচ্ছ নেই। কিন্তু
শঙ্কর, কোথায় ছিলি রে

"আমার কি আর থাকবার কোনও ঠিক-ঠিকানা আছে? এখান-ওখান করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

নরেন বললে, "আমার বিয়ের সময় নেমন্তন্নর চিঠি নিয়ে তোকে কত খোঁজা-খুঁজি করলাম, কোথাও পেলাম না।"

"বিয়ে করেছিস?"

"হ্যাঁ ভাই করেছি। মা ছাড়লে না।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "যাচ্ছিস কোথায়?"

নরেন বললে, "রেসে।"

শঙ্কর বললে, "ভাল।"

বলেই সে মোটর-বাইকটার পিছনের
বসে পড়ল। বললে, "চল, আমা
পৌঁছে দিবি একটা জায়গায়।"

নরেন বললে, "আমার
না?"

"না না, এ আর ক
চলে যাবি।"

কিন্তু গন্তব্য
শঙ্করের। সে
গুলো কথা
পারলে না
নরেনে
সে

শঙ্কর দ
নরেনকে।
এই
একটা মো
তাকিয়ে দে
ব্যাগ রয়ে
করে শঙ্ক
নরেন
ওটা

পিছন ফিরে দেখলে ইন্দ্রাণী দেখছে দাঁড়িয়ে

ফাঁকা একটা আওয়াজ করলেও লোক জড় হয়ে যাবে। অপমানের বাকী কিছু থাকবে না।

পিছন ফিরে দেখলে ইন্দ্রাণী দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ওদিকে বারান্দার পাশে মা দাঁড়িয়ে।

শঙ্কর এগিয়ে যাচ্ছিল দারোগাবাবুর দিকে।

"নমস্কার! কী খবর?"

দারোগাবাবু এ-সুযোগ পরিত্যাগ করলেন না। কনেস্টবলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "লাগাও হাতকড়া!"

হাতকড়া!

চমকে উঠল শঙ্কর। মনে পড়ল সেই মুচলেকা সই করবার কথা। দারোগাবাবুর চোখে দেখলে সেই হিংস্র আক্রোশ। বললে, "হাতকড়া লাগাবার মত কী করেছি আমি? চলুন, যাচ্ছি।"

কিন্তু কনেস্টবল তখন হুকুম পেয়ে গিয়েছে। সে শুনবে কেন? হাতকড়া নিয়ে সে এগিয়ে এল শঙ্করের দিকে।

শঙ্কর বললে, "খবরদার!"

তবু সে এগিয়ে আসছে দেখে শঙ্কর চালিয়ে দিলে এক ঘুঁষি। লোকটা বাপ্‌স্ বলে পেটে হাত দিয়ে পিছিয়ে গেল। দারোগাবাবু নিজে এইবার এগিয়ে এলেন রিভলবার হাতে নিয়ে। বললেন, পালিয়ো না বলছি। মরে যাবে।"

শঙ্কর দাঁড়িয়ে পড়ল। কনেস্টবলটা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে লাগালে হাতকড়া।

বিমলা তখন এসে দাঁড়িয়েছে তাদের কাছে। দারোগাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলে, "হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, কী করেছে শঙ্কর?"

"পরে বুঝতে পারবেন।"

দারোগাবাবু শঙ্করকে নিয়ে চলে গেলেন শঙ্করের মুখ দিয়ে কথা বেরুল না।

বিমলাও দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। তার পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে যাচ্ছে।

বিপদের সময় রাগ-অভিমান করা বৃথা। বউমা লেখাপড়াজানা মেয়ে। এ সময় কী করা উচিত, সে-ই ভাল বুঝবে। বিমলা বোধকরি তাকেই জিজ্ঞাসা করবার জন্য ডাকলে, "বউমা!"

বউমা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বিমলা

তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এ মর কী করা উচিত—"

ইন্দ্রাণী কথাটা তাকে শেষও করতে দিলে না। জবাব দেবার জন্যে দাঁড়ালও না, দোরের দিকে যেতে যেতে শুধু বলে গেল, "গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত।"

বিমলা দেখলে তার সুটকেসটা হাতে নিয়ে সমর তার পিছু পিছু চলেছে।

বুঝতে কিছু বাকী রইল না বিমলার।

"তুমি কি চলে যাচ্ছ বউমা?"

কথাটার জবাব দিলে না ইন্দ্রাণী। ফিরেও তাকালে না।

"বউমা! বউমা।"

বলতে বলতে বিমলা তার পিছু-পিছু সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল। "ছি-ছি বিয়ের কনে তুমি এরকম করে চলে যেয়ো না বউমা, আমি তোমাকে যা বলেছি, সব ফিরিয়ে নিচ্ছি বউমা। আমি তোমার দুটি হাতে ধরে বলছি, শংকর ফিরে আসবে।"

দোরের বাইরে বিমলা রাস্তায় এসে চেঁচিয়ে ডাকলে, "বউমা।"

বউমা তার ভাইকে নিয়ে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিমলার দুচোখ বেয়ে দর দর করে জল গড়িয়ে এল।

থানার দারোগাবাবু যা ভেবেছিলেন তাই করলেন। শংকরকে থানার হাজতে পুরে দিয়ে নির্যাতনের বাকী কিছু রাখলেন না। শনিবার, রবিবার—দুটি রাত্রি আর একটি দিনের ইতিহাস শংকরের জীবনে চির-স্মরণীয় হয়ে রইল।

আদালতে গিয়ে কিন্তু সব-কিছু গেল গোলমাল হয়ে। নিজেকে নিতান্ত অসহায় বোধ করতে লাগল শংকর। তাকে সাহায্য করবার কেউ নেই, জামিন হবার মানুষ নেই, একটা উকিল নেই, মোক্তার নেই, বিচার দেখবার জন্য আছে শুধু কৌতূহলী জনতা।

ফরিয়াদী নরেনকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দারোগাবাবু মামলাটা সাজিয়ে দিয়েছিলেন বেশ ভাল করে। মোটরবাইকে চড়ে নরেন যাচ্ছিল রেসে। পকেটে ছিল বারোখানা একশ টাকার নোট আর কিছু খুচরো টাকা-পয়সা। পথের ওপর হাত দেখিয়ে গাড়ি থামিয়ে শংকর রাহাজানি করে। পকেট থেকে জোর করে মনিব্যাগটা সে তুলে নেয়। তারপর দুজনে মারামারি। শংকর মনিব্যাগ খুলে সাতখানা নোট বের করে নিয়ে মনি-ব্যাগটা ছুঁড়ে দেয় তার গায়ের উপর, আর ঘুষি মেরে তার একটা দাঁত ভেঙে দেয়। শংকরের গায়ের জোরে নরেন পেরে ওঠে না। তখন সে থানায় গিয়ে ডায়রি লেখায়।

এই রাহাজানির প্রত্যক্ষদর্শী দুজন সাক্ষীও ছিল।

দারোগাবাবু টাকাগুলো উদ্ধার করবার জন্যে নরেনের সঙ্গে শংকরের বাড়িতে যান। পুলিস দেখে শংকর পালাতে চায়। একজন কনেস্টবল তাকে ধরতে গেলে শংকর তার পেটে ঘুষি মারে। তারপর অনেক কষ্টে অনেক ছোটাছুটি করে তাকে ধরতে হয়। তার পকেটে পাওয়া যায় দুশ তেইশ টাকা নগদ। আর দেড়শ টাকার একটি বাড়ি-ভাড়ার রসিদ।

প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী দুজন প্রথমেই দিলে সব বানচাল করে।

একজন বললে, নরেনের পকেট থেকে শংকর মনিব্যাগ তুলে নিয়েছিল। একজন বললে, নোটগুলো তুলে নিয়েছিল। একজন বললে, শংকর লাথি মেরে নরেনকে উল্টে ফেলে দিলে। একজন বললে, ঘুষি মেরে দাঁতটা ভেঙে দিলে। সেই ভাঙা দাঁতটা নরেনকে সে নাকি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিতেও দেখেছে।

দারোগাবাবু বললেন, শংকর টাকাগুলো নিয়ে গিয়েই বাড়িভাড়া দিয়েছে দেড়শ টাকা। ওই রসিদই তার প্রমাণ। বাকী টাকা কী করেছে ওই জানে। ওর কাছে পাওয়া গেছে দুশ' তেইশ টাকা। একটা পয়সাও সে রোজগার করে না। এত টাকা পেলে কোথায়?

বিচারক বারবার তাকাচ্ছিলেন শংকরের দিকে। প্রিয়দর্শন এক স্বাস্থ্যবান যুবক। একটা উকিল পর্যন্ত সে দিতে পারেনি। সত্যই সে দরিদ্র। বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কিছু বলবার আছে?"

শংকর বললে, "আমি আর আমার বিধবা মা থাকি একটা বস্তিতে দশ টাকা ভাড়ায় দুখানা ঘর নিয়ে। গত বৃহস্পতিবার সাতাশ নম্বর নিবারণ হালদার লেন, কালী-ঘাটে আমার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের জন্যে একটি বাড়িভাড়া নিতে চেয়েছিলাম সাত-দিনের জন্যে। এই বাড়িটি পেয়েছিলাম। বাড়িওলা বলেছিলেন সাতদিনের জন্যে দেড়শ টাকা ভাড়া দিতে হবে। বলেছিলাম, বিয়েতে আমি এক হাজার টাকা নগদ পাব। সেই টাকা পেলে ভাড়া দেব। সেই টাকা পেয়ে শুক্রবার ভাড়া দিয়েছি। রসিদের তারিখটা একবার দেখুন।"

তারিখটা দেখা গেল, সত্যই শুক্রবারের তারিখ। অথচ ঘটনা ঘটেছে শনিবার।

"নরেনবাবু যে-কথা বলেছেন, সেকথা সত্যি? ও'র পকেট থেকে তুমি মনিব্যাগ তুলে নিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ হুজুর, নিয়েছিলাম।"

শংকর বললে, "একটু আগে থেকে শুনতে হবে হুজুর। ঝিলপাড়ায় আমি আর শ্রীহরি বসাক—আমরা দুজনে একটি ক্লাব তৈরি করেছি। ক্লাবের নাম শক্তিমন্দির। ছেলেরা সেখানে ব্যায়ামচর্চা করে। শক্তি-মন্দিরের আর একটি শাখা আছে। দরিদ্র ভাণ্ডার। কারও বাড়িতে বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন হলে আমরা সেখানে দরিদ্র-ভাণ্ডারের জন্য কিছু চাঁদা ভিক্ষা করি। একবার পাড়ায় এক ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ে। বর আসছে খুব জোর প্রসেশন করে। আমাদের শক্তিমন্দিরের সামনে বরকর্তার মোটরের চাকা গেল পাঞ্চার হয়ে। আমরা সেই সুযোগে তাঁর গাড়ির কাছে গেলাম চাঁদার খাতা নিয়ে। ভদ্রলোক ভারী কৃপণ। একটি পয়সা দেবেন না। তিনিও দেবেন না, আমরাও ছাড়ব না। বরযাত্রীদের ভিতর কে একজন পাশের বাড়ি থেকে লুকিয়ে টেলিফোন করে দেন থানায়। থানা থেকে এই দারোগাবাবু একটা জিপ নিয়ে গিয়ে হাজির। তিনি বললেন, আমি চাঁদা আদায় করে দিচ্ছি। তোমরা গিয়ে বোস আমার ওই জিপে। আমি আর শ্রীহরি গিয়ে বসলাম। উনি কৌশল করে আমাদের দুজনকে থানায় নিয়ে গিয়ে আমাকে বললেন, মুচলেকা-বণ্ডে সই করতে হবে। রাস্তার মাঝে গাড়ি আটকে দলবল নিয়ে গিয়ে বেআইনী গাড়ি আটকেছ, লোক জড়ো করেছ। আমি কিছুতেই সই করতে চাইনি। সই না করে চলে এসেছিলাম। সেই থেকে ও'র রাগ ছিল আমার ওপর।

"নরেন আমার বন্ধু। এক ইস্কুলে এক ক্লাসে পড়েছিলাম। দরিদ্রভাণ্ডারের জন্য চাঁদা চেয়েছিলাম। দেয়নি। গত শনিবার ছিল আমার বিয়ের বউভাত। শক্তি-মন্দিরের বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়ে-ছিলাম। ফেরবার পথে দেখলাম মোটর-বাইকে চড়ে নরেন আসছে। হাত তুলে নরেন বলে ডাকতেই গাড়ি থামিয়ে নামল গাড়ি থেকে। বিয়ের কথা শুনলে, বউ-ভাতের কথা শুনলে। কিন্তু জানি আমি, টাকার কথা শুনলেই সে খেপে যাবে। তাই সবার শেষে বললাম, দরিদ্রভাণ্ডারের চাঁদা দে। শুনেই পালাচ্ছিল, হাতটা চেপে ধরলাম। পকেট থেকে মনিব্যাগ তুলে নিলাম। কিছুতেই দেবে না। আমিও ছাড়ব না। অতিকষ্টে মনিব্যাগ খুলে দশ-টাকার একটি নোট বের করে নিয়ে মনি-ব্যাগ ওর হাতে দিয়ে ছুটে পালালাম। 'দশ টাকা চাঁদা আমি দেব না। তোর দরিদ্র-ভাণ্ডার না কচু।' এইসব বলতে বলতে সেও আমার পিছু পিছু ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল মুখ থুবড়ে। আমি হাসতে হাসতে বাড়ি চলে এলাম।

"মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে দোকানের টাকাটা দিতে যাচ্ছিলাম, দোরের কড়া নড়ে উঠতেই আমার শালা গিয়ে দরজা খুলে দিলে। দেখি দারোগাবাবু, দুজন কনেস্টবল, ... নিয়ে গিয়ে হাজির। কেন এলেন কিছুই বুঝতে

পারিনি, নমস্কার করে কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কী খবর? চট করে উনি একজন কনেস্টবলকে হুকুম করলেন, লাগাও হাতকড়া। অবাক হয়ে গেলাম। কেন,, কী করেছি আমি, কোনও কথারই তিনি জবাব দিলেন না। মা ছুটে এল। মা জিজ্ঞাসা করলে। উনি শুধু বললেন, পরে বুঝতে পারবেন। তারপর আমার মা, আমার স্ত্রী ছোট শালা—সবার চোখের সামনে আমাকে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে এসে জিপে তুললেন। জিপের কাছে দেখলাম, মোটরবাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে নরেন। জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি তোর কাজ নাকি? নরেন তাড়াতাড়ি বাইকে চড়ে চলে গেল। তারপর থানার হাজতে নিয়ে গিয়ে দুটি দিন ধরে আমার ওপর অত্যাচারের আর কিছু বাকী রাখেননি দারোগাবাবু।"

শঙ্কর থামল।

বিচারক কী যেন লিখছিলেন।

শঙ্কর বললে, "আমি আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব নরেনকে।"

বিচারক বললেন, "কর।"

শঙ্কর বললে, "নরেনের যে-দাঁতটা আমি ভেঙে দিয়েছি, ওর সাক্ষী যেটা রাস্তায় ফেলে দিতে দেখেছে, ও একবার মুখটা হাঁ করে সেই জায়গাটা দেখাক।"

অনেকে হো হো করে' হেসে উঠল।

নরেন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "দাঁত ভাঙেনি, তবে নড়ে গেছে।"

শঙ্কর বেকসুর খালাস পেয়ে গেল।

আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে গিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এল শঙ্কর।

যাবার সময় মাকে সে কিছু বলে যেতে পারেনি। ইন্দ্রাণী কী ভাবছে কে জানে।

বাড়ির সুমুখে এসে দেখে, সদর দরজা খোলা। বাড়ির জিনিসপত্র কোথাও কিছু নেই। ওরা তাহলে এ-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বস্তির বাড়িতে চলে গিয়েছে। . শঙ্কর ছুটল বস্তির দিকে।

বাড়ির সুমুখে এসে দেখে, লোকে লোকারণ্য।

এত লোক কেন? ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল শঙ্কর।

ঘরের সুমুখে গিয়ে দেখে ফেরিওলা সেই বুড়ো রামু হাতে একটি ছোট লাঠি নিয়ে বসে আছে চৌকাঠের পাশে।

"কী হয়েছে রামু?"

"এতক্ষণে এলে? যা হবার তাই হয়েছে। ভেতরে গিয়ে দ্যাখো।"

বুড়ো তার হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছলে।

শঙ্কর ঘরে গিয়ে ঢুকল।

গিয়ে যা দেখলে, সে-দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। পরনের কাপড়টার আষ্টেপৃষ্ঠে গিঁট দিয়েছে বিমলা—যাতে না খুলে যায়। তারপর আর-একখানা কাপড় পাক দিয়ে দিয়ে দড়ির মত করে চালার মাথার উপরে মোটা একটা বাঁশের সঙ্গে নিজের গলায় ফাঁসি লটকে ঝুলে পড়েছে সে। পায়ের নীচে জলের ড্রামটা কাত হয়ে পড়ে আছে।

শঙ্কর সেইদিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলে। চিৎকার করে' উঠল, "মা।"

তারপর সেইখানেই আছাড় খেয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

বাইরে লোকজনের ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, "এখন আর কাঁদলে কী হবে বাবা? তোমার মতন ছেলের হাত থেকে মরে বেঁচেছে হতভাগী।"

রামু উঠে এল শঙ্করের কাছে।

"পুলিসে খবর দিতে হবে যে দাদাবাবু।"

আবার পুলিস।

শঙ্কর শুনেও শুনলে না কথাটা। তেমনি পড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

খানিক বাদেই বাইরে কিসের যেন গোলমাল উঠল। রামু বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলে, দুজন কনেস্টবল লোক হাটাচ্ছে। পুলিস খবর পেয়ে গিয়েছে তাহলে।

ঝিলপাড়া থানার সেই জিপগাড়িখানা এসে দাঁড়াল। জিপ থেকে নামলেন সেই দারোগাবাবু।

মনের অবস্থা তাঁর ভাল ছিল না। আদালত থেকে রীতিমত অপমানিত হয়ে এসেছেন তিনি। অপমানিত হয়েছেন যার জন্য, সেই তাকেই যে আবার এই অবস্থায় দেখবেন তা তিনি ভাবতেও পারেননি।

শঙ্করের মা আত্মহত্যা করেছে, আর শঙ্কর কাঁদছে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

ভারী জুতোর আওয়াজ শুনে শঙ্কর মুখ তুলে একবার তাকিয়ে দেখলে। সেও ভাবতে পারেনি যে সেই দারোগাবাবুই এসে দাঁড়াবেন তার মাথার কাছে। হাত বাড়িয়ে তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল শঙ্কর।

"কী হল দারোগাবাবু, কী হল দেখুন। আমার মা। আমার মা।"

কী বিচিত্র মানুষের মন। দুর্ধর্ষ এই থানা-অফিসারটির পাষাণ বদনাম চিরকালের। তাঁরও ছোট ছোট চোখ দুটো দেখা গেল চিক চিক করছে। শঙ্করের শিয়রের কাছে উবু হয়ে তিনি বসে পড়লেন; তারপর হাত বাড়িয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে ডাকলেন, "শঙ্কর!"

শঙ্কর চমকে উঠল। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলে। দেখলে, দারোগাবাবুর চোখে জল। বিশ্বাস করতে পারছিল না শঙ্কর। উঠে বসল।

দারোগাবাবু বললেন, "কেঁদো না শঙ্কর। চুপ কর। আমি সব ব্যবস্থা করছি।"

অপ্রত্যাশিত এই সহানুভূতি।

শঙ্কর বড় বেশী বিচলিত হয়ে উঠ... আবার সে ভেঙে পড়ল কান্নায়। এত ... সে কখনও কাঁদেনি।

কয়েকদিন পরে, একদিন দেখা গেল, অশৌচ অবস্থায় শঙ্কর গিয়ে দাঁড়িয়েছে—কালীঘাটে তার শ্বশুরবাড়ির দরজায়।

কড়া নাড়তেই ভিতর থেকে দরজা খুলে দিলে সমর। শঙ্করকে দেখেই সমর তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললে, "মা, জামাইবাবু এসেছে।"

শঙ্কর তার পিছু পিছু গিয়ে দাঁড়াল বাড়ির উঠোনে।

ইন্দ্রাণী বোধ করি ঠিক সেই সময় তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল। সমরের কথা শুনে আবার ঢুকে পড়ল ঘরের ভিতর। ঢুকেই দোরের খিলটা দিলে বন্ধ করে। বড় আরশি-দেওয়া একটা আলমারি ছিল ঘরের ভিতর। সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল ইন্দ্রাণী। সিঁথির সিঁদুরটা মোছবার চেষ্টা করলে কাপড়ের আঁচলটা তুলে নিয়ে। কিন্তু কী জানি কেন, হাতটা তার থর থর করে কেঁপে উঠল। পারলে না মুছতে। হঠাৎ তার কানে এল—শঙ্কর বোধ করি বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাকছে, "মা! মা!"

মা বোধ হয় সমরের কথাটা শুনতে পাননি। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

"কে?"

শঙ্করকে দেখবেন তা তিনি আশা করেননি। বললেন, "তোমার চিঠি আমি পেয়েছি।"

তারপর কী বলবেন, তিনি বুঝতে পারছিলেন না। খানিক চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, "তোমার মত ছেলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে এছাড়া ত আর কোনও উপায় ছিল না তোমার মায়ের। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কিছু বলবে?"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে না।"

বলেই সে চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল, আবার কী ভেবে ফিরে দাঁড়াল। বললে, "আপনার মেয়ের সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি?"

মা বললে, "দেখা করে আর কী হবে বল। ইন্দ্রাণী!"

দোরের খিলটা ইন্দ্রাণী খুলে দিলে। ঠক করে একটা আওয়াজ হল। মা বললে, এই ঘরে আছে।

ইন্দ্রাণী কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। খোলা একটা জানলার কাছে গিয়ে শিক ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

শঙ্কর দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। "তোমাকে আমি নিতে এসেছি ইন্দ্রাণী।"

ইন্দ্রাণী চুপ করে রইল।

"তুমি কি যাবে না?"

"না।"

শংকর আবার বললে, "কখনও যাবে না?"

ইন্দ্রাণী বললে, "না।"

"আমার সঙ্গে তোমার—"

কথাটা শংকর শেষ করতে পারলে না। অন্য কথা বললে। বললে, "তোমাকে নিয়ে আমি অন্য জায়গায় চলে যাব। তোমাকে সুখে রাখবার চেষ্টা করব।"

ইন্দ্রাণী ম্লান একটু হাসলে।

"বিশ্বাস করছ না?"

ইন্দ্রাণী বললে, "না।"

শংকর একটু কাছে এগিয়ে এল। বললে, "আমি ভাল হব ইন্দ্রাণী। তুমি বিশ্বাস কর।"

ইন্দ্রাণী কোনও কথাই বললে না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

শংকর বললে, "আমি যদি ভাল হই, আমাকে তোমার স্বামী বলে পরিচয় দিতে যদি লজ্জা না হয়, বল, তখন তুমি আসবে?"

কী জবাব দেবে ইন্দ্রাণী?

বলতে যাচ্ছিল, হ্যাঁ যাব। কিন্তু কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরুলো না। বললে, "এখন কিছু বলতে পারব না। আপনি যান।"

'তুমি' না বলে 'আপনি' বললে ইন্দ্রাণী।

শংকর আর দাঁড়াল না। বললে, "আমি চললাম।"

যাবার সময় শুধু বলে গেল, "কিন্তু মনে থাকে যেন ইন্দ্রাণী, আমি তোমার স্বামী।"

ইন্দ্রাণী জবাব দিলে, "থাক, আর স্বামীর পরিচয় দিতে হবে না আপনাকে।"

কথাটা শুনতে পেলে শংকর।

কানে যেন তার বিষ ঢেলে দিলে।

সেই ইন্দ্রাণী!

একটি রাত্রির সেই নিবিড় পরিচয়। সেই দুটি দেহ-মন-প্রাণের ঐকান্তিক মিলনের পরমক্ষণ, সেই দুটি উন্মুখ হৃদয়ের দান-প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি—সবই কি তাহলে ব্যর্থ হয়ে গেল?

স্বামীর পরিচয় দিতে হবে না আপনাকে।

শহরের সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে শংকরের কানে ক্রমাগত বাজতে লাগল ইন্দ্রাণীর মুখের সেই শেষ কথা কটি।

স্বামীর পরিচয় দিতে হবে না আপনাকে।

২

শংকর একটা রেল-স্টেশনে গিয়ে নামল ট্রেন থেকে।

একজন লোককে জিজ্ঞাসা করলে, "ময়নাবুনি কোন দিকে যাব?"

লোকটি বললে, "আসুন আমার সঙ্গে।"

শংকরের ন্যাড়া মাথায় তখন ছোট ছোট চুল গজিয়েছে। মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে গিয়েছে নিশ্চয়ই।

মাঠের উপর দিয়ে আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পথ। লোকটির সঙ্গে শংকর চলেছে ত চলেইছে। পথ যেন আর শেষ হতে চায় না!

শংকর জিজ্ঞাসা করলে, "আর কতদূর?"

"আপনি নতুন আসছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ ভাই।"

লোকটি বললে, "এখনও ক্রোশ-দেড়েক পথ।"

বলেই সে বাঁ দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে: "ওই যে জলা দেখছেন, ওই জলাটা পেরিয়ে, ওই যে গাছগুলো দেখা যাচ্ছে, ওইটে ময়নাবুনি। আমি এইদিকে যাব। আপনি চলে যান।"

এই বলে সঙ্গের লোকটি ডান দিকে রাস্তা ভেঙে চলে গেল।

শংকর একা।

চলতে চলতে কিছুদূরে গিয়েই দেখলে, রাস্তা ফুরিয়ে গিয়েছে। সুমুখে ধানের মাঠ আর জলা। সেই জলার ওপর দিয়েই দেখলে লোক চলছে। গরুর গাড়িও যাচ্ছে একটা।

সেই জলার ধারে দাঁড়িয়ে শংকর ইতস্তত করছে। ভাবছে, নামবে কি নামবে না। একটি লোক—সেও বোধ হয় যাবে ময়নাবুনি গ্রামে—এসে দাঁড়াল তার পাশে। বললে, "ভাবছেন কী, পায়ের চটি জুতো খুলে হাতে নিন, আর এক হাত দিয়ে হাঁটুর কাপড়টা তুলুন একটুখানি, তারপর আসুন আমার পিছু পিছু।"

লোকটি নেমে পড়ল জলের ওপর। জল বেশী নয়। হাঁটুর নীচে।

শংকর জিজ্ঞাসা করলে, "ময়নাবুনি যাবার অন্য পথ নেই?"

"আজ্ঞে না। এইটেই পথ।"

শংকর তার সঙ্গে জলাটা পেরিয়ে গেল। জলা থেকে উঠেই দেখলে কাদা। দু-একজন গ্রামের লোক কাদা বাঁচিয়ে চলেছে কোন-রকমে, কিন্তু একটা গরুর গাড়ি দেখলে কাদায় পড়ে আর উঠতে পারছে না কিছুতেই। কাদায় চাকা গিয়েছে ডুবে, গরু দুটো প্রাণপণে চেষ্টা করছে টেনে তোলবার, কিন্তু পারছে না।

গাড়োয়ান গরু দুটোকে মারছে নিষ্ঠুর-ভাবে, চাকায় হাত লাগিয়ে ঠেলাঠেলি করছে, কিন্তু এতটুকু নড়বার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। গাড়োয়ান আর তার সঙ্গী—দুজনেই হয়রান হয়ে গিয়েছে।

শংকর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে ব্যাপারটা। যে-লোকটি তার সঙ্গে-সঙ্গে আসছিল, সে একবার জিজ্ঞাসা করলে, "যাবেন না?"

শংকর বললে, "না। আপনি যান।"

লোকটি চলে গেল।

শংকর দেখলে, নিরীহ গরু দুটো শুধু শুধু মার খাচ্ছে। বললে, "ওদের মারছ কেন অমন করে?"

গাড়োয়ান একবার তাকাল শংকরের দিকে। একটুখানি অবজ্ঞার হাসি হাসলে শুধু।

যে-লোকটি চাকা মারছিল সে বললে, "শহর থেকে আসছেন বুঝি? কোথায় যাবেন?"

শংকর বললে, "ময়নাবুনি।"

"এই ত ময়নাবুনি। যান। দাঁড়িয়ে কেন?"

গরুর পিঠে বাড়ি পড়ল। —"কোনও কাজের নয়। বসে বসে খাচ্ছে শুধু। হে হে হে হে—আর-একটু, আর-একটু। নাঃ, পারলে না।"

চাকাটা উঠেছিল একটুখানি। আবার কাদার ভিতর পড়ে গেল।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে লোকটার। হাত দিয়ে মুছলে ঘামটা। তার-পর আবার শংকরের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, "এই কাজ আমরা হরদম করছি বাবু, আমরা জানি কত ধানে কত চাল।"

শংকর তখন তার শার্টের একটা হাত গুটোচ্ছে। বললে, "হাত লাগাব নাকি?"

গাড়োয়ান হেসে বললে, "পারবেন কেন বাবু?"

"দেখতে দোষ কী?" বলেই শংকর তার জামার আস্তিন গুটোলে, পরনের কাপড়টা আর-একটু তুললে, তারপর নেমে পড়ল কাদায়।

কিন্তু চাকায় শুধু হাত সে লাগালে না, একটা কাঁধও লাগালে গাড়ির মোটা বাঁশটায়।

কিন্তু একী? গাড়োয়ান দুজনেই কাজ বন্ধ করে দিয়ে দাঁত বের করে মজা দেখছে।

শংকর বললে, "দাঁড়িয়ে দেখছ কেন? চালাও গরু দুটো।"

"পারবেন না বাবু, মিছিমিছি হাতে-পায়ে কাদা লাগাচ্ছেন কেন?"

বলতে বলতে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা দুজন দু দিকে গরু দুটোকে চালাবার চেষ্টা করলে। —"চল্ ব্যাটা চল্। বাবু যখন বলছেন, ওঁর মান রেখে—"

কথাটা শেষ হল না। শংকর তার প্রাণপণ শক্তিতে কাঁধ দিয়ে গাড়িটাকে একটু তুলে ধরে চাকাটা দিলে ঠেলে। গাড়ি উঠে গেল কাদার উপর।

গাড়োয়ান দুজনেই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শংকরের দিকে।

একজন জিজ্ঞাসা করলে, "কার বাড়ি যাবেন বাবু?"

"তারিণী মুখুজ্জের বাড়ি।"

একজন গাড়ি নিয়ে চলে গেল। আর-একজন জবাব দিলে, "তেনাকে ত পাবেন না বাড়িতে।"

শংকর জিজ্ঞাসা করলে, "কেন? কোথায় গেছে?"

"যার নাই কোথাও [illegible] খোয়াড়কে হারিয়ে দিয়ে তিনি নতুন 'পেছিডেন' হলেন

কিনা। বারোয়ারী তলায় 'মচ্ছব' লেগে গেছে দেখুন গিয়ে।"

"মচ্ছব? সে আবার কী?"

"মচ্ছব জানেন না? শহরের মানুষ কিনা, জানবেন কেমন করে?"

লোকটি বুঝিয়ে দিলে, "মচ্ছব মানে আনন্দ, ফূর্তি। বাজনা-বাদ্য বাজছে, গাওনা হচ্ছে, ফূর্তি করছে, খাওয়া-দাওয়া চলছে। গাঁয়ে ঢুকতেই শুনতে পাবেন যান।"

গাঁয়ে ঢুকতেই সত্যি সত্যি শুনতে পেলে শঙ্কর।

একটু এগিয়ে যেতে দেখতেও পেলে।

দেখলে, বিস্তর লোক। বিরাট শোভাযাত্রা। ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে, শিঙে বাজছে, কাড়া, নাকাড়া, পালক-কঙ্কন জয়-ঢাক—কিছুই বাদ যায়নি। এমন-কি কেনেস্তারা টিন পর্যন্ত গলায় ঝুলিয়ে বেমক্কা পিটিয়ে চলেছে কয়েকজন গ্রামের ছোকরা।

গ্রামের পথে পথে তারা নাচতে নাচতে আর গাইতে গাইতে এসে দাঁড়িয়েছে ছোট্ট একটি ইঁট বের-করা দোতলা বাড়ির সামনে।

শঙ্কর একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলে, ওই বাড়িটিই রাখহরি ঘোষালের বাড়ি।

লোকগুলো গাইছে, না ছাই করছে। বিশ্রী রকমের একটা বেসুরো কোলাহল উঠছে। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে শুধু একটা ছড়া। সবাই মিলে সমস্বরে বলছে—

"বোল্ হরি বোল্
রেখো খেলে ঝোল!
হেরে হল ভূত
এবার লেজ গুটিয়ে ছোট।"
ব্যাটা তল্পি-তল্পা তোল
নয়ত ঢালব মাথায় ঘোল।
বোল্ হরি বোল্!!"

লোকজনের ভিড় ঠেলে শঙ্কর আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। দেখলে, একটা চেয়ারের দু দিকে দুটো লম্বা লম্বা বাঁশ বেঁধে তার উপর তারিণী মুখুজ্জেকে বসিয়ে কাঁধে নিয়ে নাচছে। তারিণীর গলায় ফুলের মালা।

তারিণী বললে, "এখানে কেন এলি?"

একজন বললে "রাখহরি দেখুক।"

রাস্তার ধারের দোতলার ঘরটায় রাখহরি তামাক টানছিল গড়গড়ায়। বাইরের গোলমাল, ছড়া-কাটার চমৎকার ভাষা—সবই সে শুনতে পাচ্ছিল সেখান থেকে। গড়গড়ার নলটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। অস্থির হয়ে পায়চারি করতে লাগল ঘরের ভিতর। জানলা দিয়ে দেখলে একবার ব্যাপারখানা।

"বাবা!"

'অন্য কোথাও চলে যাওয়া ভাল'

ডাক শুনে পিছন ফিরে তাকালে।

জয়া এসে দাঁড়িয়েছে। রাখহরির মেয়ে। এইটিই তার একমাত্র মেয়ে। এই মেয়েটিই সম্বল। ছেলেপুলে নেই। কিন্তু এই এত বড় মেয়ে—এখনও সিঁথিতে সিঁদুর পড়েনি কেন কে জানে। অথচ বাপের পয়সা আছে।

জয়া বেশ জোয়ান মেয়ে। দু-ভরি সোনার কম একগাছা চুড়ি হয় না—এমনি চওড়া তার হাতের কব্জি। চাঁপা চাঁপা গায়ের রঙ, চোখ দুটি সুন্দর, দাঁতগুলিও দেখতে বেশ, কিন্তু তবু যেন মনে হয় কেমন যেন মন্দ-মন্দ কাঠ-কাঠ। বিয়ে বোধ হয় সেইজন্যেই হয়নি—এমনও হতে পারে।

জয়া বললে, "বাবা, শুনছ? ওরা কীরকম ছড়া বেঁধেছে তোমার নামে?"

রাখহরি বললে, "শুনেছি।"

জয়া বললে, "এ গাঁ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া ভাল বাবা। এখানে মানুষ থাকে? ছি!"

রাখহরি বললে, "বাপ-চোদ্দপুরুষের ভিটে ছেড়ে চলে যাব? ওদের ভয়ে? ভজুকে ডেকে দে। আমি দেখছি।"

ভজু এ-বাড়ির একজন অনুগত ভৃত্য বললেও চলে, দরোয়ান বললেও ভুল হয় না। এই গ্রামেই বাড়ি। ডোমদের ছেলে। বিয়েথা করেনি। এই বাড়িতেই পড়ে থাকে চব্বিশ ঘণ্টা।

রাখহরি বেরিয়ে গেল খোলা ছাতে। ছাতের ছোট আলসের কাছে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললে "এ-সব কী হচ্ছে তোমাদের? বুড়ো মিনষে তারিণী, তোমার লজ্জা করছে না?"

তারিণী তার আগেই মুখটাকে তার ফিরিয়ে নিয়েছে অন্য দিকে।

রাখহরি আবার বললে, "বলি, থামাবে? তোমরা যাবে এখান থেকে?"

রাস্তা থেকে কে একজন বলে উঠল, "রাস্তাটা সরকারী রাস্তা। আমরা কেউ ত আপনার বাড়ির ভেতর ঢোকিনি।"

রাখহরি বললে, "তোমরা ঢোকনি, কিন্তু তোমাদের ওই আওয়াজটা ঢুকছে।"

একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল, "কান বন্ধ করুন।"

সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো লোক একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল "কান বন্ধ করুন!"

ওদিকে ঠিক সেই সময়েই রাখহরির পিছনে এসে দাঁড়াল ভজু। বললে, "ডেকেছেন?"

"হ্যাঁ নিয়ে আয় আমার বন্দুক। জয়ার কাছ থেকে দুটো টোটা চেয়ে আনবি।"

ভজু চলে গেল বন্দুক আনতে।

রাস্তার উপর ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল কার্তিক। কুড়ি-বাইশ বছরের ছোকরা।

তারিণী মুখুজ্যের ছেলে। কাঁধে চামড়ার ফিতে দিয়ে ঝোলানো একটি কমদামী টোটা আর হাতে একটি দোনলা বন্দুক।

কার্তিক বোধকরি শুনতে পেয়েছিল রাখহরির কথাটা। তাই সেও রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে বললে, "বন্দুক আমাদেরও আছে।"

তারিণী তার চৌদলের উপর থেকে বলে উঠল, "কেতো! কী হচ্ছে?"

এই বলেই যারা তাকে কাঁধে তুলে নাচাচ্ছিল, তাদের দিকে তাকিয়ে বললে, "চল্ এখান থেকে। তোরা দেখছি ঝগড়া আরম্ভ করলি।"

বড় ছেলে মারা যাবার পর, এখন এই কার্তিকই তার প্রিয় পুত্র। বদরাগী ছেলে। বেশী বলবারও উপায় নেই।

এইতেই কার্তিক খেঁকিয়ে উঠল তার বাপকে। বললে, "তুমি চুপ কর বাবা।"

ওদিকে ভজু তখন রাখহরির দোনলা বন্দুকটা এনে তার হাতের কাছে বাড়িয়ে ধরলে। রাখহরি বললে, "দে।"

বলে যেই সে বন্দুকটা নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছে, কার্তিক চেঁচিয়ে উঠল, "বন্দুকে হাত দেবেন না বলছি। মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।"

রাখহরি বন্দুকে হাত দিতে গিয়েও দিলে না। বললে, "তাই বলে তোমরা এমনি করে আমাকে অপমান করবে?"

কার্তিক বললে, "ভোটের দিনে আপনার লোকজন বাবাকে কম অপমান করেনি।"

রাখহরি বললে, "ভোটের সময় ওরকম হয়েই থাকে।"

"এই যে, হওয়া বের করছি।"

কার্তিক তার বন্দুকটা তুলে ধরে ঘোড়ায় হাত দিলে। আর-একটু হলেই সে দিয়েছিল চালিয়ে, কিন্তু হঠাৎ একটা হাত এসে দিলে বন্দুকের নলটা উপর দিকে তুলে! দড়াম্ করে আওয়াজ হয়ে গেল।

কার্তিক তাকিয়ে দেখলে, একটা অপরিচিত লোক তার বন্দুকের নলটা টেনে ধরে আছে। নলের মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

কার্তিক একটা হেঁচ্কা টান মেরে বললে, "ছেড়ে দাও।"

সবাই দেখলে ব্যাপারটা। আওয়াজ হবার সঙ্গে সঙ্গেই গান বাজনা থেমে গিয়েছে। দলের একটা লোক এগিয়ে এল, শংকরের কাছে। বললে, "কে হে তুমি লাট সায়েব?"

অনেকেই তখন ঘিরে ধরেছে শংকরকে। কিন্তু শংকরের নজর কার্তিকের দিকে। বললে, "এখুনি কী হয়ে যেত বল দেখি?"

"কী আবার হত! ও মরে যেত।"

বলিহারী জবাব! মরে যাওয়াটা যেন কিছু নয় তার কাছে।

শংকর বললে, "আর তুমি? তোমার কী হত?"

কার্তিক বললে, "কচু হত।"

"এই কেতো!"

তারিণীর গলার আওয়াজ!

কার্তিক তাকালে তার বাবার দিকে। শংকরও তাকালে।

তারিণী বললে, "কী ঝামেলা করছিস? চ। তুমি কে হে? রাখহরি আনিয়েছে বুঝি তোমাকে ভাড়া করে?"

শংকর বললে, "আজ্ঞে না। আমাকে কেউ ভাড়া করে আনেনি। আমি নিজেই এসেছি।"

"কার বাড়ি এসেছ?"

"কারও বাড়ি আসিনি। এইদিকে যাচ্ছিলাম, গোলমাল শুনে এইখানে চলে এলাম।"

"বাড়ি কোথায়?"

শংকর বললে, "বাড়ি বলে কিছু নেই আমার। যেখানে থাকি সেইখানেই আমার বাড়ি।"

কে একজন বলে উঠল, "তা আমাদের ব্যাপারে তুমি মাথা গলাচ্ছ কেন?"

শংকর বললে, "আমার স্বভাব।"

তারিণীর দিকে তাকিয়ে একজন বললে, "আপনি ঠিক বলেছেন। এ-ব্যাটা রাখহরির ভাড়াটে গুণ্ডা না হয়ে যায় না।"

শংকর বললে, "ভাল করে কথা বল। আমি গুণ্ডা নই।"

"না, গুণ্ডা নও?"

বলেই লোকটা এগিয়ে এসে ঠাস করে শংকরের গালে একটা চড় মেরে বসল।

ভিড়ের মাঝখান থেকে একজন বলে উঠল, "দে ব্যাটার মাথাটা দু ফাঁক করে।"

সত্যি-সত্যিই লাঠি উঁচিয়ে একটা লোক এগিয়ে এল শংকরের দিকে। কিন্তু চোখের নিমেষে লাঠিটা তার হাত থেকে ঝটকা মেরে সে-এক অদ্ভুত কৌশলে কেড়ে নিলে শংকর। রাগে সে তখন ফুলছে। সেই লাঠিটাই শংকর তার গায়ের উপর বসিয়ে দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় আর-একজন লাঠিয়াল শংকরের মাথাটা লক্ষ্য করে চালালে এক লাঠি। শংকর তার হাতের লাঠিটা ঘুরিয়ে নিয়ে সেই লোকটার কব্জির উপর সজোরে দিলে বসিয়ে। লাঠিটা তার হাত থেকে ছিটকে এসে পড়ল শংকরের পায়ের কাছে। পা দিয়ে লাঠিটা চেপে রেখে শংকর বললে, "আর কে আছিস চলে আয়।"

লোকগুলো তখন সরে যেতে আরম্ভ করেছে। আগের লোকটা হাতের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গিয়ে কার্তিকের কাছে গিয়ে চুপি চুপি বললে, "চালাও না বন্দুকটা। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? উঃ, কেনো যদি ফট করে আমার সামনে এসে না দাঁড়াত ত দিয়েছিলাম ব্যাটার মাথাটা ফাটিয়ে! উঃ! হাতটা ফুলে গেল। বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। কী লাগাই বল দেখি?"

কথাগুলো কার্তিকের কানে ঢুকল বলে মনে হল না। সে তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল শংকরের দিকে।

"কেতো, বাড়ি চ!"

বাপের কথা শুনে কার্তিকের যেন সম্বিৎ ফিরে এল। বললে, "হ্যাঁ, সেই ভাল। চল।"

তাদের পিছু পিছু সবাই চলে গেল। শংকর দাঁড়িয়ে রইল একা।

এই তারিণী মুখুজ্যেই তার কাকা। আর এই কার্তিক তার ভাই। জীবনে তাদের সে এই প্রথম দেখলে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে তাদেরই কথা ভাবছিল। ভাবছিল, এবার সে কোথায় যাবে, কী করবে। এমন সময় পিছন থেকে কে যেন তার পিঠে হাত দিতেই শংকর চমকে উঠল। তাকিয়ে দেখলে, রাখহরি। বললে, "সাবাস!"

শংকর রাখহরির মুখের দিকে তাকিয়েই মাথা নিচু করলে।

রাখহরি জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যাবে?"

শংকর বললে, "যেখানে যাব ভেবে এসেছিলাম, এখন ভাবছি সেখানে আর যাব না।"

"কোথায় থাকবে?"

"একলা মানুষ, যেখানে হক পড়ে থাকব।"

রাখহরি বললে, "তোমার আপত্তি যদি না থাকে, আমার বাড়িতেও থাকতে পার।"

শংকর একটু হাসলে। বললে, "কতদিন রাখবেন?"

"যতদিন তোমার খুশি।"

শংকর তখনও চুপ করে রয়েছে দেখে রাখহরি বললে, "কী ভাবছ? দু-দশটা লোককে খেতে দিতে আমরা ভয় পাই না। আমাদের পুকুরের মাছ, ঘরের গাইয়ের দুধ আর চাষের চাল—খাও না কত খাবে। তোমরা শহরের মানুষ—এর মর্ম তোমরা বুঝবে না।"

"চলুন, থাকব আপনার বাড়িতে।"

সামনের দোতলায় ছোট্ট একখানি ঘর দেওয়া হয়েছে শংকরকে। রাখহরি বলেছে "এখানে থাকতে হলে বাড়ির ছেলের মতই থাকতে হবে তোমাকে। আমার নিজের বলতে ওই একটামাত্র মেয়ে—জয়া। জয়ার মা নেই।"

জয়ার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে শংকরের রাত্রে সে এই ঘরে তার খাবার নিয়ে এসেছিল। সঙ্গে এসেছিল এই গ্রামের একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে। সে নাকি এ-বাড়িতে রান্নার কাজ করে।

পরের দিন সকালে রাখহরি এল তার খোঁজ খবর নিতে।

"রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"খাবারদাবার কষ্ট হয়নি?"

"আজ্ঞে না।। হবার জো নেই। আপনার মেয়েটি সে সব দিকে ওস্তাদ।"

রাখহরি একটু হাসলে। খুশীই হল কথাটা শুনে। বললে, "সংসারের সব কিছু ওকেই ত দেখতে হয়। ওকে রেখে দিয়েছিলাম ওর মামার বাড়িতে। বাঁকুড়ায়। এখানে না আছে একটা ইস্কুল না আছে কিছু। একটামাত্র মেয়ে। এখানে থাকলে মুখ্যু হত। তা ভাগ্যিস বাঁকুড়ায় ছিল, তাই আই-এ পাস করেছে।"

শুনে ত শংকরের চক্ষু ছানাবড়া! মেয়েটা আই-এ পাস?

রাখহরি বললে, "আরও পড়াবার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু ওর মা মরে গেল। বাধ্য হয়ে এখানে এনে রাখতে হল।"

এখনও ওর বিয়ে দেননি কেন?—কথাটা জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছে হল শংকরের। কিন্তু লজ্জায় পারলে না জিজ্ঞাসা করতে। রাখহরিও কিছু বললে না।

এখন জয়ার কথা থাক, শংকরের সব চেয়ে বড় দরকার একবার শহরে গিয়ে নিজের কিছু জামাকাপড় কিনে আনার। কলকাতার বাড়িতে যৎসামান্য যা-কিছু ছিল, সব সে বিলিয়ে দিয়ে এসেছে বস্তির লোকজনকে।

"এখান থেকে শহর কতদূর?" জিজ্ঞেস করলে শংকর।

রাখহরি বললে, "শহর এখান থেকে পাঁচ-ছ ক্রোশ দূরে। কেন, যাবে নাকি?"

শংকর বললে, "যেতে হবে।"

"কিন্তু তুমি শহুরে মানুষ, পায়ে হেঁটে পারবে যেতে?"

"কেন, ট্রেনে?"

"তার চেয়ে হেঁটে ভাল। এখান থেকে স্টেশন ত পাঁচ-ক্রোশ। তবে যেদিক দিয়েই যাও, আমাদের গ্রাম থেকে বেরিয়েই প্রায় দু-ক্রোশ জলা। এই রাস্তাটা পার হওয়া মুশকিল।"

শংকর বললে. "আপনি ত এতদিন প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ ছিলেন, এই রাস্তাটা তৈরি করতে পারেননি?"

রাখহরি বললে, "চেষ্টা করেছিলাম। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড বলেছিল, আপনারা গ্রাম থেকে অর্ধেক দিন, বাকী টাকা আমরা দেব। ওই তারিণীশংকর—এখন যে প্রেসিডেন্ট হল—ওই চামারটাই দিলে সব মাটি করে।"

"শুনেছি ত, ও'র বেশ টাকাকড়ি আছে।"

"আছে মানে? বেশ ভাল টাকা আছে।"

রাখহরি বেশ ভাল করে চেপে বসল। বলল, "কথাটা উঠল যখন, তখন শোন। ওটা মানুষ নয়, ওটা চামার। ওর এক দাদা ছিল ভবানীশংকর। বিষয় সম্পত্তি টাকা-কড়ি সে-ই সব করেছিল। লোকটা অকালে মরে গেল। বাস্, যেই মরা, তারিণীশংকর লাগল তার বিধবা স্ত্রীর পেছনে। আর সে মেয়েটাও ছিল একটু বোকা, আর ভারি বদরাগী। দুজনের ঝগড়া যেদিন খুব চরমে উঠল সেইদিন সে সব-কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। খুব খানিকটা শাপ-শাপান্ত করলে; বললে, "ভগবান দেখবেন তোমাকে।" এই না বলে তার বাচ্চা ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যে চলে গেল ভগবান জানেন। সেই যে গেল আর ফিরে এল না। তারিণীশংকরের ভালই হল। এইটিই সে চাচ্ছিল মনে-মনে। সেই যে একটা কথা আছে না—বাবা ম'লো ভালই হল, দুটো হুকোই আমার হল। তারিণীর হল তাই। সেই থেকে বড় ভাইয়ের স্ত্রী-পুত্রকে পথে বসিয়ে নিজেই সব ভোগ দখল করছে।"

শংকর বললে, "আচ্ছা, ওর সেই দাদার ছেলেটা যদি ফিরে আসে?"

রাখহরি বললে, "সে যে অনেক দিনের কথা। সে কি আর বেঁচে আছে ভেবেছ? বেঁচে থাকলে আসত না? নিশ্চয় আসত।"

শংকর বললে, "ঠিক বলেছেন। সে বোধ হয় মরে গেছে।"

এমন সময় 'বাবু' 'বাবু' বলে কে একটা লোক বাইরে চীৎকার করছে মনে হল।

রাখহরি বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে গেল। বললে, "কে রে জিতু? ওপরে উঠে আয়।"

জিতু দোতলায় এসে খবর দিলে যে, গড়গড়ির মেলায় যে নাগরদোলাটা চলছিল তার একটা খাট্‌লা নাকি ভেঙে গিয়ে উপর থেকে ছিট্‌কে একেবারে নীচে পড়ে গিয়েছে।

রাখহরি জিজ্ঞাসা করলে, "কেউ মরেছে?"

জিতু বললে, "না মরেনি। তবে পট্‌লা ডোমের ছেলেটার ডান হাতটা বোধহয় ভেঙে গেছে।"

কথাটা শুনে রাখহরি আশ্বস্ত হল।

"তাই বল! যেরকম করে এলি, আমি ত ভাবলাম কী না কী হয়ে গেছে। যা, আমাদের কথা হচ্ছিল, এ সময় বিরক্ত করিসনি, যা!"

জিতু চলে যাচ্ছিল, শংকর বললে, "শোন!"

জিতু ফিরে দাঁড়াতেই, শংকর জিজ্ঞাসা করলে, "হাতখানা কি তার ভেঙে গেছে?"

জিতু বললে, "ভাঙবে না? কতদূর থেকে পড়েছে? হাতখানা একবারে এমনি লড়বড় করছে।"

নিজের হাতটা নেড়ে কী রকম লড়বড় করছে জিতু দেখিয়ে দিলে।

ব্যাপারটা রাখহরির ভাল লাগছিল না। বললে, "কী বকবক করছিস? যা।"

শংকর উঠে দাঁড়াল। বললে, "না না, যেয়ো না, দাঁড়াও।"

এই বলে সে রাখহরির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনাদের ডাক্তারখানাটা কোথায়?"

"কী হবে?"

শংকর বললে, "লোকটাকে ডাক্তার দেখাবেন না?"

রাখহরি বললে, "ডাক্তার পাবে কোথায় যে দেখাবে?"

"গাঁয়ে ডাক্তার নেই?"

"না। ক্রোশ তিন-চার দূরে বাজিৎপুরে একটা খোঁড়া ডাক্তার আছে। রুগী মারবার যম।"

শংকর বললে, "তা হলে কী হবে?"

"হবে আবার কী?" রাখহরি বললে, "দ্যাখোগে যাও এতক্ষণ হয়ত চুন-হলুদ লাগিয়ে দিয়েছে। বাঁচে ত ওতেই বাঁচবে, যায় ত ওতেই যাবে। ডাক্তারে কি কিছু করতে পারে বাবা?"

শংকর অবাক হয়ে গেল রাখহরির কথা শুনে।

"কী বলছেন আপনি? ডাক্তারে কিছু করতে পারে না?"

রাখহরি বেশ জোর দিয়েই বললে, "না। করনেওলা—"

বলেই চোখ দুটো বুজে হাতটা সে উর্ধ্বে কড়িকাঠের দিকে বাড়িয়ে দিলে।

তারপর চোখ খুলে আবার সে বলতে লাগল, "তা হলে শোন বাবা, কথাটা যখন উঠল তখন বলি। গত বছর, ঠিক এমনি সময়ে তারিণীর বড় ছেলেটার হল কলেরা। ওই যে দেখলে বাঁদরটাকে ওইটেরই বড়। গাঁয়ে ডাক্তার নেই। শহরে যাবার ভাল রাস্তা নেই, এ দিকে কাদা, ওদিকে কাদা, মাঝখানে ধানের ক্ষেত। একগাড়ি টাকা খরচ করে পালকিতে চড়িয়ে ডাক্তার ত আনলে! মস্ত বড় ডাক্তার। কিন্তু কী হল? পারলে বাঁচাতে?"

শংকর বললে, "ডাক্তার আসতে দেরি হয়েছিল নিশ্চয়ই।"

"হবে না? দেরি হবে না? এই জলকাদা ভেঙে শহর থেকে ডাক্তার আসা কি চারটিখানি ব্যাপায়? এ-গাঁয়ে ডাক্তার আসা আর ভগবান আসা দুইই সমান। কিন্তু কী হল জান?"

শংকর উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিল। বললে, "কী হল?"

রাখহরি বললে, "তারিণীর টাকা থেকে

...ত বড় একটা শিক্ষিত ডাক্তার যাবার সময় ...ার নামে বদনাম দিয়ে গেল।"

"বদনাম দিয়ে গেল? আপনার নামে? আপনার সঙ্গে এর কী-সম্বন্ধ?"

সম্বন্ধটা যে কী শঙ্কর তা সত্যিই বুঝতে পারছিল না। রাখহরি বুঝিয়ে দিলে। বললে, "সম্বন্ধ ওই মেলা। গড়গড়ির মেলাটা যে আমার। আর ওই মেলার জন্যেই, ডাক্তার বলেছে—কলেরা। তারিণী ঠিক তাই বিশ্বাস করে বসল। আবার আমার মেলা যে!"

এই বলে রাখহরি পরম বিজ্ঞ একজন দার্শনিকের মত গম্ভীর গলায় বললে, "মেলাও প্রতি বছর হয়, কলেরাও হয়, কিন্তু কই গ্রামের সবাই ত মরে না! যে মরবার সে মরে। এই ত এ-বছরও হয়েছে। মেলাও হয়েছে, কলেরাও হয়েছে। যাদের পরমায়ু নেই তারা মরছে।"

ঠিক সময়ে ডাক্তার ডাকতে পারলে কলেরায় যে মানুষ মরে না—শঙ্করের ছিল এই বিশ্বাস। মৃত্যু সম্বন্ধে রাখহরির এই ঔদাসীন্য দেখে শঙ্কর একটু বিস্মিত হল। বললে, "না না, এ সম্বন্ধে আপনাদের কিছু করা উচিত।"

"কী করবে? মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করবে? পারবে? কখখনো পারবে না। পরমায়ু যাদের নেই তারা পটাপট মরবে। কলেরায় না মরুক, শুকনো ডাঙায় হোঁচট খেয়ে মরবে। এই যে তুমি—শহর থেকে এসেছ, লেখাপড়া-জানা একটা শিক্ষিত ছেলে—তুমিও কী বলবে, কলেরার জন্যে আমার ওই মেলাটা দায়ী? কখখনো না। চব্বিশ ঘণ্টা সেখানে হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছে. সাধ্য কি যে কলেরা সেখানে প্রবেশ করে। এটা হচ্ছে আমাদের গাঁয়ের লোকের কথা। কেউ কারও ভাল দেখতে পারে না।"

শঙ্কর বললে, "আপনার এই মেলাটি আমি দেখব।"

"বেশ ত। যাও দেখে এস। এই যে তুমি শহরে যাবে বলছিলে, যাবার দরকার হবে না। আমার মেলায় সব আছে। খুব জমাটি মেলা।"

এই বলে জিতুকে ডেকে বলে দিলে, "বাবুকে সঙ্গে নিয়ে যা।"

পথে যেতে যেতে অনেক কথাই জেনে নিলে শঙ্কর। গড়গড়ির মেলা নাকি এ-অঞ্চলে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মেলা। বহু দূরের গ্রাম থেকে লোকজন এই মেলায় আসে জিনিসপত্র কিনতে। শহরে যাবার প্রয়োজন হয় না।

শঙ্কর দেখলে, অনেকখানা জায়গা জুড়ে মেলা বসেছে। সত্যিই মেলাটা খুব বড়।

এক দিকে সরু একফালি মরা নদী, আর এক দিকে সারি সারি আখের ক্ষেত। জায়গাটা বেশ উঁচু, কাজেই জল কাদার বালাই সেখানে নেই।

তবে কোনও শ্রীও নেই, কোন শৃঙ্খলাও নেই। স্বাস্থ্যরক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেই। যে যেখানে পেরেছে বসে গিয়েছে।

মেলায় ঢুকে শঙ্কর প্রথমেই জানতে চাইলে—নাগরদোলাটা কোথায়?

জিতু ভেবেছিল, শঙ্কর শহরের মানুষ, নাগরদোলায় কখনও চড়েনি তাই বোধ হয় চড়তে চায়। পূব দিকে তাকিয়ে বললে, "নাগরদোলায় আজ আর চড়তে পারবেন না বাবু, এখনও মেরামত হয়নি। ওই দেখুন চলছে না।"

শঙ্কর বললে, "না না, নাগরদোলায় চাপবার শখ আমার নেই। যে-লোকটার হাত ভেঙে গেছে আমি শুধু সেই লোকটাকে দেখতে চাই।"

জিতু বললে, "সে এখনও এখানে আছে বুঝি? বাড়ি চলে গেছে।"

শঙ্কর বললে, "চল তার বাড়িতেই যাব।"

জিতু বললে, "বাবুর বন্ধুলোক আপনি, এই জল-কাদায় আপানাকে সেখানে নিয়ে যাই, তারপর বাবুর মার খাই আর-কি!"

"না না, মার খাবে না, চল।"

জিতু বললে, "আপনি নতুন এসেছেন, চেনেন না আমাদের বাবুকে। বেকায়দা হয়েছে কি চট্ করে হাত চালিয়ে দেবে। তার চেয়ে আপনি ততক্ষণ মেলা দেখুন, আমি চট্ করে খবর নিয়ে আসছি।"

হাঁ-হাঁ করে নিষেধ করতে করতে জিতু ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এমন সময় একটা লোকের কান্নার আওয়াজ শুনে শঙ্কর তাকিয়ে দেখলে, চাষী-গোছের একজন ছেলেমানুষের মত হো-হো করে কাঁদছে।

"কী হয়েছে তোমার? কাঁদছ কেন?"

লোকটা বললে, "হেরে গেলাম বাবু, একদম হেরে গেলাম। ধান-বেচা টাকা নিয়ে মেয়েছেলের কাপড় কিনতে এসেছিলাম বাবু।"

"কিসে হেরে গেলে?"

লোকটা বললে, "খেলায়। ওই যে খেলা হচ্ছে ওইখানে। ওই খেলায়।"

শঙ্কর এগিয়ে গিয়ে দেখলে, মস্ত বড় একটা ছক পেতে জুয়াখেলা চলছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় জুয়া যারা খেলছে তাদের ভিতর বেশ জেঁকে বসে আছে তারিণীশঙ্করের ছেলে কার্তিক।

কার্তিক শুধু বসে বসে দেখছে না, জুয়া সেও খেলছে।

শঙ্কর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে। সে তার পকেট থেকে টাকা বের করে ছকের উপর ধরলে। ঘুঁটি পড়ে গেল তারই ঘরে। যে-টাকা ধরেছিল তার দ্বিগুণ টাকা সে ফেরত পেলে। তার দেখা দেখি তারই ঘরে অন্যান্য সবাই টাকা ধরতে লাগল।

শঙ্কর দেখলে, কার্তিক যেন লোভ দেখিয়ে আর-সকলকে খেলতে বাধ্য করছে। শেষে ইচ্ছে করে হেরে যাচ্ছে নিজে। তার সঙ্গে সঙ্গে সবাই হারছে।

এ-বিদ্যেটা শঙ্কর জানে। বুঝতে তার বাকী রইল না যে এই জুয়ার আড্ডায় কার্তিকের স্বার্থ আছে ষোল আনা। নইলে সে এরকমভাবে খেলবে কেন? ওইটুকু সময়ের ভিতর শঙ্কর দেখলে, কার্তিক জিতল মাত্র দশ টাকা আর হারল প্রায় তিনশ টাকা। আর এই তিন শ টাকার সঙ্গে জুয়া যারা খেলছিল তাদেরও প্রায় শ' দুই টাকা জুয়াড়ীর থলেতে ঢুকিয়ে দিলে।

একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে এই জুয়ার আড্ডায় এসে ডাকলে, "দাদা!"

দাদা তার বোধ হয় জুয়া খেলছিল। বললে, "কী বলছিস?"

শীগ্গির এস। পিসি কেমন করছে দেখবে এস।"

দাদা বললে, "দেখতে হবে কেন, নিঘ্ঘাৎ কলেরা। আমি গিয়ে কী করব?"

ছকে সে তখন একটা আধুলি ধরে সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে আছে। অন্য দিকে মন দেবার সময় তার নেই।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে, "যাবে না দাদা? সারাদিন শুধু জুয়াই খেলবে?"

দাদা এমনভাবে মুখটাকে তার খিঁচিয়ে উঠল যে, মেয়েটি সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হল।

কে একজন জিজ্ঞাসা করলে, "তোদের পাড়ায় কজন ম'লো রে?"

"কাল থেকে চারজন মরেছে।"

"সারা গাঁয়ে তা হলে কজন হল?"

একজন বললে, "বারোজন।"

আর-একজন তাদের থামিয়ে দিলে বললে, "থাম বাবা, থাম। মনের আনন্দে আমরা একটু খেলা করছি, এ সময় কলেরা কথাটা মনে করিয়ে দিস না।"

শঙ্কর সেখান থেকে সরে গেল। —একটা গ্রামে বারোজন লোক মরল কলেরায়! গ্রামে ডাক্তার নেই, শহর থেকে ডাক্তার আসবার পথ নেই। মরবার আগে এই লোকগুলি মুখে একফোঁটা ওষুধ পড়েনি। নিতান্ত অসহায়ের মত শুধু দৈবের উপর নির্ভর করে তারা ছটফট করে মরেছে। আশাহীন সান্ত্বনাহীন যারা বেঁচে আছে, তারাই কী সুখে বেঁচে আছে কে জানে।

শঙ্কর গ্রামের দিকে যাচ্ছিল।

ওদিকে তখন জিতু আসছে পটলার খবর নিয়ে। ডাকলে, "বাবু! বাবু!"

শঙ্কর থমকে থামল।

জিতু বললে, "ছোঁড়া এখনও বেঁচে আছে বাবু!"

বাস, আর-কিছু শোনবার দরকার নেই।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি ফিরে এল নিজের আস্তানায়। প্রয়োজন ছিল রাখহরির সঙ্গে। জয়া বললে, তার বাবা নাকি দূরের কোন একটা গ্রামে গেছে বিশেষ দরকারে, ফিরতে রাত হবে।

আবার বেরিয়ে যাচ্ছিল শঙ্কর। জয়া তাদের সেই রাঁধুনী-ছোকরাটিকে বললে, "বাবুকে খেয়ে যেতে বল। বারোটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে।"

তারপর বোধ করি শঙ্করকে শুনিয়ে শুনিয়ে একটু জোরে জোরেই বললে, "সময়ে না-খেলে অমনি কুঁদো বাঘের মত শরীরটা থাকে কেমন করে, কে জানে!"

শঙ্কর একটু হেসে বললে, "খাবার দিতে বল।"

"স্নানও নেই, কিছু নেই, কোথাকার ম্লেচ্ছ রে বাবা।"

শঙ্কর খেয়ে-দেয়ে আবার বেরিয়ে গেল। সোজা চলে গেল রাখহরির গড়গাড়ির মেলায়।

সারাটা দিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যার আগে যখন সে ফিরে এল, দেখা গেল, তার হাতে একটা টিনের স্যুটকেস। কয়েকটা জামা-কাপড়, গামছা, সাবান কিনে এনেছে সে। এসেই ডাকলে, "ভজু!"

একটা ছেলে এসে জানালে, ভজু বাবুর সঙ্গে গিয়েছে। এখনও ফেরেনি।

শঙ্কর বললে, "তুই একটা কাজ করতে পারিস বাবা! এক বাটি সরষের তেল আনতে পারিস?"

"এক্ষুনি এনে দিচ্ছি!" বলে তক্ষুনি সে এক বাটি তেল এনে নামিয়ে দিলে শঙ্করের হাতের কাছে। তেল মেখে গামছা আর সাবান নিয়ে শঙ্কর বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। ঘাট-বাঁধান পুকুর একটা ছিল বাড়ির পাশেই। সেই পুকুরে স্নান করে, সাঁতার কেটে যখন সে তার দোতলার ঘরটিতে ফিরে এল, দেখলে চারিদিক তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যা নেমেছে সারা গ্রামে।

নতুন কিনে-আনা কোরা ধুতিটা পরে ভিজে কাপড়টা বাইরের রেলিংয়ে শুকতে দিয়ে শঙ্কর ঘরে ঢুকতেই দেখলে, লণ্ঠন হাতে নিয়ে জয়া দাঁড়িয়ে।

"ওবেলা আমার কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলেন তা হলে!"

শঙ্কর বললে, "শুনিয়ে শুনিয়ে বললে শুনতে হয় বই-কি!"

জয়া বললে, "তাই বলে সংধ্যাবেলায় ওই পুকুরটায় স্নান করতে ত কেউ বলেনি।"

"...বেলা স্নান করব কেমন করে? কাপড়-গামছা কিছুই ছিল না যে!"

এতক্ষণে তার পরনের কোরা কাপড়টার দিকে জয়ার নজর পড়ল। বললে, "তা জানতাম না। ম্লেচ্ছটেচ্ছ অনেককিছু বলেছি, কিছু মনে করবেন না। অন্ধকার বারান্দায় বুঝি ভিজে কাপড়টা মেলে এলেন?"

"হ্যাঁ। আলো কোথায় পাব?"

জয়া বললে, "চাইলেই পাওয়া যায়।"

"তাই ভাবছিলাম।" বলেই শঙ্কর ভিজে গামছাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে গেঞ্জিটা গায়ে দিচ্ছিল। জয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার সেই অনাবৃত সুন্দর সুগঠিত দেহের দিকে। গেঞ্জিটা পরেই শঙ্কর চট্ করে একবার মুখ তুলে তাকালে। চোখে চোখে চোখ পড়ে গেল। লজ্জাটা কাটাবার জন্যই বোধ করি জয়া তার আগের কথার জের টেনে বললে, "কী ভাবছিলেন? লণ্ঠনটা কার কাছে চাইবেন?"

শঙ্কর বললে, "হ্যাঁ।"

বলেই সে বসল তার খাটের উপর। জয়া তার হাত থেকে লণ্ঠনটা টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জানলার একটা শিক ধরে। ঠিক এমনি করে আর-একজন একদিন দাঁড়িয়ে ছিল। চট্ করে কালীঘাটের সেই বাড়িটার কথা শঙ্করের মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল ঝিলপাড়ার সেই অবিস্মরণীয় রাত্রির কথা। সারাটা রাত কাটিয়েছিল তারা একই শয্যায়—সদ্য-বিবাহিত স্বামী আর স্ত্রী। মাঝখানে কী যে সব হয়ে গেল, সেই স্ত্রীই বললে, "থাক, আর স্বামীর পরিচয় তোমাকে দিতে হবে না।"

দুজনের দাঁড়াবার ভঙ্গিটুকু এক। জয়ার চেয়ে সে বয়সে ছোট। জয়ার চেয়ে সে অনেক অনেক বেশী সুন্দরী।

যাক তার সম্বন্ধে ভেবে কিছু লাভ নেই। ইন্দ্রাণীর স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলাই উচিত! শঙ্কর জয়ার দিকে তাকালে। বললে, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ওই মোড়াটা টেনে নিয়ে বোস।"

জয়া কিন্তু বসলে না। বললে, "কিছু যদি মনে না করেন ত একটা কথা আপনাকে বলি।"

শঙ্কর বললে, "বল।"

জয়া মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে বললে, "শুনেছিলাম, শরীরটা যাদের যত বেশী শক্ত, বুদ্ধিটা তাদের তত বেশী মোটা।"

"ও হ্যাঁ, শরীরটা যাদের যত বেশী—কী বললে? কার কথা বলছ?"

জয়া হো-হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বললে, "কার কথা বলছি বুঝতে পেরেছেন?"

শঙ্কর বললে, "বুঝেছি। আমার কথা বলছ।"

তেমনি হাসতে হাসতে জয়া বললে, "হ্যাঁ।"

শঙ্কর বললে, "মেয়েদের হেঁয়ালি আমি বুঝতে পারি না। কী তুমি বলতে চাও ভাল করে বল।"

জয়া জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি বিয়ে করেছেন?"

"কী হবে তোমার সেকথা জেনে?"

"বাঃ রে, জানতে ইচ্ছে করে না?"

শঙ্কর বললে, "যদি বলি বিয়ে আমি এখনও করিনি!"

"বাস্, তা হলে আর করবেন না।"

"কেন?"

জয়া সে-এক অদ্ভুত ভঙ্গি করে বললে, "না বাবা, বলব না, রাগ করবেন।"

শঙ্কর বললে, "না, তুমি বল। আমি রাগ করব না।"

"না, করবেন না? আপনার রাগ আমি দেখেছি। লাঠি মেরে একটা লোকের হাত ভেঙে দিয়েছেন আপনি।"

"সে যে আমার মাথা ভাঙতে এসেছিল।"

"হ্যাঁ, আপনার মাথা ভাঙা এত সহজ কি-না?"

শঙ্কর বললে, "ও-সব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না। তুমি আমাকে বিয়ে করতে কেন বারণ করলে তাই বল।"

জয়া বললে, "বাব্বাঃ, যেরকম কাঠ-কাঠ কথা আপনার, কোনও মেয়ে থাকতে পারবে না আপনার কাছে। পালাবে।"

শঙ্কর চমকে উঠল জয়ার কথা শুনে। বললে, "তুমি জানলে কেমন করে?"

জয়া বললে, "আমিও ত একটা মেয়েমানুষ।"

শঙ্কর বললে, "ভুল বলছ তুমি। মেয়েরা আমাকে ভালবাসে। আমি জানি।"

"জানলেন কেমন করে? বিয়ে ত করেননি।"

শঙ্কর আর বেশীদূর এগোতে চাইলে না। বললে, "পরে বলব। এখন তুমি আমাকে এক পেয়ালা চা খাওয়াও দেখি!"

"চা খাবেন আপনি?" জয়া বললে, "তবে যে শুনলাম চা আপনি খান না!"

শঙ্কর বললে, "ভালবেসে এক-আধ পেয়ালা কেউ যদি দেয় ত খাই।"

"দিচ্ছি।" বলে সে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "ভালবাসা অত সস্তা নয়।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "মুড়ি আছে বাড়িতে?"

জয়া বললে, "নিশ্চয়ই আছে। খাবেন?"

জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই জয়া চলে গেল।

শঙ্করের ঘুম যখন ভাঙল, রাত্রির অন্ধকার তখনও কাটেনি। সারা গ্রাম তখনও ঘুমচ্ছে। শঙ্কর তার কাপড়-গামছা নিয়ে পুকুরের বাঁধান ঘাটে গিয়ে দাঁড়াল। হাত-মুখ ধুয়ে সূর্যপ্রণাম করে প্রথমে শরীরটাকে

বেশ ভাল করে গরম করে নিলে। সূর্যপ্রণাম এক অভিনব পদ্ধতির ব্যায়াম। শঙ্কর তার ক্লাবের ছেলেদের খালি হাতে ব্যায়ামের এই পদ্ধতিটাই প্রথম শেখাত।

তারপর পুকুরে স্নান করে যখন সে উঠল, দেখলে—পুবের আকাশ রাঙা করে সূর্য উঠছে। স্নিগ্ধ সুন্দর হাওয়া বইছে। চারিদিকে বিচিত্রবর্ণ ঘন সবুজের সমারোহ। পল্লীপ্রান্তের এই মনোরম পরিবেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শঙ্কর তার মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অপরূপ আনন্দের বিচিত্র আস্বাদ অনুভব করলে। সর্বাঙ্গ তার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। চোখ দুটো অকারণে জলে ভরে এল।

শুধুই তার মনে হতে লাগল, এই উদার উন্মুক্ত বহিঃপ্রকৃতির মাঝখানে বাস করে এখানকার মানুষগুলি এত সংকীর্ণ কেন? মানুষে মানুষে কেন এত হিংসা, কেন এত বিদ্বেষ? স্বার্থ-কলুষিত জঘন্য এক বিষাক্ত পরিবেশ, চারিদিকে শুধু দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগ শোক আর মহামারী!

বাড়িতে যখন ফিরে এল শঙ্কর, সবাই তখন জেগে উঠেছে।

রাখহরি কাল যেখানে গিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরতে তার অনেক রাত্রি হয়েছে। ছোট যে ছেলেটা কাল থেকে চাকরের কাজ করছে, তাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বললে, "বাবু এখনও ঘুমুচ্ছেন।" শঙ্করের হাত থেকে ভিজে কাপড়টা কেড়ে নিয়ে বারান্দার রেলিংয়ের গায়ে মেলতে মেলতে ছেলেটা জিজ্ঞাসা করলে, "চা খাবেন বাবু?"

"চা এত সকালে কোথায় পাবি?"

ছেলেটা ফিক করে হাসলে। বললে "দেখুন না, আমি এনে দিচ্ছি।" বলেই সে শঙ্করের কাছে এগিয়ে এল। বললে, "দিদিমণি কি এখন উঠেছে? রাত থাকতে উঠে আমাকে তুলে দিয়ে বলেছে—উনুনে আগুন দে। চা এতক্ষণ হয়ে গেছে।"

"না, চা এখনও হয়নি।"

ছেলেটাও ফিরে তাকালে। শঙ্করও তাকাল। দেখলে, সিঁড়ি দিয়ে জয়া উঠে আসছে। তার হাতে একটা কাচের গ্লাস। গ্লাসের উপর একটা বাটি বসানো। সোজা সে শঙ্করের ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর গ্লাস আর বাটিটা নামিয়ে দিয়ে বললে, পশ্চিমা দারোয়ানের মত 'উঠক-বোস' করে এসে চা খেতে হয় না। এইটে খেয়ে নিন।"

শঙ্কর দেখলে, বাটিতে কতকগুলো ভিজে ছোলা, আদা আর নুন। কাচের গ্লাসে বোধ হয় শরবত। অবাক হয়ে তাকালে জয়ার মুখের দিকে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। সকালে উঠেই বোধ করি কুয়োর জলে স্নান করেছে। আঁটসাঁট করে রঙিন একখানি শাড়ি পরেছে। আগুনের মত লাল টকটক করছে জামার রঙ। আর ভিজে একপিঠ কালো চুল পিঠের উপর এলানো।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি এসব জানলে কেমন করে?"

"দেখলাম যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আমার

"না চা এখনও হয়নি"

ঘরের জানলা দিয়ে সবই ত দেখা যায়।"

জয়া বললে, "আমাদের বাড়িতে একজন দারোয়ান ছিল, সে ওই চাঁপাগাছটার তলায় খানিকটা গর্ত খ'ড়েছিল। ভজ্‌য়াকে নিয়ে ওইখানে সে কুস্তি করত আর সারা গায়ে মাটি মেখে—মোষের মতন—"

এই বলে এমন হাসি হাসতে লাগল যে, হাসির ধমকে কথাটা আর শেষ করতে পারলে না।

হাসির বেগ খানিকটা থামিয়ে বললে, "না বাবা, বলব না, রাগ করবেন।—আমি থাকলে আপনি খাবেন না দেখছি, আমি পালালাম।"

যেতে যেতেও জয়া দোরের কাছে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "বাবা উঠলে চা পাঠিয়ে দেব।"

রাখহরির উঠতে সেদিন বেশ দেরি হল। শংকরের ভিজে কাপড়টা তখন শুকিয়ে গিয়েছে। শুকনো কাপড়টা তুলে নিয়ে শংকর তার ঘরের ভিতর এসে দাঁড়াতেই মনে হল, কাছাকাছি কোন বাড়ি থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে। কোন্‌ এক মায়ের বুকফাটা কান্না। ছেলে মারা গিয়েছে। মনটা উদাস হয়ে গেল শংকরের। জানলার কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল রাখহরি।

"কীরকম? কোনও কষ্ট হয়নি ত?"

শংকর ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "আজ্ঞে না।"

রাখহরি বসল খাটের উপর। বললে, "কাল ফিরতে অনেক রাত্রি হয়ে গেল। তিনটে লোকের কাছে টাকা পেতাম, তাও সব আদায় হল না।"

শংকর চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। রাখহরি বললে, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোস।"

হাতের কাপড়টা পাশে নামিয়ে রেখে শংকর বসল।

"মুখখানা তোমার ভারি-ভারি মনে হচ্ছে। কী ভাবছ?"

শংকর বললে, "কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন?"

রাখহরি বললে, "এটা ত তোমাদের শহর নয়, গ্রাম। এখানে এক মাইল দূরের কান্না এখান থেকে শোনতে পাবে। এরকম কান্না আমরা রোজই শুনি।"

শংকর বললে, "রোজ রোজ এ-কান্না বোধ হয় বেড়েই যাবে।"

রাখহরি বললে, "বাড়ুকগে। এ-শোনা আমাদের অভ্যেস আছে। কাল আমার মেলাটা কেমন দেখলে তাই বল।"

"ভাল।"

রাখহরি খুশী হল কথাটা শুনে। বললে, "এরকম মেলা এ অঞ্চলে কোথাও হয় না। ছোট ছেলেটি পর্যন্ত জানে, গড়গড়ির মেলার কথা।"

শংকর বললে, "মেলাটা তুলে দিন।"

রাখহরি তার মুখের দিকে তাকালে। "কী বললে? মেলাটা তুলে দেব?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তুলে দেবেন। আপনার এই মেলার জন্যেই গাঁয়ে কলেরা হচ্ছে।"

রাখহরি সে-কথা সহ্য করতে পারলে না। বললে, "বুঝেছি। তারিণীর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে। হুঁ, ঠিক। তারিণীই তোমাকে শিখিয়েছে এই কথা।"

শংকর বললে, "আজ্ঞে না। কারও সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কেউ আমাকে কিছু শেখায়নি। ভাল চান ত মেলাটা তুলে দিন।"

"তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?"

"আজ্ঞে না। ও কী কথা বলছেন? তাই কখনও পারি?"

রাখহরি বললে, "মেলাটা তুলে দেওয়া অমনি মুখের কথা? ওই মেলা থেকে আমার ইনকাম চারটি হাজার টাকা। গেল-বছর পেয়েছিলাম পাঁচ হাজার টাকা। এটা আর তারিণীর সহ্য হচ্ছে না।"

শংকর বললে, "মেলা তা হলে আপনি তুলবেন না?"

রাখহরি বললে, "না। তারিণী তোমাকে বিগড়ে দিয়েছে আমি বুঝতে পেরেছি।"

এই বলে রাখহরি উঠে দাঁড়াল। বললে, "খুব লোককে আমি বাড়িতে জায়গা দিয়েছি! আমারই খাবে, আর আমারই সর্বনাশ করবে? অত কাঁচা ছেলে আমি নই। তুমি আপনার পথ দেখ।"

রাখহরি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পাশের ঘর থেকে তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ওরে কে আছিস? তামাক দিয়ে যা।"

কারও কোন সাড়া না পেয়ে রাখহরি আবার চেঁচিয়ে উঠল, "কোথায় সব, মরেছে নাকি?"

জয়া চা পাঠিয়ে দিয়েছিল। একটা থালার উপর বসিয়ে দু পেয়ালা চা আর দুটো বাটিতে ঘি দিয়ে ভাজা চিঁড়ে আর নারকেলের কুচি। উপরে লংকা আর চিনি ছড়ানো। খুব যত্ন করে তৈরি করেছিল জয়া।

ছেলেটা ফিরে এল একটা কাপ আর-একটা বাটি ফিরিয়ে নিয়ে। জয়া জিজ্ঞাসা করলে, "ও কী রে, ফিরিয়ে আনলি কেন? শংকরবাবু খেলে না?"

"শংকরবাবু নেই ত ওখানে।"

জয়া বললে "যাঃ, বাবার ঘরে দেখেছিস?"

"বাবু ত একাই বসে রয়েছেন।"

"ওদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, তুই দেখতে পাসনি।"

এই বলে জয়া নিজেই ছুটল। ছেলেটাকে বললে "ও দুটো তুই নিয়ে আয়।"

জয়া একরকম হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে দাঁড়াল তাদের বার-বাড়ির দোতলায়। শংকরের ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলে, শংকর নেই। বাইরের বারান্দায় দেখলে, সেখানেও নেই। তখন নজর পড়ল, ঘরের কোণের দিকে—নতুন কিনে-আনা টিনের সুটকেসটিও নেই।

জয়া পাশের ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলে, খুব আরাম করে নারকেল-চিঁড়ে চিবচ্ছে তার বাবা। বললে, "এগুলো ভারি সুন্দর হয়েছে ত! কই, এ-রকম ত কোনদিন করিস না?"

জয়া খুশী হল কথাটা শুনে। বললে, "ভাল হয়েছে? রোজই করে দেব।"

বলেই একটু থেমে জয়া জিজ্ঞাসা করলে, "শংকরবাবু কোথায় গেলেন বাবা?"

"চলে গেছে নাকি?"

জয়া বললে, "হ্যাঁ। জিনিসপত্র কিছু নেই।"

রাখহরি বললে, "জিনিসপত্র ছিল নাকি কিছু?"

"মেলা থেকে কাপড়-জামা কিনে এনেছিল যে!"

রাখহরি জিজ্ঞাসা করলে, "কিছু নেই?"

"না। কিছু নেই।"

"বেশ হয়েছে। যাকগে, মরুকগে। হতভাগা বলে কিনা—গড়গড়ির মেলাটা আপনি তুলে দেবেন কিনা বলুন। আমার ওপর জুলুম!"

জয়া বললে, "তা হলে তুমি কিছু বলেছ?"

"বলব না? কালকেই বাড়ি ছিলাম না, আর কালকেই ও তারিণীর দলে গিয়ে ভিড়েছে। আমার মেলাটি তুলে দিতে না পারলে তারিণীর ঘুম হচ্ছে না।"

জয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল।

রাখহরি বললে, "তাই বলবার মধ্যে বলেছি—তুমি আমার বাড়িতে থাকবে, আমারই খাবে আবার আমারই শত্রুতা করবে? তার চেয়ে কাজ নেই বাবা, তুমি আপনার পথ দেখ।"

জয়া আর কথা না বলে থাকতে পারল না। বললে "তা হলে তুমিই তাড়িয়েছ।"

"হ্যাঁ, তাড়িয়েছি।"

বলে চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে চা খেতে খেতে রাখহরি বললে, "নইলে আমার বাড়িতে বসে কোনদিন আমার কী সর্বনাশ করে বসত বাবা, তার চেয়ে গিয়েছে ভালই হয়েছে।"

কথাটার কী যে ইঙ্গিত কে জানে। জয়ার পায়ের নীচের মাটিটা যেন সরে যেতে লাগল।

শংকর সত্যি সত্যিই তারিণীশংকরের বাড়ী গিয়ে হাজির!

তারিণীশংকর মন দিয়ে সব কথা শুনলে শংকরের। তারপর বললে "বা বা বা, রাখহরি আচ্ছা চাল চেলেছে ত! তোমার কথা শুনে

একাকিনী — শিল্পী ঃ গোপাল ঘোষ

শংকর হেসে বললে, "এই নাও তোমার টাকা। গুনে দেখ পঁচাত্তর টাকা সাত আনা আছে। আমি তোমাকে দেবার জন্যেই নিয়ে যাচ্ছিলাম।"

এই বলে থলিটা কার্তিকের হাতে দিয়ে বললে, "আচ্ছা, ওই যে দেখছ গাছের ডালে একটি আম ঝুলছে, তোমার ওই বন্দুক দিয়ে ওইটি পাড়তে পার?"

কার্তিক বসল গাছের তলায়। হাতের থলিটা নামিয়ে পকেট থেকে দুটি টোটা বের করলে।

শংকর বললে, "আগে টাকাটা গুনে নাও।"

"পরে গুনব।"

কার্তিক টোটা দুটো বন্দুকে পুরে গাছের ডালে যে আমটি ঝুলছিল, সেই দিকে বন্দুকটি তুলে ধরলে। যেখানে বসে ছিল, সেখান থেকে সুবিধে হল না। আর-একটু সরে গিয়ে সুবিধামত একটা জায়গা বেছে নিয়ে হাঁটু গেড়ে পাকা শিকারীর মত বসে, দিলে বন্দুকটা চালিয়ে। জোর আওয়াজ হল। গাছ থেকে কয়েকটি আমের পাতা ঝরে পড়ল, কিন্তু আমটি পড়ল না।

কার্তিক তাকালে শংকরের মুখের দিকে।

শংকর বললে, "লজ্জা কিসের? আবার চালাও। কিন্তু আমটা ফাটিয়ে দিলে চলবে না। বোঁটায় মেরে আমটিকে ফেলতে হবে।"

"সে আবার কেমন করে হবে? কার্তিক বললে, "আমটা দুলছে যে!"

শংকর বললে, "থামুক। থামলে চালাবে।"

কার্তিক বন্দুকটা নামিয়ে নিয়ে বললে "মুখে অমনি বললেই হয় না। তুমি পার?"

শংকর বললে, "আমার ত বন্দুক নেই। তোমার বন্দুক রয়েছে, সব সময়েই দেখছি বন্দুক হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ, বন্দুকের বড়াই করছ, তাই তোমাকে বলছি—এই আমটি যদি পাড়তে না পার ত বন্দুক নিয়ে আর ঘুরে বেড়িয়ো না।"

কথাটা শুনে রাগ হয়ে গেল কার্তিকের। বন্দুকটা নামিয়ে রেখে বললে, "বলা খুব সোজা! তুমি যদি নিজে পার, দেখিয়ে দাও, আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকব।"

শংকর এইবার বসল গিয়ে তার পাশে। বললে, "সত্যি বলছ?"

"হ্যাঁ, সত্যি বলছি।"

"কই, দেখি তা হলে একবার চেষ্টা করে।"

শংকর বন্দুকটা হাতে নিয়ে নিমেষের মধ্যে লক্ষ্য স্থির করে দিলে চালিয়ে। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমটি টুপ করে বোঁটা থেকে ছিঁড়ে নীচে পড়ে গেল।

কার্তিক অবাক হয়ে চেয়ে রইল শংকরের মুখের দিকে।

বন্দুকের ভিতর থেকে টোটার পোড়া খোল দুটো বের করে নলে ফুঁ দিয়ে শংকর বললে, "চল, এবার বাড়ি যাই।"

কার্তিকের মুখের চেহারা তখন বদলে গিয়েছে। পকেট থেকে আর একটা টোটা বের করে শংকরের হাতে দিয়ে বললে, "এবার একটা উড়ন্ত পাখি মার। আমি অনেক চেষ্টা করেছি—পারিনি।"

"আমিই কি পারব? আচ্ছা, দাও, দেখি। কার্তিকের হাত থেকে টোটাটা নিয়ে বন্দুকে পুরতে পুরতে শংকর বললে, "না পারলে হেস না কিন্তু।"

নাম-না-জানা কয়েকটা পাখি উড়ে যাচ্ছিল মাথার উপর দিয়ে। শংকর বন্দুকটা তুলেই একটা উড়ন্ত পাখিকে লক্ষ্য করে ঘোড়ায় হাত দিলে। প্রচণ্ড আওয়াজে পল্লীপ্রান্তর কেঁপে উঠল। পাখিটা ঝটপট করে পড়ল দূরে।

কার্তিক ছুটে গিয়ে শংকরকে জড়িয়ে ধরলে।

কার্তিকদের বাগানবাড়ির চেহারা গিয়েছে বদলে। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'ময়না-বানি শক্তি কেন্দ্র'। নানান বয়সী গ্রামের ছেলেরা সবাই জড়ো হয়েছে সেখানে। সকাল-বিকেল দু বেলা চলছে নানান

ব্লকের ব্যায়াম। সন্ধ্যায় বসছে যাত্রাগানের আসর।

তারিণী বড়-একটা আসে না এদিকে। নবদ্বীপ সেদিন সন্ধ্যায় টেনে নিয়ে এল তাকে। শঙ্করকে বললে, "তা এ-সব করেছ ভালই করেছ।"

নবদ্বীপ বললে, "ভাল, না, ছাই! আমার ভাগনেটা ভাত-টাত খেতে পারত না, এখন দু বেলায় আধ সের চাল বেমালুম উড়িয়ে দিচ্ছে।"

তারিণী বললে, "তুইও লেগে পড় না! গায়ে গতরে একটু মাংস লাগবে।"

"সে কি আর জিজ্ঞাসা করিনি ভেবেছ? আমাকে বলেছে নেবে না।"

"কেন?"

"জানি না। ওই ওকেই জিজ্ঞাসা কর।"

জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন হল না। কার্তিক বললে, "ধেৎ, ও যে গাঁজা খায়।"

নবদ্বীপ বললে, "ওই শোন!"

বলেই সে কথাটাকে অন্য দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেল। বললে, "দেখা হল রাখহরির সঙ্গে। শঙ্করের ওপর কী রাগ! বলে, ওই ছোঁড়াটাকে গাঁ থেকে যদি না তাড়াই ত আমার নাম রাখহরি নয়। আর কী বললে জান? বললে, তারিণী কিছু করতে পারবে না, যদি কিছু করি ত আমিই করব।"

তারিণী বললে, "ও সব করবে! পাঁচ বছর ধরে একটা ইস্কুল করতে পারেনি।"

শঙ্করের দিকে তাকিয়ে বললে, "তোমরা বরং সেই চেষ্টা করলে পারতে। জল কাদা ভেঙে ক্রোশখানেক দূরে কামারহাটিতে ছেলেরা যেতে চায় না।"

শঙ্কর বললে, "তার আগে আমাদের প্রোগ্রাম একটা রাস্তা তৈরি করা।"

তারিণী বললে, "তার অনেক খরচ, অনেক হাঙ্গামা, সে তোমরা পারবে না।"

শঙ্কর বললে, "আপনি একটু দয়া করবেন, তা হলেই পারব।"

সত্যি সত্যিই রাস্তা তৈরি আরম্ভ হয়ে গেল।

গ্রাম থেকে সোজা একটি রাস্তা শহরের রাস্তায় গিয়ে মিশবে। দড়ি ধরে মাপজোক করে তার প্রাথমিক আয়োজন শেষ হতে দেরি হল না। সারা গ্রামের ছেলেছোকরার দল সমবেত হল শক্তিকেন্দ্রের প্রাঙ্গণে। সারি দিয়ে দাঁড়াল তারা। হাতজোড় করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে, শপথবাক্য উচ্চারণ করলে, তারপর প্রতিজ্ঞাপত্র সই করে ঝাঁপিয়ে পড়ল এই বিরাট কর্মযজ্ঞে। দুঃসাধ্য-সাধন-ব্রত গ্রহণ করেছে তারা। ভগবান শক্তি দাও!

চমৎকার একটি গান রচনা করে দিয়েছে শঙ্কর। সেই গান গেয়ে গেয়ে তারা কাজ করতে লাগল।

নিতান্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও বাদ গেল না। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে শিশু-বাহিনী। ছোট ছোট বালতিতে জল নিয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্রান্ত কর্মীদের মুখের কাছে তারা তুলে ধরছে পিপাসার জল।

জয়া সেদিন পুকুরের পাড়ে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে এল এদের কাজ। বাড়িতে এসেই বললে,

"বাবা, দেখেছ?"

"কী দেখব?"

"ছেলেরা কেমন রাস্তা তৈরি করছে।"

রাখহরি বললে, "ও আর দেখতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি।"

"কী বুঝতে পেরেছ বাবা?"

রাখহরি বললে, "এখান থেকে চলে গিয়ে আমার মেলা ভেঙে দিয়ে যে বেআইনী কাজ ও করেছে তার জন্য ওকে আমি জেলে পুরে দিতে পারতাম তা ও জানে। এখনও সে ভয় ওর আছে। তাই লোক-দেখান একটা ভাল কাজের ছুতো করে লোক-জনকে বোঝাতে চাচ্ছে যে, উদ্দেশ্য ওর মন্দ নয়।"

জয়া বললে, "তা হক বাবা, তবু দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।"

রাখহরি রাগ করে বললে, "তোরা দেখগে যা। কাঠবিড়ালী সাগর বাঁধছে! ও কিছু হবে না শেষ পর্যন্ত। এই আমি বলে রাখলাম।"

জয়া চলে যেতেই বিশ্বনাথ এল।

সেদিন পুকুরের পাড়ে একটা গাছের তলায়...

রাখহরির প্রতিবেশী বিশ্বনাথ। বললে, "বসে বসে ঘুমচ্ছ তুমি রাখহরি, এদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেল।"

রাখহরি হাসতে লাগল। বললে, "কী সর্বনাশ?"

বিশ্বনাথ বললে, "সারা গাঁয়ের সর্বনাশ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো কেউ বাপ-মায়ের কথা শুনছে না। কী জাদুমন্ত্রে যে ভুলিয়েছে ওই ছোঁড়াটা কে জানে! ওকে তুমি জব্দ করে দিতে পারছ না?"

রাখহরি বললে, "শুনছি ওরা রাস্তা তৈরি করছে। তুমি দেখেছ?"

বিশ্বনাথ বললে, "দেখেছি মানে? এই ত সেখান থেকেই আসছি। তা বাহাদুরি আছে ছেলেগুলোর। রাস্তা অনেকখানি করে ফেলেছে।"

রাখহরি বললে, "দাঁড়াও না! রাস্তা যেদিক দিয়েই যাক, আমার জমির ওপর দিয়েই যেতে হবে। তারিণীর ছেলেটো সেদিন এসেছিল বলতে। দিক না একবার আমার জমিতে—"

কথাটা বিশ্বনাথ তাকে শেষ করতে দিলে না। বললে, "চারকুড়োর জমি কার? তোমারই ত?"

"হ্যাঁ আমার।"

"বাস, হয়ে গেছে।" বিশ্বনাথ বললে, "তোমার জমির ওপর দিয়েই নিয়ে গেছে রাস্তাটা।"

রাখহরি জিজ্ঞাসা করলে, "কতটা আন্দাজ গেছে?"

"তা দু হাত আড়াই হাত হবে। তোমার জমির আল-বরাবর।"

রাখহরি বললে, "আচ্ছা। তুমি এখন যাও, আমি দেখছি।"

পরের দিন সকালে কাজ করতে গিয়ে ছেলেরা থমকে দাঁড়াল। শঙ্কর, কার্তিক—দুজনে ছিল সবার আগে। দেখলে, তৈরি রাস্তা ভেঙে অনেকখানি জায়গা একেবারে ছুই ছত্রাকার করে দেওয়া হয়েছে।

টেকসই ও আরামপ্রদ পোষাকের জন্যে
প্রয়োজনী
টেলার্স
৩৩বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা - ৯
(সি ৮৯৩৬)

শঙ্কর কার্তিকের মুখের দিকে তাকালে। কার্তিক বললে, "আমি বুঝেছি এ কার কাজ। চললাম আমি, ওকে একবার দেখছি।"

কার্তিক চলে যাচ্ছিল, শঙ্কর তার হাতটা চেপে ধরলে।

"না, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও শঙ্করদা। আমাদের এত কষ্টের তৈরি রাস্তা এমনি করে ভেঙে দেবে?"

শঙ্কর বললে, "ভাঙুক।"

"তুমি জান না শঙ্করদা, লোকটা শয়তানের একশেষ। তোমাকে না জানিয়ে সেদিন রাত্রে আমি ওর পায়ে ধরে বলে এসেছিলাম। বলেছিলাম, সবাই দিয়েছে, এইটুকু জমি আপনি ছেড়ে দিন। আমাকে ও নিজের মুখে বলেছিল—নাওগে। আর এখন কিনা আমাদের গড়া কাজ দিলে ভেঙে!"

শঙ্কর বললে, "ভাঙুক। আজ ভেঙেছে, কালও হয়ত ভাঙবে, কিন্তু পরশু আর ভাঙতে পারবে না। হাত কাঁপবে। ওরা ভাঙুক। আমরা গড়ে যাই। দেখি শেষ পর্যন্ত কে জেতে!"

কার্তিক বললে, "রাখহরিকে কিছু বলব না?"

শঙ্কর বললে, "বলবি দেখা হলে। বলবি, এ রাস্তা একা আমাদের নয়, আপনারও। এরকম করে ভাঙবার হুকুম আপনি দিলেন কেমন করে তাই ভাবছি।"

কার্তিক বললে, "ধেৎ, অত মোলায়েম করে বললে কোন কাজই হবে না।"

শঙ্কর বললে, "হবে। ও'র একটা ছেলে যদি আমাদের সঙ্গে থাকত, তা হলে বোধ হয় একাজ উনি করতে পারতেন না।"

কার্তিক বললে, "ওর ছেলেই নেই। থাকবার মধ্যে আছে একটা ধাড়ী মেয়ে—জয়া।"

কিন্তু ছেলে যার আছে, সে কী করলে?

কার্তিকের বাবা তারিণীশঙ্কর সেদিন বসেছিল তার বাইরের ঘরে।

নবদ্বীপ বললে, "রাস্তাটা বাবু মন্দ করছে না। এ'টের ওপর কাপড় তুলে জলে-কাদায় এবার আর গপাং গপাং করে যেতে হবে না। ছোঁড়ারা কাজটা ভালই করছে, না, কী বল?"

তারিণীশঙ্কর বললে, "করবেই ত!" পুত্র-গর্বে একটু গর্বিত হল। বললে, "কেতো যে-কাজে হাত দেয় সে-কাজ ও শেষ না করে ছাড়ে না।"

বলতে বলতেই কার্তিক ঘরে ঢুকল। বললে, "বাবা, দখিন মাঠে আমাদের যে জমি আছে, এবার তার ওপর দিয়ে রাস্তাটা যাবে কিন্তু।"

নবদ্বীপ বললে, "বেশ ত। যাক না।"

তারিণী তাকে থামিয়ে দিলে। বললে, "তুই থাম।"

"থামলাম।" বলে নবদ্বীপ চুপ করে রইল।

তারিণী এইবার কার্তিককে নিয়ে পড়ল। বললে, "তুই কী রকম ছেলে রে? নিজের ক্ষতি নিজে করবি? তুই ত দলের চাঁই, তোর কথা সবাই শুনবে। রাস্তাটা রাখহরির জমির ওপর দিয়ে নিয়ে যা।"

কার্তিক বললে, "ওর জমি যতটা নেবার নিয়েছি বাবা। রাস্তাটা সোজা নিয়ে যেতে হবে ত!"

"তার কি কোনও বাঁধাধরা নিয়ম আছে নাকি? বেঁকেই না হয় গেলি?"

কার্তিক এবার বোধ হয় রাগ করলে। বললে, "তার মানে—জমি তুমি দেবে না?"

তারিণী বললে, "না, ও-জমি আমি দেব না। জলার ধারের ও-জমি আমার ডাকলে সাড়া দেয়। বেঁকে যেতে না পার, রাস্তা তৈরি বন্ধ করে দাও।"

বিদূষক নবদ্বীপ বলে উঠল, "সেই ভাল। বন্ধ করে দাও। চিরদিন আমরা জলে কাদায় হেঁটেছি বাবা, এখনও হাঁটব।"

"তুমি থাম।" বলে রেগেই চলে গেল কার্তিক।

নবদ্বীপ বললে, "রেগে গেল যে?"

তারিণী বললে, "তা যাক।"

ওদিকে আর-এক সমস্যা। বেলমার ডাঙা থেকে কাঁকর আর পাথর আনতে হবে। গরুর গাড়ি চাই।

ময়নাবুনির প্রত্যেকটি মানুষ চাষী গৃহস্থ। এক-আধখানা বাড়ি ছাড়া প্রায় সব বাড়িতেই গরুও আছে, গাড়িও আছে। আর প্রত্যেক বাড়ির ছেলে আছে শঙ্করের দলে। সবাই 'শান্তি কেন্দ্রে'র সদস্য। গরুর গাড়ির অভাব হল না। তিরিশ জোড়া গরুর গাড়ি বেরিয়ে এল ময়নাবুনির রাস্তায়।

কাজ বন্ধ রইল দুদিন। শঙ্কর আর কার্তিক দুজনেই সেই গরুর গাড়ি চড়ে বেলমা গেল। বেলমার ডাঙার যিনি মালিক তাঁর অনুমতি চাই।

অনুমতি পেতে দেরি হল না। কাঁকর-পাথরের প্রকাণ্ড ডাঙা। ডাঙার মালিক বৃদ্ধ শশধরবাবু তখন শুনেছেন যে, ময়না-বুনির ছেলেরা একজোট হয়ে নিজেরাই রাস্তা তৈরি করছে। শঙ্কর আর কার্তিকের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "এইত চাই! কাঁকর পাথর আমি নিশ্চয়ই দেব, কিন্তু দড়ি ধরে মেপে কেটে নিতে হবে বাবা। এলোপাথাড়ি যেখানে-সেখানে গর্ত করে নিলে চলবে না। গাড়ি ত আনছ অনেক, কিন্তু কাটবার লোক কোথায়?"

শঙ্কর বললে, "আপনি দেবেন।"

হো-হো করে হেসে উঠলেন তিনি।—"আরে, আরে, এ বলে কী? আমি দেব?"

কার্তিক বললে, "এইটুকু সাহায্য আপনি করুন আমাদের। তারপর আপনার কী উপকার করতে হবে বলবেন। আমরা সবাই মিলে এসে করে দিয়ে যাব।"

"উপকার?" শশধরবাবু বললেন, "রাস্তা তৈরি শেষ হলে আমাকে জানিও। তোমাদের সবাইকার নেমন্তন্ন রইল। পেট ভরে একদিন খেয়ে যাবে আমার বাড়িতে। তা হলেই আমার উপকার করা হবে।"

চমৎকার মানুষ শশধরবাবু। নিজের খরচে গাড়ির পর গাড়ি কাঁকর পাথর বোঝাই করে দিতে লাগলেন।

এমন একদিন নয়।

দিনের পর দিন।

আর এদিকে তারিণীশঙ্কর প্রতিজ্ঞা করে বসেছে—জমি সে কিছুতেই দেবে না।

শঙ্কর বললে, "জমি যখন উনি কিছুতেই দেবেন না, তখন আমরা যদি তাঁর অমতেই রাস্তাটা সোজা ওই জমির ওপর দিয়েই নিয়ে যাই, কী হয়?"

কার্তিক বললে, "তুমি চেনো না আমার বাবাকে, তাই একথা বলছ।"

শঙ্কর বললে, "কেন? উনি কি তোর নামে মামলা করবেন, না, রাস্তাটা ভেঙে দেবেন?"

"না, মামলাও করবে না, রাস্তাও ভাঙবে না, জমির শোকে আমার মাথা ভাঙবে, নয়ত নিজের মাথাটাই ভেঙে ফেলবে।"

শঙ্কর বললে, "তা হলে কি রাস্তাটা বেঁকিয়ে নিয়ে যাব হরি মোড়লের জমির ওপর দিয়ে?"

কার্তিক বললে, "না, তা হয় না। রাখহরি আমাদের গায়ে থুতু দেবে। লজ্জায় মাথা কাটা যাবে আমাদের।"

"তা হলে উপায়?"

কার্তিক বললে, "উপায় একটা আছে। বাবাকে আমি চিনি। টাকা দিয়ে জমিটা কিনে নেব বাবার কাছ থেকে।"

"টাকা পাবি কোথায়? এখন উনি আমাদের গরজ বুঝে বেশী টাকা চাইবেন।"

"যত বেশীই চান—এক হাজার টাকার বেশী হবে না।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "হাজার টাকা আছে তোর?"

"তার চেয়েও কিছু বেশী আছে। গড়-গড়ির মেলায় আমি জুয়োর কারবারে লাভ করেছি আড়াই হাজার টাকা।"

কার্তিক বললে, "গাঁয়ের লোকের টাকা গাঁয়ের কাজে লেগে যাক।"

শেষ পর্যন্ত তাই হল।

কিন্তু হল একটু অভিনব উপায়ে।

তারিণীশঙ্কর কী যেন লিখছিল বসে বসে। সুমুখে একটা লণ্ঠন জ্বলছিল।

ঘরে ঢুকল শঙ্কর। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

মুখ তুলে শঙ্করকে দেখেই তারিণী বলে উঠল, "জানি তুমি কী জন্যে এসেছ। ও-জমি আমি দেব না। কেতোকে ত আমি বলে দিয়েছি। আমার মুখে দু কথা নেই। এতে তোমাদের রাস্তা হক আর না-হক।"

শঙ্কর বসল সুমুখের মোড়াটা টেনে নিয়ে। বসতে বসতে জোরের সঙ্গেই বললে, "আজ্ঞে না, রাস্তা আমাদের হবেই।"

কথাটা শুনে তারিণী আনন্দিত হল। বললে, "বুঝেছি। তা হলে রাখহরির জমির ওপর দিয়েই রাস্তাটা নিয়ে যাবে ঠিক করলে? ভাল, ভাল। ও পরামর্শ আমি দিয়েছি। বেশ চ্যাটালো করে নিয়ে যাবে। যাক না একটু বেঁকে। রাস্তা ত!"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে না, বেঁকে যাবে না। রাস্তা সোজাই যাবে। আমরা ঠিক করেছি—আপনার জমির যা দাম হয়, আমরা দিয়ে দেব।"

তারিণী একটু বিস্মিত হল কথাটা শুনে। বিস্মিত হবার কথাই। কেতোর মুখে শুনেছে তাদের টাকা নেই, এমনকি কাঁকর পাথর কাটাইয়ের খরচের জন্যে বেলমার শশধরের হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে এসেছে তারা—সে-কথাও তার কানে এসেছে।

তারিণী ভাল করে তাকালে শঙ্করের দিকে। কথাটা শুনেছে ত ঠিক?

"দাম দিয়ে দেবে? ওই জমির? পারবে কেন হে? ও-জমি আমার সবচেয়ে সরেস জমি—ডাকলে কথা কয়। ওর দাম তোমরা দিতে পারবে কেন?"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "দাম কত হবে?"

তারিণী একটু ভাবলে। ভেবে বললে, "কেতোর মুখে যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে যেন যে-কটা মাঠের ওপর দিয়ে রাস্তাটা তোমরা নিয়ে যাচ্ছ, সব মিলিয়ে বিঘে-দুইয়েক হবে। তা এই দু বিঘের দাম আমি একটি হাজার টাকার এক পয়সা কম নেব না।"

কথাটা শোনামাত্র শঙ্কর তার পকেট থেকে একতাড়া দশ টাকার নোট বের করে গুণতে লাগল।

এতগুলো নোট শঙ্করের হাতে দেখে তারিণীর চোখ ত ছানাবড়া!—"এত এত টাকা কোথায় পেলে হে? চুরি ডাকাতি করলে নাকি কোথাও?"

সে-কথায় কানই দিলে না শঙ্কর। গোনা শেষ করে নোটের তাড়াটা তারিণীর হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললে, "গুনে নিন।"

তারিণী আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল ঠিক মনে করতে পারলে না। একটি হাজার টাকা নগদ। যে-জমিটার উপর ছোঁড়ারা দড়ি ফেলছে সেটা দু বিঘে ত হবেই না, তা ছাড়া ও-জমিতে ধানও ভাল হয় না। তারিণী নোটের তাড়াটা বেশ করে ঠুকে ঠুকে সমান করে নিয়ে কাঠের হাত-বাক্সটার উপর নামালে, তারপর বাঁ হাত দিয়ে চেপে, ডান হাতের আঙুলে থুতু লাগিয়ে, সে এক অদ্ভুত উপায়ে পট্ পট্ শব্দ করতে করতে নিমেষের মধ্যে গুণে ফেললে নোটগুলো। একখানা নোট তাড়া থেকে টেনে বের করে লণ্ঠনের আলোয় তুলে ধরে দেখলে, নকল কিংবা অচল কিনা! কিন্তু এই এতগুলো নোটের ভিতর মাত্র একখানা নোট দেখলে চলবে না। তাসের মত আঙুল দিয়ে ফর ফর করে উল্টে যেতেই হঠাৎ তার নজর পড়ল একখানা নোটের উপর। টেনে সেই নোটখানা বের করে আবার আলোর সামনে তুলে ধরলে তারিণীশঙ্কর। দেখলে, তার সাদা অংশে টকটকে লাল কালিতে লেখা : রাখহরি বন্দ্যোপাধ্যায়। নোটখানা চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এ নোটগুলো তোমরা কোথায় পেলে বলতে হবে।"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে না, ও-কথাটা আর জিজ্ঞাসা করবেন না।"

"কেন হে? তোমরা আমার ছেলের মত, তা ছাড়া টাকা বলে কথা। জিজ্ঞাসা করব না?"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে না। বারণ আছে।"

তারিণী এবার যেন লাফিয়ে উঠল, "বারণ আছে? তা হলে ত শুনতেই হবে।"

শঙ্কর কিছুতেই বলতে চায় না।—"আজ্ঞে না, শুনে কাজ নেই। শেষকালে যদি চটে যান!"

"না না চটব না। তুমি বল।"

শঙ্কর বললে, "কথাগুলো যে ভাল নয়! এই যেমন ধরুন, আপনি চামার, আপনি ছোটলোক, আপনি কেপ্পন, আপনি জোচ্চোর,—কী নন আপনি?"

কথাগুলো শ্রুতিমধুরও নয়, প্রীতিকরও নয়, তবু শুনলে তারিণী। শুনতে শুনতেই মুখের চেহারা তার অন্যরকম হয়ে গেল। রাগে তার শরীরটা মনে হল যেন কাঁপছে। বললে, "কে বলেছে এই সব কথা?"

"এই দেখুন, আপনি চটে যাচ্ছেন! এই জন্যেই আমি বলতে চাইনি।"

তারিণী জেদ ধরে বসল : "না, তোমাকে বলতেই হবে। বল কে বলেছে।"

শংকর এতক্ষণ পরে বললে, "বলেছেন রাখহরিবাবু।"

তারিণী চিৎকার করে উঠল, "রেখো বলেছে?"

শংকর বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, বলেছে। আরও যে-সব কথা বলেছে—সেগুলো মুখে উচ্চারণ করা যায় না। কানে আঙুল দিতে হয়। বলেছে—জমির দাম না পেলে ও চামার কখনও এক ছটাক জমি ছাড়বে না। এই বলে এই নোটগুলো আমার হাতে দিয়ে বললেন, "যাও, এবার ওই চামারটার মুখের ওপর এইগুলো ছুঁড়ে মেরে দাওগে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"ঠিক হওয়াচ্ছি!" বলেই নোটগুলো শংকরের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে তারিণী বললে, "ধর। তাই ত বলি, ও-হারামজাদা ছাড়া নোটের ওপর নাম কে লিখে রাখবে? নোটগুলো যেন ওর বাপুতি সম্পত্তি। দেখ, তুমি এক্ষুনি চলে যাও ওর কাছে।"

শংকর বললে, "যাব?"

তারিণী বললে, "নিশ্চয় যাবে। গিয়ে ওই নোটগুলো রেখোর মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরে দেবে। তারপর যেরকমভাবে ও আমাকে গালাগালি দিয়েছে তার তিনগুণ গালাগালি ওকে শুনিয়ে দিয়ে বলবে—তারিণী মুখুজ্যে কখনও রেখোর টাকার তোয়াক্কা করে না। যাও।"

শংকর একটু বিপদে পড়ল। বললে, "যাচ্ছি। কিন্তু আপনার জমিটার কী হবে? টাকা ত উনি ওই জমির জন্যেই দিয়েছেন।"

তারিণী বললে, "তুমি আচ্ছা বোকা ত? টাকাগুলো ওর মুখের ওপর ফেলে দিয়ে ওকে শুনিয়ে দিয়ে আসবে—শুধু জমি কেন, তোমাদের ওই রাস্তা তৈরি করবার যাবতীয় যা কিছু খরচ—সব হাম দেঙ্গা। তারিণী মুখুজ্যে চুনো পুঁটি নেহি হ্যায়।"

শংকর খুশী হয়ে উঠে দাঁড়াল।—"আমি এক্ষুনি ওকে অপমান করে দিয়ে আসছি দেখুন। আমি জানি লোকটা ভাল নয়। নইলে দেখলেন না, আমি ওর কাছে দুটো দিন থাকতে পারলাম না! মেলাটা ভেঙে দিলাম।"

"এই সুযোগে তুমি তার প্রতিশোধ নিয়ে নাও।"

শংকর বললে, "ঠিক বলেছেন। কার্তিককে তখন বললাম আমি যাব না লোকটার কাছে। কার্তিক কিছুতেই ছাড়লে না। বললে, "বাবা যখন জমিটা দেবেই না, তখন রাখহরির কাছে হাত আমাদের পাততেই হবে।"

তারিণী বললে, "কেত্তোটা ছোটলোক।"

ছোটলোক কেতো অন্ধকারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল তার বাপের কথাবার্তা। হাসি কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিল না সে। যেই দেখলে শংকর উঠে দাঁড়িয়েছে, মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কার্তিক একেবারে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল।

শংকর এসেই নোটের তাড়াটা তার হাতে দিয়ে বললে, "নে, রাখ।"

কার্তিক বললে, "খুব ভাল অভিনয় করেছ শংকরদা।"

শংকর বললে, "নোটের ওপর রাখহরির নামটা কী জন্যে লিখে রেখেছিলাম এখন বুঝতে পেরেছিস?"

"পেরেছি। এবার যাও একবার রাখহরির বাড়িতে। টাকাগুলো ফিরিয়ে দিয়ে এস।"

শংকর বললে, "তোর টাকা। তুই যা।"

কার্তিক বললে, "যাব, যদি না আবার আমাদের রাস্তা ভাঙতে যায়!"

শংকর বললে, "এ কদিন যখন যায়নি, তখন আর বোধ হয় যাবে না।"

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সেই দিনই রাত্রে রাখহরির দলবল গিয়ে হাজির। দিন-পাঁচেক আগে যে-জায়গাটা তারা ভেঙে ফেলেছিল, গিয়ে দেখলে, সেটা আবার মেরামত করে নিয়েছে ছেলেরা। রাস্তাটা আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে থেমেছে একেবারে তারিণীশংকরের জমির মাথায়। রাখহরি এবার নিজে যায়নি, বিশ্বনাথকে পাঠিয়েছে। বিশ্বনাথ তার ভাইকে সঙ্গে নিয়েছে। আর নিয়েছে দশজন মজুর। প্রত্যেকের হাতে গাঁইতি আর টামনা। দুটি মাত্র লণ্ঠন। একটি বিশ্বনাথের হাতে, আর একটি তার ভাইয়ের হাতে।

বিশ্বনাথ তার হাতের লণ্ঠনটি তুলে ধরে মজুরদের হুকুম করলে, "ওই যে ছোট একটা গাছ রয়েছে রাস্তার ধারে, ওইখান পর্যন্ত ভেঙে ফেলতে হবে।"

তার ভাই বললে, "দশজনের ভেতর তোরা ছজন গাঁইতি চালা, আর বাকী চারজন কাঁকর মাটি তুলে তুলে ওই মাঠের ওপর ছড়িয়ে দে।"

লোকগুলো চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। কেউ আর এগিয়ে গেল না।

বিশ্বনাথ বললে, "নে, তোরা দাঁড়িয়ে রইলি কেন? তাড়াতাড়ি ভেঙে দিয়ে টাকা নিয়ে চলে যা।"

তবু কেউ যেতে চায় না!

"বুঝেছি। বেশী টাকা নেবার মতলব? আচ্ছা বেশ, পঁচিশ টাকা চেয়েছিলি, পঁচিশ টাকাই দেব।"

ডোমন বাগদী এগিয়ে গেল। গিয়েই ঝপ করে একটা জায়গায় হাতের গাঁইতিটা দিলে বসিয়ে।

বিশ্বনাথ বললে, "সাবাস! এই ত চাই!"

ডোমন আবার তার গাঁইতিটা তুলে ধরলে, কিন্তু তুলে ধরে আর নামাতে পারলে না।

"কী হল? মা-কালীর মতন হাতটা তুলেই রইলি যে।"

ডোমন চলে এল। "না বাবু, এ-কাজ পারব না। ভাল লাগছে না।"

বিশ্বনাথ বলে উঠল, "মাথা-পিছু পাঁচ টাকা করে দেব। নে, লাগা।"

কে একজন বলে উঠল, "ধেৎ! চল রে চল্!"

বিশ্বনাথ এবার এগিয়ে এল একটা লোকের কাছে। বললে, "পাঁচ টাকাতেও হাত উঠছে না?"

লোকটা বললে, "না বাবু, টাকার জন্যে নয়। আমরা পারব না। এ-কাজ আগে বললে আসতাম না আমরা।"

এই বলে একে একে সবাই চলে গেল।

বিশ্বনাথ আর তার ভাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় বাইরের অন্ধকারটা মনে হল যেন আরও জমাট বেঁধে রয়েছে। ঝিঁঝিপোকা আর ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে ক্রমাগত। দূরে গ্রামপ্রান্তে একটা কুকুর কেঁদে উঠল যেন। বিশ্রী কান্না।

বিশ্বনাথের ভাই বললে, "চল দাদা, রাখুদাকে বলিগে, এখানে আর মিছেমিছি দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে?"

বিশ্বনাথ বললে, "চল। কিন্তু এই ব্যাটা ছোটলোকদের কীরকম বাড় বেড়েছে দেখেছিস? মুখের ওপর বলে দিলে—পারব না!"

সংবাদের জন্য রাখহরি বোধ করি উদ্‌গ্রীব হয়ে ঘরের ভেতর পায়চারি করছিল। বিশ্বনাথকে আসতে দেখেই জিজ্ঞাসা করলে "কী খবর?"

বিশ্বনাথ লণ্ঠনটা হাত থেকে নামিয়ে বসল একটা খাটের উপর। বললে, "উঁহু, ওদের দিয়ে হবে না। গেল দশটা টাকা।"

রাখহরি এই খবরটাই যেন শুনতে চাইছিল। হাসতে হাসতে বললে, "পারলে না?"

বিশ্বনাথ বললে, "না। ব্যাটারা পারব না বলে পালিয়ে গেল।"

"যাক্ গে। ওদের দিয়ে হবে না। ওটা উড়িয়ে দিতে হলে ডিনামাইট দরকার।"

বিশ্বনাথ বললে, "যা দরকার তাই কর।"

"তাই করব। তুমি এখন যাও। আমার কাজ আছে।"

জয়া বোধ হয় তার বাবাকে ডাকতে এসেছিল খাবার জন্যে। বিশ্বনাথ চলে যাবার পরেই সেও অন্ধকারে গা ঢেকে পালিয়ে গেল সেখান থেকে। বাবাকে আর ডাকলে না।

ছি-ছি, ডিনামাইটের কথা তার বাবা ভাবছে কেমন করে? লোকটা তার মেলা

ভেঙে দিয়েছে। শংকরের উপর রাগ হবার কথাই। তারও রাগ হয়েছিল. এখান থেকে না-বলে চলে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু মেলা ভেঙে দেবার পরেই যখন গ্রামের কলেরা বন্ধ হয়ে গেল, তখন আর রাগ-অভিমান কিছু রইল না শংকরের উপর।

সাবান দিয়ে সেদিন মাথা ঘষেছিল জয়া। চুলগুলো শুকবার জন্যে ছাদে গিয়েছিল। আলসের কাছে দাঁড়িয়ে হঠাৎ নজর পড়ল রাস্তাটার দিকে। ত্রিশ-চল্লিশ জোড়া গরুর গাড়ি ক্রমাগত কাঁকর আর পাথর ফেলে চলছে। ওদিকে গ্রামের ছেলেরা কাজ করছে। গ্রামের মজুরও রয়েছে কিছু কিছু। মাটি কাটার কাজটা ছেলেরা হয়ত ঠিক পারে না। তাই জনমজুর লাগিয়েছে টাকা দিয়ে। কিন্তু নিঃসম্বল, টাকা কোথায় পেলে?

অনেক দূরে কাজ করছে তারা। তাল-পুকুরটা ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে। এত দূরে থেকে মানুষগুলিকে ঠিক চেনা যায় না। জয়ার চোখ খুঁজছিল শুধু শংকরকে। হাজার মানুষের মাঝেও তাকে চিনতে ভুল করবে না জয়ার চোখ। ওই ত শংকর। হাতাকাটা একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে নিজেও কাজ করছে ছেলেদের সংগে। রাস্তা এগিয়ে চলেছে।

জয়ার চুল শুকিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। তবু সে ছাত থেকে নামতে পারলে না। মেয়েদের নেয় না কেন? গ্রামে ত অনেক মেয়ে আছে—যারা শুধু ভাত রাঁধে আর পড়ে পড়ে ঘুমোয়। জয়া অজ্ঞাতেই শাড়ির আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে ফেললে।

নীচে থেকে রাখহরি ডাকলে, "জয়া! চা হয়েছে?"

জয়া চমকে উঠল। এতক্ষণ নীচে নেমে গিয়ে চা তৈরি করা উচিত ছিল তার। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়ে দেখলে, চাকরটা উনন ধরিয়ে জল গরম করছে।

চমৎকার দেখাচ্ছে জয়াকে। চুলগুলো পিঠের উপর ছড়ানো, আঁটসাঁট জামার উপর গাছকোমরবাঁধা রঙিন শাড়ি। বাবাকে তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা তৈরি করে দিয়ে বললে, "বাবা, তুমি সেদিন বলছিলে ওদের রাস্তা তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে গেল। তারিণী ওর জমির ওপর দিয়ে রাস্তাটা যেতে বোধ হয় দিলে না।"

রাখহরি বললে, "তারিণীকে আমি চিনি না? আমি দিলাম বলে তারিণী দেবে ওর জমি নষ্ট করতে? রাস্তার কাজ ত এখন বন্ধ আছে।"

"চা খেতে খেতে তুমি একবার আসবে আমার সংগে?"

"কোথায়?"

"ছাতে।"

"চল।"
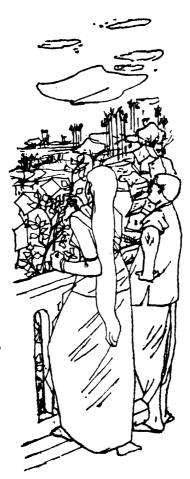
"কাজ বন্ধ হয়ে গেছে বলছিলে..."

জয়া তার বাবাকে ছাতে নিয়ে গিয়ে আঙুল বাড়িয়ে রাস্তাটা দেখিয়ে বললে, "কাজ বন্ধ হয়ে গেছে বলছিলে, দেখ।"

রাখহরি দেখলে, তারিণীর জমির উপর দিয়েই রাস্তাটা এগোচ্ছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবছিল রাখহরি।

জয়া বললে, "আর তুমি ভাবছ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবে।"

রাখহরি হঠাৎ যেন চমকে উঠল।—"তুই কোথায় শুনলি?"

জয়া বললে, "শুনেছি। তুমি একবার ভেঙে দিয়েছ, আবার ভেঙে দিতে চাও। এ-কথা সবাই জানবে, সবাই শুনবে।"

রাখহরি বললে, "না রে না, ও আমি এমনি বলেছিলাম বিশ্বনাথকে।"

"ফের যদি ওই কথা বলতে আসে বিশ্বনাথ ত আমি ওকে অপমান করে তাড়িয়ে দেব বাবা, তুমি তখন আমাকে যেন কিছু বোল না।"

রাখহরি চুপ করে তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে। একটি কথাও বললে না।

চাকরটা ডাকলে, "দিদিমণি!"

"ওমা ওকে এখনও চা দিইনি।"

এই বলে খালি কাপ-ডিশটা রাখহরির হাত থেকে নিয়ে জয়া নীচে নেমে গেল।

সেদিন সকালে কাজে যাবার সময় ছেলেদের সোজা রাস্তায় পাঠিয়ে দিয়ে শংকর কার্তিককে বললে, "আয়, আমরা একটু ঘুরে যাই।"

"কোনদিকে ঘুরে যাবে?"

"আয় না তুই আমার সংগে।"

বারোয়ারী চন্ডীমন্ডপের সুমুখ দিয়ে গিয়ে, রসিক মোড়লের বাড়ির পাশ দিয়ে যেই বাঁ দিকের রাস্তায় পা দিয়েছে শংকর, কার্তিকের বুঝতে বাকী রইল না কোনদিক দিয়ে সে যেতে চায়।

খানিকটা গিয়ে কার্তিক বেঁকে বসল। বললে, "তুমি একাই যাও, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।"

"কেন, তোর রাস্তা ত আর ভাঙেনি।"

"সুবিধে পায়নি তাই ভাঙেনি। একবার যে ভাঙতে পারে, আবার ভাঙতেই-বা তার কতক্ষণ!"

শংকর বললে, "সেই জন্যেই যাচ্ছি ওই পথে। যদি দেখা হয় ত কী বলে শুনব।"

কার্তিক বললে, "দেখা যদি না হয়?"

"দেখা না হলে চলে যাব।"

কার্তিকের হঠাৎ মনে পড়ল জয়ার কথা। হেসে জিজ্ঞাসা করলে, "জয়ার সংগে দেখা হলে কী করবে? সে যদি ডাকে?"

এবার শংকর একটু বিপদে পড়ে গেল। সেও মনে মনে সেই কামনাই করছিল। রাখহরির সংগে দেখা হক তা সে চায় না। সেও চায় জয়াকে একটিবার দেখতে। আর সেই জন্যই তার এ-পথে আসা।

কিন্তু মানুষ যা চায় সব সময় তা হয় না।

রাখহরির বাড়িটা তারা পার হয়ে চলে গেল। কারও সংগেই দেখা হল না।

হঠাৎ পেছনে ডাক শুনে থমকে থামল শংকর।

কার্তিক বললে, "তোমাকে ডাকছে, যাও।"

শংকর দেখলে বাইরের দিকের ছোট ছাতটার উপর রাখহরি দাঁড়িয়ে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললে, "শোন, তোমার সংগে কথা আছে।"

কার্তিক আবার বললে, "যাও, শুনে এস।"

"তুই যাবি না?"

"না।" কার্তিক চুপি চুপি বললে, "অমনি তোমার জয়াকে দেখে এস।"

শংকর হেসে তার গায়ে একটা চড় মেরে বললে, "যাঃ!"

শংকর ভেবেছিল রাখহরি তাকে মেলা ভাঙার কথা কিছু বলবে। হয়ত বা তিরস্কার করবে। কিন্তু কিছুই সে করলে না। সাদরে অভ্যর্থনা করে বললে, "বোস।"

শংকর বসতে বসতে বললে, "একটু তাড়াতাড়ি বলুন। কাজ আছে।"

রাখহরি বললে, "আমার বাড়ি একটু বসলেও কি তারিণী চটে যাবে?"

শংকর দেখলে, এই সুযোগ। বললে, "আজ্ঞে না। আপনাদের দুজনের ভেতরে ভেতরে যে এত রেশারেশি তা জানতাম না। যাকগে ও-সব কথা থাক, এখন বলুন, মেলাটা ভেঙে দিয়ে আমি ভাল কাজ কাজ করেছি কিনা। কলেরা একদম থেমে গেছে।"

রাখহরি বললে, "সে-কথা বলবার জন্যে আমি তোমাকে ডাকিনি। আমি জিজ্ঞাসা করছি—এই যে তোমরা রাস্তা তৈরি করছ, এত এত গাড়ি, এত এত কুলি মজুর টাকা পয়সা পাচ্ছ কোথায়?"

"এই দেখুন, আবার সেই কথা এসে পড়ল।"

শংকর বললে, "সেদিন একটা চাঁদার খাতা তৈরি করেছিলাম। ভেবেছিলাম কিছু চাঁদা তুলে খরচ চালাব। খাতার প্রথমেই লিখেছিলাম আপনার নাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, লজ্জায় আপনার কাছে আসতে পারিনি। তারিণীবাবুর কাছে খাতাটা নামিয়ে দিয়ে বললাম, 'আগে আপনি কিছু চাঁদা দিন।' খাতার পাতাটা উলটেই তিনি একেবারে লাফিয়ে উঠলেন।"

"কেন?"

শংকর বললে, "ওই যে আপনার নাম লিখেছিলাম সবার ওপরে। তারিণীবাবু খচাং করে আপনার নামটা কেটে দিলেন।"

রাখহরির মুখখানা কেমন যেন হয়ে গেল। গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, "তারপর?"

শংকর বললে, "তারপর আর না শোনাই ভাল। বললেন, খাতাটাই বরবাদ হয়ে গেল। রেখোটা চামার ছোটলোক, জোচ্চোর—"

জিব কেটে শংকর বললে, "এ-হে-হে-হে, আপনাকে এ-সব কথা বলা আমার অন্যায় হচ্ছে।"

রাখহরি বললে, "না না অন্যায় হয়নি। তুমি বল। আমি শুনব।"

শংকর বললে, "সেসব কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবেও না, সব কথা গুছিয়েও বলতে পারব না। বললেন, কোন ভাল কাজের জন্যে ও-ছোটলোকের কাছ থেকে তোমরা একটা আধলা পয়সাও বের করতে পারবে না, এই না বলে খাতার ওপরে আপনার নামটা যেখানে ছিল, সেইখানে চড় চড় করে নিজের নামটা লিখে বাকী সব নাম দিলেন কেটে। বললেন, কারও কাছে যেতে হবে না। তারিণী মুখুজ্যে বেঁচে থাকতে কেপ্পন কঞ্জুষ রাখহরির কাছে ভিক্ষে চাইতে হবে না। তোমাদের রাস্তা তৈরির সব খরচ আমি দেব।"

রাখহরি হেঁটমুখে চুপ করে সব শুনলে, তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালে শংকরের দিকে। বললে, "হুঁ। তারিণী বলেছে, আমি কৃপণ কঞ্জুষ, আমি ছোটলোক, আমি চামার! কোন ভাল কাজে আমি একটা আধলা পয়সাও দেব না।"

শংকর বললে, "এই দেখুন, আপনি চটে যাচ্ছেন।"

রাখহরি হঠাৎ যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল। বললে, "হ্যাঁ, চটছি, নিশ্চয়ই চটছি। দেখ, তোমার ওই চামার ছোটলোক তারিণী মুখুজ্জ্যেকে বলে দিও—না থাক। কিছু বলতে হবে না। তোমাকে পেয়েছে একটা কাজের লোক, তাই এ-সুযোগ ও হাতছাড়া করতে চায় না। কিছু টাকা খরচ করে তোমাদের দিয়ে ওই রাস্তাটা তৈরি করিয়ে নিয়ে খুব ঘটা করে একটা মিটিং করবে, সেই মিটিং-এর সভাপতি হবে এস ডি ও, আর না-হয় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সেইখানে তোমাকে দিয়ে বলাবে—যে কাজ রাখহরি ঘোষাল করতে পারেনি, সেই কাজ তারিণী মুখুজ্যে কারও কোন সাহায্য না নিয়েই করে ফেললেন। জনহিতকর কাজের জন্যে এত বড় স্বার্থত্যাগ, এ-রকম বদান্যতা—এই রকম সব বড় বড় কথা বলিয়ে রায়-বাহাদুর, নয়ত রায়সাহেব হবার মতলব। ও-সব আমি বুঝি।"

শংকর বললে, "আজ্ঞে না। এখন রায়-বাহাদুর, রায়সাহেব নেই, এখন দিশী খেতাব চলবে।"

"ওই একই কথা। দেখ, তুমিই না বলেছিলে—গাঁয়ে ভাল ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, বিনা চিকিৎসায় লোক মরে যায়—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সে-কথা আমাকে বলতে হবে কেন, আপনি সবই ত জানেন।"

"জানি, সবই জানি।" রাখহরি বেশ দম্ভের সংগেই বললে, "এবার ওই চামারটাকে ভাল করে জানিয়ে দেব—রাখহরি ঘোষাল ভাল কাজে খরচ করতে জানে। বলি ও হতভাগা তেরো, গ্রামের সব লোক যদি চিকিচ্ছে অভাবে মরেই যায় ত তোর ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটবে কে? শোন, তোমাদের ওই রাস্তার ধারে আমার বিঘে-দশেক জায়গা আছে, ওইখানে আমি একটা ডাক্তারখানা—মানে হাসপাতাল করে দেব। তারিণী মুখুজ্যেকে দেখিয়ে দেব—রাখহরি ঘোষাল ভাল কাজে খরচ করতে পারে। রাখহরি ওর মতন মুখ্খু নয়।"

তারিণীর কানে গিয়ে কথাটা উঠল। শুনলে রাখহরি তাকে নাকি মুর্খ বলেছে।

রাখহরির এক পিসেমশাই ছিলেন বর্ধমানের উকিল। তাঁরই বাড়িতে থেকে রাখহরি বি-এ পর্যন্ত পড়েছিল। এই তার অহংকার। গ্রামের মধ্যে কলেজে-পড়া লোক একমাত্র রাখহরি। তার উপর বাঁকুড়ায় মামার বাড়িতে থেকে মেয়েটা তার আই এ পাস করেছে।

সেদিক দিয়ে তারিণীর কিন্তু অহংকার করবার কিছু নেই। নিজে যদি-বা ঘরের খেয়ে বেলুমার ইস্কুলে পড়েছিল কিছুদিন, ছেলে কার্তিক আবার ইংরেজীতে নামটা পর্যন্ত সই করতে পারে না।

তারিণীর রাগ হল শুধু শংকরের কাছে কথাটা ফাঁস হয়ে গেল বলে। শুনে অবধি সে চেঁচাতে লাগল, "ওরে হতভাগা রেখো, গাঁসুদ্ধ সবাই ত মুখ্খু। পারিস সেই মুখ্খুদের লেখাপড়া শেখাতে? সে-কাজ রাখহরির হিম্মতে হবে না। হয় যদি ত হবে এই তারিণী মুখুজ্জ্যের পয়সায়। তা হলে শোন শংকর, ছেলেদের ইস্কুল একটা আমাদের গাঁয়ে হবেই। আমি করব একটা মেয়েদের ইস্কুল। তুমি যেখানে রয়েছ, আমার ওই বাগানবাড়ির পাশে একতলা যে-বাড়িটায় আজকাল আমার খামারবাড়ি ওই বাড়িটা মেরামত করিয়ে রঙচঙ করে দিলেই ত বাস, ফার্স্টক্লাস ইস্কুল হয়ে যাবে লাগাও তুমি এই কাজ। রাস্তাও তৈরি হক ওটাও চলুক।"

কয়েকদিন পরেই দেখা গেল, রাখহরি সত্যি-সত্যিই কাজ আরম্ভ করে দিলে তার ডাক্তারখানার। উত্তর দিক থেকে গ্রামে ঢুকতেই নতুন যে রাস্তা তৈরি হচ্ছে, তারই পাশে ভিত খোঁড়া হল। ভিত খোঁড়ার দিন সামান্য একটুখানি আয়োজন করেছিল রাখহরি। একজন পুরোহিত এল ভিত পুজো করবার জন্যে। জনগণের কল্যাণ কামনায় উৎসর্গ করা হল এই দাতব্য চিকিৎসালয়। রাখহরির মৃতা স্ত্রীর নামে নাম দেওয়া হল সার্বজনী সেবা সদন।

জয়ার আজ আনন্দের সীমা নেই। লাল চওড়া পাড় গরদের শাড়ি পরেছে। মাথার চুল খোলা। সর্ব অংগে তার শুচিস্নিগ্ধ পবিত্রতা।

কার্তিক আছে রাস্তার কাজে। শংকর এসে দাঁড়িয়েছে এইখানে। জয়া আজ শংকরের পাশে এসে দাঁড়াতে পেরেছে—এইতেই তার আনন্দ।

পুজো শেষ হল। জয়া শাঁখ বাজালে।

শংকর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। জয়া হাসতে হাসতে তার কাছে এসে দাঁড়াল।

শংকর বললে, "আজ তোমাকে ভারি সুন্দর মানিয়েছে। বেশ কেমন দেবদাসী দেবদাসী মনে হচ্ছে।"

জয়া বললে, "রক্ষে করুন! মানুষের দাসী হতে পারি না, দেবতার দাসী! কী যে বলেন!"

"না না সত্যি বলছি, কেমন যেন পুজোরিণী পুজোরিণী ভাব।

জয়া বললে, "থাক, আপনাকে আর সত্যি বলতে হবে না। আপনি মিথ্যের রাজা।"

শংকর ভাবলে, জয়া রসিকতা করছে। সেও তেমনি হাসতে হাসতে বললে, "যাক, আজ একটা নতুন কথা শুনলাম।"

জয়া বললে, "আজ আপনাকে একটি প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে। করব? নেবেন আমার প্রণাম?"

"বাঃ রে, মিথ্যের রাজাকে প্রণাম করবে?"

জয়া বললে, "হ্যাঁ, করব। মিথ্যে দিয়ে আপনি একটা কাজের মত কাজ করেছেন। কার্তিকের বাবাকেও বুঝি এমনি করে তাতিয়েছেন?"

শংকর এবার হাসতে গিয়েও হাসতে পারলে না। বুদ্ধিমতী এই মেয়েটির দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

জয়া বললে, "না ও-রকম করে তাকাবেন না। ও-চাউনি আমি সহ্য করতে পারি না।" বলেই সে মাথা নামিয়ে চট করে পায়ে হাত দিয়ে একটি প্রণাম করলে শংকরকে।

মাথার চুলগুলো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুখের উপর, হাত দিয়ে চুলগুলো সরিয়ে জয়া উঠে দাঁড়াল।

শংকর জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি এ-সব জানলে কেমন করে?"

জয়া বললে, "বাবার মনটা আমি তৈরি করে রেখেছিলাম, তারপর আপনি এসে কাজ হাসিল করে ফেললেন।"

রাখহরিকে সেইদিকে আসতে দেখে শংকর চুপিচুপি বললে, "চুপ। তোমার বাবা আসছেন।"

রাখহরি ডাকলে, "শংকর, এইবার ডাক তোমার ছেলেদের। খাবার হয়ে গেছে। খেয়ে নিক।"

জয়া শংকরের কাছ থেকে সরে গেল না তার বাবাকে দেখে। বরং দিব্য সহজ কণ্ঠে বললে, "আপনাকে ডাকতে হবে না, আমি ডাকি।"

শংকর বলে উঠল, "তুমি ডাকবে কেন?"

জয়া বললে, "গ্রামের ছেলেরা রাখহরির বাড়িতে খিচুড়ি মাংস খেয়ে এল—তারিণী-বাবুর কাছে এইটেই সাংঘাতিক খবর। তার ওপর আপনি নিজে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়ালেন—এ-বদনাম আপনার হবে কেন? আমিই ডাকি।"

বলেই সে হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছিল, আবার ফিরে দাঁড়াল, বাবা না শুনতে পায় এমনিভাবে চুপিচুপি বললে, "কী মিথ্যে দিয়ে তারিণীবাবুর কাছে এইটেকে চাপা দেবেন ভেবে ঠিক করে নিন।"

জয়া যা বলেছিল ঠিক তাই হল।

হাসপাতাল না ছাই, ওষুধ বিক্রি করে লাভ করবার মতলবে রাখহরি ছোট একটা ডাক্তারখানা করবে হয়ত। তারই ভিত খোঁড়া হল। তা হক। তাই বলে রাস্তা তৈরি করছে গ্রামের যে-সব ছেলে, তারা গিয়ে রাখহরির বাড়িতে পাতা পেতে খিচুড়ি আর মাংস খেয়ে এল—সে আবার কী রকম কথা? শংকর রাজি হল কেমন করে?

নবদ্বীপ বললে, "আমি দাঁড়িয়েছিলাম তালপুকুরের কাছে। তা আমাকে একবার ডাকলেও না। মাংসটা খুব ভাল হয়েছিল, আবার শুনেছি নাকি এক-একজনে এই এত-এত—"

শুনতে রাখহরির ভাল লাগছিল না। কথাটা তাকে শেষ করতে না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কেতো খেয়েছে?"

নবদ্বীপ বললে, "না না, কার্তিক খাবে না রাখহরির বাড়িতে। তাই খেতে পারে কখনও?"

"কেন পারে না? হ্যাঁ বাবা, আমি খেয়েছি, শংকরদা খেয়েছে।"

বলতে বলতে কার্তিক এসে দাঁড়াল।

নবদ্বীপ বললে, "এই দেখ, একা তাহলে আমিই বাদ পড়লাম!"

শংকর এল হাসতে হাসতে। বললে, "না, তুমি বাদ পড়বে না। এবার যেদিন পোলাও-মাংস খাওয়াবে সেই দিন তোমাকে ডাকব। যাও দেখি তুমি এখান থেকে, একটু সরে যাও। আমাদের একটা গোপন পরামর্শ আছে।"

এই বলে নবদ্বীপকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে শংকর বললে, "বাছাধন এবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। রাখহরি ভেবেছে, রাস্তাটা তৈরি করিয়ে আপনি সরকার থেকে একটা খেতাব-টেতাব পেয়ে যাবেন। কাজেই সেও একটা কিছু করতে চায়।"

"কী করবে?"

"বলছে ত—হাসপাতাল করব।"

তারিণী বললে, "হাসপাতাল করবার টাকা আছে?"

শংকর বললে, "তা আমি কেমন করে বলব বলুন।"

তারিণী বললে, "কয়েক পাঁজা পোড়ানো ইঁট ওর আছে, শহর থেকে নাহয় সিমেন্ট আনলে, লোহা আনলে, রাজমিস্ত্রী আনলে, —বিল্ডিং না হয় হল। কিন্তু শুধু বিল্ডিং হলেই ত হবে না।"

"আজ্ঞে না, ওষুধপত্র চাই, ডাক্তার চাই, নার্স চাই—"

"মাসে মাসে কমপক্ষে—"

"পাঁচ হাজার টাকা ত চাইই।"

তারিণী বললে, "ওই টাকা ও খরচ করে যেতে পারবে?"

শংকর বললে, "সরকারী সাহায্য ছাড়া এ-সব কাজ হয় না। আর নাহয় একসংগে লাখ পাঁচেক টাকা কি লাখ-দশেক টাকা যদি সরকারের হাতে তুলে দেয়, তা হলে হতে পারে।"

তারিণী বললে, "ব্যাটা মরেছে।"

শংকর বললে, "ওই জন্যেই ত যখন বললে—তোমাদের খাওয়াব, তখন আর বাধা দিলাম না। দু-দুটো বড় বড় খাসি কাটলে। ভাবলাম, ওর যত খরচ হয় ততই ভাল।"

তারিণী খুব খুশী হল। বললে, "বড় পার দাও থামিয়ে।"

শংকর বললে, "আপনার ত একবার খরচ করে দিলেই বাস্, আর খরচ করতে হবে না। আপনি শুধু দেখুন বসে বসে।"

তারিণী জিজ্ঞাসা করলে, "আমার ইস্কুলের কী হল? মেয়েদের ইস্কুল?"

শংকর বললে, "ভেবে দেখলাম ও-সব হবে না।"

"কেন হবে না? রাখহরি যে আমাকে মুখখু বলেছে!"

"বলুক মুখখু।" শংকর বললে, "কে মুখখু দুদিন পরে বুঝতে পারবেন। রাখহরিবাবু হাসপাতাল করছেন, হাস-পাতালে রুগীর অভাব হবে না। আর বেশী রুগী হওয়া মানেই বেশি খরচ।"

তারিণী বললে, "আমার ইস্কুলে ছাত্রীর অভাব হবে না। আর বেশী ছাত্রী মানেই বেশী ইনকাম।"

শংকর হেসে উঠল। বললে, "তার আগে ভেবে দেখুন—সব মেয়েরা ইস্কুলে আসবে না। যারা আসবে তারা অ আ ক খ জানে না। তাদের নিয়ে ইস্কুল খোলা চলে না। বড়জোর প্রাইমারি পাঠশালা একটা খুলতে পারেন।"

"তাও ত বটে!"

তারিণী বললে, "এ-কথা ত আমি ভাবিনি।"

"কাজেই সে-কথা এখন ভাবতে হবে না। আপনি রাস্তাটা আগে শেষ করুন। শহরের সংগে এই গ্রামের যোগাযোগটা সহজ হয়ে যাক, তখন দেখবেন আপনা থেকেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

তারিণীর মনের মধ্যে কিন্তু একটা কথা খিচ্ খিচ্ করতে লাগল।—রাস্তার আগে রাখহরির ডাক্তারখানাটা যদি শেষ হয়ে যায়, আমার মাথাটা কিন্তু তা হলে হেঁট হয়ে যাবে।

শংকর বললে, "ও'র ডাক্তারখানার ডাক্তার ত, হেঁটে হেঁটে আসবে না। আপনার রাস্তার ওপর দিয়েই তাঁকে আসতে হবে গাড়িতে চড়ে।"

তারিণী কিন্তু শংকরের কোন কথাই শুনলে না। বললে, "তা হক। তোমার শহরের রাস্তা যেমন হচ্ছে হক, ওর ডাক্তারখানার কাজ যেমন চলছে চলুক, আমি 'তারিণীশংকর বালিকা বিদ্যালয়' তৈরি করবই।"

শংকর বললে, "করুন। পাঠশালা হবে।"

"তা হক।"

শংকর বললে, "একজন মাস্টারনী ত চাই।"

"আসবে। কালই আমি কলকাতার কাগজে বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দেব।"

"এত দূরে গ্রামের চাকরি নিয়ে সহজে কেউ আসতে চাইবে না।"

তারিণী বললে, "বেশী টাকা মাইনের লোভ দেখাব। থাকা-খাওয়ার খরচ লাগবে না।"

শংকর বললে, "মেয়েদের মাইনে থেকে যা পাবেন তাতে আপনার মাস্টারনীর মাইনে দেওয়া চলবে না। নিজের বাড়ি থেকে দিতে হবে।"

"রাখহরি যদি একটা হাসপাতালের খরচ চালাতে পারে আমি একটা মাস্টারনীর মাইনে দিতে পারব না?"

"নিশ্চয়ই পারবেন।" বলে শংকর সেখান থেকে সরে গেল। বাইরে অপেক্ষা করছিল কার্তিক। তার নিত্য-নতুন শখ। সে যখন নিতান্ত ছোট ছিল, তার বাবা তাকে একদিন নিয়ে গিয়েছিল শহরে। সেখানে কার্তিক দেখেছিল ছেলেরা ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে। কার্তিক ঝোঁক ধরেছিল সে ওইরকম ব্যাণ্ড বাজাবে। তারিণী কিনে দিয়েছিল ব্যাণ্ড বাজাবার সাজ-সরঞ্জাম। পাড়ার ছেলেদের জড়ো করে খুব উৎসাহের সংগে কিছুদিন ধরে কার্তিক খুব ঢাক পেটাল।

গত কয়েকদিন থেকে কার্তিকের শখ হয়েছে আবার ব্যাণ্ড পার্টি গড়ে তুলবে। বোসবাগান ক্লাবে শংকরও এ-কাজ অনেক করেছে।

অবশ্য ব্যাণ্ড-পার্টি গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যও একটা ছিল। নইলে শংকর কখনও এ-ব্যাপারে সম্মতি দিত না। প্রতিদিন সকালে ছেলেরা যখন রাস্তা তৈরির কাজে বেরোয়, তখন দুজন ছেলেকে সারা গ্রামের বাড়ি বাড়ি ছুটে বেড়াতে হয়—প্রত্যেককে ডেকে ডেকে এক জায়গায় জড়ো করবার জন্যে। শংকর বলেছিল "এতে সময় নষ্ট হয় অনেক। রোজ রোজ তোমাদের ডাকতে হবে কেন?"

একটা ছেলে বলেছিল, "আমাদের কারও বাড়িতে ত ঘড়ি নেই যে, সময় দেখে বেরুব।"

কার্তিক বললে, "ঠিক আছে। কাল থেকে ব্যাণ্ডের বাজনা শুনলেই তোমরা বারোয়ারীতলায় এসে হাজির হবে।"

সেইদিন থেকে আবার ব্যাণ্ড পার্টি তৈরি হল। প্রতিদিন সকালে আবার ব্যাণ্ড বাজতে লাগল।

ব্যাণ্ড বাজিয়ে সারা গ্রামের ছেলেরা আর কুলি মজুরেরা যখন সারি দিয়ে তালে তালে পা ফেলে কাজে যায়, দেখতে মন্দ লাগে না।

টাকা থাকলে সবই সম্ভব।

এদিকে রাস্তা এগিয়ে যাচ্ছে, ওদিকে রাখহরির হাসপাতালের কাজ চলছে

আবার আর-একদিকে তারিণী আরম্ভ করে দিয়েছে বাড়ি মেরামতের কাজ। তারিণী-শঙ্কর-বালিকা-বিদ্যালয় সে সবার আগে খুলে দেবে।

ময়নাবুনি গ্রামখানাই যেন কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে।

গ্রাম থেকে বেরতে হলে এখন আর জলকাদা ভাঙতে হয় না। রেল-স্টেশন পর্যন্ত গাড়ির চলার পথ একরকম শেষ হয়ে গিয়েছে। রাস্তাটা এখন চলেছে শহরের দিকে এগিয়ে।

রাস্তার সুখে কিনা কে জানে, তারিণী আর রাখহরি—দুজনেই ট্রেনে চড়ে ঘন ঘন শহরে যেতে লাগল। পাছে একই দিনে গেলে ট্রেনে কি শহরে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়, তাই একদিনে দুজনে কখনও যায় না। তারিণী যেদিন যায়, রাখহরি সেদিন বাড়িতে থাকে, আবার রাখহরি যেদিন যায়, তারিণী সেদিন গ্রাম ছাড়ে না।

একদিন দেখা গেল, তারিণীর খামার-বাড়ির চেহারা গিয়েছে বদলে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একতলা বাড়ির বড় বড় খান-চারেক ঘর চুনকাম করা হয়েছে, দরজা-জানালায় রঙ দেওয়া হয়েছে। ছুতোর মিস্ত্রীরা চেয়ার বেঞ্চি তৈরি করছে। আর সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো রঙিন একটি সাইন-বোর্ড। তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা—"তারিণীশঙ্কর বালিকা বিদ্যালয়।"

শঙ্কর একদিন তারিণীকে জিজ্ঞাসা করলে, "গ্রামের সবাইকে বলেছেন—মেয়েদের ইস্কুলে পাঠাবার কথা?"

তারিণী বললে, "তুমি বলেছিলে সবাই হয়ত মেয়ে পাঠাবে না। কিন্তু আমি কি দেখলাম জান? ইস্কুলটা দু বেলা বসাতে হবে। প্রত্যেকটি বাড়ির ছোট-বড় সব মেয়ে ত আসবেই, এমন-কি, বাড়ির বউ যারা, ছেলেমেয়ের মা যারা—তারাও বলছে লেখা-পড়া শিখবে।"

শঙ্কর বললে, "তবে আর কি! এবার তাহলে একজন মাস্টারনী যোগাড় করুন। কলকাতার দুটো বড় বড় কাগজে বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিন।"

তারিণী দুখানা খবরের কাগজ বের করে দেখালে।

"এই দেখ, বিজ্ঞাপন আমি দিয়েছি। আরও তিনটে রবিবার বেরুবে। রাখহরির হাসপাতালের আগে আমাকে এই ইস্কুল খুলতেই হবে।"

"খুলুন।"

শঙ্কর চলে যাচ্ছিল, কিন্তু তারিণী তার হাতখানা টেনে ধরলে। যেতে দিলে না। বললে, "কেমন? আমি তা হলে একাই সব করতে পারি?"

শঙ্কর বললে, "তা পারেন।"

"হেঁ-হেঁ", বল সেই কথা।"

অর্থাৎ তিনি যে একজন করিতকর্মা মানুষ, অপরের সাহায্য ছাড়াই সব কাজ করতে পারেন, রাখহরি তার তুলনায় নিতান্ত অর্বাচীন, এই কথাটাই বারংবার শুনতে চান।

শঙ্কর মনে মনে হাসলে। বললে, "নিশ্চয়ই। আপনার মত মানুষ—সত্যি বলছি, আমি আর দেখিনি।"

ভারি খুশী হল তারিণী। বললে, "তবে হ্যাঁ, তুমি যদি না আসতে আমাদের গ্রামে, তা হলে, হয়ত এইরকম কাজ করবার—ইয়ে, মানে ইয়েটা পেতাম না।"

থাক আর নিজের প্রশংসা শুনে কাজ নেই। শঙ্কর আবার চলে যাচ্ছিল। তারিণী আবার বললে, "শোন।"

শঙ্কর ফিরে দাঁড়াল।

তারিণী বললে, "তোমাদের সাহায্য ছাড়া রাখহরি এক পা এগোতে পারবে না। সাহায্য কর, মানে বুঝতে পেরেছ?"

বলেই চোখ টিপে একটুখানি হেসে চুপিচুপি বললে, "মোটা রকমের কিছু দাও খসিয়ে! হাসপাতাল করার ঠ্যালাটা বুঝুক।"

"সে-কথা আর বলতে হবে না। আপনি শুধু দেখুন বসে বসে।"

"আমার আগে যেন কিছু না হয়!"

শঙ্কর বললে, "তাই হয় কখনও! এই ত সবে বাড়ির ছাত পড়ছে।"

"তা হলেও খুব তাড়াতাড়ি করলে ব্যাটা।"

শঙ্কর বললে, "টাকাটা কীরকম খরচ হচ্ছে দেখুন!"

কথাটা শুনে তারিণী সে এক অদ্ভুত হাসি হাসতে লাগল। পৈশাচিক আনন্দের হাসি।

শঙ্কর সেদিন রাস্তায় কাজ করছিল, রাখহরি এসে দাঁড়াল তার কাছে। বললে, "তোমার সঙ্গে আজকাল দেখাই হয় না, তাই একবার এলাম তোমার কাছে।"

শঙ্কর বললে, "দেখা না হলেও আপনার সব খবরই আমি রাখি।"

"কী খবর রাখ, কই, বল ত শুনি!"

শঙ্কর বললে, "এই যেমন ধরুন, আপনি ঘন ঘন শহরে যাচ্ছেন।"

রাখহরি বললে, "কী জন্যে যাচ্ছি তা ত জান না?"

"আজ্ঞে না, তা কেমন করে জানব বলুন!"

"তা হলে শোন, ওই ছাতিমগাছটার তলায় একটু বসি গিয়ে।"

এই বলে রাখহরি তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ছাতিমগাছের ছায়ায় নিজেও বসল। শঙ্করকেও বসালে। বললে, "তোমাকেই বলছি, এ-কথা আর-কাউকে যেন বোল না।"

শঙ্কর বললে, "না, বলব না। তবে আপনার সন্দেহ যদি হয় ত বলবেন না।"

রাখহরি তবু বললে। বললে, "তখন ত ঝোঁকের মাথায় বলে বসলাম—হাসপাতাল করব। তারপর জয়া আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলে, হাসপাতাল করবার মত টাকা তোমার আছে বাবা? সেই দিন যেন চৈতন্য ফিরে এল। সত্যিই ত, এ আমি করছি কী! গেলাম শহরে আমার চেনা একজন উকিলের কাছে। মন্মথ-উকিল খুব নাম-করা বড় উকিল। জজ, ম্যাজিস্ট্রেট থেকে আরম্ভ করে সরকারী সব বড় বড় অফিসারদের সঙ্গে তাঁর খুব দহরম-মহরম। প্রথম যেদিন গিয়েছিলাম, বলেছিলেন—হাসপাতালটা সরকারের হাতে তুলে দিতে পারেন কি না, দেখবেন বলে-কয়ে। তার পর যাই আর ফিরে আসি—তাঁর সময়ই হয় না। পরশু গিয়ে দেখি— মন্মথবাবুর ছেলের জন্মদিন। বাড়িতে লোকজন দেখে ফিরে আসছিলাম মন্মথবাবু বললেন, বসুন। বসিয়ে খুব খাওয়ালেন প্রথমে। খাইয়ে বললেন, ব্যবস্থা সবই করেছি। সরকারের হাতেই তুলে দিতে পারব। কী করতে হবে আর-একদিন এসে জেনে যাবেন। কিন্তু তার আগে এখান থেকে সিভিল সার্জেন নিজে গিয়ে দেখে আসবেন।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "আসবেন কেমন করে? ট্রেনে চড়ে?"

রাখহরি বললে, "সে-কথাও বললাম। কিন্তু স্টেশন থেকে গরুর গাড়িতে আসতে হবে শুনে বললেন, না, তা হবে না। বলেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেন্ট তারিণীবাবু যে-রাস্তাটা তৈরি করাচ্ছিলেন, সেটা শেষ হবে কবে? বললাম, শেষ হয়ে এসেছে, আর বেশী দেরি নেই। মন্মথবাবু বললেন, তবে আর কী? শেষ হলে জানাবেন। আমরা সবাই মিলে গিয়ে দেখে আসব মোটরে চড়ে। এই বলে তারিণীর প্রশংসায় মন্মথবাবু একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। বললেন, আপনিও ত প্রেসিডেন্ট ছিলেন, কিন্তু দেখুন, উনি কেমন একটা কাজের মত কাজ করলেন। সত্যি বলতে কী, আমি সহ্য করতে পারলাম না। বললাম, আপনি জানেন না তাই তারিণীর প্রশংসা করছেন। তারিণী কিচ্ছু করেনি। করেছে শঙ্কর। মন্মথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, শঙ্কর কে? আমি বললাম তোমার সব কথা। মন দিয়ে সব শুনলেন তিনি। আমি বললাম, ভারী সুন্দর ছেলে। যদি দেখতে চান ত আমি একদিন নিয়ে আসব এখানে। যাবে?"

শঙ্কর বললে, "যেতে পারি। রাস্তাটা আগে শেষ হক।"

এই বলেই শঙ্কর উঠে যাচ্ছিল। রাখহরি বললে, "দাঁড়াও, আসল কথাটাই ত এখনও

বলা হল না। মন্মথবাবুর ছেলের জন্মদিনে তাঁর এক শালীর ছেলে এসেছিল কলকাতা থেকে। সাহেবী-পোশাক-পরা বড়লোকের ছেলে। খুব মন দিয়ে তোমার কথাগুলো শুনলে। তারপর আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, কী নাম বললেন? শঙ্কর? শঙ্কর মুখার্জি? বললাম, হ্যাঁ। বেশ গাঁট্টা-গোঁট্টা চেহারা—গুণ্ডার মত দেখতে, কপালে একটা কাটা দাগ আছে? বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু গুণ্ডা কী বলছেন? সুন্দর, সুপুরুষ। ছোঁড়াটা তার মুখটা বেঁকিয়ে আমাকে ভেংচি কেটে বললে, সুন্দর! সুপুরুষ!—কোত্থেকে সে এসেছে বলতে পারেন? বললাম, জানি না। কোনদিন জিজ্ঞাসা করিনি। ছোঁড়াটা বললে, জিজ্ঞাসা করলেও বলবে না। শঙ্কর ফেরারী আসামী। কলকাতা থেকে পালিয়ে এইখানে এসে জুটেছে। কত লোককে খুন করেছে, কত লোকের টাকা মেরেছে। আমারই ত হাজার চার-পাঁচ মেরে দিয়েছে। আমি ওকেই খুঁজছিলাম। ভালই হল সন্ধান পেয়ে গেলাম।

"বললাম, বেশ ত। আপনি চলুন আমার সঙ্গে। গিয়ে দেখুন—যাকে খুঁজছেন, এ-লোকটি সেই লোক কি না। আমার বাড়িতে থাকবেন, আপনার কোনও কষ্ট হবে না। আমি শঙ্করের সঙ্গে আপনার দেখা করিয়ে দেব। দেখেশুনে আবার কাল চলে আসবেন।

"অনেক করে বললাম। কিছুতেই এল না। বললে, যাব একদিন নিশ্চয়। তবে এখন নয়।

"বললাম, আপনার নামটি বলুন। গিয়ে বলব শঙ্করকে।

"তখন কী বললে জান? বললে, না না, এখন কিছু বলবেন না। এই যে আমার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে এ-কথাটাও এখন চেপে যাবেন। আমার নাম শুনলেই পালাবে ওখান থেকে।

"এই বলে ছোঁড়াটা উঠে গেল সেখান থেকে। দেখলাম বেশ খানিকটা দূরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাইপ টানতে লাগল। পাইপ টানবার জন্যেই বোধ করি মেসো-মশাইয়ের কাছ থেকে চলে গেল।

"মন্মথবাবু ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার আত্মীয়?

"মন্মথবাবু হেসে বললেন, হ্যাঁ, আমার এক শালীর ছেলে। আমার ছেলের জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করেছিলাম, কাল এসেছে। ওর কোনও কথা বিশ্বাস করবেন না। টাকাকড়ি বেশ রেখে গিয়েছিল বাপ। এরই মধ্যে প্রায় শেষ করে আনলে।

"জিজ্ঞাসা করলাম, কী নাম? মন্মথবাবু বললেন, নরেন।"

শঙ্কর বললে, "বুঝেছি।"

"চেন তা হলে?"

শঙ্কর বললে, "খুব চিনি।"

তারিণীশঙ্কর বালিকা বিদ্যালয়ের কাজ-কর্ম সব শেষ হয়ে গিয়েছে। দুখানা ঘরে সারি সারি বেঞ্চি পাতা হয়েছে, হাই বেঞ্চি পাতা হয়েছে, চেয়ার, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড—যেখানে যেমনটি প্রয়োজন, সেইখানে ঠিক তেমনটি সাজানো। এমন কি, নতুন শিক্ষিকা যিনি আসবেন, তাঁর থাকবার ঘর, রান্নার জায়গা, খাট বিছানা, আসবাবপত্র—এমন কি, জলের কুঁজোটি পর্যন্ত ঠিক করে রেখেছে তারিণী।

এবার মাস্টারনী এলেই হয়!

দরখাস্ত এসেছে অনেকগুলো। এখনও আসছে। বক্স-নম্বর দেওয়া হয়েছিল। খবরের কাগজের আপিস থেকে তাড়া তাড়া দরখাস্ত পাঠিয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবু দরখাস্ত আসবার বিরাম নেই।

দরখাস্তের তাড়াটা শঙ্করের হাতে তুলে দিয়ে তারিণী বললে, "এই দেখ কত দরখাস্ত। এর ভেতর থেকে বেছে বেছে জন-চারেক মেয়েকে আসতে বল। তাদের মধ্যে যে ভাল হবে তাকে নেছে নিও। একদিনে ত আসতে বলবে না। কাজেই সময় লাগবে।"

চিঠির কাগজও ছাপিয়েছে তারিণী। 'তারিণীশঙ্কর বালিকা বিদ্যালয়' ছাপা কাগজের একটি প্যাড আর চারটি খামও দিয়ে দিলে শঙ্করের হাতে।

কতকগুলো দরখাস্ত বাংলায় লেখা কিন্তু বেশীর ভাগ ইংরেজীতে। সেদিক দিয়ে শঙ্করের একটু বিপদ আছে। হাতে করে নিলে দরখাস্তের তাড়াটা। নিয়ে চলে গেল রাস্তার কাজে।

কার্তিককে বললে, "তুই কাজ দেখ, আমি ততক্ষণ এইগুলো দেখি।"

বলেই শঙ্কর গিয়ে বসল রাস্তার ধারে সেই ছাতিমগাছের তলায়।

দরখাস্তগুলো শঙ্কর উলটেপালটে দেখলে। বাংলায় লেখা দরখাস্ত যে-কটি ছিল পড়ে ফেললে। ইংরেজীতে লেখাগুলো যে একেবারে পড়তে পারলে না তা নয়। সবই প্রায় একই রকম লেখা। ম্যাট্রিকুলেশন থেকে বি-এ পাস-করা সবরকম মেয়েই আছে। কী রকম মেয়ে আসবে কে জানে! দরখাস্তের পাতা উলটোতে উলটোতে হঠাৎ তার ইন্দ্রাণীর কথা মনে পড়ল। লেখাপড়া-জানা মেয়েগুলো অহঙ্কারী হয়—এই ছিল তার ধারণা। কিন্তু জয়াকে দেখে সে ধারণা তার বদলে গিয়েছে।

জয়ার কথা মনে হতেই শঙ্কর উঠে দাঁড়াল। কার্তিককে বললে, "আমি আসছি। চিঠি আজকে ডাকে না দিলে দেরি হয়ে যাবে।"

রাখহরির বাড়ি গিয়ে হাজির হল শঙ্কর। চাকর বললে, "বাবু বাড়ি নেই।"

কিন্তু বাবুর কাছে সে যায়নি। গিয়েছে যার সন্ধানে, তার কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেও শঙ্কর কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ

"বলতে হবে না। আমি এসেছি।"
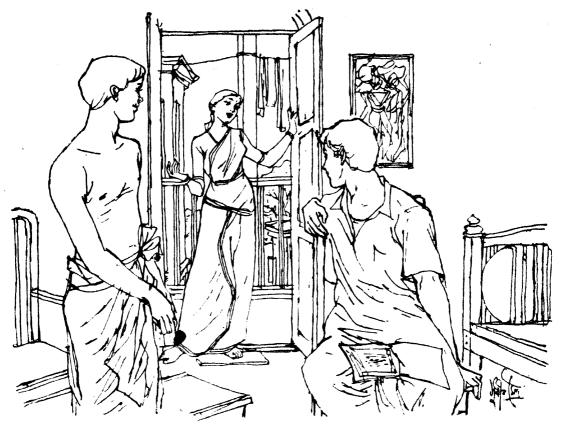
করছিল। বললে, "একটা দোয়াত আর কলম দিতে পারিস?"

চাকরটা বললে, "দিদিমণির কাছে আছে। চেয়ে আনব?"

"দিদিমণি কী করছে রে?"

"সেলাই করছে।"

শঙ্কর বললে, "আচ্ছা, আমি ওই ওপরের ঘরে বসি, তুই গিয়ে চুপি চুপি বল—শঙ্করবাবু একটা দোয়াত-কলম চাইলে।"

চাকরটা ভিতরে চলে গেল।

যে-ঘরখানা তাকে দেওয়া হয়েছিল, শঙ্কর সেই ঘরে গিয়ে দেখলে, সব তেমনই আছে, শুধু তার খাট থেকে বিছানাটা তুলে রাখা হয়েছে।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে শঙ্কর চুপ করে বসল।

চাকরটা ফিরে এসে খবর দিলে, "দিদিমণি বললে দোয়াত-কলম নেই।"

এ-রকম জবাব শঙ্কর আশা করেনি। ভেবেছিল, তার নাম শুনলে সে নিজেই ছুটে আসবে। লজ্জায় সে আর মুখ তুলতে পারলে না। দরখাস্তের ফাইলটা নাড়াচাড়া করতে করতে ভাবছিল, এখানে আসা বোধ হয় তার উচিত হয়নি।

চাকরটাকে বললে, "দিদিমণিকে বলিস আমি চলে গেছি।"

"বলতে হবে না। আমি এসেছি।"

বলতে বলতে জয়া এসে দাঁড়াল। এসেই প্রথমে ভোলা চাকরকে বললে, "যা তুই ঠাকুরের কাছে যা।"

শঙ্কর সিঁড়ির দিকে পিছন ফিরে বসে-ছিল, জয়াকে দেখতে পায়নি।

জয়া বললে, "তা আসাই বা কেন, চলে যাওয়াই বা কেন? দোয়াত কলম আমার সাঁতাই নেই। এই নিন।"

বলে জয়া তার দামী ফাউন্টেন-পেনটি শঙ্করের হাতের কাছে নামিয়ে দিলে।

শঙ্কর বললে, "তা এতই দয়া যখন করলে তখন আর একটু দয়া তোমাকে করতে হবে। এই চেয়ারটায় বোস, বলছি।"

"দাঁড়িয়েও শুনতে পাব। বলুন।"

শঙ্কর বললে, "জানতে এসেছিলাম, তোমার বাবা কবে শহরে যাবেন।"

"সে-কথা আমার চেয়ে আমার বাবা ভাল জানেন।"

"তা হলে তোমার বাবা যখন আসবেন তখনই আসব। আজ চলি।"

জয়া বললে, "কিন্তু বাবার শহরে যাওয়ার সঙ্গে দোয়াত কলমের সম্পর্কটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। একটু বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন?"

শঙ্কর বললে, "আমার চোখটা খারাপ হয়েছে। শহরে গিয়ে ডাক্তারকে দেখিয়ে চশমা নিতে হবে। অথচ এই দেখ তারিণীবাবু এই ফাইলটা আমাকে দিলেন। বললেন, এর ভেতর থেকে চারটি মেয়েকে পছন্দ করে একজন একজন করে আসতে লিখে দাও। তোমার কাছে দোয়াত কলম চেয়ে পাঠিয়ে বিপদে পড়ে গেলাম। ফাইলটা উলটে দেখি ঠিকানাগুলো ঠিক পড়তে পারছি না।"

জয়া বললে, "বুঝেছি। তারিণীবাবুর মেয়ে-ইস্কুলের মাস্টারনীদের ফাইল।"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে ত মেয়েরা আসবার আগে চশমা আপনার নিশ্চয়ই চাই।"

শঙ্কর বললে, "মেয়েরা আসবার আগে বলছ কেন?"

জয়া বললে, "মেয়েদের পছন্দ করবার ভারটাও ত আপনারই ওপর পড়বে। চশমা

ছাড়া তাদের ভাল করে দেখতে পারবেন না ত!"

শঙ্কর ঈষৎ হেসে জয়ার মুখের দিকে তাকালে।

শঙ্করের হাসিটি বড় চমৎকার!

মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গিনীর মত জয়া তার উদ্যত ফণা গুটিয়ে নিলে। চেয়ারটা টেনে তার উপর ভাল করে চেপে বসে বললে, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেল। আপত্তি যদি না থাকে ত আপনার হাতের ওই ফাইলটা একবার দেখতে চাই।"

এইটিই শঙ্কর চাইছিল। ফাইলটি তৎক্ষণাৎ তার হাতে তুলে দিয়ে বললে, "চারটে মেয়ে এর থেকে দাও না বেছে!"

"শুধু নাম আর হাতের লেখা দেখে? কিন্তু জানেন ত, ঝাঁটার মুড়োর মত চুল, নাম কিন্তু মণিকুন্তলা। পেত্নীর মত চেহারা, নাম জয়ারানী—"

আর কী যেন সে বলতে যাচ্ছিল, শঙ্কর বললে, "এটা ভুল বললে। জয়ারানীর নাম হওয়া উচিত ছিল বিজয়িনী।"

জয়া শুধু একবার তার আয়ত চোখ দুটি শঙ্করের মুখের দিকে তুলেই আবার নামিয়ে নিলে। বললে, "কাজ নেই বাবা, আমি শুধু নাম আর বিদ্যের বহরটা বলে যাব। আপনি পছন্দ করুন।"

বলেই জয়া একে একে বলে যেতে লাগল। "আরতি সান্যাল। আই-এ। হাতের লেখা বিশ্রী। চলবে না।

"সুমতি ঘোষ। বি-এ। হাতের লেখা মাঝা-মাঝি, ভালও নয়, মন্দও নয়। কী করব বলুন!"

শঙ্কর বললে, "উলটে যাও, আরও আছে।"

জয়া আবার বললে, "জ্যোতির্ময়ী ঘোষ। ম্যাট্রিকুলেশন। বিশ্রী হাতের লেখা। মমতা পাকড়াশী—আই-এ। চলবে না। সুলেখা বোস। দেখুন দেখুন। নাম সুলেখা, অথচ হাতের লেখার ছিরি দেখুন।"

এই বলে ফাইলটা শঙ্করকে দেখাতে গিয়েও দেখালে না। বললে, "ওহো, আপনি যে চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছেন না। শুনুন, আবার পড়ি। মীরা দাসী। বি-এ। হাতের লেখা ভাল। দাসী চলবে?"

শঙ্কর বললে, "দাগ দাও।"

ফাউন্টেন পেনটি খুলতে খুলতে জয়া আবার বললে, "দাসী চলবে। দাগ দিলাম। তারপর, সবিতা সরকার। ম্যাট্রিক। নাঃ, চলবে না। শঙ্করী চট্টোপাধ্যায়—বি এ। একে আপনার মনে ধরা উচিত। শঙ্কর, শঙ্করী, মুখোপাধ্যায় আর চট্টোপাধ্যায়।"

শঙ্কর বললে, "না, চলবে না। উলটে যাও।"

জয়া হাসতে হাসতে বললে, "শুনুন শুনুন, বিধুমুখী মিত্র। ধেৎ, বিধুমুখী নাম ভাল নয়।"

শঙ্কর বললে, "দেখ জয়া, দরকার মাত্র একটি মেয়ের। পড়াবে ত অ আ ক খ। যাকে হক আসতে লিখে দাও। ভাল না হয়, বিদেয় করে দেব। তারপর আর-একজনকে ডাকব।"

জয়া বললে, "অসম্ভব। মেয়েদের বিদেয় করা অত সহজ নয়। আপনি ত পারবেনই না। আমি পারি।"

শঙ্কর বললে, "তোমাকে ইস্কুলের সেক্রেটারি করে দেব।"

"তারিণীবাবুর ইস্কুলের আমি হব সেক্রেটারি? আপনার বদনামের আর কিছু বাকী থাকবে না।"

জয়া বললে, "আবার পড়ি, শুনুন। সৌদামিনী রক্ষিত। না। এই দেখুন, এ-নামটা পড়াই যাচ্ছে না। তারপর রানী-বালা বোস, জ্যোৎস্না ঘোষ। শুধু নামগুলো পড়ে যাচ্ছি। প্রণতি মুখার্জি। অপর্ণা নন্দী। সুবর্ণ বিশ্বাস। ইন্দ্রাণী দেবী। নন্দিতা—"

শঙ্কর বললে, "এইটা কী নাম বললে?"

"নন্দিতা শ্রীমানী।"

"না না, তার আগে।"

জয়া বললে, "সুবর্ণ বিশ্বাস, অপর্ণা নন্দী, ইন্দ্রাণী দেবী।"

শঙ্কর বললে, "ইন্দ্রাণী দেবী? পদবী নেই?"

জয়া বললে, "না। আই-এ-পাস। হাতের লেখাটি মন্দ নয়।"

"ঠিকানা?"

জয়া বললে, "কালীঘাট, কোলকাতা।"

শঙ্কর বললে, "বাস্, হয়ে গেছে। একেই আসতে লিখে দাও।"

তারিণীশঙ্কর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাপা প্যাড আর একটি খাম জয়ার হাতের কাছে বাড়িয়ে ধরে শঙ্কর বললে, "সাত দিন সময় দিয়ে, আসছে রবিবার সকালের ট্রেনে আসতে লিখে দাও।"

"কে লিখবে? আমি?"

"হ্যাঁ, তুমি।"

"আমার হাতের লেখা খুব খারাপ।"

"তুমি ত চাকরির দরখাস্ত করছ না।"

জয়া হেসে জিজ্ঞাসা করলে, "বাংলায়, না ইংরিজীতে?"

শঙ্কর বললে, "বাংলায়। রাত্রি নটায় হাওড়ায় চড়বে, জংশন স্টেশনে ট্রেন বদলাবে এক ঘণ্টা পরে, তারপর সারা রাত ট্রেনে এসে সকালে নামবে তোমাদের এই স্টেশনে। গরুর গাড়ি থাকবে। তাইতে চড়ে সোজা চলে আসবে তোমার কাছে। আমি সেদিন কোথাও পালাব। তুমি দেখেশুনে আলাপ পরিচয় করে ঠিক করে রাখবে। আমি চুপি চুপি এসে জেনে যাব চলবে কিনা। যদি চলে ত নিয়ে যাব তার আস্তানায়, যদি না চলে ত এইখান থেকেই বিদেয় করে দেব।"

জয়া বললে, "বেশ ত বলে গেলেন গড় গড় করে! তারপর বাবা যখন শুনবে মেয়েটি তারিণী মুখুজ্যের ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী, তখন?"

শঙ্কর বললে, "উনি কিছু বলবেন না। তুমি বলবে শঙ্কর আমাকে বলেছে। তার আগেই আমি তোমার বাবাকে সব বলে রাখব।"

চিঠিখানা জয়া লিখতে আরম্ভ করলে।

শঙ্কর তখন ভাবছে—কে এই ইন্দ্রাণী? ঠিকানা লিখেছে কালীঘাট। আই-এ-পাস। এতদিনে আই-এ-পাস করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে সুদূর এই পাড়াগাঁয়ে সে চাকরি করতে চাইবেই-বা কেন? সুন্দরী ওই যুবতী মেয়েকে মা তার একা একা এই পল্লীগ্রামে থাকবার জন্যে ছেড়েই-বা দেবে কেন? সে ইন্দ্রাণী নয় হয়ত। হয়ত-বা ওই নামের আর-একটি মেয়ে। কালীঘাট অঞ্চলে থাকে। টাকা-পয়সার অভাবে আর বেশিদূর হয়ত পড়তে পারেনি। সংসারে অভাব অত্যন্ত বেশী। আই-এ-পাস মেয়ে খাওয়া-থাকার খরচ লাগবে না, তার ওপর দেড়শ টাকা মাইনে পাবে। এর জন্যে সবরকম বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে পাড়াগাঁয়ে এসে বাস করতে পারে—সেরকম দরিদ্র মেয়ের সংখ্যা আমাদের দেশে বড় কম নেই। কিন্তু সত্যই যদি তার সেই ইন্দ্রাণী হয়? জীবনের রহস্য বোঝা ভার। জীবন-দেবতা হয়ত-বা আবার এক নতুন খেলা খেলতে চান তার সঙ্গে।

জয়ার চিঠি লেখা শেষ হল। খামের উপর ঠিকানাটা লিখে জয়া খামখানি শঙ্করের হাতে দিয়ে বললে, নিন। আপনার সেক্রেটারির কাজ করলাম। চিঠিখানা পড়ে দিতে হবে নাকি?

শঙ্কর বললে, "না।"

বলেই হঠাৎ তার কি মনে হল, বললে, "ঠিকানাটা পড়ত।"

জয়া পড়লে, "শ্রীমতী ইন্দ্রাণী দেবী। তিন নম্বর গোবিন্দ সেন লেন, কালীঘাট, কলিকাতা।"

মনে মনে হাসলে শঙ্কর। ছি ছি, নাম শুনেই লাফিয়ে উঠল সে? ঠিকানা ত আলাদা! এক নামের দুটি মেয়ে কি কালী-ঘাটে থাকবে না? এক পাড়ায় থাকা ত দূরের কথা, অনেক সময় এক-বাড়িতে থাকে।

শঙ্কর যেন নিশ্চিন্ত হল।

চিঠিখানি ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে শঙ্কর ভাবলে, ভালই হল, ইন্দ্রাণী থাক তার

অহংকার নিয়ে। যে-জীবন সে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করে এসেছে, তার আর জের টেনে লাভ নেই। ইন্দ্রাণী তার জীবনে এসেছিল যেন অভিশাপ হয়ে। ইন্দ্রাণীকে খুশী করবার জন্যই তাকে মিথ্যাচার করতে হয়েছিল। তারই জন্য তার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। মা তার আত্মহত্যা করেছে শুধু তারই জন্যে। সুতরাং ভালই হয়েছে—এ-ইন্দ্রাণী তার বিয়ে-করা স্ত্রী ইন্দ্রাণী নয়।

শংকর আবার তার রাস্তা তৈরির কাজে লেগে গেল।

কিন্তু সেদিন থেকে ইন্দ্রাণীর চিন্তা যেন তাকে নিষ্কৃতি দিলে না।

দিবারাত্রি সে শুধু ইন্দ্রাণীর কথা ভাবে। রূপলাবণ্যবতী রাজেন্দ্রাণীর মত সদ্যোবিবাহিতা সেই তন্বী-তরুণী সব-কিছুকে আড়াল করে তার চোখের সুমুখে এসে দাঁড়ায়। জ্বালাময়ী সে বহ্নিশিখা তাকে যেন ঠিক পতঙ্গের মত টানতে থাকে।

কয়েকদিনের মাত্র কয়েকটি ছোটখাটো ঘটনার স্মৃতি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে তার জীবনে। বিয়ের রাতের সেই শুভদৃষ্টি সেই দুটি আয়ত চোখের রহস্যময় এক অপরূপ সৌন্দর্য! বিদ্যুতের মত একটি মুহূর্ত মাত্র। চোখ সে লজ্জায় নামিয়ে নিয়েছিল তৎক্ষণাৎ। কিন্তু আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সে দুটি চোখ। কথা কয়েছিল। হেসেছিল।

বিবাহের পর, বাসরে ভেবেছিল পরিচয় হবে। কিন্তু ইন্দ্রাণীর বন্ধুরা তাকে সে সুযোগ দেয়নি। শুধু চোখে চোখে দেখা, আর চোখে চোখে কথা।

পরের দিন কুশণ্ডিকা।

সেদিনও শুধু একটুখানি স্পর্শের রোমাঞ্চ।

তারপর ঝিলপাড়ার সেই ভাড়া-বাড়িতে তাদের বোঝাপড়া। উদ্যতফণা ভুজঙ্গিণীকে বশ মানানো সারারাত ধরে।

বশ কি সে সত্যই মেনেছিল?

বোধ হয় না।

যেটুকু মেনেছিল, সেটুকু শুধু তার গায়ের জোরে।

ইন্দ্রাণীকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে চেয়েছিল, ইন্দ্রাণী কিন্তু তার সে ভালবাসা গ্রহণ করেনি।

তাকে সে বোঝবার সময়ও পায়নি, বুঝতে পারেওনি।

ইন্দ্রাণী যদি তার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে চলে না যেত, তার মা তাহলে এমন করে আত্মহত্যা করত না। তার এই সর্বনাশের জন্য ইন্দ্রাণীই দায়ী।

অনুতপ্ত হয়ে নিতান্ত অসহায়ের মত তার অশৌচ অবস্থায় ইন্দ্রাণীর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। ক্ষমা ভিক্ষা করেছিল। বলেছিল, তুমি যেমনটি চাও আমি তেমনি হব। তারই কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছিল। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে যাকে সে ভালবাসতে চায়, সেই তারই কাছে চেয়েছিল একটুখানি মনের আশ্রয়।

ইন্দ্রাণী তখন তাকে নিষ্ঠুরভাবে তাড়িয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি।

শংকর বলেছিল, "আমি তোমার স্বামী।"

ইন্দ্রাণী বলেছিল, "স্বামীর পরিচয় আপনাকে দিতে হবে না। আপনি যান।"

কিন্তু কি বিচিত্র মানুষের মন! সেই ইন্দ্রাণীর কথা ভেবে সে ব্যাকুল হয়ে উঠল। শিক্ষয়িত্রীদের দরখাস্তের ভিতর থেকে কোথাকার কে-এক ইন্দ্রাণীর নামটি শোনবামাত্র জয়াকে বললে, আর-সবাইকে বাদ দিয়ে তুমি একেই আসতে বল। এরও বাড়ি কালীঘাট শুনে শংকরের প্রথমে স্থির বিশ্বাস হয়েছিল—এ তারই সেই ইন্দ্রাণী। তারপর নিশ্চিন্ত হল ঠিকানা দেখে।

যে-ইন্দ্রাণী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাকে আর-একটিবার শুধু দেখবার আগ্রহ শংকর দমন করলে। যে তার স্বামিত্বের দাবি স্বীকার করেনি, তাকেই বা সে স্ত্রীর অধিকার দেবে কেন?

সে যে-ইন্দ্রাণীই হক, তার সঙ্গে শংকরের কোনও সম্বন্ধ নেই।

মন থেকে ইন্দ্রাণীর চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শংকর সেদিন রাখহরির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বললে, "শহরে যাবেন বলেছিলেন, যাবেন না?"

"হ্যাঁ, শুনেছিলাম ডাক্তারকে তুমি চোখ দেখাতে যাবে।"

"কোথায় শুনলেন?" জিজ্ঞাসা করলে শংকর।

"জয়া বলছিল।"

শংকর বললে, "হ্যাঁ চলুন, রবিবার সকালে যাই। ভোরের ট্রেনে।"

"সেই ভালো। চোখ দেখিয়ে তোমাকে নিয়ে যাব আমার সেই উকিল-ভদ্রলোকের বাড়িতে।"

কথাটা শংকরের মনে ছিল না। বললে, "কেন?"

রাখহরি বললে, "মনে নেই? সেই যে কি নাম বললে! বীরেন নাকি, তোমার চেনা সেই ছোঁড়াটা—"

শংকর বললে, "নরেন।"

"হ্যাঁ, তাকে দু' কথা বেশ করে শুনিয়ে দিয়ে এস। হতভাগা যা-তা' বলছিল তোমার নামে।"

"ঠিক বলেছেন। চলুন।"

শংকর বললে বটে, কিন্তু নরেনের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা তার ছিল না। পুরনো দিনের অপ্রীতিকর স্মৃতি সে তার মন থেকে মুছে ফেলতেই চায়। কিন্তু রহস্যময় সে অদৃশ্য জীবন-দেবতার এ কি বিচিত্র খেলা কে জানে!

শংকর ভয় পেলে না। বললে, "তাহলে এই কথা রইল। রবিবার আপনি ঠিক হয়ে থাকবেন। শেষ রাত্রে আমি আপনাকে এসে তুলে নেব।"

রাখহরির সঙ্গে শহরে এল শংকর।

"চল তোমার চোখের ডাক্তারের কাছে আগে যাই।"

শংকর বললে, "আজ্ঞে না, আগে চলুন আপনার উকিলের বাড়ি। আদালতে চলে গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।"

রাখহরি হো হো করে হেসে উঠল। বললে, "আজ রবিবার। ভুলে গেছ নাকি?"

কিছুই সে ভোলেনি। বললে, "তাহলে চলুন, আপনার আর-একটা কাজ সেরে নিন আগে। সিভিল সার্জেনের বাড়ি চলুন। এই কাজটাই সবচেয়ে বড় কাজ।"

রাখহরি বললে, "তোমার চোখ দেখানোর কাজটা বুঝি সবচেয়ে ছোট কাজ? আচ্ছা শংকর—"

বলেই সে তার পিঠে হাত দিয়ে সস্নেহে বললে, "নিজের কাজটা বুঝি কাজই নয়? তুমি পরের কাজ করতে এত ভালবাসো!"

"পরের কাজ কোনটা বলছেন?"

"আমাদের গ্রামে এসে অবধি যা তুমি করছ?"

শংকর বললে, "কিছুই ত করিনি। যা করছেন আপনারাই করছেন।"

রাখহরি বললে, "আমরা পুরুষানুক্রমে বাস করছি এই গ্রামে। কিন্তু কই, এতদিন ত করিনি! এ-মন তুমি কোথায় পেলে?"

"আমার মায়ের কাছে।"

মার কথা মনে হতেই শংকরের চোখ দুটো জলে ছল ছল করে এল। অতিকষ্টে নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে বললে, "এ আমার মার আদেশ।"

"সে মা বুঝি তোমার মারা গেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"বাবা?"

"তারও আগে। তাঁকে আমার মনেও পড়ে না।"

কথাটা বলেই শংকরের মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। এমন গম্ভীর হল যে, রাখহরি সে-মুখের দিকে তাকিয়ে কোনও কথা বলতে ভরসা পেলে না।

শহরের যে-পথ ধরে তারা এগিয়ে যাচ্ছিল, সে-পথে লোকজন কম। একদিকে বড় বড় বাড়ি। আর একদিকে প্রকাণ্ড একটা পার্ক। পার্কের ধারে ধারে বড় বড় গাছ, আর গাছের ছায়ায় বেঞ্চি পাতা।

রাখহরি বললে, "খেয়ে এসে তোমার সঙ্গে

আমি হাঁটতে পারছি না শংকর। এস এই বেঞ্চে একটু বসি।"

"বসুন।"

দুজনেই বসল। শংকরের কোনও কাজ নেই। সে শুধু পালিয়ে এসেছে ময়নাবুনি থেকে। পালিয়ে এসেছে তারিণীশংকর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর ভয়ে। ইন্দ্রাণী যার নাম। জয়ার উপর ভার দিয়ে এসেছে তাকে আদর-অভ্যর্থনা করবার। এতক্ষণ সে এসে গেছে নিশ্চয়ই। কোন্ ইন্দ্রাণী কে জানে!

চিন্তায় বাধা পড়ল।

রাখহরি কি যেন বলবার জন্য অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছিল। শংকর বুঝতে পারলে। মনে হল সেইজন্যই সে বসল। হাত বাড়িয়ে আবার রাখহরি তার কাঁধের উপর হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার বলতে কেউ নেই, না?"

শংকর বললে, "না।"

রাখহরি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

শংকর কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

রাখহরি বললে, "তোমার মত আমার যদি একটা ছেলে থাকত!"

অস্বস্তি যেন আরও একটু বাড়ল শংকরের। এ আবার কি কথা?

স্নেহের কাঙাল মন মানুষের একটুখানি স্নেহের আশ্রয় চায় বই-কি!

কিন্তু আশ্চর্য তার মনের গঠন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে-হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তার দিকে, সে-হাত ধরতে গিয়ে মনে হল যেন তার হাত দুটো থর থর করে কাঁপছে। কিসের এ কুণ্ঠা?

শংকর তার মনের কাছ থেকে কোনও জবাবই পেলে না।

রাখহরি জিজ্ঞাসা করলে, "বিয়ে-থা করে সংসারী হতে তোমার ইচ্ছে করে না শংকর?"

"থাক ও-সব কথা। চলুন।"

এই বলে শংকর উঠতে যাচ্ছিল, রাখহরি তার হাতটা ধরে ফেললে। বললে, "বল। তোমাকে বলতেই হবে।"

শংকর বললে, "একটা পয়সা যে রোজগার করে না, তার আবার সংসারী হওয়া! চলুন যাই।"

"ধর, রোজগারের কথা তোমাকে যদি ভাবতে না হত, তাহলে ইচ্ছে করত কিনা, তাই বল।"

"আচ্ছা, এ-কথা জানবার আগ্রহ আপনার কেন হল বলুন ত? বেশ ত আছি আমি। আপনারা সবাই আমাকে ভালবাসেন—"

কথাটা শংকরকে শেষ করতে দিলে না রাখহরি। বললে, "তোমার যদি মত থাকত, তাহলে জয়ার সঙ্গে তোমার আমি বিয়ে দিতাম।"

শংকর চমকে উঠল কথাটা শুনে। অবাক হয়ে একটুখানি থেমে মুখ তুলে চাইলে। বললে, "একটি ছেলে শুনেছিলাম বিলেত গেছে, ফিরে এলে জয়ার বিয়ে হবে।"

"ঠিকই শুনেছিলে। কিন্তু সে-ছেলে আর এসেছে! এক বছর পরে ফিরে আসার কথা। আজ তিন বছর হল এল না। বাপের কাছে এখন আর টাকাও চায় না, চিঠিপত্রও লেখে না।"

"আসবে, আসবে। আপনি ভাববেন না। উঠুন।"

রাখহরি আবার তাকে টেনে বসিয়ে দিলে। "তুমি এড়িয়ে যেতে চাচ্ছ আমার কথাটা। তুমি আমাকে বল। আমি নিশ্চিন্ত হই।"

শংকর ম্লান একটু হাসলে। হেসে বললে, "দু চারদিন আমাকে ভাববার সময় দিন।"

"তা বেশ, তুমি আমাকে ভেবেই বোল!"

এই বলে রাখহরি উঠল। শংকরও উঠল।

রাখহরি বললে, "শহরে যদি বাস করতাম, এতটা ভাবতাম না। কিন্তু আমাদের গ্রামের সমাজ—কত রকমের কত কথা আমার কানে আসে, আমি গ্রাহাই করি না।"

শংকর দু চারদিন সময় চাইলে ভেবে দেখবার। ভাবনা কিন্তু তার মনে তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। বিয়ে সে করতে চায়নি। মা যদি তার বিয়ের কথা না তুলত, আর বস্তির সেই মেয়েটির মোটর-ড্রাইভার মামা যদি তার মাকে অপমান না করত, তাহলে বিয়ে হয়ত সে করত না। ইন্দ্রাণীকে বিয়ে করে তার কম শিক্ষা হয়নি। আবার বিয়ে? জয়া চমৎকার মেয়ে, স্নিগ্ধ একটি দীপশিখার মত, ইন্দ্রাণীর মত উগ্র নয়। কিন্তু কি জানি হয়ত ছাই-চাপা আগুনের মত—দপ করে জ্বলে উঠতেই-বা কতক্ষণ! বিয়ের পর যাচাই করে বাজিয়ে যখন দেখতে চাইবে, —দেখবে, যাকে সে বিয়ে করেছে সে লেখাপড়া জানে না, এক পয়সা রোজগার করে না, তখন সেও ঠিক ইন্দ্রাণীর মত তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইবে কিনা, তাই-বা কে জানে!

আবার হয়ত ভালও হতে পারে। মেয়েদের সঙ্গে কতটুকুই-বা তার পরিচয়! এমনও হতে পারে, জয়া হয়ত ভিন্ন ধাতুতে গড়া। হয়ত-বা দোষ-গুণে সমেত গোটা মানুষটাকে সে ভালবাসতে জানে।

মেয়েদের ভালবাসা অসাধ্য সাধন করতে পারে। স্বামীকে মনের মত করে গড়ে তুলে এই পৃথিবীতে সুখের স্বর্গ রচনা করা তার দ্বারাই সম্ভব।

শংকরের চিন্তায় বাধা পড়ল। রাখহরি বললে, "এই ত সরকারী বড় ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টার। আমি একবার দেখা করে আসি। তুমি এইখানে একটু অপেক্ষা কর।"

অপেক্ষা অবশ্য বেশীক্ষণ করতে হল না। সুখবর নিয়ে ফিরে এল রাখহরি। বললে, "তোমার রাস্তাটা শেষ হতে আর কতদিন লাগবে শংকর?"

শংকর বললে, "আমরা ত এখন গরুর গাড়ি চলবার রাস্তাটার কাছে এসে পড়েছি। সেইটেকে পাকা করে শহরে যাবার রাস্তাটার সঙ্গে মিশিয়ে দেব। তাহলেই আমাদের কাজ শেষ।"

"সেটা কতদিনে হবে?"

শংকর বললে, "তা মাসখানেক লাগতে পারে।"

রাখহরি বললে, "তাহলেই এই শহর থেকে সোজা মোটর গাড়ি চলে যাবে আমাদের গ্রামে। কি বল?"

"জিপগাড়িগুলো এখনও যেতে পারে।"

রাখহরি বললে, "না, রাস্তাটা শেষ হক। আমারও ত সময় চাই।" বাড়িটা শেষ করে ওষুধপত্র দিয়ে সাজিয়ে চারটে বেডের ব্যবস্থা করে সরকারের হাতে তুলে দেব। সেই ব্যবস্থাটাই উনি করে দেবেন বললেন।"

এই বলে রাখহরি শংকরকে নিয়ে গেল সেই উকিলের বাড়িতে। ভদ্রলোক সমাদর করে বসালেন তাদের।

শংকরকে দেখিয়ে রাখহরি বললে, "এরই কথা হচ্ছিল সেদিন। এরই নাম শংকর।"

হাত তুলে শংকর নমস্কার করলে। মন্মথবাবু নমস্কার করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন শংকরের মুখের দিকে। শুধু মুখের দিকে নয়, সুগঠিত সুন্দর তার সারা দেহের দিকে। তারপর বললেন, "বাঃ! চমৎকার! আপনার কথা সব শুনেছি আমি।"

শংকর একটুখানি হাসলে। হাসিটি আরও সুন্দর!

মন্মথবাবু তখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

শংকর বললে, "শুনেছেন কার কাছ থেকে?" রাখহরিকে দেখিয়ে বললে, "এঁর কাছ থেকে, না আপনার আত্মীয় পাকপাড়ার নরেনের কাছ থেকে?"

মন্মথবাবু বললেন, "আরে দূর দূর, ওটা হচ্ছে গিয়ে একনম্বরের বখাটে ছোকরা। একটা সত্যি কথা বলে না, মস্ত চালিয়াৎ। বড়লোকের একটি মাত্র ছেলে, টাকাকড়ি দু হাতে ওড়াচ্ছে আর চাল মেরে মেরে বেড়াচ্ছে। ওর কথা বিশ্বাস করতে আছে? রামঃ!"

রাখহরি বললে, "একবার ডাকুন না তাকে। মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

মন্মথবাবু বললেন, "সে কি আছে নাকি এখানে? পরের দিনই পালিয়েছে কল-

কাতায়। আবার একদিন হুট করে এসে হয়ত হাজির হবে। নতুন একটা মোটরবাইক কিনেছে, আমাকে বলে গেল, তাইতে চড়ে একদিন সোজা কলকাতা থেকে এখানে এসে বাইকটা আমাকে দেখিয়ে যাবে।"

শংকর বললে, "আসুক, তারপর একদিন আসব।"

"আসতে পারেন, কিন্তু কখন আসে তার ত কোনও ঠিকঠিকানা নেই। আর এলে যে আপনাকে খবর দেব তারও কোনও ব্যবস্থা নেই।"

রাখহরি বলে উঠল, "আমার ঠিকানায় একখানা পোস্টকার্ড লিখে দিতে পারেন।"

"সে পোস্টকার্ড আপনার হাতে গিয়ে পৌঁছবে, তারপর উনি আসবেন, ততদিন সে থাকবে বুঝি?"

শংকর বললে, "মোটরবাইকটা নিয়ে আসবে ত! বলবেন যাও, ময়নাবুনি গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে এস।"

"যাবার রাস্তা কোথায়?"

রাখহরি বললে, "রাস্তা ত হল বলে। ওইটিই ত শংকরের কীর্তি। ডাক্তারবাবু সোজা এখান থেকে মোটর নিয়ে যাবেন আমাদের গ্রামে। আমার ডাক্তারখানা দেখে আসবেন। সেদিন কিন্তু আপনাকেও যেতে হবে।

"আমার সময় হবে কি?" মন্মথবাবু বললেন।

শংকর বললে, "সময় একটু করে নেবেন। সেইদিন শহর থেকে প্রথম মোটর গাড়ি যাবে ময়নাবুনি গ্রামে। ডাক্তারখানা, রাস্তা, মেয়েদের ইস্কুল—আপনাদের মতন মানুষের পায়ের ধুলো না পড়লে"—

রাখহরি তার কথাটা যেন লুফে নিলে। বাঃ, বেশ কথা বলেছে ত শংকর। কথাটা আরই বলা উচিত ছিল।

বললে, "না না আপনার কোনও কথা শুনব না। আমি নিজে এসে আপনাদের নিয়ে যাব। আপনি না থাকলে আমার ডাক্তারখানার কোনও ব্যবস্থাই হত না।"

শংকর বললে, "নরেন যদি সেদিন আসে ত খুব ভাল হয়।"

"তারিখটা আমাকে আগে জানাবেন। আমি নরেনকে একখানা পোস্টকার্ড লিখে দেব। তবে সত্যি কথা বলতে কি, ও-ছোঁড়াটার সঙ্গ আমি পছন্দ করি না। বুঝলেন?" এই বলে মন্মথবাবু হাসতে লাগলেন। শংকরও হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বললে, "আমাকে 'আপনি' বলবেন না। আমি আপনার চেয়ে অনেক ছোট।"

"আচ্ছা তাই বলব।" মন্মথবাবু বললেন, "নরেন তোমাকে যে-সব কথা বলেছে, সে-সব তুমি শুনেছ নিশ্চয়ই।"

শংকর বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, কিছু কিছু শুনেছি।"

মন্মথবাবু বললেন, "তার জন্যে তুমি যেন মন খারাপ কোর না। ছোঁড়াটা অমনিই। কারও ভাল দেখতে পারে না। যেই শুনেছে তুমি এখানে এসে একটা কাজের মত কাজ করছ, ব্যস্, অমনি যা তা বলতে লাগল তোমার নামে।"

"আপনার চেয়ে আমি বোধহয় ওকে ভাল করে চিনি। আজ তাহলে আসি। নমস্কার।"

শংকরকে বোধহয় মন্মথবাবুর খুব ভাল লেগেছিল। বললেন, "শহরে এলেই এখানে এস যেন।"

"আসব।"

রাখহরি বললে, "চল এবার তোমায় দেখব ডাক্তারের কাছে যাই।"

"চলুন।" বলে শংকর বাইরে বেরিয়ে এসেই বললে, "না থাক। আজ আর ডাক্তারের কাছে যাব না।"

"না না ও কি কথা? চোখকে কখনও অবহেলা করতে নেই।"

শংকর বললে, "অবহেলা করছি না বলেই যাচ্ছি না। গেলেই এখুনি চশমার ব্যবস্থা করে দেবে। আর একবার যদি চশমা পরি, চিরজীবন ধরে পরতে হবে। তার চেয়ে দেখি যদি এমনিই সেরে যায়।"

রাখহরি বুঝলে তার যুক্তিটা। মন্দ বলেনি। চশমা ব্যবহার না করেও ত অনেকের সেরে যায়।

রাখহরি জিজ্ঞাসা করলে, "তাহলে এখন আমাদের কী কাজ?"

"স্টেশনে যাওয়া।" শংকর বললে, "বিকেলের ট্রেনটা যদি ধরতে পারি তাহলে রাত্রি আটটা নাগাদ আমরা বাড়ি পৌঁছতে পারব।"

আটটায় পৌঁছতে পারলে না অবশ্য। ন'টা বাজল।

পল্লীগ্রামের রাত্রি ন'টা মানে সব চুপচাপ।

চুপচাপ নয় শুধু ময়নাবুনি শক্তিকেন্দ্র। মানে তারিণীশংকরের বাগানবাড়িটা। শংকর আর কার্তিকের আস্তানা।

রাখহরির গাড়িটা গিয়ে দাঁড়াল তার বাড়ির দরজায়। শংকর কিন্তু তার আগেই নেমে গেছে। রাখহরির অনুরোধ সত্ত্বেও তার বাড়িতে সে আসেনি। বলেছে, "খেতে দেরি হলে ওঁরা রাগ করেন।"

রাগ অবশ্য কেউ করে না। অ্যালুমিনিয়ামের একটা টিফিন-ক্যারিয়ারে শংকরের খাবার বাগান-বাড়িতে দিয়ে যায়। আজকাল কার্তিকের খাবারও আসছে সেখানে। আসবার অবশ্য কারণ আছে। দুজনে একসঙ্গে বসে খাবার লোভ শুধু নয়, লোভ আর-একটা জিনিসের। মুরগী বা মুরগীর ডিম তারিণীশংকরের বাড়ির ত্রিসীমানায় যাবার জো নেই। অথচ এখানে ও সবের দাম খুব সস্তা। স্টোভ জ্বালিয়ে কার্তিক নিজের হাতে রান্না করে শংকরের সঙ্গে বসে বসে খায়।

সেদিনও কার্তিক সেই ব্যবস্থাই করেছিল। ঘরের ভিতর একটা হ্যাজাক জ্বলছে। হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলো টিম টিম করে জ্বলে বলে কার্তিক একটা 'হ্যাজাক' আনিয়েছে শহর থেকে।

সেই হ্যাজাকের আলো জানলার পথে রাস্তায় এসে পড়েছে। মনে হল যেন কার্তিক একা নেই, তার সঙ্গে আরও লোকজন রয়েছে। শংকর কিন্তু বাগানবাড়ির গেটটা পেরিয়ে এসে তার ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। চৌকাঠের কাছে। ঘরে কার্তিক নেই, হ্যাজাকের সুতীব্র আলোকে স্পষ্ট পরিষ্কার দেখা গেল বসে রয়েছে মাত্র দু জন স্ত্রীলোক,—একজন রাখহরির কন্যা জয়া, আর একজন তারিণীশংকর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী নবাগতা শ্রীমতী ইন্দ্রাণী।

শংকর যা ভেবেছিল ঠিক তাই। এবার আর তার কোনও সন্দেহই রইল না।

সেই ইন্দ্রাণী! পরনে কালো চওড়া পাড় তাঁতের শাড়ি, তেমনি কালো পাড়-দেওয়া সাদা ব্লাউজ। মাথায় একমাথা চুলের এলো খোঁপা। পায়ে স্লিপার। গয়না বলতে হাতে মাত্র দুগাছা চুড়ি, কানে দুটি হীরের মত সাদা পাথর।

ইন্দ্রাণীকে যেন আগের চেয়েও বেশী পরিচ্ছন্ন, আগের চেয়েও বেশী সুন্দরী দেখাচ্ছে। এত সুন্দরী যেন তার না হলেও চলত।

শংকরকে দেখেই জয়া বলে উঠল, "এই নিন আপনার ইন্দ্রাণী দেবী। বেশ লোক যাহক! আমার ওপর বোঝাটি চাপিয়ে দিয়ে নিজে কেমন সরে পড়লেন!"

সর্বনাশ! ইন্দ্রাণী কি তাহলে সবকিছু বলে দিয়েছে নাকি?

শংকর তার নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

কিন্তু সে-ভুল তার ভাঙতে দেরি হল না। জয়া বললে, "এঁরই কথা বলছিলাম। ইনিই শংকরবাবু।"

ঘরে ঢোকবার সময়েই একবার সে শংকরকে দেখে নিয়েছে। জয়ার কথাটা শুনে আর-একবার চোখ তুলে তাকালে।

চোখে চোখ পড়ে গেল এতক্ষণে। ইন্দ্রাণীর দুটি কালো চোখের উপর পড়ল শংকরের দুটি চোখ।

ইন্দ্রাণী চোখ নামিয়ে নিলে। শংকরও বাধ্য হল চোখ ফিরিয়ে নিতে। বিদ্যুতের মত একটা শিহরণ যেন তার সর্বাঙ্গে বয়ে গেল।

কিন্তু কেন? যে-মেয়ে তার সমস্ত অধিকারকে প্রত্যাখ্যান করে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, তাকে দেখে তার কেন এ চঞ্চলতা? টেবিলের উপর মেয়েদের দরখাস্তের ফাইলটা পড়ে ছিল, শংকর সেইটে নাড়াচাড়া করতে লাগল। মনে হল তার হাতের আঙুলগুলো যেন কাঁপছে।

হঠাৎ তার পায়ের উপর হাত পড়তেই শংকর চমকে উঠল। তাকিয়ে দেখলে, ইন্দ্রাণী তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে।

হাতটি মাথায় ঠেকিয়েই আবার সে জয়ার পাশে গিয়ে বসল।

জয়া বললে, "কেমন করে দরখাস্তের জবাব দেওয়া হয়েছিল বললাম ওঁকে। সুন্দর সুন্দর নাম দেখে দেখে—"

বলতে বলতে জয়ার সে কি হাসি।

হাসতে হাসতে বললে, "ইন্দ্রাণী নামটাই ওঁর পছন্দ হল সব চেয়ে বেশী। যেই শোনা আর বললেন—বাস্ একেই আসতে বল।"

ফাইলের পাতা ওলটাতে ওলটাতে, সেদিকে না তাকিয়েই শংকর বললে, "দুজনের বুঝি খুব ভাব হয়ে গেছে।"

হাসির ধমক তখন একটু থেমেছে জয়ার। বললে "হ্যাঁ। খুব।"

শংকরের মুখে কিন্তু হাসি নেই। ইন্দ্রাণীও কী যেন ভাবছে।

জয়া ইন্দ্রাণীর গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, "আ-মর্। গোমড়া মুখ করে বসে আছে দ্যাখ! কী ভাবছ?"

ইন্দ্রাণীর মুখে একটুখানি হাসি দেখা গেল। এ যেন হাসতে হয় বলে হাসা।

জয়া বললে, "জানেন শংকরদা, গরুর গাড়িতে জীবনে এই ও প্রথম চাপলে। গাড়ি থেকে যখন এসে নামল, ভেবেছিলাম, আমারই মতন হবে হয়ত ধিঙ্গি এক কুমারী মেয়ে। ও মা! দেখি—না, সিঁথিতে সিঁদুর। এর সুন্দর মুখ কিন্তু কী গম্ভীর রে বাবা! কথা কইতে ভয় করছিল। তার পর ধীরে ধীরে মুখ খুললে। মা মারা গেছে। ছোট একটি ভাই আছে কলেজে পড়ছে, তার খরচ পাঠাতে হয়। টাকার খুব দরকার, তাই চাকরির জন্যে এই দূরে পাড়াগাঁয়ে এসেছে। আর কি বলছিল জানেন শংকরদা?"

শুনতে শুনতে শংকর বোধকরি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। নীচের দিকে মুখ করে মিছেমিছি ফাইলের পাতাগুলো তখনও সে উলটে চলেছে। বললে, "উঁ?"

ইন্দ্রাণী হাত বাড়িয়ে চুপি চুপি জয়ার গায়ে একটা ঠেলা মারলে।

জয়া কিন্তু তার বারণ শুনলে না। বললে, "বলছিল, চাকরিটা আমার হবে ত ভাই?"

"তুমি কী বললে?"

বললাম, "ভারী ত চাকরি! ধাড়ি ধাড়ি মেয়েদের অ আ ক খ পড়াতে হবে। চাকরিটা তোমারই বরং পছন্দ হলে হয়!"

শংকর মুখ না তুলেই বললে, "হুঁ।"

জয়ার কথা বোধকরি তখনও শেষ হয়নি। বললে, "শংকরদা সেরকম মনিব নন। চাকরি তোমার হবে।"

শংকরের ইচ্ছে করছিল, জয়াকে জিজ্ঞাসা করে—সে তার দাদা হল কখন থেকে? কিন্তু ইন্দ্রাণীর সামনে সে কথা জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছেটা দমন করে বললে, "মনিব আমি কেন হব? মনিব তারিণীবাবু।"

জয়া বললে, "থামুন। সে-কথা আর কাউকে বলবেন। কেন? একে বুঝি পছন্দ হচ্ছে না? আর একটা নাম খুঁজে বের করে দেব? দিন ফাইলটা।" বলেই সে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বললে, "সেই থাকমণি দাসী না কি নাম একটা দেখেছিলাম যেন।"

বাইরে জানলার কাছে ভজু এসে দাঁড়াল। ডাকলে, "দিদিমণি!"

সবাই তাকালে সেইদিকে। ভজুর এক

হাতে লাঠি, এক হাতে একটা লণ্ঠন। বললে, "বাবু আমাকে পাঠালেন দিদিমণি। বাড়ি চল।"

"হ্যাঁ, যাই," বলে জয়া উঠল, "আমি কেমন বসে বসে গল্প করছি দ্যাখো! ওদিকে বাবা এসে বসে আছে। শঙ্করদা, আপনি যে কাজের ভার দিয়েছিলেন, আমি করে দিয়েছি। এবার আমার ছুটি।"

এই বলে জয়া উঠে দাঁড়াল।

শঙ্কর এতক্ষণে মুখ তুলে তাকালে জয়ার দিকে। বললে, "ওঁর থাকবার জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ, সব—সব দেখিয়েছি। কিন্তু শেয়ালের ডাক শুনে উনি চমকে চমকে উঠছেন। ওখানে—ওঁর ওই কোয়ার্টারে উনি থাকবেন কেমন করে একা একা?"

শঙ্কর বললে, "বিশু হালদারের মেয়েটাকে রেখে দেন ওঁর কাছে। দুবেলা দুটি খেতে পেলেই কাজকর্ম করে দেবে। দেখবার কেউ কোথাও নেই।"

জয়া বললে, "আপনি সব ঠিক করেই রেখেছেন তাহলে। আজ চলি।"

"হাঁ যাও।" শঙ্কর বললে, "শত্রুশিবিরে এসেছ। বাবা একজন দরোয়ান পাঠিয়েছেন লাঠি হাতে দিয়ে। ওঁকে আজ তোমার কাছে নিয়ে গিয়েই রাখ।"

জয়া বললে, "তবে কি ভেবেছেন ওকে আপনার কাছে ছেড়ে দিয়ে যাব?"

এই বলে সে এক অদ্ভুত হাসি হেসে ইন্দ্রাণীর হাত ধরে বললে, "এস।"

যেই তারা বেরিয়ে যাবে, দোরের কাছে কার্তিক এসে তাদের পথ আটকে দিলে।

"এ কী ব্যাপার? জয়ারাণী আমাদের এখানে?"

"কেন? তোদের এখানে আসতে নেই নাকি?"

কার্তিক ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারলে না। হাত জোড় করে একটি নমস্কার করলে। বললে, "এ বুঝেছি। আপনিই বুঝি আমাদের বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হয়ে এলেন?"

জয়া বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ। এলেন। হাঁ করে আর দেখতে হবে না, কাজ [illegible]। পথ ছাড়।"

লজ্জিত হল কার্তিক। বললে, "বাঃ! আচ্ছা ফাজিল মেয়ে ত।"

পথ ছেড়ে দিয়ে শঙ্করের কাছে এসে বললে, "শঙ্করদা, জয়াটা কী। ওই বুঝি মাস্টারনী?"

"হাঁ।"

কার্তিক জিজ্ঞাসা করলে, "দরখাস্তের সঙ্গে ফটো পাঠিয়েছিল নাকি?"

শঙ্কর বললে, "না।"

"বেশ দেখেছ ত।" কার্তিক বললে, "মেরে নাও, আর দেরি কেন?"

"দে। আমি চট করে হাতমুখ ধুয়ে নিই।"

গায়ের জামাটা খুলতে খুলতে শঙ্কর উঠে দাঁড়াল।

স্টোভে-চড়ানো মাংসের বাটিটা কার্তিক টেবিলের উপর রাখলে। বললে, "দেখলে? একটা জিনিস দেখতে ভুলে গেলাম।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, "কী?"

"জয়াটা ভাল করে দেখতেও দিলে না। সিঁথিতে সিঁদুর আছে কিনা দেখলাম না।"

এতক্ষণ পরে শঙ্কর হেসে ফেললে। বললে, "আছে।"

"তুমি দেখেছ?"

"দেখেছি। আমাদের কোনও আশা নেই।"

বলেই হো হো করে হেসে উঠল শঙ্কর।

তারিণীশঙ্কর বিদ্যামন্দির (বালিকা বিদ্যালয়) খুলে দেওয়া হয়েছে। গ্রামের মুরুব্বি-মাতব্বরদের ডেকে একটি সভা আহ্বান করা হয়েছিল খোলবার আগে। গ্রামের লোকসংখ্যা কম নয়। সবাই এসেছিল। লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল বালিকা বিদ্যালয়ের সুমুখের রাস্তাটুকু। নেহাত যারা আসবার নয়, তারা ছাড়া গ্রামের মেয়েরাও উঁকিঝুঁকি মারছিল এদিক-ওদিক থেকে। সেটা অবশ্য সভা দেখবার জন্য নয়। সবাই শুনেছিল, মেয়েদের পড়াবার জন্য একজন মাস্টারনী এসেছে কলকাতা থেকে। সে নাকি লেখাপড়াজানা খুব সুন্দরী মেয়ে।

সভা কেমন করে করতে হয় তাও জানে না এখানকার কেউ। শঙ্করকেই সব আয়োজন করতে হল। সভাপতি করা হল তারিণীশঙ্করকে। শঙ্করের ইচ্ছে ছিল রাখহরিকে প্রধান অতিথি করে। রাখহরি কিছুতেই রাজি হল না। বললে, "জয়া ত রয়েছে চব্বিশ ঘণ্টা তোমাদের ওই মাস্টারনীর সঙ্গে। জয়া যাবে তাইতেই হবে। আমি আর নাই-বা গেলাম।"

শঙ্কর বললে, "একটিবার গিয়ে ঘুরে আসবেন।"

তাই হল। শঙ্করের অনুরোধ এড়ান শক্ত। হ্যাকো টানতে টানতে রাখহরি এল একবার। বালিকা বিদ্যালয়টা ঘুরে ফিরে দেখলে। পাছে তারিণীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাই তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

গ্রামের একজন অবস্থাপন্ন চাষীকে করে দেওয়া হল প্রধান অতিথি। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, তারিণীশঙ্করের পাশে লোকটি কিছুতেই চেয়ারে বসতে চাইলে না। তারিণীশঙ্করের পাশে দুখানি চেয়ারে বসল ইন্দ্রাণী আর জয়া।

আবার আর-এক বিপদ বাধল। শঙ্কর যখন তারিণীশঙ্করকে বললে, "আপনি

সুন্দর স্যানিটারী ব্যবস্থা নগরের তথা গৃহের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য অব্যাহত রাখে

দীর্ঘদিন সুনামের সহিত টিউব-ওয়েল, প্লাম্বিং এবং স্যানিটারী ব্যবসায়ে নিয়োজিত

কুমারস্ স্যানিটারী এম্পোরিয়াম

১৩৮ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড
কলিকাতা-২৬ ● ফোন: ৪৬-১২২৩
গ্রাম: কুমারস্যানিট

কিছু বলুন। বলতে হয়।"
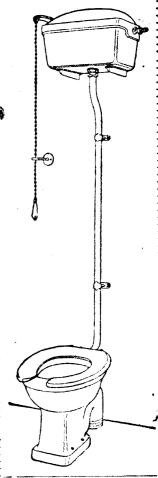
সর্বনাশ! গলাটা কাঠ হয়ে এল ভদ্রলোকের। এমন জানলে এ-সব হাঙ্গামা সে করতেই দিত না শঙ্করকে।

শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়াতেও হল। কিছু বলতেও হল। তবে ভরসা এই যে, সবাই গ্রামের লোক।

থেমে থেমে অতি কষ্টে তারিণীশঙ্কর বললে, "আমাদের এ গ্রামের চেহারা এখন একদম বদলে গেছে। আগে যারা এসেছে তারা দেখে আর চিনতে পারবে না। কিন্তু কেমন করে হল? কে করলে? তুমি করলে? তোমার ব্যাটা করলে? আমি করলাম? রাখহরি করলে? না, কেউ করেনি। করলে এই শঙ্কর। কোত্থেকে এল কেউ জানি না। কেন এল তাও জানি না। জিজ্ঞাসা করলে কিছুতেই বলে না। ওকে যেন ভগবান পাঠিয়ে দিলেন আমাদের গ্রামে। এত সুন্দর ছেলে আমরা কখনও দেখিনি। ও আমাদের নিজের ছেলের চেয়েও বেশী।"

সবাই একসঙ্গে সায় দিয়ে উঠল।

তারিণীশঙ্কর বললে, "সারা গাঁয়ের লোককে সে আপনার করে নিয়েছে। ভগবানের কাছে দিনরাত তার মঙ্গল কামনা করছি। আমি আর কিছু বলতে পারছি না।"

প্রধান অতিথি হরি মোড়ল মাটিতে উবু হয়ে বসে বসে সব শুনছিল। বয়স তার সত্তর পার হয়ে গিয়েছে। মাথার চুলগুলো সব সাদা। মুখে একটিও দাঁত নেই। তারিণীশঙ্কর বসতেই সে উঠে দাঁড়াল। বললে, "তারিণীবাবু যা বললেন তা ঠিক। আমি একটি কথা বলছি—ঠিক কিনা তোমরা বল। শঙ্করের দেশ যেখানেই হক, আমরা তাকে এখান থেকে যেতে দেব না। আমরা সারা গাঁয়ের লোক চাঁদা করে তার ঘরবাড়ি করে দেব, জমি জায়গা দেব, বিয়ে দেব—দিয়ে এই গাঁয়ে রেখে দেব। আমি তার বাড়ি তৈরি করবার সব খরচ দেব। তোমরা কে কী দেবে তাই বল।"

তারিণীশঙ্কর প্রথমেই বললে, "আমি দেব পঁচিশ বিঘে জমি।"

হরি মোড়ল বললে, "বাড়ি তৈরী ছাড়াও আমি দেব দশ বিঘে জমি।"

আর একজন বললে, "আমি দেব দু'বিঘে।"

"আমি এক বিঘে।"

"আমি এক বিঘে।"

এমনি করে কেউ এক, কেউ দুই, কেউ তিন বলতে বলতে যখন পঞ্চাশ বিঘের ওপর জমি দেবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল—শঙ্কর নিজে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বললে, "আপনারা থামুন। বাড়িঘর জমিজায়গা আমি চাই না। আমি চাই আপনাদের স্নেহ, ভালবাসা, আশীর্বাদ। এইটিই আমি চেয়েছিলাম, আর তা আমি পেয়েছি। বিষয় সম্পত্তি বাড়িঘর নিয়ে আমি কী করব? আমি একা।"

এই বলে সে একবার ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়েই বসে পড়ল। তীরটা যাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লে তার বুকে ঠিক লেগেছে কিনা বোধকরি একবার দেখতে চাইলে। ইন্দ্রাণী তখন মাথা হেঁট করে বসে আছে। মুখখানা ভাল দেখা গেল না।

ছেলেদের ইস্কুলটা ত সরকারী পয়সায় বড় হবেই, মেয়েদের ইস্কুলটাও শেষ পর্যন্ত বাদ যাবে না, তবে এখন যেমন চলছে চলুক।

এ যুগে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা একান্ত প্রয়োজন, তাই গ্রামের প্রায় সকলেই তাদের মেয়েদের পাঠালে। ছোট ছোট মেয়েগুলো ত এলই, এমনকি বড় মেয়েরাও আসতে লাগল। বড় মেয়েরা যত-না এল পড়তে, তত এল ইন্দ্রাণীকে দেখতে আর তার সঙ্গে কথা বলতে, গল্প করতে। পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা সাধারণত রেখে-ঢেকে কথা বলতে জানে না। এক-একজন ত ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে তাকিয়েই বলে ওঠে, "ও মা, এ যে দেখছি মাথায় সিঁদুর রয়েছে! তা কর্তাটি ছেড়ে দিয়েছে, না আছে এখনও?" এক-একজন এমন কথা বলে যে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে ইন্দ্রাণীর।

প্রথম কয়েকদিন জয়া প্রায় অধিকাংশ সময় তার সঙ্গে-সঙ্গেই থাকত। ইন্দ্রাণী ভেবেছিল, শঙ্কর শুধু সেই জন্যেই তার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না। নইলে নিশ্চয়ই সে আসত। তাই জয়া যেদিন বলেছিল, "আজ রাত্রেও তোর কাছে থাকতে ইচ্ছে করছে ইন্দ্রাণী।"

ইন্দ্রাণীর সত্যিই ভয় হয়েছিল মনে-মনে। বলেছিল, "তুই কি আমাকে আগলে রাখতে চাস নাকি?"

জয়া হেসেছিল। বলেছিল, "তা যেরকম রূপ নিয়ে জন্মেছিস, বিশ্বাস করব কেমন করে? তার ওপর বলছিস যখন কর্তাটির সঙ্গে তোর রাগারাগি হয়েছে—"

ইন্দ্রাণী বলেছিল, "নজর দেবার মত কেউ আছে নাকি তোদের গাঁয়ে?"

"পাশেই ত রয়েছে একজন।"

সে যে শঙ্করের কথা বলছে সেকথা বুঝতে ইন্দ্রাণীর দেরী হয়নি। বলেছিল, "যাঃ।"

জয়া বলেছিল, "আর যাই করিস, দেখিস যেন ওইখানে নজর দিস না।"

ইন্দ্রাণী বলেছিল, "কেন? তোর বুঝি আগেই নজর পড়ে গেছে।"

জয়া বলেছিল, "ভারি শক্ত ঠাঁই। একবার ফিরেও তাকায় না।"

কথাটা শুনে খুশিই হয়েছিল ইন্দ্রাণী। কিন্তু সেদিন ইস্কুলের মিটিংএ শঙ্করের কথা শুনে তার সব আশা যেন নির্মূল হয়ে গিয়েছে।

হালদারদের যে-মেয়েটিকে রেখে দেওয়া হয়েছে ইন্দ্রাণীর কাছে, তার ডাক-নাম টুনু। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, রং ময়লা, চেহারাটা ঠিক ভালও বলা চলে না, আবার নেহাত মন্দও নয়। কিন্তু বেচারার অদৃষ্টটা বড় মন্দ। সে-বছর গড়গড়ির মেলায় তার ভাই দুপয়সার তেলেভাজা খেয়ে এল; তাকেও দিয়েছিল দুটো, সেও খেয়েছিল, কিন্তু তার কিছু হল না। ভাইটার হল কলেরা। দিনে হল, রাত্রে মরে গেল। একটিমাত্র ভাই, বারো বছরের ছেলে, ধড়ফড় করে মরে গেল চোখের সামনে।

মা সেবা করেছিল ছেলের। মার হল পরের দিন। ছেলেকে পুড়িয়ে শ্মশান থেকে বাবা ফিরে এসে দেখলে, স্ত্রী ছটফট করছে। ছেলের শোক আর রোগের যন্ত্রণা বেশিক্ষণ তাকে সহ্য করতে হল না। বারো ঘণ্টাতেই সব শেষ হয়ে গেল। ছেলেকে আর স্ত্রীকে শ্মশানে রেখে এসে বাবা যে একটু বসে বসে কাঁদবে তারও সময় পেলে না। বাড়ি ফিরেই সে শুয়ে পড়লো। কিন্তু কি জানি কেন, বাপ অত সহজে গেল না। গাছ-গাছড়ার শিকড় ধারণ করে দুদিন সমানে যুঝলে এই মারাত্মক ব্যাধির সঙ্গে। সবাই বলতে লাগল, ভগবান এর নিষ্ঠুর নন। দুদিন পরে সে উঠে বসল। বললে, "খুব খিদে পেয়েছে, ভাত খাব।" পাশের বাড়ি থেকে একথালা ভাত আর একবাটি মাছের ঝোল চেয়ে আনলে টুনু। বাপ আর মেয়ে দুজন খেলে বসে বসে। কিন্তু সেই খাওয়াই তার শেষ খাওয়া হয়ে গেল। সকালে বাপ আর বিছানা ছেড়ে উঠল না। কেমন করে কখন যে মরে গেছে টুনু তা জানতেও পারল না। ছুটে ছুটে লোক জড়ো করলে। সবাই বলতে লাগল—ছেলে মলো, স্ত্রী মলো, অশৌচ অবস্থায় মাছ-ভাত খাওয়া তার উচিত হয়নি। শাস্ত্রবাক্য অমান্য করার এই ফল। শাস্ত্রবাক্য অমান্য অবশ্য টুনুও করেছিল। কিন্তু যমরাজ তাকে স্পর্শ করলে না।

বিয়ে অবশ্য একটা তার হয়েছিল। তখন তার বারো বছর বয়েস। বিয়ের পর সে তার স্বামীকেও আর দেখিনি, শ্বশুরবাড়িও যায়নি। সামুরাই গ্রামে গিয়ে হালদার তার জামাইএর খোঁজখবর অনেক করেছে কিন্তু নটবর গোঁসাইএর কোনও পাত্তা মেলেনি। ভিটেয় তার একটা নারকেল কুলগাছ ছাড়া আর কিছু ছিলও না লোকটার।

কাজেই টুনু সধবা কি বিধবা তাও সে জানে না।

বাপ ছিল নিতান্ত গরিব। সেও যখন

চলে গেল, আপনার বলতে কেউ আর রইল না টুনুর। বাড়িতেও কিছু নেই যে, বসে বসে খাবে।

টুনু একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল ব্যাপার দেখে। তার চোখের জল গেল শুকিয়ে, মুখের কথা গেল বন্ধ হয়ে। এর ওর বাড়ির দোরে গিয়ে দাঁড়ায়, মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। দেখলে দয়া হয়। অতি বড় পাষাণেরও বুক ফেটে যায়। কেউ দেয় দুটি অন্ন, কেউ দেয় লজ্জা নিবারণের বস্ত্র।

কিন্তু শুধু অন্ন আর বস্ত্র দিলেই চলে না। ভগবান তার সব কিছু কেড়ে নিয়েছেন, নেননি শুধু তার দেহের স্বাস্থ্য। সারা অঙ্গে তখন তার যৌবনের জোয়ার। অযত্ন-বর্ধিত বুনো গাছের মত সর্বদেহে তার বন্য মাদকতা।

তার জন্য চাই একটু নিরাপদ আশ্রয়।

তাও-বা কোনোদিন মিলত, কোনোদিন মিলত না।

সেই টুনু আজ আশ্রয় পেয়েছে ইন্দ্রাণীর কাছে।

ইন্দ্রাণী কিন্তু দুদিনেই তার চেহারা দিয়েছে বদলে।

"তুই রান্না করবি আর সেই রান্না আমি খাব? এই সাবানখানা নিয়ে যা পুকুরের ঘাটে, গিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত বেশ করে ঘষে ঘষে পরিষ্কার হয়ে আয়।"

ইন্দ্রাণী তাকে ভাল সাবান মাখিয়ে, ভাল তেল মাখিয়ে, নিজের পুরনো কাপড় পরিয়ে এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তুলেছে যে, তাকে আর সেই টুনু বলে চেনবার জো নেই।

ইন্দ্রাণী সেদিন একটা কাগজে লিখলে :
ভাই জয়া,

অতিথির উপর রাগ করতে নেই। জিনিসটে যদি সত্যিই তোর হয় তো সে জিনিসে আমি হাত দেবো না, তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস। এখন কিন্তু তোকে আমার একান্ত প্রয়োজন। দয়া করে টুনুর সঙ্গে একবার আসবি? না এলে আমি নিজেই যাব। ইতি।

তোর
ইন্দ্রাণী

টুনুর সঙ্গে জয়া এল হাসতে হাসতে।

"ও সব কী লিখেছিস হতভাগী?"

"বেশ করেছি। এখন শোন তোকে আমি কী জন্যে ডেকেছি।"

এই বলে জয়াকে তার ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে খাটে বসিয়ে বললে, "তোর বাবুটির সঙ্গে যে একবার দেখা করা দরকার। তোর অনুমতি ছাড়া ত দেখা করতে পারি না।"

জয়া বললে, "আমার আবার বাবু কে? যাঃ!"

"ওই যে গো পাশে থাকে, তোমাদের গাঁয়ের হিরো, ইস্কুলের সেক্রেটারি।"

"কেন, শঙ্করদার নামটা কি তোকে উচ্চারণ করতে নেই নাকি?"

এই বলে খুব রসিকতা করেছে মনে করে হাসতে হাসতে জয়া ইন্দ্রাণীকে জড়িয়ে ধরে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলে, "কী দরকার? বল না। খুব দেখতে ইচ্ছে করছে?"

ইন্দ্রাণী বললে, "তুই কি ভেবেছিস বল দেখি? ও কি আমার কাছে সত্যিই দুর্লভ? আমি যদি ইচ্ছে করি, কেনা গোলামের মত ওকে আমার পিছু পিছু ঘোরাতে পারি।"

জয়া বললে, "পারবি না।"

"বাজি রাখ।" ইন্দ্রাণী বললে, "দ্যাখ্ পারি কি-না!"

জয়া বললে, "না বাবা, যদি-বা একটু আশা আছে তাও আবার যায় কেন?"

"আছে নাকি আশা?"

নীরবে হাসতে হাসতে জয়া তার চোখের ইশারায় জানিয়ে দিলে—আছে।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করলে, "কথাবার্তা হয়েছে নাকি কিছু?"

জয়া বললে, "হ্যাঁ। বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—শঙ্করকে বিয়ে করবি? আপত্তি না থাকে ত বল্, একবার দেখি চেষ্টা করে।"

কথাটা ইন্দ্রাণীর বুকে গিয়ে বাজল ধক্ করে। তবু সে জিজ্ঞাসা করলে, "তুই কি বললি?"

"আমি? আমি ভাই লজ্জায় মুখ বুজে পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে।"

ইন্দ্রাণী হঠাৎ তলিয়ে গেল তার নিজের চিন্তায়। সত্যিই ত ওরই-বা কী দোষ? বিয়ে যে এতদিন সে করেনি—এই তার পরম সৌভাগ্য। দুরন্ত অভিমানে যাকে সে অপমান করে তাড়িয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি, মনের উত্তেজনা শান্ত হলে সেই
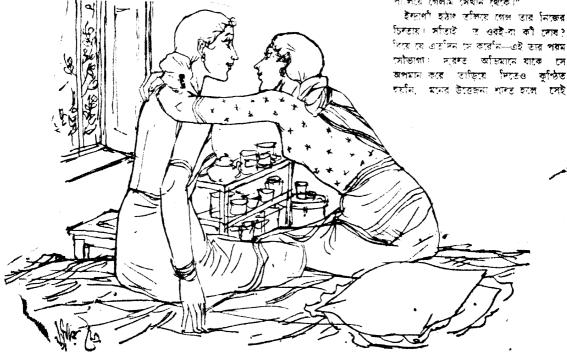
"খুব দেখতে ইচ্ছে করছে?"

তারই কথা ভেবেছে সে দিবারাত্রি। সমরকে পাঠিয়েছে কলকাতায়। ফিরে এসে বলেছে, কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না। তখন সেই দিকচিহ্নহীন অন্ধকারে বারবার শুধু মাথা ঠুকেছে আর অনুতাপ করেছে। কেঁদেছে আর বলেছে ভগবানকে—'তাকে তুমি আমার কাছে ফিরিয়ে দাও, আমি আমার ভালবাসা দিয়ে, প্রাণ দিয়ে দেখি তাকে আমার মনের মত করে তুলতে পারি কিনা! যে-ভুল আমি করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগটুকু দাও একবার।' তার সে প্রার্থনা যে এমন করে তিনি শুনবেন সেকথা কোনদিন সে কল্পনাও করতে পারেনি।

এ সুযোগ সে ছাড়বে না কিছুতেই।

শংকরের এখন অভিমানের পালা।

ইন্দ্রাণী প্রস্তুত হল অভিসার যাত্রায়।

শংকর খেতে এসেছিল বাগান-বাড়িতে। কার্তিক বাড়িতে খায় দিনের বেলা।

সেদিন রবিবার। ইস্কুলের কাজ বন্ধ।

শংকর শেষ রাত্রে ওঠে বিছানা ছেড়ে। স্যানিটারী প্রিভি, স্নানের ঘর, শংকর তৈরি করিয়েছে বাগান-বাড়িতে। ইন্দ্রাণীর কোয়ার্টারেও তৈরি করিয়ে দিয়েছে।

আমগাছের তলায় অনেকক্ষণ ধরে শংকর এক্সারসাইজ করে, নিজের হাতে কুয়ো থেকে জল তুলে স্নানের ঘরের ড্রাম ভর্তি করে, তারপর স্নান করে জামাকাপড় ছেড়ে যখন উঠনে এসে দাঁড়ায়—পূবদিকের আকাশে তখন সূর্য ওঠে। দুহাতের আঙুলে আঙুলে ভাঁজ দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে সূর্য প্রণাম করে শংকর। গ্রামের কয়েকজন ছেলে আসে ব্যায়াম করতে। শংকর তাদের দেখিয়ে দেয়।

বারোয়ারীতলায় কার্তিকের ব্যাণ্ডপার্টির বাজনার আওয়াজ শোনা যেতেই শংকর বেরিয়ে পড়ে।

বালিকা বিদ্যালয়ের ছাতে উঠে ইন্দ্রাণী সব-কিছু দেখেছে। রোজই দেখে।

রাত্রে খাওয়া শেষ করেই কার্তিক বাড়ি চলে যায়। শংকর একাই থাকে বাগান-বাড়িতে। ইন্দ্রাণীর ইচ্ছে করে ছুটে চলে যায় তার কাছে। সে যখন এল না তখন তাকেই যেতে হবে। কিন্তু যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও আবার ফিরে আসে। ছাতে গিয়ে একা বসে বসে খানিকটা কাঁদে।

ইন্দ্রাণী জয়াকে বললে, "চল্ এবার যাই। খাওয়া এতক্ষণ হয়ে গেছে।"

দুজনে গিয়ে যখন দাঁড়াল, খাওয়া শেষ করে শংকর তখন চুপ করে বসে বসে কি যেন ভাবছে। মুখ তুলে তাকিয়ে এদের দেখেই একটু হেসেই বললে, "কী খবর?"

জয়া ইন্দ্রাণীকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, "আপনার মাস্টারনী কী যেন বলবে।"

শংকর বললে, "বলুন।"

ইন্দ্রাণী বললে, "ভেবেছিলাম ক্লাসটা দেখতে যাবেন একবার, গেলেন না তাই আসতে হল।"

"রাস্তাটা নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। জয়ার বাবা তাড়া লাগিয়েছেন তাড়াতাড়ি শেষ করবার জন্যে।" শংকর জয়ার দিকে তাকিয়ে বললে, "তুমি ত জানো ওই রাস্তার ওপর দিয়ে শহর থেকে মোটরে চড়ে ডাক্তার আসবেন তোমাদের হাসপাতাল দেখতে।"

ইন্দ্রাণী বললে, "ইস্কুলে সত্তর জন মেয়ে আসছে। একটা ঘরে কুলোয় না, দুটো ঘরে বসাতে হয়।"

শংকর বললে, "বুঝেছি। একা সামলাতে পারছেন না?"

"না। দুদিক সামলান শক্ত।"

শংকর বললে, "পড়ছে ত সব অ আ ক খ?"

ইন্দ্রাণী বললে, "সেই ত হয়েছে আরও মুশকিল। কেউ ত অক্ষর চেনে না। বইও নেই অনেকের। সবাইকে চিনিয়ে দিতে হয়।"

শংকর জয়ার দিকে তাকালে। "বন্ধুকে একটু সাহায্য কর না।"

"ও আমার বন্ধু কেন হবে? শত্রু।"

এই বলে জয়া হাসতে হাসতে ইন্দ্রাণীর গায়ে ঠেলা দিয়ে বললে, "সত্যি কিনা—আচ্ছা তুইই বল না!"

শংকর বললে, "ওরে বাবা 'তুই' হয়ে গেছে এরই মধ্যে? তাহলে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।"

জয়া বললে, "কখখনো না। ওকে সাহায্য করতে গিয়ে কি আমি মরব?"

"তবে দেখুন," শংকর বললে, "অতগুলো মেয়ে থাকবে না। কতক গেছে হুজুগে পড়ে, কতক গেছে আপনাকে দেখতে।"

ইন্দ্রাণী বললে, "আমাকে 'আপনি' 'আপনি' করছেন কেন? আমি আপনার চেয়ে অনেক ছোট।"

শংকর বললে, "বয়েসে ছোট হতে পারেন, বিদ্যায় বুদ্ধিতে মর্যাদায় আমার চেয়ে আপনি অনেক—অনেক বড়।"

মাথা হেঁট করে কথাটা শুনছিল ইন্দ্রাণী। শংকরের বলা শেষ হলে ইন্দ্রাণী তার আয়ত চোখের পাতাদুটি একবার তুললে শংকরের দিকে। তুলেই আবার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিলে। রাগ নয়, অভিমান নয়, ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত যে-চোখের সঙ্গে একদিন ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল শংকরের, তার চিহ্নমাত্র ছিল না সে-চোখে। মিনতিকাতর চোখদুটি যে এরই মধ্যে সজল হয়ে এসেছে সেটুকু চোখে পড়বার মত যথেষ্ট আলো তখন ছিল সে-ঘরে।

শংকরের কিন্তু বিচলিত হবার লক্ষণ দেখা গেল না, সে বরং তার বলার সুরটা আর এক পর্দা চড়িয়ে দিলে। বললে, "তুমি বলবার মত স্পর্ধা আমার নেই। তাছাড়া সে অধিকারই-বা আমি পাব কোথায়?"

"অধিকার?" জয়া বললে, "ওর হয়ে আমি দিলাম আপনাকে। বলুন আপনি। বেশ শোনাবে।"

এই বলে ব্যাপারটাকে আরও তরল করে দেবার জন্য জয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "আমাকে কেউ 'আপনি' বললে না। —আর কিছু বলবি?"

"কাকে বলব?"

ইন্দ্রাণীর গলাটা যেন ধরে গিয়েছে মনে হল।

জয়া বললে, "আমি ত তোকে আগেই বলেছি, শংকরদার শরীরটাও যেমন পাথরের মত, ওর মনটাও তেমনি। নে, চল্।"

ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়াল। শংকরের দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। না তাকাবার কারণ বোধহয় তার চোখে তখন জল এসে পড়েছিল। জয়া কিন্তু দোরের কাছে গিয়ে একবার পিছন ফিরে তাকালে। দুষ্টু হাসি ছিল তার মুখে। কিন্তু মুখের হাসি তার মুখেই রয়ে গেল শংকরের মুখের পানে চেয়ে। তারও মুখখানা যেন কান্নার মত করুণ। মনে হল তারও চোখদুটো যেন চিক চিক করছে।

সরোজিনী সেবা-সদনের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

রাস্তা তৈরির কাজ জোর চলছে। বালমা থেকে গাড়ি গাড়ি কাঁকর আসছে, পাথর আসছে। তারিণীশংকর শহরের মিউনিসি-প্যালিটি থেকে হাতে-টানা একটা রোলার এনে দিয়েছে।

রাখহরির মুহূর্তের অবসর নেই। ডাক্তার-খানার ওষুধপত্র থেকে আরম্ভ করে সব রকমের সব জিনিস আনিয়ে সাজিয়ে দেবার ভার দেওয়া হয়েছে একজন ঠিকাদারের উপর। জিনিসপত্র আসতে আরম্ভ করেছে।

মন্মথবাবুই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

রাখহরি এরই মধ্যে একদিন গিয়েছিল রাস্তাটা দেখতে। শংকরের কাছে গিয়ে এ-কথা সে-কথার পর বললে, "দ্যাখো, ভাল কাজের একটা নেশা আছে। জলের মত টাকা খরচ হচ্ছে বটে, কিন্তু মন্দ লাগছে না।"

শংকর তার মুখের পানে তাকিয়ে হাসলে একটুখানি।

রাখহরি বললে, "নেশাটা তুমিই ধরিয়ে দিলে।"

শংকর চুপ করে রইল।

"তবে মন্মথবাবু আমাকে খুব সাহায্য করলেন।"

শংকর বললে, "মানুষটি ভাল।"

"তোমাকে তাঁর খুব ভাল লেগেছে। প্রায়ই বলেন তোমার কথা।"

শংকর জিজ্ঞাসা করলে, "আমাদের ওপ্‌নিংএর দিন আসবেন ত?"

রাখহরি বললে, "বললেন ত চেষ্টা করব। হ্যাঁ, কথায় কথায় তোমার সেই বন্ধু নরেনের কথা উঠল। বললাম, আসবার জন্যে একখানা চিঠি লিখে দিন না! উনি বললেন, হতভাগা যত না আসে ততই ভালো। এই দেখুন একখানা চিঠি লিখেছে। হাতের লেখা দেখুন না। রাবিশ্‌! বলে ড্রয়ার থেকে খামের একখানা চিঠি দেখালেন।"

"কী লিখেছে চিঠিতে?" শংকর জিজ্ঞাসা না করে পারলে না।

রাখহরি বললে, "হাতের লেখা দু'লাইনের বেশী পড়তে পারলাম না। মন্মথবাবু বললেন, আমি পড়েছি অতি কষ্টে। বড়লোকের ছেলে—বড়লোক বন্ধু জুটেছে। সেই বন্ধুর সঙ্গে কোথায় কোন্‌ জঙ্গলে যাবে বাঘ মারতে।"

শংকর হো হো করে হেসে উঠল। "নরেন বাঘ মারবে?"

রাখহরি বললে, "হ্যাঁ। মন্মথবাবুকে লিখেছে খুব ভাল একটা বন্দুক কিনবে, তার লাইসেন্সের জন্যে একটা দরখাস্ত লিখে পাঠাবেন।"

শংকর বললে, "বন্দুক কিনলেই বুঝি বাঘ মারা যায়?"

রাখহরি কিন্তু এসেছিল অন্য কথা বলতে। বললে, "মরুকগে, শোন। লেইটের কী হল? সেই যে বলেছিলাম।"

"কী বলেছিলেন, বলুন ত।"

কথাটা শংকরের ঠিক মনে পড়ছিল না।

রাখহরি বললে, "শুভকাজগুলো একসঙ্গে সেরে দিই তাহলে।"

"শুভকাজ?" শংকর আবার জিজ্ঞাসা করলে।

রাখহরির কেমন যেন লজ্জা করছিল বলতে। "এখনও মনে পড়ল না? নিজের কথা কি কিছু মনে থাকে না তোমার? জয়ার বিয়ে।"

ইন্দ্রাণী আসার পর কথাটা শংকর সত্যিই ভুলে গিয়েছিল। পরিষ্কার জবাব দিলে রাখহরি আঘাত পাবে। শংকর এখন আর তাকে সে-আঘাতটা দিতে চাইলে না। বললে, "রাস্তাটা শেষ হোক, আপনার ডাক্তারখানা খুলে যাক, তারপর বলব। এখন কিছু ভাবতে পারছি না।"

শংকর ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাত তখন প্রায় দুটো। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ চেয়ে দেখে, কে যেন বসে আছে তার বিছানায়। ঘরের জানলা দরজা সবই খোলা। বন্ধ করার অভ্যাস তার নেই। পূর্ণিমার কাছাকাছি কি একটা তিথি। জ্যোৎস্নার আলোয় ঘর ভরে গেছে।

চিনতে দেরি হল না শংকরের। ইন্দ্রাণী বসে আছে। সেই ইন্দ্রাণী তার এত কাছে? একেবারে নাগালের ভেতর, মুঠোর মধ্যে।

শংকর উঠে বসল না, শুধু পাশ ফিরে শুলো ইন্দ্রাণীর দিকে মুখ করে। "ইন্দ্রাণী!"

ইন্দ্রাণী চুপ করে আছে, কোনও কথা বলছে না। ডান হাতটি বাড়িয়ে শংকর তার একখানি হাত চেপে ধরে আবার ডাকলে, "ইন্দ্রাণী!"

মাথা হেঁট করে বসে ছিল ইন্দ্রাণী। তার চোখ থেকে গড়িয়ে টপ্‌ করে এক ফোঁটা জল পড়ল শংকরের হাতে।

"তুমি কাঁদছো ইন্দ্রাণী?"

ইন্দ্রাণী এতক্ষণ পরে কথা বললে। "আমাকে ক্ষমা কি তুমি করবে না?"

শংকর বললে, "কী দোষ তুমি করেছ যে, তোমাকে আমি ক্ষমা করব?"

ইন্দ্রাণী বললে, "তোমাকে অপমান করেছি, তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছি—"

"যাকে ভালবাসতে পারবে না, তাকে তাড়িয়ে দেবে না ত কী করবে?"

"কিন্তু তারপর?" ইন্দ্রাণী বললে, "কেঁদে কেঁদে মরলাম।"

শংকর বললে, "কার জন্যে কাঁদলে? যে-লোকটা তোমাকে প্রতারণা করেছিল, যে-লোকটা ছিল তোমার দু' চক্ষের বিষ—তার জন্যে কেঁদে মরলে?"

"তাছাড়া আমার কোনও উপায় ছিল না যে!"

"কেন? দুটো মন্ত্র পড়ে তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল বলে?"

ইন্দ্রাণী মাথা হেঁট করে যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল, কোনও কথা বললে না। শংকরের হাতটি ধরে সে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

শংকর বললে, "আমার মা চেয়েছিল আমি মানুষ হই, তুমিও চেয়েছিলে একটি মানুষের মত মানুষ। কাউকে আমি খুশী করতে পারিনি। মা সরে গেল আমার কাছ থেকে। তুমিও আমাকে সরিয়ে দিলে তোমার কাছ থেকে। আমার আর কোনও অবলম্বন রইল না পৃথিবীতে। আমি চলে এলাম দূরে। চেষ্টা করলাম আমার পিছনের জীবনটাকে ভুলে যেতে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম, তুমি সুখী হও।"

ইন্দ্রাণী মুখ তুলে চাইলে। বললে, "কেমন করে হব?"

"মানুষ কেমন করে সুখী হয় তুমি জানো না?"

ইন্দ্রাণী বললে, "না। পারলাম না ত সুখী হতে!"

শংকর বললে, "পারবে কেমন করে? ভালবাসা দিতে পারনি যে! মানুষ সুখী হয় ভালবেসে। তোমার উচিত ছিল প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পার—এমন একটি মানুষকে খুঁজে বের করা।"

"কী যা-তা বলছ? আমি হিন্দুর মেয়ে না?"
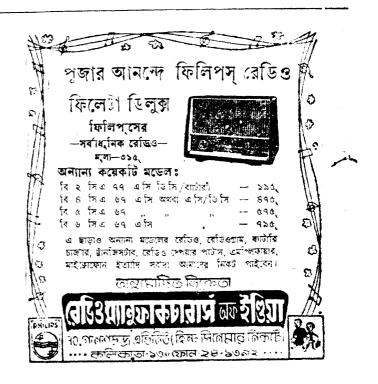
শংকর হাসলে। বললে, "ধোৎ তোর হিন্দু! দেখছি ত চারদিকে তাকিয়ে। ভালবাসার নামগন্ধ নেই কোথাও। স্বামী স্ত্রী একসংগে ঘরকন্না করছে, গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলেমেয়ে হচ্ছে, অথচ কেউ কাউকে ভালবাসে না। কাজ কি তোমার এই হিন্দু-সমাজে? তুমি হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ। সবার আগে তুমি নিজে, তোমার জীবন। তোমার জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার অধিকার তোমার আছে।"

ইন্দ্রাণী চুপ করে' শুনেছিল। মনে হচ্ছিল, এ যেন অন্য শংকর। যে-শংকরের সংগে তার প্রথম পরিচয়, এ যেন সে শংকর নয়।

শংকর কথা বলতে বলতে একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বললে, "তুমি বলছ তুমি হিন্দুর মেয়ে। দেবতা আর অগ্নিকে সাক্ষী রেখে তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলে বিয়ের সময়। তার পরমুহূর্তেই প্রতিজ্ঞা ভংগ করতে তুমি কুণ্ঠিত হওনি। তোমার স্বামী পছন্দ হয়নি, স্বামীর ঘর পছন্দ হয়নি, শাশুড়ী পছন্দ হয়নি। শাশুড়ী ঝি-এর মত কাজ করেছে, আর তুমি সেজেগুজে চুপচাপ বসে বসে রাগে ফুলেছ। বৌভাতের দিন বিদ্রোহের চরম করে' তুলেছ। ছেলেকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে, বিধবা মায়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে, আর ঠিক সেই সময় তুমি কী করেছ? কচি খুকি নও, লেখাপড়া জানা শিক্ষিতা মেয়ে, অসহায়া সেই বিধবা শাশুড়ীর অনুরোধ উপরোধ নিষেধ-বারণ সবকিছু অগ্রাহ্য করে' তাকে সেই বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে এসেছ সেখান থেকে। তুমি যদি তখন তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে, ছেলে তার যত বড় পাষণ্ডই হোক, তিনি অন্তত অমন করে গলায় ফাঁসি লটকে আত্মহত্যা করতেন না।"

আর কথা বলতে বলতে শংকরের গলাটা ধরে এল, চোখ দুটো ছল্ ছল্ করতে লাগল।

ইন্দ্রাণীর চোখ দিয়ে তখন দর্ দর্ করে' জল গড়াচ্ছে। দু হাত বাড়িয়ে শংকরের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললে, "আর বোল না। আর আমি সহ্য করতে পারছি না। আমার অন্যায় হয়েছে, অপরাধ হয়েছে।"

এই বলে সে একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

শংকর তাকে তুলে দিলে। বললে, "কেঁদো না, চুপ কর। হিন্দুর মেয়ে! হিন্দুর মেয়ে! শাশুড়ী মরে গেছে, খবর পেয়েছ, অশৌচ পালন করনি। তারপর তোমার সেই স্বামী তোমার কাছে গেছে অনুতপ্ত হয়ে, সমস্ত প্রাণমন দিয়ে দুহাত বাড়িয়ে তোমাকে চেয়েছে, তোমাকে ভালবেসে তোমার ভালবাসা পেয়ে নিজেকে আবার নতুন করে' গড়ে তুলবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে, তোমার শুধু পায়ে ধরতে বাকি রেখেছে, তুমি তাকে স্বামী বলে স্বীকার পর্যন্ত করতে চাওনি, অপমান করে, দূরে করে তাড়িয়ে দিয়েছ। তখন তুমি হিন্দুর মেয়ে ছিলে না? তখন কোথায় ছিল তোমার হিন্দুত্ব?"

কাঁদতে কাঁদতে ইন্দ্রাণী বলে উঠল, "চুপ কর, তুমি চুপ কর। তোমার দুটি পায়ে পড়ছি—তুমি আর বোল না।"

শংকর বললে, "বেশ আর বলব না। কিন্তু আমি খুশী হতাম, যদি দেখতাম, তুমি একটি মানুষকে ভালবেসে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করছ।"

"না, তা আমি পারিনি। কোনোদিন পারব না।" বললে ইন্দ্রাণী।

শংকর বললে, "তোমার হিন্দুধর্ম এইখানে খানিকটা কাজ করেছে। তোমার সহজাত সংস্কার তোমাকে ও-পথ মাড়াতে দেয়নি।"

"কী বললে? ওইরকম করলে তুমি খুশী হতে? তোমার রাগ হত না?" ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করলে।

"রাগ কেন হবে?" শংকর বললে, "আমি জানতাম আমি তোমার অযোগ্য, তুমি আমাকে ভালবাসতে পারনি, তাই অন্য আর-একজনকে ভালবেসে সুখী হয়েছ। এ ত আনন্দের কথা। ভালবাসতে পারার মত, ভালবাসা পাওয়ার মত—সুখ বল সৌভাগ্য বল আর-কিছু আছে মানুষের জীবনে? ভালবেসে ভুলও যদি কর তবু ভাল। ভালবাসার অভিনয় নয়, সত্যিকারের ভালবাসা। পৃথিবীতে যারাই বড় হয়েছে তারা, জানবে, মা-বাপের ভালবাসার সন্তান। সেই রকমের সন্তানের মা হতে তোমার ইচ্ছা করে না?"

"জানি না। তুমি বিশ্বাস কর আর না কর, ভগবানের নাম নিয়ে আর এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি—শুধু তোমার কথা ছাড়া আমি আর কারও কথা ভাবতে পারিনি। তোমার সেই ঝিলপাড়ার বাড়িতে সমরকে পাঠিয়েছি। নিজে গেছি। তোমাদের বস্তির বাড়িটা দেখে এসেছি। থানায় গেছি তোমার সন্ধান করতে। থানার বড়বাবু তোমার সম্বন্ধে কত কথা বলেছেন। বলেছেন, 'ছেলেটাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম।' তিনি আমাকে তাঁর কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার ঠিকানা নিয়ে রেখেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমিও তার খোঁজ করছি—খবর পেলেই তোমাকে জানাব'।"

বলতে বলতে ইন্দ্রাণীর ঠোঁট দুটি থর থর করে কাঁপতে লাগল।

শংকর বললে, "থাক্ থাক্ আর বলতে হবে না। বুঝতে পেরেছি।"

ইন্দ্রাণী তখন ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেলেছে।

"কিন্তু কেন? কেন তুমি সেই গুণ্ডাটাকে খুঁজে মরছিলে? সে ত তোমাকে সুখে রাখতে পারত না।"

"না আমি তাকে খুঁজিনি। আমি খুঁজেছিলাম সেই লোকটিকে যে একদিন আমার কাছে গিয়ে বলেছিল—আমি ভাল হব। আমি তোমাকে সুখে রাখবার চেষ্টা করব।"

এই বলে ইন্দ্রাণী তার হাতখানা দুহাত দিয়ে চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, "অনেক কথাই ত তুমি আমাকে বললে, এইবার আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, জবাব দেও।"

"কি বলবে বল।"

"তুমি কি কোনও মেয়েকে ভালবেসেছ?"

শংকর বললে, "বেসেছি।"

ইন্দ্রাণী বললে, "কাকে? জয়াকে?"

"না। ইন্দ্রাণীকে।"

ইন্দ্রাণী, "কেন ঠাট্টা করছ? ইন্দ্রাণীকে তুমি পাওনি, পাবার আশাও কোনোদিন করনি, তার কাছ থেকে দূরে এক গ্রামে এসে লুকিয়ে বসে আছ, তবু বলছ তাকে ভালবাসি?"

"হ্যাঁ, সত্যি বলছি ভালবাসি। ভগবানকেও ত মানুষে পায় না, কাছে পাবার আশাও করে না, তবু মানুষ তাকে ভালবাসে।"

ইন্দ্রাণী বললে, "না না হেঁয়ালী রাখ। সত্যি বল।"

"সত্যি বলছি।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

ইন্দ্রাণী এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল শংকরের বুকের ওপর। দুহাত দিয়ে শংকরের মুখখানি চেপে ধরে বললে, "আবার বল! তুমি আবার বল!"

বলতে বলতে আবার তার সেই সুচারু, সুন্দর ওষ্ঠপ্রান্ত কেঁপে উঠল, মুক্তার মত সাদা দাঁতগুলি দেখা গেল, আয়ত দুই চোখের কালো দুটি তারা থেকে আরম্ভ করে সুঠাম সুগঠিত দুটি হাত, হাতের আঙুল—মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্ব অবয়ব আনন্দের শিহরণে বাদ্যযন্ত্রের ঝংকৃত তারের মত থর থর করে কাঁপতে লাগল।

জানলার পথে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ইন্দ্রাণীর সেই অপরূপ সুন্দর মুখের ওপর। স্বচ্ছ দু' ফোঁটা জল টলটল করছে তার চোখের কোণে।

শংকর ধরলে তার মুখখানি দুহাত দিয়ে। বললে, "তুমি তোমার মনের মত স্বামী পাওনি, কিন্তু আমি? আমি ত

পেয়েছিলাম আকাশের চাঁদ—যা আশা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশী। তাই ইন্দ্রাণীর নাম হয়েছিল আমার জপমালা—যে ইন্দ্রাণী আমাকে তাড়িয়ে—"

কথাটা ইন্দ্রাণী তাকে শেষ করতে দিল না।

"না না, আর বোল না। আর আমি তোমাকে"—বলতে বলতে ইন্দ্রাণী তার নিজের মুখ দিয়ে শংকরের মুখ দিলে বন্ধ করে।

তারপর আকাশে রইল অতন্দ্র চাঁদ, আর ঘরে রইল আনন্দবিহ্বল এই বিনিদ্র দম্পতি। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল নিস্তব্ধ রাত্রি আর স্তম্ভিত গ্রাম।

আশ্চর্য সুন্দর জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে ঘরের আনাচে-কানাচে। সেখান থেকে ঠিকরে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছে পথের ধুলোয়। ঝির্ ঝির্ করে মিষ্টি-মিষ্টি হাওয়া এসে লাগছে গায়ে। গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত যেন শিউরে উঠছে শির্ শির্ করে। ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম করে ঝিঁঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত ডাক—মগজে ধরিয়ে দিচ্ছে গোলাপী নেশার আমেজ।

শংকর ঠিকই বলেছিল। তারিণীশংকর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা কমে এসেছে। অজুহাত নানারকমের। কেউ বলছে, 'টেপীর মায়ের অসুখ, এ সময় টেপী ইস্কুলে গেলে ঘরের কাজকর্ম করবে কে?' আবার কেউ-বা বলছে, 'টগরীর পরনের কাপড় ছিঁড়ে গেছে, শহর থেকে কাপড় এনে দিই, তারপর ইস্কুলে যাবে।'

তারিণীশংকর বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধরেও আনছে অনেককে। এক টাকার জায়গায় মাইনে করে দিয়েছে দু'টাকা। মোট কথা মাষ্টারনীর মাইনেটা কোনরকমে উঠে যাবে।

সেদিন শংকরকে ডেকে পাঠালে তারিণী-শংকর।

জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার ইস্কুল কেমন চলছে?"

"আমার ইস্কুল? আপনি বলছেন কি?"

"ঠিকই বলছি। তোমাকে সেক্রেটারি করে দিয়েছি, তুমি যাবে একবার করে, দেখবে, নতুন মাষ্টারনীকে একটু বলবে ভাল করে—তবে ত? শুনছি তুমি একদম ও-পথ মাড়াও না।"

"লজ্জা করে। তাছাড়া ফট্ করে কে কখন কি বদনাম রটিয়ে দেবে।"

"বদনাম রটালেই হল? আমরা মাইনে দিই, ও কাজ করে, না না, তুমি যাবে।"

শংকর বললে, "আপনি বরং যাবেন মাঝে-মাঝে।"

"আমি কি আর যাইনি ভেবেছ? দু'দিন গিয়েছিলাম। তাছাড়া মেয়েটিকে আমার বাড়িতে ডেকে এনে খুব খাইয়ে দিয়েছি সেদিন। ভারী ভাল মেয়ে। তুমি আমাকে কাকাবাবু বল, তাই না শুনে ও-ও আমাকে কাকাবাবু বললে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। কার্তিকের মায়ের সঙ্গে কত কথা।"

শংকর আর বেশী কিছু শুনতে চাইলে না। কাজ আছে, বলে চলে গেল।

কিন্তু দোরের কাছ থেকে পিছনে ডাক শুনে আবার তাকে ফিরে আসতে হল।

"আমাকে ডাকছেন?"

"হ্যাঁ ডাকছি।" তারিণীশংকর বললে, "একটা কথা মনে পড়ে গেল। শুনেছি নাকি রেখো তোমার সঙ্গে ওর ওই দিঙ্গি মেয়েটার বিয়ে দিতে চায়?"

শংকর বললে, "চাইতে পারে, কিন্তু বিয়ে করছে কে?"

"হ্যাঁ। খবরদার, খবরদার। মেয়েকে দিয়ে ব্যাটা তোমাকে হাত করতে চায়। তোমার জন্যে খুব ভাল মেয়ে দেখে দেব আমি। কার্তিকের আর তোমার এক সঙ্গে বিয়ে দেব। পুব দেশের ভাল মেয়ে।"

শংকর আবার পালাতে চাইলে, কিন্তু তারিণীশংকর আবার বসালে তাকে। যেতে দিলে না। বললে, "ওই যে মাষ্টারনী এসেছে, দাঁড়াও, ওকে একবার জিজ্ঞাসা করব আমি—ওর সোনা-টোনা আছে কি না। বউ করতে হয় ত ওই রকম মেয়ে। তোমার কাকীমাও বলছিল—ঘর আলো করা মেয়ে। হ্যাঁ, শোন, যে-কথাটা বলবার জন্যে ডাকলাম তোমাকে। শুনেছি নাকি ওর ডাক্তারখানার ওষুধপত্র সব এসে গেছে?"

শংকর বললে, "সব আসেনি। এসেছে কিছু-কিছু।"

তারিণীশংকর বললে, "ব্যাটার বেশ খসবে, কি বল?"

"হ্যাঁ তা খসবে বই-কি! ও-সবের দাম ত কম নয়।"

"কিন্তু আমার রাস্তা খোলবার আগেই ব্যাটা ওর ডাক্তারখানা খুলে দেবে না ত?"

শংকর বললে, "তাই পারে কখনও? ডাক্তারখানা হলেই ত হবে না, ডাক্তারও ত চাই!"

"হ্যাঁ তা চাই। ডাক্তার আনবে।"

শংকর বললে, "ডাক্তার ত উড়ে আসবে না! আপনার রাস্তার ওপর দিয়েই আসতে হবে। রাস্তাটা আগে শেষ হক।"

"ঠিক বলেছ। কিন্তু যদি ট্রেনে আসে? স্টেশনের রাস্তাটা ত হয়ে গেছে।"

শংকর বললে, "না গরুর গাড়ি চড়ে ডাক্তার আসবে না বলেছে। বলেছে; বড় রাস্তার ওপর দিয়ে মোটরে চড়ে আসবে।"

তারিণীশংকর আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল; "ঠিক হয়েছে। আগে আমার রাস্তা খুলবে, তারপর আমার সেই রাস্তার ওপর দিয়ে রাখহরির ডাক্তার আসবে। তাহলে আমার রাস্তা আগে, তারপর ওর ডাক্তারখানা।"

শংকর বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি চলি। আমার দেরি হয়ে গেল।"

বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি শংকর সেদিন সত্যিসত্যিই গেল বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে। কিন্তু রাস্তা তৈরির কাজ ছেড়ে আসতে আসতে দেরি হয়ে গেল। বিদ্যালয়ের তখন ছুটি হয়ে গেছে।

পাশেই ইন্দ্রাণীর কোয়ার্টার।

শংকর গিয়ে দেখলে, তোলা উনুনের উপর কেটলিতে চায়ের জল গরম করছে টুনু, আর ইন্দ্রাণী তখন স্নানের ঘর থেকে এসে জামা কাপড় ছেড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে।
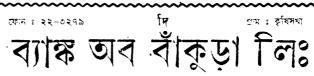
শংকর বলল, "নমস্কার!"

ইন্দ্রাণী চট্ করে মাথার কাপড়টা একটু তুলে দিয়ে মুখের হাসি ঠোঁট দিয়ে চেপে বললে, "নমস্কার। বসুন।"

খাটের উপর পরিপাটি করে বিছানা পাতা। ইন্দ্রাণী চোখের ইশারায় সেইখানেই তাকে বসতে বলেছিল, কিন্তু টুনু রয়েছে বলে শংকর খাটের তলা থেকে মোড়াটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

রাত্রে টুনু শোয় পাশের ঘরে। কাজেই এ-ঘরের কোথায় কি থাকে শংকর সবই জানে।

ইন্দ্রাণী কিছু বলবার আগেই শংকর বললে, "তারিণীবাবু ইস্কুলটা মাঝে মাঝে দেখতে বলছিলেন, তাই এসেছিলাম আপনার ছাত্রীদের দেখতে। রাস্তা থেকে আসতে দেরি হয়ে গেল। নইলে ছুটির আগেই আসতাম।"

ইন্দ্রাণী বললে, "আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনি এখান পর্যন্ত এসেছেন। ছুটি হয়ে গিয়েছে বলে আপনি দোর থেকে ফিরে যাননি এই যথেষ্ট। টুনু সেক্রেটারি-বাবুকে আগে এক পেয়ালা চা দাও। শুধু চা দেবে? দাঁড়াও দেখছি।"

ইন্দ্রাণী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শংকর ডাকলে, "টুনু!"

"উঁ" টুনু মুখ তুলে তাকালে।

"কাজকর্ম ভাল করে করছ ত?"

টুনু মাথাটি হেঁট করে বললে, "হুঁ।"

শংকর বললে, "মেয়েটা কেমন? মাষ্টারনী লোক ভাল ত?"

টুনু এবার তার ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটু হেসে বললে, "খুব ভাল"।

ইন্দ্রাণী ফিরে এল একটা কুঁজো হাতে নিয়ে। বললে, "টুনু কুঁজোতে এক ফোঁটা জল নেই। যাও চট্ করে' সেক্রেটারিবাবুর বাগানবাড়ির কুয়ো থেকে জল নিয়ে এস। ছাড়ো, চা আমি করে নিচ্ছি।"

টুনু উঠে দাঁড়াল। কুঁজোটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

দোরের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রাণী হাসিতে একেবারে ভেঙে পড়ল। "কুঁজোর জলটা ফেলে দিলাম।"

শংকর বললে, "বুঝেছি"।

"কিন্তু এ রকম আর কতদিন চলবে বল ত? আমার আর ভাল লাগছে না।"

এই বলে ইন্দ্রাণী ডিম ভাঙতে লাগল।

শংকর বললে, "রাস্তা, ডাক্তারখানা খুলে যাক।"

"কখন খুলবে?"

"আর বেশি দেরি নেই।"

ইন্দ্রাণী বললে, "সেদিন কি বিপদেই না পড়েছিলাম। কাকীমা জিজ্ঞাসা করলেন, বরটি কী করে? কী যে বলব ভেবেই ঠিক করতে পারছিলাম না। বললাম, কিছুই করে না। বরের আমার মাথার ঠিক নেই। পাগল বললেও হয়। জিজ্ঞাসা করলে, ছেড়ে দিয়েছে নাকি? বললাম, একরকম ছেড়ে দেওয়াই! প্রথম যেদিন এখানে এলাম, জয়া জিজ্ঞাসা করলে, তখন ত জানি না তোমার সঙ্গে দেখা হবে, তাই সত্যি কথাই বলেছিলাম। বলেছিলাম, বিয়ের পর স্বামী আমার নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিলাম।"

শংকর বললে, "তোমাকে আরও কাঁদাবার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু পারলাম না।"

ইন্দ্রাণী কাজ করতে করতে বলতে লাগল, "তারপর তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর জয়াকে একদিন বলেছি, তোকে আমি মিছে কথা বলেছি জয়া। স্বামী আমার নিরুদ্দেশ হয়ে যায়নি। আসলে আমার এখনও বিয়েই হয়নি। অভিভাবক বলতে কেউ নেই, একা একা এখান ওখান ঘুরে বেড়াতে হয়, তাই মিছেমিছি সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে সধবা সেজেছি। মেয়েটা খুব চালাক। আমার কথাটা বোধহয় বিশ্বাস করেনি।"

শংকর বললে, "কাকীমা তোমার খুব প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, ঘর আলো-করা বউ। তোমার বোন-টোন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন।"

"কেন?"

"থাকলে তার সঙ্গে হয় আমার, নয় কার্তিকের বিয়ে দেবেন।"

দুজনেই হাসতে লাগল।

ইন্দ্রাণী বললে, "হায়রে অদৃষ্ট। বোন আমার নেই। তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর না।"

"কী কাজ?"

"জয়াকে যে কথা বলেছি তোমার কাকা-বাবুকে বল সেই কথা। বল, মাষ্টারনীর বিয়ে হয়নি, সে কুমারী। জিজ্ঞাসা করবে ত, তাহলে সিঁথিতে সিঁদুর কেন? বলবে, অপরিচিত জায়গায় এল বলে পুরুষদের ভয়ে মিছেমিছি সিঁদুর পরে এসেছে।"

"তারপর?"

ইন্দ্রাণী হাসতে হাসতে বললে, "তোমার সঙ্গে আবার আমার বিয়ে হবে। বেশ হবে কিন্তু।"

ভাজা ডিমটা প্লেটের উপর রাখলে ইন্দ্রাণী। বললে, "যে-মানুষটির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল এখন ত আর তুমি সে-মানুষ নও। একেবারে বদলে নতুন মানুষ হয়ে গেছ। কাজেই নতুন করে' আবার যদি আমাদের বিয়ে হয়, মন্দ হবে না।"

"ভুল বলছ ইন্দ্রাণী," শংকর বললে, "আমি ঠিক সেই মানুষই আছি। এতটুকু বদলাইনি। বদলান এত সহজ নয়।"

প্লেটটা হাতে নিয়ে ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়াল। "না গো মশাই না।" বলতে বলতে শংকরের কাছে এসে প্লেটটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে, "খাও। আমি চা আনছি।"

"তুমি খাবে না?"

"পরে খাব। তুমি খাও আগে।"

শংকর ধরে বসল। "না এক সঙ্গে খাব।"

"ধেৎ! টুনু এসে পড়বে।"

শংকর চামচ দিয়ে ডিমটা দু'ভাগ করে' একটা ভাগ নিজের জন্যে রেখে আর একটা ভাগ হাত দিয়ে তুলে ইন্দ্রাণীর মুখের কাছে ধরলে। বললে, "হাঁ কর। আমি খাইয়ে দিচ্ছি।"

"না।"

"তোমাকে খেতেই হবে।"

"ধেৎ! না—"

শংকর কিছুতেই ছাড়বে না।

ইন্দ্রাণীও হাঁ করবে না। তাকে বিশ্রী দেখাবে হয়ত'। "খেয়ে রেখে দাও না। বলছি আমি পরে খাব।"

শংকরের কিন্তু জেদ চড়ে গেছে। হাঁ করে তার হাত থেকে তাকে খেতেই হবে। এক হাত বাড়িয়ে ইন্দ্রাণীকে সে জোর করে ধরে টেনে তাকে নিজের কোলের উপর এনে ফেললে। তারপর আদর করে তাকে খাওয়াতে লাগল। এক সঙ্গে সবটা কিছুতেই খেলে না ইন্দ্রাণী। একটু একটু করে দাঁত দিয়ে কেটে কেটে নিতে লাগল। ছোট মোড়ার উপর বসে আছে শংকর। ইন্দ্রাণী তার পা দুটো মুড়ে মেঝেতে বসে পড়েছে। হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে শংকরের কোমরটা, আর হেসে হেসে শংকরের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে খাচ্ছে।

টুনু এসে পড়বে বলে খেতে আপত্তি করেছিল ইন্দ্রাণী। কিন্তু মনের আনন্দে সে-জ্ঞান সে হারিয়ে ফেললে খেতে খেতে।

"বেশ তাহলে তোমাকে আমি খাইয়ে দিই।"

বাকী টুকরোটি ডান হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে ইন্দ্রাণী শংকরের মুখের কাছে ধরলে।

দুজনেই খেতে লাগল।

দোরের দিকে কেউ তাকায়নি। টুনু বাগান-বাড়িতে যাবে, কুয়ো থেকে জল তুলবে, কুঁজোটা ধোবে ভাল করে', তারপর জল ভরে নিয়ে ফটকের বাইরে এসে ফটকটা বন্ধ করবে, তারপর আসবে। ততক্ষণে তাদের খাওয়া হয়ে যাবে।

ইন্দ্রাণীর খাওয়া শেষ হয়েছিল, কিন্তু শংকরের তখনও শেষ হয়নি। খেতে খেতে হঠাৎ তার চোখ পড়ে গেল দোরের উপর।

একদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে দোরে দাঁড়িয়ে আছে টুনু নয়—জয়া।

শংকর না পারলে উঠে দাঁড়াতে, না পারলে ইন্দ্রাণীকে সরিয়ে দিতে, কী যে করবে কিছুই বুঝতে পারলে না। ইন্দ্রাণী ছিল

দোরের দিকে পিছন ফিরে, বাকী ডিমটুকু খাইয়ে দেবার জন্যে হাতটাও ঠিক সেই সময় তুলে ধরলে। হাতটা সরিয়ে দিয়ে শংকর ডাকলে, "জয়া!"

ইন্দ্রাণী চট্ করে শংকরকে ছেড়ে দিয়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই দোরের দিকে তাকিয়ে দেখে, জয়া নেই।

"কোথায় জয়া?"

শংকর বললে, "দেখেই চলে গেল।"

ইন্দ্রাণী বললে, "ছি ছি, তুমি একি করলে বল ত?"

বলেই সে চা করতে বসল। বলল, "জানি এই রকম হবে একদিন। আর কতদিন চাপা দিয়ে রাখবে আর কেনই-বা রাখবে? ভালই হয়েছে। আজ আমি জয়াকে সব বলে দেব।"

শংকর বললে, "না না আজ বোল না।"

"কেন বল ত? এখনও তুমি চাপা দিয়ে রাখতে চাচ্ছ কেন?"

টি-পটে চা দিয়ে জল ঢেলে ইন্দ্রাণী কাপ দুটো আনবার জন্যে উঠল। বললে, "কী ভেবে গেল বুঝতে পারছ?"

শংকর বললে, "খুব পারছি।"

"তার ওপর, তোমার ওপর ওর না[illegible] আছে।"

"সব জানি।"

ইন্দ্রাণী বললে, "কিছু বলব না?"

"না।"

"যদি জিজ্ঞাসা করে? কী জবাব দেব?"

"যা হক একটা দেবে বলে'। দু'দিন পরে জানতেই ত পারবে সব।"

টুনু এল জলের কুঁজো নিয়ে। জিজ্ঞাসা করলে, "কুঁজোটা এই ঘরে রাখি?"

ইন্দ্রাণী বললে, "রাখো।"

কুঁজোটা রেখে টুনু বললে, "আমি চা করছি। ছাড়ো।"

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করলে, "জয়াকে দেখলি?"

"দেখলাম।" টুনু বসল চা করতে। তারপর ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে চুপি চুপি বললে, "ওইখানে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাকে বলতে বারণ করলে।"

আজ আর টুনুকে ইন্দ্রাণী লজ্জা করলে না। চা তৈরির ভার তার উপর ছেড়ে দিয়ে ইন্দ্রাণী শংকরের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "ওই ত দাঁড়িয়ে আছে. শুনলে, এখন কী করব বল। ডেকে আনব?"

"আমি চলে যাই। তারপর।"

"তার মানে লজ্জাটা নিজে গায়ে মাখতে চাচ্ছ না। 'মরি ত আমিই'"—

টুনু চা নিয়ে এল। ইন্দ্রাণী চায়ের কাপ দুটি তার হাত থেকে নিয়ে একটি শংকরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে আর-একটি নিজে নিয়ে বসল খাটের উপর।
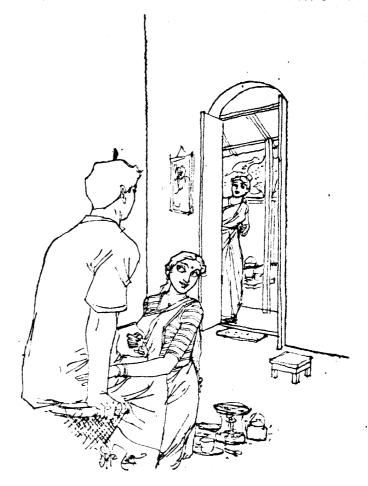
দাঁড়িয়ে আছে টুনু নয়—জয়া

"সত্যি কথা বলতে কেন বারণ করছ আমাকে বলতে হবে।"

চা খেতে খেতে শংকর বললে, "গ্রামে দুজন বড়লোক। আমার কাকাবাবু, আর জয়ার বাবা। দুজনের মনের মিল নেই। আমি সেইটেকেই মূলধন করে দুজনকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছি। জয়ার বাবার গোপন বাসনা আমাকে তিনি জামাই করবেন। আজকেই যদি সে আশাটুকু নির্মূল হয়ে যায়, আর কালকেই যদি বলে দেন—এই রইল তোর ডাক্তারখানা, ওটা আমার বৈঠকখানা হবে। তাহলেই গেছি। তাই আমি তোমার কথাটা বলতে চাই সেইদিন—যেদিন ও'র ডাক্তারখানাটা খোলা হবে। তার আর দেরি নেই। রাস্তা আর ডাক্তারখানা একই সঙ্গে খোলা হবে। আর দু'চারটে দিন কোনরকমে দাও চালিয়ে। তোমার ভয় বা লজ্জা পাবার কিছু নেই। অভিনয় করে দু'দিন মজা কর।"

ইন্দ্রাণী বললে, "মজাটা কেমন যেন মর্মান্তিক হয়ে যাচ্ছে।"

শংকর বললে, "এই দ্যাখো কেমন সুন্দর বাংলা বলছ তুমি। আমি লেখাপড়া শিখিনি। পারি না।"

"তোমাকে আমার ইস্কুলে ভর্তি করে নেব।" ইন্দ্রাণী বললে।

শংকর বললে, "টুনু সব শুনেছে ত।"

"শুনুক। টুনু বড় ভাল মেয়ে। ও আমাকে সব বলেছে। গাঁয়ের ব্যাটাছেলেগুলো ভারি বজ্জাত, না টুনু?"

টুনু বললে, "হ্যাঁ দিদিমণি।"

বলেই সে লজ্জায় যেন মরে গেল।

ইন্দ্রাণী বললে, "সব সমান। আমাদের সেক্রেটারিবাবুকে ভাল মনে করেছিলাম। ও আমাকে কেমন করছে দ্যাখ্।"

"আমি চলি।" শংকর চলে গেল।

ইন্দ্রাণী তার পিছু পিছু দোর পর্যন্ত

এল, কিন্তু জয়াকে কোথাও দেখতে পেলে না। পালিয়েছে নাকি?

সদর দোরটা বন্ধ করে ইন্দ্রাণী যেই ফিরেছে, দেখলে এদিকের একটা দেয়ালের আড়াল থেকে জয়া বেরিয়ে এল।

"দিলি ত পোড়ারমুখী সব শেষ করে?"

ইন্দ্রাণী বললে, "কি করব বল, ইস্কুলের সেক্রেটারি, একটু হাতে রাখতে হয়।"

"ওর নাম বুঝি হাতে রাখা? কোলে শুয়ে পড়েছিলি, আমি বুঝি দেখিনি!"

ইন্দ্রাণী বললে, "গায়ের জোরে পারলাম না যে! লোকটার গায়ে অসুরের মতন বল।"

জয়া বললে, "দাঁড়া, কাল আমি সব রটিয়ে দেব। শঙ্করদা ভাল, শঙ্করদা ভাল। বাবাঃ, আমার খুব শিক্ষা হয়ে গেছে।"

"তোর বাবা ত ওকে জামাই করবে।"

"আবার? তোর মতন সতীনকে নিয়ে আমি ঘর করব বুঝি?"

ইন্দ্রাণী বললে, "আমি তখন ছেড়ে দেব। —আচ্ছা ধর, আমি যদি বলি আমি কুমারী। সিঁথিতে সিঁদুর পরেছি পুরুষ মানুষের ভয়ে। আমি যদি ওকে বিয়ে করি?"

জয়া বললে, "কর না। আমি কেড়ে নেব।"

দেখতে দেখতে রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। ময়নাবুনি থেকে শহরে যাবার পাকা সড়ক। বাহাদুর শঙ্কর। বাহাদুর কার্তিক আর গ্রামের ছেলেরা। তারিণীশঙ্করের ইচ্ছা, শহর থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, বড় বড় উকিল, আর দুচারজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করে এনে, বেশ একটু জমকালো রকমের সভায় নিজের নামটা প্রচার করে রাস্তাটা খোলার ব্যবস্থা করা। তারিণীশঙ্কর সেই উদ্দেশ্য নিয়েই সেদিন শহরে গিয়েছিল। ফিরে এসে জানালে, সবাইকে এক করা মুশকিল। তবে আগামী পঁচিশে তারিখে কিসের যেন একটা ছুটি আছে, সেইদিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানকে নিয়ে আসবেন বলেছেন। কারও সাহায্য না নিয়ে নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের সামর্থ্যে এই যে এত বড় একটা কাজ করা হয়েছে, তার জন্যে প্রচুর প্রশংসা করেছেন।

শঙ্কর বললে, "তার ত এখনও দশবার দিন দেরি।"

তারিণীশঙ্কর আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেছেন। কাজেই দেরিটাকে আর দেরি মনে হচ্ছে না। বললেন, "তা হক না। এদিককার আয়োজনও ত করতে হবে।"

"না আমি সেজন্যে বলছি না। রাখহরিবাবুর ডাক্তারখানার কাজ শেষ হয়ে গেছে। উনি আর খরচ টানতে পারবেন না, তাই ওটা উনি সরকারের হাতে তুলে দিতে চান।"

তারিণীশঙ্করের খুশীর মাত্রাটা যেন আর এক ধাপ উঠল। হেসে বললেন, "দেখলে? আমার কথাটাই ঠিক হল ত শেষ পর্যন্ত। ওটা যাতে আমার হাতে আসে তার ব্যবস্থা করে দিও শঙ্কর। ও ডাক্তারখানা ইউনিয়ন বোর্ড চালাবে।"

শঙ্কর বললে, "তাই হবে আপনি ঠিকই বলেছেন।"

"আমি বেঠিক কখনও বলি না।"

শঙ্কর বললে, "শহর থেকে সিভিল সার্জেন আসবেন পরশু।"

"তুমি তাহলে সিভিল সার্জেনের কানে-কানে ওই কথাটা বলে দিও।"

"নিশ্চয়ই বলব।"

শঙ্কর বললে, "পরশু তাহলে প্রথম মোটর গাড়ি আসবে শহর থেকে আপনারই এই রাস্তার ওপর দিয়ে।"

তারিণীশঙ্কর তার কথাটাকে আর-একবার আওড়ালেন। "হেঁ-হেঁ, আমারই রাস্তার ওপর দিয়ে। আমার রাস্তা আগে, তারপর তোর ডাক্তারখানা! ওর ডাক্তারখানা আর রইলো কোথায়?"

শঙ্কর বললে, "তাহ'লে এই কথা রইল। আজ তাহলে এই রাস্তার ওপর হাতে লিখে একটা সাইনবোর্ড পুঁতে দিই। আনুষ্ঠানিক ভাবে রাস্তাটা আজই খুলে দেওয়া হল। ধরে নিন।"

"সাইন বোর্ড? কী লেখা থাকবে তাতে?"

শঙ্কর বললে, "তারিণীশঙ্কর সরণী।"

"সরণী? সরণী মানে?"

শঙ্কর বললে, "সরণী মানে সড়ক। নামটা ইন্দ্রাণী বললে। আপনার ওই মাষ্টারনী।"

আরও খুশী হল তারিণীশঙ্কর। ইন্দ্রাণীর নাম শুনে আর-একটা কথা তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল। কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বললে, "জিজ্ঞাসা করেছিলে ওর বোন-টোন আছে কিনা?"

শঙ্কর হাসলে। বললে, "এ-সব হাঙ্গামা চুকে যাক, তারপর বলব আপনাকে একটা কথা। শুনে খুশী হবেন কিনা জানি না, তবু বলব।"

"না না এক্ষুনি বল।" ধরে' বসল তারিণীশঙ্কর। কিন্তু কিছু না বলেই হাসতে হাসতে ছুটে চলে গেল শঙ্কর।

উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল শঙ্কর।

হাতে-লেখা সাইন-বোর্ড পুঁতে দেওয়া হল রাস্তার ধারে। তারিণীশঙ্কর সড়ক। সরণী কথাটা বাদ দিয়ে দিলে শঙ্কর। বললে, "আমরা সব মুখ্খু-সুখ্খু মানুষ, সরণী কথাটার মানে বুঝব না। আমাদের সড়কই ভাল।"

পরের দিন সিভিল সার্জেন আসবেন শহর থেকে। আসবেন 'সরোজিনী সেবা সদন' দেখতে। দেখেই যাবেন শুধু। দেখে গিয়ে মন্মথবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে' যা করবার করবেন।

রাখহরি বললে, "মন্মথবাবুও আসতে পারেন।"

পরের দিন সকাল থেকে সেবা-সদন সাজাতে আরম্ভ করেছে গ্রামের ছেলেরা। সরোজিনী সেবা সদনের সাইন-বোর্ড টাঙানো হয়েছে। নানারকম রঙিন কাগজের ফুল আর শিকলি তৈরি করে দিয়েছে জয়া।

কার্তিক তার ব্যান্ড-পার্টির রিহার্স্যাল দিচ্ছে। নিজে তার হাতে নিয়েছে বন্দুক আর কাঁধে ঝুলিয়েছে ক্যামেরা।

শঙ্কর তারিণীশঙ্করকে নিয়ে ব্যস্ত। তারিণীশঙ্কর বলছে, সে যাবে না। শঙ্কর বলছে, "চলুন। ডাক্তারখানার উদ্বোধন যদিও আজকে হচ্ছে না, তবুও আজ আপনার যাওয়া উচিত।"

তারিণীশঙ্কর বললে, "ও যে আসেনি আমার বালিকা বিদ্যালয়ের মিটিংএ!"

"এসেছিলেন। এসেই চলে গিয়েছিলেন মেয়েকে রেখে।"

"তাহলে আমাকে তুমি যেতে বলছ?"

শঙ্কর বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি যাবেন শুধু আপনার রাস্তার ওপর দিয়ে শহর থেকে প্রথম মোটর গাড়ি আসবে সেইটি দেখতে।"

"ঠিক বলেছ। তাহলে যাই। আমি কিন্তু কথা বলব না রেখোর সঙ্গে।"

"তা নাই-বা বললেন। তবু চলুন।"

ফরসা জামা কাপড় পরে গলায় একটা চাদর ঝুলিয়ে তারিণীশঙ্কর বেরিয়ে এলেন। কার্তিককে বললেন, "ভাল করে বাজাবি। শহর থেকে সিভিল সার্জন আসছে তারিণীশঙ্কর সরাণের ওপর দিয়ে।"

শঙ্কর বললে, "সরাণ নয়, সরণী।"

তারিণীশঙ্কর বললে, "ও হো হো, এতক্ষণে বুঝতে পারছি—আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক রাস্তাকে সরাণ বলি।"

শঙ্কর বললে, "কিন্তু সরাণ সরণী বদলে সড়ক করে' দিয়েছি।"

তারিণীশঙ্কর বললে, "বেশ করেছ। যা সবাই বোঝে সেই কথা লেখাই ভাল।"

তারিণীশঙ্কর রাখহরির সঙ্গে কথা বলবে না, রাখহরিও বলবে না তারিণীর সঙ্গে। রাখহরি ছিল তার ডাক্তারখানার দরজায় দাঁড়িয়ে, আর তারিণী ছিল তার রাস্তার

সাইন-বোর্ডটার কাছে। শংকর শুনলে না কিছুতেই। তারিণীকে বললে, "আসুন আপনাকে একবার ডাক্তারখানাটা দেখাই।"

"রেখো যে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফটকের কাছে।"

"থাক না!"

"দিয়েছ ত আচ্ছা করে খরচ করিয়ে।"

"সেইটেই ত দেখাতে চাচ্ছি আপনাকে।"

তারিণীশংকর এল। ঢুকল রাখহরির ডাক্তারখানায়।

"ওরে বাবা, এত ওষুধ?"

শংকর বললে, "এইদিকে তাকান।"

"ওরে বাবা, এটা কী?"

রাখহরি বলে উঠল, "অপারেশন টেবিল। এইখানে শুইয়ে কাটাছাঁটা করা হবে।"

তারিণীশংকর সেদিকে তাকালে না। না তাকিয়েই বললে, "দাম নিশ্চয়ই অনেক!"

শংকর চোখের ইশারা করে দিলে রাখহরিকে। রাখহরি বললে, "টাকাকড়ি যা কিছু ছিল সব শেষ হয়ে গেল। মেয়ের বিয়ে কেমন করে দেব তাই ভাবছি।"

ভারী খুশী হল তারিণীশংকর। রাখহরির বিমর্ষ মুখখানার দিকে একবার না তাকিয়ে পারলে না। বললে, "তা যদি বলছ ত একবার জিজ্ঞাসা কর শংকরকে। রাস্তাতে আমার কম খরচ হল না। তার ওপর আবার মেয়েদের ইস্কুল।—ওরে বাবা, এ-ঘরে বিছানা পাতা কেন?"

রাখহরি বললে, "যে-সব রুগী বাড়ি যেতে পারবে না তারা থাকবে এইখানে। এ ঘরে পুরুষদের ছটি বেড, আর এই ঘরে মেয়েদের ছটি বেড।"

তারিণীশংকর বসল একটা খাটের উপর। বেশ করে টিপেটুপে দেখলে। বললে, "লোহার তৈরি। দাম আছে।"

শংকর বললে, "ভাল করে চেপে বসুন। দেখাচ্ছি একটা জিনিস।"

তারিণীশংকরকে রুগীর মত শুইয়ে খাটের হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে একদিকটা উঁচু করে দেখিয়ে দিলে। বললে, "উঁচু নিচু নানারকম করা যায় এগুলো।"

"তাহলে এরই দাম অনেক বল।"

"নিশ্চয়।"

দেয়ালের ঘড়িতে ঢং করে আওয়াজ হল। রাখহরি সেইদিকে তাকিয়ে বললে, "আসবার সময় প্রায় হয়ে এল। এস আমরা বাইরে গিয়ে দাঁড়াই।"

সবাই বাইরে বেরিয়ে এল।

ব্যান্ড-পার্টির দল তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শংকর বললে, "আমি একটু এগিয়ে দেখি। তোরা ঠিক হয়ে থাক।"

তারপর হঠাৎ কী ভেবে কার্তিকের হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে বললে, "এইটে আমি নিয়ে যাচ্ছি। ডাক্তারের গাড়ি দেখলেই আমি আওয়াজ করব। আওয়াজ শুনলেই তোরা বাজাতে আরম্ভ করবি। দে একটা কার্টিজ দে।"

কার্তিক বললে, "ফাঁকা কার্টিজ নয় কিন্তু।"

"নাই-বা হল।"

কার্তিক জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি আসবে কেমন করে? গাড়ি ত চলে আসবে এগিয়ে।"

শংকর বললে, "আমি গাড়ির পাদানিতে চড়ে বসব।"

এই বলে শংকর এগিয়ে চলে গেল। নতুন তৈরি সোজা রাস্তা। ছেলেরা তাকিয়ে রইল সেইদিকে। শংকর যাচ্ছে ত যাচ্ছেই।

খানিক দূরে গিয়ে রাস্তাটা যেখানে ঢালু হয়ে নেমে গেছে, একটু একটু করে শংকর সেইখানে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাস্তার ধারে ধানের মাঠ, পুকুর আর গাছপালার ঝোপ। ঝোপের কাছে জুতোর আওয়াজ হতেই শংকর তাকালে সেইদিকে। তাকিয়ে এগিয়ে যেতে পারলে না। দাঁড়িয়ে পড়তে হল সেইখানে। দেখলে, নরেন এগিয়ে আসছে। অনেকদিন পরে নরেনের সঙ্গে দেখা। সেই আদালতে দেখেছিল তাকে আর এই এখন দেখছে। চেহারার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। দামী একটা সুট পরে তাকে মানিয়েছে চমৎকার।

শংকর বললে, "কি রে নরেন, এখানে কেন?"

নরেন একটা কথাও বলছে না। এগিয়ে আসছে তার দিকে। নরেনের একটা হাত প্যান্টের পকেটে আর একটা হাত খালি।

"কি রে, কথা বলছিস না যে? তোর খবর আমি পেয়েছি।"

তবু কথা বলছে না নরেন। শংকরের কাছে এসে ফস্ করে পকেট থেকে হাতখানা বের করলে। হাতে একটা ছোট্ট অটোমেটিক রিভলবার। শংকর ভাবতেই পারেনি যে, নরেন সেটা চালিয়ে দেবে। দুম্ করে একটা আওয়াজ হল। শংকরের পেটে লাগল গুলিটা।

বাঁ হাত দিয়ে পেটটা চেপে ধরে শংকর চিৎকার করে উঠল, "নরেন।"

নরেন তখন রাস্তার ধারে ধারে প্রাণপণে ছুটছে আর পিছন ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। শংকরের হাতে দেখেছে বন্দুক। ভয়ে তখন তার হয়ে গেছে।

ওদিকে আওয়াজ শুনে কার্তিকের ব্যান্ড-পার্টি তখন বাজাতে আরম্ভ করেছে।

যত জোরেই ছুটুক, নরেন তখনও রেঞ্জের বাইরে যায়নি। শংকরের হাতে রয়েছে দোনলা বন্দুক। একটিমাত্র কার্টিজ আছে ওতে। ওই একটি কার্টিজই যথেষ্ট। সন্ধান তার অব্যর্থ। এক্ষুনি তাকে শুইয়ে দিতে পারে।

বন্দুকে একবার হাত রাখলে শংকর। হঠাৎ কী ভেবে হাতটা সরিয়ে নিলে। প্রতিহিংসাপরায়ণ মন এক্ষুনি হয়ত প্রতিশোধ নেবার জন্য ক্ষেপে উঠতে পারে, তাই বন্দুক থেকে কার্টিজটি বের করে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

পেটে বাঁ হাতটা চেপে ধরে ছুটতে ছুটতে ফিরে আসছে শংকর। ব্যান্ড-পার্টি সমানে বাজিয়ে চলেছে।

কার্তিক বললে, "শংকরদা, গাড়ি কোথায়?"

শংকরের মুখে জবাব নেই। রাস্তার উপরেই বসে পড়ল শংকর।

ব্যান্ডের বাজনা বন্ধ করে দিয়ে কার্তিক ছুটে এল তার কাছে।

"এ কী? এত রক্ত কেন শংকরদা?"

"বন্দুকের গুলি লেগেছে।" শংকর বললে।

"এই বন্দুকে? কখনো না।" বলেই বন্দুকটা তার হাত থেকে নিয়ে চট করে' সেটা খুলে দেখলে কার্টিজটা নেই, চোখ

রাজ জ্যোতিষী

বিশ্ববিখ্যাত শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ, হস্তরেখা বিশারদ ও তান্ত্রিক, গভর্নমেন্টের বহু উপাধিপ্রাপ্ত রাজ-জ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রীহরিশচন্দ্র শাস্ত্রী যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়া এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা কোপিত গ্রহের প্রতিকার এবং জটিল মামলা-মোকদ্দমায় নিশ্চিত জয়লাভ করাইতে অনন্যসাধারণ। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। প্রশ্ন গণনায়, করকোষ্ঠি নির্মাণে এবং নষ্ট কোষ্ঠি উদ্ধারে অদ্বিতীয়। দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট মনীষিবৃন্দ নানাভাবে সুফল লাভ করিয়া অযাচিত প্রশংসাপত্রাদি দিয়াছেন। নিজের ভাগ্যও জেনে নিন।

সদ্য ফলপ্রদ কয়েকটি জাগ্রত কবচ

শান্তি কবচ:—পরীক্ষায় পাশ, মানসিক ও শারীরিক ক্লেশ, অকাল-মৃত্যু প্রভৃতি সর্ব-দুর্গতিনাশক, সাধারণ—৫, বিশেষ—২০।

বগলা কবচ:—মামলায় জয়লাভ, ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ও সর্বকার্যে যশস্বী হয়। সাধারণ—১২, বিশেষ—৪৫।

ধনদা কবচ:—লক্ষ্মীদেবী পুত্র, আয়ু, ধন ও কীর্তি দান করিয়া ভাগ্যবান করেন। সাধারণ—২৫, বিশেষ—২৫০।

হাউস অব এস্ট্রোলজি (ফোন ৪৮-৪৬৯৩)
১৯১/১সি, রসা রোড, কলিকাতা-২৬

দিয়ে নলটা দেখলে—তাতে ফায়ারিংএর কোনও চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

কার্তিক চিৎকার করে উঠল, "শংকরদা! বল—বল এ-কাজ কে করলে?" বলতে বলতে চোখ দিয়ে তার দর দর করে জল গড়িয়ে এল।

কার্তিকের সেই বুকফাটা আর্তনাদ শুনে ছেলেরা ছুটে এল।

কার্তিক বললে, "শংকরদাকে বাড়ি নিয়ে যা। আমি আসছি।"

শংকর বললে, "ওকে যেতে দিস না।" ওকে ধর।"

কার্তিক তখন বন্দুক হাতে নিয়ে ছুটেছে। ছেলেরা ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেললে। কার্তিক আবার চেঁচিয়ে উঠল, "ছেড়ে দে। আজ আমি যার হাতে বন্দুক দেখব তাকেই শেষ করে দেব।"

ওদিকে তারিণীশংকর রাখহরি দুজনেই তখন ছুটে এসেছে। রক্ত দেখে চমকে উঠেছে তারা। "কে করেছে? এ সর্বনাশ কে করলে শংকর?"

ছেলেরা তখন তাকে আড়কোলা করে তুলেছে।

শংকর বললে, "নামিয়ে দে, নামিয়ে দে, হেঁটে আমি যেতে পারব। সে শক্তি আমার আছে।"

আঙুল বাড়িয়ে শংকর সেবা সদনটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, "ওইখানে নিয়ে চ।" রাখহরির দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, "আমিই আপনার সেবা সদনের প্রথম পেশেণ্ট। অপারেশন টেবিলটা কাজে লেগে গেল।"

সাজানো সেবা-সদনের গেট পেরিয়ে ছেলেরা নিঃশব্দে শংকরকে নিয়ে ভেতরে এল। তারপর সব-চেয়ে ভাল খাটটার উপর শুইয়ে দিলে। রাখহরি আর তারিণী-শংকর পাশাপাশি এসে দাঁড়াল তার শিয়রের কাছে। "বল শংকর, এ-কাজ কে করেছে বল।"

শংকর বললে, "আমি—আমি নিজেই নিজেকে মেরেছি।"

রাখহরি বললে, "ওষুধপত্র এখানে সবই রয়েছে, অথচ ডাক্তার ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না।"

রাখহরি আর তারিণীশংকর তখন এক হয়ে গেছে।

শংকর দেখলে। দেখে বড় তৃপ্তির হাসি হাসলে। হেসে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোরা সব রাস্তায় যা। ডাক্তার-বাবু আসবেন। দ্যাখ।"

রাখহরি বললে, "আমি দেখি। আয় তোরা আমার সঙ্গে।"

ছেলেরা চলে যাচ্ছিল। তাদের ভিতর একজনকে ডেকে শংকর বললে, "গৌর, শোন। তুই একবার চট্ করে যা ত ভাই, মেয়েদের ইস্কুলের মাস্টারনী ইন্দ্রাণীকে আর জয়াকে ডেকে আন। এ-সব কছু বলিস না।"

তারিণীশংকর জিজ্ঞাসা করলে, "ওদের ডাকতে বললে কেন? চেঁচামেচি করবে।"

"হ্যাঁ, চেঁচামেচি করবে, কাঁদবে। ইন্দ্রাণী খুব কাঁদবে। ইন্দ্রাণী কে জানেন কাকাবাবু? বলে নিই। পরে যদি বলবার সময় না পাই।"

তারিণীশংকর তার শিয়রের কাছে এসে বসল।

শংকর বললে, "ইন্দ্রাণী আপনার বৌমা। আমার বিয়ে-করা স্ত্রী।"

"এ-কথা এতদিন বলনি শংকর?"

"না বলিনি। আমার মা বিয়ে দিয়ে গিয়ে-ছিলেন। আমরা মা কে জানেন? আপনার দাদার স্ত্রী—আপনার বৌদিদি। আমার মা মারা গেছেন।"

"তুমি কি তাহলে—"

"আপনার দাদা ভবানীশংকরের ছেলে—রবিশংকর। রবিটা আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি। এই আমার জন্মস্থান। তাই এ গ্রামটাকে আমি এত ভালবাসি। অনেক কিছু করবার ইচ্ছা ছিল। কিছুই করতে পারলাম না।"

এতক্ষণ পরে শংকরের চোখের কোণে জল দেখা গেল।

কার্তিককে ধরে নিয়ে এল দুজন ছেলে।

তারিণীশংকর বলে উঠল, "ওরে শোন শোন কার্তিক, শংকর কে জানিস? ও আমার দাদার ছেলে, তোর আপন জ্যেঠতুতো ভাই।"

"আরে ধেৎ, আমার কিছু ভাল লাগছে না। চুলোয় যাক্ ওর জন্মবৃত্তান্ত, ও আমার দাদা, আমার শংকরদা।"

বলেই সে শংকরের দিকে তাকিয়ে বললে, "বলবে না ত? আচ্ছা—বোলো না। কিন্তু এই আমি"—হাতের বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে বললে, "এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমাকে যে মেরেছে, সে যেখানেই থাক্, তাকে আমি বেঁচে থাকতে দেব না।"

"ওরে পাগল, শোন, এইখানে আয়!" শংকর ডাকলে কার্তিককে।

"তোমার দিকে তাকাতে পারছি না আমি।" বলতে বলতে কার্তিক গিয়ে বসল শংকরের কাছে। শংকর বললে, "কেউ আমাকে মারেনি। আমি নিজেই নিজেকে মেরেছি।"

"ও-সব কথা আমি শুনতে চাই না।"

"তবে শোন, দেশকে ভালবাসবি, মানুষকে ভালবাসবি মিথ্যাচার করবি না। জানবি সত্যই ভগবান। মা বলেছিল, 'তোর পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করবি।' সেই সম্পত্তি উদ্ধার করতে আমি এসেছিলাম। সম্পত্তি উদ্ধার আমি করেছি। এই হাসপাতাল, এই বিদ্যামন্দির আর আমাদের জীবন দিয়ে গড়া এই পথ। আজ শহর আর গ্রাম এক হয়ে গেল। ওই পথের ওপর দিয়ে আজ প্রথম আসছে ডাক্তারের গাড়ি। এইটিই আমি চেয়েছিলাম। এই পথকে প্রণাম কর।"

কার্তিকের চোখ দিয়ে দর দর করে জল গড়াচ্ছে। হাত দুটি তুলে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

রাখহরি ঘরে ঢুকল। —"ডাক্তারবাবু এসেছেন।"

কার্তিক উঠে দাঁড়াল। তারিণীশংকর এগিয়ে এল।

ঠিক সেই সময় দোরের কাছে জয়া ডাকলে, "কাবা!"

শংকর বললে, "কার্তিক, তোর বৌদি এসেছে।"

কথাটা শুনে কার্তিক একটু হকচকিয়ে গেল। আবার বসল সে শংকরের পাশে। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, "বৌদি কে? জয়া?"

শংকর বললে, "না, ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণী আমার স্ত্রী।"

"হুঁ। তা এতদিন বলতে কি হয়েছিল?" বলে কার্তিক বেরিয়ে গেল।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট এসেছিলেন। তিনিও বোধ করি ডাক্তার। এক মুহূর্ত দেরি করলেন না তিনি। শংকরকে অপারেশন টেবিলে শুইয়ে ক্লোরোফর্ম করে অপারেশনের আয়োজন ঠিক করে ফেললেন। গরম জলে ছুরি কাঁচি টগবগ করে ফুটতে লাগল।

অপারেশন করবার আগে কিন্তু একটা বড় অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে গেল। শহরের সিভিল সার্জেন এসেছেন। এসেছেন বন্ধু মন্মথবাবুর অনুরোধে নতুন এই ডাক্তার-খানাটি দেখতে। এসেই কিন্তু বিপদে পড়ে গিয়েছেন। গুলি-খাওয়া পেশেন্ট। অপারেশন করে গুলি বের করতেই হবে। সরকারী কর্মচারী হলেও ফেলবার উপায় নেই। জামা খুলে হাতে দস্তানা পরে তৈরি হলেন। কিন্তু তার আগে শংকরের মুখ থেকে তাঁর শোনা উচিত—কে মেরেছে তাকে। জিজ্ঞাসা করলেন, "এবার বলুন, কে আপনাকে গুলি মেরেছে। পুলিসের কাজটা আমিই করি।"

শংকর চুপ করে রইল।

"বলুন!" ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

শংকরের যন্ত্রণা হচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণাটা সামলে নিয়ে বললে, "জানি না।"

"জানি না কি বলছেন? চেনেন না তাকে?"

জীবনে অনেক মিথ্যা কথা বলেছে সে। আবার বললে।

"আজ্ঞে না। চিনি না।"

"লোকটা দেখতে কি রকম?"

শংকর বললে, "ঠিক মানুষের মত।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি চেনেন তাকে, তবু বলছেন না।"

"যদি না বাঁচি?" শংকর বললে।

"ছুরি আমি ধরব না।"

"তাহলে কতক্ষণে মরব?"

"বেশি দেরি হবে না।"

শংকর বললে, "ছুরি ধরে বুলেটটা বের করে দিয়ে আপনি আমাকে বাঁচাতে পারবেন?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "ঠিক বলতে পারছি না।"

"তা যখন পারছেন না, ছুরিটা তখন আর না-ই বা ধরলেন!"

ডাক্তারবাবু দেখলেন—মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ-কথা যে বলতে পারে সে বড় সহজ মানুষ নয়। ছুরিটা হাতে তুলে নিয়ে এ্যাসিস্টেন্টকে ক্লোরোফর্ম ধরতে বললেন। আর দেরি করা চলে না।

ওষুধপত্র যন্ত্রপাতি কোন কিছুরই অভাব ছিল না সেখানে। আশ্চর্য নিপুণতায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তাঁর কাজ শেষ করলেন।

এতক্ষণ কাউকে তিনি ঘরে ঢুকতে দেননি। দোর খুলেই দেখলেন, সমস্ত গ্রাম যেন ভেঙে পড়েছে সেখানে। আবাল-বৃদ্ধবনিতার অশ্রুভারাক্রান্ত মুখগুলি দেখে অপ্রিয় কোন কথা তাঁর মুখ দিয়ে সহসা বেরুতে চাইলো না। জয়া আর ইন্দ্রাণীকে তিনি পথ ছেড়ে দিলেন। সাবধান করে দিলেন—তারা যেন ওকে কোনও কথা বলবার চেষ্টা না করে।

রাখহরি তারিণীশংকর দুজনেই ছুটে এল ডাক্তারবাবুর কাছে। জিজ্ঞাসা করলে, "বাঁচবে তো?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "মনে হয় বাঁচবে।"

ইন্দ্রাণী আর জয়া—শংকরের বিছানার দুপাশে দুজন নীরবে চোখের জল ফেলছে।

ইন্দ্রাণী লুটিয়ে পড়েছিল তার পায়ের কাছে। জয়া তখনও কিছু জানতে পারেনি। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললে, "অমন করিসনি হতভাগী লোকে দেখলে কী ভাববে?"

ইন্দ্রাণী সেকথার কোনও জবাব দেয়নি।

সারাদিনের পর সন্ধ্যায় চোখ চেয়ে তাকালে শংকর।

আশায় আনন্দে অধীর হয়ে উঠল সকলে।

সুমুখেই ছিল ইন্দ্রাণী। চোখের জল মুছে জিজ্ঞাসা করলে, "কষ্ট হচ্ছে?"

শংকর বললে, "না।"

ইন্দ্রাণী তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি যেন বললে। শংকরের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে হল সে যেন হাসলে একটুখানি।

জয়া এক মুহূর্তের জন্য কাছছাড়া হয়নি। বললে, "বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস তুই। কি বললি?"

আবার কানে কানে কথা! ইন্দ্রাণী জয়াকেও বললে। জয়া তার গায়ে এক ঠেলা মেরে দূরে সরে গেল। বললে, "কিছু আর বাকি রাখলি না তুই।"

শহর থেকে একজন ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সিভিল সার্জেন। আর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্টকে। শংকর তখন ঘুমচ্ছে। ডাক্তার নিষেধ করেছিলেন তাকে জাগাতে। পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট একবার দেখলেন শুধু। বুলেটটি নিলেন হাতে করে। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলেন বাইরের ঘরে।

তাঁর প্রতীক্ষার আর শেষ হল না।

প্রহরের পর প্রহর চলে গেল। সারারাত কাটল উদগ্রীব উৎকণ্ঠায়। ভোরের দিকে ঘুম ভাঙল শংকরের। ডাক্তারের কাছে খবর পেয়ে সুপারিন্টেন্ডেন্ট এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "আপনার একটা ডিক্লারেশন নিতে এসেছি। কে আপনাকে মেরেছে বলুন।"

শংকর বললে, "আমি নিজে।"

বলেই কেমন যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতর হয়ে শংকর চোখ বন্ধ করলে। তার পর সে চোখ আর খুলল না।

ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বললেন, "শেষ হয়ে গেছে।"

ইন্দ্রাণী লুটিয়ে পড়ল তার পায়ের কাছে। বললে, "আমার পরিচয় দিয়ে গেলে না তুমি। বলে যাও আমি কে!"

কার্তিক দাঁড়িয়েছিল, জয়া দাঁড়িয়েছিল। রাখহরি, তারিণীশংকর—সবাই।

কার্তিক বললে, "আমরা সবাই জানি বৌদি, শংকরদা বলেছে তোমার পরিচয়। ওঠ।"

ফুলেপাতায় সাজিয়ে শংকরের মৃতদেহ নতুন রাস্তার উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছেলেরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে শবাধার ছেলেদের চোখে জল। আশপাশের সমস্ত গ্রাম ভেঙে লোকজন এসে জড়ো হয়েছে। দেখতে এসেছে তারা এই জীবনের জয়যাত্রা।

পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে ইন্দ্রাণী আর জয়া।

পাশাপাশি হাতে হাত দিয়ে চলেছে রাখহরি আর তারিণীশংকর।

পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট চলেছেন সবার আগে আগে মোটরবাইকে চড়ে। ডানহাতটি তাঁর কপালে তোলা—দুই চোখ ভরে এসেছে জলে। প্রণাম জানাচ্ছেন সেই মহাজীবনকে—যে-জীবন মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এমনি করেই যাত্রা করে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে।

"ক্ষমা কর। আমাকে তুমি ক্ষমা কর!" হাত থেকে বিনোদবাবুর তুলিটা পড়ে গেল। ত্রস্ত কাতর কণ্ঠে অত্যন্ত দ্রুত কথা ক'টি বলে শেষ করলেন তিনি। যেমনভাবে অসম্বৃতবসনা মেয়ে কারুর সাড়া পেয়ে কাপড়খানা বুকে টেনে দেয়; ঘরের মধ্যে হঠাৎ দপ করে আগুন জ্বলে উঠলে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেমনভাবে দুই হাতে কিছু দিয়ে সে-আগুন লোকে চাপা দেয়, তেমনিভাবে। তেমনি লজ্জার সঙ্গে, তেমনি ভয়ার্ত কাতরতার সঙ্গে। কিন্তু নীরা তেজস্বিনী মেয়ে—জীবনে বিদ্রোহই তার ধর্ম—এ নিয়ে তার অহংকারকে সে সচেতনভাবে উদ্ধত করে রাখে সদাসর্বদা। সে এ-লজ্জাকে চাবুক মেরে বলে উঠল—

—ক্ষমা? আপনার এ নির্লজ্জতা কি ক্ষমা করা যায়? ক্ষমার যোগ্য? আপনি না প্রবীণ? আজই আপনার পঞ্চাশতম জন্মদিন পালন করেছি আমরা। আপনি চিঠিতেও লিখেছেন। আপনি না সদাচারী দেশসেবক? আশ্রম করে বসে আছেন? সরকারি সাহায্য পাচ্ছেন? আপনি না খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী? তাই আমি আপনাকে বরেণ্য ব্যক্তি বলে দশের সমক্ষে স্বীকার করেছি। কি ভেবেছিলেন আপনি? আপনার প্রেম নিবেদন-করা পত্রখানি পেয়ে আমি বিগলিত হয়ে যাব? আমি আপনার প্রেমে পড়েই আছি? আপনার আমি আশ্রিতা; আপনার আশ্রমে চাকরী দিয়ে আমাকে রক্ষা করেছেন—

—আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

—না। ক্ষমা করব না। আপনি নির্লজ্জের চেয়েও আরো বেশী—যার নাম আমি জানি না।

—নীরা!

—না না। নীরা নয়। আমি নীরজা দেবী। নীরা বলে ডাকবেন না আপনি।

—বেশ! এতক্ষণে একটু বিস্ময় অপ্রতিভ হাসি হেসে বিনোদবাবু বললেন, কিন্তু একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে না, নীরজা? তুমি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট, তুমি আমার কাছে ছাত্রীর মত পড়েছ, তোমাকে আপনি বলতে পারছি না। কিন্তু এমন অপরাধ কি করেছি আমি?

এবার জ্বলে উঠল নীরা। —কেন? কেন? কেন এ পত্র লিখেছেন আপনি?

—পত্রেই লেখা আছে। তুমি অবিবাহিতা কুমারী—আমি অবিবাহিত, তোমাকে আমি চার বছর ধরে গড়ে তুলেছি। তোমাকে আমি বিবাহ করতে চাই। ঘর চাই, সংসার চাই—

কথায় বাধা দিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল নীরা, আপনি চরিত্রহীন।

—নীরজা!

বিস্ফোরকে অগ্নিসংযোগ হলে, মুহূর্তে আসে মৃত্যুযোগ। কত দেবতার মন্দির, রাজার প্রাসাদ ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, দেবতা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, রাজার দেহ মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। সে রেহাই দেয় না কাউকে। নিজের উপর ফাটলে নিজেও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মাংসখণ্ডের টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। হলেই বা বিনোদা, বিনোদ সেন, সর্বত্যাগী বলে পরিচিত, দেশমান্য, রাষ্ট্রের দরবারে সম্মানিতজন। বিস্ফোরকে তিনি আগুন দিয়েছেন, তার আঘাতে তাঁকে টুকরো টুকরো হতে হবে না ?

ছেলেদের খাবার জায়গায় যাবার ঠিক আগেই ব্যাপারটা ঘটেছে। আশ্রমের এক-প্রান্তে বিনোদ সেনের নিজের ঘর। দুখানি ঘর, বারান্দা, একটি স্টুডিও, খানিকটা বাগান। ঠিক মাঝখানে স্কুল, তার পাশে বোর্ডিং, তার পাশে খাবার ঘর, এক লাইনে পাশাপাশি এগুলি, তারই ঠিক পিছনে, বিনোদ সেনের বাড়ি যে দিকে তার বিপরীত দিকে শিক্ষয়িত্রীদের কোয়ার্টার। চল্লিশটি অনাথ ছেলে নিয়ে আশ্রম; সঙ্গে ইস্কুল, আগে ছিল—প্রাইমারী—এখন হয়েছে বেসিক, তার সঙ্গে সেকেণ্ডারি স্ট্যাণ্ডার্ডের তিনটি ক্লাস। তার জন্য আছেন দুজন বৃদ্ধ শিক্ষক; তাঁরা থাকেন বিনোদ সেনের বাড়ির লাইনে। এ লাইনে বিনোদ সেনের নিজের বাড়ির পিছনেই আর একটি কোয়ার্টার, তাতে থাকেন বিনোদ সেনের বিধবা বোন আর তাঁর ছেলেরা। তারই একদিকে থাকে এই প্রতিমা। এখানে আশ্রম পত্তন হয়েছে ১৯৫০ সালে। আটটি ছেলে নিয়ে শুরু হয়েছিল আটচল্লিশ সালে। পঞ্চাশ সালে সরকারী সাহায্য পেয়ে যেবার আশ্রমের রূপ নিল, সেইবার নাকি বিনোদ সেন নিয়ে আসেন এই প্রতিমাকে। বিনোদ সেনের কোন বন্ধুর পত্নী, শুধু তাই নয়, বান্ধবীও, প্রিয় বান্ধবী বলেই সবাই জানে। তখনও নীরা আসে নি। সে এসে শুনেছে। তখনকার শিক্ষয়িত্রী একজন, তিনি মুখ টিপে হাসতেন। ছোট ছোট ছেলেদের ভার ছিল প্রতিমার উপর। তারা 'মা' বলত। এখনও ছেলেদের কাছে প্রতিমা 'মা-মণি।'

নীরার উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনে এসেছে সবাই। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আসে নি শুধু সেনের বোন, সে পঙ্গু। তার ছেলেরা কলেজে পড়ে। কলকাতায় থাকে। একটি চৌদ্দ-পনের বছরের মেয়ে, সে এই শহরের ইস্কুলে পড়ে, সেও বোধ হয় লজ্জায় আসে নি। প্রতিমা দরজা আধখানা খুলে, বন্ধ পাটিটা ধরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাঁদছে। পাশের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, বা অনুভব করা যাচ্ছে, অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। চাপা গলায় কেউ যেন বলছেন, যাও। যাও। সব আপন আপন জায়গায় যাও। সীটে যাও। এই বিহারী, যাও না, খাবার ঘণ্টা দাও। যাও না!

মাথা হেঁট হয়ে গেল বিনো সেনের। প্রতিমার উপস্থিতি তাকে নির্বাক নতশির ক'রে দিল।

নীরা তবু ক্ষান্ত হল না। সে প্রতিমার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে এল, সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে, কোন্ মনুষ্যত্বের নিয়মে বা অধিকারে এ'কে ভালবেসে এখানে নিয়ে এসেও এ'কে বিয়ে করবেন না? আপনি নিজে সেদিন বিধবা বিবাহ সমর্থন ক'রে একঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিয়েছেন। যারা বিবাহ সত্ত্বেও আবার বিবাহ করে, মেয়েদের ভালবেসে প্রতারণা করে, বলেছেন, তাদের মাথায় বজ্রাঘাত হোক। এর পর আমাকে ভালবাসেন, আমাকে বিবাহ করতে চান বলে পত্র লিখলেন কি ক'রে আপনি?

প্রতিমা এবার কেঁদে যেন ভেঙে পড়ে গেল। দুই হাতে সেনের পা' জড়িয়ে ধরে সে হু-হু ক'রে কেঁদে উঠে বললে, আমাকে আগে বললে না কেন? আমি যে বিষ খেতাম।

বিনো সেন মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েই রইলেন।

—কি, কথা বলেন না কেন?

বিনো সেন বললেন, আমার মাথায় বজ্রাঘাতই হোক নীরজা!

প্রতিমা আবার কেঁদে উঠল, না-না-না।

নীরা বললে, ছি-ছি-ছি, আপনাকে ছি!

বলেই সে দ্রুতপদে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে আবার ফিরে গেল, দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললে, কাল সকালেই আমি চলে যাব।

প্রতিমা তখনও কাঁদছে।

সে চলে গেল।

যেতে যেতে শুনতে পেলে বিনো সেনের কণ্ঠস্বর, আপনারা যান এবার। নাটক তো ফুরিয়ে গেছে! যান!

*

নির্লজ্জ কোথাকার।

মানুষ সাধু—মানুষ সর্বত্যাগী। ছদ্মবেশী ভণ্ডের দল! দেহধারী মানুষ, দেহজ কামনার আগুন তার রোমকূপে-রোমকূপে; ছাই মেখে তার মুখ বন্ধ করে মানুষ সন্ন্যাসী সাজে! এদেশের মোহন্তদের ইতিহাসের কথা সে জানে। ইয়োরোপের সন্ন্যাসীদের ব্যভিচারের কথা সে পড়েছে। সে দেশে বিদ্রোহ হয় বিপ্লব হয়; এদেশে হয় না। তাই একদিন যারা বিপ্লবী ছিল, তারা আজ অধিকার পেয়ে ভণ্ড ব্যভিচারীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এদেশের লজ্জাবতী লতার মত স্পর্শ মাত্রেই যারা নুইয়ে পড়ে বলে, আমার এলায়িত দেহের ভঙ্গিতে আমার উত্তর নাও, মুখে বলতে কি পারি, সে তাদের দলের নয়। সে আদিম বিদ্রোহী।

ঘরের ভিতর বসে সে স্থির দৃপ্ত দৃষ্টিতে দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো মনে মনে যেন আউড়ে যাচ্ছিল। বাইরে থেকে কড়া নড়ল। তিক্ত উষ্মার সঙ্গে অল্প ঘাড় বেঁকিয়ে সে দিকে তাকিয়ে সে বললে, কে?

—আমি দিদিমণি। ডাকছে ঠাকুর নটবর।

—কি চাই?

—ছেলেরা যে খেতে আসবে, ঘণ্টা দিচ্ছে।

—দাও গে। আমি যাব না।

—আজ যে মাছ মাংস মিষ্টি হয়েছে, লুচি আছে। ওরা যে কাড়াকাড়ি ছেঁড়া-ছিঁড়ি করবে।

আজ বিনো সেনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ছেলেদের জন্যে ভোজের ব্যবস্থা হয়েছে। করেছিল যারা তাদের মধ্যে সেই প্রধান! নিজের আচরণের জন্য অনুতাপ হচ্ছে তার, রূঢ় কণ্ঠে সে বললে, করুক। আমি যাব না। আমি এখানকার কেউ নই। অন্য কাউকে ডাক গে। নমিতাদি কি কমলাদি, যাকে হোক।

—আজ্ঞে?

—যা বলেছি শুনেছ। ওঁরা না আসেন খোদ সেনবাবুকে বল গিয়ে। যাও! যাও! যাও!

সে উঠে গিয়ে দরজা একবার খুলে বললে, যাও বলছি! বলেই সে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ছিটকিনি বন্ধ করে দিলে। এখানকার সংশ্রবে সে আর একদণ্ড থাকতে চায় না। আজ রাত্রেই সে চলে যেতে চায়। হ্যাঁ। আজ রাত্রেই। কাল সকালে নয়।

রাত্রিকাল। দু পাশে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা। সামনে দামোদর। দামোদরের উপরে ডি ভি সি'র ব্যারাজে অবশ্য ব্রিজ আছে। ওপারে নতুন ডি-ভি-সি কলোনী। সঙ্গে যে আজ জিনিস অনেক! আর একদিনের কথা মনে পড়ছে। একবস্ত্রে বিয়ের কনে সাজ খুলে, কপালের চন্দন, চোখের কাজল মুছে বেরিয়ে এসেছিল। বিবাহের রাত্রে। নাটক! নির্লজ্জ সেন বললেন, নাটক শেষ হয়ে গেছে! নাটক! সে নাটক করেছে। হ্যাঁ করেছে। নাটক করে কে? যে নাটক অভিনেতা অভিনেত্রীরা করে, সে তো নকল নাটক। আসল নাটক, জীবননাটক করে তারাই যাদের চরিত্র নিয়ে নাটক হয়। যারা বিদ্রোহী, যারা সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে; যারা নিজের জীবনে আগুন লাগিয়ে সংসার সমাজে আগুন ধরিয়ে তপ্ত শিকে ছেঁকা দেওয়ার যন্ত্রণার শোধ নেয়। তার জীবন নাটক, সত্যই নাটক। মনে পড়ছে সব ঘটনা। আশ্চর্যভাবে নাটকীয়। নাটকের আকারে সাজালেই হল।

॥ দুই ॥

শান্ত-সাধারণ বাঙালীর সংসারে নাটকের আরম্ভ। তবে পটভূমিকাটা শান্ত সাধারণ নয়। উনিশশো তিরিশ সাল। দেশ অশান্ত, বিক্ষুব্ধ। উনিশশো তিরিশ সালের পঁচিশে মার্চ তার জন্ম। ২৬শে জানুয়ারী বিদ্রোহের ধ্বজা উঠেছে।

এগুলো হয়তো কিছুই নয়। কারণ অনেক মানুষ জন্মেছে সে বছর, যত ছেলে তত মেয়ে, কিন্তু তাদের সবার জীবন তো এমন নয়। তারই জাঠতুতো বোন, তার জন্ম যে-রাত্রে চট্টগ্রামে আর্মারি রেইড হয়—সেই রাত্রে। কিন্তু সে তো সেই ম্যাট্রিক ফেল করে বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ি গেছে, মার্চেন্ট আপিসের বড়বাবুর ছেলে, সেও চাকরে। একটি ছেলে তার কোলে দেখেই এসেছে, এ ক'বছরে হয়তো আর গণ্ডা দেড়েক হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টাই পান [illegible] দোক্তা খায়, পুষি বেড়ালের মত চুপচা[illegible] নিরীহ। ধমক খেলেই কাঁদে। সবা[illegible] নজর রাখত। সেই গল্প করে হে[illegible] পড়ত। তারই কাছে গল্প কর[illegible] মনে আছে একটা গল্প। বলেছিল, জানিস, আপিস থেকে ফিরতে দেরি হলেই জিজ্ঞাসা করি, এত দেরি করলে যে?

বলে, দেরি কোথায়?

বলি, ঘড়ি দেখ, ন'টা বাজে।

বলে, ন'টা? তা হলে ঘড়ি দেখতে ভুল হয়েছে। এই বন্ধুদের সঙ্গে একটু গল্প করছিলুম আর কি।

কিন্তু মুখ দেখেই আমি ধরি। উঁহু, বন্ধু নয়। তা বাগাতে তো পারিনে প্রমাণ নইলে। জামায় লম্বা চুল লেগে থাকে, দেখাই, বলে, ও তোমার চুল। একদিন পেলাম মাথার কাঁটা। বললাম, এইবার? একটু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল, তারপর, কি চালাক, হি-হি করে হেসে উঠে বললে, তোমার সন্দেহের জন্য বাগাতে নিয়ে এসেছি ওটা।

তা, আমি ছাড়িনি; আমিও কম বাপের বেটী নই। কেঁদে কেটে তুমুল কাণ্ড লাগিয়ে দিলুম। তখন মুখোস খুলল। দাঁত বের করে বলে কি, বেশ করেছি, বাপের পয়সা আছে, নিজে রোজগার করি, তোমার বাপের পয়সায় করিনে।

আমিও বললাম, এত বড় কথা? আমার বাপের কাছে নগদ গুনে তিন হাজার টাকা নাওনি? জানিস, খুব চেঁচিয়ে বলেছিলুম। তখন বলে, আঃ অত চেঁচাও কেন? আমি তখন বুঝতে পেরেছি—এ চেঁচালে ভয় পায়। তখন আরও চেঁচাতে লাগলুম। তখন বলে, জোড়হাত করছি, থাম। আমি বললাম, দিব্যি কর তা হলে, আর যাবে না। তখনই দিব্যি করলে। বাপকে খুব ভয় তো। শুধু তো বাপ নয়, আপিসের বড়বাবু। আর খুব কৃপণ। মাইনের টাকা তো হাতে দেয় না। তার উপর বাইরের রোজগারেরও হিসেব নেবে। বলবে, ওই ঠিকেদারের বিলের দরুণ কত নিয়েছিস, ওই পার্টির কণ্ট্রাক্টের দরুণ? হলে হবেকি, বাজার যে যুদ্ধের। দু হাতে রোজগার। ঘুষের টাকার হিসেব আছে, না ধরা যায়? এক একদিন চার পাঁচশো টাকার নোট পকেটে থাকে। তবে একশো দেড়শো, এই নিত্যি। ওদিকে, [illegible] আপিসে মেয়ে কেরানী, সন্ধ্যার পর তো ধর্মতলায় মেয়েদের মাইফেল। করব কি? ওই করি আর কি! এবার বলেছি, যা করবে করগে যাও বাবু, ছোট নজর করো না, আর বাঁধা পড়ো না। তা পড়বে না। সেদিকে হুঁশিয়ার আছে। আর নজরও ছোট নয়, সে গায়ের গন্ধে বুঝতে পারি। গায়ে একটা গন্ধ পাই। সেদিন বললাম, কি ব্যাপার কি বলতো? বলে, কি? বল না, কোথায় গিছলে। দিব্যি করে বলছি কিছু বলব না। গন্ধটা কেমন অচেনা লাগছে, মনে [illegible]চ্ছে। বললে, কি? শুনি? বললাম, [illegible]ট্রীতে গিয়ে মেমসাহেবদের পাশে বসলে [illegible] রকম গন্ধ পাই। হেসে সারা। বলে, [illegible]প-রে। তুমি বাবা শার্লক হোমস! ঠিক [illegible]রেছ। পার্ক স্ট্রীট এরিয়ার গন্ধ! বললাম, কত টাকা লাগল? বললে, ঈশ্বরের দিব্যি আমার নট-এ ফার্দিং, একটা পাঞ্জাবী ঠিকেদার, সে নিয়ে গিয়েছিল।

অনর্গল বলে যেত, কৌতুকভরে। জন্মের সময়গুণে যদি কিছু হত, তবে সে তার ওই স্বামীকে খুন করে কোর্টে গিয়ে বলত, আমার পাষণ্ড স্বামীকে আমি খুন করেছি।

সময়টা কিছু নয়। বাপ মায়ের প্রকৃতিতেও বিদ্রোহ বিপ্লব কিছু ছিল না। কারণ বিদ্রোহ বিপ্লবের কোন গল্প তো শোনেনি নীরা। বরং উল্টোই শুনেছে। বাপ মারা গেছেন তার পাঁচ বছর বয়সে, মা গেছেন তার আট বছরে; তাঁদের কথা কিছু মনে নেই। জেঠীমা বলত, তাকে নয়, নিজের মেয়ে ওই হেনাকে। কোন কারণে হেনা কাঁদতে ধরলে দুর্দান্ত চিৎকার করত; তখন বলত, কেমন রাত্রে জন্ম দেখতে হবে তো! ঠিক নাম দেওয়া হয়েছিল, হানাহানি, তা আবার সভ্য করে করা হল 'হেনা'।

হেনাকে শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা করতে গল্প করত সে কালের। ঠাণ্ডা হয়ে হেনাই জিজ্ঞাসা করত, সে বুঝি খুব মারামারি হানাহানি হয়েছিল?

—বাপ-রে। দেশসুদ্ধ, আমাদের এই পাড়াতেই হৈ চৈ! ছেলের দল চিৎকার করে; তোর বাপ আপিস যায় অনেক দিন থেকে। আপিসের দোকানে যাবার জো নেই। আজ এখানে বোমা, ওখানে পিস্তল; রাইটার্স বিল্ডিংয়ে উঠে তেড়ে সাহেব খুন। সাহেবরা ভয়ে ঝুড়ি মাথায় দিয়ে টেবিলের তলায় ঢোকে। মেয়েরা রাস্তায় বেরিয়ে ঝাণ্ডা ঘোরায়, জেলে যায়। পুলিসে মাথা ফাটায়। আমরা দুই জা মিলে চুপচাপ ঘরে বসে থাকি। সন্ধ্যে হলে বুক ঢিপ ঢিপ বাড়ে, মানুষ দুটি কখন ফিরবে। আমি ডাকি, ও ছোট বউ! রাত যে বেশ হল! ও বলে, তাই তো ভাবছি দিদি! তোর বাপের রেলের হেড আপিসে কাজ, নীরার বাপের রাইটার্স বিল্ডিংএ। তা হলে কি হবে, গায়ে তো লেখা থাকে না; ভিড়ের মধ্যে পড়ে গেলে তখন কে কাকে চেনে। পুলিস লাঠি চালিয়ে দিলেই তো হল। সে বাবা বড় দুর্ভাবনার সময় গেছে।

বলতে বলতে হেসে উঠতেন, হেসে নিয়ে বলতেন, দুঃখের মধ্যে হাসি মা; তোর বাপের মাছের লোভ তো দেখেছিস? তোর খুড়োরও কম ছিল না। সে দিন শুনেছেন শেয়ালদায় খুব গোলমাল, লাঠি চার্জ হয়েছে, ট্রাম বন্ধ। তো দু ভাই ঠিক করেছে—দুই ভাই আপিস থেকে এই সময়টায় বেরিয়ে একসঙ্গে হয়ে আসতেন—; ঠিক করেছে, শ্যামবাজারে এসে, ছোট লাইনে দমদম এসে, হেঁটে আসবেন। শ্যামবাজারের মোড়ে এসে শুনেছেন, বাগবাজারের ঘাটে ইলিশ একেবারে অঢেল, খুব সস্তা, টাকায় এই বড় ইলিশটা দেড়সের, দুসের। দু ভাই আর লোভ সামলাতে পারেনি, গেছে, মাছও কিনেছে। এ একটা ও একটা ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরছে, আর ওদিক থেকে হল্লা। লোক ছুটছে, পালাও, পালাও, পুলিস। এদিক থেকে চিৎপুর ধরে, ওদিক থেকে বাগবাজার ধরে। বাস—দুই ভাই মাছ হাতে নিয়ে দৌড়। একেবারে খালের দিকে। হাতে মাছ, বগলে ছাতা, অন্য হাতে খাবারের কৌটো, আরও কি-কি, বোধ হয় দুজনে দুটো ফ্রক কিনেছিল। দুজনেই একটু থলথলে মানুষ; শেষ ছাতা ফেলে, ফ্রক ফেলে, কৌটো ফেলে দৌড়। দুই ভাই হেঁটে বাড়ি ফিরল ট্রাংক রোড ধরে, রাত্রি তখন দশটা। আমরা তো দুজনে মরে ভূত হয়ে গেছি। তোরা দুটোতে খিদের চ্যাঁচাচ্ছিস। আর ধড়াধ্বড় পিটছি। মর মর! তোদের ফ্রক কিনতে গিয়েই মানুষ দুটো গেল! শেষে ঝগড়া হয়ে গেল, আমি একটু বেশী মেরেছিলুম তোকে। কাঁদিয়ে দিয়েছিস। ছোট বউ বললে, তুমি কি খেপলে দিদি? এমনি করে মারে? আমি বললুম, বেশ করেছি। নিজের মেয়ে মেরেছি, তোমার কি? সে বললে, খুব করে মার। মেরে ফেল। পুলিসে ধরবে, আমায় সাক্ষী দিতে বলবে, তাই বলছি।

বললুম, দিস তো দিস। দেবে তো ফাঁসি, আর করবে কি? সে বললে, তাই যদি হয়, সেটা যদি এতই তুচ্ছ হয়, তবে ওকে না মেরে নিজেই গলায় দড়ি দাও না! আমি বললুম, কি বললি? ব্যস লেগে গেল তুমুল ঝগড়া। ঠিক এই সময়ে দুই ভাই এলেন, গায়ের জামায় কাদা, কাপড় ছিঁড়েছে তোর বাপের, জুতোয় বেধে পড়ে গেছেন; হাঁটু ছড়েছে। তোর খুড়োর জুতো গেছে ছিঁড়ে, সে দুটো হাতে নিয়ে ঘর ফিরলেন—কিন্তু মাছ ছাড়েননি। দুজনের হাতে দুই মাছ।

জেঠীমা যত হাসতেন হেনা তত হাসত! সেও হাসত। কিন্তু হেনার মত নয়। এমন করে হেসে গড়িয়ে পড়তে তো পারে না। হাসলে, নিশ্চয়ই জেঠীমা হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলতেন, ও কি হাসি নীরা? ওই হেনাও তো হাসছে। তোমার যে বেহায়ার মত হাসি! অবশ্য সবটাই ওই নয়, নিশ্চয় তার প্রকৃতিতে কিছু ছিল, কিছু আছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেন প্রকৃতিকে আপনার ছাঁচের মধ্যে পুরে তৈরী করতে চায়, ঠিক তেমনি ভাবেই প্রকৃতিও তার শক্তি অনুযায়ী ঠেলে উত্তাপ গলিয়ে ছাঁচকে বদলে অন্য রকম করে দেয়।

থাক সে কথা।

মনে না-পড়ুক, সে জেঠীমা জ্যাঠামশায়ের গল্পের মধ্য থেকে বেশ কল্পনা করে যে, শান্ত পরিবারটিতে অশান্তি ছিল না, বিদ্রোহ ছিল না, বিপ্লব কিছুই ছিল না। সেই উনিশশো তিরিশ সালেও ছিল না। বাবা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ফিনান্সের কেরানী ছিলেন; সেখানে হিসেব কষতেন সারাদিন—ফাইল সারতেন, উপরিওলার সই করাতেন, ডিবে থেকে মধ্যে মধ্যে পান বের করে খেতেন, তার সঙ্গে বিড়ি ধরিয়ে আরাম করতেন; দেশের স্বাধীনতা কামনা আদৌ ছিল কি না সে বলতে পারে না, কারণ জেঠীমা বলেন, দুই ভাইই যেদিন কষ্ট পেয়ে বাড়ি ফিরতেন, সেদিন ঘরে বসে নেতাদের কটু কথা বলতেন। স্বাধীনতা-কামনা থাকলেও নিতান্ত সভয়ে মনের চোরকুঠরীতে এক কোণে নিষ্ঠুর পাওনাদারের ভয়ে দেনদারের মত তাঁর দৃষ্টিতে তাকিয়ে লুকিয়ে থাকত।

যেদিন কষ্ট পেতেন না, সেদিন সকৌতুকে দুই পক্ষেরই তাঁর কর্মের গল্প করে উপভোগ করতেন।—বুঝেছ না। পুলিস তাড়া মেরেছে, আর সব চোঁ-চা দৌড়। সে কি দৌড়! একজনের কাছা খুলে গেছে তো তাই নিয়েই দৌড়ুচ্ছে। বাপরে বাপরে! আবার বলতেন সায়েববেটার ঘরে ঢুকেছি, একটু বেশী শব্দ হয়েছে দরজায়, বাস, বেটা চমকে দাঁড়িয়ে উঠে বলতে শুরু করেছে, হু আর ইউ। আর্দালী, আর্দালী। সে কাঁপছে প্রায়। আমি বললাম, এক্সকিউজ মি সার। ক্যারিয়িং শো মেনি ফাইলস, আই হ্যাড টু পুস দি ডোর উইথ মাই হেড। তার পর হয়তো বলতেন, ওদের আর হয়ে এসেছে। খুট শব্দ শুনে যারা চমকে ওঠে, প্রাণপক্ষী খাঁচার গায়ে ঝট-পটিয়ে মাথা ঠোকে, তাদের পালা খতম।

হয়তো এর পর তাকে নিয়ে আদর করতেন, নীরা হীরা জিরা ধীরা মীরা টিরা—। এমনি অর্থহীন শব্দের সমাবেশ। কিন্তু তার মধ্যে ছিল পরমাশ্চর্য মধু। হয়তো বলতেন—যা অর্থহীন নয়—নীরা হীরা মণি মানিক! নীরাকে আমি ইস্কুলে পড়াব, গান শেখাব—

মা বলতেন, নাচও শিখিয়ো বাপু। আজকাল আবার ভাল করে নাচ জানার রেওয়াজ হয়েছে।

বাপ বলতেন, নিশ্চয় শেখাব। কুড়ি বছরের আগে তো বিয়ে হচ্ছে না। ইন-সিওরটা কুড়ি বছরে ম্যাচিওর করবে।

মা বলতেন, তিন হাজারে ভাল ঘরে বিয়ে হবে ভাবছ?

—না হলে করব কি? আরও তো ছেলে-মেয়ে হবে। তাদেরও তো দায় আছে।

—তবে তোমার মাইনে বাড়বে।

—তা বাড়বে। প্রমোশন হবে। জান এবার সায়েব সার্ভিস বুকে খুব ভাল নোট দিয়েছে।

—তোমরা দুই ভাই নাকি জমি বেচছ?

—হ্যাঁ ভাল দর পাচ্ছি। নার্সারিওয়ালারা নেবে।

—টাকাটা যেন খরচ করে দিয়ো না।

—বাড়িটা মেরামত করাব। আর বাকীটা ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনব।

—একটা কথা বলব?

—বল না, এত সংকোচ কেন?

—নীরাকে একটা প্যারাম্বুলেটর কিনে দেবে?

—তা না হয় দিলাম। ঠেলবে কে?

—একটা ঝি রাখব। হেনার জন্যে একটা কিনেছেন বটঠাকুর, ও যা করে চড়বার জন্যে!

—[illegible] মাইনে কত জান? আমার ডবল! আ[illegible] বেশী টাকা, দাদার একশো ষাট টাকা [illegible]

—[illegible]ক। সে বাচ্চারা বোঝে না।

—বাচ্চার মা-রাও বোঝে না!

—বেশ বাপু, দেবে না, দিয়ো না। এত কথা কেন? বাচ্চার মা নিজের জন্যে কোন দিন কিছু বলে? ওই তো দিদির গলার হার ভেঙে হার হল, আমি বলেছি তোমাকে আমারটাও হোক! দুই ভাইএর বিয়েতে তো টাকা একই নিয়েছ। বাবাকে বাজারদর দেখানো হয়েছিল। এবং বলা হয়েছিল—ছেলে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ঢুকেছে। বড় ছেলে রেলের চাকরে, পেনসন নেই। এর পেনসন আছে।

—বাপরে বাপ! বাচ্চার মা কথা বলে না বলে কম কথা বললে না।

—যাক আর বলব না। তবে কাল ওর দুটো ভাল জামা না-হলেই হবে না। ঝিটার সঙ্গে আমি কথা বলেছি, সে আর এক টাকা বেশী দিলে বিকেলবেলা বেড়িয়ে আনবে; সে আমি ওই রদ্দি জামা পরিয়ে পাঠাব না।

পরের দিনই তার বাপ শুধু ভাল ফ্রকই আনেন নি, একটা সস্তা সেকেন্ডহ্যান্ড ঠেলাগাড়িও এনেছিলেন। একটা ব্ল্যাক জাপানও এনেছিলেন। নিজেই রঙ দিয়ে নতুনের খোলস পরাতে চেয়েছিলেন।

ছেলে বয়সে তার দুঃখ খুব ছিল না। সুতরাং বিদ্রোহের কারণ ঘটেনি। সে ছিল বোধ হয় প্রকৃতিতে।

*

বাবা মারা গেলেন। মনে নেই। শুধু মনে আছে শবযাত্রাটা। একটা খাটিয়া, তাতে একটা মানুষ শোয়ানো, লোকে কাঁধে করে নিয়ে গেল। তাও খুব অস্পষ্ট। কাঁধে তোলার সময়কার একটা একটুকরো ছবি
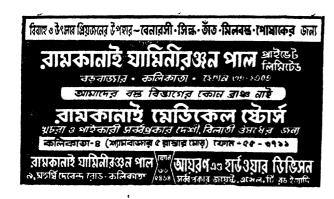
মাত্র। হয়তো মনের মধ্যে তার দরুণ সুগভীরে একটি বিন্দুর মত একটি ক্ষত আছে যার বেদনা সর্বক্ষণ নয়; যার বেদনা অকস্মাৎ কোন শবযাত্রা দেখলে মনের মধ্যে খচ করে বেজে ওঠে। কোন ছোট পিতৃহীন ছেলে বা মেয়েকে দেখলে তার স্বাভাবিক সচেতন বেদনার সঙ্গে ওই অবচেতনের বেদনাটি সংযুক্ত হয়ে প্রগাঢ় হয়ে ওঠে।

মায়ের মৃত্যু তার জীবননাটকে প্রথম অঙ্কে শেষ দৃশ্যের দিকে আকস্মিক ফেরার মুহূর্ত। দু বছর কয়েক ধরে একটি দৃশ্য। দৃশ্যের আরম্ভ বাবার মৃত্যুতে। শেষ মায়ের মৃত্যুতে। নির্মম পরিহাসের দৃশ্য তার পক্ষে। কিন্তু সে তা বুঝতে পারেনি। বুঝবার বয়স হয়নি। বড় নির্মম নাট্যকারের রচনা। মায়ের হাতে টাকা এল। অনেক টাকা একসঙ্গে। এর মধ্যে মায়ের দুবার দুটি সন্তান হয়ে মারা গেছে। দুটি ভাই হয়েছিল নীরা দুটি মারা যাওয়ার অপরাধ কার চুপচাপ না নীরা। বলতে পারবে না তার কারণ। তবে মা এর একটা ছিলেন তার ওপর। বলতেন, ওর কোলের দোষ পিঠের দোষ। একা ভোগার অধিকার নিয়ে এসেছেন। শুনেছে বাবা না কি তাকে ঘিরে রাখতেন। না, বলো না, ওর কষ্ট হয়। বাচ্চা মেয়ে।

—বাচ্চা মেয়ে, কিন্তু ভাগ্যে যে রাক্ষসী।

—তোমার ভাগ্য নয়?

তারপর বাবা মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয় পরিবর্তন। মা তাকে অগাধ স্নেহ দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। হাতে টাকা অনেক। লাইফ ইনসিওরের টাকা। জমি বিক্রী করা টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট। সবসুদ্ধ বোধহয় হাজার ছয়েক। তা ছাড়াও যে জমিটুকু ছিল তাও বিক্রী করলেন। কে দেখবে? কে আদায় করবে ফসলের ভাগ? ভাসুর সব ঠকিয়ে খেতে পারবেন না কে বললে? নীরাকে সাজাতে লাগলেন। খেলনা কিনে দিলেন। ডবল বেণী বেঁধে ইস্কুলে পাঠাতে লাগলেন। মাইল দুয়েক দূরে দমদমে ছিল মিশনারীদের ইস্কুল, সেখানে। মাইনে ছিল বেশী। হেনাকে জ্যাঠামশায় দেশী ইস্কুলে দিয়েছিলেন। হেনার বুদ্ধিও ছিল তার বেড়ালের মত নরম মোটা শরীরের মত। মেমসাহেব দেখে ভয়ও করত; তবুও আমার সেজেগুজে স্কুলের গাড়িতে যাওয়া দেখে প্রথম প্রথম কাঁদত। জেঠীমা মেয়েকে তিরস্কার করতেন, কখনও প্রহার করতেন, আর বলতেন, তোর তো এখনও বাপ মরেনি যে, তুই মেমসাহেব বনবি। আর মরলেই বা কি, ভাই যে এক গণ্ডা। তোর আগে দুটো, পরে দুটো।

আশ্চর্য, বাপকে মনে নেই, মায়ের মুখও ঝাপসা হয়ে গেছে; কিন্তু এই কথাগুলো

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch

তার মনে আছে। তাই জীবনে অনাথ আশ্রমে এসে ছেলেদের কখনও কটু কথা বলেনি। বলে না সে কাউকেই। মধ্যে মধ্যে এখানে তার সহকর্মিণীরা কতদিন কঠোর হতে বলেছে, বলেছে, শাসন কর একটু, আমরা শাসন করি আর তুমি ওদের এমন নাই দাও যে সব ভস্মে ঘি ঢালা হয়।

সে তাতে হেসেছে। বলেছে, দিদি, খাদ্যের মধ্যে সেরা মিষ্টি নুন, আর দুনিয়ার সেরা মিষ্টি মধু নয়, মিষ্টি কথা! কটু কথা বলতে নেই, ও আমি পারিনে। বেশ তো শাসন তোমরা করো, ওটার ভার তোমাদের।

আজ সে কি করে এমন নির্মমভাবে কথাগুলো বলেছে, বলতে পারে না। না, পারে। মানুষের শুধু প্রাণই সব নয়, তার মান আছে। প্রাণের চেয়ে মান বড়। দুনিয়ার যে-সব ক্ষমতামত্ত প্রতিষ্ঠাবানেরা মানুষের অসম্মান করে, তাদের ক্ষমা সে করতে পারে না। না, পারে না। ক্ষমা করতে না-পারার জন্যেই সে আজ এই নীরা হয়েছে। নইলে—

থাক, আবার ঘুরে সেই আজকের কথায় এসেছে।

নাটকের দৃশ্যে পরম্পরা ভঙ্গ হচ্ছে। স্মৃতির প্রম্‌টার, স্মারক বলছে, ভুল বলছ। ও সব পরের পার্ট। বল, শোন, শুনে বল—।

জেঠীমার কথা শুনে মা বলতেন, কি বলছ দিদি? ছি!

জেঠীমা জ্বলে উঠে বলতেন, ছি কিসের? ছি! সত্যি বলছি। আর বলছি আমার মেয়েকে।

মা বলতেন, না, বলা হচ্ছে আমার মেয়েকে!

—না-না-না। বলিনি। তুমি বললেই হল? গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে চাও? জেঠী তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠতেন।

মা দৃঢ়স্বরে বলতেন, ভাল, বটঠাকুর আসুন তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি বলেন শুনি! না-হয় প্রতিবেশীদের বলব। তাতে প্রতিকার না-হয়, সব বেচেছি, বাড়ি বেচেও উঠে যাব।

মা জানতেন ওটি ব্রহ্মাস্ত্র। কারণ প্রতিবেশী কুণ্ডুরা তখন ও অঞ্চলে রাহুর গ্রাস এবং শক্তি নিয়ে উঠেছেন। যত গ্রাস তত হজমশক্তি। জ্যাঠামশাই ওখানে টুকটাক করে রেলের আপিসের পয়সায় এক উপরাহু, কিংবা বাঘের পিছনে ফেউ নয়, নেকড়ে হয়ে উঠেছেন। মায়ের কাছে অবশিষ্ট খানী জমি জ্যাঠামশায়ের মুখ থেকে তিনিই কেড়ে নিয়েছেন। বাড়িটির উপর খুব নজর। ওটি পেলে তাঁর বাড়ির কম্পাউণ্ড প্রায় চৌকোশ হয়—অর্থাৎ বাদ থাকে শুধু জ্যাঠামশায়ের বাড়ি। সুতরাং বাড়ি বেচে দিয়ে চলে যাব বললেই চমকে উঠতেন ও'রা। ভয় পেতেন।

চুপ করে যেতেন জেঠাইমা। জ্যাঠামশায় এসে বলতেন, তুমি বাড়ি বেচবে কেন বউমা। আমরাই বরং যাব। তুমি বেচলে আমাদের দেবে না, আমি কিন্তু তোমাদেরই দিতে চাই। নিয়ে নাও।

মা তাতে ভয় পেতেন না। কারণ তিনি জানতেন যে, জ্যাঠামশাই কখনও বেচতে পারবেন না। ছলনা যখন নকল নাটকে হয়, [illegible] তাতে কেউ ভয় পায় না। এমন কি [illegible] পক্ষ যে ভয় পাওয়ার অভিনয় করে [illegible] দর্শকও না। জ্যাঠামশায়ের ছলনা [illegible] থিয়েটারী ছলনা হত। মা বলতেন, সে আপনার ইচ্ছে। ইচ্ছে হলে আপনি বেচে দিয়ে সুখের জন্যে তো কলকাতায় যেতে পারেন। আমার তা নয়। আমার মেয়েকে আমি ভাল করে মানুষ করব, পড়াব, যাতে ভাল পাত্রে পড়ে বা বিয়ে না-হলে মাস্টারীটিস্টারী করেও খেতে পারে। আর বুদ্ধি ওর ভাল। ক্লাসে ফার্স্ট হচ্ছে। ওকে এমন করে বলা আমার সহ্য হবে না। আমার যে মায়ের প্রাণ।

জেঠীমা আর থাকতে পারতেন না— ফোঁস করে উঠতেন এবার, আর আমার রাক্ষসীর প্রাণ, না?

জ্যাঠামশায় এবার ধমক দিতেন, কি হচ্ছে কি? কি বলছ এ সব?

মা বলতেন, ওই শুনুন না।

জ্যাঠামশায় বলতেন, তুমি বড়। তোমাকে সহ্য করতে হবে।

নীরা কৌতুক অনুভব করত। ছবিগুলো ফটোগ্রাফ নয়, পাকা রঙে তুলিতে আঁকা ছবির মত আঁকা হয়ে গেছে। হয়তো বা ফটোগ্রাফের সঙ্গে আঁকা ছবির যেটা তফাৎ, কালোর জায়গাটা ঘন কালো, আলোর জায়গাটা আর্টপেপারের মসৃণ অমলধবল শুভ্রতায় শুভ্র। কিন্তু বিষয়টা সত্য।

নীরা এর পর সোৎসাহে গভীর মনোযোগ সহকারে ইংরেজী পড়ত। ও ইস্কুলে প্রথম থেকেই ইংরেজী উচ্চারণ পর্যন্ত মেমসাহেবদের অনুকরণে আশ্চর্য রকমে সম্ভ্রান্ত।

Tell the man to come to me.

ও উচ্চারণ করত, "ঠেল দা ম্যান টু কম টু মি।" মানে—ও মনুষ্যটিকে বল আমার

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

টোপ

শিল্পীঃ শ্রীরণেন আয়ন দত্ত

কাছে আসিতে। উসকো বোলো মেরি পাশ আনেকো লিয়ে।

মা ওই কথাটা মিথ্যে বলেন নি; নীরার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল এবং ওই ইস্কুলের পড়ানোর গুণে পড়তেও ভাল লেগেছিল। তার সঙ্গে শিখেছিল আর একটা জিনিস। সেটা সাজপোশাক, পরিচ্ছন্নতা। বছর দুই যেতে-না-যেতে মায়ের মৃত্যুর ঠিক আগেটায় আর সে মায়ের সাজিয়ে দেওয়া নিত না। নিজেই সাজত। বলত, না। তুমি বড় লাউড করে দাও।

আশ্চর্য হয়ে মা বলতেন, কি? কি করে দি?

—লাউড! লাউড মানে উচ্চ। মানে চড়া সাজ করে দাও।

মা গৌরবে হেসে সারা হতেন, ওরে বাপরে!

মা বেঁচে থাকতেই সে ওই ইস্কুলের তিন বছরের কোর্স শেষ করে সেকালের ইউ-পি পরীক্ষায় মাসে তিন টাকা বৃত্তি পেয়েছিল। হেনা সেবার ফেল করেছিল।

এরপর মেমসাহেব নিজে এসে মাকে বলেছিলেন, আপনার কন্যাকে কোন ভাল স্কুলে ভর্তি করিয়া ডিবেন। উহার বিডা হইবে। বলেন টো আমি কোন মিশনের স্কুলে বলিয়া ডেখি। টাহারা ফ্রি করিয়া ডিবে। আমি বলিব। হাঁ। আমি বলিব।

মা আর ততটা সাহস করেননি। তিনি ওখানকার গার্লস্ হাইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। তারা সমাদরের সঙ্গে তাকে নিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইস্কুলে এবং পাড়ায় নাম রটেছিল 'ব্রিলিয়াণ্ট গার্ল।' কেউ কেউ বলতেন, হারাণ মুখুজ্জের মেয়েটি যদি মেয়ে না-হয়ে ছেলে হত!

মা তাকে আদর করে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলতেন, ওই আমার ছেলে। ছেলের চেয়েও বড়। ঠিক একদিন এমনি করে আদর করতে গিয়েই তিনি বুকে হাত দিয়ে বসে পড়লেন, একি হল? বুকে যে—। তারপরই আঁ-আঁ শব্দ করে গড়িয়ে পড়লেন।

নীরা মা—মা বলে ডাকতে ডাকতে চিৎকার করে ডাকলে, মা গো! কি হল? মা—মা—মা!

তার চিৎকারেই জেঠীমা ওপাশ থেকে ডেকে বলেছিলেন, আরে এমন করে চেঁচাচ্ছিস কেন? মা কি মরেছে?

—জানি না। কি হল দেখ! জেঠীমাগো!

জেঠী-মা এসে দেখে 'সর সর' বলে পাশে বসে মুখে কয়েকবার জলের ঝাপটা দিয়ে, নেড়ে চেড়ে দেখে, উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—খেলে মা, মাকেও খেলে? ভাই খেয়ে খিদে মিটল না, বাপ খেয়ে মিটল না, শেষ মা—তাও খেলে?

নীরা বড় বড় চোখ দুটো বিস্ফারিত করে জেঠীমার দিকে তাকিয়েছিল। সে খেয়েছে মাকে? সে?

দৃশ্যটা শেষ হল। নাটক নয়? মায়ের অনাদরে দৃশ্যের আরম্ভ, বাপের মৃত্যুতে আকস্মিক পরিবর্তনে আশ্চর্য সমাদর, তার পরই হঠাৎ হার্টফেল করে মায়ের মৃত্যু এবং অন্তে জেঠীমার নিষ্ঠুর কঠিন নির্মম তিরস্কার—'মাকেও খেলে মা?'

যদি কেউ তার জীবন নিয়ে নাটক লেখে এবং বেশী নাটকীয় করতে ইচ্ছে করে তবে সে যেন যোগ করে দেয়—নীরা তারস্বরে প্রতিবাদ করে উঠেছিল—না-না-না-। আমি খাইনি, আমি খাইনি। তারপর আছড়ে পড়েছিল মায়ের বুকের উপর—মা-মা-মা।

॥ তিন ॥

আবার যবনিকা উঠলো।

সেটা নীরার জীবনে যবনিকা ওঠাই বটে।

মৃত্যুকে সে এমন করে দেখেনি। বয়সই বা কত, যে দেখবে। আট বছর। জীবনে তখন স্মৃতি সক্ষম হয়নি; শক্ত হয়নি; জীবনের জলময় সৃষ্টি থেকে তখনও স্মৃতির পৃথিবী তরল পলিমাটির মত সদ্য জাগছিল। বাপের মৃত্যুর স্মৃতির মধ্যে বাপ নেই, ভারী মানুষটা সে তরল পলির চোরাবালির মধ্যে কোথায় ডুবে গেছে। খুঁড়লে হয়তো একটা নরকঙ্কাল বা তার ছাপওয়ালা মাটি বেরুতে পারে; থাকবার মধ্যে আছে চওড়া হাস্কা খাটিয়াটার দাগ। কিন্তু আট বছর বয়সে তার চোখের উপর, তার প্রায় কোলের উপর মায়ের এই মৃত্যু তার শক্ত-হয়ে-আসা স্মৃতির পৃথিবীতে প্রথম নিষ্ঠুর আঘাত। সে যেন হত-চেতন হয়ে গেল। তাকেই মুখাগ্নি করতে হয়েছিল, শ্রাদ্ধও করেছিল। সে সব আঘাতে সে কোন প্রতিঘাত দিতে পারেনি। শুধু দুর্বোধ বা অবোধ একটা অনিশ্চিতের ভয়ে শুধু কেঁদেই ছিল ক'দিন ধরে। শুধু একটা কথা মনে আছে। সেটা এই বিরতির মধ্যে

গ্রীনরুমে দ্বিতীয় অংকের নাট্যপরিচালকের কঠিন নির্দেশ বলতে পার। শ্মশান থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হয়েছিল। জেঠীমা বলেছিলেন, আজ আর খেতে নেই কিছু। বিছানায় শুতে নেই। ওই কম্বলে শুয়ে পড়।

পরদিন সকালেই বলেছিলেন, ওগো মেম সায়েব, সকালে উঠেই তো চুল আঁচড়াও, মুখে হয়তো পাউডারও দাও—সে সব যেন করো না। করতে নেই।

সে নিশ্চয়ই সে সব করত না। শোকের একটা স্বাভাবিক বৈরাগ্য আছে, সুখের কথা সজ্জার কথা মনে থাকে না। কিন্তু জেঠীমা যেন পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নির্দেশ দিলেন, তোমার মেক-আপ সব পাল্টাল। সর্বদা মনে রাখবে, তুমি দুঃখিনী।

যবনিকা উঠল—শ্রাদ্ধবাসরে? না, তারও পরে।

বারো চৌদ্দ দিনেই রপ্ত হয়ে গেছে তখন মেক-আপ। মুখে তখন একটা ছাপ পড়ে গেছে ক্লিষ্ট মালিন্যের; না, ছোপ ধরে গেছে।

এখানেই শুরু হোক নতুন দৃশ্যের। সেদিন রবিবার, সকাল তখন ন'টা সাড়ে ন'টা। আমার ডাক পড়লো। বাইরে জেঠামশায় ডাকছেন। স্কুলের হেডমাস্টার এসেছেন। আর এসেছেন কুণ্ডুবাবু।

দরজার কড়া নড়ছে।

নীরার মনের মধ্যে জীবননাট্যের মানস-অভিনয়ে ছন্দ কাটল। ১৯৩৮ সাল থেকে এসে পড়ল ১৯৫৬ সালে। বিনো সেনকে নিষ্ঠুর আঘাতে বিপর্যস্ত করে বিজয়িনী হয়ে সে তৃতীয় অংকে প্রবেশ করবে। বিরতির মধ্যে গ্রীনরুমে বসে ভাবছে, প্রথম অংকের দৃশ্যগুলোর কথা। কে এসে তার ঘরের দরজায় কড়া নাড়ছে, ডাকছে। তৃতীয় অংক শুরু হবে নাকি? কে ডাকছে? অনুতপ্ত বিনো সেন? বিখ্যাত প্রখ্যাত বিনো সেন নতশির হয়ে কি বলতে এসেছেন? অভিনয় চড়া হয়ে গেছে?

—নীরা! নীরা!

না, বিনো সেন নয়, অণিমাদি।

—নীরা!

—কি বলছেন? এখন মাফ করবেন আমাকে।

—তোমার খাবার এনেছি ভাই। খাবারটা নাও। খাও।

—মাফ করবেন আমাকে। এখানকার অন্ন আমার মুখে রুচবে না।

—ভাল। দরজা খোল। না খুললে, আমি যাব না এখান থেকে। কড়া নাড়ব, ডাকব।

—না, নাড়বেন না। ডাকবেন না।

—ডাকব। নাড়ব কড়া। আমি তোমাকে পত্র লিখিনি। আমাকে বলবে তুমি?

কি আপদ! দরজা খুলে সে পথ আগলে দাঁড়াল।

অণিমাদি'র বয়স হয়েছে। দু চারগাছা চুলও সাদা হয়েছে। তা তিনি সযত্নে ঢাকা দিয়ে রাখেন। বেশ একটু মোটাসোটা। তিনি প্রায় ঠেলে ঢুকলেন ঘরে। বললেন, ও মা! আমি ভাবছি, তুমি জিনিসপত্তর গোছাচ্ছ! এ যে সব যেমনকার তেমনি। বসে বসে কাঁদছিলে নাকি?

—কাঁদতে আমি জানিনে অণিমাদি জীবনে আট বছর বয়সে কান্না শেষ করেছি মরা মায়ের বুকের উপর পড়ে। তারপর আর কাঁদিনি।

হাসলে নীরা।

[illegible] থালাটা রেখে অণিমাদি বললেন, [illegible] এমন নিষ্ঠুরভাবে সমস্ত লোকের [illegible] মানুষটাকে এমন করে বলতে [illegible] হলে পারতেম না।

[illegible] মায়া নেই আপনার।

—তা হবে। তবে—। একটু হাসলেন অণিমাদি।

—কি? অনুতাপ করতে হবে? নীরাও ব্যঙ্গভরে হাসল।

—অনুতাপ টনুতাপ বুঝিনে ভাই। তুমি বি-এ পাস করেছ, তাও আবার ডিস্টিংশনে। আমরা সে হিসেবে মুখ্যু মানুষ। আমি বুঝি কি জান? বুঝি, যে জীবনে কাঁদেনি, তাকে একদিন কাঁদতে হবেই।

—না। কঠিনভাবে ঘাড় নাড়লে নীরা।

—আচ্ছা। আমি চললাম। ইচ্ছে হয় খেয়ো না-হয় খেয়ো না। দিয়ে গেলাম।

চলে গেল অণিমাদি।

নীরা তখনও ঘাড় নাড়ছিল।—না।

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আয়নাটায় তার প্রতিবিম্ব ঘাড় নাড়ছে না। মনে মনে সে বললে, সব কথা সব মানুষকে খাটে না অণিমাদি। আমি কাঁদিনি সেই দিন থেকে। কাঁদব না।

*

তোলো, জীবননাট্যের প্রথম বিরতির পর দৃশ্যপট তোলো। দেখ চরিত্র বিচার করে, সে কাঁদবে কি না। দৃশ্যপট বদল হয়েছে তখন। তাদের এবং জ্যাঠামশায়ের বাড়ির উঠোনের মাঝখানে যে পাঁচিলটা ছিল সেটা ভাঙা হয়েছে। সেটা তাদের শোবার ঘর ছিল, রাস্তার দিকে, সেটা তখন বসবার ঘর হয়েছে। ছোটখাটো অনেক বদল। নীরাকে শুতে হয় হেনার সঙ্গে।

ডাক এল, সেই ঘরে জ্যাঠামশায় ডাকছেন। স্কুলের হেডমাস্টার এসেছেন। সঙ্গে এসেছেন কুণ্ডুবাবু।

নীরাকে জেঠীমা বললেন, একটা ফরসা ফ্রক পরে যাও বাবু। বলবে, এর মধ্যে ঘুঁটে-কুড়ুনী করে তুলেছি।

ফ্রক পালটে, নীরা নিজের অভ্যাস অনুযায়ী চুলে চিরুনি দিয়ে মুখে পাউডার বুলোবার জন্যে কৌটোটা খুলেছে, ওটা তার ওই মিশন ইস্কুলের শিক্ষা। হেনা বলে উঠেছিল, ও মা! তুই পাউডার মাখছিস? তোর না মা মরেছে?

হাতখানা আর নড়েনি। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারেনি। তারপর বলেছিল, কেন? এখন তো আবার মাছ খাচ্ছি, বিছানায় শুচ্ছি। জেঠীমা বলেছেন, পরিষ্কার হয়ে যেতে।

বলেই সে তার মনের প্রশান্ত কাঠিন্যে মুখে পাফটা বুলিয়ে নিয়েছিল।

জেঠীমা বারান্দাতেই ছিলেন। [illegible] ও ছিলেন; বারান্দায় বেরিয়ে আ[illegible] চুপচা[illegible] বলেছিলেন, একটু গন্ধ মাখ[illegible] সেন্ট? তোর তো আছে।

একটা তীক্ষ্মমুখ মোটা সূচ যেন তার বুকে বিঁধে গিয়েছিল। অন্য মেয়ে হলে সে নিশ্চয় কাঁদত বা সভয়ে মুখের পাউডার মুছে ফেলত। কিন্তু সে কোনটাই করেনি। ভুরু কুঁচকে, বাপের মতন ললাটে সূক্ষ্ম তিক্ত বক্র রেখা ফুটে উঠেছিল।

অনিবার্য ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে দুঃখকে যারা জয় করে, তারা কাঁদে না। ওই লড়াইয়ে কাঁদতে মানা গো। কাঁদলেই হারলে। তোমার চোখের জলই তোমার পায়ের মাটি পিছল করে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়বে। নীরা কখনও কাঁদবে না। জীবনপথে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে দ্বিতীয় অঙ্কে, প্রথম অঙ্ক সে তুমি জান না, জানলে ও কথা বলতে না। থাক।

নতুন ড্রয়িংরুম, হাঁ, জ্যাঠামশায় তাদের শোবার ঘরখানাকে ড্রয়িংরুমই বলতে শুরু করেছেন তখন; ঘরে ঢুকতেই জ্যাঠামশায় বললেন, কাল থেকে তুমি ইস্কুলে যাবে, বুঝেছ। হেডমাস্টারমশায় নিজে এসেছেন।

নীরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ডাগর চোখ দুটিতে তার বিভ্রান্তি এবং বিস্ময় ফুটে উঠেছিল।

হেডমাস্টার বললেন, দাঁড়িয়ে কেন? বস!

সে বসল। জেঠামশায় বললেন, কি রে, তোকে আমরা ইস্কুলে যেতে বারণ করেছি?

তা তো মনে পড়ল না নীরার। সে ঘাড় নাড়লে, না।

কুণ্ডুবাবু বললেন, তবে ইস্কুল যাচ্ছ না কেন?

চুপ করে বসে রইল নীরা। ভুরু দুটো আবার কুঁচকে উঠল। হেনা ইস্কুলে যায়, দশটায় জেঠীমা তাগাদ দেন, হেনা! দশটা বাজে যে। কই তাকে তো বলেন না। তার মা মরেছে, তাকে যেতে আছে?

হেডমাস্টার বললেন, ইস্কুলে যাবে কাল থেকে। আমরা আশা করি, তুমি ভালভাবে পাশ করবে। স্কলারশিপ পাবে। ইচ্ছে হলে আই-এ, বি-এ, এম-এ পড়বে। পাস করবে। কত মেয়ে করছে। চাকরী করছে। বুঝলে না?

নীরা বললে, আমাকে ইস্কুলে যেতে আছে? আমার মা মরেছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয়। অশৌচ চলে গেছে, আবার কি? কাল থেকেই যাবে তুমি, এই তো হেনা যায়। ওর ইস্কুল তো আমাদেরই প্রাইমারি সেকশন। একসঙ্গে যাবে।

নীরা বলে ফেললে, জ্যেঠাইমা বকবেন না?

জ্যাঠামশাই বলে উঠলেন, না-না। কেন বকবেন?

—উনি তো বকেন। সব তাতেই বকেন।

জ্যাঠামশাইয়ের মুখোশ এবার খুলেছিল, বললেন, না, সব তাতেই বকেন না। অন্যায় করলেই বকেন এবং বকবেন। তোমার মা তোমার মাথা খেয়ে গেছে আদর দিয়ে। যাক, ইস্কুলে যাবে তুমি, তাতে তিনি কখনই বকবেন না।

—ছি-ছি-ছি পরাণবাবু। ছি! বলে উঠলেন কুণ্ডুবাবু।
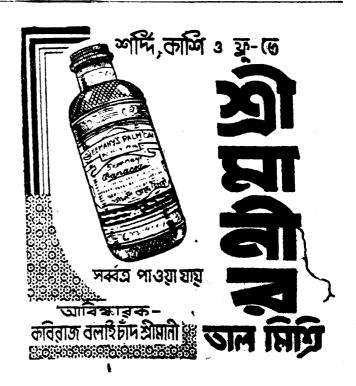
জ্যাঠামশাই নীরাকে ধমক দিলেন, যাও তুমি, ভিতরে যাও। যাও। কাল থেকে ইস্কুলে যাবে, যাও।

নীরা চলে গেল ভেতরে, শীতল শান্ত কঠিন তার পদক্ষেপ, বড় বড় চোখে বন্য অর্থাৎ ভীত সতর্ক অথচ হিংস্র দৃষ্টি।

বাইরে জ্যাঠামশায় ফেটে পড়লেন এবার, কুণ্ডুমশাই, আমি প্রটেস্ট করছি, আপনি ধনী বলে, আমার ঘরে নাক গলাতে আসবেন না। সে আমি কখনও সহ্য করব না। নেভার। —একশোবার করব। শুনুন পরাণবাবু, হারাণের সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ বন্ধুত্ব ছিল—

—ছিল, খাদ্য আর খাদকের।

—সে জানা আছে। ভাইয়ের সম্পত্তির ওপর লোভের কথা হারাণ জানত। সে যখন আমাকে প্রথম জমি বিক্রী করে, তখন সে আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিল। আমার সে দলিল আছে।

—কুণ্ডুমশাই!

—শুনুন পরাণবাবু, হারাণের মেয়েকে ফাঁকি দিতে চাইলে তা পারবেন না। আমি সব হিসেব জানি, রাখছি। আমি দরখাস্ত করব পুলিশ কমিশনারের কাছে। জজ সাহেবের কাছে।

—করবেন।

এদিকে বাড়িতে জেঠীমা, হেনা, হেনার দুই বড় ভাই, হিংস্র কিন্তু স্তব্ধ নেকড়ের মত তাকিয়েছিল নীরার দিকে। বাইরে কুণ্ডু তখনও চীৎকার করছে। সে বাঘ।

নীরা সেই বিচিত্র দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকিয়ে বারান্দার একটা থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য এইখানেই শেষ নয়। জীবন যেখানে দুর্ধর্ষ, সেখানে সে সংগ্রাম করে সরবে। যেখানে উত্তাপ বেশী সেখানে অল্পখানিকটা ধোঁয়ার ইঙ্গিতেই শেষ নয়; সেখানে জীবন টগবগ করে ফোটে।

এ-দৃশ্যের শেষ হল পরের দিন সকালে। সারাদিন কেউ নীরার সঙ্গে বাক্যালাপ করেনি। জ্যাঠামশায়ের কড়া হুকুম জারি হল, খবরদার, এই ভাবে চুনকালি আমার মুখে মাখিয়ো না।

জেঠীমা বলেছিলেন, মাখালাম আমরা, না, মাখালে তোমার ভাইঝি।

জ্যাঠামশায়ের কর্তব্যজ্ঞান টনটনে। হাজার পাঁচ কি চার টাকা এবং বসত বাড়ি ও তার সংলগ্ন ভাগের জমিটা সে-জ্ঞানটাকে অহরহ বাজনা শুনিয়ে হিসেব দেখিয়ে জাগ্রত রেখেছে। তিনি বললেন, তার শাস্তি দেব না ভেবেছ? দেব। তার সময় আছে।

নীরা ঠিক তেমনিভাবেই দাঁড়িয়েছিল। এতগুলি বিপক্ষের বিরুদ্ধে সে একা, ঘরের কোণের বন্দী, বেড়ালের মত নখ যেন ঈষৎ বের করে দাঁড়িয়েছিল। চোখের পলক পড়ছিল না তার। রাত্রে ঘরে শুয়ে জেগেই ছিল, ঘুম আসেনি। আজ যেন তার [illegible] কথাটা সে প্রথম প্রত্যক্ষভাবে [illegible] করলে। মাতৃবিয়োগের সকাতর [illegible] কে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে [illegible] হয়ে উঠেছে। সেই যে উঠল বিদ্রোহের হিংস্রতায় উগ্র হয়ে তা আর তার গেল না। রাত্রে জেগে ছিল, ঘুম আসেনি; মায়ের মৃত্যুর আগে থেকেই সে এটুকু বুঝেছিল যে, ওরা সম্পর্কে নামে আপন হলেও ওরা আপন নয়, ওরা পর; মায়ের মৃত্যুর পর থেকে আজকের ওই ঘটনার আগে পর্যন্ত তার ওই ধারণাটাই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে এসেছিল। এই ঘটনার পর বাড়ি ঢুকেই ওদের চোখমুখে কঠিন আক্রোশ এবং হিংসা দেখে সে বুঝেছে এরা শুধু পর নয়, এরা তার শত্রু। পরের কাছে হয় সংকোচ। শত্রুর কাছে হয় পায়ে লুটিয়ে পড়তে হয়, নয় দাঁত নখ যা যে অস্ত্রই তার থাকে, তাই উদ্যত করে ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হয়। নীরা ভীরু নয়। পায়ে লুটিয়ে সে পড়েনি। সে দাঁড়িয়েছিল প্রস্তুত হয়ে। এবং নিজের যুদ্ধকৌশল আপনিই তার ভিতর থেকে আবিষ্কৃত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে। নীরব অথচ উদ্ধত সহিষ্ণুতা তার প্রধান ধর্ম। সেদিন রাত্রে হেনাকে জেঠীমা ওর ঘরে শুতে দেননি। ভেবেছিলেন ভয় পাবে। কিন্তু সে ভয় পায়নি। এমন কি একলা থাকার সুযোগেও সে কাঁদেনি। সে রাত্রিটি নীরার জীবনে অক্ষয় স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত।

পরদিন সকালে ইস্কুল যাবার সময় সে বইখাতা সমস্ত ঠিক করে স্নান করবার আগে এসে দাঁড়িয়েছিল জেঠীমার সামনে। জেঠীমার বাড়িতে সেই নতুন ঠাকুর এসেছে। মায়ের শ্রাদ্ধে এসেছিল, আর তাকে বিদায় করা হয়নি।

দাঁড়াবার মধ্যেই যেন কিছু বলা হয়েছিল। জেঠীমা তবু তাকে কথা বলেননি। বলেছিলেন ঠাকুরকে—ক্লাসের ফার্স্ট

পূজার দিনে—উৎসব অনুষ্ঠানে প্রিয়জনের উপহারে

সর্বজন প্রশংসিত বিখ্যাত সামারকুল (জালি), স্বস্তিকা, ইন্টারলক্ ও অন্যান্য ক্রাউন মার্কা প্লেন গেঞ্জী পরিচ্ছদের এক অবিস্মরণীয় অবদান।

মেয়েকে ঘণ্টাখানেক আগে ইস্কুলে যেতে হয় ঠাকুর। যা হয়েছে দিয়ে দাও।

এবার সে বলেছিল, আমি কি পরে ইস্কুল যাব? আমার সাদা ফ্রকটা সেদিন হেনা পরে ওদের ইস্কুলের ফাংশানে গিয়েছিল। সেই থেকেই সেটা ও পরছে।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল জেঠীমা। তার মুখের উদ্ধত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তিনি ডেকেছিলেন, হেনা।

ও ঘরে হেনা তখন চুল আঁচড়াচ্ছে। বলেছিল, কি?

—নীরার ফ্রক নিয়েছ, দিয়ে দাও।

—না। তুমি সেদিন বের করে দিয়ে বলনি, এটা তুই পরিস।

তর্ক করো না, দাও।

—না, দেব না। আমাকে এমনি একটা সুন্দর ফ্রক না-দিলে আমি দেব না। [illegible] না।

[illegible] চুপচাপ

—দাও।

—না।

—না? জেঠীমা [illegible] ওকে [illegible] শব্দে মেরেছিলেন, এবং ফ্রকটা কেড়ে এনে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, ওই নাও।

নীরবেই সে কুড়িয়ে নিয়েছিল। এবং সেইটে পরেই ইস্কুল গিয়েছিল।

বাড়ি ফিরে পাট করে সযত্নে তুলে রেখেছিল। পরদিন সকালে দেখেছিল সেটা ফালি ফালি করে ছেঁড়া। খানিকক্ষণ সেটাকে হাতে ধরে তাকিয়ে দেখে, বাড়ির বাইরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসেছিল। কিছু বলেনি।

এইটেই প্রথম দৃশ্যের শেষ।

•

দ্বিতীয় অংক সুদীর্ঘ। দশ বৎসর। প্রথম দৃশ্য চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনা। তারপর একটি পাঁচ বৎসরের দৃশ্য। হেনারা ভাই-বোনে পাঁচজন, জ্যাঠামশায় জেঠীমা এবং সে—এই আটজনের সংসারে সে একা এবং ওরা সাতজন একদিকে। সেই ঘরের কোণের বন্দী বেড়ালের মত স্থির নিষ্পলক দৃষ্টি, উদ্যত নখ কিন্তু আক্রমণ প্রতীক্ষায় নীরব স্থির। শুধু একটা পরিবর্তন উভয় পক্ষই অনুভব করেছে, সেটা হল এই যে, ঘরের কোণের বন্দী যে জীবটিকে বিড়াল মনে হয়েছিল, সেটা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি কিশোর চিতাবাঘিনীতে।

সত্যই তাই। শুধু প্রকৃতিতে নয়, আকারেও সে এমন লম্বা ঢেঙা হয়ে উঠেছিল যে জ্যাঠামশায়ের বেঁটেখাটোর সংসারটিতে যে-কেউ এলেই একদৃষ্টিতে বুঝতে পারত, এ তাদের কেউ নয়!

গৌরাঙ্গী সে নয়, শ্যামাঙ্গী। কিন্তু বাল্যবয়সে একটা বড় কোমল লাবণ্য ছিল, শ্রী ছিল। চোদ্দ পনের বছর বয়সে সে ঢেঙা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব যেন হারিয়ে গেল। শুধু রইল ওই বড় বড় চোখ আর একপিঠ চুল। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে দেখে, নিজের উপরেই তার রাগ হত। কিন্তু কাঁদত না সে।

হেনা তখন আশ্চর্য সুন্দর হয়ে উঠেছে। ছোটখাটো মেয়েটি, নধর গড়ন, মুখে কোমল লাবণ্যই শুধু নয়, সে ততদিনে নারীসুলভ কটাক্ষও আয়ত্ত করেছে। নাটক নভেল অনেক পড়েছে! পড়ায় সে কাঁচা বরাবর, সেটা তখন এমন অবস্থায় পৌঁচেছে যে, ওদিকে পাকার সম্ভাবনা একেবারেই নষ্ট হয়েছে। নীরা

তখন পড়ছে ক্লাস নাইনে, আর হেনা পড়ে আছে ক্লাস সিক্সে।

জেঠীমা বলতেন, ওমা, কি হবে মা? এ মেয়েকে পছন্দ করবে কে?

হেনা বলত, ও কি শুধু পুরুষদের সংগে লেখাপড়ায় পাল্লা দেয়? ও যে টিফিনের ছুটিতে ইস্কুলে স্কিপিং করে। লং জাম্প দেয়, পুরুষদের সংগে ঝগড়া করবে।

হি-হি করে হাসত।

সে চুপ করে থাকত।

জেদ করে সে সাজসজ্জা প্রসাধন ছেড়ে দিয়ে নিজেকে আরও শ্রীহীনা করে তুলতে চেষ্টা করলে। একদিন জেঠীমাকে বললে, ভাববেন না। আমাকে কেউ পছন্দ করবে বলে ভগবান বোধ হয় সৃষ্টি করেনি। কিন্তু ভয় নেই, আমি কারুর গলগ্রহ হতেও জন্মাইনি। তা আমি হব না।

জেঠীমা বলেছিলেন, কি বললি? ক্লাসে ফাস্ট হোস বলে এত অহংকার তোর?

সে বলেছিল, যার কেউ নেই, তার অহং না থাকলে সে বাঁচে কি করে, বলুন? অহং যার সর্বস্ব, তার অহংকার ছাড়া কি আছে সংসারে?

—তার মানে?

—তার মানে, অহং মানে আমি। আমার আমি ছাড়া আর তো কেউ নেই, কিছু নেই। তাই অহংকার করেই বেঁচে আছি। নইলে হয় বিষ খেতে হয়, নয় গঙ্গার জলে ঝাঁপ দি[illegible]য়।

[illegible]। মানুষের যে কখন কি হয়, [illegible] কি হয় তা কেউ বলতে পারে [illegible]। [illegible]কথা কটি কিভাবে যে জেঠী-[illegible] [illegible]ায়ে বাজল, আর তার কণ্ঠস্বরেই বা সেদিন কি সুরে বেজেছিল তা নীরাও ধরতে পারেনি। তার কণ্ঠস্বর সেদিন কি মুহূর্তের জন্য তার অজ্ঞাতসারে কোমল করুণ হয়ে উঠেছিল? হয়তো উঠেছিল। নইলে সেদিন এমনটা হল কেন?

তখন জেঠীমা কিছু বলেননি। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তার ঘরে এসে জেঠীমা তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। বাড়িতে হেনারা ছিল না। তারা ভাইবোনেরা মিলে গিয়েছিল পাড়ার অ্যামেচার থিয়েটার দেখতে। সে যায়নি। যেত না কখনও। পড়ছিল সে।

জেঠীমা ডেকেছিলেন, নীরা।

সে মুখ তুলে তাকিয়েছিল, সুর শুনে বিস্মিত হয়েছিল।

জেঠীমা বলেছিলেন, তোর মনে হয় নীরা, আমরা কেউ তোকে একটু ভাল-বাসিনে, না?

নীরা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তাঁর মুখের দিকে। কথা বলেনি।

জেঠীমা বলেছিলেন, না। যতটা ভাবিস তা নয়। তোর নিজেরও দোষ আছে। ভেবে দেখিস। তুইও আমাদের আপনার ভাবতে পারিসনি। তবে হ্যাঁ, দায়িত্বটা আমাদের আগে। তুই সেই একদিন কুণ্ডুবাবুর কাছে আমার এমন কুৎসা করলি, যে—।

বলেই তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আবার বললেন, তা ছাড়া আমার ছেলেমেয়েতে পাঁচটা, তারা গুণে তোর চেয়ে এমন ছোটরে, যে তাদের জন্যে—

কথাগুলো তিনি উচ্চারণ করতে পারছিলেন না। যেখানে সত্যকথা বলে নিজেকে খাটো করতে হয়, তার চেয়ে নিষ্ঠুরতর সত্য আর নেই। সে সত্যকে ভয় ওই বিনোদেনও করেন। জোড়হাত করে বলতে হয়,

ASP/HC 148

নর্টন—নিখুঁত অংশসমূহের সমন্বয়

নর্টনের সুসম্পূর্ণতা হচ্ছে নিখুঁত অংশসমূহেরই সমন্বয়—দৃঢ়তর রীম, নিরাপদ সেণ্টার-পুল ব্রেক, সুক্ষ্ম হাবকোনস্, সাবলীল গতির আরাম এবং হালকা ওজন অথচ স্থায়িত্ব।

HIND CYCLES LTD. 250, WORLI BOMBAY 18

আমি হাতজোড় করছি, আমাকে ক্ষমা কর। আঃ—আবার ভুল হয়ে যাচ্ছে।

জেঠাইমা সেদিন কেঁদেছিলেন।

নীরা কাঁদেনি। খুশী মনে বড় আনন্দে হেসেছিল সে।

জেঠাইমা বলেছিলেন, পড় তুই ভাল করে, পড়। বিয়ে নাই করলি।

নীরা বলে ফেলেছিল, দেখবেন, স্কলারশিপ আমি নেবই।

পরের দিন স্কুল যাবার আগে জেঠাইমা ডেকেছিলেন, নীরা শোন!

—কি জেঠাইমা।

—বস তো। এক রাশ চুল, না করিস যত্ন, না সামনেটা একটু ফেরাস। বস!

নীরা খুশী মনে বসেনি, কারণ ... অভাবের জন্য প্রসাধনে তার ... তবুও সে কথা অমান্য করেনি। ... আঁচড়ে বেণী বেঁধে সামনেটা ... দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে নীরাকে ... বলেছিলেন, কে বলে শ্রী নেই! তাই ... রে। মুখখানা একটু ভরলে যে বড় সুন্দর হবে।

হেনা বলেছিল, ও মা! আমি যাব কোথায়?

অর্থাৎ জেঠীমার এই আকস্মিক পরিবর্তন দেখে।

কিছুটা দিন সুখেই গিয়েছিল। গোটা ক্লাস নাইনের পড়াটাই। জেঠীমা সত্যই স্নেহ করেছিলেন। কিন্তু নীরার জীবন যে নাটক। বাপ্‌ বলে কি হবে। হঠাৎ নাটকীয় পরিবর্তন ঘটল।

একদিন হেনার জন্য স্বেচ্ছায় আবার তার বিষদৃষ্টিতে—সে বিষ মর্মান্তিক ঘৃণার বিষ—সেই বিষদৃষ্টিতে পড়ল নীরা। জেঠীমার স্নেহের স্পর্শে ঔদ্ধত্য তার বেড়েছে। অবশ্য ভঙ্গিটা একটু পাল্টেছে। আগে হাসত না। এখন হেসে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।

জেঠাইমা গোপনে বলতেন, না। এমন করে অহংকার করে না।

নীরা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলত, আচ্ছা আর করব না।

মধ্যে মধ্যে সে দিদিমণিদের ব্যঙ্গ করত বাড়িতে। বলত, বি টি পাস হলে কি হবে, উনি জানেন না কিছু। কখনও বড়লোকের মেয়েদের ব্যঙ্গ করত।

এরই মধ্যে হেনার হয়েছিল পরিবর্তন। তার চেয়ে বয়সে কয়েকদিনের ছোট হলেও—সে তখন কৈশোর অতিক্রম করেছে। মনে আগেই—নাটক নভেল পড়ে মন তার স্বপ্নরঙীন হয়ে উঠেছে, এদিকে দেহেও তার জোয়ার আসছে তখন।

স্কুলে সে উচ্ছ্বলা হয়ে উঠেছে। বড় মেয়েদের সঙ্গেই সঙ্গ, যারা এককালে তাদের সঙ্গে পড়ত; গান গাইত। সিনেমা দেখত। ওদিকে তখন তেতাল্লিশ সাল এসে গেছে; যুদ্ধের নোটের বাজার; জ্যাঠামশাই ধনী হয়ে উঠেছেন। দমদম এরোড্রোম বড় হচ্ছে, জমির দাম পেয়েছেন; রিটায়ার করে কণ্ট্রাক্টরী শুরু করেছেন। নিত্য নূতন শাড়ি পরে। সিল্কের নামে নিতানূতন ডিজাইনের শাড়ি ব্লাউসও উঠছে। হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে একটা উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসের সুর। সে-সুর ওর মনের তারেও বাজে। নীরার জেঠাইমা যাই হোন—জীবনে এক জায়গায় ছিলেন অতি কঠিন। সেটি তাঁর হিন্দু নারীত্বের আদর্শ। ওই এক জায়গায় তিনি সঞ্চয় করতে চেয়েছিলেন জীবনের সব শুচিতা সব পবিত্রতা। মেয়ের এ চেহারা তাঁর চোখে পড়ে নি তা নয়, পড়েছিল এবং তিনি শাসন করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু এইটে জানতেন না যে, নৌকোর পাল একটা শক্ত দড়িতে বাঁধা থাকে না; অন্য দড়িগুলো না থাকলে বা দুর্বল থাকলে শক্ত দড়িটাও ছিঁড়ে যায়। হেনার নৌকোর দড়ি ছিঁড়ি-ছিঁড়ি করছিল।

নীরাও এতটা জানত না। হঠাৎ সে-দিন ক্লাসের শেষে নীরা ইস্কুল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলে হেনা তার জন্যে বসে আছে। ইস্কুলের ছুটির পর আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিট নীরাকে এবং আরও দুজন মেয়েকে এক একদিন শিক্ষক এক একটা বিষয় পড়াতেন। নীরাকে স্কলারশিপের জন্য তৈরী করছিলেন হেডমাস্টার। নীরার সম্পর্কে কোন আশংকাও তাদের ছিল না। সে একলাই চলে আসত।

সেদিন হেনাকে দেখে সবিস্ময়ে বলেছিল, তুই?

হেসে সে বলেছিল, তোর জন্যে। তোর সঙ্গেই যাব।

—জেঠীমা বলেছেন বুঝি?

—হ্যাঁ।

কিন্তু খানিকটা আসতেই সে একটু বিস্মিত হয়ে হেনাকে প্রশ্ন করলে, কি?

হেনা তার গায়ে এসে লেগেছে। হেনা উত্তর না-দিয়ে বললে—মরণ।

আরও বিস্মিত হল সে। এবার হেনা থমকে দাঁড়াল। এবং নীরার চোখে পড়ল—এই মুহূর্তে যে সাইকেল-চড়া ছেলেটি
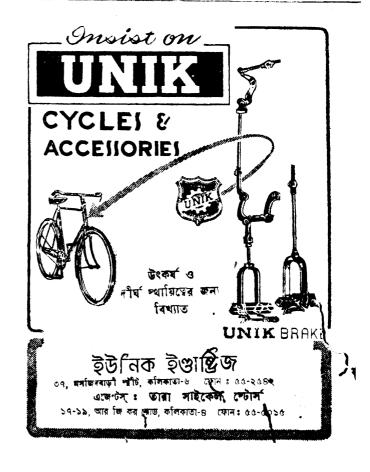
তাদের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল—সে গাড়িটা ঘুরিয়ে মন্থরগতিতে ইচ্ছে করে সাইকেলটাকে এঁকিয়ে বেঁকিয়ে একটা বিশ্রী হাসি হেসে এগিয়ে আসছে। নীরা ভুরু কুঁচকে বললে, ও কে? তোর দিকে তাকিয়ে হাসছে কেন?

হেনা বললে, ওই ওরই জন্যে। আমায় জ্বালিয়ে খেলে। ইস্কুলের মেয়েদের সঙ্গে যাই, ও -আমাকে যা-তা বলে।

—কিন্তু ও কে?

—ও মনা ঘোষ। থিয়েটার করে!

মনা ঘোষ তখন কাছে এসে গেছে। প্যাডেলে একটু একটু ধাক্কা মেরে অতি মন্থর গতিতে এসে হেসে বললে, কি? আজ এত দেরী যে?

নীরা বললে, কি চান আপনি?

—তোমাকে নয় মণি। ওই ওকে!

মুহূর্তে এক কাণ্ড করে বসল নীরা—সাইকেল-আরোহীর দিকে এক পা এগিয়ে গিয়েই এক চড় কষিয়ে দিল। মনা ঘোষ সাইকেল ছেড়ে গালে হাত দিতে গিয়ে সাইকেলসুদ্ধ পড়ে গেল। নীরা চিৎকার করে উঠল, লম্পট কোথাকার!

১৯৪৩ সালের কলকাতার শহরতলী। লোক জমে গেল। কিন্তু তার আগেই মনা ঘোষ উঠে সাইকেলটা নিয়ে চলে গেল, বলে গেল—আচ্ছা আমিও চিঠি নিয়ে ফাঁস করে দেব।

হেনা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছিল। এ রাস্তায় ওরা দুজনেই, বিশেষ করে নীরা, বিশেষ পরিচিত। তার ডেঙাপনা ও শ্রীহীনতার জন্যও বটে এবং ওর ভাল মেয়ে বলে সুখ্যাতির জন্যও বটে। সে বললে, পথ ছাড়ুন আমরা বাড়ি যাই। একটা কুকুরকে মেরেছি, তার জন্যে হৈ চৈ করছেন কেন? পথও সে করে নিয়েছিল। কিন্তু হেনা হাউহাউ করে কেঁদে বলেছিল, আমি কি করব নীরা, মা যে আমাকে কেটে ফেলবে।

—কেন?

—ওরে আমি যে ওর সঙ্গে মজা করবার জন্যে ইয়ার্কি করেছি।

স্তম্ভিত হয়ে গেল নীরা। হেনা কেঁদে উঠল, ওরে আমার যে বিয়ে হবে না [illegible] আমার যে বিয়ের কথা হচ্ছে। আমায় তুই বাঁচা নীরা! কোন উপায় কর। আঃ, তুই ওকে মারলি কেন?

জায়গাটা বাড়ির কাছেই এবং একটু নির্জন। হেনা হাউ হাউ করে কেঁদে বসে পড়ল।

নীরা বললে, তুই বলবি, তুই কিছু জানিসনে। নীরা জানে।

—ও চিঠি লিখেছিল, আমি যে তার উত্তর দিয়েছি। মনা ঘোষকে জানিসনে। আমি কি করলাম, আমি কি করব?

—কিছু করবিনে, বাড়ি চল। আমি সব দোষ ঘাড় পেতে নেব।

—আমি যে চিঠি লিখেছি।

—চিঠি ও দেখাতে আসবে না। এত [illegible] হবে না।

[illegible]। ও মনা ঘোষ। তুই জানিস নে। [illegible] তাও বলব, আমি লিখেছি তোর [illegible]য়ে। [illegible]। তোর লেখা নকল করে। [illegible] বলব, আমি ওকে একটু মজাই দেখাতে চেয়েছিলাম। পেছনে লাগে—তাই মারব বলে এই করেছি।

হেনা সকরুণ মুখে তার মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, দিব্যি কর।

—করছি। ভগবানের দিব্যি।

—না। দক্ষিণেশ্বরের মা কালীর দিব্যি।

—হাঁ তাই করছি। এবং তাই করেছিল। বাড়িতে এসেও তাই বলেছিল। কারণ বাড়িতে ততক্ষণে খবর পৌঁছে গেছে। জেঠীমা দোরগোড়ায় থমথমে মুখ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

জেঠীমা বিশ্বাস কিছুতেই করেন নি। বলেছিলেন, পা-ছুঁয়ে দিব্যি কর!

সে তাই করেছিল। নীরার কিশোর মনে যেন একটা আত্মত্যাগের নেশা লেগেছিল।

জেঠীমা পাগলের মত ওকে চুলের মুঠো ধরে মেরেছিলেন। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাঁদেনি। জেঠীমা আশ্চর্য মানুষ! তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেননি যে, নীরা তাঁর পায়ে হাত দিয়ে মিথ্যা বলতে পারে!

জ্যাঠামশায়ও বিশ্বাস করেছিলেন। তবে সন্দেহ হয়, কারণ তিনি মাস কয়েকের মধ্যেই হেনার বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন।

জেঠীমাকে হারিয়ে সে পেয়েছিল হেনাকে।

হারিয়েছিল সে অনেক কিছু। ইস্কুলে আর তার ঠাঁই হল না। মনা ঘোষ চড়ের শোধ নিতে তার কথাটাই সত্য বলে ঘোষণা করেছিল।

বাড়িতে বন্দিনীর মত জীবন হল। চুপচাপ বসে ভাবত আর বই ওল্টাতো। ওইটে সে কোন দুঃখ হতাশায় ছাড়তে পারেনি। অনুশোচনা করেনি। কিন্ত ভাবত, এ হল

এবার পুজায় প্রিয়জনকে স্থায়ী উপহার দিন। ইহা গৃহের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবে এবং মূল্যবান ধন-সম্পত্তির নিরাপত্তারও একটা সুব্যবস্থ হইবে।
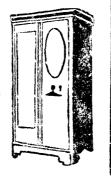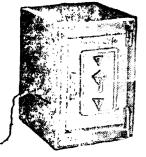
বোম্বে মেকের তৈরী ষ্টীলের আসবাবপত্র প্রকৃতই লোভনীয় উপহার

বোম্বে সেফ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ
৫৬, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১। ফোন: ২২-১১৮১

কি? এতটা তো সে ভাবেনি। এরই মধ্যে একদিন হল জ্বর। তারপর চেতনা হারাল। তারই মধ্যে যখন খানিকটা চেতনা হয়েছে—তখনই দেখেছে পাশে বসে হেনা।

বত্রিশ দিন পর সে পথ্য পেয়েছিল। কংকালসার দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে, রঙ কালো ভূষোর মত—সে যেন প্রেতিনী। মাথার চুলগুলোও উঠে গেল। হেনার বিয়ের সময় সে বাসরে যায়নি। তখন কিছুটা শরীর সেরেছে—চুল গজাচ্ছে, তবুও যায়নি। জেঠীমা যেতে বারণ করেছিলেন। শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় হেনা এসে তার বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদেছিল। বলেছিল, তুই কেন এ করলি নীরা? তোর কি হবে?

হেসে নীরা বলেছিল, তুই ভাবিস্ নে। ভগবান থাকলে তিনি ভাবছেন—আ[illegible] ভাবি আমার ভাবনা। তুই [illegible] চুপচা[illegible] যা। তা না হলে আমাকে [illegible] আমি তো কাঁদিনে জানিস।

॥ চার ॥

নীরার জীবননাট্য যদি কেউ রচনা ক[illegible] তবে দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের দৃশ্যপট হবে অন্ধকার ঘর। হ্যাঁ, প্রায় অন্ধকার ঘর। বাড়ির ভিতর যে ঘরখানার বাইরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, একেবারে উঠানের দিকে, সেই ঘরে তার স্থান হয়েছিল। উঠানের দিকে একটি জানালা, একটি দরজা। একেবারে বাড়ির একাকোণে। বুনো বেড়া সে সেই ঘরে চুপ করে বসে থাকত।

জেঠীমা কঠিন নিষ্ঠুর। তাঁর কাছে এ অপরাধের ক্ষমা ছিল না। অসুখের সময় বলতেন, ও মরে যাক। ও মরে যাক।

সে-কথা অসুখের ঘোরের মধ্যেও তার দু চারবার কানে গেছে। মনে আছে তার। রোগ সারলে বলতেন—জীবনে যার দুর্ভোগের জন্যে জন্ম, মরণও তার হয় না। যম নিতে আসে—ওই দুর্ভোগ তার পথ আগলে দাঁড়ায়। বলে, না—আমার শিকার তুমি পাবে না। দুর্ভোগের সহায় যে নিজে ভগবান। যমকে ফিরে যেতে হয়। সৌভাগ্য যাদের, সুখ যাদের, তাদের বেলা ভগবানের অন্য বিচার। আয়ু থাকতেও তারা মরে। সে মরণ তাদের মোক্ষ যে!

কখনও কখনও বলতেন, তুই যদি আমার পেটের মেয়ে হতিস, ওই হেনা যদি এই কাজ করত, তবে বিষ দিয়ে আমি মেরে দিতাম।

আবার বলতেন, ভাবতাম আমি হেনার জন্যে। ওর জন্যে তো ভাবনা হয় নি।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলতেন, এ ওই কৃশ্চান ইস্কুলের শিক্ষার ফল।

ওদিকে ছেলেরা ধুরন্ধর হয়ে উঠেছে। বড় ছেলে হেনার বড় তারও বড় সে আই এ ফেল করে বাপের সঙ্গে ব্যবসায় নেমেছে। সে মদ খাচ্ছে। দ্বিতীয় ছেলে পড়া ছাড়েনি, কিন্তু ফিল্মের হিরো হবার জন্য চেহারা বাগাচ্ছে। জ্যাঠামশায় চিরদিনই সন্ধের পর মদ গেলাস মাপে মেপে খেয়ে থাকেন—মেপে দিতেন ওই জেঠীমা—এখন জ্যাঠামশায় নিজে ঢেলে খান। তাতে জেঠীমা আপত্তি তোলেন, কচিৎ কোনদি[illegible] কপালে হাতের চাপড় মেরে বলেন, কপা[illegible]। সেটা ঘটে যেদিন জ্যাঠামশাই বাইরে পার্টি সেরে মদ খেয়ে বাড়ি ফেরেন—তাঁকে ধরে নামাতে হয় সেইদিন। কিন্তু তাও বেশীক্ষণ থাকে না। জ্যাঠামশায় যখন বলেন—চোপরাও! মেয়েছেলে মেয়েছেলের মত থাক। মিলিটারী সাহেব, তারা মদ খাওয়ালে খুশী হয় না তাদের সঙ্গে খেলে হবে হয়। ভাবে—মেনা করছে। দমদমের ওপাশের জলো জমি কিনেছিলুম অড়াইশো টাকা বিঘে, ওরা দর ঠিক করেছিল দু হাজার টাকা বিঘে; পার্টি দিয়ে ওদের সঙ্গে ক গেলাস খেয়ে [illegible] হাজার বিঘে করেছি। দশ বিঘে [illegible], টেন ইনটু ফাইভ হাণ্ড্রেড—ফাইভ [illegible]থাউজাণ্ড।

হিসেব শুনে চুপ করতেন জেঠীমা।

নীরা ঘরে বসে চুপ করে শুনত। হাসতও না। সে জানত—জেঠীমা কতবার বলেছেন—বেটাছেলের কাছে হিসেব নিয়ো না। কাজ ওদের—ধর্ম মেয়ের। ভগবানে ভক্তি আর মেয়েধর্ম—এই দুয়ে সংসারের ভাল মন্দ; পৃথিবী ওতেই শীতল—বাসুকি ওতেই স্থির। পুরুষে টাকা আনে—জিজ্ঞেস করো না—কোথা থেকে আনলে?

বলতেন মেয়েকে—হেনাকে। হেনা মধ্যে মধ্যে এসে শুধু তাকেই স্বামীর কীর্তির কথা বলত না—মাকেও বলত। মা ওই উপদেশ দিতেন। শেষে কোটেশন তুলতেন রামায়ণ থেকে, রামায়ণ পড়ে দেখ। ব্রাহ্মণের ছেলে রত্নাকর দস্যুবৃত্তি করত। একদিন নারদ আর ব্রহ্মা এলেন, তাকে বাল্মীকি ঋষি করতে হবে। রত্নাকরকে বললেন—ভাল, তুমি যে এই দস্যুবৃত্তি নরহত্যা করছ, এর পাপের কথা ভেবেছ? রত্নাকর বললেন—ঠাকুর এ পাপের ফল আমরা গোটা সংসার মিলে ভোগ করব। এক সঙ্গে থাকব যেখানেই থাকি। ভাবনা কি? ব্রহ্মা বললেন—উঁহু, তুমি জিজ্ঞাসা করে এস

তোমার সংসারকে। রত্নাকর নারদ আর ব্রহ্মাকে গাছে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যে এই দস্যুবৃত্তি নরহত্যা করে টাকা আনি, সোনা আনি, নানা জিনিস আনি, এর যে পাপ, তার অংশ তোমরা নেবে তো? স্ত্রী-বাপ-মা-বোন-ছেলে সবাই বললে, না। তুমি কোথা থেকে কি করে উপার্জন কর তা আমাদের দেখার কথা নয়। সে দায় তোমার। স্ত্রী বললেন, আমি তোমার সেবা করি, সুখী করি তোমাকে, তোমার সন্তান গর্ভে ধরি—সেই দায় শুধু আমার। বাপ-মা বললেন—বাল্যকালে তোমাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছি, আমাদের দায় চুকে গেছে। ছেলে বললে—তুমি বুড়ো হলে তোমাকে খাওয়াবার দায় আমার। তোমার দায় তোমার, তার জন্যে কোন প্রশ্নও নেই, তার পাপ পুণ্য কিছুর ভাগই আমরা নেব না। বুঝলে মা, এই হল ধর্মের শিক্ষা। ভুলো না। তোমার বাপ আজকাল মদ খেয়ে বেসামাল হয় কখনও কখনও, কিছু বলিনে। শুধু সংসারের মধ্যে মেয়েদের ভার আমার। আমি তাই নিয়ে আছি। তোর দাদাও মদ খায়। বলি নে কিছু। হয়তো আরও দোষ ঘটেছে। বিয়ে করতে বললে করতে চায় না। বুঝি।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—আমার জোর করা উচিত বুঝি। কিন্তু—। তারপর মত্ত গর্জে উঠে বলেছিলেন—এই পাপ ঘরে থাকতে—। না। ওকে নিয়ে যে কি করব বুঝতে পারিনে।

প্রায় এক বছর পর, একবার এসে হঠাৎ একদিন এমনি কথার উত্তরে হেনা বলেছিল, মা! এর কি ক্ষমা নেই মা?

—না।

—ওকে তুমি ক্ষমা কর মা।

—না।

চুপ করে গিয়েছিল হেনা। মাসখানেক পর চলে গেল। দুপুরবেলা যাবার সময় বলে গেল নীরাকে—নীরা।

নীরা বলেছিল, তুই যাচ্ছিস?

—হ্যাঁ। আবার আসব মাস দুই পর।

—কোন মাসে ছেলে হবে তোর?

—দু মাস পর সাত মাস। সাধের পর আসব।

বলে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কিছু বলতে চেয়েও পারেনি। হঠাৎ বলেছিল, আসি তা হলে। বলেই যেন হঠাৎ চলে গিয়েছিল।

আবার দু মাস নিরন্ধ্র সঙ্গীহীন জীবন। হেনা এলে তবু তার সঙ্গে কিছুটা সময় কাটে। পায়রার মত বকবক করে আপন মনে, আপনারি কথাই বলা যায়। তার সঙ্গে সিনেমার কথা। প্রেমের গল্প। সে শুধু শুনেই যায়।

হেনা চলে গেল। গাড়ির শব্দ পেলে, মোটরের হর্ণ। হেনার শ্বশুর একখানা গাড়ি কিনেছে। নীরা একখানা বই ওলটালে। হঠাৎ জেঠীমা ঘরে ঢুকলেন।

—নীরা।

কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল নীরা। সে কি ক্রোধ তাঁর কণ্ঠস্বরে।

একখানা পত্র বাড়িয়ে দিলেন।—হেনা দিয়ে গেল। এ সত্যি?

হেনা সব অকপটে স্বীকার করে পত্র লিখেছে। মুখে বলতে পারেনি, পত্রে স্বীকার করে লিখেছে, আর ওর কষ্ট দেখতে পারলাম না, লিখলাম। তুমি ওকে এমন করে কষ্ট দিয়ো না।

চুপ করে রইল নীরা।

—নীরা! বল!

—কি বলব?

—এ সত্যি?

—হেনা নিজে যখন স্বীকার করেছে—তখন আর আমার না বলে লাভ কি বলুন! হেসেছিল একটু!

স্থির বিচিত্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়েছিলেন জেঠীমা। তারপর কঠিন ঘৃণার সঙ্গে বলেছিলেন, তোর পাপ তার চেয়ে বড়। সে মতিভ্রষ্ট হয়ে ভুল করেছিল, আর তুই মতিস্থির করে করেছিস। কলঙ্কের কাজ করে ভয় পেয়ে মিথ্যে বলে সে-কলঙ্ক ঢাকতে যাওয়ার চেয়ে পাপ না করে পাপের কলঙ্ক মাথায় নেয়—তারা তো সব পারে। হেনার উপর যত ঘেন্না হল আমার, তার চেয়ে বেশী ঘেন্না হল তোর উপর!

অদ্ভুত নিষ্ঠুর সে-ঘৃণার অভিব্যক্তি তাঁর। অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে নীরা। তিনি আবার বলেছিলেন, তার মানে পাপে কলঙ্কে তোর ঘেন্না নেই, লজ্জা নেই। তা হলে তো তুই সব পারিস!

বলে তিনি চলে গিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন পর অকস্মাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিল নীরা। আপনা-আপনি যেন অকস্মাৎ বন্ধন-মুক্ত জীবের মত উঠে দাঁড়িয়েছিল। বন্ধন কেটে গেছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, দরজাটা দেবেন না।

এসে দরজাটা চেপে ধরেছিল। জেঠীমা এই এক বৎসর তার ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখতেন, রাতে তার ঘরে ঝিটা শুতো, বাইরে থেকে তালা দিতেন।

জেঠাইমা খুব জোর করেন নি। ছেড়েই দিয়েছিলেন। নীরা বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে, জেঠাইমার মুখের দিকে—সেই পুরানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল—শুনুন, সব যখন জেনেছেন, তখন আজ থেকে আমি বাইরে বেরুলাম। কাল থেকে আমি আবার ইস্কুলে যাব।

জেঠাইমা বললেন, না। তা তোমাকে যেতে দিতে পারব না।

—কেন?

—একথা প্রকাশ হবে, হেনার শ্বশুর বাড়ি যাবে। তা ছাড়া, তোমাকে বিশ্বাস কি?

—না, আমি সে-কথা প্রকাশ কখনও করব না।

—সে বিশ্বাস করলাম। তা আমি বলি নি। তোমার নিজের কথা বলছি—কলঙ্ককে যার লজ্জা নেই, ঘেন্না নেই, তাকে বিশ্বাস আমি করিনে। মনা মরেনি, বেঁচে আছে। শুনেছি সে এখন গরিব গেরস্ত-বাড়ির মেয়েদের নিয়ে মুন্দের বাজারে দালালী করছে। এ বাড়ির বাইরে তোমাকে যেতে দিতে পারব না আমি। আর ইস্কুলেই বা বলবে কি, হেনার কথা প্রকাশ না করলে।

—বেশ। ইস্কুলে আমি যাব না, কিন্তু [illegible] আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেব [illegible]।

[illegible] লেখাপড়া শিখে, মিথ্যে পাপের [illegible] করে নিজের আত্মীয়স্বজনের [illegible] এত [illegible] অপমান করলে তা শিখে হবে কি?

—পেটের ভাত হবে। আপনাদের হাত থেকে মুক্তি পাব।

একটু চুপ করে থেকে জেঠীমা বলেছিলেন, তাই দেবে। তোমার জ্যাঠাকে বলব।

সেদিন আর একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিল। সেই বাইরের মানুষের সঙ্গে যাতে সংঘাত নয়—নিজেকে দেখে নিজের মনের মধ্যে সেটা জেগেছিল—সে যুদ্ধ যেন নিজের সঙ্গে।

বাইরে বাড়িটার মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ভাঙাগড়া অনেক হয়েছে। জ্যাঠামশায় আজকাল মধ্যে মধ্যে স্যুট পরেন, আপিসের বড়বাবুদের মত ঢলঢলে প্যেন্টলুন আর গলাবন্ধ কোট নয়। দস্তুর মত স্যুট।, তবে অর্ডারী নয়, রেডিমেড। বাড়ির চেহারাটা তাই হয়েছে। বাড়ির বাইরে দরজার পাশে পিতলের নেমপ্লেট বসেছে। শ্রীপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নয়, Mr. P. C. Mukerjee Contractor. বাড়িটার চেহারাও ঠিক সেই রকম দাঁড়িয়েছে। নতুন ফার্নিচার হয়েছে। অবশ্য সেখানে ওই অসামঞ্জস্য নেই, সব নতুন এবং অত্যন্ত মডার্ন।

বাইরে অর্থাৎ উঠানের সামনে, বারান্দাটা চমৎকার হয়েছে। সেই বারান্দায় অভিজাত রুচি অনুযায়ী হ্যাট-র‍্যাক সমেত একটি সুন্দর খাড়া করা আলনা; তার নীচে জুতো রাখবার বাক্স, আর প্রায় গোটা মানুষের মাপের একটা ষ্ট্যাণ্ডিং মিরার। সেই আয়নার মধ্যে ফুটে উঠেছে—রৌদ্রালোকে আলোকিত নীরার প্রতিবিম্ব।

শিউরে উঠল সে। ভয়ে চোখ বুজল।

[শেষাংশ ২৬৯ পৃষ্ঠায়]

নর্তকী

শিল্পী ঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্লক ও মুদ্রণ : বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

রবীন্দ্রভারতীর সৌজন্যে

বেহুলা

বনফুল

মেয়েটিকে দেখে প্রথমেই একটু যেন অদ্ভুত মনে হয়েছিল আমার। কেন যে হয়েছিল তা তখন অত বিশ্লেষণ করবার সময় ছিল না। চারিদিকে রোগী ঘিরে ছিল আমাকে। যে-সব রোগী-রোগিনী প্রায়ই আসে আমার কাছে, মেয়েটি সে দলের নয়। অচেনা মুখ। দেখেই একটু চমক লেগেছিল, সে সুন্দরী বলে নয়, কম-বয়সী বলেও নয়, তার চোখে-মুখে কী যেন একটা ছিল যা অস্বাভাবিক, যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরে জেনেছি চাপা প্রতি-হিংসার আগুন ওর অন্তরে জ্বলছিল। তারই হলকা আমি দেখতে পেয়েছিলাম ওর চোখে মুখে। মনের ভিতর যে আগুন জ্বলে তা গোপন করা যায় না।

মেয়েটি রোগারোগা, রঙ কালো, চোখ-মুখের হাব-ভাব মন্দ না হলেও নিখুঁত নয়। একটা বন্য বর্বরতার ছাপ যেন আছে। চুলে তেল নেই। রুক্ষ চুলগুলো কোঁকড়ান। এত কোঁকড়ান যে মনে হয় অসংখ্য সর্প-শিশু যেন জড়াজড়ি করে ফণা তুলে আছে। অধরে অতি সামান্য একটু মুচকি হাসি।

একটু চুপ করে থেকে জবাব দিলে, "বৈরিয়া গাঁয়ে"

তা বাড়েও না, কমেও না। মনে হয় যেন বন্দিনী হয়ে আছে।

আমার কাছে মেয়েটি এসেছিল ঘায়ের ওষুধ নিতে। মাথার ঘায়ের ওষুধ। মেয়েরা যেখানে সিঁদুর পরে ঠিক সেইখানে একজিমার মত হয়েছিল, সমস্ত সীমন্তটা জুড়ে। পরীক্ষা করে দেখলাম কালো-কালো চাপড়া-চাপড়া মামড়ির মত একটা জিনিস একজিমাটাকে ঢেকে রেখেছে। সেটা পরিষ্কার করে তলায় ঘা-টাকে পরীক্ষা করলাম। একজিমার মত চলকানিই একটা, কিন্তু তার চেহারাটা বেশ রাগী-রাগী, আমাদের ডাক্তারী ভাষায় অ্যাংগ্রি লুকিং। আমার সন্দেহ হল আলকাতরা জাতীয় কোন জিনিস মেয়েটি ওর ওপর লাগিয়েছে বোধ হয়। একজিমা সারাবার জন্যে অনেকে লাগায়।

বললাম, "ঘায়ের উপর আলকাতরা লাগিও না।"

মেয়েটির মুখের মুচকি হাসি কমলও না, বাড়লও না। চোখের পাতা দুটি কেবল বার কয়েক ঘন ঘন নড়ল। একটি কথা বলল না সে। যে মলমটা দিলাম সেইটে নিয়ে চলে গেল।

চার-পাঁচ দিন মেয়েটির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। একদিন বিকেলবেলা গঙ্গার ধার দিয়ে অতি সন্তর্পণে মোটর চালিয়ে আসছি রাস্তাটা খুব খারাপ, আশে পাশে ঝোপঝাড়ও প্রচুর, হঠাৎ দেখতে পেলুম মেয়েটি অশ্বত্থগাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে, একটা ভাঙা কুঁড়েঘরের পাশে। জেলেরা যখন মাছ ধরতে আসে, তখন ওই কুঁড়েঘরে থাকে। এখন খালি, ভেঙেচুরেও গিয়েছে।

ওকে দেখে গাড়ি থামালাম আমি। মনে হল ওর মাথার ঘা দিয়ে রক্ত পড়ছে।

"এখানেই থাক না কি তুমি?"

মাথা নেড়ে ভাঙা কুঁড়েঘরটা দেখিয়ে [illegible]

[illegible] "ওই ভাঙা ঘরে থাক [illegible]"

[illegible] উত্তর দিলে না। মুখের মুচকি হাসি তেমনি স্থির হয়েই রইল।

"তোমার বাড়ি কোথা?"

চুপ করে রইল। তার চোখের দৃষ্টিতে আগুনের ঝলক যেন দেখতে পেলাম একটু। [illegible]—আমার সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেন তোমার, যেখানে যাচ্ছ যাও না। একটু চুপ করে থেকে কিন্তু জবাব দিলে, "বৈরিয়া গাঁয়ে।"

"সে আবার কোথা?"

"আমদাবাদের কাছে।"

"কোন্ জেলা?"

"পূর্ণিয়া।"

"মাথার ঘায়ে মলম লাগিয়েছিলে?"

"রোজ লাগাই।"

"তবু ত রক্ত পড়ছে দেখছি!"

চুপ করে রইল।

"আবার এসো আমার ডিসপেন্সারিতে। ভাল করে দেখব। ঠিক সিঁদুর পরবার জায়গায় একজিমা হল কী করে? আশ্চর্য ত! চুলকেছিলে নাকি? রক্ত পড়ছে।"

মেয়েটি কিছু বলল না। হঠাৎ আমার মনে হল রক্তটাই সিন্দুরের স্থান অধিকার করেছে যেন। মনে হল, যে জেলেরা প্রতিবার এখানে মাছ ধরতে আসে, মেয়েটি তাদেরই বোধ হয় আত্মীয়া। তাই ওই কুঁড়েটা অসংকোচে দখল করেছে। যদিও মেয়েটির চোখে মুখে একটা নিরুদ্ধভাব সজাগ হয়ে ছিল, তবু আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমরা কী জাত? জেলে না কি?"

মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর বলল, "না, আমরা সাপুড়ে।"

মেয়েটি মলম নিতে আমার কাছে আর আসেনি। দিন সাতেক পরে একটি ছেলে এসে আমায় খবর দিলে গঙ্গার ধারে

অশ্বত্থতলায় একটি মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাকে নিয়ে আসব কি? আমি নিজেই গেলুম। গিয়ে দেখি, সেই মেয়েটি। খুব জ্বর হয়েছে। মাথার ঘা-টা দগদগে হয়ে উঠেছে আরও। হাসপাতালে খোঁজ করলাম, বেড খালি নেই। তখন ছেলেদের বললাম, "ওই কুঁড়েঘরটাতেই নিয়ে যাও ওকে। খড় পেতে বিছানা করে দাও। তোমাদের ছাত্র-সমিতি ফান্ডে টাকা আছে?"

ছেলেটি ছাত্র-সমিতির একজন সভ্য। দুর্গত দুঃখীদের সাহায্য করাই তাদের ব্রত।

"খড় কেনবার টাকা আছে, কিন্তু ওষুধ কেনবার টাকা নেই।"

ওষুধের ভার আমিই নিলাম।

খড় কিনে বিছানা করবার জন্যে [illegible] ছেলে ঘরের ভিতর ঢুকল। আমি চুপচাপ [illegible] সে-সময়।

জিজ্ঞাসা করলাম, "ওর বিছা[illegible] নেই ভিতরে?"

"কিছু না। একটা কাপড়ে বাঁধা ঝুড়ি শুধু ঝুলছে চাল থেকে।"

"আর কিছু নেই?"

"না।"

প্রায় মাসখানেক ভুগে মেয়েটির জ্বর ছাড়ল। অবশ্য ছেলেরা তার নিয়মিত শুশ্রূষা করতে পারত না। কেবল পথ্য দিয়ে আসত। আমি প্রায় প্রতিদিন কিংবা একদিন অন্তর তাকে গিয়ে দেখে আসতুম। একদিন একটি ছেলে দৌড়তে দৌড়তে এসে আমাকে যে খবর দিলে তা অবিশ্বাস্য। এরকম যে হতে পারে তা কল্পনাতীত।

ছেলেটি বললে, "সর্বনাশ হয়ে গেছে ডাক্তারবাবু। মেয়েটিকে গোখরো সাপে কামড়েছে। আর বোধ হয় বাঁচবে না।"

"সাপে কামড়েছে? কী করে বুঝলে তুমি?"

"আমি স্বচক্ষে দেখলুম যে। আমি সাবু দিতে গেছি, গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড একটা গোখরো সাপ ওর গলায় পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে আর তার গালে মুখে ছোবলাচ্ছে। কী প্রকাণ্ড ফণা সাপটার! আমি ভয়ে পালিয়ে এলুম। বাদল আর কানাইকে ডাকলাম, তারা বাড়ি নেই। আপনি যাবেন একবার আপনার বন্দুকটা নিয়ে?"

গেলাম। গিয়ে দেখলাম, গলায় নয় সাপটা তার ডান বাহুতে জড়িয়ে রয়েছে। সাপের ফণাটা খুব জোরে চেপে রয়েছে মেয়েটি হাত দিয়ে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম আমি খানিকক্ষণের জন্য। বন্দুক কোথায় ছুঁড়ব? তারপর হঠাৎ চোখে পড়ল সাপের লেজের খানিকটা কাটা। রক্ত পড়ছে। মেয়েটির তখনও জ্ঞান ছিল। জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, "আজকে ও জো পেয়েছে। মাস খানেক বিছানায় পড়ে আছি, ওকে কামাতে পারিনি। বিষদাঁত উঠেছে ওর।"

"সাপ কি তোমার ওই ঝুড়িতে ছিল নাকি?"

"হ্যাঁ। আমার বিয়ের দিন বাসরঘরে ঢুকে আমার স্বামীকে কামড়েছি[illegible]। সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলেছিলাম ওকে আমি। বেহুলা যেমন যমের সঙ্গ ছাড়েনি, আমিও তেমনি ওর সঙ্গ ছাড়িনি। রোজ ওকে বলেছি আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও, আর এই গঙ্গার তীরে তীরে হেঁটে হেঁটে আসছি। গঙ্গার জলেই তাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল—"

"সাপের ল্যাজটা কাটা দেখছি।"

"ওরই রক্ত দিয়ে সিঁথেয় সিঁদুর পরি যে রোজ। আজও পরতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আজ ওকে সামলাতে পারলাম না।"

দেখলাম মাথায় রক্ত-সিঁদুরের রেখা। বাঁ হাতের তর্জনী আর অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে রক্তাক্ত লেজের টুকরোটাও দেখতে পেলাম।

একটু পরেই তার মৃত্যু হল। সাপটারও হল, কারণ যে বজ্রমুষ্টিতে সে সাপের মাথাটা চেপে ধরেছিল মৃত্যুও তা শিথিল করতে পারেনি।

পসরা আলোকচিত্রী : বিনয়ভূষণ দাস

জানলা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

ঝপ শব্দে জানলাটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

ঝড় উঠেছে নাকি?

না, ঝড় কোথায়? দিব্যি মোলায়েম চুপচাপ চারদিকে। তেমন একটা ভারী গাড়িটাড়িও তো যায়নি রাস্তা দিয়ে। একটা বোমা-টোমা ফাটবার মতও কিছু হয়নি।

এ ঠিক জানলা বন্ধ হয়ে যাওয়া নয়, এ সজোরে জানলাটা বন্ধ করে দেওয়া। ওপার থেকে জানলার পাল্লা দুটো এপারের দিকে ছুঁড়ে মারা। একটা বন্দুক ছুঁড়তে পারেনি বলেই যেন জানলাটা ছুঁড়ে মেরেছে।

জানলার কাঠ দুটো ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে মাঝখানে একটা ফাঁক রেখে দাঁড়িয়েছে স্তব্ধ হয়ে। যদি জানলা বন্ধ করাই উদ্দেশ্য হত, তা হলে এখনকার এই ফাঁকটা রাখত না জীইয়ে।

এ যেন একটা ধিক্কার ছুঁড়ে মারা।

যূথিকা গম্ভীর হয়ে গেল।

উঁকি মেরে তাকিয়ে দেখল, সামনের ঘরে জয়ার কাণ্ড। রণদীপ্ত মুখে রাগ যেন গরগর করছে। জানলাটা ছুঁড়ে দিয়েই সরে গেছে আলগা হয়ে।

যেন, তোমার মুখ দেখব না, তোমার মুখ দেখাও পাপ, এই রকম বলা ধমক দিয়ে। তোমার ধোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেওয়া উচিত, যেন এমনি একটা রূঢ় তর্জন।

তার উপর এই নিক্ষেপ?

যূথিকা তাকিয়ে দেখল, চেয়ারে-বসা বিভাস কি-একটা বই দেখছে নিচু চোখে। নির্লিপ্ত শৈথিল্যে।

যেন এত বড় সশব্দ অভদ্রতা চোখ তুলে চেয়ে দেখবার মত নয়। রাস্তায় হামেশা কত ঠোকাঠুকির শব্দ হয়, মোটরের কত [illegible]। সন্ত্রস্ত

এই তো সবে এরা পা দিয়েছে [illegible] এ বাড়িতে, ও-পাশের ঘরে মেসোমশায়ের [illegible] সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে বিস্[illegible] হয়ে বসেছে এ-ঘরে, এখনো প্রচ[illegible] অতিথি সংকার হয়নি, মাসিমা হয়তো [illegible] জোগাড় করছেন রান্নাঘরে, জয়ারই তা[illegible] হাত লাগানো উচিত, কিন্তু, বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ ছুটে এসে মুখোমুখি উল্টো ঘর থেকে এমনি প্রচণ্ড শব্দে জানলা ছুঁড়ে মারার মানে কি?

বুকের ভিতরটা কালো হয়ে উঠল যূথিকার।

বিভাসকে লক্ষ্য করে বললে, 'এবার যাবে?'

বইয়ের থেকে চমকে উঠল বিভাস। বললে, 'মন্দ কি?'

ও-ঘর থেকে সুশীলবাবু তেড়ে এলেন: 'সে কি কথা! এইতো এলে সবে—'

রান্নাঘর থেকে মাসিমা বলে উঠল: 'যাসনে, আমি চা করে আনছি।'

জয়া একটাও কথা বললে না।

হাসিতে-খুশিতে ঝলমল মেয়েটা। এ সময় ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাত বাড়িয়ে তার পথ আটকাবার কথা। কিন্তু কেমন যেন অন্য রকম। গম্ভীর-গম্ভীর। প্রায় নিথশিতনী মূর্তি।

কালই তো তাদের বাড়ি গিয়েছিল জয়া। বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কত হৈচৈ করেছে, ছাদে-বারান্দায় কত শিথিল সরল ছুটোছুটি। নবীন নিবিড় মেয়েটা, জল-ভরা ঘট, কেমন যেন শুকিয়ে গিয়েছে একদিনে। শরীরের খেলায় যে খোলা ছুরির ঝলক ছিল, তা যেন লোপাট হয়ে গিয়েছে। চোখে কালো জানলার ধার।

একদিনে কী এমন হতে পারে ব্যাপার?

কাল জয়াকে বাড়ি ফিরিয়ে দেবার সময় সমস্ত ভাবনা জুড়ে মেঘ করে এল যূথিকার।

কাল শনিবার ছিল। যূথিকা ফিরেছিল বিকেল তিনটেয়। বিভাস পাঁচটায়। জয়ারা এসেছিল সন্ধের দিকে। না, জয়ারা কোথায় —জয়া একাই এসেছিল—ও এখন বেশ একা-একা চলতে-ফিরতে পারে—কিন্তু দাঁড়াও, গেল কখন?

কি আশ্চর্য, কালকের মাত্র ব্যাপার, চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি, অথচ ঠিক-ঠিক কিছু মনে করতে পারছে না যূথিকা। আজকাল [illegible]ই সে তেমন মনে রাখতে পারে না। [illegible]লা-উপুড় হয়ে যাচ্ছে। তার বয়স [illegible] সে বুড়ো হচ্ছে।

[illegible] হ্যাঁ, উনি বাড়ি ছিলেন যখন [illegible]।

কিন্তু, যখন গেল? হ্যাঁ, গাড়ি বেরুল গারাজ থেকে। জয়া উঠল, ঠিকই তো উনিও উঠলেন। হ্যাঁ, না, ঠিক, উনি তো ড্রাইভারের পাশে বসলেন না, ভিতরেই বসলেন।

বুকটা দুরদুর করতে লাগল যূথিকার।

তারপর গাড়িটা ছাড়ল।

না, না, ছাড়বে কি? যূথিকা যাবে না? ও অমনি ছেড়ে দেবে?

হ্যাঁ, যূথিকাও উঠল। জয়া ওঠবার পরেই যূথিকা। যূথিকা বসল মাঝখানে, বিভাস আর জয়াকে বিভক্ত করে।

উনি ড্রাইভারের পাশে বসলেন না কেন মেয়েদের একলা ছেড়ে দিয়ে?

ও! ড্রাইভারের পাশে চাকর বসেছিল।

হ্যাঁ, জয়াকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে ওরা চলে গেল বাজার করতে। বলে গেল, কাল যাব তোমাদের বাড়ি। কই, না করল না তো!

না, গাড়িতে কিছু হয়নি।

তবে, বাড়িতে? বাড়িতেই বা সময় কতটুকু? তেমন ফাঁক কোথায়? কোথায় তেমন নিরিবিলি?

তবে কি কালকের আগের কোনো ঘটনা?

আগের ঘটনা হলে কাল ও যায় কেন সারাক্ষণ কেন উল্লাস-বিলাসের ঢেউ তোলে সোনার পাখা মেলে কেন ফুরফুর ক[illegible] উড়ে বেড়ায়?

কই, কাল তো ছিল না এমন রুক্ষরোষে চেহারা। বরং ফুল্লমল্লিকার মুখ করে ছিল।

চা আর মিষ্টি নিয়ে এল মাসিমা।

তবু তাই নিয়ে বিভাসকে ব্যাপৃত রাখতে পেরে যূথিকা একটু নিশ্চিন্ত হল।

কই, জয়া কোথায়, এত আমি খাব কী করে? বলতে-বলতে জয়ার সন্ধানে এগুলো

Cooch Behar

দেখল জয়া গুম হয়ে বসে আছে এক-কোণে।

'এই যে তুমি এখানে। আমি এত খাব কি! এস তুমিও একটু হাত লাগাও।'

উঠে দাঁড়াল জয়া। একবার একটু-বা দেখল সজাগ হয়ে পিছনে তার কেউ আছে কিনা। না, আর কেউ নেই। স্বস্তিতে হাসল জয়া। বললে, 'সামান্য জিনিস, এর আবার ভাগাভাগি কি।'

পীড়াপীড়ি করল না যূথিকা। একটু ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জিগগেস করলে, 'শরীর কেমন আছে?'

'ভালো।'

'মন-মেজাজ?'

'ভালো নয়।'

'কেন কী হয়েছে?' স্বর নামি[illegible] একটু টানতে চাইল যূথিকা। চুপচা[illegible]

'জানি না।' জয়া চোখ নি[illegible] কী ভেবে মুখে একটু শ[illegible] বললে, 'মেজাজের কি কিছু ঠিক আ[illegible]'

যূথিকা স্বর এবার গোপনের ঘরে নি[illegible] এল। বললে, 'তখন জানলাটা আমা[illegible] মুখের উপর অমন ছুঁড়ে মেরে বন্ধ ক[illegible] কেন?'

'আপনাদের মুখের উপর? কই, ক[illegible]?' ভিতরে-ভিতরে কাঁপতে লাগল জয়া। এর আবার মোকাবিলা হয় নাকি?

'সেকি, এই তো খানিক আগে। আমরা, আমি আর উনি, ওদিকের ঘরটায় বসে, আর তুমি মুখোমুখি ঘরটাতে দাঁড়িয়ে। জানলার পাল্লা তোমার দিকে। হঠাৎ তুমি তোমার দিক থেকে সজোরে ছুঁড়ে মারলে জানলাটা—'

একটু জোরে হাসতে চেষ্টা করল জয়া। বললে, 'শব্দ করে বন্ধ করলাম।'

'হ্যাঁ, তাই। তাই-বা কেন?'

'বাঃ, জানলার উপরে দেয়ালে একটা টিকটিকি ছিল, সেটাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে।' হাসির ঢল নামাতে চাইল জয়া। কিন্তু কোথায় কোন কুণ্ঠা না কষ্টের পাথরে আটকে গেল জল।

যূথিকার মন খোলসা হল না।

দুজনে চলে যাচ্ছে, সুশীলবাবু আবার কেঁদে পড়লেন। যদি মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে দিতে পারো। তোমাদের কাছে আর নতুন কী বলব। পেনসন নিয়েছি, মাইনের আদ্ধেকের চেয়েও কম। শাঁসালো বড় ছেলেটা মারা গেল, ছোট দুটো সামান্য তেলে টিমটিম করছে। বাপ-মরা ভাইঝিটা ছিল আমাদের কাছে, মফঃস্বলে। দু-দুবার আই-এ ফেল করল, মা চোখ বুজল, মামারা সুযোগ বুঝে বললে, আর টানতে পারব না জের, বিয়ে দিয়ে দিন। এখানে, আমার কাছে

চুড়োর উপরে ময়ূরপাখা—গায়ের রঙখানা তো দেখেছ। একটা কোথাও যদি তাই চাকরি জুটিয়ে দিতে পারো। মেয়েও গোঁ ধরেছে, চাকরি করবে, দাঁড়াবে নিজের পায়ে। ফেল-করার লজ্জা, অমনোনীত হবার লজ্জা, মুছে ফেলবে রোজগার দিয়ে। তোমরা দুজন আছ, তোমরা যদি কোথাও

'স্টেনোগ্রাফি তো শিখছে।' বললে যূথিকা।

'তা শিখছে। কিন্তু কত দিনে তৈরি হবে, তা কে বলবে। 'শিখছে শিখুক, ততদিন সঙ্গে-সঙ্গে কিছু একটা চাকরি। ছোট-খাটো, যেমন-তেমন—কোনো আফিস-টাফিস—কত তো তোমাদের চেনা।'

'দেখি।' যূথিকা আবার এক-নজর দেখল জয়াকে।

রঙ কালো বটে, কিন্তু কেমন একটা আলো-আলো ভাব। যেন নতুন ধানের থোরে শরতের সোনা ভরা। সবুজ-সজীব। কয়েক মাস পিচের রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে শরীর একটু শুকনো-শুকনো হয়েছে কিন্তু টান-টান তাজা ভাবটা একটুও ঝিমিয়ে পড়েনি। যে নীল-নীল আকাশভরা নরম রোদ এনেছিল গাঁ থেকে তার আভাস এখনো গায়ে মাখা আছে।

'দেখি, চেষ্টা ত করছি।' নতুন আশ্বাস দিল বিভাস।

'মেয়েদের চাকরি! শুনতেই সুন্দর, নইলে একশো গণ্ডা ঝামেলা।' যূথিকা বিরক্তির ঝাঁজ আনল গলায় : 'ট্রামে-বাসে ওঠা মানে নরককুণ্ডে ঝাঁপ মারা। তার পর আফিস ত নয়, পশুশালা। অন্যমনস্ক হয়ে, একটু নিজের মনে বসে কাজ করবার জো আছে? তার পর একেকজন বস্ যা আছেন—'

'উপায় কি।' বললেন সুশীলবাবু, 'যুগের সঙ্গে চলতে হবে মানিয়ে। যেমন গলি তেমন চলি—'

বাড়ি ফিরে এসে স্বামীকে একলা পেয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল যূথিকা: 'মেয়েটা কি-রকম বেয়াদব দেখেছ?'

কোন্ মেয়েটা জানবার দরকার নেই, তবু গোড়াতেই একেবারে লাফিয়ে ওঠা যায় না, তাই ঠাণ্ডা চোখে বিভাস বললে, 'কেন, কী করল?'

'ন্যাকামি করো না। ঐ যে তখন আমাদের মুখের উপর বন্ধ করে দিল জানলাটা!'

'মেয়েরা কখন কী করবে, হাসবে না কাঁদবে, কেউ বলতে পারে খড়ি পেতে?'

'বলল কিনা, একটা টিকটিকি ছিল, তাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে।' চোখে চোখ রাখল যূথিকা : 'তুমি কি টিকটিকি?'

'বা, আমি টিকটিকি হতে যাব কেন?' আকাশপড়া ফ্যাকাশে মুখ করল বিভাস।

'তুমি ছাড়া আর কে। তোমাকে লক্ষ্য করেই ও জানলাটা ছুঁড়ে মেরেছে। তাতে আর সন্দেহ কি।' চোখের কোণে ক্রুদ্ধ শর পরল যূথিকা : 'ওর সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার করেছ?'

'তার মানে?' কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াবার মতন করে বললে বিভাস।

'তার মানে, কোনো দুশ্চেষ্টা—'

'ও কিছু বলেছে?'

'জিগগেস করলেই পার।'

'নইলে ওর অত চটবার কারণ কি। বলা যায় না কখন কি খেয়ালের বশে কী করে ফেল আচমকা। সন্ন্যেসী আছ, কি দেখে ফট্ করে হঠাৎ বিলাসী হয়ে ওঠ।'

'তোমার রাজত্বে বাস করে কি আর বিলাসী হবার জো আছে!' একটা ম্লান শ্বাস বেরিয়ে এল বিভাসের মুখ দিয়ে।

আলোতে কপালের কাছেকার দুটো পাকা চুল যেন আরো চকচক করে উঠেছে। যূথিকা কাছে গিয়ে চুল দুটো তুলে ফেলল। আর, একবার কটা তুললে আরো কটার জন্যে আঙুল নিসপিস করে।

সন্দেহ কি, স্বামীকে যূথিকা কড়া শাসনে সন্ন্যেসী করে রেখেছে। নইলে আর শান্তিতে সংসারি করতে হত না। যে জানলায় প্রতি-বেশী আছে সে জানলায় দাঁড়াতে পায় না। রাস্তায় বেরুলে ছাড়পত্র নেই কোনো চলন্ত দীপশিখার উপর দৃষ্টিটা স্থির করে। না, বিভাসের একটাও কোনো মেয়ে-বন্ধু নেই। এমন কেউ নেই যার কাছে একটু শ্রীমান হয়ে বসতে পারে, নিজের কানে শোনেনি এমনি মোলায়েম সুরে বলতে পারে কথা। যা দু-একজন অনাত্মীয় আলাপী মেয়ে আছে, তাও ক্লাবের মেম্বর হয়ে, আর সেই ক্লাবে যূথিকাও তার সহযাত্রী। এমন কেউ নেই যে, কাগজে-কালিতে না হোক, রঙিন ভাষায় একটা আধটা চিঠি লেখে—তেমন যদি নাকের ডগায় গন্ধ লাগে, নিজেই চিঠির মোড়ক খুলে ফেলে যূথিকা। যদি তেমন কেউ বাড়িতে দেখা করতে আসে, যূথিকাই গায়ে পড়ে আগে থেকে তার ভার নেয়। আলাপের পরিধি-পরিমিতি তদারক করে। মোট কথা, সঙ্গে-রঙ্গে, প্রকাশ্যে-নেপথ্যে, আনৈক্যে-আধিক্যে, নিজেকেই সে করে রেখেছে একচ্ছত্রী। এই ত ভদ্র, প্রৌঢ় জীবনের নিয়ম-নিয়তি। নিজের কক্ষে সুষম ছন্দে এখন শুধু পাক-খাওয়া। যজ্ঞের ষাঁড় আর এখন হাল টানবে কি!

বিভাসের জীবন দেয়াল দিয়ে নিরেট গেঁথে দিয়েছে যূথিকা, জানলা খুলে রাখেনি একটাও। গানের মধ্যে রাখেনি একটুও মিশ্ররাগের অবকাশ। তুমি এখন সাংখ্যের পুরুষের মত উদাসীন থাকো আর আমি ধাত্রীভাবে দেখি-শুনি তোমাকে।

এই এখন শান্ত শালীন সুস্থ অবস্থান। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের মুখটার উপর হঠাৎ নজর পড়ল যূথিকার। মনে হল আগন্তুক কে এক মহিলা বিনানু-মতিতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। চমকে উঠবে কি না ভাবছিল, কিন্তু, না, এ ত সে নিজে। সে নিজে? তা ছাড়া আর কে। বিভাসের জীবনের রসমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী। আনন্দের মুক্তস্পন্দ।

হয়েছে। কটা দাঁত নড়তে-নড়তে এগিয়ে এসেছে মাড়ি ছেড়ে। গাল দুটো ভেঙে গিয়ে মুখের মাংস ঝুলিয়ে দিয়েছে। থলে জাগছে চোখের কোলে। দেহের উপরে-নিচে কোথাও আর নেই বৃত্তাভাস।

কিন্তু বিভাস পঞ্চাশ পেরোলেও এখনো কেমন ঋজু ও প্রশস্ত। বর্ণ ও বল, সুর ও ছন্দ, গতি ও যতি সমান প্রস্ফুট। কোথাও বিরূপ বক্রতা নেই, দৌর্বল্যশৈথিল্য নেই। তবু সব ফুরিয়ে-ফেলা নিঃস্বের মত বসে আছে দেখাচ্ছে। চলে যাচ্ছে যাক এমনি স্পৃহাহীন স্বাদহীন তরঙ্গহীন স্রোতে গা [illegible]সয়েছে। জীবনে গাঢ়তা ও গূঢ়তা যে রস [illegible]ত পারে, যূথিকার সঙ্গে আপোস করতে [illegible]য় তাই যেন খুইয়ে এসেছে। শুধু শমিত [illegible]ত। রাত্রি যূথিকার কাছে একতাল [illegible] কিন্তু বিভাসের কাছে এখনো [illegible]ংসী। সে হাঁস আর বুঝি [illegible]

[illegible]শ্বাস ও ক্লান্ত দেখাচ্ছে [illegible]াসকে।

[illegible]যাই বল, মেয়েটার কী স্পর্ধা, গুরুজন [illegible] একটুও মান্য নেই।' রাগে রি-রি করে উঠ[illegible] যূথিকা।

'[illegible]য়েদের মতিগতির মাথামুণ্ডু কিছু আ[illegible] নাকি?' সহজে নিশ্বাস ফেলল বিভাস।

'সাদামাঠা মেয়ে, দুরবস্থার সংসারে এসে উঠেছিস—' আক্ষেপের সুরে বলতে লাগল যূথিকা : 'আমরা তোর মুরুব্বি, একটা সুরাহা কোথাও করতে পারি কি না তাই দেখছি, আর তুই কি না আমাদেরই মুখের উপর—'

'মেয়েদের রাস্তায় কোনো ট্রাফিক-লাইট নেই, লেফট-রাইট নেই। কখন গলবে কখন জ্বলবে, দেবতা দূরের কথা, দানবেও বলতে পারে না।'

গলতে-গলতে যূথিকাই হঠাৎ জ্বলে উঠল : 'কিন্তু, সত্যি বলো না কী হয়েছে!'

'বা, কিছু হলে ত বলব!'

'নইলে শুধু-শুধু জানলা ছোঁড়ে?' কটাক্ষ আবার সূক্ষ্ম করল যূথিকা।

'স্থলে-জলে-আকাশে কত কি ছুঁড়ছে মানুষে—চুপ করে যাও।' কাগজ তুলে নিল বিভাস। মুখ ঢাকল।

মুখ ঢেকে চুপ করে থাকবার মেয়ে নয় যূথিকা। পরদিন সকাল-সকাল ফিরল আফিস থেকে। বাড়ি না গিয়ে গেল মাসিমাদের ওখানে।

জয়া শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল, তাকে নিয়ে এল নিভৃতিতে। দরজা বন্ধ করে দিল।

কী হয়েছিল সত্যি করে আমাকে বল। জয়ার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। [illegible] আমার সব জানা দরকার। যদি

কোথাও কিছু অন্যায় বা অসঙ্গত হয়ে থাকে তার সুষ্ঠু প্রতিকার করতেই হবে। তুমি কুমারী মেয়ে, কোনো বিপদের ঝুঁকি তুমি নিতে পার না। বললে আমার সংসারে কোনো ভাঙন ধরবে এ ভয় তুমি করো না। বরং বাড়তে-বাড়তে পাপ যদি প্রলয়ের মূর্তি ধরে, তখন দশ দিকের কোনো দিকই সমালানো যাবে না। তোমাকে বলছি, কাপড় দিয়ে আগুন ঢেকে রাখা যায় না, অধর্ম বা অন্যায় কিছুই গোপন করবার নয়।

ঘেমে নেয়ে উঠল জয়া। যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখে তাকিয়ে রইল।

'হ্যাঁ, বল, ভয় নেই।'

'কত দিনই ত গিয়েছি, সেদিনও গি... ছিলাম আপনাদের বাড়ি, সন্ধেবে... একলা—' বলতে লাগল জয়া, 'ছাদে রেলিং ধরে নিরালায় দাঁড়িয়ে ছিলাম চুপচা...'

'আমি ছিলুম কোথায়?'

'বাথরুমে।'

'হ্যাঁ—তার পর?'

'উনি হঠাৎ পিছন থেকে এসে আ... পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালেন।'

'উনি মানে—'

'বিভাসবাবু।'

'হ্যাঁ, দাঁড়ালেন—'

'হ্যাঁ, গা ঘেঁষে। আমার হাত ধরলেন। আর কানের কাছে মুখ এনে—'

'কি, চুমু খেলেন?'

এত যন্ত্রণায়ও হাসল জয়া। বললে, 'না। অতদূর নয়। শুধু তাঁর নিশ্বাসটা আমার গালের উপর পড়ল।'

'শুধু নিশ্বাসটা?'

'হ্যাঁ, আর বললেন, তুমি ভারি মিষ্টি মেয়ে। তোমাকে খুব ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। তোমার কখনো করবে আমাকে? কি, করবে?'

'তা তুমি কী বললে?'

'আমি একটা ঝটকা মেরে তাঁর হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। বললাম, ছিঃ, আপনি সম্ভ্রান্ত বিবাহিত পুরুষ, এ আপনার কী ব্যবহার! পালিয়ে চলে গেলাম ঘরের মধ্যে।'

যূথিকার মুখে কথা নেই। তাকে চুপ করে যেতে দেখে ভয় পেল জয়া। ব্যাকুল হয়ে বললে, 'বলে খুব অন্যায় করলাম। তাই না? কী দরকার ছিল বলবার! আপনি এত পীড়াপীড়ি করছিলেন—'

'না, বলে ভাল করেছ। শোন—' যূথিক. অভিভাবিকার সুরে বললে, 'তুমি আর আমাদের বাড়ি যেও না।'

'যাব না।' মুখ নিচু করল জয়া।

'আর ও'কেও স্মরণ করে দেব যেন এ বাড়ি না আসেন।'

'উনি আর আসেন কই?'

একটা সবুজ ঘাসের ডগার জন্যে আঁকুপাঁকু করছেন—'

'বেশ ত বারণ করে দেবেন।' পরে আকুল মিনতিমাখা সুরে বললে, 'কিন্তু আমাকে যাহোক একটা চাকরি জুটিয়ে দিন, যূথিকাদি। একটা চাকরি পেলেই আমি বেঁচে যাই, ছাড়া পেয়ে যাই—'

'দেখি।' গম্ভীরমুখে যূথিকা বললে.

তোমাকে শুধু ভালবাসতে ইচ্ছা করে"

'আমাদের ড্রাফটিং ডিপার্টমেণ্টে কজন কপিস্ট নেবে। তুমি একটা দরখাস্ত করে দিও। কপিইংয়ের কাজ করতে পারবে নিশ্চয়—'

'খুব পারব।' উৎসাহে নেচে উঠল জয়া। 'তার পর চাকরি করতে করতে স্টেনো-

'তখন ত লেডি-টাইপিস্ট খোদ বসু-এর প্রাইভেট সেক্রেটারি—'

কি বুঝল কে জানে, হাসল জয়া।

চাকরির জোগাড় করে আনল যূথিকা। গোড়ায় মাইনে কম, তা হোক—এই দেখ অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার। পড়েও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না জয়া।

ইণ্টারভিয়ুও হল না? কম্পিটের আবার ইণ্টারভিয়ু! দরখাস্তের হাতের লেখা দেখেই নির্বাচন। সস্ত্রীক সুশীলবাবু আশীর্বাদ করতে লাগলেন যূথিকাকে। জয়া সমস্ত শরীরে মুক্তির নিশ্বাস ফেলল।

এর আর ইণ্টারভিয়ু হয় না। ডিপার্ট-মেণ্টের বস্‌এর সঙ্গে দেখা করে ডিউটি বুঝে নিয়ে কাজে লেগে গেলেই হল।

'আপনি নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে।' আব-দেরে গলায় বললে জয়া।

'হ্যাঁ, আমিই ত নিয়ে যাব। আর শোন,' একটু ঘন হল যূথিকা ঃ 'বেশ ছিমছাম ফিটফাট থাকবে। ঝিকমিক ঝিকমিক করবে। চট করে বস্‌এর যাতে সুনজরে পড়ে যাও। যস্মিন দেশে যদাচারঃ। যেমন রেওয়াজ তেমনি আওয়াজ। চাকরি করতে আসাই উন্নতির জন্যে। আর উন্নতি মানেই উপরওয়ালার নেকনজর।'

'সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

'হ্যাঁ, সাধ্যমত। এ সব আফিসের এটি-কেটই অন্যরকম। বস্‌এর সঙ্গে ফ্রেণ্ডলি হওয়া দরকার।'

'ফ্রেণ্ডলি?' ভুরু কুঁচকাল জয়া।

'হ্যাঁ, হয়ত একটু মোটরে করে বেড়ানো, বাইরে কোথাও একটু খাওয়া, সিনেমা দেখা, কেনাকাটা করা, ছোটখাট প্রেজেণ্ট নেওয়া—এই একটু সাহচর্য, একটু বা প্রেম-প্রেম খেলা—'

'এই বুঝি রীতি?'

'হ্যাঁ, যেমন রতে যেমন কথা। তা না হলে দেখবে নীচের লোক প্রমোশান পেয়ে গেছে আর তুমি পিছনে পড়ে আছ।'

'আপনাকেও অমনি করতে হয়েছে উন্নতির জন্যে?' দ্বিধা করল না জয়া।

'নিশ্চয়। এবং আমার পক্ষে কিঞ্চিৎ হয়ত বেশি। পুরুষ মানেই ক্লান্ত, অপূর্ণ, বাড়ির বাইরে একটু বাগান চায়, পাঠ্য-পুস্তকের বাইরে একটু বা চুটকি রচনা। ঠিক উড়[illegible] না চাইলে হয়ত বা একটু ফুর-ফুর কর[illegible] চায়। তারই জন্যে এক চিলতে আকাশ হওয়া, একফালি মাঠ হওয়া—'

'বুঝেছি।' অচঞ্চল চোখে বললে জয়া। 'দরকার হলে শিখে নেব, জেনে নেব আপনার কাছে।'

'এ আর শেখবার-জানবার কি। মানে আর কিছু নয়, চালাক হওয়া। ইংরিজী[illegible] যাকে বলে ট্যাক্টফুল হওয়া। বিতরণ ন[illegible] একটু বিকিরণ করা। আঁটসাঁট ক[illegible] সংস্কারগুলো একটু ঢিলে করে দেওয়া[illegible] যেন মাস্টার উপদেশ দিচ্ছে এমনি ভাব[illegible] যূথিকার ঃ 'জল একটু ছুঁক ক্ষতি নেই, মাছ ধরতে না চাইলেই হল—'

চালাক-চালাক চোখে তাকাল জ[illegible] বললে, 'কিন্তু যদি মাছ ধরবার জন্যে হা[illegible] বাড়ায়?'

'তোমার জানলা নেই? পেপার-ওয়েট নেই? হাতের কব্জি নেই? আর আমি? আমি নেই?'

শব্দ করে হেসে উঠল জয়া।

'নিজে সাবধান থাকলেই জগৎ সাবধান। তারই মধ্যে যদি হালকা কটা তুলির টানে একটা মরা রঙকে জাগিয়ে দিতে পারি ত মন্দ কি।'

এখানে লিফট ওখানে সিঁড়ি, ঘরে-বারান্দায় প্রকাণ্ড আফিস। জয়াকে সাজিয়ে-গুজিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে গেল যূথিকা। এখানে-ওখানে কয়েকটা মেয়ে বসেছে কাজ করতে। মাত্রার উপরে রেফের মত দু-একটা বা হাঁটছে বারান্দায়।

ডিপার্টমেণ্টের বস্‌এর আফিসরুমের বাইরে দাঁড়াল দুজন। জয়ার বুক দুরদুর করতে লাগল।

যূথিকা বললে, 'ভয় কি। ঢুকে পড়। একটু মিষ্টি হেসে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস কর, তার পর কি ডিউটি আজ এসাইন করলেন [illegible]জেনে নাও। যদি একটু বা আলাপ করতে [illegible]চান একটু অপেক্ষা ক'রো।'

[illegible]সাহসে ভর করে ঢুকে পড়ল জয়া।

'বসো।' বিভাস বললে।

জয়া ধুলোপড়া সাপের মত স্থির হয়ে [illegible]ইল খানিকক্ষণ। পরে বসল আচ্ছন্নের [illegible]মত। একপাশে মুখ ফিরিয়ে রাখল।

'গোড়ায় এই কটা চিঠি নকল করতে [illegible]বে। পর-পর সাজান আছে ফাইলে। [illegible]লেকা কাজ। হ্যাঁ, শুরুতেই আগে জিগগেস [illegible]রে নি।' মুখ তুলে পণ্টাপণ্টি তাকাল [illegible]ভাস ঃ 'কি, কাজ করবে ত এখানে?'

যে রাত্রি সেই আবার মুখ ফিরিয়ে নিল।

মুখ ফেরাল জয়া। হাসিমুখে বললে, 'করব।'

অরণ্যে — শিল্পী ঃ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

পতিতার পত্র

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

লোচনার নাম ভদ্রসমাজে পরিচিত হইবার কথা নয়। তবে ভদ্রসমাজে থাকিয়াও যাহারা সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া সন্দেহজনক গলিঘুঁজিতে বিচরণ করেন, তাঁহারা অবশ্যই তাহার নাম জানেন। আর জানি আমি।

আমি ডাক্তার, সুলোচনার মৃত্যুকালে তাহার চিকিৎসক ছিলাম। কঠিন ব্যাধিতে কয়েক মাস ভুগিয়া তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাহার বয়স আটত্রিশ কি উনচল্লিশ হইয়াছিল।

মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে সে একটি পুরু খাম আমার হাতে দিয়া বলিয়াছিল, "ডাক্তারবাবু, আমার সময় ঘনিয়ে আসছে, আর বড় জোর দু-চার দিন। এটা রাখুন, আমার মৃত্যুর পর খুলে পড়বেন।"

খামের মধ্যে একটি উইল ও একটি দীর্ঘ চিঠি ছিল। উইলে সুলোচনা আমাকে তাহার যথাসর্বস্ব, আন্দাজ ত্রিশ হাজার টাকা, নিঃশর্তে দান করিয়াছে। চিঠিখানা তাহার আত্মকথা। এদেশে পতিতার আত্মকথা জাতীয় যে-সব লেখা বাহির হইয়াছে ইহা সে-ধরনের নয়। মানুষের জীবনধারা কোন্ বিচিত্র পথে কোথায় গিয়া উপস্থিত হয় এই কাহিনী তাহারই একটি উদাহরণ। নোংরামিও ইহাতে কিছু নাই। তাই নির্ভয়ে ছাপিতে দিলাম।

ডাক্তারবাবু,

জীবনে আমি অনেক পুরুষের সংসর্গে এসেছি। সবাই মন্দ লোক নয়, অনেকে দোষে-গুণে সাধারণ মানুষ। দু-একজন সত্যিকার সজ্জন ব্যক্তিও দেখেছি। আপনি ডাক্তার, এতে আশ্চর্য হবেন না। কোনও মানুষই নিখুঁত নয়, সত্যিকার সাধু-সজ্জন ব্যক্তিরও দোষ-দুর্বলতা থাকে।

আপনি যেদিন প্রথম আমার চিকিৎসা করতে আসেন, সেদিন আপনাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলুম। যেমন রুক্ষ চেহারা তেমনি কঠিন ব্যবহার। আপনি কী করে এতবড় ডাক্তার হলেন ভেবে অবাক হলুম। এখন জানি, আপনার কঠিনতার আড়ালে একটি করুণ সদয় হৃদয় আছে, আর আছে রোগ সারাবার অসামান্য ক্ষমতা। আমার রোগ আপনি সারাতে পারেননি, সে দোষ আপনার নয়। প্রথম দিন আমাকে পরীক্ষা করে আপনার মুখে যে-ভাব ফুটে উঠেছিল তা থেকে বুঝেছিলাম এ-রোগ সারবার নয়। আপনি আমাকে মিথ্যে আশ্বাস দেননি, বলেছিলেন, 'যন্ত্রণার উপশম করতে পারি। তার বেশী কিছু হবে না।'

আপনার কথা মেনে নিয়েছিলুম। আপনি অন্য ডাক্তারকে দেখাতে বলেছিলেন, আমি দেখাইনি। কেন দেখাইনি জানেন? আপনার স্পষ্টবাদিতা ভাল লেগেছিল, ভেবেছিলুম যদি মরতেই হয় আপনার হাতেই মরব। আপনাকে ভাল লাগার আর-একটা কারণ, আপনাকে দেখে আর-একজনকে মনে পড়ে গিয়েছিল, যিনি ছিলেন আপনার মতই কঠিন আর কঠোর।' তার হাতে একবার

মরেছি, এবার শেষ মরা আপনার হাতে মরব।

আমার ঘরের দেয়ালে পাশাপাশি দুটি ছবি টাঙানো আছে। দুটি যুবাপুরুষ। বিশ বছর আগে ও'রা যুবাপুরুষই ছিলেন; একজনের মুখ ফুলের মত নরম, অন্যজনের মুখ পাথরের মত শক্ত। অপরিচিত নগণ্য মানুষ নয়, দেশ-জোড়া ও'দের নাম। দুজনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব; স্বাধীনতার যুদ্ধে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ও'রা লড়েছিলেন।

যেদিন প্রথম আপনার দৃষ্টি ওই ছবি-দুটির ওপর পড়ল সেদিন আপনি ভুরু তুলে আমার পানে চেয়েছিলেন। আপনার ভুরু-তোলা প্রশ্নের জবাব তখন দিইনি। আজ এই চিঠিতে জবাব দিচ্ছি। চিঠি পড়লেই বুঝতে পারবেন আমার এই পাপ-জীবনের সঙ্গে ওই দুটি মহাপ্রাণ দেশ-নেতার কী সম্বন্ধ।

মরবার আগে আমি আমার জীবনের কাহিনী একজন কাউকে শুনিয়ে যেতে চাই। অন্য কাউকে শোনাতে গেলে সে মুখ বেঁকিয়ে হাসবে, হয়ত ও'দের দুজনের নামে মিথ্যে রটনা করবে। কিন্তু আপনি তা করবেন না, আপনি বুঝবেন। ওই বোঝা-টুকুই আমার দরকার।

আমি ভদ্রঘরের মেয়ে, বেশ্যার ঘরে আমার জন্ম নয়। বাবা ছিলেন বাংলা দেশের পশ্চিম সীমানায় এক শহরে উকিল। শুধু উকিল নয়, একজন স্থানীয় জননায়ক। রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি প্রাণ-মন ঢেলে দিয়েছিলেন। ওকালতি করার সময় পেতেন না, তাই আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। কিন্তু সুনাম ছিল দেশজোড়া। বাবা অনেক দিন হল মারা গেছেন, কিন্তু জেলার লোক তাঁর নাম এখনও ভোলেনি।

আমি স্কুলে লেখাপড়া শিখেছিলাম। কলেজে পড়িনি। বাড়িতে সৎমা ছিলেন। তিনি আমাকে সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর নিজের সন্তান ছিল না বলেই বোধ হয় আমার ওপর প্রচণ্ড আক্রোশ ছিল। বাবা আমাকে স্নেহ করতেন, আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। কিন্তু সংসারের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না, তিনি সর্বদা রাজনীতি নিয়ে মেতে থাকতেন।

ষোল বছর বয়সে আমার বিয়ে হল। সৎমা পাত্র যোগাড় করেছিলেন। বাবা একটু খুঁত-খুঁত করলেন; কিন্তু নিজে ভাল পাত্র খুঁজে বার করার সময় নেই তাঁর। তিনি খুঁতখুঁত করতে করতে রাজী হয়ে গেলেন।

বিয়ের মাস তিন-চার পরে স্বামী মারা গেলেন। তাঁর চালচুলো ছিল না, ছিল গুপ্ত ক্যান্সার রোগ; বিয়ের পর ধরা পড়ল। সৎমা নিশ্চয় রোগের কথা জানতেন না, জানলে যত আক্রোশই থাক, বিয়ে দিতেন না। আমাকে বিদেয় করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু চার মাস পরে বিধবা হয়ে আমি আবার বাপের বাড়ি ফিরে এলুম। সংসারের হাওয়া বিষিয়ে উঠল।

সংসারের বিষাক্ত হাওয়া থেকে পালাবার একটা রাস্তা ছিল আমার। রাজনৈতিক আন্দোলন উপলক্ষে শহরে প্রায়ই সভা-সমিতি হত। ছেলেবেলা থেকেই আমি সভা-সমিতির অধিবেশনে গান গাইতুম। আমার গলা ভাল ছিল, সবাই প্রশংসা করতেন। বিধবা হবার পরও আমার সভায় গান গাওয়া বন্ধ হল না। থান পরে যেতুম, গান গাইতুম। বাবা বলতেন, 'দেশের কাজে নিজের দুঃখ ভুলে যাও।' তিনি নিজে আমার অকাল-বৈধব্যে দুঃখ পেয়েছিলেন, তাই আমাকে এবং নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা করতেন।

আমার তখন ভরা যৌবন; যৌবনের স্বাদ পেয়েছি, কিন্তু সাধ মেটেনি। বাবার উপদেশ আমার কানে যেত, কিন্তু মন পর্যন্ত পৌঁছুত না। রাজনৈতিক আন্দোলনে অনেক যুবাপুরুষ ছিলেন। তাঁদের দেখতাম, মনটা উন্মুখ উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। কিন্তু আমি বিধবা; তাঁরা আমার পানে উৎসুক চোখে তাকালেও কেউ এগিয়ে আসতেন না।

এইভাবে বছর দেড়েক কাটল। তার পর দুজন যুবাপুরুষ এলেন আমাদের শহরে। তরুণ বয়স, কিন্তু দেশজোড়া নাম। দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন; তাঁদের অগ্নিময়ী বক্তৃতা শোনবার জন্যে হাজার হাজার লোক ছুটে আসে; তাঁরা হাত পাতলে মেয়েরা হাজার হাজার টাকার গয়না গা থেকে খুলে দেয়। তাঁরা দুজন যেন জোড়ের পাখি; একসঙ্গে থাকেন, একসঙ্গে কাজ করেন; অনেকবার একসঙ্গে জেল খেটেছেন। লোকে বলত, মাণিকজোড়। কেউ বলত, রাম-লক্ষ্মণ। কেউ বলত, কানাই-বলাই।

আমি তাঁদের রাম-লক্ষ্মণ বলব। দুজনের চেহারা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। রাম ছিলেন নরম-সরম, নবজলধর কান্তি; ভারি মিষ্টি চেহারা। আর লক্ষ্মণ যেন গনগনে হোমের আগুন; টকটকে রঙ, লম্বাচওড়া কঠিন দেহ; মুখে হিমালয়ের গাম্ভীর্য।

আমি দুজনকেই ভালবেসে ফেলেছিলাম। একথা সাধারণ লোক হয়ত বুঝবে না, কিন্তু আপনি বুঝবেন। আমার মনের কৌমার্য তখনও নষ্ট হয়নি, হৃদয় ভালবাসার জন্যে উন্মুখ হয়ে ছিল। তাই এ'রা দুজন যখন আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন বাছ-বিচার করতে পারলুম না, দুজনের পায়ের কাছেই আমার হৃদয়-মন ঢেলে দিলাম। যিনি আমাকে পায়ের কাছ থেকে তুলে নেবেন আমি তাঁরই।

সেবার আমাদের শহরে বিরাট সভার আয়োজন হয়েছিল। চার-পাঁচ দিন ধরে অধিবেশন চলবে; দেশের গণ্যমান্য সব নেতাই এসেছেন। স্থানীয় দেশ-সেবকদের বাড়িতে নেতাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে; কারুর বাড়িতে দুজন, কারুর বাড়িতে তিনজন। আমাদের বাড়িতে উঠেছেন রাম আর লক্ষ্মণ। বাইরের একটা ঘর ও'দের দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আমি যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছি। সারাক্ষণ তাঁদের সেবা করছি। আমার সৎমা ছিলেন গোঁড়াপ্রকৃতির মানুষ, পর্দার আড়াল ছাড়েননি; স্বাধীনতা-আন্দোলনেও বেশী সহানুভূতি ছিল না। তাই আমিই অষ্টপ্রহর অন্দর থেকে বাইরে ছুটোছুটি করতুম। যতক্ষণ রাম-লক্ষ্মণ বাড়িতে থাকতেন আমি তাঁদের আশেপাশেই ঘুরে বেড়াতুম। তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা, স্নানের আয়োজন, মাথার তেল, আয়না চিরুনি, বিছানা পাতা, বিছানা তোলা—সব আমি করতুম। শরীরে ক্লান্তি আসত না, মনে হত ধন্য হয়ে গেলুম।

রাম-লক্ষ্মণ কেবল আমার সেবা গ্রহণ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। আমার সভায় যাবার অবকাশ ছিল না, তাই তাঁরা আমায় সভার গল্প করতেন। লক্ষ্মণ ভারি গম্ভীর মানুষ, তিনি বেশী কথা বলতেন না; কিন্তু রাম বলতেন। ভারি মজার কথা বলতেন তিনি, মনটা ছিল রঙ্গরসে ভরপুর। সভায় কে কত গরম বক্তৃতা দিলে, কার ওপর পুলিসের নজর বেশী, এই সব কথা বেশ রঙ চড়িয়ে বলতেন। আমার সঙ্গেও রঙ্গ-রসিকতা করতেন। বলতেন, 'সুলোচনা, তুমি আমাদের খাইয়ে-দাইয়ে যে-রকম তাজা করে রেখেছ তোমাকেই আগে পুলিসে ধরবে; ক্যাঁক করে ধরে হাজতে পুরবে।'

লক্ষ্মণ ঠাট্টা-তামাসা করতেন না, কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ দুটি সর্বদা আমাকে লক্ষ্য করত, যেন আমাকে বোঝবার চেষ্টা করত। আমার বুক গুরুগুরু করতে থাকত। কাকে যে বেশী ভাল লাগে, বুঝে উঠতে পারতুম না।

দ্বিতীয় দিন দুপুরবেলা রাম হঠাৎ সভা থেকে ফিরে এলেন। আমি তখন ও'দের ঘরেই ছিলাম, আসবাবপত্র ঝাড়ামোছা কর-ছিলুম; তাঁকে দেখে চমকে গেলুম। তিনি ক্লান্তভাবে বিছানায় বসে বললেন, 'সুলোচনা, আজ ঝাড়া দু ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়েছি, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আমাকে এক পেয়ালা চা খাওয়াতে পারবে?'

আমি ছুটে গিয়ে চা তৈরি করে আনলুম। তিনি শুয়ে পড়েছিলেন, উঠে চায়ের পেয়ালা হাতে নিলেন। এক চুমুক চা খেয়ে করুণ চোখে আমার পানে তাকিয়ে বললেন, 'জীবনে সদর-মহলে পঁচিশটা বছর কেটে গেল। অন্দর-মহলের খবর নেওয়া হল না।'

আমার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল।

মেঘের পরে মেঘ আলোকচিত্রী : আনন্দ মুখোপাধ্যায়

তিনি আবার বললেন, 'অন্দর-মহলে যে এত মিষ্টি জিনিস আছে তা আগে জানলে হয়ত সদর-মহলে আসাই হত না।'

এই সময় আমার সৎমা দরজার বাইরে থেকে খাটো গলায় ডাকলেন, 'সুলোচনা, এদিকে শুনে যাও।'

বুকের ধড়ফড়ানি আরও বেড়ে গেল; সেই সঙ্গে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। কোনও রকমে ঘরের বাইরে এলুম। সৎমা আমাকে আমার শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ কঠিন দৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে থেকে কঠিন স্বরে বললেন, 'ভুলে যেও না তুমি বিধবা।'

এইটুকু বলে তিনি চলে গেলেন; আমি বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লুম।

সত্যিই ভুলে গিয়েছিলুম আমি বিধবা।

শুয়ে শুয়ে মন বিদ্রোহ করল। বিধবা ত কী? আমার রূপ আমার যৌবন আমার ভালবাসা, কিছুই মূল্য নেই এ-সবের? আমি কি কাগজের ফুল, চীনে-মাটির পুতুল? না, আমি চীনে-মাটির পুতুল হয়ে বেঁচে থাকতে চাই না। আমি ভালবাসা চাই, শ্রদ্ধা চাই, সম্ভ্রম চাই—

কতক্ষণ সময় কেটে গেছে খেয়াল করিনি। সৎমা'র গলা শুনতে পেলাম—'বিছানায় শুয়ে থাকলে সংসার চলে না। তোমার বাপ সভা থেকে ফিরে এসেছেন, আরও সবাই এসেছেন। তাঁদের চা-জলখাবার দিতে হবে।'

বাইরের ঘরে আট-দশ জন দেশনেতা জমা হয়েছেন। বেশীর ভাগই প্রবীণ; রাম-লক্ষ্মণও আছেন। রাজনীতির তীব্র আলোচনা হচ্ছে। আমি স্বপ্নাচ্ছন্নের মত সকলকে চা-জলখাবার দিলুম। আমাকে কেউ লক্ষ্য করলেন না, এমন কি রামও না। কেবল লক্ষ্মণের ধারাল চোখ দুটি আমাকে অনুসরণ করে বেড়াতে লাগল।

অনেক রাত্রে বৈঠক ভাঙল। সে-রাত্রে আমি কিছু না খেয়ে শুয়ে পড়লুম, কিন্তু ভাল ঘুম হল না। আমার জীবনে যেন একটা প্রবল বন্যা আসছে, কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কিছু জানি না। ভয় করছে, আবার উত্তেজনায় মুখ-চোখ গরম হয়ে উঠছে। রাম আর লক্ষ্মণ দুজনেই কি আমাকে চান? বুঝতে পারছি না। আমি ওঁদের মধ্যে কাকে চাই? তাও বুঝতে পারছি না।

পরদিন সকালে ও'রা সভায় চলে গেলেন। সভার কাজ শেষ হয়ে আসছে, আজ আর কাল দু দিন বাকী। তার পর সবাই চলে যাবেন। আর আমি—?

দুপুরবেলা রাম ফিরে এলেন। আমাকে দেখে ক্লান্ত হেসে বললেন, 'আজ আর কোনও কাজ হল না, শুধু নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি। বিরক্ত হয়ে চলে এলাম।'

তিনি নিজের বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে

চোখ বুজে রইলেন। আমি কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে জিগ্যেস করলুম, 'চা আনব?'

তিনি চোখ খুলে একটু হাসলেন : 'না, দরকার নেই। তুমি বরং আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও।'

ডাক্তারবাবু, মানুষের দেহ-মনের সব খবরই আপনি জানেন, তাই আমার তখনকার দেহ-মনের কথা বিস্তারিতভাবে লিখে আপনার ধৈর্যের ওপর জুলুম করব না। পরপুরুষের অঙ্গস্পর্শ সম্বন্ধে হিন্দু মেয়ের মনে তীক্ষ্ণ সচেতনতা আছে আপনি জানেন।......আমি খাটের শিয়রে দাঁড়িয়ে, তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম। ঘন কোঁকড়া চুল, সিঁথি নেই, কেবল কপাল থেকে পিছন দিকে বুরুশ করা।......

তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন না, মাঝে মাঝে চোখ খুলে আমার পানে তাকাতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে কতকটা বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'আমাদের সমাজে বিধবার এত অমর্যাদা কেন? কী অপরাধ বিধবার? স্বামী মরে গেলেই স্ত্রীর জীবন শেষ হয়ে যাবে কেন? তার কি স্বতন্ত্র সত্তা নেই? আমাদের সমাজ নিষ্ঠুর, স্ত্রীজাতির প্রতি দয়ামায়া নেই; একটু ছুতো পেলেই তাদের দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। অন্য সভ্য সমাজে কিন্তু এ-রকম নেই, বিধবা হবার দোষে কোনও মেয়ের জাত যায় না—'

আমি সমস্ত শরীর শক্ত করে শুনছি, এমন সময় লক্ষ্মণ ঘরে ঢুকলেন।

তাঁর মুখ অন্ধকার; চোয়ালের হাড় লোহার মত শক্ত হয়ে উঠেছে। তিনি রামের পানে একবার তাকালেন, তার পর আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে মুখে একটু হাসি আনবার চেষ্টা করে বললেন, 'আমার জন্যে এক পেয়ালা চা আনতে পারবে?'

আমি চোরের মত পালিয়ে গেলুম ঘর থেকে।

পনরো মিনিট পরে দু পেয়ালা চা নিয়ে ফিরে এসে দেখলুম, ঘরের দরজা বন্ধ, ভিতর থেকে দুজনের চাপা গলার আওয়াজ আসছে। চাপা গলা হলেও আওয়াজ নরম নয়, করাতের শব্দের মত কর্কশ। ওঁদের মধ্যে চাপা গলায় বচসা হচ্ছে। কথা সব বোঝা যাচ্ছে না। একবার মনে হল লক্ষ্মণ বলছেন, 'তুমি কোন্ পথে যাচ্ছ—'

দোরে টোকা দিতে সাহস হল না, চায়ের পেয়ালা নিয়ে ফিরে এলুম। রান্নাঘরে একলা বসে থরথর করে কাঁপতে লাগলুম। কী হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। আমার জন্যেই কি দুই বন্ধুর মধ্যে—! তবে কি এঁরা দুজনেই আমাকে চান?

সন্ধ্যার পর আজও বৈঠক বসল, খুব তর্কাতর্কি হল। রাম আর লক্ষ্মণ কিন্তু ঘরের দুই কোণে গম্ভীর মুখে বসে রইলেন, আলোচনায় যোগ দিলেন না। কেবল আমি যখন সকলকে চা দেবার জন্যে ঘরে এলুম তখন তাঁদের চোখ আমার পিছনে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

রাত্রি নটা আন্দাজ বৈঠক ভাঙল, সকলে উঠলেন। বাবা আর রাম অভ্যাগতদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। বাড়ির সদরে লক্ষ্মণ আর আমি দাঁড়িয়ে রইলুম।

হঠাৎ লক্ষ্মণ আমার হাত চেপে ধরলেন। আমি চমকে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলুম, কিন্তু তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে গাঢ়স্বরে বললেন, 'সুলোচনা, তোমার সঙ্গে আমার গোপনীয় কথা আছে। কিন্তু এখন নয়। কাল আমাদের সভার অধিবেশন শেষ হবে, তারপর বলব। তুমি তৈরী থেক। যাও, এখন ভেতরে যাও। কাউকে কিছু বোল না।'

আমার মাথাটা বনবন করে ঘুরে উঠল; অন্ধের মত হাতড়াতে হাতড়াতে বাড়ির মধ্যে ফিরে গেলুম।

সারা রাত জেগে শুধু ভাবলুম, কী কথা বলবেন আমাকে? কিসের জন্যে তৈরী থাকব?

পরদিন সকাল থেকে হৈ-হৈ লেগে গেল। আজ সভার শেষ অধিবেশন, এলোমেলো নানা কাজ হবে। তার ওপর গুজব রটে গেছে যে, কয়েকজন নেতাকে পুলিস অ্যারেস্ট করবে। ভোর থেকে বাড়িতে মানুষের যাতায়াত শুরু হয়েছে। বাবা চা খেয়েই রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে সভায় চলে গেলেন। আমাকে বলে গেলেন, 'তুমিও এস। সভায় বন্দে মাতরম্ গাইবে।'

সেদিন বন্দে মাতরম্ গাওয়া কিন্তু আমার হল না। সভায় উপস্থিত হয়ে দেখলুম, চারিদিকে পুলিস গিস গিস করছে; জনতা মুহুর্মুহু চিৎকার করছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ! বন্দে মাতরম্!

তিন-চার জন বড় বড় নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন; তার মধ্যে রাম একজন। লক্ষ্মণ গ্রেপ্তার হননি। আমি যখন উপস্থিত হলুম তখন পুলিস বন্দীদের নিয়ে মোটরে তোলবার উপক্রম করছে। বন্দীদের সকলের মুখে উদ্দীপ্ত হাসি।

গাড়িতে উঠতে গিয়ে রাম ফিরে দাঁড়ালেন। জনতার মধ্যে চারিদিকে চোখ ফেরালেন, যেন কাউকে খুঁজছেন। তার পর তাঁর চোখ পড়ল আমার ওপর। তিনি একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে রইলেন, মুখের উদ্দীপ্ত হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি আমাকে লক্ষ্য করেই মন্দ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমি শিগ্‌গিরই ফিরে আসব। ইংরেজের জেল আমাকে ধরে রাখতে পারবে না।'

বন্দীদের নিয়ে পুলিসের গাড়ি চলে গেল। তারপর সভায় কী হল আমি জানি না, চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ি ফিরে এলুম। সভায় আরও অনেক মেয়ে ছিল, তারা সবাই সেদিন কেঁদেছিল; আমার চোখের জল কেউ লক্ষ্য করেনি। আমার চোখের জলের উৎস যে আরও গভীর তা কেউ জানতে পারল না। কেবল, বাড়ি ফিরে আসবার পর, সৎমা আমাকে কাঁদতে দেখে মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'ঢঙ দেখে আর বাঁচি না।'

ইচ্ছে হল, বাড়ি ছেড়ে ছুটে কোথাও চলে যাই। বিধাতা যে অলক্ষ্যে সেই ব্যবস্থাই করছেন তা ত তখন জানতুম না।

দুপুরবেলা লক্ষ্মণ বাড়ি এলেন। মুখ [illegible] কঠিন। আমার পানে খানিক তাকিয়ে [illegible] লেন, মুখ একটু নরম হল। আবার [illegible] র মত কঠিন হয়ে উঠল। তাঁর মনের [illegible] যেন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে, কিন্তু কী [illegible] যুদ্ধ বোঝা যায় না। আমি কেবল [illegible] হিতের মত চেয়ে রইলুম।

তিনি বললেন, 'আমাদের জীবনে জেল-[illegible] ঘর-বাড়ি ওতে বিচলিত হলে চলে না। আমাকেও হয়ত আজ নয় কাল যেতে [illegible]। কিন্তু তার আগে অনেক কাজ সেরে নে[illegible] চাই। —সুলোচনা!'

[illegible] র আর কেউ ছিল না। আমি তাঁর কাছে এগিয়ে দাঁড়ালুম, মুখ তুলে তাঁর মু[illegible] পানে চাইলুম।

তিনি আমার কাঁধে হাত রাখলেন : 'তুমি আমার সঙ্গে পালিয়ে যাবে?'

আমার মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তার সব ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। শুধু বললাম, 'যাব।'

'স্বেচ্ছায় যাবে? আমি জোর করছি না।'

'যাব।'

'হয়ত যা আশা করছ তা পাবে না। তবু যাবে?'

'যাব।'

তিনি গভীর দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাইলেন; চোখ দুটি যেন করুণায় ভরে উঠল। তারপর আমার কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে আমার দিকে পিছন ফিরে খানিক দাঁড়িয়ে রইলেন। সেইভাবে দাঁড়িয়েই বললেন, বেশ। এখন আমি যাচ্ছি। রাত্রে আবার ফিরে আসব। বারোটার পর। গাড়ি নিয়ে আসব। তুমি তৈরী থেক।'

'আচ্ছা।'

তিনি চলে গেলেন।

সেদিনের কথা এখন ভাবলে মনে হয়, কেন তাঁর কথার মানে বুঝিনি। তিনি ত ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁর অটল হৃদয়ও ক্ষণেকের জন্যে টলে গিয়েছিল। সেদিন যদি আমি 'না' বলতুম! যদি বলতুম—যাব না তোমার সঙ্গে, যিনি জেলে গেছেন, তাঁর জন্যে

প্রতীক্ষা[illegible]ব। তা হলে আমার জীবনটাই অন্য পথে যেত। কিন্তু তা ত হবার নয়। আমি যে ওঁদের দুজনকেই সমান ভাবে চেয়েছিলুম। সংমা যে আমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। পালান ছাড়া আমার গতি ছিল না।

দুপুর রাত্রে তিনি গাড়ি নিয়ে এলেন। আমি তৈরী ছিলুম, গাড়িতে উঠে বসলাম। আমার নিরুদ্দেশের পথে অভিসার শুরু হল।

প্রথমে রেলের স্টেশন, সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে কাশী। ডাক্তারবাবু, শেষ কথাগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলি। সব কথা খুঁটিয়ে লিখতে ক্লান্তি আসছে।

লক্ষ্মণ আমাকে কাশীর একটা সরু গলিতে অন্ধকার একটা বাড়িতে তুললেন। আধবয়সী একজন স্ত্রীলোক এসে আমাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল, একটা সাজানো ঘরে বসাল। লক্ষ্মণ ঠিকে গাড়ির ভাড়া মেটাবার জন্যে পিছিয়ে ছিলেন, আমি তাঁর অপেক্ষা করতে লাগলুম। কিন্তু তিনি এলেন না। আধবয়সী স্ত্রীলোকটাকে প্রশ্ন করলুম, সে বলল, 'আসবেন, বাছা আসবেন। কত বাবু-ভায়েরা আসবেন। নাও এই শরবতটুকু খেয়ে ফেল। তেষ্টার সময়, শরীর ঠাণ্ডা হবে।'

সেই রাত্রে আমার জীবনে বেঁচে থাকার পালা শেষ হল, প্রেত-জীবন আরম্ভ হল। ভদ্রঘরের মেয়ে ছিলুম, পতিতা হলুম।

পরদিন সকালবেলা লক্ষ্মণ এলেন। তাঁকে দেখে আমি কেঁদে উঠলুম: 'আপনি কেন এই সর্বনাশ করলেন?'

তিনি নীরস নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বললেন, 'আমি তোমার যে-সর্বনাশ করেছি তার জন্য ভগবান আমাকে শাস্তি দেবেন। কিন্তু আমার বন্ধুকে বাঁচাবার অন্য কোনও উপায় ছিল না।'

'কিন্তু আমি কী অপরাধ করেছিলুম?'

'অপরাধ কেউ করেনি। তুমি আমার বন্ধুকে চেন না, আমি তাকে চিনি। তার মন তোমার দিকে ঝুঁকেছিল। আমি যদি তোমাকে চিরদিনের জন্যে তার সামনে থেকে সরিয়ে না দিতাম, সে হয়ত তোমাকে বিয়ে করত।'

'তাতে কি এতই ক্ষতি হত?'

'ক্ষতি হত। তার সর্বনাশ হত, দেশের সর্বনাশ হত। তাকে আমি জানি। তার মন একবার যেদিকে ঝুঁকবে সেদিক থেকে আর তাকে নড়ানো যাবে না। তার মনে প্রচণ্ড শক্তি আছে, কিন্তু সেই শক্তিকে পাঁচ ভাগ করে পাঁচ দিকে চালাবার ক্ষমতা তার নেই। সে যদি তোমাকে বিয়ে করত, তা হলে দেশের কাজ আর করত না, তোমাকে নিয়েই মেতে থাকত।'

'কিন্তু আমার কী হবে?'

'দেশের জন্যে অনেকে আত্মবলি দিয়েছে; যথাসর্বস্ব খুইয়েছে, প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে। আমি আজ এই মহাপাতক করলাম। কিসের কী ফল হবে জানি না, নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি। আমার বন্ধু যখন জেল থেকে বেরিয়ে তোমাকে খুঁজতে আসবে তখন তোমাকে পাবে না। পরে যদি তোমাকে খুঁজে পায়ও তোমার কাছে আসতে পারবে না। এই ভরসায় এত বড় পাপ করেছি। —চললাম। আর দেখা হবে না।'

তিনি চলে গেলেন।

তার পর কুড়ি বছর কেটে গেছে। সেদিন আমার যে-জীবন আরম্ভ হয়েছিল তাও শেষ হয়ে আসছে। আমার ঘরের দেয়ালে যে-দুটি ছবি দেখে আপনি ভুরু তুলেছিলেন তার মানে বোধ হয় এখন বুঝতে পারছেন। ভারত আজ স্বাধীন হয়েছে; ওঁরা দুজন ভারতের ভাগ্যবিধাতা। ওঁদের নাম জানে না এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই। ওঁদের আমি আর দেখিনি, কেবল ছবি টাঙিয়ে রেখেছি নিজের ঘরে। মাঝে মাঝে ভাবি, আমার কথা কি ওঁদের মনে পড়ে? দেশের কল্যাণে যিনি আমাকে নরকের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন আমার কথা মনে পড়লে তাঁর বুক কি বেদনায় টনটন করে ওঠে?

কিন্তু আমার কারুর বিরুদ্ধে নালিশ নেই। সবই আমার ভাগ্য, আমার জন্মান্তরের কর্মফল। তবু মনে প্রশ্ন জাগে, আমার সর্বনাশ না হলে কি ভারতবর্ষ স্বাধীন হত না?—

এবার শেষ করি। ডাক্তারবাবু, আমার পাপ-জীবনের সঞ্চয় মৃত্যুর পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা আপনাকে দিয়ে গেলাম। আপনার নিজের টাকার দরকার নেই জানি। কিন্তু আমার টাকাকে আপনি ঘৃণা করবেন না। টাকা কখনও নোংরা হয় না ডাক্তারবাবু। যত নোংরা স্থান থেকেই আসুক, টাকায় কলঙ্ক লাগে না। আপনি আমার টাকা নিজের বিবেচনামত সৎকার্যে ব্যয় করবেন।

আপনি আমার অন্তিম প্রণাম নেবেন।

ইতি—

সুলোচনা

ডাক্তারের ফুটনোট :—সুলোচনার টাকা আমার হাতে আসিলে আমি তাহা 'লক্ষ্মণের' নামে বেনামী চাঁদারূপে পাঠাইয়া দিয়াছি। 'লক্ষ্মণ' কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলের উচ্চস্থ ব্যক্তি, তিনি নিশ্চয় এই টাকার সদ্‌গতি করিতে পারিবেন।

(সি ১০৫৫/২)

মোসলেম ভাস্কর্য

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্কর্য বলতে যদি পাথর, পোড়া-মাটি, ধাতু বা অন্য উপকরণে মূর্তিরচনাকেই বুঝি, তা হলে মোসলেম ভাস্কর্য বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। ইসলামে মূর্তি-রচনা গুনাহ্। ইসলামের ধর্ম-আচরণের নীতি অনুসারে যে কোন প্রাণীর অবয়ব অঙ্কন বা রচনায় বারণ আছে।

এ-কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে ইসলাম মনে প্রাণে পৌত্তলিকতা-বিরোধী। মুহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে, আরব উপ-দ্বীপের সাবেক ধর্মপ্রথায় যে-পৌত্তলিকতার খাদ ছিল, তাকে চিরতরে বিনষ্ট করবার জন্যই ইসলামকে এতটা খড়্গহস্ত হতে হয়েছে। কে জানে কখন কোন্ ছুতোয় চাপা-পড়া মূর্তিপূজার বীজ আবার হয়ত মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। এই প্রথার প্রভাবকে সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হলে যাবতীয় প্রাণীমূর্তিকে বরবাদ করতে হয়। ইসলামী সংস্কৃতির প্রথম যুগে এই নিষেধ যথেষ্ট কড়াকড়ির সঙ্গে পালন করাও হয়েছে। অবশ্য, শেষের দিকে, বিশেষ করে ভারতীয় মুঘল আমলে, আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জহানের কালে এই নীতির যে প্রচুর ব্যতিক্রম ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই। প্রমাণস্বরূপ, অন্যান্য উদাহরণের মধ্যে, শুধু মুঘল চিত্রকলার উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। স্বল্পাকৃতি এই বর্ণচিত্র-গুলির বেলায়, আকবর ও বিশেষ করে জাহাঙ্গীর ও শাহজহান, সকলেই সমান উৎসাহ দেখিয়েছেন। পূর্ববর্তী কালের ধর্মীয় অনুশাসন, অন্ততঃ এই শিল্পকৃতি-গুলির বেলায় তাঁরা মানেননি। মুঘল দরবারে মাইনে-করা চিত্রকরেরা যথেষ্ট সম্মান প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছেন এবং তাঁদের শিল্পকর্ম শুধুমাত্র নির্জীব বিষয়বস্তুতেই যে সীমাবদ্ধ ছিল না এ-কথা সকলেই জানেন। তাঁদের অঙ্কিত বহু পট ও বর্ণচিত্র এখনও বর্তমান। সেগুলিতে বাদশাহ্, মন্ত্রী, আমীর, ওমরাহ্, সুবাদার, সেনাপতি, এমন কি রাজকীয় আস্তাবলের পেয়ারের হাতি-ঘোড়ার ছবি অবধি স্থান পেয়েছে। স্থান পাননি শুধু হারেম-সুন্দরীরা। ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য ততটা নয়, যতটা পর্দার খাতিরে তাঁদের বাদ পড়তে হয়েছে।

কিন্তু মুঘল পেইন্টিংয়ের বেলায় এই-জাতীয় লঘু নীতি অনুসৃত হলেও, মোসলেম ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে কখনই রাস এতটা আলগা হতে দেওয়া হয়নি। ফলে, মুসলমান স্থপতি ও ভাস্করেরা প্রতিভা-বিকাশের নিদারুণ তাগিদে প্রকারান্তরে খুঁজতে বাধ্য হয়েছেন।

হিন্দু ভাস্করেরা যখন পৌরাণিক কাহিনী আর তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর মূর্তিতে তাঁদের মন্দিরের দেওয়ালগুলি ভরিয়ে তুলবার অবকাশ পেয়েছেন; সুর-সুন্দরীদের অপরূপ লাস্য-ভঙ্গিমায় যখন অলঙ্কৃত করেছেন তাঁদের সাধের সৌধগুলি, তখন মুসলমান শিল্পীদের তুষ্ট থাকতে হয়েছে শুধু ফুল, লতা, পাতা আর জ্যামিতিক [illegible] নিয়ে। এর সুফল হয়েছে এই যে, হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ ভাস্করেরা মূর্তিকলার অগাধ ঐশ্বর্যে অবগাহন করবার সুযোগ পেয়ে যখন এই পরিধির বাইরের বিষয়বস্তু আহরণ করবার তাগিদ সাধারণত অনুভব করেননি, তখন মুসলমান ভাস্কর-দের অনুসন্ধানী দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হয়েছে দিকে দিকে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। এই অন্বেষণ যে ব্যর্থ হয়নি তার প্রমাণ অজস্র।

সব প্রথমে আলংকারিক লিপিশিল্পের (calligraphy-র) কথাই ধরি, যদিও মোসলেম জগতে ভাস্কর্য থেকে হাতে-লেখা

ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষেত্রেই তার প্রয়োগ হয়েছে বেশী। এই অপরূপ শিল্পকলাটির কোনও হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ তুলনা নেই। নিছক প্রয়োজনের অভাবেই অ-মুসলমান শিল্পীরা এদিকে দৃষ্টি দেননি, কেননা ভাস্কর্যের উপজীব্য বিষয়বস্তুতে তাঁদের ঘাটতি পড়েনি কোনদিন। কিন্তু অভাবে স্বভাব নষ্ট হতে না দিয়ে, মোসলেম শিল্পীবন্দেরা হস্তলিপির আলংকারিক ব্যঞ্জনাময় রূপটিকে সাদরে আহ্বান করে এনেছেন চিত্রকলার জগতে, ভাস্কর্যের আঙিনায়। এবং সে-প্রচেষ্টা যে কতদূর সফল হয়েছে সে-কথা কোরাণের অসংখ্য উৎকৃষ্ট প্রতিলিপি বা দিল্লির কুতুব-মসজিদ বা আজমীরের আড়াই-দিনকা-ঝোঁপড়া মসজিদের সুললিত ভাস্কর্য যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুরে, মালদহের পাণ্ডুয়া এবং সিকান্দ্রায় আকবরের কবরেও এ ধরনের ভাস্কর্যের ছড়াছড়ি। খোদাই-করা পাথরে এই অলংকারলিপির প্রয়োগকে ভাস্কর্য ছাড়া আর কী বলব? মূর্তি রচনা থেকে এ-শিল্প সম্পূর্ণ পৃথক। তবু যে আশ্চর্য মুনশিয়ানায় বহু মোসলেম স্থাপত্যের সঙ্গে এই অপরূপ অলংকরণ খাপ-খাওয়ানো হয়েছে, তাকে একান্তভাবে অতি উচ্চস্তরের ভাস্কর্য ছাড়া আর-কিছু বলা চলে না।

মুসলমান ভাস্করদের প্রতিভা আর-এক অভিনব দিকে প্রবাহিত হয়েছিল যেখানে অ-মুসলমান শিল্পীদের অবদান নেই বললেই চলে। আমি এনামেল করা টালি দিয়ে স্থাপত্যের বহিরঙ্গকে বর্ণসজ্জিত করবার রীতির কথা বলছি। এ-শিল্পের জন্ম ইরাণ দেশে হলেও, পরবর্তী কালে এর ব্যবহার সমগ্র মোসলেম-জগতেই ছড়িয়ে পড়ে। স্পেন থেকে ভারতবর্ষ অবধি এই ভাস্কর্যের ভূরি ভূরি নিদর্শন এখনও বর্তমান আছে। গৌড়ের কদমরসুল মসজিদে, আগ্রার চিনিকা-রওজাতে ও লাহোরের বিখ্যাত দুর্গে এই শিল্পকলার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মিলবে। ছোট ছোট টালির সমতল পিঠের একদিক কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিচিত্রবর্ণের এনামেলে সজ্জিত করা হত। সে-প্রসঙ্গ এই স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধে আলোচনা করবার অবকাশ নেই। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে এই রঙিন টালিগুলিকে পাশাপাশি সজ্জিত করে অতি সুচারু জ্যামিতিক নক্সাই শুধু সৃষ্টি করা হয়নি, ফুল, লতাপাতা, বিবিধ প্রাণী-চিত্র, এমনকি শিকারের জটিল দৃশ্য অবধি অঙ্কিত করা হয়েছে।

এই টালি-সজ্জা থেকে আর-এক ধাপ এগিয়ে মুসলমান শিল্পীরা মার্বেল মোজায়েক ও পিয়েত্রা-দুরার মনোমুগ্ধকর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। কাশ্মীরী কাঠের টেবিলের উপর হাতির দাঁতের কাজ অনেকেই দেখে থাকবেন। পূর্বকল্পিত নক্সা অনুসারে, নরুনের মত সরু ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাঠ খোদাই করে নিয়ে সেই খাতে হাতির দাঁতের পাতলা চিলতে বসিয়ে দেওয়াই এই শিল্পের পদ্ধতি। অনুরূপ-ভাবে, এক রঙের মার্বেলকে খোদাই করে সেই গর্তে অন্য বিবিধ রঙের মার্বেলের টুকরো নিপুণভাবে বসিয়ে দেওয়ার শিল্পকে মার্বেল-মোজায়েক বলতে পারি। পিয়েত্রা-দুরার ক্ষেত্রে, খোদাই-করা মার্বেলের গহ্বরে অন্য রঙের মার্বেল না বসিয়ে, মূল্যবান প্রস্তর যেমন, চুনি, পান্না, পোখরাজ বৈদুর্যমণি প্রভৃতির সমাবেশে চিত্ররচনাই রীতি ছিল। আগ্রার ইতিমদ্-উদ্দৌলায় ও সিকান্দ্রার আকবরের সমাধিসৌধে মার্বেল-মোজায়েকের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন এখনও বর্তমান আছে। আর পিয়েত্রা দুরার অলংকরণে তাজমহলকে একদা যে-রকম অপরূপভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল, তেমনটি বোধ করি আর-কোথাও হয়নি।

পারস্য-জাত এই সুকুমার ভাস্কর্যরীতি দুটি জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলেই ভারতবর্ষে বিশেষ প্রসারলাভ করে। কোন কোন সমালোচক পিয়েত্রা-দুরার রীতিটিকে ইটালির ফ্লোরেন্স থেকে আমদানি বলে মনে করেন। তাঁদের ধারণার প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে তাজমহলের অঙ্গসজ্জার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন অস্টিন-দ্য-বর্দো নামে এক ফ্লোরেন্সবাসী শিল্পী। একথা মনে করবার কোন ঐতিহাসিক কারণ নেই যে এই বিদেশী শিল্পীটির ভারতে আগমনের পূর্বে ভারতীয় কারিগরেরা পিয়েত্রা-দুরা পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। মার্বেল মোজায়েক থেকে পিয়েত্রা-দুরা মূলত পৃথক নয়। পার্থক্য শুধু বহুমূল্য পাথরের ব্যবহারে। মুঘল আমলে ইমারত তৈরির অজুহাতে যে-অর্থের স্রোত প্রবাহিত হয়েছে, তাতে নিছক আর্থিক কারণে পিয়েত্রা-দুরা পদ্ধতির সূচনা তাজ-মহল নির্মাণের সময় অবধি অপেক্ষা করে ছিল এ-কথা মনে হয় না। অস্টিন-দ্য-বর্দো স্থানীয় শিল্পীদের কারুকলার উপরে আরও কিছু রঙ-পালিশ চড়িয়েছিলেন এইমাত্র।

পিয়েত্রা-দুরার ফুল, লতাপাতা বা জ্যামিতিক অলংকরণের সমারোহে তাজমহল বা অন্যান্য মুঘল সৌধ একদা যে-অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত ছিল আজ তা চেষ্টা করে আন্দাজ করতে হয়। খোদাই করে বসানো মণিরত্ন চুরি হয়ে গিয়েছে বহুকাল। তার জায়গায় বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে সস্তা উপকরণ দিয়ে। সাবেক ঔজ্জ্বল্যের আজ আর-কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই: শুধু নক্সা-গুলির অপরূপ বিন্যাস ধারণা করা যায় মাত্র।

পাথর খোদাই করে যেখানে রূপসৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছে, আগেই বলেছি, মুসলমান ভাস্করদের সেখানে নিষেধের জোরে বাধা হয়েছে পদে পদে। মূর্তি রচনার অসীম ঐশ্বর্য থেকে বিচ্যুত হয়েও তাঁরা শুধুমাত্র ফুল, লতাপাতা, জ্যামিতিক নক্সা ও কচিৎ কদাচিৎ পশু-পাখি, প্রজাপতি প্রভৃতিকে উপজীব্য করে যে-কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা বিস্ময়কর। হিন্দু-ভাস্কর্যেও পত্র-পুষ্পের স্থান আছে এবং সে-স্থান কিছুমাত্র নগণ্য নয়। তুলনায়, মোসলেম কৃতিত্বগুলির থেকে তা হীন না সরেস, সেকথা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। উভয়
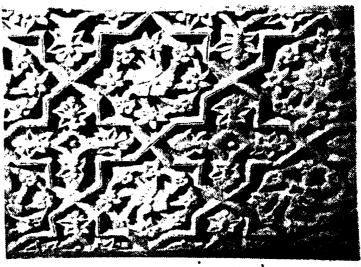
জ্যামিতিক ভাস্কর্য : ফতেপুর সিক্রি

গোষ্ঠীর কারিগরেরাই এক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। গুপ্ত বা হয়সালা ভাস্কর্যের তুলনায় আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রির খোদাই পাথরের মোসলেম ভাস্কর্যগুলি নিতান্ত নিকৃষ্ট নয়। তবে এ-কথা স্পষ্ট যে মোসলেম ভাস্কর্যের নক্সাগুলির উপর হয়সালা ভাস্কর্যের মত অতি-অলংকরণের গুরুভার চাপানো হয়নি। সহজ, সরল ও পরিচ্ছন্ন কারিগরি মোসলেম ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য। এ-ছাড়া অন্য বৈশিষ্ট্যও আছে; পাথরের উপর জ্যামিতিক চিত্রাংকণ মোসলেম ভাস্কর্যের একচেটিয়া, যার কোন হিন্দু তুলনা নেই। সারনাথের ধামেকস্তূপে যে-জ্যামিতিক নক্সাগুলির অস্তিত্ব এখন লুপ্তপ্রায়, হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ শিল্পক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম মাত্র। মোসলেম ভাস্কর্যের এলাকায় জ্যামিতিক রূপায়ণের যে-এলাহী কারবার হয়েছে, অন্যত্র তার ভগ্নাংশমাত্র হয়েছে কিনা সন্দেহ।

শ্বেত-পাথর বা বালি-পাথরে ছিদ্র করে জালি বা জাফ্‌রির কাজকে জ্যামিতিক ভাস্কর্যের অগ্রসর রূপ বলতে পারি। পদ্ধতি মোটামুটি একই। সমতল পাথরের টুকরোর উপর নক্সা এঁকে নিয়ে অন্যান্য শেষে বাটালি চালাতে হয়েছে উভয় ক্ষেত্রেই। জাফ্‌রির কাজে অবশ্য ধৈর্য ও সাবধানতা অনেক বেশী প্রয়োজন হয়েছে, কেননা, এ-পিঠ ও-পিঠ অসংখ্য ছিদ্র করবার সময়ে পাথর ভেঙে যাবার আশংকা থাকত সর্বক্ষণই। এই জালির কাজের হিন্দু-তুলনা যে একেবারেই নেই তা নয়। খাজুরাহো বা হালেবিড়-বেলুড়ের মন্দিরগুলিতে এই-জাতীয় ভাস্কর্য অল্পবিস্তর আছে যা সমপর্যায়ের মোসলেম শিল্পনিদর্শনগুলির তুলনায় অতিশয় নগণ্য। জাফরির কাজে অভিজ্ঞতা না থাকার জন্যই অধিকাংশ হিন্দু-মন্দিরের গর্ভগৃহগুলি অন্ধ-কুঠরিতে পরিণত হয়েছে। আলো প্রবেশের এই আচ্ছাদিত বাতায়নের কল্পনাটিকে মোসলেম ভাস্করেরা যে চূড়ান্ত রূপসৃষ্টির পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন তা আগ্রার ইতিমদ-উদ্-দৌলা, ফতেপুরসিক্রির শেখ সলিম চিশ্‌তির করব ও আহমদাবাদের সিদি সৈয়দ মসজিদের জাফরির কাজ যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন।

প্রসংগত, একটি কথা বলে এই সংক্ষিপ্ত [illegible] প্রবন্ধ শেষ করব। [illegible] যশোরেশ্বরী কালীর মন্দিরে শ্বেত-পাথরের উপর অপূর্ব জালির কাজ আছে। এগুলির কারিগরও হিন্দু, যেমন অধিকাংশ মোসলেম ভাস্কর্যের কারিগরও হিন্দুই ছিলেন। কথাটা আশ্চর্য শোনালেও সত্যি। একমাত্র রঙিন টালির কাজ ছাড়া, মুসলমান শিল্প-নির্দেশকদের ভারতীয় অ-মুসলমান কারিগরদের উপর প্রভূতভাবে নির্ভর করতে হয়েছে। ভাস্কর্যের কোন পদ্ধতিতেই এদেশীয় মিস্ত্রীরা অনভিজ্ঞ ছিলেন না। ফলে, নতুন প্রণালী আয়ত্ত করতে তাঁদের কিছুমাত্র বেগ পেতে হয়নি। এ-প্রবন্ধে মোসলেম ভাস্কর্য বলতে আমি এ-কথা বোঝাতে চাই না যে, এই চারুকলার আগা-গোড়া—মায় পরিকল্পনা থেকে খোদাই [illegible]—কেবলমাত্র মুসলমান কর্মীদের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়েছে। বস্তুত, ভারতীয় মোসলেম ভাস্কর্য বলতে আমি এ-কথা [illegible]: তার একটি মুসলমান শিল্প-[illegible]দের অনুপ্রেরণা, অপরটি (প্রধানত) অ-মুসলমান কারিগরদের দক্ষতা।

[আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত]

লিপিভাস্কর্য : কুতুবমিনার

কণ্ঠকণ্ডূতি

সতীনাথ ভাদুড়ী

মাইক-এর নীচের একটা টিনের চাকতির উপর বড় বড় করে লেখা "জিরানিয়া-কোয়ল", অর্থাৎ জিরানিয়া জেলার কোকিল। যে দোকান থেকে মাইক আর লাউডস্পীকার ভাড়া করা হয়েছে সেই দোকানের নাম। আবার যাঁর দোকান তাঁরও নাম ওই, লোকে সংক্ষেপে বলে কোয়লজী। শহরের সবাই দেখেছে সেই দোকানের সাইনবোর্ডের নীচেই ঝোলান থাকে একটা খাঁচা, সকালে বিকালে। খাঁচার বাসিন্দা একটা পোষা ঘুঘু পাখি। অদ্ভুত শখ কোয়লজীর। ত্রিভুবনে আর কেউ কোথাও ঘুঘু পুষেছে কিনা সেকথা এখানকার কারও জানা নাই। তারা জিজ্ঞাসা করে—একটা কোকিল পুষলেন না কেন? তাহলে তবু সাইনবোর্ডের নামটার সঙ্গে একটু সংগতি থাকত। কোয়লজী জবাব দেন না, শুধু মৃদু হাসেন। কথা তিনি পারতপক্ষে বলতে চান না। কেন চান না সেকথাও শহরের কারও অজানা নয়।
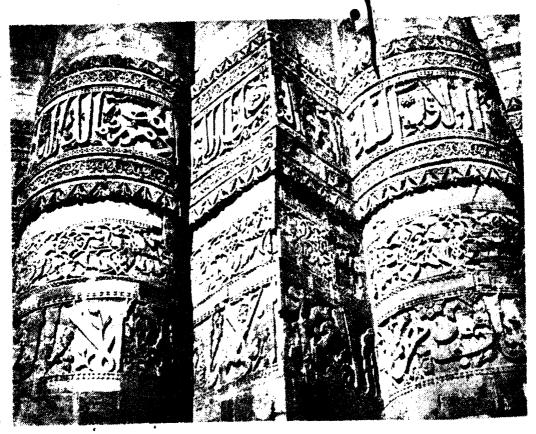
খানিক আগেই আর একবার "মাইক" খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মজবুত কোয়া-

কাপড় ছেঁড়বার সময় একরকম শব্দ হয় না? ফ্যাঁশ—চিড়-চিড়-চড়াক? সেইরকম লাগছে "মাইক"-এ ফাটা-ফাটা গলায় বলা অস্পষ্ট কথাগুলো। কি যেন একটা ধরবার জিনিসের অভাবে ফসকে আলগা-আলগা হয়ে যাচ্ছে গলার স্বরটা। অভ্যস্ত কান না হলে বোঝা শক্ত কী বলছে। আমার অবশ্য কোয়লজীর কথা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। এক সময় আমরা সহকর্মী ছিলাম। এখনও মাঝে মাঝে ওর রেডিও, লাউড-স্পীকারের দোকানে গিয়ে বসি। নিজের নিজের সুখ-দুঃখের গল্প করে আজও মনের বোঝা হাল্কা করি আমরা। আজ-কাল ও সাধারণত কথা বলে ফিস-ফিস করে। সে সময় ওর কথা বেশ বোঝা যায়। বোধহয় ওর ঠোঁটনাড়ানোটা কাছ থেকে দেখতে পাওয়া যায় বলে কথাগুলোকে অত স্পষ্ট মনে হয় তখন। এখন মাইকের সম্মুখে দাঁড়িয়েও সেই রকম আস্তে কথা বলছে না কেন। তাহলে হয়ত ওর গলার স্বরের বিকৃতি মাইকে শতগুণ বড় হয়ে এমনভাবে শ্রোতাদের কানকে পীড়া দিত না।

"এক। দুই। তিন।"

বলছে ত এই কথা কয়টিই বারে বারে। এর জন্য আবার এত বাবরি-চুল নাড়াবার ঘটা কিসের। যাত্রার মত এমন গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বলবারই বা দরকার কী! আজকে তার হল কি। অন্য কোন সভাসমিতিতে ত ও "ফিট" করবার সময় মাইকের কাছে যায় না—এক, দুই, তিন বলবার জন্য। ও চিরকাল বসে থাকে দূরে, অ্যামপ্লিফায়ার-টার কাছে। সেখান থেকে বোতাম টিপে মিস্ত্রির এক-দুই-তিন বলার স্বর নিয়ন্ত্রণ করে। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সভাসমিতিতে মাইকভাড়া দেবার কাজ তাকে নিতে হয়েছে, কিন্তু কতকগুলো অযোগ্য বক্তার গলার স্বরের দুর্বলতা ঢাকবার যন্ত্রটাকে সে চিরকাল অবজ্ঞার চোখে দেখে এসেছে। যন্ত্রটা তার অন্নদাতা। দুর্দিনে উচ্ছিষ্ট অন্ন দিয়ে সাহায্য করছে ঠিকই, কিন্তু তার জন্য এটাকে পুজো করতে পারে না, এই ছিল কোয়লজীর মনের ভাব। জানি ত তাকে।

"হেল্লো। হ্যান। টৌ। থ্রি।"

মিস্ত্রিটাকে দিয়ে বাজিয়ে নিতে পারত কথা করতা। কথা না বলে, শুধু তুড়ি [illegible] তালি দিয়েও ত পরীক্ষা করতে পারতেন মাইকটা ঠিক কাজ করছে কিনা।

লোকজন এসেছে বেশ। শামিয়ানার মধ্যে আঁটেনি। কম্পাউণ্ডের বাইরে গেট ছাড়িয়ে রাস্তা পর্যন্ত যতদূর দেখা যায়, অগণিত লোকের মাথা মনে হচ্ছে জমে চাপ বেঁধে গিয়েছে। বাঁ পাশের বারান্দায় চিকের আড়ালে মহিলারা আছেন। বেদীর পিছনের দিকে সাওজীর বাড়ীর অন্দর-মহলের একটা দরজা। এতগুলি অধৈর্য ব্যক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টি গিয়ে কেন্দ্রিত হচ্ছে কোয়লজীর দিকে। দোকানের সুনাম ও কোয়লজীর সম্মান আর বুঝি অক্ষুণ্ণ রাখা গেল না। তবু তার ভাবভঙ্গীতে, বিন্দু-মাত্র অপ্রস্তুত হয়েছে বলে বোঝা যাচ্ছে না। [illegible]মি প্রথম সারিতে বসেছি কিনা, তাই [illegible] খুঁটিয়ে দেখতে পাচ্ছি।

গাঁদাফুলের মালা-গলায় মিসিরজীর দৃষ্টি এখনও রামায়ণের পুঁথির উপর। [illegible]নাপূর্ণ চোখে তিনি তাকিয়ে রয়েছেন মাইকের কাছের অসহায় ভাগ্যবিড়ম্বিত লোকটির দিকে। জনকপুরের বিখ্যাত রামায়ণদলের দলপতি ইনি। দেশজোড়া এঁর রামায়ণগানের খ্যাতি। সাধক-ভক্ত বলেও এঁর নাম আছে। এই জনকপুর রামায়ণ কোম্পানির জন্য লোকেরা রাম-র[illegible] ছেড়ে [illegible] করে, সখী [illegible] নাচে, মিসিরজীর দম ফুরিয়ে এলে গান গায়। মিসিরজী নিজে কোন দিনই এই অভিনয়-গুলোতে নামেননি। গান ছাড়া, শুধু নাচারটি দেখাতেন মাথায় থালায় একশ-আটটা প্রদীপ নিয়ে। বুড়ো হয়ে আজকাল তা নাচতে পারেন না। দলের সঙ্গে নাচিয়ে গাওয়াও আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়েছেন। গলার সে জোর আর নাই। বহু টাকা পেলে তবেই না কোথাও যান, আগে থেকে বলে দেন যে লাউডস্পীকার ফিট করা চাই-ই চাই। তাই ডাক পড়েছিল জিরানিয়া-কোয়লের। এর আগে কখনও সাওজীর বাড়ির রামনবমীর উৎসবে মাইক ফিট করবার দরকার পড়েনি। বুড়ো সাওজী বড়, ছেলেমেয়ে নাতিপুতি রেখে গত বছর স্বর্গে গিয়েছেন। তাঁর বিধবা স্ত্রী, পয়সা খরচ করে যতদূর পুণ্য সঞ্চয় করা যায়, তাতে ত্রুটি রাখতে চান না। সেইজন্যই এবার এত খরচ করে মিসিরজীকে আনান হয়েছিল। জনকপুর রামায়ণ কোম্পানিতে নাচগানের বন্দোবস্ত থাকলে কি হবে। উনি ত বিধবা বলেছেন, সেসব হবে না। ওসব ভেজাল আজ নয়, এত বড় একজন সাধক-ভক্তকে যখন পাওয়া গিয়েছে, রাম-নবমীর দিনে, তখন সবটুকু যা পারেন মিসিরজী একাই করবেন। সেইজন্যই আজ এত ভিড়।

মাইক ঠিক হয়ে গিয়েছে। রামায়ণ গাওয়ার আরম্ভ হল। শ্রোতাদের সঙ্গে ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তবে লোকের চেঁচামেচিতে ভাল করে গান শোনবার উপায় নেই। পাশের যুবকের দল এক মিনিটের জন্যও নিজেদের কথাবার্তা বন্ধ করেনি। বেদীর পিছনে কিছু দূরে অন্দর-মহলের দরজার দিকে "অ্যামপ্লিফায়ার"টা রাখা আছে। কোয়লজী গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেইখানে। কিছুক্ষণ পরে বসল আরাম করে। এতক্ষণে বোধহয় সে মাইক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। বসে বসে পা নাচাচ্ছে আপন মনে। আর গান শুনতে শুনতে অ্যামপ্লিফায়ার-এর বাক্সটার উপর আঙুল দিয়ে তাল দিচ্ছে। আজকাল সবাই তাকে সংকোচকাতর, গম্ভীর প্রকৃতির লোক বলেই জানে। সেজন্য এখনকার এই লঘু চাপল্যটুকু লোকের নজরে পড়বার কথা।

চিরকাল কিন্তু সে এরকম গম্ভীর প্রকৃতির ছিল না। রাজনৈতিক জীবনে থাকবার সময় তার উচ্ছল উৎসাহ ও চটুল কর্মব্যস্ততা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তার উপর আবার চেহারাটি ভাল, মাথায় বাবরি চুল, একটু নাটুকে ভাব। আমরা অনেক সময় ঠাট্টা-তামাসা করতাম সংগঠনের নিমিত্তিতে তার এই অকারণ কর্মব্যস্ততা নয়; কিন্তু সেসব ত বহুকাল আগের কথা। তখন বয়স ছিল কম; শোভন-অশোভনের মান ছিল আলাদা; দশজনের, বিশেষ করে দলের উপরওয়ালাদের নজরে পড়াটাই ছিল জীবনের লক্ষ্য। এখন কোন-রকমে দিনগত পাপক্ষয় করবার জন্যই কোয়লজী দোকানটা চালায়; কিন্তু আজ একটু অন্যরকম অন্যরকম লাগছে তাকে। সকাল থেকেই। ভোরবেলাতেই আমার বাড়িতে গিয়েছিল, মিসিরজীর গান শুনতে যাবার জন্য অনুরোধ করতে। বলেছিল, এ-সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। কোথায়? শুক্লজীর বাড়িতে? এতকাল পরে আবার? সেই আস্তাবলে নয়ত? আমার পরিহাসের উত্তর দিয়েছিল কোয়লজী, তার মুখের সলজ্জ হাসিটুকু দিয়ে। তারপর বিকালে আসবার সময় আমাকে সঙ্গে করে ডেকে নিয়ে এসেছিল। তার কৃপাতেই, প্রথম লাইনে বসবার জায়গা পেয়েছি এখানে। না এলেই ভাল ছিল। একটু ধর্মভাব না থাকলে শ্রোতার পক্ষে রামায়ণ গানের রস নেওয়া কঠিন। ধর্মকর্মের বালাই আমার নেই। অনুরোধে পড়ে এসেছি। কাজেই মিসিরজীর গান আমার বিশেষ ভাল লাগছে না। কানে আসছে; মাঝে মাঝে ভাল করে শোনবার চেষ্টা করছি; কিন্তু মন বসাতে পারছি না। যে দুইজন রামায়ণ-কোম্পানির লোক মিসিরজীর দুপাশে বসে

বসে বসে পা নাচাচ্ছে আপন মনে

নেকড়া দিয়ে অনবরত তার চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে, তাদের মাসিক বেতনের পরিমাণ মনে মনে আন্দাজ করবার চেষ্টা করছি। পাশের যুবক দলের রসাল টীকা-টিপ্পনীগুলো না শুনে উপায় নাই। শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজনের উপর তারা নজর রেখেছে। যতবার মিসিরজীর চোখ মোছান হচ্ছে, ততবার নাকি তাঁরাও যন্ত্র-চালিতের মত নিজেদের চোখ মুছছেন। ওরা ধরে ঠিকই। যে লোকটা মিসিরজীকে পাখা করছে, সে দেখলাম সত্যিই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলছে। মোট কথা, এই সব নানা জিনিস মিলিয়ে গানের আসর বেশ জমে উঠেছে। এমন সময় হঠাৎ মাইক খারাপ হয়ে গেল আবার। মিসিরজী প্রথমটায় বুঝতে পারেননি; তিনি চোখ বুজে গান গেয়ে চলেছেন। পাশের লোক দুইজন তাদের চোখের জল মোছাবার ডিউটি বন্ধ করেনি। কানে এল যে শ্রোতাদের মধ্যেও কে কে যেন দেখাদেখি নিজের নিজের চোখের জল মুছে চলেছেন, মাইক অকেজো হবার পরেও। আমি কিন্তু দেখছি কোয়লজীকে। দ্রুত পদক্ষেপে সে চারিদিকে

ঘুরে ঘুরে নাড়াচাড়া করে দেখছে যন্ত্রটার কোন্ অংগ রোগগ্রস্ত। বেদীর কাছে গিয়ে মিসিরজীর পায়ে হাত দিয়ে গান থামাতে অনুরোধ করল বেশ সপ্রতিভ-ভাবেই। আবার গেল অ্যামপ্লিফায়ারটার কাছে। মুখ-চোখ দেখে বোঝা গেল যে, এতক্ষণে সে রোগ নির্ণয় করতে পেরেছে। মিনিট খানেক এদিক ওদিকে ছুটোছুটি করে গিয়ে দাঁড়াল মাইকের সম্মুখে। মিস্ত্রিটা কোয়লজীর কাছে গিয়ে কি যেন বলছে। বোধহয়, দোকান থেকে আর-একটা যন্ত্র নিয়ে আসবে কিনা, সেই কথা জিজ্ঞাসা করছে। কিংবা হয়ত অন্য কোন বেফাঁস কথা বলেছে। নইলে কোয়লজী ওরকম চটে উঠবে কেন। না! না! না! কোয়লজী অনুমতি দেয়নি। আঙুল দেখিয়ে মিস্ত্রিটাকে অ্যামপ্লিফায়ারের কাছে বসতে বলল স্বর-নিয়ন্ত্রণের বোতামটা ধরে। মাথার এক ঝাঁকানিতে বাবরি চুল ছড়িয়ে নিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে সে দাঁড়িয়েছে মাইকের সম্মুখে; ঠিক সেকালে যেমন করে দাঁড়াত। গেটের বাইরের সরকারী রাস্তা পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে সে দেখছে সম্মুখের

অগণিত লোকজনকে। একটু বুঝি আনমনা হয়ে গিয়েছে। তারপর চিৎকার করে মাইকে আরম্ভ করল—হেল্লো! হেল্লো! হান! টো! থিরি! ……হেল্লো! হান! টো! থিরি।

বেদীর উপর চেয়ারে উপবিষ্ট আড়ষ্ট রাম-সীতার মধ্যেও দৃষ্টি বিনিময় হল। পাশের লোকরা হাততালি দিচ্ছে। একজন চিৎকার করে বলে ওঠে—"মধুর! মধুর!"

"প্রেম নিবেদন করছে রে!"

"গান গাইছে বোধহয়।"

"হাপর চালাচ্ছে, হাপর!"

ছাত্রের দল নিশ্চয়ই। এরা বোধহয় বাইরে থেকে এসে এখানকার কলেজে নতুন ভর্তি হয়েছে। কোয়লজীর গলার স্বরকে নিয়ে এমন নির্দয় রসিকতা এখানকার কোন লোকের দ্বারা সম্ভব নয়। এই সেবারও ভোটের সময় জেলার হাজার হাজার লোকে স্বাক্ষর করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একখানা আবেদনপত্র দিয়েছিল—পুরাতন রাজনীতিক কর্মী জিরানিয়া কোয়লকে চিকিৎসার্থে সরকারী খরচায় ভিয়েনা পাঠাবার জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস সত্ত্বেও অবশ্য আবেদন-পত্রে কোন ফল হয়নি; কিন্তু এর থেকেই বোঝা যায়, এখানকার লোকে কীরূপে সম্ভ্রম ও স্নেহের চোখে দেখে কোয়লজীকে।

কী করে যেন ভিয়েনা শহরের নামটাও কোয়লজীর নামের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে ওর প্রথম অসুস্থতার সময়, যখন রাজধানীর হাসপাতালে ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম, তখন থেকেই। সেখানকার এক ডাক্তার বলেছিলেন যে, ভিয়েনা ছাড়া আর কোথাও এ-রোগের চিকিৎসা হয় না। কোথা থেকে যে মানুষের কী বিপদ আসে! বিপদটা প্রথম এসেছিল একটা ইলেকশনের মরশুমে। শীতকাল। আমরা এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রামে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি। একদিন সকাল বেলায় সে বলল, ঢোক গিলতে লাগছে। পরের দিন থেকেই দেখা গেল, তার গলার স্বর বার হচ্ছে না। তার গলার কোন রোগের কথা এর আগে শুনিনি। বরঞ্চ মাথা ধরার কথা সে প্রায়ই বলত। আর বলত যে, বক্তৃতা দিতে ওঠবার মুহূর্তে তার কানে তালা লেগে যায় এবং গলার স্বরও অস্বাভাবিক তীব্র হয়ে ওঠে, নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও। তারপর মিনিট খানেক নিজের বক্তৃতার স্বর কানে এলে সে-ভাবটা কেটে যায়। এছাড়া তার কোন রকম গলার অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা তার মুখে শুনিনি এর আগে।

ওষুধ-বিষুধ কিছুতেই ফল হল না। আমি আশ্বাস দিই—"ভয় কী। সেরে যাবে।" শুনে সে আমার হাত চেপে ধরেছিল। চোখে জল। আমার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়প্রত্যয়ের অভাবটাক সে ধরে ফেলেছিল অনায়াসে। কণ্ঠধ্বনি নিয়ে কম মাথা ঘামায়নি ও কোয়লজী সারাজীবন। কথার ধ্বনির মাদকতার স্বাদ পেয়েছিল সে ছোটবেলা থেকে। চানাচুরওয়ালার ছেলে কিনা। তখন ওর নাম ছিল বিরজু। চানাচুর বিক্রির কাজে বাবাকে সাহায্য করতে হত মেলার মরশুমে। এই চানাচুর বিক্রির সূত্রেই তাকে প্রথম অনর্গল কথার পর কথা সাজানর অভ্যাস আয়ত্ত করতে হয়। তার বাপের কথার বাঁধুনি ছিল বেশ। বাপ শিখিয়েছিল, "এক কলি গাইবার সময় নিজের বলা কথার আওয়াজটা নিজের কানে ধরে রাখবি। ওই আওয়াজের মুশলাতে গরমাজে তবে না মন পরের কলিরগুলোকে বার হতে দেবে। কান দিয়ে ঢুকে কথার আওয়াজটা মনের মধ্যে থেকে সংগী-সাথীদের ঠেলে বার করে। তাই না সময় মত কথা যোগায় মুখে।"

বাপের শেখানো চানাচুর তৈরির প্রক্রিয়াটা তার জীবনে কোন কাজে আসেনি; কিন্তু যখন-তখন মুখে মুখে কথা সাজানর কৌশলটা বিরজু অবিচলিত নিষ্ঠায় আয়ত্ত করেছিল। তার দরাজ গলাও বাপের কাছ থেকে পাওয়া। বাপ তাকে গ্রামের পাঠশালায় ভরতি করিয়েছিল। সেখান থেকে উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষায় একটা বৃত্তি পেয়ে সে এসে শহরের স্কুলে সবচেয়ে নীচের ক্লাসে ভরতি হয়। বয়স তখন তের-চৌদ্দ। বক্তৃতা দেবার নেশা তার তখন থেকেই। তখনই সে দশজনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেবার সুযোগ খোঁজে। তাই এই ছোট শহরের লোকজনের নজরে পড়তে ওর সময় লাগেনি। সেই সময় হল এখানে প্রাদেশিক যুব-সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন। সভা-নেত্রী হয়ে যিনি এসেছিলেন, ভরত-জোড়া তাঁর নাম। ইংরেজী ও উর্দুতে ভাষণ দেবার তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা। স্কুলের ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে বিরজু। বক্তৃতার মধ্যে সে সভানেত্রীকে ভারত-কোইলিয়া (ভারত-কোকিলা) বলে সম্বোধন করে। উত্তরে তিনি বিরজুকে জিরানিয়া-কোয়ল নামে অভিহিত করেন। সভাভঙ্গের পর ভারত-কোইলিয়া জিরানিয়া-কোয়লকে কাছে ডেকে পিঠ চাপড়ে আদর করেছিলেন। হাসতে হাসতে তাকে বলে-ছিলেন, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। কথার সুরে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, বাগ্মিতার জোরে বিরজু নিশ্চয়ই দেশের একজন গণ্যমান্য নেতা হবে। জেলার লোক বিরজুর জন্য গর্ব অনুভব করেছিল সেদিন। সেই থেকে বিরজু হয়ে গেল জিরানিয়া-কোয়ল—সংক্ষেপে কোয়লজী। সেই থেকে কোয়লজীর চোখের সম্মুখে স্বপ্নরাজ্যের দুয়ার খুলে গেল…… তার ভাষণ শোনবার জন্য লোক ভেঙে পড়ছে……ফুলের মালা গলায় দিয়ে সে সারা দেশ সফর করে বেড়াচ্ছে……জয়ধ্বনি দিচ্ছে……খবরের কাগজে ছবির ফটো বার হচ্ছে……আরও কত খবরের কথা……

বক্তৃতা দেবার সহজাত ঝোঁকটা একটা লক্ষ্যের সন্ধান পেয়ে আরও জেঁকে বসল তার মনে। এতকাল সে সুযোগ খুঁজে বেড়াত পণ্ডিতজীর ফেয়ারওয়েল মিটিং-এ, স্কুলের প্রাইজ বিতরণ সভায় বা পাড়ার তুলসী-জয়ন্তী উৎসবে। কিন্তু এবার থেকে সে মাথামাথি আরম্ভ করল এক রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। বক্তৃতা দেবার এমন সুযোগ-সুবিধা সেই প্রতিষ্ঠানের বাইরে তখন বিশেষ ছিল না।

এদিকটা ত সবই আশানুরূপ হল; হল না শুধু পড়াশোনার দিকটা। যে-লোকটা যেকোন বিষয়ের উপর অনর্গল বক্তৃতা [illegible]র মত বুদ্ধি রাখে, সে যে চেষ্টা করেও [illegible] কাজ-চালানো গোছের ইংরেজী রপ্ত [illegible]তে পারল না, জানি না। সেই নীচের [illegible] পর পর তিনবার ফেল করে তাকে [illegible] ছেড়ে দিতে হয়। সুবিধার মধ্যে [illegible]শে তখন একটা জাতীয় আন্দোলনের [illegible]ড়ক চলছে। তারই মধ্যে বিরজু নিজেকে ডুবিয়ে দিল তখনকার মত।

[illegible]ই সময় থেকে তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা।

[illegible]সরজীর রামায়ণ গান চলেছে। শ্রোতারা নড়েচড়ে আবার শান্ত হয়ে বসে। টিকের আড়াল থেকে ছোটছেলের একটানা কান্নার আওয়াজ পাশের যুবকের দলের মেজাজ খারাপ করে দিচ্ছে। চিৎকার করে তারা ছেলের মাকে তাঁর বর্তমান কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করে দিল। কোয়লজী দাঁড়িয়ে রয়েছে পিছন দিকে অ্যাম্প্লিফায়ার-এর কাছে। সে আজ খদ্দরের জামা-কাপড় পরে এসেছে। আগে খেয়াল করিনি। ইদানীং দেখতাম সে খদ্দর পরা ছেড়ে দিয়েছিল। আজ দেখছি তার সবই অন্যরকম।

এক সময় ছিল, যখন সে মাথায় করে বাড়ি-বাড়ি নিয়ে গিয়ে খদ্দর বেচত। এই শাওজীর বাড়ির পাঁচিলের বাইরে খান-কয়েক ঘর আছে, সহিস, কোচমান, ড্রাইভার-দের থাকবার জন্য। তারই একখানা ঘরে সে তখন থাকে। সবে জেল থেকে বেরিয়েছে। রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের বাড়িটা তখন গভর্নমেণ্টের হাতে। ড্রাইভার সাহেবের কৃপায় এখানে মাথা গোঁজবার জায়গা পেয়ে সে বেঁচে যায়। চানাচুর বিক্রি করতে সম্ভ্রমে বাধে। তাই দিনে স্বরাজের গান গেয়ে খদ্দর ফিরি করে বেড়াত, রাতে এসে এই ঘরে থাকত। ওই সময় আমিও কতদিন ওর ঘরে এসে আড্ডা মেরেছি। কত সময় তার জন্য ভাত-তরকারি নিয়ে গিয়েছি

...র করে। মনে আছে একটা ... সে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করত ... কি না। মিউনিসিপ্যালিটির ...র এপার পর্যন্ত শাওজীর জমি। ... থাকলে সে টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে ...য়ে বসত ড্রেনের ওপারে, রাস্তার ধারে। ...ত যে, শাওজীরা বৈষ্ণব, তাঁদের সংগে ... বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। একটু ...বাড়ি না? কে দেখতে আসত সেখানে! ...ছাড়া আমি নিজের চোখে সেখানে সহিস-...গাচমানকে ইঁদুরে পুড়িয়ে খেতে দেখেছি। ...লেও, ও নিজের জিদ ছাড়ত না। আরও ...ক্ষ্য করতাম যে, তার সৎ-অসৎ জ্ঞান ...ওজীর বেলায় যেমন সজাগ, অপরের ...ক্ষে তেমন ছিল না। এর মূলে বোধহয় ...ল তার গহন মনে লুকানো একটা দোষী ...দাবী ভাব। তখন বুঝতে পারিনি; একথা ...নুমান করেছিলাম বহুকাল পরে, তার ...নজের মুখ থেকে একটা অভিজ্ঞতার ...বরণ শুনে। অন্য প্রসংগে বলা। এরকম ...ভিজ্ঞতার কথা গোপন রাখবার বয়স তখন ...র হয়ে গিয়েছে। হাসি-ঠাট্টার খোরাক ...োগান ছাড়া কথাটার তখন আর অন্য কোন ...ল্য ছিল না।

বাইরের আস্তাবলের পাশের ঘরে ...একবার সময়, কতই বা বয়স ছিল বিরজুর। ...নে হত পৃথিবীর যাকিছু সব তারই জন্য। ...র্য ডোবে তারই জন্য; রাত্রিও শেষ হয় ...রই জন্য। তার জন্যই দোয়েলটা শিস ...ত ভোরের আলো দেখা দেবার আগে। ...র ভোরের আলো দেখা দিলে ঘুঘু পাখি ...কে ডেকে বলত—"বিরজু! ওঠো! ...ঠো! ওঠো! বিরজু! ওঠো! ওঠো! ...ঠো!" বিরজুকে জাগাতে হবে কেন? ...স ত জেগেই রয়েছে! মাঝরাত থেকে সে ...ড়ির খাটিয়াখানার উপর এপাশ ওপাশ ...রছে। কোন আড়াল থেকে লুকিয়ে যে ডাকে পাখিগুলো! সারাদিন কোথায় থাকে, কী করে, জানতে ইচ্ছা করে। মন উড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে ডানা মেলে আকাশে পাখি-গুলোর সংগে। কত কী হয়ত করে। টিকটিক চিরুনি দিয়ে অনমনা হয়ে হয়ত পালক আঁচড়ায়। ডাকে আপন খেয়াল-খুশিতে। কণ্ঠধ্বনি দিয়ে বোধহয় সাথীকে সংকেত দেয় নেপথ্য থেকে। বোধহয় ডাকবার পর সংগীর সাড়া পাবার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকে উৎকর্ণ হয়ে। বিশ্বসুদ্ধ সকলেই প্রতীক্ষা করে কারও না কারও—কিছুর না কিছুর—কেউ নীল শাড়ির, কেউ মধুগন্ধের, কেউ চাঁপার কলির পরশের। বিরজুও উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করে একটি কণ্ঠ-ধ্বনির। তার মনের সুর বাঁধা ভোর-বেলাকার একটা ধ্বনি-সঙ্কেতের সংগে। দিনের পর দিন। সময় বাঁধা। ...ওই যে!...

"কারে-ম্যায়!" অক্রুরের মা! কারের মাকে ডাকছেন তিনি। ধ্বনির সুরটা সা-রে-গা-র মত। কথাটা ঠিক ধরা যায় না স্পষ্টভাবে, এত দূরে থেকে। আন্দাজে মনে হয় তিনি বলছেন—"কারেম্যায়!"

এই প্রত্যাশিত ধ্বনিটা কানে আসবার সংগে সংগেই বিরজু এক, দুই, তিন, চার করে গুনতে আরম্ভ করে। মোটামুটি একটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছে সময়ের। পাঁচশ পর্যন্ত গুনতে যত সময় লাগে, ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আরও। মহাজনী কারবার করেন শাওজী; তাই সব সময় সাবধান। দুর্গের মত দেখতে বাড়িটা। অন্দরমহলের কামরাগুলোয় সূর্য ঢুকতে পান অতি সংকুচিতভাবে, ছাতের কাছের গরাদ আঁটা গবাক্ষগুলোর মধ্যে দিয়ে। বড় হাতিতে চড়ে পথ দিয়ে লোক গেলেও তাদের লুব্ধ দৃষ্টি যাতে বাধা পায়, সেদিকে খেয়াল রেখে পাঁচিলের উচ্চতা ঠিক করা হয়েছে। এই পাঁচিলের গায়েই বিরজুর ঘর। পথের হট্টগোলে ভোরবেলা ছাড়া শাওজীর অন্দরমহলের কল-কাকলি এ-ঘরে পৌঁছয় না। মাঝে মাঝে জাঁতা পেষার বা পরব উৎসবের কোরাস গান কানে এলে তার মধ্যে থেকে একটা গলার স্বরকে আলাদা করে চেনবার চেষ্টা করে সে। শাওজীর বাড়ির মেয়েরা শখ করে পিষতেও ত পারেন আটা। কত কিছু কল্পনা করে নিতে ভাল লাগে। পুত্রবধূ, কন্যা, আশ্রিতা, পালিতা কত আছেন শাওজীর বাড়িতে। এঁদের মধ্যে কার সেই কণ্ঠস্বর, সেকথা সে ঠিক আন্দাজ করতে পারে না। ......পাঁচশ গোনা শেষ হয়েছে। বিরজুর বুকের স্পন্দন বন্ধ হয়ে এল বুঝি। ওই! থুক্! থুক্! প্রত্যাশিত সংকেত। কাশির শব্দ। ভিজে ভিজে গলা। অতি পরিচিত। অত্যন্ত আপন। একবার গলা খাঁকারি দিয়ে বিরজুও

সাগ্রহ সংশয় — আলোকচিত্রী: জলধিরতন বন্দ্যোপাধ্যায়

কাশল—খ্‌ক্‌, খ্‌ক্‌। কাশির সংকেতের উত্তরে। বেশী জোরে নয়। ড্রাইভার-কোচমানের কাছে ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে। আবার সে কান পেতে শোনে। পরিচিত কাশির ধ্বনির মধ্যে দিয়ে আবার সাড়া দিলেন তিনি। এমনি করেই উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে, যতক্ষণ না ড্রাইভার, সহিস, কোচমান ঘুম থেকে ওঠে। ......কখন কখন মনে হয়, কৌতুকময়ী সাড়া না দিয়ে মজা উপভোগ করছেন। ....প্রথম প্রথম ছিল খেলা। পরে কিন্তু জিনিসটা বিরজুর কাছে খেলার চেয়েও অনেক বড় হয়ে উঠেছিল। কত স্বপ্নজাল বোনা এ নিয়ে। এ-ঘর ছেড়ে চলে যাবার আগের দিন, সে সারারাত কেশেছিল গলায় কম্মফর্টার জড়িয়ে ইনফ্লুয়েঞ্জার ভান করে।

জেলে যাবার সার্টিফিকেটওয়ালা লোকের বক্তৃতা দেবার সত্যিকারের ক্ষমতা থাকলে, তখনকার যুগে নেতা হবার আর কোন বাধা ছিল না। 'ভারত-কোহলিয়া'র আশীর্বাদের কথা মনে জাগরূক রেখে, অতি সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলে ফেলে নিজের অভীষ্টের দিকে এগিয়ে চলছিল কোয়লজী। বহু নামজাদা বক্তার বক্তৃতা শুনেছি; কিন্তু একেবারে খেলো কথা বলে শ্রোতাদের মন ধরে রাখবার এমন অনায়াস ক্ষমতা, কোয়লজীর মত আমি আর দেখিনি। ভাষণ শুনতে হয় ত কোয়লজীর—এমনি একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল সাধারণ লোকজনের মনে, কিছু দিনের মধ্যে। মনে মনে আমরা তাকে ঈর্ষা করতাম। ওই সময়ের একদিনের একটা ঘটনা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। রাজধানী থেকে বড় নেতা এসেছেন জিরানিয়াতে। হাঁপানি রোগে তিনি বারো-মাস ভোগেন; আর যত সারগর্ভ কথাই বলুন, লোকের মন ধরে রাখবার মত করে বক্তৃতা দিতে পারেন না। তখন মাইকের ব্যবহার এ-অঞ্চলে সবে আরম্ভ হয়েছে। মাইকে বললে হেঁপো রোগীর বক্তৃতাও সিংহ গর্জনের মত শোনাবে, এই রকম একটা কথা ফিস ফিস করে সারা জেলার লোকের কানে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। লোকে লোকারণ্য। রাজধানীর নেতা ভাষণ আরম্ভ করলেন। মাইক দিয়ে উদ্গতি হয়েছে বক্তৃতার —তাঁর খুসখুসে কাশি ও হাঁপের টানটার অবিরাম আওয়াজ সিংহ গর্জনের চেয়েও জোরে হচ্ছে। .... দেশপূজ্য নেতার 'দর্শন'টাই আসল। বেশ কিছু লোক উঠে দাঁড়িয়েছে এরই মধ্যে। সকলেই পালাতে চায়। 'শান্তি!' 'শান্তি!' "বসে' যান ভাই সব!" "প্যারে ভাইয়ো! সহনো!" কিছুতেই কিছু হল না। চোখে জল আসবার জোগাড় জেলার নেতাদের। রাজধানীর নেতা গ্লাস থেকে জল খেয়ে চশমার কাচ মুছতে আরম্ভ করেছেন। স্থানীয় নেতারা রাজধানীর নেতার কাছে কোয়লজীর জন-প্রিয়তার কথাটা না জানাতে পারলেই খুশি হতেন। কিন্তু সে উপায় যে নাই। ইঙ্গিত পেয়ে কোয়লজী উঠে দাঁড়াল। মাইকের লোকটা যন্ত্রটা তার কাছে আনতেই, হাত দিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল সেটাকে—সে হেঁপো রোগী নয়—সবচেয়ে দূরের শ্রোতাদের শোনাবার মত গলার জোর তার আছে।

কোয়লজী হাত উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। "ছি! ছি! ছি! ছি! ছি!" ...... আরে! কোয়লজী যে! কী যেন বলবে! কী মজার মজার কথা যে বলে কোয়লজী! ছি-ছি বলবার পর কোয়লজী মিনিট খানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে, শুধু চাহনির মাধ্যমে ওই তীব্র ভৎসনাটা ছড়িয়ে দিল, চতুর্দিকের শ্রোতাদের মধ্যে। বাড়িমুখো লোকটা থমকে দাঁড়িয়েছে। সে বক্তৃতা আরম্ভ করে।...... সে একবার গিয়েছিল কলকাত্তাতে কলকাত্তার মছুয়াবাজারে; হাঁ মছুয়াবাজার স্ট্রীটে। কলকাত্তার মত শহরের মাছের বাজার! সে যে কী চেঁচামেচি, কী হৈ হল্লা! তার আন্দাজ পেতে হলে আসতে হয় আপনাদের কাছে।

শ্রোতারা হেসে উঠেছে। এখনই হয়েছে কী; দেখ না, হাসিয়ে হাসিয়ে মারবে। তারপর একটু গরমাতে দে; দেখবি আগুন ছিটবে।

শ্রোতাদের হাসির দমক থামলে কোয়লজী আবার আরম্ভ করে। ......কলকাতায় ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস—বালিস্টর। আর এখানে? এখানে আছেন এই চিৎরঞ্জক। ......নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে কোয়লজী হাসছেন। সভার লোকরা হেসে গড়িয়ে পড়ে এ ওর গায়ে। তারপর কোয়লজী শ্রোতাদের স্থির হয়ে নিজের নিজের জায়গায় বসতে বলেন। যাঁর মুখ থেকে হেলায় ছিটিয়ে দেওয়া কথাগুলো কুড়িয়ে দেশের খবরের কাগজগুলো বড়লোক হয়ে গেল, সেই মহামান্য নেতার ভাষণ এইবার আরম্ভ হবে; চুপ করে শুনুন আপনারা! শুনে পুণ্য সঞ্চয় করুন! তাঁর ভাষণ শেষ হবার পর, এই অধম তার টুটা-ফুটা ভাষায় আপনাদের মনের মত দু-চার কথা শোনাবে। .....সেদিন মন্ত্রের মত কাজ করেছিল বিশৃঙ্খল জনতার উপর, কোয়েলজীর এই অনুরোধ।

লেখাপড়া শেখেনি। জনতার হৃদয়ে পৌঁছবার মত এই বলবার ক্ষমতাটুকুই ছিল তার রাজনীতিক কর্মের পুঁজি। কথা বলবার ক্ষমতা চলে যেতেই জেলার নেতারা তাকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে, রাজ-নীতির ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিই অপরিহার্য নয়। রাজধানীতে চিকিৎসাধীন থাকবার সময় সেখানকার পার্টির অফিসের লাউড-স্পীকার-এর চার্জে যে ছিল, তার সঙ্গে একই ঘরে বহুদিন থাকবার কোয়লজীকে। সেই সূত্রেই লোকের জীবিকার সঙ্গে তার পরিচয়। নাইবা দিতে পারল বক্তৃতা; মাইক, লাউডস্পীকার ফিট করবার সূত্রে সভাসমিতির সঙ্গে যোগাযোগ তবু থাকবে। বিয়ে করেনি। সংসার খরচ ছিল কম। বেশী উপার্জনের চেষ্টা ছিল না। দোকানের আয় থেকেই চলে যেত কোন রকমে। আর সুবিধার মধ্যে, কিছুকাল পরে বিকৃত স্বরে আস্তে আস্তে কথা বলবার ক্ষমতা সে ফিরে পেয়েছিল।

মিশিরজী রামায়ণের কোন জায়গায় পৌঁছেছেন, এখন সেটা পর্যন্ত ধরতে পারছি না। এত অমনোযোগী হয়ে রয়েছি আমি। মন পড়ে রয়েছে কোয়লজীর দিকে। সে বসে রয়েছে অ্যামপ্লিফায়ার-এর বাক্সর কাছে। পাশের ছাত্রের দল সরবে ঘোষণা করে দিল যে, তাদের তেষ্টা পেয়েছে। পানীয় জল সরবরাহের কর্তব্য সম্বন্ধে গৃহকর্তাকে অবহিত করাই তাদের উদ্দেশ্য। তাদের চিৎকারে মিশিরজীর একাগ্রতা ক্ষণিকের জন্য ভঙ্গ হয়েছে। তাঁর চোখের পাতা খুলেছে। গান কিন্তু বন্ধ করেননি মুহূর্তের জন্যও। সভামণ্ডপের গরম সত্যিই দুঃসহ হয়ে উঠেছে। এই ভিড়ের মধ্যে থেকে বার হয়ে চলে যাওয়াও শক্ত। আমার নজর পড়ে রয়েছে কোয়লজীর দিকে। ওর একটা হাত অ্যামপ্লিফায়ারের স্বর-নিয়ন্ত্রণের বোতামের উপর; আর-একটা হাত রাখল মাইকের থেকে আসা তারটা যেখানটায় জুড়ে দেওয়া হয়, সেইখানটাতে। অ্যাঁ! ও কী করল! কোয়লজী নিজে? ঠিকই তাই। মাইক অকেজো হয়ে গিয়েছে। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে পারি না। তার খুলে নেবার মুহূর্তে কোয়লজী বাঁহাতে 'ভলুমে'-এর বোতামটাও টিপে দিয়েছে, নইলে মাইকের গুনগুনানি শব্দটা শ্রোতারা শুনতে পেত। সভামণ্ডপে হইচই আরম্ভ হয়ে গেল। পাশের ছাত্রের দল ইতর ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে কোয়লজীকে। মিশিরজীর চোখে পর্যন্ত বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। আর কেউ দেখেনি, আমি যা দেখেছি। কেউ সে সন্দেহও করতে পারে না। তবু সকলে বিলক্ষণ চটেছে কোয়লজীর উপর। ব্যস্ত হয়ে কোয়লজী চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথায় যন্ত্রটা খারাপ হয়েছে দেখবার জন্য। আমি জানি ও দেখছে না, দেখবার ভান করছে। কেন ও অমন করল? ......পিছনের দরজা দিয়ে ও কে ঢুকলেন সভামণ্ডপে? বেদীর দিকে এগিয়ে আসছেন দুইজন বৃদ্ধা বিধবা। গৃহকর্তার মা, আর একজন বোধহয় বাড়ির দাই; আশপাশের লোকের গুঞ্জনধ্বনিতে বোঝা গেল। দাই-এর হাতে দুখান রঙিন রেশমের

রায়ে আসীন রাম-সীতাকে
ন গৃহকর্তার মা। তারপর
ভাঁজ খুলে রাম-সীতার গায়ে
ড়িয়ে দিলেন। যতক্ষণ না বৃদ্ধা দুইজন
দীর পিছন দিককার দরজা দিয়ে অন্দর-
লে ঢুকে গেলেন, ততক্ষণ শ্রোতাদের
কাগ্র দৃষ্টি তাঁদের দিকে ছিল। বারবার
ইক খারাপ হচ্ছে দেখে বোধহয় বাড়ির
াকেরা আগে থেকে এই পর্বটা ঠিক করে
খেছিলেন, যাতে মাইক মেরামতের সময়
াতাদের নজর এই দিকে থাকে। না, তা
নয়। গৃহকর্তা নিজে হন হন করে এসে
দীর উপরে উঠলেন। মিশিরজীকে
স্কার করে কী যেন বলছেন ফিসফিস
রে। তবে কি আজকের পালা এখানেই
ষ? মুখের ব্যঞ্জনায় বোঝা গেল
শিরজীর আপত্তি নেই গৃহকর্তার
ন্তাবে। গৃহকর্তা কী যেন বললেন ধ-
নের দলের লোকজনকে। তারা সবাই
ড়াতাড়ি উঠে চলে গেল। মুহূর্তে
ধা সকলে ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছে। তারা
ল নাচ-গানের জন্য সাজগোজ করতে।
ইকের ভাবগতিক দেখে বাড়ির কর্তা আর
ক্ষ্য রাখতে পারছেন না কোয়লজীর
শ্বাসে। অর্ধদণ্ড কাজ পণ্ড, লোকের
ছে মান-ইজ্জত নষ্ট—বিরক্ত তাঁদের হবারই
থা। পয়সার অভাব তাঁদের নাই। এমন
নলে অন্য জায়গা থেকে মাইক আনা
রতেন! শ্রোতারা ক্ষেপে উঠেছে।
নারকম কড়া মন্তব্য কানে আসছে,
য়লজীর বিরুদ্ধে। কোয়লজীর নিজের
ন্তু সেসব কথা কানে যাচ্ছে বলে বোধ
চ্ছে না। অসীম আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে
ঢ় পদক্ষেপে সে গিয়ে দাঁড়াল বেদীর
পরে, মাইকের সম্মুখে। মাথার এক
াঁকিতে, বাবরি চুলের বোঝা ছড়িয়ে নিল
াঁধের উপর। কেশর ফুলিয়ে পশুরাজ
ীচের নগণ্য মানুষগুলোকে দেখছে।
কৃতার মঞ্চের সম্মুখে এত লোকজন দেখে
ক পুরনো কথা মনে পড়ছে তার? ক্ষুব্ধ,
বশৃঙ্খল শ্রোতার দলকে দেখে বিচলিত
বার পাত্র কোয়লজী নয়। তার হাতের
তালোর একতাল কাদা বলে ভাবত সে
শ্রোতাদের এক সময়ে।

"হেল্লো! ওয়ান! টো! থ্রি!"

গাঁক গাঁক করে আওয়াজ বার হচ্ছে
বকট জোরে মাইক থেকে। একজন মিস্ত্রি
ছুটে যাচ্ছে অ্যাম্প্লিফায়ারের দিকে, বোধ-
হয় আওয়াজটাকে একটু আস্তে করে দেবার
জন্য। গলার স্বরের বিকৃতি মাইকে শতগুণ
বর্ধিত হয়ে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ কাঁপিয়ে
তুলেছে। গৃহকর্তা কোয়লজীর পাশে এসে
দাঁড়ালেন। থামতে বলছেন তাকে। ...যথেষ্ট
হয়েছে। আর আমাদের মাইকে কাজ নেই।
এখন নাচ-গানের পালা; তাতে মাইক

...ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলেন বৃদ্ধা

লাগবে না। আপনি দয়া করে আপনার
যন্ত্রপাতি সরিয়ে নিয়ে যান!...কোয়লজী
গৃহকর্তার কথা শুনতে পেল কি না বোঝা
গেল না।

"সেভেন! এট্! নাইন! টেন! ইলেবেন!"

থামবার কোন লক্ষণ নেই। কতদূর
পর্যন্ত গুনবে কে জানে। অকারণে চিৎকার
করে চলেছে। আমার বুক দুর দুর করছে
—এই বক্তৃতা আরম্ভ করে বুঝি কলকাত্তার
মছুয়াবাজারের! বাড়ির কর্তা তার কাঁধে
হাত দিয়েছেন, কোয়লজীর দৃষ্টি আকর্ষণ
করবার জন্য। এইজনাই বুঝি সে হঠাৎ
সংখ্যা গোনা বন্ধ করল। একবার গলা
খাঁকারি দিয়ে, সে মাইকের সম্মুখে কাশল—
খুক খুক করে। কর্কশ আওয়াজটা বুলেটের
মত গিয়ে লাগল অগণিত ধৈর্যচ্যুত
শ্রোতাদের কানের পর্দায়। অনেকক্ষণ ধরে
তারা এই অকর্মণ্য মাইকওয়ালাটার
অত্যাচার সহ্য করেছে। আর নয়। তারা
রেহাই পেতে চায় এর হাত থেকে। পাশের
ছাত্রের দলকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না।
তারা বুঝে গিয়েছে নিঃসন্দেহে যে, মুখের
কথায় কোন ফল হবে না এখানে। ব্যাপারটা
ভালভাবে বুঝে ওঠবার আগেই দেখি তারা
হৈ হৈ করে মারমুখী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে
বেদীর সম্মুখে। তাদের সমর্থনে আরও
বহু লোক এগিয়ে আসছে মাইকের দিকে।
আমিও ছুটে গিয়েছি কোয়লজীকে
বাঁচাবার জন্য। বৃদ্ধ মিশিরজী কোয়লজীকে
আড়াল করে দাঁড়িয়ে এই সব অবুঝ পাগল-

দের বোঝাচ্ছেন। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে
আছি। ক্ষুব্ধ জনতার হাত থেকে
কোয়লজীকে বাঁচাবার জন্য গৃহকর্তা ঠেলে
আমাদের পিছনের দরজার দিকে নিয়ে
যাচ্ছেন। আমরা ঢুকতেই তিনি দরজা বন্ধ
করে দিলেন, যাতে আর কেউ না ঢুকতে
পারে। দরজার পাশে রাখা অ্যাম্প্লি-
ফায়ারটাকে আছাড় দিয়ে ভাঙবার শব্দ
শোনা গেল। আমরা যেখানে ঢুকলাম, সেটা
একটা ঘর। অজস্র হুঁকো, কল্কে, গড়গড়া,
আর তামাক খাওয়ার অন্যান্য সব রকমের
সরঞ্জাম ঘরময় ছড়ান। গৃহকর্তার মা
সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাক খাচ্ছিলেন।
রাম-সীতাকে কাপড় পরিয়ে এসে, বোধহয়
তাড়াতাড়িতে বসবার সময় পাননি তখনও।
কল্কে ধরাবার পরেই বোধহয় মাইক-
বিভ্রাটটা ঘটে। বুড়ী দাইটাও ঘরের এক
কোণাতে আর-একটা কল্কে সাজছে। আমরা
ঘরে ঢুকবার মুহূর্তেই বোধহয় গৃহকর্তার
মা হুঁকোয় টান দিয়েছিলেন। নাক দিয়ে
অল্প অল্প ধোঁয়া বার হচ্ছে। কাশি আসছে
বুঝি ভদ্রমহিলার। চেষ্টা করেও চাপতে
পারলেন না। খুক খুক করে কাশলেন।
ভক ভক করে ধোঁয়া বার হল মুখ দিয়ে।
হঠাৎ আমাদের ঢুকতে দেখে ভ্যাবাচাকা
খেয়ে গিয়েছিলেন বৃদ্ধা। এতক্ষণে মাথার
কাপড় টেনে দেবার কথা মনে পড়ল তাঁর।

কোয়লজীকে তখনও আমি ধরে। কেমন
যেন আড়ষ্ট গোছের হয়ে সে বসে পড়ল
সেখানে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে,
অথচ যেন কিছু দেখছে না। দরজার বাইরের
চেঁচামেচি তখনও শোনা যাচ্ছে—
"ভিয়েনার বাচ্চা কোথাকার! একবার আয়
দরজার বাইরে—তোকে আজ মাইকে চড়াব!
ভেবেছিস কি!"

কোয়লজীর হাঁটুর কাছের অসাড় ভাবটা
কাটলে, গৃহকর্তা খিড়কির দুয়ার দিয়ে
আমাদের বার হবার পথ দেখিয়ে দিলেন।
সভামণ্ডপের হইচই তখনও থামেনি।
নিঃশব্দে চোরের মত চলেছি আমরা পথ
দিয়ে। কিজন্য সে নিজেই মাইকটা খারাপ
করে দিয়েছিল, এই প্রশ্নটা এখনই তাকে
করা উচিত হবে কিনা ভাবছি; এমন সময়
সে নিজেই কথা বলল ফিসফিস করে।

"সেই আওয়াজটা তামাক টানবার কাশির;
এ'রই।"

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত
ধ্রুবা ৩৲ লুৎফউল্লা ৩।।০
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা
শাশ্বতী পাঠাগার
৬এ রাধানাথ মল্লিক লেন, কলিঃ ১২
(সৈ ৯০৬৪।২)

আকবর বাদশা হরিপদ কেরানী

প্রথম ব্যক্তি॥ কে ওখানে—আমার বাগিচায়?

দ্বিতীয় ব্যক্তি॥ আপনি বুঝি বাগিচার জিম্মাদার?

প্রথম ব্যক্তি॥ অনাবশ্যক কৌতূহল। তুমি এখানে কেন?

দ্বিতীয় ব্যক্তি॥ পথ চলে ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম করছি।

প্রথম ব্যক্তি॥ দূরদেশের লোক বুঝি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি॥ আপনার অনুমান ঠিক, বাংলাদেশ থেকে আসছি।

প্রথম ব্যক্তি॥ বাংলাদেশ, সুবে বাংলা! কী তোমার নাম?

দ্বিতীয় ব্যক্তি॥ হরিপদ কেরানী।

প্রথম ব্যক্তি॥ কেরানী? এ কী রকম পদবী? কৌলিক পদবী কি?

হরিপদ কেরানী॥ ছিল একটা কিছু, কিন্তু তিনপুরুষের কেরানীগিরির স্মৃতির তলায় তা কবে তলিয়ে গিয়েছে।

প্রথম ব্যক্তি॥ সেজন্য দুঃখ করো না, কোন বৃত্তিই হীন নয়।

হরিপদ কেরানী॥ কিন্তু কোন কোন বৃত্তি সম্মানকর।

প্রথম ব্যক্তি॥ যেমন?

হরিপদ কেরানী॥ বাদশাহী।

প্রথম ব্যক্তি॥ সহস্র কেরানীর পায়ের উপরেই ত বাদশাহীর প্রতিষ্ঠা।

হরিপদ কেরানী॥ তবু পা পা-বই নয়। কিন্তু আপনার পরিচয় ত পেলাম না। পোশাক-আশাক মূল্যবান, আমীরওমরা হবেন মনে হচ্ছে।

প্রথম ব্যক্তি॥ এখনি ত বাগিচার জিম্মাদার মনে হয়েছিল।

হরিপদ কেরানী॥ তা হয়েছিল বটে, যখন কেবল মুখের দিকে চেয়েছিলাম।

প্রথম ব্যক্তি॥ মুখ দেখে কিছু মনে হয়নি?

হরিপদ কেরানী॥ মুখ দেখে কি মানুষ বোঝা যায়, মানুষ বুঝতে পারা যায় কাপড়ে।

প্রথম ব্যক্তি॥ কেমন?

হরিপদ কেরানী॥ এই যেমন ছেঁড়া কোর্তায় আমি হরিপদ কেরানী। এসব ছেড়ে কাশ্মীরী শালের চোগা আর পাগড়ি

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

পরলে আমিই হয়ে উঠতে পারি আকবর বাদশা।

প্রথম ব্যক্তি॥ আকবর বাদশা হয়ে ওঠা কি এত সহজ?

হরিপদ কেরানী॥ কে বলছে সহজ! কাশ্মিরী পোশাক দুর্মূল্য।

প্রথম ব্যক্তি॥ মূল্যটাই শুধু অন্তরায়? পোশাক খুলে নিলে তুমিও যা আকবর বাদশাও তা-ই, কি বলো?

হরিপদ কেরানী॥ আপনার পরিচয় না পেলে আর কিছুই বলব না। অপরিচিতের কাছে মুখ খুললেও মন খুলতে নেই।

প্রথম ব্যক্তি॥ আমি বাগিচাগুলোর মালিক।

হরিপদ কেরানী॥ গুলোর? আর কত-গুলো আছে?

প্রথম ব্যক্তি॥ অসংখ্য।

হরিপদ কেরানী॥ অসংখ্য। তবে বুঝি বড় জায়গীরদার হবেন?

প্রথম ব্যক্তি॥ প্রায় সেই রকম।

হরিপদ কেরানী॥ তবে কি আরও বড়। সুবেদার?

প্রথম ব্যক্তি॥ প্রায় সেই রকম।

হরিপদ কেরানী॥ আর ভাবতে পারছি না। আমি সামান্য কেরানী, জায়গীরদার, সুবেদার সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব অস্পষ্ট।

প্রথম ব্যক্তি॥ তবে খুলেই বলি, আমি আকবর বাদশা।

হরিপদ কেরানী॥ আকবর বাদশা! শাহানশা চিনতে পারিনি, কসুর মাপ করবেন।

আকবর বাদশা॥ কিছু কসুর হয়নি হরিপদ, কসুর মানুষের পোশাকগুলোর, ওদের ষড়যন্ত্রেই কেউ বাদশা, কেউ কেরানী।

হরিপদ কেরানী॥ হুজুর, আমরা বাঙালীরা, জাত-সাহিত্যিক, আমাদের কথা আমাদের দায়িত্বকে ছাড়িয়ে যায়, আর তার জন্যে অনেক সময়ে বিপদেও পড়ি আমরা।

আকবর॥ কিছু বিপদ হয়নি। কিন্তু তুমি এখানে কেন?

হরিপদ॥ হরিপদ কেরানীর দলের যথার্থ আশ্রয় গাছতলা। কিন্তু শাহানশাকে এখানে দেখব আশা করিনি।

আকবর॥ এই স্থানটি আমার বড় প্রিয়, তার মধ্যে আবার এই ফলের বাগিচাটি, এখানকার সেও, নারঙ্গী, আঙুর, পীচ, ডালিমের তুলনা হয় না।

হরিপদ॥ ফতেপুর শিকরী আগ্রা, দিল্লির রাজপ্রাসাদে কি এসব দুষ্প্রাপ্য?

আকবর॥ সেখানে এসব দেখি থালায়, এখানে গাছে, দুয়ে তফাৎ আছে।

হরিপদ॥ শেষ পর্যন্ত থালাতে ওঠবার জন্যেই ওরা গাছে ফলে।

আকবর॥ খালায় ওরা সুস্বাদু, গাছে ওরা সুন্দর।

হরিপদ॥ সৌন্দর্য কি রাজপ্রাসাদে দুর্লভ?

আকবর॥ রাজপ্রাসাদে যে সৌন্দর্য তা মুগ্ধ করে, তাতে কেবলই সুখ।

হরিপদ॥ আর কি দিতে পারে সৌন্দর্য! দুঃখ?

আকবর॥ সুখও নয় দুঃখও নয়, দুয়ে মিশিয়ে আর একটা কিছু।

হরিপদ॥ বুঝতে পারলাম না শাহান-শা।

আকবর॥ রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য মনকে ভোলায় মনকে দোলায় না। ফল্গুর বাগিচায় যে সৌন্দর্য দেখি তা এক সঙ্গে সুখ-দুঃখের ঢেউয়ে কল্পনাকে আঘাত করে তবে ত কল্পনা চলে।

হরিপদ॥ সেই সৌন্দর্য দেখবার জন্যই বাদশা এসেছেন এখানে?

আকবর॥ সৌন্দর্য দর্শন অনেক শুভ-যোগাযোগের ফল, কালেভদ্রে দর্শন মেলে।

হরিপদ॥ কেন, এই ত ফলে রয়েছে সিঁদুর মাখানো পীচ, সোনার রঙের সেও। ফলে ফলে পাতায় আবিরগুলাল ছড়াচ্ছে—অভাব কি?

আকবর॥ ঐ ত বললাম শুভ যোগাযোগ—না। সবই আছে কিন্তু যেভাবে যে পরিবেশে থাকলে সুন্দর বলে মনে হয় তা হয় ত নেই।

হরিপদ॥ এ যেন অশাভঙ্গের দুঃখ বলে মনে হচ্ছে।

আকবর॥ দুঃখ বই কি।

হরিপদ॥ কি আশ্চর্য! হিন্দুস্থানের বাদশার মনেও দুঃখ!

আকবর॥ দুঃখের প্রকৃতির তুমি কি জানো! হিন্দুস্থানের বাদশা কি এত বড় অভাগা যে দুঃখের স্বাদ জানে না।

হরিপদ॥ আমাদের ত তাই ধারণা।

আকবর॥ দুঃখের স্বাদ যে পায়নি সৌন্দর্য কী তা সে জানে না, প্রেম কী তা সে জানে না!

হরিপদ॥ এক নিশ্বাসে সৌন্দর্য আর প্রেম।

আকবর॥ বিধাতার এক দীর্ঘ নিশ্বাসেই যে ওদের জন্ম, মানুষের দীর্ঘনিশ্বাসের দক্ষিণে হওয়ায় যে ওরা ভেসে বেড়াচ্ছে যুগল প্রজাপতির মত।

হরিপদ॥ প্রেম আর সৌন্দর্য!

আকবর॥ আসলে ওরা দুই নয়, এক, যখন ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করি বলি সৌন্দর্য, যখন অন্তর দিয়ে গ্রহণ করি বলি প্রেম।

হরিপদ॥ সিংহাসনে বসে এত কথা ভাববার সময় কোথায় শাহানশা।

আকবর॥ সিংহাসনে যে বসে সে ভাবে না, বরঞ্চ অনেক সময় লোকে ভাবিত হয়ে ওঠে তার দৌরাত্ম্যে।

হরিপদ॥ তবে?

আকবর॥ চিরদিন ত সিংহাসনে ছিলাম না।

হরিপদ॥ সে ত বাল্যকালে।

আকবর॥ হাঁ বাল্যকালের কথাই বলছি। তুমি জানতে চেয়েছিলে কখনও সুখ পেয়েছি কিনা। একবার সুখ পেয়েছিলাম—সেই সুদূর বাল্যকালে।

হরিপদ॥ শুধু একবার?

আকবর॥ শুধু একবার।

হরিপদ॥ কৌতূহল হচ্ছে সম্রাট।

আকবর॥ তবে বলি শোন—একথা আর কেউ জানে না।

হরিপদ॥ আর কেউ জানে না?

আকবর॥ না। কাকে বলব। আমার দরবারে গুণী জ্ঞানী পণ্ডিত সভাসদ সেনাপতি যথেষ্ট আছে, চাটুকারের সংখ্যাও কম নয়। অভাব শুধু মনের কথা বলবার লোকের।

হরিপদ॥ আমার পরম সৌভাগ্য আজ।

আকবর॥ তখন হুমায়ুন বাদশা দিল্লির সিংহাসনে, আমার অখণ্ড অবসর। একাকী অশ্বারোহণে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতাম পাহাড়ে পর্বতে। একদিন তখন বয়স চৌদ্দর মধ্যে, এলাম এখানে। তখন এ বাগিচা ছিল না, এসব পরে অনেক যত্নে তৈরি করেছি, কেন করেছি সব শুনলে বুঝতে পারবে। তখন ছিল গোটা কয়েক পীচ আর সেও গাছ। দূর থেকে দেখতে পেলাম জাফরানী রঙের শাড়িপরা একটি বালিকা, আমার বয়সী হবে, একটা সিঁদুরে পীচ পাড়বার জন্যে হাত বাড়াচ্ছে কিন্তু নাগাল পাচ্ছে না। তার সেই ঊর্ধ্বোত্থিত বাহুর চেষ্টা, উন্মুখ দৃষ্টি—গুণী কাঠে বিতানিত একখানি সুরের মত, বড় অপূর্ব লাগল আমার চোখে। অপূর্ব, হরিপদ, অপূর্ব! সুন্দর নয় শোভন নয়, লোভন নয়, অপূর্ব! এ অভিজ্ঞতা জীবনে একবার মাত্র আসে; দ্বিতীয়বার এলে আর অপূর্ব থাকে না, তখনই জেগে ওঠে পুরুষের পক্ষে পৌরুষ, নারীর বক্ষে নারীত্ব! আমি নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন সময়ে হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙল তার কণ্ঠস্বরে, ঝরণার জলে আলোর চমকের মত সে কণ্ঠস্বর, সে বলল, দাও-না পেড়ে আমাকে ফলটা।

হরিপদ॥ এত বড় দুঃসাহস তার, কোথায় হিন্দুস্থানের ভাবী বাদশা, কোথায় গ্রাম্য বালিকা।

আকবর॥ ও পরিচয় পরিচয়ই নয়। এযে প্রথম পুরুষের কাছে প্রথম নারীর মিনতি। মনে পড়ল আদিম নরনারীর রূপকথা, তাদের মতই আমিও নির্বাসন বরণ করতে রাজি ছিলাম। কি হবে সিংহাসনে, হরিপদ। থাকগে। তখন ঘোড়া থেকে নেমে হাত বাড়ালাম ফলটার দিকে। কিন্তু ফল আর ধরতে পারিনে। মেয়েটি বলল, সবই যদি বললাম নামটা আর লুকিয়ে কী লাভ, আমিনা বলল, 'ও কী রকম, ফলটার দিকে তাকাও, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে ফল ধরতে পারবে কেন?' আমি বললাম ফলটাকেই দেখবার চেষ্টা করছি। কোথায়? তোমার চিক্কণ কপালের আরসীতে। আমার কথা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল সে—মনে হল এ পর্যন্ত সিরাজের যত বুলবুল গান সমাপ্ত করবার আগেই উড়ে গিয়েছে সব যেন একযোগে কূজন করে উঠল। আমিনা বলল, খুব লোককে ফল পাড়তে ডেকেছি; থাকত রহিম। রহিম কে? মিশলো প্রথম বিন্দু ঈর্ষার বিষ প্রেমে, প্রেম

'অপটিক্যাল ব্রাইটনার'

বিশুদ্ধ সাবান

সোডা বিহীন

আর ঈর্ষা নিকটতম প্রতিবেশী, যেমন কলহ ওদের মধ্যে তেমনি প্রণয়, বেশিক্ষণ কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। রহিম কে? রহিমকে চেনো না, আমার বড় ভাই। স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেললাম। তখন ফল পাড়লাম ঝুড়ি ভরে আর এখানে এই পাথরটার উপরে পাশাপাশি বসে কাড়াকাড়ি করে দুজনে খেলাম সেই ফল। এই পাথর-খানাই আমার প্রথম রাজসিংহাসন। পরে হলও তাই, এখনি বুঝবে কেমন করে হল।

হরিপদ॥ এ যে আরব্য উপন্যাসের মত অদ্ভুত।

আকবর॥ এবং সত্য। আমিনার কাহিনী বলি শোন, এতদিন কাউকে বলতে পারিনি, মনের মধ্যে ভার হয়ে রয়েছে। কাছেই সাহুগঞ্জে ওদের বাড়ি, বাপ ফৌজদারের অধীনে দারোগা, ছেলে আর মেয়ে রহিম আর আমিনা।

হরিপদ॥ শাহানশা থামলেন কেন?

আকবর॥ কি বলব ভাবছি, কেমন করে প্রকাশ করব ভাবছি, বাইরে থেকে এ সামান্য, ভিতরের দিকে এর গুরুত্ব, তা কেবল কবির কলম প্রকাশ করতে সক্ষম। কেবল এইটুকু জেনে রাখো যে সেই একদিন যে নিষ্ফল আনন্দ পেয়েছিলাম হিন্দুস্থানের সিংহাসনে বসেও সারাজীবনে তার জুড়ি মেলেনি।

হরিপদ॥ তারপরে?

আকবর॥ মেয়েটি তখন পরিচয় জানতে চাইল আমার। প্রথমে এড়িয়ে গেলাম। কিন্তু শেষে যখন পীড়াপীড়ি শুরু করল, মনঃস্থির করলাম, দেব নির্ভয়ে আমার পরিচয়। তার হাতখানা ধরে মুখের দিকে চেয়ে যখন উদ্যত হয়ে উঠেছি, এমন সময়ে অদূরে অশ্বক্ষুরধ্বনি। চেয়ে দেখি বৈরাম খাঁর পিছনে আমার অনুচরবর্গ! তারা ঘোড়া থেকে নেমে একযোগে কুর্ণিশ করে শাহানশা বলে আমাকে অভিবাদন করল, জানাল হুমায়ুন বাদশা অকস্মাৎ মারা গিয়েছেন। তারপরের ইতিহাস সুবিদিত।

হরিপদ॥ সে ইতিহাস কে না জানে? আকবর বাদশার অভিষেক হল বিনা আড়ম্বরে, নির্জন প্রান্তরের একখানা পাথরের আসনে।

আকবর॥ এই সেই নির্জন প্রান্তর, এই সেই পাথরের আসন।

হরিপদ॥ আর আমিনা?

আকবর॥ সে এতই নগণ্য তাকে কারও চোখেই পড়ল না। বাদশার ঘরে বেগম আছে প্রেয়সী নেই। তখনি রওনা হতে হল দিল্লিতে, ভাবলাম ফিরে এসে আমিনাকে সংগ্রহ করব, এখন ত আমার প্রতাপের জাল রাজ্য জুড়ে। হায় তখন কে জানত জালে মাছ ধরা পড়ে, পদ্মিনী ধরা পড়ে না।

হরিপদ॥ পরে আর কি তার সন্ধান করেননি।

আকবর॥ এখানে ফিরে এসে সন্ধান করতে পাঁচ বছর সময় কেটে গেল। কেউ তাদের সন্ধান দিতে পারল না—কোথাও তারা নেই। তখন এখানে আমিনার কথা মনে করে ফুলফলের বাগিচা তৈরি করলাম। অনেক টাকা খরচ করলাম। রাজা বাদশার অনেক টাকা, তাই তারা ভাবে টাকা দিয়ে সব শূন্যতা ভরিয়ে তোলা যায়। তারপরে সময় পেলেই এখানে ঘুরে ঘুরে আসি, লোকে ভাবে প্রথম অভিষেকের স্থানটি দর্শনই আমার উদ্দেশ্য। বাসাটা নিশ্চয় ভেঙে গিয়েছে জেনেও গাছটার কাছে ঘুরে ঘুরে আসে মুগ্ধ বিহঙ্গ। কিন্তু ও কি হরিপদ, তোমার চোখে জল কেন?

হরিপদ॥ শাহানশার দুঃখে।

আকবর॥ হরিপদ, চোখের জলের চেহারা আমি চিনি। ও জল যে আত্মগত দুঃখের।

হরিপদ॥ তবে হয়ত তা-ই হবে।

আকবর॥ বল, বল শুনি, দেখি নে চোখের জলে রাজায় প্রজায় মিল আছে কিনা।

হরিপদ॥ বিধাতা ওইখানে মানুষকে কৃপা করেছেন—সুখে মানুষ ছোট বড় কিন্তু চোখের জলে সমান।

আকবর॥ বল শুনি তোমার চোখের জলের শাহনামা।

হরিপদ॥ হায় সম্রাট! হতভাগ্য এক কেরানীর দুঃখ কাহিনী আপনার শ্রুতি-যোগ্য নয়।

আকবর॥ বল কি? সুখের কথা হলে শুনতে চাইতাম না। এ যে দুঃখের কথা! দুঃখে মেলায়। দুঃখের অগ্নিময় সিংহাসনে প্রশস্ত স্থান—অনেকের সেখানে জায়গা, সম্রাট ও কেরানী সেখানে একাসনে সমাসীন।

হরিপদ॥ তাই যদি হয় শুনুন। সুবে বাংলার পূর্ব প্রত্যন্তে ধলেশ্বরী নদী, ধলেশ্বরী নদীতীরে আমার গ্রাম। সেখানে একটি কিশোরী আমার চোখকে মুগ্ধ করে-ছিল, অনেক আকাশকুসুম রচনা করেছিলাম তাকে ঘিরে।

আকবর॥ কী তার নাম?

হরিপদ॥ সহস্রের ভিড়ে যে হারিয়ে গিয়েছে তার নামের কি সার্থকতা?

আকবর॥ ঐটুকুই ত শেষ পর্যন্ত হাতে থাকে, যখন মানুষটি আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, নামরূপে থেকে যায় সে মনের মধ্যে।

হরিপদ॥ লক্ষ্মী।

আকবর॥ কেন বিয়ে করলে না তাকে?

হরিপদ॥ ঘোর দারিদ্র্য।

আকবর॥ দারিদ্র্য নয় হরিপদ, নসীব। আমার ক্ষেত্রে অন্তরায় ঐশ্বর্য, তোমার ক্ষেত্রে দারিদ্র্য। তাই বলছি দারিদ্র্য আর ঐশ্বর্য কোনটাই অন্তরায় নয়, অন্তরায় নসীব, অদৃষ্ট। তারপরে?

হরিপদ॥ সম্পন্ন বর এসে তাকে নিয়ে গেল ছিনিয়ে আমার জীবন থেকে।

আকবর॥ তোমার স্বপ্ন থেকেও কি?

হরিপদ॥ স্বপ্ন থেকে তাকে বিদায় করি এমন সাধ্য আমার নেই। কৃষ্ণা দ্বাদশীর চন্দ্রকলার মত দেখা দেয় সে দুঃখের মধ্যরাত্রে।

আকবর॥ তবেই ত রয়ে গেল, যে-ভাবে রয়ে গেছে আমিনা আমার জীবনে। কিন্তু তুমি সৌভাগ্যবান হরিপদ।

হরিপদ॥ সৌভাগ্যবান আমি সম্রাট?

আকবর॥ সৌভাগ্যবান বই কি! ঐ একটি স্বপ্নের মদিরায় পূর্ণ হয়ে আছে তোমার জীবন। আর আমার? হিন্দুস্থানের বাদশার আকাশ সহস্র বিদ্যুতের প্রভায় উজ্জ্বল, চন্দ্রকলা সেখানে থাকলেও চোখে পড়ে কই।

হরিপদ॥ ভেবেছিলাম সম্রাটের কাছে সান্ত্বনা পাব।

আকবর॥ কে কাকে সান্ত্বনা দেয়! দুঃখের পদ্মপত্রে স্বপ্নের শিশিরবিন্দু সদ্যঃপাতী, রাজা আর ভিখারী দুজনেই সমান তৃষ্ণার্ত।

হরিপদ॥ এ-ও কি নসীব?

আকবর॥ না, এই হচ্ছে গিয়ে সংসারের প্রকৃতি। যা অনিবার্য তাকে ধীর মনে স্বীকার করে নেওয়াতেই জীবনের সার্থকতা। কতক সুখ আছে যা মেলে না, মিললে হয় ত আর তা সুখকর লাগত না, রাজারও মেলে না ভিখারীরও মেলে না।

হরিপদ॥ তবে।

আকবর॥ বিধাতা সব নেন, নেন না শুধু স্বপ্নটুকু। ঐ দয়াটুকু করেছেন তিনি মানুষকে।

হরিপদ॥ তবু যে তাকে ভুলতে পারি না।

আকবর॥ কেন ভুলবে! জীবনে যে এল না, স্বপ্ন থেকেও যদি সে বিদায় নেয় তবে দুঃখের মধ্যাহ্নে দাঁড়াব কোন্ ছায়াতরুর তলে?

হরিপদ॥ এসব তত্ত্ব কথায় সুখ পাই কই?

আকবর॥ সুখ কেন পাবে? দুঃখের সূচীবিদ্ধ পথেই ত তার আনাগোনা।

হরিপদ॥ হিন্দুস্থানের বাদশাও কি তবে দুঃখী?

আকবর॥ এমন এক আধটা দুঃখ আছে সেখানে আকবর বাদশায় আর হরিপদ কেরানীতে পার্থক্য নেই।

হরিপদ॥ হায় লক্ষ্মী।

আকবর॥ হায় আমিনা।

মনোনয়ন

আশাপূর্ণা দেবী

ন্দ্রাণীর আর অনিরুদ্ধর পরিচয়টা ছিল প্রায় আবাল্যের। সম্পর্কের কোন ক্ষীণসূত্র ধরে বোধ করি এই পরিচয়ের শুরু, তবে সে আর এখন কারোরই মনে নেই। বয়সের ধর্মে হৃদয়-উত্তাপের জ্বালে চড়ে সে পরিচয়টুকু কখন যে এক সময় প্রেমে পরিণত হয়েছিল, সেও হয়ত ওরা দুজনের একজনও খেয়াল করেনি। কিন্তু সেই প্রেম ক্রমশ দানা বাঁধতে বাঁধতে ঠিক যখন একটা পরিণতির অবয়ব নেবার জন্যে গাঢ় হয়ে আসছিল, তখনই হঠাৎ এক তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল।

অনিরুদ্ধ প্রথমটা কৌতুক অনুভব করেছিল, তারপর ক্রমশ বিরক্ত, ক্রুদ্ধ, মর্মাহত। এখন নেমে এসেছে সংগ্রামের ক্ষেত্রে। কিছুদিন অভিমানাহত চিত্তে দূরে সরে গিয়েছিল। গিয়ে অনুভব করল এটা পাগলামি। এটা ঘোরতর নির্বুদ্ধিতা। ধিক্কার দিল নিজেকে, তারপর এসে দাঁড়াল লড়াইয়ের মাঠে। শক্তিটা একটু বেশীই খরচ করতে হবে, কারণ তৃতীয় ব্যক্তি ততদিনে ইন্দ্রাণীদের বাড়িতে বেশ একটি স্থায়ী আসন লাভ করে বসেছে।

আর ইন্দ্রাণীর চিত্তলোকে?

আজ এত তোড়জোড় অনিরুদ্ধর। আজ এখানে একরকম জোর করেই ইন্দ্রাণীকে নিয়ে এসেছে অনিরুদ্ধ। লেকের ধারের বুদ্ধমন্দিরের দোতলার এই নির্জন চত্বরটায়। এনেছে ইন্দ্রাণীর নিজের মুখ থেকে একটা স্পষ্ট কথা শুনতে চায় বলে।

ইন্দ্রাণীর চিত্তলোকে যদি সেই হতভাগা তৃতীয় ব্যক্তিটা একেবারে স্বর্ণসিংহাসনে চড়ে বসে থাকে, তা হলে সেটাই থাক, অনিরুদ্ধ কিছু আর চিরদিন ধরে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে কাঙালপনা করবে না।

চিরদিনই শুনে এসেছে, মেয়েরাই পুরুষের হাতের খেলার পুতুল, অলক্ষ্যে কখন সে-পাল্লা বদলাল? যাক, বদলাক পাল্লাটাল্লা, অনিরুদ্ধ কারও খেলার খেলনা হয়ে থাকতে রাজী নয়।

কিন্তু ইন্দ্রাণী যেন কিছুতেই বুঝতে পারছে না কেন অনিরুদ্ধ ওকে এখানে ধরে এনেছে। ইন্দ্রাণীর 'ভীষণ মাথাধরা।' 'ভয়ংকর শরীর খারাপ হওয়া' এবং 'একটুও বেরোবার ইচ্ছে না থাকা' সত্ত্বেও কেন প্রায় জোর করেই ঠেলতে ঠেলতে গাড়িতে তুলেছে—'বেরোলেই সেরে যাবে' আশ্বাস দিয়ে! তাই যতবারই অনিরুদ্ধ ততবারই ইন্দ্রাণী, অবোধের ভানে মন্দিরের স্তব্ধতা আর গাম্ভীর্য, পরি-বেশের শুচিতা আর সৌন্দর্য নিয়ে পবিত্র আলোচনা জুড়ে দিচ্ছে। অতএব অনিরুদ্ধকে সে আলোচনায় একবারও যোগ দিতে হয়, একটুক্ষণও নিজের উত্তপ্ত হৃদয়ের ক্ষুব্ধ জ্বালাকে সংবরণ করে রাখতে হয়।

কিন্তু ক্রমশ ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে।

সন্ধ্যা হয়ে এল, পুরোহিত উঠে এসেছেন সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় অবস্থিত দেবমূর্তির আরতির আয়োজন নিয়ে। অনিরুদ্ধ চাপা রাগের স্বরে বলে, "তোমাকে এখানে নিয়ে আসাই দেখছি ভুল হয়েছে আমার। এমন ভাব করছ তুমি, যেন ইতিপূর্বে এখানে কখনও আসনি, যেন এমন বাগান এমন মন্দির জীবনে দেখনি। তার চাইতে গড়ের মাঠের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে বসালে আমার কথা কটা বলবার অবকাশ পেতাম।"

"কথা?" ইন্দ্রাণী আলগা আলস্যে অবাক চোখ তুলে বলে, "বিশেষ কোন কথা বলবার জন্যেই কি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে নিয়ে এলে আমায়?"

"হ্যাঁ, তাইত!" অনিরুদ্ধ রুক্ষ গলায়

তোমার সেই অনুরক্ত ভক্তটি এসে জুটবেন? আমি তোমার কাছে আজ একটা শেষকথা চাই ইন্দ্রাণী।”

ইন্দ্রাণী একবার মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করে আরও ভালমানুষ-ভালমানুষ মুখে বলে, “শেষকথা চাই! তোমার দাবি শুনে মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে যেন কোন কথা লেনদেনের বিজনেস খুলেছিলাম। কিন্তু কবে বল ত? কিছু ত মনে পড়ছে না। আচ্ছা, গোড়ার কথাটা কী?”

সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসেছে, রোদে তোলা ফোটোর মত ইন্দ্রাণীর মুখের একটা পাশ অন্ধকার দেখাচ্ছে, আর-একটা পাশ আলো আলো, সেই আলো-আলো গালটার দিকে একবার তাকিয়ে অনিরুদ্ধ কষ্টে আত্মসংবরণ করে ফের আরও রুক্ষ গলায় বলে ওঠে, “তোমার কথা শুনে কী ইচ্ছে হচ্ছে জান?”

“কী?”

“ইচ্ছে হচ্ছে তোমার ওই গালটায় ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিই।”

“চমৎকার!” হেসে গড়িয়ে পড়ে ইন্দ্রাণী, “ইচ্ছের এ-রকম মৌলিকত্ব সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। এই জন্যেই মাঝে মাঝে তোমাকে কৌশিক দত্তর চাইতে বেশী পছন্দ হয়ে যায় আমার।”

অনিরুদ্ধর দৃষ্টি কোমল হয়ে আসে, গভীর গম্ভীর স্বরে বলে, “ওটা 'মাঝে মাঝে'র জন্যে তুলে না রেখে একেবারে পাকা করে ফেল না ইন্দ্রাণী?”

“এই সেরেছে! তুমিও? গতকাল কৌশিক দত্তও যে ঠিক এই কথাটা বলেছে। আচ্ছা, এসব কথা তোমরা বিলিতী বই পড়ে শেখ বুঝি?”

“থাম।” প্রায় ধমকে ওঠে অনিরুদ্ধ, “তোমার খুকীপনার খেলা রাখ। গতকাল কৌশিক দত্তও ঠিক এই কথাই বলেছে? তার মানে তুমিও গতকাল তাকে ঠিক এই কথাটি বলেছিলে?”

ইন্দ্রাণী একটু ভাববার ভান করে বলে, “তা হয়ত বলেছিলাম। হাঁ হাঁ বলেছিলাম। কৌশিক দত্ত প্রকাণ্ড একটা কবিতা গোটা অওড়ালো বই না দেখে, তাই বললাম—”

“থাক্, থাক্ কী বলেছিলে, আর-একবার উচ্চারণ করবার দরকার নেই ইন্দ্রাণী! কিন্তু আমি বলছি কী, এই বেড়াল-ইঁদুর খেলাটা আর কতদিন চালাবে? ওই রাস্কেলটাকে যদি ছাড়তে না পার, আমাকেই রেহাই দাও; এমন করে আর দগ্ধে মেরো না।”

ইন্দ্রাণীও এবার গম্ভীর হয়ে বলে,

“ধরলেই কি ধরা হয় না? কিন্তু এই ধরা-অধরার ছায়াবাজি আর নয়, শেষ হক এর। এই শেষকথাটাই চাইছি আজ আমি।”

ইন্দ্রাণী বোধ করি চোখ তুলে তাকাল, কিন্তু অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে, আর বোঝা যাচ্ছে না কিছু, সেই না-বোঝার ছায়া থেকে মৃদু হেসে বলে ইন্দ্রাণী, “কথাটা কিন্তু এখনও আমার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে না, কী বলতে চাইছ তুমি? এই দেবমন্দিরের আওতায় বসে তোমার কাছে কবুল করতে হবে, 'এই শেষ, আর নয়?' আর কিছুতেই তোমাকে ভালবাসতে পাব না?”

“ইন্দ্রাণী!” গাঢ় স্বরে বলে অনিরুদ্ধ, “তুমি এমন অনায়াসে এমন কঠিন কথা বলতে পার! শেষকথা চাইছি মানে কি এমনি ধারা শেষ? শেষকথা হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত তুমি কাকে বিয়ে করবে? নিতান্তই যদি কৌশিক দত্তকে না পেলে তোমার জীবন মিথ্যে হয়ে যায়, ত আমি আর জ্বালাতন করতে চাই না। শুধু সেই কথাটা তোমার মুখে স্পষ্ট শুনতে চাই।”

“কী করে বলি বল ত?” কেমন একরকম নিরুপায়-নিরুপায় শোনায় ইন্দ্রাণীর গলার স্বরটা, “যতক্ষণ তোমার সামনে থাকি, মনে হয় বিয়ে করতে হলে কৌশিক দত্তকেই করা ঠিক, তুমি যেন বড্ড সাধারণ—বড্ড চেনা। আর যতক্ষণ কৌশিক দত্তর সামনে থাকি, মনে হয় ও যেন বড্ড বেশী বোকা, বড্ড বেশী হাস্যকর, অতএব বিয়ে করতে হলে তোমাকেই—”

“শুনে ধন্য হলাম।” অনিরুদ্ধ রূঢ় গলায় বলে, এরকম কেন হয় জান ইন্দ্রাণী? তোমাদের এ যুগের মেয়েদের বড্ড বেশী লোভ, বড্ড বেশী চাহিদা বলে। ভারতীয় নারীর আদর্শের কথা তুলছি না, কিন্তু এটাও মনে রেখো, ভাল-মন্দ পূর্ণতা-অপূর্ণতা দুই নিয়েই মানুষের গড়ন, একাধারে সর্বগুণাধার গড়া হয় না। তবু বাছতে হলে ভেবেচিন্তে একটা মানুষকেই বেছে নিতে হয়।”

“সে তো দিনরাত্তিরই ভাবছি গো, মনস্থির করতে পারছি না যে! এইত এখন মনে হচ্ছে তুমি যেন একটি আকাট গোঁয়ার রুক্ষ-সেপাই, কৌশিক দত্ত কেমন শান্ত-শিষ্ট সভ্য ভব্য মার্জিত সুকুমার। অথচ যেই বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকেই দেখব কৌশিক দত্ত তার সেই যত্নে-কোঁচানো ধুতির আগাটি মাটিতে লুটিয়ে গিলে-করা ভাঁজটি অটুট রেখেও সোফায় গা হেলিয়ে এমন ভঙ্গিতে বসে আছে যে, দেখে মনে হবে ও যেন অনন্তকাল ধরে আমার জন্যে অপেক্ষা

মনে হয় মেয়েমানুষ হয়ে একটা মেয়েমানুষকে আবার বিয়ে করব কি!”

অনিরুদ্ধ হতাশভাবে বলে, “তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ইন্দ্রাণী, তোমার মাথার চিকিৎসা করা দরকার।”

ইন্দ্রাণী হেসে ওঠে, “কী আশ্চর্য! আমার প্রাণের বন্ধু অনুভাও ঠিক এই কথাই বলে! আচ্ছা, কেউ কোন নতুন কথা বলতে পারে না কেন বলত? সবাই এক ধরনের কথা বলে কেন?”

“কেন, সেটা তোমার সেই ডাক্তারকে জিজ্ঞেস কোর।” উদ্ধতভাবে বলে অনিরুদ্ধ।

হঠাৎ পিছনে একটা খসখস শব্দ হয়, মৃদু একটু কণ্ঠস্বরের আভাস।

বৌদ্ধ পুরোহিত ওদের সচেতন করতে এসেছেন, আরতি সাঙ্গ হয়ে গিয়েছে, আর এখানে বাইরের লোকের থাকা বিধি নয়।

আরতি হয়ে গিয়েছে!

কী আশ্চর্য! কখন হল?

অবাক হয়ে গেল ওরা! সেই সুগম্ভীর ঘণ্টাধ্বনির একবিন্দু ধ্বনিও ওদের কানে ঢুকল না।

গাড়িতে বসে ইন্দ্রাণী দ্বিধা আলোচনার সুরে বলল, “আচ্ছা, তোমার কী মনে হচ্ছে বলত? তাহলে কি আমি তোমাকেই সত্যি ভালবাসি? নইলে অমন কানের মাথা খেয়ে গল্প করছিলাম কেন?”

অনিরুদ্ধ এক সেকেণ্ড কী একটা ভেবে নিল, তারপর রুদ্ধ স্বরে বলল “ইন্দ্রাণী, তুমি জান আমি একটা ভাল কাজ পেয়ে পুনায় চলে যাচ্ছি, ষোল তারিখে জয়েনিং ডেট,—”

“ওমা, তাই নাকি, যাচ্ছ জানি, কিন্তু এই সামনের ষোলই?”

ইন্দ্রাণী আঙুলে গুণে বলে, “মাগো ত তা হলে মাত্র সাত দিন।”

“হাঁ। এই সাত দিনের মধ্যেই আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবন স্থির করে ফেলতে চাই, মনস্থির করতে এ কটা দিন সময় দিলাম তোমায়,—এর মাঝখানে আর দেখা করে ব্যস্ত করব না। আশা করি এই সাত দিন ধরে অনবরত কৌশিক দত্তকে দেখতে দেখতে নিশ্চিত একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে তুমি।”

“তা কে জানে?”—ইন্দ্রাণী একটা হাই তুলে বলে, “কৌশিক দত্তও ত বলছিল এই তেরো তারিখ থেকে ওদের কলেজ বন্ধ হবে, দু মাস ছুটি, ত্রিপুরা না শ্রীহট্ট কোথায় যেন বাড়ি ওর, সেখানে যাবে! কাজেই দুজনকেই যদি না দেখতে পাই, দুজনের জন্যেই হয়ত মনকেমন করবে, মনস্থির করব কী করে?”

ল আনিরুদ্ধ, "আমার জবাব পেয়ে াচ্ছি। কিন্তু তুমি মনে কোর না ইন্দ্রাণী, াংলাদেশে তুমিই একমাত্র পাত্রী! আর ্মি ছাড়া আর বউ জুটবে না আমার।"

"বাঃ, সে-কথা আবার কখন মনে রলাম আমি?" ইন্দ্রাণী ছলছলে গলায় লে, "বরং এখন মনে হচ্ছে হয়ত বা তামার জন্যেই আমার বেশী মনকেমন রবে। আর পুণা জায়গাটাও থাকবার ক্ষে ভাল।"

"বেশ, আরও এক মাস সময় দিচ্ছি, ঠকানা রেখে যাব, যদি ইচ্ছে হয় চিঠি লখে জানিও।" বলে গাড়ির গতি জোর রে দিয়ে নিঃশব্দে চালাতে থাকে নিরুদ্ধ।

দরজার কাছে নামিয়ে দিয়ে গেল নিরুদ্ধ, নিজে নামল না। ইন্দ্রাণী ঘরে ুকে দেখল তাদের দুজনের মাঝখানের তীয় ব্যক্তিটি যথারীতিই অধিষ্ঠান করছেন সবার ঘরে ফুলকোঁচানো ধুতির কোঁচাটি মাটিতে লুটিয়ে, গিলে-করা াড়িদারের ভাঁজটি না ভেঙে অথচ গা হলিয়ে অনন্তকাল ধরে অপেক্ষার ভঙ্গিতে।

দেখে মাথায় রক্ত চড়ে গেল ঠিকই, তবু হাসতে কার্পণ্য করল না ইন্দ্রাণী। রীতি-মত আপ্যায়নের হাসি হেসেই বলল, "এই যে আছেন বসে? যা দেরি হল আমার, ভাবনা হচ্ছিল, আপনারও না ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।"

শুনলে লোকের বিশ্বাস হবে কিনা জানি না, কৌশিক দত্ত হচ্ছে ইন্দ্রাণীদের কলেজের অধ্যাপক। বাংলার অধ্যাপক। অধ্যাপকদের মধ্যে বয়সে সব থেকে কম, আর দেখতে সব থেকে সুন্দর।

পড়ানো?

সে ত এমন অদ্ভুত ভাল যে, ক্লাস সুদ্ধু সব মেয়েই প্রায় এই অদ্ভুত ভাল পড়ানো অধ্যাপকের প্রেমে পড়ে বসে আছে। তবে অধ্যাপক নিজে মাত্র একজনেরই প্রেমে পড়েছেন, সে ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণী ক্লাস সুদ্ধু মেয়ের ঈর্ষার আর পরিহাসের পাত্রী। ইন্দ্রাণী অবশ্য পরিহাস গায়ে মাখে না, বরং কৌশিক দত্ত ওর বাড়িতে গিয়ে কতটা হ্যাংলামি আর কী কী ক্যাবলামি করে হেসে হেসে তার বিশদ বিবরণ দিয়ে সহপাঠিনীদের সূক্ষ্ম ঈর্ষাটা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করে।

কিন্তু সে যাক। এখন উপভোগ্য রয়েছে আলাদা।

"ইন্দ্রাণীকে দেখেই কৌশিক দত্ত

নিশ্বাস ফেলে বলে, "আমার পণ ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবই।"

"সেই ত হয়েছে জ্বালা। এই দেখুন না, এতক্ষণ ধরে আনিরুদ্ধ ওই একই কথা নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর করল। বলে কিনা 'সাতদিন সময় দিলাম আমায় বিয়ে করবে কি করবে না পাকা কথা দাও।' আচ্ছা বলুন ত, বিয়ে কি একটা জিনেস যে এভাবে কথা দেওয়া যায়?"

কৌশিক দত্তর ফরসা ধবধবে গোল মুখটা পাকা আপেলের মত টুকটুকে হয়ে ওঠে। গোল মুখ আরও গোল করে উত্তর দেয় সে, "কিন্তু কথা ত একটা

পেতে চাই ইন্দ্রাণী।" কৌশিক দত্তর কণ্ঠস্বর গদগদ হয়ে ওঠে, "না না, ভুল বলছি, কথা চাই না, তোমাকেই চাই। বল ইন্দ্রাণী, তোমার দাদাকে বলি আমি।"

"এই মরেছে!" ইন্দ্রাণী চোখ কপালে তুলে বলে, "আমার দাদাকে আবার আপনি বলবেন কী? না, না, সে যা বলবার আমিই বলব।"

"কবে আর বলবে ইন্দ্রাণী?" কৌশিক দত্তর দৃষ্টি স্বপ্নালস হয়ে আসে, 'আর কতদিন রইব বসে দুয়ার খুলে?', "আমার কী ইচ্ছে করছে জান ইন্দ্রাণী?"

ইন্দ্রাণী চমকে উঠে বলে, "আঁ,

"আমার কী ইচ্ছে করছে জান ইন্দ্রাণী?"

পাওয়া দরকার। অবশ্য তুমি যদি তোমার বাল্যপ্রণয়ীকেই চাও, সে আলাদা কথা, তবে

আপনারও কিছু ইচ্ছে করছে?"

কৌশিক দত্ত সন্দেহযুক্ত স্বরে বলে

"না। ও কিছু না। মানে, অনিরুদ্ধও একটু আগে বলছিল কিনা, ইচ্ছে করছে—"

"কী ইচ্ছে করছে?" চোখটা জ্বলে ওঠে কৌশিক দত্তর অন্ধকারে নেকড়ের মত, গলার স্বরটা খাদে নেমে যায়, "বলতে বলতে থেমে গেলে যে?"

ইন্দ্রাণী চোরা হাসি হেসে বলে, "না, মানে আপনার কাছে বলতে একটু লজ্জা করছে—"

"লজ্জা করছে!" কৌশিক দত্ত সোজা হয়ে উঠে বসে, "কী বলেছে তোমায় স্কাউন্ড্রেলটা? ওকে আমি শিক্ষা দিয়ে দিতে পারি তা জান?"

"হ্যাঁ, তা শিক্ষা দিয়ে দেওয়াই উচিত," ইন্দ্রাণী দুঃখু-দুঃখু গলায় বলে, "আমায় বলে কিনা 'ঠাস করে চড় বসিয়ে দিতে ইচ্ছে তোমার গালে।' দেখুন তো—"

কৌশিক শিথিল ভঙ্গিতে বসে পড়ে হতাশ গলায় বলে, "আমার সঙ্গে তোমার ঠাট্টার সম্পর্ক নয় ইন্দ্রাণী।"

"কী কান্ড সার, আমি কি ঠাট্টা করছি? এই আপনার গা ছুঁয়ে বলছি, সত্যি ও এই কথা বলেছে আমায়।"

কৌশিক দত্ত হঠাৎ সেই গা-ছোঁয়া হাতটা ধরে ফেলে বলে, "ওর কথা তুমি আর আমার সামনে বোল না ইন্দ্রাণী, দোহাই তোমার। তুমি আমায় অনুমতি কর এই তিনদিনের মধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলে একেবারে তোমায় নিয়েই চলে যাই।"

"ওমা, সে কী! দাদা যেতে দেবেন কেন? উঁহু কক্খনো যেতে দেবেন না। অবিশ্যি ত্রিপুরা জায়গাটা শুনেছি খুব সুন্দর।"

"আরও সুন্দর হয়ে উঠবে ইন্দ্রাণী, যদি তোমার পা পড়ে। কিন্তু ইচ্ছে করে ছেলেমানুষের মত কথা বল কেন? আমি কি এমনি নিয়ে যেতে চাইছি তোমায়? বিয়ে করে নিয়ে গেলেও যেতে দেবেন না তোমার দাদা?"

"বিয়ে! ও! তাড়াতাড়িতে অতটা বুঝতে পারিনি। মাপ করবেন। কিন্তু দাদা যে আমার বিয়েতে ভীষণ ঘটা করতে চান, তিন দিনের নোটিসে কি রাজী হবেন?"

আশায় জ্বল-জ্বল করে ওঠে কৌশিক দত্তর ঈষৎ সোনালী চোখ দুটো। আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে বুক। কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে, "বেশ আমি অপেক্ষা করব। বল, কতদিন প্রতীক্ষার শেষে পাব তোমায়?"

ইন্দ্রাণী ব্যস্তভাবে বলে, "না না, সে কী? ছুটিটা মিথ্যে নষ্ট করবেন কেন? এত তাড়াহুড়োর কী দরকার? তার চেয়ে ঠিকানাটা আমায় দিয়ে যান, আমি বরং চিঠি লিখে—"

কৌশিক দত্ত হতাশভাবে বলে, "বেশ! বুঝেছি তুমি এখনও মনস্থির করতে পারনি। আশ্চর্য হয়ে যাই ভেবে, কী আছে তোমার ওই অনিরুদ্ধর মধ্যে। ওই ত চেহারা!"

"তা যা বলেছেন!" ইন্দ্রাণী হেসে ওঠে "চেহারায় [illegible]পনার ধারেকাছে ও লাগতে পারে না। [illegible]কগে, চা খাবেন ত সার্।"

অনিরুদ্ধ সত্যিই সাত দিনের মধ্যে একবারও দেখা করেনি। চলে গেল পুনায়। কিন্তু কৌশিক দত্ত ত্রিপুরা যাবার আগে স্টেশনে যাবার সময় পর্যন্ত দেখা করে গিয়েছে, বিদায় নিয়েছে কাঁপা কাঁপা গলায় —'আশার বাণী' বহন-করা পত্র চেয়েছে তাড়াতাড়ি।

পুনায় চিঠি যায় কৌশিক দত্তর যেন অনুকূলেই। "অনেক ভেবে দেখলাম অনিরুদ্ধ, তোমার সম্বন্ধে মনস্থির করতে পারলাম না। অনেক জ্বালিয়েছি তোমায়, ছোটবেলার বন্ধু বলে মাপ কোর।"

কিন্তু কৌশিক দত্ত কেন খাম খুলে অমন নীলচে মেরে গেল? কেন তার গোল গোল মুখটা ঝুলে পড়ল অমন করে? ওর চিঠির ভাষাটাও যে প্রায় একই।

"অনেক ভেবে দেখলাম সার্, কিছুতেই মনস্থির করতে পারলম না। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে, ভাবছি আর হাসি পাচ্ছে। হয়ত অনেক বিরক্ত করেছি আপনাকে, ছাত্রী বলে মাপ করবেন।"

ওরা দুজনে যখন চিঠিটা রেখে স্তব্ধ হয়ে ভাবছিল—ইন্দ্রাণী কিনা শেষটায় ওই একটা বাজে লোককে—তখন ইন্দ্রাণী ওর বান্ধবী অনুভার উদ্দেশে চিঠি লিখছিল, "কী করব বল্, মনস্থির করার উ[illegible]য় কোথা? আমি ত সিরিয়াস হতেই চাই, কিন্তু সিরিয়াস হতে পাব এমন লোক ত পাই না। ওরা যখন সিরিয়াস হয় তখন আমার কেবল হাসি পায়। অনেকবার অনিরুদ্ধটার কথা ভেবেছি, কিন্তু বলেইছি ত তোকে, বড্ড বেশী পরিচিত, বড্ড বেশী আটপৌরে হয়ে গেছে ও। ও কথা কইতে গেলেই আমি বুঝতে পারি ও কী বলবে, আমি তাকালেই ও বুঝতে পারে আমি কী বলতে চাই। এই রহস্যহীন জীবন নিয়ে কদিন ঘর করতে পারব? শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে ফেলেছি দাদাকেই নির্বাচনের ভার দেব। গলায় মালা দেবার আগে পর্যন্ত বরের ফুলশয্যার রাতে অবগুণ্ঠনের আড়ালে বসে ঘামতে ঘামতে পুলকে রোমাঞ্চিত হব। কী বলিস, আইডিয়াটা খারাপ? তুইও ত বলিস পড়া-বই কিনতে তোর ভাল লাগে না।

ওদের কথা বলবি? তার জন্যেও ভাবি না, ওদেরও ত একই অবস্থা। ওদের মধ্যেও ত একজন অন্তত না-পড়া বই পড়বার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হত? তবে কী জানিস, মানুষের জীবনে রসের প্রয়োজন আছে, আর যে-রসটা হচ্ছে নিষিদ্ধ ফলের। মনস্থির করে স্থির করেছি, সারাজীবন ধরে ওদের প্রেমপত্র লিখব আমি। সে সব চিঠিতে এই কথাটা বেশ ভাল করে বুঝিয়ে ছাড়ব বুদ্ধির [illegible] তাকে মিস্ করে জীবনে একটা পরম ক্ষতি হয়ে গেছে আমার। কী বলিস এ আইডিয়াটাই কি মন্দ? দেখিস তা হলে ওরাও কোনদিন বুড়িয়ে যাবে না, আর আমিও। না আমি কোনদিন মূল্যহীন হয়ে পড়ব না। পুরুষের আসক্তি দিয়েই ত মেয়েদের মূল্যের পরিমাপ।

খুব খারাপ ভাবছিস আমায়?

কিন্তু কেন? ভেবে দেখ সত্যিই কি খারাপ?

জগতের সমস্ত কাব্যরসই ত এই নিষিদ্ধ ফলের রস। 'স্বামীটি ছাড়া আর আমার কোন অনুরক্ত ভক্ত নেই' এ ভাবতে নিজেকে, ভারী বেচারী-বেচারী লাগে না কি? আমি বলি ঘর সংসার করতে যেমন একটি স্নেহবান হৃদয়বান এবং অর্থবান মজবুত স্বামীর দরকার, তেমনি ঘর সংসারের ঊর্ধ্বে অবস্থিত মনটাকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রেমপত্তর লেখবার মত দু-একটা ভক্ত থাকাও নিশ্চয় দরকার। নয় কি না তুইই বল্। তোর ত বিয়ে হয়েছে, এ রকম না হলে কদিন আর বেঁচে থাকতে পারবি তুই? কিন্তু দেখ এতে আমিও বেঁচে থাকব, ওদেরও বাঁচিয়ে রাখব।"

হাইড্রোসিল (একশিরা)

কোষ সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ ও দৌর্বল্য বিনা অস্ত্রে চিরতরে আরোগ্য করা হয়। দি ন্যাশনাল ফার্মেসী এবং ডাঃ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ এম বি'র সাইনবোর্ড দেখিয়া দোতলায় আসুন। ৯৬-৯৭, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা—৭। প্রবেশপথ—হ্যারিসন রোডের উপর জংশন হইতে দ্বিতীয় দরজা। স্থাপিত—১৯১৬। ফোন: ৩৩—৬৫৪০ সময়—প্রত্যহ সকাল ৯টা হইতে রাত্রি ৮টা। রবিবারও খোলা থাকে।

সুদূর মফস্বলের একটি ছোট্ট রেল স্টেশন। প্লাটফর্ম বলতে বিশেষ কিছু নেই লাইনের ধারে একসারি পাথরের লম্বা লম্বা [illegible], তার ভিতর হালকা করে সুরকি ছড়ানো, তাইতেই যা হয়। সমস্ত অঞ্চলটাই মেঠো আর বিরল-বসতি। স্টেশনের কাছাকাছি গ্রাম ত নেইই, দূরেও গাছপালার আড়ালে কোথায় কী আছে আন্দাজ হয় না ঠিকমত। তারই মধ্যে একখানির নাম ধরে স্টেশনের নামকরণ করা হয়েছে। গাড়ি সমস্ত দিনে তিনখানি আপ, তিনখানি ডাউন। আমি যাব আপ অর্থাৎ উত্তরে। আসতে আসতে বেশ খানিকটা পথ থাকতেই গাড়ি এসে চলে গেল। ফাল্গুনের মাঝামাঝি রোদ বেশ তেতে এসেছে। প্লাটফর্মের মাঝখানে একটি বেশ ঘনপল্লবিত দেবদারু গাছ, তারই নীচে গিয়ে হোল্ডঅল থেকে শতরঞ্চিটা বের করে পেতে বসলাম।

প্লাটফর্মে লোক আর মাত্র দুজন। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক আর একটি বছর পনেরোর মেয়ে। পাল্কিতে আসতে আসতে দূর থেকেই চোখে পড়েছিল; ভদ্রলোক একটা কী বিছিয়ে শুয়ে আছেন, মেয়েটি দুলে দুলে তাঁর পা টিপছে। বস্তুত তার উল্টো দিকেই মুখ করেছিল, একবার ঘুরে আমার দিকে নজর পড়তে ভদ্রলোককে বোধ হয় জানাল। তিনিও ঘাড়টা ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে উঠে বসলেন।

আমি পৌঁছে গুছিয়ে বসে আলাপ শুরু করেছিলাম। দুঃখের কাহিনী।...ভদ্রলোক নাম বললেন লক্ষ্মীকান্ত বসু। হ্যাঁ, এটি মেয়েই। আসছেন নগাঁ থেকে; ওই যে তিনটে তালগাছ একসঙ্গে মাথা ফুঁড়ে উঠেছে, ওইখানে। না, বাড়ি ওখানে নয়, বাড়ি ওঁদের হুগলি জেলে, সেও এই রকম স্টেশন থেকে নেমে দু ক্রোশ পথ। পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যাবে, তারপর গাড়ি যদি লেট করে এল—প্রায়ই লেট থাকে, এই গাড়িটাই টাইমে এসেছিল—কপাল দোষেই বলতে হবে ইস্টিশনে পা দিতে-না-দিতে ছেড়ে দিল—তিনি যদি আবার লেট করে আসেন ত চিত্তির; [illegible] পথ, সঙ্গে মেয়ে, কী যে করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

ক্লান্ত আর কেমন যেন বেশী রকম মন-মরা দেখে আমি সান্ত্বনাচ্ছলে বললাম, অত ভেবে কী করবেন? এমনও ত হতে পারে আজ টাইমে আসবার পালা আছে।'

একটু ম্লান হাসি হাসলেন ভদ্রলোক, বললেন, 'বড় সুযাত্রা করে বেরিয়েছি কিনা, সব শুনলে ওকথা আর বলতেন না। ওই ত বললাম, গাড়ি টাইমে এল সেও কপাল দোষেই।'

'কী ব্যাপারখানা—যদি আপত্তির কিছু না থাকে...'

শহরের দিকে হলে প্রশ্নটা মুখে বেধে যেত। ভদ্রলোক একটু ঠোঁটে সেইরকম হাসি নিয়ে মাথা নিচু করে রইলেন, তারপর জানালেন, 'না, আপত্তি কিসের? দুঃখের কথা জানাতেই ত চায় লোকে, জানবার লোক পেলে হালকাই ত হয় মনটা। কিন্তু ফল ত নেই, যাকে শোনানো তারও মনটা না হক ভারী করে দেওয়া, একে ত আমারও গাড়ি টাইমে এসে পড়ায় এই নিগ্রহ... নগাঁয় ওঁর এক আত্মীয়ের বাড়ি। পাশের গ্রাম চন্দনায় একটি পাত্র যোগাড় করে মেয়েটিকে দেখাবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, ওদিকে খেতের ফসল তোলার হাঙ্গামায় আর যাওয়া হয়নি—একে সামান্যই, টেনেটুনে বছরটা কোনরকমে চলে, ছেড়ে গেলেই ত পরের হাত তোলার উপর নির্ভর—হাঙ্গামা মিটিয়ে নিয়ে এসেছিলেন মেয়েটিকে, তা...'

প্রশ্ন করলাম, 'হল না?'

কথাটা ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোক হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, একটু চুপ থেকে যেন গ্রামটার দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন, 'না হওয়ারও একটা সামঞ্জস্য আছে। এ যেন এগিয়ে দিয়ে—টেনে নেওয়া ভগবানের। তাইত হয় দুঃখ। সব একরকম ঠিকঠাক হয়ে একটা সামান্য খুঁতের জন্যে গেল ভেস্তে—সে খুঁত এমন যে, আজ পর্যন্ত খুঁত বলে কারুর মনে হয়নি, বরং প্রশংসাই পেয়ে এসেছে সবার।'

থেমে গিয়ে ভদ্রলোক একটু অন্যভাবে হেসে মেয়ের সঙ্গে একটু ঠাট্টা করেই বললেন, 'হ্যাঁরে অনু, বল্ দোষ কি খুঁতটা! না হয় ঘুরেই চা না ওনার দিকে, দেখুন নিজের চোখে।'

মেয়েটি আমি আসা পর্যন্ত মুখটা

ঘুরিয়ে দুটি হাঁটু জড়িয়ে বসেছিল, মাথায় আপাত্তির একটু ঝাঁকুনি দিয়ে আরও ঘুরিয়ে নিল ওদিকে।

'লজ্জা পেয়ে গেছি।'

একটু হেসেই আমার দিকে চেয়ে বললেন কথাটা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কী যে হোল, চোখ দুটো হঠাৎ ডবডব করে উঠল, তারপর কোঁচার খুঁটটা তোলবার আগেই ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়ল।

বেজায় অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম আমি, বললাম, 'থাকগে একথা। আমারই ভুল হয়েছে, জানতাম না ত। স্থির হন আপনি।'

চোখ দুটো মুছে নিয়ে বললেন, 'কী যে লজ্জা...আগেকার মতন ন দশ বছরের মেয়ে নয়ত...খায়নি পর্যন্ত...পেটে বেদনার ছুতো করে...কোথায় বেদনা তা আমি বাপ হয়ে কি না বুঝে পারিনে পাগলি?... উফ!...'

কী যে করব, কী বলব ভেবে উঠতে পারছি না। উনি ত চোখে কোঁচার খুঁটটা চেপে ধরেছেনই, বেশ বুঝলাম মেয়েটিও স্থির থাকতে পারেনি, চাপা কান্নায় ভেঙে পড়েছে ওদিকে।

একটু নিরুপায়ভাবে চুপ করে থেকে মনে করলাম একটু এগিয়ে গিয়েই না হয় শান্ত করবার চেষ্টা করি গায়ে পিঠে হাত দিয়ে, পাড়াগাঁ-ই ত। উঠতে যাব, এমন সময় স্টেশনের বাইরে হঠাৎ একটা চেঁচামেচি উঠতে সমস্ত ব্যাপারটা আপনিই সামলে গেল।

আমি যে-রাস্তা দিয়ে এলাম, সে-রাস্তায় আর-একখানি ছৈ-দেওয়া গরুর গাড়ি আসছিল। আমরা লাইনের দিকে মুখ করে বসে ছিলাম, লক্ষ্য করা হয়নি, গাড়িটি এসে গিয়েছে এবং চেঁচামেচি সেইখানেই।

প্রথমেই আচমকা যে-কথাটা শুনে আমরা তিন জনেই চকিত হয়ে ঘুরে চাইলাম সেটা হচ্ছে—'আমি হচ্ছি মালীঘরার ডাকসাইটে মিত্তির বাড়ির ছেলে—আমার নাম বংশী-ধারী—আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি চলবে না!'

চড়া গলা। একটি প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের মোটাসোটা ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরই। ভিতর থেকে একে একে আরোহীরা নেমে আসছে, জিনিস-পত্র নামানো হচ্ছে, উনি এক হাতে একটা মোটা লাঠি নিয়ে একটা হাত কোমরে দিয়ে বকে যাচ্ছেন—

'তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে হাত-পা জখম করতে হবে না, গাড়ির ঢের দেরি আছে...নিগ্রহের কসুর হয়নি, এর ওপর আর বাড়াবার দরকার নেই...ট্রাংকটা দুজনে ধরে, দুজনে...মহিম তুমি ভেতর থেকে অংটোটা ধরে আলগে দাও...নাপতে কোথায় গেল?...একটু ধর-না সামনে এসে বাবা, পাওনা মারা গেল বলে তোর যে দেখছি... তা বলে ওই মেয়ে ঘরে আনতুম এইটেই ইচ্ছে তোদের? ...ললিত কোথায় গেল? ...ও ছৈয়ের ওদিকে রয়েছে? না, দেখছি ত, তোমারও মনটা যেন—কী যে বলে...'

গুছিয়েগাছিয়ে নিয়ে দলটা এগুল। বড়র মধ্যে তিনজন, তিনটি যুবা, দুটি বছর বারো তেরো ছেলে, একটি আরও ছোট, একজন নামাবলী গায়ে বামুন পণ্ডিত আর একজন ছেঁফর গোছের। হাতে টোপর দেখে মনে হল নাপিত আর উনি পুরুত, আর সমস্ত দলটি বরযাত্রীর দল।

ভদ্রলোক চেঁচাতে চেঁচাতেই আসছেন—'হল নিগ্রহ, কিন্তু দোষটা কার? গোড়াতেই যদি দেখিয়ে দেয় এই আমাদের মেয়ে...নাও ওইখানটায়ই বোস, বেশ ঠাণ্ডা আছে, হীরু, কম্বল দুটো বিছিয়ে দে—আপনাদের অসুবিধে হবে?'

এসে পড়েছেন গাছতলাটায়। বললাম, 'না, অসুবিধে কিসের? জায়গা ত যথেষ্ট রয়েছে। বরং এদিকটায় এসে বিছুতে বলুন, রোদ এসে পড়বে। কোনদিকে যাবেন?'

'আগে গাড়ির ত দেরি আছে এখনও? আজগুবি দেশ মশায়, কোন গাড়ি কখন আসবে, ওদিকে মেয়ের বাপ সে সাধু কি ধাপ্পাবাজ দাঁড়াবে—কিচ্ছু হদিস পাওয়ার জো নেই এ-দেশে।'

বললাম, 'দেরি আছে।...বরযাত্রী নিয়ে যাচ্ছেন?'

'নিয়ে যাচ্ছি মানে!'—হীরু নাপিত কম্বল বিছিয়ে দিয়েছে, সবাই বসেছে, উনি বসতে গিয়ে হঠাৎ উগ্রভাবে আমার দিকে চেয়ে থেমে গেলেন, তারপর হাতের ভরে ভারী শরীরটা নামিয়ে দিয়ে সেই ভাবেই বলে চললেন, 'নিয়ে যাচ্ছি কী বলছেন আপনি। বিয়ে ভেঙে দিয়ে ফিরে আসছি।...এইত হয়েছে, আপনি একজন বাইরের লোক, কোনদিকে টেনে বলবার আপনার কোন স্বার্থ নেই, আপনি নিরপেক্ষভাবে বলুন... তার আগে আমার মুখটা ভাল করে দেখে নিন একবার দয়া করে।'

ভদ্রলোক সোজা আসনপিঁড়ি হয়ে বসে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। কেন দেখানো এভাবে, কী উদ্দেশে, কিছুই বুঝতে না পেরে আমি একটু হতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকে বললাম, 'মুখ ত দিব্যিই দেখছি।'

ভদ্রলোক চোখ কপালে তুলে বললেন, 'কিন্তু নাক কোথায় মশায়!...কুলীর বংশ নয় মালীঘরার মিত্তিররা, কিন্তু নাক কোথায়? এই নাক (হাত বুলিয়ে) দুদিকে গালের সঙ্গে প্রায় মিশে এলো বলে—বাবার, তাঁর আগে ঠাকুর্দার অয়েল রয়েছে বৈঠকখানায় টাঙানো, দেখলে মিলিয়ে দেখুন পুরুষানুক্রমে কী রকম নেমে আসছে, এর ওপর আমি যদি আ... খাঁদা মেয়ে এনে ঘরে ঢোকাই...আ... ওর নাকটাও তা হলে দেখে নিন একবা... সাধন! একবার ফিরে চাও এদিকে।'

আর ও-মেয়েটির মত নয়। তিন যুবকের মধ্যে মাঝেরটি আস্তে আ... তুলছিলই মাথা, আর-একটা ডাকে সে... করে তুলে আমার মুখের দিকে চাইল। ... নরম কচি মুখখানি, গৌরবর্ণ, টানা-টা... চোখ। নাকটা ভদ্রলোকের ধাঁচেই, খানি... চাপা; তবে তাতে তাঁকেও যেমন কুৎসি... করেনি, তেমনি একেও করেনি। ই... লজ্জিত, হয়ত একটু কাতরও; মি... মুখটার ওপর দৃষ্টিটা আটকে গিয়েছি... ভদ্রলোকের প্রশ্নে চকিত হয়ে উঠল... 'দেখলেন ত?...আমার ছেলে, এরই বি... দিতে এসেছিলুম। দেখলেনই ত আ... চেয়েও এক ডিগ্রি নেমেছে। এখন আপনি... বলুন, যদি এখনও সাবধান না হওয়া য... এই বোঁচার স্কন্ধে আর-এক বোঁচি এনে...

'তা বলে ভেঙে দিয়ে আসা একেবারে না এগুলেই ত ভাল ছিল।'

ও'র কথাগুলো সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে রাগের মাথায়; তা ভিন্ন আমার সামনে চেহারার খুঁত নিয়ে ঠিক ওই ধরনের এ... ট্র্যাজেডী, মনটা খিঁচড়ে এসেছে, এক... বিরক্তভাবেই কথাগুলো বলে থাকব, বংশী-ধারীবাবু একটু যেন দমেই গেলেন। তারপ... —'আপনিও তা হলে...' বলে আবার পু... হাঁসফাঁস খাপ্পাই হয়ে উঠলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, দি... আসতে হল ভেঙে। যেমন কুকুর তেম... মুগুর না বের করলে চলে? তোমার খাঁ... মেয়ে তা সে কথা লুকিয়ে ওরকম ধাপ্প... দেওয়ার দরকার কী? ওই মহিম রয়ে... ছেলের মামা, ও ত মিছে কথা বলবে না... যখন মেয়ে দেখতে এল—ও আর ওই ললি... এসেছিল—বলুক ওরা।' দিব্যি নাকওয়... মেয়েই ওদের দেখায়নি তখন? কি গে... ললিত?

সমস্ত দলটি স্বভাবত ঝিমিয়ে গিয়েছে, মহিম আমার দিকে চেয়ে একটু মন্দকণ্ঠে বললেন, 'আমাদের ত অন্য মেয়েই দেখিয়ে ছিল। তঞ্চকতাটুকু না করলেই হত।'

ললিত একটু আড়ে চেয়ে বললে... 'রাত্তিরে দেখা, অনেক দিন হলও, আ... মনে নেই। তা হয়ই যদি ত এ-মেয়ে... পড়ে থাকবার নয়।'

'শুনুন। ললিত আমার ওপর চটেছে, পড়ে থাকবার কথা হচ্ছে কী? কিন্তু, সাধন, আর-একবার ঘুরে চাও।'

একবারেই হুকুম তামিল করবার ... কড়া গলা এবার, সাধন এবার আর ইতস্ত... না করে ঘাড়টা তুলে চাইল আমার দিকে। বংশীধারীবাবু বললেন, 'আমার কাছে ত ঢাক কড়া নেই, বেশ ভাল করে দেখে নিন। ও...

...জের মধ্যে পা বাড়িয়ে দিলে কী নাশটা ডেকে আনা হত। একটা গোটা বংশ, সব আছে, নাক নেই, নেমে যেতে যেতে বিলকুল লোপাট! ভাবতে পারেন?'

ললিত একটু বিরক্ত হয়েই মুখটা ঘুরিয়ে বললেন, 'যদি হত সর্বনাশ—যেমন তুমি বলছ—চীনেরা জাপানীরা যখন টিঁকে আছে তোমার বংশও থাকত টিঁকেই—ভালভাবেই টিঁকে, তাদের তুলনায় সাধন তোমার ত খগরাজ গরুড় বলতে হবে।'

'শুনে রাখুন মশায় কথাটা!...সাধন। অত অবাধ্য হয়েছ কেন? খানিকক্ষণ ঘুরিয়ে রাখতে কী হয় মুখখানা?'

এতক্ষণ হুকুমই ছিল, এবার রীতিমত রাগ। সাধন আবার ফিরে চাইলে বললেন, না, গোমড়াপনা করবে না মুখ, তাতে নাকে ইতর-বিশেষ হবে ধোঁকায় ফেলতে পারে ওঁকে। ...এইবার দেখুন মশায় ভাল করে। ললিতের ওটা রাগের কথা হল না? এই ছেলেকে খগরাজ গরুড় বলতে হবে?... আর তাই মনে করে মালীঘরার মিত্তির বংশের ছেলে আমি—একজন ধাপ্পাবাজি করে তার খাঁদা মেয়েকে যে গছিয়ে দিতে চাচ্ছে...তা নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে...'

একটু রাগের হাসি হেসেই বললাম, কিন্তু যাদের একেবারে ঘাড়ে কুড়ুল পড়ল...'

'পড়তে পারল কোথায় মশায়? টাকার জোর আছে, আগে বোধ হয় কথাও হয়ে নাকের জন্যে ভেস্তে গিয়ে থাকবে। পাশের গ্রাম থেকে সেই পাত্র আনিয়ে...'

'তা আপনিও না হয় খাঁইটা বাড়িয়ে দিতেন, এমন একটা দাঁও...'

মনটা ক্রমেই তিক্ত হয়ে উঠছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম কাজ কী, পরের কথায় যাব না। কিন্তু ক্রমেই ভদ্রলোককে ব্যাপারটা তিক্ত করে তুলতে দেখে মনে হল, তা হলে ভাল করেই মিষ্টি মিষ্টি দু কথা শুনিয়ে ঠাণ্ডা করে দিই। কিন্তু এই সময় একটা ব্যাপার হতে মাঝপথেই থেমে যেতে হল।

লক্ষ্মীকান্তবাবু এতক্ষণ মুখটা একেবারেই ওদিকে করেছিলেন, আঘাতটা একেবারে সোজাসুজি গিয়ে পড়ছে ত, আমার এই ভাব পরিবর্তনে ঘুরে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর সব ছেড়ে আমার দৃষ্টিটা একেবারে ওঁর নাকের উপর কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠল—যা এতক্ষণ মোটে খেয়াল করিনি।

মুখটি একটু শুকনো এবং সে তুলনায় নাকটি বেশ বড় এবং বর্তুল। মনটা বংশীধারীবাবু থেকে একেবারে ওঁদের দিকে গিয়ে পড়ল,—এই বাপের মেয়ে যখন তখন এখানেও দেখছি নাকেরই ট্র্যাজেডি—ওদিকে স্বল্পতায়, এদিকে বাহুল্যে।

তা হলে কিন্তু কোনদিকে যায় মানুষ? সমস্যাটা একটি বিষম প্রশ্নে ঘনিয়ে উঠেছে মানে এমন সময়ে নিশ্চয় হঠাৎ সব কথা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যই এতক্ষণ পরে মেয়েটিও ঘুরে চাইল।

চোখ যেন জুড়িয়ে গিয়ে মনের সব জ্বালা কোথা দিয়ে গেল নেমে। দুর্লভ মুখ একখানি। টানা-টানা বিহ্বল চোখ, চাপা ঠোঁট। বিশেষ করে নাকটি। পরন্তু গোলছাঁটের সুডৌল মুখে বাপের ওই নাকই তার পরুষ বর্তুলতা হারিয়ে কী বাহার করে ঠোঁটের কাছাকাছি পর্যন্ত যে নেমে এসেছে, যেন চোখ ফেরানো যায় না।

দেখা অবশ্য আধ মিনিটও নয়, ফিরিয়ে নিয়েছে মুখটা। আমি কিন্তু মন স্থির করে ফেলেছি। হেসেই মিষ্টি মিষ্টি করে "দাঁও"-এর কথা বলতে যাচ্ছিলাম বংশীধারীবাবুকে, সেই হাসিটাকে মোলায়েম আর রুচিকর করে নিয়ে বললাম, 'না, রাগ করবেন না বংশীধারীবাবু, দাঁও মারাটা দুনিয়ার চাল হয়ে গেছে বলেই বলছিলাম, মালীঘরার মিত্তির বাড়ির সন্তান যে তাতে নামবেন না এটা জানাই। তবে...'

হাসিটা আরও বড় করে দিয়ে চুপ করে গেলাম।

ভাব ও ভঙ্গিমার একেবারে দিক পরিবর্তনে সবার দৃষ্টি এদিকে এসে পড়েছে, বংশীধারীও একটু হকচকিয়ে গিয়েছেন, বললেন, 'বলুন, কী বলছেন, থেমে গেলেন কেন?'

একটু শব্দ করেই হেসে বললাম, 'কিন্তু মিত্তির বংশের মর্যাদা কঠোর পরীক্ষার সম্মুখে, আগে থাকতেই বলে রাখছি, মাফ করবেন। বলছিলাম, সত্যিই নাকের জন্যেই এত চাচ্ছেন কী? তা হলে আমি এমন বাঁশির মত নাক দিতে পারি—এখনই—এখানেই...'

'কোথায়? চলুন—কথা দিচ্ছি আপনাকে। ...কিন্তু এখানে কোথায়?...'

লক্ষ্মীকান্তবাবুর বিস্ময় বিমূঢ় চোখদুটির উপর দৃষ্টি ফেলে বললাম, 'আপনার মেয়েকে একটু ঘুরে বসতে বলবেন না?... নামটিও বোধ হয় আদরিণী?'

ললিতবাবু বললেন, 'এঁরই মেয়ে ত?'

একটু যেন আশঙ্কারই বেশ ছিল, অভাব থেকে একেবারে অতিরিক্ত ত। কিন্তু ততক্ষণে লক্ষ্মীকান্তবাবু উঠে পড়েই ঘুরিয়ে বসিয়েছেন কন্যাকে।

একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠেছেন বংশীধারীবাবু। নামটা জেনে নিয়েছেন আমার, ব্রাহ্মণ জেনে ছেলেকে আর ভাবী বধূকে প্রণাম করিয়ে নিয়েছেন। বলছেন, 'যাত্রা অশুভ বলছিলাম শৈলেনবাবু? এমন শুভযাত্রা জীবনে আসেনি। একটা বংশের গোটা ধারাটাই বদলে গেল—চার পুরুষ ধরে কি সর্বনাশের পথে যে নেমে চলেছিল। বরং দেখে নিন আর একবার? বিশ্বাস না হয়ত। ...সাধন!...'

কী যে করবেন, কী বলবেন যেন ভেবে পাচ্ছেন না। সমস্ত দলটিও যেন কোন এক দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছে।... সাধনকে নিয়ে তার বন্ধু দুজন স্টেশন-ঘরের আড়ালে কোথায় ওদিকে চলে গেল।

কিন্তু মালীঘরার খামখেয়ালী সন্তান, আর এ-নাকের চেয়ে আরও ভাল নাকের অভাবও ত নেই সংসারে, ব্যাপারটা জুড়ুতে দেওয়া সংগত মনে করলাম না, বললাম, 'শুভযাত্রাই যখন এত, তখন হাতছাড়া করার দরকার কী মিত্তির মশাই? ভাল নাক একটা দুর্লভ ত সংসারে; দেখলেনই ত খুঁজে।'

পুরুতমশাইয়ের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলাম, 'আর দিনটিন আছে সামনে?'

কেন জানি না একটু হাসলেন, বললেন, 'একটা ত কালই, এমাসে ওই শেষ, তারপর একেবারে বোশেখের মাঝামাঝি।'

শিউরে উঠলেন বংশীধারী, 'অত দেরী? সর্বনাশ! আরে অত দেরি করতে আছে? কালই।... অবিশ্যি বেহাইয়ের যদি আপত্তি না হয়...'

আশায়, আনন্দে, তার সঙ্গে ভয়ে অদৃষ্টের উপর অবিশ্বাসে কী রকম হয়ে গিয়েছেন লক্ষ্মীকান্তবাবু, হাত দুটি একত্র করে বললেন, 'আজ্ঞে আমায় যখন আদেশ করবেন। গরিবের আয়োজন, তার জন্যে...'

গাড়ি আসার ঘণ্টি পড়ল। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বংশীধারী, 'তা হলে মহিম, তুমি এই গাড়িতে ফিরে যাও, তোয়ের থাকতে বলোগে বাড়িতে। আর দ্যাখো, বরযাত্রী যারা অমন করে গা-ঢাকা দিলে, সবাইকে আবার ধরে নিয়ে আসবে—কাল সকালের গাড়িতেই।'

মহিমবাবুকে বললাম, 'চলুন, সাথী হব খানিকটা পথ...'

অনেকক্ষণ কেটেছে, গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতেই যাচ্ছিলাম, লক্ষ্মীকান্ত ডান হাতটা চেপে ধরলেন, চোখে জল এসে গিয়েছে। বললেন, 'আপনি যাবেন? সে হতেই পারে না। দুটো দিন...যতই কাজ থাক...'

আরও আপত্তি করে উঠলেন বংশীধারী, 'আপনি যাবেন মানে। ঘটক, আপনি হলেন এযজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর, আপনাকে কে যেতে দিচ্ছে।'

একটু ক্ষতি হবে। কিন্তু ওই কথা, মালীঘরার মিত্তির বংশের খেয়ালী সন্তান, আর এই নাকের পর আর নাক নেই এমনও ত বলা যায় না—আজ থেকে কাল পর্যন্ত সময়।

হেসে আবার বসেই পড়লাম।

বীরভূমে থিয়েটার

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বাড়ির বাহিরে পা বাড়াইতেই মাথায় চাল ঠেকিয়া গেল। 'সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বীরভূম-অনুসন্ধান সমিতির প্রথম অধিবেশনেই একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিল। অধিবেশনে যোগদানের জন্য কলিকাতা হইতে মহামহোপাধ্যায় আচার্য হরপ্রসাদ এবং 'বিশ্বকোষের' প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু আমন্ত্রিত হইয়া হেতমপুর রাজবাড়িতে আসিয়াছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক একজন রাজকর্মচারীর অসৌজন্যে তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন। রাজকর্মচারিগণের অনেকেই "হ্যাট কোট" না দেখিলেই মানুষকে বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না। তাছাড়া নগেন্দ্রনাথকে তাঁহারা চিনিতেন অন্য পরিচয়ে। বীরভূমে সিউড়ীতে তাঁহার সামান্য কিছু সম্পত্তি ছিল। এই সম্পত্তির জন্য রাজ এস্টেটের সঙ্গে অল্পস্বল্প আর্থিক দেনা-পাওনার ব্যাপারে তাঁহাকে মাঝে মাঝে হেতমপুরে আসিতে হইত, পরিচয়টা সেই সূত্রে। নগেন্দ্রনাথের অন্য পরিচয় তাঁহারা জানিতেন না, জানা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু কে হরপ্রসাদ? শাস্ত্রী উপাধি ত, হয়ত টোলের কোন পণ্ডিত আসিয়াছেন কথঞ্চিৎ সাহায্য ভিক্ষায়! অথবা অন্য কোন কারণও থাকিতে পারে, এই পর্যন্ত! সুতরাং যাহা ঘটিবার ঘটিল, আমি উপস্থিত থাকিয়াও ঘটনার প্রতিরোধ করিতে পারিলাম না। ফলে বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন সাবধান হইয়া গেলেন। অতঃপর কোন সাহিত্যিক কিংবা ওই ধরনের জ্ঞানী গুণী কেহ হেতমপুরে আসিলে তিনি একক আমার উপরই তাঁহাদের তত্ত্বাবধানের ভার দিতেন। আদেশ ছিল—"চিরকুট দিয়া ভাণ্ডারে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চাহিয়া পাঠাইব; না পাই, যেন কাহাকেও কোন কথা না বলি। এবং নিজে দাম দিয়া বাজার হইতে তাহা সংগ্রহ করি। পরে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন।" এই কারণেই আমি স্বনামধন্য শ্রীনামকীর্তন প্রচারক অধুনা নিত্য লীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের সেবার সুযোগ লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলাম। পর পর কয়েক বৎসরই তিনি স-দলে হেতমপুরে শুভ-পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে নবরাত্র নামসংকীর্তনের অনুষ্ঠান হইত।

তখন 'সরস্বতীপূজা উপলক্ষে হেতমপুর রাজবাড়িতে খুব ধুমধাম হইত। কবি, ঝুমুর, লেটো, যাত্রা, কলিকাতার থিয়েটার, কয়দিন ধরিয়া উৎসবের বন্যা বহিত। অনেক অনেক সাহেবসুবো আসিতেন, রাজবাড়ির খরচে কেলনার কোম্পানি তাঁহাদের খানাপিনার ভার গ্রহণ করিতেন। মেলায় নানান জিনিসের প্রদর্শনী বসিত। মেলা জমিয়া উঠিত। পূজার পরদিন শীতলা ষষ্ঠী, ওই দিন সাধারণ গৃহস্থের গৃহে অরন্ধন পালিত হইত। এই দিনেই মহারাজা রামরঞ্জনের বার্ষিক শ্রাদ্ধতিথি। পোলাওয়ের সহিত মাছ মিষ্টান্নের আয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে চারি আনা দক্ষিণার ব্যবস্থা থাকিত বলিয়া নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত বহু ব্রাহ্মণ শুভাগমন করিতেন। বাড়িতে বাসী খাওয়ার হাঙ্গামা পোহাইতে হইত না, আর সেকালে চারি আনায় অনেক-কিছু পাওয়া যাইত। সুতরাং রঙ্গ দেখা এবং কলাকেনার সুযোগ ঘটিত। আমি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের কথা বলিতেছি। রাজাদের নিজেদেরই একটি যাত্রার দল ছিল। 'সরস্বতী-পূজায় এই দলের অভিনয় হইত। অন্য সময়ও হইত। বাঁধা স্টেজ ছিল বলিয়া যাত্রার দলের লোক লইয়া এবং বাহির হইতে লোক আনাইয়া মহারাজকুমার মাঝে মাঝে থিয়েটারেরও ব্যবস্থা করিতেন। এইজন্য তিনি বাঁধা স্টেজ তৈয়ারি করাইয়াছিলেন। তাঁহার লেখার সখ ছিল, গান বাজনা জানিতেন। "সরস্বতী" নাম দিয়া নিজে একখানি নাটকও লিখিয়াছিলেন। বাহিরের লোক আনাইয়া নাচ গান এবং অভিনয় শিক্ষা দেওয়াইতেন। মহারাজা রামরঞ্জনের এক ভাগিনেয় সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার ম্যানেজার ছিলেন। এই যাত্রা ও থিয়েটার দল উপযুক্ত দক্ষিণা লইয়া নানা স্থানেই অভিনয় করিয়া বেড়াইত। ছেলেবেলায় সিউড়ী বড়বাগানের [illegible] হেতমপুরের যাত্রাদলের গান শুনিয়াছি। থিয়েটার দেখিয়াছি। আর উপনয়ন উপলক্ষে থিয়েটার কুড়মিঠায় আসিয়াছিল। এই থিয়েটা[illegible] সূত্রে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার প[illegible] ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মাঝে ম[illegible] হেতমপুরে আসিয়া দুই-দশ দি[illegible] থাকিয়া যাইতেন। একবার ক্ষীরোদপ্র[illegible] বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রে[illegible] ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিছু[illegible] হেতমপুরের নিকটবর্তী দুবরাজপুরে স[illegible] রেজিস্ট্রার ছিলেন। নিমন্ত্রিত হইয়া তি[illegible] মাঝে মাঝে হেতমপুরে আসিতেন। একব[illegible] ক্ষীরোদপ্রসাদ আসিয়াছেন এই উপল[illegible] ছোটখাট একটা মজলিসের অনু[illegible] হইয়াছে। নিমন্ত্রিত শচীশচন্দ্রকে আ[illegible] দেখিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ বলিলেন "এই [illegible] কেমন আছেন?" শচীশচন্দ্র একটু মেজা[illegible] ছিলেন, বলিলেন "কেন, আমার [illegible] আপনার এত দুশ্চিন্তা কেন? গুম হয় [illegible] বোধ হয়! কই চিঠিপত্র লিখে কোন[illegible] একটা খবরও নেন না। কাকের মুখে [illegible] কোন খবর নেই। আর আজ দে[illegible] একেবারে কেমন আছেন!" ক্ষীরোদপ্র[illegible] কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পান নাই।

যে-বৎসর আমি বীরভূমের ইতিহাস[illegible] উপকরণ সংগ্রহের কাজে হেতমপ[illegible] যাই, হেতমপুরে বীরভূম অনুসন্ধান-সমি[illegible] প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৎসরই 'সরস্ব[illegible] পূজার সময় আচার্য হরপ্রসাদ হেতমপ[illegible] আসিয়াছিলেন। ইহারই পর বৎ[illegible] 'সরস্বতী-পূজায় কলিকাতা হইতে নাট্য[illegible] অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় থিয়েটার লইয়া হেতমপুরে আসেন। অপরেশচ[illegible] সঙ্গে ছিলেন রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু, বাহাদু[illegible] পরে প্রসিদ্ধ সুরকার জানকীনাথ [illegible] থিয়েটার জগতের স্বনামখ্যাত কর্মী শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ। অভিনেতা-অভিনেত্রী অন্য স্থানে রাখিয়া একটি পৃথক [illegible] অপরেশচন্দ্রকে বাসা দেওয়া হ[illegible] তত্ত্বাবধানের ভার পাইলাম আ[illegible] এইখানেই প্রথম আমি অপরেশচন্দ্রের স[illegible] পরিচিত হই। অপরেশচন্দ্রকে আদর করার মধ্যে মহিমানিরঞ্জনের অপর এ[illegible] উদ্দেশ্যও ছিল। পূর্বেই মহিমানিরঞ্জ[illegible] নাটক লেখার কথা বলিয়াছি। 'রমা[illegible] হেতমপুরের স্টেজে অভিনীত হইয়া[illegible] গিরিশচন্দ্র এই নাটকখানি পড়িয়া একটি প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। এই নাটকে য[illegible] ও ফকির নামে দুইটি চরিত্র [illegible] একবার আমি রাজ এস্টেটের তদানী[illegible] ম্যানেজার প্রিয়লাল শ্রীবনবিহারী [illegible] সঙ্গে এই দুইটি ভূমিকা [illegible] করিয়াছিলাম। আর একবার হেতম[illegible]

...অভিনীত হয়। এই নাটকে ...মলহর রাও হোলকার রূপে স্টেজে ...তে হইয়াছিল। বর্নবিহারী সাজিয়াছিল ...জী সিন্ধিয়া। বাস, এই পর্যন্ত, আমার ...নুরোধে মহারাজকুমার আর কোনদিন ...কে থিয়েটার করিতে বলেন নাই। ...ার অসম্মতির কারণ, কেহ কেহ আমাকে ...ধান করিয়া দিয়াছিলেন—শেষে যাত্রার ...লও হয়ত ডাক পড়িতে পারে। যাঁহারা ...মাকে সাবধান করিয়াছিলেন তাঁহারা ...বার মহিমানিরঞ্জনকে বলিয়াছিলেন, ...মি নাকি 'রমাবতী' নাটকখানির খুব ...ো করিয়াছি। মহারাজকুমার আমাকে ...হ করিতেন বলিয়া অনেকে আমার উপর ...রক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই আমি ...ং বর্নবিহারী থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ ...র।

...হারাজকুমার আরও একখানি নাটক ...খিয়াছিলেন, আমি নাম দিয়াছিলাম ...ঙ্গ বর্গী'। নাটক ছাপানো হয় নাই। ...হার আশা ছিল অপরেশচন্দ্র এই ...টকখানি দেখিয়া শুনিয়া স্টার থিয়েটারে অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এইজন্য বহুদিন তিনি অপরেশ-চন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। সরস্বতী-পূজার কিছুদিন পরে মহারাজকুমার কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাদের রিপন স্ট্রীটের বাড়িতে অপরেশচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করেন। সেইদিন এই নাটকের পাণ্ডুলিপি লইয়া আলোচনা হয়। নাটকের বিষয়বস্তু ছিল—বীরভূমে বর্গীর হাঙ্গামা। দিল্লির সুলতানের কন্যা শেরিনা হাফেজ নামে এক যুবককে ভালবাসিয়া ফেলে। শেরিনার পিতা কিন্তু ওসমান নামক একজন ওমরাহপুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। বিবাহের দিন নিকট জানিয়া শেরিনা ও হাফেজ পলাইয়া আসিয়া হেতমপুরের ফৌজদার হাতেম খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। খুঁজিতে খুঁজিতে ওসমান বাঙলায় আসিয়া উপস্থিত হন। এবং বর্গী দলের সাহায্য লইয়া বীরভূমে হাতেম খাঁর গড়ে হানা দেন। বীরভূমের রাজধানী ছিল রাজনগর। হাতেম খাঁ ছিলেন বীরভূমের অধীশ্বর বদিওজ্জমানের অধীনস্থ একজন সামান্য ফৌজদার। তাঁহার আর সৈন্যসামন্ত কোথায়? বীরভূম-রাজও সাহায্য করিতে পারিলেন না। অল্পক্ষণের যুদ্ধেই হাফেজ নিহত হইলেন, ধরা পড়িবার ভয়ে শেরিনাও আত্মহত্যা করিলেন। হাতেম খাঁর নামেই হাতেমপুর, এখন হেতমপুর নামে পরিচিত। হেতমপুরের পূর্ব দিকে গড়ের ধ্বংসাবশেষ এবং তাহার নিকটেই পূর্ব-দক্ষিণ দিকে শেরিনা বিবির কবর আছে। কিছুদূরে রাঘব বেড়া—এখানে রাঘব নামে এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। রাজনগর-

বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস লিমিটেড

শুভ শারদোৎসবে

আপনাদিগকে

শুভেচ্ছা ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছে

অফিস:
৬৩, রাধাবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা
ফোন : ২২—৪৯৭৬

মিলস্:
রিষড়া, শ্রীরামপুর
হুগলী
ফোন : শ্রীরামপুর ৩২০

রাজের একজন তহসিলদারের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ ঘটে। রাজদরবারে কোন প্রতিকার না পাইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ কামনায় তিনিও এই ব্যাপারে জড়াইয়া পড়েন। নাটকের ইহাই ছিল বিষয়বস্তু। অপরেশচন্দ্রের পরামর্শ মত নাটকখানি নূতন করিয়া লিখিলাম। লিখিতাম, তাঁহাকে দেখাইয়া আসিতাম, পড়িয়া শুনাইতাম। নাটকখানি অভিনীত হইল না। কিন্তু আমার লাভ হইল অপরেশচন্দ্রের বন্ধুত্ব।

এই বিষয়বস্তু লইয়া বীরভূমের খ্যাতনামা সাহিত্যিক রায় বাহদুর নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি নাটক লিখিলেন। ইহার পূর্বেই তাঁহার লিখিত নাটক 'বীর রাজা' কলিকাতার থিয়েটারে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার লিখিত প্রহসন 'রাতকাণা'র খ্যাতি তখন লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে। অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে নির্মলশিবের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদও নির্মলশিবকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, লাভপুরেও তাঁহার যাতায়াত ছিল। অপরেশচন্দ্র ত কয়েকবারই লাভপুরে আসিয়াছেন। নির্মলশিব এক সময় তাঁহাদের কয়লাকুঠীর কাজ দেখিবার জন্য কিছুদিন রানীগঞ্জে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অপরেশচন্দ্র বার-দুই রানীগঞ্জের বাসাতেও গিয়াছিলেন। নির্মলশিবের থিয়েটারের শখ ছিল, তাঁহারও থিয়েটারের দল ছিল। নিজে নাট্যকার, ভাল অভিনেতা, সুদক্ষ শিক্ষক। লাভপুরেও থিয়েটারের জন্য বাঁধা স্টেজ ছিল। কথাসাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে হাতেখড়ি হয় লাভপুরে নির্মলশিবের হাতে। কিশোর তারাশংকর নির্মলশিবের থিয়েটারে অভিনয় করিতেন। এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, হেতমপুর ও লাভপুরের আদর্শেই বীরভূমে শখের থিয়েটারের প্রসার বাড়ে। এখন ত ছুটিছাটায় স্কুলের ছেলেরাও থিয়েটার না করিয়া ছাড়ে না।

নির্মলশিব যখন রানীগঞ্জে, আমি হেতমপুর ছাড়িয়া সেই সময় নির্মলশিবের নিকট চাকুরি স্বীকার করিয়াছিলাম। আমার এক আত্মীয় মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় নির্মলশিবদের রানীগঞ্জ অফিসের ম্যানেজার ছিলেন। আমি তাঁহারই বাসার নিকট একটি বাসা ভাড়া লইয়া কয়েক মাস রা... করিয়াছিলাম। মৃত্যুঞ্জয় মুখোপা... সঙ্গে নির্মলশিবদেরও নিকট-সম্পর্কে আত্মীয়তা ছিল।

একবার অপরেশচন্দ্র রানীগঞ্জ গিয়াছে... নির্মলশিবের লেখা নাটকটির কথা উ... অপরেশচন্দ্র নাটকখানি শুনিলেন—'ব... বর্গী' নামটিও তাঁহার পছন্দ হই... 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের সহকারী সম্পা... বিহারীলাল সরকারের একখানি বই ছি... নাম 'বঙ্গে বর্গী', নামটি আমি বিহা... লালের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছিল... 'বঙ্গে বর্গী' স্টারে অভিনীত হইবে, ... পাকা হইয়া গেল। নাটকের পাণ্ডুলি... লইয়া আমি অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে কলিকা... আসিলাম। দেখি কলিকাতা শহরের যেখ... সেখানে প্রাচীরপত্র। মনোমোহন থিয়ে... বঙ্গে বর্গী নাটক অভিনীত হইবে। য... স্মরণ হয় রচয়িতার নাম নিশিব... বসু। দাশরথি মুখোপাধ্যায়ের 'কণ্ঠ-হা... নাটকের যোগে 'বঙ্গে বর্গী' বহু... চলিয়াছিল।

অপরেশচন্দ্র নির্মলশিবের লেখা নাটকখানির নাম দিলেন 'নবাবী আমল'। এ নামও ধার করা, ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি বই ছিল, নাম 'নবাবী আমল'। নাটকখানি নূতন করিয়া লেখার প্রয়োজন দেখা দিল। আমি অপরেশচন্দ্রের কলিকাতার বাসায় থাকিয়া গেলাম।

এই সময় আমি একটা গুরুতর অসুখে ভুগিতেছিলাম। সে একটা অদ্ভুত ব্যারাম আমি 'চা' খাই না, সকালে অন্য কিছু খাইতাম না। দুপুরে সামান্য ঝোল-ভাত খাইতাম কিন্তু তাহাতেই বৈকালের দিকে মনে হইত যেন দম বন্ধ হইয়া যাইবে। কী যেন একটা ঠেলিয়া উপর দিকে উঠিত, অসহ্য যাতনা হইত। অপরেশচন্দ্রের ডাক্তার-বন্ধুর সংখ্যা বড় ক... ছিল না। কলিকাতার অনেক নাম-করা ডাক্তার তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। স্টার থিয়েটারের নিকটেই রাজাবাগান স্ট্রীটে ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ি... কারমাইকেল কলেজের অন্যতম পরিচালক ধাত্রী-বিদ্যাবিশারদ ডাক্তার নরেন্দ্র... ভদ্রতার অবতার ছিলেন। যুবক ডাক্তার এই 'সার্' অপরেশচন্দ্রকে যথেষ্ট শ্র... করিতেন। প্রায় প্রতিদিন বৈকালের দি... ডাক্তার বসুর বৈঠকখানায় বিরাট এক... আড্ডা বসিত। ডাক্তার মদনমোহন ... ডাক্তার বটকৃষ্ণ রায়, থিয়েটারের অন্য... কর্ণধার মনোমোহন পাঁড়ে, আরও অনে... আসিয়া সেই আড্ডায় যোগ দিতেন। প্র... পাশাখেলা চলিত। নরেন্দ্রনাথ মাঝে ম... প্রচুর জলযোগের যোগান দিতেন। আড্ডার আড্ডাধারী আজিও এক...

বাজারের সেরা
ধীরেন ও গৌরী
মার্কা কড়াই
ব্যবহার করুন
ডি, এন, সিংহ অ্যাণ্ড কোং
৫৮, ক্লাইভ স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭
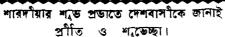
—প্লাম্বিং ও স্যানিটারী বিভাগ শোরুম—
৩১।১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ — ফোন : ৩৪-৪৭৫৭
১৪৪কে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬
—হেড অফিস ও ফ্যাক্টরী—
২০, সীতানাথ বোস লেন, শালখিয়া, হাওড়া
(ফোন নং ৬৬-২৩৪৮)
ফ্যাক্টরী নং ২—ভারত আইরণ এণ্ড স্টীল কর্পোরেশন
১১ গোপাল ঘোষ লেন, শালখিয়া, হাওড়া। ফোন : ৬৬-৩২১৩।

আছেন, নাম ডাক্তার শ্রীইন্দুভূষণ ... সংস্কৃত বহু উদ্ভট শ্লোক ...হার মুখস্থ ছিল। মনে হয়, যত্ন করিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। এই সব ডাক্তারের দলও থিয়েটার করিতেন। একবার একটি বড় মজার ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ডাক্তারের দল দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে' অভিনয় করিতেছেন। প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, রায় বাহাদুর চুনিলাল বসু প্রভৃতি বড় বড় ডাক্তারেরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন, অভিনয় দেখিতেছেন। পার্বতী দয়াল সরযূ শান্তা কে সাজিয়াছিল মনে নাই। মনে আছে ডাঃ নরেন্দ্রনাথ মহিমের ভূমিকায় সাজিয়াছিলেন। শান্তাকে লইয়া তাহার ঢলাঢলি সকলেই সহিয়া গেলেন। কিন্তু চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নর্তকীর নাচগান ও বন্ধুবান্ধব লইয়া মহিমের হুল্লোড় দুই-একজন যেন বরদাস্ত করিয়া উঠিতে পারিলেন না। হঠাৎ ডাক্তার চুনিলাল হুংকার দিয়া উঠিলেন, "নরেন!" আমরা চমকিয়া উঠিলাম, অভিনয় বন্ধ হইয়া গেল। আমি প্রতিবাদ করিলাম, "এখানে ত নরেন বলিয়া কেহ নাই, স্টেজে ত উনি মোহিত। আর দৃশ্যটা যদি অশ্লীল বলিয়া মনে হয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি (চুনিলাল) ডাক্তারবাবু কি নাটকখানি পড়িয়া আসিবার সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই? অভিনয় দেখিতে না আসিলেই ত পারিতেন।" ডাক্তার আচার্য আমাকে ধরিয়া বসাইলেন। কিন্তু আমাদের অনুরোধে পুনরায় ওই দৃশ্য হইতেই থিয়েটার আরম্ভ হইল।

নরেন্দ্রনাথের পাশার আড্ডায় আমিও যোগ দিতাম। সুতরাং আমার চিকিৎসার কোন ত্রুটি ঘটিল না। অপরেশচন্দ্রের আতিথেয়তারও কোন কমতি নাই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ব্যারাম বাড়িয়া চলিল, রাত্রে আমি জলবার্লি খাইতে ধরিলাম। প্রায় মাসখানেক ধরিয়া যখন এই দুর্ভোগ চ...তেছে, এমন সময় হঠাৎ এক রাত্রে একটা ...শ্চর্য কাণ্ড ঘটিল। রাত্রিশেষের দিকে ...ন দেখিলাম একটি ভাঙা শিবমন্দির, নিকটেই প্রকাণ্ড দিঘিতে কাকচক্ষু জল টল টল করিতেছে। আমি শিবের পূজা দিতে গিয়াছি, পূজক ব্রাহ্মণ আমাকে শিবের চরণামৃত খাওয়াইয়া দিলেন। ঘুম ভাঙিয়া গেল, আর ঘুমাইলাম না। মনে মনে খোঁজ করিতে লাগিলাম, কোথায় সেই শিবমন্দির। মনে পড়িল আমাদের গ্রামের কিছু দূরেই একটি গ্রামের শিবমন্দিরের কথা। লোকে সেখানে অম্লশূলের ঔষধ আনিতে যায়। কিন্তু সেখানে ত বড় দিঘি নাই। মন্দিরের পাশে ছোট একটি কুণ্ড আছে। যাহা হউক মনে মনে শিবের উদ্দেশে পূজা মানসিক করিয়া সকালে উঠিয়া হাত মুখ ধুইলাম। দুপুরে ঝোল-ভাত খাইয়া ভয়ে ভয়ে বৈকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কোন যন্ত্রণা নাই, যেন মন্ত্রশক্তিগুণে সকল ব্যাধি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে সম্পূর্ণ সহজ অবস্থা। অপরেশচন্দ্র প্রতিদিন বৈকালে জিজ্ঞাসা করিতেন "আজ কী খাইবেন?" রোজ রোজ জলবার্লির কথা শুনিয়া বিরক্ত হইতেন, তিরস্কার করিতেন। বলিতেন "সাহস করুন, জলবার্লি ছাড়িয়া যাহা রুচি হয় পুষ্টিকর কিছু খাওয়া ধরুন, নইলে এমন করিয়া কত দিন বাঁচিবেন" ইত্যাদি। আমার কিন্তু সাহস হইত না। খাবার নামেই ভয়ে বুক কাঁপিত। আজ যেমন জিজ্ঞাসা করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম, "লুচি খাইব।" অপরেশচন্দ্র যেন খুশিতে ভরিয়া উঠিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "সে কী মশায়, এ দুর্বুদ্ধি আপনাকে কে দিলে? বেশ ত জলবার্লি চলছিল, সামান্য তিনটে পয়সার মামলা। লুচির খরচ জানেন?" রাত্রে তিনি লুচি খাইতেন। সে দিন একটু ঘটা করিয়াই ঠাকুরকে আয়োজন করিতে বলিলেন। রাত্রে এক সঙ্গেই দুইজনে আহার করিলাম। গ্রামে ফিরিয়া শিবের পূজা দিয়াছিলাম। চরণামৃত খাইয়া আসিয়াছিলাম। সেইদিন হইতে প্রায় বিশ বৎসর সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলাম। পরে পুনরায় সেই ব্যারামে আক্রান্ত হই। এবার আক্রমণ অত্যন্ত তীব্র। কলিকাতায় থাকিয়া প্রায় চারি মাস ধরিয়া কবিরাজী

ঔষধ খাইয়া সে যাত্রা রক্ষা পাই। গত বৎসর পুনরায় তাহাই রূপান্তরে দেখা দিয়াছিল, এবং ডাক্তারের শরণ লইয়াছিলাম, কারণ এবারকার ব্যাধির নাম নাকি করোন্যারি থ্রম্বসিস!

তখনকার দিনে খুব সদাচারে থাকিতাম, কারণ প্রায় বাড়িতেই থাকিতাম। মন ছিল নির্মল, তাই স্বপ্নে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাইতাম। কোন সময়ে ভবিষ্যৎ বিপদের ইঙ্গিত, কোন সময়ে বা তাহার প্রতিকার পন্থা স্বপ্নে জানিতে পারিতাম। স্বপ্নেই আমি শ্রীগীতগোবিন্দের নিগূঢ় রহস্যের সামান্য সন্ধান পাইয়াছি। স্বপ্ন আমার অনেক সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছে।

অর্ধেন্দুশেখর ও গিরিশচন্দ্রের পর অপরেশচন্দ্রের মত শক্তিধর পুরুষ থিয়েটারের রাজ্যে আমার নজরে পড়ে নাই। একাধারে নিপুণ নাট্যকার, সু-অভিনেতা, সুদক্ষ অভিনয়-শিক্ষক এবং অভিজ্ঞ থিয়েটার-পরিচালক ছিলেন অপরেশচন্দ্র। কিছু পরে দেখিয়াছি নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে। যুগসৃষ্টিকারী অভিনেতা, একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অর্ধেন্দুশেখর গিরিশ-চন্দ্র ও অপরেশচন্দ্রের পর এহেন সুনিপুণ শিক্ষকও বাঙলায় আর পঞ্চম জন জন্মগ্রহণ করেন নাই। অপরেশচন্দ্রের নাম আজকাল কেহ স্মরণ করে না। শিশিরকুমারও আমাদের অনাদর অবহেলা সহিয়া গিয়াছেন।

প্রথম যৌবনে অপরেশচন্দ্র দেখিতে বেশ সুপুরুষ ছিলেন। কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে দারুণ বাতব্যাধি প্রায় তাঁহাকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছিল। ঘাড় ফিরাইতে পারিতেন না, ঘাড় সোজা করিয়া হাঁটিতে পারিতেন না। তাহার উপর আবার হাঁপানি ছিল। হাঁপানিতে তিনি মাঝে মাঝেই খুব কষ্ট পাইতেন। এইজন্য নিজে কিছু লিখিতে পারিতেন না, একজন গণেশের দরকার হইত। সুগায়ক রাধাচরণ ভট্টাচার্য এবং জানকীনাথ বসু প্রায় তাঁহার গণেশ-কর্ম করিতেন। অপরেশচন্দ্র জানকীনাথকেই পছন্দ করিতেন খুব বেশী। কারণ জানকীনাথের হাতের লেখা ছিল মুক্তার মত, বানান ছিল নির্ভুল, আর লেখার সময় তিনি কোন উচ্চবাচ্য করিতেন না। জানকীনাথ কানে একটু কম শুনিতেন।

আমি বহু দিন অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে কাটাইয়াছি। সুতরাং তাঁহার গণেশের কাজও করিয়াছি। কলিকাতার উপকণ্ঠে নাগেরবাজারে গদাই মল্লিকের বাগানে প্রায়ই তিনি থাকিতেন। সেখান হইতেই থিয়েটারে যাতায়াত করিতেন। ঘুম হইতে উঠিতেন প্রায় বেলা আটটায়। উঠিয়া হাত-মুখ ধুইয়া চা খাইয়া একেবারে স্নানাদি সারিয়া লইতেন। তারপর শুধু এক গ্লাস জল খাইতেন। বাগানে স্টোভে ও কুকারে নিজে রাঁধিতেন। তিনি রাঁধিতে পারিতেন সুন্দর। নিজে যেমন ভোজনবিলাসী ছিলেন, তেমনই [illegible] য়াইতেও বড় ভালবাসিতেন। খাওয়াদাওয়ার পর দিবানিদ্রা ছিল তাঁহার প্রতিদিনের অভ্যাস। ঘুম হইতে উঠিয়া একটি ডাবের জল কিংবা মিছরির পানা নিত্য বরাদ্দ ছিল। বৈকালে থিয়েটারে আসিতেন কিংবা গল্পগুজব করিতেন। অপরেশচন্দ্র খুব সুরসিক এবং মজলিসী লোক ছিলেন। রাত্রের খাবারও বাগানে নিজেই তৈয়ারি করিয়া লইতেন। তাহার পর রাত্রি দশটা নাগাদ লেখা আরম্ভ হইত। বিছানায় আসনপিঁড়ি হইয়া বসিতেন। যখন তামাক খাইতেন, সারি সারি আট-দশটি কলিকায় তামাক সাজা থাকিত। একটি নিবিলে আর একটিতে আগুন দিতে হইত। যখন সিগারেট খাইতেন একটা গোটাকোটা রাত্রেই নিঃশেষ হইয়া যাইত। তিনি বলিতে আরম্ভ করিতেন, আমি লিখিয়া যাইতাম। বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে থামিতেন। কখনও বলিতেন, "একটু পড়ুন ত।" পড়িতাম। বলিতেন, "আর একটু আগে হইতে পড়ুন।" কখনও কখনও খাতাখানি চাহিয়া লইয়া নিজে পড়িয়া দেখিতেন। এমনই করিয়াই লেখা আগাইয়া চলিত। রাত্রি তিনটা বাজিয়াছে। ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসিতেছে, খাতার উপর ঢুলিয়া পড়িতেছি। দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "যান, শুয়ে পড়ুন গিয়ে, আপনার দ্বারা আর কিছু হবে না।"

লেখার সময় সাবধান করিয়া দিতেন, "ভুল ধরিবেন না। তর্ক তুলিবেন না, যাহা বলিবার পরদিন বলিবেন।" সময় সময় সে কথা ভুলিয়া যাইতাম। ভুল ধরিতাম তর্ক করিতাম। এক-এক দিন রাগিয়া গিয়া খাতাটা কাড়িয়া লইয়া পাতা কয়খানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। সে দিন আর লেখা হইত না। শুনিয়াছি তিনি এক-আসনে বসিয়া দশ ঘণ্টার মধ্যে "সাইন অব দি ক্রশ" অনুবাদ করিয়া আহুতি নাটকখানি লিখিয়া দিয়াছিলেন। দেখিয়াছি দিনের পর দিন দিনে রাতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া চৌদ্দ দিনে 'শ্রীরামচন্দ্র' নাটক লেখাইয়া লইয়াছেন। তিনি বেশী বয়সেই লেখা আরম্ভ করিয়াছিলেন। আত্মপ্রকাশে তাঁহার জানি না কেন একটা কুণ্ঠা ছিল। ধীরে ধীরে সে সঙ্কোচ দূরীভূত হয়। তিনি অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকটি [illegible] থিয়েটারে জমিয়াছিল। তাঁহার ক[illegible] নাটকই থিয়েটারকে আর্থিক সংকট হইতে বাঁচাইয়াছিল। অপরেশচন্দ্রের ভাষা ছিল বড় চমৎকার। তাঁহার রচিত 'অযোধ্যার বেগম', 'শ্রীগৌরাঙ্গ', 'মগের মুলুক' প্রভৃতি হইতে ইহার উদাহরণ মিলিবে। তিনি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলার' অনুবাদ করিয়াছিলেন। 'মন্ত্রশক্তি' 'পোষ্য পুত্র' প্রভৃতি উপন্যাস তাঁহার হাতে নাটকে রূপান্তরিত হইয়াছিল। অভিনয়শিক্ষায় তিনি অর্ধেন্দুশেখর, গিরিশচন্দ্র ও অমৃত মিত্রের ছাত্র।

লোকে দুর্নাম করিত অপরেশচন্দ্র পরের লেখা চুরি করিয়া নিজের বলিয়া চালাইয়া দেন। এ-কথা যে কত মিথ্যা আমি তাহার একজন প্রধান সাক্ষী। 'রামানুজ' নাটক লইয়া এই রকম একটা কথা উঠিলে আমি তাঁহাকে সে কথা জানাই। তিনি ক্ষীরোদ-প্রসাদের লেখা রামানুজ, নিজের লেখা 'রামানুজ' এবং মাদ্রাজ মঠ হইতে প্রকাশিত 'রামানুজ চরিত' আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দেখিলাম, দুইজনে রামনুজ চরিত্রের দুইটি দিক বাছিয়া লইয়াছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ জ্ঞানের দিক দেখিয়া তদনুরূপ ঘটনাগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। আর অপরেশচন্দ্র ভক্তিপথের পথিক হইয়াছেন। কেহ কাহাকেও স্পর্শ করেন নাই। অপরেশচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। মাতৃবিয়োগের পর বাড়িতেও মন বসিত না। পিতা বিপ্রদাস কলিকাতায় থাকিয়া এই সময় মাসে মাসে 'পাক-প্রণালী' প্রকাশ করিতে-ছিলেন। মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত যখন বীণা থিয়েটার ভাড়া লইয়া প্যান্ডোরা নাম দিয়া থিয়েটারের দল খোলেন, অপরেশচন্দ্র সেই দলে যোগদান করেন। এবং এই লইয়া পিতার সঙ্গে সামান্য কথা-কাটাকাটির পর বাড়ি হইতে পলাইয়া যান। বর্ধমান, রানীগঞ্জ ভাগলপুর পাটনা কাশী এলাহাবাদ প্রভৃতি ঘুরিয়া আসিয়া আবার তিনি মণীন্দ্রবাবুর দলে ভিড়িয়া পড়িলেন। মাঝখানে একটি কাজ জুটিয়া গেল— সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার কে বি দত্তের পিতা-ঠাকুরকে শ্রীমদ্‌ভাগবত শোনানো।

অপরেশচন্দ্র কিছুদিন হোরমিলার কোম্পানির অফিসে কাজ করিয়াছিলেন। জীবনের কিছুদিন ঠিকাদারির কাজেও কাটিয়াছিল। ১৩১১ সালের ৩রা ফাল্গুন মিনার্ভা থিয়েটারের ম্যানেজাররূপে তাঁহার নাম বিজ্ঞাপিত হয়। সেই হইতে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি থিয়েটারের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অপরেশচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল ১২৮২ সালের ৪ঠা শ্রাবণ ১৩৪১ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ তাঁহার লোকান্তর ঘটিয়াছে।

খাওয়া

মনোজ বসু
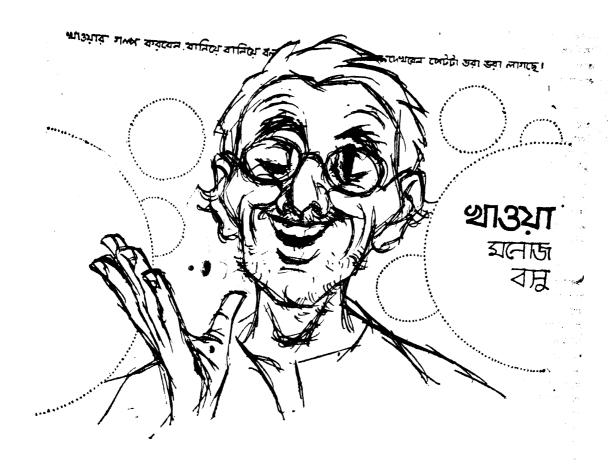
"শ হুরে বাবুভেয়ের কথা বলবেন না। প্যান্টলুন-জুতো-জামায় ঢাকা থাকে, তাই। জামা উঁচু করে তুললে
খ চাওয়া যায় না। পাঁকাটির মত
, সরু, পনেরো-বিশটা হাড় জুড়ে-গেঁথে
খানা কাঠামো—একদানা মাংস নেই
ড়র গায়ে। বাঁচেন না আবার সেই
হয় দেমাকে। এটা ওটা মাখছেন, সাবান
ছন অহরহ। জামা-কাপড় বদলে বদলে
হচ্ছে—এখন এটা, তখন সেটা।
ারের রোগীর বেলা ডাক্তারে যেমন ঘন ঘন
ধ বদল করে—এখন রাঙা ওষুধ, দু-
পরে সাদা ওষুধ, তারপরে বড়ি,
পরে সবুজ ওষুধ। ওঁদেরও সেই
। সিকিখানা ফুলকো লুচি আলটপকা
ার ফেললেন, ওই সঙ্গে কণিকাপ্রমাণ
একঢোক জল খেলেন। খেয়ে ঢেকুর
নন: ওঃ, বিষম খাওয়া হয়েছে। এই
। ওঁরা। খাওয়ার গল্প ওঁদের কাছে
যাবেন না। মাথার মধ্যেই ঢুকবে না।"

•

দুাং-সরবরাহ কি রকম বানচাল হয়ে
ছ। অনেকক্ষণ থেকে এই অবস্থা।
অন্ধকারের মধ্যে আমি এসে জায়গা নিলাম। স্যুটকেশটার উপরে চেপে বসে টিফিন-কেরিয়ারটা হাতে ধরে আছি। স্টেশনে যত রিফিউজি এসে কায়েমি বাসা বেঁধেছে। সাতজনে দশ ফুট বাই আট ফুট টিনের ঘরে ভাগাভাগি করে থাকে—ভাড়ার অংক শুনে তাতেও পিলে চমকাবে। হেন অবস্থায় মাঠের মত ঘরের মধ্যে স্ত্রীপুত্র ভাইরাদার নিয়ে পুরোপুরি পা মেলে শুয়ে সংসারধর্ম করছে—দোষ দেব কি, আমিই ত হিংসে করি ওদের। অস্পষ্ট ছায়ার মত একটা দল অন্ধকারে গল্পগাছা করছে। খাইয়ে লোক নিঃসন্দেহ—কেবলই খাওয়ার গল্প। খেতেই যেন এসেছে দুনিয়ার উপর, খাওয়া ছাড়া অন্য কিছু নেই। স্পষ্টাস্পষ্টি ঠিক এই কথাটাই বলছে একজনে।

"বেঁচে থাকা খাওয়ার জন্যে। চর্বচোষ্য মজা করে খাব, সেই লোভেই ত কষ্টের জীবন বয়ে বেড়াই। আমাদের রাখাল চক্রবর্তি কবিরাজ মশায়ের কিন্তু আলাদা রকম বুঝ। এক ছটাক পরিমাণ পুরনো সরু চালের অন্ন আর মসুরির ডালের ঝোল খেতেন তিনি। তরকারির মধ্যে একটা পটল আর সিকিখানা কাঁচকলা। সারাজীবন এই খেয়ে গেলেন। স্নানের বিষয়ে বলতেন, 'যতটা জানি, একবার স্নান হয়েছিল আঁতুড়ঘর থেকে বেরনোর মুখে। আরও একবারের বাসনা রাখি—শ্মশানে যখন চিতায় উঠব, সেই সময়টা। সেই চিতায় ওঠা, হিসেব করে দেখো, একশ'টি বছরের আগে হচ্ছে না। ষোলআনা নিয়ম মেনে চলি, মরণ অমনি হলেই হল!' আমরা বলতাম, একশ' বছর কি কবিরাজ, একটা বছরও তোমার ঐ নিয়ম মানতে হলে তার আগে গাঙে ঝাঁপ দিয়ে মরে থাকব। তা-ও বাঁচলেন নাকি কবিরাজ! পঞ্চাশও পুরল না—না খেয়ে খেয়ে পনরো আনা মরেই ছিলেন, একদিন সন্ধ্যাবেলা চিঁচিঁ-গলায় 'বড়বউ' 'বড়বউ' বার দুয়েক ডেকে চোখ উলটে পড়লেন।

"বড়বউ অর্থাৎ কবিরাজের বউ ঠিক উল্টো মেজাজের। হবে না কেন, কোন্ বংশের মেয়ে! ওঁর ঠাকুরদাদা হলেন মুকুন্দপুরের ঘোষাল। আপমনে মুকুন্দ বাঁর নাম। রায়তোড়ের রাজাবাবু ভোজন দেখে চমৎকৃত হয়ে তিরিশ বিঘে খাস জমি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর যাঁকে লেখাপড়া করে

"এই বিপুল আয়োজন। বিয়ের ভোজে মাংস দেয় না—আর্ত জীব ভ্যা-ভ্যা করবে গলায় কোপ পড়বার সময়, শুভকর্মের সঙ্গে সেটা খাপ খায় না। ঐ মাংসটা বাদ দিয়ে পল্লীগ্রামে যত কিছু ভাবতে পারা যায়, সমস্ত আছে। আর সামান্য ডাল নিয়ে এ-হেন অপমানের কথা শুনতে হল, নিবারণ দিশাহারা হয়ে পড়লেন একেবারে। 'কী আশ্চর্য, ডাল দেয় নি আপনাদের?' চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবার অবস্থা নেই নিবারণের, জ্বলতে জ্বলতে তিনি রান্নাঘরের দিকে ছুটলেন। কী কুরুক্ষেত্র বেধে যায় দেখ এইবার। কেষ্টাকে সকলে গালমন্দ করছে। মেজজ্যেঠা পংক্তির গোড়ায়। হুঙ্কার দিয়ে তিনি সকলকে থামিয়ে দিলেন, 'বকাবকি যা করতে হয়, বাড়ি গিয়ে। এখন অন্য ব্যাপার। কথা যখন একটা বলে ফেলেছে, কোট বজায় রাখতেই হবে। যাক প্রাণ, রোক মান—'

"কথা শেষ হল না, নিবারণ ছুটে এসে ঢুকলেন। পরিবেশনের লোক তাঁর পিছু পিছু—হাতে মালসা-ভরা ডাল। কৃষ্ণপদর কাছে গিয়ে বলেন, 'ইনি নাকি ডাল পান নি। দাও ডাল, আরও দাও—।' পাঁচ হাতা দেওয়া হয়ে গেছে, নিবারণ শুনবেন না। ক্রমাগত বলছেন, 'দাও ডাল—আরও, আরও। ডাল-ভাতের খাওয়া—তা বলছেন, ডাল নেই মোটে।' কৃষ্ণপদ বিপন্নমুখে এদিক-ওদিক তাকায়। ডালের স্রোতে ভাসিয়ে দেয় যে একেবারে! গতিক বুঝে মেজজ্যেঠা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'শুনুন ও বেহাইমশায়, ডাল ত আমরাও পাইনি। শুধু একজনকে দিলে হবে না।'

'ও, আপনিও পান নি? এদিকে আন মালসা, এঁকে দাও।'

'শুধু আমি কেন, কেউ পায়নি আমাদের মধ্যে। আর ঐ দু-হাতা চার হাতা কী দিচ্ছেন মশায়। মালসা নিয়ে এসেছেন—অমনি মালসা এক-একটা রেখে যান সকলের পাতের কাছে। তার পরে জিজ্ঞাসা করবেন, কে আর কটা নেবে।'

"নিবারণ হতভম্ব হয়ে যান এক মুহূর্ত। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। বড় ভোজের ডাল নেমে গেছে, তবে আর ভাবনা কিসের? সেই ডালে মান রক্ষা হক, ভোজের জন্য পরে রান্না হবে। কিন্তু বসেছেন ষাটজনে, অত মালসা পাওয়া যায় এখন কোথা? কুমোরবাড়ি লোক ছুটল, সেখান থেকে কতকগুলো আনল। আর এ-বাড়ি ও-বাড়ি নতুন পুরনো মিলিয়ে জোগাড় হয়ে গেল।

"কন্যাপক্ষ ঐ ব্যাপারে ছুটোছুটি করছেন, আর মেজজ্যেঠা ছেলেদের তাতিয়ে দিচ্ছেন এদিকে, 'ভাবনা কোর না বাপ-সকল। পেট নয়, চামড়ার থলি! দেখতেই ছোট—যত খাবে, ফুলে ফুলে আরও জায়গা করে দেবে। জন প্রতি গড়ে দু-মালসা করে সাপটানো যাবে না? তা হলেই হবে। কোন রকমে গলা দিয়ে নামিয়ে দাও, তার পরে বটতলায় ধীরেসুস্থে বসে বিলের জলে না হয় উগরে দিও। যাক প্রাণ, রোক মান। আমি বুড়োমানুষ মুখ-পাতে আছি—আমি যদি পারি, জোয়ান-যুবো তোমাদের হেরে গেলে হবে কেন?'

"মালসা দেওয়া হল প্রতি পাতার পাশে। ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে মালসায়। পুরো মালসা নয়, অর্ধেক আন্দাজ। বলে, 'খেতে লাগুন না। যেমন যেমন খাবেন, আবার দিয়ে যাব।' ডাল আর কতই বা রান্না হয়, দশটা ভাল ভাল তরকারির মধ্যে কতটুকুই বা খায় লোকে ডাল! ভোজের ডালও কাবার হয়ে যায়-যায়। দু-হাতে মালসা ধরে চুমুক দিচ্ছি আমরা ডালে। শেষ করে বলি, 'কই—নিয়ে আসুন।' ভাতের ফ্যান মিশিয়ে বেশি করছে ডাল, ফ্যান নেই গরম জল মেশায়। তাতেও কুলায় না। দোকানে ছুটোছুটি করে এর মধ্যে ডাল কিনে নিয়ে এসেছে—কিন্তু কাঁচা ডাল রান্না করবার সময় চাই ত একটা। ততক্ষণে পাত কোলে করে বসে থাকবে মানুষগুলো—বিশেষ করে এই সব বরযাত্রী মানুষ? সময় বুঝে মেজজ্যেঠা আবার একটু ঠাট্টা ছাড়লেন নিবারণের দিকে, 'ও বেহাই মশায়, শুধুই যে হলুদ-গোলা আপনাদের রাঁধা ডাল। জলের মধ্যে ডাল ছাড়তে ভুলে গিয়েছিল নাকি?'

"নিবারণ ঘোষালের কাঁদ-কাঁদ অবস্থা। বরযাত্রী আমরা বুঝতে পারছি, অবস্থা সঙ্গিন। মরি-মরি করে আর দু-পাঁচটা মালসা টানতে পারলেই রণজয় নির্ঘাৎ। পরিবেশনের লোক বলে, 'মাছের কালিয়া একটু চেখে দেখুন না মাঝখানে। নিয়ে আসব? মুখ বদলে নিন। খেলে দেখবেন আরও স্বাদ লাগবে তখন।' এ চালাকি একটা শিশুও বোঝে। সময় চাচ্ছেন ওঁরা। মাছের কালিয়া খাওয়া চলবে, বারম্বার এসে এসে মাছ যাচাই হবে—আর সেই ফাঁকে দাউদাউ করে উনুন জ্বালিয়ে ডাল ফোটানো হচ্ছে তাড়াতাড়ি। অন্তত দুটো কড়াই যদি নামিয়ে নিতে পারেন, কোনক্রমে আর পারা যাবে না। হুল্লোড় লাগিয়েছি আমরা অতএব, 'মুখ বদলাতে কে চায় মশাই? ডাল চলছে, তাই আনুন না। ডাল চাই—আরও ডাল। ডালের যোগাড় নেই ত মুখে জাঁক করা কেন ডাল-ভাত বলে?'

"পরিপূর্ণ পরাজয়। নিবারণের আর দেখা নেই। ঘরে দরজা দিয়েছেন, কিম্বা কোন জঙ্গলে গিয়ে বসে আছেন। এত রকম আয়োজন করেও মাথা হেঁট হয়ে [illegible] গ্রামে এসে নিবারণ ঘোষাল মেজজ্যেঠাকে বললেন, 'আজন্ম ব্রাহ্মণ সব ধরে ধরে বর-যাত্রী নিয়ে গিয়েছিলেন। লোকে মাছ-মাংস খায়, দই-মিষ্টি খায়। পায়সও খায় কেউ কেউ। কিন্তু মুখপাতে ডালই খেতে লাগল এক মালসা দেড় মালসা। এমন ত জন্মে দেখি নি—।' মেজজ্যেঠা খানিকক্ষণ ধরে হেসে নিলেন, 'কী বলছেন বেহাই মশায়? গিয়েছিল ত রোগাপটকা নিখাউন্তি কতগুলো। থাকত আমাদের ইন্দির—খাওয়া কাকে বলে দেখিয়ে দিয়ে আসত। দশ গ্রামের লোক হাঁ করে চেয়ে থাকত।' আমার পিঠে থাবা মেরে মেজজ্যেঠা বলেন, 'এই আমার ভাইপো। মাছ নইলে ভাত রোচে না। পাকা রুই কিম্বা কাতলা। আশা আছে, কিন্তু খায় কতটুকু? এ-বেলা তিন-চার গণ্ডা দাগা, ওবেলাও তাই। ওজনে কত আর দাঁড়াবে—দেড় সের, সাত পোয়া? এ ছোঁড়াও সেজেগুজে বরযাত্রী হয়ে চলল ছ্যা—ছ্যা—এ কি আর লোকের কাছে পরিচয় দেবার মতন?'—"

আলো জ্বলে উঠল চারিদিকে। বিদ্যুতের সরবরাহ চালু হয়ে গেছে। খাওয়ার গল্প সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ। মানুষগুলো আমার দিকে চেয়ে আছে। শহুরে বাবুভেয়েদের ঠেস দিয়ে গল্পের শুরু—অতএব আমি ত আসামী একজন। বক্তা লোকটি উঠে আমার কাছে এল, "স্যর, কিছু মনে করবেন না। আমরা ভিক্ষুক নই। কিন্তু পুরো দিন পেটে কিছু পড়েনি, চুপ করে থাকতেও পারছি নে।"

টিফিন-কেরিয়ারের দিকে লোলুপ চোখে তাকায়।

বললাম, "আমি রেস্তোরায় খাব। বাড়ি থেকে এটা জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে, খুলে দিতে আপত্তি নেই। কিন্তু মাছ নইলে যে মশায়ের রোচে না। দু-বেলা দেড় সের পৌনে দু সের রুই-কাতলা দাগা। আর টিফিন-কেরিয়ারে বোধ হয় মাছই দেয়নি মোটে।"

লোকটা জিভ কাটে, "ছি-ছি, ঐ গল্প শুনলেন বুঝি? মিছে কথা স্যর, একেবারে বানানো। বড়বউঠাকরুনের কথা হচ্ছিল, চেয়ে দেখুন তাঁকে, না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে সলতে হয়ে আছেন।" সকাতরে বলে, "মিছে কথায় কান দেবেন না। পেটে কিছু নেই, তখন খাওয়ার কথা বলে বলেও সু[illegible] স্যারের কোন দিন যেন উপোস করতে হয়। হলে তখন গরিবের এই কারদা পরখ করে দেখবেন। খাওয়ার গল্প করবেন, বানিয়ে বানিয়ে বলে যাবেন—পেট খানিক ভরা-ভরা মনে হবে।"*

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

কে বলে সাত সমুদ্র পার হয়ে এসে গোষ্পদে ডুবে মরা। পরানের তাই হয়েছে।

বুড়ো মানুষের পকেটে সে হাত দেয় না। দিতে তার পৌরুষে বাধে। বুড়ো মানুষের পকেটে হাত দোব। যে চোখে দেখে না, কানে শোনে না! তেমন হাত কেটে ফেলাই ভাল।

গোঁফ বেরুনোর পর সে হাত দেওয়া দূরে থাক্, বুড়ো মানুষের পকেটের দিকে মুখ ফিরিয়ে চায়নি কখনও। অথচ অদৃষ্টের পরিহাস, সেই বুড়ো মানুষের পকেটেই তাকে হাত দিতে হল, নিতান্ত নাচার হয়ে। এবং ব্যাগটা বের করে সরিয়ে ফেলার আগেই হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল।

ধরলে সেই বুড়ো ভদ্রলোক নয়। গায়ে ধোপ-দুরস্ত সাদা চাইনিজ কোট, তার উপর চাদর চাপিয়ে তিনি তাঁর আসনে নিশ্চিন্ত বসে। ধরলে তাঁর সামনের বেঞ্চের একটি ছোকরা।

পরানের ভাব-ভঙ্গিতে তার বরাবরই একটা সন্দেহ হচ্ছিল। কয়েক বারই পরান বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির পকেটের দিকে হাত বাড়িয়েই আবার সরিয়ে নিচ্ছিল। ছোকরাটি ভাবছিল, সুবিধা হচ্ছিল না বলে বোধ হয় পরান হাত সরিয়ে নিচ্ছিল। পরানের মনের দ্বিধার খবর সে জানবে কী করে? পকেট-মারেরও যে আবার পৌরুষের অভিমান আছে একথা কে ভাবতে পারে বলুন।

কিন্তু ছোকরাটির বেশ ভাল লাগছিল। মৎস্যশিকারীর মাছ ধরা দেখতে যেমন আমোদ লাগে, কেমন একটা নেশা ধরে যায়, তেমনি চিরদিন শুনে এসেছে, পকেটমারে পকেট মারে। স্টেশনে, ডাকঘরে সাইন-বোর্ড দেখেছে: 'পকেটমার হইতে সাবধান!' 'সাবধান! পকেটমার আপনার কাছেই আছে।'

কিন্তু পকেটমার যে সত্য সত্যই এত কাছে থাকতে পারে, এরকম চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর কখনও হয়নি।

পরান একবার সন্তর্পণে হাত বাড়িয়েই টেনে নিচ্ছে। যেন ছিপের ফাতনা টিপ টিপ করছে, অথচ ডুবছে না। ট্রামের মধ্যে অসম্ভব ভিড়। সেই ভিড়ের ফাঁক দিয়ে ছোকরার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। এই ভিড়, ভিড়ের ঠেলাঠেলি কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারছে না। ভিড়ের ফাঁক দিয়ে সে একাগ্র দৃষ্টিতে পরানের হাতের দিকে চেয়ে। নেশা জমে গিয়েছে তার।

দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময় কী যেন একটা হয়ে গেল।

ভূমিকম্পে ট্রামটা যেন দুলে উঠল। যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা এ ওর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পরান সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ঘাড়ের উপর। সঙ্গে সঙ্গে যেন খোলের ভিতর থেকে কাছিমের মুখের মত একখানা শীর্ণ, দীর্ঘ হাত বেরিয়ে এল বৃদ্ধ ভদ্র-লোকের পকেট পর্যন্ত।

হাত নয়, যেন হাতের ছায়া। তার স্পর্শ নেই। এবং এক পলকের জন্যে।

কী হল?

ধাক্কার মধ্যে ছোকরাটির দেহ নড়েছে, কিন্তু চোখ নড়েনি।

কী হল? হয়ে গেল? খেলা খতম?

ছোকরাটা ঠিক বুঝতে পারলে না। হয়ে গেল কী? এরই মধ্যে হয়ে গেল! তার মন বললে, গেল। কাজ হয়ে গিয়েছে।

পরান সরে পড়বার জন্যে কেবল পিছু হটছে। ছোকরাটি সেই ভিড় যেন তীরের মত ভেদ করে পরানের উপর লাফিয়ে পড়ল।

পরান গর্জন করছে। যাত্রিদল হতচকিত।

কী হল? কী হল?

পকেটমার!

বাস্, আর দেখতে হল না। ট্রামে যে যেখানে ছিল, বসে কিংবা দাঁড়িয়ে, বাদুড়ের মত ঝুলামান অবস্থায়, সব ঝাঁপিয়ে পড়ল পরানের উপর এবং—

এবং যে-মারটা চলল, চড়-কিল-ঘুষি,

'চোর কোথাকার, হাজতে তেল আরও মরবে"

সে-মার গরুমোষেও সহ্য করতে পারে না, শুধু পকেটমারেই পারে।

পরান গোড়ায় গোড়ায় গর্জন করেছিল। চোখ রাঙিয়েছিল। কিন্তু ট্রামশুদ্ধ লোক ঝাঁপিয়ে পড়ার পর চুপ করে গিয়েছিল।

দূর থেকে কে যেন একবার বলেছিল, "থাকগে মোসাই, ব্যাটার খুব সিখ্যে হয়েছে, এবার দুটো লাথি মেরে নাবিয়ে দিন।"

আর যায় কোথায়?

সবাই চিৎকার করে উঠল, "ওটাকেও মশাই। এর সঙ্গী ও। পাকড়ান, পাকড়ান।"

কিন্তু পাকড়াবে কে? তার গায়ে হাত পড়বার আগেই লোকটা বিদ্যুদ্বেগে চলন্ত ট্রাম থেকে লাফ দিয়ে পড়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

ট্রাম এসে থামল থানার সামনে।

সেইখানে পরানকে নামানো হল। তার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। গায়ের আদ্দির পাঞ্জাবিটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন। পরিধেয় বস্ত্রেরও সেই অবস্থা। মাথার চুল বিপর্যস্ত।

পরান ট্রাম থেকে নেমেই শিথিল বস্ত্র ঠিক করে নিয়ে পকেট থেকে বিড়ি দেশলাই বের করে একটা বিড়ি ধরালে।

বললে, "চলুন, কোথায় নিয়ে যাবেন।"

লোকেরা (মানে নিরীহ লোকেরা নয়। তারা যে-যার সরে পড়েছে। উৎসাহী লোকেরা, যারা থানা-কোর্ট পর্যন্ত অগ্রসর হতে প্রস্তুত) তারা মার বন্ধ করেছে। দয়ায় নয়, ক্লান্ত হয়ে। তখন তারা হাঁফাচ্ছে। ঠেলতে ঠেলতে তারা পরানকে থানার দিকে

ইতিমধ্যে একটা ট্রাফিক পুলিস এসে পরানের ভার নিয়েছে।

আগে পরান এবং তার হাত ধরে কনস্টেবল। পিছনে রীতিমত একটা জনতা। এরা সবাই যে ট্রামে ছিল, তা নয়। কিছু রাস্তায় জুটেছে। এবং অধিকাংশই থানা পর্যন্ত যাবেও না।

সবাই মারমুখী। সকলেরই হাত নিশ-পিশ করছে। কিন্তু পুলিসের জন্যে পরানের গায়ে হাত দিতে পারছে না। শুধু মুখেই শাসাচ্ছে।

কিন্তু পরানের এই সমস্ত শাসানি এবং নানা প্রকার শ্রাব্য-অশ্রাব্য মন্তব্যের দিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। যেন কটূক্তি-বর্ষণটা অন্য লোকের উপর চলছে, তার উপর নয়। সে নিশ্চিন্তে বিড়ি টানতে টানতে চলেছে। চেষ্টা করছে হন হন করে চলবার। কিন্তু প্রহার-জর্জর দেহটা ঠিক পারছে না।

প্রশস্ত রাস্তায় প্রবল জনস্রোত। বেশীর ভাগই অফিস-ফেরত বাবুদের দল। তাদের কেউ পরানকে একবার চোয়ে দেখেই চলে যাচ্ছে। কেউ কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে জেনে নিচ্ছে ব্যাপারটা কী। কেউ বা শেষ পর্যন্ত দেখবার আগ্রহে জনতার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

পরানের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই।

"এইখানে চাঁদা করে একদফা হয়ে যাক না, ও কনস্টেবল সাহেব!" —দূরের থেকে দোকানের কোন ছোকরা প্রস্তাব করলে।

জনতার এবিষয়ে আগ্রহের অভাব নেই। বস্তুত এইখানে ট্রামের মত একপ্রস্থ হয়ে ---- জনতার অনেকে খুশী হয়ে বাড়ি

ফিরে যেতে পারে। কিন্তু কনস্টেবলটার জন্যে সে সুবিধা নেই।

জনতার উপর পুলিসের ভয় আছে। এইখানে সত্য সত্যই চাঁদা করে একপ্রস্থ হয়ে গেলে তার সাধ্য নেই পরানকে রক্ষা করে। কিন্তু পুলিসের উপর পরানের প্রচুর আস্থা আছে। চারিদিকের বিরুদ্ধ মন্তব্য এবং ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও সে তাই নিশ্চিন্তে চলেছে বিড়ি টানতে টানতে।

বাঁ দিকের সরু গলিটা তার চেনা গলি। খানিকটা গিয়ে ডান দিকে বেঁকেই একটা জানা বস্তি। সেখান পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে কাকে ধরে কে? কিন্তু এই দেহ নিয়ে পারবে কি?

এবারে ভয় তার পুলিসের জন্যে নয়। ভারী-বুট-পরা কনস্টেবলের সাধ্য নেই দৌড়ে তার সঙ্গে পাল্লা দেয়। ভয় তার জনতাকে। তারা ঠিক ধরে ফেলবে। এবং পুলিসের আশ্রয়চ্যুত অবস্থায় পেলে এই মারমুখী জনতা তাকে আর আস্ত রাখবে না।

সুতরাং গলিটার দিকে একবার চেয়েই সে-সংকল্প পরিত্যাগ করল।

পালাবার লোভটাকে মন থেকে তাড়াবার জন্যে সে পা চালিয়ে চলতে গেল। সামনেই একটা জীর্ণ ভিখারিণী।

'ভাগ্!'

পরান এমন করে গর্জন করে উঠল যে পাশের কনস্টেবলটা চমকে উঠল। পিছনে জনতা ইতিমধ্যে খানিকটা হালকা হয়েছে গর্জনে তারাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নিজেকে সামলে নিয়ে কনস্টেবলটা ও হাতে একটা ঝাঁকি দিলে, "কেয়া হুয়া?"

ওর প্রশ্ন পরানের কানে গেল কি-না সন্দেহ। তার চোখে ক্রোধ এবং ভ্রূকুটি "হারামী কা বাচ্চা কাঁহাকা!"

ভিখারিণীটাও হকচকিয়ে গিয়েছিল। ত কিছু করেনি। ভিক্ষাও চায়নি। পরানে কাছ-বরাবর গিয়েছিল বটে, হয়ত ভিক্ষা চাইতেই। কিন্তু তখন ও কনস্টেবলটা দেখেনি। বুঝতে পারেনি, পুলিস ধরে নি যাচ্ছে একটা চোরকে। তা হলে ওর ক বরাবর যাবেই বা কেন?

কিন্তু হতচকিত ভাবটা কাটতে দেরি না। ভিক্ষা করলেও সে যে সামান্য অন্তত একটা পকেটমারের চেয়ে বেশী, সামাজিক বোধটা ওর মনে জেগে উঠ

কোমরে সেই মলিন ছেঁড়া কাপ একটা প্রান্ত জড়াতে জড়াতে সেও গ করে উঠল, "তুই হারামীর বাচ্চা। কোথাকার। মারের চোটে গতর দিয়েছে। হাজতে তেল আরও মরবে।"

কিন্তু এসব কথা পরানের কানে গেল মনে হল না। সে তখন খানিকটা চলে গিয়েছে।

জনতার অবশিষ্ট অংশ, যারা থানা

যেত না, তারা এইখানেই মজা পেয়ে গেল। তারা ভিখারিণীকে তাতিয়ে আরও নতুন নতুন মুখরোচক গালাগালি শুনতে লাগল। যদিও যার উদ্দেশে গালাগালি সে তখন প্রায় থানার কাছে।

ছেলেবেলার কথা পরানের ভাল মনে পড়ে না।

শুধু মনে পড়ে পশ্চিমের একটা শহর, সর্দার বলে আলিগড়. উলঙ্গ দেহে সেখানকার ধুলোভরা রাস্তায় খেলা করত আরও পাঁচটা ছেলের সঙ্গে। সেখানে একটা আম্মা ছিল। অত্যন্ত রুগ্ন একটি আম্মা, দিনরাত্রি খকখক করে কাশত। আর একটি বাপও ছিল। প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা জাঁদরেল একটা বাপ। অত্যন্ত নিষ্ঠুর। মাকে পায়ই ধরে ধরে মারত, অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। সেও বাদ যেত না। মারের চোটে মুখ দিয়ে তার রক্ত উঠত। অজ্ঞান হয়ে যেত। জ্ঞান হলে দেখত, আম্মা চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে বসে। পাশে একটা জলের লোটা। বোধ হয় তার চোখে-মুখে জলের ছিটে দেবার জন্যে।

বাপকে খুব বেশী দেখতে পেত না। মাঝে মাঝেই কোথায় চলে যেত। আম্মা বলত, "কলকাতা গেছে সওদা করতে।" কী সওদা করতে সে-ই জানে। কিন্তু টাকা-পয়সা জিনিসপত্র আনত অনেক। ক'দিন খুব খাওয়া-দাওয়া হত। তারপর আবার একদিন বাপ উধাও হয়ে যেত।

সেই সময়টা খুব আনন্দে কাটত। আম্মারও, ওরও। যখন বাপ থাকত না।

যখন বাপ থাকত, ও ত পারতপক্ষে তার ছায়া মাড়াত না। বাইরে বাইরেই থাকত। কিন্তু আম্মার ত সে সুবিধা ছিল না। তাকে থাকতে হত বড় পর্দায়। সুতরাং মার জুটত কথায়-কথায়, একটু কিছু ত্রুটি হলেই।

মনে পড়ে, একদিন বাইরে থেকে খেলা করে ফিরে এসে দেখে, আম্মা মাটির দাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। কপাল কেটে রক্ত পড়ছে। বেশী রক্ত অবশ্য নয়। বেশী রক্ত তার ছিল না।

কী যে করবে সে ভেবে পায়নি। পাশের বাড়ির লোকদের জানানো নিষেধ ছিল। জানালেও বাপের ভয়ে কোন পড়শী আসতে সাহস করত না। পাড়াসুদ্ধ লোক তাকে ভয় করত।

এটুকু জেনেছিল, চোখে মুখে জলের ছাট দিলে জ্ঞান হয়। তাই দিয়েছিল। একটু পরে আম্মার জ্ঞান হয়েছিল। তখনই কপালের রক্ত ধুয়ে ফেলে আবার রান্নাঘরে গিয়ে রান্না চড়িয়েছিল।

আশ্চর্য এই আম্মা! মার খেয়ে কখনও [illegible] করত না। [illegible] মুখ ঘোমটায় ঢাকা। বড় বড় নীল দুটি রক্তহীন চোখ, কখনও কাঁদত কিংবা হাসত বোঝবার উপায় ছিল না।

আলিগড় না কী শহর কে জানে. সেখানকার আর-কিছুই পরানের মনে নেই। শুধু আম্মাকে মনে পড়ে।

সেই আম্মার কান-নাক কী রকম ফুলে উঠল। বোধ হয় সেই জন্যেই দিনরাত মুখ ঘোমটায় ঢেকে রাখত। তারপর একদিন হাতে-পায়ে ক্ষত দেখা গেল।

পরানের ধারণা হয়েছিল, মারের জন্যে ঘা বুঝি।

কিন্তু আম্মাই একদিন তাকে বুঝিয়ে দিল, মারের ঘা নয়, খুব খারাপ ঘা। এ ঘা কোনদিন সারবে না। এইবারে সে মরে যাবে। মরে গেলেই অবশ্য বাঁচে। কিন্তু পরানের কী হবে?

ঘায়ের দিকে চেয়ে পরান শিউরে উঠেছিল। তারপরে মরার কথা শুনে, পরানের এখনও মনে পড়ে, লুকিয়ে লুকিয়ে খুব কেঁদেছিল সে।

লুকিয়ে লুকিয়ে মানে সে-পরিবেশে কান্না নিষেধ, জোরে কান্না একেবারেই নিষেধ। আম্মা কাঁদত না, পরানও কাঁদত না। কান্না পরানের আজও আসে না।

এর পরে পরান চলে এল কলকাতায়। এই আড্ডায়। তার বাপ একদিন এসে সেই যে দিয়ে গেল আর আসেনি। আর তাকে দেখেনি। তার জন্যে তার দুঃখ ছিল না। কিন্তু আম্মার জন্য অনেক দিন পর্যন্ত তার মন-কেমন করত। সেই ঘায়েভরা আম্মা, তার বড় বড় নীল রক্তহীন চোখ। তার শব্দহীন অস্তিত্ব যেন মুখর হয়ে উঠত।

তারপরে এই আড্ডা।

এখানকার পরিবেশ অন্য রকমের। যে বুড়ো সর্দারের অধীনে তারা পাঁচ-ছটি ছেলে থাকত, তার মায়া-মমতা কিছু ছিল। সময়-সময় নিষ্ঠুর প্রহার দিত সত্যি, প্রায় সেই আলিগড়-না-কোথাকার বাপের মতই, কিন্তু মাঝে মাঝে আবার ওদের নিয়ে খেলাও করত।

সেই সর্দারের কাছেই শুনেছিল, আলিগড়ের আগেও তার একটা জীবন ছিল। ওরা তার সত্যকারের বাপ-মা নয়।

ওর বাপের কাছেই সর্দার শুনেছে, এই কলকাতাতেই ওর বাড়ি। হয়ত বস্তির স্যাঁতসেঁতে খোলার ঘরে কোন ঝিয়ের কোলে জন্মেছে সে। কি হয়ত নিম্নমধ্যবিত্ত কোন গৃহস্থ-পরিবারে। খেলা করছিল রাস্তায়। সেখান থেকে ওকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল কেউ। তার কাছ থেকে পায় ওর বাপ।

শোনার পর থেকে পরানের মাঝে মাঝে মনে হয়, সেই খোলার ঘর কিংবা অন্য কোন ঘর, যেখানে ও জন্মেছে, সেটা যদি একবার দেখতে পেত! ফিরে যাবার জন্যে নয়। এই জীবন ছেড়ে আর কোথাও ফিরে যাবার তার ইচ্ছাও নেই, উপায়ও নেই।

কিন্তু যদি একবার দেখতে পেত!

ফিরে যাবার উপায় যখন নেই, ইচ্ছাও নেই, তখন দেখে দূরে থেকেই হক আর কাছ থেকেই হক—শুধু দেখে কী যে তার স্বর্গলাভ হত, তা সে বলতে পারে না।

তবু ইচ্ছা হয় দেখবার, তার সত্যকারের মা-বাপ-ভাই-বোনকে। তারা কে কেমন জানবার ইচ্ছা হয়। জেনে লাভ নেই, তবু ইচ্ছা হয়। যেমন সকল মানুষেরই গত-জন্মের আত্মজনদের দেখবার ইচ্ছা হয়। সকল সময় নয়, মাঝে মাঝে, ক্বচিৎ কোন আশ্চর্য মুহূর্তে।

এইখানে সর্দারের শিক্ষায় তার হাত পাকতে লাগল।

এমন পাকল যে, সর্দার পর্যন্ত অবাক। প্রথম প্রথম সর্দার নিজে সঙ্গে থাকত। মক্কেল দেখিয়ে দিত। বুঝিয়ে দিত, কী করে জানা যায়, কার পকেটে মাল আছে, কোথায় আছে। কী কৌশলে তা মারা যায়, গোড়ায়-গোড়ায় হাত সাফাইয়ের সেই কায়দাটা নিজে মেরে দেখিয়ে দিত।

তারপরেও কিছুদিন নিজে সঙ্গে থাকত। নিজে মারত না, ওদের মারতে দিত। নিজে সুসজ্জিত বেশে মক্কেলের পাশে বসত। ওদের হাত-সাফাই পর্যবেক্ষণ করত। ভুল-ভ্রান্তি হলে বাড়ি ফিরে সংশোধন করে দিত।

এমনি করে যে-শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল গৃহকোণে, বাইরের জগতে তা সম্পূর্ণ হল।

প্রথম প্রথম পরানের ভয় করত। হাত কাঁপত, বুক শুকিয়ে যেত। কিন্তু সাফল্যেই সাহস বাড়ে। পরানেরও বাড়তে লাগল। দেখতে দেখতে পকেটমারার ক্ষেত্রে সে অদ্বিতীয় হয়ে উঠল।

সর্দার বলত, "আঙুল ত নয়, যেন পালকের ছুরি।"

বলত, "ওর চোখে এক্স-রে আছে। হাজার লোকের মধ্যে কোন লোকটির ফতুয়ার পকেটে মাল আছে, ওর চোখের আলো নির্ঘাত সেখানে গিয়ে পড়বে। আর সঙ্গে সঙ্গে পালকের ছুরি কাজ হাঁসিল করে ফেলবে। মাছিটি পর্যন্ত টের পাবে না।"

এর কিছুকাল পরে সর্দার বিছানা নিলে। সবাই তাকে ফেলে যে-যার সুবিধামত সরে পড়ল। কিন্তু সে তাকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলে পালাল না। রয়ে গেল।

সকাল-সকাল রেঁধে-বেড়ে তাকে খাইয়ে সওদা করতে বেরিয়ে পড়ে। বিকেলে ফিরে এসে আবার তার সেবা-যত্ন করে।

তারপরে আজ ধরা পড়ে গেল। পালকের ছুরি, কিংবা এক্স-রে কোনটাই কাজে এল না।

সর্দারের জন্যে দুটো ভাব কিনে নিয়ে যাওয়ার কথা। বুড়ো হয়ত অপেক্ষা করে আছে সেই জন্যে।

কনস্টেবলের সঙ্গে চলতে চলতে সেই কথা মনে পড়ে পরান হেসে ফেললেঃ মর শালা বুড়া! আমি আর ফিরছি না।

মরবে ত নিশ্চয়ই। সর্দারের দিন শেষ হয়ে এসেছে। তবু আরও কটা দিন বাঁচত হয়ত, যদি পরান ধরা না পড়ত। হয়ত একটু আরামে মরতে পারত।

তা আর কী করা যায়!

সে ত আর ইচ্ছা করে জেলে যাচ্ছে না! ধরা পড়া গেলে আর করবে কী? বুড়ো সর্দারের অদৃষ্ট। নইলে সাত সমুদ্র পার হয়ে এসে এই সামান্য গোষ্পদের জলে ডুববে কেন?

বুড়ো সর্দারেরই অদৃষ্ট। এমনি করে অসহায় অবস্থায় তার মৃত্যু আছে, কে খণ্ডাবে!

সন্ধ্যার মুখে পরান প্রতিদিনই সর্দারের জন্যে একবার ফেরে। তার পরে তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে কোনদিন আবার বেরয়, কোনদিন বা আর বেরয় না।

সন্ধ্যেবেলাটা আজও বুড়ো তার জন্যে অপেক্ষা করবে। হয়ত তার জন্যে নয়, ডাবের জন্যে, সন্ধ্যের আহারের জন্যে। তাকে ফিরতে না দেখে ভাববে হয়ত। রাত দশটা পর্যন্ত ভাববে। তারপরে বুঝবে, কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। এবং অঘটনটা কী হতে পারে, তার মত ঘুঘু পকেটমারের বুঝতে বিলম্ব হবে না। তখন, তখন কী করবে সে?

মর্ শালা ছটফট করে!

থানায় এসে হাজতে কিছুক্ষণ বসে থাকতে হয়েছিল। দারোগাবাবু বেরিয়েছিলেন। তিনি ফিরতে পরানকে তাঁর সামনে হাজির করা হল।

ডায়েরির বই টেনে দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "নাম কী?"

'আজ্ঞে, পরান।'

"পরান কী?"

"আজ্ঞে, আর কিছুই নয়, শুধু পরান।"

"বাপের নাম কী?"

"সে সব জানি না মোসাই।"

"বাপের নাম জানিস না?"

"না মোসাই, ওসব পাট নেই।"

তারপর আবার বললে, "ওসবে কী হবে মোসাই! যাব ত আমি জেলে। বাপের নাম যাই হক না কেন?"

"হুঁ।"

"আজ্ঞে। বাপের নাম জানি না। আমার নাম পরান। পরান বক্সও লিখতে পারেন।"

"বক্স আবার কী করে হল?"

"আজ্ঞে হয়, গেরোর ফের থাকলে সবই হয়।"

দারো[illegible] লিখে নিলেন—পরান বক্স, বাপের নাম অ[illegible]ত।

জিজ্ঞাসা করলেন, "পকেট মারতে গিয়েছিলি?"

"আজ্ঞে আর বলেন কেন হুজুর, ও এক ঝকমারি হয়ে গেল।"

"ঝকমারি! কী রকম?"

পরান এতক্ষণ বেশ শান্ত ছিল। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। বললে, "ঝকমারী নয়ত কী! এই আঙুল দেখছেন স্যার? সর্দার বলত পালকের ছুরি।"

দারোগা হেসে ফেললেন, "তা পালকের ছুরি ভোঁতা হয়ে গেল কী করে?"

"তবে আর বললুম কী স্যার! ঝকমারি। মাইরি বলছি, গোঁফ বেরুবার পর থেকে বুড়ো মানুষের পকেট আমি ছুঁই না।"

"তবে ছুঁলি কেন?"

"আজ্ঞে, গেরো।"

"গেরো?"

"না ত কী বলুন স্যার। গেরো। আর সেই ঘেয়ো মাগী।"

বিস্মিত কণ্ঠে দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, "ঘেয়ো মাগী আবার কোথায় পেলি?"

"আজ্ঞে, গেরোর ফেরে জুটে গেল।"

"কোথায়?"

"পথে। ঘেয়ো মাগী আর কোথা জুটবে?"

পরানের কণ্ঠস্বরে তীব্র বিরক্তি প্রকাশ পেল।

দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কী করলে?"

"কী আর করবে মোসাই। করেনি কিছুই। একটা ঘেয়ো মাগী আর কী করতে পারে?"

"তবে?"

"তা হলে বলি শুনুন।"

থানার সেই হল-ঘরের মেঝেয় দারোগার টেবিলের নীচে পরান উবু হয়ে বসে পড়ল। বলতে লাগল ঃ

"তিনটে আন্দাজ একটা শিকার জুটে গেল। মাল বেশী ছিল না। খুচরো পয়সাতেই ব্যাগটা ফুলে উঠেছিল। খানকয়েক এক টাকার নোট আর সব খুচরো।"

"কোন্ ট্রামে?"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পরান বললে, "সে একটা স্যামবাজার যাবার ট্রামে।"

"তারপরে?"

"সেইটে হাতিয়ে ফুর্তিসে 'সিস্' দি[illegible] দিতে চলছি—সামনে একটা ঘেয়ো মা[illegible] আলুমিনামের ফুটো বাটি, হাতে দাঁড়া[illegible]

"তারপরে?"

"দিয়ে দিলাম।"

"কী দিয়ে দিলি?"

বিরক্তিভরে পরান উত্তর দিলে, "ত[illegible] কী দোব মোসাই, বেগটা।"

"গোটা ব্যাগটা দিয়ে দিলি?"

"দিলাম বইকি!"

হঠাৎ পরানের চোখটা যেন জ্ব[illegible] উঠল ঃ "জানেন মোসাই, ঘেয়ো আমি একেবারে সইতে পারি না। সঙ্গে যা থাকে দিয়ে দিই। কতবার দিয়েছি। আর সওদাতে বেরুতাম না হয়ত। কিন্তু সর্দারের জন্যে আবার বেরুতে হল। গেরো আর কাকে বলে?"

কিন্তু শেষের কথাগুলো দারোগাবাবুর বোধ হয় কানেই গেল না। তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

"ঘেয়ো মাগী দেখলে সব দিয়ে দিস?"

"বললুম তো স্যার, কতবার দিয়েছি।"

"কেন দিস?"

"তা জানিনে মোসাই।"

পরানের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ বিরক্তি। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ যেন কোন্ সুদূরে উধাও হয়ে গেল ঃ আলিগড়-না-কোন্ শহরের সেই খোলার বাড়ি। ছোট্ট উঠান। আলো ঢোকে না। সেখানে সেই সর্বদা-ঘোমটায়-মুখ-ঢাকা আম্মা। সেই রক্তহীন নীল চোখ। যে কখনও কাঁদে না, কাঁদতে জানে না। স্বল্পভাষিণী। হাতে-পায়ে ঘা...

মারের ঘা নয়। খুব খারাপ ঘা। এ ঘা কোনদিন সারবে না।

পরান দারোগার দিকে মুখ তুলে চাইলে। কাঁপা গলায় বললে, "ওরা বেশী দিন বাঁচে না মোসাই।"
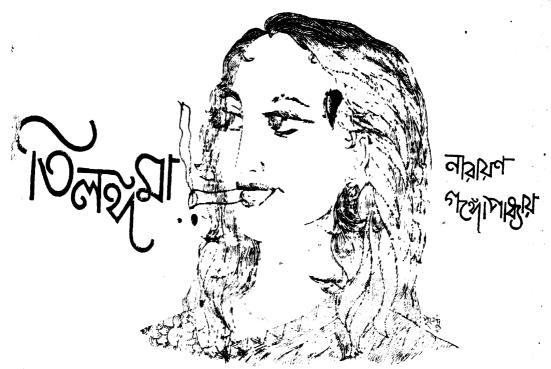
তিলোত্তমা? আমি চমকে উঠে বললুম, "এর মানে কী? এমন শব্দ ত কখনও পেয়েছি বলে মনে পড়ছে না।"

সাংবাদিক বন্ধু, তাঁর প্রসন্ন প্রশান্ত হাসিটি মুখের উপর মেলে দিয়ে বললেন, "শুধু আপনি কেন কোন আভিধানিকও কখনও পেয়েছেন বলে জানি না। তিলে তিলে গঠন করে যে নারী এমনি একটা ব্যুৎপত্তি করে নিতে পারেন।"

"আধুনিক কবিদের কী যে হয়েছে"—আমি গজগজ করে উঠলুম।

"আধুনিক কবিদের উপর আগে থেকেই অবিচার করবেন না।" বন্ধু আবার হাসলেন। বললেন, "আমার এই রিভিউটা প্রথমে পড়ে নিন, তারপরে যা বলবার বলবেন।"

অগত্যা পড়তে আরম্ভ করলুম। বেশ দীর্ঘ সমালোচনা। লাইনে লাইনে প্রশংসার উচ্ছ্বাস। তা থেকে যে তত্ত্ব মোটের উপর পাওয়া গেল, তা এই রকম:

"এ এক আশ্চর্য কবিতার বই। এর ভাষা নতুন, ছন্দ নতুন, বক্তব্য নতুন। এমন ভাষা-ছন্দ-ভাব বাংলা সাহিত্যে এর আগে কেউ ব্যবহার করেননি রবীন্দ্রনাথের মত মহাপ্রতিভাও এর কল্পনা করতে পারেননি (আলোচনার এই জায়গাটায় এসে আমি বিষম খেয়েছিলুম) আজকের দিনের সাধারণ পাঠক বা সমালোচক 'তিলোত্তমা'র মর্ম বুঝবে না; কিন্তু যেমন বোদলেয়ার অনেক পরে তাঁর উপযুক্ত স্বীকৃতি পেয়েছেন, যেমন জেমস জয়েসের স্ট্রীম অফ কনসাস-নেস্ অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে নিজের মহিমার আসন পেয়েছে, তেমনি এক-দিন হয়ত এই কাব্য আজকের সমস্ত উপেক্ষা-উপহাসের মেঘাবরণ ছিঁড়ে সূর্যের মত বেরিয়ে আসবে। এই বই থেকে বিচ্ছিন্ন-ভাবে উদ্ধৃতি দেবার শক্তি আমার নেই, কারণ আমি মনে করি—সম্পূর্ণ বইখানিই উদ্ধৃতিযোগ্য।"

আমি হাঁ করে রইলুম কিছুক্ষণ।

"সত্যিই কি এমনি নিদারুণ প্রতিভা জন্মেছে নাকি বাংলা দেশে?"—অস্বস্তি-ভরে বললুম, "কাগজ-টাগজগুলো আমিও ত পড়ি, কিন্তু এ-কবির কোনও কবিতা ত কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না।"

"এর কবিতা কোন কাগজে ছাপা হয়নি। কবি কখনও পাঠাননি।"

"বোধ হয় ভাবেন, তাঁর কবিতা কেউ বুঝবে না?"

"না, তাও নয়। তিনি শুধু নিজের মনেই লিখে যান। বইখানি ছাপিয়েছেন তাঁর স্ত্রী।"

আমার ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বছর দুয়েক আগে নিজের খরচে আমি একখানা উপন্যাস ছেপেছিলুম। পঞ্চাশ কপিও বিক্রি হয়নি আজ পর্যন্ত। আর সেজন্য আমার স্ত্রী যা বলে থাকেন, তা প্রকাশ্যে শোনাবার মত নয়।

"ভাগ্যবান স্বামী!" আমি শীর্ণ স্বরে বললুম, "আর এমন স্বামীর স্ত্রীও ভাগ্যবতী।"

"স্ত্রীও ভাগ্যবতী?"—বন্ধু বিচিত্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন: "খুব সম্ভব। কিন্তু আপনাকে আর ধোঁয়ার মধ্যে রেখে লাভ নেই। আগে কবিতার বইখানা আপনাকে একবার দেখানো দরকার।"

ব্যাগ থেকে বইটি বের করে এনে বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে: "পড়ুন।"

ছোট বই। রেক্সিনে বাঁধানো—সোনালী হরফে জ্বলজ্বল করছে নাম: তিলোত্তমা—সোমেন দে চৌধুরী। দামী বিলিতি কাগজে চমৎকার ছাপা।

"টাকা আছে অনেক।"

"না, স্ত্রীকে গয়না বেচতে হয়েছে।"

আমার আর একবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আমার স্ত্রী কুন্তলার কথাগুলো একবার শোনা উচিত ছিল। কিন্তু আপাতত সে বাড়িতে নেই—হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে কোন বান্ধবীর কাছে আড্ডা দিতে বেরিয়েছে।

ভাবতে ভাবতে আমি বইয়ের পাতা

ওল্টাচ্ছিলুম। কিন্তু চোখের দৃষ্টি থমকে থেমে গেল। একটি কবিতার নাম হল "চণ্ডালিতা হিণ্ডালিকা"। আর তার লাইনগুলো এই :

"পর্যুদস্ত পাঁশুটে বিকেল
ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং ট্রামের তেল।
টিং টিং —কার্বালির হিং:
সবুজ চায়ের পেয়ালা—
বীবর্ণ প্রাণে লাল নীল শিং।
বাগিচায় বুলবুলি তুই—
ম্যান্ডোলীনা কচী কচী কাটা
নিয়ে আয় থাঁরা বলী দেব,
ওঁ কালিঘাটের ভো ভো
(পাঁটা—পাঁটা !)"

আমার হাত থেকে বইখানা খসে পড়বার উপক্রম হল।

"কী কাণ্ড মশাই!"

"ভাল লাগল না?"

"ভাল! পাউন্ডের ক্যাণ্টোজ থার্টি সেভেন উলটেছি। হেনরি মিলারের রোজি ক্রুসিফিকেশন নিয়ে চেষ্টা করেছি—কিন্তু এ-কবিতা পড়লে যে ভো-ভো করে লোককে কামড়ে দিতে ইচ্ছে করে!

"আমার সমালোচনার সঙ্গে মত মিলছে?" —বন্ধুর ঠোঁটের কোণায় চাপা হাসি দুলে উঠল একটুকরো।

"এক দিক থেকে মিলছে বইকি!" আমি তিক্তগলায় বললুম, "ঠিকই বলেছেন, এই বস্তু—এই বানান রবীন্দ্রনাথ কল্পনাও করতে পারতেন না। যেমন হয়েছেন আপনারা সমালোচকেরা, তেমনি এই আধুনিক কবির দল—"

"বলেছি ত, আধুনিক কবিদের উপর আগে থাকতেই অবিচার করবেন না। তাঁদের কোনও দোষ নেই।"

"কিন্তু এ যে পাগলের কাণ্ড!"

"ঠিক।" —বন্ধু একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন: "আধুনিক কবিরাও এই কবিতাগুলো পড়ে ওই কথাটাই বলবেন। আর ওই কথার প্রতিবাদ একজন বিশেষ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যেই এই সমালোচনা আমাকে লিখতে হয়েছে।"

"কে সেই বিশেষ মানুষটি?"

"লীলা দে চৌধুরী। আগে ছিল লীলা মিত্র।"

আমি হতাশ দৃষ্টিতে তাকালুম।

"সমস্ত জিনিসটাকে এমন জটিল করে তুলেছেন যে, কিছু বুঝতে পারছি না।"

"জটিলতার জাল এখুনি খুলে দিচ্ছি। লীলা মিত্রের গল্পই বলি। তিলত্তমার সমস্যা তা হলে সহজেই সমাধান হয়ে যাবে।"

বন্ধু ধীরে-সুস্থে চুরুট ধরালেন। সামনের দেওয়ালে ক্যালেণ্ডারের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে শুরু করলেন লীলা মিত্রের গল্প।

কলকাতার কোন মিশনারি কলেজে লীলা মিত্র ছিল আমাদের সহপাঠিনী। শুধু আমাদের ক্লাসেরই নয়—সারা কলেজের ছাত্রেরাই লীলা মিত্রকে একটা বিশেষ চোখ দিয়ে দেখত। এমনকি, কখনও কখনও অধ্যাপকেরা পর্যন্ত রোল-কল করতে করতে মাথা তুলে [illegible] করতেন সেভেনটি ফাইভ যথাস্থানে হা[illegible]র আছে কি না! অনুপস্থিত মেয়েদের রোলে অযাচিতভাবে রেসপণ্ড করে যে-সব ছেলেরা শিভাল্‌রির পুলক অনুভব করত, তারাও কোনদিন লীলা মিত্রের প্রক্সি দিতে সাহস পেত না।

এ থেকে মনে হতে পারে, লীলা মিত্র অসাধারণ সুন্দরী ছিল। না, তা নয়। রঙ কালোর দিকেই চলনসই চেহারা। পড়াশুনোতেও সাধারণ ধরনের। সাহিত্যে বা সঙ্গীতে তার যে কোন বিশেষ দক্ষতা আছে, সে পরিচয়ও কেউ পায়নি। তবু সব মিলিয়ে কী যে তার মধ্যে ছিল—তার উপর চোখ না পড়েই পারত না।

এখন বুঝতে পারি, ওটা ব্যক্তিত্ব। খুব সাধারণ কথা—খুব সহজে বলে ফেললুম। কিন্তু জিনিসটা অত সহজ নয়। চেহারায় বৈশিষ্ট্য অনেকেরই থাকে—কিন্তু ব্যক্তিত্ব হল 'কোটিকে গুটিক'। চেহারা থেকে অনেকেরই স্বভাব ফুটে ওঠে, কিন্তু চরিত্রের দীপ্তি জ্বলে ওঠে না। লীলা মিত্রের মুখে ছিল চরিত্রের শিখা—তা থেকে ছড়িয়ে পড়ত ব্যক্তিত্বের আলো।

শুনেছি, অ-বাঙালীরা নাকি বাঙালী মেয়েদের পছন্দ করেন। আমার মনে হয়, বাঙালী মেয়ের চোখই হচ্ছে তার প্রধান কারণ। কারও চোখ গাছের পাতায় শিশিরের মত কম্প্রাকে ছুঁয়েই আছে, একটু ছোঁয়া লাগলেই টুপটাপ করে ঝরে পড়বে: কেউবা রবীন্দ্রনাথের 'আনমনা'—'নিদ্রা-নীরব রাত্রে অন্ধকার শালের বনে ঝিঁঝির ডাকের মত সুরবাঁধা সান্ত্বনাই হয়ত তার মগ্ন চোখকে জাগিয়ে তুলতে পারে: কারও বা' মনের বসন্ত ছায়া-আলোতে কালো তারার উপরে কেঁপে কেঁপে উঠছে: কারও চোখ কঠিন-গম্ভীর—অনেক পরীক্ষা দিয়ে তবে তার মনের দরজায় পৌঁছনো যাবে।

কথাগুলো যদি রোমান্টিক শুনিয়ে থাকে আমাকে ক্ষমা করবেন। এভাবে ছাড়া লীলা মিত্রকে আমি বোঝাতে পারতুম না। তার চোখেও একটা আলো ছিল—উপমা দিয়ে বলতে পারি, হীরের আলো। তা হীরের বাইরে জ্বলছে না; হীরের ভেতরেও নয়—ভেতরে বাইরে সবটাই জ্যোতির্ময় হয়ে আছে। যে সহজ, উজ্জ্বল, তাকে বুঝতে, তাকে চিনতে এক মিনিটও দেরী হয় না।

একটা উদাহরণ দিই। খুব বৃষ্টি নেমেছে একদিন। ছুটির পরে আমরা অনেকেই আটকে পড়েছি, কারণ সামনের পার্কটার ভেতর দিয়ে সর্টকাট করলেও ট্রাম লাইন পর্যন্ত পৌঁছতেই ভিজিয়ে একেবারে ভূত করে দেবে।

ছাতা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছিল লীলা মিত্র। একটি ছেলে ফস করে বলে ফেলল, 'ইস্, ছাতার তলায় যদি এগিয়ে দিত ট্রাম পর্যন্ত।'

তখুনি ফিরে দাঁড়াল লীলা। বললে, 'আসুন।'

ছেলেটা অপ্রস্তুতের একশেষ। জিভ কেটে বললে, 'কিছু মনে করবেন না—ঠাট্টা করেছিলুম।'

'ঠাট্টা কেন হবে? আসুন না—এগিয়ে দিই।'

'না-না, ছোট ছাতা আপনার, দুজনেই ভিজব।'

'আধখানা করে ভিজব। একা যেতে গেলে আপনি সবটাই ভিজবেন। আসুন—'

লীলার চোখে সেই সহজ, উজ্জ্বল—সেই হীরের আলোটা জ্বলছিল। বাধ্য হয়ে এগোল ছেলেটা। কোন বাঙালী পাঁটাকেও অমন অনিচ্ছার সঙ্গে হাড়িকাঠের দিকে এগোতে দেখিনি।

আমরা দূরে দাঁড়িয়ে ওর দুর্গতি দেখছিলুম। বেচারার ট্র্যাজেডি ওখানেই শেষ নয়। ওইটুকু লেডীজ ছাতার তলায় সে যত স্পর্শ বাঁচাতে চেষ্টা করে—লীলা তত বেশী রক্ষা করতে চায় তাকে। শেষ পর্যন্ত আর পারল না—অর্ধেকটা যেতে-না-যেতেই টেনে দৌড় লাগাল, এক লাফে উঠে পড়ল একটা চলন্ত ট্রামে।

এই রকম কোন মেয়ে কি আমাদের মনে কোন রোমান্স সৃষ্টি করতে পারে? এত স্পষ্ট এত সহজ? বোধ হয় না। এমন একটি মেয়েকে আমরা পেতে চাই যে পাতায়-ঢাকা ফুলের মত এক-একটি করে পাতা সরিয়ে যাকে দিনের পর দিন আবিষ্কার করতে হয়। সেই একটু-একটু করে জানার আকুলতাই প্রেম, সেই তিলে তিলে অবগুণ্ঠন সরানোই রোমান্স। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই যাকে চেনা হয়ে গেল, সে অন্তরঙ্গা হতে পারে, অন্তরতমা হয় না।

আজ বুঝতে পারি, লীলা মিত্র সম্পর্কেও এইটিই আমরা অবচেতনভাবে অনুভব করেছিলুম। আমরা জানতুম, ও আশ্চর্য। ওর জন্যে আসবে আলাদা পুরুষ—একটি চরিত্র, একটি ব্যক্তিত্ব। আবরণ মোচন করবার ধৈর্য যার নেই—সে এসেই হাত বাড়িয়ে ওকে জয় করে নেবে।

ছবির চিত্তে অর্ঘ্য সাজাবে না—সংগে সংগে দাবি জানাবে।

লীলাকে একটু বিশেষভাবেই জানতুম আমি। জানবার কারণও ছিল।

একদিন আবিষ্কার করলুম, আমাদের স্টপ থেকেই ও ট্রামে উঠছে। আরও আবিষ্কার করলুম, পাড়ায় যে বিরাট একটা চারতলা নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি উঠেছে, তারই একটা ফ্ল্যাটে ভাড়াটে হয়ে এসেছে ওরা।

একসংগেই প্রায় কলেজে আসি—একই ট্রামে প্রায়ই ফিরতে হয়। ট্রামেই আলাপ হল।

অফিস-ফেরত ভিড়, লেডীজ সীটে বসবার জায়গা পেয়েছে লীলা—আমি রড ধরে দাঁড়িয়ে আছি কাছাকাছিই। এমন সময় লীলার পাশের মেয়েটি নেমে গেল। স্পষ্ট, পরিষ্কার গলায় লীলা আমাকে বললে, 'আসুন, বসুন না এখানে।'

আমি বসে পড়লুম। ছাতার তলা থেকে পালানো সেই দুর্বলচিত্ত ছেলেটার মত আমি নই। আমি জানতুম, লীলা এত সহজ—এত স্পষ্ট যে, ওর সম্পর্কে কোন দ্বিধার প্রশ্ন কোথাও নেই। ও যত সাধারণ, ততই অসাধারণ, যত কাছে, তত দুর্লভ। তাই ওর পাশে বসে স্বচ্ছন্দে গল্প করতে পারি—তাতে আমারও ভয় নেই, ওরও ভাবনা নেই।

লীলা বললে, 'আপনাদের পাড়ায় এসেছি—জানেন তো?'

'জানি। উনিশ নম্বরের একটা ফ্ল্যাটে আছেন।'

'তেতলায় উঠে ডানদিকের ফ্ল্যাটটা। আসুন না একদিন। আমারও স্বার্থ আছে।'

'কী স্বার্থ বলুন?'

'আপনি ইংরেজী অনার্সের ছাত্র। আমার আবার ইংরেজীকে দারুণ ভয়। ডি-কুইনসি একদম বুঝতে পারি না। দেবেন একটু পড়িয়ে?'

এইভাবে আলাপ। তারপরে ওদের বাড়িতেও আসা-যাওয়া চলল। লীলার বাবা ছিলেন না। দাদা একটা ভাল মোটা মাইনের চাকরি করতেন রাইটার্স বিল্ডিংএ—স্বল্পভাষী মানুষ অবসর সময়ে বসে বিলিতী পত্রিকার ক্রশ-ওয়ার্ড নিয়ে মাথা ঘামাতেন। মা ছিলেন কোন্ এক জমিদারবাড়ির মেয়ে—বাপের বাড়িতে হাতি ছিল, তার গল্প করতেন; ওর বৌদি ক্লাসিকাল গান গাইতেন, অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারতুম ও বস্তু তাঁর কোনদিন হবার নয়। ফার্স্ট-ইয়ারে-পড়া লীলার ছোট ভাই, ডন ব্র্যাডম্যান হওয়ার স্বপ্ন দেখত আর লীলার প্রকাণ্ড মোটা দিদি মধ্যে মধ্যে মুখ ভর্তি পান চিবোতে চিবোতে শ্বশুর বাড়ি থেকে একটা বড় মোটরে চেপে চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বেড়াতে আসতেন।

এইটে বুঝেছিলুম, পরিবারটা একটু দাম্ভিক, একটু স্বতন্ত্র। ওর মা এসে গল্প করতেন বটে, কিন্তু প্রত্যেক কথার ভেতরে বাপের বাড়ির হাতিটা এসে উঁকি মারত। বাকী সবাই স্বল্পভাষী, সবাই আত্ম-কেন্দ্রিক। লীলার বউদির সংগে অবশ্য আমার কথাবার্তার সুযোগ হয়নি।

আপনি বোধ হয় বিরক্ত হচ্ছেন।

দেখতুম, হীরের আলোর ওপর আর-একটা কিসের আভা পড়েছে

ভাবছেন, 'তিলংগমা' দিয়ে আরম্ভ করে আমি এ কোন্ শিবের গীতে এসে পৌঁছেছি! কিন্তু এই পরিবারের যে একটা চাপা অহমিকা—একটা স্বাতন্ত্র্য-বোধ লীলা সেইটেকেই নিজের মধ্যে আশ্চর্য সহজ অথচ অদ্ভুত সুন্দরতায় রূপায়িত করেছিল। এদের মনে আভি-জাত্যের যে অঙ্গার ধিকি ধিকি করছে, সেইটেই জ্বলতে জ্বলতে লীলার ক্ষেত্রে হীরে হয়ে উঠেছিল।

ডি-কুইন্সি পড়েছি, নিও রোমান্টিক কবিদের নিয়ে আলোচনা করেছি, ব্যাখ্যা করেছি ম্যাথিউ আর্নল্ড, শেক্সপীঅরের সূত্র ধরে জার্মান স্কলারদের কাছাকাছি পৌঁছেছি। ভালই লাগত। নিজেরও পড়াশোনা হত। লেখাপড়ায় লীলা যতই সাধারণ হক, সেই অসাধারণ মেয়ের কাছে আমি অন্তত সাধারণ হতে পারতুম না। আত্মমর্যাদায় বাধত।

বন্ধুরা আমাদের অন্তরংগতার খবর জানত। কিন্তু এ নিয়ে কেউ একটা হাল্কা ঠাট্টাও কোনদিন করেনি। আমরা পরস্পরকে 'তুমি' বলতুম। তবুও এ-কথা কারও মনে হয়নি— একান্ত সহজ পরিচয় ছাড়া আমাদের মধ্যে আর-কোন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে।

শেষ পর্যন্ত সেই অসাধারণ এল। সোমেন দে চৌধুরী। এই 'তিলংগমা'র কবি।

কী বললেন? এই রকম অদ্ভুত কবিতা লিখে সে লীলা মিত্রের মন জয় করেছিল? না—না। সোমেন দে চৌধুরী তখন কবিতা লিখত না। কবিতা সে পড়ত বলেও মনে হয় না। যুদ্ধের তখন প্রথম মুখ—সে এয়ারফোর্সে চাকরি নিয়েছিল।

লীলাদের বাড়িতেই আলাপ। লম্বা, স্বাস্থ্যবান, ব্রাইট। দূরসম্পর্কের কী আত্মীয়তার সূত্রে আসা-যাওয়া করত ওদের ওখানে। আর-এ-এফ-এর গল্প করত সোমেন। বলত, ওদের অভিজ্ঞতার কথা।

মালয়ের যুদ্ধ তখনও আরম্ভ হয়নি। কলকাতার আলো তখনও ব্ল্যাক আউটের ঠোঙা পরেনি। ওদের তখন ট্রেনিং আর মহলা। সোমেন এমনভাবে তারই গল্প জমিয়ে বলতে থাকত যে শুনে রোমাঞ্চ হত।

আর সেই গল্প শুনতে শুনতে লীলার দিকে দৃষ্টি পড়ত আমার। দেখতুম, হীরের আলোর ওপর আর-একটা কিসের আভা পড়েছে।

বলত, 'ভয় করে না সোমেনবাবু?'

'কিসের ভয়?'

প্যারাস্যুট জাম্পে বিপদের সম্ভাবনা [নেই]?'

[']থাকবে না কেন? কর্ড টানলুম—[প্যা]রাস্যুট হয়ত খুললই না। তার মানে [সো]জা পাঁচ সাত হাজার ফুট থেকে [মা]টিতে আছড়ে পড়া। কিংবা কখনও [আ]গেই খুলে গেল প্যারাস্যুট—ফেঁসে [গেল] ডানায় লেগে—বাস্, আর দেখতে [হবে] না!'

'এ ত মরণকে সঙ্গে নিয়ে চলা!'

'তবু ত এ ট্রেনিং! এর পরে আছে [অ্যা]কচুয়াল অপারেশন। এনিমি এরিয়ায় [যে]তে হবে বোমা ফেলতে। অভ্যর্থনা করবে [অ্যা]ক্ অ্যাক্ ব্যাটারি। ফাইটার প্লেন [তা]ড়া করবে মেশিন গান নিয়ে। তখন [জ্ব]লন্ত প্লেন নিয়ে আকাশ থেকে হেডলং [ডা]ইভ—অ্যান্ড অফ্ এ মিটিওর!'

লীলা কথা বলতে পারত না। মুগ্ধ [হ]য়ে তাকিয়ে থাকত সোমেনের দিকে—[শ]রীরের উপর আর-একটা কিসের ছায়া [কাঁ]পত। আমি বুঝেছিলুম। ও ছায়া [ভা]লবাসার।

ডি-কুইন্সি ছেড়ে লীলা সিনেমায় [যে]তে আরম্ভ করল। সোমেন কলকাতায় [থাক]লে ওর কলেজে আসা বন্ধ হয়ে যেত। [রো]লকল করতে করতে অধ্যাপক হঠাৎ [চো]খ তুলে তাকিয়ে দেখতেন সেন্টেন্টি [লা]ইভ যথাস্থানে আছে কিনা; অনুপস্থিত [মে]য়েদের রোলে সাড়া দিয়ে যে-সব ছেলে [অ]শিভালরির পুলক অনুভব করে, তারাও ওর প্রক্সি দিতে সাহস পেত না।

আমি একদিন জিজ্ঞেস করলুম, [']তোমার মতলব কী? পরীক্ষা দেবে না?'

[']না।'—পরিষ্কার জবাব দিলে লীলা।

'কী করবে তবে?'

'বিয়ে করব।'

'সোমেন দে চৌধুরীকে?'

'নিশ্চয়। নইলে তোমাকে নাকি?'—লীলা হেসে উঠল : 'তা হলে বিয়ের রাত্রেও তুমি আমাকে ডি-কুইন্সি পড়াতে চেষ্টা করবে।'

আমিও হেসে বললুম, 'এক পাতা ইংরেজী লিখতে যার পাঁচটা গ্রামার আর স্পেলিঙের ভুল হয়—তার মত 'বাজে ছাত্রী'কে বিয়ে করতে আমার বয়ে গেছে।' লীলা ভ্রূকুটি করে বললে, 'আচ্ছা দেখব, কোন্ লেডী নেসফিল্ড তোমার বরাতে এসে জোটে।'

'দেখো। কিন্তু বিয়েটা কবে হচ্ছে?'

'হবে—হবে এত ব্যস্ত কেন? ভোজের জন্যে এখুনি ছটফটিয়ে উঠছ বুঝি? কোয়াতের ছেলে হয়ে তুমি যে বামুনের নোলাকেও ছাড়িয়ে উঠলে।'

বেশী দিন দেরী করতে হল না। আরও মাস কয়েকবাদে অসাধারণ লীলা মিত্রের সঙ্গে অসাধারণ সোমেন দে চৌধুরীর বিয়ে হয়ে গেল। তারপর বছর চারেক আর খবর জানি না। এম এ পড়তে পড়তে একটা নিউজ এজেন্সির চাকরি নিয়ে লাহোরে চলে যাই। সেখান থেকে যখন কলকাতার এই কাগজটায় এসে যোগ দিলুম, তখন লীলা দে চৌধুরী মন থেকে কোথায় মিলিয়ে গেছে। বার্মা মণিপুরের বনে জঙ্গলে লড়াই চলছে পুরোদমে—বোমার ভয়ে অন্ধকার কলকাতা প্রায় জনশূন্য। [অক্ষ]শক্তির অবিমিশ্র মিথ্যে প্রোপাগান্ডা সত্ত্বেও বেশ বোঝা যাচ্ছে বাংলা দেশের অবস্থা খুব আশ্বাস পাওয়ার মত নয়। ওদিকে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের গর্জন উঠছে রেডিয়োতে। সারা ভারতবর্ষের স্নায়ু থরথর করে কাঁপছে—তখন কোথায় লীলা, কোথায় কে?

একদিন ওর দাদার সঙ্গে ট্রামে দেখা হয়েছিল।

'ভাল আছেন?'

'ভাল আছি।'

লীলার কথাটা জিজ্ঞেস করব কিনা ভাবতে ভাবতে দেখলুম, আমার টার্মিনাস এসে গেছে। নেমে পড়তে হল। আর তখুনি শুনলুম পাশের পানের দোকানের রেডিয়োতে উইনস্টন চার্চিলের বক্তৃতার 'রিলে' চলছে। 'দরকার হলে আমরা ইংলিশ চ্যানেলের জলে নেমে যুদ্ধ করব, তবু নাৎসীদের কোনও শর্ত গ্রহণ করব না।'

আর আমার মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক বোমার উড়ে গেল—খুব সম্ভব ফ্রন্টের দিকে। লীলার কথা ভাববার মত সময় কোথায় তখন?

আরও অনেক জল গড়িয়ে গেল তারপর। আরও আট বছর। যুদ্ধ শেষ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা, পাকিস্তান, রিফিউজিকমিশন। আবার একদিন লীলার দাদার সঙ্গে দেখা ডালহাউসি স্কোয়ারে।

'এই যে, চিনতে পারেন?'—ভদ্রলোক নিজেই আমাকে সম্ভাষণ করলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনেক বদলে গেছেন লীলার দাদা। মাথার আধখানা জুড়ে টাক পড়েছে, রগের দু ধারে চিক চিক করছে দু গোছা সাদা চুল। চোখের দৃষ্টি ক্লান্ত আবার কোমল, সেই চাপা অহমিকার দীপ্তিটা নিবে গেছে। বোঝা যায় এর মধ্যে অনেক পোড় খেয়েছেন, জীবনের দায় অনেক বেশী চেপে বসেছে, আরও দশজন সাধারণ চাকুরে বাঙালীর সঙ্গে তাঁর আর-কোনও পার্থক্য অবশিষ্ট নেই।

বলা দরকার, আমি যখন লাহোরে, তখনই বাবা উত্তর ছেড়ে দক্ষিণ কলকাতায় এসে বাসা নিয়েছিলেন।

বললুম, 'চিনতে পারব না কেন? তা ভাল আছেন?'

ভদ্রলোক একটা আধপোড়া চুরুট বের করে ধরালেন। বললেন, 'ভাল আর কী করে থাকা যাবে মশাই—যা দিনকাল।'

ওই সর্বজনীন ক্ষোভের জেরটা আমি আর টানলুম না। প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করলুম, 'এখনও এই শ্যামবাজার অঞ্চলেই আছেন?'

'হ্যাঁ, সেই ফ্ল্যাটেই। ভাড়া অবশ্য অনেক বাড়িয়েছে। এই বাড়িওলাগুলো যা হয়েছে, বুঝলেন—'

আবার সেই মধ্যবিত্ত অসন্তোষের গুঞ্জন। আমি সংক্ষেপে থামিয়ে দিয়ে বললুম, 'তা বটে। ভাল কথা, লীলার খবর কী? কেমন আছে? কোথায় আছে সে?'

লীলার দাদার মুখে ছায়া পড়ল।

'আপনি জানেন না? খুব স্যাড্ ব্যাপার—বুঝলেন!'

আমার বুকের ভিতর ধক্ করে উঠল। লীলা কি মারা গেছে?

ভদ্রলোক বোধ হয় আমার মনের চেহারাটা দেখতে পেলেন। বললেন, লীলা এখন কলকাতাতেই আছে—আমাদেরই ওই বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটে থাকে। কিন্তু জীবনটা ওর একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।'

জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে? আমি আবার চমকে উঠলাম। আর একটা সম্ভাবনা তৎক্ষণাৎ দেখা দিল সামনে। আর এ এফ-এ যোগ দিয়েছিল সোমেন দে চৌধুরী। তা হলে কি একদিন কৌতুকের ছলে যে-কথা বলেছিল, সেইটেই সত্য হয়েছে শেষ পর্যন্ত? জ্বলন্ত বিমান নিয়ে সে মিলিয়ে গেছে আরাকানের কোন দুর্গম জঙ্গলে, কিংবা বে অব বেঙ্গলের হাঙর-ভরা কালো জলে? দি এন্ড অফ এ মিটিওর?

'সোমেন পাগল হয়ে গেছে।'

'পাগল!'

লীলার মৃত্যু নয়—সোমেনের মৃত্যু নয়—তারও চাইতে বড়, তারও চাইতে অনেক ভয়ংকর আঘাত। লীলা মিত্রের এমন পরিণাম—অসাধারণ, আশ্চর্য লীলা মিত্রের এই ইতিহাস সেদিন কলেজের দু হাজার ছেলেমেয়ের একজনও কি কল্পনা করতে পারত? ভাবতে পারতেন কোন অধ্যাপক—রোল কল করতে করতে যাঁর চোখ নিজের অজ্ঞাতেই একটি বিশেষ জায়গায় ঘুরে আসত একবার?

'আর বলেন কেন—স্রেফ্ উন্মাদ। পারেন ত একবার যাবেন, আপনাদের দেখলে তবু মেয়েটা একটুখানি সান্ত্বনা পাবে। আপনাকে ত ও খুব শ্রদ্ধা করত!'

সুমনের বাসটার দিকে দ্রুত এগোতে

এগোতে বললেন, 'আচ্ছা—নমস্কার।' কিন্তু আমি আর নড়তে পারলুম না।' প্রায় পনেরো মিনিট ধরে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম ওখানে।

ভেবেছিলুম যাব না, লীলার মত মেয়ের এত বড় দুর্ভাগ্যের চেহারাটা কোন মতেই আমি সইতে পারব না। তবু যেতে হল। একটা কঠিন টান পড়েছিল বুকের নাড়ীতে।

আমাকে দেখে লীলা হাসতে চেষ্টা করল। বললে, 'এস কমল। এক যুগ পরে দেখা হল তোমার সঙ্গে।'

লীলার চোখের দিকে তাকালুম। সেই হীরে দুটোর উপরে যেন ধুলোর স্তর জমেছে—যে আলো না বাইরে না ভেতরে সেই অপরূপ জ্যোতির্ময়তার উপরে নেমে এসেছে একটা অস্বচ্ছ আবরণ। আর ওরও সিঁথির একটা পাকা চুল রুপোর তারের মত চিক চিক করে জ্বলছে।

জোর করে বললাম, 'ভাল আছ লীলা?'

'খুব ভাল আছি।'

ঠাট্টা করছে? নিজের তিক্ততাকে বোঝাতে চাইছে 'খুব ভাল'র উপর জোর দিয়ে? কিন্তু তা ত নয়। স্পষ্ট, স্বাভাবিক ভাষায় বলছে—চমৎকার আছে সে।

'বোস, চা আনি।' ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে লীলা একবার থমকে দাঁড়াল: "ওর সঙ্গে তোমাকে দেখা করিয়ে দেবার উপায় নেই, উনি আজকাল নিজের সাধনা নিয়েই রাতদিন থাকেন, কারও সঙ্গে কথা বলেন না। তুমি কিছু মনে কোর না।'

লীলার দাদার কথা কানে বেজে উঠল। সোমেন পাগল হয়ে গেছে। অথচ লীলা ত সে-কথা বলল না! সোমেন সাধনা করছে—বরং এই কথাটা বলতে একটা চাপা গর্বের আলোয় মুখ ভরে উঠল তার।

আমি কী জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলুম, তার আগেই লীলা চা আনতে গেল।

তারপর সব কথা শুনলুম চা খেতে খেতে।

যুদ্ধ থামবার পর স্বাধীন-ভারতে সোমেন পোস্টেড হয়েছিল ব্যাঙ্গালোরে। সেখানেই ক্রমশ তার ভাবান্তর ঘটতে থাকে। রাতদিন চুপচাপ বসে থাকে, কাজ-কর্ম করে না, আর কেবল বলে, 'ঈস—রবীন্দ্রনাথ মারা গেলেন! তা হলে আর ভারতবর্ষের রইল কী!'

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে—না, ঠিক আমার মুখের দিকে নয়—আমাকে পার হয়ে লীলার চোখ সুদূরের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেল: 'ওরা ওঁকে ছাড়িয়ে দিলে। বললে, মেণ্টাল ডিরেঞ্জমেণ্ট্‌। বুঝলনা—উনি একটা নতুন জগতে চলে এসেছেন। ও'র অসামান্য শক্তি একটা নতুন মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে।'

লীলা বলে চলল, 'আমরা কলকাতায় এলুম। আর যেদিনই এলুম—সেইদিনই উনি চলে গেলেন নিমতলার শ্মশানঘাটে। যেখানে রবীন্দ্রনাথকে দাহ করা হয়েছিল, এক মুঠো মাটি তুলে আনলেন সেখান থেকে। তারপর থেকে রোজ ভোরে সেই মাটির একটা ফোঁটা কপালে পরে উনি কবিতা লিখতে বসেন। সকাল পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত কবিতা লিখে চলেন। অদ্ভুত অসাধারণ সে কবিতা। পৃথিবীর কোন দেশের কোন কবি সে-রকম কবিতা কখনও লিখতে পারেননি। দেখবে দু-একটা?'

লীলা উঠে গেল, ফিরে এল চমৎকার নীল কাগজে মুক্তোর মত হরফে লেখা কতগুলো কবিতা নিয়ে। সে কবিতা-গুলো কী রকম, আশা করি, তা আপনাকে আর বলবার দরকার নেই। 'তিলত্তমা'র পাতা খুলেই বোধ হয় আপনি তার কিছু পরিচয় পেয়েছেন।

আমার চা জুড়িয়ে জল হয়ে গিয়েছিল। আমি স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলুম কাগজগুলোর দিকে।

লীলা বললে, 'জানো—বড় প্রতিভাকে কেউ বুঝতে পারে না, তাকে তুচ্ছ করে—তাকে অপমান করে। সেইটেই হল মূর্খের সান্ত্বনা—তার আত্মতৃপ্তি। দাদা বলে, ওর মাথা খারাপ; বউদি বললে, রাঁচীতে পাঠানোর কথা; মা কাঁদেন, বলেন, লীলার সর্বনাশ হয়ে গেল! কিন্তু আমি কেমন করে ওদের বোঝাব ও'র এই আশ্চর্য সৃষ্টি একদিন পৃথিবীতে হয়ত যুগান্তর আনবে—হয়ত নোবেল-প্রাইজের মত সম্মান ও'রও জন্যে অপেক্ষা করে আছে।'

আমার চা জুড়িয়ে জল হয়ে গিয়েছিল। আমি শুধু ভাবছিলুম, অসাধারণ লীলা মিত্র কিছুতেই হার মানবে না: যে অসামান্য পুরুষকে সে জীবনে বেছে নিয়েছিল, এক-বিন্দু ক্ষুন্ন হতে দেবে না তার মহিমা।

লীলা বললে, 'দাদা বলে, পাগলই যদি না হবে—তবে কেন অমন ছাইপাঁশ লেখে—যার মাথামুণ্ড বোঝা যায় না? আমি বলি, এ তোমার ক্রসওয়ার্ড পাজল নয় যে 'মুড' আর 'হুডের' সমাধান করতে পারলেই হল। বউদি আরও ঘ্রাণ্টলি বলে, মাথা খারাপ না হলে তোমার গায়ে কেন হাত তোলে? আমি জবাব দিই, লেখার ধ্যানে ও যখন ডুবে থাকে তখন আমি গিয়ে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ওকে বিরক্ত করি—ওর চিন্তার সুতো কেটে যায়—মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। যারা সত্যি-কারের শিল্পী, তারা এমন করে সংসারের হিসেব মেনে চলে না।'

এইবার আমার চোখে পড়ল। লীলার গলার কাছে একটা বন্যজন্তুর আঁচড়ের মত কতকগুলো নখের দাগ শুকিয়ে আছে। ওটা যে কিসের তা আর জিজ্ঞেস করবার দরকার ছিল না।

'তুমিই বল কমল। সাহিত্যের ভাল ছাত্র তুমি, শুনেছি লেখক হিসেবেও তোমার খুব নাম হয়েছে এখন। এগুলো কি সত্যিই পাগলের প্রলাপ? এগুলো কি সেই রকমের কবিতা নয়—যা সব ভাষা, ছন্দ, সংস্কারকে ছাপিয়ে নিজের ইতিহাস তৈরি করতে চলেছে?'

আমি দেখলুম, দুটো হীরের উপর সেই অস্বচ্ছ আবরণটা কাঁপছে। যে আলো না-বাইরে, না-ভিতরে, স্থির জ্যোতির্ময়তার মহিমায় যা এতদিন সমুজ্জ্বল হয়ে থাকত—এখন মনে হল, সেটা একটা প্রদীপের ম্লান শিখায় পরিণত হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে—এই মুহূর্তে আমিই ওটাকে নিবিয়ে দিতে পারি।

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, 'তুমি ঠিকই বুঝেছ লীলা। তোমার পরের কথাটাই সত্যি।'

দেখলুম, অনেক বছর আগেকার হীরক-দীপ্তি আবার ঝকমক করে উঠল। লীলার গলায় নখের হিংস্র আঁচড়গুলোকে একটা দুর্মূল্য গজমোতির হারের মত মনে হল এখন।

লীলা বললে, 'আমি ওর একটা পাণ্ডুলিপি ছাপব কমল। তোমাকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে।'

একবারের জন্যে আমি দ্বিধা করলাম। তারপর লীলার চোখ থেকে দৃষ্টি নামিয়ে বললুম, 'সে ত খুব ভাল কথা। আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব।'

সাংবাদিক-বন্ধু চুরুটটাকে অ্যাশ-ট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললেন, "এই সেই কাব্য—'তিলত্তমা'। আপনি ভাববেন না—এ সমালোচনা ছাপা হবে না কোথাও। শুধু এর একটি কপি থাকবে লীলা দে চৌধুরীর কাছে। সোমেনের পরেই পৃথিবীতে আমাকে সে সব চাইতে বিশ্বাস করে—দুনিয়ার সবাই চিৎকার করে সোমেনকে পাগল বললেও অসাধারণ লীলা জানবে, সোমেনের এই অসামান্য কবিতা একদিন বিশ্বসাহিত্যে বিপ্লব আনবে।"

একটু হেসে বন্ধু আবার জুড়ে দিলেন: "আর কে বলতে পারে, ভবিষ্যতের সমালোচক এই কবিতার মধ্যেই আরও বড় বোদলেয়ার, আরও বড় জেমস জয়েসের সন্ধান পাবেন কিনা!"

রাজভবনে নিমন্ত্রণ। পত্রের শিরোদেশে তারিখ রয়েছে ১লা অক্টোবর, ১৭৭৯। শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী হেস্টিংস তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দনসহ শ্রীযুক্ত অমুককে আগামী বৃহস্পতিবারের খানাপিনা ও গান-বাজনার অনুষ্ঠানে সবান্ধবে উপস্থিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। কিন্তু পত্রের পাদদেশে এক আশ্চর্য সাবধানবাণী। একমাত্র হুঁকো-বরদার ছাড়া শ্রীযুক্ত অমুকের সঙ্গে অন্য কোন ভৃত্য থাকা চলবে না। প্রশ্ন উঠবে, সবাইকে বরবাদ করে হুঁকোবরদারের প্রতি এমন ঢালাও দরদ কেন? প্রশ্ন করব, ব্যাপারটা কি খুব ধোঁয়াটে লাগছে? আসলে ধুমধামের ব্যাপারে ধূমপানের ঘনঘটা ঘটানোই যে ছিল সেকালের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের ধরন।

ইংরেজ উপনিবেশের আদিযুগের যে-কোন ভ্রমণ-কাহিনী কিংবা স্মৃতিকথার নীরস তথ্যের তেপান্তরে এগোতে এগোতে যখন ক্লান্ত ও শিথিল হয়ে পড়েছে আপনার দৃষ্টিচারণ, তখন হঠাৎ বহুবিশেষণভূষিত এমন একটি বস্তুবিশেষের বর্ণনা আপনার চোখে পড়বে, যাকে হুঁকো বলে মেনে নিতে আপনার কিঞ্চিৎ বিস্মিত বা বিচলিত হওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়। আপনার ম্লান দৃষ্টি উস্কে-দেওয়া প্রদীপের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে সেখানটায়। আপনি পড়ে যাবেন—"নিঃসন্দেহে হুঁকোকে বলা চলে 'হৃদয়-সখা।' তা সে ক্লান্ত পথিক বা নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী যারই কাছে হক। হুঁকোই আমাদের সেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যার কাছে বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি জীবনের গোপন ঘটনাবলী। আবার হুঁকোই হল আমাদের জীবনে সেই রকম এক পরামর্শ-দাতা, যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যার মতামতে আস্থা রাখা যায়। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে বা সংসারে সে হল সামগ্রী হিসেবে সুশ্রী ও সুরুচিকর। আবার দেখুন, জনসমাবেশে বা উৎসবে আনন্দ-দানের উৎস হিসেবে তার সহযোগিতা কেমন সুস্বাদু। হুঁকোর মৃদু-মধুর গুঞ্জন নাইটিঙ্গলের কূজনকে লজ্জা দেয়। গোলাপের গালে লজ্জার আভা ফোটায় তার সুবাসের ছটা। তাকে যখন নিশ্বাসে গ্রহণ এবং প্রশ্বাসে বর্জন করছি, তখন বারে বারে মনে হয়—জীবন সুধাপান করে চলেছে।"

বিজিত দেশের নিষ্কাষিত তরবারি আর পরিপূর্ণ কোষাগারের উপর আধিপত্য বিস্তার করে প্রবল ইংরেজ যেদিন এদেশে গদিয়ান হয়ে বসল, সেদিন তার চোখের মধ্যে ছিল সাম্রাজ্যবিস্তারের সুদূরব্যাপী স্বপ্ন, আর চোখের সামনে ছিল আরাম উপভোগের অতুল ঐশ্বর্যরাশি। অধিকৃত রাজ্যের উপরতলায় জীবন উপভোগের যে-সব বৈচিত্র্যে-ভরা বিলাস-ব্যবস্থা সেকালে স্বগর্বে ও স্বমহিমায় প্রচলিত ছিল, সেদিকে তাকিয়ে অধোবদন লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠত ইংরেজ সমাজের লাল মুখ। বক্ষদেশে এক গভীর অসমকক্ষতার জ্বালা নিয়েই তারা ভাবত, যদি না রাজা-মহারাজা, আমীর-ওমরাহের চালে দিন কাটানো যায়, তা হলে জীবন তুচ্ছ, দেশাধিকারে ধিক।

ফলে বেশ দ্রুতগতিতেই ইংরেজদের চোখ পড়ল বঙ্গের গৃহস্থ-সংসারের চন্দ্রপুলি আর নারকেল-নাড়ুর দিকে। বাঙালীর পান-সুপারিতে রাঙা হল তাদের ওষ্ঠাধর। লেবুর রসের মিশেল দেওয়া শীতল শরবত জুড়িয়ে দিল তাদের গ্রীষ্মের দাহ। তাদের অন্তরকে আকৃষ্ট করল বাঙালীর কালী-পুজো আর কীর্তন। তাদের কর্মহীন ক্লান্তিকর অবসরকে মুখরিত করল বাঙালীর টপ্পা-ঠুংরী, খেউড়-খেমটা। অবশেষে তাদের অন্তঃপুরে এল বাঙালীর হুঁকো। হুজুরের হুকুমে হুঁকোবরদার হুঁকোর কপালে রাজটীকা দিলে। হুঁকো মুখে দিয়ে ইংরেজরা 'হঠাৎ-নবাব' হয়ে উঠল। আসলে কিন্তু ইংরেজ হঠাৎ-নবাবেরা যেটা ব্যবহার করতেন, সেটা ঠিক হুঁকো নয়। সেটা সোনা-বাঁধানো আলবোলা কিংবা রুপোয় গড়া গড়গড়া। ইংরেজদের নানা মুখে ঘুরতে ঘুরতে সেকালে তৈরী হয়েছিল হুঁকোর নামের নামাবলী। কেউ তাকে বলেছে Cream can, কেউ ডেকেছে aillon, কারও মুখে Hubble-bubble। কারো গলায় goodgudi, অনেকের ভাল লেগেছে Kalyan অপরের সোহাগ marghiles-এ। কিন্তু সবাই সেই একের উপাসনা। রাম-রহিমের মত অভিন্ন।

হুঁকো বলতে আজকে যে বস্তুটিকে আমরা চিনতে পারি, সেটা সেকালে ব্যবহার করত পাল্কী-বেয়ারারা। আলবোলা বা গড়গড়ার অঙ্গে হুঁকো ছিল একটা বিশিষ্ট অনুষঙ্গের মত। সে আছে কেন্দ্রে। তার চারপাশে চাপরাশ-আঁটা নানাবিধ সাজ-সরঞ্জামের খবরদারি চলেছে। দেখা গেল পায়ের তলায় ইয়া লম্বা এক দশহাতী নল যেন রাজ-দরবারে করুণাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। তুলে দেখুন, একেবারে দিব্যকান্তি রাজপুরুষ। গায়ে জরীর পোশাক জড়ানো। আবার হুঁকোর মাথায় যে কলকে, সেদিকে তাকান। তার বুকের ভিতরে আগুন। মাথায় রাজমুকুট। সেই মুকুট বা ঢাকনি থেকে ঝুলছে রুপোর ঝালর। উড়ছে মধুর খোসবাই। উড়বেই ত। গড়গড়ার জলে যে গোলাপজল মেশানো। গন্ধটা শুধু গোলাপজলেরই বা কেন? তামাক তৈরির মধ্যে কারিকুরি নেই কিছু? তাই যদি না থাকবে, তা হলে কোথায়

বোম্বাই, কোথায় বুন্দেলখণ্ড, সেখানে লোক-লস্কর, পাইক-পেয়াদা পাঠিয়ে তামাক আনানোর এত হাঙ্গামা কেন?

ইংরেজ-পরিবারে ধূমপানের প্রথম পর্ব শুরু হত প্রাতঃকালে। ক্ষৌরকার চুল, নখ, দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে, কানের ময়লা তুলে দিয়ে যাওয়ার পর। অতঃপর প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে সাহেব ঢুকতেন ভোজনাগারে। ভৃত্য এসে চুল আঁচড়ে দিত। আর হুঁকো-বরদার পাশ থেকে বাড়িয়ে দিত দশহাতী নলটা। স্বদেশে সাহেবরা এই সময়টা খবরের কাগজ পড়ে কাটাতেন। কলকাতায় কাটত ধূমপানে। খবরের কাগজের চেয়ে ধূমপানটাই যে অধিকতর আকর্ষণের, সেটা প্রকাশ করতে গিয়ে কোন কোন সাহেব খবরের কাগজের উপর তীক্ষ্ম কটাক্ষ করেছেন।

প্রাতরাশের পরে আর-একবার হুঁকোবরদারদের মধ্যে 'সাজ-সাজ' রব পড়ে যেত, সেটা দ্বিপ্রহরের আহারের পর। আহারের পর ধূমপান করাটা এদেশীয় রীতি। সাহেবরা সেটা গ্রহণ করেছিল। অতিথি-অভ্যাগত কেউ এলে সাহেবরাও তাঁদের নিজস্ব হুঁকোটা এগিয়ে দিত। এটা অতিথির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। তবে এক নলে দুজনের ধূমপান করা চলত না। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা নল। ইংরেজীতে যাকে বলা হত Snake। উৎসবাদি উপলক্ষে ধূমপানের এই আড়ম্বর বৃদ্ধি পেত দ্বিগুণতর। প্রত্যেক নিমন্ত্রিত অতিথিই তাঁদের সঙ্গে নিজস্ব হুঁকোবরদার নিয়ে উৎসবে বা ডিনার পার্টিতে আসতেন। আহারের পর লেডিরা কক্ষান্তরে চলে গেলেই শুরু হত তাম্রকূট-পর্ব। দৃশ্যারম্ভেই দেখা যেত পাশের কামরা থেকে হলঘরে সারবন্দী ঢুকছে যে-যার প্রভুর অভিরুচি মাফিক সাজসজ্জায় ভূষিত হয়ে। ধূমপানের অব্যবহিত পূর্বে সমাগত জনমণ্ডলীর গায়ে গোলাপজলের সুবাস কিংবা কস্তুরী-মৃগের সৌরভ ছিটানো হত। তার কিছুক্ষণ পরেই সারাটা হলঘর প্রকম্পিত হয়ে উঠত হুঁকোর হুংকারে। ঝড়ের সঙ্গে মেঘনাদ আর মেঘনাদের সঙ্গে বজ্রপাতের আকাশ-মাটি-কাঁপানো গর্জন মিশলে যেমন হয়, অবিশ্রান্ত হট্টগোল, তুমুল অট্টহাসি, অসংলগ্ন চিৎকার একসঙ্গে মিলে তেমনি উন্মত্ত আবহাওয়া জেগে উঠত। আধ ঘণ্টারও বেশী সময় লাগত এই উন্মাদনার উত্তাপ জুড়োতে। তারপর শুরু হত স্বাভাবিক কথোপকথন, কুশল-বিনিময় ইত্যাদি। কথার দিকে কর্ণপাত করার অবস্থাটা ফিরে এলেও তখনও কথকের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করবার রফা-রফা। কেননা, সারা হলঘর তখন ঊর্ধ্ব-অধঃব্যাপী পুঞ্জীভূত ধোঁয়ার মণ্ডলীতে আচ্ছন্ন। এই উন্মাদনাময় পরিবেশে সবচেয়ে বিব্রত, বিপর্যস্ত হতে হত তাঁদের, যাঁরা নবাগত, অথবা ধূমপানে অনাসক্ত। তেমন সাহেবের সংখ্যাও সেখানে কম ছিল না। তাঁদের দরজায় ট্যাবলেট ঝুলত—No Hokka up-stairs। তেমনি আবার মেমসাহেবদের মধ্যেও হুঁকানু-রাগিনীর সংখ্যা বেড়ে চলেছিল ধীরে ধীরে। পার্সিয়ান তামাকের উগ্র ঝাঁঝালো ও মিঠে খোসবাই তাঁদের খাস-কামরা [illegible] হলঘরে টেনে নিয়ে আসত কখনও ক[illegible] কেউ সাহেবদের অলক্ষ্যে, কেউ-বা [illegible] সাহেবদের

প্রাচীন কোলকাতার হুঁকোবরদার

সঙ্গেই হুঁকো টানতে বসে যেত। অবশ্য এ-রীতি খুব বেশী সংক্রামিত হবার মত সমাদর পায়নি। হুঁকো নিয়ে মাতামাতি যত, হাতাহাতিও তেমনি। এজাতীয় হাতা-হাতির সূত্রপাত হত হুঁকোর নলকে নিয়ে। একের হুঁকোর নল অপরের ডিঙিয়ে যাওয়াটা সেকালে একটা নগণ্য ব্যাপার ছিল না। মস্ত বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য হত সেটা। সেই ক্ষমাহীন অসৌজন্যতার পরিণামে "A duel was inevitable."

"গুড ওল্ড ডেজ অব অনারেবল জন কোম্পানি'র লেখক তাঁর সমসাময়িক যুগের বর্ণনায় বলেছেন, "মনে পড়ে সেই সময়ের কথা, যখন দু বেলা আহারের শেষে হুঁকোর প্রচলন শুরু হচ্ছে। এও দেখেছি খাবার টেবিলের এধারে ওধারে তিরিশটা করে হুঁকো সাজানো। হুঁকোবরদারেরা চিলম সাজত। লাল আগুন ঠিকরে বেরুত জ্বলন্ত গুলে থেকে। গৃহস্বামী প্রতিবেশীর সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন আর তিরিশ তিরিশ খানটা হুঁকোর গুড়ুক গুড়ুক শব্দের সে এক বিচিত্র না, বিচিত্র নয়—বেসুরো কর্কশ ধ্বনিতে ভরে উঠত সারা ঘর। যাই হক, একথা সত্যি যে, সেযুগের কোন ডিনারই হুঁকোর বহুল সমাবেশ ছাড়া 'বহুৎ আচ্ছা' হয়ে উঠতে পারেনি।"

১৮৪০ পর্যন্ত এই ট্রাডিশন সমানে চলেছে।

এযাবৎ যা বলা হল, তা শুধুই হুঁকোর উপাখ্যান। হুঁকো আবিষ্কারের উৎসে পৌঁছতে গেলে কয়েক শতক পিছনে ফেলে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে সপ্তদশ শতকের উত্তর-পারস্যে। কিংবদন্তী বলে, উত্তর-পারস্যের রাজা করিম খাঁ জেন্দই হলেন হুঁকোর আবিষ্কর্তা। কিন্তু ইতিহাস অনুমান মানে না। প্রমাণহীনতাই সেখানে প্রমাদ। ঐতিহাসিকেরা বলেন, প্রমাণ আছে বইকি। প্রাচীন বোম্বাইয়ে হুঁকোর যেদিন প্রথম আবির্ভাব ঘটে, সেদিন লোকে তাকে চিনত Cream Can নামে। এই Cream Can-ই কি Karim Khan-এর স্মৃতিবাহী নয়। এছাড়াও আরবীতে hugga নামের একটা শব্দ আছে। যার ইংরেজী প্রতিশব্দ হল 'কাসকেট'। কারও কারও মতে ঐ আরবী hugga-ই হল আধুনিক hukka-র ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ।

ভারতবর্ষে হুঁকোর আগে তামাকের প্রচলন ছিল। আকবরের রাজসভার দেখা গিয়েছে তামাক সেবনের **handsome pipe of Jewel work** রাজ-দরবারে তামাক আমদানির সে-কাহিনী সত্যি-মিথ্যের রঙে পালিশ-করা, কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক।

আসাদ বেগ কাজ্ঞানী আকবরের রাজ-দরবারের একজন কর্মচারী ও খ্যাতিমান কবি। এক সময় বিজাপুরে বেড়াতে গিয়ে তিনি একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে পরিচিত হন। তারা সদ্য ফিরেছে পবিত্র মক্কা নগরী থেকে। এবং তাদের মুখে তামাক খাওয়ার পাইপ। আসাদ বেগ কৌতূহলবশতই তাদের কাছ থেকে তামাক সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে ফেরার পথে প্রচুর তামাকপাতা কিনলেন তাদেরই কাছ থেকে। বিজাপুর থেকে কেনা অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যসম্ভারের সঙ্গে সেই তামাকপাতাও তিনি উপহার দিলেন সম্রাট আকবরকে। এবং পাতার সঙ্গে কারুকার্যখচিত পাইপও।

আকবর সেই তামাকে সবে কয়েকটা টান দিয়েছেন কি দেননি, রাজদরবারের চিৎকার। নবাব খান-ই-আজম্ আশ্বাস দিলেন, আপনি খেয়ে যান সম্রাট। পবিত্র আরব দেশে অবাধে তামাক সেবন করা

হয়ে থাকে।

বহাল দরবারের চিকিৎসকেরা। তাঁরা বললেন, জাঁহাপনা, ধূমপান শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে ধূমপান-ঘটিত ব্যাধির কোন প্রতিষেধক নেই। আসাদ বেগও জেদী। তিনি সম্রাটকে ইউরোপীয় চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে বললেন। কারণ তামাক সম্বন্ধে তাঁদের অভিজ্ঞতা আছে।

দরবারের চিকিৎসকেরা তবু নাছোড়-বান্দা। তামাক প্রচলনের বিরুদ্ধে তারা জোরালো প্রতিবাদ শুরু করে দিলে। আসাদ বেগ বললেন, আশ্চর্যই বটে! পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই যে-কোন সামাজিক রীতি কোন একটা সময়ে তু একেবারেই নতুন ছিল। নতুন কোন জিনিস প্রচলন করার সময়ে দেখা যায় জনসাধারণ সেটাকে গ্রহণ করতে বেশ কিছুকাল দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থাকে।

শেষ পর্যন্ত আসাদ বেগেরই জয় হল। বিরোধী পক্ষের সোরগোল আকবরের হাতের একটা ইঙ্গিতেই নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল।

আসাদ বেগ রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছেই পাঠালেন তামাকপাতার নমুনা। খবর পেয়ে আগ্রার ব্যবসায়ীরা এল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে। কীভাবে এবং কোথা থেকে এই তামাকপাতা এ-দেশে আমদানি করা যায় তার হদিস জেনে নিলে সবাই। দেখতে দেখতে তামাকপাতার ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে উঠল কয়েক বছরের মধ্যে। তামাক খাওয়ার চর্চাটাও হয়ে উঠল সামাজিক রীতি। সেই সঙ্গে এ-দেশেও শুরু হল তামাকপাতার চাষ। ১৭৪০ সনে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বোম্বাই মাদ্রাজ আর কলকাতায় এটাকে 'cash-crop' হিসেবে গণ্য করলে। অর্থাৎ অন্যান্য শস্যাদি এক অংশ থেকে যা তারা কিনবে তার ট্যাক্স দেবে জিনিসের বদলে জিনিস দিয়ে। কিন্তু তামাকপাতা কেনার বেলায় জিনিসের বদলে টাকা।

মনে রাখা দরকার, তখনও কিন্তু সর্বসাধারণে হুঁকোর প্রচলন হয়নি। কুম্ভকাররাই প্রথম 'পাইপে খাওয়া' তামাকের ধারাটাকে পাল্টে দিলে কলকে বা চিলম আবিষ্কার করে। আগে তামাকপাতা। তারপর কলকে। হুঁকোর ক্রমবিকাশের পথে এগুলি এক-একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

ভারতবর্ষে যখন সপ্তদশ শতাব্দী তখন এদেশে সুগন্ধী নির্যাসের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহার জনসাধারণের মধ্যে। কীভাবে যেন তামাকসেবীদের মাথায় একটা পরিকল্পনা আসে, সুগন্ধী জলের মধ্যে দিয়ে তামাকের ধোঁয়া পান করতে হবে। তার ফলেই চিলম-এর সঙ্গে সংযোগ ঘটল আরও নানা সাজসরঞ্জামের। এবং তা থেকে উদ্ভূত হল হুঁকোর আদি রূপ বা আদিম হুঁকো। রুপোর কারুকার্যমণ্ডিত যে প্রথম বহুমূল্য একটা হুঁকো ভারতবর্ষে তৈরি হয়েছিল, তার অধিকারী ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। প্রবাদ আছে, ধাতুনির্মিত হুঁকোর সেই শিল্পীটিকে পুরস্কারস্বরূপ জাহাঙ্গীর সাতটি গ্রাম উপহার দিয়ে-ছিলেন।

মোগলযুগে তামাকের সুগন্ধ যে হারেমের বিলাসিতার অঙ্গ হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ মোগলচিত্রে ধূমপানরতা রমণীরা। ক্রমে মোগল-সাম্রাজ্যের দেউটি একে একে নিভে এল ভারতবর্ষে। ইংরেজরা সম্রাট-বাদশাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল রাজ্যপাট। আর মুখ থেকে নিল হুঁকোর নল। ভারতবর্ষের নতুন রাষ্ট্রনায়ক হল ইংরেজ। আর ভারতবর্ষে শুরু হল হুঁকোর একনায়কত্ব, যতদিন পর্যন্ত না সিগার-চুরুট-বিড়ি-সিগারেটের সম্মিলিত শক্তি আত্মঘোষণা করল তাদের গণতান্ত্রিক কার্যসূচী নিয়ে।
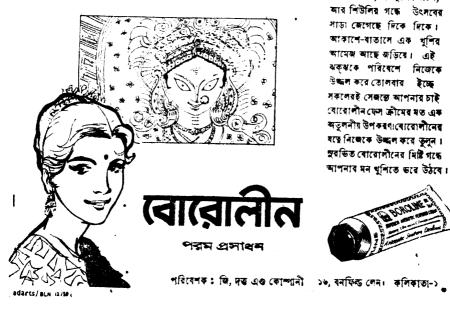
পরিবেশক : জি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী ১৬, বনফিল্ড লেন। কলিকাতা-১

ভদ্রলোক আমার দিকে আবার তাকাল। লোকটির মুখে চাপ-দাড়ি ও গোঁফ। ডান চোখটা নেই। নেই মানে একেবারে অক্ষিগোলক-সমেত সবটাই উধাও সেখান থেকে। আলোটা ভালভাবে না পড়ায় ডান চোখের গহ্বরটাকে বড় বেশী অন্ধকার মনে হচ্ছে। কিন্তু বেশ শক্তসমর্থ চেহারা ভদ্র-লোকের। ট্রেনের ঝাঁকুনিতেও অটল হয়ে বসে আছে লোকটা একটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে। বাইরে শীতের রাতের কুয়াশাকে ছিঁড়ে-ফুঁড়ে আমাদের ট্রেন তখন প্রচণ্ড-গতিতে ছুটে চলেছে।

খড়্গপুরে যখন উঠলাম তখন ভদ্রলোক শুয়ে ছিল আমার দিকে পিছন ফিরে। মিনিট পাঁচেক আগে পাশ ফিরতেই আমাকে দেখে উঠে বসেছে ভদ্রলোক। আর তার পর থেকেই মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে আমার দিকে আর কী যেন ভাবছে।

আমার অস্বস্তি লাগতে লাগল। এই এক-চক্ষুহীন মানুষটা হঠাৎ আমার মধ্যে কী দ্রষ্টব্য পেল?

ভদ্রলোক হঠাৎ হাসল আমার দিকে তাকিয়ে।

আমার রাগ হল, ফস্ করে বলেই ফেললাম, "আমার দিকে তাকিয়ে আপনার হাসবার হেতুটা জানতে পারি কি?"

ভদ্রলোক হাসিমুখেই প্রশ্ন করলেন, "আপনি অজিত গুপ্ত?"

"তার মানে? আমি অজিত গুপ্ত হলেই বা আপনি হাসবেন কেন?"

"চিনি বলে। আমায় চিনতে পারছ না জিতু?"

মানে? ভদ্রলোক যে ডাকনামটিও জানে।

"কে আপনি?"

ভদ্রলোক হাসল, "আমার নাম সঞ্জয়—রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দূত সঞ্জয় নই—পাটনার সঞ্জয় সেন।"

চিনলাম। সঞ্জয় সেন। স্কুলে পড়তে পড়তে কী করে একবার ওর ডান চোখে ঘা হয়েছিল—সেপটিক হওয়ায় শেষে পুরো চোখটাই উপড়ে ফেলে দিতে হয়। অবস্থা খুব ভাল ছিল না সঞ্জয়ের। বাপমা ছিল না। কাকার ওখানে থেকে খুব কষ্টে-সৃষ্টে পড়ত। আগে একটু ডানপিটে মত ছিল, কিন্তু ওই চোখটা খারাপ হবার পর থেকেই কেমন যেন মিইয়ে গেল। কারও কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই সে গাল খেত—কানা কোথাকার! সবাই যে আড়ালে তাকে কানা সঞ্জয় ছাড়া অন্য নামে ডাকে না তা সে জানত। তাই সে সবার থেকে একটু দূরে দূরে থাকা আরম্ভ করল। একা একা। তার সেই একাকিত্বের নির্জনতায় একমাত্র আমাকেই সে একটু আন্তরিকতার সঙ্গে আহ্বান জানাত। খানিকটা বন্ধুত্ব তার সঙ্গে যে ছিল একথা আজও স্বীকার করি আমি—যদিও আড়ালে আমিও তাকে কানা সঞ্জয়ই বলতাম। স্কুলের পর থেকে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ও গেল আর্টসে, আমি সায়েন্সে। লেখাপড়ায় ভাল ছিল সঞ্জয়, তবু বি-এ পাস করে আর পড়ার ব্যবস্থা করতে পারল

না সে। কাকার অবস্থাও ভাল ছিল না। চাকরির চেষ্টা শুরু হল তখন। আর ঠিক সেই সময় কানাঘুষো শুনলাম যে, সঞ্জয় নাকি প্রেমে পড়েছে। মেয়েটির নাম সুধা। আমাদের পাড়ার মেয়ে। আমার ছোট বোনের মতই। একদিন সুধাকে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, 'হ্যাঁরে সুধা, সঞ্জয় নাকি তোকে ভালবাসে?' সুধা জবাব দিল, 'আমাকে ভালবাসে ত কী এমন অপরাধ করেছে? বাসুক না।' আমি বললাম, 'আর তুই?' সুধা খিল খিল করে হেসে বলল, 'মরণ আর কি, আমি ওই কানাকে ভালবাসব কেন?' সঞ্জয় সেনের বন্ধু হলেও সুধার কথাটা আমার পছন্দ হয়েছিল সেদিন। ভালবাসার ব্যাপারেও যেমন, তেমনি চাকরির ব্যাপারেও সঞ্জয় সেনের একটি চোখ তার বৈরিতা করল। সে আবিষ্কার করল যে তার একটি চোখের জন্যই তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগ্যতা সব কিছুই পৃথিবীর কাছে নিরর্থক হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ একদিন সকালে শুনলাম যে সঞ্জয় নিরুদ্দেশ। তার কাকা দু-একদিন আমাদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে পরে হাল ছেড়ে দিলেন। আমরাও কিছুদিন সহানুভূতির সঙ্গেই কানা সঞ্জয়ের চর্চা করে অবশেষে তাকে ভুলে গেলাম।

তারপর আজ দীর্ঘ বারো বছর পরে—

বললাম, "আশ্চর্য, কতদিন বাদে দেখা হল!"

সঞ্জয় বলল, "আশ্চর্য হবার কী আছে জিতু?"

"এই হঠাৎ দেখা?"

"জীবন একটা পথ—ঘুরে-ফিরে এই পথে দেখা হতেও পারে, নাও হতে পারে—কোন কিছুতেই আশ্চর্য হয়ে লাভ নেই।"

"তোমার কথার অর্থ বুঝলাম না।"

"সত্যকে জানলে মানুষ আশ্চর্যবোধ করে না জিতু।"

সঞ্জয় কি শাস্ত্র থেকে আবৃত্তি করছে? প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টায় বললাম, "হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছিলে কেন?"

"একটা উদ্দেশ পাবার জন্যে। হাঁ হে, আমার কাকাবাবু কেমন আছেন?"

অবাক হয়ে গেলাম, "বল কি হে, আর যাওনি বাড়ি?"

"না ত!"

"তোমার কাকাবাবু ত প্রায় চার-পাঁচ বছর আগে মারা গেছেন।"

নির্বিকারভাবে সঞ্জয় বলল, "যাক, একটা চিন্তা কমে গেল।"

আমি না বলে আর পারলাম না "কাকার মরার খবর পেয়েও তোমার একটু দুঃখ হচ্ছে না? এও কি তোমার সত্য-বোধের ফল নাকি হে?"

সঞ্জয় হাসল, "সত্যকে জানবার চেষ্টা [illegible] কিছু [illegible] আর পড়েছি তাই আওড়াচ্ছি। সত্যবোধ হলে হয়ত কিছু জিজ্ঞেসই করতাম না।"

হাসলাম, "খুব শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ছ বোধ হয়?"

সঞ্জয়ের মুখে একটু বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল, বলল, "পড়ছিলাম, কিন্তু নিজের জন্য নয়। আমি যাঁর কাছে চাকরি করতাম তাঁর জন্যে।"

"কে সে?"

"একজন অন্ধ।"

কৌতূহল হল, বললাম, "অন্ধ? কী চাকরি করতে তাঁর ওখানে?"

সঞ্জয় বলল, "সেক্রেটারির কাজ—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সভায় সঞ্জয়ের শেষে যে কাজ ছিল।"

"হেঁয়ালি কোর না—খুলে বল সঞ্জয়।"

সঞ্জয় একবার তাকাল আমার দিকে। বোধ হয় মনে মনে বিচার করল যে আমায় বলা যায় কি না। তারপর সে হেসে বলল, "তাহলে একটু ধৈর্য ধর—সিগারেটটা ধরিয়ে নিই।"

আমাকে একটা দামী সিগারেট দিয়ে সঞ্জয় নিজেও ধরাল, কম্বলটা আরও ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল :

আমি আজ যা বলব তা শুনে তুমি হয়ত আমার ওপর রাগ করবে, হয়ত ভাববে যে আমি একটা পাপিষ্ঠ। পাপপুণ্যের সংজ্ঞা এখন তোমার কী তা আমি জানি না জিতু, তবে এ নিয়ে আমাদের দুজনের মতের মিল যে হবে না এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তবে আমার তরফ থেকে এইটুকু অকপটে বলতে পারি যে, আমি একটা একচক্ষুহীন মানুষ। মুখবন্ধকে গুরুতর শব্দ প্রয়োগে গুরু-গম্ভীর করে তুলে যে পরিমাণ কৌতূহল আমি তোমার মধ্যে সৃষ্টি করছি সেই পরিমাণ চমকপ্রদ কাহিনী তুমি আমার কাছে পাবে কিনা জানি না। কিন্তু কাহিনী মানে ত শুধু ঘটনা নয় জিতু, কাহিনী মানে একটি উদ্ঘাটন—একটি সত্যের প্রকাশ। যদি সেটুকু পাও তা হলেই আমার বলা সার্থক হবে।

ছোটবেলার কথা মনে পড়ে জিতু? আমার ডান চোখটা নষ্ট হয়ে গেল। সবাই হাসত আড়ালে। একমাত্র তুমিই খানিকটা প্রীতি পোষণ করতে। অবশ্য তুমিও যে আড়ালে এক-আধবার হেসেছ তাও আমি জানি। লজ্জা পেও না, আজ বুঝি যে তোমাদের কারও দোষ নেই তোমরা সবাই মানুষ। আজ বুঝি যে মানুষ শুধু মানুষের বাইরেরটাই বড় করে দেখে। প্রাকৃতিক বিকৃতিকে মানুষ ঘৃণা করে, করুণা করে উপহাস করে, কিন্তু ভালবাসে না কখনও। মানুষের দেহ আর আত্মা নাকি দুটি কণা [illegible]। [illegible] নাকি [illegible] সবাই একবর্ণ, একগণ, [illegible] ওজন। কিন্তু একথা আমি বিশ্বাস করি না। মায়া শব্দের অর্থ আগে বুঝতাম না, পরে বুঝেছি যে তা সত্য। শিক্ষা, বুদ্ধি, তপস্যাকে তা ব্যর্থ করে ওই দেহের স্তরেই এনে বানচাল করে। ওই মায়ার প্রভাবের অমৃতকলস ছেড়ে কৃমি-কীট-ভরা নর্দমায় এসে মুখ থুবড়ে পড়তেই বেশী ভাল লাগে।

ছোটবেলা থেকেই আমি এই বোধ-সমেত বড় হয়ে উঠেছি। আমার এই উপলব্ধিকে বদলে দেবার মত একটি ঘটনাও তখন ঘটেনি। ভাল ছাত্র ছিলাম একথা তোমার হয়ত মনে আছে। বি-এতে দর্শন ও সংস্কৃত ছিল, ডিস্টিংশনে পাস করেছিলাম। কিন্তু তবু ভাল চাকরি পেলাম না। ভালবাসলাম। তুমি নিশ্চয়ই চেন সে মেয়েটিকে। সুধা। কিন্তু চাকরি আর ভালবাসা—দু ব্যাপারেই আমার এক চোখের শূন্যতা ব্যর্থতা আর হতাশার সৃষ্টি করল। শেষে একদিন উধাও হয়ে গেলাম।

পাটনা থেকে গেলাম কলকাতা। লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়ে ডিস্টিংশনের সব চিহ্ন মুছে গেল। এক মোটরের কারখানায় মিস্ত্রী হলাম। সেখানেই ড্রাইভিং শিখলাম। বছর দুই কাটল। সংস্কৃত কাব্য আর নাটকের রস পুড়ে ছাই হয়ে গেল। শিলাকঠিন গদ্যের রূপ ধারণ করল আমার মন। হিংস্র হয়ে উঠলাম। একা মানুষের মনের বল অনেক হয়। আমারও তাই হল। আমার ত কেউ ছিল না। মা বাপ ভাই বোন বন্ধু—কেউ না। ঘৃণা হল পৃথিবীর ওপর—একটি আক্রোশ জন্মাল। শুধু অন্ধ, কানা আর বিকলাঙ্গেরাই আমার সহানুভূতির পাত্র হল। বাকী সবাই যেন শত্রু। বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। নীতির বাঁধন ছিঁড়ে ফেললাম। পয়সা দিয়ে সস্তা নারীদেহের সঙ্গে পরিচয় ঘটালাম। জয়-মা-কালী ব্র্যান্ড দিয়ে আমার বিবেক ও অস্থার শ্বাসরোধ করলাম। আমার গোত্রান্তর ঘটল সাময়িকভাবে। আর ঠিক সেই সময় হঠাৎ একদিন একটা নতুন চাকরি পেলাম। এক মস্ত বড়-লোকের বাড়িতে মোটর চালাতে হবে। নিলাম চাকরিটা। দিনরাত লোহালক্কড় এবং পেট্রল গ্রীজ আর ভাল লাগছিল না।

মালিকের আসল নাম বলব না। ধর তাঁর নাম বিনায়ক চৌধুরী। কলিয়ারির মালিক তিনি। দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর বিরাট বড় বাড়ি। লক্ষপতি লোক। কিন্তু অন্ধ। বসন্ত রোগে তাঁর দুটি চোখই গেছে। ভদ্রলোকের বয়স তখন বত্রিশের মত হবে। আমার চেয়ে বয়সে ছ-সাত বছরের বড়। চব্বিশ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন তিনি। তার পরের বছরেই এই দুর্বিপাক ঘটে। সঞ্চারিণী বিদ্যুল্লতার মত তাঁর স্ত্রী। [illegible] তাঁর রূপ। [illegible] ভার নেমে আসে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপর।

যে রূপ আমার এই কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করছে তার বর্ণনা না করে পারছি না। আজকাল রূপবর্ণনাকে মানুষ বড় করে স্থান দেয় না। কিন্তু আমি সংস্কৃতের ছাত্র, রূপের স্তুতি না করে পারি না। বিনায়ক চৌধুরীর স্ত্রী অনসূয়া চৌধুরী বিলেত-ফেরত এক নামজাদা ব্যারিস্টারের সুশিক্ষিতা মেয়ে। আজকাল তাঁর বাপ নেই। এক ভাই আছেন—তিনি বিবাহিত ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। অনসূয়া চৌধুরীর বয়স পঁচিশের বেশী নয়, কিন্তু দেখে তা মনে হয় না। তাঁর আবেশভরা যৌবনের ওপর অতীত-কৈশোরের ছায়া যেন তখনও বর্তমান ছিল। তিনি বাণভট্টের কাদম্বরী নন, তবু কাদম্বরীর দেহবর্ণনার সঙ্গে যেন তাঁর সাদৃশ্য আছে। প্রজাপতির দৃঢ়-নিষ্পেষণে অতি-ক্ষীণ তাঁর কটিদেশ। পয়োধরের উন্নতি যেন অন্তরায় ছিল বলেই তাঁর কটিদেশ অনসূয়া চৌধুরীর মুখ দেখতে না পেয়ে ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। আর সেই কটিদেশ থেকে যেন দ্বিধা-বিভক্ত লাবণ্যের স্রোতের মত নেমে গেছে তাঁর উরুযুগল। তাঁর বাহুদুটি যেন দুটি চঞ্চল মৃণাল। ঠোঁট দুটি যেন রূপসাগরের দুটি তরঙ্গ। দুটি চোখ যেন দুটি কৃষ্ণ-ভ্রমর। আর তাঁর হাসি—সে যেন পদ্মরাগমণির ধরণডালায় মুক্তার স্বপ্ন। বুঝতে পারছি জিতু, তোমার সন্দেহ হচ্ছে। মনিব-পত্নীর রূপ নিয়ে আমার এত আগ্রহ কেন? সেই জন্যেই ত আগে বলেছি যে, আমাকে তুমি পাপিষ্ঠ ভাবতে পার। তা ভাব। আমি যা সত্য তাই বলছি। কত বছর কেটে গেছে, তবু অনসূয়া চৌধুরীর রূপের সেই প্রথম-দর্শন-স্মৃতি আমাকে এখনও [illegible]তের মত অনুসরণ করে। ফুলের গন্ধে, পূর্ণিমার আলোতে, কালবৈশাখীর উদ্দাম হাওয়ায়, চন্দ্রহীন রাতের অতি-নির্জন ও নিকষ-কালো কোন কোন মুহূর্তে এখনও আমার অনসূয়া চৌধুরীর রূপের কথা মনে পড়ে আর মনে পড়ে যে আমি একচক্ষুহীন—অর্ধেক-অন্ধ।

রাগ কোর না জিতু। তোমাকে ত আগেই বলেছি যে, অকপটে সব কথা বলব। না, আমার লজ্জা হচ্ছে না, কারণ আমি জানি যে বিধাতার দুরন্ত ইচ্ছা না হলে তোমার সঙ্গে আমার আর সহজে দেখা হবে না। হ্যাঁ, আমি টাটানগরে নেমে যাব। রাতশেষে আমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার তোমার একটা দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হবে। সুতরাং একটু ধৈর্য ধরে শোন। আমি চাকরির খবর পেলাম। চৌধুরী বাড়িতে ড্রাইভার আর-একজন ছিল। কিন্তু গাড়ি দুটি। একটি মালিকের, দ্বিতীয়টি তাঁর স্ত্রীর। আমার ওপর দ্বিতীয়টিরই ভার পড়বে।

বিনায়ক চৌধুরীর সামনে প্রথমেই হাজির করা হল আমাকে। দোহারা গড়ন ভদ্রলোকের। দামী ধুতি ও জামা পরনে। দেশী কায়দায় সাজানো বাইরের কামরা। ঘরের চার দিকে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি টাঙানো। আর ছিল বীণা, তানপুরা, হারমোনিয়াম, তবলা ও পাখোয়াজ। অনুমান করলাম যে ভদ্রলোক সঙ্গীতানুরাগী। সামনে ম্যানেজার ছিলেন। বয়স্ক ভদ্রলোক, নাম শ্যামাদাস ভট্টাচার্য। বিনায়কবাবুর বাপের আমলের লোক। বাপের মতই। বিনায়ক আমাকে শিক্ষা-দীক্ষার কথা জিজ্ঞেস করলেন। ভাসা ভাসা জবাব দিলাম যে, ইংরেজী-বাংলা লিখতে পড়তে জানি। আরও দু-একটা প্রশ্নের পর আমার চাকরি হল। বিনায়ক তাঁর স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। অনসূয়া চৌধুরী আমার

জীবন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন। আমায় দেখে সম্মতি জানালেন। আমি লক্ষ্য করলাম যে তাঁর ঠোঁটের কোণে মৃদু ও অস্পষ্ট একটু হাসি ঝিলিক দিল। আমি বুঝলাম যে সে হাসি আমার একচোখের উৎকট শূন্যতাকে দেখে। কিন্তু আমার রাগ হল না, কারণ আমি আমার এক চোখ দিয়েই তাঁর দু চোখের মধ্যে এক বিচিত্র অস্থিরতা আর চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম। স্বামীর ওপর সে দৃষ্টি থাকে না, কারও ওপর নয়—সেই দৃষ্টি যেন চমকে, চমকে বাইরের দিকে কী খোঁজে।

কাজ শুরু করলাম। বেশী খাটতে হত না। সারা দিনে হয়ত দু-তিনবার বেরোয় অনসূয়া দেবী। বান্ধবীদের বাড়ি। সবাই বড়লোক। কিংবা হয়ত কোনদিন বিকেলে গড়ের মাঠে, নয় ত সিনেমায়। বাড়িতে ঝি-চাকর অনেক, কিন্তু আর কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। যাঁরা আত্মীয় বলে প্রচার করেন তাঁদের সঙ্গে অনসূয়ার বনে না বনে বিনায়কেরও বনে না। হ্যাঁ, বিনায়কের সঙ্গে মাঝে মাঝে বেরোতেন তিনি। এক-আধদিন। বেড়াতে কিংবা কোন গানের জলসায়।

গান গাইতেন বিনায়ক চৌধুরী। চমৎকার মিষ্টি গলা তাঁর। পৌরুষ ছিল তাতে। বড় বড় ওস্তাদের কাছে ছোটবেলায় গান শিখেছেন। কিন্তু ধ্রুপদাঙ্গ গানই বেশী গান। কাজ আর কী তাঁর, ওই কাজ। গ্র্যাজুয়েট তিনি। কিন্তু সম্পত্তির কাগজপত্র বা পড়াশোনা আর ত হবে না তাঁর, তাই গানবাজনার চর্চাই একটা প্রধান কাজ। একজন সেক্রেটারি আছেন তাঁর, মাঝে মাঝে এটা ওটা পড়ে শোনায়। কিন্তু ওসব বেশী ভাল লাগে না তাঁর। ভাল লাগে শুধু অনসূয়ার সঙ্গ আর গান। বিয়ের এক বছর বাদেই তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন—অনসূয়ার সেই দেবীদুর্লভ সৌন্দর্য চিরকালের জন্য তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে অন্তর্হিত হলেও তার স্মৃতিটুকু তাঁর দু চোখের অন্ধকারে বহু দূরের তারার মত জ্বলে।

কিন্তু অনসূয়ার কি ভালো লাগত স্বামীর সঙ্গ? না। প্রথম দিনে তাঁর চোখের চঞ্চল তারাতে আমি যা পাঠ করেছিলাম তা ঠিক। প্রথম কিছুদিন ভাবলাম, আমার কি ভুল হল? এক মাস বাদেই যখন অনসূয়ার বিশ্বাস জন্মাল আমার ওপর, তখন টের পেলাম যে আমার শয়তান মন ঠিকই দেখেছিল। অনসূয়া চৌধুরী তাঁর অন্ধ স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। গড়ের মাঠে আর সিনেমাতে তাঁর বেড়াতে যাওয়ার মাত্রা ক্রমেই যখন বেড়ে গেল তখন লক্ষ্য করলাম যে, সুপ্রকাশ মুখার্জি নামক একজন সুদর্শন যুবক তাঁর প্রতীক্ষায় থাকত। লোকটিকে একদিন বিনায়ক চৌধুরীর দপ্তরে দেখেছিলাম। তাঁর এক পিতৃ-বন্ধুর ছেলে। বিরাট বড়লোক, কলকাতা-বোম্বাইতে ব্যবসা আছে। বোম্বাইতেই বাসা, তবে বছরের অধিকাংশ সময় কলকাতাতেই থাকে। হোটেলে।

কিন্তু কেন বলি এ-কথা? বলেই বা লাভ কী? আমার পাপ মন আমাকে যে মন্ত্রণা দিল সেই অনুযায়ী আমি নির্লিপ্ত হয়ে দিন কাটাতে লাগলাম। গড়ের মাঠ ছেড়ে এখন ওদের হোটেলেই দেখা হতে লাগল। হোটেল থেকে অনসূয়া চৌধুরীকে যখন বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতাম তখন পেছনের সীটে বসে তিনি মাঝে মাঝে গুন গুন করে গাইতেন। সেই রূপসী স্বৈরিণীর দেহ থেকে ভেসে আসা মৃদু বিলাতী সেন্টের সুবাস আমাকে বাসনা-বিহ্বল করে তুলত আর নানা দুরাশার দুঃস্বপ্ন দেখাত।

উৎকট কৌতূহলে লক্ষ্য রাখতাম। কী আশ্চর্য এক মুখোশ পরে অনসূয়া চৌধুরী তাঁর স্বামীর কাছে যেতেন। আর বিনায়ক চৌধুরী? তিনি যেন বাতাসেও গন্ধ পেতেন অনসূয়ার। মাঝে মাঝে তিনি যখন রাতে গাইতেন তখন আমি লুকিয়ে উঁকি মেরে তাঁকে দেখতাম আর গান শুনতাম। সেই সময় এক-আধদিন অনসূয়া নিঃশব্দে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেন। কিন্তু বিনায়ক ঠিক টের পেতেন। বলতেন, "অনসূয়া এসেছ? বোস। একটি ধানশ্রী গাইছি শোন।" অনসূয়া বসতেন। তখন তাঁকে দেখাত শুচিস্নিগ্ধা, সাত্ত্বিক প্রকৃতির একটি কল্যাণী বধূর মত। বসতেন স্বামীর কাছাকাছি—স্বামীকে যে প্রতারণা করছেন তা যেন পুষিয়ে দেবার জন্য একটু মুগ্ধতার রেশ গলায় তুলে বলতেন, 'আহা, বড় সুন্দর ত—গাও।' বিনায়ক মৃদুকণ্ঠে বলতেন, 'তোমার জন্যেই ত গাই অনু—তুমি কাছে থাক বা দূরে থাক আমার সব গানই তোমার জন্যে।' আড়ালে দাঁড়িয়ে হাসি পেয়েছে আমার একথা শুনে, করুণা হয়েছে ঐ অন্ধের ওপর। ঘৃণায় কাঁপতে কাঁপতে সরে গেছি। কিন্তু বাসনায় উন্মাদ হয়ে আবার ফিরে এসেছি, আবার উঁকি মেরে দেখেছি অনসূয়া চৌধুরীকে। ক্রমে আমার হৃদয়ে শয়তান অনসূয়া চৌধুরীর রাজত্ব গড়ে তুলল।

অনসূয়া আমাকে বহুবার পরীক্ষা করেছিলেন যে আমি তাঁর বিশ্বাসভাজন কিনা। আমাকে ইঙ্গিতে বলেও ছিলেন যে আমি তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে একটিকেও কাউকে বললে আমার চাকরি যাবে। আমিও ইঙ্গিতে জানিয়েছিলাম যে, আমি বিশ্বাসভাজন। একদিন এক কাণ্ড হল। বিনায়ক চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে অনসূয়া একদিন বিকেলের পর গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে গেলেন।

বিনায়ক প্রশ্ন করলেন, "অনসূয়া, সূর্য কোথায়?"

অনসূয়া বললেন, "অস্তে যাচ্ছে।"

"কেমন দেখাচ্ছে সূর্যকে—বল না একটু।"

"লাল।"

অন্ধের সেই আকুতি আমি বুঝেছিলাম। তাই অনসূয়ার সেই সংক্ষিপ্ত উত্তর আমার ভাল লাগল না। আমি পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, বলে ফেললাম, "গঙ্গার পশ্চিম দিকে সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছেন, গঙ্গার জল দুলছে—তার ওপারে লাল টকটকে সূর্যদেবকে মনে হচ্ছে যেন একটি মধুক্ষরা রক্তপদ্ম—"

অনসূয়া ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন। বিস্ময়? হয়ত একটু, কিন্তু তার চেয়েও বেশী ছিল বিরক্তি। একটা কানা ড্রাইভারের এ কী প্রগলভতা!

বিনায়ক চৌধুরী কিন্তু ভারি খুশী হলেন, বললেন, "তুমি বেশ বললে ত? মনে হল যেন একটি ছবি দেখলাম। কতদূর পড়েছ তুমি?"

একদিন লজ্জায় শিক্ষার কথা গোপন করেছিলাম। আজ মনে অতিদূরের আকাশবিহারী এক নক্ষত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা হল।

বললাম, বি-এতে ডিস্টিংশন নিয়ে পাস করেছি।"

"আঁ! বল কী? কী কী সাবজেক্ট ছিল?"

"সংস্কৃত আর দর্শন।"

"তাই—তাই এমন সুন্দর উপমা দিলে। কিন্তু—কিন্তু তুমি ড্রাইভারের কাজ করছ কেন?"

অনসূয়ার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম, "আমার একটা চোখ নেই।"

স্তব্ধ হয়ে গেলেন বিনায়ক চৌধুরী, তারপরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, "বুঝেছি। কাল থেকে তুমি আমার সেক্রেটারির কাজ করবে।"

অনসূয়া চমকে বললেন, "কিন্তু একজন ত আছেনই।"

বিনায়ক দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "তাকে কলিয়ারিতে ভালো কোন কাজে পাঠাব।"

অনসূয়া বললেন, "বেশ, কিন্তু নতুন ভাল ড্রাইভার না আসা পর্যন্ত আরও কটা দিন আমার গাড়িটা ওই চালাক।"

"বেশ।"

অনসূয়ার বলার কারণ স্পষ্ট। সুতরাং তাই হল। পরদিন থেকে সেক্রেটারির কাজ শুরু করলাম। সেক্রেটারি মানে সঙ্গী। বিনায়ককে বই পড়ে শোনাতাম, সব-কিছু নিখুঁত ও জীবন্ত বর্ণনা দিয়ে বোঝাতাম। ঠিক তোমাদের মহাভারতের সঞ্জয়ের মত।

তিনিও নাকি প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের সারথি ছিলেন, পরে মন্ত্রী হন। অবশেষে দূত। দিব্য-দৃষ্টি পাওয়াতে তিনি অ-দৃষ্ট বস্তুও দেখতে পেতেন। আমার জীবনে অবিকল তেমনি ঘটনা না ঘটলেও অনুরূপ অনেক কিছুই ঘটল। এই কাজের সংগে অনসূয়া চৌধুরীকে গড়ের মাঠে বা হোটেলে নিয়ে যাওয়ার কাজটাও আমার চলতে লাগল। প্রায় বছরখানেকের মত কাটল। বিনায়ক আমাকে ভালবেসে ফেললেন। পিতৃসম শ্যামাদাসও স্নেহ করতে লাগলেন। আমার জ্ঞান ও চরিত্র-মাধুর্য তাঁদের মুগ্ধ করল। এমনি সময় একদিন রাতে গানবাজনার পর অনসূয়ার সংগে বিনায়ক চৌধুরীর কথা-কাটাকাটি হয়ে গেল।

গান বন্ধ করে বিনায়ক হঠাৎ আকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "তোমার কী হয়েছে অনু?"

"কই? কিছু না ত।"

"কিন্তু আমার যে মনে হচ্ছে অনু। বল, কী হয়েছে?"

অনসূয়া ধীরকণ্ঠে বললেন, "কিছু না।"

হঠাৎ বিনায়ক উঠে দাঁড়ালেন, হাতড়াতে হাতড়াতে অনসূয়ার কাঁধ খুঁজে দু হাতে তাঁকে চেপে ধরে বললেন, "তুমি মিথ্যে কথা বলছ।"

"হাত সরাও—আমার লাগছে"—দু হাতে সবলে নিজেকে মুক্ত করে বসন্তের দাগে হতশ্রী ও অন্ধ বিনায়কের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকালেন অনসূয়া। বললেন, "রোজ রোজ এক প্রশ্ন। বলেছি ত, ক'দিন ধরে শরীরটা ভাল নয়—এতে ভাববারও কিছু নেই।"

"অনু। তুমি মিথ্যে কথা বলছ।"

"কী বলতে চাও তুমি?"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে বিনায়ক বললেন, "কাল থেকে তুমি আর বাইরে বেরোতে পারবে না।"

"কেন?"

"আমার হুকুম।"

"কিন্তু কেন এই হুকুম?"

"তোমাকে জিরোতে হবে—ভাল হতে হবে।"

অনসূয়া স্বামীর দিকে তাকিয়ে তিক্ত হাসি হাসলেন, বললেন, "আচ্ছা তাই হবে।"

ঘর ছেড়ে অনসূয়া বেরিয়ে যেতেই বিনায়ক কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন। খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে তারপর তিনি তানপুরাটি টেনে মৃদুকণ্ঠে গান ধরলেন :

"তেরো নাম চহুঁচক ভরপুর রহা,
তুঁহি সুরমে ফিরত,
তুঁহি সবন মে করত কল্লোল।
তুঁহি তান, তুঁহি মান, তুঁহি
রোম-রোম রম রহো,
তুঁহি মন, তুঁহি বোলত বোল।"

আমি এর আগেও এ গান শুনেছি। ধ্রুপদাঙ্গ গান। জোনপুরী রাগ, চৌতাল। প্রতিপাদ্য ঈশ্বর। কিন্তু এ কোন্ ঈশ্বরের গান গাইতে গাইতে আজ বিনায়ক চৌধুরীর দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল! অন্ধের আত্মা কি এতদিনে টের পেয়েছে যে অনসূয়া চৌধুরী বদলে গেছে?

ক'দিন কাটল। অনসূয়া চৌধুরী আর বেরোয় না। তবে কি সুস্থতা ফিরে এল তাঁর। না। পাঁচ-ছ দিন বাদেই এক সকালে অনসূয়া আমাকে আড়ালে ডেকে পাঠালেন। আমাকে একটা কাগজে-মোড়া বইয়ের প্যাকেট দিয়ে বললেন, "এই প্যাকেটটা আমাদের বন্ধু সেই সুপ্রকাশবাবুকে দিয়ে এস সঞ্জয়—বড় দরকারী।"

'আজ্ঞে' বলেই পা বাড়াচ্ছিলাম। অনসূয়া ডেকে বললেন, "শোন, কেউ যেন এ কথা না জানে।"

হেসে বললাম, "আজ্ঞে না।"

রাস্তায় থেমে প্যাকেটটা খুলে দুটো বই পেলাম। একটা বইয়ের ভেতর একটি খাম।

প্যাকেট নিয়ে দিলাম সুপ্রকাশবাবুকে। তিনি আমাকে আদর করে বসিয়ে আবার একটা প্যাকেট দিলেন এবং একশো টাকার একটা নোট আমার হাতে গুঁজে দিলেন। বলা বাহুল্য ফেরার পথে সেই প্যাকেট খুলে বইয়ের ভেতর তাঁর চিঠি পেলাম। অনসূয়ার গৃহত্যাগের বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। পরদিন অন্ধকার থাকতেই গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়ে মোটরে করে অনসূয়াকে নিয়ে চলে যাবেন তিনি। অনসূয়া যেন ভোর চারটেয় তাঁর হোটেলে পৌঁছন। তাঁর বাড়ি থাকলে শ্যামাদাসবাবুরা সন্দেহ করবেন।

চিঠিটা পড়ে বাজারে গিয়ে ভাল চিঠির কাগজ কিনে অবিকল সুপ্রকাশবাবুর হাতের লেখা নকল করে আসলটা আমি বুকপকেটে রাখলাম। তারপর নকলটি-সমেত প্যাকেটটি নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলাম। উন্মাদ আগ্রহের সংগে অনসূয়া প্যাকেটটি নিলেন। খানিকবাদে আবার তিনি ডাকলেন আমাকে, স্থিরদৃষ্টি মেলে বললেন, "তোমায় বিশ্বাস করতে পারি সঞ্জয়?"

বললাম, "এতদিন করেননি?"

অনসূয়া মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ, তবু তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, কাউকে বলবে না সুপ্রকাশবাবুর কথা?"

বললাম তা। তখন অনসূয়া প্রস্তাব জানালেন যে, তাঁর গাড়িটাকে মেরামত করার নাম করে জনক সেন লেনের মুখে সন্ধ্যার সময় দাঁড় করিয়ে রাখব আমি। তারপর রাতের বেলা ওই গাড়িতেই গিয়ে শুয়ে থাকব। ভোর রাতে তিনি এলে তাঁকে এক জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। তারপর ভোরবেলায় সতি কোন গ্যারেজে গাড়ি দিয়ে আমি বাড়ি ফিরব।

বিনায়ক চৌধুরীর সেদিনকার চোখের জলের কথা আমার মনে পড়ে গেল। বললাম, "এটা কি উচিত হবে?"

"কী উচিত?"

"মাপ করবেন—আপনার এভাবে যাওয়া?"

অনসূয়া আমার দিকে তাকালেন। তাঁর
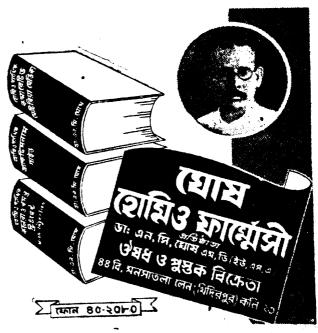
চোখে কি আগুনে জ্বলল? না কি বেদনা? তিনি বললেন, "তোমার এ অনধিকার চর্চা সঞ্জয়। তবু আজ বাধ্য হয়েই বলছি। তুমি শিক্ষিত লোক—কিন্তু তোমার একটা চোখ নেই বলেই কি তুমি আজ ওই অন্ধের কথা বড় করে ভাবলে? আমার কথাও কি ভেবেছ একদিন? আমি বড় ক্লান্ত। আমি এ অন্ধের জগতে আর থাকতে পারছি না। আমি চাই সুস্থের ভালবাসা—আমি চাই যে আমায় ভালবাসবে সে আমায় দু চোখভরে দেখুক আর স্তব করুক।"

প্রচণ্ড এক জ্বালায় জ্বলে উঠলাম, তবু বললাম, "বুঝেছি। আপনি যা বললেন তাই হবে।"

"শোন, তুমি যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর তা হলেও আমার মতি বদলাবে না। আজ না পারি কাল—একদিন-না-একদিন আমি যাবই।"

"বুঝেছি। কাউকে জানাব না আমি—প্রতিজ্ঞা ত করেইছি।"

আমি চলে গেলাম।

নিজের ঘরে বসে ভাবতে লাগলাম। সত্যি কি ঠাকুর-দেবতা মানি আমি?

বিনায়ক চৌধুরীকে জানাব না?

শেষে আমি সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বকে জয় করলাম।

না, বিনায়ক চৌধুরীর জীবনে অনসূয়া এক অভিশাপ। সে অভিশাপ দূরেই যাক। তা ছাড়া এক ঢিলে দুই পাখি মারব আমি।

দিন গেল। রাত এল। যেমন ঠিক হয়েছিল তেমনি করলাম। মাঝ রাতে নিজের ঘর ছেড়ে পাঁচিল টপকে বাইরে গেলাম। তারপর জনক সেন লেনের মোড়ে। গাড়িতে বসে সিগারেটের পর সিগারেট জ্বালালাম। অনেকক্ষণ জেগে থেকে যখন সবে একটু তন্দ্রা এসেছে তখন অনসূয়া এসে আমায় জাগালেন।

চাদর মুড়ি দিয়ে অতি সাধারণ একটা নীল রঙের তাঁতের শাড়ি পরে এসেছেন তিনি।

তিনি পেছনে বসতেই বললাম, "কেউ টের পায়নি ত?"

"না। হোটেলে চল সঞ্জয়।"

গাড়ি চালালাম। সবেগে। শেষ রাতের ফাঁকা রাস্তা একেবারে জনশূন্য। হোটেলের দিকে নয়। নির্জনতর অংশের দিকে।

"এ কোথায় যাচ্ছ?" অনসূয়া রূঢ়কে প্রশ্ন করলেন।

"একটু নির্জনে।"

"কেন?"

"আপনাকে ঠিকই পৌঁছে দেব, চিন্তা করবেন না। তবে একটু বোঝাপড়া আছে আপনার সঙ্গে।"

"বোঝাপড়া মানে?" অনসূয়ার কণ্ঠস্বর কর্কশ ও বিশ্রী হয়ে উঠল।

গাড়ির বেগ আরও বাড়িয়ে বললাম, "সুপ্রকাশবাবুর আসল চিঠিটা আপনাকে আমি দিইনি—সেটা আমি কর্তাকে দিতে পারতাম বা পারি।"

সামনের ছোট্ট মিররে অনসূয়ার মুখ বিকৃত হয়ে উঠল, "তার মানে—কী চাও তুমি?"

স্পষ্টই বললাম।

"গাড়ি থামাও।"

"গাড়ির স্পীড এখন সত্তর মাইল—থামবে না।"

"আমি চেঁচাব।"

"ঠিক আছে। তাহলে বাড়িতেই ফিরিয়ে নিয়ে যাই আপনাকে—আপনার অন্ধ স্বামীর কাছে—"

অনসূয়ার গলা কাঁপছে তখন, বলেন, "টাকার জন্য এমন করছ সঞ্জয়—তোমায় আমি হাজার টাকা দেব।"

বললাম, "না। এ জীবনে আমিও লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করতে পারব, কিন্তু আপনাকে পাব না।"

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে ক্ষীণ গলায় অনসূয়া বললেন, "কোথায় সে চিঠি?"

দেখালাম দূর থেকে।

"আমাকে হোস্টেলে পৌঁছে দাও।"

"শর্তটা তা হলে মঞ্জুর করলেন?"

দাঁতে দাঁত পিষে অনসূয়া বললেন, "শয়তান, আমাকে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দাও।"

অপমানে, রাগে, দুঃখে অনসূয়া কাঁদলেন, হিংস্র হয়ে উঠলেন কিন্তু আমি বিচলিত হলাম না।

ওরা পালাল। আমি সব পর্ব সেরে বাড়ি ফিরলাম। তখনও কেউ টের পায়নি। কিন্তু একটু বাদেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল, কোথায় অনসূয়া? শ্যামাদাসবাবু আমাকে আড়ালে নিয়ে বললেন যে, অনসূয়া নিশ্চয়ই সুপ্রকাশের সঙ্গে পালিয়েছেন। তাঁর সন্দেহকে সত্য করল অনসূয়ার চিঠি। বিনায়কের নামে লেখা। কিন্তু বিনায়ককে তিনি সে কথা জানালেন না। বললেন যে, অনসূয়া বাপের বাড়ি গেছেন। অনসূয়ার দাদা রথীনবাবুর কাছে গেলেন তিনি। কী সব পরামর্শ হল তাঁদের। তারপর তাঁরা এসে বিনায়ককে বললেন যে, অনসূয়া তাঁর কাছেই এবং সেদিনই সকালে দার্জিলিংয়ে বেড়াতে যাচ্ছেন। বিনায়ক তাকে অহেতুক ভাবে বাড়ি থেকে বেরতে নিষেধ করাতেই তিনি এমন করেছেন। দু-চারদিনেই ওর মাথা ঠাণ্ডা হবে, বিনায়ক যেন এ নিয়ে ছেলেমানুষী বা জেদ না করেন। বিনায়ক স্থির হয়ে শুনলেন সে কথা। শান্ত হলেন, সম্মতি জানালেন। বললেন, 'রথীদা, অনসূয়াকে বলবেন আমায় ক্ষমা করতে।' রথীনবাবু চলে গেলেন। ইতিমধ্যে শ্যামাদাস বোম্বাইতে সুপ্রকাশের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। খবর পেলেন যে সে বোম্বাই ফিরবে না, মোটরে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াবে। পুরনো চাকরদের রাতারাতি তিনি কালিয়ারীতে চালান করে নতুন চাকরদের বহাল করলেন। তারপর রথীনবাবুকে গিয়ে বললেন, 'আর দেরি করা উচিত নয়। হয় সত্যি কথা বলতে হয়। নয় বলতে হয় যে অনসূয়া মারা গেছেন।' রথীন অনেক ভেবে বললেন, 'চলুন তাই বলব—অনসূয়ার এবার মরাই ভাল।' তাঁরা বিনায়কের কাছে গিয়ে জানালেন যে, দার্জিলিংয়ের পথে একটা মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন অনসূয়া। অন্ধের কাছে মিথ্যাকে সত্য করে তোলার যত উপায় ছিল সব প্রয়োগ করা হল। বিনায়ক চৌধুরী বিশ্বাস করলেন।

এর পর বিস্তৃতভাবে বলতে পারব না কিন্তু। বলা যায় না। বিনায়ক চৌধুরী কাঁদেননি অনসূয়ার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। কিন্তু কেমন যেন হয়ে গেলেন। বাজে-পোড়া গাছ দেখেছ? তেমনি। শ্যামাদাস বাপের মত আগলে রাখলেন। আমিও। কিন্তু আমার অবস্থাও যে তখন বর্ণনাতীত। আমি গ্লানি বোধ করেছিলাম? না। বিনায়ককে দেখে অপরাধ বোধ করছিলাম। এই অন্ধ, সৎ, সুকুমার ও শিল্পী লোকটির জীবনের এক বিয়োগান্ত অধ্যায় রচনাতে আমি যে হীন বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম সে-কথা স্মরণ করে আমার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হল। বিনায়ককে বললাম সে কথা। 'আমায় ছুটি দিন।'

বিনায়ক আমার দু হাত চেপে ধরলেন, "আমাকে ছেড়ে যাবে সঞ্জয়? না না, তুমি যেও না। আমার মত অন্ধকে কে সাহায্য করবে? তুমি থাক সঞ্জয়, আমার ছোট ভাই হও—আমি তোমার মাইনে বাড়িয়ে দেব।"

থাকলাম। আমার মাইনে অনেক বেড়ে গেল। কিন্তু মরমে মরে গেলাম। শিক্ষিত যে মনটাকে জানোয়ার করে তুলেছিলাম, সে আবার নিজের সত্তা ফিরে পেল। ভাবলাম, যার এত ক্ষতি করেছি তাঁর কাছে থাকব কী করে? কোন উদ্দেশ্যে? তাও ঠিক করলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম যে আমি তাঁকে রক্ষা করব। তাঁর কুলত্যাগিনী স্ত্রীর রূপমুগ্ধ বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য আমি—তবু যেন আমি বিনায়কের দুঃখ বুঝলাম। আমি স্থির করলাম যে অনসূয়াকে আমি ভুলে যাব এবং বিনায়ককেও ভুলতে বাধ্য করব।

দিন কাটতে লাগল। আমি বিনায়কের

ছায়া হয়ে উঠলাম। তিনি স্ত্রীর বিষয়ে গল্প করেন না, বেশী কথা বলেন না। আমি চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই। তখন একদিন তাকে বিয়ে করতে বললাম। তিনি চমকে উঠে বললেন, 'অসম্ভব। অন্ধ হলেও চরিত্রবলে আমি ছোট নই সঞ্জয়।' তিনিই উলটে আমাকে বিয়ে করতে বললেন। আমিও চমকে উঠলাম। অসম্ভব। অন্য কোনও নারী আর আমার সহ্য হবে না। কোন নারীর ভালবাসা পাওয়া আমার ভাগ্যে নেই।

কিন্তু দিন কাটবে কী করে? বিনায়ক আর গানও করেন না। অনসূয়ার স্মৃতি তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রেতের মত তিনি শীর্ণ হয়ে উঠছেন। প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করলাম তাঁকে। 'বেশ ত, বিয়ে না করলেন, কিন্তু আর কিছু?' ঘৃণায় বিনায়কের মুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠল, তিনি বললেন, 'ছিঃ সঞ্জয়!' তাহলে? এবার কী করি? কী করে বিনায়ককে বাঁচাই? কি করে নিজে বাঁচি? বিনায়ককে একদিন প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা, জীবন কী? মানুষের লক্ষ্য কী?" বিনায়ক হাসলেন, 'প্রশ্নটা বেশ ত। এস জানা যাক।'

আবার কাজ পেলাম। বিনায়কবাবু আর আমার কাজ। ফর্দ করে বই আনতে শুরু করলাম। কিনে, লাইব্রেরি থেকে। দর্শন, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, বাইবেল। আমি পড়ি আর বোঝাই। আমি বক্তা, তিনি শ্রোতা। আমি অধ্যাপক, তিনি ছাত্র। আমি গুরু, তিনি শিষ্য। শুনতে শুনতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। বলতে বলতে আমি বদলে যেতে লাগলাম, বিনায়ককেও বদলাতে লাগলাম। এক চক্ষুহীন হয়েও আমি বিনায়কের দু চোখ হয়ে উঠলাম। আকাশ বাতাস ফুল-ফলের বর্ণনা করে বোঝাতে লাগলাম তাঁকে, ছবি এঁকে এঁকে তুলে ধরতে লাগলাম তাঁর কাছে। আমার পাপ স্খালনের জন্য উঠে-পড়ে লাগলাম। ধীরে ধীরে বাড়ির এঘরে ওঘরে অনসূয়া চৌধুরীর যত ছবি ছিল তার ওপর অবহেলা আর ঔদাসীন্যের ধুলো জমল। তানপুরার ধুলো গেল। আমিও তবলা শিখলাম, পাখোয়াজ শিখলাম। জীবনের অর্থ খুঁজে পেলাম আমরা, জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পেলাম।

বিনায়ক আবার গান শুরু করলেন। আরও মিষ্টি হয়ে উঠল তাঁর গলা। পাড়ার লোকেরা এসে উঁকি মারতে শুরু করল। মধুমুগ্ধ ভ্রমরের মত। দিন মাস বছর কাটল। বছরের পর বছর। এরই মধ্যে শ্যামাদাস মারা গেলেন। অন্ধের রাজ্যে এক-চক্ষুহীন আমি রাজ-সদৃশ হয়ে উঠলাম। দীর্ঘ দশ বছর কেটে গেল। সাধুর মত আকৃতি হয়ে উঠল আমাদের। বিনায়ককে

"কাউকে জানাবো না আমি, প্রতিজ্ঞা ত করেইছি"

দেখাত যোগীর মত। বীতশোক, ব্রহ্ম-পদাধিতে আনন্দিত তনু। ভবভূতির সীতাবিহীন রামের মত। এতদিন আমি গুরু ছিলাম, এবার তিনি গুরু হলেন। তিনি তাঁর দিব্য অনুভূতির কথা রোজ শোনাতে লাগলেন। মনে হল যে আর কাউকে ঘৃণা করব না, হিংসা করব না। অনুভব করলাম যে আমিই ব্রহ্ম—আমার অন্তরে ব্রহ্ম, বাইরে ব্রহ্ম। আমি অমৃত-সাগরে নিমজ্জমান এক অমৃত-কুম্ভ। সত্যকে অনুভব করলাম। বুঝলাম যে, মানুষের ঘৃণা প্রেম হিংসা ভালবাসা সুখ আর দুঃখ—এসবই গুণের বিকার, এ সব কিছুই। জানলাম যে সত্যই ভগবান।

বছর কয়েক বাদে বিনায়ক বললেন, "এবার তীর্থে চল।"

বললাম, "কোথায়?"

"হিমালয়ে—মানস-কৈলাস তীর্থে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখরে ভগবানের মুখোমুখি হতে।"

উৎফুল্ল হয়ে বললাম, "চলুন।"

বেরোলাম। আমি, বিনায়ক, তিন-জন চাকর, একজন সরকার। কুলি আট-দশজন। তাঁবু, রসদ, ওষুধ, মালপত্র আর দুটি বন্দুক। তখন যাত্রী-দের চলাচল শুরু হয়ে গেছে। আলমোড়া থেকে ডাণ্ডিতে চড়িয়ে নিলাম বিনায়ককে। পেছনে মালবাহী ঘোড়ার দল ও কুলিরা। ধর্মচিনারের পর উতরাইয়ের পথ ধরে একটু নামতেই দূরে অভ্রভেদী হিমালয়কে দেখতে পেলাম। আমি বিনায়ককে চলতে চলতে সব কিছুর বর্ণনা দিতে লাগলাম। হিমালয়ের চুড়োয় চুড়োয় তুষার রাশির ওপর সূর্যের আলো

আমি ঈশ্বরকে পাব না জানি, কিন্তু বিনায়ককে পেতে হবে।

বেলা বাড়ল। হাওয়া বাড়ল। মানসের নীল জল আমার মনের মতই অস্থির হয়ে উঠল। আমরা আবার যাত্রা করলাম কৈলাসের দিকে। কিন্তু মানসের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পেঁছতেই বিকেল হল। আমরা তখন মানস আর রাবণ-হ্রদের মধ্যবর্তী খালটার ধারে তাঁবু ফেললাম।

আবার দিন গেল। সন্ধ্যা হল। চাঁদ উঠল। কৈলাসের স্বপ্নে বিভোর বিনায়ক শাস্ত্রালোচনা শুরু করলেন। কিন্তু আমার মনে, তখন অজস্র কীট কুড়ে খাচ্ছে। আমার খালি ভুল হতে লাগল।

বিনায়ক হেসে বললেন, "কাল তাঁর দর্শন হবে সঞ্জয় ?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

বিনায়ক তানপুরোয় ঝংকার তুলে গাইতে শুরু করলেন। পূরবী থেকে শ্রী-রাগে, শ্রী-রাগ থেকে দরবারীতে গেলেন তিনি। বাজাতে আজ ভাল লাগছিল না আমার, তবু বাজিয়ে চললাম। ক্রমে আঙুলগুলো অবশ হয়ে এল।

হঠাৎ গান বন্ধ করে বিনায়ক বললেন, "কে ?"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "কেউ না।"

"আচ্ছা সঞ্জয়, কাল কে এসেছিল ?"

বললাম, "একজন লোক।"

বিনায়কের অন্ধ চোখে কি দৃষ্টি ফিরে এল ? আমার দিকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "সত্যি করে বল—স্ত্রীলোক ?"

হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠলাম। ভগবানের সামনে যে দাঁড়াতে চায় তাকে আমি কেন সত্য কথা বলব না ? সত্যই ত ভগবান। দাঁড়াক সে ভগবানের মুখোমুখী।

বললাম, "সত্যি কথা বলব ?"

"বল সঞ্জয়।"

"অনসূয়া দেবী এসেছিলেন।"

তানপুরো নামিয়ে রেখে বিনায়ক হাসলেন, "অনসূয়া তা হলে মরেনি ?"

"তাই ত মনে হচ্ছে।"

"রথীদা আর শ্যামকাকা তা হলে মিছে কথা বলেছিলেন। বুঝেছি কেন বলেছিলেন। শিব—শিব।" বিনায়ক আবার তানপুরো তুলে নিলেন, বললেন, "সত্যই ভগবান সঞ্জয়—সেই সত্য তুমি গোপন করেছিলে ?"

জবাব দিলাম না।

প্রশান্ত হেসে বিনায়ক বললে, "বাজাও ভাই।"

বললাম, "আমার হাত ফেটে গেছে।"

"আহা, শ্রান্ত হলে তুমি শোও—আমি আরও [illegible]থা।"

তিনি [illegible]র কণ্ঠে শুরু করলেন।

"ধন ধনি ভাগ, সুহাগ তেরো,
তু পিয় কে মন ভাই—"

বিনায়কের উদ্দেশে মাথা নিচু করলাম। যে ভয়কে আমি বজ্রাগ্নির মত ভয়ংকর ভেবেছিলাম তা এক ফুঁয়ে যেন কোথায় উড়িয়ে দিলেন বিনায়ক। বিনায়ক ভগবানকে পেয়েছেন। আমি হীন, নরাধম, লালসাতুর। তবু বিনায়কই আমার সাধনা। সে সাধনায় আমি সিদ্ধি পেয়েছি।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। বিনায়কের গানের স্রোতে স্রোতে কোথায় যেন ভেসে গিয়েছিলাম। হঠাৎ বন্দুকের শব্দে ঘুম ভাঙল। রাতের বেলা অমন বন্দুক ছাড়ি আমরা। ডাকাত না আসে সেই ভয়ে। কিন্তু চোখ মেলে ঘরের ভেতর আলো দেখলাম, অথচ বিনায়ককে দেখলাম না। ছুটে বাইরে গেলাম। দেখলাম আরও দু-চারজন বেরিয়ে এসেছে। দূরে মানসের নীল জলে আজও চাঁদের আলো। স্থির, অচঞ্চল জল এখন। আর তেমনি স্থির ও অচঞ্চল হয়ে রক্তাক্ত দেহে পাথরের ওপর পড়ে আছেন বিনায়ক। বন্দুকটা ছিটকে দূরে পড়েছে। মারা গেছেন তিনি।

তাঁবুর ভেতর গিয়ে দেখলাম, চিঠি রেখে গেছেন :

"সঞ্জয়, আমি ভুল পথে যাচ্ছিলাম। তুমিও ভুল করছিলে। আজ হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে, ভাল না বাসলে ঈশ্বরকে সঠিক জানা যায় না। এতদিন যা জেনেছি তা তোমার পুঁথি থেকে পড়ে। শোনানো কথা দিয়ে। কিন্তু জানা আর অনুভব করা এক কথা নয় সঞ্জয়। আমি ভালবাসতে পারিনি। কারণ আমি ভালবাসা পাইনি তাই প্রেমহীন জীবনে ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটবে না জেনেই আমি মরলাম। আমার সমস্ত জীবনের সমস্ত ঘটনাকে তুচ্ছ করে দিলাম। এই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি যে মরবার আগে আজ আমি রাজহংসের মত গেয়েছি। মানসের জলে হাওয়ার দোল লেগে যে অনন্তের সুর বাজে তা আমি শুনেছি। তুমি ফিরে যাও সঞ্জয় ইতি—বিনায়ক চৌধুরী।"

ট্রেনের গতি বেড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সঞ্জয়ের কথা থেমে যেতেই নড়ে বসলাম। এতক্ষণ যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম।

প্রশ্ন করলাম, "তারপর ?"

সঞ্জয় বলল, "আমি সেদিন সেই মানসের তীরে শেষ রাক্ত সত্যকে দেখলাম। এই সত্যকে দেখলাম যে, এতদিন এক চোখ দিয়ে আমি শুধু অর্ধেক সত্যই দেখে এসেছি। জীবনকে দেখেছি আমি অর্ধেক আলো আর অর্ধেক অন্ধকারে।"

"তারপর ?"

"অনেক ঘুরেছি। প্রায় দু বছর অনসূয়াকে খুঁজেছি। কিন্তু পাইনি। শুনেছি বোম্বাইয়ের সব-কিছু ধ্যানের সম্পত্তি দান করে তিনি নাকি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

"এখন কোথায় যাচ্ছ ?"

"চৌরঙ্গীতে। আমার নতুন মনিব সেখানে। কাঁচ কারখানার মালিক, কোটিপতি লোক। মাড়োয়ারী। মোটা মাইনে দেবে।"

"আবার চাকরি করছ ? বেশ বেশ কি করে পেলে ?"

সঞ্জয় ম্লান হেসে বলল, "আমার, এক-চোখের কথা শুনেই ভদ্রলোক ভয়ানক খুশী হয়ে গেলেন।"

"সে কী—এ কেমন লোক ?"

সঞ্জয় বলল, "এও অন্ধ।"

সিদ্ধার্থ

শিল্পী : শ্রীনন্দলাল বসু

বাসাবাড়ী

বিষ্ণু দে

বাসাবাড়ী রুক্ষ মাটি। শিকড় গজাতে লাগে
বহু গ্রীষ্ম বর্ষা বহু হিম।
ভাবি কোন্ ঘর পা। কবিতার ডাগে,
কোথায় ছড়াবে মন, পূব না পশ্চিম।

এখানে উত্তর খোলা, তবু ও ফাল্গুনে ঝিমঝিম
মন আর হাওয়া দোলে গন্ধের বাহারে,
টুনটুনির মিষ্টি গলা খুলে দেয় ঝুরঝুরে নিম,
ঘুঘু, বুলবুলি বসে আর আসে মিছিলে আহারে

[illegible] সে নিরাসক্ত [illegible] ওষ্ঠাধরে
যায় আর চুপচাপ ভাবে,
ছাতকুড়া শালিক আছে আর কাক, যতই আদরে
অন্য পাখী চাও, এরা সমানে চেঁচাবে।

বাসাবাড়ী রুক্ষমাটি অনাবাদী, ভূদানের মতো,
ত্যাগী বাসযোগ্য নয়, তাও পেতে হিমশিম,
লালিত মেলাতে নানা পাখিতে বিরক্ত আপাতত
তবুও ঘরে উঠি, ফুলে ছায় নির্বিকার নিম।

দিনলিপি : জ্যৈষ্ঠ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

হাসিময় রোদ্রের সকাল—
টেবিলে আমার ছোট রাধাচূড়া ডাল।
জীবন দেখায় হাসি মৃত্যু থেকে টেনে
আমাকে আবার।
ছুঁয়ে যাই এই আলো, যেন অন্ধকার
বুকে বজ্র হেনে
চলে যায় আজকে সকালে—
বাড়ি-ঘর স্বপ্ন দেয় চোখ ভরে স্বচ্ছ রৌদ্রজালে।
স্বপ্ন আসে অতীতের যৌবনের মতো
ভুলে যাই প্রৌঢ় বুকে আছে শত ক্ষত।
ক্ষতকে ভোলায়—
মনের যৌবন আজ, মুগ্ধ আমি জীবনের শান্তির

২

রুগ্ন বুকে সকালের শব্দগুলো ভারি
তবু শব্দ শুনি, যেন জীবনের ঝারি
ঢেলে দেয় চারদিক হতে।
এ পৃথিবী লাবণ্যের স্রোতে
রবে চিরদিন—
তোমার মতন নয়, দু'দিনের ভালোলাগা ঋণ
শোধ করে দিয়ে যাওয়া নয়।
পৃথিবীর পরিচয়
চির যুবতীর মতো পেয়ে গেছি বলে—
ভালো লাগে এ স্নিগ্ধাকে ভোর সন্ধ্যা হলে॥

মেলা

অরুণ মিত্র

গাঁ থেকে অনেকখানি পথ ভাঙার পর এই মেলা। ছেলেটাকে নিয়ে রওনা হওয়ার সময় তাদের ভয় ছিল মাঝখানের সীমানা যদি না পেরোনো যায়। অথচ গোটা বছরকে তারা এই দিকেই ঘুরিয়ে রেখেছিল। নইলে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতো কি করে? তাই মেলার জমিতে পা দেওয়ামাত্র বাপমা'র রক্তেও ঝাড় লেগে যায়। তাদের কুঁড়ে ঘরটা এখন দিগন্তের ওধারে ডুবে গিয়েছে, ঝিঁঝিঁ'র ডাক আর লম্বা ছায়া নিয়ে গাছের ঝাড়গুলো হটে হটে প্রকাণ্ড জায়গা ছেড়ে দিয়েছে আলোর জন্যে হাসির জন্যে। আর কোনো ভাবনা নেই, দৌড়ও, এক দৌড়ে একেবারে ছেলেবেলায় গিয়ে থামো।

ছোট্ট মেয়ের সামনে বিরাট দরজাটা হাসতে হাসতে খুলে গেল। এক মুহূর্তে তার মনে পড়ল ইন্দ্রধনুর তলা দিয়ে অনেকবার সে এইখানটায় আসতে চেয়েও আসতে পারেনি। ভেতরে ঢুকে সে সব কথা তার মনে থাকে না। তার পরনের ন্যাতায় এখন ফুলের নক্সা ফুটে উঠছে, সারা গা জলের মতো ছলছল করছে। এখানকার স্রোতে নিশে সে মুখটা শুধু জাগিয়ে রাখে আর চোখ বড় বড় করে দ্যাখে। কি নেবে সে, কি নেবে? শেষকালে পুতুলগুলোর সামনে এসে তাকে থেমে পড়তে হল। এই তো এতক্ষণ সে খুঁজছিল। দুটো মাটির পুতুল তুলে নিয়ে সে আহ্লাদে আটখানা। আর কিছু তার নেবার নেই।

ছেলেটা তাকে দেখেও দ্যাখেনি। স্রোতের টানে একবার কাছে এসেছিল, কিন্তু তাকে চিনত না, চিনলে চীৎকার ক'রে ডাকত। একা একাই সে তার ব্যাকুলতা নিয়ে ভেসে বেড়িয়েছে। ভাসতে ভাসতে দিশেহারা হাত বাড়িয়ে পেয়ে গিয়েছে একটা তালপাতার ভেঁপু। এখন তার খুশী আর ধরে না, যেন মুঠোর মধ্যে যাদুমন্ত্র পেয়েছে।

মেলা থেকে বেরিয়ে গাঁয়ের পথই ধরতে হয়। বয়েসের আর গাছপাথর নেই বাপমা'র। ধুলোর উপর ভারী পা ফেলে ছেলেকে নিয়ে তারা ফেরে। তার হাতে তালপাতার ভেঁপু, সেটা সে কেবলই বাজায়। পুতুল বুকে আঁকড়ে একটা মেয়ে অন্য পথে গিয়েছে, আওয়াজটা এখন সে শুনতে পায় না। কিন্তু একদিন পাবে। যখন এ গাঁয়ের হাওয়া ও গাঁয়ে পৌঁছুবে। তখন সে আকুল হয়ে কাছে আসবে। তারপর হাওয়ার জাদু ফুরোলে দুজনে মেলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দিন গুণবে।

আশ্বিনে রোদ্দুর

হরপ্রসাদ মিত্র

সে এলে আজ লাগতো ভালো এই জগতের সমস্ত রূপ-রঙ
সে আসেনি, সে আসেনি,
তাই এখানে অশান্ত মন নিয়ে
খোলা দরজা পেরিয়ে চলা
যদিও তা কাছেই,—কাছেই, মানে
চেনা রাস্তায় হাঁটা কেবল
চেনা ইঁটের রঙ-কুয়াশার বুকে—
একান্ত এই নিজের মতো সংস্কারের
রসি ছোঁড়ার খেলা!

সমুদ্রকে মাপছে পাগল
ওরে পাগল, এ তো সাগর নয়!

তোর চেয়ে ঢের সুস্থ মানুষ এই আমাদের মদন-মহাজন,
সজনেতলার মুকুন্দ শেঠ, রহিমপুরের রহিম বা রামধন
দিন গুজরান সহজ স্রোতে, তেজারতির সামান্য সব [illegible]
অভ্যাসে যায় সহজ হয়ে যে-খেয়ালী বলুবে তাদের [illegible]
নুনের মতো বিঁধবে কেবল, —নেই ও যেমন
গোপন আশ্বাস
যৌথ ভালোবাসার উঠোন পেরিয়ে যাবার যদিই-বা হয় [illegible]
আছে রাগের রক্তরাগ এই সংসার-কুরুক্ষেত্রে ঢের,
আস্ফালনের কেউ লাগে না, হাকিমবাবুই অদ্বিতীয় প্রভু'

চেনা সময়, চেনা বাড়ি—
প্রতিদিনের কান্না-হাসি [illegible]
তারই মধ্যে রাস্তা খোঁজা
যে অশান্ত নতুন প্রাণের দিকে,
নিজেকেই সে ছাড়ছে কেবল,
ছেড়ে ছেড়েই পৌঁছবে ঠিক, ঠিক।
তার প্রতীক্ষা মনে-মনে, তারই জন্যে উৎসুক সব দিক্ [illegible]

করবী ফুল ফুটছে এখন এই যে তোমার জানলাটোর আজ
ওদের মতন সহজ এবং প্রগল্ভ সুখ,
সর্বনাশের সাজ
জ্বলবে তোমার অঙ্গে অঙ্গে
সেই দেশলাই অকালিক ভরদুপুরে
মদন মহাজনের মুখে পড়লো এসে আশ্বিনে রোদ্দুর!

খুকুর মুকুর

শ্রীকৃষ্ণধন দে

খুকুর মুকুর ছোট হোক্, তবু খুকু যে দেখিতে পায়
আকাশের ছবি, পৃথিবীর ছবি, মানুষের ছবি তায়।
সাদা কালো মেঘ, তরুলতা পাখি, কত যে পথিক, পথ,
কত যে রঙিন ফুলফলপাতা, কত কুঁড়ে, ইমারত,
মোটর, রিক্‌শা, ভ্যান, সাইকেল, কত বাস, কত ট্রাম,
খুকুর মুকুরে ক্ষণিকের ছবি এঁকে যায় অবিরাম;

খুকুর মুকুরে ছায়া ফেলে কত হাসি-কান্নার মুখ,
কেহ ভ্যাংচায়, কেহ শিস্ দেয়, কেহ করে কৌতুক;
রবি দেখা দেয় মুকুরে তাহার, চাঁদ খেলে চোর-চোর,
সারাদিন খুকু মুকুর লইয়া দেখার নেশায় ভোর।
ক্ষণিক দেখার ছায়া ফেলে যায় এ পৃথিবী কি মায়ায়,
একখানি শিশুমনের মাধুরী স্বর্গ গড়িতে চায়;

হঠাৎ কখন খুকুর মুকুর ভেঙে হোল চুরমার,
খুকু কেঁদে বলে—"আমার পৃথিবী ফিরে দাও একবার!"

স্টেশন

দিনেশ দাস
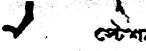
স্টেশন অনেক দূরে।
তুমি এলে রেশমী ধুলোর পথে আমাকে এগিয়ে দিতে।
এতক্ষণ ঘরে ছিলে জলের অতলে ডুব দিয়ে,
হঠাৎ আলোয় এসে
মাছের মতই যেন উঠলে লাফিয়ে।

স্টেশন অনেক দূরে।
তবু পথে যেতে যেতে ক্রমাগত
কিসের আওয়াজ শুনি,
টেলিগ্রাফ তারে-তারে হাওয়ার শব্দের মত।
তুমি পাশে চলেছিলে ঘাড়টি হেলিয়ে শুধু কথা ব'লে ব'লে।
একবার ক্ষীণ হেসে বললাম,
"তুমি [illegible]ক এখনো আছো মোমের পুতুল,
ধারে[illegible]রে রঙের বাহার ?"
তো[illegible] ঠোঁটের ফাঁকে সরল উত্তর :
"প[illegible]নো পুতুল নিয়ে খেলবে আবার ?
হ[illegible]নো খেলনা নিয়ে খেললে কি ক্ষতি ?"
[illegible]মি শুধু চুপচাপ চেয়ে দেখি, রাস্তার ধারে
[illegible]দা এক ফুলের ওপর ব'সে মিছিমিছি ডানা নাড়ে
[illegible]রো শাদা এক প্রজাপতি।

শুধু পথ হাঁটি[illegible]
[illegible]একটি গন্ধ কালোনখে আ[illegible] ধরেছে মাটি।
[illegible] কথা [illegible] [illegible]গুলি,
[illegible] কথা শুনিনি সব
[illegible] পাপড়িগুলি মাটিময় ঝরেছে কেবল।
আমি পথ হাঁটি আনমনে
শুধুই একটি পথ
যে-পথ চলেছে সোজা ম[illegible]র গহনে।

[illegible]নে হ'ল, এ মেয়েকে খুলে সব বলি,
জীবনের দুধশাদা কাগজের পাতা
[illegible]ড়ে পুড়ে মিশকালো হয়েছে কেবলই,
[illegible]খানে কেমন করে রঙিন কথার দাগ পড়ে :
ভয় হল : এ কথা বলার পরে
আরো তো নিঃসঙ্গ মনে হবে
আরো মনে হবে একা একা :
এর চেয়ে বরং অনেক ভাল
চুপচাপ পথ চলা। শুধু পথ দেখা।

এখনো আকাশে সেই একটানা আওয়াজ কিসের !
টেলিগ্রাফ তারে তারে উড়ো বাতাসের ?
হয়তো ঘুমের মত নতুন জলের সুর—
স্টেশন এখনো দূরে।

রঘুবাবুর যুক্তিতে

মণীন্দ্র রায়

জয়ন্তী, আবার আমি ছবি আঁকছি ! অবাক হ'য়ো না,
ভুলিনি দুঃখের দিন, চাকরিতেও নিইনি বিদায়।
যোগবালা বিদ্যালয়ে অঙ্কন-শিক্ষক আশী টাকা
এখনো আনবে। শুধু আরো এক বাঁচার উপায়
শিখে[illegible]সে, তাই ধুলো ঝেড়ে
ইজে[illegible] নতুন রঙ ঢালে, আর চলে ছবি আঁকা।

একদিন, জয়ন্তী, তুমি বলেছিলে—ভোলোনি নিশ্চয়—
'জীবন কী সাধারণ ! কিছুই হলো না।'
তারি প্রতিধ্বনি বুকে বেজেছিল, আর দীর্ঘশ্বাসে
সমুদ্রশ্বসিত রাত্রি অনিদ্রায় হল অশ্রুলোনা।
যেন আলো-আঁধারির বনপথে ঘুরে স্বপ্নময়
হঠাৎ এলাম নগ্ন রোদেপোড়া মঠের সন্ন্যাসে।

কেটেছে অনেক কাল। তুমি আর আমি
কেউ কারো মুখোমুখী না দাঁড়িয়ে, নিয়তিকে মেনে,
চলেছি সমান্তরাল—একটি আকাশে দুটি পাখি
দুজনে মেলার মতো কোনো শাখা আছে-কি না-জেনে
ক্লান্তির দূরত্বে বাঁচি প্রতিদিন। কী হল সহসা,
দেখ সে শূন্যতা আজ জাগে রূপে, মুছে যায় ফাঁকি।

আজকে রাস্তায়, জানো, বহুদিন পরে
পিছনে শুনেছি দূর শৈশবের ডাকনাম, আর
রঘুদাকে দেখি আসে দু' যুগ ডিঙিয়ে।
সেই হাসিমুখ, রোগা, দীর্ঘদেহ হাড়ের পাহাড়
কাছে এসে ধরে হাত; আর মেষশাবকে ঈগল
যেমন উড়ায় বেগে, আমাকেও গেল ঘরে নিয়ে।

কতোদিন পরে দেখা। প্রাথমিক কুশল প্রশ্নের
পরে জানা গেল ক্রমে, চাকরি আর ব্যবসাতে মিলে
[illegible] বার শিকল কেটে পেশা তার অরণ্যে উধাও।
এখনো খোঁজার পালা চলছে। তা হোক, এ নিখিলে
[illegible] তো সবারি আছে, ক'রে যেতে হবে, কিন্তু ভাবো
এ অভাব মেটে যদি, পাবে কি সত্যি—যা তুমি চাও।

হঠাৎ আশ্চর্য লাগে। বাণপ্রস্থ এল কি চল্লিশে ?
রঘুদা আবার বলে, 'তন্ত্রমন্ত্র জানি না, শুধুই
একটি জানালা আমি খুলে রেখে দিয়েছি। গুমোটে
তাই বেঁচে আছি। তাই সকালের খুশি নিয়ে দু' একটি চড়ুই
উড়ে আসে; আমারো এ বুনোগাছে দেখি
আনন্দে স্বপ্নের কুঁড়ি ফোটে।'

কৌতূহল সীমা ছাড়ে, প্রশ্ন করি তাই—
'কী ক'রে তা ঘটে ?' শুনি রঘুদার সলজ্জ গলায়
ধীরে ধীরে ভাষা জাগে, 'নাটকের নেশা ছিল, তাতো
জানোই, নাটক করি। আর তারি চলায় বলায়
মুক্তি পাই। কেটে গেল অর্ধেক জীবন। কী পেলাম
হিসাব কষি না। কিন্তু স্মৃতির করাতও

রক্তাক্ত করে না মন। শিখেছি—কেবল
আচমকা প্রবেশ আর করতালি নয়, আত্মদানে
প্রতি মুহূর্তের বলা-না-বলার সমস্ত মহিমা
বাঁচে শুধু চরিত্রের শেষের প্রস্থানে।'…………
জয়ন্তী, এ সব শুনে মনে হল বাঁচি, ছবি আঁকি।
প্রথমে তো মাটি, শেষে যা রাখি তা আমারি প্রতিমা।

অনিচ্ছা থেকে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সৃষ্টির আগ্রহ নেই শিল্পীর আঙুলে,
নিদ্রার নিগড়ে হাত বাঁধা।
অথচ সম্মুখে তার সিক্ত এলোচুলে
জন্ম নেয় রাধা।

কোথায় হাতুড়ি তোর, কোথা রে বাটালি,
স্বপ্নের যন্ত্রণা কই তোর।
ওরে শিল্পী, বিভাবরী বৃথাই কাটালি,
রাত্রি হয় ভোর।

আমি ত ছিলাম সেই পুষ্পিত তমালে,
প্রহর কেটেছে দুই তিন।
ভাবিনি যে, ইচ্ছা হতে পারে কোনোকালে
যন্ত্রণাবিহীন।

অথচ যন্ত্রণা নিয়ে আকাঙ্ক্ষার হাওয়া
সত্যিই রাত্রির জানালায়
এসেছিল, বকুলের-গন্ধে নিশি-পাওয়া
শিল্পীর আশায়।

তা না-হলে তরঙ্গিত যমুনার কূলে
এই রাত্রি হত না সমাধা;
নিত না নবীন জন্ম সিক্ত এলোচুলে
ত্রিকালিনী রাধা।

না, তবু আগ্রহ নেই শিল্পীর আঙুলে,
নিদ্রায় নয়ন তার বাঁধা।

সাম্রাজ্য

উমা দেবী

সে মুহূর্ত মাঝে মাঝে আসে
হৃদয়ের নির্জন আকাশে।
জীবনের খণ্ড খণ্ড ঘটনারা—খণ্ড খণ্ড ভাঙা কাঁচ—
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধারা[illegible]
কুড়িয়ে কুড়িয়ে এনে চিত্র-রচা হ'লে সেই রহস্যের আলো
তাতে প্রতিবিম্ব ফেলে জ্বলে
অস্তিত্বের গভীর অতলে।
সেখানে অনেক স্মৃতি ঘুমায় মুক্তার মত বিস্মৃতির
শুক্তি-গর্ভাশ[illegible]
অনেক আশ্চর্য ক্ষণ ধীরে ধীরে জেগে ওঠে উজ্জ্বল
প্রবালদ্বীপ হ'[illegible]
হৃদয়ের ভরন্ত বিশ্বাস
অনায়াসে ফেলে মুক্তিশ্বাস।

সে মুহূর্তে তোমাকেই মনে হয় সে দ্বীপের একক [illegible]
এলোমেলো জীবনের ভাঙা রাজ্যপাট
আবার বিন্যস্ত কর দৃঢ়রশ্মি করে
সুশাসিত নিস্তব্ধ প্রহরে।
সযত্নে শাসন কর অশ্রুর সমুদ্র-ঘেরা বাসনার স্বর্ণময় দ্বীপ,
সমুদ্র মেখলা এই ধরিত্রীরই সম্রাট-প্রতীপ।

সে মুহূর্ত মাঝে মাঝে আসে
নির্বাপিত কাম-তৃষ্ণা শান্ত অবকাশে,
ধ্যানের দেবতা হ'য়ে রূপ পায় যে মুহূর্তে [illegible]নীর
[illegible]
হিসাব বিস্মৃত হয়—কি নিলেম—কিংবা কি দিলেম—
হৃদয়ের ভরন্ত বিশ্বাস
অনায়াসে ফেলে মুক্তিশ্বাস।

ভালোবাসি

অরুণকুমার সরকার

মানুষ এখনো মাটির পুতুল কেনে
রথের মেলায় বাঁশি,
জানলায় দোরে গভীর পর্দা টেনে
হেসো না অবিশ্বাসীর বিজ্ঞ হাসি।

স্নিগ্ধ আলোক রয়েছে শিশুর চোখে
আশা প্রেমিকের মনে।
শ্রাবণদিনের আর্দ্রতা কারো শোকে
[illegible] জাগরণে।

ছোটোখাটো সুখ ব্যর্থতা চেষ্টার
হাজার জীবন চলে
সমুদ্রে নয়, দূর নির্জন উপত্যকায়;
একা একা কথা বলে।

সেই কথাগুলি পুতুল বানায়, বাঁশি
বাজায় উদাস সুরে।
সব সত্ত্বেও জীবনকে ভালোবাসি
বলে শুধু ঘুরে ঘুরে।

পারস্পরিক

জগন্নাথ চক্রবর্তী

আমি তবু ছাদের দরজা খুলি—
কনকনে শীতের রাত্রে যখন পাখিরা হিমে জড়
গ্যারাজে গাড়ির মতো গুটিশুটি, নিরাপদ নীড়ে;
নির্বান্ধব গলি শূন্য; জনশূন্য। কার্নিসের নীচে
দরিদ্র মাধবীলতা—আমারই আশ্রিতা—চুপ;
কুয়াশায় আবৃত কলকাতা।
আমি তাকে খুঁজি
যে আমাকে অহরহ খোঁজে।

আমি তবু ছাদের দরজা খুলি—
শ্রাবণের উচ্ছ্বসিত জল, অথৈ, দুরন্ত, মত্ত-
[illegible]র্জাতির আড়ালে না, অসংকোচে ভিজি।
সেই দণ্ডে আমি যেন মাধবীলতার কেউ, নিরাশ্রয়;
পৃথিবীর মতো কান্না আমার শরীরে নামে, আমি স্তব্ধ।

এই বর্ষা রস ঢালে গোপন শিকড়ে
চন্দ্রমল্লিকার আর লজ্জাবতী লতার গহনে,
এই বৃষ্টি গান গায় বেহালার তারে।
আমি তাকে দেখি
যে আমাকে অহরহ দেখে।

আমি তবু ছাদের দরজা খুলি—
আমি নয়, অন্য কেউ যেন—
কে যেন দরজা খুলে দেয়, ডাকে,
[illegible] হরিণীর মতো উঠে আসি,
আমার বাঘকে খুঁজি, কস্তুরী সৌরভে ঢাকি
আমার মৃত্যুর পথ।

নিষ্ঠুর কৃতান্ত ব্যাধ, তাকে খুঁজি
যে আমাকে অহরহ খোঁজে।
কনকনে শীতের রাত্রে আকাশের নীচে
বৃষ্টির ঝড়ের মাঝে করুণ শ্রাবণে
আমি তাকে দেখি
যে আমাকে অহরহ দেখে॥

ক্রান্তিকাল

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

আশ্বিনে আমার জন্ম, তোমার ফাল্গুনে—
শুভ্র কাশমঞ্জরীতে তুমি আনো পলাশের লাল;
আবর্তিত ঋতুচক্রে আমরা দুজনে রাখি ধরে
দুই হাতে দুই ক্রান্তিকাল।

আমি থাকি নীল শূন্যে ফেরারী মেঘের শুভ্রপালে
তুমি থাকো মাটিতে নিহিত;
তোমার রেখেছে ঘিরে ধাতু-জল-বীজ ইন্দ্রজালে
কখন যে হবে জাগরিত!

আমি আসি আকস্মিক বর্ষণের সজল আবেগে
মাথা কুটি মৃত্তিকার দ্বারে,
কুমার-সম্ভব নাট্যে কখন জাগবে তুমি উমা
হিন্দোলে না বসন্ত-বাহারে!

শমী শাখা দীর্ণ করে যেমন সহসা অগ্নি আসে—
তুমি আনবে পলাশের বিভা,
আমি দেব শরতের আমনের সম্ভুল সংবাদ'
সংহতির প্রদীপ্ত প্রতিভা।

সৃষ্টি স্থিতি কাঁপে এই মিলনের রাগিনী ঝঙ্কারে:
নাচি সেই আনন্দ সংহিতা—
বসুন্ধরা যে আবেগে থরো থরো আলিঙ্গনে বাঁধে
বন্দনা প্রজ্ঞাপারমিতা।

পৃথিবীর দুই লগ্ন মিশে যায় সে-কেন্দ্রবিন্দুতে,
সেইখানে নৃত্যময় সবই
নটরাজের মত মাতে বিশ্ব ঘূর্ণমান বেগে
নাচে লক্ষ গ্রহ-তারা-রবি।

নির্জন চেতনা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

ছায়ার মতোই যেন দূরে-দূরে সঙ্গে-সঙ্গে আছে!
সুহৃদ বৃষ্টির পর একমুঠো রোদের মমতা
কখনো সে। পক্ষান্তরে মনীষীর প্রেরণার কাছে
দর্পণে প্রিয়ার চোখ, হৃদয়ের নিখুঁত স্বচ্ছতা।

একটি পাখির শুভ্র আকাঙ্ক্ষায় আধো অন্ধকারে
নিভন্ত সত্তায় আনে সারাক্ষণ নক্ষত্রচেতনা;
ভেজায় তৃষিত মাটি, ছড়ায় দু'হাতে বারে বারে
দুঃখের অশ্রুদ্রুতা জল, প্রত্যাশার স্বর্ণশস্যকণা।

অভিভূত বনান্তে যখন তৃষ্ণায় পিচ গলে,
আগ্নেয় আবেগ জাগে বিচলিত অন্ধকার কোণে
এবং বিদ্যুতের সংঘর্ষের ক্ষুব্ধ রোষ জ্বলে—
সে আমাকে নিয়ে যায় জীবনের গভীর অতলে

সেখানে সন্ধ্যার চোখে সৃজনের মায়াবী কাজল
এবং ঊষার বাঁকে রক্তিমাভ দিগন্তের বাঁক;
আকাঙ্ক্ষায় যন্ত্রণায় সুগভীর তবু অচঞ্চল
সেখানে গুহার মুখে নিরুচ্চার সিংহকণ্ঠ হাঁক।

সেখানে সফেনবেগে কল্লোলিনী হৃদয়ের নদী
মুহূর্তেই ত্রিলোকে, একবার ডাক দিই যদি॥

রূপান্তর

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

মরুভূমির বিফল গোধূলি
সবুজ শস্যের সুষমা নিয়ে ফিরে আসবে,
আলস্যের বিষণ্ণ দিনগুলি
শ্রমের ফাঁকে আনন্দে হাসবে,
বেকারকে আমি কাজ দেব,
সেই রূপান্তরের স্বপ্ন দেখি।

হায় হেমন্ত, এ বারেও আমি লজ্জিত,
তোমার ফসল ফলাতে পারিনি,
নামতে পারিনি মাটির মর্মমূলে,
আমার মান্ধাতার আমলের লাঙলে
কবির পুরনো ভাব ও কৌশল
রসের গভীরে আমাকে নিল না।

আমার শিকড়কে নিয়ে চলো মাটি,
তোমার হৃদয়ের আরো গভীরে,
কবিকে নিয়ে চলো দুঃখিনী নারী
তোমার হাসি-কান্নার গোপন খনিতে,
বসন্তকে আমি কথা দিয়েছি,
আর সৃষ্টিতে কৃপণ থাকব না।

ক্ষীণায়ু

অরবিন্দ গুহ

আমার বাগান নেই। কিন্তু আমি তোমাকে অম্লান
কিছু ফুল দিতে চাই। তা ব'লে কি দোকানীর কাছে
ফুল কিনতে যাবো ? না, যাবো না। মনে-মনে বলি, 'আনো,
আগে আনো বাগানের দিন, বীজ, ফুল ফোটাও গাছে।'
তাছাড়া কি অন্য ফুল আমি নিতে পারি, দিতে পারি ?
না, পারি না। আগে চাই বাগান, বিশ্বস্ত সহকারী।

ফুল ফোটানো তেমন সহজ নয়। একটি ছোটো চারা
অনেক চেষ্টায় যত্নে ধৈর্যে পরিশ্রমে বেঁচে থাকে,
বড়ো হয়, পাতা মেলে, ফুল ফোটায়। সতর্ক পাহারা
কিন্তু সারাক্ষণ রাখা চাই। মানে, আমি যা তোমাকে
দেবো তা ও ফোটাবে আপন রক্তে—সর্বস্বের ভারে
উদয়াস্ত ছয়ঋতু সাতসমুদ্রের সমাহারে।

সব বাতাস, যাবতীয় বৃষ্টিমেঘ বন্ধু ? না, বন্ধু না।
পরাক্রান্ত কীট বৈরী। সব শত্রুতার প্রতিবাদ ?
আমার অপার প্রেম কম্পমান। সুন্দর করুণা
তাই দেবে অন্য বায়ু, বৃষ্টি, মেঘ—গন্ধে, বর্ণে, স্বাদে।
অযত্ন-নিযুত ফুল কে চায়। কয়েকটি ক্ষীণজীবী
উপহারে ধন্য হবে বাগানের নিভৃত পৃথিবী।

ক্ষীণায়ু আমার দিন। যদি ফুল ফোটানোর আগে
দিন যায়, রাত্রি যায়, জীবনযৌবন দেশান্তরী
হয়ে যায় ! তাহলে কি বাগানের সীমান্য ভূভাগে
বিপুল সুদৃঢ় ফুল নিতে আসবে ? দুঃসাহসে ভরি
আমার ক্ষীণায়ু রাত্রি ঃ তুমি আসবে অন্ধকারে। ঘাসে
[illegible] পুনর্বসু, অনুরাধা অতন্দ্র আকাশে॥

অনেক দিনের শূন্যতা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ভেবেছিলাম বুঝি আর কোনদিন মনেও পড়বে না
হে আমার উত্তরের জানালার আলো
শুকুরঙে দগ্ধ দিন, তৃষ্ণা, শোক, খর চক্ষে চেনা
দেওয়ালের লম্বমান অন্ধকার, জীর্ণ স্মৃতি জীবনে ছড়ালো,—
হাওয়ার নিপুণ শিল্প রেখে গেল চক্ষে ওষ্ঠে মুখে
কালের পুরোনো গল্প, বে[illegible] যেন চির [illegible]
একলা ঘরে স্থির থাকি, তিনটি ইঁদুর এসে
প্রতিদিন ঘুরে ফিরে চোখের সম্মুখে
একদিন গলি কেটে আমার বুকের মধ্যে করে এল
পাতাল দর্শন।

পদ্মপত্রে নীর কাঁপে, বেলা ভাঙে সায়াহ্নের মায়াবী শরীরে
হে আমার উত্তরের জানালার আলো,
আকাশে একটি স্থির নিষ্ঠুর আলেয়া জ্বলে
আমাকে বলেছে ধীরে ধীরে,—
সমস্ত গবাক্ষ রুদ্ধ করে দাও, ভুলে থাকা সবচেয়ে ভালো।
অলিন্দ সর্পের মত ভেদ করো অন্ধকার যোনির গহ্বর
দ্বার খোলো নৈঃশব্দের, চেয়ে দেখ পুনর্জন্ম, মৃত্যুর বিভাস,
ভুলে যাও প্রেম-পুণ্য, রক্তস্রোত মুগ্ধ ডাক, প্রিয় কণ্ঠস্বর
সমস্ত মানুষ দেখ দুরিত স্বপ্নের ক্রীতদাস।

বহুদিন পর আজ ঘুম ভেঙে মনে হল আমার শিয়রে
শীতল দুঃখের মূর্তি, হে আমার বিস্মৃত বাসনা,—
উদাসী হাওয়ার সঙ্গী সুগন্ধের মত তুমি ভরে আছ
অন্ধকার ঃ
হৃৎস্পন্দনের শব্দ অস্তিত্বের, জীবনের স্বরে উপাসনা।
সব দৃশ্য মনে পড়ে, সব আলো, সুখ-শোক,
রমণীর উজ্জ্বল হ
বোধি এসে কণ্ঠ চাপে, যন্ত্রণায় মুচড়ে ওঠে প্রাণ ;
লোভের আঙুল দিয়ে আমি কোন ভবিষ্যৎ করিনি তো ঃ
দূরের আলেয়া তুমি দূরে যাও,
ঘনিষ্ঠ আলোর আমি করি স্তুতিগ

বোধন

গোবিন্দ চক্রবর্তী

দিগন্তে
অদৃশ্য মেঘের পাখোয়াজ।
এখানে জলের মত সুরে
ঘুরে-ঘুরে ডাকে।
নদীস্রোতে এস্রাজের ছড়—
গীটারের মত দোয়েল-শ্যামার কণ্ঠস্বর।
শিউলি ফোটে, স্থলপদ্ম ফোটে—
ক'টি অপরাজিতা।

সবুজ আগুনের মত
আমের শাখা, বেলের পাতা।
পাকা ধানে
হলুদ পোখরাজের আলো।
ঘাসের শীষে মুক্তো জ্বলে ঃ
কাশের শীষে হীরে জ্বলে ঃ
আরেক নীল আগুনে
গনগন করে আকাশ।
কোথায় একটি হোমের আয়োজন
এই বুঝি সম্পূর্ণ হ'ল।
পৃথিবী—দেবতার মত।

এই প্রতিপদে,
প্রতি পদে শুধু পদক্ষেপ শুনি
তৃণে, তারায়, পাহাড়ে—সমুদ্রে।
পথের পাঁওদলে,
মানুষের মনে।
শুধু পদক্ষেপ শুনি,
পদক্ষেপ শুনি।

একটি কবিতা

অবন্তী সান্যাল

হৃদয়ের মুখে ফুঁ দিয়েছিলাম
বেজে উঠেছিল শঙ্খের গর্জন,
শিরা উপশিরা নেচে উঠেছিল যুদ্ধের ঘোড়ার মত,
পেশিগুলো যেন ছিলা-টানটান ধনুক।

মনের আগুনে ফুঁ দিয়েছিলাম
জ্বলে উঠেছিল দাউদাউ দাবানল,
পুড়ে ছাই হ'তে চেয়েছিল ভূতভবিষ্যৎ বর্তমান—
ইহকাল পরকাল সমগ্র অস্তিত্ব।

হৃদয়ের মুখে ফুঁ দিলাম
ককিয়ে উঠল ফাটা বাঁশির আর্তনাদ,
শিরা উপশিরায় জেগে উঠল হিমশৈলের সঞ্চরণ—
পেশিগুলো প্রাণহীন রক্তহীন শ্লথ।

মনের আগুনে ফুঁ দিলাম
কুণ্ডলী পাকিয়ে এল চোখ-জ্বালা-করা ধোঁয়া,
মাথা তুলে দাঁড়িয়ে উঠল দম-আটকানো বিরাট পাহাড়—
অস্তিত্বের চারপাশে নাস্তির আড়াল।

স্মৃতিরেখা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

উমি বলেছিল, ভুলে যেয়ো,
রুমি বলেছিল, মনে রবে?
ইলা ছিল যুবতী বিধবা
বড়ো ভয়, বুঝি পাপ হবে।

কে লিখে রেখেছে কথাগুলি
কিছু ডায়েরিতে, কিছু মনে;
নতম চোখ চম্পক-অঙ্গুলি,
হারালাম নীল ফুলবনে॥

আকাশ

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

সেই দিনগুলো জানি যে নেই
গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়েছে হাওয়ায় মিশে ঃ
সময় যখন চোখে-চোখেই
চেয়েই কাটত—বয়সটা উনবিংশে।

একফালি চাঁদ, নীল আকাশ
নিয়েই যে ছিল জীবনটা প্রজাপতি;
ভালবাসতুম ফুল যে ঘাস—
একটি নীড়ের নিবিড় স্বপ্ন অতি।

আকাশ সেদিন অনেক কাছে
নেমে এসেছিল দু'চোখে জ্যোৎস্না নিয়ে,
খোলা জানালার ফ্রেমের কাছে
সাদা শাড়ি তার গিয়েছিল আটকিয়ে।

সে আকাশ আজ অনেক দূরে...
জানিনা কখন বহুদূরে স'রে গেছে,
একা, কেউ নেই, শুধু দূরের
সাড়া ভেসে আসে, মনটা কী বুড়িয়েছে?

আয়নায় মুখ

চিত্ত ঘোষ

আয়নায় ত্রিকোণ মুখ। শোকার্ত ত্বকের রেখা জ্বলে ঃ
ক্ষয়ের অথই শূন্যে সে-অতীত পরিত্যক্ত গুহা—
স্মৃতিসেতু অন্ধকার। গভীরতা গাঢ়স্বর জলে,
বর্ষার দুর্বার নদী ধাবমান তরঙ্গে আত্মহা।

সে কেন নিশ্চিন্ত তবু? ক্লেদ, ক্লান্তি, নশ্বরতা তার
লালিত গর্হিত স্বপ্নে। অগ্নিময় নিবন্ত আয়নায়
দগ্ধ দেহ, দগ্ধ পরিণাম। প্রতিচ্ছবি নিঃসংগ তুষার
হরিৎ শস্যের বর্ণ হেমন্তের অশ্রুর পাতায়।
থামবে না কখনো তুমি তারাময় তরঙ্গের গান ঃ
হে সময়, অন্ধকার স্রোতমগ্ন নদী—
হে আকাশ, জলধারা, হে শুভ্র পাষাণ
আমাকে যা দিলে দাও, তাকে দিও সে-দানের ক্ষতি।

শিশিরের মুখ

বটকৃষ্ণ দে

ঝুর্ ঝুর্ বৃষ্টি, বাইরে। ঘরে নম্র নীল আলো আঁকা।
রেডিয়োয় রবীন্দ্রসংগীত, শোন, সুচিত্রা মিত্রের;
দেয়ালে যামিনী রায়, কাছে কাব্যগ্রন্থ, বিচিত্রের
বিচিন্তা, দর্শন, আমি কে, তুমি কে !—এই আমি-তুমি,
এই যে টুপ্ টুপ্ বৃষ্টি, তার মূলে দূর মেঘ-ভূমি
তারও পারে ওই যে আকাশ, ওই দূরান্তৃত ফাঁকা
পাতালোক, সেখানে ঝংকার ঝরে দ্বৈত রাগিণীর,—
দুই-এক-হওয়া মন্ত্র গেয়ে চলো বেদনা বৃষ্টির !

ঝির ঝির শান্তি, বাইরে। বৃষ্টির শ্লোকের শোক শেষে
সুখের আনন্দঘন মৌন মন পৃথিবীকে দেখে,
শিল্পী যাকে রক্ত-রঙ যন্ত্রণার তুলিকায় আঁকে
প্রশান্ত প্রদীপ্ত ছবি, সুর যাতে রূপ পায় এসে,—
(সেই প্রেম !) সৃষ্টির বেদনা-তীর্থে পরিস্নাত সুখ
—ভোরের শিউলি-শীর্ষে রাত্রি আঁকে শিশিরের মুখ।

গাগরীটা পড়ে আছে

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

শাদা মশা ছেঁকে ধরে, হাঁটুতে এখন ধৈর্য নেই,
ঘড়ির কাঁটার মতো হৃৎপিণ্ড সব নিচ্ছে মেপে,
এখন এখানে কোনো শিউশরণ প্রদীপ জেললো না,
বিবেকের হাতে আমি মারা পড়বো প্রদীপ জ্বললেই।
বিবেক দেখতে ঠিক মোম-শাদা ভূতের মতন,
মাংসমেদমজ্জা নেই, আর আমি এই সন্ধ্যাবেলা
ক্লান্ত আছি, তাকে দেখে ঠিকমতো কথোপকথন
যদি না চালাতে পারি !

তবু দ্যাখো পা-তোলা পা-ফেলা,
ঘড়ির কাঁটার মতো বিতর্কমূলক পদক্ষেপে
হৃৎপিণ্ড চলেছে যে, এই ভালো। যে তার গাগরী
ভরেছিল, সে এখন দূরে, নীল দিগ্বলয় রোপে;
লবণাম্বুহীনতায় পড়ে আছে গাগরী একেলা,
শীতে ফাটা ওর ঠোঁট শাদা মশা হয়ে ছেঁকে ধরি।

জনান্তিক

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

সকলেই ছদ্মবেশ ধরে আছে দৈনিক নাটকে।
কেউ প্রেমে সুখী, কেউ পরাজিত, প্রত্যহ সংসার
[illegible] নিচ্ছে নেপথ্যের [illegible], মন [illegible]
আলো [illegible] [illegible] দুঃখে-সুখে আনন্দে [illegible]
প্রত্যেকেই মগ্ন কোনো নিজস্ব নিপুণ ভূমিকায়।
বহুরূপী রাত্রিদিন দৃশ্যপটে রেখেছে আকাশ
নীলিমায় মেঘের শিল্প, রৌদ্র-ঝড়, দীর্ঘ বার মাস
আবহসংগীত বাজে ঋতুরঙ্গে, বসন্ত-বর্ষায়।
সকলেই ছদ্মবেশ ধরে আছে প্রাচীন নাটকে—
ক্লান্তিহীন রঙরেখা, তুমি এর [illegible]ভেদের গভীরে।
আর না, এবার তুমি খুলে ফেলো ছদ্মরূপময়
নকল ছায়ার মূর্তি, জীবনের শুদ্ধ দুঃখ-শোকে
আনন্দে সুখের স্পর্শে উন্মোচিত হও ধীরে-ধীরে।

দ্যাখো, কার চোখে জ্বলছে স্বচ্ছ, মুগ্ধ, পবিত্র প্রণয়।

আলোছায়া

সুনীল বসু

শ্যাওলা ঝোপ সরিয়ে বুঝি পানসি চলে বেঁকে
আকাশ দেখ তারা ফুলের সাজি।
ডাক-পাখিরা জলাবিলের চড়ায় ওঠে ডেকে
অকূল গাঙে বৈঠা বায় মাঝি।

রেশমী সুতো জোছনা যেন মেঘের তাঁতে বোনা
লুটিয়ে ঝলে পদ্মফোটা ঝিলে
প্রিয়তমা বশ করেছো তোমার চোখের নীলে
বশ করেছে তোমার হাতের ঝিলিক দেওয়া সোনা।

হ্যারিকেনের দুলছে আলো দূরের আলপথে
চাঁপাগাছের চাতালটার কোলে
কুয়োতলায় বালতিতে জল তোলে
রেশমী ছায়ার ডুরে শাড়ি দেখায় খদ্যোতে।

পানসি গেল দূরের বাঁকে হালকা চালে ঘুরে
শীতের লেপের উষ্ণতা কি মিঠে
নীড় বেঁধেছি অনেক হাজার ইঁটে
তনুর তাপ লাগুক এবার অবশ অঙ্গ জুড়ে॥

আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি। একজন প্রবীণ অধ্যাপকের বাড়িতে কোন প্রয়োজনে গিয়েছিলাম। তখন আমি নিজে অপ্রবীণ। গিয়ে দেখি বাইরের ঘরে কতকগুলি বই স্তূপায়মান—কলেজ স্ট্রীটের পুরাতন বইয়ের দোকানের একজন মালিক বইগুলির স্বাস্থ্য, মূল্যবত্তা ও শ্রীসৌষ্ঠব পরীক্ষা করছে। গৃহকর্তা আরও বইয়ের সন্ধানে তেতলায় গিয়েছেন। ওই বইয়ের স্তূপে নৈবেদ্যের উপর মোণ্ডার মত আমার রচিত উপহৃত তিনখানি বই বিরাজ করছে। এই দেখে আমি দ্রুতবেগে পলায়ন করলাম—শ্রদ্ধেয় অধ্যাপককে অপ্রতিভ ত করা যায় না। আমারই উপহৃত আমার নিজের বই কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথ থেকে দু আনা দশ পয়সায় অনেকবার কিনে এনেছি। এপথ দিয়ে আমার বহু পরিচিত লোক চলাফেরা করে, কাজেই উপায় কী?

সম্ভ্রান্ত আত্মীয়কে তিনবার একই বই দিয়েছি—তিনি তবু বলেন, "তোমার সেই হাসির গানের বইখানা দিলে না ত! তোমার বই কি কিনতে হবে নাকি?" তর্ক করিনি, চতুর্থবার আর-একখানি বইয়ের অপচয় করেছি।

বন্ধু বাড়িতে এসেছেন—বই উপহার দিয়েছি—নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছেন। তবু ভাল, আমার বই আমার কাছেই থাকল। নয়ত তিনি ট্রামে বাসে ফেলে যেতেন। মোটর চড়ে এলেই কি উপহৃত বই তাঁর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছত? একজন মোটর-ড্রাইভার একবার আমাকে বলেছিল, "আপনার পদ্য ও ছড়াগুলো বেশ মিষ্টি সার্—বাড়ির ছেলেমেয়েরা সব মুখস্থ করেছে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার কোনও বই কিনেছ নাকি?" সে বলল, "না সার্। সেদিন মেজোবাবুর হাতে একখানা বই দিলেন। বাড়ি পৌঁছে মোটর থেকে নেমে তিনি উপরে উঠছিলেন—আমি বইখানা দিতে গেলাম ছুটে, সিঁড়ি থেকে তিনি বললেন, ওখানা তুমিই নাও। আমার বেশ লাভ হল।" দেখলাম অপহৃত না হলেও সে বইখানা একজনের কাছে বেশ সমাদর লাভ করেছে। মেজোবাবুর দোতলায় উঠলে তার পাতা কেউ খুলত না। কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথেই চলে যেত।

একজন পদস্থ প্রতপত্তিশালী ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম—রসচক্রের প্রকাশিত ১৮ খানা কথাসাহিত্যের বই উপহার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি যথেষ্ট সৌজন্য দেখালেন, কিন্তু বললেন, "বাংলা বই আমি ত পড়ি না, রেখে যান, থাক্, মেয়েরা পড়বে।" একখানা বইও হাতে করে ছুঁলেন না। বাড়ি ফিরে ভাইয়ের কাছে তিরস্কৃত হলাম। আর এক বন্ধুকে একখানা বই উপহার দিলাম বাড়িতে এসে। চলে গেলে দেখলাম বইখানা পড়ে রয়েছে। পরদিন দেখা হলে জিজ্ঞাসা করলাম, "বইখানা না নিয়েই চলে এলে কেন?" সে বললে "আমি আনন্দবাজার জড়িয়ে তোমার সাক্ষাতেই ত নিয়ে এলাম। এখনও অবশ্য তা মোড়ক খুলে পড়বার অবসর পাইনি।" আমি বললাম, "বাড়ি গিয়ে দেখবে, সে বইখানা বিভূতির 'দৃষ্টিপ্রদীপ'। আমার বই তোমার নামে উপহার লেখা এ বাড়িতেই রয়েছে—'দৃষ্টিপ্রদীপ' বই খুঁজে পেলাম না।" যাই হক, 'দৃষ্টি[illegible]দীপ'টাও ফেরত পাইনি—উপহৃত বইও সে নিতে আসেনি।

রা—বাবু ছিলেন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ঐতিহাসিক। তিনি আমাকে ও আমার বন্ধু শ-কে খুব ভালবাসতেন। তখন আমাদের বয়স বাইশ-তেইশ। তাঁর সিমলা স্ট্রীটের বাসায় দেখা করতে গেলে তিনি আমাকে তাঁর সাতখানা বড় বড় বই উপহার দিয়েছিলেন। আমি শ-এর কাছে সগর্বে সে কথা বললাম। তাতে শ—বলল, "আমাকেও দিয়েছিলেন সাতখানা বই। বোঝা বইতে হবে বলে আনিনি।" ভাবলাম শ—মিথ্যা জাঁক করছে। রা-বাবুকে শ-এর কথা বললাম। রা-বাবু বললেন, "হাঁ, আমি শ-এর জন্য চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করতে বাড়ির ভিতর গেলাম—ফিরে এসে দেখি শ—পালিয়েছে—বইগুলোর মধ্যে কেবল একখানা নেই। ও বুঝি ইতিহাসের বই—পছন্দ করে না?"

উপহৃত বইয়ের দুর্দশা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

আমি একজন অকৃতবিদ্য শিক্ষকমাত্র সাহিত্যসেবার দ্বারা কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিনি—পদগৌরবও আমার নেই। আমি নিজে রাশি রাশি পুস্তক উপহার পাই না। জ্ঞানগর্ভ মূল্যবান বাংলা পুস্তকগুলি হয় কিনেছি, নয়ত ভিক্ষা করে পেয়েছি। অবশ্য কথাসাহিত্যের দু-দশখানা বই উপহার পেয়েছি, অধিকাংশই অনুজ সাহিত্যিকদের কাছে চেয়ে নেওয়া—ইচ্ছা করে শ্রদ্ধাবশত উপহার কচিৎ কেউ দিয়েছে। রাশি রাশি অপাঠ্য বা দুষ্পাঠ্য কবিতার বই উপহার পাই। তাই আমারও উপহৃত পুস্তকের প্রতি দরদ নেই। উপহৃত অধিকাংশ উপন্যাসও বাড়িতে নেই। ছেলেদের মাসিমারা বেড়াতে এসে সব নিয়ে যায়, পনেরো দিনের মধ্যে সে সব বই টালিগঞ্জ থেকে টালায় কিংবা বালিগঞ্জ থেকে বালিতে চলে যায়। উপন্যাসগুলোর পাখা আছে। ওগুলো কিছুতেই পোষও মানে না। যে পোষ মানে না, স্বতই তার প্রতি দরদ থাকে না।

পদস্থ, সম্ভ্রান্ত ও সুপণ্ডিত লোকদের পরিতোষণের জন্য আমরা বই উপহার দিই। সেগুলিকে তাঁদের গৃহে রাখবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা দেখতে পাই না। অধ্যাপকরা [illegible] অধ্যাপনায় সহায়ক গ্রন্থগুলিকে, ব্যবহারজীবেরা আইনের বইগুলিকে যত্ন করে রক্ষা করেন। অনেক পদস্থ লোকের বাড়িতে পোশাকের জন্য ও খেলনার জন্য স্বতন্ত্র আলমারি দেখি, কিন্তু সাহিত্য-পুস্তক রাখার জন্য স্বতন্ত্র আলমারি দেখি না। তাঁদেরও বই উপহার পাওয়ার আগ্রহ নেই—অতএব বই উপহার দিয়ে তাঁদের তুষ্ট করা যায় না। অধিকাংশ উপহৃত বই সরাসরি না-হোক একাধিক হাত ঘুরে শেষ পর্যন্ত পুরাতন বইয়ের দোকানে চলে যায়। যাঁরা পুরাতন বই কেনেন, তাঁরা পুরাতন বইয়ের পাতা উল্টিয়েই দেখতে পাবেন—কে কাকে বইখানা উপহার দিয়েছেন। সেয়ানা লেখকরা বইয়ের এমন পাতায় উপহার লেখেন যে, পাতাটা ছিঁড়ে নতুন বই বলে তা দোকানে বিক্রি করা চলবে না।

যাঁর নামে কোন বই উৎসর্গ করা হয়—উৎসর্গ-করা বই একখানা অন্তত তিনি সযত্নে রক্ষা করবেন—এ প্রত্যাশা করা [illegible]। সকলেই কি তা করেন? অনেকে [illegible] দিনের মধ্যে উৎসর্গের কথা ভুলে [illegible] একখানা পোস্ট কার্ড লিখেও অনেকে একটা ধন্যবাদও দেন না। উৎসর্গের দ্বারা সম্মানিত ব্যক্তি ও উৎসর্গকারী লেখকের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্কও গড়ে ওঠে না। এবিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে।

যাক, এ সব অবান্তর কথা। যা বলছিলাম তাই বলি—[illegible] মূল্যের বইগুলো ও বেকার [illegible] বইগুলোকে তালা বন্ধ করে রাখতে হয়। জানি না তারা বন্দী হয়ে স্বাধীনতা [illegible] অধিকতর সমাদর লাভের জন্য ব্যাকুল কি না। অধিকতর সমাদর যারা করবে তাদের চোখে যাতে না পড়ে সেজন্যই এই বন্দী রাখার ব্যবস্থা। আমার নিজের নামে উৎসর্গ-করা বইগুলোকেও আমি আলমারিতে তালাবন্দী করে রেখেছি—এগুলি আমার পরম সম্পদ। যখনই সেগুলি আমার চোখে পড়ে তখনই তাদের লেখকের উদ্দেশে আমার হৃদয়ে প্রীতি বিগলিত হয়। যখনই এই সব উৎসর্গের কথা মনে পড়ে, তখনই তাদের রচনার উদ্দেশে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে মতামত ব্যক্ত করতে কুণ্ঠা বোধ করি।

ইংরাজী ও সংস্কৃত বইগুলিকে বন্দী করে রাখার প্রয়োজন হয় না। 'বিদ্যাপতির পদবলী' সংস্কৃতও নয়, ইংরাজীও নয়। এর সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত ছিল। আমার দুখানি বিদ্যাপতি অন্য সাহিত্যানুরাগীর গৃহে অধিকতর যত্ন আদরে রক্ষিত আছে—সে যত্ন আদর যদি এ গৃহে পেত, তা হলে তা গৃহান্তরিত হত না।

গ্রন্থের যথোচিত আদর করতে হলে চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করতে হবে।

যুবতী-হৃদয়

সন্তোষকুমার ঘোষ

"এ-বাসটা ভাল না, এই বাসে যাব না।"

অন্য সব দিনের মত আজও বিশবস্ত রেনটি-গাছটা ছাতা ধরে ছিল, মাদী শূয়োরটা নর্দামার কাদা শুঁকতে শুঁকতেই মুখ তুলে এক-একবার ভীত চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল, দুপুরের চড়া রোদে কৃষ্ণচূড়াগাছটাকে খুব রাগী আর এলোচুল মাতালের মত লাগছিল, মোটর-মেরামতী দোকানটায় লোহাপেটানো আওয়াজের বিরাম ছিল না। কাছাকাছি, কিন্তু অন্তত তখন চোখের আড়ালে কোন উৎস থেকে মৃদু-মিষ্টি একটা গন্ধ আসছিল, হয়ত কোন ফুলের, যার নাম করবী জানে না। কিন্তু গন্ধটুকু মন্দ লাগে না, আজও [illegible]ছিল না, আর লাগছিল না বলেই [illegible]টর-মেকানিক ছোকরা অন্যান্য দিনের মত [আ]জও তাকে দেখে হাসল, করবী তবু রাগ করতে পারল না।

নিজের হাসি চেপে সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। ছেলেটা রোজ ওকে চেয়ে চেয়ে দেখে। রোজ হাসে। ও করবীর নাম জানে।

করবীও ওর নাম জানে। হাবুল। ওই নামে দোকানের একটা লোক ওকে [illegible] করবী শুনেছে।

মাথা নিচু করে [illegible] করছিল হাবুল। ওর পোষা কুকুরটা পাশে শুয়ে শুয়ে দেখছিল। মুগ্ধ, নিরীহ, ভক্ত। গ্রামোফোন রেকর্ডে যে-রকম ছবি দেখা যায়। কুকুরটাও কাজ শিখছে নাকি। হাবুল বুঝি কুকুরটাকেই ওর শাগরেদ বানাবে। তেল-কালিমাখা খাকী প্যান্টটার পিছনে হাত মুছল হাবুল, শুকনো পাঁউরুটি পকেট থেকে বের করে, ছিঁড়ে মুখে পুরল এক টুকরো। কুকুরটা থাবায় ভর করে উঠে দাঁড়িয়েছিল, হাবুল ওকে তাক করে প্রথমে একটা ঢিল ছুড়ল। কুকুরটা নড়ল না দেখে হাবুল অগত্যা পাঁউরুটিরই খানিকটা কুকুরটাকে ছিঁড়ে দিল। রোজ যেমন দেয়। ওর সারাদিনের খোরাকে কুকুরটা ভাগ বসায়, হাবুল রাগ করে বটে, কিন্তু সেটা রাগের ভানমাত্র, সত্যিকারের রাগ নয়। প্রভু আর ভক্ত কুকুরের কাড়াকাড়ি দেখতে মন্দ লাগে না।

লাগে না, তাই অন্য দিনের মত করবী আজও একটুখানি দাঁড়াল। লোহা-লক্কড়-লকড়ির একটা লোকে-ভর্তি খাঁচা এসে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সেটায় উঠল না। গরম টায়ার থেকে ভাপসা গন্ধ উঠছিল, তার হলকা নাকে লাগতে করবী সরে দাঁড়াল। কেমন যেন কড়া, কটু-কটু। বিশ্রী লাগে, সহ্য হয় না।

"এ-বাসটা ভাল না, এই বাসে যাব না।" করবী বলল মনে মনে। বাসটাকে এক বাক্যে নামঞ্জুর করল। কনে দেখতে এসে পাত্রপক্ষ যেমন করে। তাকেও অনেকে যা করেছে। "ওরা ভাল করে দেখে না, যাচাই করে না, সরাসরি খারিজ করে দেয়।"

করবীও তাই করল। শোধ নিল। অস্পষ্ট অবচেতন বিরাগ বাসটার উপর যেন পুরুষ সত্তা আরোপ করল। করবীও ইচ্ছা হলে তার অপছন্দ করার অধিকারকে প্র[illegible] করতে পারে।

প্রত্যাখ্যাত বাসটা যেই চোখের আড়াল [illegible] অমনই করবীর মনে হল, কাজটা [illegible] হয়নি। বাস অবশ্য আরও আছে, অ[illegible] আসবে, কিন্তু হাতের একটা বাস ঝো[illegible] দুটোর চেয়ে ভাল। আর সত্যই সা[illegible] খোলা রাস্তাটার দিকে করবী যতক্ষণ [illegible] রইল, কোন বাসের চিহ্নমাত্র দেখতে [illegible] না।

এত দেরি কেন করছে, কে জানে। দু[illegible] ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়ে[illegible] খানিকটা সরে রেনট্রি-গাছটার নীচে দাঁ[illegible] হল করবীকে, হাওয়ায় আজ্ঞা উড়[illegible] বিস্রস্ত আঁচল সামলাতে ব্যস্ত করবী [illegible] পাচ্ছিল, মোটর-মেরামতী দোকানের হ[illegible] তার দিকে চেয়ে আছে। চোখে চোখ প[illegible] হাবুল একটু হাসলও। এ-হাসির

মানে নেই, এ-হাসিতে বিশ্রী কোন ইশারাও নেই, এ শুধু হাসার জন্যেই হাসা।

এতক্ষণ পথের পিচ, ধুলো আর বালি তেতে ছিল, বৃষ্টির ফোঁটা তাই মাটি ছুঁতে-না-ছুঁতে উবে গেল। বাষ্প হয়ে ফের আকাশে উড়ে যাবার পথে খানিকটা ধুলো-বালির গন্ধ গায়ে মেখে নিল। কারখানাটা টিনের আটচালা, টুপটুপ বৃষ্টির ফোঁটা টোকা দিয়ে দিয়ে ফুটো খুঁজছিল। আর, সেই মাদী শুয়োরটা তার বাচ্চার পাল নিয়ে কালভার্টের নীচে আশ্রয় খুঁজছিল। আর-একটু পরেই ত কালভার্টের তলা দিয়ে ঢল বয়ে যাবে, তখন কোথায় যাবে ও?

আসলে করবী নিজেও একটু ভয় পেয়েছিল। যদি আরও জোরে বৃষ্টি নামে? তখন ধুলোমাখা বৃষ্টির গন্ধে হয়ত নেশা থাকবে না, করবীকে আরও পিছিয়ে গাছের গুঁড়িটার সঙ্গে লেপ্টে দাঁড়াতে হবে। গুঁড়ি বেয়ে সারি-সারি পিঁপড়ের ওঠা-নামা করবী আগেই দেখে নিয়েছিল, নইলে গুঁড়ি ঘেঁষে দাঁড়াতে করবীর আপত্তি ছিল না। এখনই পিঠের কাছটা সিরসির করছে, জামার নীচে যেন পিঁপড়ে হাঁটছে। পিঁপড়ে, না, জলের ফোঁটা?

যদি চেপে নেমে আসে বৃষ্টি, তখন হয়ত আর এই গাছের তলাতে কুলোবে না, করবীকে ওই মোটর-মেরামতী চালায় দাঁড়াতে হবে। হাবুল ওকে দাঁড়াতে দেবে নিশ্চয়ই, হয়ত একটা টুলও পেতে দেবে। তারপর হাসবে। সেই হাসি ফিরিয়েও দিতে হবে। আশ্রয়টুকু আর টুলে বসার দাম। কিন্তু তার পরে? আরও কোন কথা হবে কি? কী কথা হতে পারে টাইপিস্ট একটি মেয়ের সঙ্গে মোটর-মেকানিক এক ছোকরার? বই নিয়ে?—না। গান নিয়ে? ও গানের কী বোঝে! তবে সিনেমার গান জানে। সিনেমা নিয়েও দু-চার কথা অবশ্য হতে পারে। ছোট্ট চালাটার মধ্যে হাবুলও চলাফেরা করবে, কাজে না হক, কাজের অছিলায়, এক-আধবার গা-ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যেতে পারে। আঁচলে একটু তেলকালি লাগবে, ভাবতেই খারাপ লাগছে। কিন্তু আর কী-ই বা ক্ষতি হবে! অপরিচিত লোকগুলো যে বাসে দু-চার বার করে কনে-পছন্দ করার ছুতোয় তাকে ছুঁয়ে যায়, হাতের তেলো টিপে দেখে, যারা মাধবুড়োটে তারা পায়ের গোছও দেখে, কতটুকু ক্ষতি হয় করবীর? কী খোয়া যায়? কিছু না। হাবুল ছুঁলেও অতএব কিছু আসে যাবে না। বাড়ি ফিরে একবার গা ধুলেই—ব্যস্।

কিন্তু এত ভাবনার দরকার ছিল না, বৃষ্টি তার জোরে নামেনি, করবীও তাই গাছ-তলায় দাঁড়িয়েই অল্প-অল্প ভিজছিল। আর, ওর ভাগ্য ভাল, দ্বিতীয় বাসটা একটু পরে এসেও পড়ল। এর চেহারা ভাল, কিন্তু এ কি আমাকে নেবে, বড্ড যে ভিড়, করবী ভয়ে ভয়ে ভাবল, হাত তুলল, কয়েক পা এগিয়েও গেল তাড়াতাড়ি। পা-দানিতেও লোক দাঁড়িয়ে, বাসের পিছনেও যে লোক দাঁড়িয়ে, তা টের পাওয়া যায়।

'এ-বাস আমাকে নেবে না' করবী আবার ভাবল ভয় পেয়ে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভরসাও পেল, কেন না ফুটবোর্ডে কনডাকটারের শাগরেদ যে ছোঁড়া তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল সে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। করবীকে আর কষ্ট করতে হল না, ওই ছোকরাই তাকে ঝুঁকে পড়ে তুলে নিল।

"উঠুন, উঠুন, উঠে যান, চলে যান ভেতরে।" করবী বুঝতে পারছিল না, ছোকরা কাকে লক্ষ্য করে বলছিল, তাকে, না, অন্য কাউকে। পা কাঁপছে, করবী তখন পর্যন্ত মাত্র হাতলটাই ধরতে পেরেছিল। চোখে অন্ধকার, দম বন্ধ হয়ে আসছে।

"যান, যান ভেতরে যান", ছোকরা আবার বলল। যাই কী করে, করবী মনে মনে বলল, হাতের বেড় দিয়ে তুমি এখন আমাকে ধরে আছ, জাপটে রেখেছ বলতে পারি, তবে আমি রাগ করছি না, কারণ তুমি আমাকে তুলেও নিয়েছ। তুমি না থাকলে এ-বাসেও আমার ওঠা হত না। এ-বাসটাও আমাকে নিত না।

বাস চলছিল। টলতে টলতে করবী এগিয়ে গেল সামনে, প্রায় নিরবয়ব হয়ে গলে গলে। যাত্রীরা সকলেই ঊর্ধ্ববাহু, উপরের রডে হাত রাখার জায়গা নেই। তবু করবী কোনমতে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট সীটের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারল। সীটে অন্য লোক ছিল—পুরুষ। করবীকে দেখেই সে ভ্রূকুঞ্চিত করেছিল, কিন্তু সামান্য একটু ইতস্তত করে লোকটা উঠেও পড়ল। তার পিছনে-পিছনে তার পাশের ভদ্রলোকটিও। ধপ করে বসে পড়ল করবী, এতক্ষণে ব্যাগটা কোলে ফেলে কোমরে-গোঁজা ছোট্ট রুমাল বের করে মুখ মোছার অবসর পেল। রুমালে ঘামের গন্ধ, কিন্তু এ-গন্ধ করবী চেনে, ঘাম তার নিজের। কসিতে গুঁজে রাখা রুমালটা এতক্ষণ তবে একটু-একটু করে ভিজে উঠছিল?

পাঞ্জাবির কোণাই এতক্ষণ পাশের লোকটির উপস্থিতির একমাত্র প্রমাণ ছিল। মুখ মুছে করবী আড়চোখে তাকাল তার দিকে। কামানো গাল, ফরসা-ফরসা মুখ, আর দশজনের মতই, তবু যেন চেনা-চেনা মনে হয়।

লোকটাও করবীর দিকে চেয়েছিল। করবী তাকাতে তার চোখের পলক পড়ল। লোকটা যেন একটু হাসল। সেই হাসি দিয়েই করবী চিনতে পারল ওকে।

সামনের বাড়ির ছাদে যে বিকেলে ওঠে, সেই লোকটা না? পাড়ার লোক। অথচ কখনও আলাপ হয়নি, তবু করবীর কেমন সংকোচ হল, সরে বসল জানলার ধারে। অস্ফুট স্বরে বলল, "বসুন আপনি, বসুন না।"

দ্বিরুক্তি করল না, সঙ্গে সঙ্গে লোকটা বসে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে করবী টের পেল, দুজনের পক্ষে সীটগুলির পরিসর কত কম। লোকটাও নিতান্ত রোগা নয়, সত্যি। ওর কব্জির বেড় দেখেই বুঝতে পারছি। কিন্তু ইচ্ছে করেই ও এদিকে ঘেঁষে বসেনি ত!

এ-বাসটার চলা কেমন যেন, মাতাল-মাতাল। যেন টলমল নৌকো। যাত্রীদেরও মাতাল করে দেয়। টাল সামলানো দায়, এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। সে ভয় করবীরও ছিল, সে শক্ত করে জানলার রড আঁকড়ে ধরে বসে রইল।

পোদ্দার যে-লোকটা ওর পাশে বসে আছে, যাকে ও বসতে দিয়েছে, না না, বসতে দিতে বাধ্য হয়েছে, সে কেন সামনের সীটের পিঠটা শক্ত করে ধরেনি, করবী বুঝতে পারছিল না। একে গরম, তাতে ভিড়, আর বাসটার অসভ্য মাতাল-মাতাল চলা—করবী চটেছিল। বিশ্রী গুমোট গন্ধটা এড়াতে সে জানলার রডে নাক রেখেছিল। রডটা ঠাণ্ডা। পাশে তাকালেই ঝিম ধরে, মাথা ঘোরে, তবু করবী মাঝে মাঝে চমকে উঠছিল। মৃদু একটা সুবাস—ফুলের, তবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সুবাস [illegible] থেকে [illegible] চলন্ত বাসে, এই ভিড়ে? করবী চঞ্চল হয়ে এদিক-ওদিক চাইছিল, আর তখনই তার নজরে পড়ল। পাশের ভদ্রলোকই ডান হাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা ধরে আছেন। সবুজ ডাঁটার আভাস করবী অনেক আগেই পেয়েছিল, তখন ঠিক ধরতে পারেনি। ভেবেছিল, সবজি বা ওই-জাতীয় কিছু হবে। এই দমবন্ধ ঊর্ধ্বশ্বাস বাসে, ঘাম-ঘাম পরিবেশেও যিনি রজনীগন্ধার গুচ্ছ বয়ে নিয়ে চলেছেন, তাঁর প্রতি করবী কৃতজ্ঞতা বোধ করল।

ভদ্রলোক যে কিছু শৌখিন, তা ত করবী জানেই। ছাদ ত সবার বাড়িতেই আছে, কিন্তু সন্ধ্যা হলেই কজন সেখানে উঠে হাওয়া খায়? ইনি খান। অনেকখানি শখ বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন বলেই ত?

অথচ আমি, মরমে মরে গিয়ে করবী ভাবল, অথচ আমি ভুল বুঝেছি ওঁকে। ওঁর হাওয়া-খাওয়ার খারাপ মানে করেছি। ঘরে ফিরে কাপড়-ছাড়বার সময় অস্বস্তি বোধ করেছি। কোনদিন শব্দ করে বন্ধ করে দিয়েছি জানলা। এই ত এতক্ষণ ধরে উনি আমারই পাশে বসে, কই, চুরি করে অন্য বাড়ির মেয়েদের দেখে নেবার মত লোক ত উনি নন! অন্তত তেমন ত মনে হচ্ছে না এখন। যারা বাসেও রজনীগন্ধার সুবাস

[illegible]তে বিলেতে যায়, পরের বাড়ির মেয়েদের দেখে উঁকি দেবার মত কুরুচি তাদের হয় না।

অথচ এই লোকটা দেখেও কিন্তু। লোকটা নয়, এই ভদ্রলোক। ইনি দেখেন। তাতে কোন ভুল নেই। করবীর মনে তখন পাল্টা ভাবনার স্রোত বইছিল। আমার চোখের সাক্ষিকে আমি ভুলব কী করে!

কতবার এই লোকটাই করবীর চোখে ধরা পড়ে গিয়েছে। সরে গিয়েছে চোর-চোর ভাব নিয়ে। মনে পাপ না থাকলে অমন চোর-চোর ভাব হবে কেন?

পাপ? করবী আবার ভাবল, এই ভদ্রলোক যা করে থাকেন, তা কি পাপ? অন্যায়, তাই বা কেন। মাঝে মাঝে আমার ত বেশ মজাই লাগে। আমিও চোখ না নামিয়ে সো[illegible] ওঁর দিকে চেয়ে থাকি। সন্ধ্যাবে[illegible] গা ধুয়ে এসে যখন কোন কাজ থাকে না, [illegible]বই ছুঁতে মন যায় না, তখন ওই [illegible]টুকুই বা মন্দ কী! খেলা বই ত নয়। [illegible]রচার আনন্দ।

সেই ভদ্রলোকই এখন ওর পাশে বসে আছে, করবীর গায়ে কাঁটা দিল। ওঁর কোঁচা নীচে লুটোচ্ছে, ওঁর হাতে ফুলের গুচ্ছ। যাকে আড়ি-পাতা লোভী লোক ভাবতুম, তাকে ঠিক এখন অন্য রকম লাগছে।

"আপনি কোথায় যাবেন—চৌরঙ্গী?" করবী চমকে [illegible]। ভদ্রলোকের গলা। [illegible] এ[illegible] কন্ডাক্টর [illegible]ভাড়ার পয়সা নিতে হাত পেতেছে। ওকে দেবেন বলে ভদ্রলোক এক টাকার একটি নোট বের করেছেন। বাধা দেবে বলে করবী হাত তুলতে গেল, চঞ্চল হাতে ঘাঁটাঘাঁটি করল নিজের ব্যাগের খুচরো পয়সা, কিন্তু সবিস্ময়ে এও লক্ষ করল, প্রতিবাদের একটি কথাও তার মুখে ফুটল না। অবাক হয়ে টের পেল, সে অর্থহীন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে, "চৌরঙ্গীতে যাব কী করে জানলেন?"

"আমি জানি।" মৃদু হাসলেন ভদ্রলোক, ওর হাতে একটা টিকিট গুঁজে দিলেন। করবী সেই সঙ্গে এ-ও দেখল, ওঁর নিজের টিকিটটা আলাদা রঙের—বোধ হয় দু-পয়সা কম ভাড়ার।

"আমি নামব কলুটোলায়", বললেন ভদ্রলোক। যেন করবীর কৌতূহলটা নিরসন করলেন।

করবী ফুলগুলির দিকে চেয়েছিল। ভদ্রলোক বুঝি সে-প্রশ্নটিও বুঝলেন—"আমার এক বন্ধুর আজ জন্মদিন। সে অসুস্থ। তাকে দেব।"

আশ্চর্য, কী সুন্দর বুদ্ধি। কী পরিমিত হাসি! আর উনি কী [illegible]! তবু কিন্তু সন্ধ্যাবেলা ছাদে উঠতে ছাড়েন না। নির্লজ্জের মত চেয়ে থাকেন আমাদের ঘরের দিকে।

কিন্তু কী দেখেন উনি, আমাকে? বউদিকে দেখেন না ত! বউদি ফরসা—বউদি সুন্দরী। তবে সুন্দর শুধু মুখটাই। ওকে দেখার কিছু নেই। ওর শরীরে নেই। বিয়ে হবার পর এই সাত বছরে চারবার হাসপাতালে গিয়েছে। এবার ওদের সাবধান হওয়া ভাল। ও একেবারে কাঠি হয়ে গিয়েছে। মাসে আজকাল [illegible]বার বিছানা নেয়। তবু বুঝি ভিজে কাঁথা, ট্যাঁ-ট্যাঁ কান্না-শোনার শখ মেটে না? এইভাবে যদি ফতুর হতে থাকে বউদি তবে ত বাইরের লোক দূরে থাক, দাদাকেও ও আর টানতে পারবে না। রূপ মানে কি শুধু রঙ আর মুখের কাটিং? পুরুষেরা আরও কিছু চায়। বউদি বোকা, জানে না।

বাস চলছিল, থামছিল, দোলানিতে ঝিমুনি আসছিল, আর করবী ভাবছিল। বউদিকে ইনি দেখেন না, এটা সে ধরেই নিয়েছিল। তাকেই দেখেন। যদিও সে ময়লা এবং মোটা। তবু তার দেহে সৌষ্ঠব আছে। ওই ভদ্রলোক তাই দেখেন। সে যখন ঘাড় নুইয়ে জামার বোতাম আঁটে, তখন। সে যখন পিছন দিকে মাথা এলিয়ে চুলে চিরুনি চালায়, তখনও।

আমারও যে কোন আকর্ষণ নেই, বলা যায় না। করবী ভাবল। কিন্তু আছে যে, তাই বা বলি কী করে! আজ পর্যন্ত পছন্দ ত কারও হল না, অথচ দেখে গেল কত জন। মাসে গড়ে পাঁচজন। আমার বয়স এই আটাশ—না না, সাতাশ বছর দশ মাস। ছোট-ছোট চোখ, চাপটা নাক, ভরা গোলগোল গাল, যেন ফোলানো বেগুনী বেলুন। আমাকে লোকের চোখে ধরবে কেন! বউদির মত শুকিয়ে চিমসে ত হব না, একদিন একেবারে ফেটে মরব। এই বাসে এই ভদ্রলোক উঠলেন কোথা থেকে? আমি এটাতেই উঠব, উনি জানতেন? তা কী করে হবে, উনি আসলে ভিড় এড়াতে একটা বা দুটো স্টপ আগে থেকে উঠেছিলেন। তবু লেডীজ সীট ছাড়া বসবার জায়গা পাননি।

করবীর ঘুম পেয়েছিল, তবু টান টান করে চোখ মেলে চেয়ে রইল। ভদ্রলোকের ভঙ্গি কেমন নির্বিকার, অন্যমনস্ক দেখ[illegible]। করবীর রাগ হল। সব ভান, সে যেন আর বোঝে না! মাঝ মাঝে ঝাঁকুনিতে কাঁধে-কাঁধ ঠেকে যাচ্ছে, কখনও বা হাতে-হাতে—দূরের ছাদ থেকে চেয়ে চেয়ে যতটুকু পান, ভদ্রলোক, আজ তার থেকে ঢের বেশী পেয়ে গেলেন।

করবীর তন্দ্রা এসেছিল। একটা রাস্তার মোড়ে গাড়ি থামতেই তন্দ্রা ছুটে গেল, চেয়ে দেখল, ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছেন। কিছু বললেন না, যাবার আগে সামান্য হাসলেন। যেন করবীর কাছে গচ্ছিত রাখলেন হাসিটা। সে-হাসির মানে করবী বুঝল। মানে, "আমি এখানেই নামব।"

ফিরতি পথেও করবী বাসে উঠেছিল। এ-বাসেও ভিড়, তবে তেমন নয়। সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ঝিরঝির বৃষ্টি চলছে ত চলছেই, নামছে, থামছে, নামছে।

এই বৃষ্টির জন্যেই ত আজ অফিসে কাজ বিশেষ হল না। মাত্র গোটা চারেক চিঠি খটাখট করতে হয়েছিল। কিন্তু সাহেব একবারও ডাকেননি। আর সেকশনের বড়বাবু নিজেই গরহাজির। বীরেন, ললিত, তালুকদার, দত্ত, ওরা সবাই মিলে উপর তলার ক্যান্টিনের কোণের ঘরটায় আড্ডা জমিয়েছিল। করবীকে ওরা ডেকে নিয়েছিল। মিনাকেও। ডিমভাজা আর চা চলছিল। চা আর চুরুট। ধোঁয়া আর কড়া গন্ধ। ওরা ইলেকশনের কথা বলছিল। বীরেন এবার ইলেকশনে দাঁড়াবে, ইউনিয়নের সেক্রেটারি হবে। মিনাও ওদের কথায় যোগ দিয়েছিল, ওর একটু পাকামি-ভাব আছে। আমি কিছু বলছিলাম না, শুধু শুনেছিলাম। ডিমভাজা ভেঙে ভেঙে মুখে তুলছিলাম।

অনিল মুখোপাধ্যায় রচিত
ইংরাজী কথাসাহিত্যের এক অনুপম নৈবেদ্য

"মাই মাদার"

পূজা প্রকাশনায় এক গরিমাদৃপ্ত আলেখ্য
বাঙলার শতাব্দীকালীন অশ্রুরুধিরসিঞ্চিত ইতিহাসের পটভূমিকায়
সমাজবিপ্লবের তমসাঘন গগনে জ্যোতির্ময়ী জননীর
নবজীবনের আশ্বাসবহী অমর ইংগীত
বিবরণী — পোষ্ট বক্স নং ১০৯
পাটনা—১

মিনা প্লেটটা ছুঁয়েও দেখেনি, গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে বলেছে, খিদে নেই। ঢং। ওরা মিনাকে সাধছিল, নিজেরাও খাচ্ছিল। আমার খিদে পেয়েছে, আমি ত খাবই। আমার কি খিদে বেশী! দত্তর কী একটা কথায় মিনা হেসে উঠল, সাদা দাঁত কিন্তু মাড়িও দেখা গেল। তোর উপরের ঠোঁট ছোট কোন্ লজ্জায় তুই খোজাখুঁজি হাসিস জানিনে। হাসি পেলে হাত দিয়ে ত মুখ আড়াল করা যায়। আর-একবার কী-একটা কথার পিঠে সকলে হেসে উঠল, কিন্তু মিনা আলগোছে ললিতের পিঠে থাপ্পড় মারল, ও বরাবরই গায়ে-পড়া। ওর কটা মুখ চড়া আলোয় বিশ্রী লাগছিল—অত কটা সত্যি-সত্যিই তুমি কিন্তু নও বাপু। বেশ কয়েক পাল্লা ত পালিশ! নইলে তোমার কনুই থেকে হাতের পাতা অবধি আলাদা রকমের হত না। গোঁজামিল ধরা পড়েই। চেষ্টা করলে আমিও—নাকটাকে টিকলো না করতে পারি—আর-একটু ফরসা হতে কি পারি না? ধরা পড়ার ভয় আছে যে। রুচিও নেই। তা-হলেও আড্ডা জমেছিল কিন্তু খুব। আমার নেশার মত লাগছিল। উঠে আসতে মন চাইছিল না। মাঝে মাঝে হাসি-ঠাট্টাও চলছিল। এত হাসি আমি জীবনে হাসিনি। তালুকদার আমার কব্জিতে একটা চিমটি কাটল। এখনও যেন জলছে। ওর সাহস কিন্তু খুব—কিন্তু আমি রাগ করিনি। ওর বেশী ত এগোবে না, ওদের আমি চিনি। চিমটি পর্যন্তই। তা-ছাড়া তালুকদারের ত বউ আছে, বীরেন ত শুনেছি বিয়েই করবে না। চুরুটের কড়া গন্ধ, চা, আড্ডা, বড় জোর চিমটি—এর চেয়ে বেশী কিছু ওরা দেবে না। আমিও নেব না। ডিমভাজা অতটা খেয়ে ফেলা কিন্তু ঠিক হয়নি। ভাল খেতে পাইনে বলেই কি আমার খিদে একটু বেশী?

কনডাকটার, 'টিকিট' বলতেই করবীর ভাবনার সুতো ছিঁড়ে গেল। চেয়ে দেখতে মনে হল, দুপুরের বাসে যে ছিল, সেই। মুখ শুকনো, চুল এলোমেলো। সেই থেকে এই অবধি খাটছে? দুপুরে ওই ভদ্রলোক পাশে ছিলেন, পয়সা দিয়েছিলেন। এখন করবীর পাশটা খালি। এই জলে সাধ করে কেউ পথে বের হয়! বউদি কী করছে এখন? কাত হয়ে শুয়ে বাচ্চাকে থাবড়াচ্ছে? আছে বেশ আরামে। খাটুনি নেই, রাস্তা নেই, বাস নেই, ভিড় নেই। ঘর, বারান্দা, বিছানা। ঘরে শোওয়া আর থুথু ফেলার ছুতোয় বারান্দায় বেরোনো। দাদা ফিরলে একবার হাই তুলবে, খাবারের থালার ঢাকনাটা তুলে দেবে শুধু। জানে। সুখ যাই হক, তার দামও দিতে হয় পুরোপুরি চুকিয়ে। এই সাত বছরেই হাড় ভাজা-ভাজা হয়েছে, মাস দাঁড়ি, শুকিয়ে খিটখিটে শাঁকচুন্নি, আর এক গন্ডা বাচ্চার মা জননী। ঘর পেয়েছে কিন্তু ঘরনীগিরির সুখের সুদ মেটাচ্ছে বার বার হাসপাতালে গিয়ে। সেবার ত তিন দিন অজ্ঞান হয়ে ছিল।

অমিতবাবু ফিরেছেন কিনা, তাও করবী একবার ভাবল। দাদার বন্ধু পেয়িং গেস্ট এই ভদ্রলোকটি এক নম্বরের কুড়ে। পাশ ফিরে শোন না, জল গড়িয়ে খান না। হয়ত চাদর-মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছেন। অলস বটে, তবে ভাল মানুষ। একটা ঘরে থাকা আর দু-বেলা দু-থালা ভাত, তার জন্যেই মাস গেলে সওয়া-শ টাকা। দাদার আয়ের ফন্দিটা বেশ। জামা-কাপড় ময়লা হয়ে জমে থাকে, ভদ্রলোকের হুঁশ নেই। বউদি মাঝে মাঝে গেঞ্জি-টেঞ্জি কেচে দেয়। তা দিক, কিন্তু বউদি করবীকে নিয়ে ঠাট্টা করে কেন? অমিতবাবু কি ভুলেও কোনদিন তার দিকে চোখ তুলে চেয়েছেন? চশমার আড়ালে ওঁর চোখ দুটি কানা কিনা তাই বা কে জানে! করবীর ভাবতেই হাসি পেল—বউদি বলে, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি। বলে, তুমি কোন কাজের নও ঠাকুরঝি। থাকত আমার উপায় তবে দেখতে মুনিবরের ধ্যান করে দিতুম ছুটিয়ে। মুখের বড়াই যত সব। তোমার সাধ্য নয়। আমি এই ভারী গতর নিয়ে পারি না, আর তুমি ত চামচিকে!

ওঁর গেঞ্জি-টেঞ্জি মাঝে মাঝে কাচতে হয় কিন্তু করবীকেও। বউদি ত প্রায়ই বিছানা নেয়। সাবানের ফেনা জমে, নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে যায়—থিকথিক, ঘিনঘিন! ঘেন্না করে। কিন্তু সবটাই কি ঘেন্না? যদি তাই হবে তবে ওই থিকথিক-ঘিনঘিন ফেনার স্তূপ একদিন নাকের কাছে ধরেছিলুম কেন? আমার মাথা ঘুরেছিল, গা উঠেছিল গুলিয়ে। কী উৎকট, কী অসহ্য! বউদি কোনদিন কি টের পায় না এ-সব—নাকি এ-গন্ধ ওর সয়ে গিয়েছে? বিয়ে হলে কি মেয়েদের এ-সব বোধ ভোঁতা হয়? জানব কী করে!

আরও জোরে বৃষ্টি নেমেছিল, হঠাৎ একটা ঝমঝম পাগলামি, করবী সরে বসল। তাতেও হল না—সব ভিজে যায় যে। জানলা ধরে টানাটানি করল খানিক, কিন্তু পাল্লা একচুল নড়ল না। অসহায় করবী বসে ছিল, চাইছিল এদিক-ওদিক, তখন ঐ খাকী জামাপরা কনডাকটর এগিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে দিল সে, বেয়ারা বাচ্চাকে যেমন করে শাসন করে, তেমন করে যেন কান ধরে যতক্ষণ না উঠল জানলা ততক্ষণ করবী কাঁপতে থাকল। কনডাকটারের কনুই ঠেকেছে তার মাথায়, করবীর কাঁধ ওর কোমরের কাছে। এত নুয়েই বা পড়ছে কেন লোকটা, ওর নিশ্বাস কি তার চুলে পড়ছে? করবী কাঠ হয়ে ছিল। শিটিয়ে যাচ্ছে কেন সারা শরীর—সেই সঙ্গে, সেই সঙ্গে একটু ভালই বা লাগছে কেন!

জানলা বন্ধ হবার পরও অনেকক্ষণ করবী যেন পাথরের মত নিশ্চল হয়ে ছিল। পলক পড়ছিল না, একটি স্পর্শকে কিছুতেই কি ভোলা যায় না, মোছা যায় না! রাগ করতে চাইছে করবী, পারছে না। শেষ পর্যন্ত বাড়ি থেকে গোটা দুই স্টপ আগেই কোনমতে মাথা নিচু করে নেমে পড়তে হল।

তখনও বৃষ্টি একেবারে থামেনি। পথে ছলছল জল ছিল। তবু এ-পথটুকু হেঁটে পার হওয়া শক্ত হবে না। ধুলো, পাঁক অশুচিতা, আর যত গ্লানি আর কুৎ[illegible]

নিচু হয়ে জুতোর স্ট্র্যাপ বাঁধল ক[illegible] আর সঙ্গে সঙ্গে যেন তার একমুখী ভাবনা ঠোক্কর খেল। অশুচি—এ-কথাই বা সে ভাবছে কেন? রুচির কথাই বা উঠছে কিসে! কিছু কি লোকসান হল আমার, কিছু কি হারালাম, করবী জিজ্ঞাসা করল নিজেকে, সোজা হয়ে উঠে উপর দিকে চাইল।—কিছু না। বরং পেলাম।

[illegible] আস্তে এগিয়ে করবী দাঁড়া[illegible] রেন্ট্রি গাছটার নীচে। মোটর-মেরামতি দোকানে তখনও আলো জ্বলছিল, হাবুরা জেগেছিল।—আর এ-ছাড়া, করবী ভাবছিল, আর এ-ছাড়া আমি পাবই বা কী! রুচি-শুচি দিয়ে ত কিছু হল না, আটাশ বছর পুরো হয়ে এল। আমার বাকী জীবনও এই। সামনের বাড়ির ওই ভদ্রলোকের চাউনি, ওই হাবুলের একটু হাসি, অফিস ক্যান্টিনে হাসাহাসি আর চা-চুরুটের গন্ধ মাখামাখি; কখনও কখনও গেঞ্জিকাচা ফেনা—আর, আর কী? মনে পড়ছে না। এই দিয়েই ভরে তোলা। কোনদিন হয়ত বাড়ি ফেরার পথে বৃষ্টি নামবে, কনডাকটার জানলা তুলে দেবে। বৃষ্টি যদি না থাকে, তবে রোদ ত থাকবে! এই সব গন্ধ আর স্পর্শের ছিটেফোঁটা নিয়েই বেঁচে চলব। বউদি কী সুখ পেয়েছে জীবনে? জানি না। কোনদিন তার অভিজ্ঞতা আমার হবে না। কিন্তু আমিও কম পাব না। ওরা পায় যেমন বেশী, দামও তেমনি বেশী দেয়। আমি পাব সামান্য, কিন্তু দামও ত দেব সামান্যই! তিল-তিল কুড়িয়েই সুখকে সম্পূর্ণ করে নেব।

বৃষ্টি থেমেছিল। করবী বাড়ির দিকে

বায়ু পরিবর্তনে এসে সপ্তাহখানেকের মধ্যেই স্থান কাল পাত্রের অপরিবর্তনীয় রূপটা বড় বেশী করে অনুভব করতে লাগলাম। ছোট শহর। শহর নয়, গ্রামই বলা চলে। এখানে-ওখানে কিছু কিছু বাড়ি ছড়িয়ে আছে। বেশির ভাগই তালাবন্ধ। বাড়ি আর বাগান মালীদের রক্ষণাধীন। চেঞ্জারদের ভিড় এড়াবার জন্যে আমরা দিন দশেক আগেই এসে পড়েছি। কয়েকটি দিন নিরিবিলিতে প্রকৃতির কোলে চুপচাপ শুয়ে বসে ঘুমিয়ে কাটিয়ে যাব এই আশা।

আমার যাঁরা সঙ্গে এসেছেন বলা ভাল আমি যাঁদের সঙ্গে এসেছি, তাঁরা নিরিবিলিতে থাকবার মানুষ নন। দুই জোড়া

পরের সোনা দিসনে কানে

শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

কাক আর কাক-বৌ। এখানে-ওখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। মনের মত একটি জায়গা খুঁজে পায় না—যেখানে ওরা একটি বাসা বেঁধে বাস করবে।

কাক একটু নিরিবিলি পছন্দ করে। সে বললে,—চলো, মানুষের বসতি ছেড়ে একটু বনের ধারে গিয়ে থাকি—কেউ বিরক্ত করতে আসবে না।

উঁচু ডালে বাঁধবো বাসা—
থাকবো মনের সুখে—
কারো কোনো ধারবো না ধার
শান্তি রবে বুকে॥

কাক-বৌয়ের কিন্তু তা পছন্দ নয়। সে একটু লোভী কিনা,—তাই বড়লোকের বাড়ির আশে-পাশে থাকতে চায়।

প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ি—চারদিকের বাগানে

"ওখানে একটা বড় গাছে বাসা বাঁধি।"

ছোট-বড় নানা জাতের গাছ—সেইটে দেখিয়ে বললে,—চলো আমরা ওখানের একটি বড় গাছে বাসা বাঁধি। ও-বাড়িতে একটি সুন্দরী মেয়ে আছে। সে রোজ সকালে উঠে পিয়ানো বাজায়। ভারী মিষ্টি শব্দ। আর ওরা রোজ যা খাবার ফেলে দেবে তাই খেয়ে আমাদের দুটি প্রাণীর দিব্যি চলে যাবে। কে আর মিছিমিছি রন্দুরে-রন্দুরে ঘুরে বেড়াবে বলো? একটু আরাম ত' চাই।

কাক জবাব দেয়,—তোর বড় আলিস্যি কাক-বৌ। আমাদের এত লোভ ভালো নয়। মানুষদের বসতি থেকে দূরে থাকলে ঝামেলা কম। এখানে-ওখানে উড়ে কি আর রোজকার খাবার জোগাড় করা যেত না? কথায় বলে, লোভে পাপ, আর পাপে মৃত্যু।

কাক-বৌ কিন্তু ওর কথা কানে তোলে না! বলে,—ওরে কাক, তুই বুঝিস নে! বড় গাছে নাও বাঁধতে হয়। বড়লোকের বাড়িতে বাসা বাঁধলে কোনোদিন খাবারের অভাব হয় না!

ঠোঁট নেড়ে কাক বলে,—তোর যেমন ইচ্ছে! কিন্তু আমি বলে রাখছি—

বড়র পিরিতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে-দড়ি—ক্ষণেকে চাঁদ॥

যাই হোক শেষ পর্যন্ত কাক-বৌয়ের কথাই থাকল। সেই বড়লোকের বাড়ির সামনে একটি প্রকাণ্ড দেবদারু গাছের ডালে ওরা সুন্দর একটি বাসা তৈরি করে ফেলল। বড়লোকের মেয়েটি রোজ রোজ মাথা থেকে চুলের কাঁটা ফেলে দিয়ে নতুন কাঁটা ব্যবহার করে। কাক আর কাক-বৌ সেই চুলের কাঁটা কুড়িয়ে এনে সুন্দর একটি বাসা তৈরি করে নিলে।

বাসা দেখে কাক-বৌ ভারী খুশী। বললে,—দেখলি কাক, ভাগ্যিস বড়লোকের আওতায় আছি। তাই ত রোজ চুলের কাঁটা পাওয়া গেল! আর সেইজন্যেই এমন সুন্দর বাসা আমাদের হল! এ বাসা আমাদের কোনোদিন ভাঙবে না, আর ঝড়ে উড়ে যাবে না!

কাক ফোড়ন কাটলে,—কী যে বলিস তুই! পাখির বাসা হাওয়ায় নড়ে! আজ আছে, কাল নেই! সেই বাসা নিয়ে গর্ব করিস তুই? বনের ধারে থাকলে আমরা সত্যি মনের সুখে থাকতুম! কেউ আমাদের জ্বালাতন করত না।

কাক-বৌ ফোঁস করে উঠে বলল,—তোর যেমন বুদ্ধি! তোকে এত করে বুঝিয়ে বলি, কথা তুই কানে তুলিস না! এই যে রোজ বড়লোকের মেয়ের পিয়োনোর সঙ্গে মিষ্টি গান শুনছি—এই শুনতে শুনতে আমাদেরও গান গাইবার ইচ্ছে মনে জাগবে। আর পিয়োনোর সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমাদেরও কণ্ঠ মিষ্টি হবে। আমরা গান গাইতে পারি না বলে, কোকিলরা আমাদের কত ঠাট্টা করে! অথচ মজা দেখ, ওদের ডিম ফোটাবার জন্যে কাকের বাসায় চুপি চুপি রেখে দিয়ে যায়! ঘেন্নায় মরি!

একটু দম নিয়ে কাক-বৌ আবার বলে,—এইবার আমি ঠিক করেছি, যে করেই হোক, গানের গলা আমার মিষ্টি করতেই হবে। রোজ পিয়োনোর সঙ্গে গান গাইলে গলা ভালো না হয়ে যায়! তুইও আমার সঙ্গে গাইবি রোজ, বুঝলি?

কাক-বৌয়ের কথা শুনে কাক বেচারী হি হি করে হাসতে লাগলো। বলল,—তোর যেমন কথা কাক-বৌ! কাকের গলায় কখনো গান জাগে? বিধাতা যে আমাদের মেরে রেখেছে! আমাদের যা আছে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা ভালো।

টিপ্পনী কেটে কাক-বৌ বললে,—তোর ও-সব হতাশার কথা আমি ভালো বুঝিনে! বনের ধারে থাকলে গানের গলাও ভালো হবে না, আর বড়লোকের বাড়ির ভালো-মন্দ খাবারও খাওয়া যাবে না! এখানে আছি—বেশ আছি।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে কাক উত্তর দিলে,—থাকতে চাচ্ছিস এখানে, থাক। আমি বাধা দেবো না। কিন্তু একটা কথা জেনে রাখিস—আমাদের দেশের প্রবীণ মাতব্বরেরা বলে—

"পরের সোনা দিসনে কানে—
কেড়ে নেবে হ্যাঁচকা টানে॥"

আর দু'দিন পরে তোর বাচ্চা হবে। কখন, কোন্‌দিক থেকে কী বিপদ আসে কেউ বলতে পারে? বড়লোকের বাড়ির আওতা ছেড়ে—বনের ধারে গিয়ে থাকলে, প্রাণে ভয় নিয়ে বসবাস করতে হত না!

কাক-বৌ ওকে আশ্বাস দিয়ে বলল,—কোনো ভয় নেই তোর। এত উঁচু গাছের ডালে আবার বিপদ কিসের? এক ঝড়ের

বাসা ভেঙে নীচে ফেলে দিল

ভয়! সে ভয় ত বনের ধারেও আছে।

কাক আর কাক-বৌ তখন সেই উঁচু গাছের ডালেই মনের আনন্দে বাসা বেঁধে বাস করতে লাগলো।

কয়েকদিন বাদেই ডিম ফুটে কাক-বৌয়ের বাচ্চা বেরুল। কাক-বৌয়ের আনন্দ দেখে কে! ওরা খুব ছেলেবেলা থেকেই পিয়োনোর গান শুনতে পাবে, কোকিলের মতো ওদের মিষ্টি গলা হবে,—এই আনন্দেই সে একেবারে আত্মহারা!

আরো কিছুদিন যায়—কোনো অসুবিধে নেই এখানে। বড়লোকের মেয়ে যে-সব খাবার জানলা দিয়ে ছুঁড়িয়ে ফেলে দেয়, তাই খেয়েই ওরা মনের আনন্দে আছে। কাক-বৌ বলে,—দেখলি মজা! আমি আগেই বলেছিলাম না? বড় গাছে নৌকো বাঁধতে হয়। তা হলে আর ঝড়-বাদলে কোনো বিপদের ভয় থাকে না!

কাক কোনো উত্তর করে না, শুধু মাথা নাড়ে!

এর কিছুদিন বাদে সেই বড়লোকের বাড়িতে সাজ-সাজ রব পড়ে যায়!

দলে দলে লোকজন খাটছে, মালীরা বাগানের আগাছা সাফ করছে, মিস্ত্রীরা নতুন করে অট্টালিকায় রঙ লাগাচ্ছে। ময়রা, স্যাকরা, গয়লা, বাসনওয়ালা, কাপড়ওয়ালা এদের আনাগোনা বেড়ে যেতে লাগলো।

কাক শঙ্কিত হয়ে বলল,—বাড়িতে কী যেন কাণ্ড হবে, আমরা এখান থেকে পালাই চল—

কাক-বৌ হেসে উত্তর দিলে,—তোর যেমন বুদ্ধি! আমাদের পালাবার কী হয়েছে! আমি খোঁজ নিয়েছি। বড়লোকের সেই সুন্দরী মেয়েটার বিয়ে হবে। চারদিকে সব লাল রঙের চিঠি পাঠানো হচ্ছে, দেখিসনি? আরো ত মজাই হল! মিঠাই-মণ্ডা, মাছ, মাংস প্রচুর খাওয়া যাবে। তুই চুপ করে বসে [illegible] না কাণ্ডটা!

কাক আর প্রতিবাদ করে না, শুধু আপন মনে মাথা নেড়ে বলে, ক-ও-য়া কা—কা—!

আস্তে আস্তে বড়লোকের বাড়ি নতুন রঙে সেজে ঝলমল করে ওঠে। রেলিংগুলো নতুন রূপ পায়। বাড়ির সামনে আকাশ ছোঁয়া তোরণ আর নহবৎ বসে।

লোকজনের আনাগোনা আরো বেড়ে যায়। নানা যায়গা থেকে আত্মীয়-স্বজন এসে সেই বিশাল অট্টালিকা ভর্তি করে ফেলে। ছেলে-মেয়েদের কত রকমের সাজ পোশাক। থরে থরে সব বাসন কোসন আসে। কত রকমের গয়না-গাঁটি পরে মেয়েরা বাগানে ঘুরে বেড়ায়। উদ্যানের ভাঙা-চোরা ফোয়ারাগুলি নতুন করে সারিয়ে তোলা হয়।

কাক বলে,—এখনো ভেবে দেখ্ কাক-বৌ।

কাক-বৌ জবাব দেয়,—তোর যেমন কথা! এত তুই ভীতু কেন আমায় বলতে পারিস? একটু থেমে সে আবার বলে,—তার চাইতে চল আমাদের আত্মীয়-স্বজন যে-খানে আছে—সবাইকে নেমন্তন্ন করে আসি। আমরা এখানে কী সুখে আছি—সবাইকে দেখাতে হবে ত! জ্ঞাতি-কুটুম্বরা আমাদের বড়লোকি দেখলে হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরবে!

কাকের খুব ইচ্ছে ছিল না। তবু কাক-বৌয়ের তাগিদে কাককেও ওর সঙ্গে বেরুতে হল—আত্মীয়-স্বজনদের নেমন্তন্ন করতে।

এদিকে বড়লোকের বাড়ির ম্যানেজারের হুকুমে একদল ইলেকট্রিক মিস্ত্রি উঠে পড়ল বাগানের লম্বা লম্বা সব গাছগুলির উপর। বাড়ির একমাত্র মেয়ের বিয়ে। গোটা বাগানটা ছোট ছোট লাল-নীল-সবুজ বেগুনী বালব দিয়ে সাজাতে হবে। প্রত্যেকটি গাছের ডালে-ডালে-বিজলীর তার ঝুলিয়ে দিতে লাগল তারা।

যখন সেই সব মিস্ত্রীর দল দেবদারু গাছে উঠল—দেখলে, একটা কাকের বাসা। ছোট্ট ছোট্ট কাকের ছানাগুলি খিদের জ্বালায়—কা—কা করে চাঁচাচ্ছে।

আর একটি মিস্ত্রী থু-থু ফেলে বলল,—কী বিচ্ছিরি কাণ্ড! দে কাকের বাসাটাকে ভেঙে ফেলে!

আর একটি মিস্ত্রি তাকে সায় দিয়ে জবাব দিলে,—ঠিক কথা বলেছিস ভাই! এই রকম নোংরা কাকের বাসা থাকলে ইলেকট্রিকের তার গাছের ডালে জড়াবো কী করে?

ওরা একটা কাঠের টুকরো দিয়ে সেই কাক আর কাক-বৌয়ের বাসা ভেঙে, নীচে ফেলে দিলে! কাকের ক্ষুদে-ক্ষুদে ছানা-গুলি তলায় পড়ে যে চোট পেলে তাতেই মরে গেল!

তারপর মিস্ত্রির দল নিজেদের কাজ শেষ করে লম্বা বাঁশের মই বেয়ে নীচে নেমে গেল!

এর অনেকক্ষণ বাদে কাক আর কাক-বৌ যত রাজ্যের আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে ফিরে এসে দেখে, তাদের বাসা ধুলোয় লুটোচ্ছে, আর তাদের ছানাগুলি মরে পড়ে আছে—এধারে-ওধারে! রাশি রাশি লাল পিঁপড়ে ওদের ছেঁকে ধরেছে!

গুণধর

লেখা ও ছবি—শ্রীশৈল চক্রবর্তী

গুণধর, গোরুর কথা জানো কি?—
জান না। তবে বলি শোনো—
তার চারটি পা, মাথায় দুই শিং
কানও দুটি কিন্তু বেশ বড় বড়।
বড় মানে কী? বেশী শোনে।
বেশী শোনে মানে কী?
বেশী বোঝে,
এমন কি আমাদের কথাও বোঝে সে।

আমার সঙ্গে কী ভাব!
ভাব ত ভাব, কিন্তু কেন ভাব?
তা বলবো না।
কিছুতেই বলবো না—
শুধু একটু বলছি—
আমি ত বই পড়ি, নামতা পড়ি
কত কিছু পড়ি।
পড়ার ঘরের পাশেই থাকে গুণধর।
আমার পড়া শোনে আর জাবর কাটে
আর মাঝে মাঝে বলে,
বি এল্ এ ব্লা—আ—আ—আ—
কিন্তু তাও নয়—
একদিন কাকা বললে
তিন পাঁচে কত রে?
আমি বললুম, তেষট্টি।
কাকা বললে, তুই একটা আস্ত গোরু।
পাশের ঘরে গুণধরের কী হাসি!
তারপরে সে আমায় বললে কি জানো?
বললে, তুমিও গোরু, আমিও গোরু—
কী মজা, হাঃ হাঃ হাঃ
বি-এল-এ ব্লা—আ—আ,
তোমার সাথে বেশী ভাব, হাঃ হাঃ
বি এল এ ব্লা—ব্লা—ব্লা—
এই ত সে আমার হাত চেটে দেয়,
পিঠ চুলকে দেয়,
আর, আমার ধারাপাতখানা
আস্ত চিবিয়ে খেয়েছে।
তা থাক, নামতা ত আমার মুখস্থ।

একাগ্রতা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মহাভারতে আছে—কৌরবদের শস্ত্র-পরীক্ষার সময় দ্রোণাচার্য এক গাছের ডালে পাতার ফাঁকে একটা মাটির পাখি রেখে ডালে পতার ফাঁকে একটা মাটির পাখি রেখে বার বার পরীক্ষার্থীদের শুধু এই কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"কী দেখছ তোমরা ?" উত্তরে যারা জবাব দিয়েছিল,—"গাছ দেখছি, ডালপালা দেখছি, আপনাদের দেখছি"—তাদের আর পরীক্ষা দিতেই দেননি। এই রকম পরীক্ষার্থীই ছিল বেশির ভাগ। কেবল অর্জুন বলেছিলেন, "শুধু পাখিটা দেখছি।" দ্রোণাচার্য প্রশ্ন করেছিলেন, "গোটা পাখিটা দেখছ ?" অর্জুন উত্তর দিয়েছিলেন, "না প্রভু, শুধু ওর চোখটা দেখছি।" খুশী হয়েছিলেন দ্রোণাচার্য। বলেছিলেন, "এইবার তীর ছোঁড়।" অর্জুনের তীর পাখির সেই বিন্দুর মত চোখটিই বিদ্ধ করেছিল। দ্রোণাচার্য বলেছিলেন—তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অর্জুনই সর্বশ্রেষ্ঠ—ওঁর তুলনা নেই।

কিন্তু শুধু শস্ত্রবিদ্যা নয়—মানুষের জীবনে যে-কোন বিদ্যায় পারদর্শী হতে গেলে, যে-কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে গেলেই চাই এই একাগ্রতা, তন্ময়তা।

আধুনিক যুগের একজনের কথাই বলছি।

তোমরা পেনিসিলিনের নাম শুনেছ সকলেই। সে এক আশ্চর্য ওষুধ—এতকাল যে-সব রোগ ছিল চিকিৎসার অসাধ্য বা দুঃসাধ্য—যা ছিল কষ্টকর, যন্ত্রণাদায়ক—তা অতি সামান্য সময়ের মধ্যে সেরে যাচ্ছে এই ওষুধের কল্যাণে।

বহু রোগের বীজাণু ধ্বংস করতে পারে এই ওষুধটি। অবশ্য বেশী বার প্রয়োগ করলে অনিষ্টও হয় মানুষের। চট করে সেরে যায় বলে চিকিৎকরা যেখানে সেখানে পেনিসিলিন প্রয়োগ করেন—তার ফলে রোগীর এক এক সময় প্রাণান্ত হবার যোগাড় হয়। এঁর আবিষ্কারক স্বয়ং আলেকজান্দার ফ্লেমিং—আমাদের দেশে এসেই বলে গেছেন, "দোহাই তোমাদের, তোমরা পেনিসিলিনের এত ব্যবহার বন্ধ কর!"

কিন্তু মহাশক্তিশালী জিনিস বলেই এত সতর্কতা তাঁর। পাশুপত অস্ত্র দেবার সময় মহাদেব অর্জুনকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, "খুব সাবধান! এ অস্ত্রের হাত থেকে দেব অসুর যক্ষ রক্ষ কারও নিস্তার নেই বটে—কিন্তু সামান্য মানুষের ওপর কখনও প্রয়োগ করতে যেও না—তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, বিশ্বে প্রলয় দেখা দেবে।"

এহেন ওষুধ আমরা বার করতে পারি না কেন ?

কেন পারি না—তার জবাব পাওয়া যাবে এই আশ্চর্য ওষুধ পেনিসিলিনের আবিষ্কর্তা স্যার আলেকজান্দার ফ্লেমিং-এর জীবনের একটি ঘটনা থেকে।

গল্পটি বলেছেন তাঁরই কর্মসচিব বা সেক্রেটারি। ঘটনার মধ্যে তিনিও জড়িত ছিলেন।

১৯৪৪ সাল। বিলেতে নিত্য বোমা পড়ছে। এক আধটা নয়—অসংখ্য, অজস্র। গোটা দেশটাই ধ্বংস হতে বসেছে প্রায়।

স্যার আলেকজান্দার তখন তাঁর ঘরে বসে কাজ করছেন, কী সব জরুরী 'নোট' দিচ্ছেন, সেক্রেটারি বসে লিখে নিচ্ছেন সেগুলো। বলতে বলতেই তন্ময় হয়ে যাচ্ছেন তিনি—কোন সুদূরে মন চলে যাচ্ছে। চিন্তায় ডুবে যাচ্ছেন মধ্যে মধ্যে।

এমনি একটি তন্ময়-মুহূর্ত যাচ্ছে তাঁর। এমন সময় বোমা পড়বার বিপদ আসন্ন জানিয়ে সাইরেন বেজে উঠল।

এরোপ্লেন নয়—বোমারা স্বয়ং উড়ে আসছে। উড়ুক্কু বোমা যাকে বলে—তাই। সাধারণ বোমার চেয়ে ঢের বেশী শক্তিশালী।

মুখ শুকিয়ে উঠল সেক্রেটারির। তিনি অসহায় বিপন্নভাবে চাইলেন স্যার আলেকজান্দারের মুখের দিকে।

কিন্তু সেই জ্ঞানতপস্বী নির্বিকার। তিনি নিজের সাধনায় ডুবে গেছেন তখন। তেমনি স্থির নিশ্চলভাবে বসে রইলেন তিনি।

আর একটু পরে দ্বিতীয় বার বাজল সাইরেন। অর্থাৎ এসে পড়েছে।

আর সে ত খোলা জানলা দিয়ে নিজের চোখেই দেখছেন সেক্রেটারি। কানেই শুনতে পাচ্ছেন তার আগমনের বিকট ঘর্ঘর রব।

অমোঘ অব্যর্থ গতিতে এগিয়ে আসছে, তাঁদেরই লক্ষ্য করে।

সেক্রেটারি ঘেমে নেয়ে উঠলেন ভয়ে, হাত এত কাঁপছে যে পেন্সিলটা ধরে রাখা যাচ্ছে না। আবারও অসহায় করুণভাবে চাইলেন স্যার আলেকজান্দারের দিকে। তিনিও চেয়ে আছেন জানলার দিকেই—কিন্তু নির্বিকার প্রশান্ত তাঁর মুখভাব, ললাটের একটি রেখাও চঞ্চল হচ্ছে না এই আসন্ন মৃত্যুর সামনে।

ক্রমে সে বস্তুটি মাথার উপরে এল।

না,—এ বাড়িতে পড়েনি। একটুর জন্যে বেঁচে গেছে। একেবারে কান-ঘেঁষে বেরিয়ে যাওয়া যাকে বলে।

কিন্তু গেছে একেবারে বাড়িটার উপর দিয়েই। তার ফলে গোটা বাড়িটা ঝন্ ঝন্ শব্দে কেঁপে উঠল। দূরে গিয়ে যেখানে পড়ল—সেখানকার সে ধ্বংসের শব্দও কম নয়। কানে যেন তালা লেগে গেল সে শব্দে। তবু একটুকু বিচলিত হলেন না ফ্লেমিং। তেমনি স্বপ্নালু দূর-নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি।

একটু পরেই আবারও সাইরেন বাজল,—'অল্ ক্লিয়ার' সাইরেন। বিপদ কেটে গেছে—এবার অন্তত কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত।

কিন্তু এই সাইরেন বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই কাণ্ড ঘটে গেল। স্যার আলেকজান্দার হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, "লুকোও, লুকোও! করছ কি—শুনতে পাচ্ছ না—এখনি বোমা পড়বে যে!"

বলতে বলতে নিজেও গিয়ে গুঁড়ি মেরে একটা টেবিলের নীচে ঢুকলেন!

আগের সাইরেন বা বোমার শব্দ কোনটাই কানে যায়নি তাঁর। এইটেকেই তিনি বিপদসূচক সাইরেন ভেবেছেন। এমনি তন্ময়তা ও একাগ্রতা [illegible] এসে পৃথিবীতে কোন বড় কাজই করা যায় না—কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না।

স্বপ্নালু দূর-নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি

কে জেব্দ??

লীলা মজুমদার

১নং

ভাই ☛

কাল যখন গুপ্তস্থানে তোমার চিঠি পেলুম না, তখন আমার মনের অবস্থা যে কী হয়েছিল, সে আর কী বলব! তবে কি তুমি এত সহজেই ভয় খেয়ে গেলে? চিরকাল তো দেখে এসেছি যে, স্বয়ং হেডস্যার পেছন ফিরে বোর্ডে কিছু লিখতে গেলেই, তুমি ভেংচি কাটতে, বগ দেখাতে, সে-সময় তো তোমার অন্য মূর্তি দেখতুম।

এমনও নয় যে, তোমার অসুখ করেছে। তা হলে আমার চিঠিটা নিলে কী করে? তাছাড়া মামার সঙ্গে বুক ফুলিয়ে খেলার মাঠে যাওয়া হচ্ছিল, সে কি আমার চোখে পড়েনি ভেবেছ?

তোমাদের বাড়ির লোকদের ধারণা, আমার সঙ্গে মিশলে তুমি গোল্লায় যাবে। তাই তোমার মন ভোলাবার জন্যেই ওদের এসব চেষ্টা, সে কি তুমি বোঝ না?

তাহলে তোমার এও জানা উচিত যে, আমাদের বাড়ির লোকদের বিশ্বাস, তুমি একটা পাজি বদমায়েস, তাই আমাকে ও-স্কুল থেকে ছাড়িয়ে অন্য স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে।

তোমার সঙ্গে মিশলে আমি খারাপ হয়ে যাব, একথা জেনেও আমি তোমাকে ছাড়িনি; আর তুমি কি শেষ মুহূর্তে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছ নাকি? আমাদের বাড়ির লোকেরা বলে, তোমার টেরি বাগানো দেখেই তোমাকে হাড়ে হাড়ে চেনা যায়। সে কথা কি তবে সত্যি?

অবিশ্যি এও হতে পারে যে, অন্য কোনো দুষ্টু লোকে আমার চিঠিখানা সরিয়েছে, তুমি সেটা পাওইনি। কিন্তু তুমি তাদের বলে না দিলে গুপ্তস্থান খুঁজে বের করা কারো পক্ষে তো সম্ভব নয়।

তোমাদের বাড়ির লোকদের চিনতে আমার বাকি নেই। ওরা যদি তোমার ওপর কোনো রকম জোর-জবরদস্তি করে তো আমাকে একটু জানালেই হয়। ওদের আমি একবার দেখে নিই! যাই হক, আমাদের বাড়ির লোকদের চেয়ে খারাপ তো আর ওরা হতে পারে না।

এ চিঠির উত্তর তোমার দেওয়া চাই-ই। কারণ সেই তাদের ও-রকম বন্দী অবস্থায় আর বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমার অবস্থা তো সবই জানো, ওদের খাবার জোগানো আমার বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠছে না। অথচ কাজ হাঁসিল হবার আগে মরে গেলেও তো আগাগোড়া লোকসান। ভালো চাও তো চিঠি পেয়েই গুপ্তস্থানে উত্তর রেখে দেবে।

ইতি ☛

২নং

ভাই ☛

তা বললে তো চলবে না, এই সময় ওরা মরে গেলে হবে না। আমি আর ধরে আনতে পারব না বলে রাখলাম। প্রাণ হাতে নিয়ে ও-কাজ করতে হয়েছিল। আম বাগানের ও-দিকটাতে কি ঘন কচুবন, তোমার কোনো ধারণাই নেই। আমি বলেই পেরেছিলাম। বড় জোর আজ বাদে কাল। তারপর তো আর খাবারের দরকার হবে না, এখন আর অত বাছবিচার কিসের? তবে আশা করি ওদের এক সঙ্গে রাখনি? তা হলে হিংস্র হয়ে উঠে আবার পরস্পরকে না আক্রমণ করে!

আমাদের বাড়ির লোকেরা শনিবারের তিনটের শোর জন্যে বাড়িসুদ্ধু সকলের টিকিট কিনেছে আর রবিবার ভোরে দল বেঁধে সোনারপুরে যাওয়া হচ্ছে, সেখানে লুচি পাঁঠা রান্না হবে। আমাকে হিংসে করে তোমার বাড়ির লোকদের সম্বন্ধে তুমি যা ইচ্ছে বলতে পারো, তাতে আমার কাঁচকলাও এসে যাবে না। তাছাড়া ওরা যে লোক ভালো নয় সে তো আমি বরাবর জানি। গত বছর যাত্রা দেখতে যাওয়া নিয়ে কী কাণ্ড করেছিল, সে আমি আজও ভুলিনি। না বলে যাব না তো কী করে যেতাম? বললে কি ওরা মত দিত বলতে চাও? সে যাক গে, এখন একটু চুপচাপ থাকো, এদের মনের সন্দেহ ঠাণ্ডা হক, তারপর আর কোনো ভাবনাই থাকবে না। ওদিকে আমিও বিষম ফ্যাসাদে পড়েছি, টাকাকড়ি না হলে তো কোনো ব্যবস্থাই করা যাচ্ছে না। তোমার জন্মদিনে পাওয়া টাকাগুলো এরই মধ্যে কী করে খরচ হয়ে গেল, ভেবে পেলাম না। সব টাকা আমি জোগাব, আমি কি একটা ব্যাঙ্ক নাকি? ঐ যে কি নাম, ভুলে যাচ্ছি যা নিয়ে দেবতারা ঝগড়া করতেন, ইচ্ছে-পাই [illegible] যেন?

ইতি ☛

পুঃ—কালকের চিঠির উত্তর দিইনি কারণ ফুলুরা কেবিনে মামার সঙ্গে কাটলেট খেতে যাবার দরুন সময় পাইনি।

৩নং

ভাই ☛

তোমার চিঠি পড়ে বুঝতে বাকি রইল না, তোমার কতদূর অধঃপতন হয়েছে। জন্মদিনের টাকা দিয়ে তো কবে সেই টিকিটের অ্যালবাম কিনেছিলুম, কোন্ কালে সে হারিয়েও গেছে।

আর টাকার অভাব আবার একটা কথা নাকি? আমার অনেক হাতের লেখা লিখতে হয়, নইলে টাকা রোজগার করা কি এমন শক্ত বুঝলুম না। যাই হক, কয়েকটা উপায় বাতলে দিচ্ছি, তাতে কিছু টাকার উপায় হবেই। যেমন (১) তেলেভাজার দোকান—কোনো মূলধন লাগে না। তোদের রান্নাঘরে ও ভাঁড়ারঘরে সব পাবি। (২) ধারের ব্যবসা। মামার কাছ থেকে দুটো টাকা চেয়ে দু-টাকার জায়গায় তিনটাকা দেবে। আবার খাটাবি, হবে সাড়ে চারটাকা—তা হলেই হবে। (৩) লটারি করা। তোদের পুরোনো রেডিওটা লটারি করে দে, একটাকা টিকিট। তিন দিনে দুশো টিকিট বিক্রি হবে—তার দেড়শো দিয়ে একটা নতুন রেডিও কিনবি, বাকি টাকা আমাদের। এইগুলো করে দ্যাখ, নিশ্চয়ই যথেষ্ট হবে।

ইতি ☛

পুঃ—আর দ্যাখ, দু একদিনের মধ্যে যা হয় করিস। ওদের মধ্যে তিনজন নড়ছে-চড়ছে না। ভাতটাত খায় না কেউ। রুটিও না।

৪নং

ভাই ☛

তোর আহ্লাদ দেখে অবাক হই! আমি সব করব আর উনি শুধু বুদ্ধি জোগাবেন, এতো মজা মন্দ না। এদিকে চারদিক থেকে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। ওদের ভালো করে তোদের খালি গোয়ালে লুকিয়ে রেখেছিস? শব্দটব্দ করে না আশা করি?

ঝিশ আমার খুব মনে হয় না'—'আমাদের াছু নিয়েছে। জানিস তো ওর কি রকম নাভ। আমাকে এক দণ্ড ছাড়ে না, ইস্কুলে সঙ্গে সঙ্গে যায় আসে। গোপনস্থানের পাশ দরে যাই আসি তবু চিঠি নেওয়া একটা মস্যা হয়ে পড়েছে। কেউ নিশ্চয় ওকে াকা দিয়ে বশ করেছে। কারণ চিরকাল তো র ট্যাঁক গড়ের মাঠ বলে জানি, অথচ কাল খন সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল, পকেট থেকে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ হচ্ছিল। ও চান করতে বাড়ি গেলে এ চিঠির ব্যবস্থা করব।

যাই হক, তুই কিছু ভাবিস না, কাল একটা হেস্তনেস্ত করবই। কিন্তু, ভাই মনে থাকে যেন, এবার আমাকে রাজা করতেই হবে, আমি আর ঘৃণ্য হীন পদে থাকতে রাজী নই। এত করছি শুধু ঐ জন্যেই।

ইতি

৫নং.

ভাই

গুপ্তস্থানের কথাটা ম—কে বলতে হয়েছে, কারণ এরা আমাকে দুদিন উপরি উপরি জোলাপ খাওয়াল, চিঠিপত্র নেওয়া আনার আর কোনো ব্যবস্থা করা গেল না। তবে ও কাউকে বলবে না বলেছে। ওর নাকি ভয় ভয় করে, যদি ধরা পড়ে তাই। তাই ওকে কিন্তু সেনাপতি না করলে হয়তো সব ফাঁস করে দেবে। এদিকে ওদের তো প্রায় সবার দফা শেষ। গোয়ালে আর ঢুকতেও ইচ্ছে করে না। সেই অন্যদের দিয়েই কাজ চালাতে হবে। টাকার কিছু করতে পেরেছিস নাকি? বেশী কেনবার কী দরকার? গোটা পাঁচেক হলেই তো যথেষ্ট। আমি ছোড়দাদুর পাকাচুল তুলে একটাকা জমিয়েছি, বাকিটা কিন্তু তোকে তুলতেই হবে, নইলে সব মাটি, আর সময়ও নেই।

ইতি

৬নং

ভাই

শুনে খুশি হবি, সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। শ—ই আমার শাপে বর হল। ওকেও দলে টানতে হল। বলেছি মন্ত্রী করে দেব। ওর কাছ থেকে তিনটাকা ধার নিয়ে পাঁচটা কিনেছি। আর যা যা লাগবে তোর টাকাটা দিয়েই হয়ে যাবে। আজ রাত্রে শ—নিজে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেলবে। তুই ম—কে দিয়ে সেই অন্যদের জোগাড় করে পাঠাস আর টাকাটাও দিস। তা হলে কাল ভোরের মধ্যে সব হয়ে যাবে। শুধু তাদের বাঁচিয়ে রাখা গেল না, এই এক দুঃখ থেকে গেল।

ইতি

৭নং

ভাই

আমার সত্যি সত্যি সর্দি জ্বর হয়েছে। জানতুম অত জোলাপ আমার সইবে না! তার ওপর সকাল থেকে মন খারাপ, কারণ কিছুই বুঝে উঠতে পারলুম না। ম—র দেখা নেই, সেই কাল সন্ধেবেলা টাকা নিয়ে আর অনাগুলোকে নিয়ে গেছে তো গেছেই, কাজ হাসিল হয়েছে কিনা তা পর্যন্ত বুঝলুম না। সব জানাস ভাই, নইলে এই রোগশয্যা থেকে আর উঠতে ইচ্ছে করছে না।

ইতি

ভাই গুপি,

আর গোপনতার কোনো দরকার নেই, যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছে। শম্ভু আর মণ্টু দুজনে মিলে রাতে নতুন খুড়োর পুকুরে পাঁচটা ছিপই কেঁচো গেঁথে ফেলে রেখেছিল। ভোরে গিয়ে দেখে পাঁচটা চার সেরি সাড়ে চার সেরি কাতলা পড়েছে। সেইগুলোকে তুলে নিয়ে চারটেকে ওরা পুজো কমিটির চারজনার বাড়িতে নিজেদের নামে দিয়ে এসেছে আর একটা দিয়েছে নতুন খুড়োকে। এতবড় মিথ্যাবাদী যে, বলেছে টালিগঞ্জে গিয়ে নাকি কোন বন্ধুর পুকুর থেকে ধরেছে। তাঁরা তো সব আহ্লাদে আটখানা। মাছের গায়ে তো আর টিকিট ঝোলানো নেই যে, নতুন খুড়োর পুকুর থেকে ধরা।

নতুন খুড়ো এইমাত্র জ্যাঠামশাইকে বলে গেলেন, শম্ভু আর মণ্টু নাকি পুজোর নাটকে রাজা আর শত্রু-রাজা হবে, আর তোকে আমাকে নাকি মন্ত্রী আর সেনাপতি করা হবে। সে পার্টগুলো কত ছোট তোর মনে আছে তো ভাই? আর শম্ভু মণ্টুর পের্জিম দেখলি। নতুন খুড়োর পুকুর থেকেই রাতারাতি মাছ চুরি করে—চুরি নয় তো কি ভাই?—ও'কে আর ও'র দলটিকে দিয়ে আমাদের পার্টগুলো বাগিয়ে নিলে। এই বয়সেই এই, আরো বড় হলে যে পাকা দাগী চোর হবে না, তাই বা কে বললে!

চাঁদের বুড়ী

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

চাঁদের বুড়ী চরকা কাটে সারাটা রাত ধরে,
জ্যোৎস্না মেখে কালপেঁচারা আকাশ দিয়ে ওড়ে...
ঝিঁঝি ডাকে,
বনের ফাঁকে
জোনাকিরা জ্বলে,
মটমটিয়ে বাঁশের ঝাড়ে বাতাস কথা বলে......
ঘুড়ি ওড়াও, সুতো ছাড়ো,
খবর পাঠাও তাতে,
মনে মনে ডাক দিয়ে যাও
নিষুতি এই রাতেঃ
চাঁদের বুড়ী মুক্তো ঝরাও উদার হাসি হেসে
রূপকথাদের রূপোর কাঠি ছোঁয়াও কাছে এসে...
ডাকতে ডাকতে ভোর হবে ত, পথটা অনেক দূরে,
আসতে যদি না পারে সে
দেখবে ওপাশ ঘেঁষে
দাঁড়িয়ে আছে ওর বদলে সোনালী রোদ্দুর॥

অথচ বুদ্ধিটা হল তোর আমার! কচুবন থেকে ফড়িং ধরে এনেছিলাম আমি, নেহাত তুই বাঁচাতে পারলি না বলে কেঁচো দিয়ে ধরতে হল। কিন্তু সমস্তটা আমাদের মাথা থেকেই বেরুল, অথচ ফল ভোগ করছে ওরা দুটোতে। তোর বাবাও আমাদের বাইরের ঘরে বসেছিলেন, নতুন খুড়ো তাঁকে কি বললেন জানিস? বললেন, ঐ জগু গুপি দুটি গুণধরকে আলাদা করে দিয়ে খুব বুদ্ধির কাজ করেছেন, দাদা। শম্ভু মণ্টুর মতো ভালো ছেলেদের সঙ্গে মিশলে এখনো ওদের সুমতি হতে পারে। নিজের পুকুরের মাছ উপহার পেয়েই একেবারে গলে জল। ঐ বুড়োকে কী করে জব্দ করা যায় এখন তাই ভাবছি। সবচেয়ে দুঃখ হচ্ছে, গুপ্তস্থানটা ওরা জেনে গেল বলে। নইলে কচুবনের পেছনের ভাঙা দেয়ালের আলগা ইঁট সরিয়ে তার পেছনে চিঠি রেখে, আবার ইঁট বন্ধ করার কথা তোর ছাড়া আর কার মাথা থেকে বেরুতে ভাই?

ঠিক করেছি, তোর জ্বর হয়েছে বলে বাবা জ্যাঠামশাইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে একবার তোকে দেখতে যাব। তখন বাকি কথা হবে। ইতি—তোর প্রাণের বন্ধু

জগু।

বুধো-ডাক্তারের ষাঁড়জরী

শেষে ঘেনুর কপালে সেটা উঠলো। বেশ বড়সড় হয়েই উঠলো। কী জ্বালা! উঠবি তো ওঠ না কেন অন্য কোথাও; তা নয়, উঠলো কিনা ঘেনুর তেল-চুকচুকে ওপর-কপালের ঠিক মাঝখানে! পোকা নয় যে, ঘেনু টুস্কি মেরে সেটা ফেলে দেবে। কুটো নয় যে, সট্ করে ঝেড়ে ফেলবে। কাক-চড়ুই নয় যে, হুস্ করে তাড়িয়ে দেবে। তা হলে ঘেনু করে কি এখন কপালের এই লিচুর বোঁটার মতন আঁচিলটাকে নিয়ে?

নাইতে, খেতে বা খেলতে কিছুতেই ঘেনুর সোয়াস্তি নেই। খালি চুকচুক করে আঁচিলটাকে তার টানতে ইচ্ছে করে। তা ছাড়া সবাই যখন অসভ্যর মতন প্যাট্‌প্যাট্ করে চেয়ে দেখে তার কপালের দিকে, তখন কী বিশ্রীই যে লাগে ঘেনুর, সে আর বলে বোঝানো যায় না! আরে, অমন করে দেখার কী আছে? ঘেনু কি আঁচিল সারাবার কম চেষ্টা করেছে? চুন দিয়েছে, চুল জড়িয়েছে, সোডা-সাবান লাগিয়েছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। বরং আঁচিল সারানো সোজা, কিন্তু আঁচিল সারানো [illegible] অসাধ্য!

ঘেনুর কষ্টটা [illegible] কেউ না বুঝুক, পেনু [illegible] পারতো। ঘেনুর কষ্ট দেখে [illegible] নিজে থেকেই [illegible] পাড়লো [illegible] আপদ-বিপদে [illegible] দরকার। সে সুযোগ যখন [illegible] পেনুর নিজে থেকেই সেটা [illegible] সে সেদিন ঘেনুকে বোঝাতে [illegible] "দেখ ঘেনো, তুই তো অনেক কিছু করলি, তা [illegible] একবার বুধোদার কাছে তোর আঁচিলটা দেখিয়ে আন।"

"বুধো?" ঘেনু প্রশ্ন করলো, "সে উধো আবার কে?"

ঘেনুর মন্তব্যে পেনু একটু চটেই উঠলো। সে জবাব দিলে, "আজ্ঞে, বুধোদাকে তার [illegible] বলতে [illegible] বুধোদা নিজে ডাক্তার না হলেও ডাক্তারের ছেলে। বাবার ডিস্‌-পেনসারীতে বসে বসেই ও অনেক কিছু শিখে ফেলেছে। আরে, কতলোক স্রেফ ওর কাছ থেকেই ওষুধ খেয়ে ভালো হয়ে গেলো, তা তোর, তোর তো সামান্য একটা আঁচিল রোগ—হ্যাঁ! বড় হলে দেখবি, বুধোদা কী নাম-করা ডাক্তার হয়!"

বুধোদার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পেনুর এত বড় ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়াতে ঘেনুর মনে কেমন একটু আশা হয়। সে ভাবে, হয়তো হলেও কিছু হতে পারে, তবু কিন্তু-কিন্তু করে জিগ্‌গেস করে, "হ্যাঁরে, তোর বুধোদা শেষে এমন ওষুধ দিয়ে দেবে না তো যে, আমার কপালসুদ্ধু পুড়ে যাবে?"

"আরে, তেমন তেমন বুঝলে বুধোদা তোকে তো তার বাবা-ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। তাতে ভালোই হবে তোর। বিনি-পয়সায় একটা বড় ডাক্তার দেখাতে পারবি।" পেনু বোঝাতে থাকে ঘেনুকে, "আগে থাকতেই ঘাবড়াস কেন? বুধোদার বাবা আমাকেও জানেন।"

ঘেনু ভেবে দেখলে, পেনুর কথাটা ঠিক। তেমন একটা কিছু হলে বুধো-ডাক্তারের

"জিব দেখি"

বাবা-ডাক্তার তো রয়েইছে হাতে। কুছ্-পরোয়া নেই, ঘেনু দেখাবে পেনুর বুধোদাকে তার আঁচিলটা।

দিন-ক্ষণ দেখে ঘেনুকে নিয়ে পেনু সটান হাজির হলো তার বুধোদার কাছে। বুধোদা তখন তার ঘরে বসে মোটা একটা ডাক্তারী বইয়ের ছবি দেখছিল। পেনুকে দেখে সে বেশ খুশি হয়ে উঠলো। চেয়ার-খানা দেখিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, "আরে, তোকেই খুঁজছিলাম পেনো। এই বইটা দেখছিস না? এর মধ্যে মানুষের চেরা হাত-পায়ের সব ছবি আছে, বুঝলি? এর গোটাকতক আমাকে এঁকে দিতে হবে।"

পেনু চালাক ছেলে। বেশী বাজে কথা না বলে সে কাজের কথা পাড়লে। "ছবি হবেখন। তোমার সঙ্গে দরকারী কথা আছে বুধোদা। ঘেনুকে নিয়ে এলুম তোমার কাছে। ওর বড় অসুখ।"

বুধোদার ঘরের দেয়ালে ঝোলানো কঙ্কালের ছবি, বইয়ের তাকে লাল, নীল ওষুধের শিশি ও আরও সব টুকিটাকি দেখে ঘেনুর মনে হলো, বুধোদা বয়সে তার চেয়ে তেমন বড় না হলেও ভবিষ্যতে বড় হবার উপযুক্ত বটে।

রোগীর কথা শুনে বুধোদা হাত গুটিয়ে ঘেনুকে বললে, "বোস এই চেয়ারে। কী অসুখ? পেটের মধ্যে হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে, না পড়তে বসলে চোখ বুজে যায়?"

ঘেনুকে অসুখের বিবরণ নিজে কিছু বলতে হলো না। পেনুই গড়গড় করে সব বলে গেলো।

বুধোদা ঘেনুর আঁচিলটা দু'বার টেনে টেনে দেখলে; তারপর কপালে দু'বার টোকা মেরে বললে, "জিব দেখি।"

ঘেনু ভালোছেলের মতই জিব বের করলে। জিব দেখে বুধোদা গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলে, "এটা অসুখ নয়।"

ঘেনু এবং পেনু দুজনেই রুদ্ধনিঃশ্বাসে এতক্ষণ বুধোদার রোগ-পরীক্ষার পদ্ধতি দেখছিল। বুধোদার মন্তব্য শুনে তারা একসঙ্গে বলে উঠলো, "তা হলে?"

বুধোদা ওদের কথা নকল করে বলে উঠলো, "তাহলে? ডাক্তারির কী বুঝিস তোরা? যদি বলি, 'ত্বক্-তন্তু বিবৃদ্ধি,' বুঝবি কিছু? যাকগে, কী ওষুধ খাচ্ছিস?"

ঘেনু এত বড় একটা রোগের নাম শুনে কেমন ঘাবড়ে গেলো। সে সম্ভ্রমে উত্তর দিলে, "খাইনি কিছু। এই চুন-টুন লাগিয়েছিলুম।"

বুধোদা বললে, "এ চুনকামের কেস নয়। দেখছিস না, শিঙের মতন ঠেলে উঠছে। এ সারজারীর কেস"

দুর্ভাবনায় ঘেনু ঘেমে উঠলো। সে ভাবলে, তাহলে কি শিং-জাতীয় কিছু নাকি রে বাবা! সে আমতা আমতা করে প্রশ্ন করলো, "তার মানে?"

বুধোদা জবাব দিলে, "মানে, অস্তর করতে হবে। ঘাবড়াসনি, এক মিনিটে সারিয়ে দেবো। কিস্‌সু টের পাবিনি। কুচ্ করে এমন কেটে দেবো যে, আঁচিলের আঁটটুকুও আর থাকবে না তোর কপালে।"

"বাবারে মরে গেলুম, মরে গেলুম,"

শিং-টিঙের ব্যাপার নয় জেনে ঘেনু আশ্বস্ত হলো। আঁচলটা কাটতে গেলে হয়তো একটু লাগবে, তা লাগুক। ওতে ঘেনুমাস্টার কিছু ভয় পায় না।

বন্ধুর বিপদে বন্ধু কত কাজে আসে, বোধ করি সেই কথা স্মরণ করে পেনু বলে উঠলো, "কি রে ঘেনো! বলেছিলুম কিনা যে, বুধোদার কাছে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কত বড় ডাক্তারের ছেলে বুধোদা! ভাগ্যিস এসি আমার সঙ্গে।"

বুধোদা ততক্ষণে টেবিলের ওপর তুলো, আইডিন এবং স্পিরিটের শিশি সাজিয়ে রেডি হয়ে গেছে। টানা থেকে একটা নখ-কাটা কল বের করে, স্পিরিট দিয়ে সেটা মুছতে মুছতে সে বলে উঠলো "এই পেনো! বাজে বকিসনি। ধরদিকিনি ওর মাথাটা টাইট করে হেলিয়ে ওপর দিকে।"

বুধো-ডাক্তার একটা স্পিরিট-ভেজানো তুলো ঘেনুর আঁচিলের চারপাশে বুলোতে বুলোতে আদেশ করলে, "চোখ বোজ্ ঘেনু।"

ঘেনু সুবোধ বালকের মত চোখ বুজে ফেললো। চোখ বুজে সে বুধো-ডাক্তারের সারজারির কায়দা দেখবার কিছু সুযোগ পাচ্ছিল না বটে, কিন্তু উপলব্ধি করতে পারছিল ঠিকই।

ঘেনু বেশ বুঝতে পারলে যে, একটা চিমটে যেন তার আঁচিলের গোড়াটা কষে চিমটি দিয়ে ধরেছে। মাথাটা তার কট্‌কট্ করে উঠলো। চোখ খুলে প্রতিবাদ করবে কি না সে, একথা ভাবতে ভাবতেই কুট করে একটা শব্দ হলো। তারপরে ঘেনুর গালের ওপর টপ্‌টপ্ করে কি একটা জলীয় পদার্থ গড়িয়ে পড়লো।

ঘেনু চোখ খুলে দেখে যে, তার কপাল থেকে টপ্‌টপ্ করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বুধোদা চিন্তিত মুখে ঘনঘন তার কাটা জায়গাটা একবার মুছছে, আর একবার তুলো চেপে ধরছে। রক্ত কিছুতেই থামছে না। পেনুর মুখটাও কেমন হাঁ হয়ে উঠছে! বুধোদার হাতে রক্তমাখা তুলোর পুঁটলি-গুলো দেখে ঘেনু আতঙ্কিত হয়ে কাঁদ-কাঁদ গলায় বলে উঠলো, "অ্যাঁ, এত রক্ত!"

বুধোদা মুখটা কাঁচুমাচু করে জবাব দিলে, "এই একটু রক্তারক্তি হয়ে গেলো। একেবারে শিকড়সুদ্ধু দিলুম কিনা সাফ করে—এাই পেনো!" বুধোদা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, "ঢাল না আইডিনটা এখানে।"

বুধোদার হুঙ্কারে, পেনো, ঘেনোর মাথাটা ছেড়ে দিয়ে আইডিনের শিশিটা নিয়ে এলো এবং কোথায় ঢালতে হবে বুঝতে না পেরে ঝাঁটিতে ঘেনুর কাটা কপালেই উপুড় করে দিলে।

ঘেনু সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে চিংড়ি মাছের মতন লাফিয়ে উঠলো এবং "উরে বাবারে মরে গেলুম, মরে গেলুম!" বলে ঘরের মধ্যে দাপাতে শুরু করে দিলে।

বুধোদা পেনুর কাণ্ড দেখে রাগে রক্ত-মাখা তুলোটা দিয়ে থপাস্ করে তার মুখে প্রকাণ্ড একটা থাবড়া কষিয়ে বলে উঠলো, "ক্যাবলাচণ্ডে! ঢালতে বললুম কোথায়, আর ঢাললি কোথায়? আর রোগী ধরে এনেছিস না পাগলাগাধা ধরে এনেছিস? চেঁচাচ্ছে দেখো না! এাই পাগ্‌লো ইদিকে আয়।" বুধোদা ঘেনুর দিকে তুলো আর শিশি-হাতে ধাওয়া করলে।

বুধো-ডাক্তারের হাতে ঘেনুর আর মোটেই আত্মসমর্পণ করার ইচ্ছে ছিল না। বুধোদাকে ধেয়ে আসতে দেখেই সে "ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু!" বলে বুধোদাদের অন্দরমহল-মুখো দৌড় দিলে।

বুধো-ডাক্তারের রক্তচাপড় খেয়ে এবং ঘেনুর রক্তাক্ত অবস্থা দেখে পেনুও কেমন বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল। সে ও ঘেনুর পিছু পিছু বাড়ির মধ্যে গিয়ে চেঁচাতে শুরু করলে, "মেসোমশাই! শিগ্‌গির আসুন—বুধোদা সারজারী করে রক্তারক্তি কাণ্ড করে দিলে—শিগ্‌গির আসুন! সারজারী দেখে যান!"

বুধোদার বাবা মোটা মানুষ। রুগী দেখে

"ডাক্তারবাবু, রক্ত বন্ধ হচ্ছে না যে!"

অবেলায় বাড়ি ফিরে তিনি দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন। ঘেনুদের চেঁচামেচিতে ঘুমন্ত চোখে "কে রা—কে রা?" করে ঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন এবং সামনে রক্তস্নাত ও টিন্‌চার আইডিনলাঞ্ছিত ঘেনুকে দেখে থমকে গিয়েই হড়বড় করে শুরু করলেন, "এ্যাঁ, ষাঁড়ে গুঁতিয়েছে—এমনি করে?—দেখি কোথা? এ্যাঁ, মাথায়? তা মাথায় গুঁতুলে কেন? ষাঁড়ের সঙ্গে চুঁসোচুঁসি করছিলি বুঝি? কী ষাঁড়?—পোষা না ক্ষ্যাপা?"

পুষি আর বাঘা

॥ গোবিন্দপ্রসাদ বসু ॥

পুষি : মিয়াও...ম্যাও...মাঁও...
দুধ-মাছ-ভাত আমায় খেতে দাও,
ছাই ভস্ম খাইনে—আমি পুষি।

বাঘা : ঘেউ...ঘেউ-উ...ঘেউ...
একমুঠো ভাত আমায় দিলে কেউ,
আমি বাঘা—তাতেই হবো খুশি!

পুষি : ইঁদুর, ছুঁচো, আরসোলা, টিকটিকি
একবারটি সামনে আসুক দিকি:
কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাব ঠিক!

বাঘা : চোর, কি ডাকাত আসুক আমার কাছে
বুকের পাটা দেখবো কত আছে!
হাঁক-ডাকেতে জাগাবো চারদিক!

পুষি : ছোট্ট রুমি আমায় কোলে করে
সারাটি দিন এখান-ওখান ঘোরে!

বাঘা : সকাল-বিকেল প্রত্যহ দুইবেলা
আমার সাথে রুনটু করে খেলা।

পুষি : বাজায় কে ঝুমঝুমি?
আরে,—আসছে দেখি রুমি!

বাঘা : বাজাচ্ছে কে বাঁশি
যাই—ছুটে দেখে আসি!

পেনু যত বোঝাতে চেষ্টা করে যে, ষাঁড় নয়—এটা সারজারী ডাক্তারবাবু, ততই বলে ওঠেন, "এ্যাঁ! ষাঁড়ের সঙ্গে সারজারী—তাই করেছে বুধো? তার গায়ে কি জোর আছে যে, সে গেছে ষাঁড়ের সঙ্গে পাঞ্জা-জুরী ফলাতে?"

পেনু ফেল্ হয় দেখে, ঘেনু নিজেই এগিয়ে এলো। এবং ডাক্তারবাবুর গলার ওপর এক পর্দা গলা চড়িয়ে শুরু করলে। "ডাক্তারবাবু রক্ত বন্ধ হচ্ছে না যে!"

"রক্ত বন্ধ হবে কী করে?" ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন, "ষাঁড়ের গুঁতোর জোর তো কম নয়! যেমন হয়েছো তোমরা!"

"আজ্ঞে, এটা গুঁতোবার কেস নয় ডাক্তারবাবু।" ঘেনু কপাল থেকে রক্ত মুছে বলতে থাকে, "আঁচিল-কাটা কেস। আমার আঁচিলটা বুধোদা অপারেশন করে দিয়েছে।"

ডাক্তারবাবুর কাছে ব্যাপারটা এবার পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তিনি গর্জে ওঠেন, "এ্যাঁ, বুধো বুঝি ধরে তোমার আঁচিল কেটেছে? তোমার ওপর সার্জারী ফলিয়েছে? বাবু ডাক্তার হয়েছেন! কোথায় গেলো সেই ষাঁড়টা? বসো, তোমার রক্তপড়া আগে বন্ধ করি, তারপর বের করছি আমি বুধো-ডাক্তারের ষাঁড়ঝাড়ী! পেনু, খোল ডিসপেন-সারী ঘর। নিয়ে আয় চাবি।"

কে নেবে ভার ?

অমিতা ঘোষাল

(বৃদ্ধ আশ্রমগুরু বসে বসে ভাবছেন, তাঁর মৃত্যুর পর কে নেবে আশ্রম পরিচালনার ভার। এমন সময় এক শিষ্য প্রবেশ করলো)

শিষ্য—ভাবছেন কী গুরুদেব!
কী ঘটেছে কোথা, আদেশ করুন,
জানিয়ে দোব সবাইকে সে কথা।
পূজোপাঠ, নাম-কীর্তন,
বাসনা যা থাকে; বলুন আমাকে।

গুরু—বয়স হলো বৃদ্ধ হলাম
এবার ছুটি চাই।
কাকে দেব আশ্রম-ভার
ভাবছি বসে তাই।
আমার মনের বাসনা যা
প্রচার করো আজ
পরখ করে দেখবো আগে
পরে দেব কাজ।
সত্যি যে কেউ বড় হবে
স্বভাব গুণে জ্ঞানে
তারেই দোব আশ্রম-ভার
পরম সম্মানে।

(শিষ্যের প্রস্থান)

প্রথম গুণীর প্রবেশ। (বিচিত্র ভঙ্গিতে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল)

গুরু—কী পরিচয় তোমার বাছা?
গুণী—আমি বড়লোকের ছেলে,
মণ্ডামিঠাই সন্দেশ
খাই যে খিদে পেলে।
বেড়াই হেসে খেলে।
গুরু—বেশ, বেশ! বিদ্যা কতদূর?
গুণী—বিদ্যা? বিদ্যা অনেকদূর!
ভাবনা নাই কিছু!
গোটা চারেক পণ্ডিত
ঘোরে রোজই আমার পিছু!
খুব বেশী নয় বছর দু-তিন
পাঠ করেছি শুরু,
কিন্তু তবু পাইনি আজও
মনের মতো গুরু।
প্রবেশিকা সামান্য সে কথা
অকারণে ঘামাইনি আর মাথা।
পরীক্ষা তো দিতে পারি,
যখন—খুশি হলে
কারণ, আমি বড়লোকের ছেলে।
গুরু—বটেইতো! বটেইতো!
বয়স হলো কত?
গুণী—আজ্ঞে! বয়স আমার?
তা বেশী নয় উনিশ বছর
এগার মাস হলো—
স্বাস্থ্য খুবই ভালো।
সারাটা দিন বেড়াই হেসে খেলে
খাওয়াপরার নেই ভাবনা,
বড়লোকের ছেলে।
গুরু—তা বেশ বেশ! জিরোও খানিক,
ভেবে দেখি আগে,
খবর পাবে সময় মত
যদি কাজে লাগে।

[ছেলেটি খানিক দূরে গিয়ে উৎসুক হয়ে দাঁড়াবে ও পরে যারা ঢুকবে তাদের কথার সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র ভাবভঙ্গি করবে, ওস্তাদ বোকার মতো]

(দ্বিতীয় গুণীর প্রবেশ)

গুরু—কী পরিচয় তোমার বলো শুনি?
গুণী—আমি বড় পালোয়ান
ডনগীর বলীয়ান—মহাবীর সিং
রোজ নাম-গান গাই
পাঁচ সের দুধ খাই
তিন সের ছাতু দিয়ে
এক তোলা হিং।
দিতে পারি বৈঠক
পাঁচকুড়ি পাঁচবার। বুক ডন পিঠ ডন
হিসাব নেই তার
রোগা বটি দেখতে, কপাল যে মন্দ
ম্যালেরিয়া হাঁপি রোগ
বলে নিঃসন্দ
ডাক্তার কবরেজ হার মানে বার বার
ভজন পূজনে মন দিতে চাই এইবার।
গুরু—বেশ বৎস, বেশ বেশ!
বিশ্রাম করো তুমি।
একটু হাঁফ ছেড়ে
খবর পাবে সময় হলে
কপাল যদি ফেরে!

(হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে দাঁড়াবে আগের গুণীটির পাশে। ভাবভঙ্গিতে হতাশা ফুটে উঠবে)

তৃতীয় গুণীর প্রবেশ

গুরু—কী পরিচয় বৎস?
গুণী—আমি বড় ওস্তাদ,
সারা দিন গান গাই
কান নাড়া, নাক নাড়া
তাইরে নাইরে নাই।
বাগেশ্রী ছাগেশ্রী
দিল্‌খুসা খাম্বাজ
কেওড়া তেওড়া তালে
আমি পাকা নামবাজ।
শোনাতেও পারি অবশ্য
যদি শুনতে চান
সুমধুর নাম-গানে
খুশি হন ভগবান।

(বিকৃত কণ্ঠে গলা ভাঁজা শুরু করলে গুরু ব্যস্ত হয়ে বাধা দিবেন)

গুরু—থাক্‌ থাক্‌ বৎস।
বৃথা কেন কষ্ট,
আগে দেখি ভেবে
সময়মতো খবর পেলে
পরে কাজ নেবে।

(হতাশভঙ্গিতে সকলের সঙ্গে সেও মিললো)

চতুর্থ গুণীর প্রবেশ

(ছেঁড়া ময়লা জামা কাপড়, সুন্দর নিটোল স্বাস্থ্য)

গুরু—কে তুমি সুকুমার,
পরিচয় কী তোমার?
গুণী—গরিবের ছেলে আমি
দিনভর করি কাজ—
জলে ভিজি—রোদে পুড়ি
ছোট কাজে নাহি লাজ।
রাতে পড়ি পাঠশালে
শিখি, লিখি, পড়ি,
চাষ করি, তাঁত বুনি
হাতের শিল্প গড়ি।
ঘরে রুগ্ন বাপ-মা
ছোট ভাই বোন
ঘুচাতে পারি না একা
দুঃখ অনটন।
(মুখে কাতরতা ফুটে উঠলো)
গুরু—এস বৎস।
তুষ্ট হয়েছি আমি
তোমার কথা শুনে
তোমাকে দিলাম ভার
মুগ্ধ হয়ে গুণে।

(গুরু আসন ত্যাগ করে উঠে আশীর্বাদ করলেন, আর সব গুণীরা রেগে প্রস্থান করল)

(সমাপ্ত)

রাজা কা দো শিং

শচীন [illegible]

আরশিতে নিজের মুখ দেখতে গিয়ে রাজা হঠাৎ দেখলেন, তাঁর দুটি শিং গজিয়েছে।

রাজা মহা ভাবনায় পড়লেন। তাই তো মাথায় দুটি শিং নিয়ে তিনি কী করে লোকের সামনে বেরুবেন। তারা যে দুয়ো দুয়ো করবে। এখন কী উপায়!

দুশ্চিন্তায় রাজার চোখে ঘুম নেই। আহারে রুচি নেই। কারও সংগে কোন কথা বলেন না। সব সময় মুখ ভার করে বসে থাকেন। সামান্য কথা নিয়ে রানীর সংগে খিটিমিটি লেগে যায়। মন্ত্রী কোন কাজের কথা বলতে এসে বলেন, "পরে হবে, এখন আমার সময় নেই।" প্রজারা কোন নালিশ জানাতে এলে খবর পাঠিয়ে দেন—"আজ সভা বসবে না। শরীর ভালো নেই।"

সবাই অবাক। তাই তো, আমাদের রাজা মশাই তো এমন ছিলেন না। হঠাৎ তাঁর কী হলো! সবাই মাথায় হাত দিয়ে ভাবে। রাজাকে জিজ্ঞেস করার সাহস হয় না।

রাজাও মাথায় হাত দিয়ে শুধু ভাবেন। ভরসা করে কাউকে কিছু বলতে পারেন না। আরশির সামনে যখন তখন চুল আঁচড়ান। চুল দিয়ে ছোট দুটি শিং ঢেকে রাখেন। কিন্তু ভয় যায় না। শিং দুটি এখন অবশ্য ছোট আছে। কিন্তু যখন বড় হবে তখন তো আর চুল দিয়ে ঢেকে রাখা যাবে না। কী সর্বনাশ হলো। ভগবান কেন তাকে এই শাস্তি দিলেন। রাজা বুঝি কেঁদেই ফেলেন।

রাজার কপালের জোরে শিং দুটি আর বড় হলো না। বড় বড় চুল দিয়ে তিনি তা কোন রকমে ঢেকে রাখলেন। ধীরে ধীরে মনের ভারও অনেকটা নামল। এখন দু-এক জনের সংগে কথাও বলেন। সভাতে গিয়েও মাঝে মাঝে বসেন। প্রজাদের নালিশ শোনেন। মন্ত্রীর সংগে রাজ্য শাসনের কথা বলেন। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কিন্তু রাজা হাঁফ ছাড়তে পারলেন না। ভাবলেন—আর কেউ দেখতে না পেলেও নাপিত তো একদিন দেখবেই। বাবরি চুল তো রাখা যাবে না। চুল কাটাতেই হবে। রাজা আবার ভাবনায় পড়লেন। তাইতো, কী করা যায়।

অনেক ভেবে ভেবে একদিন তিনি নাপিতকে ডাকলেন। তারপর তাকে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে কানে কানে বললেন, তাঁর দুটি শিং গজিয়েছে। শিং দুটি তিনি নাপিতকে দেখালেন। পরে বললেন, "তুমি আসবে যাবে, চুল কাটবে। কিন্তু খবরদার, আমার শিং গজানোর কথা যদি তুমি কাউকে বল, তবে তোমায় আর আস্ত রাখব না। মনে থাকে যেন।"

নাপিত দুই হাত জোড় করে বলল, "আজ্ঞে না মহারাজ, একথা আমি কাউকে বলব না। মহারাজের শিং, একি আমি বলতে পারি।"

রাজা খুশি হলেন। নাপিত চুল কেটে চলে গেল।

কিন্তু বাড়ি গিয়ে নাপিতের অবস্থা কাহিল। রাজার শিং গজিয়েছে এমন কথাটা কাউকে বলতে না পেরে সে ছটফট করে মরছে। কিন্তু উপায় কী। রাজার কানে কথাটা গেলে তার প্রাণ যাবে। কিন্তু এদিকেও যে তার প্রাণ যাবার জো হয়েছে। কথাটা বলতে না পেরে নাপিতের পেট ফুলে ঢাক!

তিন চার দিন এমনি করেই কাটল। নাপিতেরও রাজার অবস্থা। চোখে ঘুম নেই। খাওয়ার রুচি নেই। কথা বলতেও ভালো লাগে না। কাজে মন বসে না। নাপিত পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কাউকে দেখতে পেলেই ডাকে, "শোন দাদা, শোন। একটা ভারি মজার খবর।" কিন্তু আর বলা হয় না। রাজার মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সবাই ভাবে নাপিত বেটা পাগল হয়ে গেছে।

নাপিত আর পারল না। একদিন চলে গেল গভীর এক জংগলে। জংগলের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে অনেক দূর চলে গেল। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখল, সেখানে জনমানব কেউ নেই। চারদিকে শুধু গাছ আর গাছ। নাপিত তখন একটা বড়গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, "শোন, শোন, ভারি মজার কথা শোন। রাজার দুটি শিং গজিয়েছে।"

কিন্তু কে শুনবে মজার কথাটি। একটা মানুষও সেখানে নেই। আছে শুধু গাছ-পালা। কিন্তু তাতেই নাপিতের আনন্দ। মনের কথাটা তবু তো বলতে পেরেছে। অনেকটা হাল্কা হয়ে নাপিত বাড়ি ফিরে এল।

নাপিতের একথা কেউ জানে না। রাজার শিং-এর খবরও কেউ জানল না। নাপিত বাঁচল। রাজারও চিন্তা দূরে হলো।

কিন্তু একদিন হঠাৎ রাজার শিং-এর কথা ফাঁস হয়ে গেল। নাপিতের মজার কথাটা সবাই জেনে ফেলল। কী করে জানল সেটা আরও মজার কথা। সেইটেই বলছি।

সেদিন রাজার বাড়িতে কী একটা উৎসব। আশে পাশের দশ গাঁ ভেঙে লোক এসেছে রাজার বাড়িতে। রাজার বাড়ির উৎসব। ফুলের মালা, নিশান, কত রং বেরং-এর আলো। বাইরে নহবতের শানাই বাজছে। বাড়ির উঠোনে ঢাকিরা নেচে নেচে ঢাক বাজাচ্ছে। হঠাৎ সবাই শুনল একটা ঢাক বারবার বলছে—

রাজা কা দো শিং
রাজা কা দো শিং
কিসনে কহা, কিসনে কহা?
বাব্বনে হাজমনে কহা।
রাজা কা দো শিং
রাজা কা দো শিং।

হঠাৎ শুনে সবার মনে সন্দেহ হলো, তাঁরা ভুল শুনছেন না তো! রাজার শিং, এ-ও কি সম্ভব। রাজার শিং আছে, একথা কে বলেছে? তাঁরা নিজেকে প্রশ্ন করেন। আর ওদিক থেকে জবাব দেয় ঢাক—

বাব্বনে হাজমনে কহা
বাব্বনে হাজমনে কহা
রাজা কা দো শিং

রাজার শিং-এর কথা আর গোপন রইল না। যে নাপিত রাজার চুল কাটত তার নাম বাব্বন। বাব্বন নাপিত যে গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে বলেছিল, "রাজা কা দো শিং"—সেই গাছটা একদিন কাঠুরেরা কেটে নিয়ে আসে বাজারে বিক্রি করতে। কোন এক ঢাকী সেই গাছের ডাল দিয়ে ঢাকের কাঠি তৈরি করে। কোন মানুষ নাপিতের কথাটি শোনেনি। কিন্তু সেই গাছটা শুনেছিল। তাই তার ডাল একদিন ঢাকের কাঠি হয়ে শিং-এর কথাটা ফাঁস করে দিল।

সেই শিংওলা রাজা নেই। বাব্বন নাপিতও নেই। কিন্তু রাজার শিং আর নাপিতের গল্পটা ঢাকের বোল হয়ে এখনও বাজছে। ভারতের উত্তর প্রদেশের কোন গাঁয়ে গিয়ে যে-কোন একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করো ঢাকের বোল বলে দেবে—

রাজা কা দো শিং
কিসনে কহা, কিসনে কহা
বাব্বনে হাজমনে কহা।

বাংলা দেশের ছেলেরা অবশ্য ঢাকের বোল অন্যরকম করে বলে। তারা বলে—তাক্ ডুডুম ডুম, তাক ডুমা ডুম ডুম, ডুডুম, ডুডুম

নাপিতের পেট ফুলে ঢাক

গদাইচরণ

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

আজব দেশের মহারাজা, বেজায় তিনি খেয়ালী,
কখন কি তাঁর মরজি হবে সবার কাছেই হেঁয়ালি।
কখনো বা দিলদরিয়া, দরাজ হাতে বরদান,
কখনো বা বেজায় রেগে করেন দাবী গর্দান।
একটি ব্যক্তি আছে শুধু, সে তাঁর প্রিয় ভৃত্য—
গদাইচরণ; দুই বেলা তাঁর হাত পা টেপে নিত্য।
তারই প্রতি উদার এবং সদয় তিনি সদাই,
যখন তখন ডাকেন, "ওরে, কোথায় গেলি গদাই?"
অনেক গল্প বলে গদাই, যায় না তাদের গোনা,
কতক গল্প বানানো তার, কতক গল্প শোনা;
গল্প শুনে মহারাজা কাঁদেন এবং হাসেন।
কখনো বা কায়দা করে হাঁচির ঢঙে কাশেন।
গান গেয়েও শোনায় গদাই, নেই কোনো তার মানা,
নাই বা থাকুক সুরের বালাই, হোক না সে তালকানা;
শোনায় বাউল, ভাটিয়ালী, পল্লীগীতি, ভজন,
টপ্পা, গজল, ঠুংরি, ধ্রুপদ শোনায় ডজন ডজন;
কোনটা কি গান মহারাজা অত কি ছাই জানেন?
গদাই যে-গান যা-বলে গায় তাই বলেই মানেন।
বলেন, "আহা, গদাইচরণ হীরের টুকরো ছেলে
বিশ্বভুবন ঘুরলে পরেও ওর কি জুড়ি মেলে?
মন্ত্রী গেলে মিলবে আবার যখন তখন সদাই,
কিন্তু আহা, গদাই গেলে মিলবে না আর গদাই।"

পাঁচ মিনিটের গিন্নী

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

পাঁচ মিনিটের গিন্নী হয়ে বসল ইভা রান্নাশালে।
সরষে বাটা যেটুক ছিল ঢালল সেটা মুগের ডালে।
মা বসেছেন ঠাকুর-পুজোয় গিন্নীপনা করছে খুকু।
শুনবে নাকি, বলব খুলে, কেমন মজার ব্যাপারটুকু।
এক ঘটি জল সবটা দিলে ডালের হাঁড়ির মুখে ঢেলে।
পোয়াখানেক লবণ দিলে হাঁড়ির ভেতর সবটা ফেলে।
টিনের ভেতর হলুদ গুঁড়ো ছিল যত সবগুলো দেয়।
তার পরেতে চুপি চুপি মুঠো খানেক তেজপাতা নেয়।
তেজপাতা আর গোলমরিচে মিশিয়ে দিল ডালের মাঝে।
ডালের হাঁড়ির মধ্যে খুকুর খুন্তি কাঠির বাজনা বাজে।
শেষকালেতে উনুন থেকে ডালের হাঁড়ি তুলতে গিয়ে
উল্টে পড়ে খুকুমণি মেঝের উপর হুড়মুড়িয়ে।
ভাঙল হাঁড়ি, গরম ডালে পুড়ল খুকুর হাত দু'খানি।
গড়াগড়ি দিয়ে খুকু সারাটি দিন কাঁদল জানি।

একটি অদ্ভুত ম্যাজিক

জাদুকর পি সি সরকার

প্যারিসের সিতে য়ুনিভেরসেতের-এ মাঝে মাঝে যেতাম আমার বন্ধু ডক্টর মিশ্রের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। এই ইউনিভার্সিটিতে তিনি অংকশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করছিলেন। একদিন তাঁর ঘরে পরিচয় হল সিনর কার্লো, হের গুটেনবার্গ, মঁসিয়ে মিলো ও শেখ গামাল এর সঙ্গে। এঁরা সবাই ওখানে গবেষণা করছিলেন উচ্চগণিত সম্বন্ধে ডক্টর মিশ্রের সঙ্গে।

কথায় কথায় তাঁরা আমার পরিচয় পেয়ে ধরে বসলেন, আমাকে ম্যাজিক দেখাতেই হবে। কী আর করি? একটা থট্‌রীডিং-জাতীয় খেলা দেখালাম তাঁদের।

একটা খাতার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে তা চার ভাগে ভাগ করলাম। নব-পরিচিতদের বললাম এক-একটি দেশের নাম বলতে। সিনর কার্লো বললেন—ব্রেজিল। একটি স্লিপে আমি তা লিখে কাগজ মুড়ে রাখলাম। এমনি করে হের গুটেনবার্গ, মঁসিয় মিলো ও শেখ গামাল যথাক্রমে জার্মানি, ফ্রান্স ও ইজিপ্টের নাম বললেন। আমিও আলাদা আলাদা স্লিপে তা লিখে মুড়ে নিলাম। এর পরে এই স্লিপগুলো রাখা যায় এমন একটি পাত্র খোঁজার জন্যে চলে গেলাম কামরা-সংলগ্ন বাথরুমে। বলা বাহুল্য, স্লিপগুলো ওদের সামনে টেবিলের উপরেই পড়ে রইলো। খুঁজে খুঁজে একটা প্লেট এনে হাজির করলাম। এই প্লেটের উপরে গুটানো স্লিপগুলো রেখে ওদের একজনকে বললাম, যে কোনও একটি স্লিপ তুলে নেবার জন্য। শেখ গামাল তুলে নিলেন একটি। দেশলাইর কাঠি জ্বালিয়ে আমি পুড়িয়ে ফেললাম বাকি স্লিপগুলো—ছাই হয়ে গেল তা। এবার ঐ ছাই একটু তুলে নিয়ে বাঁ হাতের কব্জির একটু উপরের দিকে ভেতরের পিঠে ঘষে নিলাম আচ্ছা করে। সবাই অবাক হয়ে দেখলেন, কব্জির উপরে লেখা ফুটে উঠেছে—'ব্রেজিল'। শেখ গামাল স্লিপটা খুললেন আমার অনুরোধে।

সবাই দেখে অবাক হলেন যে, ঐ স্লিপটার ভেতরেও লেখা আছে 'ব্রেজিল' কথাটা।

এখন শোন, কেমন করে এই মজার ম্যাজিকটা দেখিয়েছিলাম।

করেছিলাম কি জানো? চারজনে চার দেশের নাম বললে কী হবে। লেখার সময়ে আমি কিন্তু প্রত্যেকটি স্লিপেই লিখেছিলাম 'ব্রেজিল' কথাটা। এর পরে বাথরুমে গিয়ে পাত্র খোঁজার অছিলায় হাতের উপরে সরু মুখ সাবানের কুচি ঘষে ব্রেজিল লিখে-ছিলাম। চারটি স্লিপেই লেখা ছিল ব্রেজিল। কাজেই যে স্লিপই তোলা হক না কেন, হাতে ব্রেজিল লেখা স্লিপ আসবেই আসবে।

বাকী তিনটে স্লিপে আগুন লাগানোতে তা হয়ে যায় ছাই। কারসাজির আর কোন প্রমাণই অবশিষ্ট থাকে না। হাতটা যখন সবার সামনে এগিয়ে দেওয়া যায়, তখন তাতে কোনও লেখার চিহ্নই থাকে না। কারণ, সাবানের দাগ দেখা যায় না এমনি-ভাবে। এই সাবানের দাগের উপরে ছাই ঘষে দিলে সাবানের আঠালো ভাবের জন্য ছাই-গুলো তাতে আটকে গিয়ে কালো লেখার সৃষ্টি হয়।

ভালো করে অভ্যাস করে নিয়ে যদি এ খেলা দেখাও, তবে খুব বাহবা পাবে দর্শকদের কাছ থেকে।

টাকার খেলা

মনোজিৎ বসু

গঙ্গার ধারে নির্জন একটা জায়গা বেছে নিয়ে আস্তানা গাড়লেন সাধু-মহারাজ। ধুনি জ্বলে উঠলো বটগাছের নীচে।

সাধু-মহারাজ রাত শেষ হতে-না-হতেই ঘুম থেকে ওঠেন, গঙ্গায় স্নান সেরে পুজোয় বসেন। পুজো শেষ হলে বসেন ধ্যানে। সেই ধ্যান ভাঙে ঠিক দুপুরে, সূর্য যখন মাথার ওপরে। তারপর চলে যান গঙ্গার তীর ধরে—কখনও এক ক্রোশ, কখনও বা দু-ক্রোশ। সঙ্গে থাকে ভক্ত-শিষ্য জোয়ান মাধব। সাধু-মহারাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে-ও চলে হেঁটে। বনে বনে ঘুরে, ফল-মূল সংগ্রহ করে গুরু-শিষ্য যখন নিজেদের আস্তানায় ফিরে আসেন—সূর্য তখন পাটে নামে। সারা দিনরাতে সেই একবার মাত্র ফলাহার। অথচ, দুজনার স্বাস্থ্যের কি বাহার! সাধু-মহারাজের বয়স বোধকরি ষাটের ওপর—কিন্তু চেহারা দেখে তা বোঝবার উপায় নেই। চুল-দাড়িতে পাক ধরলেও, শরীরে পাক ধরেনি কোথাও। যেমন উঁচু-লম্বা স্বাস্থ্যবান তিনি, গায়ের রঙও তেমনি উজ্জ্বল তাঁর। চোখের দিকে তাকালেই মনে হয়, জ্যোতি যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। কণ্ঠস্বরও গুরুগম্ভীর।

সন্ধ্যা হতে-না-হতেই আবার ধ্যানে বসেন বৃদ্ধ সাধু। পাশে বসে ধুনির আগুন ঠিক-ভাবে জ্বালিয়ে রাখে শিষ্য মাধব। গঙ্গা থেকে ঘড়া ভর্তি করে জল তুলে আনে। কাঠকুটো লতা-পাতা কুড়িয়ে জড়ো করে। তারপর, সেও বসে পুজো-আর্চায়। দুপুর রাতে বালির ওপরে খড় বিছিয়ে ঘুমোন গুরু-শিষ্য। ধুনির আগুনটা কিন্তু ধিকি-ধিকি জ্বলতে থাকে সারা রাত ধরেই। সেদিকে তাকিয়ে বোধ করি আকাশের তারা-গুলোও অবাক হয়ে যায়। শরৎকালের নির্মল আকাশের নীচে, বটগাছের তলায়—গভীর নিদ্রায় মগ্ন হন সাধুবাবা আর তাঁর শিষ্য। নিদ্রা কোথায়, তাঁরা যেন তখনও ঈশ্বরের ধ্যানে আত্মহারা।

দু-চার দিন যেতে-না-যেতেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের গ্রামে। খবর রটে মুখে মুখে—হিমালয়ে বারো বছর তপস্যার পর দৈবজ্ঞ এক সাধুবাবা গঙ্গার তীরে ফুলডুংরিতে এসে আস্তানা গেড়েছেন। মানুষের চেহারা দেখেই তিনি তার ভূত-ভবিষ্যৎ সব নির্ভুল বলে দেন, মরা-মানুষও নাকি তাঁর মন্ত্রঃপূত জল পেয়ে বেঁচে ওঠে! ফলে, গাঁয়ের লোক দল বেঁধে ছোটে সেই-দিকে। ছেলে-বুড়ো, জোয়ান-মদ্দ, মেয়ে-ছেলে কেউ বাদ যায় না। বটগাছের তলায় যেন হাট বসে—সকাল থেকে সন্ধে।

কেউ বলে—বাবা হাতটা একবার দেখুন। কেউ বলে,—একটা শেকড়-টেকড় দিন সাধুজী, ঘরে ছেলেটা মরমর। কেউ বলে,—কি করলে টাকা ডবল করা যায় সেই মন্ত্রটা একবার বাৎলে দিন মহারাজ, আমি আপনার কেনা-গোলাম হয়ে থাকব। সাধু-মহারাজ শুনে হাসেন, আর বলেন—ভগবানকে ডাকো, তিনিই সবকিছু বাৎলে দেবেন! বলেই আবার ধ্যানে বসেন। লোকজনেরা বলাবলি করে—সময় না-হলে সাধুবাবা সঠিক কিছু বলবেন না। ভক্তি দেখাতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে—তবেই না অমন দৈবজ্ঞ ঋষির করুণা মিলবে।

সেই থেকে, যারা আসে তারা কেউ আনে ঘড়া ঘড়া দুধ, ঝুড়ি ঝুড়ি ফলমূল, থালা থালা মণ্ডা-মেঠাই। সাধুবাবার জন্যে কেউ কেউ আবার পেন্নামী আনে যার যেমন সাধ্যি। শিষ্য মাধব বাধা দিলেও শোনে না কেউ। সাধু-মহারাজ আপত্তি করলেও, নিজেদের জিনিস-পত্র কেউই ফিরিয়ে নিয়ে যায় না। বলে—ভক্তের দান কি ভগবান ফিরিয়ে নেন বাবা? আমরা বড় গরিব, যতটুকু সাধ্যি তাই আপনার সেবায় দিচ্ছি। আমাদের অপরাধ নেবেন না, দোহাই মহারাজ! সাধুবাবা আর কি করেন? কেউ মনে দুঃখ পায় সেটা তিনি চান না। ভক্তের দান হাসিমুখেই গ্রহণ করেন। ভগবানকে ভোগ দিয়ে প্রসাদ বিলিয়ে দেন সবাইকে।

খবরটা ক্রমশ গ্রাম ছাড়িয়ে শহরে গিয়ে পৌঁছায়। শহরের মানুষও এসে ভিড় করে গঙ্গার ধারে। সাধারণ মানুষ যেমন আসে, তেমনি আসে বড় মানুষের দল। সাধুবাবার পায়ের নীচে গড় করে সবাই; সিকি-দোয়ানির বদলে এবার থেকে মুঠো মুঠো রুপোর টাকা ছড়িয়ে পড়ে। দৈবজ্ঞ ঋষির করুণা আর কে না চায়?

সাধুবাবা ক্রমশই বড় চিন্তায় পড়েন।

"সে কী কথা বলছেন বাবা?"

তাঁর সাধন-ভজনের ব্যাঘাত ঘটে, ধ্যান-[illegible]স্যা করা হয় দুঃসাধ্য। জনহীন গঙ্গার তীরে সকাল থেকে সন্ধে জন-কোলাহলে মুখর। ভূত-ভবিষ্যতের সঠিক হদিস দিতে চাইলেও, কেউ যেন সন্তুষ্ট হয়ে ঘরে ফিরতে চায় না। তারা চায়, কিসে বেশী টাকাকড়ি মিলবে, কী করলে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যাবে। ধনীরাও অনুরোধ করে মন্ত্রঃপূত কিছু-না-কিছু একটা দিতে—যাতে করে তারা আরও অনেক টাকা পাবে, বড়লোক থেকে আরও বড়লোক হবে। টাকা, টাকা, টাকা—সবাই চায় টাকার সন্ধান।

সন্ধ্যার পর, লোকেরা যখন বিদায় নিয়ে চলে যায়, সাধু-মহারাজ তখন শিষ্যকে ডেকে বলেন, "বল্ বেটা, এখন আমরা কী করি? এমন হলে তো আর এখানে থাকা যায় না। পুজো-আর্চা, ধ্যান-তপস্যা সব যে বন্ধ হবার জোগাড়! তার চেয়ে চল এখানকার আস্তানা উঠিয়ে ঐ বনে, লোকালয় থেকে দূরে। লোকজনদের তো আর কড়া কথা বলে তাড়াতে পারি না। ওরা আমার কথায় আঘাত পায়, সেটাও আমি চাই না।"

শিষ্য বলে, "সে কি কথা বলছেন বাবা? লোকের ভয়ে আমরা পালিয়ে যাব? তার চেয়ে এক কাজ করুন। বড়লোকেরা যখন আসবে তখন তাদের কাছ থেকে নারায়ণের সেবায় বেশী করে টাকা চেয়ে নিন। [illegible]র, সেই টাকা গরিবদের দিন ধার। দেখুন, কদিন বাদেই এ জায়গা আবার আগেকার মতো ফাঁকা হয়ে ওঠে কিনা!"

শিষ্যের কথায় খুশি হয়ে গুরু বললেন, "সাবাস্ বেটা, তোর বুদ্ধি আছে।"

পরদিন থেকে তাই হলো। বড়লোকদের কাছ থেকে রাশি রাশি টাকা চেয়ে নেন সাধুবাবা। পরে আবার সেই টাকাই গরিব লোকদের ধার দিতে শুরু করেন। বলেন, "পরের টাকা—এমনি তো আর বিলিয়ে দিতে পারি না! এখন তোমরা নিয়ে যাও, সুবিধে হলেই শোধ দিয়ে যেও। তোমাদের দুঃখ দূর হোক।"

কদিন যেতে-না-যেতেই গঙ্গার ধার আবার আগেকার মতো ফাঁকা। সাধুবাবাকে মোটা টাকা প্রণামী দিতে হবে ভেবে বড়লোকেরা আর সেদিকে যায় না, আর ধারের টাকা শোধ দিতে হবে মনে হতেই গরিবেরা আর সেদিকে পা বাড়ায় না।

শিষ্যের মুখে হাসি ফোটে।

সাধুবাবাও হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচেন। যার সত্যিকারের ভক্ত তেমন দু-চারজন লোক আনাগোনা করলেও সাধুবাবার কোনো অসুবিধা হয় না তাতে। বরং, খুশিই হ[illegible] তাদের সত্যিকারের ভক্তি দেখে। আবা[illegible] পুজো-আর্চা চলে নিয়ম মতো, ধ্যান-তপস্যা হয় বিনা বাধায়।

রাক্ষুসে গাছপালা

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গাছ মানুষের উপকারে লাগে, এই কথাই তো আমরা শুনে আসছি। আমাদের দেশে নানান্ ধরনের গাছ আছে। প্রায় প্রত্যেক গাছই কিছু না কিছু আমাদের উপকারে লাগে। কিন্তু গাছ মানুষের ক্ষতি করে—এটা শুনতে কেমন লাগে? পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এমন সব বিচিত্র গাছ আছে, যাদের অদ্ভুত অদ্ভুত চেহারা। কেউ বা দেখতে অক্টোপাশের মতো, কেউ বোতলের মতো, কারও পাতা ছড়ির মতো লম্বা।

নানান্ জায়গার গাছ নিয়ে নানান্ রকমের গল্প আছে। শোনা যায়, অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে এমন সব গাছ আছে, যাদের ডাল-পালাগুলো পশুর থাবার মত, আর তার ডগায় লম্বা লম্বা খোঁচাওলা কাঁটা। কোনও পথিক হয়ত ঘোড়ায় চড়ে বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, আর দুর্ভাগ্যক্রমে সেই গাছের কাছে এসে পড়ল, গাছটা তার থাবা দিয়ে পথিকটিকে চারদিক থেকে এমন করে জড়িয়ে ফেললো যে, কাঁটা ছাড়িয়ে সে আর বেরোবার পথ পেল না।

'ব্ল্যাক বয়' বা কালোছেলে গাছ
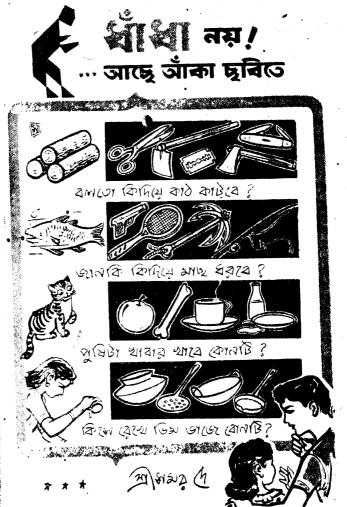
তারপরও কিছু গাছ আছে অস্ট্রেলিয়ায়, যাদের প্রথমে দেখলেই মনে হবে রাক্ষুসে গাছ। কিন্তু সত্যি সত্যিই তারা কোন ক্ষতি করে না। এই গাছগুলোকেও কিন্তু ওই থাবাওয়ালা গাছের দলে ফেলা হয়। কারণটা হলো, ঠিক সন্ধে হলেই এদের চেহারা যায় বদলে। সারাদিন বেশ ভাল ছেলের মত থাকে গাছগুলো, কিন্তু সন্ধে হলেই রূপ পালটে ফেলে। বিরাট লম্বা গুঁড়ি, গায়ের রং মিশমিশে কালো, আর মাথার ওপর এক-ঝাঁকড়া পাতা। এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'কালো ছেলে'। কোন পথিক বনের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ যদি গাছটার কাছে এসে পড়ে, ভয়ে আঁতকে উঠবে গাছটাকে দেখে।

আমরা তো মাংস খাই, কিন্তু গাছ মাংস খায় এটা অদ্ভুত, না? কিন্তু মাদাগাস্কার অঞ্চলে এমন গাছও আছে। ওই অঞ্চলের লোকেরা ওই গাছের নাম দিয়েছে মানুষ-খেকো তাল। দেখতে বিরাট বড় একটা আনারসের মত, পাতাগুলো চটচটে আঠালাগানো ছুঁড়ির

মত, আর অসংখ্য। অক্টোপাশের মত তারা লতিয়ে ওঠে। এই গাছগুলো মানুষ খায় বলে ওখানকার পিগমিরা ওদের পুজো করে। আমরা ঠাকুরের পুজো করে যেমন পাঁঠা বলি দিয়ে থাকি, ওরা তেমনি মাঝে মাঝে এক-একটা মেয়েকে উৎসর্গ করে গাছকে। গাছের কাছে মেয়েটিকে দিয়ে আসে আর তৎক্ষণাৎ গাছটি তার ডালপালা দিয়ে এমনভাবে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে যে, বাইরে থেকে তাকে আর দেখা যায় না। এক সপ্তাহ পরে গাছটার কাছে এলে দেখা যায়, সেই মেয়েটির হাড়গুলি ছাড়া গায়ের সমস্ত মাংস গাছটা খেয়ে ফেলেছে। হাড়গুলো পড়ে আছে গাছের তলায়।

অস্ট্রেলিয়াতে আর এক রকমের গাছ আছে বাওবাব্ বা বোতল গাছ। খানিকটা দেখতে ঠিক বিরাট বড় একটা বোতলের মত। এই বোতলের মত গুঁড়ির ভিতর ওরা খাবার, জল—সব ভর্ত্তি করে রাখে। সময়মত একটু একটু করে খায়। এই গাছগুলোকে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো গাছ বলা হয়।

কুইন্সল্যান্ড ও নিউ সাউথওয়েলসে এক রকমের গাছ আছে, যাদের মানুষ ছুঁতে ভয় করে। এই গাছগুলো লম্বায় হয় প্রায় একশো ফুট আর গুঁড়িগুলো মোটা হয়

'বাওবাব' বা বোতল-গাছ

চার ফুটের মত। পাতাগুলো খুব বড় বড়, পুরু, আর প্রায় বারো ইঞ্চির মতো লম্বা। সবচেয়ে মজা হলো, গাছগুলোর পাতার ওপরে অসংখ্য রোঁয়া থাকে—যার মধ্যে ওরা সাংঘাতিক রকমের বিষ রেখে দেয় যত্ন করে। যে বিষ মানুষ বা কোন জন্তুর গায়ে লাগলে তারা মরে যায়।

গাড়ডু-গাধা

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

এক যে ছিলো বোকা-হাঁদা।
সবাই বলে, গাড্ডু-গাধা।
কাজকর্ম করবে সে ঠিক,
আগাগোড়া হিসেব সঠিক।
তবে কাজের ধারণ-ধরন
নয়কো তোমার-আমার মতন।
শেষটাকে সে করবে আগে।
শুরুর কথা বললে রাগে।

ঘর তৈরি করতে হলে
সবার আগে ছাদটা ঢালে।
কারণ জানো? বিষ্টি পড়ে
দেয়ালে নয়, ঘরের চালে।

কোথাও যেতে সর্বদা সে
দরজা জোড়া সঙ্গে নেবে।
রাত্রে যদি চোরটি আসে?
দরজা এঁটে রাখতে হবে।

আরেকটি তার কাণ্ড আজব,—
তোমরা শুনে হাসবে জানি :
দেয়াল জুড়ে পড়লে ছায়া,
ঘষবে বসে দেয়ালখান।

সবার সেরা কীর্তি তাহার
বলছি শোনো কাছে এসে :
সবাই যখন কাঁদে তখন
গাড্ডু-গাধা উঠবে হেসে।
আবার যখন সবাই হাসে,
তানধরে কেউ গা-মা পা-ধা,
গাড্ডু তখন হাঁউ-মাউ-কাঁউ
উঠবে কেঁদে—এমনি হাঁদা।

এই পাতার ডগাগুলো ছুঁচলো, যদি কোন-রকমে মানুষের গায়ে একবার ফুটে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হয়।

আমাদের দেশে আলোকলতা বলে এক-রকমের লতানে গাছ আছে। যারা কোনও গাছকে আশ্রয় করে বেড়ে চলে। হলদে রংএর সরু-সরু লতা। কুইন্সল্যান্ড-এ এই ধরনের গাছ আছে—যারা বীজ থেকে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই অসংখ্য ডালপালা নিয়ে লতিয়ে ওঠে এবং সামনের কোনও গাছকে আশ্রয় করে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলে। অল্পদিনের মধ্যেই সেই গাছটাকে মেরে ফেলে। তখন আবার তারা নতুন শিকারের সন্ধান করে।

এই সব গাছ সত্যিই মানুষের ক্ষতি-

সম্বর্ধনা

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

ন্যাড়া পাল নাকি যাবে বেলতলা
শিখতে কী এক কল।
কেলাব ঘরেতে জল্পনা করে
গাঁয়ের ছেলের দল—
"বিদেশে গেলে বা ঘুরে এলে কেউ,
কিংবা চাকরী পেলে,
অথবা বয়েস পঞ্চাশ ষাট,
সত্তর হয়ে গেলে,
নয়তো ভোটের লড়াইয়েতে নেমে
কেউ যদি যায় জিতে
চাঁদা করে সভা ডেকে তাকে হয়
সম্বর্ধনা দিতে।"
বললে পঞ্চা—"ভজহরি তোরা,
নেই কিছুতেই সাড়া!
বিলেত না যাক, পাকা ছটি মাস
হবে সে তো গ্রাম-ছাড়া।
যা করেই হোক, সম্বর্ধনা
দিতে হবে ন্যাড়াদাকে।"
সেদিন বিকালে স্যাওড়াতলায়
তাই তারা সভা ডাকে।

পাড়ার সকলে জুটেছে সেখানে,
ভিন্ন গাঁয়েরও জন।
নেলো ময়রার খুড়তুতো ভাই
গাইলো উদ্বোধন।
কানাই মুদীর ছোটছেলে ঘাঁচা
ন্যাড়াকে পরালে মালা।
গদ্যে পদ্যে তারপরে যত
শুভেচ্ছা হলো ঢালা।
প্রধান অতিথি পালারাম দাস
বলেন ভাষণ শেষে—
"কাজ শিখে এসে বাবা নেড়ু, তুমি
বসবাস করো দেশে।"
সভাপতির অভিভাষণে বলেন
দোলগোবিন্দ মাল—
"করুক উজ্জ্বল আমাদের মুখ
কল শিখে ন্যাড়া পাল।
বেলতলা থেকে বিলেত আমেরিকা
ঘুরে আসতেও পারে।
আজকাল শুনি, হরে-নরে-ঘোদো
রোজ কত পাড়ি মারে।"
সভা শেষ হলো হাততালি দিয়ে,
'খরবায়ু' হলো গান।
তারপর ন্যাড়া পালেরই খরচে
সকলের জলপান।

কারক, কিন্তু তবুও অন্য সব গাছের এরা বছরের পর বছর নিজেদের জা দখল করে বসে থাকে।

হাঁস মুরগীর লড়াই

শ্রীপরিতোষ কুমার চন্দ্র

মুরগির লড়াই তোমরা হয়তো অনেকেই দেখেছ। কিন্তু আমি জোর করেই বলতে পারি, তোমাদের কেউই হাঁস-মুরগির লড়াই দেখনি। তোমাদের বাড়িতেই এই দুটো পাখির লড়াই লাগিয়ে দিলে কেমন হয়? কী? —লাগিয়ে দেবে নাকি? তাহলে চট্‌পট্‌ নীচের ফর্দ মতো জিনিস কটা যোগাড় করে ফেলো:—

(১) হাঁস ও মুরগির ছবি দুটো ধরে এমন মাপের এক পিস্‌ পাতলা পিচবোর্ড। (২) সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ও আধ ইঞ্চি চওড়া বেশ মোটা ও শক্ত পিচবোর্ডের দুটো লম্বা পিস্‌। ৪নং ছবিটা দেখো। (এই পিস্‌ দুটোর একটা পিঠ যদি কালো রং করতে পারো তবে ভালো হয়)। (৩) কাঁচি। (৪) ময়দার লেই বা গদের আঠা। (৫) টোয়াইন বা মোটা যে কোনো সুতো। (৬) শিরীষ কাগজ। (৭) হাঁস ও মুরগির ছবি দুটো যদি রং করতে চাও, তবে তোমার পছন্দ মতো জল-রং ও তুলি।

এইবারেই বই থেকে হাঁস ও মুরগির ছবি দুটো কাঁচি দিয়ে চৌকো করে কেটে নিয়ে এ দুটোর জন্যে নির্দিষ্ট পিচবোর্ডটার গায়ে আঠা দিয়ে জুড়ে দাও ও একটা ভারী বইয়ের তলায় চাপা দিয়ে রেখে দাও। এটা বাইরে ফেলে রাখলে দুমড়ে বেঁকে যাবে। কদিন শুকিয়ে গেলে এটা বের করে হাঁস ও মুরগির ছবি দুটোর ধার বরাবর কাঁচি চালিয়ে আলাদা আলাদা করে কেটে ফেলো।

এবারে পিচবোর্ডের লম্বা পিস্‌ দুটোতে শিরীষ কাগজ ঘষে বেশ করে প্লেন করে নাও, যেন কোথাও খোঁচ না থাকে। শিরীষ কাগজ ঘষা হয়ে গেলে পিস্‌ দুটো পাশাপাশি সমান্তরালে রেখে দুটোরই এক দিকের প্রান্ত থেকে ১½ ইঞ্চি দূরে এবং অপর দুটো প্রান্ত থেকে ¾ ইঞ্চি দূরে মোটা খাতা সেলাই করা ছুঁচ দিয়ে একটা করে ফুটো করো। ৪নং ছবিটা আবার দেখ।

এখন সমান একটা জায়গায় হাঁস ও মুরগির ছবি দুটো উপুড় করে রেখে তার ওপরে পিচবোর্ডের লম্বা পিস্‌ দুটো সিকি ইঞ্চি ফাঁক রেখে সমান্তরালে পাশাপাশি এমনভাবে রাখো যাতে একটা পিসের এক প্রান্তের ১½ ইঞ্চি দূরের ফুটোটার ঠিক নীচেই অন্য পিসটার ¾ ইঞ্চি দূরের ফুটোটা থাকে, এবং ঠিক তেমনি অন্যদিকে ¾ ইঞ্চি ফুটোটার ঠিক নীচেই অন্য পিসটার ১½ ইঞ্চি দূরের ফুটোটা থাকে। খেয়াল রেখো, হাঁস ও মুরগির পাগুলোর ঠিক মাঝখানে নীচের পিসের ফুটো দুটো রাখতে হবে। ৩নং ছবিটা দেখলেই সব কিছুই পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে। যদি পিস দুটোর এক পিঠ রং করে থাকো তবে রং করা দিকটা নীচের দিকে অর্থাৎ ছবির সামনের দিকে করে রাখতে হবে।

এবার এক হাত দিয়ে এগুলো সাবধানে চেপে ধরে রেখে পিস দুটোর চারটে ফুটোরই ভেতর দিয়ে ছুঁচ ঢুকিয়ে হাঁস ও মুরগির পা ও গা এফোঁড় ওফোঁড় করে ফুটো করে দাও। তারপর এই ফুটোগুলোর এপাশ থেকে টোয়াইন সুতো ঢুকিয়ে ওপাশে বের করে দুপাশেই গেরো দিয়ে এমন ভাবে বেঁধে দাও, যাতে পিস্‌ দুটোর গায়ে হাঁস ও মুরগির ছবি দুটো বেশ টাইট্‌ হয়ে সেঁটে লেগে থাকে।

এবার এটা তুলে নিয়ে তোমার ইচ্ছে মতো তোমার দিকে বা তোমার বন্ধুদের দিকে হাঁস ও মুরগির ছবির সোজা দিকটা রেখে এক হাতের দুটো আঙুল দিয়ে ওপরের পিস্‌টার বেশী-বেরিয়ে থাকা প্রান্তটা ধরে অন্য হাতের দুটো আঙুল দিয়ে নীচের পিসেরও বেশী বেরিয়ে থাকা প্রান্তটা ধরে একবার বাঁ দিকে আর একবার ডান দিকে বারবার ঠেল ও টানো,—দেখবে হাঁস ও মুরগি দুটো দিব্যি লড়াই করবার কায়দায় কেমন পরস্পরকে ঠোকরাতে চাচ্ছে; কিন্তু কিছুতেই তা পারছে না। কেবলই মাটিতে ঠোকর মারছে।

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

★ পুতুল-বিলু ★
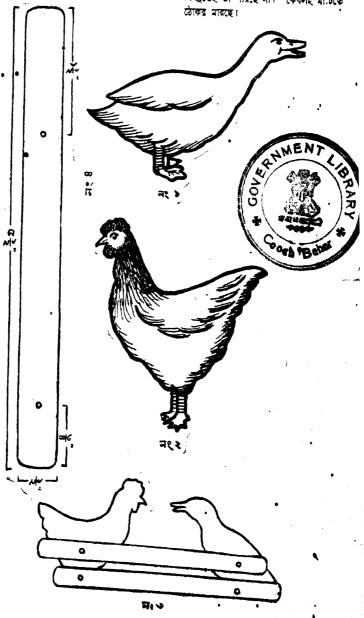
পয়সা পেয়ে সাধু খুশি, বিলুর হাতে বড়ি দিলে,
বললে—'ইচ্ছা পূরণ হোবে: এইটা তুমি খাইলে গিলে।'
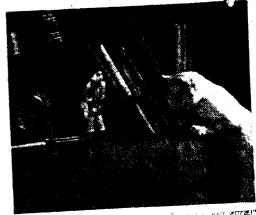
ভাবল বিলু—'কেইবা তাকে করলে ছোটো, তুলল এনে র‍্যাকে!'
বই, ঘড়ি, পুষি সব যে বিরাট! অবাক চোখে দ্যাখে।

ঘরে গিয়ে বড়ি গিলে, পুষিটাকে সঙ্গে নিয়ে,
চোখ বুজে কী ভাবলো বিলু: শুলো বুকে হাতটি দিয়ে।
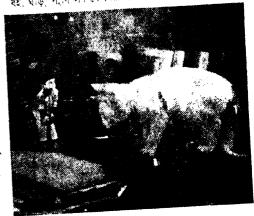
বিলুর বিপদ দেখে, লাফিয়ে পুষি উঠলো র‍্যাকের পরে
বললে—'পুতুল হওয়ার ইচ্ছে যেমন,' হাঁকলো 'মিয়াঁও' করে।

'টিক্-টিক্-টিক্, ভুল করেছ ঠিক!' হঠাৎ কানে আসে
বিলু দেখে—"ওমা! সে যে ছোট্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ঘড়ির পাশে।

'আঁ-আঁ-পুষিটা বাঘ!' চেঁচায় বিলু জোরে
ছুটে এসে দিদি জাগায়—'ঐ তো পুষি ওরে।

ছড়া—শ্রীবিমল ঘোষ

ফটো—রেবন্ত ঘোষ

তখন শরৎকাল। বর্ষার শেষে আকাশ পরিষ্কার। বন্যার জল কমতির দিকে। মাঠে কচি ধানের শিষের সমারোহ। সকালবেলায় শাপলা ফুলের মেলা। রাতের আকাশ তারার মালায় উজ্জ্বল। বাতাস শিউলির গন্ধে মদির। আউশ ধানের গোলা তখনও শূন্য হয়নি। নতুন ফসলের শুভ আভাস। অন্নচিন্তা কম হলেই অন্যচিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। নতুন চাষের শুরুতে পাশের জমির আল-ভাঙা নিয়ে যখন নায়েবের তোয়াজ করা বা থানা পুলিশ কোর্ট কাছারি করার সময় আসেনি, তখন দেশের জন্য ভাবার ও সেবা করার মহৎ ব্রত পালন করলে মন্দ হয় না, ভাবলেন শহরের বাবুরা। বললেন চলো গ্রামে। ভালো তাদের যারা অনুন্নতকে উন্নত করতে চায়, গ্রামে শিক্ষার আলো চায় জ্বালাতে। কিন্তু সেবকদের তোয়াজ করবে কে? তারা গ্রামের মধ্যে যারা দু একজন বাবু আছে। বাবু মানে শিক্ষিত অর্থাৎ মাইনর পাশ দিয়েছে। কি আর করি! মাথা পেতে নিলুম। কলকাতা থেকে বাবুরা গিয়েছেন সপরিবারে। প্রোগ্রাম, বিদ্যা-প্রচার ত হবেই, সেই সঙ্গে পুষ্টিসুদ্ধ সকলকে চার দেওয়াল থেকে বের করে একটু হাওয়া পরিবর্তন করিয়ে আনাও হবে। সুযোগ বুঝে আমরাও উঠে পড়ে লেগে গেলাম আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি জাহির করতে। অনুষ্ঠানের অন্ত নেই। কার্যপন্থী নাম সব। সকালে 'মুকুন্দবাবু সেবন' অর্থাৎ সবাইকে নিয়ে পাড়ার কাদা ভেঙে অলিগলি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এলুম। তাঁরাও বাংলা পল্লীর অনবদ্য রূপ দেখে মহা উল্লসিত। প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেমন খড়ের ঘর। মাটির দাওয়া। ভিজে মেঝে, পাটকাঠির বেড়া। কাকের কা কা রব। উলঙ্গ শিশু। কেমন ঘরের ভেতর নির্ভেজাল সূর্যালোক ঢোকে। ভাড়াটের জন্য দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না, কেমন পাশ থেকে সব কাজই শাকভাত আসছে। এই সব দেখে তাঁরা ত মহা উল্লসিত। আমরাও সগর্বে বক্ষ ধারণ করে নিজেদের ধন্য মনে করতে লাগলাম।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান "অবগাহন ও সন্তরণ"। সে যে কী দশা তা কি আর বলে বোঝাতে পারব? বাবুদের ও তাঁদের সঙ্গে দিদি-মণি ও মা-জননীদের নিয়ে ত ঘাটে হাজির হলাম। বাবুরা আমাদের কাঁধে ভর দিয়ে কোমর অবধি জলের নীচে যেতেই গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে এলোপাতাড়ি হাত ছুঁড়তে লাগলেন। পিছন ফিরে দেখি যে দিদিমণিরা হাঁটুজলেই হাবুডুবু খাচ্ছেন। ডুবতে কতক্ষণ! উঠে আসতেই হাসি হুল্লোড়ের মধ্যে শুনলাম, "কি সুন্দর সাঁতরেছে ম্যাডাম", "পাজী আর একটু হলে ডুবত আর কি?" "গামছা শরীরটা কেমন ফ্রেশ মনে হচ্ছে?" ইত্যাদি। আমরাও অবশ্য এই সুযোগে সাঁতারে বাহাদুরী দিতে কসুর করিনি।

তৃতীয় অনুষ্ঠান "নৌকা-বিহার", অর্থাৎ বর্ষণ ক্লান্ত মেঘমুক্ত নির্মল নীল

দূরদৃষ্টি আলোকচিত্রী : শ্রীশম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায়

চাঁদোয়ার নীচে এবং স্রোতহীন গাঢ়নীল জলের উপর দেশী মিস্ত্রীর তৈরি ডিঙি নৌকায় প্যাটাতনের উপর বসে ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা বঙ্গ প্রকৃতির দৃশ্য অবলোকন। ব্যাপারটি অনুধাবন করে আমরা আধ-ময়লা গেঞ্জি গায়ে, মালকোচা দিয়ে কাপড় এঁটে কাঠের বৈঠা এবং বাঁশের লগি হাতে নিয়ে লাফ দিয়ে নৌকায় উঠে অতিথিদের সাদর আহ্বান জানালুম। কোন কোন দাদা ত আমাদের অনুসরণ করতে গিয়ে পাটাতনের ভিতর ঢুকে গেলেন। উপর থেকে আহা, উহু, হা-হা, হি-হি ইত্যাদি হৈ চৈ ধ্বারা ঐ সব কৃতী নৌকাচালকদের বাহবা বর্ষণ চলতে থাকল। অন্য যাত্রীরা প্রায় প্রত্যেকেই কারো কাঁধে ভর দিয়ে, হামাগুড়ি হয়ে এবং চোখে মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ নিয়ে নৌকায় উঠে প্রত্যেকে প্রত্যেকের যথাসম্ভব কাছে বসে পড়লেন। ধাক্কা খেয়ে নৌকা যখন জলে ভেসেছে তখন আর একদফা ভীতি বিহ্বল চিৎকার এবং জড়াজড়ি করে ডিঙি নৌকা ডোবাবার উপক্রম। যা হক নৌকার টাল সামলানর পর ক্রমে সকলে ধাতস্থ হলেন। মণিদা তাঁদের সবার অনুরোধে পড়তে শুরু করলেন "গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ"। প্রত্যেকের জন্যে শাপলার মালা তৈরি করা হল এবং দিদিমণিরা মাথায় গুঁজলেন সদ্যফোটা শালুক ফুল, প্রায় ডজন খানেক করে। এবার ফেরবার পালা। মণ্টুদা, গাবুদা নৌকার মাঝখানে বসেই চতুর্ভুজ হয়ে দিদিমণিদের বৈঠা চালনা শিক্ষা দিয়ে একেবারে সার্টি-ফিকেট নিয়ে ফেললেন। ঘাটে এসে নৌকা লাগানোর পর আমাদের আর পায় কে? বুঝতেই পারছেন আমাদের মত বীর-পুঙ্গবদের তাঁদের কাপড় ধোয়া, জুতোর কাদা ছাড়ানো ইত্যাদি সব কাজেই দরকার। এহেন পদমর্যাদা দেখে মূঢ় গ্রামবাসী বিমূঢ় হয়ে শুধু আমাদের তারিফ ছাড়া আর কি করতে পারে। ওদিকে আশপাশের গ্রাম প্রধানদের সঙ্গে উন্নতি বিধায়িনী সমিতির সভা সমাপ্ত হয়েছে।

তার পরের অনুষ্ঠান "ভোজ সম্মিলনী"। ভিজে মাটির উপরে বাঁশের অল্প পরিসর পাটাতন করে বাঁশের খুঁটির উপর বসবার জায়গা এবং ডাইনিং টেবিল করা হয়েছে। আমরা স্থানীয় ছেলেমেয়েরাই পরিবেষক। মেয়েরা ভাঁড়ার থেকে পাত্রভর্তি ভোজ্যবস্তু আমাদের এগিয়ে দিচ্ছে এবং আমরা পরি-বেশণ করে চলেছি। অবশ্য তাড়াতাড়িতে কেউ লেবু পাননি, কারও পাতায় নুন দেওয়া হয়নি, ডাল দিয়ে ফিরতে না ফিরতে ভাত শেষ হচ্ছে, একজনকে চাটনি দিতে আর-একজন বেগুন ভাজা চেয়ে বসছে। ব্যস্ততার শেষ নেই। একবার ভিজে মাটিতে পা পিছলে গিয়ে ডালের হাঁড়ি আমার গায়ের উপরই পড়ল। কিন্তু তাই কি দেখবার সময়। এদিকে এক দিদিমণি যে লেবু চাইছেন। ভাবলেশহীন মুখে উঠেই চিৎকার করতে করতে ছুটেছি, "বিনু, বিনু, শিগগির একটু চাটনি দাও।" সেটা হাতে নিয়ে আবার "বিনু-বিনু, মাছের ঝোলটি এগিয়ে নিয়ে এস।"

এর মধ্যে তৈরি হয়ে বাবুদের আশে পাশে ঘুর ঘুর করছি এবং উৎসুক নেত্রে তাঁদের মুখের দিকে তাকাচ্ছি পরবর্তী অনুষ্ঠানের নির্দেশের জন্যে। শুনলাম এবার অদ্যকার শেষ অনুষ্ঠান শুরু হবে—"স্বপ্নায়োজন"।

এহেন অনুষ্ঠানের নাম শুনে ত চক্ষু চড়ক গাছ। বাবুরা কষ্ট করে স্বপ্ন দেখবেন, তার আয়োজন আমরা কী করে করব! নিজেরা কোন পথ দেখতে না পেয়ে নতুন কিছু দেখবার জন্য উন্মুখ হচ্ছি, এমন সময় যেন হঠাৎ গাবুদা আমাকে আবিষ্কার করে বললেন, "হ্যালো, ইয়ংম্যান, মুষড়ে পড়েছ নাকি? বিছানা-টিছানাগুলো শোবার ঘরে নিয়ে পেড়ে ফেলো ত?" এতক্ষণে বোঝা গেল। অনুষ্ঠানের নামকরণ দেখেই বোঝা উচিত ছিল। যা হক তাদের শোবার ঘরের নির্দেশ দিয়ে লাইব্রেরী থেকে ট্রেনের ধুলো আর ছারপোকা ভর্তি হোল্ডঅল ঘাড়ে করে স্কুল ঘরে হাজির হলুম। ইতিমধ্যে সবাই সেখানে হাজির হয়ে স্থান নির্বাচনে ব্যস্ত। চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে পার্টিশান করে মেয়েদের ও পুরুষদের আলাদা শোবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। বাবুদের সময়-জ্ঞান দেখে বিস্ময় বোধ করছিলাম। প্রথমেই গাবুদার বিছানা খুলে লম্বা করে ফেললাম। স্ট্র্যাপ খুলে উপরে মোড়া দুগ্ধফেননিভ চাদরটার মাঝামাঝি ধরে টান দিতেই লালুদি কোথেকে হাঁহাঁ করে এসে বললেন, "থাক ভাই থাক, ওসব গাবুদাই ঠিক করে নেবেন। এখন বিশ্রাম নাও গিয়ে, খাওয়া হয়েছে?" খাওয়া অবশ্য তখনও হয়নি, তবু যেন লালুদির এত দরদে অভিভূত হয়ে গেলাম। খুশী হয়ে নীচে নামতে নামতে শুনলুম গাবুদার অনুযোগ, "তুমি কি বলত লালী, বিছানাটি পেতে দিলে দিব্যি শুয়ে পড়া যেত, দিলে সব ভণ্ডুল করে।" উত্তরে লালুদি যা বললেন, তা শুনে ঘাড়-হেঁট করে দৌড়ে পালাতে বাধ্য হলুম। লালুদি বলছিলেন, "ওঃ তাহলে ত বড় অন্যায় করেছি! আচ্ছা গাবুদা পাড়াগাঁয়ে এসে একেবারে জংলী হয়ে গেছ নাকি? আমার দিকে অত না তাকিয়ে চাদরে দেখ পচা কাদা রঙের পঞ্চাঙ্গুলির ছোপ খাবোল।"

ঘাটে এসে হাত ধুয়ে ফেললুম। হোল্ড-অলের গায়ে ট্রেনের ধুলো আর নৌকার কাদার সমন্বয়ে এই অপূর্ব রঙের সৃষ্টি করেছিল। ঠিক করলাম আর এসব বাবুদের পাশেও ঘেঁষব না।

কিন্তু আমি ঠিক করলে কি হবে, শহুরে বাবুরা কি গ্রামবাসীদের রেহাই দেবেন? পিকনিক করার মেজাজ এলেই যে তাঁরা গ্রামের দিকে পা বাড়ান—গ্রামোন্নয়ন বা অমনি কোন নামে।

পৃথিবীখ্যাত

পেয়ারার জেলী

শ্রীকিষণ দত্ত এণ্ড কোং
১২৮, মিড্‌ল রোড, কলিঃ-১৪

বাংলার ভবিষ্যৎ জাতির স্বাস্থ্যের দৃঢ় ভিত্তি

বিশ্বনাথ ঘৃত

আমদানীকারক

পঞ্চানন আশ এণ্ড কোং

২বি, রামকুমার রক্ষিত লেন,
বড়বাজার — চিনিপট্টী
কলিকাতা—৭
ফোন ৩৩-৫৪১৪

সীমান্ত

প্রফুল্ল রায়

শেষ পর্যন্ত সীয়াশরণজীকেই আসতে হল।

লাইন-বাবুরা এখানে আসতে চায় না। কিসের টানেই বা আসবে!

এখানে মানুষ বলতে বিলাসপুরী কুলীকামিন। তাদের সাময়িক আস্তানা হিসেবে গুটিকতক হোগলার ঝুপড়ি আর চটের তাঁবু।

এখান থেকে আধ মাইলের মধ্যে সীমান্ত। সীমান্ত বরাবর রেলের লাইন বসাবার কাজ চলছে।

রেলের লাইন, ভাঙা পাথর আর স্লিপার স্তূপাকার হয়ে আছে।

চারপাশে ধু-ধু নিষ্ফলা মাঠ, উঁচুনিচু কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ি। নোনা মাটি ফুঁড়ে মাথা তুলে আছে কিছু ন্যাড়া শিমুল আর রুগ্ন চেহারার কয়েকটা পলাশ।

এ সবও বাধা হত না। লাইন-বাবুরা হয়ত আসত। যদি ফালতু রোজগারের ভরসা থাকত। কিন্তু তার উপায় নেই।

এখানে আসার নাম শুনেই লাইনবাবুরা ছুটির দরখাস্ত নিয়ে বসল।

অগত্যা সীয়াশরণজীকেই রওনা হতে হল। সীয়াশরণজীও লাইন-বাবু অর্থাৎ লাইন-ইনস্পেক্টর।

●

সীয়াশরণজী যখন এসে পৌঁছলেন, তখন আকাশে গলা কাঁসার রঙ ধরেছে। সে দিকে তাকানো যায় না। তাকালে চোখ ঝলসে যাবে। আকাশটা যেন পুড়ে পুড়ে গলে গলে নীচে ঝরে পড়ছে।

বিশ মাইল ট্রলিতে এসেছিলেন। সীয়াশরণজীর মনে হল, এইমাত্র একটা আগুনের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এলেন। মনে হল, রোদের স্যাঁকা খেতে খেতে চামড়া মাংস কুঁকড়ে কুঁকড়ে গিয়েছে।

আগে থেকেই খবর দেওয়া হয়েছিল। সীয়াশরণজীর জন্য আলাদা একটা তাঁবুর বন্দোবস্ত হয়েছে।

ট্রলি থেকে নামতেই কুলীদের সর্দার তাঁকে তাঁবুতে নিয়ে গেল। কোন দিকে তাকাবার মত অবস্থা নয় সীয়াশরণজীর। সিধা বাঁশের মাচানে দেহটাকে সঁপে আচ্ছন্নের মত পড়ে রইলেন।

কুলীদের সর্দার বলল, "তখলিফ হচ্ছে ইনাসপিটারজী?"

অস্ফুট শব্দ করলেন সীয়াশরণজী। কী বললেন, ঠিক বোঝা গেল না।

সর্দার তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই একটি কামিনকে সঙ্গে নিয়ে আবার এল। ডাকল, "ইনীসপিটারজী।"

চোখ বুজেই সীয়াশরণজী বললেন, "হুঁ—"

"রতিয়াকে এনেছি। আপনার তখলিফ হচ্ছে। রতিয়া থোড়া হাওয়া করুক।"

সীয়াশরণজী এবার জবাব দিলেন না। চোখও মেললেন না।

এটা কী তিথি কে জানে। সন্ধের ঠিক পরে পরেই চাঁদ দেখা দিল। ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্নায় ঝাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ি বিভোর হয়ে আছে। আকাশটা আশ্চর্য নীল, আশ্চর্য স্নিগ্ধ। কে বলবে দুপুরে এই আকাশটাই গলা কাঁসার রঙ ধরেছিল!

ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস দিয়েছে।

ঘোর-ঘোর আচ্ছন্ন ভাব অনেকটা কেটে গিয়েছে। শরীরটা জুড়িয়েছে। খানিকটা ধাতস্থ হয়ে উঠে বসেছেন সীয়াশরণজী।

দুপুরে তাঁবুতে ঢুকেই শুয়ে পড়ে-ছিলেন। তাঁবুর ভিতরকার কিছুই দেখেননি। এখন সীয়াশরণজী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

এক কোণে একটা লণ্ঠন জ্বলছে।

তাঁবুতে আসবাব বলতে দুটি বাঁশের মাচান, একটি মাটির সোরাই আর নারকেল পাতার খান-দুই পাখা।

বাইরে একটা গলা পাওয়া গেল, "অন্দর আসব জী?"

জবাবের অপেক্ষা না করেই একটি কামিন ঘরে ঢুকল। তার হাতে তিনটে পিতলের বাসন।

প্রথমে খেয়াল করেননি সীয়াশরণজী। উদাসীন গলায় বললেন, "তুই কে?"

"আমি রতিয়া। তামাম দিন আপনাকে বাতাস করলাম। এখন পুছছেন আমি কে!"

সীয়াশরণজীর মনে পড়ল। দুপুরে সেই ঘোর-ঘোর আচ্ছন্ন অবস্থায় সর্দারের মুখে রতিয়ার নাম শুনেছিলেন বটে।

পিতলের বাসন তিনটে নামিয়ে তেজী লণ্ঠনটা উসকে জোরালো করল রতিয়া।

একটু আগে উদাসীন অন্যমনস্কের মত কথা বলছিলেন সীয়াশরণজী। জোরালো আলোতে রতিয়ার দিকে হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন।

সুঠাম শরীর। চকচকে তামার মত চামড়ার রঙ। কাঁধ থেকে দুটো টোল, মসৃণ, নগ্ন হাত নেমে গিয়েছে। সুপুষ্ট শরীর, খাটো কাপড়ে বাগ মানে না। বিড়ালীর মত কটা চোখ। জোড়া ভুরুর মাঝখানে কালো উল্কিতে সাপ আঁকা। হাঁটু পর্যন্ত আঁটো কাপড়। তারপর উদাস পা। হাতে রূপার কাঙন, পায়ে গুজরি-পঞ্চম। সারা দেহে এক ধরনের উগ্র বন্যতা।

রতিয়া বলল, "যে ক' রোজ থাকবেন, সর্দার আমাকে আপনার দেখাশোনা করতে বলেছে। রোটি-ভাজি পাকিয়ে দিতে বলেছে।"

পিতলের বাসনগুলো দেখিয়ে বলল "এই আপনার রাতের খানা—"

"ঠিক আছে, তুই এখন যা।"

"আপনার বিস্তারা পেতে দিয়ে যাই।"

"দরকার নেই। আমিই পেতে নেব। তুই এখন যা।"

একরকম তাড়া দিয়েই তাঁবু থেকে রতিয়াকে বার করে দিলেন সীয়াশরণজী

যাবার আগে রতিয়া বলল, "কাল্ল ফির আসব ইনাসপিটারজী।"

বলার পর একটু হাসল রতিয়া। তিনা

ENT LIBRARY Cooch Behar

চোখা ধারাল দাঁত বেরিয়ে পড়ল। তারপর চিকন দুটি নিটোল পায়ের ছন্দ বাজিয়ে চলে গেল।

পরের দিন সকাল থেকেই কাজ শুরু হল।

কাজ আর কী! সীমান্ত-বরাবর রেলের লাইন আর স্লিপার পাতা হচ্ছে। সিগন্যাল-পোস্ট, সিগন্যাল-পুলি বসানো হচ্ছে। এই-সবের ইন্সপেক্‌সন অর্থাৎ তদারকি করা।

বিলাসপুরী কুলীরা ভারী ভারী লোহার লাইন টানে। আর হাঁকে, 'আরে জ—জো—রা—স—স—"

"হাঁইও—"

তাদের ঘামে-মাজা পিঠ মুখ রোদে চক-চক করে।

দুপুরের আগে আগেই কাজ শেষ হয়ে যায়।

সেই সকাল থেকেই মহড়া চলে। রোদের তাত বাড়তে বাড়তে এক সময় আকাশে গলা কাঁসার রঙ ধরে। কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ির উপর দিয়ে লু ছুটে যায়। অনেক—অনেকদূরে আকাশ যেখানে ধনু-রেখায় নেমে গিয়েছে, ঠিক সেইখানে ঝিল-মিল করে আগুনের একটা হল্কা কাঁপতে থাকে।

এ-বেলার মত কাজ চুকল। বিকেলের পর যখন ঝিরঝিরে, ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ি জুড়োতে শুরু করবে, আবার কাজ আরম্ভ হবে।

সীয়াশরণজী তাঁবুতে ফিরলেন।

রতিয়া স্নানের জল আর দুপুরের খাবার রেখে গিয়েছে।

রতিয়া ছিল না। না থাকাতে, মনে মনে স্বস্তিই পেলেন সীয়াশরণজী।

ধীরেসুস্থে স্নান সেরে খেতে বসেই চমকে উঠলেন। পিতলের থালায় রোটি আর মাংস রেখে গিয়েছে রতিয়া। থালাটা ঠেলে উঠে পড়লেন সীয়াশরণজী। হাঁকলেন, "সর্দার—সর্দার—"

কুলীদের সর্দার ছুটতে ছুটতে তাঁবুতে ঢুকল, বলল, "জী—"

"এ কী খানা দিয়েছে!"

যেমন এসেছিল, ছুটতে ছুটতে তেমনি বেরিয়ে গেল সর্দার। একটু পর রতিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আবার ঢুকল। ভয়ে ভয়ে বলল, "আপনার রোটি এই রতিয়া পাকিয়েছে।"

সীয়াশরণজী বললেন, "এ কী পাকিয়েছিস!"

"কেন, গোস্ত আর রোটি।"

লাইন-বাবু বলে ডয়ডর নেই রতিয়ার। সহজ স্বাভাবিক গলায় সে জবাব দিল।

সীয়াশরণজী বললেন, "আমি মাছ-গোস্ত খাই না। এগুলো নিয়ে যা।"

থালাটা নিয়ে যেতে যেতে রতিয়া বেজার মুখে বলল, "আপনার জন্যে বহুত আচ্ছা করে গোস্ত পাকিয়েছিলাম ইনাস-পিটারজী।"

রতিয়া চলে গেল। এ বেলা সীয়াশরণজীর খাওয়া হল না।

সন্ধে পর্যন্ত লাইন পাতার কাজ চলল।

রাত্রে তাঁবুতে ফিরে সীয়াশরণজী দেখলেন লণ্ঠন জ্বালিয়ে রতিয়া বসে আছে। তাঁকে দেখেই মেয়েটা হেসে উঠল। হাসল কিন্তু শব্দ হল না। দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে তিনটে চোখা ধারাল দাঁত বেরিয়ে পড়ল। ভুরু দুটো কুঁচকোতে উল্কির সাপটা আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে বেরুল।

রতিয়া বলল, "আপনার রোটি এনেছি ইনাসপিটারজী—"

সীয়াশরণজী জবাব দিলেন না। কেন জানি না তাঁর মনে হল, রতিয়ার সঙ্গে যত কম কথা বলা যায়, ততই মঙ্গল।

এ-বেলা রোটি, চুকা শাক ভাজি, অড়হর ছোকা আর মরিচের আচার নিয়ে এসেছে রতিয়া। খেতে বসে বেশ খুশীই হলেন সীয়াশরণজী। মরিচের আচার তাঁর খুব প্রিয়।

খেতে খেতেই সীয়াশরণজী মুখ তুললেন। রতিয়া এখনও যায়নি। লণ্ঠনটার পাশে বসে জুল জুল করে তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে।

সীয়াশরণজী বললেন, "তুই এখনও যাসনি?"

"না ইনাসপিটারজী। আপনার খাওয়া হলে তাম্বু সাফ করব। বর্তন নিয়ে যাব।"

আর কিছু না বলে সীয়াশরণজী রুটি ছিঁড়তে লাগলেন।

খাবার পর আঁচিয়ে বাঁশের মাচানে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লেন সীয়াশরণজী। রতিয়া ঠুক ঠাক, ঠুন ঠান শব্দ করে তাঁবু সাফ করতে লাগল।

বাইরে কালকের মত ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্না দেখা দিয়েছে। কাঁকুরে ডাঙা স্নিগ্ধ দুর্জ্ঞেয় রহস্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। দূরের ন্যাড়া শিমুল আর রুগ্ন পলাশ-গুলি অদ্ভুত এক শ্রী পেয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশের অগ্রগতি

অন্ধ্র প্রদেশ গঠিত হওয়ার তিন বছর পর উহার অগ্রগতি বস্তুতঃই লক্ষ্য করবার মত।

খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে চলতি পরিকল্পনার লক্ষ্য ইতিমধ্যেই বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। প্রস্তাবিত সার কারখানা স্থাপন হলে উহা আরও এগিয়ে যাবে।

সমাজ উন্নয়ন প্রচেষ্টায়ও অন্ধ্র প্রদেশ বেশ এগিয়ে চলেছে। এখন ২২৮টি ব্লক কাজ করছে এবং জেলাগুলিতে কুড়িটি এড হক পঞ্চায়েৎ সমিতির মধ্য দিয়ে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের উপর উন্নয়নের দায়িত্বভার অর্পিত হবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হওয়ার আগেই সার্বজনীন ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বরঙ্গল ও তিরুপতিতে আরো দুটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ও তিনটি নূতন পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কাকিনাড়া ও বরঙ্গলে বেসরকারী প্রচেষ্টায় আরো দুটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তিরুপতিতে আরো একটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই শিক্ষা-বৎসর থেকেই হায়দ্রাবাদে বি এস-সি নার্সিং কোর্স সহ একটি নার্সিং কলেজ খোলা হয়েছে।

বর্তমান পরিকল্পনাধীনে তেলেঙ্গানা অঞ্চলের প্রত্যেক জেলা হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা বাড়িয়ে ১৯৬১ সালের মার্চ মাসের আগেই ১০০টি করা হবে এবং সবগুলোর না হলেও অনেক তালুক হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ৫০টি করা হবে। জনসাধারণের সাগ্রহ সহযোগিতায় সারা রাজ্য মধ্যে ইতিমধ্যেই ১১৭টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তা ছাড়াও ২২১টি সাহায্যপুষ্ট পল্লী ডিস্পেন্সারী স্থাপিত হয়েছে।

চলতি পরিকল্পনা সময় মধ্যে এই রাজ্যে ১৪টি সমবায় কৃষি সমিতি কাজ আরম্ভ করেছে।

নাগার্জুনসাগর বাঁধ স্থানে স্থানে ৬০ ফুট উঁচু হয়েছে এবং ৫০ মাইল পর্যন্ত দুই পাশে প্রধান ক্যানালের খনন কাজ চলছে। আরও কয়েকটি পরিকল্পনা হয় সমাপ্ত হয়েছে, নয় দ্রুত সমাপ্তির পথে। পোচামপাদ পরিকল্পনা সম্পর্কে অনুসন্ধান শেষ হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন আস্তে আস্তে বেড়েই চলেছে এবং মাথা পিছু বিদ্যুৎ খরচা (যা বর্তমানে ১২ ইউনিট) দ্বিতীয় পরিকল্পনা সময় শেষ হওয়ার আগেই ১৫ ইউনিটে পৌঁছবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সিঙ্গারেণী কোলিয়ারীসমূহে কয়লা উৎপাদন বছরে ১৫ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ২১ লক্ষ টনের বেশী হয়েছে, আর এই পরিমাণকে বাড়িয়ে ৩০ লক্ষ টন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই রাজ্যে অন্যান্য শিল্প সম্পর্কে সম্প্রসারণ পরিকল্পনার কাজ হচ্ছে।

সমবায়, কুঁড়েঘর নির্মাণ এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে অনুরূপ দ্রুত অগ্রগতিতে কাজ এগিয়ে চলেছে।

মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন সীয়াশরণজী। কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন হুঁশ নেই। হঠাৎ পায়ের উপর ঠাণ্ডা হাত পড়তেই চমকে উঠলেন। পা দুটো টেনে গুটিয়ে খাড়া হয়ে বসলেন। দেখলেন, সামান্য ঝুঁকে ধূর্ত চতুর হাসি হাসছে রতিয়া।

মুখোমুখি সাপ দেখলে যেমন হয়, সীয়াশরণজীর অবস্থা ঠিক তেমনি। অস্ফুট, ভয়ভয় গলায় তিনি বললেন, "কী—কী—কী [illegible] সব?"

"কুছ না ইনাসপিটারজী। আপনার পায়ের দাবিয়ে থোড়া আরাম দেবে।"

সীয়াশরণজী চেঁচিয়ে উঠলেন, "না, না, দরকার নেই। তুই যা।"

"আচ্ছা, আচ্ছা জী।" তাঁবু থেকে বেরুবার আগে ফিস ফিস করে রতিয়া বলল, "রাতে কুছু দরকার হলে আমাকে বুলাবেন ইনাসপিটারজী। আমি পাশের ঝোপড়িতেই আছি।"

রতিয়া চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ একই ভাবে বসে রইলেন সীয়াশরণজী। বুকের মধ্য থেকে কেমন এক ধরনের ঠাণ্ডা সিরসিরে কাঁপুনি উঠছে। কিছুতেই তাকে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

সামলে উঠতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। নিজের কথা ভাবতে শুরু করলেন সীয়াশরণজী।

তিনি মৈথিলী ব্রাহ্মণ। সুগৌর ঋজু চেহারা। বেশ বয়স হয়েছে। চল্লিশ পার হয়েছেন। কিন্তু মাথার চুলে দু-একটা পাক ধরানো ছাড়া বয়স তাঁর চেহারায় আঁচড় কাটতে পারেনি। গাম্ভীর্য আর প্রসন্নতা শ্রী হয়ে তাঁর মুখে চোখে লেগে আছে।

সীয়াশরণজী বিয়ে করেননি। কামিণীতে তাঁর মোহ নেই, কাঞ্চনে লোভ নেই। জীবন সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নির্বিকার এবং নির্মোহ।

এটুকুই সীয়াশরণজীর সমস্ত পরিচয় নয়। জীবনে তিনি মিতাচারী, অদ্ভুত সংযমী। এমন খাদ্য খান না যাতে শরীর উত্তেজিত হয়। এমন কথা ভাবেন না যাতে মন বিচলিত হয়। নীতি এবং সংযমে তাঁর অটুট নিষ্ঠা।

সীয়াশরণজী লাইন-ইন্সপেক্টর। সমস্ত জীবন তিনি রেলের লাইন পেতে আসছেন। রেলের লাইনই শুধু নয়, নিজের জীবনে নীতি আর সংযমের লাইনও তিনি বসিয়ে চলেছেন। তার বাইরে যাবার উপায় নেই।

এখানে, এই কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়িতে লাইন পাততে এসেছেন তিনি। সীমান্ত-বরাবর রেলের লাইন টেনে নিতে মাস-দুই সময় লাগবে।

দু মাস মেয়াদের সঙ্গে রতিয়ার কথাটা যতই ভাবলেন, বিচিত্র এক ভয় চার পাশ থেকে তাঁকে ঘিরে ধরল।

সীয়াশরণজী ঠিক করলেন, রতিয়াকে এড়িয়ে চলবেন। পারতপক্ষে তার সঙ্গে কথা বলবেন না।

সীয়াশরণজী আসার পর দিন-দশেক পার হল। লাইন পাতার কাজ পুরোদমে চলছে। দুপুরে আকাশ, বাতাস, কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ি যখন অস্বাভাবিক তেতে থাকে, সেই সময়টুকু ছাড়া কাজের কামাই নেই। এ কদিনে অনেকখানি লাইন বসানো হয়েছে।

কাজ যেই চুকে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুতে চলে আসেন সীয়াশরণজী। তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও, অজান্তেই একটা ব্যাপার ঘটে চলেছে।

সেই যে তিনি ভেবে রেখেছিলেন, রতিয়াকে এড়িয়ে চলবেন, তার সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলবেন না, তা আর হয়ে ওঠেনি।

এই বিলাসপুরী কামিনটা ভারি ফিচেল। হেসে হেসে ঢলে ঢলে প্রচুর কথা বলে। আশ্চর্য! সীয়াশরণজী তাকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন। তার সঙ্গে তাল রেখে পাল্লা দিয়ে কথা বলছেন, হাসছেন।

রতিয়া বলে, "ইনসাপিটারজী কী [illegible]-উদি করেছেন?"

"না।"

গালে একটা হাত রাখে রতিয়া। চোখের কটা তারা দুটো [illegible]কির মত জোরে। কপট দুঃখ করে একটা নিশ্বাস ফেলে। তারপর বলে, "হায় রামজী! এখনও সাদি করেননি!"

সীয়াশরণজী হাসেন। বলেন, "সাদি করিনি ত হয়েছে কী?"

"জনমটাই আপনার বেফায়দা হয়ে গেল ইনাসপিটারজী। সমঝালেন?"

"হাঁ।" আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন সীয়াশরণজী।

সীয়াশরণজীর এমনিতে বড় ভুলো মন। লাইনের তদারকিতে গিয়েছেন। ছাতাটা ভুলে সঙ্গে নেননি। রোদের তাতে চামড়া সেঁকছে।

ছুটতে ছুটতে ছাতা নিয়ে এল রতিয়া। ফিস ফিস করে বলল, "আপনার বহুত ভুল হয় ইনাসপিটারজী। ভুল সজুত করার জন্যে একটা সাদি করুন। বহুড়ী এলে আর ভুল হবে না।"

সস্নেহে ধমক দেন সীয়াশরণজী, "যা যা তামাসাবালী—"

একটা নধর ভুট্টাগাছের মত শরীর। দুলতে দুলতে ঢলতে ঢলতে চলে যায় রতিয়া।

জোর কাজ চলছে।

আর মাস-খানেকের মধ্যেই সীমান্ত

পর্যন্ত লাইন পাতা হয়ে যাবে।

সীয়াশরণজী আসার পর পুরো দেড়টা মাস পার হতে চলল। এই দেড় মাসে রতিয়ার হাসি, ঢলানি, তামাসা নিজের অজান্তেই তাঁর সমস্ত সত্তাটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

আজকাল রতিয়াকে ছাড়া সীয়াশরণজীর চলে না।

সকাল-দুপুর-সন্ধে—দিনে তিনবার তাঁর তাঁবুতে আসে রতিয়া। তাঁবু সাফ করে। রোটি-ভাজি সাজিয়ে দেয়। মাটির সোরাইতে জল ভরে রাখে। বিছানা পাতে। লণ্ঠনের কাচ মোছে। টুকিটাকি কাজ সারে আর হেসে হেসে তামাশার কথা বলে, রসের কথা বলে।

ইদানীং আরও একটা কাজ বেড়েছে রতিয়ার। রাত্রে খেয়েদেয়ে সীয়াশরণজী শুয়ে পড়লে নরম ঠাণ্ডা হাতে তাঁর পা টিপে দেয়।

এখানে আসার পরের দিন তাঁর পায়ে রতিয়া হাত ঠেকাতেই চমকে উঠে বসেছিলেন সীয়াশরণজী। অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুকের ভিতরটা কেঁপেছিল। কিন্তু কখন যে নিজের অজান্তে রতিয়ার এই সেবাটুকু মেনে নিয়েছেন, খেয়াল নেই তাঁর।

রতিয়ার আসতে দেরি হলেই সীয়াশরণজী অস্থির হয়ে ওঠেন। তাঁবুর বাইরে এসে পায়চারি করেন; এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজতে থাকেন।। রতিয়া যতক্ষণ না আসে, স্বস্তি পান না।

সিগন্যাল পোস্ট, সিগন্যাল পুলি পোঁতা হচ্ছে। স্লিপার বসানো হচ্ছে। আর পনের দিনের মধ্যেই রেল-লাইন সীমান্ত ছোঁবে।

কুলী কামিন এবং ইন্সপেক্টরজীর শ্বাস ফেলার ফুরসত নেই।

আজ একটানা সমস্ত দিন কাজ হয়েছে। দুপুরে খেতে আসতে পারেননি সীয়াশরণজী। রতিয়া বার দুই ডেকে ফিরে গিয়েছে।

সন্ধের পর আকাশে চাঁদ দেখা দিল। কাঁকুরে ডাঙা আর শালবনের থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ উঠে আসছে। দুপুরের আগুনে আকাশটা স্নিগ্ধ এক রহস্যে বিভোর হয়ে আছে। ঝিরঝিরে, মিঠেল বাতাসে সমস্ত দিনের অবসাদ জুড়োতে জুড়োতে তাঁবুতে ফিরে এলেন সীয়াশরণজী। কারণ নেই, হেতু নেই, তবু অদ্ভুত এক খুশিতে মন ভরে আছে।

তাঁবুর বাইরে থেকেই সীয়াশরণজী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন, "রতিয়া—রতিয়া—"

অন্য অন্য দিন ডাকতে হয় না। পায়ের শব্দ পেলেই লণ্ঠন হাতে বাইরে বেরিয়ে আসে রতিয়া।

বার-তিনেক ডাকার পরও সাড়া মিলল না। ভিতরে তাঁবুর ভিতরে ঢুকলেন সীয়াশরণজী। রতিয়া নেই। এক কোণে একটা তেলের লণ্ঠন জ্বলছে।

লাইন থেকে ফিরে রতিয়াকে দেখা, তার সঙ্গে গল্প করা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আজ কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। অহেতুক খুশিতে মনটা ভরিয়ে তাঁবুতে ফিরেছিলেন সীয়াশরণজী। মনটা এখন উদাস হয়ে গিয়েছে।

মাচানের উপর নিঝুম হয়ে পড়ে রইলেন সীয়াশরণজী।

খানিকটা পর তাঁবুর বাইরে খচমচ শব্দ হল। ধড়মড় করে উঠে বসলেন সীয়াশরণজী। আকুল আগ্রহে ডাকলেন, "আয় আয় রতিয়া।"

কিন্তু তাঁবুর ভিতর যে ঢুকল, সে রতিয়া নয়। অন্য একটা কামিন। কামিনটা পিতলের থালায় রোটি-ভাজি এনেছে।

থালা নামিয়ে কামিনটা চলে গেল।

সীয়াশরণজী একবার ভাবলেন, কামিনটাকে ডেকে রতিয়ার কথা জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু কোথায় যেন বাধো-বাধো সংকোচ ঠেকল। সংকোচটাকে ছাপিয়ে তাঁর ইচ্ছা জয়ী হল না।

অনেকক্ষণ বসে রইলেন সীয়াশরণজী। মনের সঙ্গে অনেক যুঝলেন। কিন্তু একটা অবুঝ যন্ত্রণা তাঁকে বিকল করে ফেলল। আর সেই যন্ত্রণাটাই তাঁকে তাঁবুর বাইরে টেনে আনল।

লাইনের ধারে টিকারা বাজিয়ে কুলীরা হোলির গীত গাইছে। সন্তর্পণে তাদের এড়িয়ে যেখানে ন্যাড়া শিমুল আর রুগ্ন পলাশগুলি সারি-বাঁধা জমাট অন্ধকারের মত দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে চলে এলেন সীয়াশরণজী।

শিমুল আর পলাশের নীচে কামিনদের ঝুপড়ি। ঝুপড়িগুলোর চারপাশে কিছুক্ষণ ঘুর ঘুর করলেন। বার বার ভাবলেন, রতিয়াকে ডাকেন। এতে দোষের কিছু নেই। রতিয়া রোজ তাঁর তাঁবুতে যাচ্ছে। তা ছাড়া ইন্সপেক্টরজী যদি তাকে রাত্রে ডাকেনই, কুলীরা খারাপ চোখে দেখবে না। সীয়াশরণজীকে বিশ্বাস করে তারা।

কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত রতিয়াকে আর ডাকা হল না। অসহ্য অবুঝ এক যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে তাঁবুতে ফিরে এলেন সীয়াশরণজী।

সারা রাত ঘুম হয়নি। ভোরের বাতাসে চোখদুটো জুড়ে এসেছিল।

কে যেন ডাকল, "ইন্সপিটারজী—"

চোখ মেলেই সীয়াশরণজী যাকে দেখলেন, সে রতিয়া। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলেন। প্রথমেই যে কথা বললেন, তা এই, "কাল রাতে আসিসনি কেন রতিয়া?"

রতিয়া জবাব দিল না। ঠোঁট টিপে সেই হাসি হাসল, যাতে শব্দ নেই।

একটা রাত্রি না ঘুমিয়ে চোখ বসে গিয়েছে। হনু দুটো ফুঁড়ে বেরিয়েছে। মুখটা শুকনো, চুল উড়ুউড়ু। সীয়াশরণজীকে দেখতে দেখতে রতিয়া বলল, "চেহারায় এ কী সুরত হয়েছে!"

ব্যস্তভাবে সীয়াশরণজী বললেন, "ও কুছ্ না, কুছ্ না। কাল তুই আসিসনি কেন, বল্?"

রতিয়া এবারও জবাব দিল না। ঠোঁট টিপে আগের মতই হাসতে লাগল।

সীয়াশরণজী বললেন, "হাসছিস কেন?"

"বলব?" জবাবের অপেক্ষা না রেখেই ফিস ফিস করে রতিয়া বলল, "কাল রাতে একটা বেকুব মুরুখ আমার ঝোপড়ির পাশে ঘুর ঘুর করছিল। লেকিন ভরোসা করে ঝোপড়িতে ঢুকল না। মুরুখটার জন্যে দরদ লাগল।" খিল খিল করে দমকে দমকে হেসে উঠল রতিয়া।

সীয়াশরণজী শিউরে উঠলেন। অসহ্য গলায় চিৎকার করলেন, "বাহার যা, বাহার যা—"

হাসি থামিয়ে সীয়াশরণজীর মুখের দিকে তাকাল রতিয়া। সে মুখে কী দেখল, সে-ই জানে। আর একটা কথাও না বলে সে বেরিয়ে গেল।

আজ আর বেরুলেন না সীয়াশরণজী। সমস্ত দিন তাঁবুতে বসে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করলেন। এতকাল নিজের জীবনে নীতি আর সংযমের লাইন পেতে এসেছেন। জীবনের চাকাটা মসৃণ নিয়মেই তার উপর দিয়ে চলছিল। কিন্তু এখানে, এই সীমান্তে এসে, চল্লিশটা বছর পার হয়ে জীবনের সীমান্তে পৌঁছে সেটা বেচাল হয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়ার উপক্রম করেছে। প্রায় দুটি মাস অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে কাটিয়ে সীয়াশরণজী আজ আত্মস্থ হলেন। স্থির করে ফেললেন, আজই এখান থেকে চলে যাবেন।

বিকালে কুলীকামিনদের অবাক করে দিয়ে ট্রলিতে উঠলেন সীয়াশরণজী।

সকলের সঙ্গে রতিয়াও ট্রলির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার কটা চোখ-দুটো ধক ধক করছে। রতিয়ার চোখের দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলেন সীয়াশরণজী।

বিড় বিড় করে দুর্বোধ্য গলায় রতিয়া বলল, "ডরপোক—"

ট্রলি চলতে শুরু করল। জীবনের ভয়ানক এক সীমান্ত থেকে পালিয়ে গেলেন সীয়াশরণজী।

বেকার সমস্যা

পূর্ণেন্দুকুমার বসু

জ থেকে বারো বছর আগে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। স্বাধীন হবার পর দেশবাসীর আশা ছিল যে প্রায় দুশো বছর ইংরাজ রাজত্বে দেশে যে অভাব অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়েছিল তার বুঝি সমাধান হবে। প্রধান অভিযোগ ছিল দেশে মানুষের কাজের ব্যবস্থা হয় না। যত লোক কাজ করতে পারে তাদের কাজ জোটে না, বেকার অবস্থায় থাকে। দেশে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই সমস্যা সমাধানের কথা সরকার ভাবতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আজও মানুষের সে আশা সফল হয়নি। প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই সমস্যার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়, কিন্তু দেশে বেকারের সংখ্যা হ্রাস ত পায়ইনি বরং উত্তরোত্তর বাড়ছে। এই প্রবন্ধে সারা ভারতবর্ষে বেকার সমস্যার সমগ্ররূপ যে কি দাঁড়িয়েছে তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। এর সমাধান যে কী তা বলা খুবই শক্ত, তবে তারও কিঞ্চিৎ আভাস দেব।

অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারতবর্ষ একটি অনগ্রসর দেশ। প্রতি বছর এর জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। জনসংখ্যা বাড়ার জন্য কাজ করার লোকও সংগে সংগে বাড়ছে। দেশে যে পরিমাণ কাজের ব্যবস্থা হচ্ছে তার সংগে কর্মক্ষম লোকের সমতা থাকছে না, যার ফলে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। এই সমস্যাটির প্রকৃত রূপ কী? সমগ্র দেশের জনসংখ্যার তুলনায় এর অংশ কতটা? শহরে এবং গ্রামে এই সমস্যার কি কোন তারতম্য আছে? এইরূপ বিবিধ প্রশ্ন মনে ওঠে। তারই কিছু জবাব দেবার চেষ্টা করছি।

১৯৫১ সালে আদমসুমারি হয়। তখন লোকসংখ্যা ছিল ৩৫·৬৯ কোটি। তারপর ৮ বছর হয়ে গিয়েছে, এই সময়ে লোকসংখ্যা কি দাঁড়িয়েছে, তা অনুমান করা যায়। ১নং তালিকাতে ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত, ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা রাশিতথ্যের সাহায্যে অনুমান করা হয়েছে। এই তালিকা থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে প্রতি বছর প্রায় ০·৫০ কোটি লোক যোগ হচ্ছে।

১নং তালিকা, ১৯৫২—৫৮ সাল পর্যন্ত লোকসংখ্যা (অনুমান)

বৎসর	লোকসংখ্যা (কোটি)	বৎসর	লোকসংখ্যা (কোটি)
১৯৫২	৩৬·৭৫	১৯৫৬	৩৮·৭৪
১৯৫৩	৩৭·২৩	১৯৫৭	৩৯·২৪
১৯৫৪	৩৭·৭১	১৯৫৮	৩৯·৭৫
১৯৫৫	৩৮·২৪		

এই হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে ১৯৬১ সনে অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনা আরম্ভ করার সময় লোকসংখ্যা দাঁড়াবে ৪২ কোটির মতন। মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৮৩ ভাগ থাকে গ্রামে আর ১৭ ভাগ থাকে শহরে। গ্রামে ও শহরে সমাজ বিন্যাস আলাদা, কাজের ধরনও আলাদা। সেইজন্য বেকার-সমস্যা আলোচনা করতে হলে গ্রাম ও শহরকে আলাদা করে দেখতে হবে।

গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৮২·৪৯ জন লোক অশিক্ষিত, ১৬·৯৯ জন লোক সামান্য লেখাপড়া জানে আর মাত্র ০·৪৬ জন শিক্ষিত। শহরাঞ্চলের অবস্থা অন্যরকম। শতকরা ৫৫·২৫ জন লোক অশিক্ষিত, ৩৯·২৪ জন লোক সামান্য লেখাপড়া জানে আর ৫·৫ জন শিক্ষিত। আয়ের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে যে গ্রামে শতকরা ২৯·২৮ জন আয় করে আর শহরে শতকরা ২৯·৫৪ জন আয় করে। শতকরা অর্ধেকের বেশী লোক শহরে ও গ্রামে নির্ভরশীল, শহরে এর পরিমাণ শতকরা ৬৪·০৪ ভাগ আর গ্রামে ৫৩·০৮ ভাগ। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যারা আয় করে কিন্তু তবুও তারা কিছু পরিমাণ পরনির্ভরশীল, তাদের ইংরাজীতে বলা হয় 'আরনিং ডিপেনডেন্টস'। এদের সংখ্যা শহরের থেকে গ্রামে অনেক বেশী, শহরের ভাগ হচ্ছে শতকরা ৬·২৫ আর গ্রামের ভাগ ১৬·৬১। (২নং তালিকা দ্রষ্টব্য)

২নং তালিকা:—গ্রামের ও শহরের শিক্ষার ও অর্থনৈতিক অবস্থা (শতকরা)

	গ্রাম			শহর		
	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
শিক্ষা।						
১। অশিক্ষিত	৭২·৭২	৯২·৬৪	৮২·৪৯	৪৩·৪৩	৬৮·৩১	৫৫·২৫
২। সামান্য লেখাপড়া জানে	২৬·৩৬	৭·২৫	১৬·৯৯	৪৭·৭৮	২৯·৮১	৩৯·২৪
৩। শিক্ষিত	০·৮৪	০·০৭	০·৪৬	৮·৭৫	১·৮৪	৫·৪৭
৪। জানা যায় নি	০·০৮	০·০৪	০·০৬	০·০৪	০·০৪	০·০৪
অর্থনৈতিক অবস্থা						
১। রোজগারী	৪৯·১৮	৯·৮০	২৯·৮৮	৪৯·৩৯	৭·৬৬	২৯·৫৪
২। রোজগারী, কিন্তু নির্ভরশীল	১০·৭৮	২২·৬৮	১৬·৬১	৫·০০	৭·৬২	৬·২৫
৩। পরনির্ভরশীল	৩৯·৫৬	৬৭·১৫	৫৩·০৮	৪৫·৪৯	৮৪·৪৮	৬৪·০৪
৪। জানা যায় নি	০·৪৮	০·৩৭	০·৪৩	০·১২	০·২৪	০·১৭
নমুনার সংখ্যা	২০,৬৫৪	১৯,৭৫৮	৪০,৪১২	৪৬,৩২৯	৩৮,৯৩৭	৮৫

ভারতবর্ষের বেকার সমস্যার কথা আলোচনা করতে হলে এই সমাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে করতে হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে এই প্রবন্ধের রাশি-

[illegible]গুলি নমুনা পর্যবেক্ষণের সাহায্যে সরকারী ব্যবস্থায় সংগ্রহ করা হয়েছে, নীচের লাইনে নমুনার সংখ্যা দেওয়া হয়েছে।

দেশে কতজন বেকার হয়ে আছে, এ বিষয় অনুসন্ধান করতে হলে প্রথমেই দেখা প্রয়োজন মোট জনসংখ্যার মধ্যে কতজন লোক কর্মপ্রার্থী, কারণ অনেক লোক আছে যারা বেকার কিন্তু কাজ চায় না, এই শ্রেণীর লোককে বেকারের আওতায় আনা যায় না। যারা কাজ চায়, তাদের বলা হয়েছে "লেবার ফোর্স"। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে যারা বসে আছে তারাই প্রকৃত বেকার। তাদের কাজের সংস্থান করাই সরকারের আশু কর্তব্য।

যারা বর্তমানে কাজ করছে তাদের চার ভাগে ভাগ করা যায়—(১) নিযুক্ত ব্যক্তি, (২) নিয়োক্তা, (৩) নিজের কাজ করে আর (৪) বাড়ির কাজ করে। ৩নং তালিকাতে গ্রামের ও শহরের লোকের কাজ হিসাবে (ইনডাস্ট্রিয়াল স্ট্যাটাস) শ্রেণী বিভাগ করে দেখান হয়েছে।

৩নং তালিকা :—গ্রামের ও শহরের লোকের কাজ হিসাবে শ্রেণী বিভাগ

(শতকরা)

কাজ চায়। ৩নং তালিকা থেকে দেখা যায় শহরের বেকারের সংখ্যা বেশী। পূর্বেই বলা হয়েছে মোট লোকসংখ্যার ৮৩ ভাগ থাকে গ্রামে আর ১৭ ভাগ থাকে শহরে। এই ভাগ অনুসারে গ্রামের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩ কোটির মতন আর শহরের ৭ কোটির মতন। এই লোকসংখ্যার উপর ভিত্তি করে দেখতে পাওয়া যাবে যে শুধু পুরুষদের মধ্যে বেকার সংখ্যা গ্রামে ও শহরে মোট ২২ লক্ষের মত। এ ছাড়া শহরে মেয়েদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। উপরোক্ত সংখ্যার মধ্যে যারা বাড়িতে কাজ করে, বা বছরে কিছুদিন কাজ করে বা ছাত্র ইত্যাদিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সারা দেশে যদি কর্মপ্রার্থী লোকের হিসাব করতে হয় তা হলে তার সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশী হবে। ১৯৫৬ সনে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন দেশে মোট কত লোক বসে আছে তার সংখ্যা নিরূপণ করেছেন। ১৯৫৬ সনে এই সংখ্যা ছিল ৫৩ লক্ষ। আরও দু বছরে এই সংখ্যা আরও বেড়েছে। প্রথম পরিকল্পনার পর বেকারের সংখ্যা এইরূপ ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনা আরম্ভ হয় ১৯৫৬ সন থেকে, এই পরিকল্পনায় ৪৮০০ কোটি টাকা খরচ করা

	গ্রাম			শহর		
	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
১। প্রয়োজনীয় কাজ করছে	৫৯·০৭	২৮·০৮	৪৩·৮৮	৫১·৬০	১১·৫৬	৩২·৫৫
২। যারা কাজ খুঁজছে	০·৩২	০·০৪	০·২৯	৩·৪৪	০·৪০	১·৯৯
৩। কাজের লোক	৫৯·৩৯	২৮·১২	৪৪·১৭	৫৫·০৪	১১·৯৬	৩৪·৫৪
৪। যারা কাজ চায় না	৪০·৩২	৭১·৮৪	৫৫·৭৭	৪৪·৮৯	৮৮·০২	৬৫·৪১
৫। জানা যায় নাই	০·০৯	০·০৪	০·০৬	০·০৭	০·০২	০·০৫

উপরের তালিকা থেকে দেশে বেকারের অবস্থা বেশ ভাল ভাবে বোঝা যায়। শহরে পুরুষের মধ্যে বেকারের সংখ্যা শতকরা ৩·৪৪ ভাগ আর গ্রামে মাত্র ০·৩২ ভাগ, স্ত্রীলোকের মধ্যে গ্রামে বেকারের সংখ্যা খুবই কম কিন্তু শহরে এর ভাগ ০·৪০। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় (১) লোক বেকার হয়ে পড়লেই গ্রাম থেকে শহরে চলে আসে, কারণ শহরে কাজ পাবার আশা অনেক বেশী। (২) গ্রামে বেশীর ভাগ অশিক্ষিত লোক থাকে এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় চাষের কাজ। বেশীর ভাগ লোক বছরে কিছু না কিছু চাষ করে, এইজন্য তারা বেকারের পর্যায়ে আসে না, কিন্তু তারা বছরে বহু সময় বেকার অবস্থায় থাকে, (৩) গ্রামে মেয়েরা চাষের এবং বাড়ির কাজ করে, কিন্তু শহরে শিক্ষিতদের সংখ্যা বেশী, সেইজন্য মেয়েরা

হবে। পরিকল্পনা শেষ হবে ১৯৬১ সনে। সরকার আশা করেন এর পর বেকারের সংখ্যা কিছু হ্রাস পাবে।

গ্রামে ও শহরে যারা কাজ করছে তাদের শ্রেণী বিভাগ কী রকম? কারণ যদি বেকারদের কাজ দিতে হয়, কী ধরনের কাজ সৃষ্টি করতে হবে তা জানা প্রয়োজন।

শহরে এবং গ্রামে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এমনই আলাদা যে একই ধরনের কাজ দু-জায়গায় সম্ভব নয়। ৪নং, ৫নং এবং ৬নং তালিকায় এই প্রয়োজনীয় রাশি-তথ্য দেওয়া হল।

৪নং তালিকা। গ্রামে ও শহরে নিযুক্ত লোকের বয়স হিসাবে শ্রেণী বিভাগ (শতকরা)

বয়স	গ্রাম	শহর
০—৬	০·০০	০·০৮
৭—১৫	২২·৫৯	৭·৭০
১৬—১৭	৫৭·৬৮	২৮·২৬
১৮—২১	৬৫·৫৮	৩৭·৪৩
২২—২৬	৭১·২৭	৫১·৫৭
২৭—৩৬	৭৪·৯০	৬১·৪২
৩৭—৪৬	৭৪·০৩	৬৩·৩৫
৪৭—৫৬	৬৭·০৯	৫৯·১০
৫৭—৬১	৫২·৪৬	৪২·১৩
৬২—	৩৬·৫৭	২৪·৩০

৪নং তালিকা থেকে দেখতে পাওয়া যাবে গ্রামে অনেক কম বয়স থেকে লোক কাজ করতে আরম্ভ করে আর কাজ করে যায় অনেক বেশী বয়স পর্যন্ত। ৭-১৫ বছরে গ্রামে কাজ করে শতকরা প্রায় ২৩ জন আর শহরে প্রায় ৮ জন। ৬২ বছরের বেশী বয়সে গ্রামে কাজ করে শতকরা ৩৭ জন আর শহরে কাজ করে ২৪ জনের মতন।

৫নং তালিকা—নিযুক্ত লোকের শিক্ষার মান হিসাবে শ্রেণী বিভাগ (শতকরা)

শিক্ষার মান	গ্রাম	শহর
অশিক্ষিত	৭৯·৬৯	৪৫·৩৫
অর্ধশিক্ষিত	১৯·৭৩	৪৪·৩৭
শিক্ষিত	০·৫৭	১০·০৭

পরিবার-নিয়ন্ত্রণে বা জন্মনিয়ন্ত্রণে •
যাবতীয় পরামর্শ ও "প্রয়োজনীয়" জিনিস
[illegible] সাক্ষাৎ করুন।
রবিবার বন্ধ। মহিলাদেরও ব্যবস্থা আছে।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
মোডকো সাপ্লাই, রুম নং ১৮, টপ ফ্লোর,
১৯৬, অমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন: ৩৪-২৫৮৬

রেকোকাশ্মীর
ফেস পাউডার
মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে
রেডা কেমিক্যাল • কলিকাতা-১

গ্রামে অশিক্ষিত লোক কাজ করে প্রায় শতকরা ৮০ জন আর শহরে করে প্রায় ৪৬ জন, অর্ধশিক্ষিত আর শিক্ষিত লোক কাজ করে গ্রামে শতকরা ২০ জন আর শহরে করে প্রায় ৫৬ জন।

৬নং তালিকা গ্রামে ও শহরে নিযুক্ত লোকের কাজ হিসাবে শ্রেণী বিভাগ

(শতকরা)

কাজের ধরন	গ্রাম	শহর
কৃষি	৮৪·২১	২০·০২
শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদি	১০·৮২	৪৭·২৭
যানবাহন চলাচল	০·৮০	৭·৬৫
অন্যান্য	৪·১৭	২৫·০৬

৬নং তালিকা—গ্রামে ও শহরে নিযুক্ত শতকরা ৮৪ জনের অধিক লোক কৃষির কাজ করে আর শহরে শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি কাজে শতকরা ৮০ জন লোক কাজ করে। অতএব দেখা যাচ্ছে শহরে ও গ্রামে কাজের ধরন সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী।

যদি এই বিপুল সংখ্যক বেকার লোকের কাজের সংস্থান করতে হয় তা হলে উপরোক্ত বিষয়গুলি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। বেকার সমস্যার সমাধান কিভাবে হতে পারে এ বলা খুবই শক্ত কিন্তু তার উপায় সম্বন্ধে দু-একটি কথা আলোচনা করব।

প্রথমেই দেখতে হবে বেকারের সংখ্যা যাতে আর খুব বেড়ে না যায়। ১নং তালিকাতে দেখান হয়েছে আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে বছরে প্রায় ০·৫০ কোটি। এই হার কমাতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভারত সরকারকে অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে। গ্রামে শতকরা ৮৪ জন লোক চাষের উপর নির্ভর করে। লোক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাষের জমিও মাথা পিছু কমে যাচ্ছে। বেকার লোকেদের আর চাষের জমি দেওয়া সম্ভব নয়, বরং চাষের কাজ থেকে কিছু সংখ্যক লোককে অন্য কাজে দেওয়া প্রয়োজন। অতএব গ্রামে বেকার সমস্যা সমাধান করতে হলে আমাদের কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রাকার শিল্প প্রবর্তন করা প্রয়োজন। কুটির ও ক্ষুদ্রাকার শিল্পের প্রসার হলে গ্রাম থেকে আর লোক শহরে চলে আসবে না।

কুটির ও ক্ষুদ্রাকার শিল্প পাঁচটি মণ্ডলীতে ভাগ করা যায়, যেমন (১) বস্ত্রাদি, (২) যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, (৩) কাষ্ঠসামগ্রী (৪) ফাঁপা পাত্রাদি, (৫) বিবিধ। বস্ত্রাদি বলতে মিলজাত কাপড়ের কথা বলা হচ্ছে না, হস্তচালিত বা বৈদ্যুতিক তাঁতে প্রস্তুত জিনিসের কথা বলা হয়েছে। এর আওতায় আসে (ক) রঙীন বা সাদা বোনা কাপড়, (খ) হোসিয়ারি দ্রব্যাদি, (গ) পাটের বস্তা (যেগুলি রপ্তানির জন্য নয়)। কাষ্ঠ-সামগ্রীর অধীনে আসে গৃহস্থালির আসবাব ও মালপত্র, দরজা জানলার প্যানেল ও ফ্রেম। ফাঁপা পাত্রাদি বলতে লোকের বাড়িতে ব্যবহারের জন্য ধাতব পাত্রাদি। বিবিধের মধ্যে অনেকগুলি বলা যেতে পারে, যেমন দেশলাই তৈরী, কাপড় কাচা সাবান তৈরী, শিল্পে ব্যবহার্য চামড়া ইত্যাদি। এই ধরনের ক্ষুদ্রকার শিল্প যদি গ্রামে গ্রামে গড়ে ওঠে তাহলে গ্রাম থেকে শহরে লোক চলে যাওয়া বন্ধ হবে। গ্রামে নতুন নতুন কাজের সন্ধান পেলে, গ্রামগুলি আবার নতুন করে গড়ে উঠবে। সরকার এ বিষয়ে অবহিত আছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই বাবদে বেশ মোটা টাকা খরচ করা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এ কাজ তেমন ভাল ভাবে এগোয়নি। গ্রামবাসীর মধ্যে এ কাজের জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে যাতে তারা দলে দলে কুটিরশিল্পে মন দেয়। এ ছাড়া কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় প্রথায় চাষ করার প্রথা প্রবর্তন করা দরকার।

শহরে সরকারের অধীনে ভারী শিল্পের প্রসার প্রয়োজন। স্বাধীনতার পর এ বিষয়ে সরকার খুবই সচেতন এবং অনেকগুলি ভারী শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এ শিল্পের প্রসার আরও হবে। বেসরকারী বিভিন্ন ভারী শিল্প সংস্থাগুলি যতদূর সম্ভব জাতীয়করণ করা প্রয়োজন। সরকারী উদ্যমে ভারী শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে। অতএব বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে আমাদের নিম্নলিখিত জিনিসগুলি মনে রাখতে হবে:—(১) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ (২) গ্রামে কুটির ও ক্ষুদ্রাকার শিল্প প্রতিষ্ঠা ও সমবায় চাষ ও (৩) পাবলিক সেক্টরে নতুন ভারি শিল্প সংস্থা গঠন ও ভারী শিল্প জাতীয়করণ।

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ

যাঁহাদের বিশ্বাস এ রোগ আরোগ্য হয় না, তাঁহারা আমার নিকট আসিলে ১টি ছোট দাগ বিনামূল্যে আরোগ্য করিয়া দিব।

বাতরক্ত, অসাড়তা, একজিমা, শ্বেতকুষ্ঠ, বিবিধ চর্মরোগ, ছুলি, মেচেতা, ব্রণাদির দাগ প্রভৃতি চর্মরোগের বিশ্বস্ত চিকিৎসাকেন্দ্র।

হতাশ রোগী পরীক্ষা করুন।

২০ বৎসরের অভিজ্ঞ চর্মরোগ চিকিৎসক

পণ্ডিত এস. শর্মা (সময়: ৩—৮)

২৬/৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

আপনার শুভাশুভ ব্যবসা, অর্থ, পরীক্ষা, বিবাহ, মোকদ্দমা, বিবাদ, বাঞ্ছিতলাভ প্রভৃতি সমস্যার নির্ভুল সমাধান জন্য জন্ম সময়, সন ও তারিখ সহ ২্ টাকা পাঠাইলে জানান হইবে। ভট্টপল্লীর পুরশ্চরণসিদ্ধ অব্যর্থ ফলপ্রদ—নবগ্রহ কবচ ৭্, শনি ৫্, ধনদা ১১্, বগলামুখী ১৮্, সরস্বতী ১১্, আকর্ষণী ৭্, **সারাজীবনের বর্ষফল ঠিকুজী**—১০্ টাকা।

জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য বিশ্বস্ততার সহিত করা হয়। পত্রে জ্ঞাত হউন।

ঠিকানা—**অধ্যক্ষ ভট্টপল্লী জ্যোতিঃসঙ্ঘ**

পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

তিন দিকে জল

সমরেশ বসু

র সকলের কৌতূহল মিটে-ছিল লোকটার সম্পর্কে। মেটেনি খেলানীর।

কিংবা বলা যায়, লোকটার সম্পর্কে আর কৌতূহলী হয়ে কোনো লাভ নেই বলে কেউ হয় না। কারণ তাতেও লোকটির ঠিক ঠাহর পাওয়া মুশকিল।

কিন্তু খেলানীর কৌতূহল কি-না কে জানে। ওর চোখে একটা খেলার ইশারা কেমন যেন হাতছানি দিয়ে ফিরতে লাগল। লোকটাকে দেখলে খেলানীর ফুলো ফুলো ঠোঁট দুটি ধনুকের ছিলার মত হাসির টানে বাঁকে। কালো দুটি টানা টানা চোখের অতি সূক্ষ্ম বক্রতায়, জাদুকরের অংগুলি সংকেতের মত কি একটা কথা যেন শুধু বলার অস্পষ্টতায় চাপা পড়ে থাকে। কাঁপে, ঝিকিমিকি করে। নতুন খোলস-ছাড়া সাপের মত তার কালো রঙের ছটা শুধু চমকে যায় না। লোকটার কাছে এলে, খোলস-ছাড়া সাপের মতই তার গতি শ্লথ নিদ্রালু হয়ে ওঠে।

শাস্তানুযায়ী কুলকঙ্কণ মিলিয়ে খেলানীর রূপ যাচাই চলবে না। নাক মুখ এমন কিছু নেই। সব মিলিয়ে একটা নিরালা নদীর মত। যার খবর কেউ রাখে না, কিন্তু পাহাড়ের ঢলটা নেমেছে অনেকদিন। বেয়ে যাবার পথে কোথায় যেন থমকে গেছে। সেখানে একটি প্রতীক্ষমান আবর্ত পাক খাচ্ছে প্রায় বাইশ চব্বিশের গহীনে।

আদিবাসী নাকি ছিল। এখন এই বাদা অঞ্চলের সংগে মিশ খেয়ে গেছে পুরো-পুরি। কোন্ পুরুষে এসেছিল কোথা থেকে, তার হদিসনিকেশ জানা নেই খেলানীর। ওর মা ছিল এক জোতদারের কাছে, এই জগপুরের বাদাতেই। বয়স হয়েছে এখন। জোতদার ঘর করে থাকার মত একটু জায়গা দিয়েছে জীবনস্বত্ব স্বরূপ। মা মেয়ে এখন কৃষিমজুরি করে।

বাদায় যেমন করে আদিবাসীরা।

খেলানী এখন পুরোপুরি বাদাবনের মেয়ে। এখানে লাল মাটি, চূড়ো পাহাড়, নুড়ি অরণ্য নেই। এখানে কালো মাটি, নোনা জল আর সাপ-চকচকে কাঁচা সবুজ অরণ্য। সুন্দরি অর্জুনের কোমরে কোমরে হোগলা আর গোলপাতার জংগল। গেমো আর কেওড়ার পায়ে পায়ে বিষ কাঁটারির ঝাড় দিগন্ত জুড়ে আবাদ।

দুলাল সোরেনের সংগে বিয়ে হয়েছিল খেলানীর। জাতের লোক ছিল সে। যার কামড়ে কেউ মরে না, সেই বিছের কামড়ে দুলাল মারা গেল। সাঙা করবার লোকের অভাব ছিল না। ভাত কাপড় দেবার মানুষও পেখম খুলে ছিল চারপাশে। কিন্তু ও লোকটাকে দেখে খেলানীর কূল ভাসে ভাসো।

প্রথম প্রথম অবশ্য জগপুরের গঞ্জে দেখে বাঁধে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। সেই থেকে শুরু। তারপর একদিন গঞ্জ থেকে মাইল খানেক আবাদ পেরিয়ে লোকটা হাজির বেশভূষা দেখে কিছু আন্দাজ করবার উপা নেই। ভদ্রলোক হতে পারে। নাও হতে পারে। চুলে বোধহয় তেল দেয় না কোনো দিন। না দিক, ফণা ফণা চুলগুলিতে লোকটাকে মানিয়েছিল। মালকোঁচা ধুতি সেটা কোনদিন ফর্সা থাকে, কোনদিন থাকে না। গায়ের জামার বরাবরই বুকটা হাট করে খোলা। লোকে বলে মেয়েদে বয়েস দেখে কিছু বোঝা যায় না। লোকটি ক্ষেত্রে সেটা উল্টো। তিরিশ হতে পারে চল্লিশ হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। দশ বছর বেমালুম শরীরের নানান আনা কানাচে গায়েব করে রেখেছে। চেহার মধ্যে বিশেষত্ব কিছু নেই। আর দশটা ভ ঘুরের মতই। গাছপালাহীন একটি ধূ পাহাড়ের মত। তার গায়ে পৃথিবীর বয়সে দাগ কতখানি পড়ে, টের পাওয়া যায় সহসা। কেবল চোখ দুটিতে কী এক চুম্ব আছে। একটি দুর্জ্ঞেয় অচেনা হাতছানি

মত কী যেন লক্ষ্য করা যায়। চোখে চোখ পড়লে তাই একটু লক্ষ্য করে দেখতে হয়। দেখতে দেখতে এক সময়ে হাত-ছানির ইশারায় বুঝি পা বাড়াতেও ইচ্ছে করে। বাড়ালে তা থামবে কোথায়, কে জানে। ওই চোখও তা জানে না। পা যে বাড়াবে, সে হারিয়ে যাবার জন্যেই বাড়াবে।

লোকটা যেদিন আবাদের ওই দূরে এসে হাজির, খেলানীর পা আর একমুহূর্ত ঘরে থাকতে চাইল না। আসলে খেলানীর চোখের কোণে যে জাদুকরের অঙ্গুলি-সংকেতের মত কি একটি না জানার ইশারা খেলছিল, সেটা হারিয়ে যাবার ইচ্ছেরই সংকেত।

বাদ সাধলে তানিচারি, খেলানীর মা। বাবুর সঙ্গে ঘর করবে, তাতে বোধ হয় আপত্তি ছিল না তানিচারির। নয় তো জাতের লোকের সঙ্গে সাঙা। কিন্তু ওই লোকটিকে চেনে সারা জগপুরে লাট আবাদের মানুষেরা। বাবু নয়, চাষা নয়। যে-মানুষের ঠিকানা নেই, তার কড়া নাড়বে কোথায়?

জগপুর গঞ্জের লোকেরা লক্ষ্য করেছিল খেলানীর ছটফটে হাবভাব। মন দেয়নি। লোকটিকে নিয়ে তারা আর মাথা ঘামায় না।

এক সময়ে গোটা জগপুরের আবাদ গঞ্জ ঘামিয়েছে। লোকটার নাম বুঝি হিরণ। প্রথম যখন এসেছিল জগপুরে, তখন সে কিংবদন্তীর লোক। মস্ত লেখাপড়া জানা মানুষ নাকি। লঞ্চে এসেছিল ভাসতে ভাসতে। জগপুরের মা-কালী হোটেলে কয়েকদিন থাকল। তারপরে দেখা গেল, ডাক্তার বাবুর ডিসপেন্সারিতে ওষুধ তৈরী করছে।

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে আধুনিক চিকিৎসা আপনার নখ-দর্পণে মশাই। পড়াশোনা করেছেন নাকি?

হাসে। বলে, ওসব কিছু নয়। আপনাদের সঙ্গে উঠাবসা করি। কিছু জানা হয়ে যায়। তারপরে আবার দেখা গেল লঞ্চের টিকেট-বাবু হয়ে বসে আছে হিরণ। কিন্তু তা-ই বা কতদিন। লোকের মামলা মোকদ্দমায় সাহায্য করল কিছুদিন। মহকুমা কোর্টের উকিলরা জগপুরের হিরণবাবুকে চিনে ফেলেছিলেন। এক বাক্যে বলে দিয়েছিলেন তাঁদের নিজেদের মুক্কেল, যা ঘটবে, আগে ওই বাবুটির সঙ্গে পরামর্শ করবে তারপর আমাদের কাছে আসবে। আইনের জ্ঞান ওঁর জবর।

কিন্তু পাওয়া যাবে কেমন করে তাকে? সে হয় তো তখন নদীর ওপারে মাটো-খারির সার্ভিসের মোটর চালাচ্ছে। তাই বা চালায় কতদিন। শীতের মরসুমে তবে মাঝি-দের সঙ্গে সমুদ্রে যাবে কে?

ইংরেজী হাতের লেখা নাকি চমৎকার। অনেকের অনেক দরখাস্ত লিখে দিয়েছে। এখন দরকারের সময় খোঁজ করে দেখ। জগপুর মাটোখারি, দক্ষিণের গোটা তল্লাটে তার ছায়াটিও খুঁজে পাবে না।

তারপরে যদি দেখা যায়, জগপুর গঞ্জের এক পুবে-বাতাস-দোলা দুপুরে, বাজারের মেয়েপাড়ায় মেয়েদের সঙ্গে বসে দুনিয়ার গল্প ফেঁদেছে লোকটি, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

তবু ইজ্জৎ আছে। ডাক্তারবাবু হাত তুলে নমস্কার করেন। থানার দারোগাবাবু ভ্রূ কুঁচকে কিন্তু সমীহ করে কথা বলেন।

যে যতই সমীহ করুক, তানিচারি বোকা নয়। বাদার কালো মাটির একটি টুকরো নেই, এমন লোকের কাছে মেয়ে ভিড়তে দেবে না সে।

কিন্তু ভিড়তে না দেবার মালিক তানি-চারি নয়। জলের স্রোতকে বাঁধ দিয়ে আটকানো যায়। রক্তস্রোতকে বাঁধা যায় না।

হিরণ ফিরে গেল। সন্ধ্যার আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে খেলানীও পিছু নিল তার।

হিরণ তখন বাঁধের ওপর বসে গালে হাত দিয়ে ওপারের দিকে তাকিয়ে ছিল। সামনে এসে দাঁড়াল খেলানী। হাতে একটি ছোট পুঁটলি তার। গলার রুপোর হারগাছটি খোলা ছিল। পরে আসতে ভোলেনি সে।

হিরণ তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে দেখল। খেলানীর সর্বাঙ্গে ওর শেষ লজ্জাটা একেবারেকে আড়ষ্ট হয়ে আছে। ঠোঁটের হাসিটুকু দাঁত দিয়ে ধরে রেখেছে চেপে। দু চোখ দিয়ে যেন হাতড়ে ফিরছে হিরণের বুকের মধ্যে। ফিসফিস করে বলল, পালায়ে এইচি।

হিরণ ফিরে তাকাল একবার নদীর দিকে: ভাটা নামা নদী সমুদ্রে যাচ্ছে। কিন্তু তার মুখের তেমন কোনো পরিবর্তন হল না। শুধু চোখ দুটি যেন আরো গাঢ় গহীন হয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল। —বলি, যাবি তা হলে?

খেলানী হিরণের চোখের দিকে তাকিয়ে ত্রাসচকিত ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে জানাল, যাবে। হিরণ উত্তর দিকে, বাঁধের নীচে গেঁয়ো গাছের গোড়ায় বাঁধা একটি নৌকো দেখিয়ে বলল, ওই নৌকোটায় গিয়ে বোস। সুরীন মাঝি আছে। আমি আসছি।

—কোথা গো?

উৎকণ্ঠিত ত্রাস খেলানীর গলায়।

হিরণ বলল, কিন্তু চক্রবর্তীর ধান চালানের কাজে হাত দিয়েছিলাম। বলে আসি, থাকব না. লোকটা মুশকিলে পড়ে যাবে নইলে।

বলে হিরণ বাঁধের নীচে গঞ্জের চালা-ঘরের ভিড়ে হারিয়ে গেল। খেলানী সেই দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে ভীরু পায়ে সুরীনের নৌকোর দিকে এগিয়ে গেল।

কিন্তু নৌকোয় উঠল না। হিরণের জন্য দাঁড়িয়ে রইল।

নদী বড় নিরালা। নৌকো নেই, লঞ্চেরও সময় নয় এখন। আর এ নদীতে লোক নামে না। মৃত্যুদণ্ড-শমন কামটেরা আছে এই তিক্ত নদীর জলে। তবু রক্তাভাখানি তাকিয়ে দেখতে ভাল লাগে।

সুরীন নৌকোর গলুয়ে চুপ করে বসেছিল গালে হাত দিয়ে। খেলানীকে একবার তাকিয়ে দেখছে মাত্র। কিছুই বলেনি।

একটু পরেই হিরণ এল। বলল, উঠিসনি?

খেলানীর চোখে এর মধ্যেই অভিমানের ছায়া। বলল, তুমি চলে বেইছিলে যা।

বলে হিরণের দিকে তাকাল। হিরণ হাত বাড়িয়ে খেলানীর হাত ধরে বলল, আয়।

নৌকোয় উঠে, নির্দেশ দিল হিরণ, মাটোখারির ঘাটে চল সুরীন।

খেলানী গঞ্জের দিকে তাকিয়ে রইল। মা খুঁজতে আসবে হয়তো এখুনি। পরে সুরীনের কাছে খবর পাবে। তখন এই ঘাটে বসে কাঁদবে, গাল দেবে।

খেলানী ফিরে তাকাল হিরণের দিকে।

হিরণ বলল, কোথায় যাবি খেলানী?

খেলানী বলল, জানি না।

হিরণ বলল, শহরে যাবি?

—কোন্ শহরে?

—কলকাতায়।

খেলানীর দুই চোখে কলকাতার কল্পনা রংমশাল হয়ে জ্বলে উঠল। বলল, যাব।

কলকাতা কোনোদিন দেখেনি খেলানী।

হিরণ জিজ্ঞেস করল, পুঁটলিতে তোর কী আছে?

—দুইখানা কাপড়, দুইখানা জামা।

হিরণের ঠোঁটে একটু হাসির আভাস ফুটল। তার চোখে মুখে কোথাও একটি মেয়ে নিয়ে পালাবার কোনো উত্তেজনা নেই। যত ভাবনা সব যেন ওই চোখে আর আলুথালু চুলের অন্ধকারে মিশে আছে।

নৌকো থেকে পাড়ে ওঠবার সময় খেলানীর হাত থেকে পুঁটলিটা নিয়ে, নৌকোয় ফেলে দিল হিরণ। বলল, ও কাপড় থাক্। শহরে গিয়ে নতুন কাপড় পরবি। ওগুলো তোর মাকে দিয়ে দেবে সুরীন, কেমন?

খেলানী হিরণের চোখের দিকে একবার তাকিয়ে তার বুকের কাছে ঘেঁষে এল। এসে তাকিয়ে রইল পুঁটলিটার দিকে। ওই পুঁটলিতে তার বিয়ের স্মৃতি ছিল একটি। কিন্তু সে আর হাত বাড়িয়ে নিল না।

হিরণের বুকের আড়ালে আড়ালে, মাটোখারির মোটরে করে মহকুমা শহরে এল। মহকুমা শহর থেকে কলকাতা।

মধ্য কলকাতায় যে-বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল হিরণ, দেখে, খেলানী তার জামা টেনে ধরল। বলল, কোথা যাইছ?

হিরণ বলল, ভয় পাচ্ছিস কেন, এইখানে আমার বাসা আছে। কড়া নাড়ল হিরণ।

একটি লোক এসে দরজা খুলে দিল।

সামনে ছোট একটি উঠোন। তারপরে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি।

হিরণ দোতলায় উঠল। দোতলার দরজার মাথাতেই সাইনবোর্ড ছিল, মুন্সী হোটেল। ফুডিং অ্যাণ্ড লজিং। চার্জ মডারেট।

কিন্তু হিরণ সে সব ফিরে দেখল না। বারান্দায় যিনি চেয়ারে বসেছিলেন, তাকে জিজ্ঞেস করল, তেতলার সিঁড়িঘরটা খালি আছে তো মহেন্দ্রবাবু?

মহেন্দ্রবাবু হাঁ করে দেখছিলেন খেলানীকে। বললেন, হ্যাঁ, আছে বৈ কি। কিন্তু এটি কে হিরণবাবু?

হিরণ বলল, [illegible]

মহেন্দ্রবাবুর নড়া দাঁতগুলি জিভের ধাক্কায় টলমল করতে লাগল। কপালের ওপর যেন দলা পাকাতে লাগল কালো কালো পুরু সাপ।

কিন্তু খেলানীর হাসি পেয়ে গেছে।

মহেন্দ্রবাবু বললেন, বিয়ে করলেন কবে?

—এই দু চারদিন।

—দু' চারদিন। এই ভাদ্র মাসে?

—হ্যাঁ। দিন, চাবিটা দিন।

বলে সে টেবিলের কাছে গেল। চাবিটা দিতে দিতে মহেন্দ্রবাবু ফিসফিস করে বললেন, দেখবেন, কোনো রকম হরণ কোসলানোর কেস্‌টেস্ হবে না তো। হোটেলটিই কিন্তু ভরসা।

হিরণ খেলানীর হাত ধরে তেতলার সিঁড়ি উঠতে উঠতে বলল, না, সে ভয় নেই।

সিঁড়ি-ঘরের দরজা খুলে বাতি জ্বালল হিরণ। ছোট একটি বিছানাও গুটানো ছিল সেখানে। গত বছরের একটি ক্যালেণ্ডার দেয়ালে, তাতে একটি মেশিনের ছবি।

হিরণ বলল, এই ঘরটায় আমরা থাকব। কেমন লাগছে?

একটু যেন কুণ্ঠার সঙ্গে বলল খেলানী, ভাল।

হিরণ আর একটি দরজা খুলল। আলসে ঘেরা বড় ছাদ। নীচে রাস্তা। সেখানে গাড়ি ঘোড়া লোকজন। খেলানী উঁকি দিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারল না। তার ঠোঁটের কোণে, চোখের তারায় বিস্মিত খুশির হাসিটা একটু একটু করে ছড়াতে লাগল। একটু একটু করে সর্বাঙ্গে একটা ঢেউ লেগে যেন সে কেঁপে উঠে হিরণের বুকের কাছে লেপটে এল।

হিরন বলল, ভাল লাগছে খেলানী?

খেলানী ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, খুব ভাল লাইগছে আমার।

হিরণ তাকে বুকের মধ্যে সাপটে নিয়ে বলল, আমরা এখন এখানেই থাকব তা হলে।

হিরণকে শুধু মহেন্দ্রবাবুই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। হিরণ শাড়ি ব্লাউস, সায়া, আয়না চিরুনি আলতা পাউডার কেনা, কিছু বাদ দিলে না। বিকেল হলেই খেলানীকে নিয়ে হয় থিয়েটার, না হয় সিনেমায়।

মহেন্দ্রবাবু চিরকাল জানতেন হিরণ একটি ভবঘুরে লোক। মাঝে মাঝে আসে। দু' এক মাস থাকে। আবার চলে যায়। শোনা যায়, কাগজেপত্রে নাকি কী সব লেখে। অর্থাৎ পত্রপত্রিকায়।

কিন্তু বিয়ে? মহেন্দ্রবাবু চিরকাল হিরণের মুখে শুনে এসেছেন, মেয়েমানুষের সঙ্গে ঘর? মাপ করবেন মহেন্দ্রবাবু। ওর মধ্যে নেই।

সেই লোক হিরণ? তাও আবার ওই জংলীদের মত দেখতে একটি মেয়ে। খালি হাসে নয় তো হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু এক মাস গেল না, খেলানী হাঁপিয়ে উঠল।

একদিন বলল, মনটা আমার টিকছে না এখেনে। আর কোথাও চল।
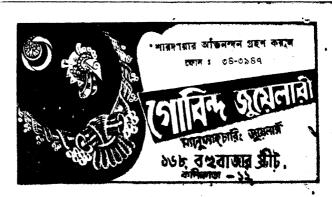
হিরণ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখল খেলানীর দিকে। এর মধ্যেই একটু যেন ফর্সা হয়ে গেছে খেলানী। লাবণ্যে ঢলঢল করছে। চোখের তারায় একটি ঢুলুঢুলু আবেশ।

সে বলল, যাবি?

খেলানী বলল, হ্যাঁ, আর কোথাও চল।

হিরণ বলল, আর দুটো দিন দেরী কর। তারপরে যাব।

দুদিন হিরণের নাওয়া খাওয়া বেড়াবার সময় হল না। তৃতীয় দিন বাসা ছেড়ে, খেলানীকে নিয়ে বেরুল। কিন্তু জামাকাপড় সব পড়ে রইল।

হিরণ বলল, একটা বাড়তি শাড়ি নে, আর জামা নে। এগুলো এখানেই থাকুক এখন।

ভোর ভোর বেরিয়ে আবার সেই দক্ষিণের পুনর্যাত্রা দেখে খেলানী বলল, কোথা যাইছ গো?

হিরণ বলল, সাগরে।

—সাগরে?

—হ্যাঁ। আকশা দ্বীপের নাম শুনেছিস খেলানী?

—না।

—সেখানে আমার এক বন্ধু আছে। শুকনো মাছের কারবার করে। সেখানে যাব।

খুব খুশি খেলানী। যাক্, জগপুরে তো নয়। মাটৌখারির ঘাটে তো নয়। সাগরে, আকশা দ্বীপে যাবে।

আশ্বিন মাস। সাগরের চেহারা খুব সুবিধার নয়। কিন্তু মাঝি যখন সাহস করল, তখন পিছনে ফেরবার কারণ নেই।

সন্ধ্যা ঘেঁষে প্রথম ভাটার মুখেই নৌকা ভাসল। মাঝ রাতে নৌকা নাচতে লাগল উথালিপাথালি। মাঝিরা চিৎকার করে নাম-গাজি অনামী দেবতার সঙ্গে কথা বলল।

খেলানী কেঁদে বমি করে অস্থির। কিন্তু ভোররাত্রেই নৌকা এসে লাগল আকশা দ্বীপে।

হিরণ যাকে বন্ধু বলে পরিচয় দিল, সে লোকটার বয়স হিরণের চেয়ে বেশী বলে মনে হল। মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। রক্তাভ চোখ।

বালির ওপরে বাঁশের ঘর। মাথায় গোল-পাতার ছাউনি। আকশা দ্বীপেও বন আছে। সেদিকটায় কেউ যায় না।

লোকটির নাম অধীর। সে ছাড়াও আর তিনজন শুকনো মাছের ব্যবসায়ী আছে এই দ্বীপে। প্রত্যেকেরই দু তিনটি করে নৌকো, জনা পাঁচ ছয় করে মুসলমান মাঝি আছে।

হিরণ বলল, অধীর, তোর এখানে কিছু-দিন থাকব।

অধীর বলল, দ্বীপে! থাকতে পারবি?

—কেন, থাকিনি আগে?

—তখন একলা ছিলি।

—খেলানী থেকে দোকলা হয়েছি বটে। কিন্তু একলারই সামিল। যেখানে যাব, সেখানেই যাবে ও [illegible]।

অধীরের মুখে একটু অস্পষ্ট হাসির আভাস দেখা গেল। সে খেলানীকে ঘরে বসাল ডেকে। হিরণকে ডেকে নিয়ে গেল বাইরে। বলল, তা হলে সারা দেশ ঘুরে এত-দিন বাদে সেই মেয়েকে খুঁজে পেলি?

—কোন্ মেয়েকে?

—যে তোর মতই যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে পারবে? তোর তত্ত্বে বিশ্বাস করবে?

—বোধহয়।

অধীরের ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম একটি হাসি আবার দেখা দিল। বলল, এমন করে বোধ-হয় বাগবাজারের অরুণা ঘোষও থাকতে পারত।

হিরণ ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বলল, মিথ্যে কথা। থাকতে পারলে নিশ্চয়ই কেরানী বিয়ে করে ঘর করত না।

অধীর বলল, আর বিজলী চৌধুরী?

হিরণ বলল, ও-পাখি তো সোনার খাঁচা ছাড়া কিছু চিনতই না।

অধীর বলল, কিন্তু কণা হালদার তোর সঙ্গে ভাসতে চেয়েছিল।

হিরণের হাসিটা ছুরির ফলার মত চকচকিয়ে উঠল। বলল, মেয়েটার সাহসটুকুর ভড়ং ছিল খুব। আসলে মেয়েটার ধারণা ছিল, আমার মত একটা বিকৃতমনা ভবঘুরে পুরুষকে ও জয় করবে, তারপরে মাথায় শামলা পরিয়ে, মুখে পান গুঁজে দিয়ে, টা টা করে চাকরি করতে পাঠাবে।

অধীর হেসে ফেলল। বলল, তুই দেখছি কিছুতেই আর মত বদলালিনে হিরণ। সংসারে থাকতে গেলে, কণা বিজলীরা ছাড়া উপায় কী? একটা বাঁধা নিয়মে কাজকর্ম ছাড়াই বা রাস্তা কোথায়?

হিরণ বলল, সেইজন্যেই ওদের জড়াইনি। সংসারে ইচ্ছেমত, খুশিমত থাকতে চাই। সেইজন্যেই খেলানীকে নিয়ে বেরিয়েছি। ও তো আমাকে ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে নিয়ে তুলবে না কাছা টেনে ধরে। বি এস-সি পাস করেছি বলে, চিপটেন কেটে কেটে প্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোক না হতে পারার জন্য খোটা দেবে না। বাঁধা সড়কের ধারে ভদ্রলোক হয়ে বাস করতে চাইনে বলেই বউ করেছি খেলানীকে।

—কিন্তু এটাকে কী জীবন বলে হিরণ।

—প্রতিবাদের জীবন।

—তা হলে রাজনীতি করলিনে কেন?

—সেটাও ওই সব নামী অনামী ভাই লোকেরাই করে থাকেন।

অধীরের শান্ত হাসিটাও প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ ও বিদ্রূপাত্মক মনে হল। বলল, খেলানী যদি কোনোদিন বাঁধতে চায়?

হিরণ বলল, ফেলে রেখে যাব।

অধীর প্রসঙ্গ ত্যাগ করল। বলল, আমা-দের মুক্তারানী স্ট্রীটের বাসায় গেছিলি নাকি?

—হ্যাঁ। তোর দাদা বউদি ভালই আছেন। তোর বউদির এখন তেরোটি সন্তান, সকলেই ভাল আছে। তুই নাকি রাগ করেই এ ব্যবসায় পড়ে রইলি, তোর দাদা বল-ছিলেন।

অধীর বলল, রাগটা দাদার ওপর নয়। কার ওপর ঠিক বলতে পারছিনে। কিন্তু এক ভদ্রলোকের ঘাড়ে বসে, ম্যাট্রিক ফেল করে বারো বছর বিনা পয়সায় খাওয়া, সেটাও আর সম্ভব ছিল না। এই ভাল আছি।

বলে অধীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হিরণ বলল, যতদিন থাকি, তোর কাজেকর্মে সাহায্য করব। খেলানী আর আমি, দুজনেই করব। তাড়ানর দরকার হলে আগেই বলিস।

অধীর হেসে বলল, বাঃ। সংসার পাতবার আগেই সংসারী লোকের মত কথা বলছিস যে? তবে কাজকর্ম যদি করিস, তাড়াব না। বিনে মাইনের লোক তো শত হলেও।

হিরণ বলল, কিন্তু পেটভাতা আছে।

এবার পূজায় আমাদের বিখ্যাত গেঞ্জী—4 Seasons, 3 Aces, Florida & 3 Flowers ব্যবহারে ও উপহারে আনন্দ বর্ধন করুন।

প্রস্তুতকারক :
গোয়র টেক্সটাইল ওয়ার্কস
ফোন : ৫৫—৩১৬১
১১৭বি, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৫

আর এখেনে ভাল লাইগছে না, বুইলে?

হিরণ বলল, চলে যাবি?

—হ্যাঁ।

—কোথায় যাবি?

—যেখেনে যাবে।

—বেশ। কাল পরশুই যাব।

একদিন পরেই হিরণ অধীরের মাঝিদের সঙ্গে পাড়ি দিল। তুলে দিয়ে গেল কাকদ্বীপে।

খেলানী মুখটি অন্য দিকে ফিরিয়ে রেখে বলল, কোথা যাবে এখন?

হিরণ বলল, এখন কলকাতা যাব খেলানী, তারপরে দুদিন কি চারদিন বাদে, অন্য জায়গায় চলে যাব।

খেলানী বলল, আমি কিন্তুক যাব না।

হিরণ থমকে গেল।—যাবিনে?

—না।

খেলানী হাত ধরে কাছে টেনে মুখ তুলে ধরল। খেলানীর মুখে যেন একটি বিচিত্র রহস্যের হাসি।

হিরণ যেন ভয় পেল হঠাৎ। বলল, তবে কোথায় যাবি?

খেলানী বলল, জগপুরে।

—জগপুরে?

হিরণের সেই গাছপাতাহীন পাহাড়ের মত ভাবলেশহীন মুখ কঠিন হয়ে উঠল। বলল, তুই পরশু আকখায় বমি করছিলি কেন বল তো?

লজ্জায় মাথা নীচু করে, নখ দিয়ে মাটি খুঁটতে লাগল খেলানী। বলল, বলা যায় নাকি? বুইঝতে পার না?

এই প্রথম বুঝল হিরণ, খেলানী গর্ভবতী হয়েছে। তাইতে ওর এত আনন্দ?

মুখ আরো কঠিন হল হিরণের। সে বলল, কিন্তু আমি তোর সঙ্গে তো সেখানে যাব না। তোর কাছে ওখানে থাকতে পারব না।

খেলানী হিরণের জামার বোতাম খুঁটতে খুঁটতে বলল, তুমি যাওগা, বুইলে? তুমি যাওগা, আমি ফিরে যাই। মন কইরলে আবার এইস জগপুরে, অঁয়া। আইসবে তো?

হিরণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল খেলানীর মুখের দিকে। এমন কথা কোনো মেয়ের মুখে সে আর কোনো দিন শোনেনি। শুধু কি রক্তের কোষ ভরে এইটুকু নিতেই তার সঙ্গে এসেছিল খেলানী? এইটুকু নিয়ে ফিরে যাবে আবার সেই আবাদের জগপুরে, গাঙে ভেড়ি বাঁধে। খাটবে খাবে, ছেলে নিয়ে হাসবে? হিরণকে বাঁধবে না, ডাকবে না, খোরপোষ খেসারত কিছুই চাইবে না!

খেলানী জামা ছেড়ে দিয়ে কয়েকটা নৌকার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওরা ক্যানিং হইয়ে উজরে যাবে। আমি ওদের সাথে যাইগা, অঁয়া?

হিরণ যেন নিশিপাওয়া মানুষের মত বলল, যা।

খেলানী একটু যেন আদরের আশা করল। হিরণের চুলে গালে হাত বুলিয়ে বলল, জগপুরে আবার এইস, কেমন?

হিরণ তাকিয়ে রইল। খেলানী নেমে গেল জলের দিকে। একটু পরেই ব্যাপারীদের ঘাটিন নৌকা ছেড়ে গেল।

হিরণ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। তার মনে হল, জীবনে এই প্রথম পৃথিবীর এক ভাগ স্থলের এক কোণে সে তার বহু যুগ যুগান্তের ফেলে আসা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শুনতে পাচ্ছে।

টি মার্চেন্টস্ বি. কে. সাহা এণ্ড কোং লিঃ
পাইকারী ও খুচরা চা বিক্রেতা
৭, পোলক স্ট্রীট, ১৩১।১এ, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

সেতুর কথা

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

গোধূলির ম্লান অস্তরবিরশ্মি-রঞ্জিত বর্ণাঢ্য প্রদোষে অথবা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাস্নাত নিশীথে স্রোতস্বিনীর উপর সুন্দর একটি সেতু সত্যই তটিনীবক্ষে যেন এক সুরচিত স্নিগ্ধ কবিতা, যেন স্বর্গারোহণের এক সুবিন্যস্ত সোপানশ্রেণী। সেতুর ইতিবৃত্ত মানবজীবনের দূরদৃষ্টি ও অসীম সাহস, দুরাশা ও দুরাকাঙ্ক্ষা, বিষাদ ও বেদনা, চেষ্টা ও উদ্যমের এক মহাকাব্য। সেতু শুধু সুখস্বাচ্ছন্দ্যের, প্রয়োজন ও মানোন্নয়নের মাধ্যম নয়, মানুষের মস্তিষ্ক, হৃদয় ও বাহুর এক সমবেত প্রচেষ্টার অভূতপূর্ব কাহিনী। সেতু শুধু ইস্পাত আর ইঁট-পাথরের সন্নিবেশ নয়, স্ট্রেস, স্ট্রেনের জটিল সমন্বয়ই নয়, এটি মানুষের এক অনন্যসাধারণ সৃজন-প্রতিভার অভিব্যক্তি; আদর্শ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূর্ত বিকাশ। সেতু বিভাগকে করে বিদূরিত, দূরকে করে নিকট, পরকে করে বন্ধু। প্রবাদ আছে, একা নদী বিশ ক্রোশ। সেতু-সংযোজনায় সেই দূরত্ব হয় দূরীভূত। যান-চলাচল ও বাণিজ্যের হয় সুবিধা। সেতু-রচনার নৈপুণ্যের বিবর্তনধারা সভ্যতার ইতিহাস ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির নিদর্শন, ইঞ্জিনীয়ারিং-বিদ্যার ক্রমোন্নতির উদাহরণ, তৎকালীন মানুষের সৌন্দর্যবোধের পরিচয়, কালের অর্থনৈতিক পরিবেশ-সম্পর্কে আলেখ্য, শিল্প ও কারিগরের পারিপার্শ্বিক পরিচয়। সেতু উচ্চনীতিনির্দেশে ও সমাজ জনসাধারণের প্রয়োজন মেটায়। সেতু পরিকল্পনাকারী ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার এবং বিজ্ঞান ও কলাকুশলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বর্তমান জনগণের প্রেরণা, দূরদৃষ্টির স্মারকচিহ্নস্বরূপ অনাগত ভবিষ্যতের সন্তানসন্ততির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত ঐতিহাসিক স্মরণক।

এক সেতু-উদ্বোধনী সভায় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলেছিলেন "এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না যে, সেতু-নির্মাণের কাহিনী সত্যই বহুলাংশে মানব-সভ্যতার ইতিবৃত্ত। এর প্রগতি থেকে সহজেই মানুষের অগ্রগতির এক বৃহৎ অংশের পরিমাপ করতে পারি।"

সত্যই রুজভেল্টের উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হয় যখন আমরা দেখি সেতু-নির্মাণকারী ইঞ্জিনীয়ারদের একসঙ্গে গাণিতিক, ধাতুতত্ত্ববিদ, ভিত্তিরচনা-বিশেষজ্ঞ, ইস্পাত-ব্যবহারিক, শিল্পী, স্থপতি ও মানবজাতির এক অধিনায়ক হতে হয়। যদিও সেতু-নির্মাণব্যয়ের প্রায় অর্ধেক মৃত্তিকা ও নদীগর্ভে প্রোথিত থাকে, যা মানুষের নয়নগোচর হয় না। তবুও যা নভ-চুম্বন করার দুরন্ত প্রয়াসের অভিজ্ঞানস্বরূপ দীপ্ত গৌরবে দণ্ডায়মান, তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

সেতু-নির্মাণের ইতিহাসে প্রাকৃতিক পরিবেশ, নৈসর্গিক গঠন উপাদান, পৃথিবীর বিভিন্ন ভূভাগের [illegible]নের উপর সেতুর আকৃতি ও [illegible]রূপ নির্ণয়ে যুগে যুগে উদ্যোগী পুরুষসিংহকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এর বহু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ক্রমাগত উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রথম যেদিন এক বৃক্ষকাণ্ড বা প্রস্তরখণ্ড বর্বর মানুষ নির্ঝরিণী পার হবার জন্য স্থাপন করে, সেই দিনই সেতুর ইতিহাসের শুরু। প্রসারণী খিলান বা ঝুলন-সেতুর প্রেরণা, প্রকৃতির রম্য নিকেতন থেকেই যে গ্রহণ করা হয়েছে, তা অনস্বীকার্য।

সেতুর বিভাগ নানাভাবে করা যায়। যেমন বিভিন্ন প্রণালীতে সেতুর ভর, ভারগ্রাহী ভিত্তির উপর সংস্থাপনের প্রক্রিয়ার উপর।

১। সহজভাবে বসানো সেতু (simply supported)।

২। সংযোজনী সেতু বা অবিচ্ছিন্ন সেতু (continuous)।

৩। অর্ধবৃত্তীয় বা বৃত্তাভাসীয় সেতু (arch)।

৪। প্রসারণী সেতু (এক দিক সংলগ্ন ও অপর দিক মুক্ত) (cantilever)।

৫। ঝুলন-সেতু, (suspension)।

৬। প্রসারণী ঝুলন অথবা প্রসারণী বৃত্তীয় সেতু (combined)।

গঠনসামগ্রীর উপর সেতুর উত্তার বহুলাংশে নির্ভর করে। যেমন ৪০০০ ফুট উত্তারের সেতু কোনদিনই কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত হতে পারে না। গঠন উপাদানের উপর সেতুকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন—

১। কাষ্ঠনির্মিত সেতু বা দারুময় সেতু।

২। প্রস্তরনির্মিত সেতু।

৩। ইষ্টকনির্মিত সেতু।

৪। কাণ্ড-লৌহনির্মিত সেতু (wrought iron).

৫। ইস্পাতনির্মিত সেতু।

৬। উচ্চ টানের ইস্পাতনির্মিত সেতু high tensile).

৭। শক্তিসম্বন্ধ কংক্রীটের সেতু (reinforced concrete).

৮। পাইপনির্মিত সেতু।

৯। অন্য ধাতুর সেতু।

প্রাকৃতিক ঝুলন সেতু

'মানুষ ও দেবতা'

চিত্তাকর্ষক বইখানা একবার পড়ে জীবনকে মহিমান্বিত দেবত্বে উন্নীত করুন। শ্রী ইউ সি ভৌমিক; রিভার ট্রান্সপোর্ট কোং, পোঃ—কুমাসিয়া কলিয়ারী, মধ্য প্রদেশ। মূল্য—আড়াই টাকা মাত্র। একত্রে তিনখানা লইলে পোষ্টেজ লাগে না।

পাইওনীয়ারের গেঞ্জী

বিজ্ঞানসম্মতভাবে ধৌত (Scientifically Bleached)। ইহা যেমন নরম তেমনই সত্বর ঘাম শুষিয়া লয়।

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ

'পাইওনীয়ার বিল্ডিংস', কলিকাতা—২
ফোন নং ৫৫—২৯৮৩

১০। ইস্পাত অথবা উচ্চ টানের ইস্পাতের তারনির্মিত সেতু (cable wire)।

১১। অপূর্ব শক্তিসম্বন্ধ কংক্রীটের সেতু (pre-stressed concrete).

নির্মাণপ্রণালীর বিভিন্নতার দিক দিয়ে বিচার করলে নিম্নলিখিত পর্যায়ে সেতুকে বিভক্ত করা যায়—

১। ইস্পাতের চাদরনির্মিত কড়ি বা প্লেট গার্ডার (plate girder)।

২। দৃঢ়ভাবে শলাকাসম্বন্ধ ইস্পাতের কাঠামো বা রিভেট মারা ট্রাস (riveted truss).

৩। শঙ্কু-নিবন্ধ লোহ কাঠামো বা পিন দিয়ে জোড়া ট্রাস (pin-jointed truss)।

সেতুনির্মাণে দুটি প্রধান অংশ থাকে—একটি ভিত্তিস্তম্ভ, অপরটি উপরে দৃশ্যমান গঠিত অংশ অর্থাৎ সাধারণত যাকে সেতু বলে থাকি। বহু উত্তারের সেতু-নির্মাণে সবচেয়ে [illegible] সেতুনির্মাণ সম্ভব, যার একটি সেতুস্তম্ভের ব্যয় উপরের একটি জ্যা নির্মাণের ব্যয়ের সমান। এটি গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়।

লৌহবর্ত্ম ও রাজবর্ত্ম সেতুর বিভিন্ন অংশে স্থাপনের উপর সেতুকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

১। শিরোগামী সেতু বা ডেক শ্রেণীয় (deck)

২। অর্ধ-মধ্যগামী সেতু (half-through)।

৩। পূর্ণ অন্তর্গামী বা পূর্ণ মধ্যগামী সেতু (full-through)।

তা ছাড়া একতল, দ্বিতল ও ত্রিতল সেতু আছে। কোথাও বা সেতু বাড়ির মত চাল দিয়ে ঢাকা, কোথাও বা সেতু খোলা যায়, যার অর্ধ উত্তারকে ডাইনে-বাঁয়ে পাক দিয়ে সরিয়ে যেমন পোর্ট কমিশনারের সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোডের সেতু, কোথাও বা কাৎ করে উপরে উঠিয়ে, কোথাও বা সমস্তটা লম্বাভাবে খাড়া উপরে তুলে, যেমন বাগ-বাজারের খালের মুখের সেতু। কোথাও বা বয়া ভাসিয়ে ভাসমান পুল তৈরি করা হয়, যেমন প্রাচীন হাওড়ার সেতু ছিল।

এখন বিভিন্ন রীতিতে সেতুভার ভিত্তিব নিক্ষেপণের প্রক্রিয়ার উপর সেতু বিভাগের কথাই শুধু আলোচিত হবে।

১। সহজভাবে বসানো সেতু

একটি কড়ি অথবা ওই জাতীয় ইস্পাতের গঠনকে দুটি সরলোন্নত সেতুস্তম্ভের অথবা তীরস্তম্ভের উপর ন্যস্ত করলে সেতুর ভার লম্বভাবে দুই স্তম্ভের উপর পড়বে। এইরূপ সেতুকে সহজভাবে বসানো সেতু বলে। ইস্পাতে তৈরি এইরূপ সেতুর উত্তার ৬০০ ফুট; নিকেল-ইস্পাতে নির্মিত হলে ৭৫০ ফুট পর্যন্ত করা যায়। ইলিনয় প্রদেশে মেট্রোপোলিস শহরে ওহায়ো নদীর উপর সেতুটি ৭২০ ফুট উত্তারের, ক্যানাডার নবস্কোশিয়া প্রদেশে প্রায় ৩০০ ফুট উত্তারের কাষ্ঠনির্মিত সেতুও দেখেছি। প্লেট গার্ডারে ১০০ থেকে ১২০ ফুট দীর্ঘ জ্যায়ের সেতুনির্মাণের রীতি। প্লেট গার্ডারের গভীরতা উত্তারের ১।১২ হইতে ১।২০ ভাগ সাধারণত হয়।

২। সংযোজনী বা অবিচ্ছিন্ন সেতু

যদি সেতুর কাঠামোকে তিন বা ততোধিক ভারগ্রাহী সেতুস্তম্ভের উপর স্থাপন করা যায়, তাকে সংযোজনী সেতু বলে। যদিও সেতুর ভার লম্বভাবে তীর বা সেতুস্তম্ভে ন্যস্ত করা যায়, কিন্তু মধ্যস্তম্ভের অবস্থিতির দরুণ লোহ কাঠামোর মধ্য-স্থলে সর্বাধিক বক্রীকরণের (Bending Moment) বহু চ্যুতি ঘটে ও বক্রীকরণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কংক্রীটের সেতুতে এই প্রণালীর সুযোগ নেওয়া হয়।

৩। অর্ধবৃত্তীয় বা বৃত্তাভাসীয় সেতু

এর আকৃতি প্রাচীন কালের বাড়ির দরজা-জানলার উপর খিলানের অনুরূপ, কিন্তু আকারে বৃহৎ। বর্তমানে দরজা-জানলার উপর লিন্টেল দেওয়ারই রেওয়াজ অধিক। তা ইস্পাতের, প্রস্তরের, ইস্টকের অথবা কংক্রীটের (সাধারণ অথবা শক্তি-সংযোজিত) হয়ে থাকে। এর ভার কতক ঋজুভাবে এবং কতক তির্যকভাবে ন্যস্ত হয়। যেখানে তীরবর্তী ভূমি সেতুর পার্শ্বস্থ চাপ সহজে গ্রহণ করতে পারে, সেখানে সেতু নিম্নের জমি ও নদী থেকে অতি ঊর্ধ্বে এবং যেখানে সহজে সেতু-স্তম্ভ নদীগর্ভে নির্মাণ করা সম্ভব নয়, সেখানে বৃত্তীয় অথবা ঋজুল সেতুর সাহায্য গ্রহণ করার রীতি। তিন হাজার ফিট উত্তারের বৃত্তীয় সেতুনির্মাণ সম্ভব। নিউ ইয়র্ক শহরের হেলগেট সেতুটি ৯৭৭'—৬" উত্তারের দুই শঙ্কু-সম্মিবিষ্ট জ্যার উপর থেকে ১৩৫' ফুট ঊর্ধ্বে অবস্থিত বৃত্তীয় সেতু। এর ইঞ্জিনীয়ার গুস্তাফ লিনডেনথেল এটি পরিকল্পনা ও নির্মাণ করেন। দুই শঙ্কুযুক্ত সেতু রেলপথ নিয়ে যাওয়ার পক্ষে উপযোগী, কিন্তু তিন শঙ্কুবিশিষ্ট বৃত্তীয় সেতু আরও স্থিতিস্থাপক। তিনটি শঙ্কুর দুটি দুই তীরে এবং তৃতীয়টি শীর্ষে সংযুক্ত।

জাম্বেসী নদীর উপর ভিক্টোরিয়া জল-প্রপাত সেতুটি নদীগর্ভ হইতে ৪০০ ফুট ঊর্ধ্বে, ৫০০ ফুট উত্তারের সেতু। এর নির্মাণকাল ১৯০৫।

হেলগেট সেতুর দীর্ঘ জ্যায়ের বৃত্তীয় সেতুর গৌরব অস্ট্রেলিয়ার সিডনি হারবার সেতু হরণ করে। এর উত্তার ১৬৫০ ফুট ও চলার পথ নদীর জলের উপর হতে ১৭২

যা উর্ধে অবস্থিত। সাধারণ নির্মাণ বিভাগের মুখ্য ইঞ্জিনীয়ার ডাঃ ব্র্যাডফীল্ড সাধারণ বিন্যাস ও রালফ ফ্রীম্যান এর বিশদ পরিকল্পনা ও গণনার জন্য দায়ী। প্রতি ফুটের ওজন ৫৭,৫০০ পাউন্ড। ১৯৩১ সনের মে মাসে এর নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ওই বৎসর নভেম্বর মাসে নিউ ইয়র্কে কিলভ্যানকুল নদীর উপর বেয়নী সেতু খোলা হয়—এর উত্তারের মাপ ১৩৫২ ফুট ১ ইঞ্চি। অর্থাৎ সিডনি সেতুর চেয়ে ২′—১″ বেশী। এটির প্রধান ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন ও এইচ আম্মান। শ্রী আম্মান প্রথমে লিনডেনহলের অফিসে কাজ শুরু করেন। যে সোনার কাঁচি দিয়ে বেয়নী সেতুর উদ্বোধনপর্বের ফিতা কাটা হয়েছিল, সেই সোনার কাঁচি ১৯৩২ সনের মার্চ মাসে পৃথিবীর অপর প্রান্তে সিডনি হারবারের সেতুর উদ্বোধনপর্বের কাজে লাগে। সিডনি বন্দরের সেতুটি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভারী সেতু ও সবচেয়ে প্রশস্ত পথ নির্মাণ করা হয়েছে এর উপর।

ফ্রীম্যান দক্ষিণ আফ্রিকার সাবী নদীর উপর ১০৮০ ফুট উত্তারের ব্রীকীনাউ বত্তীয় সেতু নির্মাণ করেন। এই সেতু-নির্মাণকার্যে 'ক্রমেডর ইস্পাত' ব্যবহার করা হয়। এটি তৃতীয় দীর্ঘতম বত্তীয় সেতু। এই সেতুগুলি বত্তীয় সেতুর অর্ধ-মধ্যগামী শ্রেণীর অর্থাৎ এর দুই বত্তীয় অংশের মধ্য দিয়ে তাইবন্ধ ও রাস্তাটি স্থাপিত। কিন্তু খিলানের শীর্ষ দিয়ে পথ স্থাপনের উদাহরণে নিউ ইয়র্ক শহরে 'হেনরি হাডসন' সেতু অন্যতম। এর উত্তার ৮০০ ফুট ও উচ্চতা ১২০ ফুট। পীটসবার্গ শহরের এলিখনী নদীর উপর 'ওয়াশিংটন ক্রসিং' সেতুটি ১৯২৪ সনে যাতায়াতের জন্য খোলা হয়। নায়গ্রা নদীর উপর ১৯২৭ সনে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শান্তির শতবার্ষিকী উৎসবের স্মারকচিহ্নস্বরূপ 'শান্তি সেতু' নামকরণ হয়। ১৯০৮ সনে ডঃ স্টাইনম্যানের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস হিসাবে যে ইস্পাতের বত্তীয় সেতুর পরিকল্পনা 'স্পার্টেম ডেভিলস', পঁচিশ বৎসর পরে, সে-পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হয়। নায়েগ্রার 'হনিমুন সেতু' বরফের আক্রমণে নদীগর্ভে পতিত হওয়ায় সেখানে আর-একটি সেতু ৯৫০′ উত্তারের ১৯৪১ সনে নির্মিত হয়। এটি বত্তীয় সেতুর চতুর্থ দীর্ঘতম সেতু।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে নাগাসাকি শহরে ১০৪২ ফুট উত্তারের একটি দীর্ঘতম ইস্পাতের বত্তীয় সেতু নির্মিত হয়েছে। এইটি বর্তমানে বত্তীয় চতুর্থ দীর্ঘতম সেতু পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। কলিকাতার মারাঠা খালের উপর কয়েকটি কংক্রীটের বত্তীয় সেতু বিদ্যমান।

৪। প্রসারণী সেতু

এই সেতু উচ্চ সেতুস্তম্ভ থেকে দু দিকে প্রসারিত। তীরস্থ প্রসারণী অংশটি ভূগর্ভে এমনভাবে নিহিত যে তার ওজন নদী বা সমুদ্রের দিকে প্রসারিত অংশের স্থির ও চলমান যানবাহনের ওজনের চেয়ে যেন কিছু বেশী হয়, যাতে না নদীস্রোতের নিকটস্থ অংশ অবিকল অবস্থায় থাকে। ফার্থ অব ফোর্থের উপর অবিস্মরণীয় সেতুটি দীর্ঘ প্রসারণী সেতুর গৌরব অর্জন করে আসছিল যতক্ষণ না কুইবেকের প্রসারণী সেতুটি তার স্থানটি অধিকার করে। কুইবেক সেতুর নির্মাণকাহিনী এক রোমাঞ্চকর, লোমহর্ষণ ঘটনা। নানা বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে মানুষের অদম্য সাহস ও প্রচেষ্টার ... ১৯১৭ সনে নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ওইটি ১৮০০ ফুট উত্তারের সেতু। এর নির্মাণকার্য চলে প্রায় পনের বৎসর। ১৯৫৮ সনে সমাপ্ত ১৫৭৫ ফুট জ্যায়ের নিউ অরলীএ সেতুর পর হাওড়ার রমণীয় ব্রীজ। ১৯৪৩ সনে হাওড়া ব্রীজ যানচলাচলের জন্য খোলা হয়। এর দুই তটস্থ স্তম্ভের মধ্যবর্তী জ্যায়ের মাপ ১৫০০ ফুট যার মধ্যস্থলে ৫৬৪ ফুট দীর্ঘের ঝুলনাংশ দুই ৪৬৮ ফুট দৈর্ঘ্যের তীরস্থ অংশের উপর ন্যস্ত। (৪৬৮+৫৬৪+৪৬৮=১৫০০)· তীরস্থ প্রসারণী অংশদ্বয় ৩২৫ ফুট দৈর্ঘ্যের দুই পাশ থেকে দুটি ক্রেন ওর নদীবক্ষ থেকে খণ্ড খণ্ড অংশ গ্রহণ করে সেতুটি গঠিত। কোন অতিরিক্ত কাঠামো গঠনের প্রয়োজন হয়নি। পৃথিবীর দীর্ঘতম সেতু ও দীর্ঘ জ্যায়ের সেতুর গৌরব স্যানফ্রান্সিসকো শহরের। যখন বাসে দুই দীর্ঘ সেতু অতিক্রম করি তখন ইঞ্জিনীয়ারদের কৃতিত্বে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। "ওকল্যান্ড বে" সেতুটি দুতলা, দৈর্ঘ্যে ঝুলন অংশ ১০,৪৫০ ফুট, প্রসারণী অংশ ১৪০০ ফুট, ৫টি ৫০৭ ফুট উত্তারের গার্ডার ও ১৪টি ৩০০ ফুট উত্তারের সেতু।

৫। ঝুলন-সেতু

ঝুলন-সেতুর ঐতিহ্য অনুসন্ধানে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনের কাছে যাব না। আরও প্রাচীন কালের দ্রাক্ষা কি মাধুরী লতার বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে যাওয়ার প্রাকৃতিক নিদর্শনের আশ্রয় নেব। ১৮৯৪ সনে যুক্তরাষ্ট্রীয় ইঞ্জিনীয়ার বোর্ড সর্ব দীর্ঘ ৪৩৩৫′

হাওড়ার ব্রিজ

জ্যায়ের সম্ভাবনার অঙ্ক কষেন। ১৯১৩ সনে বিখ্যাত সেতু-ইঞ্জিনীয়ার রাল্‌ফ্‌ মড্‌জেস্কী ৭০১০ ফুট পর্যন্ত জ্যায়ের ঝুলন-সেতুর পরিকল্পনা করেন। বর্তমানে ঝুলন-সেতু বলতে গেলে সুবর্ণ-তোরণ সেতুর কথাই মনে পড়ে। ঝুলন-সেতুর প্রধান অংশটি হল ইস্পাতের মোটা তার বা চেন যার উপর সমস্ত ভারের টান পড়ে। ওই ঝোলাবার তার দুই অতিদীর্ঘ সেতুস্তম্ভের উপর দিয়ে চলে গিয়ে দুই তীরস্থ ভিত্তিতে এমন দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন যে সমস্ত ভারের টান সহ্য করতে সক্ষম। এর সুবিধা এই যে টানের মাত্রা ইস্পাতের উপর ৫৫০০০ থেকে ৬০,০০০ পাউন্ড প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে দেওয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের "ব্রুকলীন" সেতু দীর্ঘ বিশ বৎসর দীর্ঘতম ঝুলন-সেতুর গৌরব বহন করে। ১৯০৩ সনে ঈস্ট নদীর উপর "উইলিয়ামস্‌বার্গ সেতু"টি ৪'—৬" বেশী দৈর্ঘ্যের ১৬০০ ফুট জ্যায়ের নির্মিত হবার পর প্রথম স্থান অধিকার করে। তারপরে ১৯২৪ সনে 'বেয়ার মাউন্টেন সেতু' ১৬৩২ ফুট জ্যায়ের, ১৯২৬ সনে 'ফিলাডেলফিয়া কেমডেন সেতু' ১৭৫০ ফুট জ্যায়ের, ১৯২৯ সনে যুক্তরাষ্ট্রের মোটর-নগরী ডিট্রয়েট ও কানাডার মোটর-নগরী উইণ্ডসরকে সংযুক্ত করার জন্য 'অ্যামব্যাসেডর সেতু' ১৮৫০ ফুট জ্যায়ের নির্মাণ করা হয়, কিন্তু এই ক্রমোন্নতির ধারার রেকর্ড পূর্ণ করে ১৯৩১ সনে নির্মিত নিউ ইয়র্কের 'জর্জ ওয়াশিংটন সেতু'। এটি ৩৫০০ ফুট জ্যায়ের। ১৯৩৭ সনে নির্মিত হয় 'সুবর্ণ তোরণ সেতু', ৪২০০ ফুট জ্যায়ের। দীর্ঘ সেতুর নির্মাণের উদ্যম বেশ কিছুদিন স্থগিত থাকে। এর মোট উত্তার ৮৯৮১ ফুট, এর তীরস্তম্ভদ্বয় ৭৪৬ ফুট উর্দ্ধে আকাশ বিদ্ধ করে, প্রতি তারটির ব্যাস ৩৮½ ইঞ্চি ও ২৭,৫৭২টি তারের ৬১টি গুচ্ছিতে প্রস্তুত। ২৭শে মে, ১৯৩৭ সনে এটির উদ্বোধন হয়। সিঁদুরের রঙে রঞ্জিত বলে একে আলোক-প্লাবনে মনে হয় যেন একটি সুবর্ণ উত্তাব। ১৯৪০ সনে টেকোমা নেরোসের ২৮০০ ফুট জ্যায়ের সেতু তৃতীয় দীর্ঘ ঝুলন-সেতু, ৬৪ লক্ষ ডলার ব্যয়ে নির্মিত হয়। ডঃ স্টীনম্যানের পরিকল্পনায় মেকিনাক প্রণালীর সেতু পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘ জ্যায়ের ঝুলন-সেতু। তবে দু পাশের জ্যা যোগ করলে এটি দীর্ঘতম ঝুলন-সেতু, যার মোট দৈর্ঘ্য ৮৬১৪ ফুট, যদিও তীরস্তম্ভের অন্তর্বর্তী জ্যা ৩৮০০ ফুট। এটি গত বৎসর শেষ হয়েছে। এর তীরস্তম্ভের ভিত্তি জলের উপর থেকে ২০৫ ও ২১০ ফিট নিম্নে প্রোথিত। দুই তীরস্তম্ভে ৪,৯০,০০০ টন কংক্রীট ও ইস্পাত লাগানো হয়েছে। অন্যান্য সেতুতে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৭৬ মাইল বেগে ঝটিকা-প্রবাহে কিঞ্চিৎ ভয়ের কারণ আছে। কিন্তু 'বিগ ম্যাকের' বেলা ৬৩২ থেকে ৯৬৬ মাইল বেগের ঝটিকাও এর কোন অংশ বিধ্বস্ত করতে পারবে না—মডেলের পরীক্ষায় জানা গিয়েছে। ৫৫২ ফুট উচ্চ তীরস্তম্ভ থেকে ২৪½ ইঞ্চি ব্যাসের তারের কেব্‌ল ঝোলানো। ডেভিড স্টীনম্যান বর্তমানে ইটালি ও সিসিলিকে সংযোগ করার জন্য মেশিনা প্রণালীর উপর ৫০০০ ফুট জ্যায়ের একটি সেতুর পরিকল্পনা করেছেন।

৬। প্রসারণী ঝুলন বা প্রসারণী বৃত্তীয় সেতু

উপরিউক্ত দুই প্রকারের সেতু সমন্বয়ে এ ধরনের সেতু গঠিত। প্রকৃতপক্ষে হাওড়া ব্রীজ প্রসারণী ও ঝুলন-সেতুর উদাহরণ। শুধু প্রসারণীর নয়। তেমনি দুই প্রসারণী অংশের মধ্যবর্তী স্থান পূরণের জন্য ঝুলনাংশের বদলে বৃত্তীয় অংশ সংযুক্ত করা যায়।

সেতুনির্মাণের গণনাকার্যে কত দুরূহ ও জটিল গাণিতিক গণনা, বায়ুসুড়ঙ্গে কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নির্মাণের সময় অসাবধানতা, অবাধ্যতা ও নিরাপত্তার নিয়মাবলী অগ্রাহ্য করার জন্য অথবা দৈব দুর্বিপাকে কত জীবন বলি দিতে হয়, তার কাহিনী কোন রম্য উপন্যাস বা রোমাঞ্চ শ্রেণীর গল্পের চেয়ে কোনু অংশে কম উদ্দীপনাময় নয় বা কম বিস্ময়কর নয়।

সন্ন্যাসী প্রদত্ত
গ্যারাণ্টিড্
অর্শের মহৌষধ
পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় দুদিন ঔষধ সেবনেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। মূল্য ৫
শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দেবী (২) শ্রীধরধাম, ৪১, চাউলপট্টী রোড, কলিকাতা-১০

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ
(সিডিউল্ড ব্যাংক)
— হেড অফিস —
২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা
ফোন : ২২-৫৯৮৮ ও ২২-৫৯৮৯
— ব্রাঞ্চ —
বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট ও খুলনা।
উপযুক্ত জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়।
সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
শ্রীযুক্ত এন. ব্যানার্জি, এম-এ, জেনারেল ম্যানেজার।

[১২৮ পৃষ্ঠার পর]

একি সে? পাথর চাপা বিবর্ণ ঘাসের মত বিবর্ণ শীর্ণ প্রায় কঙ্কালসার একটি মেয়ে, মুখের হনুর হাড় দুটো উঁচু হয়ে উঠেছে, পিছনে ফোলা ফাঁপা একরাশ বিশৃঙ্খল চুল তাকে আরও কদর্য করে তুলেছে, না—কদর্য নয়, বীভৎস। শুধু রয়েছে সেই চোখ দুটো। সেই দুটি চোখ দেখে সে চিনতে পারলে—এ-সে নিজে!

জীবনে ত্যাগ-স্বীকারের এই পরিণতি! পুণ্যফল?

না। জেঠীমা'র কথা সত্য। নিজের আত্মার যে অপমান সে করেছে, এ তার ফল।

অকস্মাৎ সে উঠে চলে গেল সিঁড়ি বেয়ে ছাদের উপর, সূর্যালোকিত পৃথিবীর দিকে তাকালে। ওঃ, এই এক বছরে জায়গাটা কত বদলে গেছে!

সারাটা দিন সে ছাদের উপর ঘুরল। সন্ধ্যেবেলা সে নতুন করে পড়বার জন্য বই নিয়ে বসল। হঠাৎ বেরিয়ে এসে বললে, জেঠীমা আমার দরজায় তালা চাবি দেবেন না।

জেঠীমা তার মুখের দিকে শুধু একবার তাকালেন, কিছু বললেন না। তাতে যত অবজ্ঞা—তত ঘৃণা।

এই মেয়েটির মত নিষ্ঠুর সে আর জীবনে কাউকে দেখেনি। এই নিষ্ঠুর ঘৃণা আর তার কোনদিন যায়নি। শুধু কি তার উপর! এরপর থেকে হেনাকেও তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি যেন তার জীবন-সংস্কারের এক ফলহীন পুষ্পহীন শুধু শাখা পল্লব-ময় আর পুণ্য নিয়ে বিষাক্ত একটা গাছ, যার তলায় রৌদ্র আসে না—ঘন হিম অন্ধকার, আর অহরহ পত্রপল্লব থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে বিচিত্র পুণ্যের বিষবাষ্প। শুধু যেন কয়েকটা দিনের জন্য, যে কারণে মানুষের ব্যাধি হয়, তেমনি একটা কারণে স্নেহের পোকা লেগে একটা ডাল শুকিয়ে ভেঙে গিয়েছিল, তারই মধ্য দিয়ে এসে পড়েছিল খানিকটা সূর্যালোকের দীপ্তি এবং উত্তাপ। আবার সেখানে ডাল গজিয়ে ফাঁকটা সম্পূর্ণরূপে ঢেকে গেছে।

এইবার দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্য।

এ দৃশ্যে ভাগ্য অদৃষ্ট যদি মানো, তবে ভাগ্য অদৃষ্ট, যদি বিচিত্র কার্যকারণ বল, তবে তাই; যত আঘাত করলে তারা, তত আঘাত করলে সে। হার-জিত ঠিক হয়নি। তবে সে হারেনি, আঘাতে আহত হয়ে শুয়ে পড়েনি। সিন্দুর চিহ্নহীন মাথার সিঁথিটাকে সে মনে করে অপরাজয়ের চিহ্ন। আবার বর্তমান এই অনাথ আশ্রমে বেসিক ইস্কুলে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ আঁকড়ে বেঁচে থাকা, এইটেই তার ব্যর্থতার

মহাশ্বেতা

পরিচয়। যার শেষ হবে আজ। তবে নয়, হল।

আজকের কথা থাক।

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যের কথা। ৪৫ সালের এপ্রিলে আরম্ভ—৪৯ সালের শেষ দিকে সমাপ্তি। চার বৎসরেরও বেশী। তবে মার সে একা খায়নি। জেঠাইমাও খেয়েছেন। থাক; নাটকের নিয়ম পরের পর সাজানো। শুধু নাটকেরই বা কেন, ভগ্নক্রম, এলোমেলো, যা কিছু, তাই বিশৃঙ্খল—অনিয়ম।

যবনিকা [illegible] ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস; নীরা পড়ছে মুখ গুঁজে, সামনে তার পরীক্ষা। অপরাহ্ণবেলা।

দৃশ্যপটে, সেই প্রায় অন্ধকার বারান্দার ঘরখানা নয়। তার বা তাদের ভাগের যে ঘরখানায় একসময় হেনা আর সে দুজনে শুতো, সেই ঘরখানা। পরে সেই ঘরখানাই নির্দিষ্ট হয়েছিল—হেনা এবং তার স্বামী এলে তাদের জন্য। এখন তারা নতুন দোতলায় শোয়। সে বিনা কোলাহল কলরবে একদিন ওই ঘরখানায় তার বই এবং বাক্স দুটো, যা তার মা রেখে গিয়েছিলেন, সব ওই ঘরে ঢুকিয়ে নিয়েছিল। এবং দেখে শুনে তাদের নিজস্ব যে পুরনো ফার্নিচার পেয়েছিল, তাও টেনে এনে ঢুকিয়েছিল। সব হয়ে গেলে জেঠীমাকে বলেছিল, ওঘরটা অত্যন্ত অন্ধকার অস্বাস্থ্যকর, আমি আমাদের ঘরটায় থাকব আজ থেকে। অনুমতি নীরা প্রার্থনা করেনি, অত্যন্ত সহজ পদক্ষেপে আপন অধিকারে প্রবেশ করেছিল। জেঠীমা কিছু বলেননি। তবে দৃষ্টিতে তাঁর একটা অবজ্ঞা ছিল। ঘরখানাকে যথাসাধ্য পরিচ্ছন্ন এবং নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়ে আবার আরম্ভ করেছিল ছেদপড়া জীবনের নূতন অধ্যায়। সন্ধ্যায় জ্যাঠামশাইকে বলেছিল, আমার কয়েকখানা বই লাগবে।

ভুরু কুঁচকে পরাণবাবু বলেছিলেন, বই? কি বই? কিসের জন্যে?

—ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেব আমি।

—ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে? যেন এর চেয়ে আশ্চর্য বা অসংগত কিছু হতে পারে না।

জেঠীমা ঘরে ঢুকে হেনার চিঠিখানা তাঁর হাতে দিয়ে বলেছিলেন, পড়। হেনা লিখেছে। আজকের ডাকে এসেছে। তুমি এ ঘর থেকে যাও নীরা।

নীরা চলে গিয়েছিল।

১

কিছুক্ষণ পর জ্যাঠামশায় ডেকে বলেছিলেন, ক'খানা বই লাগবে? কত দাম? একটা কথা আমি বলে রাখি। তোমার মা যা রেখে গিয়েছিলেন তার আর খুব বেশী অবশিষ্ট নেই।

মনের মধ্যে কঠিন কথা এসেছিল, কিন্তু সে তা বলতে পারে নি। বোধহয় এতদিন নীরব সহিষ্ণুতার অভ্যাসে খানিকটা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। নীরবে দাঁড়িয়ে মথ খুঁটেছিল।

জ্যাঠামশায় বলেছিলেন, যে কটা টাকা আছে, আর তোমার অংশের বাড়ির একটা দাম ধরলে বিয়েটা অবশ্য গৃহস্থঘরে কোন রকমে হতে পারে।

জেঠীমা বলেছিলেন, পরীক্ষাটা দিতে চায়, তাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়।

এবার নীরা বলেছিল, বিয়ে আমি করতে চাইনে। আমাকে বিয়েই বা করবে কে? পরীক্ষাটা দিয়ে পাশ আমি করবই, কোন চাকরী আমি খুঁজে নিয়ে চলে যাব। আমাকে বরং টাকাটাই দিয়ে দেবেন। বলে সে চলে গিয়েছিল। বই সে পেয়েছিল এবং কঠোর পরিশ্রমে সে পড়ছিল।

এগুলো দৃশ্যান্তরের বিরতির মধ্যেই ঘটে গেছে।

এদৃশ্য শুরু যখন, যখন নাটক এল, সেদিন তখন অপরাহ্ণবেলা—সে পড়ছে; ঝি চাকরে কাজ শুরু করেছে; জেঠীমা এক ঘটকীর সঙ্গে বড়ছেলের বিয়ের কথা বলছেন। এবার বড়ছেলের বিয়ের জন্য তিনি ব্যস্ত হয়েছেন; ব্যস্ত কথাটা পর্যাপ্ত নয়, উঠে পড়ে লেগেছেন। বাজারের ফাউয়ের মত তার বিয়ের কথাটাও আছে।

সে অবশ্য একদিন বলে দিয়েছে, আমার বিয়ের কথা কইবেন না জেঠীমা।

জেঠীমা বলেছেন, আচ্ছা। কিন্তু তবুও বলছেন। সে নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ করবার তার এই মুহূর্তে সময় নেই বলেই সে আর কিছু করেনি।

হঠাৎ মেজছেলে, হেনার ঠিক উপরের ভাই সুজিত বাইরে থেকে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢুকল—মা। মা! কই? মা!

জেঠীমা বিরক্তি ভরেই বললেন, কি? এইতো রয়েছি। বাইরে থেকে এমন করে চেঁচাচ্ছ কেন?

সে উঠোনে ঢুকেই বললে, তোমার বড়ছেলের বিয়ে হয়ে গেল।

—বিয়ে হয়ে গেল? মানে? তোর বাবা বুঝি সেই পাটের দালাল হঠাৎ বড়লোককে কথা দিয়ে দিলে? আচ্ছা আমিও দেখব বিয়ে কি করে হয়।

সুজিত হেসেই খুন।

—হাসছিস কেন?

—হাসছি কেন? বললাম, বিয়ে হয়ে গেল, না তুমি বলছ—তোর বাবা বুঝি পাকা করলে বিয়ে? না—না। সব পর্ব খতম। বিয়ে শেষ।

—তুই কি নেশা করেছিস? বিয়ে হল কখন?

—আজ। দিনের বেলা। রেজেস্ট্রি করে বিয়ে। আমি তার একজন সাক্ষী। পাটের দালালের মেয়ে নয়। সিনেমা স্টার—এণাক্ষী বোস! ওরফে এনা বোস। ওরা আজ হোটেলে উঠেছে। সেইখানেই রাত্রে খাওয়াদাওয়া এবং বাসর!

নীরার পড়া সহজে বন্ধ হত না; সংসারের নানান আকস্মিকতার মধ্যেও পড়ে যেত। ঝনঝন করে কিছু পড়লে না, দুমদাম শব্দে বড়ভাই অজিত চাকর বা ঠাকুরকে মারলে না, ড্রইং রুমে বসে হঠাৎ সমবেত অট্টহাস্য হাসলে না, জ্যাঠামশায় পার্টি থেকে ফিরে চিৎকার করলেও না। আজ কিন্তু তার পড়া বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল, হয়তো এমন একটা কিছু ঘটবে—যা সে কল্পনা করতে পারে না, কল্পনাতীত মর্মান্তিক কিছু; কৌতুকে নয়—আশংকায়, তার পড়া বন্ধ হয়েছিল।

আশ্চর্য, জেঠীমা তার কিছুই করেন নি। চিৎকার করেন নি, মাথা ঠোকেন নি, অজ্ঞান হন নি, কিছু করেন নি, শুধু নিঃশব্দে উঠে ঘরের মধ্যে চলে গিয়েছিলেন। চিৎকার করেছিলেন জ্যাঠামশায়।

—ত্যাজ্যপুত্র করব আমি। বাড়ি ঢুকতে দেব না। সে বহুতর শপথ এবং আস্ফালন। সুজিত খুক্ খুক্ করে হাসছিল। সে সেই মাত্র হোটেলে বউভাতের ডিনার খেয়ে ফিরেছে।

নীরাই তাকে বলেছিল, তুমি হাসছ কেন সুজিত?

সুজিত ডিনার খেয়ে এসেছে, চোখ তার ঈষৎ রাঙা এবং ঘোরালো, কথায়-বার্তায় তার অপরিসীম কৌতুকবোধ; সে বলেছিল —ত্যাজ্যপুত্র করবে বাবা—তাই হাসছি। অজিত মুখার্জী এক্সপার্ট ছেলে—সে আট-ঘাট বেঁধে কাজ করে। আজই বাবার সই করা ব্যাঙ্ক চেকে—সেল্ফ নাম দিয়ে তিরিশ হাজার টাকা ক্যাশ বের করে পকেটে পুরে রেজিস্ট্রারের কাছে গেছে। টাকাটা সে এনা বাসকেও দেয় নি। তারপর তার নামে যা শেয়ার কেনা আছে, সেসব তার পোর্ট ফোলিওতে। টুডে—দি ওল্ডম্যান—রাগের মাথায় জাম্পিং এ্যান্ড বাম্পিং, কাল আপিসে গিয়ে শিভারিং এ্যান্ড স্ট্যাগারিং। হাসছি সেই জন্যে।

জেঠীমা নীরবে মুখ গুঁজে পড়ে ছিলেন। খান নি। জ্যাঠামশায়ের ক্রুদ্ধ শপথ এবং চিৎকার সত্ত্বেও না। শেষ পর্যন্ত তিনি—যা খুশী তাই করগে, আই ডোন্ট কেয়ার, স্ত্রী পুত্র কারুর জন্যেই আমার কোন মাথা-ব্যথা নেই—বলে—বেশখানিকটা মদ্যপান করে গাল[illegible]য়েছিলেন জেঠীমাকে।

অনেক[illegible] রাত্রে সে গিয়ে ডেকেছিল, জেঠীমা—ঠাকুরটা খাবার নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে।

তিনি পাশ ফিরে শুয়েছিলেন। সে আশ্চর্য রকমের একটা আঘাত অনুভব করেছিল। চলেই আসছিল। হঠাৎ জেঠীমা ডেকেছিলেন, শোন।

ঘরে দাঁড়িয়েছিল [illegible]

—তুমি আমার ঘরে ঢুকলে কেন? এঘরে আমার ঠাকুর আছে।

দপ করে জ্বলে উঠেছিল নীরা। নিষ্ঠুর উত্তর দিতে গিয়ে কিন্তু আত্মসম্বরণ করেছিল। জেঠীমা বলেছিলেন, তুমি, তোমার জন্যেই আমি ছেলের বিয়ে দিইনি। না-হলে এই কাণ্ড আজ ঘটত না।

নীরা আর থাকতে পারে নি, বলেছিল, ঘটত। আমার জন্যে জ্যাঠামশায় এমন করে মদ খাচ্ছেন না। খাচ্ছেন ব্ল্যাক মার্কেটের টাকার জন্যে। এ কাণ্ড আমার জন্যে ঘটেনি ঘটেছে ওই টাকার জন্যে। তবে ভাববেন না। আমি চলে যাব এবার আপনার বাড়ি থেকে। পরীক্ষার ফল বের হলেই আমার কি আছে বুঝিয়ে দেবেন—আমি চলে যাব।

তার পরীক্ষা যেদিন শেষ হল—সেদিন বাড়িতে বউ এল। এনা বোস—এখন এনা মুখার্জী এল। অজিতকে ফিরিয়ে না-এনে পি সি মুখার্জী অর্থাৎ জ্যাঠামশায়ের গত্যন্তর ছিল না। ব্যবসা অচল হত। অনেক জমি তার নামে; মোটা টাকার শেয়ারের অধিকারী সে। একটা মিটমাট হল। টাকা-শেয়ার-জমি অংশমত নিয়ে বাকীটা অজিত ফিরিয়ে দিলে; বাপ বাড়ির অংশ তাকে লিখে দিলেন। তেতলায় দুখানা ঘর উঠেছে। সেখানে হবে তাদের সুখনীড়। এনা মুখার্জী শপথ করে বলেছে, সে আর সিনেমায় নামবে না। বাস মিটে গেল।

জেঠীমা স্বতন্ত্র হবেন। রান্নাবান্না সব।

বেলা তখন সাড়ে পাঁচটা। মন তার ভাল ছিল না। তার চেষ্টা উদাম সব বোধহয় ব্যর্থ হয়েছে। পরীক্ষা তার ভাল হয়নি। অঙ্ক ভুল হয়ে গেছে। একটা সে কষতে পারেনি—তিনটের উত্তর ভুল হয়েছে। সেই যে তার মাথার মধ্যে ব্যর্থতার ক্ষোভ জন্মাল তার ফলে সারারাতটা সে ঘুমোয়নি। পরের দিন সংস্কৃতের পেপারে সে যা করেছে তা একটা ছোট ছেলেতেও করে না। একটা কোশ্চেনেরই ডবল উত্তর লিখেছে। 'অর' লেখাটা তার ওই বিভ্রান্তিতেই চোখ এড়িয়ে গেছে। তারপর তার স্নায়ু, ধৈর্য এমনই ভেঙে গেল যে, শেষের দিকে কত ভুল হয়েছে সে তা জানে না। মনে পড়ছে মধ্যে মধ্যে বানান নিয়ে ধাঁধা লেগেছে। ইতিহাসের পেপারে খ্রীষ্টাব্দ ভুল হয়েছে। রচনায় বোধ-হয় শব্দ পড়ে গেছে; অ্যাডিশনাল পেপারে প্রাণপণ চেষ্টা করেও কিছু হয় নি; হাত কেঁপেছে; সে ঘেমেছে, কাঁদতে তার এই দিনটিতে ইচ্ছে হয়েছিল, বুক থেকে ঠেলে উঠেছিল কান্না; লজ্জাটায় কাঁদতে পারেনি। কোনরকমে আত্মসম্বরণ করে ফিরেছে। মনে পড়ল ক্লাস নাইনে উঠে অধিকাংশ মেয়ে যখন অঙ্ক ছেড়ে দিয়ে ডোমেস্টিক সায়েন্স নিয়েছিল—তখন অঙ্কে একশোর মধ্যে একশো পাওয়া আদৌ অসম্ভব নয় বলে, অঙ্কই নিয়েছিল। কিন্তু বাড়িতে বসে সব পড়াই বোঝা সম্ভবপর হয়েছে—অঙ্ক বোঝা সম্ভবপর হয় নি। তবুও এতগুলো ভুল হবে এ আশংকা সে করেনি। হেনার ছোট ভাই রণজিৎ সেও তার সঙ্গে পরীক্ষা দিলে। সে খুব খুশী। তার থার্ড ডিভিসন কেউ মারতে পারবে না। কিন্তু তার যে শুধু ফার্স্ট ডিভিসনেই ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

বাড়িতে যখন এল, তখন সে অত্যন্ত ক্লান্ত, হতাশায় প্রায় ভেঙে পড়েছে। ইচ্ছে ছিল বাড়ি এসেই শুয়ে পড়বে। কিন্তু বাড়িতে তার অবকাশ ছিল না।

বাড়িতে তখন সমারোহের কোলাহল উঠেছে। সিনেমা স্টার বউদিকে নিয়ে দেবরেরা কলকল্লোল তুলেছে। চারিদিকে আছাড় খেয়ে পড়ছে তার ঢেউ। বিয়াল্লিশ সালের সাইক্লোনের মধ্যেও সে বিঘ্ন বোধ করেনি। কিন্তু এর মধ্যে বিশ্রাম, ঘুম অসম্ভব। তেতলায় নতুন ফার্নিচার উঠছে। স্যুটকেস ট্রাঙ্ক উঠছে। বাড়ির দোরে দুখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একখানা অজিতদার। স্ট্যান্ডার্ড টুয়েল্ভ। পুরনো হলেও নতুনের মত ঝকঝকে, তার পিছনে হেনার স্বামীর গাড়ি। হেনা এসেছে। কথাটা সে শুনে গিয়েছিল, কিন্তু এমন সমারোহ উচ্ছ্বাস সে কল্পনা করতে পারেনি, জেঠীমা বিদ্যমানে। জেঠীমার ঘর-খানি বন্ধ। স্তব্ধ হয়ে তিনি ঘরে বসে আছেন। চাকর ঝি ঠাকুর সব ব্যস্ত। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল তার ঘরের সামনের বারান্দায়! খিদে পেয়েছে, কিন্তু দেবে কে? এক কাপ চা পাওয়ারও কোন আশা নেই।

মধ্যে ওর নামটা ধ্বনিত হয়ে উঠল প্রায় কোরাসে।

—নীরা! নীরা! নীরা-দি! নীরু! নীরুদি। চিরুদি।

প্রথম ডাকটা অজিতদার। শেষেরটা হেনার।

তাকালো সে ছাদের দিকে। আলসের উপর ভর দিয়ে সারি সারি মুখ। তার মধ্যে একখানি আশ্চর্য ঝকমকে মুখ সোনা-রুপোর গহনার মধ্যে একখানি মীনা করা আভরণের মত নানা বর্ণে ঝলমল করছে।

—উপরে আয়। নীরা। চা তৈরি। বউদির সঙ্গে আলাপ করে যা।

এণাক্ষী মৃদু মৃদু হাসছে। বিজয়িনী গরবিনীর প্রসাদ-ঝরা হাসি। প্রকাশে সে আকারে আয়তনে মৃদু, অর্থাৎ ঈষৎ, কিন্তু ওজনে সে সোনার চেয়েও গুরুভার; তার আলোর প্রতিচ্ছটার ঝিকিমিকির মধ্যে চোখ ধাঁধানো কৌতুক: সর্বোপরি তুমি ধন্য হয়েছ, এইটে নটীর স্বগতোক্তির মত অভিব্যক্ত।

ইস্, সে গেল।

তেতলার সিঁড়ির মুখে জেঠীমার ঘর। এ ঘরটা তিনি পাল্টেছেন। নইলে বউকে যেতে হবে ওঠা-নামার সময়। সেটা পার হয়ে সে উঠে গেল। অজিতদা বললে, ইনিই শ্রীমতী নীরা, যার সম্পর্কে অনেক গল্প করেছি। আর এই ছোট বউদি, ফেমাস এণাক্ষী।

অকস্মাৎ এণাক্ষী সকলকে সচকিত করে দিয়ে বলে উঠল, তাহলে, একেই তুমি বলতে কাজল কুন্তী! কি চমৎকার ফিগার! আর রূপ যে এই সবে ফুটেছে, উঁকি মারছে।

কথাটা অন্য বলতে হেসে উঠল। কিন্তু এ এণাক্ষী বোস। এ তারই মুখ চাইলে। শুধু হেসে উঠল বর্ণজিৎ। সে ভাবলে এ এণাক্ষীর একটা মহামূল্য বাণ, রস রসিকতা, সাটায়ার।

কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল নীরার। সে নীরা। সে বলে উঠল, ঠাট্টা করছেন? তা অবশ্য—

বাধা দিয়ে এণাক্ষী বললে, না! তোমার দাদার নিন্দা করে বলতে পারি, না। দেখ, তোমার দাদার চেয়ে আমি বয়সে কিছু বড়। ফিল্মে কাজ করেছি, রূপ আমি চিনি, গায়ের রঙে রূপ নয়, রূপ সব কিছু নিয়ে। গায়ের রঙ তো ফেরানো যায়। মুখে সফটনেসের শ্রী তো আনা যায়। আমি নিজে করেছি। কিন্তু তোমার গড়নে-পেটনে রূপ ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। জাগেনি। জাগছে। কিছু মনে করো না তুমি এতদিন ফোর্টুন গো সুন্দরী, এইবার ফুটছ, কিছুদিনেই বুঝতে পারবে:—একটা মনা ঘোষ নয়— ঝাঁকবন্দী মনা ঘোষ ভন ভন করবে চারিদিকে। তখন চড় মারতে হবে, দশভুজা হতে হবে। অদ্ভুত ফিগার তোমার। টল, গ্রেসফুল।

লজ্জায় বিস্ময়ে নীরা কেমন হয়ে গেল। এণাক্ষী তাকে মনে মনে প্রশ্ন করবার অবকাশ দিল না, এ কি সত্যি? সে তার হাত ধরে টেনে ঘরে নিয়ে গেল, এস তো, দেখাই। ঘরে নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে তাকে বসিয়ে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তার মাথার সেই সুপ্রচুর চুলগুলি নিয়ে কি করতে শুরু করলে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই যেন জাদু শুরু হল। শিউরে উঠল নীরা। এ কি? ও কে? ও কে? সে একটা আশ্চর্য চিত্ত উদ্বেলতা! ভুলে গেল সে তার পরীক্ষার কথা। বিস্ময়, এক অনির্বচনীয় গোপন আনন্দ, ভয়—সব একসঙ্গে। পরমুহূর্তেই সে উঠে দাঁড়াল।

—বস, বস!

—না।

—বস না।

—না। তার কণ্ঠে সে দৃঢ়তা ফিরে পেয়েছে তখন।

ছেড়ে দিল এণাক্ষী তাকে। হাসতে লাগল। বললে, এত ভয়?

—গরিবের অনাথার ভয়ই তো আত্ম-রক্ষার আশ্রয়।

—গরিব অনাথ অবস্থা তোমার ঘুচতে কতক্ষণ? টাকা অনেক পাবে, নাথ—? হাসতে হাসতে বললে, নাথ চাইলে অনেক জুটবে। না চাও, অনাথের নাথ একটা ভক্তিমান দারোয়ান রেখো, একটা আলসেশিয়ান পুষো। বলো, নামিয়ে দি ফিল্মে। এমন ফিগার, এমন উচ্চারণ তোমার! ক্যামেরা-মাইকের টেস্টে তুমি উৎরাবে এ আমি বিনা পরীক্ষায় বলতে পারি। নামবে?

তার সেই বিচিত্র নিষ্পলক দৃষ্টিতে নীরা এণাক্ষীর দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

এণা সকৌতুকে বললে, কি?

নীরা বললে, না।

—না নয়। ভেবে দেখো।

—না। ও আমি পারব না। আমাকে লোভ দেখাবেন না।

—অভিনয় তুমি খুব পারবে। অদ্ভুত পারবে। দু দিনে ভয় ভেঙে যাবে।

—অভিনয় আমার ভাল লাগে না। এবং চাই না করতে। মাফ করবেন আমাকে।

বলেই সে ফিরল এবং বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ছুটে সে পালায় না, ধীরপদক্ষেপেই নেমে এল। হেনা তার পথ আটকেছিল, দেখি দেখি। ওই তো চুলটা ফেরানোতে—।

—পথ ছাড়। বলে তাকেও সরিয়ে নেমে এসেছিল।

নিজের ঘরে এসে ঘর বন্ধ করে স্তব্ধ হয়ে তার মায়ের পুরনো আয়নায় তার প্রতি-

জাপানী প্রথায় ধান চাষ করুন!

জাপানী প্রথা মানে বৈজ্ঞানিক প্রথা। সবাই জানেন এই প্রথায় ধান চাষ করা মানেই বিঘা-প্রতি কমপক্ষে বেশি ফসল পাওয়া।

জাপানী প্রথায় চাষ করতে হলে দুটি অপরিহার্য যন্ত্র হচ্ছে আমাদের 'সীড ড্রিল' বা সারি করে বীজ বোনার যন্ত্র এবং 'জাপানী প্যাডি উইডার' বা আধুনিক কলের নিড়েন। এতে নিড়েন দিলে ফলন যেমন বাড়ে, খরচও কমে তেমনি।

যে-কোন রকমের আধুনিক কৃষিযন্ত্রের জন্যে

কার্লওমস এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ

২৮, ওয়াটারলু স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন: ২৩—৬১২৭

বিম্বের দিকে চেয়ে বসে সে নিজের রূপকে আবিষ্কার করেছিল। তারপর সব এলো-মেলো করে দিয়েছিল।

হঠাৎ সেই অজ্ঞাত রূপসীকে সে দর্পণে আবিষ্কার করলে পূর্ণ গৌরবে—তার বিবাহসজ্জায়। ১৯৪৯ সাল—অগ্রহায়ণ মাস। এর মধ্যে সে, অর্থাৎ সে তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে, এ-কথা গোপন বা অজ্ঞাত ছিল না। তার নিজের কাছেও ছিল না, অপর সকলের কাছেও না। তাকে সে অসম্মান করেনি, তবে তাকে আসন পেতে বসিয়ে ধূপ দীপ গন্ধে পুষ্পে অর্চনাও করেনি। ইতিমধ্যে তার সব কল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। শুধু তার দুর্ভাগ্য নয়, গোটা দেশের দুর্ভাগ্য, দুর্যোগের রূপ নিয়ে সব আচ্ছন্ন করে দিয়ে তার জীবনদুর্যোগকে দুর্লঙ্ঘনীয় করে দিলে।

১৯৪৬ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সে ফার্স্ট ডিভিসনেও পাস করেনি, করেছিল থার্ড ডিভিসনে। সব আশা ধূলিসাৎ হয়েছিল সেসেই বলা হল না, লজ্জাতেও সে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে টিটকিরির সীমা ছিল না। রণজিৎও থার্ড ডিভিসনে পাস করেছে। ঘরের মধ্য থেকে নির্বাক জেঠীমার কথাও শোনা গিয়েছিল, অতি দর্পে হত লঙ্কা অতিমানে দুর্যোধন। এত অহংকার কি সয়! থাক সে-সব কথা। এণাক্ষী নিজে নেমে এসে বলেছিল, নামবে ছবিতে? দেখ?

ঘাড় নেড়ে সে বলেছিল, না।

তারপর জ্যাঠামশাইকে বলেছিল, আমার বাড়ির অংশের দাম, আর যদি কিছু আমার সে টাকার দরুণ পাওনা থাকে, আমাকে দিন। আমাকে তো পথ খুঁজতে হবে।

—পথ? মেয়েদের জন্যে পথ নয়, মেয়েদের জন্যে ঘর।

—ঘর ভেঙে যাদের ভগবান পথে দাঁড় করান, আমি তো তাদের একজন।

—কোন পথে হাঁটিবে ... বংশের মান, সেটা তো আমাকে দেখতে হবে।

কোন বাক্য সে করেনি। সে বলেছিল, আমার ইচ্ছে আমি কোন ইস্কুলে চাকরী করি। সেখান থেকে আই-এ দেব। তারপর পারি তো—

—হুঁ, ভাল। চাকরী পাও। দেখ... পাবে তুমি।

কিন্তু নেমে এল এক ভীষণ দুর্যোগ। গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে। শুরু হল কলকাতায় ১৬ই আগস্ট, হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা। তার কিছুদিন আগেই গেছে আজাদ হিন্দ দিবস। কলকাতা তখন বারুদ-স্তূপ। তার মত মেয়েও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। মনা ঘোষকে সে দেখেছে। কিন্তু মানুষের এই উলঙ্গ উন্মত্ত চেহারা সে দেখেনি। ১৬।১৭।১৮ই আগস্টের সে কি রাত্রি! মনে আছে ওই অঞ্চলটা তখন ওদিকে বসিরহাট বারাসত এবং এদিকে কলকাতার মধ্যে পড়ে নিদারুণ আতঙ্কের মধ্যে কাটিয়েছিল। ছাদে ইঁটপাটকেল জড়ো করে ওরা চার ভাই সেদিন এমনি একটা চেহারার আভাস দেখিয়েছিল বটে। সুজিত কেন ভাইয়ের সে চেহারা সব থেকে স্পষ্ট। অজিতদের তখন দুটো বন্দুক, একটা রিভলভার, একটা রাইফেল, একটা কার্টিজ ছাড়া ব্রিজ লোডিং ডবল ব্যারেল। সারারাত সে বন্দুক ছুঁড়ে বিনাটা আয়ত্তে এনে ফেলে-

সামান্য একটু *টিনোপাল ব্যবহার করলে

সাদা জামাকাপড় সবচেয়ে —বেশী সাদা— হয়ে ওঠে।

স্টকিস্টস্: জেনার্ল হিন্ডাইস প্রাইভেট লিঃ, পি-১১, নিউ হাওড়া ব্রীজ এপ্রোচ রোড, কলিকাতা—১।

ছিল। অজিত শুধু মাথায় হাত দিয়ে চুপ করে বসেছিল একখানা চেয়ারে। জেঠীমা তাঁর ঠাকুরের সামনে জপ করেছিলেন। জ্যাঠামশায় হয়ে গিয়েছিলেন একতাল মাংস-স্তূপ। আর চেহারা দেখেছিল এনার। কোমরে কাপড় জড়িয়ে রিভলবারটা হাতে নিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়েছিল। স্বভাববশে খানিকটা আড়ম্বর দেখিয়েছিল, কার্টিজ বেল্টটা গলায় পরে নিয়েছিল, কিন্তু সত্যই তার সাহসের অভাব ছিল না। সে স্তম্ভিত হয়ে ছাদের আলসেতে কনুই রেখে, শূন্য-দৃষ্টিতে রাত্রির আকাশের দিকে চেয়ে থাকত। কোন ভাবনাই তার ছিল না।

পুজোর পর সে জ্যাঠামশাইকে বলেছিল, যা হয় করে দিন জ্যাঠামশায়, আমার পথ তো আমাকে করতে হবে!

—এই দুঃসময়ে?

—দুঃসময় যদি না কাটে!

—না—কাটে, আমাদের ভাগ্যে যা হবে তোমার ভাগ্যেও তাই হবে। আমি তো এ সময় তুমি যেতে চাইলেও যেতে দেব না না।

এই একবার, এই একটি কথা জ্যাঠা-মশায়ের মেঘাচ্ছন্ন রাত্রের একটি ফাঁকে একটি নক্ষত্রের মত জেগে আছে তার স্মৃতিতে। নইলে তার জীবনে এতবড় দুর্ভাগ্য আর কেউ হয়নি।

জেঠীমা কথাটা শুনে বলেছিলেন, ওর তো লাঞ্ছনার ভয়ও নেই, পাপের ভয়ও নেই। ওর মায়া... ও পরের।

জ্যাঠামশাই সেদিন বলেছিলেন ওঁর কথা তুমি ধরো না মা। ওঁকে তো জান।

অমান্য সে করতে পারেনি। রণজিতের আই এর বই নিয়ে পড়াশুনো আরম্ভ করেছিল। এরই মধ্যে জীবনে তার বিকৃতি ঘটছিল ওই এণাক্ষীর আবিষ্কার করা রূপসী। মধ্যে মধ্যে আয়নায় তাকে দেখে, তার সেই বিচিত্র অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখত। আশ্চর্য বোধ হত। মনের মধ্যে একটি কোন সুক্ষ্ম তারে একটি নতুন সুর বাজত। বাথরুমে স্নান করতে গিয়ে নিজের অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গের দিকে চেয়ে দেখত। কৈশোরে এতদিন যা কুঁড়ির মত ছিল তা স্থলপদ্মের মত ফুটছে। আশ্চর্য। জীবন যেন অকস্মাৎ মহাসমারোহের আয়োজন করছে তার দেহ জুড়ে। দেহ পুষ্ট হয়ে ভরছে। যেমন তিন বছর আগে হেনার হয়েছিল। মুখের যেন চেহারা পাল্টাচ্ছে। তার বর্ণ পাল্টাচ্ছে। আশ্চর্য! মগের পর মগ জল ঢালত মাথায়। জল বেয়ে পড়ত, সে দেখত। হাসত। চুলের রাশি মুখে বুকে পিঠে সেঁটে লেগে যেত। সাবান মাখার নেশা লেগেছিল। এবার সে ঘর বন্ধ করে চুল আঁচড়ে নানা ভঙ্গিতে সাজিয়ে নিজেকে তুলনা করে দেখত। তারপর দু হাত দিয়ে এলোমেলো করে দিয়ে বাইরে বেরুত। রূপ তার নিজের জন্য। সে যেন বাইরে কাউকে দেখা না দেয়।

৪৭ সালে স্বাধীনতা তখন আসছে। তখন শ্যাডো মিনিস্ট্রি হয়েছে। এক মাস পর পনেরই আগস্ট দেশ ভাগ হয়ে স্বাধীন হবে। সে নিশ্বাস ফেলেছিল। এইবার সে বের হবে এ বাড়ি থেকে। হঠাৎ সুজিত মারা গেল। সে মেতেছিল ওই মহামারণে। কোথায় বোমা মারতে গিয়ে বোমা মেরে পালাবার সময় পা পিছলে পড়ে সঙ্গের অন্য বোমাটা ফেটে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। জ্যাঠামশাই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সেরিব্রেল থ্রম্বসিস। পঙ্গু হয়ে বাঁচলেন। বিচিত্র জেঠীমা, তিনি বসলেন পাশে। আশ্চর্য বসা। এণাক্ষী এসেছিল, কিন্তু জেঠীমা তাকে ফিরিয়ে দিলেন।—না। তুমি [illegible] তারপর নীরার দিকে চেয়ে বলে[illegible]ন, তুই একটু বসবি? আমি স্নান পুজোটা সেরে আসি!

সে বসেছিল।

এরই মধ্যে কেটে গেল সাতচল্লিশ সাল। অজিত ব্যবসার মালিক হয়ে ব্যবসাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। নতুন বিভাগ খুলেছে। শক্তিগড়ের কাছাকাছি রাইস মিল কিনেছে। শুধু তাই নয় রেফিউজিদের সেবা করে, দান করে নামও কিনছে। আগামী ইলেক-সনে সে দাঁড়াবে। টিকিট চাই তার। মধ্যে মধ্যে দিল্লি যায়, সঙ্গে এণাক্ষী। নতুন ব্যবসায়ে বড় ব্যবসাদার শরিক জুটেছে। প্রবীণ হুঁশিয়ার মানুষ। দ্রুত ধাবমান রথ থেকে নেমে অজিতের বৃদ্ধ অসহায় পরাণ-বধূর শয্যার পাশে দাঁড়াবার অবকাশ কোথায়। অন্য ছেলেরা রণজিৎ অভিজিৎ তাদেরও সময় নেই। এর মধ্যে ওই জেঠী-মাকে ওই রোগীর পাশে একা রেখে আসতে সে পারেনি। কিন্তু তার যে দিন চলে যায়। দরখাস্ত কয়েকটা করেছিল, কিন্তু কোনটাতেই সাড়া মেলেনি। একে শুধু মাট্রিক, তার উপর সর্বত্র সরকারী নির্দেশে রেফিউজি অগ্রাধিকার জীবনের মুক্তি পথকে সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর করে দিয়েছিল। এরই মধ্যে হঠাৎ মনস্থির করলে সে, আই-এ পরীক্ষা দেবে। পাস সে করবে। যে ডিভি-সনে হোক। রণজিতের বই পড়েই ছিল; সে পড়া ছেড়েছে, স্যুট পরে বিজনেসে ঢুকেছে। সেই বই নিয়ে বসল। এবং এক দিন অজিতকে গিয়ে বললে, সে পরীক্ষা দেবে। ফিয়ের টাকা চাই। কিছু বই চাই।

অজিত বললে, পরীক্ষা? পড়লে কোথায়?

—পড়েছি। পড়েছি রণজিতের বই নিয়ে।

অনেক দিন পর এণাক্ষীর সঙ্গে দেখা। তেতলা ইন্দ্রলোক। সে মর্ত্যভূমের বাসিন্দা,

দি রিলিফ
২২৬, আপার সার্কুলার রোড
এক্সরে, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা হয়
দরিদ্র রোগীদের জন্য—মাত্র ৮, টাকা
সময় :—সকাল ৯টা থেকে ১২-৩০ ও বৈকাল ৬টা থেকে ৭টা

শারদীয়ার প্রীতি সম্ভাষণ গ্রহণ করুন

ফোন : ৩৪-৪১০২
শাখা : ২৭৭, বিবেকানন্দ রোড
(রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের সংযোগস্থল) কলিকাতা—

শরতের আবির্ভাবে উৎসবের
ঘণ্টা বেজে উঠেছে
মেঘগুলি সরে গেছে—আকাশ পরিষ্কার। উৎসবের ঘণ্টা বেজে উঠেছে। আনন্দের ঋতু শরৎকে আগমনী জানাচ্ছে। আনন্দ এবং সুখ বয়ে এনে শরৎ এল আপনাকে আমোদিত করতে।
বাদল হোক, আর খরাই হোক, শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক, সারাবছরই আপনার চুলের জন্য চাই একই প্রকারের যত্ন। সারা বছর ধরে আপনার চুলকে অপরূপ কালো এবং সুস্থ রাখবার যত্ন। চুল কালো রাখবার জন্যে সর্বত্র প্রশংসিত "লোমা" এই যত্ন নিতে সক্ষম। আর মনে রাখবেন "লোমা" শুধু পাকা চুলকেই কালো করে না, চুলের পাকা হয়ে ওঠাও রোধ করে। যে দিক থেকেই দেখুন না কেন, তুলনায় এটা আরও ভালো।
লোমা
একমাত্র পরিবেশক: এম্ এম্ খাম্বাটাওয়ালা, আমেদাবাদ—১
এজেন্ট: সি. নরোত্তম এণ্ড কোং, বম্বে—২
১২৯, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

দেখা হয় না এমন নয়, কিন্তু সে দেখার শুধু তাকানো, দেখা ঠিক হয় না। সে হেসে ঘাড় নেড়ে বলেছিল, তোমার কপালে শনির দৃষ্টি। না হলে, তোমার অন্ন খায় কে?

অজিত বলেছিল, থাক না ও কথা।

—থাক। তবে তুমি নামছ ওই বিজনেসে, খুব ভাল হিরোইন হত।

সে কঠিন ভাবে বলেছিল, সকল অন্ন সকলের জন্য নয় বউদি। কারও জন্যে গোবিন্দভোগ, কারুর জন্য খুদ। আমার খুদের ভাগ্য। আমাকে আপনি আর এই কথাটা বলবেন না।

এণাক্ষী রাগ করেনি। হেসে বলেছিল, চমৎকার কথা বল তুমি। আচ্ছা আর বলব না। ওগো টাকাটা দিয়ে দাও বাপু।

ওই পরীক্ষা দেওয়া তার ভুল হল। অথবা ভুল নয়, ওইটেই তার মুক্তির পথ করে দিয়েছে।

সে ফেল হয়ে গেল। পড়তে সে ঠিক পায় নি। জ্যাঠামশাই মরতে মরতে মরছিলেন না। নিদারুণ কষ্টের মধ্যেও প্রাণ বেরুচ্ছিল না। ডান হাত ডান অঙ্গ অবশ। কথা বলতে পারেন না। গোঙান, প্রলাপের রোগীর মত চিৎকার করেন। আর বাঁ হাতে ডান হাতের চেয়েও জোরে এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জেঠীমাকে মারেন, তাঁর চুল ধরে টানেন। ছুটে গিয়ে ছাড়াতে হত তাঁকে। মলমূত্র বিছানায়; পরিষ্কার করতেন জেঠীমা; সে অবশ্য দূরে সরে থাকত। তাঁর অগোচর ছাড়া তিনি তাকে নড়তে দেননি। শেষে বলেছিলেন, ও তুমি করতে যেয়ো না, ও আমি কাউকে করতে দেব না। আমি পায়খানায় বসি, বাথরুমে যাই, থাকবেন কিছুক্ষণ ওই অবস্থায়। ওঁর অদৃষ্ট ওই রয়েছে। আমি বারণ করলাম।

কেন আসত মধ্যে মধ্যে, নাকে কাপড় দিয়ে ঘরে ঢুকত।

পরীক্ষার ফল বেরুল, সে ফেল হয়েছে। এর দিন দশেক পর জ্যাঠামশায় মারা গেলেন। জেঠীমা আবার ঘরে ঢুকলেন। সে তাঁর কাছে গিয়েছিল। জেঠীমা বলেছিলেন, এবার আমার বিধবার জীবন নীরা। সেবা আমি কারুরই চাইনে। তুমি আমার কিছু ছুঁয়ো না। এরপরই চলে গেলেন কাশী।

সেই দিনই সে চলে যেত। কিন্তু অজিতদা ছিল না বাড়ি। গিয়েছিল বম্বে। তার টাকায় ছবি হচ্ছে। তার কি সব করবার জন্য বম্বে গেছে এণাক্ষীকে নিয়ে।

ফিরে এলে সে বলতেই বললে, আমার ছবিটা রিলিজ হোক। টাকা আটকে গেছে। তার আগে তো পারছিনে। জোর করলেও উপায় নেই, পারব না।

ছবি রিলিজ হল। দু সপ্তাহেই ছবি শেষ। মাথায় হাত দিয়ে বসল অজিতদা। একদিন পর এণাক্ষীকে নিয়ে গাড়িতে কোথায় চলে গেল। রণজিৎ বাড়িতে বসে রইল, আপিস গেল না।

দিন কয়েক পর একখানা বড় গাড়ি এসে দাঁড়াল। রণজিৎ চাকরকে বললে, বল গিয়ে বাবুরা সব বাইরে গেছেন। কিন্তু চাকরকে ঠেলে তিনি বাড়ি ঢুকলেন। অবশ্য তার আগেই রণজিৎ খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

—অজিতবাবু! অজিতবাবু! রণজিৎ। কে রয়েছে বাড়িতে?

এবার বাধ্য হয়ে বেরিয়ে এল নীরা।—এঁরা তো কেউ বাড়ি নেই।

এক বৃদ্ধ; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিশ্চয়। তিনি বললেন, কোথায় গেছেন?

নীরা বললে, [illegible] আমার কথার জবাব দিন, আপনি এভাবে বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন কেন? আপনি কোন একজন সম্ভ্রান্ত লোক।

বৃদ্ধ নীরার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, চাকর বললে, বাবুরা কেউ বাড়ি নেই। অজিত স্ত্রী ছাড়া কোথাও যায় না, ওর মা কাশীতে—

বাধা দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে আরোপ করে নীরা হেসেই বললে, আরও কেউ থাকতে পারেন, দেখতেই পাচ্ছেন আমি রয়েছি।

বৃদ্ধ বললেন, আমার ভুল হয়েছে স্বীকার করছি। অজিতের কারবারে আমি অংশীদার। আমার প্রয়োজন জরুরী। আমার মনে হচ্ছে, ও ইচ্ছে করে আমার সঙ্গে দেখা করছে না। তাই ঠিক হিসেবটা হয়নি। তোমার কথা মনে হয়নি আমার। তুমি তো অজিতের খুড়তুতো বোন। কিন্তু—। কথাটা কিন্তুতেই চাপা রেখে বললেন, চমৎকার মেয়ে তো তুমি।

চুপ করে ছিল নীরা।

বৃদ্ধ বলেছিলেন, আচ্ছা আসি মা। আমি বৃদ্ধ, কোন অপরাধ নিয়ো না আমার।

পরদিন আপিসের একজন কর্মচারী এসে রণজিতের সঙ্গে দেখা করলে। রণজিত বেরিয়ে গেল তার সঙ্গে। ফিরে এল হাসিমুখে। পরদিন যথাসময়ে আপিস গেল। পরদিন সেই বৃদ্ধ এলেন। এবার রণজিৎ সমাদর করে তাঁকে ড্রইংরুমে বসাল। তারপর তাকে ডাকলে, উনি একবার ডাকছেন। কি হয়েছে সে দিন! হাসতে লাগল। আসতেই হবে, নইলে উনি আসবেন। বলছেন, আমার ঠিক ক্ষমা চাওয়া হয়নি। এসেছেন ওই জন্যে। ভাল লেগেছিল নীরার সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধের ওই বিনয়। সে গিয়েছিল ড্রইংরুমে একটু কুণ্ঠিত ভাবে। সে কি রূঢ় কিছু বলেছিল! ঘরে ঢুকেই কিন্তু একটু

ARATI : LEELA
KAMALA : MAYA etc.
WANTED WHOLESALE DEALERS
NEW POPULAR PRESS
Post Box No. 11405, Calcutta-6

বি, এম, সি, লিঃ'র
মসকুইটো প্রুফ সিস্টার্ণ

ব্যবহারে বিশেষ উপযোগী ও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত
(কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত)
দি বেঙ্গল মেশিনারী কর্পোরেশন (প্রাইভেট) লিমিটেড
৯এ, নিউ ট্যাংরা রোড, কলিঃ-১৫
ফোন নং: ২৪-২৫৫৮

অপ্রস্তুত হয়েছিল। একটি রূপবান যুবকও বসে আছে।

বৃদ্ধ বলেছিলেন, এটি আমার ছেলে মা। ভাল ছেলে, এম-এ পড়ে, আবার দুষ্টু ছেলে। ওকে নিয়ে এই পথে যাচ্ছিলাম, মনে হল সেদিনের ত্রুটি স্বীকার ঠিক হয়নি। তাই নেমে পড়লাম।

নীরা দুজনকেই নমস্কার করেছিল, তারপর বলেছিল, না। ত্রুটি হয়তো আমারও হয়েছিল। আপনি যেন কিছু মনে করবেন না।

হা-হা করে হেসে বৃদ্ধ বলেছিলেন, তুমি অসামান্যা মা। শুধু ব্যবহারে নয়। রূপেও। অজিত বলত, একটু কালো বেশী, ঢ্যাঙা। তাই আমি চিনতে পারিনি। যা মিষ্টি করে আমাকে সচেতন করেছিলে! জান, এই এম-এ পড়া ছেলে আমার সামনে কথা বলতে পারে না।

ছেলেটি স্তব্ধ মৌন হয়ে বসেছিল।

• •

তারপর ঘটনা ঘটল অত্যন্ত দ্রুত। অজিত-এণাক্ষী ফিরে এল। পুজোর পর তখন। তাকে ডেকে বললে, নীরা, একটা কথা আছে। সোমেশবাবু তোকে পুত্রবধূ করতে চান। তিনি তোকে দেখে গেছেন। ছেলেও দেখেছে, তুইও দেখেছিস। তোর ভাগ্য ভাল।

এণাক্ষী বলেছিল, বহু লক্ষের মালিক।

তার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। সে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। তবু সে বলেছিল, ভেবে বলব। সারাটা রাত্রি—সে তার নিদ্রাহীন রা[illegible] ঘরে আলো জ্বলছিল। সেই আলোয় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বারবার প্রশ্ন করেছিল, তুমি এত রূপসী? তুমি এত ভাগ্যবতী? আকস্মিকতায় তার অতীতের সব দুঃখ, ভাদ্রের শেষ সপ্তাহে বর্ষার কালো মেঘের মত কোথায় যেন মিলিয়ে গিয়ে শরৎপ্রভাব জেগে উঠেছিল। জীবনে মোহ বোধ করি ওই একবার!

বৃদ্ধ সত্যই সম্ভ্রান্ত, [illegible] অজাত। রূপবান যুবকটি স্তব্ধ, মৌন!

সকালবেলা অজিতই এসে ডেকেছিল, নীরা।

নীরা তখন শেষরাত্রে ঘুমিয়ে তখনও ঘুমুচ্ছে। সে জেগে উঠে বলেছিল, হ্যাঁ, বলো আমার মত আছে। তবে আমার বাবার যে টাকা কটি আছে তাই সব। তা না-নিলেও হবে না। তার বেশী দিলেও হবে না।

তাই হয়েছিল। সোমেশবাবু নিজে এসে আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন, তুমি রাজ্য চালাতে পার মা। দিন স্থির হয়েছিল অগ্রহায়ণে। জেঠীমা এসেছিলেন কাশী থেকে। সে লিখেছিল নিজে এবং অজিতকে বলেছিল তাঁকে আনতে হবে। তিনি না-হলে হবে না।

সেদিন তাকে সাজিয়েছিল এণাক্ষী। নিজের মধ্যের রূপসীকে পূর্ণ গৌরবে রানীর মত মহিমায় প্রকাশিত দেখে নিজের প্রেমে সে নিজেই পড়েছিল। দীর্ঘাঙ্গী, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল, মধ্য-ফাল্গুনের শ্যামলতার মত উজ্জ্বলশ্যামা, আয়ত নয়না, ঘন কালো একরাশি চুলের পৃষ্ঠপটে সে যেন কোন কাব্যের নায়িকা। নায়কের জন্য প্রতীক্ষমানা। অবনতমুখী। জেঠীমা সম্প্রদান

শিশুদের
সুস্থ ও সবল করে তোলার পক্ষে
আদর্শ টনিক

ডোঙ্গরে বালামৃত

কে, টি ডোঙ্গরে এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
৮২ মেডোস্ স্ট্রীট ফোর্ট বোম্বাই—১।
শাখাঃ—বিরহানা রোড, কানপুর

কথা ছিল বিবাহের পরই তারা চলে যাবে ভারতভ্রমণে। সে এক স্বপ্ন।

অকস্মাৎ স্বপ্ন ভেঙে গেল। যেমন ঝন ঝন শব্দ করে একরাশ বাসন ভেঙে পড়ে তেমনিভাবে আর্তনাদ করে।

প্রথম সাক্ষাতেই লগ্ন।

পাত্র এসেছে। সানাই বাজছে। চারিদিকে ব্যস্ততার কোলাহল। ফুলের মালার, ফুলের সজ্জার, পুষ্পসারের সৌরভে চারিদিক ভরে গেছে। এরই মধ্যে একটি নারীকণ্ঠ করুণ আর্ত-চিৎকার করে উঠল—আমি কি অপরাধ করলাম? বল—বল—বল। কি আমার অপরাধ! তোমার সন্তান যে আমার গর্ভে!

উচ্চ দর্পিত কোলাহলে তার আর্তকণ্ঠ ঢাকা পড়ে গেল।

•

ওঃ, সে কি নির্মম বাস্তবের নিষ্ঠুর প্রকাশ! মহাকাব্যের বর্ণনার মত আলো নেভেনি, পুষ্পসজ্জা নিষ্প্রভ হয়নি; সৌরভের হানি ঘটেনি, তবে হ্যাঁ, সানাই থেমে গিয়েছিল। ও যে মানুষে বাজায়। মেয়েরা ছুটে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল রেলিংয়ে ভর দিয়ে। কি হল? তাদের সঙ্গে সেও। থর থর করে কাঁপছিল সর্বাঙ্গ। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ভয়ে উদ্বেগে যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। মিনিটে যদি হৃৎস্পন্দনের সংখ্যা সীমায় বাঁধা থাকে তবে সে তখন এক মিনিটে বহু মিনিট অতিক্রম করছিল। হয়তো সমস্ত পরমায়ুর স্পন্দনসংখ্যা শেষ করে লুটিয়ে পড়তে চেয়েছিল। অথবা এই ঘটনার সময়টা সংক্ষিপ্ত করে দিতে চেয়েছিল।

একটি সুন্দরী মেয়ে। মা হবে অল্প দিনে। দু চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। বর পাথর, নতশির। মুখ দেখে তার স্বীকৃতি সুস্পষ্ট। সঙ্গে এক বৃদ্ধ, আর কয়েকজন অল্পবয়সী ছেলে।

বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত সোমেশবাবুর আজ এই মুহূর্তে এ কি মূর্তি? হাতের রূপো-বাঁধানো ছড়িটা ঠুকছেন আর বলছেন, তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি জোচ্চোর। ঠগ তোমরা! বেরিয়ে যাও! এ যেন দণ্ডমুণ্ডের কোন শাসনকর্তা—যিনি মুহূর্তে দণ্ড হিসাবে মুণ্ডটা অনায়াসে গ্রহণ করতে পারেন।

অজিতদা তার সুরে সুর মিলিয়ে বলছে, ব্ল্যাকমেলারস!

মেয়েটির সঙ্গের বৃদ্ধ হাত জোড় করে বলছে, না—না—ঈশ্বরের শপথ করে বলছি এ সত্য। আপনার ছেলে আমার ছেলের সহপাঠী ছিল। আমি গরিব, আমি সাধারণ, কিন্তু সে লেখাপড়ায় অসাধারণ ছিল। সেই সূত্রে আপনার ছেলে আমার বাড়ি আসত। আমার ওই মেয়ে, হতভাগিনী, বিবেচনা করেনি, বিচার করেনি সম্ভব অসম্ভব, হাত বাড়িয়েছিল আপনার পুত্রের দিকে। আমার ছেলের মৃত্যুর পর স্নেহের মধ্য দিয়ে ঘটেছে এটা। দোষ আপনার ছেলেকে আমি দেব না। জেনে, অতিসম্পাত্র দিয়েছি মেয়েকে। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। সর্বনাশ তখন ঘটে গেছে। দয়া করুন—

—প্রমাণ কি? আপনাকে আমি পুলিশে দেব।

—এই দেখুন ওদের বিবাহের পরদিনের ছবি, জিজ্ঞাসা করুন আপনার ছেলেকে।

—কিসের বিবাহ? কই সার্টিফিকেট কই?

—রেজেস্ট্রি করে বিবাহ হয়নি। কথা ছিল, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। হিন্দুমতে ভগবান সাক্ষী রেখে।

—ভগবান সাক্ষী? আমরা ব্রাহ্মণ, আপনি কায়স্থ, হিন্দু মতে ভগবান এ বিবাহ স্বীকার করেন না। চলে যান। আপনি চলে যান।

ধীরে ধীরে এসে ঘরে ঢুকে নীরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল! এ কি হল? কি করবে সে? পৃথিবী শূন্য হয়ে গেছে তার কাছে। বুকের মধ্যে একটা ঝড় বইছে শুধু। হাহাকার ক্রোধ মিলে প্রচণ্ড একটা কিছু। কানে এল পাশের ঘরে এণাক্ষী বলছে, ওরা খবর পেলে কি করে? ছি-ছি-ছি!

অজিতদা বললে, কি করে জানব? আমি কি করে বলব। আমি বারবার সোমেশবাবুকে এ সব উৎসবটুৎসব করতে বারণ করেছিলাম। উনি যে নিজেকে বড় পয়গম্বর মনে করেন। হ্যাঃ—ওরা আবার কিছু করতে পারে!

এণাক্ষী বলেছিল, তারপর? বিয়ে যদি ভেঙে যায়? টাকা তো সোমেশবাবু ছাড়বেন না! আমি কি করব বলার মানেটা ভেবেছ?

সকল আবরণ ছিঁড়ে গেল। নগ্ন সত্য তার সামনে এসে ব্যঙ্গ হেসে দাঁড়াল। না, সত্য ব্যঙ্গ হাসি হাসে না; সে ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, বল, এবার কি করবে? স্থির কর তোমার পথ।

সেই তার পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দিয়েছিল, ওই পথ।

এ বাড়ির সদর দরজা পার হয়ে বিশাল পৃথিবীর দিকে দিকে পথ চলে গেছে। যে পথে বারবার চলতে চেয়েছ কিন্তু চেয়েও পারোনি। আজ বের হও। এই রাত্রেই, এই মুহূর্তে!

কিন্তু সে করেনি। মালা ছিঁড়ে ফেলেছিল, গহনা খুলে ফেলেছিল, শাঁখা ভেঙে ফেলেছিল, কনে-চন্দন মুখের কাজল, মুখের প্রসাধন মুছে বেনারসী শাড়ি ব্লাউস বদলে সাধারণ শাড়ি ব্লাউস পরে বেরিয়ে পড়বার মুখে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

ঘরখানা মস্ত সুজিতের ঘর। তার জন্য এখন থেকে সাজানো থাকবার কথা। সুজিতের ড্রয়ার খুলে সে বের করে নিয়েছিল তার একখানা ছোট নেপালী ভোজালি। ছোট, কিন্তু মারাত্মক সেটা। আর তুলে নিয়েছিল সাজানো দান সামগ্রীর মধ্যে রাখা একটি ছোট ভেলভেটের থলি। তাতে ছিল নগদ একশো এক টাকা। ধাতুর টাকা।

বিবাহ-সভার সবার সামনে এসে সে দাঁড়িয়েছিল। অকুণ্ঠিতা অসমসাহসে সে তখন অগ্নিশিখার মত জ্বলছে; প্রদীপ্ত অনবনমিতা সে তখন। সোমেশবাবুকে বলেছিল, আপনার পুত্র আর পুত্রবধূকে নিয়ে ফিরে যান দয়া করে। আমি বিবাহ করব না।

চমকে উঠেছিল সমস্ত সভাটা।

অজিত ছুটে এসেছিল।—নীরা।

সে ভোজালিটা বের করে বলেছিল, এসো না আমার কাছে। তা হলে আমি আত্মহত্যা করব।

হতভাগিনী সেই মেয়েটা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিল। নীরা তাকে বলেছিল, জোর করে তোমার স্বামীকে ওখান থেকে টেনে নামিয়ে নিয়ে যাও। সে তোমার দায়। আমি চলে যাচ্ছি।

—নীরা। অজিত আর একবার চিৎকার করেছিল।

বাকী সব স্তব্ধ স্তম্ভিত। সে তারই মধ্যে চিন্তাহীন মনে শঙ্কাহীন চিত্তে দৃপ্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে গিয়েছিল সদর দরজা দিয়েই। সেখানে ডেকরেটারদের সাজানো ফটকের মাথায় রোসনচৌকীর লোকগুলি বসে ছিল অবাক হয়ে।

—নীরা! আবার চিৎকার করেছিল অজিত।

—না। থাক, মনা ঘোষের উচ্ছিষ্ট কন্যায় আমার প্রয়োজন নেই। সোমেশবাবুর গম্ভীর কণ্ঠ শুনতে পেয়েছিল।

একবার ইচ্ছে হয়েছিল সে ফিরে জবাব দিয়ে আসে, কিন্তু আত্মসম্বরণ করেছিল সে।

ছোরাটায় হাত রেখে রাত্রির পৃথিবীর পথে এগিয়েছিল নির্ভয়ে; কন্যাসজ্জার এলো খোঁপাটা কখন এলিয়ে গেছে। কাজললতাটা শুধু আটকে ছিল চুলে। পিঠে বিঁধছিল। সেটাকে টেনে নিয়ে ফেলে দিয়েছিল পথে।

তার মুক্তি। প্রথম অঙ্ক ওখানেই শেষ হয়েছে।

॥ পাঁচ ॥

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ হল আজ। ৪৯ সালের নভেম্বর থেকে আজ ৫৬ সালের জুলাই; ছ বৎসর আট মাস। হ্যাঁ, ছ বছর আট মাস। দ্বিতীয় অঙ্কের শুরু থেকে আজকের সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত জীবন প্রথম অঙ্কের ঠিক বিপরীত। একটানা সার্থকতার জীবন। যতক্ষণ জীবন ততক্ষণ সংগ্রাম। পথের পাঁচালীর বিভূতিবাবু তাঁর খাতায় লিখে দিয়েছিলেন, 'গতিই জীবন।' নীরা জেনেছে সে-গতি সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

পৃথিবী নাকি যেদিন উৎক্ষিপ্ত হয়ে

চার, তিন কন্যা, এক পুত্র। এক পুত্র থাকেন রানীগঞ্জে, তাঁর তিন। কনিষ্ঠার এক। ওদের বন্ধু—তারা বলে পিতামহ। সামনে পুকুর ঘ্যাম্প, তাদের ছেলেগুলো ঘোরে ফেরে—তারা শুনে শুনে জেনেছে, এর নাম পিতামহ। আমার সামনের এই ড্রেন, এতে যখন জোয়ার জল চলে, তখন তারা এসে শুয়ে পড়ে সাঁতার কাটে, আর চেঁচায়, আও পিতামহ (দাদু) পানিয়া মে সাঁতার খেলা। এর মধ্যে দেবতা আছে দৈত্য আছে, যক্ষ আছে রক্ষ আছে, কিন্নর গন্ধর্ব রাক্ষস নরবানর সব আছে। আমি পিতামহ ব্রহ্মা। বাড়িটির মধ্যে অহরহ চলছে পুরাণের পালা। সমুদ্রমন্থন। দুটো বাদাম, চারটে ছোলা, একটা পেয়েক বা নাট বল্টু নিয়ে চলছে মহা সংগ্রাম। তা তুমি এলে, তুমি নীরা, তুমি সাক্ষাৎ মোহিনী হয়ে এদের বিবাদ ভঞ্জন করবে, থাকবে। ঠিক হয়েছে।

বক্তৃতার ভঙ্গিতে, যাত্রা থিয়েটারের বক্তৃতার ভঙ্গিতে বললেন বৃদ্ধ শিল্পী। চিত্ত তার ভরে গেল।

ঘোষাল বললেন, আমি নিশ্চিন্ত। শুধু তুমি আশ্রয় পেলে না, একজন অমর-শিল্পীর—

বাধা দিয়ে বৃদ্ধ আবার বক্তৃতা শুরু করে দিলেন, মৃত্যু, তুমি মৃত্যু। এই ডাকাতের দল আমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কেউ ভাল কেউ মন্দ, কেউ দেবতা কেউ পাষণ্ড। এদের জন্য কেউ বলবে ধন্য ধন্য, এমন পিতামহ না-হলে এমন নাতি! কেউ বলবে, এমন কুচক্রী মন্দ ঠাকুরদা না হলে এমন নাতি! এক অংশে চন্দন এক অংশে পংক মেখে, আমিও বলব ধন্যোহং, আমি অমর পিতামহ। এখন মোহিনী তুমি এসেছ, দেখ তোমার মোহে যদি দৈত্যেরা দেবতা হয়। আমার দুই অংশে চন্দনের সমতুল্য [illegible] হয়।

পূর্ণ দেড় বছর এখানে তার কেটেছিল। জীবননাট্যে অনেক দুর্যোগময় পরিবেশ এবং অনেক যন্ত্রণাময় যুদ্ধের নাট্যপ্রবাহের পর এটি একটি সুন্দর প্রভাত। মেঘ নাই, মাটি ভিজে নরম, কিন্তু পিচ্ছিল নয়, পাখিরা কলরব করে আকাশে ডানা মেলেছে; তারই মধ্যে একটি বাউল একতারা বাজিয়ে গান গাইছে—

"কাঁদিস কেন ও পোড়া মন
'রাধে' বলে নাচনা কেন?
এমন মানব জনম [illegible] পাইবে—
[illegible]?
ওরে কোন্ [illegible] মরবি কেন—
[illegible] ডুবে মরবি কেন?"

এ ওই বৃদ্ধ শিল্পী শিবনাথ দাদু, পিতামহ। প্রাণে তিনি সুর লাগিয়ে দিয়েছিলেন। গানটি তিনি সত্যিই গাইতেন। গলা ছিল না, তবু গাইতেন। অবশ্য বাউল সেজে নয়। তবে পোশাক ছিল বিচিত্র, লোকে দেখে মুচকে হাসত। শিল্পী শিবনাথের এই পোশাক, এই চেহারা। খালি-গা, গলায় রাঁধুনীবামুনের মত মালার ঢঙে পৈতে; থান-কাপড় ডবল করে লুঙ্গির মত পরা, খালি পা, শীর্ণকায় কৃষ্ণবর্ণ বৃদ্ধের হাতে মাটি গায়ে ধুলো। তা ওই এক ধরনের বাউল গুণ গুণ করে গাইতেন। গানটা ওঁরই রচিত। বৃহৎ সংসার—তিন ভাইপো পুত্রকন্যা, পুত্রবধূ, পৌত্র পৌত্রী চাকর ঠাকুর ঝি নিয়ে ছিল তেইশ তাকে নিয়ে হয়েছিল চব্বিশ। এ ছাড়া বাড়ীতে একজন দুজন আছেনই। কেউ তার সাক্ষাৎ মা-কালী, কেউ শনিঠাকুর, কেউ দুর্গা কেউ লক্ষ্মী, অবশ্য ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে। বাড়ির গৃহিণী ওদের দেখলেই চেনেন। সকালে আটটা থেকে ভাত খাওয়া শুরু, রাত্রে একটায় শেষ। পিতামহ [illegible] বাড়িতে ওই নাতিগুলোর মধ্যে অহরহ দেবাসুর সংগ্রাম চলছে, [illegible] নয়। দালানে বাড়ির [illegible] একেবারে [illegible] বলে ডাকলে কিলকিল-কাকাম [illegible] চলেছেই, তখন ওদের কারুরও [illegible]। পাশেই বড় মেয়ের ছেলেও এসে জোটে। [illegible] মেয়ে আসে। বড় [illegible] এদের মধ্যে [illegible] এবং শ্রেষ্ঠা; আশ্চর্য গুণবতী [illegible] শালিনী মেয়ে। দাদুই নাম রেখেছিলেন শকুন্তলা—এখন হয়েছে সরস্বতী। আর দুজন মণি-রুণি। মণি [illegible], [illegible] রুণিকে বলেন অপ্সরী, কারণ সে প্রায় অনবরতই নাচে। আর একজন আছে ছোট ছেলের বড় মেয়ে মঞ্জু, সে [illegible] কর্মস্থল থেকে মায়ের সঙ্গে আসে—[illegible] তাই—নাচে। আর একটি [illegible], কন্যার প্রথমা কন্যা বছর [illegible] বয়স, [illegible] আলোমোহিনী। দাদু ছড়া বেঁধেছেন—

'আলোমোহিনী রাণী
আলোমোহিনী মান করেছে [illegible]।'

বড় নাতিকে বলেন, [illegible]। বড় পৌত্রকে বলেন, জেণ্টেলম্যান। মেজ পৌত্র 'মহাবীর', তৃতীয় নাতিটি বড় ভাল। শুধু মানুষ। মধুর মানুষ। তার পরেরটির অনেক নাম—বুদ্ধিমান, জ্ঞানবৃদ্ধ—কথাটা মিথ্যা নয়, পুরাণের গল্প শুনে কণ্ঠস্থ করেছে, কখনও হয় রাম কখনও হয় অর্জুন কখনও বুদ্ধও সাজে, এবং দুষ্টবুদ্ধির অন্ত নেই। [illegible] থেকে পড়ে কপাল কাটে, পথে পড়ে হাঁটু কাটে। তার ছোটটি শ্যাম, এটি ওরই চাপে পৃথিবীর মত উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপার মত একটু ম্লান হয়ে গেছে। বড় লোভী। কিছু না পেলে

ভাঁড়ারের চাল নিয়ে ভিজিয়ে খায়। গোটা রেশনের চালে জল ঢেলে দেয়। তার পরেরটা দিনরাত্রি হুড়োয় নাড়ায় চেঁচায়; হাতে পেরেক স্ক্রু-ড্রাইভার ছুরি কাটারি নিড়েন, একটা কিছু চাই-ই। বছর চারের বয়স, এর মধ্যে মায়ের ড্রেসিং টেবিলটা পেরেক ঠুকে ভেঙেছে। ডাক্তার আসছেই আসছেই। এর জ্বর, ওর পা কেটেছে, ওর টনসিল। আর দাদুর অসুখ লেগেই আছে। মধ্যে মধ্যে সন্দেহ হয়, তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত। তবে শরীর অসুস্থ তাতে সন্দেহ নেই। বড় ভাই-পো চাকরে, কিন্তু কার্যাবিভোর। মেজ ভাইপো ডাম্বল ভাঁজে, কলেজ ইউনিয়নে সেক্রেটারি, আপন মেজাজে আছে, তার পরেরটি ঘাড় গুঁজে পড়ে, একটু গোঁয়ার, কিন্তু বেশ লোক। বড় জামাইটি আশ্চর্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি। ছোট জামাই ডাক্তার। বড় ছেলে ভাল চাকরি করেন। সুখের সংসার। সব সুখ ওই মানুষটিকে কেন্দ্র করে। তবু কলহ বাধে। বড় ছেলের সঙ্গে বাধে, সে তাগাদা দেয় নূতন কিছু আঁকুন।

বলে, আপনি জানেন না, কত বড় শিল্পী আপনি। উনি চটেন। মধ্যে মধ্যে ক্ষেপে যান। মধ্যে মা এবং স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করেন। কারণ তিনি সংসার চালান এখন। সেটা জাহির করেন। দাদুরও স্ত্রীর সঙ্গে বাধে মধ্যে মধ্যে, সে ভীষণ বাধা। তিনি পূজো নিয়েই থাকেন। তবে তাঁর ধারণা দাদু তাঁকে ঠিক তাঁর উপযুক্ত মনোরমা মনে করেন না। দাদুর অধিকাংশ নারীমূর্তির মুখে তাঁর আদল। তারা ছবির ভাববস্তুতে মহিমান্বিত। তবু স্ত্রী বলেন, কি খারাপ করেই [illegible]কলে তুমি আমাকে। লাগে বিরোধ। [illegible]ত বিরোধ। বড় পুত্রবধূ, ঝগড়া সে করে না, তবে মধ্যে মধ্যে না খেয়ে শুয়ে থাকে। বিচিত্র মানুষ, কখনও মনে হয় এ বাড়িতে এসে সে ধন্য হয়েছে, কখনও ভাবে এ বাড়িতে পড়ে তার কোন সাধই মিটল না। বড় মেয়ে পাশে থাকে। ব[illegible] জামাই তাকে আশ্চর্য গড়েছে। সুস্থ সবল [illegible]। সকল গৃহকর্ম নিজে হাতে করে, ক্লান্তি নাই, বিরক্তি নাই, হাসিমুখে।

রোজ সন্ধ্যায় বাপ-মাকে দেখতে আসে। ছোট জামাই ডাক্তার, কৃতী ছেলে, সেও রুপোর চাঁদ নয়, সেও সোনার। ছোট মেয়ে বাপের সর্বাপ্রিয় সন্তান। চমৎকার মেয়ে, কিন্তু তাতেও পোকা, সর্বদাই ভয়ে অস্থির—তার টি বি হবে। ছোট ছেলে বাইরে থাকে, খুব কৃতী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী। বাস্তববাদী দুর্বাসা। ছোট বউটি মাটির মানুষ, বড় ভাল। তাদের বড় মেয়েটি নৃত্যপরা—দুটি ছেলে, তার একটি ওই বুদ্ধিমানের চ্যালা, অন্যটি বাচ্চা, একটা মোড়া ঠেলে বেড়ানোই তার একমাত্র নেশা। কলরব কোলাহল, কলহ, হাসি-কান্নার সে এক অহরহ মুখরতার মধ্যে মূল একটি সুর কান পাতলেই ধরা যায়, সে সুর আনন্দের, সে সুর সুখের। সে ওই মানুষটিকে কেন্দ্র করে। এই দেড় বৎসরে সেও ওই সুরে জীবনের তার বাঁধতে চেয়েছিল। অনেক সময় বেশ খুশি হয়ে ভেবেছে, বাস, এইবার সে সুখী হতে পারবে। কিন্তু আশ্চর্য, আবার কিছুক্ষণ বা কয়েকদিন পরেই দেখেছে, ঠিক সুরে সুর

পূর্বপুরুষদের দান

তখনো ইতিহাস লেখা হয়নি। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে মানুষ যে ফসল প্রথম ফলাতে সুরু করেছিল তা হচ্ছে বার্লি। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। খৃষ্টজন্মের তিন হাজার বছর আগেকার মিশরের মিনার-এর যে ধ্বংসস্তুপ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে যে শস্যের নিদর্শন রয়েছে তা বার্লি বলেই পণ্ডিতেরা বলেন। তাছাড়া, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী ও স্প্যাডেনের প্রাচীন সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতেও বার্লির প্রাচীনত্বের প্রমাণ মেলে। খৃষ্টজন্মের ... ০ বছর আগে সম্রাট সেংসুঙ্ এর চাষ সুরু করেছিলেন চীনে।

আমাদের সংস্কৃত পুরাণ ও শাস্ত্রাদিতে যবের উল্লেখ রয়েছে। মহেঞ্জোদড়োয় সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের মধ্যেও জানা গেছে যে বার্লির ফসল খৃষ্টজন্মের ৩০০০ বছর আগে ভারতবর্ষে ছিল। বেদে যবের উল্লেখ থেকে আরো মনে হয় ধান বা গম চাষের অনেক আগেই ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য ছিল বার্লিশস্য। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা বার্লির পুষ্টিকর গুণগুলির কথা জানতেন। ...লা-পার্বণ ও উৎসবে এবং প্রাত্যহিক আহার্য ও পানীয় হিসেবে বার্লির ব্যবহার ছিল। এই কারণে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে বার্লিশস্য একাত্ম হ'য়ে আছে।

আজো বার্লি মানুষের একটি বিশিষ্ট খাদ্য। বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে অসংখ্য মানুষ বার্লির পানীয় দিয়েই জীবনধারণ করে। বার্লি-শস্য থেকে উৎপন্ন পার্ল বার্লি ও গুঁড়ো বার্লি সহজে হজম হয় এবং শারীর ক্রিয়ার সহায়ক ব'লে রুগ্নদের জন্যেই এর বহুল ব্যবহার।

শস্য উৎপাদন পদ্ধতি ও যান্ত্রিক উন্নয়নের ফলে বার্লির চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। 'শিউরিটি বার্লি' প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাটলান্টিস (ইস্ট) লিঃ-এর সর্বাধুনিক কারখানায় উঁচুজাতের বার্লিশস্য থেকে স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বার্লি তৈরী হয়। এই জন্যেই 'শিউরিটি বার্লি' রুগ্ন, শিশু ও প্রসূতিদের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। যুবা ও বৃদ্ধরাও এই বার্লি খেয়ে উপকার পান।

অ্যাটলান্টিস (ইস্ট) লিঃ (ইংল্যাণ্ডে সংগঠিত)

PTY 3084

মিথ্যে না। এবং আরও আশ্চর্য হয়েছিল, বিচিত্র বেদনাহত অবস্থায় ওই বৃদ্ধকে দেখে। যেন কত বেদনা, কত উদাসীনতা। মধ্যে মধ্যে চোখে জলও পড়তে দেখেছে। কিন্তু প্রশ্ন করতে সাহস হয়নি। তবে মনে হয়েছে, ঠিক তারই মত দাদুর মনের মূলে সুরটি এদের সঙ্গে পৃথক। স্টুডিয়োয় ঢুকলেই এই বেসুরো মানুষটা আত্মপ্রকাশ করত। উদাস দৃষ্টি বেদনায় আচ্ছন্ন, চোখে জল পড়ে। ও ঘরে সে ঢুকত না। সাহস হত না তার। ভাবত, অনধিকার চর্চা। সে নিজের অধিকারের গণ্ডি লঙ্ঘন কেন করবে? উনি স্টুডিয়োতে ঢুকলে বাড়িটার প্রত্যেকেই প্রহরারত নন্দিকেশ্বরের মত তর্জনী উদ্যত করে শাসন করে, চুপ। ছবি আঁকতে বসেছেন। চুপ। ও ঘরে যাবে না ছেলেরা! নিজেরাও যায় না। উনি বেরিয়ে এলে চুপি চুপি গিয়ে দেখে আসে, কি ছবি আঁকা শুরু করেছেন। কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরে আসে, দেখতে পায় ক্যানভাসটা সাদাই আছে। অবশ্য তাগিদে বরাতে কিছু আঁকেন, ওরা হৈ হৈ করে, উনি বিষণ্ণ হাসেন।

এরই মধ্যে সে আই-এ পাস করলে ফার্স্ট ডিভিসনে। সমস্ত কিছুর মধ্যেও আর কিছু না হোক সে পড়াশুনার সুবিধেটা পেয়েছিল। তা পেয়েছিল। অসুবিধে ছিল, তবু আনন্দের মধ্যেই সহ্য হয়ে গেছে। এঁদের বাড়ি খাওয়া থাকা ছাড়া আর কিছু পেত না, তবে পাজোর কাপড় জামা দিয়েছিলেন, আর পরীক্ষার ফিজটা দিয়েছিলেন। মাত্র এক বাড়িতে একটি ছেলেকে পড়িয়ে দশ টাকা পেত, তা থেকেই চলেছে কলেজের মাইনে। সম্বল একপাশে এক টাকার সবটাই খরচ হয়ে দাঁড়াল তিরিশ টাকা।

পরীক্ষার খবরে সে খুশি হল। ফার্স্ট ডিভিসন, অখুশি হবার নয়। সে সর্বাগ্রে ছুটে গেল দাদুকে প্রণাম করতে। আজ অধিকার অনধিকার বিবেচনা করলে না, গিয়ে ঢুকল স্টুডিয়োতে। উনি চুপ করে বসেছিলেন। সামনে ইজেলে ফ্রেমে আঁটা কাপড়, তুলিটা নামানো, উনি জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন। একটু চঞ্চল পলেই সে ঢুকেছিল, তবুও তাঁর তন্ময়তা ভঙ্গ হয়নি। অকারণে একটু কেশে সে বলেছিল, দাদু!

—কে? ও। কি খবর? কিছু সৌভাগ্য নিশ্চয়, তুমি তো কখনও এঘরে ঢোক না!

—আমি ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছি দাদু!

—বাঃ। বহুত আচ্ছা!

নীরা এবার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলেছিল, কিন্তু এইবার যে বড় ভাবনা হল দাদু। এরপর?

—পড়। পড়ে যাও।

—পড়া ঠিক এই রকম করে হয় না দাদু! তা ছাড়া—থাক দাদু।

—কেন ভাবছ আমি ভাবব ইঙ্গিতে তুমি আমার উপর চেপে বসতে চাও? না, তা ভাবব না। তোমাকে চিনি।

চুপ করে একটু বসে থেকে সে প্রসঙ্গটা পরিবর্তনের জন্যই বললে, কই, আঁকেননি তো কিছু? একটা দাগও পড়েনি।

—নাঃ।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব দাদু?

—কর। বল।

—বাড়িতে প্রায়ই শুনি আর শুনি তাগিদ ছাড়া বরাত ছাড়া ছবি আঁকেন না। মানে নিজের কল্পনায়। কেন?

মুখের দিকে চেয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নীরা সাহস করে বললে, দাদু!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, যা আঁকতে চাই তা যে কল্পনা করতে পারছিনে। নীরা, সংসারে রূপ অপরূপ অনেক এঁকেছি। দেখেছি, এঁকেছি। অরণ্য এঁকেছি, পাহাড় এঁকেছি, সমুদ্র এঁকেছি, আকাশে সূর্য চন্দ্র, সূর্যাস্ত সূর্যোদয়, প্রতিপদ পূর্ণিমার চাঁদ এঁকেছি, লতা গাছ ফুল মানুষ, মা প্রিয়া পূজারিণী বিধবা, শিশু যুবক বৃদ্ধ, অনাথ বিদ্রোহী প্রেমিক, মৃত্যু ভবনারত, মৃত সদ্যপ্রসূত দেখলাম আর আঁকলাম। ঝড় এঁকেছি, আলো এঁকেছি, অন্ধকার এঁকেছি। বুদ্ধ এঁকেছি, খ্রীস্ট এঁকেছি, গান্ধী এঁকেছি, রবীন্দ্রনাথ এঁকেছি, সুভাষচন্দ্র এঁকেছি। অনেক নাম, অনেক যশ, তার সঙ্গে অর্থও অনেক পেয়েছি। কিন্তু নিজে কি আঁকলাম? অথবা এ সবের পিছনে যিনি বা যা একটা কিছু তাকে কই আঁকলাম? পাচ্ছি না যে তাকে। যা বা যিনির মধ্যে এ সব আছে, সেই বিশ্বরূপ! কিসের শিল্পী আমি নীরা, তাঁকে আমি কল্পনা করতে পারিনে, তাঁকে আঁকতে পারিনে। মিছে—আমার সব মিছে হয়েছে। তাই তুলি ফেলে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে শুধু ভাবি, আর কাঁদি আমি নীরা।

বলে আকাশের দিকেই চাইলেন আবার। নীরা সন্তর্পিত পদক্ষেপে বেরিয়ে এল। তিনি অবশ্য ফিরেও তাকালেন না।

এই দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। মধুর তবু প্রচ্ছন্ন বেদনা আছে। তা থাক। বেদনায় মাধুর্যে, পৃথিবীর দিনরাত্রির মত সহজ আনন্দ প্রসন্ন।

আরম্ভ হল যেন রাত্রির পর দিন।

•

দ্বিতীয় দৃশ্য। প্রভাত যেন দ্বিপ্রহরের পথে অগ্রসর হচ্ছে। ডাক পড়ছে চারদিক থেকে, ঘণ্টা পড়ছে ইস্কুলে। আপিসে

নবপ্রকাশিত 'পার্ল' পুস্তকাবলী

PB-15, **আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক মানুষ :**
লেখক—জেমস বি. কোনাণ্ট; অনুবাদিকা—সাধনা দেবী। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা। মূল্য—৫০ নয়া পয়সা।

PB-16, **রক্তপলাশ :**
লেখিকা—ক্যাথারিন অ্যান পোর্টার; অনুবাদিকা—শিউলি মজুমদার। বিশ্ববিখ্যাত ছোটগল্পের সংকলন। মূল্য—৭৫ নয়া পয়সা।

PB-17, **আবার রাশিয়ায় :**
লেখক—লুই ফিশার; অনুবাদক—অধ্যাপক শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী। বিখ্যাত লেখকের রাশিয়ায় সাম্প্রতিক সফর। মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা।

PB-18, **মুক্তদ্বার :**
লেখিকা—হেলেন কেলার; অনুবাদক—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। অন্ধ, বধির ও মূক বালিকার আত্মার বাণী। মূল্য—৫০ নয়া পয়সা।

PB-21, **আমাদের পরমাণুকেন্দ্রিক ভবিষ্যৎ :**
লেখক—এডওয়ার্ড টেলার ও অ্যালবার্ট এল. ল্যাটার; অনুবাদক—বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি-ফিল, রসায়ন বিভাগ, কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ ইয়র্ক। সচিত্র। মূল্য—এক টাকা।

PB-22, **এব্রাহাম লিংকন :**
লেখক—লর্ড চার্নউড; অনুবাদক—আশু চট্টোপাধ্যায়। সেই অত্যাশ্চর্য প্রেসিডেন্টের শ্রেষ্ঠ জীবনালেখ্য। ৪৫৪ পৃষ্ঠা। মূল্য—এক টাকা।

পার্ল পাব্লিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড,
বোম্বাই-১

একমাত্র পরিবেশক : **ইণ্ডিয়া বুক হাউস**
২০-এ, লিণ্ডসে স্ট্রীট
হুমায়ুন কোর্ট;
কলিকাতা-১৬

আপিসে লোক ছুটছে। দরজা খুলছে। সে চিন্তায় পড়েছিল। এখানে থেকে কি করবে সে? এখানে এদের কাজ কিছু নেই। ছেলেরা ঠিক তার কাছে পড়ে না। নামমাত্র বসে। তারপর উঠে যায় ওদের কাকু শিবনাথবাবুর বড় ভাইপোর কাছে।

হঠাৎ সেদিন সে চমকে উঠল। দাদু উল্লাসে চিৎকার করছেন, বিনো-দা! আরে বাপরে। বিনো দা' দি গ্রেট। জয় ভগবান, সর্বশক্তিমান, জয় জয় ভবপতি। অভিমানের বদলে আজ নেব তোমার মালা! হে বিনো-দা!

হা-হা হাসিতে গোটা বাড়িটা ভরিয়ে দিয়ে কে হেসে উঠল। এবং সে এক ভরাট কণ্ঠস্বরে বিরক্তভাবে বললেন, আরে-আরে ওকি হচ্ছে, ওকি হচ্ছে। দাদু! ইউ আর লাভলি, ইউ আর গডলি! আই অ্যাম ম্যাডলি ইন লাভ উইথ ইউ।

—চুমু খাবো বিনো-দা, তোমায় চুমো খাবো। বিশ্বাস কর, মুখে গন্ধ নেই, পুরানো দাঁত একটাও নেই, কোন জার্ম নেই। তুমি আজ দু বছর আসো নি। কিন্তু টুপিটা কেন? ওটা তো আগে পরতে না।

আবার হেসে উঠলেন তিনি। বললেন, টাকের জন্যে দাদু। টাকের জন্য। দেখুনে না।

—হে ভগবান! এ যে প্রায় মনুমেণ্টের পাদদেশ করে ফেলেছ। অনবরত মিটিং বুঝি? কিন্তু দেশ তো উদ্ধার হয়ে গেছে। না 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়'দের দলে জুটে মিটিং বাড়িয়ে ফেলেছ? কিন্তু তারা তো আণ্ডারগ্রাউণ্ড হে। দরজা বন্ধ করব নাকি!

—রামোচন্দর। ও সব বাদ দিয়েছি। বিশ্বাস করুন। কিন্তু টাক পড়ার কারণটা বুঝছি না। বংশে তো নেই, আমার হয়ে গেল। তা থাকগে এখন আপনার ঝণ্টুর দলকে ডাকুন, কিঞ্চিৎ বিলাতী মিষ্টান্ন আছে, অর্থাৎ টফি লজেন্স। আলাপ করা যাক, ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

—এ যে অনেক গো বিনো-দা! এত?

—সেখানে যে আমার [illegible] আছে। সে তো কম নয়। আপনি [illegible] জানতেন, সাত আটটি। এখন যে পঁচিশটি'। একেবারে পাকাপোক্ত পঞ্চাশ বিঘে জমির উপর পাকাবাড়ি, ইস্কুল, বোর্ডিং। বুঝলেন না। সরকার টাকা দিচ্ছে। আমাদের এডুকেশন সেক্রেটারি গিয়েছিলেন, দেখে এসে চীফ মিনিস্টার এডুকেশন মিনিস্টারকে বলেছেন, বিশ বাইশটে ছেলে, তা বিনো সেন খুব ভাল ম্যানেজ করছে; ডাকাতের দল হবে না, ওকে টাকা দেওয়া উচিত। তা টাকা দিয়েছেন।

বিস্ময়ের আর বাকী ছিল না নীরার। কে এই মহাপুরুষ? এতগুলি ছেলে। পঁচিশটি! ঠিক যেন ধরতে পারছে না ব্যাপারটা। দাদুর কোন বন্ধু সন্দেহ নেই, হয় তো দাদা। তা হলে বোধ হয় নাতি। আট নয় সন্তানের পিতা, আট নয় সন্তানের গড়ে দু বছর অন্তর সন্তান হলে, দু বছরে ষোলটি আঠারোটি, তার সঙ্গে আগের সাতটি যোগ করলে অবশ্যই পঁচিশটি হতে পারে। আরও বেশী হয়নি এই আশ্চর্য। ওদিকে বাড়িতে সাড়া পড়ে গেছে, দাদুর বড় মেজ দুই নাতি উঁকি মেরে দেখে সোরগোল তুলেছে, বিনো-দা, দিদি দিদি বিনো-দা এসেছেন, মা পিসীমা বিনো-দা!

দেখতে দেখতে ঘরটা ভরে গেল। বাচ্চাগুলো এবার সাহস করে ঢুকেছে। সেই কণ্ঠ-

দুর্গোৎসব

সৃষ্টির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে আছে ধ্বনি। সুপ্রাচীন ধর্মশাস্ত্র অথবা ভারতীয় রাগ-সঙ্গীত—যারই চর্চা আমরা করিনা কেন, নাদব্রহ্মের সত্যতা আমাদের এক নিগূঢ় শক্তির আশ্রয় দান করে। দেবদেবীর আরাধনা ও মন্ত্রের সুগম্ভীর ধ্বনিও মুহূর্তে আমাদের এক অকল্পনীয় ভাবলোকে নিয়ে যায়। সেখানে চরিত্র, বীর্য, মহত্ত্ব ও শান্তি। আগমনী গানের সুরসৃষ্টিতে দেবী দুর্গার আবাহনে সেই ভাবলোকের নিরন্তর শান্তি আজ বাঙ্গালীর জীবনে সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ।

কে, সি, দাশ প্রাইভেট লিমিটেড

আ/বিষ্কারক—রসোমালাই

কলিকাতা

আমার কাছে লজ্জা করতে নেই দেখছ, আমি বিনো-দা। ইউনিভার্স্যাল।

দিদি বললেন, এই খানে খাবেন, ইলিশ মাছ আনাই।

—অম্লান।

—এখনও নিম-সেদ্ধ খান না-কি? ভিটামিন?

আবার হাসি। সেই ঘরভরা হাসি। তারপর বললেন, না। তা আর খাইনে। তবে খাদ্যটা সত্যিই ভাল ছিল।

—আর ভাল ছিল।

—ভাল ছিল না? রঙটা দেখছেন তো? এ ওই নিম খেয়ে।

—আমার আর রঙ পরিষ্কারের দরকার নেই, ওই আপনার কৃষ্ণবর্ণ দাদুকে বলুন। তারপর হঠাৎ বললেন, নীরা তুমিও খেয়ে দেখতে পার। তোমার রঙ কালো নয়, কিন্তু একটু মাটো।

বিনো-দা বললেন, না না না। স্বর্ণ-লতায় আর শ্যাম-লতায় তফাৎ আছে দিদি। ওই শ্যামলিমাতেই ও অপরূপা। জিজ্ঞেস করুন দাদুকে। কি দাদু?

দাদু বললেন, কি বলব বল, 'তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা' ও তো পড়োনি। আর আমাদের মত শিল্পীর চোখ তো নয় ওর। ওদের হল সর্বদোষ হরে গোরা। নইলে বিনো-দা তুমিই বল, আমার ভুবন আলো করা কালোরূপ থাকতে তোমার গৌরবর্ণে মুগ্ধ হয়!

বউ মেয়ে পালাল। সঙ্গে সঙ্গে সেও ফিরলে। দিদি হয় তো ঝগড়া করতেন, কিন্তু দাদুর জন্যে হাসতে বাধ্য হলেন, বললেন, বলব কি বলুন। বউ বেটীর সামনে, ছি! এখন চা খাবার পাঠাচ্ছি। বীণার ঘর থেকে হারমোনিয়ম পাঠাচ্ছি। গান শোনান।

—যা আজ্ঞা করবেন। কিছু লবঙ্গ পাঠাবেন তা হলে।

আবার একবার চমকে উঠল নীরা। এ কি কণ্ঠস্বর! গান রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু যেমন কণ্ঠস্বর তেমনি প্রাণ ঢেলে গাওয়া! বুকের মধ্যে প্রতিধ্বনি ওঠে। জানালার লোহার গরাদেতে হাত দিলে টের পাওয়া যায় কম্পন উঠছে। গাইছিলেন—

'আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি?
হায়, বুঝি তার খবর পেলে না।
পারিজাতের মধুর গন্ধ পাও—কি—
হায়, বুঝি তার নাগাল মেলে না।

কোলাহলমুখর চঞ্চল সংসারটার জীবন স্রোত, স্রোত কল্লোল, সব স্তব্ধ স্থির হয়ে গেছে। যমুনা হয় তো এমনই ভাবে উজান বইত। কিন্তু ভগবান যাকে দেন, তাকে কি এমনি করে দু হাত ভরে দিয়েও ক্ষান্ত হন না, পরিপূর্ণ করে উপচে মাটিতে ফেলে দেন? এ লোক তো গান গাওয়ার মত গায় না!

দিদি বললেন, হ্যা বটে। সুধা আপনার প্রাণে আছে। খবর কেউ পেলে না।

আবার সেই হাসি।

দিদি বললেন, একখানা ভক্তি রসের হোক। রবীন্দ্রনাথেরই।

—উঁহু। এগুলো এই প্রেমের গান, নতুন শিখেছি এখন। সেগুলো পুরনো, মনে হচ্ছে।

একটি আদর্শ সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠান

দি কমনওয়েলথ এসিওরেন্স

কোম্পানী লিঃ

হেড অফিস:—পুণা
স্থাপিত—১৯২৮
প্রধান কার্যালয়:—৮২, মেডোস স্ট্রীট ফোর্ট, বোম্বাই—১

দৃঢ়তম আর্থিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত "কমনওয়েলথ" সন্তোষজনক সেবা দ্বারা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

আপনার সাধারণ বীমা বিষয়ক যাবতীয় প্রয়োজনের জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

কলিকাতা শাখা: ১২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১
টেলিগ্রাম—কমনওয়েলথ : টেলিফোন—২২-১৪৮১

—তবে শুনবেন।

—মহাত্মাজীকে যেদিন হত্যা করেছে, সেই দিন থেকে গানটাই ভুলে গেছি। খাইদাই, ওই অনাথ আশ্রমটা করেছি, তাই করি, ছবি আঁকি,, ও সব দামোদরে ভাসিয়ে দিয়েছি। এখন গান শুনুন—বলেই ধরে দিলেন,

কান্না হাসির দোল দোলানো
পৌষ ফাগুনের পালা—
তারই মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা।
এই কি তোমার খুশি,
আমার তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ ঢালা।

গানের পর গান, বেলা দেড়টা পর্যন্ত। তারপর স্নান খাওয়া। সে রাত্রিটাও রইলেন তিনি। ছেলেদের সঙ্গে দেখা না করে যাবেন কি করে! বিকেলবেলা দাদু তাকে ডাকলেন, বললেন, নীরা, বিনো-দা তোমার কাহিনী শুনে তোমার ভক্ত হয়ে পড়েছেন। বলছেন, তুমি যদি ও'র অনাথ-আশ্রমে যাও, কাজ কর, তবে উনি তোমার কাজ দেবেন। বিদ্যে পড়ারও খুব সুবিধে করে দেবেন। অবশ্য প্রাইভেটে।

বিনো-দা বললেন, আমার এক মাস্টার-মশাই আছেন। বুড়োমানুষ। পণ্ডিত লোক। মাস্টারি কলেজেই করতেন। রিটায়ার করে নুরুদ্দিন, দেশে গিয়েছিলেন, ময়মনসিংহে সেই, ভৈরবের ধারে। দেশভাগের সময় আসতে গিয়ে [illegible] এসেছেন, দুটো নাতি এসেছে, আর বিধবা বৌমা, বাকী সব খতম। সর্বস্বান্ত। আমি তাকে ওখানে নিয়ে গেছি। যা পারি সেবা করি। উনি এটা ওটা করেন। তুমি পড়লে সানন্দে পড়াবেন। মাইনে দেব চল্লিশ টাকা, আর খেতে পাবে দু বেলা বোর্ডিং-কিচেনে। আরও দুটি মেয়ে মাস্টার আছেন, একটি মহিলা আছেন ছোট বাচ্চাদের দেখেন, এঁরা সবাই কিচেনের খাবার পান, তার ওপর নিজেরা যে যা পারে করে নেয়। এই আর কি! তোমার মত একটা মেয়ে বাংলাদেশে জন্মায় শুনেই তো আমার নাচতে ইচ্ছে করে। বই-কাগজে এ দেশের মেয়েরা দুঃখে দুর্দশায় কেবল অধঃপাতে যাচ্ছে, মিথ্যে বলছে, নিজেদের বেচছে, চোখে কাঁদছে আর কাজল পরছে, ঠোঁটে রঙ মাখছে, এই তো শুনি। এমন হয়েছে যে মেয়ে দেখলেই সন্দেহ হয়, কে রে বাপু, কি এর কাহিনী। তা তোমার কথা শুনে ভারী ভাল লেগেছে। তোমার মত মেয়ের উপকারই আমি করছি তা নয়, মনে ভরসা হচ্ছে, আশ্রমটা গড়ে তুলতে পারব।

সেও এর মধ্যে বিনো-দার কাহিনী শুনেছিল।

বিনো-দা—বিনয় সেন, আর্ট ইস্কুলে পড়তে পড়তে টেগার্টের চেষ্টার অপরাধে ধরা পড়ে জেলে ঢুকেছিল। হাতেখড়ি তার আগেই হয়েছিল। তখন তার বিশ বছর বয়স, ১৯৩১ সালে।

তিন বছর জেল—সশ্রম কারাদণ্ড। তারপর ডিটেনসন। তারপর বেরিয়ে এসে গণ-সংযোগ। ছবি আঁকা অবশ্য বন্ধ হয়নি। জেলে প্রথম কাঠকয়লা। তারপর কাগজ রঙও জুটেছিল। ডিটেনসনে সব যোগাড় হয়েছিল, ইংল্যান্ড থেকে বিলিতি তুলি রঙ, সব। ডিটেনসনের আর একটা সুবিধা হয়েছিল, গ্রামটা ছিল বোলপুরের কাছে, [illegible] শিল্পী নন্দলালের কাছে মাঝে মাঝে যেতেন। ওখানকার অন্য শিল্পীদেরও সাহচর্য শিক্ষা তাও পেয়েছিলেন। বেরিয়ে এসে গণসংযোগ করতে করতে হঠাৎ কলকাতায় এসে আবার বছরখানেক আর্ট ইস্কুলে পড়ে বেরিয়ে এলেন খ্যাতিমান হয়ে; সেবারকার একজিবিসনে [illegible] মেডেল পেলেন। তখন এক বছর খাঁটি শিল্পী হয়ে কলকাতায় কাটিয়েছিলেন। সেই সময়েই দাদুর সঙ্গে আলাপ। কিছুদিন শিষ্যত্বও করেছিলেন। সেই সময় বিনয় সেনের চেলারা এসে ডাকত 'বিনো-দা'। একদা দাদুও বললেন 'বিনো-দা'। সে নামটা কলকাতায় ছড়াল। বেশী বয়সীরাও বলতে লাগল, বিনো-দা। তারপর বিনো-দা হঠাৎ আবার উধাও। এবার একেবারে মহাত্মাজীর আশ্রমে। সেখানে বছরখানেক থেকে ফিরে এসে এবার গণসংযোগ। সেই সময়েই এই অঞ্চলে গিয়েছিলেন। বছর আড়াই পরে বিয়াল্লিশ সাল। ফের বিনো-দা জেলে। বেরুলেন পঁয়তাল্লিশ সালে। তখনই এই আশ্রমের পত্তন। বিয়াল্লিশে এই অঞ্চলে শুরু করেছিলেন আশ্রমের ঘর। ফিরে যখন সেখানে গেলেন, তখন দুর্ভিক্ষে মড়কে গ্রাম শেষ। ছিল দুটি তিনেক ব্যাধিগ্রস্ত কঙ্কালসার মেয়ে, একটি পুরুষ আর দুটি চারেক ছেলে। কাজ শুরু করেছিলেন তাদের নিয়ে। সাতচল্লিশে দেশ স্বাধীন হল, সেবার তিনি পেলেন একটি বড় শিল্পীর সম্মান। সেই বছরই তিনি গেলেন ফ্রান্সে। আশ্রমের ভার দিয়ে গেলেন এক অনুগামী কর্মীকে। ফিরে এলেন গান্ধীজীর তিরোভাবের পর। অর্থাৎ মাস কয়েক থেকেই। বললেন, কি হবে আর ছবি এঁকে! চাকরী তিনি দু তিনটে পেয়েছিলেন। কিন্তু তার কোনটা নিলেন না, এসে বসলেন এই অরণ্যভূমে, সেই গ্রামটিতে। গড়ে তুলতে লাগলেন। মধ্যে মধ্যে কলকাতায় আসতেন, তখন ঘন ঘনই আসতেন, দাদুর বাড়ি আসতেন, দু বেলা খেয়ে গান শুনিয়ে চলে যেতেন। মধ্যে মধ্যে দিল্লিও যেতে হয়। একদা মহাত্মার স্নেহ পেয়েছিলেন, আজ যাঁরা রাষ্ট্রের কর্ণধার তাঁরা এই খেয়ালী প্রিয়দর্শন শিল্পী কর্মীকে চেনেন, তাঁর গানও

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
লিমিটেড

(স্থাপিত ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৬ সাল)

অনুমোদিত বিলিকৃত এবং
বিক্রীত মূলধন—৫,৫০,০০,০০০্ টাকা

আদায়ীকৃত মূলধন—
৩,০০,০০,০০০্ টাকা

সংরক্ষিত তহবিল—
৩,১০,০০,০০০্ টাকা

হেড অফিস:
মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বাই।

—শাখাসমূহ—

কলিকাতা—২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড (মেইন অফিস), ৫৯, কটন স্ট্রীট, বড়বাজার এবং ৩নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। আমেদাবাদ—ভদ্রা (মেইন অফিস), এলিস ব্রিজ, গান্ধী রোড, মানেক চক, নভরংপুরা, স্টেশন ব্রাঞ্চ। বোম্বাই—আন্ধেরী, বান্দ্রা, বুলিয়ন এক্সচেঞ্জ, চার্চ গেট, কোলাবা, ফোর্ট, কলবাদেবী, মালাবার হিল, সায়ন। অমৃতসর, বাঙ্গালোর, বরোদা, ভুজ (কাচ), কালিকট, কোয়েম্বাটোর, দিল্লী, গান্ধীধাম (কাচ), হায়দরাবাদ (ডেকান), জামসেদপুর, জুনাগড়, কানপুর, মাদ্রাজ, সোকারপেট, নাগপুর, নাগপুর সিটি, নিউদিল্লী, পালানপুর, পুণা, পুণা সিটি, রাজকোট, সোলাপুর, সুরাট, ভেরাভল, ভিজাগাপটম।

বৈদেশিক শাখাসমূহ—লণ্ডন—১৭, মুরগেট, লণ্ডন, ই সি ২। এডেন, দার-এস-সালাম, জিঞ্জা, কাম্পালা, করাচী, মোম্বাসা, নাইরোবী, ওসাকা, সিঙ্গাপুর, টোকিও।

পৃথিবীর সমস্ত প্রধান দেশে এজেন্টস ও করস্পণ্ডেন্টস্ রহিয়াছে।

পরিচালকবৃন্দ—স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর, ব্যারনেট, জি-বি-ই, কে-সি-আই-ই, চেয়ারম্যান, মিঃ এ ডি শ্রফ, ভাইস-চেয়ারম্যান, মিঃ আম্বালাল সারাভাই, মিঃ রামনিবাস রামনারায়ণ, মিঃ ভগবানদাস সি. মেটা, মিঃ কৃষ্ণরাজ এম. ডি. থ্যাকারসে, মিঃ মদনমোহন মঙ্গলদাস, মিঃ এম. কে. পেটিগারা, মিঃ জগমোহন-প্রসাদ গোয়েঙ্কা, মিঃ জয়সিং বিঠলদাস।

জেনারেল ম্যানেজার—
মিঃ টি. আর. লালওয়ানী।

কলিকাতা কমিটি—মিঃ এম. বি. ইজিকায়াল।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ভার লওয়া হয় এবং অনুমোদিত আমদানিকারীদের লেটার অফ ক্রেডিট দেওয়া হয়।
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কারবারের সুযোগ-প্রদান হয়।

এস. কে. চৌধুরী, এজেন্ট,
২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-১

নব

অগ্রদূত
সংবাদ !!

অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন ঃ
দীপ্তি রায় ॥ অসিতবরণ
শোভা সেন ॥ জহর গাঙ্গুলী
শিশির বটব্যাল ॥ সীতা
মুখার্জি ॥ তিলক
বা বু য়া ... ও
সুচরিতা সান্ন্যাল
— পরশমল-দীপচাঁদ রিলিজ —

শুনেছেন। তাঁকে ডাকতেন শিক্ষাদপ্তর; সমাজকল্যাণ দপ্তর। তিনি যেতেন। পথে দাদুর বাড়ি ইলিশ মাছ না খেয়ে আর গান না শুনিয়ে যেতেন না। তারপর এই দু বছর একেবারে আসেননি: দু বছর পর এসেছেন, বাড়ি মেতে উঠেছে। উজ্জ্বল বাড়ি উজ্জ্বলতর হয়েছে। এই সর্বজনীন বিনো-দা; শিল্পী দেশসেবক বিনয় সেন। তিনি বললেন, যাবে আমার সঙ্গে?. দেখ!

নীরা বললে, যাব।

...গা তার ভাগ্য! একজন খ্যাতিমান ... সেদিন তার অটোগ্রাফের খাতায় ...খে দিয়েছেন—

পিছে তোর পড়ে থাক নগরীর দীপ

মানুষের ঘরে জ্বালা ভীরু শিখা আলো—
ভয় কিরে? চিরদিন আঁধার সমুদ্রে

যাত্রীদলে নক্ষত্রেরা দিগন্ত দেখালো।
এতো ধ্রুবতারার আলো।

চল উত্তর মুখে। ওই ...। শ্রেষ্ঠ পথ।

॥ ছয় ॥

এসেছিল বিনো-দার সঙ্গে অনাথ আশ্রমে। এই তৃতীয় দৃশ্য, এই দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্য। ছ বছর ধরে একটি দৃশ্য। শেষ হল আজ। আকাশের নক্ষত্রও খসে পড়ে অঙ্ক শেষ। নাটক নয়? থাক সে কথা। আশ্চর্য বিশ্বাস এবং আশা নিয়ে এসেছিল। এখানে পৌঁছনোর দিনের কথা মনে পড়ছে। বিনো-দার সঙ্গে সে এসে নামল। চারিদিকে নতুন বাড়ির পত্তন হয়েছে, রাজমিস্ত্রী মজুর খাটছে। একপাশে কতকগুলি মাটির বাড়ি। সবই দো-চালা ঘর। সামনে শালখুঁটির বারান্দা। আঁকা-বাঁকা কাঁচা শাল কেটে লাগানো হয়েছে—যথাসম্ভব কম খরচের জন্য বোধহয়। ওদিকে যার পত্তন হয়েছে সে এর তুলনায় রাজসূয়ের আয়োজন। শান্ত শ্যামশোভায় স্নিগ্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে ঘন গেরুয়া রঙের কাঁকুরে প্রান্তর, তার মধ্যেও ছোট ছোট শাল-চারা জন্মেছে অজস্র। পথে দামোদর-ভ্যালি কর্পোরেশনের দুর্গাপুর ব্যারেজের কাজ শুরুর আয়োজন দেখে এসেছে! তারা যেতেই গোটা আশ্রমে সোরগোল উঠেছিল।

বিনো-দা এসেছে। বিনো-দা, বিনো-দা, বিনো-দা! গোটা আশ্রমের ছেলে মেয়ে। শিক্ষয়িত্রীরা তিনজন। বিনো-দার চ্যালা কজন। দেখতে কয়েকজন গ্রামের লোকও এসেছিল। গ্রামে আবার লোকজন বসতে শুরু করেছে। ঘরদোর করেছে। এক বৃদ্ধও এলেন। চিনতে বাকী রইল না—ইনিই সেই মাষ্টার মশাই। কিন্তু উল্লাস উচ্ছ্বাসটা যেন ঘা খেলে। সকলের চোখে মুখে একটি প্রশ্ন জেগেছে—সঙ্গে এ কে? অর্থাৎ নীরা। নীরা মুখ নত করতে বাধ্য হল। শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে গোপনে ইশারা শুরু হয়েছে, একজন একজনের আঙুল টিপছেন। কিন্তু চোখ তারই উপর। একজন স্থূলাঙ্গী—একটু বয়স হয়েছে। অপরজন ক্ষীণাঙ্গী, বয়স ধরা যায় না, তবে বয়স অপরজনের কাছাকাছিই হবে। তাদের পাশে আর একজন, বিধবার সজ্জা—মেয়েটি সুন্দরী—তার থেকে কিছু বয়স বেশী, হয়তো বত্রিশ চৌত্রিশ। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকে দেখছেন। আশ্চর্য বিস্ময় এবং প্রশ্ন তাঁর চোখে। বৃদ্ধটি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কে বিনো?

বিনো-দা বললেন, ও নীরা, এক ভৈরবী মেয়ে। এখানে কাজ করবে। ওই দুষ্টুদের শায়েস্তা করবে। আর আপনার ছাত্রীও বটে, আপনার কাছে পড়বে। আই এ পাশ করেছে ফার্স্ট ডিভিসনে। বি এ-র ভার আপনার মাষ্টার মশাই। আরে জামা ধরে টানিস কেন? কোনটা রে?

পিছন দিকে তিন চারটে বাচ্চা ওঁর জামা ধরে টানছিল।

স্থূলাঙ্গী মেয়েটি হেসে বললে—ওদের পাওনার জন্যে ওরা যে সব চুল-বুল করছে

বিনো-দা বললেন, আমার সন্দেহ, ওদের চুলবুলুনির পিছনে লীডারদের উস্কানি আছে। আমি তো পলিটিক্যাল লীডার ছিলাম, আমি তো জানি, ব্যাংকের হুকুম না এলে ফাইলদের অ্যাকশন শুরু হয় না এবং আমি আরও জানি যে, ওদের দিদি-মণিরা ও মাস্টার ওদের চেয়েও লজেন্স টফি খেতে ভালবাসেন।

একেবারে হেসে ভেঙে পড়লেন স্থূলাঙ্গী। তিনি ওই ক্ষীণাঙ্গীর কাঁধে ভর দিয়ে হাসছিলেন, ক্ষীণাঙ্গীও হাসছিল। বিনো-দা বললেন, একটু সামলে অণিমাদি, বেচারী কমলা কাঠির মত মানুষ আপনার ভারে ও মট করে না ভেঙে যায়।

সমবেত সকলেই হেসে উঠল। এমন প্রসন্ন রসিকতায় সব যেন ঝলমল করে উঠেছে। অণিমাদি তো হেসেই খুন। ক্ষীণাঙ্গী কমলাও খিলখিল করে হাসছে। নীরাও হাসছে। কিন্তু হঠাৎ চোখ পড়ল বিধবাটি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। বিনো-দা এগিয়ে গিয়ে টফি এবং লজেন্সের ঠোঙা তার হাতে দিয়ে বললেন, নাও, দাও বণ্টন করে। কিন্তু তুমি হাসছ না কেন প্রতিমা?

—হাসছি তো!

—না! যাও ছেলেদের মা-মণির কার্য কর।

কতকগুলো হাতে নিয়ে বাকীটা ঠোঙা-সুদ্ধ তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, দিদিমণিরা আমার কাছে। এখানে উল্টো ক্রম, মানে, বড় থেকে ছোট। ফার্স্ট অণিমাদি। কাম। নাও কমলাদি। নাও শ্রীমতী নীরা—এস-এস। আচ্ছা। এইবার মাষ্টার মশাই। এবার আমি। নিজের মুখে লজেন্স পুরতে পুরতে

বললেন, দিদির [illegible] ফেরার পথে বেনারসে নেমে[illegible]লাম সার। গোপীনাথ কবিরাজ মশায়ের সঙ্গে দেখাও করেছি। আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, এ প্রশ্ন কার? তোমার তো হতে পারে না। বললাম—কেন বলুন তো? বললেন, এ প্রশ্ন যারা করবে তাদের মুখের চেহারা আলাদা হয়। আর সে বয়সও নয় তোমার। বুঝুন!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। কি বললেন?

—বললেন—একটু নির্জনে চলুন, বাচ্চারা হৈ হৈ করছে।

নীরাকে টেনে নিয়ে তখন অণিমাদি আলাপ জুড়ে দিয়েছেন।

—আশ্চর্য চেহারা ভাই তোমার। দেখলেই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে, আবার ভয়ও হয়। বলেই জড়িয়ে ধরে আলাপ শুরু।

—কিন্তু ভবিষ্যতে যদি মোটা হও, তবে আর দুঃখের সীমা থাকবে না। এই লম্বা তুমি, আমার ডবল মোটা হয়ে যাবে। বলেই হাসতে শুরু করে দিলেন।

কমলাদি বললেন, নমটিও তোমার বেশ ভাই নীরা।

নীরা এবার বললে, প্রতিমাদি কি এখানে? আপনারা দিদিমণি উনি মা-মণি কেন?

হাসি শুরু করেছিল অণিমাদি কিন্তু কমলা একটু রূঢ় স্বরেই বললেন, অণিমাদি! ওকি! সে থেমে গেল।

কমলাদি বললেন, উনি ছোট বাচ্চাদের দেখেন। তাই মা-মণি।

তারপর আবার বললেন, দেখ, আমরা ঠিক জানিনে। তবে মনে হয় জীবনে সন্তান হারিয়েছিলেন, বিনো-দাকে তো দেখলে, উনি এখানে এসে অনেক ছেলের মা করে দিয়েছেন। অবশ্য প্রতিমাদি আমা[illegible] আগে এসেছেন। বোধ হয় উনি [illegible]দার আত্মীয়া, তা না-হয় তো আগের চেনা [illegible]। বিনো-দার একটু বেশী স্নেহও আছে, প্রতিমাদির দাবীও একটু বেশী। মানে আমরা যা পারি না। এই আর কি! প্রতিমাদির জীবনে দুঃখ আছে। বুঝেছ না। উনি ওইরকম।

নীরব[illegible] এরই মধ্যে আবদ্ধ হয়েছিল বৃদ্ধ [illegible]শিক্ষক এবং শিষ্যের দিকে। গভীর আলোচনায় মগ্ন দুজনে। এ বিনোদাকে সে এই কদিনের মধ্যে দেখেনি। এ এক নূতন মানুষ; গোপীনাথ কবিরাজের কথা এই কিছুদিন আগে আনন্দবাজারে পড়েছে। বিরাট মনীষী। যে মানুষ তাঁর কথা নিয়ে আলোচনা করছে সে যেন ঝড়ো বাতাসে চঞ্চলপল্লব বনস্পতি নয়, সে যেন এই মুহূর্তে একটি পাথরের বা ধাতুর তৈরী স্তম্ভের মত হয়ে গেছে। গুরু শিষ্য দুজনেই শুধু নির্বাক হয়ে ওই স্তম্ভের দিকে তাকিয়ে আছেন।

হঠাৎ গোলমাল উঠল। অণিমাদি বলে উঠলেন, গেল, গেল, দুটোর একটা গেল।

নীরা ফিরে দেখলে প্রতিমার দেওয়া টফি লজেন্স নিয়ে দুটি বড় ছেলেতে প্রচণ্ড মারামারি বাধিয়েছে। প্রতিমা একটা বাখারি কুড়িয়ে নিয়ে ওদের পিটছে নির্মম ভাবে। তবু ওরা ছাড়ছে না।

—আমি এ শরীর নিয়ে ছুটতে পারব না, তুমি যাও কমলা ভাই।

—আমি পারব ওই দৈত্যদের সঙ্গে? তার উপর প্রতিমাদি রাগলে যা করেন, জানো তো। ডাকো বিনো-দাকে ডাক।

নীরা বললে, আমি যাচ্ছি। সে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেল। সংকোচ করলে না। এবং দুই হাতে দুজনকে

বিভিন্ন পরিকল্পনার
সুষ্ঠু রূপায়নে

ডায়মণ্ডহারবার সেতু — ২৪ পরগনা

চ্যাটার্জী ব্রাদার্স

বিল্ডারস্ এণ্ড আর্কিটেক্ট্স্
১৪এ প্রতাপাদিত্য রোড
কলিকাতা ২৬

গ্রাম ঃ "স্ক্যাফোল্ড"

ফোন ঃ
৪৬-৩৮১৯
৪৬-১০৩৭
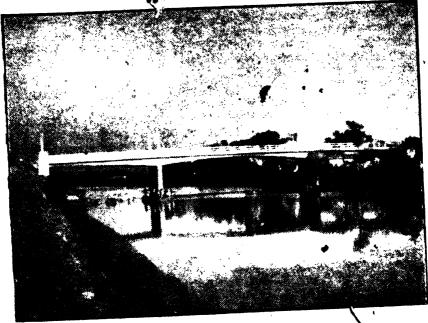
ধমক কঠিন কণ্ঠে বলল, ছাড়! ছাড়!

অপরিচিত একটি মুখ এবং সে মুখে যেন একটা কিছু ছিল যা তারা মা-মণি বা দিদিমণিদের মধ্যে দেখে নি। দেখে তারা ছেড়ে দিল; কিন্তু মুহূর্ত পরেই একটি ছেলে ক্রুদ্ধ হয়ে তার উপর লাফিয়ে পড়ল। চুলের মুঠোয় ধরে সে তাকে তুলে মাটিতে ফেলে দিয়ে বললে—তোমাকে আরও নিষ্ঠুর শাস্তি দিতাম আমি, কিন্তু আজ তোমাকে ক্ষমা করলাম।

প্রতিমা সেই বিস্মিত তিক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। নীরা বললে, আপনাকে আঁচড় কামড় দেয় নি তো।

—না। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েই সে ফিরল। এবং টফি লজেন্সের ঠোঙাটা ফেলে দিয়ে অণিমাদি বললে—ওকে বলো, এ আর আমি পারছি না। লোকও এসেছে, লোকেরও অভাব হবে না। আমি চলে যেতে চাই এখান থেকে। বলেই সে চলে গেল মাঠ ভেঙে ওদিকের ঘরগুলির দিকে।

অণিমাদি এবার হাসলে না—বললে, মরণ তোমার!

কমলাদি একটু হাসলে। নীরা বললে, কি ব্যাপার বলুন তো?

—ব্যাপার? মরণের ব্যাপার! আবার কি? তার ওপর তুমি এসেছ। আর রক্ষে আছে?

কমলাদি বললেন, থাকতে থাকতে সবই বুঝবে ভাই। দু-দিন দিন।

অণিমাদি বললেন বুঝবে আর ছাই। ওই শিবের মত লোকটাকে অতিষ্ঠ করে দিলে না!

কমলাদি বললেন, সেব মিছে নিন্দে ভাই। মন যে বড় অবুঝ!

অবুঝ মেয়েটিকে তখনও দেখা যাচ্ছিল, ওই ও প্রান্তে ছুটির ঘরগুলির এলাকায় সবে ঢুকেছে। মন্থর ক্লান্ত গতিতে।

নীরার আর সন্দেহের সীমা রইল না। সে বুঝেছে—ওই সুন্দরী মেয়েটি বিনো-দাকে ভালবেসেছে। বিনো-দাও তা জানেন। হয় তো বা ভালও বাসেন। তবে? তবে, কেন তাকে এ দুঃখ দিচ্ছেন? কিসের জন্য? এমন মানুষের একি আচরণ? একটু মনে লাগল তার। কিন্তু হঠাৎ এমন আচরণ করলেন কেন? হঠাৎ নিজের মনেই প্রশ্ন করলে, তাকে দেখে? সে হাসতে গেল কিন্তু পারলে না। ছি!

পরের দিন থেকে শুরু হল কর্মজীবন।

বিনো-দাই এসে তাকে ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি নীরা-দি, বুঝলে। ইনি তোমাদের অঙ্ক কষাবেন, ইতিহাস পড়াবেন। আর তোমাদের খেলার মাঠে তোমাদের দৌড়াবেন চরাবেন খেলাবেন। কাল দুই বণ্ডাকে যা শায়েস্তা করেছেন শুনেছি আমি। দেখছ কতটা লম্বা—কেমন হাত। তিনি হাতখানা টেনে তুলে দেখালেন। আবার তেমনি সুন্দর মিষ্টি চেহারা এবং মন। তোমাদের ঝগড়া-ঝাঁটির বিচারও উনি করবেন। তোমাদের মা-মণিকে তোমরা বড্ড বিরক্ত কর। উনি শান্তশিষ্ট মানুষ; এই সব দুর্দান্তপনা সইতে পারেন না। ওঁর প্রমোশন হল, উনি আপীল শুনবেন আর ওই ছোট বাচ্চাদের দেখবেন, মানে মোটামুটি সবই দেখবেন। আপিসে বসে থাকবেন। বুঝেছ?

প্রতিমা বিনো-দার সঙ্গেই এসে ঢুকেছিলেন ক্লাসে। প্রসন্ন মুখেই এসেছিলেন। কাজ তার ভারী ভাল লাগল। সারাটা দিন আনন্দের মধ্যে দিয়ে দিনটা যে কোন-দিকে গেল সে বুঝতেই যেন পারলে না। সব সময় ক্লাস ঘরে নয়; মাঠে গাছতলায়। ওরই মধ্যে একজন চাষী মাস্টার আছেন, তিনি ছেলেদের নিয়ে মাঠে খাটেন খাটান। তখন অনেক বাগান হয়েছে, তোলা হচ্ছে। অণিমাদি দুপুরে চলাতে শুরু করেন, তখন গোলমাল করলে একেবারে রেগে খুন হন। দুহাতে পেটেন। কমলাদি বিকেলের দিকে মাড় হয়ে যান, দুর্বল মানুষ। নীরার ডিউটি আছে খেলার মাঠে, তাই এক ঘণ্টা আগে ছুটি। আপিস-ঘরে বইটইগুলি রাখতে এসে প্রতিমাদির সঙ্গে আলাপও হল। স্বল্পভাষী মেয়েটি। দেহে মনে খুব সবল নন বরং দুর্বল, তার উপর সারা-অন্তর-জোড়া দুঃখ। বললেন, তোমার কথা সব শুনলাম ওঁর কাছে। মানে তোমাদের বিনো-দার কাছে। ওঃ খুব শক্ত মেয়ে, বাহাদুর মেয়ে তুমি।

নীরা বললে, জলে ফেলে দিলে সবাই সাঁতার শিখে যায়। ভগবানই বলুন আর অদৃষ্টই বলুন আমাকে যে জলে ফেলে দিয়েছিল। কি করব, হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে কূল পেয়ে গেলাম।

প্রতিমাদি ঘাড় নাড়লেন—না। কি বোঝাতে চাইলেন তিনিই জানেন। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, শিবনাথ দাদুর বাড়িতে ক'বার ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?

—এই তো এবারই। একদিন।

চশমার ও দাঁত বাঁধাইবার কলিকাতায় শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। ডাক্তারেরা চক্ষু পরীক্ষা ও দন্ত-রোগের চিকিৎসা হয়। আধুনিক ফ্রেমের কলিকাতায় বৃহত্তম ষ্টকিষ্ট। ক্রয় না করিয়া দেখিয়া গেলেও আপনার উপযুক্ত ফ্রেম সম্পর্কে ধারণা করিতে পারিবেন

ইণ্টারন্যাশনেল অপটিক্যাল এণ্ড ডেণ্টাল করপোরেশন
২৮৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট (লালবাজারের নিকট)
কলিকাতা-১২। ফোন : ২২-৬৩৬২

আনন্দোৎসবে অপরিহার্য

"কাকাতুয়া" মার্কা ময়দা
"হ্যারিকেন" মার্কা ময়দা
"গোলাপ" মার্কা আটা
"ঘোড়া" মার্কা আটা

প্রস্তুতকারক
দি হুগলী ফ্লাওয়ার মিলস কোং লিঃ
দি ইউনাইটেড ফ্লাওয়ার মিলস কোং লিঃ

ম্যানেজিং এজেণ্টস
শ ওয়ালেস এণ্ড কোং লিঃ

নিবেদক : চৌধুরী এণ্ড কোং
৪/৫, বাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

—সে কি? ক'বারই তো উনি গেছেন কলকাতা! দিল্লির পথে।

—তা জানিনে। আমি তো দেড় বছরের মধ্যে দেখিনি।

—ও হ্যাঁ। উনি যে এ-কবার আসান-সোলে উঠেছেন, আসানসোলে নেমেছেন। তারপর হঠাৎ উঠে এসে তার হাত ধরে বললেন, তোমার সঙ্গে কাল আমার কথা বলা হয়নি। ছেলে দুটো এমন করলে! একটু হাসলেন, হেসে বললেন, কিছু মনে করনি তো?

—না—না। সত্যিই আপনার যা নরম-স্বভাব আর ডেলিকেট শরীর তাতে ও সামলানো সম্ভবপর হত না। বোধহয় ফেলে দিত আপনাকে। তবে, বড় সুন্দর আপনি—ওদের তাতেই বশ মানা উচিত।

মুখ ফিরিয়ে তাকালেন খোলা দরজার দিকে—তারপর বললেন, রূপ! তিক্ত হাসি ফুটে উঠল মুখে। নাঃ। সেই দুর্বোধ্য —না!

খেলার মাঠে সে কোমর বেঁধে দাঁড়াল। শুধু দাঁড়াল না, যে যখন পড়ল তাকে গিয়ে তুললে। ধুলো ঝেড়ে বললে, যাও যাও, ফের যাও।

বিনো সেন একটা চুরুট মুখে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন। খেলার শেষে বললেন, ওয়াণ্ডারফুল। কনগ্র্যাচুলেশনস।

সন্ধেবেলা অণিমাদি স্থূলকায় দেহ নিয়ে কাত হয়ে শুয়ে বললেন, কেমন লাগল?

—খুব ভাল।

কমলাদি একটা ওখানকার তৈরী ডেক চেয়ারে শুয়ে কপাল টিপছিলেন—হেসে বললেন, স্বাস্থ্য ভাল ভাই। ভাল লাগল। বাপ, খেলার মাঠে যা মূর্তি তোমার!

নীরা বললে, আজ কিন্তু প্রতিমাদিকে ভাল লাগল। আলাপ হল। বেশ মানুষ!

অণিমাদি বললেন, কাল যে লেকচারি-ফায়িং হয়েছে। দেড় ঘণ্টা!

—মানে বিনো-দা?

—হ্যাঁ গো। রোজ একটি করে লেকচার। অবশ্য এই এলেন বলে। সকলের ঘরে এসে খোঁজ করবেন, হাসবেন, হাসাবেন। লোকটা সাক্ষাৎ শিব, বুঝেছ! তারপর ওঁর ঘরে গিয়ে কোনদিন আধঘণ্টা কোনদিন এক ঘণ্টা। অবিশ্যি, পড়ান—ধর্মশাস্ত্র গীতা জাতক। কিন্তু কে শোনে? ওই ছাই চাপা দিয়ে যান, ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উড়িয়ে দেয়। কিছুতেই বুঝবে না বিনো সেনের মত মানুষ কাউকে ভালবাসে না, বাসতে পারে না!

নীরা বললে, কেন বলুন তো? উনি কি এমন, যে কাউকে ভালবাসেন না, বাসতে পারেন না?

কমলাদি বললেন, না। ঠিক তা নয়। উনি যে মানুষ তাতে বিয়ে আর করতে পারেন না। ভালো উনি প্রতিমাকে বাসেন, কিন্তু ও'র ভালবাসা প্লেটোনিক। আর প্রতিমাদি তার ধার ধারেন না।

—কমলাদি! অণিমাদি! বাইরে থেকে সেই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল। বিনো সেন।

ধড়মড় করে উঠে বসলেন অণিমাদি। —আসুন!

—এসেছি। আরে বাপরে, নীরাদি সুদ্ধ? ত্রিমূর্তি?

অণিমাদি বললেন, হ্যাঁ। তিনকন্যে বেড়ী। এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান— এক কন্যে রাগ করে বাপের বাড়ী যান।

—তা হলে শিবঠাকুর খুঁজি আমি। কিন্তু—

—কি কিন্তু?

—নীরা কন্যে যা কন্যে—তাতে ও সতীনও নেবে না—বুড়ো শিবও নেবে না। দেখেছেন তো খেলার মাঠে? ওঃ, চুলগুলো যা উড়ছিল, একরাশ কালো চুল। ওয়াণ্ডারফুল।

নীরা বললে, ওসব বললে আমি কিন্তু খেলার মাঠের ভার নিতে পারব না।

—আচ্ছা আচ্ছা বলব না। আমি একটা পরীক্ষা করলাম। ছেলেরা তোমাকে পেয়ে খুশি হবে ভেবেছিলাম। তা হয়েছে। এখন চল, মাস্টারমশায়ের কাছে—পড়বে। বসে আছেন তিনি।

অণিমাদি বললেন, প্রতিমাদির বাড়ি যাবেন না?

—সেরে এসেছি।

বৃদ্ধ হরিচরণ বসু, সর্বাঙ্গে বেদনাহত মানুষ। বললেন, নেবার আর কিছু নেই মা। সব গেছে, নেব কার জন্যে? নিয়ে করব কি? সবই বাহুল্য মনে হয়। তবে যেটুকু আছে, যতক্ষণ পারি দিয়ে যাই। তুমি যখন সুবিধে হবে আসবে। পড়াতে পেলে সব ভুলে থাকি। তুমি আমায় বাঁচালে।

পড়া শেষ করে যখন ফিরল তখন প্রায় দশটা। বাইরে বিনো-দার গান শোনা যাচ্ছে; একটু এগোতেই দেখলে আপন বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি গান গাইছেন, 'কান্নাহাসির দোল দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা।' ছোট একটি চিমনী জ্বলছে টেবিলের উপর। একখানা বইও নামানো। তিনি রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে গাইছেন। তিনি তার পায়ের শব্দে তাকালেন বোধহয়। একটা মাটির খোলা তার পায়ের স্লিপারের চাপে মড়মড় শব্দে ভেঙে গেল। —কে? নীরা?

—হ্যাঁ।

—পড়া শেষ করে ফিরছ বুঝি?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আলো নেই কেন? এখানে সাপ আছে।

—এইটুকু তো পথ।

—না। দাঁড়াও। একটু আগে একটা বড় সাপ বেরিয়েছিল মাঠে। টর্চটা নিয়ে পথে নামলেন। চলতে চলতে প্রশ্ন করলেন, কেমন পড়লে?

—খুব ভাল।

—হ্যাঁ খুব ভাল পড়ান উনি। জান, সংসারে উজাড় করে দিতে [illegible] সবাই তা পারে না। সেইটেই মানুষের বোধ হয় সব থেকে বড় ট্রাজেডি। যারা পারে, তারাই মহত্তম মানুষ। উনি তাই। পড় ও'র কাছে ভাল করে।

তারপর হঠাৎ বললেন, দেখ, প্রতিমাকে একটু সহ্য করে চলো। করুণা করো। ও বড় দুঃখী। ও—। মানে কথাটা তোমাকে বলাই উচিত, ও ঠিক তোমাকে পছন্দ করেনি। প্রশ্ন করো না। যাও।

ঘরে এসে বসে পড়ে খানিকটা স্তব্ধ হয়েছিল সে। ভুরু দুটি কুঁচকে উঠেছিল। —কেন? পছন্দ করেননি? তিনি কি ভাবেন—সে বিনো-দাকে ভালবাসে? না। সে দাঁড়িয়ে পড়তে এসেছে। জীবনে সে পথ করে নেবে।

নক্ষত্রের আলো ডাকে আঁধার সমুদ্র বক্ষে
নূতন দিগন্তে যারা তরণী ভাসালো।

বিনো সেন তখনও গাইছেন—এই কি তোমার খুশি—আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ ঢালা।

N. BANDURI & BROS.

(Estd. 1892)

Pioneer Manufacturers of
Bolts, Nuts, Rivets, Dogspikes etc.
Government & Railway Suppliers.

Works & Office : 33. Mahendra Bhattacherjee Road,
(Old—122. Circular Rd.)
P.O. Santragachi, Howrah Phone : 67-2868

City Office : 71 A, Netaji Subhas Road, Calcutta—1
ROOM N. B 23 PHONE : 22-7377
Telegram : "STUDBOLTS" HOWRAH

বিদ্যোদয়ের পূজা-প্রকাশন

প্রবন্ধ সাহিত্য

চিত্রদর্শন
কানাই সামন্ত

প্রবীণ চিত্র-সমালোচকের দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম ও গবেষণার ফল এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি। মননশীলতায় ভাস্বর এর প্রতিটি ছত্র। আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস, বিশেষ বিশেষ school ও শিল্পী সম্পর্কিত আলোচনায় সমৃদ্ধ এবং শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু কর্তৃক সুপ্রশংসিত এই অনন্যসাধারণ গ্রন্থখানি প্রবেন আর্ট কাগজে ছাপা ১৯খানি বহুবর্ণের ও ৪১খানি একবর্ণের চিত্রে সজ্জিত। মূল্য: ২৫.০০

মানববিকাশের ধারা
প্রফুল্ল চক্রবর্তী

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে লেখক জীবনের লীলা-মঞ্চ এই পৃথিবীর প্রস্তুতি-পর্ব থেকে শুরু করে জীবনের উদ্ভব এবং প্রাগৈতিহাসিক ও তৎপরবর্তী বিভিন্ন প্রাণীর ক্রমবিকাশ এবং সর্বশেষে মানবের উদ্ভব ও তার দৈহিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক পরিচয় দিয়েছেন প্রাঞ্জল ভাষায়। গ্রন্থখানি আর্ট পেপারে সুমুদ্রিত ৬০খানি চিত্রে সমৃদ্ধ। মূল্য : ১২.০০

পরিব্রাজকের ডায়েরী
নির্মলকুমার বসু

কত-না বিচিত্র মানবগোষ্ঠীর সম্মিলন-ভূমি আমাদের এই দেশ। বিচিত্র তাদের জীবন, বিচিত্র তাদের রীতিনীতি ও সংস্কৃতি। 'পরিব্রাজকের ডায়েরী'তে প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ নির্মলকুমার বসু এদেরই জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় তুলে ধরেছেন। পরিবর্ধিত সংস্করণ। মূল্য : ৪.৫০

উপন্যাস

মধুমিতা
সরোজকুমার রায়চৌধুরী

সরোজকুমারের এই নূতন উপন্যাসখানিতে প্রবীণ কথাশিল্পীর তীব্র সন্ধানী আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সমাজ-জিজ্ঞাসার এক নূতন দিগন্ত। মূল্য: ৬.০০

নাগিনী মুদ্রা
অমরেন্দ্র ঘোষ

বিলাসপুরীর সোনার লোভে এল মতি বাঈজী। তারপর হল পটপরিবর্তন। বিলাস ছুটলেন মতির পিছনে এবং তারই পরিণাম বোধ হয় দেখতে পেলেন বিশ্বনাথ ওঝা ঐ মরা হাঙরটার মধ্যে, কানপায় যার কাদছে রক্ত। মূল্য : ৩.৫০

কিশোর-সাহিত্য

স্বপনবুড়োর কৌতুক কাহিনী

বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের কাছে যুগান্তর-পাততাড়ির পরিচালক স্বপন-বুড়োর লেখার জনপ্রিয়তা অসাধারণ। তাঁরই নয়টি নূতন হাসির গল্পের সংকলন 'স্বপন-বুড়োর কৌতুক কাহিনী'। মূল্য : ৩.০০

পাতালপুরীর কাহিনী
খগেন্দ্রনাথ মিত্র

তিন পুরী নিয়েই আমাদের জগৎ— স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল। প্রবীণ শিশু-সাহিত্যিকের এই অভিনব কিশোর উপন্যাসখানি বিচিত্র সেই পাতালপুরীতে একটি কিশোরের বিচিত্রতর অভিজ্ঞতারই কাহিনী। মূল্য : ৩.০০

পরিভাষা কোষ—সুপ্রকাশ রায়	১০.০০
বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র	৬.০০
মহাভারত—শ্রীহেমদাকান্ত চৌধুরী	১২.০০
শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য—খগেন্দ্রনাথ মিত্র	৭.০০
সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা—ডাঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য	৬.৫০
বক্তব্য—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৫.০০
রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন—ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য	৫.০০
চলমান জীবন—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়	৫.০০
স্বর্ণালিম যুগ—আনা লুইস স্ট্রং	৩.২৫
উপন্যাস	
মনুরাক্ষী—সরোজকুমার রায়চৌধুরী	৩.০০
গৃহকপোতী—সরোজকুমার রায়চৌধুরী	৩.৫০
সূর্যগ্রাস—সুশীল জানা	৩.৭৫
তাপসী—প্রফুল্ল রায়চৌধুরী	৩.৫০
পথে-প্রান্তরে (২য় পর্ব)—বেদুইন	৪.০০
দুরন্ত নদী—আনা লুইস স্ট্রং	৪.৫০
কিশোর-সাহিত্য	
আমার ভালুক শিকার—শিবরাম চক্রবর্তী	২.৫০
গল্পময় ভারত—সুশীল জানা	৪.০০
অথ ভারত কথকতা—শ্রীকথকঠাকুর	২.২৫
আজব ভুলির দেশে—সুখলতা রাও	২.০০
গল্প আর গল্প—প্রেমেন্দ্র মিত্র	২.০০
সোনার ফসল—পাভলেংকো	২.০০
চীনের উপকথা—জয়ন্তকুমার অনূদিত	২.০০
সাইবেরিয়ায় শেষ মানুষ—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২.০০
দাবুর্তি'র রহস্য—মণীন্দ্র দত্ত	১.২৫

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী (হ্যারিসন) রোড ॥ কলিকাতা ৯

তিন বছর পর ১৯৫৪ সালে বি এ পরীক্ষা দিয়ে সে ডিস্টিংশনের সংগে পাস করলে। খবর পাঠিয়েছিলেন দাদু। টেলিগ্রাম করেছিলেন। বিনো-দা টেলিগ্রাম হাতে এসে বলেছিলেন, টেলিগিরাপ দিদি-মণি—বকশিস। সেলাম করে দাঁড়িয়েছিলেন।

বুঝতে পেরেছিল সে। ঢিপ করে একটা প্রণাম করে সে বলেছিল, দিচ্ছিরে, বকশিস তো মিল গিয়া।

—নাও। শুধু পাস নয়, উইথ ডিস্টিংশন'। আজ আমি ভোজ দেব। স্কুলের ছুটি। ছুটি তোমাদের, সব ছুটি আজ। নীরা দিদিমণি খুব ভাল করে বি এ পাস করেছে। রাতে আজ লুচি মাংস মিষ্টি।

নীরা ছুটে গিয়েছিল হরিচরণবাবুকে প্রণাম করতে। হরিচরণবাবু মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। বিশীর্ণ মুখে কৃষ্ণা চতুর্দশীর শেষ রাত্রির আকাশের ক্ষীণ চন্দ্রলেখার মত শীর্ণ রেখায় একটুকরো হাসি ফুটে উঠল। সে বুঝলে বেদনার অন্তর্নিহিত অর্থটুকু। তিনি মধ্যে মধ্যে বলতেন, এই পৌত্র দুটির বড় ভাই অর্থাৎ বড় পৌত্রের কথা। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছেলে ছিল। সে থাকলে সেও এবার বি এ দিত।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়তে চাইছিল, সেটাকে চেপেই সে বেরিয়ে এল। তারও মনে পড়ছে মাকে। বেরিয়ে এসে সে ফিরেই যাচ্ছিল ইস্কুলে। ওই ডাকাতদের সংগে খানিকটা হৈ চৈ করতে হবে। ওরা তাকে বড় ভালবাসে। ও সেই একদিনেই সেই ছেলে দুটোকে মেরেছিল। তারপর আর মারেনি। সে তো জানে এই সকল আপনজন-হারা ছেলেগুলির জীবনের কি ক্ষোভ; কি অভিমান। মন আছে তাই ফুল ফোটে। পরগাছা অর্কিডেও ফুল ফোটে, তাতে তার একটি গাছকে জীবনের সকল রস দিয়ে পরিপুষ্ট করতে; বুকে ক্ষত করে রক্ত দিয়ে পালন করার মত।

তাই সে দিতে চায়। প্রত্যেক ক্ষোভের ক্ষেত্রে, নিজের বাল্যকালের কথা স্মরণ করে, মিলিয়ে দেখে বিচার করে সে। আজ সে তার বাল্যকালের অন্যায়কেও সে দেখতে পায়। আজ সে ওদের সংগে হাসবে খেলবে গান করবে।

> আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি—
> হায়, বুঝি তার খবর পেলে না।

ছেলেদের নিয়ে সে গানটা রপ্ত করছে। শোনায় এবং বলে সমাজকে, সংসারকে। আজ সে নিজেও বলবে। সবাইকে বলবে। জীবনে কিছু কিছু সঞ্চিত সুধা-নির্ঝরের যেন স্বপন ভঙ্গ হয়েছে। আপন মনেই সে আবৃত্তি করতে করতে চলেছিল আনন্দচঞ্চল পদক্ষেপে—

> আমি ঢালিব করুণা ধারা,
> আমি ভাঙিব পাষাণ কারা,

আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।
এত কথা আছে, এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে—
প্রাণ হয়ে আছে ভোর॥

হঠাৎ সব ছন্দ তাল কেটে গেল। কাকে যেন স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসছে? সঙ্গে বিনো-দা। পিছনে দাঁড়িয়ে অণিমাদি আর কমলাদি!

কে আবার? বুঝতে বাকী রইল না। প্রতিমাদি। নইলে প্রতিমাদি কই? এই দিকেই আসছে যে। এইদিকেই তো তাদের কোয়ার্টার। এর মধ্যে তাদের কোয়ার্টারগুলি নূতন হয়েছে।

পথে দেখা হল। প্রতিমাদিই বটেন। বিনো-দা একটু হেসে বললেন, প্রতিমা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তুমি যাও আপিসে। কাগজপত্র দেখে সামনে রাখো। এরপর তো গোটা ইস্কুলের ভার পড়বে তোমার উপর। স্ট্রেচারের মধ্যে প্রতিমাদি প্রায় মরার মত নির্জীব হয়ে পড়ে আছেন।

অণিমাদি কমলাদির সঙ্গে দেখা হতেই তাঁরা বললেন, মা। কি কাণ্ড!

—কি হল বল তো?

—কি আবার? ঝগড়া করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেল। তোকে নিয়ে ঝগড়া।

—মানে?

—নেকী তুই।

কমলাদি বললেন, আপিসে এসু। এখানে—ছেলেদের সামনে নয়।

আপিসে সে শুনলে—কমলাদি আর অণিমাদি ক্লাসেই ছিলেন, ছুটি পেয়ে ছেলেরা নাচছিল। হঠাৎ চিৎকার শুনে ছুটে গিয়ে দেখল অফিস-রুমের দরজা বন্ধ। প্রতিমা প্রায় আর্তনাদ করছে, কই আমার জন্যে তো কর নি। আমিও তো পড়তে পারতাম। পাস করতে পারতাম। দুবার ফেল করেছি বলে—তুমি। বিনো-দা বলছিলেন, তার আগেও তুমি কলকাতায় একবার ম্যাট্রিক দিয়ে ফেল করেছিলে। এখানে দুবার ফেলের পর আমি বলেছিলাম, তুমি পড় না। পড়াতে চাও না। আমি নিজে তোমাকে পড়িয়েছি। তোমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত। তুমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তুমি কখনও আকাশের দিকে তাকাতে পারলে না। তোমার আমার সম্পর্ক তাও তুমি—

অণিমাদি বললেন—এই না ভাই, সে কি চিৎকার। ওই—ওই—ওই সব বিস্ময়ে দিলে—টানছে—। বাস উনি গম্ভীর গলায় বললেন, প্রতিমা। তারপর ধড়াস্। পতন ও মূর্ছা।

কমলাদি হাসলেন একটু। সেও একটু দুঃখ থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল, প্রতিমাদি আমায় টানেন কেন?

—উনি জানেন, বিনো-দা তোমার প্রেমে পড়েছেন!

—অণিমাদি!

—তোর ধমকে আমি ভয় পাইনে। আমি পুরুষ মানুষ হলে আমিই তোর প্রেমে পড়তাম। তোর পিছু পিছু ঘুরতাম।

—আমি ছেলে বয়সে একজনকে এক চড় মেরেছিলাম।

—সেটা হাঁদা। আমি এক গালে চড় খেলে আর একগাল পেতে দিতাম। চড় মার, ঝাঁটা মার—দেহি পদপল্লবমুদারম।

এবার সে না হেসে পারে নি। [illegible]ক্ষেণ পর সে বিনো-দার কাছে গিয়েছিল। [illegible] বন্ধ করুন খাওয়া দাওয়া। প্রতিমাদির অসুখ। তিনি বলেছিলেন না। সেরে যাবে অসুখ সবেরই মত। তাঁর সে মুখ দেখে প্রতিবাদের সাহস হয় নি। বাড়ি ফিরে এসে সে বসে ভেবেছিল, কিছু কি সত্যই করেছে সে আপন অজ্ঞাতসারে? না। দিনের পর দিন, সেই সকালে উঠে ছেলেদের খবর নেওয়া, কে কেমন আছে। তারপর ইস্কুল। বিকেলে খেলা দেখা। সন্ধ্যায় একবার করে বিনো-দা সবার কাছে আসেন, তার কাছেও আসেন। খবর নিয়ে যান। তারপর সে যায় হরিচরণবাবুর কাছে পড়তে। কোন কোন দিন অবশ্য বিনো-দা সঙ্গে যান। রাত্রে ফেরার সময় তিনি বারান্দায় কোনদিন গান করেন, কোনদিন ছবি আঁকেন হেজাক বাতি জ্বেলে—তাকে দেখলেই নেমে সঙ্গে তার বাড়ির দোর অবধি আসেন, এই পর্যন্ত। কই কখনও তো এমন কোন কথা বলেন নি যার মধ্যে এতটুকু অনুরাগের কথা আছে। শুধু একটা কথা, তুমি ওয়ান্ডারফুল। আশ্চর্য মেয়ে! মধ্যে মধ্যে ছেলেদের নিয়ে পিকনিক হয়েছে, তাতে হৈচৈ হয়েছে, হুল্লোড় সবাই করেছে, বিনো-দা সব থেকে বেশী। একদিন ছেলেদের সঙ্গে রেস নিয়েছিলেন, তাতে তিনি তাকেও টেনেছিলেন। হ্যাঁ সে যোগ দিয়েছিল। অণিমাদি মোটা, কমলাদি রোগা, প্রতিমাদি মাটির পুতুল। তার শক্তি আছে উৎসাহ আছে, সে রেস দিয়েছিল। বিনো-দা জিতেছিলেন, সে সেকেণ্ড হয়েছিল, ছেলেরা দম রাখতে পারে নি। তার মধ্যে প্রেম কোথায়? মধ্যে মধ্যে বিনো-দা মিটিং করেছেন সমাজ-সংস্কার নিয়ে, মুগ্ধ হয়ে সে শুনেছে। নিশ্চয় চোখে মুখে ফুটে উঠেছে সে মুগ্ধতার ছায়া। তাই বা প্রেম হবে কেন?

সে এমনই ক্ষুব্ধ হয়েছিল—যে সে হঠাৎ উঠে কোন বিবেচনা না-করেই গিয়েছিল প্রতিমার কোয়ার্টারে। কেন—কেন তিনি এমন সন্দেহ করবেন!

তিনি বিছানায় পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। দেখে তার মায়া হয়েছিল। হায়রে অবুঝ মন! সেইদিন টেবিলের উপর পড়েছিল বিনো-দার ওই ছোট চিঠিখানা।

সচিত্র ও মনোজ্ঞ ক্যাটালগের জন্য ৫০ নয়া পয়সার ষ্ট্যাম্প সহ লিখুন।

EASTERN STEEL TRADING
Co. (Private) Ltd.
Iron & Hardware Merchants * Government & Railway contractors * Manufacturers of culverts & Municipal carts etcetras
18, Maharshi Debendra Road, Calcutta-7. Phone : 33-6416.

মার্কনী ফ্যান

মাসিক কিস্তিতেও পাওয়া যায়
মার্কনী ইলেকট্রিক
কর্পোঃ (প্রাঃ) লিঃ
১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৯। ফোন: ৩৫-৩০৫৪

সে নিজেকে সম্বরণ করতে পারে নি। চিঠিখানা তুলে নিয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই মুখ তুলেছিল প্রতিমা। এবং সংগে সংগেই মুখ গুঁজে পড়ে বলেছিল, তুমি যাও, তুমি যাও। আমাকে কি মরতেও দেবে না শান্তিতে? কাঁদতেও দেবে না?

সে বলেছিল, আমি আসতাম না প্রতিমাদিন কিন্তু আপনি যে আমাকে বিশ্রীভাবে জড়িয়ে আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন। কেন আপনি এ রকম ভাবেন?

—ও তোমাকে ভালবাসে না?

—না। আমি অন্তত মনে করি না। স্নেহ করেন। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। তার মধ্যে আপনি যা ভাবেন তার লেশমাত্র নেই।

—লেশমাত্র নেই! ব্যঙ্গ ভরে সে বলেছিল। চোখ মুছে ভেবে দেখ!

তারপরই কেঁদে উঠেছিল হু হু করে। সে চলে এসেছিল নিরুপায় হয়ে। একে সে কি বলবে? ঘৃণা হয়েছিল, করুণাও হয়েছিল। বাসায় এসে খেয়াল হয়েছিল চিঠিখানা তার মুঠোর মধ্যেই রয়ে গেছে। ভ্রূ-কুঞ্চিত করে সে ভাবতে বসেছিল, বিনো-দা'র প্রতি তার কি—? বিনো-দা'র কথা বিনো-দা জানেন। না, সে ও জানে, ও মানুষ ভাল কাউকে বাসে না! জগৎ ওদের কাছে তুচ্ছ, ক্ষুদ্র। হায় প্রতিমাদি, তুমি যদি জানতে যে এ মানুষের কাছে নীরারও দাম নেই। আর সে? না। সে কোনদিন মনে ঠাঁই দেয় নি। কোনদিন না। এই মুহূর্তে চোখ বুজলে হয় তো তার মুখ দেখবে সে তোমার কথার সূত্র ধরে কিন্তু তা বলে তাই সত্য নয়। সে মনে করে দেখছে। ভাল করে খতিয়ে দেখছে। হিসেব সে তোমাকে দেবে।

হঠাৎ সে চাবুক খেয়ে চমকে উঠল যেন। মনকে সন্ধান করে দেখতে গিয়ে দেখলে, বিনো-দা। বিনো-দা। বিনো সেন। হ্যাঁ, এ হয় তো প্রকাশ সে করে নি, তার কর্মে তার বাক্যে, কিন্তু কত নিদ্রাহীন রাত্রে তন্দ্রার মধ্যে বিশেষ করে জীবনের পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় যত উদাস-করা দিবারাত্রি গেছে, তার মধ্যে তো ওই একটা লোকই ভেসেছে চোখের উপর।

ঠিক এই সময় পড়ল কিচেন ঘণ্টা।

—নীরি। নীরি। আঃ যার বিয়ে তার মনে নেই পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। তোর পাসের ভোজ, তুই কি করছিস? ঘরে ঢুকেছিল অণিমাদি—বসে ধ্যান করছিস কার?

—কারও নয় চল। জীবনটা খতাচ্ছিলাম। মাথা ধরে গেছে।

খাওয়া দাওয়া সেরে সে আবার এসে ভাবতে বসেছিল। ঘরে গরম বোধ হচ্ছিল। বাইরের বারান্দায় ডেক-চেয়ার টেনে আকাশের দিকে চেয়ে বসে ছিল। ভাবতে ভাবতে সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আকাশে মেঘ ছিল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। তারই মধ্যে মনটা শূন্য হয়ে যাচ্ছিল যেন। কখন ঘুমিয়ে গিয়েছিল এরই মধ্যে। হঠাৎ একটা চড়া বিদ্যুতের আলোয় ঘুম ভেঙে গেল। তারপরই কড় কড় শব্দে মেঘের ডাক। চমকে উঠেছিল সে। কাপড়চোপড় শরীর সব ভিজে ভিজে হয়ে গেছে বৃষ্টির ছাটে। বৃষ্টি নেমেছে তখন। ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিল। আঃ বিনো সেনের মুখ। দেওয়ালে ফটোটা টাঙানো রয়েছে। টেবিলে বাতিটা জ্বলছে। কিন্তু উঠতে যে সে আর পারছে না। সে পাশ ফিরে শুয়েছিল।

পরের দিন সে যখন উঠল, তখন শরীরটা
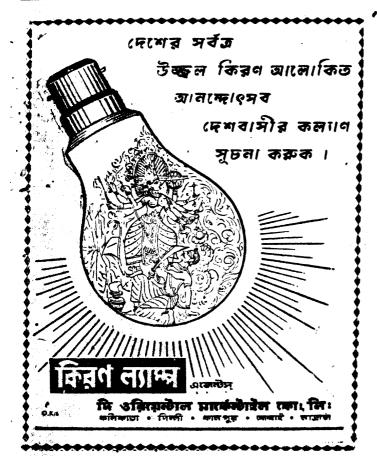
জ্বর, মাথায় যন্ত্রণা, দেহে যন্ত্রণা। শরীর মন সব যেন ঝিম ঝিম করছে। কি হল তার? ডাকলে—অণিমাদি।

পাশের ঘরেই থাকে অণিমাদি। সাড়া দিলেন—কি?

—এস না ভাই একবার। দেখ না আমার কি হল? বড্ড খারাপ করছে শরীর।

—এযে বেশ জ্বর রে। কপালে হাত দিয়ে বলেছিলেন অণিমাদি।

সেই জ্বর বত্রিশ দিন। সুস্থ যখন হল তখন চল্লিশ দিন। সে দিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের শীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। এ কালের চিকিৎসা—উপবাসের চিকিৎসা নয়। কঙ্কালসার হয় নি, তবে রোগা হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকেছিল অণিমাদি। —কি দেখছিস? কত সুন্দর হয়েছিস?

—সুন্দর হয়েছি? তোমার কি সব তাতেই ঠাট্টা?

—উঁহু। বিনো-দা বলেছে। তোর ছবি তুলে নিয়ে গেছে।

—মানে?

—বত্রিশ দিনে তোর জ্বর ছাড়ল। তুই অঘোরে ঘুমুচ্ছিস, কাত হয়ে শুয়ে আছিস, মুখটা একটু পিছনের দিকে হেলে গেছে। হাত দুখানা প্রায় জোড়হাতের মত; চুলের তো পাঁজা, সে খোলা, মাথার উপর দিকে ছড়িয়ে আছে। বিনো-দা কলকাতা গিয়েছিলেন ফিরে এসেই বরাবর এলেন তোকে দেখতে। আমি পাশে বসে বললাম, সকাল বেলা জ্বর ছেড়ে গেছে। উনি একদৃষ্টে তোকে দেখছিলেন, আমাকে বললেন, জানালাগুলো খুলে দিন তো। বললাম, রোদ্দুর আসবে। বললেন, সে তো পরে বন্ধ করলেই হবে। বলে নিজেই জানালা খুলে দিয়ে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললেন, এখানে আসুন। এইবার দেখুন। বললাম, কি দেখব?—নীরাকে কি সুন্দর লাগছে! ওয়ান্ডারফুল। শুয়ে আছে দেখুন! ঠিক যেন সতী সদ্য দেহত্যাগ করেছেন। ওয়ান্ডারফুল। বলেই গলায় ঝোলানো ক্যামেরা তুলে ক্লিক্‌ ক্লিক্‌ করে নিলেন। তারপরই আবার ওদিকে সেই কান্ড! দেখবি বোধ হয় সতীর দেহত্যাগ ছবি হবে।

কোথায় যেন লেগেছিল। সারা চিত্তটা বিমুখ হয়ে উঠেছিল। শক্তি থাকলে সে তখনই যেত। কিন্তু যেতে পারে নি। বিকেল বেলা বিনো-দা এলে বলেছিল, ওভাবে আমার ফটো নিয়ে ছবি আঁকবেন কেন?

বিনো-দা বলেছিলেন, সেটা দুর্লভ মুহূর্তে, ছবিটা নিয়ে রেখেছিলাম। আঁকলে তোমার অনুমতি না নিয়ে আঁকতাম না। ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু পারলাম না। মনে হল তোমাকে যেন মেরে ফেলছি। অন্তত মৃত্যু কামনা করছি।

বড় ভাল লেগেছিল কথাটা। সব উত্তাপ জুড়িয়ে গিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত পরে নীরা গাঢ় কণ্ঠে বলেছিল, আমি এবার চলে যেতে চাই বিনো-দা! আমি এখানে—

—হ্যাঁ। শান্তি পাচ্ছ না। সহ্য করে থাকতে পার না?

—না।

হাসলেন বিনো-দা। তারপর বললেন, জোরই বা কোথায় আমার? যাবে। তবে সে ব্যবস্থা আমিই করব, অন্তত সেটুকু ভার আমাকে দিয়ো। একখানা দরখাস্ত লিখে টাইপ করিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সই করে দিয়ো। একটা বিদেশী স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে শিক্ষা সম্পর্কে পড়াশুনো করে এস। তোমার আমি উজ্জ্বল ভবিষ্যত চাই।

সে উঠে তাঁকে প্রণাম করেছিল। তিনি তার মাথায় হাত দিয়ে পায়ের তলায় বসিয়ে তার চুলের রাশির খানিকটা মুঠোয় পুরে বলেছিলেন, শোন—একটা কথা বলব।

—বলুন।

—বিচলিত হবে না যেন।

বুক তার ঢিপ ঢিপ করে উঠেছিল। নীরবে প্রতীক্ষা করেছিল সে।

—দাদু নেই।

—অ্যাঁ!

—না। না। চঞ্চল হতে নেই। কাঁদতে নেই তাঁর জন্যে। তিনি বারণ করে গেছেন সকলকে।

উঠে গেলেন। যাবার সময় হেসে বলে গেলেন, আমার মৃত্যুতেও কেঁদো না। যেখানেই থাক। আমিও তাই বলে যাব সকলকে।

কি নিষ্ঠুর মানুষ! সে কাঁদে নি। আকাশ পানে চেয়ে বসেছিল।

*

তারপর এ ক'টা মাস সে সেই দরখাস্তের উত্তরের অপেক্ষা করেই রয়েছে এখানে। এর মধ্যে প্রতিমার মনের অসুখ দেহকে চেপে ধরেছে। সে বড় ক্লান্ত বড় ক্লিষ্ট। বিনো-দা তাকে বিশ্রাম দিয়েছেন। বিশ্রাম করো। প্রতিমা ঘুরে বেড়ায় উদভ্রান্তের মত। মায়া হয়।

হঠাৎ আজ—বিনো সেনের জন্মদিন। জন্মদিন প্রতিবারই প্রতিপালিত হয়। উদ্যোগ করেন অণিমাদি। এবার সে ভার নিয়েছিল। সে চলে যাবে, আসছে জন্মদিনে থাকবে না। তাই তার মনের মত করে সব করেছিল। নিজে মালা গেঁথেছিল; নিজে অভিনন্দন রচনা করেছিল। লিখেছিল, 'তোমার জীবনকেন্দ্রে আছে একটি অমৃত-বিন্দু—সে বিন্দু আজ সিন্ধুর মত করুণা-তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত। তোমার জন্মমুহূর্তে জন্মভূমি তোমার ললাটে পরিয়ে দিয়েছিলেন বৈরাগ্যের তিলক, তুমি জন্ম-বৈরাগী। কোন বন্ধনে তুমি বাঁধা পড় না, অথচ সকলকে তুমি বাঁধো এক অচ্ছেদ্য গভীর বন্ধনে। মন তোমার রামধনুর সপ্তবর্ণের ভান্ডার; তোমার তুলিতে তুমি সৃষ্টি কর অপরূপের। রূপ তোমার পায়ে এসে নিজেকে অঞ্জলি দেয়।'

কথাটা সে প্রতিমাকে স্মরণ করেই লিখেছিল। কিন্তু বিনো সেন—। বিনো সেন তখন

ডাঃ দাসের

আর্ণিকা হেয়ার অয়েল

নিশ্চয়ই মাথা ঠান্ডা রাখে, অনিদ্রা দূর করে ও চুলের শ্রীবৃদ্ধি করে।
মূল্য—২৲ টাকা।

হেলথের ক্রিমিকাল

ক্রিমি ও তজ্জনিত উপসর্গ দূর করিতে অব্যর্থ। ডজন প্যাকেট—২৲ টাকা।

সুন্দর হোমিও সদন

(হ্যানিম্যান হোমিও কোম্পানী)

১১৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

এম. এল. বসু য্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

ভ্রষ্ট হয়েছেন, কামনা জেগেছে। তিনি ভাবলেন, নীরা বুঝি নিজের কথাই লিখেছে। বিনো সেন যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠে গেলেন সভার শেষে। ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। বললেন, আমায় যেন কেউ না ডাকে। সারাটা দিনের পর সন্ধ্যায় বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন নীরার বারান্দায়।

—নীরা!
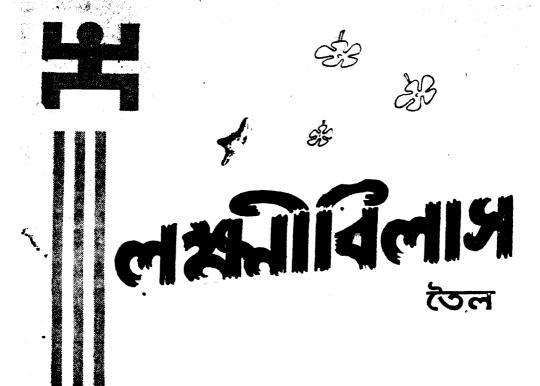
—আসুন। আপনি এমন করে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ভাবলাম শরীর খারাপ। আবার ভাবলাম, হয় তো অন্যায় কিছু লিখেছি। বলেছি।

বিনো সেন বিচিত্র দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে বলেছিলেন—না।

তবে?

এটা ধর আগে। তোমাকে একটা পরীক্ষা দিতে হবে, তোমার সেই স্কলারশিপের জন্য। একখানা খাম এগিয়ে দিলেন। সে কি বলবে ভেবে পেলে না। কিন্তু একটা বেদনা যেন সে অনুভব করলে। চলে যাবে সে এখান থেকে।

—তারপর—। চুপ করে গেলেন বিনো সেন।

—বলুন।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, এই চিঠিখানা—

—কার চিঠি?

—পড়ে দেখো। ধর। বলেই তিনি উঠে পড়লেন।—প্রতিমা আজ একটু বেশী অসুস্থ, আমি ওকে দেখে আসি।

চিঠি হাতে করেই নীরা তাঁর দিকে তাকালে—প্রতিমা! প্রতিমা! প্রতিমা! চাঁদে কি কলঙ্ক থাকেই!

"নীরা

বহু দ্বন্দ্ব করে শেষে নিজেকে নিঃসংশয়ে যাচাই করে তোমাকে পত্রখানা লিখছি। আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে তুমি বললে, 'তোমার জন্মমুহূর্তে জন্মভূমি তোমার ললাটে পরিয়ে দিয়েছিল বৈরাগ্যের তিলক, তুমি জন্ম-বৈরাগী! কোন বন্ধনে তুমি বাঁধা পড় না অথচ সকলকে বাঁধ অচ্ছেদ্য গভীর বন্ধনে।' বুকটা আমার হাহাকারে ভরে উঠল। এ হাহাকার চিরদিন আছে নীরা। ইদানীং অনুভব করছি আমার কেউ নেই। কেউ আমার নয়। আপনার, একান্ত আপনার কাউকে যে আমি চাই। আমার আত্মা ব্যাকুল। তোমাকে আমি চেয়েছি। অনেকদিন থেকে চেয়েছি। কিন্তু—আজ যখন চিঠি এল, বিদেশে যাবে তুমি, সব সম্পর্ক কেটে যাবে, তখন আর যে আমার নিবেদন না-জানালে নয়। আমার আত্মা শতবাহু বিস্তার করে তোমাকে চায় তার বাহুবেষ্টনের মধ্যে, হৃদয়ে চায় মনে চায়। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

তোমাকে আমি বিবাহ করতে চাই। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাস। প্রতিমা কোন বাধা নয়—।"

আর নীরা পড়েনি। চিঠিখানা হাতে করে একেবারে যেন জ্বলতে জ্বলতে বেরিয়ে গেল।—লম্পট। ভ্রষ্ট! প্রতিমার জীবনটা নষ্ট করে আবার—।

দুই হাতে দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে সে দাঁড়াল বিনো সেনের সামনে।

পর মুহূর্তে শোনা গেল বিনো সেন যেন আর্তনাদ করে উঠলেন—আমি ক্ষমা চাচ্ছি, আমার অন্যায় হয়েছে। আমাকে ক্ষমা কর।

—না—না—না। চিৎকার করে উঠল নীরা—আপনি লম্পট আপনি ভ্রষ্ট, আপনি মুখোসধারী।

রাত্রির স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে সে চিৎকার ছড়াচ্ছিল। গোটা আশ্রমটা চকিত হয়ে উঠল। কি হল।

বিনো সেন আর্তনাদ করছেন, আমাকে ক্ষমা কর। আমি হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চাচ্ছি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

—ক্ষমা! ওই প্রতিমা—। এই চিঠি! স্তব্ধ হয়ে গেলেন বিনয় সেন। অপমানে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিয়ে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তুমি ভণ্ড তুমি লম্পট। নীরা যুদ্ধ করে অনেক জয় করে এসেছে। এখানেও সে হারবে না। সে জিতবে।

বিনয় সেন বললেন—নাটক শেষ হয়ে গেছে। যাও সব যে যার চলে যাও।

নাটক শেষ হয়ে গেছে? না।

চলে যাচ্ছে নীরা আশ্রম থেকে। ডাকছে তাকে, বহুদূরের পৃথিবী। নামক নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা।

॥ আট ॥

ঠিক দু বছর পর। ১৯৫৮ সাল। দমদম এরোড্রোমে এসে নামল—নামল একখানা বড় প্লেন। প্লেন থেকে নামল নীরা। দু বছর পর ইংলণ্ডে পড়া শেষ করে সে ফিরছে। লীডস্ ইউনিভারসিটিতে শিশু শিক্ষার জন্যই সরকারী বৃত্তি সে পেয়েছিল, তাই শেষ করে ফিরছে। রোগা হয়ে গেছে সে। রঙটা খানিকটা উজ্জ্বল হয়েছে, কিন্তু একটা ক্লান্তি যেন তার সর্বাঙ্গে। সেই আয়ত দীপ্ত চোখ দুটিতে যেন একটা কিছুর ছায়া নেমেছে। বর্ষার আকাশে দিগন্তে জলভারাবনত কালো মেঘ উঠলে, আকাশে মধ্যাহ্নের সূর্য থাকতেও যেমন একটা ছায়া নামে তেমনি একটি ছায়া। সেদিন যাত্রা করেছিল—মনে পড়ছে সেদিন বলেছিল, ফিরে এলে নাটকের যবনিকা ওঠে যেন। দূর বিদেশে যেন জীবন নাটক না হয়ে ওঠে। ভারাক্রান্ত মন নিয়েই গিয়েছিল। প্রথমটা মন বিদ্রোহ করেছিল। না, বিনো সেনের ক'রে দেওয়া বৃত্তি নিয়ে সে যাবে না। সে জানত এর পিছনে বিনো সেনের সুপারিশ আছে। নইলে দরখাস্ত করলেই বৃত্তি হয় না। কিন্তু শেষটা সে প্রশ্ন করেছিল—দেশ কি বিনো সেনের? সে হকদার নয়? পরীক্ষা তো এক[illegible] দিতে হবে। তাতে সে উত্তীর্ণ হলে [illegible] নেবে না? পরীক্ষায় পাস করে সে [illegible]বনীর মতই নিয়েছিল বৃত্তি। টাকা তার এ কয়েক বছরে কিছু জমেছিল। তা ছাড়াও আর একটা সুবিধে হয়েছিল একেবারে আকস্মিকভাবে। ভাগ্য ছাড়া তার আর সংজ্ঞা হয় না। পাসপোর্ট আপিসে মুখোমুখি দেখা হয়েছিল এণাক্ষীর সঙ্গে। সে চমকে উঠে[illegible] সেছিল নীরা!

—হ্যাঁ। তোমাদের সব ভাল?

—আমার ভাল। আর যাদের কথা বলছ তাদের কথা ঠিক জানিনে। মনে তোমার অজিতদা'র সঙ্গে ডাইভোর্স হয়ে গেছে আমার। ওঃ তুমি সেদিন যা বেরিয়ে এসেছিলে! বাপরে বাপ! তা এখানে? যাবে নাকি কোথাও?

—হ্যাঁ। ইংল্যান্ড যাচ্ছি। গবর্ণমেণ্ট স্কলারশিপ পেয়েছি।

—স্কলারশিপ! খানিকক্ষণ সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, ওঃ দেখালে খুব। আমি যাচ্ছি ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালে। ইংল্যান্ডও যাব। ঠিকানা দিও। হ্যাঁ একটা সংবাদ দিই তোমাকে। বিদেশে যাচ্ছ সুবিধে হবে। অজিতের প্রায় সব গেছে। বাড়ি বিক্রির কথা চলছে। কিন্তু তোমার অংশ তো তোমার সই ছাড়া বিক্রি হবে না। কেউ নিচ্ছে না। তুমি গেলেই টাকাটা পেয়ে যাবে। যাবামাত্র। তোমার খোঁজ করছে। শেষ কথা হয়েছে, না পেলে তোমার অংশের টাকা কেটে রেখে দেবে।

টাকাটা সে পেয়েছিল। টাকাটা কম নয়, আট হাজার টাকা। ইচ্ছে ছিল পড়া শেষ করে ইউরোপ ঘুরবে। কিন্তু তা হয়নি, ভাল লাগেনি। প্রথম দিকটা তার [illegible] শান্তভাবে চলেছিল; ইউনিভারসিটির অধ্যাপক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দিনগুলি

স্বচ্ছ[illegible]গামিনী নদীস্রোতের মত চলেছে। বিচিত্র দেশ, মুক্ত, স্বাধীন। জীবন যে এত মুক্ত এবং হাস্যমুখর হতে পারে, তা সে দেখে বিস্মিত হয়েছিল। সেও হাসতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি। মনে হয়েছিল যে হাসি, যে গতিবেগ তার জীবনে ছিল, তাও যেন স্তিমিত হয়ে গেছে। হৃদয় যেন ভারাক্রান্ত। এত দূরে গিয়ে তার মনে হয়েছিল, যে রূঢ় আচরণ সে বিনো-দা'র সঙ্গে করে এসেছে, তা ঠিক হয়নি। আরও সহজভাবে হতে পারত। সে চিঠি লিখে জবাব দিয়ে চলে আসতে পারত। একটি কথায় জবাব হ'ত, ছি, বিনো-দা! দেবতা যখন কাঙালীপনা করে তখন মানুষ কি করে বলুন তো?

না, ওটা বড় বেশী নরম হত। সে তো লিখতে পারত—। না, এ লেখা যেত না। আপনি প্রতিমাকে ভালবেসে আবার আজ আমাকে ভালবেসেছেন। আমি জীবনে কাউকে ভালবাসিনি। আমার এ অনুচ্ছিষ্ট হৃদয় কি যায়, হাত উচ্ছিষ্ট তার হাতে দেওয়া যায়? না। এ লিখতে সে পারে না। এতে যে স্বীকার করা হত যে সে তাকে ভালবাসত। আজও [illegible] বিনিদ্র রাতে বিনো যেন বন্ধ ঘরের সার্সীর গায়ে যেন ভেসে ওঠে। স্বপ্নেও তাকে দেখে। হয়তো উপকারের জন্য। না। কানে যে ভেসে ওঠে "আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি—" মনে পড়ত সবশেষের মিনতি—"ক্ষমা কর। আমি হাত জোড় করে অপরাধ স্বীকার করছি। আমাকে ক্ষমা কর।" প্রচ্ছন্ন বেদনায় সে যেন বদলে শান্ত স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল দেশ ছেড়ে একবার গিয়ে পড়লে অনায়াসে ভুলে যাবে সেদিনের কথা। কিন্তু সব আবার বদলে গেল। আবার সে জ্বলে উঠল। গিয়েছিল ইন্ডিয়া হাউসে—ইউরোপের বড় শহরগুলির এনডোর্সমেন্টের জন্য এবং হিসাব মিটাবার জন্য। সেখানে একজন বিশিষ্ট কর্মচারী তাকে দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠেছিলেন—[illegible] আপনি—? শুধু উনিই নন—আরও দু'জনও সবিস্ময়ে তাকে দেখছিল। সে বিব্রত এবং বিরক্ত হয়ে বলেছিল—আপনারা কি বলতে চাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি না।

অবশেষে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছিল। ইন্ডিয়া হাউসে ভারতীয় শিল্পীদের কিছু ছবি সদ্য এসেছে। তার মধ্যে একখানি বড় ছবি এসেছে। মহাশ্বেতা। ছবিখানি যত ভাল তত ভাল তার বিষয়টি। অপূর্ব রোমান্টিক। কবি বাণভট্টের কাদম্বরীর অন্তর্গত।

লক্ষ্মীর মানসপুত্র, পদ্মের মধ্যে জন্ম—নাম পুণ্ডরীক—ঋষিকুমার। আর মহাশ্বেতা অপরূপা গন্ধর্ব রাজকন্যা। দুজনে দুজনকে

কল্যাণীর আনন্দময় — পরিবেশে —

দেখে মুগ্ধ হলেন। দুবেই
বিরহ সইতে না-পে মৃত্যু
হল। মহাশ্বেতা নিয়ে
দেবতার আদেশে ে করে
হলেন তপস্বিনী। রবেন
তাঁর দয়িতকে। পুণ্ডরীক
বৈশম্পায়ন হয়ে। পুত্র
হয়ে। রাজার পুত্র ভাবী
মন্ত্রী।

রাজকুমারের সঙ্গে গেলেন
সৈন্যবাহিনী নিয়ে খান-
কার রাজকন্যা কাদম্বরীর
প্রণয়ই মূল ঘটনা-কথা।
সেই অরণ্যে শিলায় বসে
মহাশ্বেতা তপস্যা করছে
দয়িতের প্রত্যাগমনের
বৈশম্পায়ন অকস্মাৎ দেখে
যেন কোন্ অস্পষ্ট ের
আকর্ষণ অনুভব করলেন
সন্দেহ নিয়ে এই দিনা।
তিনি অগ্রসর হ
অ র। তপস্বিনী র
মধ্যে চিনতে পারে
তপস্বিনী প্রদীপ্ত
চোখে আগুন
িনো দয়িত সেই
র সেই ছবি। কিন্তু আর
ীরা যেন এক
চনা যায়। মনে হয়
ঢেক করে - বসিয়ে
কেছে। দেখেছি
মনের আঁকা। মহ
সুখের পর পথে
বর্ণক্লিষ্ট মুখের প্রতি
ছল সেই সময়
নো যেন একদিন
টো নিয়েছিল, ব
ি আঁকবে। মহা
ল। চোখ দুটো
ক সেই ছবি!
শম্পায়নের মুখে
জের আনন্দ। কি
ের মত, তবু
না যাবার মত ক
খতে দেখতে
নের কাছে খবর
কি মেয়ে দেখে
খ, অস্বস্তি অনু
ল এবং সকলে ম
উ ভাগাই।
ই পুনরাবৃত্তি
াদারা অতর্কিতে
র বিষয়ে গিয়ে।
পনি তো মরেন
—ছি। কোত

সে একবার! নাটক আর সে করবে না। তবে বিনো-দাকে জিজ্ঞাসা সে করবে, পুণ্ডরীক পরজন্মে বৈশম্পায়ন তার কি প্রতিভার মত আর কোন প্রণয়িনী ছিল? এবং সে কি মহাশ্বেতার মত প্রণয়মুগ্ধ গন্ধর্ব রাজকন্যা? যাকে জীবনে পথের খোয়ায় কাটায় পা দুখানা ক্ষতবিক্ষত করে চলতে হয়েছে, যে জীবনের প্রেমের স্বপ্নকে রূঢ়ভাবে নিজের হাতে ভেঙে দিয়েছে, মুছে দিয়েছে। তাকে এমন ব্যঙ্গ এমন অপমান আপনি কেন করলেন। এমন অপমান মন্মথ ঘোষ করে নি, সোমেশবাবুর ছেলে করে নি! ছি! ছি! ছি!

—নীরা!

ডি, ৭৬৪২।
(সি ৯

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

গোপীচন্দ্রের গান—
ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য ... ১০.০০

কাঞ্চী-কাবেরী—
ডক্টর সুকুমার সেন ও সুনন্দা সেন ৫.০০

লালন-গীতিকা—
(অর্থসংকেত ও শব্দসূচীসহ লালনশাহ ফকিরের প্রায় ৩০০ গান) ডক্টর মতিলাল দাস ও পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ৭.০০

প্রাচীন কবিওয়ালার গান—
(প্রায় একশত কবিওয়ালার গান)
প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত ... ১৩.০০

বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য—
ডক্টর প্রভাময়ী দেবী ৬.৫০

বিচিত্র-চিত্র-সংগ্রহ—
অমরেন্দ্রনাথ রায় সংকলিত ... ৪.০০

শিব-সংকীর্তন বা শিবায়ন—
(রামেশ্বর-কৃত)
যোগীলাল হালদার ... ৮.০০

শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ—
গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী ... ৩.৫০

মৈমনসিংহ-গীতিকা—
(৩য় সং) ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ১২.০০

দ্বাইশ কবির মনসামঙ্গল—
আশুতোষ ভট্টাচার্য ... ১০.০০

রায়শেখরের পদাবলী—
যতীন্দ্র ভট্টাচার্য ও ব্রজেশ শর্মাচার্য ... ১০.০০

গীতার বাণী—
অনিলবরণ রায় ... ২.০০

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস—
মোহিতলাল মজুমদার ... ২.৫০

গিরিশ নাট্য-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য—
অমরেন্দ্রনাথ রায় ... ২.৫০

স্বাধীনরাষ্ট্রে সংবাদপত্র—
মাখনলাল সেন ... ২.০০

সাহিত্যে নারী—স্রষ্ঠী ও সৃষ্টি—
অনুরূপা দেবী ... ৬.০০

উপনিষদের আলো—
ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার ... ৩.৫০

বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও ভাষাপ্রীতি—
অমরেন্দ্রনাথ রায় ... ৩.৫০

এগারটি বাংলা নাট্য গ্রন্থের দৃশ্যানদর্শন—
(চণ্ডী নাটক প্রমুখ দুষ্প্রাপ্য নাটক হইতে উদ্ধৃত দৃশ্য)—
অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত ৬.০০

কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী—
ডক্টর সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য ১০.০০

অভয়ামঙ্গল—
(দ্বিজ রামদেব-কৃত)
ডক্টর আশুতোষ দাস— ৭.০০

ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের সমন্বয়—
ম. ম. যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, ডি. লিট. ২.৫০

দেবায়তন ও ভারত-সভ্যতা—
(ভাল আর্ট পেপারে ৯৬৭খানি চিত্র ও ৪খানি মানচিত্র সহ)
শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২০.০০

বৈষ্ণব পদাবলী (৬ষ্ঠ সং) ৪.০০

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (১ম ভাগ)
ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী ১০.৫০

হারামণি (লোকসঙ্গীত) —
মনসুর উদ্দিন ২.৫০

মঙ্গলচণ্ডীর গীত—
সুধীভূষণ ভট্টাচার্য ৮.০০

বাংলার বাউল—
ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী ২.০০

পদাবলী সাহিত্য—
কালিদাস রায় কবিশেখর ৬.০০

জ্ঞানদাসের পদাবলী—
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১০.০০

বাঙালীর পূজা-পার্বণ—
অমরেন্দ্রনাথ রায় ৪.০০

রামদাস ও শিবাজী—
চারুচন্দ্র দত্ত ৪.০০

সহজিয়া সাহিত্য—
মণীন্দ্রমোহন বসু ২.৫০

বাংলা ছন্দের মূলসূত্র—
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ৪.৫০

বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—
প্রমথ চৌধুরী ০.৫০

কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে ৪৮নং হাজরা রোডস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন-বিভাগে খোঁজ করুন। নগদমূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনস্থিত নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র হইতেও কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক পাওয়া যায়।

॥ বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট সংযোজন ॥
শিশির সর্বাধিকারীর
"আভি সে বাগদাদ"
৩·০০

"সাধারণ মামুলী উপন্যাসের ছকবাঁধা নিয়মেতে যাদের মন ক্লান্ত, তাঁরা এই বইতে * * এক অপরিচিত ক্ষেত্রে রোমাঞ্চময় বিচরণের স্বাদ পাবেন।"
—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

যুগান্তর—"* * বইটিতে এমন অনেক মুহূর্তে ও ঘটনার সন্ধান পাওয়া যাবে যা বস্তুরমত নাটকীয়। * * ভাষা ঝরঝরে ও সুখপাঠ্য।"
"কাহিনীটি আগাগোড়া আকর্ষণীয়।"
—বসুমতী

আনন্দবাজার—"* * এতই সরস ও উপভোগ্য যে দ্রুত শেষ করা যায়।"
"ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বইখানিকে অপূর্ব রসসমৃদ্ধ করেছে। * * বইখানির যোগ্য সমাদর কামনা করি।"
—দেশ

কাহিনী সত্য,
কিন্তু
উপন্যাস অপেক্ষা চমকপ্রদ :

প্রাপ্তিস্থান :
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স (প্রাঃ) লিঃ
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কাস্টমস সেরে বেরুতেই সে শুনলে—নীরা! পরিচিত কণ্ঠস্বর। কে? বহুলোকের মধ্যে—কে?

—আমি রে—অণিমাদি!

হ্যাঁ। অণিমাদিই তো বটে। এগিয়ে এসে একটু হেসেই বললেন—তুই ফিরলি?

—হ্যাঁ। এই তো বেরুচ্ছি। কিন্তু অণিমাদি অনেক পালটেছেন। খুব একচোট হেসে গলা জড়িয়ে ধরে গুরুভার দেহখানি নিয়ে তার উপর ঢলে পড়লেন না।

—ভাল ছিলি? কিন্তু রোগা হয়ে গেছিস। খানিকটা পাল্টে গেছিস।

—মেম সাহেব হয়েছি?

—না। তোর ও—। না থাক। এখন উঠবি কোথায়?

—দেখি। কোন হোটেলে বা বোর্ডিংয়ে। দাদু থাকলে সেখানে যেতে পারতাম। তা—। একটু চুপ করে থেকে বললে—তা তুমি এখানে কোথায়? কেউ আসবে বুঝি? সঙ্গে সঙ্গে মনে হল—বিনো সেন। মুহূর্তে সে ব্যস্ত হয়ে বললে—আমি যাই।

দাঁড়া না একটু। কেউ আসছে না—আমি যাচ্ছি।

—কোথায়? কোথায়?

—ডালহৌসি।

—ডালহৌসী? বিস্ময়ের আর সীমা রইল না নীরার।

—বিনো-দা সেখানে। চাকর আছে আর তো কেউ দেখবার নেই। অত্যন্ত কাতর। আমি দেখি তাঁকে। আমাকে জোর করে পাঠিয়েছিলেন আশ্রমের সব দলিলটলিল নিয়ে। কাল এসেছিলাম রাইটার্স বিল্ডিংয়ে দিয়ে আজ ফিরে যাচ্ছি। গবর্নমেণ্টকে দিয়ে দিলেন আশ্রম। কি করবেন? আর ক'টা দিনই বা?

—অণিমাদি! আর্তস্বরে প্রায় চিৎকার করে উঠল সে। —কি বলছ তুমি?

—বিনো-দার টি বি হয়েছে রে।

—টি—বি? সে কি?

—হ্যাঁ। সেই সর্বনাশী! প্রতিমা—তার রোগ হয় ছিল—প্রকাশ পেল, স্যানাটোরিয়ামে দেবার কথা হল—তা হাউ হাউ করে কান্না। ওঁকে ছাড়লে না। উনিও সেবা করলেন দুহাত দিয়ে। বললে বলতেন, না করলে? বিবাহ করেছি। আমার স্ত্রী। আমাদের মনে হত যেন তোর ওপর আক্রোশ করে!

—আমার উপর আক্রোশ তো তিনি ছবি এঁকে মিটিয়েছেন। তাঁর স্ত্রীর সেবা করেছেন—তাকে ভালবাসতেন—এর মধ্যে আমাকে টানা কেন? তিনি তাকে বিয়ে করেছিলেন

এতে অবশ্য আমি সুখী। বিনোদার মত লোক প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। আচ্ছা আমি যাই। হাত টেনে ধরলেন অণিমাদি। না শোন। শুনে যা লোকটার যা ক্ষতি তুই করেছিস তা শত্রুতেও করে না অথচ তুই তাকে ভালবাসতিস।

—না।

—আমি জানি। তোর অসুখের সময় আমি তোর শিয়রে থাকতুম। বিনো-দা থাকতেন বাইরে। যেদিন প্রলাপ বকেছিলি—তার মধ্যে অনেক বলেছিলি বিনো-দা বলেছিলেন, এ কথা যেন কেউ না শোনে অণিমাদি। ওকেও বোলো না। তুই নিজেও জানিস না। তাই শুনে যা। প্রতিমা ওঁর এক বন্ধুর স্ত্রী। সে বন্ধু বড়লোক মনীলোক—আজও বেঁচে আছেন। তিনি আবার বিয়ে করে প্রতিমাকে তাড়িয়ে দেন। প্রতিমা রাস্তায় দাঁড়াতে গিয়েছিল। উনি ওকে এখানে নিয়ে আসেন। প্রতিমা আক্রোশভরে বিধবা সেজেছিল। উনি আপত্তি করেন নি। ওতে অন্তত বন্ধুর মানটা বাঁচবে। কেউ এটা জানবে না। আমাকে সব বলেছেন কিন্তু বন্ধুটির নাম বলেন নি। এখানে ওকে এনে বলেছিলেন, এই বাচ্চাদের মা হয়ে দুঃখ ভোল। কিন্তু প্রতিমা ভয়ংকর মেয়ে। এখন বিনো-দা আমাকে সব বলেন। আর তো কেউ নেই। বোন মরেছে। ভাগ্নী শ্বশুরবাড়ি, বিয়ে হয়েছে। ভাগ্নেরা চাকরি করে। আমি পারিনি ওকে ছাড়তে। বলেন, দিদি না-বলে মা বলতে ইচ্ছে করে। সব বলেন। বলেন, ভগবান জানেন দিদি ওকে আমি ও-চক্ষে কোনদিন দেখি নি। কিন্তু এসপ্লানেডে পথের ধার থেকে যেদিন ওকে নিয়ে এলাম ওকে বাঁচবার জন্যে, সেদিন থেকে ওর ধারণা হল আমি ওকে ভালবাসি। আমি বলেছি বারবার, তোমাকে আমি ওই চোখে দেখি নে। আমাকে বার বার বলেছে, তবে আমাকে সেদিন ঘুরিয়ে আনলে কেন?" পড়ালাম—,

• নিজে পড়বার এবং প্রিয়জনকে পড়াবার মতো কয়েকখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ •

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর
ভারতকথা
সুললিত ভাষায় গল্পাকারে লিখিত মহাভারতের কাহিনী
দাম : ৮·০০ টাকা
*
প্রফুল্লকুমার সরকারের
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ
২য় সংস্করণ : ২·০০ টাকা
অনাগত
২য় সংস্করণ : ২·০০ টাকা
ভ্রষ্টলগ্ন
২য় সংস্করণ : ২·৫০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ
শুধু ইতিহাস নয়, ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য। ভারতের দৃষ্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের বিচার।
২য় সংস্করণ : ১৩·০০ টাকা
*
শ্রীজওহরলাল নেহরুর
আত্ম-চরিত
৩য় সংস্করণ : ১০·০০ টাকা
*
মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে
দাম : ২·৩০ টাকা

অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন
ভারত-ইতিহাসের এক বিরাট পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণের বহু রহস্য ও অজ্ঞাত তথ্যাবলী
২য় সংস্করণ : ৭·৫০ টাকা
*
আর জে মিনির
চার্লস চ্যাপলিন
দাম : ৫·০০ টাকা
*
শ্রীসরলাবালা সরকারের
অর্ঘ্য
(কবিতা-সঞ্চয়ন)
দাম : ৩·০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা ৯

অপূর্ব সুযোগ

সহজ কিস্তিতে কিনুন—কোন বাড়তি খরচ নেই।

উষা ফ্যান

সহজ কিস্তিতে ১৯৫৭ পর্যন্ত

- ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫৭ পর্যন্ত এই সুযোগ পাবেন।
- যত শীঘ্র কিনবেন কিস্তির হারে ততই সুবিধা হবে।

বিনা খরচায় মেশিনের গুণাবলী দেখে নিন

আপনার নিকটতম উষা বিক্রেতাকে বলা মাত্রই সে আপনার বাড়িতে এসে বিনা খরচায় আপনাকে উষা মেশিনের গুণাবলী কল চালিয়ে দেখিয়ে যাবে। আপনার কোনও রকম বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

উষা সেলাই মেশিন

জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, কলিকাতা

পড়লে না? শুধু আমাকে গ্রা... তে চাইলে। তবু বুঝিয়ে তিরস্কার কর... রেখেছিলাম। আর হিন্দু-বিবা... য়। তারপর নীরা এল। হ্যাঁ। ওকে আ... ল-বেসেছিলাম। সত্যিই মনে হয়েছি... এই মেয়েটির জন্যে জন্মান্তরে তপস্যা ... — এ জন্মেও এতদিন ওর পথ চে... সে আছি। আমার বয়স বেশী হয়েছি... তু আমি জীবনে তপস্যা করে নিজেকে ... ব করতে পারতাম। তাই, সে দিন, য... ওর স্কলারশিপের চিঠি এল: আমিই ... থা করেছিলাম: সেদিন মনে হল, এই ... রা আমার চিরজীবনের জন্য হারিয়ে যা... ন আর থাকতে পারি নি। ভুলের মা... -খানা লিখে ফেললাম। নীরা আমা... তে দিয়ে চলে গেল। লোকের কাছে... মা সম্পর্কে অপরাধের রায় দিয়ে গেল ... র মত। ওদিকে ডাইভোর্স বিল প... । ডাইভোর্স করিয়ে অপরাধ থেকে ... য়ে রাক্ষসীকে বললাম—নে প্রেস কর ... । দিদি—ও আমাকেও বলেনি ও... র কথা। প্রথম দিনেই দেহ স্প... র বুঝলাম। কিন্তু তখন আর তে... লা না। আর এত সেবা? এটা কি ... -হেলা করব বল? তা-ছাড়া আর... কি হবে বোঁচে! ডাক্তারও তাই বলে... যে চাচ্ছেন না উনি!

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নীরা...

পায়ের তলায় পৃথিবীটার এপা... —ওপাশ নামছে। না—চারিটা ... খেয়ে বনবন করে ঘুরছে: সব ... ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

অণিমাদি বললেন—নীর... টলছিস। নীরা!

চেতনা হতেই সে ডাকলে—...

ভাল সব সময়েই ...

মজুমদার ব্রাদার্স অ্যান্ড ...
কলিকাতা—১

বিনামূল্যে ধবল

বা শ্বেতকুষ্ঠের ৫০,০০০ প্যাকেট নমুনা ঔষধ বিতরণ। ভিঃ পিঃ ৮০। চর্মরোগ-চিকিৎসক কবিরাজ শ্রীবিনয়শঙ্কর রায়, ৩নং হরগঞ্জ রোড। পোঃ সালিখা, হাওড়া। ব্রাঞ্চ—৪৯বি, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। ফোন : ৬৬—৩৬৪২। (পি ৯৪৩৯)

মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(একটি তপশীলভুক্ত ব্যাংক)

দক্ষতা ও নিরাপত্তা

সুনিশ্চিত

ব্যাংক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়

প্রধান অফিস :

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৩

শাখাসমূহ :

মিশন রো, উত্তর কলিকাতা, দক্ষিণ কলিকাতা, খড়্গপুর,

কোচবিহার ও আলিপুর দুয়ার

আস। কোথায়? অণিমাদি!

ই যে! যাক সুস্থ হয়েছিস। আর এশুয়ে থাক!
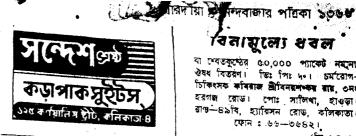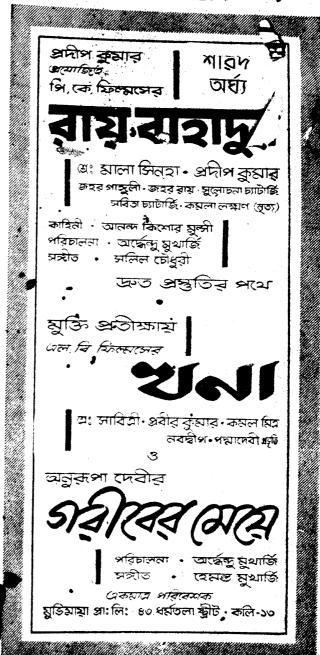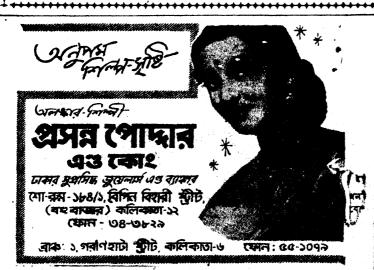
আমি তোমার সঙ্গে যাব। অণিমাদি!

বসল সে। চোখ দিয়ে তার জল প। মায়ের মৃত্যুর পর আজ সে প্রথম ব। হেরেছে সে। সে হারে তার লজ্জা দৈন্য নেই, গোপনের চেষ্টা নেই—ীর সবার সামনে সে কাঁদছে—।

*

াহৌসিতে যখন পৌছুল তখন হ্য বেলা। তার জন্যে প্রায় বারোঘণ্টা হয়ে গেছে। একটা মোড় ফিরেই—াদি বলতে গেলেন—ওই বাংলো—। নীরাই বললে—ওই যে!

ন ভেসে আসছে। সে কণ্ঠস্বর আর তবুও তার অবশেষ তো যাবার নয়।

আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে,

চাও কি—

, বুঝি তার খবর পেলে না।"

কণ্ঠটা থামল। উনি ওদিকের বারান্দায় গেছে চলেছেন—সামনে টাঙানো 'মহা-া' ছবি—শেষ কলি গাইছেন—

ক উঠেছে বারেবারে,

তুমি সাড়া দাও কি॥

ত ঝলেনদিনে দোলন লাগে,

তোমার পরাণ হেলে না॥

য়, বুঝি তার খবর পেলে না।"

রা এসে পায়ের ওপর উপুড় হয়ে ।

কে? —কে?

ঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে নীরা। বাঁধ ভেঙ্গে গঙ্গোত্রীর!

নীরা?

-আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে তুমি ক্ষমা

-ক্ষমা? আমার ক্ষমার মূর্তিই যে । কিন্তু এত দেরি করে এলে?

—না—আসি নি। দেরি হয় নি! কিন্তু মহাশ্বেতার ও কি ছবি এঁকেছ?

—বেশ, কাল থেকে পুণ্ডরীকের জীবন আঁকব।

আবার কাঁদতে লাগল নীরা। তার মাথায় রাখলেন বিনয় সেন।

হে অদৃশ্য রঙ্গমঞ্চ-পরিচালক—আর না। নকা ফেল। শেষ কর!

সমাপ্ত

"জ্যোতিষের যুগান্তর"

তপস্বী রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের পৌত্র

তান্ত্রিকাচার্য শ্রীউমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

কোষ্ঠী ও হস্তরেখা বিচারে সকলকে কারিতেছেন। তাঁহার অলৌকিক তান্ত্রিক ও ফলিত বিচার বিস্ময়কর ও । ডাকটিকিট সহ পত্র লিখুন—

জ্যোতিষ গবেষণা কেন্দ্র

৫, রাজা কালীকৃষ্ণ ২য় লেন, কলি—৫

বাংলা ছবির বিবর্তন

সেবাব্রত গুপ্ত

গত এক দশকের বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস সংক্রান্তি-পূর্ণ ও বৈচিত্র্যাভিগ। এই দশকে বাংলা ছবির কূলে এসে আঘাত করেছে বিচিত্র প্রাণচাঞ্চল্যের ঢেউ, পরিচিত তীর থেকে নতুন দিগন্তের সন্ধানে নোঙর তুলেছেন দুঃসাহসিক নবাগতরা। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে বাংলা ছবির ব্যবহারিক ও মানসবাণিজ্যও [illegible] হয়েছে এই অতি আধুনিককালে। [illegible] ও আবিষ্কার ধর্মের এই বাণিজ্যে [illegible] সাঁস আখ্যা দেওয়া যায় কি না সে প্রশ্ন আপাতত স্থগিত রেখে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বাংলা ছবি এখন প্রাচীনের অন্তরাগ ও নবীনের পূর্বরাগের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে অনুবীক্ষণে এই নব-উন্মেষের মধ্যেও অবক্ষয়ের কোন প্রচ্ছন্ন বীজাণু ধরা পড়বে কি না এই প্রশ্ন আমরা সবিনয়ে উত্থাপন করতে পারি।

আলোচনার ভূমিতে পৌঁছবার আগে সামান্য ভূমিকার প্রয়োজন। চলচ্চিত্র যে শুধু নিষ্প্রাণ যন্ত্রের কারিগরি নয়—এ-সত্য নিঃসংশয়ে স্বীকৃত। গল্প লেখা বা কবিতা রচনা করা হাতের কাজ হয়েও যেমন আর্ট, চলচ্চিত্রও তেমনি যন্ত্রের কারিগরি হয়েও রূপ ও বাণীর মায়াসৃষ্টির ভেতর দিয়ে আর্টের পর্যায়ে উন্নীত। আর সাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের সম্বন্ধ যেমন নিবিড়, ছায়াছবির সঙ্গেও দর্শকের সম্বন্ধ তেমনি প্রত্যক্ষ। ছায়াছবি সাহিত্যের ভাষাকে দেয়

ধবল বা শ্বেতি
(LEUCODERMA)
দুরারোগ্য নহে, স্বল্পব্যয়ে ও অল্পদিনে নিশ্চিহ্ন হয়। পুরাতন ও দুরারোগ্য রোগের বিশ্বস্ত চিকিৎসাকেন্দ্র। সাক্ষাৎ বা পত্রালাপ—ডাঃ কুণ্ডু (Dermatologist), ৬৪।৯, নরসিং এভিনু, কলিকাতা—২৮।
Leucoderma Research & Cure Centre
(সে ১৯৭০)

ভাল সব [illegible]ই ভাল

মজুমদার ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোং
কলিকাতা—১

পূজা পার্ব্বণে · বিবাহে · উপনয়নে
ঘরে ঘরে—
রাঙ্গাজবা
সিন্দুর · আলতা
স্নো · পাউডার
সাবান · কেশ তৈল
সকলে হৃদয় স্পর্শ করে!
রাঙ্গাজবা কেমিক্যাল · কলিকাতা-৪০

শুভমুক্তি সমাসন্ন